বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

জওহরলাল নেহরু

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY"

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

জে. এফ. হোরাবিন অঙ্কিত
৫০ খানা মানচিত্র সম্বলিত

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী
কলিকাতা—৯

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীজওহরলাল নেহরু রচিত GLIMPSES OF WORLD HISTORY বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থ,—আমাদের পক্ষে নূতন করিয়া উহার পরিচয় দিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

এই অনুবাদে মূলগ্রন্থের অধুনাতম সংস্করণের সম্পূর্ণপাঠ সম্বলিত হইয়াছে। ইংরেজীগ্রন্থে প্রকাশিত মিঃ জে. এফ. হোরাবিন অঙ্কিত অসাধারণ নৈপুণ্য ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মানচিত্রগুলিও বাংলা পরিচয়লিপিসহ এই অনুবাদগ্রন্থে মুদ্রিত হইল। এই বিরাট গ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্রণ ব্যাপারে আমাদিগকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তজ্জন্য কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হইতে পারে। আশা করি পাঠকবর্গ এইসব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করিবেন।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশনের ব্যাপারে বহু কৃতী বন্ধুর নিকট বহু-প্রকার সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দেশের জনসাধারণ যদি বইখানি পড়িয়া আনন্দ পান এবং বিশ্ব-ইতিহাস আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বোধ করিব।

জন্মাষ্টমী, ১৩৫৮ — শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

পরিচিতি

১৯৩০ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৩৩ সনের আগস্ট, এই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে GLIMPSES OF WORLD HISTORY (বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ) লিখিত হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং ভারতে বৃটিশ-শাসনের প্রতিরোধ করিবার অপরাধে গ্রন্থকার তখন কারাজীবন যাপন করিতেছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এই অবশ্য বিশ্রামের—তাঁহার নিজের ভাষায়, 'অবকাশ ও নির্লিপ্তির',—সুযোগ গ্রহণ করেন এবং বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বালিকা কন্যার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাকারে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, কারণ প্রায়ই কারাগারে রুদ্ধ থাকার ফলে এই কন্যার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করার কোন সুযোগ তাঁহার ছিল না।

১৯৩৪ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুনরায় ধৃত হইয়া 'রাজদ্রোহে'র' অপরাধে দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্বে পণ্ডিত নেহরু যখন অত্যল্পকালের জন্য অবকাশ পাইয়াছিলেন, তখন তিনি এই পত্রগুলি একত্রিত করেন। অতঃপর ১৯৩৪ সনে তাঁহার ভগ্নী মাননীয়া শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত * * * এই পত্রগুলিকে GLIMPSES OF WORLD HISTORY (বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন।

নামকরণ যথোপযুক্তই হইয়াছে। পুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিচিতির পক্ষে এই নামটির ব্যঞ্জনা যথেষ্ট। * * *

১৯৩৬ সনে মুক্তিলাভের পর পুনরায় পণ্ডিত নেহরু রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ইহার পর কর্মব্যস্ততা, দায়িত্ব এবং, দুর্ভাগ্যবশত, পারিবারিক বিয়োগ-বেদনায় তাঁহার আর অবকাশ থাকে না। ভারতেও ঘটনাবলী তীব্রতা ও ত্বরার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। ইউরোপ তথা পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন ও যুগান্তকারী ঘটনাসমূহ পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিতজী ভাবী সভ্যতার পক্ষে অর্থময় এই সকল ঘটনার দর্শকমাত্র ছিলেন না, সেগুলিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করিয়াছিলেন। কেন না, পণ্ডিত নেহরু সেই বিরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননায়কদের অন্যতম যাঁহাদের মধ্যে উদ্দাম কর্মতৎপরতার সহিত দৃষ্টির প্রসারতা ও নিস্পৃহতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইউরোপ ভ্রমণকালে পণ্ডিতজী পাশ্চাত্ত্য জগতের কতিপয় সাম্প্রতিক ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি চীন ও স্পেনের সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন।

বর্তমান সংস্করণটিকে অনেকদিক হইতে একখানি নূতন বই বলা চলে, স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক ইহা সংশোধিত, বহুল পরিমাণে পুনর্লিখিত এবং ~~১৯৩৮~~ ১৯৩৮ সনের শেষ পর্যন্ত ঘটনা সংবলিত করা হইয়াছে। এই কাজগুলি তিনি কারাগারের বাহিরে করিলেও ইহাতে মূল রচনার নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতা বিন্দুমাত্রও ব্যাহত হয় নাই। বরং ইহা অধিকতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

GLIMPSES OF WORLD HISTORY (বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ) ঘটনার বিবরণী মাত্র নহে। বিবরণের দিক হইতে উহা যেমন মূল্যবান, তেমনি লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপও উহাতে বর্তমান। তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও অনুভূতিপ্রবণ মন এই ইতিহাস গ্রন্থকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। বর্ধিষ্ণু শিশুর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের আকারও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহার আবেদন সরল এবং ঋজু; কিন্তু বিষয়বস্তুর আলোচনা কোথাও অগভীর নহে। ঘটনার বিবৃতি বা তাৎপর্য বিশ্লেষণ কোথাও অতিমাত্রায় সরলীকৃত হয় নাই। * * *

লণ্ডন
মে, ১৯৩৯

ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন

ইংরেজী চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

"বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গে"র শেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হইবার পর যে তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাতে ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীতে বহু ঐতিহাসিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। ঐ সকল পরিবর্তনের অর্থ এবং আঘাত যেমন ব্যাপক তেমনি বৈপ্লবিক। যাঁহারা ইতিহাস হইতে প্রেরণা ও পথের সংকেত পাইতে চাহেন, যাঁহারা ইতিহাসের সতর্ক-বাণী এবং তাহার পৌর্বাপৌর্য চেতনার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থ এখন অর্থে ও ইঙ্গিতে আরও সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

উপরন্তু এই ঘটনাবলী গ্রন্থকারকে একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকাররূপে অভিব্যক্ত করিয়াছে। তিনি নির্ভুল এবং দুঃসাহসিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমাদের জন্য ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহের তাৎপর্যালোচনা করিয়াছেন। সংগ্রামের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে সে দৃঢ়তার সহিত শান্ত সমাহিতভাবে বিরাট সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতেছে। ফলে, যে-সকল ঘটনাবলীর সমাবেশে চলতি ইতিহাস রচিত হয় তাহাতে নব-ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও বহুবাঞ্ছিত নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এতটা বিজড়িত আছেন যে এই গ্রন্থখানিকে বর্তমান কালপর্যন্ত টানিয়া আনিবার মতো অবসর তাঁহার নাই।

আমরা অবশ্যই আশা করিয়া থাকিব যে, অনতিদূর ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার ব্যাখ্যান-প্রতিভার দ্বারা আমাদিগকে ও ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে উপকৃত করিবার সুযোগ পাইবেন। যাহাই হউক, বর্তমানে যেমনটি আছে তাহাতেও "বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ"কে সমকালের বলা চলে, কারণ, ইহা সর্বকালের।

লণ্ডন
মে, ১৯৪৮

ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন

প্রস্তাবনা

এই পত্রগুলি কবে ও কোথায় প্রকাশিত হইবে, বা আদৌ প্রকাশিত হইবে কিনা, জানি না। নানা বিচিত্র ঘটনার ভরে ভারতবর্ষ আজ টলমল করিতেছে; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলাই এখন কঠিন ব্যাপার। তবুও এই কয়টি কথা লিখিয়া রাখিতেছি—এখনও আমার লিখিবার মত অবসর আছে, হয়তো পরে আর থাকিবে না।

এই পত্রাবলী ইতিহাস লইয়া রচিত, ইহার জন্য একটু কৈফিয়ত ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পত্রগুলি পড়িতে পড়িতে হয়তো পাঠক নিজেই আমার সে কৈফিয়ত ও ব্যাখ্যাটি বুঝিয়া লইবেন। বিশেষ করিয়া ইহার শেষ পত্রটি পড়িয়া দেখিতে বলিব; হয়তো এই বইটি সেই শেষ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করাই সুযুক্তি, কারণ জগৎটাই এখন উল্টোপাল্টা হইয়া আছে।

পত্রগুলি ক্রমশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলি লিখিবার পূর্বে আমি কোন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা করিয়া লই নাই; এইগুলি এমন বৃহৎ আকার ধারণ করিবে সে-ধারণাও আমার ছিল না। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের কথা, আমার কন্যার বয়স তখন দশ বৎসর। সেই সময়ে আমি তাহাকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বজগতের প্রথম যুগ সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত ও সরল বিবরণ ছিল। প্রথম-কালের সেই পত্রগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, পাঠকের নিকটেও সেটি আদৃত হইয়াছিল। সেইরূপ পত্র আরও কিছুদূর লিখিয়া চলিব, এই কল্পনা আমার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপ লইয়া আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি এত ব্যস্ত যে, কল্পনাকে কার্যে রূপ দিবার অবসর পাই নাই। কারাবাসে সেই অবসর পাইলাম, তাহার সদ্ব্যবহারও করিলাম।

কারা-জীবনের কতকগুলি সুবিধা আছে : সেখানে কাজের অবসর পাওয়া যায়, মনকে কিছুটা সমাহিত করিয়া আনা যায়। কিন্তু ইহার অসুবিধাগুলিও অতি প্রখর। পুঁথিপত্রের বালাই বন্দীর থাকে না; সে-অবস্থায় বই লিখিতে, বিশেষতঃ ইতিহাসের বই লিখিতে বসা দুঃসাহসের কাজ। কিছু কিছু বই অবশ্য আমার হাতে পৌঁছিত, কিন্তু সেগুলিকে হাতের কাছে আটকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না—বই আসিত, আবার চলিয়া যাইত।

কিন্তু বারো বৎসর পূর্বে আমার দেশের বহু পুরুষ ও নারীর সহিত একত্রে আমি কারাতীর্থের পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; সেই সময়ে একটি বস্তু অভ্যাস করিয়াছিলাম—যে-বই পড়িলাম তাহার সংক্ষিপ্ত টীকা লিখিয়া রাখা। আমার এই টীকার খাতা ক্রমশ সঞ্চিত হইয়াছে; যখন লিখিতে বসিলাম, এই খাতাগুলি আমার সহায় হইল। অবশ্য ইহা ছাড়া আরও বহু বই হইতেও আমি প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর OUTLINES OF HISTORY ইহাদের অন্যতম। তবুও, দেখিয়া লইবার মত ভাল পুঁথিপত্রের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছি; এই অভাবের জন্যই বহু স্থলে বহু আলোচনাকে অস্পষ্ট রাখিতে হইয়াছে, বহু কালের কাহিনীকে বাদ দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি।

এই চিঠিগুলি একটি বিশেষ ব্যক্তিকে লেখা, ইহার মধ্যে বহুস্থানে এমন একান্ত কথা আছে যাহা শুধু আমার কন্যাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। সেগুলিকে লইয়া এখন কী করি সেও এক সমস্যা; পত্র হইতে সেগুলিকে বাদ দিতে গেলে এখন আবার অনেক কাটাকুটি করিতে হয়। সুতরাং আমি সেগুলি কিছুই করিলাম না, যেমন ছিল তেমনই রাখিয়া দিলাম।

দৈহিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে অন্তর্দৃষ্টির অভ্যাস বাড়ে, মানুষের মন ও চেতনায় ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। এক এক সময়ে আমার মনে এক এক রূপ ভাব দেখা দিয়াছে,

সেই পরিবর্তনের ছাপ এই পত্রগুলির মধ্যেও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসের বর্ণনা যেরূপ নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক হওয়া উচিত, এই পত্রের বর্ণনা সেরূপ হয় নাই। আমি ইতিহাসকার নহি, ইতিহাস লিখি নাই। এই পত্রাবলীর মধ্যে বহু স্থলে অপরিণত শিশুর নিকটে বলা সহজ আলোচনা এবং পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তির যোগ্য গুরু-গম্ভীর আলোচনার অসম মিশ্রণ ঘটিয়াছে, বহু স্থলে একই কথার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। বস্তুত, কত রকম ত্রুটি যে এই পত্রগুলির মধ্যে আছে তাহার সীমা নাই। এগুলি আর কিছুই নয়, কতকগুলি ভাসাভাসা বর্ণনা আর কাহিনী, গল্প বলার সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া কোনক্রমে একত্র গাঁথা, এই মাত্র। কাহিনীর মধ্যে যেসকল তথ্য ও জল্পনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও আমি সংগ্রহ করিয়াছি বিশৃঙ্খল ভাবে—যখন যে-বইটি হাতের কাছে পাইয়াছি তাহা হইতে। অতএব এই বিবরণের মধ্যে ভুলত্রুটিও অনেক থাকা সম্ভব। আমার ইচ্ছা ছিল—কোন দক্ষ ইতিহাসবেত্তাকে দিয়া পত্রগুলি আগাগোড়া সংশোধন করাইয়া লইব। কিন্তু কারাগারের বাহিরে যে অল্প কয়টা দিন কাটাইয়া যাইতেছি, তাহার মধ্যে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার অবসর আমি পাইলাম না।

এই পত্রগুলির মধ্যে আমি বহুস্থলে আমার মতামত অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি; সে মতামত আমার এখনও বদলায় নাই। কিন্তু পত্রগুলি যেসময়ে লিখিতেছিলাম সেই সময়ের মধ্যেই জগতের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমশ বদলাইয়া যাইতেছিল। পত্রগুলি তখন লিখিয়াছি; এখন যদি লিখিতে হইত তবে ইহার অনেক কথা আমি অন্যভাবে ও অন্যভঙ্গীতে লিখিতাম। কিন্তু যেকথা একবার বলিয়াছি তাহা মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া বলিব, ইহাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১লা জানুয়ারী,
১৯৩৪

জওহরলাল নেহরু

সূচীপত্র

সেণ্ট্রাল জেল : নাইনি

এস. এস. ক্র্যাকোভিয়া-জাহাজ : আরব সাগর

ডিস্ট্রিক্ট জেল : বেরিলী

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মানচিত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

মানচিত্র

জন্মদিনের চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীকে লেখা,
তার ত্রয়োদশ জন্মতিথিতে

সেণ্ট্রাল জেল, নাইনি
২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০

ছেলেবেলা থেকেই তোমার জন্মদিনে তুমি উপহার আর শুভেচ্ছা পেয়ে এসেছ। নাইনির জেল থেকে আমি কেবল তোমায় আন্তরিক শুভেচ্ছাই পাঠাতে পারি। উপহার আর কী পাঠাব তোমায়? কয়েদখানার ভিতর থেকে তোমায় যে উপহার আমি পাঠাব তাকে বন্দী করে এমন সাধ্যি এই চারদিকের উঁচু প্রাচীরের নেই, কারণ সে উপহার হল আমার মনের জিনিষ।

তুমি তো জানো, সদুপদেশ দেওয়া আমার ধাতে সয় না। যখনই ওরকম একটা-কিছু করতে আমার ইচ্ছা হয় তখনই আমার মনে পড়ে সেই বিজ্ঞ লোকের উপাখ্যান। এ গল্পটি যে বইয়ে আছে সেটি তুমি একদিন হয়তো পড়বে। তেরো শো বছর আগে চীনদেশের একজন পরিব্রাজক এসেছিলেন আমাদের দেশে, জ্ঞানান্বেষণ করতে। জ্ঞানস্পৃহা তাঁর এত প্রবল যে উত্তরদিকের কত-শত পাহাড়পর্বত, নদনদী, মরুভূমি অতিক্রম করে, বহু সংকট, অনেক বাধা তুচ্ছ করে তিনি এসেছিলেন। তাঁর নাম ছিল হিউয়েন সাঙ। আজকাল যে শহরের নাম পাটনা, পুরাকালে তারই নাম ছিল পাটলিপুত্র—সেই পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহুকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির জন্য এবং বৌদ্ধনীতিশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অধিকার থাকার দরুন তাঁকে "নীতিবিশারদ" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি এক ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। আমার যে উপাখ্যানের কথা মনে হয়েছে সেটা এই বই থেকে নেওয়া। এই উপাখ্যানে বর্ণিত বিজ্ঞ লোকটি ছিলেন দক্ষিণী—তিনি কর্ণসুবর্ণ নগরীতে (আজকালকার ভাগলপুর) একটা বিচিত্র পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর মাথায় বাঁধা থাকত একটা জ্বলন্ত মশাল, তাঁর কোমর থেকে উদর অবধি ঢাকা থাকত তামার পাত দিয়ে। লম্বা লম্বা পা ফেলে, হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে, বুক ফুলিয়ে তিনি বেড়াতেন। লোকে প্রশ্ন করলে বলতেন, তাঁর অগাধ জ্ঞান পেট ফেটে বেরিয়ে যেতে পারে এই ভয়েই ওরকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অজ্ঞানান্ধকারে যারা পথ খুঁজে হাতড়ে বেড়াচ্ছে তাদেরই জন্যে তিনি মাথায় মশাল ধরে থাকেন—এইরকম ছিল তাঁর জবাব।

ভাগ্যিস আমার অগাধ জ্ঞান নেই, কাজেই আমার বর্মে-চর্মেও কাজ নেই। আর যাই হোক, জ্ঞান যে আমার উদরপ্রদেশে বাস করে না এ বিশ্বাসটুকু আমার আছে। এও জানি যে জ্ঞানের বাসস্থান যেখানেই হোক-না কেন, এবং সে যতই বৃদ্ধি লাভ করুক-না কেন, তার স্থান-সংকুলান হবেই। কাজেই আমার এই স্বল্প বুদ্ধি নিয়ে আমি উপদেশ দেবার মতো ধৃষ্টতা করব না—আমার অতিবিজ্ঞ হয়ে কাজ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপদেশ দিয়ে যতটা না হোক, আলাপে আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বেশি সহজে ভালোমন্দ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করা যায়। তোমার আমার মধ্যে অনেক কথা হয়েছে, তা বলে মনে কোরো না—সেই অতিবিজ্ঞের মতো—যা শেখবার মতো বা শেখবার তা শেখা হয়ে গেছে, জানা হয়ে গেছে। আমাদের এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ছাড়াও আরও কতসব আশ্চর্য জগৎ আছে—তাদের সম্বন্ধে শিখতে হলে, জানতে হলে কিন্তু অতিবিজ্ঞের মতো বড়াই করলে চলবে না। আমাদের অত বেশি জ্ঞান হয়ে কাজ নেই, কী বলো? তা হলে তো জ্ঞানের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে, আর নিত্য নূতন জিনিষ শেখার কিংবা নিত্য নূতন আবিষ্কার করবার আনন্দ আমরা আর পাব না।

কাজেই, অতিবিজ্ঞের মতো উপদেশ দিয়ে কাজ নেই। তা হলে কী করি, বলো? চিঠি যদি আলাপ হয় তবে তো সে হবে একতরফা। কাজেই যদি আমি এমন কিছু বলি যা সদুপদেশের মতো শোনায় তা হলে সেটাকে বিরক্তিকর ভেবো না। মনে কোরো, যেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে একটা প্রস্তাব উত্থাপিত করছি।

জাতির ইতিহাসে যুগপ্রবর্তনের কথা পড়েছ। ইতিহাসবিখ্যাত নরনারীদের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে আমরা কল্পনা করি, সেই বীর ও বীরাঙ্গনাদের মতো আমরাও যেন সব বড়ো বড়ো কাজ করতে পারি। তুমি যখন ছোটো ছিলে তখন জোয়ান অব আর্ক-এর গল্প পড়ে ভেবেছ, কেমন করে তাঁর মতো হতে পারবে। সাধারণ মানুষ বীরত্বের ধার দিয়েও যায় না, নিজের নিজের সন্তানসন্ততি বাড়িঘরদোর নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এমনসব সময় আসে যখন বড়ো-একটা-কিছুর জন্যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এরাও অসাধারণ হয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো নেতারা যখন জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলেন তখন ইতিহাসে যুগপ্রবর্তন হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে—যে সালে তোমার জন্ম—এইরকম একজন যুগপ্রবর্তক তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। দুঃস্থ এবং দরিদ্রের জন্যে তাঁর হৃদয় প্রেমে ও করুণায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। ঠিক তোমার যে মাসে জন্ম সেই মাসেই যুগান্তকারী রুশ-বিপ্লব ঘটেছিল এবং তার নেতা ছিলেন লেনিন। আজ আমাদের ভারতবর্ষে ঠিক তেমনি একজন নেতা আমরা পেয়েছি, যাঁর প্রেম ও সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী স্বরাজ-সাধনার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী আজ তাঁর মহতী বাণী শুনেছে, যদিচ সেই বাপুজি আজ কারাগারে। তারা আজ তাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ছেড়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের মস্ত বড়ো সৌভাগ্য যে, আজ আমরা আমাদের চোখের সামনেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যুগ-প্রবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি।

এই বিরাট আন্দোলনে আমাদের উপর কী কর্তব্যভার পড়বে সে আমি জানি না; শুধু এইটুকু জানি যে, আমাদের স্বরাজ-সাধনা এবং আমাদের দেশ যাতে আমাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অবমানিত না হয়, সেটুকুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি ভারতের মুক্তিসেনা হতে চাই তবে মনে রাখতে হবে যে ভারতের সম্মান আমাদের হাতে গচ্ছিত রয়েছে এবং প্রাণ দিয়েও তাকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে হবে। অনেক সময় আমরা হয়তো আস্থা হারাব, আমাদের পক্ষে কী যে শ্রেয় সে সম্বন্ধে বহু সন্দেহ আসবে। এইরকম দোটানায় ও সংকটের সময় মনে রাখতে হবে, আমরা এমন কিছু যেন কখনও না করি যার জন্যে আমাদের একদিন লজ্জা পেতে হবে, এমন কিছু যেন না করি যা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে হবে। গোপন করার চেষ্টা ভীরুর—সে চেষ্টা ভারতের মুক্তিসেনার অযোগ্য। মনের সাহস ও হৃদয়ের বলই হল সবচেয়ে বড়ো ভরসা, বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে এই সাহস অবলম্বন করতে হবে। বাপুজির নেতৃত্বে আমরা যে এই স্বরাজ-আন্দোলন করছি এর মধ্যে লুকোচুরি বা ভয়ের তো কিছু নেই। প্রত্যক্ষ দিবালোকে আমরা আমাদের কর্তব্য করে যাচ্ছি। ব্যক্তিগত জীবনেও যদি আমরা আলোকে ভয় না করি, তবে দেখবে যে কোনো কিছুই আমাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে পারবে না।

দেখেছ, কী মস্ত লম্বা চিঠি হয়ে গেল! তবু তোমাকে বলার মতো কথা যেন ফুরোয়ই না, সামান্য চিঠিতে কতটুকুই-বা বলা যায়?

বলেছি তো তোমায়, এ তোমার পরম সৌভাগ্য যে এদেশের সেই বিরাট স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিজে দেখতে পাচ্ছ। তোমার পক্ষে আরও ভাগ্যের কথা যে, তুমি এমন জননী পেয়েছ যিনি ক্ষীণকায়া হলেও খুব তেজস্বী ও চমৎকার। কোনোরূপ বিপদ বা সংকট উপস্থিত হলে তাঁর চেয়ে সত্যিকার বন্ধু তুমি আর কোথাও পাবে না।

এবার শেষ করি। আশা করি বড়ো হয়ে তুমিও ভারতের একজন মুক্তিসেনা হবে।

১

নববর্ষের উপহার

নববর্ষের প্রথম দিন, ১৯৩১

মনে আছে তোমার, দু বছর আগে আমি যখন এলাহাবাদে ছিলাম আর তুমি ছিলে মুসৌরিতে, তখন তোমাকে কতগুলি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেগুলি তোমার নাকি ভালো লেগেছিল। তার পর থেকে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, আমাদের এই পৃথিবী সম্বন্ধে ওই পর্যায়ের অনুসারী আরও কিছু তোমায় লিখব কি না। কেমন যেন দ্বিধা হয়েছিল এই সেদিনও। পুরোনোকালের ইতিহাস, বীর ও বীরাঙ্গনাদের কাহিনী পড়তে খুব ভালো লাগে, না? কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক ভালো হয় যদি আমরা ইতিহাস-গঠনে সাহায্য করি আমাদের নিজেদের কর্তব্য করে। বলেছি তো তোমায়, আমাদের দেশের ইতিহাসে একটা নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে। ভারতের অতীত অতি পুরাতনের আবছায়া কুয়াশায় আবৃত; কতশত শতাব্দী, কত হাজার বছর আগে যে আমাদের ইতিহাসের শুরু সে আমরাই ঠিক বলতে পারি নে। ভারতের অতীত ইতিহাসের কলঙ্কের কথা স্মরণ করলে আমাদের লজ্জিত ও দুঃখিত হতে হয়; তবু মোটামুটি ধরলে বোঝা যায় যে আমাদের অতীত-গৌরবও কম ছিল না। সেই গৌরবময় অতীতদিনের স্মৃতি এখনও আমাদের গর্বের জিনিষ। আজ কিন্তু পুরাতনের কথা মনে করে সময়ক্ষেপ করলে আমাদের চলবে না। যে বর্তমানের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং যে ভবিষ্যৎকে আমরা গড়ে তুলছি তার কথাই আজ আমাদের মনে রাখতে হবে।

তোমাকে যা লিখব ভেবেছিলাম সে সম্বন্ধে নাইনি জেলে বসে অনেক মালমশলা সংগ্রহ করেছি অবশ্য, তবু মন আমার কিছুতেই বসতে চায় না; কেবলই ভাবি বাইরের বিরাট আন্দোলনের কথা, ভাবি, বাইরের লোকেরা স্বরাজ-সাধনায় যে কর্তব্য করছে তাই আমিও করতাম আজ তাদের সঙ্গে থাকলে। বর্তমানের সব ঘটনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমার সমস্ত মনটাকে জুড়ে আছে। তাই আর অতীতের কথা ভাববার সময় নেই। বুঝি অবশ্য যে, বাইরের কাজে যোগ দিতে পারব না, সুতরাং এভাবে বিচলিত হওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়।

কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ধরনের চিঠি লিখি নি কেন তার সত্যি কারণটা বলি শোনো। আমার এখন ভাবনা হচ্ছে, আমি কতটুকুই-বা জানি যার বলে তোমাকে শিক্ষা দেব। বুদ্ধিতে এবং মাথায় তুমি এমন চটপট বড়ো হয়ে উঠছ—আমি স্কুল-কলেজে এবং তার পরেও যত পড়াশোনা করেছি তা হয়তো তোমার পক্ষে অতিসামান্য কিংবা অতিসাধারণ মনে হতে পারে। আরও কিছুদিন পরে তুমিই হয়তো শিক্ষক হয়ে অনেক নূতন নূতন জিনিষ শেখাবে আমাকে! কেমন? তোমার জন্মদিনে লেখা চিঠিটাতে লিখেছি-না যে অতিবিজ্ঞের মতো আমার অত জ্ঞান নেই যে বিদ্যে ফেটে বেরিয়ে পড়বার ভয়ে বর্ম এ'টে রাখতে হবে!

পৃথিবীর একেবারে প্রাচীনকালের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয় বলে সে সম্বন্ধে যা তোমাকে লিখেছিলাম তার জন্যে আমার খুব বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু যেই আমরা অতিপুরাতনের খোলস ছেড়ে সত্যিকার ইতিহাসের সূচনায় আসি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাদেশে বিভিন্ন সভ্যতার পরিব্যাপ্তি দেখতে আরম্ভ করি, তখন শতসহস্র ঘটনার সংঘাত মানবসমাজের বিচিত্র পরিণতির নানাবিধ খুঁটিনাটির মধ্যে পড়ে, বুদ্ধি যেন পথ হারিয়ে ফেলে। বই পড়ে অবশ্য অনেক সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু নাইনি জেলে তো সে সুবিধে নেই। কাজেই পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আশা কোরো না আমার কাছ থেকে। ছেলেমেয়েরা যখন সন তারিখ মুখস্থ করে বিশেষ কোনো-একটি দেশের ইতিহাস আয়ত্ত করতে চায়, তখন আমার ভারি দুঃখ হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে সেটাকে উপেক্ষা করলে ইতিহাস টে'কে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি ওরকম বিশেষ একটা কি দুটো দেশের ইতিহাস পড়তে যাবে না—ওটা ভুল। সমস্ত

পৃথিবীর ইতিহাস বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে পরম্পরাক্রমে আমাদের দেখে নিতে হবে। মনে রেখো যে জাতে জাতে এবং দেশে দেশে যে বৈষম্যটুকু আছে বলে আমরা মনে করি তা সব সময়ে সত্যি নয়। মানচিত্রে এবং ভূপরিচয়ে আমরা সাধারণত নানান দেশ, নানান রঙে রঞ্জিত দেখি—মানুষে মানুষে ওইরকম বৈষম্য আছে, কিন্তু মিলও আছে। কাজেই সীমারেখা আর মানচিত্রের নজির অনুসারে চললে আমরা অনেক সময় ভুল করব।

আমি যে ধরনের ইতিহাস পছন্দ করি সেইরকমটি লেখা আমার আয়ত্তের অতীত—তার জন্যে তোমার অন্য বই পড়তে হবে। তবু মাঝে মাঝে তোমাকে অতীতের কাহিনী এবং পুরাকালের প্রখ্যাতনামা লোকদের কথা শোনাবার ইচ্ছে রাখি।

আমার চিঠিগুলো তোমার মনে আরও জানবার ইচ্ছে জাগিয়ে দেবে কি না বা আদৌ তোমার ভালো লাগবে কি না, সে আমার জানা নেই। সেগুলো তোমার কাছে পৌঁছবে কি না সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। মুসৌরিতে যখন ছিলে তখন সত্যিই বেশ কিছুটা ব্যবধান ছিল, এখন তুমি কাছেই রয়েছ অথচ যেন কতশত যোজন দূরে! তোমার কাছে তখন খুশিমতো চিঠি পাঠাতে পারতাম, আর খুব বেশি ইচ্ছে হলে তোমাকে দেখে আসাও সম্ভবপর ছিল। আজ আমাদের মাঝখানে কেবল যমুনা নদীর ব্যবধান, তবু নাইনি জেলের প্রাচীর তোমায় যেন কত দূরে সরিয়ে রেখেছে। চোদ্দ দিন অন্তর তোমার কাছে চিঠি লেখার অনুমতি পাই, দীর্ঘ চোদ্দ দিনের পর তোমার একটু-খানি দেখা মেলে কেবল মিনিট-কুড়ির জন্যে! তবু এ ব্যবস্থা যেন ভালোই—যা আমরা সহজে পাই তার মর্যাদা আমরা খুব কমই রাখি। তাই আমার মনে হয় যে কিছুদিনের জন্যে কয়েদখানায় বন্দী থাকা—শিক্ষারই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, আমার দেশবাসী ভাইবোনেরা আজ অনেকেই এ শিক্ষা পাচ্ছে।

বলেছি তো, আমার ভয় আছে পাছে এ চিঠিগুলো তোমার ভালো না লাগে। তবু কী জানো, এ লিখছি আমি নিজেরই একটু আনন্দের জন্যে—চিঠির ভিতর দিয়ে মনে হয় তোমার যেন নাগাল পাচ্ছি, যেন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ চলছে। প্রায়ই তোমার কথা ভাবি। আজকে তো বিশেষ করেই তোমার কথা মনে হচ্ছে। আজ নববর্ষের প্রথম দিন। খুব ভোরবেলায় আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে মনে হল পুরোনো বছরের আশা-আনন্দ-দুঃখ-দুরাশায়-মেশা আমাদের দিনগুলোকে। মনে হল, কী যেন যাদুমন্ত্রে বাপুজি যারবেদা জেল থেকে আমাদের জীর্ণ জাতীয়-জীবনে নূতন যৌবনের সঞ্চার করেছেন; তোমার দাদু এবং আরও অনেকের কথাও মনে হয়েছিল। বিশেষ করে ভাবছিলাম তোমার আর তোমার মার কথা; ইতিমধ্যে শুনলাম যে তোমার মাকে ওরা ধরে কয়েদখানায় আটকে রেখে দিয়েছে। নিশ্চয় উনি খুব খুশি হয়েছেন। আজ আমি যেরকম নববর্ষের উপহার চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি পেয়েছি।

তুমি বড়োই একলা পড়ে গেলে—না? প্রতি চোদ্দ দিন অন্তর তোমার মার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তো তোমার—তখন উভয়পক্ষের বার্তাবহ হয়ে উঠবে তুমি। যে দিনগুলো অমনি অমনি কাটবে সেই সেই দিনেও চিঠি লিখতে লিখতে তোমার কথা ভাবব। কল্পনায় দেখব, তুমি বসেছ আমার পাশে, কতরকম আলাপ হচ্ছে তোমার আমার মধ্যে। দুজনে মিলে আমরা সেই পুরাকালের স্বপ্ন দেখব আর ভাবব যে ভবিষ্যৎকে যেন অতীতের চেয়েও বড়ো করে গড়তে পারি আমরা। আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে এসো আমরা দুজনে সাহস করে বলি যে, এ বছরও যেদিন পুরোনো হয়ে পড়বে সেদিন হিসেব মিলিয়ে দেখতে পাব যে এ বছরটা বৃথা অতিবাহন করি নি। ভারতের অতীত গৌরবের ইতিহাসে এ যেন একটা বিশিষ্ট স্থান পায়, যেন এ বছরটি আমাদের ভবিষ্যতের সেই স্বপ্নকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিতে পারে।

২

ইতিহাসের শিক্ষা

৫ই জানুয়ারি, ১৯৩১

তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসে কেবলই ভাবছি, কীভাবে শুরু করব। অতীতের কথা ভাবতে গেলেই যেন অনেকগুলো ছবি একসঙ্গে চোখের উপর এলোমেলো হয়ে ভেসে ওঠে। কোনোটা আবছায়া অস্পষ্ট ছবির মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। যে ঘটনাগুলোর উপর আমার পক্ষপাত আছে, সেগুলো অধিকতর স্পষ্ট ছবির মতো প্রতিভাত হয়। পুরাতন দিনের ঘটনাবলীর সঙ্গে আমি আজকালকার দিনের তুলনা করি; চেষ্টা করি ইতিহাসের শিক্ষা পেয়ে বর্তমানের পথে যাতে ঠিকমতো চলতে-ফিরতে পারি। কিন্তু দেখে, এলোমেলো মন একেবারে কাটা-ছেঁড়া অসম্পূর্ণ নানাবিধ জটিল চিন্তায় ঠাসা; সে যেন এক চিত্রপ্রদর্শনী, যেখানে ছবিগুলো এবড়োখেবড়ো বিশৃঙ্খলায় সাজানো। দোষটা সব সময় যে মনের তা নয়, কারণ মন বহুবিধ ঘটনাসমবায়ের মধ্যেও তো অনেক সময় সামঞ্জস্য আর সমন্বয় খুঁজে বার করে। আসল কথা হচ্ছে, ঘটনাগুলোই অধিকাংশ সময় এত অদ্ভুত ও বিচিত্র যে তাদের পারম্পর্যের নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত করে দেখা খুব কঠিন।

লিখেছি তোমায় যে, ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দেখি, পৃথিবী ধীরে ধীরে নিশ্চিত উন্নতির পথে জয়যাত্রা করেছে; প্রাণী-সমবায়ের ক্রমবিবর্তনের ফলে কেমন করে সর্ব-শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ এসে স্বীয় বুদ্ধিবলে অপরদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করল, সে কথাও তোমাকে বলেছি। বর্বরতা অতিক্রম করে সভ্যতায় পরিণতি—এই হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই সভ্যতার পিছনে রয়েছে কর্মের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র—তাই সমবেত শক্তির প্রচেষ্টাই হল আমাদের সভ্যতার ভিতরকার কথা, আমাদের চরম আদর্শ! মাঝে মাঝে মানুষ যখন এই আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়েছে তখন তার অগ্রসরণে এসেছে অনেক বাধাবিপত্তি—ইতিহাসে এইসব ব্যর্থতার কাহিনীগুলো যেন মরুভূমির মতো উষর! আজকালকার পৃথিবীতে সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাব, স্বার্থপরতা এবং হৃদয়হীনতা যেন চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। আমরা যদি আমাদের জ্ঞানহীনতা এবং মূঢ়তা-বশত মানবসভ্যতার জয়যাত্রার পথ রুদ্ধ করি তবে সেটা কি ভালো হবে? প্রাচীনযুগের সভ্যতার উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সন্দেহ হয় যে, আমরা হয়তো পিছু হটছি। আমাদের নিজেদের দেশেরই গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অকিঞ্চিৎকরতার তুলনা করলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক বলছি কি না। কেবল আমাদের দেশেই নয়, মিশর, চীন এবং গ্রীস দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যও বর্তমানের তুলনায় বিশেষ গৌরবময় ছিল। কিন্তু তাই বলে আমাদের হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না; মনে রাখতে হবে যে, বিপুলা পৃথ্বীর কাছে একটা-কোনো জাতি বা দেশের উত্থানপতনে এমন কিছু আসে-যায় না।

আধুনিক সভ্যতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে অনেকে অর্থহীন গর্ব অনুভব করেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা অত্যদ্ভুত অনেক কিছু সম্ভব করেছেন এবং সেজন্যে তাঁরা আমাদের সম্মানের পাত্র—তবে বড়াই করতে যাবার আগে এ কথাটাও একবার ভেবে দেখা ভালো যে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের সভ্যতা পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে আছে। অনেকের কাছে হয়তো আমার এই কথাটা নির্বোধের উক্তি মনে হবে, কিন্তু তারা জানে না। তুমি মেটারলিঙ্কের লেখা মৌমাছি, উইপোকা ইত্যাদির সমাজ-সংগঠনের কথা পড়ে নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছিলে, নয় কি? প্রাণীজগতে আমরা এদের তুচ্ছ এবং নগণ্য মনে করি, তবু এদের একতা, এবং ব্যষ্টিকে সমষ্টির কাছে উৎসর্গ করা দেখে মানুষের সমাজ অনেক কিছু শিখতে পারে। বহুর জন্যে উইপোকার আত্মাহুতির কথা যেদিন শুনেছি সেদিন থেকে তাকে যেন ভালোবেসে ফেলেছি। সমাজের জন্যে ত্যাগস্বীকার এবং সমবেত প্রচেষ্টা যদি সভ্যতার নিদর্শন হয় তবে পিঁপড়েদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক গুণে ভালো—কী বলো?

আমাদের একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে যার অনুবাদের সারমর্ম এরূপ: 'পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে, সমাজের জন্য পরিবারকে, দেশের জন্য সমাজকে এবং আত্মার জন্য সমগ্র জগৎকে বর্জন করবে।' আত্মা যে কী বস্তু তা আমাদের মধ্যে অল্প লোকেই জানে বা বলতে পারে এবং আমাদের প্রত্যেকেই একে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোক থেকে আমরা পরস্পর-সহযোগিতা ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের শিক্ষাই লাভ করছি। আমরা ভারতবাসীরা অনেকদিন আগেই প্রকৃত মহত্ত্বের এই প্রকৃষ্ট পন্থার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আমাদের পতন হয়েছে। কিন্তু পুনরায় যেন এর কিছুটা দৃষ্টিগোচরে আসছে এবং সারা দেশে চঞ্চলতার সাড়া জেগে উঠছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকার দল নিজ নিজ দুঃখকষ্টের প্রতি দ্রূক্ষেপ না করে স্মিতহাস্যে দেশের কাজে অগ্রসর হচ্ছে। কী চমৎকার দৃশ্য! তাদের স্মিতহাস্য ও আনন্দের একটা সংগত কারণ আছে, যেহেতু একটা মহৎ কার্যে যোগদান করার আনন্দের তারা অধিকারী; এবং যারা ভাগ্যবান তারাই শুধু আত্মত্যাগের আনন্দ লাভ করতে সক্ষম। আজ আমরা ভারতকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করছি; এটাও একটা বড়ো কাজ। কিন্তু সার্বভৌম মানবতার আদর্শ এর চেয়েও বড়ো। এবং যেহেতু আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের সংগ্রাম হল দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসানের জন্য বিশ্বমানবের বিরাট সংগ্রামের অংশবিশেষ মাত্র, তাই আমরা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি যে, দুনিয়ার অগ্রগতিতে আমরাও কিঞ্চিৎ সাহায্য করছি।

ইতিমধ্যে তুমি থাকবে আনন্দভবনে, এবং তোমার মা থাকবে মালাক্কা বন্দীনিবাসে, আর আমি এই নাইনি জেলে; এবং কেউ কারও দর্শন পাব না—নয় কি? কিন্তু একবার ভাবো তো সে দিনটির কথা, যেদিন আমাদের তিনজনের আবার মিলন হবে! আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষা করে থাকব, এবং এই কল্পনাই আমার মনকে হাল্কা আর উৎফুল্ল করে তুলবে।

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'

৭ই জানুয়ারি, ১৯৩১

চোখের সামনে যখন থাকো তখন তুমি প্রিয়দর্শিনী। চোখের আড়ালে রয়েছ বলে তোমায় যেন আরও বেশি করে ভালো লাগে।

আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসে মনে হল, সুদূর মেঘগর্জনের মতো যেন বহু কণ্ঠের একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারি নি, শুধু মনে হল শব্দটা যেন চেনা-চেনা, যেন বুকের মধ্যে তার অনুরণন বাজছে। জনতা নিকটতর হলে কথাগুলোও স্পষ্টতর হল, আর বুঝতে বাকি রইল না। 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সমস্ত কারাগার মুখর হয়ে উঠল। মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আমাদের এত কাছাকাছি, কারাপ্রাচীরের ঠিক অপর পাশেই কারা যে বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করে চলে গেল জানি না। হয়তো তারা এই শহরেরই লোক, হয়তো তারা গাঁ থেকে এসেছে—কৃষকের দল। নাই-বা জানলাম ওরা কোথাকার লোক—ওদের ওই নূতন যুগের আবাহনমন্ত্রে আমাদের সমস্ত মন যেন নীরবে সাড়া দিল।

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' এই বাণীর অর্থ কী? কেনই-বা আমরা বিপ্লব চাই? ভারত আজ অনেক কিছু নূতন করে গড়তে চায়। যে বিরাট পরিবর্তন আমরা আনতে চাই তা যখন সার্থক হবে, যখন আমরা স্বরাজ পাব, তখনও কিন্তু আমাদের চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। প্রাণবস্তু যা-কিছু তার ক্রমাগত অদলবদল ঘটছে। সমস্ত প্রকৃতি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নিত্যনূতন হয়ে

প্রকাশিত হচ্ছে। একমাত্র প্রাণহীন জড়পদার্থ অচল হয়ে বসে থাকে। উৎসধারা আপনার বেগে বেরিয়ে যেতে চায়, তাতে যদি বাধা দাও তা হলে সে অপরিচ্ছন্ন ডোবায় পরিণত হবে, আপনাকে নিরর্থক করে দেবে। মানুষ কিংবা জাতির জীবনটাও এইরকম একটা অব্যাহত ধারা। আমাদের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, আমরা বড়ো হবই। খুকিরা বয়সে বেড়ে হয় ছোটো ছোটো মেয়ে, আবার ছোটো ছোটো মেয়েরা পরিণত হয় বড়ো বড়ো মেয়ে ও বয়স্কা মহিলাতে এবং পরিণতবয়স্কা মহিলারা কালক্রমে বৃদ্ধা হন। এসকল পরিবর্তন-পরিবর্ধন মেনে নিতেই হবে। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা জগতের পরিবর্তন স্বীকার করতে চান না। তাঁরা তাঁদের মনের দুয়ার রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ করে রাখেন, যাতে করে কোনো নূতন ভাবধারা তাতে প্রবেশ করতে না পারে। চিন্তাশক্তি-পরিচালনার কথা ভাবতেই তাঁরা যৎপরোনাস্তি ভীত হন। ফল কী দাঁড়ায়? তাঁদের সাহায্য ব্যতীতও দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু তাঁরা এবং তাঁদের মতোই অন্যান্য লোকেরা নিজেদের জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন না সেজন্যেই মাঝে মাঝে বিরাট অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়; এক শো চল্লিশ বছর আগেকার ফরাসি-বিপ্লব বা তেরো বছর আগেকার রুশ-বিপ্লবের মতো বড়ো বড়ো বিপ্লব ঘটে থাকে। সেইরূপ আমাদের দেশে এখন আমরা একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অবশ্যই স্বাধীনতা চাই—কিন্তু তার চেয়েও আরও কিছু বেশি চাই। আমরা সব আবদ্ধ জলাশয়গুলির রুদ্ধ গতিপথ মুক্ত করে দিয়ে সর্বত্র জলপ্রবাহ আনতে চাই। আমাদের দেশ থেকে দুঃখ-দৈন্য-মলিনতা ঝেঁটিয়ে দূর করতেই হবে। আর যতদূর পারা যায়, দূর করতে হবে বহু লোকের মনের আবরণস্বরূপ সেই মাকড়সার জাল, যা তাদের চিন্তাশক্তি লুপ্ত করে দিয়েছে এবং আমাদের মহৎ কাজে তাদের সহযোগিতার পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এটা খুব বড়ো কাজ—হয়তো এতে সময়ও লাগবে যথেষ্ট। লাগাও ধাক্কা, হেঁইও জোয়ান, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

বিপ্লবের দুয়ারে এসে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি। ভবিষ্যৎ কী বহন করে আনবে তা জানি না, তবে বর্তমানেও আমাদের শ্রমের প্রভূত পুরস্কার তো আমরা পেয়েছি। আজ দেশের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখো—কী গর্বভরে তাঁরা এই আন্দোলনে সবার আগে এগিয়ে চলেছেন। শান্ত অথচ দুর্দম এই বীরাঙ্গনাদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ সবাইকে চলতে হচ্ছে। যে পর্দার অভিশাপের আড়ালে এঁরা আত্মগোপন করেছিলেন, আজ সে পর্দা কোথায়? অতীত যুগের বহু নিদর্শনের সঙ্গে যাদুঘরে তা স্থান পেতে চলেছে।

কেবল মেয়েদের কেন, শিশুদেরও দেখো, তাদের বানর-সেনা, বালসভা, বালিকাসভার দিকে তাকাও। এইসব বালকবালিকাদের বাপ-পিতামহ কেউ কেউ হয়তো অতীত কালে ভীরুর মতো ব্যবহার করেছে, বিজাতীয়ের দাসত্ব করেছে। এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভীরুতা কিংবা গোলামি কোনোটাই বরদাস্ত করবে না—সে কথা বুঝতে আজ আর কারও বাকি নেই।

কালের চাকা ঘুরে চলেছে, যারা তলায় চাপা পড়ে ছিল তারা আজ উপরে উঠে আসছে, উপরওয়ালারা নেমে যাচ্ছে নীচে। এ দেশের চাকা-ঘোরার সময় এসেছে এবার। চাকার গায়ে কাঁধ লাগিয়ে এবার আমরা এমন ধাক্কা দেব যে, সে চাকার ঘূর্ণি আর কেউ থামাতে পারবে না।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

এশিয়া ও ইউরোপ

৮ই জানুয়ারি, ১৯৩১

গতবারের চিঠিতে লিখেছি যে, সব জিনিষ অনবরত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এইসব পরিবর্তনের কাহিনীই হল ইতিহাস। পুরাকালে যদি খুব কম পরিবর্তন ঘটে থাকে তা হলে সেকালের ইতিহাসও সেই অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর হতে বাধ্য।

স্কুল-কলেজে আমরা যে ইতিহাস পড়ি তা যৎসামান্য। অন্যদের কথা ঠিক হয়তো জানি না, তবে আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে, স্কুলে আমি খুব অল্পই শিখেছি। ইংলন্ডের ইতিহাস ততোধিক সামান্য। দেশের কথা যতটুকু শিখেছি তার অধিকাংশই হল ভুল, কিছু-বা সত্যের অপলাপ। হবে না কেন, যাঁরা এসব বই রচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই ছিল এ দেশের প্রতি গভীর অবজ্ঞা। ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশের ইতিহাস খুবই আবছা-রকম শিখেছিলাম। সত্যিকার ইতিহাস আমি পড়তে শুরু করি কলেজ থেকে বেরোবার পরে। বার বার জেলে যাওয়া আমার ইতিহাস-অধ্যয়নের পক্ষে খুব অনুকূল হয়েছে।

আগের কয়েকটা চিঠিতে তোমাকে দ্রাবিড়সভ্যতার কথা, আর্যদের এ দেশে আসবার কথা, মোটকথা প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখেছি। প্রাক্-আর্য যুগের ভারত সম্বন্ধে খুব অল্পই জানি বলে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখি নি। তোমাকে বলে রাখা ভালো যে, কয়েক বছর আগে একটি বহু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে মোহেঞ্জোদারো-নামক একটি জায়গায়। পাঁচ হাজার বছরকার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে অনেক কিছু বেরিয়েছে—এমনকি মিশরের পিরামিড্-এর মতন মৃতদেহের মমি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। একবার ভেবে দেখো কত হাজার বছর আগের, আর্যদের এ দেশে আসবার কত আগেকার সভ্যতার নিদর্শন এই মোহেঞ্জোদারো। ইউরোপে তো তখন বর্বর যুগ।

আজ ইউরোপ ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী, আজ পশ্চিমের লোক নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদেরকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে প্রচার করে। এশিয়া ও এশিয়াবাসীদের প্রতি ওদের অসীম অবজ্ঞা। এ দেশে ওরা যা-কিছু পায় তাই লুঠতরাজ করে নিয়ে যায়। এশিয়া ও ইউরোপকে পাশাপাশি রাখলেই আমরা দেখতে পাব সময়ের ফেরে কীভাবে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে। পৃথিবীর মানচিত্র খুলে দেখো—দেখতে পাবে স্বল্পায়তন ইউরোপ এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সঙ্গে কেমনভাবে জুড়ে রয়েছে, মনে হবে ইউরোপ এই মহাদেশেরই একটা ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। তুমি যখন ইতিহাস পড়তে শুরু করবে তখন জানতে পারবে যে, বহুকাল ধরে এশিয়া ইউরোপের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে। সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ের মতো এশিয়া থেকে মানুষের ঢেউ গিয়ে ইউরোপকে প্লাবিত করেছে, ইউরোপকে সভ্য করে তুলেছে। আর্য, সাইথীয়, হূন, আরব, মঙ্গোল, তুর্কি—এশিয়ার এইসব বিভিন্ন জাতি ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল পঙ্গপালের মতো। বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপ ছিল এশিয়ার একটি উপনিবেশের মতো। আধুনিক ইউরোপের অনেক সুসভ্য জাতি এশিয়ার এই আক্রমণকারীদের বংশসম্ভূত।

মানচিত্রের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এশিয়া, দেখে মনে হয় যেন একটা অতিকায় দৈত্য হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ইউরোপ সেই তুলনায় কত ছোটো। তাই বলে মনে কোরো না, যেন যে, আয়তনে বড়ো বলেই এশিয়া বড়ো এবং আয়তনে ছোটো বলেই ইউরোপকে উপেক্ষা করা চলে। আকার দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতির বৃহত্ত্ব বিচার করতে যাওয়া চলে না। মহাদেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রায়তন হলেও আজ ইউরোপ সভ্যজগতে খুব বড়ো-একটা জায়গা অধিকার করে আছে, এ কথা আমরা ভালো করেই জানি। ইউরোপের অনেক দেশের ইতিহাস যুগে যুগে নানারকম কীর্তি-কাহিনীতে গৌরবময়। পশ্চিমের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী তাঁদের নানারকম সত্য-আবিষ্কারের দ্বারা সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণধারণের জন্য সুখ-সুবিধার বিধান করে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বহু লোক জন্মেছেন যাঁরা সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পকলায়, সংগীতে পৃথিবীজোড়া নাম কিনেছেন। ইউরোপের ইতিহাসে জ্ঞানী ও কর্মী কত রয়েছেন! ইউরোপের প্রাপ্য গৌরব তাকে না দেওয়াটা নির্বুদ্ধিতা।

এশিয়া যেখানে বড়ো সেখানে তার মহত্ত্ব স্বীকার না করাটাও ঠিক একই প্রকারের বোকামি হবে। ইউরোপের বাইরের জাঁকজমক দেখে আমরা অনেক সময় অতীতের কথা ভুলে যাই। পৃথিবীর প্রধান ধর্মপ্রবর্তকগণ সকলেই জন্মেছেন এই এশিয়ায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে ধর্মের প্রভাব আজও বর্তমান, সেই হিন্দুধর্মের উদ্ভব এই ভারতেই। চীন জাপান বর্মা তিব্বত সিংহল—

প্রভৃতি দেশের ধর্মগুরু বুদ্ধেরও জন্মস্থান এই ভারতে। ইহুদি ও খৃষ্টীয় ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল প্যালেস্টাইনে—এশিয়ার পশ্চিম-উপকূলে। পার্শিরা যে জরথুস্ত্রের ধর্মে বিশ্বাস করে তার সূচনা হয়েছিল ইরানে, ইসলামের পয়গম্বর মহম্মদ জন্মেছিলেন আরব দেশের মক্কাশরীফে। কৃষ্ণ বুদ্ধ জরথুস্ত্র খৃষ্ট মহম্মদ, চীনের দার্শনিকশ্রেষ্ঠ কনফুসিয়স ও লাওৎসে—কত-যে দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানী এ দেশে জন্মেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পাতার পর পাতা লিখে গেলেও এশিয়ার জ্ঞানবীর ও কর্মবীরদের নামের তালিকা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এ ছাড়া, আরও কতভাবে এশিয়া যে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে সে কথা বলে শেষ করা যায় না।

সে দিন আর নেই। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি কালের সঙ্গে সঙ্গে কত অদলবদল-ওলটপালট ঘটে যাচ্ছে। সচরাচর অবশ্য ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দীতে মন্থরগতিতে চলে। অপর কোনো হিসাব উল্টে দেবার জন্যই যেন সময় সময় ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে, বিপর্যয় ঘটে যায়। আজ এই মন্থর এশিয়া মহাদেশ তার বহু দিনের তন্দ্রা ভেঙে আবার জেগে উঠছে। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে এশিয়ার দিকে। সবাই জানে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে এশিয়া।

প্রাচীন সভ্যতা ও আমাদের উত্তরাধিকার

৯ই জানুয়ারি, ১৯৩১

'ভারত' বলে যে হিন্দি সংবাদপত্রখানা সপ্তাহে দুবার আমাদের বাইরের জগতের খবর এনে দেয় তাতে গতকাল পড়লাম যে, মালাক্কা জেলে তোমার মায়ের ঠিকমতো যত্ন হচ্ছে না। আর শীগগিরই নাকি ওকে লক্ষ্ণৌ জেলে পাঠানো হচ্ছে। পড়ে একটু দমে গেলাম, একটু উদ্বিগ্ন হলাম। হয়তো 'ভারত'-এর গুজব সত্যি নয়। তবু সন্দেহও ভালো লাগে না। নিজের কষ্ট অসুবিধা সহ্য করা শক্ত নয়। ওতে ফল ভালোই হয়, ও না হলে আমরা অতিরিক্ত নরম হয়ে পড়তে পারি। কিন্তু আমাদের প্রিয়জনের দুঃখকষ্টের কথা ভাবা সহজও নয়, আরামপ্রদও নয়—বিশেষত আমরা যদি কোনো সাহায্যই না করতে পারি। তাই 'ভারত' আমার মনে সংশয় জাগিয়ে তোমার মায়ের সম্বন্ধে আমায় উদ্বিগ্ন করে তুলল। ওর সাহস আছে, আছে সিংহীর মতো মনের জোর, কিন্তু দেহে ও দুর্বল; ও আরও দুর্বল হয়ে পড়ুক এ আমি চাই না। যতই মনের পাটা থাক্-না কেন, শরীর যদি ভেঙে পড়ে তো আমরা কী-ই বা করতে পারি? কোনো কাজ যদি ভালোভাবে করতে হয় তবে আমাদের স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই, চাই সুঠাম শরীর।

হয়তো লক্ষ্ণৌ পাঠালে তোমার মায়ের ভালোই হবে। সেখানে আর-একটু আরাম আর আনন্দ পেতে পারে, আর লক্ষ্ণৌ জেলে কিছু সাথিও জুটবে। মালাক্কায় বোধহয় ও একেবারে একা। তবু ভেবে মন্দ লাগত না যে, আমাদের জেলখানা থেকে ও মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে আছে। কিন্তু এ তো অর্থহীন কল্পনা! জেলখানার উঁচু পাঁচিল যখন মাঝখানে তখন পাঁচ মাইলও যা, এক শো পঞ্চাশ মাইলও তাই।

'দাদু' এলাহাবাদে ফিরে এসেছেন এবং একটু ভালো আছেন জেনে আজ খুব আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল জেনে যে উনি তোমার মাকে দেখতে মালাক্কা জেলে গিয়েছিলেন। বরাতে থাকলে হয়তো কাল তোমাদের সবাইকে আমি দেখতে পাব, কারণ কাল আমার দেখা করবার দিন, আর জেলে 'মুলাকাত-কা দিন' তো মস্ত দিন! প্রায় দু মাস আমি 'দাদু'কে দেখি নি। আশা করি, তাঁকে দেখব, নিজের চোখে দেখে তৃপ্তি পাব যে, তিনি একটু সেরে উঠেছেন। আর তোমারও দেখা পাব সুদীর্ঘ পক্ষকাল পরে, তুমি তোমার আর তোমার মায়ের খবর আমায় এনে দেবে।

আরে! তোমাকে লিখতে বসেছিলাম অতীতের ইতিহাস, আর কীসব আজেবাজে ব্যাপার লিখে যাচ্ছি। এসো, বর্তমানকে ভুলে গিয়ে, দু-তিন হাজার বছর পিছিয়ে যাই।

আগের কোনো কোনো চিঠিতে আমি তোমাকে মিশরের আর ক্রীটদ্বীপে প্রাচীন নোসসের কথা লিখেছি। আর বলেছি যে, প্রাচীনকালের সভ্যতা এ দুটি দেশ ছাড়াও শিকড় গেড়েছিল আজকের ইরাক বা মেসোপটেমিয়ায়, চীনে, ভারতবর্ষে আর গ্রীসে। গ্রীসের সভ্যতা খুব সম্ভব এদের একটু পরবর্তী। তা হলে ভারতবর্ষের সভ্যতা বয়সের দিক দিয়ে মিশর, চীন আর ইরাকের সহোদর-সভ্যতার পাশে স্থান নিতে পারে। প্রাচীন গ্রীসও এদের ছোটো বোন। এইসব প্রাচীন সভ্যতার কী হল? নোসস আর নেই। তিন হাজার বছর হল তার বিলয় ঘটেছে। কনিষ্ঠ সভ্যদেশ গ্রীসের লোকেরা এসে তাকে ধ্বংস করেছে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা হাজার হাজার বছরের বিস্ময়কর ঐতিহ্যের পর মিলিয়ে গেল—বিশাল পিরামিড স্ফিংক্স্, মন্দির আর মমিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কোনো চিহ্নই রইল না তার। মিশর দেশটা অবশ্য আজও আছে, সেকালের মতোই নীলনদ তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, অন্য দেশের মতোই সেখানে নরনারীর বাস। কিন্তু আজকের এই মানুষগুলির সঙ্গে ও দেশের সেই অতীত গৌরবের আর কোনো যোগ নেই।

ইরাক আর পারশ্য—কত সাম্রাজ্যই না ওখানে গড়ে উঠেছে আর পরস্পরকে অনুসরণ করেছে চিরবিলুপ্তির পথে! শুধু যদি প্রাচীনতমগুলির নামই ধরা যায় তা হলেও কত—বাবিলনিয়া, আসিরিয়া, কল্ডিয়া। বাবিলন আর নিনেভে-র সেই মহানগরী! বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট ভর্তি তো এদেরই কাহিনী। আরও পরে, প্রাচীন ইতিহাসের যুগে আরও অনেক সাম্রাজ্য ওখানে গড়ে উঠেছে, আবার ধুলোয় লুটিয়েছে। ওখানে একদিন ছিল বোগ্দাদ—আরব্যোপন্যাসের সেই যাদুশহর! কিন্তু সাম্রাজ্য ওঠে আর পড়ে, রাজামহারাজাদের মধ্যে মহামহীয়ান যারা, পৃথিবীর নাটমঞ্চে তাদের ঘোরাফেরাও খুব ক্ষণিকের জন্যে। তবু সভ্যতা বেঁচে থাকে। ইরাক আর পারশ্যের সভ্যতা অবশ্য মিশরেরই মতো নিঃশেষে লোপ পেয়েছিল।

অতীত যুগে গ্রীসের সত্যিই গরিমা ছিল—আজও লোকে সবিস্ময়ে সে গৌরবকাহিনী পড়ে; তার মর্মরমূর্তির সামনে আমরা নির্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তার পুরোনো সাহিত্যের যেটুকু আমাদের কাছে এসেছে সেটুকু শ্রদ্ধার সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পড়ি। যথার্থই বলা হয়েছে যে, নব্য ইউরোপ কোনো কোনো দিক দিয়ে প্রাচীন গ্রীসেরই সন্তান; গ্রীক চিন্তাধারা, গ্রীক প্রথা এতই প্রভাবিত করেছে ইউরোপকে। কিন্তু গ্রীসের সে গৌরব আজ কোথায়? বহু যুগ হল সে প্রাচীন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নূতন প্রথা দেখা দিয়েছে—গ্রীস আজ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এক ক্ষুদ্র দেশ মাত্র।

মিশর, নোসস, ইরাক, গ্রীস—সব চলে গেছে। বাবিলন আর নিনেভে-র মতো তাদের অতীত সভ্যতাও আজ অস্তিত্বহীন। আর এই পুরোনো সভ্যতার দলের অন্য দুটি প্রাচীন দেশ? চীন আর ভারত? অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়েছে এবং ভেঙেছে। আক্রমণ, ধ্বংস, লুঠতরাজ হয়েছে খুব বড়ো হারে। শত শত বছর ধরে এক রাজার বংশ শাসন করেছে, আবার অন্যে এসে তাদের জায়গা নিয়েছে। অন্যসব জায়গার মতো চীন আর ভারতেও এসব ঘটেছে। কিন্তু চীন আর ভারত ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার একটা প্রকৃত অবিচ্ছিন্নতা দেখা যায় নি। সমস্ত পরিবর্তন, যুদ্ধবিগ্রহ, আক্রমণ সত্ত্বেও এই দুটি দেশেই প্রাচীন সংস্কৃতির সূত্র একটানা চলেছে। এ কথা ঠিক যে, দুটি দেশই তাদের অতীত গৌরব থেকে অনেক নেমে গেছে, আর অতীতের সেই সংস্কৃতি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত ধুলোয় আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; কিন্তু তবু তারা টিঁকে আছে, আর ভারতের সেই প্রাচীন সভ্যতাই আজকের ভারতীয় জীবনধারার ভিত্তিস্বরূপ। আজকের পৃথিবীতে হাওয়াবদল হয়েছে। বাষ্পজাহাজ, রেলপথ আর প্রকাণ্ড কারখানায় পৃথিবীর চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। হয়তো, হয়তো কেন খুবই সম্ভবত, ভারতবর্ষের চেহারাও বদলে যাবে, বদলে যাচ্ছেও ক্রমশ। কিন্তু ইতিহাসের উষা থেকে সোজা আমাদের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে বিশাল পরিপ্রেক্ষিত ও অবিচ্ছিন্নতা, এর কথা ভাবতেও কৌতূহল জাগে, চমৎকৃত হতে হয়। একদিক দিয়ে আমরা ভারতীয়েরা এই বহুসহস্র বছরের উত্তরাধিকারী।

একদা যাঁরা উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে এই ব্রহ্মাবর্ত বা আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের সূর্যহাসিত সমভূমিতে এসেছিলেন, আমরা তাঁদেরই সন্তাতি। পাহাড়ে পথ বেয়ে তাঁরা নীচের অজানা ভূমিতে দলে দলে নেমে আসছেন, দেখতে পাও না? বীর তাঁরা, দুঃসাহসের তেজে পূর্ণ-প্রাণ, পরিণামের ভয় না করে এগিয়ে এসেছিলেন। মৃত্যু এলে পরোয়া করতেন না তাঁরা, হাসিমুখে বরণ করে নিতেন তাকে। কিন্তু জীবনকে তাঁরা ভালোবাসতেন, জানতেন যে জীবনকে ভোগ করা যায় একমাত্র নির্ভয় হলে, পরাজয়-দুর্দৈব নিয়ে উদ্বিগ্ন হলে চলে না। যারা ভয়হীন, পরাজয়-দুর্দৈব তাদের থেকে কেন জানি তফাতে থাকে। ভাবো তাঁদের কথা, আমাদের সেই বহু দূরের পূর্বপুরুষ যাঁরা, অভিযানের পথে সহসা তাঁরা সাগরগামী পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে এসে উপনীত হলেন। না জানি সে দৃশ্য তাঁদের কত উৎফুল্ল করে তুলেছিল! নত হয়ে তাঁরা যে তাঁদের সুললিত ব্যঞ্জনাময় ভাষায় তার প্রশস্তি গেয়েছিলেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

সত্যই বিস্ময় জাগে যে আমরাই সেইসব যুগের উত্তরাধিকারী। কিন্তু দম্ভ করা উচিত নয়, কারণ সে যুগের ভালো মন্দ, দুয়েরই উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। আর আজকের ভারতে বহু মন্দ জিনিষ রয়ে গেছে, যা বিশ্বে আমাদের নীচু করে রেখেছে, আমাদের মহান্ দেশকে নিদারুণ দরিদ্র করে ফেলেছে, অন্যের হাতের পুতুল করে তুলেছে। কিন্তু আমরা কি স্থির করে ফেলি নি যে এ আর চলবে না?

৬

হেলাসের অধিবাসী

১০ই জানুয়ারি, ১৯৩১

তোমরা কেউ আজ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে না, 'মুলাকাৎ-কা দিন' প্রায় ফাঁকাই গেল। হতাশ হতে হল। আরও খারাপ হচ্ছে দেখা করবার দিন পিছিয়ে দেবার কারণটি। আমাদের বলা হল যে দাদু অসুস্থ। আর কিছু জানবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তা, যখন জানলাম যে দেখাসাক্ষাৎ আজ আর হবে না, আমি আমার চরখা নিয়ে কিছু সুতো কাটলাম। দেখছি যে চরখা কাটলে আর নেওয়ার বুনলে বেশ সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অতএব, যখনই মনে সংশয় জাগবে, সুতো কেটো।

আগের চিঠিতে আমরা ইউরোপ আর এশিয়ার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখিয়েছিলাম। এবার এসো সে সময় প্রাচীন ইউরোপ যেমন ছিল বলে কল্পনা করা হয়, সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করি। বহুকাল যাবৎ ইউরোপ বলতে বোঝাত ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকের দেশগুলি। জর্মানি, ইংলণ্ড আর ফরাসি দেশে বন্য বর্বর জাতির বাস বলে মনে করত ভূমধ্যসাগরবর্তীরা। প্রথম প্রথম শুধু ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-অঞ্চলগুলিকেই সভ্যতার কেন্দ্র বলে ধরা হত। জানোই তো যে, মিশর (অবশ্য এ দেশ ইউরোপে নয়, আফ্রিকায়) আর নোসসই ছিল এদের অগ্রণী। ধীরে ধীরে আর্যরা এশিয়া থেকে পশ্চিমদিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রীস এবং পাশের অন্যান্য দেশ আক্রমণ করল। এরাই হচ্ছে সেই আর্যগ্রীক যাদের আমরা প্রাচীন গ্রীক বলে জানি এবং সম্মান করি। গোড়ার দিকে এদের থেকে ভারতীয় আর্যদের বোধহয় খুব তফাত ছিল না। কিন্তু পরে নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটেছিল, ফলে আর্যজাতির এ দুই শাখা ক্রমশ ভিন্ন হয়ে গেল। ভারতীয় আর্যদের উপর প্রভাব পড়ল ভারতবর্ষের প্রাচীনতর সভ্যতার—দ্রাবিড়সভ্যতার, যার ভগ্নাবশেষ আমরা মোহেঞ্জোদারোতে দেখতে পাই। দ্রাবিড় আর আর্যরা পরস্পরকে দিয়েছিল অনেক, পরস্পরের থেকে নিয়েওছিল অনেক, ফলে এক সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। ঠিক এমনিভাবেই আর্যগ্রীকরা তখনকার গ্রীসে বিকাশমান নোসসের প্রাচীনতর সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও তারা নোসস ও তার

পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতা
এবং
দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ
ভারতবর্ষ
নিনেভে
ব্যাবিলন
প্যালেস্টাইন
মিশর
গ্রীস
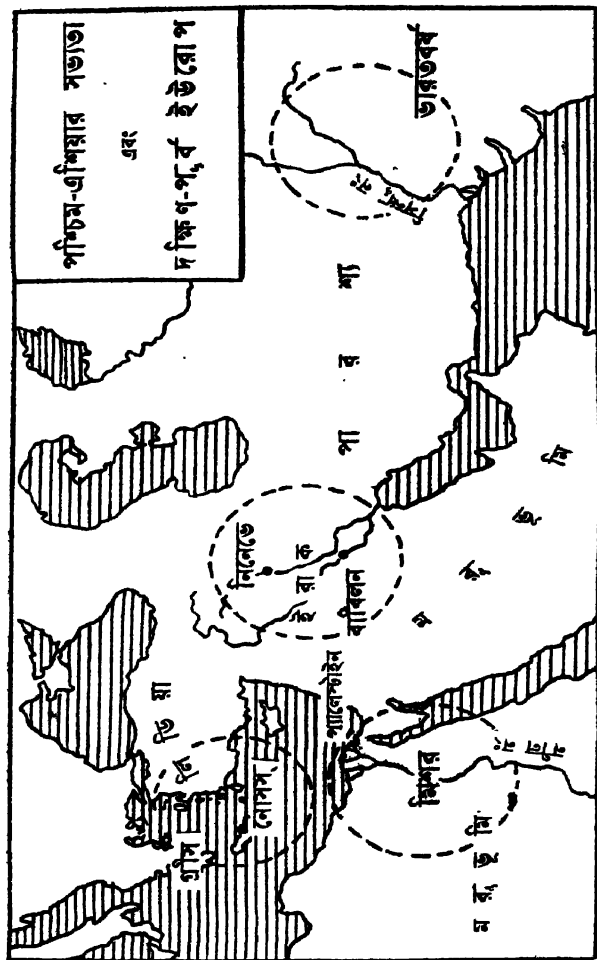
সভ্যতার অনেকখানিই ধ্বংস করে সেই ভগ্নস্তূপের উপর তাদের আপন সভ্যতাকে খাড়া করে তুলেছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেকালে আর্যগ্রীক ও ভারতীয় আর্যরা ছিল রুক্ষ কঠোর যোদ্ধার জাত। শক্তিমান তারা, দুর্বলতর জাতিকে হটিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিত।

অতএব, খৃষ্ট জন্মাবার এক হাজার বছর আগে নোসস ধ্বংসে হল। আর নবাগত গ্রীকরা গ্রীস ও তার চতুর্দিকের দ্বীপপুঞ্জে আস্তানা গাড়ল। সাগরপথে তারা গেল এশিয়া-মাইনরের পশ্চিমকূলে, দক্ষিণ-ইতালি ও সিসিলিতে, এমনকি ফরাসি দেশেরও দক্ষিণে। ফরাসি দেশে মার্সেই শহরের প্রতিষ্ঠা তাদেরই হাতে। কিন্তু তারা ওখানে যাবার আগেও বোধহয় ওখানে ফিনিশীয়দের বসতি ছিল। তোমার মনে আছে যে, ফিনিশীয়রা এশিয়া-মাইনরের নাবিক জাত, বাণিজ্যের জন্যে দূরদূরান্তরে যেত। সেই আদিযুগে, ইংলণ্ড যখন বর্বর ছিল, তখনই তারা ইংলণ্ডে যাতায়াত করত—জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে তাদের সুদীর্ঘ সিন্ধুযাত্রা নিশ্চয় দুর্গম ছিল।

গ্রীসের ভূখণ্ডে প্রসিদ্ধ নগর সব গড়ে উঠল—এথেন্স্, স্পার্টা, থীব্স্, করিন্থ। গ্রীকরা, অথবা যে নামে তাদের ডাকা হত, হেলীন্রা, তাদের প্রথম দিনগুলিকে অমর করে রেখে গেল তাদের দুটি প্রখ্যাত মহাকাব্যে—ইলিয়াড ও অডিসী-তে। এ দুটি কাব্য সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো—আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে এক বিষয়ে এদের মিল আছে। কথিত আছে, এ দুখানি অন্ধ হোমরের রচনা। ইলিয়াড আমাদের শোনায়, কেমন করে প্যারিস রূপসী হেলেন্কে তাঁর ট্রয় শহরে হরণ করে নিয়ে যান, কেমন করে গ্রীক রাজারাজড়ারা তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে ট্রয় অবরোধ করেন। আর অডিসী হচ্ছে ট্রয়-অবরোধের শেষে য়ুলিসেস্ বা অডিসিয়ুস্-এর দেশদেশান্তরে অভিযানের কাহিনী। এশিয়া-মাইনরে, সিন্ধুকূল থেকে অদূরে ছোট্ট শহর ট্রয় অবস্থিত ছিল। আজ আর তার অস্তিত্ব নেই; কিন্তু কবির প্রতিভা তাকে অমর করে রেখেছে।

এটা লক্ষ্য করবার মতো যে, গ্রীক বা হেলীন্রা যখন তাদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার সাবালকত্বের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল তখনই আর-একটি শক্তি অনাড়ম্বরে জন্ম নিয়েছিল ভবিষ্যতে গ্রীসকে জয় করে তারই স্থান নেবার জন্যে। রোম নাকি এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েক শত বছর পর্যন্ত বিশ্বের নাটমঞ্চে তার স্থান গৌণই ছিল। কিন্তু যে মহানগরী একদিন সারা ইউরোপের উপরে মাথা উঁচিয়ে ছিল, যাকে অভিহিত করা হয়েছিল 'বিশ্বের কর্ত্রী', 'চিরন্তন নগরী' বলে, তার জন্ম একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বৈকি! রোমের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে,—কেমন করে তার প্রতিষ্ঠাতা রেমাস্ আর রোমিউলাস্কে নিয়ে গিয়ে এক নেকড়েবাঘিনী পালন করেছিল। সে গল্প বোধ হয় তুমি জানো।

রোম-প্রতিষ্ঠার সমসময়েই, অথবা একটু আগে প্রাচীন পৃথিবীর আর-একটি মহানগর গড়ে উঠেছিল। কার্থেজ তার নাম, আফ্রিকার উত্তরকূলে—ফিনিশীয়দের হাতে তার প্রতিষ্ঠা। এক বিশাল সমুদ্রশক্তিতে এ পরিণত হয়েছিল, বহু বছর ধরে রোমের সঙ্গে তার ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘটেছিল তুমুল যুদ্ধ। শেষে রোমেরই জয় হয়েছিল, কার্থেজ নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গেল।

আজকের মতো শেষ করবার আগে একবার প্যালেস্টাইনের দিকে এক পলক তাকিয়ে নেওয়া যাক। অবশ্য প্যালেস্টাইন ইউরোপে নয়, তার ঐতিহাসিক প্রাধান্যও অল্প। কিন্তু অনেকে এর প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্পর্কে উৎসাহী, কারণ ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে এর নাম রয়েছে। ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট্ হচ্ছে ইহুদি জাতের একটা শাখার গল্প, ছোট্ট এই দেশটিতে তাদের বাস ছিল; তাদের পরাক্রান্ত প্রতিবেশী বাবিলনিয়া, আসিরিয়া আর মিশরের সঙ্গে তাদের কেমন করে গোলমাল বেধেছিল, তারই কাহিনী। যদি এ কাহিনী ইহুদিধর্ম ও খৃষ্টধর্মের অঙ্গ না হত, তবে খুব অল্প লোকেই তা জানত।

এইরকম সময়েই নোসসের পতন হয়। প্যালেস্টাইনের একটা অংশ হল ইস্রায়েল, তার রাজা ছিলেন সল। তাঁর পরে আসেন দায়ুদ, তাঁরও পরে সলোমন—তাঁর জ্ঞানের জন্যে তিনি যশস্বী। এ তিনজনের নাম তোমাকে বললাম, কারণ তুমি নিশ্চয় এঁদের কথা শুনেছ বা পড়েছ।

৭

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩১

গত চিঠিতে তোমাকে গ্রীকদের কথা কিছু কিছু বলেছি। তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হলে আরও একটু আলোচনা করা দরকার। অবশ্য যাদের আমরা কখনও চোখে দেখি নি তাদের সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা বড়ো শক্ত। কারণ বর্তমান যুগ এবং প্রচলিত জীবনপ্রণালীতে আমরা এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, সুদূর অতীতের সেই ভিন্ন জগৎটাকে আমরা কিছুতেই কল্পনায় আনতে পারি না। অথচ ভারতবর্ষেই বলো আর চীন কিংবা গ্রীস দেশেই বলো, প্রাচীনকালে দুনিয়াটা সর্বত্রই অন্যরকম ছিল। সেই প্রাচীন যুগের লোকদের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে এখন কল্পনার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই—তাদের লেখা বই, তাদের ঘরবাড়ি কিংবা ভগ্নাবশেষ দেখে যা একটু-আধটু অনুমান করা যায়।

গ্রীস দেশ সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বড়ো বড়ো রাজ্য কিংবা সাম্রাজ্য গ্রীকদের পছন্দ ছিল না। তাদের ছিল এক-একটি নগর নিয়ে এক-একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রত্যেক নগরই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেগুলো আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যৎসামান্য তার পরিধি—মাঝখানে শহর; চারদিকে কিছু ফসলের জমি, তাই থেকে নগরবাসীদের খাদ্যসংগ্রহ হত। গণতন্ত্র কাকে বলে সে তো তুমি জানোই—তাতে কোনো রাজা থাকে না। এইসব গ্রীক রাষ্ট্রেও ছিল না। রাজ্য শাসন করত ধনী নাগরিকের দল। শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের বলতে গেলে কোনোই হাত ছিল না। অনেকে ছিল আবার ক্রীতদাস, তাদের তো কোনোরকমের অধিকারই ছিল না। তা ছাড়া স্ত্রীলোকেরাও শাসনাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই এসব রাষ্ট্রে খুব অল্পসংখ্যক লোকই নাগরিকের অধিকার ভোগ করত অর্থাৎ শাসনসম্পর্কীয় ব্যাপারে ভোট দিতে পারত। সংখ্যায় অল্প বলে প্রয়োজনের সময় সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে ভোট দেওয়া এদের পক্ষে কঠিন ছিল না। ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্র বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল, বিরাট দেশ হলে এটা অসম্ভব হত। আর এখন, সারা ভারতবর্ষের কথা না-হয় ছেড়েই দাও, এক বাংলা কিংবা আগ্রা প্রদেশের সব ভোটদাতা এক জায়গায় একত্র হলে কী বিরাট ব্যাপার হয় একবার ভেবে দেখো দেখি। সে রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার! পরবর্তী কালে এটা অনেক দেশেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষে ভেবে-চিন্তে একটা সমাধান স্থির হল—তাকে বলা চলে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র। তার মানে, তেমন কোনো জরুরি ব্যাপার দেখা দিলে দেশসুদ্ধ লোককে এক জায়গায় জড়ো হয়ে উপায় বাৎলাতে হবে না, নিজেদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিলেই চলবে। তারাই প্রয়োজনের সময় মিলিত হয়ে দেশের সব বিধি-ব্যবস্থা স্থির করবে, আইনকানুন তৈরি করবে। এইরকম ব্যবস্থা হলে সাধারণ ভোটদাতারাও পরোক্ষভাবে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।

কিন্তু গ্রীস দেশে এ রীতি প্রচলিত ছিল না। নগর-রাষ্ট্র ছাড়া বহুবিস্তৃত রাজ্য তাদের ছিলই না, কাজেই এ সমস্যাও তাদের দেখা দেয় নি। অবশ্য তোমাকে আগেই বলেছি, গ্রীকরাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—দক্ষিণ-ইতালি, সিসিলি এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল-ভাগে; কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা কিংবা সমস্ত দেশকে এক-শাসনের অন্তর্গত করবার চেষ্টা তারা কখনও করে নি। তারা যেখানে গিয়েছে সেইখানেই স্বতন্ত্র নগর-রাষ্ট্র স্থাপন করেছে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখবে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও ছোটো ছোটো গণতান্ত্রিক রাজ্য ছিল, অনেকটা ঠিক গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মতো। কিন্তু সেগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয় নি, বৃহত্তর রাজ্য এসে তাদের গ্রাস করেছে। তা হলেও আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা তার পরেও বহুদিন অবধি টিঁকে ছিল। বোধ করি, প্রথম দিকে আর্যদের ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্র-স্থাপনের দিকেই ঝোঁক ছিল। ক্রমে নানা দেশের প্রাচীনতর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কিংবা হয়তো ভৌগোলিক

কারণে, তারা তাদের পূর্বমত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে পারশ্য দেশে বড়ো বড়ো রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল দেখতে পাই। ভারতবর্ষেও ক্রমে বড়ো বড়ো রাজ্য স্থাপনের দিকেই ঝোঁক দেখা দিল। গ্রীস দেশে কিন্তু বহুকাল ধরে ঐ নগর-রাষ্ট্রই চলে এসেছে। অবশেষে এক ইতিহাসবিখ্যাত গ্রীক বীর সমস্ত পৃথিবী জয় করবারই চেষ্টা করলেন। এর পূর্বে এ ধরনের চেষ্টা কেউ করেছিলেন বলে আমরা জানি না। ইনি হচ্ছেন মহাবীর আলেকজাণ্ডার। পরে তাঁর কথা তোমাকে আরও বলব।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, গ্রীকরা তাদের ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে বড়ো রাজ্য কিংবা রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করে নি। তারা একদিকে যেমন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে অপরদিকে তেমনি একে অন্যের সঙ্গে নিরন্তর মারামারি-কাটাকাটিও করেছে। এদের মধ্যে বিষম রেষারেষি ছিল, তার ফলে প্রায়ই লড়াই বেধে যেত।

তা সত্ত্বেও কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কয়েকটি যোগসূত্র ছিল। এদের সকলেরই এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম। তাদের ধর্মে অনেক দেবদেবীর পূজো ছিল। হিন্দুদের পুরাণের গল্প যেমন চমৎকার, গ্রীক পুরাণের গল্পও তেমনি চিত্তাকর্ষক। গ্রীকরা ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। তাদের তৈরি মর্মর এবং প্রস্তর -মূর্তি এখনও কিছু কিছু রয়েছে, সেগুলো দেখতে অপূর্ব সুন্দর। সুঠাম সুন্দর দেহকান্তির প্রতি তাদের খুব অনুরাগ ছিল এবং শরীরচর্চার জন্যে তারা নানাবিধ ক্রীড়ামোদের প্রবর্তন করেছিল। মাঝে মাঝে অলিম্পাস পর্বতে বিরাট আকারে ক্রীড়ামোদের ব্যবস্থা হত। তখন গ্রীস দেশের সকল প্রান্ত থেকে বহু লোক এসে সেখানে জড়ো হত। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে, অলিম্পিক খেলা আজকালও হচ্ছে। নামটা কিন্তু এসেছে গ্রীকদের সেই অলিম্পাস পাহাড়ের খেলাধুলো থেকে। ঐ নামে এখন বিভিন্ন দেশের ক্রীড়ামোদীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

এখন দেখা গেল, গ্রীক রাষ্ট্রগুলো বরাবর পৃথকভাবেই ছিল, খেলাধুলোর উপলক্ষে মাঝে মাঝে এক জায়গায় মিলেছে, আবার সারাক্ষণ নিজেরা নিজেরা লড়াই করেছে। অবশেষে একদা যখন বিদেশী শত্রু এসে দেশ আক্রমণ করল তখন কিন্তু এরা সবাই মিলিত হয়ে শত্রুর প্রতিরোধ করেছে। এই আক্রমণ হচ্ছে পারশ্যরাজের আক্রমণ। এ বিষয়ে আমরা আবার পরে আলোচনা করব।

৮

পশ্চিম-এশিয়ার সাম্রাজ্য

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩১

কাল তোমাদের দেখা পেয়ে খুব ভালো লাগল। তোমার দাদুকে এতটা অসুস্থ ও দুর্বল দেখব আশা করি নি। ওঁর জন্য ভারি দুশ্চিন্তা বোধ করছি। তোমাদের সেবাশুশ্রূষার দ্বারা ওঁকে আবার সুস্থ ও সবল করে তুলো। এ বিষয়ে কাল তোমাকে বিশেষ কিছু বলতেই পারি নি। এত অল্প সময়ের সাক্ষাতে কতটুকুই-বা বলা চলে। দেখাশোনা ও আলাপের অভাবের দরুন মনের এই শূন্যতা আমি চিঠি লিখে ভরে নিতে চাই। কিন্তু এ তো আসল জিনিষ নয়, এ যেন কেবল মনকে চোখঠারা। তবু মাঝে মাঝে মনকে এভাবে সান্ত্বনা দেওয়া মন্দ কী?

পুরোনোকালের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। এই সেদিন প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তোমার হয়তো মনে প্রশ্ন জাগবে, সে সময় অন্যান্য দেশের কীরকম অবস্থা ছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে তখন জানবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না—সুতরাং তাদের কথা আমরা সহজেই বাদ দিতে পারি। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের উত্তরপ্রান্তের দেশগুলিতে তখন নূতন নূতন অবস্থার আবির্ভাব হচ্ছিল। তুমি হয়তো জানো, বহু যুগ আগে

এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেরই উত্তরভাগ ছিল প্রচণ্ড শীতের দেশ। সেই বরফের যুগে তুষারের বিরাট বিরাট ঢেউ মধ্য-ইউরোপের বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবধি প্রবল বেগে নেমে আসত। সে সময় ও দেশে হয়তো মানুষের বসতিই ছিল না, আর থাকলেও তাদের ঠিক মানুষ বলা যেত কি না সন্দেহ। তুমি হয়তো ভাবছ সেই দূর অতীতে বরফের নদী ছিল কি না-ছিল সে সম্বন্ধে আমরা জানলাম কী করে। সে যুগে লেখক ছিল না, বই ছিল না, সুতরাং ইতিহাসও ছিল না; এ সবই সত্যি। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না—প্রকৃতি দিনের পর দিন, মাটির উপর, পাথরের উপর, যে ইতিহাস লিখে যায় তা পড়তে জানলেই পড়া যায়। এ যেন পৃথিবীর আত্মজীবনী। তুষারনদীর ওই একটি ধরন আছে, সে যেদিক দিয়ে যায় সেই পথে তার ধারার একটা চিহ্ন এঁকে রাখে। একবার যদি চিনে নিতে পারো তা হলে এই চিহ্ন দেখলেই বরফের স্রোতের গতিপথ আবিষ্কার করতে পারবে। আর চিনে নেওয়া খুব যে বেশি কষ্টসাধ্য তাও নয়। হিমালয় বা আল্‌প্‌স্ -অঞ্চলে যেখানে তুষারনদী আছে সেখানে একবার গেলেই বুঝবে। তুমি তো আল্‌প্‌স্ পর্বতে ম' ব্লাঁ-র ধারে-কাছে বরফের নদী দেখেছ। এই বিশেষ চিহ্নগুলি তখন হয়তো তোমায় কেউ দেখিয়ে দেয় নি। কাশ্মীর এবং হিমালয়ের নীচে আরও অনেক জায়গায় চমৎকার বরফের নদী দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে পিণ্ডারি নদী সবচেয়ে কাছে—আলমোড়া থেকে হপ্তাখানেকের রাস্তা। খুব ছেলেবয়সে—তখন তোমার চেয়েও ছোটো—আমি একবার পিণ্ডারি দেখতে গিয়েছিলাম। সে দৃশ্য আমি এখনও ভুলি নি।

দেখো, অতীতের ইতিহাস থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছি—একেবারে বরফের নদী পিণ্ডারিতে চলে এসেছি। মনগড়া কল্পনা নিয়ে খেলতে গেলে বারেবারে খেই হারিয়ে যায়। যদি সম্ভব হত তা হলে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প বলতাম আর তা হলে মাঝে মাঝে পথ ভুলে বেশ বরফের নদী প্রভৃতি জায়গায় মনে মনে বেড়িয়ে আসা যেত।

বরফের যুগের কথা বলতে গিয়ে বরফের নদীর কথা এসে গেল। বরফের নদী কেবল মধ্য-ইউরোপে নয়, ইংলণ্ড অবধি নেমে এসেছিল। এসব দেশে এখনও ধারাপথের চিহ্ন থেকে গেছে। অনেক দিনের পুরাতন শিলাখণ্ডের উপর এই চিহ্নগুলি দেখে মনে হয়, সে সময় ইউরোপের উত্তর ও মধ্য -ভাগ খুবই ঠাণ্ডা ছিল। তার পর আবহাওয়া উষ্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই নদীগুলি ক্রমশ শুকিয়ে শীর্ণ হতে থাকে। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা, অর্থাৎ পৃথিবীর গঠনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা, বলেন যে শীতের যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গরমের যুগ আসে। তখন ইউরোপের আবহাওয়া এখনকার চেয়েও গরম ছিল। এই উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে ইউরোপে ঘন অরণ্য জেগে ওঠে।

আর্যদের অভিযান মধ্য-ইউরোপ অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। সেখানে সেই সময়টাতে তাঁরা উল্লেখযোগ্য এমন কিছু করেন নি যেজন্য তাঁদের স্মরণ করা যেতে পারে। গ্রীস ও ভূমধ্যসাগর -অঞ্চলের লোকেরা খুব সম্ভব উত্তর ও মধ্য -ইউরোপের লোকদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। সুসভ্য লোকদের কাছে ওরা ছিল বর্বর। অরণ্যসংকুল উত্তর ও মধ্য -ইউরোপের এই 'বর্বর' জাতিরা এদিকে কঠোর জীবনসংগ্রামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। শক্তিমান স্বাস্থ্যবান ও সাহসী এই নূতন জাতি, জীবন এদের কাছে যুদ্ধ। একদিন দক্ষিণ-ইউরোপে নেমে এসে সেখানকার সভ্যজাতিদের সমস্ত শাসনব্যবস্থা ওলটপালট করে দেবার জন্য এই বর্বরেরা যেন ওৎ পেতে বসে ছিল। এটা ঘটে অনেক দিন পরে, সুতরাং এখানে সে কথা বলে লাভ নেই।

উত্তর-ইউরোপ সম্বন্ধে তবু তো কিছু জানা যায়—আমেরিকার মতো মহাদেশ ও আরও অনেক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস একেবারেই অজ্ঞাত থেকে গেছে। বলা হয়, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। তা বলে এ কথা তো বলা চলবে না যে, কলম্বস আমেরিকায় পদার্পণ করবার আগে সে দেশে কোনো সভ্য লোকই ছিল না। সে যাই হোক, এ কথা সত্যি যে, আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময়কার আমেরিকা সম্বন্ধে আমরা এখনও পর্যন্ত কিছু জানি না। এক মিশর ও ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণতীরবর্তী দেশগুলি ছাড়া আফ্রিকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি। এ সময়টা মিশরের সুপ্রাচীন ও গৌরবময় সভ্যতার হয়তো পড়ন্তি অবস্থা। কিন্তু তা হলেও মিশর তখনও অন্য অনেক দেশের তুলনায় ঢের বেশি উন্নত ছিল।

এশিয়ায় তখন কী হচ্ছিল ভেবে দেখা যাক। এই মহাদেশে সভ্যতার মোটামুটি তিনটি কেন্দ্র ছিল—মেসোপটেমিয়া, ভারত ও চীন।

মেসোপটেমিয়া, পারশ্য ও এশিয়া-মাইনরে প্রাচীন কালে কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটেছে। আসীরীয়, মীডীয়, বাবিলনীয় ও পারশিক প্রভৃতি সাম্রাজ্য পর পর এসেছে ও ভেঙে গিয়েছে। এই সাম্রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল, কখন একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধবিবাদ করেছে, আর কখনই-বা পাশাপাশি দুই রাজ্য পরস্পরের সহযোগী হয়ে শান্তিতে দিন কাটিয়েছে—এইসব খুঁটিনাটি ইতিহাসের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র ও পশ্চিম-এশিয়ার এই সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে যে প্রভেদ সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। এশিয়ার এই দেশগুলিতে গোড়া থেকেই একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলার দিকে অদ্ভুত ঝোঁক দেখা যায়। এই প্রবল ইচ্ছেটার মূলে থাকতে পারে হয়তো ওদের প্রাচীনতর সভ্যতার প্রেরণা বা অন্যবিধ কারণ।

ক্রীশাস্ রাজার কথা তুমি নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে 'ক্রীশাসের মতো ধনী'। তুমি হয়তো এও পড়েছ কীভাবে এই ধনী ও দাম্ভিক ক্রীশাসের মাথা হেঁট হয়েছিল। আজ যে দেশকে এশিয়া-মাইনর বলা হয়, এশিয়ার পশ্চিম-উপকূলের এই দেশকে তখনকার যুগে বলা হত লিডিয়া। ক্রীশাস্ ছিলেন লিডিয়ার রাজা। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত বলে লিডিয়ায় ব্যবসাবাণিজ্য খুব ভালো চলত। সে সময় কাইরাসের অধীনে পারশ্য-সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। শক্তিশালী কাইরাসের সঙ্গে ক্রীশাসের সংঘর্ষ হয় ও ক্রীশাসের পরাজয় ঘটে। পরাজিত লাঞ্ছিত হয়ে ক্রীশাসের অশেষ দুর্গতি ঘটে ও তারই ফলে তাঁর জ্ঞানোন্মেষ হয়, তিনি সত্যাসত্য বুঝতে শেখেন। এইসমস্ত কথা গ্রীক ইতিহাসরচয়িতা হিরোডটাস লিখে গিয়েছেন।

কাইরাসের সাম্রাজ্য ছিল বহুদূরবিস্তৃত—পূর্বদিকে ভারতের সীমা অবধি তাঁর ছিল অখণ্ড প্রতাপ। দারিয়ুস-নামে কাইরাসের পরবর্তী একজন সম্রাটের রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়। মিশর, মধ্য-এশিয়ার একটি অংশ, এমনকি সিন্ধুনদের কাছাকাছি ভারতবর্ষের একটি অংশও তখন পারশ্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শোনা যায়, পারশ্যের এই ভারতীয় প্রদেশ থেকে দারিয়ুসের রাজস্বস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে সোনা পাঠানো হত। তখনকার দিনে খুব সম্ভব সিন্ধুনদের বেলাভূমিতে স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যেত। এখন আর তা পাওয়া যায় না, বরঞ্চ প্রদেশের এই অংশের বেশির ভাগই আজকাল পতিত জমি। এই থেকেই বোঝা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াও বদলে গিয়েছে।

ইতিহাস পড়তে গিয়ে অতীতের অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করতে গেলে দেখবে, মধ্য-এশিয়াতে যেরকম ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে তেমন বোধ হয় আর কোনো দেশে ঘটে নি। এই দেশ থেকে কত দল, কত জাতি ও উপজাতি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। এই দেশে প্রাচীন কালে কত জনবহুল সমৃদ্ধিশালী শহর গড়ে উঠেছিল। আজকের দিনের কলকাতা কিংবা বোম্বাই শহরের চেয়েও বড়ো ছিল এইসব নগরী, ইউরোপের বড়ো বড়ো রাজধানীর সঙ্গে এদের অনায়াসে তুলনা করা চলে। তখন মধ্য-এশিয়ার এইসব শহর ছিল গাছপালায় সবুজ, চারদিকে বাগবাগিচা, আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। সেদিন আর নেই। এখনকার দিনে এই অঞ্চলে খুব কম লোকেরই বসবাস—লতাগুল্মহীন শুষ্ক মরুপ্রান্তরের মতো এর চেহারা। অতীতের দু-একটি শহর এখনও দাঁড়িয়ে আছে, যেমন ধরো সমরকন্দ্ ও বোখারা। এ শহরদুটির নাম শুনলেই মনে কত-না ছবি জেগে ওঠে। এদের প্রাচীন গৌরব আর নেই, যেন অতীতের ছায়ামাত্র।

ওই দেখো, আগেভাগে সব কথা বলে ফেলছি। আমি যে সময়কার কথা বলছি তখন না ছিল সমরকন্দ্ না ছিল বোখারা। এরা তখন ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। মধ্য-এশিয়ার গৌরবময় উত্থান ও তার পর তার পতন ঘটে আরও অনেকদিন পরে।

ঐতিহ্যের বোঝা

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩১

জেলে এসে অবধি আমার কতকগুলো নূতন অভ্যাস হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, খুব ভোরে ওঠা, এমনকি ভোর হবার অনেক আগেই। গত গ্রীষ্মকাল থেকে এ অভ্যাসটি করেছি। ধীরে ধীরে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে আর একটি-একটি করে তারার আলো নিবছে—বসে বসে তাই দেখতে বেশ লাগত। ঠিক ভোর হবার আগে তুমি চাঁদের আলো কখনও দেখেছ? আকাশের রঙ বদলে আস্তে আস্তে কেমন করে দিনের আলো দেখা দেয়! আমি কতদিন যে বসে বসে এই চাঁদের আলো আর ভোরের আলোর সংঘর্ষ দেখেছি। শেষ পর্যন্ত ভোরের আলোই বরাবর জিতে যায়। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মায়ালোকে বেশ কিছুক্ষণ বোঝাই যায় না, সেটা ঠিক চাঁদের আলো, না, নবাগত দিনের আলো। তার পরে অকস্মাৎ কখন অন্ধকারের কুহেলি ভেদ করে স্পষ্ট দিবালোক দেখা দেয়, আর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চাঁদ মলিন মুখে বিদায় নেয়।

অভ্যাসমতো আজও খুব সকালে উঠেছি, আকাশে তখনও তারা দপ্‌দপ্‌ করছে। কিন্তু আকাশে বাতাসে এমন একটা অস্পষ্ট আভাস ছিল, মনে হচ্ছিল ভোর হতে আর বেশি বিলম্ব নেই। বসে বসে পড়ছিলাম। হঠাৎ ভোরের নিস্তব্ধ প্রশান্তি ভেদ করে দূরে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং গাড়ির ঘড়্‌ঘড়ানি শুনতে পেলাম। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। মনে পড়ল, আজকে সংক্রান্তি, মাঘমেলার প্রথম দিন। হাজার হাজার স্নানার্থী ভোরবেলায় সংগমে স্নান করতে চলেছে, যেখানে গঙ্গা এসে মিশেছে যমুনার সঙ্গে, সরস্বতীও অদৃশ্য ভাবে এসে সেই ধারায় মিলেছে। দলে দলে চলেছে আর গান করছে, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করছে 'গঙ্গা-মায়ীকি জয়'। নাইনি জেলের প্রাচীর ভেদ করে তাদের কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে পৌঁচচ্ছে। বসে বসে শুনছি আর ভাবছি, ভক্তি-বিশ্বাসের কী অসীম ক্ষমতা—অসংখ্য মানুষকে টেনে এনেছে এই নদীর ধারে। কিছুক্ষণের জন্য অন্তত এরা এদের দুঃখ দারিদ্র্য ক্লেশ, সব ভুলে গিয়েছে। ভাবছিলাম, বছরের পর বছর, কত সহস্র বছর ধরে তীর্থযাত্রীর দল এই ত্রিবেণী-সংগমে এসে জড়ো হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এসেছে আর গেছে; কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, আবার অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা সমানভাবে চলছে। বংশানুক্রমে মানুষ তার কাছে মাথা নত করেছে। এই-যে কালের ধারা, এর মধ্যে ভালো জিনিষ অনেক আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এটাও একটা নিদারুণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাতে করে আমাদের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। অবশ্য এটা ভাবতে বেশ লাগে যে, একটা কোনো অদৃশ্য সূত্রে আমরা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় অতীতের সঙ্গে বাঁধা রয়েছি। তেরো শো বছর পূর্বে এই মেলার যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল তাও পড়তে বেশ লাগে। অবশ্য তারও বহু যুগ আগে এই মেলা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু এই-যে সূত্রটার কথা বলেছি, সেটা কেমন যেন শিকল হয়ে আমাদের চলবার পথে বাধা দেয়। তখন মনে হয় আমরা যেন সেই পুরোনো ঐতিহ্যের কবলে পড়ে বন্দী হয়ে আছি। অতীতের সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা করতেই হবে, কিন্তু সেই অতীত যদি কারাগার হয়ে আমাদের অগ্রগতিতে বাধা দেয় তবে আবার কারাগার ভেঙে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে।

আমার গত তিনটি চিঠিতে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, আড়াই হাজার, তিন হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল। কোনো সন-তারিখের উল্লেখ আমি করি নি; ওসব আমার পছন্দ নয়। তুমিও এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাও এ আমি চাই না। তা ছাড়া সেই প্রাচীন কালে কখন কী ঘটেছে তার সঠিক তারিখ বার করাও বড়ো সহজ নয়। পরে হয়তো কিছু কিছু সন-তারিখ দেবার দরকার হবে। তাতে কোন্‌ ঘটনার পর কোন্‌ ঘটনা ঘটল মনে রাখা

সহজ হবে। আপাতত শুধু প্রাচীন কালের পৃথিবী সম্বন্ধে তোমাকে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করছি।

ইতিমধ্যে গ্রীস, ভূমধ্যসাগর, মিশর, এশিয়া-মাইনর ও পারশ্য সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা ধারণা হয়েছে। এবার আমাদের নিজের দেশে ফিরে আসা যাক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমদিকটাতে বড়ো মুশকিলে পড়তে হয়। প্রাচীন যুগের আর্যেরা, যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা কোনো ইতিহাস লিখে রেখে যান নি। নানা দিক থেকে তাঁরা যে কত উন্নত ছিলেন, সে কথা গোড়ার দিককার চিঠিগুলোতে আমি কিছু কিছু বলেছি। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি যেসব বই এঁরা লিখে গিয়েছেন সাধারণ লোকের পক্ষে তা লেখা কখনোই সম্ভব নয়। এসব বই এবং আরও কিছু উপাদান থেকে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাস জানতে পারি। আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, ভাবনাচিন্তা এবং তাঁদের জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা ঐ বই থেকে জানা যায়, কিন্তু এগুলোকে খাঁটি ইতিহাস বলা চলে না। খাঁটি ইতিহাস বলতে সংস্কৃত ভাষায় যে একখানিমাত্র বই আছে সেটি হল কাশ্মীরের ইতিহাস, তাও অনেক পরবর্তী কালের লেখা। এই গ্রন্থের নাম 'রাজতরঙ্গিণী'। এটি কাশ্মীরের রাজাদের ইতিবৃত্ত। কহ্লন-নামক এক পণ্ডিত এই বই লিখেছিলেন। তুমি শুনে সুখী হবে যে তোমার রণজিৎ পিসেমশাই* এখন কাশ্মীরের সেই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসখানি সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করছেন। বিরাট গ্রন্থ, কিন্তু প্রায় অর্ধেক অনুবাদ হয়ে গেছে। সমস্ত অনুবাদ-গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হবে,† তখন আমরা সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে সেই বই পড়ব, কারণ মূল গ্রন্থ পড়বার মতো সংস্কৃতজ্ঞান আমাদের অনেকেরই নেই। একে তো বইখানি চমৎকার, তা ছাড়া কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এতে অনেক কথা আছে। আর তুমি তো জানো, কাশ্মীরেই ছিল আমাদের আদিনিবাস।

আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ সুসভ্য ছিল। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মোহেঞ্জো-দারোতে যেসব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তার থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই একটি অতি উন্নতধরনের সভ্যতা এ দেশে চলে আসছিল। তবে এ বিষয়ে খুব বেশি কিছু আমরা এখনও জানি না। আর ক-বছরের মধ্যেই বোধ করি অনেক কিছু জানা যাবে। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকরা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে যাঁরা ইতিহাসের তথ্য উদ্ধার করে থাকেন তাঁরা, মাটি খুঁড়ে যখন সব-কিছু বার করবেন তখন আরও অনেক কথা আমরা জানতে পারব।

এ ছাড়াও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-ভারতে তখন দ্রাবিড়দের একটি অতি উঁচুদরের সভ্যতা ছিল, এমনকি উত্তর-ভারতেও ঐজাতীয় কিছু থাকা অসম্ভব নয়। দ্রাবিড়দের ভাষা আর্যদের সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। এদের ভাষা অনেক বেশি প্রাচীন এবং তাদের সাহিত্যও খুব সমৃদ্ধ। তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম্—এসব হচ্ছে দ্রাবিড়দের ভাষা। দক্ষিণ-ভারতে—বর্তমান মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে—এখনও এইসব ভাষারই চলন। তুমি বোধ হয় জানো, আমাদের জাতীয় কংগ্রেস ভাষাগত পার্থক্য অনুযায়ী প্রদেশ ভাগ করেছে। ইংরেজ সরকার যেভাবে প্রদেশ গঠন করেছে তার চেয়ে এটা অনেক ভালো ব্যবস্থা। কারণ এর ফলে বিশেষ এক জাতের লোক, যারা এক ভাষায় কথা বলে, একই রকমের রীতিনীতি পালন করে, তারা সকলে এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। কংগ্রেসের বিভাগ অনুযায়ী দক্ষিণ-ভারতে অনেকগুলি প্রদেশ হবার কথা। এই যেমন মাদ্রাজের উত্তরভাগে হবে অন্ধ্র প্রদেশ—ওখানকার লোকের ভাষা হচ্ছে তেলেগু; তামিলভাষী লোকদের জন্য হবে তামিলনাদ প্রদেশ; বোম্বায়ের দক্ষিণে, যেখানকার লোক কানাড়ি ভাষায় কথা বলে, তাদের জন্য আলাদা প্রদেশ হবে—কর্ণাটক; আর মালাবার-অঞ্চলে, যেখানে মালয়ালম্ ভাষা প্রচলিত, সেখানে হবে কেরল প্রদেশ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতে যখন ভারতবর্ষের প্রদেশ-বিভাগ হবে তখন প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষার উপরেই খুব জোর দেওয়া হবে।

* শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী রণজিৎ পণ্ডিত, এই সময়ে তিনি লেখকের মতোই কারারুদ্ধ ছিলেন।

† পরে এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাগুলির সম্বন্ধে আরও একটু কথা বলে নেওয়া ভালো। ইউরোপে এবং অন্যত্রও কতক লোকের ধারণা, ভারতবর্ষে কয়েক শত বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এটা নিতান্তই বাজে কথা, যারা এরকম বলে তারা নিজেদের মূর্খতাই প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে অসংখ্য উপভাষা থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু সেগুলো আলাদা ভাষা নয়, স্থান-বিশেষে একই ভাষার রূপান্তর মাত্র। তা ছাড়া অনেক পাহাড়ি জাত আছে কিংবা এখানে-সেখানে ছোটোখাটো সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের মধ্যে চলতি বিশেষ কোনো ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ নিয়ে যখন কথা তখন দেখবে এসব ভাষার কোনো স্থানই নেই, এ সবই অবান্তর। কেবলমাত্র লোকগণনার বেলায় এসব ভাষার উল্লেখ হয়। বোধ করি আগের এক চিঠিতে তোমাকে বলেছিলাম যে, ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—দ্রাবিড়ীয়, তার কথা এইমাত্র তোমাকে বলেছি, এবং আর্যভারতীয়। এই আর্যভাষার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সংস্কৃত। এই গোত্রের অন্যান্য ভাষাগুলি সংস্কৃতেরই সন্তান—যেমন: হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি; এদেরই সমগোত্রীয় আরও দু-একটা ভাষা আছে: আসামে অসমিয়া ভাষা, উড়িষ্যা বা উৎকলে ওড়িয়া ভাষা। উর্দু হিন্দিরই রূপান্তর আর হিন্দুস্থানি বলতে হিন্দি উর্দু দুইই বোঝায়। তা হলেই দেখতে পাচ্ছ ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা হল ঠিক দশটি—হিন্দুস্থানি, বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম্, ওড়িয়া এবং অসমিয়া। এর মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা যে হিন্দুস্থানি তাই উত্তর-ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, দিল্লি এবং মধ্যভারতের সর্বত্র লোকে এই ভাষাতেই কথা বলে। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় পনেরো কোটি লোকের বাস। তবেই তো দেখছ, পনেরো কোটি লোক এখনই হিন্দুস্থানি বলছে—স্থানবিশেষে একটু ভাষার অদলবদল আছে, এই যা। তা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই লোকে হিন্দুস্থানি ভাষা বুঝতে পারে। খুব সম্ভব একদিন হিন্দুস্থানিই সর্বভারতের ভাষা হবে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, যেসব প্রধান প্রধান ভাষার নাম এইমাত্র করেছি সেগুলি একেবারে উঠে যাবে। প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে ওগুলো থাকবেই, বিশেষ করে যখন এদের চমৎকার সব সাহিত্য রয়েছে। যে ভাষা রীতিমতো উন্নতি লাভ করেছে সে ভাষা কোনো জাতির হাত থেকে কেড়ে নিতে নেই। কোনো জাতিকে বড়ো হতে হলে, তাদের সন্তানসন্ততিকে সুশিক্ষিত করতে হলে, নিজেদের ভাষার সাহায্যেই করতে হবে। ভারতবর্ষে তো এখন সব-কিছুই বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলেছে—আমরা নিজেদের মধ্যেও কথায়বার্তায় বেশির ভাগ বলি ইংরেজি। এই-যে আমি ইংরেজিতে তোমাকে চিঠি লিখছি, জানি এটা নিতান্তই হাস্যকর, তবু লিখছি! যাক গে, আশা করছি এ অভ্যাসটা শীগগিরই ছাড়তে পারব।

১০

প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য পঞ্চায়েত

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩১

আমার এই প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত কিছুতেই এগোচ্ছে না। সোজা রাস্তায় না গিয়ে আমি ক্রমাগত অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। গত চিঠিতে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে আমি ভারতের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধেই কেবল আলোচনা করেছি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এবার আসা যাক। আজ যাকে আমরা আফগানিস্তান বলি, অনেকদিন পর্যন্ত সে দেশ ভারতের অন্তর্গত ছিল। এই উত্তর-পশ্চিম অংশের প্রাচীন নাম ছিল গান্ধার দেশ। ভারতের উত্তরভাগে সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর তীরবর্তী সমতলভূমিতে আর্যরা দলে দলে এসে বসতি স্থাপন করে। এদের অনেকে এসেছিল পারশ্য ও মেসোপটেমিয়া থেকে। সেই প্রাচীন

কালেও এই দুটো দেশে অনেক বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে ভারতীয় আর্যরা বাড়িঘর তৈরি করার কৌশল বেশ ভালো করেই জানত। আর্যদের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশের মাঝে মাঝে ছিল অরণ্যের অন্তরাল। বিস্তীর্ণ অরণ্যের প্রাচীর ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ -ভাগকে যেন পৃথক করে রেখেছিল। এই অরণ্য ভেদ করে আর্যদের খুব কম লোকই দক্ষিণে বসবাস করতে যেত। তবে কেউ কেউ যায় নি এমন নয়—কেউ গেছে আবিষ্কারের নেশায়, কেউ বাণিজ্য করতে, আবার কেউ কেউ গেছে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন হয়ে। জনশ্রুতি আছে, আর্যদের মধ্যে অগস্ত্যঋষিই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে যান আর্যধর্ম ও সাধনার বাণী বহন করে।

পূর্ব থেকেই ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসাবাণিজ্য চলত। দক্ষিণের মশলাপাতি, সোনা ও মুক্তার লোভে অনেক বিদেশী বণিক সমুদ্র পার হয়ে ভারতে আসত। খুব সম্ভব চালও রপ্তানি হত। বাবিলনিয়ার বহু প্রাচীন প্রাসাদে মালাবারের সেগুন কাঠের তৈরি জিনিষ পাওয়া গেছে।

ধীরে ধীরে আর্যদের গ্রাম-ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতার সঙ্গে নবীন আর্যসভ্যতার একটি সমন্বয় দেখা যায়। এই গ্রামগুলি ছিল প্রায় স্বাধীন, গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিস্বরূপ পঞ্চায়েত গ্রামের সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। কয়েকটি গ্রাম কিংবা ছোটোখাটো শহর এক-একজন রাজা বা প্রধানের অধিনায়কত্বে যুক্ত থাকত—এই নায়ক কখনও-বা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন, কখনও উত্তরাধিকারসূত্রে এই পদ লাভ করতেন। সর্বসাধারণের উপকারে লাগে এমনি অনেক কাজ—যেমন ধরো, রাস্তাঘাট তৈরি করা, পান্থশালা প্রতিষ্ঠা করা কিংবা জল-সেচনের জন্যে খাল কাটা—এসব কাজ কয়েকটা গ্রাম মিলে যৌথভাবে করত। রাজা রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে পারতেন না। প্রজাদের মতো তিনিও ছিলেন আর্য-বিধিবিধানের অধীন, অন্যায় করলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার কিংবা তাঁর শাস্তি-বিধান করবার অধিকার ছিল প্রজাদের। 'আমিই রাষ্ট্র' এ কথা বলা চলত না। এসব থেকেই বুঝতে পারো যে, আর্য-উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থা অনেকটা জনতান্ত্রিক ছিল, অর্থাৎ দেশের শাসনব্যবস্থা অনেকটা প্রজাদের আয়ত্তাধীন ছিল।

ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে গ্রীসের আর্যদের তুলনা করা যাক। প্রভেদ ছিল অনেক, আবার উভয়ের মধ্যে মিলও ছিল খুব। দুই দেশেরই শাসনব্যবস্থাকে একহিসাবে প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করা চলে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। এই প্রজাতন্ত্র ছিল কেবল আর্যদের নিজেদের জন্য। যারা ক্রীতদাস, যাদেরকে ওরা নিচু জাত বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় কোনো অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। তাদের না ছিল স্বাধীনতা, না ছিল স্বায়ত্তশাসন। বহুধাবিভক্ত জাতিভেদপ্রথা তখনকার দিনে আজকের মতো এমন উগ্ররূপে দেখা দেয় নি। তখন ভারতীয় আর্যদের সমাজে কেবলমাত্র চারটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগকেই বলা হয় চাতুর্বর্ণ্য। যাঁরা ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে সময় কাটাতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ; দেশ-শাসন করতেন ক্ষত্রিয়; যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করতেন তাঁরা বৈশ্য; আর যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম অর্থাৎ মজদুরি করে জীবিকানির্বাহ করতেন তাঁদের বলা হত শূদ্র। তা হলে দেখা যাচ্ছে কাজকর্মের বিভেদের উপরই ছিল জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা। এমনও হতে পারে যে, পরাজিত অনার্যদের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রাখবার উদ্দেশ্যেই আর্যরা জাতিভেদের প্রবর্তন করেছিল। নিজেদের সভ্যতা নিয়ে আর্যদের মনে বেশ একটু দম্ভ ছিল, অনার্যদের তারা বর্বর বলে অবজ্ঞা করত—তাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। সংস্কৃতে 'জাত' অর্থে 'বর্ণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ থেকে এও বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের তুলনায় আর্যদের গায়ের রঙ অনেক বেশি ফরশা ছিল।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একদিকে আর্যরা শ্রমজীবীদের শূদ্র বলে সমাজের নিচুস্তরে স্থান দিয়েছে, দেশশাসন করবার অধিকার তাদের দেয় নি; অন্যদিকে আবার নিজেদের মধ্যে তাদের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল। দেশের শাসনকর্তা যাঁরা তাঁদের যথেচ্ছাচার করবার ক্ষমতা ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাঁদের পদচ্যুত হতে হত। সাধারণত ক্ষত্রিয়রাই রাজা হত কিন্তু কখনও কখনও তার ব্যতিক্রম ঘটত—বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহে যখন বিপদ আসত। এরূপ অবস্থায় ক্ষমতাশালী শূদ্রের পক্ষেও

সিংহাসন দখল করা বিচিত্র ছিল না। আর্যদের অবনতি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদপ্রথা অটল সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেল। নানা ভেদবিভেদের ফলে দেশ দুর্বল হয়ে পড়ল—তাদের স্বাধীনতার পূর্ব আদর্শও তারা ভুলে গেল। অথচ এককালে একটা কথাই ছিল—আর্য কখনও দাসত্ব স্বীকার করে না। 'আর্য' নামের অবমাননার চেয়ে তারা মৃত্যুকেও শ্রেয় জ্ঞান করত।

আর্যদের নিবাসভূমি এই শহর ও গ্রামগুলি যেমন-তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি শহর ও গ্রাম গঠিত হত কোনো সুপরিকল্পিত প্রণালী অনুযায়ী। শুনলে অবাক হবে যে এই পরিকল্পনাগুলিতে জ্যামিতিক পদ্ধতি অনুসৃত হত। বৈদিক পূজা-অনুষ্ঠানে দেখা যায় বেদি প্রভৃতি রচনায় অনেক ক্ষেত্রে জ্যামিতির ব্যবহার ছিল—এখনও অনেক হিন্দু-পরিবারে পূজা-পার্বণের সময় তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। গৃহ ও নগর -নির্মাণের সঙ্গে জ্যামিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সেকালকার আর্যগ্রাম এক-একটি সুরক্ষিত শিবির, কারণ সর্বদাই তখন আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ-আশঙ্কা না থাকলেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হত—প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বেশি চতুষ্কোণ একখণ্ড জমি, তার চারদিকে প্রাচীর, চারটি বড়ো চারটি ছোটো তোরণদ্বার, প্রাচীরাভ্যন্তরে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত পথ ও বাড়িঘর; গ্রামের ঠিক মাঝখানে পঞ্চায়েত-ঘর—গ্রামবৃদ্ধদের আলাপ-আলোচনার স্থান। ছোটো ছোটো গ্রামে পঞ্চায়েত-ঘরের পরিবর্তে একটা বড়ো গাছের তলায় মোড়লরা বসত। প্রতি বছর গ্রামবাসীরা মিলে পঞ্চায়েত নির্বাচন করত।

অনেক জ্ঞানীগুণী লোক নগর বা গ্রামের সন্নিহিত কোনো অরণ্যে গিয়ে সরল জীবনযাত্রা যাপন করতেন বা শান্তভাবে জ্ঞানচর্চা ও কর্মে মনোনিবেশ করতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের কাছে শিষ্যেরা এসে একত্র হত—এইভাবে এক-একজন গুরুকে কেন্দ্র করে এক-একটি আশ্রম গড়ে উঠত। এই তপোবনগুলিকেই সেকালকার বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। এইসব বিদ্যালয়ে বড়ো বড়ো অট্টালিকার আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু বহু দূর দেশ থেকেও বিদ্যার্থীরা এইরকম বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে আসত।

আমাদের 'আনন্দভবন'*এর ঠিক উল্টোদিকেই ভরদ্বাজ-আশ্রম। তুমি তো এই আশ্রম কতবার দেখেছ। তুমি হয়তো এও শুনে থাকবে যে ভরদ্বাজ-মুনি ছিলেন সেই প্রাচীন রামায়ণের কালের একজন জ্ঞানী। রামচন্দ্র বনবাসের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। শোনা যায় হাজার হাজার শিষ্য ও ছাত্র তাঁর সঙ্গে তপোবনে বাস করত। ভরদ্বাজের অধ্যক্ষতায় একে পুরোপুরি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই বলা যেতে পারে। সেকালে এ আশ্রম ছিল ঠিক গঙ্গার ধারেই—আজকাল অবশ্য গঙ্গার ধারা প্রায় মাইলখানেক দূরে সরে গেছে। আমাদের বাগানের কোনো কোনো জায়গায় বালির পরিমাণ খুব বেশি—কে জানে হয়তো এই বাগানের ভিতর দিয়েই ছিল প্রাচীন গঙ্গার ধারাপথ।

এই সময়টা ছিল আর্যদের গৌরবময় যুগ। খুবই দুঃখের বিষয়, এ যুগের ইতিহাস আমরা জানি না, যতটুকু জানি তা অপ্রামাণিক গ্রন্থ থেকে। তখনকার আর্যপ্রদেশ ও রাজত্বগুলির নাম ছিল: দক্ষিণ-বিহারে মগধ; উত্তর-বিহারে বিদেহ; কাশী অথবা বারাণসী; কোশল, এর রাজধানী ছিল অযোধ্যা—আজকাল যার নাম ফয়জাবাদ; গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশ পাঞ্চাল। পাঞ্চাল দেশের সবচেয়ে বড়ো দুটি শহরের নাম ছিল মথুরা ও কান্যকুব্জ। পরবর্তী কালের ইতিহাসে এই দুটি শহর কম বিখ্যাত ছিল না। দুটি শহরই এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, কেবল কান্যকুব্জের নাম বদলে হয়েছে কনৌজ। এই শহরটি কানপুরের কাছে। আর ছিল উজ্জয়িনী; আজকাল উজ্জয়িনী গোয়ালিয়র রাজ্যের একটি সামান্য শহরমাত্র।

পাটলিপুত্র অথবা পাটনার কাছে ছিল বৈশালী। এই বৈশালী ছিল ইতিহাসপ্রখ্যাত লিচ্ছবিকুলের রাজধানী। বৈশালীতে ছিল সাধারণতন্ত্র, প্রজাদের প্রতিনিধি-সংসদ থেকে নির্বাচিত একজন নায়ক দেশ শাসন করতেন।

* লেখকের পৈত্রিক বাড়ি

কালক্রমে বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠতে লাগল। ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারকম শিল্পেরও যথেষ্ট প্রসার হতে আরম্ভ করল। শহরগুলি হল ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। তপোবনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির আকার আয়তন ও জনসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল। এইসব আশ্রমে থাকতেন আচার্যরা ও তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায়; এমন বিষয় ছিল না যা নিয়ে তাঁরা চর্চা না করতেন। যত বিদ্যা সে যুগে জানা ছিল সবই শিক্ষা দেওয়া হত। এমনকি ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত শিক্ষা দিতেন। তুমি তো মহাভারতে পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্যের কথা পড়েছ। দ্রোণ ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিনি তাঁর ক্ষত্রিয় শিষ্যদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১১

চীনের সহস্র বৎসর

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩১

কারাপ্রাচীর ভেদ করে বাইরের জগতের খবর এখানেও এসে পেঁচেছে—সে খবরে একদিকে যেমন মনে দুঃখ পাই অপরদিকে তেমনি গর্বে আনন্দে বুক ভরে ওঠে। শোলাপুরের লাঞ্ছনার কাহিনী আমরা শুনেছি। আবার সে সংবাদ শুনে দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয়েছে তারও টুকরা-টাকরা খবর আমরা পাচ্ছি। আমাদের ছেলেরা প্রাণ দিচ্ছে, হাজার হাজার লোক স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে বেপরোয়া লাঠির আঘাত সইছে—এসব কথা ভাবলে নিশ্চেষ্ট হয়ে এখানে চুপ করে বসে থাকা কঠিন হয়। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে—এতে আমাদের ভালোই হবে। আমার মনে হয়, প্রত্যেকেরই সেই সুযোগ আসছে যখন সকলকে চরম পরীক্ষার মুখে দাঁড়াতে হবে। ইতিমধ্যে দেশবাসীর সাহস দেখে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি। এগিয়ে গিয়ে তারা দুঃখকে বরণ করছে। শত্রু যত আঘাত করছে এদের শক্তি তত বাড়ছে, দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুকে প্রতিরোধ করছে।

প্রতিদিনের খবর এসে মনকে এত দোলা দিচ্ছে যে অন্য কোনো কথা ভাবা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু মিথ্যে ভেবে ভেবে কিছু লাভ হয় না। সত্যিকারের কাজ করতে হলে মনকে সংযত করতে হবে। কাজেই এসব দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়ে মনটাকে বরং খানিকক্ষণের জন্য চালান দেওয়া যাক পুরাকালের জগতে।

যাওয়া যাক একেবারে চীন দেশে। প্রাচীনকালের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আর চীন দেশ যেন দুই ভগিনী। চীন এবং পূর্ব-এশিয়ার অন্যান্য দেশ—এই যেমন জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচীন, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশ—আর্যদের বাসস্থান নয়। ওসব দেশে মঙ্গোলীয় জাতির বাস।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে কিংবা তারও আগে এক দল লোক চীন দেশ আক্রমণ করেছিল। এরা এসেছিল মধ্য-এশিয়া থেকে। সভ্যতার দিক থেকে এরা অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। এরা কৃষিবিদ্যা জানত এবং গোপালন-মেষপালনেও অভ্যস্ত ছিল। এরা তখন চমৎকার বাড়িঘর তৈরি করতে শিখেছে, এদের সমাজব্যবস্থাটিও ছিল সুশৃঙ্খল। প্রথমটায় এসে এরা হোয়াংহো বা পীত নদীর ধারে বসবাস শুরু করল, আস্তে আস্তে সেখানে একটি ছোটো রাষ্ট্র গড়ে উঠল। তার পরে কয়েক শো বছর ধরে ওরা ক্রমে চীন দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে তাদের শিল্পকলারও অনেক উন্নতি হয়েছে। চীন দেশের লোকেরা প্রধানত ছিল কৃষিজীবী। আর তাদের মধ্যে যারা ছিল দলের মোড়ল তারা অনেকটা সেই প্যাট্রিয়ার্ক বা সমাজপতিদের মতো, যাদের কথা আমি আগের কয়েকটি চিঠিতে তোমাকে বলেছি। এর ছ-সাত শো বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে চার হাজার বছরেরও আগে ইয়াও বলে একজন লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়—ইনি নিজেকে সম্রাট বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু মস্ত বড়ো নাম নিলে কী হবে, আসলে তিনি ছিলেন সেই সমাজপতিরই শামিল। মিশর কিংবা মেসোপটেমিয়ার সম্রাট বলতে আমরা যা দেখেছি ইনি তার
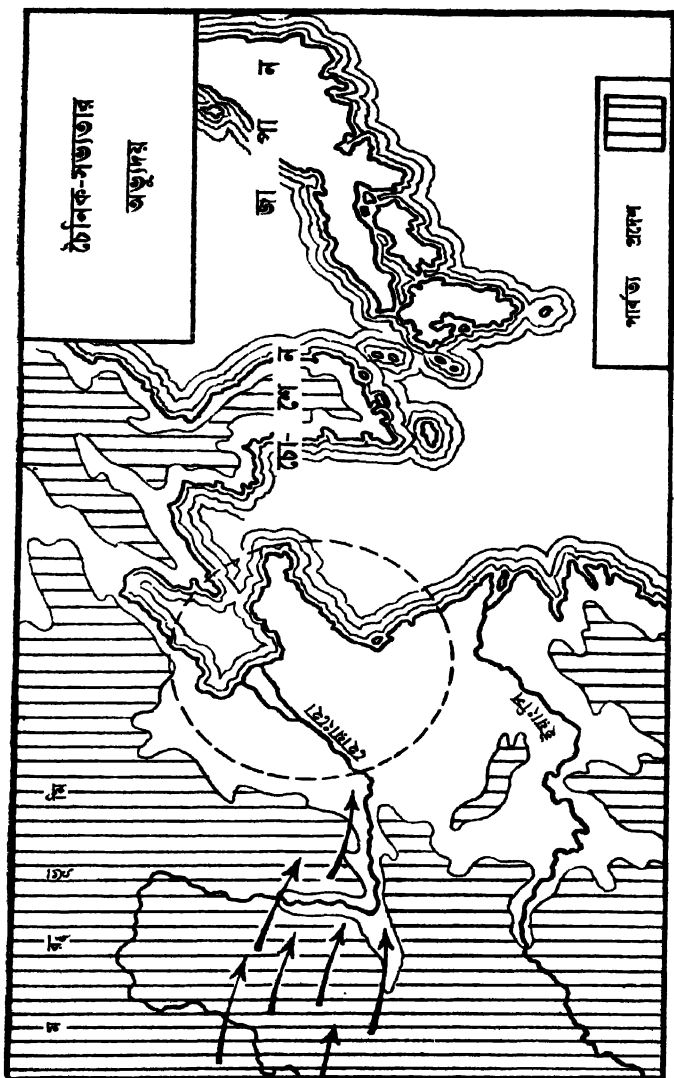
কিছুই ছিলেন না। চীন দেশের লোকেরা প্রধানত কৃষিকাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, কাজেই বহুকাল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো শাসনপ্রণালী ও দেশে গড়ে ওঠে নি।

গোড়ার দিকে লোকেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে সমাজপতি নির্বাচিত করে নিত, কিন্তু ক্রমে সমাজপতির পদ হয়ে গেল বংশানুক্রমিক, অর্থাৎ পিতা থেকে পুত্রে বর্তাতে লাগল। চীন দেশেও তাই ঘটেছিল। অবশ্য ইয়াও-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় নি। দেশের মধ্যে যাকে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করেছিলেন তাকেই সম্রাটপদে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই রাজপদ বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে এবং গোড়ার দিকে চার শো বছরেরও বেশি কাল কোন্-এক সিয়া-বংশ চীন দেশে রাজত্ব করে। এ বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন খুব অত্যাচারী। তার ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে। এর পরে শাঙ বা ঈন্ নামে আর-একটি বংশ রাজ্যভার গ্রহণ করে। এদের রাজত্ব চলেছিল প্রায় সাড়ে ছ শো বছর।

দু-চার কথায় এবং অল্প কটি ছত্রের মধ্যেই আমি চীন দেশের সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস শেষ করে দিয়েছি। খুব অদ্ভুত লাগছে, না? ইতিহাসের মধ্যে যে বিশাল কালের বিস্তার তাতে এ ছাড়া আর উপায় কী? কিন্তু এ কথা মনে রাখবে যে ইতিহাসটা যতই সংক্ষেপে বলি না কেন, কালের দৈর্ঘ্যটাকে তাই বলে ছেঁটে সংক্ষেপ করি নি; সেটা হাজার বা এগারো শো বছরই আছে। আমাদের কাছে সময়ের পরিমাপ হচ্ছে দিন মাস বছর দিয়ে। কাজেই বেশির কথা ছেড়ে দাও, বোধকরি এক শো বছর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করাই তোমার পক্ষে কঠিন। এই-যে তোমার মাত্র তেরো বছর বয়স হয়েছে তা-ই তোমার কাছে রীতিমতো সুদীর্ঘকাল বলে মনে হয়, তাই না? তা ছাড়া, এক-একটি বছর যায় আর তুমি মাথায় কতখানি বড়ো হয়ে ওঠো! তা হলেই দেখো, এমনিতরো ইতিহাসের হাজারটা বছরের কথা কল্পনা করা কি সহজ ব্যাপার? এ যে দীর্ঘাতিদীর্ঘ কাল! যুগের পর যুগ আসছে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র শহর মহানগরী হয়ে উঠছে আবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, ঠিক সেই স্থানেই আবার নূতন শহরের পত্তন হচ্ছে। কেবল গত হাজার বছরের ইতিহাসের কথাই ভেবে দেখো-না, তা হলেই কালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তোমার একটু ধারণা হবে। গত হাজার বছরে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন হয়েছে, ভাবতে গেলে সত্যি অবাক হতে হয়।

এই চীন দেশের ইতিহাস বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কত প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতির ধারা বহন করে চলেছে এই ইতিহাস, আর কত রাজবংশের ইতিবৃত্ত—তার কোনোটি চলেছে পাঁচ শো বছর ধরে, কোনোটি বা আট শো বছরেরও বেশি।

আমি অতি সংক্ষেপে যে এগারো শো বছরের ইতিহাস বলেছি, মনে রাখবে সে সময়টাতে চীন দেশের সভ্যতার বিকাশ হয়েছে অতিশয় ধীর গতিতে। ক্রমে ক্রমে সমাজপতির শাসন গেল উঠে, দেখা দিল কেন্দ্রীয় শাসন, সৃষ্টি হল সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের। সেই অতিপ্রাচীন কালেই কিন্তু চীন দেশের লোকেরা লিখনপ্রণালী জানত। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো, আমাদের ভাষায় কিংবা ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় যে লিখনপ্রণালী—চীনা ভাষার লিখনপ্রণালী তার থেকে স্বতন্ত্র। ও ভাষায় কোনো অক্ষরমালা নেই। ওরা লেখে ছবি কিংবা সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে।

ছ শো চল্লিশ বছর রাজত্ব করবার পর প্রজারা বিদ্রোহ করে শাঙ-বংশকে সিংহাসনচ্যুত করে। এবারে যাঁরা ক্ষমতা লাভ করলেন তাঁরা চাউ-বংশ বলে খ্যাত। শাঙ-বংশের চাইতে এঁরা আরও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। এই চাউদের রাজত্বকালেই সুনিয়ন্ত্রিত চীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কন্‌ফুসিয়স এবং লাওৎসে নামে বিখ্যাত জ্ঞানী দার্শনিকদের আবির্ভাবও এই সময়েই হয়েছিল। পরে এঁদের কথা আরও বলব।

শাঙ-রাজারা যখন বিতাড়িত হলেন তখন কিৎসি-নামক এঁদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী চাউ-রাজাদের বশ্যতা স্বীকার না করে বরং দেশত্যাগী হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। পাঁচ হাজার অনুচর সঙ্গে করে তিনি চীন দেশ ছেড়ে কোরিয়া দেশে চলে গেলেন। তিনি গিয়ে দেশের নামকরণ করলেন ‘চো-শেন’ বা প্রভাত-শান্তির দেশ। কোরিয়া বা চো-শেন চীন দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত, এই ভেবেই কিৎসি পূর্বাচলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন এর পূর্ব-

দিকে আর কোনো দেশ নেই, তাই ঐ নাম দিয়েছিলেন। এই কিংসির আগমনকাল থেকেই কোরিয়ার ইতিহাস শুরু—আর তাও ঘটেছিল খৃষ্টজন্মের এগারো শো বছর আগে। কিংসি যখন এই নূতন দেশে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আনলেন চীনাদের শিল্পকলা, তাদের গৃহনির্মাণপ্রণালী, কৃষিবিদ্যা এবং রেশমশিল্প। কিংসির পরে আরও-সব চীনা দলে দলে এসে এ দেশে বসবাস শুরু করে দিলে। কিংসির বংশধরেরা চো-শেনে ন শো বছরেরও বেশি কাল রাজত্ব করেছিল।

অবশ্য চো-শেন পূর্বাঞ্চলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত নয়। তারও পূর্বে রয়েছে জাপান। কিন্তু কিংসি যখন চো-শেনে আগমন করেন তখন জাপানের অবস্থা কী ছিল আমরা জানি নে। জাপানের ইতিহাস চীন দেশের ইতিহাসের মতো অত প্রাচীন নয়, এমনকি কোরিয়া বা চো-শেনের মতোও নয়। জাপানিরা বলে, তাদের প্রথম সম্রাটের নাম জিম্মু টেনো, খৃষ্টজন্মের ছ-সাত শো বছর আগে তিনি রাজত্ব করেছিলেন। জাপানিদের মতে তিনি নাকি সূর্যদেবীর বংশধর। ও দেশে আবার সূর্যকে দেবতা না বলে দেবী বলা হয়। জাপানের বর্তমান সম্রাট নাকি ঐ জিম্মু টেনোরই বংশধর, কাজেই ইনিও সূর্যবংশসম্ভূত।

তুমি বোধহয় জানো আমাদের দেশের রাজপুতরাও এমনিভাবে চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি বংশের একটি হল সূর্যবংশী আর একটি চন্দ্রবংশী। উদয়পুরের মহারাণা হলেন সূর্যবংশীদের কুলপতি। তিনি বলেন, প্রাচীনতম কাল থেকে তাঁদের এই বংশ চলে আসছে। আমাদের এই রাজপুতরা সত্যি এক আশ্চর্য জাত। এদের কাহিনী বলে শেষ করা যায় না।

১২

অতীতের আহ্বান

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩১

আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীর চেহারাটা যেমন ছিল তার মোটামুটি একটা আন্দাজ আমরা পেয়েছি। খুব স্বল্পপরিসরের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। যে দেশগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল অথবা যাদের সম্বন্ধে ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য নজির আছে, কেবল তাদের সম্বন্ধেই দু-এক কথা বলা হয়েছে। এই দেখো-না, মিশরের সভ্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেবলমাত্র পিরামিড ও স্ফিংক্স্-এর কথাই বললাম। আরও অনেক উল্লেখযোগ্য কথা ছিল যার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। মিশরীয় সভ্যতা যে কত প্রাচীন তা একটা কথা থেকেই বুঝতে পারবে—আমরা যে সময়কার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি তখন মিশরের পড়তি অবস্থা, তার বহু আগেই ও দেশের গৌরবময় যুগের অবসান হয়ে গেছে। নোসসের সভ্যতায়ও তখন ভাঙন ধরেছে। আগের চিঠিতে তোমাকে চীন দেশের কথা বলেছি। সে যুগে চীনে খুব বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল; দীর্ঘকালের জন্য সমস্ত দেশকে একতাবদ্ধ করে এই সাম্রাজ্যগুলি চীনের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিখনপদ্ধতির প্রবর্তন, রেশমের আবিষ্কার প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীনকালে কোরিয়া ও জাপানের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই দু-এক কথা তোমাকে বলেছি। ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে এখানকার প্রাচীন সভ্যতার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছি—প্রথমত সিন্ধুনদের তীরবর্তী মোহেঞ্জোদারো-যুগের সভ্যতা, দ্বিতীয়ত দ্রাবিড়সভ্যতা, ও তার পরবর্তী কালের আর্যসভ্যতা। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আর্যদের লেখা কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তকের কথাও বলেছি। আর্যরা কেমন করে প্রথম প্রথম উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ও তার পর দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়দের সংস্পর্শে এসে 'আর্য-দ্রাবিড়' নামে একটা নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তোলে—এ সবই তুমি শুনেছ। আর্যগ্রামগুলির

প্রজাতান্ত্রিক ভিত্তি, গ্রাম থেকে কালক্রমে শহর ও রাষ্ট্রের উদ্ভব, তপোবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতি—এইসব ঘটনার কথাও তোমাকে বলেছি। খুব অল্পের মধ্যে যদিও, তবু তোমাকে পারশ্য ও মেসোপটেমিয়ার বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের কথা এবং দারিয়ুস নামে পারশ্যের একজন রাজার সিন্ধুনদ অবধি রাজ্যবিস্তারের কথা বলেছি। প্যালেস্টাইনের কথা বলতে গিয়ে ইহুদিদের কথা এবং কেমন করে ছোট্ট একটি দেশের মুষ্টিমেয় লোক সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—এ সবই তোমাকে জানিয়েছি। এই ইহুদিদের ডেভিড ও সলোমন নামে দুজন রাজার নাম বাইবেল গ্রন্থে আছে, ফলে তাঁরা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন—যদিও তাঁদের চাইতে বড়ো বড়ো রাজার কথা লোকে ভুলে গেছে। নোসসের ধ্বংসস্তূপে নূতন আর্যসভ্যতার বনিয়াদ গঠন, গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র, ভূমধ্যসাগরের ধারে ধারে গ্রীসের উপনিবেশ স্থাপন, রোমের ভাবী গৌরবের সূচনা, ইতিহাসের প্রাঙ্গণে রোমের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কার্থেজ নগরের পদার্পণ—কোনো কথাই বাদ দিই নি।

কিন্তু এ দেখা নিতান্তই উপর-উপর দেখা। এ ছাড়া আমি অন্য অন্য দেশের কথাও হয়তো বলতে পারতাম—এই যেমন উত্তর-ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার কয়েকটা দেশ। সেই প্রাচীন যুগেও দক্ষিণ-ভারতের নাবিকেরা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে মালয় প্রভৃতি দেশে গিয়েছিল। কত কথাই তো বলা যায়, কিন্তু সব কথা বলতে গেলে আর এগোনো যাবে না।

ইতিপূর্বে যেসব দেশের কথা বলেছি সেগুলি সবই বহু প্রাচীন। সেই সুদূর অতীতে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ ছিল খুবই কম; পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে তো কথাই নেই। যারা একটু দুঃসাহসী তারা সাগর পার হয়ে বিদেশে যেত, আবার কেউ কেউ দেশদেশান্তর অতিক্রম করে চলে যেত ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এটা অবশ্য কালেভদ্রেই ঘটত, কারণ বিদেশে বিভুঁয়ে যাবার বিপদ ছিল ঢের। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে লোকের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না। লোকের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী একটা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—পৃথিবী যে গোল সে কথা আবিষ্কৃত হয় অনেককাল পরে। গ্রীসের লোকেরা চীন বা ভারত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না, তেমনি আবার চীন ও ভারতের লোকেরাও ভূমধ্যসাগরের দেশগুলি সম্বন্ধে একপ্রকার অজ্ঞই ছিল।

প্রাচীন কালের পৃথিবীর একটি মানচিত্র যদি সংগ্রহ করতে পারো তো খুব ভালো হয়। সে সময়কার পৃথিবী ও দেশবিদেশের বিবরণ প্রাচীন লেখকরা কিছু কিছু লিখে গেছেন। এইসব লেখায় বিভিন্ন দেশের আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে। অতীতের পৃথিবীর যেসব মানচিত্র আজকাল তৈরি হয়, সেগুলি অতীতের ইতিহাস বোঝার পক্ষে খুবই দরকারি। হাতের কাছে এরকম মানচিত্র রাখা উচিত। মানচিত্র ছাড়া ইতিহাস বোঝা একপ্রকার অসম্ভব বললেই হয়। কেবল মানচিত্র কেন, পুরাতন কালের ঘরবাড়ি ভগ্নাবশেষ প্রভৃতির ছবি যা পাওয়া যায় সব-কিছুই ইতিহাস বোঝার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই ছবিগুলিই এক হিসাবে ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কালকে রূপায়িত জীবন্ত করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। ইতিহাস থেকে সত্যকার শিক্ষা পেতে হলে অতীতের ঘটনাপ্রবাহকে দেখতে হবে চলচ্চিত্রের ছবির মতো—যেন মনে হবে সব চোখের উপর ভাসছে। ইতিহাস যেন একটা রোমাঞ্চকর অভিনয়ের মতো। এ অভিনয় একবার দেখতে বসলে চোখ ফেরানো যায় না। কখনও মিলনান্ত কখনও-বা বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হচ্ছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে। যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা হলেন প্রাচীন কালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারী।

ছবি ও মানচিত্র দেখলে ইতিহাসের ঘটনাবলীর শোভাযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা চোখ খুলে যায়। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে এগুলি দেওয়া উচিত। এর চেয়ে অনেক ভালো হয় যদি তারা স্বচক্ষে অতীতের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে আসতে পারে। সব-কিছু দেখা সম্ভব নয়, কারণ এগুলি ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু একটু নজর দিলে আমাদের নাগালের মধ্যেই কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বড়ো বড়ো যাদুঘরেও এই ধরনের জিনিষ কিছু কিছু সংগ্রহ করে রাখা থাকে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ অনেক ধ্বংসাবশেষ ভারতে দেখা যায়। খুব প্রাচীন কালের নিদর্শন অবশ্য মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায়

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এমনও হতে পারে যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রচণ্ড তাপের ফলে অনেক কিছুই শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে গেছে। এ ধারণাটা কেবল আংশিকভাবে সত্য। প্রাচীন কালের চিহ্নস্বরূপ অনেক-কিছু জিনিষ এখনও মাটির তলায় আত্মগোপন করে আছে; সেগুলি আজ পর্যন্ত খুঁড়ে বার করা হয় নি। এইসব ধ্বংসাবশেষ অনুশাসন ইত্যাদি খুঁড়ে বার করা হলে পর দেখবে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বই যেন পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। ইঁটপাথরের পাতায় দেখতে পাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী।

তুমি তো দিল্লি শহরের আশেপাশে কিছু কিছু পুরোনো ঘরবাড়ি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখেছ। আবার যখন দিল্লি গিয়ে এগুলি দেখবে তখন বিগত দিনের কথা ভেবে দেখো—মনে হবে যেন সেই প্রাচীন কালে ফিরে গেছ। এই ধ্বংসাবশেষগুলি যে-কোনো ইতিহাসের বইয়ের চাইতে অনেক বেশি শিক্ষা দিতে পারে। সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দিল্লি শহরে বা তার আশেপাশে কত মানুষ বসবাস করে এসেছে। কত লোক কত নামে ডেকেছে এই শহরকে : ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর, তুঘ্‌লকাবাদ, শাজাহানাবাদ এবং আরও কত নামে। শোনা যায়, যমুনা নদীর ধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাত-সাতটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই একই দিল্লি শহর পত্তন করা হয়। আজ যে নূতন দিল্লি বা রায়সিনা শহর দেশের বর্তমান শাসনকর্তাদের হুকুমে নির্মিত হয়েছে, এক হিসাবে তাকে অষ্টম দিল্লি বলা চলে। কত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এই দিল্লি শহর, কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটেছে এই দিল্লিতে!

এ দেশের প্রাচীনতম শহর বারাণসী বা কাশীতে গিয়ে একবার তার অস্ফুট কথাগুলি কান পেতে শুনো দেখি। কাশী তোমাকে স্মরণাতীত কালের খবর দেবে। বলবে, তার চোখের সামনে কত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তবু সে টিঁকে আছে। বলবে, বুদ্ধ এসেছিলেন বারাণসীতে তাঁর নূতন ধর্মের বাণী নিয়ে। আর বলবে লক্ষ লক্ষ লোকের কথা—যারা যুগে যুগে পুণ্যধামে এসেছে শান্তি ও সান্ত্বনার আশায়। পলিতকেশা, ন্যুব্জদেহা জীর্ণচীরপরিহিতা বৃদ্ধা এই কাশী—যুগযুগান্তের সঞ্চিত শক্তিতে এখনও শক্তিমতী এই প্রাচীনা নগরী। এখনও মানুষের মনোহরণ করে এই আশ্চর্য কাশী, তার চোখে যেন প্রাচীন ভারত জ্বল্‌জ্বল্‌ করে, তার গঙ্গার কলধ্বনি যেন অতীতের বিস্মৃত কণ্ঠের সংগীত যুগ যুগ বহন করে নিয়ে চলেছে।

অত দূরে নাই-বা গেলে, আমাদের এলাহাবাদ অথবা প্রয়াগ নগরীর অশোকস্তম্ভের উপর যে অনুশাসন খোদাই করা আছে তার সামনে একটিবার দাঁড়াও—মনে হবে যেন দু হাজার বছরের ব্যবধান থেকে প্রিয়দর্শীর কণ্ঠ ভেসে আসছে।

১৩

ধনসম্পদ যায় কোথায়?

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩১

মুসৌরিতে তোমাকে যেসব চিঠি লিখেছি তাতে মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে নানাবিধ শ্রেণীর উদ্ভব হল তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। আদিম কালের মানুষকে বড়ো কঠোর জীবন যাপন করতে হত। কেবলমাত্র খাদ্যসংগ্রহ নিয়েই তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। বনে বনে শিকার খুঁজে বেড়াতে হত, প্রতিদিনের খাদ্যের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করতে হত। কখনও কখনও খাদ্যের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দল গড়ে উঠতে লাগল। এই দলগুলো আর-কিছু নয়, কতকগুলো বৃহৎ পরিবারের সমষ্টিমাত্র। তারা একসঙ্গে বাস করত, একসঙ্গে শিকার করত, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে একা থাকার চাইতে দল বেঁধে থাকা বেশি নিরাপদ। তার পরে একটা বিরাট পরিবর্তন এল—এটি হল কৃষিবিদ্যা-আবিষ্কারের

সংগে সংগে; এতে এক ঘোরতর পরিবর্তন হল। লোকে দেখল, সারাক্ষণ শিকার করে বেড়ানোর চাইতে কৃষিবিদ্যার সাহায্যে জমি থেকে খাদ্যসংগ্রহ করা অনেক বেশি সহজ। আর জমি চাষ করা, বীজ বপন করা, ফসল কেটে আনা—এতসব কাজে ব্যাপৃত থাকলে জমিটাকেই সম্বল করে বাস করতে হয়। এতদিন যে তারা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াত এখন আর তা সম্ভব হল না। কাজেই জমির কাছাকাছি স্থায়ী আস্তানা করতে হল। এরই ফলে আস্তে আস্তে গ্রাম শহর গড়ে উঠতে লাগল।

কৃষিবিদ্যার ফলে আরও-সব পরিবর্তন হয়েছে। জমি থেকে যে খাদ্য সংগ্রহ হত তা অনেক সময়েই তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়ত; এই বাড়তি ফসল তারা মজুত করে রাখত। সেই পুরোনো দিনে যখন তারা শিকার করে খেত, তার চাইতে এখন জীবনের জটিলতা একটু বেড়ে গেল। বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ হয়ে এক দল লোক জমিতে চাষের কাজ করতে লাগল, এক দল রক্ষণাবেক্ষণের, আর এক দল সাধারণ শৃংখলা-বিধানের। এই পরিচালক এবং শৃংখলা-বিধানকারীর দলই ক্রমে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। পরে তারাই হল সমাজপতি কিংবা শাসনকর্তা, রাজা কিংবা অভিজাতসম্প্রদায়। হাতে ক্ষমতা পেয়ে খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশের বেশির ভাগ এরাই গ্রাস করতে লাগল। কাজেই এরা হয়ে উঠল অপরের চেয়ে ধনী; আর যারা জমিতে খেটে ফসল ফলাত তাদের ভাগে যেটুকু আসত তাতে কোনোরকমে তাদের উদরপূর্তি হত মাত্র। ক্রমে ক্রমে অবস্থা হল, পরিচালকের দল এত অলস এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ল যে, তাদের দ্বারা পরিচালনার কাজও আর ভালো করে চলত না। তারা কিছুই করত না, কিন্তু ভাগ নেবার বেলায় সবচেয়ে বড়ো ভাগটি তাদের নেওয়া চাই। তাদের এখন এই ধারণা জন্মে গেল যে অপরে যা পরিশ্রম করে উৎপাদন করবে তাই বসে বসে খাবার জন্মগত অধিকার তাদের আছে।

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, কৃষিবিদ্যা-আবিষ্কারের সংগে সংগে মানুষের জীবনে কী বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। খাদ্যসংগ্রহের উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবন করে, খাদ্য সহজলভ্য করে দিয়ে, কৃষিবিদ্যা বলতে গেলে সমাজের ভিত্তি একেবারে নেড়েচেড়ে দিল। লোকের হাতে এখন প্রচুর অবসর। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হল; প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন আর খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয় না, কাজেই কতক লোক অন্য কাজ বেছে নিল। নানান রকমের শিল্প, নূতন নূতন ব্যবসা দেখা দিল। কিন্তু ক্ষমতা থেকে গেল সেই পরিচালকশ্রেণীর হাতেই।

পরবর্তী ইতিহাস থেকে তুমি দেখতে পাবে, খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের সংগে সংগে সমাজে কীভাবে বড়ো বড়ো পরিবর্তন এসেছে। সভ্যতার গতির সংগে সংগে খাদ্য ছাড়া আরও অনেক জিনিষের প্রয়োজন মানুষ বোধ করতে লাগল। কাজেই উৎপাদন-প্রণালীর পরিবর্তনের সংগে সংগে সমাজেও পরিবর্তন এল। একটা বেশ বড়োরকমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এই ধরো, যখন রেল স্টীমার কারখানা সব বাষ্পে চালিত হতে লাগল তখন কাজেকাজেই আমাদের উৎপাদন এবং বণ্টনপ্রণালীতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। সাধারণ শিল্প-ব্যবসায়ীরা তাদের নিজ হাতে এবং ছোটো ছোটো হাতিয়ারের সাহায্যে যেসব জিনিষ তৈরি [illegible] তাই এখন অনেক বেশি দ্রুতবেগে উৎপন্ন হতে লাগল বাষ্পচালিত কারখানায়। বড়ো বড়ো [illegible] তো আর কিছু নয়, খুব বিরাট আকারের হাতিয়ার মাত্র। এখন থেকে খাদ্যদ্রব্য [illegible] উৎপন্ন অন্যান্য জিনিষ রেলে স্টীমারে করে দ্রুতবেগে দেশে দেশান্তরে প্রে[illegible] এর ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে কত বড়ো পরিবর্তন এল তা তুমি সহজেই বুঝতে প[illegible]

ইতিহাসে দেখা যায় কিছুকাল পরে পরেই নূতন নূতন এবং দ্রুততর [illegible] আবিষ্কৃত হয়েছে। তুমি নিশ্চয় ভাবছ উৎপাদনপ্রণালী যত উন্নত হবে উৎপন্ন [illegible] তত বাড়বে, পৃথিবীর সম্পদও ক্রমে বাড়তে থাকবে এবং বণ্টনের বেলায় প্রত্যেকে[illegible] বেশি পড়বে। আমি কিন্তু বলব তোমার কথা খানিকটা সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য[illegible] প্রণালীর উন্নতির ফলে পৃথিবীর সম্পদ অনেক বেড়েছে, এ কথা অবশ্যই সত্য। [illegible] কোন্‌খানটায়? স্পষ্টই তো দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে এখনও দুঃখদৈন্যের [illegible] কেবল কি আমাদের দেশে? ইংলন্ডের মতো ধনী দেশেও ঐ অবস্থা। কেন [illegible] ধনসম্পদ তা হলে কোথায় যায়? এটা বড়ো আশ্চর্যের বিষয় যে ক্রমেই পৃথিবীর ধ[illegible]

কিন্তু তা সত্ত্বেও গরিবেরা সেই গরিবই থেকে যাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু যে পরিমাণে ধনোৎপাদন হচ্ছে, তার তুলনায় সেটা কিছুই নয়। এইসব ধনসম্পদ কোথায় যাচ্ছে সেটা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। ঐ-যে সব কর্মকর্তা আর পরিচালকের দল রয়েছেন, তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে সব ভালো জিনিষের মোটা অংশটা তাঁদেরই হাতে এসে পড়ে। আরও আশ্চর্য, সমাজে এমনসব শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা ভুলেও কোনো কাজ করে না; অথচ অপরের পরিশ্রমলব্ধ লাভের বারো-আনা অংশ তারাই বাগিয়ে নেয়। আর বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, এরাই সমাজে সম্মানের পাত্র হয়ে বসেছে। আবার এমন মূর্খও আছে যারা ভাবে, খেটে খেতে গেলে সম্মান বুঝি থাকে না। পৃথিবী জুড়ে এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায় যে চাষীর দল জমিতে খেটে খাদ্য উৎপাদন করছে এবং যে শ্রমিক কারখানায় খেটে ধনোৎপাদন করছে, তারা যে দরিদ্রই থেকে যাবে, এ আর বিচিত্র কী? আমরা তো দেশের স্বাধীনতার কথা বলছি, কিন্তু সমাজের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা যদি দূর না হয়, শ্রমিক যদি তার পরিশ্রমের পুরস্কার না পায় তবে সেই স্বাধীনতা দিয়ে আমাদের কী হবে? রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং ধনবণ্টন-সমস্যা নিয়ে কতসব মোটা মোটা বই লেখা হচ্ছে। বড়ো বড়ো পণ্ডিত অধ্যাপকের দল এইসব বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কেবল কথা আর আলোচনাই চলছে; ওদিকে যে লোকটা খাটছে তার তো দুঃখের অন্ত নেই। দু শো বছর আগে প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত ভল্টেয়ার এইসব রাজনীতিজ্ঞের দল সম্বন্ধে বলেছিলেন, "যে চাষী খাদ্য উৎপাদন করে অপরের প্রাণরক্ষা করছে, তাকে অনাহারে বধ করাই হচ্ছে এদের দস্তুর।"

যাক সে কথা। আদিম মানুষ ক্রমে উন্নত হয়ে ধীরে ধীরে বন্যপ্রকৃতির উপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বনজঙ্গল সাফ করেছে, বাড়িঘর তৈরি করেছে এবং জমি চাষ করেছে। লোকে বলে, মানুষ নাকি প্রকৃতিকে জয় করেছে। এটা একটু ধোঁয়াটে রকমের কথা, পুরোপুরি সত্য বলে একে গ্রহণ করা যায় না। এর চেয়ে বরং বলা ভালো যে, মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে শুরু করেছে এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, প্রকৃতিকে আপনার প্রয়োজনে নিয়োজিত করছে। প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ভয়ের চোখে দেখেছে। বোঝবার চেষ্টা না করে পুজো দিয়ে, বলির আয়োজন করে প্রকৃতিদেবীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করেছে। তাদের কাছে প্রকৃতি ছিল যেন একটা হিংস্র জন্তু; তাকে খোশামোদ করে, খুশি করে শান্ত রাখতে হয়। বজ্রপাত, বিদ্যুৎচমক, মহামারী সবতাতেই তাদের ভয় ছিল, আর তারা ভাবত উপযুক্ত বলি না পেলে এরা কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না। অনেক সরলপ্রাণ লোকের ধারণা, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণও একটা ভয়ংকর রকমের দুর্ঘটনা। এটা যে একটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ঘটনা সে কথা বোঝবার চেষ্টা না করে লোকে মিছিমিছি দুশ্চিন্তায় অধীর হয় এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে চন্দ্র-সূর্যকে রক্ষা করবার জন্য উপোস করে কিংবা গঙ্গাস্নান করে। চন্দ্র-সূর্য [illegible]বাই নিজে [illegible] রক্ষা করতে পারে; তাদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই।

[illegible]তা এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির কথা আমরা বলেছি এবং এও দেখেছি, এর শুরু হয়েছিল [illegible] শহরে এবং গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে। খাদ্যের যে উদ্বৃত্ত অংশ [illegible]ফলে মানুষের খানিকটা অবকাশ মিলল; এখন তারা শিকার এবং আহার অন্বেষণ মুস্তৌরি[illegible]ষের কথা ভাববার সময় পেল। চিন্তাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম শিল্প, নানাবিধ শ্রেণী[illegible]স্কৃতিরও উন্নতি হতে লাগল। ওদিকে লোকসংখ্যাও বাড়ছে, তার ফলে অনেক জীবন যাপন [illegible]গে কাছাকাছি থাকতে হত। তাতে একে-অন্যের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ল এবং নানান শিকার ক্ষুর [illegible] মানুষে আদানপ্রদান চলল। অনেক লোক একসঙ্গে বাস করতে হলে প্রত্যেকে খাদ্যের অন্বে[illegible]ধ একটু বিবেচনা না করলে চলে না। এমন কাজ করা চলবে না, যাতে সঙ্গী এই দলগুলো [illegible]র অসুবিধা হতে পারে। এ না হলে সামাজিক জীবন কিছুতেই গড়ে উঠতে করত, একসঙ্গে[illegible]ন্তস্বরূপ একটি পরিবারের কথাই ধরো-না—একটি পরিবারই তো বলতে গেলে থাকা বেশি নি[illegible]া সমাজ। পরিবারস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি অপরের সম্বন্ধে একটু বিবেচনা না করে [illegible] তো কিছুতেই সুখী হতে পারে না। এটি এমন কিছু শক্ত ব্যাপারও নয়,

কারণ পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির মধ্যে এমনিতেই একটি ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যায়, আমরা ঐ সামান্য বিবেচনাটুকু করতে ভুলে যাই। তাতে শুধু প্রমাণ হয় যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সভ্য এবং মার্জিত নই। পরিবারের চেয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠী সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই খাটে—সেটা আমাদের প্রতিবেশী কিংবা এক-নগরের অধিবাসী, স্বদেশবাসী অথবা বিদেশী—এদের যার সম্বন্ধেই হোক। সুতরাং লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনে অনেক উন্নতি হয়েছে। অপরের জন্য বিবেচনাবোধ এবং আত্মসংযম অনেক বেড়েছে। সংস্কৃতি, সভ্যতা, এসব কথার যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া বড়োই কঠিন। আমি তা দেবার চেষ্টাও করছি না। তবে সংস্কৃতি বলতে আমরা যেসব গুণের সমাবেশ মনে করি তার মধ্যে আত্মসংযম এবং অপরের মঙ্গলচিন্তা—এই দুটি গুণ নিশ্চয়ই প্রধান। যে ব্যক্তির মধ্যে এই আত্মসংযম এবং অপরের প্রতি বিবেচনাবোধের অভাব আছে, তাকে মার্জিত এবং সুসভ্য নিশ্চয়ই বলা চলে না।

১৪

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ও ধর্ম

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩১

ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলো আমরা এগিয়ে যাই। দু হাজার পাঁচ শো বছর অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছ শো বছর আগেকার একটা জায়গায় এসে আমরা থেমেছি। তারিখটা একেবারে যে নির্ভুল তা নয়। আন্দাজে মোটামুটি একটা সময় নির্দেশ করেছি মাত্র। এইরকম একটা সময়ে কয়েকজন নামকরা লোক, কেউ-বা তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী, কেউ-বা ধর্মপ্রবর্তক, বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেউ চীনে, কেউ ভারতবর্ষে, কেউ পারস্যে, কেউ-বা গ্রীসে। তাঁরা ঠিক যে সমসাময়িক সে কথা বলা চলে না। অল্প কয়েক বৎসর আগে-পরে আবির্ভূত হয়ে এঁরা খৃষ্টপূর্ব ছয় শতককে বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। একটা নূতন চিন্তার ধারা, বর্তমান সম্বন্ধে একটা অসন্তোষের ভাব, অনাগত কালের জন্য একটা আশাআকাঙ্ক্ষা যেন সমস্ত পৃথিবীময় একই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা কথা মনে রেখো, বড়ো বড়ো ধর্মপ্রবর্তক যাঁরা তাঁরা সবাই চেয়েছেন, মানবসাধারণের মঙ্গল হয় যাতে, যাতে তারা উন্নত হয় এবং তাদের দুঃখকষ্টের লাঘব ঘটে। বর্তমানের অন্যায় ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁরা নির্ভয়ে বিদ্রোহ করেছেন। যেখানে পুরাতন সংস্কার মানুষকে অধর্মের পথে নিয়ে গেছে, মানুষের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইখানেই তাঁরা তাকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। তাকে দূর করার জন্য নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের সামনে তাঁরা তুলে ধরেছেন মহান জীবনের আদর্শ—যুগে যুগে মানুষ এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, প্রেরণা লাভ করেছে।

সেই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীর; চীনে [illegible] ও লাওৎসে; পারস্যে জরথুস্ত্র বা জোরোআস্টার;* এবং গ্রীসের সামোস দ্বীপে [illegible] পাইথাগোরাস্। ইতিহাস ছাড়াও অন্য প্রসঙ্গে তুমি হয়তো এঁদের নাম শুনে থাকবে। [illegible] স্কুলের ছেলেমেয়েদের ধারণা যে পাইথাগোরাস্ লোকটার খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, তাই [illegible] যেন কী একটা সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছিলেন। সেটা আবার বেচারাদের মুখস্থ করতে হয়। [illegible]-বিশিষ্ট ত্রিভুজের তিন বাহুর উপর অঙ্কিত তিনটি চতুর্ভুজ নিয়ে এই সিদ্ধান্তের [illegible]। ইউক্লিডের বা অন্য যে-কোনো জ্যামিতির বইয়ে এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। জ্যামিতিক [illegible] ছাড়াও চিন্তাশীল দার্শনিক হিসাবে পাইথাগোরাসের খুবই নাম আছে। ওঁর সম্বন্ধে আমরা [illegible]

---

* জরথুস্ট্র সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন।

অল্পই জানি, এমনকি কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন পাইথাগোরাস্ নামে কেউ ছিলেন কি না।

পারশ্যের জোরোআস্টারকে জরথুস্ত্রবাদ নামে একটি ধর্মের গুরু বলা হয়। তাঁকে ঠিক নবধর্ম-প্রবর্তক বলা চলে কি না জানি না। খুব সম্ভব পারশ্যের পুরাতন ধর্মমতকে একটা নূতন রূপ দিয়ে তিনি নূতন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ বহুদিন অতীত হল পারশ্য থেকে এই ধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেক দিন আগে ও দেশ থেকে এক দল লোক এসেছিল ভারতবর্ষে, আমরা তাদের পার্শি বলি। এই পার্শি-সম্প্রদায় এখনও জরথুস্ত্রের ধর্ম অনুসারে অগ্নির উপাসনা করে।

আগেই বলেছি, এই একই সময়ে চীন দেশে জন্মেছিলেন কনফুসিয়স ও লাওৎসে। কনফুসিয়স নামটার ঠিক বানান হল কং ফু-ৎসে। ধর্মপ্রবর্তক বলতে যা বোঝায় এঁরা সেরকম ছিলেন না। এঁরা কতকগুলি নীতি ও সমাজব্যবস্থা বেঁধে দিয়েছিলেন। এঁদের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিত কোন্ কাজ করা উচিত, কোন্ কাজ অনুচিত। মৃত্যুর পর কনফুসিয়স ও লাওৎসের স্মৃতিরক্ষার জন্য চীন দেশে অনেক মন্দির নির্মিত হয়। হিন্দুদের কাছে যেমন বেদ ও খৃষ্টানদের কাছে যেমন বাইবেল, তেমনি এঁদের লিখিত গ্রন্থগুলি চীনদেশবাসী খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। চীনের লোকেরা যে এত ভদ্র, এত মার্জিতব্যবহারসম্পন্ন ও শিক্ষাদীক্ষায় এত উন্নত, তা অনেকখানিই কনফুসিয়সের প্রভাবে।

ভারতবর্ষে ছিলেন মহাবীর ও বুদ্ধ। আজ যাকে আমরা জৈনধর্ম বলি তার প্রবর্তন করেন মহাবীর। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বর্ধমান, তাঁর মহত্ত্বের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তাঁকে তাঁর শিষ্যেরা মহাবীর উপাধি দিয়েছিল। বেশির ভাগ জৈন থাকে পশ্চিম-ভারত ও কাথিয়াওয়ার-অঞ্চলে। আজকাল তাদের প্রায়ই হিন্দু বলে ধরা হয়। কাথিয়াওয়ারে ও রাজপুতানার আবুপর্বতে কতকগুলি অতি সুন্দর জৈনমন্দির আছে। জৈনেরা অহিংসাকে পরম ধর্ম বলে মনে করে; কোনো প্রাণীকে আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া তাদের চোখে পাপ। শুনে আশ্চর্য হবে যে মহাবীরের সমসাময়িক গ্রীসের পাইথাগোরাস ছিলেন নিরামিষভোজী, তাঁর শিষ্য ও চেলাদের পক্ষে আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল।

এবার গৌতমবুদ্ধের কথায় আসা যাক। তুমি তো জানোই, তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, একজন রাজকুমার। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের জননীর নাম মায়া। বুদ্ধের বংশপরিচয়ে রাজরানী মায়ার যে বর্ণনা আছে সেটা এখানে তুলে দিই: "সর্বলোকপূজিতা, নবচন্দ্রমাসদৃশ রূপবতী, বসুমতীর মতো ধীরা, বিকশিত পদ্মের মতো নির্মলা ছিলেন মহীয়সী মায়াদেবী।"

সিদ্ধার্থের বাবা আর মা তাঁকে আরাম ও বিলাসিতার মধ্যে লালনপালন করতেন। সর্বদা চেষ্টা করতেন যাতে দুঃখদুর্দশার দৃশ্য তাঁকে কখনও না দেখতে হয়। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় কী করে। কিংবদন্তীতে জানা যায়, সিদ্ধার্থ দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট এবং মৃত্যু সবই দেখেছিলেন এবং এইসব দৃশ্য দেখে তাঁর মনে গভীর বেদনার সঞ্চার হয়। রাজপ্রাসাদের সুখ তাঁর আর ভালো লাগল না। ভোগবিলাসের আড়ম্বর, সুন্দরী স্ত্রীর ভালোবাসা—সব-কিছুই তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হতে লাগল। তিনি মানুষের দুঃখের কথা এবং কী উপায়ে সেই দুঃখ দূর করা যায়, সেই কথা ভাবতে লাগলেন। আর তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না; একদিন গভীর রাত্রে রাজপুরী ত্যাগ করে, প্রিয়পরিজন সবাইকে ত্যাগ করে রাজার কুমার বেরিয়ে পড়লেন। যেসব প্রশ্ন তাঁর মনে উদয় হয়েছে তার জবাব খুঁজে বার করতে হবে। কত দিন ধরে শ্রান্তি ক্লান্তি তুচ্ছ করে তিনি সন্ধান করে বেড়ালেন। অবশেষে অনেক বৎসর পর, গয়ার কাছে একটি অশ্বত্থগাছের তলায় দীর্ঘ তপস্যার পর তিনি প্রজ্ঞা লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন। সেই থেকে সিদ্ধার্থের নাম হয় 'বুদ্ধ', অর্থাৎ জ্ঞানী। যে গাছটির তলায় তিনি সাধনা করেছিলেন তার নাম 'বোধিবৃক্ষ'। কাশীর কাছে সারনাথের উদ্যানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা হল সৎভাবে জীবনযাপন করার পথনির্দেশ করা। দেবতার উদ্দেশে কোনো জীবকে বলি দেওয়া তিনি অন্যায় মনে করতেন। তিনি বলতেন, যদি বলি দিতে হয় তো রাগ দ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি মোহকেই বলি দেওয়া উচিত।

বুদ্ধের আবির্ভাব যখন হয় সে সময়ে ভারতের প্রচলিত ধর্ম ছিল বৈদিক ধর্ম। তখন থেকেই এই ধর্মের অবনতি শুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ, অন্ধ কুসংস্কার দ্বারা সত্যধর্মকে কলুষিত করেছে। আর তা তো করবেই, কারণ পূজা যত হয় ততই ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা মেলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদ তীব্রতর হল। জপতপ মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে স্বার্থান্বেষী পুরোহিতের দল সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলল। এইভাবে দেশের জনসাধারণকে নিজেদের বশে এনে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। যখন এই দুই উচ্চ জাতির মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, বুদ্ধ ঠিক সেই সময় বৈদিক ধর্মের অনাচার ও পুরোহিতদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মানুষ যাতে সৎভাবে জীবনযাপন করে, পূজা বলি প্রভৃতি নিরর্থক কাজ থেকে বিরত হয়ে যাতে তারা ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করে, তারই জন্য চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর শিক্ষাকে যারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করল তাদের বলা হত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিয়ে তিনি তাঁর 'সংঘ' গঠন করলেন।

অনেক কাল একটি বিশেষ ধর্ম বলে বুদ্ধের ধর্ম ভারতে স্বীকৃত হয় নি। এর পর আমরা দেখতে পাব কেমন করে এই ধর্ম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল ও কিছুকাল পরে আবার কেমন সমস্ত দেশ থেকেই যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। একদিকে সিংহল থেকে আরম্ভ করে সুদূর চীন দেশ অবধি বৌদ্ধধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করল, তেমনি আবার অন্যদিকে বুদ্ধের জন্মভূমি এই ভারতে বুদ্ধের ধর্ম শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম অথবা হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। তবে এ কথা সত্য যে, এককালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর বৌদ্ধধর্ম প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞের অনেকগুলি কুসংস্কার দূর করতে পেরেছিল—সেটাও কম কথা নয়।

বর্তমান জগতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। মাথাগুণতির হিসাবে বৌদ্ধধর্মের পরেই স্থান হল খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের। ইহুদি, শিখ ও পার্শিদের ধর্মও উল্লেখযোগ্য। ধর্ম ও ধর্মগুরুরা ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন, এঁদের বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বড়ো বড়ো ধর্মের প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মানুষদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের শিষ্য ও অনুগামীরা অনেক সময় গুরুর মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। ইতিহাসে আমরা প্রায়ই দেখি যে, যে ধর্ম আমাদের উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ধর্মই আমাদের পাশবিকতার নিম্নতম স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে। জ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্যোতির জায়গায় এনেছে অজ্ঞানের অন্ধকার, মনকে উদার মুক্তির প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত না করে তাকে সংকীর্ণ, অনুদার ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু করেছে। ধর্মের নামে একদিকে অনেক বড়ো বড়ো কাজ হয়েছে। অপরদিকে আবার লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ প্রভৃতি কত-যে পাপ সাধিত হয়েছে তারও ইয়ত্তা নেই।

তা হলেই মনে হয়, ধর্ম নিয়ে কী করা উচিত? কারও কারও কাছে ধর্ম মানেই স্বর্গ কিংবা ওই ধরনের একটা পরলোক। স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় তারা ধর্মানুষ্ঠান করে। এ যেন জিলিপির মতো কোনো-একটা মিষ্টি জিনিষের লোভে দুষ্টু ছেলের লক্ষ্মী হয়ে থাকা। সচরাচর ভদ্রবাড়ির সন্তানেরা তো এরকম করে না। সুতরাং ভেবে দেখো, পরিণতবয়স্কেরা যদি এরকম কাজ করতে শুরু করেন তা হলে সেটা কীরকম হাস্যকর হয়। আসলে জিলিপির প্রতি লোভ ও স্বর্গের প্রতি লোভের মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। লোভী অল্পবিস্তর আমরা সকলেই। কিন্তু আমরা ছেলেমেয়েদের এমনভাবে মানুষ করতে চাই যাতে তারা নির্লোভ হয়, নিঃস্বার্থ হয়। আদর্শের ক্ষেত্রে স্বার্থটা বড়ো হয়ে উঠলে চলে না। তা যদি হয় তা হলে জীবনকে বড়ো আদর্শের অনুগামী করে গড়ে তোলা যায় না।

আমরা সকলেই নিজেদের কীর্তির ফলাফল নিজের চোখে দেখে নিতে চাই। এটা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু দেখতে হবে আমাদের লক্ষ্যটা কোন্ দিকে? আমরা কি কেবল নিজেদের নিয়ে বিব্রত থাকি—নিজেদের মঙ্গলটুকু চাই? সমাজের, দেশের, সমগ্র মানবজাতির যাতে মঙ্গল

হয়—সেটা আমরা চাই কি? দশের মঙ্গলেই তো আমাদেরও মঙ্গল। কিছুদিন আগে আমার একটি চিঠিতে একটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেছি। সেই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে, ব্যক্তি পরিবারের কাছে, পরিবার সমাজের কাছে ও সমাজ দেশের কাছে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন করবে। আজ ভাগবত থেকে একটি শ্লোকের অনুবাদ দিচ্ছি : "আমি অষ্টসিদ্ধিসংযুক্ত পরমা শান্তি চাই না; পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে নিবৃত্তি—তাও আমার কাম্য নয়। জীবজগতের সমস্ত ক্লেশ আমি বরণ করে নিতে চাই, তাদের দুঃখ নিজের বলে স্বীকার করে আমি তাদের দুঃখ মোচন করতে চাই।"

এক ধর্মের লোক বলে এই, অন্য ধর্মের লোক বলে আর। পরস্পর পরস্পরকে দোষ দেয়, বলে নির্বোধ, বলে দুষ্ট। এদের মধ্যে সত্য কথা বলে কে? চক্ষুকর্ণের প্রমাণের বাইরের বিষয় নিয়ে যখন কারবার তখন এদের মধ্যে বিবাদভঞ্জন করা সহজসাধ্য নয়। বিজ্ঞজনের মতো এদের এইসমস্ত কথা আলোচনা করাই বেয়াদবি। মতামত নিয়ে যখন মাথা-ভাঙাভাঙি হয় তখনই বিপদ। আমরা বেশির ভাগ লোকই সংকীর্ণমনা, জ্ঞানবুদ্ধিও আমাদের সীমাবদ্ধ। সবটুকু সত্য আমরা জেনে ফেলেছি, এ বিশ্বাসটা আস্পর্ধাবিশেষ। সেই সত্য জোর করে যখন অন্য লোককে স্বীকার করাতে চেষ্টা করি তখন সেটা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। সত্য কারও একচেটিয়া নয়। ফুলকে কেউ গাছ বলে ভ্রম করে না। কেউ কেবল যদি ফুলটাই দেখে, কারও কাছে যদি পাতা কিংবা কাণ্ডটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, তা হলে তারা কেবল গাছের অংশবিশেষ দেখেছে। বিশেষ বিশেষ অংশকে সমগ্র গাছ বলে ভুল করা ও তাই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মারামারি করা—এর চাইতে বোকামি আর-কিছুই হতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, পরলোকের প্রতি আমার তেমন অনুরাগ নেই। ইহলোকে আমার কী করা উচিত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। বর্তমানের পথটা আমি যদি ঠিকমতো দেখতে পাই তা হলেই ব্যস—তার বেশি কিছুতে আমার দরকার নেই। এখানকার কাজ ঠিকমতো করে চলতে পারি যদি তা হলে কী হবে আমার পরলোকের কথা ভেবে।

বড়ো হয়ে নানা ধরনের লোক দেখতে পাবে—কেউ ধর্ম নিয়ে থাকে, কেউ ধর্মের তোয়াক্কা করে না, কেউ আবার দুদিককারই আতিশয্য পরিহার করে চলে। অনেক বড়ো বড়ো ধর্মমন্দির ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান আছে, প্রচুর তাদের অর্থসম্পত্তি, প্রচুর ক্ষমতা। কখনও তারা সদুদ্দেশ্যে তাদের অর্থ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কখনও-বা মন্দ কাজে। অনেক ধার্মিক লোক আছে যারা ভালো লোক বলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আবার অনেক ভণ্ড বদমাইশ আছে যারা ধর্মের নাম করে মানুষ ঠকিয়ে খায়। এসমস্ত দেখে-শুনে তোমার নিজের পথটি বেছে নিতে হবে। অন্যদের উদাহরণ থেকে অনেক-কিছু শেখা যায় সত্য, কিন্তু ঠেকে শেখা কিংবা নিজের চেষ্টায় শেখাটাই সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা। কতকগুলি সমস্যা আছে যার সমাধান আমাদের নিজেদেরই করতে হয়, তা ছাড়া গতি নেই।

চট করে একটা মতামত স্থির করে বোসো না যেন। একটা বড়োরকমের সিদ্ধান্তে পেঁছবার আগে নিজেকে নানা দিক থেকে তৈরি করে নিতে হয়। নিজের ভাবনা নিজে ভেবেচিন্তে, কর্তব্যা-কর্তব্য নিজেই নির্ধারণ করা—একশোবার উচিত। কিন্তু সবাই তা পারে না। নবজাত শিশু তার ভালো-মন্দ বুঝে কাজ করতে পারে কি? এমন অনেকে আছে যারা বয়সে প্রবীণ হলেও বুদ্ধিশুদ্ধিতে প্রায় কচি ছেলের মতো।

অন্যান্য দিনের চেয়ে এ চিঠি অনেক বড়ো হয়ে গেল। এত লম্বা চিঠি পড়তে তোমার হয়তো ভালো লাগবে না। ধর্মবিষয়ে আমার বক্তব্যগুলো বলে আমি খালাশ। আজ যদি আমার সব কথা তুমি বুঝতে নাও পারো, তাতে কিছু আসে-যায় না। কিছুদিন পর আপনা থেকেই বুঝতে পারবে।

পারশ্য এবং গ্রীস

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩১

তোমার চিঠি আজ পেলাম। মা ও তুমি দুজনেই ভালো আছ জেনে খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমার দাদুর অসুখ যে সারছে না, ওঁর জ্বরটা ছাড়লে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। উনি সারাজীবন পরিশ্রম করেছেন, এখন এ বয়সে যে শান্তি এবং বিশ্রাম দরকার তাও পাচ্ছেন না।

তুমি যে দেখছি লাইব্রেরি থেকে অনেক বই পড়ে ফেলেছ, আমার কাছ থেকে আরও সব বইয়ের নাম চেয়েছ। কিন্তু ইতিমধ্যে কী কী বই পড়েছ তার নাম তো আমাকে লেখ নি? বই পড়ার অভ্যাস খুবই ভালো; কিন্তু যারা তাড়াতাড়ি অনেক বই পড়ে ফেলে তাদের বেলায় একটু সন্দেহ হয়। মনে হয় বোধ করি ভালো করে পড়ে নি, কোনোরকমে চোখ বুলিয়ে গেছে, আজ পড়ছে তো কাল ভুলে যাচ্ছে। পড়বার মতো বই যদি হয় তবে তা বেশ যত্ন করে খুঁটে খুঁটে পড়াই ভালো। এমন বইও অনেক আছে যা মোটে পড়বার যোগ্যই নয়। এত বইয়ের মধ্যে থেকে ভালো বই বেছে নেওয়া কিছু চাট্টিখানি কথা নয়। তুমি হয়তো বলবে আমাদের লাইব্রেরি থেকেই যখন বই বেছে নিয়েছ তখন নিশ্চয় ভালো বই-ই হবে, কারণ তা নইলে আমরা এসব বই রাখব কেন? তা বেশ, বেশ, পড়ে যাও, আমি জেল থেকে তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করব। শরীরে মনে তুমি কত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছ আমি অনেক সময়ে তাই ভাবি। তোমার কাছে যেতে ভারি ইচ্ছে করছে। এই-যে আমি তোমাকে যেসব চিঠি লিখছি, তোমার হাতে পেঁাছতে পেঁাছতে হয়তো তোমার বিদ্যে এসব চিঠির বিদ্যেকে ছাড়িয়ে যাবে। তবে ততদিনে হয়তো চাঁদ* বড়ো হয়ে উঠবে, সে-ই তখন পড়বে। তা হলেই হল; একজন কেউ এর মর্ম বুঝলেই হল।

এবারে এসো গ্রীস এবং পারশ্যদেশের কথা একটু বলি, এই দুই দেশের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল তার কথা একটু আলোচনা করা যাক। আগের এক চিঠিতে গ্রীসদেশের নগর-রাষ্ট্রগুলির কথা বলেছি; পারশ্যদেশের এক রাজা যে বিরাট এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তারও উল্লেখ করেছি। গ্রীকরা এ রাজার নাম দিয়েছিল দারিয়ুস। দারিয়ুসের সাম্রাজ্য শুধুই যে বহুবিস্তৃত ছিল তাই নয়, খুব সুশৃঙ্খলও ছিল। এশিয়া-মাইনর থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তার লাভ করেছিল। মিশররাজ্য এবং এশিয়া-মাইনরের কতকগুলি গ্রীক নগরীও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই বিরাট সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চমৎকার রাজপথ তৈরি হয়েছিল। তার সাহায্যে নিয়মিতরূপে সম্রাটদপ্তরের সংবাদপ্রেরণের ব্যবস্থা হত। কী কারণে দারিয়ুস স্থির করলেন গ্রীস দেশের নগর-রাষ্ট্রগুলি জয় করতে হবে। সেই সূত্রে এই দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটেছিল।

হিরোডটাস-নামক একজন গ্রীক ঐতিহাসিকের লেখা থেকে আমরা এইসব যুদ্ধের বিবরণ পেয়েছি। এই যুদ্ধের অল্পকাল পরেই তাঁর জন্ম হয়। অবশ্য গ্রীকদের প্রতি তিনি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন, তা হলেও তাঁর লেখা বিবরণগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। আমার এই চিঠিতে তাঁর ইতিহাস থেকে কিছু কিছু কথা উদ্ধৃত করব।

পারশ্যরাজের প্রথমবারের অভিযান সফল হয় নি। কারণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে তাঁর বহু সৈন্য রোগাক্রান্ত হয়ে এবং খাদ্যাভাবে মারা যায়। এমনকি গ্রীস পর্যন্ত তারা গিয়ে পেঁাছতেই পারে নি, তার আগেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তার পরে আবার খৃস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে দ্বিতীয় অভিযান হল। পারশ্যসৈন্যরা এবার স্থলপথে না গিয়ে সমুদ্রপথে অগ্রসর হল। এথেন্সের নিকটবর্তী ম্যারাথন-নামক একটি স্থানে তারা অবতরণ করল। এথেন্সবাসীরা

* শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কন্যা চন্দ্রলেখা

তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, কারণ পারশ্যসাম্রাজ্যের তখন বিষম প্রতিপত্তি। এমনকি ভয়ে তারা তাদের বহুকালের পুরোনো শত্রু স্পার্টার সঙ্গে মিতালি করবার চেষ্টা করল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। স্পার্টার সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই কিন্তু এথেন্সবাসীরা পারশ্যসেনাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিল। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ম্যারাথনের যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে।

গ্রীসদেশের ছোট্ট একটি নগর-রাষ্ট্র কিনা এত বড়ো সাম্রাজ্যের সেনাদলকে হারিয়ে দিল—ভাবলে একটু অদ্ভুত ঠেকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাইরে থেকে যতটা অদ্ভুত মনে হয়, আসলে ততটা নয়। গ্রীকরা লড়াই করেছিল নিজের ঘরের পাশে আপন দেশ রক্ষার জন্য; আর পরাশ্যসেনা দেশ ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে এসেছিল অনেক দূরে। তার উপরে আবার তাদের পাঁচমিশালি সৈন্যদল, সাম্রাজ্যের সব অংশ থেকে জড়ো-করা। ওরা মাইনে-করা সৈন্য, লড়াই করেছে পয়সার খাতিরে। গ্রীসদেশ জয় হোক বা না হোক তা নিয়ে ওরা বড়ো একটা মাথা ঘামায় নি। অপর পক্ষে এথেন্সবাসীরা যুদ্ধ করেছে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। স্বাধীনতা হারানোর চেয়ে তারা মৃত্যুকেও শ্রেয় মনে করেছে। যারা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে মরণপণ করে তারা কখনও পরাজিত হয় না।

কাজেই দারিয়ুসকে ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হল। তাঁর মৃত্যুর পরে জেরিক্সিস হলেন পারশ্যের সম্রাট। জেরিক্সিসও মনে মনে গ্রীসজয়ের আশা পোষণ করেছিলেন। রাজা হয়ে তিনি গ্রীস-অভিযানের আয়োজন শুরু করলেন। এইখানে হিরোডটাসের লেখা একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী তোমাকে বলব। আর্তাবানাস ছিলেন জেরিক্সিসের পিতৃব্য। তিনি বুঝেছিলেন যে, গ্রীস-অভিযান অত্যন্ত বিপদসংকুল ব্যাপার—কাজেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। জেরিক্সিস তাঁকে যে জবাব দিয়েছিলেন হিরোডটাসের বিবরণ থেকে এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

> আপনি যা বলছেন তার মধ্যে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু চারদিকে যদি কেবল বিপদ দেখে আঁৎকে উঠি তা হলে চলবে কেন? সব বিপদকে গ্রাহ্য করলে চলে না। সংসারে সকল ব্যাপারকে যদি একই মাপকাঠিতে যাচাই করতে যাই তা হলে কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের জুজুটার ভয়ে সারাক্ষণ সশংক থেকে লাভ কী? না-হয় খানিকটা দুঃখভোগের হাত এড়ানো গেল। এর চেয়ে আমি বলি, আশাবাদী হয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়াই শ্রেয়, তাতে যদি দুঃখভোগ করতে হয় সেও ভালো। সঠিক পন্থা নির্দেশ না করে কেবল যদি প্রত্যেক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তা হলে আপনিও দুঃখ পাবেন, অপর পক্ষও পাবে। প্রত্যেক কার্যেই সফলতা এবং বিফলতার সম্ভাবনা সমপরিমাণে থাকে। ভবিষ্যতের দাঁড়িপাল্লাটা কোন্ দিকে ঝুঁকবে মানুষ তা কেমন করে জানবে? তার পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সফলতা তারাই অর্জন করে যারা এগিয়ে গিয়ে কাজে হাত দেয়। আর যারা ভীরু, যারা কেবল চুলচেরা হিসেব করে, তাদের পক্ষে সফলতার আশা সুদূরপরাহত। পারশ্যরাজ্য যে বিরাট শক্তি অর্জন করেছে সে কথা একবার ভেবে দেখুন। আমার যেসব পূর্বপুরুষ পারশ্যের সিংহাসনে বসেছেন তাঁরা যদি আপনার অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন, কিংবা আপনার মতো পরামর্শদাতা যদি তাঁদের জুটত তা হলে আজকে পারশ্যরাজ্য এতদূর বিস্তৃত হতে পারত না। তাঁরা বিপদকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলেই আমাদের এই উন্নত অবস্থা। বৃহৎ জিনিষ লাভ করতে হলে কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করেছি, তার কারণ অন্যসব বিবরণের চেয়ে এই কথাগুলির দ্বারাই আমরা পারশ্যরাজকে ভালো করে বুঝতে পারি। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গেল, আর্তাবানাস ঠিক পরামর্শই দিয়েছিলেন, গ্রীসদেশে পারশ্যসেনার পরাজয় হল। জেরিক্সিস পরাজিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথার মূল সুরটি যথার্থই সত্য, তার থেকে আমাদের সকলেরই কিছু শিক্ষণীয়

গ্রীক ও পারশিকগণ
দানিয়ুব
ম্যারাথন
সার্ডিস
লিডিয়া
এথেন্স
টাইগ্রিস
ইউফ্রেটিস
সিরিয়া
মিডিয়া
পার্থিয়া
সুসা
পারশ্য
সিন্ধু নদ
ভারতবর্ষ
মিশর
আরব
দারিয়ুসের সাম্রাজ্যের
সীমা নির্দেশ করছে
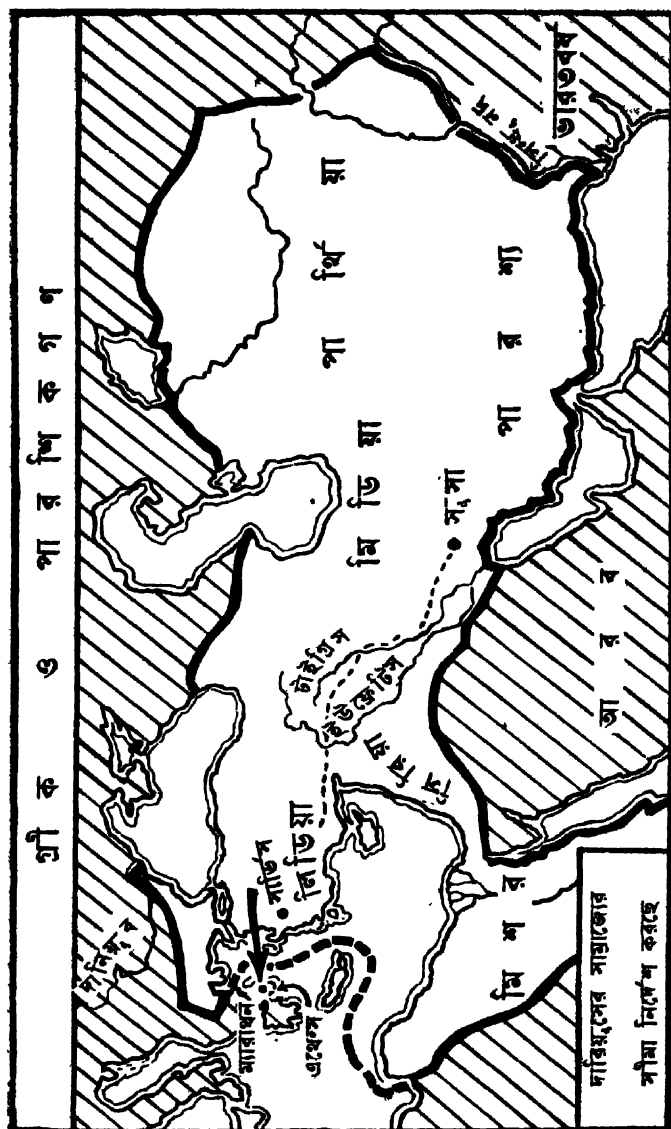
আছে। এই-যে আজকে আমরা বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছি, মনে রাখতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে বহু কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে আমাদিগকে যেতে হবে।

সম্রাট জেরিক্সিস তাঁর বিরাট সৈন্যদল নিয়ে এশিয়া-মাইনরের ভিতর দিয়ে রওনা হলেন। তার পরে দার্দানেলিস-প্রণালী অতিক্রম করে ইউরোপে পদার্পণ করলেন। তখন দার্দানেলিসের নাম ছিল হেলেস্‌পণ্ট্‌। পথিমধ্যে জেরিক্সিস ট্রয়নগরের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেছিলেন, সেই যেখানে প্রাচীনকালের গ্রীক বীরেরা হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্য লড়াই করেছিলেন। হেলেস্‌পণ্ট্‌ প্রণালী পার হবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের জন্য বিরাট সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। পারশ্য-সৈন্যদল যখন সেতু পার হয়ে যাচ্ছে তখন জেরিক্সিস তীরবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় মর্মর সিংহাসনে বসে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। হিরোডটাস লিখেছেন :

> সমস্ত হেলেস্‌পণ্ট্‌ জাহাজে পরিপূর্ণ এবং এবিডসের তীরভূমি ও প্রান্তরসমূহ লোকে লোকারণ্য, সেই দৃশ্য দেখে জেরিক্সিস বললেন, 'আমি আজ সত্যই সুখী'; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। পিতৃব্য আর্তাবানাস—সেই যিনি প্রথমে জেরিক্সিসকে গ্রীস-অভিযান থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন—তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, 'রাজন্‌, অল্প সময়ের মধ্যে তোমার এ কী মতিপরিবর্তন! এইমাত্র তুমি নিজ মুখে আহ্লাদ প্রকাশ করছিলে আর পরমুহূর্তেই দেখছি তোমার চোখে জল।' জেরিক্সিস বললেন, 'এই দৃশ্য দেখে হঠাৎ আমার মনে হল মানুষের জীবন কী ক্ষণস্থায়ী! এই-যে চতুর্দিকে অগণিত মানুষ দেখছি, একশত বৎসর পরে এর একজনও পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না'।

যা হোক, সেই বিরাট সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হল আর বহুসংখ্যক জাহাজ সমুদ্রপথে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু সমুদ্রের দেবতা বোধহয় গ্রীকদের পক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন, কারণ হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠে বেশির ভাগ জাহাজ একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেল। ওদিকে এত বড়ো বিরাট সৈন্যদল দেখে গ্রীকরা সত্যই ভয় পেয়ে গেল। তাদের পুরাতন আত্মকলহ সব ভুলে গিয়ে তারা সমবেতভাবে আক্রমণকারীর প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হল। প্রথম দিকটায় পশ্চাৎ-অপসরণ করে তারা থার্মোপোলি-নামক স্থানে পারশ্যসেনাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল। সেই স্থানটি একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ গিরিপথ—তার একদিকে পাহাড়, অপরদিকে সমুদ্র। কাজেই এখানে অল্পসংখ্যক লোকও একটি সুবৃহৎ সেনাদলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। মাত্র তিন শত স্পার্টান-সমেত গ্রীক বীর লিওনিডাস মরণপণ করে সেই গিরিপথ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। ম্যারাথনের যুদ্ধের ঠিক দশ বৎসর পরে সেই স্মরণীয় দিনে এইসব বীর সন্তান দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিল। পারশ্যসেনার গতিরোধ করে তারা গ্রীক সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণের সুযোগ দিল। সেই সংকীর্ণ গিরিপথে এক-একজন এসে শত্রুর গতিরোধ করছে, প্রাণ দিচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আর একজন তার স্থান গ্রহণ করছে। পারশ্যসেনার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ। লিওনিডাস এবং তাঁর তিন শত সঙ্গীর প্রত্যেকে থার্মোপোলির রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হল—তবে পারশ্যসেনা অগ্রসর হতে পারল। খৃস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ ঠিক দু হাজার চার শো দশ বৎসর পূর্বে; কিন্তু আজও তাদের সেই অজেয় বিক্রমের কথা ভাবলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। থার্মোপোলিতে গেলে লোকে আজও দেখতে পাবে লিওনিডাস এবং তাঁর সঙ্গীদের বাণী খোদিত রয়েছে প্রস্তর-ফলকে—

> হে পথিক, যাও, স্পার্টায় গিয়ে বলো, তাদের আজ্ঞা পালন করে আমরা অবহেলে প্রাণ বিসর্জন করলাম।

যে অমিত বিক্রম মৃত্যুকেও জয় করে তার তুলনা নেই। লিওনিডাস এবং থার্মোপোলি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, সুদূর ভারতবর্ষে আমরাও যখন সে কথা ভাবি আমাদেরও প্রাণে রোমাঞ্চ

জাগে। এখন ভেবে দেখো দেখি, আমাদেরই দেশের নরনারী, আমাদেরই পূর্বপুরুষ, যাঁরা ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে হাসিমুখে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছেন, অসম্মান এবং দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেছেন, শত নির্যাতনেও যাঁরা মস্তক অবনত করেন নি—ভেবে দেখো, তাঁদের কথা মনে হলে আমাদের কতখানি গর্ব হওয়া উচিত। চিতোর এবং চিতোরের অতুলনীয় ইতিহাসের কথা ভেবে দেখো, রাজপুত নরনারীর অত্যাশ্চর্য বীরত্বের কাহিনী একবার স্মরণ করো। আর এই আজকের দিনেই দেখো-না—আমাদেরই সঙ্গীদল, আমাদেরই মতো ধমনীতে যাঁদের উষ্ণ রক্ত-স্রোত বইছে—ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তাঁরাও তো মৃত্যুভয়ে ভীত হন নি।

থার্মোপোলিতে বাধা পেয়ে কিছুকালের জন্য পারশ্যসেনার অগ্রগতি বন্ধ রইল, কিন্তু বেশি দিন নয়। গ্রীকরা কেবলই পিছু হটে যেতে লাগল; কোনো কোনো গ্রীকনগরী শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। গর্বিত এথেন্সবাসীরা কিন্তু আত্মসমর্পণ করার চেয়ে নগর ত্যাগ করে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল। সমস্ত অধিবাসী একযোগে নগর ত্যাগ করে চলে গেল, বেশির ভাগই পালাল সমুদ্রপথে। পারশ্যসেনা সেই জনমানবহীন নগরীতে প্রবেশ করে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। কিন্তু গ্রীকদের নৌবহর তখনও অক্ষত রয়েছে। স্যালামিস্-নামক স্থানে বিরাট এক জলযুদ্ধ হল, তাতে পারশ্য-নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই পরাজয়ের আঘাতে সম্রাট জেরিক্সিস ভগ্নমনোরথ হয়ে পারশ্যে ফিরে এলেন।

এর পরেও কিছুকাল পারশ্যসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু ম্যারাথন এবং স্যালামিসেই পতনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। কী করে পতন ঘটল পরে সে কথা বলব। এত বড়ো সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে দেখে সে যুগের লোকেরা নিশ্চয় খুব বিস্মিত হয়েছিল। হিরোডটাস এই পতনের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি নীতিসূত্রও উদ্ধার করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে তিনটি পর্যায় আছে—প্রথম পর্যায়ে সাফল্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে সাফল্যজনিত অহমিকা এবং অন্যায়ের প্রশ্রয়, সর্বশেষে এরই ফলে অধঃপতন।

১৬

গ্রীসের বিগত গৌরব

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩১

গ্রীকরা যে পারশ্যসেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল তার ফল হল প্রধানত দুটি। পারশ্য-সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল, ক্রমে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল; অপর পক্ষে শুরু হল গ্রীক ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। একটি জাতির দীর্ঘ জীবনের তুলনায় এই গৌরব অবশ্য খুবই স্বল্পস্থায়ী। গ্রীসের গৌরবের যুগ পুরো দু শো বছরও স্থায়ী হয় নি। পারশ্য অথবা অন্যান্য প্রাচীন সাম্রাজ্যের মতো এদের গৌরবের কাহিনী রাজ্যবিস্তারের কাহিনী নয়। পরে অবশ্য আলেকজাণ্ডারের অভ্যুদয় হয়েছিল এবং অল্পকালের জন্য তাঁর বিজয়-অভিযান সমস্ত পৃথিবীকে চমকিত করেছিল। যাক, তাঁর সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। ইতিমধ্যে আমরা পারশ্যযুদ্ধ এবং আলেকজাণ্ডারের অভ্যুদয়ের মধ্যকাল সম্বন্ধে অর্থাৎ থার্মোপোলি এবং স্যালামিসের যুদ্ধের পরবর্তী শ-দেড়েক বছরের ইতিহাস আলোচনা করছি। পারশ্যসম্রাটের আক্রমণের ভয়ে গ্রীকরা একতাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই আশঙ্কা দূর হবামাত্রই একতাসূত্রটি ছিন্ন হয়ে গেল, আবার শুরু হল বিবাদ-বিসংবাদ। বিশেষ করে এথেন্স এবং স্পার্টা—এই দুটি নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ ছিল। অবশ্য তাদের বিরোধের কাহিনী এখানে অবান্তর, কারণ, এর কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। সে যুগে গ্রীস অত উন্নত হয়েছিল বলেই তাদের বিবাদ-বিসংবাদ আমরা আজও মনে করে রেখেছি।

প্রাচীন গ্রীসের মুষ্টিমেয় কয়েকখানি গ্রন্থ, কয়েকটি মূর্তি এবং কিছু ধ্বংসাবশেষ মাত্র আমাদের সম্বল। কিন্তু তাই যথেষ্ট; এই কটি নিদর্শন থেকেই আমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সে যুগের গ্রীকরা সর্ব বিষয়ে কতখানি উন্নতিলাভ করেছিল তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তাদের অপূর্ব ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি দেখলে তবেই বোঝা যায়, কতখানি ছিল তাদের ধীশক্তি আর শিল্পচাতুর্য। ফিডিয়াস ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা ভাস্কর—তিনি ছাড়াও আরও অনেকে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ ছাড়া গ্রীকদের রচিত নাটক—বিয়োগান্ত মিলনান্ত দুই-ই, এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। সফোক্লিস, এস্‌কাইলাস, ইউরিপিডিস, এরিস্টোফেনিস, পিণ্ডার, মিনাণ্ডার এবং সাফো—এসব নাম বোধকরি তোমার কাছে এখন অর্থহীন মনে হবে। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন তুমি এ'দের বই পড়বে তখন নিশ্চয় গ্রীসের গৌরবের কথা তুমি কতকটা বুঝতে পারবে।

কোন্ দেশের ইতিহাস ঠিক কীভাবে পড়া উচিত—গ্রীক ইতিহাসের এই যুগটির কথা ভাবলেই আমরা তা বুঝতে পারব। সে যুগের গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং ছোটো-খাটো বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল কেবলমাত্র সেই দিকেই যদি আমরা নজর দিই তবে গ্রীকদের সম্বন্ধে সত্যিকার কতটুকু আমরা জানলাম, কতটুকু বুঝলাম? তাদের ভালো করে জানতে হলে তাদের চিন্তা-জগতে প্রবেশ করতে হবে। তারা কী ভেবেছে, কী করেছে তার সম্যক্ উপলব্ধি চাই। মননের ইতিহাসই হল আসল ইতিহাস। এইজন্য বলা যেতে পারে, বর্তমান ইউরোপের ইতিহাস অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বংশধর মাত্র।

বিভিন্ন জাতির জীবনে এই ধরনের উন্নত যুগ কীভাবে এসেছে গিয়েছে তার পর্যালোচনা বড়োই চিত্তাকর্ষক। অকস্মাৎ বিদ্যুৎচমকে সমস্ত-কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, নরনারী সকলে নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ব্যাপৃত হয়। দেশবাসী সকলে নূতন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। আমাদের দেশেও এরকম যুগ এসেছে। সর্বপ্রথম যে গৌরবের যুগকে আমরা জানি সেটি হচ্ছে বেদ উপনিষদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ-রচনার যুগ। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন যুগের কোনো গ্রন্থবদ্ধ ইতিহাস আমাদের নেই, সেদিনের কত কত অপূর্ব সৃষ্টি হয়তো একেবারে লোপ পেয়ে গেছে বা হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সে যুগের যেটুকু নিদর্শন আমাদের হাতে আছে তাতেই প্রমাণ হয়, প্রাচীন ভারতে কতবড়ো ধীশক্তিসম্পন্ন চিন্তাবীরদের জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী কালের ইতিহাসেও ভারতবর্ষে অনুরূপ গৌরবের যুগ এসেছে। আমাদের এই ইতিহাস-পরিক্রমার সূত্রে ক্রমে ক্রমে সেসব যুগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন বিশেষ করে এথেন্স নগরী খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। একজন মস্ত বড়ো রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তার অধিনায়ক। তাঁর নাম ছিল পেরিক্লিস। ত্রিশ-বৎসর-কাল এথেন্সের শাসনভার তাঁর হাতে ছিল। সে সময়ে এথেন্স নগরীর গরিমার অন্ত ছিল না—একদিকে সুদৃশ্য হর্ম্যে শোভিত, অপরদিকে বড়ো বড়ো শিল্পী এবং সুধীবৃন্দের বাসভূমি। এখনও সেকালের এথেন্সের কথা বলতে হলে আমরা বলি পেরিক্লিসের এথেন্স কিংবা পেরিক্লিসের যুগ।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হিরোডটাস ছিলেন ঐ যুগের একজন এথেন্সবাসী। এথেন্সের উন্নতির কারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি স্বভাবতই একটু নীতিবাগীশ ছিলেন; এই সূত্রেও তিনি একটি নীতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থে বলেছেন:

> এথেন্স ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠল—এর থেকেই প্রমাণ হয় এবং সর্বত্রই এর প্রমাণ মেলে যে, স্বাধীনতার ফল কখনও ভালো না হয়ে যায় না। এথেন্সবাসীরা যতদিন স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের অধীনে ছিল ততদিন তারা সামরিক শক্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল না। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের অবসান হওয়ামাত্র তারা শক্তিতে আর সকলকে ছাড়িয়ে গেল। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, পরাধীন অবস্থায় তারা আপন শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে নি, কেবলমাত্র প্রভুর আজ্ঞা পালন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আপন শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছে।

সে যুগের মহারথীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এঁদের মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, এমনকি যাঁকে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম বলা চলে, তাঁর নাম এখনও করা হয় নি। তাঁর নাম সক্রেটিস। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং জ্ঞানযোগী, নিরন্তর সত্যের সন্ধানে রত। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অভিলাষ। বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রকৃত সত্য যাতে উদ্ঘাটিত হতে পারে, এই ছিল উদ্দেশ্য। তাঁর অনেক-সব শিষ্য অথবা চেলা ছিল, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন প্লেটো। প্লেটো অনেক বই লিখে রেখে গেছেন। সেসব বই থেকে আমরা তাঁর গুরু সক্রেটিস সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। প্রায়ই দেখা যায়, যারা নূতন নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত, শাসকসম্প্রদায় তাদের বড়ো-একটা সুনজরে দেখে না, সত্যানুসন্ধান তারা পছন্দ করে না। পেরিক্লিসের অব্যবহিত পরেই যাঁরা এথেন্সের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সক্রেটিসের ভাবভঙ্গি, মতামত পছন্দ করতেন না। এঁদের হুকুমে সক্রেটিসের বিচার হল এবং বিচারের ফলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হল। কর্তারা বললেন, সক্রেটিস যদি লোকজনের সঙ্গে ঐসব আলোচনা বন্ধ করেন এবং তাঁর মতিগতি পরিবর্তন করেন তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সক্রেটিস তাতে রাজি হলেন না; যা কর্তব্য বলে জেনেছেন তা ত্যাগ করার চেয়ে বিষপাত্র গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর বিচারক এবং এথেন্সবাসীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন:

> আমি আমার সত্যানুসন্ধানের ব্রত ত্যাগ করব এই শর্তে আপনারা আমাকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছেন। তার উত্তরে আমি এথেন্সবাসীদের বলব, আপনাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের আদেশ পালনে আমি অক্ষম, কারণ আমি ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছি। তিনিই আমাকে এ কার্যে নিয়োজিত করেছেন। যতদিন আমার দেহে প্রাণ আছে ততদিন এই জ্ঞানান্বেষণের ব্রত থেকে আমি বিরত হব না। আমার অভ্যস্ত প্রথানুযায়ী যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হবে, সম্বোধন করে বলব, 'তুমি যে জ্ঞান এবং সত্যানুসন্ধান ছেড়ে, আপন আত্মার কল্যাণচিন্তা ভুলে গিয়ে, কেবলমাত্র অর্থ এবং যশের পিপাসায় মত্ত হয়ে আছ, এ কি ঘোরতর লজ্জার কথা নয়?' মৃত্যু কী জিনিষ আমি জানি না, কে জানে এর ফল কল্যাণকর হতেও-বা পারে, সুতরাং আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি শুধু এইটুকু জানি, কর্তব্য কাজ থেকে বিরত হওয়া অন্যায়। যাকে নিশ্চিত অন্যায় বলে জানি তার চেয়ে যাতে কল্যাণের সম্ভাবনা হয়তো-বা নিহিত আছে সেই মৃত্যুকেই আমি অধিক বরণীয় মনে করি।

সক্রেটিস যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রাণ দিয়ে সত্য এবং জ্ঞানের সাধনা করে গিয়েছেন; সেই সাধনা আরও বেশি সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর মৃত্যুতে।

আজকাল সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং আরও কত কত সমস্যা সম্বন্ধে তোমরা নানা আলাপ-আলোচনা শুনছ কিংবা পড়ছ। পৃথিবীতে দুঃখদৈন্য অবিচার অনেক রয়েছে। বর্তমান বিধি-ব্যবস্থায় অনেকেরই আস্থা নেই, তাঁরা এসব বদলাতে চান। রাষ্ট্রপরিচালনা সম্বন্ধে প্লেটোও অনেক কথা ভেবেছেন, অনেক-কিছু লিখেও গেছেন। তাতেই দেখা যাচ্ছে, সেই যুগের লোকেরাও দেশের রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলবার কথা ভেবেছেন যাতে সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো যায়।

প্লেটো যখন প্রায় বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন তখন আর-একজন গ্রীক পণ্ডিত ক্রমে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম এরিস্টটল্‌। তিনি ছিলেন মহাবীর আলেকজাণ্ডারের গৃহ-শিক্ষক। পরে আলেকজাণ্ডার তাঁকে বহুপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। সক্রেটিস এবং প্লেটোর ন্যায় এরিস্টটল্‌ দার্শনিকতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। প্রকৃতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। একে বলা যায় প্রকৃতিদর্শন কিংবা আজকালকার ভাষায় যাকে বলে বিজ্ঞান। এই হিসাবে এরিস্টটল্‌ পৃথিবীর প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম।

এর পরে আমরা এরিস্টটলের শিষ্য আলেকজান্ডারের জীবনকাহিনী আলোচনা করব। কিন্তু সেটি হবে কালকে, আজকে ঢের লেখা হয়ে গেছে।

আজকে বসন্ত-পঞ্চমী, আজ থেকে বসন্তঋতুর সূচনা। আমাদের স্বল্পস্থায়ী শীতঋতু শেষ হয়ে গেল, বাতাসে আর সেই কন্‌কনে ভাবটা নেই। ক্রমেই পাখির দল এসে ভিড় করছে আর পাখির গানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠছে। পনেরো বৎসর আগে দিল্লি নগরে ঠিক এই দিনটিতে তোমার মায়ের আর আমার বিয়ে হয়েছিল!

১৭

দিগ্বিজয়ী বীর কিন্তু গর্বান্ধ যুবক

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৩১

আমার গত চিঠিতে এবং তার আগেও মহাবীর আলেকজান্ডারের নাম উল্লেখ করেছি। বোধকরি বলেছিলাম, তিনি জাতিতে গ্রীক। সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। গ্রীস দেশের উত্তর দিক ঘেঁষে মাসিডন নামে একটি দেশ আছে, তিনি আসলে সেই দেশের অধিবাসী। মাসিডনের অধিবাসীরা অনেকাংশে ছিল গ্রীকদের মতো; ওদের বলা যেতে পারে গ্রীকদের জ্ঞাতি ভাই। আলেকজান্ডারের পিতা ফিলিপ ছিলেন মাসিডনের রাজা। তিনি অতি বিচক্ষণ রাজা ছিলেন; তাঁর পরিচালনায় তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যটি ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠল। বিশেষ করে তিনি একটি চমৎকার সেনাদল গড়ে তুলেছিলেন।

আলেকজান্ডারকে মহাবীর আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তিনি ইতিহাসেও খুব প্রখ্যাত। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের জন্য তিনি অনেকাংশে পিতার কাছে ঋণী, কারণ ফিলিপই সব-কিছুর সূচনা করে গিয়েছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে আলেকজান্ডার যত বড়ো ছিলেন, মানুষ হিসাবে ঠিক ততখানি বড়ো ছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্তত আমি তো তাঁকে মহামানব বলে মানতে রাজি নই। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর অল্পদিনের জীবনে তিনি দু-দুটি মহাদেশে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রেখে গিয়েছেন এবং ইতিহাসে যতসব দিগ্বিজয়ী বীরের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম। সুদূর মধ্য-এশিয়ায় তিনি এখনও সেকেন্দর নামে বিখ্যাত। মানুষ হিসাবে তিনি যা-ই হোন-না কেন, ইতিহাসে তিনি প্রভূত গরিমা লাভ করেছেন। তাঁর নাম অনুসারে বহু নগর-নগরীর নাম হয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্যন্তও বেঁচে আছে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহর তার মধ্যে সর্বপ্রধান।

মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোড়া থেকেই তাঁকে খ্যাতির নেশায় পেয়ে বসেছিল। সবুর আর সয় না। পিতা যে চমৎকার সৈন্যদলটি গড়ে তুলেছিলেন, স্থির হল, তাই নিয়ে তাদের পুরোনো শত্রু পারশ্য দেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবেন। গ্রীকরা কিন্তু মনে মনে ফিলিপ কিংবা আলেকজান্ডার কাউকেই পছন্দ করত না। তা হলেও তাদের ক্ষমতার দাপটে ওরা ভয়ে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। একটি-একটি করে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি ওদের আধিপত্য স্বীকার করে নিল এবং পারশ্য-অভিযানকারী সম্মিলিত গ্রীক সেনাদলের প্রধান সেনাপতি হলেন আলেকজান্ডার। কিন্তু থিব্‌স্‌-নামক গ্রীক নগরীটি তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আলেকজান্ডার থিব্‌স্‌ নগরী আক্রমণ করলেন; সেই প্রচণ্ড আক্রমণে সুপ্রসিদ্ধ নগরীটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বহু অধিবাসীকে তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং বহু সহস্র লোককে তিনি ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করেন। তাঁর এই বর্বরোচিত ব্যবহারে সমস্ত গ্রীস দেশে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। অবশ্য এইসব বর্বরজনোচিত ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না, বরং দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মায়।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
ম্যাসিডোনিয়া
এশিয়া মাইনর
এথেন্স
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর
মেসোপটেমিয়া
বাবিলন
সুসা
পার্থিয়া
পারস্য
পার্সিপোলিস
সমরকন্দ
গান্ধার
খাইবার
তক্ষশীলা
ভারতবর্ষ
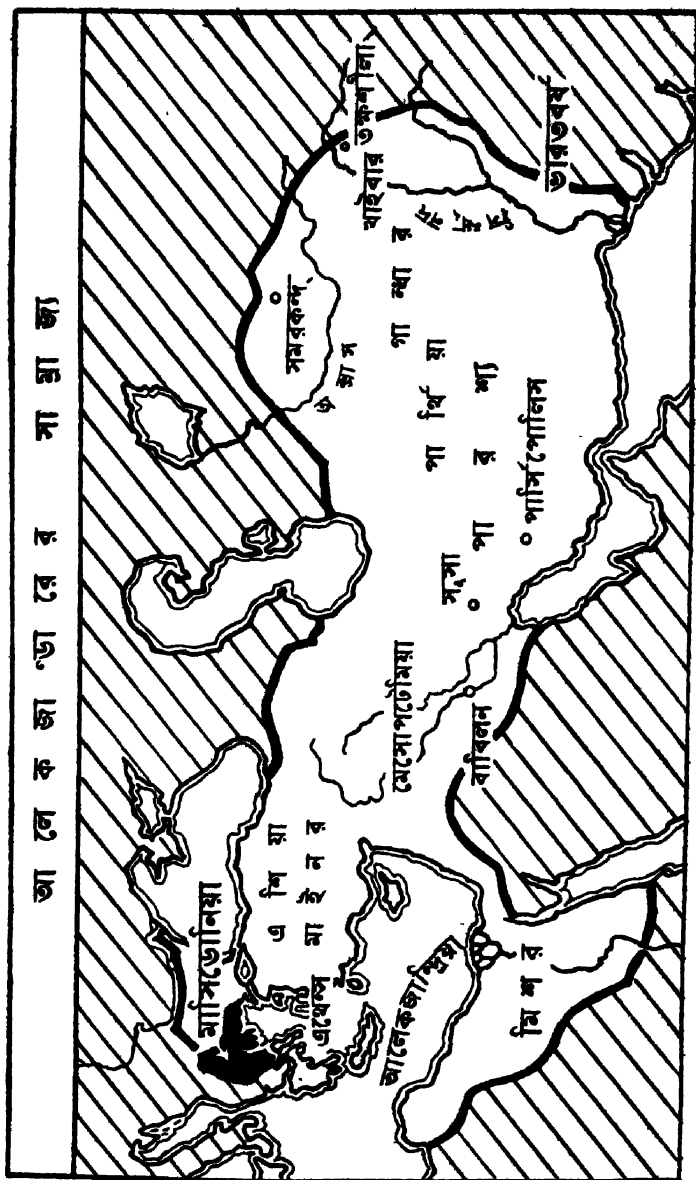
মিশর তখন ছিল পারশ্যরাজের অধীন। আলেকজান্ডার সহজেই মিশর জয় করলেন। জেরিক্সিসের পরবর্তী রাজা পারশ্যসম্রাট তৃতীয় দারিয়ুসকে তিনি ইতিপূর্বেই যুদ্ধে পরাভূত করেছিলেন। মিশর-জয়ের পরে তিনি পুনরায় পারশ্য-অভিমুখে অগ্রসর হন এবং দারিয়ুসকে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত করেন। সম্রাট দারিয়ুসের প্রাসাদ আলেকজান্ডার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেন। তিনি বলেছিলেন, জেরিক্সিস যে এথেন্স ধ্বংস করেছিলেন এটি তারই প্রতিশোধ।

পারশ্যভাষায় একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে ফিরদৌশি নামে এক কবি এটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম শাহ্‌নামা, এটি পারশ্যরাজাদের ইতিবৃত্ত। এর মধ্যে আলেকজান্ডার এবং দারিয়ুসের যুদ্ধ-কাহিনীর বর্ণনা আছে, তার কিছুটা বোধকরি অতিরঞ্জিত। এই গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, দারিয়ুস যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফুর্‌ বা পুরু নামে এক রাজা ছিলেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে বায়ুবেগে তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু পুরু তাঁকে কোনো সাহায্য করতে সমর্থ হন নি। অল্পকালের মধ্যেই তাঁকেও আলেকজান্ডারের বিজয়ী সেনাদলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফিরদৌশির শাহ্‌নামা-গ্রন্থে বহু স্থানে উল্লেখ আছে যে, তখনকার কালে পারশ্যের রাজা এবং আমির-ওমরাহরা ভারতবর্ষে-নির্মিত তরবারি, ছোরা ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সেই আলেকজান্ডারের সময়েও ভারতবর্ষে অতি উঁচুদরের ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হত এবং দেশবিদেশে সেসব জিনিসের সমাদরও ছিল।

পারশ্য থেকে আলেকজান্ডার বরাবর অগ্রসর হতে লাগলেন। বর্তমানে হিরাট, কাবুল, সমরকন্দ্‌ প্রভৃতি শহর যেখানে অবস্থিত সেই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্রমে তিনি সিন্ধু নদের উপত্যকাভূমিতে উপস্থিত হলেন। এইখানে সর্বপ্রথম ভারতীয় এক রাজা তাঁর অগ্রগতিতে বাধা দিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা তাঁদের উচ্চারণ অনুযায়ী তাঁর নাম দিয়েছেন পোরাস। তাঁর আসল নামটা বোধকরি এরই কাছাকাছি একটা-কিছু হবে, সেটা আমরা সঠিক জানি না। উল্লেখ আছে যে, পোরাস খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং তাঁকে পরাজিত করতে আলেকজান্ডারকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। পোরাস যেমন বীর ছিলেন, তেমনি দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর চেহারা। আলেকজান্ডার তাঁর বীরত্বে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, যুদ্ধে পরাজিত করেও তিনি তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হলেও বুঝতে হবে যে, যিনি আগে ছিলেন স্বাধীন নৃপতি, এখন তিনি হলেন গ্রীকদের অধীনস্থ শাসনকর্তা মাত্র।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খাইবার-গিরিপথ দিয়ে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং রাওয়ালপিণ্ডির উত্তরে অবস্থিত তক্ষশীলা হয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাবে। পোরাসকে পরাজিত করে আলেকজান্ডার দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হল না, সিন্ধুনদের উপত্যকা থেকেই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। আলেকজান্ডার সত্যি সত্যি যদি হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন তা হলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াত সেটা একবার ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে। সেখানেও কি তিনি জয়লাভ করতেন না ভারতীয় সৈন্যদলের কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হত? পোরাসের ন্যায় সীমান্তবাসী এক রাজাকে দমন করতেই তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, সুতরাং মধ্য-ভারতের বড়ো বড়ো রাজশক্তির পক্ষে আলেকজান্ডারকে বাধা দেওয়া বোধকরি অসম্ভব হত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে ব্যাপারটা নির্ভর করে নি, তাঁর সৈন্যদলের সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। বহু বৎসরের অভিযানের ফলে তাঁর সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমনও হতে পারে, ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল দেখে তারা একটু দমে গিয়েছিল, বুদ্ধিমানের মতো পরাজয়ের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়াই তারা উচিত মনে করেছিল। যে কারণেই হোক, তাঁর সৈন্যদল আর অগ্রসর হতে রাজি হয় নি। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডারকে তাই মেনে নিতে হল। কিন্তু ফেরবার পথে এদের বিষম বিপদে পড়তে হয়েছিল; খাদ্য এবং পানীয়ের অভাবে সৈন্যদের অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হল। এর অল্পকাল পরেই খৃষ্টপূর্ব ৩২৩

অব্দে ব্যাবিলন শহরে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। সেই-যে কবে পারশ্য-অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তার পরে আর আপন দেশ মাসিডনে তাঁর ফিরে যাওয়া হল না।

মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হল। তিনি ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি কী করে গেলেন? কয়েকটি বড়ো বড়ো যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, এই পর্যন্ত। তিনি যে একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অহংকারী, উদ্ধত এবং নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন, মনে মনে তিনি নিজেকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন। কখনও রাগের মাথায়, কখনও-বা খেয়ালের বশে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও হত্যা করেছেন, আবার কখনও সমস্ত অধিবাসী-সমেত বড়ো বড়ো নগরী তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন অথচ তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাতে স্থায়ী কিছুই রেখে যান নি—এমনকি ভালো রাস্তাঘাট পর্যন্ত নয়। আকাশের উল্কার ন্যায় তিনি অকস্মাৎ দেখা দিলেন এবং উল্কার মতোই অন্তর্হিত হলেন। পশ্চাতে তাঁর নামের স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই রেখে গেলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিরা একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য শতধাবিভক্ত হয়ে গেল। তাঁকে বলা হয়েছে জগজ্জয়ী বীর। গল্প আছে একবার তিনি নাকি এই বলে কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন যে, জয় করবার মতো দেশ আর একটিও বাকি নেই। কিন্তু আমরা দেখেছি যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামান্য একটু অংশ ছাড়া গোটা ভারতবর্ষটাই তাঁর জয় করতে বাকি ছিল। এ ছাড়া সেই যুগেও চীন দেশ এক বিরাট রাজ্য ছিল, আলেকজান্ডার তো চীন দেশের ধারে-কাছেও গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সেনাপতিরাই এতবড়ো সাম্রাজ্যটিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিল। মিশর দেশ পড়েছিল টলেমির ভাগে। সেখানে তিনি বেশ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। বহুদিন ধরে তাঁর বংশধরেরা সেখানে রাজত্ব করেছিল এবং এদের অধীনে মিশর একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল তখন মিশরের রাজধানী। সে আমলে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল।

পারশ্য, মেসোপটেমিয়া এবং এশিয়া-মাইনরের কতক অংশ পড়েছিল সেলিউকস-নামক অপর একজন সেনাপতির ভাগে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে অংশটুকু আলেকজান্ডার জয় করেছিলেন সেটুকু সেলিউকসের ভাগেই পড়েছিল। কিন্তু ভারতের সেই অধিকৃত অংশটুকু তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরেই গ্রীক সৈন্যদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডার ভারতে আগমন করেন। তাঁর আগমনটা নিতান্তই একটা আকস্মিক আক্রমণের মতো, তা ভারতবর্ষের উপর কোনোই স্থায়ী ফল রেখে যায় নি। অবশ্য কোনো কোনো লোকের ধারণা, এই আক্রমণের পর থেকেই গ্রীস এবং ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। আলেকজান্ডারেরও আগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং পারশ্য, এমনকি গ্রীস দেশের সঙ্গেও, ভারতের নিয়মিত ব্যবসাবাণিজ্য চলত। অবশ্য আলেকজান্ডারের আগমনে এই যোগাযোগ নিশ্চয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ভারতীয় এবং গ্রীস সংস্কৃতির পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছিল। এমনকি 'ইণ্ডিয়া' শব্দটিও সিন্ধুনদের গ্রীক উচ্চারণ 'ইনডাস' থেকে উদ্ভূত।

আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তার নাম মৌর্যসাম্রাজ্য। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় যুগ। এই যুগটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অর্থশাস্ত্র

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩১

আগের এক চিঠিতে মগধের কথা উল্লেখ করেছি। আজকাল যেখানটায় বিহার প্রদেশ সেইখানে এই প্রাচীন রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র, বর্তমানে পাটনা নামে খ্যাত। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে নন্দবংশ বলে একটি রাজবংশ মগধে রাজত্ব করত। আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেন তখন নন্দবংশেরই কোনো রাজা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করছিলেন। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন যুবক বাস করতেন, তিনি বোধ করি ঐ রাজারই কোনো আত্মীয় হবেন। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন অতিশয় চতুর, উদ্যোগী এবং উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ভয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিরূপ হয়ে রাজা তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করেন। ইতিমধ্যে আলেকজান্ডার এবং গ্রীকদের নানাবিধ গল্প শুনে চন্দ্রগুপ্ত বোধহয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজ্য ছেড়ে তিনি তক্ষশীলায় গমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ—নাম বিষ্ণুগুপ্ত অথবা চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য দুজনের কেউই নেহাত শান্তশিষ্ট ভালোমানুষটি ছিলেন না। অদৃষ্টে যা ঘটবে তাই মেনে নেবার পাত্র তাঁরা নন। মাথায় তাঁদের বড়ো বড়ো সব মতলব, আর সেসব মতলব হাঁসিল না করে তাঁরা ছাড়বেন না। আলেকজান্ডারের গুণগরিমা দেখে নিশ্চয় চন্দ্রগুপ্তের চোখে ধাঁধা লেগেছিল। মনে মনে ইচ্ছা, তিনিও আলেকজান্ডারের মতো হন। এ বিষয়ে চাণক্য হলেন তাঁর প্রধান সহায় এবং মন্ত্রণাদাতা। দুজনেই খুব সচকিত হয়ে তক্ষশীলায় অবস্থান করছিলেন এবং যা-কিছু ঘটছিল তাই মনোনিবেশপূর্বক লক্ষ্য করছিলেন। এখন একবার সুযোগ পেলেই হয়।

সুযোগ আসতে বিলম্ব হল না। আলেকজান্ডারের মৃত্যুসংবাদ যখন এসে তক্ষশীলায় পৌঁছল চন্দ্রগুপ্ত ভাবলেন, এবার কাজের সময় এসেছে। আলেকজান্ডার একটি গ্রীক সৈন্যদল এ দেশে রেখে গিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত চারদিকের লোককে এদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুললেন এবং তাদের সাহায্যে গ্রীক সৈন্যকে আক্রমণ করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন। তক্ষশীলা অধিকার করে চন্দ্রগুপ্ত সঙ্গীদের নিয়ে পাটলিপুত্র-অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং নন্দবংশের সেই রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে খৃষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে এই যুদ্ধ হয়। সেই থেকে মৌর্যবংশের রাজত্ব আরম্ভ হল। চন্দ্রগুপ্তকে কেন মৌর্য বলা হয়েছে তার কারণটা খুব সুস্পষ্ট নয়। কেউ কেউ বলে তাঁর মায়ের নাম ছিল মুরা, সেইজন্যই ঐ নাম হয়েছে। আবার অন্যেরা বলে, তাঁর মায়ের বাবা ছিলেন রাজার ময়ূর-রক্ষক—ময়ূর থেকেই ঐ নামের উৎপত্তি। যাক গে, কথাটা যেখান থেকেই আসুক, 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য' নামেই তিনি পরিচিত। বেশ কয়েক শো বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত নামে আর-একজন বড়ো রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন। এই দুইজন সম্বন্ধে পাছে কোনো ভ্রান্তি জন্মে এইজন্যে বিশেষ করে এঁকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বলা হয়।

মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং কাহিনীতে আমরা বড়ো বড়ো সব রাজচক্রবর্তীদের কথা শুনেছি। তাঁরা একেবারে অখণ্ড ভারতের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু সে প্রাচীন কালের সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। সেই সময়ে ভারতবর্ষ কতদূর বিস্তৃত ছিল তাও আমরা ঠিক জানি নে। এমনও হতে পারে, এইসব প্রাচীন কাহিনীতে তখনকার দিনের রাজাদের পরাক্রমের কথা অনেকখানি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। যাই হোক, শক্তিশালী এবং সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বলতে ভারতের ইতিহাসে এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যেরই সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের বেশ একটি উন্নত এবং শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা ছিল। এ কথা ঠিক যে, এরূপ একটি রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা হঠাৎ কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। নিশ্চয় বহুকাল ধরে কতকগুলো ধারা চলে আসছিল যার ফলে

ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো ক্রমে একত্রিত হয়েছিল এবং শাসনব্যবস্থাও ক্রমেই উন্নততর প্রণালীতে অগ্রসর হচ্ছিল।

এশিয়া-মাইনর থেকে ভারতবর্ষ অবধি আলেকজাণ্ডারের বিজিত দেশগুলি পড়েছিল তাঁর সেনাপতি সেলিউকসের ভাগে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সেলিউকস সিন্ধু নদ অতিক্রম করে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর হঠকারিতার দরুন তাঁকে পরে অনুতাপ করতে হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই আবার তাঁকে ফিরে যেতে হল। লাভ তো কিছু হলই না, মাঝখান থেকে গান্ধার অর্থাৎ আফগানিস্থানের বেশ কতকটা অংশ, একেবারে কাবুল এবং হিরাট পর্যন্ত, চন্দ্রগুপ্তের হাতে ছেড়ে দিতে হল। আর সেলিউকসের কন্যার সঙ্গে হল চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এখন আফগানিস্থানের কতক অংশ-সহ সমগ্র উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হল—একেবারে কাবুল থেকে বাংলাদেশ এবং আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর অবধি। কেবলমাত্র দক্ষিণ-ভারত তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। এই বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম মেগাস্থিনিস। মেগাস্থিনিস তখনকার দিনের একটি অতি চিত্তাকর্ষক বিবরণ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে এর চেয়ে মনোরম এবং পূর্ণতর একটি বিবরণ আমরা পেয়েছি। এটির নাম 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র'। এই কৌটিল্য আর কেউ নন, আমাদেরই পূর্বপরিচিত চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। আর অর্থশাস্ত্র হচ্ছে ধনসম্পদের মূল নীতিকথা।

এই 'অর্থশাস্ত্র' এক বিচিত্র গ্রন্থ; এর মধ্যে এতসব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে যে এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজার কর্তব্য, মন্ত্রী এবং পারিষদবর্গের কর্তব্যের কথা তো আছেই, তা ছাড়া মন্ত্রণাসভা, শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর এবং গ্রামসমূহের শাসনব্যবস্থা, আইন-আদালত, সামাজিক রীতিনীতি, নারীর অধিকার, বৃদ্ধ এবং অক্ষমের প্রতিপালন, বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ, শুল্কনীতি, সেনাদল এবং নৌবহর, যুদ্ধ ও শান্তি, কূটনীতি, কৃষিব্যবস্থা, বয়নশিল্প, শিল্পজীবীদের সমস্যা, ছাড়পত্র, কারাগার, ইত্যাদি সব বিষয়েরই আলোচনা আছে। আরও কত বলব! কৌটিল্যের গ্রন্থের সবগুলি পরিচ্ছেদের নাম করতে গেলে এই চিঠি তাইতেই ভর্তি হয়ে যাবে।

রাজ্যাভিষেকের সময় প্রজারাই রাজার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করত এবং রাজাকে এই শপথ গ্রহণ করতে হত যে, তিনি প্রজাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করবেন। তাঁকে সর্বসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করতে হত : "যদি কোনো কারণে তোমাদের উপরে কোনো অত্যাচার করি তবে ভগবান যেন আমাকে ইহকাল পরকালের সুখ এবং সন্তান-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেন।" ঐ গ্রন্থে রাজার প্রাত্যহিক কর্তব্য এবং কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। জরুরি কার্যাদির জন্য তাঁকে সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হত, কারণ প্রজাসাধারণের কাজ রাজার খোশ-খেয়ালের দ্বারা বিলম্বিত হতে পারে না। রাজা নিজে যদি কাজে তৎপর হন তা হলে প্রজারাও তৎপর হবে। প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণে রাজার কল্যাণ। যাতে কেবলমাত্র নিজের সুখবৃদ্ধি হয় তাকেই রাজা অন্যায় বলে জানবেন, আর যাতে প্রজাসাধারণের সুখবৃদ্ধি হয় তাকেই তিনি সত্যিকারের কল্যাণ বলে মেনে নেবেন।—পৃথিবী থেকে রাজার দল ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে এবং এদেরও যেতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, প্রাচীন ভারতে রাজা-অর্থে বোঝাত—প্রজার সেবক। রাজাদের ঈশ্বর-দত্ত অধিকার ব'লে কিছু ছিল না, স্বৈরাচারের প্রশ্নই উঠত না। রাজা কোনোরকম অনাচার করলে প্রজারা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আর-একজনকে তাঁর জায়গায় বসাত। রাজা এবং রাজত্ব সম্বন্ধে এই ছিল তাদের ধারণা। অবশ্য এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁরা এই আদর্শানুযায়ী চলতেন না। তাঁদের মূর্খতার ফলে দেশের এবং দশের অশেষ দুর্গতি হত।

'অর্থশাস্ত্র'-গ্রন্থে আর-একটি নীতির উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে— আর্যজাতীয় কোনো ব্যক্তিকে কখনও ক্রীতদাসহিসাবে ব্যবহার করা হবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দেশী

হোক বিদেশী হোক, ক্রীতদাসের চলন তখন ছিল। কিন্তু আর্যজাতীয়েরা যাতে ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত।

মৌর্যসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র—গঙ্গাতীরে নয়-মাইল-ব্যাপী অতি সুদৃশ্য নগরী। নগরীর চারদিক ঘিরে চৌষট্টিটি বিরাট সিংহদ্বার ছিল, এ ছাড়া আরও কয়েক শত ছোটো ছোটো প্রবেশদ্বার ছিল। বাড়িঘর বেশির ভাগ ছিল কাঠের তৈরি। আগুন লাগবার আশঙ্কা ছিল বলে সে বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা ছিল। প্রধান প্রধান রাস্তায় হাজার হাজার জলপাত্র সারাক্ষণ জলে ভর্তি করে রাখা হত। প্রত্যেক গৃহস্থের উপর বাড়িতে জলপাত্র রাখবার হুকুম ছিল। তা ছাড়া মই, আঁকশি প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষও রাখতে হত।

কৌটিল্যের গ্রন্থে নগরবাসীদের জন্য একটি নীতির উল্লেখ আছে, সেটি তোমার খুব ভালো লাগবে। রাস্তায় কেউ আবর্জনা ফেললে তাকে জরিমানা দিতে হত। কারও বাড়ির সুমুখে রাস্তায় জলকাদা জমে থাকলে তাকেও জরিমানা করা হত। পাটলিপুত্র এবং অন্যান্য নগরের লোকেরা যদি সত্যি সত্যি এসব নিয়ম মেনে চলে থাকে তবে তো বলতে হবে, ওগুলো অতি সুন্দর তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে স্বাস্থ্যকর শহর ছিল। আমাদের পৌরসভাগুলো এইসব আইন-কানুন প্রবর্তন করলে আমি খুশি হতাম।

নগর-পরিচালনার জন্য পাটলিপুত্রে একটি পৌরসভা ছিল। নাগরিকরাই এই পৌরসভার সদস্য নির্বাচন করত। এ'রা সংখ্যায় ছিলেন ত্রিশজন। পাঁচজন করে সভ্য নিয়ে ছ'টি আলাদা সমিতি গঠন করা হত। তাদের কোনোটির উপর ভার ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের, কোনোটির উপর কুটিরশিল্পের। কোনো সমিতি পথিক এবং তীর্থযাত্রীদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করত, কোনোটি-বা ট্যাক্স-নির্ধারণের জন্য জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখত, আবার কোনোটি-বা পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করত। আর সমগ্র পৌরসভার উপর ছিল নগরের স্বাস্থ্য, আয়ব্যয়, জল-সরবরাহের ভার এবং প্রমোদ-উদ্যান ও সরকারি গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার।

বিচার আচার এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পঞ্চায়েত-প্রথা ছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারি গোলাঘরগুলিতে অর্ধেক শস্য দুর্ভিক্ষের জন্য আলাদা করে রাখা হত।

বাইশ শো বছর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য মিলে যে মৌর্যসাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এই ছিল তার রূপ। কৌটিল্য এবং মেগাস্থিনিস যেসব কথা বলে গেছেন তারই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করলাম। তখনকার দিনে উত্তর-ভারতের অবস্থা কীরূপ ছিল এইটুকু থেকেই তার মোটামুটি ধারণা করতে পারবে। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যের সহস্র সহস্র নগর শহর গ্রাম নিত্য জীবনের আনন্দে মুখরিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে বড়ো বড়ো সব রাস্তা। আর সর্বপ্রধান যে রাজপথ সেটি চলে গিয়েছে পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়ে একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবধি। রাজ্যের সর্বত্র খাল কাটানো হয়েছিল, সরকারি সেচ-বিভাগ তার দেখাশোনা করত। আর নৌবিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল বন্দর, খেয়া-পারাপার এবং সেতুনির্মাণ-ব্যবস্থা। অসংখ্য নৌকা এবং জাহাজ জলপথে যাতায়াত করত। সমুদ্রগামী জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে চীন-ব্রহ্মদেশ অবধি যেত।

চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ-বৎসর-কাল রাজত্ব করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ২৯৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরের চিঠিতে মৌর্যসাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলব।

১৯

তিনটি মাস!

এস্. এস্. ক্রাকোভিয়া
২১শে এপ্রিল, ১৯৩১

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি। ইতিমধ্যে প্রায় তিনটি মাস কেটে গেছে; অনেক দুঃখ, কষ্ট, উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এই কটি মাস কাটল। এই তিন মাসে ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আর সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হয়েছে আমাদেরই পরিবারে। সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য আন্দোলন আপাতত কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে, কিন্তু ভারতের যেসমস্ত সমস্যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে তার সহজ সমাধান এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে আমাদের পরিবারের যিনি ছিলেন কর্তা তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয়; তাঁর কাছেই আমরা শক্তি এবং প্রেরণা লাভ করেছি, তাঁরই পক্ষপুটে আশ্রয়লাভ করে দিনে দিনে বর্ধিত হয়েছি এবং ভারতমাতার যৎসামান্য সেবার অধিকারও তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

নাইনি জেলে সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেদিন ২৬শে জানুয়ারি। রোজকার অভ্যাসমতো সেদিনও তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম—পুরাকালের ইতিহাস সম্বন্ধে। এর ঠিক আগের দিনেই তোমাকে চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর স্থাপিত মৌর্যবংশ সম্বন্ধে লিখেছিলাম। সেই চিঠিতেই বলে রেখেছিলাম যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরে যাঁরা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলব, বিশেষ করে মহামতি অশোক সম্বন্ধে, যিনি ছিলেন দেবতাদেরও প্রিয়। ভারতের আকাশে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অশোকের আবির্ভাব। তাঁর তিরোধানের পরেও তিনি তাঁর অমর স্মৃতি পশ্চাতে রেখে গিয়েছেন। অশোকের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন অতীতের প্রান্ত থেকে আবার ঘুরে ফিরে বর্তমানের ক্ষেত্রে ফিরে এল, ঠিক এই ২৬শে জানুয়ারির দিনটিতে। এটি আমাদের একটি স্মরণীয় দিন, কারণ এক বৎসর পূর্বে এই দিনটিকে আমরা ভারতবর্ষের সর্বত্র নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা-দিবস কিংবা পূর্ণস্বরাজ-দিবস রূপে পালন করেছিলাম এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সেদিন স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। তার পরে পুরো একটি বৎসর কেটে গেছে—বহু সংগ্রাম, বহু দুঃখের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু জয়ের সূচনাও দেখা গিয়েছে। আজ আবার সেই উৎসবের দিনটি ফিরে এসেছে। নাইনি জেলের ৬ নম্বর ব্যরাকে বসে বসে ভাবছিলাম, আজ আবার দেশময় কত সভা কত শোভাযাত্রা হবে, পুলিশের লাঠি চলবে, কত লোক বন্দী হয়ে জেলে যাবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে একদিকে মন গর্বে আনন্দে অপরদিকে বেদনায় ভরে উঠছিল। হঠাৎ আমার চিন্তার সূত্রটি গেল ছিঁড়ে। বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ এল, তোমার দাদু খুব অসুস্থ। তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হবার জন্য আমাকে নাকি তক্ষুনি মুক্তি দেওয়া হবে। দুশ্চিন্তার ভারে আরসব ভাবনা গেল গুলিয়ে। তোমাকে যে চিঠি সবে লিখতে শুরু করেছিলাম তা রেখে দিতে হল। নাইনি জেল থেকে বেরিয়ে রওনা হলাম আনন্দভবনের দিকে।

দাদুর মৃত্যুর পূর্বে দশটি দিন আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলাম। ঐ কটি দিন দিবারাত্রি আমি তাঁর ব্যাধিযন্ত্রণা লক্ষ্য করেছি। কী অসীম সাহসের সঙ্গে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছেন তাও দেখেছি। জীবনে তিনি বহু সংগ্রাম করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছেন। কখনও হার মানেন নি, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও মৃত্যুর কাছে হার মানতে চান নি। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সেই শেষ সংগ্রাম দেখছিলাম। যাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তাঁর রোগযন্ত্রণা এতটুকু লাঘব করতে পারছিলাম না ভেবে আমার মন যখন অবসন্ন তখন, অনেকদিন আগে এড্গার এলেন পো'র গল্পে-পড়া কয়েকটি লাইন আমার মনে পড়ে গেল—মানুষ দেবতাদের কাছেও বশ্যতা স্বীকার করে না, এমনকি নিতান্ত দুর্বলচিত্ত না হলে মৃত্যুকেও পুরোপুরি স্বীকার করে না।

৬ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন। তাঁর অতিপ্রিয় জাতীয় পতাকায় মৃতদেহটিকে আবৃত করে লক্ষ্মৌ থেকে আনন্দভবনে তাঁকে নিয়ে এলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই দেহ একমুঠো ভস্মে পরিণত হল এবং মা গঙ্গা সেই অতি মূল্যবান দেহাবশেষ সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন।

লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই-যে আমরা—যারা তাঁর সন্তান, তাঁর রক্তমাংসে গড়া মানুষ—তাদের মনের অবস্থা কে বুঝবে? আর এই-যে আনন্দভবন, তার অবস্থাই বা কী? এটিও তো আমাদের মতোই তাঁর সন্তান। নিজের হাতে কত যত্নে কত ভালোবেসে একে গড়ে তুলেছিলেন। আজ সেই গৃহ জনহীন, পরিত্যক্ত; তার প্রাণশক্তি অন্তর্হিত। বারান্দায় মৃদুপদক্ষেপে অতিসন্তর্পণে আমরা হাঁটি চলি, পাছে যিনি এই সুখের নীড় গড়েছিলেন তাঁর শান্তির ব্যাঘাত হয়।

আমরা তাঁর জন্য শোকার্ত, প্রতি মুহূর্তে তাঁর অভাব বোধ করছি। এই-যে দিন যাচ্ছে, কই, শোকের তাপ তো একতিল কমছে না? তাঁর অভাব তেমনি অসহ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি এটি চান নি; চান নি যে শোকে আমরা ভেঙে পড়ি। তিনি যেভাবে দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন এবং দুঃখকে জয় করেছেন আমরাও তাই করি, এই তিনি চেয়েছিলেন। তিনি যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাই করে গেলে তবেই তিনি তৃপ্তি পাবেন। চুপ করে বসে বৃথা আমাদের শোক করবার সময় কোথায়? কাজ যে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আমাদের আহ্বান এসেছে। সেই যজ্ঞেই তিনি প্রাণ আহুতি দিয়েছেন। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বেঁচে থাকব, প্রাণপণে সংগ্রাম করব, প্রয়োজন হয় তো প্রাণ দেব।

বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি, সুমুখে যতদূর দেখা যায় আরবসাগরের নীল জলরাশি, অপরদিকে বহুদূরে ভারতের তটসীমা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই সীমাহীন অনন্ত বিস্তার দেখে কেবলই মনে পড়ছে, উঁচু দেয়াল-ঘেরা নাইনি জেলের ছোট্ট ব্যারাকটি, যেখান থেকে তোমাকে আগের সব চিঠি লিখেছি। সুমুখে দিক্‌চক্রবাল-রেখাটি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—যেখানে আকাশ এবং সমুদ্র যেন মিশে গেছে। কিন্তু জেলখানার বন্দীর চোখে চারদিক-ঘেরা উঁচু দেয়ালটাই দিগন্ত-রেখা টেনে দেয়। বন্দীদের মধ্যে আমরা অনেকে আজ কারাপ্রাচীরের বাইরে আছি, বাইরের মুক্ত হাওয়া উপভোগ করছি। কিন্তু আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে আজও সংকীর্ণ কারাকক্ষে আবদ্ধ; সেখানে তারা না দেখে সমুদ্র, না দেখে ডাঙা, না দেখে দূর দিগন্ত। বলতে গেলে ভারতমাতা নিজেই কারারুদ্ধ, তাঁর স্বাধীনতা আজও অনাগত। ভারতবর্ষই যদি স্বাধীন না হল তবে আমাদের এইটুকু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য কোথায়?

২০

আরবসাগর

এস্. এস্. ক্রাকোভিয়া
২২শে এপ্রিল, ১৯৩১

ক্রাকোভিয়া-জাহাজে আমরা বোম্বাই থেকে কলম্বো যাচ্ছি, এই ভেবে কেমন অবাক লাগছে। বেশ মনে পড়ছে—প্রায় চার বছর আগে ভেনিসে এই ক্রাকোভিয়া-জাহাজের ভিড়বার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। জাহাজে আসছিলেন তোমার দাদু; তোমাকে সুইজারল্যাণ্ডে তোমার ইস্কুলে রেখে আমি গিয়েছি ভেনিস থেকে তাঁকে এগিয়ে আনতে। আবার কয়েক মাস পরে এই ক্রাকোভিয়া-জাহাজেই তিনি ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন, আমি বোম্বাইয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করলাম। সেবারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে এক জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। এ'রা সারাক্ষণ তাঁর সম্বন্ধেই কথা বলছেন, তাঁরই গল্প করছেন।

গত তিন মাসের মধ্যে যে কত পরিবর্তন হয়েছে সে কথা কালকে তোমাকে লিখেছি। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যেসমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষ করে তোমাকে স্মরণ রাখতে বলছি, কারণ সারা ভারতবর্ষেই এই ঘটনাটি বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ এক মাসও হয় নি, কানপুর শহরে ভারতের একটি অতি বীর সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী—অপরের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিহত হয়েছেন। গণেশজি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যেমন মহৎপ্রাণ তেমনি নিঃস্বার্থ কর্মী। তাঁর মতো লোকের সঙ্গে একযোগে কাজ করাও গৌরবের কথা। গত মাসে কানপুরের জনতা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে একে অন্যকে হত্যা করছিল তখন গণেশজি সেই ক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আপন দেশবাসীদের সঙ্গে লড়াই করতে যান নি, গিয়েছিলেন তাদের রক্ষা করতে। শত শত লোকের প্রাণরক্ষা করেও-ছিলেন, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি, রক্ষা করবার চেষ্টাও করেন নি। যাদের রক্ষা করতে গিয়েছিলেন তাদের হাতেই তিনি নিহত হলেন। আমাদের প্রদেশ এবং বিশেষ করে কানপুর একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারিয়েছে। আর আমরা হারিয়েছি আমাদের অতিপ্রিয় এবং শুভানুধ্যায়ী সুহৃদকে। কিন্তু ভেবে দেখো, কী গৌরবের মৃত্যু—ধীর, স্থির, দ্বিধাহীনচিত্তে তিনি উন্মত্ত জনতার সম্মুখীন হয়েছেন, চতুর্দিকের হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও নিজের কথা না ভেবে অপরের প্রাণরক্ষার কথাই ভেবেছেন।

পরিবর্তন-ভরা তিনটি মাস! অসীম কাল-সমুদ্রে এ যেন একটি ফোঁটা, একটা জাতির জীবনে একটি নিমেষ। তিন সপ্তাহ আগে আমি সিন্ধু নদের উপত্যকায় মোহেঞ্জো-দারোর ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না। সেখানে দেখলাম, ইষ্টকনির্মিত বড়ো বড়ো পাকা বাড়ি এবং প্রশস্ত রাজপথ -সমেত একটি বিরাট নগরী ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসছে। লোকে বলে, এসব পাঁচ হাজার বছর আগের তৈরি। তা ছাড়া সেই প্রাচীন নগরীতে চমৎকার সব গহনাপত্র এবং কতরকমের মৃৎপাত্র দেখলাম। আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম, সুসজ্জিত নরনারীর দল রাস্তায় সার বেঁধে চলেছে, ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছে, বাজারে কতরকমের পণ্যদ্রব্য থরে থরে সাজানো, লোকেরা কেনাবেচায় ব্যস্ত, ওদিকে মন্দিরে মন্দিরে পূজারতির ঘণ্টা বাজছে।

এই পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে একটি জীবনধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে, কত পরিবর্তন তার জীবনে ঘটেছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কী জানো, আমাদের এই বৃদ্ধা ভারতমাতা—অবশ্য তিনি প্রাচীনা হলেও অনন্তযৌবনা এবং অসামান্যা রূপসী—ইনি তাঁর সন্তানদের অধৈর্য এবং অস্থিরতা দেখে বোধকরি মনে মনে হাসেন, কারণ, মানুষের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, দিবসান্তে কোথায় মিলিয়ে যায়।

২১

ছুটি ও স্বপ্নযাত্রা

২৬শে মার্চ, ১৯৩২

অতীতের ইতিহাস সম্বন্ধে নাইনি জেল থেকে তোমাকে লেখার পর চোদ্দটি মাস কেটে গেছে। তার তিন মাস পরে আবার আরবসাগর থেকে আরও দুখানা ছোট্ট চিঠি লিখেছিলাম। তখন আমরা ক্রাকোভিয়া-জাহাজে চড়ে যাত্রা করেছি লঙ্কার দিকে। আমি লিখতাম, আর আমার সামনে থাকত বিশাল সমুদ্র—আমার ক্ষুধাতুর চোখদুটো তাকে দেখে দেখে আর আশ মেটাতে পারত না।

তার পর লঙ্কায় পৌঁছলাম, সেখানে দুঃখকষ্ট ভুলতে চেষ্টা করলাম মহানন্দে ছুটিটা কাটিয়ে। মনোরম সেই দ্বীপটির এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি, প্রকৃতির মাধুর্যে ও প্রাচুর্যে মুগ্ধ হয়ে। বিগত মহিমার ভগ্নাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কান্ডী, নুবারাএলিয়া, অনুরাধাপুর! সে সময়ে দেখা জায়গাগুলোর কথা ভাবতে আজ কী সুন্দর লাগে! কিন্তু সেই প্রাণোচ্ছ্বল, শীতল ক্লান্তীয় বনভূমি তার সহস্র চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে আছে, এই দৃশ্যটিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। সেই সরল, সুন্দর, সরু সুপারিগাছ, অগণ্য তালনারিকেলপরিবৃত সিন্ধুতীর! সেখানে দ্বীপের শ্যামলিমা মিশছে সাগর ও আকাশের নীলিমাতে; সেখানে সমুদ্রের জল ঝিল্‌মিলিয়ে ওঠে, খেলা করে বেলাভূমিতে; আর তালীকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস বয়ে যায় মর্মর-শব্দে।

পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলে সেই তোমার প্রথম পদার্পণ, আমারও তাই, কিন্তু বহুপূর্বের সেই লুপ্তস্মৃতি পর্যটনে বহু নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গিয়েছিল। যাবার আগে সেগুলোর প্রতি আমার আসক্তি ছিল না, কারণ উত্তাপকে আমার বড়ো ভয়। সমুদ্র, পাহাড় আর সর্বোপরি সেই উত্তুঙ্গ তুষারস্তূপের নাম শুনেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু যাবার পরে আমাদের সেই স্বল্পস্থায়ী সিংহলপ্রবাসেই আমি উষ্ণদেশের মোহিনী মায়া অনুভব করেছিলাম প্রাণে। আবার মিতালি পাতানোর আশায় ব্যগ্র হয়েছিলাম সেখান থেকে ফিরে আসবার সময়।

সিংহলের ছুটি আমাদের ফুরিয়েছিল বড়ো তাড়াতাড়ি, সাগরপাড়ি দিয়ে আমরা আবার ফিরেছিলাম ভারতের দক্ষিণসীমায়। সেই কন্যাকুমারী-দর্শন মনে পড়ে, যেখানে বাস করেন আমাদের চিরকুমারী দেবী আর যাকে পাশ্চাত্যবাসীরা স্বীয় প্রতিভাগুণে বিকৃত করে নিয়েছে 'কেপ কমোরিন'-রূপে। বলতে গেলে তখন আমরা ভারতমাতার চরণতলে বসে দেখেছিলাম, আরবসাগর মিশছে বঙ্গোপসাগরের জলে; কল্পনা করেছিলাম, ভারতবর্ষকে তারা দিচ্ছে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। কী নিবিড় শান্তি তখন সেখানে, আমার মন উড়ে চলেছিল শতসহস্র ক্রোশ পার হয়ে ভারতের আর-এক সীমায়, চিরতুষারকিরীটী শান্তিধারাস্নাত হিমাচলের দেশে। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্য জুড়ে রয়েছে কত বিরোধ, কত দুর্দশা, কত দারিদ্র্য!

অন্তরীপ থেকে আমরা যাত্রা করেছিলাম উত্তরদিকে।

ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিনের মধ্য দিয়ে, মালাবারের খালের জল কেটে কেটে আমরা চলেছিলাম, কেমন করে চন্দ্রালোকে-উদ্ভাসিত বনময় তীরের কোলে কোলে ভেসে চলেছিল আমাদের নৌকো। তার পর একে একে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই—শেষে এলাহাবাদ! সে নয় মাস আগের কথা—তখন জুন মাস।

কিন্তু আজকাল আগে হোক পরে হোক, ভারতের সব পথেরই গন্তব্যস্থল এক। সত্যেই হোক আর স্বপ্নেই হোক, সকল যাত্রারই অবসান হয় কারাদুর্গের মধ্যে। সুতরাং আমি আবার এখানে ফিরে এসেছি, আমার চারদিকে সেই অতিপরিচিত দেয়াল আর হাতে চিন্তা করবার মতো অথবা তোমাকে চিঠি লেখবার মতো প্রচুর অবসর। আবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, দেশের নরনারী ছেলেমেয়ে সবাই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করবার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে যুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার দেবতা দুর্জয়। প্রাচীন দেবদেবীর মতো তিনি তাঁর পূজারীদের কাছে চান নরবলি।

কারাগারে আজ আমার পুরো তিন মাস কাটল। তিন মাস আগে ঠিক এমনি দিনে— ২৬শে ডিসেম্বরে— আমাকে ষষ্ঠবার গ্রেফ্‌তার করা হয়। বহুদিন পরে আবার তোমাকে চিঠি লিখছি—কিন্তু তুমি তো জানো, বর্তমানেই যখন চিত্ত পরিপূর্ণ, অতীতের কথা চিন্তা করা তখন কত কঠিন! বাইরের ঘটনাতে মনকে আর বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে কারাগারের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বসতে কিছু সময় লাগে। এবার থেকে ঠিকমতো তোমার কাছে লিখতে চেষ্টা করব। এখন আমি অন্য-একটা কারাগারে। তাতে যা পরিবর্তন হয়েছে তা আমার পছন্দ হচ্ছে না, আর কাজেরও কিছু ব্যাঘাত হচ্ছে। আমার চারদিকের দিগ্বলয় এখানেই সবচেয়ে উঁচু— দেয়ালগুলোর অন্তত উচ্চতার দিক দিয়ে চীনের প্রাচীরের সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ আছে! উচ্চতায় এগুলো ২৫ ফিটের কাছাকাছি বলেই

বোধ হচ্ছে। আমাদের দেখা দেবার জন্যে এই দেয়াল ডিঙিয়ে আসতে সূর্যদেবের আরও দেড় ঘণ্টা বেশি সময় লাগে।

আমাদের দিক্‌চক্রবাল কিছুদিনের জন্যে গণ্ডিবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যাক গে, তার চেয়ে সেই সুনীল সাগর, মরুপর্বত, আর দশ মাস আগে তুমি আমি ও তোমার মা যে স্বপ্নযাত্রা করেছিলাম, তাদের কথা চিন্তা করাও ভালো—যদিও এখন আর সেগুলিকে সত্যি বলে মনে হয় না।

২২

মানুষের জীবনসংগ্রাম

২৮শে মার্চ, ১৯৩২

বিশ্বের ইতিহাসের সূত্র ধরে আবার অতীতের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে নিই। সে এক জটিল সূত্র, জট খোলাও কঠিন, আবার তার সম্পূর্ণ আকার দেখতে পাওয়াও সহজ নয়। তার সামান্য এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে তাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতেই আমরা সুনিপুণ। আমরা প্রায় সবাই ভাবি যে, আমাদের স্বদেশের ইতিহাস অন্য সকল দেশের চেয়ে মহিমময় ও অনুধাবনযোগ্য। এ সম্বন্ধে একবার তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছি, আবার দিচ্ছি, কারণ ঐ ফাঁদে পড়া বড়োই সহজ। এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে সেইজন্যেই আমি এসব চিঠি তোমাকে লিখতে শুরু করি, তবুও মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে আমিও সেই একই ভুল করছি। আমার নিজের শিক্ষার মধ্যেই যদি গলদ থাকে, যে ইতিহাস আমি পড়েছিলাম তাই যদি এমন উল্টোপাল্টা হয়, তবে আর কী করা যাবে? সে দোষ আমি কারাগারে নির্জনে আরও পড়াশুনো করে সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করেছি, হয়তো সফলও হয়েছি কতকটা। কিন্তু অল্পবয়সে মনের যাদুঘরে যেসব মানুষ ও ঘটনাবলীর ছবি ঝুলিয়েছিলাম আজ আর সেগুলোকে সরাতে পারছি না। আর এইসব ছবিগুলিই ইতিহাস সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে রাঙিয়ে রেখেছে, সে দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেকটা সীমাবদ্ধ। কাজেই লিখতে লিখতে আমি ভুল করব, বহু অপ্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করব এবং প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করতে ভুলে যাব। কিন্তু এ চিঠিগুলো তো ইতিহাসের পুঁথির জায়গা নেবে বলে লেখা নয়। এরা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে বহু কঠিন প্রাচীরমালা আর হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধান না থাকলে দুজনে বসে যে আলোচনা হত, তাই; অন্তত এদের সেইরকম বলে কল্পনা করেই আমি তৃপ্তিলাভ করি।

যেসব প্রসিদ্ধ লোকেদের কথায় ইতিহাসের পাতা পূর্ণ, তাঁদের কথা তোমার কাছে না লিখে আমি পারব না। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস বেশ উপভোগ্য, আর তাঁরা যে কালে বাস করতেন সেই কালকে বুঝতে তাঁরা বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু ইতিহাস তো কেবল বড়ো বড়ো লোক আর রাজামহারাজাদের কীর্তিকলাপ নয়। তাই যদি হত তবে ইতিহাস এতদিনে শেষ হয়ে যেত, কারণ, বিশ্বের নাটমঞ্চের উপর রাজারাজড়াদের ঘোরাফেরার পালা প্রায় থেমে গেছে। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের বড়ো তাঁদের প্রকাশ পেতে সিংহাসন বা রাজমুকুট অথবা মণিরত্ন লাগে না। রাজাদের রাজত্বটুকু বাদে আর কিছুই নেই, তাই ভিতরের নগ্নতাকে লুকিয়ে রাখতেই তাঁদের এত পোশাকপরিচ্ছদ লাগে, আর দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অধিকাংশই সেই বাইরের চাকচিক্যে ভুলে যায়। অথচ এঁরা—

> 'সামান্য রাজা ছাড়া আর কিছু নয় যে,
> কিরীট দেখেই তারে রাজকীয় কয় যে!'

প্রকৃত ইতিহাস কেবল এখান-সেখান থেকে গুটিকয় ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে আলোচনা করবে না; যারা জাতির সৃষ্টি করে, জীবনের অত্যাবশ্যক এবং বিলাসসম্ভার জোগাতে যাদের পরিশ্রম করতে

হয়, আর যারা শতসহস্রভাবে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেই জনগণের কথাই থাকবে তাতে। মানুষের এরকম ইতিহাস সত্যিই চমৎকার। মানুষ যুগে যুগে যে সংগ্রাম করে এসেছে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বিরুদ্ধে, বন এবং বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে, আর স্বার্থ নিয়ে স্বজাতীয় যারা তাকে জয় করতে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে, তারই কাহিনী এ, মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী। আর যেহেতু ঠান্ডা আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে হলে খাওয়া-পরা-থাকার জন্যে কতকগুলো জিনিষ অত্যাবশ্যক, তাই, যাদের এইসব সুবিধা আছে তারাই অন্যের উপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করে এসেছে। শাসকদের কর্তৃত্বের ক্ষমতা ছিল, কারণ জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিও তাদের ছিল। তাই তারা অন্যকে উপোস করিয়ে বশে আনবার শক্তিও অর্জন করেছিল। সেইজন্যেই আমরা বারংবার দেখেছি, কেমন করে বহুসংখ্যক জনতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে— এরা বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জন করে নিচ্ছে, আর তারা পরিশ্রম করেও জীবিকা অর্জন করতে পারছে না।

বর্বর আদিম মানুষ একলা শিকার করতে করতে ধীরে ধীরে এক সংসার গড়ে তোলে। আবার এইরকম বহু সংসার একত্র করে সৃষ্টি হয় গ্রামের, আর বিভিন্ন গ্রামের মজুর, বণিক আর কারিকরেরা মিলে দল বাঁধে। এমনি করে ধীরে ধীরে এক-একটি সমাজ গড়ে আর বেড়ে উঠেছে। সূত্রপাত এর একটি মানুষ, একটি বন্য জীবকে নিয়ে। তখন কোনোরকম সমাজ ছিল না। এর পরে এল সংসার, তার পরে পল্লী, আর কয়েকটি পল্লী নিয়ে একটি গ্রাম। কিন্তু কেন এই সমাজ গড়ে উঠল? জীবনসংগ্রামই তার মূল, কারণ আত্মরক্ষার সময় একলা যুদ্ধ করার চেয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চালানোই অধিকতর কার্যকরী। তা ছাড়া অন্যান্য কাজেও সহযোগিতার দাম ছিল। একত্র কাজ করে তারা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি খাদ্য এবং জীবনের অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ জোগাড় করতে পারত। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে বন্য বর্বর শিকারী থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা সমাজ, একটা দলবদ্ধ জীবন। সম্ভবত বিরামহীন-জীবনসংগ্রাম-জাত এই দল থেকেই আবার উদ্ভূত হয়েছিল বৃহত্তর সমাজ। সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে অবিরত দুঃখবিপদের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, এই বৃদ্ধি ঘুরেফিরে এসেছে। কিন্তু মনে কোরো না যে, এই বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর প্রচুর অগ্রগতি হয়েছে বা তখনকার চেয়ে এখনকার পৃথিবী আরও আনন্দপূর্ণ। হয়তো আগের চেয়ে কিছু ভালো হয়েছে, কিন্তু তাই বলে সর্বাঙ্গ-সুন্দর এটা মোটেই হয় নি, চতুর্দিকে রয়েছে প্রভূত দুঃখকষ্ট।

এই অর্থনৈতিক সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন জটিলতর হয়ে ওঠে। ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ে। দানের পরিবর্তে আরম্ভ হয় বিনিময়, আর অর্থ এসে এই বিনিময়ের জগতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে যায়। বাণিজ্যের অগ্রগতির পক্ষে এটা অত্যন্ত সুবিধাজনক, কারণ সোনারুপোর মুদ্রা আসাতে বিনিময়ের পথ সরল হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে মুদ্রাও সব সময়ে ব্যবহৃত হয় না, তার নিদর্শনেই কাজ চলে যায়। একটুকরো কাগজই হয়ে ওঠে যথেষ্ট। এইভাবে সৃষ্টি হয় 'ব্যাঙ্ক-নোট' আর 'চেক'-এর। এর মানে হচ্ছে, ধারে ব্যবসা চালানো। এই ধারের সুবিধা হল, এটা বাণিজ্যের উন্নতির সহায়। তুমি তো জানো, 'চেক' আর 'ব্যাঙ্ক-নোট' আজকাল বহুল পরিমাণে চলে, নির্বোধ না হলে কেউ থলিথলি সোনারুপো সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না।

আমরা দেখছি, অস্পষ্ট অতীতের থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস, মানুষ কৃষিজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে উৎপাদন করছে ক্রমে ক্রমে, বিভিন্ন ব্যবসায়ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জন করছে, পরস্পরের সঙ্গে দ্রব্যবিনিময় চলছে, আর এইভাবে বিকাশলাভ করছে বাণিজ্য। যানবাহনের ক্রমিক উন্নতিও আমরা দেখছি, বিশেষ করে গত এক শতাব্দী ধরে, বাষ্পযানের অভ্যুদয়ের পর থেকে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের ধনবলও বর্ধিত হচ্ছে, তার ফলে কেউ কেউ পাচ্ছে আরও বিশ্রাম। অতএব যাকে সভ্যতা বলা হয় তারই হচ্ছে বিকাশ।

এইসব ঘটছে, আর মানুষ গর্ব করছে প্রাগ্রসর আলোকপ্রাপ্ত নবযুগের এবং নবীন সভ্যতার, শিক্ষার এবং বিজ্ঞানের বিস্ময়ের। কিন্তু তবুও গরিবেরা গরিব দুঃখীই থাকছে, বিশাল জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করেই মরছে ও লক্ষ লক্ষ মানুষ মারছে, আর আমাদের দেশের মতো

বিপুল সব দেশ রয়েছে বিদেশীর শাসননিপীড়িত হয়ে। নিজের সংসারের মধ্যেও যদি স্বাধীন হয়ে না থাকতে পারি তবে কী লাভ সেই সভ্যতায়? তবে কিনা, আমরা এখন কিছু-একটা করব বলে দৃঢ় সংকল্প করেছি।

কী সৌভাগ্য আমাদের যে, আমরা জন্মেছি এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে, যখন আমাদের প্রত্যেকে এই দুঃসাহসিক ব্রতে যোগ দিয়ে কেবল ভারতবর্ষ নয়, পরিবর্তনশীল সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পাবার ক্ষমতা রাখে। মহাভাগ্যবতী তুমি! বিপুল বিদ্রোহ যখন রুশদেশে নবযুগ নিয়ে এল, সেই বছরের সেই মাসে তোমার জন্ম। আর স্বদেশের এক মহাবিপ্লবেরও সাক্ষী তুমি, হয়তো একদিন এরই নাটমঞ্চে করবে অভিনয়। জগৎ জুড়ে দেখা দিয়েছে পরিবর্তন। সুদূর প্রাচ্যে চীনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে জাপান। এদিকে পশ্চিমে, বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে, পুরোনো নিয়ম শিথিল হয়ে এসেছে, ভেঙে পড়বে বলে ভয়! দেশে দেশে আলোচনা চলছে নিরস্ত্রীকরণের, এদিকে প্রত্যেকের দিকে সতর্কদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সশস্ত্র হয়ে রয়েছে। জগৎ জুড়ে এতকাল পুঁজিবাদীদের যে প্রাধান্য চলছিল তার দিন শেষ হয়ে আসছে। আর যাবেই যখন, তখন যেদিন সে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে বহু পাপ, বহু আবর্জনা।

২৩

পরিপ্রেক্ষা

২৯শে মার্চ, ১৯৩২

অনন্ত যুগের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রাপথের কোন্ জায়গায় এসে পৌঁচেছি আমরা? আগেই তো প্রাচীন মিশর, ভারত, চীন ও নোশসের বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। দেখেছি, যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল পিরামিডের, মিশরের সেই পুরাতন ও অপূর্ব সভ্যতা কী করে ধীরে ধীরে হৃতবল হয়ে ক্রমে এক নিরাকার অপচ্ছায়ায় পরিণত হয়ে গেল, প্রকৃত প্রাণের স্পন্দন রইল না তাতে, রইল কেবল কাঠামোটা আর কতকগুলো স্মৃতিচিহ্ন। গ্রীস দেশের মধ্যাঞ্চল থেকে প্রতিবেশী-জাত এসে কী করে নোশসকে ধ্বংস করে ফেলেছিল তাও দেখেছি। সদ্যারব্ধ ভারত ও চীনের অস্পষ্ট সুদূর প্রতিচ্ছবিও দেখেছি, উপকরণের অভাবে জানতে পারি নি বিশেষ কিছুই, তবুও উপলব্ধি করেছি সেকালের মহান্ সভ্যতাকে, আর বিস্মিত হয়েছি বহুসহস্র বছর আগেও সভ্যতার ক্ষেত্রে এই দেশদুটি কীভাবে সংযুক্ত ছিল, তাই দেখে। মেসোপটেমিয়াতেও স্বল্পকালের জন্যে কী করে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, তার পরে সকল সাম্রাজ্য যে পথে গেছে সেই পথেই চলে যাচ্ছে, তারই আভাস পেয়েছি।

খৃষ্টের পাঁচ-শো ছ-শো বছর আগে বড়ো বড়ো মনীষী যাঁরা বিভিন্ন দেশে জন্মেছিলেন, তাঁদের কথাও কিছু কিছু বলেছি— বলেছি ভারতের বুদ্ধ আর মহাবীর, চীনের লাওৎসে আর কনফুসিয়স, পারশ্যের জরথুস্ত্র আর গ্রীসের পাইথাগোরাসের কথা। বুদ্ধ পুরোহিতদের এবং ভারতের প্রাচীন বৈদিক ধর্মের তৎকালীন রূপকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, কুসংস্কার ও পূজা-অর্চনাই জনগণের মন ভোলাচ্ছে এবং তাদের প্রতারিত করছে। জাতিবিভাগ ছিল তাঁর অপ্রিয় এবং তিনি সাম্যের প্রচার করে গিয়েছিলেন।

তার পরে আমরা ফিরে চলেছিলাম পশ্চিমে, এশিয়া ও ইউরোপ মিলেছে যেখানে, চলেছিলাম পারশ্য-গ্রীসের অদৃষ্টলেখার অনুসরণ করে— কী করে পারশ্যে গড়ে উঠল এক বিরাট সাম্রাজ্য আর 'রাজার রাজা' দারিয়ুস তাকে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করলেন; কী করে এই সাম্রাজ্যটি ছোট্ট গ্রীসকে চেয়েছিল গ্রাস করতে, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখেছিল যে, এই ক্ষুদ্র দেশটিও উল্টে যুদ্ধ করতে এবং নিজেরটা ধরে রাখতে পারে। তার পরে চলেছিলাম গ্রীক

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিস্ময়কর সূত্র ধরে, একদল মনীষী যেখানে জন্মেছিলেন এবং সৃষ্টি করেছিলেন অতি উঁচুদরের সাহিত্য ও শিল্পকলা।

গ্রীসের স্বর্ণযুগ স্থায়ী হল না। মাসিডনের আলেকজাণ্ডার তাঁর দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রীসের যশগৌরব বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীসের উন্নত সভ্যতা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে লাগল। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পারশিক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ভারতের সীমান্তও অতিক্রম করেছিলেন। তিনি রণকুশল সেনাপতি ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐতিহ্য তাঁর নামের চারদিকে উপাখ্যানের মালা গেঁথে তুলে তাঁকে এমন একটা খ্যাতি দান করেছে যা তাঁর যথার্থ প্রাপ্য নয়। কেবল পাঠানুরাগীরাই কিছু জানে, সক্রেটিস বা প্লেটো বা ফিডিয়াস কিংবা সফোক্লিস অথবা গ্রীসের অন্যান্য মনীষীদের কথা, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের নাম কে না শুনেছে?

আলেকজাণ্ডারের কীর্তি সে তুলনায় কম। পারশিক সাম্রাজ্য তখন প্রাচীন, অবলম্বনহীন—আর টিঁকবে বলে আশাও ছিল না। আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ-আক্রমণ সামান্য দস্যুবৃত্তি মাত্র, তার মূল্যও সামান্যই। আরও কিছুকাল বাঁচলে হয়তো আলেকজাণ্ডার সত্যিকারের কিছু-একটা করে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর সাম্রাজ্য শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তবু সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তাঁর নাম এখনও লুপ্ত হয় নি।

আলেকজাণ্ডারের আগমনের একটা বড়ো ফল হল, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক নূতন যোগসূত্র-স্থাপন। বহুসংখ্যক গ্রীক প্রাচ্যদেশে এসে পুরোনো নগরগুলিতে অথবা নব-প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশে বাস স্থাপন করলেন। আলেকজাণ্ডারের আগেও পূর্ব-পশ্চিমে সংযোগ ছিল এবং বাণিজ্য চলত। কিন্তু তাঁর পরে সেটা বহুলপরিমাণে বেড়ে গেল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের আর-একটা অনুমিত ফল সত্য হলে গ্রীকদের পক্ষে তা হয়েছিল অত্যন্ত অশুভ। বলা হয়েছে যে, মেসোপটেমিয়ার জলাভূমি থেকে গ্রীক-সমতলে তাঁর সৈন্যেরা ম্যালেরিয়াবাহী মশা নিয়ে গিয়েছিল, আর এইভাবে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে গ্রীকদের করে তুলেছিল দুর্বল। গ্রীকদের অবনতির যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এটি তার অন্যতম। কিন্তু এ কেবল অনুমানমাত্র, এতে কতখানি সত্য নিহিত আছে কেউ তা জানে না।

আলেকজাণ্ডারের স্বল্পায়ু সাম্রাজ্যের অবসান হল, সে জায়গায় গড়ে উঠল কয়েকটি ছোটো রাজ্য। তার মধ্যে ছিল টলেমির শাসনাধীন মিশর আর সেলিউকস-অধিকৃত পশ্চিম-এশিয়া। টলেমি ও সেলিউকস উভয়েই ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সেনাধ্যক্ষ। সেলিউকস ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হয়ে দেখলেন যে, ভারতও সজোরে আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ভারতের পূর্ব ও মধ্যাঞ্চল জুড়ে এক শক্তিমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আগের একটা চিঠিতে তোমাকে চন্দ্রগুপ্ত, তাঁর সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য আর তাঁর লেখা অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে বলেছি। সৌভাগ্যবশত ২২০০ বছর পূর্বের ভারতবর্ষের চমৎকার ছবি এ বইখানিতে পাওয়া যায়।

পিছন ফিরে দেখা আমাদের শেষ হল। পরের চিঠিতে আবার মৌর্যসাম্রাজ্য আর অশোকের কাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাব। আসলে এ কাজটা আমি চোদ্দ মাস আগে, ১৯৩১-এর ২৫শে জানুয়ারি, নাইনি জেলে থাকতে করব বলেছিলাম। এখনও সে কথা রাখা হয় নি।

২৪

দেবপ্রিয় অশোক

৩০শে মার্চ, ১৯৩২

বোধহয় রাজামহারাজাদের খাটো করে দেওয়াটা আমার একটু বেশিরকম ভালো লাগে। তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা বা তারিফ করার যোগ্য গুণ আমি খুব কমই দেখি। কিন্তু এবার আমি যাঁর কথা বলছি তিনি রাজা বা সম্রাট হয়েও ছিলেন মহৎ ও শ্রদ্ধার্হ। তিনি অশোক, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ (যাঁর রোমাঞ্চকর বইগুলির কিছু কিছু তুমি হয়তো পড়েছ) তাঁর 'ইতিহাসের কাঠামো' বইয়ে অশোক সম্বন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভিড় করে রয়েছে যেসব রাজারাজড়াদের নাম, শ্রীমন্মহারাজ, শ্রীল শ্রীশ্রীমহাধিপ ইত্যাদি, তাদের মধ্যে অশোকের নামও দীপ্তিমান এবং বলতে গেলে একমাত্র অশোকের নামেরই রয়েছে দীপ্তি, যেন একটি নক্ষত্র। ভল্‌গা থেকে জাপান পর্যন্ত আজও তাঁর নাম সম্মানিত হয়। চীন, তিব্বত, এবং তাঁর ধর্মত্যাগ করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ, তাঁর মহিমার ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রেখেছে। কন্‌স্টান্‌টাইন বা শার্লামেনের নাম যারা শুনেছে তাদের চেয়ে ঢের বেশি লোকের স্মৃতিপটে অশোক অবিস্মরণীয়।'

এটা সত্যই খুব বড়ো সম্মান, কিন্তু এ তাঁর প্রাপ্য; এবং ভারতবাসীর পক্ষে ভারতের ইতিহাসের এই যুগটি কল্পনা করা বিশেষ সুখদায়ক।

খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার প্রায় তিন শো বছর আগে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পরে তাঁর ছেলে বিন্দুসার পঁচিশ বছর শান্তভাবে রাজত্ব করে গেছেন বলেই মনে হয়। গ্রীক জগতের সংগে তিনি সম্বন্ধ রক্ষা করেছিলেন, মিশরে টলেমির এবং পশ্চিম-এশিয়াতে সেলিউকসের ছেলে অ্যান্টিওকাসের সভা থেকে তাঁর কাছে দূত আসত। বহির্জগতের সংগে বাণিজ্যও চলত। শোনা যায় মিশরীয়রা নাকি ভারতবর্ষ থেকে নীল আমদানি করে তাই দিয়ে তাদের কাপড় রঙাত। আরও শোনা যায়, ভারতের মস্‌লিন হত তাদের 'মমি'দের আবরণ। বিহারে কতকগুলি পুরোনো ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করে দেখা গেছে যে, মৌর্যযুগের পূর্বেও ভারতে একরকম কাঁচ তৈরি হত।

জেনে খুশি হবে যে, চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের শিল্প ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে গেছেন এবং বিশেষভাবে বলেছেন সেকালে পাদুকার ব্যবহারের কথা। কাজেই 'হাই হীল' জুতো পুরোপুরি নূতন উদ্ভাবন নয়!

২৬৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের পরে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেন অশোক। সে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সম্পূর্ণ উত্তর ও মধ্য ভারত, এমনকি মধ্য-এশিয়ার খানিক অংশ। রাজত্বের নবম বর্ষে বোধহয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব-ভারতের অন্যান্য অংশগুলিকে রাজ্যের মধ্যে আনবার সংকল্প নিয়ে তিনি কলিঙ্গবিজয় আরম্ভ করেন। ভারতের পূর্ব-উপকূলে কলিঙ্গ— মহানদী গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মাঝখানে। কলিঙ্গবাসীরা যুদ্ধ করল বীরের মতো, কিন্তু অবশেষে ভীষণ ধ্বংসলীলার পরে বিজিত হল। এই সংগ্রাম ও বীভৎস অত্যাচার এত গভীরভাবে অশোককে আঘাত করল যে, যুদ্ধ ও সকল সামরিক কার্যকলাপের উপর তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। এর পর থেকে তাঁর আর যুদ্ধ করা হল না। দক্ষিণের এক ক্ষুদ্র খণ্ড বাদে সমগ্র ভারত ছিল তাঁর অধীন আর এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটিও তিনি অনায়াসেই জয় করতে পারতেন। এইচ, জি, ওয়েল্‌সের মতে, ইতিহাসে উল্লিখিত তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি বিজয়লাভ সত্ত্বেও যুদ্ধবৃত্তি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

আমাদের সৌভাগ্য, আমরা অশোকের কীর্তিকথা এবং চিন্তাধারা তাঁর নিজের ভাষাতেই পাই। পাথর অথবা ধাতুর উপর খোদিত অসংখ্য লিপিখণ্ডে আমরা তাঁর বাণী দেখতে পাই সমসাময়িক জনগণের ও ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্যে। জানো তো, এলাহাবাদ দুর্গে এইরকম একটি অশোকস্তম্ভ আছে। এরকম আরও বহু আছে আমাদের প্রদেশে।

এইসব লিপিতে অশোক আমাদের বলেছেন যুদ্ধ এবং দেশবিজয়ে তাঁর আতঙ্ক ও বিষাদের কথা। তিনি বলেছেন, ধর্মের সাহায্যে নিজেকে ও অন্যের হৃদয় জয় করাই প্রকৃত বিজয়লাভ। আমি এই বাণীগুলির কয়েকটি তোমার জন্যে উল্লেখ করব। সেগুলি পড়তে বেশ লাগে, তারা অশোককে তোমার কাছে স্পষ্ট করে তুলবে। একটি লিপিতে আছে :

> অষ্টবর্ষ রাজত্বের পর কলিঙ্গদেশ শ্রীমন্মহারাজকর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। তাহাতে দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী হইয়াছিল, এক লক্ষ নিহত হইয়াছিল ও তাহার বহুগুণ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছিল।
>
> কলিঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরেই মহারাজের ধর্মনীতিপ্রিয়তা বা তাহার সংরক্ষণ ও পালনে উৎসাহের সূচনা হয়। এইরূপে কলিঙ্গবিজয়ের পর মহারাজের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়, কারণ দেশবিজয়ের জন্য বহু বন্দীকরণ, অত্যাচার ও হত্যাসাধন আবশ্যক। ইহা সম্রাটের পক্ষে গভীর শোকসন্তাপের বিষয়।

লিপিতে আরও আছে যে অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধে নিহত বা বন্দীদের একশত বা এক-সহস্রভাগ লোকের হত্যা বা নিপীড়নও আর সহ্য করবেন না।

> উপরন্তু, কেহ যদি তাঁহার প্রতি অবিচার করে তাহাও সম্রাট যথাসম্ভব ধীরভাবে বহন করিবেন। রাজ্যের বন্যজাতিগুলির উপরও মহানুভব সম্রাট সদয়, তিনি তাহাদের চিন্তাশক্তিকে ঠিকপথে লইয়া যান, নতুবা তাঁহার মনে অনুতাপ জন্মিবে, কারণ সম্রাট মনে করেন, প্রত্যেক সজীব বস্তুরই নিরাপত্তা, আত্মসংযম, মনের শান্তি ও প্রফুল্লতা থাকা উচিত।

অশোক আরও বুঝিয়েছেন যে, কর্তব্য বা ধর্মপরায়ণতা দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করাই প্রকৃত জয়লাভ এবং তিনি কেবল স্বদেশে নয় বিদেশেও এরকম বিজয়গৌরব ইতিপূর্বেই অর্জন করেছেন।

এই লিপিগুলিতে যে ধর্মনীতির তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন তা বুদ্ধের ধর্মনীতি। অশোক স্বয়ং একনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে জোরের প্রশ্ন নেই। মানুষের হৃদয় জয় করে তাদের দীক্ষিত করতেন তিনি। ধর্ম-প্রচারকেরা কদাচিৎ অশোকের মতো অন্যধর্মসহিষ্ণু হন। স্বীয় ধর্মে জনগণকে দীক্ষিত করতে তাঁরা প্রায়ই অবৈধভাবে শক্তিপ্রয়োগ, বঞ্চনা এবং ভীতিপ্রদর্শন করেন। সমগ্র ইতিহাস ধর্মের নামে অত্যাচার ও যুদ্ধবিরোধে পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বরের নামে যত রক্তপাত সাধিত হয়েছে আর কোনো কারণেই বোধহয় তা হয় নি। অতএব ভারতের এক মহৎ ধর্মপ্রাণ সন্তান, এক সাম্রাজ্যনায়ক তাঁর নিজের চিন্তাধারার আলোয় অন্যদের আনতে কীরকম আচরণ করেছিলেন তা স্মরণ রাখা ভালো। ধর্ম আর বিশ্বাস যে তলোয়ার বা সঙিনের ফলা দিয়ে মানুষের অন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এ ভাবার মতো মূঢ়তা সত্যিই অদ্ভুত!

অশোক-লিপিতে 'দেবানাম্ প্রিয়' অর্থাৎ 'দেবতাদের প্রিয়' বলে অশোকের উল্লেখ আছে—এই দেবপ্রিয় অশোক পশ্চিমে এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকাতে তাঁর দূত ও চর পাঠালেন। তোমার স্মরণ আছে, সিংহলে তিনি তাঁর নিজের ভাই মহেন্দ্র ও বোন সংঘমিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন এবং শোনা যায় তাঁরা গয়া থেকে পুণ্য বোধিদ্রুমের একটি শাখা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুরাধাপুরের মন্দিরে একটি বটগাছ দেখেছিলাম, মনে পড়ে? এ নাকি সেই প্রাচীনশাখাসম্ভূত।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত প্রসারিত হল। আর যেহেতু অশোকের ধর্ম অসার মন্ত্র-উচ্চারণ ও পূজা-অর্চনার অভিনয় নয়, মহৎ কার্য ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাই তার লক্ষ্য, তাই দেশ জুড়ে নির্মিত হল বাগান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কুয়ো প্রভৃতি। নারীশিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। চারটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্র—পেশোয়ারের কাছে সুদূর উত্তরে তক্ষশীলা, মথুরা (বর্তমানে ইংরেজদের দ্বারা বিশ্রীভাবে উচ্চারিত 'মুট্রা'), মধ্য-ভারতে উজ্জয়িনী ও বিহারে পাটনার কাছে নালন্দা— কেবল ভারতের নয়, চীন থেকে পশ্চিম-এশিয়া অবধি বহুদূরের ছাত্রদেরও আকর্ষণ করত, আর এই ছাত্রেরা বুদ্ধের অমৃতবাণী তাঁদের সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যেতেন। দেশময় গড়ে উঠল বিরাট সব মঠ—তাদের বলা হত বিহার। পাটলিপুত্র বা পাটনার চারদিকে এইগুলি এত

প্রচুর পরিমাণে গড়ে উঠল যে, সারা প্রদেশটারই নাম হয়ে গেল বিহার—সেই নামেই আজও একে ডাকা হয়। কিন্তু প্রায়ই যেমন ঘটে, এই মঠগুলি থেকে অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষাদানের উৎসাহ, চিন্তাশক্তির প্রেরণা চলে গেল, সেগুলি হয়ে দাঁড়াল লোকের দৈনিক কর্মসূচী অনুসরণ করে পূজা করার স্থান।

জীবরক্ষার জন্যে অশোকের অনুরাগ পশু পাখি পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল। তাদের জন্যে বিশেষ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল, পশুবলি হয়েছিল নিষিদ্ধ। এই দুটি ব্যাপারে তিনি আমাদের কালকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পশুবলি আজও কিছু কিছু আছে, ধর্মের একটা অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক বলেই তাকে ধরা হয়; অথচ একে ঠিকভাবে পালন করার বন্দোবস্ত খুব কমই আছে।

অশোকের আদর্শ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে ভারতে নিরামিষ-ভোজন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তখন পর্যন্ত ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা সাধারণত মাংস আহার ও মদ্য পান করতেন। এইবার মাংস ও মদ্য উভয়ের প্রচলনই বহুলপরিমাণে কমে এল।

এইভাবে ৩৮ বছর অশোক রাজত্ব করলেন শান্তির সঙ্গে, জনহিতের জন্যেই ছিল তাঁর সর্বথা প্রয়াস। রাজকার্যের জন্যে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন : "সর্বস্থানে, সর্বকালে, আমার আহারকালে বা পুরাঙ্গনাগণের কক্ষে, আমার শয়নগৃহে, অথবা আমার পরামর্শ-শালায়, আমার রথের মধ্যে কিংবা আমার প্রাসাদকাননাভ্যন্তরে, রাজ্যের সংবাদদাতারা প্রজাবর্গের সংবাদ সম্বন্ধে আমাকে সর্বদা অবহিত রাখিবে। যদি কোনো বিপত্তি ঘটে, তৎক্ষণাৎ আমার সমীপে সংবাদ প্রেরিত হইবে, সে যে কালেই হউক এবং তখন আমি যে-কোনো স্থানেই থাকি না কেন; কারণ জনহিতই আমার কর্তব্য।"

২২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

মৌর্যযুগের ভগ্নাবশেষ আমরা সামান্যই পেয়েছি। কিন্তু যা পেয়েছি তা, আর্যসভ্যতার যত অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, বলতে গেলে তার মধ্যে প্রাচীনতম; কারণ মোহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। বারাণসীর নিকটে সারনাথে সিংহচূড়াশোভিত সুন্দর অশোকস্তম্ভ দেখতে পাবে।

অশোকের রাজধানী মহানগরী পাটলিপুত্রের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ১৫০০ বছর আগে, অশোকের ৬০০ বছর পরে, ফা-হিয়েন নামে এক চীনা পরিব্রাজক জায়গাটা দেখতে এসেছিলেন। নগরটি তখন ধনে জনে পূর্ণ, কিন্তু তবুও অশোকের পাষাণপ্রাসাদ ছিল চূর্ণ অবস্থায়। ফা-হিয়েন এই অবস্থায় তাকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণলিপিতে আছে, এ প্রাসাদ মানুষের দ্বারা তৈরি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন নি।

পাষাণে-গাঁথা বিরাট প্রাসাদ আজ তিরোহিত, কোনো চিহ্ন সে পিছনে ফেলে যায় নি। কিন্তু অশোকের স্মৃতি আজও সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জুড়ে বেঁচে আছে, শিলালিপিতে খোদিত তাঁর বাণী আমাদের কাছে বোধ্য ও উপভোগ্য। এখনও সেগুলি থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় বহু আছে। এ চিঠিটা খুব বড়ো হয়ে গেল, তোমার কাছে ক্লান্তিদায়ক হতে পারে। একটি লিপি থেকে অশোকের বাণী উদ্ধৃত করে দিয়ে শেষ করব :

> কোনো-না-কোনো কারণে সকল সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের শ্রদ্ধা করলে মানুষ তার স্ব-সম্প্রদায়কে তো উন্নত করেই, তাছাড়া অন্যজাতিগুলির প্রতিও নিজের কর্তব্যপালন করে।

অশোকের সময়ের পৃথিবী

৩১শে মার্চ, ১৯৩২

আমরা দেখেছি, অশোক দূরদেশে ধর্মযাজক ও দূত পাঠাতেন এবং ভারতের সঙ্গে এসব দেশের অবাধ সহযোগিতা ছিল। অবশ্য তোমার মনে রাখতে হবে যে, তখনকার যোগাযোগ এবং বাণিজ্য এখনকার মতো ছিল না। এখন ট্রেনে, স্টীমারে, উড়োজাহাজে মালপত্র পাঠানো খুবই সহজ। কিন্তু সেই অতীতকালে প্রত্যেকটি যাত্রাই ছিল সুদীর্ঘ সংকটময় এবং দুঃসাহসী, কষ্টসহিষ্ণু মানুষ ছাড়া কেউ সে যাত্রার ভার নিত না। কাজেই তখনকার ও এখনকার বাণিজ্যে তুলনাই হতে পারে না।

অশোক কোন্ 'সুদূর দেশের' নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁর সময়ে পৃথিবীর আকৃতি ছিল কীরকম? মিশর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল ব্যতীত আফ্রিকার কিছুই জানি না। ইউরোপের উত্তর, মধ্য ও পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধেও আমরা অল্পই জানি। আমেরিকার সম্বন্ধেও সবই অজ্ঞাত আমাদের কাছে। কিন্তু বহু লোক আছেন যাঁরা মনে করেন বহু পূর্ব থেকেই আমেরিকায় উন্নত সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। বহুযুগ পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বস আমেরিকা 'আবিষ্কার' করেছেন বলে জানা যায়। আমরা জানি, দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুতে ও চতুষ্পার্শ্বের অন্যান্য দেশে উন্নত সভ্যতা তখন বর্তমান ছিল। কাজেই খৃষ্টের জন্মের পূর্বের তৃতীয় শতকে, যখন ভারতে ছিলেন অশোক, তখন আমেরিকায় সভ্য জনগণ বসবাস করত ও তারা সুসমঞ্জস সমাজের সৃষ্টি করেছিল, এ খুবই সম্ভব। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই এবং অনুমান করে বিশেষ ফল হবে না। আমি এগুলির উল্লেখ করছি, কারণ আমরা এইরকমই ভাবতে অভ্যস্ত যে, যেসব দেশের কথা আমরা শুনেছি ও পড়েছি, সভ্য লোক বুঝি কেবল পৃথিবীর সেইসব জায়গাতেই বাস করত। বহুদিন ধরে ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল যে, প্রাচীন ইতিহাস বলতে কেবল গ্রীস, রোম আর ইহুদিদের ইতিহাসকেই বোঝায়। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ তাদের মতে তখন ছিল জনমানবশূন্য। পরে তারা বুঝেছিল, কত সীমাবদ্ধ তাদের জ্ঞান, যখন তাদেরই পণ্ডিতবর্গ ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাদের শোনালেন চীন ভারত ও অন্য দেশের কাহিনী। কাজেই আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন; মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটেছে বা ঘটছে সবই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বর্তমানে আমরা বলতে পারি যে, অশোকের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, প্রাচীন সভ্য পৃথিবী প্রধানত ছিল ইউরোপের ও আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরোপকূলের দেশগুলি, পশ্চিম-এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ নিয়ে। চীন তখন পশ্চিমের দেশগুলি, এমনকি, পশ্চিম-এশিয়া থেকেও প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল এবং তখন চীন বা ক্যাথে সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে বহু অদ্ভুত ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। পশ্চিমের সঙ্গে চীনের যোগসূত্র ছিল বোধহয় ভারতবর্ষ।

আগেই দেখেছি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাধ্যক্ষরা তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনটি প্রধান বিভাগ ছিল তার: (১) সেলিউকস-কবলিত পশ্চিম-এশিয়া, পারশ্য ও মেসোপটেমিয়া; (২) টলেমির অধীন মিশর; (৩) অ্যান্টিগোনাস-অধিকৃত ম্যাসিডোনিয়া। প্রথম দুটি বহুদিন টিঁকে ছিল। তোমার মনে আছে, সেলিউকস ছিলেন ভারতের লোভী প্রতিবেশী, তিনি চেয়েছিলেন ভারতের একটি খণ্ড নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নিতে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁর অজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি সেলিউকসকে হটিয়ে দিলেন, আফগানিস্থানের একাংশ কেড়েও নিলেন তাঁর কাছ থেকে।

ম্যাসিডোনিয়ার ভাগ্য আরও খারাপ। উত্তরদিক থেকে গল্ ও অন্যান্য জাতিরা এসে তাকে কেড়ে নিল, একটি ক্ষুদ্র অংশ কেবল গল্‌দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে

অশোকের সাম্রাজ্য
২৬৮—২২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ
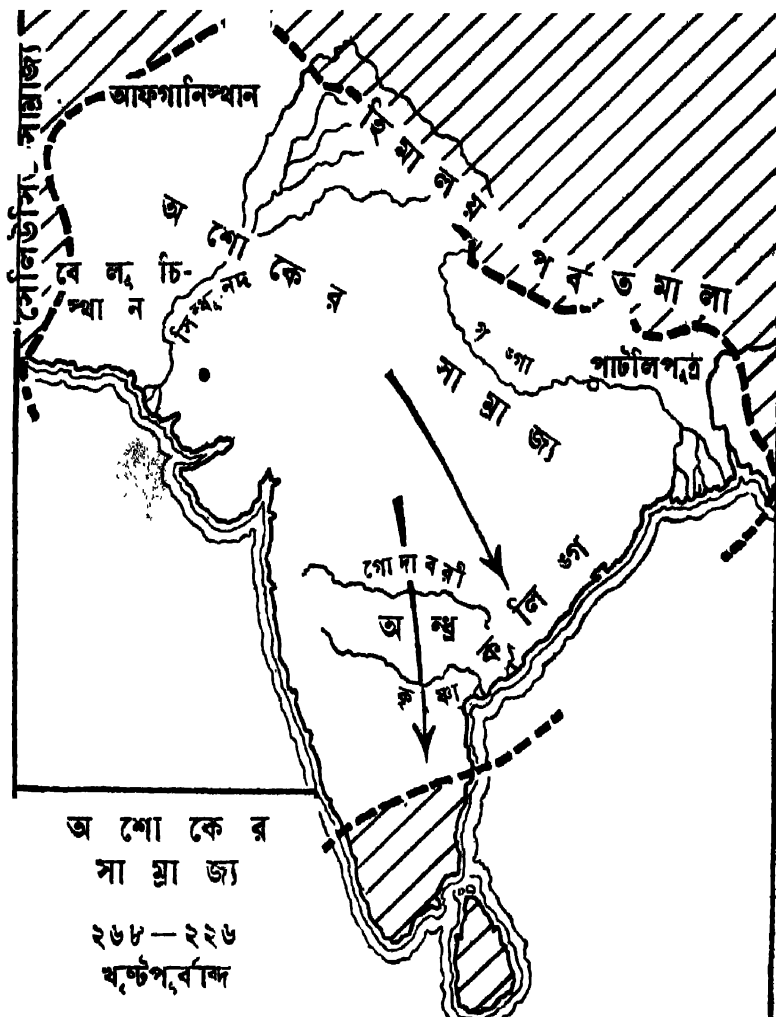
পারল। সেটি হচ্ছে এশিয়া-মাইনরে পার্গামম, আজ যেখানে তুরস্কের অবস্থান। সে একটি ছোট্ট গ্রীক রাজ্য, কিন্তু এক শো বছর ধরে গ্রীক শিল্পসভ্যতার নিবাস সেখানেই ছিল, সেখানেই গড়ে উঠেছিল বিরাট প্রাসাদ, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর। একদিক দিয়ে সে ছিল সাগরপারের আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী।

মিশরে টলেমিদের রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। প্রাচীন পৃথিবীর খুব প্রসিদ্ধ নগর হয়ে উঠেছিল সেটি। এথেন্সের মহিমা বহুলপরিমাণে তখন খর্ব হয়েছে, তখন আলেকজান্দ্রিয়াই হল গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র। প্রাচীন পৃথিবীর পণ্ডিতদের মন তখন দর্শন, গণিত, ধর্ম ও অন্যান্য শাস্ত্রে পূর্ণ ছিল। যেসব ছাত্রেরা এই নিয়ে আলোচনা করত, আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রন্থভবন ও যাদুঘর ছিল তাঁদের লোভনীয়। ইউক্লিড, যাঁর কথা সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে শুনেছে, তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ও অশোকের সমসাময়িক।

তুমি জানো, টলেমিরা ছিল গ্রীক; কিন্তু বহু মিশরীয় আচারব্যবহার তাদের মধ্যে এসে গিয়েছিল। মিশরের প্রাচীন দেবদেবীদেরও কেউ কেউ তাদের পূজা পেতেন। প্রাচীন গ্রীসের জুপিটার, অ্যাপোলো প্রভৃতি দেবতারা, যাঁদের কথা হোমর তাঁর মহাকাব্যে বহুবার বর্ণনা করেছেন— মহাভারতের বৈদিক দেবদেবীদের মতো, তাঁরা নূতন বেশে, নূতন নামে আবির্ভূত হলেন। প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন মিশরের আইসিস, ওসাইরিস, হোরাস প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে এক মিশ্রণ ঘটল, আর এই মিশ্রিত দেবতাদের খাড়া করা হল জনগণের সামনে পূজা করার জন্যে। যাকেই পূজা করা হোক-না, যে নামেই ডাকা হোক-না, যতক্ষণ পূজা করার মতো কিছু আছে ততক্ষণ আর ভাবনা কী? এই নবনির্জরদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি 'সেরাপিস'দেবের।

আলেকজান্দ্রিয়া বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল এবং সভ্য পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে বণিকেরা সেখানে আসত। আমরা শুনেছি, আলেকজান্দ্রিয়ায় একদল ভারতীয় বণিক থাকত এবং দক্ষিণ-ভারতে মালাবার উপকূলে একদল আলেকজান্দ্রিয়ানিবাসী বণিকের বসত ছিল।

ভূমধ্যসাগরের পারে আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে রোম তখন বড়ো হয়ে উঠেছে, আরও বড়ো ও শক্তিশালী হবার চেষ্টায় আছে। আফ্রিকার কূলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কার্থেজ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু। প্রাচীন পৃথিবীর সম্বন্ধে ধারণা জন্মাতে হলে তাদের কাহিনীও কিছুটা আলোচনা করতে হবে।

প্রাচ্যে তখন চীন হয়ে উঠছিল রোমের সমান; অশোকের সময়কার পৃথিবীর ছবি আঁকবার জন্যে তারও আলোচনা আমাদের করতে হবে।

২৬

চীন এবং হান-বংশ

৩রা এপ্রিল, ১৯৩২

নাইনি জেল থেকে গত বছর তোমাকে যেসব চিঠি লিখেছি তাতে চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা কিছু কিছু বলেছি। হোয়াং-হো নদীর তীরে তাদের বসবাসের শুরু থেকে তাদের প্রাচীন রাজবংশগুলির কথা— সিয়া-বংশ, সাঙ বা ঈন্ এবং চাউ -বংশের কথা বলেছি। কেমন করে ক্রমে ক্রমে চীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল এবং বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র গড়ে উঠল, সেসব কথার আলোচনা করেছি। এর পরে আবার দেখা দিল বিশৃঙ্খলা, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ভেঙে পড়ল। তখনও চাউ-বংশের রাজত্ব চলছে, কিন্তু সেটা নামে মাত্র। এখানে-সেখানে ছোটো ছোটো রাজারা স্বাধীন হয়ে বসেছে, আর নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি চলছে। দেশের এই দুরবস্থা চলল কয়েক শো বছর ধরে— চীন দেশে কিছু-একটা ঘটলেই সেটার জের

চলতে থাকে হয় কয়েক শো নয় তো একেবারে কয়েক হাজার বছর ধরে। শেষটায় ডিউক অব্ চীন বলে স্থানীয় এক রাজা প্রাচীন চাউ-বংশের দুর্বল রাজাকে দিল তাড়িয়ে। এঁর বংশধরেরা চীন-বংশ বলে খ্যাতিলাভ করেছিল। এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই চীন-বংশ থেকেই চীন দেশের নামকরণ হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ২৫৫ অব্দে চীন দেশে এই চীন-বংশের রাজত্ব শুরু হল। এর ঠিক তেরো বছর পূর্বে ভারতবর্ষে অশোক তাঁর রাজত্ব শুরু করেছেন। কাজেই এখন চীন দেশে যাঁদের কথা বলছি তাঁরা অশোকের সমসাময়িক। প্রথম তিনজন চীন-সম্রাট খুব অল্পকাল রাজত্ব করেছিলেন। তার পরে খৃষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে এই বংশের চতুর্থ রাজা সিংহাসনে বসেন; কোনো কোনো দিক থেকে এঁকে রীতিমতো স্বনামধন্য বলা যেতে পারে। এঁর নাম ছিল ওয়াঙ চেঙ, কিন্তু পরে তিনি অন্য নাম গ্রহণ করেন—শি হুয়াঙ টি। এই দ্বিতীয় নামেই তিনি সাধারণত পরিচিত। কথাটার মানে হল—প্রথম সম্রাট। বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, তাঁর নিজের এবং নিজের কাল সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু অতীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। বস্তুত তিনি চেয়েছিলেন, লোকেরা অতীতের কথা ভুলে যায় এবং তাঁকে নিয়েই ইতিহাসের শুরু হয়েছে এরকম ভাবতে শেখে। এইজন্যেই তাঁর নাম হল, সর্বপ্রথম সম্রাট। তাঁর আগেও যে দু হাজার বছর ধরে কত কত সম্রাট চীন দেশে রাজত্ব করে গেছেন, সেসব তিনি উড়িয়েই দিলেন। এমনকি, তিনি দেশ থেকে তাঁদের নাম, স্মৃতি পর্যন্ত লোপ করে দেবার চেষ্টা করলেন। আর কেবল প্রাচীন সম্রাটই নয়, অতীতে দেশে যতসব প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল তাঁদের কথাও ভুলতে হবে। কাজেই তিনি হুকুম জারি করলেন যে, অতীতের সব গ্রন্থ, বিশেষ করে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় এবং কন্‌ফুসিয়সের ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সব পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে হবে। কেবলমাত্র চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বই ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাঁর হুকুমনামায় তিনি বলেছিলেন, 'যারা বর্তমানকে ছোটো করবার জন্য অতীতকে বড়ো করে দেখবে তাদের সপরিবারে হত্যা করা হবে।'

তাঁর যে কথা সেই কাজ। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁদের প্রিয় গ্রন্থগুলিকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁদের জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলেন। তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, আমাদের এই প্রথম-সম্রাটটি কীরকম কোমলচিত্ত এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন! ভারতবর্ষে যখন লোকের মুখে অতীতের অতিরিক্ত স্তুতি শুনতে পাই, তখন এঁর কথা আমার মনে পড়ে এবং খানিকটা সহানুভূতিও হয়। আমাদের দেশে বহু লোক কেবলই অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, অতীতের স্তুতিগান করে এবং অতীতের দিকেই সব-কিছুর অনুপ্রেরণার জন্য চেয়ে থাকে। অতীত যদি সত্যই বড়ো কাজে অনুপ্রেরণা জোগায়, তবে অতীতকে নিশ্চয় মেনে নেব; কিন্তু কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো জাতি যদি সারাক্ষণ পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকে তবে তাকে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি না। সেই-যে কে একজন বলেছেন, পিছন দিকে চাওয়া এবং পিছনে যাওয়াই যদি মানুষের উদ্দেশ্য হত তবে তার চোখদুটো মাথার সুমুখে না থেকে পিছনেই থাকত। আমাদের অতীতকে জানতে মানা নেই, অতীতে প্রশংসার বস্তু থাকলে প্রশংসা করতেও বাধা নেই, কিন্তু আমাদের চোখের দৃষ্টি রাখতে হবে সামনে এবং পাদুটোও এগিয়ে চলবে সামনের দিকে। শি হুয়াঙ টি প্রাচীন গ্রন্থগুলি ধ্বংস করে এবং তাদের পাঠকদের জ্যান্ত পুঁতে দিয়ে যে অত্যন্ত নৃশংস কাজ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফল হল এই যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সব কীর্তি শেষ হয়ে গেল। তাঁর সাধু ইচ্ছেটা ছিল, তিনি হবেন প্রথম সম্রাট এবং তাঁর পরে দ্বিতীয় তৃতীয় এমনি করে অনন্তকাল ধরে তাঁর বংশের রাজারাই রাজত্ব করে যাবেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, চীন দেশের সব রাজবংশের মধ্যে এই চীন-রাজাদের রাজত্বকালই সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী। আগেই তো বলেছি, ও দেশের কোনো কোনো রাজবংশ শত শত বৎসর ধরে রাজত্ব করেছে। এই চীনদেরই ঠিক আগে যে বংশ রাজত্ব করেছিল তাদেরও রাজত্ব চলেছে আট শো সাতষট্টি বছর। কিন্তু পরাক্রান্ত চীন-রাজারা হঠাৎ দেখা দিয়ে যুদ্ধ জয় করে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে কেবলমাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আবার

লোপ পেয়ে গেল। শি হুয়াঙ টি ভেবেছিলেন, তিনি হবেন বিরাট এক রাজবংশের স্থাপয়িতা। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ২০৯ অব্দে তাঁর মৃত্যু হলে পর তিন বছরের মধ্যেই এই রাজবংশের অবসান হল। কন্‌ফুসিয়স-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য সব গ্রন্থ, যা মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, অবিলম্বে সেগুলো খুঁড়ে বের করা হল এবং পূর্বের মতোই আবার তাদের সমাদর হল।

রাজা হিসাবে শি হুয়াঙ টি-কে চীন দেশের অন্যতম পরাক্রান্ত সম্রাট বলা যায়। দেশময় যতসব ছোটোখাটো রাজা ছড়িয়ে ছিল, তিনি তাদের সকলকে দমন করে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করেন এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র গড়ে তোলেন। তিনি সমগ্র চীন দেশ, এমনকি আন্নাম রাজ্য জয় করেছিলেন। তিনিই চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছিলেন। এটা যদিচ খুব ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছিল, তবু চীনারা ভাবল, বিদেশী শত্রুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিরাট সৈন্যদল পোষণ করার চেয়ে এই প্রাচীর-নির্মাণে টাকা ব্যয় করা শ্রেয়। এই প্রাচীরের দ্বারা নিশ্চয় কোনো বড়ো আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। ছোটোখাটো আক্রমণ প্রতিরোধ করা চলত; কিন্তু এই থেকে বোঝা যায়, চীনারা শান্তিপ্রিয় ছিল এবং যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা সামরিক গৌরবের প্রয়াসী ছিল না।

শি হুয়াঙ টি অর্থাৎ প্রথম-সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশে দ্বিতীয় সম্রাট পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁর সময় থেকেই চীন দেশে একটি ঐক্যের ধারা চলে আসছে।

এর পরে আর-একটি রাজবংশের উদয় হল— এটির নাম হান-বংশ। এই বংশটি চার শো বৎসরেরও বেশি রাজত্ব করেছিল। গোড়ার দিকে এই বংশের একটি স্ত্রীলোকেও কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের ষষ্ঠ রাজা উ-টি চীন দেশের খ্যাতনামা এবং পরাক্রমশালী রাজাদের অন্যতম। ইনি পঞ্চাশ বছরের অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন। তখন তাতার দস্যুরা ক্রমাগত উত্তর-চীন আক্রমণ করছিল, তিনি তাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পূর্বদিকে কোরিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে একেবারে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত চীন-সম্রাটের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল; মধ্য-এশিয়ার সব জাতিগুলি তাঁকে অধীশ্বর বলে মেনে নিয়েছিল। এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে খৃষ্টপূর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে চীনের শক্তি এবং প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ঠিক ঐ সময়ে রোম-সাম্রাজ্যও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, বহু গ্রন্থেই আমরা এসব কথা দেখতে পাই, তাই থেকে অনেকে মনে করেন রোমের শক্তি বুঝি তখন সমগ্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিল। রোমকে বলা হয়েছে 'সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরী'। অবশ্য রোম সে সময়ে বড়ো হয়েছিল, তার শক্তিও ক্রমে বাড়ছিল। কিন্তু এর তুলনায় চীন-সাম্রাজ্য অনেক বড়ো, অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।

খুব সম্ভব সম্রাট উ-টির সময় থেকেই চীন এবং রোমের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পার্থিয়ানদের সহযোগিতায় এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবহার চলছিল। পার্থিয়ানদের বাস ছিল বর্তমান পারশ্য এবং মেসোপটেমিয়া -অঞ্চলে। পরে যখন রোমের সঙ্গে পার্থিয়ার যুদ্ধ বাধে, তখন কিছুকালের জন্য ঐ বাণিজ্যসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোম তখন সমুদ্রপথে সরাসরি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করল। একটি রোমান জাহাজ সত্যিসত্যি চীনে এসে পৌঁচেছিল। কিন্তু এসব হল গিয়ে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা। আমরা এখন যে সময়ের কথা আলোচনা করছি সেটা খৃষ্টপূর্ব যুগের কথা।

হান-বংশের রাজত্বকালেই চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম আমদানি হয়। খৃষ্টীয় যুগের আগে থেকেই চীনের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের কথা শুনে এসেছে, কিন্তু তার প্রচার শুরু হয়েছে পরে। কথিত আছে, তৎকালীন চীন-সম্রাট নাকি একদা স্বপ্নে এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলেন— ষোলো ফিট দীর্ঘ তাঁর দেহ, মাথা থেকে অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে! সেই স্বপ্নমূর্তিটিকে তিনি পশ্চিম দিক থেকে আসতে দেখেছিলেন, সুতরাং তিনি সেই দিকে তাঁর দূত প্রেরণ করেন। কিছুকাল পরে দূতেরা ফিরে এল, সঙ্গে তাদের বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলী। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চীন দেশে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ক্রমে চীন থেকে কোরিয়া এবং কোরিয়া থেকে জাপান পর্যন্ত এই প্রভাব বিস্তারলাভ করে।

হান-বংশের রাজত্বকালে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। একটি হচ্ছে কাষ্ঠফলকের সাহায্যে মুদ্রণশিল্পের উদ্ভাবন, যদিচ উদ্ভাবন সত্ত্বেও প্রায় হাজার-বছর-কাল এর তেমন প্রচলন হয় নি। তা হলেও এ বিষয়ে চীন দেশ ইউরোপের তুলনায় পাঁচ শত বছর অগ্রগামী।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হচ্ছে, রাজকর্মচারী নিয়োগের জন্য পরীক্ষাপ্রণালী-প্রবর্তন। আমি জানি ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা-জিনিষটা ভালোবাসে না, এ বিষয়ে তাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু সেই যুগেও যে চীন দেশে কর্মচারী-নিয়োগের এরূপ একটি ব্যবস্থা ছিল সেটি আমার কাছে বড়ো আশ্চর্য ঠেকে। অন্যান্য দেশে এই সেদিনও কর্মচারী নিযুক্ত হত বেশির ভাগই খোশামুদির জোরে এবং সেসব চাকুরি বিশেষ বিশেষ শ্রেণী কিংবা উচ্চবর্ণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। চীন দেশে চাকুরি-জিনিষটা বিশেষ কোনো শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না। যে কেউ পরীক্ষা পাশ করতে পারলে সরকারি চাকুরি পেত। অবশ্য আমি বলছি না যে এটাই একটা আদর্শ ব্যবস্থা, কারণ, কন্‌ফুসীয় শাস্ত্রে খুব ভালো করে পরীক্ষা পাশ করেও রাজকর্মচারী হিসাবে অপদার্থ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু খোশামুদি আবদার ইত্যাদির চেয়ে এই নিয়মটা যে ঢের ভালো তা স্বীকার করতেই হবে এবং মনে রাখা উচিত যে, দু হাজার বছর ধরে চীন দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই অল্প কিছুদিন হল এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে।

২৭

রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ

৫ই এপ্রিল, ১৯৩২

দূরপ্রাচ্য থেকে এবার আমরা পশ্চিমে যাব এবং রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে নাকি রোম নগর স্থাপিত হয়েছিল। রোমানরা বোধকরি আর্যদেরই বংশধর হবে। টাইবার নদীর তীরে যে সাতটি পাহাড় আছে তারই আশেপাশে এরা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছিল। ক্রমে এই বিক্ষিপ্ত বাসস্থানগুলি মিলিয়ে একটি নগরী গড়ে উঠল। এই নগর-রাষ্ট্রটি ক্রমেই বেড়ে চলল এবং ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করে একেবারে ইতালির দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী মেসিনা নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

গ্রীস দেশের নগর-রাষ্ট্রগুলির কথা বোধহয় তোমার মনে আছে। গ্রীকরা যেখানেই গিয়েছে সংগে সংগে তাদের নগর-রাষ্ট্রও গিয়েছে, ফলে ভূমধ্যসাগরের উপকূলভূমি গ্রীক উপনিবেশ এবং নগর-রাষ্ট্রে ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রোমে আমরা যে রাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। গোড়ার দিকে রোম বোধকরি অনেকটা গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মতোই ছিল; কিন্তু রোম ক্রমে প্রতিবেশী জাতগুলোকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্যবিস্তার করতে লাগল। এইভাবে রোম-রাষ্ট্র কেবল বেড়েই চলল, শেষটায় প্রায় সমগ্র ইতালি ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। এতবড়ো রাজ্যকে আর নগর-রাষ্ট্র বলা চলে না। রোম ছিল শাসনকেন্দ্র, সেইখান থেকে সমগ্র রাজ্য শাসন করা হত। আর রোম নগরের শাসনব্যবস্থাটিও ছিল অদ্ভুত ধরনের। এখানে রাজা, সম্রাট কেউ ছিল না, আবার প্রজাতন্ত্র বলতে আজকাল যা বোঝায় তেমন ধারাও কিছু ছিল না। তথাপি শাসনপ্রণালীটা খানিকটা ছিল প্রজাতন্ত্রের মতোই, যদিচ ধনী জমিদারদের হাতেই ছিল প্রাধান্য। বিধিনিয়ম অনুযায়ী শাসনক্ষমতা ছিল সিনেট-সভার হাতে, কিন্তু সিনেটের সভ্য মনোনয়নের ভার ছিল দুজন কন্সালের উপর। এই কন্সাল-দুজন নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। বহুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকেরাই সিনেটের সভ্য হতে পারতেন। সমগ্র রোমান জাতি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একটিকে বলা হত প্যাট্রিসিয়ান—এরা ছিল ধনী অভিজাত-সম্প্রদায়, বেশির ভাগই জমিদার। অপর শ্রেণীটিকে বলা হত প্লিবিয়ান, এরা ছিল সাধারণ

নাগরিকের দল। গোড়ার দিকে কয়েক শো বছর ধরে রোমান রাষ্ট্র বা সাধারণতন্ত্রের ইতিহাস, বলতে গেলে, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষেরই ইতিহাস। প্যাট্রিসিয়ানদের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা, আর যেখানে ক্ষমতা টাকাপয়সাও সেখানেই এসে জমে। ওদিকে প্লিবিয়ান বা প্লেবরা ছিল নিঃস্ব এবং নিঃসহায়ের দল; তাদের না ছিল ক্ষমতা, না ছিল অর্থ। ক্ষমতালাভের জন্য তারা শুরু করল সংগ্রাম, তার ফলে কখনও কখনও এক-আধটু সুযোগ-সুবিধা কপালক্রমে জুটত। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের সূত্রে প্লেবরা একবার একধরনের অসহযোগ-পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং তাতে বেশ ফলও পেয়েছিল। তারা সব দল বেঁধে রোম ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নূতন এক শহরে আস্তানা করল। প্যাট্রিসিয়ানরা তাতে ভয় পেয়ে গেল, কারণ প্লেবদের না হলে তাদের চলে না। কাজেই কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের সঙ্গে আপোস-নিষ্পত্তি করতে হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্লিবিয়ানরা উচ্চপদ-লাভের অধিকার পেল, এমনকি সিনেটের সভ্য হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হল।

এতক্ষণ আমরা শুধু প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ানদের ঝগড়াবিবাদের কথাই বলে আসছি। তাতে কারও কারও মনে হবে, এরা ছাড়া রোমে বুঝি আর কোনো লোক ছিল না। আসলে কিন্তু তা নয়; এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও রোম-রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস বাস করত। এদের কোনোরকম নাগরিক অধিকার ছিল না, ভোট দেবার ক্ষমতাও ছিল না। গরু-ভেড়ার মতো এরা ছিল তাদের মনিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মনিবরা খোশ-খুশি-মতো এদের বিক্রিও করে দিতে পারত। আবার ইচ্ছে হল তো দাসত্ব থেকে মুক্তিও দিতে পারত। এসব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের নিয়ে দেশে আরু একটা নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সেই যুগে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ক্রীতদাসের চাহিদা ছি খুব বেশি। তার ফলে স্থানে স্থানে দাস-ব্যবসায়ের বিরাট বিরাট ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। এসব ব্যবসায়ীরা দল বেঁধে গিয়ে দূরদেশ থেকে স্ত্রীপুরুষ বাচ্চাকাচ্চা জোর করে ধরে নিয়ে আসত এবং তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করত। প্রাচীন গ্রীস, রোম এবং মিশরের ঐশ্বর্যের মূলে ছিল এই দাস-ব্যবসা।

ভারতবর্ষেও কি এরকম দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। খুব সম্ভব ছিল না। চীন দেশেও ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য ভারতবর্ষ কিংবা চীন দেশে দাস-প্রথার কোনো অস্তিত্বই ছিল না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিস্তৃতভাবে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত না থাকলেও কোনো কোনো পরিবারে ক্রীতদাস দেখা যেত। পরিবারস্থ চাকরবাকরদের মধ্যে কতক লোক ছিল যাদের ক্রীতদাস বলা যেতে পারত। কিন্তু অন্যান্য দেশে খেতখামারের কাজে যেমন অগণিত লোককে কেনা-গোলামের মতো ব্যবহার করা হত, চীন কিংবা ভারতবর্ষে সেরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, এই দুটি দেশে অন্তত দাসপ্রথা নিতান্ত জঘন্য আকারে কখনও দেখা দেয় নি।

যাক, এদিকে রোম ক্রমেই বড়ো হয়ে চলল। আর প্যাট্রিসিয়ানদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। কিন্তু প্লিবিয়ানদের অবস্থার কোনো ইতরবিশেষ হল না। প্যাট্রিসিয়ানরা আগের মতোই ওদের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগল। আবার প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান দুই দলই প্রভু হয়ে ক্রীতদাস বেচারিদের ঘাড়ে চেপে রইল।

রোম ক্রমে বড়ো হয়ে চলছে; কিন্তু এখন এর শাসনব্যবস্থা চলছে কীভাবে, সেই হল প্রশ্ন। আগেই তো বলেছি শাসনভার ছিল সিনেট-সভার হাতে। সিনেটের সভ্যরা ছিলেন মনোনীত সদস্য। মনোনয়নের ভার ছিল দুজন কন্সালের উপর। এঁরা দুজন ছিলেন নির্বাচিত ব্যক্তি। নাগরিকেরা ভোট দিয়ে এঁদের নির্বাচন করত। গোড়ার দিকে রোম যখন একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র মাত্র ছিল, তখন নাগরিকেরা সকলে রোম নগরে কিংবা তারই আশেপাশে বাস করত। সবাই এক জায়গায় একত্র হয়ে ভোট দেওয়া এদের পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না। কিন্তু ক্রমে রোম যখন বিস্তারলাভ করল, তখন বহুসংখ্যক নাগরিক হয়ে পড়ল দূরের বাসিন্দা। তাদের পক্ষে ভোট দেওয়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে পড়ল। আজকাল যাকে বলা হয় প্রতিনিধিমূলক গবর্মেণ্ট, সেকালে তা ছিল না। জাতীয় আইনসভা, পার্লামেণ্ট কিংবা কংগ্রেসে আজকাল প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র থেকেই একজন করে প্রতিনিধি

পাঠানো হয়; সুতরাং বলতে গেলে, নির্বাচিত সদস্যগণ সমগ্র জাতিটারই প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু প্রাচীন রোমানগণ এ দিকটা খেয়াল করে নি। তারা রোম নগরীতে ভোট-গ্রহণের ব্যবস্থা করত; কিন্তু দূরবর্তী অধিবাসীদের পক্ষে রোমে গিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব হত না। সত্যি কথা বলতে কী, রোমে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা ওরা জানতেই পারত না। খবরের কাগজ কিংবা বই-পুস্তকাদি তো আর ছিল না। তা ছাড়া খুব কম লোকেই পড়তে জানত। ভোটের অধিকার থাকা সত্ত্বেও দূরের অধিবাসীরা তার সুযোগ নিতে পারত না।

তবেই দেখতে পাচ্ছ, নির্বাচন কিংবা অন্যান্য ব্যাপারে শুধু রোমের বাসিন্দারাই প্রকৃতপক্ষে অংশ গ্রহণ করত। ভোটের ব্যবস্থা হত খোলা মাঠে ঘেরাও-করা জায়গায়। ভোটদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্লিবিয়ান বা দরিদ্র নাগরিকের দল। প্যাট্রিসিয়ান বা ধনী-সম্প্রদায় ছিল ক্ষমতা-লিপ্সু আর উচ্চপদপ্রার্থী; সুতরাং তারা ঐ দরিদ্র লোকদিগকে ঘুষ দিয়ে ভোট আদায় করত। আজকালকার নির্বাচন-ব্যাপারে যেমন অনেক সময় ঘুষ আর চতুরতা চলে, তখন রোমেও সেটা চলত।

রোম-রাষ্ট্র যেমন বেড়ে চলল ইতালিতে, তেমনি আবার কার্থেজ ক্ষমতাশালী হতে লাগল উত্তর-আফ্রিকায়। কার্থেজের অধিবাসীরা ছিল ফিনিসীয়দের বংশধর—জাহাজি, ব্যবসায়ী। এদের শাসনপ্রণালী ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু কার্যত সেটা ছিল ধনী-সম্প্রদায়ের প্রজাতন্ত্র, রোমের চেয়েও এক ডিগ্রি চড়া। এই নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে ক্রীতদাস ছিল অসংখ্য।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-ইতালি এবং মেসিনাতে গ্রীক উপনিবেশ ছিল। রোম আর কার্থেজ একযোগে গ্রীকদিগকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাদের এই মৈত্রীবন্ধন বেশি দিন অটুট ছিল না, শীঘ্রই শিথিল হয়ে পড়ল এবং শুরু হল বিরোধ। ভূমধ্যসাগর এত চওড়া ছিল না যে, দু তীরে মুখোমুখি দুটো শক্তিশালী রাষ্ট্র থাকতে পারে। উভয় রাষ্ট্রই ক্ষমতাভিলাষী ছিল। রোম-রাষ্ট্র ক্রমশ বিস্তারলাভ করছিল। তার যেমন ছিল উচ্চাভিলাষ, তেমনি দৃঢ়তা। কার্থেজ প্রথমে রোম-রাষ্ট্রকে উপেক্ষাই করেছে; সমুদ্রে আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে বলেই তার ধারণা ছিল। শ-খানেক বছর দুটো রাষ্ট্র পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করেছে, মাঝে মাঝে আবার রফা-নিষ্পত্তিও হয়েছে। এদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে তিনবার, ইতিহাসে তাকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ তেইশ বৎসর যাবৎ চলেছিল, খৃষ্টপূর্ব ২৬৪ থেকে ২৪১ সন পর্যন্ত। এই যুদ্ধে রোমের জয় হয়। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ হয় বাইশ বছর পরে; ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হানিবল ছিলেন কার্থেজবাসীদের সেনাপতি। তিনি পনেরো-বছর-কাল যাবৎ রোম-রাষ্ট্রকে নানা-রকমে উত্ত্যক্ত করলেন; রোমানগণ ছিল ভয়ে জড়োসড়ো। রোমের সৈন্যবাহিনীকে তিনি লণ্ডভণ্ড করে দিলেন, বিশেষ করে খৃষ্টপূর্ব ২১৬ সনে কেণীর যুদ্ধে। কিন্তু এই পরাজয় এবং দুর্ঘটনা সত্ত্বেও রোমানরা বশ্যতা স্বীকার করে নি, বরং শত্রুর সংগে অনবরত যুদ্ধ করেছে। সম্মুখ-যুদ্ধে তারা হানিবলকে আক্রমণ করতে সাহস পায় নি; তাঁকে নানান রকমে হয়রান করতে চেষ্টা করেছে, কার্থেজের সংগে যোগাযোগ-রক্ষায় বাধা দিয়েছে। এই সময়ে রোমান সেনাপতি ছিলেন ফ্যাবিয়াস; এই সেনাপতি দশ-বছর-কাল সম্মুখ-যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছিলেন। ইনি খুব নামজাদা লোক ছিলেন না; তবু-যে আমি এঁর নাম উল্লেখ করছি তার কারণ, এঁর নাম থেকে ইংরেজি ফ্যাবিয়ান-শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ফ্যাবিয়ান-পন্থীদের কার্যপ্রণালী হল সাক্ষাৎভাবে কোনো প্রশ্নের মীমাংসা না করা—তারা সম্মুখ-যুদ্ধ এড়িয়ে চলে, কোনো সংকটের সম্মুখীন হয় না। ইংলণ্ডে ফ্যাবিয়ান-পন্থীদের একটা সমিতি আছে; এরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, অথচ আশু একটা পরিবর্তন চায় না।

হানিবল ইতালিকে প্রায় মরুভূমিতে পরিণত করেছিলেন; কিন্তু রোমও ছিল নাছোড়বান্দা এবং শেষ পর্যন্ত রোমই জয়লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব ২০২ সনে জামা-নামক স্থানে এক যুদ্ধে হানিবল পরাস্ত হন। কিন্তু তাতেই এ ব্যাপারের শেষ হয় নি। রোম হানিবলকে মোটেই নিষ্কৃতি দিল না, অনবরত তার পিছনে লেগে রইল। তিনি যেখানে যান সেখানেই রোম তাড়া করে; অবশেষে বিষ খেয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কার্থেজ একেবারে দমে গেল, রোমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না কোনো। অর্ধশতাব্দী-কাল এ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে আর কোনো বিবাদ হয় নি। কিন্তু রোমের মনের ঝাল

মেটে নি, তাই একটা অজুহাতে আবার কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল; এইটাই তৃতীয় পিউনিক-যুদ্ধ। দারুণ হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হল কার্থেজ। এমনকি, যে স্থানে একদা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রানী সমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগরী অবস্থিত ছিল, লাঙল দিয়ে চষে ফেলা হল সে স্থান!

২৮

রোম-শাসনতন্ত্রের রূপান্তর

৯ই এপ্রিল, ১৯৩২

কার্থেজের পরাজয় এবং ধ্বংসের পর পশ্চিম ভূখণ্ডে রোম সর্বেসর্বা হয়ে উঠল, প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না। গ্রীক রাষ্ট্রগুলো তো আগেই রোমের বশ্যতা স্বীকার করেছিল; এখন কার্থেজের অধীনস্থ দেশগুলোও রোম দখল করে বসল। দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের পর স্পেন এসে গেল রোমের অধিকারে। কিন্তু তথাপি কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিই রোমের অধীনতা স্বীকার করেছিল; সমগ্র উত্তর এবং মধ্য -ইউরোপ ছিল স্বাধীন।

যুদ্ধজয় আর দেশ-অধিকারের ফলে রোম ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল; বিজিত দেশসমূহ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ আর ক্রীতদাসের আমদানি হতে লাগল, আর সেই সঙ্গে এল বিলাসিতা। তোমাকে পূর্বে বলেছি, রোমে শাসনক্ষমতা ছিল সিনেটসভার হাতে, এবং এই সিনেটের সভ্য ছিলেন ধনী অভিজাতসম্প্রদায়ের লোকেরা। রোমের ক্ষমতা আর অধিকার যত বেড়ে চলল, এই ধনীসম্প্রদায়ের ধনসম্পদও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে। কাজেকাজেই ধনীরা হল অধিকতর ধনী; আর গরিব সেই গরিবই থেকে গেল, কিংবা আরও বেশি দুঃস্থ হয়ে পড়ল, বাড়ল দাস-অধিবাসীদের সংখ্যা। বিলাসবৈভব আর দুঃখদুর্গতি পাশাপাশি বেড়ে চলল।

আশ্চর্য, কতকাল আর মানুষ এই অবস্থা সহ্য করবে? তবে কিনা মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলেই সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়।

ধনীসম্প্রদায় নানারকম খেলাধুলো, সার্কাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দরিদ্র জনসাধারণ আর দাসদের ভুলিয়ে শান্ত রাখত। একদল লোক অস্ত্রের খেলা দেখাত, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করত; ওদের বলা হত গ্লাডিয়েটর। সার্কাসে ওদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা করা হত; কত ক্রীতদাস আর যুদ্ধ-বন্দীকেই না হত্যা করা হয়েছে এ ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে, খেলার ছলে।

কিন্তু আভ্যন্তরিক গোলযোগ বেড়ে চলেছিল রোম-রাষ্ট্রে। রাজদ্রোহিতা আর হত্যাকাণ্ড লেগেই ছিল; নির্বাচনে ঘুষ আর অসাধু উপায়ের তো যেন কথাই ছিল না। এমনকি চিরপদদলিত ক্রীতদাসরাও একবার স্পার্টাকাস্-নামক জনৈক দ্বন্দ্বযুদ্ধকারীর অধীনে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে; কথিত আছে ছয় হাজার বিদ্রোহীকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

এই সময়ে কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে; সিনেটসভাকে তারা আমল দিত না। বাধল গৃহযুদ্ধ; সৈন্যাধ্যক্ষরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি শুরু করল, উজাড় করে দিল দেশ। খৃষ্টপূর্ব ৫৩ সনে প্রাচ্য ভূখণ্ডে পার্থিয়ায় (মেসোপটেমিয়া) কেরির যুদ্ধে রোমান সৈন্যবাহিনী দারুণভাবে পরাজিত হয়েছিল।

পূর্বকথিত সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—পম্পে আর জুলিয়স সিজার। সিজার ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড জয় করেছিলেন, তা তুমি জানো। পম্পে গিয়েছিলেন পূব-দিকে। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একে অন্যকে সহ্য করতে পারতেন না; আবার উভয়েই ছিলেন ক্ষমতাভিলাষী। সিনেটসভা আড়ালে পড়ে গেল, কেউ বড়ো-একটা মানে না।

রোমের সাম্রাজ্যে
পরিণতি
গল
স্পেন
রোম
ডালমাটিয়া
দানিয়ুব
গ্রীস
কার্থেজ
পারগেমাম
কেরী
মিশর
রোম ও কার্থেজ
চার শো খৃষ্ট-পূর্বাব্দে
অগাস্টাসের মৃত্যুকালে
রোম-সাম্রাজ্যের পরিধি
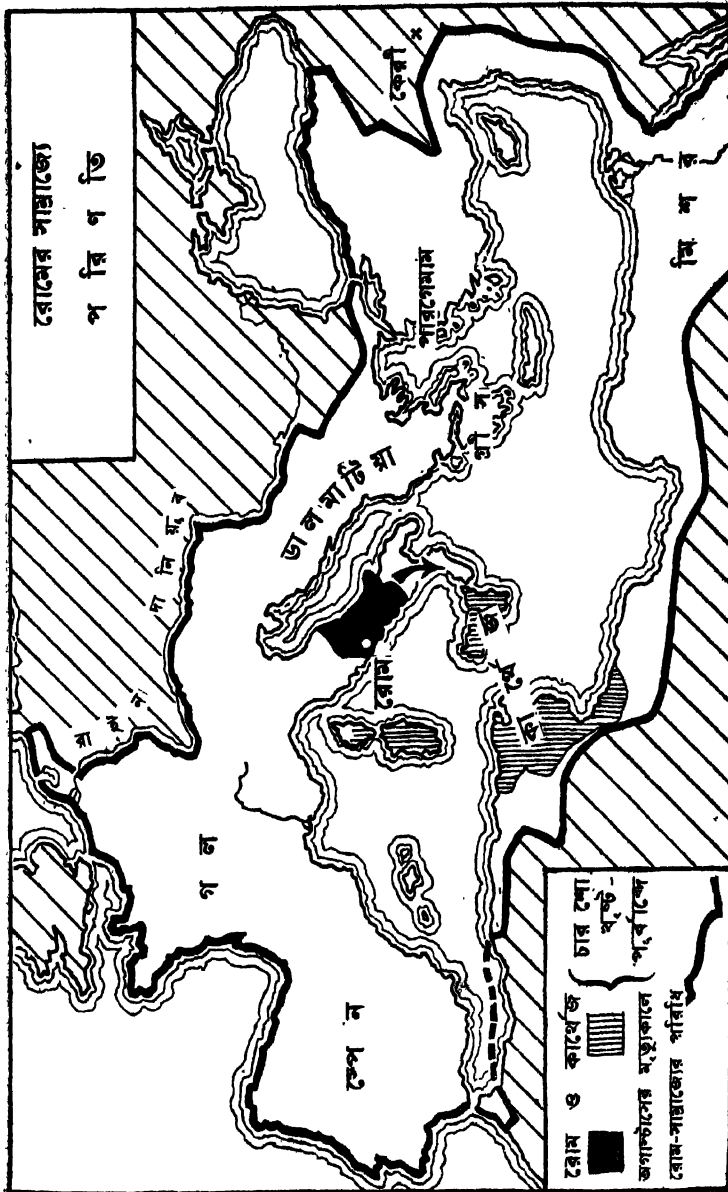
সিজার পম্পেকে পরাস্ত করে রোম-রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখন রোমে শাসনব্যবস্থা ছিল সাধারণতান্ত্রিক, তাই সরকারিভাবে সকল ব্যাপারে তিনি ক্ষমতা লাভ করতে পারলেন না। তাঁকে রোমের রাজা কিংবা সম্রাট করার চেষ্টা হল, তিনিও সম্রাট হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাধল বহুকাল-প্রচলিত শাসনপ্রথায়। সত্যি বলতে কী, ঐ শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথাকে অমান্য করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্রুটাস এবং অন্যান্যেরা ছুরিকাঘাতে সিজারকে হত্যা করেছিল। শেক্সপিয়রের 'জুলিয়স সিজার' -নাটকে এই দৃশ্যটির বর্ণনা আছে, তুমি নিশ্চয় তা পড়েছ। খৃষ্টপূর্ব ৪৪ সনে সিজারকে হত্যা করা হয়েছিল।

সিজারের মৃত্যু হল বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। সিজারের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তাঁর পোষ্যপুত্র অক্টেভিয়ান আর বন্ধু মার্ক এণ্টনি। আবার সৃষ্ট হল সেই রাজপদ, অক্টেভিয়ান হলেন রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি। লোপ পেল প্রজাতন্ত্র। সিনেটসভা থাকল বটে, কিন্তু তার প্রকৃত কোনো ক্ষমতা রইল না।

অক্টেভিয়ান রাজা হয়ে 'অগাস্টাস সিজার' এই নূতন নাম এবং উপাধি গ্রহণ করলেন। পরে তাঁর বংশধরদের সকলকেই বলা হ'ত সিজার। প্রকৃতপক্ষে, সিজার কথার মানে দাঁড়াল সম্রাট। কাইজার এবং জার এই দুটি কথারও উৎপত্তি হয়েছে এই 'সিজার' শব্দ থেকে। কাইজার কথা অনেককাল যাবৎ হিন্দুস্থানি ভাষায়ও প্রচলিত আছে, যেমন—কাইজার-ই-হিন্দ্, কাইজার-ই-রুম। ইংলণ্ডের রাজা জর্জ মনের আনন্দে এই কাইজার-ই-হিন্দ্ উপাধি গ্রহণ করেছেন। জর্মানির কাইজার আর নেই; তেমনি অস্ট্রিয়া আর তুরস্কের কাইজার এবং রুশিয়ার জারও বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! শুধু ইংলণ্ডের রাজা অদ্যাবধি সেই নাম কিংবা জুলিয়স সিজার উপাধি আঁকড়ে ধরে আছেন! অথচ এই জুলিয়স সিজারই রোমের পক্ষ থেকে ইংলণ্ড জয় করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, জুলিয়স সিজারের নামটা রাজকীয় মহিমা-জ্ঞাপক একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। আচ্ছা, পম্পে যদি গ্রীসে সিজারকে পরাস্ত করতেন তবে কেমন হত? সম্ভবত তখন পম্পে সম্রাট হতেন, আর 'পম্পে' কথাটির অর্থ হত সম্রাট। জর্মানির কাইজারের পরিবর্তে আমরা পেতাম জর্মানির পম্পে, এবং এমনকি রাজা জর্জই হয়তো-বা উপাধি নিতেন পম্পে-ই-হিন্দ্।

রোম-রাষ্ট্রে যখন এইসব পরিবর্তন ঘটছে, প্রজাতন্ত্র পরিণত হচ্ছে সাম্রাজ্যে, তখন মিশরে ছিল এক নারী, নাম ক্লিওপেট্রা। সৌন্দর্যের জন্যে ইতিহাসে এর নাম থেকে গেছে। কখনও কখনও গুটিকতক স্ত্রীলোক তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের জোরে ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে; ক্লিওপেট্রা ছিল তাদেরই একজন, যদিও সম্ভ্রম কিংবা প্রতিষ্ঠার দাবি তার তেমন ছিল না। জুলিয়স সিজার যখন মিশরে যান তখন ক্লিওপেট্রা বালিকামাত্র। পরে অবশ্য মার্ক এণ্টনির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব জন্মে, কিন্তু তাতে এণ্টনির কিছু ভালো হয় নি। বস্তুত, এক নৌযুদ্ধে ক্লিওপেট্রা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের জাহাজ নিয়ে সরে পড়েছিল।

মিশর পরিদর্শনের পর থেকে সিজার সম্ভবত নিজেকে রাজা কিংবা সম্রাট বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। মিশরের শাসনব্যবস্থায় ছিল রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র নয়; শাসনকর্তা কেবলমাত্র সর্বেসর্বাই ছিলেন না, তাঁকে দেবতা বলে মানা হত। এই ছিল প্রাচীন মিশরীয় রীতি। আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর মিশরের শাসনভার গেল গ্রীক টলেমিদের হাতে। ওরা অনেকাংশে মিশরীয় মতবাদ, রীতিনীতি ইত্যাদি গ্রহণ করেছিল। ক্লিওপেট্রা ঐ টলেমি-বংশের মেয়ে, সুতরাং সে ছিল একজন গ্রীক নারী।

শাসনকর্তাকে দেবতারূপে মানার মনোবৃত্তিটা রোমও গ্রহণ করল; এতে ক্লিওপেট্রার কোনো হাত ছিল কি না সঠিক বলা যায় না। এমনকি জুলিয়স সিজারের জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রতিমূর্তি গড়ে পুজো করা শুরু হল। দেখতে পাবে, পরবর্তীকালে এটা রোমান-সম্রাটগণের নিকট একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

রোমের ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণে এসে আমরা পোঁচেছি। প্রজাতন্ত্রের তখন অন্তর্দশা। অক্টেভিয়ান খৃষ্টীয় ২৭ সনে রাজা হলেন, উপাধি নিলেন অগাস্টাস সিজার। রোম-সাম্রাজ্য ও

তার সম্রাটদের কাহিনী পরে বলব; প্রজাতন্ত্রের শেষ আমলে রোমের অধীন রাজ্যগুলোর অবস্থাটা আগে আলোচনা করা যাক।

ইতালি তো রোমের অধীনে ছিলই, আর ছিল পাশ্চাত্যের স্পেন এবং গল্ (ফ্রান্স), এই দুটি দেশ। পূর্বদিকে গ্রীস আর এশিয়া-মাইনর রোমের অধিকারে ছিল; এশিয়া-মাইনরে গ্রীক রাষ্ট্র পার্গেমাম্-এর কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। উত্তর-আফ্রিকায় মিশরকে রোমের আশ্রিত-রাজ্য হিসাবে ধরা হত; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কার্থেজ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ রোমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজে কাজেই, উত্তরে রোম-রাষ্ট্রের সীমানা ছিল রাইন নদী। জর্মানি, রুশিয়া, উত্তর ও মধ্য -ইউরোপ এবং মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকের সমস্ত দেশ ও জাতি রোম-রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে ছিল।

সেকালে রোম ছিল বিরাট সাম্রাজ্য। ইউরোপের লোকেরা সমগ্র পৃথিবীটাকেই রোমের অধীন বলে মনে করত। অন্যান্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান ছিল না কিনা? আদতে কিন্তু ব্যাপার তা নয়। চীনের হান্-বংশের কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। ঠিক এই সময়টাই ছিল হান্-বংশের রাজত্বকাল এবং এদের ক্ষমতা আর অধিকার এশিয়া থেকে বরাবর কাস্পিয়ান সাগর অবধি বিস্তৃত ছিল। মেসোপটেমিয়ায় কেরির যুদ্ধে রোমানদের দারুণ পরাজয় হয়েছিল। মঙ্গোলীয়গণ সে যুদ্ধে পার্থিয়াবাসীদের সাহায্য করেছিল, এই আমার আন্দাজ।

রোমের ইতিহাস, বিশেষ করে রোমের প্রজাতন্ত্রের-যুগের ইতিহাসের প্রতি ইউরোপীয়দের একটা টান আছে; ওরা মনে করে প্রাচীন রোম-রাষ্ট্র আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্মদাতা। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। তাই তো ইংলণ্ডে স্কুলের ছাত্রদের গ্রীস আর রোমের ইতিহাস পড়ানো হয়, অথচ, আধুনিক যুগের ইতিহাস হয়তো তারা জানেই না। আমার মনে আছে, ইংলণ্ডে আমাকে লাতিন ভাষায় জুলিয়স সিজারের গল্-আক্রমণের কাহিনী পড়তে হয়েছিল। সিজার কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, সাহিত্যরচনায়ও তাঁর চমৎকার হাত ছিল। আজও ইউরোপের হাজার হাজার বিদ্যালয়ে তাঁর রচিত 'দ্য বেলো গ্যালিকো' পড়ানো হয়।

অশোকের রাজত্বকালে পৃথিবীর অপরাপর দেশের অবস্থার পর্যালোচনা শুরু করেছিলাম। তা শেষ করে আমরা চীন এবং ইউরোপে চলে গিয়েছি। এখন খৃষ্টীয় যুগের শুরুতে চলো আবার ভারতবর্ষে ফিরে যাই; অশোকের মৃত্যুর পর সে দেশে অনেক-কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, উত্তর আর দক্ষিণ -ভারতে নূতন নূতন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন, এই ধারণা আমি তোমার মনে জন্মাতে চাই। কিন্তু মনে রেখো, সেই প্রাচীন যুগে দূরদূরান্তরের দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ-রক্ষার তেমন কোনো উপায় ছিল না। রোম অনেক বিষয়েই খুব উন্নত ছিল বটে, কিন্তু ভূবিদ্যা আর ভূচিত্রাবলীর জ্ঞান ছিল না বললেই হয়, শেখবার চেষ্টাও করে নি। সৈন্যাধ্যক্ষরা ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর, সিনেটের সদস্যরাও ছিলেন বটে জ্ঞানী ব্যক্তি, কিন্তু ভূগোলের জ্ঞান তাঁদের সামান্যই ছিল; আজকালকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও তার চেয়ে ঢের বেশি জানে। রোম-সম্রাটগণ যেমন নিজেদের পৃথিবীর অধীশ্বর বলে মনে করতেন, ঠিক তেমনি হাজার হাজার মাইল দূরে এশিয়া মহাদেশে চীনের সম্রাটগণও ভাবতেন, তাঁরাই পৃথিবীর অধিপতি।

দক্ষিণ-ভারতের প্রাধান্যলাভ

১০ই এপ্রিল, ১৯৩২

সুদূর প্রাচ্যের চীনদেশ আর পাশ্চাত্যের রোম পরিভ্রমণ করে অনেক কাল পরে ভারতে ফিরে এলাম।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। উত্তর-ভারতের প্রদেশগুলো হীনবল হয়ে পড়ে; ওদিকে দাক্ষিণাত্যে গজিয়ে ওঠে একটা নূতন সাম্রাজ্য—অন্ধ্র-সাম্রাজ্য। অশোকের বংশধরগণ বছর-পঞ্চাশেক মগধে রাজত্ব করেছিল, তার পর শেষ মৌর্যরাজের সেনাপতি বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, নাম পুষ্যমিত্র। এঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়; বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের উপর কিছুটা অত্যাচার-অবিচারও করা হয়েছিল। ভারতের ইতিহাস পড়তে পড়তে তুমি দেখতে পাবে, বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের আক্রমণের রীতিটা ছিল কূটনৈতিক, অশিষ্ট অত্যাচার কখনও করে নি। কিছুটা অত্যাচার অবিচার যে হয় নি তা নয়, তবে সম্ভবত তার হেতু ছিল রাজনৈতিক। বৌদ্ধসংঘগুলো ছিল খুব শক্তিশালী; এগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট। সম্রাটদের মধ্যে অনেকে এই সংঘগুলোকে রীতিমতো ভয় করে চলতেন, এবং তাই ওদের ক্ষমতা লোপ করবার জন্যে বরাবর চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মকে দেশছাড়া করল, তবে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ কতকটা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

এই নূতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়, কিংবা বৌদ্ধধর্মের আদর্শকে অস্বীকারও করে নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাচীন নায়কগণের রীতি ছিল, নূতনকে গ্রহণ করা, খাপ খাইয়ে নেওয়া। আর্যগণ প্রথম যখন ভারতে এল তখন তারা দ্রাবিড়জাতির আচারপদ্ধতি ও সংস্কৃতি অনেকাংশে গ্রহণ করেছিল; জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, এই রীতিই তারা পালন করেছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তাদের এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে—বুদ্ধকে করেছে অবতার আর দেবতা। অগণিত জনসাধারণ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে, অথচ তাঁর বাণী ও আদর্শকে পালন করে নি। ওদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা হিন্দুধর্মও তার আদর্শ এবং ভাবধারা বজায় রেখেছে। বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাববিস্তারের এই চেষ্টা অনেককাল ধরে চলেছিল, কেননা, অশোকের মৃত্যুর পরেই তো আর বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে লোপ পায় নি। আরও কয়েক শো বছর ছিল এ দেশে।

অশোকের মৃত্যুর পরে মগধে কোন্ বংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হল, কারাই-বা রাজা হল তা আলোচনা করার দরকার নেই। দু শো বছরের মধ্যেই মগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি লোপ পেয়ে গেল; অবশ্য পরেও বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে তার খ্যাতি ছিল।

এদিকে উত্তর-ভারত আর দাক্ষিণাত্যে মহা আন্দোলন চলছিল। শক, তুর্কি, কুষাণ, ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকজাতি, সিথিয়াবাসী প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির আক্রমণে উত্তর-ভারত উত্ত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। মধ্য-এশিয়া ছিল নানা জাতির জন্মস্থান; এরা কীরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র এশিয়ায়, এমনকি ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় বারে বারে এদের আবির্ভাব হয়, সে কথা তোমাকে পূর্বে বলেছি। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে প্রায় দু শো বছর-কাল যাবৎ এভাবে ভারত অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু মনে রেখো, এইসমস্ত আক্রমণের উদ্দেশ্য দেশ-জয় কিংবা লুঠপাট নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল জায়গা দখল করে বসবাস করা। মধ্য-এশিয়ার জাতিদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানে এদের সংকুলান হত না; কাজেই এরা এখান থেকে ওখানে যেত, নূতন জায়গার সন্ধানে ফিরত। আর-একটা কারণ এই ছিল যে, পিছন থেকে প্রায়ই এদের উপর চাপ পড়ত; এক জাতি আর-এক জাতিকে স্থানচ্যুত করে দিত এবং বাধ্য হয়েই এরা অন্য দেশ আক্রমণ করত। সুতরাং যেসকল জাতি ভারতবর্ষ

আক্রমণ করেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আশ্রয় লাভ করা। চীন-সাম্রাজ্যও যখনই সুযোগ পেয়েছে—যেমন হান্‌-বংশের রাজত্বকালে—যাযাবর জাতিগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছে দেশ থেকে।

আর-একটা কথা মনে রাখবে, মধ্য-এশিয়ার এইসমস্ত যাযাবর জাতি ভারতবর্ষকে পুরোপুরি শত্রুর দেশ বলে মনে করে নি। ইতিহাসে এদের বলা হয়েছে বর্বর; সে যুগের ভারতের তুলনায় এরা অবশ্য ততটা সভ্যভব্য ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ জাতিই ছিল গোঁড়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, এবং ভারতবর্ষ এদের ধর্মের জন্মভূমি হওয়াতে এরা ভারতকে খুব শ্রদ্ধা করত।

পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালেও ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিনান্দার ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন বৌদ্ধ। ব্যাক্‌ট্রিয়া ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে। প্রথমে সেলিউকসের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। পুষ্যমিত্রের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মিনান্দার কাবুল আর সিন্ধুদেশ অধিকার করতে সমর্থ হন।

ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসীদের পরে এল শকজাতি। শকেরা উত্তর এবং পশ্চিম -ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এরা ছিল তুর্কি যাযাবর জাতির একটা শাখা; কুষাণজাতি এদের স্থানচ্যুত করেছিল। ব্যাকট্রিয়া, পার্থিয়া প্রভৃতি রাজ্য পদদলিত করে শকেরা এ দেশে এসে উত্তরাঞ্চলে, বিশেষত পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং কাথিয়াওয়াড়ে রাজ্য স্থাপন করে। ক্রমে এরা যাযাবর জাতির রীতিনীতি পরিত্যাগ করে এবং সভ্য জাতিতে পরিণত হয়।

এই সময়ের ইতিহাসে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটা এই যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তুর্কি, ব্যাক্‌ট্রীয় প্রভৃতি বিদেশী জাতি রাজত্ব করলেও ইন্দো-আর্য সমাজব্যবস্থায় তেমন কোনো ওলটপালট কখনও হয় নি। এরা ছিল বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধসংঘব্যবস্থাই মেনে চলেছে; আর ঐসকল বৌদ্ধসংঘ তো প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এদের রাজত্বকালেও এ দেশে স্বায়ত্তশাসনমূলক গ্রাম্য শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। তখনও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে তক্ষশীলা আর মথুরার খুব নামডাক ছিল, চীন এবং পশ্চিম-এশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা ওখানে আসত।

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত থেকে পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে এবং মৌর্য-সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরাতে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি ক্রমে এ অঞ্চল থেকে অন্তর্হিত হয়; দাক্ষিণাত্যের ভারতীয় রাষ্ট্রগুলোই খাঁটি ইন্দো-আর্য প্রথার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বহু গুণীজ্ঞানী লোক উত্তরাঞ্চল থেকে চলে যায় দাক্ষিণাত্যে। হাজার বৎসর পরে যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করে তখনও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছিল। এই দেখো-না কেন, আজও পর্যন্ত উত্তর-ভারতই ঐসমস্ত আক্রমণের ফল ভোগ করছে, দাক্ষিণাত্যে বড়ো-একটা আঁচড় লাগে নি। আমরা উত্তর-ভারতের বাসিন্দারা একটা মিশ্র সংস্কৃতির আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছি; এটা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং তাতে আবার পাশ্চাত্যের ঢেউ এসে লেগেছে। এমনকি আমাদের ভাষাও মিশ্র ভাষা, তাকে হিন্দি, অথবা উর্দু, কিংবা হিন্দুস্থানি যাই বলো-না কেন। অথচ দাক্ষিণাত্য আজও হিন্দুপ্রধান, অধিবাসীরা বেজায় নিষ্ঠাপরায়ণ, সে তো তুমি নিজেই দেখেছ। শত শত বৎসর ধরে দাক্ষিণাত্য প্রাচীন আর্যসভ্যতার ধারা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে, এবং তার ফলে এমন এক কঠোর মনোবৃত্তিসম্পন্ন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে যে তার পরমত-অসহিষ্ণুতা দেখলে অবাক লাগে। দেয়াল জিনিষটা ভয়াবহ; কখনও কখনও বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করলেও, শেষ পর্যন্ত মানুষকে বন্দী আর ক্রীতদাসে পরিণত করে; স্বাধীনতার বিনিময়ে তখন তোমাকে কিনতে হয় শুচিতা আর পবিত্রতা। আর মনের মধ্যে যদি একবার দেয়াল খাড়া করে তুলতে পারো তবে সেটা হবে আরও সাংঘাতিক; প্রাচীন কালের কোনো কুপ্রথাকেই তুমি ছাড়তে পারবে না, আবার নূতন চিন্তা বা আদর্শকে গ্রহণ করতেও তোমার বাধবে।

কিন্তু তথাপি দাক্ষিণাত্য একটা কাজের মতো কাজ করেছে, সহস্রাধিক বৎসর-কাল যাবৎ শিল্পকলা ধর্ম আর রাজনীতিতে ভারতীয় আর্যসভ্যতার ধারা রক্ষা করেছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-কলার নিদর্শন দেখতে চাও তো তোমাকে দক্ষিণ-ভারতে যেতে হবে। আর রাজনীতির দিক থেকে

দাক্ষিণাত্যের গণতান্ত্রিক সংসদগুলো যে রাজশক্তিকে সংযত রাখত, সে কথা তো মেগাস্থেনিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকেই আমরা জানতে পারি।

কেবল যে জ্ঞানী লোকেরাই উত্তর-ভারত ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিল তা নয়; শিল্পী, কারিকর, মিস্ত্রি প্রভৃতি অনেক গুণী লোকও মগধের পতনের পরে দাক্ষিণাত্যে চলে যায়। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য চলত। এ দেশ থেকে সোনা, মুক্তা, হাতির দাঁত, চাল, লঙ্কা, ময়ূর, এমনকি বানরও, বাবিলন মিশর গ্রীস এবং রোমে রপ্তানি করা হত। মালাবার-উপকূল থেকে সেগুন কাঠ চালান দেওয়া হত বাবিলনে। আর-একটা কথা খেয়াল করবে যে, ভারতের নিজস্ব জাহাজে করেই এই ব্যবসাবাণিজ্য চলত। জাহাজের খালাসি ছিল যত দ্রাবিড়-জাতির লোক। এ থেকেই বুঝতে পারছ, সেই প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে দাক্ষিণাত্যের স্থান কত উপরে ছিল। অসংখ্য রোমান মুদ্রা দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া গেছে। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, মালাবার-উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়ার উপনিবেশ ছিল, আর ওদিকে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়।

অশোকের মৃত্যুর কিছু পরেই দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রজাতি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ভারতের পূর্ব-উপকূলে এবং মাদ্রাজের উত্তরে এই অন্ধ্রদেশ; বর্তমানে অন্ধ্র একটি কংগ্রেসী প্রদেশ, তা তুমি জানো। অন্ধ্রদেশের ভাষা তেলেগু। অশোকের মৃত্যুর পরে এই সাম্রাজ্য অতি দ্রুত বিস্তার-লাভ করে। উপনিবেশ-স্থাপনের ব্যাপারে দাক্ষিণাত্য কীরূপ উদ্যোগী হয়েছিল সে কথা পরে বলব।

শক, সিথিয়াবাসী প্রভৃতি জাতির কথা তোমাকে বলেছি; এরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং উত্তর-ভারতে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে এরা ভারতেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়; আমরা উত্তর-ভারতের বাসিন্দারা যেমন আর্যদের বংশধর তেমনি আবার ওদেরও বংশধর। বিশেষ করে, সাহসী রাজপুত জাতি আর কাথিয়াওয়াড়ের কর্মঠ অধিবাসীরা তো এদেরই সন্তানসন্ততি।

৩০

কুষাণ-সাম্রাজ্য

১১ই এপ্রিল, ১৯৩২

শক আর তুর্কি জাতি কর্তৃক পুনঃপুনঃ ভারত-আক্রমণের কথা গত চিঠিতে বলেছি। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রজাতির প্রবল হয়ে ওঠার কথাও উল্লেখ করেছি; এই জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেটা বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণদের নিকট তাড়া খেয়েই শকেরা এ দেশে এসেছিল; কিছুকাল পরে আবার কুষাণরা নিজেরাই এসে হাজির হল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণজাতি ভারতের সীমান্তে এক রাজ্য স্থাপন করে; এই রাজ্যই কালক্রমে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। দক্ষিণে বারাণসী ও বিন্ধ্যপর্বত, উত্তরে ইয়ারখন্দ ও খোটান, আর পশ্চিমে পারশ্য এবং পার্থিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ মধ্য-এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুষাণজাতি তিন শো বৎসর-কাল রাজত্ব করেছিল। কুষাণ-সাম্রাজ্য আর দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র-সাম্রাজ্য সমসাময়িক। প্রথমে কুষাণ-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কাবুলে; পরে পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) স্থানান্তরিত হয়।

কুষাণ-সাম্রাজ্যের ইতিহাস অনেক কারণে চিত্তাকর্ষক। কুষাণ-সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন কনিষ্ক; ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র তক্ষশীলা রাজধানী পেশোয়ারের নিকটে অবস্থিত ছিল। কুষাণরা ছিল মঙ্গোলীয় কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট জাত। কুষাণ-রাজধানী থেকে নিশ্চয়ই লোকজন সর্বদা মঙ্গোলিয়ায় যাতায়াত করত; সেই কারণেই বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চীন এবং মঙ্গোলিয়ায় পৌঁচেছিল। পশ্চিম-এশিয়াও নিশ্চয় এইভাবেই বৌদ্ধ

কুষাণ-আমলে
ভারতবর্ষ
কাবুল
কাশ্মীর
পুরুষপুর
কুষাণ সাম্রাজ্য
পারস্য
সিন্ধুনদ
সিন্ধু
গঙ্গা
বারাণসী
মগধ
বিন্ধ্য পর্বতমালা
অন্ধ্র
গোদাবরী
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা
সিংহল
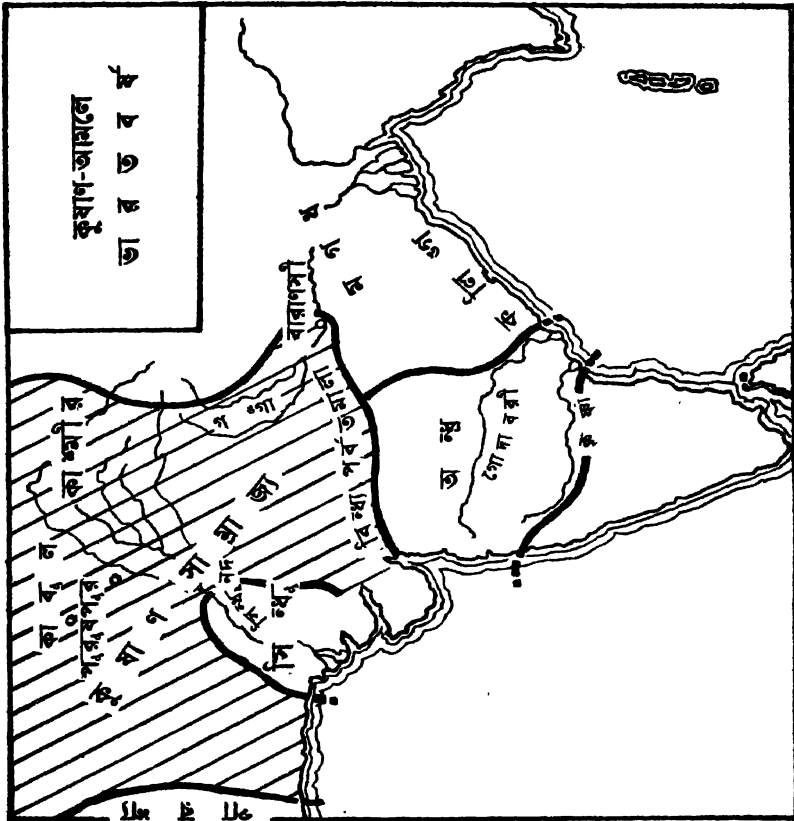
আদর্শ ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিল। আলেকজান্ডারের সময় থেকেই পশ্চিম-এশিয়া ছিল গ্রীক-শাসনাধীনে, কাজে কাজেই গ্রীক সভ্যতারও আমদানি হয়েছিল ওখানে। সেই গ্রীক-এশিয়াটিক সভ্যতা এখন ভারতীয়-বৌদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে মিশ খেয়ে গেল।

দেখা যাচ্ছে, চীন আর পশ্চিম-এশিয়ার উপরে ভারতবর্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তেমনি আবার ভারতের উপরে এই দুই দেশের ছাপ পড়েছিল। মনে করো, কুষাণ-সাম্রাজ্য এক বিরাট মূর্তি, এশিয়ার পিঠের উপরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে; পশ্চিমে গ্রীস-রোম-সাম্রাজ্য, পূর্বদিকে চীন, আর দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এ যেন ছিল ভারতবর্ষ ও রোম এবং ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যবর্তী একটি বিশ্রামগৃহ।

এইরূপ কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের দরুন ভারতবর্ষ আর রোমের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ভারতে যখন কুষাণ-রাজত্ব তখন রোমে জুলিয়স সিজার বেঁচে ছিলেন; প্রজাতন্ত্র-যুগ শেষ হয়ে রোমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কথিত আছে, কুষাণ-সম্রাট রোমে অগাস্টাস সিজারের রাজসভায় দূত পাঠিয়েছিলেন। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলত। ভারতবর্ষ থেকে নানা সুগন্ধি, রেশম, মসলিন, বহুমূল্য বস্ত্রাদি রোমে চালান দেওয়া হত। রোম থেকে সোনা আমদানি হত এ দেশে। প্লিনি নামে রোমের এক গ্রন্থকার সোনা-রপ্তানির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, ঐ রপ্তানির ফলে রোম বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হত।

এই সময়ে বৌদ্ধসংঘের অধিবেশনে এবং আশ্রমগুলোতে ধর্মবিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। দক্ষিণ আর পশ্চিম-অঞ্চল থেকে নূতন নূতন চিন্তাধারা কিংবা পুরোনো আদর্শই নূতন আকারে আমদানি হচ্ছিল এবং তাতে করে আদর্শের মধ্যে একটু জটিলতা এসে গেল। ক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধগণ দুই শাখায় বিভক্ত হয়; এক শাখা 'মহাযান' এবং অপর শাখা 'হীনযান' মত অবলম্বন করে। এর ফলে লোকের ধর্ম ও জীবনাদর্শে একটা পরিবর্তন দেখা দিল এবং সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল শিল্পে, স্থাপত্যে। কী করে এই পরিবর্তন ঘটল তা বলা শক্ত; তবে সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য আর যাবনিক আদর্শ বৌদ্ধ চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

আসলে বৌদ্ধধর্মটা কী? ওটা শ্রেণীবিভাগ, পুরোহিত-প্রথা আর আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির একটা বিরুদ্ধ মতবাদ মাত্র, এ কথা তোমাকে পূর্বেও বলেছি। গৌতম ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী। তিনি নিজেকেও দেবতা বলে দাবি করেন নি। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধ। এই মনোভাবের দিক থেকে বুদ্ধ কোনো মূর্তিতে প্রকাশ পান নি; সুতরাং সে যুগের স্থাপত্যশিল্পেও কোনো মূর্তির স্থান ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা হিন্দু আর বৌদ্ধধর্মের বিভেদ ঘোচাবার জন্যে বরাবর চেষ্টা করেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হিন্দু আদর্শ প্রবর্তন করতে চেয়েছে। গ্রীস-রোম থেকে যেসকল কারিগর এ দেশে এসেছিল তাদের দিয়ে দেবমূর্তি গড়ানো হত। এভাবেই ক্রমে বৌদ্ধ-মন্দিরে-মন্দিরে মূর্তি গড়ে উঠতে লাগল। প্রথমে বোধিসত্ত্বের বিগ্রহ, কেননা বুদ্ধ পূর্ব-পূর্ব জন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন বলে লোকে বিশ্বাস করত; তার পরে ক্রমে স্বয়ং বুদ্ধের মূর্তি তৈরি হল, লোকে দেবতাজ্ঞানে তাঁর পূজো করতে লাগল।

মহাযান-শাখা এইসব পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। কুষাণ-সম্রাটগণ মহাযান-মত অবলম্বন করেন। কিন্তু তাই বলে ওঁরা হীনযান কিংবা অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি মোটেই অসহিষ্ণু ছিলেন না। কনিষ্ক তো নাকি জরথুস্ট্রের ধর্ম-প্রচারেও উৎসাহ দেখাতেন।

মাঝে মাঝে বৌদ্ধসংঘের অধিবেশনে মহাযান আর হীনযান এই দুই মতবাদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হত। কনিষ্ক কাশ্মীরে সংঘের এক সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। কয়েক শো বছর ধরে এই দুটি মতবাদের মধ্যে বিরোধ চলেছিল। উত্তর-ভারতের বৌদ্ধগণ মহাযান, আর দক্ষিণ-ভারতের বৌদ্ধগণ হীনযান-মত অবলম্বন করে; অবশেষে উভয় মতবাদই হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে চীন জাপান তিব্বতে মহাযান-পন্থা প্রচলিত। সিংহল এবং ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরা হীনযান-মতাবলম্বী।

প্রত্যেক জাতির শিল্পকলার মধ্যে জাতির মানসিক গতির পরিচয় পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে বৌদ্ধধর্মের চিন্তা এবং ভাবধারা অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

ক্রমে বৌদ্ধ-প্রচারকের দল সহজ পথ ছেড়ে নানারকম রূপকের সাহায্যে মর্মব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তার ফলে ভারতীয় শিল্পকলাও ক্রমেই অলংকারবহুল হয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে গান্ধারপ্রদেশে মহাযান-সম্প্রদায়ের যে স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। এমনকি হীনযানদের স্থাপত্যশিল্পও এর ছোঁয়াচ থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নি। এদের শিল্পের মধ্যে যে অনাড়ম্বর সরলতাটুকু ছিল তা দূর হয়ে ক্রমেই আলংকারিক কারুকলার প্রয়াস দেখা দিতে লাগল।

সে যুগের কিছু কিছু শিল্পনিদর্শন এখনও বর্তমান রয়েছে। এর মধ্যে অজন্তার প্রাচীর-চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুষাণদের কাছ থেকে এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো; সাধারণত বিদেশীরা এসে বিজিত দেশকে যেভাবে শাসন করে থাকে কুষাণরা ঠিক সেভাবে ভারতবর্ষ শাসন করে নি। একে তো ধর্মের যোগ থাকাতে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের অমনিতেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিল, তা ছাড়া কুষাণরা আবার রাজ্যচালনার ব্যাপারে আর্যদেরই রীতিনীতি, শাসনপ্রণালী সব-কিছু অবলম্বন করেছিল। অনেক পরিমাণে আর্যদের চালচলন রীতিনীতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল বলেই প্রায় তিন শো বছর ধরে এরা উত্তর-ভারতে রাজত্ব করতে পেরেছিল।

৩১

যিশুখৃষ্ট ও তাঁর ধর্ম

১২ই এপ্রিল, ১৯৩২

এ যাবৎ খৃষ্টপূর্ব যুগের কথাই বলে এসেছি; এবারে আমরা খৃষ্টীয় আমলে উপনীত হলাম। খৃষ্টের জন্মের কল্পিত তারিখ থেকে এই যুগের শুরু। প্রকৃতপক্ষে এই তারিখের চার বছর আগে খৃষ্টের জন্ম হয়েছিল। অবশ্য এতে কিছু এসে-যায় না। খৃষ্টজন্মের পরেকার সময়ের উল্লেখ করতে সাধারণত A.D.—Anno Domini—অর্থাৎ 'প্রভুখৃষ্টের বৎসরে' কথা ব্যবহৃত হয়। এই কথা ব্যবহার করায় ক্ষতি নেই। তবে আমার মনে হয়, এই যুগের উল্লেখ করতে A.C.—After Christ— অর্থাৎ 'খৃষ্টোত্তর' কথা ব্যবহার করা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হবে; কেননা খৃষ্ট জন্মের পূর্বেকার সময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় B.C. যাই হোক, আমি A.C. কথাই ব্যবহার করব।

খৃষ্ট অথবা যিশুর কাহিনী বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত হয়েছে। ঐসকল বিবরণ থেকে খৃষ্টের ছেলেবেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; শুধু জানা যায় যে, নেজারেথ্-নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়, গ্যালিলিতে তিনি ধর্মপ্রচার করেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে জেরুজালেমে উপস্থিত হন। কিছুকাল পরেই তাঁর বিচার হয় এবং রোমান-শাসনকর্তা পণ্টিয়স পিলেট তাঁকে শাস্তি দেন। ধর্ম-প্রচার শুরু করার আগে যিশু কী করেছিলেন, কোথায়ই-বা গিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। মধ্য-এশিয়া, কাশ্মীর, লাডাক, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে আজও লোকে মনে করে, যিশু ঐসমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন; কারও কারও ধারণা, তিনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক কিছুই বলবার উপায় নেই এবং তাঁর জীবনেতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ কথা বিশ্বাস করেন না। তথাপি কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। দেশবিদেশ থেকে ছাত্ররা এখানে বিদ্যালাভ করতে আসত; সুতরাং সে উদ্দেশ্যে যিশুও হয়তো-বা এসেছিলেন। কোনো কোনো বিষয়ে

যিশুর ধর্মোপদেশের সঙ্গে গৌতমের ধর্মের সাদৃশ্য এত বেশি যে, মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের কথা নিশ্চয়ই তাঁর বেশ ভালো জানা ছিল। তবে ভারতে না এসেও যিশু এসব কথা জেনে থাকবেন, কেননা অন্যান্য দেশেও তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল।

এই পৃথিবীতে ধর্মের জন্যে অনেক বিরোধ, অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, এ কথা স্কুলের ছাত্ররাও জানে। কিন্তু তথাপি এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধর্মগুলো শুরুতে কীরকম ছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্মগুলোর পারস্পরিক তুলনা চিত্তাকর্ষক। তুলনা করলে দেখা যায়, ধর্মসমূহের অন্তর্নিহিত বাণী ও ভাবের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে; অথচ কেন যে লোকে ধর্মের খুঁটিনাটি এবং তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাধায়, ভেবে পাই নে। আসল কথা এই, গোড়ায় ধর্ম যে আকারে থাকে পরবর্তী কালে গোঁজামিল দিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে বিকৃত করে ফেলা হয় এবং শেষকালে ধর্মের প্রকৃত রূপটা চেনাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ধর্মগুরুর স্থান গ্রহণ করে যত নীচমনা ধর্মান্ধ লোক। অনেক সময়ে আবার ধর্ম রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সহায় হয়েছে। প্রাচীনকালে রোমে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের উপরে খুব জোর দেওয়া হত। জনগণ যদি গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় তা হলে তাদের শোষণ করা আর দাবিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার কিনা। ইতালীয় রাজনীতিবিদ্ মেকিয়াভেলি বলেছেন, শাসনব্যাপারেও ধর্মের প্রয়োজন আছে; কর্তব্যের খাতিরে রাজাকেও একটা ধর্ম মেনে চলতে হতে পারে, হোক-না সে ধর্ম ঝুটা। ধর্মের খোলসে সাম্রাজ্যবাদের অভিযান আধুনিক কালেও অনেক হয়েছে। সুতরাং কার্ল মার্ক্স্ যে লিখেছেন, ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিমের মতো, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

যিশু ছিলেন একজন ইহুদি। এই ইহুদিরা এক অদ্ভুত নাছোড়বান্দা জাতের লোক। ডেভিড আর সলোমনের সময়ে ওদের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল; তার পরেই এল দারুণ দুঃসময়। কিন্তু এই স্বল্পকালস্থায়ী শুভক্ষণকেই ইহুদিরা একটা স্বর্ণযুগ বলে কল্পনা করে নিলে; ভবিষ্যতে যথাসময়ে আবার ঐ যুগ ফিরে আসবে, ইহুদিজাতি আবার বড়ো ও ক্ষমতাশালী হবে, এই হল তাদের স্বপ্ন। রোম-সাম্রাজ্য এবং অন্যত্র ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ল; অদূর ভবিষ্যতে একজন মেজায়া বা ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের সঙ্গে তাদের জীবনে শুভদিন আসবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস তারা হারাল না। এদের না ছিল ঘরবাড়ি, না ছিল আশ্রয়; অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন হয়েছে এদের উপরে; হত্যা করা হয়েছে কত ইহুদিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জাতি কী করে দু হাজার বছর-কাল টিঁকে ছিল, বজায় রেখেছিল নিজের বৈশিষ্ট্য, সেটা ইতিহাসে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

ইহুদিরা একজন ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় ছিল এবং সম্ভবত যিশুর উপরেই ছিল তাদের আশাভরসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হল তাদের। যিশু সেই সময়ের আচার-ব্যবহার এবং সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির সমালোচনা করলেন এবং বিশেষ করে ধনী আর ভণ্ড ধর্মধ্বজী ব্যক্তিদের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। ইহুদিরা এসব পছন্দ করল না। কোথায় তিনি তাদের সুখসমৃদ্ধি-লাভের পথ দেখাবেন, তার পরিবর্তে কিনা তিনি অনিশ্চিত এবং কাল্পনিক এক স্বর্গরাজ্য-লাভের জন্য সকলকে বললেন সর্বস্ব ত্যাগ করতে! তাঁর বলার ভঙ্গিটি ছিল নূতন; গল্প ও কাহিনীর ছলে তিনি উপদেশ দিতেন। তবে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি আজন্ম বিপ্লবী। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, তাই তার সংস্কারের জন্যে তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। ইহুদিরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করে নি। সুতরাং অনেকে তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে রোমান গভর্নর পণ্টিয়স পিলেটের হস্তে সমর্পণ করল।

ধর্মের ব্যাপারে রোমানরা ছিল উদার। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাচরণে কোনোরূপ বাধানিষেধ ছিল না, এমনকি দেবদেবীর নিন্দা করলে কিংবা তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও কারও শাস্তি হত না। সম্রাট টিবেরাস বলতেন, দেবতারা যদি অপমানিত হয়েই থাকেন তবে তাঁরা নিজেরাই তার প্রতিকার করবেন। এমতাবস্থায় রোমান গভর্নর পণ্টিয়স পিলেট নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান নি। যিশুকে একজন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী এবং সমাজদ্রোহী-রূপে দাঁড় করানো হল; বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং অবশেষে তাঁকে ক্রুশে

বিদ্ধ করে হত্যা করা হল। তিনি যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর তখনই তাঁর প্রিয় শিষ্যেরাও বিরুদ্ধ-বাদীদের ভয়ে পরিত্যাগ করল তাঁকে। ওদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর ঐ যন্ত্রণাকে যেন আরও দুঃসহ করে তুলল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাতরস্বরে বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে?"

যিশুর বয়স তখন অল্প, সবেমাত্র ত্রিশ বৎসর পার হয়েছে; এই সময়েই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর কাহিনী পড়লে মনে বড়ো ব্যথা লাগে।

খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার হবার পর থেকে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যিশুর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়েছে, যদিও তাঁর ধর্মোপদেশ তারা পালন করে নি। তবে কিনা তাঁকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় তখন প্যালেস্টাইনের বাইরে তাঁর নাম বিশেষ প্রচারিত হয় নি। রোমের অধিবাসীরা তো তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানত না এবং পন্টিয়স পিলেটও এই শোকাবহ ঘটনাকে মোটেই কোনো গুরুত্ব দেন নি।

বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে যিশুর প্রধান প্রধান শিষ্যেরা তাঁকে ধর্মগুরু বলে মানতে অস্বীকার করেছিল, এ কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই অপর এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। এঁর নাম পল; ইনি যিশুকে কখনও দেখেন নি। অনেকের ধারণা, পল যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন তা বস্তুত যিশুর ধর্মোপদেশ থেকে বিভিন্ন। পল পণ্ডিত লোক, তাঁর ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট; কিন্তু যিশুর ন্যায় তিনি সমাজদ্রোহী ছিলেন না। যা হোক, পলের প্রচেষ্টা সফল হল, খৃষ্টধর্ম ধীরে ধীরে প্রচারলাভ করল। প্রথমে রোমানরা এটা খেয়ালের মধ্যেই আনে নি; মনে করেছিল, খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা ইহুদি জাতেরই একটা সম্প্রদায়-বিশেষ। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, এরা যেন বিদ্রোহী আর পরমত-অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে এবং সম্রাটের মূর্তি পূজা করতেও অস্বীকার করছে। রোমবাসীরা কিন্তু তাদের এই মনোভাব সম্যক্ বুঝে উঠতে পারল না। মনে করল, এরা সব মাথা-পাগলা লোক, অশিক্ষিত আর ঝগড়াটে এবং সবরকম উন্নতির বিরোধী। ধর্মের দিক থেকে তারা খৃষ্টধর্মকে মেনে নিতে পারত, কিন্তু খৃষ্টানরা যে সম্রাটের মূর্তিকে পূজা করতে অস্বীকার করল! সেটা তাই রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে রোমানরা মনে করল এবং সেই অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা দিল প্রাণদণ্ড। তার পর শুরু হল অত্যাচার; খৃষ্টানদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, তাদের নিক্ষেপ করা হল সিংহের মুখে। ঐসকল খৃষ্টান শহিদদের কাহিনী হয়তো তুমি পড়েছ, সিনেমায় এসবের ছবিও দেখে থাকবে-বা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কেউ মরতে প্রস্তুত হয়, আর গৌরব বোধ করে ঐ মরণে, তখন তাকে কিংবা তার উদ্দেশ্যকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব। রোম-সাম্রাজ্যও খৃষ্টানদের দাবিয়ে রাখতে পারল না। বস্তুত, এই বিরোধে খৃষ্টানদেরই হল জয়। চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে একজন রোম-সম্রাট খৃষ্টের ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকে এই ধর্মই সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্মরূপে গণ্য হল। এই সম্রাটের নাম কনস্টান্‌টাইন। ইনিই কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর কথা পরে বলব।

খৃষ্টীয় ধর্মের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে যিশুর দেবত্ব নিয়ে শুরু হল ঘোরতর বিরোধ। গৌতমবুদ্ধের বেলায়ও এরকমটা হয়েছিল, সে কথা তোমাকে বলেছি। নিজে কখনও বলেন নি, তিনি দৈবশক্তির অধিকারী, অথচ লোকে তাঁকে দেবতা এবং অবতার-জ্ঞানেই পূজা করে এসেছে। ঠিক সেরকম যিশুও দেবত্ব দাবি করেন নি; পুনঃপুনঃ বলেছেন বটে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, মানুষের সন্তান, কিন্তু এতে করে বোঝায় না যে, তিনি দৈব কিংবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে নিজেকে জাহির করেছেন। মানুষ অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতেই ভালোবাসে। কিন্তু আশ্চর্য, দেবত্ব আরোপ করা হলে পর আর তাঁদের বাণী মেনে চলবার প্রয়োজন বোধ করে না। ছয় শো বৎসর পরে হজরত মহম্মদ আর-একটি বড়ো ধর্ম প্রচার করলেন। আগে থাকতেই সাবধান হলেন তিনি; স্পষ্ট করে বললেন, তিনি মানুষ, দেবতা নন।

কোথায় খৃষ্টানরা যিশুর ধর্মোপদেশ মেনে চলবে, তা না করে তারা ওঁর দেবত্বের স্বরূপ আর ট্রিনিটি বা ত্রিত্বভাব নিয়ে মহা তর্কবিতর্ক জুড়ে দিল, ঝগড়াঝাঁটিও শুরু করল এবং

অবশেষে মারামারি কাটাকাটি। এক সময়ে প্রার্থনার একটা শব্দের উচ্চারণ নিয়ে দুই দলের মধ্যে বেধে গেল ভীষণ সংঘর্ষ এবং তাতে লোকক্ষয় হল বিস্তর। এই সেদিনও পাশ্চাত্যে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের গোলযোগ বিদ্যমান ছিল।

ইংলণ্ড কিংবা পশ্চিম-ইউরোপে খৃষ্টধর্মের বার্তা পৌঁছবার পূর্বেই তার ঢেউ এসে লেগেছিল ভারতবর্ষে। তোমার হয়তো অবাক লাগছে; কিন্তু তা সত্যি। যিশুর মৃত্যুর এক শো বছরের মধ্যেই খৃষ্টান-ধর্মপ্রচারকগণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতে এসে উপস্থিত হল এবং কালক্রমে বহু লোককে তারা দীক্ষা দিল নূতন ধর্মে। ওদের বংশধরগণ আজও পর্যন্ত সেখানে বসবাস করছে। এরা প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোক। বর্তমানে ইউরোপে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই।

ইউরোপের প্রবল এবং শক্তিশালী জাতিসমূহের ধর্ম হল খৃষ্টধর্ম, সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে এই ধর্মকেই বর্তমান যুগের প্রধান ধর্ম বলা চলে। কিন্তু কোথায় যিশু আর কোথায়ই-বা বর্তমান যুগের খৃষ্টানসম্প্রদায়? অহিংসা-নীতির উদ্গাতা এবং সমাজদ্রোহী যিশুর কথা ভাবলে অবাক লাগে। আজ তাঁর ধর্মাবলম্বীরা জোরগলায় সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ, যুদ্ধোপকরণ, আর ধনদৌলতের মহিমা কীর্তন করতেই ব্যস্ত। যিশুর ধর্মোপদেশ, আর বর্তমান কালের ইউরোপ এবং আমেরিকার খৃষ্টীয় ধর্ম—কতই-না প্রভেদ! অনেকের মতে পাশ্চাত্যের তথাকথিত খৃষ্টানদের চেয়ে বাপুজিই খৃষ্টের বাণী বেশি উপলব্ধি করেছেন।

৩২

রোমক-সাম্রাজ্য

২৩শে এপ্রিল, ১৯৩২

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি। ইতিমধ্যে এলাহাবাদের খবরে মন বড়ো খারাপ লেগেছিল, বিশেষ করে তোমার 'দোল আম্মা'র (ঠাকুমা) জন্যে। আমি তো জেলে কতকটা আরামেই আছি, আর ওদিকে আমার বৃদ্ধা রুগ্ণা মাকে কিনা পুলিশ লাঠির আঘাত করল? মনে মনে চটে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই; বরং কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

আজ আবার রোমের কথাই বলব। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রোমের আর-এক নাম দেওয়া হয়েছে—রোমক। ইতিপূর্বে আমরা রোমক প্রজাতন্ত্রের পতন এবং রোম-সাম্রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করেছি। প্রথম রাজার পদে অভিষিক্ত হলেন জুলিয়স সিজারের পোষ্যপুত্র অক্টেভিয়ান। তিনি রাজা হয়ে অগাস্টাস সিজার এই নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজা উপাধি তিনি নিলেন না; ওটা নাকি তাঁর পদমর্যাদার উপযোগী ছিল না; তা ছাড়া প্রজাতন্ত্রের বাইরেকার খোলসটাও তিনি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। 'ইম্পারেটর' অর্থাৎ 'রাজ্যের প্রভু' এই উপাধি তিনি গ্রহণ করলেন। এই কথাটাই শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ-উপাধি-রূপে গণ্য হল। পরে এই কথা থেকেই ইংরেজি 'এম্পারার' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য এমন দুটি শব্দের সৃষ্টি করেছে যা সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা সানন্দে নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। শব্দ দুটি হল 'এম্পারার', আর 'সিজার', 'কাইজার' অথবা 'জার'। প্রথমে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবীতে একই সময়ে একজনের বেশি সম্রাট থাকবে না। রোম-নগরকে সেকালে বলা হত 'মিস্ট্রেস অব দি ওয়ার্ল্ড' বা 'ধরিত্রীর অধিনেত্রী'। রোমের অবস্থা তখন খুব উন্নত; পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা তাই মনে করত, রোমের শক্তি ও প্রভুত্বে সারা পৃথিবী আচ্ছন্ন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা এবং এতে করে ভূবিদ্যা এবং ইতিহাসে তাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। রোম-সাম্রাজ্য ছিল প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয়

সাম্রাজ্য; পূর্বদিকে এর সীমা ছিল মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত। সময় সময় আবার চীন এবং ভারতবর্ষে রোমের চেয়ে বড়ো আর শক্তিশালী রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও সেগুলি ছিল অধিকতর উন্নত। তবে কিনা পৃথিবীর পশ্চিমাংশে রোমই ছিল একমাত্র সাম্রাজ্য এবং প্রাচীনরা ঐ অংশকে একটা পৃথিবী বলেই মনে করত। রোমের তখন দারুণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

রোমের একটা আদর্শ ছিল— সর্বাধিনায়করূপে পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করার আদর্শ। তাই তো রোমের পতন হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্য রক্ষা পেল, রোম-নগর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েও সেই আদর্শটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। এমনকি সাম্রাজ্য যখন একেবারে লোপ পেল, মিলিয়ে গেল ছায়ায়, তখনও আদর্শটা থেকে গেল।

রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখা সহজ ব্যাপার নয়। আমি একটু মুশকিলেই পড়েছি। কত বইয়ে কত কথা পড়েছি, হরেক রকমের তথ্য ও কাহিনীতে আমার মন এলোপাথাড়ি বোঝাই হয়ে আছে; বেছে বেছে কোন্‌টা লিখব আর কোন্‌টা লিখব না, ঠাওর পাচ্ছি নে। অধিকাংশ বই জেলে বসে পড়েছি। বাস্তবিক, জেলে না এলে রোম-সম্পর্কে একখানি প্রসিদ্ধ বই কোনোকালে আমার পড়া হত কি না সন্দেহ। বিরাট বই, নানা কাজের ফাঁকে সময় করে আগাগোড়া পড়া সম্ভব নয়। বইখানি গিবন-নামক জনৈক ইংরেজের লেখা—'দি ডিক্লাইন অ্যান্ড্ ফল অব দি রোমান এম্পায়ার'। দেড় শো বছর পূর্বেকার লেখা বই; এখনও পড়তে ভারি চমৎকার, উপন্যাসের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক। প্রায় দশ বছর পূর্বে লক্ষ্ণৌ-জেলে এই বই পড়তে শুরু করেছিলাম; কিন্তু মাসখানেক পরেই জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল আমাকে, তাই সেবারে বইখানি শেষ করা হয় নি। তার পরে আর সময়ও পাই নি, তা ছাড়া মনের অবস্থাও ঠিক রোম এবং কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের ইতিহাস পড়বার মতো ছিল না; অথচ আর মাত্র শ-খানেক পৃষ্ঠা বাকি ছিল।

কিন্তু সে তো দশ বছর আগেকার কথা এবং এত দিনে অনেক-কিছু হয়তো আমি ভুলে গেছি; তথাপি এখনও অনেক কথা আমার মনে তালগোল পাকিয়ে আছে। যাই হোক, তোমাকে বিভ্রান্ত করব না।

খৃষ্টীয় যুগের অব্যবহিত পূর্বে অগাস্টাস সিজার রোম-সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। প্রথমে কিছুকাল প্রজাতন্ত্রের কাঠামোটা বজায় রইল, সম্রাটগণ সিনেটকে মেনে চললেন। কিন্তু সে বেশি দিনের জন্যে নয়। শীঘ্রই সম্রাট সমস্ত ক্ষমতা নিলেন নিজের হাতে, শুরু হল স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র, লোকে তাদের দেখতে লাগল দেবতার মতো। সম্রাট যত দিন বেঁচে থাকতেন প্রজারা অর্ধ-দেবতা-জ্ঞানে তাঁর পূজা করত; আর মৃত্যুর পরেই তিনি পুরোপুরি দেবত্ব লাভ করতেন। সেকালের সমস্ত লেখকই সম্রাটদের গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সম্রাটরা ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী, বিশেষত অগাস্টাস। তাঁর যুগকে বলা হয় স্বর্ণযুগ, সব-কিছু চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল তখন; শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এই ছিল নীতি। স্বেচ্ছাচারতন্ত্র যে দেশে সে দেশের নিয়মই এই; রাজার প্রশংসা করলে লেখকরা পুরস্কৃত হন! ভার্জিল, ওবিদ, হোরেস, প্রভৃতি লাতিন-গ্রন্থকারগণ সে যুগের লোক। প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে যে গৃহযুদ্ধ আর গোলযোগের শুরু হয়েছিল, সেসমস্ত অবসানের পরে সম্ভবত ব্যবসাবাণিজ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল এবং সভ্যতা কিয়ৎপরিমাণে বিস্তারলাভ করেছিল।

কিন্তু সেই সভ্যতা কীরূপ ছিল, জানো? সে সভ্যতা ছিল ধনীদের একচেটিয়া। আর ঐ ধনীরা ছিল নেহাত স্থূলবুদ্ধি এক দল লোক, সর্বদা আমোদপ্রমোদে মত্ত। বিদেশ থেকে তাদের জন্যে আমদানি হত খাদ্য আর বিলাস-সামগ্রী, আর তার কতই-না আড়ম্বর! এজাতীয় লোক কিন্তু এখনও আছে। জাঁকজমক, আড়ম্বর, শোভাযাত্রা, সার্কাসের খেলা ইত্যাদি লেগেই থাকত, কিন্তু এসবের অন্তরালে জনগণের দুর্দশার অবধি ছিল না। ট্যাক্সের হার খুব বেশি ছিল। শ্রমসাধ্য কাজের ভার ছিল ক্রীতদাসের উপরে। শুনে অবাক হবে যে, ঐ গ্রীক ক্রীতদাসরাই ছিল ধনীদের রোগ-চিকিৎসক এবং এমনকি বিদ্যানুশীলনের ভারও ছিল তাদেরই উপরে। শিক্ষার ব্যবস্থা বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার সংবাদ এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা অতি সামান্যই ছিল।

৬

কত সম্রাট এল আর গেল। সব অকর্মণ্যের দল। ক্রমে ক্রমে সেনা-বিভাগ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল; সম্রাটকে তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। কাজেকাজেই সেনা-বিভাগকে হাতে না রাখলে চলে না, দিতে হয় ঘুষ। সেই ঘুষের জোগাড় হত জনগণকে শোষণ করে। দাসব্যবসা চলত পুরোদমে এবং সেটা ছিল রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান উপায়। প্রাচীন গ্রীসের পবিত্র ডেলস্-দ্বীপ ছিল দাসব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র। দাসরা পরস্পরকে হত্যা করে সকলের সামনে অস্ত্রখেলা দেখাত; কোনো-এক সম্রাট তো একই সময়ে একত্রে বারো শো ক্রীতদাসের খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করতেন!

এই তো রোম-সাম্রাজ্যের সভ্যতা! কিন্তু গিবন তাঁর বইতে কী লিখেছেন, জানো? লিখেছেন: "যদি কাকেও বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা সময়ের উল্লেখ করো যখন মানবজাতি সবরকম সুখসমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছিল, সে নিশ্চয় বিনা দ্বিধায় বলবে, দোমিতানের মৃত্যুর পর থেকে কমোডাসের সিংহাসন-আরোহণের মধ্যবর্তী কাল"—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৯৬ থেকে ১৮০ অব্দের মধ্যবর্তী চুরাশি বছর। আশ্চর্য, গিবন জ্ঞানী লোক হয়েও এমন কথা কী করে বললেন! অধিকাংশ লোকই নিশ্চয় এ কথায় সায় দেবে না। মানবজাতি-অর্থে তিনি প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় পৃথিবীর অধিবাসীদের কথাই বলেছেন; কেননা, ভারতবর্ষ চীন কিংবা প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না।

কিন্তু হয়তো আমি রোম-সম্পর্কে একটু অবিচার করছি। বস্তুত সীমান্তে অহরহ লড়াই চললেও প্রথম দিকটায় সাম্রাজ্যের ভিতরে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। দেশ নিরুপদ্রব হওয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। নাগরিক অধিকার সকলকেই দেওয়া হত; তাই বলে ক্রীতদাসদের নয়। জনগণের বিশেষ-কোনো ক্ষমতা ছিল না, সম্রাটই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজনীতি আলোচনা করলেই রাজদ্রোহের দায়ে পড়তে হত। উচ্চশ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্যে একই আইন এবং একই শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল।

কালক্রমে রোমানরা বড়ো অলস হয়ে পড়ল, যুদ্ধ করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। পল্লী-অঞ্চলের লোক করভারে ক্রমশ দরিদ্র হয়ে পড়ল, নগরবাসীদের অবস্থাও তদ্রূপ। সম্রাট নাগরিকদের খুশি রাখবার চেষ্টা করেন, যাতে-না কোনো ফ্যাশাদ বাধায় ওরা। রোম-নগরের অধিবাসীদের জন্যে বিনা মূল্যে রুটি বিতরণ আর বিনা দর্শনীতে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কত কাল এবং কত জায়গায়ই-বা এই ব্যবস্থা বজায় রাখা চলে? আর ঐ রুটির জোগাড় হত কোথা থেকে জানো? মিশর প্রভৃতি দেশের ক্রীতদাসদের অংশে ভাগ বসিয়ে। সেখান থেকে বিনা মূল্যে ময়দা জোগাড় করা হত।

রোমানরা তো যেন যুদ্ধবিদ্যা ভুলে গেল, কিন্তু সেনাদল রাখতে হবে যে! সৈন্যবিভাগে লোক সংগ্রহ করা হ'ত বর্বর জাতি থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল রোমের শত্রু; এদের দলের লোকরাই সীমান্তে অনবরত গোলযোগ সৃষ্টি করছিল। রোম-নগর যত শক্তিহীন হতে লাগল, এই অসভ্যজাতি তত দুঃসাহসী আর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। পূর্ব-সীমান্ত ছিল অরক্ষিত এবং সেদিক থেকেই ছিল বিপদের আশঙ্কা। অগাস্টাস সিজারের তিন শো বছর পরে সম্রাট কন্স্টান্টাইন এমন এক ব্যবস্থা করলেন যার ফল হল সুদূরপ্রসারী। রোম-নগর থেকে সাম্রাজ্যের রাজধানী তিনি সরিয়ে নিলেন, কৃষ্ণসাগর আর ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী বস্ফোরাস্ উপসাগরের তীরে বাইজেন্টাম্-নগরের নিকটে তিনি এক নূতন শহর গড়ে তুললেন। নিজের নাম অনুসারে তার নাম রাখলেন কন্স্টান্টিনোপ্ল্। তখন থেকে এই নগরই হল রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী। এশিয়ার কোনো কোনো অংশে কন্স্টান্টিনোপ্ল্ আজও 'রুম' নামে পরিচিত।

রোম-সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩২

আজও আমরা রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাসই আলোচনা করব। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে ৩২৬ সনে কন্‌স্টান্‌টাইন কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌-নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীও প্রাচীন রোম থেকে স্থানান্তরিত করেন বস্ফোরাসের তীরে ঐ নূতন রোমে। একবার মানচিত্রের দিকে তাকাও। দেখবে, ইউরোপের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ নগর, সম্মুখে বিরাট এশিয়া মহাদেশ। এই নগর যেন দুটি মহাদেশের সংযোগস্থল। এই নগরকে কেন্দ্র করে স্থল এবং জলপথে ব্যবসাবাণিজ্যের পথ চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শহর আর রাজধানীর পক্ষে এই নগরের অবস্থান চমৎকার। কন্‌স্টান্‌টাইন জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন ভালোই। কিন্তু প্রাচীন রোম-নগর এশিয়া-মাইনর এবং প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে যেমন বেশ খানিকটা দূরে ছিল, তেমনি আবার এই নূতন রাজধানীও বৃটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের দেশসমূহ থেকে অনেকটা দূরে এসে গেল।

ব্যবস্থা হল, দুজন সম্রাট দু জায়গায় শাসনকার্য চালাবেন, একজন রোমে আর একজন কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লে। কিছুকাল এই ব্যবস্থা চলল। কিন্তু এতে করে আবার সাম্রাজ্যটা পূর্ব আর পশ্চিম এই দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পশ্চিম-সাম্রাজ্য বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারল না, যাদের বর্বর জাতি বলা হত তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। গথ, ভেণ্ডাল, হূন প্রভৃতি অসভ্য জাতি পর পর রোম আক্রমণ করল এবং তাতেই পতন হল পশ্চিম-সাম্রাজ্যের। হূন কথাটা তুমি ইতিপূর্বে শুনে থাকবে। ইংরেজরা গত মহাযুদ্ধে জর্মনদের সম্বন্ধে এই কথাটা অহরহ ব্যবহার করেছে; বোঝাতে চেয়েছে যে, জর্মনরা অসভ্য জাতি। বস্তুত, যুদ্ধের সময়ে কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে না; প্রত্যেক জাতিই তার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা ভুলে যায়, নিষ্ঠুর আর বর্বর হয়ে ওঠে। জর্মন, ইংরেজ, ফরাসি জাতি—সকলেই সমান; সবাই নেহাত বর্বরের মতো ব্যবহার করেছে। কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলব?

হূন আর ভেণ্ডাল কথাদুটি গালাগালের শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত এরা যথেষ্ট অসভ্য আর নিষ্ঠুর ছিল, ক্ষতিও করে থাকবে যথেষ্ট। কিন্তু এদের সম্বন্ধে আমরা যা-কিছু জেনেছি তা সবই তো তাদের শত্রুপক্ষ রোমানদের কাছ থেকে। এসব কথা যে পক্ষপাতদুষ্ট নয় তা কী করে বলা যায়? সে যাই হোক, আসল কথা এই যে, ভেণ্ডাল হূন প্রভৃতি জাতির আক্রমণে পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ওদের পক্ষে কাজটা এত সহজ হল কেন, জানো? অতিরিক্ত ট্যাক্সের চাপে আর দেনার দায়ে সাম্রাজ্যের কৃষকসম্প্রদায় একেবারে কাবু হয়ে পড়েছিল, তাই তারা যে-কোনো রকমের একটা পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। এই দেখো-না, আজকাল ভারতবর্ষেও দরিদ্র কৃষিজীবীরা দুঃখদুর্দশায় এরূপ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে যে, তারাও যে-কোনো রকম পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত।

ধ্বংস হল পাশ্চাত্যের রোম-সাম্রাজ্য। কিন্তু হূন আরব তুর্ক প্রভৃতি জাতি পুনঃপুনঃ আক্রমণ করা সত্ত্বেও প্রাচ্যখণ্ডে রোম-সাম্রাজ্য বহু শতাব্দী-কাল টিঁকে রইল। এগারো শো বছর অব্যাহতভাবে এই সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্ক জাতি কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার করে এবং তদবধি এই পাঁচ শো বছর-কাল তুর্কদের অধিকারেই আছে। কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের আর-এক নাম দেওয়া হয়েছে ইস্তাম্বুল। তুর্ক জাতি ঐখানেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা ইউরোপের নানা দেশ জয় করতে করতে ভিয়েনা নগরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য তারা পেছনে হটতে বাধ্য হয়। গত মহাযুদ্ধে তাদের পরাজয় হয় এবং ফলে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ ইংরেজের অধিকারে এসে যায়। কিছুকাল তুরস্কের সুলতান ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে রইলেন। তার পর মহান নেতা মুস্তাফা

কামাল পাশার আবির্ভাব হয়। তাঁর আবির্ভাবে তুর্ক জাতির উদ্ধার হল। তুরস্কে এখন সাধারণতন্ত্র প্রচলিত, সুলতানের পদ লোপ পেয়ে গেছে। কামাল পাশা* এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ তুর্ক-রাষ্ট্রের অন্তর্গত বটে, কিন্তু তার রাজধানী নয়। সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়া থেকে বহু দূরে এশিয়া-মাইনরে অ্যাঙ্গোরা বা আন্‌কারা-নামক স্থানে তুরস্কের রাজধানী স্থাপিত হয়েছে।

এই তো গেল দু হাজার বছরের ইতিহাস। পর পর কত পট-পরিবর্তন! কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ নগর স্থাপন এবং সেখানে রোমক-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা। কন্‌স্টান্‌টাইনের আরও একটা কীর্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি খৃস্টধর্মকে সাম্রাজ্যের অফিশিয়াল বা সরকারি ধর্মে পরিণত করেন। এতে করে খৃস্টধর্মের রূপ গেল বদলে। এতকাল ছিল নিগৃহীত, এক্ষণে গণ্য হল একেবারে রাজকীয় ধর্মে। গোড়ায় একটু গোলযোগ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হল এবং শেষ পর্যন্ত গ্রীক আর লাতিন -সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমতো বিচ্ছেদ ঘটল। লাতিন-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল রোমে; রোমের বিশপ ছিলেন ধর্মগুরু; পরবর্তীকালে বিশপের পরিবর্তে পোপ উপাধির সৃষ্টি হয়েছে। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ছিল গ্রীক-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। লাতিন-সম্প্রদায় উত্তর আর পশ্চিম -ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল; কালক্রমে এরাই রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়েছে। গ্রীক দলকে বলা হত গোঁড়া বা প্রাচীন-মতাবলম্বী সম্প্রদায়। প্রাচ্যখণ্ডে রোম-সাম্রাজ্যের পতনে পরে গোঁড়াপন্থীরা রাশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করেছিল; কিন্তু বলশেভিক মতবাদ প্রচারের পর থেকে সে দেশে কোনো ধর্মই সরকারিভাবে গৃহীত হয় নি।

প্রাচ্যখণ্ডের রোম-সাম্রাজ্যের কথা বলছি বটে, কিন্তু আদতে রোম নগরের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। এমনকি ভাষাও ছিল ভিন্ন; রোমের ভাষা ছিল লাতিন, আর পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হত গ্রীক। পশ্চিম-ইউরোপের সঙ্গে বড়ো-একটা সংযোগ ছিল না; কিন্তু তথাপি এই পূর্ব-সাম্রাজ্য 'রোমান' কথাটি আঁকড়ে ধরে ছিল এবং অধিবাসীদিগকেও বলা হত রোমান। এই শব্দটায় যেন যাদু ছিল! রোম আর শেষকালে সাম্রাজ্যের প্রধান নগর ছিল না, তবু কিন্তু রোমের খ্যাতি কমে নি। এমনকি আক্রমণকারী বর্বর জাতিরাও এই নগরকে সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। নাম আর আদর্শের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে হয় বৈকি!

এর পরে রোম একটা নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করল—সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সাম্রাজ্য। যিশুর শিষ্য পিটার নাকি ছিলেন রোমের প্রথম বিশপ। তাই খৃস্টানদের নিকট রোম ছিল পবিত্র ভূমি, আর বিশপের পদেরও ছিল একটা বৈশিষ্ট্য। সম্রাট কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে চলে যাবার পরে বিশপদের গুরুত্ব গেল বেড়ে। রোমে বিশপের উপরে আর কেউ রইল না; তা ছাড়া পিটারের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে তিনি হলেন সমস্ত বিশপদের নেতা। পরে তাঁর নাম হল পোপ। আজও পোপের পদ বজায় আছে; তিনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নেতা।

রোমান আর গ্রীক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হল মূর্তিপূজা। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মহাপুরুষদের মূর্তি, বিশেষ করে যিশুমাতা মেরির মূর্তি পূজার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু গোঁড়া সম্প্রদায় ছিল তার একান্ত বিরোধী।

রোম কয়েক যুগ উপজাতিগুলোর শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু তারাও অনেক সময়ে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেছে। ক্রমে ধর্মগুরু হিসেবে বিশপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিশপ সম্রাটকে অমান্য করতে শুরু করে। তার পর যখন মূর্তিপূজার প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ বাধল তখন পোপ প্রাচ্য-সাম্রাজ্য থেকে রোমকে বিচ্ছিন্ন করাই স্থির করলেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক-কিছু ঘটনা ঘটে গেছে—আরব দেশে নূতন ইসলামধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে, আরবরা উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেনকে পদদলিত করে ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ

* ১৯৩৯ সনে কামাল পাশার মৃত্যু হয়েছে।

চালাতে শুরু করেছে, উত্তর এবং পশ্চিম-ইউরোপে নূতন নূতন রাজ্য গড়ে উঠছে, আর এদিকে আরবদের আক্রমণে পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের অবস্থা কাহিল।

পোপ ফ্রাঙ্ক্ নামে উত্তরাঞ্চলের এক জর্মন জাতির সাহায্য চেয়ে পাঠালেন; তার ফলে কার্ল্ বা চার্ল্স্ নামে এক ব্যক্তি রোমে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হলেন। এতে করে একটা নূতন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল রোমে; কিন্তু নাম রইল সেই রোমান-সাম্রাজ্য। রোমান না হয়েও যে সাম্রাজ্য থাকতে পারে এ ধারণা তখন লোকের ছিল না। যদিও শার্লামেন বা চার্ল্স্ দি গ্রেটের সংগে রোমের কোনই সম্বন্ধ ছিল না তবুও তিনি উপাধি নিলেন ইম্পারেটর, সিজার এবং অগাস্টাস্। পরে এই নূতন সাম্রাজ্যের নামের সংগে 'হোলি' কথাটি যোগ করা হয়েছিল—হোলি রোমান এম্পায়ার। খৃষ্টধর্মীদের সাম্রাজ্য এবং পোপ ইহার ধর্মগুরু, সুতরাং পবিত্র।

আদর্শের শক্তি অদ্ভুত। মধ্য-ইউরোপের একজন জর্মন কিংবা ফ্রাঙ্ক্ হলেন রোমের সম্রাট। আর এই 'হোলি' বা পবিত্র সাম্রাজ্যের পরবর্তী ইতিহাস আরও অদ্ভুত। কার্যত এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। কত পরিবর্তনই-না এর হল! মাঝে মাঝে লোপ পায়, আবার দেখা দেয়। এ যেন ভূতের সাম্রাজ্য। রোম-নামের জোরে এবং খৃষ্টীয় উপাসকমণ্ডলীর প্রতিপত্তিতে লোকের মুখে-মুখে আর কল্পনায় বেঁচে ছিল। আদতে ওটার অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়। কে যেন, সম্ভবত ভল্টেয়ার, ঐ হোলি রোমান এম্পায়ার বা পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, এটা এমন বস্তু যা হোলি নয়, রোমান নয় কিংবা এম্পায়ারও নয়—এই তিনের কোনোটাই নয়। সেরকম আমাদের দেশের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কে একজন বলেছেন, এটা না ইণ্ডিয়ান, না সিভিল, না সার্ভিস।

কিন্তু তথাপি এই ছায়া-কল্পিত হোলি রোমান এম্পায়ার বা পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য প্রায় এক হাজার বছর-কাল অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল; অবশ্য নামেমাত্র। নেপোলিয়নের সময়ে—এক শো বছর আগে—এই সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অবসান হয়। লোকে তা খেয়ালই করে নি; অনেক কাল ওর প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না কিনা, তাই লোকে এর অবসান জানতেই পারে নি। কিন্তু ভূতটা একেবারে ছেড়ে যায় নি, কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে ছিল মাত্র। কেননা, পরে আবার ঐ ভূত অন্য আকারে—কাইজার জার ইত্যাদি রূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু চোদ্দ বছর আগে গত মহাযুদ্ধে এই ভূতগুলোর অধিকাংশকেই কবর দেওয়া হয়েছে।

৩৪

বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩২

আমার এই চিঠিগুলো পড়ে সম্ভবত তোমার বিরক্তি ধরে গেছে। গত দুটি চিঠিতে কেবল রোম-সাম্রাজ্যের কথাই লিখেছি। হয়তো তুমি ধৈর্য হারিয়েছ। হাজার হাজার বছরের কাহিনী বলেছি; হাজার হাজার মাইল পথ আমাকে আনাগোনা করতে হয়েছে; এতে তোমার মনে যদি কিছু গোলমাল পাকিয়ে থাকে তবে সে দোষ আমার। তুমি ঘাবড়িয়ো না; শুনে যাও। সব-কিছু নাই-বা বুঝলে, ক্ষতি নেই। আমি তো আর তোমাকে ইতিহাস পড়াচ্ছি না? একটা আভাস দিচ্ছি মাত্র। আর, এতে করে তোমার মনে কৌতূহলও জাগবে।

রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিশ্চয়ই তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। অন্তত আমার তো তাই হয়েছে। কিন্তু আজও ঐ সম্পর্কেই কিছুটা আলোচনা করব, তার পর কিছু কাল আর এর উল্লেখ করব না।

অধুনা স্বদেশানুরাগ দেশাত্মবোধ ইত্যাদি কথা খুব শোনা যায়। ভারতবর্ষে আজকাল আমরা সবাই ঘোরতর স্বদেশানুরাগী। ইতিহাসে এই দেশাত্মবোধ জিনিষটি হালে আমদানি হয়েছে। এর উৎপত্তি আর ক্রমবিকাশের কথা আজ আমরা আলোচনা করব। রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে কখনও এ ধরনের ভাব প্রকাশ পায় নি। লোকে মনে করত, রোম-সাম্রাজ্য একটা বিরাট রাষ্ট্র এবং তাই সমগ্র পৃথিবীটাকে শাসন করছে। আসলে কোনোকালে এমন একটি সাম্রাজ্য কিংবা রাষ্ট্র ছিল না যা নাকি সমগ্র পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করেছে। একে তো লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না, তাতে আবার দূরদূরান্তরে যাতায়াত করা ছিল নেহাত দুরূহ ব্যাপার; তাই লোকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল। সাম্রাজ্য গড়ে উঠবার আগে থেকেই ইউরোপে এবং ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে রোম রাষ্ট্রকে সর্বেসর্বা রাষ্ট্ররূপে লোকে কল্পনা করে নিয়েছিল। রোম-সাম্রাজ্যের এতটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল যে, মিশর, পার্গেমাম্, এশিয়া-মাইনরস্থ গ্রীক রাজ্য প্রভৃতির শাসনকর্তারা ঐসকল দেশ রোমকে দান করেছিল। তাদের নিকট রোম ছিল অশেষ পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য। অথচ রোম কোনোকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ ছাড়া আর কোনো দেশ শাসন করে নি। উত্তর-ইউরোপের বর্বর জাতিরা কখনও রোমের অধীনতা স্বীকার করে নি। আধিপত্য যতটুকুই থাকুক-না কেন, বরাবরই বিশ্বরাষ্ট্রগঠনের একটা কল্পনা রোম-সাম্রাজ্যের ছিল। তাই তো রোমান সাম্রাজ্য টি'কে ছিল এত দীর্ঘ কাল এবং সাম্রাজ্য ছায়ায় মিলিয়ে গেলেও তার গৌরব অস্তমিত হয় নি।

বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা শুধু রোমেই ছিল না; প্রাচীন যুগে চীন এবং ভারতবর্ষেও ছিল। দেখা গেছে, অনেক সময়ে চীন রাষ্ট্র আকারে রোম-সাম্রাজ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চীনারা তাদের সম্রাটকে বলত ঈশ্বরের পুত্র এবং তাদের কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বসম্রাট। অবশ্য কতকগুলো উপজাতি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করত না; তাদের বলা হত বর্বর জাতি। রোমানরাও তো উত্তর-ইউরোপের অধিবাসীদিগকে বর্বর জাতি বলত।

সেই প্রাচীন যুগে ভারতেও তথাকথিত বিশ্বসাম্রাজ্যের কল্পনা ছিল; কেননা, ইতিহাসে বিশ্বসম্রাট বা চক্রবর্তী রাজাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। এই বিরাট ভারতবর্ষ দেশটাই ওদের নিকট ছিল পৃথিবী এবং তার অধিনায়ক হওয়া মানেই পৃথিবীর উপর আধিপত্য করা। অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা ছিল বর্বর বা 'ম্লেচ্ছ' জাতি। পৌরাণিক যুগে ভরত একজন রাজচক্রবর্তী ছিলেন। তাঁর নামেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইয়েরা পৃথিবীর অধিরাজ হবার জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন। বিশ্ব-আধিপত্যের একটা প্রতীক ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ। সম্ভবত অশোকের মনেও এরূপ আধিপত্যলাভের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তিনি তো [illegible] পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেড়েই দিলেন। পরবর্তীকালের গুপ্ত-সম্রাট এবং আরও অনেক সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটদে সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে।

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, প্রাচীন যুগেও লোকে বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের কথা ভেবেছে। তার অনেক কাল পরে হয়েছে দেশাত্মবোধ এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব। বর্তমান যুগে আবার বিশ্বরাষ্ট্রের কথা উঠেছে; তবে কিনা, এ ঠিক পৃথিবী-জোড়া একটা সাম্রাজ্য নয়। এ হচ্ছে বিশ্ব-প্রজাতন্ত্র, যেখানে এক জাতি বা শ্রেণী অন্য জাতি বা শ্রেণীকে শোষণ করতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পাবে কি না বলা শক্ত। তবে এ ধরনের কিছু-একটা গড়ে না তুললে পৃথিবী দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

উত্তর-ইউরোপের বর্বর জাতিদের কথা অনেকবার উল্লেখ করেছি। রোমানরা এদের বলত বর্বর, তাই আমি ঐ 'বর্বর' কথাটাই ব্যবহার করছি। অবশ্য এদের চেয়ে রোম-সাম্রাজ্যের কিংবা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা নিঃসন্দেহ অধিকতর সভ্য ছিল। পরে এই বর্বর জাতি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমান যুগের উত্তর-ইউরোপের অধিবাসীরা ঐ বর্বর জাতিদেরই বংশধর।

রোম-সম্রাটদের নাম আমি উল্লেখ করি নি। সংখ্যায় তারা অনেক; অধিকাংশই ছিল নেহাত বদ লোক। তুমি নিশ্চয়ই নিরোর নাম শুনেছ। অনেকে আবার তার চেয়েও পাপিষ্ঠ ছিল।

আইরিন-নাম্নী এক স্ত্রীলোক নিজে সম্রাজ্ঞী হবার জন্যে নিজ পুত্রকে হত্যা করেছিল! এই ব্যাপার ঘটেছিল কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে। \

সম্রাটদের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক ছিলেন মার্কাস্‌ অরেলিয়াস্‌ অ্যান্টনিনাস্‌। দার্শনিক বলে অ্যান্টনিনাসের খ্যাতি ছিল। এঁর মৃত্যুর পরে সম্রাট হল এঁর পুত্র, দুর্বৃত্তের শিরোমণি।

রোম-সাম্রাজ্যে প্রথম তিন শো বছর পাশ্চাত্যের কেন্দ্র ছিল রোম নগর। বিরাট শহর, প্রাসাদোপম অট্টালিকা। দূরদূরান্তর থেকে লোকজনের আনাগোনা। উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বহুমূল্য বস্ত্র ইত্যাদি ভালো ভালো জিনিষ দেশবিদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত। প্রতি বৎসর মিশরের একটি বন্দর থেকে ১২০টি জাহাজ ভারতে (প্রধানত দক্ষিণ-ভারতে) যেত। সেখানে এইসব জাহাজগুলিতে বহুমূল্য মালপত্র বোঝাই করা হত এবং তার পর অনুকূল বায়ুতে সেগুলি মিশরে ফিরে আসত। মিশর থেকে জল এবং স্থলপথে এইসব মালপত্র রোমে প্রেরিত হত। কিন্তু এই ব্যবসাবাণিজ্যে ধনীদেরই লাভ হত বেশি। অধিকাংশ লোকই ছিল গরিব, তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

তিন শো বছর বাদে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ নগরের প্রতিষ্ঠা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে রোমের এমন-কিছু অবদান নেই যা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা বিষয়ে রোমের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল—সে হল আইনশাস্ত্র। পাশ্চাত্যে আইন-ব্যবসায়ীদের আজও রোমান ল' বা রোমক আইন পড়তে হয়; ইউরোপের আইনের ভিত্তি নাকি ঐ রোমান ল'।

বৃটিশ-সাম্রাজ্যকে অনেক সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইংরেজরা নিজেরাই তা করে থাকে, এতে তারা তৃপ্তি পায়। সাম্রাজ্যমাত্রই এক. বহুজনকে শোষণ করেই এর প্রতিপত্তি। কিন্তু রোমান আর ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ একটা সাদৃশ্য আছে—উভয়েরই কল্পনাশক্তির একান্ত অভাব। নিরুপদ্রবে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনের পথে তারা এগিয়ে চলেছে, পৃথিবীটা যেন তাদের ভোগের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে!

৩৫

পার্থিয়া-রাজ্য এবং সসানিদ-রাজবংশ

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩২

রোমক সাম্রাজ্য এবং ইউরোপের কথা ছেড়ে এবার চলো এশিয়ায়। ভারতবর্ষ আর চীন দেশের ইতিহাসও আলোচনা করতে হবে। এতদিনে পৃথিবীতে অন্যান্য অনেক দেশ ইতিহাসের কোঠায় এসে পৌঁচেছে এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলতেই হবে। বাস্তবিক এত দেশের এত কাহিনী আলোচনা করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্য থাকবে কি না সন্দেহ।

ইতিপূর্বে এক চিঠিতে পার্থিয়ায় কেরিয়ার যুদ্ধে রোমক প্রজাতন্ত্রের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের কথা উল্লেখ করেছি। পার্থিয়াবাসীদের সম্বন্ধে কোনো কথা, কীরূপেই বা তারা একটা রাজ্য স্থাপন করল ইত্যাদি, কিছুই তখন বলি নি। বর্তমানে পারশ্য আর মেসোপটেমিয়া যে স্থান অধিকার করে আছে, সেকালে পার্থিয়া রাজ্য সে স্থানেই ছিল। তোমার হয়তো মনে আছে, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকস একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং তা ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমে এশিয়া-মাইনর অবধি বিস্তৃত ছিল। প্রায় তিন শো বছর-কাল সেলিউকসের বংশধরগণ সেখানে রাজত্ব করে; তার পর মধ্য-এশিয়ার একটা জাতি এসে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য দখল করে বসে, এদেরই বলা হয় পার্থিয়ান। এরাই রোমানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল এবং পরবর্তীকালে রোম-সাম্রাজ্য কখনোই এদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে পারে নি। আড়াই শতাব্দী-কাল এরা পার্থিয়ায় রাজত্ব করে; তার পরে শুরু হয় অন্তর্বিদ্রোহ এবং ফলে ওদের

রাজত্বের অবসান ঘটে। পারশিকরা নিজেদের জাতির একজনকে রাজা করল। এই রাজার নাম প্রথম আর্দেশির; তাঁর বংশকে বলা হয় সসানিদ-বংশ। আর্দেশির ছিলেন জরথুস্ত্রপন্থী। জরথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্মই পার্শিদের ধর্ম। প্রথম আর্দেশির পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন না। সসানিদ আর রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত; এমনকি একবার একজন রোমান-সম্রাটকেও তারা বন্দী করেছিল। যুদ্ধ করতে করতে বার-কয়েক পার্শিসৈন্যেরা কন্স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ পর্যন্ত পৌঁচেছিল; একবার তারা মিশরও জয় করে। সসানিদ-সাম্রাজ্যে জরথুস্ত্রধর্মের খুব প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম-ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সসানিদ-সাম্রাজ্য এবং জরথুস্ত্রধর্ম উভয়েরই অবসান হয়। তখন অনেক জরথুস্ত্রপন্থী অত্যাচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে আসে ভারতবর্ষে। কোনো আশ্রয়প্রার্থীকে ভারতবর্ষ কখনও বিমুখ করে নি, সুতরাং এরাও ভারতে বসবাসের স্থান পেল। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে পার্শিসম্প্রদায় আছে তারা ঐ জরথুস্ত্রপন্থীদেরই বংশধর।

বিভিন্ন ধর্মের প্রতি ভারতবর্ষ যে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা দেখিয়েছে তা সত্যি অপূর্ব। এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনাই চলতে পারে না। অতীতে অনেক দেশে, বিশেষ করে ইউরোপে, যারা সরকারি ধর্ম পালন করত না তাদের উপরে নানা জোরজবরদস্তি আর অত্যাচার করা হত। ইতিহাসে দেখতে পাবে, ইউরোপে বিধর্মী দমনের জন্যে বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল; তথাকথিত ডাইনিদের পুড়িয়ে মারা হত। কিন্তু পুরাকালে ভারতবর্ষে পরধর্মে অসহিষ্ণুতা মোটেই ছিল না। হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কিছু কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল বিরোধ বিদ্যমান ছিল তার তুলনায় এ নিতান্ত সামান্য। দুর্ভাগ্যবশত কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে ধর্মগত এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও গোলযোগ শুরু হয়েছে; অনেকে মনে করে যুগযুগান্ত ধরেই ভারতবর্ষে এই ব্যাপার ঘটছে। কিন্তু তারা ভ্রান্ত, ইতিহাসের কথা জানে না বলেই তারা এরূপ মনে করে। এই ধরনের গোলযোগ তো সেদিনের ঘটনা। তুমি দেখতে পাবে, ইসলামধর্মের প্রবর্তনের পরে বহু শতাব্দী-কাল ইসলামধর্মীরা শান্তিতে ভারতবর্ষে বসবাস করেছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কখনও কোনো বিরোধ বাধে নি। ওরা যখন এ দেশে ব্যবসা করতে এল তখন ভারতবর্ষ সমাদরে তাদের গ্রহণ করেছে, বসবাস করতে উৎসাহিত করেছে।

জরথুস্ত্রপন্থীরা ভারতবর্ষে সমাদর লাভ করেছিল যেমন করেছিল ইহুদিরা কয়েক শতাব্দী আগে; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ইহুদিরা অত্যাচারের ভয়ে রোম থেকে পালিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে।

পারস্যে সসানিদ-বংশের রাজত্বকালে সিরিয়া দেশের পাল্‌মিরা-অঞ্চলে একটি ছোটো রাষ্ট্র ছিল; মরুভূমি-অঞ্চলে পাল্‌মিরা ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। এককালে এই রাজ্যও উন্নতি লাভ করেছিল; আজও বিরাট অট্টালিকাসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যে শাসনকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক, নাম জিনোবা। রোমানরা তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রোমে নিয়ে গিয়েছিল।

খৃষ্টীয় যুগের প্রথমে সিরিয়া অতি মনোরম দেশ ছিল। নিউ টেস্টামেণ্টে সিরিয়ার কথা আছে। বড়ো বড়ো শহর, লোকসংখ্যা বিপুল; বিস্তর নদীনালা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারও যথেষ্ট। অথচ শাসনব্যবস্থা ভালো ছিল না, অত্যাচার-অনাচারও ছিল। কুশাসন আর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ছয় শো বৎসরের মধ্যেই এই রাজ্য একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়—শহরগুলো হয় জনমানবহীন, ঘরবাড়ি হয় বিনষ্ট।

যদি বিমানযোগে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ যাও তবে পাল্‌মিরা আর বাল্‌বকের উপর দিয়ে তোমাকে যেতে হবে। বাবিলন কোথায় ছিল তা দেখতে পাবে, এবং অধুনাবিলুপ্ত সেকালের আরও অনেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান।

দক্ষিণ-ভারতের উপনিবেশ-স্থাপন

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩২

দূরদূরান্তের কাহিনী অনেক বলা হল। এখন আবার ভারতের কথাতেই ফিরে আসা যাক; এ দেশে আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী একবার আলোচনা করব। কুষাণ-সাম্রাজ্যের কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। সমগ্র উত্তর-ভারত এবং মধ্য-এশিয়ারও বেশ খানিকটা জুড়ে ছিল এই মহান বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য—পুরুষপুর অথবা পেশোয়ারে ছিল এর রাজধানী। এই সময়েই দক্ষিণ-ভারতেও এক বিরাট সাম্রাজ্য ছিল—অন্ধ্র-সাম্রাজ্য। তিন শো বছর-কাল এই কুষাণ আর অন্ধ্র-রাষ্ট্রের খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুইটি সাম্রাজ্যই লোপ পায়; তার পরে কিছুকাল ভারতবর্ষে কতগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু একশো বছরের মধ্যেই পাটলিপুত্রে আর-এক চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব হল; তিনি উৎকট হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদের আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু গুপ্তবংশের কাহিনী বলবার আগে একবার ভারতের দক্ষিণ অংশের ইতিহাস আলোচনা করা যাক; কেননা, এই অঞ্চলে তখন কয়েকটি বড়ো বড়ো ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, যাতে করে ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ধারা প্রাচ্যের সুদূর দ্বীপসমূহেও গিয়ে পোঁচেছিল।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আকার সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে। উত্তর-অংশ সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে। অতীতে এই অংশের স্থল-সীমান্ত পার হয়ে অনেক শত্রু ও আক্রমণকারী এ দেশে এসেছে এবং সেজন্য এই অঞ্চলকে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হত। কিন্তু পূব পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে বিরাট সমুদ্রোপকূল, এবং ভারতের আকৃতি নীচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে এসে পূব আর পশ্চিম মিশে গেছে কন্যাকুমারী অথবা কুমারিকা অন্তরীপে। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসীদের সমুদ্রের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। আমি পূর্বে তোমাকে বলেছি, দক্ষিণ-ভারত বহু প্রাচীন যুগ থেকেই পাশ্চাত্যের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য চালাত। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে জাহাজ-শিল্পের প্রচলন ছিল; লোকে বাণিজ্য উপলক্ষে এবং হয়তো এ্যাডভেঞ্চার বা অসমসাহসিক কার্যের উদ্দেশ্যেই সমুদ্র-পাড়ি দিত। গৌতমবুদ্ধের সময়ে বিজয়সিংহ ভারতবর্ষ থেকে সিংহলে গিয়ে সে দেশ জয় করেছিলেন। মনে পড়ে, অজন্তাগুহায় যেন একখানি চিত্র আঁকা আছে, তাতে দেখানো হয়েছে, বিজয় হাতিঘোড়া-সহ জাহাজে করে সিংহলে যাচ্ছে। বিজয় এই দ্বীপের নাম দিলেন সিংহল। 'সিংহ' কথা থেকে 'সিংহল' শব্দের উৎপত্তি; ওখানে আজও একটা সিংহের গল্প প্রচলিত আছে। সিংহল থেকে ইংরেজি 'সিলোন' নামের উৎপত্তি হয়েছে, এরূপ আমার আন্দাজ।

দক্ষিণ-ভারত থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিংহল যাওয়া অবশ্য তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কথা এই যে, সে যুগে ভারতে জাহাজনির্মাণ-শিল্পের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমুদ্রোপকূলে অনেক বন্দর ছিল এবং লোকে ঐসকল বন্দর থেকেই সাগর পাড়ি দিত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তমৌর্যের মন্ত্রী চাণক্য -লিখিত অর্থশাস্ত্রের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে লিখেছি; চাণক্য তাতে নৌবিভাগের উল্লেখ করেছেন। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিসের বর্ণনায়ও তার উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৌর্য-বংশের রাজত্বের শুরুতেই ভারতে জাহাজনির্মাণ-শিল্প খুব প্রসার লাভ করেছিল। আর ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই তো জাহাজ নির্মিত হয়েছিল? তা হলে নিশ্চয়ই বহু লোক ঐ যুগে জাহাজে করে সমুদ্র-পারাপার করেছিল। বাস্তবিক, এসব কথা ভাবলে অবাক লাগে; কিন্তু তবু দেখো, এখনও এমন লোক আছে যারা সমুদ্রযাত্রা করতে ভয় পায় এবং সেটা ধর্মবিরুদ্ধ বলে মনে করে! তবে সুখের বিষয়, এ ধরনের অদ্ভুত মনোভাব ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারতের সংগেই বেশি চলত। তামিল-

চীন
ফরমোজা
ফিলিপাইন
ভারতবর্ষ
ব্রহ্মদেশ
শ্যাম
আঙ্কোর
কাম্বোডিয়া
সিংহল
মালয় উপদ্বীপ
সিঙাপুর
বোর্ণিও
সেলিবিস
সুমাত্রা
জবদ্বীপ
শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য
হিমালয় পর্বতমালা
ভারতের উপনিবেশ-স্থাপন
(শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্যের বিবরণ ৪৬শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)
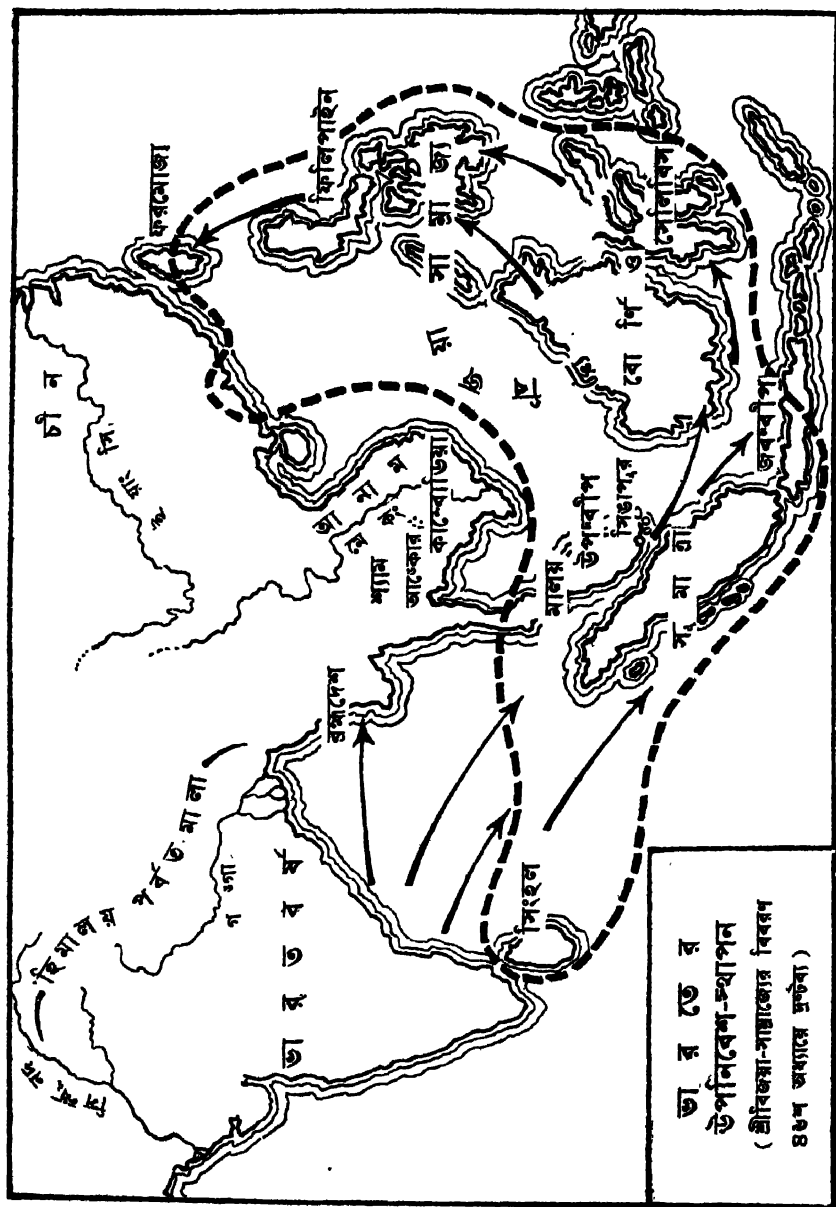
কবিদের রচনায় 'যবন'দের মদ, পাত্রাদি এবং ল্যাম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'যবন' কথাটা প্রধানত গ্রীকদের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হত, তবে হয়তো এতে সমস্ত বিদেশীকেই বোঝাত। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে অন্ধ্র-সাম্রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রাসমূহে দুই মাস্তুলের একটা জাহাজের চিত্র আঁকা থাকত; এতেই বোঝা যায় সেই প্রাচীন যুগে অন্ধ্রবাসীরা জাহাজনির্মাণ-ব্যাপারে আর সামুদ্রিক বাণিজ্যে কতটা অগ্রসর হয়েছিল।

সুতরাং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দক্ষিণ-ভারত জাহাজ-শিল্প আর সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ উদ্যোগী হওয়ার ফলেই প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করতে পেরেছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই এই উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয় এবং কয়েক শো বছর ধরে এ কাজ চলে। মালয় জাভা সুমাত্রা কম্বোডিয়া বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ-সমূহের সর্বত্রই ভারতীয়েরা বসবাস করতে শুরু করে; তাদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির ধারা সেখানে গিয়েছিল। ব্রহ্মদেশ শ্যাম এবং ইন্দোচীনেও ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করে। অনেক স্থলে তারা নূতন শহর এবং বাসস্থানকে ভারতীয় নাম দিয়েছে—যেমন, অযোধ্যা হস্তিনাপুর তক্ষশীলা গান্ধার ইত্যাদি। অ্যাংলো-স্যাক্সনরাও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে ইংরেজি ধরনে অনেক স্থানের নামকরণ করেছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এইভাবেই ঘটে। তাই আজও যুক্তরাষ্ট্রে সেই পুরোনো আমলের ইংরেজি শহরের নাম দেখতে পাওয়া যায়।

ঐ ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ যেখানেই গেছে সেখানেই অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে; অবশ্য ঔপনিবেশিকমাত্রেই এরূপ অন্যায় ব্যবহার করে থাকে। প্রথমে কিছুকাল তারা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব করল, শোষণ করল তাদের। তার পরে কিন্তু নবাগত আর আদিম অধিবাসীরা পরস্পর মিলেমিশেই থাকতে লাগল; কেননা, ঔপনিবেশিকদের পক্ষে সদাসর্বদা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে হিন্দু- রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য স্থাপিত হল; পরে আবার বৌদ্ধ-রাজারা আসতে লাগল; তখন আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে হিন্দু আর বৌদ্ধদের মধ্যে শুরু হল বিবাদ-বিসংবাদ। সে অনেক কথা—বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। কত বিরাট বিরাট অট্টালিকা আর মন্দির ছিল ঐ ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে; এখনও তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কত বড়ো বড়ো শহর—কম্বোজ শ্রীবিজয় আঙকর প্রভৃতি; ভারতীয় মিস্ত্রি আর কারিগররাই ঐসকল শহর নির্মাণ করেছিল।

এইসকল দ্বীপে হিন্দু আর বৌদ্ধ -রাষ্ট্রগুলো প্রায় চোদ্দ শো বছর-কাল টিঁকে ছিল; কিন্তু অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত এবং অনেক সময়ে আবার হাত-বদল হত, কোনোটা-বা ধ্বংস হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা সব দখল করে বসল; তার পরে ক্রমে পর্তুগিজ, স্পেন দেশের লোক, ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের আবির্ভাব হল; সর্বশেষে এল আমেরিকানরা। প্রতিবেশী-রাজ্য হিসাবে চীন তো ছিলই; কখনও ওদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে, কখনও-বা দখল করেও বসেছে; তবে অধিকাংশ সময়েই চীনারা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রাচ্যের হিন্দু-উপনিবেশগুলির সম্পর্কে আলোচনা করলে কতগুলি ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধান কথা এই যে, উপনিবেশ স্থাপনের মূলে ছিল দক্ষিণ-ভারতের তৎকালীন একটি প্রধান রাজ্য; এইটেই সব ব্যবস্থা করেছিল। প্রথমে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো আবিষ্কারক ঐসমস্ত দ্বীপে গিয়েছিল; পরে বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) এবং পূর্ব-উপকূলের লোকেরাই নাকি আগে গিয়েছিল। বাংলা দেশ থেকেও সম্ভবত কতক লোক গিয়েছিল। কথিত আছে, গুজরাটের কতক অধিবাসীকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাতে ওরা এইসকল দ্বীপে চলে যায়। তবে এ সবই অনুমানমাত্র। দক্ষিণে তামিলখণ্ডে তখন পহ্লব-বংশের রাজত্ব; ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ঐ পহ্লবরাজ্যের অধিবাসী এবং এই পহ্লবী গবর্মেণ্টই উপনিবেশ-স্থাপনের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিল। হয়তো এর একটা কারণও ছিল; উত্তর-ভারত থেকে অনেক লোক দক্ষিণে চলে আসে এবং তাতে দক্ষিণ-অঞ্চলে লোকসংখ্যা দারুণ বেড়ে যায়; এই চাপে

পড়েই হয়তো উপনিবেশের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কারণ যাই থাক্-না কেন, রীতিমতো পরিকল্পনা করেই যে এই দূরবর্তী দ্বীপসমূহে উপনিবেশ-স্থাপনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি আরও অনেক দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। সবগুলোই পহ্লবী উপনিবেশ, নামও ছিল ভারতীয়। ইন্দোচীনে উপনিবেশটির নাম দেওয়া হয়েছিল কম্বোজ, কাবুল-উপত্যকায় গান্ধার-অঞ্চলের একটি স্থানের নামানুসারে। ঐ কম্বোজ উপনিবেশই বর্তমানে কম্বোডিয়া নামে পরিচিত।

চার-পাঁচ শো বৎসর-কাল এইসমস্ত উপনিবেশে হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল; পরে ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। অনেক কাল পরে কতকগুলি অংশে মুসলিমধর্মের প্রসার হয়, অন্য অংশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থেকে যায়।

কত রাজ্য আর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হল এই উপনিবেশগুলিতে। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের একটা ফল হল এই যে, পৃথিবীর এ অংশে ভারতীয় আর্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করল। বর্তমান যুগের ওখানকার অধিবাসীরা ভারতীয় সভ্যতার আবহাওয়াতেই জন্মেছে, এ কথা বলা যেতে পারে। তবে অন্যান্য দেশের প্রভাবও ছিল, বিশেষ করে চৈনিক প্রভাব। ভারতীয় আর চৈনিক প্রভাবের একটা অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে ঐ অঞ্চলে। কোনো কোনো দ্বীপে ভারতীয় প্রভাব, আবার কোনোটাতে চীনের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়; যেমন—ব্রহ্মদেশ শ্যাম এবং ইন্দোচীনে চৈনিক প্রভাব বেশি, কিন্তু মালয়ে নয়। ওদিকে জাভা সুমাত্রা এবং অন্যান্য দ্বীপে ভারতীয় প্রভাব প্রবল।

কিন্তু বিরোধ কোথাও ছিল না। ভারতীয় আর চৈনিক প্রভাব—পরস্পরের সঙ্গে বৈষম্য ছিল প্রচুর। অথচ পাশাপাশি উভয়েরই কাজ চলেছে, সংঘর্ষ বাধে নি কখনও। ধর্ম সম্পর্কে অবশ্য কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা হিন্দুধর্মই হোক আর বৌদ্ধধর্মই হোক, ভারতবর্ষ ছিল ধর্মের উৎস। এমনকি ধর্মের ব্যাপারে চীনও ভারতের কাছে ঋণী। শিল্পকলার দিক থেকেও ভারতীয় প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা গেছে; ইন্দোচীনে তো চীনেরই প্রতিষ্ঠা বেশি, অথচ সেখানকার ঘরবাড়ি সবই ছিল ভারতীয় ধরনে তৈরি। এইসকল স্থানের শাসনপদ্ধতিটা নিয়ন্ত্রণ করেছে চীন দেশ এবং সেইসঙ্গে সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রণালীও। তাই তো চীনের সঙ্গেই ব্রহ্ম ইন্দোচীন আর শ্যামদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কটা ভারতের চেয়ে বেশি। ওদের শরীরে মঙ্গোলীয় রক্তের ভাগ অধিক এবং সেই কারণেই দেখতে কতকটা চীনাদের মতো।

জাভায় বরবদুর-নামক স্থানে বড়ো বড়ো বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়; এইসকল মন্দির নির্মাণ করেছিল ভারতীয় মিস্ত্রি। বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর চিত্র মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা—ভারতীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতীয় প্রভাব ফিলিপাইন এবং ফরমোসা দ্বীপেও বিস্তার লাভ করেছিল। এই দ্বীপগুলো কিছুকাল সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে ফিলিপাইন দ্বীপ স্পেনের অধীনে যায় এবং বর্তমানে আমেরিকার শাসনাধীনে। ম্যানিলা এর রাজধানী। কিছু কাল আগে ওখানে নূতন আইনসভাগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে; তার সম্মুখভাগে খোদাই করা চারটি মূর্তি। তন্মধ্যে একটি প্রাচীন ভারতের আইনস্রষ্টা মনুর, দ্বিতীয়টি চীনের দার্শনিক লাওৎসি; অপর দুটি অ্যাংলো-স্যাক্সন আইন ও বিচারবিধি, এবং স্পেন দেশের প্রতীক। এই মূর্তিগুলি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ফিলিপাইন ঐ চারটি দেশের কাছ থেকে তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা লাভ করেছে।

গুপ্তযুগে হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদ

২৯শে এপ্রিল, ১৯৩২

দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা যখন মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরদূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করছিল, উত্তর-ভারতে তখন চলছিল অশান্তি আর গোলযোগ। কুষাণ-সাম্রাজ্যের সে পরাক্রম আর নেই, পতন শুরু হয়েছে। সমগ্র উত্তর-অঞ্চল জুড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্র; শক, তুর্কি প্রভৃতি জাতির বংশধরগণের সেখানে আধিপত্য। এইসকল জাতির লোকেরা ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; তারা লুটপাট করতে ভারতে আসে নি, এসেছিল বসবাস করতে। ভারতে এসে তারা এ দেশের তৎকালীন আচার-ব্যবহার ঐতিহ্য ইত্যাদি গ্রহণ করল। তাদের ধর্ম সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্যে তারা ভারতের কাছে ঋণী। কুষাণরাও ইন্দো-আর্য আচার-ব্যবহার ও কৃষ্টি গ্রহণ করেছিল বলেই এতকাল ভারতে রাজত্ব করতে পেরেছিল। তাদের আচার-ব্যবহার ছিল ইন্দো-আর্যদের মতো; এ দেশের অধিবাসীরা যাতে তাদের বিদেশী বলে মনে না করতে পারে, সে চেষ্টা তারা করেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা সে কথা ভুলতে পারে নি, বিদেশীদের শাসনাধীনে থেকে তাদের মনে ছিল দারুণ ক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত এরাই একজন ক্ষমতাশালী নেতার সন্ধান পেল এবং আর্যাবর্তকে স্বাধীন করবার জন্যে শুরু করল ধর্মযুদ্ধ।

এই নেতার নাম চন্দ্রগুপ্ত। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত বলে একে ভুল কোরো না যেন। এ ব্যক্তি মৌর্য-বংশের কেউ নয়। অশোকের বংশধরগণ তখন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। মনে রাখবে, আমরা এখন খৃষ্টজন্মের পরবর্তী চতুর্থ শতকের কথা বলছি—৩০৮ খৃষ্টীয় সনের কথা। এর ৫৩৪ বৎসর পূর্বে অশোকের মৃত্যু হয়েছে।

যে চন্দ্রগুপ্তের কথা বলছি তিনি ছিলেন পাটলিপুত্রের ছোটোখাটো একজন রাজা। লোকটি খুব কর্মদক্ষ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য সামন্ত রাজাদের নিয়ে তিনি একটি যৌথরাষ্ট্র গঠন করতে মনস্থ করলেন। বিখ্যাত লিচ্ছবি-বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে তিনি বিয়ে করলেন এবং তাতে লিচ্ছবি-রাজ্য তাঁর পক্ষে যোগ দিল। এইভাবে গোড়াঘর বেঁধে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে সমস্ত বৈদেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ক্ষত্রিয়রা এবং উচ্চবংশোদ্ভব আর্যরা বৈদেশিক শাসনাধীনে সব রকমে খাটো হয়ে ছিল; তারাও সমর্থন করল চন্দ্রগুপ্তকে। প্রায় বছর বারো লড়াই করে তিনি উত্তর-ভারতের এক অংশে আধিপত্য স্থাপন করলেন; এখনকার যুক্তপ্রদেশ ঐ অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে রাজাধিরাজ বলে ঘোষণা করলেন।

এইভাবেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সৃষ্টি। এ বংশের রাজত্বকাল দু শো বৎসর। এই সময়ে উৎকট হিন্দুয়ানি আর জাতীয়তাবাদের বিকাশ দেখা গিয়েছিল। তুর্কি পার্থীয় এবং অনার্য বৈদেশিক শাসকদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হল, উদ্ভব হল জাতিগত বিরোধ। ইন্দো-আর্যদের ছিল জাতের বড়াই; বর্বর আর ম্লেচ্ছদের তারা ঘৃণা করত। গুপ্ত-সাম্রাজ্য এই ইন্দো-আর্যদের যদিও-বা কতকটা রেহাই দিল, অনার্যদের মোটেই ক্ষমা করল না।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পিতার চেয়েও কুশলী যোদ্ধা এবং দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নানা দেশ জয় করতে শুরু করলেন; এমনকি দক্ষিণ-ভারতের অনেক রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এইরূপে ভারতের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন। তিনি শক কিংবা তুর্কি রাজাদের পরাজিত করে কাথিয়াওয়াড় এবং গুজরাট জয় করেন। তাঁর এক উপাধি ছিল 'বিক্রমাদিত্য', এবং এই নামেই তিনি সবিশেষ পরিচিত। তবে 'সিজার' নামের মতো এই 'বিক্রমাদিত্য' নামও অনেক রাজাই গ্রহণ করেছিলেন; সুতরাং এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার।

দিল্লিতে কুতবমিনারের নিকটে এক বিরাট লৌহস্তম্ভ দেখে থাকবে। ওটা নাকি বিক্রমাদিত্যের জয়স্তম্ভ, তিনিই তৈরি করিয়েছেন। স্তম্ভের কারুকার্য চমৎকার; চূড়ায় একটি পদ্মফুল, সাম্রাজ্যের প্রতীক।

গুপ্ত-রাজাদের আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদ প্রবল ছিল। আর্যসভ্যতা আর সংস্কৃত-বিদ্যানুশীলনের তখন খুব প্রচলন হয়। গ্রীক কুষাণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতিগুলি ভারতীয় জীবন এবং সভ্যতায় যে গ্রীক মঙ্গোলীয় প্রভাব আমদানি করেছিল সেটা অপসারণ করে দিয়ে তার পরিবর্তে ইন্দো-আর্য ঐতিহ্যের উপরেই জোর দেওয়া হল বেশি।

সরকারি ভাষা ছিল সংস্কৃত, কিন্তু তা সাধারণের কথ্য ভাষা ছিল না। প্রচলিত ভাষা ছিল প্রাকৃত, সংস্কৃতেরই জ্ঞাতি। তথাপি সংস্কৃত খুব জীবন্ত ভাষা ছিল; সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং ইন্দো-আর্য শিল্পকলা খুব সমৃদ্ধ ছিল। বেদ এবং মহাকাব্যের যুগের পরে সম্ভবত সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগই শ্রেষ্ঠ। কালিদাস এই যুগের কবি। সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শিল্পী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের কথা তুমি শোনো নি কি? কথিত আছে, কবি কালিদাস ঐ নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। দিগ্বিজয়ের পক্ষে তিনি সম্ভবত অযোধ্যাকেই উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেছিলেন; আর হয়তো-বা বাল্মীকি-কৃত মহাকাব্যের অমর কাহিনীও তাঁকে ঐ প্রেরণা দিয়ে থাকবে।

গুপ্ত-সম্রাটগণ হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁদের তেমন সুনজর ছিল না। ক্ষত্রিয় এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী, আর বৌদ্ধধর্ম ছিল জনগণের ধর্ম; তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মের মহাযান-মতবাদের সঙ্গে উত্তর-ভারতের কুষাণ এবং অন্যান্য বিদেশী শাসকদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তথাপি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে নি। তখনও বৌদ্ধাশ্রমগুলোই ছিল প্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সিংহলের বৌদ্ধরাজা মেঘবর্ণ বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়ে সমুদ্রগুপ্তকে সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং সিংহলী ছাত্রদের জন্যে একটি বৌদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গয়াতে।

কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটল। ক্রমশ হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়াতেই এটা হল; তৎকালীন রাজশক্তির চাপে কিংবা ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নয়।

চীনের বিখ্যাত পর্যটক ফাহিয়েন এই সময়ে ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি এ দেশে আসেন। ফাহিয়েন ভারতের নানা স্থান পর্যটন করে সেই সময়ের এক বিবরণ লিখে গেছেন। সেই বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, গুপ্ত-রাজাদের আমলে মগধের লোকেরা বেশ সুখেশান্তিতে বাস করত; দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল না। কপিলাবস্তু তখন জঙ্গলাকীর্ণ; গয়ার অবস্থাও তথৈবচ, লোকজনের বসতি ছিল না; কিন্তু পাটলিপুত্রের তখন খুব সমৃদ্ধ অবস্থা। দেশের নানা স্থানে বড়ো বড়ো বৌদ্ধ-শ্রমণাশ্রম; তা ছাড়া ছিল বিশ্রামগৃহ পান্থশালা হাসপাতাল এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

ভারতবর্ষ পর্যটন করে ফাহিয়েন সিংহলে যান এবং সেখানে দু বছর থাকেন। সিংহল থেকে তিনি সমুদ্রপথে দেশে ফিরেছিলেন। তাঁর সঙ্গী তাও-চিঙ আর নিজের দেশে ফিরলেন না, ভারতেই থেকে গেলেন; এ দেশটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য তেইশ বৎসর-কাল রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত রাজত্ব করেন চল্লিশ বছর-কাল। তাঁর পরে স্কন্দগুপ্ত ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁকে নূতন এক উপদ্রবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ঐ উপদ্রবের ফলেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল। সে কাহিনী পরের চিঠিতে বলব।

গুপ্তযুগে চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কারুকার্যখচিত মন্দির, অজন্তার চিত্রাবলী ইত্যাদিতে অদ্যাপি তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতে যখন গুপ্ত-বংশের রাজত্ব তখন পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অবস্থাটা কী ছিল? কনস্টান্টিনোপ্‌লের স্থাপয়িতা কন্‌স্টান্‌টাইন দি গ্রেট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। পরবর্তী গুপ্ত-রাজাদের যুগেই রোম-সাম্রাজ্য দু ভাগ হয়ে যায় এবং পরিশেষে উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতি পাশ্চাত্যের রোম-সাম্রাজ্য দখল করে। দেখা যাচ্ছে, যখন রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটছে ভারতে তখন স্বর্ণযুগ—পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য, বড়ো বড়ো যোদ্ধা, বিপুল সেনাবাহিনী। অনেকে সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' নাম দিয়েছেন; কিন্তু যদিও তিনি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ভারতের বাইরে দিগ্‌বিজয়ের কথা কখনও তিনি মনে স্থান দেন নি।

গুপ্তযুগ উৎকট সাম্রাজ্যবাদ, অধিকার আর যুদ্ধজয়ের যুগ। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই এরূপ সাম্রাজ্যবাদের যুগের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না। গুপ্ত-রাজাদের আমলে ভারতে শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে নবজাগরণের অপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শুধু এইজন্যেই ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক স্মরণীয় যুগ।

৩৮

ভারতে হূন-উপদ্রব

৪ঠা মে, ১৯৩২

গত চিঠিতে ভারতে নূতন এক উপদ্রবের কথা বলেছিলাম। সে হচ্ছে, হূন-নামক এক জাতির উপদ্রব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে ওরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ইতিপূর্বে রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে একবার হূনদের উল্লেখ করেছিলাম। এত্তিলা নামে একটি লোক ছিল ইউরোপে এদের নেতা। এই লোকটি অনেক বৎসর রোম আর কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে নানা উপদ্রব আর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এই হূনদেরই একটা শাখা ঐ সময়েই ভারতে আসে। ওরা মধ্য-এশিয়াবাসী এক বর্বর যাযাবর জাতি, শ্বেত-হূন নামে পরিচিত। অনেককাল যাবৎ এরা ভারতের সীমান্তে অত্যাচার করছিল, সম্ভবত পেছন থেকে আর-এক জাতির তাড়া খেয়ে হঠাৎ দলে দলে প্রবেশ করে ভারতে। গুপ্ত-সম্রাট স্কন্দগুপ্ত এই হূনদের আক্রমণে বাধা দেন, যুদ্ধে পরাস্ত করে একেবারে হটিয়ে দেন ওদের। কিন্তু বছর-বারো পরে হূনেরা আবার ফিরে আসে; ছড়িয়ে পড়ে গান্ধার এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য অংশে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপরে এরা অকথ্য অত্যাচার করেছিল।

পরবর্তী গুপ্ত-রাজাদের সঙ্গে হূনদের যুদ্ধ লেগেই ছিল; কিন্তু এদের একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। হূনেরা মধ্য-ভারতেও ছড়িয়ে পড়ল এবং তাদের দলপতি তোরামানকে রাজা করল। তোরামান লোকটি ভালো ছিল না। তার পুত্র মিহিরকুল ছিল নিতান্ত বর্বর আর দারুণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। কহ্লন তাঁর কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'তে রাজা মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন: পাহাড়ের চূড়া থেকে হাতিগুলোকে নীচের উপত্যকায় ফেলে দেওয়া হত এবং এতে মিহিরকুল খুব আমোদ পেত। তার অত্যাচারে সমগ্র আর্যাবর্ত খেপে গেল। অবশেষে গুপ্ত-সম্রাট বালাদিত্য আর মধ্য-ভারতের রাজা যশোধর্মন সম্মিলিতভাবে মিহিরকুলকে আক্রমণ করলেন; যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মিহিরকুল বন্দী হল। বালাদিত্য প্রকৃত বীরের মান রাখতে জানতেন, তাই তিনি মিহিরকুলকে মুক্তি দিয়ে এ দেশ ছেড়ে যেতে বললেন। কিন্তু মিহিরকুলের স্বভাব যাবে কোথায়? সে লুকিয়ে রইল কাশ্মীরে এবং পরে এক সময়ে সুযোগমতো বালাদিত্যকে আক্রমণ করল!

ভারতে হূনদের শক্তি খর্ব হল। কিন্তু হূন-বংশ একেবারে লোপ পেল না, কতক থেকে গেল, মিশে গেল আর্য অধিবাসীদের সঙ্গে। রাজপুতানা এবং মধ্য-ভারতের কোনো কোনো রাজপুত-বংশের মধ্যে অদ্যাপি শ্বেত-হূনদের রক্তের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

হূনেরা ভারতে বেশি দিন রাজত্ব করতে পারে নি, এমনকি পঞ্চাশ বৎসরও নয়। অতঃপর তারা শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করল। কিন্তু তাদের যুদ্ধবিগ্রহ এবং তার ভয়াবহতা আর্যদের মনে স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। ওদের জীবনযাত্রা ও শাসনপ্রণালী ছিল আলাদা ধরনের, ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে খাপ খায় নি। আর্যরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি; রাজাকেও জনগণের ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়াতে হত; গ্রাম্য সংসদের হাতে ছিল প্রচুর ক্ষমতা। কিন্তু হূনদের সঙ্গে একত্র থেকে আর্যদের উন্নত আদর্শও খর্ব হয়েছিল।

গুপ্তবংশের শেষ সম্রাট বালাদিত্যের মৃত্যু হয় ৫৩০ খৃষ্টাব্দে। তিনি হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এমনকি, একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে তিনি গুরু মেনেছিলেন। গুপ্তযুগে কৃষ্ণপূজার খুব প্রচলন ছিল, কিন্তু তবুও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে নি।

গুপ্ত-বংশ রাজত্ব করেছিল দু শো বছর-কাল। এর পরে সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল; সবাই স্বাধীন, কেন্দ্রে কর্তৃত্ব ছিল না কারও। এ গেল উত্তর-ভারতের অবস্থা। ওদিকে দক্ষিণ-ভারতে তখন বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে, চালুক্য-সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন পুলকেশী নামে এক রাজা; ইনি নিজেকে রামচন্দ্রের বংশধর বলে মনে করতেন। প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে অবস্থিত উপনিবেশগুলির সঙ্গে দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ভারত ও উপনিবেশগুলির মধ্যে সদাসর্বদাই যাতায়াত চলত। ভারতীয় জাহাজ নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে পারশ্যেও যেত হামেশাই। চালুক্য-সাম্রাজ্য আর পারশ্যের মধ্যে রাজদূতের বিনিময় ছিল।

৩৯

বিদেশী বাজারে ভারতের প্রতিষ্ঠা

৫ই মে, ১৯৩২

দেখা যাচ্ছে, ঐ প্রাচীন যুগেও ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য পাশ্চাত্যে ইউরোপ আর পশ্চিম-এশিয়া এবং প্রাচ্যে চীন অবধি বিস্তার লাভ করেছিল, এবং তা বজায় ছিল হাজার বৎসরেরও অধিক কাল। এর কারণ কী? সে যুগে ভারতবাসীরা যে উৎকৃষ্ট নাবিক আর ব্যবসায়ী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, শিল্পনৈপুণ্যেও তাদের ছিল। কিন্তু শুধু ঐ কারণেই যে বিদেশের বাজারে তারা একচেটিয়া ব্যবসা করত তা নয়। আসল কারণ হল এই, ভারতবর্ষ তখন রসায়ন-শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, বিশেষত রঞ্জনশিল্পে। সে যুগের ভারতবাসীরা পাকা রঙ তৈরি করতে জানত এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি রঙাত। একরকম গাছগাছরা থেকে তৈরি হত নীল রঙ। এই নীল কথাটার উদ্ভব হয়েছে ভারতবর্ষে। ইস্পাতের ব্যবহারও জানা ছিল এ দেশে, নানাবিধ সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি হত ইস্পাত দিয়ে। আলেকজান্ডারের আক্রমণ সম্বন্ধে পারশ্যে কতকগুলো প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে; তাতে যেখানেই উৎকৃষ্ট তরবারি আর ছোরার উল্লেখ আছে সেখানেই বলা হয়েছে, ওগুলো ভারতে তৈরি। অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতে প্রস্তুত এইসমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট ছিল বলেই বিদেশের বাজারে তার প্রতিষ্ঠা ছিল। যে শস্তায় ভালো জিনিষ তৈরি করবে বাজারে তার মালের কাটতি অপেক্ষাকৃত বেশি হবেই; অন্যেরা তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। এ তো স্বাভাবিক। এই কারণেই তো গত দু শো বছরের মধ্যে ইউরোপ এশিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে। নূতন নূতন উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের ফলে কত অভিনব যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে ইউরোপে, নির্মাণপ্রণালীরও হয়েছে কত পরিবর্তন। তাই তো ইউরোপ আজ পৃথিবীর বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বিপুল অর্থের অধিকারী আর শক্তিশালী হয়েছে। অবশ্য আরও কারণ

আছে; কিন্তু তুমি একবার যন্ত্রপাতির গুরুত্বের কথা ভেবে দেখো। কে যেন বলেছিলেন, মানুষ একটি যন্ত্রনির্মাতা প্রাণী। আর সেই আদিম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস তো যন্ত্রনির্মাণেরই ইতিহাস—প্রস্তরযুগের পাথরের তৈরি তীর আর মুগুর থেকে বর্তমান যুগের রেলওয়ে, স্টীম-এঞ্জিন এবং অসংখ্য রকমের যন্ত্রাদি পর্যন্ত। বাস্তবিক আমাদের সব কাজেই যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। যন্ত্র না থাকলে আজ আমাদের অবস্থাটা কী হত?

চমৎকার জিনিষ এই যন্ত্রপাতি; আমাদের কাজ হাল্‌কা করেছে। তবে এর অপব্যবহার হতে পারে। করাত তো দরকারি হাতিয়ার, কিন্তু তা ছেলেপিলেদের হাতে দেওয়া যায় না। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ ছুরি, অথচ এই ছুরি দিয়ে একজন লোক আর-একজনকে হত্যা করতে পারে। এটা ছুরির দোষ নয়, যে লোক এর অপব্যবহার করে তারই দোষ।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধেও সেই কথা; নানাপ্রকারে এসবের অপব্যবহার করা হচ্ছে। জনসাধারণের কাজ এবং পরিশ্রমের লাঘব না করে বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। যে জিনিষ লক্ষ লক্ষ লোককে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে তাই কিনা অনেকের জীবনে এনেছে দুঃখদুর্দশা। তা ছাড়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন দেশের গবর্মেণ্ট এত শক্তিশালী হয়েছে যে, যুদ্ধে লাখ লাখ লোকের জীবন-নাশ করতে পারে। অবশ্য সেজন্যে যন্ত্রপাতি দায়ী নয়; তার অপব্যবহারের দরুনই এরকমটা হয়ে থাকে। যতসব দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থান্বেষী লোকের হাতে রয়েছে কর্তৃত্ব; তা না হয়ে যদি জনগণের মঙ্গলের জন্যে যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত তবে আজ অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত।

যাই হোক, সে যুগে উৎপাদনের দিক থেকে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীতে অগ্রগামী ছিল। ভারতের বস্ত্র, রঞ্জনদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী দূরদেশে রপ্তানি হত; চাহিদাও ছিল খুব। বাণিজ্যের ফলে যথেষ্ট অর্থাগম হত এ দেশে। তা ছাড়া দক্ষিণ-ভারত থেকে বিদেশে মরিচ আর নানা মশলা রপ্তানি হত। রোম এবং পাশ্চাত্যে ঐ মরিচের খুব আদর ছিল। কথিত আছে, এলারিক নামে গথজাতির এক নেতা পঞ্চম শতাব্দীতে রোম থেকে তিন হাজার পাউণ্ড মরিচ নিয়ে গিয়েছিল।

৪০

রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতন

৬ই মে, ১৯৩২

অনেক কাল চীন দেশ সম্পর্কে কিছু বলি নি। আজ কিছু বলব। প্রতীচ্যে যখন রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটছে, এবং গুপ্ত-সম্রাটদের কালে ভারতের জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন চীনের অবস্থাটা কীরকম ছিল পর্যালোচনা করে দেখা যাক। রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান কিংবা পতনে চীনের কিছু এসে-যায় নি, কেননা, দু দেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক। মধ্য-এশিয়ার জাতিসমূহকে চীন-সাম্রাজ্য তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে কথা তোমাকে পূর্বে বলেছি; তার ফল কিন্তু ইউরোপ আর ভারতবর্ষের পক্ষে শুভ হয় নি। কেননা, এইসকল বিতাড়িত জাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল— কতক গেল পশ্চিমে, কতক দক্ষিণ দিকে, আবার কতক পূর্ব-ইউরোপ আর ভারতবর্ষে বসবাস করতে শুরু করল। এদের উৎপাতে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হল, অনেক রাজ্য বিপর্যস্ত হল।

রোম আর চীনের মধ্যে অবশ্য বহুকাল থেকেই একটা সম্পর্ক বজায় ছিল, রাজদূতের বিনিময়ও ছিল। চীনের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আন্‌-টুনের রাজত্বকাল থেকেই এই সম্পর্কটা চলে এসেছে। ইতিপূর্বে এক চিঠিতে আমি মার্কাস অরেলিয়স অ্যাণ্টোনিনাসের উল্লেখ করেছি; আন্‌-টুন্‌ আর অ্যাণ্টোনিনাস একই ব্যক্তি।

ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্যের পতন এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা কেবলমাত্র একটা নগর কিংবা একটা সাম্রাজ্যের পতনই নয়। কেননা, রোম-সাম্রাজ্য পরবর্তীকালে বহুদিন কনস্টাণ্টিনোপ্‌লে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল এবং এই সাম্রাজ্যের ভূত সারা ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়েছে চোদ্দ শো বছর-কাল। আসলে রোমের পতনে একটা বিশেষ যুগের অবসান ঘটল, ধ্বংস হল গ্রীস আর রোম, পৃথিবীর দুটি সুপ্রাচীন রাজ্য। অপর দিকে এই ধ্বংসাবশেষের উপর আবার প্রতীচ্যে গড়ে উঠতে লাগল নূতন কৃষ্টি ও সভ্যতা, নূতন পৃথিবী। কিন্তু সেটা গ্রীক আর রোমীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লোকে বলে, বর্তমান যুগের ইউরোপের নানা দেশ গ্রীস আর রোমের সন্তান। এ কথা কতকাংশে সত্য হলেও মোটের উপর তারা ভ্রান্ত। কেননা, ইউরোপের দেশসমূহে যে আদর্শ আর ভাবধারা অভিব্যক্ত হয়েছে তা গ্রীস আর রোমের আদর্শ ও ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাচীন গ্রীস ও রোম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। সহস্রাধিক বৎসরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ক্রমশ তা লোপ পেল। এই সময়ে পশ্চিম-ইউরোপের কয়েকটি দেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে উঠতে লাগল নূতন সংস্কৃতি আর সভ্যতা। প্রাচীন গ্রীস-রোমের ইতিহাস থেকে তারা শিখল অনেক-কিছু, ধার করল বিস্তর। কিন্তু শেখবার এই প্রণালীটা ছিল বেজায় শক্ত আর শ্রমসাধ্য। তাই কয়েক শতাব্দী-কাল ইউরোপে কৃষ্টি ও সভ্যতা যেন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। কেবল অজ্ঞতা আর গোঁড়ামি। এই শতাব্দীগুলো ছিল অন্ধকারের যুগ।

এ স্থলে তুমি প্রশ্ন করতে পার, কেন এরকমটা হল? পৃথিবীর উন্নতি না হয়ে অবনতি হবে কেন? আর কেনই-বা যুগযুগান্তের শ্রমলব্ধ জ্ঞান সহসা হবে অন্তর্হিত কিংবা লোপ পাবে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে? এগুলো বড়ো শক্ত প্রশ্ন এবং তা নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা মাথা ঘামাচ্ছেন। আমি এসবের জবাব দেবার চেষ্টা করব না। ভাবলে বিস্ময় লাগে, যে ভারত এককালে কর্মে ও ভাবে মহান্‌ ছিল তারও হল অধঃপতন এবং শেষ পর্যন্ত রইল পরাধীন হয়ে! আর চীন? কোথায় গেল তার অতীতের কীর্তি আর গৌরব! সে দেশে এখনও লড়াই লেগেই আছে। মানুষ যুগযুগান্ত-কাল ধরে অল্পে অল্পে যে জ্ঞান সঞ্চয় করে গেছে সম্ভবত তার ক্ষয় নেই। কিন্তু তথাপি এক-এক সময়ে যেন আমরা চোখ বুজে থাকি, দেখতে পাই নে কিছুই—জানলা বন্ধ, তাই অন্ধকার। কিন্তু বাইরের জগৎ আলোয় উদ্ভাসিত। আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি, কিংবা জানলা বন্ধ করে দিতে পারি; তাই বলে, এমন কথা তো বলা চলে না যে, আলো নেই।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপে অন্ধকার যুগের মূলে ছিল খৃষ্টধর্ম। ঠিক যিশুর প্রবর্তিত ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না। এ হচ্ছে সেই সরকারি খৃষ্টধর্ম যা নাকি পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করেছিল রোম-সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্‌ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পর থেকে। কন্‌স্টান্‌টাইন্‌ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন চতুর্থ শতাব্দীতে। ওদের বক্তব্য এই যে, ঐ ঘটনার পরে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর-কাল পাশ্চাত্যে জ্ঞানের উন্নতি হয় নি; বরং যুক্তি ছিল শৃঙ্খলিত এবং চিন্তাধারা অবরুদ্ধ। এর ফল হল গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা আর উৎপীড়ন। বিজ্ঞান, কিংবা অন্যান্য বিষয়ে উন্নতিলাভের পথ রুদ্ধ হল। দেখা গেছে, ধর্মগ্রন্থগুলো উন্নতির পরিপন্থী। ওতে সেই মান্ধাতার আমলের কথা ও কাহিনী, আদর্শ ও আচারব্যবহার লিপিবদ্ধ থাকে। 'পবিত্র' গ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্রের কথা কিনা, তাই এ সম্বন্ধে কেউ কখনও কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করে না। কিন্তু পৃথিবীটা তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। অথচ এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে আমরা চলতে পারি না, কাজেকাজেই ফ্যাসাদ অনিবার্য।

কারও কারও মতে ইউরোপে এই অন্ধকার যুগ সৃষ্টির জন্যে দায়ী খৃষ্টধর্ম। কেউ-বা বলেন, খৃষ্টধর্ম আর যাজকসম্প্রদায় এই অন্ধকার যুগেও জ্ঞানের আলো অনির্বাণ রেখেছিল; তারাই বাঁচিয়ে রেখেছে শিল্পকলা, সযত্নে রক্ষা করেছে মূল্যবান গ্রন্থরাজি।

লোকে এইভাবেই যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে। সম্ভবত দু দলের কথাই ঠিক। তথাপি এরূপ উক্তি হাস্যকর যে, রোমের পতনের পরে যেসকল অনাচার দেখা দিয়েছিল তার জন্যে দায়ী খৃষ্টধর্ম। তবে এটা ঠিক, রোমের পতনের মূলে ছিল ঐসব অন্যায় আর পাপাচার।

কিন্তু আসল কথা ছেড়ে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি। আমি তোমাকে এই বলতে চাই যে, ইউরোপে যেমন হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটল, সমাজের বাঁধন পড়ল খসে, চীন কিংবা ভারতে তেমন কোনো আকস্মিক পরিবর্তন কখনও পরিলক্ষিত হয় নি। ইউরোপে এক বিরাট সভ্যতার অবসান হল, দিগন্তে দেখা দিল নূতন আলো; তার পর আস্তে আস্তে গড়ে উঠল নূতন যুগের নূতন সভ্যতা এবং তাই কালক্রমে পরিণত হয়েছে আজকের সভ্যতায়। কিন্তু চীন দেশে আবহমান কাল একই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রয়েছে, ছেদ পড়ে নি কখনও। তবে উন্নতি অবনতি অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে। রাজবংশের পরিবর্তন হয়েছে, সম্রাটদের মধ্যেও ভালোমন্দ দুই-ই ছিল। কিন্তু তাই বলে কৃষ্টি ও সভ্যতা ক্ষুণ্ন হয় নি কখনও। এমনকি চীন যখন ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, লিপ্ত হয়েছে গৃহযুদ্ধে, তখনও শিল্প সাহিত্য চিত্রকলা ও কারুশিল্পের অনুশীলন বন্ধ থাকে নি। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হল, চা খাওয়া ফ্যাশনে দাঁড়াল, এমনকি কবিতায় চায়ের স্তুতিগানও করা হল। চীনের শিল্পকলা ও সৌন্দর্যবোধ কোনোকালে ক্ষুণ্ন হয় নি। সে দেশের সভ্যতা অতি উঁচুদরের ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যেতে পারে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ব্যাহত হয় নি কখনও, একটানা চলে এসেছে। অবশ্য সময়ের ভালোমন্দ ছিল। অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলার যুগও যেমন এসেছে, ধ্বংস আর অবনতির যুগও তেমনি বাদ পড়ে নি। কিন্তু সভ্যতার ধারা অব্যাহতভাবে বয়েই চলেছে; ভারতের সীমা ছাড়িয়ে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এমনকি যেসকল বর্বর জাতি ভারতবর্ষে লুঠতরাজ করতে এসেছিল তারাও এই সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

মনে কোরো না, আমি পাশ্চাত্যের নিন্দা আর ভারতবর্ষ ও চীনের সুখ্যাতি করছি। চীন আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে গর্ব করবার মতো আজ আর কিছু নেই; অতীত যতই গৌরবোজ্জ্বল হোক-না কেন, বর্তমানে এই দুটি দেশ যে ঢের নিম্নস্তরে নেমে গেছে তা একজন অন্ধও বুঝতে পারে। সভ্যতার ধারা ব্যাহত না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে বিপথে যায় নি এমন কথা তো বলা যায় না? সভ্যতার ধারা বজায় থাকাতে আমরা আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারি বটে, কিন্তু এখন যে তার চরম অবনতির দশা! এর চাইতে বরং ধারা ব্যাহত হলেই যেন ছিল ভালো। আমাদের টনক নড়ত, নূতন শক্তি ও জীবনের প্রেরণা পাওয়া যেত। সম্ভবত আজকাল যেসকল ঘটনা অন্যান্য দেশে ঘটছে তা আমাদের এই প্রাচীন দেশকে নাড়াচাড়া দিচ্ছে, নূতন জীবন-যৌবনে সঞ্জীবিত করে তুলছে।

পুরাকালে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক পঞ্চায়েত-প্রথা প্রচলিত ছিল। বলতে গেলে, ভারতের শক্তি ও অধ্যবসায়ের মূলে ছিল এই প্রথা। এখনকার মতো ভূস্বামী কিংবা জমিদার সেকালে ছিল না। জমির মালিক ছিল গ্রাম্যসমাজ বা কম্যুনিটি; অথবা পঞ্চায়েত কিংবা চাষি। পঞ্চায়েত নিযুক্ত করত গ্রামবাসীরা, সুতরাং ওর ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র। আর এই পঞ্চায়েত কতই-না ক্ষমতাশালী ছিল! কত রাজামহারাজা এল আর গেল, পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করল, কিন্তু গ্রাম্য পঞ্চায়েত-প্রথার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারল না, কিংবা তার স্বাধীনতাও হরণ করল না। তাই সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হলেও গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা প্রায় অক্ষুণ্নই থেকে গেল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসক-পরিবর্তন ভারতে খুব বেশি হয়েছে বটে, কিন্তু দেশের লোক তাতে বড়ো-একটা বিচলিত হয় নি; মাথা না ঘামিয়ে তারা তাদের কাজ করে গেছে।

বর্ণপ্রথা অনেক কাল যাবৎ ভারতের সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, দৃঢ়ীভূত করেছে। আগে শ্রেণীবিভাগ কিন্তু এতটা কঠোর ছিল না। জন্ম কখনও বর্ণ-নির্ধারণ করত না। এই প্রথা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত করেছে, কোনো পরিবর্তন বা উন্নতির পথ রুদ্ধ করে নি। আর, ধর্ম ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকালই সহিষ্ণু এবং পরিবর্তনশীল। কিন্তু পুনঃপুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অন্যান্য উপদ্রবের দরুন জাতিভেদ-প্রথা ক্রমশ কঠোরতর হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনোভাব বদলে যায় এবং অনমনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রথাই হল ভারতের কাল, সকল রকমের উন্নতির মূলে করল কুঠারাঘাত এবং ক্রমে ক্রমে

ভারত বর্তমানের এই হীন অবস্থায় এসে পৌঁছল। শ্রেণী-বিরোধ সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে খান্‌খান্‌ করে দেয়, হীনবল করে আমাদের, এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে দেয় লেলিয়ে।

অতীতে বর্ণপ্রথা ভারতের সমাজব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু ধ্বংসের বীজও নিহিত ছিল ওতে। সাম্য ও ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় কিনা, তাই এ প্রথা চিরকাল বজায় থাকতে পারে না। কোনো সমাজ অসাম্য এবং অন্যায়কে ভিত্তি করে, কিংবা এক শ্রেণী আর-এক শ্রেণীর উপর জুলুম করে, টিঁকে থাকতে পারে না। আজও এই অন্যায় জুলুম চলছে, একদল অন্য দলের স্বার্থে আঘাত হানছে; তাই তো সারা পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি আর হাঙ্গামা। তবে সুখের বিষয় এই যে, সর্বত্রই লোকে এটা অন্যায় বলে বুঝতে পারছে এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করছে।

ভারতের মতো চীনদেশেও সমাজব্যবস্থার মূলে ছিল গ্রাম। সমাজে ক্ষমতা ছিল যত চাষি আর কৃষিজীবীদের হাতে। সে দেশেও বড়ো জমিদার বলতে কেউ ছিল না। ধর্মকে কখনও প্রাধান্য দেওয়া হয় নি, কিংবা ধর্মে অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ পায় নি। পৃথিবীতে একমাত্র চীনদেশেই ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামি সবচেয়ে কম। তা ছাড়া মনে রাখবে, ভারতবর্ষ বা চীন কোনো দেশেই গ্রীস, রোম কিংবা প্রাচীন মিশরদেশের মতো দাস-শ্রমিক ছিল না। পরিবারের চাকরবাকরদের মধ্যে কতক দাস ছিল বটে, কিন্তু তারা সমাজব্যবস্থার কোনো হানি করতে পারে নি। প্রাচীন গ্রীস আর রোমের ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। ছিল অসংখ্য দাস এবং তারা সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল; সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ নির্ভর করত তাদের উপরে। আর দাস-শ্রমিক না থাকলে তো মিশরে পিরামিডগুলো তৈরিই হত না!

বলতে শুরু করেছিলাম চীনের কাহিনী, কিন্তু দেখো, কোথায় এসে পড়েছি। আমার প্রায়ই এরকমটা হচ্ছে, নয়? আচ্ছা, এর পরে শুধু চীনের কথাই বলব।

৪১

তাঙ-বংশের আমলে চীনের উন্নতি

৭ই মে, ১৯৩২

ইতিপূর্বে আমি তোমাকে চীনের হান-বংশের রাজত্বের কথা বলেছি। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, সরকারি কর্মচারী-নিয়োগে পরীক্ষাগ্রহণের কথা, ইত্যাদিরও উল্লেখ করেছি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে হান-বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং সমগ্র সাম্রাজ্য তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এই রাষ্ট্র তিনটি টিঁকে ছিল কয়েক শো বছর। তার পর আবার সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঙ-বংশের রাজাদের আমলে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোকে একীভূত করে একটিমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।

কিন্তু সাম্রাজ্য বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও চীনের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি; এমনকি তাতারজাতির আক্রমণেও তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। চীনের অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রকলা, সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ইত্যাদির কথা আমাদের জানা আছে। ভারতবর্ষ কেবল সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি চীনে রপ্তানি করেই ক্ষান্ত হয় নি; তার চিন্তাধারা, তার ধর্ম এবং শিল্পকলাও পাঠিয়েছে ও দেশে। ভারতবর্ষ থেকে বহু বৌদ্ধধর্মপ্রচারক চীনে গিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার ধারাও প্রবেশলাভ করে সে দেশে। ভারতের শিল্পী এবং সুনিপুণ কারিগরও সেখানে গিয়ে থাকবে। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং নূতন ভাবধারার আমদানি হওয়াতে চীনে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। চীনের সুপ্রাচীন শিল্পকলা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ এবং এর ফলে নূতন ধরনের এক সভ্যতার উদ্ভব হল। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ পড়ল বটে, কিন্তু চীনের নিজস্ব

রূপ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রইল। এইভাবে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ চীনের মনোজগতে এবং শিল্পজীবনে সৃষ্টি করেছিল এক বিরাট আলোড়ন।

বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় শিল্পকলার বাণী পূর্বপ্রান্তে কোরিয়া আর জাপানেও গিয়ে পৌঁছল; তাতে করে ঐসব দেশ কতটা প্রভাবিত হল তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রত্যেক দেশই একে গ্রহণ করল। এই দেখো-না কেন, বৌদ্ধধর্ম তো চীন জাপান দুই দেশেরই ধর্ম, কিন্তু তাও বিভিন্ন রূপ নিয়েছে এক-এক দেশে। এমনকি প্রথমে ভারতবর্ষ থেকে যে বৌদ্ধধর্মের আমদানি হয়েছিল তার সঙ্গেও নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। শিল্পকলার স্বরূপও বদলায় দেশ ও অধিবাসীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আজকাল আমরা ভারতবাসীরা শিল্প ও সৌন্দর্য -জ্ঞান হারিয়েছি। আমরা যে দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো বড়োরকমের সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারি নি, শুধু তা নয়, আমরা অনেকেই সুন্দরের পুজো করতেও ভুলে গেছি। পরাধীন দেশে আবার কিসের শিল্প, কিসেরই বা সৌন্দর্য? পরাধীনতা আর বাধানিষেধের নিষ্পেষণে সব-কিছু লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জেগেছে, তাই তো স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত। আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান অল্পে অল্পে ফিরে আসছে। দেশ স্বাধীন হলে দেখো, আবার শিল্প ও সৌন্দর্যের বিরাট অভ্যুত্থান হবে; এবং আমি আশা করি, তখন আমাদের ঘরবাড়ি, শহর এবং আমাদের জীবনযাত্রা থেকে সবরকম নোংরামি আর কুশ্রীতা লোপ পাবে। এ বিষয়ে চীন ও জাপানকে প্রশংসা করতে হয়; আজও পর্যন্ত শিল্প ও সৌন্দর্যকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে।

চীনে বৌদ্ধধর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৌদ্ধ এবং শ্রমণ সে দেশে যেতে শুরু করল এবং চীনা শ্রমণরাও ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করতে লাগল। ইতিপূর্বে ফাহিয়েনের কথা তোমাকে বলেছি; হিউয়েন সাঙ-এর কথাও তুমি জান। এঁরা দুজনেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে হুইসেঙ্ নামে জনৈক শ্রমণ চীনের রাজধানীতে এসে বললে, সে চীন থেকে কয়েক হাজার মাইল পুব দিকে এক নূতন দেশে গিয়েছিল, ও দেশের নাম ফু-সেঙ্। চীন আর জাপানের পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর; সম্ভবত হুইসেঙ্ এই সাগর পার হয়ে মেক্সিকো গিয়েছিল, কেননা সেখানে তখনও এক প্রাচীন সভ্যতা বিদ্যমান ছিল।

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার বেড়ে যাওয়াতে ভারতের বোধিধর্ম অর্থাৎ মহাধর্মাধ্যক্ষ ক্যাণ্টন চলে গেলেন। এদিকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল; ওঁর চীনে যাবার সম্ভবত তাও একটা কারণ। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ওখানে যান; তাঁর সঙ্গে এবং পরে বহু ভারতীয় শ্রমণ চীনে গিয়েছিল। কথিত আছে, চীনের শুধু লো-ইয়াঙ্ প্রদেশেই কয়েক হাজার ভারতীয় বাস করত; তার মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই ছিল হাজার-তিনেক।

কিন্তু শীঘ্রই আবার ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুত্থান হল। একে তো ভারতবর্ষ বুদ্ধের জন্মস্থান, তাতে আবার ধর্মগ্রন্থাদিও ছিল এখানেই; তাই স্বভাবতই ভারতের প্রতি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তথাপি মনে হয়, ভারতে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য কিছু ছিল না; কেননা শেষ পর্যন্ত চীনদেশই ঐ ধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল।

তাঙ্-বংশের প্রথম সম্রাট কাও-সু। সে ৬১৮ অব্দের কথা। কেবল সমগ্র চীনদেশই নহে, পরন্তু দক্ষিণে আনাম, কম্বোডিয়া থেকে পশ্চিমে পারশ্য ও কাস্পিয়ান সাগর অবধি তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কোরিয়ার কতক অংশও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাজধানী সিয়ান-ফু নগর সমৃদ্ধিতে এবং শিল্প দর্শন ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পূর্ব-এশিয়ায় বিখ্যাত ছিল। তাঙ্-সম্রাটদের আমলে ব্যবসাবাণিজ্য খুব উন্নতিলাভ করেছিল। চীনের নিজস্ব সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। বিদেশীরা যাতে এখানে এসে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে তার জন্যে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। দক্ষিণাংশে, ক্যাণ্টনের নিকটবর্তী স্থানসমূহে, আরবরা বসবাস করত; এটা ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্মের পূর্বেকার ঘটনা। আরবগণ চীনাদের সঙ্গে একযোগে ব্যবসাবাণিজ্য করত।

চীনে লোকগণনার ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। তোমার হয়তো অবাক লাগছে,

ইউরোপ
আরব
টাইগ্রিস
পারস্য
কাস্পিয়ান
ভারতবর্ষ
হিমালয় পর্বত
তিব্বত
কোরিয়া
জাপান
আনাম
ভারতীয় উপনিবেশ
তাঙ-সাম্রাজ্য
০
১০০০
২০০০
৫০০০ মাইল
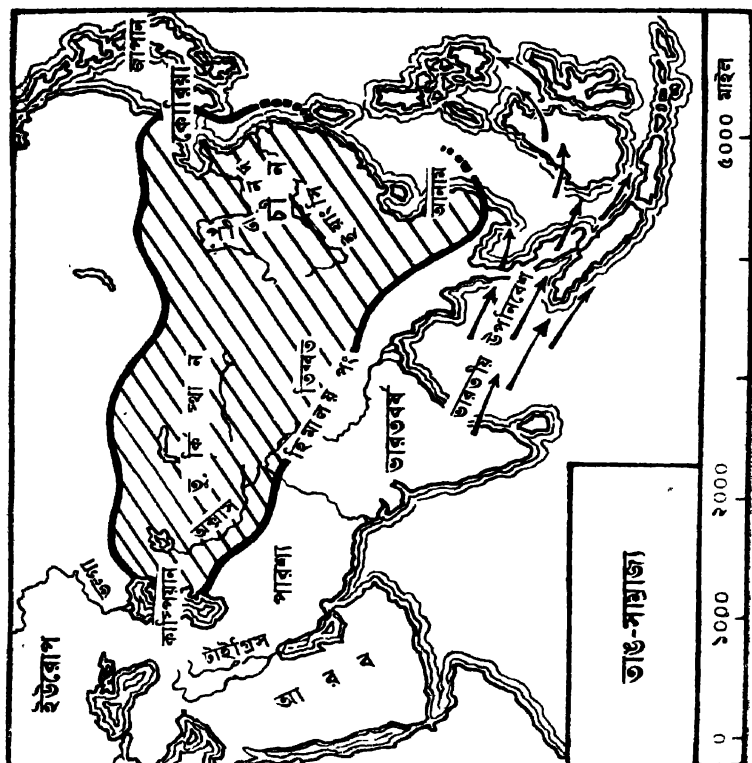
কিন্তু কথাটা সত্যি। কথিত আছে, ১৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়েছিল, সম্ভবত হান্-বংশের আমলে। ব্যক্তিগতভাবে জনসংখ্যার হিসাব না করে পরিবারের সংখ্যা গণনা করা হত, ধরে নেওয়া হত প্রতি পরিবারে লোকসংখ্যা পাঁচ। এই হিসাবে দেখা যায়, ১৫৬ অব্দে চীনদেশে লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। লোকগণনার পক্ষে অবশ্য এটা সঠিক পদ্ধতি নয়; কিন্তু মনে রাখবে, পাশ্চাত্যে এই সেন্সাসের ব্যবস্থাটা অতি আধুনিক ব্যাপার। আমি যতটা জানি, মাত্র দেড় শো বছর আগে আমেরিকায় প্রথম সেন্সাস গ্রহণ করা হয়েছিল।

তাঙ্-বংশের রাজত্বের গোড়ার দিকে চীনে আরও দুটি ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল— খৃষ্টীয় ধর্ম আর ইসলামধর্ম। যে খৃষ্টীয় সম্প্রদায় এখানে এল তাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়ে পাশ্চাত্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্বের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে বলেছি। ওরকম একটা বাদবিসংবাদের দরুনই রোম থেকে ওরা বিতাড়িত হয়েছিল। চীন, পারশ্য এবং এশিয়ার নানা অংশে তারা ছড়িয়ে পড়ল; এক দল ভারতবর্ষে এল এবং কতকটা সুযোগসুবিধাও পেয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং ইসলামধর্মীদের প্রভাব খুব বেড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ওদের আর কোনো পাত্তা রইল না। গত বছর যখন আমরা দক্ষিণ-ভারতে যাই তখন সেখানে কোনো-এক অঞ্চলে তাদের একটি ছোটো উপনিবেশ দেখে আমার অবাক লেগেছিল। ওদের বিশপ আমাদের নেমন্তন্ন করে চা খাওয়ালেন। তোমার মনে আছে নিশ্চয়?

চীনে খৃষ্টধর্মের প্রবেশ একটু দেরিতেই হয়েছে। কিন্তু ইসলামধর্মের বেলায় দেরি হয় নি, এমনকি হজরত মহম্মদের জীবদ্দশাতেই ইসলামধর্মীরা চীনে গিয়েছিল। তৎকালীন চীন-সম্রাট উভয় ধর্মের প্রতিনিধিদেরই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আরবগণ ক্যাণ্টন শহরে একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিল, সে তেরো শো বছর আগেকার কথা। আজও সেখানে মসজিদটি আছে।

তাঙ্-সম্রাট খৃষ্টধর্মীদেরও গির্জানির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে চীনের এই সহিষ্ণু মনোভাব এবং পাশ্চাত্যের গোঁড়ামি লক্ষ্য করবার বিষয়।

কথিত আছে, আরবরা চীনাদের কাছে কাগজ তৈরি করতে শিখেছিল, পরে আরবদের কাছ থেকে ইউরোপের অধিবাসীরা তা শেখে। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থানে আরব আর চীনাদের মধ্যে একটা যুদ্ধ বেধেছিল; তাতে অনেক চীনা আরবদের হাতে বন্দী হয়; ঐ বন্দী চীনারাই নাকি আরবদের কাগজ তৈরি করতে শেখায়।

তাঙ্-বংশ তিন শো বছর রাজত্ব করেছিল— ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কারও কারও মতে এই তিন শো বছর-কালই চীনের ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট যুগ। এ সময়ে শুধু যে চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল তা নয়, জনগণও সুখসমৃদ্ধি লাভ করেছিল। নানা বিষয়ে জ্ঞানচর্চার তো কথাই ছিল না, তখন চীনে এমন অনেক বিষয়ের চর্চা হত যা ইউরোপ জেনেছে অনেক কাল পরে। যেমন, কাগজ বারুদ ইত্যাদি তৈরি। চীনারা খুব ভালো ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যাও জানত। মোটের উপর প্রায় প্রতি বিষয়েই চীন ইউরোপ থেকে ঢের বেশি অগ্রসর ছিল। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় যে, সব রকমে উন্নত হয়েও বিজ্ঞান আর আবিষ্কারের ব্যাপারে চীন ইউরোপকে পথ দেখাতে পারে নি! ইউরোপ কিন্তু চুপচাপ ছিল না; আস্তে আস্তে উন্নতিলাভ করে সহসা চীনের সমপর্যায়ে এসে দাঁড়াল এবং শীঘ্রই আবার চীনকে পেছনে ফেলে রেখে অগ্রসর হয়ে গেল। একটা জাতি বা দেশের ইতিহাসে কেন এরকমটা ঘটে সেটা দুরূহ প্রশ্ন; দার্শনিকরা তা ভেবে দেখবেন। তুমি তো আর দার্শনিক নও যে এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে? সুতরাং আমারই-বা কী দায় পড়েছে?

এই যুগের চীনদেশ সমগ্র এশিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। চীন ছিল শিল্পকলা ও সভ্যতার পথপ্রদর্শক। ভারতে তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছে এবং ম্লান হয়ে এসেছে তার গৌরব। চীনারাও ক্রমে অতিরিক্ত বিলাসী এবং আরামপ্রিয় হয়ে উঠল। রাষ্ট্রে প্রবেশ করল দুর্নীতি, ট্যাক্সের পর ট্যাক্স ধার্য হতে লাগল জনগণের উপরে। লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং অবশেষে তাঙ্-বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাল।

৪২

কোরিয়া ও জাপান

৮ই মে, ১৯৩২

পৃথিবীর ইতিহাস তোমাকে বলছি, সুতরাং অনেক দেশ, অনেক জাতিই আমাদের আলোচনার মধ্যে আসবে। আজ জাপান আর কোরিয়া সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব। এই দুটি দেশ চীনের নিকট-প্রতিবেশী এবং বলতে গেলে চীনসভ্যতারই বংশধর। এশিয়ার একেবারে শেষ সীমান্তে, পূর্বপ্রান্তে, এই দেশদুটি অবস্থিত; তার পরেই বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর। সুদূর সাগরপারে আমেরিকা মহাদেশের সঙ্গে এদের যে সম্পর্ক, সে তো এই সেদিনের! তার আগে একমাত্র সম্পর্ক ছিল চীন মহাদেশের সঙ্গে। ধর্ম বলো, শিল্প-সভ্যতা বলো, সব-কিছুই চীন থেকে কিংবা চীনের সহায়তায় এরা পেয়েছে। চীনের কাছে এই দুটি দেশ অশেষ ঋণী। কতকটা আবার ভারতের কাছেও ঋণী। তবে কিনা, ভারতের কাছ থেকে এরা যা পেয়েছে তা সবই চীনের দৌলতে।

এশিয়া কিংবা অন্যত্র যেসকল প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে কোরিয়া আর জাপানের বড়ো-একটা সম্পর্ক ছিল না; সবরকমের গোলযোগ, আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে এরা অনেকটা দূরে ছিল। এই দিক থেকে দেখতে গেলে এই দুটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে, বিশেষ করে জাপানের পক্ষে। সুতরাং এদের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার তেমন প্রয়োজন নেই। আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচনা করলেই চলবে এবং তাতে এশিয়ার অন্যান্য দেশের ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতেও বেগ পেতে হবে না। তবে বর্তমানের ঘটনাবলীর গতি ও ধারা বোঝবার জন্যে অতীত ইতিহাস কিছুটা জানা মন্দ নয়।

কোরিয়ার কথা লোকে প্রায় ভুলেই গেছে। ছোট্ট দেশ, তাতে আবার জাপান তাকে গ্রাস করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তথাপি কোরিয়া আজও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, জাপানের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে লড়াই করে। অধুনা জাপান অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্য বলে গণ্য হয়েছে। খবরের কাগজে দেখে থাকবে, জাপান চীনদেশ আক্রমণ করেছে। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ চলছে। তাই বর্তমানের ঘটনাবলীর তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করবার জন্যে জাপান ও কোরিয়ার অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

গোড়ায় মনে রাখতে হবে যে, এই দুটি দেশ অনেক কাল বহির্জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। বাস্তবিক, জাপানের সঙ্গে কারও কোনো সম্পর্ক ছিল না, এবং বলতে গেলে জাপান বিদেশী আক্রমণ থেকেও ছিল মুক্ত। এই সেদিন পর্যন্ত জাপানের যত হাঙ্গাম আর গোলযোগ, তা সবই ছিল তার ভিতরকার সৃষ্টি। কিছুকাল জাপান বহির্জগৎ থেকে নিজেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যে, কোনো জাপানি দেশের বাইরে অন্যত্র যেতে পারে নি, কোনো বিদেশীও জাপানে প্রবেশ করতে পারে নি, এমনকি চীনারাও নয়! আসলে তারা চায় নি যে, ইউরোপীয়রা এবং খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের দেশে এসে উৎপাত শুরু করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং ফলও খারাপ হতে বাধ্য। কেননা, এতে করে সমগ্র একটা জাতিকে যেন জেলে পুরে রাখা হল, বাইরের জগতের ভালোমন্দ প্রভাব থেকে আলাদা করে। সহসা একসময়ে জাপান খুলে দিল সমস্ত জানলা-দরজা, বেরিয়ে এল তথাকথিত কারাগার থেকে, করায়ত্ত করে নিল ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা। এবং এত ভালো করেই সব-কিছু আয়ত্ত করল যে, দুই পুরুষের মধ্যেই ইউরোপের যে-কোনো দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠল—ভালোর দিকটা তো গ্রহণ করলই, খারাপ দিকটাও বাদ দিল না। এ সবই গত সত্তর বছরের ঘটনা।

কোরিয়ার ইতিহাস শুরু হয় চীনের অনেক পরে; এবং জাপানের ইতিহাসও আবার কোরিয়ার অনেক পরেকার কাহিনী। গত বছর এক চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম, কিৎসি-নামক চীনের জনৈক নির্বাসিত ব্যক্তি তার পাঁচ হাজার অনুগামী-সহ দেশ ছেড়ে পূর্বদিকে চলে যায়

এবং এক স্থানে বসবাস করতে শুরু করে; জায়গাটার নাম দিলে চোজেন্ বা প্রভাতকালীন শান্তির দেশ। সে খৃষ্টপূর্ব ১১২২ সনের কথা। চীনের শিল্প, কৃষিবিদ্যা, কারিগরিনৈপুণ্য ইত্যাদিও এল এদের সঙ্গে। নয় শো বছর-কাল কিংসি'র বংশধরগণ এ স্থানে রাজত্ব করল। সময়ে সময়ে চীনা ঔপনিবেশিকরা এই দেশে এসে বসবাস করেছিল এবং এভাবে চীনের সঙ্গে একটা নিকট-সম্পর্ক গড়ে উঠল।

শি. হুয়াঙ. টি যখন চীনের সম্রাট তখন চীনের বহুসংখ্যক অধিবাসী চোজেনে গিয়েছিল। এই সম্রাটের কথা হয়তো তোমার মনে আছে। ইনি আমাদের সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি নিজকে 'প্রথম সম্রাট' বলে ঘোষণা করেছিলেন। পুরোনো সমস্ত পুঁথি ইনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এঁর উৎপীড়ন-অত্যাচারের দরুন অনেক চীনা কোরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিংসি'র বংশধরদের তাড়িয়ে দেয়। এর পরে চোজেন্ বিভক্ত হল কতকগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে। আট শো বছর-কাল এভাবে চলল। এই রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ করত। এক সময়ে এদের মধ্যে একটি রাষ্ট্র চীনের সাহায্য চেয়ে পাঠাল। সাংঘাতিক অনুরোধ, নয় কি? চীন সাহায্য করতে এল বটে, কিন্তু আর ফিরে গেল না। শক্তিশালী দেশের কাজকারবারই এইরকম। চীন থেকে গেল, অধিকন্তু চোজেনের কতক অংশ নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল; বাকিটাও কয়েক শো বছর-কাল তাঙ্-বংশের আনুগত্য স্বীকার করেছিল।

অবশেষে ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে চোজেনের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো মিলিত হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ওয়াঙ কিন্ -নামক একটি লোকের চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছিল; সাড়ে চার শো বছর ওর বংশধরগণ এই রাজ্য শাসন করে।

দু-তিনটি অনুচ্ছেদে আমি তোমাকে কোরিয়ার দু হাজার বৎসরের ইতিহাস বলে দিলাম! কোরিয়া যে চীনের কাছে অশেষ ঋণী, এইটেই বড়ো কথা। চীনের লিখন-পদ্ধতিই কোরিয়াতে প্রচলিত হয়েছিল। এক হাজার বৎসর পরে কোরিয়ার লোকেরা নিজেদের ভাষার উপযোগী একটা বর্ণমালা উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

কোরিয়াতে বৌদ্ধধর্ম এসেছিল চীনের মধ্য দিয়ে, আর কনফুসীয় দর্শন এল খাস চীন থেকে। ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ কোরিয়া আর জাপানে পৌঁচেছিল চীনের মধ্যস্থতায়। কোরিয়ার শিল্পকলা, বিশেষ করে ভাস্কর্য সবিশেষ উন্নতিলাভ করল। স্থাপত্যশিল্পে কোরিয়া অনুসরণ করল চীনকে। জাহাজশিল্পেরও উন্নতি হল খুব। বাস্তবিক, একসময়ে কোরিয়ার নৌবিভাগ বেজায় শক্তিশালী হয়েছিল. এমনকি জাপানকেও আক্রমণ করেছিল।

আধুনিক জাপানিদের পূর্বপুরুষ সম্ভবত কোরিয়া কিংবা চোজেন্ থেকে এসেছিল, এই আমার আন্দাজ। কতক দক্ষিণ থেকে, মালয় থেকেও এসে থাকবে। তুমি তো জানোই, জাপানিরা মঙ্গোলিয়ান-বংশোদ্ভব। অদ্যাপি জাপানের উত্তরাংশে কতক লোক আছে, রোমশ দেহ, ফরশা রঙ, জাপানিদের থেকে ধরনধারন আলাদা। এদের বলা হয় আইনাস; সম্ভবত এরা আদিম অধিবাসী।

আদিযুগে জাপানের নাম ছিল যামাতো অথবা ইয়ামাতো। ২০০ খৃষ্টাব্দে ইয়ামাতো-রাষ্ট্রের সম্রাজ্ঞী ছিল জিঙ্গো নামে এক নারী। এর নামটা খেয়াল করবে। ইংরেজি ভাষায় জিঙ্গো শব্দের অর্থ দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী। শুধু সাম্রাজ্যবাদীও বলতে পারি, কেননা, এ তো জানা কথা যে, সাম্রাজ্যবাদীমাত্রেই উৎকট আত্মশ্লাঘী হয়ে থাকে। এই সাম্রাজ্যবাদ-রোগ জাপানেরও আছে এবং সম্প্রতি কোরিয়া আর চীনের প্রতি তার আচরণ নিতান্ত ন্যায়বিগর্হিত হয়েছে। কাজেকাজেই তার প্রথম শাসকের নাম যে জিঙ্গো ছিল, সেটা অদ্ভুত সংঘটন বলতে হবে।

কোরিয়ার সঙ্গে ইয়ামাতোর একটা সম্পর্ক ছিল; এবং সেকারণেই চীনসভ্যতা প্রবেশ করতে পেরেছিল ইয়ামাতো-রাজ্যে। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনের লেখ্য ভাষাও সেখানে প্রচলিত হয়; বৌদ্ধধর্মের প্রচলনও হয়েছিল কোরিয়ার দৌলতে।

জাপানে প্রচলিত ধর্মের নাম ছিল সিণ্টোধর্ম। সিণ্টো কথাটা চীনের—মানে, দেবতাদের পথ। সিণ্টোধর্ম ছিল প্রকৃতি-পূজা আর পূর্বপুরুষ-পূজা, এই দুয়ের সংমিশ্রণ। এই ধর্মে ভবিষ্যৎ-জীবনের প্রশ্ন বা সমস্যার স্থান ছিল না; এ ছিল প্রধানত যোদ্ধৃজাতির ধর্ম। চীন আর জাপান

পাশাপাশি অবস্থিত এবং চীনসভ্যতার কাছে জাপান অশেষ ঋণী; তথাপি এই দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে। চীনারা বরাবরই শান্তিপ্রিয় জাতি; তাদের সমগ্র সভ্যতায় এবং তাদের জীবনদর্শনে আছে শান্তির বাণী। আর জাপানিরা বরাবরই যোদ্ধার জাত। সৈনিকের প্রধান গুণ হল নেতা এবং সঙ্গীদের প্রতি আনুগত্য। এইটেই জাপানিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাই তো ওরা এত শক্তিশালী। সিন্টোধর্মের মূল কথা ছিল : দেবতাদের পূজা করো এবং তাদের বংশধরদের প্রতি অনুগত থাকো। দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি সিন্টোধর্ম আজও জাপানে টি'কে আছে।

কিন্তু এইটে কি একটা ধর্ম? একজন সঙ্গী অথবা একটা উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে গুণ বলা যেতে পারে বটে। তবেই দেখো, সিন্টো এবং অন্যান্য ধর্মমত আমাদের আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে আমাদের শাসকশ্রেণীকে প্রবল করে তুলেছে। জাপান, রোম এবং অন্যত্র এই শক্তি বা কর্তৃত্বের পূজাই চলে এসেছে; এই ধর্মমত আমাদের কত ক্ষতি করেছে, পরে জানতে পারবে।

জাপানে প্রথম যখন বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এসে পেঁছিল, প্রাচীন সিন্টোধর্মের সঙ্গে তার বাধল বিরোধ। কিন্তু বিরোধ মিটতে দেরি হয় নি এবং তার পর থেকে দুটো ধর্মই আজও পর্যন্ত পাশাপাশি চলছে। কিন্তু সিন্টোধর্মই বেশি জনপ্রিয়; তা ছাড়া ওতে শাসকশ্রেণীর সমর্থনও আছে। ঐ ধর্ম জনগণকে তাদের প্রতি বাধ্য আর অনুগত থাকতে বলে কিনা? আবার, বৌদ্ধধর্মও একটু ভয়াবহ ধর্ম; কেননা, ওর প্রবর্তক ছিলেন একজন বিদ্রোহী।

জাপানে শিল্পের উন্নতির মূলে বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম-প্রচলনের পর থেকেই সে দেশে শিল্পের উন্নতি শুরু হয়। তখন থেকে জাপান অথবা ইয়ামাতো চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে; জাপানি দূতের আনাগোনা শুরু হয় বিশেষ করে তাঙ্-বংশের রাজত্বকালে। চীনের রাজধানী সিয়ান-ফু তৎকালে পূর্ব-এশিয়ায় খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইয়ামাতোর লোকেরা অবিকল সিয়ান-ফু নগরের মতো এক নূতন রাজধানী স্থাপন করল, নাম দিল নারা। বাস্তবিক, অপরকে অনুকরণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা এই জাপানিদের।

জাপানে বড়ো বড়ো বংশগুলি ক্ষমতালাভের জন্যে একে অন্যের বিরোধিতা করে থাকে, ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। অবশ্য প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশেও এরকমটা হয়েছে। জাপানের ইতিহাস প্রধানত পারিবারিক কিংবা বংশগত প্রতিদ্বন্দ্বিতারই ইতিহাস। জাপানিরা তাদের সম্রাট মিকাডোকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করে—একেবারে দেবতা, সূর্যের বংশধর। সিন্টোধর্ম ওদের শিখিয়েছে সম্রাটের একাধিপত্য মেনে নিতে, দেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা গেছে, জাপানে সম্রাটের কোনো ক্ষমতা থাকে না; প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রভাবশালী বড়ো পরিবার কিংবা বংশের হাতে, সম্রাট তাদের হাতের পুতুল মাত্র।

সর্বপ্রথম সোগা-পরিবার জাপানে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। তাদের আমলেই বৌদ্ধধর্ম সরকারিধর্মরূপে গণ্য হয়েছিল। এই বংশের শোতুকু তাইশি'র নাম জাপানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং খুব ক্ষমতাশালী লোক। শাসনতন্ত্রকে ইনি ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হলেন। জাপানে তখন কুলনেতাদের খুব প্রতাপ; কারও কর্তৃত্ব কেউ মানে না, সবাই স্বাধীন। সম্রাট ছিল নামেমাত্র সম্রাট। শোতুকু তাইশি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে শক্তিশালী করে গড়ে তুললেন; অধিকন্তু সকল সামন্তকে বাধ্য করলেন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে। সে ৬০০ খৃষ্টাব্দের কথা।

শোতুকু তাইশির মৃত্যুর পরেই সোগা-বংশ বিতাড়িত হল। কিছুদিন কাটল। এর পরে কাকাতোমি নো কামাতোরি নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব। এই ব্যক্তি শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করল, আমদানি করল চীনা-পদ্ধতি। সম্রাটের হাতে ক্ষমতা এল, কেন্দ্রীয় গবর্মেন্ট হল অধিকতর শক্তিশালী।

এই সময়েই রাজধানী নারা-নগরের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু রাজধানী বেশি দিন সেখানে ছিল না। ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত হল কয়েটো-নগরে এবং এই সেদিন পর্যন্ত, প্রায় এগারো শো বছর-কাল ঐখানেই ছিল। এর পরে টোকিও হল রাজধানী। টোকিও আধুনিক যুগের বড়ো শহর।

জাপানের প্রসিদ্ধ ফুজিআরা-বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই কাকাতোমি নো কামাতোরি। দু শো বছর-কাল এই বংশ জাপানে রাজত্ব করেছে। এদের দারুণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

চীন-সম্রাট এক সময়ে জাপানের সম্রাটকে এক বাণী প্রেরণ করেছিলেন, নারা-নগর তখন রাজধানী। তিনি জাপ-সম্রাটকে সম্বোধন করেছিলেন, 'তাই-নিহি-পুং-কোক্'এর সম্রাট। এই কথাটার অর্থ, সূর্যোদয়ের রাজ্য। নামটা জাপানিদের খুব পছন্দ হল; তারা তখন থেকে ইয়ামাতো নামের পরিবর্তে 'দাই নিপ্পন' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ, এই নাম ব্যবহার করতে শুরু করল। আজও এই নামই প্রচলিত।

নিপ্পন কথা থেকে জাপান নামের উৎপত্তি। সে এক মজার কাহিনী। প্রায় ছ শো বছর পরের কথা। মার্কোপোলো-নামক এক ইতালীয় পরিব্রাজক চীন দেশে গিয়েছিল। সে জাপানে কখনও যায় নি, কিন্তু তার ভ্রমণবৃত্তান্তে জাপানের কথা সে লিখে গেছে। নি-পুং-কোক্ নামটা সে শুনেছিল। এই নামকে মার্কোপোলো তার বইয়ে লিখেছে চিপাংগো এবং তা থেকেই জাপান নামের উদ্ভব।

আচ্ছা, আমাদের দেশের নাম ইণ্ডিয়া এবং হিন্দুস্থান কেন হল, জান? এই দুটো নামই ইণ্ডাস্ বা সিন্ধুনদের নাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রীকরা আমাদের দেশের নাম দিয়েছিল ইণ্ডস্; তা থেকেই এসেছে ইণ্ডিয়া। আবার এই সিন্ধুকেই পারশ্যবাসীরা বলত হিন্দু এবং তা থেকেই হিন্দুস্থান কথার উদ্ভব হয়েছে।

৪৩

হর্ষবর্ধন ও হিউয়েন সাঙ

১১ই মে, ১৯৩২

আবার ভারতবর্ষের কথাতেই ফিরে আসা যাক। হূনদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কতক এখানে-সেখানে থেকে গেছে। বালাদিত্যের পর গুপ্ত-বংশের অবনতি শুরু হয়েছে। উত্তর-ভারতে ছোটো-বড়ো অসংখ্য রাজ্য; আর দক্ষিণে, পুলকেশী স্থাপন করলেন চালুক্য-সাম্রাজ্য।

কানপুরের অদূরে কনৌজ-শহর। কানপুর তো এখন মস্তবড়ো শহর, কত কলকারখানা আর চিমনি। আর কনৌজ ছোটো এতটুকু শহর, গ্রামও বলা চলে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন কনৌজ মস্তবড়ো রাজধানী; তার কবি, শিল্পী আর দার্শনিকের খ্যাতিতে চার দিক মুখরিত। কানপুর তখন কোথায়?

কনৌজ নামটা আধুনিক। আসল নাম কান্যকুব্জ—কুব্জ-পৃষ্ঠা কন্যা। গল্প আছে, জনৈক ঋষির শাপে এক রাজার এক শো কন্যা কুব্জা হয়ে যায়; সেই থেকে ঐ রাজা যে নগরে বাস করতেন তার নাম হয় কুব্জা কন্যার শহর—কান্যকুব্জ।

যা হোক, আমরা বলব কনৌজ। হূনরা কনৌজের রাজাকে হত্যা করে তার পত্নী রাজ্যশ্রীকে করল বন্দী। রাজ্যশ্রীর ভাই রাজ্যবর্ধন বোনকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিহত হলেন বিশ্বাসঘাতকের হাতে। ছোটো ভাই হর্ষবর্ধন তখন বের হলেন বোনের খোঁজে। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী পালিয়ে যায় পাহাড়ে, দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সংকল্প করে। কথিত আছে, সে যখন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হর্ষবর্ধন সেখানে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করেন তাকে। পরে হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেন।

হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করেছিলেন; দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতমালা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বিন্ধ্যপর্বতমালার অপর দিকে ছিল চালুক্য সাম্রাজ্য।

হর্ষবর্ধন নিজে একজন কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তাই তাঁর রাজসভায় অনেক কবি আর

শিল্পীর সমাগম হত; এবং তার ফলে রাজধানী কনৌজ-নগরের সুখ্যাতি বেড়ে গেল। হর্ষবর্ধন ভারতের শেষ বৌদ্ধসম্রাট। তাঁর পরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বেড়ে যায়।

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশসমূহ সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানা যায়। হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন; তাই ঐ ধর্মের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখবার জন্যে তিনি ভ্রমণে বের হয়েছিলেন; শাস্ত্রগ্রন্থাদি সংগ্রহ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গোবি মরুভূমি এবং সমরকন্দ, তাসখন্দ, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত শহর অতিক্রম করে তিনি ভারতে এসেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, সম্ভবত সিংহলও বাদ যায় নি। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব চিত্তাকর্ষক, নানা তথ্যে ভরতি। ভারতের নানা স্থানের অধিবাসীদের বিবরণ, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী, আর তাঁর শোনা কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি তার কোমরে তামার কোমরবন্ধ এঁটে রাখত, এই মজার গল্পটা তোমাকে আগেই

হিউয়েন সাঙ্ অনেক বৎসর ভারতে, বিশেষ করে নালন্দায় ছিলেন। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আশ্রম ছিল; সেখানে দশ হাজার ছাত্র ও শ্রমণ বাস করত। নালন্দা ছিল বৌদ্ধধর্ম এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র; ওদিকে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের পীঠস্থান ছিল কাশী।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষকে বলা হত 'চন্দ্রের দেশ'—ইন্দুরাজ্য। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই নামের উল্লেখ আছে। চীনা ভাষায় চাঁদকে বলে ইন্-টু। সুতরাং তুমি তো সহজেই একটা চীনা নাম নিতে পার? *

হিউয়েন সাঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। লম্বা গড়নের লোকটি, দেখতে সুপুরুষ; উজ্জ্বল দুটি চোখ, গম্ভীর প্রকৃতি এবং বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে তিনি একাকী ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে তিনি তুরফান-রাজ্যে প্রবেশ করেন; মরুভূমির প্রান্তে এই তুরফান-রাজ্য ছিল সংস্কৃতি ও সভ্যতার মরুদ্যানবিশেষ। ঐ রাজ্য এখন লোপ পেয়েছে এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্য ছিল জমজমাট, এর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। ভারতবর্ষ, চীন, পারশ্য এবং ইউরোপের সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছিল এখানে। বৌদ্ধধর্ম খুব প্রসার লাভ করেছিল। সংস্কৃত-ভাষা-প্রচলনের ফলে ভারতীয় প্রভাব খুব লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু চালচলনে চীন আর পারশ্যের প্রভাব ছিল বেশি। তুমি হয়তো মনে করছ, ও দেশের ভাষা ছিল মঙ্গোলীয়। কিন্তু তা নয়, চলতি ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়। ওখানকার আঁকা প্রাচীরচিত্র ইউরোপীয় ধরনের। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং দেবদেবীদের প্রাচীরচিত্র চমৎকার; তাতে ভারতীয় রমণীয়তা, গ্রীক ভাস্কর্য আর চীনা সৌন্দর্যের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

তুরফান আজও আছে, মানচিত্রে দেখতে পাবে। কিন্তু তার সে গৌরবের দিন আর নেই, আজ তার অবস্থা নগণ্য। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, সেই সুদূর সপ্তম শতাব্দীতেও দেশ-বিদেশের সভ্যতার একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল এখানে।

তুরফান থেকে হিউয়েন সাঙ্ মধ্য-এশিয়ার অন্যতম সভ্যতার কেন্দ্র কুচা-নগরে গেলেন। কুচা সেকালে সংগীতচর্চার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল; তা ছাড়া ওখানকার নারীদের সৌন্দর্যের সুখ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের ধর্ম আর শিল্পকলা এখানে প্রসারলাভ করেছিল; ইরান থেকে নানাবিধ পণ্যাদি আমদানি হত এবং সেইসঙ্গে ইরানি সভ্যতার ধারাও এসে পৌঁছেছিল। এমনকি, ওখানকার ভাষার উপরে সংস্কৃত ফার্শি আর লাতিন ভাষার প্রভাব ছিল।

দেখা যাচ্ছে হিউয়েন সাঙ্ তুর্ক-রাজ্যও পরিভ্রমণ করেছিলেন। সেখানকার অধীশ্বর ছিলেন

* ইন্দিরার ডাক নাম ইন্দু।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; মধ্য-এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ছিল তার অধীনে। তার পরে হিউয়েন সাঙ্ এলেন সমরকন্দে; ওখানে তখনও আলেকজান্ডারের স্মৃতি জাগরূক ছিল। সেখান থেকে কাবুল আর কাশ্মীর, তার পরে ভারতবর্ষ।

চীনে তখন তাঙ্-বংশের রাজত্ব শুরু হয়েছে। রাজধানী সিয়ান-ফু শিল্প ও সভ্যতার কেন্দ্র। তখনকার দিনের চীন পৃথিবীতে সভ্যতার পথপ্রদর্শক। তা হলেই বুঝতে পারছ, হিউয়েন সাঙ্ কত বড়ো সুসভ্য দেশ থেকে এসেছিলেন এবং তাঁর তুলনার মাপকাঠিও কত উঁচুদরের ছিল। তাই তো ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা এত গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান। তিনি ভারতবাসীদের এবং তাদের শাসনব্যবস্থার খুব প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতের অধিবাসীরা খুব সৎ আর সম্মানার্হ; আর্থিক ব্যাপারে কেউ ছল-কলার ধার ধারে না। বিচারকার্যে সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়; লোকের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য, প্রতারণার স্থান নেই কোথাও; প্রতিশ্রুতিপালনেও তারা পরাঙ্মুখ নয়। আর আচারে ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র এবং বিনয়ী। শাসনব্যবস্থায় অদ্ভুত ন্যায়পরতা পরিলক্ষিত হয়। চোর-ডাকাত কিংবা বিদ্রোহী নেই বললেই হয়, মাঝে মাঝে এক-আধটু উপদ্রব হয়ে থাকে। গবর্মেণ্টের নীতি খুব উদার, আর শাসনকার্যেও কোনো জটিলতা নাই।" তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আরও জানা যায় যে, প্রজাদিগকে অতি সামান্যই খাজনা দিতে হত; কৃষিকার্য ছিল জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। লোকে নিজেদের ঘরবাড়ি নিজেরাই সামলে রাখত। খাস গবর্মেণ্টের জমি যারা চাষবাস করত তারা খাজনা-বাবদ উৎপন্ন শস্যাদির এক-ষষ্ঠাংশ দিত। ব্যবসাবাণিজ্যের অবাধ প্রচলন ছিল।

দেশে শিক্ষাব্যবস্থার বনিয়াদ ছিল পাকা। সাত বৎসর বয়সে বালকবালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে হত; তার পরের ধাপ ছিল শাস্ত্রপাঠ। আজকাল 'শাস্ত্র' কথায় কেবল খাঁটি ধর্মগ্রন্থই বোঝায়; কিন্তু তখনকার দিনে সবরকমের বিদ্যাকেই বোঝাত। শাস্ত্র ছিল পাঁচ রকমের; যথা—ব্যাকরণ, শিল্পকলা, চিকিৎসা, ন্যায় এবং দর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়েও এইসমস্ত বিষয় পড়ানো হত এবং এই শিক্ষা সমাপ্ত হত সাধারণত ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে। কিন্তু আমার তো মনে হয় না যে, খুব বেশি লোক ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষালাভ করত। তবে মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা অধিকতর প্রসার লাভ করেছিল; কেননা, বৌদ্ধ শ্রমণ আর সন্ন্যাসীরাই ছিল শিক্ষক এবং সংখ্যায় এদের কমতি ছিল না। ভারতবাসীদের জ্ঞানস্পৃহা দেখে হিউয়েন সাঙের বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

হিউয়েন সাঙ্ প্রয়াগের (বর্তমান এলাহাবাদ) কুম্ভমেলার একটা বর্ণনা লিখে গেছেন। তুমি আবার যখন এই মেলায় যাবে তোমার মনে পড়বে, হিউয়েন সাঙ্ও এই মেলা দেখেছিলেন তেরো শো বছর আগে। অবাক হোয়ো না, এই মেলা তখনও ছিল; প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই এটার প্রচলন হয়েছিল কিনা?

হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও যেতেন এই হিন্দুমেলায়। তাঁর আমন্ত্রণে রাজ্যের যত দীনদুঃখীর সমাবেশ হত এখানে। দৈনিক এক লাখ লোকের আহারের ব্যবস্থা তিনি করতেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগের এই ধর্মমেলায় হর্ষ তাঁর রাজকোষের সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণ, বহুমূল্য অলংকারাদিও উজাড় করে বিলিয়ে দিতেন সকলকে। এমনকি নিজের মাথার রাজমুকুট এবং পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্রাদিও তিনি দান করতেন। হর্ষ খাদ্যোপকরণ-হিসাবে প্রাণীহত্যা করতে দিতেন না; সম্ভবত ব্রাহ্মণরা এতে তেমন আপত্তি করে নি, কেননা, বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিরামিষাশী হয়ে পড়েছিল।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে একটা মজার খবর আছে। সেকালে অসুখবিসুখ হলে লোকে সাতদিন উপোস করে থাকত, এবং এই সময়ের মধ্যেই তার অসুখ সেরে যেত। ঔষধ খাওয়ার রেওয়াজ তখন বড়ো-একটা ছিল না; যদি ঐ সময়ের মধ্যে অসুখ না সারত তবেই ঔষধ ব্যবহার করা হত। তখনকার দিনে অসুখবিসুখ কম হত, ডাক্তার-কবিরাজের প্রয়োজন তেমন ছিল না।

ভারতের আর-একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, রাজা মহারাজা সেনাপতি প্রভৃতি জ্ঞানী আর বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বিদ্যাকেই বরাবর সম্মান দেখানো হয়েছে, বিত্তকে নয়।

অনেক বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে হিউয়েন সাঙ আবার তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেলেন। ফেরবার পথে সিন্ধুনদে একটা দুর্ঘটনার ফলে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়, তিনি নিজেও প্রায় জলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন; তা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করবার কাজে অনেক কাল ব্যস্ত ছিলেন। চীনের সম্রাট রাজধানী সিয়ান-ফু-নগরে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করেছিলেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণাতেই হিউয়েন সাঙ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে গেছেন।

ঐ ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা মধ্য-এশিয়ার তুর্কদের কথা জানতে পারি। মধ্য-এশিয়ার সর্বত্র—পারশ্য, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, খোরাসান, মোসাল প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ আশ্রম দেখতে পাওয়া যেত। পারশ্যের অধিবাসীদের নাকি বিদ্যাশিক্ষার দিকে আগ্রহ ছিল না, শিল্পকর্মের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। অন্যান্য দেশে পারশ্যের শিল্পের আদর ছিল যথেষ্ট।

এই তো গেল হিউয়েন সাঙের কথা। এরকম কত পরিব্রাজকই-না ভ্রমণে বেরিয়েছিল। কত শত বৎসর আগেকার কথা, কত অদ্ভুত তাদের কাহিনী। আধুনিক কালের আফ্রিকার জঙ্গলে কিংবা মেরুপ্রদেশে অভিযান তখনকার দিনের ভ্রমণব্যাপারের তুলনায় অতি তুচ্ছ। বছরের পর বছর তারা কেবল পথ চলতেই থাকত,—বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, দুস্তর পাহাড় পর্বত মরুভূমি পেরিয়ে, চলার আর বিরাম ছিল না। কখনও হয়তো-বা বাড়িঘরের জন্যে তাদের বেদনা জাগত। হিউয়েন সাঙের এক শো বছর আগে সুঙ্-উন্ নামে এক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিল। এক সময়ে এই দূর দেশে ফুলফল, গাছপালা, বসন্তকালীন সৌন্দর্য, পাখির সুমিষ্ট কলতান, বাতাসের মর্মধ্বনি ওর মনকে আকুল করে দিল, প্রাণ কেঁদে উঠল স্বদেশের জন্যে এবং শেষ পর্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ল। বেচারা!

৪৪

দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রসমূহ : শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব

১৩ই মে, ১৯৩২

খৃষ্টীয় ৬৪৮ অব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে, বেলুচিস্থানের রাজনৈতিক আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ জমে উঠেছিল। ওটা প্রচণ্ড এক ঝড়ের পূর্বাভাস; সে ঝড়ে পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা আর দক্ষিণ-ইউরোপ বিপর্যস্ত হয়েছিল। ওদিকে আবার আরবদেশে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, নাম তাঁর মহম্মদ। তিনি এক নূতন ধর্ম প্রচার করলেন—ইসলামধর্ম। এই ধর্ম আরবদের দিল নূতন প্রেরণা, উদ্বুদ্ধ করল আত্মশক্তিতে। তারা বের হল দেশ জয় করতে। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এরা দেশের পর দেশ জয় করে যেতে লাগল। সম্পূর্ণ এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হল পৃথিবীতে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ইসলামধর্মী আরবগণ বেলুচিস্থান অধিকার করে এবং তার পরে সিন্ধুদেশ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার পরে তিন শো বছর-কাল মুসলমানেরা আর অগ্রসর হতে পারল না; ভারতবর্ষ আক্রমণ করা হয়ে উঠল না। পরবর্তীকালে যে আক্রমণ হয়েছিল তা আরবদের দ্বারা নয়; ওরা ছিল মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি জাত, মুসলিমধর্মে দীক্ষিত।

এই সময়ে পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের মহারাষ্ট্র-অঞ্চলে চালুক্য-বংশের রাজত্ব। রাজধানীর নাম বাদামি। হিউয়েন সাঙ এই মহারাষ্ট্রবাসীদের শৌর্যবীর্যের খুব প্রশংসা করে গেছেন। চালুক্য-সম্রাটদিগকে রীতিমতো ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল। তিনদিকে তিন শত্রু! উত্তরে হর্ষবর্ধন, পূর্বে কলিঙ্গ আর দক্ষিণে পহ্লবীগোষ্ঠী। তথাপি এরা উত্তরোত্তর দুর্জয় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল, রাজ্যবিস্তার করল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারল না; রাষ্ট্রকূটরা এসে হটিয়ে দিল ওদের।

বাস্তবিক দক্ষিণ-ভারতের তখন জমজমাট অবস্থা। বড়ো বড়ো রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য। কখনও সব কটিই সমান উন্নত, আবার কখনও-বা কোনো-একটি খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দিক দিয়ে অন্যদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাণ্ড্য-রাজাদের আমলে মাদুরা ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। তখন তামিল-কবি ও লেখকদের খুব খ্যাতি। পহ্লব-রাজবংশের রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুরা, বর্তমান কাঞ্জিভরম; এককালে পহ্লবী-রাজাদের নামডাক ছিল যথেষ্ট।

এর পরে এল চোল-সাম্রাজ্য। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোল-বংশ সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিরাট নৌবিভাগ, বঙ্গোপসাগর আর আরবসাগরে একাধিপত্য। কাবেরী নদীর মুখে প্রধান বন্দর কাবেরীপত্তিনাম্। প্রথম বড়ো রাজার নাম বিজয়ালয়। চোল-বংশ উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের নিকট পরাজিত হয়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট রাজারাজের আমলে হৃতগৌরব আবার ফিরে পেয়েছিল। এই সময়ে উত্তর-ভারতে মুসলমান-আক্রমণ শুরু হয়েছে; রাজারাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন এবং লঙ্কাদ্বীপ দখল করলেন। সেখানে সত্তর বৎসর-কাল চোল-রাজাদের আধিপত্য ছিল। রাজারাজের পুত্র রাজেন্দ্রও ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়; তিনি দক্ষিণ-ব্রহ্ম জয় করেন, যুদ্ধের হাতিগুলোকেও জাহাজে করে সে দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর-ভারতে বঙ্গদেশের রাজাও তাঁর নিকট পরাজিত হয়। চোল-সাম্রাজ্যের সে কী আধিপত্য! কিন্তু বেশি দিন তা বজায় ছিল না। রাজেন্দ্র বড়ো যোদ্ধা ছিলেন, রাজ্যও জয় করেছিলেন বটে অনেক, কিন্তু রাজ্যগুলোর বাসিন্দাদের চিত্ত জয় করতে পারেন নি; ফলে, তাঁর মৃত্যুর পরে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং চোল-সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাজেন্দ্রের শাসনকাল ১০১৩ থেকে ১০৪৪ খৃষ্টাব্দ।

চোলদের রাজত্ব-কালে দেশবিদেশে ব্যবসাবাণিজ্যও খুব বিস্তারলাভ করেছিল। এ দেশের তুলাজাত দ্রব্যের তখন খুব চাহিদা। নানা দ্রব্যসম্ভার নিয়ে জাহাজ কাবেরীপত্তিনাম্ বন্দরে যাতায়াত করত। ওখানে যবন অর্থাৎ গ্রীকদেরও বসতি ছিল। মহাভারতেও চোল-বংশের উল্লেখ আছে।

এই তো গেল দক্ষিণ-ভারতের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস। খুব সংক্ষেপেই বলা হল, কেননা তা ছাড়া উপায় নেই। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের আলোচনা করতে হবে, সুতরাং ক্ষুদ্র এক অংশের—তা হলই-বা আমাদের বাসভূমি—ইতিহাস আলোচনাতেই অধিকাংশ সময় কাটালে চলবে কেন?

আসল কথা এই যে, সম্রাট, রাজামহারাজা কিংবা তাদের রাজ্যবিস্তার অপেক্ষাও সে যুগের সংস্কৃতি, এবং শিল্পকলা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-ভারতে আজও অত্যুৎকৃষ্ট আর্টের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। উত্তর-ভারতের অনেক প্রাচীন মনুমেণ্ট, অট্টালিকা, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিধ্বস্ত হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহে আর মুসলমানদের আক্রমণের ফলে। অবশ্য দক্ষিণ-ভারতেও মুসলমান-আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু তার দরুন শিল্পকলার নিদর্শনগুলি নষ্ট হয় নি। দুঃখের বিষয়, সেকালে উত্তর-ভারতের অনেক সুদৃশ্য মনুমেণ্ট ধ্বংস করা হয়েছিল। যে মুসলিম দল এসেছিল তারা ছিল মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী, আরবদেশের লোক নয়। এরা ছিল গোঁড়া মুসলমান, তাই এই দেশের দেবদেবীর মূর্তিগুলি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে আবার দেবমন্দিরগুলোকে দুর্গ হিসাবেও ব্যবহার করেছিল। দক্ষিণ-অঞ্চলের অনেক মন্দির দুর্গের আকারে গঠিত, যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে আত্মরক্ষার ব্যূহ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং আত্মরক্ষার দুর্গ ছিল বলেই তো মুসলমান আক্রমণকারীরা ওগুলোকে বিধ্বস্ত করেছিল! এইসব মন্দিরে কেবল যে পুজা-অর্চনাই হত তা নয়, গ্রাম্য আসর, পাঠশালা, পঞ্চায়েত-বৈঠক ইত্যাদিও, এক কথায় গ্রাম্য জীবনযাত্রার কেন্দ্র ছিল ঐ মন্দির। কাজেকাজেই সেকালে মন্দিরের পুরোহিত আর ব্রাহ্মণদেরই ছিল প্রাধান্য।

আজও তাঞ্জোরে একটি সুন্দর মন্দির দেখতে পাওয়া যায়; ওটা চোল-সম্রাট রাজারাজের কীর্তি। বাদামি আর কাঞ্জিভরমেও সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। কিন্তু ইলোরার কৈলাস-মন্দির শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন; অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ওটার নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। এ ছাড়া, পাথর আর ব্রোঞ্জে উৎকীর্ণ সুদৃশ্য মূর্তি তো অসংখ্য। এর মধ্যে আবার নটরাজের

মূর্তি সবিশেষ বিখ্যাত। চোল-সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্রের আমলে সেচকার্যের খুব উন্নতি হয়েছিল; চোলপুরম-নামক স্থানে তখন ষোলো মাইল লম্বা এক বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এক শো বছর পরে ঐ বাঁধ দেখে আরবীয় পরিব্রাজক আল্‌বেরুনির তাক্‌ লেগে গিয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, ওঁর দেশের লোক এর স্থপতিনৈপুণ্যই বুঝতে পারবে না, নির্মাণ করা তো দূরের কথা।

এই চিঠিতে সে যুগের অনেক সম্রাট আর তাদের কীর্তিকাহিনীর উল্লেখ করা হল। এরা সবাই বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে এমন এক অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল যাঁর কাছে সম্রাটদের কীর্তি তুচ্ছ। এ'র নাম শঙ্করাচার্য। সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ওঁর জন্ম হয়েছিল। ইনি ভারতীয় জীবনধারায় এক যুগান্তর আনয়ন করলেন। হিন্দুধর্মকে ইনি পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন বিশেষ ধরনের এক ধর্ম—শৈবধর্ম, অর্থাৎ শিবের পূজা। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং যুক্তিতর্কের সাহায্যে জোর প্রচারকার্য শুরু করলেন। বৌদ্ধসংঘের অনুরূপ এক সন্ন্যাসী-দলও তিনি গড়ে তুললেন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ভারতের চার অঞ্চলে চারটি কেন্দ্র স্থাপিত হল, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল সন্ন্যাসীসংঘ। সারা ভারতবর্ষে তিনি প্রচার করে বেড়ালেন, তাঁর যুক্তিতর্কের কাছে সর্বত্রই লোকে হার মানল, গ্রহণ করল তাঁর মতবাদ। সারা ভারত জয় করে তিনি এলেন কাশীতে। পরে তিনি যান কেদারনাথে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়; তখন শঙ্করাচার্যের বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর।

শঙ্করাচার্যের কৃতিত্ব অসাধারণ। বৌদ্ধধর্ম প্রায় অন্তর্হিত হল ভারতবর্ষ থেকে। সমগ্র দেশে হিন্দুধর্ম ও সেইসঙ্গে শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হল। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য এবং অন্যান্য বই ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করল দেশে। তিনি কেবল যে ব্রাহ্মণশ্রেণীর গুরু হয়ে দাঁড়ালেন তা নয়, জনসাধারণের চিত্তও জয় করলেন। শুধু মানসিক ক্ষমতা আর বিচারশক্তির জোরে কারও পক্ষে নেতা হওয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের মন জয় করা এবং ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ অসাধারণ ব্যাপার! বড়ো বড়ো যোদ্ধা এবং বিজেতার নাম ইতিহাসে লেখা থাকে বটে, কখনও-বা তারা ইতিহাসের মোড় ফিরিয়েও দেয়। আবার এমনও দেখা গেছে, বড়ো বড়ো ধর্মনেতাগণ কোটি কোটি লোকের চিত্ত জয় করেছে, উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলেছে তাদের দেহ মন। এর মূল কারণ, লোকের ধর্মবিশ্বাস। লোকের মন আর বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আবেদন করে বিশেষ ফল হয় না; কেননা, অধিকাংশ লোকেরই চিন্তাশক্তি নেই, তারা ভাবপ্রবণ। তথাপি শঙ্করাচার্য জনগণের মনের তন্ত্রীতে ঘা দিলেন, নির্ভর করলেন তাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর বিচারশক্তির উপর। কিন্তু পুরোনো কথার আবৃত্তি তিনি করেন নি। তাঁর যুক্তিতর্ক বিচার-সহ ছিল কি ছিল না, তা নিয়ে এখন তর্ক করে লাভ নেই। ধর্ম মনের ব্যাপার। ধর্মের ব্যাপারে ভাবপ্রবণতাই বেশি কাজ দেয়। খেয়াল রাখবে, শঙ্কর ধর্ম-প্রশ্নের মীমাংসা করলেন যুক্তিতর্কের সাহায্যে, লোকের ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে নয়। অদ্ভুত তাঁর মননশক্তি, এবং তিনি যে সাফল্যলাভ করলেন তা অপূর্ব। এর থেকে আমরা তখনকার দিনের শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাবেরও একটা আভাস পাচ্ছি।

হিন্দু দার্শনিক চার্বাকের নাম সম্ভবত তুমি শোনো নি। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। আজকাল এমন অনেক লোক আছে, বিশেষ করে রাশিয়ায়, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আমি এখানে সে বিষয় আলোচনা করব না। লক্ষ্য করবে, সেই প্রাচীনকালেও ভারতে চিন্তার এবং লেখার স্বাধীনতা ছিল; বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী লোকের চলবার স্বাধীনতা ছিল। অথচ ইউরোপের দিকে দেখো, কিছুদিন আগেও সেখানে এই ধরনের স্বাধীনতা ছিল না, এমনকি এখনও অনেক বাধাবিঘ্ন আছে।

শঙ্করাচার্যের জীবনকালে আর একটা ব্যাপার পরিস্ফুট হয়েছে; সেটা হল, ভারতের সংস্কৃতিগত ঐক্য। প্রাচীনকালের ইতিহাসে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। তুমি জান, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তা এক। রাজনীতির দিক থেকে ভারতবর্ষ অনেকবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আবার একই কেন্দ্রীয় গবর্মেন্টের শাসনাধীনে রয়েছে। ভারতবর্ষ বরাবরই সংস্কৃতির দিক থেকে অবিভাজ্য। কেননা, তার পটভূমি এক, কৃষ্টিধারা

এক, ধর্ম এক, পৌরাণিক কাহিনী এক, ভাষা এক (সংস্কৃত); এমনকি, এক গ্রাম্য পঞ্চায়েত-প্রথা, একই শাসনতন্ত্র। সাধারণ লোকের কাছে সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল পুণ্যভূমিবিশেষ; আর, পৃথিবীর বাদবাকি অংশে ছিল যত ম্লেচ্ছ আর বর্বরদের বাস। জনগণের মনে ঐক্যবোধ এত তীব্র ছিল যে, শাসনব্যাপারে দেশটা বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও লোকে তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি। উপরের দিকে শাসনব্যবস্থার যত পরিবর্তনই হোক-না কেন, গ্রাম্য পঞ্চায়েত-প্রথার পরিবর্তন কখনও হয় নি।

শঙ্কর ভারতের চার অঞ্চলে সন্ন্যাসীমণ্ডলীর জন্যে চারটি মঠ অথবা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এতে করে এই প্রমাণ হয় যে, সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতবর্ষ অবিভাজ্য বলেই স্বীকৃত হত। তা ছাড়া, তাঁর ধর্মের আন্দোলনে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে যে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন তাতেও প্রমাণ হয় যে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ধারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করত।

শঙ্কর শৈবধর্ম প্রচার করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতেই বিশেষ করে এই ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল; সে অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরই শিবমন্দির। উত্তরাঞ্চলে গুপ্ত-রাজাদের সময়ে বৈষ্ণবধর্মের—কৃষ্ণের পূজার—খুব প্রচলন ছিল। হিন্দুধর্মের এই দুটি শাখাধর্মের মন্দিরগুলো কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন।

এই চিঠি খুব দীর্ঘ হয়ে পড়ল। কিন্তু তবু মধ্যযুগের ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে সব কথা বলা হয় নি। পরের চিঠিতে আবার এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

৪৫

মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

১৪ই মে, ১৯৩২

তোমার হয়তো মনে আছে, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করেছি। এই চাণক্য অথবা কৌটিল্য ছিলেন অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের প্রধান মন্ত্রী। ঐ পুস্তকে সে যুগের মানুষ আর শাসনপ্রণালী সম্পর্কে হরেকরকম জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ আছে; এ যেন একটা জানলা, যার মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে আমরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে একবার দেখে নিতে পারি। বাস্তবিক, রাজারাজড়াদের এবং তাদের যুদ্ধজয়ের অতিরঞ্জিত কাহিনী না পড়ে বরং এই ধরনের বই পড়লে বেশি কাজ দেয়, কেননা এতে আছে সেকালের শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিবরণ।

শুক্রাচার্য-লিখিত 'নীতিসার'ও এই ধরনের বই। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের মতো অত ভালো না হলেও এ বই থেকেও আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক-কিছু জানতে পারি। সুতরাং এই 'নীতিসার' আর শিলালিপি এবং অন্যান্য বিবরণ থেকে খৃষ্টজন্মের পরেকার নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখা যাক।

নীতিসার বলে, "শুধু জন্মগত অধিকারে কিংবা পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে কেহ প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হতে পারে না।" দেখা যাচ্ছে, শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্র হওয়া উচিত গুণ, জন্মগত অধিকার নয়। আর-এক জায়গায় আছে, "সরকারি কার্যে নিয়োগের বেলা চরিত্র, কৃতিত্ব ও কর্মক্ষমতাই বিবেচ্য, জাতি কিংবা বংশ নয়।" রাজা তাঁর খুশিমতো কাজ করতে পারেন না; জনগণের অভিমত তাঁকে গ্রাহ্য করতে হয়। "কয়েকগাছি সুতো একত্রে পাকিয়ে নিলে দড়ি খুব মজবুত হয় এবং তা দিয়ে সিংহকেও বেঁধে রাখা যায়; তেমনি একা রাজার চেয়ে জনসাধারণের অভিমত অধিকতর ক্ষমতাশালী।"

কথাগুলো খুব সুন্দর এবং বর্তমান যুগেও মানানসই। কিন্তু আসলে তেমন কাজে আসে না। যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতা থাকলে লোকে সংসারে উন্নতিলাভ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন

এই, লোকে এইসকল গুণ অর্জন করবে কী প্রকারে? ধরো, একটি বালক যেন খুব চতুর আর বুদ্ধিমান, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে জীবনে সে কৃতী হতে পারে; কিন্তু যদি উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা নাই পায় তা হলে ওর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

সেইরকম, জনগণের অভিমত বস্তুটা কী? জনসাধারণের অভিমত বলতে কার মতামতকে বোঝায়? শূদ্রদেরও যে মতামত প্রকাশের অধিকার আছে সেটা সম্ভবত নীতিসারের লেখক বিবেচনা করেন নি। জনগণের অভিপ্রায় বলতে তিনি হয়তো-বা শাসকসম্প্রদায় এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের অভিপ্রায়ের কথাই বলেছেন।

তবে লক্ষ্য করা যায়, মধ্যযুগে ভারতে স্বৈরতন্ত্রের স্থান ছিল না। সেকালেও রাজার অধীনে শাসনপরিষদ ছিল, এবং সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, বিশ্রামাগার, রাস্তাঘাট, পুল, ড্রেন, নগর ও গ্রাম ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর।

গ্রামসংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল পঞ্চায়েত-সভার হাতে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরাও পঞ্চায়েতদিগকে সম্মানের চোখে দেখতেন। জমির বিলিবন্দোবস্ত, ট্যাক্স-আদায়, সরকারে খাজনা জমা দেওয়া, ইত্যাদি সমস্তই পঞ্চায়েতকে করতে হত। দক্ষিণ-ভারতের কতকগুলো প্রাচীন শিলালিপি থেকে পঞ্চায়েতের নির্বাচনপ্রণালী জানা যায়। কোনো সভ্য তহবিলের টাকাকড়ির হিসাব না দিলে সদস্যপদ থেকে তার নাম খারিজ করে দেওয়া হত। সদস্যদের আত্মীয়স্বজনকে চাকরি দেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। চমৎকার নিয়ম। আজকালকার মিউনিসিপ্যালিটি, আইনসভা ইত্যাদিতেও এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে পারলে বেশ হত। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে আবার কয়েকজনকে নিয়ে সংসদ গঠন করা হত; সংসদের কার্যকাল ছিল এক বৎসর। কোনো সদস্য অন্যায় করলে বিনা নোটিশে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। পঞ্চায়েত-বৈঠকের হাতে বিচার এবং সালিশীর ক্ষমতা ছিল।

কোনো পঞ্চায়েত-বৈঠকের সভ্যতালিকায় একজন স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ আছে; দেখা যাচ্ছে, সেকালে নারীরাও পঞ্চায়েত কিংবা সংসদের সদস্য হতে পারতেন।

পঞ্চায়েত-প্রথাই ছিল সেকালের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এই বৈঠকের হাতে। এইসকল গ্রাম্য পরিষদ তাদের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে এতটা সচেতন ছিল যে, রাজকীয় অনুজ্ঞা বা ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো সৈনিক গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না। নীতিসার বলে, "প্রজারা যদি কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় তবে সে ক্ষেত্রে রাজার কর্তব্য প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করা; আর যদি অভিযোগকারীদের সংখ্যা খুব বেশি হয় তবে রাজার উচিত হবে সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করা। কেননা, সরকারি পদের দেমাকে কেই-বা মোহাবিষ্ট না হয়?" খাঁটি কথা। বিশেষ করে, এ দেশের আজকালকার সরকারি কর্মচারীদের সম্বন্ধে এ কথা খুব খাটে; এদের কুকর্ম-কুশাসনের তো আর অন্ত নেই?

বড়ো বড়ো শহরগুলোতে লোকের পেশা হিসাবে বিভিন্ন রকমের সমিতি গঠন করা হত; যেমন কারিগর-সমিতি, ব্যাঙ্ক-কর্মচারী-সমিতি, ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ ইত্যাদি। ধর্মসঙ্ঘও ছিল।

কর ধার্য করবার সময়ে রাজা লক্ষ্য রাখতেন যাতে না প্রজাদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফুলবিক্রেতা যেমন এক দিনেই বাগানের সমস্ত গাছের ফুল সংগ্রহ করে না, রাজারও তেমনি রয়ে বসে ট্যাক্স ধার্য করা কর্তব্য।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধরনের খুচরা খবরই আমরা পাচ্ছি। তবে কিনা, বইয়ের এসকল নীতিকথা কার্যত কতটা অনুসৃত হয়েছিল তা জানা একটু শক্ত ব্যাপার। নীতিকথা বইয়ে লেখা সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেসব প্রয়োগ করা বা মেনে চলা খুবই কঠিন। এইসব নীতিকথা হয়তো লোকে পুরোপুরি মেনে চলে নি, কিন্তু তথাপি বইগুলো থেকে আমরা অন্তত সে যুগের অধিবাসীদের আদর্শ ও মনোভাব উপলব্ধি করতে পারি।

সেকালে রাজা এবং শাসকশ্রেণী মোটেই স্বেচ্ছাচারী ছিল না; পঞ্চায়েত-সভার জন্যেই তা সম্ভব হয় নি। দেখা যাচ্ছে, গ্রাম এবং শহরগুলোতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল এবং কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট পারতপক্ষে এ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করত না।

আসল কথা এই যে, সে যুগে ভারতের শাসনব্যবস্থার মূলে ছিল শ্রেণীবিভাগ। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের হাতে ছিল শাসনক্ষমতা। এরা সাধারণত একমত হয়ে দেশ শাসন করত; তবে কখনও-বা শাসনক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে লড়াই বেধে যেত। অন্যান্য শ্রেণীকে তারা রাখত দাবিয়ে, মাথা তুলতে দিত না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির ফলে বৈশ্যসম্প্রদায় হয়ে উঠল বিত্তশালী, এবং তাতে করে সমাজে বাড়ল তাদের প্রতিপত্তি; আদায় করল অনেক-কিছু ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তাই বলে রাজ্যশাসন-ব্যাপারে এদের প্রকৃত কোনোই ক্ষমতা ছিল না। আর শূদ্রজাতি? ওরা বরাবর নিম্নস্তরেই থেকে গেছে। অবশ্য, এর নীচেও কয়েকটি শ্রেণী ছিল।

ক্বচিৎ কখনও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও উঁচু ধাপে উঠেছে, শূদ্রজাতির লোকও রাজা হয়েছে। অনেক সময় কোনো কোনো নীচ জাতি হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ক্রমশ উন্নতি লাভ করেছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, পাশ্চাত্যের মতো এ দেশে দাসত্বপ্রথা যদিও ছিল না, ভারতের সমগ্র সমাজ-কাঠামোটা ছিল কয়েকটি ধাপের সমষ্টি—এক শ্রেণীর উপরে আর-এক শ্রেণী। উপরের শ্রেণী দাবিয়ে রাখত নিম্নস্তরের শ্রেণীকে, দস্তুরমতো শোষণ করত তাদের। এইসকল দরিদ্র অধিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষার কোনো ব্যবস্থা এরা করে নি, পরন্তু সমাজে চিরকালের জন্য এদের খাটো করে রাখবার জন্যে বিধিমতো চেষ্টা করেছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত-সভায় কৃষিজীবীদের হয়তো-বা সামান্য ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সেখানেও আধিপত্য করত ব্রাহ্মণরা।

ভারতে আর্যদের আবির্ভাব থেকে এই মধ্যযুগ অবধি, অর্থাৎ আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, আর্যদের শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রমশ এর অবনতি হতে লাগল; অনেক কালের পুরোনো কিনা, তাই। তা ছাড়া পুনঃপুনঃ বহিরাক্রমণের দরুনও হয়তো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি আলগা হয়ে গিয়েছিল।

তুমি জেনে অবাক হবে, পুরাকালে ভারতবর্ষ অঙ্কশাস্ত্রে খুব উন্নত ছিল। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক, নাম লীলাবতী। কথিত আছে, লীলাবতী আর তাঁর পিতা ভাস্করাচার্য এবং ব্রহ্মগুপ্ত নামে আর এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম দশমিক-প্রথার উদ্ভাবন করেন। বীজগণিতের চর্চাও প্রথমে ভারতেই হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে এ বিদ্যা আরবদেশে যায় এবং তার পর সেখান থেকে ইউরোপে। কথাটার উৎপত্তি হয়েছে আরবি ভাষা থেকে।

৪৬

আংকোর-নগরী ও শ্রীবিজয়া

১৭ই মে, ১৯৩২

চলো, এই ফাঁকে একবার বৃহত্তর ভারত থেকে ঘুরে আসা যাক। বৃহত্তর ভারত বলতে আমি মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি ভারতীয় উপনিবেশগুলির কথা বলছি। কী অবস্থায় এইসকল বসতি আর উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল সে কথা আগে বলা হয়েছে। এগুলো কিন্তু বিনা চেষ্টায় খামোকাই গড়ে ওঠে নি। সমুদ্রে ভারতীয়দের আধিপত্য ছিল এবং হামেশাই তারা সমুদ্র পারাপার করত বলেই তো একই সময়ে নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে এইসমস্ত উপনিবেশ-স্থাপন শুরু হয়। প্রথমে এগুলো ছিল হিন্দু উপনিবেশ; কয়েক শতাব্দী বাদে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ফলে সমগ্র মালয়েশিয়া বৌদ্ধ উপনিবেশে পরিণত হয়।

ইন্দোচীনের কথা আলোচনা করা যাক। সর্বপ্রথমে যে উপনিবেশ স্থাপন করা হয় তার নাম ছিল চম্পা, জায়গাটার নাম ছিল আনাম। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে এই উপনিবেশে পাণ্ডুরঙ্গম ছিল

প্রধান শহর; আবার দু শো বছর পরে দেখা যায়, কম্বোজ নগর সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। এই নগরের বাড়িঘর, মন্দির ইত্যাদি ছিল পাথরে তৈরি। সমস্ত ভারতীয় উপনিবেশেই বিরাট সব বাড়ি ভারতীয় কৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন। স্থপতিবিশারদ, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি ভারতবর্ষ থেকেই সেখানে গিয়েছিল। বাড়িঘরনির্মাণ-ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্র আর দ্বীপগুলোর মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত; তার ফলে অতি উঁচুদরের স্থপতিবিদ্যার বিকাশ হয়েছিল।

এইসকল উপনিবেশের চার দিকে সমুদ্র। অধিবাসীরা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষগণ সমুদ্র পার হয়েই এখানে এসেছিল। স্বভাবতই এরা সমুদ্রগামী লোক। বণিক আর ব্যবসায়ী লোক এরা; নানা-প্রকার মালপত্র নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করত এ-দ্বীপে ও-দ্বীপে, পশ্চিমে ভারতবর্ষ আর পূর্বে চীন পর্যন্ত। মালয়ের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বণিকশ্রেণীর আধিপত্য ছিল। হামেশাই বিরোধ বাধত ঐসব রাষ্ট্রের মধ্যে, ফলে হত যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ড। কখনও-বা হিন্দু আর বৌদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যেই শুরু হত লড়াই। ঐসকল যুদ্ধবিগ্রহের আসল কারণ ছিল, ব্যবসাবাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তেমনি দেখো, এ যুগেও শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধছে ব্যবসাবাণিজ্যে একচেটিয়া প্রাধান্যলাভের উদ্দেশ্যে।

অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিন শো বছর-কাল ইন্দোচীনে তিনটি হিন্দুরাষ্ট্র ছিল। নবম শতাব্দীতে জয়বর্মণ নামে এক বড়ো রাজা ঐ তিনটি রাষ্ট্রকে একত্র মিলিত করে বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। উনি সম্ভবত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। আংকোর-নামক স্থানে তিনি তাঁর রাজধানী নির্মাণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি; পরে তাঁর বংশধর যশোবর্মণের আমলে সে কাজ শেষ হয়। কম্বোডিয়া-সাম্রাজ্যও টিঁকে ছিল শ'-চারেক বছর এবং বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। আংকোর নগরের তখন খুব খ্যাতি, অধিবাসীর সংখ্যা দশ লাখেরও বেশি; আকারে সিজারদের আমলের রোম নগরের চেয়েও বড়ো। কাছেই আংকোর-বটের মন্দির। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কম্বোডিয়া-সাম্রাজ্যের বড়ো দুর্দিন গেছে, নানা দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল; পূর্বদিকে আনামিদের আক্রমণ, পশ্চিমে আদিম জাতি আর উত্তরে শান জাতির আক্রমণে সাম্রাজ্য একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তথাপি আংকোর নগরের মহিমা ক্ষুণ্ন হয় নি। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক চীনা দূত কম্বোডিয়া-রাজ্যে এসেছিল; সে আংকোর নগরের খুব প্রশংসা করে গেছে।

কিন্তু ১৩০০ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ ভীষণ এক উৎপাত সৃষ্টি হল। পলি পড়ে মিকঙ নদীর মোহানা গেল বন্ধ হয়ে, জলস্রোত আর বয় না; স্রোতে ভাঁটা পড়াতে নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে দেখা দিল বন্যা, জমির উর্বরতা গেল নষ্ট হয়ে, পরিণত হল জলাভূমিতে। শীঘ্রই খাদ্যাভাব দেখা দিল; অধিবাসীদের দুর্দশার একশেষ। অবশেষে দলে দলে লোক শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল। সমৃদ্ধিশালী আংকোর নগর পরিণত হল জঙ্গলে; বিরাট অট্টালিকাগুলিতে বাসা করল যত বন্যজন্তু। তার পর কালক্রমে ঐসমস্ত অট্টালিকাও ধ্বংস হল, মিশে গেল মাটিতে, রইল কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল।

কম্বোডিয়া-সাম্রাজ্য এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারল না, শুরু হল সাম্রাজ্যের পতন। শেষ পর্যন্ত একটা প্রদেশের আকারে তার অস্তিত্ব বজায় রইল, কখনও শ্যামদেশের শাসনাধীনে, কখনও বা আনামিদের অধিকারে। প্রসিদ্ধ আংকোর-বট-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এক সমৃদ্ধিশালী নগরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইন্দোচীনের অদূরে সুমাত্রা দ্বীপ। খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের পহ্লবীবংশ ওখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। মালয় উপদ্বীপ প্রথমে সুমাত্রা-রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত ছিল এবং পরে বহুকাল যাবৎ এদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সুমাত্রা পর্বতমালায় অবস্থিত শ্রীবিজয়া নগরী ছিল রাষ্ট্রের রাজধানী। পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুমাত্রায় বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ক্রমে মালয়ের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসীই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। এই কারণেই সুমাত্রা-রাষ্ট্রকে বলা হয় শ্রীবিজয়ার বৌদ্ধসাম্রাজ্য। শ্রীবিজয়ার খ্যাতিপ্রতিপত্তি খুব বেড়ে চলল এবং ক্রমে বোর্ণিও, ফিলিপাইন, সেলিবিস, জাভা আর ফরমোসা দ্বীপের অর্ধাংশ,

সিলোন এবং এমনকি ক্যান্টনের নিকটবর্তী দক্ষিণ-চীনের একটি বন্দরও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সম্ভবত ভারতের দক্ষিণ-সীমার একটি বন্দরও তার দখলে ছিল। দেখা যাচ্ছে, এখানে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এইসকল ভারতীয় উপনিবেশে প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসাবাণিজ্য আর জাহাজনির্মাণ-শিল্প। সে কালের চীনা এবং আরবীয় লেখকদের বৃত্তান্তে সুমাত্রা-রাষ্ট্রের বহু বন্দর আর উপনিবেশের তালিকা পাওয়া যায়।

অধুনা সারা পৃথিবী জুড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য, সবখানেই তার বন্দর— জিব্রাল্টার, সুয়েজ খাল (প্রধানত বৃটিশের অধীনে), এডেন, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, আরও কত কী। বৃটিশরা বণিকের জাত, গত তিন শো বছর যাবৎ বাণিজ্যই করছে; আজ যে তারা বাণিজ্য আর ক্ষমতায় এত বড়ো হয়েছে তার মূলে, সমুদ্রে তাদের আধিপত্য। শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্যও ছিল এমনিতর একটি সামুদ্রিক শক্তি, বাণিজ্যের জন্যে যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই বন্দর প্রতিষ্ঠা করেছে। সমরনীতির দিক থেকেও এই বন্দরগুলির বিশেষত্ব আছে; যেসকল স্থান থেকে সমুদ্রে আধিপত্য করা সম্ভব, বেছে বেছে সেইসমস্ত স্থানেই বন্দর স্থাপন করা হয়েছিল।

সিঙ্গাপুর তো আজকাল মস্তবড়ো শহর। প্রথমে এখানে সুমাত্রার অধিবাসীরা একটা বসতি স্থাপন করেছিল। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, নামটা ভারতীয় ধরনের—সিংহপুর। সিঙ্গাপুরের বিপরীত দিকে ওদের আর-একটা উপনিবেশ ছিল। কখনও কখনও এই দুটি উপনিবেশ দু দিক থেকে সমুদ্রে একটা লোহার শিকল টেনে ধরে যাতায়াতকারী জাহাজ আটক করে মোটা রকমের কর আদায় করত।

আকারে ছোটো হলেও শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য অন্যদিক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মতোই ছিল। আর এই সাম্রাজ্য অনেক কাল টিঁকে ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্য হয়তো ততদিন থাকবে না। একাদশ শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্য খুব প্রতিপত্তি আর সমৃদ্ধি লাভ করে; দক্ষিণ-ভারতে তখন চোল-সাম্রাজ্যের খুব উন্নত অবস্থা। কিন্তু শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য চোল-সাম্রাজ্যের পরেও অনেক কাল টিঁকে ছিল। এই দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় ছিল অনেক কাল; এদের বাণিজ্যও প্রসার লাভ করেছিল খুব; দুই সাম্রাজ্যেরই নৌবিভাগ ছিল শক্তিশালী। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে এদের মধ্যে লাগল বিরোধ, বাধল যুদ্ধ। চোল-সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র সমুদ্রপথে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন, শ্রীবিজয়া তার নিকট পরাস্ত হয়। কিন্তু শীঘ্রই আবার শ্রীবিজয়া শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনসম্রাট ব্রোঞ্জনির্মিত কয়েকটি ঘণ্টা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন সুমাত্রার রাজাকে। পরিবর্তে তিনিও চীনসম্রাটকে উপহার পাঠালেন মুক্তো, হস্তীদন্ত আর কতকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ। কথিত আছে, সোনার থালায় ভারতীয় অক্ষরে খোদাই করা একখানি চিঠিও নাকি ঐ সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য অনেক কাল একটানা অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। একে তিনটে পর্যায়ে ভাগ করা যায় : প্রথমত, দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত; দ্বিতীয়, বৌদ্ধ-ধর্মের যুগ, একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতি; তৃতীয় ব্যবসাবাণিজ্যের যুগ—সমগ্র মালয়ে একচেটিয়া বাণিজ্য-কর্তৃত্ব। পরিশেষে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে একটা পড়ুরী উপনিবেশের আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়।

শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য সিংহল থেকে চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যবর্তী প্রায় সমস্ত দ্বীপই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু জাভার পূর্বাংশ কখনও এর বশ্যতা স্বীকার করে নি, বৌদ্ধ-ধর্মও গ্রহণ করে নি; বরাবর স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র থেকে গেছে। ওদিকে কিন্তু পশ্চিম-জাভা ছিল শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্যের অধীনে। পূর্ব-জাভায় হিন্দুরাষ্ট্রকে বাণিজ্যের উপরেই নির্ভর করতে হত, বাণিজ্যের দৌলতেই তার উন্নতি। সিঙ্গাপুর তখন মস্তবড়ো বাণিজ্যিক কেন্দ্র; পূর্ব-জাভা ঈর্ষার চোখে তাকে দেখে। ক্রমে শ্রীবিজয়া আর পূর্ব-জাভার মধ্যে শুরু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তা পরিণত হল ভীষণ শত্রুতায়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পূর্ব-জাভা একটু একটু করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে লাগল, শ্রীবিজয়া তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না; অবশেষে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-জাভা শ্রীবিজয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করল। এই যুদ্ধে ধ্বংস হল সিঙ্গাপুর আর শ্রীবিজয়া-

শহর, পতন হল মালয়ের দ্বিতীয় বড়ো সাম্রাজ্যের—শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য। এর ধ্বংসাবশেষের উপরেই গড়ে উঠল তৃতীয় এক সাম্রাজ্য, মাজপাহিত-সাম্রাজ্য।

পূর্ব-জাভা ঐ যুদ্ধে খুব নিষ্ঠুর বর্বরের মতো ব্যবহার করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তৎকালীন বইপুস্তক থেকে জানা যায়, এই হিন্দুরাষ্ট্র খুব উঁচুদরের সভ্যতার অধিকারী ছিল। বিশেষ করে পাকা বাড়ি আর মন্দিরাদির নির্মাণব্যাপারে এই রাষ্ট্রের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। মন্দির ছিল পাঁচ শোর বেশি; তার মধ্যে কতকগুলো অতি সুন্দর দেখতে, স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এর অধিকাংশই তৈরি হয়েছে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে, অর্থাৎ ৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বহু স্থপতিবিশারদ আর রাজমিস্ত্রি ভারতবর্ষ থেকে জাভা গিয়েছিল এবং তাদের সাহায্যেই ঐসকল বিরাট মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পরে এক চিঠিতে জাভা আর মাজপাহিত-সাম্রাজ্যের কাহিনী বলব।

বোর্ণিও আর ফিলিপাইনের অধিবাসীরা ভারতীয় লিখনপদ্ধতি শিখেছিল; দুর্ভাগ্যবশত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বহু প্রাচীন পুঁথি নষ্ট করে ফেলেছে স্পেনের লোকেরা।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই, এমনকি ইসলামধর্মের আবির্ভাবের আগে থেকেই, আরবরা এইসকল দ্বীপে বসবাস শুরু করেছিল। এরা বণিক; যেখানে বাণিজ্যের সুবিধা সেখানেই এরা গিয়েছে।

৪৭

রোমের আকাশে তমসা

১৯শে মে, ১৯৩২

অনেক সময়ে মনে হয়, আমি হয়তো অতীত ইতিহাসের গোলমেলে সব কাহিনী ঠিকমতো তোমাকে বলতে পারছি নে। এক-এক সময়ে আমার নিজেরই সব তালগোল পাকিয়ে যায়। আবার ভাবি, আমার এই চিঠিগুলোতে তোমার অন্তত কিছুটা উপকার তো হবে? তাই লিখি, লিখতে লিখতে তোমার কথা ভাবি, ভুলে যাই এখানকার তাপ ১১২ ডিগ্রি, ভীষণ লু বইছে, এবং এমনকি ভুলে যাই, আমি বেরিলির ডিস্ট্রিক্ট জেলে আছি।

গত চিঠিতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মালয়ের ইতিহাস আলোচনা করেছি। ওদিকে উত্তর-ভারতের ইতিহাস বলা হয়েছে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী অবধি; আর ইউরোপের ইতিহাসে আমরা এখনও ঢের পেছনে পড়ে আছি। একসঙ্গে সব দেশের একই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করা শক্ত ব্যাপার। অবশ্য আমি সেভাবেই বলতে চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময়ে তা হয়ে ওঠে না; এই দেখো-না কেন, আংকোর আর শ্রীবিজয়ার কাহিনী শেষ করবার জন্যে আমাকে এগিয়ে যেতে হল কয়েক শো বছর। কম্বোডিয়া আর শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্যের কালে ভারতবর্ষ, চীন আর ইউরোপে নানা দিকে নানারকম পরিবর্তন হচ্ছিল। গত চিঠিতে দু-এক পৃষ্ঠার মধ্যে ইন্দোচীন আর মালয়ের এক হাজার বৎসরের ইতিহাস বলেছি। এশিয়া এবং ইউরোপের মূল ইতিহাসের সঙ্গে এইসমস্ত দেশের যোগ নেই; সুতরাং এদের ইতিহাস নিয়ে কেউ বড়ো-একটা মাথা ঘামায় না। তবে কিনা এদের ইতিবৃত্তও উপেক্ষা করবার নয়; শিল্প, স্থাপত্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে এদের ইতিহাস বাস্তবিকই গৌরবোজ্জ্বল। বিশেষ করে ভারতীয়রা তো উপেক্ষা করতেই পারে না; ঐ দেশগুলো তো ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। ভারতের লোকেরাই স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সাগর পার হয়ে গিয়েছিল ঐসব দেশে, সঙ্গে নিয়েছিল ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, শিল্পকলা ও ধর্ম।

যা হোক, মালয়ের ইতিহাস বলতে গিয়ে যদিও কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গেছি, আসলে কিন্তু আমরা এখনও সপ্তম শতাব্দীতেই আছি। আরবদেশের কথা, ইসলামধর্মের অভ্যুত্থান এবং এশিয়া আর ইউরোপে তার প্রতিক্রিয়া, এসব তো বলাই হয় নি। তা ছাড়া, ইউরোপের ঘটনাবলীর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুতরাং ইউরোপের দিকেই একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। রোমসম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন বস্‌ফরাসের তীরে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হল এই নগরে; কিন্তু শীঘ্রই সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হল— পশ্চিম আর পূর্ব -সাম্রাজ্য। পশ্চিম-সাম্রাজ্যের রাজধানী রইল প্রাচীন রোম আর পূর্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী হল কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌। পূর্ব-সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে কত ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেল, কত শত্রুর সম্মুখীন হতে হল তাকে; তা সত্ত্বেও এই সাম্রাজ্য এগারো শো বছর-কাল স্থায়ী ছিল! অবশেষে তুর্কিদের হাতে এর পতন হয়।

কিন্তু পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য এতকাল স্থায়ী ছিল না। অতি অল্পকালের মধ্যেই এর ধ্বংস হল। আশ্চর্য, রোম নগর কিংবা রোমান নামের মহিমা একে রক্ষা করতে পারল না। কোনো শত্রুর আক্রমণকেই এ বাধা দিতে পারে নি। গথ্‌-নেতা এলারিক ৪১০ খৃষ্টাব্দে রোম দখল করে। পরবর্তী কালে আবার ভেন্ডাল জাতি রোম লুণ্ঠন করেছিল। এই ভেন্ডালরা ছিল জর্মন-বংশোদ্ভব; এরা ফ্রান্স এবং স্পেন অতিক্রম করে আফ্রিকায় গিয়ে কার্থেজ নগরের ধ্বংসাবশেষের উপরে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল; সেই কার্থেজ থেকে সমুদ্র পার হয়ে এসে কিনা তারা দখল করল রোম!

এই সময়ে হূনজাতি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; এরা ছিল মধ্য-এশিয়া অথবা মঙ্গোলিয়ার আদিম অধিবাসী। দানিয়ুব নদীর পূর্বতীরে এবং পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম দিকে ছিল এই হূনজাতির বাসস্থান। এদের উৎপাতের দরুন পূর্ব-সাম্রাজ্যের সম্রাটকে খুব ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। হূন-দলপতি এত্তিলা সম্রাটের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করে। এইভাবে পূর্ব-সাম্রাজ্যকে দমন করে এত্তিলা পশ্চিম-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করল। দক্ষিণ-ফ্রান্সের অনেক শহর বিধ্বস্ত হল তার আক্রমণে; সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী তাকে বাধা দিতে পারল না; তখন ফ্রাঙ্ক্‌, গথ্‌ এবং অন্যান্য তথাকথিত বর্বর জাতি একযোগে এত্তিলাকে আক্রমণ করে; ট্রয়েস্‌-নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়, দেড় লক্ষ লোক মারা যায় তাতে এবং এত্তিলা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। সে ৪৫১ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু এত্তিলা পরাজিত হয়েও দমল না; সে ইতালি আক্রমণ করে উত্তরাঞ্চলের অনেক শহর লুঠপাট করল, জ্বালিয়ে দিল। কিছুকাল পরেই তার মৃত্যু হয়; কিন্তু নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতার জন্যে সে ইতিহাসে নাম রেখে গেছে। তার পর থেকেই হূনজাতি দমে যায়। এর কাছাকাছি এক সময়েই শ্বেত হূনজাতি ভারতে এসেছিল।

চল্লিশ বৎসর পরে থিওডরিক নামে একজন গথ্‌ রোমের সম্রাট হন; পশ্চিম-সাম্রাজ্যের তখন শেষ অবস্থা। পূর্ব-সাম্রাজ্যের তৎকালীন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ইতালিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করলেন; ইতালি আর সিসিলি তিনি জয় করলেন বটে, কিন্তু রাখতে পারলেন না বেশিদিন। কেননা, এদিকে নিজের সাম্রাজ্য নিয়েই তাঁকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হল।

এত শীঘ্র রাজধানী রোম এবং তার সাম্রাজ্যের পতন, বিস্ময়কর ঘটনা। সাম্রাজ্যের ভেতরটা যেন ছিল ফাঁপা। সাম্রাজ্যের শক্তি অনেক কাল কেবল রোম নামের মহিমাতেই পর্যবসিত ছিল। তার অতীতের ইতিহাস লোকের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভয়ের উদ্রেক করত, কিন্তু আসলে রোমের কোনো ক্ষমতা ছিল না। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যেত না কিছু; থিয়েটারে, খেলার মাঠে আগের মতোই জনসমাগম, হাটবাজারে ভীড়। অথচ রোম ধ্বংসের পথেই এগিয়ে চলেছিল; শক্তিহীনতাই তার একমাত্র কারণ নয়, আসল কারণ হল এই যে, দরিদ্র জনগণকে শোষণ করে করে রোম একটা ধনিকসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। সমাজের কাঠামোটা হয়ে পড়ল জীর্ণ, নিজে থেকেই হয়তো এক সময়ে ভেঙে পড়ত; গথ্‌ এবং অন্যান্য জাতির আক্রমণে সেটা আরও সহজ হল। কৃষিজীবীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না, তাই তারা যে-কোনো পরিবর্তনের জন্যেই উন্মুখ হয়েছিল।

পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে নূতন জাতির লোকের আবির্ভাব হল—গথ্, ফ্রাঙ্ক্ প্রভৃতি নানান জাতি। এরাই বর্তমান যুগের পশ্চিম-ইউরোপের জর্মন, ফরাসি প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ। ইউরোপে ধীরে ধীরে এইসমস্ত দেশ গড়ে উঠতে লাগল এবং সেইসঙ্গে নিকৃষ্টধরনের একটা সভ্যতা। রোম নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জাঁকজমক, বিলাসবৈভব, তার সভ্যতা, সবই যেন নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল! মানব-সমাজ যে পশ্চাৎগামী হয়, এ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রীস, রোম—সর্বত্রই এ ব্যাপার ঘটেছে। অনেক কালের গড়ে-তোলা সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শ্রমলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অগ্রগতি সহসা বন্ধ হয়ে যায়। আর কেবল যে গতিরোধ হয় তা নয়, দস্তুরমতো পিছিয়ে পড়তে হয় তাকে। অতীতের উপরে একটা আবরণ পড়ে যায়, নূতন করে সঞ্চয় করতে হয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। অবশ্য প্রতিবারই অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি দূরে অগ্রসর হওয়া যায়। এই যেমন, মাউণ্ট এভারেস্ট -অভিযান; প্রত্যেক পরবর্তী অভিযানেই আগের চেয়ে বেশি উপরে উঠছে, শীর্ষদেশের নিকটবর্তী হচ্ছে এবং শীঘ্রই হয়তো সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে যাবে।

এভাবেই ইউরোপে এল অন্ধকারের যুগ। লোকের জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বালাই নেই; একমাত্র কাজ হল লড়াই করা। কোথায় রইল সক্রেটিস আর প্লেটোর যুগ!

এ তো গেল পাশ্চাত্যের অবস্থা। পূর্ব-সাম্রাজ্যে কী ঘটছে, একবার দেখা যাক। কন্স্টান্টাইন্ খৃষ্টধর্ম সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম করেছিলেন। পরবর্তী কালে জুলিয়ন নামে এক সম্রাট ঐ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করে প্রাচীন ধর্মের আশ্রয় নিলেন, দেবদেবীর পুজো প্রবর্তন করতে চাইলেন। কিন্তু সুবিধে হল না, খৃষ্টধর্মকে দমন করে প্রাচীন দেবদেবীরা আর মাথা তুলতে পারল না। খৃষ্টানরা জুলিয়নকে বলত 'জুলিয়ন দি এপস্টেট্' বা পাষণ্ড জুলিয়ন; ইতিহাসে জুলিয়ন এই নামেই পরিচিত।

এর পরে সম্রাট হলেন থিওডসিয়স্ দি গ্রেট্। তিনি আবার ছিলেন জুলিয়নের বিপরীত, প্রাচীন যত মন্দির আর দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে তছনছ করে দিলেন। অখৃষ্টানদের উপরে ছিল তাঁর বিষনজর; আবার যারা তাঁর মতে গোঁড়া খৃষ্টান ছিল না তাদের উপরেও করতেন অত্যাচার। থিওডসিয়স্ কিছুকালের জন্যে পূর্ব আর পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যকে একত্র করে তার সম্রাট হয়েছিলেন। সে ৩৯২ খৃষ্টাব্দের কথা।

খৃষ্টধর্ম ক্রমশ প্রসার লাভ করছিল। কিন্তু আশ্চর্য, খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল। উত্তর-আফ্রিকা, পশ্চিম-এশিয়া এবং ইউরোপের অনেক স্থানে বিভিন্ন খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের মধ্যে হামেশাই বিরোধ বাধত, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করত।

৫২৭ থেকে ৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কন্স্টাণ্টিনোপ্লের সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ন। ইতালি আর সিসিলিকে তিনি পূর্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। পরে গথ্ জাতি ইতালি দখল করে। কন্স্টাণ্টিনোপ্লের বিখ্যাত স্যাংটা সোফিয়া গীর্জা জাস্টিনিয়নের কীর্তি। আর-এক কারণে জাস্টিনিয়ন খ্যাতিলাভ করেছেন; তিনি তৎকালীন সমস্ত আইনবিধি সংগ্রহ করে আইনজ্ঞ দ্বারা সেগুলো সংকলন করান এবং 'ইন্স্টিটিউট্স্ অব্ জাস্টিনিয়ন' নামে একখানি আইনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; আমাকে সে বই পড়তে হয়েছিল। কন্স্টাণ্টিনোপ্লে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ওদিকে প্লেটো-স্থাপিত গ্রীক দর্শনের প্রাচীন বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এবারে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে পৌঁছনো গেল। দেখতে পাচ্ছি, রোম আর কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের জর্মন জাতিরা দখল করল রোম, কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ নামে রোমান থাকলেও কার্যত পরিণত হল গ্রীক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে। বর্বর বিজেতার অধিকারে এসে নষ্ট হল রোমের সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব; পূর্ব ঐতিহ্য বজায় থাকলেও কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ও নেমে আসছে সভ্যতার নীচু স্তরে। খৃষ্টান-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে লেগেছে বিরোধ, শুরু হয়েছে অন্ধকারের যুগ। এতকাল গ্রীক কিংবা প্রাচীন লাতিন শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু গ্রীক

দর্শন আর দেবদেবীদের কথায় ভর্তি ঐসকল গ্রন্থ আর এ যুগের খৃষ্টানদের নিকট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল না। সুতরাং শিক্ষা ও শিল্পকলার দিক পিছিয়ে পড়ল।

অবশ্য খৃষ্টধর্ম শিক্ষা ও শিল্পকলার দিকটা বজায় রাখবার কিছু চেষ্টা করেছিল। বৌদ্ধাশ্রমের মতো অনেক খৃষ্টসংঘ গ'ড়ে উঠেছিল এবং সেখানে প্রাচীন ধরনে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা সাধ্যানুসারে শিক্ষা ও শিল্পকলার বর্তিকা জেবলে রেখেছিল, যদিও তার আলো ছিল মিট্‌মিটে। শিক্ষার আলো যে একেবারে নিভে যায় নি, এই তো যথেষ্ট। কিন্তু কয়েক শতাব্দী বাদে এই আলোই চার দিক আলোকিত করেছিল।

খৃষ্টধর্মের প্রথম যুগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে ধর্মপ্রবণতার ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে যেত, ঘরবাড়ি ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে, এমনকি মরুভূমিতে গিয়ে বাস করত। নিজেদের শরীরের যত্ন নিত না, নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করত। মিশরেই এ ধরনের সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল বেশি। এদের ধারণা ছিল এই যে, যারা যত বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করবে, নোংরা আর অপরিষ্কার থাকবে, তারা তত বেশি পুণ্য লাভ করবে। এক সাধু তো অনেক বৎসর যাবৎ একটা স্তম্ভের উপরেই বসে ছিল। কোনোরকম ভোগবিলাস এদের কাছে ছিল পাপ। কিন্তু ইউরোপে সেদিন আর নেই এখন! সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং সকলেই এখন যার-যার সুখ-সুবিধে করে নিতে ব্যস্ত। কিন্তু এর পরিণামও ভালো নয়, শ্রান্তি এসে যায়।

মিশরের খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মতো এক জাতের লোক আজকালও ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায়। কেউ হয়তো হাত একখানা তুলে ধরে আছে, কেউ হয়তো-বা বসে আছে লোহার পেরেকের উপরে; আরও কত অদ্ভুত কাজ-কারবারই না তারা করছে। কেউ কেউ এইসব ভড়ং দেখিয়ে অজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি আদায় করে; আর, কেউ-বা সত্যি সত্যি মনে করে, কৃচ্ছ্রসাধনে পুণ্য সঞ্চয় হবে বেশি।

বুদ্ধদেবের একটি কাহিনী মনে পড়ল। তাঁর এক যুবক শিষ্য কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করেছিল। তিনি একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করবার আগে বীণা বাজাতে জানতে?" লোকটি উত্তর করল, "হাঁ।" বুদ্ধদেব বললেন, "বেশ, তাহলে শরীর আর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তুলনা করলে বুঝতে পারবে। বীণার তার কষে টেনে বাঁধলে সুর ঠিক করা যায় না; আবার যদি তার একেবারে আল্‌গা করে দেওয়া যায় তা হলে সুরের লয় তান কিংবা মাধুর্য কিছুই থাকে না; আর যখন এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় তার বাঁধা হয় তখন সুরে রীতিমতো লয়সংগতি থাকে। দেহের পক্ষেও সে কথা খাটে। শরীরকে কষ্ট দিলে শ্রান্তি আসে, মন অশান্ত হয়ে ওঠে; তেমনি আবার শরীরকে অতিরিক্ত আয়াস দিলে অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে।"

৪৮

ইসলামধর্মের আবির্ভাব

২১শে মে, ১৯৩২

কত কত দেশের ইতিহাস, কত কত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আমরা আলোচনা করেছি; কিন্তু এযাবৎ আরবদেশের ইতিহাস আলোচনা করি নি। মানচিত্রের দিকে তাকাও। পশ্চিমে মিশর, উত্তরে সিরিয়া এবং ইরাক, পূব দিক ঘেঁষে পারশ্য অথবা ইরান; আর একটু উত্তর-পশ্চিমে দেখো এশিয়া-মাইনর আর কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌। অদূরে গ্রীস, আর সমুদ্রের ঠিক পরপারেই ভারতবর্ষ। চীন আর সুদূর প্রাচ্যের কথা বাদ দিলে, প্রাচীন সভ্যতার দিক থেকে আরবদেশ একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কত সমৃদ্ধিশালী নগর গড়ে উঠেছিল চার দিকে— ইরাকে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর তীরে; মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগর, সিরিয়ায় দামাস্কাস্‌,

এশিয়া-মাইনরে এণ্টিওক্। আরবগণ ছিল ব্যবসায়ী এবং ব্যবসার খাতিরে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াত। ঐসমস্ত শহরে তারা নিশ্চয়ই বহুবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু তথাপি ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আরবদেশে ঘটে নি; আশেপাশের দেশগুলোর মতো উঁচুস্তরের সভ্যতাও কোনোকালে সে দেশে ছিল না। অন্য দেশ জয় করবার চেষ্টা আরবগণ করে নি; আবার অন্যের পক্ষেও আরবদেশ জয় করা সহজ ছিল না।

মরুভূমির দেশ এই আরব। মরুভূমি আর পার্বত্য দেশের অধিবাসীরা সাধারণত কঠোর প্রকৃতির লোক, স্বাধীনতাপ্রিয়; সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না। আরব ঐশ্বর্যশালী দেশ ছিল না, কাজেকাজেই কোনো বিদেশী আক্রমণকারী কিংবা সাম্রাজ্যবাদীর কুদৃষ্টি পড়ে নি। সে দেশে থাকবার মধ্যে ছিল ছোটো দুটি শহর, মক্কা আর এদ্রিব। বাদবাকি সব মরুভূমি এবং সেখানেই লোকে ঘরবাড়ি করে বাস করত। তাদের বলা হত বেদুইন, অর্থাৎ মরুভূমির অধিবাসী। ওদের চিরসংগী ছিল উট আর ঘোড়া। গাধাও তাদের খুব বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল, অদ্ভুত সহনশক্তি কিনা ঐ জীবের! গাধার সহিত তুলনা করলে আরববাসীরা নিন্দার কথা বলে মনে করত না।

মরুভূমির দেশের এই লোকেরা স্বভাবতই ছিল গর্বিত আর ঝগড়াটে; অল্পেতেই রেগে উঠত। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত; বৎসরে একবার ঝগড়া মিটমাট করে সবাই মিলে একসংগে যেত তীর্থস্থানে, মক্কায়। অনেক দেবতার মূর্তি ছিল সেখানে। বিশেষ করে, তারা এক বিরাট কালো প্রস্তরখণ্ডের পূজা করত, ওটা কাবা নামে পরিচিত।

আরবগণ ছিল যাযাবর জাতি; অবশ্য পরে তারা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। কত সময়ে কত সাম্রাজ্য আরবদেশকে অধিকারভুক্ত করতে চেয়েছে; কিন্তু যাযাবর মরুজাতিকে অধীনস্থ করা কি সহজ ব্যাপার?

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সিরিয়ার অন্তর্গত পাল্‌মিরাতে একটি ছোটো রাষ্ট্র কিছুকাল আধিপত্য বিস্তার করেছিল; কিন্তু সেটা ছিল আরবদেশের সীমানার বাইরে। বেদুইনরা তাই বংশপরম্পরায় মরুভূমিতেই বাস করত, আর আরবরা জাহাজে করে দেশবিদেশে যেত ব্যবসা করতে। দেশের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। কতক লোক খৃষ্টান হল, আবার কতক হল ইহুদি; কিন্তু অধিকাংশই ছিল মক্কার সেই কাবা এবং অন্যান্য ৩৬০টি মূর্তির উপাসক।

আরবজাতি বহুযুগ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল; বাইরের জগতে কী ঘটছে না ঘটছে তার খবরাখবর রাখত না কিছু। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে তার ঘুম ভেঙে গেল, আয়ত্ত করল বিপুল ক্ষমতা, সারা পৃথিবীর চমক লেগে গেল। আরবজাতির এই কাহিনী, কী করে তারা এশিয়া ইউরোপ আর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ল, গড়ে তুলল উচ্চাংগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সেটা ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

আরবজাতির এই নব চেতনা ও শক্তির মূলে ইসলামধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খুব শান্ত-সমাহিত জীবন যাপন করতেন; লোকে তাঁকে খুব বিশ্বাস করত। কিন্তু যখন তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করলেন, বিশেষ করে মক্কায় মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন তখন চার দিক থেকে লোকে প্রতিবাদ করতে লাগল এবং শেষপর্যন্ত তারা মহম্মদকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিলে; অল্পের জন্যে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

মহম্মদ প্রচার করলেন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই (মহম্মদ) ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বা পয়গম্বর।

মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মহম্মদ তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ এদ্রিবে আশ্রয় নিলেন। এই ঘটনা ৬২২ খৃষ্টাব্দে ঘটেছিল। মক্কা থেকে এই পলায়নকেই আরবি ভাষায় "হিজরী" বলা হয় এবং এই তারিখ থেকেই মুসলমানেরা সাল গণনা করে থাকেন। ওঁদের মাস গণনা করা হয় চন্দ্রের গতি অনুযায়ী আর আমাদের সূর্যের গতি অনুসারে। সৌর বৎসর গণনায় পাঁচ কি ছয় দিন বেশি হয়। 'হিজরী' সালে মাসগুলো ঋতু অনুযায়ী স্থির থাকে না, নড়চড় হয়; এ বৎসর শীতকালে যে মাস পড়ল, কয়েক বছর বাদে সেটা সরে যাবে গ্রীষ্মকালে।

৬২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের পলায়নের তারিখ বা হিজরীর আরম্ভ থেকে ইসলামধর্মের অভ্যুদয় ধরা হয়; তবে বলতে গেলে কিছু আগে থেকেই তার সূচনা হয়েছিল। এদ্রিব নগর মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করল এবং তাঁর সম্মানার্থে ঐ নগরের নাম দেওয়া হল মদিনাৎ-উল্-নবী, অর্থাৎ পয়গম্বরের শহর। বর্তমানে এই শহর মদিনা নামে পরিচিত।

ইসলামধর্মের বিস্তার এবং আরবজাতির ক্ষমতালাভের কথা বলার আগে একবার চার দিকের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা যাক। রোম নগরীর পতন হয়েছে। গ্রীক-রোমান সভ্যতার চিহ্নমাত্র নেই। উত্তর-ইউরোপের উপজাতিসমূহ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং একটা নূতন ধরনের সভ্যতা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। এদিকে প্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, নূতন সভ্যতারও বিকাশ হয় নি, সুতরাং ইউরোপে তখন অন্ধকারের যুগ। ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে অবশ্য পূর্বরোম-সাম্রাজ্য তখনও টিঁকে ছিল; কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্ নগর তখন খুব সমৃদ্ধিশালী, ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর। জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। কিন্তু তথাপি সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। পারশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই ছিল। পারশ্যের দ্বিতীয় খসরু কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্-সাম্রাজ্যের কিয়দংশ জয় করে নিয়েছিল এবং এমনকি আরবদেশের উপরেও অধিকারের দাবি করেছিল। খসরু মিশর জয় করে কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু সেখানে গ্রীক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পরাজিত হয়।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, পাশ্চাত্যে ইউরোপ এবং প্রাচ্যে পারশ্যের অবস্থা তখন রীতিমতো মন্দ। তার ওপরে আবার বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ছিল বিরোধ। পাশ্চাত্যে এবং আফ্রিকায় খৃষ্টধর্মের রূপ বিকৃত; পারশ্যেও রাষ্ট্রধর্ম ছিল জরথুস্ট্রের ধর্ম এবং তাই অধিবাসীদের ওপরে জোর করে চাপানো হয়েছিল। কাজেকাজেই ইউরোপ, আফ্রিকা কিংবা পারশ্যের জনসাধারণ প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ইউরোপে ভীষণ মহামারী দেখা দেয় এবং তাতে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভারতবর্ষে তখন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব; পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এ দেশে এসেছেন। ভারতসাম্রাজ্য খুব শক্তিশালী। কিন্তু অনতিকাল পরে উত্তর-ভারত ছিন্নবিচ্ছিন্ন আর দুর্বল হয়ে পড়ল। সুদূর প্রাচ্যে চীনদেশে তাঙ-বংশের রাজত্ব সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুঙ সিংহাসনে আরোহণ করেন; চীন-সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করল। মধ্য-এশিয়ার অধিকাংশ দেশ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। তবে সম্ভবত এই বিরাট সাম্রাজ্যে কোনো কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট ছিল না।

চীন খুব শক্তিশালী সাম্রাজ্য, কিন্তু অনেক দূরে; ভারতবর্ষও অন্তত কিছুকাল বেশ শক্তিশালী ছিল এবং কোনো বিরোধ ছিল না; ইউরোপ ও আফ্রিকার অবস্থা ক্লান্ত আর দুর্বল। এশিয়া আর ইউরোপখণ্ডের যখন ইত্যাকার অবস্থা, তখন ইসলামধর্মের অভ্যুদয় হয়।

পলায়নের সাত বৎসরের মধ্যে মহম্মদ আবার মক্কা নগরীতে ফিরে এলেন। তিনি তখন অপূর্ব ক্ষমতাশালী। ইতিপূর্বে মদিনা থেকেই তিনি পৃথিবীর নানা রাজা আর সম্রাটদের নিকট এই মর্মে আদেশনামা পাঠিয়েছিলেন, যেন সকলেই ঈশ্বরকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং তাঁকে পরগম্বর বলে স্বীকার করে। কন্স্টান্টিনোপ্‌লের সম্রাট হিরাক্লিয়াস্ এবং পারশ্যের রাজা সেই শমন পেয়েছিলেন; এমনকি চীন-সম্রাট তাই সুঙও নাকি বাদ যান নি। ওঁদের নিশ্চয়ই তাজ্জব লেগেছিল যে, কোথাকার কে জানা নেই, একেবারে হুকুম করে বসল? যাই হোক, এ থেকে বোঝা যায়, নিজের ধর্মের ওপরে মহম্মদের খুব আস্থা ছিল। তাঁর এই বিশ্বাসের বলেই তিনি আরবজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করলেন, নূতন শক্তির সঞ্চার করলেন মরুজাতির মধ্যে; জয় করলেন অর্ধ পৃথিবী।

নিজের ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস একটা বড়ো জিনিষ। ইসলামধর্মের বাণী হল, ইসলাম-ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক, ভাই-ভাই। এতে করে লোকে গণতন্ত্রের কতকটা আঁচ পেল। তৎকালে খৃষ্টধর্ম যেরূপ বিকৃত হয়ে পড়েছিল তাতে এই ভ্রাতৃত্বের বাণী কেবল আরবজাতিরই নহে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল।

মহম্মদ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি আরবদেশের কতকগুলো যুধ্যমান উপজাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করে একটা নেশন বা জাতি গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটা নতুন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর পরিবারেরই এক ব্যক্তি, নাম আবুবকর। তিনি খলিফা নামে অভিহিত হলেন। দুই বৎসর পরে আবুবকরের মৃত্যু হয়; এবারে খলিফা হলেন ওমর, এবং তিনি দশ বৎসর-কাল খলিফা ছিলেন।

আবুবকর এবং ওমর উভয়েই ধর্মগুরু আর রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খুব বড়ো এবং ক্ষমতাশালী ছিলেন। এ'দের আমলেই আরবজাতি নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। পদের গুরুত্ব ছিল খুব, ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট; কিন্তু আশ্চর্য, এ'দের জীবনযাত্রা ছিল নেহাত সহজ ও সরল; জাঁকজমক, বিলাস একেবারে পছন্দ করতেন না। ইস্লামধর্মের গণতন্ত্রের বাণী তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন। অথচ তাঁদের কর্মচারী আমীর ওমরাহগণ বেজায় বিলাসী ছিল, সিল্ক ছাড়া কিছু ব্যবহার করত না; আবুবকর আর ওমর নাকি এজন্যে তাদের তিরস্কার করতেন, শাস্তি দিতেন এবং অনেক সময়ে ওদের অমিতাচারের জন্যে নিজেরা চোখের জল ফেলতেন। তাঁরা এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সরল ও কর্মকঠোর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে পারশ্য কিংবা কন্স্টান্টিনোপ্ল্-রাজসভার দেখাদেখি যদি আরবগণ বিলাসী হয়ে ওঠে তবে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

যাই হোক, আবুবকর আর ওমরের আমলে এই বারো বছরের মধ্যেই পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্য, পারশ্য, ইরাক, সিরিয়া, জেরুজালেম এই নতুন মুসলমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

৪৯

আরবজাতির দিগ্বিজয়

২৩শে মে, ১৯৩২

অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকগণের ন্যায় মহম্মদও প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। নিকটবর্তী দেশসমূহের অধিবাসীরা বহুকাল যাবৎ স্বেচ্ছাচারী শাসক আর ধর্মগুরুদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে উঠেছিল। ইসলামধর্মের সহজ ও সরল পন্থা, সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শ তাদের মনে সাড়া জাগিয়ে তুলল। তারা একটা পরিবর্তনের জন্যে একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। ইসলামধর্মের মধ্যেই তারা ঐ পরিবর্তন খুঁজে পেল। তাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হল, লোপ পেল বহু অনাচার। কিন্তু ইসলামধর্ম সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে নি; পারলে ভালো হত, জনগণের শোষণ অনেকটা বন্ধ হত। তবে মুসলমানদের পক্ষে ফল ভালো হয়েছিল; তাদের শোষণ বন্ধ হয়ে গেল, একভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হল।

আরবজাতি দেশ-জয়ে বের হল। অনেক সময়ে বিনা যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করেছে। পয়গম্বরের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আরবগণ পারশ্য, সিরিয়া, মিশর, আরমেনিয়া এবং মধ্য-এশিয়া আর উত্তর-আফ্রিকার কতকাংশ জয় করল। মিশর অতি সহজে পরাজিত হয়েছিল, তার কারণ, রোম-সাম্রাজ্যের শোষণ এবং বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গুলোর বিরোধের ফলে মিশর একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কথিত আছে আরবগণই আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রসিদ্ধ লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলেছিল; কিন্তু সেটা মিথ্যা বলেই লোকের ধারণা। কেননা, বইপুস্তকের কদর তারাও ভালো জানত, সুতরাং ঐরূপ বর্বরোচিত কাজ নিশ্চয়ই তারা করে নি। সম্ভবত কন্স্টান্টিনোপ্লের সম্রাট থিওডসিয়স্ এই ধ্বংসকার্যের জন্যে দায়ী। অবশ্য লাইব্রেরির এক অংশ অনেক আগে জুলিয়স সিজারের আমলে নষ্ট করা হয়েছিল। থিওডসিয়সের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে বলেছি। ইনি ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ খৃষ্টান। গ্রীক পুরাণ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক

গ্রন্থাদি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না; কথিত আছে, তিনি ঐসমস্ত পুস্তক পুড়িয়ে স্নানের জল গরম করতেন।

আরবজাতি পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়দিকে এগিয়ে চলল। পূর্বদিকে হিরাট, কাবুল জয় করে তারা সিন্ধুদেশের উপকূলে এসে উপস্থিত হল, কিন্তু অগ্রসর হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করল না। ওদিকে পাশ্চাত্যে তাদের জয়যাত্রা ক্ষান্ত হল না। উত্তর-আফ্রিকা অতিক্রম করে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে এসে থামল; এখন ঐ স্থানের নাম হয়েছে মরক্কো। আরব-সেনাপতি ওক্‌বা সম্মুখে অন্তহীন মহাসাগর দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন; ঘোড়ায় চড়েই মহাসাগর পার হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না হওয়াতে ঈশ্বরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আল্লার নামে জয় করবার মতো দেশ আর ওদিকে নেই!

অতঃপর স্পেন আর ইউরোপ। আরব-সেনাপতি প্রথমে জিব্রাল্টারে অবতরণ করেন। জিব্রাল্টার-নামের সঙ্গে ঐ আরব-সেনাপতির স্মৃতি জড়িত আছে। ও'র নাম ছিল টারিক্, আর জিব্রাল্টারের আসল নাম জবল-উৎ-টারিক্।

স্পেন জয় করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। আরবগণ ফ্রান্সের দক্ষিণ-অঞ্চলে প্রবেশ করল। দেখা যাচ্ছে, মহম্মদের মৃত্যুর এক শো বছরের মধ্যে আরব-সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ফ্রান্স, স্পেন হয়ে বরাবর উত্তর-আফ্রিকা থেকে সুয়েজ পর্যন্ত এবং বরাবর আরব পারশ্য আর মধ্য-এশিয়া থেকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের কেবলমাত্র সিন্ধুদেশ তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরবগণ দু দিক থেকে ইউরোপ আক্রমণ করেছিল, সরাসরি কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্ থেকে, আর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে। দক্ষিণ-ফ্রান্সে আরবগণ সংখ্যায় ছিল অল্প; অনেক দূরে চলে যাওয়াতে নিজেদের দেশ থেকে সাহায্যও বড়ো-একটা পায় নি। বিশেষত আরবদেশ তখন মধ্য-এশিয়া জয় করতে ব্যস্ত। কিন্তু তথাপি ফ্রান্সের ঐ আরবদের ভয়ে পশ্চিম-ইউরোপ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল এবং কয়েকটি দেশ সম্মিলিত হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে একটা জোট পাকাল। এই সম্মিলিত দলের নেতা হলেন চার্ল্‌স্ মর্টেল; ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত টুর্‌স্-নামক স্থানে এক যুদ্ধে তিনি আরবদিগকে পরাজিত করেন। ইউরোপ রক্ষা পেল। জনৈক ঐতিহাসিকের কথায়, পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য যখন প্রায় করায়ত্ত হয়ে এসেছে তখনই আরবদের এই পরাজয় ঘটল। বাস্তবিক, ঐ যুদ্ধে আরবগণ জয়লাভ করলে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ হত। কোথায় থাকত খৃষ্টধর্ম? ইউরোপের ধর্ম হত ইসলাম। আরও কত কী পরিবর্তনই না ঘটত! যাক, ওসব কল্পনামাত্র। আসল কথা, আরবদের অগ্রগতি ব্যাহত হল ফ্রান্সে। কিন্তু স্পেনে তাদের আধিপত্য বজায় ছিল কয়েক শো বছর।

একটা যাযাবর মরুজাতি কিনা স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হল। এদের বলা হত সারাসেন জাতি, অর্থাৎ মরুভূমির অধিবাসী। কিন্তু আশ্চর্য, এই মরুজাতি শীঘ্রই নাগরিক জীবন আর বিলাসবৈভবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল; নগরে নগরে গড়ে উঠল বিরাট অট্টালিকা। কিন্তু যতই দেশ জয় করে থাকুক-না কেন, ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদের অভ্যাসটা দূর হয় নি। এই সময়ে আবার বিরোধের একটা বিশেষ কারণও ছিল। কে নেতৃত্ব পাবে, খলিফা হবে, এই নিয়ে হামেশাই বিরোধ বাধত। কেননা, আরবদেশের নেতা হওয়া মানে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের পরিচালন-ক্ষমতা হাতে পাওয়া। সামান্য ঝগড়াবিবাদ, পারিবারিক কলহ থেকে একেবারে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। এই ধরনের বিরোধের ফলে ইসলামধর্মের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হল, গড়ে উঠল দুটি পৃথক সম্প্রদায়—সিয়া আর সুন্নি। এই দুই সম্প্রদায় এখনও আছে।

আবুবকর আর ওমর এই দুই মহান খলিফার শাসনকালের পরেই নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হতে লাগল। বিরোধ লেগেই ছিল। মহম্মদের কন্যা ফাতিমার স্বামী আলি অল্পকালের জন্যে খলিফা হয়েছিলেন; তাঁকে হত্যা করা হয়। কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র হুসেনকে সপরিবারে কারবালার মাঠে হত্যা করা হয়। এই শোচনীয় ঘটনাকে স্মরণ করেই মুসলমানেরা, বিশেষত সিয়া-সম্প্রদায়, প্রতিবৎসর মহরমের মাসে শোকোৎসব করে থাকে।

আরবজাতির দিগ্বিজয়...
মিশর
আফ্রিকা
আরব
মক্কা
মদিনা
বোগদাদ
তুর্কিস্থান

খলিফার বিশেষত্ব আর রইল না; সে এখন পূর্ণক্ষমতাবিশিষ্ট রাজা হয়ে বসল। গণতন্ত্রের আদর্শ উধাও হল। নামে ধর্মগুরু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন খলিফা ইসলামধর্মের অবমাননাই করেছিলেন।

প্রায় এক শো বছর-কাল মহম্মদের বংশের এক শাখা থেকে খলিফা নিযুক্ত হয়েছিল। এদের বলা হত ওমায়েদ। এই সময়ে দামাস্কাস নগর ছিল রাজধানী। খুব সুন্দর শহর ছিল এই দামাস্কাস। কত গির্জা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, আর ফোয়ারা। দামাস্কাস নগরের জলসরবরাহ-ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। এই সময়ে আরবগণ নূতন ধরনের এক স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলেছিল, শাদাসিধে অথচ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। স্তম্ভ, তোরণ, মসজিদের চূড়া, গম্বুজ ইত্যাদিতে ঐ শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। অদ্যাপি স্পেনে এই স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। ভারতেও এই শিল্পের আমদানি হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ ওটাকে আলাদাভাবে গ্রহণ না করে নিজস্ব পদ্ধতি ও আদর্শের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে।

সাম্রাজ্য আর ঐশ্বর্য এনেছে বিলাসিতা, এবং বিলাসের সামগ্রী ও খেলাধুলা। ঘোড়দৌড়, শিকার, পোলো এবং দাবাখেলা আরবদের খুব প্রিয় ছিল। গানবাজনার প্রতি তাদের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল।

ক্রমশ নারীসমাজেও একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আরবদেশে স্ত্রীলোকেরা পর্দানশিন ছিল না। অবরোধপ্রথা না থাকায় তারা প্রকাশ্যে চলাফেরা করত, গির্জা কিংবা সভাসমিতিতে যেত, এমনকি বক্তৃতাও দিত। কিন্তু ক্রমে আরবগণ পূর্ব-রোম আর পারশ্য এই দুটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের কতকগুলো আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির অনুকরণ করতে শুরু করল। অথচ পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যকে তারাই পরাজিত করেছিল, ধ্বংস করেছিল পারশ্যকে; আর শেষপর্যন্ত কিনা এই দুই সাম্রাজ্যের যত-কিছু খারাপ আচারব্যবহার গ্রহণ করল নিজেরা। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ আর পারশ্যের প্রভাবেই নাকি আরবদের নারীসমাজে অবরোধপ্রথার সৃষ্টি হয়। ক্রমে 'হারেম'-ব্যবস্থাও প্রচলিত হল; সামাজিকভাবে স্ত্রী-পুরুষের দেখাসাক্ষাৎ বিরল হয়ে উঠল। দুর্ভাগ্যবশত নারীর এই অবরোধপ্রথা মুসলিম সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল এবং মুসলমান-আমলে ভারতবর্ষও সেটা গ্রহণ করল। ভাবতে অবাক লাগে, এখনও অনেকে এই বর্বর প্রথা মেনে চলছে। যারা পর্দানশিন তাদের সঙ্গে বহির্জগতের কোনো সংযোগ থাকে না। এদের কথা ভাবলেই আমার জেলখানা কিংবা চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়ে। একটা জাতির লোকসংখ্যার অর্ধেকই যদি এক ধরনের কয়েদখানায় অবরুদ্ধ থেকে যায় তবে সে জাতির উন্নতি কি সম্ভব?

সুখের বিষয়, ভারতবর্ষ অতি দ্রুত এই কুপ্রথা পরিত্যাগ করছে। এমনকি মুসলমান-সমাজও এই বন্ধন থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করে এনেছে। তুরস্কে কামাল পাশা এই প্রথার বিলোপ সাধন করেছেন। আর মিশর থেকেও এটা লোপ পাচ্ছে।

আর-একটা কথা বলে এই চিঠি শেষ করছি। গোড়াতে এই ধর্মের প্রতি আরবদের ভীষণ অনুরাগ থাকলেও পরধর্মসহিষ্ণুতাও তাদের ছিল। জেরুজালেমে খলিফা ওমর এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্পেনে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভারতবর্ষে একমাত্র সিন্ধুদেশ ছাড়া আর কোথাও আরবগণ আধিপত্য করে নি বটে, কিন্তু মেলামেশা যথেষ্ট ছিল; অথচ দু জাতির মধ্যে বরাবর মধুর সম্পর্কই বজায় রয়েছে। এই সময়ের ইতিহাসে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হল, মুসলমান আরবদের পরমতসহিষ্ণুতা আর ইউরোপে খৃষ্টানদের অসহিষ্ণুতা।

*

বাগদাদ ও হারুন-অল-রশিদ

২৭শে মে, ১৯৩২

অন্য দেশে ফিরে যাবার আগে চলো আরবজাতির ইতিহাসই আরও আলোচনা করা যাক।

প্রায় এক শো বছর-কাল হজরত মহম্মদের বংশের ওমায়েদ-শাখার লোকেরাই খলিফা হয়েছিলেন, এ কথা আগের চিঠিতে তোমাকে বলেছি। দামাস্কাস ছিল তাঁদের রাজধানী এবং সেখান থেকেই তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এই খলিফাদের আমলে আরবগণ বিপুল উদ্যমে দিকে দিকে ইসলামধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগল, নূতন নূতন দেশ জয় করল। এদিকে আবার স্বদেশে বিরোধ, গৃহযুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ফলে শেষপর্যন্ত ওমায়েদগণকে পরাস্ত করে মহম্মদেরই আর-এক শাখাবংশ ক্ষমতা লাভ করে; এরা মহম্মদের খুড়ো আব্বাসের বংশধর, আব্বাসি নামে অভিহিত। আব্বাসিরা খলিফাপদ অধিকার করে ওমায়েদগণের ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। অনেকদিন ধরে হত্যাকাণ্ড চলল; ওমায়েদগণকে যেখানে পেল নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাসি খলিফাদের শাসন শুরু হয়। আরম্ভটা শুভ না হলেও আব্বাসিদের আমলে আরবজাতি খুব উন্নতি লাভ করেছিল। নানা বিষয়ে পরিবর্তনও হয়েছিল অনেক। আরবে গৃহযুদ্ধের দরুন সমগ্র আরব-সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। স্বদেশে আব্বাসিরাই জিতেছিল; কিন্তু সুদূর স্পেনে শাসনকর্তা ছিল একজন ওমায়েদ, সে আব্বাসি খলিফাকে মানতে অস্বীকার করল। ওদিকে শীঘ্রই উত্তর-আফ্রিকাও অল্পবিস্তর স্বাধীন হয়ে উঠল, আর মিশর তো আব্বাসিদের উপেক্ষা করে একেবারে নূতন একজন খলিফাই মনোনীত করল। মিশর নেহাত কাছাকাছি ছিল কিনা, তাই আব্বাসিরা প্রায়ই মিশরকে ভয় দেখাত, হুমকি দিত, কিন্তু আফ্রিকা ও স্পেন সম্বন্ধে চুপচাপ থাকত। তবেই দেখো, আব্বাসি আমলের শুরুতেই আরব-সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। খলিফা আর মুসলিম জগতের একচ্ছত্র অধিপতি এবং ধর্মগুরু ছিলেন না; ইসলামধর্মের একতা নষ্ট হল। আব্বাসি আর স্পেনের আরবগণ পরস্পরকে দস্তুরমতো ঘৃণা করত, একে অন্যের দুর্ভাগ্য কামনা করত।

যে ধর্মবিশ্বাস আর শক্তি আরবজাতিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা লোপ পেয়ে গেল। কোথায় গেল তাদের সরলতা, আর কোথায়ই-বা গণতন্ত্রের আদর্শ! পারশ্য কিংবা কনস্টাণ্টিনোপ্‌লের সম্রাটের সঙ্গে ধর্মগুরুর কোনো পার্থক্য রইল না। হজরত মহম্মদের সময়কার আরবদের মধ্যে অদ্ভুত জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যেত; সে যুগের পৃথিবীতে ওদের সমকক্ষ কেউ ছিল না, সকল রাজাই তাদের কাছে মাথা নত করেছে, কেউ তাদের অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারে নি। জনসাধারণ রাজারাজড়াদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল; সুতরাং আরবগণ যেন তাদের নিকট আশার বাণী বহন করে এনেছিল।

কিন্তু এখন সেই অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। এখন লোকেরা থাকে ভালো, খায় ভালো। আগে ডেরা বেঁধে থাকত মরুভূমিতে, এখন বাস করে অট্টালিকায়; খেত খেজুর, আর এখন খায় বহুমূল্য সামগ্রী। বেশ আরামে আছে, সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে তারা মাথা ঘামাবে কেন? সমাজদ্রোহিতার কথাও কখনও তারা ভাবে নি। তারা কেবল প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাঁকজমক বাড়িয়েছে, গ্রহণ করেছে ওদের যত-কিছু খারাপ রীতিনীতি—যেমন, নারীর অবরোধ-প্রথা।

এই সময়ে রাজধানীও স্থানান্তরিত হয়েছিল দামাস্কাস থেকে ইরাকের বাগদাদ নগরে। বাগদাদ ছিল পারশ্যের সম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস। এখন থেকে আব্বাসিদের দৃষ্টি পড়ল এশিয়ার ওপরে, কারণ ইউরোপ থেকে বাগদাদ অনেকটা দূরে অবস্থিত। অতঃপর ইউরোপীয় জাতি-

সমূহের সঙ্গে যেসকল যুদ্ধ হল তা সবই আত্মরক্ষামূলক। আব্বাসি খলিফাগণ এখন নিজেদের সাম্রাজ্যকে সংহত করবার চেষ্টায় মন দিলেন। স্পেন আর আফ্রিকা ছাড়াও এই সাম্রাজ্য যথেষ্ট বড়ো ছিল।

বাগদাদ! আরব্যোপন্যাসের কত অদ্ভুত কাহিনী এই নামের সঙ্গে জড়িত! মনে পড়ে তোমার হারুন-অল-রশিদ আর শাহারাজাদীর কাহিনী? আরব্যোপন্যাসের সেই নগরই নূতন করে গড়ে উঠল আব্বাসি খলিফাদের আমলে। বিরাট শহর; কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা স্কুল কলেজ অফিস আদালত আর দোকানপাট, কত প্রমোদোদ্যান আর খেলার মাঠ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য খুব ফেঁপে উঠল। সরকারি কর্মচারীদিগকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হ'ত। ক্রমশ শাসনকর্ম বেশিরকম জটিল হয়ে পড়ল, সৃষ্টি করা হল নানান বিভাগ; সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আর রাজধানীর সঙ্গে সংযোগ রাখত ডাকবিভাগ। হাসপাতাল ছিল অসংখ্য। দেশবিদেশ থেকে লোকজনের আনাগোনা, বিশেষ করে ছাত্র আর শিল্পীর। খলিফারা বিদ্বান আর শিল্পীদের গুণের আদর করতে জানতেন।

খলিফারা বেজায় বিলাসী ছিলেন। অসংখ্য দাস তাঁদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকত। স্ত্রীলোকেরা বাস করত হারেমে। ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালকে আব্বাসি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা চলে; এই সময়টাই ছিল হারুন-অল-রশিদের শাসনকাল। এই সময়ে সাম্রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। চীনের সম্রাট এবং পাশ্চাত্যের সম্রাট শার্লামেন রাজদূত পাঠিয়েছিলেন হারুন-অল-রশিদের দরবারে। আরবি-স্পেন ব্যতীত তৎকালীন ইউরোপের তুলনায় বাগদাদ ও আব্বাসি সাম্রাজ্য অনেক বেশি উন্নতি লাভ করেছিল শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য, শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে। এই সময়ে আরবদেশে বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হয়। আধুনিক জগতে বিজ্ঞান মস্তবড়ো স্থান অধিকার করে আছে, বিজ্ঞানের কাছে আমরা অশেষ ঋণী। বিজ্ঞান শুধু এক জায়গায় বসে ঘটনা ঘটিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করে না; কেন কোন ঘটনা ঘটে বিজ্ঞান তার হদিশ জানতেও চেষ্টা করে। বিজ্ঞান পরখ করেই চলছে, বিরাম নেই, কখনও সফল হয় কখনও-বা হয় না; কিন্তু এভাবেই মানুষের জ্ঞান বাড়ছে। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কালের এই পৃথিবীর প্রভেদ বিস্তর। এই প্রভেদের মূলে প্রধানত বিজ্ঞান, কেননা, আধুনিক জগৎ বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

প্রাচীন যুগের মিশর, চীন কিংবা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসে তবু খানিকটা মেলে, রোমে কিন্তু আবার বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। কিন্তু আরবগণের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাটুকু ছিল; সুতরাং তাদের আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা যেতে পারে। চিকিৎসা, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি কতকগুলো বিষয় ওরা ভারতবর্ষের কাছ থেকে শিখেছে, ভারতের অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিরা বাগদাদে যেত কিনা? তা ছাড়া অনেক আরবি ছাত্র উত্তর-ভারতের তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে আসত। চিকিৎসা এবং অন্যান্য-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আরবগণ অনেক-কিছু আবার চীনের কাছ থেকেও শিখেছে, যেমন, কাগজ তৈরি করা। অপরের কাছে যে জ্ঞান তারা লাভ করেছিল সেটা ভিত্তি করে আরবরা নিজেরা গবেষণা করেছে যথেষ্ট, আবিষ্কারও করেছে অনেক-কিছু। দূরবীন আর দিগ্দর্শন-যন্ত্র ওরাই প্রথম আবিষ্কার করে। চিকিৎসাশাস্ত্রে আরবগণ বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল; আরবি চিকিৎসকগণ ইউরোপে বিখ্যাত ছিল।

বাগদাদ ছিল এইসব বিদ্যানুশীলনের একটা বড়ো কেন্দ্র। আর, পাশ্চাত্যে আরবি-স্পেনের রাজধানী কোর্দবাও একটি কেন্দ্র ছিল। তা ছাড়া আরব-সাম্রাজ্যে এই ধরনের আরও কতকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র ছিল; যেমন, কায়রো, বসরা, কুফা ইত্যাদি। কিন্তু সকলের ওপরে বাগদাদের স্থান; ইসলামধর্মের রাজধানী, সাম্রাজ্যের রাজধানী, শিল্প সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের কেন্দ্র। এই নগরের জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। আজকালকার কলিকাতা কিংবা বোম্বাই শহরের চেয়ে ঢের বেশি।

আজকাল লোকে পায়ে মোজা পরে থাকে। কবে কোথায় এর প্রচলন শুরু হল, জানো? বাগদাদে। ওখানকার ধনী লোকেরা সেকালে মোজা বা স্টকিং পরত। হিন্দুস্থানি কথাটা ঐ আরবি

'মোজাস' শব্দ থেকেই এসেছে। সেরূপ ফরাসি 'সেমিজ' কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'কামিজ' শব্দ থেকে; কামিজ মানে শার্ট। কামিজ আর মোজা এই দুটি কথাই আরব থেকে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে রপ্তানি হয়েছিল এবং সেখান থেকে ইউরোপে।

আরব ভ্রাম্যমান জাতি। সমুদ্রে লম্বা পাড়ি দিয়ে এরা আফ্রিকায়, ভারতের উপকূলে, মালয়ে এবং এমনকি চীনেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আরবি পরিব্রাজকদের মধ্যে আলবেরুনির নাম বিখ্যাত; ইনি ভারতেও এসেছিলেন এবং হিউয়েন সাঙের মতো একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্তও লিখে গেছেন।

আরবগণ ইতিহাসের চর্চা করত। তাদের লেখা বইপুস্তক এবং ইতিহাস থেকে আরবজাতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি। আর, তারা যে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী ও উপন্যাস রচনা করতে পারত সে তো জানা কথা। এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা কখনও আব্বাসি খলিফা আর তাদের সাম্রাজ্যের কথা শোনে নি; কিন্তু একাধিক-সহস্র রজনীর (থাউজেন্ড এ্যান্ড ওয়ান নাইট্‌স্‌) শহর, রহস্যময় স্বপ্নপুরী বাগদাদের কথা তারা জানে। প্রকৃত সাম্রাজ্যের চেয়ে কল্পনার সাম্রাজ্য অনেক সময়ে অধিকতর বাস্তব আর অধিককাল স্থায়ী হয়ে থাকে।

হারুন-অল-রশিদের মৃত্যুর অল্প পরেই আরব-সাম্রাজ্যে নানা অশান্তি দেখা দিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শুরু হল বিদ্রোহ; প্রাদেশিক গভর্নরের পদ হল বংশানুক্রমিক। খলিফাদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে কমতে শেষকালে এমন এক সময় এল, একমাত্র বাগদাদ শহর এবং আশেপাশে কয়েকটি গ্রাম ছাড়া আর কোথাও খলিফার কর্তৃত্ব রইল না। একজন খলিফাকে তো তার অধীনস্থ সৈন্যেরাই জোর করে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে এনে হত্যা করেছিল। আবার এক সময়ে বাগদাদে শাসনকার্য পরিচালনা করল জনকয়েক ক্ষমতাশালী লোক, খলিফা ছিল তাদের হাতের পুতুল।

ধর্মগত ঐক্যবোধ বহুপূর্বেই লোপ পেয়েছিল। মধ্য-এশিয়ায় মিশর থেকে খোরাশান পর্যন্ত সবখানেই পৃথক পৃথক মুসলমান রাজ্য গড়ে উঠল; সুদূর প্রাচ্য থেকে যাযাবর জাতির লোকেরা পাশ্চাত্য অভিমুখে যেতে লাগল। মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন তুর্ক জাতি মুসলমানধর্ম অবলম্বন করে বাগদাদ দখল করে বসল। এরা সেলজুক তুর্ক নামে অভিহিত। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের সৈন্যবাহিনীকে এরা পরাস্ত করল। ইউরোপ ভেবেছিল, আরব এবং মুসলমান জাতির সে পরাক্রম আর নেই, তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে; কিন্তু কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পরাজয়ে ইউরোপ অবাক হয়ে গেল। আরবজাতির ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল এটা সত্যি; কিন্তু এখন সেলজুক তুর্কিরা এসে তাদের স্থান গ্রহণ করল, তুলে ধরল ইসলামের পতাকা, যুদ্ধে আহ্বান করল ইউরোপকে।

আর ইউরোপ শীঘ্রই সে আহ্বান গ্রহণ করল। ইউরোপের খৃষ্টান জাতিগুলি দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের হাত থেকে খৃষ্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করল। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং এশিয়া-মাইনর কার দখলে থাকবে তাই নিয়ে লাগল ভীষণ লড়াই। শতাধিক বৎসর-কাল এই লড়াই চলল এবং এই তিন দেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গা ভিজে গেল মানুষের রক্তে। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল শস্যপূর্ণ মাঠ, লোপ পেল বাণিজ্য, সমৃদ্ধি, সবকিছু।

এই দুটি জাতের লড়াই শেষ হবার আগেই ইতিহাসে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। সেটা হচ্ছে, মঙ্গোলিয়ায় চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব। ওর বিপুল পরাক্রম এশিয়া ও ইউরোপকে প্রায় কাঁপিয়ে তুলেছিল। চেঙ্গিস খান আর তার বংশধরগণ বাগদাদ ও সাম্রাজ্যকে লোপাট করে দিয়েছিল। সমৃদ্ধিশালী নগর বাগদাদ পরিণত হল ধুলা আর ভস্মে; ২০ লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হল। এটা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের কথা।

বর্তমানকালে বাগদাদ শহর আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। বাগদাদ এখন ইরাক-রাষ্ট্রের রাজধানী। কিন্তু তার আগেকার রূপ আর নেই, মঙ্গোলিয়ানরা যে দারুণ ক্ষতি করেছিল তা আর পূরণ হয় নি।

৫১

হর্ষবর্ধন থেকে সুলতান মাহ্মুদ

১লা জুন, ১৯৩২

আরব কিংবা সারাসেনদের কাহিনী রেখে চলো অন্যান্য দেশের দিকে একবার তাকাই। আরবজাতি যে সময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠল, জয় করল দেশ বিদেশ, এবং আবার হীনবল হয়ে পড়ল, সেই সময়টাতে ভারতবর্ষ, চীন আর ইউরোপে কী ঘটছিল একবার আলোচনা করে দেখা যাক। অবশ্য এর কিছুটা আভাস আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি—৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের টুর্স্-নামক স্থানে চার্ল্‌স্ মর্টেলের সৈন্যবাহিনীর নিকট আরবদের পরাজয়, মধ্য-এশিয়ায় তাদের আধিপত্য, আর ভারতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত তাদের বিজয়-অভিযান।

প্রথমে ভারতবর্ষের দিকেই তাকানো যাক।

৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অধঃপতন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবশ্য আগে থেকেই এই অধঃপতন শুরু হয়েছিল; হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ এই ব্যাপারটাকে সহায়তা করেছে। হর্ষবর্ধনের জীবিতকালে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই উত্তর-ভারতে কয়েকটি ছোটো ছোটো রাষ্ট্র গড়ে ওঠে; কখনও কখনও এই রাষ্ট্রগুলো প্রতিপত্তি লাভ করেছে, আবার কখনও-বা পরস্পর কেবল ঝগড়াঝাঁটি করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই অবস্থাতেও হর্ষর মৃত্যুর পরে তিন শতাধিক বৎসর-কাল স্থাপত্য ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প এবং সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যিকগণ এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই যুগের কয়েকজন রাজার আমলে শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। রাজা ভোজ এঁদেরই একজন; ইনি পৌরাণিক কালের আদর্শ রাজা-রূপে পরিণত হয়েছেন, এবং আদর্শ রাজা বলতে আজও লোকে ভোজরাজার নাম করে থাকে।

কিন্তু তথাপি উত্তর-ভারতের অধঃপতন ঘটছিল। দাক্ষিণাত্য উত্তর-ভারতকে পশ্চাতে ফেলে পুনরায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলল। ইতিপূর্বে এক পত্রে (৪৪) তোমাকে তখনকার দিনের দাক্ষিণাত্যের অবস্থার কিছুটা আভাস দিয়েছি; চালুক্য, চোল, পহ্লবী আর রাষ্ট্রকূট -সাম্রাজ্যের কাহিনী বলেছি। শঙ্করাচার্যের কথাও তোমাকে বলা হয়েছে; ইনি সারা ভারতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের মনে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন; বৌদ্ধধর্ম এ দেশ থেকে প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শঙ্করাচার্য যখন প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন তখনই কিনা ভারতের প্রবেশদ্বারে এক নূতন ধর্ম এসে হানা দিল! পরবর্তীকালে এই ধর্মই বন্যার মতো বেগে প্রবেশ করে এ দেশে, এবং তাতে করে প্রচলিত আচার-ব্যবস্থায় শুরু হয় বিরাট পরিবর্তন।

আরবগণ অতি দ্রুত ভারতের সীমান্তে এসে উপস্থিত হল, এমনকি হর্ষবর্ধনের জীবিত-কালেই কিছুকাল সীমান্তে অবস্থান করে পরে সিন্ধুদেশ দখল করল। ৭১০ খৃষ্টাব্দে সতেরো বৎসর বয়স্ক একটি বালক আরবসৈন্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করে এবং মুলতান পর্যন্ত সমগ্র সিন্ধু-উপত্যকা জয় করে; এই বালকের নাম মহম্মদ বিন কাসিম। ভারতে আরব-অধিকারের বিস্তার ঐ পর্যন্ত। খুব চেষ্টা করলে তারা আরও অগ্রসর হতে পারত, বিশেষ বেগ পেতে হত না, উত্তর-ভারত তখন হীনবল হয়ে পড়েছিল কিনা! আসল কথা এই, আরবরা যদিও চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজাদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করছিল, দেশ-জয়ের জন্য তারা কোনো চেষ্টা করে নি। সুতরাং রাজনীতির দিক দিয়ে আরবদের এই সিন্ধুদেশ-জয়ের বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। মুসলমান-কর্তৃক ভারত-জয় তো কয়েক শো বছর পরের ঘটনা। কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে আরবদের সঙ্গে ভারতের অধিবাসীদের এই মিলনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

দাক্ষিণাত্যের ভারতীয় সম্রাটদের সঙ্গে আরবদের খুব সম্ভাব ছিল, বিশেষ করে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে। বহুসংখ্যক আরব ভারতের পশ্চিম-উপকূলে বসবাস করতে শুরু করল এবং তৈরি করল অনেক মসজিদ। আরব পর্যটক আর ব্যবসায়ীরা ভারতের নানা স্থানে যেতে লাগল। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্যে বিখ্যাত; আরব থেকে দলে দলে বিদ্যার্থীরা এল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কথিত আছে, হারুন-অল-রশিদের আমলে বোগদাদে ভারতীয় মনীষার খুব আদর ছিল; এবং ভারতীয় চিকিৎসকগণ নাকি সেখানে গিয়ে হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অঙ্ক এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র -সম্পর্কিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে, আরবজাতি প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি থেকে অনেক-কিছুই গ্রহণ করেছিল। পারশিক এবং যাবনিক বা গ্রীক সংস্কৃতি থেকেও নিয়েছিল অনেক-কিছু। আরবরা বলতে গেলে একটা নূতন জাতি, শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে এই সবে উঠতি সময়; সুতরাং আশে-পাশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে তারা শিখল ঢের এবং তাকে ভিত্তি করেই গড়ে তুলল নিজস্ব সংস্কৃতি— সারাসেনিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অল্পকালের মধ্যেই লোপ পায় বটে, কিন্তু ইউরোপের অন্ধকার মধ্যযুগে এই সংস্কৃতিই চার দিক আলোকিত করেছিল।

ইন্দো-আর্য, পারশিক আর যাবনিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আরবজাতি যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আরবদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় পারশ্যবাসী কিংবা গ্রীকদের তেমন কোনো লাভ হয় নি। এর হেতু সম্ভবত এই যে, আরবজাতি সবেমাত্র গড়ে উঠেছে; তার নূতন শক্তি, নূতন উদ্যম। ওদিকে, ওরা সব প্রাচীন জাত; পুরাতনের মায়া কাটাতে পারে নি, পরিবর্তনের পক্ষপাতীও ছিল না; সুতরাং চলেছে পুরোনো-চলা পথে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের উপরে, তেমনি একটা জাতির উপরেও, বয়স একই রকমের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার! বয়স কোনো লোক কিংবা জাতির চলৎশক্তি রহিত করে, হ্রাস করে মনের প্রসারতা, শরীরের শক্তি; তাকে করে তোলে রক্ষণশীল আর পরিবর্তনবিরোধী!

সুতরাং আরবদের সঙ্গে কয়েক শো বছরের মেলামেশার ফলেও ভারতীয়দের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। তবে এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই নূতন ইসলামধর্ম সম্বন্ধে কিছু জেনে থাকবে। কেননা, মুসলমান আরবগণ সর্বদাই আসা-যাওয়া করেছে, এখানে-সেখানে মসজিদও তৈরি করেছে; তা ছাড়া কখনও কখনও ধর্মপ্রচার করেছে, দীক্ষাও দিয়েছে। সেকালে এসব ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ ছিল না; হিন্দু আর ইসলামধর্মের মধ্যে বিরোধ কিংবা সংঘর্ষও বাধে নি কোনো। এটা লক্ষ্য করবে। কেননা, পরবর্তীকালে এই দুটো ধর্মের মধ্যে বিরোধ আর সংঘর্ষ ঘটেছে। একাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ তলোয়ার-হাতে বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করল তখন এ দেশে দেখা দিল একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া; যুগযুগান্তের পরমতসহিষ্ণুতার ভাব অন্তর্হিত হল, তার স্থান গ্রহণ করল বিদ্বেষ আর বিরোধ।

এই বিজয়ীর বেশে ভারতে এল গজনির মাহ্মুদ; সঙ্গে আনল নিষ্ঠুর হত্যা আর অগ্নিকাণ্ড। বর্তমানে গজনি আফগানিস্থানের একটি ছোটো শহর। দশম শতাব্দীতে গজনির আশেপাশে একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নামেমাত্র বোগদাদের খলিফার অধীনে ছিল। তোমাকে তো পূর্বেই বলেছি, হারুন-অল-রশিদের মৃত্যুর পরে ক্রমশ খলিফার ক্ষমতা হ্রাস পায়; অবশেষে এক সময়ে তার সাম্রাজ্য যায় ভেঙে, গড়ে ওঠে গোটা-কতক স্বাধীন রাষ্ট্র। ঠিক এই সময়কার ইতিহাসই আমরা এখন আলোচনা করছি। তুর্কি ক্রীতদাস সবুক্তগীন ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে গজনি এবং কান্দাহারে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সবুক্তগীন ভারতবর্ষও আক্রমণ করেছিলেন। ঐ সময়ে লাহোরের রাজা ছিলেন জয়পাল, বেজায় দুঃসাহসী লোক। জয়পাল সসৈন্যে কাবুল-উপত্যকায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে সবুক্তগীনের নিকট পরাস্ত হলেন।

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর রাজা হলেন মাহ্মুদ। ইনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ একজন সেনাপতি, আর উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনানায়ক। মাহ্মুদ বছরের পর বছর ভারত আক্রমণ

করেছেন; হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন দারুণ নিষ্ঠুরভাবে; আর লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন রাশি রাশি ধনরত্ন। মোট সতেরো বার তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন; কিন্তু মাত্র একবারের আক্রমণ ব্যর্থ হয়—কাশ্মীর-আক্রমণ। তা ছাড়া তাঁর প্রতিটি আক্রমণ সফল হয়েছিল; সারা উত্তর-ভারতে তিনি দারুণ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দক্ষিণে পাটলিপুত্র, মথুরা এবং সোমনাথ পর্যন্ত তিনি অভিযান করেছিলেন। থানেশ্বরের যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি দুই লক্ষ বন্দী আর প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছেন সোমনাথে। প্রাচীনকাল থেকে সোমনাথের মন্দিরে অগাধ ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল। কথিত আছে, মাহ্‌মুদ আক্রমণ করতে আসছে খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক এই মন্দিরে আশ্রয় নেয়; ওরা আশা করেছিল অলৌকিক কিছু ঘটবে, মন্দিরের দেবতা রক্ষা করবে তাদের। কিন্তু কী জানো, অলৌকিক ঘটনা বড়ো-একটা ঘটে না—বিশ্বাসীদের কল্পনাতেই এর স্থান। মাহ্‌মুদ মন্দির ভেঙে ফেললেন, লুণ্ঠন করে নিলেন সব-কিছু। পঞ্চাশ হাজার লোক ধ্বংস হল সেখানে। ওরা অলৌকিক ঘটনার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু দৈব ঘটনা ঘটল না।

১০৩০ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌মুদের মৃত্যু হয়। সমগ্র পাঞ্জাব আর সিন্ধুদেশ তাঁর আধিপত্য স্বীকার করেছিল। লোকে মনে করে, ইসলামধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে এসেছিলেন; তাই মুসলমানরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আর হিন্দুরা দেখে বিদ্বেষের চোখে। আসলে মাহ্‌মুদ ধর্মের ধার বড়ো-একটা ধারতেন না। তিনি মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার সৈনিক, কুশলী নিপুণ যোদ্ধা। মাহ্‌মুদ ভারতে এসেছিলেন জয়ের উদ্দেশ্যে, বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠনের আশায়। সৈনিকদের কাজই এই। সুতরাং যে ধর্মের লোকই তিনি হতেন না কেন, লুটপাট তিনি করতেনই। আশ্চর্য যে, সিন্ধুর মুসলমান রাজাদেরও তিনি শাসিয়েছিলেন; বশ্যতা স্বীকার করে এবং কর দিয়ে তবে তারা রক্ষা পায়; এমনকি, বোগদাদের খলিফাকেও তিনি হত্যার ভয় দেখিয়েছিলেন, তাঁর কাছে সমরকন্দ দাবি করেছিলেন। সুতরাং মাহ্‌মুদকে একজন কৃতী সৈনিক ছাড়া আর কিছু মনে করা ভুল।

অনেক ভারতীয় মিস্ত্রি আর কারিগরকে মাহ্‌মুদ গজনি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এদের দিয়ে সেখানে অতি সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'স্বর্গের পরী'।

মথুরা নাকি তখন খুব সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। মাহ্‌মুদ গজনির শাসনকর্তার নিকট লিখেছিলেন: "মথুরায় হাজার হাজার সুন্দর সুদৃঢ় অট্টালিকা আছে। বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়-ব্যতীতই যে এই নগরী বর্তমান উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তা মনে হয় না, এবং দু শো বছরের মধ্যেও এরূপ আর একটি শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি নে।"

মাহ্‌মুদ-প্রদত্ত মথুরা নগরীর এই বর্ণনা ফির্দৌশির বইয়ে আছে। মাহ্‌মুদের সময়ে বিখ্যাত পারশিক কবি ফির্দৌশি 'শাহ্‌নামা' রচনা করেছিলেন। গত বছর তোমাকে লিখিত এক চিঠিতে আমি ফির্দৌশি এবং তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শাহ্‌নামার উল্লেখ করেছিলাম। কথিত আছে, মাহ্‌মুদের অনুরোধেই কবি 'শাহ্‌নামা' রচনা করেন; প্রতি দু লাইনের একটি শ্লোকের জন্যে মাহ্‌মুদ কবিকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ফির্দৌশি সংক্ষেপে সারবার লোক ছিলেন না; রচনা করলেন হাজার হাজার শ্লোক—বিরাট কাব্য। মাহ্‌মুদ প্রশংসা করলেন যথেষ্ট, কিন্তু প্রতিশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারলেন না; অবশ্য তিনি কিছু দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা প্রতিশ্রুত অর্থের চেয়ে ঢের কম। তাই ফির্দৌশি রাগ করে কিছুই নিলেন না।

হর্ষ থেকে মাহ্‌মুদ, প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক বৎসরের ভারতের ইতিহাসের আলোচনা মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে শেষ করা গেল। এই দীর্ঘকালের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আরও অনেক-কিছুই হয়তো বলা যেত। কিন্তু তেমন কোনো কথা আমার জানা নেই, সুতরাং চুপ করে যাওয়াই ভালো। অবশ্য, সে যুগের রাজারাজড়া এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের কাহিনী বলতে পারি; পাঞ্চালরাজ্যের মতো উত্তর-ভারতের অন্যান্য বড়ো বড়ো

রাজ্যগুলোর ইতিহাস কিংবা কনৌজ নগরের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীও বলা যায় বটে, কিন্তু প্রয়োজন নেই; বরং তাতে করে তোমার সব গোল পাকিয়ে যাবে।

ভারতের ইতিহাসে এক দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষ সীমায় এসে পেঁচৈছি, এখানে নূতন এক অধ্যায়ের শুরু। ইতিহাসকে বিভিন্ন কোঠায় ভাগ করা দুরূহ ব্যাপার এবং সেটা সমীচীনও নয়। প্রবহমান নদীর মতো এই ইতিহাস—বয়ে চলেছে তো চলেইছে। তবে কিনা তারও পরিবর্তন হয়; এক অঙ্ক শেষ হয়ে শুরু হয় আর-এক অঙ্ক। কিন্তু এইসব পরিবর্তন নেহাত অতর্কিতে ঘটে না। ধীরে ধীরে নূতন যুগ পুরোনো যুগকে ছায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। যাই হোক, ভারতেতিহাসে একটি অঙ্কের প্রান্তসীমায় এসে আমরা পেঁচৈছি। হিন্দুযুগ শেষ হয়ে আসছে; হাজার হাজার বছরের সুপ্রাচীন ইন্দো-আর্য সংস্কৃতিকে এখন বোঝাপড়া করতে হবে আর-এক নবাগতের সঙ্গে। কিন্তু মনে রেখো, এই পরিবর্তন সহসাই ঘটে নি, খুব আস্তে আস্তে হয়েছে। মাহ্‌মুদের সঙ্গে ইসলামধর্মও এসেছিল উত্তর-ভারতে। কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের এই ঢেউ দাক্ষিণাত্যে এসে লাগে নি অনেক কাল; আর বাংলাদেশ তো তার পরেও দু শো বছর-কাল ঐ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। উত্তরে চিতোর-রাজ্য; বিভিন্ন রাজপুত জাতিগুলো সমবেত হয়েছিল এখানে। পরবর্তীকালের ইতিহাসে অসম সাহস আর বীরত্বের জন্যে চিতোর খ্যাতিলাভ করেছে। সে যাই হোক, মুসলমান-আধিপত্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করছিল এবং তাকে ঠেকাবার সাধ্য কারও ছিল না। সুপ্রাচীন ইন্দো-আর্য ভারতের অধঃপতন শুরু হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি পারল না বিদেশী বিজেতাকে ঠেকিয়ে রাখতে; আত্মরক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না আর। আশ্রয় নিল গণ্ডির মধ্যে, খাড়া করল একটা আবরণ। কঠোরতর করা হল বর্ণভেদ-প্রথা, হরণ করা হল নারীজাতির স্বাধীনতা, এবং এমনকি, গ্রাম্য-পঞ্চায়েত-প্রথাও ক্রমে অবনতির দিকে গেল। অধিকতর শক্তিশালী লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু তথাপি এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ওদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নূতনের সঙ্গে। আশ্চর্য, নূতনকে গ্রহণ এবং নিজস্ব করার এতটা ক্ষমতা এর ছিল যে, শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতির দিক থেকে হার মানতে হল বিজেতাকে।

মনে রাখবে, এই বিরোধ ইন্দো-আর্য সভ্যতা আর সুসভ্য আরবজাতির মধ্যে নয়। এক দিকে সুসভ্য অথচ ক্ষয়িষ্ণু ভারত, অপর দিকে মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য এবং সদ্য ইসলাম-ধর্মে-দীক্ষিত যাযাবরজাতি—বিরোধ ঘটেছিল এ দুয়ের মধ্যে। দুঃখের বিষয়, ভারত ঐ অ-সভ্যতা আর মাহ্‌মুদের আক্রমণের বিভীষিকার সঙ্গে ইসলামধর্মকেও জড়িত করে ফেলল এবং তার থেকেই হল তিক্ততার সৃষ্টি।

৫২

ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি

৩রা জুন, ১৯৩২

চলো এবারে ইউরোপ ঘুরে আসি। আগের বার যখন ইউরোপের কথা লিখেছি তখন সেখানে বড়ো গোলযোগ। রোমের পতনের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল। পূর্ব-ইউরোপে, কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌-সাম্রাজ্য ছাড়া বাদবাকি অংশে অবস্থা ছিল আরও খারাপ। হূন-বংশীয় এট্টিলা মহাদেশ জুড়ে ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু ক্ষয়িষ্ণু পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্য টি'কে আছে, মাঝে মাঝে আবার বিক্রমও দেখাচ্ছে।

রোমের পতনের পরে পশ্চিম-ইউরোপে একটা ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল; এটা যখন থিতিয়ে এল, শুরু হল নূতন ব্যবস্থা, নূতন সংস্থাপনা। সময় লাগল অনেক। খৃষ্টধর্মের

প্রচার হতে লাগল, কখনও ধর্মানুরাগীদের প্রচেষ্টায়, কখনও-বা সৈনিক রাজাদের তলোয়ারের জোরে। গড়ে উঠল নূতন রাজ্য। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আর জর্মানির একাংশে ফ্রাঙ্ক্‌রা এক রাজ্য স্থাপন করল; রাজার নাম ছিল ক্লোভিস এবং এঁর শাসনকাল ৪৮১ থেকে ৫১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই ফ্রাঙ্ক্‌ আর ফরাসিরা এক নয় কিন্তু। ক্লোভিসের পিতামহের নামে এই রাজবংশের নামকরণ হয়েছিল মেরোভিঙ্গিয়ান-বংশ। কিন্তু এই বংশের রাজাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, রাজ্যের জনৈক প্রধান কর্মচারীর হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা; এই কর্মচারীকে বলা হত, 'মেয়র অব দি প্যালেস'। ক্রমে মেয়রের পদও বংশানুক্রমিক হয়ে গেল এবং তারাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল। মেয়রই ছিল প্রকৃত শাসনকর্তা, রাজারা ছিল তাদের হাতের পুতুল।

এই মেয়রদেরই একজনের নাম ছিল চার্ল্‌স্‌ মর্টেল; ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত টুর্স-নামক স্থানে এক যুদ্ধে ইনি আরবদিগকে পরাস্ত করেন। এই পরাজয়ের ফলে সারাসেনজাতির অগ্রগতি রুদ্ধ হয় এবং খৃষ্টানদের মতে ইউরোপ রক্ষা পায়। মর্টেল প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান লাভ করলেন; লোকে মনে করল, তিনি শত্রুর হাত থেকে খৃষ্টীয় সমাজকে রক্ষা করেছেন। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের সম্রাটের সঙ্গে রোমের পোপদের বনিবনাও ছিল না; সুতরাং তাঁরা চার্ল্‌স্‌ মর্টেলের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তখন মর্টেলের পুত্র পেপিন স্থির করলেন, সাক্ষিগোপাল রাজাকে সরিয়ে নিজেই রাজা হবেন; পোপও এ প্রস্তাবে রাজি হলেন।

পেপিনের পরে এলেন তাঁর পুত্র শার্লামেন। পোপ আবার ফ্যাসাদে পড়ে শার্লামেনের শ্বারস্থ হলেন। চার্ল্‌স্‌ পোপের শত্রুদিগকে তাড়িয়ে দিলেন। তার পর ৮০০ খৃষ্টাব্দে ক্যাথিড্রালে বিরাট এক উৎসবের অনুষ্ঠান করে পোপ শার্লামেনকে রোমের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করলেন। সেদিন পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্যের পত্তন হল। এর কথা আমি আগে একবার তোমাকে লিখেছি।

বিচিত্র এই সাম্রাজ্য; এর পরবর্তীকালের ইতিহাস আরও অদ্ভুত; ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য লোপ পেয়ে গেল, চিহ্নমাত্র রইল না—এলিসের গল্পের বেড়ালটার মতো। কিন্তু তার তখনও ঢের দেরি; ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করাই ভালো।

পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য কিন্তু পাশ্চাত্যের সেই প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের পরিপূরক নয়। কিছুটা পার্থক্য ছিল। ওটাই যেন একমাত্র সাম্রাজ্য এবং সম্রাট একমাত্র পোপ ছাড়া পৃথিবীর আর সবাইকার প্রভু। পোপ আর সম্রাটের মধ্যে কে বড়ো এই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে কত দ্বন্দ্ব, কত বিরোধ। কিন্তু এটাও অনেক পরেকার ঘটনা। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, নূতন সাম্রাজ্যকে প্রাচীন রোমক-সাম্রাজ্যেরই পুনরুত্থান বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তবে কিনা এর একটা নূতনত্ব ছিল, খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টীয় সমাজের ধারণা। তাই তো এই সাম্রাজ্যকে বলা হত 'হোলি' বা 'পবিত্র'। সম্রাট এবং পোপকে মনে করা হত ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক ব্যাপারাদি দেখাশোনা করতেন সম্রাট, আর পারমার্থিক দিকটা ছিল পোপের হাতে। অন্তত ধারণাটা তাই ছিল এবং তার থেকেই ইউরোপে রাজার ধর্মগত অধিকারের কথা উঠেছে, এইরূপ আমার আন্দাজ। সম্রাট ছিলেন ধর্মের রক্ষক। ইংলণ্ডের রাজাকে আজও 'ডিফেন্ডার অব্‌ দি ফেথ্‌' বা ধর্মের রক্ষাকর্তা বলা হয়।

খলিফার সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যায়; খলিফাকে বলা হত ধর্মবিশ্বাসীদের নেতা বা 'কমান্ডার অব্‌ দি ফেথ্‌ফুল'। প্রথমাবস্থায় খলিফা একাধারে সম্রাট আর পোপ দুই-ই ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি নামেমাত্র কর্তা থাকেন।

এদিকে পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাটরা পাশ্চাত্যের এই নূতন 'হোলি রোমান এম্পায়ার'কে মোটেই স্বীকার করল না। শার্লামেনকে যখন ওখানে সম্রাট করা হয় তখন কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের সিংহাসনে বসেছেন এক নারী, নাম আইরিন। এই স্ত্রীলোকটিই সম্রাজ্ঞী হবার জন্যে নিজের ছেলেকে হত্যা করেছিলেন; এঁর শাসনব্যবস্থায় ছিল নানা গলদ আর বিশৃঙ্খলা। এই কারণে পোপ কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌-সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে শার্লামেনকে সম্রাট করলেন।

শার্লামেন পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সমাজের কর্তা হয়ে বসলেন; শুধু তাই নয়, মর্তে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, আর পবিত্র সাম্রাজ্যের সম্রাট। কী গালভরা কথা! এই ধরনের কথা দিয়ে সহজেই

নবম শতাব্দীতে ইউরোপ

লোক ভুলানো যায়। ঈশ্বর এবং ধর্মের দোহাই পেড়ে শাসনকর্তৃপক্ষ অনেক সময়েই অন্যের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের ক্ষমতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। কিন্তু, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে এইসমস্ত রাজামহারাজা আর ধর্মাধ্যক্ষদের সংগে সাধারণ লোকের কোনো সম্পর্ক ছিল না, ওরা ছিল জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রায় দেবতার মতো। এবং এই কারণেই জনসাধারণ ভয় করত ওদের। রাজসভার রীতিনীতি আদব-কায়দা আর আচার-অনুষ্ঠানের সংগে মন্দির অথবা গির্জার আচার-অনুষ্ঠানাদির তুলনা করে দেখো; দুই স্থানেই নতজানু হয়ে অভিবাদন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ইত্যাদি প্রচলিত। ছেলেবেলা থেকেই আমরা নানারকমে কর্তৃপক্ষকে পুজো করতে শিখি; কিন্তু প্রীতি বা অনুরাগের বশে নয়, করি ভয়ে।

শার্লামেন ছিলেন বোগদাদের হারুন-অল-রশিদের সমসাময়িক। ওঁদের দুজনের মধ্যে পত্রালাপ ছিল। এমনকি, যাতে পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্য এবং স্পেনে সারাসেনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় সেজন্যে উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধির প্রস্তাবও হয়েছিল। অবশ্য সে প্রস্তাব কার্যকরী হয় নি, কিন্তু তথাপি এ থেকে শাসক এবং রাজনৈতিকদের মনের গতি বোঝা যায়। খৃষ্টীয় সমাজের কর্তা অর্থাৎ সম্রাট কিনা বাগদাদের খলিফার সংগে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করবে অপর এক খৃষ্টান-সাম্রাজ্য আর এক আরবশক্তির বিরুদ্ধে! ব্যাপারটা কল্পনা করো তো? তোমার হয়তো-বা মনে আছে, স্পেনের সারাসেনরা বোগদাদের আব্বাসি খলিফাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। ওরা ছিল স্বাধীন, তাই বোগদাদের গাত্রদাহ। কিন্তু সারাসেনরা থাকত অনেক দূরদেশে, তাই কোনো বিরোধ বাধে নি। এদিকে কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ আর শার্লামেনের মধ্যেও তেমন বনিবনা ছিল না; এখানেও দূরত্বের জন্যেই কোনো সংঘর্ষ বাধতে পারে নি। কিন্তু তথাপি দেখো, প্রস্তাব করা হয়েছিল, খৃষ্টান আর আরব এই দুই জাতি মিলে অপর এক খৃষ্টান এবং আরব -শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হোক। আসলে রাজাদের মনের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম—কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আর ধনসম্পত্তি দখল করা; তাই ওটাকে একটা ধর্মের খোলস দেওয়া হয়েছিল। সর্বত্রই এই ব্যাপার। ভারতবর্ষে কী হল? মাহ্‌মুদ ধর্মের দোহাই দিয়ে এ দেশে এসে বিপুল ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করলেন। ধর্মের নামে প্রায়ই লোকে অনেক কিছু করে নিয়েছে।

কিংতু যুগে যুগে লোকের মনোভাবের পরিবর্তন হয়ে থাকে; সুতরাং প্রাচীনকালের লোকদের কার্যকলাপের বিচার করা আমাদের পক্ষে দুরুহ ব্যাপার। যে ব্যাপার আজ আমাদের নিকট অতি সাধারণ বলে মনে হচ্ছে সেটা হয়তো ওদের মনে হত অদ্ভুত; আবার সেকালের আচার-বিচারও আমাদের মনঃপুত না হতে পারে। পবিত্র সাম্রাজ্য, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, খৃষ্টের প্রতিনিধি পোপ, ইত্যাকার বড়ো বড়ো কথা লোকে অনেক বলেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। শার্লামেনের রাজত্বের অব্যবহিত পরে ইতালিতে আর রোমে যাচ্ছেতাই ব্যাপার ঘটেছিল। রোমের একদল লোক কেবল তাদের খুশিমতো এক-একজনকে ধরে এনে পোপের আসনে বসিয়ে দিত।

রোমের পতনের পরে পশ্চিম-ইউরোপে যে অব্যবস্থা আর গোলযোগের সৃষ্টি হল তাতে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, সাম্রাজ্যটাকে পুনরায় গড়ে তুলতে পারলে অবস্থার উন্নতি হবে। একজন সম্রাট না থাকাও অনেকের নিকট মর্যাদাহানিকর বলে মনে হয়েছিল। সেকালের জনৈক লেখকের অভিমত এই যে, খৃষ্টানদের একজন সম্রাট না থাকলে পাছে-বা বিধর্মীরা তাদের অপমান করে, এজন্যে চার্ল্‌স্‌কে সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করা হয়।

ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, এবং জর্মনি আর ইতালির অর্ধেকটা শার্লামেনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল স্পেন, আরবদের অধীনে; উত্তর-পূর্বে শ্লাভ এবং অন্যান্য জাতি; উত্তরদিকে দিনেমারজাতি, আর দক্ষিণ-পূর্বদিকে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া; তার পরে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পূর্ব-সাম্রাজ্য।

৮১৪ খৃষ্টাব্দে শার্লামেনের মৃত্যু হয়, এবং তার পরেই শুরু হয় গোলযোগ; সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর বংশধরগণ ছিল অকর্মণ্য; ওদের কারও কারও উপাধি থেকেই তা বোঝা যায়—দি ফ্যাট্, দি বল্ড, দি পায়াস বা 'মোটা', 'টেকো' ইত্যাদি। যাই হোক, এই গোলযোগের ফলে

দেখা গেল, জর্মানি আর ফ্রান্স আলাদাভাবে গড়ে উঠছে। জাতিহিসাবে জর্মানির শুরু সম্ভবত ৮৪৩ অব্দে; তবে সম্রাট অটো দি গ্রেট নাকি জর্মানদিগকে এক জাতিতে পরিণত করেন; ওঁর রাজত্বকাল ৯৬২ থেকে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দ। ফ্রান্স অটোর সাম্রাজ্যের অধীন ছিল না। ৯৮৭ সনে হিউ ক্যাপেট -নামক এক ব্যক্তি শার্লামেনের বংশধরদের তাড়িয়ে দিয়ে ফ্রান্স অধিকার করেন। ফ্রান্স তখন নানা অংশে বিভক্ত, এক-এক অংশে এক-এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাধান্য। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত। হিউ ক্যাপেট ফ্রান্সকে এক জাতিতে পরিণত করেন। তখন থেকেই ফ্রান্স আর জর্মানির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, এবং আজও পর্যন্ত, এই হাজার-বছর-কাল সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এসেছে। প্রতিবেশী দুটি দেশ, আর অধিবাসীরা শিক্ষাদীক্ষায় কত উন্নত; অথচ আশ্চর্য যে, সেই পুরোনো বিরোধটাকে বংশপরম্পরায় এরা আজও জিইয়ে রেখেছে। তবে সম্ভবত এর দোষটা রীতিনীতি এবং শাসনব্যবস্থার, অধিবাসীদের নয়।

প্রায় এই সময়েই রাশিয়াও দেখা দিল ইতিহাসের পাতায়। ৮৫০ সনের কথা; উত্তর-অঞ্চল থেকে এসে রুরিক নামে এক ব্যক্তি রুশ-রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ওদিকে ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হল; রুশিয়া এবং 'পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্যে'র মাঝখানে গড়ে উঠতে লাগল হাঙ্গেরি আর পোল্যান্ড।

ইতিমধ্যে আবার ইউরোপের উত্তর-অঞ্চল থেকে একদল লোক জাহাজে করে পশ্চিম ও দক্ষিণ -অঞ্চলের দেশগুলোতে যায়; শুরু করে লুঠপাট, লোকজনকে হত্যা করে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। দিনেমারজাতি এবং অন্যান্য উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী অর্থাৎ নরম্যানদের কথা তুমি পড়েছ; ওরা ইংলণ্ডে গিয়েছিল লুঠপাট করতে। এই নরম্যানরা নিজেদের জাহাজে করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যায়; যেখানে গিয়েছে সেখানেই অবাধে লুণ্ঠন আর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ইতালিতে অরাজকতা; রোমের অবস্থাও তথৈবচ—নিতান্ত শোচনীয়। ওরা রোম লুঠ করল, এবং এমনকি কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌কেও ভয় দেখাল। এই দস্যু আর লুণ্ঠনকারীর দল দখল করল ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল—বর্তমান নরম্যাণ্ডি; তা ছাড়া দক্ষিণ-ইতালি আর সিসিলি। ঐসব স্থানে তারা আস্তানা গেড়ে বসল এবং কালক্রমে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠল, দস্যুর দল পরিণত হল ধনীসম্প্রদায় আর জমিদারশ্রেণীতে। ফ্রান্সের এই নরম্যাণ্ডি থেকেই বিজয়ী উইলিয়মের অধীনে নরম্যানরা ইংলণ্ডে যায় এবং সে দেশ দখল করে; সে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, ইংলণ্ডও গড়ে উঠছে।

আমরা এতক্ষণে ইউরোপে খৃষ্টীয় যুগের প্রথম এক হাজার বৎসরের শেষের দিকে এসে পৌঁচেছি। এই সময়েই ভারতে গজনির মাহ্‌মুদের লুণ্ঠনকার্য চলছে, এবং বোগদাদে আব্বাসি খলিফাদের আধিপত্য লোপ পাচ্ছে; আর, তুর্কিরা পশ্চিম-এশিয়ায় ইসলামধর্ম প্রচার করছে। স্পেন তখনও অবশ্য আরবদের অধীনেই ছিল; কিন্তু এই আরবরা তাদের স্বদেশ আরবদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এমনকি বোগদাদের খলিফাদের সঙ্গে এদের বনিবনাও ছিল না। উত্তর-আফ্রিকা তো বলতে গেলে স্বাধীন ছিল, বোগদাদের আধিপত্য মানত না। মিশরে তো ছিল স্বাধীন গভর্মেণ্ট; কেবল তাই নয়, স্বতন্ত্র একজন খলিফাও। কিছুকাল আবার উত্তর-আফ্রিকাও এই মিশরীয় খলিফার শাসনাধীনে ছিল।

ভূম্যধিকার-প্রথা

৪ঠা জুন, ১৯৩২

বর্তমান কালের ফ্রান্স, জর্মানি, রুশিয়া এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলো গড়ে ওঠবার প্রাথমিক ইতিহাস গত চিঠিতে আলোচনা করেছি। ঐ দেশগুলো সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা, সেকালের লোকদের কিন্তু সেই ধারণা ছিল না। ইংরেজ, ফরাসি আর জর্মনদিগকে আমরা আলাদা-আলাদা জাতি হিসাবে দেখি; এরাও প্রত্যেকেই নিজের দেশকে মাতৃ কিংবা পিতৃভূমি বলে মনে করে থাকে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। এ যুগে পৃথিবীতে এই জাতীয়তাবোধ বিশেষ প্রবল। ভারতে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধও জাতীয় যুদ্ধ। কিন্তু সেকালে এ জিনিষটা ছিল না। তবে খৃষ্টীয় সমাজ কিংবা কোনো-একটা বিশেষ খৃষ্টান-দল-ভুক্ত হবার একটা মনোভাব তখনও ছিল। ঠিক তেমনি আবার ঐস্লামিক সমাজের একটা পরিকল্পনা মুসলমানদেরও ছিল।

কিন্তু খৃষ্টীয় কিংবা ইসলাম-সমাজের এইসমস্ত ধারণা মোটেই স্পষ্ট ছিল না, জন-সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সংগে তার কোনো সম্পর্কও ছিল না। এইসমস্ত ধারণা শুধু মাঝে মাঝে লোকের মনে অনুপ্রেরণা দিত এবং সেই অনুপ্রেরণাতেই লোকে নিজ নিজ ধর্মের জন্য লড়াই করত। পূর্বে বলেছি, জাতীয়তাবোধ তখন ছিল না; তার পরিবর্তে ছিল মানুষে মানুষে একটা অদ্ভুতরকমের সম্পর্ক। সেটা হল জমির স্বত্বভোগের সম্পর্ক। জমিবিলির ব্যবস্থা থেকে এই সম্পর্কটার উদ্ভব হয়েছিল। রোমের পতনের পর পাশ্চাত্যে পূর্বপ্রচলিত রীতি-নীতি লোপ পেয়েছিল; সর্বত্র কেবল অনাচার, অত্যাচার এবং অরাজকতা। ক্ষমতাবান লোকেরা সব-কিছু দখল করে বসত, কিছুই ছাড়ত না; আবার হয়তো অধিকতর ক্ষমতাশালী লোক এসে তাদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই ঐসমস্ত দখল করত। ক্ষমতাশালী এবং জমিদারশ্রেণীর লোকেরা নানা স্থানে দুর্গ তৈরি করেছিল; মাঝে মাঝে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে লুঠপাট করত; কখনও-বা অন্যান্য দুর্গের অধিকারীদের সংগে লড়াই করত। দরিদ্র কৃষিজীবী আর শ্রমিকদের দুর্গতির সীমা ছিল না। এই গোলযোগের থেকেই সৃষ্টি হয় ভূম্যধিকার-পদ্ধতি।

কৃষিজীবীরা তো আর দলবদ্ধ ছিল না? তাই ঐসকল ক্ষমতাশালী দস্যুদের সংগে তারা পেরে উঠল না। এদের রক্ষা করবার মতো কেন্দ্রে কোনো শক্তিশালী গভর্মেণ্টও ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে এরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করল; যেখানে দুর্গের মালিক এদের উপরে অত্যাচার করত সেখানে তার সংগে কৃষিজীবীদের একটা আপোস-নিষ্পত্তি হল। কথা থাকল, উৎপন্ন শস্যাদির কতক অংশ তারা ঐ দুর্গাধিপতিকে দেবে, এবং কোনো কোনো ব্যাপারে তার অনুগত থাকবে; কিন্তু দুর্গাধিপতি তাদের সম্পত্তি লুঠপাট কিংবা কোনো অত্যাচার করতে পারবে না; অধিকন্তু অপরাপর দস্যু দুর্গাধিপতিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। ছোটো আর বড়ো দুর্গের মালিকদের মধ্যেও আবার ঐ ধরনের একটা কথাবার্তা স্থির হল। কিন্তু ছোটো তো আর নিজে চাষি নয়? সুতরাং বড়োকে উৎপন্ন শস্যের ভাগ দেবে কোথা থেকে? তাই স্থির হল, যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে সে বড়োকে সাহায্য করবে; যখনই প্রয়োজন হবে সে লড়বে। ছোটো হল বড়ো দুর্গাধিপতির প্রজা, সুতরাং বড়ো রক্ষা করবে তাকে। এইভাবে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনুসারে ব্যবস্থাটা ধাপে ধাপে চাষি থেকে দুর্গাধিপতি এবং দুর্গাধিপতি থেকে রাজা পর্যন্ত পেঁাছল। কিন্তু সেখানেই শেষ হল না। লোকে মনে করতে লাগল, স্বর্গেও ভূম্যধিকার-ব্যবস্থা রয়েছে, ঈশ্বর তার সর্বময় কর্তা।

ক্রমে ইউরোপে এই ব্যবস্থাই দাঁড়িয়ে গেল। বস্তুত তখন না ছিল কোনো কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট, না ছিল পুলিশের ব্যবস্থা। জমির মালিকই ছিল শাসনকর্তা, সর্বেসর্বা; তার জমিতে যারা বাস করত তাদের উপরে তারই আধিপত্য, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের দায় তার। ছোটোখাটো একজন

জায়গিরদার আর কি। তার অধীনস্থ লোকদের বলা হত ভূমিকর্ষণকারী প্রজা। একেও আবার দায়ী থাকতে হত উপরওয়ালা জমিদারের কাছে; যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হত।

এমনকি, বিশপ, ধর্মযাজক প্রভৃতি খৃষ্টধর্মোপাসক-সমাজেও এই জায়গিরপ্রথা বিদ্যমান ছিল। ধর্মযাজকরা ছিলেন এক-একজন জায়গিরদার। জর্মনিতে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ধনসম্পত্তি আর জমিজমা বিশপ প্রভৃতি ধর্মযাজকদের হাতেই ছিল। পোপ নিজেই ছিলেন একজন ভূম্যধিকারী জমিদার।

দেখা যাচ্ছে, এই জমিদার-প্রথায় শ্রেণীবিভাগ ছিল। সমাজে মানুষে-মানুষে সাম্যের ভাব কোথাও ছিল না। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল চাকরান—জমির প্রজা বা চাষি—তার পরে ছোটো জায়গিরদার, বড়ো জায়গিরদার, বড়ো জমিদার এবং রাজা। সমগ্র সমাজের ভার বইতে হত ঐ নিম্নস্তরের প্রজাকে। খৃষ্টীয়ধর্মোপাসক-সমাজেও ছিল এই ব্যবস্থা। ছোটো বড়ো কোনো জমিদারই শস্যোৎপাদন কিংবা অন্য কোনো পরিশ্রমের কাজ করত না। ওতে তাদের মানের লাঘব হত। ওদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ করা; আর যখন যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ ঘটত না, তখন মত্ত থাকত শিকারে কিংবা অপর-কোনো ক্রীড়ামোদে। মূর্খ আর নিরক্ষর ছিল এই জমিদারগুলো; লড়াই করা আর মদ খাওয়া ছাড়া অন্যপ্রকারের আমোদ-আহ্লাদের কথা ওদের মাথায় আসত না। খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের ভার ছিল চাষি আর কারিগর-শ্রেণীর লোকের উপরে। এই ব্যবস্থায় সবার উপরে ছিল রাজা, যেন ঈশ্বরের একজন খাস প্রজা।

এই হল ভূম্যধিকার-প্রথার মূল কথা। জমিদারগণ তাদের প্রজাদের রক্ষা করবে, হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, এই ছিল উদ্দেশ্য; কিন্তু আদতে তারা যা খুশি তাই করত। উপরওয়ালারা কিংবা রাজা কারও কাজে হস্তক্ষেপ করত না, ওদিকে চাষিরাও পারত না তাদের বাধা দিতে। চাষিদের কোনো ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং জমিদারগণ ওদের কাছ থেকে জোর করে সব-কিছু আদায় করত; প্রজাদের দুর্দশার সীমা থাকত না। সর্বদেশে সর্বকালে জমির মালিকদের রীতিই এই। জমিদার বরাবর ভদ্র আখ্যা পেয়ে এসেছে; সমাজে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, বিস্তর ক্ষমতা, তা সে দস্যুতা করে জমির মালিক হলেও! চাষি, উৎপাদক কিংবা শ্রমিকের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব আদায় করাই তার কাজ। আইনও জমিদারদের পক্ষে, কেননা, সে আইন তো তারা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে। এই কারণেই অনেকে মনে করেন, ভূসম্পত্তি কোনো একজনের হাতে না থেকে সমাজ-গোষ্ঠীর অধীনে থাকা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র অথবা সমাজ-গোষ্ঠীর হাতে জমি থাকার মানে, তাতে সকলেরই সমান স্বত্ব, কোনো একজন লোক অন্যায়ভাবে শোষণ করতে কিংবা অসংগত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

কিন্তু এই ধারণা তখন কোথায়? আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কেউ এই দিক থেকে কথাটা ভাবে নি। নিতান্ত দুরবস্থা সহ্য করা ছাড়া সাধারণ লোকের কোনো উপায় ছিল না। বশ্যতা যদি মজ্জাগত হয়ে যায়, লোকে সব-কিছু সহ্য করতে পারে।

তা হলে তখন সমাজে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এক দিকে জমিদার ও তার অনুগৃহীতের দল, অপর দিকে নিতান্ত গরিব ও অসহায় জনগণ। ভূম্যধিকারীর অট্টালিকা ও দুর্গের চার দিকে গরিবদের বস্তি। এ যেন দুটো পৃথিবী, একটার সঙ্গে আর-একটার যোগ নেই। জমির মালিক চাষি প্রজাদের গরুবাছুরের শামিল মনে করত। কখনও কখনও নিম্নস্তরের যাজকসম্প্রদায় চাষিদের পক্ষ অবলম্বন করত বটে, কিন্তু সাধারণত তারা জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করত। আর তা করবেই-বা না কেন? বিশপরা নিজেরাই যে ছিল এক-একজন ভূম্যধিকারী!

ভারতে ঠিক এইরূপ ভূম্যধিকার-প্রথা না থাকলেও কতকটা এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। আজও ভারতীয় রাজ্যগুলোতে তার অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। জাতিভেদ-প্রথাই তো সমাজে নানা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। চীনদেশে কোনো কালে এই ধরনের স্বৈরশাসনব্যবস্থা (Autocracy) ছিল না। সে দেশে সরকারি কর্মচারী-নিয়োগের যে পরীক্ষাব্যবস্থা ছিল তাতে করে যে-কোনো লোক সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হতে পারত।

ভূম্যাধিকার-প্রথায় সাম্য কিংবা স্বাধীনতার স্থান ছিল না। ছিল অধিকার আর কর্তব্যের প্রশ্ন। অধিকার হিসাবে জমিদার তার পাওনাটা ষোলো আনাই আদায় করে নিত, কিন্তু পরিবর্তে চাষিদের প্রতি কর্তব্যটা যেত ভুলে। এমনটাই হয়, অধিকার সাব্যস্ত করতে ভুল হয় না, যত অবহেলা কর্তব্যপালনের বেলা। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে আজকালও এমন অনেক জমিদার আছে যারা প্রজাদের কাছ থেকে শুধু শুধু প্রচুর খাজনা আদায় করে থাকে, বাধ্যবাধকতার কোনো ধার ধারে না।

ইউরোপের প্রাচীন বর্বরজাতিরা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়; কিন্তু ক্রমে ওদের মধ্যেও ভূম্যাধিকার-প্রথা প্রচলিত হল। অথচ এই প্রথা স্বাধীনতার বিরোধী। ঐ বর্বরজাতিরা তাদের নেতা বা রাজা নির্বাচন করত, তাকে শাসনে রাখত। কিন্তু এখন দেখছি, সর্বত্র স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বা অটোক্র্যাসির যুগ; নির্বাচনের ব্যবস্থা পেয়েছে লোপ। এই পরিবর্তন কেন হল, বলতে পারি না। সম্ভবত খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ কর্তৃক গণতন্ত্রবিরোধী মতের প্রচার এর জন্য দায়ী। রাজাকে মনে করা হত পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া; এমতাবস্থায় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ছায়াকে অমান্য করা কিংবা তার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা কি সম্ভব? স্বর্গ-মর্ত দুইই এই ভূম্যাধিকার-প্রথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে স্বাধীনতার যে আদর্শ বিদ্যমান ছিল, কালক্রমে তা লোপ পেয়ে যায়। তবে মধ্যযুগের প্রথমভাগেও ঐ আদর্শ লোকের মনে কিয়ৎপরিমাণে জাগরূক ছিল, শুক্রাচার্যের 'নীতিসার' এবং দাক্ষিণাত্যের শিলালিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রমে ইউরোপে নূতন নূতন আদর্শ ও ব্যবস্থার সূত্রপাত হল, ধীরে ধীরে স্বাধীনতার আলো দেখা দিল। জমিদার এবং চাষি ক্রীতদাস ছাড়াও সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর লোক ছিল, যেমন—কারিগর ও ব্যবসায়ী। এরা জায়গিরপ্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের প্রাধান্য বেড়ে গেল, অর্থশালী হয়ে উঠল তারা; লর্ড, জমিদার প্রভৃতি ওদের কাছ থেকে টাকাকড়ি ধার করতে শুরু করল। ওরা ধার দিলে বটে, কিন্তু পরিবর্তে কতকগুলো সুবিধা ও অধিকার আদায় করে নিলে; তাতে করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল ওরা। ফলে কী হল জানো? এখন আর লর্ডদের দুর্গের আশেপাশে চাষি বা ক্রীতদাসদের ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরগুলি রইল না; দেখা গেল, গির্জা, ক্যাথিড্রাল কিংবা সমিতি ও সভাগৃহকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো শহর গড়ে উঠছে। ব্যবসায়ী এবং কারিগরশ্রেণীর লোকেরা নানা সমিতি বা মিলনগৃহ স্থাপন করত, কালক্রমে ওগুলো থেকেই টাউন-হলের সৃষ্টি হয়েছে।

এই-যে নগরগুলো গড়ে উঠছিল—কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, হ্যামবুর্গ ইত্যাদি, এগুলো খাড়া হল ভূম্যাধিকারীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। ওখানে গড়ে উঠছিল একটা নূতন শ্রেণী, নূতন সমাজ—বণিক আর ব্যবসায়ীর সমাজ। এই শ্রেণী ছিল বিত্তশালী, জমিদাররা পাত্তা পেত না ওদের কাছে। এই শ্রেণীযুদ্ধ চলল বহুকাল। লর্ড আর জমিদারদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হত রাজাকে, তাই অনেক সময়ে রাজা ঐসমস্ত নগরগুলোর পক্ষই সমর্থন করত।

আমি অনেক দূর এগিয়ে গেছি। তখনকার দিনে যে জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ছিল না, সে কথাটাই তোমাকে বলতে শুরু করেছিলাম। ঊর্ধ্বতন প্রভু বা লর্ডের প্রতি কর্তব্য আর বাধ্যবাধকতা ছাড়া লোকে আর-কিছু জানত না, এমনকি রাজার সম্পর্কেও তাদের কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। জমিদার যদি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের কী আসে-যায়?—তারা সমর্থন করবে জমিদারকে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, জাতীয়তাবোধের সঙ্গে এই ধারণার মিল নেই কোনো।

তবে ন্যাশন্যালিটি অর্থাৎ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হল কবে?—সে অনেক কাল পরের কথা।

৫৪

চীন ও যাযাবর জাতি

৫ই জুন, ১৯৩২

চীন এবং সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলো সম্পর্কে অনেক-কাল তোমাকে কিছু লিখি নি। ইতিমধ্যে ইউরোপ, ভারতবর্ষ আর পশ্চিম-এশিয়া সম্পর্কে আমরা অনেক-কিছু আলোচনা করেছি; দেখেছি, আরবজাতি দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল, জয় করল নানা দেশ; ইউরোপ ডুবে গেল অন্ধকারে। এই সময়ে চীনের অবস্থা ছিল খুব উন্নত। সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীর কথা, চীনে তখন তাঙ-বংশের রাজত্ব। এই তাঙ-সম্রাটদের রাজত্বকালে সভ্যতা, সমৃদ্ধি, এবং শাসনব্যবস্থার দিক দিয়ে চীন এত বেশি উন্নতি লাভ করেছিল যে, তৎকালে সম্ভবত পৃথিবীর আর-কোনো দেশ চীনের সমকক্ষ ছিল না। রোমের পতনের পরে ইউরোপের এত অবনতি ঘটেছিল যে, চীনের সঙ্গে তার তুলনাই করা চলে না। উত্তর-ভারতের অগ্রগতিতেও তখন ভাঁটা পড়েছিল, ক্রমশ তার অবনতি ঘটছে; অবশ্য দাক্ষিণাত্যের অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত উন্নত—সাগরপারে শ্রীবিজয়া, আঙ্কোর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের উপনিবেশগুলোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই সময়কার চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দুটি রাষ্ট্রের নাম করা যেতে পারে, তা হচ্ছে আরব-রাষ্ট্র বোগদাদ আর স্পেন। কিন্তু এদের উন্নত অবস্থাও খুব বেশিকাল স্থায়ী ছিল না। এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঙ-বংশের জনৈক সম্রাট একবার সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন; তার পর আরবদের সহায়তায় তিনি পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন।

দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে চীন দস্তুরমতো সুসভ্য দেশে পরিণত হয়েছে; সুতরাং চীন যদি তৎকালীন ইউরোপীয়দিগকে অর্ধ-বর্বর বলে মনে করত তবে নেহাত অন্যায় হত না। তখনকার পরিচিত জগতে চীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেশ আর ছিল না। পরিচিত জগৎ বলছি এই জন্যে যে, আমেরিকায় তখন কী ঘটছিল আমি জানি না। এইটুকু মাত্র জানি যে, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশে কয়েক শো বছর আগেই সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছিল; কোনো কোনো বিষয়ে তারা আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভও করেছিল, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল নেহাত পশ্চাৎপদ। যা হোক, ঐসকল দেশের সম্পর্কে আমি এত কম জানি যে, বেশি-কিছু বলতে ভরসা পাই না। তবে মেক্সিকো আর মধ্য-আমেরিকার 'মায়া'-সভ্যতা এবং পেরুরাষ্ট্রের কথা তোমাকে মনে রাখতে বলি। জ্ঞানী ব্যক্তিরা হয়তো-বা এদের সম্পর্কে তোমাকে অনেক-কিছু বলতে পারবেন।

আর-একটা কথা মনে রাখবে। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতিদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি; এদের কতক ইউরোপে চলে গেল, কতক-বা এল ভারতবর্ষে; হূন, তুর্ক, সিথিয়ান প্রভৃতি আরও অনেকে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো দলে দলে এদিকে-ওদিকে গেল। শ্বেতহূনজাতি এল ভারতবর্ষে, আর এত্তিলার অধীনস্থ হূনরা গেল ইউরোপে। মধ্য-এশিয়ার সেলজুক তুর্ক-জাতি বোগদাদ-সাম্রাজ্য দখল করেছিল; পরবর্তীকালে তুর্কদের আর-এক বংশ, অটোম্যান তুর্ক-জাতির আবির্ভাব হয়; এরা কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্ জয় এবং ভিয়েনা নগরের দ্বারদেশ অবধি অভিযান করেছিল। এই মধ্য-এশিয়া অথবা মঙ্গোলিয়া থেকেই এসেছিল দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় জাতি; এরা দেশ জয় করতে করতে একেবারে ইউরোপের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এমনকি চীনকেও তাদের অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছিল। এদেরই একজন আবার ভারতে একটা রাজবংশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, এবং এই বংশের কয়েকজন রাজা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভও করেছেন।

মধ্য-এশিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার যাযাবর জাতিদের সঙ্গে চীনদেশকে অনবরত যুদ্ধ করতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এইসকল যাযাবর জাতি চীনকে কেবলই উত্ত্যক্ত করেছে, সুতরাং আত্মরক্ষার্থে লড়াই করা ছাড়া চীনের উপায় ছিল না। আর এদের প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যেই বিখ্যাত 'চীনের প্রাচীর' নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাচীর ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি।

চীন-সম্রাটগণ একজনের পর একজন কেবলই ওদের তাড়িয়েছেন এবং এই করেই চীন-সাম্রাজ্য পাশ্চাত্যে কাস্পিয়ান সাগর অবধি বিস্তার লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ চীনে ছিল না বললেই হয়। কোনো কোনো সম্রাট সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন বটে, দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের ছিল, কিন্তু সাধারণত চীনারা ছিল শান্তিপ্রিয় জাতি, যুদ্ধবিগ্রহ আর দেশজয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল না। যোদ্ধার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই চীন বরাবর বেশি সম্মান দেখিয়েছে। এতৎসত্ত্বেও যে সময়ে-সময়ে চীন-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল তার কারণ, যাযাবর জাতিদের অত্যাচার ও আক্রমণ। একেবারে রেহাই পাবার জন্যে চীন-সম্রাটগণ এদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বহুদূরে পশ্চিমদিকে; কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় নি; তবে চীন কিয়ৎপরিমাণে নিরুপদ্রব হয়েছিল।

চীন স্বস্তি লাভ করল বটে, কিন্তু ফ্যাসাদ হল অন্যান্য দেশের। চীনাদের কাছে তাড়া খেয়ে যাযাবর জাতিগুলো আক্রমণ করল তাদের। ওরা প্রবেশ করল ভারতবর্ষে, ইউরোপে হানা দিল বারংবার। তুর্কজাতি গেল ইউরোপে, আর হূন, তাতার প্রভৃতি জাতি অন্যান্য দেশে।

কিন্তু এর পরে এমন একটা সময় এল যখন চীনারা আর যাযাবর জাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ততটা সক্ষম রইল না।

তাঙ-রাজবংশের প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্রমশ লোপ পেতে লাগল; পর পর কতকগুলো অক্ষম, অপদার্থ ব্যক্তি হল শাসনকর্তা। অনাচারে ছেয়ে গেল দেশ; তার উপরে অতিরিক্ত ট্যাক্সের ভার; জনগণের মনে অসন্তোষ। অবশেষে ৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই বংশের পতন হল।

এর পরে অর্ধ-শতাব্দী-কাল চীনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি। ৯৬০ খৃষ্টাব্দে চীনে আর-এক প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়—সুঙ-বংশ; এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাও-সু। কিন্তু তখনও রাজ্যের ভিতরে ও সীমান্তে গোলযোগ লেগেই ছিল। জমির খাজনা ধার্য হয়েছিল অতিরিক্ত; চাষিরা করভারে জর্জরিত, ক্ষুব্ধ। ভারতের মতো চীনেও জমিবিলির ব্যবস্থায় চাপ পড়ত বেশি জনসাধারণের উপর, এর প্রতিকার না হলে দেশে শান্তি বা উন্নতির আশা ছিল না। কিন্তু এ তো জানা কথা, কোনো-কিছুর আমূল পরিবর্তন করা দুরূহ ব্যাপার। তবে এটাও ঠিক যে, যথাসময়ে পরিবর্তন করা না হলে হঠাৎ এক সময়ে নিজে থেকেই পরিবর্তন ঘটবে, সব-কিছু ওলটপালট করে দেবে।

তাঙ-রাজবংশ শাসনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করে নি, কাজেকাজেই তার পতন ঘটল। সুঙ-সম্রাটদের রাজত্বকালেও নানা অশান্তি উপদ্রব লেগেই ছিল। একটি লোক এইসমস্ত অশান্তি দূর করতে পারতেন বটে; তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীতে সুঙ-রাজাদের প্রধানমন্ত্রী—ওয়াঙ আন্ শি।। চীনদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল কন্‌ফুসিয়সের আদর্শানুযায়ী। কন্‌ফুসিয়সের বিরোধিতা করতে সাহস করত না কেউ। ওয়াঙ আন্ শি-ও অবশ্য তার বিরোধিতা করেন নি, তবে ঐ মত ও আদর্শের ব্যাখ্যা করেছিলেন নূতন ধরনে। তাঁর কতকগুলো মতবাদ তো সম্পূর্ণ আধুনিক কালোপযোগী। ওঁর উদ্দেশ্য ছিল, দরিদ্র জনগণের করভার লাঘব করে ধনীদের উপরে তা চাপানো। বস্তুত ওয়াঙ আন্ শি জমির ট্যাক্স কমিয়ে দিলেন; গরিব চাষিরা ইচ্ছা করলে অর্থের পরিবর্তে উৎপাদিত শস্য দ্বারা খাজনা দিতে পারত। ধনীদের উপরে বসানো হল আয়কর। এই আয়করের ব্যবস্থাকে অতি আধুনিক বলে মনে করা হয়, অথচ দেখো, নয় শো বছর আগেই চীনদেশে এর প্রবর্তন করা হয়েছিল! গভর্মেণ্ট থেকে চাষিদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা হল। বাজার-দর হ্রাস পেলে চাষিদের বড়ো ক্ষতি, শস্যাদি বিক্রি করে লাভ থাকে না, ট্যাক্স দিতে পারে না। ওয়াঙ প্রস্তাব করলেন, বাজার-দরের যাতে উঠ্‌তি-পড়্‌তি না হয় সেজন্যে গভর্মেণ্টেরই কর্তব্য, শস্যাদি কেনা-বেচা করা। প্রত্যেক লোককে তার কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, বিনা পারিশ্রমিকে কাকেও খাটানো হত না। একটা সামরিক বাহিনীও ওয়াঙ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসকল সংস্কারকার্য বেশিদিন স্থায়ী হল না; কেবল সামরিক বাহিনী আট শতাধিক বৎসর-কাল টিঁকে ছিল।

শাসনব্যাপারে সুঙ-রাজাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমাধান করতে চেষ্টা করেন নি; ফলে তাঁদের অধঃপতন ঘটতে লাগল। উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতি

খিতানদের সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠলেন না, সাহায্যের জন্য কিন্ বা তাতারদের দ্বারস্থ হলেন। কিন্‌রা এসে খিতানদের তাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু নিজেরা থেকে গেল। সবলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে গেলে দুর্বলের বরাতে এরকমটাই ঘটে থাকে। কিন্‌জাতি উত্তর-চীন দখল করে বসল, পিকিঙ হল তাদের রাজধানী। সুঙরা সরে গেল দক্ষিণদিকে। চীন-ভূখণ্ডে দুটো সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল—উত্তরে কিন্ আর দক্ষিণে সুঙ -সাম্রাজ্য। উত্তর-চীনে সুঙ-বংশের রাজত্বকাল চলেছিল ৯৬০ থেকে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ অবধি; আর, দক্ষিণ-চীনে দেড় শো বৎসর; ১২৬০ সনে মঙ্গোলিয়ানদের হাতে তাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য, চীনদেশও প্রাচীন যুগের ভারতেরই মতো; চীনের অধিবাসীরা এমনভাবে মঙ্গোলিয়ানদের আপন সভ্যতা ও কৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত করে নিলে যে শেষপর্যন্ত ওদের পৃথক অস্তিত্ব বড়ো-একটা রইল না, দস্তুরমতো চীনা বনে গেল।

যাই হোক, চীন যাযাবর জাতির কাছে হেরে গেল। কিন্তু তাদের হাতে চীনকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি; কেননা, চীনের সংস্পর্শে এসে তারা সভ্য হয়েছিল।

তাঙ-রাজাদের মতো সুঙ-রাজারা রাষ্ট্রশক্তির দিক থেকে তত ক্ষমতাশালী ছিল না। কিন্তু শিল্পকলার দিক দিয়ে তারা পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল, এমনকি যথেষ্ট উন্নতিসাধনও করেছিল। বিশেষত দক্ষিণ-চীনে সুঙ-রাজাদের আমলে শিল্পকলা এবং কাব্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল; সুঙ-শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকতে বিশেষ পটু ছিলেন। এই সময়েই পোর্সিলিনের বা চীনামাটির বাসনের আবির্ভাব হয়; সুঙ-শিল্পীদের তুলির স্পর্শে চীনামাটির বাসনের সৌন্দর্য শতগুণ বেড়ে যায়। এর দু শো বৎসর পরে মিঙ-রাজাদের আমলে আরও উৎকৃষ্ট পোর্সিলিন প্রস্তুত হয়েছিল। তখনকার এক-একখানি চীনামাটির বাসন আজও আমাদের চোখে অপূর্ব বলে মনে হয়।

৫৫

জাপানে শোগান-রাজত্ব

৬ই জুন, ১৯৩২

চীন থেকে পীতসাগর পার হয়ে জাপানে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার। সুতরাং এত কাছে যখন এসেছি, একবার জাপান ঘুরে আসা যাক। ইতিপূর্বে জাপানের সম্বন্ধে যা লিখেছি তা মনে আছে তো? ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে বিত্তশালী কয়েকটি বড়ো পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলতে দেখেছি; তার পরে কেন্দ্রে একটা গভর্মেণ্ট-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হচ্ছিল। আগে সম্রাটের ক্ষমতা কোনো-একটা বড়ো এবং ক্ষমতাশালী বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টেই সম্রাটের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কেন্দ্রে ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ নারা-নগরে রাজধানী স্থাপিত হল। পরে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কয়টো-নগরে। চীনা শাসন-পদ্ধতির অনুকরণ করল জাপান; এমনকি শিল্পকলা, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি অনেক-কিছু গ্রহণ করল সরাসরি চীন থেকে কিংবা চীনের মধ্যস্থতায় অন্য দেশ থেকে। 'দাই নিপ্পন' এই নামটাও চীনা।

ফুজিআরা-বংশ খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল; সম্রাট ছিল তাদের হাতের পুতুল। দু শো বছর তারা জাপানে আধিপত্য করেছে; শেষ পর্যন্ত সম্রাটরা হতাশ হয়ে সিংহাসন ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যায় মঠে। কিন্তু সন্ন্যাসী হলেও সংসার থেকে একেবারে আলগোছ রইল না, পরবর্তী সম্রাটকে শাসনকার্য সম্পর্কে নানা সলাপরামর্শ দিতে লাগল। এতে করে অবস্থাটা জটিল হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুজিআরা-বংশের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অনেকটা কমে গেল। সম্রাটরা একজনের পর একজন সিংহাসন ত্যাগ করে মঠে গেল বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা রইল তাদেরই হাতে।

এদিকে দেশে আরও পরিবর্তন ঘটছিল; নূতন এক জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হল—সামরিক শ্রেণী। এরা ফুজিআরা-বংশেরই সৃষ্টি, গভর্মেণ্টের খাজনা আদায় করত। এদের বলা হত 'দাইমো',

অর্থাৎ 'বড়ো নাম'। ব্রিটিশরা আসবার আগে আমাদের প্রদেশেও এ ধরনের এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়েছিল, বিশেষত অযোধ্যায়। ওখানকার রাজা ছিল অকর্মণ্য, ট্যাক্স-আদায়ের জন্য তাকে লোক নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এই লোকগুলো জোর করে ট্যাক্স আদায় করবার জন্য সৈন্যসামন্ত রাখত; আদায়ীকৃত ট্যাক্সের অধিকাংশই আত্মসাৎ করত নিজেরা। পরে এদের অনেকে এক-একজন বড়ো তালুকদার হয়ে দাঁড়ায়।

দাইমোরাও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ, সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। পরস্পরের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকত, কয়টোর কেন্দ্রীয় গভর্মেন্টকে মানত না কেউ। এদের মধ্যে আবার টায়রা আর মিনামতো -বংশ ছিল প্রধান। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে এদের সহায়তায় সম্রাট ফুজিআরা-বংশকে দমন করেন। কিন্তু তার পরে এই দুই বংশ একে অন্যকে আক্রমণ করল; জয় হল টায়রাদের, এবং ভবিষ্যতে যেন আর উপদ্রব করতে না পারে এই উদ্দেশ্যে চারটি শিশু ছাড়া মিনামতো-বংশের অন্যান্য সকল লোককে তারা মেরে ফেলল। ঐ চার জনের মধ্যে একটির বয়স ছিল বারো বৎসর, নাম আরিতমো। টায়রা-পরিবার ঐখানে মস্ত একটা ভুল করল; আরিতমোকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি; ভেবেছিল, ঐ একরত্তি ছেলে কী আর করবে? কিন্তু কালক্রমে আরিতমো ওদের দারুণ শত্রু হয়ে দাঁড়াল, প্রতিহিংসার সংকল্প ওর মনে। শেষ পর্যন্ত ও প্রতিহিংসা নিলে, রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দিলে টায়রা-বংশকে, এক নৌ-যুদ্ধে ধ্বংস করল ওদের।

এখন আর তাকে পায় কে? অফুরন্ত ক্ষমতা তার হাতে। সম্রাট আরিতমোকে সি-ই-তাই-শোগান উপাধিতে ভূষিত করল; এর অর্থ—দুর্বৃত্ত-দমনকারী বীর সেনাপতি। এটা ১১৯২ খৃষ্টাব্দের কথা। এই উপাধিটা বংশগত হয়ে দাঁড়াল এবং তার সঙ্গে এল পূর্ণ শাসনক্ষমতা।

এভাবেই শুরু হল জাপানে শোগান-রাজত্ব। এই শোগান-রাজত্ব অনেক-কাল চলেছিল—এই সেদিন পর্যন্ত, প্রায় সাত শো বছর। তার পরেই পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল আধুনিক জাপান।

কিন্তু তা বলে মনে কোরো না, আরিতমোর বংশধরগণই এই সাত শো বৎসর রাজত্ব করেছিল। এই সময়ের মধ্যে শোগান-বংশে কত পরিবর্তন, কত গৃহযুদ্ধ ঘটেছে। অনেক সময়ে সম্রাটের প্রকৃত কোনো ক্ষমতাই থাকত না, শুধু নামে-মাত্র সম্রাট; রাজ্যশাসন করত জনকতক কর্মচারী।

আরিতমো রাজধানী কয়টোতে বাস করত না, পাছে রাজধানীর বিলাসব্যসন তাকে অকর্মণ্য করে তোলে। সে থাকত কামাকুরা-নামক স্থানে; ওটা হল তার সামরিক রাজধানী। দেড় শো বৎসর অর্থাৎ ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ অবধি তা টিঁকে ছিল। এই সময়ে দেশে কোনোরূপ অশান্তি বা গৃহযুদ্ধ ছিল না; নানা বিষয়ে দেশের উন্নতিও হয়েছিল। শাসনব্যবস্থাও ছিল উৎকৃষ্ট, সমসাময়িক কালের ইউরোপের কোনো দেশে এমনটা ছিল না। চীনের উপযুক্ত শিষ্য হলেও এই দু দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিভিন্ন। চীন শান্তিপ্রিয় দেশ; আর জাপান দেশটা ছিল আক্রমণশীল ও সামরিক। চীনে সৈন্যরা ছিল ঘৃণার পাত্র, যুদ্ধ করা সম্মানের কাজ বলে কেউ মনে করত না; কিন্তু জাপানে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সকলেই ছিল সৈনিক।

চীনের অনেক-কিছু জাপান গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তা নিজস্ব পদ্ধতিতে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপযোগী করে। চীনের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক তার বরাবর ছিল, ব্যবসাবাণিজ্য তো চলতই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মঙ্গোলীয়গণ যখন চীন এবং কোরিয়াতে আসে, তখন হঠাৎ ঐ সম্পর্কে ছেদ পড়েছিল। মঙ্গোলীয়গণ জাপান জয় করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি; জাপানিরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। এই মঙ্গোলীয়গণ এশিয়ার চেহারা বদলে দিয়েছিল, ইউরোপকেও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, অথচ জাপানের কিছু করতে পারে নি। জাপানে বহির্জগতের প্রভাব পড়ে নি, নিজস্ব ধারাই সে বজায় রেখে চলেছে।

তুলার চাষ কী করে প্রথম জাপানে প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে; জাপানের প্রাচীন সরকারি দলিলপত্রাদি থেকে তা জানা যায়। ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জাপানের উপকূলে একখানি জাহাজ জলমগ্ন হয়েছিল; তারই কয়েকজন ভারতীয় যাত্রীর কাছে ছিল তুলার বীজ।

আর জাপানে চায়ের প্রচলন কবে থেকে জানো? সে পরেকার কথা। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চাষ শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু তখন সুবিধা হয় নি। তার পরে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ চীন থেকে চায়ের বীজ নিয়ে যায় জাপানে, এবং শীঘ্রই চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু চা পান করবার পাত্র চাই তো? ঝোঁক পড়ল সুদৃশ্য বাসন তৈরির দিকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে একজন জাপানি চীনদেশে গেল পোর্সলিন বা চীনামাটির বাসন তৈরি করা শিখতে। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর লোকটি সেখানে রইল, তার পর দেশে ফিরে সুন্দর জাপানি পোর্সলিন তৈরি করতে শুরু করল। আজকাল জাপানে চা-পান একটা চারুশিল্পে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে কতই-না উৎসব! যদি কখনও জাপানে যাও, ঠিক রীতি অনুযায়ী তোমাকে চা পান করতে হবে, নতুবা তুমি সেখানে অপাংক্তেয়।

৫৬

মানুষের অগ্রগতি

১০ই জুন, ১৯৩২

চার দিন আগে বেরিলি জেল থেকে তোমাকে চিঠি লিখেছি। ঠিক সেদিন সন্ধেবেলাতেই আমার উপরে হুকুম হল, তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে বেরোতে হবে—না, মুক্তি দেওয়ার জন্য নয়, অন্য জেলে আমাকে বদলি করা হবে। কাজেই ব্যারাকের বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে নিলাম। গত চারটি মাস এঁদের সঙ্গে কাটিয়েছি। চব্বিশ ফুট উঁচু দেয়ালটাকে একবার শেষবারের মতো দেখে নিলাম, এরই আশ্রয়ে এতদিন ছিলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম, খানিকক্ষণের জন্য হলেও বাইরের জগৎটাকে একবার দেখা যাবে। আমার সঙ্গে আর-একজন বন্দীকেও বদলি করা হচ্ছিল। এরা কিন্তু আমাদের বেরিলি স্টেশনে নিয়ে গেল না, পাছে লোকে আমাদের দেখে ফেলে। আমরা যেন পর্দানশিন, কেউ দেখে ফেললে দোষ হবে। পঞ্চাশ মাইল মোটরে করে এনে মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা স্টেশনে ওরা আমাদের তুলে দিল। মোটর-ড্রাইভটির জন্য আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। বহু মাস নির্জনবাসের পরে আলো-অন্ধকারে মানুষজনের ভিড় আর ছায়ামূর্তির মতো গাছের সারির ভিতর দিয়ে ছুটে যেতে ভারি ভালো লাগছিল; রাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেরাদুনে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই আমাদের ট্রেন থেকে নাবিয়ে আবার মোটরে চাপানো হল, পাছে এখানেও লোকে আমাদের দেখে ফেলে।

এখন দেরাদুনের ছোট্ট জেলটিতে আছি। বেরিলির চেয়ে এখানটাতে ভালো আছি বলতে হবে। জায়গাটা ঠাণ্ডা, বেরিলির মতো তাপ ১১২ ডিগ্রিতে ওঠে না। চার দিকের দেয়ালটা ওখানকার মতো উঁচু নয়, আর দেয়ালের বাইরে থেকে যে গাছগুলো উঁকি মারছে সেগুলো দেখতে ঢের বেশি সবুজ। দেয়াল ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা তালগাছের মাথা দেখা যায়, মনটা খুশি হয়ে ওঠে, মালাবার এবং সিংহলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গাছের সারি ছাড়িয়ে দেখা যায় পাহাড়ের সারি—খুব বেশি দূরের পাল্লা নয়—তারই চূড়ায় গুঁড়ি মেরে পড়ে আছে মুসৌরি শহর। পাহাড়গুলি ভালো করে দেখা যায় না, গাছের সারিতে ঢাকা পড়ে গেছে; কিন্তু পাহাড়ের কাছে আছি এইটে ভাবতেই ভালো লাগে। আর রাত্তিরবেলায় বহু দূরে মুসৌরি শহরের আলোগুলি আকাশের তারার মতো ঝিক্‌মিক্‌ করছে, ভাবতে বেশ লাগে।

চার বছর আগে—না তিন বছর হল?—তোমাকে এইসব চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম, তখন তুমি ছিলে মুসৌরিতে। এই তিন-চার বছরে কত কী ঘটে গিয়েছে, তুমিও কত বড়ো হয়ে গিয়েছ! খেয়াল-খুশি-মতো যখন সময় পেয়েছি তখন এসব চিঠি লিখেছি, বেশির ভাগ চিঠি জেল থেকে লেখা। মাঝে মাঝে লেখায় ছেদ পড়েছে, বেশ কিছুকাল হয়তো লেখাই হয় নি। কিন্তু

যতই লিখছি, নিজেরই আর তেমন মন উঠছে না। কেবলই ভয় হয়, তোমার কাছে বোধ করি এগুলো ভালো লাগছে না, হয়তো-বা রীতিমতো বোঝার মতো ঠেকছে। তা হলে আর লিখে দরকার কী?

আমি চেয়েছিলাম অতীতটাকে একেবারে জীবন্ত করে তোমার চোখের সামনে তুলে ধরব, যাতে তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে, আমাদের এই পৃথিবী কীভাবে ধীরে ধীরে বদলিয়েছে, ক্রমে ক্রমে এগিয়েছে; আবার কখনও-বা আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বুঝি-বা পিছিয়েই যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, তোমাকে দেখাব প্রাচীন কালের বিভিন্ন সভ্যতা কীভাবে জোয়ার-জলের মতো কূল ছাপিয়ে এসেছে, আবার ভাটার টানে কোথায় মিলিয়ে গেছে। ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মতো যুগ যুগ ধরে অবিরাম বেগে ছুটে চলেছে—কোথাও বাধা পেয়ে, কোথাও পাক খেয়ে—কিন্তু কেবলই ছুটে চলেছে কোন্ অজানা সমুদ্রের পানে। আজও সেই চলার বিরাম নেই। ইচ্ছে ছিল হাত ধরে তোমাকে মানুষের সেই চলার পথ বেয়ে নিয়ে আসব, একেবারে সেই আদিযুগ থেকে যখন মানুষকে মানুষ বলেই চেনা যেত না। চলতে চলতে আসব একেবারে আজকের দিনের মানুষের কাছে, আপন সভ্যতার গর্বে যে গর্বিত, যদিও আমার মনে হয় যে এ অহংকারও মূর্খের অহংকার। তোমার বোধ হয় মনে আছে ঠিক সেভাবেই আমরা শুরু করেছিলাম। সেই মুসৌরিতে তোমাকে যেসব চিঠি লিখেছি তাতে বলেছিলাম, কীভাবে আগুন আবিষ্কার হল, কৃষিকার্যের পত্তন হল, শহর গড়ে উঠল এবং সমাজে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কিন্তু যতই এগিয়ে গিয়েছি ততই রাজ্য-সাম্রাজ্যের গোলকধাঁধায় পড়ে আসল গতিপথের খেই হারিয়ে ফেলেছি। আমরা শুধু ইতিহাসের স্রোতটা উপর উপর ছুঁয়ে এসেছি অর্থাৎ অতীতের কঙ্কালটাই কেবল তোমার সামনে ধরেছি। ইচ্ছে ছিল গায়ে রক্তমাংস জুড়ে দিয়ে সেটাকে জীবন্ত করে তোমাকে দেখাব।

কিন্তু মনে হচ্ছে সে শক্তি আমার নেই, কাজেই সে কঠিন কাজটি তোমার আপন কল্পনার সাহায্যে নিজেকেই করে নিতে হবে। ভালো ভালো বই থেকে তুমি নিজেই তো অতীতের ইতিহাস পড়ে নিতে পারো, আমার আর লেখার দরকার কী? তবু নিজেকে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত করতে পারছি নে বলেই লিখে চলেছি, বোধ করি পরেও লিখব। লিখব বলে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তা আমার মনে আছে; সেই কথা অবশ্যই রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো প্রলোভন হল, তোমার কাছে চিঠি লেখার আনন্দ। লিখতে বসলেই মনে হয়, তুমি আমার পাশে বসে আছ, আর আমরা দুজনে মিলে কথা বলছি।

আদিম মানুষ যখন প্রথম জঙ্গল থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল সেই থেকে তার চলার শেষ নেই। ঐ চলার পথের কথাই বলছিলাম—বহু সহস্র বৎসরের দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের কাহিনী। অথচ যদি পৃথিবীর কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করো তবে এটা অতি যৎসামান্য সময়, কারণ তারও পূর্বে কত যুগ যুগ, কত অযুত বৎসর কেটে গেছে যখন মানুষের জন্মই হয় নি। কিন্তু আমাদের কারবার মানুষকে নিয়ে, কারণ তার আগে যতসব প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে তাদের চেয়ে সে শ্রেষ্ঠ। মানুষ শ্রেষ্ঠ কারণ তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে একটি নূতন জিনিষের উদ্ভব হয়েছে। সেটি হচ্ছে মানুষের মন—তার কৌতূহল—অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা। সেই আদিকাল থেকে শুরু হয়েছে মানুষের জানবার প্রয়াস। একটি ছোট্ট শিশুকে লক্ষ্য করে দেখো, কী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সে তার চার দিকে তাকায়, আস্তে আস্তে চার দিকের লোকজন জিনিষপত্র চিনতে শুরু করে, দেখে দেখে শেখে। একটি ছোট্ট মেয়েকেই দেখো-না—সে যদি সুস্থমনা এবং কৌতূহলী হয় তবে হাজার বিষয়ে হাজার রকম প্রশ্ন করে উদ্ব্যস্ত করবে। ঠিক তেমনি সেই আদি যুগে যখন ইতিহাসের কেবলমাত্র শুরু এবং মানুষের সবে শৈশব তখন পৃথিবীটা ছিল তার চোখে একেবারে নূতন, বিস্ময়কর এবং বোধ করি ভয়াবহ। সেও তখন এমনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চার দিকে তাকিয়েছে, কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কত প্রশ্ন করেছে। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করেছে। তা ছাড়া কাকে জিজ্ঞেস করবে, কে জবাব দেবে? সেই-যে বলেছি, মন—সে এক অত্যাশ্চর্য জিনিষ, তারই সাহায্যে ধীরে ধীরে ঠেকে ঠেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সে যা-কিছু সব শিখেছে। সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই। বহু জিনিষ

সে শিখেছে, কিন্তু এখনও ঢের শেখবার আছে। নূতনের সন্ধানে যতই সে এগিয়ে যাচ্ছে, বহু-বিস্তৃত অজানার রাজ্য ততই চোখের সামনে দেখা দিচ্ছে। সে রাজ্যের শেষ সীমানা এখনও বহু বহু দূরে—মোটেই তার শেষ আছে কি না কে জানে!

এই-যে মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, সেটা কী? কী সে জানতে চায়, কোথায়ই-বা সে চলেছে? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। ধর্ম বলো, দর্শন বলো, বিজ্ঞান বলো, সকলেই এ প্রশ্নের বিচার করেছে, অনেক রকমের জবাবও দিয়েছে। সেসব জবাবের কথা বলে তোমাকে মিছামিছি ভোগাতে চাই নে, তার কারণ আমি নিজেই ওসব ব্যাপার ভালো করে বুঝি নে। ধর্ম মোটামুটি এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার মধ্যে গোঁড়ামি আছে। কারণ, ধর্ম মানুষের মনকে আমল না দিয়ে জোর-জবরদস্তিতে তার মতামতকে মানুষের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছে। আর বিজ্ঞান আমতা-আমতা করে কিছু বলেছে, সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলে নি। বিজ্ঞান স্বভাবতই মানুষের মনকে প্রাধান্য দেয় এবং সত্যকে যুক্তিবিচার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। বলা বাহুল্য, আমি নিজে বিজ্ঞানের পদ্ধতিটাকেই গ্রহণীয় বলে মনে করি।

মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই; তবে এইটুকু দেখা গেছে, মানুষের জ্ঞানপিপাসা দুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। মানুষ যেমন বাইরের দিকে তাকিয়েছে তেমনি অন্তরের দিকেও। বহিঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বোঝবার চেষ্টা করেছে। মূলতঃ দেখতে গেলে জিনিষটা একই, কারণ মানুষ প্রকৃতিরই অংশবিশেষ। প্রাচীন ভারত এবং গ্রীসদেশের জ্ঞানীব্যক্তিরা বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি', অর্থাৎ নিজেকে জানো। পুরাকালে ভারতীয় আর্যগণ যে বিপুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার ইতিহাস উপনিষদগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আর প্রকৃতিকে জানবার যে চেষ্টা সেটা বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞান এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছে বর্তমান পৃথিবীই তার প্রমাণ। বিজ্ঞানের বাহু ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং জ্ঞানের এই দুই ধারাকে এক জায়গায় সংযুক্ত করবার চেষ্টা করছে। দূরতম নক্ষত্রের প্রতিও তার নিশ্চিত দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে, এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অত্যাশ্চর্য অণুপরমাণুর সন্ধান আমাদের জানিয়েছে, যার থেকে এই বিশ্বের সব-কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের মনই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে এই অনন্ত জিজ্ঞাসার পথে। বিশ্বপ্রকৃতিকে যত বেশি করে জানতে পেরেছে ততই বেশি করে তাকে নিজের প্রয়োজনে লাগিয়েছে, আর সেই পরিমাণে তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য অনেক সময় সে শক্তির অপব্যবহারও সে করেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে সাংঘাতিক সব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, তাতে আপন জনকেই বিনাশ করেছে এবং যে সভ্যতা সে এত যত্নে গড়ে তুলেছিল তাকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে।

৫৭

খৃষ্টোত্তর হাজার বছর

১১ই জুন, ১৯৩২

আমরা এ পর্যন্ত যতদূর এগিয়েছি তাতে এখানটায় একটু থেমে চার দিকটা একবার তাকিয়ে নিলে হয়। আমরা কতদূর এসেছি, এখন কোন্‌খানটায় আছি, পৃথিবীর চেহারাটা এখন কেমন হয়েছে, একবার দেখলে হয়। এসো-না, আমরা আলাদীনের মন্ত্রঃপূত কার্পেটটায় বসে একবার সে যুগের দুনিয়াটা ধাঁ করে দেখে আসি।

খৃষ্টযুগের প্রথম হাজার বছর আমরা পার হয়ে এসেছি। কোনো কোনো দেশের বেলায় হয়তো আর-একটু বেশিই এগিয়েছি, আবার কোনো দেশের বেলায় পিছিয়ে আছি, অর্থাৎ হাজার বছরের কথা এখনও বলা হয় নি।

এশিয়ার চীনদেশে দেখছি তখন সুঙ-বংশ রাজত্ব করছে। সুবিখ্যাত তাঙ-বংশের রাজত্ব-কাল শেষ হয়েছে। সুঙদের আমলে দেশের ভিতরে চলছে আত্মকলহ, ওদিকে আবার উত্তর-অঞ্চল থেকে খিতান নামে এক অসভ্য জাতি তাদের দেশ আক্রমণ করেছে। দেড় শো বছর পর্যন্ত তারা কোনোরকমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল, কিন্তু শেষে এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে বাধ্য হয়ে দেশরক্ষার জন্য তাতার বা কিন্ নামে অপর এক বর্বর জাতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হল। কিন্‌রা সাহায্য করতে এসে সে দেশেই থেকে গেল, মাঝখান থেকে বেচারি সুঙদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ-চীনে সরে পড়তে হল। সেখানে কোণঠাসা অবস্থায় আরও শ-দেড়েক বছর তারা রাজত্ব করল। এ সময়টাতে ও দেশে নানারকম শিল্পের খুব উন্নতি হয়। চিত্রবিদ্যা এবং চীনেমাটির দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল।

কোরিয়াতে কিছুকাল ভাগ-বাঁটোয়ারা আর দ্বন্দ্বের পর ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে একটা যুক্ত স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয়, সে রাজ্য স্থায়ী হল অনেক কাল, প্রায় সাড়ে চার শো বছর। চীনদেশের কাছ থেকে কোরিয়া তার সভ্যতা, শিল্প এবং রাজ্যশাসনপ্রণালীর অনেক উপাদান গ্রহণ করেছিল। তার আর জাপানের ধর্ম এবং আংশিকভাবে শিল্পও চীনদেশের মারফত ভারতবর্ষের থেকে পাওয়া। সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত জাপান, যেন এশিয়ার প্রহরীর মতো। বাকি জগৎটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করছিল। সেখানে তখন ফুজিআরা-বংশের প্রাধান্য। সম্রাট কিছুদিন আগেও গোষ্ঠীপতির মতোই ছিলেন, ইদানীং তাঁর পদমর্যাদা কিছু বেড়েছিল, তা হলেও তাঁর ক্ষমতা এমন-কিছু ছিল না।

মালয়েশিয়াতে ভারতীয় উপনিবেশগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল। কম্বোডিয়া আর তার রাজধানী আঙ্কোর তখন শক্তি ও উন্নতির শীর্ষে। সুমাত্রাতে শ্রীবিজয়া ছিল একটি বৃহৎ বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজধানী, সমস্ত প্রাচ্য দ্বীপগুলি তারই আয়ত্তাধীনে থেকে নিজেদের মধ্যে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। পূর্ব-যবদ্বীপে ছিল একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য; অল্পদিন পরেই এটি প্রবল হয়ে উঠে শ্রীবিজয়ার সঙ্গে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যলব্ধ ধনসম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা করে আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদের মতো দারুণ যুদ্ধ বাধিয়ে দিল, আর শেষে তাকে জয় করে ধ্বংস করে দিল।

ভারতবর্ষের উত্তর এবং দক্ষিণদিক কিছুকাল ধরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল, এখন ব্যবধান আরও বাড়ল। উত্তর-ভারতে গজনির মাহ্‌মুদ বার বার হানা দিয়ে ধ্বংস এবং লুঠতরাজ চালাচ্ছিলেন। প্রচুর ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে তিনি পাঞ্জাবকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। দক্ষিণে দেখতে পাচ্ছি, রাজরাজ আর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রের অধীনে চোলরাজ্য বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। দক্ষিণ-ভারত জুড়ে তাঁদের প্রতিপত্তি, আরবসাগর আর বঙ্গোপসাগরে তাঁদের নৌবহর সদর্পে ঘুরে বেড়াত; সিংহল, দক্ষিণ-ব্রহ্ম এবং বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাঁরা বিজয়-অভিযান চালিয়েছিলেন।

মধ্য আর পশ্চিম-এশিয়ায় দেখতে পাচ্ছি, বোগদাদের আব্বাসি-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। বোগদাদ কিন্তু তখনও সমৃদ্ধ, আর প্রকৃতপক্ষে নূতন সেলজুক-তুর্কি বাদশাদের আমলে তার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। কিন্তু পুরোনো সাম্রাজ্যটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড রাজত্বে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'ইসলাম' বলতে তখন আর একটি সাম্রাজ্যকে বোঝাত না, ইসলাম হয়ে পড়েছে কেবলমাত্র বহু দেশ ও জাতির ধর্ম। আব্বাসি-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে গড়ে উঠেছে গজনি-রাজ্য, এ রাজ্যের বাদশা মাহ্‌মুদ এখান থেকেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে হুড়মুড় করে ভারতবর্ষের উপরে এসে পড়লেন। সাম্রাজ্য ভেঙে গেলেও বোগদাদ কিন্তু বৃহৎ নগরীর মর্যাদা হারাল না, দূরদূরান্তর থেকে শিল্পী আর জ্ঞানীরা তখনও সেখানে আসতেন। বোখারা, সমরকন্দ, বল্‌খ্‌ এবং আরও কত বড়ো বড়ো প্রসিদ্ধ শহরও সে সময় মধ্য-এশিয়ায় গড়ে উঠেছিল। নিজেদের মধ্যে তাদের প্রচুর ব্যবসাবাণিজ্য চলত, বড়ো বড়ো ক্যারাভান এক শহর থেকে অন্য শহরে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসত।

মঙ্গোলিয়াতে ও তার চার পাশে নূতন যাযাবর জাতিরা দলে ভারি আর শক্তিশালী হয়ে উঠল, দু শো-বছর পরে তারাই সারা এশিয়ায় অভিযান চালিয়েছিল। মধ্য এবং পশ্চিম -এশিয়ায় তখন যারা শক্তিশালী জাতি তারাও যাযাবরদের জন্মভূমি মধ্য-এশিয়া থেকেই এসেছিল। চীনাদের তাড়া

খৃষ্টীয় দশম শতকে
এশিয়া ও ইউরোপ
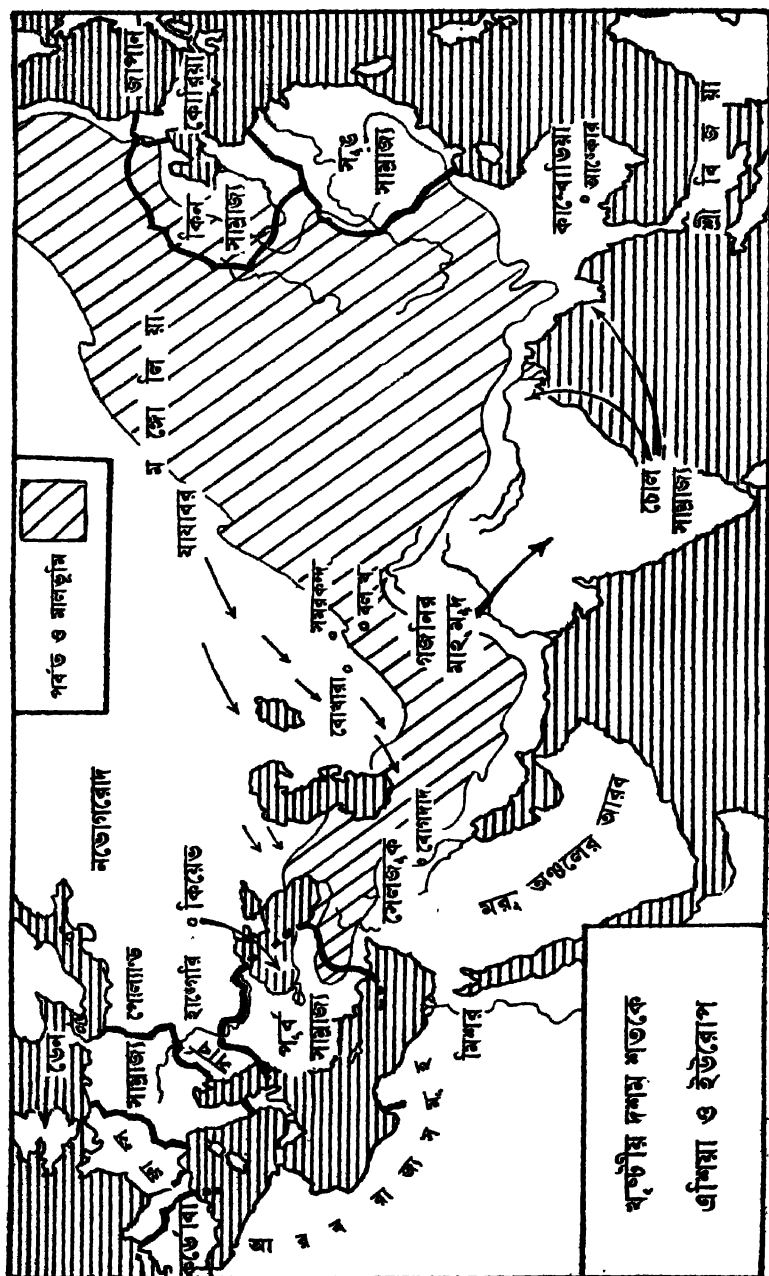
খেয়ে তারা পশ্চিমদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিছু গিয়েছিল ইউরোপে, কিছু এসেছিল ভারতবর্ষে। দেখা গেল, তাড়া খেয়ে পশ্চিমে এসে সেলজুক তুর্কিরা বোগদাদের সাম্রাজ্যকে আবার সমৃদ্ধ করে তুলল এবং কন্স্টান্টিনোপ্‌লে পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে তাকে হারিয়ে দিল।

এশিয়ার সম্বন্ধে এটুকুই। লোহিতসাগরের ওপারে ছিল মিশর, সে বোগদাদের অধীন নয়। সেখানকার বাদশা নিজেকে একজন স্বতন্ত্র খলিফা বলে প্রচার করেছিলেন। উত্তর-আফ্রিকাও তখন স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে। জিব্রাল্টার প্রণালী পেরিয়ে স্পেনেও তখন কর্‌ডুবা অথবা কর্‌ডোবা নামে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল, সেই রাষ্ট্রের অধিপতিকে বলা হত আমির। এঁর সম্বন্ধে পরে তোমাকে কিছু বলতে হবে। কিন্তু আব্বাসি খলিফারা যখন প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠিছিল তখনও যে স্পেন তাদের কাছে নতি স্বীকার করে নি, সে কথা তো তুমি আগেই শুনেছ। সে সময় থেকে স্পেন স্বাধীনই ছিল। অনেকদিন আগে তার ফ্রান্স জয় করার চেষ্টা চার্লস মর্টেল ব্যর্থ করে দেন। এবার স্পেনের উত্তরের খৃষ্টান রাজ্যগুলির মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করার পালা; যতই সময় যেতে লাগল ততই তারা বেশি সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালাতে লাগল। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমিরের অধীনে কর্‌ডুবা একটি বড়ো আর উন্নতিশীল রাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলি থেকে সভ্যতা আর বিজ্ঞানে সে অনেক এগিয়ে আছে। স্পেন ছাড়া ইউরোপের বাকি অংশটা তখন কতকগুলি খণ্ড খণ্ড খৃষ্টান-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টানধর্ম এর মধ্যেই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে; বীর, দেবতা আর দেবীদের পুরোনো ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। ইউরোপের আধুনিক দেশগুলি তখন গড়ে উঠিছিল। ৯৮৭ অব্দে হিউ ক্যাপেটের অধীনে ফ্রান্সকে দেখতে পাচ্ছি। ইংলণ্ডে রাজত্ব করছিলেন 'ক্যানিউট দি ডেন'—সে ১০১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সমুদ্রতরঙ্গকে প্রতিহত হবার জন্যে আদেশ করেছিলেন ব'লে এঁর প্রসিদ্ধি আছে। এর পঞ্চাশ বছর পরে নরম্যাণ্ডি থেকে 'উইলিয়ম দি কঙ্কারার'এর আবির্ভাব হয়। জর্মনি ছিল পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ, সমস্ত দেশটা অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল, কিন্তু তবু সবগুলি মিলে যে একটা দেশ হয়ে উঠবে তারও সূচনা দেখা যাচ্ছিল। রাশিয়া পূর্বদিক রাজ্যবিস্তার করে তার রণতরীর সাহায্যে কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্ অধিকার করার তালে ছিল। কন্স্টান্টিনোপ্‌লের প্রতি রাশিয়ার সর্বদাই আশ্চর্য আকর্ষণ দেখা গেছে, এই সময় থেকেই তার সূচনা। এক হাজার বছর ধরে ক্রমাগত সে এই নগরটি লাভ করার চেষ্টা করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত চোদ্দ বছর আগেও মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এটিকে পাবার আশা পোষণ করেছে। কিন্তু হঠাৎ বিপ্লব এসে প্রাচীন রাশিয়ার সমস্ত সংকল্প ভেস্তে দিল।

নয় শো বছর আগেকার ইউরোপের মানচিত্রে মেগায়ারদের বাসস্থান পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরিকেও দেখতে পাবে, আর পাবে বুলগেরিয়ান এবং সার্বদের রাজ্য। পূর্ব-রোমান-সাম্রাজ্যকে বহুশত্রুপরিবৃত দেখতে পাবে, কিন্তু তবু তখনও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নি। রুশরা একে আক্রমণ করছিল, বুলগেরিয়ানরা এর উপর উপদ্রব করছিল, নরম্যানরা একে উত্ত্যক্ত করে তুলছিল; এদের সবার চেয়ে ভীষণ সেলজুক তুর্কিদের হাতে এখন এর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু এত শত্রুতা আর অসুবিধা সত্ত্বেও এ রাজ্যের পতন হতে আরও চার শো বছর লেগেছিল। কন্স্টান্টিনোপ্‌লের সুদৃঢ় অবস্থান দেখলেই এই অদ্ভুত ব্যাপারের কিছুটা কারণ বোঝা যাবে। এই সুন্দর অবস্থিতির জন্যই একে অধিকার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এর আরও একটা কারণ ছিল, গ্রীকদের আবিষ্কৃত আত্মরক্ষার এক অভিনব উপায়। এটা ছিল 'গ্রীক ফায়ার' নামে একটা জিনিষ, জলের স্পর্শ পেলেই এটা জ্বলে উঠত। এই গ্রীক ফায়ারের সাহায্যেই কন্স্টান্টিনোপ্‌লের অধিবাসীরা আক্রমণকারী সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করে দিত, বস্‌ফরাস পেরিয়ে আসতে চাইলেই তাদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিত।

খৃষ্টীয় হাজার অব্দের শেষে এই ছিল ইউরোপের মানচিত্র। নর্থম্যান বা নরম্যানরা তাদের জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থানে আর মাঝদরিয়ায় জাহাজগুলির উপর উৎপাত এবং লুঠতরাজ করছে, এও দেখতে পাবে। বার বার সফল হয়ে এদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। ফ্রান্সের পশ্চিমে নরম্যাণ্ডিতে তারা অধিষ্ঠিত হয়েছিল, এই ঘাঁটি থেকে তারা ইংলণ্ড জয় করেছিল।

মুসলমানদের কাছ থেকে সিসিলি কেড়ে নিয়ে তার সংগে দক্ষিণ-ইতালি যুক্ত করে তারা সিসিলিয়া নামে একটি রাজ্যেরও পত্তন করেছিল।

মধ্য-ইউরোপে উত্তরসাগর থেকে রোম পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আরামে বিরাজ করছিল পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য, এর অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজ্যের সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন সম্রাট। এই জর্মন-সম্রাট আর রোমের পোপের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে রেষারেষির আর অন্ত ছিল না। কখনও কখনও সম্রাট প্রাধান্য লাভ করতেন, কখনও আবার পোপই প্রধান হয়ে উঠতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে পোপদেরই ক্ষমতা বেড়ে গেল। তাঁদের এক মারাত্মক অস্ত্র ছিল, সমাজচ্যুত করে দেবার ভয় দেখানো, অর্থাৎ তাঁরা যে-কোনো লোককে সমাজ থেকে বের করে তাকে আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন। একজন সম্রাটকে সত্যিসত্যি এতদূর অপদস্থ করা হয়েছিল যে পোপের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য তাঁকে খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে ইতালির কেনোসাতে তাঁর বাড়িতে যেতে হয়েছিল, আর যতক্ষণ পোপ তাকে ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দেন নি ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল!

ইউরোপের দেশগুলি গড়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাদের চেহারা এখনকার চেয়ে অনেক আলাদা, অন্তত জাতিগুলির মধ্যে অনেক প্রভেদ রয়েছে। তারা নিজেদের ফরাসি, ইংরেজ বা জর্মন বলে অভিহিত করত না। বেচারি কৃষকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তারা দেশ অথবা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানত না, তারা শুধু জানত তারা তাদের প্রভুর দাস আর প্রভুর আদেশ তাদের পালন করতেই হবে। অভিজাতদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে শোনা যেত, তাঁরা হচ্ছেন অমুক জায়গার লর্ড (অর্থাৎ সামন্ত রাজা), তাঁদের উপরেও আছেন আবার কোনো বড়ো লর্ড বা স্বয়ং সম্রাট। সারা ইউরোপ জুড়ে এই ছিল সামন্ততন্ত্রের রূপ।

জর্মনি এবং বিশেষভাবে উত্তর-ইতালিতে বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। প্যারিস-শহরও তখন খুব সমৃদ্ধ। এই শহরগুলি ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, আর দেশের ধনদৌলত ওগুলিতেই গিয়ে জমা হ'ত। এই শহরগুলি সামন্তরাজাদের আমল দিত না, উভয়ের মধ্যে সর্বদাই রেষারেষি চলত, শেষ পর্যন্ত ধনদৌলতেরই জিত হল। সামন্তরাজাদের কাছে ধার-দেওয়া টাকা থেকে তারা নানারকম সুবিধা আর ক্ষমতা আদায় করে নিল। কাজেই ধীরে ধীরে নূতন একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠল, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংগে তার খাপ খেত না।

এভাবে দেখতে পাই, ইউরোপের সমাজব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের গঠন-ভেদে কতকগুলি স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং খৃষ্টীয় ধর্মযাজক-সম্প্রদায় বা চার্চ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন এবং অনুগ্রহ দান করলেন। সারা ইউরোপ জুড়ে কোনো জাতীয়তার অনুভূতি ছিল না, কিন্তু বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে এমন একটা অনুভূতি ছিল যে এরই ফলে সমস্ত খৃষ্টান রাজ্যগুলি একতাবদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মযাজক-সম্প্রদায় এই ভাবটি প্রচারে সাহায্য করতে লাগলেন, কারণ এর ফলে এই সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বেড়ে যাবার আর পশ্চিম-ইউরোপের ধর্ম-সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র অধিপতি পোপেরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। এ কথা মনে রাখতে হবে যে রোম কন্স্টান্টিনোপ্ল্ এবং পূর্ব-রোমান-সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে এসেছিল। কন্স্টান্টিনোপ্লে তখন পুরোনো গোঁড়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য, আর রুশদেশও আপনার ধর্ম-ব্যাপারে তারই অনুগত ছিল। কন্স্টান্টিনোপ্লের গ্রীকরা পোপকে আমল দেয় নি।

কিন্তু যখন কন্স্টান্টিনোপ্লের চারি দিক শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে, বিশেষত যখন সেলজুক তুর্কিরা তার আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই বিপদের সময় নিজের গর্ব এবং রোমের প্রতি বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে বিধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে পোপের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। রোমে তখন হিল্‌ডেব্রাণ্ড নামে একজন শক্তিশালী পোপ ছিলেন, পরে তিনিই পোপ সপ্তম গ্রেগরি বলে খ্যাত হন। বরফের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে গর্বিত জর্মন-সম্রাটকে কেনোসাতে এঁরই কাছে যেতে হয়েছিল।

আর-একটি ঘটনাতেও তখন খৃষ্ট-ইউরোপের চিন্তাধারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান বিশ্বাস করতেন যে খৃষ্টের জন্মের এক Millennium (হাজার বছর) পরে

পৃথিবীর শেষ হয়ে যাবে। Millennium (মিলেনিয়াম্) কথার মানে হল—হাজার বছর। কথাটি লাতিন শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। Mille অর্থ হাজার, আর annus মানে বছর। এক Millennium পরে পৃথিবীর শেষ হয়ে যাবে ধারণা ছিল বলেই, কথাটির অর্থ হয়ে দাঁড়াল—ভালোর দিকে পৃথিবীর আকস্মিক পরিবর্তন। তোমাকে বলেছি, ইউরোপের তখন চরম দুরবস্থা, Millennium এর আশা অনেক দুর্গতদের মনে সান্ত্বনা এনে দিত। পৃথিবীর শেষ সময়ে পবিত্র ভূমিতে থাকবে বলে অনেকে জমিজমা বিক্রি করে প্যালেস্টাইনে পাড়ি দিল।

কিন্তু পৃথিবীর শেষ দিন আর এল না। যে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী জেরুজালেমে গিয়েছিল তুর্কি'রা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার আর উৎপীড়ন করতে লাগল। তারা ক্রোধ আর অপমানের বোঝা নিয়ে ইউরোপে ফিরে এল এবং পবিত্র ভূমিতে তাদের দুর্দশার কাহিনী সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র নগরী জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য বিশেষভাবে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন তপস্বী পিটার নামে দণ্ডধারী এক বিখ্যাত তীর্থযাত্রী। খৃষ্টান-সমাজের মধ্যে ক্রোধ আর উৎসাহের মাত্রা বেড়েই চলেছে দেখে পোপ ঠিক করলেন, তিনিই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করবেন।

ঠিক এই সময়েই জেরুজালেম থেকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন এল। সারা খৃষ্টান-সমাজ, রোমান এবং গ্রীক, উভয়েই যেন তুর্কিদের অগ্রগমনে বাধা দেবার জন্য মিলিত হয়ে দাঁড়াল। ১০৯৫ অব্দে নিখিল খৃষ্টীয় ধর্মযাজক-সম্প্রদায় পবিত্র জেরুজালেম-নগরী উদ্ধার করবার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার সংকল্প করল। এমনি করেই ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের, বাঁকা চাঁদের বিরুদ্ধে ক্রুশের যুদ্ধ বা ক্রুসেডের সূত্রপাত হল।

৫৮

ইউরেশীয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

১২ই জুন, ১৯৩২

সারা পৃথিবীটাকে আমাদের সংক্ষেপে দেখা হয়ে গেছে—খৃষ্টের হাজার বছর পরেকার এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কিছুটা আমরা দেখেছি। তবু আর-একবার দেখা যাক।

এশিয়া। ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের পুরোনো সভ্যতা তখনও নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির পথে। মালয়েশিয়া এবং কম্বোডিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে প'ড়ে সেখানে প্রচুর ফল ফলিয়েছে। চীনদেশের সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে কোরিয়া, জাপান এবং আংশিকভাবে মালয়েশিয়াতে। এশিয়ার পশ্চিমভাগে আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতে আরবীয় সভ্যতার আধিপত্য; পারশ্যদেশে পুরোনো পারশিক সভ্যতার সঙ্গে নবতর আরবীয় সভ্যতার মিলন ঘটেছে। মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি দেশ এই মিশ্রিত আরব্য-পারশিক সভ্যতাকে গ্রহণ করে লালন করছে, তার উপর পড়েছে ভারতবর্ষ এবং চীনদেশেরও কিছু প্রভাব। এই সবগুলি দেশেরই সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরের, তাদের বাণিজ্য, শিল্পও উন্নত হয়ে উঠছিল। চার দিকে বড়ো বড়ো শহর, বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে দূরদূরান্তর থেকে শিক্ষার্থীরা আসত পড়তে। মঙ্গোলিয়া, মধ্য-এশিয়ার কোনো কোনো অংশ আর সাইবেরিয়াতে শুধু বিরাজ করছিল নিম্নস্তরের সভ্যতা।

এবার ইউরোপ। এশিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলির তুলনায় ইউরোপ তখন অনুন্নত এবং অর্ধসভ্য। পুরোনো গ্রীক-রোমক সভ্যতা শুধু সুদূর অতীতের স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার শিক্ষার মূল্য গেছে কমে, শিল্পের নিদর্শনও তেমন-কিছু নেই, বাণিজ্যে সে এশিয়ার বহু পিছনে পড়ে আছে। দুটি জায়গায় মাত্র দেখা যাচ্ছিল আলোর রেখা। আরবদের অধীনে স্পেন আরব-সভ্যতার গৌরবের দিনগুলির উত্তরাধিকার বহন করছিল; আর, এশিয়া ও ইউরোপের সীমারেখায়

দাঁড়িয়ে ছিল কনস্টান্টিনোপল্। তারও গৌরব ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছিল, কিন্তু তবু তখনও সে বৃহৎ এবং জনবহুল নগরীর মর্যাদা হারায় নি। ইউরোপের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে অব্যবস্থা চলেছে, প্রচলিত সামন্ততন্ত্রের ফলে নাইট এবং লর্ডরা যেন নিজেদের অধিকারের মধ্যে এক-একজন ছোটোখাটো রাজা। প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম এক সময়ে একটি গ্রামের মতোই ছোটো হয়ে পড়েছিল, পুরোনো কলোসিয়া হয়ে উঠেছিল বন্যজন্তুদের বাসস্থান। এখন অবিশ্যি আবার তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল।

কাজেই খৃষ্টের হাজার বছর পরে এশিয়া এবং ইউরোপ দুটি মহাদেশের তুলনা করলে দেখতে, এশিয়াই অনেক এগিয়ে আছে।

এসো, আর-একবার তাকিয়ে জিনিষটাকে তলিয়ে দেখি। দেখতে পাবে, আপাতদৃষ্টিতে এশিয়াকে যতটা ভালো মনে হচ্ছে ততটা ভালো সে নেই। প্রাচীন সভ্যতার দুই ধাত্রী ভারতবর্ষ ও চীনদেশ বিপদগ্রস্ত। শুধু বাইরের শত্রুর আক্রমণই তাদের বিপদের কারণ নয়, এ বিপদ আরও বাস্তব। এটা তাদের জীবনীশক্তি এবং বীর্য শুষে নিচ্ছিল। পশ্চিমে আরবদের গৌরবের দিনও শেষ হয়ে এসেছে। সেলজুকরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিল সত্য, কিন্তু তাদের এই উন্নতি কেবলমাত্র যুদ্ধোদ্যমেরই ফল। ভারতবর্ষ, চীন, পারশ্য অথবা আরবের মতো তারা এশিয়ার সংস্কৃতির প্রতিনিধি নয়, তারা যেন এশিয়ার সমরপ্রতিভা। এশিয়ার সব জায়গায় প্রাচীন সুসভ্য জাতিদের উদ্যম যেন মিইয়ে আসছে। তারা নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে শুধু আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। নূতন উদ্যম নিয়ে যে নূতন শক্তিশালী জাতিদের অভ্যুত্থান হচ্ছিল, তারা এশিয়ার এই প্রাচীন জাতিদের জয় করেছে, ইউরোপও তাদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত। কিন্তু তাদের নেই সভ্যতার কোনো নূতন উপাদান বা সংস্কৃতির কোনো নূতন প্রেরণা। পুরোনো জাতিগুলি এই বিজয়ীদের সুসভ্য করে ধীরে ধীরে তাদের আত্মসাৎ করে নিল।

কাজেই এশিয়ার বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। প্রাচীন সভ্যতার গতি তখনও একেবারে শেষ হয় নি। সুকুমার-কলার উন্নতি হচ্ছে, বিলাসিতার মধ্যে তখনও সূক্ষ্ম রুচিবোধ বর্তমান, কিন্তু সব সভ্যতারই নাড়ি যেন দুর্বল হয়ে এসেছে, তাদের প্রাণস্পন্দন ধীরে ধীরে আসছে থেমে। তারা বেঁচে থাকবে অনেকদিন। মঙ্গোলদের আগমনের ফলে শুধু আরবে এবং মধ্য-এশিয়ায় ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার গতিতে সত্যিকার ছেদ পড়ে নি, বা কোথাও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় নি। চীন এবং ভারতবর্ষে এই সভ্যতা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে শেষে প্রাণহীন ছবির মতো শুধু দূর থেকেই চোখকে টানছিল; কাছে এলে দেখতে পাবে, তাতে উই ধরেছে।

সাম্রাজ্যের মতোই সভ্যতারও পতনের কারণ বাইরের শত্রুর আক্রমণ ততটা নয়, যতটা তার নিজের দুর্বলতা এবং আভ্যন্তরীণ অবনতি। বর্বরদের আক্রমণে রোমের পতন হয়েছিল, এ কথা বলা চলে না। সে মরেই ছিল, তারা উৎখাত করেছিল শুধু সেই মৃতদেহটিকে। রোমের প্রাণস্পন্দন তার অঙ্গচ্ছেদের আগেই থেমে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ, চীনদেশ এবং আরবের বেলায়ও আমরা এই রীতিরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। আরবসভ্যতা যে হঠাৎ গড়ে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই আবার ভেঙে পড়ল। ভারতবর্ষ এবং চীনে এই পতনের ঠিক ঠিক সময় নির্দেশ করা কঠিন, এ পতন ঘটেছে অনেকদিন ধরে।

এর সূচনা হয়েছিল গজনির মাহ্মুদ ভারতবর্ষে আসারও অনেক আগে। লক্ষ্য করে দেখলেই ভারতবাসীর মানসিক পরিবর্তন ধরা পড়ে। নূতন ভাব এবং বিষয় সৃষ্টি না করে তারা পুরোনোর পুনরাবৃত্তি এবং অনুকরণেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মন তখনও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির অধিকারী, তবু বহুদিন পূর্বে যেসব কথা বলা বা লেখা হয়ে গেছে তার টীকা এবং ব্যাখ্যা -রচনায়ই তারা মত্ত হয়ে ছিল। তখনও তারা অপূর্ব ভাস্কর্য এবং খোদাইয়ের কাজ করতে পারে, কিন্তু তাদের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও অলঙ্করণে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, এবং তার মধ্যে প্রায়ই অস্বাভাবিকতার স্পর্শ দেখা দিচ্ছে। তার মধ্যে মৌলিকতা নেই, আর নেই সবল এবং উন্নত পরিকল্পনা। মার্জিত-রুচি লালিত্য, শিল্প এবং বিলাসিতা ধনী এবং সংগতিপন্নদের মধ্যে তখনও প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু সমগ্রভাবে দেশবাসীর দুঃখদারিদ্র্য লাঘব বা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াবার কোনো চেষ্টাই নেই।

এ সমস্তই অস্তগামী সভ্যতার নির্দশন। এগুলি দেখা দিলে নিশ্চিত বুঝতে হবে সভ্যতার প্রাণশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে, কারণ, অনুবৃত্তি বা অনুকরণে প্রাণের লক্ষণ নেই, আছে নূতন সৃষ্টিতে।

এরকম ধরনের প্রক্রিয়াগুলি তখন ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভুল বুঝো না। এর জন্য চীনদেশ বা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল অথবা তারা আবার অসভ্য হয়ে উঠেছিল, এ কথা আমি বলছি না। আমি শুধু বলতে চাই, চীনদেশ এবং ভারতবর্ষ অতীতে যে সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করেছে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে আসছিল, কিন্তু তার মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিল না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এই শক্তি খাপ খাওয়াতে পারছিল না, শুধু নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে চলছিল। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক সভ্যতার জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটে। কখনও আসে সৃষ্টির বিরাট প্রেরণা আর বিকাশ, কখনও আবার দেখা দেয় শ্রান্তি ও অবসাদের মুহূর্ত। চীনদেশ এবং ভারতবর্ষের বেলায় এই শ্রান্তিজনিত অবসাদ অনেক দেরিতে এসেছিল এটাই অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, আর তবু পরিপূর্ণ অবসাদ এদের কোনোদিনই আসে নি।

ইসলাম মানবজাতির পক্ষে এক নূতন উন্নতির প্রেরণা নিয়ে ভারতবর্ষে এল। এর ফল হল যেন পুষ্টিকারক ওষুধের মতো। ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্পন্দন জেগে উঠল। কিন্তু এই ফল যত ভালো হতে পারত তত ভালো হয় নি দুটি কারণে। এটা এসেছিল ভুল পথ ধরে, আর এসেছিল অনেক দেরিতে। কারণ, গজনির মাহ্‌মুদের আক্রমণের শত শত বৎসর আগে থেকেই মুসলমান-ধর্মপ্রচারকের দল ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়িয়েছেন, অভিনন্দনও পেয়েছেন। তাঁরা শান্তির পথে এসেছিলেন বলে কিছু পরিমাণে সফলতাও অর্জন করেছিলেন। ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ ছিল না বললেই হয়। তার পর মাহ্‌মুদ এলেন আগুন এবং তরবারি নিয়ে বিজেতা এবং লুণ্ঠনকারী ঘাতকের রূপে। এতে ভারতবর্ষে ইসলামের সুনাম যেরকম ক্ষুণ্ণ হল, আর কিছুতেই তা হতে পারত না। তিনি অবশ্য অন্যান্য বড়ো অভিযানকারীদের মতো হত্যা এবং লুণ্ঠন করতেই এসেছিলেন, ধর্মের জন্য তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু বহুদিন ধরে তাঁর অভিযানগুলি ভারতবর্ষে ইসলামধর্মকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। তাই অন্য সময়ের মতো নিরপেক্ষভাবে এই ধর্মকে বিচার করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এটা একটা কারণ। এর অন্য কারণ, এটা যথাসময়ে আসতে পারে নি। এ ধর্ম যখন এখানে এল তখন তার সূচনার পর প্রায় চার শো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার কিছু শক্তিক্ষয় হয়েছে, তার সৃষ্টির ক্ষমতাও গেছে অনেক কমে। ইসলামধর্মের প্রথম যুগে যদি আরবরা একে নিয়ে ভারতবর্ষে আসতেন তা হলে উদীয়মান আরব-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের সভ্যতার মিলনে এবং পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ায় এক বিরাট ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। দুটি সুসভ্য জাতি তা হলে একত্র মিলিত হতে পারত, কারণ ধর্মসম্বন্ধে সহিষ্ণু এবং যুক্তিবাদী বলে আরবদের খ্যাতি ছিল। সত্যি সত্যি এক সময়ে খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় বোগদাদে একটি সভারও সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে সকল ধর্মের লোক, ধর্মে যাদের আস্থা নেই তাদের সঙ্গে মিলে যুক্তিবাদের দিক থেকে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিতর্ক করতেন।

কিন্তু আরবরা কখনও খাস ভারতবর্ষে আসে নি। তারা সিন্ধু পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছিল, ভারতবর্ষের উপর তাদের কোনো প্রভাব পড়ে নি। ইসলাম ভারতবর্ষে এল তুর্কি এবং অন্য অনেকের মধ্যস্থতায়, আরবদের মতো তাদের পরধর্মসহিষ্ণুতা বা সংস্কৃতি কিছুই ছিল না, তারা ছিল শুধু যোদ্ধা।

তবুও ইসলামের সঙ্গে উন্নতি এবং সৃষ্টির একটা প্রেরণা ভারতবর্ষে এসেছিল। এ প্রেরণা কী করে ভারতবর্ষে নূতন প্রাণের সঞ্চার করল, আর তার পরিণতিই বা কী হল, সেটা আমরা পরে বিচার করব।

ভারতীয় সভ্যতার যে শক্তি কমে আসছিল তার আর-একটা প্রমাণ এবারে পাওয়া গেল। যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হল তখন ভারতবর্ষ এই জোয়ারের মুখে আত্মরক্ষার জন্য নিজের চার দিকে একটি খোলস তৈরি করে প্রায় বন্দীদশা মেনে নিল। এটাও দুর্বলতা এবং ভয়ের লক্ষণ; উপশমের চেষ্টা করতে গিয়ে এ রোগ বেড়েই চলল। গতিহীন শ্লথ অবস্থাই এ রোগের কারণ, বিদেশীর

আক্রমণ নয়। স্বতন্ত্র হয়ে থাকার জন্যই এই গতিহীনতা আরও বাড়ল এবং বিকাশের সব পথই বন্ধ হয়ে গেল। পরে দেখতে পাবে, চীনদেশ এমনকি জাপানও নিজের নিয়মে এই একই পথে চলেছিল। খোলসের মতো বন্ধ সমাজে বাস করলে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর; আড়ষ্ট ভাব আমাদের ঘিরে ধরে; মুক্ত হাওয়া এবং সজীব ভাবধারাতে আমরা অনভ্যস্ত হয়ে পড়ি। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সমাজ-জীবনেও তেমনি, মুক্ত হাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

এশিয়া সম্বন্ধে এটুকুই। ইউরোপ এ সময় অনুন্নত এবং বিবাদে রত ছিল দেখেছি। কিন্তু এই অব্যবস্থা এবং অসংগতির পিছনে অন্তত বীর্য এবং জীবনীশক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। বহুদিন প্রবল থাকার পর এশিয়ার অবনতি ঘটছিল, ইউরোপ প্রাণপণ চেষ্টা করছিল উন্নত হয়ে ওঠবার জন্য। কিন্তু এশিয়ার কাছাকাছি আসতেও তখন তার অনেক বাকি।

আজকের ইউরোপই প্রবল, আর এশিয়া স্বাধীনতালাভের জন্য দুঃখময় সাধনা করছে। কিন্তু তবু আর-একবার গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাবে, এশিয়াতে নূতন শক্তি, নূতন সৃষ্টির প্রেরণা এবং নূতন জীবনের সঞ্চার হয়েছে। এশিয়া নিঃসন্দেহে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। আর ইউরোপে, প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম-ইউরোপে, সমস্ত মহিমা সত্ত্বেও অধোগতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। ইউরোপকে ধ্বংস করে দেবার শক্তি রাখে এমন কোনো বর্বর জাতি আজকে নেই। কিন্তু সময় সময় সুসভ্য জাতিরাও বর্বরের মতো ব্যবহার করে, আর তাতে করে একটা সভ্যতা ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে।

ভৌগোলিক পরিভাষায় আমি এশিয়া ইউরোপ ইত্যাদি বলছি, কিন্তু আমাদের সামনে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলি কেবল এশিয়া অথবা ইউরোপের নয়, সেগুলি সারা জগতের এবং সর্বমানবের সমস্যা; আর সারা জগতের কল্যাণের জন্য আমরা যদি এগুলির সমাধান না করি তা হলে বিপদ থামবে না। সর্বত্র দুঃখদারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারলেই শুধু এ সমস্যার সমাধান হবে। অনেক সময় হয়তো লাগবে, তবু এটাই আমাদের লক্ষ্য, এর চেয়ে কম কিছুতে আমরা সন্তুষ্ট হব না, এটা যখন ঘটবে তখনই আমরা সাম্যের ভিত্তিতে প্রকৃত সংস্কৃতি এবং সভ্যতার অধিকারী হব। সে সভ্যতায় কোনো দেশ বা সম্প্রদায়ের শোষণনীতি থাকবে না, সে সমাজ হবে গঠনমূলক এবং বর্ধিষ্ণু, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সংগে সে মানিয়ে চলবে, তার নির্ভর হবে প্রত্যেক সভ্যের সহযোগিতার উপর। শেষ পর্যন্ত এ ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। প্রাচীন সভ্যতার মতো এ সভ্যতার ধ্বংস হবার বা ক্ষয় পাবার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার সময় মনে রাখতে হবে, নিজের এবং অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা নিয়ে সর্বমানবের স্বাধীনতাই হল আমাদের মহান লক্ষ্য।

৫৯

আমেরিকার মায়া-সভ্যতা

১৩ই জুন, ১৯৩২

এই চিঠিগুলিতে আমি পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করছি। কিন্তু এটা হয়ে উঠেছে যেন এশিয়া, ইউরোপ আর উত্তর-আফ্রিকার ইতিহাস। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে অতি সামান্যই বলেছি, কিছু বলি নি বললেই চলে। এই প্রাচীন যুগে আমেরিকায় যে একটি সভ্যতা ছিল এ কথা অবশ্য তোমাকে বলা হয়েছে। এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি, এর সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও খুবই অল্প। তবু এখানে কিছু বলবার লোভ সামলাতে পারছি না, কারণ তা না হলে তুমি একটি সাধারণ ভুল করে বসবে; হয়তো ভাববে, কলম্বস এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা যাবার আগে আমেরিকা বর্বর দেশের শামিল ছিল।

প্রাচীনকালে, সম্ভবত প্রস্তরযুগে, যখন মানুষ কোথাও বসতি স্থাপন করে নি, শুধু যাযাবরবৃত্তি আর শিকারই যখন তাদের একমাত্র কাজ, তখন এশিয়া আর উত্তর-আমেরিকার মধ্যে একটি স্থলপথের সংযোগ ছিল। আলাস্কার উপর দিয়ে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী নিশ্চয়ই এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গিয়েছে। পরে এই সংযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আমেরিকার লোকেরা তখন নিজেদের সভ্যতা নিজেরাই ধীরে ধীরে গড়ে তুলল। মনে রেখো, আমরা যতদূর জানি, সে সভ্যতার সঙ্গে এশিয়া অথবা ইউরোপের যোগসূত্র পাওয়া যায় নি। পঞ্চম শতাব্দীর এক চীনদেশীয় সন্ন্যাসীর কাহিনী তোমাকে বলেছি। তিনি বলেছিলেন, চীনের অনেক পূর্বে একটি দেশ তিনি দেখে এসেছেন। এটা হয়তো মেক্সিকো। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তথাকথিত নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এ ছাড়া আর কোনো কার্যকরী সংযোগের বিবরণ পাওয়া যায় নি। আমেরিকার এই জগৎটি যেন একটি সুদূর এবং ভিন্ন জগৎ, ইউরোপ এবং এশিয়ার কোনো ঘটনাই এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি। মনে হয়, মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা এবং পেরুতে এই সভ্যতার তিনটি কেন্দ্র ছিল। কখন এর পত্তন হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই, তবে মেক্সিকোর বছর গোনা আরম্ভ হয়েছে ৬১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের কোনো সময় থেকে। খৃষ্টীয় যুগের সূচনা থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং তার পরে অনেকগুলি শহর উঠছে দেখতে পাই। পাথরের কাজ, মৃৎশিল্প, বয়ন এবং সূক্ষ্ম রঙের কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। তামা এবং সোনার ব্যবহার ছিল প্রচুর, কিন্তু ছিল না লোহা। এদের স্থাপত্য উন্নতধরনের ছিল, নগরগুলি নির্মাণচাতুর্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। একটা জটিলধরনের বিশেষ লিপিও তাদের ছিল। চিত্রশিল্প, বিশেষ করে ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রচুর, তাদের সৌন্দর্যও নেহাত কম ছিল না।

সভ্যতার এই কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটির কয়েকটি করে রাষ্ট্র ছিল। কতকগুলি ভাষা এবং প্রচুর সাহিত্যও তাদের ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল সুনিয়মিত এবং শক্তিশালী, শহরগুলিতে সংস্কৃতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা বাস করতেন। এই রাষ্ট্রগুলির আইন এবং রাজস্বব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নতধরনের ছিল। ৯৬০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উক্সমল্ শহরের পত্তন হয়; শোনা যায়, অল্পদিনের মধ্যেই এটি মহানগরীতে পরিণত হয়েছিল। তখনকার এশিয়ার বড়ো বড়ো শহরের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারত। এ ছাড়া লাবুয়া, মায়াপান, চাওমুলতান প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো শহরও ছিল।

মধ্য-আমেরিকার তিনটি প্রধান রাষ্ট্র মিলে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করেছিল, তাকে এখন 'মায়াপানের লীগ' বলা হয়। এটা হবে খৃষ্টজন্মের ঠিক এক হাজার বছর পরে। এশিয়া ও ইউরোপের বেলায়ও আমরা এ যুগে এসে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং খৃষ্টের এক হাজার বছর পরে মধ্য-আমেরিকাতে সুসভ্য এবং শক্তিশালী একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু এসকল রাষ্ট্র, এমনকি মায়া-সভ্যতাটাই, পুরোহিত-প্রধান ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ব'লে সম্মান পেত জ্যোতির্বিদ্যা। পুরোহিতরা এই বিজ্ঞান জানত, তাই সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারত। ভারতবর্ষেও ঠিক এমনি করেই হাজার হাজার লোককে চন্দ্র এবং সূর্য -গ্রহণের সময় স্নান করতে প্রবৃত্ত করা হয়।

মায়াপানের লীগ এক শো বছরেরও বেশি কাল স্থায়ী হয়েছিল। তার পর হয়তো ওখানে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে, সেই সুযোগে প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদেশী শক্তি এসে ঢুকে পড়ল। ১১৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মায়াপানের লীগ ধ্বংস হয়ে গেল। অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরগুলি অবশ্য তখনও ছিল। আরও এক শো বছরের মধ্যে আর-একটি জাতির আবির্ভাব হল, তারা মেক্সিকোর আজ্‌টেক। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তারা মায়াদেশ জয় করে নেয়, আর প্রায় ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে টেনক্‌টিটলান শহরের পত্তন করে। অল্পদিনের মধ্যে অগণিত লোক এসে এখানে জমা হল, এটা হয়ে দাঁড়াল মেক্সিকান জগতের রাজধানী আর আজ্‌টেক-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল।

আজ্‌টেকরা ছিল সামরিক জাতি। তাদের সামরিক উপনিবেশ ও দুর্গরক্ষী সৈন্যদল ছিল আর সৈন্য-চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করে তারা দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছিল। ধূর্তও তারা কম ছিল না, অধীন রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে নাকি তারা ঝগড়া বাধিয়ে দিত। সকল সাম্রাজ্যেরই

মায়া সভ্যতা
য়ুকাটান
মায়াপান
উক্সমল
টেনোক্‌টিট্‌লান
আজটেক
মায়া
মেক্সিকো
গুয়াটেমালা
দঃ আমেরিকা
প্রাচীন নগর
ও মন্দিরের অবস্থান.... x

এটা একটা পুরোনো পদ্ধতি। রোমে এই নীতিটিকে বলা হত Divide et impera—অর্থাৎ সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য বিভিন্ন দলে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজন।

অন্যান্য বিষয়ে আজ্‌টেক্‌দের যতই ধূর্ততা থাক্‌, এরাও ছিল পুরোহিত-প্রধান; এমনকি এরা আরও খারাপই ছিল বলতে হবে। এদের ধর্মে নরবলির প্রচলন ছিল। এরকমভাবে অত্যন্ত বীভৎস উপায়ে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার মানুষের প্রাণ হরণ করা হত।

প্রায় দু শো বছর আজ্‌টেকরা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছিল, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-রাজত্বের মতোই, রাজ্যের মধ্যে বাইরের নিরাপত্তা এবং শান্তি ছিল! কিন্তু প্রজাদের নির্দয়ভাবে শোষণ করে তাদের সকলরকমে দরিদ্র করে তোলা হয়েছিল। এরকম গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত কোনো রাষ্ট্রই স্থায়ী হতে পারে না। আর ঘটলও তাই। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৫১৯ অব্দে যখন নাকি মনে হচ্ছিল আজ্‌টেকরা উন্নতির শীর্ষে তখনই একদল অভিযানকারী দস্যুর আক্রমণে সমস্ত রাজ্যটি হুড়্‌মুড়্‌ করে ভেঙে পড়ল। কোনো সাম্রাজ্যপতনের এর চেয়ে বিস্ময়কর নিদর্শন আর বেশি পাবে না। হারনেন কর্‌টেস নামে একজন স্পেনদেশীয় অল্প-কিছু সৈন্য নিয়ে এ কাজ করেছিলেন। ঘোড়া আর বন্দুক এ দুটো জিনিষ তাঁর সহায় হয়েছিল। অনুমান করা যায়, মেক্সিকোতে তখন ঘোড়া ছিল না, আর বন্দুক তো ছিলই না। কিন্তু আজ্‌টেক-সাম্রাজ্যের ভিতরে ভিতরে যদি ঘুণ ধরে না যেত তবে করটেসের সাহস অথবা ঘোড়া এবং বন্দুক কিছুতেই কিছু হত না। এর ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গিয়েছিল, বাইরের চেহারাটাই শুধু টিঁকে ছিল। অল্প আঘাতেই তাই তার পতন সম্ভব হয়েছিল। এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল শোষণনীতির উপর, প্রজারা ছিল এর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। যখন বাইরে থেকে আক্রমণ হল তখন প্রজাসাধারণ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপদে আনন্দিতই হয়েছিল। এরকম অবস্থায় সমাজবিপ্লব ঘটা খুবই স্বাভাবিক, এখানেও তাই ঘটেছিল।

প্রথমবার করটেসের আক্রমণ রুখে দেওয়া হয়েছিল, তিনি শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার ফিরে গিয়ে সেখানকার কয়েকজন অধিবাসীর সাহায্যে রাজ্যটি জয় করে ফেললেন। তাঁর হাতে শুধু আজ্‌টেক-সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছিল এমন নয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেক্সিকান সভ্যতাও ভেঙে পড়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রধান শহর বিরাট টেনক্‌টিটলান নগরীরও আর কোনো চিহ্নই রইল না। এর একটি পাথরও আর অবশিষ্ট নেই, যেখানে এ নগরী ছিল সেখানে স্পেনদেশীয়রা একটি গির্জা তৈরি করেছে। মায়ার অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরগুলিও টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল; য়ুকাটানের বন ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে এদের গ্রাস করে নিল। এখন ওগুলোর নাম পর্যন্ত লোকে ভুলে গেছে, কোনো-কোনোটির নাম কাছাকাছি কোনো গ্রামের নামের মধ্যে বেঁচে আছে। এদের সমস্ত সাহিত্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তিনটি মাত্র বই এখনও রয়েছে; এগুলিও আবার এখন পর্যন্ত কেউ পড়তে পারে নি!

প্রায় পনেরো শো বছর ধরে যে জাতি বেঁচে ছিল, ইউরোপ থেকে আগত নূতন জাতির সংস্পর্শে সে প্রাচীন জাতি ও তাদের পুরোনো সভ্যতা কী করে লুপ্ত হয়ে গেল তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। মনে হয়, যেন এই সংস্পর্শটি ব্যাধির মতো অথবা নূতন কোনো মহামারীর মতো তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। কোনো কোনো দিক থেকে তাদের সভ্যতা উন্নত-ধরনের হলেও, কতকগুলি ব্যাপারে তারা আবার অত্যন্ত পিছিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের একটি বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

দক্ষিণ-আমেরিকার সভ্যতার আর-একটি কেন্দ্র ছিল পেরুতে, সেখানে ইন্‌কার রাজত্ব ছিল। এ রাজার দেবত্বে লোকের বিশ্বাস ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পেরুর সভ্যতা অন্তত শেষ সময়ে মেক্সিকান সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশি ছিল না। তবু তারা পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই জানত না। অনেক বিষয়ে তারা যে অনেক পেছিয়ে ছিল এটাই তার একটা প্রমাণ। মেক্সিকোতে কর্‌টেসের সাফল্যলাভের কিছুদিন পরেই আর-একজন স্পেন-দেশীয় লোক পেরুর রাজ্যটিকেও নষ্ট করে দেন। এঁর নাম পিজারো। ইনি ওখানে গিয়েছিলেন ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে। বিশ্বাসঘাতকতা করে ইনি ইন্‌কাকে বন্দী করেন। দেবস্বরূপ রাজাকে বন্দী

করাতে সমস্ত প্রজারা ভয় পেয়ে গেল। পিজারো কিছুকাল ইন্‌কার নামে রাজত্ব করতে চেষ্টা করলেন, প্রচুর ধনসম্পত্তিও জবরদস্তি করে আদায় করলেন, কিন্তু শেষকালে ছলনা ধরা পড়ে গেল। স্পেনদেশীয়রা পেরুকে তাদের অধিকারভুক্ত করে নিল।

টেনক্‌টিটলান শহরের বিরাটত্ব দেখে কর্‌টেস প্রথমে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, ইউরোপে এর জুড়ি তিনি কখনও দেখেন নি।

মায়া এবং পেরু -সভ্যতার বহু ভগ্নাবশেষ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে; আমেরিকার যাদুঘরগুলিতে, বিশেষ করে মেক্সিকোতে, সেগুলি দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পে তাদের একটি সুন্দর ঐতিহ্য রয়েছে। পেরুর সোনার কাজ নাকি অপূর্ব। কতকগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শন, বিশেষ করে কতকগুলি পাথরের তৈরি সাপ পাওয়া গেছে, সেগুলির কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কতকগুলি কাজ আবার ভীতিপ্রদ করেই তৈরি বলে মনে হয়, আর সেগুলি দেখলে সত্যি সত্যি ভয় হয়!

৬০

প্রাচীন মহেঞ্জোদারোর কথা

১৪ই জুন, ১৯৩২

মহেঞ্জোদারো এবং সিন্ধু-উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছুদিন ধরে পড়ছি। একটি নূতন বই বেরিয়েছে, অত্যন্ত মূল্যবান। তার মধ্যে এর বর্ণনা এবং এর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা-কিছু জানা গিয়েছে, সমস্তই আছে। ওখানকার খনন-কাজের ভার যাঁদের উপর তাঁরাই এ বইটি সংকলন করেছেন। তাঁরা একটু একটু করে খনন করেছেন আর দেখেছেন ধরিত্রী-মা'র ভিতর থেকে একে বেরিয়ে আসতে। আমি ওই বইটি এখনও দেখি নি। এখানে ওটা পেলে হত। কিন্তু আমি ওটার একটা সমালোচনা পড়েছি। সেটাতে ওই বইয়ের যে অংশগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি তুমি আর আমি মিলে পড়ব। বড়ো আশ্চর্য এই সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা, এর সম্বন্ধে যতই জানা যায় ততই অভিভূত হয়ে যেতে হয়। তাই পুরোনো ইতিহাসের বর্ণনায় কিছুক্ষণের জন্য ছেদ টেনে এ চিঠিতে যদি আমরা এক লাফে পাঁচ হাজার বছর আগে চলে যাই, তুমি কিছু মনে করবে না, আশা করি।

মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা নাকি অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। কিন্তু যে মহেঞ্জোদারোকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা একটা সুন্দর শহর এবং রুচিসম্পন্ন সুসভ্য লোকের বাসস্থান। অনেকদিনের বিকাশের ফলেই এরকম হওয়া সম্ভব। ও বইটাতে এ কথা বলা হয়েছে। খনন-কার্যের তত্ত্বাবধান করছেন সার জন মার্শাল। তিনি বলেছেন, "মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার সভ্যতার যেটুকু পরিচয় এযাবৎ পাওয়া গেছে তা থেকে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ওটা সে সভ্যতার প্রথম যুগ নয়; ওটা তখনই যথেষ্ট প্রাচীন, ভারতের মাটিতে তার স্থায়ী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার পিছনে রয়েছে মানুষের হাজার হাজার বছরের প্রয়াস। সুতরাং এখন থেকে পারশ্য, মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের সংগে ভারতবর্ষকেও সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র বলে গণনা করতে হবে।"

হরপ্পা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি নি বোধ হয়। মহেঞ্জোদারোর মতো এখানেও প্রাচীন যুগের অনেক ধ্বংসাবশেষ খনন করে পাওয়া গেছে। এ জায়গাটা পাঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, সিন্ধু-উপত্যকা আমাদের শুধু পাঁচ হাজার বছর নয়, আরও হাজার হাজার বছর আগে নিয়ে যায়; শেষে আমরা হারিয়ে যাই সেই পুরোনো যুগে, যে যুগে মানুষ কোথাও বসতি স্থাপন করে নি।

মহেঞ্জোদারো যখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তখনও আর্যরা ভারতবর্ষে আসেন নি, তবু এ বিষয়ে

কোনো সন্দেহ নেই যে তখন "ভারতের অন্যান্য অংশে না হলেও পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতে নিজস্ব একটি উন্নত এবং অনেকটা একই ধরনের সভ্যতা ছিল। সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের সভ্যতার সঙ্গে এর খুব মিল দেখা যায়; কোনো কোনো বিষয়ে এটা শ্রেষ্ঠও ছিল।"

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতে খনন করে এই অপূর্ব সভ্যতার কথা জানতে পারা গিয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় হয়তো আরও কত জিনিষ মাটি-চাপা পড়ে আছে। এ সভ্যতা শুধু মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না; হয়তো আরও অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দুটো জায়গার দূরত্বও কম নয়।

সে যুগে "পাথরের এবং তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র এবং তৈজসপত্র একই সঙ্গে ব্যবহৃত হত।" সমসাময়িক মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার লোকদের থেকে সিন্ধু-উপত্যকার লোকেরা কী কী বিষয়ে আলাদা এবং শ্রেষ্ঠ সে কথা স্যর জন মার্শাল বলেছেন। তিনি বলেন, "কয়েকটি মাত্র প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয়, বস্ত্রবয়নের জন্য তুলার ব্যবহার সে সময়ে একমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল, আরও দু তিন হাজার বছর পরে এটা পাশ্চাত্য জগতে প্রসার লাভ করে। তা ছাড়া, মহেঞ্জোদারোর সুনির্মিত স্নানাগার এবং নাগরিকদের প্রশস্ত বাসগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কিছু প্রাগৈতিহাসিক মিশর, মেসোপটেমিয়া অথবা এশিয়ার পশ্চিমভাগের কোনো স্থানে ছিল না। সেসব দেশে সুদৃশ্য দেবমন্দির, প্রাসাদ এবং রাজকীয় সমাধি তৈরির জন্য বহু অর্থ এবং চিন্তার অপব্যয় করা হত কিন্তু বাকি লোকদের নিশ্চয়ই নগণ্য মাটির ঘরে বাস করে সন্তুষ্ট থাকতে হত। সিন্ধু-উপত্যকার চিত্র অন্যরকম, শহরবাসীদের সুবিধার জন্যই সবচেয়ে সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলি তৈরি হত।"

তিনি আরও বলেছেন যে, "সিন্ধু-উপত্যকার শিল্প এবং ধর্মও একই রকম বিশিষ্টতাসম্পন্ন; এসবের মধ্যেও তাদের নিজস্ব ছাপ রয়েছে। ভেড়া কুকুর এবং অন্যান্য জন্তুর faience (ফ্যাইন্স) পদ্ধতির বা মুদ্রাগুলির খোদাইএর সঙ্গে রূপকার্যের দিক থেকে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনো নিদর্শন অন্য কোনো দেশে এ যুগে তৈরি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। Intaglio(ইনট্যাগ্লিও) খোদাই মুদ্রার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বিশেষ করে কুঁজ এবং খাটো শিং-যুক্ত ষাঁড়ের ছবিটির মধ্যে কল্পনার প্রসার, কারুরেখার সূক্ষ্মতা এবং নির্মাণ-কুশলতার যে বিশেষত্বগুলি প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন glyptic (গ্লিপ্‌টিক্‌) শিল্পে কখনও হয় নি বললেই চলে। ১০ এবং ১১-সংখ্যক প্লেটে হরপ্পা থেকে আনা যে-দুটি ক্ষুদ্র মানুষের মূর্তি আছে, তার ভঙ্গির লালিত্যের সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো কাজ গ্রীসের ক্লাসিক্যাল যুগের আগে পাওয়া অসম্ভব। সিন্ধু-উপত্যকার লোকেদের ধর্মের সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য দেশেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। সকল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে এর মধ্যে ভারতবর্ষের বিশেষত্বগুলি এরকম পরিস্ফুট যে, বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্ম থেকে এর প্রভেদ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।..."

এই উদ্ধৃতির মধ্যে কতকগুলি কথা হয়তো তুমি বুঝবে না। Faience শব্দের অর্থ মাটির অথবা চীনেমাটির কাজ। Intaglio এবং glyptic কাজ হচ্ছে—কোনো শক্ত জিনিষ, প্রায়ই কোনো মূল্যবান পাথর বা মুক্তোর উপর, খোদাই-কার্য করা।

হরপ্পাতে পাওয়া মূর্তিগুলি, নিদেনপক্ষে তাদের ছবিগুলি, দেখতে পেলে বেশ হত। কোনোদিন হয়তো তুমি আর আমি একসঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ইচ্ছেমতো এসব দৃশ্য দেখে আসব। ইতিমধ্যে তোমাকে থাকতে হবে পুণাতে তোমার স্কুলে; আর আমাকে আমার স্কুলে—দেরাদুন ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল জেল যার নাম।

৬১

কর্ডোবা ও গ্রানাডা

১৬ই জুন, ১৯৩২

এশিয়া ও ইউরোপ পরিক্রমা করে আমরা এখন যে সময়টাতে পোঁচেছি সে হল খৃষ্টজন্মের হাজার বছর পরেকার যুগ। গত চিঠিতে আমরা এক পলক পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আরবদের অধীনে স্পেনদেশের অবস্থা সে সময় কেমন ছিল সে কথাটা কেমন করে যেন বাদ পড়ে গেছে। আবার একবার পিছনে ফেরা যাক। স্পেনকে সেই সময়কার ইতিহাসে তার নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে তো!

আগে আগে যা বলেছি তা যদি তোমার মনে থাকে তবে স্পেনের ইতিহাস কিছুটা তোমার খুব সম্ভব জানাই আছে। খৃষ্টীয় ৭১১ অব্দে আরব-সেনাপতি তারিখ্ সমুদ্র পার হয়ে আফ্রিকা থেকে স্পেনে পদার্পণ করেন, তাঁর জাহাজ জিব্রাল্টার-বন্দরে এসে লাগে। তারিখের পাহাড়—জাবাল-উৎ-তারিখ্—এই কথাগুলি এখনও জিব্রাল্টার-নামের মধ্যে থেকে গেছে। দুই বছরের মধ্যে সমস্ত স্পেন আরবদের পদানত হয়। কিছুকাল পরে তারা পর্তুগালও দখল করে বসে। এখানেই তাদের অভিযান শেষ হল না, তারা দলে দলে ঢুকে পড়ল ফ্রান্সে, ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ-ইউরোপের সর্বত্র। এই আরব-বিভীষিকা ইউরোপের মনে তুমুল ত্রাসের সঞ্চার করে। ফ্রাংক্ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ চার্লস্ মার্টেলের নেতৃত্বে আরবদের বাধা দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাদের এই চেষ্টা সফল হয়—পোয়াটিয়েসের্র কাছে টুর্স্ বলে একটি জায়গায় ফ্রাংক্‌রা আরবদের পরাজিত করে। এই পরাজয়ের পর আরবদের ইউরোপ জয় করার সকল স্বপ্ন ভূমিসাৎ হয়ে যায়। এর পরও অনেকবার ফ্রাংক্ ও অন্যান্য খৃষ্টান জাতিদের সঙ্গে আরবদের সংঘাত হয়েছে, কখনও তারা ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে, কখনও-বা ফ্রাংক্‌রা তাদের হটিয়ে দিয়েছে স্পেনে। শার্লামেন স্পেনে ঢুকে আরবদের আক্রমণ করেছিলেন, পরাজিত হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলা যায়, দু পক্ষের কেউই কারও চেয়ে কম ছিল না। আরবেরা স্পেনদেশের শাসনকর্তা হয়ে বসলেও ইউরোপের অন্যান্য জায়গা অধিকার করার অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করে।

স্পেন এইভাবে বিরাট আরব-সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সে সাম্রাজ্য তখনকার দিনে সুদূর মঙ্গোলিয়া থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকা অতিক্রম করে স্পেন অবধি বিস্তৃত ছিল। এ সাম্রাজ্য কিন্তু বেশি কাল স্থায়ী হয় নি। তোমার হয়তো মনে আছে, আগেই তোমাকে বলেছি যে, আরব-দেশে অনেকদিন ধরে একটা গৃহবিবাদ চলে। আব্বাসি আরবেরা ওমেয়াদ-খলিফার অনুগামী আরবদের হারিয়ে দেয়, খলিফা স্বয়ং দেশত্যাগ করে প্রাণে বাঁচেন। স্পেনে আরবদের যে রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন তিনি ছিলেন ওমেয়াদ, নূতন আব্বাসি খলিফাকে তিনি মেনে নিতে সম্মত হলেন না। এইভাবে স্পেন আরব-সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। বোগদাদের খলিফা তখন ঘরের বিবাদ মেটাতেই ব্যস্ত, হাজার মাইল দূরের এই রাজ্যটিকে রক্ষা করার মতো তাঁর আগ্রহও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু স্পেনে-বোগদাদে এইভাবে পরস্পরের প্রতি একটা বৈরী ও বিদ্বেষের ভাব জন্মাল, যার ফলে বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, একের বিপদে অন্যে যেন খুশি হয়ে উঠত।

মাতৃভূমি থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্পেনীয় আরবেরা মস্ত একটা ভুল করেছিল। সুদূর বিদেশে বিজাতীয় শত্রুদের মাঝখানে তাদের বাস, সংখ্যায় তারা যৎসামান্য, বিপদে-আপদে তাদের সহায়-সম্বল কেউ ছিল না। সুখের বিষয়, সে সময় তাদের মনে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না, তাই তারা বিঘ্নবিপদকে অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারত। বস্তুতপক্ষে, উত্তরদিক থেকে খৃষ্টান প্রতিপক্ষের নিরন্তর চাপ সত্ত্বেও, তারা আর কারও সাহায্য ছাড়াই স্পেন দেশের অনেকখানি অংশের উপর পাঁচ শো বছর ধরে তাদের প্রভুত্ব রেখেছিল। তার পরেও আরবেরা দক্ষিণ-স্পেনের একটি

অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন রাজ্য দু শো বছর ধরে নিজেদের অধিকারে রাখে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, বোগদাদ-সাম্রাজ্যের পতনের অনেক-কাল পরেও স্পেনের আরবেরা অপ্রতিহত ছিল। বোগদাদ শহর ধুলোয় মিশে ধুলো হয়ে যাবার আরও অনেক যুগ পরে আরবেরা স্পেন থেকে শেষবারের মতো বিদায় নেয়।

একাদিক্রমে বিদেশাগত আরবেরা যে স্পেন শাসন করেছিল সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, এই আরব অর্থাৎ মুরদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এদিক থেকে তারা খুবই যে উন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুর-সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক হয়তো একটুখানি উৎসাহের আতিশয্যেই বলে গেছেন: "মুররা কর্ডোবায় যে আশ্চর্য একটি রাজ্য গঠন করেছিল, মধ্যযুগের পক্ষে তা এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। সমস্ত ইউরোপ যখন অজ্ঞান ও হিংসা-বিদ্বেষের অন্ধকারে ডুবে ছিল তখন পশ্চিম-জগতের দৃষ্টির সম্মুখে একমাত্র কর্ডোবাই জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক তুলে ধরেছিল।"

কর্‌টুবা ছিল পাঁচ শো বছর ধরে এই মুর-রাজ্যের রাজধানী। ইংরেজিতে এই নামটি সচরাচর কর্ডোবা বলে উচ্চারিত হয়। আমি অনেক সময় একই নাম ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিখি। আশা করি কর্ডোবার বেলা সে ভুলটা কাটিয়ে উঠতে পারব। কর্ডোবা শহরটি যেমন বড়ো ছিল তেমনি সুদৃশ্য; উদ্যানের মতো পরিপাটি ও মনোরম ছিল এর ঘরবাড়ি, পথঘাট। এ শহরে দশ লক্ষ লোক বাস করত। কর্ডোবা লম্বায় ছিল দশ মাইল, শহরতলী-অঞ্চলের আয়তন ছিল চব্বিশ মাইল। লিখিত আছে যে, এই শহরে প্রাসাদ ও অট্টালিকাদির সংখ্যা ছিল ষাট হাজার, সাধারণ বসতবাটী ছিল দুই লক্ষ, দোকান ছিল আশি হাজার, ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য সাত শো হামাম। সংখ্যাগুলি হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তবু এর থেকেই বোঝা যায় কীরকম প্রকাণ্ড ও জমকালো শহর ছিল কর্ডোবা। শহরে অনেকগুলি গ্রন্থাগার ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল আমিরের খাস গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। কর্ডোবার বিশ্ববিদ্যালয় সারা ইউরোপে এমনকি পশ্চিম-এশিয়াতেও বিদ্যার পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। দরিদ্র প্রজাদের জন্য অনেকগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেন: "স্পেনের অধিকাংশ লোকই লিখতে পড়তে জানত। খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে কিন্তু তা ছিল না। সেখানে একমাত্র যাজক-সম্প্রদায় ছাড়া আর সকলে এমনকি উচ্চবংশীয় লোকেরা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর ছিল।"

এই ধরনের শহর ছিল কর্ডোবা। কেবল আর একটিমাত্র শহর ছিল তার সঙ্গে তুলনীয়—সে হল বোগদাদ। কর্ডোবার খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতকে একজন জর্মন লেখক কর্ডোবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এ শহর সমস্ত বিশ্বের ভূষণস্বরূপ।" দূর দেশ থেকে ছাত্রেরা আসত কর্ডোবা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতে। আরব-দর্শনের প্রভাব ইউরোপের নাম-করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে—প্যারিসে অক্সফোর্ডে, উত্তর-ইতালির বিখ্যাত বিদ্যা-কেন্দ্রগুলিতে এই দর্শনের যথেষ্ট সমাদর হয়। আভের্‌রোয়েস অর্থাৎ ইবনে রশিদ ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ডোবার একজন উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক। তাঁর শেষ বয়সে তাঁর সঙ্গে স্পেনের শাসনকর্তা বা আমিরের মনোমালিন্য হয় ও তার ফলে তিনি নির্বাসিত হন। তিনি তখন প্যারিসে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন।

ইউরোপের অপরাপর দেশের মতো স্পেনেও তখন সামন্তপ্রথার প্রচলন ছিল। শক্তিশালী সামন্তবর্গের সঙ্গে শাসনকর্তা আমিরের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। এই গৃহবিবাদের ফলে স্পেনদেশে আরবদের রাজ্য এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে বহিঃশত্রুর আক্রমণেও তা সম্ভব হতে পারত না। এই সময়ে উত্তর-স্পেনের কয়েকটি খৃষ্টান রাজ্য পরাক্রান্ত হয়ে আরবদের বহিষ্কৃত করে দিতে আরম্ভ করে।

খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দের কাছাকাছি আমিরের রাজত্ব প্রায় সমস্ত স্পেন জুড়ে বিস্তৃত ছিল, দক্ষিণ-ফ্রান্সের একটা ছোটো অংশও ছিল এই রাজ্যের অন্তর্গত। অল্পদিনের মধ্যে এ রাজ্যে ভাঙন ধরে দেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। আরবেরা স্পেনে যে চমৎকার সভ্যতার কাঠামো গড়ে

তুলেছিল—তাদের শিল্প, বিলাসব্যসনের নানা উপকরণ, তাদের আদবকায়দা, সমস্তই ছিল ধনিক-শ্রেণীর উপযোগী। এই ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনাহারক্লিষ্ট সর্বহারাদের দল বিদ্রোহ করে; তারা পণ করে বসে যে, বড়োলোকদের জন্য কায়িক পরিশ্রমের কাজ তারা করবে না। গৃহবিবাদ দেশের চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন প্রদেশগুলি মূল রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্পেনদেশের আরব-সাম্রাজ্য ভেঙে খান্ খান্ হয়ে পড়ে। এরূপ বিপর্যয় সত্ত্বেও আরবরা বহুদিন মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে কাস্টিলের খৃষ্টান রাজার হাতে কর্ডোবার পতন ঘটে।

আরবদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণদিকে। দক্ষিণ-স্পেনে তারা গ্রানাডা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে এবং সেখান থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। আকারে ছোটো হলেও গ্রানাডাকে আরব-সভ্যতার একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে অভিহিত করা চলে। গ্রানাডার বিখ্যাত আলহাম্ব্রা প্রাসাদ এখনও আরব স্থাপত্য ও সভ্যতার একটি চমৎকার নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভ তোরণ প্রভৃতির নির্মাণকৌশল ও গঠনবৈচিত্র্যে, প্রাচীরগাত্রে আরবীয় অলংকরণের শোভায় এই প্রাসাদটি এখনও মানুষের মনোহরণ করে। আরবিতে এর নাম ছিল 'আলহাম্‌রা' অর্থাৎ রক্তবর্ণ প্রাসাদ। আরবীয় স্থাপত্যে ও শিল্পে অলংকরণের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি দেখা যায়, এই অলংকরণ-শিল্পের নিদর্শন ইসলাম-প্রভাবিত অনেক অট্টালিকা ও মসজিদে নিশ্চয় দেখে থাকবে। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা ইসলামধর্মনীতির বিরুদ্ধ। এইজন্যই আরব-স্থপতিরা নানাবিধ জটিল ও সূক্ষ্ম অলংকরণের সাহায্যে তাদের সৌন্দর্যস্পৃহা চরিতার্থ করবার সুযোগ খুঁজত। কখনও কখনও তারা স্তম্ভ, প্রাচীর কিংবা তোরণগাত্রে কোরাণগ্রন্থ থেকে শ্লোক উৎকীর্ণ করে রাখত। আরবি হরফের আকারে একটি চমৎকার ঢেউ-খেলানো রূপ আছে, এজন্য সহজেই এই হরফের সাহায্যে অলংকার-চিত্র অর্থাৎ ডিজাইনের অবতারণা করা চলে।

গ্রানাডা রাজ্য দুই শত বছর ধরে আরবদের শাসনাধীন ছিল। স্পেনের খৃষ্টীয় রাজ্যগুলি ক্রমেই আরবদের উপর চাপ দিতে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল কাস্টিল। কাস্টিলের খৃষ্টান রাজাকে গ্রানাডা কয়েকবার কর দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিল। গ্রানাডা যে এত বছর ধরে টিঁকে ছিল তার একটি কারণ এই যে, খৃষ্টীয় রাজ্যগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধতা করত। অবশেষে ১৪৬৯ অব্দে দুটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার বিবাহের ফলে কাস্টিল, আরাগন ও লিওন—এই তিনটি রাজ্য একত্রিত হয়। এরা একযোগে আক্রমণ করবার পর গ্রানাডায় আরব-রাজত্বের অবসান ঘটে। শত্রুকর্তৃক পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আরবরা বেশ কয়েক বছর নিছক সাহসের উপর নির্ভর করে সংগ্রাম চালিয়েছিল। রসদ শূন্য হয়ে যাবার ফলে ১৪৯২ অব্দে তারা স্পেনবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আরবীয় অর্থাৎ সারাসেনদের অনেকেই স্পেন ত্যাগ করে আফ্রিকায় চলে যায়। আধুনিক গ্রানাডার কাছে একটি জায়গা আছে, যেখান থেকে সমস্ত শহর দেখা যায়; এ জায়গাটির নাম—'এল্ আল্‌টিমো সোস্‌পিরো দেল্ মোরো'—অর্থাৎ মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস।

কিছু কিছু আরব স্পেন দেশে থেকে যায়। এরা ও দেশের লোকদের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছে তা স্পেনের ইতিহাসে একটি লজ্জাকর অধ্যায়। নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবলীলায়, পরধর্মসহিষ্ণুতার যে প্রতিশ্রুতি স্পেনবাসী দিয়েছিল, তার কথা তারা সমস্ত ভুলে গেল। এই সময়ে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় অন্য মতাবলম্বী লোকদের নির্বিচারে ধ্বংস করার জন্য 'ইন্‌কুইজিশান' নামে একটি হৃদয়হীন অস্ত্র আবিষ্কার করে। 'ইন্‌কুইজিশান' অর্থাৎ ধর্মবিচারের অজুহাতে স্পেনে যে ভয়াবহ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হত তার তুলনা বিরল। সারাসেন অথবা আরবদের অধীনে ইহুদিরা ব্যবসাবাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। ইন্‌কুইজিশানের ফলে তাদের অনেককে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, ধর্মত্যাগ করতে যারা চায় নি তাদের স্পেনবাসী পুড়িয়ে মারে। স্ত্রীলোক ও শিশুদেরও এই অত্যাচার থেকে অব্যাহতি ছিল না। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন: "বিধর্মী অর্থাৎ সারাসেনদের প্রতি আদেশ দেওয়া হয়, তারা যেন আরবদেশের বিচিত্র পোশাক পরিহার করে বিজেতা স্পেনের প্রচলিত লম্বা পাজামা ও টুপি পরতে শুরু করে। নিজেদের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, এমনকি নাম পর্যন্ত, পরিত্যাগ করে স্পেনের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান ও স্পেনীয়

নাম গ্রহণ করতে সারাসেনদের বাধ্য করা হয়।" এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বহু বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু সব-কিছু অকরুণভাবে দমন করে স্পেন তার প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।

স্পেনদেশীয় খৃষ্টানরা স্নান করা, গা-হাত-পা ধোয়া বিশেষ পছন্দ করত না। আরবরা স্নান, অবগাহন, আচমন ইত্যাদি অভ্যাস খুব ভালোবাসত বলেই হয়তো স্পেনের কর্তারা হুকুম জারি করলেন যে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য সব হামামগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। বলা হল: "বিধর্মী মোরিস্কো বা মুরদের পাপের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এমন আইন বানাতে হবে যাতে আরবরা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ঘরে অথবা বাইরে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, স্নান-প্রক্ষালনাদি আর না করতে পারে। আরবদের তৈরি পাপের কুন্ড এই হামামগুলি ভেঙেচুরে ধ্বংস করে দিতে হবে।"

স্নানরূপ অপরাধ ছাড়া আর যে-একটি দোষের জন্য আরবরা স্পেনের কাছে অপরাধী প্রতিপন্ন হয়েছিল সে হল আরবদের পরধর্মসহিষ্ণুতা। কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য মনে হয়, কিন্তু ধর্মবিষয়ে আরবদের ঔদার্য অপরাধের তালিকায় খুব উঁচু স্থান পেয়েছিল। ভ্যালেন্সিয়ার প্রধান ধর্মযাজক ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচিত একটি বইয়ে* সারাসেনদের স্পেন থেকে বিতাড়িত করার স্বপক্ষে যতগুলি যুক্তি দিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, আরবরা তাদের নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেও নাকি যথেষ্ট গোঁড়া ছিল না। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে ভ্যালেন্সিয়ার আর্চবিশপ লিখেছেন: "এই মোরিস্কো অর্থাৎ আরবরা তুর্কি ও অন্যান্য মুসলমান জাতির মতো ধর্মবিষয়ে নিজেদের প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, প্রজারা এদের অধীনে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মমত অনুসরণ করে।" সমালোচনা করতে গিয়ে বিশপঠাকুর স্পেনের আরবদের কতবড়ো প্রশংসা করে গেছেন তা তিনি নিজেও জানতেন না। এই আরবদের তুলনায় কীরকম সংকীর্ণমনা ও ধর্মান্ধ ছিল স্পেনদেশীয় খৃষ্টানরা! রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনো ধর্ম তাদের কাছে প্রশ্রয় তো পায়ই নি, বরঞ্চ লাঞ্ছিত হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ সারাসেনদের জোর করে স্পেন থেকে বহিষ্কৃত করা হয়; এদের বেশির ভাগ যায় আফ্রিকায় এবং একটা অংশ যায় ফ্রান্সে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, বহিষ্কৃত হবার আগে এই আরবরা দীর্ঘ সাত শো বছর ধরে স্পেনে বসবাস করছিল। এই সময়ের মধ্যে তারা অনেক অংশে স্পেনের লোকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। জাতিতে আরব হলেও এরা ক্রমেই স্পেনবাসী হয়ে যায়। শেষের দিকে খুব সম্ভব স্পেনের আরবদের সঙ্গে বোগদাদের আরবদের খুব অল্পই মিল ছিল। স্পেনে যেসব জাতি বাস করে তাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাদের ধমনীতে যথেষ্ট পরিমাণে আরব-রক্ত আজও প্রবাহিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি, কিছু-কিছু আরব যায় দক্ষিণ-ফ্রান্সে, এমনকি সুইজারল্যাণ্ডেও—স্পেন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে। তারা এসব জায়গায় বসতি স্থাপন করে। এখনও এইসব অঞ্চলের দু-একটি ফরাসি-মুখের মধ্যে আরবীয় ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

এইভাবে স্পেনে কেবল আরবদের রাজ্য নয়, তাদের সভ্যতারও অবসান ঘটে। এশিয়া-খণ্ডে আরব-সভ্যতার পতন আরও আগেই ঘটেছিল। সে সম্বন্ধে কিছু পরেই আমরা আলোচনা করব। অনেক দেশ, অনেক সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করেছিল এই আরব-সভ্যতা; বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই সভ্যতার বহু উল্লেখযোগ্য স্মরণচিহ্ন পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালের ইতিহাসে আরব তার পুরাতন প্রাধান্য আর উদ্ধার করতে পারে নি।

আরবদের চলে যাবার পর, ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার অধীনে স্পেন খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিছুদিন পরেই আমেরিকা-আবিষ্কারের ফলে স্পেনের ধনসম্পত্তি প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং কিছুকালের মতো স্পেন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য বলে স্বীকৃত হয়। স্পেনের উত্থান-পতন দুইই আকস্মিক। অভূতপূর্ব উন্নতির পরই স্পেন আবার এমন একটা জায়গায় গিয়ে নামে যে, রাজশক্তিহিসাবে তার স্থান অতি নগণ্য হয়ে যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি যখন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তখন স্পেন পচা ডোবার মতো আপনার আবর্তের মধ্যে আপনি ঘুরপাক

* *Apostacies and Treasons of the Moriscos.*

থাকিছল। মধ্যযুগের গৌরবময় স্বপ্নের মধ্যে সে ছিল বিভোর হয়ে, নতুন যুগ যে এসেছে তা আর সে খেয়াল করে নি।

ইংরেজ ঐতিহাসিক লেন্ পুল স্পেনবাসী সারাসেনদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

বহু শতাব্দী ধরে স্পেন ছিল সভ্যতার কেন্দ্র। শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চারুকলার পীঠস্থান ছিল এই স্পেন। মুরদের উন্নত শাসনব্যবস্থার ধারে-কাছেও সেকালকার ইউরোপীয় কোনো রাজশক্তি আসতে পারত না। ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার সময়ে এবং সম্রাট চার্ল্সের রাজত্বকালে স্বল্পকালের মতো স্পেনের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে, কিন্তু মুরদের মতো দীর্ঘকালস্থায়ী গৌরবের বুনিয়াদ গঠন করতে তাঁরা কেউ পারেন নি। মুরদের নির্বাসিত করা হল। কিছুদিন খৃষ্টান-স্পেন উজ্জ্বলভাবে শোভা পেল চাঁদের মতো ধার-করা আলো নিয়ে। তার পরে এল চন্দ্রগ্রহণের অন্ধকার; সেই তখন থেকে অন্ধকারের মধ্যে স্পেন বৃথা পথ হাতড়ে মরছে। মুরদের সত্যিকার সমাধিস্থান দেখা যায় উষর নির্জন বন্ধ্যা প্রান্তরে, এই প্রান্তরেই একদিন মুররা সোনা ফলিয়েছিল। মুরদের আমলে যে দেশ বাক্‌চাতুরী ও বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছিল, সে দেশের লোক আজ মূর্খতার পঙ্কে নিমজ্জিত। জাতিহিসাবে, দেশহিসাবে স্পেনের এমন অধঃপতন হয়েছে যে আজ তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঐতিহাসিকের এই মন্তব্যটি খুবই কঠোর। বছরখানেক আগে স্পেনে একটি বিদ্রোহ হয় ও তার ফলে রাজা সিংহাসনচ্যুত হন। এখন সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলছে। আশা করা যায় যে, এই গণতন্ত্রের আওতায় স্পেনের অবস্থা উন্নত হবে এবং স্পেন জগৎসভায় আবার তার স্বকীয় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হবে

৬২

খৃষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ

১৯শে জুন, ১৯৩২

কিছুকাল আগে লেখা আমার একটি চিঠিতে (৫৭ নম্বর) আমি তোমায় লিখেছিলাম যে, খৃষ্টান-ধর্মগুরু পোপ এবং তাঁর অধীনস্থ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম-সমিতি, খৃষ্টানদের তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেম শহর পুনরধিকার করবার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেলজুক তুর্কিদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ইউরোপের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—সবচেয়ে ভয় পেয়েছিল কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের লোকেরা, কারণ তুর্কিদের রাজ্য ছিল কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পাশেই। তুর্কিদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের ক্রুদ্ধ হবার আর-একটি কারণ হল এই যে তখন অনেক খৃষ্টান তীর্থযাত্রীই অনুযোগ করত, জেরুজালেম কিংবা প্যালেস্টাইন -যাত্রীদের প্রতি তুর্কিদের ব্যবহার নাকি ভালো ছিল না। এক দিকে এই ভয়, অন্য দিকে বিজাতীয়ের প্রতি রাগবশত, 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পোপ ও তাঁর অনুগামী ধর্মপ্রতিষ্ঠান ইউরোপের খৃষ্টধর্মাবলম্বী সমস্ত লোককে ডাক দিয়ে বললেন যে, পবিত্র জেরুজালেম শহর তুর্কিদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে।

এইপ্রকার অবস্থায় ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মযুদ্ধের শুরু হয়। প্রায় দেড় শো বছরেরও বেশি কাল ধরে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের, ক্রুশের সঙ্গে ঈদের চাঁদের সংঘাত চলতে থাকে। মাঝে মাঝে বিরতি ঘটলেও এই যুদ্ধ প্রায় একটানা ভাবেই চলে এবং কাতারে কাতারে খৃষ্টান-ধর্মযোদ্ধারা ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনে আসেন ও তাঁদের তীর্থক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করবার জন্য দলে দলে প্রাণ উৎসর্গ করেন। এই দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে খৃষ্টানদের উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ হয় নি। অল্প-দিনের জন্য জেরুজালেম তাঁদের দখলে এসেছিল বটে, কিন্তু তুর্কিরা সেই-যে আবার তাদের হৃতরাজ্য

অধিকার করল, তার পর থেকে তাদের আর স্থানভ্রষ্ট করা যায় নি। ধর্মযুদ্ধের মোট ফলাফল হল, লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ও মুসলমানদের দুঃখ দুর্গতি ও মৃত্যু। অবিরাম রক্তের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল এশিয়া-মাইনর ও প্যালেস্টাইন।

এই দুঃসময়ে বোগদাদ-সাম্রাজ্যের দশা কীরূপ ছিল দেখা যাক। আব্বাসি মুসলমানেরা তখনও বোগদাদে আধিপত্য করছেন, তাঁদের নেতাই ছিলেন খলিফা অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মগুরু। কিন্তু খলিফারা তখন নামেই ছিলেন নেতা, আসলে তাঁদের হাতে খুব বেশি শক্তি ছিল না। আগেই আমরা পড়েছি যে, আব্বাসি-সাম্রাজ্য ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে পড়ে, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে পড়েন। বার বার ভারত-আক্রমণ করেছিলেন সেই-যে গজনির মাহ্‌মুদ—তিনি ছিলেন একজন অতি পরাক্রান্ত নৃপতি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে তিনি খলিফাকে পর্যন্ত শাসাতে দ্বিধা করতেন না। বোগদাদ শহরের মধ্যেও তুর্কিরাই ছিল সত্যকার প্রভুস্থানীয়। ইতিমধ্যে আর-এক দল তুর্কি (তাদের বলা হয় সেলজুক তুর্কি) দ্রুত তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং চতুর্দিকে তাদের রাজ্যবিস্তার করতে আরম্ভ করে। বিজয়ী বীরের মতো এরা একেবারে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের দুয়ারে গিয়ে হানা দেয়। তবু এখনও পর্যন্ত আব্বাসি খলিফাই মুসলমানদের ধর্মগুরু হয়ে রইলেন—যদিচ সত্যকার রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁর কিছুই ছিল না। সেলজুক-অধিনায়কদের তিনি সুলতান উপাধি দিয়ে খালাস। এই সুলতানরাই ছিলেন দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। খৃষ্টান-ধর্মযোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে হয় এই সেলজুক-সুলতান এবং তাঁদের অনুচরদের বিরুদ্ধে।

ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের খৃষ্টানরা খৃষ্টীয় জগৎকে অন্য ধর্মীদের জগৎ থেকে যেন পৃথক করে দেখতে শুরু করলেন। সারা ইউরোপ একটি জায়গায় একত্র মিলল—সকলেরই লক্ষ্য ছিল কীভাবে বিধর্মীদের হাত থেকে 'পুণ্যভূমি' প্যালেস্টাইন উদ্ধার করা যায়। এই একই ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে গৃহ পরিবার এমনকি দেশ পর্যন্ত ত্যাগ করে, এই মহান উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। কেউ কেউ গিয়েছিল একটা বড়ো আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, কেউ গিয়েছিল তাদের পাপ ক্ষালন করতে। পোপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ধর্মযোদ্ধাদের পূর্বকৃত অপরাধ সবই ভগবান যিশু মার্জনা করবেন। এ ছাড়া ইউরোপের এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার একটি কারণ ছিল এই যে, রোম চেয়েছিল সর্বকালের জন্য কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের অবিসংবাদিত প্রভু হয়ে বসতে। তোমার হয়তো মনে আছে, কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লে খৃষ্টধর্মের যে সমাজ ছিল তারা ছিল ক্যাথলিক সমাজ থেকে আলাদা। এই কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের সমাজকে বলা হত সনাতন (orthodox) সমাজ। এদের সঙ্গে ক্যাথলিক সমাজের একবারে যেন জন্মগত বিরোধ-বিদ্বেষ ছিল, পোপকে এরা দু চোখে দেখতে পারত না; মনে করত, ইনি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। পোপ ঠিক করেছিলেন, কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের এই অহমিকা চূর্ণ করবেন; ভেবেছিলেন, কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্ একবার হাতের মুঠোর মধ্যে এলে সেখানকার সমাজের জায়গায় ক্যাথলিক সম্প্রদায় গড়ে তাঁর প্রভুত্ব বজায় রাখা শক্ত হবে না। ধর্মযুদ্ধের অছিলায় তিনি বিধর্মী তুর্কিদের আক্রমণচ্ছলে সত্য সত্য চেয়েছিলেন তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন সফল করে তুলতে। একেই বলে রাজনীতির কূটনৈতিক চাল। রোম ও কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের এই বিরোধের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ধর্মযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই আমাদের এই ঘটনার উল্লেখ করতে হবে।

ধর্মযুদ্ধ ঘটানোর আর-একটা কারণ হল, ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি। ভেনিস জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরের বাসিন্দা বড়ো বড়ো বণিকেরা ভেবেছিল যুদ্ধ বাধিয়ে তাদের মন্দা ব্যবসা আবার ফলাও করে ফাঁপিয়ে তুলতে পারবে। ইউরোপের সঙ্গে পূর্বদেশের বাণিজ্যসম্ভার যেসব রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত তার অনেকগুলিই সেলজুক তুর্কিরা দিয়েছিল বন্ধ করে।

জনসাধারণ অবশ্য অন্তর্নিহিত এই কারণগুলি সম্বন্ধে কিছু জানত না। কেউ তাদের বলেন নি ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত কারণ কী। রাজনীতি যাঁদের পেশা তাঁরা সত্যকার কারণ অগোচরে রেখে ধর্ম সত্য ন্যায়বিচার প্রভৃতির বুলি কপচান। ক্রুসেডের বেলা ঠিক তাই হয়েছিল।

আজও ঠিক তাই হয়। সেকালে রাজনীতিকেরা এইভাবে প্রজাসাধারণকে ভাঁওতা দিতেন, সেই একই ধরনের বড়ো কথার প্রবঞ্চনা আজও চলছে।

ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য দলে দলে লোক এগিয়ে এল। তাদের কেউ কেউ ছিলেন সত্যকার ভালো ও ধর্মপ্রাণ লোক, আবার কেউ কেউ এসেছিল নিছক লুটতরাজের লোভে। পুণ্যাত্মা লোকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধ করতে এমন-সব চোর গুণ্ডা বদমাইশ যারা কোনোরকম পাপ কাজ করতেই কুণ্ঠা বোধ করত না। ইতিহাস পড়লে দেখি এই ধর্ম (?) -যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকে এমন-সব নীচ ও জঘন্য অপরাধ করেছে যার কথা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়। কেউ কেউ এমনভাবে লুটতরাজ ও অন্যান্য পাপকর্মে লিপ্ত ছিল যে তারা প্যালেস্টাইনের ধারে কাছেও পেঁছতে পারে নি। পথে যেতে যেতে কত যে নিরপরাধ ইহুদি এমনকি খৃষ্টানদের পর্যন্ত তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এদের অমানুষিক অত্যাচারে তিক্ত বিরক্ত হয়ে অনেক খৃষ্টান-দেশের কৃষাণশ্রেণীর লোক ক্রুসেড-অভিযানকারী সৈন্যদের আক্রমণ করেছে। কাউকে প্রাণে মেরেছে, কাউকে-বা দেশের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ধর্মযোদ্ধাদের একটি দল নর্ম্যাণ্ডিদেশের বুইলোঁ-বাসী গড্‌ফ্রে-নামক একজন সেনানায়কের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে গিয়ে পেঁছয়। তাদের আক্রমণ তুর্কিরা প্রতিরোধ করতে না পারায় জেরুজালেম খৃষ্টান-কবলিত হয়। তার পর এক সপ্তাহ ধরে চলে এক অতি বীভৎস হত্যাকাণ্ড। একজন ফরাসি প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, "মসজিদের সামনে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল। রক্তের স্রোতে হাঁটু অবধি ডুবে যেতে লাগল। রক্তের নদী ঘোড়ার লাগাম অবধি উঠেছিল।" গড্‌ফ্রে জেরুজালেমের রাজা হয়ে বসলেন।

সত্তর বছর পরে মিশরের সুলতান সালাদিন খৃষ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম পুনরধিকার করে নেন। এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপবাসী আবার বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর পর আবার কয়েকটি ধর্মযুদ্ধের অভিযান এল ইউরোপ থেকে। এবার স্বয়ং খৃষ্টান রাজারাজড়ারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু যুদ্ধে কৃতকার্য হবেন কী, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে কলহ বিবাদ করতে লাগলেন। ধর্মযুদ্ধের নামে এমন নীচতা নৃশংসতা, এমন হেয় জঘন্য মনোবৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না। কখনও-বা এই নিদারুণ বীভৎসতার ঊর্ধ্বে উঠেছে মানুষের উচ্চতর প্রবৃত্তি, শত্রু শত্রুর সঙ্গে ন্যায়সংগত ও শিষ্টাচারসংগতভাবে যুদ্ধ করেছে। ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড। শারীরিক শক্তি ও সাহসের জন্য লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'কুর দ্য লিয়' অর্থাৎ পুরুষকেশরী। সালাদিন নিজেও ছিলেন পরাক্রান্ত যোদ্ধা, শত্রুর প্রতি তাঁর আচরণ ছিল সত্যকার বীরের আচরণ। এইজন্য খৃষ্টান যোদ্ধারা পর্যন্ত তাঁকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে : প্যালেস্টাইনের প্রখর গ্রীষ্মে রিচার্ড একবার কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদে সালাদিন রিচার্ডের জন্য সদ্য সদ্য পাহাড় থেকে আনীত বরফ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজকাল আমরা যেমন কলের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি করে থাকি তখনকার দিনে তা করা যেত না। সুতরাং বুঝতেই পারো, ক্ষিপ্রগতি হরকরা পাঠিয়ে সেই বরফ উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে অতি কষ্টে আহরণ করে আনতে হয়েছিল।

ক্রুসেড সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সার ওয়াল্টার স্কটের 'ট্যালিসম্যান' বইটিতে তুমি এই ধরনের গল্প কিছু কিছু পড়ে থাকবে।

খৃষ্টান যোদ্ধাদের একটা দল গিয়ে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার করে নেয়। গ্রীসের পূর্ব-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ থেকে বহিষ্কৃত করে সেখানে তারা রোমান রাজ্য ও রোমের ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। এখানেও তুমুল রক্তপাত হয়, শহরের একটি অংশ আক্রমণ-কারীরা অগ্নিদগ্ধ করে ধ্বংস করে। এই রোমান রাজ্যও কিন্তু বেশি দিন টেঁকে নি। দুর্বল হলেও পূর্ব-সাম্রাজ্যের গ্রীকরা আবার ফিরে আসে এবং কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করার পর রোমানদের তারা কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌কে

কেন্দ্র করে গ্রীকদের এই পূর্ব-সাম্রাজ্য আরও দু শো বছর, অর্থাৎ ১৪৫৩ অব্দ অবধি, টিঁকে ছিল। ১৪৫৩ অব্দে তুর্কিদের হাতে এই বিখ্যাত শহরটির পতন ঘটে।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও পোপের সত্যকার অভিপ্রায় ছিল কন্স্টান্টিনোপ্লে তাদের অধিকার বিস্তৃত করা; ধর্মযোদ্ধাদের দ্বারা এই শহর অধিকার করানো থেকেই তাঁদের এই গূঢ় অভিপ্রায় বোঝা যায়। একদিন খুব সংকটের মুহূর্তে এই শহরের গ্রীকরা তুর্কিদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য রোমের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু ধর্মযোদ্ধাদের তারা মনে মনে একটুও পছন্দ করত না, যুদ্ধে অতি অল্পই সাহায্য করেছিল তারা।

এই ধর্মযুদ্ধের সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হল, ইতিহাসে যাকে বলা হয় বালকদের ধর্মযুদ্ধ। ইউরোপময় এই উত্তেজনা ও উন্মাদনার ফলে ফ্রান্স ও জর্মানি থেকে বহুসংখ্যক কিশোরবয়স্ক বালক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্যালেস্টাইনে যাবার জন্য এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে কেউ গেল রাস্তায় মারা, কেউ গেল পথ হারিয়ে। যা হোক, বেশির ভাগ তো শেষ পর্যন্ত পেঁছিল গিয়ে মার্সাই বন্দরে। সেখানে এই সরলমতি বালকদের উৎসাহের সুযোগ নিয়ে বদমাইশ লোকেরা তাদের নানাভাবে প্রবঞ্চিত করে। এইসব বদমাইশেরা ক্রীতদাসের ব্যবসা করত; পুণ্যভূমি জেরুজালেমে নিয়ে যাবার ছলে এরা এই বালকদের জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে গেল মিশরে এবং সেইখানে বিক্রি করল ক্রীতদাস ব'লে।

প্যালেস্টাইন থেকে ফেরবার পথে ইংলন্ডের রাজা রিচার্ড পূর্ব-ইউরোপে তাঁর শত্রুদের কবলে বন্দী হন; অর্থের বিনিময়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। একবার প্যালেস্টাইনেই একজন ফরাসি-রাজা ধরা পড়েছিলেন, তিনিও বহু অর্থব্যয়ে শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ফ্রেডরিক বার্বারোসা তো প্যালেস্টাইনের একটি নদীতে ডুবে মারাই যান। ধর্মযুদ্ধের নামে লোকের মনে যে কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল ক্রমেই তা হ্রাস পেতে লাগল। লোকে ভাবল, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। জেরুজালেম রয়ে গেল মুসলমানদের হাতে। কিন্তু ইউরোপের রাজারাজড়ারা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করার জন্য আর ধনপ্রাণ নষ্ট করতে রাজি নন। সেই তখন থেকে প্রায় সাত শো বছর ধরে জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এই মাত্র সেদিন, ১৯১৮ অব্দে মহাযুদ্ধের পর, তুর্কিদের হাত থেকে একজন ইংরেজ সেনাপতি জেরুজালেমের প্রভুত্ব হস্তগত করেন।

পরবর্তীকালে একটি ধর্মযুদ্ধ হয় সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের সময়। সে এক মজার যুদ্ধ, তেমন যুদ্ধ পূর্বে কখনও হয় নি। আসলে এটাকে যুদ্ধ বলাই হয়তো ভুল। ফ্রেডরিক ছিলেন পবিত্র রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট। যুদ্ধ করতে এসে তিনি করলেন মিশরের তদানীন্তন সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সাক্ষাতের ফলে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিত্রতা পাতালেন। ফ্রেডরিক সাধারণ লোক ছিলেন না। যে কালে রাজাবাদশারা পড়াশুনার ধার ধারত না সে কালে জন্মেও তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ্, এমনকি আরবিভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। 'পৃথিবীর আশ্চর্য মানুষ' বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। পোপকে তিনি বড়ো-একটা খাতির করতেন না, এজন্য পোপ তাঁকে একঘরে করে দেন। এতে অবশ্য তাঁর এমন-কিছু ক্ষতি হয় নি।

আখেরে ধর্মযুদ্ধের স্থায়ী ফল কিছুই দাঁড়ায় নি। তবে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সেলজুক তুর্কিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ছাড়া সেলজুক-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে সামন্তপ্রথা থাকার ফলে। বড়ো বড়ো সামন্তরাজারা নিজেদের স্ব-স্ব-প্রধান বলে মনে করতেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি তাঁদের লেগেই থাকত। এক-এক সময় অপর পক্ষকে হারিয়ে দেবার জন্য তাঁরা খৃষ্টানদের সহায়তা নিতেও দ্বিধা করেন নি। এই আভ্যন্তরিক দুর্বলতার জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম-যোদ্ধারা মাঝে মাঝে তুর্কিদের হারিয়ে দিত। সালাদিনের মতো শক্ত শত্রুর পাল্লায় পড়লে খৃষ্টানরা পদে পদে পরাজিত হত।

ইদানিং ক্রুসেড সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা একটি নূতন মতবাদের অবতারণা করেছেন— এঁদের মধ্যে গ্যারিবল্ডির জীবনচরিতকার ইংরেজ লেখক জি. এম. ট্রেভেলিন অন্যতম। তিনি যা বলেন তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ট্রেভেলিন বলেছেন, "নূতন করে যখন ইউরোপের

শক্তি জেগে উঠছে ঠিক সেই সময় এই ধর্মযুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়। ধর্মের দিক থেকে ও শক্তি-পরীক্ষার দিক থেকে এ যুদ্ধগুলি প্রাচ্যের দিকে পাশ্চাত্যের সহজাত আকর্ষণের বাহ্য পরিচয়। ইউরোপ পবিত্র দেবস্থান বিধর্মীদের হাত থেকে একেবারে উদ্ধার কোনোদিন করতে পারে নি, খৃষ্টান দেশগুলি একসূত্রে গাঁথবার স্বপ্নও তার সফল হয় নি। এ দিক থেকে ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস ইউরোপের পক্ষে একটানা বিফলতার ইতিহাস। ইউরোপ এশিয়া থেকে যা নিয়ে গিয়েছিল তা হল সুকুমার কলা ও শিল্প, বিলাসব্যসনের উপকরণ, বিজ্ঞান, এবং বিবিধ বিষয়ে জানবার ও বোঝবার ইচ্ছা। ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন যিনি সেই সাধু পিটার এর কোনোটাই অনুমোদন করতেন না।"

১১৯৩ অব্দে সালাদিনের মৃত্যুর পর আরব-সাম্রাজ্যের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ভেঙেচুরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ ধর্মযুদ্ধের তারিখ হল ১২৪৯ অব্দ। সেই বছর ফ্রান্সের রাজা নবম লুইএর নেতৃত্বে খৃষ্টানরা শেষবারকার মতো একবার লড়তে আসে। লুই পরাজিত হয়ে টুকরো টাকরা হয়ে যায়। পশ্চিম-এশিয়ায় স্ব-স্ব-প্রধান সামন্তদের বিবাদ-বিসংবাদের ফলে আরবদের হাতে বন্দী হন।

ইতিমধ্যে পূর্ব ও মধ্য -এশিয়ায় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে আরসব ঘটনা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলে মঙ্গোলদের মধ্যে একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়—এই নেতাই হলেন চেঙ্গিস খাঁ। চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মঙ্গোলরা সমস্ত পূর্বদেশ অধ্যুষিত করে পঙ্গপালের মতো এগিয়ে যেতে থাকে। খৃষ্টান-ধর্মযোদ্ধা ও তার মুসলমান প্রতিপক্ষ সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে এই মঙ্গোল-অভিযান ঝোড়ো হাওয়ার মতো সমস্ত দিগন্ত আবৃত করে এগিয়ে যেতে থাকে। এর পরের কোনো চিঠিতে তোমায় চেঙ্গিস খাঁ ও মঙ্গোলদের সম্বন্ধে বলব।

চিঠি শেষ করার আগে একটা কথা বলে রাখি। মধ্য-এশিয়ার বোখারা শহরে তখনকার দিনে একজন খুব নামজাদা চিকিৎসক বাস করতেন। তাঁর খ্যাতি এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আরব-চিকিৎসকের আসল নাম ছিল ইব্‌ন্ সিনা, কিন্তু ইউরোপে তিনি আবিসেন্না নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁকে সকলে ভিষক-সম্রাট উপাধি দিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত আগে ১০৩৭ অব্দে তিনি মারা যান।

এত খ্যাতি ছিল বলেই আমি বেছে ইব্‌ন্ সিনার নাম উল্লেখ করলাম। একটা কথা মনে রেখো, আরব-সাম্রাজ্যের যখন পড়তি অবস্থা সেই সময়েও পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় আরব-সভ্যতার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। সালাদিনের মতো রাজা, যাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে খৃষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে, তিনিও বহু বিদ্যায়তন ও চিকিৎসা-সদন প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। তখনকার লোক ঠিক বুঝতে পারে নি এ সভ্যতার অকস্মাৎ পতন ঘটবে। এ পতনের পর আরব বহুদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। এই সর্বনাশের কারণ যারা সেই মঙ্গোলরা ইতিমধ্যে পূর্বদিক থেকে এগিয়ে আসছে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে।

৬৩

ধর্মযুদ্ধের সময়কার ইউরোপ

২০শে জুন, ১৯৩২

একাদশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতের বিষয়ে গত চিঠিতে তোমায় কিছু কিছু লিখেছি। খৃষ্টস্তান সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা ইউরোপের সর্বত্র এই সময় ছড়িয়ে পড়ে। ইতিপূর্বেই অবশ্য খৃষ্টধর্ম ইউরোপের সর্বত্র বিস্তারলাভ করেছে; পূর্ব-ইউরোপের শ্লাভজাতির অন্তর্গত রাশিয়ান ও অন্যান্য জাতিরা সর্বশেষে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সত্য মিথ্যা জানি নে, রাশিয়ানদের ধর্মান্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে বেশ মজার গল্প প্রচলিত আছে। প্রবীণ রাশিয়ানরা নাকি নূতন ধর্ম নেবার আগে এই প্রশ্নটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। আলোচনার বিষয় ছিল, তারা যে দুটি নূতন ধর্মের কথা শুনেছিল তার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করবে—খৃষ্টধর্ম না ইসলাম? আধুনিক কালের রীতি অনুসারে তারা একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে খৃষ্টান-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান দেশগুলি দেখে আসবার জন্য পাঠায়। কথা ছিল, তারা যে রিপোর্ট দাখিল করবে তাই দেখে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে। এই প্রতিনিধিদল মুসলমান-প্রধান পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলি ঘুরে অবশেষে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে যায়। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের কাণ্ডকারখানা দেখে রাশিয়ানরা একেবারে অবাক হয়ে গেল। সেখানকার সনাতনপন্থী খৃষ্টানদের ভজন-পূজনের ঘটা, ধর্মমন্দিরের বিবিধ আড়ম্বর, পুরোহিতদের জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ, ধূপধুনা, সংগীত ইত্যাদি দেখে শুনে উত্তর-দেশ-বাসী অর্ধসভ্য সহজ সরল রাশিয়ানরা মুগ্ধ হয়ে গেল। ইসলামধর্মে এইরকম বাহ্যাড়ম্বরের বালাই নেই। সুতরাং প্রতিনিধিদল স্থির করল যে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাই বিহিত হবে। ফিরে এসে তারা দেশের রাজাকে তাদের এই অভিমত জানাল। রাজা প্রজা সবাই মিলে রাশিয়ানরা এইভাবে নাকি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ থেকে ধর্ম আমদানি করা হয় বলে রোমের ক্যাথলিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত না হয়ে রাশিয়ানরা সনাতনপন্থী গ্রীক খৃষ্টানদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই, রাশিয়া কোনো কালে রোমের পোপ অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরুর বশ্যতা স্বীকার করে নি।

ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক আগেই রাশিয়া খৃষ্টধর্মাবলম্বী হয়। বুলগেরিয়ানদের সম্বন্ধে বলা হয়, তারাও নাকি ইসলামের দিকে ঝুঁকেও শেষ পর্যন্ত কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের আকর্ষণ এড়াতে না পেরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। বুলগেরিয়ার রাজা কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের রাজকুমারীকে বিয়ে করে সনাতন-শ্রেণীভুক্ত খৃষ্টান হন। এইভাবে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিও খৃষ্টধর্ম স্বীকার করে নেয়।

এখন প্রশ্নটা হল এই—ধর্মযুদ্ধ চলছিল যখন তখন ইউরোপে কী ঘটছিল? আগেই তো পড়েছ, কোনো কোনো খৃষ্টান রাজারাজড়া বহু দেশ অতিক্রম করে প্যালেস্টাইনে পৌঁছে নানারূপ দুর্বিপাকে পড়েন। এদিকে পোপ নিরাপদে রোমের ধর্ম-সিংহাসনে বসে আদেশ অনুজ্ঞা পাঠাচ্ছিলেন—খৃষ্টানরা যেন বিধর্মী তুর্কিদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড চালিয়ে যায়। এই সময়ে খৃষ্টজগতে পোপ ছিলেন সর্বেসর্বা, এত ক্ষমতা এর আগে বা পরে তাঁর কখনও হয় নি। আগেই তো তোমায় গল্প বলেছি, কেমন করে একজন আত্মম্ভরী সম্রাট ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেনোসা নামে একটা জায়গায় খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন পোপের দর্শন পাবার জন্যে ও তাঁর কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করবার জন্যে। এই পোপের নাম সপ্তম গ্রেগরি (গুরুপদ পাবার আগে তাঁর নাম ছিল হিল্‌ডে ব্রাণ্ড্)। পোপ-নির্বাচন-বিষয়ে ইনি একটি নূতন নিয়মের প্রবর্তন করেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিতদের নাম ছিল কার্ডিনাল। এই কার্ডিনালদের একটা ধর্মমহাসমিতি থেকে পোপ নির্বাচিত হতেন। ১০৫৯ অব্দে এই

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ
নভোগরোদের
সামন্ত-রাজ্য
স্যুইডেন-রাজ্য
ডেনমার্ক-রাজ্য
ইংলণ্ড-রাজ্য
পোল্যাণ্ড
রাজ্য
কিয়েভের
ডিউক-রাজ্য
হাঙ্গেরি
রাজ্য
দানিয়ুব
সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
রোম
পূর্ব- সাম্রাজ্য
সেলজুক
ফরাসি -রাজ্য
রাইন
স্পেনীয়
রাজ্যসমূহ
লিয়ঁ
পর্তুগাল
নাভার
আরাগন
ভল্গা
ডন
নীপার

নিয়ম প্রবর্তিত হয়, একটু-আধটু রদবদল হয়ে থাকলেও আজও সেই একই নিয়ম চলে আসছে। এখনও কোনো পোপের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মমহাসমিতির একটা কুলুপ-আঁটা কক্ষে অধিবেশন হয়। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কার্ডিনালের ঘরের বাইরে বেরোবার উপায় নেই। অনেক সময় সর্ববাদিসম্মত কোনো একটা সিদ্ধান্তে না আসার ফলে এদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই বন্ধ ঘরে বন্দীর মতো কাটাতে হয়েছে—চৌকাঠ পেরোবার উপায় নেই। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসায় আসতেই হয় কার্ডিনালদের। পোপ-নির্বাচন পর্ব সমাধা হলে চিমনি দিয়ে শাদা রঙের ধোঁয়া ছাড়া হয়। এই ধোঁয়া দেখে বাইরের প্রতীক্ষমান জনতা জানতে পারে যে নূতন ধর্মগুরু একজন-কেউ নির্বাচিত হয়েছেন।

পোপের বেলায় যেমন, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট-নিয়োগের বেলাও সেইরকম নির্বাচনরীতি অনুসৃত হত। তফাত এই যে, সম্রাট নির্বাচন করত দেশের শক্তিশালী সামন্তবর্গ। এই শ্রেণীর সাতজন সামন্তরাজাদের বলা হত—নির্বাচক রাজা। সিংহাসনের উপর যাতে বংশানুক্রমিক অধিকার না জন্মায়, এই ছিল নির্বাচনের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যেত যে অনেক সময় একই বংশপরম্পরার মধ্যে এইরূপ নির্বাচন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত, বৎসরের পর বৎসর।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হোহেনস্টফেন্-রাজবংশ সম্রাটের পদ নিজেদের মধ্যে প্রায় কায়েমি করে রেখেছিল। হোহেনস্টফেন সম্ভবত জর্মানির অন্তর্গত একটি ছোটো শহর কিংবা গ্রামের নাম ছিল। এককালে এখানকার বাসিন্দা ছিল বলে বংশের নামও হয়েছিল হোহেন-স্টফেন। এই বংশের প্রথম ফ্রেডরিক ১১৫২ অব্দে সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসের পাতায় তিনি ফ্রেডরিক বার্বারোসা নামে পরিচিত। ইনিই ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার কালে পথিমধ্যে জলে ডুবে মারা যান। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এঁর শাসনকালকে বলা হয়, সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। জর্মানিবাসীদের কাছে তিনি পুরাণ-বর্ণিত বীরপুরুষদের সমগোত্র—তাঁকে ঘিরে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ফ্রেডরিক নাকি কোনো-এক পাহাড়ের গভীর গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, উপযুক্ত অবসর হলে তিনি যথাসময়ে গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠবেন এবং তাঁর দেশ ও জাতিকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন।

পোপের সঙ্গে ফ্রেডরিক বার্বারোসার বহুকাল ধরে একটা দারুণ বিসংবাদ চলে, শেষ পর্যন্ত পোপেরই জয় হয় এবং পোপের শাসন ফ্রেডরিককে নত মস্তকে স্বীকার করে নিতে হয়। বার্বারোসা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট। কিন্তু তা হলে কী হয়, শক্তিশালী সামন্তদের হাতে এঁকে যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। ইতালিতে তখন যেসব বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠছিল ফ্রেডরিক চেয়েছিলেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। কিন্তু এ কাজে তিনি সফলকাম হন নি। জর্মানিতেও এ সময় বড়ো বড়ো শহর নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল। কলোন, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্টের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বদেশে ফ্রেডরিক অন্য নীতি গ্রহণ করেছিলেন; স্বাধীন জর্মন শহরগুলি যাতে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি সবরকম সাহায্য করেছিলেন। এই স্বাধীন ও শক্তিশালী শহরগুলি বড়ো বড়ো সামন্তদের শক্তি খর্ব করবে, এটাই তিনি চেয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে একাধিকবার তোমায় বলেছি, এ দেশের প্রাচীনকালের শাস্ত্রাদিতে রাজধর্ম সম্বন্ধে কীরূপ ধারণা ছিল। আর্যদের সময় থেকে অশোকের রাজত্বকাল অবধি এবং এদিকে অর্থশাস্ত্র থেকে শুক্রাচার্যের নীতিসার রচনার কাল অবধি বার বার বলা হয়েছে যে, রাজা প্রজানুরঞ্জনের জন্য জনসাধারণের মতামত শ্রদ্ধাসহকারে পালন করবেন। দেশের প্রকৃত রাজাই হলেন জনসাধারণ। প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেরও কোনো কোনো রাজা যথেচ্ছাচারিতা করতেন। এ বিষয়ে ইউরোপীয় মতবাদের তুলনা করতে গেলে দেখি যে, সেখানকার আইন অনুসারে রাজা ছিলেন দেশের সার্বভৌম কর্তা—তাঁর কথার উপর কারও কথা চলত না। ইউরোপীয় মতে রাজা ছিলেন দেশের শাসন-নিয়মের জীবন্ত প্রতীক। ফ্রেডরিক বার্বারোসা একবার বলেছিলেন, "রাজা কী নিয়মে রাজ্য চালাবেন

সে বিষয়ে প্রজাদের নির্দেশ দেবার কোনো অধিকার নেই; তাদের একমাত্র কর্তব্য হল রাজার আদেশ মেনে চলা।"

চীনদেশে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে কীরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল সে কথাও এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। চীনদেশের রাজারাজড়াদের অনেক গালভরা সব উপাধি ছিল—তাঁদের বলা হত স্বর্গপুত্র ও আরও কত কী! তাই বলে মনে কোরো না যেন যে তাঁরা ইউরোপীয় সম্রাটদের মতো সর্বশক্তিমান ছিলেন। রাজধর্ম সম্বন্ধে ভারত ও চীনের মতবাদ প্রায় একই রকমের ছিল। চীনদেশের একজন প্রাচীন লেখক মেঙ-সি বলেছেন, "দেশে সবার উঁচু স্থান হল জনসাধারণের, তার পর যাঁদের স্থান তাঁরা হলেন পৃথিবী ও শস্যের দেবগণ, সর্বশেষে যাঁর আসন তিনি হলেন দেশের শাসনকর্তা।"

ইউরোপে সম্রাটদের স্থান ছিল সবার ঊর্ধ্বে, তাঁরা যেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন চালাতেন। এই থেকে ইউরোপে একটা বিশ্বাস প্রচলিত হয় যে, রাজারা হলেন ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। আসলে কিন্তু এতটা ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অনেক সময় সামন্তরাজারা সম্রাটের বিরুদ্ধতা করতেন; পরবর্তীকালে বড়ো বড়ো শহরে নূতন নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা সম্রাটের ক্ষমতার অংশ দাবি করে বসে। ওদিকে আবার রোমান ক্যাথলিকদের গুরু পোপ বলতেন যে, তিনিও সর্বশক্তিসম্পন্ন। যেখানে দুজন সর্বশক্তিমানের সংঘাত হয় সেখানে অনিবার্য বিপর্যয়।

ফ্রেডরিক বার্বারোসার পৌত্রের নামও ছিল ফ্রেডরিক। বালক-বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁর নাম হয় দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। এ'র কথা তোমাকে ইতিপূর্বেই বলেছি—ইনিই সেই রাজা যাঁকে বলা হত 'পৃথিবীর আশ্চর্য মানুষ'; ইনিই ধর্মযুদ্ধ করতে প্যালেস্টাইন গিয়ে মিশরের সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়ে ফিরে আসেন। পিতামহের মতো ইনিও পোপের বিরুদ্ধতা করেন ও পোপের অনুজ্ঞা মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। পোপ তাঁকে সম্প্রদায়-বহির্ভূত ও ধর্মচ্যুত ঘোষণা করে অপমানের প্রতিশোধ নেন। এই একটি মস্ত বড়ো অস্ত্র ছিল পোপদের হাতে, তবে বেশি ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই এই অস্ত্রে মরচে ধরেছিল। ধর্মগুরুর রোষ ফ্রেডরিকের মনে খুব বেশি দাগ কাটতে পারে নি। দিনকালও পূর্বের মতো ছিল না। ইউরোপের সমস্ত রাজারাজড়াদের কাছে ফ্রেডরিক দীর্ঘ পত্র লিখে জানালেন যে, রাজকার্যে পোপের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। তিনি ধর্মগুরু, ধর্ম ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে তিনি থাকুন; রাজনীতিতে তাঁর মাথা গলাবার কোনো দরকার নেই। ধর্মযাজকদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসারের কথাও তিনি উল্লেখ করতে ছাড়েন নি। যুক্তির দিক থেকে ফ্রেডরিককে হারাবেন পোপের এমন সাধ্য ছিল না। সম্রাটের এই চিঠিগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সম্রাটের সঙ্গে পোপের এই বিরোধের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির বিরোধের ইঙ্গিত পাই। আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ফ্রেডরিকের যুক্তির যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ধর্মবিষয়ে বিশেষ সহনশীল ছিলেন, অনেক আরব ও ইহুদি দার্শনিক তাঁর রাজসভার সভাসদ ছিলেন। শোনা যায় যে, তাঁরই মারফত ইউরোপে আরবি সংখ্যা ও অ্যালজেব্রা (তোমার হয়তো মনে থাকবে, গণিতের এই শাখাটি সর্বপ্রথম ভারতে আবিষ্কৃত হয়) ইউরোপে প্রচলিত হয়। নেপ্‌ল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সালের্নোর বিখ্যাত চিকিৎসা-শিক্ষালয় এই সম্রাটই প্রতিষ্ঠা করেন।

ফ্রেডরিকের রাজত্বকাল ছিল ১২১২ অব্দ থেকে ১২৫০ অবধি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে হোহেনস্টফেন-বংশের প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হয়। গোটা সাম্রাজ্যটাই ভেঙে পড়ে। ইতালি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জর্মনি খান্‌খান্‌ হয়ে যায় এবং চার দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চার দিকে দস্যু-তস্কর বিনা বাধায় দেশময় অত্যাচার ও লুটতরাজ চালাতে থাকে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিরাট ভার জর্মন দেশ বহন করতে অপারগ হয়। ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের রাজারা তাঁদের সামন্তদের দমন করে নিজেদের নিজেদের রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করলেন। জর্মনির রাজা ছিলেন একাধারে সে দেশের রাজা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট—তাঁরই হল

সবচেয়ে মুশকিল। এক দিকে পোপ ও অন্য দিকে শক্তিশালী ইতালীয় শহরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, গৃহশত্রু সামন্তদের দমন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের ফাঁকা সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে গৃহযুদ্ধে সমস্ত দেশ বিভক্ত ও দুর্বল হতে থাকে। জর্মানি একতাবদ্ধ হবার অনেক আগেই ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরাক্রমশালী দেশ বলে পরিগণিত হয়। বহুকাল ধরে জর্মানিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদে ক্ষুদে রাজারাজড়াদের দল রাজত্ব করে। মাত্র ষাট বছর আগে জর্মানি আবার একতাবদ্ধ হয়, যদিচ ক্ষুদে রাজারা তখনও টিঁকে থাকে। ১৯১৪-১৮ অব্দের মহাযুদ্ধের পর এই ক্ষুদে নবাবদের দল নিশ্চিহ্ন হয়।

দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যুর পরে জর্মানিতে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে, সুদীর্ঘ তেইশ বছর সম্রাট-নির্বাচন স্থগিত থাকে। ১২৭৩ অব্দে হাপ্‌স্‌বুর্গের কাউণ্ট রুডল্‌ফ্‌ সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হন। ইউরোপের সাম্রাজ্য-উত্থানপতনের রঙ্গালয়ে এবার হাপ্‌স্‌বুর্গ-রাজবংশের আবির্ভাব হয়। সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার আগে পর্যন্ত এই বংশ কোনোমতে টিঁকে ছিল। রাজবংশ হিসাবে হাপ্‌স্‌বুর্গদের পতন ঘটে মহাযুদ্ধের পর। যুদ্ধ বাধবার সময় অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ ছিলেন হাপ্‌স্‌বুর্গীয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল অনেক—ইতিপূর্বেই তিনি একাদিক্রমে ষাট বছর রাজত্ব করেছেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রাঞ্জ্‌ ফার্ডিন্যাণ্ড্‌। বল্‌কান দেশের বোস্‌নিয়া জেলার সেরাজেভো শহরে ফ্রাঞ্জ্‌ ও তাঁর স্ত্রী আততায়ীর হাতে ১৯১৪ অব্দে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলেই মহাযুদ্ধের সূচনা হয় এবং মহাযুদ্ধের ফলে অন্য অনেক জিনিষের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন হাপ্‌স্‌বুর্গ-রাজবংশও লোপ পায়।

এই তো গেল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কথা। এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। দুই দেশে যুদ্ধ যদি-বা ক্ষান্ত হত, দুই দেশের সামন্তবর্গ ও রাজাদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। জর্মানির সম্রাটের চেয়ে এই দুই দেশের রাজাদের অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে; এঁরা সামন্তদের নিজেদের বশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অনেক বেশি সংহত ও একতাবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে। একতার বলে এদের শক্তি প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ইংলণ্ডে এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে সে দেশের ইতিহাসের ধারা পর্যন্ত বদলে যায়। ১২১৫ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা জন ম্যাগ্‌না কার্টা নামে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। পুরুষকেশরী রিচার্ডের পর জন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জন পরস্বাপহরণে তৎপর ছিলেন অথচ তাঁর যতটা লোভ ছিল ততখানি ক্ষমতা ছিল না। ফলে তিনি সকলেরই বিরক্তিভাজন হয়ে পড়েন। সামন্তেরা তাঁর পিছু ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত টেম্‌স্‌ নদীর উপর অবস্থিত রাণীমিড নামে একটি দ্বীপে তাঁকে বন্দী করে এবং তাদের নিষ্কোষিত তলোয়ারের হুমকি দেখিয়ে জনকে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করায়। এই ম্যাগ্‌না কার্টায় অর্থাৎ মহাঘোষণা-পত্রে সই করতে গিয়ে রাজাকে অঙ্গীকার করতে হয় যে, তিনি ইংলণ্ডের সামন্তবর্গের ও প্রজাসাধারণের কতকগুলি সহজাত অধিকার মেনে নেবেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে এটা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চুক্তিপত্রে বলা হয়, রাজা প্রজাদের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো লোকের স্বাধীনতায় কিংবা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এ থেকে জুরিপ্রথার অর্থাৎ সমশ্রেণীর লোকেদের দ্বারা বিচার-নিষ্পত্তির রেওয়াজ আসে। ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা খুব আগের থেকেই আরম্ভ হয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে রাজার সার্বভৌমত্ব-বিষয়ে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, ইংলণ্ডে সে ধারণা গোড়া থেকেই সমর্থন পায় নি।

ইংলণ্ডে সাত শো বছর আগে এই-যে একটি নীতি প্রবর্তিত হয়—ইংরেজদেরই রাজত্বে আজ ১৯৩২ অব্দেও ভারতে তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই। এ কথা ভাবতে খুব আশ্চর্য মনে হয়, না? আজ এ দেশে সর্বশক্তিমান ভাইসরয় দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, তিনি অর্ডিন্যান্স ও বিশেষ আইন জারি করে প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি হরণ করতে পারেন।

ম্যাগ্‌না কার্টা স্বাক্ষরিত হবার পর ইংলণ্ডে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। দেশের সামন্তবর্গ ও প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সমিতি ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে।

এইভাবে ইংল্যন্ডে পার্লামেণ্ট-শাসনের পত্তন হয়। লর্ড ও বিশপদের নিয়ে 'হাউজ অব লর্ড্স্' এবং জনসাধারণ ও যুদ্ধোপজীবী সামন্তদের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'হাউজ অব কমন্স' গঠিত হয়। প্রথম প্রথম পার্লামেণ্টের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, কালক্রমে জাতীয় সমিতির শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছয় যেখানে রাজা ও সমিতির মধ্যে সার্বভৌমত্ব নিয়ে শক্তিপরীক্ষা হয়। রাজা নিহত হলেন এবং দেশের লোকের প্রতিনিধি-সভা স্বীয় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এই ঘটনা ঘটে প্রায় চার শো বছর পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে।

ফ্রান্সেও তিন শ্রেণীর লোকদের এক-একটি কৌন্সিল ছিল। এই তিন শ্রেণীর লোক হল অভিজাত-সম্প্রদায়, যাজক-সম্প্রদায় ও জনসাধারণ। রাজার ইচ্ছা অনুসারে কালে-ভদ্রে এই কৌন্সিল বসত। ইংরেজ পার্লামেণ্ট যতটা ক্ষমতা অর্জন করে ফরাসি কৌন্সিল ততটা ক্ষমতা অর্জন করতে পারে নি। ফ্রান্সেও রাজশক্তি ধ্বংস হবার পূর্বে একজন রাজাকে তাঁর মস্তক দান করতে হয়।

পূর্ব-দেশে তখনও গ্রীকদের পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিল। গোড়া থেকেই কারও-না-কারও সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের যুদ্ধ লেগেই থাকত। অনেক সময় পরাভূত হবার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর-দেশাগত বর্বর ও তার পর মুসলমানদের পর পর আক্রমণ সত্ত্বেও এই সাম্রাজ্য কোনো-প্রকারে টি'কে ছিল। এই সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় রাশিয়ান, বুলগেরিয়ান, আরব ও সেলজুক তুর্কি'রা। গ্রীক সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হয় ধর্মযোদ্ধাদের আক্রমণের ফলে—এ যুদ্ধে যেমন ক্ষতি হয় তেমন সর্বনাশ তার কখনও হয় নি। বিধর্মী'রা যতটা না ক্ষতি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে খৃষ্টান-ধর্মযোদ্ধাদের দল। খৃষ্টান কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ শহরের উপর এরা যে নিদারুণ অত্যাচার করে তেমন অত্যাচার অসভ্য বর্বরেরাও করে নি। এই সর্বনাশা সংঘাতের পর কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি।

পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলি পূর্ব-ইউরোপের এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে খুব অল্পই জানত। কেবল জানত না বললে খুব কমই বলা হবে; খৃষ্টস্তানের বাইরে বলে পূর্বদেশবাসী ইউরোপীয়দের অবজ্ঞা করত। এ দেশের ভাষা ছিল গ্রীক, পশ্চিম-ইউরোপের সভ্য ভাষা ছিল লাতিন। অথচ তার পড়্তি অবস্থাতেও কন্স্টাণ্টিনোপ্লে যেমন বিদ্যাশিক্ষার চর্চা হত তেমনটা পশ্চিম-ইউরোপের খুব গৌরবের দিনেও হত কি না সন্দেহ। পূর্ব-দেশের এই বিদ্যা ছিল পরিণত বয়সের বিদ্যা, এর মধ্যে শক্তি ও সৃজনী ক্ষমতা ছিল না। পশ্চিম-দেশে বিদ্যার চর্চা বেশি ছিল না সত্য, কিন্তু এ বিদ্যায় ছিল যৌবনোচিত শক্তি, সৃজনক্ষমতা। এই শক্তিই একদিন প্রকাশ পেল শিল্পে, সাহিত্যে, নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টিতে।

পূর্ব-সাম্রাজ্যে ধর্মের সঙ্গে রাজশক্তির বিরোধ ছিল না, যেমনটা ছিল রোমে। রাজা ছিলেন সর্বশক্তিমান, তাঁর যথেচ্ছাচারিতায় কারও বাধা দেবার অধিকার ছিল না। এরকম স্বৈরতন্ত্রী রাজার অধীনে স্বাধীনতার প্রসঙ্গই ওঠে না। ছলে বলে কৌশলে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই করতেন সিংহাসন অধিকার। অন্যায় করে, রক্তপাত করে যিনি রাজমুকুট ছিনিয়ে নিতেন, প্রজাসাধারণ সভয়ে মেষপালের মতো তাঁকেই অনুসরণ করত। কে রাজা হলেন এতে তাদের খুব বেশি মাথাব্যথা ছিল না; তারা জানত যে রাজ-আজ্ঞা তাদের প্রতিপালন না করে গত্যন্তর নেই।

ইউরোপের তোরণদ্বারে পূর্ব-সাম্রাজ্য ছিল শান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে, এশিয়ার আক্রমণ থেকে পশ্চিমকে রক্ষা করাটাই ছিল যেন তার কাজ। শত শত বছর এ আক্রমণ তারা ঠেকিয়ে রেখেছিল। আরবরা কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ অধিকার করতে পারে নি। এই শহরের দরজা থেকে সেলজুক তুর্কি'দের বিদায় নিতে হয়। মঙ্গোলরা রাশিয়া আক্রমণ করতে যায় এর পাশ কাটিয়ে। সর্বশেষে আসে অটোম্যান তুর্কি'রা; এদের হাতেই শেষ পর্যন্ত ১৪৫৩ অব্দে এই বহুপ্রখ্যাত নগরীর পতন ঘটে, এবং এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-সাম্রাজ্যেরও পতন হয়।

ইউরোপে শহর ও নগরের উৎপত্তি

২১শে জুন, ১৯৩২

যে সময়ে ক্রুসেড পরিচালিত হচ্ছিল সেটা ছিল ইউরোপে ধর্মবিশ্বাসের যুগ। এই ধর্মের জোরেই লোকে দৈনন্দিন দুঃখকষ্ট সহ্য করত। সে যুগে না ছিল বিজ্ঞান, না বিদ্যানুশীলন; আর, ধর্ম বিজ্ঞান এবং শিক্ষা এই তিনের সমন্বয় বড়ো-একটা দেখাও যায় না। বিদ্যা আর জ্ঞান মানুষকে ভাবতে শেখায়। ধর্মের সঙ্গে প্রশ্ন এবং সন্দেহের যোগাযোগ সহজে হয় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে পরীক্ষা আর অনুসন্ধিৎসার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, কিন্তু ধর্মের পথ আলাদা। কী করে এই ধর্মের মধ্যে দুর্বলতা ঢুকল এবং লোকের মনে সন্দেহ জাগল তা পরে আমরা দেখতে পাব।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের খুব জাঁকালো অবস্থা। রোমান চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায় ছিল ধর্মনেতা, এবং অনেক ক্ষেত্রে শোষক। হাজার হাজার ধর্মবিশ্বাসীকে পাঠিয়েছিল প্যালেস্টাইনে ধর্মযুদ্ধে, কিন্তু তারা আর ফেরে নি। ইউরোপে অনেক খৃষ্টান কিংবা খৃষ্টান-সংঘ সব ক্ষেত্রে পোপকে মানত না; তাই তিনিও তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে শুরু করলেন। কেবল তাই নয়, পোপ এবং উর্ধ্বতন ধর্মসম্প্রদায় মনে করতেন ধর্মের উপরে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার; সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই চার্চের কতক বিধি অমান্য করবার অনুমতি দিয়ে পোপ এক বিধান বা 'ডিস্‌পেন্‌সেশনস্‌' জারি করেছিলেন। তবেই দেখো, যে চার্চ আইন জারি করত, অবস্থাবিশেষে তা অমান্য করবার ব্যবস্থাও সেই দিত। সুতরাং কতকাল আর ঐ-সমস্ত বিধির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকবে? পাশাপাশি আর-একটা ব্যবস্থাও পোপ করেছিলেন, সেটা হল ক্ষমা বা 'ইন্‌ডাল্‌জেন্স্‌'। রোমান ধর্মসম্প্রদায়ের মতে, মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা চলে যায় স্বর্গ আর নরকের মধ্যবর্তী একটা জায়গায়; পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত পাপকার্যের জন্যে দণ্ড ভোগ করতে হয় সেখানে। পরে এক সময়ে সেখান থেকে আত্মা যায় স্বর্গে। পোপ কী করলেন, জানো? তিনি ব্যবস্থা দিলেন, পাপক্ষালনের স্থানে না গিয়ে মানবাত্মা সরাসরি স্বর্গে যেতে পারবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা তিনি বিনামূল্যে দিলেন না; অর্থের বিনিময়ে লোককে এই ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হত। জনসাধারণের ধর্ম-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে চার্চ এভাবে শোষণ করত তাদের। এটা ক্রুসেডের পরেকার কথা। এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি হল, অনেকেই রোমান চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল।

আশ্চর্য যে, লোকে এসব অন্যায় সহ্য করে থাকে। তাই তো অনেক দেশেই ধর্ম একটা মস্ত ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে গেছে। মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতদের কাণ্ডটা দেখো-না কেন; যারা পুজো দিতে আসে তাদেরকে শোষণ করতে এরা খুব মজবুত। গঙ্গার তীরে যাও, দেখবে, আগেভাগে পাওনাটা আদায় না করে পাণ্ডাঠাকুর কারও কাজ করতে রাজি নয়। বাড়িতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, যাই ঘটুক-না কেন, পুরোহিত আসবে, এবং তোমার কিছু অর্থদণ্ডও হবে।

হিন্দু খৃষ্টান ইসলাম প্রভৃতি সব ধর্মেই ইত্যাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেক ধর্মেরই আবার টাকা আদায়ের একটা নিজস্ব ফন্দি আছে। হিন্দুধর্মে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থায় অস্পষ্টতা নেই কোনো। ইসলামধর্মে পুরোহিতের বালাই নেই, এবং সেইহেতু অতীতে মুসলমানগণ শোষণের হাত থেকে কতকটা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু কালে কালে সমাজে হরেক রকমের লোক আর শ্রেণীর উদ্ভব হল,— কত মোল্লা, মৌলবি, পীর, ধর্মোপদেশক, আরও কত কী। তারা জনসাধারণকে প্রতারণা করে শোষণ শুরু করল। যেখানে নাকি মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় টিকি, কপালে ফোঁটা-তিলক, পরনে আলখাল্লা কিংবা গেরুয়া বসন থাকলেই পরম সাধু মহাপুরুষ বলে গণ্য হওয়া যায় সেখানে লোককে প্রতারণা করা তো কঠিন ব্যাপার নয়।

আমেরিকা তো সবচেয়ে উন্নত দেশ। সেখানেও ধর্ম একটা ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে, জনগণকে শোষণ করাই তার কাজ।

এই দেখো, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি, মধ্যযুগ থেকে ধর্মের যুগে! মধ্যযুগের কথাই আরও বলবার আছে। দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম আর ধরাছোঁয়ার বাইরে নেই। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম-ইউরোপ-ময় গির্জা বা ধর্মমন্দির নির্মিত হয় এবং এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের স্থপতিবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাট এক-একটি গির্জা, কিন্তু কী-এক কৌশলে যেন এই বিরাট ইমারতের ছাদের ভার রাখা হল বাইরের দিকে দেয়ালের উপর। অভ্যন্তরভাগে যে সরু সরু স্তম্ভ আছে, মনে হবে, বুঝি-বা ওর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত; কিন্তু আদতে তা নয়। আর ঐ-যে খিলান, সেটার গড়ন ছিল আরবি স্থাপত্যের অনুকরণে। চূড়াটা উপরের দিকে ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এইভাবে এই গড়নরীতির উদ্ভব হয়েছিল ইউরোপে, একে বলা হত গথিক স্টাইল। ভারি সুন্দর! ধর্মের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে যেন। গির্জার এই গঠনরীতি ধর্মের যুগের খাঁটি নিদর্শন। যেসকল স্থপতি আর কারিগর তাদের শিল্পে একান্তভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে একমাত্র তাদের দ্বারাই এই ধরনের ইমারত নির্মাণ সম্ভব।

পশ্চিম-ইউরোপে এই গথিক স্টাইলের উদ্ভব সত্যিই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। সেই অরাজকতা, অজ্ঞতা আর অসহিষ্ণুতার দিনেই গড়ে উঠেছিল এই সুন্দর শিল্পাদর্শ। ফ্রান্স, উত্তর-ইতালি, জর্মানি আর ইংলণ্ডে একই সময়ে ঐ গথিক স্টাইলে গির্জা তৈরি হয়েছিল। কখন কী অবস্থায় এদের নির্মাণ শুরু হয় বলা বড়ো শক্ত; কারিগরদের নামও কেউ জানে না। আর-একটা নূতন জিনিষ হল, গির্জার জানলায় রঙিন কাঁচের ব্যবহার; তাতে আবার নানা রঙে সুদৃশ্য ছবি আঁকা থাকত, এবং ঐ জানলার ভিতর দিয়ে যে আলো প্রবেশ করত তা গির্জার গুরুগম্ভীর ভাবকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলত।

ইতিপূর্বে এক চিঠিতে আমি এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের তুলনা করেছিলাম। তখনকার দিনে এশিয়া শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইউরোপের চেয়ে ঢের বেশি উন্নত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি।—আমার মতে সৃষ্টিই জীবন। অর্ধসভ্য ইউরোপ গথিক স্থাপত্যশিল্পের উদ্ভাবন করেছিল, সুতরাং সেখানে যে জীবনীশক্তি প্রবল ছিল তা স্বীকার করতে হবে। নানা গোলযোগ, আর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভাব সত্ত্বেও জীবনের গতি রুদ্ধ হয় নি সেখানে; গথিক ধরনের ইমারতগুলো তার সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তীকালে এই জীবনীশক্তি স্ফূর্ত হয়েছে চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, আর নানা দুঃসাহসিক কার্যে।

গথিক ধরনের গির্জা তুমিও দেখেছ, কিন্তু হয়তো মনে নেই। সেই-যে জর্মানির কলোন-নগরের সুদৃশ্য ক্যাথিড্রাল? আর ইতালির মিলানে, ফ্রান্সের সাত্রাস্ নগরে? কিন্তু কত আর নাম করব? জর্মানি ফ্রান্স ইংলণ্ড আর উত্তর-ইতালির যেখানে-সেখানে এই ধরনের ক্যাথিড্রাল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য, রোমে এই জিনিষটি নেই।

ঐ একাদশ আর দ্বাদশ শতাব্দীতে গথিক ধরনের ছাড়া অন্য ধরনের গির্জাও নির্মিত হয়েছিল, যেমন প্যারির নোতরদাম্ এবং ভেনিস-নগরের সেণ্ট্ মার্ক্ গির্জা। এগুলো গ্রীক স্থাপত্যের নিদর্শন।

কিন্তু ক্রমশ ধর্মের যুগে ভাটা এল, গির্জা ক্যাথিড্রাল ইত্যাদি নির্মাণের ঝোঁকও কমল। লোকের মন তখন অন্য দিকে—ব্যবসাবাণিজ্যে আর নাগরিক-জীবনযাত্রায়। ক্যাথিড্রালের পরিবর্তে গড়ে উঠল টাউন-হল্। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই দেখা গেল, উত্তর আর পশ্চিম-ইউরোপের সর্বত্র সুদৃশ্য গথিক স্টাইলের টাউন-হল্ কিংবা নাগরিক-সমাজগৃহের ছড়াছড়ি। লণ্ডনে পার্লামেণ্ট-ভবন গথিক ধরনে নির্মিত। কবেকার তৈরি আমার জানা নেই, তবে আমার ধারণা, আদত গথিক ইমারতটি কোনো-এক সময়ে আগুনে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে ঐ ধরনের আর-একটি গৃহ নির্মিত হয়।

ইউরোপময় একটা পরিবর্তন শুরু হল, দেখা দিল একটা নূতন জীবনের স্পন্দন। চার দিকে নূতন নূতন শহর আর নগর গড়ে উঠতে লাগল, লোকের ঝোঁক এল নাগরিক জীবনযাত্রার প্রতি। অবশ্য, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর গথিক ক্যাথিড্রালগুলিও গড়ে উঠেছিল শহরে আর নগরে। সেই রোমান সাম্রাজ্যের যুগেও ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে বড়ো বড়ো নগরাদির অভাব ছিল না। কিন্তু

রোম-সাম্রাজ্য আর গ্রীক-রোমান সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোপ পেয়ে যায়; বলতে গেলে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ছাড়া বড়ো নগর ইউরোপে আর ছিল না। অথচ তখন এশিয়ার নানা দেশে—ভারতবর্ষ চীন এবং আরব প্রভৃতিতে বড়ো বড়ো নগরের অভাব ছিল না। শহর সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশাপাশি গড়ে ওঠে; রোমের পতনের পরে ইউরোপে এ তিনের কোনোটাই ছিল না।

কিন্তু এখন আবার নাগরিক জীবন নূতন করে গড়ে উঠতে লাগল, বিশেষত ইতালিতে। এই নগরগুলি পবিত্র রোমান-সম্রাটদের পথে কণ্টকস্বরূপ ছিল, কেননা এদের যেসব নির্দিষ্ট নাগরিক-অধিকার ছিল সেসবের সংকোচে এরা রাজি হত না। এখন ইতালির এই সমস্ত নগরে এবং অন্যত্রও ব্যবসায়ী আর মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া (bourgeoisie) শ্রেণীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল।

ভেনিস ছিল স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাজ্য; আদ্রিয়াতিক-সমুদ্রে তার আধিপত্য। কী সুন্দর দেখায় এই ভেনিস-নগরীকে, আঁকাবাঁকা জলপথে ঘেরা। লোকে বলে, এ স্থানটা আগে ছিল জলাভূমি। হূন-নেতা এত্তিলা যখন একুইলিয়া আক্রমণ করেন তখন কতক লোক পালিয়ে ভেনিসের জলাভূমিতে আশ্রয় নেয়; পরে তারাই ভেনিস শহর গড়ে তোলে। পূর্ব এবং পশ্চিম রোমান-সাম্রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত ছিল বলে ওটা স্বাধীন থেকে যায়। ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ভেনিস ব্যবসাবাণিজ্যের যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, তাতে করে তার বিস্তর অর্থসমাগম হয়; ক্রমে শক্তিশালী নৌবিভাগ গড়ে তোলে। এখানে প্রজাতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল, প্রেসিডেণ্টকে বলা হত 'দোগা'। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এই প্রজাতন্ত্র রাজ্য অধিকার করেন। তখন দোগা ছিল একজন খুন্‌খুনে বৃদ্ধ। কথিত আছে, নেপোলিয়ন যেদিন বিজয়ীর বেশে ভেনিসে প্রবেশ করেন সেদিনই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। সেই ভেনিসের শেষ দোগা।

ইতালির আর-এক দিকে ছিল জেনোয়া-নগরী, ব্যবসাবাণিজ্য আর নৌশক্তির দিক থেকে ভেনিসেরই সমকক্ষ। মাঝখানে বলোনা পিসা ভেরোনা আর ফ্লোরেন্স; কত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্ম হয়েছিল এই ফ্লোরেন্স-নগরে। মেদিসি-বংশের শাসনকালে ফ্লোরেন্স খুব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। উত্তর-ইতালির মিলান শহর ছিল কলকারখানার কেন্দ্র। আর দক্ষিণে নেপ্‌ল্‌স্‌ শহরের তখন উঠন্ত অবস্থা।

ফ্রান্সের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই প্যারি-নগরীর প্রতিপত্তি বেড়েছে। ফ্রান্সের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র এই প্যারি-নগরী। কত দেশের কত রাজধানীই তো ছিল; কিন্তু প্যারি যেমন নাকি ফ্রান্সের উপর আধিপত্য করেছে তেমন কি আর-কোনো রাজধানী পেরেছে? অন্তত গত হাজার বছরের মধ্যে এমনটি দেখা যায় নি। ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলোর মধ্যে লিওঁ, মার্সাই, অর্লেয়াঁ, বর্দো আর বলোন প্রসিদ্ধ।

ইতালির ন্যায় জর্মানিতেও নানা শহর গড়ে উঠছিল, বিশেষ করে ত্রয়োদশ আর চতুর্দশ শতকে। তাদের লোকসংখ্যা বাড়ল; সম্পদ ও ক্ষমতা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের সাহসও বাড়ল। তখন ব্যবসার স্বার্থে কয়েকটি শহর একজোট হয়ে এক-এক দল পাকাল, কখনও-বা দলগুলো পরস্পর হানাহানি শুরু করল। এ বিষয়ে সম্রাটের কাছ থেকেই তারা উৎসাহ পেত। ঐসকল শহরের মধ্যে হাম্‌বুর্গ্‌, ব্রিমেন, কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট্‌, মিউনিক, ডান্‌জিগ, নুরেম্‌বার্গ্‌, ব্রেস্‌লো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নেদারল্যাণ্ডে (আধুনিক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম) ছিল আন্তোয়ার্প্‌ আর ঘেণ্ট্‌ বাণিজ্যপ্রধান শহর। ইংলণ্ডে অবশ্য তখন লণ্ডন-শহর ছিল, কিন্তু কোনো দিক দিয়েই তা ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরগুলোর সমকক্ষ ছিল না—না আকারে, না অর্থসম্পদে, না ব্যবসাবাণিজ্যে। শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে অক্স্‌ফোর্ড্‌ আর কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল। ইউরোপের পূর্বাংশে ছিল সুপ্রাচীন ভিয়েনা-নগরী, আর রুশিয়ায় ছিল মস্কো, কিয়েভ ও নভোগরোদ।

এই-যে নূতন নূতন শহরগুলো গড়ে উঠল, এর উপলক্ষ্য ছিল ব্যবসাবাণিজ্য, কোনো রাজা কিংবা সম্রাটের আনুকূল্যে এগুলোর সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং পুরোনো সাম্রাজ্যিক শহরগুলোর সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল। এদের ক্ষমতা ছিল ব্যবসায়ী-শ্রেণীর হাতে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের হাতে নয়। এক কথায়, এগুলো ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের শহর। সুতরাং এদের উন্নতির অর্থ ছিল, মধ্যবিত্ত-

শ্রেণীর উন্নতি। পরবর্তীকালে আবার এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজা কিংবা সামন্ততান্ত্রিকদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু সে অনেককাল পরের কথা।

দেখা গেছে, যেখানে শহর সেখানেই সভ্যতার বিকাশ। শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও হয় প্রচার প্রসার, আর জাগে স্বাধীনতার স্পৃহা। গ্রামাঞ্চলে লোক বাস করে বিচ্ছিন্নভাবে, আর তারা প্রায়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাদের খাটুনি বেজায়, বিশ্রাম নেই বললেই হয়; হুকুম অমান্য করবার সাহসও নেই। ওদিকে শহরে জীবনযাত্রাপ্রণালী আলাদা। লোকে বাস করে দলবদ্ধভাবে; শিক্ষায়, চিন্তায়, আলাপ-আলোচনায় ভদ্রজীবন-যাপনের সুযোগ মেলে শহরে।

আর সেই স্বাধীনতার স্পৃহা! সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, এবং ধর্মের ব্যাপারে চার্চের কর্তৃত্ব—এই উভয়প্রকার নাগপাশ থেকেই লোকে মুক্তি খোঁজে। বিশ্বাসের যুগ যায়, শুরু হয় সন্দেহ। পোপ আর চার্চের কর্তৃত্ব লোকে আর অন্ধভাবে মেনে নেয় না। পোপের প্রতি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের ব্যবহার তো আমরা জানি। সেই অগ্রাহ্যের ভাবটা ক্রমশ বেড়ে চলল।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষার দিকটাও যেন পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ইউরোপে তখন লাতিনভাষাই ছিল শিক্ষার বাহন। জ্ঞানলাভের আশায় ইতালির লোকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়াত। ইতালির বিখ্যাত কবি দান্তে এলিঘিরির জন্ম হয় ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে, আর কবি পেট্রার্ক্ জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৪ সনে। এর অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ডে বিখ্যাত কবি চসারের আবির্ভাব।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। এই সময়েই প্রথম বিজ্ঞানচর্চার দিকে লোকের ঝোঁক এসেছিল। আরবদের বৈজ্ঞানিক-স্পৃহা ছিল, এ কথা পূর্বে বলেছি; খানিকটা চর্চা তারা করেওছিল। কিন্তু তখন তো ইউরোপে মধ্যযুগ। বিজ্ঞানচর্চায় যে অনুসন্ধিৎসা আর একাগ্র সাধনার প্রয়োজন, তা এই গোঁড়ামির যুগে সহজসাধ্য ছিল না। ধর্মসম্প্রদায়ই ছিল এর বিরোধী। কিন্তু তথাপি একটু-আধটু বিজ্ঞানচর্চা শুরু হল। ইউরোপের এই যুগে প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে একজন ইংরেজের নাম করা যেতে পারে; ইনি অক্স্‌ফোর্ডের অধিবাসী রোজার বেকন্; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এঁর জন্ম হয়।

৬৫

মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণ

২৩শে জুন, ১৯৩২

গতকাল তোমাকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি। লিখতে বসেছিলাম; জেলখানা আর পারিপার্শ্বিক সব-কিছু ভুলে গিয়ে কল্পনার রথে চড়ে একেবারে মধ্যযুগের পৃথিবীতে উধাও হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সহসা চমক ভাঙল। সেই অতীত যুগ থেকে পলকে ফিরে এলাম বর্তমান যুগে। খেয়াল হল, আমি জেলে রয়েছি। উপর থেকে আদেশ এসেছে, তোমার মা ও ঠাকুরমার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ এক মাস বন্ধ থাকবে। হেতুটা কী তা আমাকে বলা হল না। কেনই-বা বলবে, আমি কয়েদী যে! এদিকে আজ দশ দিন যাবৎ ওঁরা দেরাদুনে এসে অপেক্ষা করছেন; কিন্তু খামোকা, আমার সঙ্গে দেখা না করেই ওঁদের ফিরে যেতে হবে। এই তো ভদ্রতা! যাক, এ নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই; জেল তো জেল, তা ভুললে চলবে না।

যা হোক, এর পরে আর অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে, আজ মন পাতলা হয়ে গেছে, তাই নূতন করে লিখতে বসেছি।

অনেক-কাল বাইরে-বাইরে ছিলাম, এবারে ভারতে ফিরে আসা যাক। মধ্যযুগের ইউরোপ আমরা দেখেছি। দেখেছি সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার এবং নানাবিধ গোলযোগ আর কুশাসনে লোকের দুরবস্থা, পোপ আর সম্রাটের দ্বন্দ্ব, ক্রুসেডের সময়ে খৃষ্টধর্ম আর ইসলামধর্মের বিরোধ, আর

দেখেছি, কী করে দেশগ্লো সব ন্তন আকারে গড়ে উঠল। আচ্ছা, ভারতবর্ষের অবস্থা তখন কীরকম ছিল?

মধ্যযুগের প্রথম দিককার ভারতের অবস্থা আমরা জানি। সুলতান মাহ্মুদ গজনি থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলেন উত্তর-ভারতে, তাও দেখেছি। মাহ্মুদের লুণ্ঠন আর ধ্বংসকার্যে ভারতে স্থায়ী পরিবর্তন কিছু ঘটে নি। তবে উত্তর-ভারতের বহু সমৃদ্ধ নগর তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন, ধ্বংস করেছিলেন অসংখ্য স্তম্ভ আর ইমারত। কেবলমাত্র সিন্ধুদেশ এবং পাঞ্জাবের কতকাংশ তিনি নিজের শাসনাধীন করেছিলেন; দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ, কিংবা ভারতের অন্য কোনো অংশ তিনি গজনি-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। মাহ্মুদের আক্রমণের দেড় শো বছর পরেও মুসলিম-রাজ্য কিংবা ইসলামধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে, আবার উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত থেকে ভারত-আক্রমণ শুরু হয়। তখন গজনি-সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে এবং ঘোর-রাজ্যের আফগান শাসক সাহাবুদ্দিন ঘোরি পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি লাহোর অধিকার করে দিল্লির দিকে অভিযান করেন। দিল্লির অধিপতি ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। উত্তর-ভারতের আরও কয়েকজন হিন্দু রাজার সংগে মিলিত হয়ে তিনি সাহাবুদ্দিন ঘোরিকে বাধা দেন এবং যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু পর-বৎসর সাহাবুদ্দিন ঘোরি বহু সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন।

পৃথ্বীরাজ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। লোকে আজও তাঁর নাম করে থাকে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এ দেশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যাকে তিনি হরণ করে নিয়েছিলেন। এই হেতু রাজা জয়চন্দ্র তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং দুজনের মধ্যে এই শত্রুতাই সাহাবুদ্দিন ঘোরির জয়লাভের সহায়তা করেছিল।

১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করে সাহাবুদ্দিন ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন; ক্রমশ তা বিস্তার লাভ করতে লাগল। দেড় শো বছরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের বহুলাংশ তার অন্তর্ভুক্ত হল। কিন্তু শীঘ্রই আবার বাধা পড়ল। দাক্ষিণাত্যে গোটাকতক হিন্দু ও মুসলমান স্বাধীন রাষ্ট্র এই সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়; এদের মধ্যে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য প্রধান। প্রায় দু শো বছর মুসলমান-সাম্রাজ্য কোণঠাসা হয়ে রইল। তার পরে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবরের সময় থেকে আবার শুরু হল ইসলামের জয়যাত্রা, প্রায় সমগ্র ভারতে তার প্রতিপত্তি স্থাপিত হল।

এই মুসলমান-আক্রমণেরও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতবর্ষে। আক্রমণকারীরা সকলেই ছিল আফগান—আরব অথবা পারশ্যবাসী নয়, কিংবা পশ্চিম-এশিয়ার শিক্ষিত এবং সুসভ্য মুসলমানও নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আফগানরা ভারতীয়দের সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু তারা ছিল অধিকতর পরাক্রমশালী জাতি আর সজীব। ভারতীয়রা তখন অচল অসাড় জাতি, জীবনহারা। তারা প্রাচীনপন্থী, সাবেকি আমলের রীতিনীতিই আঁকড়ে ধরে ছিল; এমনকি যুদ্ধনীতিরও পরিবর্তন করে নি। তাই তো, সেকালের ভারত, সাহসী আর ত্যাগী হয়েও, মুসলমানদের নিকট পরাস্ত হয়েছিল।

প্রথমে এই মুসলমানরা কী ক্রূর আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকই-না ছিল! অবশ্য কারণও ছিল। একে তো তাদের দেশটাই ছিল কাঠখোট্টাগোছ, কোমলতার স্থান ছিল না সেখানে; তার উপরে আবার ওরা এসে পড়েছিল একটা অজানা অচেনা দেশে, চার দিকে শত্রু, প্রতিমুহূর্তে বিদ্রোহের আশংকা। এ অবস্থায় নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় কী? লোককে দমিয়ে রাখতে হবে তো? তাই নির্বিচারে হত্যা চলল। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডে ধর্মের প্রশ্ন ছিল না কোনো; আসল ব্যাপার হল, বিজয়ী কর্তৃক পরাজিতের বিদ্রোহী মনোভাব নষ্ট করা। সাধারণতই দেখা যায়, এইসব নিষ্ঠুর কার্যের অজুহাত হিসাবে ধর্মকে দাঁড় করানো হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম ছিল একটা ছল, আসল কারণটা ছিল রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক। মধ্য-এশিয়ার যেসকল জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, ইসলামধর্মে দীক্ষিত হবার আগে থেকেই তো তারা

ছিল নির্দয় নিষ্ঠুর। আসল কথা কী জানো? নূতন দেশ জয় করে তার উপরে আধিপত্য বজায় রাখবার একটামাত্র উপায়ই তাদের জানা ছিল—সেটা হল ভয়প্রদর্শন।

কালক্রমে ভারতীয়দের সংস্পর্শে এই দুর্দান্ত জাতির স্বভাব কোমল হল, সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগল। বিদেশী আক্রমণকারীর মনোভাব আর রইল না, নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করতে লাগল। বিয়ে-সাদিও হল এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে; আক্রমণকারী আর আক্রান্তের মধ্যে প্রভেদটা কমে এল ধীরে ধীরে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গজনির সুলতান মাহ্মুদ তো শ্রেষ্ঠ ধ্বংসকারীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন; হিন্দু-বিদ্বেষীও তাঁকে বলা হয়। কিন্তু শুনে অবাক হবে, তাঁর অধীনে এক হিন্দু-সেনাবাহিনীও ছিল, এবং ঐ বাহিনীর সেনানায়কও ছিল একজন হিন্দু—নাম তিলক। এই তিলক এবং তার সৈন্যবাহিনীকেই মাহ্মুদ গজনি পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহী মুসলমানদের দমন করতে। তবেই দেখো, মাহ্মুদের উদ্দেশ্যটা ছিল দেশ-জয়। তিনি ভারতবর্ষে যেমন মুসলমান সৈন্যের সাহায্যে মূর্তিপূজাপন্থীদের দমন করেছেন, তেমনি আবার মধ্য-এশিয়ায় হিন্দু সৈন্যের সহায়তায় মুসলমানদের হত্যা করতে কশুর করেন নি।

ইসলামধর্ম ভারতকে একটা নাড়াচাড়া দিলে। ইদানিং ভারতবর্ষের সমাজ তথাকথিত অচলায়তনে পরিণত হয়েছিল, সর্বপ্রকার অগ্রগতির ধারা ছিল রুদ্ধ। ইসলাম এনে দিল জীবনী-শক্তি, অগ্রগতির উদ্যম। হিন্দু-শিল্পকলার অবনতি ও বিকৃতি ঘটেছিল; উত্তর-ভারতে একটা নূতন শিল্পকলার জন্ম হল—সজীব ও সতেজ; একে ইন্দো-মুসলিম শিল্পকলা বলা যেতে পারে। মুসলমানরা যে নূতন ভাবধারা আমদানি করল ভারতীয় স্থপতিবিশারদগণ অনুপ্রাণিত হল তাতে; ইসলামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শের ছাপ পড়ল স্থাপত্যে।

মুসলমান-আক্রমণের ফলে উত্তর-ভারত থেকে দলে দলে লোক দক্ষিণ-ভারতে চলে গেল। মাহ্মুদের লুণ্ঠন আর হত্যাকাণ্ডের পর উত্তর-ভারতে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। লোকে মনে করত, যেখানে ইসলাম সেখানেই নৃশংসতা আর ধ্বংস। সুতরাং নূতন আক্রমণ যখন শুরু হল, যতসব গুণীজ্ঞানী লোক চলে গেল দাক্ষিণাত্যে; ফলে সেখানকার আর্যসভ্যতায় খুব-একটা সজীবতা ও উদ্দীপনা এসে গেল।

দাক্ষিণাত্যের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে কিছু কিছু বলেছি। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে দু শো বছর-কাল চালুক্য-সাম্রাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করেছিল পশ্চিম আর মধ্য -ভারতে, অর্থাৎ মারাঠাদেশে। হিউয়েন শাঙ সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভায় এসেছিলেন। তার পরে এল রাষ্ট্রকূটরা; ওরা চালুক্যদের পরাস্ত করে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেছিল প্রায় দু শো বছর, অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সিন্ধুর আরব-রাজাদের বেশ সদ্ভাব ছিল; বহু আরব-ব্যবসায়ী আর পর্যটক এসেছিল ওদের রাজসভায়। জনৈক পর্যটক তৎকালীন (নবম শতাব্দী) রাষ্ট্রকূট-সম্রাট সম্বন্ধে বলে গেছেন যে, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন সম্রাটের মধ্যে একজন। তাঁর মতে অন্য তিনজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন, বোগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট আর রুম অর্থাৎ কন্স্টান্টিনোপ্লের সম্রাট। এ থেকে সেই সময়কার এশিয়ার লোকদের ধারণারই পরিচয় পাওয়া যায়। খলিফার বোগদাদ-সাম্রাজ্য তখন ক্ষমতা ও খ্যাতির শীর্ষদেশে; সুতরাং আরব-পর্যটক যে তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের তুলনা করেছেন, তাতে বোঝা যায়, ঐ রাজ্যও খুব সমৃদ্ধ আর শক্তিশালী ছিল। দশম শতাব্দীতে চালুক্য-বংশ আবার পরাক্রমশালী হয়ে উঠল এবং ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের পরাস্ত করে রাজত্ব করল দু শো বছর, ১১৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। একজন চালুক্য-সম্রাটের সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, তাঁর স্ত্রী স্বয়ম্বর-সভায় তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করেছিল। এই প্রাচীন আর্যরীতি যে এতকাল প্রচলিত ছিল এটা আশ্চর্যের বিষয়।

আরও দক্ষিণ-পূর্বে তামিলদেশ। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নবম শতক অবধি এই ছয় শো বছর পহ্লবী-বংশের রাজত্ব ছিল এখানে; ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শ-দুই বছর পহ্লবীরা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই পহ্লবীরাই মালয় এবং প্রাচ্যের

দ্বীপসমূহে উপনিবেশ-অভিযান প্রেরণ করেছিল, সে কথা তোমার মনে থাকবে-বা। পহ্লব-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্।

এর পরে চোল-বংশের আধিপত্য। চোল-সাম্রাজ্যের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র এই দুই সম্রাটের আমলে চোল-সাম্রাজ্য খুব পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল। ওঁরা বিরাট নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং সিংহল, ব্রহ্ম আর বঙ্গদেশ জয় করতে গিয়েছিলেন। এ'দের প্রধান কীর্তি, গ্রাম্য পঞ্চায়েত-প্রথার প্রচলন। নীচ থেকে শুরু করে উপর অবধি এই প্রথায় কাজ হত। গ্রাম্য সমিতিগুলো নির্বাচন করত বিভিন্ন কার্যনির্বাহক সমিতি আর জেলা-সমিতি; কতকগুলো জেলা নিয়ে গঠিত হত একটা প্রদেশ। আমি অনেক চিঠিতেই এই স্বায়ত্তশাসন-প্রথার উল্লেখ করেছি; আর্যশাসনব্যবস্থার মূলে ছিল এই প্রথা।

উত্তর-ভারত যখন আফগানদের আক্রমণে বিপর্যস্ত, দক্ষিণ-ভারতে তখন চোল-বংশের প্রাধান্য। কিন্তু আশ্চর্য, শীঘ্রই চোল-বংশ হীনবল হয়ে পড়ে এবং তাদেরই অধীন একটা ছোটো রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্যের নাম পাণ্ড্য-রাজ্য, মাদুরা ছিল এর রাজধানী। এখানে কয়াল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ভেনিসবাসী প্রসিদ্ধ পর্যটক মার্কোপোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুবার কয়াল-বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত বিবরণে কয়াল-নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে; আরব ও চীন দেশের বাণিজ্য-জাহাজে বন্দর ভর্তি থাকত। মার্কো জাহাজে করেই চীন থেকে এখানে এসেছিলেন। মার্কোর বিবরণে সূক্ষ্ম মসলিন-বস্ত্রের উল্লেখ আছে, তৈরি হত ভারতের পূর্ব-উপকূলে। মাদ্রাজের উত্তরে তেলেগু-রাজ্যের রানী ছিলেন রুদ্রমণি দেবী; ইনি চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। মার্কোপোলো এ'র খুব প্রশংসা করেছেন। ওঁর বিবরণে আর-একটা খবর আছে—আরব ও পারশ্য থেকে বিস্তর ঘোড়া দক্ষিণ-ভারতে আমদানি হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের জলবায়ু অশ্ব-উৎপাদনের উপযোগী ছিল না। লোকে বলে, ভারতের মুসলমান-আক্রমণকারীরা যে ভালো যোদ্ধা ছিল তার একটা কারণ, তাদের ঘোড়াগুলো খুব তেজী ছিল। এশিয়ায় অশ্ব-উৎপাদনের ভালো ভালো স্থানগুলো ওদেরই অধীনে ছিল কিনা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোল-বংশের পতনের পর পাণ্ড্য-রাজ্যই ছিল প্রভাবশালী তামিল-রাজ্য। চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-আক্রমণের ঢেউ এসে পৌঁছল দাক্ষিণাত্যে; অচিরে পাণ্ড্য-রাজ্য মুসলমানদের বশীভূত হল।

এই চিঠিতে দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল, অবশ্য এর অনেক কথা আমি আগেও তোমাকে লিখেছি। পহ্লব, চালুক্য, চোল প্রভৃতি কত কত বংশের রাজত্ব, সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে সমগ্রভাবে যদি এই যুগের ইতিহাসের দিকে তাকাও, মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে বেগ পেতে হবে না। অশোক সারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তুমি জানো; তা ছাড়া সমগ্র আফগানিস্থান এবং মধ্য-এশিয়ার কতকাংশও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর রাজত্বের পর দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র-সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়; এর প্রতিপত্তি বজায় ছিল চার শো বছর। এই সময়েই আবার উত্তর-ভারতে ছিল কুষাণ-সাম্রাজ্য। তেলেগু অন্ধ্র-বংশ হীনবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তামিল পহ্লব-বংশের আবির্ভাব হয়; এই বংশ রাজত্ব করল দীর্ঘ ছয় শো বছর। পহ্লবীরা মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তার পরে চোল-বংশের রাজত্ব। শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল এদের; তাই তো সমুদ্রেও আধিপত্য ছিল চোলদের, জয় করেছিল তারা দূরদূরান্তের দেশ। তিন শো বছর রাজত্বের পর চোল-বংশের অন্তর্ধান; তার স্থান অধিকার করে পাণ্ড্য-রাজ্য। রাজধানী মাদুরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল, কয়াল হল বাণিজ্যপ্রধান বন্দর।

এই হল দক্ষিণ আর পূর্ব -ভারতের ইতিহাস। পশ্চিমে মহারাষ্ট্র-অঞ্চলে প্রথমে ছিল চালুক্য-বংশের রাজত্ব; পরে রাষ্ট্রকূট এবং তার পর আবার চালুক্যদের আধিপত্য।

অনেকগুলো বংশের নাম উল্লেখ করতে হল। একটা বিষয় লক্ষ্য করবে, এইসকল রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল, এবং উঁচুদরের সভ্যতা বিস্তার করেছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ছিল এদের এবং সেজন্যেই ইউরোপের রাজ্যগুলোর চেয়ে এরা বেশি দিন টি'কে ছিল, শান্তিতেও ছিল। কিন্তু

কী জানো, সমাজের কাঠামোটা জীর্ণ হয়ে এসেছিল, তাই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন দক্ষিণ-দিকে মুসলমান-সৈন্যরা অগ্রসর হতে লাগল, ওটা ভেঙে পড়তে সবুর সইল না।

৬৬

দিল্লির দাস-রাজবংশ

২৪শে জুন, ১৯৩২

গজনির সুলতান মাহ্‌মুদের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে বলেছি; তাঁর রাজসভার বিখ্যাত কবি ফির্দৌশির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মাহ্‌মুদের অনুরোধেই ফির্দৌশি 'শাহ্‌নামা' রচনা করেছিলেন। মাহ্‌মুদের সময়কার আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলা হয় নি। ইনি সুপণ্ডিত আলবেরুনি; মামুদের সঙ্গে পাঞ্জাবে এসেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ করতে নয়। ইনি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের মানুষ ছিলেন। এই দেশটাকে চেনা ও জানার আগ্রহে তিনি সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন, এমনকি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। 'ভগবদ্গীতা' তাঁর খুব প্রিয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে চোল-সাম্রাজ্যে উন্নত ধরনের সেচকার্যের ব্যবস্থা দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড আর অসহিষ্ণুতার সেই যুগে আলবেরুনি ছিলেন প্রকৃত সত্যের উপাসক।

পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর দিল্লিতে সুলতানী রাজত্ব শুরু হয়। এই সুলতানগণ দাস-রাজা নামে পরিচিত। কুতবুদ্দিন দাস-বংশের প্রথম সুলতান। ইনি ছিলেন সাহাবুদ্দিনের একজন ক্রীতদাস। সেকালে কোনো ক্রীতদাস বীরত্ব ও কার্যদক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে সে উচ্চপদ লাভ করতে পারত; সুতরাং সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন দিল্লিতে প্রভুত্ব স্থাপন করলেন। তাঁর পরবর্তী কয়েকজন সুলতানও প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস, তাই একে দাসবংশীয় রাজত্ব বলা হয়। এ'রা সকলেই অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন; এ'দের রাজত্বে লুণ্ঠন, ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড অবাধে সংঘটিত হয়েছিল। পাঠাগার, পাকা ইমারতাদি এ'রা ধ্বংস করেছিলেন। ইমারত এ'রাও পছন্দ করতেন, কিন্তু ছোটো আকারের নয়। বৃহদাকার অট্টালিকা এ'রা নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লির কুতবমিনার স্তম্ভ তুমি দেখেছ, কুতবুদ্দিন এই স্তম্ভনির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সম্রাট ইল্‌তুৎমিস্‌ এই স্তম্ভের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া কয়েকটি সুদৃশ্য মসজিদ ইত্যাদিও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য এদের মালমশলা সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় অট্টালিকা, বিশেষত দেবমন্দির থেকে। আর, হিন্দু শিল্পীদের দ্বারাই তিনি ঐসমস্ত নির্মাণ করিয়েছিলেন; তবে কিনা, হিন্দু শিল্পীরা নূতন মুসলিম আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

গজনির মাহ্‌মুদ থেকে শুরু করে যে-কেউ ভারত আক্রমণ করেছে প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক ভারতীয় স্থপতি ও কারিগরকে স্বদেশে নিয়ে গেছে। এভাবেই ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যা মধ্য-এশিয়ায় প্রচারলাভ করেছিল। এই সময়ে বাংলা ও বিহারে কীরূপে আফগানরা প্রভুত্ব স্থাপন করল সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার! বাংলাদেশ তো নেহাত অতর্কিতেই তারা জয় করে নিলে!

ইল্‌তুৎমিসের রাজত্বকাল ১২১১ থেকে ১২৩৬ সন। তাঁর শাসনকালে ভারতের সীমান্তে ভীষণ দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। ব্যাপার আর কিছু নয়, চেঙ্গিস খানের অভিযান। শত্রুর পিছনে তাড়া করতে করতে তিনি সিন্ধুনদ পর্যন্ত এসেছিলেন, আর অধিক অগ্রসর হন নি। আপাতত ভারতবর্ষ রক্ষা পেল। কিন্তু প্রায় দু শো বছর পরে তাঁরই এক বংশধর ধ্বংস আর লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। আমি তৈমুরের কথা বলছি। চেঙ্গিস আসেন নি বটে, কিন্তু মঙ্গোলীয়গণ হামেশাই ভারত-আক্রমণ করেছে; সুলতানগণ তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত, কখনও-বা টাকাকড়ি দিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পেত। হাজার হাজার মঙ্গোলীয় পাঞ্জাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল।

সুলতানদের মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক, ইনি ইল্‌তুৎমিসের কন্যা রেজিয়া। শাসনকার্যে ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন; এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালনাও করতেন। কিন্তু ওমরাহগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করত। আবার মঙ্গোলদের বিরুদ্ধেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে দাস-রাজত্বের অবসান হয়। অল্পকাল পরেই আলাউদ্দিন খিল্‌জি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর পিতৃব্য এবং শ্বশুর জালালুদ্দিন খিল্‌জিকে হত্যা করে সম্রাট হন। তার পর সন্দেহভাজন সকল মুসলমান ওমরাহগণকে তিনি হত্যা করেন; কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত হন না। পাছে মঙ্গোলরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত মঙ্গোলকে হত্যা করার আদেশ করেন—যেন একজনও অবশিষ্ট না থাকে। ফলে ২০ থেকে ৩০ হাজার মঙ্গোল নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল।

বার বার হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করাটা সুখকর ব্যাপার নয়; ইতিহাসের বৃহত্তম পটভূমিকায় এসবের তেমন তাৎপর্যও নেই। তবে কিনা এ থেকে উত্তর-ভারতের তৎকালীন অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যায়; বোঝা যায়, অবস্থা মোটেই নিরাপদ কিংবা উন্নত ছিল না। বলতে গেলে, বর্বরতার যুগই যেন ফিরে এসেছিল। ইসলামধর্মের সঙ্গে একটা সভ্যতার ধারা ভারতে এসেছিল, আর আফগান-মুসলমানগণ আমদানি করল বর্বরতা। অনেকে আবার এই দুটি জিনিষকে এক করে দেখে, কিন্তু তা ঠিক নয়। এ দুয়ে পার্থক্য আছে।

অন্য সবাইর মতো আলাউদ্দিনও ছিলেন পরমত-অসহিষ্ণু। তথাপি যেন ক্রমশ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছিল। নিজেদের আগন্তুক বিদেশী বলে মনে না করে ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে মেনে নিতে শুরু করেছিলেন। আলাউদ্দিন আর তাঁর পুত্র বিবাহ করেছিলেন হিন্দুনারী।

আলাউদ্দিন উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সেনাবিভাগের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তাকে খুব শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যেই তিনি গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের বহুলাংশ জয় করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি দাক্ষিণাত্য থেকে ৫০ হাজার মোন সোনা, বিস্তর-পরিমাণে মণিমুক্তা, ২০ হাজার ঘোড়া এবং ৩১২টি হাতি লুণ্ঠন করে এনেছিল।

চিতোরের কথা তুমি জানো। বীরত্ব ও রোমান্সের কাহিনীতে ভরা এই চিতোর। প্রাচীন যুদ্ধ-রীতির পরিবর্তন না করার ফলে আলাউদ্দিনের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের নিকট চিতোর-দুর্গের পতন হয়েছিল। সে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দের কথা। দুর্গের পতন যখন আসন্ন দুর্গের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ চিরাচরিত-প্রথানুসারে জহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন করলেন। জহরব্রত হল এই যে, পরাজয় যখন আসন্ন এবং রক্ষার কোনোই উপায় থাকে না, শেষ মুহূর্তে তখন পুরুষরা সকলে দুর্গ থেকে বার হয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় আর মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাশয্যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা সাংঘাতিক কাজ। আমার তো মনে হয়, মেয়েরাও তলোয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণ দিলেই ভালো হত। সে যাই হোক, দাসত্ব ও মর্যাদাহানির চেয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয়।

এদিকে ভারতের অধিবাসী হিন্দুরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল—অবশ্য খুব মন্থরগতিতে; কেউ-বা ভয়ে, কেউ-বা সত্যি সত্যি ইসলামধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে। আবার অনেকে স্রোতের গতি লক্ষ্য করে নূতন ধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার আসল হেতুটা ছিল আর্থিক। অমুসলমানদের একটা বিশেষ ট্যাক্স দিতে হত, যাকে বলে 'জিজিয়া'-কর। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে ওটা দুঃসহ বোঝাস্বরূপ ছিল। কেবল এই ট্যাক্স থেকে রেহাই পাবার জন্যেই অনেকে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করত। আর, উচ্চশ্রেণীর লোকদের কথা আলাদা, সম্রাটের অনুগ্রহ আর উচ্চপদ-লাভ ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি মালিক কাফুর প্রথমে হিন্দু ছিলেন।

দিল্লির আর-একজন সুলতানের কথা তোমাকে বলছি; এঁর নাম মহম্মদ বিন তোগলক। অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন এই সুলতান। আরবি ও ফার্শি ভাষায় এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল; দর্শন এবং তর্কশাস্ত্র, এমনকি গ্রীক দর্শনও ইনি অধ্যয়ন করেছিলেন। তা ছাড়া অঙ্ক, বিজ্ঞান আর চিকিৎসা-শাস্ত্রও তিনি জানতেন। এক কথায়, সে যুগের পক্ষে তিনি রীতিমতো

জ্ঞানী লোক ছিলেন, আর বীরপুরুষ। কিন্তু, অবাক কান্ড! এই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন নিষ্ঠুরতার অবতারবিশেষ, আস্ত একটি পাগল! সিংহাসন লাভ করলেন পিতাকে হত্যা করে। চীন আর পারস্য-জয়ের কল্পনাও জেগেছিল এ'র মস্তিষ্কে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন—এই যেমন, রাজধানী-পরিবর্তন। দিল্লি-নগরীর কতিপয় অধিবাসী বেনামীতে তাঁর শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করেছিল, এই হেতুতে তিনি তাঁর রাজধানী ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। মহম্মদ দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত নগরী দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার আদেশ দেন। এই স্থানের নূতন নাম হল দৌলতাবাদ। বাড়ির মালিকদিগকে কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল; সুলতানের আদেশে সকল অধিবাসী তিন দিনের মধ্যে দিল্লি ছাড়তে বাধ্য হল। কতক লোক না গিয়ে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু পরে ধরা পড়ে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল তাদের; এদের মধ্যে একজন ছিল অন্ধ, আর এক ব্যক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ ছিল চল্লিশ দিনের পথ। এতটা পথ যেতে লোকদের শারীরিক কষ্টের অবধি ছিল না, পথেই কতজনের জীবনান্ত ঘটেছিল!

আর দিল্লী-নগরী? তার কী অবস্থা হল, জানো? দু বৎসর পরেই মহম্মদের মতি পরিবর্তিত হল, পুনরায় দিল্লিতে রাজধানী-স্থাপনের চেষ্টা করলেন; কিন্তু সুবিধে হল না। তাঁর খেয়ালে সুদৃশ্য দিল্লি-নগরী মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। একটা উদ্যানকে মরুভূমিতে পরিণত করা সহজ; কিন্তু মরুভূমিকে উদ্যানে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রসিদ্ধ মুর পর্যটক ইব্‌ন্‌ বতুতা সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, "দিল্লি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। আমরা যখন ঐ রাজধানীতে প্রবেশ করি তখনকার দিল্লির অবস্থা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। দিল্লি তখন পরিত্যক্ত জনহীন নগরী।" আর-এক ব্যক্তির বর্ণনা থেকে জানা যায়, দিল্লি-নগরী আট-দশ মাইল বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সমগ্র নগরীকে এরূপভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল যে, শহর কিংবা শহরতলীতে একটা কুকুর-বেড়ালও দেখতে পাওয়া যায় নি।

এই পাগলা সুলতান পঁচিশ বৎসর-কাল রাজত্ব করেন, ১৩৫১ সন পর্যন্ত। আশ্চর্য, লোকে কতকাল আর শাসকদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অক্ষমতা বরদাস্ত করবে? যাই হোক, মহম্মদের রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল। তাঁর খামখেয়ালিতে দেশের সর্বনাশ হল; তার উপরে আবার অতিরিক্ত ট্যাক্সের চাপ। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, নানা স্থানে বিদ্রোহ ঘটতে লাগল। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই সাম্রাজ্যের অনেক অংশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলাদেশ স্বাধীন হল; দাক্ষিণাত্যেও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হল, তন্মধ্যে বিজয়নগরের নাম উল্লেখযোগ্য। দু বৎসরের মধ্যে ঐ হিন্দুরাজ্য দাক্ষিণাত্যে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠল।

মহম্মদের পিতা দিল্লির নিকটে 'তোগলকাবাদ'-নামক এক নূতন শহর নির্মাণ করেছিলেন। আজও তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবে।

৬৭

চেঙ্গিস খাঁ

২৫শে জুন, ১৯৩২

গত কয়েক চিঠিতেই আমি মঙ্গোলদের উল্লেখ করেছি; বাস্তবিক তারা আতঙ্ক ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুঙ-রাজাদের আমলে তারা চীনে প্রবেশ করে; আবার পশ্চিম-এশিয়াতেও দেখতে পাই, মঙ্গোলরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে তছনছ করে দিলে। ভারতবর্ষে দাস-বংশের সম্রাটগণ যদিও তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল তথাপি তারা যে একটা মস্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাতে ভুল নেই। মঙ্গোলিয়ার এইসকল যাযাবর জাতি সমগ্র এশিয়াকে যেন অবনতির ধাপে নামিয়ে এনেছিল; কেবল এশিয়া নয়, ইউরোপের অর্ধেক অংশেরও এই দশা

ঘটেছিল। কিন্তু এরা কারা—হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সারা পৃথিবীকে চমকিত করে দিলে? মধ্য-এশিয়ার হূন, তুর্ক, তাতার প্রভৃতি জাতি ইতিপূর্বে ইতিহাসে কীর্তি রেখে গেছে; যেমন, পশ্চিম-এশিয়ার সেলজুক তুর্ক জাতি, এবং উত্তর-চীনে তাতার জাতি। কিন্তু এযাবৎ মঙ্গোলদের কার্যকলাপ তো কিছু দেখা যায় নি? সম্ভবত পশ্চিম-এশিয়ায় তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতই না। এরা ছিল উত্তর-চীনে কিন্-তাতার-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অজ্ঞাত অখ্যাত উপজাতি।

হঠাৎ যেন তারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। যে যেখানে ছিল সবাই একত্র হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ খানকে নিজেদের নেতা মনোনীত করল এবং তার আনুগত্য স্বীকার করল। খানের অধীনে শুরু হল তাদের অভিযান পিকিঙ-অভিমুখে, ধ্বংস করল কিন্-সাম্রাজ্য। তারা চলল এগিয়ে পশ্চিমদিকে, কত কত সাম্রাজ্যকে দিল ছারখার করে। রাশিয়াকেও তারা করল পদানত। অতঃপর বোগদাদকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিল, লোপ পেল সাম্রাজ্য। এভাবে অগ্রসর হয়ে তারা পোল্যাণ্ডে এবং মধ্য-ইউরোপে এসে পৌঁছল। তাদের অগ্রগতিতে কেউ বাধা দিতে পারল না। দৈবক্রমে ভারতবর্ষ রক্ষা পেল। এ যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত; এশিয়া ও ইউরোপের অধিবাসীদের নিশ্চয় তাক্ লেগে গিয়েছিল। ভূমিকম্পের মতো একটা দৈবদুর্বিপাকবিশেষ, যাতে মানুষের কোনো হাত থাকে না।

মঙ্গোলিয়ার এই যাযাবরগণ যেমন জোয়ান তেমনি ছিল কষ্টসহিষ্ণু। স্ত্রীপুরুষ সবাই এক-রকমের। বাস করত তাঁবুতে। কিন্তু তারা যে এতটা সাফল্য লাভ করেছিল তা তাদের শারীরিক শক্তি কিংবা কষ্টসহিষ্ণুতার দরুন নয়, নেতার গুণে। অসামান্য ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন এই চেঙ্গিস খাঁ। ইনি ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আসল নাম তিমুচিন। তাঁর শৈশবাবস্থায় পিতা ইয়েসুগি বাগাতুরের মৃত্যু হয়। মঙ্গোল ওমরাহগণকে 'বাগাতুর' বলা হত। এই শব্দটার অর্থ বীর। এর থেকেই উর্দু 'বাহাদুর' কথাটার উদ্ভব হয়েছে, এইরূপ আমার আন্দাজ।

দশ বছর বয়স থেকে তাঁর জীবনসংগ্রাম শুরু হয়; সাহায্য করবার ছিল না কেউ; নিজের চেষ্টাতেই তিনি বড়ো হলেন, ক্ষমতা আয়ত্ত করলেন। অবশেষে মঙ্গোলদের জাতীয় সমিতি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ খান বা কেগান অর্থাৎ সম্রাট মনোনীত করল। অবশ্য, ইতিপূর্বেই তাঁকে চেঙ্গিস নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

এই নির্বাচন সম্বন্ধে চীনদেশে ত্রয়োদশ শতকে লিখিত ও চতুর্দশ শতকে প্রকাশিত 'মঙ্গোল-জাতির গুপ্ত ইতিহাস' নামক পুস্তকেও উল্লেখ আছে।

চেঙ্গিস যখন 'কেগান' বা সম্রাট হন তখন তাঁর বয়স একান্ন বৎসর। এই বয়সে লোকে নিরিবিলিতে শান্ত জীবন যাপন করতে চায়। কিন্তু তাঁর জীবনে এই সবে জয়যাত্রার শুরু। লক্ষ্য করে থাকবে, বড়ো বড়ো যোদ্ধারা সাধারণত যৌবনকালেই দেশজয়ে বের হন। চেঙ্গিস কিন্তু যৌবনের উৎসাহে এশিয়া-অভিমুখে ধাওয়া করেন নি। তাঁর যৌবন অনেক-কাল আগেই পেরিয়ে গেছে, তখন তিনি মধ্যবয়স্ক লোক। আগে থেকে ভেবে-চিন্তে মতলব ঠিক করে তবে তিনি কাজে নেমেছেন।

মঙ্গোলরা ছিল যাযাবর, নগর এবং নাগরিক জীবনধারা তারা পছন্দ করত না। অনেকের ধারণা, ওরা ছিল বর্বর। যাযাবর কিনা? কিন্তু এটা ভুল। তারাও জীবনযাপনের একটা প্রণালী গড়ে তুলেছিল, এবং সেই ব্যবস্থাটা ছিল দস্তুরমতো জটিল। শৃঙ্খলা আর সংঘবদ্ধতার গুণেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয়েছিল, শুধু সংখ্যাধিক্যের দরুন নয়। তা ছাড়া, চেঙ্গিসের মতো একজন ক্ষমতাশালী নেতাও তাদের ছিল। এ তো জানা কথা, চেঙ্গিসের মতো নেতা আর সামরিক প্রতিভাশালী যোদ্ধা ইতিহাসে আর নেই। তাঁর সঙ্গে তুলনায় আলেকজাণ্ডার ও সিজারের স্থান অনেক নীচে। চেঙ্গিস নিজে তো বড়ো সেনানায়ক ছিলেনই, তা ছাড়া তাঁর অধীনস্থ বহু সৈন্যাধ্যক্ষকে তিনি সামরিক শিক্ষা দিয়ে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ধাওয়া করেছেন, চার দিকে শত্রু আর বিরুদ্ধভাবাপন্ন অধিবাসী, এবং তারা সংখ্যায়ও অধিক; তথাপি চেঙ্গিসের অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারে নি।

চেঙ্গিস যখন দেশ জয় করে বেড়াচ্ছেন, মানচিত্রে তখনকার এশিয়া আর ইউরোপের চেহারাটা কীরকম ছিল জানো? মঙ্গোলিয়ার পূব আর দক্ষিণ দিকে চীন তখন দ্বিধাবিভক্ত;

চেঙ্গিস — "বিধাতার অভিশাপ"
নভোগরোদ
কিয়েভের ডিউক-রাজ্য
বাইজানটাইন সাম্রাজ্য
সালাদিনের সাম্রাজ্য
বোগদাদ
বোখারা
সমরকন্দ
খোরাশান
মংগোলিয়া
কারাকোরাম
তানগুৎ
পিকিঙ
কোরিয়া
কিন্ সাম্রাজ্য
সুঙ সাম্রাজ্য
দিল্লি
তিব্বত
দাসরাজ গণ
শ্রী বি জ য়া
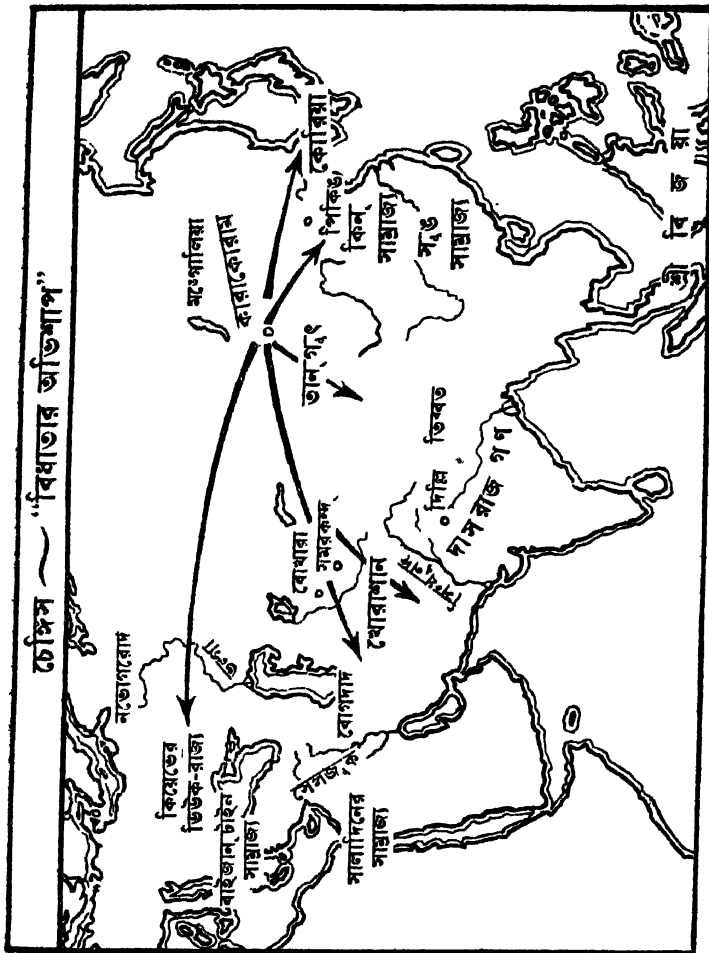
দক্ষিণে ছিল সুঙ-সাম্রাজ্য; উত্তরে কিন্‌-তাতার-সাম্রাজ্য, পিকিঙ তার রাজধানী। আর পশ্চিম-দিকে গোবি মরুভূমিতে তান্‌গুৎ-সাম্রাজ্য। ভারতবর্ষে তখন দাস-রাজাদের আমল। পারশ্য আর মেসোপটেমিয়া ছিল মুসলিম শাসনাধীনে, খোরাশান বা খিবা-সাম্রাজ্য বলা হত তাকে; ভারতের সীমান্ত অবধি তা বিস্তৃত ছিল; রাজধানী সমরকন্দ। তারও পশ্চিমে সেলজুক তুর্ক, আর মিশর ও প্যালেস্টাইনে সালাদিনের বংশধরগণ তখন রাজত্ব করছে। বোগদাদে খলিফাদের রাজত্ব।

ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড তখন শেষ পর্যায়ে। দ্বিতীয় ফ্রেডরিক তখন রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট। ইংলণ্ডে 'ম্যাগনা কার্টা'র যুগ। ফ্রান্সে নবম লুই সম্রাট; ইনি ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে তুর্কদের হাতে বন্দী হন এবং পরে অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন। পূর্ব-ইউরোপে রাশিয়া দুটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত—উত্তরে নভগরোদ্‌ আর দক্ষিণে কিয়েভ্‌। রাশিয়া এবং রোম-সাম্রাজ্যের মাঝে ছিল হাঙ্গেরি আর পোল্যান্ড। আর কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের চার দিকে তখনও বাইজান্‌টাইন-সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ছিল।

চেঙ্গিস তাঁর জয়যাত্রার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিলেন। সৈন্যদলকে সামরিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, ঘোড়াগুলিকেও শিক্ষা দিয়েছিলেন। যাযাবর জাতির পক্ষে ঘোড়া অপরিহার্য কিনা? উত্তর-চীনের কিন্‌-সাম্রাজ্য আর মাঞ্চুরিয়া বিধ্বস্ত করে তিনি পিকিঙ দখল করলেন। তার পরে কোরিয়া। দক্ষিণ-চীনের সুঙ-রাজাদের প্রতি সম্ভবত তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন, কেননা ওরা কিন্‌সাম্রাজ্য-জয়ের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল। ভবিষ্যতে নিজেদের পালাও যে আসতে পারে, সে কথা ভাবে নি। পরে তান্‌গুৎ-সাম্রাজ্যও চেঙ্গিসের অধীনতা স্বীকার করেছিল।

এত এত রাজ্য জয় করে চেঙ্গিস হয়তো-বা ক্ষান্ত দিতে চেয়েছিলেন; পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। খোরাশানের রাজার সঙ্গেও মৈত্রীসম্বন্ধ-স্থাপনে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু, তা হবে কেন? লাতিন প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বর যাদের ধ্বংস করতে চান তারাই প্রথমে পাগলামো শুরু করে। খোরাশানের শাহ্‌ এমনসব কার্যকলাপ শুরু করল যে, মনে হল, ধ্বংসই তার কাম্য। তার অধীনস্থ এক শাসনকর্তা অনেক মঙ্গোল ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। চেঙ্গিস তা সত্ত্বেও অশান্তি সৃষ্টি করতে চান নি, শুধু ঐ গভর্ণরের শাস্তি দাবি করে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শাহ্‌ তখন কাণ্ডজ্ঞানরহিত, তাঁর আদেশে দূতেরা নিহত হল। চেঙ্গিস অতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করবেন কেন? কিন্তু তিনি তাড়াহুড়ো না করে ভালোরকম তৈরি হয়ে নিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন।

এই জয়যাত্রা শুরু হয় ১২১৯ খৃষ্টাব্দে। এশিয়ায় এবং ইউরোপের কতকাংশে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল। এ যেন আবর্তমান একটা বিরাট লৌহখণ্ড, নগরের পর নগর আর লাখ লাখ মানুষ এর তলায় চাপা পড়ে পিষে যাচ্ছিল। খোরাশান-সাম্রাজ্য লোপ পেল। নিশ্চিহ্ন হল সমৃদ্ধিশালী বোখারা-নগরী; ধ্বংস হল রাজধানী সমরকন্দ, এবং তার দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে জীবিত রইল মাত্র ৫০ হাজার। হিরাট প্রভৃতি কত কত বর্ধিষ্ণু নগরী ভস্মীভূত হল, নিহত হল কত লক্ষ লক্ষ অধিবাসী। শত শত বৎসরের সাধনায় যে শিক্ষা সংস্কৃতি আর শিল্প গড়ে উঠেছিল পারশ্য ও মধ্য-এশিয়ায়, তার অস্তিত্ব আর রইল না। যে পথ দিয়ে চেঙ্গিস গেলেন তা পরিণত হল মরুভূমিতে।

খোরাশানের রাজার পুত্র জালাল্‌উদ্দিন এই বন্যাস্রোতের গতি রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সিন্ধুনদের তীরে তাঁকে এমনই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়তে হয় যে, কথিত আছে, তিনি ঘোড়াসুদ্ধ ত্রিশ ফুট নীচে নদীতে লাফিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে নদী পার হয়ে যান। দিল্লির রাজসভায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। চেঙ্গিস আর তাঁর পশ্চাদনুসরণ করেন নি।

সেলজুক-সাম্রাজ্য আর বোগদাদের সৌভাগ্য, তারা রেহাই পেল, চেঙ্গিস সোজা রাশিয়ায় ঢুকে পড়লেন। কিয়েভের ডিউককে পরাজিত করে তাকে বন্দী করলেন। কিন্তু আবার তাঁকে ফিরতে হল পূর্বদিকে, তানগুৎ-সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করতে।

১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স বাহাত্তর বৎসর। তাঁর সাম্রাজ্য কৃষ্ণসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল। মঙ্গোলিয়ায় কারাকুরাম নগর ছিল তাঁর

রাজধানী। যাযাবর হলে কী হয়, সংগঠন-ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। তাঁর মৃত্যুতে তাই সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে নি।

পারশিক ও আরবি ঐতিহাসিকদের মতে চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন দানববিশেষ, সাংঘাতিক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুর ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কিনা সমসাময়িক শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ তফাত ছিল না। ভারতে আফগান-রাজারা ঐ একই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। ১১৫০ সনে আফগানরা যখন গজনি দখল করে তখন কী হয়েছিল? কবেকার এক পুরোনো শত্রুতার অজুহাতে তারা গজনি শহরকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে; ক্রমান্বয়ে সাত দিন ধরে লুণ্ঠন আর হত্যাকাণ্ড চলেছিল। সমস্ত শিশু আর স্ত্রীলোকদের বন্দী করা হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় পুরুষদের। সুদৃশ্য অট্টালিকা ও ইমারতাদির একটিও আস্ত ছিল না। এই তো ছিল মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ব্যবহার! ভারতে আফগান-সম্রাটগণের কার্যকলাপ আর পারশ্য ও মধ্য-এশিয়ায় চেঙ্গিস খাঁর ধ্বংসকার্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাত কিছু নেই। খোরাশানের শাহ্‌ তাঁর দূতকে হত্যা করাতেই চেঙ্গিস বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। চেঙ্গিস যেখানে গেছেন সেখানেই ধ্বংসকার্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু মধ্য-এশিয়ায় ধ্বংসলীলা চরমে উঠেছিল।

নগরাদি ধ্বংস করার পিছনে চেঙ্গিসের একটা উদ্দেশ্য ছিল। উনি ছিলেন যাযাবর, শহর-নগরাদির প্রতি ছিল বিজাতীয় ঘৃণা। বাস করতেন স্তেপ-অঞ্চল বা বৃক্ষবিরল সমভূমিতে। এক সময়ে তিনি চীনের সমস্ত শহর ধ্বংস করবার কল্পনা করেছিলেন। সৌভাগ্য যে, সে ক... কার্যে পরিণত করেন নি। যাযাবরের জীবনধারার সঙ্গে সভ্যতার ধারার মিলন ঘটাবেন, মতলবটা তাঁর ছিল। কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব হয়?

চেঙ্গিস খাঁ এই নাম থেকে তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে, তিনি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তা নয়। ওটা মঙ্গোলীয় নাম। চেঙ্গিস পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর ধর্ম ছিল শামধর্ম—নীলাকাশের আরাধনা। চীনের তাও-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নানা আলোচনা হত; কিন্তু স্বধর্মে তিনি অবিচল ছিলেন, এবং বিপৎকালে আকাশের পূজা করতেন।

আমি গোড়াতেই বলেছি, মঙ্গোলীয় পরিষদ চেঙ্গিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ খান অর্থাৎ সম্রাট মনোনীত করেছিল। ওটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক পরিষদ, গণপরিষদ নয়। তাই চেঙ্গিসও ছিলেন সামন্তাধিপতি।

চেঙ্গিস এবং তাঁর অনুগামীর দল নিরক্ষর ছিলেন; এমনকি, লিখনপদ্ধতির কথাই তাঁর জানা ছিল না। সংবাদাদি পাঠানো হত লোকমুখে, ছোটো ছোটো পদ্য কিংবা প্রবাদবাক্যের আকারে। মৌখিক সংবাদাদি আদানপ্রদানের দ্বারা এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য পরিচালনা করা বড়ো বিস্ময়কর ব্যাপার। পরবর্তীকালে লিখনপদ্ধতির কথা জানতে পেরে তিনি তার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর পুত্রগণ ও প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে ও... আয়ত্ত করে নিতে বললেন। অতঃপর মঙ্গোলদের প্রচলিত আইন এবং তাঁর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করার আদেশ হল। চেঙ্গিসের ধারণা ছিল, এইসমস্ত চিরাচরিত বিধি অপরিবর্তনীয়। কোনো কালেই নড়চড় হবে না, কেউ অমান্য করতে পারে না, এমনকি সম্রাটও নয়। কিন্তু সেইসমস্ত অপরিবর্তনীয় বিধি আজ কোথায় লোপ পেয়ে গেছে! বর্তমান যুগের মঙ্গোলরাও নিশ্চয় তার খবর রাখে না।

প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক ধর্মেরই কতকগুলো চিরাচরিত বিধি আর লিপিবদ্ধ আইন আছে, এবং তার ধারণা, এসবের লয় নেই কোনোকালে। কখনও-বা এসবকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে মনে করা হয়; এবং সেইহেতুই এসব অপরিবর্তনীয় আর চিরস্থায়ী। কিন্তু আইন তো করা হয় চল্‌তি কাল অনুযায়ী, এবং আইনের উদ্দেশ্য হল লোকের ভালো করা। কাল ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে পুরোনো বিধি খাপ খাবে কেন? কাল ও অবস্থা ভেদে তারও পরিবর্তন অপরিহার্য। নইলে তো ঐসমস্ত বিধিব্যবস্থা আমাদের পায়ে লোহার বেড়ির মতো জড়িয়ে থাকবে, পৃথিবীর অগ্রগতির সঙ্গে আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। কোনো আইনই অপরিবর্তনীয় বিধি বলে গণ্য হতে পারে না। জ্ঞানের উপর এর ভিত্তি, সুতরাং জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর উন্নতিও অনিবার্য।

চেঙ্গিস খাঁ সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি খবর তোমাকে দিলাম। এতটা বোধ করি দরকার ছিল না। কিন্তু এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। আমি একজন শান্তশিষ্ট অহিংস শান্তিপ্রিয় লোক; বাস করি শহরে, ঘৃণা করি সামন্ততন্ত্রকে। অথচ দেখো, আমার মতো লোকের কিনা যাযাবর জাতির এক অতি নিষ্ঠুর ভীষণপ্রকৃতির সামন্তাধিপতির প্রতি আকর্ষণ! আশ্চর্য নয় কি?

৬৮

মঙ্গোল-আধিপত্য

২৬শে জুন, ১৯৩২

চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হলেন তাঁর পুত্র ওঘোতাই। ইনি আবার ছিলেন পিতার বিপরীত—সহৃদয় আর শান্তিপ্রিয়। বলতেন, "এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সম্রাট চেঙ্গিস খাঁকে দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে; সুতরাং এখন প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করে তাদেরকে সুখ-শান্তি দেওয়া কর্তব্য।" প্রজাদের সম্বন্ধে একজন সামন্ততান্ত্রিক রাজার এরকম মনোভাব লক্ষ্য করবার বিষয়।

কিন্তু মঙ্গোলদের জয়ের পালা শেষ হয় নি। তখনও তাদের উৎসাহ আর উদ্যম যেন উপ্‌চে পড়ছে। সেনাপতি সাবুতাইএর নেতৃত্বে ইউরোপে আবার শুরু হল অভিযান। ইউরোপের সেনাবাহিনী আর জেনারেলগণ কোনো কাজের ছিল না। অভিযান শুরু করার পূর্বে সাবুতাই গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রুর দেশের সব খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। আর যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন নিপুণ যোদ্ধা; তাঁর কাছে বিপক্ষের সেনাপতিরা ছিল যেন শিক্ষানবিশ। সাবুতাই সোজা রাশিয়ায় প্রবেশ করলেন। ছয় বৎসর সে অভিযান চলল; বিধ্বস্ত হল মস্কো, কিয়েভ, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি প্রভৃতি। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে মধ্য-ইউরোপে সাইলেশিয়ার অন্তর্গত লিবনিজ-নামক স্থানে এক পোলিশ ও জর্মন সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হল। মঙ্গোলদের অগ্রগতিতে বাধা দেবে কে? ইউরোপ বুঝি আর রক্ষা পায় না। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মতো লোক মঙ্গোলদের এই কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। হতাশ হয়ে পড়ল ইউরোপের রাজারা। কিন্তু সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে স্রোতের গতি ফিরল।

ওঘোতাইএর মৃত্যু হল। কে সম্রাট হবে তা নিয়ে বাধল গোলযোগ। ইউরোপের মঙ্গোল-বাহিনী আর অগ্রসর না হয়ে ফিরল দেশের দিকে। সে ১২৪২ খৃষ্টাব্দের কথা। ইউরোপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এদিকে আবার মঙ্গোলরা চীনেও বিস্তার লাভ করেছিল। উত্তরে কিন্‌-রাজ্য এবং দক্ষিণ-চীনে সুঙ-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করল। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গু খাঁ হলেন সম্রাট; তিনি কুব্‌লাইকে চীনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। কারাকুরাম-নামক স্থানে সম্রাট মঙ্গুর রাজসভায় এশিয়া ও ইউরোপ থেকে বিস্তর লোক-সমাগম হত। সম্রাট মঙ্গু যাযাবরদের ধরনে বাস করতেন তাঁবুতে। কিন্তু ঐসমস্ত তাঁবু ধনরত্নাদি লুঠের মালে ছিল ভরতি। দেশ-বিদেশ থেকে বেসাতি নিয়ে আসত ব্যবসায়ীর দল, বিশেষ করে মুসলমান ব্যবসায়ীরা, আর মঙ্গোলরা হরেকরকমের জিনিষ কিনত তাদের কাছ থেকে। ছিল বটে তাঁবুর শহর, কিন্তু তার জৌলুস কত, আর কতই-না তার দাপট। দেশদেশান্তর থেকে নানা জাতির লোকজন এসে জড়ো হত এখানে—কত জ্যোতিষী, কত অঙ্কশাস্ত্রবিদ, কত বিজ্ঞানী, কত কারিগর! সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা; নানা-দেশীয় লোকজনের আনাগোনা। এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা নিকট-সম্বন্ধ।

আর নানান ধর্মের লোক এসে জড়ো হয়েছিল এই কারাকুরাম-নগরে। এবং তারা সকলেই মঙ্গোলদিগকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিল। ইসলাম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক সেখানে ছিল; রোম থেকে পোপ পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। কিন্তু মঙ্গোলরা খুব ধর্মপ্রবণ জাতি ছিল না, তাই নূতন ধর্ম গ্রহণের তেমন আগ্রহ তারা দেখায় নি। এক সময়ে যেন খৃষ্টধর্মের প্রতি সম্রাটের একটা ঝোঁক এসেছিল; কিন্তু পোপের দাবি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, মঙ্গোলরা যে যেখানে বসবাস করছিল সেখানকার স্থানীয় ধর্মই তারা গ্রহণ করেছে; যেমন, চীন আর মঙ্গোলিয়ায় ওরা হল বৌদ্ধ, মধ্য-এশিয়ায় মুসলমান; আর রাশিয়া এবং হাঙ্গেরিতে বোধ হয় কতক লোক খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিল।

সম্রাট মঙ্গু পোপকে আরবি ভাষায় একখানি চিঠি লিখেছিলেন; রোমের ভ্যাটিকান-শহরে পোপের গ্রন্থাগারে আজও সে চিঠিখানি দেখতে পাওয়া যায়। ওঘোতাইএর মৃত্যুর পর পোপ এক দূত-মারফতে নূতন খাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যেন ইউরোপ পুনরাক্রমণ করা না হয়; তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ খান বলে পাঠালেন, যেহেতু ইউরোপীয়রা তাঁর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করে নি, তাই তিনি ইউরোপ আক্রমণ করেছেন।

আর-এক দফা আক্রমণ আর ধ্বংসকার্য শুরু হল। মঙ্গুর ভাই হুলাগু ছিল পারশ্যের গভর্নর। কোনো কারণে বোগদাদের খলিফার ব্যবহারে চটে গিয়ে সে তাকে সতর্ক করে দিল, ভবিষ্যতে ভালো ব্যবহার না করলে তার সাম্রাজ্য ধ্বংস করা হবে। খলিফা লোকটি তেমন বুদ্ধিমান ছিল না। সে পাঠালে এক কড়া জবাব, অধিকন্তু বোগদাদে এক জনতা মঙ্গোল দূতকে করল অপমান। আর যায় কোথা? হুলাগু ভীষণ চটে গিয়ে বোগদাদ আক্রমণ করল; চল্লিশ দিন অবরোধের পর বোগদাদ আত্মসমর্পণ করে। ধ্বংস হল বোগদাদ-নগরী—আরব্যোপন্যাসের সেই বোগদাদ! লোপ পেল পাঁচ শো বছরের প্রাচীন সাম্রাজ্য। পুত্রাদি আর আত্মীয়স্বজনসহ খলিফা নিহত হল। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল, তাইগ্রিস-নদীর জল লাল হয়ে গেল মানুষের রক্তে। কথিত আছে, পনেরো লক্ষ লোকের জীবন নষ্ট হয়েছিল এ ব্যাপারে; এবং সেই সঙ্গে কত ধনসম্পদ, কত অপূর্ব শিল্পসাহিত্য-সম্পদ, আর কত পুস্তকাগার! বোগদাদ-নগরীর চিহ্ন রইল না কোনো। এমনকি, পশ্চিম-এশিয়ার গৌরবের জিনিষ, হাজার বছরের পুরোনো সেই সেচ-প্রণালীটাও হুলাগু সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছিল।

আলেপ্পো, এডেসা এবং আরও কত কত নগরী ধ্বংস হল; পশ্চিম-এশিয়ার উপরে নেমে এল রাত্রির কালো ছায়া। জনৈক ঐতিহাসিকের কথায়, এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞান আর সৎকার্যের রীতিমতো দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এক মঙ্গোল সৈন্যবাহিনী প্যালেস্টাইনে গিয়েছিল; মিশরের সুলতান তাকে পরাজিত করেন। এই সুলতানের অধীনে আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ বন্দুকধারী এক বাহিনী ছিল, তাই সুলতানের এক উপাধি ছিল 'বন্দুকদার'। এবারে আগ্নেয়াস্ত্রের যুগে আসা গেল। চীনারা অনেক-কাল আগে থেকেই বারুদের ব্যবহার জানত; মঙ্গোলরা সম্ভবত তাদের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল। এবং এই মঙ্গোলরাই আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করে ইউরোপে।

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ-নগরী ধ্বংস হয়, লোপ পায় আব্বাসি-সাম্রাজ্য। পশ্চিম-এশিয়ায় আরব-সভ্যতার সমাধি হল এখানে। বহু দূরে দক্ষিণ-স্পেনের গ্রানাডা-নগর অবশ্য আরব-ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল আরও দু শো বছর, কিন্তু পরে তারও পতন হয়। ঐ সময়ের পরে ইতিহাসে আরবদেশের কোনো অবদান নেই, তাই ক্রমশ তার প্রাধান্য কমে আসতে লাগল। পরবর্তীকালে আরবদেশ অটোম্যান তুর্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধের কালে ইংরেজদের প্ররোচনায় আরবজাতি তুর্কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; সেই থেকে আরবদেশ কতকটা স্বাধীন হয়েছে।

দু বছর খলিফা-পদ শূন্য ছিল। তার পরে মিশরের সুলতান বৈবার সর্বশেষ আব্বাসি খলিফার এক আত্মীয়কে খলিফা মনোনীত করেন। কিন্তু এই খলিফার কোনো রাজনৈতিক

ক্ষমতা ছিল না। কন্স্টান্টিনোপ্‌লের তুর্ক সুলতানগণও এককালে এই খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সে তিন শো বছর পরের কথা। কয়েক বছর আগে মুস্তাফা কামাল পাশা সুলতান আর খলিফা এই উভয় উপাধিই লোপ করে দেন।

আসল কাহিনী ছেড়ে আমি অন্য কথায় এসে পড়েছি। মৃত্যুর পূর্বে গ্রেট খান মঙ্গু তিব্বত জয় করেছিলেন। ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন গ্রেট খান বা সম্রাট হলেন কুব্‌লাই খাঁ। ইনি অনেক-কাল চীনদেশের শাসনকর্তা ছিলেন; ও দেশটা তাঁর ভালো লেগেছিল। তাই তিনি কারাকুরাম থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন পিকিঙে। তখন থেকে নগরের নূতন নাম হল 'খানবলিক' অর্থাৎ 'খাঁদের শহর'। কুব্‌লাই খাঁ নিজের সাম্রাজ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতেন না, চীনদেশ নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত; ফলে প্রধান প্রধান মঙ্গোল শাসনকর্তাগণ ক্রমশ স্বাধীন হয়ে গেল।

কুব্‌লাই খাঁ-ও চীনদেশে অভিযান চালিয়েছিলেন, এবং তাঁর সময়েই চীন-জয় সম্পূর্ণ করা হয়। তাঁর অভিযানগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; অন্যান্য মঙ্গোল-অভিযানের মতো এতে অতটা নিষ্ঠুরতা আর ধ্বংসলীলা প্রকাশ পায় নি। চীনের আবহাওয়া কুব্‌লাইকে অনেকটা ভদ্র করে তুলেছিল; চীনারাও তাঁকে নিজেদেরই একজন বলে মনে করত। এমনকি, কুব্‌লাই চীনে একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নাম ছিল ইউনান-রাজবংশ। তঙকিঙ আনাম ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাপান আর মালয়দেশ জয়ের চেষ্টাও কুব্‌লাই করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। কেননা মঙ্গোলরা সমুদ্রে চলাফেরায় অভ্যস্ত ছিল না। ওরা জাহাজ তৈরি করতে জানত না কিনা?

সম্রাট মঙ্গুর নিকট ফ্রান্সের রাজা নবম লুই-এর কাছ থেকে দূত এসেছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খৃষ্টান দেশগুলো আর মঙ্গোলদের মধ্যে একটা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন তিনি। বেচারি লুই ধর্মযুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন কিনা তাই। কিন্তু মঙ্গোলরা এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নি, কোনো ধর্মসম্প্রদায়কে আক্রমণ করতে তারা রাজিও ছিল না।

আর কেনই-বা মঙ্গোলরা ইউরোপের যত ক্ষুদ্র নগণ্য রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করবে? এবং কার ভয়ে? পশ্চিম-ইউরোপের রাজ্য কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে মঙ্গোলদের কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। দৈবক্রমেই তো পশ্চিম-ইউরোপ মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল? সেলজুক তুর্করাও বশ্যতা স্বীকার করেছিল তাদের। একমাত্র মিশরের সুলতানের কাছেই মঙ্গোল-বাহিনীর পরাজয় ঘটে, কিন্তু মঙ্গোলরা ইচ্ছা করলে যে তাকে দমন করতে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এশিয়া আর ইউরোপ জুড়ে মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। মঙ্গোল-অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু ইতিহাসে কোনো কালে ঘটে নি। এত বড়ো বিরাট সাম্রাজ্যও কোনো কালে ছিল না। মঙ্গোলরাই যেন তখন ছিল পৃথিবীর অধীশ্বর! ভারতবর্ষ তাদের পথে পড়ে নি, তাই রক্ষা। পশ্চিম-ইউরোপও মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু সেটা মঙ্গোলদের দয়ায়। অন্তত, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অবস্থাটা এইরকমই মনে হয়েছিল।

তার পরে যেন মঙ্গোলরা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল, দেশজয়ের লিপ্সা তাদের কমে গেল। তখনকার দিনে লোকে চলাফেরা করত পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে। দ্রুতবেগে যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সুতরাং একদল সৈন্যবাহিনীকে মঙ্গোলিয়া থেকে ইউরোপ-সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যেতে হলে এক বৎসর সময় লেগে যেত। তা ছাড়া লুণ্ঠনের সুযোগও মিলত না, কেননা সারাটা পথ যেতে হত নিজেদেরই সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে। আর এত যুদ্ধবিগ্রহ, লুঠপাট মঙ্গোলরা করেছে যে, লুঠের মাল প্রত্যেকের ঘরেই অল্পবিস্তর ছিল; সুতরাং লুণ্ঠনের নেশাও তাদের আর ছিল না। মঙ্গোলরা শান্তশিষ্টভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করল। এটা তো জানা কথা যে, জীবনে যা-কিছু কাম্য তা আয়ত্ত করবার পরে লোকে শান্তিতেই থাকতে চায়।

এই বিরাট মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের শাসনকার্য নিশ্চয়ই একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল। নতুবা

এর ভাঙন ধরবে কেন? ১২৯২ খৃষ্টাব্দে কুব্‌লাই খাঁর মৃত্যু হয়; তার পর আর কেউ সম্রাট হয় নি। সাম্রাজ্য পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেল :

(১) চীন-সাম্রাজ্য : মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং তিব্বত এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চল ছিল কুব্‌লাই খাঁর বংশধরদের অধীন।

(২) সুদূর প্রতীচ্যে রাশিয়া, পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরিকে কেন্দ্র করে আবার গড়ে উঠল একটা সাম্রাজ্য।

(৩) পারশ্য, মেসোপটেমিয়া এবং মধ্য-এশিয়ায় ছিল ইল্‌খান-সাম্রাজ্য; প্রতিষ্ঠাতা হুলাগু।

(৪) মধ্য-এশিয়ায় তুরস্ক—তাকে বলা হত 'জগতাই সাম্রাজ্য'।

(৫) সাইবেরিয়া-সাম্রাজ্য।

মঙ্গোল-সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু উল্লিখিত অঞ্চলগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল খুব শক্তিশালী।

৬৯

মার্কোপোলো

২৭শে জুন, ১৯৩২

মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকুরাম-নগরের খুব নামডাক ছিল; ঐ মঙ্গোলজাতটার শৌর্য-বীর্য আর দেশজয়ের খ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা, তাই। দেশবিদেশ থেকে হাজারো-রকম লোকের সমাগম হয়েছিল এই নগরে—কত গুণীজ্ঞানী, ব্যবসায়ী আর ধর্মপ্রচারক। অনেক সময়ে মঙ্গোলদের আহ্বানেই তারা এসেছে। অদ্ভুত এই মঙ্গোলজাতির প্রকৃতি। লোকগুলো এক দিকে যেমন ছিল পারদর্শী, তেমনি আবার অন্য দিকে ছেলেমানুষিরও ছিল না অন্ত। এমনকি তাদের হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ছেলেমানুষি ভাব ছিল। তাই তো এই যোদ্ধৃ-জাতটার একটা আকর্ষণ আছে। কয়েক শো বছর পরে জনৈক মঙ্গোল (ভারতীয়রা বলত, মোগল) আমাদের দেশ জয় করেন। তাঁর নাম বাবর; এ'র মা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভূতা। ভারি মজার লোক ছিলেন এই বাবর। ভারতবর্ষ জয় করবার পর কাবুলের জন্যে তাঁর মনে সে কী কষ্ট! কাবুলের ঠাণ্ডা হাওয়া, বন-উপবন, ফুল-ফল, এমনকি তরমুজের জন্যও তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন! তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায়, কী চমৎকার মানুষটি তিনি ছিলেন।

জ্ঞানলাভের আগ্রহ ছিল এই মঙ্গোলদের; তাদের উৎসাহেই দেশদেশান্তর থেকে লোকজন আসত রাজসভায় এবং ঐসকল পরিদর্শকদের কাছ থেকে তারা নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। এই যেমন, লিখন-প্রণালীর কথা জানামাত্র চেঙ্গিস খাঁ তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং কর্মচারীদিগকে সেটা আয়ত্ত করতে বলেছিলেন। তাদের মনের দ্বার ছিল খোলা, অন্যের কাছে কিছু শিখতে সংকোচ ছিল না। পিকিঙ-নগরে কুব্‌লাই খাঁর রাজসভায় দুজন ব্যবসায়ী এসেছিলেন ভেনিস-শহর থেকে—নিকলো পোলো আর মফিয়ো পোলো—দু ভাই। এ'রা বাণিজ্য উপলক্ষে বোখারা অবধি গিয়েছিলেন; সেখানে কুব্‌লাই খাঁর দূতের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় এবং তাঁর অনুরোধে ওঁরা পিকিঙে আসেন।

কুব্‌লাই খাঁ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ওঁদের দু ভাইকে। ওঁরা সম্রাটকে শোনালেন ইউরোপের কাহিনী, খৃষ্টধর্ম আর পোপের কথা। কুব্‌লাই খাঁ অবাক হয়ে সব শুনলেন, মনে মনে আকৃষ্ট হলেন খৃষ্টধর্মের প্রতি। ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পোলো-ভ্রাতৃদ্বয়কে পাঠালেন ইউরোপে; ওঁদের মারফত পোপকে বলে পাঠালেন, খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে এমন এক শো জন বিদ্বান লোককে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওঁরা দেশে ফিরে দেখতে পেলেন ইউরোপে

নানা গোলযোগ, পোপ নিরুপায়। কুব্লাই খাঁর কথামতো এক শো লোক তখন একেবারে দুষ্ট। ওঁরা কী আর করতে পারেন? বছর-দুই গড়িমসি করে দুজন খৃষ্টান সন্ন্যাসীকে সংগে নিয়ে আবার রওনা দিলেন পিকিঙ-অভিমুখে। আর-একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এবারে নিকলোর যুবক পুত্র মার্কো তাঁদের সংগ নিলেন।

আর সে কী সাংঘাতিক পর্যটন! সমগ্র এশিয়া তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন হাঁটাপথে। এই যুগেও ওঁদের ভ্রমণপথ অনুসরণ করলে প্রায় এক বছর লেগে যাবে। হিউয়েন সাঙ যে পথে এসেছিলেন পোলোরা অনেকটা সেই পথ ধরেই চলেছিলেন। ওঁদের ভ্রমণপথটা ছিল এইরকম—প্যালেস্টাইন হয়ে প্রথমে আরমেনিয়া, তার পর মেসোপটেমিয়া এবং পারশ্য উপসাগর। পারশ্য অতিক্রম করে বল্খ্ এবং পর্বতমালা পার হয়ে খাশগর; তার পরে খোটান ও লপ্নর হ্রদ। আবার মরুভূমি পার হয়ে চীনদেশ এবং পিকিঙ। পর্যটনে ছাড়পত্র হিসাবে কুব্লাই খাঁ ওঁদের একটা সোনার পাত দিয়েছিলেন।

প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের আমলে চীন আর সিরিয়ার মধ্যে এইটেই ছিল যাতায়াতের পথ। কিছুকাল আগে আমি সুইডিস পর্যটক ভেন্ হেডেনের ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছিলাম; উনি গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে খোটান গিয়েছিলেন। কিন্তু সবরকমের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাই তিনি পেয়েছিলেন, তথাপি নানা ফ্যাসাদ ও দুঃখকষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। তবেই বুঝতে পারো সাত শো এবং তেরো শো বছর আগে পোলো আর হিউয়েন সাঙ্কে কতই-না বেগ পেতে হয়েছিল। ভেন্ হেডেন একটা মজার আবিষ্কার করেছিলেন; তিনি দেখেছিলেন, লপ্নর হ্রদের অবস্থান বদলে গেছে। তরিন্ নদী এই হ্রদে এসে মিশেছে। চতুর্থ শতাব্দীতে এই নদী হঠাৎ তার গতিপথ বদলে অন্য পথে চলতে শুরু করে; পুরোনো গতিপথ বালিতে ভরতি হয়ে যায়। তীরবর্তী লুলান শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বহির্জগৎ থেকে, অধিবাসীরা চলে গেল শহর ছেড়ে। নদীর সংগে সংগে হ্রদটাও স্থান-পরিবর্তন করল, এবং তার সংগে ভ্রমণ-পথ আর বাণিজ্য-চলাচলের রাস্তা। অল্প কয়েক বছর আগে নদীটা আবার গতিপথ বদলে আগের জায়গায় চলে গেছে, এবং সেইসংগে হ্রদটাও স্থান-পরিবর্তন করেছে; ভেন্ হেডেন তাই দেখেছেন। তরিন্ নদী আবার লুলান-নগরের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। হয়তো-বা ষোলো শো বছরের অব্যবহৃত এই পথ একদিন আবার পরিণত হবে রাজপথে। তবে কিনা তখন উটের পরিবর্তে চলবে মোটরকার। এই কারণেই লপ্নর হ্রদকে বলা হয় ভ্রাম্যমান হ্রদ। এ থেকেই বোঝা যায়, জলপ্রবাহ এক বিরাট ভূম্যাংশের পরিবর্তন করতে পারে, ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে পারে। এককালে মধ্য-এশিয়ার জনসংখ্যা ছিল বিপুল; ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো দলে দলে লোকেরা দেশ জয় করতে করতে পশ্চিম আর দক্ষিণাভিমুখে বার হয়ে গেছে। আজ গোটাকতক শহর ছাড়া মধ্য-এশিয়ায় আর কিছু নেই, বলতে গেলে ওটা জনশূন্য। সম্ভবত সেই যুগে ওখানে জলই ছিল বেশির ভাগ, তাই অধিবাসী-সংখ্যাও বেড়েছিল। তার পর ক্রমশ আবহাওয়া শুষ্ক হয়েছে, জলের প্রাচুর্য হ্রাস পেয়েছে, তাই জনসংখ্যাও কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে লাভও আছে। নূতন নূতন ভাষা শেখবার সময় পাওয়া যায়। ভেনিস থেকে পিকিঙ পোঁছতে পোলোদের সাড়ে তিন বছর লেগেছিল; এই সময়ের মধ্যে মার্কোপোলো মঙ্গোল ভাষা এবং সম্ভবত চীনা ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। সম্রাট কুব্লাই খাঁ তাঁকে স্নেহ করতেন; প্রায় সতেরো বছর কাল মার্কো সম্রাটের অধীনে চাকরি করেছেন। তিনি ছিলেন একজন শাসনকর্তা। সরকারি কাজে তাঁকে প্রায়ই চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হত। স্বদেশে ফেরবার জন্য ওঁদের প্রাণ কাঁদত, কিন্তু উপায় ছিল না; সহজে সম্রাটের অনুমতি মিলত না। অবশেষে একটা সুযোগ ঘটল। পারশ্যে ইল্খান-সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন একজন মঙ্গোল, কুব্লাই খাঁর জ্ঞাতি ভাই। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি পুনরায় বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বজাতীয় মেয়ে ছাড়া তিনি বিয়ে করবেন না। অগত্যা বিয়ের কনের জন্যে পিকিঙে কুব্লাই খাঁর কাছে তিনি দূত পাঠালেন।

কুব্লাই কনে পছন্দ করলেন। পোলো তিনজনের উপরে ভার পড়ল তাঁকে পারশ্যে নিয়ে

বাবার, ভ্রমণে ওঁদের অভিজ্ঞতা ছিল কিনা তাই। সমুদ্র-পথে ওঁরা চীন থেকে সুমাত্রায় গেলেন, এবং সেখানে রইলেন কিছুকাল। সুমাত্রায় তখন বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের আধিপত্য, কিন্তু ইহা পতনোন্মুখ ছিল। সুমাত্রা থেকে তাঁরা এলেন দাক্ষিণাত্যে, এবং অনেক দিন এখানে কাটালেন। তাঁদের কোনো তাড়া ছিল না যেন, পারস্যে পোঁছতে লাগল দু বছর। কিন্তু হায়, ততদিনে বর পঞ্চত্ব পেয়েছেন! কতকাল আর তিনি অপেক্ষা করবেন? অগত্যা তাঁর পুত্রই বিয়ে করল ঐ কনেকে; বয়সের মিল ছিল ওদের।

পোলোরা তিনজন সেখান থেকে রওনা দিলেন স্বদেশের দিকে। ১২৯৫ সনে তাঁরা ভেনিস পৌঁছলেন। চব্বিশ বছর তাঁরা দেশছাড়া! পূর্বপরিচিত বন্ধুবান্ধবরা কেউ চিনতে পারল না ওঁদের। ওঁরা তখন কী করলেন, জানো? সবাইকে ডেকে এক ভোজ দিলেন এবং সেখানে সকলের সামনে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদের শেলাই খুলে ফেললেন; আর অমনি থরে থরে বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য, হীরামুক্তা ইত্যাদি বার হয়ে পড়ল! তাক লেগে গেল সবার। কিন্তু তথাপি তাঁদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কাহিনী অতি অল্প লোকেই বিশ্বাস করল। ভেনিসের মতো ক্ষুদ্র জায়গায় বাস করে তারা চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের আকার ও ধনসম্পদের ধারণা করতে পারবে কেন?

তিন বছর পরের কথা। জেনোয়া-নগরের সঙ্গে ভেনিসের যুদ্ধ বাধল। উভয়ের মধ্যে রেষারেষি ছিল আগে থেকেই। বিরাট নৌযুদ্ধে ভেনিস পরাজিত হল, হাজার হাজার লোক বন্দী হল জেনোয়াবাসীদের হাতে। মার্কোপোলোও ছিলেন তাদের মধ্যে। জেনোয়ার কারাগারে বসে মার্কো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখলেন; কিংবা মুখে বলে গেলেন, অপরে লিখে নিল। বাস্তবিক, ভালো কোনো কাজ করবার পক্ষে জেল উপযুক্ত স্থান।

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে চীনের কথাই বিশেষ করে বলেছেন; তা ছাড়া শ্যামদেশ, জাভা, সুমাত্রা, সিংহল, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশের কথাও আছে। চীনের বড়ো বড়ো বন্দরগুলিতে দেশবিদেশ থেকে জাহাজ এসে ভিড়ত; বিরাট বিরাট জাহাজ, এক-একটাতে খালাসিই থাকত তিন-চার শো। উন্নতিশীল দেশ এই চীন, কত শহর আর বন্দর! স্বর্ণখচিত এবং রেশমি বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত সে দেশে; কত ফলফুলের বাগান, আর শস্যক্ষেত্র; পর্যটকদের জন্য কত ভালো ভালো হোটেলের ব্যবস্থা। বিশেষ দূতের মারফত রাজকীয় সংবাদাদি পাঠানো হত। এবং এই সংবাদ গড়ে ২৪ ঘণ্টায় চার শো মাইল দূরে পৌঁছে যেত। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, চীনারা মাটির নীচ থেকে কালো পাথর খুঁড়ে বার করে তাই দিয়ে আগুন ধরাত। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে যুগেই চীনে কয়লার খনিতে কাজ হত এবং লোকে কয়লার ব্যবহার জানত। কুবলাই খাঁ কাগজের নোট প্রচলন করেছিলেন; এই কাগজের নোটের মূল্য প্রদান করা হত স্বর্ণ দ্বারা। আশ্চর্য যে, তখনকার দিনেই চীনে আধুনিক কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। আর একটি খবরে মার্কো ইউরোপের অধিবাসীদের চমকিত করেছিলে; সে হল এই যে, তখন চীনে একটি খৃস্টান উপনিবেশ ছিল, তার শাসনকর্তার নাম জন প্রেস্টার।

জাপান, ব্রহ্ম আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অনেক কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে স্থান পেয়েছে। এর কতক নিজের দেখা, কতক-বা শোনা। অতি বিস্ময়কর মার্কোর এই ভ্রমণকাহিনী। এতকাল ইউরোপের অধিবাসীরা ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর রেষারেষি করত; এবারে চোখ খুলে গেল তাদের; বহির্জগতের বিরাটত্ব, ধনসম্পদ আর নূতনত্বের একটা ধারণা হল। লোকের কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ হল, অসমসাহসিক কাজের ইচ্ছা আর অর্থলোভ জাগল মনে, ঝোঁক এল সমুদ্রযাত্রায়। ইউরোপে তখন নূতন জীবন শুরু হয়েছে; মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের মোহ সে কাটিয়ে উঠছে, নূতন সভ্যতার উন্মেষ হচ্ছে, যৌবনের বলবীর্যে সে মহিমময়। অসমসাহসিক কার্য এবং সমুদ্রযাত্রার স্পৃহা আর অর্থলোভ জাগল বলেই তো পরবর্তীকালে ইউরোপীয়গণ দেশ-দেশান্তরে ছুটোছুটি করেছে, পাড়ি দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর, গেছে আমেরিকায়, চীন, জাপান আর ভারতবর্ষে। সমুদ্রই হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজপথ, হ্রাস পেল স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা।

মার্কোপোলো পিকিঙ থেকে চলে যাবার পরেই কুবলাই খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউনান-সাম্রাজ্যও আর বেশি দিন টিঁকল না। মঙ্গোল-শক্তি ক্রমশ খর্ব হতে লাগল। ওদিকে

বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চীনেও আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং ৬০ বৎসরের মধ্যেই দক্ষিণ-চীন থেকে মঙ্গোলরা বিতাড়িত হল। নান্কিঙে একজন চীনা নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। বছর-কয়েক পরেই অর্থাৎ ১৩৬৮ সনে, মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হল; চীনারা মঙ্গোলদের তাড়িয়ে দেশের সীমানা পার করে দিলে।

এখন থেকে চীনে 'তাই মিঙ'-রাজবংশের আধিপত্য। তিন শো বছর-কাল চীন এই বংশের সুশাসনে ছিল। এই সময়ে দেশজয় কিংবা সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের কোনো চেষ্টা হয় নি।

চীনে মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের পতনের ফলে চীন আর ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগসূত্র ছিন্ন হল। স্থলপথে গমনাগমন তখন নিরাপদ ছিল না, অথচ জলপথের প্রচলনও ততটা হয় নি।

৭০

রোমান ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক বলপ্রয়োগ

২৮শে জুন, ১৯৩২

কুব্লাই খাঁ পোপের নিকট এক শো জন জ্ঞানী লোক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে কথা তোমাকে বলেছি। কিন্তু পোপ সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। তিনি তখন নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। সময়টা হল ১২৫০ থেকে ১২৭৩ সনের মধ্যবর্তী কাল; সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আর কেউ সিংহাসনে বসেন নি। মধ্য-ইউরোপে তখন নানা গোলযোগ, চার দিকে লুঠপাট চলছে। অবশেষে ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে হাপ্স্বর্গের রুডল্ফ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু সুরাহা হল না। ইতালি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রাজনৈতিক উৎপাত তো ছিলই, তা ছাড়া আবার ধর্মসম্বন্ধীয় গোলযোগেরও সূত্রপাত হয়েছিল। লোকে রোমান ধর্মসম্প্রদায়কে সন্দেহ করতে শুরু করল; আগের মতো তারা আর চার্চের আদেশ মানতে রাজি হল না। ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ বিপজ্জনক। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পোপের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছিলেন, সমাজচ্যুত হবার ভয়ে তিনি ভীত হন নি। এমনকি, সম্রাট লিখিতভাবে পোপকে কতকগুলো প্রশ্নও করেছিলেন, কিন্তু পোপ তার সদুত্তর দিতে পারেন নি। সেই সময়ে ইউরোপে অনেকের মনেই নানা সন্দেহ জেগেছিল। অনেকে আবার পোপ কিংবা চার্চের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামায় নি বটে, কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের বিলাসিতা আর ব্যভিচারে তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

এদিকে ক্রুসেডের অবস্থাও শোচনীয়, আর বুঝি শেষরক্ষা হল না। শুরু হয়েছিল খুব তোড়জোড় করে, উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না, কিন্তু ফল হল না কিছুই। ব্যর্থতার একটা প্রতিক্রিয়া আছেই। চার্চের কাছে নিরাশ হয়ে লোকে অন্যত্র প্রেরণা খুঁজতে লাগল। চার্চ বলপ্রয়োগ শুরু করল, ভয় দেখিয়ে লোকের মন দমিয়ে রাখতে চাইল; লোকের সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা করল লাঠির সাহায্যে, যুক্তিতর্ক দিয়ে নয়। কিন্তু মানুষের মন খেয়ালি, পাশবিক শক্তি তার কী করবে?

চার্চের প্রথম কোপদৃষ্টি পড়ল ইতালির অন্তর্গত ব্রেসিয়ার ধর্মপ্রচারক আর্নল্ডের উপরে। সে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা। লোকটি সত্যিকারের একজন ধর্মপ্রচারক ছিল, আর খুব জনপ্রিয়। ধর্মযাজকদের বিলাসিতা এবং অসাধুতার কথা আর্নল্ড প্রকাশ্যে বলে বেড়াত। এই অপরাধে আর্নল্ডকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তার মৃতদেহটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতেই শেষ হল না; যাতে আর্নল্ডের এতটুকু চিহ্নও লোকে না রাখতে পারে সেজন্যে ভস্মাদি টাইবার নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর্নল্ড শেষ পর্যন্ত শান্ত অবিচল ছিল।

বাস্তবিক পোপরা বাড়াবাড়ি শুরু করে দিলেন। কেউ ধর্ম সম্বন্ধে সামান্য মতান্তর প্রকাশ করলে কিংবা ধর্মযাজকদের সমালোচনা করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত। রীতিমতো ধর্মযুদ্ধ

ঘোষণা করা হল এবং বিরোধীদের উপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু হল, বিশেষ করে ওয়াল্‌ডো-নামক এক ব্যক্তির শিষ্যসম্প্রদায় এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সের অন্তর্গত টুলুর অধিবাসী অলবিজিওদের উপর।

এই সময়ে ইতালিতে সত্যিকারের একজন খৃষ্টান বাস করতেন। এ'র নাম ফ্রান্সিস, এসিসি-নগরের অধিবাসী। ধনীর সন্তান হয়েও ইনি দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করে দরিদ্র এবং পীড়িতদের, বিশেষ করে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের সম্প্রদায়। এ ছিল অনেকটা বৌদ্ধসংঘের মতো। ফ্রান্সিস খৃষ্টের আদর্শে জীবনযাপন করতেন, পীড়িতের সেবা আর মতবাদ প্রচার করে বেড়াতেন। অসংখ্য লোক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। ক্রুসেডের সময়ে তিনি প্যালেস্টাইন আর মিশরে গিয়েছিলেন। ছিলেন বটে খৃষ্টান, কিন্তু মুসলমানরাও মান্য করত তাঁকে। ১২২৬ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে চার্চের সঙ্গে তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধ বাধে। দারিদ্র্যব্রত-গ্রহণ চার্চের মনঃপূত ছিল না। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে মার্সাই-নগরে এই সম্প্রদায়ের চারজন সভ্যকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

বছর-কয়েক আগে এসিসি-নগরে সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের স্মৃতির সম্মানার্থে বড়ো একটা উৎসব হয়ে গেছে। ঠিক কী উপলক্ষে এই উৎসব হয়েছিল মনে নেই, তবে সম্ভবত এইটে ছিল তাঁর মৃত্যুর সাত শততম বার্ষিক অনুষ্ঠান।

পাশাপাশি আর-একটি ধর্মসম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল খৃষ্টীয় সমাজে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্পেনের অধিবাসী সেণ্ট্ ডমিনি। এই সম্প্রদায় ছিল গোঁড়া। ধর্মমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হত বেশি এবং তাতে নিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্যে বলপ্রয়োগেও আপত্তি ছিল না।

অবশেষে ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে চার্চ সরকারিভাবেই ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ শুরু করে। শন নামে একপ্রকার বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হল। এখানে লোকের ধর্মমতের নৈষ্ঠিকতার বিচার করা হত। নিষ্ঠায় ত্রুটি প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল খোঁটায় বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা। শত শত লোককে এভাবে পুড়িয়ে মারা হল। দোষী স্ত্রীলোকদিগকে বলা হত ডাইনি, কত কত গরিব স্ত্রীলোকের প্রাণ গেল। ইন্‌কুইজিশনের আদেশেই যে এটা হত তা নয়, অনেক সময়ে জনতাই এ কাজ করেছে, বিশেষত ইংলণ্ডে আর স্কটল্যাণ্ডে।

পোপ এক আদেশ জারি করে প্রত্যেক লোককে বললেন গোয়েন্দার কাজ করতে! তিনি রসায়নশাস্ত্রের নিন্দা করে একে শয়তানী-বিদ্যা বলে ঘোষণা করলেন। এই অত্যাচার আর ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না। লোকে সত্যিসত্যিই মনে করত, যূপকাষ্ঠে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে তারা নিজেদের এবং অন্যের আত্মার মঙ্গল করছে। ধর্ম-প্রচারকগণ অনেক সময়ে নিজেদের মতবাদ জোর করে অন্যের উপরে চাপিয়েছে; ভেবেছে, তাতে করে সমাজের মঙ্গল করা হল। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে তারা হত্যা করতে কশুর করে নি; 'অমর আত্মা'র মঙ্গলার্থে মরণশীল মানুষকে তারা করেছে ভস্মীভূত। ধর্মের ইতিহাস বাস্তবিকই খারাপ। কিন্তু সম্ভবত ইন্‌কুইজিশনের চেয়ে খারাপ আর-কিছু নেই। তবে এটা ঠিক যে, ব্যক্তিগত লাভের আশায় কেউ এই দুষ্কার্য করে নি, ন্যায্য কাজ করছে এই ধারণাই তাদের মনে বদ্ধমূল ছিল।

এদিকে পোপদের সার্বভৌম ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। কোনো সম্রাটকে জাতিচ্যুত করা কিংবা ভয় দেখিয়ে বশ করা আর সম্ভব ছিল না। পবিত্র-রোমান-সাম্রাজ্যের যখন দুরবস্থা তখন ফ্রান্সের রাজা পোপের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে কোনো ব্যাপারে রাজা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পোপের দরবারে একজন লোককে পাঠালেন। সেই লোকটি জোর করে পোপের শয়নঘরে ঢুকে তাঁকে মুখের উপর অপমান করে এল। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো দেশই পোপের প্রতি ঐ অপমানজনক ব্যবহারের নিন্দা করল না।

কয়েক বছর পরে ১৩০৯ সনে একজন ফরাসি হলেন পোপ। তিনি রোমের পরিবর্তে ফ্রান্সের অন্তর্গত এভিগনো-নামক স্থানে বাস করতে থাকেন, এবং সেই থেকে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ অবধি পোপগণ সেখানেই বাস করলেন ফরাসি-রাজাদের আওতায়। পরের বছর ধর্মযাজকদের মধ্যে বাধল বিরোধ, ফলে দুই বিরোধী দল দুজন পোপ নির্বাচন করল। একজন থাকলেন রোমে; রোমের সম্রাট এবং উত্তর-ইউরোপের কয়েকটি দেশ তাঁকে মেনে নিল। আর-একজন রইলেন

এভিগনোতে; ফ্রান্সের রাজা এবং অন্যান্যেরা তাঁকে সমর্থন করতে লাগল। এই ব্যবস্থা চলল ৪০ বছর-কাল; পোপ দুজন একে অন্যকে অভিসম্পাত দেন আর জাতিচ্যুত করেন। অবশেষে ১৪১৭ সনে দুই দলে একটা মিটমাট হল। তার ফলে পোপ নির্বাচিত হলেন একজন এবং তিনি থাকলেন রোমে। কিন্তু এতকাল দুজন পোপের মধ্যে যে অশোভন বিবাদ চলেছিল তাতে করে ইউরোপের অধিবাসীদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মগুরুরা নিজেদের 'পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে পরিচয় দিতেন; অথচ তাঁরাই যদি এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করেন তবে লোকে তাঁদের শ্রদ্ধাবিশ্বাস করবে কেন? অবস্থাটা তাই দাঁড়াল; ধর্মগুরুদের আধিপত্য আর লোকে অন্ধভাবে মেনে নিতে রাজি হল না। কিন্তু আর-একটা ব্যাপারে অবস্থা চরমে উঠল।

ওয়াইক্লিফ নামে একজন ইংরেজ খোলাখুলি চার্চের সমালোচনা করেছিলেন; তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক আর অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। তিনিই প্রথম ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। জীবদ্দশায় তিনি রোমের কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টি এড়িয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একত্রিশ বছর পরে, ১৪১৫ সনে, কর্তৃপক্ষের আদেশে কবর থেকে তাঁর অস্থিগুলো বার করে পোড়ানো হয়। ওয়াইক্লিফের মৃতদেহের অসম্মান করা হল বটে, কিন্তু তাতে করে তাঁর মতবাদের প্রচার রোধ করা গেল না। বোহেমিয়ায়ও (আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়া) তা প্রচারিত হল এবং প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জন্ হাস্ এতে আকৃষ্ট হলেন। তখন পোপ তাঁকে সমাজচ্যুত করেন; কিন্তু জনের কোনো অনিষ্ট হল না, তিনি সেখানে খুব জনপ্রিয় ছিলেন কিনা তাই। অগত্যা তাঁর সঙ্গে এক চাতুরি খেলা হল। সম্রাট তাঁকে ডেকে পাঠালেন সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত কন্স্টান্স্-নগরে। তাঁর আশঙ্কার কোনো কারণ নেই এবং নিরাপদে তাঁকে পেঁৗছে দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। জন্ হাস্ গেলেন। সেখানে তখন চার্চ-আইনসভার অধিবেশন হচ্ছিল। জন্‌কে বলা হল তাঁর ভুল স্বীকার করতে। জন্ রাজি হলেন না। তখন কোথায় রইল তাঁদের প্রতিশ্রুতি! তাঁরা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলেন জন্‌কে। সে ১৪১৫ সনের ঘটনা। জন্ হাস্ সত্যিকারের সাহসী লোক ছিলেন; মিথ্যাকে স্বীকার করে নেবার চেয়ে মৃত্যুই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। চেক্-জনসাধারণ তাঁকে একজন শহিদ বলে মনে করে এবং আজও তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে থাকে।

জন্ হাসের মৃত্যুবরণ একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বোহেমিয়ায় তাঁর অনুগামীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। পোপ ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড ঘোষণা করলেন তাদের বিরুদ্ধে। তখন কথায় কথায় ক্রুসেড, কারও কোনো দায় নেই; আর পাজি বদমায়েশ লোকের তো যেন অভাবই ছিল না, তাদের পক্ষে এটা ছিল একটা মস্ত সুযোগ। ধর্মযুদ্ধকারীরা নিরপরাধ লোকের উপরে কী দারুণ অত্যাচারটাই না করত! কিন্তু এবারে হাসের অনুগামী সৈন্যদল যেই এগিয়ে এল অমনি ধর্মযুদ্ধকারীরা মারলে পিছটান, গেল পালিয়ে। ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারটাই ছিল এইরকম; লুঠপাট আর নিরপরাধ গ্রামবাসীদের উপরে নৃশংস অত্যাচার করার বেলায় তাদের বীরত্বের অবধি ছিল না; কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে কেউ বাধা দিলে ঐ ধর্মযুদ্ধকারীদের আর পাত্তা পাওয়া যেত না।

এ থেকেই শুরু হল বিদ্রোহ, ঐ গোঁড়া, স্বৈরাচারমূলক ধর্মের বিরুদ্ধে; ইউরোপময় গোলযোগ আর কত বিভিন্ন মতাবলম্বী দল! ফল হল এই যে, শেষ পর্যন্ত খৃষ্টানদের মধ্যে দুটো দলের সৃষ্টি হল—ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট্।

কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

৩০শে জন, ১৯৩২

ভয় হচ্ছে, ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরোধের কাহিনী তোমার কাছে তত সরস লাগবে না। কিন্তু বর্তমান ইউরোপের ক্রমোন্নতিকে জানতে হলে সর্বাগ্রে এদের জানা প্রয়োজন। এদের ভিতর দিয়েই আমরা ইউরোপকে বুঝতে পারব। চতুর্দশ শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে ধর্মমতের স্বাধীনতার সংগ্রামের যে বিস্তার দেখি, আর তার কিছু পরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে সংগ্রাম, দুটোই আসলে একই সংগ্রামের দুই দিক। এই সংগ্রাম ছিল কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। 'পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য' ও তার 'পোপ' উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে পদদলিত করতে চেয়েছিলেন। মহামান্য সম্রাটের ছিল 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা', 'পোপ' ছিলেন তার চেয়েও উঁচুতে; আর এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা, বা তাঁদের হুকুমকে অবহেলা করবার অধিকার কারও ছিল না। নিছক বাধ্যতা ছিল মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ। এমনকি ব্যক্তিগত বিচারশক্তির প্রয়োগও দুষ্কর্ম বলে বিবেচিত হত। এইভাবে অন্ধ আনুগত্য ও স্বাধীনতার ভিতরে পার্থক্য বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে বিবেকের স্বাধীনতা (ধর্মমতের স্বাধীনতা) ও পরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার এক বিরাট সংগ্রাম চলছিল। অনেক উত্থানপতন ও অনেক দুঃখভোগের পরে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়। কিন্তু ঠিক যখন লোকে স্বাধীনতার শিখরে পৌঁছে গেছে ভেবে নিজেদের তারিফ করছিল তখনই তারা নিজেদের ভুল দেখতে পায়। যতক্ষণ দারিদ্র্য আছে, ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, ততক্ষণ সত্যিকার স্বাধীনতাও আসে না। বুভুক্ষু ব্যক্তিকে স্বাধীন ঘোষণা করা মানে তাকে বিদ্রূপ করা। তাই পরবর্তী কার্যপন্থা হল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম, যে সংগ্রাম আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু একটিমাত্র দেশেই প্রধানত জনগণের হাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে—সে হল রাশিয়া, অথবা সোভিয়েট ইউনিয়ন।

ভারতবর্ষে বিবেকের স্বাধীনতার জন্যে যে কোনো সংগ্রামের অস্তিত্ব ছিল না তার কারণ এই যে, বহু পুরাকাল থেকেই এখানে এই অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে। লোকে যার যা খুশি তাতেই বিশ্বাসস্থাপন করত, কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করতে নিয়োজিত হত মৌখিক তর্কবিতর্ক, লাঠ্যৌষধি নয়। মাঝে মাঝে হয়তো শক্তিপ্রয়োগ বা উৎপীড়ন চলত, তবু নিজ নিজ ধর্মমতের অধিকার প্রাচীন আর্য-মতবাদে মেনে নেওয়া হয়েছিল। হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবু এর ফলও সব দিক দিয়ে ভালো হয় নি। মতগত স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে লোকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করল না, ফলে ক্রমশ অধঃপতিত ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের নাগপাশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এইভাবে যে ধর্মমতের সৃষ্টি হল তাতে তারা বহুদূর পিছিয়ে পড়ল এবং ধর্মনেতৃত্বের ক্রীতদাসে পরিণত হল। সেই নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব শুধু একজন 'পোপ' বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এ ছিল 'পবিত্র শাস্ত্র' ও পুরোনো রীতিনীতির শাসন। তাই যখন আমরা ধর্মমতের স্বাধীনতা নিয়ে গর্ববোধ করছিলাম তখনই স্বাধীনতা থেকে অনেক দূরে গিয়ে, পুরোনো বই আর পুরোনো প্রথার শৃঙ্খলে বন্দী হয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্ব আমাদের উপর প্রভুত্ব করেছিল ও আমাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে যে শৃঙ্খল দ্বারা কখনও কখনও আমাদের বন্দী করা হয় সেটাই যথেষ্ট খারাপ জিনিষ। কিন্তু ধারণা আর সংস্কার দিয়ে গড়া যে অদৃশ্য শৃঙ্খল আমাদের মনকে পাকে পাকে জর্জরিত করে সেটা আরও অনেক বেশি খারাপ। এই শৃঙ্খল আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি; কত সময় তাদের সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, তাই আরও কঠিনভাবে তারা আমাদের আঁকড়ে ধরে।

আক্রমণকারী হিসেবে ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমনের পর ধর্মের ভিতরে প্রথম বাধ্যতামূলক নীতি পরিলক্ষিত হয়। আসলে এটা ছিল বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে রাজনৈতিক রেষারেষি, উপরে ছিল ধর্মের আবরণ, এবং সময়ে সময়ে ধর্মের নামে উৎপীড়নও চলত। কিন্তু তাই বলে ইসলামধর্ম এই অত্যাচারকে সমর্থন করত, এ ভাবা ভুল হবে। ১৬১০ সালে এক স্পেনীয় মুসলমান যখন অবশিষ্ট আরবদের সাথে স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়, তার সেইসময়কার বক্তৃতার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাওয়া যায়। ইন্‌কুইজিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে বলল :

"আমাদের বিজয়ী পূর্বপুরুষ, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, কি স্পেন থেকে কখনও খৃষ্টধর্মকে নির্মূল করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন? পরাধীনতার অন্তরালে থেকেও তোমাদের পূর্বপুরুষ কি, ধর্মবিষয়ক সমস্তরকম স্বাধীনতা উপভোগের অনুমতি পায় নি?......বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণের উদাহরণ যদি থেকেও থাকে, তা এত বিরল যে উল্লেখযোগ্য নয় বললেও চলে। এবং এ ধরনের কাজ যারা করেছে তারা যে শুধু ঈশ্বরভীতিশূন্য পরম অধার্মিক তাই নয়, তারা ইসলামের পবিত্র অনুজ্ঞা ও উপদেশাবলীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। সত্যকার মুসলমান নাম-ধারণের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির দ্বারা এই দুরাচরণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্মভাবাপন্নতার তোমাদের ঘৃণিত ইন্‌কুইজিশনের তুলনা চলে। অবশ্য যারা আমাদের ধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে আমাদের দ্বার সর্বদাই খোলা। তবে আমাদের পবিত্র 'কোরাণ' কখনও অপরের বিবেকের উপর জুলুম সমর্থন করে না। আমাদের ভিতরে এমন কোনো বর্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজে পাওয়া যাবে না যার সংগে"

তাই প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার যে দুটি প্রধান বিশেষত্ব, পরধর্মসহিষ্ণুতা ও বিবেকের স্বাধীনতা, দুটোই কিছু কিছু আমাদের জীবন থেকে মুছে গেল। ওদিকে ইউরোপ অগ্রসর হতে হতে আমাদের ছাড়িয়ে গেল ও বহু ঝড়ঝাপটার পর এই দুটি আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। ভারতবর্ষে কত সময়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়, হিন্দু-মুসলমান পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করে। হয়তো এ ধরনের ব্যাপার অল্প জায়গায় অল্প সময়ের জন্যই ঘটে, বেশির ভাগই আমরা সদ্ভাব ও প্রীতির সংগে বসবাস করি, কারণ আমাদের সত্যকার স্বার্থ এক। তবু এটা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয় যে, কোনো হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্মের নামে ভাইয়ের সংগে মারামারি করে। এর অবসান ঘটানোই আমাদের কর্তব্য, এবং আমরা তা করবও। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ধর্মের মুখোশ পরে পুরোনো প্রথা, রীতি ও কুসংস্কারের যে জটিল মতবাদ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া।

পরধর্মসহিষ্ণুতার বিষয়ে যেমন, তেমনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ প্রথমে ভালোভাবেই যাত্রা শুরু করেছিল। আমাদের গ্রামের সাধারণতন্ত্রের কথা মনে করে দেখো। সেখানে প্রথমদিকে রাজার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে ধরা হত। ইউরোপের রাজার মতো সেখানে 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা'র স্থান ছিল না। যেহেতু গ্রামের স্বাধীনতার উপরেই আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রনীতি (polity) প্রতিষ্ঠিত ছিল, লোকের রাজা সম্পর্কে চিন্তার কোনো প্রয়োজন হত না। তাদের কাছে স্থানীয় স্বাধীনতা বজায় থাকলেই যথেষ্ট, উপরে বসে যেই প্রভুত্ব করুক তাতে কারও কিছু এসে যেত না। কিন্তু এই ধরনের ধারণা ছিল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও অত্যন্ত বিপজ্জনক। ক্রমে সেই ঊর্ধ্বতন প্রভু ক্ষমতা প্রসারিত করতে করতে গ্রামের স্বাধীনতার উপরে চড়াও হলেন। তখন এমন এক সময়ের উদ্ভব হল যখন আমাদের রাজাদের হল সম্পূর্ণ একাধিপত্য, গ্রামের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অদৃশ্য হল, এবং সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কোথাও স্বাধীনতার একটু ছায়াও অবশিষ্ট রইল না।

মধ্যযুগের অবসান

১লা জুলাই, ১৯৩২

ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপে আবার ফিরে যাওয়া যাক। সে সময়টা ছিল ভয়ংকর রকম বিশৃঙ্খলা, মারামারি, আর হানাহানির যুগ। ভারতবর্ষের অবস্থাও তখন বেশ শোচনীয়, তবে ইউরোপের তুলনায় তাকে শান্তিপূর্ণই বলা চলত।

মঙ্গোলীয়রা ইউরোপে বারুদ আমদানি করায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহী সামন্ত অভিজাতদের (noble) দমন করতে রাজারা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য নিলেন। এই কাজে তাঁরা শহরের নূতন বণিকশ্রেণীর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পান। এই অভিজাতসম্প্রদায়ের কাজই ছিল নিজেদের ভিতরে অনবরত ছোটোখাটো যুদ্ধে লিপ্ত থাকা। এতে তাদের শক্তির হ্রাস ঘটেছিল, আশেপাশের পল্লীপ্রান্তকেও উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল। রাজা তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান ঘটালেন। কোনো কোনো জায়গায় রাজমুকুট দাবি করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। যেমন, ইংলণ্ডে হাউজ অব ইয়র্ক আর হাউজ অব ল্যাংকাস্টার, এই দুই পরিবারের সংঘর্ষ। উভয় দলেরই বিশিষ্ট-চিহ্ন ছিল গোলাপ; একদলের শাদা, অপরের লাল। এই যুদ্ধগুলি তাই গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses) নামে খ্যাত। এই গৃহযুদ্ধে বহু সামন্ত জমিদারের মৃত্যু হয়। ক্রুসেড অথবা ধর্মযুদ্ধেও এদের অনেকে মারা যায়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সামন্ত প্রভুরা আয়ত্তে আসে। কিন্তু এ থেকে বোঝায় না যে, সামন্ত জমিদারদের ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তরিত হয়। বরং রাজা আরও প্রতাপান্বিত হতে লাগলেন। সাধারণ লোকের অবস্থা প্রায় সমানই রইল, তবে ঘরোয়া যুদ্ধের অবসানে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। রাজা অবশ্য ক্রমে সর্বময় প্রভু ও একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠলেন। তখনও রাজা ও নূতন বণিকশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় নি।

যুদ্ধ ও হত্যালীলার চেয়েও ভয়ংকর রূপ নিয়ে ১৩৪৮ সালের কাছাকাছি ইউরোপে দেখা দিল 'করাল মহামারী' (The Great Plague)। রাশিয়া ও এশিয়া-মাইনর থেকে ইংলণ্ড অবধি সারা ইউরোপে সেটা ছড়িয়ে পড়ল। গেল মিশরে, উত্তর-আফ্রিকায়, মধ্য-এশিয়ায়, অবশেষে বিস্তার লাভ করল পশ্চিমে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মৃত্যুর তমসা' (The Black Death)। লক্ষ লক্ষ লোক এরই কবলে প্রাণ দিল। ইংলণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়, চীন ও অন্যান্য জায়গাতেও মৃত্যুসংখ্যা অভাবনীয়। ভারতবর্ষ কিন্তু অদ্ভুতভাবে এর হাত থেকে বেঁচে গেল।

এই সর্বনাশের পর লোকসংখ্যা এত কমে যায় যে, ভূমিকর্ষণের লোকেরও অভাব ঘটে। সেই কারণেই মজুরের মজুরির অত্যন্ত হীন অবস্থা থেকে কিছুটা উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু আইনসভা তখন জমিদার ও মালিকদের অধিকারে। তারা লোককে অত্যন্ত অল্প মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করে আইন পাশ করায়। বেশি চাইবার অধিকারও দূর হয়। লাঞ্ছিত ও শোষিত কৃষক ও জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় তারা বিদ্রোহ করে। সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপ জুড়ে একের পর এক কৃষক-বিদ্রোহ হতে থাকে। ১৩৫৮ সালে ফ্রান্সে 'জ্যাকোয়ারি' নামে খ্যাত বিদ্রোহ ঘটে। ইংলণ্ডে তখন 'ওয়াট টাইলার'এর বিদ্রোহ। ১৩৮১ সালে ইংরেজ-রাজের সামনে ওয়াট টাইলারকে মারা হয়। এসমস্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্যের নূতন আদর্শ তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। লোকের মনে তখন জেগেছে আত্মজিজ্ঞাসা—কেন তাদের এই দারিদ্র্য আর নিত্য উপবাস, আর অপরদের কেন এত ধনসম্পদ আর প্রাচুর্য? কেন কেউ প্রভু, কেউ হুকুমের দাস? কারও দেহে শৌখিন পোশাক, আর কারও দেহাবরণের জন্যে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়াও জোটে না কেন? কর্তৃপক্ষের প্রভুত্বের নিকট নতিস্বীকারের পুরোনো আদর্শ—যার উপরে সমস্ত সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। তাই বারবার হতে থাকল

কৃষক-অভ্যুত্থান, কিন্তু দুর্বল সংগঠনের জন্যে তাদের সহজেই দমন করা হল, যদিও কিছুদিন পরেই তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রায় সর্বক্ষণই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত থাকত। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের ভিতরে চলেছিল 'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ'। ফ্রান্সের পূর্বদিকে বারগাণ্ডি এক শক্তিশালী রাষ্ট্র, যদিও নামে ফ্রান্সের রাজার অনুগত। কিন্তু অনুগত রাষ্ট্রের তুলনায় বারগাণ্ডি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও অশান্ত। ইংলণ্ড এই বারগাণ্ডি ও আরও কয়েকটি শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চতুর্দিক থেকে ফ্রান্সকে চেপে ধরল। পশ্চিম-ফ্রান্সের বেশ একটা বড়ো অংশ বহুদিন ধরে ইংরেজের অধিকৃত হয়ে রইল এবং ইংলণ্ডের রাজা নিজেকে 'ফ্রান্সের রাজা' বলতে শুরু করলেন। ফ্রান্স যখন দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁচেছে, যখন তার কোথাও আর আশাভরসা নেই, তখন একটি কিশোরী কৃষকমেয়ের রূপ ধরে তার সামনে এসে দাঁড়াল বিজয়ের সংকেত। তুমি তো অর্লেয়াঁর মেয়ে জোয়ান অব্ আর্কের কথা কিছু কিছু জানো, তুমি তো তার খুব ভক্ত। সেই মেয়ে তার ভগ্নোদ্যম দেশের লোকের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে বিরাট প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করল, এবং তারই নেতৃত্বে দেশের মাটি থেকে তারা ইংরেজকে বিতাড়িত করল। কিন্তু এসবের জন্যে তার পুরস্কার মিলল ইন্‌কুইজিশনের বিচার, ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর শাস্তি। ইংরেজ তাকে ধরে নিয়ে চার্চের কাছে দোষী প্রতিপন্ন করল, এবং রোয়ে'র প্রকাশ্য বাজারে ১৪৩০ সালে তাকে পুড়িয়ে মারল। বহু বৎসর পরে রোমান চার্চ দোষীর সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়ে পুরোনো ভুল শোধরাবার চেষ্টা করে। এবং আরও বহু পরে তাকে 'সেণ্ট', মহাপ্রাণ, এই আখ্যা দেওয়া হয়!

জোয়ান তার স্বদেশভূমিকে বিদেশীর হাত থেকে বাঁচানোর কথা বলেছিল। এ ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কথা। তখনকার দিনের লোকেদের চিন্তাধারা সামন্ততান্ত্রিকতায় এত বেশি পূর্ণ ছিল যে, তারা জাতীয়তাবাদের কথা ভাবতে পারত না। কাজেই জোয়ানের কথা তাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, তাকে তারা ভালো করে বুঝতে পারে নি। জোয়ান অব্ আর্কের সময় থেকেই দেখি ফ্রান্সে ক্ষীণ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।

ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়ানোর পর ফ্রান্সের রাজা বারগাণ্ডির দিকে মন দেয়, কারণ বারগাণ্ডি তাকে বহু জ্বালিয়েছে। অবশেষে এই প্রতাপান্বিত অনুগত রাজ্যটি আয়ত্তাধীনে আসে, এবং ১৪৮৩ সালে ফ্রান্সের এক অংশ বলে গণ্য হয়। ফরাসি-রাজা এবার বেশ ক্ষমতা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সে সামন্ত জমিদারদের হয় উৎখাত করেছে, নয়তো সম্পূর্ণ নিজের অধীনস্থ করেছে। ফ্রান্স বারগাণ্ডিকে আত্মসাৎ করবার পর এবার এল জর্মানির সঙ্গে তার বোঝাপড়ার পালা। এদের সীমান্তদেশ এবার পরস্পরের গায়ে লাগালাগি হয়ে গেল। তবে ফ্রান্সে ছিল কেন্দ্রীভূত বলশালী রাজতন্ত্র, আর জর্মানি কতকগুলি ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভক্ত ও দুর্বল।

এদিকে ইংলণ্ড আবার তখন স্কটল্যাণ্ড অধিকারের চেষ্টায় ছিল। এও এক বহুদিনব্যাপী সংগ্রামের কাহিনী, এবং স্কটল্যাণ্ড বেশির ভাগ সময়ই ইংলণ্ডের বিপক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিত। ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে রবার্ট্ ব্রুসের নেতৃত্বে স্কটল্যাণ্ডবাসী 'ব্যানক্‌বার্ন'-এ ইংরেজকে পরাজিত করে।

এরও আগে, দ্বাদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের আয়র্ল্যাণ্ডকে জয় করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সে আজ সাত শো বছর আগের কথা; এবং তখন থেকেই আয়র্ল্যাণ্ডে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক লেগেই ছিল। বিদেশী প্রভুর কাছে নতিস্বীকার করতে এই ছোট্ট দেশটা কোনোমতেই রাজি হয় নি, তাই পুরুষানুক্রমে বিদ্রোহ করে সে নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধকে ঘোষণা করেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের আর-একটি ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যাণ্ড তার স্বাধীনতার অধিকার দাবি করে। এটি ছিল পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্যের একটি অংশ, অস্ট্রিয়া দ্বারা শাসিত। তুমি উইলিয়ম টেল্ আর তার ছেলের গল্প নিশ্চয় পড়েছ, কিন্তু সেটা বোধ হয় সত্যি নয়। বিরাট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সুইস্ কৃষকদের বিদ্রোহের গল্প আরও চমৎকার। কিছুতেই তারা হার মানবে না। প্রথমে তিনটি ক্যাণ্টন অথবা জেলা বিদ্রোহ করে ও ১২৯১ সালে তাদের 'চিরস্থায়ী দল' নামে এক সংঘ গঠন করে। অন্য ক্যাণ্টনগুলিও যোগ দেয়, এবং ১৪৯৯ সালে সুইজারল্যাণ্ডে

স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন ক্যাণ্টনের সংঘ হওয়াতে এর নাম হয় 'সুইস্ কন্‌ফেডারেশন'। তোমার মনে আছে তো, অগাস্ট মাসের প্রথম দিনে সুইজারল্যাণ্ডের কত পাহাড়ের চূড়ায় আমরা আগুন জ্বলতে দেখেছি? সেটা সুইস্‌দের জাতীয় দিবস, সুইস্-বিপ্লবের সমাবর্তন-উৎসবের দিন। এইদিনের আরম্ভে আগুন জ্বালিয়ে অস্ট্রিয়ান শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার সংকেত করা হয়েছিল।

ইউরোপের পূর্বদিকে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে তখন কী হচ্ছিল? তোমার নিশ্চয় মনে আছে, লাতিন-ধর্মযোদ্ধারা খৃষ্টোত্তর ১২০৪ সালে গ্রীকদের হাত থেকে এই শহরটা কেড়ে নেয়। ১২৬১ সালে গ্রীকরা এদের বিতাড়িত করে 'পূর্ব-সাম্রাজ্যে'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মাথার উপরে তখন আরও বড়ো একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছিল।

মঙ্গোলীয়রা যখন এশিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছিল, তাদের সামনে থেকে পঞ্চাশ হাজার অটোম্যান তুর্কি পলায়ন করেছিল। এরা ছিল সেলজুক তুর্কি থেকে বিভিন্ন। এরা 'অথম্যান' বা 'ওস্‌মান' নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে দাবি করত, তাই তাদের নাম ছিল 'অটোম্যান' বা 'ওসমান্‌লি' তুর্কি। এই অটোম্যানরা পশ্চিম-এশিয়ায় সেলজুকদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সেলজুক তুর্কিদের শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অটোম্যানদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। তারা ক্রমশ অধিকার বিস্তার করতে থাকে। পূর্ববর্তী অনেকের মতো তারা কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ আক্রমণ করতে গেল না, বরং একে অতিক্রম করে ১৩৫৩ অব্দে গিয়ে প্রবেশ করল ইউরোপে। সেখানে তারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া অধিকার করে অ্যাড্রিয়ানোপ্‌লে তারা রাজধানী স্থাপন করল। এইভাবে অটোম্যান-সাম্রাজ্য কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের দুই ধার দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপে প্রসারিত হল। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ বেষ্টিত হল বটে, কিন্তু এর অন্তর্গত হল না। এক হাজার বছরের পুরোনো গর্বিত পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের চিহ্ন রইল শুধু এই ছোট্ট শহরটিতে, কার্যত আর কোথাও না। তুর্কিরা যদিও পূর্ব-সাম্রাজ্যকে অতি দ্রুত গ্রাস করছিল তবু তখন সুলতান ও সম্রাটদের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি দেখা গেছে, পরস্পরের পরিবারে তাদের বিবাহাদিও চলেছিল। অবশেষে ১৪৫৩ সালে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ তুর্কিদের হস্তগত হয়। এখন শুধু অটোম্যান তুর্কিদের কথাই বলব। সেলজুকরা ইতিমধ্যে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছে।

কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতন বহুদিন ধরে আশঙ্কিত হলেও এটা ইউরোপকে বড়োরকমের একটা নাড়া দিল। এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার বছরের পুরোনো গ্রীক পূর্ব-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল এবং ইউরোপে মুসলিম আক্রমণের আর-একটা পর্বের সূচনা হল। তুর্কিরা অবিরত বিস্তার লাভ করে চলল, মাঝে মাঝে মনে হত বুঝি তারা সমগ্র ইউরোপকে অধিকার করে বসবে, কিন্তু তারা বাধা পেল এসে ভিয়েনার দ্বারদেশে।

সম্রাট জাস্টিনিয়ন ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'সেণ্ট সোফিয়া'র যে বিরাট ধর্মমন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেটা পরিণত হল 'আয়া সুফিয়া' নামে এক মসজিদে, এর ধনসম্পত্তির কিছু লুণ্ঠনও হয়েছিল। ইউরোপ অত্যন্ত খেপে গেল বটে, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সত্যি কথা বলতে কী, তুর্কি সুলতানরা গোঁড়া গ্রীক চার্চ সম্পর্কে খুব সহিষ্ণু ছিলেন, এবং কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্-অধিকারের পরে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কার্যত নিজেকে গ্রীক চার্চের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করেছিলেন। মহামহিমান্বিত সুলেমান (Suleiman the Magnificent) নামে খ্যাত এক পরবর্তী সুলতান নিজেকে প্রাচ্য-সম্রাটদের প্রতিনিধি বিবেচনা করতেন, ও 'সিজার' উপাধি গ্রহণ করেন। পুরোনো ঐতিহ্যের এমনি ক্ষমতা।

অটোম্যান তুর্কিরা কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের গ্রীকদের কাছে খুব অবাঞ্ছনীয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। প্রাচীন সাম্রাজ্যের মুমূর্ষু দশা তারা দেখেছিল। পোপ এবং পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্মাবলম্বীর চেয়ে তারা তুর্কিদেরই পছন্দ করেছিল। লাতিন-ধর্মযোদ্ধাদের সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বিশেষ সুবিধের ছিল না। কথিত আছে যে, ১৪৫৩ সালে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের বিগত অবরোধের সময়

'বাইজানটিনা'র এক ধনী অভিজাত বলেছিলেন, "পোপের মস্তকাবরণের চেয়ে পয়গম্বরের পাগড়িও ভালো।"

তুর্কিরা একটা নূতন ধরনের বাহিনী গড়ে তোলে, একে বলত 'যানিসারিজ'। খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে দান হিসাবে তাদের সন্তানদের গ্রহণ করে এক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করত। বাপ-মায়ের কাছ থেকে ছেলেদের আলাদা করে রাখা খুবই নিষ্ঠুর কাজ বটে, তবে এসব ছেলেদের একটা সুবিধে ছিল এই যে, ভালো শিক্ষা পেয়ে তারা একরকম অভিজাত সামরিক-শ্রেণীতে পরিণত হত। এই যানিসারিদের বাহিনী ছিল অটোম্যান সুলতানদের এক স্তম্ভস্বরূপ। 'যানিসারি' শব্দটি এসেছিল 'যান' (জীবন) ও 'নিসার' (উৎসর্গ) থেকে—অর্থাৎ এমন একজন যে তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে।

ঠিক এইভাবে মিশরে 'মামেলুক' নামে যানিসারির মতোই এক বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেছিল, এমনকি এর মধ্য থেকে মিশরের সুলতান পর্যন্ত মনোনীত হত।

কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকারের পর অটোম্যান সুলতানরা যেন তাঁদের পূর্ববর্তী বাইজানটিনার সম্রাটদের বিলাস ও কলুষতার কদভ্যাসগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জন করেছিলেন। বাইজানটিনার অধঃপতিত সাম্রাজ্যের রীতিনীতি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে তাদের সমস্ত শক্তিকে ক্রমে নষ্ট করে ফেলতে লাগল। তবে কিছুদিনের জন্যে তাদের শক্তির কাছে খৃষ্টীয় ইউরোপকে ভয়ে কম্পমান হতে হয়েছিল। মিশরকে পরাভূত করে তারা আব্বাসিদের দুর্বল ও হীনশক্তি প্রতিভূর কাছ থেকে 'খলিফা' উপাধি কেড়ে নেয়। সেই সময় থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্তও অটোম্যান সুলতানরা নিজেদের 'খলিফা' বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। মুস্তাফা কামাল পাশা 'সুলতান' ও 'খলিফা' দুয়েরই উচ্ছেদ করে এর অবসান ঘটান।

কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতনের দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয়। একটা যুগের অবসান ও নূতন যুগের শুরু হিসাবে একে ধরা হয় যুগসন্ধি বলে। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল। এক হাজার বৎসরের 'অন্ধকারের যুগ' শেষ হয়ে ইউরোপে দেখা দিল নূতন প্রাণের স্পন্দন। একেই বলা হয় 'রেনেসাঁস'-এর গোড়ার দিক—সাহিত্য ও শিল্পের নবজন্ম। যেন বহুদিনের ঘুমের ঘোর কাটিয়ে মানুষ জেগে উঠল। বহু শতাব্দীর পর্দা ভেদ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই প্রাচীন গ্রীসে, তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির উপরে। এরাই তাকে জোগাল অনুপ্রেরণা। চার্চের শেখানো জীবনের যে ভয়াবহ আর গাম্ভীর্যময় রূপ মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তারই বিরুদ্ধে সমস্ত মনের মধ্যে এক বিদ্রোহের সুর বেজে উঠল। আবার দেখা দিল সুন্দরের প্রতি পুরোনো গ্রীক অনুরাগ, ইউরোপ বিকশিত হয়ে উঠল শিল্প ও ভাস্কর্যের নিপুণতম অবদানে।

অবশ্য এ সবই সহসা কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতন-জনিতই নয়। সেরকম ভাবা ভারি ভুল হবে। তুর্কিদের দ্বারা শহরটি অধিকৃত হওয়ায় সমস্ত পরিবর্তনটা দ্রুতগতিতে ঘটেছিল বটে, কারণ বহুসংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোক শহর ছেড়ে পশ্চিমে চলে যান। ঠিক যে সময় পশ্চিম রসগ্রহণে প্রস্তুত হয়েছিল, এঁরা ইতালিতে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন গ্রীক সাহিত্য-ভাণ্ডারের সেরা জিনিষগুলি। এ হিসেবে অবশ্য কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতন রেনেসাঁসকে আহ্বান করতে অল্প কিছুটা সাহায্য করেছিল।

কিন্তু এটা বিরাট পরিবর্তনের একটা ক্ষুদ্র নিমিত্তমাত্র। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও চিন্তাধারা ইতালি বা মধ্যযুগীয় পশ্চিমের কাছে কিছু নূতন জিনিষ ছিল না। লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করত, জ্ঞানী লোকেরাও এসবের কথা আগেই অবগত ছিলেন। কিন্তু এসব খুব অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনকার জীবনাদর্শের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় বিস্তৃতি লাভ করতে পারে নি। ক্রমে মানুষের মনে প্রচলিত জীবনযাত্রার প্রতি সংশয় জাগল, নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারার উন্মেষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। এতদিনের জানা জিনিষ নিয়েই তারা আর সন্তুষ্ট হতে পারল না, আরও বেশি জানবার আকাঙ্ক্ষায় তারা নূতনের সন্ধানে মন দিল। আশা-আশঙ্কায় ভরা মনের এই অবস্থায় যখন তারা গ্রীসের পুরোনো pagan (প্যাগান) দর্শনকে আবিষ্কার

করল, সেই সাহিত্যকে তারা পান করল আকণ্ঠ। মনে হল এতদিনের বাঞ্ছিত জিনিষ তারা খুঁজে পেয়েছে, একে আবিষ্কার করে তারা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

রেনেসাঁসের প্রথম শুরু হয় ইতালিতে। পরে তার আবির্ভাব হয় ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও অন্যান্য জায়গায়। এটা শুধু গ্রীক সাহিত্য ও ভাবধারার পুনরাবিষ্কার নয়, তার চেয়ে অনেক বৃহৎ, অনেক মহৎ। ইউরোপে যা এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে চলেছিল, এ হল তারই বহিঃপ্রকাশ। প্রকাশভঙ্গির আরও কত নব নব উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। রেনেসাঁস তারই একটা রূপ।

৭৩

সমুদ্রপথের আবিষ্কার

৩রা জুলাই, ১৯৩২

আমরা এখন ইউরোপের এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছি যখন মধ্যযুগের অবসান ঘটতে আরম্ভ হয়েছে, এবং তার স্থানে এক নূতন যুগ, নূতন জীবনপদ্ধতির আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। প্রচলিত অবস্থার বিরুদ্ধে তখন যে ক্ষোভ আর অসন্তোষ জেগেছে সেই হল পরিবর্তন ও প্রগতির জন্মদাতা। সামন্ততন্ত্র আর ধর্মনীতি যেসব শ্রেণীর শোষণ করছিল তাদের ভিতরে জাগল অসন্তোষ। আমরা কৃষক-বিদ্রোহ, অথবা ফরাসি ভাষায় যাকে 'জ্যাকোয়ারি' (জ্যাকোয়েস-নামক একটি ফরাসি চাষির নাম থেকে) বলা হয়, ঘটতে দেখেছি। কিন্তু কৃষকরা তখনও অত্যন্ত অনুন্নত ও দুর্বল থাকায় বিদ্রোহ করেও বিশেষ লাভ হয় নি। তাদের দিন তখনও আসে নি। আসল বিরোধ ছিল পুরোনো সামন্তশ্রেণী ও নূতন পূর্ণজাগরিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে। শেষোক্ত শ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সামন্তযুগের পদ্ধতিতে ধনসম্পত্তি ছিল ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, আসলে ভূমিই ছিল ধনসম্পদ। কিন্তু এখন যে নূতন সম্পদ আহরিত হতে লাগল তার সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক নেই। এটা হল যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্যের দান, এর থেকেই লাভবান হয়ে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। সামন্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই সংঘাত অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছিল। এখন যেটা দেখছি সেটা শুধু উভয় দলের পারস্পরিক অবস্থার পরিবর্তন। সামন্তনীতি এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আর মধ্যবিত্তশ্রেণী নবলব্ধ শক্তির আশ্বাসে আক্রমণাত্মক পন্থায় চলেছে। শত শত বৎসর ধরে চলেছে এই সংগ্রাম, আর তাতে মধ্যবিত্তশ্রেণীই উত্তরোত্তর জয়ী হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সংগ্রামের তীব্রতার কমবেশি দেখা গেছে। পূর্ব-ইউরোপে সংগ্রাম খুবই কম হয়। পশ্চিম-ইউরোপেই মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রথম প্রাধান্য লাভ করে।

প্রাচীন বাধানিষেধের বেড়াজাল ভাঙতে পারলেই মানুষ বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে ও নব নব আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হতে পারে। বন্ধনমুক্ত মানবাত্মা নিজেকে প্রসারিত করে, ব্যাপ্ত করে। ঠিক এমনি করেই, যখন আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসবে, আমাদের দেশবাসীর প্রতিভা চতুর্দিকে নিজেকে উজাড় করে দেবে।

চার্চের প্রভাব যত স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল, লোকে ধর্মমন্দির বা চার্চ -নির্মাণে তত কম খরচ করতে শুরু করল। কত জায়গায় সুন্দর সুন্দর বাড়ি গড়ে উঠল, কিন্তু বেশির ভাগই টাউন-হল বা সেইজাতীয়। 'গথিক' নির্মাণপদ্ধতি দূরীভূত হয়ে তার স্থলে এল নূতন এক ধরন।

কতকটা এইরকম সময়েই, যখন পাশ্চাত্য-ইউরোপ নূতন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে পূর্ব দিক থেকে এল স্বর্ণরাজ্যের হাতছানি। মার্কোপোলো ও অন্যান্য পর্যটকদের ভারতবর্ষ ও চীন -ভ্রমণের কাহিনী ইউরোপের কল্পনাশক্তিকে অস্থির করে তুলেছে, প্রাচ্যের প্রভূত ধনসম্পদের উত্তেজনায় অনেকেই নেমে এল সমুদ্রপথে। এই সময়েই ঘটল কন্স্টান্টিনোপ্লের পতন। পূর্ব দিকের স্থল ও জলপথ তখন তুর্কিরা নিয়ন্ত্রণ করছিল, বাণিজ্যকে তারা বেশি আমল দিত না।

বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ও বণিকসম্প্রদায় এতে চটে গেল। প্রাচ্যের-স্বর্ণ-কামী নূতন অভিযাত্রীদলও অত্যন্ত বিরক্ত হল। স্বর্ণময় প্রাচ্যদেশে পৌঁছনোর জন্যে তাই তারা নূতন পথের সন্ধান করতে লাগল।

ইস্কুলের সব মেয়েই তো জানে, পৃথিবীটা গোল আর সেটা সূর্যের চার দিকে প্রদক্ষিণ করে। এ তো আমরা সবাই বুঝতে পারি। কিন্তু বহুদিন আগে এটা এত স্পষ্ট ছিল না; বরং যারাই সাহস করে এ কথা ভাবত, চার্চ তাদের বিপদে ফেলত। কিন্তু চার্চের ভয় থাকা সত্ত্বেও ক্রমেই অধিকসংখ্যক লোক 'পৃথিবীটা গোল' এই সত্য বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ আবার ভাবল, পৃথিবী যদি সত্যই গোল হয় তবে অনবরত পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে চীন ও ভারতবর্ষে পৌঁছনো নিশ্চয় সম্ভব। আবার অনেকে ভাবল, আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে পৌঁছবে। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, তখন সুয়েজ-খালের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কাজেকাজেই ভূমধ্যসাগর থেকে কোনো জাহাজ লোহিতসাগরে পৌঁছতে পারত না। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যবর্তী স্থলভাগটুকুতে মালপত্র ও ব্যবসায়সামগ্রী সম্ভবত উটের পিঠে চাপিয়ে পার করা হত এক সাগরের জাহাজ থেকে অন্য সাগরের জাহাজে। কিন্তু এইরকমভাবে আদানপ্রদানটা মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। মিশর আর সিরিয়া তুর্কিদের অধীনে থাকায় এ পথটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ভারতবর্ষের ধনসম্পদ পাশ্চাত্যের লোককে অনবরত আকর্ষণ করতে লাগল। স্পেন এবং পোর্তুগাল এই অনুসন্ধানী সমুদ্রযাত্রায় নেতৃত্ব গ্রহণ করল। স্পেন তখন গ্রানাডা থেকে মুর এবং সারাসেনদের অবশিষ্টাংশকে বিতাড়িত করছিল। অ্যারাগনের ফার্ডিনান্ড ও কাস্টিলের ইসাবেলা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে খৃষ্টধর্মাবলম্বী স্পেনকে যুক্ত করেন, এবং ১৪৯২ সালে, ইউরোপের অপর প্রান্তে তুর্কিরা কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার করার প্রায় ৫০ বৎসর পরেই, আরবদের গ্রানাডার পতন হয়। অনতিকালের মধ্যেই স্পেন ইউরোপের এক বৃহৎ খৃষ্টধর্মী শক্তিতে পরিণত হয়।

পোর্তুগালবাসী যেতে চেষ্টা করল পূর্বদিকে, স্পেনবাসী গেল পশ্চিমে। ১৪৪৫ সালে পোর্তুগাল কর্তৃক বার্ড-অন্তরীপের আবিষ্কার এই প্রচেষ্টার পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অন্তরীপটি আফ্রিকার পশ্চিমতম প্রদেশে অবস্থিত। আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকাও, দেখবে, ইউরোপ থেকে এই অন্তরীপে যেতে হলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেতে হয়। আবার বার্ড-অন্তরীপের কোণ ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে হয়। এই অন্তরীপ আবিষ্কারের পরে লোকের মনে আশার সঞ্চার হল; তারা ভাবল, এবার আফ্রিকাকে প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে পৌঁছনো যাবে।

অবশ্য এই আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করতে আরও চল্লিশ বছর কেটে গেল। ১৪৮৬ সালে পোর্তুগালের বারথোলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ ঘুরে যান। এই অংশের নাম 'কেপ অব গুড হোপ' বা উত্তমাশা অন্তরীপ। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাস্কো-ডা-গামা নামে আর একজন পোর্তুগালবাসী এই আবিষ্কারের সুযোগ নেন, এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মালাবারের তীরে কালিকটে এসে পৌঁছন।

ভারতবর্ষে পৌঁছনোর প্রতিযোগিতায় পোর্তুগালই গেল জিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তে এমন-সব বৃহৎ ঘটনা ঘটছিল যার থেকে স্পেন লাভবান হল। ক্রিস্টফার কলম্বস ১৪৯২ সালে আমেরিকায় উপস্থিত হন। কলম্বস ছিলেন জেনোয়ার এক গরিব ঘরের ছেলে। পৃথিবীটা গোল জেনে তিনি পশ্চিমদিক দিয়ে জাহাজ চালিয়ে জাপান ও ভারতবর্ষে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ভাবেন নি রাস্তাটা এতটা লম্বা হবে। তিনি বিভিন্ন রাজ-দরবারে ঘুরে ঘুরে রাজন্যদের তাঁর অনুসন্ধানী সমুদ্রযাত্রায় সাহায্য করতে অনুরোধ জানান। অবশেষে স্পেনের ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হন, এবং কলম্বস তিনটি ছোট্ট জাহাজ আর অষ্টাশি জন লোক নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। অজানার উদ্দেশে এই পাড়ি-দেওয়াটা নিতান্তই দুঃসাহসিক হয়েছিল, কারণ সামনে কী কেউ জানে না। কিন্তু কলম্বসের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সেটা সত্যে পরিণত হল। উনসত্তর দিন সমুদ্রযাত্রার পর তাঁরা স্থলের নাগাল পেলেন।

দেশ ও সমুদ্রপথের আবিষ্কার

কলম্বস ভাবলেন, এটাই বুঝি ভারতবর্ষ। আসলে সেটা ছিল 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ'এর একটা দ্বীপ। কলম্বস কোনোদিন খাস আমেরিকায় পৌঁছতে পারেন নি, আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি এশিয়ায় পোঁচেছেন। তাঁর এই অদ্ভুত ভ্রান্ত বিশ্বাস আজও চলে আসছে, এই দ্বীপগুলিকে এখনও বলা হয় 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' বা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের এখনও 'ইণ্ডিয়ান' অথবা 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলা হয়ে থাকে।

কলম্বস ইউরোপে ফিরে এসে পরের বৎসরই আরও অনেক জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে পৌঁছনোর নূতন রাস্তা আবিষ্কার (তাই ছিল লোকের বিশ্বাস) সারা ইউরোপকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। এর অল্প কিছু পরেই ভাস্কো-ডা-গামা তাঁর প্রাচ্যের সমুদ্রযাত্রা দ্রুত শেষ করে কালিকটে পৌঁছন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, যত নব নব আবিষ্কারের সংবাদ আসতে লাগল, ইউরোপের চঞ্চলতা ততই বর্ধিত হল। পোর্তুগাল ও স্পেন ছিল নবাবিষ্কৃত দেশে আবিষ্কার-বিস্তারের ব্যাপারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। পটভূমিতে তখন হল পোপের আবির্ভাব; স্পেন ও পোর্তুগালের দ্বন্দ্ব মিটমাট করে দিতে গিয়ে তিনি পরের কড়িতে দাতব্য শুরু করলেন। ১৪৯৩ সালে তিনি একটি অনুশাসন জারি করেন। এই অনুশাসনের নাম 'বুল অব ডিমারকেশন', (পোপের অনুশাসনকে কোনো কারণে 'বুল' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে) অর্থাৎ, সীমানা-নির্ধারণের অনুশাসন। 'আজোর'-এর এক শো 'লীগ' পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনি একটা কাল্পনিক রেখা টানলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এই রেখার পূর্ব দিকে যত অখৃষ্টীয় জায়গা আছে তারা যাবে পোর্তুগালের অধিকারে, আর স্পেনের অধিকারে থাকবে রেখার পশ্চিমাংশ। ইউরোপ বাদে প্রায় সারা পৃথিবীটাকেই পোপ বিনা আয়াসে বিলিয়ে দিলেন! আজোরদ্বীপগুলি আটলাণ্টিক সমুদ্রে অবস্থিত, আর তাদের ১০০ 'লীগ' অর্থাৎ ৩০০ মাইল পশ্চিম দিয়ে যদি একটা রেখা টানা যায়, তা হলে পশ্চিম দিকে পরে সমগ্র উত্তর-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ। অতএব কার্যত পোপ স্পেনকে দান করলেন আমেরিকা, আর পোর্তুগালকে দান করলেন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান এবং অন্যান্য প্রাচ্য-দেশগুলি, এমনকি সমগ্র আফ্রিকাও!

পোর্তুগাল এই বিস্তৃত রাজ্যের উপর অধিকারস্থাপনে ব্যাপৃত হল। কাজটা সহজ নয়। কিছুটা অগ্রসর হয়ে পর্তুগীজরা পূর্বদিকে যেতে থাকল। ১৫১০ সালে তারা গোয়ায় এসে পৌঁছয়। ১৫১১ সালে পৌঁছল মালয় উপদ্বীপের মালাক্কাতে; তার কিছু পরেই জাভায়; এবং ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে পৌঁছল চীনদেশে। এর অর্থ এই নয় যে, এসমস্ত জায়গাই তারা অধিকার করতে পেরেছিল। মাত্র কয়েকটা ছোটোখাটো জায়গায় তারা কিছুটা স্থান পায়। প্রাচ্যে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিষয় আমরা পরবর্তী কোনো চিঠিতে আলোচনা করব।

প্রাচ্যে আগত পর্তুগীজদের মধ্যে ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। পর্তুগীজ প্রভুদের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন, এবং স্পেনের প্রজা হন। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে, পূবের সমুদ্রপথ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য-দ্বীপগুলিতে একবার এসেছিলেন। এখন তাঁর খেয়াল হল, পশ্চিমের পথ দিয়ে আমেরিকা হয়ে সেখানে যাবার। হয়তো, তিনি জানতেন যে, কলম্বস-আবিষ্কৃত দেশ এশিয়া থেকে অনেক দূরে। এমনকি ১৫১৩ সালে 'বালবোয়া' নামে একজন স্পেনদেশবাসী মধ্য-আমেরিকায় পানামা পর্বতমালা পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁচেছিল। যে কারণেই হোক, সে এর নাম দিয়েছিল 'দক্ষিণ-সমুদ্র', আর নব-আবিষ্কৃত সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সে দাবি করেছিল যে, এই সমুদ্রধৌত যত দেশ আছে, সব তার প্রভু স্পেনের রাজার সম্পত্তি।

১৫১৯ সালে ম্যাগেলান তাঁর পশ্চিম-সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। এটাই পরে সবচেয়ে বৃহৎ সমুদ্রযাত্রা বলে প্রতিপন্ন হয়। তাঁর ছিল পাঁচটি জাহাজ ও ২৭০ জন লোক। তিনি আটলাণ্টিক পার হয়ে যান দক্ষিণ-আমেরিকায়, এবং মহাদেশের শেষ প্রান্তে না পৌঁছনো পর্যন্ত ক্রমাগত দক্ষিণে যেতে থাকেন। পথে একটি জাহাজ নষ্ট হয় জলমগ্ন হয়ে, আর-একটি জাহাজ পালিয়ে যায়। রইল তিনটি জাহাজ। এদের নিয়ে তিনি দক্ষিণ-আমেরিকা ও একটি দ্বীপের মাঝখানের সংকীর্ণ একটি প্রণালী পার হয়ে অন্যদিকের মহাসমুদ্রে এসে পড়েন। এটাই হল প্রশান্ত মহাসাগর।

আটলান্টিকের তুলনায় খুব শান্ত ছিল বলেই ম্যাগেলান তার এইরকম নাম দিয়েছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছতে তাঁর ঠিক চোদ্দ মাস লেগেছিল। আর যে প্রণালীটি তিনি পার হয়েছিলেন, তাঁর নামে তার নাম দেওয়া হল 'স্ট্রেট অব ম্যাগেলান'।

তার পরে ম্যাগেলান এই অজানা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে প্রথমে উত্তরে এবং পরে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হতে লাগলেন। সমুদ্রভ্রমণের এই অংশটাই ছিল সবচেয়ে ভয়ানক। কেউ জানত না যে, এত বেশি সময়ের দরকার হবে। প্রায় চার মাস ধরে, সঠিকভাবে ঠিক ১০৮ দিন ধরে, তাঁদের প্রায় খাদ্যপানীয়হীন অবস্থায় মাঝ-সমুদ্রে ভাসতে হয়েছিল। অবশেষে বহু দুর্দশার পর তাঁরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছন। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করে ও তাঁদের খাদ্য দেয়। এদের সঙ্গে তাঁদের উপহার-বিনিময়ও হয়। কিন্তু স্পেনের লোকের স্বভাবই ছিল উগ্র আর উদ্ধত। দুই দলের সর্দারের মধ্যে একটা ছোটোখাটো যুদ্ধে জড়িত হয়ে ম্যাগেলান মারা যান। অন্যান্য বহু স্পেনীয় তাদের উগ্র স্বভাবের দোষে দ্বীপের লোকেদের হাতে মারা পড়ে।

স্পেনের লোকেরা তার পরে খুঁজতে বেরোল 'স্পাইস আইল্যান্ড্‌স্', যেখান থেকে তাদের মূল্যবান মশলাপাতি আসত। আর-একটা জাহাজকেও শেষ করতে হল আগুনে পুড়িয়ে। বাকি রইল মাত্র দুটি। তখন ঠিক হল একটা জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে স্পেনে ফিরে যাবে, আর-একটা জাহাজ ফিরবে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ধরে। পূর্বোক্ত জাহাজটি বেশি দূর এগোবার আগেই পর্তুগীজরা তাদের বন্দী করে। কিন্তু অন্য জাহাজটি—ভিটোরিয়া—চুপি চুপি আফ্রিকা ঘুরে ১৮ জন লোক নিয়ে পৌঁছল স্পেনের 'সেভিল'-এ। তারা পৌঁছল ১৫২২ সালে, রওনা হবার ঠিক তিন বছর পরে। এইভাবে এই জাহাজটাই সর্বপ্রথম সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এল।

ভিটোরিয়া জাহাজের কথা এত বেশি করে বলছি তার কারণ, এর সমুদ্রযাত্রাটা ছিল বড়ো চমৎকার। আমরা তো আজকাল কত আরামে সমুদ্র পার হই, বড়ো বড়ো জাহাজে লম্বা পথ পাড়ি দিই। কিন্তু ভাবো তো একবার সেইসব দিনের সমুদ্রযাত্রীর কথা, যাঁরা সমস্ত বিপদ মাথায় করে অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তাদের পরবর্তীদের জন্যে কত সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে গেছে! তখনকার দিনের স্পেন ও পোর্তুগালের লোকেরা উদ্ধত, অহংকারী এবং নিষ্ঠুর ছিল সত্যি; কিন্তু তাদের সাহস ছিল অদ্ভুত, আর ছিল অজানাকে জানবার দুর্দম আগ্রহ।

ম্যাগেলান যখন সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, কর্টেস তখন মেক্সিকো শহরে ঢুকে স্পেনের রাজার জন্যে 'আজটেক'-সাম্রাজ্য জয় করছিলেন। এই সম্বন্ধে ও আমেরিকার 'মায়া'-সভ্যতা সম্বন্ধে তোমাকে আগেই কিছু কিছু বলেছি। কর্টেস্ মেক্সিকো পৌঁছলেন ১৫১৯ সালে। দক্ষিণ-আমেরিকা 'ইনকা'-সাম্রাজ্যে (এখন যেখানে 'পেরু') পিজারো পৌঁছলেন ১৫৩০ সালে। সাহস, স্পর্ধা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার সাহায্যে, আর দেশের আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগ নিয়ে, কর্টেস্ আর পিজারো দুই প্রাচীন সাম্রাজ্যকে লুপ্ত করতে সক্ষম হলেন। অবশ্য এই দুটি সাম্রাজ্যই খুব জীর্ণশীর্ণ হয়ে এসেছিল, আর কোনো কোনো বিষয়ে ছিল অত্যন্ত আদিম। তাই প্রথম ধাক্কাতেই তারা ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো।

যে পথে বড়ো বড়ো অনুসন্ধানী আর আবিষ্কারক গিয়েছিলেন সেই পথে তাঁদের অনুসরণ করল লুণ্ঠনলোভী দুঃসাহসিক দস্যুর দল। বিশেষ করে স্পেনীয় আমেরিকাকেই এই দস্যুদলের হাতে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল, কলম্বসও এদের লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার পান নি। সেই সময়েই পেরু আর মেক্সিকো থেকে স্পেনে অবিশ্রান্ত সোনা আর রুপোর সমাগম হচ্ছিল। ইউরোপের চোখ ধাঁধিয়ে প্রভূতপরিমাণ মূল্যবান ধাতু এসে স্পেনকে ইউরোপের মধ্যে বিরাট এক শক্তিতে পরিণত করল। এই সোনারুপো ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যান্য দেশেও, আর এইভাবে প্রাচ্যদেশের উৎপন্নদ্রব্য ক্রয় করার জন্যে প্রচুর অর্থ এসে পড়ল।

পোর্তুগাল ও স্পেনের এই সাফল্য স্বভাবতই অন্যান্য দেশের লোকদের, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইংলন্ড, হল্যান্ড এবং উত্তর-জর্মানির শহরবাসীদের কল্পনারাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রথমে তাঁদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা হল উত্তরদিকের সমুদ্রপথে এশিয়া ও আমেরিকায় যাবার রাস্তা খুঁজে

পাওয়া, নরওয়ের উত্তর হয়ে পূর্বদিকে, তার পর গ্রীনল্যান্ড ছুঁয়ে পশ্চিমে। কিন্তু প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে তারা পরিচিত রাস্তাগুলিই গ্রহণ করল।

সে সময়টা কী আশ্চর্য সুন্দরই না ছিল, যখন মনে হত পৃথিবী বুঝি তার সমস্ত ধন-সম্পদ আর বিস্ময়ের ঝুলি উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে! একের পর এক হতে লাগল নব নব আবিষ্কার, কত অজানা মহাসমুদ্র, আর মহাদেশ, আর অপরিমিত ধনভাণ্ডার, সবাই যেন একটি যাদুমন্ত্রের অপেক্ষায় ছিল—'চিচিং ফাঁক্'। সারা আকাশ-বাতাস বুঝি ভরে ছিল সেই দুঃসাহসিক যাদুমন্ত্রের মায়াতে।

এখন পৃথিবীকে কত সংকীর্ণ মনে হয়, এখন যেন কিছুই আবিষ্কার করার নেই। কিন্তু তা তো সত্যি নয়! বিজ্ঞান যে আবিষ্কারের অজস্র পথ খুলে দিয়েছে, বন্ধুর যাত্রাপথের তো অভাব নেই—বিশেষ করে আজকের ভারতবর্ষে!

৭৪

ধ্বংসমুখে মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্য

৯ই জুলাই, ১৯৩২

তোমাকে আগেই লিখেছি মধ্যযুগের অবসানের কথা, তার পর ইউরোপে নূতন প্রাণের স্পন্দনের কাহিনী, নব উদ্দীপনার কত বিচিত্র বহির্মুখিতা। মনে হল, ইউরোপ কর্মব্যস্ততা আর সৃষ্টির উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তার দেশের লোকে বহু শতাব্দী ধরে ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার পর হঠাৎ পাগলের মতো পার হয়ে গেল সমুদ্রের বিশাল জলরাশি, প্রবেশ করল পৃথিবীর গভীরতম অভ্যন্তরে। আত্মশক্তিতে সচেতন বিজয়ীর মতো তারা এগিয়ে চলল। আর এই আত্মবিশ্বাসই তাদের সাহস জুগিয়েছে, তাদের করে তুলেছে অদ্ভুতকর্মা।

নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছ, হঠাৎ এমন পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হল? ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এশিয়া ও ইউরোপের উপর প্রভুত্ব করছিল মঙ্গোলীয়রা। প্রাচ্য-ইউরোপ ছিল তাদের অধিকারে, আর পাশ্চাত্য-ইউরোপ সেই প্রচণ্ড আর দুর্জয় (অন্তত তাই মনে হত) যোদ্ধৃবৃন্দের ভয়ে সর্বদা কম্পমান থাকত। ইউরোপের রাজা আর সম্রাটের দল তো 'মহামান্য খান'এর একটি সেনাপতির তুলনায়ও নগণ্য মাত্র!

দু শো বৎসর পরে অটোম্যান তুর্কিরা সাম্রাজ্যের প্রধান নগর কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ ও দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপের বেশ-একটা বড়ো অংশ দখল করে। মুসলমান ও খৃষ্টীয়দের মধ্যে আট শো বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহের পরে আরব ও সেলজুকদের এতদিনের আশার ধন অটোম্যানদের হস্তগত হয়ে গেল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অটোম্যান-সুলতানরা লোলুপ দৃষ্টি ফেরাল পশ্চিমে, এমনকি রোমের উপরেও। তারা জর্মন-সাম্রাজ্যকে (পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য) এবং ইতালিকে ভীতিপ্রদর্শন করল। হাঙ্গেরিকে পরাজিত করে তারা পৌঁছল ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে ও ইতালির সীমান্তদেশে। পূর্বদিকে তারা বাগদাদকে নিজেদের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করল এবং দক্ষিণে মিশরকে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহামান্য সুলতান সুলেমান বিশাল তুর্কি-সাম্রাজ্য শাসন করছিলেন। এমনকি সমুদ্রেও তাঁরই নৌবাহিনী ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী।

কেমন করে এই পরিবর্তন ঘটল? কেমন করে ইউরোপ মঙ্গোলীয় গ্রাসের কবলমুক্ত হল? তুর্কির হাত থেকে বাঁচল কেমন করে? শুধু বাঁচলই না, নিজেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে অপরের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করল কেমন করে?

মঙ্গোলীয়রা ইউরোপকে বেশি দিন ভয় দেখায় নি। নূতন খান নির্বাচন করতে গিয়ে তারা নিজে থেকেই বিদায় হল, আর ফিরল না। পশ্চিম-ইউরোপ তাদের দেশ মঙ্গোলিয়া থেকে বড়ো

বেশি দূর ছিল। অথবা হয়তো নিজেরা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি এবং তৃণাঞ্চলের মানুষ বলে, অরণ্য-সংকুল দেশ তাদের ততটা আকর্ষণ করে নি। তবে অন্য যে কারণেই হোক, পশ্চিম-ইউরোপ মঙ্গোলীয়দের হাত থেকে নিজেদের বীরত্বের জোরে বাঁচে নি, বেঁচেছে তারা কিছুটা অন্য কাজে ব্যস্ত, এবং নিরুৎসুক ছিল বলে। প্রাচ্য-ইউরোপে মঙ্গোলীয়রা আরও কিছুদিন টিঁকে ছিল, তার পরে তাদের ক্ষমতা ক্রমশ একেবারে লোপ পায়।

তোমাকে আগেই বলেছি যে, ১৪৫২ সালে তুর্কিদের কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌-অধিকার ইউরোপের ইতিহাসের গতি ফিরিয়ে দেয়। মধ্যযুগের অবসান, নূতন চৈতন্যের উদয় ও তার নানাবিধ বিকাশকে (Renaissance) সুবিধার জন্যে এই ঘটনার দ্বারা সূচিত করা হয়। তুর্কিরা যখন ইউরোপকে শাসাচ্ছিল, তার সাফল্যমণ্ডিত হবার সম্ভাবনাও যখন প্রচুর, ঠিক তখনই অদ্ভুতভাবে ইউরোপ করছিল শক্তিসঞ্চয়। পাশ্চাত্য-ইউরোপে তুর্কিরা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল; তাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অনুসন্ধানীগণ নূতন দেশ আর সমুদ্র আবিষ্কার করে পৃথিবী পরিক্রমা করছিলেন। মহামান্য সুলেমানের রাজত্বকালে (১৫২০—১৫৬৬) তুর্কি-সাম্রাজ্য ভিয়েনা থেকে বাগদাদ ও কায়রো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু তার পরে আর অগ্রসর হয় নি। তুর্কিরা ক্রমে গ্রীক-অধিকৃত কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পুরোনো কদাচার ও দৌর্বল্যের কাছে আত্মসমর্পণ করছিল। ইউরোপ যত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিল, তুর্কিরা তাদের আগের উদ্যম ও শক্তি ততই হারিয়ে ফেলছিল।

অতীত যুগে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখেছি, ইউরোপ কতবার এশিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অবশ্য এশিয়াও কয়েকবার ইউরোপ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তবে সে বিশেষ কিছু নয়। আলেকজান্ডার এশিয়া পার হয়ে ভারতবর্ষে ঢুকেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। রোমানরা মেসোপটেমিয়া ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। অপরপক্ষে, বহু আগে থেকেই এশিয়াবাসী জাতিপুঞ্জ ইউরোপকে বারবার পর্যুদস্ত করেছিল। এইসব আক্রমণের মধ্যে সর্বশেষ ছিল অটোম্যান কর্তৃক ইউরোপ-আক্রমণ। ক্রমে ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে, ও ইউরোপই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনটা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটে বলা যেতে পারে। নব-আবিষ্কৃত আমেরিকা ইউরোপের কাছে তৎক্ষণাৎ হার মানে। কিন্তু এশিয়াই ছিল কঠিন সমস্যা। দু শো বছর ধরে ইউরোপ-মহাদেশ এশিয়ার বিভিন্ন অংশে দন্তস্ফুট করতে চেষ্টা করে, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এশিয়ার কিছু অংশকে অধীনস্থ করতে সক্ষম হয়। এটা ভালো করে মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, কারণ ইতিহাসাজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা, ইউরোপ চিরকালই এশিয়ার উপরে প্রভুত্ব করেছে। আসলে ইউরোপের এই নূতন ভূমিকা খুব বেশি দিনের নয়, এটা আমরা দেখতেই পাব; আর ইতিমধ্যেই দৃশ্যপটের পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে, এই ভূমিকাও এখন অতিক্রান্তকাল। প্রাচ্যের দেশে দেশে এখন নূতন ভাবধারা জেগে উঠেছে, স্বাধীনতাকামী সবল আন্দোলন ইউরোপকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার প্রভুত্বের আসনকে দিয়েছে কাঁপিয়ে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার চেয়েও বিস্তীর্ণ ও গভীর হল সাম্যের নূতন সমাজতন্ত্রী মতবাদ, যার উদ্দেশ্য, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিলোপসাধন। ভবিষ্যতে এশিয়ার উপরে ইউরোপের প্রভুত্ব, বা ইউরোপের উপর এশিয়ার প্রভুত্ব, বা যে-কোনো দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্ব, এসবের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

ভূমিকা হল অনেক। এখন আমরা মঙ্গোলীয়দের কাছে ফিরে আসি। তাদের ভাগ্য অনুসরণ করে দেখা যাক, কী ঘটেছিল। তোমার মনে আছে যে, কুব্‌লাই খাঁ ছিলেন শেষ 'উল্লেখযোগ্য খান'। ১২৯২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর, কোরিয়া থেকে সারা এশিয়া, ওদিকে ইউরোপে পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরি অবধি তাঁর যে বিশাল সাম্রাজ্য, সেটা বিভক্ত হয়ে গেল পাঁচটা সাম্রাজ্যে। বস্তুত এর এক-একটি সাম্রাজ্যই ছিল অত্যন্ত বিরাট। আগের একটা চিঠিতে (৬৮-সংখ্যক) এদের পাঁচটির নাম তোমায় জানিয়েছি।

এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হল চীন-সাম্রাজ্য। তার অন্তর্গত ছিল মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, কোরিয়া, আনাম, টঙ্‌কিঙ্‌, এবং বর্মার কতকাংশ। কুব্‌লাইয়ের বংশধরেরা, অর্থাৎ ইউয়ান-রাজবংশ এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন, তবে বেশি দিনের জন্যে নয়। দক্ষিণে কতকাংশ শীঘ্রই

হস্তচ্যুত হয়, এবং তোমাকে আগেই বলেছি, ১৩৬৮ সালে, কুব্‌লাইয়ের মৃত্যুর ঠিক ছিয়াত্তর বছর পরে, তাঁর রাজবংশের পতন হয় ও মঙ্গোলীয়রা বিতাড়িত হয়।

সুদূর পশ্চিমে ছিল 'গোল্ডেন হোর্ড' বা স্বর্ণভাণ্ডারের সাম্রাজ্য। তখনকার নামগুলোর মধ্যে কীরকম একটা মোহ ছিল। কুব্‌লাইয়ের মৃত্যুর পর রাশিয়ার অভিজাতসম্প্রদায় প্রায় দু শো বছর ধরে একে কর দিয়ে এসেছে। শেষ দিকে (১৪৮০) যখন সাম্রাজ্য কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, মস্কোর 'গ্র্যাণ্ড্ ডিউক' (যিনি রাশিয়ার প্রধান অভিজাতের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন) এই কর দিতে অস্বীকার করেন। এই গ্র্যাণ্ড্ ডিউকের নাম ছিল 'আইভান দি গ্রেট' বা মহামান্য আইভান। রাশিয়ার উত্তরে ছিল 'নভোগরোদ'-এর প্রাচীন সাধারণতন্ত্র। ছোটো ও বড়ো বণিকসম্প্রদায় এর শাসন নিয়ন্ত্রণ করত। আইভান এই সাধারণতন্ত্রকে পরাজিত করে নিজের জমিদারির সঙ্গে যুক্ত করে নেন। ইতিমধ্যে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ তুর্কিদের হস্তগত হয়েছে এবং প্রাচীন সম্রাটপরিবারগণ বিতাড়িত হয়েছেন। এই প্রাচীন সম্রাট-বংশের এক মেয়েকে আইভান বিবাহ করেন, ও সেই সূত্রে নিজেকে সম্রাট-বংশের একজন বিবেচনা করে প্রাচীন বাইজানটিয়ামের উত্তরাধিকার দাবি করেন। এইভাবে মহামান্য আইভানের অধীনে গড়ে উঠল রুশ-সাম্রাজ্য, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্যে ঘটল যার পতন। আইভানের পৌত্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। নিষ্ঠুরতার জন্যে তাঁর নাম হয়েছিল 'ভয়ংকর আইভান'। ইনি 'জার' উপাধি গ্রহণ করলেন, এই জার, 'সিজার' বা 'সম্রাট' উপাধির সমগোত্রীয়।

এইরূপে মঙ্গোলীয়রা চূড়ান্তভাবে ইউরোপের আসর থেকে বিদায় গ্রহণ করল। গোল্ডেন হোর্ডের অবশিষ্টাংশ বা মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্য নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, সেগুলোর বিষয়ে আমার তত জানাও নেই। একটি লোককে কিন্তু আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না।

এই লোকটি হচ্ছেন তৈমুর, ইনি দ্বিতীয় চেঙ্গিস খাঁ হতে চেয়েছিলেন। চেঙ্গিসের বংশধর বলে তিনি নিজেকে দাবি করেন, আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন তুর্কি। খঞ্জ বলে লোকে তার নাম দিয়েছিল 'তৈমুর লঙ' অথবা 'খঞ্জ তৈমুর'। পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দের শাসক হন। এর অল্প কিছু পরেই শুরু হয় তাঁর নৃশংসতা ও দেশবিজয়ের কর্মপঞ্জী। তিনি ছিলেন নিপুণ সেনাপতি, কিন্তু একেবারে বন্য বর্বর। ইতিমধ্যে মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলীয়রা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, তৈমুর নিজেও ছিলেন মুসলমান। কিন্তু সে কারণে মুসলমানের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে এতটুকু কোমলতার চিহ্নও ছিল না। তাঁর যাবার পথে পথে তিনি ছড়িয়ে গেছেন ধ্বংস, মহামারী আর চরম দুর্গতির বীজ। তাঁর প্রধান আনন্দ ছিল মানুষের মাথার খুলি দিয়ে বিরাট স্তম্ভ নির্মাণ করা। পূর্বদিকে দিল্লি থেকে পশ্চিমে এশিয়া-মাইনর পর্যন্ত হাজার হাজার লোকের উপরে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা করে বিরাট বিরাট স্তম্ভে তাদের মাথার খুলি সাজিয়েছিলেন তৈমুর।

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁর মঙ্গোলীয় অনুচরগণ নির্মম ও ধ্বংসপ্রিয় ছিলেন বটে, তবে তৎকালীন অন্যলোকের সঙ্গে বিশেষ তফাত ছিল না। কিন্তু তৈমুর ছিলেন আরও অনেক খারাপ। দুর্দান্ত অস্থিরতা আর দানবোচিত নৃশংসতায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কথিত আছে, কোনো-এক জায়গায় দু হাজার জীবন্ত মানুষের একটা স্তম্ভ নির্মাণ করে সেটাকে তৈমুর ইঁট ও সুরকি দিয়ে চাপা দেন!

ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার এই বর্বরকে আকৃষ্ট করেছিল। তবে ভারতবর্ষ-আক্রমণের প্রস্তাবে তাঁর সেনাপতি ও ওমরাহদের সম্মত করাতে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। সমরকন্দে এক বিরাট মন্ত্রণাসভা বসে, এবং ওমরাহগণ ভারতবর্ষ অত্যন্ত উষ্ণ বিবেচনায় সেখানে যাওয়া সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। অবশেষে তৈমুর কথা দেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বেশি দিন থাকবেন না, লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য সমাপ্ত হলেই প্রত্যাবর্তন করবেন। সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেছিলেন।

তোমার মনে আছে, উত্তর-ভারতে তখন মুসলমান-রাজত্ব চলছিল। দিল্লির মসনদে তখন এক সুলতান ছিলেন। কিন্তু এই মুসলিম-রাষ্ট্র ছিল অত্যন্ত দুর্বল, আর সীমান্তদেশে মঙ্গোলীয়দের

সঙ্গে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে এর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। তাই তৈমুর যখন তাঁর মঙ্গোলীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন, প্রায় বিনা বাধাতেই তিনি মহানন্দে তাঁর হত্যালীলা ও স্তম্ভনির্মাণ সমাপ্ত করলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই হত্যা করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো তারতম্য ছিল বলে মনে হয় না। যুদ্ধবন্দীরা ভারস্বরূপ হওয়ায় তৈমুরের হুকুমে এক লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, কোনো-এক জায়গায়, হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে রাজপুত-নিয়মে জহরব্রত পালন করেছিল, অর্থাৎ মরবার সংকল্প নিয়েই যুদ্ধে যোগদান করেছিল। কিন্তু এই বিভীষিকাময় কাহিনীর পুনরুক্তি করে লাভ কী? তৈমুরের সারা পথের এই একই ইতিহাস। তৈমুরের সেনাবাহিনীকে অনুসরণ করে এল ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ। দিল্লিতে তৈমুর পনেরো দিন ছিলেন, তার মধ্যেই এই বিরাট শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। তৈমুর তখন ফিরে এল সমরকন্দে। পথে কাশ্মীরের লুণ্ঠনকার্য সমাধা হল।

বর্বরতা সত্ত্বেও তৈমুরের অভিলাষ ছিল, সমরকন্দে ও মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করা। তাই, বহুদিন আগে সুলতান মাহ্‌মুদ যা করেছিলেন তারই অনুকরণে ভারতবর্ষের যত প্রসিদ্ধ গৃহনির্মাতা, স্থপতি ও যন্ত্রবিদ্‌ সংগ্রহ করে, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এদের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের নিয়োগ করলেন নিজের সাম্রাজ্যের কাজে। অন্যদের পশ্চিম-এশিয়ার প্রধান শহরগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হল। এইভাবে স্থাপত্যশিল্পে এক নূতন পদ্ধতির উৎপত্তি ও প্রসার হয়।

তৈমুর বিদায় নিলে দেখা গেল, দিল্লি শুধু মৃতের শহরে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর অখণ্ড তাণ্ডবনৃত্য চলেছিল বিনা বাধায়। দুই মাস পর্যন্ত সেখানে না ছিল কোনো শাসক, না ছিল কোনো সংগঠন। অধিবাসীও খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। এমনকি তৈমুর-নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধিও দিল্লি থেকে মুলতানে প্রস্থান করেন।

তৈমুর তখন পারশ্য ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে দিয়ে ধ্বংসের বীজ ছড়াতে ছড়াতে পশ্চিমে অগ্রসর হলেন। অ্যাঙ্গোরাতে তাঁকে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কিদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়। নিপুণ সৈন্যপরিচালনাগুণে তিনি তুর্কিদের পরাজিত করেন। কিন্তু সমুদ্রকে আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না, বস্ফরাস প্রণালী তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না। এইভাবে ইউরোপ তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পায়।

তিন বছর পরে, ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে, চীনদেশে অভিযানকালে তৈমুরের মৃত্যু হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া-ব্যাপী তৈমুরের বিশাল সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ে। অটোম্যান-সাম্রাজ্য, মিশর ও গোল্ডেন হোর্ড তাঁকে কর দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু তৈমুরের সত্যকারের ক্ষমতা অসাধারণ নিপুণ সেনাপতিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাইবেরিয়ার তুষাররাজ্যে তাঁর অভিযান অতুলনীয়। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন একটা ভবঘুরে নিষ্ঠুর পিশাচ। চেঙ্গিস খাঁর মতো সাম্রাজ্য-পরিচালনা করবার জন্যে কোনো উপযুক্ত লোক বা কোনো সংগঠন তিনি গড়ে রেখে যান নি। তাই তৈমুরের সাম্রাজ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু নির্বিচার ধ্বংস ও হত্যার স্মৃতি। মধ্য-এশিয়ার বুকের উপর দিয়ে যত দুঃসাহসিক ও বিজেতার দল পার হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে চার ব্যক্তিকে এখনও স্মরণ করা হয়—সিকান্দার বা আলেকজাণ্ডার, সুলতান মাহ্‌মুদ, চেঙ্গিস খাঁ এবং তৈমুর।

অটোম্যান তুর্কিদের পরাজিত করে তৈমুর তাদের ভিত্তিকে কম্পিত করে তোলেন। কিন্তু তারা আবার শীঘ্রই পূর্বাবস্থা ফিরে পায় ও ৫০ বছরের মধ্যেই (১৪৫৩) কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ দখল করে।

এইবার মধ্য-এশিয়া থেকে বিদায় নেওয়া যাক। সভ্যতার তুলাদণ্ডে ক্রমে এর মূল্য হ্রাস হয়ে এ বিস্মৃতির অতলে প্রবেশ করেছে। চোখে পড়বার মতো আর কোনো ঘটনাই এখানে ঘটে নি। শুধু রয়ে গেছে পুরোনো সভ্যতার স্মৃতি, যে সভ্যতাকে মানুষ নিজের হাতে নষ্ট করেছে। অবশেষে প্রকৃতিও হয়েছে বিরূপ, ক্রমে আবহাওয়া শুষ্ক হতে হতে এ অঞ্চল মানুষের বাসের পক্ষে আরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এবার মঙ্গোলীয়দের বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তবে আমাদের আরও আলোচনা করতে হবে তাদেরই অপর একটি শাখা সম্পর্কে, যে শাখা ভারতবর্ষে এসে এক বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁর বংশধরদের সাম্রাজ্য চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল, মঙ্গোলীয়রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতির অধীনে বিভক্ত হয়ে ফিরে গেল তাদের পুরোনো পার্বত্য জীবনযাত্রায়।

৭৫

কঠিন সমস্যা-সমাধানে ভারতবর্ষ

১২ই জুলাই, ১৯৩২

তোমাকে তৈমুর, তাঁর হত্যালীলা এবং নর-কপাল দিয়ে তাঁর পিরামিড-নির্মাণের কথা আগেই লিখেছি। মনে হয়, কী ভয়ংকর বর্বরতা! সভ্যসমাজে বুঝি কখনোই এরকম ঘটতে পারত না। কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হয়ো না। সেদিনও আমরা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখেছি, কান দিয়ে শুনেছি, আমাদের নিজেদের যুগেই কী ঘটে থাকে ও ঘটতে পারে। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের সম্পত্তি ও জীবন -নাশের কাহিনীও ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পাশে তুচ্ছ হয়ে যায়। এবং বর্তমান যুগের বীভৎসতার কাহিনী যে-কোনো মঙ্গোলীয় নিষ্ঠুরতাকে পিছনে ফেলে যেতে পারে।

তবু নিঃসন্দেহে আমরা চেঙ্গিস অথবা তৈমুরের সময় থেকে সহস্রগুণে উন্নত হয়েছি। আজকের জীবন শুধু যে প্রচণ্ডরকম জটিল তাই নয়, অনেক বেশি সমৃদ্ধও বটে। প্রকৃতির বহু শক্তিকে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করে মনুষ্যব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। সত্যই তো, পৃথিবী এখন কত সভ্য ও মার্জিত হয়েছে। তবে কেন যুদ্ধের সময় আমরা পুরোনো বর্বরতার যুগে ফিরে যাই? কারণ যুদ্ধ জিনিষটাই সভ্যতা ও কৃষ্টির অভাব সূচিত করে। শুধু একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ সভ্যতাকে স্বীকার করে এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে; সে হচ্ছে, সভ্য মানুষের চিন্তাশক্তিকে আরও শক্তিশালী ও আরও ভয়ংকর মারণাস্ত্রনির্মাণে নিযুক্ত করা। যেসব লোক যুদ্ধসংক্রান্ত কাজ করে তাদের ভিতরে এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঞ্চার হয় যে, তারা ভুলে যায় সভ্যতার দেওয়া শিক্ষা, ভুলে যায় সত্য ও সুন্দরকে। তখন হাজার হাজার বছর আগেকার আমাদের বর্বর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সামঞ্জস্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই যে যুগেই হোক, যুদ্ধ জিনিষটা যে এত ভয়ংকর তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ভাবো তো, আমাদের এই পৃথিবীটায় যদি যুদ্ধের সময় এক অজানা অতিথি এসে হাজির হয়, তার কী মনে হবে? ধরো, সে যদি শান্তির সময় আমাদের না দেখে শুধু যুদ্ধের সময়েই দেখে? তখন সে শুধু আমাদের যুদ্ধের আবহাওয়া দিয়েই বিচার করবে আর ভাববে, আমাদের মতো নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন কেউ নেই, আমরা মাঝে মাঝে সাহস দেখাই আর স্বার্থত্যাগ করি বটে, তবু আমরা বন্য। আর অল্প কিছু ভালো দিক আমাদের থাকলেও, মোটের উপর আমাদের একটিমাত্র চরম লক্ষ্য—পরস্পরকে হত্যা ও নিশ্চিহ্ন করা। আমাদের একটিমাত্র বিশেষ রূপ দেখে এবং তাহাও খুব অনুকূল সময়ে নয়, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে বিকৃত মত গড়তে তাকে হবেই, আমাদের প্রতি অবিচার করতে সে বাধ্য।

ঠিক তেমনি, আমরাও যদি অতীত যুগটাকে যুদ্ধ এবং হত্যালীলার পটভূমিকাতেই শুধু দেখি তবে তার প্রতি অবিচার করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ডের উপর আমাদের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়। মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারায় তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক নেই। তাই ঐতিহাসিক আর কী করেন? যুদ্ধবিগ্রহের উপরেই তাঁর যত নজর, তাকেই তুলে ধরেন যতটা পারেন। যদিও এই যুদ্ধগুলোকে আমরা ভুলতেও পারি না, উপেক্ষাও করতে পারি না,

তবু যতটা গুরুত্বের প্রয়োজন তার বেশি দেওয়াও উচিত নয়। তাই অতীতকে আমরা দেখব বর্তমানের আলোয়, আর সে যুগের মানুষকে দেখব আমাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে। তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো তা হলেই অনেকটা সহজ ও বাস্তব হয়ে আসবে; আমরা এই সত্য উপলব্ধি করব যে, সাময়িক যুদ্ধবিগ্রহগুলোই বড়ো কথা নয়, তার চেয়ে বড়ো জিনিষ তাদের চিন্তাধারা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি। এ কথাটা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, কারণ, দেখবে, তোমার ইতিহাসের পাতাগুলো শুধু যুদ্ধের কাহিনীতেই ভরা। এমনকি আমার চিঠিগুলোও হয়তো সেই ধরনেরই হয়ে যাবে। এর আসল কারণ অবশ্য এই যে, অতীত যুগের দৈনন্দিন ঘটনা সম্পর্কে লেখা বড়ো কঠিন। ভালো করে আমার জানাও নেই সেসব।

আমরা দেখে এসেছি যে, ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে তৈমুর ছিলেন অন্যতম প্রধান ঝঞ্ঝা। তাঁর যাত্রাপথের আশেপাশে যে বিভীষিকার তরঙ্গ তিনি তুলে গেছেন সে কথা ভাবতে গেলেও বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। তবু তো সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তাঁর কালো ছায়া পড়ে নি, পূর্ব পশ্চিম ও মধ্য -ভারতেও নয়। এমনকি দিল্লি এবং মীরাটের কাছাকাছি উত্তরদিকের খানিকটা অংশ বাদে বর্তমান যুক্তপ্রদেশও প্রায় সর্বতোভাবেই বেঁচে গিয়েছিল। দিল্লি শহরের পরেই তৈমুরের হাতে বহুলাঞ্ছিত প্রদেশ হিসেবে নাম করা যায় পাঞ্জাবের। তবে পাঞ্জাবেও, যারা তৈমুরের পথের সামনে পড়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পাঞ্জাবের বেশির ভাগ অধিবাসী তখনও শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল। কাজেই এইসব যুদ্ধ ও অত্যাচ কাহিনীকে আমরা যেন অতিরঞ্জিত না করি।

এবার আমরা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফেরাই। দিল্লির সুলতানশক্তি (Sultanate) দুর্বল হতে হতে তৈমুরের আগমনের সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পায়। ভারতবর্ষে বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল বহু—তার মধ্যে মুসলিম-রাষ্ট্রই অধিকসংখ্যক। কিন্তু দক্ষিণে একটি প্রতাপশালী হিন্দু-রাষ্ট্র ছিল, তার নাম বিজয়নগর। ইসলাম তখন ভারতবর্ষে নবাগত নয়, বরং সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন প্রাচীন আফগান হানাদার আর দাস-রাজাদের নিষ্ঠুর প্রতাপ অনেক কমে এসেছে, এবং মুসলিম-রাজারা হিন্দু-রাজাদের মতোই ভারতীয় ব'নে গেছে। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধত সেটা রাজনৈতিক কারণে, ধর্মসংক্রান্ত নয়। কখনও-বা মুসলিম-রাষ্ট্রে হিন্দু সৈন্য নিযুক্ত হত, তেমনি হিন্দু-রাষ্ট্রে মুসলিম সৈন্য। মুসলমান রাজারা কখনও-বা হিন্দু রমণীকে বিবাহ করত, মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে কত সময় নিয়োগ করত হিন্দুকে। তাদের মধ্যে তখন বিজিত বা বিজেতা, শাসিত বা শাসকের সম্পর্ক খুব কমই ছিল। বাস্তবিকপক্ষে, অধিকাংশ মুসলমান, এমনকি শাসকবর্গের মধ্যেও, মুসলমান-ধর্মান্তরিত ভারতীয়ের সংখ্যাই ছিল বেশি। বহু লোকে ধর্মান্তর গ্রহণ করত রাজপ্রসাদ, অথবা আর্থিক সুব্যবস্থার আশায়, এবং ধর্মান্তর গ্রহণ সত্ত্বে পুরোনো রীতিনীতিই আঁকড়ে থাকত। কোনো কোনো মুসলিম শাসক ধর্মান্তরকরণে বল-প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করলেও, প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই করতেন। কেননা তাঁরা ভাবতেন, রাজধর্মে ধর্মান্তরিত প্রজাই প্রভুর অনুগত বেশি। কিন্তু ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগের চেয়ে অর্থনৈতিক কারণই অধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল। তখনকার দিনে অ-মুসলমানদের 'জিজিয়া' কর দিতে বাধ্য করা হত, অনেকেই এই করের হাত এড়াতে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত।

কিন্তু এ সমস্তই শহরের ঘটনা। গ্রামের জীবনযাত্রা থাকত অব্যাহত, লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী পুরোনো নিয়মেই কালাতিপাত করত। রাজকর্মচারীরা অবশ্য পল্লীজীবনেই হস্তক্ষেপ করত বেশি। গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের ক্ষমতা আগের চেয়ে কমে গেলেও সেটা পল্লীর মেরুদণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র হয়ে বেঁচে রইল। সামাজিক বিষয়ে এবং ধর্ম ও প্রাচীন প্রথায় গ্রামের চেহারা প্রায় অপরিবর্তিতই রইল। তুমি তো জানো, ভারতবর্ষ এখনও হাজার হাজার গ্রাম নিয়েই গঠিত। শহরগুলো হল এর বাইরের রূপ, আসল ভারতবর্ষ এখনও পল্লীগ্রামপ্রধান। এই পল্লীগ্রামপ্রধান ভারতবর্ষকে ইসলামধর্ম বদলাতে পারে নি।

ইসলামধর্মের আগমনে হিন্দুধর্মে দুই দিক থেকে নাড়া লেগেছিল। আর মজা এমনি,

এই দুটো দিক আবার পরস্পরবিরোধী। এক দিকে সেটা হয়ে উঠল বিষম গোঁড়া, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় কঠোরভাবে একটি ক্ষুদ্র গাঁণ্ডর ভিতরে করল আত্মগোপন, জাতিবৈষম্য আরও প্রকট ও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠল, স্ত্রীলোকের পর্দা ও অবরোধ বেড়ে গেল। অপর পক্ষে, জাতিভেদ ও অত্যধিক পুজো-পার্বণের বিরুদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চলল সংস্কারের প্রচেষ্টা।

অবশ্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই, হিন্দুধর্মকে কদাচারমুক্ত করবার অভিপ্রায় নিয়ে বারবার ইতিহাসে উদয় হয়েছেন কত সংস্কারক। এ'দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বুদ্ধ। অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করাচার্যের কাহিনী তোমায় আগেই বলেছি। তিন শো বছর পরে, একাদশ শতাব্দীতে, দক্ষিণে চোল-সাম্রাজ্যে শঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়করূপে আর একজন বিখ্যাত সংস্কারক দেখা দিলেন। তাঁর নাম ছিল রামানুজ। শঙ্কর ছিলেন শৈব পণ্ডিত, রামানুজ ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। রামানুজ সারা ভারতবর্ষকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তোমাকে তো বলেছি, রাজনীতিগতভাবে বিভিন্ন যুদ্ধরত রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ খণ্ডিত ছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে সে ছিল একীভূত। যখনই কোনো মহামানবের বা বিরাট আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছে, সমস্ত রাজনীতির সীমা উপেক্ষা করে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই এক নূতন ধরনের সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের কাজ ছিল ক্রিয়াকর্মের বাহুল্য দূরীভূত করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই সাধারণ অংশের উপর জোর দিয়ে দুটো ধর্মকে কাছাকাছি আনা। এই-ভাবে দুটো ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলে, দুটোকে মিলিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উভয় দলই পরস্পরের সম্পর্কে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় কাজটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু তবু দেখতে পাব যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই প্রচেষ্টার বিরতি নেই। কয়েকজন মুসলমান শাসক, এমনকি মহামান্য আকবরও, এই ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম এই মিলনের বাণী প্রচার করলেন রামানন্দ; ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর দক্ষিণ-ভারত-বাসী এক খ্যাতনামা ধর্মশিক্ষক। ইনি জাতিভেদ মানতেন না, এবং তার বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। এ'র শিষ্যদের মধ্যে কবীর নামে এক মুসলমান তাঁতি ছিলেন; কবীর পরে আরও বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। কবীরকে সকলেই ভালোবাসত। তুমি বোধহয় জানো, তাঁর হিন্দি গান উত্তর-ভারতের বহু দূর পল্লী-অঞ্চলেও অত্যন্ত সুপরিচিত। কবীর হিন্দু মুসলমান কিছুই ছিলেন না, অথবা তিনি দুইই ছিলেন, অথবা ছিলেন দুই-এরই মাঝামাঝি অন্য-কিছু। তাঁর শিষ্যরা এসেছিল সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায় থেকে। কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে একটি শ্বেত আচ্ছাদনে আবৃত করা হয়। হিন্দু শিষ্যেরা তাঁকে ভস্মীভূত করতে চায়, মুসলমান শিষ্যেরা কবর দিতে চায়। তার পর চাদর তুলে তারা দেখতে পায়, যে দেহ নিয়ে এত কলরব সেটা অদৃশ্য হয়েছে, তার জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা টাটকা ফুল। গল্পটা হয়তো কাল্পনিক, কিন্তু বড়ো সুন্দর।

কবীরের অল্প-কিছু পরেই উত্তর-ভারতে অপর একজন ধর্মনেতা ও সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। ইনি হলেন গুরু নানক, শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পরে পর পর শিখধর্মের আরও দশটি গুরুর আবির্ভাব হয়; এ'দের মধ্যে সর্বশেষ হলেন গুরু গোবিন্দ সিং।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও কৃষ্টির ইতিহাসে আর-একটি সুপরিচিত নামের উল্লেখ করতেই হবে। ইনিই চৈতন্য, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হয় বাংলার এই বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব। ইনি সহসা নিজ পাণ্ডিত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ভক্তি ও বিশ্বাসের পথ গ্রহণ করেছিলেন। সারা বাংলায় ইনি শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ভজন গেয়ে বেড়ালেন, পরে বৈষ্ণবধর্মের স্থাপনা করেন। বাংলাদেশে এ'র প্রভাব এখনও অসামান্য।

ধর্ম- সংস্কার ও সমন্বয় সম্বন্ধে আজ এই পর্যন্ত। জীবনের অন্যান্য বিভাগেও কখনও সচেতন কখনও অচেতনভাবে এই একই সমন্বয় চলছিল। এক নূতন কৃষ্টি, নূতন কারুশিল্প, এক নূতন ভাষা গড়ে উঠছিল। কিন্তু মনে রেখো, গ্রামের চেয়ে এসমস্ত শহরেই বেশি ঘটছিল, বিশেষ করে

রাজধানী-শহর দিল্লি ও অন্যান্য রাষ্ট্র ও প্রদেশের বৃহৎ শহরগুলিতে। সবচেয়ে উঁচুতে সর্বেসর্বা রাজা। যথেচ্ছাচারকে দমন করবার নানা রীতি ও অনুশাসন প্রাচীন রাজাদের আমলে ছিল। কিন্তু নূতন মুসলিম শাসকদের সেটা ছিল না। যদিও বিচারতর্কের দিক দিয়ে ইসলামধর্মেই অধিক সাম্য বর্তমান, এমনকি, আমরা তো দেখেওছি, একজন ক্রীতদাসও সুলতান হতে পারে; তবু রাজার যথেচ্ছাচার ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তি বেড়েই চলেছিল। উন্মাদ তোগলকের কাহিনীই এর সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন—যে তোগলক রাজধানী-শহরকে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে তুলে এনেছিল।

সুলতানদের ক্রীতদাস রাখার প্রথা ক্রমশই বেড়ে চলল। যুদ্ধের সময় এদের বন্দী করার জন্য বিশেষ-রকম উপায় গ্রহণ করা হত। এদের মধ্যে কারুশিল্পীদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করা হত। অবশিষ্ট সকলকে নিযুক্ত করা হত সুলতানের রক্ষীর কাজে।

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে কী ঘটল দেখা যাক। তাদের অস্তিত্ব বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল, তবে আরও অনেক নূতন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তাদের বলা হত 'টোল', সেখানে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হত। তবে তাদের মধ্যে আধুনিকতা ছিল না, বরং অতীতকে উজ্জীবিত করে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখত। বারাণসী বরাবরই এর সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র।

উপরে বলেছি কবীরের হিন্দি গানের কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এইভাবে হিন্দিভাষা যে শুধু লোকপ্রিয় হয়েছিল তাই নয়, সাহিত্যেও পরিণত হয়েছিল। সংস্কৃতভাষার মৃত্যু ঘটে বহু আগেই। এমনকি কালিদাস ও গুপ্তরাজাদের সময়ও সংস্কৃত কেবলমাত্র পণ্ডিতদের ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকে কথা বলত প্রাকৃতভাষায়; সংস্কৃতেরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ এই প্রাকৃত। ধীরে ধীরে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অপর ভাষাগুলি বিস্তারলাভ করে, যথা-হিন্দি, বাংলা, মারাঠি এবং গুজরাটি। বহু মুসলমান লেখক ও কবি হিন্দিভাষায় রচনা করলেন। জৌনপুরের এক মুসলমান রাজা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাভারত ও ভাগবতের সংস্কৃত থেকে বাংলা তর্জমা করান। দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত বিজাপুরের মুসলমান রাজত্বের বিবরণ মারাঠিভাষায় লেখা হয়েছিল। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলি যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। দক্ষিণ-ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং ক্যানারিজ প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলি অবশ্য বহু পুরোনো।

মুসলিম রাজভাষা ছিল ফার্শি। শিক্ষিত ব্যক্তিদের রাজসভা অথবা শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত কোনো কাজ করতে হলেই ফার্শি শিখতে হত। এমনি করে বহু হিন্দু ফার্শিভাষা আয়ত্ত করেন। ক্রমে বাজারে শিবিরে সাধারণের মধ্যে একটি চলিত ভাষার জন্ম হল, এর নাম উর্দু। এই উর্দু-শব্দের অর্থ 'শিবির'। আসলে এটা কোনো নূতন ভাষা নয়। কিছুটা ভিন্ন পোশাকে একে হিন্দিই বলা চলে। ফার্শি কথার বাহুল্য থাকলেও, অন্যান্য বিষয়ে এটা হিন্দিই। এই হিন্দি-উর্দু ভাষা, যাকে বলা হয় হিন্দুস্থানি, সারা উত্তর ও মধ্য-ভারতে বিস্তারলাভ করল। আজ অল্প-কিছু তফাত সত্ত্বেও, প্রায় পনেরো কোটি লোকে এই ভাষায় কথা বলে, এবং ততোধিক লোকে এই ভাষা বোঝে। কাজেই সংখ্যাধিক্যতার দিক থেকে এটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ ভাষাপুঞ্জের একটি।

স্থাপত্যশিল্পে নূতন ধরন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ও প্রসার হওয়ায় কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা গড়ে ওঠে—দক্ষিণে বিজাপুর ও বিজয়নগরে, গোলকুণ্ডাতে, আমেদাবাদে; (এই আমেদাবাদ তখনকার দিনে একটি বিরাট ও সুন্দর শহর ছিল) এবং এলাহাবাদের সন্নিকটে জৌনপুরে। হায়দ্রাবাদের কাছে আমরা গোলকুণ্ডার ভগ্নাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে? বিরাট দুর্গটার মাথায় চড়ে আমরা নিম্নে বিস্তৃত প্রাচীন শহরটাকে দেখেছিলাম। কত রাজপ্রাসাদ, কত পণ্যশালা—আর আজ সব ধ্বংসস্তূপ!

তাই, যখন রাজন্যবর্গ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে পরস্পরকে ধ্বংস করছিলেন, এক নীরব শক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সমন্বয় ঘটাতে, যাতে ভারতবাসী নির্বিরোধে পাশাপাশি বাস করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে যৌথ-উদ্যম প্রয়োগ করতে পারে। কয়েক শতাব্দীর পর এই প্রচেষ্টা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু এই কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই আর-একটা গোলমালে

আমরা আবার কিছুটা পথ পিছিয়ে গেলাম। আবার আমাদের যা-কিছু ভালো তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় -সাধনের জন্যে পূর্ব-অনুসৃত পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এইবার অগ্রসর হতে হবে আরও দৃঢ় পদক্ষেপে। এবার এর প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই স্বাধীনতা ও সাম্যের উপরে, আরও-ভালো পৃথিবীর উপযুক্ত ও যোগ্য হওয়া চাই। তবেই এটা স্থায়ী হবে।

শত শত বছর ধরে ধর্ম ও কৃষ্টির এই সমন্বয়-সমস্যা চিন্তাশীল ভারতবাসীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সমস্যার কথা তাঁরা ভুলে গেলেন। তাই ইউরোপ যখন কত বিভিন্ন দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেল, অনগ্রসর অনুন্নত ভারতবর্ষ রইল পিছনে পড়ে।

তোমায় আগেই বলেছি, এমন এক সময় ছিল যখন রসায়নশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উৎকর্ষের জন্যে রঙ-তৈরি, ইস্পাতের কাজ ও অন্যান্য বহু বিষয়ে আমাদের দেশ বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করত। এদেশের বাণিজ্যপোতগুলি নানাবিধ পণ্য বহু দূরদূরান্তরে বহন করে নিয়ে যেত। এখন যে সময়ের কথা বলছি তার বহু আগেই ভারতবর্ষ সে নিয়ন্ত্রণাধিকার হারিয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে নদীর গতি আবার প্রাচ্যের দিকে মোড় ফেরে। প্রথমে সেটা ছিল ক্ষীণ জলধারা। কিন্তু পরে সেটা পরিণত হয় বিরাট স্রোতস্বিনীতে।

৭৬

দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রসমূহ

১৪ই জুলাই, ১৯৩২

আর-একবার ভারতের দিকে তাকিয়ে দ্রুতপরিবর্তনশীল রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যগুলি দেখা যাক। সমাপ্তিহীন বিরাট চলচ্চিত্রের নির্বাক ছবির মতো এদের পর পর আগমন ও প্রয়াণ।

উন্মাদ সুলতান মহম্মদ তোগলক ও তাঁর হাতে দিল্লি-সাম্রাজ্যের ভাঙনের কথা বোধহয় তোমার মনে আছে। দাক্ষিণাত্যের বড়ো বড়ো প্রদেশ ক্রমে ধ্বংসে পড়ল, এবং তার স্থানে নূতন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব হল। এদের মধ্যে প্রধান হল বিজয়নগরের হিন্দু-রাষ্ট্র এবং গুলবর্গার মুসলিম-রাষ্ট্র। পূর্বদিকে বাংলা ও বিহারের সংযোগে তৈরী গৌড়দেশ একজন মুসলিম শাসকের অধীনে স্বাধীন হল।

মহম্মদের পরবর্তী হলেন তাঁর ভাইপো ফিরোজ শাহ্। তাঁর কাকার তুলনায় তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন এবং কতকটা কম নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা তখনও ছিল। ফিরোজ কৃতী শাসক ছিলেন এবং তিনি শাসনবিধি অনেক পরিমাণে মার্জিত করেছিলেন। দক্ষিণ ও পূর্বের হৃত প্রদেশগুলি তিনি পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের ভাঙন রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নূতন নূতন নগর, প্রাসাদ ও মসজিদ-নির্মাণ, এবং উদ্যানসজ্জা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। দিল্লির সন্নিকটে ফিরোজাবাদ এবং এলাহাবাদের অদূরে জৌনপুর তাঁরই সৃষ্টি। তিনি এ ছাড়া যমুনাতে একটি বিরাট খাল খনন করেছিলেন, এবং ভগ্নপ্রায় বহু অট্টালিকার সংস্কারসাধন করেছিলেন। এসব কাজে তিনি রীতিমতো গর্ব অনুভব করতেন; এবং যেসব নূতন অট্টালিকা নির্মাণ অথবা পুরোনো অট্টালিকার সংস্কার তিনি করেছিলেন তাদের দীর্ঘ তালিকা রেখে গেছেন।

ফিরোজ শাহের মা ছিলেন জনৈক বড়ো রাজপুত-সর্দারের মেয়ে; নাম বিবি নৈলা। গল্প আছে যে, প্রথমে ফিরোজের পিতা এ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ফলে যুদ্ধ বাধল, এবং নৈলার স্বদেশ আক্রান্ত ও নষ্টপ্রায় হল। তাঁরই জন্যে তাঁর দেশের লোকের এই অবস্থা জানতে পেরে বিবি নৈলা অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং নিজেকে ফিরোজ শাহের পিতার নিকট সমর্পণ করে এসবের ক্ষান্তি এবং দেশের লোকের প্রাণরক্ষা করার সিদ্ধান্ত করলেন। অতএব ফিরোজ

শাহের দেহে রাজপুত-রক্ত ছিল। লক্ষ্য করে দেখো, মুসলিম শাসক এবং রাজপুত রমণীদের মধ্যে এই ধরনের আন্তর্জাতিক পরিণয় প্রায়ই ঘটেছে, এবং এর ফলে নিশ্চয় একটা সাধারণ জাতীয়তার অভ্যুদয়ে বিশেষ সাহায্য হয়েছিল।

দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর রাজত্ব করার পরে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহের দেহান্তর ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির যে সাম্রাজ্য তিনি কোনোরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে রেখেছিলেন তাও খসে পড়ল। কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল না, এবং খুদে শাসকরা চার দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। এইরকম অরাজকতা ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সময়ে, ফিরোজ শাহের মৃত্যুর ঠিক দশ বছর পরে, উত্তর থেকে তৈমুর হানা দিলেন। তিনি দিল্লিকে প্রায় ধ্বংস ও নিঃশেষ করে এনেছিলেন। ধীরে ধীরে দিল্লি আবার উঠে দাঁড়াল এবং পঞ্চাশ বছর পরে একজন সুলতানের শাসনাধীনে দিল্লি আবার কেন্দ্রীয় শাসনের রাজধানী হল। কিন্তু তা হল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, এবং দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সুলতানেরা ছিলেন আফগান। তাঁরা সবাই ছিলেন অক্ষম; তাঁদের নিজেদের আফগান ওমরাহরাই অবশেষে বিরক্ত হয়ে একজন বিদেশীকে আমন্ত্রণ করলেন এ দেশে এসে তাঁদের উপরে রাজত্ব করবার জন্যে। এই বিদেশীই বাবর। ইনি একজন মঙ্গোল, মোঙ্গল, অথবা মোগল; এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তাঁরা মোগল নামেই পরিচিত। তিনি ছিলেন তৈমুরের সাক্ষাৎ বংশধর, এবং তাঁর মা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশের মেয়ে। এই সময়ে তিনি ছিলেন কাবুলের রাজা। ভারতে আসার আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন; বস্তুত আমন্ত্রণ না পেলে তিনি হয়তো আপনা থেকেই ভারতে এসে উপস্থিত হতেন। দিল্লির কাছে, পানিপথ-প্রান্তরে ১৫২৬ সালে বাবর হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য জয় করলেন। ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্য নামে আবার এক বিরাট সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হল, এবং দিল্লি তার পূর্ব সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেয়ে রাজধানীতে পরিণত হল। কিন্তু এসব আলোচনা করার আগে দেখা দরকার দিল্লির দেড় শো বছরব্যাপী অধোগতির সময়ে বাকি ভারতে কী ঘটছিল।

এই সময়ে ভারতবর্ষে ছোটো বড়ো অনেক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। নবগঠিত জৌনপুরে শারকি-রাজগণ-শাসিত একটি ছোটো মুসলিম-রাষ্ট্র ছিল। আকার অথবা শক্তিতে এ রাজ্য বড়ো ছিল না, রাজনীতির দিক দিয়েও এর ছিল না কোনো গুরুত্ব। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক শো বছর ধরে এ ছিল সংস্কৃতি ও পরধর্মসহিষ্ণুতার আধারস্থল। জৌনপুরের মুসলিম বিদ্যামন্দির-সমূহের চেষ্টায় এই সহিষ্ণুতার ভাবধারা দিকে দিকে প্রচারিত হল। এদের একজন রাজা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন, সে গল্প আমি গত চিঠিতে লিখেছি। শিল্পকলা এবং স্থাপত্য উৎসাহিত করা হতে লাগল, এবং দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু দুই ভাষা, হিন্দি ও বাংলা, অনুরূপ উৎসাহ পেল। সীমাহীন অসহিষ্ণুতার মধ্যে এই ছোটো অল্পস্থায়ী রাজ্য জৌনপুর, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি শান্তিপূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মতো শোভা পেয়েছে।

পূর্বদিকে প্রায় এলাহাবাদ পর্যন্ত ছিল বঙ্গ-বিহার-সম্মিলিত বিশাল গৌড়রাষ্ট্র। গৌড়নগরী ছিল বন্দর, এর সঙ্গে ভারতের অন্যান্য সমুদ্রতীরবর্তী নগরসমূহের যোগাযোগ ছিল। মধ্য-ভারতে, এলাহাবাদের পশ্চিম থেকে প্রায় গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মালবরাজ্য, এর রাজধানীর নাম ছিল মাণ্ডু, একাধারে নগর ও দুর্গ। এই মাণ্ডুতে বহু সুরম্য প্রাসাদ জেগে উঠেছিল, এই প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের আকৃষ্ট করে।

মালবের উত্তর-পশ্চিমে ছিল রাজপুতানা। এখানে অনেক রাষ্ট্র ছিল, আর এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল চিতোর। চিতোর, মালব ও গুজরাটের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। এই দুই প্রবল রাষ্ট্রের তুলনায় চিতোর ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু রাজপুতেরা চিরকালই নির্ভীক যোদ্ধা। কখনও কখনও সংখ্যালঘুতা সত্ত্বেও তারা জয়লাভ করত। মালবের সঙ্গে এইরকম এক যুদ্ধে জয়লাভ করায় চিতোরে যে বিজয়-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল তাতে নির্মিত হয়েছিল চিতোরের সুরম্য জয়স্তম্ভ। মাণ্ডুর সুলতান হার মানতে রাজি না হয়ে তার চেয়েও এক বড়ো স্তম্ভ গঠন করলেন। চিতোরের স্তম্ভ আজও বর্তমান; মাণ্ডুর স্তম্ভ কালের অতল গহ্বরে অদৃশ্য হয়েছে।

মালবের পশ্চিমে ছিল গুজরাট। এইখানে এক প্রবল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সুলতান

আহ্‌মদ শাহ্‌ আহ্‌মদাবাদে এর রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে এই আহ্‌মদাবাদ দশ লক্ষ অধিবাসী-পূর্ণ এক বিরাট নগরে পরিণত হয়েছিল। এই নগরে অতি সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ গড়ে উঠল, এবং কথিত আছে, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ, এই তিন শত বৎসর-কাল আহ্‌মদাবাদ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই নগরের বিখ্যাত জামি মসজিদের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে চিতোরের রানার নির্মিত রণপুরের জৈনমন্দিরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এর থেকে বোঝা যায় কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিরা নূতন আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি করছিল। এইখানে আবার শিল্পের সমন্বয়ের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছ, যার সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। এখনও আহ্‌মদাবাদে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাচীন অট্টালিকা আছে যাদের পাথরে-গড়া দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে অপূর্ব সব শিল্পনিদর্শন। কিন্তু তাদের চার পাশে যে বর্তমান ব্যবহারিক যুগের নগর গড়ে উঠেছে তা মোটেই সুশ্রী নয়।

প্রায় এই সময়েই পর্তুগীজরা ভারতে পৌঁছল। তোমার মনে থাকবে, ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে প্রথম এ দেশে আসেন। তিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণে কালিকট নগরে পৌঁছন। অবশ্য তার আগে অনেক ইউরোপীয় ভারতে এসেছিল, কিন্তু তারা এসেছিল বণিকরূপে অথবা শুধু দেশ দেখতে। পর্তুগীজরা এল ভিন্ন অভিপ্রায় নিয়ে। তারা ছিল গর্বিত ও আত্মপ্রত্যয়শীল; পোপের কাছ থেকে তারা সমগ্র প্রাচ্য উপহার পেয়েছিল। তারা তাই এল জয়ের বাসনা নিয়ে। প্রথমে তারা এসেছিল অল্পসংখ্যায়, কিন্তু ক্রমে আরও অনেক জাহাজ এল, এবং কিছু কিছু সমুদ্রতটবর্তী নগর, বিশেষ করে গোয়া, তাদের অধিকারে গেল। পর্তুগীজরা ভারতে বিশেষ কিছু করে নি। তারা দেশের ভিতরে কখনও যায় নি। কিন্তু তারাই ছিল প্রথম ইউরোপীয় জাতি যারা জলপথে ভারত আক্রমণ করতে এসেছিল। তাদের পরে এল ফরাসি এবং ইংরেজ। এইভাবে সমুদ্রপথের আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন রাজশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের বেশি মনোযোগ পড়েছিল দেশের ভিতরের অংশ থেকে বিপদের সম্ভাবনার উপর।

গুজরাটের সুলতানরা সমুদ্রেও পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা অটোম্যান তুর্কিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা পর্তুগীজ নৌবাহিনীকে পরাজিত করল, কিন্তু পরে পর্তুগীজরা জয়লাভ করে সমুদ্রের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে দিল্লির মোগলদের ভয়ে গুজরাটের সুলতানরা পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তৎপর হলেন, কিন্তু পর্তুগীজরা বিশ্বাসঘাতকতা করল।

দক্ষিণ-ভাবতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দুটি বড়ো রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছিল—গুলবর্গা, যার অন্য নাম বাহ্‌মনিরাজ্য, এবং তারও দক্ষিণে, বিজয়নগর। বাহ্‌মনিরাজ্য সমস্ত মহারাষ্ট্রদেশ ছেয়ে ফেলল, এবং কর্ণাটকেরও কতক অংশ গ্রাস করল। এর স্থায়িত্বকাল দেড় শো বছর, কিন্তু এর ইতিহাস কুখ্যাত। অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার ও হত্যা সমানে চলেছিল, এবং সুলতান ও ওমরাহদের বিলাসিতার প্রাচুর্যের পাশেই ছিল জনসাধারণের চরম দুর্দশা।. ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নেহাত অক্ষমতার ফলে বাহ্‌মনিরাজ্য পাঁচটি সুলতানরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল—বিজাপুর, আহ্‌মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও বেরার। এদিকে বিজয়নগর-রাজ্য প্রায় দু শো বছর ধরে চলছিল এবং তখনও ধনজনপূর্ণ ছিল। এই ছয়টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত, প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য বিস্তার করা। পরস্পরের সঙ্গে নানা ভাবে যোগ দিয়ে তারা বিপক্ষের সঙ্গে লড়ত, এবং এই মৈত্রী ছিল ক্ষণপরিবর্তনশীল। কোনো সময়ে মুসলমান-রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দু-রাষ্ট্রের লড়াই হত। কখনও-বা এক হিন্দু ও এক মুসলমান-রাষ্ট্র মিলিত হয়ে অপর-এক মুসলমান-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এই যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, এবং যখনই কোনো-একটি রাজ্য বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছে বলে সন্দেহ হত তখনই অপরেরা তার বিরুদ্ধে মিলিত অভিযান শুরু করত। অবশেষে বিজয়নগরের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য দেখে অন্য সকলে সম্মিলিত হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করল, এবং ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে তারা বিজয়নগরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করতে সমর্থ হল। আড়াই

শতাব্দীর অস্তিত্বের পরে বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের পতন হল, এবং নগরের অতুল ঐশ্বর্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

অল্পকাল পরেই জয়ী মিত্রশক্তিরা পরস্পরের মধ্যে কলহ শুরু করল, এবং অনতিবিলম্বে দিল্লির মোগল-সাম্রাজ্যের ছায়া তাদের উপর পড়ল। তাদের আর-এক বিপদ ছিল পর্তুগীজ; এই পর্তুগীজরা ১৫১০ সালে গোয়া অধিকার করেছিল। গোয়া ছিল বিজাপুর-রাজ্যের অন্তর্গত। তাদের হটানোর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পর্তুগীজরা গোয়া আঁকড়ে বসে রইল, এবং তাদের নেতা আল্‌বুকার্ক্‌ (এই আল্‌বুকার্কের এক চমৎকার উপাধি ছিল—প্রাচ্যের রাজপ্রতিনিধি) ঘৃণিত নিষ্ঠুর ব্যাপার আরম্ভ করল। পর্তুগীজরা হত্যালীলা শুরু করল, এবং নারী ও শিশুও তাদের হাত থেকে রেহাই পেল না। সেই সময় থেকে আজও পর্যন্ত পর্তুগীজরা গোয়ায় রয়েছে।

এইসব দক্ষিণী রাজ্যে অতি সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন-সব নির্মিত হয়েছিল, বিশেষ করে বিজয়নগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরে। গোলকুণ্ডা এখন ধ্বংসস্তূপ। বিজাপুরে এইসব অট্টালিকার কিছু কিছু বর্তমান আছে। বিজয়নগর ধূলিকণায় পর্যবসিত, তার অস্তিত্বও আর নেই। এইরকম সময়েই গোলকুণ্ডার কাছে হায়দ্রাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, যেসমস্ত স্থপতি ও শিল্পীরা এই নগর নির্মাণ করেছিল তারা পরে উত্তর-ভারতে গিয়ে আগ্রার তাজমহল-নির্মাণে সহায়তা করে।

সাধারণভাবে পরধর্মসহিষ্ণুতা থাকলেও মধ্যে মধ্যে ধর্মদ্বেষ এবং গোঁড়ামি প্রকাশ পেত। যুদ্ধের সঙ্গে প্রায়ই ভয়াবহ হত্যা ও ধ্বংস দেখা দিত। তবু কৌতূহলের বিষয় এই যে, মুসলমান-রাজ্য বিজাপুরে হিন্দু অশ্বারোহী-সেনাদল ছিল, এবং হিন্দু-রাজ্য বিজয়নগরে মুসলমান সৈন্য ছিল। যতদূর মনে হয়, সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরেই উঠেছিল, তবে তা শুধু ধনীর জন্যে, তাতে খেতের চাষিজাতীয় লোকের কোনো ভাগ ছিল না। সে গরিবই ছিল, অথচ বড়ো লোকের বিলাসিতার ভার বহন করতে হত তাকেই—যেমন সচরাচর হয়ে থাকে।

৭৭

বিজয়নগর

১৫ই জুলাই, ১৯৩২

গত চিঠিতে যতগুলো দক্ষিণী রাজ্যের কথা আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে বিজয়নগরের ইতিহাস দীর্ঘতম। অনেক বিদেশী পর্যটক এ প্রদেশে এসে রাষ্ট্র ও রাজধানী সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবন্ধ করে গেছেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে নিকোলো কন্তি নামে জনৈক ইতালীয় এসেছিলেন; ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার সুবিখ্যাত খানের দরবার থেকে এসেছিলেন হিরাটের আব্দর-রাজ্জাক; এবং ১৫২২ খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন পর্তুগীজ পর্যটক পেইস। এমনি আরও অনেকে। এ ছাড়া দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহ সম্বন্ধে, বিশেষ করে বিজাপুর সম্বন্ধে, আলোচনাপূর্ণ একখানা ভারতের ইতিহাস আছে। এটা লিখিত হয়েছিল আকবরের সময়ে ফার্শি ভাষায় ফেরিশ্‌তা কর্তৃক, আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তার অনতিকাল পরে। সমসাময়িক ইতিহাস প্রায়ই পক্ষপাতদুষ্ট ও অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে, কিন্তু তবু তাদের থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। প্রাক্‌-মুসলমান যুগের বিষয়ে কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী' ছাড়া আর-কিছু আমাদের জানা নেই বললেই চলে। ফেরিশ্‌তা-কৃত ইতিহাস তাই হল সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। তার পরে এল অন্যরা।

বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা পড়ে আমরা বিজয়নগর সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিরপেক্ষ চিত্র পাই।

হামেশাই যেসব জঘন্য যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত সেগুলি ছাড়াও অনেক-কিছু আমরা এইসব ইতিহাসে পাই। অতএব এই পর্যটকরা কী লিখে গেছেন সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব।

বিজয়নগর স্থাপিত হয় ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে। এর অবস্থিতি ছিল দক্ষিণ-ভারতের যে অংশকে কর্ণাটক বলা হয় সেইখানে। হিন্দু-রাষ্ট্র হওয়ায় দক্ষিণ-ভারতের অনেক মুসলিম-রাষ্ট্র থেকে আশ্রয়প্রার্থীরা এখানে ভিড় করত। এর বৃদ্ধি হল দ্রুত। কয়েক বছরের মধ্যেই এটা দাক্ষিণাত্যের প্রধান রাজ্য হয়ে দাঁড়াল, এবং এর রাজধানী ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের জন্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হল।

ফেরিশ্‌তা এর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন, এবং ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে যখন গুলবর্গা থেকে এক মুসলিম বাহ্‌মনি-রাজা বিজয়নগরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করতে আসেন তখনকার সমারোহ বর্ণনা করেছেন। ছয় মাইল ধরে পথের উপরে নাকি বিছানো হয়েছিল সোনার এবং মখমলের আস্তরণ এবং অনুরূপ মহার্ঘ সামগ্রী। অর্থের কী ভয়ানক শোচনীয় অপব্যবহার!

১৪২০ অব্দে এলেন নিকোলো কন্তি-নামক ইতালীয়। এঁর বর্ণনা অনুসারে বিজয়নগরের পরিধি ছিল ৬০ মাইল। এত বড়ো হওয়ার কারণ, বহুসংখ্যক উদ্যানের অবস্থিতি। কন্তির মতে বিজয়নগরের রাজা, অথবা রায়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন।

তার পরে এলেন মধ্য-এশিয়া থেকে আব্‌দর-রাজ্জাক। বিজয়নগরে যাওয়ার পথে ম্যাঙ্গালোরে তিনি এক অপূর্ব মন্দির দেখেন, বিশুদ্ধ গলিত পিতল দিয়ে তৈরি। এর উচ্চতা ছিল ১৫ ফুট, এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই ৩০ ফুট হিসেবে। আরও পরে বেলুরে তিনি আর-একটা মন্দির দেখে আরও বেশি অবাক হয়েছিলেন। বর্ণনা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। কারণ তাঁর ভয় হয়েছিল, চেষ্টা করলে হয়তো তাঁর প্রতি 'অতিরঞ্জনের দোষারোপ' করা হবে! তার পরে বিজয়নগরে পৌঁছে তিনি নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। "এ নগর এমনি যে, সমস্ত পৃথিবীতে কেউ কখনও এরকমটি চোখে দেখে নি বা কানে শোনে নি।" তিনি তার পরে নগরের বহুতর বাজারের বর্ণনা করেছেন: "প্রত্যেক বাজারের সামনে আছে একটি করে সুউচ্চ তোরণ ও অপূর্ব মণ্ডপ, কিন্তু রাজার প্রাসাদই সবচেয়ে উচ্চ।" "এইসব বাজার অতি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত......এই নগরে সুগন্ধি তাজা ফুল সব সময়ে পাওয়া যায়, এবং ফুলকে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করা হয়, কারণ ফুল ছাড়া এখানকার লোক বাঁচতে পারে না। এক ধরনের বা একই জাতীয় পণ্যসম্ভারের দোকানগুলি সব পরস্পর-সংলগ্ন। মণিকারেরা তাদের চুনি, মুক্তা, হীরা ও পোখরাজ প্রকাশ্যভাবে বাজারে বিক্রয় করে।" তার পর আব্‌দর-রাজ্জাক বলছেন, "যে মনোরম ভূখণ্ডের উপর রাজার প্রাসাদ অবস্থিত সেখানে বহু স্রোতস্বিনী পাথর-কাটা মসৃণ পরিখার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। ......দেশটা এত জনবহুল যে অল্প জায়গায় তার বিশদ বর্ণনা অসম্ভব।" পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া থেকে আগত এই পর্যটক বিজয়নগরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে এই ধরনের অনেক কথাই বলেছেন।

মনে হতে পারে, আব্‌দর-রাজ্জাক বেশি সংখ্যায় বড়ো শহরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, ফলে বিজয়নগর দেখেই অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের পরবর্তী পর্যটক বহু দেশই ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর নাম পেইস, জাতে পর্তুগীজ। তিনি এসেছিলেন ১৫২২ খৃষ্টাব্দে, ঠিক যে সময়ে রেনেসাঁসের ঢেউ ইতালিকে প্রভাবান্বিত করেছে, এবং সেখানে সুন্দর সুন্দর নগর গড়ে উঠছে। মনে হয়, পেইস এইসব ইতালীয় নগর দেখেছিলেন, এবং সেইজন্যেই তাঁর লেখা বিবরণ এত মূল্যবান। তিনি বলেছেন, "বিজয়নগর রোমের মতোই বৃহৎ এবং অতি সুদর্শন নগর।" তিনি নগরের আশ্চর্য জিনিষগুলি এবং তার অগণিত জলাশয়, জলপথ এবং উদ্যানের বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে এই নগর "পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ, কারণ অন্য নগরে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য আমদানির বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু এখানে সব জিনিষই অফুরন্ত।" প্রাসাদে তিনি একটি ঘর দেখেছিলেন, সেটা "সম্পূর্ণ গজদন্তনির্মিত—ভিত্তি দেয়াল ছাদ সমস্তই, এবং ঘরটির স্তম্ভগুলির উপরিভাগে গজদন্তের সুদৃশ্য সুগঠিত

গোলাপ ও পদ্মফুল বসানো। সবটা মিশে এতই সুন্দর যে আর কোথাও এমনটি দেখা যায় না।"

এই সময়ে যিনি বিজয়নগরের রাজা ছিলেন পেইস তাঁরও বর্ণনা করেছেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতীয় ইতিহাসে একজন বিখ্যাত শাসক; শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও লোকপ্রিয় দয়াবৎসল রাজারূপে এবং শত্রুর প্রতি দাক্ষিণ্য, এবং সাহিত্যপ্রীতির জন্যে, দাক্ষিণাত্যে তাঁর নাম এখনও লোকের মনে জাগরূক আছে। তাঁর নাম ছিল কৃষ্ণদেবরায়। তিনি ১৫০৯ থেকে ১৫২৯ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিলেন। পেইস তাঁর দৈর্ঘ্য, দেহগঠন, এমনকি গাত্রবর্ণ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন; তাঁর রঙ নাকি ফরশা ছিল। "তিনি সবচেয়ে পরাক্রান্ত এবং আদর্শ রাজা—প্রফুল্লচিত্ত এবং আমোদপ্রিয়। তিনি বৈদেশিকদের সম্মান দেখান, তাদের সহৃদয়ভাবে অভ্যর্থনা করেন, এবং তারা যে অবস্থারই লোক হোক-না কেন, তাদের সকল কথা প্রশ্ন করে জেনে নেন।" রাজার বহু উপাধির তালিকা শেষ করে পেইস বলেছেন, "কিন্তু তিনি এতই সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ভীক বীর ছিলেন যে, মনে হয়, তাঁর যত উপাধি থাকা উচিত ছিল বস্তুত তা তাঁর নেই।"

অতি উচ্চ প্রশংসা! এই সময়ে বিজয়নগরের সাম্রাজ্য সমগ্র দক্ষিণ এবং পূর্ব-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আর-একটা কথা বলা উচিত। প্রায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, নগরে নির্মল জল আনার জন্য বিরাট জলসেচ-যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। একটা পুরো নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। এখান থেকে জল একটি প্রণালী বয়ে নগরে পৌঁছত; প্রণালীটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৫ মাইল, এবং স্থানে স্থানে পাথর কেটে এটি তৈরি করতে হয়েছিল।

এই ছিল বিজয়নগর। ধনগর্বে রূপগর্বে গর্বিত, নিজের পরাক্রমে অতিবিশ্বাসী। কেউ জানত না যে এই নগর এবং সাম্রাজ্যের পতন এত নিকটে। পেইসের আগমনের মাত্র তেতাল্লিশ বছর পরে সহসা বিপদ ঘনিয়ে এল। দাক্ষিণাত্যের অন্যসব রাজ্য বিজয়নগরের উপর ঈর্ষাবশে এর বিরুদ্ধে মিলিত হয়ে একে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। তখনও বিজয়নগর নির্বুদ্ধিতা-বশত আত্মপ্রত্যয়ী। ধ্বংস ও অবসান দ্রুত এল, এবং সে ধ্বংস, সে অবসান এতই সম্পূর্ণ, এতই ভয়ানক!

আগেই বলেছি, এই মিলিত রাষ্ট্রসমূহের হাতে বিজয়নগরের পতন ঘটে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে। অবর্ণনীয় হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হল, এবং এই বিশাল নগরের ধ্বংসকার্য তার পরেই এল। সমস্ত সুন্দর প্রাসাদ ও মন্দির লয় পেল। ভাস্কর্যের অপূর্বসুন্দর নিদর্শনসমূহ ধূলিতে পরিণত হল; পোড়ানোর মতো যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিরাট চিতা জ্বালিয়ে সব নিঃশেষ করা হল। যতক্ষণ না সমস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল ততক্ষণ এমনি চলল। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন, "সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন এত ভয়ানক সর্বনাশ এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুন্দর নগরের উপরে আসে নি। আজ যা ছিল কর্মচঞ্চল বিত্তশালী জনতাপূর্ণ নগর, প্রাচুর্যের প্রতিমূর্তি, পরদিনই তা বর্বর ভয়াবহ হত্যা ও ধ্বংসলীলার মধ্যে পরিসমাপ্ত হল। বর্ণনায় এ সর্বনাশ বোঝানো যায় না।"

মালয়েশিয়ার মাজপাহিত ও মালাক্কা-সাম্রাজ্য

১৭ই জুলাই, ১৯৩২

মালয়েশিয়া এবং প্রাচ্য দ্বীপসমূহ সম্বন্ধে আমরা একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছি, এবং অনেকদিন তাদের কথা লিখি নি। হিসেব করে দেখছি তাদের সম্বন্ধে শেষ লিখেছি ৪৬-সংখ্যক পত্রে। তার পরে একত্রিশখানা চিঠি লিখে ৭৮ সংখ্যায় এসে পৌঁচেছি। সব দেশের সম্বন্ধে এক-সঙ্গে সমস্তরে থাকা কঠিন ব্যাপার।

আজ থেকে ঠিক দু মাস আগে তোমাকে যা লিখেছিলাম, মনে আছে? কাম্বোডিয়া, আঙ্কর, সুমাত্রা ও শ্রীবিজয়ের কথা? কেমন করে ইন্দোচীনে প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশগুলি বহুশত বৎসর পরে এক বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হল—কাম্বোডিয়া-সাম্রাজ্যে? তার পরে সহসা এল প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যার ফলে নগর ও সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল। এটা হয়েছিল ১৩০০ খৃষ্টাব্দে।

কাম্বোডিয়া-রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রায় সমসাময়িক আর-একটা বড়ো রাষ্ট্র ছিল সুমাত্রা দ্বীপে। তবে শ্রীবিজয়-সাম্রাজ্যের বিস্তার একটু পরে আরম্ভ হয়েছিল, এবং কাম্বোডিয়ার পরেও ইহা বেঁচে ছিল। এর সমাপ্তিও আকস্মিক, কিন্তু সে সমাপ্তি মানুষের হাতে, প্রকৃতির হাতে নয়। তিন শো বছর ধরে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য শ্রীবিজয় বর্তমান ছিল, এবং প্রাচ্যের প্রায় সব দ্বীপেরই ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল; এমনকি কিছুকাল ধরে ভারত, সিংহল ও চীনেও তার প্রভাব এসে পড়েছিল। এটা ছিল বণিক-সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্যই ছিল এর প্রধান কাজ। কিন্তু তার পরে যবদ্বীপের পূর্বাংশে আর-একটি বণিক-রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, এক হিন্দুরাজ্য, যা শ্রীবিজয়ের প্রাধান্য অস্বীকার করল।

নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ৪০০ বছর ধরে এই পূর্ব-যবদ্বীপ-রাষ্ট্র শ্রীবিজয়ের ক্রমবর্ধমান পরাক্রমে বিপন্ন হচ্ছিল। কিন্তু সে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে অগণিত অপূর্বসুন্দর প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করেছিল। এদের মধ্যে বৃহত্তম, বরোবদুর-মন্দিরশ্রেণী এখনও বর্তমান আছে, এবং বহুসংখ্যক ভ্রমণকারীকে আকৃষ্ট করে থাকে। শ্রীবিজয়ের আধিপত্যে না পড়ে পূর্ব-যবদ্বীপ নিজেই বলদর্পী হয়ে দাঁড়াল, এবং পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীবিজয়ের আশঙ্কার কারণ ঘটাল। উভয়েই ছিল বণিক-রাষ্ট্র, উভয়েরই কাজ ছিল বাণিজ্যের জন্যে সমুদ্র পার হওয়া, এবং এইরূপে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ হল।

যবদ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে বর্তমান দুই রাষ্ট্রের, ধরো, জর্মানি ও ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপমিত করার লোভ সামলাতে পারছি না। শ্রীবিজয়কে অবদমিত রাখার একমাত্র উপায় নিজের বাণিজ্যবৃদ্ধি এবং নৌশক্তির উন্নতি, এই অনুভব করে যবদ্বীপ নিজের সমুদ্রশক্তি বিলক্ষণ বাড়িয়ে তুলল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক নগর স্থাপিত হল, নাম হল মাজপাহিত। ক্রমবর্ধিষ্ণু যবদ্বীপ-রাষ্ট্রের এই হল রাজধানী।

এই যবদ্বীপ-রাষ্ট্র এত বলদর্পী ও স্পর্ধান্বিত হয়ে উঠল যে, মহামান্য কুব্‌লাই খানের যেসব দূত কর-গ্রহণে প্রেরিত হয়েছিল, তাদের রীতিমতো অপমান করতেও দ্বিধা করে নি। কর তো দেওয়া হলই না, উপরন্তু রাজদূতদের একজনের কপালে উল্‌কি দিয়ে অপমানজনক উত্তর লিখে দেওয়া হল। একজন মঙ্গোল খানের সাথে এইরকম বাহাদুরি অত্যন্ত বিপজ্জনক নির্বুদ্ধিতার কাজ। অনুরূপ অপমানের ফলে চেঙ্গিস্ মধ্য-এশিয়া এবং পরে হুলাগু বাগদাদ ধ্বংস করেছিলেন। তবু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যবদ্বীপের স্পর্ধা হয়েছিল এতখানি সাহসিকতা দেখাতে। তার নিতান্ত সৌভাগ্য, মঙ্গোলরা বহুল পরিমাণে নরম হয়ে এসেছিল, এবং রাজ্যজয়ের আর-কোনো বাসনা তাদের ছিল না। তা ছাড়া নৌযুদ্ধ তাদের পছন্দসই ছিল না; তারা শক্ত জমির উপরে ঢের বেশি সুবিধে পেত। তবু কুব্‌লাই অপরাধী রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যে যবদ্বীপে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। চীনারা যবদ্বীপবাসীদের পরাজিত করে রাজাকে নিহত করল। কিন্তু

মনে হয় তাহারা বিশেষ-কিছু ধ্বংস করে নি। চীনাজাতির প্রভাবে মঙ্গোলদের কী অদ্ভুত পরিবর্তন!

মনে হয়, চীনাবাহিনীর আগমনের ফলে যবদ্বীপ, অর্থাৎ মাজপাহিত-সাম্রাজ্য যেন বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। তার কারণ চীনারা যবদ্বীপে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করল, এবং সম্ভবত এই আগ্নেয়াস্ত্রই পরবর্তী কালের যুদ্ধসমূহে মাজপাহিতের জয়ের প্রধান কারণ।

মাজপাহিত প্রসার পেয়ে চলল। এ বৃদ্ধি দৈব দুর্ঘটনা নয়, যেমন-তেমন ভাবেও নয়। এ হল সাম্রাজ্যবাদী প্রসার, যার পিছনে ছিল রাষ্ট্রের সংগঠন, এবং যা সম্ভব হয়েছিল নিপুণ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সাহায্যে। প্রসারের কতক অংশের সময় রানী সুহিতা নামক এক রমণী ছিলেন রাষ্ট্রের অধিশ্বরী। শাসনবিভাগ যতদূর মনে হয় বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত এবং নিপুণ ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন যে করগ্রহণরীতি, চুঙি, পথকর, এবং আভ্যন্তরীণ কর আদায়ের ব্যবস্থা অতি উচ্চাঙ্গের ছিল। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছিল ঔপনিবেশিক বিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ, জনকল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য -বিভাগ, অভ্যন্তরবিভাগ এবং সমর-বিভাগ। দুজন প্রধান এবং সাতজন সাধারণ বিচারপতি -সংবলিত এক উচ্চতম বিচারালয় ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু রাজার কাজ ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রিত রাখা।

এইসকল বিভাগ, এমনকি এদের কোনো-কোনোটির নাম পর্যন্ত, অনেকটা অর্থশাস্ত্রকে মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক বিভাগ ছিল নূতন। অভ্যন্তরবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব, যাঁর কাজ ছিল স্বরাষ্ট্র পরিচালনা, তাঁকে বলা হত মন্ত্রী। এর থেকে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতের পহ্লবজাতিকর্তৃক উপনিবেশ-স্থাপনের ১২০০ বছর পরেও ভারতীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতি এই-সকল দ্বীপে বর্তমান ছিল। সংযোগ থাকলে তবে এটা সম্ভব হতে পারে। বাণিজ্যের সাহায্যে যে এই সংযোগ রাখা হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাজপাহিত ছিল বণিক-সাম্রাজ্য, কাজেই এটা স্বাভাবিক যে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় খুবই সাবধানে সংগঠিত ছিল। এই বাণিজ্য ছিল প্রধানত ভারত, চীন, এবং এর নিজের উপনিবেশগুলির সঙ্গে। যতদিন পর্যন্ত শ্রীবিজয়ের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান ততদিন এই রাষ্ট্রের সঙ্গে, অথবা এর কোনো উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল না।

এই যবদ্বীপীয় রাষ্ট্র বহুশত বৎসর ধরে ছিল, কিন্তু মাজপাহিত-সাম্রাজ্যের সবচেয়ে যশঃপূর্ণ কাল ছিল ১৩৩৫ থেকে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঠিক ৪৫ বৎসর। এই কালের মধ্যেই, ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে, শ্রীবিজয় শেষপর্যন্ত পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। আনাম, শ্যাম, ও কাম্বোডিয়ার সাথে এর মৈত্রী ছিল।

মাজপাহিতের রাজধানী ছিল সুগঠিত ঐশ্বর্যশালী নগর; এর কেন্দ্রস্থলে ছিল এক বিরাট শিবমন্দির। বহুসংখ্যক অট্টালিকার অস্তিত্ব ছিল। মালয়েশিয়ার সব ভারতীয় উপনিবেশেরই বৈশিষ্ট্য ছিল সুদর্শন স্থাপত্য। এ ছাড়া যবদ্বীপে আরও অনেক বড়ো নগর এবং বন্দর ছিল।

চিরশত্রু শ্রীবিজয়ের পতনের পর এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বেশি দিন ছিল না। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল, এবং চীনের সঙ্গে বিরোধের ফলে এক বিরাট চৈনিক নৌবাহিনীর যবদ্বীপে আগমন হল। উপনিবেশসমূহ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে এল মন্বন্তর, এবং দু বছর পরে মাজপাহিতের সাম্রাজ্য হিসেবে অস্তিত্ব শেষ হল। তার পরেও পঞ্চাশ বছর মাজপাহিত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রইল, কিন্তু এবার মালাক্কার মুসলিম-রাষ্ট্র দেশ অধিকার করল।

ভারতীয় প্রাচীন উপনিবেশ থেকে উৎপন্ন সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে তৃতীয়টির এমনিভাবে সমাপ্তি ঘটল। আমাদের ছোটো চিঠিতে আমরা দীর্ঘকালের বিষয় আলোচনা করেছি। ভারত থেকে প্রথম ঔপনিবেশিকরা আসে খৃষ্টান অব্দের প্রায় প্রথমে, এবং আমরা এখন পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে পৌঁচেছি। অতএব আমরা এই উপনিবেশগুলির ১৪০০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচিত তিনটি সাম্রাজ্য—কাম্বোডিয়া, শ্রীবিজয় এবং মাজপাহিত—প্রত্যেকটিই বহুশত বর্ষ ধরে বর্তমান ছিল। এইসব দীর্ঘ সময়ের কথা মনে রাখা ভালো, কারণ এর থেকে

রাষ্ট্রগুলির স্থায়িত্ব ও সুশাসনবিধির খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। সুদর্শন স্থাপত্য তাদের অতি প্রিয় ছিল, এবং তাদের প্রধান পেশা ছিল বাণিজ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য তারা বজায় রেখেছিল এবং তার সঙ্গে চৈনিক সংস্কৃতির বহুবিধ সামঞ্জস্য ঘটিয়েছিল।

তোমার মনে থাকবে যে, যে তিনটি ভারতীয় উপনিবেশের কথা আমি বিশেষভাবে বললাম, তা ছাড়াও আরও বহু উপনিবেশ ছিল। কিন্তু তাদের পৃথকভাবে আলোচনা সম্ভব হবে না। এবং দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলতে পারছি না। এই দুই দেশেই শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং ললিতকলার উন্নতি ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম দুই দেশেই বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রহ্ম মঙ্গোলজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু শ্যামদেশ কখনও চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয় নি। কিন্তু ব্রহ্ম ও চীন দুই দেশই অনেক সময় চীনকে রাজস্ব দিত। এ যেন শ্রদ্ধেয় বড়োকে শ্রদ্ধানত ছোটোর উপহার। এই রাজস্বের পরিবর্তে চীন থেকে কনিষ্ঠের কাছে মহার্ঘ উপহারসামগ্রী আসত।

ব্রহ্মদেশে মঙ্গোল-আক্রমণের পূর্বে দেশের রাজধানী ছিল উত্তর-ব্রহ্মে পাগান-নগর। ২০০ বছরের উপর এই নগর রাজধানী ছিল, এবং শোনা যায় এটা নাকি খুব সুন্দর নগর ছিল; এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আঙ্কর। এর শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ছিল বৌদ্ধ-স্থাপত্যের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—আনন্দমন্দির। এ ছাড়া আরও অনেক সুদর্শন অট্টালিকা ছিল। পাগান-নগরের বর্তমান ধ্বংসাবশেষও সুন্দর। পাগানের সমৃদ্ধিকাল ছিল একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পরবর্তীকালে কিছুদিন ব্রহ্মে গোলযোগ দেখা দিল, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হল। ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণে একজন পরাক্রান্ত রাজার উদ্ভব হল এবং তিনি আবার দুই ব্রহ্মের মিলন ঘটালেন। তাঁর রাজধানী ছিল দক্ষিণে পেগু।

আশা করি ব্রহ্ম ও শ্যামের এই ছোটো অথচ আকস্মিক অবতারণায় তোমার সব গুলিয়ে যাবে না। আমরা মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদের শেষে উপনীত হয়েছি এবং আমি আমার আলোচনা সর্বাঙ্গীণ করতে চাই। এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যা-কিছু প্রভাব এই দেশগুলির উপর পড়েছিল, সবই ভারত এবং চীনের মারফত। আগেই বলেছি, এশিয়ার পূর্ব-দক্ষিণে মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত দেশগুলি, যথা, ব্রহ্ম শ্যাম ও ইন্দোচীন, চীন কর্তৃক বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছিল। দ্বীপসমূহ এবং মালয়-উপদ্বীপের উপর ভারতের প্রভাব ছিল অধিক।

এবারে ঘটনাস্থলে নূতন প্রভাবের আবির্ভাব হল। এই প্রভাব আনল আরবরা। ব্রহ্ম এবং শ্যামের কোনো পরিবর্তন হল না, কিন্তু মালয় এবং দ্বীপসমূহ এর অধিকারে এল এবং শীঘ্রই এক মুসলমান-সাম্রাজ্য গড়ে উঠল।

আরব বণিকরা হাজার বছর ধরে এই দ্বীপে ব্যবসা ও বসতি করেছিল। কিন্তু তারা বাণিজ্যে নিমগ্ন ছিল, শাসনবিধিতে হস্তক্ষেপ করে নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব-ধর্মপ্রচারকরা এল এবং সফল হল, বিশেষ করে স্থানীয় কয়েকজন রাজাকে ধর্মান্তরিত করায়।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছিল। মাজপাহিত বড়ো হচ্ছিল এবং শ্রীবিজয়কে পেষণ করছিল। শ্রীবিজয়ের পতনের পরে বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী মালয়-উপদ্বীপের দক্ষিণে গিয়ে মালাক্কা-নগরীর সৃষ্টি করল। নগর এবং রাষ্ট্রসমূহ দ্রুত বড়ো হতে লাগল, এবং ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এটা খুব বড়ো নগরে পরিণত হল। মাজপাহিতের যবদ্বীপীয় জাতি তাদের বিজিত প্রজাদের প্রিয় ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের সচরাচর যা হয়ে থাকে, তারা ছিল অত্যাচারী, এবং অনেক লোক মাজপাহিতের অধীনে থাকার চেয়ে নবগঠিত মালাক্কা-রাষ্ট্রে যাওয়া শ্রেয় মনে করল। এই সময় শ্যামদেশও একটু রাজ্যলোলুপ হয়ে পড়ে। ফলে মালাক্কা বহু জাতির আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল। সেখানে বৌদ্ধ ও মুসলমান দুইই ছিল। রাজারা প্রথমে ছিলেন বৌদ্ধ, পরে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন।

এক পাশে যবদ্বীপ, অপর পাশে শ্যাম, এই দুই দেশ নবগঠিত রাষ্ট্র মালাক্কার আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মালাক্কা চেষ্টা করল দ্বীপসমূহে অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী

স্থাপন করতে। এমনকি চীনের কাছেও রক্ষার জন্য সাহায্য চেয়ে পাঠাল। এই সময়ে মিঙ্‌রা, যাঁরা এসেছিলেন মঙ্গোলদের পরে, চীনে রাজত্ব করছিলেন। আশ্চর্য এই যে, মালয়েশিয়ার ক্ষুদ্র ইসলাম-রাষ্ট্রগুলি সবাই একই সময়ে চীনের সাহায্য প্রার্থনা করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, শক্তিশালী কোনো শত্রুর কাছ থেকে সত্বরই কোনো বিপদাশঙ্কা ছিল।

চীন চিরকালই মালয়েশীয় দেশগুলি সম্বন্ধে বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে কৌতূহলী ছিল না। রাজ্যজয়ের কোনো স্পৃহা তার ছিল না। সে ভাবত, তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে তা সামান্য; তবে নিজের সভ্যতা-বিস্তারে তার কোনো আপত্তি ছিল না। যতদূর মনে হয় মিঙ-সম্রাট তাঁদের চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রমের সিদ্ধান্ত করে এইসব দেশ সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া স্থির করলেন। সম্ভবত যবদ্বীপ ও শ্যামের উদ্ধত ভাব তাঁর ভালো লাগে নি। অতএব, এসব বন্ধ করে চীনের পরাক্রম সম্বন্ধে অন্যদের মনে ধারণা জন্মানোর জন্যে তিনি নৌসেনাপতি চেঙ হো'র অধীনে এক বিরাট নৌবাহিনী পাঠালেন। এই বাহিনীর কোনো কোনো পোত চার শো ফুট দীর্ঘ ছিল।

চেঙ হো অনেক অভিযান করলেন এবং প্রায় সব দ্বীপেই পদার্পণ করলেন—ফিলিপাইন যবদ্বীপ সুমাত্রা মালয়-উপদ্বীপ, ইত্যাদি। এমনকি সিংহলে এসে দেশজয় করে রাজাকে চীনে ধরে নিয়ে গেলেন। তাঁর শেষ অভিযানে তিনি পারশ্য-উপসাগর পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চেঙ হো'র এইসব অভিযান তিনি যেসব দেশে ভ্রমণ করেছিলেন তার সবগুলিতেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিন্দু-মাজপাহিত ও বৌদ্ধ-শ্যামকে দমিত রাখবার জন্যে তিনি ইচ্ছে করে মুসলমানদের উৎসাহিত করতে লাগলেন, এবং তাঁর বিশাল নৌবাহিনীর আশ্রয়ে মালাক্কা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। চেঙ হো'র উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, এবং ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন বৌদ্ধ।

এইরূপে মালাক্কা-রাষ্ট্র মাজপাহিতের বিরুদ্ধাচরণের প্রধান অংশী হয়ে দাঁড়াল। এর শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পেল এবং ক্রমে যবদ্বীপের উপনিবেশগুলি অধিকার করল। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মাজপাহিত-নগর অধিকৃত হল। ফলে ইসলাম রাজসভা এবং নগরের ধর্মে পরিণত হল। কিন্তু গ্রামদেশে, ভারতের মতোই, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস পুরাণ এবং রীতিনীতি চলতে লাগল।

মালাক্কা-সাম্রাজ্য হয়তো শ্রীবিজয় এবং মাজপাহিতের মতোই বিশাল এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত, কিন্তু সুযোগ পেল না। পর্তুগীজদের আগমন ঘটল, এবং কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৫১১ সালে মালাক্কার পতন হল। কাজেই এইসব সাম্রাজ্যের চতুর্থের স্থানে এল পঞ্চম, কিন্তু তারও স্থিতি বেশি দিনের নয়। ইতিহাসে এই প্রথম ইউরোপ প্রাচ্যসমুদ্রে প্রাধান্য লাভ করল।

৭৯

পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপের লোলুপ হস্ত

১৯শে জুলাই, ১৯৩২

আমার গত চিঠি শেষ করেছিলাম মালয়েশিয়ায় পর্তুগীজদের আগমন দিয়ে। জলপথের আবিষ্কার এবং পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের মধ্যে সুদূর প্রাচ্যে আগে পৌঁছনোর যে প্রতিযোগিতা চলছিল সে সম্বন্ধে কয়েকদিন আগেই বলেছি। পর্তুগাল গেল পূর্বদিকে; স্পেন পশ্চিমে। পর্তুগাল আফ্রিকা ঘুরে ভারতে পৌঁছতে সমর্থ হল। স্পেন ক্রমক্রমে আমেরিকায় পৌঁছে গেল, এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ-আমেরিকা ঘুরে মালয়েশিয়ায় এসে পড়ল। আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন সূত্রকে একত্রিত করে মালয়েশিয়ার কাহিনী বলে যেতে পারি।

মশলা (মরিচ ইত্যাদি) জাতীয় জিনিসগুলি, তুমি বোধহয় জানো, বিষুবরেখার নিকটবর্তী গরম দেশে উৎপন্ন হয়, ইউরোপে এসব মোটেই হয় না। দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে কিছু কিছু হয়। কিন্তু এসব মশলার বেশির ভাগই আসত মালাক্কা-নামধেয় মালয়েশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে। এসব দ্বীপগুলি স্পাইস্ আইল্যান্ডস্ অথবা মশলা-দ্বীপপুঞ্জ নামেই পরিচিত। অতি প্রাচীন যুগ থেকে ইউরোপে এসব মশলার খুব বেশি চাহিদা ছিল, এবং এসব সেখানে নিয়মিত প্রেরিত হত। ইউরোপে পৌঁছনোর পরে এসব জিনিষ খুব দুর্মূল্য সামগ্রী হয়ে দাঁড়াত। রোমক যুগে মরিচ ছিল ওজনদরে সোনার সমান। যদিও ইউরোপে মশলার এত দাম ও চাহিদা ছিল, ইউরোপ নিজে সেসব জোগাড় করার কোনো চেষ্টা করে নি। বহুকাল যাবত এ ব্যবসা ছিল ভারতীয়দের হাতে, তার পরে আসে আরবদের হাতে। এই মশলার লোভই পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তে আকৃষ্ট করেছিল; অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ হল মালয়েশিয়ায়। স্পেন যখন প্রাচ্যের পথে আমেরিকায় গিয়ে বিশেষ লাভজনক কাজে ব্যস্ত ছিল, পর্তুগীজরা ততদিনে তাদের অনুসন্ধানে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত-আগমনের অনতিকাল পরে বহু পর্তুগীজ জাহাজ সেই পথে এল, এবং আরও পূর্বদিকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে মালাক্কার নূতন সাম্রাজ্য মশলা ও অন্যান্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করছে। সুতরাং অবিলম্বে পর্তুগীজদের সাথে এদের এবং মোটামুটি সব আরব-বণিকেরই বিরোধ বেধে গেল। পর্তুগীজদের রাজপ্রতিনিধি আলবুকার্ক ১৫১১ সালে মালাক্কা অধিকার করে মুসলমান-বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটালেন। এখন পর্তুগীজরাই ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভার পেল, এবং তাদের রাজধানী লিসবন ইউরোপে মশলা এবং অন্যান্য প্রাচ্য-সামগ্রী সরবরাহ করার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে যদিও আলবুকার্ক আরবদের নির্মম শত্রু ছিলেন, তিনি প্রাচ্যের অন্যান্য বণিকজাতির সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে যেসব চীনার সংস্পর্শে তিনি আসতেন, সকলকেই বিশেষ সৌজন্য দেখাতেন, এবং তার ফলে চীনে পর্তুগীজদের সম্বন্ধে অনুকূল সংবাদ পৌঁছল। আরবদের প্রতি শত্রুতার কারণ ছিল সম্ভবত প্রাচ্য বাণিজ্যে তাদের প্রধান স্থান।

ইতিমধ্যে স্পাইস্ আইল্যান্ড্সের অনুসন্ধান চলল, এবং ম্যাগেলান, যিনি পরবর্তীকালে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন, মালাক্কা-দ্বীপপুঞ্জ-আবিষ্কারকারী অভিযানের একজন ছিলেন। ষাট বছরেরও বেশি কাল ইউরোপে মশলার ব্যবসায়ে পর্তুগীজদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তার পরে ১৫৬৫ সালে স্পেন ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করল এবং এইরূপে প্রাচ্যসমুদ্রে দ্বিতীয় ইউরোপীয় শক্তির আবির্ভাব হল। কিন্তু স্পেনের আগমনে পর্তুগীজ বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হল না, কারণ স্পেনীয়রা প্রধানত বণিকজাতি ছিল না। তারা প্রাচ্যদেশে সৈন্যবাহিনী ও মিশনারি পাঠিয়েছিল। ইতিমধ্যে পর্তুগাল মশলা-ব্যবসায় এতদূর স্বায়ত্ত করে ফেলেছিল যে, পারশ্য এবং মিশর পর্যন্ত মশলার জন্য পর্তুগীজদেব মুখাপেক্ষী ছিল। পর্তুগীজরা অপর কাউকে সরাসরি মশলা-দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্য পর্যন্ত করতে দিত না। এইরূপে পর্তুগালের সমৃদ্ধি বাড়ল, কিন্তু উপনিবেশ প্রসারের কোনো চেষ্টা তারা করে নি। তুমি জানো, পর্তুগাল দেশটা ছোটো এবং বিদেশে পাঠানোর মতো জনবল তার ছিল না। এক শো বছর ধরে—সম্পূর্ণ ষোড়শ শতাব্দী যাবৎ—প্রাচ্যে এই ক্ষুদ্র দেশটি যা করেছিল তাই যথেষ্ট বিস্ময়কর।

স্পেনীয়রা ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আঁকড়ে ধরে থাকল, এবং এদের থেকে যতদূর সম্ভব টাকা করা যায় তার চেষ্টা দেখতে লাগল। কর আদায় ছাড়া আর বিশেষ কিছু তারা করে নি। প্রাচ্যসমুদ্রে বিরোধ এড়ানোর জন্যে তারা পর্তুগীজদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল। স্পেনীয় সরকার ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জকে স্পেনাধিকৃত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে দিত না, পাছে মেক্সিকো ও পেরুর সোনা ও রুপো পূর্বদেশে চলে যায়। বছরে মাত্র একখানা জাহাজ সেখানে গিয়ে ফিরে আসত। এর নাম ছিল 'ম্যানিলা গ্যালিয়ন', এবং কল্পনা করে দেখো, ফিলিপাইনস্থিত স্পেনীয়রা

কী অধীর আগ্রহে এই বার্ষিক আগমনের প্রতীক্ষা করত। ২৪০ বছর ধরে এই 'ম্যানিলা গ্যালিয়ন' দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করেছিল।

স্পেন ও পর্তুগালের এই সাফল্য দেখে ইউরোপের অন্যান্য জাতি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। পরে দেখতে পাবে, এই সময়ে সারা ইউরোপের উপরে স্পেনের প্রাধান্য। ইংলণ্ড ধরতে গেলে প্রথম শ্রেণীর শক্তিই ছিল না।

নেদারল্যান্ড্সে, অর্থাৎ হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের কিছু অংশে, স্পেনীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটেছিল। ওলন্দাজদের উপরে সহানুভূতি এবং স্পেনের প্রতি ঈর্ষা -বশত ইংরেজরা গোপনে হল্যান্ডকে সাহায্য করেছিল। তাদের কোনো কোনো নাবিক মাঝ-সমুদ্রে যা করে বেড়াচ্ছিল, তাকে জলদস্যুবৃত্তি ছাড়া আর-কিছু বলা চলে না; তাদের কাজ ছিল আমেরিকা থেকে আগত স্পেনীয় ধনপূর্ণ জাহাজ অধিকার করা। এই বিপজ্জনক কিন্তু লাভের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন সার ফ্রান্সিস ড্রেক, আর তাঁর ভাষায় এ কাজটা ছিল স্পেনের রাজার দাড়িতে ছ্যাঁকা দেওয়া।

১৫৭৭ সালে ড্রেক পাঁচটা জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন স্পেনীয় উপনিবেশসমূহ লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ে। আক্রমণে সফল তিনি হলেন, কিন্তু চারটি জাহাজ হারালেন। একটি মাত্র জাহাজ—'গোল্ডেন হিন্দ্'—প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছল, এবং এতে করে ড্রেক উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। এইভাবে তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন, এবং 'গোল্ডেন হিন্দ্' হল এই অভিযানে দ্বিতীয় পোত। প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ম্যাগেলানের 'ভিক্টোরিয়া'। প্রদক্ষিণে সময় লেগেছিল তিন বছর।

স্পেনের রাজার দাড়িতে ছ্যাঁকা দেওয়া বেশি দিন ধরে চললে গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং শীঘ্রই ইংলণ্ড ও স্পেনে যুদ্ধ বাধল। ওলন্দাজরা আগে থেকেই স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। পর্তুগালও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, কারণ কয়েক বৎসর ধরে স্পেন ও পর্তুগালের রাজা ছিলেন একই ব্যক্তি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বেশ একটু কপালজোরে সারা ইউরোপকে বিস্মিত করে ইংলণ্ড জয়ী হল। ব্রিটেন-অধিকারের জন্যে প্রেরিত 'অজেয় আর্মাডা' ধ্বংস হল. তোমার বোধহয় মনে আছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রাচ্য।

ইংরেজ এবং ওলন্দাজ, দুই দলই সুদূর প্রাচ্যে অভিযান করে স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের আক্রমণ করেছিল। স্পেনীয়রা সকলে ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে কেন্দ্রীভূত ছিল, ফলে তাদের পক্ষে দেশরক্ষা সোজা হল। কিন্তু পর্তুগীজদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। তাদের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ৬০০০ মাইল, লোহিত সাগর থেকে মালাক্কা, অর্থাৎ মশলা-দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। এডেনের কাছে, পারশ্য-উপসাগরে, সিংহলে, ভারতের তটভূমির বহু স্থানে, এবং প্রাচ্য-দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ও মালয়-উপদ্বীপে তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রমে তারা তাদের প্রাচ্য-সাম্রাজ্য হারাল; নগরের পর নগর, উপনিবেশের পর উপনিবেশ, ইংরেজ অথবা ওলন্দাজদের করায়ত্ত হল। এমনকি মালাক্কারও পতন ঘটল ১৬৪১ সালে। বাকি থাকল শুধু ভারত এবং আর দুই-একটি জায়গায় কয়টি ক্ষুদ্র বসতি। পশ্চিম-ভারতে গোয়া এদের মধ্যে প্রধান: পর্তুগীজরা এখনও সেখানে আছে, এবং কয়েক বৎসর আগে যে পর্তুগীজ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা তার একটি অংশ। মহাপরাক্রমশালী আকবর পর্তুগীজদের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও পারেন নি।

এমনি করে পর্তুগাল প্রাচ্য ইতিহাস থেকে বিদায় নিল। এই ক্ষুদ্র দেশটি বহু দেশ গ্রাস করার জন্যে যে অস্বাভাবিক চেষ্টা করেছিল, তার ফলেই তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এর পরেও স্পেন ফিলিপাইন দখল করে রইল, প্রাচ্য রাজনীতিতে বিশেষ কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করে। লাভজনক প্রাচ্যবাণিজ্য এবারে হল্যান্ড ও ইংলণ্ডের হস্তগত হল। এই দুটি দেশেই ব্যবসায়ীসংঘ গঠন করে এই চেষ্টার অনেকখানি কাজ সেরে রাখা হয়েছিল। ইংলণ্ডে ১৬০০ সালে রাজ্ঞী এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এক সনদ দিয়েছিলেন। দু বছর পরে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হল। দুটি কোম্পানিই ছিল কেবল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তারা ছিল ব্যক্তিগত কোম্পানি, কিন্তু প্রায়ই রাষ্ট্রের সহায়তা পেত। তাদের আগ্রহ ছিল মালয়েশিয়ার মশলা-ব্যবসায়ের

সম্বন্ধে। ভারতবর্ষে তখন মোগল-সম্রাটদের বিপুল বিক্রম, এবং তাদের চটানো খুব নিরাপদ ছিল না।

ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে কলহ করত, এবং অবশেষে ইংরেজরা স্পাইস্ আইল্যান্ড্স্ থেকে সরে ভারতের দিকে বেশি মনোযোগ দিল। পরাক্রান্ত মোগল-সাম্রাজ্য তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং তার সুযোগ নিয়ে বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষীদের আগমন ঘটল। পরে দেখবে, কেমন করে ইংলন্ড ও ফ্রান্স থেকে আগত এইসব ভাগ্যান্বেষী ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের অংশ নিজেদের অধিকারভুক্ত করার জন্যে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহ করেছিল।

৮০

চীনদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ

২২শে জুলাই, ১৯৩২

মানিক আমার, জানলাম তোমার অসুখ করেছিল, এবং হয়তো এখনও শয্যাশায়ী আছ। জেলের মধ্যে খবর এসে পৌঁছতে সময় লাগে। তোমার কোনো উপকার করার উপায় আমার নেই, নিজের খবরদারি তোমার নিজেরই করতে হবে। কিন্তু তোমার কথা খুবই চিন্তা করব। কী অদ্ভুত ভাবে সবাই ছড়িয়ে আছি—তুমি সুদূর পুনায়; মা এলাহাবাদে রোগশয্যায়; বাকি সবাই বিভিন্ন কারাগারে!

কিছুদিন যাবৎ তোমার কাছে চিঠি লিখতে অসুবিধে বোধ করছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এমনি একটা কল্পনা চালিয়ে যাওয়া শক্ত। খালি মনে পড়ছে, পুনায় তুমি রোগশয্যায় পড়ে আছ, ভাবছি কবে আবার তোমাকে দেখব, আমাদের দেখা হওয়ার আগে কত মাস, কত বৎসর কাটবে; আর সেই সময়টাতে তুমি কত বড়ো হয়ে যাবে।

কিন্তু অতিরিক্ত চিন্তা কোনো কাজের কথা নয়, বিশেষ করে জেলখানায়, অতএব কিছুক্ষণের জন্যে বর্তমানকে ভুলে অতীতকে স্মরণ করা যাক।

মালয়েশিয়ার কথা হচ্ছিল, না? একটা অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা দেখলাম আমরা। এশিয়াতে ইউরোপ ক্রমে মারমূর্তি ধরছিল; পর্তুগীজরা এল, তার পরে স্পেনীয়রা; তারও পরে এল ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা। কিন্তু এইসব ইউরোপীয় জাতির কর্মতৎপরতা মালয়েশিয়া ও দ্বীপপুঞ্জে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিমে মোগলদের অধীনে ছিল প্রবলপ্রতাপান্বিত ভারত। উত্তরে চীনদেশ আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ। কাজেই ভারত এবং চীনে ইউরোপীয়েরা বেশি গোলমাল করে নি।

মালয়েশিয়া থেকে চীন এক-পা রাস্তা। সেখানেই যাওয়া যাক। মঙ্গোল-সম্রাট কুব্লাই খাঁ প্রতিষ্ঠিত ইউয়ান-বংশ লোপ পেয়েছে। জনবিদ্রোহের ফলে শেষ মঙ্গোল-বাহিনী ১৩৬৮ সালে চীনের বিরাট প্রাচীরের বাইরে বিতাড়িত হয়েছে। বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন হুঙ উ, এঁর জীবনের আরম্ভ হয়েছিল দরিদ্র শ্রমজীবীর পুত্ররূপে, এবং লেখাপড়া শেখার সুযোগ এঁর হয় নি। কিন্তু জীবনের বৃহত্তর শিক্ষালয়ে তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র, ফলে তিনি সার্থক নেতা, এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞ শাসক হতে পেরেছিলেন। সম্রাট হয়েছেন বলে অহঙ্কারে, গৌরবে তিনি স্ফীত হয়ে ওঠেন নি; সারা জীবন ধরে তিনি মনে রেখেছিলেন যে তিনি সাধারণবংশজাত। তিনি রাজত্ব করেছিলেন ত্রিশ বৎসর ধরে, এবং যে জনসাধারণের মধ্য থেকে তাঁর উদ্ভব তাদের কল্যাণের জন্যে তাঁর অবিরত চেষ্টার জন্যে তাঁর রাজত্বকালের কথা লোকে এখনও মনে রেখেছে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রথম জীবনের রুচির সাদাসিধে ভাব বজায় রেখেছিলেন।

হুঙ উ ছিলেন নবগঠিত মিঙ-রাজবংশের প্রথম সম্রাট। তাঁর ছেলে ইউঙ লো'ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি রাজত্ব করেছিলেন ১৪০২ থেকে ১৪২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু আর

তোমার উপর এই চীনে নামের বহর চাপাব না। পর পর অনেক সুশাসকের পরে সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই হল, অর্থাৎ ভাঙন ধরল। কিন্তু সম্রাটদের কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে চীনের সমসাময়িক ইতিহাসের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'মিঙ' শব্দটির অর্থ উজ্জ্বল। মিঙ-রাজবংশ ২৭৬ বৎসর বর্তমান ছিল, ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত। সমস্ত রাজবংশের মধ্যে এইটিই ছিল খাঁটি চীনা-লক্ষণ-সম্পন্ন, এবং এ'দের রাজত্বকালে চীনের জনসাধারণের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক, দুই দিক দিয়েই এটা ছিল শান্তির কাল। রাজ্যজয়ের স্পৃহার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি, সাম্রাজ্যবাদিতার ভাগ্যান্বেষণও ছিল না। প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় ছিল। শুধু উত্তরে তাতার-নামক উপজাতির কাছ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল। প্রাচ্য জগতের আর সকলের কাছে চীন ছিল বড়ো ভাইয়ের মতো, ধীসম্পন্ন এবং সুসংস্কৃতিপূর্ণ; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সজাগ, কিন্তু ছোটো ভাইদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এবং নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাদের শেখাতে এবং ভাগ দিতে সর্বদা প্রস্তুত। এবং তারাও চীনকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা করত। কিছুকালের জন্যে জাপান পর্যন্ত চীনের বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং জাপানের শাসক শোগান নিজেকে মিঙ-সম্রাটের সামন্ত বলে পরিচয় দিতেন। কোরিয়া এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ইন্দোচীন থেকে কর আসত।

এই ইউঙ লো'র রাজত্বকালেই নৌসেনাপতি চেঙ হো'র অধীনে মালয়েশিয়ায় বিরাট সমুদ্রাভিযান হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চেঙ হো পূর্বসমুদ্রগুলির সর্বত্র পারশ্য-উপসাগর পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। মনে হতে পারে, ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকে ভীত রাখার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা। কিন্তু রাজ্যজয় অথবা আর্থিক লাভের কোনো চেষ্টাই নাকি ছিল না। শ্যাম এবং মাজপাহিতের ক্রমবর্ধিষ্ণু সামরিক শক্তি দেখে সম্ভবত ইউঙ লো এই অভিযান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কারণ যাই হোক-না কেন, এই অভিযানের ফল হয়েছিল বহুতর। এর ফলে মাজপাহিত ও শ্যাম অবদমিত হল, মালাক্কার নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম-রাষ্ট্র বৃদ্ধির উদ্বোধন পেল, এবং চীনা সংস্কৃতি সারা ইন্দোনেশিয়া ও প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

চীন ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি বিদ্যমান থাকায় ঘরোয়া ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল। সুশাসন ছিল, এবং করভার লঘু থাকায় কৃষকের উপর থেকে বোঝা কমেছিল। রাস্তা, জলপথ, খাল প্রভৃতি উন্নত করা হয়েছিল। দুঃসময়ে খাদ্যশস্যের অভাবের প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে সাধারণ শস্যাগার নির্মিত হয়েছিল। সরকার থেকে কাগজের মুদ্রা প্রচলিত করে ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এবং বাণিজ্য ও বিনিময়ের সহায়তা করা হয়েছিল। কাগজের মুদ্রার বহুল প্রচার ছিল। রাজকরের শতকরা ৭০ অংশ এই মুদ্রায় দেওয়া চলত।

এর চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বহুযুগ ধরে চীনার সুসংস্কৃত ও কলারসিক বলে খ্যাত। মিঙ-যুগের সুশাসন এবং মিঙদের শিল্পকলায় উৎসাহ-অনুরাগের ফলে লোকের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেল। সুরম্য অট্টালিকাসমূহ জেগে উঠল, আর তৈরি হল অপরূপ চিত্রপট; মিঙ চীনামাটির বাসন তাদের গঠনসৌকর্যের জন্যে খ্যাত। ইতালিতে সেই রেনেসাঁসের যুগে অঙ্কিত চিত্রাবলীর সঙ্গে মিঙ-যুগের চিত্র তুলনীয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশ ঐশ্বর্যে, ব্যবহারিক শিল্পে এবং সংস্কৃতিতে সে যুগের ইউরোপের চেয়ে ঢের বেশি অগ্রসর ছিল। সমগ্র মিঙ-যুগে ইউরোপের কোনো দেশই জনসাধারণের সুখ এবং শিল্পোৎসাহের দিক দিয়ে চীনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এবং মনে রেখো, ইউরোপের বিপুল নবজাগরণের যুগ (রেনেসাঁস) এই যুগেরই এক অংশ।

শিল্পকলার বিষয়ে মিঙ-যুগের খ্যাতির একটা কারণ হচ্ছে, তখনকার শিল্পের নিদর্শন এখনও বহু আছে। বিশাল স্মৃতিমন্দির, সুন্দর কাঠখোদাই, এবং গজদন্ত ও জেডের খোদাই কাজ, ব্রোঞ্জের পুষ্পাধার এবং চীনামাটির বাসন অনেক আছে। মিঙ-যুগের শেষ ভাগে কারুকার্য একটু অতিরিক্ত হয়ে পড়ায় খোদাই এবং চিত্রগুলি তাদের সৌন্দর্য খানিকটা হারিয়ে ফেলে।

এই যুগেই চীনে প্রথম পর্তুগীজ জাহাজের আগমন হয়। তারা ক্যাণ্টনে পৌঁছয় ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। আলবুকার্ক যত চীনার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে

সদ্ব্যবহার করেছিলেন, ফলে পর্তুগীজদের সম্বন্ধে চীনে অনুকূল সংবাদ গিয়েছিল। ফলে তারা সাদরে অভ্যর্থিত হল। কিন্তু অল্প\কিছুদিন পরেই পর্তুগীজরা অন্যায় আচরণ আরম্ভ করল, এবং বহু স্থানে দুর্গ নির্মাণ করল। এই অভদ্রতায় প্রথমে চীন-সরকার বিস্মিত হল। হঠাৎ কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করল না, কিন্তু শেষটায় সবসুদ্ধ পর্তুগীজদের দেশ থেকে বিতাড়িত করল। তখন পর্তুগীজরা বুঝল যে, তাদের চিরাচরিত প্রথা চীনে চালিয়ে লাভ নেই। তারা একটু শান্ত ও বিনীত ভাব অবলম্বন করল, এবং ১৫৫৭ সালে ক্যাণ্টনের কাছে বসতি করার অনুমতি পেল। তার পরে তারা মাকাও-নগর স্থাপন করে।

পর্তুগীজদের সঙ্গে এল খৃষ্টান মিশনারিরা। এদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা পাদ্রী ছিলেন সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার। তিনি বহুকাল ভারতে কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর নামে বহু মিশনারি কলেজ আছে। তিনি জাপানেও গিয়েছিলেন। চীনে অবতরণের অনুমতির প্রতীক্ষা করতে করতে তিনি চীনের এক বন্দরেই মারা যান। চীনারা খৃষ্টান মিশনারিদের উৎসাহ দেয় নি। দু জন জেসুইট পাদ্রী কিন্তু বৌদ্ধ ছাত্রের ছদ্মবেশে বহু বৎসর ধরে চীনাভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁরা বিখ্যাত কনফুসীয় শাস্ত্রের অধিকারী বলে এবং বৈজ্ঞানিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের একজনের নাম ছিল মাতেও রিচি। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ছিলেন এবং স্বভাবগুণে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্বরূপ প্রকাশিত করেন, এবং তাঁর প্রভাবে চীনে খৃষ্টধর্মের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়।

ওলন্দাজরা মাকাওতে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তারা বাণিজ্য করার অনুমতি চাইল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পর্তুগীজদের সদ্ভাব ছিল না, এবং ফলে পর্তুগীজরা চীনাদের মনে ওলন্দাজদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করার যথেষ্ট চেষ্টা করল। তারা চীনাদের বুঝিয়ে দিল যে, ওলন্দাজরা হিংস্র জলদস্যুর জাত। ফলে চীনারা ওলন্দাজদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করল। কয়েক বছর পরে ওলন্দাজরা তাদের বাটাভিয়া নগর থেকে মাকাওতে প্রকাণ্ড এক নৌবহর পাঠাল। নির্বোধের মতো তারা বলপ্রয়োগে মাকাও অধিকার করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু চীনা ও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কিছু করে উঠতে পারল না।

ওলন্দাজদের পরে এল ইংরেজরা। তাদেরও বিশেষ সুবিধে হল না। তবে মিঙ-যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারা চৈনিক বাণিজ্যে কিছু অংশ পেল।

ভালো মন্দ সব জিনিষেরই একদিন সমাপ্তি হয়, মিঙ-যুগও তেমনি শেষ হল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। উত্তরে যে তাতারাতঙ্ক মেঘের মতো ক্ষীণভাবে দেখা দিয়েছিল, তা বড়ো হতে হতে ক্রমে চীনের উপরে ছায়াপাত করল। 'কিন' অথবা 'স্বর্ণ-তাতার'দের কথা তোমার হয়তো মনে আছে। তারা সুঙদের চীনের দক্ষিণে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং পরে নিজেরাও মঙ্গোলদের হাতে বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্‌দের স্বজাতীয় এক নূতন উপজাতি চীনের উত্তরে প্রবল হয়ে উঠল, যেখানে এখন মাঞ্চুরিয়া সেইখানে। তারা মাঞ্চু বলে পরিচিত ছিল। এই মাঞ্চুরাই পরে মিঙদের স্থান গ্রহণ করল।

কিন্তু চীন যদি পরস্পরবিরোধী দলে বহুবিভক্ত না হত, মাঞ্চুদের পক্ষে চীন অধিকার কঠিন হত। প্রায় সব দেশেই যখন বৈদেশিক আক্রমণ সফল হয়েছে, যেমন চীনে অথবা ভারতে, বুঝতে হবে তার কারণ হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং গৃহবিবাদ। সেইরকম চীনের সর্বত্র গৃহকলহে ছেয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত শেষের দিকের মিঙ-সম্রাটরা ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ ও অকর্মণ্য, অথবা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল। মাঞ্চুদের প্রতিরোধের ব্যয়ও কম হল না, এবং বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ল। সর্বত্র দস্যুনেতার উদ্ভব হল, আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে সে অল্প কিছুদিনের জন্যে সম্রাট পর্যন্ত হয়েছিল। মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে অভিযানে মিঙদের সৈন্যদলের যিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন তাঁর নাম ছিল উ সান-কুই। দস্যুসম্রাট ও মাঞ্চুদল, এদের মধ্যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে তাঁর রীতিমতো মুশকিল হয়েছিল। অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা করে, অথবা হয়তো ইচ্ছে করে বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি দস্যুদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মাঞ্চুরা খুশি হয়েই সাহায্য করল এবং পিকিঙেই রয়ে গেল।

তার পরে উ সান-কুই বুঝলেন যে, মিঙদের অবস্থা শোচনীয়, ফলে তাদের পরিত্যাগ করে বিদেশী শত্রু মাঞ্চুদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই উ সান-কুই আজও পর্যন্ত দেশের একজন বড়ো বিশ্বাসঘাতক শত্রু বলে ঘৃণিত হয়ে থাকেন, এবং তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাঁর উপরে দেশের রক্ষণভার থাকা সত্ত্বেও তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে দক্ষিণ-প্রদেশগুলো দমনে বস্তুত তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ মাঞ্চুরা তাঁকে উক্ত প্রদেশগুলোর রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিল।

১৬৫০ অব্দে ক্যান্টন নগর মাঞ্চুদের অধিকারে এল, এবং তাদের চীন বিজয় সম্পূর্ণ হল। তাদের সাফল্যের কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যোদ্ধা হিসেবে চীনাদের চেয়ে ভালো ছিল। হতে পারে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করে যোদ্ধারূপে চীনাদের দৌর্বল্য এসেছিল। কিন্তু মাঞ্চুদের জয়লাভের দ্রুততার অন্য কারণও ছিল, বিশেষ করে তারা চীনাদের খুশি রাখবার যে চেষ্টা করেছিল সেই চেষ্টাই হয়তো অন্যতম কারণ। পূর্বযুগে তাতার-আক্রমণের পর প্রায়ই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলত। এবার কিন্তু চীনা রাজপুরুষদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে বিশেষ চেষ্টা হল, এবং তাঁরাই আবার নূতন করে পূর্বপদে নিযুক্ত হলেন। চীনা রাজপুরুষেরা উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন। মিঙ-শাসনবিধিরও কোনো পরিবর্তন হল না। বাইরের থেকে শাসনপ্রথা একই রইল, কিন্তু অন্তরালে যে হাত তার নিয়ন্ত্রণ করছিল তা ভিন্ন হাত।

কিন্তু দুটো লক্ষ্যণীয় ব্যাপার থেকে বোঝা যেত যে চীন বাইরের শাসকের অধী বিশিষ্ট কেন্দ্রসমূহে মাঞ্চু সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত ছিল; এবং বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ চীনাদের উপর টিকি রাখার মাঞ্চুরীতি চাপিয়ে দেওয়া হল। আমরা অনেকেই চীনাদের সঙ্গে কল্পনায় টিকি যোগ করে এসেছি। কিন্তু এটা মোটেই চীনা রীতি নয়। এটা ছিল দাসত্বের চিহ্ন, যেমন দাসত্বের চিহ্ন আজও ভারতে অনেকে ধারণ করে থাকে, তার অন্তর্নিহিত লজ্জাকরতাকে উপেক্ষা করে। চীনারা এখন আর টিকি রাখে না।

এইভাবে উজ্জ্বল মিঙ্‌যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল। বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, তিন শো বছরের সুশাসনের পরে এত দ্রুত এ যুগের পতন হল কেন? যদি সত্যিই শাসনব্যবস্থা এত ভালো হয়ে থাকে, তবে বিদ্রোহ, অন্তর্বিপ্লব, এসব এল কেন? মাঞ্চুরিয়া থেকে আগত বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করা গেল না কেন? হতে পারে শেষের দিকে শাসনবিধি অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। এও হতে পারে যে, অতিমাত্রায় অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালনের ফলে জনসাধারণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিশু অথবা জাতি, কারও পক্ষেই ঝিনুকে করে খাওয়ানো কল্যাণকর নয়।

সে যুগের চীন এত সংস্কৃতিপূর্ণ হয়েও কেন অন্য দিকে অগ্রসর হয় নি—বিজ্ঞান, আবিষ্কার প্রভৃতির দিকে, এ কথা ভেবেও মনে বিস্ময় লাগে। ইউরোপের জাতিরা তার অনেক পিছনে প ছিল। কিন্তু তবু সেই রেনেসাঁসের যুগে তাদের দেখি, উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ, অনুসন্ধিৎসায় অসহিষ্ণু। এই দু দলের একটির তুলনা চলে মধ্যবয়স্ক মার্জিতরুচি ব্যক্তির সঙ্গে, যে শান্তিতে থাকতে চায়, নূতন নূতন বিপদসংকুল কাজে জড়িত হয়ে দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না, তার সাহিত্য ও শিল্প নিয়েই সে ব্যস্ত; এবং অপরটির দুরন্ত এক কিশোরের সঙ্গে, যার উৎসাহ উদ্যম অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই, যে নব নব বিপদসংকুল কাজের জন্যে উৎসুক। চীনে সৌন্দর্যের অভাব নেই, কিন্তু সে যেন অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যার শান্ত রূপ।

বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক লোপ

২৩শে জুলাই, ১৯৩২

চীন শেষ করে একবার জাপানে যাওয়া যাক, পথে অল্পক্ষণ কোরিয়ায় দাঁড়িয়ে। অবশ্যই মঙ্গোলজাতি কোরিয়ায় শক্তিস্থাপন করেছিল। তাদের জাপান-আক্রমণের চেষ্টা সফল হয় নি। কুব্লাই খাঁ জাপানে অনেকগুলি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রতিবারেই বিতাড়িত হয়েছিল। যতদূর মনে হয় জলযুদ্ধে মঙ্গোলরা মোটেই সুবিধে পেত না। তারা ছিল প্রায় পূর্ণভাবে স্থলদেশের লোক। দ্বীপময় হওয়ার ফলে জাপান তাদের হাত থেকে বেঁচে গেল।

চীন থেকে মঙ্গোলরা বিতাড়িত হওয়ার অল্প পরে কোরিয়ায় এক বিপ্লব হল, এবং যেসব শাসক মঙ্গোলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের বিতাড়িত হতে হল। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ই তাই-জো নামে এক দেশভক্ত কোরীয়। নূতন রাজা হলেন তিনিই, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ৫০০ বছরেরও উপর বর্তমান ছিল, ১৩৯২ সাল থেকে, অতি আধুনিক সময়ে জাপান কর্তৃক কোরিয়া অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত। সিউল রাজধানী হল; এখনও তাই আছে। এই ৫০০ বছরের কোরীয় ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়। কোরিয়া (অন্য নাম চোসেন) প্রায় স্বাধীন দেশ হিসেবেই চলল, শুধু চীনের নামেমাত্র বশ্যতার ছায়ায়, এবং কালেভদ্রে কর দিয়ে। জাপানের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ বাধে এবং কয়েক ক্ষেত্রে কোরিয়া সফল হয়। কিন্তু এখন আর এই দুয়ে কোনো তুলনা চলে না। জাপান এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিশাল সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যবাদীর যত দোষ, সবই তার আছে। বেচারা কোরিয়া এই সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ, জাপানকর্তৃক শাসিত ও শোষিত, স্বাধীনতালাভের জন্যে তার বীরত্বপূর্ণ চেষ্টা আছে, কিন্তু সামর্থ্য নেই। কিন্তু এ সবই হল আধুনিক যুগের ইতিহাস, এবং আমরা এখনও রয়েছি সুদূর অতীতে।

তোমার হয়তো মনে আছে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শোগানই হয়েছিলেন জাপানের প্রকৃত শাসক। সম্রাট ছিলেন নামেমাত্র সম্রাট। প্রথম শোগান-শাসন যার নাম কামাকুরা শোগানেত, প্রায় ১৫০ বছর বর্তমান ছিল এবং দেশকে শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনে রেখেছিল। শাসকবংশের অবশ্যম্ভাবী অবনতি ঘটল, ফলে এল অক্ষমতা, বিলাসিতা ও গৃহযুদ্ধ। সম্রাট নিজের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করায় শোগানের সঙ্গে বিরোধ বাধল। সম্রাট বিফল হলেন, পুরোনো শোগানেতেরও পতন হল, এবং ১৩৩৮ সালে নূতন শোগানেতের উদ্ভব হল। এর নাম ছিল আশিকাগা শোগানেত এবং এর অস্তিত্ব ছিল ২৩৫ বছর। কিন্তু এ সময়টা ছিল বিরোধ ও যুদ্ধপূর্ণ। এটা ছিল চীনের মিঙদের প্রায় সমসাময়িক। এই শোগানদের একজন মিঙদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্যে পরম উৎসুক ছিলেন, এবং এত দূর এগিয়েছিলেন যে নিজেকে মিঙ-সম্রাটের সামন্ত বলে পরিচয় দিতেন। জাপানি ঐতিহাসিকেরা জাপানের এই অপমানে সর্মাধিক বিরক্ত, এবং এই লোকটিকে সমুচিত নিন্দা করেছেন।

স্বভাবতই চীনের সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, এবং মিঙ্-যুগের চীনা-সংস্কৃতিতে নূতন আগ্রহের উদয় হল। যা-কিছু চীনা তাই অধীত এবং আদৃত হত—শিল্প, কাব্য, স্থাপত্য, দর্শন, এমনকি যুদ্ধশাস্ত্র পর্যন্ত। এই সময়ে দুটি বিখ্যাত সৌধ নির্মিত হয়, কিন্‌কাকুজি (স্বর্ণ-প্রাসাদ) এবং গিন্‌কাকুজি (রজত-প্রাসাদ)।

শিল্পকলার উদ্বোধন ও বিলাসবাহুল্যের পাশাপাশি কৃষিজীবীদের দুঃখের শেষ ছিল না। তাদের উপর করভার ছিল অতি বিপুল, এবং গৃহযুদ্ধের ব্যয়ের বোঝাও তাদের উপরেই পড়েছিল। দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলল, এবং অবশেষে রাজধানীর বাইরে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের কোনো প্রভাব রইল না বললেই হয়।

পর্তুগীজরা এল ১৫৪২ সালে এইসব যুদ্ধের সময়। জেনে রাখতে পারো, এই সময়েই জাপানে পর্তুগীজরা প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করে। এটা খুবই বিস্ময়কর, কারণ চীনে তাদের ব্যবহার জানা ছিল বহুকাল পূর্ব থেকে, এমনকি ইউরোপ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে চীনাদের কাছ থেকে, মঙ্গোলদের মারফত।

অবশেষে শতবর্ষপ্রাচীন গৃহযুদ্ধ থেকে জাপানকে উদ্ধার করলেন তিনটি লোক; নবুনাগা—একজন দাইমিও অথবা অভিজাত; হিদেয়োশি—একজন কৃষক, এবং তোকুগাওয়া ইয়েয়াসু—একজন অতি বিশিষ্ট অভিজাত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র জাপান আবার একীভূত হল। কৃষক হিদেয়োশি ছিলেন জাপানের একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক। কিন্তু শোনা যায়, তিনি কুৎসিৎ ছিলেন—খর্বকায় এবং চ্যাপটা গড়নের দেহ, আর বানরের মতো মুখ।

জাপানকে একতাবদ্ধ করে এই তিনজনের সমস্যা হল তার বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর বিলিব্যবস্থা করা। আর-কিছু করার না থাকায় তাঁরা কোরিয়া আক্রমণ করলেন। কিন্তু পরিতাপ করতেও সময় লাগল না। কোরীয়রা জাপানি নৌবাহিনীকে পরাজিত করে দুই দেশের মধ্যস্থিত জাপানসমুদ্র অধিকার করল। এই সাফল্যের কারণ তাদের নূতন ধরনের জাহাজ—লোহা দিয়ে মোড়া এবং কচ্ছপের পিঠের মতো তার ছাদ। এদের নামই ছিল 'কচ্ছপ-পোত'। ইচ্ছেমতো এদের সামনে কিংবা পিছনে দাঁড় বেয়ে চালানো যেত। জাপানি রণপোতবাহিনী এদের হাতে বিধ্বস্ত হল।

তোকুগাওয়া ইয়েয়াসু, উপরোক্ত তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন, গৃহযুদ্ধের ফলে বিলক্ষণ লাভবান হয়েছিলেন। তিনি বিপুল ধনের মালিক হলেন এবং জাপানের প্রায় এক-সপ্তমাংশ ভূমি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হল। তাঁর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যস্থলে তিনি য়েদো নগর নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে এরই নাম হয় টোকিও। ১৬০৩ সালে ইয়েয়াসু শোগান হলেন, এবং এই তৃতীয় ও শেষ শোগানেতের অর্থাৎ তোকুগাওয়া শোগানেতের রাজত্বকাল চলে ২৫০ বৎসর।

এই সময়ে পর্তুগীজরা অল্পস্বল্প বাণিজ্য চালাচ্ছিল। ৫০ বছর ধরে তাদের কোনো ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; স্পেনীয়রা এল ১৫৯২ সালে, এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজরা আরও পরে। সম্ভবত ১৫৪৯ সালে সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচলিত হয়। জেসুইটদের ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এমনকি তাদের উৎসাহিত করা হত। এর কারণ অবশ্য রাজনৈতিক, কারণ বৌদ্ধ সংঘগুলি ছিল ষড়যন্ত্রের আড্ডা। এই কারণে এইসব শ্রমণদের দমন করে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অনুগ্রহ দেখানো হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জাপানিরা অনুভব করল যে, এই মিশনারিরা বিপজ্জনক লোক, এবং অবিলম্বে তারা রীতিপরিবর্তন করে এদের বিতাড়িত করার চেষ্টা পেল। ১৫৮৭ সালেই এক খৃষ্টানবিরোধী আইন জারি করা হয়, তাতে সমস্ত মিশনারিদের বিশ দিনের মধ্যে জাপান ছেড়ে দিতে আদেশ দেওয়া হয়, অন্যথায় মৃত্যুদণ্ড। এর লক্ষ্যস্থল অবশ্য বণিকরা নয়। এও বলা হয়েছিল যে বণিকরা ব্যবসা চালাতে পারে, কিন্তু তাদের জাহাজে মিশনারি আনলে জাহাজ এবং তার সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। হিদেয়োশি বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে মিশনারিরা এবং ধর্মান্তরিত জাপানিরা রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সন্দেহ যে খুব অমূলক তাও নয়।

এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যেই একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে হিদেয়োশি বুঝলেন যে, তাঁর ভয় অমূলক নয়; তাঁর ক্রোধের অবধি রইল না। ম্যানিলা গ্যালিয়নের কথা তোমার মনে আছে, যা বছরে একবার করে ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ ও স্পেনীয়-আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করত। একবার ঝড়ের ফলে জাহাজটা জাপানি উপকূলে এসে পড়ে। স্পেনীয় ক্যাপ্টেন একটা পৃথিবীর মানচিত্রে স্পেন-রাজার বিশাল সাম্রাজ্য দেখিয়ে স্থানীয় জাপানিদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টায় ছিলেন। প্রশ্ন হল—স্পেন কী করে এত বড়ো সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। তিনি উত্তর দিলেন যে, উপায় অতি সোজা। মিশনারিরা যায় প্রথমে, এবং পরে যখন বহু লোক ধর্মান্তরিত হয় তখন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শাসনবিভাগ বিধ্বস্ত করার জন্যে সৈনাদল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর যখন হিদেয়োশির কাছে গেল তিনি খুশি হলেন না মোটেই, এবং মিশনারিবিদ্বেষ তাঁর বাড়ল বৈ কমল না। ম্যানিলা

গ্যালিয়নকে তিনি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু জনকয়েক মিশনারি ও তাঁদের দ্বারা ধর্মান্তরিত কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দিলেন।

ইয়েয়াসু শোগান হয়ে বিদেশীদের প্রতি এর চেয়ে বেশি বন্ধুভাব দেখিয়েছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশেষ করে তাঁর নিজের বন্দর য়েদোতে, বাণিজ্যের প্রসার করতে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইয়েয়াসুর মৃত্যুর পর খৃষ্টান-দমন-রীতি আবার আরম্ভ হল। মিশনারিদের তাড়িয়ে দেওয়া হল, এবং ধর্মান্তরিত জাপানিদের খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। বাণিজ্যরীতিরও পরিবর্তন হল, বিদেশীদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি সম্বন্ধে জাপানিরা এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, যে রূপেই হোক, বিদেশীদের দেশের বাইরে রাখতেই হবে।

জাপানের এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। শুধু বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশেও তাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদীর নেকড়েকে ধর্মের মেষচর্মের অন্তরালে দেখতে পেয়েছিল। পরবর্তীকালে এবং অন্য দেশে ইউরোপীয়রা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে কেমন করে ধর্মের সহায়তা নিয়েছে তা সবাই জানে।

এইবারে ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। সেটা হল জাপানের দ্বার-রোধ। বিশেষ চেষ্টায় স্বতন্ত্রীকরণ-রীতি অনুসৃত হল, এবং একবার আরম্ভ হয়ে বিস্ময়কর সম্পূর্ণতার সঙ্গে এ রীতি চলতে থাকে। কোনোরকম আপ্যায়ন না পেয়ে ১৬২৩ সালে ইংরেজরা জাপানে যাওয়া ছেড়ে দিল। পর-বৎসর সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করা হত সেই স্পেনীয়রা বিতাড়িত হল। আইন জারি হল যে, কেবলমাত্র অখৃষ্টানরা বাণিজ্যের জন্যে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু তারাও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যেতে পারবে না। অবশেষে বারো বৎসর পরে, ১৬৩৬ সালে জাপানের দ্বার পুরোপুরি বন্ধ হল। পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দেওয়া হল; খৃষ্টান, অখৃষ্টান, কোনো জাপানিরই বাইরে গেলে আর ফেরার অধিকার রইল না, ফিরলে মৃত্যুদণ্ড! শুধু জনকতক ওলন্দাজ রইল, কিন্তু তাদের বন্দর ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। ১৬৪১ সালে এই ওলন্দাজদেরও নাগাসাকি-পোতাশ্রয়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে অপসারণ করা হল, এবং প্রায় কয়েদির মতো তাদের সেখানে রাখা হল। এইভাবে প্রথম পোর্তুগীজ-আগমনের ঠিক নিরানব্বই বছর পরে জাপান বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে রুদ্ধ করল।

১৬৪০ সালে একটি পর্তুগীজ জাহাজ এল বাণিজ্য পুনরায় আরম্ভ করার অনুমতি চাইতে। অনুমতি মিলল না। জাপানিরা দূতসংঘ এবং নাবিকদের অধিকাংশকে হত্যা করল, এবং জনকয়েককে ছেড়ে দিল দেশে গিয়ে সংবাদ দেবার জন্য।

২০০ বছরের উপর জাপান বহিঃপৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকল, তার প্রতিবেশী চীন ও কোরিয়ার কাছ থেকেও। বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগসূত্র রইল দ্বীপের মধ্যে জনকয়েক ওলন্দাজ, এবং তীক্ষ্ন দৃষ্টির মধ্যে কালেভদ্রে আগত দুই-একজন চীনা। এই সম্পর্কচ্ছেদ জিনিষটা অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিষ। জানা ইতিহাসের কোনো কালে, কোনো দেশে এরকম ঘটনার আর-একটা উদাহরণ পাওয়া যায় না। এমনকি রহস্যময় তিব্বত অথবা মধ্য-আফ্রিকাও তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা বিপজ্জনক; শুধু যে ব্যষ্টির পক্ষে বিপজ্জনক তাই নয়, জাতির পক্ষেও। কিন্তু জাপান সে বিপদ কাটিয়ে উঠল, এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ফিরে পেল, দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষতি ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠল। এবং অবশেষে যখন ১৮৫৩ সালে সে তার রুদ্ধ গৃহের দরজা জানলা খুলল তখন আর-একটি অদ্ভুত কাজ করল। সে অগ্রসর হল ভীমবেগে, এতদিনের নষ্ট সময়ের ক্ষতি অতি অল্প সময়ে পূরণ করে নিল, ইউরোপীয় জাতিদের সমান-সমান হল এবং তাদের খেলাতেই তাদের পরাজিত করল।

কী নীরস ইতিহাসের এই নিরলঙ্কার রেখাচিত্রগুলি! যেসব অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি একে একে এর মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে, কী প্রাণহীন তারা! তবু কখনও কখনও, যখন প্রাচীন যুগে লেখা বই পড়া যায়, মৃত অতীতের মধ্যে যেন প্রাণসঞ্চার হয়, তাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চ আমাদের অনেক কাছে এগিয়ে আসে, আর আমাদের মতোই রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ, যারা ভালোবাসতে জানে, ঘৃণা করতে জানে, তারা এই রঙ্গমঞ্চে এসে দেখা দেয়। আমি লেডি মুরাসাকি নামে বহুশত বৎসর

আগের এক ভদ্রমহিলার কথা পড়ছিলাম; এই চিঠিতে যেসব গৃহযুদ্ধের কথা লিখেছি, তারও বহুকাল পূর্বের লোক তিনি। তিনি জাপানের সম্রাটের রাজসভায় তাঁর অভিজ্ঞতার দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন; এই বইয়ের স্থানে স্থানে যখন পড়ি তখন এর চমৎকার ঘনিষ্ঠ বিবরণগুলির রচয়িত্রী আমার কাছে একান্ত জীবন্ত হয়ে ধরা দেন, এবং প্রাচীন জাপানের রাজসভার সসীম অথচ কলাবিদগ্ধ জগৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

৮২

ইউরোপে অন্তর্বিপ্লব

৪ঠা আগস্ট, ১৯৩২

বেশ কয়েক দিন তোমার কাছে এই চিঠির ধারা বজায় রাখতে পারি নি। শেষ বোধ হয় লিখেছি প্রায় দু সপ্তাহ আগে। বাইরের পৃথিবীর মতো কারাকক্ষেও মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়, এবং কিছুদিন ধরে চিঠি লেখার কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না, আমি ছাড়া কেউ তো আর এ চিঠি দেখে না। একসঙ্গে জড়ো করে চিঠির রাশ গুছিয়ে রেখে দি, কত কাল পরে, কত মাস কত বছর পরে তুমি পড়বে, এই আশায়। কত মাস কত বছর পরে! আবার যখন আমাদের দেখা হবে, তোমাকে দেখে অবাক হব, তুমি কত বড়ো হয়েছ, কত বদলে গেছ! আমাদের কথা বলার এত জিনিষ থাকবে যে, তুমি এসব চিঠি পড়ার সময়ই পাবে না। ততদিনে চিঠির পাহাড় জমে যাবে, তার মধ্যে রুদ্ধ থাকবে আমার জীবনের কতশত ঘণ্টার কারাজীবন!

তবু লিখব, এবং চিঠির স্তূপ বেড়েই যাবে। হয়তো তুমি পড়ে খুশি হবে। অন্তত আমি লিখে আনন্দ পাই।

এশিয়ার ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছি; ভারত, মালয়েশিয়া, চীন ও জাপানের গল্প করেছি। ঠিক যে সময়ে ইউরোপ জেগে উঠছিল এবং পরিস্থিতি কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠছিল, সেই সময়েই আমরা ইউরোপ ছেড়েছি। রেনেসাঁস অথবা পুনর্জন্ম শুরু হয়েছিল। নবজন্ম বলাই হয়তো ঠিক, কারণ যে ইউরোপ ষোড়শ শতাব্দীতে জাগছিল তা কোনো প্রাচীন যুগের অনুকরণ নয়। এটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ, কিংবা পুরোনো জিনিষও যদি হয় তবে তার উপরের আবরণ সম্পূর্ণ নূতন।

ইউরোপের সর্বত্র গোলযোগ ও অশান্তি, এবং রুদ্ধ স্থান ভেঙে বের হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বহুশত বৎসর ধরে এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান সামন্তপ্রথানুসারে গড়ে উঠেছিল, এবং সমগ্র ইউরোপকে অধিকার করে রেখেছিল। কিছুকাল ধরে এই বহিরাবরণের ফলে উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু বহু স্থানে এই আবরণ ভেঙে পড়ছিল। কলম্বস ও ভাস্কো-ডা-গামা, এবং জল-পথের আদি-আবিষ্কর্তারা এই আবরণ ভেঙে বাইরে এসেছিলেন, এবং স্পেন ও পর্তুগালের আমেরিকা ও প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত আকস্মিক বিস্ময়কর ঐশ্বর্য ইউরোপের চোখ ঝলসে দিল এবং তাতে পরিবর্তন সহজ হয়ে এল। ইউরোপ তার সংকীর্ণ জলরেখার বাইরে তাকাতে আরম্ভ করল এবং পৃথিবীর কথা ভাবতে শিখল। বিশ্ববাণিজ্য ও পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের সম্ভাবনার পথ মুক্ত হল। মধ্যশ্রেণীর লোকেদের শক্তিবৃদ্ধি হল এবং পশ্চিম-ইউরোপে সামন্তপ্রথা ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি করল।

সামন্তপ্রথা আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এই রীতির বিশেষত্ব ছিল, কৃষিজীবীদের নির্লজ্জ শোষণ। বলপ্রয়োগে কাজ করানো, বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো, এবং জমির মালিককে দেয় বহুপ্রকার কর, এসব তো ছিলই, তার উপর বিচারক ছিলেন মালিক নিজে। আগেই জেনেছ যে, কৃষকদের দুর্দশা এত বেড়ে গিয়েছিল যে ঘন ঘন কৃষক-বিদ্রোহ চলছিল। এই কৃষক-সংগ্রাম চার দিকে

ছড়িয়ে পড়ল এবং আরও ঘন ঘন হতে আরম্ভ করল; ইউরোপের বহু স্থানে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটল, তা প্রাচীন সামন্তপ্রথার পরিবর্তে মধ্যশ্রেণীয় অথবা বুর্জোয়া-রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটাল; এর আগমনের জন্যে প্রধানত দায়ী কৃষক-বিদ্রোহ এবং জ্যাকোয়ারি (Jacqueries)।

কিন্তু মনেও কোরো না যে, এই পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটেছিল। এর জন্যে অনেক সময় লেগেছিল, এবং বহু বৎসর ধরে ইউরোপে গৃহবিরোধ চলেছিল। ইউরোপের অনেকখানি অংশ এই গৃহযুদ্ধের ফলে ধ্বংসীভূত হয়েছিল। শুধু যে কৃষকযুদ্ধ তা নয়; তাদের মধ্যে ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ, স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য জাতীয় যুদ্ধ (যেমন নেদারল্যান্ড্‌সে হয়েছিল), এবং রাজার অবিসংবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণীর বিদ্রোহ। ভীষণ গোলমেলে, না? সত্যিই তাই। কিন্তু যদি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও আন্দোলন অনুধাবন করি তা হলে খানিকটা বোঝা যাবে।

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছিল বহুলপরিমাণে, যার ফলে হল কৃষকসংগ্রাম। দ্বিতীয় কথা হল মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয় এবং উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি। উৎপাদনের জন্যে বেশি করে শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছিল, এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। তৃতীয়ত, চার্চ ছিল সবচেয়ে বড়ো জমিদারশ্রেণী। এটা ছিল তাদের প্রচণ্ড স্বার্থ, এবং তার ফলে সামন্তপ্রথার স্থায়িত্বের জন্যে তাদের ছিল গভীর চেষ্টা। এমন কোনো অর্থনৈতিক পরিবর্তন তাদের রুচিকর নয়, যার ফলে তাদের ধনসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ফলে, যখন রোমের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ধর্মবিদ্রোহ আরম্ভ হল, তখন অর্থনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে তা বেশ খাপ খেল।

এই বিরাট অর্থনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সব দিকেই পরিবর্তন ঘটেছিল—সামাজিক, ধর্মসংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক। যদি তুমি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে সুদূরপ্রসারী ব্যাপক দৃষ্টি দাও বুঝতে পারবে, কেমন করে এইসব আন্দোলন এবং পরিবর্তন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সাধারণত এই সময়ের তিনটি বড়ো আন্দোলনের উপরে জোর দেওয়া হয়—রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, রিফর্মেশন বা পরিমার্জন, এবং বিপ্লব। কিন্তু এসবের পিছনেই ছিল অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং গোলযোগ, যার ফলে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল, এবং যা সব পরিবর্তনের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

রেনেসাঁস ছিল বিদ্যার নবজন্ম—শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উদ্বোধন, এবং ইউরোপীয় দেশ-সমূহের ভাষার উন্নতি। রিফর্মেশন ছিল রোমান-ধর্মকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহ; তা ছাড়া, ইউরোপের রাজন্যবর্গকর্তৃক তাদের উপরে প্রভুত্ব করার পোপের দাবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তৃতীয়ত, অভ্যন্তর থেকে চার্চের পরিমার্জনের প্রচেষ্টা। বিপ্লব ছিল মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজাদের নিয়ন্ত্রিত রাখা এবং তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ করার জন্যে।

এইসব আন্দোলনের পশ্চাতে আর-একটা জিনিষ ছিল—ছাপাখানা। তোমার মনে আছে, আরবরা চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরি শিখেছিল, এবং ইউরোপ শিখল আরবদের কাছ থেকে। তা হলেও যথেষ্ট পরিমাণে শস্তায় কাগজ তৈরি করতে সময় লাগল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপের নানা স্থানে—হল্যান্ড, ইতালি, ইংলন্ড, হাঙ্গেরি প্রভৃতি জায়গায়—বই-ছাপানো আরম্ভ হল। কাগজ এবং ছাপা আরম্ভ হওয়ার আগে পৃথিবী কেমন ছিল কল্পনা করার চেষ্টা করো। আমরা কাগজ, ছাপানো বই প্রভৃতিতে এতই অভ্যস্ত যে ছাপাখানা ছাড়া পৃথিবীকে কল্পনা করাও শক্ত। বই না ছাপিয়ে জনসাধারণকে শুধু অক্ষরপরিচয় করানোও প্রায় অসম্ভব। বহু পরিশ্রমে বই হাতে করে নকল করতে হত, তাতে অতি সামান্য পরিমাণ লোকই বই সংগ্রহ করতে পারত। শিক্ষা জিনিষটা ছিল বেশির ভাগই মৌখিক, এবং ছাত্রদের সবই মুখস্থ করতে হত। এই জিনিষটা এখনও সেকেলে মক্তব অথবা পাঠশালায় দেখতে পাবে।

কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পর থেকে এক অতি বিরাট পরিবর্তন ঘটল। স্কুলপাঠ্য প্রভৃতি ছাপানো বই দেখা দিল। অতি শীঘ্রই বহু লোকে লিখতে পড়তে শিখল। লোকে যত পড়ে তত চিন্তা করতে শেখে (অবশ্য এ কথা শুধু সুচিন্তিত বইয়ের বেলাতেই খাটে, আজকাল যেসব

বাজে বই বের হয় তাদের বেলায় নয়)। আর লোকে যত বেশি ভাবে ততই বর্তমান পরিস্থিতি পরীক্ষা করে সমালোচনা করতে শেখে। অজ্ঞতা পরিবর্তনকে ভয় করে। অজানা জিনিষের ভীতির ফলে তা গতানুগতিক পন্থা আঁকড়ে ধরে থাকে, সেখানে যতই দুরবস্থা থাক-না কেন। নিজের অন্ধতায় কোনোরকমে হোঁচট খেয়ে দিন-গুজরান করে। কিন্তু সুপাঠ্য বই পড়লে লোকে খানিকটা জ্ঞানলাভ করে, ফলে খানিকটা চোখ ফোটে।

কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এই চোখ-ফোটার ফলে, যেসব বিরাট আন্দোলনের কথা বলছি, তাদের প্রচণ্ড সহায়তা হয়। সর্বপ্রথম ছাপানো বইগুলির অন্যতম হচ্ছে বাইবেল, এবং যেসব লোকে শুধু বাইবেলের লাতিনভাষা শুনেছিল অথচ বোঝে নি, তারা এখন নিজেদের ভাষায় পড়তে সমর্থ হল। পড়ার ফলে তারা সমালোচনা করতে শিখল, এবং যাজকসম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী আর তত থাকল না। বিদ্যালয়পাঠ্য বইও প্রচুর পরিমাণে দেখা দিল। এই সময় থেকে আরম্ভ করে ইউরোপের ভাষাসমূহের খুব দ্রুত অগ্রগতি ঘটল। এতদিন পর্যন্ত লাতিনভাষাই ছিল মুখ্য।

এই সময়ের যশস্বী লোকেদের নামে ইউরোপের ইতিহাস পূর্ণ। তাঁদের কারও কারও বিষয় পরে আলোচনা করব। সর্বদা, যখনই কোনো দেশ তার বহিরাবরণ ভেদ করতে সমর্থ হয়, তার উন্নতি আরম্ভ হয় এবং বহু দিকে অগ্রগতি ঘটে। ইউরোপে এইরকম হয়েছিল, এবং ইউরোপের সমসাময়িক ইতিহাস অতি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ, কারণ এই সময়েই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বড়ো পরিবর্তন ঘটেছিল। এর সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের তুলনা করে দেখো, অথবা সমসাময়িক চীনের সঙ্গে। আগেই বলেছি, এই দুই দেশই বহুরূপে ইউরোপ থেকে অগ্রসর ছিল। তবু তাদের ইতিহাসে একটা নিষ্ক্রিয়তা আছে, যার তুলনায় এই যুগের ইউরোপের ইতিহাস একটা প্রচণ্ড গতিশীলতায় পূর্ণ। ভারতে এবং চীনে বড়ো বড়ো রাজা এবং খ্যাতনামা লোকের অভাব ছিল না, অতি উচ্চ সংস্কৃতিও ছিল, কিন্তু একটা জিনিষ—বিশেষ করে ভারতবর্ষে—জনসাধারণ ছিল নিস্তেজ এবং নিষ্ক্রিয়। শাসকসম্প্রদায়ের পরিবর্তন ঘটত, কিন্তু জনসাধারণ বিশেষ আপত্তি জানাত না। তাদের যেন পুরোপুরি পোষ মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল, এবং আদেশ পালন করতে তারা এতই অভ্যস্ত ছিল যে, আপত্তির কথাই উঠত না। ফলে, তাদের ইতিহাস মধ্যে মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক হলেও তাতে ছিল নিছক ঘটনাবলী এবং শাসকদের কাহিনী, জনসাধারণের আন্দোলনের কথা নয়। আমি জানি না চীন সম্বন্ধে এ উক্তি কতদূর প্রযোজ্য। তবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বহু শতাব্দী ধরে এই উক্তিই সত্য। আর ভারতে যা-কিছু দুর্দশা ঘটেছে এই শত শত বছর ধরে, সবই আমাদের জনসাধারণের অসুখী অবস্থার জন্যে।

ভারতের আর-একটি স্বভাব, সামনে না তাকিয়ে শুধু পিছন ফিরে অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—যে গৌরব আমাদের আগে ছিল তার দিকে, যে গৌরব একদিন আমরা পাব বলে আশা করি তার দিকে নয়। ফলে আমাদের দেশের লোকে শুধু অতীতের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, এবং অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে যখন যে যা আদেশ দিয়েছে, মাথা পেতে নিয়েছে। পরিণামে সাম্রাজ্য টিঁকে থাকে তার শক্তির উপর নির্ভর করে নয়, যে জনসাধারণের উপর তারা কর্তৃত্ব করে তাদের দাস-মনোভাবের উপর।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ

৫ই আগস্ট, ১৯৩২

যে অন্তর্বিপ্লব সারা ইউরোপে প্রসার লাভ করছিল তার থেকেই রেনেসাঁসের অভ্যুদয় হল। এর প্রথম জন্ম ইতালির জমিতে, কিন্তু দৃষ্টি ও বুদ্ধির জন্যে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করল প্রাচীন গ্রীস থেকে। গ্রীসের কাছ থেকে সে নিল তার সৌন্দর্যানুরাগ, এবং দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরের গভীরতর আত্মার সৌন্দর্যের সংযোগসাধন করল। এ হল নাগরিক-অভ্যুদয়, এবং উত্তর-ইতালির নগরসমূহ একে আশ্রয় দিল। বিশেষ করে ফ্লোরেন্স হল প্রথম যুগের রেনেসাঁসের গৃহ।

ফ্লোরেন্সে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীয় ভাষার দুই মহাকবি দান্তে এবং পেট্রার্কের উদয় হয়। মধ্যযুগে বহুকাল ধরে এই নগর ছিল ইউরোপের অর্থজগতের প্রধান নগর, যেখানে বড়ো বড়ো মহাজনদের আগমন হত। এ ছিল ধনীদের ছোটো একটা সাধারণতন্ত্র; কিন্তু সে ধনীরা খুব প্রশংসনীয় চরিত্রের ছিলেন না এবং তাঁদের স্বদেশের বড়ো লোকদেরও উৎপীড়ন করতেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'চঞ্চলচরিত্র ফ্লোরেন্স'। কিন্তু কুসীদজীবী মহাজন এবং স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী শাসকসম্প্রদায় সত্ত্বেও পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই নগরে তিনজন স্মরণীয় ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছিল—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফাএল। তিনজনই ছিলেন অতি নিপুণ শিল্পী। লিওনার্দো ও মাইকেল এঞ্জেলো অন্য দিকেও বড়ো ছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন চমৎকার ভাস্কর, নিরেট মর্মর প্রস্তর থেকে বিরাট সব মূর্তি কেটে বের করতেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন দক্ষ স্থাপত্যশিল্পী, এবং রোমে সেন্ট পিটারের প্রকাণ্ড ক্যাথিড্রাল প্রধানত তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত। তিনি অতি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, প্রায় নব্বুই বছর পর্যন্ত, এবং প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেন্ট পিটারের গির্জায় পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর জীবন সুখের ছিল না, তিনি সকল বস্তুর বহির্ভাগের অভ্যন্তরে একটা-কিছু খুঁজতেন, সর্বদা চিন্তা করতেন, সর্বদা বিস্ময়কর কাজে হাত দিতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "মানুষ হাত দিয়ে ছবি আঁকে না, মস্তিষ্ক দিয়ে আঁকে।"

এই তিনজনের মধ্যে লিওনার্দো ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং নানা দিক দিয়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর। তাঁর যুগে সম্ভবত তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তি; মনে রেখো, যে যুগের কথা বলছি সে যুগে বহু শক্তিমান পুরুষ জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন অতি দক্ষ চিত্রকর ও ভাস্কর, তা ছাড়া বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি সর্বদা অনুসন্ধান করতেন, পরীক্ষা করতেন, সব জিনিষের কারণ বের করার চেষ্টা করতেন, এবং এক কথায় বলা যেতে পারে যে, যেসব মহাবিজ্ঞানী আধুনিক বিজ্ঞানের পত্তন করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বলতেন, "দয়াশীল প্রকৃতি কৃপা করে পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছেন।" তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত লোক, এবং তিরিশ বছর বয়সে ল্যাতিনভাষা ও অঙ্কশাস্ত্র শিখতে আরম্ভ করেন। কালে তিনি বড়ো যান্ত্রিকও হয়েছিলেন এবং তিনিই প্রথম প্রাণীদেহে রক্ত-চলাচল আবিষ্কার করেন। দেহের গঠন তাঁকে মুগ্ধ করত। তিনি বলেছিলেন, "কু-অভ্যাস ও বিচারশক্তিবিহীন অমার্জিত লোকের নরদেহের মতো সুন্দর একটি যন্ত্র, এমন জটিল শারীরিক গঠন থাকার কোনো অধিকার নেই। তাদের থাকা উচিত শুধু একটা থলে, যার মধ্যে আহার্য নিয়ে আবার বের করে দেওয়া যায়; কারণ তারা আসলে খাদ্যনালী ভিন্ন আর কিছুই নয়।" তিনি নিজে নিরামিষাশী ছিলেন এবং জীবজন্তুদের ভালোবাসতেন। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল—বাজারে খাঁচায়-ভরা পাখি কিনে অবিলম্বে তাদের মুক্ত করে দেওয়া।

লিওনার্দোর সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে বিমানবিহারের চেষ্টা। সফল তিনি হন নি, কিন্তু সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গঠিত মতবাদ ও পরীক্ষাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার মতো কেউ ছিল না। হয়তো তাঁর পরে আরও জনদুই লিওনার্দো

থাকলে আধুনিক এরোপ্লেন দু-তিন শো বছর আগে আবিষ্কৃত হতে পারত। এই অদ্ভুত বিস্ময়কর মহাপুরুষ ১৪৫২ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, "তাঁর জীবন ছিল প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ।" তিনি ক্রমাগতই প্রশ্ন করতেন, এবং পরীক্ষার সাহায্যে তাদের উত্তর বের করতে চেষ্টা করতেন। তিনি যেন সর্বদাই অগ্রগামী হতেন, ভবিষ্যৎকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে।

ফ্লোরেন্সের এই তিনজনের মধ্যে লিওনার্দোর কথাই বিশেষ করে বললাম, কারণ তিনি আমার অতি প্রিয়। ফ্লোরেন্সের সাধারণতন্ত্রের ইতিহাস খুব প্রীতিপ্রদ নয়, কারণ এ হল ষড়যন্ত্র এবং উৎপীড়নকারী স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ইতিহাস। কিন্তু ফ্লোরেন্সে যেসব মহাপুরুষদের অভ্যুদয় হয়েছিল তাঁদের কথা মনে করলে ফ্লোরেন্সের অনেক দোষই, এমনকি তার সুদখোর মহাজনদেরও, ক্ষমা করা যেতে পারে। এখনও ফ্লোরেন্সের এইসব বিরাট সন্তানদের ছায়া তার উপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি; এই পরমরমণীয় নগরের রাজপথে ভ্রমণ করতে করতে, অথবা প্রাচীন যুগের সেতুর নীচ দিয়ে যখন আরনো নদী বয়ে যায়, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, হঠাৎ মন যেন কেমন-এক মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, অতীত যেন দৃষ্টির সামনে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়ায়। দান্তে পথ বেয়ে চলে যান, তাঁর মানসীপ্রিয়া বিয়াত্রিচে তাঁর অঙ্গের মৃদু সৌরভে পথ আচ্ছন্ন করে সামনে দিয়ে চলে যান। আর সংকীর্ণ রাজপথ দিয়ে গমনরত চিন্তাবিভোর লিওনার্দোকে দেখা যায়, যেন জীবন ও প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে ধ্যানমগ্ন।

এইরূপে রেনেসাঁস পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালিতে বিকশিত হয়ে ক্রমে পশ্চিমে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল। দক্ষ শিল্পীরা চেষ্টা করলেন প্রস্তরে ও পটে জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে। ইউরোপের বহু চিত্রশালা ও প্রত্নগৃহ তাঁদের তৈরি ছবি ও ভাস্কর্যে পূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতালিতে শিল্পকলার নবজাগরণের অগ্রগতি মন্দ হল। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যান্ডে নিপুণ শিল্পীদের অভ্যুদয় হল, তাঁদের মধ্যে একজন সুবিখ্যাত শিল্পী হলেন রেম্‌ব্র্যান্ট্‌। এই সময়ে স্পেনে ছিলেন ভেলাস্কে। কিন্তু আর নাম করে লাভ নেই, কারণ তাঁদের সংখ্যা প্রায় অগণ্য। যদি এই শিল্পীশ্রেষ্ঠদের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে ঔৎসুক্য থাকে, শিল্পশালায় গিয়ে তাঁদের কীর্তি দেখো। তাঁদের নামে কিছু আসে-যায় না, তাঁদের বাণী লিপিবদ্ধ আছে তাঁদের শিল্পকলার সৌন্দর্যে।

এই সময়ে, পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে, বিজ্ঞানও ধীরে ধীরে অগ্রগামী হয় এবং ক্রমে তার প্রাপ্য স্থান অধিকার করে। চার্চের সঙ্গে বিজ্ঞানের তীব্র বিরোধ বেধেছিল, কারণ চার্চ জনসাধারণের চিন্তা এবং গবেষণায় বিশ্বাস করতেন না। চার্চের বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এবং সূর্য এর চার দিকে ভ্রমণ করে, আর যতসব নক্ষত্র স্বর্গের স্থির জ্যোতিষ্কবিন্দু। যে-কেউ এর বিরোধী কথা বলত সেই ধর্মদ্রোহী, এবং হয়তো-বা ইন্‌কুইজিশনের হাতে পড়ত। এ সত্ত্বেও কোপার্নিকাস্‌-নামক একজন পোল্যান্ডবাসী এই বিশ্বাস অস্বীকার করে প্রমাণ করে দিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে। এইরূপে তিনি বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বর্তমান ধারণার ভিত্তিস্থাপন করলেন। তিনি ১৪৭৩ থেকে ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁর এই বৈপ্লবিক ও ধর্মদ্রোহী মতামত সত্ত্বেও তিনি কোনোরকমে চার্চের ক্রোধ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরে যাঁরা এলেন তাঁদের অদৃষ্ট অত ভালো ছিল না। জিওর্দানো ব্রুনো -নামক জনৈক ইতালীয় প্রচার করলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে এবং নক্ষত্ররা নিজেরাই এক-একটা সূর্য; এবং এর ফলে তাঁকে ১৬০০ সালে রোমে চার্চের হাতে পুড়ে মরতে হয়। তাঁর সমসাময়িক একজন, গ্যালিলিও, যিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁকেও চার্চ থেকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল; তিনি ছিলেন ব্রুনোর চেয়ে দুর্বলচিত্ত, এবং তাঁর মত প্রত্যাহার করাই তিনি বুদ্ধির কাজ বিবেচনা করেছিলেন। অতএব তিনি চার্চের কাছে স্বীকার করলেন যে, তাঁরই ভুল হয়েছে; পৃথিবীই বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এবং সূর্য তার চার দিকে ঘোরে। তা সত্ত্বেও তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের জন্যে কিছুকাল কারাবাস করতে হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন হার্ভি, যিনি অবিসংবাদীরূপে জীবদেহে রক্ত-চলাচল সপ্রমাণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে গণিতবিদ্‌

আইজাক নিউটনের নাম পাওয়া যায়। তিনি মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করে প্রকৃতির কাছ থেকে তার আর-একটা গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পর্যন্তই থাক। এই সময়ে সাহিত্যেরও বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল। চার দিকে যে নূতন ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল, নবীন ইউরোপীয় ভাষাসমূহকে তা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করল। এসব ভাষার অস্তিত্ব তখনই কিছুকাল যাবৎ ছিল; ইতালিতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন মহাকবির অভ্যুদয় হয়েছিল। ইংলণ্ডে জন্মেছিলেন চসার। কিন্তু সারা ইউরোপে লাতিনভাষা ছিল শিক্ষিতসমাজ ও চার্চের ভাষা, এবং অন্যান্য ভাষা তার অনেক নীচে পড়ে ছিল। সেসব ছিল সর্বসাধারণের ভাষা অর্থাৎ ভার্নাকুলার, যে অদ্ভুত নামে এখনও অনেকে ভারতীয় ভাষাসমূহকে অভিহিত করে। সেসব ভাষায় লেখা যেন লোকের কাছে সম্মানের হানিকর ছিল। কিন্তু নবজাগ্রত ভাবধারা, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভব, এইসব ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। ইতালীয় ভাষা হল সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। তার পরে এল ফরাসি, ইংরেজি, স্প্যানিশ, সবশেষে জর্মন। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে একদল নূতন লেখক স্থির করলেন যে তাঁরা লাতিনের পরিবর্তে নিজেদের ভাষায় রচনা করবেন, এবং এইরূপে তাঁদের প্রাকৃতকে এতদূর উন্নত করবেন যাতে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হতে পারে।

এইরূপে ইউরোপীয় ভাষাসমূহের অগ্রগতি হল, এবং ক্রমশ তাদের সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে তারা বর্তমানের মনোরম ভাষাসমূহে পরিণত হয়েছে। অধিকসংখ্যক বিখ্যাত লেখকের নাম না করে মাত্র গোটাকয়েক নাম বলছি। ইংলণ্ডে ১৫৬৪ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত ছিলেন যশস্বী শেক্স্‌পীয়র। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর অব্যবহিত পরে এলেন মিল্টন—'প্যারাডাইস-লস্ট'-এর অন্ধ কবি। ফ্রান্সে ছিলেন দার্শনিক দেকার্তে এবং নাট্যকার মলিয়ের, দুজনেই সপ্তদশ শতাব্দীতে। মলিয়ের হলেন প্যারিসের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ 'কমেদি ফ্রাঁসেইজ'এর প্রতিষ্ঠাতা। স্পেনে শেক্স্‌পীয়রের একজন সমসাময়িক ছিলেন 'ডন্ কুইক্সোট'এর লেখক সারভেণ্টিস্।

আর-একটি নাম এইখানে করব, তাঁর মহত্ত্বের জন্যে নয়, শুধু অতিপরিচিত বলে। সে নাম হল ম্যাকিয়াভেলি, ফ্লোরেন্সের আর-একজন অধিবাসী। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সাধারণ একজন রাজনীতিক, কিন্তু তিনি 'প্রিন্স'-নামক একখানা বই লিখেছিলেন, যা খুব খ্যাতিলাভ করে। এই বই থেকে আমরা তৎকালীন রাজনীতিকদের এবং রাজাদের মনের খানিকটা পরিচয় পাই। ম্যাকিয়াভেলির মতে রাজ্যশাসনের জন্যে ধর্মের প্রয়োজন আছে; মনে রেখো, প্রজা-সাধারণকে ধার্মিক করার জন্যে নয়, তাদের যাতে শাসন করে পদদলিত করে রাখা যায়, সেই জন্যে। রাজার পক্ষে মিথ্যা জেনেও কোনো ধর্মকে সমর্থন করা কর্তব্য হতে পারে! ম্যাকিয়াভেলির মতে "রাজার পক্ষে জানা প্রয়োজন, কেমন করে একই কালে মানুষ এবং পশু, সিংহ এবং শৃগালের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। যদি তিনি এমন কোনো কথা দিয়ে থাকেন যার ফলে তাঁর অনিষ্ট হতে পারে, তা হলেও তাঁর পক্ষে সে কথা রাখা উচিতও নয়, সম্ভবও নয়।......আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সর্বদা সাধু হওয়ায় অজস্র অসুবিধা আছে। কিন্তু সাধু, বিশ্বাসী, সদয় এবং ধার্মিক হওয়ার ভান করায় লাভ আছে। ধর্মের ভানের চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ আর নেই।"

বিশেষ সুবিধের নয়, তাই না? এর অর্থ এই দাঁড়ায়, যে লোকটা যত বড়ো পাজি সে তত বড়ো রাজা। তৎকালীন ইউরোপে এই ছিল মোটামুটি রাজাদের মনোভাব, এবং এর ফলে যে অবিরাম গোলযোগ চলেছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অতদূর পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কী? এখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের আচরণ অনেকটা ম্যাকিয়াভেলির রাজার মতোই। ধার্মিকতার ভানের নীচে আছে লোভ, নিষ্ঠুরতা এবং যথেচ্ছাচার; সভ্যতার হস্তাবরণের নীচে আছে শ্বাপদের তীক্ষ্ন নখর।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিদ্রোহ এবং কৃষাণ-যুদ্ধ

৮ই আগস্ট, ১৯৩২

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক চিঠি তোমাকে আগেই লিখেছি। মধ্যযুগের অন্তর্ধান, কৃষিজীবীদের দুরবস্থা, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুদয়, আমেরিকা ও প্রাচ্য দেশের জলপথের আবিষ্কার, ললিতকলার উন্নতি, বিজ্ঞানের প্রগতি এবং ইউরোপের ভাষা-সমূহ, এতগুলো বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি। কিন্তু এই রেখাচিত্রের সম্পূর্ণীকরণের জন্যে আরও অনেক-কিছু বলা প্রয়োজন। মনে রেখো, আমার শেষ দুটো চিঠি, জলপথ সম্বন্ধে চিঠি, যে চিঠিটা এখন লিখছি এবং সম্ভবত এর পরেও দু-একটা লিখব, সবই ইউরোপের একই যুগের কথা। বিভিন্ন আন্দোলন পৃথক করে বর্ণনা করছি, কিন্তু এসব মোটামুটি একই সময়ে ঘটেছিল এবং পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

রেনেসাঁসের পূর্বেও রোমান চার্চের সংঘের মধ্যে গোলমালের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। চার্চের কঠোর কর্তৃত্বের চাপ রাজা প্রজা সকলেই অনুভব করে অল্প-অল্প বিরক্তি ও সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিল। তোমার মনে থাকতে পারে, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পোপের সঙ্গে বেশ একটু বিবাদ করেছিলেন, এবং বহিষ্করণের (excommunication) ভয়েও বিশেষ শঙ্কিত হন নি। সন্দেহ এবং অবাধ্যতার এইসকল লক্ষণ রোমের ক্রোধ উৎপাদন করেছিল, এবং এই নূতন ধর্ম-দ্রোহিতার শেষ করবার জন্যে ধর্মসংঘ উঠে-পড়ে লাগল। এই উদ্দেশ্যে ইন্‌কুইজিশনের সৃষ্টি হয়, এবং সারা ইউরোপে ধর্মদ্বেষী অপবাদে বহু হতভাগ্যকে, এবং ডাইনী অপবাদে বহু নারীকে, পুড়িয়ে মারা হয়। প্রাগের জন্ হাস্‌কে এইরূপে ফাঁদে ফেলে পুড়িয়ে মারা হয়, তার ফলে বোহেমিয়াতে তাঁর অনুসরণকারীরা (যাদের বলা হত হাসাইট, অর্থাৎ হাস্-মতাবলম্বী) বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ইনকুইজিশনের বহু অত্যাচারের ভয়েও রোমান চার্চের বিরুদ্ধে এই নূতন বিদ্রোহের ভাব দমন করা গেল না। প্রসার ঘটল, নিঃসন্দেহ প্রধান ভূম্যধিকারীরূপে চার্চের বিরুদ্ধে কৃষিজীবীদের মনোভাব এর সঙ্গে যুক্ত হল; এবং স্বার্থের খাতিরে বহু স্থানে রাজারা এই বিদ্রোহী মনোভাবকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কারণ, তাঁদের নজর ছিল চার্চের বিপুল সম্পত্তির উপর—ঈর্ষান্বিত লোলুপ দৃষ্টি। বই এবং বাইবেল ছাপা হওয়ার ফলে এই প্রধূমিত বহ্নির বৃদ্ধি ঘটল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে জর্মানিতে মার্টিন লুথারের জন্ম হয়। ইনি পরবর্তীকালে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। একবার রোমে গিয়ে সেখানকার চার্চের দুর্নীতি ও বিলাসব্যসন চাক্ষুষ করে তাঁর অপরিসীম বিরক্তির উৎপাদন হয়। তিনি নিজে ছিলেন একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক। এই বিসংবাদ বাড়তে বাড়তে ক্রমে রোমান চার্চ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল, পশ্চিম-ইউরোপ দুই বিবদমান দলে বিভক্ত হল, শুধু ধর্মসম্বন্ধীয় নয়, রাজনীতির দিক দিয়েও। প্রাচীন মতাবলম্বী গ্রীক চার্চের দলভুক্ত রাশিয়া এবং পূর্ব-ইউরোপ এই কলহের বাইরে থাকল। এই চার্চের দিক দিয়ে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস থেকে রোমও ছিল বহুদূরে।

এইরূপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিদ্রোহের পত্তন হল। এর নাম হল 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট', কারণ এ রোমের চার্চের বহু অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে 'প্রোটেস্ট' অর্থাৎ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এর পর থেকে বরাবর পশ্চিম-ইউরোপে খৃষ্টধর্মের দুটি বিভিন্ন শাখা চলে আসছে—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট। কিন্তু প্রোটেস্ট্যাণ্টরা নিজেরাই বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

চার্চের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের নাম হল 'রিফর্মেশন' অর্থাৎ সংস্কার। এটা প্রধানত চার্চের দুর্নীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহ। এর পাশে পাশে বহু রাজা চেয়েছিলেন তাঁদের উপরে পোপের প্রাধান্যের প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটাতে। তাঁদের রাজনৈতিক ব্যাপারে

রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
প্রোটেস্ট্যান্ট
রাষ্ট্রসমূহ
নরওয়ে
স্কটল্যান্ড
সুইডেন
ডেনমাক
ইংলন্ড
ব্রান্ডেনবুর্গ
প্রাশিয়া
মাস্কোভি
নেদারল্যান্ডস
স্যাক্সনী
সাম্রাজ্য
পোল্যান্ড
নীপার
ফ্রান্স
সুইস
দানিয়ুব
স্পেন
রোম
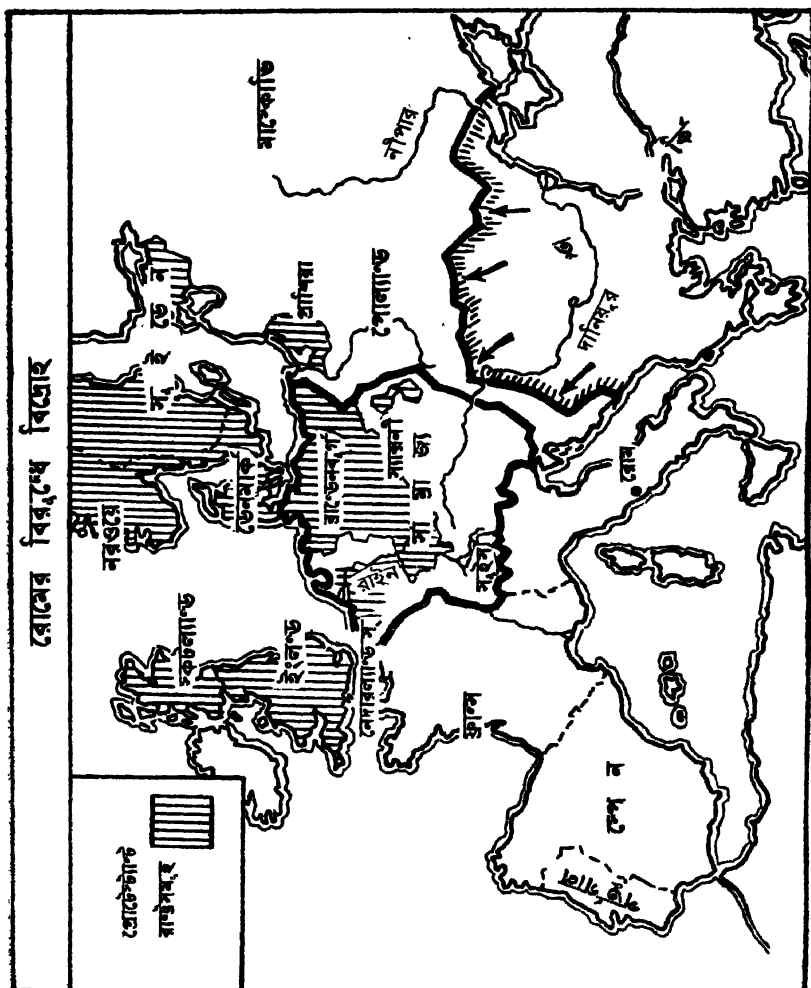
পোপের হস্তক্ষেপ তাঁদের বিলক্ষণ বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। রিফর্মেশনের আর-একটি, অর্থাৎ তৃতীয় দিক ছিল, তা হল চার্চের অনুরক্ত ধার্মিকগণ কর্তৃক ভিতর থেকে চার্চের দুর্নীতি দূর করা।

চার্চের দুটি বিধান ছিল—ফ্রান্সিস্কান এবং ডোমিনিকান—তা হয়তো তোমার মনে আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে যে সময়ে মার্টিন লুথারের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন ইগ্ন্যাশিয়াস-নামক লয়োলার একজন স্পেনীয় কর্তৃক আর-একটি নূতন সংঘবিধানের সৃষ্টি হয়। তিনি এর নাম দেন 'যিশুর ধর্মসমাজ', এবং এ সম্প্রদায়ের দলভুক্ত ব্যক্তিদের বলা হত জেসুইট। জেসুইটদের চীন ও প্রাচ্যদেশ -ভ্রমণের কথা আগেই বলেছি। এই 'যিশু-সমাজ' ছিল একটি অসাধারণ সমিতি। এর উদ্দেশ্য ছিল রোমান চার্চ ও পোপের অবিরাম এবং যথোপযুক্ত সেবার জন্যে লোককে শিক্ষিত করে তোলা। এই শিক্ষা ছিল অতি দুরূহ, এবং এর ফলে চার্চের অনুগত অসামান্য কর্মতৎপর সেবকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। চার্চের প্রতি আনুগত্য তাদের এত অধিক ছিল যে, তারা বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে তার আদেশপালন করত, এবং নিজেদের শক্তির শেষবিন্দুটুকু পর্যন্ত দিত। চার্চের লাভের জন্যে আত্মবলি দিতেও তারা কুণ্ঠিত হত না। চার্চের সেবার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিতেও তাদের বাধত না শোনা যায়। চার্চের মঙ্গলেই যে-কোনো অন্যায়ের মার্জনা ছিল।

এই অসাধারণ সমিতি রোমান চার্চকে অজস্র সাহায্য করেছিল। শুধু-যে সংঘের নাম ও বাণী তারা দূর-দূরান্তরে বহন করে নিয়ে যেত তাই নয়, উপরন্তু তাদের কাজে চার্চের অনেক উন্নতি হয়েছিল। অংশত আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যে আন্দোলনের ফলে, এবং খানিকটা প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহের বিপদের জন্যে রোমে দুর্নীতি অনেক কমে গিয়েছিল। এইরূপে রিফর্মেশন যে শুধু চার্চকে দুই ভাগে ভাগ করল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকেও খানিকটা সংস্কার সাধন করেছিল।

প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রাজন্যবর্গ কেউ এ পক্ষে, কেউ ও পক্ষে যোগ দিলেন। এ ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি এবং লাভের বাসনা। এই সময়ে হোলি রোমান এম্পায়ারের সম্রাট ছিলেন পঞ্চম চার্ল্স্, একজন হাপ্স্বুর্গ। তাঁর পিতা এবং পিতামহের বিবাহের ফলে তিনি একটি বিরাট সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, যার অন্তর্গত ছিল অস্ট্রিয়া, জর্মনি (নামেমাত্র), স্পেন, নেপ্ল্স্ ও সিসিলি, নেদারল্যান্ড্স্ এবং স্প্যানিশ-আমেরিকা। সেকালে এইরকম ভাবে বিবাহের যৌতুকরূপে রাজ্যবৃদ্ধি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এইরূপে চার্ল্স্ স্বকীয় কোনো গুণ ব্যতিরেকেই অর্ধ-ইউরোপের অধীশ্বর হয়ে উঠলেন এবং কিছুকাল যাবৎ তাঁর খ্যাতির অন্ত রইল না। তিনি প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে পোপের পক্ষ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। সংস্কারের ধারণার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ধারণা খাপ খায় না। কিন্তু ছোটোখাটো জর্মন রাজাদের মধ্যে অনেকেই প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ নিলেন; এবং গোটা জর্মনি দুই বিবদমান সম্প্রদায়ে পরিণত হল—রোমান এবং লুথারান। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল, জর্মনিতে গৃহযুদ্ধ।

ইংলন্ডে বহুবিবাহিত রাজা অষ্টম হেন্রি পোপের বিরোধী হয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ নিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নিজের পক্ষ নিলেন। চার্চের সম্পত্তির দিকে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি ছিল, এবং রোমের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তিনি চার্চ ও বিভিন্ন ধর্মের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। পোপের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের একটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল যে, তিনি পত্নীকে ত্যাগ করে আর-একজন রমণীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন।

ফ্রান্সে পরিস্থিতি ছিল একটু অদ্ভুত। রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কার্ডিনাল রিশেলিউ, ইনি নিজেই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। রিশেলিউ ফ্রান্সকে রোমের পক্ষে রাখলেন এবং স্বদেশে প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদকে চূর্ণ করলেন। কিন্তু রাজনীতির গতি এতই কুটিল যে, জর্মনিতে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদকে সাহায্য করতে লাগলেন, যাতে জর্মনি গৃহযুদ্ধের ফলে দুর্বল ও ঐক্যহীন

হয়ে যায়। ফ্রান্স ও জর্মানির শত্রুতা ইউরোপের ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে বরাবর চলে আসছে।

প্রধান প্রোটেস্ট্যাণ্ট লুথার পোপের প্রাধান্যের বিপক্ষাচরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মমত উদার ছিল এ কথা কল্পনাও কোরো না। যে পোপের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, তিনি নিজেও তাঁরই মতো অনুদার ছিলেন। ফলে রিফর্মেশন ইউরোপে ধর্ম-স্বাধীনতা আনল না। বরং ধর্মান্ধতার নূতন দৃষ্টান্ত নিয়ে এল—পিউরিটান এবং কাল্‌ভিনিস্ট্‌। কাল্‌ভিন ছিলেন পরবর্তী যুগের প্রোটেস্ট্যাণ্ট-আন্দোলনের একজন নেতা। তাঁর সংগঠন-শক্তি ছিল ভালো, এবং কিছুকাল তিনি জেনেভা-নগরী শাসন করেছিলেন। জেনেভার পার্কে অবস্থিত রিফর্মেশনের উদ্দেশে স্থাপিত বিরাট স্মৃতিস্তম্ভের কথা তোমার মনে আছে? কাল্‌ভিন ও অন্যান্য নেতাদের মূর্তিসংবলিত বিশাল প্রাচীর? তাঁর পরমত-অসহিষ্ণুতা এতই প্রবল ছিল যে, যাদের মত কাল্‌ভিনের সঙ্গে মিলত না তাদের অনেককেই তিনি পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

লুথারের প্রোটেস্ট্যাণ্ট-মতবাদ জনসাধারণের সমর্থনে লাভবান হয়েছিল, কারণ রোমান চার্চের বিরুদ্ধে লোকের মন ছিল উত্তেজিত। আগেই বলেছি, চাষিদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা হত ঘন ঘন। এই দাঙ্গাহাঙ্গামা জর্মানিতে রীতিমতো কৃষাণ-যুদ্ধে পরিণত হয়। যে কুরীতির ফলে তাদের এত দুর্দশা, চাষিরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অতি ন্যায়সংগত দাবি জানিয়েছিল যে, সার্ফরীতির (প্রায় ক্রীতদাসের মতো অবস্থা) উচ্ছেদ হোক, এবং তাদের শিকার করা ও মাছ ধরার অধিকার দেওয়া হোক। কিন্তু এটুকুও তাদের দেওয়া হয় নি, এবং জর্মানির রাজারা সর্বপ্রকার বর্বরতার সাহায্যে তাদের দমনের চেষ্টা করেছিলেন। এবং এত বড়ো সংস্কারক লুথারের মনোভাব কীরকম ছিল? তিনি কি দরিদ্র কৃষিজীবীদের পক্ষাবলম্বন করে তাদের ন্যায়সংগত দাবির সমর্থন করেছিলেন? মোটেই না! সার্ফরীতির উচ্ছেদের জন্য কৃষাণদের দাবি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন: "এই ব্যাপারের ফলে সব মানুষই সমান হয়ে যাবে, ফলে খৃষ্টের আধ্যাত্মিক স্বর্গরাজ্য পার্থিব হয়ে পড়বে। অসম্ভব! বৈষম্য ব্যতীত পৃথিবীর রাজ্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিছু লোক হবে স্বাধীন, কিছু থাকবে দাস, কেউ হবে শাসক, কেউ বা হবে শাসিত।" তিনি চাষিদের গাল দিয়ে তাদের ধ্বংস করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন: "অতএব আমাদের সকলের উচিত তাদের নির্মূল করা, অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে; মনে রেখো বিদ্রোহীর চেয়ে বিষাক্ত ঘৃণিত শয়তানের চর আর কিছু নেই। খ্যাপা কুকুরকে যেমন করে মারে, তাকেও তেমনি করে হত্যা করো। কারণ তুমি যদি তার উপরে চড়াও না হও, সে তোমার উপরে চড়াও হয়ে তোমার জমি ছিনিয়ে নেবে।" ধর্মনেতা এবং সংস্কারকের বাণীই বটে!

অতএব দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা শুধু উচ্চশ্রেণীর জন্যে, দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে নয়। জনসাধারণ প্রায় প্রতি যুগে জানোয়ারের মতো উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। লুথারের মতে এই রীতিই চলা প্রয়োজন, কারণ এই হল দৈবের লিখন। রোমের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিদ্রোহের বড়ো কারণ হল, জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই দুরবস্থা প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিদ্রোহের অনুকূল হওয়ায় এর সুযোগ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু যখন মনে হল, সার্ফরা বড়ো বেশি দূর এগিয়ে যাচ্ছে, এবং হয়তো-বা দাসত্বপ্রথা থেকে মুক্তি পাবার পথে—এটা তো একটা বেশ বড়ো ব্যাপার—প্রোটেস্ট্যাণ্ট-নেতারা তাদের দমনের জন্যে রাজাদের পক্ষাবলম্বন করলেন। জনসাধারণের সুদিনের তখনও বহু বিলম্ব ছিল। যে নূতন যুগের উদয় হচ্ছিল তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের যুগ। ষোড়শ শতাব্দীর এইসমস্ত সংগ্রাম ও বিরোধ থেকে যেন অবশ্যম্ভাবীরূপে অল্প অল্প করে এই শ্রেণীর উদয় দেখা যায়।

এই নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণী যেখানেই একটু প্রবল হয়েছিল সেখানেই প্রোটেস্ট্যাণ্ট-মতবাদের প্রসার হল। প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে বহু বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। ইংলণ্ডে রাজা স্বয়ং

চার্চের প্রধান হলেন—'ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক';* এবং চার্চ বলতে গেলে আর চার্চ থাকল না, হল সরকারি একটি দপ্তর। চার্চ অব্ ইংলণ্ড সেই থেকে আজ পর্যন্ত এইরকমই আছে।

অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে জর্মনি সুইজারল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ড্‌সে, অন্য অন্য সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করল। মধ্যশ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খেত বলে কাল্‌ভিনিজ্‌মের বিস্তার ঘটল। ধর্মবিষয়ে কাল্‌ভিন ছিলেন প্রচণ্ডরূপে অসহিষ্ণু। তথাকথিত ধর্মদ্রোহীদের যন্ত্রণা দেওয়া হত এবং পুড়িয়ে মারা হত, এবং সংঘের অন্তর্ভুক্তদের তীব্র নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখা হত। কিন্তু ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর উপদেশ ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের পক্ষে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের চেয়ে অধিক পরিমাণে উপযোগী ছিল। ব্যবসায়ে লাভ করা তাঁর মতে ঈশ্বরানুমোদিত, এবং ধারের ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হত। অতএব নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী পুরোনো ধর্মবিশ্বাসের এই নববিধান গ্রহণ করে হৃষ্ট মনে অর্থোপার্জন করে চলল। সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা জনসাধারণের সহানুভূতির সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এখন জমিদারদের উপরে বিজয়ী হয়ে তারা জনসাধারণকে অবহেলা এবং উৎপীড়ন করতে লাগল।

কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামনে এখনও বহু প্রতিবন্ধক ছিল। স্বয়ং রাজা ছিলেন তাদের প্রগতির অন্তরায়। নগরবাসী জনসাধারণের সঙ্গে রাজা যোগ দিয়েছিলেন ভূম্যধিকারীদের দমন করতে। এখন ভূম্যধিকারীরা শক্তিহীন হয়ে পড়ায় রাজার প্রতাপ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল, এবং তাঁর প্রাধান্যে হস্তক্ষেপ করার কেউ রইল না। রাজা এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম তখনও শুরু হয় নি।

৮৫

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বেচ্ছাতন্ত্র

২৬শে আগস্ট, ১৯৩২

আবার আমি কর্তব্যে অবহেলা আরম্ভ করেছি। শেষ চিঠি লিখেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। আমাকে তাগাদা দেওয়ার কেউ নেই। ফলে মধ্যে মধ্যে ঢিলা দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি। আমরা একত্র থাকলে অবশ্য এটা হত না। কিন্তু তুমি আমি একসঙ্গে কথা বলতে পেলে চিঠি লেখারই বা কী প্রয়োজন থাকত?

আমার শেষ কয়খানা চিঠি ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে লেখা। তাদের বিষয়বস্তু ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিরাট পরিবর্তন, যেসব পরিবর্তনের কারণ হল অর্থনৈতিক বিপ্লব, যার ফলে মধ্যযুগের শেষ, এবং 'বুর্জোয়া' অথবা মধ্যবিত্তশ্রেণীর আরম্ভ। শেষ চিঠিতে দেখেছ পশ্চিম-ইউরোপের খৃষ্টধর্মাবলম্বী রাজ্যসমূহের দুই পরস্পর-বিরোধী ভাগে বিভক্তীকরণ—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। এই ধর্মবিষয়ক সংগ্রামের অকুস্থল ছিল বিশেষ করে জর্মনি, কারণ এইখানেই দুই পক্ষ দলে প্রায় সমান ছিল। পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য দেশও এই বিরোধে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করেছিল। ইউরোপ-মহাদেশের এই ধর্মবিষয়ক সংগ্রাম থেকে ইংলণ্ড সরে থাকল। রাজা অষ্টম হেন্‌রির নেতৃত্বে ইংলণ্ড প্রায়

* রাজা অষ্টম হেন্‌রি স্বয়ং Fidei Defensor অথবা 'ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক' পদবী গ্রহণ করেন নি, তথাকথিত সত্যধর্মদ্রোহী লুথারের বিরুদ্ধে পুস্তক রচনা করে পোপের কাছ থেকে এই উপাধি পেয়েছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষকরূপে। যখন তিনি নিজেই পোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্যাথলিক ধর্ম বর্জন করলেন, তখনও এই শ্রুতিমধুর পদবীটির মায়া কাটাতে পারলেন না। ইংলণ্ডের রাজাদের এই পদবীটি এখনও বর্তমান আছে।

বিনা অন্তর্বিপ্লবেই রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট -মতবাদের মাঝামাঝি এক নিজস্ব ধর্মরীতির প্রতিষ্ঠা করল। ধর্মসম্বন্ধে হেন্‌রির খুব মাথাব্যথা ছিল না। তিনি চার্চ-অধিকৃত ভূমি চেয়েছিলেন, তা পেলেনও; আবার বিয়ে করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন, তাও করলেন। এইরূপে রিফর্মেশন অথবা সংস্কারের প্রধান ফল হল রাজামহারাজদের পোপের বন্ধনরজ্জু থেকে মুক্ত করা।

যখন রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের এইসব আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে ইউরোপের চেহারার পরিবর্তন ঘটছিল, তখন রাজনৈতিক পটভূমি কেমন ছিল? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মানচিত্রই বা কেমন ছিল? অবশ্য এই দু শো বছরে এ মানচিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সে মানচিত্রের অবস্থা কী ছিল, একবার দেখা যাক।

দক্ষিণ-পূর্বে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ছিল তুর্কির হাতে, আর তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করছিল হাঙ্গেরি পর্যন্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরব বিজেতাদের বংশধর মুসলমান সারাসেনরা গ্রানাডা থেকে বিতাড়িত হয়েছে, এবং স্পেন ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার সম্মিলিত শাসনে খৃষ্টান রাজশক্তিরূপে উদিত হয়েছে। মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিরোধের ফলে স্পেন গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মকে আঁকড়ে বসে আছে। এই স্পেনেই বীভৎস ইন্‌কুইজিশন-রীতির উদ্ভব। আমেরিকা-আবিষ্কারের গৌরবে, এবং এই আবিষ্কারের ফলে সদ্য-আগত ঐশ্বর্য লাভ করে স্পেন ইউরোপীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আবার মানচিত্রের দিকে তাকাও, ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে বেশ চেনা যাচ্ছে, এখন যেমন তখনও প্রায় তাই ছিল। মানচিত্রের মধ্যস্থলে হচ্ছে সাম্রাজ্য (পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য), অনেকগুলি ছোটো ছোটো জর্মন রাষ্ট্রে বিভক্ত, যারা প্রত্যেকে প্রায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। রাজা, ডিউক, বিশপ, ইলেক্‌টর প্রভৃতি নানাবিধ ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হচ্ছে এই সাম্রাজ্য। অনেক শহর আছে যাদের বিশেষ অধিকার আছে, এবং উত্তরের বাণিজ্যপ্রধান শহরগুলির সম্মিলনে সংগঠিত এক সমিতি আছে। তার পরে সুইজারল্যান্ডের সাধারণতন্ত্র, আসলে স্বাধীন, কিন্তু সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়। ভেনিসের সাধারণতন্ত্র, এবং উত্তর-ইতালিতে আরও কতকগুলি সাধারণতন্ত্রী নগর; রোমের আশেপাশে পোপদের অধিকারে ভূখণ্ড, যার নাম পেপাল স্টেট্‌স্‌। আর দক্ষিণে নেপ্‌ল্‌স্‌ ও সিসিলি রাজ্য। পূর্বে এই সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার মধ্যে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি রাজ্য, অটোম্যান তুর্কিদের অগ্রগতির ছায়া যার উপর পড়ছে। আরও পূর্বদিকে রাশিয়া, গোল্ডেন হোর্ডের মঙ্গোলদের বিতাড়িত করে সবে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠছে। উত্তর-পশ্চিমে আরও গোটাকতক দেশ।

এই ছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম যুগের ইউরোপ। ১৫২০ সালে পঞ্চম চার্লস্‌ সম্রাট হলেন। তিনি ছিলেন হাপ্‌স্‌বুর্গ-বংশীয়, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে স্পেনরাজ্য, নেপ্‌ল্‌স্‌, সিসিলি, এবং নেদারল্যান্ডস্‌ পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের বিবাহের ফলে সমগ্র জাতি ও দেশ কীরকম ভাবে ইউরোপে হাতবদল হত এটা একটা অদ্ভুত জিনিষ। লক্ষ লক্ষ প্রজা এবং বিশাল দেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত। সময়ে সময়ে যৌতুকরূপে দেশ দান করা হত। বোম্বাই দ্বীপ ইংরেজ-রাজা দ্বিতীয় চার্লসের হাতে এসেছিল তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিন্‌ অব ব্রাগাঞ্জার (পোর্তুগাল) যৌতুকরূপে। হিসেব করে বিয়ে করে হাপ্‌স্‌বুর্গরা এক বিশাল সাম্রাজ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল, এবং পঞ্চম চার্লস্‌ হলেন এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ; তাঁর খ্যাতি ছিল তাঁর দৈনিক খাদ্যের প্রচণ্ড পরিমাণে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রাজ্যের বিশালতায় তাঁকে সাম্রাজ্যে অতিমানুষ বলে মনে করা হত।

যে বছর চার্লস্‌ সম্রাট হলেন সেই বছরই সুলেমান অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রধান হলেন। তাঁর রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য চতুর্দিকে, বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপের দিকে, প্রসারলাভ করেছিল। তুর্কিরা সুন্দরী নগরী ভিয়েনার দ্বারদেশ পর্যন্ত এসে পড়েছিল, খালি অধিকার করতে পারে নি।

কিন্তু তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ-সম্রাট সুলেমানকে কর দিয়ে শান্ত করা বুদ্ধির কাজ মনে করলেন। ব্যাপারটা কল্পনা করো, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পরাক্রান্ত সম্রাট তুর্কির সুলতানকে কর দিচ্ছেন! সুলেমান, 'সুলেমান দি ম্যাগনিফিশেণ্ট' অথবা 'মহানুভব সুলেমান' নামে খ্যাত। তিনি নিজে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলেন, কেননা তাঁর বিবেচনায় তিনি পূর্ব-বাইজানটাইন্‌-সীজারদের প্রতিনিধি ছিলেন।

সুলেমানের সময়ে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লে প্রাসাদ-নির্মাণ বেশি মাত্রায় আরম্ভ হয়েছিল, এবং অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ইতালির ললিতকলার রেনেসাঁসের মতো প্রাচ্যেও এই পুনরভ্যুদয় বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। শুধু যে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লেই ললিতকলার চর্চা হচ্ছিল তা নয়, পারশ্যে এবং মধ্য-এশিয়ার খোরাশানেও সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হচ্ছিল।

ভারতবর্ষে বাবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এসে নূতন রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন। এ হল ১৫২৬ সালে, যখন পঞ্চম চার্ল্‌স্‌ ইউরোপে সম্রাট ছিলেন এবং সুলেমান কনস্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ শাসন করছিলেন। বাবর এবং তাঁর বিখ্যাত বংশধরদের সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলব। কিন্তু এইখানে একটি জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে, বাবর নিজেই এই রেনেসাঁস ধরনের রাজা ছিলেন, যদিও ইউরোপীয় রাজন্যসাধারণের চেয়ে উন্নতধরনের। তিনি ভাগ্যান্বেষী হলেও বীর সেনানী ছিলেন, এবং সাহিত্য ও শিল্পে তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। সে যুগের ইতালিতেও রাজবংশোদ্ভূত এরকম ভাগ্যান্বেষী কেউ কেউ ছিলেন, যাঁদের শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল এবং যাঁদের ক্ষুদে রাজসভায় একটা ভাসা ভাসা ঔজ্জ্বল্য পাওয়া যেত। ফ্লোরেন্সের মেদিচি-পরিবার, এবং বোর্জিয়ার৺ তখন বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এইসব ইতালীয় রাজন্যবর্গ এবং তৎকালীন ইউরোপের অধিকাংশ রাজাই ছিলেন মাকিয়াভেলির আসল চেলা। তাঁদের সঙ্গে মহাবীর বাবরের তুলনা করলে অন্যায় হবে, যেমন অন্যায় হবে এইসব তুচ্ছ রাজসভার সঙ্গে আকবর, শাহ্‌জাহান প্রভৃতি মোগল-সম্রাটদের দিল্লি বা আগ্রার রাজসভার তুলনা করা। শোনা যায় এইসব মোগল-রাজসভার সমারোহ ছিল অতুলনীয়, সম্ভবত সর্বকালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই ইউরোপ থেকে ভারতে চলে এসেছি। কিন্তু এই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে ভারত ও অন্যত্র কী ঘটছিল সে সম্বন্ধে তোমাকে খানিকটা উপলব্ধি করাতে চাই। তুরস্ক ও পারশ্যে, মধ্য-এশিয়ায় ও ভারতে শিল্পকলার বিশেষ চর্চা চলছিল। চীনে এ সময়টা ছিল মিঙ্‌-রাজবংশের অধীনে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ, ললিতকলা তখন অতি উচ্চস্তরে উঠেছিল। কিন্তু রেনেসাঁস-যুগের এই ললিতকলা ছিল একমাত্র চীন ছাড়া সর্বত্রই রাজসভার শিল্প, জনসাধারণের নয়। ইতালিতে যেসব শিল্পাচার্যদের নাম করেছি তাঁদের মৃত্যুর পর পরবর্তী যুগের রেনেসাঁস-শিল্প সাধারণ গতানুগতিক শিল্পে পরিণত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজাদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেল। তখন রাজাদের নামেই সব চলত, দেশের অধিবাসীদের নামে নয়। ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও স্পেন থাকল ক্যাথলিক; জর্মানি আধা-ক্যাথলিক আধা-প্রোটেস্ট্যাণ্ট। ইংলণ্ড প্রোটেস্ট্যাণ্ট, কেবলমাত্র রাজা প্রোটেস্ট্যাণ্ট এই কারণে। এবং যেহেতু ইংলণ্ড হল প্রোটেস্ট্যাণ্ট, এবং সে আঁয়ার্লাণ্ডকে পরাজিত ও অত্যাচারিত করতে চেয়েছিল, সেইজন্যে আয়ার্লাণ্ড রয়ে গেল ক্যাথলিক। কিন্তু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের বৈষম্যে কিছু এসে-যেত না বললে ভুল হবে, কারণ শেষ দিকে এর ফল দেখা দিয়েছিল, এবং এই ধর্মের জন্যে বহু যুদ্ধ এবং বিপ্লব ঘটেছিল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে ধর্মসংক্রান্ত অবস্থাকে পৃথক করে দেখা কঠিন। যতদূর মনে পড়ে, আগেই তোমাকে বলেছি যে, বিশেষ করে যেখানে বণিক-সম্প্রদায় প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল সেখানেই রোমের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিদ্রোহ ঘটেছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ও বাণিজ্যের মধ্যে খানিকটা যোগাযোগ আছে। আবার অনেক সময় রাজারা ধর্মসংস্কারের আন্দোলনকে ভয় পেতেন, কারণ, কে বলতে পারে, ধর্মসংস্কারের তলে তলে সাধারণ বিপ্লবের অভ্যুদয় হয়ে তাঁদের কর্তৃত্বের অবসান করবে কি না! যদি কোনো লোক পোপের ধর্মকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে রাজার শাসনকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ মতবাদ

রাজাদের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। তাঁরা তখনও রাজাদের ভগবদ্দত্ত স্বত্বের ধারণা আঁকড়ে বসে আছেন। এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট-রাজারাও এটা ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু তবু সংস্কার-আন্দোলন সত্ত্বেও ইউরোপের রাজগণ ছিলেন সর্বশক্তিমান। এর পূর্বে কোনো সময়েই এতটা স্বেচ্ছাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। ইতিপূর্বে বড়ো বড়ো ভূম্যধিকারী ওমরাহরা তাঁর ক্ষমতার প্রতিবন্ধক ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে তাঁর কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতেন। বণিক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এইসব ওমরাহদের পছন্দ করতেন না, রাজাও করতেন না। অতএব বণিকশ্রেণী এবং কৃষিজীবীদের সহায়তায় রাজা ওমরাহদের দমন করে নিজেই সর্বশক্তিমান হলেন। মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও এতটা বাড়ে নি যে রাজাকে প্রতিহত করবে। কিন্তু শীগ্গিরই এই মধ্যশ্রেণী রাজার অনেক কাজেই আপত্তি জানাতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে তাদের আপত্তি হল অত্যধিক কর এবং ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এসব রাজার মোটেই পছন্দ হল না। তাঁর কোনো কাজের সম্বন্ধে তাদের আপত্তি করার স্পর্ধা রাজার অসহ্য বলে মনে হল। অতএব তিনি তাদের কারারুদ্ধ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে শাস্তি দিতে আরম্ভ করলেন। আজ যেমন আমরা ভারতে ব্রিটিশ গভর্মেন্টকে মেনে চলতে অস্বীকার করলে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হই, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা এসব জায়গাতেও চলল। রাজা বাণিজ্য-ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন। এইসব কারণে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হল এবং রাজার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ল। রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই সংগ্রাম বহুশত বর্ষ ধরে, এই সেদিন পর্যন্ত, চলল এবং রাজাদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটার আগে বহু রাজারই মাথা কাটা গেল। কোনো কোনো দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জয় দ্রুত এসেছিল, কোথাও-বা বিলম্বে। এই সংগ্রামের বিবরণ আমরা পরে আলোচনা করব।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র রাজাই ছিলেন মালিক। প্রায় সর্বত্র, কিন্তু একেবারে সর্বত্র নয়। তোমার মনে আছে হয়তো যে, সুইজারল্যান্ডে গরিব পাহাড়ি চাষিরা প্রবল-প্রতাপ হাপ্সবুর্গ-সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। এইরূপে ইউরোপের স্বেচ্ছাচারের মহাসাগরে সুইজারল্যান্ডের ক্ষুদ্র কৃষকসাধারণতন্ত্র জেগে রইল দ্বীপের মতো, যেখানে রাজার কোনো স্থান নেই।

শীগ্গিরই আর-এক জায়গায় অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াল—নেদারল্যান্ড্স্; সেখানেও জনসাধারণের রাজনৈতিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অধিবাসীরা জয়ী হয়েছিল। দেশটা ছোটো, কিন্তু এ যুদ্ধ হয়েছিল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশালী শক্তি স্পেনের বিরুদ্ধে। এইরূপে নেদারল্যান্ড্স্ ইউরোপে স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক হল। তার পরে ইংলন্ডে প্রজা-স্বাধীনতার আন্দোলন এল, যার ফলে রাজার মাথা গেল, এবং পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা এল। এইরূপে নেদারল্যান্ড্স্ এবং ইংলন্ড, উভয়েই ইউরোপে স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণীর সংগ্রামে পথ দেখাল। এবং যেহেতু এইসব দেশে মধ্যশ্রেণীর জয় ঘটল, এরা পৃথিবীর নব অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্যসব দেশের থেকে বেশি এগিয়ে গেল। পরবর্তীকালে এই দুই দেশেই শক্তিশালী নৌবাহিনীর সৃষ্টি হল। উভয়েই দূরবর্তী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করল এবং উভয়েই এশিয়ায় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করল।

এতক্ষণ এসব চিঠিতে ইংলন্ড সম্বন্ধে বেশি কিছু বলি নি। বলার মতো কিছু ছিলও না, কারণ ইংলন্ড সে যুগে ইউরোপে একটি অপ্রধান দেশ ছিল। কিন্তু এইবার পরিবর্তন আরম্ভ হল এবং দ্রুতগতিতে ইংলন্ড এগিয়ে গেল। ম্যাগ্না কার্টা এবং পার্লামেন্টের প্রথম পত্তন, চাষিবিদ্রোহ, এবং বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বিষয় আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এইসব যুদ্ধের সময় রাজাদের গুপ্তহত্যা খুবই নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। এইসব যুদ্ধে বহু সামন্ত ভূস্বামী মারা গেলেন, ফলে এই শ্রেণীর শক্তিক্ষয় ঘটল। টিউডর-নামক নূতন রাজবংশ সিংহাসনে এল, এবং তাঁরা স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। অষ্টম হেন্রি এবং তাঁর মেয়ে এলিজাবেথ ছিলেন টিউডর।

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের পরে সাম্রাজ্য অনেক ভাগে ভেঙে গেল। স্পেন এবং নেদারল্যান্ড্স্ পড়ল তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপের ভাগে। সে যুগে স্পেনে ছিল ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশালী

রাজতন্ত্র। তোমার বোধহয় মনে আছে, এর অধীনে ছিল পেরু আর মেক্সিকো, এবং আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা আসতে লাগল। কিন্তু কলম্বস, কর্টেস এবং পিজারোর পরিশ্রম সত্ত্বেও স্পেন নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। বাণিজ্যে স্পেনের কোনো উৎসাহ ছিল না। এর প্রীতি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ধর্মের গোঁড়ামিতে। সারা দেশে ইন্‌কুইজিশনের প্রবল প্রতাপ, এবং তথাকথিত অধার্মিকদের উপর বীভৎস অত্যাচার করা হত। মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য উৎসবের আয়োজন করা হত; সেখানে রাজা, রাজ-পরিবার, রাজদূত এবং সহস্র সহস্র লোকের সামনে দলে দলে ধর্মদ্রোহী নরনারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। এইসব প্রকাশ্য দাহন-সভাকে বলা হত Autos-da-fé অথবা বিশ্বাসের কাজ। এসব পৈশাচিক বলে মনে হয়। ইউরোপের এই যুগের সমগ্র ইতিহাস এইরকম ধর্মের নামে অত্যাচার ও বীভৎস নিষ্ঠুরতায় এত পূর্ণ যে, অবিশ্বাস্য বোধ হয়।

স্পেন-সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ক্ষুদ্র হল্যাণ্ডের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে এর ভিত সম্পূর্ণরূপে নড়ে গিয়েছিল। অল্প পরে, ১৫৮৮ সালে, ইংলণ্ড-বিজয়ের চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়, এবং যে 'অজেয় আর্মাডা'তে স্পেনের সৈন্যবাহিনী আসছিল তা ইংলণ্ডে পেঁছিতে পর্যন্ত পারল না। মাঝ-সমুদ্রেই তা ধ্বংস হল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ, যে লোকটির অধ্যক্ষতায় এই রণতরী-বাহিনী আসছিল তিনি জাহাজ অথবা সমুদ্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এমনকি তিনি রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে এই পদ থেকে তাঁকে অপসারণের অনুরোধ জানান; কারণ, তিনি নৌযুদ্ধ-নীতি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, উপরন্তু তিনি জাহাজে সমুদ্রপীড়া-গ্রস্ত হতেন। কিন্তু রাজা উত্তর দিয়েছিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর এই রণতরীবাহিনী চালনা করবেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে স্পেন-সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পঞ্চম চার্লসের সময় বলা হত যে, তাঁর সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না—যা আজকাল আর-একটি দাম্ভিক সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে।

৮৬

নেদারল্যাণ্ড্‌সের স্বাধীনতা-সমর

২৭শে আগস্ট, ১৯৩২

আমার গত চিঠিতে তোমাকে বলেছি, কী উপায়ে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ষোড়শ শতাব্দীতে রাজাদের অবিসংবাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে ছিল টিউডর-বংশ, স্পেন এবং অস্ট্রিয়াতে হাপ্‌স্‌বুর্গ। রাশিয়াতে, জর্মনির অধিকাংশ স্থলে এবং ইতালিতে রাজারা ছিলেন সর্বেসর্বা। ব্যক্তিগত শাসনের দিক দিয়ে ফ্রান্স ছিল প্রধান দৃষ্টান্ত, সমগ্র রাজ্যই ছিল প্রায় রাজার নিজস্ব সম্পত্তির শামিল। ফ্রান্স এবং তার রাজতন্ত্রের প্রতাপবৃদ্ধিতে কার্ডিন্যাল রিশেলিউ-নামক একজন অতি দক্ষ মন্ত্রী খুবই সহায়তা করেছিলেন। ফ্রান্সের বিবেচনায় তার নিজের শক্তি নির্ভর করত জর্মনির দৌর্বল্যের উপর। সেইজন্যে রিশেলিউ, যিনি নিজে ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক, এবং ফ্রান্সে নির্মমভাবে প্রোটেস্ট্যাণ্ট-দলনের রীতি চালিয়েছিলেন, তিনি জর্মনির প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সমর্থন করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল জর্মনিতে পরস্পর বিরোধ ঘটানো এবং অরাজকতা আনা, আর এইরকম করে তাকে শক্তিহীন করা। এই উদ্দেশ্য বিশেষ সাফল্য লাভ করল। জর্মনিতে অতি গুরুতর গৃহযুদ্ধের উৎপত্তি হয়ে তার সর্বনাশ হয়ে গেল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সেও গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, যাকে বলা হয় 'ফ্রণ্ডের যুদ্ধ'। কিন্তু রাজা অভিজাতবর্গ এবং বণিকসম্প্রদায়, দু পক্ষকেই দমন করলেন। অভিজাতদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাদের নিজের দলে রাখবার জন্যে রাজা তাদের অসংখ্য

বিশেষ অধিকার দান করলেন। তাদের প্রায় কোনো করই দিতে হত না। অভিজাত-সম্প্রদায় এবং যাজকগণ উভয় পক্ষই এই সুবিধা ভোগ করত। ফলে সমগ্র করভার পড়ল গরিবদের উপরে, বিশেষ করে চাষিদের উপরে। এই হতভাগ্যদের কাছ থেকে আহৃত অর্থ দিয়ে বড়ো বড়ো প্রাসাদ তৈরি হল, এবং রাজাকে ঘিরে প্রচণ্ড সমারোহপূর্ণ রাজসভার পত্তন হল। প্যারিসের কাছে ভার্সাই-ভ্রমণ মনে আছে? যেসব বিরাট প্রাসাদ সেখানে দেখেছি তাদের উৎপত্তি সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি কৃষিজীবীদের রক্ত দিয়ে। ভার্সাই হচ্ছে সম্পূর্ণ একতন্ত্রী দায়িত্বশূন্য রাজতন্ত্রের প্রতীক। এবং ভার্সাই যে ফরাসি-বিপ্লবের অগ্রদূত হয়ে সমস্ত রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখনও বিপ্লবের অনেক দেরি। রাজা ছিলেন চতুর্দশ লুই, মহানৃপতি, যাঁকে বলা হত রাজসূর্য, যে সূর্যের চার দিকে রাজসভার পারিষদ-রূপ গ্রহরা প্রদক্ষিণ করত। ১৬৪৩ থেকে ১৭১৫, এই দীর্ঘ বাহাত্তর বছর ধরে তিনি রাজত্ব করলেন, এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আর একজন খ্যাতনামা কার্ডিন্যাল, নাম—মাজারিন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছিল বিলাসিতার চরম, এবং রাজা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ললিতকলার পরিপোষণ করতেন; কিন্তু এই সমারোহের সূক্ষ্ম আবরণের তলে ছিল দুরবস্থা ও দুর্দশা। এ ছিল সেই জগত, যেখানে বাইরে ছিল মনোরম পরচুল, লেসের আস্তিন আর চমৎকার সব পোশাক, আর ভিতরে ছিল মালিন্য আর আবর্জনা।

বাইরের জাঁকজমক আর সমারোহ দেখে আমরা সকলেই আকৃষ্ট হই; চতুর্দশ লুই যে তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে ইউরোপের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি ছিলেন রাজার আদর্শ, এবং অন্যেরা তাঁর অনুকরণের চেষ্টা করত। কিন্তু এই মহানৃপতি আসলে কী ছিলেন? একজন সুপরিচিত ইংরেজ লেখক কার্লাইল লিখেছিলেন, "চতুর্দশ লুইয়ের রাজবেশ খুলে ফেলো, দেখবে, ভিতরে আর কিছুই নেই, আছে শুধু একটা হতভাগা চেরা মুলো, যার মাথাটা খুব কায়দা করে খোদাই করা।" বর্ণনাটা একটু কঠোর, তবে সম্ভবত রাজাপ্রজা সকলের সম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

চতুর্দশ লুই আমাদের নিয়ে চলেন ১৭১৫ পর্যন্ত, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে। ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অনেক-কিছু ঘটেছিল, সেগুলো একটু লক্ষ্য করা দরকার।

স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ড্‌সের বিদ্রোহের কথা আগেই বলেছি। তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আর একটু ভালো করে দেখা দরকার। জে. এল. মট্‌লি -নামক একজন আমেরিকান এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা বিখ্যাত বিবরণ লিখেছেন, যা অতি চিত্তাকর্ষক। ৩৫০ বছর আগে ইউরোপের এক ক্ষুদ্র কোণে যে ঘটনা ঘটেছিল তার এই বর্ণনার চেয়ে সুখপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক কোনো উপন্যাসও আছে বলে আমার জানা নেই। বইটার নাম The Rise of the Dutch Republic (ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয়); এটা আমি জেলেই পড়েছি।

নেদারল্যাণ্ড্‌স্ বলতে হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ম দুটোকেই বোঝায়। এদের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এগুলি নিম্নভূমি। হল্যাণ্ড কথাটার উৎপত্তি 'হলো ল্যাণ্ড' অর্থাৎ 'ফাঁপা ভূমি' থেকে। এর অনেক অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নীচে, এবং উত্তরসাগর থেকে তাকে রক্ষা করা হয় বিরাট খাদ (dyke) এবং দেওয়ালের সাহায্যে। এইরকম দেশে সমুদ্রের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামের ফলে কষ্টসহিষ্ণু সাগরচারী জাতির সৃষ্টি হয়, এবং যারা প্রায়ই সমুদ্রযাত্রা করে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যপ্রিয় হয়। এইরূপে নেদারল্যাণ্ড্‌সের অধিবাসীরা ব্যবসায়ী হল। তারা পশমী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ উৎপন্ন করত, এবং প্রাচ্যদেশের মশলা প্রভৃতিও তাদের হাতে গেল। কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধিশালী নগরের পত্তন হল—ব্রুগেস্, ঘেণ্ট, বিশেষ করে আন্তোয়ার্প। প্রাচ্য-দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব শহরের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে আন্তোয়ার্প ইউরোপের প্রধান বাণিজ্য-নগরীতে পরিণত হল। এর এক্সচেঞ্জ-হাউসে নাকি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে প্রত্যহ ৫০০০ বণিকের আগমন হত। এক সময়ে এর বন্দরে ২৫০০ জাহাজ ছিল। প্রতিদিন বন্দরে প্রায় ৫০০ জাহাজ আসত-যেত। এই বণিক-সম্প্রদায় নগরের শাসনবিধি নিয়ন্ত্রণ করত।

এইরকম বণিক-সম্প্রদায়ই 'রিফর্মেশন' অথবা সংস্কারের ধর্মসম্বন্ধীয় নূতন আদর্শের প্রতি

আকৃষ্ট হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট বিধি এখানে বিস্তৃতি লাভ করল, বিশেষ করে উত্তরে। বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার বিধি অনুসারে হাপ্‌স্‌বুর্গ পঞ্চম চার্লস্‌ এবং তার পরে তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপ, নেদারল্যান্ড্‌সের অধিপতি হলেন। এই দুজনের একজনও রাজনৈতিক অথবা ধর্মবিষয়ক কোনো স্বাধীনতাই সহ্য করতে পারতেন না। ফিলিপ এইসব শহরের বিশেষ অধিকার এবং ধর্মের নব-বিধান ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন। প্রধান শাসনকর্তা হিসেবে তিনি পাঠালেন আল্‌ভার ডিউক্‌কে, যিনি অত্যাচার এবং নিষ্পেষণের জন্যে খ্যাতনামা হয়েছেন। ইন্‌কুইজিশন (তথাকথিত অধার্মিকদের শাস্তি দেবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত আদালত) প্রতিষ্ঠিত হল, আর স্থাপিত হল এক 'রক্তসভা', যার বিচারে হাজারে হাজারে লোক ফাঁসিকাষ্ঠে অথবা আগুনে পুড়ে প্রাণ দিল।

এ কাহিনী অতি দীর্ঘ, সব বলার সময় নেই। স্পেনের অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও লোকের বাড়ল। তাদের মধ্যে এক মহান্‌ জ্ঞানী নেতার উদ্ভব হল অরেঞ্জের প্রিন্স উইলিয়ম (মৌন উইলিয়ম নামে খ্যাত); ইনি ছিলেন ডিউক অব আল্‌ভার অত্যাচারের সমুচিত প্রত্যুত্তর। ইন্‌কুইজিশন ১৫৬৮ সালে বিচার করে এক রায়ে জন-কয়েককে বাদ দিয়ে নেদারল্যান্ড্‌সের সমুদয় অধিবাসীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। ইতিহাসে এই রায়ের জুড়ি নেই, তিন-চার ছত্রের রায়ে ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড!

প্রথম দিকে মনে হয়েছিল যুদ্ধ বুঝি নেদারল্যান্ড্‌সের অভিজাত-সম্প্রদায় ও স্পেনের রাজার মধ্যে। অন্যান্য দেশে যেমন রাজা ও আমির-ওম্‌রাহতে বিরোধ বাধে, সেইরকম বুঝি। আল্‌ভা তাদের দমন করার চেষ্টা করলেন, এবং অনেক বড়ো বড়ো অভিজাত পুরুষকেই ব্রুসেল্‌সে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়তে হল। যেসব জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা অভিজাতদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন কাউণ্ট এগ্‌মণ্ট। পরে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আল্‌ভা নূতন গুরুভার করের প্রবর্তন করলেন। তার ফলে ধনী বণিক-সম্প্রদায়ের পুঁজিতে হাত পড়ল, তখন তারা বিদ্রোহ করল। এর সঙ্গে ছিল ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টের বিরোধ।

স্পেন ছিল প্রবলপ্রতাপ শক্তি, তার প্রাধান্যের উচ্চতম শিখরে অবস্থিত। নেদারল্যান্ড্‌স্‌ ছিল বণিক-সম্প্রদায় এবং অমিতব্যয়ী অভিজাত-সম্প্রদায় অধ্যুষিত কয়েকটি প্রদেশের সমষ্টি মাত্র। এই দুইয়ের মধ্যে তুলনাই চলে না। তবু স্পেনের পক্ষে এদের দমন সহজ হল না। পুনঃপুনঃ হত্যালীলা চলল, কোনো কোনো জায়গা জনশূন্য করে দেওয়া হল। মানুষের প্রাণধ্বংস করার কাজে আল্‌ভা এবং তাঁর সেনাপতিরা চেঙ্গিস্‌ খাঁ ও তৈমুরের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। সময়ে সময়ে তাঁরা মঙ্গোলদেরও ছাড়িয়ে গেলেন। নগরের পর নগর আল্‌ভা অবরোধ করলেন, এবং যুদ্ধ-বিদ্যায় অশিক্ষিত পুরুষ, কখনও কখনও নারীরাও জলে স্থলে আল্‌ভার সুশিক্ষিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়তে লাগল, যতদিন না খাদ্যাভাবের ফলে আর লড়াইয়ের উপায় থাকল না। স্পেনের অধীনতার চেয়ে নিজেদের যাবতীয় প্রিয় জিনিষের সম্পূর্ণ ধ্বংসও তাদের কাছে কাম্য হয়ে উঠল, এবং ওলন্দাজরা ডাইক ভেঙে ফেলে উত্তরসাগরের জল ভিতরে নিয়ে এল স্পেনের সেনাবাহিনীর ধ্বংস ও বিতাড়নের জন্য। যত দিন গেল, সংগ্রাম ততই নির্মম হয়ে উঠল, এবং দু পক্ষই অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে পড়ল। সুরম্য নগরী হারলেম-অবরোধের প্রতিরোধ হয়েছিল প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে, কিন্তু তার সমাপ্তি হল স্পেনের সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যালীলা ও লুঠতরাজে। তার পর আল্‌ক্‌মারের অবরোধ, যা বাঁচল ডাইক ভেঙে দিয়ে। তার পর লিডেন—শত্রুসেনাবেষ্টিত—অনাহারে ও রোগে যেখানে লোক মরছিল হাজারে হাজারে। লিডেনের কোনো গাছে সবুজ পাতা ছিল না, উপবাসী জনসাধারণ সেগুলি খেয়ে শেষ করেছিল। আবর্জনার স্তূপে ক্ষুধিত কুকুরের দলের সঙ্গে খাদ্যান্বেষী নরনারীর যুদ্ধ বেধে গেল। তবু তারা যুদ্ধ করে চলল, এবং নগর-প্রাচীর থেকে ক্ষুধাশীর্ণ নরনারী শত্রুসৈন্যদের প্রতি অপমান-বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। তারা স্পেনবাসিদের বলল যে, আত্মসমর্পণ করার চেয়ে তারা বরং ইঁদুর আর কুকুর খেয়েও যুদ্ধ করবে। "আর যখন আমরা নিজেরা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, জেনে রেখো, আমরা নিজেদের বাঁ হাতের মাংস খেয়ে ডান হাতকে বাঁচিয়ে রেখে দেব, বৈদেশিক অত্যাচারীর হাত থেকে আমাদের নারীজাতির সম্মান, স্বাধীনতা ও ধর্মের রক্ষার জন্যে। ক্রুদ্ধ ঈশ্বর যদি আমাদের

ধ্বংসের পথেই পাঠান, আমাদের কোনো সাহায্য যদি না আসে, তবু তোমাদের প্রবেশ রোধ করতে আমরা যুদ্ধ করব। যখন অবসান আসবে তখন স্বহস্তে আমরা নগরে আগুন লাগিয়ে দেব, এবং আবালবৃদ্ধ নরনারী একসঙ্গে সেই অগ্নিশিখায় পুড়ে মরব, তবু আমাদের গৃহ অপবিত্র করতে দেব না, আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে দেব না।"

এইরকম ছিল লিডেনবাসীদের মানসিক শক্তি। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, সাহায্য আর এল না, সবার মন হতাশ্বাসে ভরে গেল। তখন তারা বাইরে Estates of Holland-এর বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠাল। এই এস্টেটরা মনস্থ করল যে, লিডেনকে শত্রুর হাতে পড়তে দেওয়ার চেয়ে তারা নিজেদের প্রিয় ভূমিকে জলমগ্ন করবে। "কারণ, শত্রুহস্তগত দেশের চেয়ে জলমগ্ন ভূমি শ্রেয়।" তারা বিধ্বস্তপ্রায় লিডেন নগরের কাছে প্রত্যুত্তর পাঠাল: "হে লিডেন, তোমাকে ত্যাগ করার চেয়ে আমরা আমাদের সমস্ত ভূমি এবং আমাদের সমস্ত সম্পত্তি সমুদ্রের হাতে সমর্পণ করব।"

অবশেষে একটার পর একটা ডাইক ভাঙা হল, অনুকূল বায়ু পেয়ে সমুদ্রের জল তোড়ের সঙ্গে ঢুকল, তার সঙ্গে এল ওলন্দাজ-জাহাজের দল, খাদ্য এবং সৈন্য বহন করে। এবং এই নূতন শত্রু সমুদ্রের ভয়ে স্পেনের সেনাবাহিনী পালিয়ে গেল। এইরূপে লিডেন রক্ষা পেল এবং তার অধিবাসীদের বীরত্বের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫৭৫ সালে বিখ্যাত লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

এইরকম বীরত্বের আরও অনেক কাহিনী আছে, আর আছে নির্মম নিষ্ঠুরতার কাহিনী। সুন্দর আন্তোয়ার্প-নগরে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে মরে ৮০০০ জন অধিবাসী। এই হত্যাকাণ্ডের নাম হল 'স্প্যানিশ ফিউরি'।

কিন্তু এই মহাসংগ্রাম চলল হল্যাণ্ডেই বেশি, নেদারল্যাণ্ড্‌সের দক্ষিণ-অংশে নয়। ঘুষ দিয়ে এবং বলপ্রয়োগে, স্প্যানিশ শাসকরা নেদারল্যাণ্ড্‌সের অনেক অভিজাত ব্যক্তিকে নিজেদের দলে এনে তাদেরই সাহায্যে তাদের স্বদেশবাসীর দলন করাল। তাদের সুবিধে হয়েছিল আর-একটা কারণে; দক্ষিণে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের চেয়ে ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল বেশি। তারা ক্যাথলিকদের দলে টানতে চেষ্টা করে অংশত কৃতকার্য হল। আর অভিজাত-সম্প্রদায়! দেশ যখন ধ্বংস হচ্ছে, তখনও তাদের অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও জুয়াচুরির সাহায্যে স্পেনের রাজার কাছ থেকে অনুগ্রহ ও অর্থ পাবার যে লজ্জাজনক চেষ্টা করেছিলেন, তা না বলাই ভালো।

নেদারল্যাণ্ড্‌সের 'জেনারেল অ্যাসেম্বলি' অথবা 'রাষ্ট্রসভা'কে সম্বোধন করে উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ বলেছিলেন, "নেদারল্যাণ্ড্‌সের দমন করছে নেদারল্যাণ্ড্‌সই। ডিউক অব্ আল্‌ভা তার যে শক্তির গর্ব করে, তা কোথা থেকে পেয়েছে? তোমাদের কাছ থেকেই, নেদারল্যাণ্ড্‌সের নগরগুলির কাছেই। তার জাহাজ, খাদ্যসামগ্রী, টাকা, অস্ত্র, সৈন্য, কোথা থেকে এসেছে? এই নেদারল্যাণ্ড্‌সের লোকদের কাছ থেকেই।"

অবশেষে স্পেনবাসিগণ নেদারল্যাণ্ড্‌সের অংশ পুনরায় জয় করল, যা এখন মোটামুটি বেলজিয়ম। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক, হল্যাণ্ডকে তারা নত করতে পারল না। অদ্ভুত এই যে, দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যেও হল্যাণ্ড স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনতা অস্বীকার করে নি। তিনি যদি তাদের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করতেন তবে তাঁকে রাজা বলে মানতে তারা রাজি ছিল। অবশেষে অবশ্য তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ভিন্ন আর উপায় রইল না। তারা তাদের নেতা উইলিয়মকে রাজমুকুট পরাতে চাইল, তিনি তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন না। এইরূপে ঘটনাচক্রে প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বে তাদের সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করতে হল। রাজতন্ত্রের প্রথা তখন এমনি বদ্ধমূল ছিল!

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সমর চলল বহুদিন ধরে, পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ এসে গেল। কিন্তু নেদারল্যাণ্ড্‌সের প্রকৃত যুদ্ধ চলেছিল ১৫৬৭ থেকে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জকে পরাজিত করতে না পেরে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ গুপ্তঘাতক দিয়ে তাঁকে হত্যা করালেন। তখনকার ইউরোপের নৈতিক অবস্থা এমনি ছিল যে, তিনি তাঁর হত্যার জন্যে প্রকাশ্যভাবে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। উইলিয়মকে হত্যা করার অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ

হয়েছিল। ১৫৮৪ সালে ষষ্ঠ চেষ্টা সফল হল, এবং এই মহাপুরুষ, যাঁকে সারা হল্যান্ডের লোক বলত 'পিতা উইলিয়ম,' নিহত হলেন। কিন্তু তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। ত্যাগ ও দুঃখ-ভোগের মধ্য দিয়ে ওলন্দাজ-সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেশের ও জাতির পক্ষে শুভকর। এতে শিক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধি হয়। এবং হল্যান্ড সবল আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে অবিলম্বে এক প্রধান নৌশক্তির স্থান পেল, এবং সুদূরে প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তারলাভ করল। হল্যান্ড থেকে পৃথক হয়ে বেলজিয়ম স্পেনের অধিকারভুক্তই থাকল।

ইউরোপের চিত্র সম্পূর্ণ করতে হলে জর্মনির দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত এ দেশে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ চলল, যার নাম ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে, এবং জর্মনির ক্ষুদে সর্দার ও ইলেক্‌টরেরা পরস্পরের সঙ্গে এবং সম্রাটের সঙ্গে লড়ে চলছিলেন। আর ফ্রান্সের ক্যাথলিক রাজা প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ নিয়ে গোলযোগের মাত্রা বৃদ্ধি করলেন। অবশেষে সুইডেনের রাজা গুস্টাভাস্ অ্যাডল্‌ফাস্— উত্তরাপথের সিংহ—এসে সম্রাটকে পরাজিত করে প্রোটেস্ট্যান্টদের বাঁচালেন। কিন্তু জর্মনির আর-কিছু অবশিষ্ট ছিল না। 'মার্সেনারি' অর্থাৎ বেতনভোগী সৈন্যেরা (যারা টাকার বিনিময়ে যে-কোনো পক্ষে লড়তে প্রস্তুত) ছিল ডাকাতের মতো। তারা লুঠতরাজ করে চলল। এমনকি সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষরাও সৈন্যদের বেতন এমনকি খাবার পর্যন্ত দিতে অসমর্থ হওয়ায় নিজেরাও লুটপাট আরম্ভ করলেন। এ অবস্থা চলল কতদিন জানো? তিরিশ বছর; তিরিশ বছর ধরে হত্যা আর ধ্বংসলীলা আর লুঠতরাজ। ব্যবসা বিশেষ কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। চাষেরও সেই অবস্থা। ফলে খাবারের পরিমাণ কমে চলল, অনাহার উপবাস বাড়ল। তার ফলে উদ্ভব হল আরও ডাকাতের, আরও বেশি লুণ্ঠন হতে লাগল। দেশ পেশাদারী বেতনভোগী সৈন্যদের শিক্ষাকেন্দ্রবিশেষ হয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে এ যুদ্ধ শেষ হল, সম্ভবত লুণ্ঠনের মতো কিছু অবশিষ্ট ছিল না বলে। কিন্তু জর্মনির আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে বহু বহু দিন কেটে গেল। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধি অনুসারে জর্মন-গৃহযুদ্ধের অবসান হল। এর ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট শক্তিহীন ছায়ায় মাত্র পরিণত হলেন। ফ্রান্স একটা বড়ো অংশ নিল—আল্‌সাস্। দু শো বছর রাখার পর নূতন এক জর্মনিকে এই আল্‌সাস্ ফিরিয়ে দিতে হল। আবার ১৯১৪-১৯১৮ অব্দের মহাযুদ্ধে ফিরে পেল। এইরূপে এই সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের লাভ হল। কিন্তু জর্মনিতে এখন আর-এক শক্তির অভ্যুত্থান হল, যার ফলে ফ্রান্সকে ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল; এই শক্তি হল প্রাশিয়া, যার অধিপতি ছিল হোহেন্‌জোলার্ন-রাজবংশ।

ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিপত্র অনুসারে সুইজারল্যান্ড ও হল্যান্ডের সাধারণতন্ত্র স্বীকৃত হল।

যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাহিনী! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই ছিল রেনেসাঁসের পরপরই ইউরোপের অবস্থা, যে রেনেসাঁসের সময় ললিতকলা ও সাহিত্যের অতখানি নবশক্তি প্রকাশিত হয়েছিল! ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলির তুলনা করে দেখিয়েছি, দেখিয়েছি ইউরোপে যে নবজাগরণের উন্মেষ হচ্ছিল তার চিহ্ন। পুরোনো বিধিনিয়মের মধ্য দিয়ে নূতন জীবনের অভ্যুদয় বেশ বোঝা যায়। নবজাত শিশু ও নবজাত সামাজিক বিধানের আগমনের আনুষঙ্গিক হচ্ছে প্রচুর দুঃখ, প্রচুর বেদনা। ভিত্তিতে যখন থাকে অর্থনৈতিক অস্থায়িত্ব তখন উপরে সমাজ ও রাজনীতি টলায়মান হয়। ইউরোপে যে নবজীবনের অভ্যুদয় হচ্ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এর চার দিকে ছিল বর্বরোচিত আচরণ। সে যুগের নীতি ছিল—'রাজ্যশাসনের বিজ্ঞান হল মিথ্যাচারের বিজ্ঞান'। সে কালের সমস্ত আবহাওয়া মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের বিষে বিষাক্ত, হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় দূষিত। অবাক হতে হয়, লোকে কী করে এ অবস্থা সহ্য করত!

১

ইংলণ্ডে রাজার প্রাণদণ্ড

২৯শে আগস্ট, ১৯৩২

এবারে ইংলণ্ডের ইতিহাস কিছুকাল ধরে আলোচনা করা যাক। এতক্ষণ পর্যন্ত ইংলণ্ডকে অনেকাংশে বাদ দিয়ে এসেছি, কারণ মধ্যযুগে সেখানে জানার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। এ দেশ ফ্রান্স বা ইতালির চেয়ে অনগ্রসর ছিল। তবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তার কিছু পরে কেম্‌ব্রিজের উদয় হয়। এই অক্সফোর্ড থেকেই ওয়াইক্লিফের উদ্ভব, যাঁর সম্বন্ধে তোমাকে আগেই বলেছি।

ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান আকর্ষণ হল পার্লামেণ্টের অভ্যুদয়। প্রাচীন কাল থেকেই রাজার ক্ষমতা সংক্ষেপ করার জন্যে অভিজাত-সম্প্রদায়ের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ১২১৫ সালে হল ম্যাগ্‌না কার্টা। অল্প পরে পার্লামেণ্টের অস্তিত্বের কিছু কিছু আরম্ভ হয়। আরম্ভ অবশ্য হয় একটু অদ্ভুতভাবে। বড়ো বড়ো লর্ড এবং বিশপরা সম্মিলিত হয়ে হাউজ অব্ লর্ড্‌স'এ পরিণত হয়। কিন্তু তার চেয়ে কালক্রমে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় একটি নির্বাচিত সভা, যার সভ্য ছিল নাইটরা এবং ছোটোখাটো ভূম্যধিকারীরা এবং নগরসমূহের জনকতক প্রতিনিধি। এই নির্বাচিত সভাই পরে হাউজ অব্ কমন্‌স্'এ পরিণত হয়। দুটি সভাই ছিল ভূম্যধিকারী এবং ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। হাউজ অব্ কমন্‌স্'এ পর্যন্ত সভ্যরা ছিল অল্পসংখ্যক ভূম্যধিকারী ও বণিক।

হাউজ অব্ কমন্‌সের বিশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। তারা রাজার কাছে তাদের নালিশ জানাত, এবং ধীরে ধীরে কর বসানোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। তাদের অনুমোদন ব্যতীত নূতন কর ধার্য করা অথবা আদায় করা কঠিন হওয়ায় রাজা এইসব কর ধার্য করার আগে তাদের অনুমোদন চাওয়ার রীতি প্রবর্তিত করলেন। টাকার ক্ষমতা যার হাতে থাকে সেই সবচেয়ে শক্তিমান। ফলে পার্লামেণ্ট, বিশেষ করে কমন্‌স্-সভার সম্মান এবং প্রতাপ, এই ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পেল। রাজা এবং কমন্‌স্-সভার মধ্যে প্রায়ই গোলমাল বাধত। তবু পার্লামেণ্ট ছিল দুর্বল জিনিষ, এবং টিউডর-শাসকরা প্রায় সর্বেসর্বা রাজা ছিলেন। কিন্তু টিউডরদের বুদ্ধি ছিল, তাই পার্লামেণ্টের সঙ্গে কলহ এড়িয়ে চলেছিলেন।

ইউরোপে যে ধর্মসংক্রান্ত তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়, সেটা থেকে ইংলণ্ড খুব বেঁচে গিয়েছিল। অবশ্য এখানেও অনেক কলহ, অনেক গোঁড়ামি দেখা গিয়েছিল, এবং ডাইনি-অপবাদে অসংখ্য স্ত্রীলোককে পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্তু ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে তুলনায় ইংলণ্ড ছিল শান্তিপূর্ণ। অষ্টম হেন্‌রির সঙ্গে দেশ প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ গ্রহণ করল। কিন্তু দেশীয় ক্যাথলিক বহু ছিল, এবং চরমপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্টেরও অভাব ছিল না। ইংলণ্ডের নূতন চার্চ হল এই দুয়ের মধ্যে একটি—নামে প্রোটেস্ট্যাণ্ট, কিন্তু সম্ভবত ক্যাথলিকগন্ধী। প্রকৃতপক্ষে এটা হল শাসনবিভাগের একটি দপ্তর, যার কর্তা হলেন রাজা স্বয়ং। রোম এবং পোপের সঙ্গে বিচ্ছেদ কিন্তু সম্পূর্ণ হল। এবং পোপবিরোধী অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে (তিনি ছিলেন অষ্টম হেন্‌রির মেয়ে) প্রাচ্যদেশ এবং আমেরিকার নূতন জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বাণিজ্যের যে নূতন সুযোগ হয়েছিল তা অনেককে প্রলুব্ধ করল। স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ নাবিকদের সাফল্য দেখে এবং ধনরত্নলাভের প্রত্যাশায় ইংলণ্ড সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করল। স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেক এবং ঐরকম কেউ কেউ জলদস্যুতে পরিণত হলেন, এবং তাঁদের কাজ হল আমেরিকা-প্রত্যাগত স্প্যানিশ জাহাজ লুট করা। তার পরে ড্রেক এক বিরাট কার্যভার গ্রহণ করলেন—পৃথিবীর প্রদক্ষিণ। সার ওয়াল্টার র‍্যালে আটলাণ্টিক অতিক্রম করে, বর্তমানে যে দেশের নাম

ইউনাইটেড্ স্টেট্স্, তার পূর্ব-উপকূলে বসতিস্থাপনের প্রয়াস পেলেন। ভার্জিন অর্থাৎ কুমারী রানী এলিজাবেথের সম্মানে এই দেশের নাম দেওয়া হল ভার্জিনিয়া। র‍্যালেই প্রথম আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে ধূমপানের অভ্যাস আমদানি করেন। তার পরে এল 'স্প্যানিশ আর্মাডা' এবং এই দর্পিত অভিযানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ইংলণ্ডকে অনেকখানি উৎসাহিত করল। এসব জিনিষের সঙ্গে রাজা ও পার্লামেণ্টের বিরোধের কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল এইটুকু ছাড়া যে, এসব ব্যাপার লোকের মনকে অন্যমনস্ক রাখল এবং বৈদেশিক ঘটনাবলীর উপর নিবন্ধ করল। কিন্তু টিউডরদের যুগেও অসন্তোষ দেশের অন্তরে অন্তরে প্রধূমিত হচ্ছিল।

এলিজাবেথীয় যুগ ইংলণ্ডের উজ্জ্বলতম কালসমূহের অন্যতম। এলিজাবেথ ছিলেন মহিমময়ী রানী, এবং তাঁর যুগে ইংলণ্ডে অনেক কর্মবীরের অভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু রাজ্ঞী এবং তার ভাগ্যান্বেষী বীরপুরুষদের চেয়ে বড়ো ছিলেন সে যুগের কবি এবং নাট্যকাররা, এবং তাঁদের সবার উপরে ছিলেন অমর কবি উইলিয়ম শেক্সপীয়র। তাঁর নাটকাবলী পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে আমরা কমই জানি। ইংরেজি ভাষাকে যাঁরা নানা বহুমূল্য মানিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে আমাদের আনন্দদান করেন, তিনি সেই অত্যুজ্জ্বল সাহিত্যনায়কদের অন্যতম। এলিজাবেথের যুগের ছোটো ছোটো গীতিকবিতারও এমন একটা আশ্চর্য মিষ্টতা আছে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। সরলতম, মধুরতম ভাষায় তারা খুশিমনে এগিয়ে চলে, এবং নিতান্ত দৈনন্দিন ঘটনার কথা তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে শুনিয়ে দেয়। লিটন্ স্ট্রেচি-নামক একজন ইংরেজ সমালোচক এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, "এলিজাবেথীয় যুগের সেই মহাপুরুষের দল, যাঁদের সবল সুষ্ঠু প্রাণ এক-পুরুষেই যাদুমন্ত্রের মতো ইংলণ্ডকে সারা পৃথিবীর মধ্যে নাটকীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য দান করেছে।"

আকবরের মৃত্যুর দু বছর আগে ১৬০৩ সালে এলিজাবেথের মৃত্যু হল। উত্তরাধিকার-সূত্রে তৎকালীন স্কটল্যাণ্ডের রাজা তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি হলেন প্রথম জেম্স্ এবং এইরূপে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড মিলিত হয়ে এক রাজ্যে পরিণত হল। বলপ্রয়োগে ইংলণ্ড যা করতে পারে নি তা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হল। প্রথম জেম্স্ রাজাদের ভগবন্দত্ত অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং পার্লামেণ্টকে ঘৃণা করতেন। তিনি এলিজাবেথের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না, এবং অতি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বাধল। তাঁরই রাজত্বকালে অনেক অদম্য প্রোটেস্ট্যাণ্ট চিরকালের জন্য স্বদেশ ইংলণ্ড ত্যাগ করে ১৬২০ সালে মেফ্লাওয়ার জাহাজে করে আমেরিকায় বসতি করতে চলে গেল। তারা প্রথম জেম্সের স্বেচ্ছাচারের বিরোধী ছিল, নূতন 'চার্চ অব ইংলণ্ড'এর প্রতি তাদের প্রীতি ছিল না, কারণ তাদের মতে এ চার্চ যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটেস্ট্যাণ্ট নয়। তাই তারা ঘরবাড়ি দেশ ছেড়ে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে অজানা নূতন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করল। উত্তর-উপকূলে একটি স্থানে তারা অবতরণ করল, তার নাম দেওয়া হল নিউ প্লিমথ্। তাদের পরে আরও অনেক ঔপনিবেশিক এল, এবং ক্রমে বসতি বেড়ে বেড়ে পূর্ব-উপকূল ভরে তেরটা উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হল। এইসব উপনিবেশই কালক্রমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু সে গল্পের এখনও দেরি আছে।

১৬২৫ সালে প্রথম জেম্সের পুত্র প্রথম চার্লস্ রাজা হওয়ার অল্পকাল পরেই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। ১৬২৮ সালে পার্লামেণ্ট 'পিটিশন অব্ রাইট' নামে এক আবেদন তাঁকে দিল, যা হল ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ দলিল। এই আবেদনে রাজাকে জানানো হয় যে, তিনি সর্বময়কর্তা নন, এবং অনেক কাজই তাঁর করার অধিকার নেই। তিনি বেআইনিভাবে কর ধার্য করতে অথবা লোককে কারারুদ্ধ করতে পারেন না। ভারতবর্ষের ইংরেজ ভাইস্রয় বিংশ শতাব্দীতে যা করেন—অর্থাৎ অর্ডিন্যান্স জারি এবং বিনা বিচারে লোককে কারারুদ্ধ করা—তা ইংলণ্ডের রাজা সপ্তদশ শতাব্দীতেও করতে পারতেন না।

কী করতে পারেন না-পারেন এইসব কথায় বিরক্ত হয়ে চার্ল্স্ পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভেঙে দিয়ে পার্লামেণ্ট ছাড়াই রাজ্যশাসন আরম্ভ করলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে তাঁর আর্থিক

অবস্থা এত খারাপ হল যে, আবার তাঁকে পার্লামেণ্ট আহ্বান করতে হল। বিনা পার্লামেণ্টে চার্ল্‌স্‌ যা করেছিলেন তাতে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং পার্লামেণ্ট তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। ১৬৪২ সালে, দু বছরের মধ্যে, গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। এক দিকে রাজা, তাঁর সহায় হল অভিজাত-সম্প্রদায় এবং সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ; অন্য দিকে পার্লামেণ্ট, তার সমর্থক হল ধনী বণিকরা এবং লণ্ডন-নগরের অধিবাসীরা। এই যুদ্ধ চলল অনেক বছর ধরে, অবশেষে পার্লামেণ্টের পক্ষে অলিভার ক্রম্‌ওয়েল নামে এক শক্তিশালী নেতার অভ্যুদয় হল। সংগঠন-কার্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিয়মানুবর্তিতার দিকে তাঁর ছিল প্রখর দৃষ্টি, এবং যে কারণ নিয়ে যুদ্ধ তার সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কার্লাইল ক্রম্‌ওয়েল সম্বন্ধে লিখেছেন, "যুদ্ধের ঘনঘটা বিপদের মধ্যে যখন আর কারও মনে আশার লেশও অবশিষ্ট ছিল না তখনও তাঁর মধ্যে আশার আলো জ্বলছিল আগুনের স্তম্ভের মতো।" ক্রম্‌ওয়েল নূতন সেনাবাহিনী গঠন করলেন, তার নাম দিলেন 'আয়রন্‌সাইড্‌স্‌,' এবং নিজের উৎসাহে তাদের উৎসাহিত করলেন। পার্লামেণ্ট-সেনাবাহিনীর 'পিউরিটান্‌রা' চার্ল্‌সের 'ক্যাভালিয়ার'দের সম্মুখীন হল। অবশেষে ক্রম্‌ওয়েলের জয় হল, এবং রাজা চার্ল্‌স্‌ পার্লামেণ্টের হাতে বন্দী হলেন।

পার্লামেণ্টের অনেক সভ্যই তখনও রাজার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ক্রম্‌ওয়েলের নবগঠিত সেনাবাহিনী সে কথায় কানও দিল না। এই বাহিনীর একজন সেনানী, কর্নেল প্রাইড, সরাসরি পার্লামেণ্ট-গৃহে ঢুকে এই ধরনের সভ্যদের বার করে দিলেন। এর নাম হল Pride's Purge অথবা প্রাইড কর্তৃক গৃহমার্জন। সমাধানটা একটু রূঢ় প্রকৃতির হল, এবং পার্লামেণ্টের পক্ষে প্রশংসনীয় হল না। পার্লামেণ্ট রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরোধী ছিল, কিন্তু এখন এল তাদের নিজেদের সৈন্যবাহিনীর স্বেচ্ছাচার, যা পার্লামেণ্টের আইনসম্মত কচ্‌কচির দিকে কোনো দৃষ্টি দিল না। বিপ্লবের পন্থাই এই।

হাউজ অব্‌ কমন্সের (যার নাম এখন হল রাম্প পার্লামেণ্ট) অবশিষ্ট সভ্যরা হাউজ অব্‌ লর্ড্‌সের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাজার বিচার করা স্থির করল, এবং তাঁকে 'অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক, খুনী, এবং দেশের শত্রু রূপে' প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এবং ১৬৪৯ সালে, যে লোকটি তাদের রাজা ছিল, এবং ভগবদ্দত্ত রাজশক্তির কথা বলত, লণ্ডনের হোয়াইট-হলে তার শিরশ্ছেদ করা হল।

রাজারা মরে অন্য লোকের মতোই। এমনকি ইতিহাসে তাদের অনেকেই হত্যাকারীর হাতে মরেছে। স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র হত্যাকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং অতীতে অনেক ইংরেজ রাজাই এমনিভাবে মরেছে। কিন্তু এই ব্যাপারটার নূতনত্ব এবং বিস্ময় হল এই যে, একটা নির্বাচিত সভা বিচারসভা গ্রথিত করে রাজার বিচার করে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল। আশ্চর্য এই যে, ইংরেজজাতি চিরদিনই রক্ষণশীল, এবং আকস্মিক পরিবর্তনের বিরোধী, তারাই কিনা শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক রাজার প্রতি কী আচরণ করতে হয় তাই দেখিয়ে দিল! কিন্তু এ কাজটা ঠিক ইংরেজ জনসাধারণের নয়, এটা হল ক্রম্‌ওয়েলের অধীনে নূতন 'আয়রনসাইড্‌স্‌' সেনাবাহিনীর কীর্তি।

ইউরোপের যাবতীয় সিজার এবং প্রিন্স এবং ক্ষুদে রাজারা বিষম আঘাত পেলেন। সাধারণ প্রজারা যদি এইরকম মাথা-গরম হয়ে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে আরম্ভ করে, তা হলে? তাঁদের অনেকেই ইংলণ্ড আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তা তখন আর কোনো অকর্মণ্য রাজা নয়। ইতিহাসে ইংলণ্ড এখন প্রথম সাধারণতন্ত্র, এবং ক্রম্‌ওয়েল ও তাঁর সৈন্যবাহিনী তার রক্ষক। ক্রম্‌ওয়েল ছিলেন মোটা-মুটি ডিক্টেটর, অর্থাৎ রাজ্যের সর্বেসর্বা। তাঁকে বলা হত 'লর্ড প্রোটেক্টর'—মহারক্ষক। তাঁর কঠোর সুশাসনে ইংলণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পেল, এবং তার নৌবাহিনী ওলন্দাজ, ফরাসি এবং স্প্যানিশ নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করল। এই প্রথম ইংলণ্ড ইউরোপের প্রধান নৌশক্তির স্থান পেল।

কিন্তু ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র হল স্বল্পকালস্থায়ী, প্রথম চার্ল্‌সের মৃত্যুর পর মাত্র এগারো বছর। ১৬৫৮ সালে ক্রম্‌ওয়েলের মৃত্যু হল, এবং দুই বৎসর পরে সাধারণতন্ত্রের পতন ঘটল।

প্রথম চার্লসের ছেলে, যিনি বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, ইংলণ্ডে ফিরে এসে সাদরে গৃহীত হলেন, এবং দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌ রূপে সিংহাসন গ্রহণ করলেন। এই দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌ ছিলেন নীচ এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তি, এবং তাঁর ধারণা ছিল রাজা হওয়ার অর্থ বিলাসব্যসনে কালযাপন করা। কিন্তু তাঁর এটুকু বুদ্ধি ছিল যে, পার্লামেণ্টের বেশি বিরুদ্ধাচরণ না করাই ভালো। আসলে তিনি ফরাসি-রাজের বেতনভোগী ছিলেন। ক্রমওয়েলের সময়ে ইংলণ্ড যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল তার বিচ্যুতি ঘটল। এমনকি ওলন্দাজরা টেম্‌স্‌ নদীতে এসে ইংলণ্ডের নৌবাহিনী পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

চার্লসের পরে তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ রাজা হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধল। জেম্‌স্‌ নিষ্ঠাবান্‌ ক্যাথলিক ছিলেন, এবং তিনি ইংলণ্ডে পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ জাতির ধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণাই থাক্‌-না কেন, আর সে ধারণা যতই অস্পষ্ট হোক-না কেন, একটা বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চয় ছিল—পোপ এবং পোপাবিধির প্রতি বিদ্বেষভাব। এই বিদ্বেষভাবের বিরুদ্ধে জেম্‌সের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, এবং পার্লামেণ্টকে চটানোর ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে হল।

আবার রাজার সঙ্গে বিরোধে পার্লামেণ্টের জয় ঘটল, এবং এবার বিনা গৃহযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে। কিন্তু ইংলণ্ড আর সাধারণতন্ত্রে পরিণত হল না। লোকে বলে ইংরেজজাতি মনিব ভালোবাসে, এবং তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে রাজকীয় সমারোহ। অতএব পার্লামেণ্ট নূতন রাজার খোঁজ করতে লাগল, এবং অরেঞ্জ-রাজবংশে একজনের সাক্ষাৎ পেল। শতবর্ষ আগে স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডসের যুদ্ধে এই পরিবার থেকেই সে সংগ্রামের নেতা William the Silent, অথবা মৌন উইলিয়মের উদ্ভব হয়েছিল। অরেঞ্জের প্রিন্স আর-এক উইলিয়মকে পাওয়া গেল, যাঁর সঙ্গে ইংরেজ-রাজবংশের মেরির বিবাহ হয়েছিল। এইরূপে উইলিয়ম ও মেরি যুক্তভাবে ১৬৮৮ সালে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য এইবার অবিসংবাদী হল, এবং এই বিপ্লবের ফলে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্বাচকদের হাতে ক্ষমতার আগমন সম্পূর্ণ হল। সেদিন থেকে আর কোনো ব্রিটিশ রাজা অথবা রানী পার্লামেণ্টের কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করতে সাহস পান নি। অবশ্য সোজাসুজি বিরোধ না বাধিয়েও ষড়যন্ত্রের নানাবিধ উপায় আছে, এবং অনেক ব্রিটিশ রাজাই সে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

পার্লামেণ্ট এখন হল সর্বময় কর্তা। কিন্তু মনেও কোরো না যে, এ পার্লামেণ্ট প্রকৃতই ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করত। জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিল এর অতি সামান্য এক অংশ। হাউজ অব্‌ লর্ডসের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এরা ছিল বড়ো বড়ো ভূম্যধিকারী এবং বিশপ। এমনকি হাউজ অব্‌ কমন্সও ছিল ধনীর সংঘ। হয় জমির মালিক, না-হয় বড়ো বড়ো সদাগর। খুব কম লোকেরই ভোটের অধিকার ছিল। এক শো বছর আগে পর্যন্ত তথাকথিত 'পকেট বরো'র সংখ্যা ছিল অগণ্য, অর্থাৎ যেসব 'বরো' থেকে নির্বাচন কারও না কারও পকেট বা অর্থ-প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করছে। এমনও হতে পারে যে, ঐরকম একটা নির্বাচনস্থলে ভোটার-সংখ্যা ছিল এক কিংবা দুই। ১৭৯৩ সালে নাকি ১৬০ জন লোক হাউজ অব্‌ কমন্সে ৩০৬ জন সভ্য নির্বাচিত করেছিল। ওল্ড্‌ সেরাম্‌ নামক এক পল্লীগ্রাম থেকে পার্লামেণ্টে দুজন সভ্য নির্বাচিত হত। ফলে দেখতে পাচ্ছ যে, অধিকাংশ লোকেরই ভোট ছিল না এবং পার্লামেণ্টে তাদের কোনো প্রতিনিধিও যেত না। হাউজ অব্‌ কমন্সকে মোটেই জননির্বাচিত-সভা বলা চলত না। শহরে শহরে যে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল, এ সভা তাদের পর্যন্ত প্রতিনিধিমূলক ছিল না। পার্লামেণ্টের আসন কেনাবেচা চলত, এবং ঘুষ চলত অবাধে। ১৮৩২ সাল অর্থাৎ এক শো বছর আগে পর্যন্ত এইরকম চলল, তার পরে তুমুল আন্দোলনের পরে 'রিফর্ম বিল' পাশ হল, যার ফলে অধিকসংখ্যক লোকের হাতে ভোটাধিকার এল।

অতএব দেখছ, রাজার উপর পার্লামেণ্টের জয়ের অর্থ মুষ্টিমেয় জনকতক ধনী ব্যক্তির জয়। ইংলণ্ডের শাসনভার ছিল প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় জনকয়েক ভূম্যধিকারী এবং বণিকের ছিটেফোঁটার হাতে। অন্যসমস্ত শ্রেণীর, অর্থাৎ প্রায় সম্পূর্ণ জাতির, এ বিষয়ে কোনো অধিকার ছিল না।

তোমার মনে পড়তে পারে, স্পেনের সঙ্গে সংগ্রামের পর যে ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্রের উদ্ভব হয়, তাও ছিল ধনীর সাধারণতন্ত্র।

উইলিয়ম ও মেরির পরে মেরির ছোটো বোন অ্যান্ ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হলেন। ১৭১৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে আবার পরবর্তী রাজা নিয়ে মুশকিল বাধল। অবশেষে রাজা-নির্বাচন নিয়ে পার্লামেণ্টকে জর্মানি পর্যন্ত ধাওয়া করতে হল। তৎকালীন ইলেক্টর অব হ্যানোভারকে (হ্যানোভার নামক জর্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা) প্রথম জর্জ পদবীতে সিংহাসনে বসানো হল। তাঁর নির্বাচনের কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি ছিলেন স্থূলবুদ্ধি, এবং চালাকচতুর পার্লামেণ্টের কাজে হস্তক্ষেপকারী রাজার চেয়ে বোকা রাজাই তাঁদের অধিক মনঃপূত হল। প্রথম জর্জ ইংরেজি পর্যন্ত বলতে পারতেন না! এমনকি তাঁর ছেলে দ্বিতীয় জর্জও ইংরেজিতে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এইরূপে ইংলণ্ডে হ্যানোভার-রাজবংশ স্থাপিত হল, এবং এখনও তার অস্তিত্ব আছে। এ রাজবংশ রাজত্ব করছে বললে ভুল করা হবে, কারণ রাজত্ব করার মালিক পার্লামেণ্ট।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে অনেক বিরোধ চলেছিল। এলিজাবেথ ও প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে আয়ার্ল্যাণ্ড-জয়ের চেষ্টা, তার ফলে বিদ্রোহ ও হত্যালীলা সংঘটিত হয়। উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডে আল্‌স্টারে জেম্‌স্ প্রচুর পরিমাণে ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এইসব স্থানে বসবাস করার জন্যে স্কটল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের আমদানি করলেন। সেই সময় থেকে বরাবর প্রোটেস্ট্যাণ্ট ঔপনিবেশিকরা সেইখানেই রয়ে গেছে এবং আয়ার্ল্যাণ্ড দু ভাগে বিভক্ত হয়েছে—দেশীয় আইরিশ এবং স্কট ঔপনিবেশিক, রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যাণ্ট। এই দু পক্ষে প্রচণ্ড বিদ্বেষ বর্তমান, এবং বলা বাহুল্য, ইংলণ্ড এই বিদ্বেষভাব থেকে লাভবান হয়েছে। চিরকালই শাসকরা দু পক্ষে বিরোধ ঘটিয়ে শাসন করা পছন্দ করে এসেছে। এখন পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল আল্‌স্টার-সমস্যা।

ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের সময় আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরেজদের অনেককে হত্যা করা হয়েছিল। এর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিলেন ক্রম্‌ওয়েল; আইরিশদের দলে দলে হত্যা করে; এবং আজ পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘটনা আইরিশদের মনে জাগরূক আছে। তার পরে আরও যুদ্ধ হয়, সন্ধিও হয়, সে সন্ধি ভঙ্গ করে ইংরেজরা। আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্দশার ইতিহাস দীর্ঘ বেদনার কাহিনী।

গালিভার্‌স্ ট্রাভ্‌ল্‌স্ গ্রন্থের লেখক জোনাথান সুইফ্‌ট্ এই সময়ের লোক (১৬৬৭-১৭৪৫)। শিশুপাঠ্য বইয়ের মধ্যে এই বইয়ের স্থান অতি উচ্চে, কিন্তু আসলে, এ হল তৎকালীন ইংলণ্ডের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক রচনা। ডানিয়েল ডেফো, 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'র লেখক, সুইফ্‌টের সমসাময়িক ছিলেন।

৮৮

বাবর

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

এইবার ভারতে ফিরে আসা যাক। আমরা ইউরোপে কাটিয়েছি অনেকক্ষণ, অনেক চিঠিতে ষোড়শ আর সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের যুদ্ধ, বিপ্লব প্রভৃতির কারণাদি বুঝতে চেষ্টা করেছি। জানি নে, ইউরোপের এ যুগ সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়েছে। যে ধারণাই হোক, তা যে বহুবিধ ধারণার সংমিশ্রণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তখন ইউরোপ ছিল একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণের স্থান। অনবরত বর্বর যুদ্ধ, ধর্মের অত্যধিক গোঁড়ামি, অতুলনীয় নিষ্ঠুরতা, রাজাদের ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা, দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাত-সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের নির্লজ্জ শোষণ, এই ছিল তখনকার ইউরোপ। চীন ছিল অনেক বেশি অগ্রসর, সুসংস্কৃত, ললিতকলাকুশল,

উদার, এবং মোটামুটি শান্তিপূর্ণ দেশ। ভারতের বিরোধ ও অবনতি সত্ত্বেও ভারত তুলনায় অনেক ভালো ছিল।

কিন্তু ইউরোপেরও অন্য দিক ছিল, তার প্রীতিকর দিক। আধুনিক বিজ্ঞানের পত্তনের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, এবং জনসাধারণের স্বাধীনতার আদর্শ বৃদ্ধি পেয়ে রাজার সিংহাসন টলাতে আরম্ভ করেছিল। এইসবের নীচে, এবং এইসব এবং আরও অনেক কর্মতৎপরতার কারণ ছিল পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতি। বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠল, বণিকরা সেখানে দূরবর্তী দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যস্ত, কারুশিল্পীদের কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ। সমস্ত ইউরোপে কারুশিল্পীদের সমিতি গড়ে উঠল। এইসব বণিক এবং ব্যবহারিক কারুশিল্পীরা হল বুর্জোয়া, নূতন মধ্যশ্রেণী। এই শ্রেণীর অগ্রগতি আরম্ভ হল, কিন্তু এর সামনে পড়ল অনেক বাধা—রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয়। রাজনীতি এবং সামাজিক রীতির মধ্যে প্রাচীন সামন্ত-প্রথার খানিকটা তখনও অবশিষ্ট আছে। এই প্রথা হল এমন এক অতীত যুগের, যা নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না, এবং শিল্প-বাণিজ্যকে ব্যাহত করে। ফিউডাল লর্ড অর্থাৎ ভূম্যধিকারীরা নানারকম কর গ্রহণ করতেন যা বণিকশ্রেণীকে বিরক্ত করে তুলল। তাই মধ্যশ্রেণী এই তথাকথিত ক্ষমতা দূর করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল। রাজা নিজেও এইসব অভিজাতদের পছন্দ করতেন না, কারণ তারা তাঁর অধিকারেও হস্তক্ষেপ করত। ফলে রাজা এবং মধ্যশ্রেণী মিলে অভিজাত-সম্প্রদায়কে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করলেন। এইরূপে রাজার শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন।

এইরূপেই এটাও অনুভূত হল যে তৎকালীন ইউরোপে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথা এবং প্রচলিত জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস শিল্প ও বাণিজ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ধর্ম ছিল নানারূপে সামন্ত-প্রথার সঙ্গে যুক্ত, এবং চার্চের সম্পত্তি দেখলে বোঝা যায়, তারাই ছিল সবচেয়ে বড়ো ভূম্যধিকারী। অনেক বছর ধরে অনেকে রোমান চার্চকে সমালোচনা করে এসেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হয় নি। এখন কিন্তু ক্রমবর্ধমান মধ্যশ্রেণী পরিবর্তনের পক্ষপাতী হওয়াতে সংস্কারের জন্যে আন্দোলন বিরাট রূপ গ্রহণ করল।

এইসব পরিবর্তন, তা ছাড়া আগে যেসব পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সমস্তই হল মধ্যশ্রেণীকে অগ্রবর্তী করার জন্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিভিন্ন অংশ। পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলিতে পরিবর্তন প্রায় একইরূপে এসেছিল, কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে। পূর্ব-ইউরোপ এই সময়ে, এবং বহুকাল পর পর্যন্ত শিল্পবিষয়ে অনগ্রসর ছিল, তাই সেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

চীন এবং ভারতেও শিল্পী-সংঘ ছিল, আর ছিল বহু কারুশিল্পী এবং মিস্ত্রি। ব্যবহারিক শিল্প পশ্চিম-ইউরোপের মতো, এবং সাধারণত তার চেয়ে বেশি, অগ্রসর ছিল। কিন্তু এই কালে ইউরোপে যেমন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল, এসব স্থানে তা হয় নি, এবং জনস্বাধীনতার জন্যে কোনো চেষ্টাও দেখা যায় নি। দুই দেশেই গ্রামে নগরে স্থানীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতার দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। রাজার ক্ষমতা অথবা একনায়কতন্ত্র নিয়ে লোকে মাথা ঘামাত না, যতক্ষণ না তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। দুই দেশেই একটা সমাজিক গঠন ছিল, যার অস্তিত্ব ছিল বহুদিন ধরে, এবং ইউরোপের যে-কোনো সামাজিক বিধিব্যবস্থার থেকে তার স্থায়িত্ব ছিল বেশি। সম্ভবত এই অতিরিক্ত স্থায়িত্বের ফলেই উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল। বিরোধ ও অবনতির ফলে মোগল বাবর কর্তৃক উত্তর-ভারত বিজিত হয়েছিল। জনসাধারণ তাদের প্রাচীন আর্য স্বাধীনতার আদর্শ ভুলে গিয়ে সর্বতোভাবে যে-কোনো শাসকের বশ্য ক্রীতদাসে পরিণত হতে প্রস্তুত ছিল। এমনকি মুসলমানরা, যারা এ দেশে নূতন জীবন এনেছিল, তারাও এইরকম দাসত্বমনোভাবের বশবর্তী হয়েছিল বলে মনে হয়।

প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতায় যে নব জীবনীশক্তির অভাব ছিল সেই জীবনীশক্তির অধিকারী হয়ে ইউরোপ এগিয়ে চলল এবং প্রাচ্যের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রবর্তী হল। তার সন্তানরা পৃথিবীর দূরতম দেশে ভ্রমণ করল। বাণিজ্য ও ঐশ্বর্যের আকর্ষণে তার নাবিকরা এশিয়া ও

আমেরিকায় গেল। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াতে পোর্তুগীজরা আরবদের মালাক্কা-সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটাল। ভারতের উপকূলে পূর্ব-সমুদ্রের সর্বত্র তাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু মশলা-ব্যবসায়ে তাদের অপ্রতিহত অধিকারের শীগ্‌গিরই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াল—দুই নবোত্থিত নৌশক্তি, হল্যান্ড ও ইংলন্ড। প্রাচ্যদেশ থেকে পোর্তুগাল বিতাড়িত হল এবং তার প্রাচ্য বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। পোর্তুগীজদের স্থান কতকটা ওলন্দাজরা গ্রহণ করল এবং পূর্ব-সাগরের অনেক দ্বীপ তাদের হাতে এল। ১৬০০ সালে রানী এলিজাবেথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে লণ্ডনের এক বণিক-সম্প্রদায়কে ভারতে বাণিজ্যের জন্য এক সনদ দিলেন, এবং দু বছর পরে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হল। এইরূপে এশিয়াতে ইউরোপের লুটের যুগের পত্তন হল। বহুকাল ধরে এ অবস্থা শুধু মালয় এবং প্রাচ্য দ্বীপসমূহে সীমাবদ্ধ থাকল। চীন ছিল ইউরোপের পক্ষে অতি প্রবল, তার প্রাবল্যের কারণ মিঙ-রাজত্ব এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রবলপ্রতাপ মাঞ্চু-আধিপত্য। জাপান একটু বেশি দূর এগিয়েছিল। ১৬৪১ সালে দেশ থেকে সমস্ত বৈদেশিক বিতাড়িত করে সম্পূর্ণরূপে তার দ্বার রুদ্ধ করে দিল। আর ভারতবর্ষ? ভারত সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলা হয় নি, এখন সেটা পুরিয়ে নিতে হবে। আমরা দেখব, নূতন মোগল-রাজবংশের অধীনে ভারতে প্রতাপশালী শাসনের গঠন হয়েছিল, এবং ইউরোপ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা অথবা বিপদ প্রায় ছিলই না। কিন্তু সমুদ্রে ইউরোপের তখন প্রাবল্য আরম্ভ হয়েছে।

এবার ভারতে ফিরে আসি। ইউরোপ, চীন, জাপান ও মালয়েশিয়াতে আমরা সপ্তদশ শতাব্দী পার হয়ে প্রায় অষ্টাদশে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু ভারতে এখনও আমরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বাবরের আগমনের সময়ে।

১৫২৬ সালে দিল্লির দুর্বল এবং হেয় আফগান সুলতানের উপর বাবরের জয়লাভের সঙ্গে ভারতে নূতন যুগ, নূতন সাম্রাজ্যের আরম্ভ হল—মোগল-সাম্রাজ্য। মাঝখানে অল্প একটু ছেদ ছাড়া এর অস্তিত্ব ছিল ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত ১৮১ বছর ধরে। এই কয় বছর ছিল মোগল-সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও যশের যুগ, যখন মোগল-সম্রাটদের খ্যাতি এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল। এই রাজবংশের ছয়জন বড়ো শাসক ছিলেন, তাঁদের শেষ হলে সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এইসব বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে শিখ, মারাঠা এবং অন্য অনেকে নূতন রাজ্য তৈরি করে নিল। তাদের পরে এল ব্রিটিশ জাতি, যারা কেন্দ্রশক্তির ভাঙনদশার এবং দেশের গোলমালের সুযোগ নিয়ে ক্রমে রাজ্য সংস্থাপন করল।

বাবর সম্বন্ধে আগেই কিছু বলেছি। তাঁর জন্ম হয়েছিল চেঙ্গিস এবং তৈমুরের বংশে, এবং তাঁদের বিরাট প্রতিভা এবং যোদ্ধৃগুণের অংশ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু চেঙ্গিসের যুগের চেয়ে মঙ্গোলরা সভ্যতায় অগ্রসর হয়েছিল, এবং বাবর ছিলেন অতি মার্জিতরুচির অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে সম্প্রদায়গত মনোভাব, ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামি কিছুই ছিল না, এবং তিনি তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মতো ধ্বংসের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর শিল্পে ও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিজেও পারশ্যভাষায় সুকবি ছিলেন। তিনি ফুল এবং উদ্যান ভালোবাসতেন, এবং ভারতবর্ষের তপ্ত গ্রীষ্মের মধ্যে তিনি প্রায়ই মধ্য-এশিয়ার কথা ভাবতেন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখে গেছেন, "ফারগানায় ভায়লেট ফুল চমৎকার, টিউলিপ ও গোলাপের স্তূপ সেখানে।"

পিতার মৃত্যুর পরে বাবর যখন সমরকন্দের রাজা হলেন তখন তিনি এগারো বছরের বালক মাত্র। এই রাজার কাজ বড়ো সহজ ছিল না। চারি দিকে তাঁর শত্রু ছিল। এইরূপে, যে বয়সে ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় যায় সেই বয়সে তাঁর তলোয়ার-হাতে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। তিনি একবার সিংহাসন হারিয়ে তা পুনরধিকার করলেন, এবং তাঁর কর্মবহুল জীবনে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবু তিনি সাহিত্য, কাব্য ও ললিতকলার চর্চা করার সময় পেয়েছিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যায়। কাবুল অধিকার করে তিনি সিন্ধুনদ পার হয়ে ভারতে এলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু নবাবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্র (কামান ইত্যাদি), যা ইউরোপ ও পশ্চিম-এশিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা তাঁর ছিল। এই ক্ষুদ্র সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর

কাছে বিরাট আফগান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল, এবং বিজয়লক্ষ্মী বাবরকে বরণ করলেন। কিন্তু তাঁর বিপদের তাতেও শেষ হল না। বহুবার তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্ভাবনা ঘটেছে। একবার বিষম বিপদের সম্মুখে তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে উত্তরদিকে পশ্চাদপসরণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দৃঢ় ধাতুতে তৈরি ছিল তাঁর দেহ-মন; তাই তিনি বললেন, পলায়নের চেয়ে মৃত্যুকে তিনি শ্রেয় মনে করেন। তিনি সুরাসক্ত ছিলেন, কিন্তু জীবনের এই সংকটে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, জীবনে আর মদ খাবেন না, এবং তাঁর সমস্ত সুরাপাত্র ভেঙে ফেললেন। তাঁর জয় হল, এবং সুরাত্যাগের প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করলেন।

ভারত-আগমনের চার বছরের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হল। এই চার বছর ধরেই তিনি যুদ্ধ করেছেন, বিশ্রাম পান নি, ফলে ভারতকে জানার সুযোগের অভাবে তিনি আগন্তুকই রয়ে গিয়েছিলেন। আগ্রায় তিনি একটি রমণীয় রাজধানী পত্তন করেন, এবং কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ে একজন বিখ্যাত স্থপতির জন্যে লোক পাঠান। এই সময় সুলেমান দি ম্যাগ্‌নিফিশেণ্ট কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌-নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। সিনান ছিলেন একজন যশস্বী তুর্কি-স্থপতি, এবং তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য ইউসুফ্‌কে ভারতে পাঠিয়ে দেন।

বাবর তাঁর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এবং তাঁর এইসব সুখপাঠ্য বই-এ আসল মানুষটির অনেকটা জানা যায়। তিনি হিন্দুস্থান এবং সেখানকার জন্তু, ফুল, ফল, গাছ, এমনকি ব্যাঙ সম্বন্ধেও লিখে গেছেন। তিনি তাঁর স্বদেশের তরমুজ আর আঙুর আর ফুলের সম্বন্ধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গেছেন। আর তিনি এ দেশের মানুষগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন। তাঁর মতে তাদের একটাও গুণ নেই। সম্ভবত তিনি চার বছরে তাদের ভালো করে চেনার সুযোগ পান নি, এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এই নূতন দেশজয়ীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকত। এও হতে পারে যে একজন আগন্তুকের পক্ষে অন্য এক জাতির জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যাই হোক, তিনি দেশশাসক আফগানজাতি অথবা অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে প্রশংসা করার মতো একটি জিনিষও খুঁজে পান নি। তিনি সূক্ষ্মদ্রষ্টা, এবং আগন্তুকের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব বাদ দিলেও তাঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায়, উত্তর-ভারত তখন অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল। তিনি দক্ষিণ-ভারতে মোটেই যান নি।

বাবর লিখেছেন, "হিন্দুস্থান-সাম্রাজ্য বিস্তৃত, জনবহুল এবং সমৃদ্ধিশালী। পূর্বে, দক্ষিণে, এমনকি পশ্চিমেও এ স্থান সমুদ্রবেষ্টিত। এর উত্তরে কাবুল, গজনি ও কান্দাহার। সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লি।" লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভারত বহু ভাগে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাবর হিন্দুস্থানকে একীভূত রূপেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাসে বরাবরই ভারতের একত্বের ধারণা পাওয়া যায়।

বাবর ভারত-বর্ণনায় আরও লিখেছেন :

"এ দেশ বড়োই মনোরম। অন্য সব দেশের সঙ্গে তুলনায় এটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এর পাহাড় এবং নদী, বন এবং সমভূমি, এর জীবজন্তু এবং গাছপালা, এর অধিবাসী এবং ভাষা, এর ঝড় এবং বৃষ্টি, সবই অন্যরকম।...... সিন্ধুদেশ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ পাথর, ভ্রাম্যমান উপজাতি, লোকদের আচার-ব্যবহার, সবই হিন্দুস্থানের; এমনকি সরীসৃপও অন্যরকম।...... হিন্দুস্থানের ব্যাঙও লক্ষ্য করার মতো। যদিও আমাদের দেশী ব্যাঙেরই মতো, তবু তারা জলের উপরে ছ-সাত গজ দৌড়ে যেতে পারে।"

তার পরে তিনি হিন্দুস্থানের জীবজন্তু, ফুল, গাছপালা এবং ফলের বর্ণনা দিয়েছেন। তার পরে অধিবাসীদের কথা :

"হিন্দুস্থানে প্রীতিকর কিছু নেই বললেই হয়। অধিবাসীরা দেখতে সুশ্রী নয়। বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন অথবা অবাধ মেলামেশার আনন্দের সঙ্গে তারা অপরিচিত। তাদের প্রতিভা নেই, মনের বিচার-বিবেচনার শক্তি নেই, ব্যবহারে ভদ্রতা নেই, লোকের প্রতি সহানুভূতি অথবা সদয়ভাব নেই, যন্ত্রের সাহায্যে অথবা অন্যরূপে শিল্পকলার উন্নতি করার কোনো ক্ষমতা নেই, স্থাপত্যবিদ্যার জ্ঞান অথবা নৈপুণ্য নেই। তাদের ভালো ঘোড়া নেই, ভালো মাংস নেই, আঙুর অথবা খরমুজ নেই, ভালো

ফল নেই, বরফ কিংবা ঠাণ্ডা জল নেই, ভালো খাবার নেই, বাজারে রুটি নেই, স্নানাগার নেই, বিদ্যাপীঠ নেই, মোমবাতি নেই, মশাল নেই, বাতিদান নেই।”

জানতে ইচ্ছে করে, তা হলে আছে কী? বাবর নিশ্চয় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এসব কথা লিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন :

“হিন্দুস্থানের প্রধান গুণ হল, দেশটা খুব বড়ো এবং অজস্র পরিমাণে সোনা-রুপো পাওয়া যায়।......হিন্দুস্থানের আর-একটা সুবিধা হল যে, প্রতি ব্যবসাতে কারিগরদের সংখ্যা অগণ্য। যে-কোনো কাজের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে লোক পাওয়া যায়, যারা পিতৃপিতামহক্রমে তাদের ব্যবসা শিখেছে।”

বাবরের স্মৃতিকথার থেকে অনেকখানিই উদ্ধৃত করে দিলাম। যে-কোনোরূপ বর্ণনার চেয়ে এইরকম একটা বইতে একটা মানুষের সম্বন্ধে ঢের বেশি পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

বাবর ১৫৩০ সালে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে একটা সুপরিচিত কাহিনী আছে। তাঁর ছেলে হুমায়ুন যখন পীড়িত হয়ে পড়েন তখন স্নেহাসক্ত পিতা বাবর নাকি নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। শোনা যায়, এই ঘটনার পরে হুমায়ুন সেরে ওঠেন এবং বাবর কয়েকদিন পরেই মারা যান।

বাবরের দেহ কাবুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর এক প্রিয় উদ্যানে সমাহিত করা হয়। যে ফুলের জন্যে তাঁর এত আকুল আকাঙ্ক্ষা সেই ফুলের দেশেই তিনি অবশেষে ফিরে গেলেন।

৮৯

আকবর

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

বাবর তাঁর সেনাপতিত্বে এবং সামরিক প্রতাপের সাহায্যে উত্তর-ভারতের একটি বড়ো অংশ অধিকার করেন। তিনি দিল্লির আফগান সুলতানকে পরাজিত করেন, এবং পরে আরও একটি কঠিনতর কাজ সম্পাদন করেন; সেটা হচ্ছে, রাজপুত-ইতিহাসের একজন বিখ্যাত বীর, পরমশক্তিমান যোদ্ধা রাণা সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বে মিলিত রাজপুতদের বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। কিন্তু পুত্র হুমায়ুনকে তিনি বড়ো কঠিন কাজ দিয়ে গেলেন। হুমায়ুন শিক্ষিত এবং মার্জিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বাপের মতো যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁর নবলব্ধ সাম্রাজ্যের সর্বত্র গোলমাল বাধল, এবং ১৫৪০ সালে, বাবরের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে, শের খাঁ নামে বিহারের একজন আফগান রাজা তাঁকে পরাজিত করে ভারত থেকে বিতাড়িত করলেন। এইরূপে মহা-মোগলবংশের দ্বিতীয় সম্রাট যাযাবরবৃত্তি-অবলম্বনে বাধ্য হলেন, তাঁর অদৃষ্টে জুটল নিরন্তর আত্মগোপন এবং বহুতর দুর্দশা। রাজপুতানার মরুভূমিতে এইরকম ভ্রমণের সময়ে ১৫৪২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর পত্নী একটি পুত্র প্রসব করলেন। এই ছেলের মরুভূমিতে জন্ম হলেও কালে ইনি সম্রাট আকবর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করে সেখানকার শাহ্ তামাস্প-এর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতে শের খাঁর অবিসংবাদী প্রাধান্য ঘটল এবং তিনি পাঁচ বছর শের শাহ্ নাম নিয়ে রাজত্ব করলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর কর্মতৎপরতার অনেক নিদর্শন দিয়েছিলেন। সংগঠন-কার্যে তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ, এবং তাঁর শাসনবিধি ছিল কর্মঠ ও নিপুণ। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি কৃষিজীবীদের দেয় কর নির্ধারণের জন্যে উন্নততর ভূমিরাজস্ববিধির প্রবর্তন করার সময় পেয়েছিলেন। তিনি মানুষ হিসেবে ছিলেন নির্মম ও কঠিন, কিন্তু ভারতের যাবতীয় আফগান-অধিপতির মধ্যে এবং অন্য অনেকের চেয়েও তিনি ছিলেন নিশ্চিতরূপে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু

সচরাচর দক্ষ একনায়কতন্ত্রের ফলে যা হয়, তিনিই ছিলেন শাসনবিভাগের সর্বেসর্বা, ফলে তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

হুমায়ুন এই ভগ্নদশার সুযোগ নিয়ে ১৫৫৬ সালে সসৈন্যে পারশ্য থেকে ফিরে এলেন। তিনি জয়ী হলেন এবং দীর্ঘ ষোলো বছরের অবসানে পুনরায় দিল্লির সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়; ছ মাস পরে তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন।

শের শাহ্ এবং হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের তুলনামূলক আলোচনা বেশ শিক্ষাপ্রদ। আফগান রাজার কবর বিহারে সাসারাম-নামক স্থানে, আসল মানুষটির মতোই কঠোর শক্তিমান তার গঠন। হুমায়ুনের কবর দিল্লিতে; এটার গঠন সুদৃশ্য এবং শিল্পসংগত। এই দুটি প্রস্তরগৃহ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সাম্রাজ্যের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বেশ ভালো ধারণা করা যায়।

আকবরের বয়স সে সময়ে মাত্র তেরো। তাঁর পিতামহের মতো তিনিও সিংহাসন পেয়েছিলেন অল্প বয়সে। বৈরাম খাঁ, অথবা খাঁ-বাবা নামে তাঁর একজন অভিভাবক ও রক্ষক ছিল। কিন্তু বছর-চারেকের মধ্যেই আকবর অন্য লোকের অভিভাবকত্বে অতিষ্ঠ হয়ে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

১৫৫৬ সালের প্রারম্ভ থেকে ১৬০৫ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর আকবর ভারত শাসন করেছিলেন। এটা ছিল ইউরোপে নেদারল্যান্ড্‌সের বিদ্রোহ এবং ইংলণ্ডে শেক্সপীয়রের যুগ। আকবরের নাম ইতিহাসের পাতায় অনেকের উপরে, এবং কয়েক বিষয়ে তিনি অশোককে মনে করিয়ে দেন। আশ্চর্য এই যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতের এক বৌদ্ধ সম্রাট এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলমান সম্রাট একই রকম ভাবে, এমনকি প্রায় একই স্বরে বাণী উচ্চারণ করতেন। কী জানি হয়তো-বা এ হল ভারতের চিরন্তন বাণী, তাঁর দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুখে উচ্চারিত। অশোক সম্বন্ধে তিনি নিজে শিলালিপিতে যা রেখে গেছেন তা ছাড়া আমাদের জ্ঞান অল্প। আকবর সম্বন্ধে আমরা অনেক-কিছু জানি। তাঁর সভার দু'জন সমসাময়িক ঐতিহাসিক দীর্ঘ বিবরণ রেখে গেছেন, তা ছাড়া যেসব বৈদেশিকরা তাঁর কাছে আসতেন, বিশেষত যে জেসুইট্ পাদ্রীরা তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাও অনেক-কিছু লিখে গেছেন।

বাবর হইতে বংশপরম্পরায় তিনি ছিলেন তৃতীয়। কিন্তু মোগলরা তখনও দেশে নবাগত। তাদের তখনও বিদেশী হিসেবেই দেখা হত, এবং দেশে সামরিক শক্তি ছাড়া আর কোনো প্রভাব তাদের ছিল না। আকবরের রাজত্বকালই মোগল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করল, এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে সর্ববিষয়ে ভারতীয়ে পরিণত করল। তাঁর রাজত্বকালেই ইউরোপে 'গ্রেট মোগল' অথবা 'মহামোগল' কথাটার প্রথম উৎপত্তি হয়। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। সে সময়ে ভারতে রাজার ক্ষমতা প্রতিহত করার বাষ্পও ছিল না। যা হোক আকবর ছিলেন জ্ঞানী একনায়কতন্ত্রী, এবং তিনি ভারতের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বহুল পরিশ্রম করতেন। এক হিসেবে তাঁকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলা যেতে পারে। যে সময় দেশে জাতীয়তাবোধ ছিল না বললেই হয়, এবং ধর্মই ছিল বিরোধের মূল, আকবর ইচ্ছে করেই ধর্মের বিভিন্নতার উপরে ভারতের জাতীয়তাবোধের আদর্শকে স্থান দিলেন। তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু সেই সাফল্যের পথে যে দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন তা বিস্ময়কর।

তবু আকবরের সাফল্য তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টার বশেই হয় নি। কোনো মানুষ বড়ো কাজে কৃতকার্য হতে পারে না, যদি-না সময় এবং আবহাওয়া অনুকূল হয়। শক্তিশালী ব্যক্তি নিজেই আবহাওয়া তৈরি করে নিয়ে অনেক সময়েই দ্রুতগতিতে সাফল্য আনতে পারেন। কিন্তু সেই শক্তিশালী ব্যক্তি নিজেই হচ্ছেন যুগের সন্তান। সেইরকম আকবর ছিলেন ভারতের তৎকালীন যুগের পুত্র।

আগের এক চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, কীরূপে বহু নিঃশব্দ শক্তি দুই সংস্কৃতি এবং ধর্মের সমন্বয় ঘটানোর জন্যে একত্র হয়ে ভারতে কাজ করেছিল। স্থাপত্যের নূতন ধারা, এবং ভারতীয় ভাষাসমূহ, বিশেষ করে উর্দু অথবা হিন্দুস্থানির উৎপত্তির কথা বলেছি। তা ছাড়া

আকবরের
সাম্রাজ্য
কাবুল
সিন্ধুনদ
দিল্লি
আগ্রা
গঙ্গা
এলাহাবাদ
পাটনা
গুজরাট
দিউ
দমন
গোদাবরী
পর্তুগীজ
গোয়া
কালিকট
কোচিন
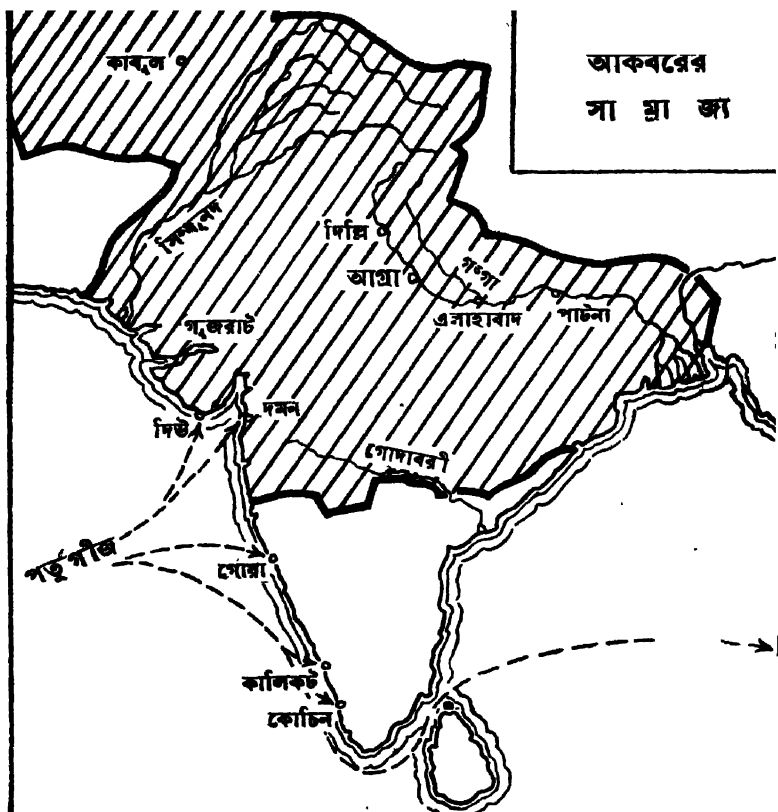
বলেছি সংস্কারক ও ধর্মগুরুদের কথা—যেমন রামানন্দ, কবীর ও নানক—যাঁরা ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মকে পরস্পরের কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, দুই ধর্মের যা এক তাদের গ্রহণ এবং অনুষ্ঠান-উপচারের বর্জন। আকাশে বাতাসে এই সমন্বয়ের ভাব ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আকবর তাঁর উদার মন দিয়ে এই ভাবকে গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনিই ছিলেন এর প্রধান প্রবর্তক।

রাজনীতিজ্ঞ হিসেবেও তিনি নিশ্চয় এই তথ্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর বল এবং জাতির বল এই সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। যোদ্ধা হিসেবে তাঁর সাহসের অভাব ছিল না এবং তিনি নিপুণ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। অশোকের মতো তাঁর কখনও যুদ্ধে অরুচি হয় নি। কিন্তু তিনি তরবারি-অর্জিত লাভের চেয়ে প্রীতি দিয়ে যা পাওয়া যায় তার বেশি পক্ষপাতী ছিলেন, এবং জানতেন যে, তা অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। অতএব তিনি হিন্দু অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা-লাভের জন্যে চেষ্টা করলেন। তিনি অমুসলমানদের উপরে ধার্য জিজিয়া কর এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীর দেয় করের রহিত করলেন। তিনি এক উচ্চবংশীয় রাজপুত রমণীকে বিবাহ করলেন। পরে তাঁর ছেলেরও বিয়ে দিলেন এক রাজপুত রমণীর সঙ্গে। এবং এইরূপ সঙ্কর-বিবাহে তিনি উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। রাজপুত রাজন্যদের তিনি সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদে নিযুক্ত করতে লাগলেন। তাঁর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অনেক দুঃসাহসিক অধ্যক্ষ, সুদক্ষ মন্ত্রী এবং শাসনকর্তাদের অনেকে ছিলেন হিন্দু। এমনকি কিছুকালের জন্যে রাজা মানসিংহ কাবুলে শাসনকর্তারূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাজপুত-রাজন্যবর্গ এবং হিন্দু জনসাধারণের সদ্ভাব-রক্ষণের জন্যে তিনি এতদূর অগ্রসর হতেন যে, মধ্যে মধ্যে মুসলমানদের উপর অবিচার করে বসতেন। কিন্তু তিনি হিন্দুদের শুভেচ্ছালাভে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং রাজপুতরা তাঁর সেবা এবং সম্মান করার জন্যে এগিয়ে এসেছিল—কেবল একজন অদম্য ব্যক্তি ছাড়া, তিনি মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ। রাণা প্রতাপ শুধু নামেও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে আপত্তি জানালেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, তিনি আকবরের সামন্তরূপে ভোগসুখ লাভের চেয়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই শ্রেয় মনে করলেন। এই গর্বিত রাজপুত যোদ্ধা আজীবন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে লড়লেন, এবং কখনও বশ্যতা স্বীকারে রাজি হলেন না। তাঁর জীবনের শেষ দিকে তিনি কিছু কিছু সফলও হয়েছিলেন। এই মহান রাজপুত বীরের স্মৃতি রাজপুতানার অতি গৌরবের বস্তু, এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনী গড়ে উঠেছে।

আকবর রাজপুতদের প্রীতি এবং প্রজাদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। তিনি পার্শিদের, এমনকি যেসমস্ত জেসুইট পাদ্রী তাঁর সভায় এসেছিল তাদেরও, অনুগ্রহ করতেন। এই অনুগ্রহ-প্রদর্শন, এবং কতকগুলি মুসলমান অনুষ্ঠানের প্রতি অমনোযোগের ফলে তিনি মুসলমান ওমরাহদের অপ্রিয় হয়ে পড়লেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল।

আমি অশোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছি, কিন্তু ভুল বুঝো না। অনেক বিষয়েই তাঁর অশোকের সঙ্গে অমিল ছিল। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষারও শেষ ছিল না, এবং শেষজীবন পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্যজয়ী, সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্যে ব্যগ্র। জেসুইটরা লিখেছেন :

"তাঁর মন ছিল সদাজাগ্রত এবং বিচারশীল; তাঁর ভালোমন্দজ্ঞান ছিল গভীর, রাজকার্যে তিনি ছিলেন বিজ্ঞ, এবং সবার উপরে তিনি ছিলেন সদয়, অমায়িক এবং উদার। এইসব গুণের সঙ্গে তাঁর সেইরকম সাহস ছিল, যা বড়ো বড়ো কাজের ভার নিয়ে তা সম্পন্ন করতে পারে।......তাঁর বহু বিষয়ে কৌতূহল ছিল, এবং শুধু-যে সামরিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারেই তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্ঞান ছিল তা নয়, বহুবিধ যন্ত্রের ব্যবহারও তিনি জানতেন।...... সদয় ভাব এই রাজার দেহ থেকে ফুটে বের হত, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আততায়ীকেও তিনি ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি প্রায় কোনো সময়েই মেজাজ গরম করতেন না। যদি কোনো কারণে তা হত তা হলে তাঁর জ্ঞান থাকত না; কিন্তু তাঁর ক্রোধ কখনোই বহুক্ষণ স্থায়ী হত না।"

মনে রেখো, এ কোনো সভাসদের লেখা বিবরণ নয়; এ হল ভিন্ন দেশের এক আগন্তুকের রচনা, যিনি আকবরকে পর্যবেক্ষণ করার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন।

আকবরের দৈহিক শক্তি এবং কর্মপটুতা ছিল অসাধারণ, এবং হিংস্র বন্য জন্তু শিকার

করতে তিনি পরম আনন্দ পেতেন। সৈনিক হিসেবে তাঁর সাহস দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে পড়ত। আগ্রা থেকে আহমদাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নয় দিনে অতিক্রম করার গল্প থেকেই তাঁর প্রচণ্ড পরিশ্রম-ক্ষমতা বোঝা যায়। গুজরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল, তাই আকবর একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্য দিয়ে ৪৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে সেখানে গিয়েছিলেন। এটা অসাধারণ বাহাদুরির কথা। মনে রাখতে হবে, তখন রেলওয়ে অথবা মোটরগাড়ি ছিল না।

কিন্তু প্রকৃত বড়ো লোকদের এসব ছাড়া অন্য কিছুও থাকে। লোকে বলে, তাঁদের একপ্রকার চুম্বকশক্তি থাকে যা লোককে আকর্ষণ করে। এই জিনিষটি আকবরের প্রচুর পরিমাণে ছিল। জেসুইট্‌দের চমৎকার বর্ণনায়—তাঁর দু চোখ ছিল "সূর্যালোকে সমুদ্রের মতো কম্পমান।" এই লোকটি যে এখনও আমাদের মুগ্ধ করেন, এবং তাঁর রাজোচিত পৌরুষপূর্ণ মূর্তি রাজা-নাম-ধারী অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

দেশজয়ী হিসেবে আকবর উত্তর-ভারতের সর্বত্র, এমনকি দক্ষিণ-ভারতেও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে তিনি গুজরাট, বাংলা, উড়িষ্যা, কাশ্মীর এবং সিন্ধুদেশ যোগ করেন। মধ্য ও দক্ষিণ -ভারতেও তিনি বিজয়ী হয়ে কর গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য-ভারতের রানী দুর্গাবতীকে পরাজিত করার মধ্যে অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নেই। রানী ছিলেন বীরনারী এবং সুশাসিকা, এবং আকবরের কোনো ক্ষতি করেন নি। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যের অভিলাষের কাছে ওসব বাধা খুব গ্রাহ্য নয়। দক্ষিণ-ভারতে তাঁর সৈন্যবাহিনী আর-একজন রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, ইনিই যশস্বিনী চাঁদবিবি, আহমদনগরের রাজমাতা। এই নারীর সাহস এবং কর্মক্ষমতা ছিল, এবং যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম মোগল-বাহিনীকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি নিজের অনুকূল শান্তির শর্ত পেলেন। দুর্ভাগ্যবশত পরে তিনি নিজেরই কয়েকজন অসন্তুষ্ট সৈনিকের হাতে নিহত হন।

আকবরের সেনাদল চিতোরও অবরুদ্ধ করেছিল। এ হল রাণা প্রতাপের পূর্ববর্তী কালে। জয়মল অতুল বীর্যের সঙ্গে চিতোর রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভীষণ জহরব্রতের পুনরভিনয় ঘটল এবং চিতোরের পতন হল।

আকবর বহু নিপুণ অনুরক্ত সহকারীর সাহায্য পেয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফৈজি ও আবুল ফজল-নামক দুই ভাই এবং বীরবল—যাঁর সম্বন্ধে এখনও অসংখ্য গল্প প্রচলিত। তাঁর অর্থসচিব ছিলেন টোডরমল। সমস্ত রাজস্বরীতির তিনিই পুনর্গঠন করেন। তোমার হয়তো শুনে অদ্ভুত লাগবে যে, সে যুগে জমিদারি-প্রথা অথবা জমিদার-তালুকদারের অস্তিত্ব ছিল না। রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তের ব্যক্তিগতভাবে কারবার চলত। এই প্রথার নাম ছিল রায়ৎওয়ারি প্রথা। বর্তমান যুগের জমিদারেরা ব্রিটিশের সৃষ্টি।

জয়পুরের রাজা মানসিংহ আকবরের শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের অন্যতম। আকবরের রাজসভার আর-একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম হল বিখ্যাত গায়ক তানসেন, যিনি পরবর্তী কালে ভারতের যাবতীয় গায়কের পূজ্য হয়েছেন।

আকবরের রাজত্বের আরম্ভে তাঁর রাজধানী ছিল আগ্রা, এবং সেখানেই তিনি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তার পরে তিনি ফতেপুরসিক্রিতে নূতন শহর নির্মাণ করালেন; এ জায়গাটা আগ্রা থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে। শেখ সেলিম চিস্তি নামে একজন মহাপুরুষ ফকির সেখানে থাকতেন বলে রাজধানীর জন্যে এই স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। এখানে তিনি একটি মনোরম নগর নির্মাণ করালেন, যা সে যুগের ইংরেজ ভ্রমণকারীদের মতে "লন্ডন থেকে অনেক বড়ো।" পনেরো বছর ধরে এখানেই তাঁর রাজধানী থাকল, তার পরে তিনি লাহোরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আকবরের বন্ধু ও মন্ত্রী আবুল ফজল বলেন, "সম্রাট চমৎকার চমৎকার বাড়ির পত্তন করেন এবং তাঁর মন ও হৃদয়ের কাজকে পাথর ও মাটির পোশাক পরান।" ফতেপুরসিক্রি, তার বিখ্যাত মসজিদ, বুলন্দ দরবাজা ও আরও অনেক প্রাসাদ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এটা এখন জনমনুষ্যহীন শহর এবং কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। কিন্তু এক মৃত সাম্রাজ্যের প্রেতাত্মা যেন এখনও এর রাজপথ এবং প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের বর্তমান এলাহাবাদ নগরও আকবর পত্তন করেছিলেন; অবশ্য এ শহরের অস্তিত্ব

বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে, এবং রামায়ণের যুগেও প্রয়াগের অস্তিত্ব ছিল। এলাহাবাদের দুর্গ আকবরনির্মিত।

আকবরের জীবন ছিল রাজ্যজয় এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সংগঠনে কর্মব্যস্ত। কিন্তু এই রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের আর-একটি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তা হল সত্যের অনুসন্ধানে তাঁর অপরিসীম কৌতূহল। যে-কেউ যে-কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞাতব্য তথ্য বলতে পারত, আকবর তাঁকেই ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করতেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাঁর ইবাদৎখানায় মিলিত হতেন, প্রত্যেকের মনেই আশা, তাঁকে নিজের ধর্মে নিয়ে আসবেন। অনেক সময়েই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করতেন, এবং আকবর বসে শুনতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁদের তর্কের বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন। যতদূর মনে হয় তিনি স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলেন যে, সত্য কোনো ধর্ম অথবা সম্প্রদায় -বিশেষের একচেটিয়া নয়, এবং তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর নীতি হল সকল ধর্মের সম্বন্ধে ঔদার্য।

তাঁর রাজত্বকালের একজন ঐতিহাসিক—বদাউনি—যিনি নিশ্চয় এসব তর্কসভায় যোগদান করতেন, আকবর সম্বন্ধে কৌতূহলজনক বর্ণনা দিয়েছেন; তার খানিকটা আমি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। বদাউনি নিজে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান, এবং আকবরের কার্যকলাপ তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন। তিনি লিখেছেন :

"সম্রাট সকলেরই, বিশেষ করে যারা মুসলমান নয় তাদের মতামত সংগ্রহ করে যা তাঁর পছন্দ তাই গ্রহণ করতেন, এবং যা-কিছু তাঁর খেয়ালের কাছে প্রীতিকর নয় তাই বর্জন করতেন। অতি শৈশবকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত, এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সম্রাট ধর্মবিষয়ে এবং ধর্মানুষ্ঠান-বিষয়ে অসংখ্য মতামতের সংস্পর্শে এসেছেন, এবং কেতাবে যা পাওয়া যায় সবই সংগ্রহ করেছেন তাঁর নিজস্ব মনীষা দিয়ে, এবং তাঁর জিজ্ঞাসু মন দিয়ে, যা যাবতীয় ইসলামনীতির বিরুদ্ধ। এইরূপে তাঁর হৃদয়ের আরশিতে কতকগুলি ধর্মের প্রাথমিক নীতি প্রতিফলিত হয়ে এক নূতন ধর্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং সম্রাটের উপর বিস্তৃত যাবতীয় লোকের প্রভাবের ফলে তাঁর মনে ধীরে ধীরে এই ধারণাই গড়ে উঠেছে যে, সব ধর্মেই জ্ঞানী লোক আছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি আছে, এবং সব জাতির মধ্যেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোক আছে। যদি এইরূপে সর্বত্রই কিছু কিছু সত্য জ্ঞান পাওয়া যায় তবে সত্য এক ধর্মে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন?......"

তোমার বোধ হয় মনে আছে, এই যুগেই ইউরোপে ধর্মবিষয়ক ব্যাপারে অসাধারণ অসহিষ্ণুতা চলছিল। স্পেন, নেদারল্যাণ্ড্স্ এবং অন্যত্র ইন্‌কুইজিশন (ধর্মের নামে নির্যাতন) চলছিল, এবং ক্যাথলিক ও কাল্‌ভিনিস্ট উভয় পক্ষই ভাবত, অপরের ধর্মের প্রতি ঔদার্য-প্রদর্শন মহাপাপ।

বছরের পর বছর আকবর সকল ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে তাঁর ধর্মবিষয়ক আলোচনা এবং তর্কাদি চালিয়ে গেলেন, এবং অবশেষে এইসব পণ্ডিতরা তাঁকে নিজ নিজ ধর্মমতে আনবার চেষ্টা ব্যর্থ বুঝে বিরক্ত হয়ে গেলেন। যখন সব ধর্মেই কিছু কিছু সত্য রয়েছে তখন তিনি এক ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকেন কী করে? জেসুইট্‌দের বিবরণ অনুসারে, তিনি নাকি বলেছিলেন, "হিন্দুরা তাদের ধর্মনীতি ভালো মনে করে; মুসলমান ও খৃষ্টানরাও নিজ নিজ ধর্ম উৎকৃষ্ট ভাবে। অতএব, কোন্ ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করব?" আকবরের প্রশ্ন সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত, কিন্তু জেসুইট্ পাদ্রীরা বিরক্ত হয়ে লিখেছিলেন, "এই রাজার মধ্যে নাস্তিকের প্রধান দোষ বর্তমান, অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসকে তর্কের উপরে স্থান দেন না; এবং তাঁর ক্ষীণবুদ্ধি মন দিয়ে যা বুঝতে পারেন না, তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে সত্য বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে যা মানুষের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরও অতীত সে বিষয়ে নিজের অসম্পূর্ণ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করেন।" এই যদি নাস্তিকের সংজ্ঞা হয় তবে এরকম নাস্তিক যত বেশি হয় ততই ভালো।

আকবরের লক্ষ্যবস্তু কী ছিল ঠিক বোঝা যায় না। তিনি কি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিবিষয়ে প্রশ্নটিকে গ্রহণ করেছিলেন? সর্বসাধারণগ্রাহ্য জাতীয়তাবাদের খাতিরে তিনি কি জোর করে সব ধর্মকে একই প্রণালীতে চালাতে চেয়েছিলেন? অথবা হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সত্যধর্মের

অনুসন্ধান? এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর ভূমিকা ছিল রাজনীতিকের, ধর্মসংস্কারকের নয়। তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক-না কেন, তিনি সত্যিই এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন, যার নাম 'দিন-ইলাহি'—এবং যার নেতা ছিলেন তিনি স্বয়ং। অন্য বিষয়ে যেমন, ধর্মেও তেমনি, তাঁর একনায়কত্ব ছিল অবিসংবাদী, এবং পদচুম্বন, সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত প্রভৃতি খেলো কতকগুলো জিনিষের উদ্ভব হয়েছিল। এ নূতন ধর্ম কারও মনে ধরল না। মাঝ থেকে মুসলমানদের মনে বিরক্তির উৎপাদন করল।

আকবর ছিলেন কর্তৃত্ববাদের প্রতীক। তবু জানতে কৌতূহল হয়, রাজনীতিতে উদারনৈতিক-বাদের উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন হত। যদি বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার থাকে তবে জনসাধারণের বেশি রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বা থাকবে না কেন? বিজ্ঞানের প্রতি যে তাঁর অনুরাগ জন্মাত সেটা নিঃসন্দেহ। দুর্ভাগ্যবশত, এইসব ভাবধারা তখন ইউরোপে কোনো কোনো লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করলেও ভারতে তখন তার অস্তিত্ব ছিল না। তখন মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না, ফলে শিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ। তুমি শুনে অবাক হবে, আকবর ছিলেন নিরক্ষর, লিখতেও জানতেন না, পড়তেও না! কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, এবং অপরকর্তৃক পুস্তক-পাঠ শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁর আদেশে অনেক সংস্কৃত বই ফার্শিতে অনূদিত হয়েছিল।

তিনি হিন্দু-বিধবাদের সহমরণ-প্রথা এবং যুদ্ধবন্দীদের দাসত্ব-প্রথা আইন জারি করে বন্ধ করেছিলেন।

চৌষট্টি বছর বয়সে ১৬০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর আকবর মারা গেলেন। আগ্রার কাছে সেকেন্দ্রায় এক রমণীয় সমাধিমন্দিরের নীচে তিনি সমাহিত আছেন।

আকবরের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতে কাশীতে একটি লোক ছিলেন, যাঁর নাম যুক্তপ্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রামবাসী জানে। সেখানে তিনি আকবর অথবা যে-কোনো রাজার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত, অনেক বেশি জনপ্রিয়। তাঁর নাম তুলসীদাস, যিনি হিন্দিতে রামচরিতমানস অথবা রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

৯০

ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের অধোগতি ও পতন

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

আকবর সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করা দরকার। কিন্তু সে যুগের পোর্তুগীজ মিশনারিদের বিবরণ থেকে আরও কিছু উদ্ধৃত না করে পারছি না। পারিষদদের মতামতের চেয়ে তাঁদের মতের মূল্য অনেক বেশি এবং মনে রাখা দরকার, আকবর খৃষ্টান না হওয়ায় তাঁরা বিশেষভাবে নিরাশ হয়েছিলেন। তবু তাঁরা লিখেছিলেন : "তিনি প্রকৃতই মহান রাজা ছিলেন; কারণ তিনি জানতেন শ্রেষ্ঠ নৃপতি তাঁকেই বলে যিনি যুগপৎ প্রজাদের বাধ্যতা, শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং ভয়ের কারণ। তিনি ছিলেন সবার অনুরাগের পাত্র, তিনি শক্তের কাছে ছিলেন দৃঢ়, দরিদ্রের কাছে সদয়, এবং উচ্চ-নীচ, পরিচিত-অপরিচিত, খৃষ্টান, মুসলমান বা বিধর্মী, সকলের প্রতিই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফলে প্রত্যেকেই মনে করত রাজা তারই পক্ষে।" আবার : "কখনও-বা তিনি রাজকার্যে গভীরভাবে ব্যাপৃত আছেন, অথবা প্রজাদের দর্শন দান করছেন, পর-মুহূর্তেই তিনি উটের লোম ছাঁটছেন, পাথর ভাঙছেন, কাঠ কাটছেন, অথবা নেহাইয়ে লোহার উপর হাতুড়ি পেটাচ্ছেন, এবং সবই এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে করছেন যেন সেইটিই তাঁর পেশা।" তিনি প্রতাপশালী এবং স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন, কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমকে তাঁর সম্মানের হানিকর মনে করতেন না, যেমন কেউ কেউ এখন মনে করেন।

আমরা আরও জানতে পারি, "তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন, এবং বছরে পাঁচ-ছয় মাসের বেশি মাংস খেতেন না।......অনেক কষ্টে তিনি রাত্রে তিন ঘণ্টা আন্দাজ ঘুমোতে পেতেন।......তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। তিনি তাঁর সব হাতির নাম জানতেন, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল বহু সহস্র, এবং তাঁর সব ঘোড়া, হরিণ, এমনকি কবুতরদেরও নাম জানতেন!" এরূপ অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না, এবং এ বিবরণে অতিরঞ্জন থাকা সম্ভব। কিন্তু তাঁর মন যে ছিল বিস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "যদিও তিনি পড়তে অথবা লিখতে জানতেন না তবু তিনি তাঁর রাজ্যে যা ঘটছে সব জানতেন।" আর তাঁর "জ্ঞানের আগ্রহ" ছিল এত বেশি যে, তিনি "একসঙ্গে সব শেখার চেষ্টা করতেন, ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন এক গ্রাসে সমুদয় খাদ্য উদরস্থ করতে চেষ্টা করে।"

আকবর ছিলেন এইরকম। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্রী, এবং যদিও তাঁর অধীনে জনসাধারণ অনেক পরিমাণে শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী হয়েছিল এবং কৃষকদের করভার লাঘব করা হয়েছিল, তবু শিক্ষার সাধারণ স্তরের উন্নতি সম্পাদনের জন্যে তিনি খুব সচেষ্ট ছিলেন না। এটা ছিল সর্বত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রের যুগ, এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনায় তিনি নরপতি ও মানুষ হিসেবে ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

যদিও বাবর থেকে আরম্ভ করে আকবর ছিলেন বংশের তৃতীয় রাজা, তবুও আকবরই ছিলেন ভারতে মোগল-রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। চীনদেশে কুব্‌লাই খানের ইউয়ান্-রাজবংশের মতো আকবর থেকে শুরু করে মোগল রাজারা ভারতীয় রাজবংশে পরিণত হলেন। এবং তিনি সাম্রাজ্যের একত্ব-সম্পাদনের জন্যে যে পরিশ্রম করেছিলেন তারই ফলে তাঁর বংশ তাঁর মৃত্যুর পরে এক শো বছরেরও বেশি বজায় ছিল।

আকবরের পরে তিনজন কর্মদক্ষ রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো অসাধারণত্ব ছিল না। যখনই এক সম্রাটের মৃত্যু হত তখনই সিংহাসনের জন্যে তাঁর ছেলেদের মধ্যে অসভ্য কুদৃশ্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। প্রাসাদে প্রাসাদে ষড়যন্ত্র, সিংহাসন-লাভের জন্যে যুদ্ধ, পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের বিদ্রোহ, আত্মীয়দের হত্যা অথবা অন্ধ করে দেওয়া, স্বেচ্ছাতন্ত্রের সব উপকরণই ছিল। অতুলনীয় সমারোহ ও বিলাসিতা ছিল। তোমার মনে আছে, এই যুগেই 'নৃপতিসূর্য' চতুর্দশ লুই ফ্রান্সে রাজত্ব করছিলেন এবং ভার্সাইতে জাঁকজমকপূর্ণ রাজ-সভায় প্রভুত্ব করছিলেন। কিন্তু এই নৃপতিসূর্যের সমারোহ মোগল-সম্রাটের সমারোহের কাছে অকিঞ্চিৎকর। সম্ভবত এই মোগল রাজারা সে যুগে পৃথিবীর ধনীতম নরপতি ছিলেন। তবু মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হত, রোগ মহামারী দেখা দিত, যার ফলে বহু লোকের মৃত্যু ঘটত। সে সময়েই সম্রাটের প্রাসাদে জীবন চলত অপূর্ব বিলাসিতায়।

আকবরের ধর্মসম্বন্ধীয় ঔদার্য তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও চলল, কিন্তু তার পরে তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, এবং খৃষ্টান ও হিন্দুদের কিছু কিছু নির্যাতন আরম্ভ হল। পরবর্তী কালে, ঔরঙজেবের সময়ে, মন্দির ধ্বংস এবং বহুনিন্দিত জিজিয়া করের পুনঃপ্রচলন করে হিন্দু-নির্যাতনের বিশেষ চেষ্টা চলেছিল। এইরূপে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি আকবর অত কষ্টে অত পরিশ্রমে স্থাপন করেছিলেন তার একে একে অপসারণ ঘটল এবং সহসা সাম্রাজ্য টলে উঠে ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

আকবরের পরে রাজা হলেন হিন্দু-পত্নীর গর্ভে জাত জাহাঙ্গীর। তিনি পিতার ধারা কিছুকাল ধরে বজায় রাখলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত রাজকার্যের চেয়ে শিল্পকলা, উদ্যান ও ফুলের বেশি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর একটি চমৎকার চিত্রশালা ছিল। প্রতি বৎসর তিনি কাশ্মীর যেতেন, এবং যতদূর জানি, তিনিই শ্রীনগরের কাছে শালিমার ও নিশাৎ বাগ্, এই দুটি বিখ্যাত উদ্যান তৈরি করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের বহু পত্নীর অন্যতমা ছিলেন রূপসী নূরজাহান, যিনি ছিলেন সিংহাসনের পিছনে আসল শক্তি। জাহাঙ্গীরের সময়েই ইৎমদ্‌উদ্দৌলার কবরের উপরের সুন্দর সৌধ নির্মিত হয়। যখনই আমি আগ্রা যাই, এই স্থাপত্যের অপূর্ব রত্নটিকে দেখে চক্ষু সার্থক করি।

জাহাঙ্গীরের পরে এলেন তাঁর ছেলে শাহ্‌জাহান। তাঁর রাজত্বকাল চলল তিরিশ বছর ধরে

(১৬২৮-১৬৫৮)। তাঁর রাজত্বকালে—তিনি ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের সমসাময়িক ছিলেন—মোগল সমারোহ উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, এবং তাঁরই সময়ে রাজ্যের জরার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন, যা ছিল অমূল্য-রত্নরাজি-খচিত, রাজাসনরূপে নির্মিত হয়েছিল। তার পরে তৈরি হয়েছিল তাজমহল, যমুনা নদীর ধারের বিখ্যাত সৌন্দর্যস্বপ্ন। তুমি বোধ হয় জানো, এটা হচ্ছে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধি। শাহ্জাহান নিন্দনীয় কাজও যথেষ্ট করেছিলেন। তিনি ছিলেন পরধর্মে অসহিষ্ণু, এবং দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছিল, তার নিবারণের জন্যে বলতে গেলে কোনো চেষ্টাই করেন নি। তাঁর প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর ঐশ্বর্য আর সমারোহ অতি ঘৃণিত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তবু সম্ভবত, পাথর ও মর্মরে তিনি যেসব রূপশিল্প রচনা করিয়ে গেছেন, তাদের বিষয় বিবেচনা করলে বোধ হয় তাঁর অপরাধের অনেকখানিই ক্ষমা করা যায়। তাঁর সময়েই মোগল স্থাপত্য চরম উন্নতি করেছিল। তাজ ছাড়া তিনি আগ্রার মোতি মসজিদ নির্মাণ করেন; দিল্লির বিরাট জামি মসজিদ, দিল্লির কেল্লায় দেওয়ান-ই-আম এবং দেওয়ান-ই-খাস তাঁরই কীর্তি। এইসব সাদাসিধে প্রাসাদের সৌন্দর্য অতুলনীয়; কেউ বিরাট অথচ কলাচাতুর্যে পূর্ণ, এবং পরীস্থানের হাল্কারূপে ভরা।

কিন্তু এই পরীস্থানের সৌন্দর্যের পিছনে ছিল দরিদ্র জনসাধারণ, এইসব প্রাসাদের জন্য ব্যয়িত অর্থ তারাই দিয়েছিল, যদিও তাদের অনেকের বাসোপযোগী মেটে ঘরও ছিল না। স্বেচ্ছাচার চলল অপ্রতিহত গতিতে, এবং সম্রাট অথবা তাঁর প্রতিভূর কোনো অসন্তোষ উৎপাদন করলে শাস্তি ছিল কঠিন। প্রাসাদের ষড়যন্ত্র চলত মাকিয়াভেলির নীতি অনুসারে। আকবরের সদয়তা, ঔদার্য এবং সুশাসন অতীতের জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোলযোগ বাধবার আর বেশি বিলম্ব ছিল না।

তার পরে এলেন ঔরঙজেব, মোগল-বংশের শেষ বড়ো সম্রাট। তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হল পিতাকে কারারুদ্ধ করে। ১৬৫৯ থেকে ১৭০৭, এই আটচল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করলেন। তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীরের মতো তাঁর শিল্প বা সাহিত্যে অনুরাগ ছিল না, পিতা শাহ্জাহানের মতো স্থাপত্যেও অনুরাগ ছিল না। তিনি ছিলেন গুরুগম্ভীর লোক, নিজের ছাড়া অন্যসকলের ধর্মে ছিল তাঁর পরম অসহিষ্ণুতা। রাজসভার সমারোহ বজায় রইল, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ঔরঙজেব ছিলেন সাদাসিধে, প্রায় ফকিরের মতো। ইচ্ছা করেই তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নির্যাতনের রীতি প্রচলিত করলেন। ইচ্ছা করেই তিনি আকবরের আপোস ও মৈত্রীর রীতির বৈপরীত্য সাধন করলেন, যার ফলে সাম্রাজ্য যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তাই গেল সরে। তিনি হিন্দুদের উপরে জিজিয়া-করের পুনঃপ্রবর্তন করলেন। যতদূর সম্ভব রাজকার্য থেকে হিন্দুদের বহিষ্কার করলেন। যেসব রাজপুত রাজা আকবরের সময় থেকে এই মোগল-বংশকে সমর্থন দিয়ে আসছিল তাদের অসন্তোষ-উৎপাদনের ফলে রাজপুত-যুদ্ধের সৃষ্টি হল। তিনি হাজারে হাজারে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করলেন, এবং এইরূপে অতীতের অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ ধুলোয় পরিণত হল। এবং যদিও দক্ষিণে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটল, গোলকুণ্ডা বিজাপুর তাঁর করায়ত্ত হল, এবং সুদূর দক্ষিণে রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন, সাম্রাজ্যের ভিত্তি আগেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফলে ক্রমে তা আরও শক্তিহীন হতে লাগল এবং চার দিকে শত্রুরা মাথা তুলে দাঁড়াল। জিজিয়া-করের বিরুদ্ধে এক হিন্দু-আবেদনে লেখা ছিল যে, এই কর "ন্যায়বহির্ভূত; রাজ্যের সুশাসনের নীতিতেও অচল, কারণ এর ফলে দেশ দরিদ্র হতে বাধ্য। উপরন্তু এটা একটা নূতন-কিছু এবং হিন্দুস্থানের আইনবিরুদ্ধ।" সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সে সম্বন্ধে চিঠিতে ছিল : "মহামান্য সম্রাটের রাজত্বকালে সাম্রাজ্য বহু লোকের সহানুভূতি হারিয়েছে, এবং আরও বেশি দেশক্ষয় অনিবার্য, কারণ ধ্বংস ও লুটতরাজ অপ্রতিহতভাবে চলছে। আপনার প্রজারা পদদলিত, সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশ দারিদ্র্যগ্রস্ত, লোকসংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু, এবং অসুবিধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

সর্বসাধারণের এই দুরবস্থাই দেশের আসন্ন বিপুল পরিবর্তনের উপক্রমণিকা। এই পরিবর্তন চলেছিল পঞ্চাশ বছর ধরে। এই পরিবর্তনের অন্যতম ছিল ঔরঙজেবের মৃত্যুর পর বিরাট মোগল-সাম্রাজ্যের অতি আকস্মিক ও সম্পূর্ণ ধ্বংস। বড়ো পরিবর্তনের ও বড়ো আন্দোলনের পিছনে থাকে

প্রায় সব সময়েই অর্থনৈতিক কারণ, এবং ইউরোপে ও চীনে সাম্রাজ্যধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি অর্থনৈতিক পতন, এবং পরে বিপ্লব। ভারতেও এইরকমই হল।

যেমন সব সাম্রাজ্যেরই হয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। কিন্তু এই ধ্বংসের সহায়তা করেছিল হিন্দুদের মধ্যে নবজাগরিত বিদ্রোহ-মনোভাব, যার কারণ ঔরঙজেবের কুনীতি। কিন্তু এই ধর্মসংক্রান্ত হিন্দু জাতীয়তার মূল ঔরঙজেবের রাজত্বের আগেই ছিল, এবং বলা যেতে পারে অংশত এই কারণেই ঔরঙজেব অত তীব্র ও অনুদার ভাব অবলম্বন করেছিলেন। হিন্দু-নবজাগরণের সম্মুখে ছিল মারাঠা, শিখ এবং অন্যান্য জাতি, এবং এদের সম্মিলিত আঘাতে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। কিন্তু এই অতুল সৌভাগ্যের মালিক তারা হতে পারল না। ধূর্ত ব্রিটিশজাতির আগমন ঘটল চুপিচুপি, এবং যখন অন্যরা পরস্পরের সঙ্গে কলহবিবাদে মত্ত তখন এই ঐশ্বর্যের মালিক হল তারাই।

মোগল-সম্রাটরা যখন যুদ্ধযাত্রা করতেন তখন তাঁদের শিবির কেমন হত জানতে তোমার কৌতূহল হতে পারে। সে ছিল এক বিরাট ব্যাপার, তার পরিধি হত ত্রিশ মাইল, আর তাতে লোক থাকত পাঁচ লক্ষ। সম্রাটের সহগামী সেনাবাহিনী এই লোকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এ ছাড়াও আরও অজস্র লোক থাকত, এবং এই চলন্ত শহরের মধ্যে থাকত শত শত বাজার। এইরকম চলন্ত শিবিরেই উর্দু, অর্থাৎ শিবিরের ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল।

মোগল-যুগের অনেক অনুকৃতি এখনও বর্তমান আছে, সূক্ষ্ম কারুমণ্ডিত সব ছবি। সম্রাটদের অনুকৃতির রীতিমতো চিত্রশালা আছে। তা থেকে বাবর থেকে ঔরঙজেব পর্যন্ত এইসব সম্রাটদের ব্যক্তিত্বের চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়।

মোগল-সম্রাটরা দিনে অন্তত দুবার অলিন্দতে এসে প্রজাদের দর্শন দিতেন এবং তাদের আবেদন গ্রহণ করতেন। ইংরেজ-রাজা পঞ্চম জর্জ যখন ১৯১১ সালের মুকুটোৎসব-দরবারের জন্যে ভারতে এসেছিলেন তখন তাঁকেও অনুরূপ দর্শন দিতে হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারত-সাম্রাজ্যে নিজেদের মোগলদের উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে, এবং খেলো জাঁকজমকে তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তোমাকে আগেই বলেছি, ইংরেজ-রাজাকে মোগলদের উপাধি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কাইজার-ই-হিন্দ্। এখনও ইংরেজ-ভাইস্‌রয়কে ঘিরে যে জাঁকজমকের অস্তিত্ব আছে তেমন বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

তোমাকে এখনও পরবর্তী মোগল-সম্রাটদের সঙ্গে বৈদেশিকদের সম্বন্ধের কথা বলি নি। আকবরের রাজসভায় পোর্তুগীজ মিশনারিরা অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন, এবং ইউরোপীয় জগতের সঙ্গে আকবরের সম্পর্ক প্রধানত এই পোর্তুগীজদের মধ্যস্থতায়। তাঁর কাছে পোর্তুগীজরাই ছিল আপাতদৃষ্টিতে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিমান জাতি, এবং সমুদ্রে তারা ছিল অদ্বিতীয়। তখনও ইংরেজদের দেখা যায় নি। আকবরের গোয়ার উপর লোভ ছিল, এবং তা আক্রমণও করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। মোগলরা সামুদ্রিক নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না এবং নৌশক্তির সামনে ছিল তারা শক্তিহীন। এটা একটু অদ্ভুত, কারণ এই সময়ে পূর্ববঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জাহাজ নির্মিত হত। কিন্তু এসব জাহাজ ছিল বেশির ভাগই মালবাহী। বলা হয়ে থাকে যে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের একটা কারণ, সমুদ্রে অক্ষমতা। নৌশক্তির উত্থানের দিন তখন এসে গিয়েছে।

ইংরেজরা যখন মোগল-সভায় আসার চেষ্টা করছিল তখন ঈর্ষান্বিত পোর্তুগীজরা অনেক চেষ্টা করছিল জাহাঙ্গীরকে তাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন করতে। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌সের রাজদূত সার টমাস রো ১৬১৫ সালে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় পৌঁছে বাণিজ্যবিষয়ে সম্রাটের অনুমতি পেয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতসাগরসমূহে ইংরেজ-নৌবহর পোর্তুগীজদের পরাজিত করেছিল। ইংলণ্ডের ভাগ্যনক্ষত্র ধীরে ধীরে দিক্‌চক্রবাল-রেখার উপরে উঠছিল; পোর্তুগালের নক্ষত্র তখন পশ্চিমাকাশে অস্তোন্মুখ। ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা ধীরে ধীরে পোর্তুগীজদের পূর্ব-সমুদ্র থেকে দূরে তাড়িয়ে দিল, এবং মালাক্কা বন্দর পর্যন্ত ১৬৪১ সালে ওলন্দাজদের হাতে এল। ১৬২৯ সালে হুগলিতে পোর্তুগীজদের সাথে শাহ্‌জাহানের যুদ্ধ বাধে। পোর্তুগীজরা দাস-ব্যবসায় চালাচ্ছিল এবং জোর করে লোককে খৃষ্টান করছিল। তুমুল

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পর দুর্গগুলি পোর্তুগীজদের হস্তচ্যুত হয়ে মোগলের হাতে এল। ছোটো দেশ পোর্তুগাল এই ক্রমাগত যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সাম্রাজ্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সে দূরে সরে দাঁড়াল, কিন্তু গোয়া প্রভৃতি দু-একটা জায়গা আঁকড়ে ধরে রইল। এখনও সেসব জায়গা পোর্তুগালের অধীন।

ইতিমধ্যে ইংরেজরা ভারতের উপকূলবর্তী শহর মাদ্রাজ ও সুরাটে ফ্যাক্টরির (মালগুদামের) পত্তন করল। মাদ্রাজ শহরের পত্তন তারাই করেছিল ১৬৩৯ সালে। ১৬৬২ সালে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্ পোর্তুগালের ক্যাথারিন অব ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করে যৌতুক পেলেন বোম্বাই দ্বীপ। এ ঘটনা ঘটে ঔরঙজেবের রাজত্বকালে। পোর্তুগীজদের বিতাড়িত করে গর্বিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভেবেছিল, মোগল-সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় হচ্ছে, এবং ১৬৮৫ সালে ভারতে তাদের ভূমি-সম্পত্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লাভ হল না কিছু। ইংলণ্ড থেকে গোটা রাস্তা অতিক্রম করে যুদ্ধ-জাহাজ এল, এবং ঔরঙজেবের রাজ্যের উপর পূর্বে বাঙলায় এবং পশ্চিমে সুরাটে আক্রমণ হল। কিন্তু তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার মতো ক্ষমতা তখনও মোগলদের ছিল। এই থেকে ইংরেজদের এমন শিক্ষা হয়েছিল যে, তারা ভবিষ্যতে ঢের বেশি সাবধান হল। এমনকি ঔরঙজেবের মৃত্যুর পরেও, মোগলশক্তি যখন স্পষ্টই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, তখনও বড়ো বড়ো অভিযানের আগে তারা বেশ কিছুকাল ইতস্তত করত। ১৬৯০ সালে জব চার্নক -নামে একজন ইংরেজ কলকাতা শহরের পত্তন করলেন। এইরূপে তিনটি বড়ো শহর—মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা ইংরেজকর্তৃক স্থাপিত হল এবং প্রারম্ভে ইংরেজদের চেষ্টাতেই তাদের বৃদ্ধি ঘটল।

এইবার ফ্রান্সকেও ভারতে দেখা গেল। একটা ফরাসি বাণিজ্য-সমিতি স্থাপিত হল, এবং ১৬৬৮ সালে তারা সুরাট এবং অন্য কয়েকটি স্থানে ফ্যাক্টরি স্থাপন করল। কয়েক বছর পরে তারা পণ্ডিচেরি শহর ক্রয় করল। পূর্ব-উপকূলে এইটেই সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্য-বন্দর হয়ে দাঁড়াল।

১৭০৭ সালে ঔরঙজেব প্রায় ৯০ বছর বয়সে মারা গেলেন। ভারতরূপ প্রকাণ্ড রাজ্যের অধিকারের জন্য এবার সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চ তৈরি হল। তাঁর অকর্মণ্য বংশধরেরা এবং তাঁর বড়ো বড়ো শাসনকর্তারা রইল; আর থাকল মারাঠা এবং শিখজাতি; আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে লোলুপদৃষ্টিনিক্ষেপকারী কেউ থাকল; আর থাকল সমুদ্রপারবর্তী দুটি বৈদেশিক জাতি, ইংরেজ এবং ফরাসি। কিন্তু ভারতের হতভাগ্য জনসাধারণ তখন কোথায়?

৯১

শিখ এবং মারাঠা

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

ঔরঙজেবের মৃত্যুর পরে এক শো বছর ভারত ছিল জোড়াতালি-দেওয়া একটা অদ্ভুত পদার্থ—ক্ষণপরিবর্তনশীল, কুশ্রী। এই হল ভাগ্যান্বেষীদের উপযুক্ত কাল, আর যারা অসদুপায়ের সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধে করে নিতে পরাঙ্মুখ নয় তাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত কাল। ফলে ভারতের চার দিকে ভাগ্যান্বেষী জুটতে লাগল, তাদের কেউ-বা দেশেরই লোক, কেউ-বা এল উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ পার হয়ে, এবং কেউ কেউ, যেমন ইংরেজ ও ফরাসি, এল বহু সাগর পার হয়ে। প্রত্যেকে, অথবা প্রতি দল, নিজের নিজের সুবিধের জন্যে অন্যদের অধঃপাতে পাঠাতে তৈরি ছিল। কখনও দুই বা ততোধিক দল মিলে অপর এক দলকে দমন করে অবশেষে নিজেরাই কাটাকাটি করতে লাগল। রাজ্যলাভের ও রাতারাতি ধনী হওয়ার উদ্দাম চেষ্টা চলতে লাগল, আর চলল লুণ্ঠন—নির্লজ্জ প্রকাশ্যে, কখনও-বা বাণিজ্যের অতি ক্ষীণ ছদ্মবেশে। এবং এসবের পেছনে ছিল দ্রুতক্ষয়িষ্ণু মোগল-সাম্রাজ্য, যার লয় হল শীগ্‌গিরই, এবং তথাকথিত সম্রাট ছিলেন অন্যের দুর্ভাগা বৃত্তিভোগী অথবা বন্দী।

কিন্তু এইসব তুমুল আলোড়ন ছিল, আবরণের অন্তরালে যে বিপ্লব চলছিল তার বাইরের লক্ষণ। পুরোনো অর্থনীতিক বিধানের ধ্বংস ঘটছিল। সামন্ততন্ত্রের দিন শেষ হয়েছিল. দেশের নূতন অবস্থার সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছিল না। ইউরোপে এই অবস্থা দেখেছি, আরও দেখেছি বণিকসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় এবং স্বৈরাচারী রাজা কর্তৃক তাদের দমন। শুধু ইংলণ্ডে এবং কিছু পরিমাণে হল্যাণ্ডে রাজার ক্ষমতার হ্রাস হয়েছিল। ঔরঙজেব যখন সিংহাসনে বসলেন তখন ইংলণ্ডে চলছিল স্বল্পকালস্থায়ী সাধারণতন্ত্রের যুগ, যার আগমন হয়েছিল প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের পরে। এই ঔরঙজেবের যুগেই দ্বিতীয় জেম্সের পলায়ন এবং ১৬৮৮ সালে পার্লামেণ্টের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ-বিপ্লবের পূর্ণতা ঘটেছিল। এই সংগ্রামে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মতো আধা-জননির্বাচিত সভা থাকায় সংগ্রামের অনেক সুবিধে হয়েছিল। এমন একটা-কিছু পাওয়া গেল যা ভবিষ্যতে ভূমির মালিক অভিজাতসম্প্রদায় এবং পরবর্তী কালে রাজার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইউরোপের অবশিষ্ট প্রায় সব দেশেই অবস্থা ছিল অন্যরূপ। ফ্রান্সে তখনও ছিলেন মহান্ সম্রাট চতুর্দশ লুই। তিনি তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে ঔরঙজেবের সমসাময়িক ছিলেন, এবং শেষোক্ত সম্রাটের মৃত্যুর পরেও আট বছর বেঁচে ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ একতন্ত্র চলল, তার পরে এল বিখ্যাত ভীষণ বিপ্লব, যার নাম ফরাসি-বিপ্লব। জর্মনিতে সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ভয়ানক সময়। এই শতাব্দীতেই ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ঘটে—যাতে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা ছিল কিছু পরিমাণে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধকালীন-জর্মনির মতো। কিন্তু এ তুলনা বেশি দূর টানা চলে না। দুই দেশেই পুরোনো অর্থনৈতিক অবস্থার ধ্বংস ঘটছিল; ফলে ফিউডাল অথবা ভূম্যধিকারী-শ্রেণীর স্থান নূতন অবস্থায় ছিল না। যদিও ভারতে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নদশা এসেছিল তবু এর সম্পূর্ণ অন্তর্ধান ঘটতে বহু দিন লাগল, এবং প্রায় সম্পূর্ণ অবসানের পরেও এর বাইরের রূপ বর্তমান থাকল। এমনকি, এখনও ভারতে এবং ইউরোপেরও কোনো কোনো স্থানে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব আছে।

এইসব অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মোগল-সাম্রাজ্যে ভাঙন এল, কিন্তু এই ভাঙনের সুযোগ গ্রহণ এবং ক্ষমতা হাতে নেওয়ার মতো কোনো মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। এইসব শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ কোনো সংঘ অথবা সমিতি ছিল না, যেরকম ছিল ইংলণ্ডে। অত্যধিক স্বৈরাচারের ফলে লোকের মনে দাসত্ব-মনোভাব এসেছিল, এবং স্বাধীনতার পুরোনো ধারণার কোনো স্মৃতি বর্তমান ছিল না। তবু, এই চিঠিতেই পরে দেখবে যে, ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা হয়েছিল; সে চেষ্টা অংশত সামন্তপ্রধানদের, অংশত মধ্যবিত্তের, এবং খানিকটা কৃষিজীবীর, এবং এইসব চেষ্টার কোনো-কোনোটা সাফল্যের খুবই কাছে এসেছিল। কিন্তু যে জিনিষটা লক্ষ্য করা দরকার তা হচ্ছে এই যে, সামন্তপ্রথার পতন, এবং ক্ষমতা-গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত মধ্যশ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল বলে মনে হয়। এরকম ব্যবধান থাকলেই গোলযোগের উৎপত্তি হয়, যেমন হয়েছিল জর্মনিতে। ভারতেও সেইরকম হল। ক্ষুদে রাজার দল দেশের আধিপত্যের জন্যে লড়েছিল, কিন্তু তারা নিজেরাই হল ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন বিধানের প্রতিনিধি, এবং তাদের ছিল সুদৃঢ় ভিত্তির অভাব। এক নূতন শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের সম্মুখীন হল, ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা, যারা অল্পদিন আগে নিজের দেশে জয়ী হয়েছিল। এই ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামন্তপ্রধান শ্রেণীর চেয়ে সমাজের উচ্চতর স্তরের প্রতিনিধি ছিল। পৃথিবীর নবাগত অবস্থাবলীর সাথে এই শ্রেণীর সামঞ্জস্য ছিল। এদের সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র অনেক ভালো, ফলে যুদ্ধে ছিল এরা দুর্ধর্ষ। তা ছাড়া সমুদ্রে এদের প্রাধান্য ছিল। ভারতের সামন্ত-রাজারা এই নবশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম, ফলে একে একে তারা সবাই পরাভূত হল।

চিঠির উপক্রমণিকাই প্রকাণ্ড হয়ে গেল। এখন একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার। এই চিঠি এবং এর আগের চিঠিতে আমি জনসাধারণের অভ্যুত্থান এবং ঔরঙজেবের রাজত্বের শেষভাগে হিন্দু-জাতীয়তার পুনরভ্যুত্থানের কথা বলেছি। এখন আরও কিছু বেশি করে বলি। মোগল-সাম্রাজ্যের বহু স্থানে ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনের উদয় দেখতে পাই। কিছুকাল তারা শান্তিপূর্ণ থাকে,

রাজনীতির সংস্পর্শে আসে না। দেশের নানা ভাষায়—হিন্দি, পাঞ্জাবি, মারাঠিতে সংগীত এবং স্তোত্র রচিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইসব গান ও স্তোত্র জনগণের মনে জাগরণ আনে। জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারকদের কেন্দ্র করে ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক অবস্থাবৈগুণ্যে এইসব সম্প্রদায় রাজনীতির দিকে ফেরে; প্রথমে শাসনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, তার পরে সেই সম্প্রদায়ের দমন। এই দমনের ফলে শান্তিপ্রিয় ধর্মসম্প্রদায় সামরিক সংঘে পরিণত হয়। এমনিভাবেই শিখ এবং আরও অনেক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। মারাঠাদের ইতিহাস আর-একটু জটিল, কিন্তু সেখানেও ধর্ম ও জাতীয়তার সমন্বয়ে তাদের মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের পতন ব্রিটিশের হাতে নয়, তাদের পরাজয় এই ধর্ম ও জাতীয়তার মিশ্র আন্দোলনের ফলে, বিশেষ করে মারাঠাদের অভ্যুদয়ে। ঔরঙজেবের ধর্মবিষয়ে অসহিষ্ণুতার ফলেই এই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। এটা খুবই সম্ভব যে, ঔরঙজেবের অসহিষ্ণুতার প্রধান কারণ, তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে এই ক্রমবর্ধমান ধর্মজাগরণ।

১৬৬৯ সালে মথুরার জাঠ কৃষাণরা বিদ্রোহ করে। তারা বারবার পরাজিত হলেও তিরিশ বছর ধরে, ঔরঙজেবের মৃত্যু পর্যন্ত, ক্রমাগত বিদ্রোহ করে চলল। মনে রেখো, মথুরা আগ্রার খুবই কাছে, অর্থাৎ এই বিদ্রোহ রাজধানীর খুব কাছেই ঘটেছিল। আর-একটা বিদ্রোহ হল সৎনামীদের; এই সৎনামীরা ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের একটি ধর্মসংঘ। অতএব এটাও গরিব লোকের বিদ্রোহ এবং আমির-ওমরাহদের বিদ্রোহ থেকে ভিন্ন। তৎকালীন একজন মোগল-ওমরাহ তাদের ঘৃণাভরে বর্ণনা করেছিলেন : "একদল হতভাগা বিদ্রোহী—স্যাঁকরা, ছুতোর, মেথর, মুচি প্রভৃতি ইতর জীব।" তাঁর মতে এইসব 'ইতর জীব'দের উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান অত্যন্ত অন্যায় ব্যাপার।

এবারে শিখদের কথা বলতে হলে কিছু আগের থেকে আরম্ভ করতে হবে। গুরু নানকের কথা আগেই বলেছি। বাবর ভারতে আসার অল্পদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। যাঁরা হিন্দু এবং মুসলমান -ধর্মের একটা আপোস করতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর পরে আরও তিনজন গুরুও সম্পূর্ণ শান্তিকামী ছিলেন, এবং ধর্ম ছাড়া আর-কোনো বিষয়ে তাঁদের কৌতূহল ছিল না। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির এবং পুষ্করিণীর জন্যে আকবর চতুর্থ গুরুকে ভূমি দান করেন। সেই থেকে অমৃতসর হল শিখদের প্রধান কেন্দ্র।

তার পরে এলেন পঞ্চম গুরু অর্জুন সিংহ, যিনি 'গ্রন্থ' সংকলিত করেন। এই গ্রন্থ হল কতকগুলি বাণী ও স্তোত্রের সংগ্রহ এবং শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কোনো রাজনৈতিক অপরাধের জন্যে জাহাঙ্গীর অর্জুন সিংহের প্রাণদণ্ড করেন। এই থেকেই শিখ-আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। তাদের গুরুর প্রতি এই অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণের ফলে শিখদের ক্রোধের শেষ থাকল না, এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাদের নজর পড়ল। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিংহের সময় শিখরা একটি যোদ্ধৃ-সংঘে পরিণত হল এবং শাসনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতে লাগল। গুরু হরগোবিন্দ নিজেই দশ বৎসরের জন্যে জাহাঙ্গীর কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। নবম গুরু ছিলেন তেগ্ বাহাদুর; তিনি ঔরঙজেবের সমসাময়িক ছিলেন। ঔরঙজেব তাঁকে আদেশ দিলেন ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে; অস্বীকার করায় তাঁর হল প্রাণদণ্ড। দশম এবং শেষ গুরু ছিলেন গোবিন্দ সিংহ। তিনি শিখদের প্রতাপশালী যোদ্ধৃসংঘে পরিণত করলেন; উদ্দেশ্য, দিল্লির সম্রাটের বিরোধিতা করা। ঔরঙজেবের এক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরে আর-কোনো গুরু হন নি। কথিত আছে, গুরুদের শক্তি এখন শিখজাতির উপর নির্ভরশীল—যার নাম হল 'খালসা' অথবা 'নির্বাচিত'।

ঔরঙজেবের মৃত্যুর অল্প পরেই শিখ-বিদ্রোহ হল। এ বিদ্রোহ দমিত হলেও শিখদের শক্তি-বৃদ্ধি হয়ে চলল, এবং তারা পাঞ্জাবে সংঘবদ্ধ হতে লাগল। পরবর্তীকালে, শতাব্দীর শেষ দিকে রণজিত সিংহের নেতৃত্বে এক শিখ-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

এইসব বিদ্রোহ বিরক্তিকর হলেও মোগল-সাম্রাজ্যের আসল বিপদ হল, দক্ষিণ-পশ্চিমে মারাঠা-জাতির অভ্যুদয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালেও শাহ্‌জি ভোঁসলা -নামক এক মারাঠা-সর্দার বহু গোলযোগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আহ্‌মদনগর-রাজ্যের একজন সেনানী, পরে বিজাপুরের।

কিন্তু মারাঠাদের অতুল যশের কারণ তাঁর ছেলে শিবাজি (জন্ম—১৬২৭), এবং তিনি ছিলেন মোগল-সাম্রাজ্যের যম। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি পুনার কাছে প্রথম এক দুর্গ অধিকার করেন। তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক সেনানী, আদর্শ গেরিলা নায়ক ও ভাগ্যান্বেষী, এবং একদল অনুরক্ত সাহসী ও শক্ত পাহাড়িকে সংঘবদ্ধ করে সেনাবাহিনী গঠন করলেন। তাদের সাহায্যে তিনি বহু দুর্গ অধিকার করলেন এবং ঔরঙজেবের সেনাধ্যক্ষদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। ১৬৬৫ সালে তিনি সহসা সুরাটে এসে নগর লুঠ করলেন। সুরাটে তখন ইংরেজদের একটি গুদাম ছিল। অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি আগ্রাতে ঔরঙজেবের রাজসভায় যান, কিন্তু সেখানে স্বাধীন নৃপতিরূপে গৃহীত না হওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তাঁকে বন্দী করা হয়, কিন্তু তিনি পলায়ন করেন। তখনই কিন্তু ঔরঙজেব তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু শীগ্গিরই শিবাজি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, এবং দক্ষিণ-ভারতের মোগল-রাজপুরুষরা তাঁকে এত ভয় করতেন যে, তাঁকে শান্ত রাখার জন্যে টাকা ঘুষ দিতে আরম্ভ করলেন। এই হল বিখ্যাত চৌথ অথবা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ, যা মারাঠারা যেখানে যেত সেখানেই আদায় করত। এইরূপে দিল্লি-সাম্রাজ্যের শক্তির হ্রাস এবং মারাঠা-শক্তির বৃদ্ধি হতে লাগল। ১৬৭৪ সালে শিবাজি মহাসমারোহে রায়গড়ে রাজমুকুট ধারণ করলেন। ১৬৮০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত জয়ী হয়েছিলেন।

তুমি এখন কিছুকাল যাবৎ মারাঠাদেশের কেন্দ্রস্থলে পুনায় রয়েছ, অতএব নিশ্চয় জানো, শিবাজিকে সে দেশের লোকেরা কীরকম ভালোবাসে। যে ধরনের ধর্ম-জাতীয়তার পুনরুত্থানের কথা আগেই বলেছি, শিবাজি ছিলেন তারই প্রতীক। অর্থনৈতিক ভাঙন এবং জনসাধারণের দুর্দশা এর ক্ষেত্র তৈরি করেছিল, এবং তাতে উর্বরতা সম্পাদন করেছিলেন দুজন বড়ো মারাঠি কবি, রামদাস এবং তুকারাম, তাঁদের কাব্য ও ভজনের সাহায্যে। মারাঠাজাতি জাতীয়তা ও একতার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই ছিল, যখন এই অপূর্ব নেতার আবির্ভাব তাদের বিজয়ের পথে নিয়ে গেল।

শিবাজির ছেলে সম্ভাজিকে মোগলরা নির্যাতিত করে হত্যা করেছিল, কিন্তু সামান্য পরাজয়ের পরে আবার তারা বেশি করে প্রতাপশালী হতে লাগল। ঔরঙজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। অনেক শাসনকর্তা রাজধানীর বশ্যতা অস্বীকার করে ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। বাঙলা খসল। অযোধ্যা ও রোহিলখন্ডও সরে গেল। দক্ষিণে উজির আসফ-জা এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন, তা হল বর্তমান হায়দরাবাদ। বর্তমান নিজাম এই আসফ-জার বংশধর। ঔরঙজেবের মৃত্যুর সতেরো বছরের মধ্যে মোগল-সাম্রাজ্য প্রায় অন্তর্হিত হল। কিন্তু দিল্লি ও আগ্রাতে পর পর নামে-মাত্র কয়েকজন সম্রাট হলেন, যাঁদের সাম্রাজ্য বলতে কিছুই ছিল না।

সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের শক্তির উত্থান হতে লাগল। তাদের প্রধানমন্ত্রী পেশোয়াই আসল শক্তি হয়ে দাঁড়ালেন রাজাকে পিছনে ফেলে। পেশোয়া-পদ বংশানুক্রমিক হল, অনেকটা জাপানের শোগানদের মতো, এবং রাজার গুরুত্ব কমে গেল। নিজের দৌর্বল্যবশত দিল্লির সম্রাট দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র মারাঠাদের চৌথ আদায়ের দাবি স্বীকার করলেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পেশোয়া গুজরাট, মালব ও মধ্য-ভারত জয় করলেন। তাঁর সেনাবাহিনী প্রায় দিল্লির দ্বারে এসে পড়ল। মনে হল মারাঠারাই বুঝি ভারতের সর্বময়প্রভু হবে। দেশে তাদের অক্ষুন্ন প্রাধান্য। কিন্তু সহসা ১৭৩৯ সালে উত্তর-পশ্চিম থেকে এক শক্তির অনাহূত প্রবেশের ফলে একটা ওলটপালট ঘটল এবং উত্তর-ভারতের রূপ বদলে গেল।

৯২

ভারতের দ্বন্দ্বে ইংরেজের জয়

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

আমরা দেখেছি, দিল্লি-সাম্রাজ্যের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। এমনকি এ বললেও দোষ হয় না যে, সাম্রাজ্য হিসেবে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তবু দিল্লি এবং উত্তর-ভারতের আরও বেশি পতন হওয়া বাকি ছিল। তোমায় বলেছি, ভারতে তখন ভাগ্যান্বেষীর যুগ। এক ভাগ্যান্বেষী রাজা সহসা উত্তর-পশ্চিম থেকে ছোঁ মেরে, তুমুল হত্যা ও লুঠতরাজের পরে বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে চলে গেলেন। এই লোকটি ছিলেন নাদির শাহ্, যিনি বাহুবলে পারশ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। শাহ্‌জাহান-নির্মিত প্রসিদ্ধ ময়ূরসিংহাসন তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এই ভীষণ আবির্ভাব হয় ১৭৩৯ সালে; ফলে উত্তর-ভারত অতি দুরবস্থায় পড়ল। নাদির শাহ্ তাঁর রাজ্যবিস্তার করে একেবারে সিন্ধুনদ পর্যন্ত নিয়ে এলেন। ফলে আফগানিস্থান ভারতের বাইরে চলে গেল। মহাভারতের এবং গান্ধাররাজ্যের যুগ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ভারতের ইতিহাসে আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এবার সেটা গেল।

সতেরো বছরের মধ্যে দিল্লিতে আর-একজন আক্রমণকারী এল। এ হল আহ্‌মদ শাহ্ দুর্‌রানি, আফগানিস্থানের সিংহাসনে নাদির শাহ্‌এর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এইসব আক্রমণ সত্ত্বেও মারাঠাশক্তি প্রসারিত হয়ে চলল এবং ১৭৫৮ সালে পাঞ্জাব তাদের করতলগত হল। তারা এইসব বিজিত রাজ্যে শাসনবিধি স্থাপনের কোনো চেষ্টা করে নি, প্রসিদ্ধ চৌথ-কর আদায় করে স্থানীয় লোকদের উপরেই শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিল। এইরূপে তারা ছিল প্রায় সমগ্র দিল্লি-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তার পরে কিন্তু সহসা বাধা এল। দুর্‌রানি আবার উত্তর-পশ্চিম থেকে নেমে এসে অন্যদের সাহচর্যে মারাঠাদের এক বিপুল বাহিনীকে পানিপথের প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করল। এবার দুর্‌রানি হল উত্তর-ভারতের অধীশ্বর, এবং তাকে দমন করার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু এই বিজয়ের মুহূর্তে তার নিজের সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় সে ফিরে চলে গেল।

মনে হল, বুঝি-বা মারাঠাদের প্রাধান্যের দিন শেষ হয়েছে। যে প্রকাণ্ড লক্ষ্যবস্তুর পিছনে তারা ছুটেছিল তা তাদের হাত এড়িয়ে গেল। কিন্তু ক্রমে তারা তাদের পুরোনো প্রাবল্য ফিরে পেল এবং ভারতের প্রবলতম আভ্যন্তরীণ শক্তি হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কিন্তু তাদের চেয়েও বড়ো শক্তি ঘটনাস্থলে এসে পড়েছিল এবং বেশ দীর্ঘকালের জন্যে ভারতবর্ষের অদৃষ্ট-নিরূপণ হচ্ছিল। এই সময় বহু মারাঠা সামন্ত-রাজার অভ্যুদয় হয়। কাগজে-কলমে তাঁরা ছিলেন পেশোয়ার অধীনস্থ। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া; এ ছাড়া বরোদার গাইকোয়াড় এবং ইন্দোরের হোলকার ছিলেন।

এবার, আগে যেসব ঘটনার নাম করেছি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করি। এই যুগে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ ও ফরাসির মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক সময়েই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ চলত, এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা লড়তেন ভারতে। কিন্তু কখনও কখনও সরকারিভাবে ইউরোপে উভয়ের মধ্যে শান্তি থাকলেও ভারতে ফরাসি-ইংরেজের যুদ্ধ চলত। উভয় পক্ষেই দুঃসাহসিক বিবেকহীন ভাগ্যান্বেষীর অভাব ছিল না, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ধন এবং ক্ষমতা-লাভ; ফলে স্বভাবতই দু দলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ফরাসি-পক্ষে সে সময়ে প্রধানতম ব্যক্তি ছিল ডুপ্লে। ইংরেজ পক্ষে ক্লাইভ। ডুপ্লে প্রথম যে লাভজনক ব্যবসার পত্তন করে তা হল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদে সৈন্য ভাড়া দেওয়া এবং পরে লুঠতরাজ করা। ফরাসি-প্রভাব বাড়ল; কিন্তু অবিলম্বেই ইংরেজরা তাদের পন্থা অনুসরণ করে তাদের চেয়েও পাকা হয়ে উঠল। দু পক্ষই ক্ষুধার্ত শকুনির মতো গোলযোগের অনুসন্ধান করতে লাগল, এবং গোলযোগের তো কোনো অভাব ছিলই না। যখনই দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কোনো বিবাদ বাধত

ভারতে
ইংগ-ফরাসি দ্বন্দ্ব
আফগান
সিন্ধুনদ
দিল্লি
অযোধ্যা
গংগা
গোয়ালিয়র
মারাঠা
বংগদেশ
চন্দননগর
বোম্বাই
নিজাম
মাদ্রাজ
মহীশূর
পাণ্ডিচেরি
মূল ফরাসি-
প্রভাবাধীন অঞ্চল
ক্লাইভের আমলে
ব্রিটিশ-অধিকার
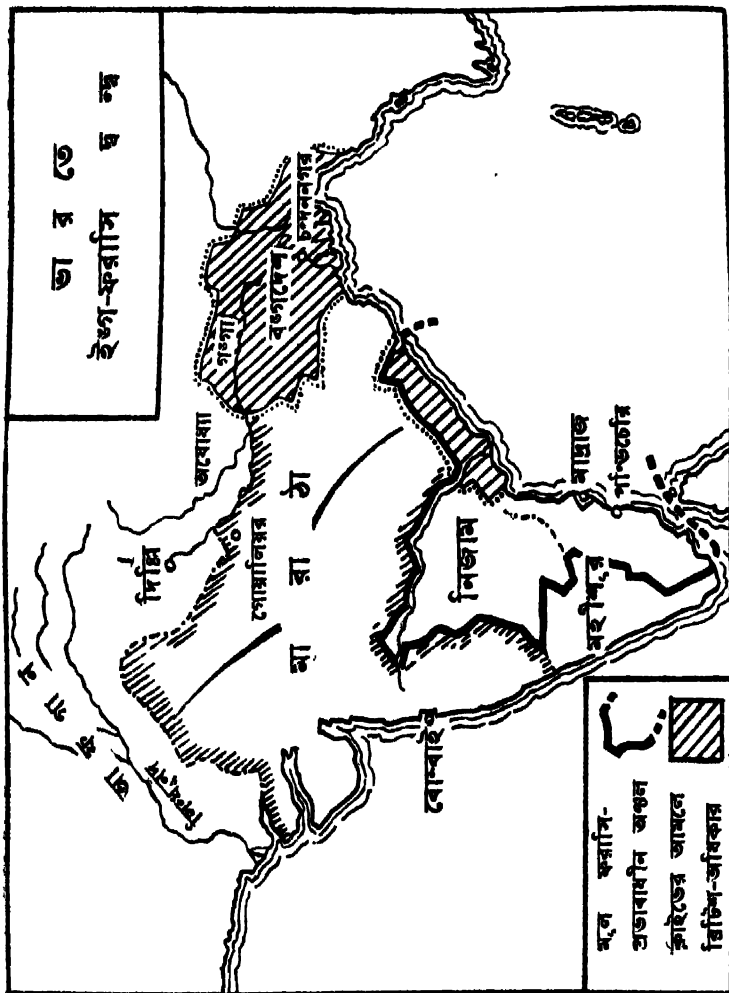
তখনই এক পক্ষে ইংরেজ ও অপর পক্ষে ফরাসির সমর্থন খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। পনেরো বছরের (১৭৪৬-১৭৬১) চেষ্টার পর ফ্রান্সের উপর ইংলণ্ড জয়ী হল। ভারতে ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীরা তাদের স্বদেশের পূর্ণ সমর্থন পেত। ডুপ্লে এবং তার সহকর্মীরা ফ্রান্সের কাছ থেকে এ সুবিধেটা পায় নি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভারতে ইংরেজদের পিছনে ছিল ব্রিটিশ বণিক-সম্প্রদায় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারেরা। তারা প্রয়োজন হলে পার্লামেণ্টের ও গভর্মেণ্টের সাহায্য পেত। ফরাসিদের পিছনে ছিলেন রাজা পঞ্চদশ লুই (চতুর্দশ লুইয়ের পৌত্র এবং পরবর্তী রাজা), যিনি বিলাসব্যসনে দিন কাটিয়ে ধীরে ধীরে রসাতলের দিকে যাচ্ছিলেন। ইংরেজদের নৌবহরের প্রাধান্যও তাদের অনুকূল ছিল। ফরাসি এবং ইংরেজ দু পক্ষই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিত, যাদের বলা হত 'সিপয়্' অর্থাৎ সিপাহি। তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং শিক্ষা স্থানীয় সেনাদলের চেয়ে ভালো ছিল, কাজেই তাদের চাহিদাও ছিল খুব।

এইরূপে ইংরেজরা ভারতে ফরাসিদের পরাজিত করে দুটি ফরাসি শহর, চন্দননগর ও পণ্ডিচেরি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল। ধ্বংসের মাত্রা এমন হয়েছিল যে, শোনা যায়, দুটোর একটা শহরেও কোনো বাড়ির ছাদ অবশিষ্ট ছিল না। ভারতের রঙ্গভূমি থেকে ফরাসিরা এবার বিদায় নিল, এবং যদিও পরবর্তীকালে তারা পণ্ডিচেরি ও চন্দননগর ফিরে পায়, এবং এখনও এ দুটি শহর তাদের হাতে আছে, তবু এ দেশে তাদের বিন্দুমাত্রও প্রতিষ্ঠা নেই।

একালে শুধু যে ভারতেই ইংরেজ ও ফরাসিতে যুদ্ধ হয়েছিল তা নয়। ইউরোপ ছাড়া তারা কানাডা এবং অন্যত্রও লড়েছিল। কানাডাতে ইংরেজরা জয়ী হল। অল্পদিন পরেই কিন্তু আমেরিকান উপনিবেশগুলি ইংরেজদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং ফরাসিরা এই উপনিবেশদের সাহায্য করে ইংরেজদের উপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বলা যাবে।

ফরাসিদের পরাজয়ের পরে ইংরেজদের অগ্রগতির পথে আর কী বাধা ছিল? অবশ্য পশ্চিম ও মধ্য -ভারতে ছিল মারাঠারা, এমনকি উত্তরেও তাদের খানিকটা প্রাধান্য ছিল। হায়দরাবাদে নিজাম ছিল, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে। দক্ষিণ-ভারতে নূতন প্রতাপশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দর আলির আবির্ভাব হয়েছিল। প্রাচীন বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ তিনি করায়ত্ত করেছিলেন, যা বর্তমানে মহীশূর। উত্তরে বাঙলাদেশে ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা—সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ব্যক্তি। দিল্লি-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল শুধু কল্পনায়। কিন্তু মজা এই, ইংরেজরা তাঁদের বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ দিল্লি-সম্রাটকে সসম্মানে উপহার পাঠাতেন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ নাদির শাহ্‌এর আক্রমণের অনেক দিন পরেও, যদিও সে আক্রমণ কেন্দ্রীয় সরকারের ছায়াটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়েছিল! তোমার মনে থাকতে পারে, বাঙলাদেশের ইংরেজরা ঔরঙজেবের সময় একবার আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে এমন বিপর্যয় ঘটেছিল যে, আবার চেষ্টা করার আগে তারা যথেষ্ট ইতস্তত করছিল। যদিও উত্তর-ভারতের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তির আক্রমণের এই ছিল সুবর্ণসুযোগ।

সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা-রূপে স্বদেশবাসীর কাছে বহুসম্মানিত ইংরেজ ক্লাইভ ছিল এইরকম দৃঢ়-সংকল্প ব্যক্তি। তার জীবনী ও কার্যের আলোচনা করলে সাম্রাজ্য কী করে তৈরি হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। ক্লাইভ ছিল দুঃসাহসিক, অসাধারণ লোভী, এবং তার সংকল্পের কাছে জাল জুয়াচুরি বা মিথ্যা কথার কোনো দোষ ছিল না। বাঙলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ব্রিটিশদের অনেক ব্যবহারে ত্যক্ত হয়ে তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে এসে কলকাতা দখল করলেন। এই সময়েই তথাকথিত 'অন্ধকূপ-হত্যা' ঘটেছিল বলে প্রকাশ। গল্প এই যে, নবাবের একজন রাজপুরুষ বহুসংখ্যক ইংরেজকে একরাত্রি একটি ছোটো শ্বাসরোধক ঘরে আটকে রেখে দেন। তার ফলে তাদের অধিকাংশই দম আটকে মরে যায়। এ ধরনের কাজ যে বর্বরোচিত ও ভীষণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গল্পের উৎপত্তি হচ্ছে মাত্র একজন লোকের কথা থেকে, যে লোকটি খুব বিশ্বাস্য ছিল না। কাজেই বহু লোকের ধারণা যে, গল্পটা মোটামুটি মিথ্যা, এবং তা যদি নাও হয় তা হলেও অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।

ক্লাইভ কলকাতা-অধিকারে নবাবের সাফল্যের প্রতিশোধ নিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যনির্মাতা

কাজটা করল তার নিজের মনোমতো উপায়ে—নবাবের মন্ত্রী মীরজাফরকে ঘুষ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি করিয়ে, এবং একটি জাল দলিল তৈরি করিয়ে। কিন্তু সেসব গল্প অনেক বড়ো। জালিয়াতি এবং বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে জয়ের পথ সুগম করে নিয়ে ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে নবাবকে পলাশির রণক্ষেত্রে পরাজিত করল। যুদ্ধের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল ছোটোখাটো, কিন্তু আসলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই ষড়যন্ত্র দিয়ে যুদ্ধ প্রায় জেতা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পলাশির ছোটো যুদ্ধের ফল হয়েছিল বড়ো। বাঙলার ভাগ্যনিরূপণ এতেই হয়ে গেল, এবং পলাশির যুদ্ধ থেকেই ভারতে ইংরেজশাসন সুরু হল বলা হয়ে থাকে। এরকম বিশ্বাস-ঘাতকতা ও জালিয়াতির জঘন্য ভিত্তির উপরে ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই হল সব সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যনির্মাতার সাধারণ পদ্ধতি।

নিয়তিচক্রের এই আকস্মিক ঘূর্ণন বাঙলার লোভী ইংরেজদের মাথা গরম করে দিল। তারা ছিল বাঙলার প্রভু এবং তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। অতএব, ক্লাইভের নেতৃত্বে তারা এই প্রদেশের সাধারণ রাজকোষ সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিল। ক্লাইভ নিজের জন্যে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা নগদ নিল, এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে একটা জায়গির গ্রহণ করল, যার বার্ষিক আয় ছিল বহু লক্ষ টাকা। অন্যসব ইংরেজরাও এমনি করে নিজেদের 'ক্ষতিপূরণ' করে নিল। ধনের জন্যে নির্লজ্জ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের ঘৃণিত লোভ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ইংরেজরা ভারতের 'নবাব-নির্মাতা' হয়ে ইচ্ছামতো নবাব-পরিবর্তন করতে আরম্ভ করল। প্রতি পরিবর্তনের ফলে আসত ঘুষ এবং প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন। রাজ্যশাসনব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না, তা ছিল হতভাগা নবাবের কাজ। তাদের কাজ ছিল রাতারাতি বড়োলোক হওয়া।

কয়েক বছর পরে ১৭৬৪ সালে ব্রিটিশরা বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লির নামে-মাত্র সম্রাটকে বশ্যতা স্বীকার করাল। তিনি তাদের বৃত্তিভোগী হলেন। বাঙলা ও বিহারে ব্রিটিশের প্রভুত্বের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। দেশের থেকে বিপুল ধনসম্পত্তি লুঠ করেও তাদের তৃপ্তি হল না, তারা টাকা রোজগারের অন্য পন্থা খুঁজতে লাগল। আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে তাদের কোনো হাত ছিল না। এখন তারা এই ব্যবসা আরম্ভ করল, কিন্তু যে বাণিজ্য-কর অন্যসব দেশী বণিকদের দিতে হত তা দিতে অস্বীকার করল। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংসের এই হল প্রথম আঘাত।

উত্তর-ভারতে ব্রিটিশদের ক্ষমতা এবং ধনসম্পত্তির উপর অধিকার ছিল, কিন্তু কোনো দায়িত্ব ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক-ভাগ্যান্বেষীরা প্রকৃত ব্যবসা এবং সোজাসুজি লুঠতরাজের তফাত নিরূপণের জন্যে কষ্ট করত না। এই সময়ে ইংরেজরা ভারত থেকে ভারতীয় ধনের [illegible] নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরত, আর তাদের বলা হত 'নবব্' অর্থাৎ নবাব। যদি থ্যাকারের 'ভ্যা[illegible] ফেয়ার' পড়ে থাকো তবে এরকম একটা টাকার কুমিরের কথা তোমার মনে পড়বে।

রাজনৈতিক স্থিতির অভাব, অনাবৃষ্টি এবং ব্রিটিশদের লুটের পদ্ধতির সংমিশ্রণে ১৭৭০ সালে বাঙলা ও বিহারে এক অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হল। শোনা যায়, এই দুর্ভিক্ষে এসব দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়। সমস্ত ঘটনাটা ভেবে দেখো, কত লক্ষ লক্ষ লোক ধীরে ধীরে অনাহারে মরল। গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল, এবং কৃষিক্ষেত্র ও লোকালয় জঙ্গলে ছেয়ে গেল। এই ক্ষুধার্তদের কেউ সাহায্য করল না। নবাবদের শক্তিসামর্থ্য ছিল না, বাসনাও ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শক্তি-সামর্থ্য ছিল, কিন্তু ইচ্ছা অথবা দায়িত্ববোধের অস্তিত্ব ছিল না। তাদের কাজ ছিল টাকা জোগাড় করা এবং খাজনা তোলা। এ দুটো কাজ তারা নিজেদের দিক থেকে এত ভালো করে করেছিল যে, আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, এই মহাদুর্ভিক্ষ এবং এক-তৃতীয়াংশ লোকের অন্তর্ধান সত্ত্বেও তারা জীবিতদের কাছ থেকে পুরো খাজনা আদায় করতে পেরেছিল। আসলে তারা আদায় করেছিল ঢের বেশি, এবং সরকারি কাগজপত্র অনুসারে সে আদায় হয়েছিল 'বলপ্রয়োগে'। এক প্রচণ্ড মন্বন্তরে নিরন্ন হতভাগ্য জীবিতদের কাছ থেকে এরকম বলপ্রয়োগে টাকা আদায়ের অমানুষিকতা পুরোপুরি বোঝা কঠিন।

ফরাসিদের উপর এবং বাঙলাদেশে ইংরেজদের জয় সত্ত্বেও দক্ষিণে তাদের বেশ-একটু অসুবিধে হয়েছিল। পরিপূর্ণ জয়লাভের আগে তাদের পরাজয় এবং অবমাননা বরণ করতে হয়েছিল। মহীশূরের হায়দর আলি ছিলেন তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি ছিলেন যোগ্য সামরিক নেতা, এবং তিনি বহুবার ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। ১৭৬৯ সালে তিনি নিজের সুবিধা-জনক শান্তির শর্ত মাদ্রাজ দুর্গের নীচেই ইংরেজদের উপরে চাপান। দশ বছর পরে তিনি আবার প্রচুর সাফল্য লাভ করলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে টিপু সুলতান ব্রিটিশদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালেন। বহু বছর ধরে দুটো মহীশূর-যুদ্ধের পরে অবশেষে টিপুর পরাজয় ঘটল। মহীশূরের বর্তমান মহারাজার একজন পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশের রক্ষণাধীনে সিংহাসনে বসানো হল।

মারাঠারাও ১৭৮২ সালে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজদের পরাজিত করল। উত্তর-ভারতে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া প্রবল হয়ে উঠলেন, এবং হতভাগ্য দিল্লির সম্রাট হলেন তাঁর হাতের পুতুল।

ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ইংলণ্ড থেকে এসে প্রথম গভর্নর-জেনারেল হল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এতদিনে ভারতের প্রতি মনোযোগ দিতে লাগল। হেস্টিংস্ নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ শাসক, কিন্তু তার সময়েও যে গভর্মেণ্ট ছিল দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ তা সবাই জানে। হেস্টিংস্ কর্তৃক মোটা মোটা টাকার শোষণ সম্বন্ধে বোধ হয় একটু জানাজানি হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতশাসনের জন্যে পার্লামেণ্টে হেস্টিংসের বিচার হয়, এবং দীর্ঘকাল বিচারের পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ক্লাইভেরও অনুরূপ বিচার হয়েছিল। ফলে সে আত্মহত্যা করে। এইরূপে ইংলণ্ড তার দুটি লোকের বিচার করে বিবেক ঠাণ্ডা করল, কিন্তু মনে মনে তারা ইংলণ্ডে পরম পূজিত ব্যক্তি। তদুপরি তাদেরই পদ্ধতিতে লাভবান হতেও ইংলণ্ডের আপত্তি ছিল না। ক্লাইভ ও হেস্টিংস্ নিন্দিত হতে পারে, কিন্তু তারাই হল খাঁটি সাম্রাজ্যনির্মাতা, এবং যতদিন পরাধীন জাতির উপর এমনি করে সাম্রাজ্যের ভার চাপাতে হবে এবং তাদের শোষণ করতে হবে, ততদিন এইসব লোকই হবে বহুমান্য। শোষণের পদ্ধতি বিভিন্ন যুগে বদলাতে পারে, কিন্তু তার মূল একই। ক্লাইভ পার্লামেণ্টে নিন্দিত হল বটে, কিন্তু লণ্ডনে হোয়াইট-হলে ইণ্ডিয়া-হাউসের সামনে তার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং ভিতরে তারই আত্মা ভারতে ইংরেজ-শাসনবিধির সৃষ্টি করছে।

হেস্টিংস্ প্রথম ব্রিটিশ-অধীনে ক্ষমতাহীন ভারতীয় রাজন্যদের সৃষ্টি আরম্ভ করে। অতএব যে অসংখ্য সাজপোশাকপরা শূন্যমস্তিষ্ক মহারাজা এবং নবাবের দল চার দিকে পেখম ধরে বেড়িয়ে বেড়ায় এবং নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ দেয়, তাদের জন্যে অংশত হেস্টিংস্ দায়ী।

ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা, আফগান, শিখ এবং বর্মীদের সাথে আরও অনেক যুদ্ধ তাদের করতে হয়। কিন্তু এইসব যুদ্ধের একটা মজা হল এই যে, যদিও এই-সব যুদ্ধ লড়া হত ইংরেজদের উপকারের জন্যে, খরচ জোগাত ভারতবর্ষ। ইংলণ্ড অথবা ইংরেজদের উপরে কোনো বোঝা পড়ত না। তারা খালি উপকারটা গ্রহণ করত।

মনে রেখো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটা বণিক-সমিতি, ভারত শাসন করছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ বাড়ছিল, কিন্তু মোটামুটি ভারতের অদৃষ্টনিয়ন্তা ছিল একদল ভাগ্যান্বেষী বণিক। শাসন ছিল বহুল পরিমাণে ব্যবসা এবং ব্যবসা ছিল বহুল পরিমাণে লুঠ। এই তিনটি জিনিষের ভেদরেখা ছিল সূক্ষ্ম। কোম্পানির অংশীদারেরা শতকরা ১০০, ১৫০, এবং কখনও কখনও ২০০ ভাগেরও উপর লভ্যাংশ পেত। তা ছাড়া, এদের ভৃত্যরা ভারত থেকে মোটা মোটা টাকা জোগাড় করত—যেমন ক্লাইভ। কোম্পানির আমলারাও ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে অতি দ্রুত প্রচুর অর্থের মালিক হত। এইরকম ছিল ভারতে কোম্পানির শাসন।

চীনের বিখ্যাত মাঞ্চু-অধিপতি

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

আমার মন এত বিচলিত যে কী করব বুঝতে পারছি না। একটা ভীষণ দুঃসংবাদ পেয়েছি যে, বাপু আমরণ প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত করেছেন। আমার নিজস্ব ছোটো জগত, যেখানে তাঁর স্থান এত বড়ো, কেঁপে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সব জায়গাই যেন শূন্য, সবই যেন অন্ধকার। তাঁর মূর্তি বারেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যখন শেষবার তাঁকে দেখি, বছরখানেক আগে, পশ্চিম-যাত্রী জাহাজের উপরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কি আর তাঁকে দেখতে পাব না? মন যখন সন্দিগ্ধ, যখন উপদেশের প্রয়োজন, যখন মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে সান্ত্বনা চায়, তখন কার কাছে যাব? যে প্রিয় নেতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে পরিচালনা করতেন তিনি চলে গেলে আমরা কী করব? যে দেশের মহান্ লোকেরা এমনি করে মরে সে দেশ কী ভয়ানক! এ দেশের লোক জন্ম-ক্রীতদাস, তাদের মনও ক্রীতদাসের মতো, যারা স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে কলহবিবাদ করে।

লেখার মতো মানসিক অবস্থা নয়; ভেবেছিলাম এই পত্রধারা শেষ করে দেব। কিন্তু সেটা বোকামি হবে। আমার এই কুঠুরির মধ্যে আমি লেখাপড়া ও চিন্তা করা ছাড়া আর কী করতে পারি? যখন আমি ক্লান্ত, মন যখন বিক্ষিপ্ত, তখন তোমার চিন্তা ও তোমার কাছে চিঠি লেখার চেয়ে বড়ো সান্ত্বনার উপকরণ আর কী আছে? দুঃখ ও অশ্রু এ পৃথিবীতে সঙ্গী করলে চলে না। বুদ্ধ বলেছিলেন, "মহাসাগরে যত জল, তার চেয়ে অধিক পরিমাণে অশ্রুপাত ঘটেছে।" এ হতভাগ্য পৃথিবীর সুখের দিন আসার আগে আরও অনেক চোখের জল পড়বে। আমাদের কর্তব্য এখনও বাকি আছে, বিরাট কর্মসম্ভার এখনও আমাদের আহ্বান করছে। আমাদের নিজেদের ও আমাদের যারা অনুবর্তী তাদের, এ কাজ যতদিন শেষ না হয় ততদিন বিশ্রাম নেই। অতএব আমি আমার কার্যসূচী মেনে চলতে সিদ্ধান্ত করেছি, এবং আগের মতোই লিখে চলব তোমার কাছে।

আমার শেষ কয়েকটা চিঠি হয়েছে ভারত সম্বন্ধে, এবং কাহিনীর শেষ দিকটা খুব প্রীতিকর নয়। ভূপাতিত ভারত ছিল যাবতীয় দস্যু এবং ভাগ্যান্বেষীর লুণ্ঠনের স্থান। প্রাচ্যে ভারতের প্রতিবেশী চীনের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। এখন চীন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

তোমার মনে আছে, আমি তোমাকে মিঙ-যুগের সমৃদ্ধির কথা বলেছি (পত্র ৮০); আর বলেছি, কেমন করে দুর্নীতি ও বিভেদ এল এবং চীনের উত্তরের প্রতিবেশী মাঞ্চুরা এসে চীন দখল করল। ১৬৫০ সালের পর থেকে মাঞ্চুরা চীনের সর্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অর্ধবিদেশী মাঞ্চু-রাজবংশের অধীনে চীনের প্রতাপ বৃদ্ধি পেল, এমনকি সংগ্রামলিপ্সা প্রকাশ পেল। মাঞ্চুরা নূতন উদ্যম নিয়ে এল। তারা চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করত; তার পরিবর্তে তাদের অতিরিক্ত উদ্যম উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত করল।

নূতন রাজবংশে সাধারণত প্রথম দিকে জনকয়েক সক্ষম শাসকের উদ্ভব হয়ে শেষের দিকে অক্ষমতায় তলিয়ে যায়। সেইরকম মাঞ্চু-রাজবংশেও কয়েকজন অসামান্য ক্ষমতাশালী শাসক ও রাজনীতিবিদ্ জন্মেছিলেন। দ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন কাঙ্‌হি। সিংহাসন-আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মোটে আট। একষট্টি বছর ধরে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও জনবহুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁর অধিকারের দাবি শুধু এইজন্যে অথবা তাঁর সামরিক প্রতাপের জন্যে নয়। তাঁকে লোকে মনে রেখেছে তাঁর রাজনীতিজ্ঞতা এবং সাহিত্যবিষয়ে উৎসাহের জন্যে। ১৬৬১ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ চুয়াম্ন বছর ধরে তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজাধিরাজ চতুর্দশ লুইয়ের সমসাময়িক। দুজনেই অতি দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেন, কিন্তু

রাজত্বকালের দৈর্ঘ্যের প্রতিযোগিতায় লুই নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন বাহাত্তর বছর রাজ্যশাসন করে। এই দুজনের তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু সে তুলনায় লুইয়ের হার হবে। বিলাসিতার আধিক্যে তিনি দেশের সর্বনাশ করলেন, এবং ঋণভারে জর্জরিত করে তাকে ক্লান্তির শেষ সীমায় এনে ফেলেছিলেন। ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু। কাঙ্‌হি নিষ্ঠাবান কনফুসীয় ছিলেন, কিন্তু অন্যের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ছিলেন উদার। তাঁর অধীনে, শুধু তাঁর একার কেন, প্রথম চারজন মাঞ্চু-সম্রাটের অধীনেই, মিঙ-সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। এই সংস্কৃতির উচ্চ স্তর বর্তমান রইল, এমনকি কোনো কোনো স্থলে তার উন্নতি ঘটল। ব্যবহারিক শিল্প, ললিতকলা, সাহিত্য এবং শিক্ষার বহুল প্রচলন মিঙ-যুগের মতোই রইল। আগের মতোই চমৎকার চীনেমাটির জিনিষ তৈরি হতে লাগল। রঙিন ছবি-ছাপার কাজ আবিষ্কৃত হল এবং জেসুইট-পাদ্রীদের কাছে চীনদেশ তাম্রফলকে খোদাই করা ছাপার কাজ শিখল।

মাঞ্চু শাসকদের রাজনীতিজ্ঞতা ও সাফল্যের মূল হল চীন-সংস্কৃতির সাথে তাঁদের সম্পূর্ণভাবে মিলন। চীনের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সভ্য মাঞ্চুদের উদ্যম ও কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলেন নি। ফলে কাঙ্‌হি ছিলেন দুটি বিরুদ্ধ ভাবের অসাধারণ সংমিশ্রণ: তিনি ছিলেন দর্শন ও সাহিত্যের অনুরাগী, সংস্কৃতিমূলক কাজে নিবিষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে একজন সমর্থ সামরিক নেতা, দেশজয়ে অনুরাগী। সাহিত্য ও ললিতকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ভাসা-ভাসা ছিল না। তাঁর সাহিত্যবিষয়ে কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি জিনিষ—যা তাঁর অনুরোধে এবং সময়ে সময়ে তাঁরই সহায়তায় তৈরি হয়েছিল—তোমাকে তাঁর বিদ্যার গভীরত্ব সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দেবে।

তোমার মনে থাকতে পারে, চীনাভাষা শব্দের সমষ্টি নয়, শব্দচিত্রের সাহায্যে গঠিত।

উপর শব্দচিত্র; বহুসংখ্যক দৃষ্টান্তসহকারে এইসব শব্দচিত্রের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কাঙ্‌হির উৎসাহের ফলে আর-একটি জিনিষ রচিত হয়েছিল, একটি বিশাল সচিত্র বিশ্বকোষ, বহুশত খণ্ডে বিভক্ত। বইখানি একাই ছিল পুরো একটা লাইব্রেরি। এ বইতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছিল, কিছু বাদ দেওয়া হয় নি। কাঙ্‌হির মৃত্যুর পরে এই বইখানি তামার পাতের সাহায্যে মুদ্রিত হয়েছিল।

তৃতীয় জিনিষটি হল, চীনাভাষার সমগ্র সাহিত্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা; অর্থাৎ একটি অভিধান, যাতে শব্দ এবং বাক্যসমষ্টি চয়ন করে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা আছে। এই বইখানিও ছিল একটা অসাধারণ জিনিষ, কারণ এর রচনার জন্যে সমগ্র সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ প্রয়োজন। কবি, ঐতিহাসিক এবং প্রবন্ধকারদের রচনা থেকে পূর্ণ রচনা অনেক স্থলে উদ্ধৃত করে দেওয়া ছিল।

কাঙ্‌হির আরও অনেক সাহিত্যবিষয়ক কাজের নিদর্শন আছে, কিন্তু লোককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করার পক্ষে এই তিনটিই যথেষ্ট। একমাত্র অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধান (Oxford English Dictionary) —যার রচনা বহু পণ্ডিতের পঞ্চাশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে কয়েক বছর আগে সমাপ্ত হয়েছে—ছাড়া আধুনিক যুগে এমন কিছু নেই যা কাঙ্‌হির যুগের এই তিনটি বইয়ের সঙ্গে তুলনীয়।

কাঙ্‌হির মনোভাব খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টান মিশনারিদের প্রতি অনুকূল ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে তাঁর উৎসাহ ছিল এবং চীনের সমস্ত বন্দর তিনি এই কাজের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু শীগ্‌গিরই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, ইউরোপীয়রা তাঁর আনুকূল্যের ব্যভিচার করছে, এবং তাদের দাবিয়ে রাখা প্রয়োজন। তিনি সন্দেহ করলেন (নেহাত অকারণে নয়) যে, মিশনারিরা নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের দেশজয়ের সুবিধের জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। এতে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের অন্তর্ধান ঘটল। ক্যান্টনের জনৈক চীনা সেনানীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে তাঁর সন্দেহ দৃঢ়তর হল। ফিলিপাইন ও জাপানে ইউরোপীয় বণিকসমাজ এবং মিশনারিদের সঙ্গে তাদের স্ব-স্ব রাজসরকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই পত্র থেকে জানা গেল। এই সেনানী পরামর্শ

দিলেন যে, বৈদেশিক ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং খৃষ্টধর্মের প্রচলন বন্ধ করতে হবে।

এই রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল ১৭১৭ সালে। প্রাচ্যদেশসমূহে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র, এবং যে উদ্দেশ্যে এইসব দেশসমূহের কোনো-কোনোটিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও খৃষ্টধর্মের প্রচার সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে এতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরনেরই একটা ব্যাপার ঘটেছিল জাপানে, যার ফলে সে দেশে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে, চীন এবং অপরাপর প্রাচ্যদেশ অনগ্রসর, অজ্ঞ, এবং বৈদেশিকদের উপরে বিদ্বেষবশত তারা শুধু বাণিজ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের পর্যালোচনায় এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত চীন এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে অতি প্রাচীন যুগ থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিদেশী এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি বিদ্বেষের প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি বহুকাল যাবৎ ভারত বহু বৈদেশিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। শুধু যখন থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, বৈদেশিক বণিকসঙ্ঘ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের রাজ্যবিস্তারের উপায় তখনই তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল।

ক্যান্টনের সেনাপতির রিপোর্ট আলোচনা করে চীনা রাষ্ট্রপরিষদ তা অনুমোদন করলেন। ফলে কাঙ্‌হি যথোপযুক্ত বিধি অবলম্বন করে বৈদেশিক বাণিজ্য ও মিশনারিদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ করার আদেশ দিলেন।

এবার চীন ছেড়ে তোমাকে খানিকক্ষণের জন্যে এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়ায় নিয়ে গিয়ে সেখানে কী হচ্ছিল বলব। বিশাল সাইবেরিয়া পূর্বপ্রান্তে চীনদেশের সঙ্গে পশ্চিমে রাশিয়ার যোগসাধন করে। আমি বলেছি, চীনের মাঞ্চু-সাম্রাজ্য রাজ্যবিস্তারের পক্ষপাতী ছিল। চীন-সাম্রাজ্যে মাঞ্চুরিয়া তো ছিলই, তা ছাড়া এই সাম্রাজ্য মঙ্গোলিয়া ছাড়িয়ে আরও দূরে প্রসারিত হয়েছিল। রাশিয়াও গোল্ডেন হোর্ডের মঙ্গোলদের বিতাড়িত করে প্রবল প্রতাপশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, এবং সাইবেরিয়ার সমভূমি অতিক্রম করে পূর্বদিকে প্রসারিত হচ্ছিল। এই দুই সাম্রাজ্য এখন এসে সাইবেরিয়ায় মিলিত হল।

এশিয়ায় মঙ্গোলদের দ্রুত অধোগতি এবং অবনতি ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা। যারা একদিন ঝড়ের মতো এশিয়া ও ইউরোপের উপর দিয়ে বজ্রনাদে চলে গিয়েছিল, চেঙ্গিস ও তাঁর বংশধরদের নেতৃত্বে সেকালের পরিচিত পৃথিবীর অধিকাংশ জয় করেছিল, তারা বিস্মৃতিতে মিলিয়ে গেল। তৈমুরের অধীনে তারা আবার উঠেছিল, কিন্তু তৈমুরের সঙ্গে সঙ্গেই তার সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেল। তার পরে তার বংশের কেউ কেউ, যাদের নাম হল তাইমুরিদ কিছুদিন মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করেছিল, এবং তাদের রাজসভায় একটি চিত্রাঙ্কনের বিশেষ রীতির অভ্যুদয় হয়েছিল। ভারতজয়ী বাবর ছিলেন একজন তাইমুরিদ। এসব তাইমুরিদ-রাজার অস্তিত্ব সত্ত্বেও মধ্য এশিয়ায়, রাশিয়া থেকে শুরু করে তাদের স্বদেশ মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত, মঙ্গোলজাতির জড়তা দেখা দিল এবং তাদের সমস্ত প্রাধান্য লোপ পেল। কেন যে এরকম হল তা কেউ জানে না। কেউ কেউ বলেন যে, জলবায়ুর পরিবর্তনই এই অধোগতির কারণ। অন্য কেউ অন্য কথা বলেন। যা হোক, পুরোনো যুগের দিগ্বিজয়ীরা এখন নিজেরাই চার দিক থেকে আক্রান্ত।

মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে এশিয়া-অতিক্রমের স্থলপথসমূহ প্রায় দু শো বছর ধরে বন্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু রুশরা স্থলপথ দিয়ে চীনে এক দূতসঙ্ঘ প্রেরণ করে। তারা চেয়েছিল মিঙ-সম্রাটদের সাথে কূটনৈতিক সম্বন্ধ-স্থাপন, কিন্তু সফল হয় নি। অল্পকাল পরে ইয়েরমাক নামে এক রুশজাতীয় দস্যু একদল কশাক সঙ্গে নিয়ে উরাল-পর্বত অতিক্রম করে সাইবির-নামক একটি ছোটো দেশ দখল করে। এই রাষ্ট্রের নামেই গোটা দেশের নাম হল সাইবেরিয়া।

এ হল ১৫৮১ সালের ঘটনা, এবং সেই সময় থেকে রুশরা ক্রমাগত পূর্বদিকে যেতে লাগল এবং অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ বছরে প্রশান্ত মহাসাগরে পেঁছিল। অতি শীঘ্রই চীনাদের সাথে আমুর উপত্যকায় তাদের বিরোধ বাধল এবং যুদ্ধে রুশদের পরাজয় ঘটল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে দুই দেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল, যাকে বলে নার্চিনস্কের সন্ধি। রাজ্যের সীমারেখা স্থিরীকৃত হল এবং

উভয়পক্ষের বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করা হল। ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গে চীনের এই প্রথম সন্ধি। এই সন্ধির ফলে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত হল, কিন্তু বিপুল পরিমাণে ক্যারাভান্-বাণিজ্য গড়ে উঠল। এই সময় রুশ-জার ছিলেন পিটার দি গ্রেট, এবং তিনি চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসুক ছিলেন। তিনি কাঙ্‌হির নিকট দুটি দূতসঙ্ঘ প্রেরণ করেন এবং পরে চীন-রাজসভায় স্থায়ীভাবে একটি দূতাবাসের প্রতিষ্ঠা করেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে চীন বৈদেশিক দূতসঙ্ঘের আগমনে অভ্যস্ত। যতদূর মনে পড়ে আমার একটা চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে, রোমক-সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস অ্যাণ্টনিয়াস খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এক দূতসঙ্ঘ প্রেরণ করেছিলেন। ১৬৫৬ সালে ওলন্দাজ ও রুশ দূতসঙ্ঘ চীন-রাজসভায় গিয়ে মোগল-সম্রাটের রাজদূতদের দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা নিশ্চয় শাহ্‌জাহান কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন।

৯৪

একজন ইংরেজ রাজার কাছে এক চীন-সম্রাটের চিঠি

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

মাঞ্চু-সম্রাটরা অসাধারণ দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন মনে হয়। কাঙ্‌হির পৌত্র ছিলেন চতুর্থ সম্রাট, চিয়েন্ লুঙ। তিনিও দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে রাজত্ব করেছিলেন, ১৭৩৬ থেকে ১৭৯৬ পর্যন্ত। অন্যান্য বিষয়েও পিতামহের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। তাঁর দুটি জিনিষে উৎসাহ ছিল— সাহিত্যচর্চা ও সাম্রাজ্যবিস্তার। সংগ্রহের উপযুক্ত সব সাহিত্য তিনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। সংগ্রহের পরে বিবিধতথ্যসংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তালিকা বললে অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যায় না, কারণ প্রতি বইয়ের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ করে সমালোচনা-সংযুক্ত করা হয়েছিল। এই বিরাট বিবরণ-সংবলিত তালিকার চারটি ভাগ ছিল— পৌরাণিক অর্থাৎ কন্‌ফুসিবাদ, ইতিহাস, দর্শন এবং অপরাপর সাহিত্য। শোনা যায়, এর সমতুল্য কোনো বই আর কোথাও নেই।

এই কালেই চীনা উপন্যাস, ছোটো গল্প এবং নাট্যসাহিত্যের উন্নতি হয় এবং অতি উচ্চস্তরের হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ইংলণ্ডেও এই সময়ে উপন্যাস-সাহিত্যের প্রগতি হচ্ছিল। চীনা পোর্সিলিনের বাসন এবং ললিতকলার অন্যসব নিদর্শন এই সময়ে ইউরোপে সাগ্রহে গৃহীত হচ্ছিল এবং এদের ধারাবাহিক বাণিজ্য চলছিল। তার চেয়ে কৌতূহলপ্রদ হচ্ছে চায়ের ব্যবসা। এর শুরু হয়েছিল প্রথম মাঞ্চু-সম্রাটের আমলে। চা প্রথম সম্ভবত দ্বিতীয় চার্ল্সের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ রোজনাম্‌চা-লেখক স্যামুয়েল পেপিসের খাতায় ১৬৬০ সালে প্রথম চা-পানের উল্লেখ আছে 'Tee—a china drink'। চায়ের ব্যবসায়ের প্রচণ্ড প্রসার হয়, এবং দু শো বছর পরে ১৮৬০ সালে ফুচাও নামে একটা চীনা বন্দর থেকেই এক মরশুমে চা রপ্তানি হয়েছিল দশ কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ বারো লক্ষ মোনের উপর। পরবর্তীকালে চায়ের চাষ অন্য জায়গাতেও আরম্ভ হয়, এবং ভারতে ও সিংহলে চায়ের বহুল উৎপাদন হয়।

চিয়েন লুঙ মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থান এবং তিব্বত অধিকার করে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসার করেছিলেন। কয়েক বছর পরে ১৭৯০ সালে নেপালের গুর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে। চিয়েন্ লুঙ তখন যে শুধু গুর্খাদের তিব্বত থেকে তাড়িয়ে দেন তাই নয়, উপরন্তু হিমালয়ের পরপারে নেপাল পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে নেপালকে চীন-সাম্রাজ্যের সামন্তরাজ্যে পরিণত করেন। নেপাল-বিজয় বিস্ময়কর ঘটনা। চীনা সৈন্যের পক্ষে তিব্বত ও হিমালয় অতিক্রম করে গুর্খাদের মতো দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিকে তাদের নিজের দেশে পরাজিত করা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারতে ব্রিটিশ

মাত্র বাইশ বছর পরে ১৮১৪ সালে নেপালের সঙ্গে গোলযোগ বাধিয়েছিল। তারা নেপালে এক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। তবু তো তাদের হিমালয় অতিক্রম করতে হয় নি।

চিয়েন্ লুঙের রাজত্বকালের শেষ ভাগে ১৭৯৬ সালে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং তুর্কিস্থান তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেসব সামন্তরাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত তারা ছিল—কোরিয়া, আনাম, শ্যামদেশ এবং ব্রহ্মদেশ। কিন্তু রাজ্যজয় এবং সামরিক অভিযানের খ্যাতি অর্জন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তার ফল হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যয়, ফলে করভার বেড়েই চলে। সর্বকালে এই করভার গরিবের উপরেই পড়ে। অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছিল, তাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। দেশের সর্বত্র গুপ্ত সমিতি গজিয়ে উঠল। ইতালির মতো চীনেরও গুপ্ত সমিতির আধিক্যের খ্যাতি আছে। এদের কোনো-কোনোটার নাম বেশ কৌতূহলপ্রদ : শ্বেত লিলি সমিতি, স্বর্গীয় বিচার সমিতি, শ্বেতপালক সমিতি, স্বর্গ ও মর্ত সমিতি।

ইতিমধ্যে বহু অন্তরায় সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়ে চলছিল। এইসব অন্তরায় বিদেশী বণিকদের অসন্তোষের উদ্রেক করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রসার ক্যাণ্টন পর্যন্ত ঘটেছিল, এবং ব্যবসায়ের বৃহত্তম অংশ তাদের হওয়ার দরুন প্রতিবন্ধকের অসুবিধা তাদেরই বেশি হচ্ছিল। এইসব সময়েই তথাকথিত শিল্পবিপ্লবের আরম্ভ হচ্ছিল এবং তা ঘটছিল ইংলণ্ডের নেতৃত্বে। এ সম্বন্ধে পরে বলব। স্টীম-এঞ্জিন তৈরি হয়েছিল, এবং যন্ত্রের ব্যবহার ও অন্যান্য নূতন পন্থা অবলম্বনের ফলে কাজ সোজা এবং উৎপাদন বেশি হচ্ছিল, বিশেষ করে কার্পাসবস্ত্রের। এসব অতিরিক্ত মালের কাটতির জন্যে বাজারের দরকার। ঠিক এই সময়েই ভারত ইংলণ্ডের হাতে থাকায় ইংলণ্ডের খুব সুবিধে হয়েছিল, কারণ জোর করে ভারতের বাজারে মাল চালানোর শক্তি তার ছিল এবং সে শক্তির প্রয়োগও হয়েছিল। কিন্তু চীনের বাজারের প্রতিও তার লোলুপ দৃষ্টি ছিল।

অতএব ১৭৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ম্যাকার্টনির নেতৃত্বে পিকিঙে এক রাজদূত-সংঘ পাঠালেন। তখন তৃতীয় জর্জ ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা। চিয়েন্ লুঙ তাদের দর্শন দিয়ে তাদের সঙ্গে উপহার-বিনিময় করলেন। কিন্তু সম্রাট বাণিজ্যের প্রচলিত প্রতিবন্ধকের কোনো পরিবর্তনে অস্বীকার করলেন। চিয়েন্ লুঙ তৃতীয় জর্জকে যে উত্তর পাঠিয়েছিলেন তা অতীব কৌতূহলপ্রদ। আমি তার থেকে বেশ খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"হে রাজন্, তোমার বাস বহু সমুদ্রের পরপারে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার সংস্পর্শে উপকৃত হওয়ার বিনীত বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার নিকটে দূতসংঘ প্রেরণ করেছ। তারা সসম্মানে তোমার লিপি নিয়ে এসেছে।......আমার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করবার নিমিত্ত তুমি তোমার দেশজাত দ্রব্যাদি অর্ঘ্যরূপে প্রেরণ করেছ। আমি তোমার লিপি পাঠ করেছি। যেরূপ পরম আগ্রহ-সহ এটা রচিত হয়েছে তাতে তোমার যে সশ্রদ্ধ বিনীত ভাব অনুভূত হয় তা অতীব প্রশংসনীয়।...

"এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর একাধিনায়করূপে আমার মাত্র একটি লক্ষ্য আছে, রাজ্যে নির্দোষ শাসন-রীতি পরিচালিত করে আমার কর্তব্যপালন। অদৃষ্টপূর্ব ও মহার্ঘ সামগ্রীর প্রতি আমার কোনো অনুরাগ নেই। তোমার দেশজাত দ্রব্যেও আমার কোনোরূপ প্রয়োজন নেই। হে রাজন্, তোমার কর্তব্য, আমার মনোভাবের সম্মান রক্ষা করা এবং ভবিষ্যতে অধিকতর রাজভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা—যাতে আমার সিংহাসনের প্রতি অবিচল বশ্যতার দ্বারা তুমি তোমার দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পার।......

"কম্পিতকলেবরে আদেশ পালন করো, যেন কোনো ত্রুটি না হয়!"

এই উত্তর পড়ে তৃতীয় জর্জ ও তাঁর মন্ত্রীরা নিশ্চয় বেশ একটু চমকে গিয়েছিলেন! কিন্তু আসলে এই উত্তরে শ্রেষ্ঠ সভ্যতার উপরে যে পরম বিশ্বাস এবং প্রবল প্রতাপের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তার কোনো স্থায়ী ভিত্তি ছিল না। মাঞ্চু-সরকার চিয়েন লুঙের নেতৃত্বে সত্যসত্যই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু নূতন অর্থনৈতিক বিধির প্রবর্তনে তার ভিত্তি শিথিল হয়ে আসছিল। যেসব গুপ্ত সমিতির কথা আমি উল্লেখ করেছি তারাই হল অসন্তোষের নিদর্শন। কিন্তু আসল গলদ ছিল এই যে, নূতন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত
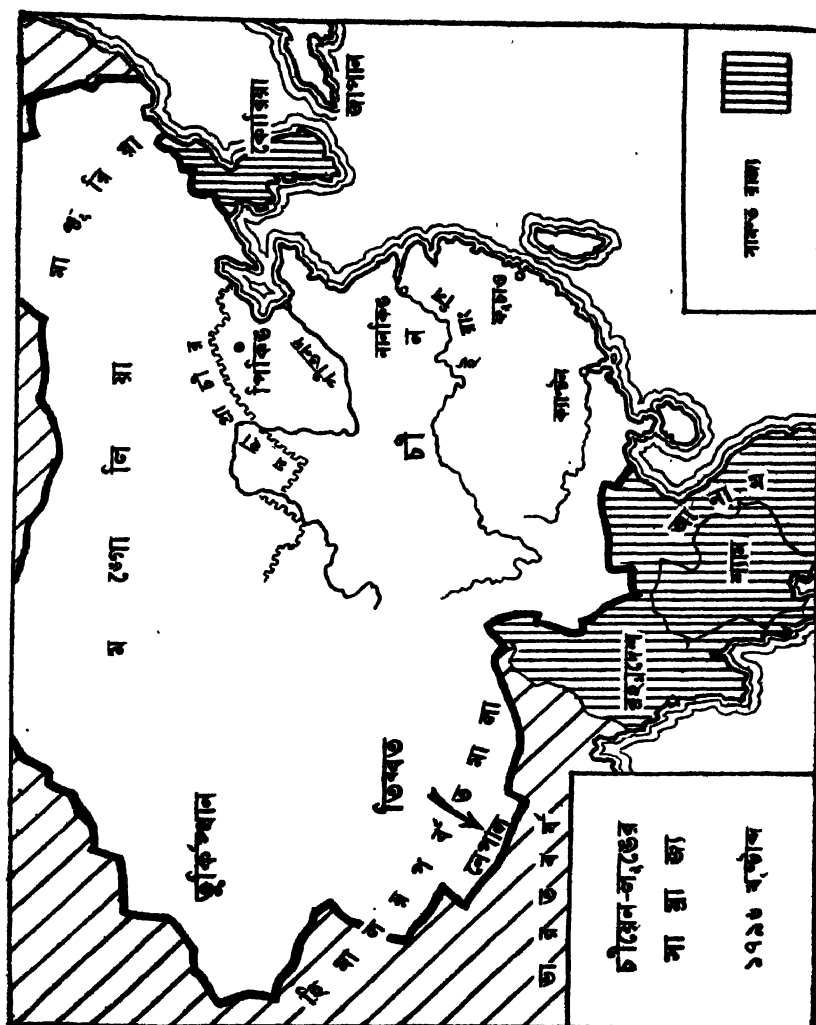
হয় নি। এই নববিধানে পশ্চিম ছিল নেতা, এবং দ্রুত অগ্রগতি সহকারে পরম শক্তিমান হয়ে চলল। তৃতীয় জর্জের কাছে চিয়েন্ লুঙের দম্ভপূর্ণ চিঠি প্রেরণের পর সত্তর বছর কাটল না, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের হাতে তার অবমাননা ঘটল, তার গৌরব ধূলিলুণ্ঠিত হল।

কিন্তু এ গল্প বলব আমার চীন সম্বন্ধে পরের চিঠিতে। ১৭৯৬ সালে, চিয়েন্ লুঙের মৃত্যুর সঙ্গেই বলতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে এসে পড়ি। কিন্তু এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে আমেরিকা ও ইউরোপে অনেক-কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চীনের উপর পশ্চিমের চাপের হ্রাস হয়েছিল ইউরোপের যুদ্ধের ফলে। পরবর্তী চিঠিতে আমরা ইউরোপ সম্বন্ধে আলোচনা করব, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে গল্প ধরব। ভারত এবং চীনের সম্বন্ধেও বলব।

কিন্তু চিঠি শেষ করার আগে তোমাকে প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতির কথা বলব। ১৬৮৯ সালে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে 'নার্চিন্স্কের সন্ধি'র পরে প্রাচ্যে দেড় শতাব্দী ধরে রাশিয়ার প্রভাব বেড়ে চলল। ১৭২৮ সালে রাশিয়ার বেতনভোগী বিটস বেরিং-নামক জনৈক দিনেমার-ক্যাপ্টেন এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্তী প্রণালীটি আবিষ্কার করলেন। তুমি জানো, এই প্রণালীটি এখনও তাঁর নামানুসারে বেরিং প্রণালী নামে খ্যাত। বেরিং প্রণালী পার হয়ে আলাস্কা পৌঁছে তাকে রুশ-অধিকার-ভুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। আলাস্কা হচ্ছে ফার অর্থাৎ রোমশ-পশু-চর্মের দেশ, এবং চীনে ফারের চাহিদা থাকার দরুন রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বেশ-একটা ফারের ব্যবসা গড়ে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনে ফারের চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, রাশিয়া কানাডার হাড্‌সন্-বে থেকে ইংলন্ড হয়ে ফার আমদানি করে সাইবেরিয়াতে বৈকাল-হ্রদের কাছে কিয়াখ্‌টার বিরাট ফারের বাজারে পাঠাতে লাগল। ভেবে দেখো, কতখানি পথ ঘুরে ফার যথাস্থানে পৌঁছত!

আমার অন্য সব চিঠির চেয়ে এ চিঠিটা ছোটো। আশা করি তুমি খুশি হবে।

৯৫

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে বিভিন্ন ভাবধারার বিরোধ

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

এবার ইউরোপে ফিরে গিয়ে সেখানকার পরিবর্তনশীল নিয়তির অনুসরণ করা যাক। যে বিরাট পরিবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় অমোঘ ছাপ রেখে গেছে, ইউরোপ এখন সেইসব পরিবর্তনের উপক্রমণিকায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এসব পরিবর্তন উপলব্ধি করতে হলে বাইরের আবরণের ভিতরে যা ঘটছে তাই দেখতে হবে, আর মানুষের মনের মধ্যে কী আছে তা অনুভব করতে হবে। কারণ, কাজ আর কিছুই নয়, চিন্তা এবং মনোবৃত্তি, কুসংস্কার, আশা, ভয়, সব জিনিষের জটিল সংমিশ্রণে এর উৎপত্তি। আর, শুধু কাজের দ্বারাই তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না; জানা চাই কী কারণে সে কাজের শুরু হল। কিন্তু সে খুব সহজ কথা নয়; যদি আমি এইসব কারণ আর উদ্দেশ্য, যার থেকে ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাবলীর সৃষ্টি হয়, তার সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে লিখতে পারতাম, তা হলেও অকারণে এই চিঠিগুলোকে দুষ্পাচ্য এবং একঘেয়ে করতে দ্বিধা করতাম। সম্ভবত সময়ে সময়ে কোনো-এক বিশেষ বিষয় অথবা দৃষ্টিভঙ্গির সম্বন্ধে উৎসাহবশত আমি আত্ম-বিস্মৃত হয়ে যা বলতে চাই তার চেয়ে বেশি বলে ফেলি। তোমার অবশ্য এসব সহ্য করতে হবে! যাই হোক, এ বিষয়ে আর গভীরভাবে বলবার চেষ্টা করব না। কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেও নির্বুদ্ধিতা হবে। যদি এড়িয়ে যাই তা হলে ইতিহাসের আকর্ষণকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিই হারাব।

ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের গোলযোগ এবং অশান্তি

সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিতে (১৬৪৮) ত্রিশ-বর্ষব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। পরের বছর ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ শেষ হয় এবং প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়। এর পরে কিছুদিন অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটে। ইউরোপ মহাদেশ শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। আমেরিকার উপনিবেশসমূহ এবং অন্যসব জায়গার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে ইউরোপে অর্থাগম হতে লাগল এবং দুরবস্থার খানিকটা নিরসন হল; শ্রেণী-বিরোধটাও একটু নরম হল।

ইংলণ্ডে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব এল, যার ফলে দ্বিতীয় জেমসের বিতাড়ন এবং পার্লামেণ্টের জয় ঘটল (১৬৮৮)। প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই পার্লামেণ্টের প্রকৃত জয় হয়েছিল। এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবে শুধু চল্লিশ বছর আগেকার বাহুবলে উপনীত সিদ্ধান্তের পাকাপাকি গ্রহণ ঘটল মাত্র।

এইরূপে ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা কমে গেল, কিন্তু ইউরোপ মহাদেশে সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দু-একটা ছোটো ছোটো স্থান ছাড়া সর্বত্রই এর বিপরীত ছিল। ইউরোপে তখনও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজার রীতিই ছিল, এবং ফ্রান্সের গ্র্যাণ্ড্ মনার্ক চতুর্দশ লুই ছিলেন অন্যদের বরণীয় এবং অনুসরণীয় আদর্শ। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী ছিল বলতে গেলে চতুর্দশ লুইয়ের শতাব্দী। ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের দৃষ্টান্ত দেখেও নিজেদের ভয়াবহ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ইউরোপের রাজারা চরম নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারের পথে চললেন। তাঁদের দাবি ছিল দেশের সমস্ত ধন এবং ক্ষমতার উপরে, আর তাঁদের দেশ ছিল প্রায় তাঁদের নিজস্ব ভূসম্পত্তির মতো। চার শো বছরেরও বেশি আগে বিখ্যাত ওলন্দাজ পণ্ডিত ইরাস্‌মুস্ লিখেছিলেন :

"অন্যসব পাখির মধ্যে একমাত্র ঈগলই জ্ঞানীব্যক্তিদের কাছে নরপতির আদর্শ। সুন্দর নয়, গান গাইতে পারে না, খাদ্য নয়; শুধু মাংসাশী, লোভী, সকলের ঘৃণিত, সকলের কাছে অভিশাপের মতো, এবং অন্যায় আচরণের সমস্ত শক্তি থাকার ফলে সেই আচরণের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ।"

এ যুগে রাজা প্রায় নেই; যারা আছে তারাও অতীত যুগের একটা টুকরো মাত্র, কোনো ক্ষমতা নেই তাদের। আমরা তাদের তুচ্ছ করতে পারি। কিন্তু তাদের জায়গায় এসেছে অন্যেরা, তাদের চেয়ে ঢের বেশি ভয়ানক; এবং ঈগল পাখি এখনও এ যুগের লোহা তেল সোনা রুপোর রাজা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের উপযুক্ত প্রতীক।

ইউরোপের রাজশাসিত রাষ্ট্রসমূহ প্রবল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগের মালিক এবং সামন্তের ধারণা লোপ পাচ্ছিল। দেশকে সম্পূর্ণ একক ভাবে দেখার আদর্শ আস্তে আস্তে সেই স্থান অধিকার করছিল। রিশেলিউ ও মাজারিন -নামক দুজন প্রতিভাশালী মন্ত্রীর প্রভাবে ফ্রান্স এই পরিবর্তনের নেতৃস্থান গ্রহণ করেছিল। এমনি করে জাতীয়তা এবং অল্প পরিমাণে দেশপ্রেম বৃদ্ধি পেল। এতদিন ধর্মই ছিল মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রধান জিনিষ এখন তা পিছু হটে গেল, তার স্থান অধিকার করল নূতন নূতন ভাবধারা, যার সম্বন্ধে আমি পরে কিছু বলব।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন, এবং দেশের উৎপন্ন মাল সারা পৃথিবীতে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত। এই বিরাট নূতন বিক্রয়স্থল স্বতঃই ইউরোপের পুরোনো অর্থনীতি উল্টে দিল, এবং পরবর্তীকালে ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকায় যা ঘটেছিল তা বুঝতে হলে এই নূতন বিক্রয়স্থলের কথা স্মরণ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতি হল পরে, এবং তার সাহায্যে সারা পৃথিবীর বিক্রয়স্থলের মালের অভাব মোচনের উপায় ঘটল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য -প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে, শুধু ইউরোপে নয়, কানাডা ও ভারতেও যুদ্ধ ঘটেছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে এইসব যুদ্ধের পরে পুনরায় কিছুদিনের জন্যে অপেক্ষাকৃত শান্তভাব দেখা দিল। ইউরোপের উপরিভাগ ছিল শান্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে তরঙ্গহীন। ইউরোপের অসংখ্য রাজসভা অতি অমায়িক এবং মার্জিত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এ শান্তভাব শুধু বাইরের। ভিতরে ছিল ঝড় এবং মানুষের মন আন্দোলিত হচ্ছিল নূতন ধারণা ও ভাবধারায়। এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু দারিদ্র্য-বশত কেবল রাজসভার মায়ামণ্ড এবং উচ্চশ্রেণীর কেউ কেউ ছাড়া মানুষের দেহ ক্রমে ক্রমে দুর্দশার নিষ্পেষণে পিষ্ট হচ্ছিল। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শান্তভাব প্রকৃত অবস্থার

সূচক ছিল না। এ ছিল শুধু ঝড়ের আগের শান্তভাব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ইউরোপের রাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো অধিপতির রাজধানী প্যারিসে ঝড় দেখা দিল। এর ঝাপটায় রাজতন্ত্র এবং সেইসঙ্গে বহু প্রাচীন কীটদষ্ট রীতিনীতি নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে গেল।

এই ঝড় এবং পরবর্তী পরিবর্তন ফ্রান্সে এবং অংশত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বহুকাল ধরে নূতন ভাবধারার সাহায্যে তৈরী হয়েছিল। সারা মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে ধর্মই ছিল সবচেয়ে বড়ো জিনিষ। এমনকি পরেও, অর্থাৎ সংস্কারের যুগে, ধর্মই ছিল সব। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক, সব প্রশ্নেরই বিবেচনা হত ধর্মের দিক দিয়ে, ধর্ম জিনিষটাকে এমন করে তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল যে পোপ অথবা খৃষ্টধর্মের বড়োকর্তাদের মতামতই ছিল ধর্ম। সমাজের সংগঠন ছিল অনেকটা ভারতবর্ষের জাতিভেদের মতো। মূলে জাতিভেদের অর্থ ছিল পেশা বা কর্ম-ভেদে সমাজের বিভাগ। এই বৃত্তিভেদে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগই ছিল মধ্যযুগের সামাজিক আদর্শ। একই শ্রেণীর ভিতরে, যেমন ভারতে একই জাতির ভিতরে, সাম্য ছিল। কিন্তু দুই অথবা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ছিল। এই বৈষম্য সমাজবিধির মূলে ছিল, কিন্তু কেউ তাতে আপত্তি জানাত না। এই প্রথায় যাদের দুরবস্থা ঘটত তাদের বলা হত, তারা স্বর্গে পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পারে। এই উপায়ে ধর্ম এই অন্যায় সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের সমর্থন করত এবং পরলোকের কথা তুলে ইহলোকের চিন্তা থেকে মানুষকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করত। এই প্রথা আর-একটি মতবাদের সৃষ্টি করেছিল—'গচ্ছিত-রক্ষা'। অর্থাৎ ধনীরা ছিলেন দরিদ্রের একরকম গচ্ছিত-রক্ষা-কর্তা। ভূম্যধিকারীর কাছে প্রজার জমি 'গচ্ছিত' থাকত। ধর্ম এমনি করে একটা কঠিন পরিস্থিতির সমাধান করতে চেষ্টা করেছিল। ধনীর এতে কিছু এসে-যেত না, দরিদ্রেরও কোনো সান্ত্বনা ছিল না। চাতুরী করে নূতন ধরনের ব্যাখ্যা করলেই তাতে নিরন্নের অন্নের সংস্থান হয় না।

ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের তীব্র ধর্মসংগ্রাম, ক্যাথলিক ও কালভিনিস্ট উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম-অসহিষ্ণুতা, সব মিলিয়ে একটা অসহ্য ধর্মসংক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিল। ভেবে দেখো! ইউরোপে, বিশেষ করে পিউরিটানদের হাতে, লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক ডাকিনী-অপবাদে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা পড়েছিল। বিজ্ঞানের নূতন মতবাদ বন্ধ করে দেওয়া হত; কারণ, সেসব নাকি চার্চের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী। এ হল জীবনের নিশ্চল অবস্থা, উন্নতির কোনো প্রশ্ন এ অবস্থায় উঠতে পারে না।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে এসব ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে; বিজ্ঞানের প্রথম আগমন হয় এবং ধর্মের সর্বভূতে অধিকার কমে যায়। রাজনীতি এবং অর্থনীতির বিচার হয় ধর্মকে বাদ দিয়ে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের অভ্যুদয় হয়, অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে বিচারের ব্যবহার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরমতসহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল বলা হয়। অংশত কথাটা সত্য। কিন্তু এই জয়ের আসল অর্থ হল মানুষ আর পূর্বের মতো ধর্মে অত গুরুত্ব আরোপ করত না। পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে নিস্পৃহ ভাবের অল্পই প্রভেদ। কোনো বিষয়ে যখন মানুষের তীব্র নিষ্ঠা থাকে তখন তারা বড়ো-একটা তার বিরোধী মত সহ্য করতে পারে না। যখন সে বিষয়ে তার আসক্তি কমে যায়, সে উদারভাবে ঘোষণা করে যে, সে পরমত সম্পর্কে পরম সহিষ্ণু। ব্যবহারিক শিল্প ও যন্ত্রযুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে অনাসক্তি আরও বাড়ল। বিজ্ঞান ইউরোপের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিল। নূতন শিল্প এবং অর্থনীতির উদ্ভবে নূতন নূতন সমস্যা মানুষের চিন্তা আচ্ছন্ন করে থাকল। ফলে ইউরোপের লোকেরা ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস বা মতবাদ নিয়ে পরস্পরের মাথাভাঙা অভ্যাস ত্যাগ করল (অবশ্য পুরোপুরিভাবে নয়)। তার পরিবর্তে তারা অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক কলহে মাথাভাঙা আরম্ভ করল।

ইউরোপের এই ধর্মযুগের সঙ্গে বর্তমান ভারতের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষাপ্রদ এবং কৌতূহলজনক। ভারতবর্ষকে অনেক সময়ে, কখনও-বা প্রশংসা আবার কখনও-বা বিদ্রূপের ছলে বলা হয়, ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দেশ। ইউরোপের সঙ্গে এর তুলনা করে দেখানো হয় যে, ইউরোপ ধর্মহীন দেশ, এবং ইহলোকের বিলাসিতায় মগ্ন। প্রকৃতপক্ষে 'ধার্মিক' ভারত আর ষোড়শ শতাব্দীর

ইউরোপের মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। অবশ্য এ তুলনামূলক সাদৃশ্য বেশি দূর টেনে নেওয়া চলে না। কিন্তু একটা জিনিষ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, বিভিন্ন ধর্মানুবর্তীদের স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মিশ্রণ, সাম্প্রদায়িক কলহ এবং মধ্যযুগের ইউরোপে আর যেসব সমস্যা ছিল তার অনুরূপ সমস্যা আমাদের দেশেও বর্তমান। আসল প্রভেদ বস্তুতান্ত্রিক পশ্চিম এবং আধ্যাত্মিক ও ধর্মগতপ্রাণ পূর্বের মধ্যে নয়। আসল প্রভেদ, আধুনিক যন্ত্রযুগের ভালো এবং মন্দ নিয়ে গড়া কর্মকুশল পশ্চিম এবং প্রাক্-শিল্প-যুগের কৃষিজীবী পূর্বের মধ্যে।

ইউরোপের এই পরমতসহিষ্ণুতা এবং যুক্তিবাদ জন্মেছিল ধীরে ধীরে। পুস্তকের সাহায্যে খুব বেশি এর প্রসার হয় নি, কারণ প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্মের সমালোচনা করতে লোকে ভয় পেত, করলে কারাদণ্ড বা অন্য কোনো দণ্ডভোগ করতে হত। কন্‌ফুসিয়স্‌কে অতিরিক্ত প্রশংসা করার অপরাধে একজন জর্মন দার্শনিককে প্রাশিয়া থেকে নির্বাসিত করা হয়। এই প্রশংসার অর্থ করা হয় যে, এটা খৃষ্টধর্মের নিন্দা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকসংখ্যক লোকের মনে যখন এসব ধারণা পরিষ্কার হয়ে এল তখন এসব বিষয়ে বই বের হতে শুরু হল। যুক্তিবাদ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক ছিলেন ভল্‌টেয়ার-নামক একজন ফরাসি; কারাবাস ও নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে অবশেষে তিনি জেনেভার কাছে ফার্নিতে বসবাস আরম্ভ করেন। কারাদণ্ডকালে তাঁকে কাগজ অথবা কালি দেওয়া হয় নি। অগত্যা তিনি সীসের টুকরোর সাহায্যে বইয়ের ছত্রগুলির মধ্যের ফাঁকা জায়গায় কবিতা রচনা করতেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর অসাধারণ শক্তি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভল্‌টেয়ার অবিচার ও বিরোধী ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁর বিখ্যাত বাণী -Écrasez l'infâme (কুসংস্কারের আবর্জনা দূর করো)। তিনি বহুকাল বেঁচেছিলেন (১৬৯৪-১৭৭৮) এবং অসংখ্য বই লিখেছিলেন। তাঁর খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনার জন্যে গোঁড়া খৃষ্টানরা তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। তাঁর একটা বইতে তিনি লিখেছিলেন, "যে ব্যক্তি বিনা পরীক্ষায় তার ধর্ম স্বীকার করে নেয় সে সেই ষাঁড়ের মতো, যে ঘাড়ে জোয়াল চাপালে আপত্তি করে না।" ভল্‌টেয়ারের রচনায় প্রভাবান্বিত মানুষের মন যুক্তিবাদ এবং নূতন চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকেছিল। ফার্নি শহরে তাঁর পুরোনো বাড়ি এখনও অনেকের কাছে তীর্থস্থান।

ভল্‌টেয়ারের সমসাময়িক, তবে তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো, আর-একজন বড়ো লেখক ছিলেন ঝাঁ-ঝাক্-রুশো। তাঁর জন্মস্থান ছিল জেনেভা, এবং জেনেভা সেইজন্যে গৌরবান্বিত। সেখানে তাঁর প্রতিমূর্তি দেখেছ, মনে আছে? ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে রুশোর লেখায় তুমুল হৈচৈ উঠেছিল। সে যাই হোক, তাঁর নূতন ধরনের নির্ভীক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ অনেকের মনে নূতন চিন্তাধারা, নূতন আদর্শের আলো জ্বেলেছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এখন পুরোনো হয়ে গেছে, কিন্তু বিপ্লবের জন্যে ফ্রান্সের জনসাধারণকে তৈরি করতে তাদের ভূমিকা কম ছিল না। রুশো বিপ্লবের মত প্রচার করেন নি, হয়তো-বা বিপ্লবের প্রত্যাশাও করেন নি। কিন্তু নিঃসন্দেহ তাঁর লেখা মানুষের মনে যে বীজ বপন করেছিল, তারই পরিণতি হয়েছিল বিপ্লবে। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত বই হচ্ছে Du Contrat Social অর্থাৎ সামাজিক চুক্তি। এই বইয়ের আরম্ভ হচ্ছে একটি বিখ্যাত ছত্র দিয়ে: "মানুষ জন্মায় স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই আছে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়।"

রুশো একজন বড়ো শিক্ষাবিদও ছিলেন এবং তিনি শিক্ষাদানের যেসব নূতন পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকগুলো এখন স্কুলে স্কুলে ব্যবহৃত হয়।

ভল্‌টেয়ার ও রুশো ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে আরও অনেক যশস্বী চিন্তাবীর এবং লেখক ছিলেন। আমি আর মাত্র একজনের নাম করব—মঁতেস্কিউ—যাঁর লেখা অনেক বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে Esprit des Lois। এই সময়ে প্যারিসে একখানা বিশ্বকোষও প্রকাশিত হয়, তাতে দিদেরো এবং আরও অনেক দক্ষ লেখকদের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিষয়ে রচনা বের হয়। ফ্রান্সে এ সময়ে বহু দার্শনিক ছিলেন, তাঁদের রচনার বহুল প্রচার ছিল এবং তাঁরা বহুসংখ্যক সাধারণ লোকের মনে তাঁদের চিন্তাধারা বপন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

এইরূপে ফ্রান্সে একটি শক্তিশালী মতবাদের দল গড়ে উঠল, যারা পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিশেষ অধিকারের বিরোধী ছিল। স্বাধীনতার একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা লোকের চিত্ত অধিকার করল। কিন্তু মজা এই, দার্শনিক অথবা জনসাধারণ, কেউই তখনও রাজার অপসারণের কথা ভাবে নি। সাধারণতন্ত্রের ধারণা তখন প্রচলিত ছিল না, এবং লোকে তখনও আশা করত, হয়তো তারা একজন আদর্শ রাজা পাবে, অনেকটা প্লেটোর দার্শনিক রাজার মতো, যে তাদের সব দুর্দশার দূরীকরণ করবে এবং তাদের সুবিচার ও খানিকটা স্বাধীনতা দেবে। অন্তত এই ছিল দার্শনিকদের রচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু জনসাধারণ রাজাকে কতটা ভালোবাসত সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে।

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক চিন্তাধারার এত প্রসার ঘটে নি। কথায় বলে, ফরাসি রাজনৈতিক জন্তু, কিন্তু ইংরেজ তা নয়। এ ছাড়া ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে সমস্যার খানিকটা লাঘব হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেণীবিশেষের অনেক বিশেষ অধিকার বর্তমান ছিল। নূতন অর্থনৈতিক প্রসারণ, আমেরিকা ও ভারতে ব্যবসায় ও অন্যান্য হাঙ্গামায় ইংরেজের মন অন্য দিকে ব্যস্ত ছিল। এবং যখন সামাজিক অসন্তোষ বেড়ে গেল, সাময়িক আপোষ দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখা হল। ফ্রান্সে আপোষের কোনো উপায় ছিল না, ফলে বিপ্লব এল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডে আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব হয়। আগেই বলেছি, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে 'গলিভারস্ ট্রাভলস্' এবং 'রবিনসন্ ক্রুশো' প্রকাশিত হয়। তার পরে আরম্ভ হয় সত্যিকারের উপন্যাস। ইংলণ্ডে এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে নূতন পাঠকগোষ্ঠির আবির্ভাব হয়েছিল।

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই গিবন-নামক ইংরেজ তাঁর বিখ্যাত বই Decline and Fall of the Roman Empire (রোম-সাম্রাজ্যের অধোগতি ও পতন) রচনা করেন। যে চিঠিতে আমি রোম-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তাতে তাঁর কথাও আগেই বলেছি।

৯৬

বিপুল পরিবর্তনের প্রারম্ভে ইউরোপ

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

আমরা ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নরনারীর মননধারা, বিশেষ করে ফ্রান্সের মননধারা সম্বন্ধে কিছু বোঝবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এ হল নূতন ও পুরোনো ভাবধারার দ্বন্দ্ব-দর্শন উপলক্ষ্যে ক্ষণিক চেষ্টা মাত্র। ইউরোপের রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের পশ্চাতে অবলোকন করে বর্তমানে আমরা সেখানকার অভিনেতাদের ভালো করে দেখব।

ফ্রান্সে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর রাজত্ব বেশ কয়েক পুরুষকাল স্থায়ী হয়েছিল। তার পরে সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর প্রপৌত্র, পঞ্চদশ লুই। আবার উনষাট বছরব্যাপী রাজত্ব চলল। এইরূপে ফ্রান্সের পর পর দুজন রাজা ক্রমান্বয়ে ১৩১ বছর রাজত্ব করলেন! সম্ভবত এইটেই পৃথিবীর রেকর্ড। চীনের দুজন মাঞ্চু-সম্রাট, কাঙ্‌হি এবং চিয়েন লুঙ, প্রত্যেকে ষাট বছরের উপর রাজত্ব করেছিলেন; কিন্তু পর পর নয়, কারণ তাঁদের মধ্যবর্তীকালে আর-একজন রাজা ছিলেন।

অসাধারণ দৈর্ঘ্য ছাড়া পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকাল দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্র সম্বন্ধেও অদ্বিতীয় ছিল। দেশের রাজকোষ রাজার বিলাসিতার জন্যে ব্যয়িত হত। রাজসভায় রাজার প্রিয়পাত্র নরনারীকে ভূমি উপঢৌকন দেওয়া হত, এবং পুরস্কারস্বরূপ বিনা কাজের মোটা বেতনের চাকরি দেওয়া হত। এই ব্যয়ের গুরুভার ক্রমেই বেশি করে জনসাধারণের উপরে পড়তে লাগল। স্বৈরাচার, অকর্মণ্যতা,

এবং দুর্নীতি মহানন্দে একত্র চলল। কাজেই শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই যে তারা পথের শেষ প্রান্তে রসাতলে গেল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং এই ভেবেই বিস্ময় জাগে যে, তারা এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিল এবং পতন আসতে এত দেরি হয়েছিল। পঞ্চদশ লুই প্রজাদের বিচার এবং প্রতিহিংসা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ষোড়শ লুইয়ের কপালে সেটা পড়েছিল।

নিজের অক্ষমতা এবং হীন চরিত্র সত্ত্বেও রাজ্যে সম্পূর্ণ একাধিপত্য সম্বন্ধে পঞ্চদশ লুইয়ের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনিই ছিলেন একেশ্বর এবং তাঁর যথেচ্ছাচারে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও ছিল না। ১৭৬৬ সালে প্যারিসে এক সংসদে তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় স্বৈরাচারের সমর্থনে এক বক্তৃতা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কালের জন্যে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন এইরকম। কিছুকালের জন্যে তিনি ইউরোপে আত্মপ্রভাব বিস্তার করেছিলেন মনে হয়, কিন্তু শেষে অন্য দেশের রাজা-প্রজার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধশক্তিদের কেউ কেউ আর ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকায় ছিল না, কিন্তু তাদের জায়গায় অন্যেরা এসে ফরাসি শক্তির আত্মপ্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়াল। শক্তিমদমত্ত স্পেন তার স্বল্পকালের সামরিক যশের অবসানে ইউরোপ এবং অন্যত্র পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে তার বৃহৎ উপনিবেশ ছিল। অস্ট্রিয়ার হাপ্‌স্‌বুর্গ-বংশ বহুকাল ধরে সাম্রাজ্যে তথা ইউরোপে একাধিপত্য করে অবশেষে প্রাধান্য হারিয়েছিল। অস্ট্রিয়া আর সাম্রাজ্যের (পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য) প্রধান রাষ্ট্র ছিল না। তার জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল প্রাশিয়া। অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে অনেক যুদ্ধ চলেছিল, এবং মারিয়া থেরেসা-নামক একজন নারী বহুকাল তা অধিকার করেছিলেন।

তোমার মনে থাকতে পারে, ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধি (১৬৪৮) প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তির আসন দিয়েছিল। হোহেন্‌জোলার্ন-বংশ ছিল এই রাষ্ট্রের রাজবংশ, এবং এটি অপর জর্মন-রাজবংশ অস্ট্রিয়ার হাপ্‌স্‌বুর্গদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ছেচল্লিশ বছর (১৭৪০-১৭৮৬) ধরে প্রাশিয়ার শাসক ছিলেন ফ্রেডরিক, সামরিক সাফল্যের জন্যে যাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেডরিক দি গ্রেট, অর্থাৎ মহান ফ্রেডরিক। ইউরোপের অন্যান্য রাজার মতো তিনিও ছিলেন স্বৈরাচারী, কিন্তু দার্শনিকের মুখোশ পরতেন, এবং ভল্‌টেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং নিজেও সেনাপতিহিসেবে সাফল্যলাভ করেছিলেন। তিনি নিজেকে একজন যুক্তিবাদী বলে প্রচার করতেন, এবং তিনি নাকি বলেছিলেন: "স্বর্গগমনের জন্যে নিজের নিজের ইচ্ছামতো পথ বেছে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেকের আছে।"

সপ্তদশ শতাব্দী এবং তৎপরবর্তীকালে ইউরোপে ফরাসি-সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভল্‌টেয়ারের খ্যাতি সারা ইউরোপব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি কেউ কেউ এই শতাব্দীকে 'ভল্‌টেয়ারের শতাব্দী' আখ্যা দিয়েছিলেন। ইউরোপের সকল রাজসভায়, এমনকি অনগ্রসর সেন্টপিটার্সবার্গেও, ফরাসি-সাহিত্য পড়া হত, এবং শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোকেরা রচনা ও কথোপকথনের জন্যে ফরাসিভাষা পছন্দ করতেন। ফ্রেডরিক দি গ্রেট প্রায় সব সময়েই ফরাসি বলতেন এবং লিখতেন, এমনকি ফরাসিতে কবিতা রচনা করে ভল্‌টেয়ারের সাহায্য চাইতেন তার সংশোধনের জন্যে।

প্রাশিয়ার পূর্বভাগে ছিল রাশিয়া। রাশিয়া তখনই তার ভবিষ্যতের বিরাট রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। চীনের ইতিহাস আলোচনা করার সময়ে দেখেছ, রাশিয়া কেমন করে সাইবেরিয়া অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁচেছিল, এমনকি সমুদ্র অতিক্রম করে আলাস্কা পর্যন্ত গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে রাশিয়ায় একজন শক্তিমান নৃপতি ছিলেন, পিটার দি গ্রেট। রাশিয়ার হাবভাব-চালচলনে যে মঙ্গোলীয় প্রভাব ছিল, পিটার তার দূরীকরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ার পশ্চিমীকরণ। তাই তিনি প্রাচীন আদর্শ ও চিরাচরিত প্রথা -বিজড়িত মস্কো ত্যাগ করে নিজের জন্যে এক নূতন নগর এবং রাজধানী নির্মাণ করালেন। তার নাম হল

সেণ্টপিটার্সবার্গ; এর স্থিতি হল উত্তরে নেভা নদীর তীরে, ফিন্‌ল্যান্ড-উপসাগরের উপকূলে। মস্কো-নগরের স্বর্ণখচিত গোলাকার-চূড়া-বৃন্ত এবং গম্বুজের মতো এর কিছু ছিল না। তার পরিবর্তে এর রূপ হয়েছিল পশ্চিম-ইউরোপের বড়ো বড়ো শহরের মতো। তুমি বোধ হয় জানো, সেণ্টপিটার্সবার্গ নাম আর নেই। গত বিশ বছরের মধ্যে দুবার এর নাম পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে হল পেট্রোগ্রাড, পরে লেনিনগ্রাড। এখন এই দ্বিতীয় নামেই পরিচিত।

পিটার দি গ্রেট রাশিয়ায় বহু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। একটার কথা বলছি। তিনি মেয়েদের অবরোধ-প্রথা (Terem), যা সে সময়ে রাশিয়ায় প্রচলিত ছিল, তুলে দিয়েছিলেন। পিটার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের মূল্য জানতেন এবং ভারতের উপরে তাঁর চোখ ছিল। তাঁর উইলে তিনি লিখেছিলেন, "মনে রেখো, ভারতের বাণিজ্যই পৃথিবীর বাণিজ্য। যে-কেউ তার উপর একাধিপত্য করতে পারে সেই হবে ইউরোপের সর্বেসর্বা।" তাঁর শেষ কয়টি কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারত-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শক্তিবৃদ্ধির দৃষ্টান্তে। ভারতশোষণ করে ইংলণ্ড পেয়েছিল শক্তি ও সম্মান, এবং বহু পুরুষ ধরে সে-ই ছিল পৃথিবীর প্রধান শক্তি।

এক দিকে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া, অপর দিকে রাশিয়া, এই রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল পোল্যান্ড। এই দেশ ছিল অনগ্রসর দরিদ্র কৃষিজীবীর দেশ। বাণিজ্য অথবা শিল্প বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, বড়ো শহরও না। এর শাসনবিধি একটু অদ্ভুত ছিল; রাজা বংশানুক্রমিক না হয়ে নির্বাচিত হতেন, এবং ক্ষমতা থাকত ভূম্যধিকারী অভিজাতসম্প্রদায়ের হাতে। এর চতুর্দিকের রাজ্যগুলির শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর শক্তি ক্ষীণ হয়ে এল। প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া এর দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

কিন্তু মজা এই, এই পোল্যান্ডের রাজাই ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার উপরে তুর্কি-আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তার পরে আর অটোম্যান তুর্কিদের আক্রমণের স্পৃহা দেখা যায় নি। তাদের সঞ্চিত শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে স্রোতের মোড় ঘুরে যাচ্ছিল। এর পর থেকে তারা আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করল এবং ধীরে ধীরে ইউরোপে তুর্কি-সাম্রাজ্য ক্ষয় হতে শুরু হল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, অর্থাৎ যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তখন, তুরস্ক ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রতাপশালী দেশ ছিল, আর তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বল্‌কান ছাড়িয়ে হাঙ্গেরি থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত।

দক্ষিণে ইতালি বিভিন্ন শাসকের হাতে বিভক্ত ছিল, এবং ইউরোপের রাজনীতিতে তার স্থান খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পোপের আধিপত্যের কিছু আর বাকি ছিল না এবং রাজরাজড়ারা তাঁকে ভক্তি প্রদর্শন করলেও রাজনীতিতে বাদ দিয়ে চলতেন। ক্রমে ইউরোপে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হল, মহা মহা শক্তির অভ্যুদয়। প্রতাপশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র জাতিগঠনের আদর্শে সাহায্য করল। লোকে স্বদেশকে এক অপূর্ব ভাবে দেখতে লাগল, যা বর্তমানে খুবই আছে কিন্তু সেকালে ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড অথবা ব্রিটানিয়া, ইতালিয়া, এবং অনুরূপ অন্যসব মূর্তির আবির্ভাব হতে লাগল। তারা জাতির রূপক। আরও পরে উনবিংশ শতাব্দীতে এইসব অস্পষ্ট মূর্তি নরনারীর মনে স্পষ্ট দেহ গ্রহণ করে তাদের মনের উপর অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করল। এইসব দেশের অধিষ্ঠাত্রী মূর্তি হলেন নূতন দেবী, যাঁদের মন্দিরে স্বদেশপ্রেমিকরা পূজার অনুষ্ঠান করেন, যাঁদের নামে দেশভক্তরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তুমি জানো, ভারতমাতার চিন্তা আমাদের সকলকে কীরকম ভাবে অভিভূত করে এবং এই কাল্পনিক বিগ্রহের জন্যে লোকে হাসিমুখে সকল কষ্ট সহ্য করে, এমনকি মৃত্যুকে বরণ করে। অন্য দেশের লোকেও তাদের মাতৃভূমির জন্যে এইরকমই অনুভব করত। কিন্তু এ সবই অনেক পরের কথা। বর্তমানে এইটুকু জেনে রাখো যে, এই জাতীয়তার আদর্শ এবং দেশপ্রেম অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম উৎপন্ন হয়। ফরাসি দার্শনিকরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং ফরাসি-বিপ্লবে হয় এর পূর্ণ পরিণতি।

এই বিভিন্ন জাতিই ছিল দেশের প্রধান শক্তি। রাজার পরে রাজা আসত, কিন্তু জাতির কোনো পরিবর্তন হত না। এইসব শক্তির মধ্যে ক্রমে কয়েকটি অন্যদের চাইতে বেশি গুরুত্ব লাভ করে প্রধান হয়ে দাঁড়াল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং

রাশিয়া ছিল অবিসংবাদীভাবে 'মহাশক্তি'। স্পেন এবং আরও কেউ কেউ কাগজেকলমে প্রধান স্থান পেলেও ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল।

ইংলন্ডের ঐশ্বর্য এবং প্রাধান্য অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এলিজাবেথের সময় পর্যন্ত ইউরোপেও তার গুরুত্ব বেশি ছিল না, পৃথিবীতে তো ছিলই না। লোকসংখ্যা ছিল সামান্য। সম্ভবত এ সময়ে তার লোকসংখ্যা ষাট লক্ষের বেশি ছিল না, অর্থাৎ বর্তমান লন্ডনের লোক-সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু পিউরিটান্-বিপ্লব এবং রাজার উপরে পার্লামেন্টের জয়লাভের ফলে ইংলন্ড নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল এবং এগিয়ে চলল। হল্যান্ডও, স্পেনের প্রভুত্ব দূর হওয়ার পরে, অনুরূপভাবে অগ্রসর হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ-লাভের জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। ইউরোপের অনেক শক্তিই এতে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু অবশেষে প্রধান প্রতিযোগিতা চলল শুধু ইংলন্ড ও ফ্রান্স এই দুই দেশের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ও ভারতবর্ষ দুই স্থানেই ইংলন্ড অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চদশ লুইয়ের অক্ষম শাসন ছাড়াও ফ্রান্সের আর-একটা অসুবিধে ছিল, ইউরোপীয় রাজনীতিতে বড়ো বেশি অংশগ্রহণ। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ চলল ইউরোপে কানাডায় এবং ভারতবর্ষে, কার প্রাধান্য হবে এই নিয়ে। এর নাম হল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ভারতবর্ষে এর একটু অংশ হয়েছিল, যাতে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। কানাডাতেও ইংলন্ড জয়ী হল। ইউরোপে ইংলন্ড তার নিজস্ব প্রসিদ্ধ রীতি অনুসরণ করল, সেটা হল অর্থের বিনিময়ে অন্যকে দিয়ে যুদ্ধ করানো। ফ্রেডরিক দি গ্রেট তার মিত্র হলেন।

এই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফল ইংলন্ডের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়েছিল। কী ভারতে, কী কানাডায়, কোথাও আর তার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সমুদ্রে তার নৌবাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইরূপে ইংলন্ডের পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করে 'পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তি' পদবী অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাশিয়ারও গুরুত্ব এই সময় বৃদ্ধি পেল।

আবার ইউরোপ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ফলে পুনরায় মহাদেশে খানিকটা শান্তির ভাব এল। কিন্তু এই শান্তভাবের জন্যে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার পক্ষে পোল্যান্ডকে গ্রাস করার কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। পোল্যান্ডের পক্ষে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না, কাজেই এই তিনটি হিংস্র শ্বাপদ পর পর কয়েকবার তাকে বিভক্ত করে স্বাধীন দেশ হিসেবে পোল্যান্ডের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিল। সর্বসমেত তিনবার ভাগ হয়েছিল, ১৭৭২, ১৭৯৩, এবং ১৭৯৫ সালে। এর প্রথমটার পরে পোলরা স্বদেশের সংস্কার এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল। পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা হল এবং শিল্প ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটল। কিন্তু পোল্যান্ডের প্রতিবেশী স্বৈরাচারী রাজারা রক্তের আস্বাদ পেয়েছিলেন, ফলে তাঁদের অত সহজে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তা ছাড়া এঁরা কেউ পার্লামেণ্ট পছন্দ করতেন না। ফলে পোলদের দেশপ্রেম, এবং মহাবীর কসিউস্কোর নেতৃত্বে আপ্রাণ যুদ্ধ সত্ত্বেও ১৭৯৫ সালে ইউরোপের মানচিত্র থেকে পোল্যান্ডের অন্তর্ধান ঘটল। সে সময়ে অন্তর্ধান ঘটল বটে, কিন্তু পোলরা তাদের দেশপ্রেম জাগরূক রেখে দিল এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে চলল। অবশেষে ১২৩ বছর পরে তাদের স্বপ্ন সফল হল, মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অবসানে স্বাধীন দেশরূপে পোল্যান্ডের পুনরাবির্ভাব হল।

আমি বলেছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপ কিছু পরিমাণে শান্ত ছিল; কিন্তু সে শান্তভাব খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, এবং ছিল শুধু বাইরে। আমি তোমাকে এই শতাব্দীর অনেক ঘটনাবলীর কথা বলেছি। কিন্তু আসলে অষ্টাদশ শতাব্দী বিখ্যাত তিনটি বিপ্লবের জন্য, এবং এই শতবর্ষকালের মধ্যে আর সব ঘটনাই এই তিনটি ঘটনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এই তিনটি বিপ্লবই ঘটে শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে। তারা ছিল তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির, রাজনৈতিক, শিল্পনৈতিক এবং সামাজিক। রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে আমেরিকায়। এটা ছিল সেখানকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ, যার ফল হল স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন, যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কালে এত প্রতাপশালী হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়

ইংলণ্ডে, এবং পরে পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং আরও অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছিল শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, কিন্তু বহু দূরপ্রসারী, এবং ইতিহাসের যে-কোনো ঘটনার চেয়ে মানুষের জীবনে এর প্রভাব বেশি। এর অর্থ হল বাষ্প ও যন্ত্রশক্তির আগমন, এবং পরিণামে ব্যবহারিক শিল্পের যে অগণ্য শাখা আমরা দেখতে পাই তাদের অভ্যুদয়। সামাজিক বিপ্লব হল ফরাসি-বিপ্লব, যাতে শুধু ফ্রান্সে রাজতন্ত্রবাদের শেষ হয় নি, বিশেষ অধিকারশালী ব্যক্তিদের অধিকারের সমাপ্তি হয়েছিল, এবং নূতন নূতন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটিয়েছিল। একটু বিস্তৃতভাবে এই তিনটি বিপ্লবই আমরা আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি, এইসব বিরাট পরিবর্তনের প্রাক্কালে ইউরোপে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে। আইন প্রবর্তিত হত ধনীর সম্পত্তি ও স্বত্ব রক্ষা করবার জন্যে। শিক্ষাও ছিল ধনী ও বিশেষ অধিকারশালী ব্যক্তিদের জন্যে। মোট কথা, শাসনবিভাগের অস্তিত্বই ছিল শুধু এইসব শ্রেণীর জন্যে। সে যুগের একটা বিরাট সমস্যা ছিল গরিব লোকেরা। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্তু দরিদ্রদের দুর্দশা যে শুধু থেকে গেল তাই নয়, বরং বাড়ল।

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে ইউরোপের জাতিরা নিষ্ঠুর দাসত্বপ্রথা চালিয়েছিল। দাসত্বপ্রথা বলতে যা বোঝায় তা আর ইউরোপে ছিল না, কিন্তু কৃষিজীবীরা, যাদের বলা হত সার্ফ অথবা ভিলেন, ক্রীতদাসের চেয়ে খুব ভালো অবস্থায় ছিল না। আমেরিকার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার প্রাচীন দাসব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতম অভিযান আরম্ভ হল। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজরা এই ব্যবসায় আরম্ভ করল আফ্রিকার উপকূল থেকে নিগ্রো ধরে ক্ষেতের কাজের জন্যে আমেরিকায় চালান করে। এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে ইংলণ্ডও পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। এই যেসব নিগ্রোদের বন্য জন্তুর মতো শিকার করে শিকলে বেঁধে আমেরিকায় চালান দেওয়া হত এদের ভীষণ দুরবস্থার কথা কল্পনা করাও তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব। পথ শেষ হবার আগেই অসংখ্য লোক মরে যেত। পৃথিবীতে যারা দুর্ভাগা তাদের সবার চেয়ে গুরুভার বহন করেছে বোধহয় এই নিগ্রোরা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে দাসপ্রথার যথারীতি বর্জন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ নিগ্রোরা হল এই ক্রীতদাসদের বংশধর।

এইসব অপ্রীতিকর বিষয়ের মধ্যে একটা খুশি হওয়ার জিনিষ দিয়ে চিঠি শেষ করব। এই শতাব্দীতে জর্মানি ও অস্ট্রিয়াতে সংগীতের বহুল উন্নতি হয়েছিল। তুমি জানো, ইউরোপীয় সংগীতে জর্মনদের স্থান সবার উপরে। সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাদের অনেক বড়ো সংগীত-রচয়িতার নাম শোনা যায়। অন্যান্য জায়গার মতো ইউরোপেও সংগীত প্রায় ধর্মানুষ্ঠানের অংশ ছিল। ক্রমে এদের মধ্যে ব্যবধান এল এবং সংগীত পৃথক একটি ললিতকলার স্থান পেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সবার নাম ছাপিয়ে উঠেছে দুটি নাম, মোৎসার্ট ও বীটোফেন। দুজনেরই প্রতিভা শৈশবেই প্রকাশ পেয়েছিল, দুজনেই ছিলেন পরম গুণী। বীটোফেন সম্ভবত প্রতীচীর শ্রেষ্ঠ সংগীতরচয়িতা, কিন্তু শুনতে অবাক লাগে, তিনি ছিলেন বধির। ফলে তাঁর পরমরমণীয় সংগীত শুনে অন্যে মুগ্ধ হলেও তাঁর নিজের তা শোনবার শক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁর হৃদয় নিশ্চয় তাঁর অন্তরেন্দ্রিয়ের কাছে গান করেছিল—যে সুরের রেশ ধরে তিনি সংগীত সৃষ্টি করেছিলেন।

৯৭

যন্ত্রশক্তির আবির্ভাব

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

এইবারে শিল্পবিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এর পত্তন হয় ইংলণ্ডে, অতএব ইংলণ্ডের বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই বিপ্লবের নির্দিষ্ট সঠিক তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ পরিবর্তনটা যাদুমন্ত্রের বলে এক দিনে আসে নি। তা বলে এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, এক দিনে না হলেও বেশ দ্রুতই হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে এক শো বছরেরও কমে এর ফলে সমস্ত জীবনধারার রূপ বদলে গিয়েছিল। এই চিঠিগুলোতে আমরা আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বছর ধরে যত পরিবর্তন ঘটেছিল সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করেছি। কিন্তু এসব পরিবর্তন এমনি যত বড়োই হোক, মানুষের জীবনযাত্রার কোনো বিশেষ পরিতর্বন ঘটায় নি। সক্রেটিস অথবা অশোক অথবা জুলিয়াস সীজার যদি সহসা ভারতবর্ষে আকবরের দরবারে, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর আদিভাগে ইংলণ্ড কিংবা ফ্রান্সে উপস্থিত হতেন, তা হলে অনেক পরিবর্তনই তাঁদের চোখে পড়ত। তার মধ্যে কিছু তাঁদের মনোমতো হত, কিছু-বা তাঁরা অপছন্দ করতেন। কিন্তু মোটামুটি, অন্তত বাইরে থেকে, তাঁরা পৃথিবীকে চিনতে পারতেন, কেননা মানবমনের গতি তখনও খুব বেশি বদলায় নি। বাইরের আকৃতি দিয়ে বিচার করলে তাঁরা সেখানে খুব বেশি অস্বস্তিও বোধ করতেন না। যদি ভ্রমণের প্রয়োজন হত তা হলে তাঁরা ব্যবহার করতেন ঘোড়া অথবা ঘোড়ার গাড়ি, ঠিক যেমন তাঁদের নিজেদের কালে ছিল। ভ্রমণে সময়ও অনেকটা একই রকম লাগত।

কিন্তু এই তিনজনের কেউ যদি বর্তমান কালের পৃথিবীতে আসতেন তা হলে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকত না এবং সে বিস্ময় হয়তো অনেক সময়েই বেদনাদায়ক হত। তিনি দেখতে পেতেন যে বর্তমানের মানুষ সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত চলে, তীরবেগের চেয়েও বেশি গতিতে। রেলওয়ে, বাষ্পীয় জাহাজ, মোটরকার এবং এরোপ্লেনের সাহায্যে তারা প্রচণ্ড বেগে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। তার পরে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার, আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রে উৎপন্ন অসংখ্য বই, সংবাদপত্র এবং আরও অনেক জিনিষে তাঁর কৌতূহল জাগত; এইসব ব্যবহারিক শিল্পের সন্তান, যাদের উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং পরে। সক্রেটিস বা অশোক বা জুলিয়াস সীজার এসব নূতন রীতি দেখে খুশি হতেন কি না তা আমি বলতে পারি না, তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, তাঁদের স্ব স্ব কালের পদ্ধতি থেকে এদের ভিন্নতা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন।

শিল্পবিপ্লব যন্ত্রযুগ নিয়ে এল পৃথিবীতে। অবশ্য এর আগেও যন্ত্র ছিল, কিন্তু নূতন যন্ত্রের মতো অত বড়ো নয়। যন্ত্র কাকে বলে? যন্ত্র হল যে বিরাট হাতিয়ার দিয়ে মানুষ কাজ করে। মানুষকে যন্ত্রনির্মাতা জীব বলা হয়ে থাকে, এবং আদিম যুগ থেকে মানুষ কল তৈরি করছে ও তাদের উত্তরোত্তর উন্নতিসাধনের চেষ্টা করছে। তার চেয়ে অধিক শক্তিমান অন্যান্য জীবের উপরে তার প্রাধান্যের মূল হল যন্ত্র। আসলে যন্ত্র হল তার হাতের সহায়ক, তৃতীয় হস্তও বলতে পারো। আধুনিক যন্ত্র হল এই আদিম যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ। এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ ইতর প্রাণীর উপরে উঠেছে। যন্ত্র তাকে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ সহজে জিনিষ উৎপন্ন করেছে। উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছে বেশি, কিন্তু তার অবসরও হয়েছে বেশি। এর থেকে সভ্যতার ললিতকলাসমূহের উন্নতি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও বিজ্ঞানের উন্নতি।

কিন্তু এই বড়ো যন্ত্র এবং তার সহযোগিতার ফল নিরবচ্ছিন্ন ভালো হয় নি। সভ্যতার উন্নতিতে যেমন এরা সাহায্য করেছে, যুদ্ধ ও ধ্বংসের উপযোগী ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে বর্বরতারও অগ্রগতি ঘটিয়েছে। প্রাচুর্য ঘটিয়েছে, কিন্তু সে প্রাচুর্য সবার জন্যে নয়। প্রধানত অল্প

জন্যে। অতীতে ধনী-দরিদ্রের বিলাসিতা এবং দারিদ্র্যের যে তারতম্য ছিল তা বাড়িয়েছে বৈ কমায় নি। মানুষের হাতের যন্ত্র ও ভৃত্য হওয়ার পরিবর্তে তার প্রভু হতে প্রয়াস পেয়েছে। এক দিকে কয়েকটি গুণ শিখিয়েছে, যেমন—সহযোগিতা, সঙ্ঘবদ্ধতা, সময়ানুবর্তিতা; অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনকে একঘেয়ে আনন্দহীনতায় পরিণত করেছে। জীবনকে বানিয়েছে যান্ত্রিক বোঝা, যার মধ্যে আনন্দ অথবা স্বাধীনতার স্থান নেই।

কিন্তু এসব দুর্ভাগ্যের জন্যে শুধু যন্ত্রকে দোষ দিয়ে কী হবে? আসল দোষ মানুষের, যার হাতে এর অন্যায় ব্যবহার হয়েছে; আর সমাজের, যে যন্ত্রের কাছ থেকে সবটুকু সুবিধা আদায় করে নেয় নি। পৃথিবী অথবা কোনো দেশ শিল্পবিপ্লবের পূর্বযুগে ফিরে যাবে এটা অচিন্তনীয়। যাওয়া বোধ হয় বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ কতকগুলো দোষের জন্যে, যন্ত্রযুগ মানুষের যে অজস্র উপকার করেছে সেগুলো বাদ দেওয়া চলে না। যাই হোক, যন্ত্রযুগ এসেছে এবং থাকবে। অতএব আমাদের সমস্যা হল এর ভালোটুকু গ্রহণ করে অবাঞ্ছনীয় অংশটুকু ত্যাগ করা। যে ধন এর থেকে উৎপন্ন হয় তা গ্রহণ করব, কিন্তু দেখব যে সে ধন যারা উৎপাদনের জন্যে দায়ী তাদেরই মধ্যে সেটা মোটামুটি সমভাবে বিতরণ করা হয়।

এ চিঠিতে আমি তোমাকে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার যেমন অভ্যাস, আমি অন্য দিকে চলে গিয়ে যন্ত্রযুগের ফলাফল সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করেছি। যে সমস্যাটার কথা বললাম তার কুফল আজ মানুষ ভোগ করছে। কিন্তু বর্তমানের কথা বলার আগে অতীত জেনে নিতে হবে। যন্ত্রযুগের ফলাফল আলোচনা করার আগে দেখতে হবে সে যুগ কখন কেমন করে এল। এ বিষয়ে এতক্ষণ বলার কারণ হল, আমি তোমাকে এই বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে চাই। সাধারণ রাষ্ট্রবিপ্লবের মতো এ শুধু রাজা এবং শাসনকর্তৃপক্ষের পরিবর্তন ঘটায় নি। এই বিপ্লব যাবতীয় শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, প্রত্যেকটি মানুষের উপর। যন্ত্র ও যন্ত্রযুগের জয়ের অর্থ, যন্ত্র যাদের হাতে তাদের জয়। অনেক আগে তোমাকে বলেছি, যে শ্রেণী উৎপাদনের উপায় নিয়ন্ত্রণ করে সেই আসলে শাসকশ্রেণী। অতীত যুগে উৎপাদনের একমাত্র বিশিষ্ট উপায় ছিল ভূমি, অতএব ভূম্যধিকারীরাই ছিল শাসক। সামন্ততান্ত্রিকযুগে ছিল তাই। তার পরে জমি ছাড়া অন্য ধনের অভ্যুদয় হল এবং শাসনক্ষমতা দু ভাগে ভাগ হল—জমির মালিক এবং উৎপাদনের নূতন উপায়ের মালিক। পরে এল কলকারখানা, এবং স্বভাবতই এই জিনিষটা যাদের হাতে তারাই পুরোভাগে এসে কর্তা হয়ে দাঁড়াল।

আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি কেমন করে নাগরিক বুর্জোয়া (মধ্যম শ্রেণী) ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠল এবং সামন্ত অভিজাতসম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়ে খানিকটা বিজয় লাভ করল। সামন্ততন্ত্রের পতন সম্বন্ধেও বলেছি, ফলে তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে যে এই নব-উদ্ভূত মধ্যম শ্রেণী তার স্থান অধিকার করল। যদি আমি এই কথা বলে থাকি তবে এই বেলা শুধরে নি। মধ্যম শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়েছিল অতি ধীরে ধীরে, এবং যে সময়ের কথা বলছি তখনও এ অভ্যুদয় ঘটে নি। ফ্রান্সের মহাবিপ্লব এবং ইংলণ্ডে অনুরূপ বিপ্লবের সম্ভাবনার ফলে মধ্যম শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসে। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের জয় হয়, কিন্তু ভুলে যেয়ো না, পার্লামেণ্ট ছিল অতি অল্পলোকের একটা সঙ্ঘ, তাও আবার ভূম্যধিকারীদের সঙ্ঘ। নগর থেকে বড়ো বণিক দুই একজন হয়তো ঢুকে থাকতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর এই বণিকশ্রেণী অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর কোনো স্থান সেখানে ছিল না।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ছিল ভূম্যধিকারীদের হাতে। ইংলণ্ডে এবং অন্যত্রও এইরকমই অবস্থা ছিল। এইরকম স্থাবর সম্পত্তি বাপের কাছ থেকে ছেলের হাতে আসে, ফলে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংলণ্ডের 'পকেট বরো' সম্বন্ধে আগেই তোমাকে বলেছি—অর্থাৎ যেসব জায়গা থেকে পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হত অতি অল্পসংখ্যক ভোটাধিকারীর দ্বারা। সাধারণত এইসব ভোটাধিকারী কারও না কারও হাতে থাকত, কাজেই বলা হত, 'বরো' তার পকেটে আছে। এই ধরনের নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং দুর্নীতি প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল, পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিত্ব এবং ভোটের রীতিমতো বেচাকেনা

চলত। ক্রমোন্নতিশীল মধ্যম শ্রেণীর কোনো কোনো ধনী এমনি করে পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্ব ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণের কোনো দিকেই কোনো লাভ ছিল না। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা পেত না এবং ক্ষমতা ক্রয় করার অর্থবলও তাদের ছিল না। কাজেই ধনী ও বিশেষ অধিকারশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রপীড়িত এবং শোষিত হলেই বা তারা কী করতে পারত? পার্লামেন্টের ভিতরে তাদের হয়ে বলার কেউ ছিল না, এমনকি পার্লামেন্টের সভ্যনির্বাচনেও তাদের কোনো হাত ছিল না। বাইরে তারা যদি আন্দোলন করত তাতেও কর্তৃপক্ষ চটতেন এবং বলপ্রয়োগে সব থামিয়ে দিতেন। তারা ছিল অসম্বদ্ধ, দুর্বল, অসহায়। কিন্তু দুর্দশা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, তারা শান্তির কথা ভুলে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত। এইজন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে অরাজকতার আধিক্য ছিল। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা হীন ছিল। আরও খারাপ হল, যখন বড়ো বড়ো ভূম্যধিকারীরা ছোটো চাষিদের সরিয়ে নিজেদের ভূসম্পত্তি বাড়াতে আরম্ভ করলেন। পল্লীর সাধারণ সম্পত্তি ছিল যেসব জমি তাতেও তাঁরা হাত দিলেন। এইসমস্ত জনসাধারণের দুরবস্থা বৃদ্ধি করল। সাধারণ লোকে শাসনবিধির মধ্যে তাদের কোনো অধিকার না থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, এবং স্বাধীনতা-বৃদ্ধির অস্পষ্ট দাবি শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সে অবস্থা ছিল আরও খারাপ, যার ফলে হল বিপ্লব। ইংলণ্ডে রাজপদের তত গুরুত্ব ছিল না এবং শাসনক্ষমতা অনেকের হাতে বিভক্ত ছিল। তা ছাড়া ফ্রান্সে যেমন রাজনৈতিক ভাবধারার উদ্বোধন ঘটেছিল, ইংলণ্ডে তা হয় নি। ফলে ইংলণ্ডে ফ্রান্সের মতো অত বড়ো বিস্ফোরণ ঘটল না, পরিবর্তন এল ধীরে ধীরে। ইতিমধ্যে যন্ত্রযুগের অগ্রগতির ফলে এবং নূতন অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পশ্চাৎপট ছিল এইরকম। কুটিরশিল্পে ইংলণ্ডের অগ্রগতি ঘটেছিল প্রধানত বিদেশী কারিগরদের আগমনে। ইউরোপের ধর্মবিরোধের ফলে অনেক প্রোটেস্ট্যান্টকে দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। স্প্যানিশ বাহিনী যখন নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করছিল তখন বহু কারিগর সেখান থেকে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে। শোনা যায়, তাদের মধ্যে ত্রিশ হাজার পূর্ব-ইংলণ্ডে বসবাস স্থাপন করে, এবং রানী এলিজাবেথ বসবাসের অনুমতির এই শর্ত দিয়েছিলেন যে, প্রতি গৃহে একজন করে ইংরেজ শিক্ষানবিশ রাখতে হবে। এর থেকে ইংলণ্ডের বয়নশিল্প গড়ে উঠল। এই শিল্প যখন স্থায়ী হল তখন নেদারল্যান্ড থেকে ইংলণ্ডে কাপড় আমদানি নিষিদ্ধ হল। এই সময় নেদারল্যান্ড তাদের স্বাধীনতার জন্যে তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, ফলে তাদের শিল্পের ক্ষতি ঘটছিল। তা থেকে এই হল যে, আগে যেমন নেদারল্যান্ড থেকে ইংলণ্ডে কাপড় চালান নিয়ে বহু জাহাজ যেত, অল্পদিনের মধ্যেই তা যে শুধু থেমে গেল তা নয়, উপরন্তু ইংলণ্ড থেকে নেদারল্যান্ডে কাপড়ের একটা বিপরীত ধারা শুরু হয়ে ক্রমশ বেড়ে চলল।

এইরকম ভাবে বেলজিয়মের ওয়ালুনরাও ইংরেজদের বয়নশিল্প শেখাল। তার পরে এল ফ্রান্স থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট আশ্রয়প্রার্থী হিউজিনোরা, শিখিয়ে দিল ইংরেজদের রেশম বোনার কাজ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপ থেকে অনেক নিপুণ কারিগর এল, এবং ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে অনেক পেশাই শিখল, যেমন—কাগজ, কাঁচ, কলের পুতুল, ঘড়ি প্রভৃতি তৈরি করা।

এতদিন ধরে ইংলণ্ড ছিল ইউরোপের একটি অনগ্রসর দেশ, কিন্তু এমনি করে তার ঐশ্বর্য ও প্রাধান্য বাড়ল। লণ্ডন শহরও বড়ো হল এবং ধনী বণিক-সম্প্রদায়-পূর্ণ একটি প্রধান বন্দরে পরিণত হল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লণ্ডনের একটি প্রধান বন্দর এবং বাণিজ্যস্থলে পরিণত হওয়ার সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ গল্প আছে। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রথম চার্লসের পিতা) স্বৈরাচার এবং রাজাদের ভগবদ্দত্ত স্বত্বে পরমবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পার্লামেণ্ট এবং হঠাৎ-ধনী লণ্ডনের বণিকসম্প্রদায়কে বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। একদিন রাগের মাথায় তিনি ভয় দেখালেন যে, তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করে অক্সফোর্ডে নিয়ে

যাবেন। এই ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অবিচলিত লর্ড মেয়র জবাব দিলেন, "আশা করি মহারাজ অনুগ্রহ করে টেম্‌স্‌-নদীটাকে রেখে যাবেন।"

লণ্ডনের এই ধনী বণিকসম্প্রদায়ই পার্লামেণ্টকে সমর্থন করত, এবং প্রথম চার্লসের সঙ্গে বিরোধের সময়ে পার্লামেণ্টকে অনেক টাকা দিয়েছিল।

এই-যে সব শিল্প ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল, সবই ছিল উটজ বা কুটির -শিল্প। অর্থাৎ, কারিগর অথবা মিস্ত্রিরা নিজেদের বাড়ি বসে, অথবা ছোটো ছোটো দলে কাজ করত। কারিগরদের এক-এক ব্যবসায়ে পৃথক পৃথক সমিতি ছিল, অনেকটা ভারতের জাতিভেদের মতো, যদিও তাতে ধর্মসংক্রান্ত কোনো অংশ থাকত না। ওস্তাদ কারিগর শিক্ষানবিশ নিয়ে তাদের কাজ শেখাত। তাঁতিদের নিজেদের তাঁত ছিল, যারা সুতো কাটত তাদের নিজেদের চরকা ছিল। সুতো কাটত অনেকেই, এবং মেয়েদের অবসর সময়ের ব্যবসা ছিল সুতো কাটা। কখনও কখনও ছোটো ছোটো কারখানায় কতকগুলো তাঁত একসঙ্গে নিয়ে তাঁতিরা কাজ করত। কিন্তু প্রত্যেক তাঁতি পৃথকভাবে তার নিজের তাঁতে কাজ করত, এবং আসলে বাড়িতে কাজ করার সঙ্গে এই সকলে মিলে কাজ করার কোনো প্রভেদই ছিল না। এই ছোটো কারখানা মোটেই বড়ো বড়ো কলকব্জা-ওয়ালা আধুনিক কারখানার মতো ছিল না।

ব্যবহারিক শিল্পের এই উটজ-যুগ যে শুধু ইংলণ্ডে ছিল তা নয়, সারা পৃথিবীতে যেখানেই শিল্পের অস্তিত্ব ছিল, সব জায়গাতেই ছিল। ইংলণ্ডে কুটিরশিল্প প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, কিন্তু ভারতে এখনও অনেক কুটিরশিল্প টিঁকে আছে। কাপড়ের কল এবং কুটিরের তাঁত পাশাপাশি চলছে, ইচ্ছে হলে দুটোয় তুলনা করে দেখতে পারো। তুমি জানো, আমরা যে কাপড় পরি তা হল খাদি। এর সুতো হাতে কেটে হাতে কাপড় বোনা হয়, কাজেই সর্বতোভাবে ভারতের কুটির এবং মেটে ঘরের জিনিষ।

নূতন নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে ইংলণ্ডের কুটিরশিল্পের অনেক উন্নতি ঘটেছিল। মানুষের কাজ ক্রমেই কলের দ্বারা হতে লাগল, ফলে অল্প পরিশ্রমে উৎপাদন বেড়ে গেল। এইসব যন্ত্রের আবির্ভাব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। পরের চিঠিতে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

আমি সংক্ষেপে খাদি-আন্দোলনের কথা বলেছি। এ সম্বন্ধে এখানে বেশি বলার ইচ্ছে নেই। শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দিতে চাই যে, এই আন্দোলন ও চরকার উদ্দেশ্য যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়। অনেকেই এই ভুল করেন এবং ভাবেন, চরকার অর্থ মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া এবং নূতন যুগের যন্ত্রশিল্প ও কলকারখানা বর্জন করা। মোটেই তা নয়। আমাদের আন্দোলন একেবারেই যন্ত্রশিল্প অথবা কারখানার বিরুদ্ধে নয়। আমরা চাই, ভারতবর্ষ সব ভালো জিনিষই পাক, যত শীঘ্র সম্ভব। কিন্তু ভারতের বর্তমান দুরবস্থার কথা এবং বিশেষ করে আমাদের কৃষিজীবীদের নিদারুণ দারিদ্র্যের বিষয় বিবেচনা করে, আমরা তাদের অবসর সময়ে চরকা কাটতে বলেছি। এইরূপে তারা যে শুধু নিজেদের অবস্থার একটু উন্নতি করতে পারবে তাই নয়, তারা আমাদের বিদেশী বস্ত্রের উপর নির্ভর খানিকটা কমাবে, সেই সঙ্গে কিছু কিছু দেশের টাকা বাইরে যাওয়াও হবে বন্ধ।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের আরম্ভ

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

যেসব যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদনের উপায়ের তুমুল পরিবর্তন ঘটে, এবার তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এখন যখন আমরা কোনো কারখানায় সেসব দেখি, খুবই সরল বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম তাদের ভেবে বের করা এবং তাদের আবিষ্কার খুবই কঠিন ব্যাপার। এইজাতীয় আবিষ্কারের প্রথমটি হয়েছিল ১৭৩৮ সালে, কে-নামক একজনের হাতে। তাঁত বোনার ফ্লাইং শাট্‌ল্ অথবা মাকু ইনিই উদ্ভাবন করেন। এই আবিষ্কারের আগে মাকুর সুতো টানার সুতোর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে হত। ফ্লাইং শাট্‌লে এই কাজটা খুব দ্রুত হতে লাগল এবং তাঁতির উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফলে তাঁতির পক্ষে ঢের বেশি সুতোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। যারা সুতো কাটত, এই অতিরিক্ত পরিমাণে সুতো সরবরাহ করা কঠিন হওয়ায় তারা সুতোর উৎপাদন বাড়ানোর উপায় খুঁজতে লাগল। এই সমস্যার আংশিক সমাধান হল ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে, হারগ্রিভ্‌স্ যখন স্পিনিং-জেনি নামক যন্ত্র তৈরি করলেন। তার পরে এল রিচার্ড আর্করাইট এবং অন্য অনেকের আবিষ্কার। প্রথমে জলশক্তি এবং তার পরে বাষ্পশক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল। এইসব আবিষ্কারের প্রথম প্রয়োগ হল কার্পাস-শিল্পে, ফলে কারখানা অথবা কাপড়ের কল গড়ে উঠল। তার পরে পশম-শিল্প এই নূতন উৎপাদন-রীতি গ্রহণ করল।

ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে জেম্‌স্ ওয়াট্ তাঁর স্টীম-এঞ্জিন তৈরি করলেন। এই বিরাট আবিষ্কারের থেকে কারখানায় বাষ্পের ব্যবহার গৃহীত হল। নূতন নূতন কারখানার জন্যে কয়লার প্রয়োজন ঘটল, ফলে কয়লার উৎপাদন বেড়ে গেল। কয়লার ব্যবহারের ফলে খনিজ পদার্থ থেকে বিশুদ্ধ লোহা নিষ্কাশনের নূতন পদ্ধতি বের হল। ফলে লৌহশিল্প দ্রুত উন্নত হতে লাগল। কয়লার খনির কাছে নূতন কারখানা তৈরি হতে লাগল, কারণ কয়লা সেখানে শস্তা।

এইরূপে ইংলণ্ডে তিনটি বৃহৎ ব্যবহারিক শিল্প গড়ে উঠল—বয়ন, লৌহ এবং কয়লা। কয়লা-খনি এলাকায় এবং অন্যান্য উপযোগী জায়গায় নূতন নূতন কারখানা গড়ে উঠল। ইংলণ্ডের চেহারা বদলে গেল। সবুজ নয়নানন্দকর পল্লীভূমি পরিবর্তিত হয়ে অনেক জায়গায় এইসব নূতন কারখানা নির্মিত হল, তাদের দীর্ঘ চিমনির ধোঁয়ায় আশেপাশের পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। এসব কারখানার কোনো সৌন্দর্য ছিল না, তাদের চার দিকে থাকত কয়লা আর আবর্জনার পাহাড়। যেসব নূতন উৎপাদন-নগরী এইসব কারখানার কাছে গড়ে উঠল, তাদেরও সৌন্দর্য বলে কোনো পদার্থ ছিল না। মালিকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু টাকা উপার্জন করা, ফলে শহরগুলো যেমন-তেমন করে গড়া হয়েছিল। এইসব শহর ছিল নোংরা, প্রকাণ্ড এবং কুৎসিত। কারখানার ব্যবস্থা ছিল চূড়ান্তভাবে অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের এ অবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

বড়ো বড়ো ভূম্যধিকারীরা কী করে ছোটোখাটো চাষিদের সরিয়ে দিয়েছিল এবং সেইজন্যে বেকার-অবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলণ্ডে যে দাঙ্গা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে আগেই বলেছি। নূতন ব্যবহারিক শিল্পের অভ্যুত্থানের আরম্ভেই ফল আরও খারাপ হল। কৃষির ক্ষতি হল, বেকার-অবস্থা বৃদ্ধি পেল। নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে হাতের কাজ লোপ পেয়ে যন্ত্র এসে চেপে বসল। তার ফলে শ্রমিকদের কাজ গেল এবং তাদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হল। তাদের অনেকেই এইসব নূতন কলকে বিদ্বেষের চোখে দেখতে আরম্ভ করল, এমনকি কখনও কখনও ভেঙে ফেলারও চেষ্টা করতে লাগল। এদের বলত মেশিন-রেকার্‌স্ অথবা যন্ত্রধ্বংসকারী।

ইউরোপের যন্ত্রধ্বংসের ইতিহাস বেশ পুরোনো, ষোড়শ শতাব্দীতে জর্মনিতে একটি সহজ কলের তাঁতের আবিষ্কার থেকে তার আরম্ভ। ১৫৭৯ সালে একজন ইতালীয় পাদ্রীর লেখা

একটা পুরোনো বইতে এই তাঁতের সম্বন্ধে বিবরণ আছে : "ডান্‌জিগের নাগরিক-সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এই যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে অনেক কারিগরের চাকরি যাবে, তাই তাঁরা যন্ত্রটিকে নষ্ট করেন, এবং আবিষ্কর্তাকে গোপনে হয় গলা টিপে অথবা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়!" আবিষ্কর্তার এই সরাসরি সমাপ্তি সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীতে যন্ত্রটির পুনরাবির্ভাব ঘটল, এবং ইউরোপ জুড়ে দাঙ্গা বাধল। অনেক দেশে যন্ত্রের বিরুদ্ধে আইন তৈরি হল এবং কোথাও কোথাও প্রকাশ্য জনতার সামনে যন্ত্র পুড়িয়ে ফেলা হল। যখন প্রথম এই যন্ত্রের আবিষ্কার হয় তখনই এর ব্যবহার আরম্ভ হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক আবিষ্কার ঘটত এবং যন্ত্রযুগের আগমন সম্ভবত অনেক আগেই ঘটত। কিন্তু তা না হওয়ায় বোঝা যায় যে, দেশের অবস্থা তখনও যন্ত্রযুগের অনুকূল হয় নি। সময় যখন এল তখন অসংখ্য দাঙ্গাহাঙ্গামা সত্ত্বেও যন্ত্র তার নিজের স্থান অধিকার করে বসল। শ্রমিকদের পক্ষে যন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষের ভাব স্বাভাবিক। ক্রমে তারা বুঝতে শিখল যে, যন্ত্রের কোনো দোষ নেই, দোষ হচ্ছে সেই রীতির যা অল্প জনকয়েকের লাভের জন্যে এর ব্যবহার করে। কিন্তু তার আগে ইংলন্ডে কলকারখানার উন্নতি সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া যাক।

নূতন কলকারখানা অনেক কুটিরশিল্প এবং স্বাধীন কারুশিল্পকে গ্রাস করল। এসব কুটিরশিল্পের পক্ষে যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ফলে এই কারিগরদের তাদের পুরোনো পেশা ছেড়ে আসতে হল দিনমজুর হয়ে সেখানেই যে কলকারখানাকে তারা এত ঘৃণা করত। না করলে ফল হত কর্মহীনতা। উটজশিল্পের পতন সহসা ঘটে নি, কিন্তু মোটামুটি বেশ দ্রুতই ঘটেছিল। এই শতাব্দীর শেষে, অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ সালে, অনেক বড়ো-বড়ো কারখানা দেখা গেল। প্রায় ত্রিশ বছর পরে স্টিফেন্‌সনের বিখ্যাত এঞ্জিন 'রকেট'এর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে রেলওয়ের সূত্রপাত হল। এইভাবে যন্ত্রের প্রসার বেড়ে চলল, ব্যবহারিক শিল্প এবং জীবনের প্রায় সব স্থানেই এর প্রভাব বিস্তৃত হল।

যেসব আবিষ্কর্তার নাম করেছি তাঁরা, এবং আরও অনেকে, জন্মেছিলেন কায়িক-শ্রমজীবীর ঘরে। এই শ্রেণী থেকেই প্রথম যুগের শিল্পপতিদের অনেকের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাঁদের উদ্ভাবনা এবং কারখানা-পদ্ধতির ফলে মালিক ও শ্রমিকের ব্যবধান বেড়েই চলল। কারখানার শ্রমিক যন্ত্রের একটি ক্ষুদ্রতম অংশে পরিণত হল; যে বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাক, বুঝতেও পারত না, তার হাতে অসহায় অবস্থায় পড়ল। কারিগর ও মিস্ত্রিদের সন্দেহদৃষ্টি এ দিকে প্রথম পড়ল, যখন তারা দেখল যে, নব-আবিষ্কৃত কারখানা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জিনিসের উৎপাদনের খরচ এবং দাম এত শস্তা করে ফেলেছে যে, তাদের পুরোনো ধরনের হাতিয়ার দিয়ে তার কিছুই করা সম্ভব নয়। বিনা দোষে তাদের নিজেদের ছোটো ছোটো দোকান বন্ধ করতে হল। নিজেদের চিরাচরিত শিল্পেই যখন তাদের এই অবস্থা, তখন নূতন কোনো শিল্পে হাত দিয়ে সফল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে বেকার ক্ষুধার্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, এই মাত্র। একটা কথা আছে, "ক্ষুধা কারখানার মালিকের আড়কাঠি"; সেই ক্ষুধা তাদের শেষটায় এইসব নূতন কারখানায় তাড়িত করে নিয়ে গেল কাজের চেষ্টায়। মালিকরা কিন্তু তাদের খুব করুণা-প্রদর্শন করল না। কাজ তারা পেল বটে, কিন্তু অতি অল্প মজুরিতে, আর সেইটুকুর জন্যেই হতভাগ্য মজুরদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হতে লাগল। মেয়েরা, এমনকি শিশুরা পর্যন্ত, অস্বাস্থ্যকর স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করত, অনেকে শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে মূর্ছাপন্ন হত। পুরুষরা কাজ করত সমস্ত দিন কয়লা-খনির গভীর খাদের মধ্যে, এবং অনেকে মাসের পর মাস সূর্যালোকের মুখ দেখতে পেত না।

কিন্তু ভেবো না যে, এই সবই মালিকদের নিষ্ঠুরতার জন্যে। জ্ঞাতসারে হৃদয়হীন তারা বড়ো-একটা হত না। আসল দোষ ছিল এই পদ্ধতির। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, উৎপাদনের বৃদ্ধি করা এবং দূর দেশের বাজারে মাল চালানো; আর এই কাজের জন্যে তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল। নূতন কারখানা তৈরি করতে আর যন্ত্রপাতি কিনতে অনেক টাকা লাগে। আর সে টাকার ফল ভোগ করা যায় তখনই যখন উৎপাদন আরম্ভ হয়ে মাল বাজারে বিক্রি হতে থাকে। কাজেই কারখানার মালিকদের কারখানা-তৈরির জন্যে ব্যয়সংক্ষেপ করতে হত, এবং মাল-

বিক্রির পয়সা ঘরে এলে তারা আবার নূতন নূতন কারখানা তৈরি করত। ব্যবহারিক উৎপাদন-পদ্ধতির উপায় আগে পাওয়ার জন্যে অন্যান্য দেশের চেয়ে তারা বেশিদূর এগিয়েছিল, আর তারা চাইত তার লাভটা ভোগ করতে। লাভ তারা সত্যিই ভোগ করত। ফলে ব্যবসাবুদ্ধির এবং অর্থোপার্জনের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় তারা তাদেরই পিষে মারত যাদের কায়িক শ্রম ছিল তাদের ঐশ্বর্যের মূলে।

কাজেই এই নব উৎপাদন-পদ্ধতি সবলকর্তৃক দুর্বলের শোষণের বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। ইতিহাসে চিরকাল এই ঘটনাই দেখা যায়। কারখানা-রীতি ব্যাপারটাকে আরও সোজা করে তুলল। আইনমতে ক্রীতদাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুধার্ত শ্রমিক, কারখানার দিনমজুরের অবস্থা পুরোনো যুগের ক্রীতদাসের চেয়ে একটুও ভালো ছিল না। আইন ছিল মালিকের অনুকূলে। এমনকি ধর্মও ছিল তারই সুবিধের, কারণ ধর্ম বলত, গরিবরা যেন ইহলোকে তাদের দুর্দশা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, ক্ষতিপূরণ মিলবে পরলোকে। শাসকসম্প্রদায় বেশ সুবিধাজনক এক দার্শনিক মত তৈরি করে ফেললেন যে, সমাজের হিতার্থে গরিবের প্রয়োজন, অতএব তাদের অল্প মজুরি দেওয়া সম্পূর্ণ ধর্মানুগত। বেশি মজুরি দেওয়া হলেই নাকি গরিবরা বিলাসিতা শিখবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করবে না। এরকম চিন্তাপদ্ধতির এই সুবিধে ছিল যে, এই ধারণা কারখানার মালিক এবং অন্যান্য ধনীব্যক্তিদের বস্তুতান্ত্রিক বিধির সঙ্গে বেশ খাপ খেত।

এই সময়ের ইতিহাস বেশ কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ। এ থেকে অনেক-কিছু শেখা যায়। দেখতে পাই, উৎপাদনের যান্ত্রিক-পদ্ধতি অর্থনীতি ও সমাজের উপর কী তুমুল প্রভাব বিস্তার করে! সামাজিক রীতির আমূল পরিবর্তন হয়। নূতন নূতন শ্রেণী পুরোবর্তী হয়ে ক্ষমতা-লাভ করে। শিল্পীশ্রেণী কারখানার মজুরশ্রেণীতে পরিণত হয়। এ ছাড়া নূতন অর্থনীতি মানুষের ধর্ম ও নীতি -সংক্রান্ত বিশ্বাস নূতন ছাঁচে গড়ে তোলে। অধিকাংশ লোকের মতবাদ নিজেদের স্বার্থ ও শ্রেণীচেতনার উপর নির্ভর করে, ফলে ক্ষমতা পেলে তারা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করে। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে যাতে মানবহিতৈষণা এবং ধার্মিকতার থেকেই আইনের উৎপত্তি বলে মনে হয় সেইরকম চেষ্টা হয়ে থাকে। আমরা ভারতের ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য সরকারি কর্তাদের কাছ থেকে অনেক মিষ্টি কথা শুনেছি। অহরহ আমরা শুনে আসছি, আমাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁরা কী ভীষণ পরিশ্রম করছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শাসনবিধি চালান অর্ডিন্যান্স্ ও বেয়নেটের সাহায্যে, এবং জনসাধারণের পেষণকার্য সমানে চলতে থাকে। আমাদের জমিদারেরা বলেন, তাঁরা প্রজাদের কী ভীষণ ভালোবাসেন, কিন্তু সেজন্যে তাদের করভারে পীড়িত করে শোষণ করতে তাঁদের বাধে না, পীড়নের ফলে হতভাগ্যদের উপবাসী দেহ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের পুঁজিবাদীরা এবং বড়ো বড়ো কারখানার মালিকরা শ্রমিক-মঙ্গলের প্রতি তাঁদের প্রখর দৃষ্টির কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, কিন্তু এই শুভেচ্ছার থেকে মজুরিবৃদ্ধি অথবা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কোনো আভাস পাওয়া যায় না। লাভ যা হয় সবই মালিকদের নূতন নূতন প্রাসাদ গড়তে ব্যয় হয়ে যায়, শ্রমিকদের মাটির ঘরের উন্নতির জন্যে কিছু বাকি থাকে না।

ভাবতে অবাক লাগে, লোকে স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে নিজেদের মনকে এবং অপরকে কীরকম চোখ ঠারে। এইরকমে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ মালিকরা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিতে সবরকমে বাধা দিত। কারখানাসংক্রান্ত এবং বাসস্থান-সংস্কারের আইনে তাদের আপত্তি ছিল, এবং সমাজের যে লোকের দুর্গতির অপসারণে কোনো দায়িত্ব আছে, এ কথা তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করত। তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিত এই চিন্তা করে যে, শুধু অলস লোকরাই ভোগে। তা ছাড়া, শ্রমিকরা যে তাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ এ কথা তারা মানতেই চাইত না। একটা নূতন নীতির উদ্ভব তারা করেছিল, যাকে বলে Laissez-faire, অর্থাৎ সরকার থেকে কোনোরকম বাধা স্বীকার না করে ব্যবসায়ে তারা যা খুশি করতে চাইত। অন্য দেশের আগে কারখানা শুরু করে তারা অগ্রগামী হয়েছিল, কাজেই তারা অর্থোপার্জন-ব্যাপারে স্বাধীনতা চাইত। Laissez-faire

প্রায় অর্ধ-ঐশ্বরিক মতবাদ হয়ে দাঁড়াল, এবং তার অর্থ হল সকলের পক্ষেই সমান সুযোগ, শুধু যদি তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। প্রতিটি নরনারী বাকি পৃথিবীর বিরুদ্ধে অগ্রগমনের জন্যে লড়াই করে; সে সংগ্রামে যদি অনেকের পতন ঘটে, কী এসে-যায় তাতে?

পরস্পরের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা সভ্যতার ভিত্তি, এ কথা তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু Laissez-faire-নীতি এবং নূতন ধনতান্ত্রিকবাদ সভ্যতার মধ্যে আরণ্য-নীতি নিয়ে এল। কার্লাইল এর নাম দিয়েছিলেন 'শূকরদর্শন'। জীবন এবং ব্যবসায়ের এই নূতন রীতি কার সৃষ্টি? শ্রমিকদের নয়, কারণ এ ব্যাপারে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। এর সৃষ্টি হল ধনীশ্রেষ্ঠ কারখানার মালিকদের হাতে, যারা অর্থহীন ভাবপ্রবণতার নামে সাফল্যের পথে অন্তরায় চায় নি। স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিস্বত্বের নামে তারা বাসস্থানের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জিনিষে ভেজাল মেশানোর বিরোধিতার ব্যাপারেও আপত্তি করত।

আমি এখনি ক্যাপিটালিজ্‌ম্ (ধনতান্ত্রিকবাদ বা পুঁজিবাদ) কথাটা ব্যবহার করেছি। এক ধরনের পুঁজিবাদ সব দেশেই বহুকাল ধরে চলে আসছিল, অর্থাৎ সঞ্চিত ধন থেকে ব্যবসার পরিচালনা। কিন্তু কলকারখানা এবং নূতন ব্যবহারিক শিল্পের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার উৎপাদনের জন্যে বহুগুণ বেশি টাকার দরকার হয়ে পড়ল। এর নাম হল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসায়ের পুঁজি। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ কথাটার এখন ব্যবহার হয় শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী অর্থনৈতিক রীতিকে বোঝাতে। এই রীতিতে ক্যাপিটালিস্টরা, অর্থাৎ পুঁজির মালিকরা, কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে লভ্যাংশ গ্রহণ করত। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আর দুই-একটি জায়গা ছাড়া। প্রথম থেকেই পুঁজিবাদ ধনীদরিদ্রের প্রভেদটা বড়ো করে দেখিয়েছিল। উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলের ফলে উৎপন্ন জিনিষের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং বেশি ঐশ্বর্যও উৎপন্ন করল। অতি ধীরে ইংলণ্ডে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হল, তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের শোষণ। কিন্তু উৎপাদনের লাভের উপর শ্রমিকদের অংশ ছিল খুবই কম। শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদ উৎপাদনের সমস্যার সমাধান করল, কিন্তু এই নূতন-উৎপাদিত অর্থের বণ্টন-সমস্যার সমাধান হল না। ফলে যাদের আছে এবং যাদের নেই এই দুই দলের বিভেদ যে শুধু রয়ে গেল তাই নয়, তীব্রতর হয়ে উঠল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পবিপ্লব ঘটল। ঠিক এই সময়েই ব্রিটিশরা ভারত ও কানাডার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। এই সময়েই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলে। এইসব ঘটনার পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বেশ-একটু হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের ভৃত্যরা (ক্লাইভের কথা মনে কোরো) পলাশির যুদ্ধের পরে ভারত থেকে যে বিশাল পরিমাণে ধনসম্পত্তি লুট করেছিল তাই দিয়ে নূতন নূতন ব্যবহারিক শিল্পের পত্তনের খুব সুবিধে হল। আগেই বলেছি, কলকারখানার প্রবর্তন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আরম্ভে অনেক টাকা লাগে, কিন্তু সে টাকার ফল অনেকদিন পাওয়া যায় না। ঋণ অথবা অন্য কোনো উপায়ে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত না হলে দারিদ্র্য ও দুর্দশার সৃষ্টি হয়, যতদিন-না কারখানায় কাজ চলে টাকা আসতে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের খুবই বরাতজোর যে, যখন তার কলকারখানার উন্নতির জন্যে টাকা প্রয়োজন তখনই ভারতের লুণ্ঠনের ফলে টাকা এসে পৌঁছল।

কারখানা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিষের অভাব অনুভূত হল। তৈরি মালের জন্যে কাঁচা মাল প্রয়োজন। যেমন কাপড় তৈরি করতে তুলো লাগে। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল এইসব উৎপাদিত মাল বিক্রয়ের উপযুক্ত স্থান। সকলের আগে নূতন ব্যবহারিক শিল্পের বিধি প্রবর্তন করে ইংলণ্ড অনেকখানি এগিয়ে ছিল অন্যান্য দেশের তুলনায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মাল বিক্রয়ের বাজারের সমস্যাটা রইল। সমাধানের জন্যে আবার ভারতের প্রবেশ, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। নানা উপায়ে ইংরেজরা ভারতের বস্ত্রশিল্পের উচ্ছেদ করে বিলাতি বস্ত্রশিল্প ঢোকাল। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। আপাতত মনে রাখা দরকার, কী করে ভারতকে হস্তগত করে নিজেদের ইচ্ছে তার ওপর জোর করে চাপিয়ে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সহায়তা করা হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং মোটামুটি ইংলণ্ডেরই

অনুরূপ পুঁজিবাদী ব্যবসায় আরম্ভ হল। পুঁজিবাদের ফলে স্বতই নূতন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব, কারণ সর্বত্রই কাঁচা মালের এবং মাল বিক্রি করার মতো বাজারের চাহিদা বেড়ে গেল। এই দুই জিনিষই পাবার সবচেয়ে সোজা উপায় হল, দেশটাকেই অধিকার করা। ফলে শক্তিমান দেশগুলির মধ্যে নূতন রাজ্যবিস্তারের জন্যে হুঁড়োহুড়ি পড়ে গেল। ইংলণ্ডের নৌশক্তি ছিল এবং ভারতের উপরে আধিপত্য ছিল, ফলে তারই জয় হল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ফল সম্বন্ধে পরে বলব।

শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজশাসিত দেশগুলিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকরা, লোহার কারখানার কর্তারা এবং কয়লার খনির মালিকরা ক্রমেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে চলল।

৯৯

ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার বিচ্ছেদ

২রা অক্টোবর, ১৯৩২

এইবার আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় প্রধান বিপ্লবের বিষয়ে আলোচনা করব—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকান উপনিবেশসমূহের বিদ্রোহ। এটা শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের মতো অতখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর পরবর্তী বিপ্লব, যা ইউরোপের সমস্ত সামাজিক ভিত্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, সেই ফরাসি-বিপ্লবের তুলনাতেও এর গুরুত্ব অল্প। কিন্তু আমেরিকার এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। যে আমেরিকান উপনিবেশগুলি সেদিন স্বাধীন হয়েছিল তারাই আজ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, সবচেয়ে ধনী এবং যন্ত্রশিল্পে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রণী দেশ।

তোমার 'মেফ্লাওয়ার' জাহাজের কথা মনে আছে? এই জাহাজেই একদল প্রোটেস্টান্ট ১৬২০ সালে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় চলে আসেন। প্রথম জেম্‌সের স্বৈরাচার এবং ধর্মমত তাঁদের পছন্দ হয় নি। কাজেই পরবর্তীকালে 'পিল্‌গ্রিম ফাদার্‌স্‌' বলে পরিচিত এই ব্যক্তিরা চিরদিনের জন্যে ইংলণ্ড ত্যাগ করে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে নূতন অজ্ঞাত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে চলল, অধিকতর স্বাধীনতার প্রত্যাশায়। তারা উত্তরে এক জায়গায় পৌঁছে তার নাম দিল নিউ প্লিমথ। তাদের আগেও ঔপনিবেশিকরা উত্তর-আমেরিকার তটরেখার স্থানে স্থানে গিয়েছিল, পরেও অনেকে যায়, ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আমেরিকার পূর্ব-তটরেখায় অনেক ছোটো ছোটো উপনিবেশ গড়ে উঠল। এইসব উপনিবেশের মধ্যে ক্যাথলিক উপনিবেশ ছিল, ইংলণ্ডের ক্যাভালিয়ার অভিজাতদের সৃষ্ট উপনিবেশ ছিল, আর ছিল কোয়েকার-উপনিবেশ। পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার নামকরণ হয়েছিল 'কোয়েকার পেন'এর নাম থেকে। আরও ছিল ওলন্দাজ জর্মন ডেন এবং কিছু ফরাসি। এই সংমিশ্রণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক। ওলন্দাজরা একটি নগর নির্মাণ করে তার নাম দিল নিউ অ্যাম্‌স্‌টার্‌ডম। পরে এই নগর ইংরেজদের হস্তগত হলে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় নিউ ইয়র্ক, বর্তমান যুগের বিখ্যাত নগর।

ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা ব্রিটিশ রাজা এবং পার্লামেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করত। এদের অনেকেই দেশ ছেড়েছিল সেখানে তাদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে, এবং রাজা অথবা পার্লামেণ্টের খুব পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের বাসনাও তাদের ছিল না। দক্ষিণাংশের উপনিবেশসমূহের অধিবাসী ছিল ক্যাভালিয়ার এবং রাজার পক্ষাবলম্বী লোকেরা, এবং তারা স্বতই দেশের প্রতি অনেক বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট ছিল। এইসব উপনিবেশ প্রায় সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ছিল, এবং পরস্পরের সঙ্গে কোনো মিলও তাদের ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার পূর্ব-

তটে তেরোটা উপনিবেশ ছিল, সবই ব্রিটিশ-শাসন-ভুক্ত। উত্তরে ছিল কানাডা, দক্ষিণে স্পেন-অধিকৃত দেশসমূহ। এই তেরোটি ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যে ওলন্দাজ, দিনেমার ও অন্যান্য জাতির যেসব বসতি ছিল সেগুলো সবই ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের অধীনেই ছিল। কিন্তু এইসব উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল শুধু তটরেখায় এবং অল্প কিছুদূর ভিতর পর্যন্ত। তারও পরে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বিশাল দেশ, এই তেরোটা উপনিবেশের প্রায় দশগুণ বড়ো। এইসব অঞ্চল ছিল নানা রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। এইসব উপজাতির মধ্যে প্রধান ছিল ইরোকী জাতি।

তোমার মনে থাকতে পারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী বিবাদ চলেছিল, এরই নাম হল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। এ যুদ্ধ শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু ভারত ও কানাডাতেও এসে পৌঁচেছিল। জয় ঘটল ইংলন্ডের, ফলে কানাডা ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হয়ে ইংলন্ডের অধিকারভুক্ত হল। আমেরিকা থেকে ফ্রান্সের অন্তর্ধান ঘটল এবং উত্তর-আমেরিকার সমস্ত উপনিবেশই ইংলন্ডের শাসনাধীনে এল। একমাত্র কানাডার কিউবেক-প্রদেশে কিছু ফরাসি জনসংখ্যা ছিল। তা ছাড়া উপনিবেশগুলির মধ্যে সর্বত্রই ইংরেজজাতির প্রাধান্য ঘটল। অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে, অ্যাংলো-স্যাক্সন অধিবাসীবেষ্টিত হলেও কিউবেক এখনও ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বীপবিশেষ। যতদূর জানি, কিউবেক-প্রদেশের বৃহত্তম নগর মন্ট্রিলে (কথাটা এসেছে Mont Royal থেকে), যত ফরাসিভাষী লোক আছে, প্যারিসের বাইরে আর-কোনো শহরে তত নেই।

আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় নিগ্রো-মজুর আনার জন্যে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে যে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল তার সম্বন্ধে আমি আগের এক চিঠিতে বলেছি। এই ভয়াবহ ঘৃণিত বাণিজ্য ছিল মোটামুটি স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ ও ইংরেজদের হাতে। আমেরিকায়, বিশেষ করে দক্ষিণ-রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমজীবীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল বড়ো বড়ো তামাকের খেতে কাজ করার জন্যে। দেশের আদিম অধিবাসী, অর্থাৎ তথাকথিত রেড-ইন্ডিয়ানরা ছিল যাযাবর, এবং একস্থানে স্থিতিবিধি তাদের রুচিকর ছিল না। তা ছাড়া দাসরূপে কাজ করতে তাদের বিলক্ষণ আপত্তি ছিল। মচ্‌কানোর চাইতে ভাঙতে তারা প্রস্তুত ছিল, এবং কালক্রমে সত্যিই তাদের ভাঙতে হল। রেড-ইন্ডিয়ানদের প্রায় শেষ করে আনা হল; যারা বাকি থাকল, নূতন ধরনের অবস্থার মধ্যে পড়ে তারাও অনেকে মরল। যারা একদিন একটা গোটা মহাদেশ অধ্যুষিত করে ছিল, আজ তাদের মধ্যে খুব অল্প কয়জনই টিঁকে আছে।

রেড-ইন্ডিয়ানরা খেতে কাজ করতে রাজি হল না, অথচ শ্রমজীবীর বিশেষ দরকার। ফলে মানুষ-শিকারীরা ধরতে লাগল আফ্রিকার হতভাগ্য অধিবাসীদের, এবং অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাদের সমুদ্রপারে পাঠাতে আরম্ভ করল। এইসব নিগ্রোদের দক্ষিণ-রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হল, ভার্জিনিয়া ক্যারোলিনা জর্জিয়া এইসব স্থানে, এবং দলে দলে তামাক ও অন্যান্য ফসলের খেতে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল।

উত্তর-রাষ্ট্রসমূহে অবস্থা একটু অন্যরকম ছিল। মেফ্লাওয়ার জাহাজে পিলগ্রিম-ফাদারেরা যে পিউরিটান আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন তা সেখানে ছিল। ক্ষেত ছিল ছোটো ছোটো, দক্ষিণের মতো অত বিশাল নয়। অগণিত শ্রমিক অথবা দাসের প্রয়োজন এসব ক্ষেতে ছিল না। জমির কোনো অভাব ছিল না, সকলেই নিজস্ব কৃষিক্ষেত্র অবলম্বন করে নিজেই নিজের প্রভু হতে চেয়েছিল। ফলে এই ঔপনিবেশিকদের মধ্যে একটা সাম্যের ভাব গড়ে উঠল।

ইংলন্ডের রাজা এবং অনেক ধনী ভূম্যধিকারীর এইসব উপনিবেশে, বিশেষ করে দক্ষিণে, বেশ একটু স্বার্থ ছিল। তাঁরা এইসব উপনিবেশকে যতদূর শোষণ করা যায় তার চেষ্টা করতেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে আমেরিকান উপনিবেশগুলি থেকে টাকা তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল। পার্লামেণ্ট ছিল ভূম্যধিকারীদের করতলগত, কাজেই তাঁরা উপনিবেশগুলিকে দোহন করতে সহজেই প্রস্তুত ছিলেন, এবং রাজার নীতি সমর্থন করতে লাগলেন। নূতন নূতন কর ধার্য হল, এবং বাণিজ্য-ব্যাপারে আরোপ করা হল অনেক বাধানিষেধ। তোমার মনে থাকতে পারে, এই সময়ে
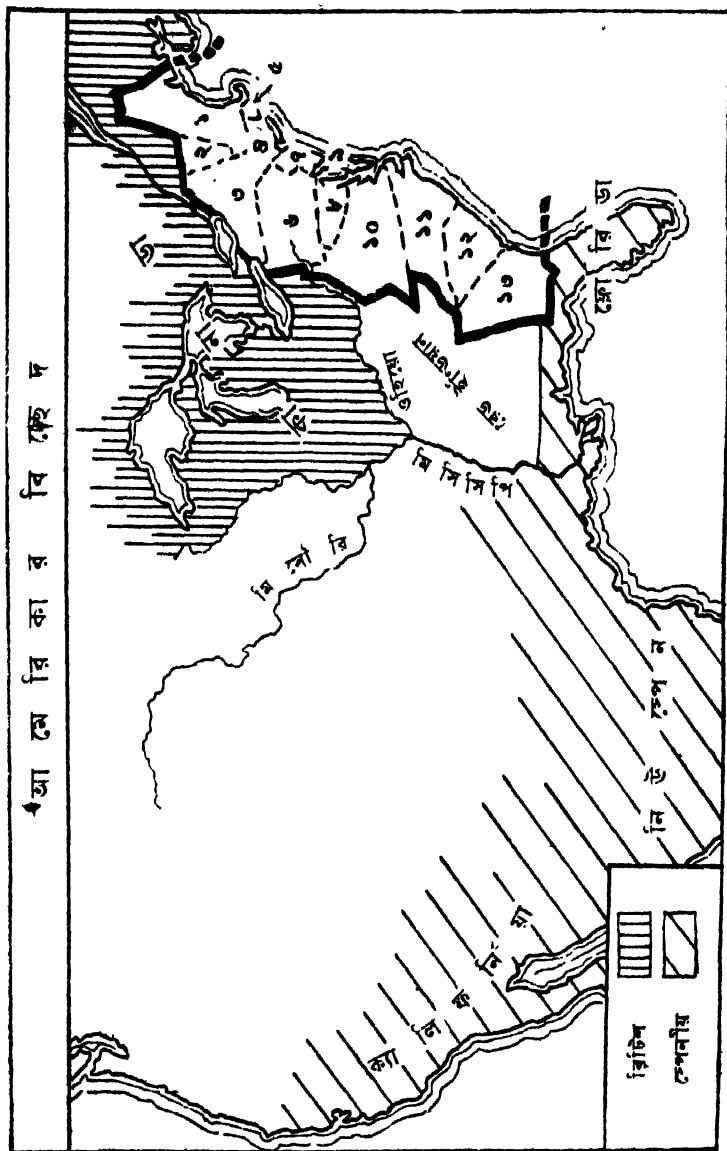
মানচিত্রে সংখ্যাদ্বারা নির্দেশিত আমেরিকার তেরোটি বিদ্রোহী উপনিবেশের নাম :—

১—ম্যাসাচুসেট্‌স্‌, ২—নিউ হ্যাম্‌প্‌সায়ার, ৩—নিউইয়র্ক, ৪—কনেক্টিকাট, ৫—রোডদ্বীপ, ৬—পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া ৭—নিউজার্সি, ৮—মেরিল্যাণ্ড, ৯—ডেলাওয়ার, ১০—ভার্জিনিয়া, ১১—উত্তর-ক্যারোলিনা, ১২—দক্ষিণ-ক্যারোলিনা, ১৩—জর্জিয়া।

ভারতবর্ষেও ইংরেজদের দ্বারা বাঙলাদেশে দোহনকার্য আরম্ভ হয়েছিল এবং ভারতীয় বাণিজ্যের পথে অনেক অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঔপনিবেশিকরা এইসব অন্তরায় ও নূতন কর-নীতির প্রতিবাদ করল, কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজ-সরকারের আত্মশক্তির উপরে বিশ্বাস এসেছিল, কাজেই এসব প্রতিবাদে তাঁরা কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী সংগ্রামে ঔপনিবেশিকরাও অনেক জিনিষ শিখেছিল। বিভিন্ন উপনিবেশ অথবা রাষ্ট্রের অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিল। স্থায়ী ইংরেজ-সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একসঙ্গে ফরাসি-সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা যুদ্ধের ভীষণতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। অতএব তারাও অন্যায় ও অবিচার মুখ বুজে মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

১৭৭৩ সালে যখন ব্রিটিশ সরকার জোর করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চা তাদের উপরে চাপানোর চেষ্টা করলেন তখনই গোলমাল ঘনিয়ে এল। ইংলণ্ডের অনেক ধনীই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার ছিলেন, ফলে কোম্পানির ভালোমন্দ তাঁদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল। শাসনবিভাগে তাঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এবং সম্ভবত কর্তৃপক্ষেরও অনেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফলে, তারা যাতে অবাধে আমেরিকার বাজারে চা নিয়ে বিক্রয় করতে পারে তার জন্যে সরকার কোম্পানিকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু এর ফলে স্থানীয় ঔপনিবেশিকদের চায়ের ব্যবসায়ে ক্ষতি হল এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হল। অতএব তারা বিদেশী চা বর্জন করার সিদ্ধান্ত করল। ১৭৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চা বোস্টন-বন্দরে জাহাজ থেকে নামানোর চেষ্টায় বাধা পড়ল। কয়েকজন ঔপনিবেশিক রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে মালজাহাজে উঠে চা সমুদ্রে ফেলে দিল। বেশ খোলাখুলিভাবে সহানুভূতিশীল জনতার সামনেই ব্যাপারটা ঘটল। যেন ঔপনিবেশিকরা ইংলণ্ডকে যুদ্ধে আহ্বান করল, এবং এর থেকেই বিদ্রোহী উপনিবেশ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ ঘনিয়ে এল।

ইতিহাসের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি কখনও ঘটে না, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সময়ে সময়ে এক-একটা ঘটনা ঘটে যাকে প্রায় পুনরাবৃত্তিই বলা চলে। ১৭৭৩ সালে বোস্টন-বন্দরে সমুদ্রে চা নিক্ষেপের ইতিহাস বিখ্যাত। একে বলা হয় 'বোস্টন টি-পার্টি'। আড়াই বছর আগে বাপু যখন তাঁর লবণ-সত্যাগ্রহ, এবং ডাণ্ডির লবণ-অভিযান আরম্ভ করলেন, ব্যাপারটা আমেরিকায় অনেককে 'বোস্টন টি-পার্টি'র কথা মনে করিয়ে দিল। অনেকে এই নূতন সল্ট্-পার্টির সঙ্গে তার তুলনা করেছিল। অবশ্য দুটো ঘটনার মধ্যে অনেক তফাত আছে।

দেড় বছর পরে ১৭৭৫ সালে ইংলণ্ড এবং তার আমেরিকান উপনিবেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাধল। উপনিবেশগুলি লড়ছিল কী জন্যে? স্বাধীনতার জন্যে অথবা ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে নয়। এমনকি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেও, যখন উভয় পক্ষে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে তখনও, ঔপনিবেশিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জকে 'মহানুভব নৃপতি মহোদয়' বলে পত্রাদিতে সম্বোধন করতেন, এবং নিজেদের তাঁর পরম অনুগত প্রজা বলে মনে করতেন। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে এবং সেইজন্যেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হল্যাণ্ডে যখন স্পেনের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম চলছে তখনও স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে তার অধীশ্বর বলে স্বীকার করা হত। অনেক বছর যুদ্ধ করার পরে তবে হল্যাণ্ড নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ভারতে বহুবর্ষব্যাপী সন্দেহ ও ইতস্তত করার পর, এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও অনুরূপ কতকগুলি জিনিষ নিয়ে নাড়াচড়া করার অবসানে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারি আমাদের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতার পক্ষে মত ঘোষণা করলেন। এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা পূর্ণ-স্বাধীনতার নামে ভয় পান, এবং ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেন। কিন্তু হল্যাণ্ড ও আমেরিকার উদাহরণ এবং ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, এরকম সংগ্রামের সমাপ্তি হতে পারে শুধু পূর্ণ-স্বাধীনতায়।

১৭৭৪ সালে, উপনিবেশসমূহ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধার অল্প দিন আগে, ওয়াশিংটন বলেছিলেন যে, সমস্ত উত্তর-আমেরিকার মধ্যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই স্বাধীনতা চায় না।

অথচ এই ওয়াশিংটনই কালে আমেরিকান সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন। ১৭৭৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে, ঔপনিবেশিক কংগ্রেসের ছেচল্লিশ জন প্রধান সভ্য বিনীত প্রজা রূপে রাজা তৃতীয় জর্জকে সম্বোধন করে পত্র লিখলেন, এবং শান্তি ও 'রক্তবন্যা'র বিরতির জন্যে প্রার্থনা জানালেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ড ও তার আমেরিকান উপনিবেশগুলির মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবের পুনঃস্থাপন হয়। তাঁরা বেশি কিছু প্রার্থনা করেন নি, চেয়েছিলেন শুধু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এবং বলেছিলেন (ওয়াশিংটনের ভাষায়) যে, কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই স্বাধীনতা চায় নি। এই আবেদনের নাম হল 'অলিভ ব্র্যাঞ্চ পিটিশন'*।

কিন্তু দু বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এই আবেদনের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে পঁচিশ জন আর-একটি দলিলে স্বাক্ষর করলেন, সে দলিল হল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশসমূহ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে নি। তাদের অসন্তোষের কারণ ছিল করভার, এবং অবাধ-বাণিজ্যের অন্তরায়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর দিতে বাধ্য করার অধিকার তারা অস্বীকার করেছিল। তাদের বিখ্যাত ধ্বনি ছিল 'প্রতিনিধিত্ব বিনা কর দেব না', কারণ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাদের একজনও প্রতিনিধি ছিল না।

ঔপনিবেশিকদের সৈন্যবাহিনী ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন হলে পিছিয়ে গিয়ে নির্ভর করে থাকবার মতো বিশাল ভূখণ্ড ছিল। ক্রমে তারা সৈন্যদল গড়ে তুলল। অবশেষে ওয়াশিংটন তাদের সর্বাধিনায়ক হলেন। দু-একটি খণ্ডযুদ্ধে তারা সাফল্যলাভ করবার পর ফ্রান্স বোধ হয় ভাবল, এই হল পুরোনো শত্রুকে জব্দ করার উপযুক্ত সময়, এবং ফলে উপনিবেশদলের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল। স্পেনও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইংলণ্ডের অবস্থাবৈগুণ্য দেখা দিল, কিন্তু যুদ্ধ চলল বহুকাল ধরে। ১৭৭৬ সালে এল ঔপনিবেশিকদের বিখ্যাত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'। ১৭৮২ সালে যুদ্ধ শেষ হল, এবং যুদ্ধরত দেশসমূহের মধ্যে সন্ধিপত্র (প্যারিসের শান্তিচুক্তি) স্বাক্ষরিত হল ১৭৮৩ সালে।

এইভাবে তেরোটি আমেরিকান উপনিবেশ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে পরিণত হল, যার নাম হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঈর্ষার ভাব বর্তমান ছিল, এবং প্রত্যেকেই মোটামুটি নিজেকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করত। যুক্ত জাতীয়তার ভাব এল ধীরে ধীরে। দেশ ছিল বিশাল, আর তার বৃদ্ধি ছিল ক্রমাগত পশ্চিম দিকে। এই হল বর্তমান জগতের প্রথম মহাসাধারণতন্ত্র—ক্ষুদ্রকায় সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর-কোথাও প্রকৃত সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল না। হল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্র হলেও সেখানে অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ছিল। ইংলণ্ডে যে শুধু রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাই নয়, এর পার্লামেণ্টও ছিল অল্পসংখ্যক ধনী ভূম্যধিকারীর হাতে। অতএব যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্র হল একটা নূতন ধরনের দেশ। এশিয়া ও ইউরোপের সব দেশের মতো এর অতীত বলে কিছু ছিল না। সামন্তপ্রথার কোনো চিহ্ন ছিল না, অবশ্য দক্ষিণ-রাষ্ট্রসমূহে দাসবৃত্তি ছাড়া। ফলে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃদ্ধির পথে বিশেষ কোনো অন্তরায় ছিল না, এবং বৃদ্ধি ঘটলও খুব দ্রুত। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষের নীচে। দু বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে বারো কোটি ত্রিশ লক্ষ।

জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়া স্টেটের একজন ধনী ভূম্যধিকারী। এই কালের আর যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সাধারণতন্ত্রের স্থাপয়িতা বলা হয়, তাঁরা হলেন টমাস পেন, বেঞ্জামিন ফ্রাংক্লিন, প্যাট্রিক হেন্রি, টমাস জেফার্সন, অ্যাডাম্স্, এবং জেম্স্ ম্যাডিসন। বেঞ্জামিন ফ্রাংক্লিনের খ্যাতি ছিল অসামান্য, এবং তিনি একজন বড়ো বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। ছেলেদের ঘুড়ি উড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, মেঘে যে বিদ্যুৎ চমকায় তা পৃথিবীর বিদ্যুৎ থেকে অভিন্ন।

১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণায় ছিল 'জন্মকালে সব মানুষই সমান'। এ তথ্য পুরো

অলিভ অর্থাৎ জলপাইয়ের শাখা—শান্তির প্রতীক।

সত্য নয়; কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কেউ জন্মায় দুর্বল হয়ে, কেউ-বা সবল, কেউ অন্যের চেয়ে বুদ্ধিমান এবং কার্যক্ষম। কিন্তু এই ঘোষণার ভিতরের আদর্শ স্পষ্ট এবং প্রশংসনীয়। ঔপনিবেশিকরা চেয়েছিলেন ইউরোপের সামন্তপ্রথার অসাম্য দূর করতে। শুধু যদি এইটেই ধরা যায়, তবু তাঁদের প্রচেষ্টা কম অগ্রগামী নয়। সম্ভবত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনেক লেখকই ভল্টেয়ার, রুশো, এবং তৎপরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য ফরাসি দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

জন্মকালে সব মানুষই সমান—কিন্তু তবু হতভাগ্য নিগ্রো ছিল অধিকারবর্জিত ক্রীতদাস মাত্র! এই নিগ্রো-দাসত্ব নব-নির্মিত শাসনবিধির সঙ্গে খাপ খেল কী করে? খাপ খেল না এবং এখনও খাপ খায় নি। বহুবর্ষ পরে উত্তরের এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক তুমুল গৃহযুদ্ধ বাধল। ফলে দাসত্ব-প্রথা বর্জিত হল। কিন্তু নিগ্রো-সমস্যা আমেরিকায় এখনও চলছে।

১০০

বাস্তিল-এর পতন

৭ই অক্টোবর, ১৯৩২

এতক্ষণ সংক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটো বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এবার আমার বক্তব্য হবে তৃতীয় বিপ্লব, অর্থাৎ ফরাসি-বিপ্লব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ। তিনটি বিপ্লবের মধ্যে ফরাসি-বিপ্লবই সবচেয়ে বেশি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ইংলণ্ডে প্রথমারব্ধ শিল্পবিপ্লবের গুরুত্ব বিরাট, কিন্তু তার আগমন হয়েছিল ধীরে ধীরে, এবং সে আগমন অধিকাংশ লোকের নজরেই পড়ে নি। অল্প লোকেই তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ফরাসি-বিপ্লবের বেলা কিন্তু তা হয় নি। সমস্ত ইউরোপকে স্তব্ধ বিস্মিত করে বজ্রাঘাতের মতো তার স্ফুরণ। তখনও ইউরোপ অজস্র রাজা ও সম্রাটের পদানত ছিল। প্রাচীনকালের 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য' অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু কাগজেকলমে তার অস্তিত্ব ছিল, এবং ইউরোপের ওপর তার প্রেতযোনির প্রভাব তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ফরাসি-বিপ্লব-রূপ অদৃষ্টপূর্ব ভীতিপ্রদ দৈত্যের আবির্ভাব ঘটল রাজামহারাজা রাজসভা রাজপ্রাসাদ -সমন্বিত এই পৃথিবীর জনসাধারণেরই অন্তস্তল থেকে। কীটদষ্ট প্রাচীন রীতিনীতি, সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ অধিকার এই বন্যার স্রোতে ভেসে গেল। এর কল্যাণে একজন রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘটল এবং অন্যদেরও আশঙ্কা দেখা দিল। কাজেই রাজন্যগণ ও অন্যান্য বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, যাঁরা এতদিন ধরে যে জনসাধারণকে অবহেলা ও পদদলিত করে এসেছেন, তাঁরা যে এই বিদ্রোহের সামনে কম্পিত হবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

ফরাসি-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করল আগ্নেয়গিরির আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো। কিন্তু বিনা কারণে এবং দীর্ঘ বিবর্তন ব্যতীত বিপ্লব অথবা আগ্নেয়গিরি সহসা ফেটে বের হতে পারে না। আকস্মিক বিস্ফোরণ দেখে আমরা অবাক হই; কিন্তু ভূপৃষ্ঠের অতলে অগণিত বিভিন্ন শক্তি যুগযুগ ধরে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে বিভিন্ন অগ্নির সম্মিলন ঘটায়, তার পরে পৃথিবীর বহিরাবরণ যখন আর তাদের দমন করে রাখতে পারে না তখন তারা মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড অগ্নিশিখা আকাশের দিকে ছোটে, গলিত লাভা গিরির গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। সেইরকম, বিপ্লবে যেসব শক্তি প্রকাশ পায় তাদের কর্মস্থল দীর্ঘদিন ধরে সমাজের ভিতরের স্তরেই গড়ে ওঠে। জল গরম করলে ফুটতে থাকে। কিন্তু ফোটার উত্তাপে এসে পৌঁছতে তার প্রয়োজন ক্রমশ উত্তরোত্তর গরম হওয়া।

আদর্শবাদ এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আনুকূল্যের ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। নির্বোধ

কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলে এসব জিনিষ দেখতে পান না। তাই তাঁরা ভাবেন, বিপ্লব সৃষ্টি করে আন্দোলনকারীরা। যারা প্রচলিত অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে পরিবর্তন চায় এবং তদনুসারে কর্মতৎপর হয়, তাদেরই বলা হয় আন্দোলনকারী। প্রত্যেক বৈপ্লবিক যুগে এদের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকে। এদের নিজেদেরই উৎপত্তি অসন্তোষের বীজ থেকে। কিন্তু শুধু আন্দোলনকারীর কথা শুনে লক্ষ লক্ষ লোক কাজে মেতে উঠতে পারে না। অধিকাংশ লোকেই ধনসম্পত্তির নিরাপত্তাকে স্থান দেয় সবার ওপরে, এবং যা তাদের আছে সেসব তারা অকারণে বিপন্ন করতে চায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা যখন এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, দুর্দশা দিন দিন বেড়েই চলে, এবং প্রাণধারণ পরিণত হয় দুর্বিষহ ভারে, তখন দুর্বল যে সেও সব-কিছু বিপন্ন করতে প্রস্তুত হয়। আর তখনই তারা আন্দোলনকারীর কথা কানে তোলে, কারণ তারা ভাবে, হয়তো তারই হাতে দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে।

আগের অনেক চিঠিতে আমি তোমাকে জনসাধারণের দুরবস্থা এবং কৃষক-অভ্যুত্থানের কথা বলেছি। কৃষক-বিদ্রোহ ইউরোপ ও এশিয়ার সব দেশেই ঘটেছে, এবং তুমুল রক্তপাত ও নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করে তাকে দমন করা হয়েছে। প্রচণ্ড দুর্দশায় উন্মুখ হয়ে চাষিরা ছুটেছে বিপ্লবের পথে, কিন্তু লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। এই চিন্তার অস্পষ্টতা এবং আদর্শের অভাবে প্রায়ই তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফরাসি-বিপ্লবের বেলায় আমরা একটা নূতন জিনিষ দেখি, বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার জন্যে দুটি প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগাযোগ—বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং আদর্শবাদ। যেখানে এই যোগাযোগ ঘটে, প্রকৃত বিপ্লব সেখানেই আসে; এবং প্রকৃত বিপ্লব জীবন ও সমাজের প্রতিটি স্তরে আঘাত করে, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্ম -সংক্রান্ত বিষয়, সব-কিছুর উপরেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বছরে আমরা ফ্রান্সে এই যোগাযোগ দেখতে পাই।

তোমাকে আগেই বলেছি, এক দিকে ফরাসি-রাজাদের বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতি, অন্য দিকে জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্য। ফরাসি জনসাধারণের মনে অসন্তোষের বীজ সম্বন্ধে, এবং ভল্‌টেয়ার, রুশো, মঁতেস্ক্যু এবং আরও অনেকের রচিত ভাবধারার কথাও বলেছি। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও ভাবধারার সংগঠন, এই দুটি জিনিষ একই সঙ্গে চলল, এবং যথারীতি পরস্পরের উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একটা জাতির সামনে আদর্শবাদ খাড়া করতে সময় লাগে, কারণ লোকে নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে, এবং অতি অল্প লোকেই তাদের প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করতে উৎসুক হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, যতদিনে নূতন ভাবধারা মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, এবং জনসাধারণ নূতন নূতন আদর্শ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে, ততদিনে এইসব ভাবধারাই পুরোনো হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি-দার্শনিকদের ভাবধারার মূলে ছিল ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের আগের যুগ। কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল, এবং শিল্প ও জীবনযাত্রার এই পরিবর্তনের ফলে অনেক নূতন ফরাসি মতবাদই অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আসল কথা এই যে, শিল্পবিপ্লবের প্রসার হয়েছিল পরে, এবং ফরাসি দার্শনিকরা ভবিষ্যতে কী আসছে বুঝে উঠতে পারেন নি। তবু, তাঁদের যেসব ভাবধারার ওপরে ফরাসি-বিপ্লবের আদর্শবাদের অনেকাংশের ভিত্তি, নূতন যন্ত্রশিল্পযুগে তারা কিছু পরিমাণে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ফরাসি দার্শনিকদের এইসব আদর্শ ও মতবাদ বিপ্লবের উপরে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল। জন-বিদ্রোহ এর আগে অনেকবারই ঘটেছে। কিন্তু এবারে যা হল তা হচ্ছে সজাগ জনসাধারণের মিলিত বিদ্রোহ, অথবা সজাগভাবে পরিচালিত জনসাধারণের বিদ্রোহ। এইজন্যেই ফ্রান্সের এই বিরাট বিপ্লবের এতখানি গুরুত্ব।

আগেই বলেছি, চতুর্দশ লুইয়ের পরে তাঁর প্রপৌত্র পঞ্চদশ লুই ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হয়ে উনষাট বছর রাজত্ব করেন। প্রবাদ আছে, তিনি নাকি বলেছিলেন, "আমার পরেই সর্বনাশ আসছে," এবং তাঁর আচরণও হয়েছিল সেইরকম। দেশকে তিনি অকাতরে রসাতলে পাঠালেন। ব্রিটেনের বিপ্লব ও ইংরেজ-রাজের শিরশ্ছেদ দেখেও তাঁর শিক্ষা হয় নি। তাঁর পরে ১৭৭৪ সালে রাজা

হলেন তাঁর পৌত্র, ষোড়শ লুই। মস্তিষ্ক বলে কোনো পদার্থ তাঁর ছিল না। হাপ্‌স্‌বুর্গ-বংশীয় অস্ট্রিয়ান-সম্রাটের ভগ্নী মারি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন তাঁর স্ত্রী। বুদ্ধি তাঁরও ছিল না, তবে একরোখা একটা শক্তি ছিল, যার ফলে তিনি স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আজ্ঞাবহ করে রাখতে পেরেছিলেন। রাজাদের ভগবদ্দত্ত অধিকার সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ছিল আরও বেশি পরিমাণে, এবং জনসাধারণকে তিনি ঘৃণ্য মনে করতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে যা আরম্ভ করলেন তাতে রাজতন্ত্রের উপর লোকের বিদ্বেষের ভাব আরও বৃদ্ধি পেল। বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পরেও ফরাসি নরনারীর রাজতন্ত্র সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু লুই এবং মারি আঁতোয়ানেতের নির্বুদ্ধিতার ফলে সাধারণতন্ত্রের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান লোকেরাও অনুরূপ আচরণ করে থাকেন। ১৯১৭ সালে. রুশ-বিপ্লবের প্রাক্কালে, রাশিয়ার জার ও জার-পত্নী অতুলনীয় নির্বোধ আচরণ করেছিলেন। সংকট যতই ঘনীভূত হয়ে আসে, নির্বুদ্ধিতার পরিমাণও তত বেড়ে চলে, এবং তার ফলে ঘটে আত্মবিনাশ। লাতিন ভাষায় একটা সুপরিচিত কথা আছে—*quem deus perdere vult, prius dementat* অর্থাৎ, ভগবান যাকে বিনষ্ট করতে চান, প্রথমে তাকে উন্মাদ করে দেন। এর প্রায় অবিকল অনুরূপ একটা কথা সংস্কৃতেও আছে—"বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ।"

রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের একটি প্রধান অবলম্বন হচ্ছে, যুদ্ধজয়ের যশ। স্বদেশে যখন গোলযোগ আরম্ভ হয়, রাজা অথবা দেশের কর্তৃপক্ষ তখন বিদেশে সামরিক অভিযানের প্রতি আকৃষ্ট হন, জনসাধারণকে অন্যমনস্ক করার জন্যে। কিন্তু ফ্রান্সের পক্ষে সামরিক অভিযানের ফল ভালো হয় নি। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ে লোকের মনে রাজতন্ত্রের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয়েছিল। রাজকোষের দেউলিয়া হবার সময় আসন্ন হয়ে আসছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরে ফ্রান্সের যোগদানের অর্থ, ব্যয়বৃদ্ধি। এত টাকা আসে কোথা থেকে? অভিজাত ও যাজক -সম্প্রদায় ছিলেন বিশেষ অধিকারসম্পন্ন, তাদের প্রায় কোনোরকম করই দিতে হত না। কিন্তু টাকা তোলার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, শুধু ধার-শোধ করবার জন্যে নয়, রাজার পারিবারিক বিলাসব্যসনের সমারোহের খরচ জোগাতে। জনসাধারণের অবস্থা তখন কেমন ছিল? এ সম্বন্ধে ইংরেজ-লেখক কার্লাইল ফরাসি-বিপ্লব সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার খানিকটা তুলে দিচ্ছি। তাঁর লিখনভঙ্গি একটু অদ্ভুত, কিন্তু কলমের টানে ছবি আঁকতে তিনি সিদ্ধহস্ত :

"শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাও ভালো নয়। দুর্ভাগ্য! এদের সংখ্যা দুই কোটি থেকে আড়াই কোটি। আমরা অবশ্য এদের পিণ্ডাকৃতি একাকার করে দেখতেই অভ্যস্ত—বিরাট কিন্তু অস্পষ্ট, দূরের জিনিষ। খুব সদয় হলে আমরা এদের 'জনগণ' বলে অভিহিত করে থাকি। জনগণই বটে; যদি কল্পনানেত্রে তাদের অনুসরণ করে তাদের মাটির কুটিরে পৌঁছতে পার তা হলে দেখতে পাবে, স্বতন্ত্র ব্যষ্টিবৃন্দ সমাহার এই জনগণ। তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র হৃদয় আছে, নানা দুঃখ বেদনা আছে; যে চর্মে তাদের দেহ আবৃত সে তাদের নিজেরই, তাতে আঘাত করলে রক্তও পড়ে।"

এ বর্ণনা যে শুধু ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের সম্বন্ধে খাটে তা নয়, ১৯৩২ সালের ভারতের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমরাও ভারতের জনসাধারণকে একসঙ্গে স্তূপাকার করে রেখে দিই, এবং লক্ষ-কোটি চাষি ও শ্রমিককে হতভাগ্য কুৎসিতদর্শন জানোয়ার বলেই মনে করি। তাদের 'পরে 'সমবেদনা' জানাই, এবং মুরুব্বিয়ানাভাবে তাদের উপকার করার কথা বলি। কিন্তু তাদের মানুষ এবং ব্যক্তি বলে গণনা করি না, ভুলে যাই তারাও অনেকটা আমাদেরই মতো। তাদের মাটির কুঁড়েতে তারাও আমাদেরই মতো পৃথক পৃথক জীবনযাপন করে, তাদেরও ক্ষুধা ও শীতবোধ আছে, বেদনাবোধ আছে। আইনে অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা শাসনবিধির সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা বলেন, কিন্তু আইন আর শাসনবিধির সৃষ্টি যে মানুষদের জন্যে তাদের কথা ভুলে যান। আমাদের দেশের লক্ষকোটি মাটির ঘরের এবং শহরের বস্তির অধিবাসীদের কাছে রাজনীতির অর্থ ক্ষুধার অন্ন, লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র, এবং মাথা-গোঁজার আশ্রয়।

ষোড়শ লুইয়ের অধীনে ফ্রান্সের এই অবস্থা ছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই ক্ষুধিত জনসাধারণের দাঙ্গা ঘটেছিল। অনেক বছর ধরেই এমনি চলল, তার পরে বিরতি, তার পরে নূতন

করে কৃষক-বিদ্রোহ। এই ধরনের এক দাঙ্গার সময়ে দিজঁর গভর্নর বলেছিলেন, "মাঠে ঘাস গজিয়েছে, সেখানে গিয়ে ঘাস চিবোগে যা!" বহু লোক পেশাদার ভিক্ষুকে পরিণত হল। সরকারি হিসেবমতো ১৭৭৭ সালে ফ্রান্সে এগারো লক্ষ ভিক্ষুক ছিল। এই দারিদ্র্য আর দুর্দশার কথা ভাবলে ভারতের কথাই মনে আসে।

চাষিদের অভাব ছিল দুটো জিনিষের—খাদ্য ও ভূমির। সামন্ত-রীতি অনুসারে জমির মালিক ছিলেন অভিজাত-সম্প্রদায়, এবং জমির আয়ের একটা মোটা অংশ তাঁদের ভাগে পড়ত। চাষিদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট, লক্ষ্যবস্তু ছিল অজ্ঞাতপ্রায়, কিন্তু তাদের জমির উপর আকাঙ্ক্ষা ছিল, এবং যে সামন্ত-রীতিতে তাদের পেষণ চলছিল তার 'পরে তাদের বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। এমনি বিদ্বেষের ভাব তারা পোষণ করত অভিজাত ও যাজক -সম্প্রদায়ের প্রতি, এবং লবণ-করের সম্বন্ধে (ভারতবর্ষের মতো); কারণ লবণ-করে গরিবদেরই বেশি কষ্ট ছিল।

চাষিদের অবস্থা ছিল এইরকম, কিন্তু রাজা-রানীর টাকার খাঁইয়ের শেষ ছিল না। রাজকোষে টাকা ছিল না, ঋণ বেড়েই চলল। মারি আঁতোয়ানেতের নামকরণ হয়েছিল 'মাদাম ডেফিসিট' অর্থাৎ 'দেউলিয়া মাদাম'। টাকা তোলার কোনো পন্থাই ছিল না। অবশেষে মরিয়া হয়ে ষোড়শ লুই ১৭৮৯ সালের মে মাসে স্টেট্‌স্-জেনারেল অর্থাৎ রাষ্ট্রসমিতিকে আহ্বান করলেন। দেশের তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সমিতির গঠন—অভিজাত, যাজক এবং সাধারণ। গঠনের দিক দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অব লর্ড্‌স্ ও হাউজ অব কমন্সের সঙ্গে সমিতির মিল ছিল, কিন্তু দুই সমিতিতে প্রভেদও ছিল প্রচুর। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কয়েক শো বছর ধরে নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে আসছিল, ফলে তার একটা ঐতিহ্য ছিল, আইনকানুন ছিল, কর্মপদ্ধতি ছিল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রসমিতির অধিবেশন খুব কমই হত, ঐতিহ্যেরও বালাই ছিল না। দুটি সমিতিই উচ্চশ্রেণীর প্রতিভূ ছিল; ফ্রান্সের রাষ্ট্রসমিতির সাধারণ সভার চেয়ে ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স সম্বন্ধে এ উক্তি আরও বেশি করে প্রযোজ্য। চাষিদের মুখপাত্র কোথাও ছিল না।

১৭৮৯ সালের ৪ঠা মে ভার্সাইতে রাজা রাষ্ট্রসমিতির উদ্বোধন করলেন। কিন্তু অল্প পরেই রাজা বুঝলেন এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একত্র করে তিনি কাজটা ভালো করেন নি। তৃতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, অবাধ্য হয়ে পড়ল, এবং যাতে তাদের সম্মতি ব্যতীত কর ধার্য করা যেতে না পারে, এই জোর দিতে লাগল। ইংলণ্ডে সাধারণ-সভা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এরাও তাদের অনুকরণে নিজেদের অধিকার জানিয়ে দিল। তৎকালীন আমেরিকার উদাহরণও তাদের সামনে ছিল। একটা ভুল ধারণা তাদের ছিল; তারা ভাবত, ইংলণ্ড বুঝি স্বাধীন দেশ। আসলে ইংলণ্ডে প্রভুত্ব করত অভিজাত-সম্প্রদায় এবং জমির মালিকরা। এমনকি পার্লামেন্টও ছিল তাদের একায়ত্ত, কারণ ভোট দেবার ক্ষমতা ছিল অতি অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

যাই হোক. তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যেটুকু করেছিলেন তাতেই রাজা অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি সভাকক্ষ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতিনিধিদের চলে যাওয়ার বাসনা মোটেই ছিল না। তাঁরা নিকটস্থ একটি টেনিস-কোর্টে মিলিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, একটা শাসন-বিধির প্রবর্তন না করা পর্যন্ত তাঁরা বিচ্ছিন্ন হবেন না। এই প্রস্তাবই 'টেনিস-কোর্টের শপথ' নামে পরিচিত। তার পরে আবার সংকট এল; রাজা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের সৈন্যদল তাঁর আদেশপালনে অসম্মত হল। প্রতি বিপ্লবে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সরকারের প্রধান অবলম্বন—সৈন্যদল—জনতার মধ্যে তাদের স্বজাতির উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। লুই ভীত হয়ে হার স্বীকার করলেন, কিন্তু তাঁর চিরাচরিত নির্বুদ্ধিতাপরবশ হয়ে বিদেশী সৈন্য-দলের সাহায্যে নিজের প্রজাদের গুলি করে মারার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এ ব্যবহার জনসাধারণের অসহ্য হয়ে উঠল, এবং ১৭৮৯ সালের চিরস্মরণীয় ১৪ই জুলাই তারিখে তারা প্যারিসে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বহুকালের কারাগার বাস্তিল অধিকার করল এবং বন্দীদের মুক্তিদান করল।

বাস্তিলের পতন ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর থেকেই বিপ্লবের শুরু। সারা দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের এই হল সংকেত। এর অর্থ দাঁড়াল, ফ্রান্সে প্রাচীন রীতি, সামন্তপ্রথা, রাজার একাধিপত্য, এবং সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ অধিকারের পরিসমাপ্তি। ইউরোপের যাবতীয়

রাজন্যবর্গের পক্ষে এ হল অমঙ্গলের ভীতিপ্রদ ভীষণতার পদধ্বনি। ফ্রান্সেই সর্বাধিপতি রাজার ফ্যাশনের উৎপত্তি, এখন সেই দেশেই এই উল্টো অবস্থা দেখে ইউরোপ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। কেউ-বা ভীতত্রস্ত হৃদয়ে এই ব্যাপার দেখল, কেউ পেল এতে নূতন আশা, ভবিষ্যতের শুভদিনের প্রতিশ্রুতি। এখনও পর্যন্ত ১৪ই জুলাই ফ্রান্সে জাতীয় উৎসবের দিন, এবং প্রতি বছর দেশের সর্বত্র এই উৎসব পালন করা হয়।

১৪ই জুলাই ক্রুদ্ধ জনতার কাছে বাস্তিল-দুর্গের পতন হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতই দৃষ্টিহীন যে, আগের রাত্রে, অর্থাৎ ১৩ই তারিখে, ভার্সাইতে রাজপ্রাসাদে এক উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। নৃত্যগীতের প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল, এবং বিদ্রোহী প্যারিসের উপর আগতপ্রায় জয়লাভের উদ্দেশে রাজা-রানীর সামনে স্বাস্থ্যপান করা হল। রাজতন্ত্র লোকের মনে যে কী গভীর ভিত করেছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্তমান যুগে আমরা সাধারণতন্ত্রে অভ্যস্ত, এবং রাজাদের খুব বেশি আমল দিই না। পৃথিবীতে যে ক'জন রাজা অবশিষ্ট আছেন তাঁরাও ভয়ে ভয়ে থাকেন, কখন তাঁদের অদৃষ্টে কী ঘটে! তবু অধিকাংশ লোকই রাজতন্ত্রের বিরোধী, কারণ তাতে করে শ্রেণী-বিভাগ করে, এবং বড়োর পক্ষে ছোটোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সুযোগ বাড়ে। কিন্তু সে যুগে রাজাহীন রাজ্যের কথা লোকে কল্পনা করতেও পারত না। কাজেই লুইয়ের নির্বুদ্ধিতা এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার কথা তখনও ওঠে নি। আরও প্রায় দু বছর ধরে প্রজারা তাঁকে ও তাঁর অবিরাম ষড়যন্ত্র সহ্য করে চলল, এবং অবশেষে নিতান্তই যেদিন তিনি পলায়নের চেষ্টা করে ধরা পড়লেন, সেদিন ফ্রান্স স্থির করল রাজার আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু তা পরের কথা। ইতিমধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রসমিতি জাতীয় সমিতিতে রূপান্তরিত হল, এবং মনে করা হল যে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বা নিয়মতন্ত্রসম্মত হয়েছে। কিন্তু তিনি এ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন, এবং মারি আঁতোয়ানেৎ আরও বেশি ঘৃণা করতেন। তাঁদের উপরে প্যারিসের জনসাধারণের অত্যধিক প্রীতির অবকাশ ছিল না। তারা বরাবরই সন্দেহ করত যে, রাজা-রানী নানারকম ষড়যন্ত্র করার চেষ্টায় আছেন। তখন রাজা-রানীর বাসস্থান ছিল ভার্সাইতে এবং সে জায়গা প্যারিস থেকে অনেক দূরে হওয়ায় লোকের পক্ষে তাঁদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব ছিল না। ভার্সাইতে বিলাসব্যসন ও ভোজের সমারোহ -বিষয়ে নানারকম জনশ্রুতিও প্যারিসের ক্ষুধার্ত জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলল। তার পরে একদিন রাজা-রানীকে অদৃষ্টপূর্ব এক শোভাযাত্রা সহকারে প্যারিসের তুইলারিতে নিয়ে যাওয়া হল।

বিপ্লবের ইতিহাস পরের চিঠিতেও আমি বলব।

১০১

ফরাসি-বিপ্লব

১০ই অক্টোবর, ১৯৩২

তোমার কাছে ফরাসি-বিপ্লবের বিষয়ে কিছু লেখা কঠিন বলে বোধ হচ্ছে—উপকরণের অভাবে নয়, তার প্রাচুর্যে। বিদ্রোহটা ছিল অপূর্ব, চির-আবর্তিত এক মহানাটক; তার অসাধারণ ঘটনাবলী আজও আমাদের রোমাঞ্চিত করে। রাজা আর রাজপুরুষদের রাজনীতি আলোচিত হয় গোপন কক্ষের মধ্যে, এক রহস্যের হাওয়ায় তারা পূর্ণ। ঘোমটার আড়ালে থাকে বহু পাপ, চাকচিক্যময় ভাষা ঢেকে রাখে বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আকাঙ্ক্ষা ও লোভ। যখন এই দ্বন্দ্বের ফলে শুরু হয় যুদ্ধ, বহু তরুণ জীবনকে যখন মরণের মুখে পাঠানো হয় এই লোভের জন্যে, আমরা এসব নীচ অভিপ্রায়ের কথা শুনতে পাই না, পরিবর্তে আমাদের শোনানো হয় মহান আদর্শ, সৎ উদ্দেশ্যের কথা; তারা দাবি করে আমাদের চরম ত্যাগস্বীকার।

কিন্তু বিদ্রোহ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার উৎপত্তি মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে; তার কার্যপ্রণালী অমার্জিত। বিদ্রোহ যারা সৃষ্টি করে, রাজারাজড়াদের মতো তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ হয় নি। তাদের ভাষা ভদ্র ও সুমার্জিত নয়, তার ভিতরে লুকিয়ে নেই অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও শঠতা। তাদের সম্বন্ধে রহস্যের কিছু নেই, তাদের মনের কর্মধারা গোপন করার জন্যে ঘোমটার দরকার হয় না। মনের কথা দূরে যাক, তাদের শরীরেরও লাগে না বিশেষ আবরণ। বিদ্রোহের রাজনীতি রাজা ও রাজনৈতিকদের কাছে খেলার জিনিষ; কিন্তু এদের কারবার সত্যের সঙ্গে, আর তার পিছনে থাকে কর্কশ মনুষ্যচরিত্র ও অনশনের শূন্যোদর।

তাই, ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত নিয়তির লীলাময় এই পাঁচ বছর আমরা ফ্রান্সে ক্ষুধার্ত জনগণকে দেখতে পাই কর্মরত। ভীরু রাজনৈতিকদের তারাই জোর করে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও ধর্মযাজকদের সুখসুবিধাজনক অধিকারগুলি বর্জন করতে বাধ্য করাল। দেবী-গিলোটিনের পূজার বলি হল তারাই অতীতে যারা জনগণকে দাবিয়ে রাখত, এবং সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলে যাদের সন্দেহ করা হল তাদের উপর নৃশংস প্রতিহিংসা নিতে লাগল জনসাধারণ। এই জীর্ণবস্ত্র নগ্নপদ লোকগুলোই তাদের যেমন-তেমন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহের স্বপক্ষে লড়াই করে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র ইউরোপের সুশিক্ষিত সেনাদলকে হটিয়ে দিল। এই ফরাসিরা বিস্ময়কর কাজ করল বটে, কিন্তু কয়েক বছর অবিরত অত্যুদ্যম এবং সংগ্রামের ফলে বিদ্রোহ তার অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়ে ফেলে তার নিজের সন্তানদেরই গ্রাস করতে লাগল। তার পর এল প্রতিবিপ্লব প্রকৃত বিদ্রোহকে নষ্ট করে দিয়ে সে জনসাধারণকে—যারা অসমসাহসিক কার্য করে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিল—পাঠিয়ে দিল 'শ্রেষ্ঠ' অভিজাত শ্রেণীর হাতে শাসিত হতে। এই প্রতিবিপ্লবের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন নেপোলিয়ন—শাসক ও সম্রাট। কিন্তু প্রতিবিপ্লব বা নেপোলিয়ন, কেউই জনসাধারণকে তাদের পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। কেউই বিদ্রোহের প্রধান বিজয়গুলি মুছে ফেলতে পারল না, কেউই পারল না ফরাসিজাতি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশবাসীদের মন থেকে কেড়ে নিতে সেদিনের স্মৃতি, যেদিন স্বল্পকালের জন্যে হলেও বন্দী কুকুর তার শিকল ছিঁড়ে ফেলেছিল।

বিদ্রোহের প্রারম্ভে প্রভুত্বের জন্যে বহু বিভিন্ন দল লড়েছিল। রাজার দল ষোড়শ লুইকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবার মিথ্যা আশা নিয়ে লড়েছিল। ছিল নরমপন্থীরা, রাজার শক্তি সীমাবদ্ধ করে দিয়ে শাসনপ্রণালী গড়বার চেষ্টায় আরও ছিল 'গিরোঁদ-এর দল' নামে একদল মধ্যপন্থী, এবং আর-একদল চরমপন্থী—নাম তাদের 'জ্যাকোবিন'। জ্যাকোবিন-মঠের কক্ষ তাদের পরামর্শ-স্থল ছিল বলে তাদের এই নাম। এই হল প্রধান দল-কয়টি, তা ছাড়া তাদের প্রত্যেকটির ভিতরে ও দলের বাইরে ছিল বহু দুঃসাহসী। আর এইসমস্ত দলের পিছনে ছিল ফরাসি-জনগণ, বিশেষ করে প্যারিসের নাগরিকেরা, বহু অজানা নেতার নেতৃত্বাধীন। বৈদেশিক রাজ্যে, বিশেষত ইংলণ্ডে ফরাসি-ঔপনিবেশিকরা ছিল; তারা সম্ভ্রান্ত দল, বিদ্রোহের সময় পালিয়ে এসে নিত্যই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। সমগ্র ইউরোপের শক্তি দাঁড়িয়েছিল বিদ্রোহী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। পার্লামেন্টের অধীন কিন্তু অভিজাত ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের রাজামহারাজারা জনসাধারণের এই উৎপাতে আশঙ্কিত হয়েছিলেন ও তাঁদের চেষ্টা ছিল তাকে দমনের।

রাজা ও তাঁর অনুবর্তী দল ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সর্বনাশই ডেকে নিয়ে এলেন। জাতীয় মহাসভায় যারা দলে সবচেয়ে ভারি ছিল তারা হল নরমপন্থী, তারা চেয়েছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার মতো শাসনপ্রণালী। তাদের নেতা ছিলেন মিরাবো। প্রায় দু বছর সভায় এঁদেরই কর্তৃত্ব ছিল, এবং প্রথম যুগের সাফল্যে গর্বিত হয়ে এঁরা বহু দুঃসাহসিক ঘোষণা করেছিলেন ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিলেন শাসনপ্রণালীতে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট, বাস্তিলের পতনের কুড়ি দিন পরে, সভায় বেশ একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, জায়গিরদারদের অধিকার ও সুবিধা। তখন ফরাসিদেশের হাওয়ায় হাওয়ায় একটা-কিছু ছিল যাতে জায়গিরদার প্রভুদেরও নূতন স্বাধীনতার উন্মাদনায় নেশা লেগে গিয়েছিল। সম্ভ্রান্তজনেরা এবং গির্জার নেতারা মহাসভার কক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের জায়গিরত্যাগের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে

লাগলেন। কাজটা হয়েছিল বেশ উদার, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে ওতে বিশেষ কিছু ফল হল না। মাঝে মাঝে (যদিও খুবই কদাচিৎ) বিশেষ সুখ-সুবিধাভোগী একটা দলের মনে এরকম উদার আকাঙ্ক্ষা হয় অথবা হয়তো সুবিধার শেষ হয়ে আসছে দেখে এরকম ধর্মাচরণই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে তাঁরা মনে করেন। এই তো অল্প কয়েকদিন আগে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্যে বাপুজি যখন উপবাস আরম্ভ করলেন, যেন যাদুদণ্ডের সাহায্যে সহানুভূতির একটা ঢেউ দেশের উপর দিয়ে চলে গেল, এ দেশের বর্ণ-হিন্দুর দল তখন এমনি একটা উদার পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যে শিকল হিন্দুরা তাদের ভাইয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল তা খসে পড়ল, বহুযুগ ধরে অস্পৃশ্যদের জন্যে যে শতসহস্র দ্বার রুদ্ধ ছিল তা গেল খুলে।

তেমনি উৎসাহের এক আবেগে বিদ্রোহী ফরাসিদেশের জাতীয় মহাসভা সিদ্ধান্ত করে দাসত্ব-প্রথা, এবং জায়গিরদারদের সুবিধেগুলো তুলে দিল; সম্ভ্রান্তদের ও ধর্মযাজকদের কর ধার্য করার অধিকার, এবং খেতাব-দানের প্রথা রদ করল। বিস্ময়কর এই যে, রাজা থাকতেও ধনীরা তাঁদের খেতাব হারালেন।

মহাসভা তখন 'মানুষের অধিকার' সম্বন্ধে এক ঘোষণা করতে গেল। এর কল্পনাটা বোধ হয় এসেছিল আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণা থেকে। কিন্তু আমেরিকার ঘোষণা ছিল সরল সংক্ষিপ্ত, আর ফরাসিদেরটা হল জটিল ও সুদীর্ঘ। মানুষের অধিকার তাই যা তাকে এনে দেয় সাম্য, স্বাধীনতা ও সুখ। সে সময়ে এটা বড়ো দুঃসাহসিক বলে মনে হয়েছিল, আর পরবর্তী এক শো বছর ধরে সাধারণতন্ত্রী ইউরোপের ঐ ছিল সনদ। কিন্তু তবু আজ সে পুরোনো হয়ে গেছে, বর্তমান যুগের কোনো সমস্যারই সমাধান এতে হয় না। আইন অনুসারে সাম্য অথবা ভোটের অধিকার থাকলেই যে সব সময় প্রকৃত সাম্য, সুখ বা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এবং আইন থাকা সত্ত্বেও যে শক্তিমানের হাতে তাদের নির্যাতন সম্ভব, তা আবিষ্কার করতে জনসাধারণের প্রচুর সময় লেগেছিল। ফরাসি-বিদ্রোহের আমলের তুলনায় আজ আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বহু উন্নতি ও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সম্ভবত অতি-রক্ষণশীল লোকেরাও আজ 'মানুষের অধিকার'-পত্রের শূন্যগর্ভ বড়ো বড়ো কথায়-ভরা মূলনীতিগুলি মেনে নেবেন। কিন্তু অনায়াসেই আমরা দেখতে পাব, তাঁরা যে প্রকৃতই সাম্য বা স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত, এ তার অর্থ নয়। এই ঘোষণাটি সত্যই বেসরকারি সম্পত্তিকেও রক্ষা করল। জায়গির ও বিশেষ সুবিধাদি-সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণে সম্ভ্রান্ত ধনী ও ধর্মযাজকদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হল। কিন্তু সম্পত্তিকরণের অধিকার সে সময় বিবেচিত হত পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে। তুমি বোধ হয় জানো, উন্নত ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারানুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করা একটা পাপ, এবং যথাসম্ভব তাকে দূরীভূত করা উচিত।

মানবাধিকারের ঘোষণা আজ আমাদের কাছে অতিসাধারণ একখণ্ড চিরকুট বলে মনে হতে পারে। কালকের মহান আদর্শ প্রায়ই আজকে নগণ্য বলে মনে হয়। কিন্তু তার ঘোষণার সময় সারা ইউরোপের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এক শিহরণ; সে নিয়ে এসেছিল নিপীড়িত-পদদলিতদের কাছে এক মহত্তর যুগের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সেদিনের রাজা তাকে পছন্দ করেন নি, এরকম কেলেঙ্কারীতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তিনি সেটাকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। তখনও তিনি ভার্সাইয়ে ছিলেন। তখনই প্যারিসের জনগণ নারীদলের নেতৃত্বে ভার্সাই-প্রাসাদে এসে রাজাকে দিয়ে সনদ অনুমোদন তো করিয়ে নিলই, উপরন্তু তাঁকেও প্যারিসে জোর করে নিয়ে গেল। গত চিঠিটিতে এই অদ্ভুত মিছিলের উল্লেখই আমি করেছিলাম।

এই মহাসভা বহু প্রয়োজনীয় সংস্কারও করেছিল। ধর্মযাজকদের বিশাল সম্পত্তি রাজশক্তি বাজেয়াপ্ত করে নিল। ফরাসিদেশটা বিভক্ত হল আশি ভাগে, এবং বোধ হয় আজও এই বিভাগগুলি বর্তমান। পুরোনো জায়গিরদারদের শাসনসভার স্থান নিল উন্নততর আইনসভা। ভালোর জন্যেই এগুলো হয়েছিল, কিন্তু বেশি দূর এরা যেতে পারল না। জমি-যাচক কৃষক বা বুভুক্ষু নাগরিকেরা এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হল না। বিদ্রোহটাকে যেন দমিয়ে দেওয়া হল। আগেই বলেছি যে, জনগণ, কৃষকমজুর, নাগরিক, এদের স্থান ছিল না মহাসভাতে। মিরাবোর কর্তৃত্বে মধ্যবিত্তেরা

চালাতেন এই সভা; আর যেই তাঁরা বুঝলেন তাঁরা যা চাইছিলেন তা পেয়েছেন, অমনি বিদ্রোহ থামিয়ে দেবার জন্যে হল তাঁদের চেষ্টা। এমনকি, তাঁরা রাজা লুইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে প্রদেশে চাষিদের গুলি করে হত্যা করতে লাগলেন। তাঁদের নেতা মিরাবোই হলেন রাজার গোপন উপদেষ্টা। আর যে জনসাধারণ ছারখার করে জয় করে নিয়েছিল বাস্তিল, নিজেদের শৃঙ্খলমুক্ত ভেবেছিল, তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, 'কী হল!' তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন রইল আগেরই মতো সুদূরপরাহত, নূতন জাতীয় মহাসভা পূর্বতন জমিদারদের মতোই তাদের রাখতে লাগল দাবিয়ে।

মহাসভায় স্থান না পেয়ে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ প্যারিসের নাগরিকেরা তাদের বিপ্লবী-শক্তির আর-একটি উৎসরণ-পথ পেল। সে হল কম্যুন, অর্থাৎ প্যারিসের জনপদ। কেবল কম্যুনই নয়, নগরের প্রতিটি অংশও, যেগুলির অধিকার ছিল 'কম্যুনে' তাদের কয়েকটি করে সভ্য পাঠাবার, জনগণের সঙ্গে সংযোগ রেখে স্থাপন করল একটি সংঘ। কম্যুন, বিশেষত এই নগরাংশগুলিই হল বিদ্রোহের পতাকাবাহী ও মধ্যবিত্তদের মহাসভার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইতিমধ্যেই বছর ঘুরে এল বাস্তিলের পতনের পর, আর প্যারিসের অধিবাসীরা করল এক বিপুল উৎসব তদুপলক্ষে ১৪ই জুলাই তারিখে। তার নাম হয়েছিল 'সংঘের উৎসব'। প্যারিসের জনসাধারণ অযাচিতভাবে নগর সুসজ্জিত করার জন্যে পরিশ্রম স্বীকার করল সেদিন; কারণ তারা উপলব্ধি করেছিল যে, উৎসব তাদেরই।

এই হল ১৭৯০ ও ১৭৯১ জুড়ে বিদ্রোহের অবস্থা। মহাসভা তার বিপ্লবাত্মক শক্তি হারিয়ে ফেলল, সাধিত হল তার বহু পরিবর্তন, কিন্তু প্যারিসের নাগরিকদের মধ্যে তখনও বিদ্রোহের উদ্যম ধূমায়মান, কৃষকের দল তখনও তৃষাতুর চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে। বেশিদিন এ ভাবে চলতে পারে না। হয় বিদ্রোহাগ্নি পূর্ণোদ্যমে জ্বলবে, নয়তো সম্পূর্ণরূপে যাবে নিভে। ১৭৯১তে শান্তিবাদী নেতা মিরাবোর অকালে মৃত্যু হল। রাজার সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন, জনসাধারণকে তিনি সংযত করে রাখতেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন বিদ্রোহের ভাগ্য নির্দেশ করে দিল একটি ঘটনা। সে হল ছদ্মবেশে রাজা লুই ও মারি আঁতোয়ানেতের পলায়ন। তাঁরা প্রায় সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন, কিন্তু ভার্দুর কাছে ভারেন্নিতে কতকগুলি কৃষক তাঁদের চিনে ফেলল। ধরা পড়ে তাঁরা ফের ফিরে এলেন প্যারিসে।

প্যারিসের লোকেদের দিক থেকে রাজা ও রানীর এই কাজ তাঁদের ভাগ্য-নির্ধারণ করে দিল। গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা যেতে লাগল বেড়ে, কিন্তু মহাসভার সভ্যেরা এই জনমতের থেকে ছিলেন এত দূরস্থিত ও এতই নরমপন্থী যে, লুইয়ের সিংহাসনচ্যুতিকামীদের তখনও তাঁরা গুলি করে হত্যা করেই চললেন। এ বিদ্রোহেতিহাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র পলাতক মারাট্‌কে কর্তৃপক্ষ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন প্রকাশ্যভাবে রাজনিন্দার ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। প্যারিসের নর্দমাগুলির মধ্যে লুকিয়ে তাঁর দেহে দেখা দিল কঠিন চর্মরোগ।

তবুও অদ্ভুত ব্যাপার! আরও এক বছর লুই রাজা বলে গণ্য হলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় মহাসভা নিজের জীবনচরিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে স্থান করে দিল ব্যবস্থাপক সমিতির। আগেরটির মতোই এটিও হল নরমপন্থী, চলতে লাগল সমাজের উচ্চ-স্থানীয়দেরই প্রতিনিধিত্বে। ফরাসিদেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু উত্তাপের ছিল না এতে স্থান। এই বিপ্লবের উত্তাপ সঞ্চারিত হল জনসাধারণের মধ্যে, গণতন্ত্রকামীদের মধ্যে, জ্যাকোবিন্‌দের মধ্যে, উত্তরোত্তর বলীয়ান হয়ে।

ইতিমধ্যেই ইউরোপের শক্তিসমূহ সত্রাসে এই অদ্ভুত ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করছিল। কিছু কালের জন্য প্রাশিয়া, রুশদেশ ও অস্ট্রিয়া অন্যত্র লুঠতরাজে ব্যস্ত ছিল। প্রাচীন পোল্যাণ্ডের অবসান ঘটাচ্ছিল তারা। কিন্তু ফরাসিদেশের ব্যাপার বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল, তারাও শেষে এতে আকৃষ্ট হল। ১৭৯২ অব্দে যুদ্ধ বাধল ফরাসিদেশের সঙ্গে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার। জেনে রাখো, এ সময়ে নেদারল্যাণ্ডের বেলজিয়াম-অংশটুকু ছিল অস্ট্রিয়া-অধিকৃত, ফরাসিদেশ এবং তার মধ্যে সীমানাটা ছিল একই। বিজাতীয় সৈন্যদল ফরাসিরাজ্যে ঢুকে ফরাসি-সেনাদের হারিয়ে

দিল। রাজাকে তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হল (নিতান্ত অকারণেও নয়), রাজ-দলীয় সকলকেই সন্দেহ করা হল প্রতারণার অপরাধে। যতই বিপদ চার দিকে ঘিরতে লাগল, ফরাসিরা ততই হয়ে উঠল উত্তেজিত ও আতঙ্কিত। সর্বত্রই তারা দেখতে লাগল গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতক। এই শঙ্কার সময়ে প্যারিসের বিদ্রোহী 'কম্যুন' নিল নেতৃত্ব, রাজসভার বিরুদ্ধে সামরিক আইন ঘোষণা করে রক্তনিশান উড়িয়ে দিল; তার পর ১৭৯২ অব্দের ১০ই আগস্ট রাজপ্রাসাদ আক্রমণের আদেশ দিল। তাঁর সুইস্ রক্ষীদের দিয়ে রাজা তাদের গুলি করে মারলেন। কিন্তু জয় হল জনগণেরই; 'কম্যুন' ব্যবস্থাপক সমিতিকে বাধ্য করল, রাজাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত ও বন্দী করতে।

সকলেই জানে, সেই রক্তনিশান আজ সাম্যবাদের নিশান, কুলিমজুরের 'ঝাণ্ডা'। পূর্বে তাকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক আইন-সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হত। সঠিক বলতে পারি না, তবু মনে হয়, প্যারিস-কম্যুনই প্রথম জনসাধারণের পক্ষ থেকে ঐ নিশান তুলেছিল, আর ঐ থেকেই মজুরদের নিশানরূপে তার পরিণতি হয়ে থাকবে।

রাজার বিতাড়ন ও শৃঙ্খলদশাতেই ও ব্যাপারের শেষ হল না। প্যারিসের নাগরিকেরা সুইস্ রক্ষীদের হাতে তাদের সহকর্মীদের হত্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বিশ্বাসহন্তা ও গুপ্তচরদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে, যাদের সন্দেহ করল তাদের দিয়েই কারাগার ভর্তি করতে লাগল। যারা ধরা পড়ল তাদের অনেকেই নিঃসন্দেহ দোষী ছিল, কিন্তু বহু নির্দোষও তাদের সঙ্গে ধৃত হয়েছিল। কিছু-দিন পরে আবার ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে উঠে নাগরিকেরা বন্দীদের ধরে কৃত্রিম বিচারের অভিনয়ের পরে তাদের অধিকাংশকেই হত্যা করল। এই 'সেপ্টেম্বর হত্যালীলা'য় যাদের বলি দেওয়া হল তাদের সংখ্যা এক হাজারেরও উপর। প্যারিসের জনতা এই প্রথম রক্তের আস্বাদ পেল বহুল পরিমাণে। এ তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্যে আরও বহু রক্তপাত হবার আয়োজন হল।

এই সেপ্টেম্বরেই প্রাশিয়ান ও অস্ট্রিয়ান সেনাদলের প্রথম পরাজয় ঘটল ফরাসিদের হাতে। ভাল্মির এই যুদ্ধটা আপাতদৃষ্টিতে ছোটো হল বটে কিন্তু এর ফল হল বিরাট; বিদ্রোহের অবসান ঘটাল এই যুদ্ধ।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বসল। সমিতির স্থান নিল এই নূতন সভা। পূর্বতন সমিতিদ্বয়ের চেয়ে এ হল অধিকতর উন্নত, কিন্তু তবুও কম্যুনের তুলনায় এ পড়ে রইল কিছু পিছিয়ে। এর প্রথম কাজ হল, প্রজাতান্ত্রিক শাসন ঘোষণা। অনতিকাল পরেই হল ষোড়শ লুইয়ের বিচার। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল তাঁকে, রাজত্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে নিজের শির দিয়ে করতে হল। গিলোটিনে হল তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি। ফরাসিদের আর ফেরার পথ রইল না, ইউরোপের রাজামহারাজাদের অগ্রাহ্য করে তারা চলল এগিয়ে। রাজ-শোণিত-স্নাত সেই গিলোটিনের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েই বিপ্লবের নেতা দাঁতোঁ জনতাকে সম্বোধন করলেন ও অন্য দেশের রাজাদের প্রতি ঘোষণা করলেন তাঁর সদম্ভ আহ্বান। তিনি বললেন : "ইউরোপের রাজারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে তাদের ছুঁড়ে দেব আমরা একটি রাজার এই মাথা।"

১০২

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩২

রাজা লুই বিগত হলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেও ফরাসিদেশে এসেছিল বহু অভাবিত পরিবর্তন। বিদ্রোহের উদ্দীপনায় আগুন হয়ে উঠেছিল সে দেশের লোকেদের রক্ত, শিরায় শিরায় এসেছিল তাদের আলোড়ন। প্রজাতান্ত্রিক ফরাসিদেশ এক দিকে; সমগ্র ইউরোপ, রাজকীয় ইউরোপ তার বিপক্ষে। ফরাসিরা এই রাজাগুলোকে দেখাতে প্রস্তুত, কেমন করে লড়ে স্বাধীনতার রবিকরদীপ্ত দেশপ্রেমিকেরা। প্রস্তুত তারা, শুধু নিজেদের জন্যে নয়, নৃপতিনিষ্পেষিত সব দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে। ফরাসিরা ইউরোপের সব দেশে বলে পাঠাল তাদের শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, নিজেদের তারা ঘোষণা করল মানবের বন্ধু, রাজ-শাসনের শত্রু রূপে। স্বাধীনতার জননী ফরাসি-দেশের মন্দিরে আত্মোৎসর্গ হল আনন্দের কারণ। আর এই প্রচণ্ড উৎসাহের সময় তাদেরই দীপ্ত প্রাণের হর্ষ বয়ে তাদের কাছে এল অপূর্ব এক সংগীত, প্রেরণা দিল তাদের সকল বাধা ছিন্ন করে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। রাইন-নদী-তীরের সৈন্যদের উদ্দেশে লেখা রু দ্য লিল্-এর সেই সমরগীতির নাম তখন থেকে হল 'মার্সাই'। আজও সে গান ফরাসিদের জাতীয় সংগীত।

"ফরাসিভূমির সন্তান-সবে, আয় রে আয় রে আয়!
কীর্তিলাভের শুভ অবসর যায় রে বহিয়া যায়।
অত্যাচারের উদ্যত ধ্বজা রক্তে করিয়া স্নান
আমাদের 'পরে বৈর সাধিতে হয়েছে অধিষ্ঠান!
শুনিছ কি সবে কী ভীষণ রবে কাঁপায়ে জলস্থল
দম্ভের ভরে গর্জন করে শত্রুসৈন্যদল।
তারা যে আসিছে কেড়ে নিতে বলে তোমার সকল ধন,
গ্রাসিতে শস্যক্ষেত্র, নাশিতে পুত্র ও পরিজন!
ধরো হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল!
চল্ রে চল্ রে চল্!
মোদের শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল!"

রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করে নয় তাদের গান। মাতৃভূমির প্রতি পুণ্যপ্রেম ও প্রিয় স্বাধীনতার গানই তারা গেয়েছিল :

"জন্মভূমির নির্মল প্রেম! ওগো চিরসম্বল!
তোমার-শত্রু-নাশে-উদ্যত এ বাহুতে দেহো বল।
ওগো স্বাধীনতা! প্রিয় স্বাধীনতা! হও ত্বরা পরকাশ!
আমাদের সাথে মিলিয়া আপন শত্রু করহ নাশ।" *

বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। অস্ত্র ছিল না, বস্ত্র ছিল না, আহার ছিল না, আবরণ ছিল না। নাগরিকদের অনেক সময় অনুরোধ করা হয়েছে, তাদের জুতোজামা সৈন্যদের দিয়ে দিতে। দেশপ্রেমিক তারা, অনেক দুষ্প্রাপ্য আহার ছেড়ে দিয়েছে সৈন্যদের প্রয়োজনে। প্রায়ই উপবাস করতে হয়েছে অনেককে। চামড়া, রান্নার সরঞ্জাম, কড়া, বালতি প্রভৃতি চাওয়া হত তাদের কাছে। প্যারিসের রাস্তায় কামারশালায় ঠকাঠক্ পড়ত হাতুড়ির ঘা, নাগরিক-নাগরিকারা সবাই সাহায্য করত

* সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত অনুবাদ।

অস্ত্র-প্রস্তুত-করণে। কষ্ট হত খুব, কিন্তু তাতে কী যায়-আসে—স্বাধীনতা-কিরীটিনী জন্মভূমি ফরাসিদেশ যখন বিপন্ন, জীর্ণবসন, শত্রু যখন তার দ্বারে দিয়েছে হানা? ফরাসি তরুণেরা তারই উদ্ধারকল্পে এল বেরিয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেল জয়যাত্রায়। কার্লাইল বলে গেছেন, "নিত্য আহার ও ব্যবহারের জিনিষ ছাড়া আর কিছুতে মানুষের সংঘবদ্ধ আস্থা ক্বচিৎ দেখা যায়। যখন যায় তখনই তার ইতিহাস হয় চিত্তোদ্বেলক, অবিস্মরণীয়।" এই-যে আস্থা এসেছিল বিদ্রোহী নরনারীদের মনে এক বিরাট লক্ষ্যের ওপর, এবং যে ইতিহাস তারা গড়েছিল, যে ত্যাগস্বীকার তারা করেছিল সেই স্মরণীয় দিনে, আজও তা আমাদের জাগিয়ে তোলে, শিরায় শিরায় আনে আলোড়ন।

সামরিক শিক্ষায় অর্ধশিক্ষিত এই বিপ্লবী সৈন্যদল ফরাসিদেশের মাটি থেকে সমস্ত বিজাতীয় সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিল, অস্ট্রিয়াবাসীদের হাত থেকে মুক্ত করল নেদারল্যান্ড্‌স্ (বেলজিয়ম ইত্যাদি)। শেষবারের মতো হাপ্‌স্‌বুর্গেরা ছেড়ে গেল নেদারল্যান্ড্‌স্। ইউরোপের শিক্ষিত, পেশাদার সৈনিকেরা এই বিপ্লবী সেনাদলের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তারা লড়ত সন্তর্পণে, টাকার জন্যে, আর বিপ্লবী সৈনিকেরা লড়ত আদর্শের জন্যে। জয়লাভের জন্যে অনেক বিপদ ঘাড়ে নিতে পারত তারা। প্রথম দল চলত ধীরে ধীরে পাহাড়ের মতো বোঝা সঙ্গে করে, দ্বিতীয় দলের বইবার কিছুই ছিল না, গতিও তাই ছিল দ্রুততর। এই বিপ্লবী সেনাদের কৌশল রণশাস্ত্রে নূতন এক আদর্শ হল, যুদ্ধও তারা করত নূতন পন্থায়। পুরোনো কায়দা তারা বদলে ফেলল, পরবর্তী শতবর্ষের সৈন্যদের তারাই হল আদর্শ। কিন্তু এই সৈন্যদের আসল জোর ছিল তাদের উদ্দীপনায়, তাদের দুঃসাহসে। তাদের মূলমন্ত্রস্বরূপ আমরা 'দাঁতোঁ'র সুবিখ্যাত বাণীই উল্লেখ করতে পারি:

"মাতৃভূমির শত্রুদের হটাতে হলে চাই সাহস, সর্বদা ও সর্বত্র চাই সাহস, বারেবারে ফিরে ফিরে চাই সাহস।"

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ইংলণ্ড তার নৌসেনার বলে হয়ে উঠল বলীয়ান শত্রু। গণতান্ত্রিক ফরাসিদেশ গড়ে তুলেছিল বিরাট স্থলসেনা, জলযুদ্ধে সে ছিল দুর্বল। ইংলণ্ড সকল ফরাসি-বন্দর অবরোধ করতে লাগল। যেসব ফরাসি দেশত্যাগ করে ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করেছিল তারা ফরাসিদেশে ফরাসি-গণতন্ত্রের রাশি রাশি জাল মুদ্রা পাঠাল। এইভাবে ফরাসি আয়ব্যয় ও মুদ্রা-ব্যবস্থা নষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগল তারা।

বিদেশী যুদ্ধই ছিল সবার উপর, দেশের সকল শক্তি লাগত তাতেই। বিপ্লবের পক্ষে এসকল যুদ্ধ ভয়ংকর, কারণ সামাজিক সমস্যা থেকে মনোযোগকে তারা সরিয়ে নিয়ে যায় শত্রুদলনের দিকে, এবং বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। যুদ্ধের উদ্যম স্থান নেয় বিপ্লবোদ্যমের। ফরাসিদেশেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল, এবং আমরা দেখতেও পাব, তার শেষ অবস্থা হল এক বিরাট সেনানায়কের নেতৃত্বাধীনতা।

স্বদেশেও লাগল গোলমাল। পশ্চিম-ফ্রান্সে 'ভে'দে'-গ্রামে চাষিরা বাধাল বিপ্লব,—অংশত চাষি-সম্প্রদায় নূতন সৈন্যদলে ঢুকতে অস্বীকার করার জন্যে, আর অংশত রাজভক্ত ও দেশত্যাগী ফরাসিদের চেষ্টায়। বিপ্লব আসলে চালাচ্ছিল প্যারিসের নাগরিকেরা। চাষিরা রাজধানীতে এই দ্রুত পরিবর্তন বুঝতে না পেরে পিছিয়ে পড়েছিল। বিপুল নৃশংসতার সঙ্গে 'ভে'দে'-বিপ্লব দমন করা হল। যুদ্ধের সময়, বিশেষত গৃহবিবাদের সময়, মানুষের নীচ প্রবৃত্তিগুলিই জাগরূক থাকে, করুণা হয়ে দাঁড়ায় গৃহহারা ভবঘুরের মতো। বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন দেখা দিল 'লিয়''তে। সেটাকে দমন করা হল এবং প্রস্তাব আনা হল যে, শাস্তিস্বরূপ মহানগরী লিয়'কেই ধ্বংস করা হোক! 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে লিয়'—তার আর অস্তিত্ব রাখা হবে না!' ভাগ্যক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, তবু অত্যাচার লিয়'কে কম সহ্য করতে হয় নি।

ইতিমধ্যে প্যারিসে কী ঘটছিল? কার আধিপত্য ছিল সেখানে? নবনির্বাচিত এক কম্যুন ও তার বিভাগগুলিই কর্তৃত্ব করছিল শহরের উপর। জাতীয় প্রতিনিধি-সভায় বিভিন্ন দলের মধ্যে শক্তির শ্রেষ্ঠতা নিয়ে সংঘর্ষ চলছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল গিরোঁদী বা নরমপন্থীর দল ও জ্যাকোবিন বা চরমপন্থীর দল। জ্যাকোবিনরাই জিতল, ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অধিকাংশ

গিরোঁদীদের সভা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হল। প্রতিনিধি-সভা এখন জায়গিরদারি ঘুচিয়ে দেবার জন্যে শেষ পন্থা অবলম্বন করল। জায়গিরদাররা যেসমস্ত জমি অধিকার করে ছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হল স্থানীয় কম্যুন ও জনপদগুলিকে—অর্থাৎ সেগুলি সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেল।

জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি-সভা দুটি সমিতি স্থাপন করল, জনহিত ও জননিরাপত্তার জন্যে—এবং তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করল। এই সমিতিদ্বয়, বিশেষত জনসাধারণের নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্তটি, বিশেষ শক্তিমান হয়ে উঠল। লোকে তাদের ভয় করতে লাগল। প্রতি-পাদবিক্ষেপে তারা এগিয়ে নিয়ে চলল প্রতিনিধি-সভাকে, যতদিন পর্যন্ত না বিপ্লব গড়িয়ে পড়ল ভয়ংকর সশস্ত্র বিদ্রোহের অতল গহ্বরে। সকলের মনে ছায়াপাত করে রইল ভয়—বিদেশী শত্রুর ভয়, বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরের ভয়, আরও বহু। ভয় মানুষকে অন্ধ ও মরিয়া করে তোলে, প্রতিনিধি-সভাও ভয়ার্ত হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এক ভীষণ আইন পাশ করল—সন্দেহের আইন। যাকেই সন্দেহ করা হল তারই নিরাপত্তা গেল চুকে। আর কেই-বা রইল সন্দেহের বাইরে? একমাস পরে সভার বাইশ জন গিরোঁদী প্রতিনিধিকে বিপ্লবী-বিচার-সভার আদেশ অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

সশস্ত্র বিদ্রোহের সূচনা হল এমনি করে। প্রতিদিন দণ্ডিতদের যাত্রা চলল গিলোটিনের পথে। প্রতিদিন প্যারিসের পাষাণ-পথ দিয়ে এই বলির মানুষদের বয়ে নিয়ে গাড়িগুলো—টাম্‌ব্রিল্ নাম তাদের—ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করতে করতে চলত—পথিকেরা বিদ্রূপ করত দুর্ভাগাদের। প্রতিনিধি-সভাতেও নেতৃদলের বিরুদ্ধে কিছু বলা ছিল বিপজ্জনক; তাতে সন্দেহের সৃষ্টি করত, আর সন্দেহের পরিণাম হত বিচার ও গিলোটিন। জনহিত ও নিরাপত্তা-সমিতির হাতেই চালিত হত প্রতিনিধি-সভা। বাঁচা-মরার ভার ছিল এই সমিতির হাতে, সে ক্ষমতা কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে তারা অসম্মত হল। প্যারিসের কম্যুনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলল তারা, যাদের সঙ্গেই মতে মিলল না তাদের বিরুদ্ধেই তুলল আপত্তি। শক্তির অসম্ভব ক্ষমতা মানুষকে ধ্বংস করবার। অতএব, সমিতি চলল বিপ্লবের মেরুদণ্ড কম্যুনকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে। আগে ভাঙল বিভাগগুলিকে, তার পর অবলম্বনহীন কম্যুনকে। এইভাবেই বিপ্লব নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে। প্যারিসের বিভাগগুলি ছিল জনসাধারণের পরিচালিত গণসভার যোগসূত্র, ছিল সেই ধমনী যার মধ্য দিয়ে বয়ে যেত বিপ্লবের শোণিত, বিপ্লবকে দিত প্রাণ ও শক্তি। সুতরাং ১৭৯৪ অব্দের গোড়ার দিকে কম্যুনকে ধ্বংস করে ফেলার অর্থই হল এই ধমনীর ছেদন। এর পর থেকে প্রতিনিধি-সভাই স্থাপিত হল শাসনের শিখরে—তাদের সঙ্গে জনসাধারণের ছিল না কোনো যোগ, ভয় দেখিয়ে তারা সবাইকে বশ করত। এই হল প্রকৃত বৈপ্লবিক যুগের অবসান। আরও ছ মাস ধরে চলল আতঙ্কের জের ও বিপ্লবের শেষ পালা। কিন্তু এসবের সমাপ্তি তখন অনতিদূরে।

এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে কে ছিল প্যারিস ও ফ্রান্সের অধিনায়ক? বহু নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। ক্যামিল দেমুল্যাঁ, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বাস্তিল-আক্রমণের নেতা, আরও অনেক কাজে তিনি গ্রহণ করেছেন বিপুল অংশভার। আতঙ্কের যুগে কোমল ও করুণাপূর্ণ নীতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়াতে তিনিও হয়েছিলেন গিলোটিনের কবলিত। অল্প কয়েক দিন পরে তাঁর তরুণী পত্নী লুসিল্ তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁকে হারিয়ে থাকার তুলনায় মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে। কবি ফাব্‌র্ দেলান্তিন্, ফুকিয়ে তিঁভিল্—জনগণের শাস্তিদাতা। মহত্ত্বে ও কর্মক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এঁদের মধ্যে মারাট—শার্লোঁ কোর্দে নামে একটি মেয়ে তাঁকে হত্যা করে। দাঁতোঁ—এরই মধ্যে দুবার আমি তাঁর উল্লেখ করেছি—সিংহের মতো বীর দাঁতোঁ—জনপ্রিয় বাগ্মী দাঁতোঁ—গিলোটিনেই তাঁর জীবনান্ত হয়। আর সবশেষে সবচেয়ে খ্যাতিমান রোবেস্পিয়রের জ্যাকোবিনদের নেতা, শঙ্কার সময় প্রতিনিধি-সভার চালক বললেই চলে। বিভীষিকার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি, তাঁর কথা স্মরণ করে অনেকে শিউরে ওঠে। কিন্তু তবুও এঁর সততা, এঁর দেশপ্রীতি নিঃসংশয়ে স্বীকার্য। অসাধুতা-মুক্ত বলে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। জীবনযাত্রা যেমন তাঁর অতি সাধাসিধে ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর সঙ্গে মতে যার না মিলবে সেই দেশের ও বিপ্লবের শত্রু। তাঁর সহকর্মী, বিদ্রোহের বহু

সেরা লোককে তাঁরই আজ্ঞায় গিলোটিনে যেতে হয়। শেষে তাঁরই অনুসারী প্রতিনিধি-সভা রুখে দাঁড়াল তাঁর বিরুদ্ধে। অত্যাচারী দুর্বৃত্ত বলে তাঁকে অভিহিত করে তারা উচ্ছেদ করল তাঁর ও তাঁর দুর্ধর্ষতার।

বিপ্লবের সকল নেতাই ছিলেন যুবাপুরুষ—বুড়োদের দ্বারা বিপ্লব ক্বচিৎ হয়। নেতা হিসেবে এ'রা প্রধান হলেও এই মহানাটকের অংশভার কারোরই, এমনকি রোবেস্পিয়েরেরও ছিল না বিরাট। বিপ্লবের বিপুলত্বের তুলনায় তাঁরা যেন সংকুচিত হয়ে যান। কারণ বিপ্লব ছিল না তাঁদের হাতে। যুগে যুগে সামাজিক দুরবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশা ও অত্যাচার যা ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে গড়ে তোলে, এ সেই মানব-ভূকম্পেরই একটি।

ঝগড়াঝাঁটি আর গিলোটিনে পাঠানো ছাড়া প্রতিনিধি-সভা যে আর কিছুই করে নি তা নয়। একটা প্রকৃত বিপ্লব থেকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বিপুল। বৈদেশিক যুদ্ধবিগ্রহে তার অনেকখানিই শোষিত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও অবশিষ্ট ছিল বেশ-কিছু, তাই দিয়েই বহু গঠন-মূলক কার্যাবলী হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হল। আজ স্কুলে ছোটো ছেলেরা যে 'মেট্রিক'-প্রণালী শেখে, এই সময়েই তা উদ্ভাবিত হল; তাতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ আকৃতি ইত্যাদি পরিমাপে সুবিধেও হল যথেষ্ট। সভ্যজগতের প্রায় সকল অংশেই এ প্রণালী এখন বিস্তার-লাভ করেছে, কেবল রক্ষণশীল ইংলন্ড এখনও তার গজ-ফার্লং-পাউন্ড-হন্দরের এ-যুগে-অচল প্রাচীন প্রণালীগুলিকে আঁকড়ে রেখেছে। আর ভারতে আমাদের এই জটিল পরিমাপ শিখতে তো হচ্ছেই, তা ছাড়া নিজেদের মন-সের-ছটাকও আছেই।

মেট্রিক-প্রণালীর পরে এল এক গণতান্ত্রিক দিনপঞ্জী। তার মতানুযায়ী অব্দ শুরু হল গণতন্ত্র-ঘোষণা-দিবস ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে। সাত দিনের সপ্তাহ হল দশ দিনের 'দশাহ', দশম দিন হল ছুটির দিন। মাসের সংখ্যা বারোটিই রইল, কেবল তাদের নামগুলো গেল বদলে। কবি ফাব্‌র্‌ দেলান্তিন্‌ ঋতু-অনুযায়ী মাসগুলিকে সুন্দর সুন্দর নাম দিলেন। বসন্তের মাসতিনটির নাম হল—স্ফুটনিকা, কুসুমিকা ও সুপর্ণিকা। নিদাঘমাসত্রয়ের নাম দ্যুতনিকা, তপনিকা ও ফলনিকা। শরতের সাড়া পাওয়া গেল ক্রয়নিকা, কুহেলিকা ও তুহিনিকা-তে। আর শীত—সুতন্বিকা, কোয়েলিকা ও মলয়িকা। গণতন্ত্রের অবসানের পর এ পঞ্জিকা আর বেশি দিন চলে নি।

এরই মধ্যে একবার খৃষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন জেগে ওঠে, প্রস্তাব হয় 'যুক্তি'র পূজা করার—সত্যের মন্দির হয় স্থাপিত। দ্রুতবেগে প্রদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল এ আন্দোলন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে স্বাধীনতা ও যুক্তির উদ্দেশে এক উৎসব হয় প্যারিসের নোতর্‌দাম্‌ ক্যাথিড্রালে, একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে যুক্তিদেবীরূপে সাজিয়ে বসানো হয়। কিন্তু রোবেস্পিয়ের এসব ব্যাপারে ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনিও এগুলিকে সমর্থন করলেন না, দাঁতোও না। জনকল্যাণকারী জ্যাকোবিন-সমিতি ছিল এর বিরুদ্ধে; অতএব আন্দোলনের পান্ডাদের গিলোটিন করা হল। শক্তি ও গিলোটিনের মাঝে কোনো মধ্যপথ ছিল না। এই মুক্তি ও যুক্তি -উৎসবের প্রতিবাদস্বরূপ রোবেস্পিয়ের আর-একটি উৎসবের আয়োজন করলেন—পরমব্রহ্মের উদ্দেশে। প্রতিনিধি-সভার ভোটে স্থির হল ফরাসিদেশ বিশ্বাস রাখে পরমব্রহ্মে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মই আবার ধীরে ধীরে আদরণীয় হয়ে উঠল।

প্যারিসের বিভাগগুলি আর কম্যুন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা চরম পরিণতির দিকে এগুচ্ছিল। জ্যাকোবিনরাই ছিল শীর্ষস্থানীয়, তারাই চালাত শাসন; কিন্তু তারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে বসল। যুক্তি-মুক্তি-উৎসবের নেতা হিবার ও তাঁর সমর্থকদের গিলোটিন হওয়ার পরে প্রথমে ভাঙন ধরে জ্যাকোবিন-দলে তার পর গিলোটিন হল ফাব্‌র্‌ দেলান্তিনের; আর তার পর যখন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দাঁতোঁ ও ক্যামিল দেমুল্যাঁ ও অন্যেরা প্রতিবাদ জানালেন রোবেস্পিয়েরের বিরুদ্ধে এত লোককে গিলোটিনে পাঠানোর জন্যে, তাঁদেরও হল অবসান। ১৭৯৪ অব্দের এপ্রিল মাসে দাঁতোঁর গিলোটিন অতি সত্বর সেরে ফেলা হল, পাছে লোকেরা বাধা দেয়, ও সেইসঙ্গেই বিপ্লব শেষ হল প্যারিস ও অন্য প্রদেশবাসীদের পক্ষে। বিপ্লবসিংহের পতন হল, শক্তির শিখরে দাঁড়াল এক সংকীর্ণ

ক্ষুদ্র দল। শত্রুপরিবৃত, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এই দল চার দিকেই দেখতে লাগল শঠতা, আতঙ্ককে প্রবলতর করাই হল তার আত্মরক্ষার একমাত্র পন্থা।

বিভীষিকা বাড়ল, অভিযুক্তদের দিয়ে গিলোটিন-গামী টাম্‌ব্রিলগুলো ভরাট হতে লাগল এবার সবচেয়ে বেশি। জুনে নূতন আইন দ্বারা মিথ্যাসংবাদ-প্রচার, জনসাধারণকে উত্তেজিত করা, নৈতিক অবনতি ঘটানো ও জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধিকে খর্ব করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত করা হল। রোবেস্পিয়রের ও তাঁর সহচরদের সঙ্গে যার মতভেদ হবে সেই আইনের এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে। দলকে-দল একসঙ্গে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হত—এক-এক বারে দেড় শো জন বা তারও বেশি—দাগি আসামী, রাজতন্ত্রী, একসঙ্গে এক সময়ে এদের সকলের বিচার হত।

ছেচল্লিশ দিন টিঁকে ছিল এই নূতন আতঙ্ক। অবশেষে তপনিকার নবম দিনে (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪) চাকা ঘুরল। প্রতিনিধি-সভা সহসা রোবেস্পিয়রের ও তার সহচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, ও 'শয়তান নিপাত যাক'-ধ্বনির মাঝে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করল। একটি কথাও বলবার অধিকার দিল না। পরদিন, যেখানে তিনি এত লোককে পাঠিয়েছিলেন সেই গিলোটিনে, একটা টাম্‌ব্রিল্‌ তাঁকেই নিয়ে গেল এবং এখানেই সমাপ্ত হল ফরাসি-বিপ্লব।

রোবেস্পিয়রের পতনের পরে এল প্রতিবিপ্লব। মধ্যপন্থীরাই এল সবার সামনে, আর জ্যাকোবিনদের উপর পড়ে তাদেরই সন্ত্রস্ত করে তুলল তারা। 'রক্ত-বিভীষিকা'র শেষে এল 'শুভ্র-বিভীষিকা'র যুগ। পনেরো মাস পরে ১৭৯৫-এর অক্টোবর মাসে প্রতিনিধি-সভা ধ্বসে পড়ল, পাঁচটি সভ্যের এক সমিতিই হল শাসনকেন্দ্র। অবশ্য এটা হল একটা 'বুর্জোয়া' শাসন এবং জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখাই হল এর চেষ্টা। চার বছরেরও উপর এই সমিতি ফরাসিদেশ শাসন করে, আর গণতন্ত্রের ক্ষমতা ও আত্মসম্মান ছিল এতই যে, আভ্যন্তরীণ সকল গোলযোগের পরও বিদেশে সে বিজয়যুদ্ধ চালায়। তার বিরুদ্ধে কয়েকটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কিন্তু তাদের থামিয়েও দেওয়া হয় জোর করে। এদের একটিকে থামায় গণতন্ত্র-সৈন্যদলের একটি তরুণ সেনানায়ক—নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, প্যারিসের জনতাকে লক্ষ্য করে সে গুলি চালাতে সাহস করে—মেরেও ফেলে কয়েকজনকে। ইতিহাসে এ ঘটনার নাম 'গোলাগুলির ফুৎকার'। প্রাচীন বিপ্লবী সেনাই যখন প্যারিসের জনগণের উপর গুলি চালাতে পারল তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, বিপ্লবের ছায়া বলেও আর কিছুর ছিল না অস্তিত্ব।

কাজেই বিপ্লবের হল শেষ, আদর্শবাদীর বহু স্বপ্ন ও দরিদ্রের বহু আশারও শেষ হল তারই সঙ্গে। কিন্তু তবুও যে লাভের জন্যে শুরু হয়েছিল এ অভিযান তার অনেক-কিছু হল লব্ধ। কোনো প্রতিবিপ্লবই ফিরিয়ে আনতে পারল না দাসত্বকে, ফরাসিদের বুরবোঁ-রাজবংশের উত্তরাধিকারীরাও চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে-দেওয়া তাদের জমি নিতে পারল না ফিরিয়ে। আগের চেয়ে জনসাধারণ গ্রামেই হোক নগরেই হোক অনেক সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে আতঙ্কের সময়েও সে প্রাগ্‌বিদ্রোহ যুগের চেয়ে সুখে ছিল বিদ্রোহের সন্ত্রাসজনক পরিণতি তার বিরুদ্ধে ছিল না; ছিল তাদের বিরুদ্ধে যারা সমাজে তার উপরে, যদিও শেষ দিকে কয়েকটি গরিব লোককেও কিছুটা নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

বিদ্রোহের হল পতন, কিন্তু গণতান্ত্রিক মতবাদ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে গেল মানবাধিকার-ঘোষণা-পত্রের মূলতত্ত্ব।

১০৩

গভর্মেণ্টের নীতি

২৭শে অক্টোবর, ১৯৩২

দু সপ্তাহ ধরে কিছু লিখি নি বলে কুঁড়ে হয়ে যাবার ভয় হচ্ছে। গল্পের শেষে পৌঁছে যাচ্ছি, এ ভাবনাই আমাকে পিছিয়ে রাখছে। এর মধ্যেই তো আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এসে পড়েছি। এর পরে উনিশ শতকের একশোটা বছর অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর এই বত্রিশটা বছর পার হলেই পৌঁছে যাব একেবারে আজকের যুগে! কিন্তু এই এক শো বত্রিশ বছরেই অনেক কিছু বলতে হবে। এত কাছে বলে তারা প্রকাণ্ড হয়ে আমাদের মনকে চেপে ধরেছে প্রাচীন ঘটনাবলীর চেয়ে অধিকতর উল্লেখযোগ্য সেজে। আজ আমাদের চার দিকে যা দেখি তাদের অধিকাংশেরই মূল ঐ দিনগুলিতে; আর সত্যিই, ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন এই বিগত শতাধিক বছরের মধ্য দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে আমার বেশ বেগ পেতে হবে। এইজন্যেই বোধ হয় আমার আলস্য! কিন্তু আবার ভাবছি, মানবেতিহাসকে যখন ১৯৩২-এ টেনে আনব, অতীত যখন বর্তমানরূপে অভ্যুদিত হয়ে ভবিষ্যতের ছায়াতোরণে এসে থেমে দাঁড়াবে, তখন আমি আর কী করব? তখন তোমাকে আর কী লিখব খুকু? কলম হাতে নিয়ে বসে তোমার কথা ভাববার, অথবা আমার পাশে বসে তুমি যেন আমায় প্রশ্ন করছ আর আমি যেন তার উত্তর দেবার চেষ্টা করছি, এ ছবি কল্পনা করার জন্য কীই-বা কৈফিয়ত দেব তখন?

ফরাসি-বিপ্লবের বিষয়ে তিনখানা চিঠি তো লিখেছি—ফরাসি দেশের সামান্য পাঁচটি বছর সম্বন্ধে সুদীর্ঘ তিনখানি চিঠি! যুগযাত্রা-পথে আমরা এক-এক লাফে এক-এক শতাব্দী অতিক্রম করেছি, বিপুল মহাদেশ দেখে নিয়েছি এক পলকে। কিন্তু ১৭৮৯ ও ১৭৯৪-এর মাঝখানে এই ফরাসিদেশে বহুক্ষণ ধরে থমকে রয়েছি, যদিও তুমি আশ্চর্য হবে শুনলে যে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সংক্ষেপের; কারণ ঐ বিষয়েই তখন আমার মন ভরপুর, কলম আমার চাইছিল ছুটে চলতে। ইতিহাসের পক্ষ থেকে ফরাসি-বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। এক যুগের অবসান ও নবযুগের সূচনার মধ্যে সেই সন্ধিস্থল। কিন্তু তার নাটকীয় গুণেও সে আকৃষ্ট করে আমাদের, বহু শিক্ষাও দান করে। আজকের জগৎ আবার দোলায়মান, বিপুল পরিবর্তনের প্রত্যুষে দাঁড়িয়ে আমরা। স্বদেশেও চলছে আমাদের এক বিপ্লবের যুগ, যতই হোক-না সে শান্তিময়! সুতরাং অনেক শিক্ষণীয় আছে আমাদের ফরাসি-বিপ্লবের ও আর একটি বিপ্লবের থেকে যা আমাদেরই যুগে, আমাদেরই চোখের সামনে ঘটেছে রুশদেশে। এ দুটির মতো জনগণের প্রকৃত বিপ্লব জীবনের কঠোর বাস্তবতার উপর করে কী তীব্র আলোকপাত! বিদ্যুদ্বহ্নির মতো সমগ্র ভূমিখণ্ডটিকে সে আলোকিত করে তোলে, বিশেষতঃ তার অন্ধকার কোণগুলিকে। মুহূর্তেকের জন্যেও লক্ষ্যকে মনে হয় বড়ো স্পষ্ট, বড়ো কাছে। বিশ্বাস ও কর্মশক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ; সন্দেহ ইতস্তত করার ভাব সব দূরে চলে যায়। মিটমাটের কোনো কথাই ওঠে না। তীরের মতো সোজা বিপ্লবীরা ছুটে চলে লক্ষ্যপানে, অন্য কোনো দিকে তাকায় 'না। আর যতই সরল, যতই তীক্ষ্ম তাদের দৃষ্টি, ততই এগিয়ে চলে বিপ্লব। কিন্তু এ ঘটে কেবল বিপ্লবের শীর্ষদেশে, যখন নেতৃবর্গ দাঁড়িয়ে পর্বতশৃঙ্গে আর জনগণ চলে সে পর্বতের সানুদেশ বেয়ে। কিন্তু হায়! এমনও সময় আসে যখন গিরিশিখর থেকে তাদের নেমে আসতে হয় নীচের গভীর গহ্বরে—বিশ্বাস হয়ে আসে নিষ্প্রভ, শক্তি হয়ে আসে ক্ষীণ।

১৭৭৮ অব্দে বৃদ্ধ ভল্‌টেয়ার—সারাজীবনই তাঁর কেটেছিল নির্বাসনে—ফিরে এলেন প্যারিসে শুধু মরতে। ৮৪ বছর বয়স তখন তাঁর, প্যারিসের যুবাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "তরুণের দল সৌভাগ্যবান, বিরাট জিনিষ দেখবে তারা।" সত্যিই তারা বিরাট জিনিষ দেখল, তাতে অংশ

নিল, কারণ তার এগারো বছর পরে শুরু হয়েছিল বিপ্লব। বহুদিন ধরে হয়ে রয়েছিল তার সম্ভাবনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাসম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, "আমিই রাজ্য অর্থাৎ আমার রাজ্যে আমি সর্বেসর্বা।"—"আসুক প্লাবন আমি চলে গেলে" বললেন তাঁর উত্তরাধিকারী পঞ্চদশ লুই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ আহ্বানের পর প্লাবন এসে দলবলসুদ্ধ ষোড়শ লুইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সাদা পরচুলা আর রেশমের পাজামা-পরা সম্ভ্রান্ত লোকদের বদলে এগিয়ে এল সাঁসকুলোৎ—পাজামা-বর্জনকারীদের দল। ফরাসিদেশের সবাই হল নাগরিক ও নাগরিক নব-গণতন্ত্র জগৎকে শোনাল তার স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী।

বিপ্লবের দিনে আতঙ্কই বড়ো হয়ে থাকে। বিশেষ বিপ্লবী আদালতের প্রতিষ্ঠার পর থেকে রোবেস্পিয়েরের পতন, এই ষোলো মাসেরও অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় ৪ হাজার লোককে গিলোটিন করা হয়। সংখ্যাটা বেশ বড়ো; আর যখন তারই সঙ্গে মনে পড়ে কত নির্দোষ নিরপরাধ ওর সঙ্গে গিয়ে থাকবে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই, ব্যথিত হই। তবু এই ফরাসি বিভীষিকাকে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে গেলে কয়েকটি তথ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য। শত্রু, গুপ্তচর, বিশ্বাস-ঘাতকে বেষ্টিত ছিল তখন গণতন্ত্র, এবং দণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে ছিল গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, গণতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধনের জন্যে ছিল তাদের প্রয়াস। আতঙ্কের শেষ দিকে নির্দোষিরাও অপরাধীদের সঙ্গে দণ্ডভোগ করত। ভয় এলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়, দোষী-নির্দোষে আমরা আর প্রভেদ বুঝতে পারি না। এক দুঃসময়ে ফরাসি গণতন্ত্রকে লাফায়েৎ-এর মত স্বপক্ষীয় অনেক সমরনায়কের বিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে হয়েছিল। অতএব আশ্চর্য নয় যে, নেতৃবর্গের মাথা আর স্থির ছিল না, এলোমেলোভাবে এদিকে-ওদিকে তাঁরা আঘাত চালাতে আরম্ভ করলেন।

এইচ. জি. ওয়েল্স্ যেমন দেখিয়েছেন, এ সময় ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে কী ঘটছিল সেটা সত্যিই স্মরণযোগ্য। ফৌজদারি আইন, বিশেষতঃ সম্পত্তিরক্ষার পক্ষে, ছিল নৃশংস-রকমের, সামান্য অপরাধেই ছিল ফাঁসির চলন। শারীরিক নির্যাতনের ব্যবস্থা তখনও কোথাও কোথাও আইনানুসারেই হত। ওয়েল্সের মতে আতঙ্কযুগে ফরাসিদেশে গিলোটিনে যত লোক মরেছে, ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ড-আমেরিকায় ফাঁসিতে মরেছে ঢের বেশি।

সে সময়ের ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর, অমানুষিক অত্যাচারের কথা ভাবো, আর যুদ্ধবিগ্রহ, বিশেষ করে আজকের যুদ্ধের কথাও ভাবো, শতসহস্র যুবকের জীবনকে যে যুদ্ধ বিকাশের সময়ই নষ্ট করে ফেলে। আরও কাছে এসো, আমাদের স্বদেশে, আধুনিক যুগের ঘটনাগুলিই বিচার করে দেখো। তেরো বছর আগে অমৃতসরে এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যাবেলায় বসন্তোৎসবের দিনে জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে শত শত লোককে হত্যা ও সহস্রাধিক লোককে জখম করা হয়। আর এই-যে সমস্ত ষড়যন্ত্রের মামলা, বিশেষ বিচারসভা, বিশেষ আইন জারি, এসব জনগণকে আতঙ্কিত করে দাবিয়ে রাখার কায়দা ছাড়া আর কী? এই কণ্ঠরোধ বা ভয় দেখিয়ে শাসন, এরা শাসন-কর্তাদের ভয়েরই পরিমাণ নির্দেশ করে। প্রতি শাসনপদ্ধতি, সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলেই এই ভয় দেখিয়ে শাসন শুরু করে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা এর সাহায্য নেয় কয়েকটি ক্ষমতাশালী লোকের স্বপক্ষে ও জনসাধারণের বিপক্ষে। বিদ্রোহ করে যারা শাসক হয়েছে তারা আরও স্পষ্টবাদী; প্রায়ই হয় কঠোর, নিষ্ঠুর; কিন্তু তাদের মধ্যে শঠতা, শয়তানি অল্পই আছে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা থাকে প্রবঞ্চনারই আবহাওয়ার মধ্যে, তারা জানে ধরা পড়লে তাদের অস্তিত্বই থাকবে না আর। এরা স্বাধীনতার কথা বলে, আর সে অর্থে মনে করে যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা। এরা ন্যায়ের কথা বলে, তার অর্থ এরা চিরকালই এমনি অবস্থায় এমনি করে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, অন্যে মরুক আর বাঁচুক, কিছু যায়-আসে না। সবচেয়ে বড়ো হল, এরা আইনের কথা, নিয়মের কথা বলে, আর সেই শব্দের আবরণের তলে তলে মানুষকে গুলি করে মারে, গলা টিপে মারে, বাঁধন পরিয়ে রাখে, সকলরকম অন্যায়, বেআইনি কাজ করে।

সভায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আড়াই বছর আগে এপ্রিল মাসের আর-এক দিনে এই নামেরই

দোহাই দিয়ে এদের মেশিনগান পেশোয়ারে আমাদের বীর পাঠানভাইদের নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করে মেরেছে। আর এই ন্যায়বিচারের নামে ব্রিটিশ বিমানবাহিনী আমাদের দেশের প্রান্তের গ্রামগুলিতে এবং ইরাকে বোমা ফেলে নর-নারী-শিশু-নির্বিচারে কত লোককে হত্যা করেছে অথবা সারাজীবনের মতো করে রেখেছে পঙ্গু। পাছে বিমানের আবির্ভাবে লোকেরা পালিয়ে যায় তাই 'বিলম্বিত বোমা' নামে এক শয়তানি মাল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি মাটিতে পড়ে নিষ্ক্রিয় থাকে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত ফাটে না। গ্রামের নরনারীরা বিপদ কেটে গেছে ভেবে যেই বাড়ি ফিরে আসে তার কিছুক্ষণ পরেই হয়তো বোমাগুলো ফেটেফুটে করে তাদের ধ্বংসের কাজ।

আবার ভাবো আজকের অনশনের কথা, লক্ষ লক্ষ লোককে যে কবলিত করে ফেলছে। চার দিকের দুঃখকষ্ট দেখতে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে আসছি; মনে করছি যে, চাষি-মজুরেরা আমাদের চেয়ে অনেক সহনশীল, দুঃখকষ্ট তাদের অত বাজে না। বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মিথ্যা আমাদের এ যুক্তি। মনে পড়ে, আমি একবার বিহারে ঝরিয়ার কয়লাখনি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে মাটির নীচে ঘন কালো অন্ধকার খোপের মধ্যে কর্মরত অগণ্য স্ত্রীপুরুষকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। লোকে খনির মজুরদের দিনে আট ঘণ্টা কাজের কথা বলে; অনেকে আবার এতেও সন্তুষ্ট নন, আরও বেশি তাঁরা চান আদায় করতে। এই যুক্তিগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে আসে সেই ভূগর্ভের অন্ধকূপের অভিজ্ঞতা, যেখানে আট মিনিটও আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

ফরাসি-বিভীষিকার যুগ ছিল সত্যিই ভয়ানক। কিন্তু তবু দারিদ্র্য, বেকার-জীবন ইত্যাদির মতো স্থায়ী রোগগুলির তুলনায় তার আঘাত তুচ্ছ। এই সামাজিক বিপ্লবের আঘাত যত বেশিই হোক-না কেন, বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অন্তস্তল থেকে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে যেসকল পাপ যুদ্ধবিগ্রহ, সামান্য তারা এদের তুলনায়। ফরাসি-বিপ্লবের ভীষণতা বিপুল বলে মনে হয়, কারণ অনেক খেতাবধারী অভিজাতসম্প্রদায় পড়েছিলেন তার কবলে, আর এই সম্ভ্রান্তশ্রেণীকে সম্ভ্রম করতে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এঁরা বিপদে আপদে পড়লে আমাদের সমবেদনা সহজেই এঁদের দিকে ছোটে। অন্যদের সঙ্গে তাঁদের প্রতি সমবেদনা-প্রদর্শনও ভালো, কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যায় তারা অত্যল্প। আমরা শুভেচ্ছা জানাতে পারি তাঁদের, কিন্তু আসল হচ্ছে দেশের জনসাধারণ, আর সংখ্যালঘুদের জন্যে আমরা এই বেশিকে বলি দিতে পারি না। রুশো লিখে গেছেন, "জনসাধারণই সৃষ্টি করেছে সমগ্র মানবজাতি। যারা জনসাধারণ নয় তারা এত নগণ্য যে, তাদের গণনা করবার পরিশ্রমটুকু বাদ দিলেও বেশ চলে।"

এ চিঠিতে নেপোলিয়নের কথা তোমাকে বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মনের সঙ্গে কলম উড়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়, কাজেই নেপোলিয়ন এখনও রইলেন পরিদর্শনাধীন। আমাদের আনন্দের জন্যে তাঁকে পরের চিঠিখানি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

১০৪

নেপোলিয়ন (১)

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩২

ফরাসি-বিপ্লবের মধ্য থেকে অভ্যুদয় হল নেপোলিয়নের। ফরাসিদেশ, গণতান্ত্রিক ফরাসিদেশ, যে কিনা সারা ইউরোপের রাজন্যবর্গকে আহ্বান করবার মতো সাহস দেখিয়েছিল, এই ছোট্ট কর্সিকাবাসীটির হাতে তার ঘটল অপমৃত্যু। তখন ফ্রান্সের ছিল এক অপূর্ব সৌন্দর্য। ফরাসি-কবি বার্বিয়ে তাকে অবাধ্য মুক্ত বুনো ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন—গর্বোদ্ধত তার শির, চক্‌চক্‌ করছে তার গায়ের চামড়া—যেন এক যাযাবর, জিন-লাগামের বাঁধন তার অসহ্য, মাটিতে পদাঘাত

করছে, জগৎকে করে তুলছে শঙ্কাকুল তার হ্রেষারবে। সেই উদ্ধত ঘোড়া পোষ মানল এই কর্সিকার যুবকের কাছে, তাকে নিয়ে যুবক দেখালেন বহু বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ। বশ করে নিয়ে তার মুক্ত-জীবনের উদ্দাম বন্যতার সুখ ঘুচিয়ে দিলেন তিনি, বিজিত ঘোড়াকে লুটিয়ে পড়তে হল তাঁর পায়ে।

"নিদাঘদিনের রৌদ্রালোকে ফরাসিদেশ সমুজ্জ্বল
বিদ্রোহী এক বন্য ঘোড়ার মতো;
জিন-লাগামের-বাঁধন-ছেঁড়া অদম্য সে, কী চঞ্চল!
নয় কারও বশ—অশ্ব সে উদ্ধত।
মুখ দিয়ে তার ফুটছে ফেনা—নৃপতিদের রক্ত সে;
পদক্ষেপে স্পর্ধা প্রকাশ পায়।
মুক্ত প্রাণের মত্ত সুখে নয়কো কারও ভক্ত সে,
বন্দী করার নেই কোনো উপায়।
গায়ের আভা ঝলসে ওঠে, বন্ধহারা অবাধপ্রাণ—
কেশরাশির ঝামর ওঠে দুলে;
বিশ্ব মানে শঙ্কা শুনে সতেজ কণ্ঠে হ্রেষার তান,
ত্রস্ত হয়ে তাকায় আঁখি তুলে।"

কীরকম লোক ছিলেন এই নেপোলিয়ন? বিশ্বের তিনি কি ছিলেন ভাগ্যবিধাতা?—প্রচণ্ড বীর, মানবজাতিকে বিবিধ বোঝার গুরু চাপ থেকে মুক্ত করতে তিনি কি করেছিলেন সাহায্য? অথবা এইচ. জি. ওয়েলস্ ও অন্যান্য কয়েকজন যেমন বলেছেন—তিনি কি ছিলেন তেমনি দুঃসাহসী ধ্বংসকারী, ইউরোপের ও সমগ্র মানবসভ্যতার ক্ষতিসাধক? বোধ হয় দুটি মতই অত্যুক্তির কোঠায় পড়বে। আবার বোধ হয় উভয়েরই অন্তরে কিছু সত্য আছে নিহিত। আমরা সবাই, বড়ো-ছোটো-নির্বিশেষে ভালোমন্দের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিনিও ছিলেন তাই, তবে অনেক অসাধারণ উপাদান লেগেছিল এই মিশ্রণে। তাঁর ছিল অদম্য সাহস, আত্মনির্ভর, বিরাট কল্পনা, কর্মশক্তি, বিপুল উচ্চাশা। তিনি ছিলেন খুব বড়ো একজন সেনানায়ক, সমরকৌশল তাঁর আয়ত্ত, আলেক-জাণ্ডার ও চেঙ্গিসের মতো প্রাচীন বীরদের সমকক্ষ। কিন্তু তেমনি আবার ছিলেন নীচ, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক; জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজেরই শক্তিবৃদ্ধি, কোনো আদর্শের সন্ধানে ফেরেন নি তিনি। তিনি বলেছিলেন, "শক্তিই আমার প্রিয়া। তাকে জয় করতে আমায় বহু কষ্ট পেতে হয়েছে, এখন কাউকে আমি তাকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে বা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে দেব না।" বিপ্লবেই জন্ম তাঁর, তবুও তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিপুল সাম্রাজ্যের, আলেকজাণ্ডারের বিজয়কাহিনী ভরে রাখত তাঁর মন। সারা ইউরোপও তাঁর কাছে পর্যাপ্ত ছিল না, তাঁকে ডাকত প্রাচ্য-পৃথিবী, বিশেষত মিশর ও ভারত। সাতাশ বছর বয়সে সমৃদ্ধির সূচনায় তিনি বলেছিলেন, "কেবল প্রাচ্যেই হয়েছে বিশাল সাম্রাজ্য ও বিরাট পরিবর্তন—সেই প্রাচী, যেখানে ষাট কোটি লোকের বাস! ইউরোপ তো তার কাছে গোষ্পদমাত্র!"

কর্সিকা তখন ফ্রান্সের অধীন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে সেখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জন্ম। দেহে তাঁর ফরাসি-কর্সিকান ও ইতালিয়ান রক্তের মিশ্রণ। ফ্রান্সের এক সমর-শিক্ষায়তনে তাঁর শিক্ষালাভ, জ্যাকোবিনদের এক সংঘের সভ্য ছিলেন তিনি বিদ্রোহের সময়ে। সে সভ্যপদ বোধহয় স্বার্থসিদ্ধিরই জন্যে, কোনো আদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে নয়। ১৭৯৩ অব্দে 'তুলোঁ'য় তাঁর প্রথম জয়লাভ। এই বিপ্লবী-শাসনের হাতে নিজেদের সম্পত্তি খোয়াবার ভয়ে সেখানকার বিত্তশালী লোকেরা ইংরেজদের নিমন্ত্রণ করে ফরাসি-নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশ তাদের হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছিল। নবীন গণতন্ত্রকে এটি এবং আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা বিষম আঘাত করে; প্রতিটি সমর্থ পুরুষ এবং নারীদেরও যুদ্ধে নাম-লেখানোর জন্যে ডাকা হল। সুকৌশলে আক্রমণের ফলে বিদ্রোহী-শক্তিকে চূর্ণ করে ইংরেজদের নেপোলিয়ন হারিয়ে দিলেন তুলোঁয়। তাঁর ভাগ্যনক্ষত্র এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চব্বিশ বছর বয়সেই তিনি উন্নীত হলেন সেনাধিনায়কের পদে। তবু কয়েক

ইউরোপে নেপোলিয়নের প্রভুত্ব
অধীন রাজ্য
মস্কো
ব্রিটেন
রা শি য়া
প্রাশিয়া
ওয়ারস
রাইনের
রাষ্ট্র
গোষ্ঠী
ফরাসি
সাম্রাজ্য
অ স্ট্রী য়
সাম্রাজ্য
ভেনিস
স্পে ন
কর্সিকা
দানিয়ুব
অ টো ম্যা ন
সা ম্রা জ্য

মাসের মধ্যেই, রোবেস্পিয়েরের গিলোটিনের সময়ে তাঁকে বিপদে পড়তে হল। তাঁকেও সন্দেহ করা হয়েছিল ঐ-দলীয় বলে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি যে দলের ছিলেন তার সভ্য মাত্র একজন—তিনি নিজে। তার পর শাসনের পালা এল 'ডাইরেক্টরি'র, তাতে নেপোলিয়ন প্রমাণ করে দিলেন যে জ্যাকোবিন্ হওয়ার পরিবর্তে তিনি প্রতিবিপ্লবেরই নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আর জনসাধারণকে তিনি গুলি করে মারতেও পারেন কোনো দিকে দৃক্পাত না করে। এই হচ্ছে ১৭৯৫ অব্দের বিখ্যাত 'গোলাগুলির ফুৎকার'। সেইদিন নেপোলিয়ন প্রথম আঘাত হানলেন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে, আর দশ বছরের মধ্যে গণতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করে হলেন ফরাসি-সম্রাট।

১৭৯৬ অব্দে ইতালিগামী ফরাসি-সেনাদলের নায়ক হয়ে উত্তর-ইতালিতে এক রণাভিযানে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি চমকে দিলেন সারা ইউরোপকে। বিপ্লবাগ্নির কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল ফরাসি সৈন্যদের মনে, কিন্তু ছিল না কাপড়চোপড়, খাবারদাবার, জুতোমোজা, টাকাকড়ি। মুমূর্ষু, ক্ষতবিক্ষত এই দলকে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন আল্প্স্ পার করে—ইতালীয় সমভূমিতে পৌঁছলে বহু খাবার ও ভালো ভালো জিনিষ মিলবে এই উৎসাহ দিয়ে। অন্য দিকে তেমনি ইতালীয়দের দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার আশ্বাস; বলেছিলেন, অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্যেই নাকি তিনি এসেছেন! বিপ্লবীদের অর্থহীন বাক্যাবলীর সঙ্গে লুণ্ঠনের, ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষার এ এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এইভাবে ফরাসি ও ইতালিয়ান উভয় দলকেই তিনি বেশ খেলাতে লাগলেন, আর নিজে আংশিক ইতালিয়ান হওয়াতে বেশ প্রভাব বিস্তারও করলেন। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদর ও খ্যাতি বাড়তে লাগল। নিজের সেনাদলে সাধারণ সৈনিকের ভাগ্যের অংশই তিনি গ্রহণ করতেন, তার বিপদে ও সেইসঙ্গে আক্রমণের সময় যে জায়গাটা সবচেয়ে বিপজ্জনক সেখানেই তাঁকে দেখা যেত। তিনি খুঁজতেন সত্যকারের গুণী, আর তার গুণকে অবিলম্বে পুরস্কৃত করতেন, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও। সৈন্যেরা তাঁকে দেখত পিতার মতো—তাদের তরুণ পিতা! তাদের কাছে তাঁর নাম ছিল 'পেতি কাপোরা' (বাচ্চা সেনাপতি), তারা তাঁকে অনেক সময় 'তু' (তুমি) বলেই ডাকত। বিশ বছর বয়সেই এই নবীন সেনানায়ক যে ফরাসি-সৈনিকদের আদরের বস্তু হয়ে উঠেছিলেন, এর পরেও কি তা আর আশ্চর্য লাগে?

উত্তর-ইতালির সর্বত্র জয়লাভের পর অস্ট্রিয়াকে সেখানে হারিয়ে দিয়ে, ভেনিসের পুরোনো গণতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন ও সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের মতো এক অবাঞ্ছিত সন্ধিস্থাপন করে, বিজয়ী বীর রূপে তিনি ফিরে এলেন প্যারিসে। তখনই ফ্রান্সে তাঁর প্রতিপত্তির সূচনা হল। কিন্তু বোধহয় তাঁর মনে হয়েছিল যে, শক্তি কেড়ে নেবার মতো সময় এখনও আসে নি, তাই এক সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি মিশরে যাবার উদ্যোগ করলেন। যৌবনোন্মেষের সময় থেকেই মিশরের ডাক তাঁর কানে বেজেছিল, আজ তিনি তারই উত্তর দিতে চললেন। বিপুল সাম্রাজ্যের স্বপ্নও বোধহয় তখন তাঁর মনে জেগে থাকবে। ভূমধ্যসাগরে অল্পের জন্যে ইংরেজ নৌবাহিনীকে এড়িয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে তিনি নামলেন।

মিশর তখন অটোম্যান-তুর্কি-সাম্রাজ্যের অংশ। কিন্তু সে সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসের পথে, কাজেই নামেমাত্র তুর্কি-সুলতানের অধীন, মামেলুকেরাই আসলে কর্তৃত্ব করত। বিপ্লবের পরে বিপ্লব, নূতন নূতন আবিষ্কার ইউরোপকে যখন দোলা দিয়ে যেত, সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে মামেলুকেরা তখনও রাজ্যশাসন করে যেত মধ্য-যুগের কায়দায়। জানা যায় যে, নেপোলিয়নের দল কায়রোর দিকে এগোতে শুরু করলে কোনো-এক মামেলুক-সেনাপতি ঝলমলে রেশমের বস্ত্রে ও পুরোনো দামাস্কাসীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ফরাসি-দলের সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ফরাসিদের নেতাকে নাকি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। অত্যন্ত অ-বীরোচিতভাবে এক ঝাঁক গুলিগোলা দিয়ে বেচারাকে প্রত্যুত্তর জানানো হয়। অল্প পরেই নেপোলিয়ন জয়ী হন 'পিরামিডের যুদ্ধে'। তিনি নাটকীয় ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণ করতে বড়ো ভালোবাসতেন। পিরামিডগুলোর সামনে সেনাবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে তিনি নাকি বলেছিলেন, "সৈন্যদল, চল্লিশটি শতাব্দী চেয়ে রয়েছে তোমাদের দিকে।"

স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন ছিলেন অতি সুনিপুণ, কাজেই তিনি জিতেই চললেন। কিন্তু

নৌসমরে তিনি ছিলেন অসহায়। নিজে তিনি ওর বেশি বুঝতেন না, আর সুযোগ্য কোনো নৌসেনাধ্যক্ষও ছিল না তাঁর। আর ঠিক তখনই ভূমধ্যসাগরে নৌবাহিনীর প্রভুত্বে ইংলণ্ডের ছিল একজন প্রতিভাশালী যোদ্ধা—হোরেশিয়ো নেল্‌সন্‌। নেল্‌সন্‌ একদিন একটু বেশি সাহস করেই বন্দরে ঢুকে ফরাসি-নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন, এরই নাম 'নীলনদের যুদ্ধ'। নেপোলিয়ন এখন বিদেশে এসে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। গোপনে পালিয়ে তিনি ফ্রান্সে এসে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু এতে তাঁর 'প্রাচ্যদেশের সেনাদল'কে দিতে হল বলিস্বরূপ।

কিছু বিজয়, কিছু গৌরবলাভ সত্ত্বেও 'প্রাচ্য-অভিযান' ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও এর একটা ঘটনা বেশ কৌতূহলজনক। মিশরে নেপোলিয়নের সঙ্গে অনেক বড়ো বড়ো বিদ্বান বুদ্ধিমান অধ্যাপক, বহু গ্রন্থরাজি ও যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়েছিলেন। রোজ এই বিদ্বন্মণ্ডলীর আলোচনা-সভা বসত, নেপোলিয়ন তাতে সমভাবে যোগ দিতেন। এই পণ্ডিতেরা বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি করেছিলেন। মিশরীয় লিপিচিত্রের পুরোনো রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল—গ্রীক ও দুরকম মিশরীয় ছবির লেখা, এই তিন ভাষায় খোদিত একটি পাষাণফলকের সাহায্যে। গ্রীকদের সহায়তা নিয়ে অপর ভাষাদ্বয়ের অর্থনির্ণয় করা হল। আরও কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, সুয়েজের মধ্য দিয়ে একটা খাল কাটার প্রস্তাব নেপোলিয়নকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত করেছিল।

মিশরে থাকতে নেপোলিয়ন পারশ্যের শাহ্‌ ও দক্ষিণ-ভারতের টিপু সুলতানের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান আরম্ভ করেন। কিন্তু সমুদ্রে শক্তিহীনতার দরুন তাতে কোনো ফল হয় নি। এই নৌশক্তিহীনতাই হয়েছিল অবশেষে নেপোলিয়নের পতনের কারণ, আর এই নৌশক্তিই ইংলণ্ডকে ঊনবিংশ শতকে শক্তির শিখরে স্থাপন করেছিল।

মিশর থেকে নেপোলিয়ন যখন ফিরে এলেন, ফ্রান্সে তখন দুরবস্থা। ডাইরেক্টরি তখন জনসাধারণের কাছে নাম খারাপ করে অপ্রিয় হয়ে পড়েছে, তাই সবাই ফিরে তাকাল তাঁরই দিকে। শক্তিগ্রহণে তাঁর অনিচ্ছা ছিল না একটুও। প্রত্যাবর্তনের এক মাস পরে, ১৭৯৯ অব্দের নভেম্বর মাসে ভাই লুসিয়ে'র সহায়তায় মহাসভাকে জোর করে ভেঙে দিয়ে তৎকালীন শাসনধারার উচ্ছেদ করলেন তিনি। এই 'কু-দেতা' (অর্থাৎ বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ) নেপোলিয়নকে নেতৃস্থানীয় করে তুলল। এখন সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মধ্যে একমাত্র তাঁকেই কর্ণধার করা ছিল সম্ভব; কারণ তিনি ছিলেন জনপ্রিয়, জনসাধারণ আস্থা রাখত তাঁর উপরে। বিপ্লবের শেষ চিহ্নও বহুদিন হল মুছে গেছে, সাধারণতন্ত্রও লুপ্ত হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে, তাই এই জনপ্রিয় সেনাপতির হাতেই পড়ল কর্তৃত্বের ভার। নূতন শাসনরীতির খসড়া করা হল, তাতে তিন জন কন্‌সাল থাকবেন (এ নামটি গৃহীত হয়েছিল প্রাচীন রোম থেকে), পূর্ণশক্তি থাকবে নেপোলিয়নের হাতে, তিনি হবেন এই তিন জনেরই একজন। তাঁর নাম হল প্রথম কন্‌সাল, তাঁর কর্মভার হল দশ বছরের জন্যে। শাসনরীতি আলোচনার মধ্যে কে-একজন প্রস্তাব আনলেন যে, একজন সভাপতি নিযুক্ত করা হোক। তাঁর সত্যকার কোনো কাজ থাকবে না, কেবল দলিলপত্তরে সীলমোহর লাগাতে হবে আর নামেমাত্র গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে রইবেন, আজকের ফ্রান্সের সভাপতির মতো কতকটা। কিন্তু নেপোলিয়নের চাই শক্তি, রাজার পোশাকটা দিয়ে তাঁর কী হবে? এরকম জাঁকজমকালো নিষ্কর্মা অসহায় সভাপতিতে তাঁর কোনো দরকার নেই। তিনি তাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই পেট-মোটা শুয়োরটাকে দূর করে দে তো!"

দশ বছরের জন্যে নেপোলিয়নকে প্রথম কন্‌সাল রূপে নিয়ে শাসন চালানোর প্রস্তাব জনগণের নিকট উপস্থিত করা হল, এবং ত্রিশ লক্ষেরও বেশি ভোটে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এ প্রস্তাব। এমনি করে ফরাসিরা নিজেদের হাতের ক্ষমতা তুলে দিল নেপোলিয়নকে মিথ্যা আশা নিয়ে যে, তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবেন স্বাধীনতা ও সুখ।

কিন্তু নেপোলিয়নের জীবনকাহিনী বিশদভাবে অনুসরণ করতে আমরা অক্ষম। প্রচণ্ড কর্মশক্তি, ও আরও ক্ষমতার জন্যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার ইতিহাসেই পূর্ণ এর পাতা। 'কু-দেতা'র পররাত্রিতেই, নবশাসনরীতি গঠিত বা গৃহীত হবার আগেই একটা বিধিবদ্ধ আইনের খসড়া তৈরির জন্যে তিনি দুটি সমিতি নিয়োগ করলেন। বহুবিধ আলোচনার পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই আইনের

খসড়া গ্রহণের চরম সিদ্ধান্ত হল, নাম তার 'নেপোলিয়নের বিধিবন্ধ আইন' (Code Napoleon)। বৈপ্লবিক বা আধুনিক যুগের তুলনায় এই আইনগুলি খুব উন্নতপ্রণালীর না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগধর্মের তুলনায় তাকে উন্নতই বলতে হবে, এবং এক শো বছর ধরে এই আইনগুলিই ছিল ইউরোপের আদর্শস্বরূপ। আরও বহু উপায়ে রাজ্যশাসনপদ্ধতিতে সরলতা ও নিপুণতার প্রবর্তন করেছিলেন নেপোলিয়ন। সব কাজেই হাত লাগাতেন তিনি, ছোটো ছোটো খুঁটিনাটিও চমৎকার মনে রাখতে পারতেন। তাঁর আশ্চর্য কর্মক্ষমতা ও সুপ্রচুর প্রাণশক্তির সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠত তাঁর সহকর্মীরা। তাঁর জনৈক সহকারী এই সময়ের উল্লেখ করে লিখেছিলেন : "রাজ্যশাসন, সংস্কার, সন্ধি-সংস্থাপন—তাঁর এই সুসমঞ্জস ধীশক্তি নিয়ে তিনি দিনে আঠারো ঘণ্টা কাজ করে যান। অন্য নৃপতিরা শতাব্দীব্যাপী শাসনে যা করতে পারেন নি তিনি তিন বছরে তাই করেছেন।" অত্যুক্তি বটে, কিন্তু এ কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আকবরেরই মতো অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ও পরিষ্কার মন ছিল নেপোলিয়নের। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "কোনো জিনিষ মন থেকে দূর করতে চাইলে আমি দেরাজের সেই টানাটা বন্ধ করে দিয়ে অন্য-একটা টানা খুলি। টানার ভিতরের জিনিষগুলো কখনও এলোমেলো হয়ে যায় না, তারা আমাকে বিন্দুমাত্র শ্রান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে না। ঘুম চাই? সমস্ত টানাগুলো বন্ধ করে দিলেই ধীরে ধীরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।" সত্যি, অনেক সময় ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে রণাঙ্গনেই তাঁকে আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে আবার সুদীর্ঘ কালের জন্যে অবিশ্রান্ত কাজের মধ্যে ডুবে যেতে দেখা গেছে।

দশ বছরের জন্যে তাঁকে প্রথম কন্‌সাল করা হল। তিন বছর পরে ১৮০২ অব্দে এল শক্তি-সোপানের দ্বিতীয় ধাপে উন্নতি, আজীবন তাঁকে কন্‌সাল-পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও তাঁর ক্ষমতাবর্ধনই তখন সাব্যস্ত হল। গণতন্ত্র তখন তিরোহিত হয়েছে, তিনি সাম্রাজ্যাধিপতি নন শুধু নামে। অতএব ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নিজেকে তিনি সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন, অবশ্য জনসাধারণের 'ভোট' নিয়ে। ফ্রান্সের তিনিই তখন সর্বেসর্বা, অথচ পুরোনো আমলের রাজাদের থেকে তাঁর অনেক তফাত। তাঁর ক্ষমতার ভিত্তিভূমি ছিল না গতানুগতিক ধারার উপরে বা রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারের উপরে—ছিল তাঁর কর্মনৈপুণ্যে আর জনপ্রিয়তার উপরে, বিশেষ করে চাষিদের ভালোবাসায়, যারা আজীবন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তিনিই তাদের ক্ষেত খামার রক্ষা করেছেন। নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন, "বৈঠকখানা-বিলাসী বাচালদের মতে আমার কী আসে-যায়? আমি শ্রদ্ধা করি কেবল এক দলের মত, সে মত কৃষাণদের।" কিন্তু অবিরাম যুদ্ধের জন্যে নিজেদের ছেলেদের পাঠাতে পাঠাতে সে চাষির দলও বিরক্ত হয়ে গেল। আর তাদের এই সাহায্য বন্ধ হতেই নেপোলিয়নের এতদিনের গড়া বিরাট কীর্তি টলমল করে উঠল।

দশটি বছর তিনি ছিলেন সম্রাট; এ দশ বছর সারা ইউরোপ জুড়ে ছুটোছুটি করে, লড়াই বাধিয়ে, ও স্মরণীয় সব যুদ্ধ জিতেই কেটেছিল। সারা ইউরোপ তাঁর নামে কেঁপে উঠত, পড়ে রইল সে তাঁর বশীভূত হয়ে—এরকম বশ তাকে আগে আর কেউ করতে পারে নি। মারেঙ্গো (১৮০০ অব্দে যখন তিনি সুইজারল্যান্ডের তুহিনাবৃত সেণ্ট বার্নার্ড গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছিলেন), উল্‌ম্‌, অস্টারলিজ্‌, জেনা, ঈলো, ফ্রিয়েডল্যান্ড, ওয়াগ্‌রাম্‌ তার কয়েকটি স্থলযুদ্ধক্ষেত্রের নাম, এগুলিতে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রুশদেশ সব একে একে ধ্বসে পড়ল তাঁর সামনে। স্পেন, ইতালি, নেদারল্যান্ড, রাইন-রাষ্ট্র নামে জর্মনির একাংশ, পোল্যান্ড, সব হল তাঁর অধীন। প্রাচীন সেই 'পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য' এতদিন ধরে নামখানি মাত্র বজায় রেখে এবার পৌঁছল চরম অবসানে।

প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে কেবল ইংলণ্ডই দুর্ভাগ্যের হাত এড়িয়ে যেতে পারল। নেপোলিয়নের কাছে যে সমুদ্র ঠেকত অগাধ রহস্যময় বলে সেই সমুদ্রই রক্ষা করল ইংলণ্ডকে। আর সাগরদত্ত এই নিরাপত্তার দরুনই সে হয়ে দাঁড়াল নেপোলিয়নের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু। পূর্বেই বলেছি, কী করে প্রতিপত্তির প্রারম্ভেই নীলনদের যুদ্ধে নেপোলিয়নের নৌবাহিনী ধ্বংস হয়েছিল নেল্‌সনের হাতে। ১৮০৫ অব্দের ২১শে অক্টোবর সম্মিলিত ফরাসি ও স্পেনীয় পোত-বাহিনীর

বিরুদ্ধে স্পেনের দক্ষিণকূলে ট্রাফাল্‌গার-অন্তরীপে যুদ্ধের ফলে নেল্‌সনের ভাগ্যে অঙ্কিত হল জয়টিকা। এই নৌযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই নেল্‌সন তাঁর সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "ইংলণ্ড বিশ্বাস করে যে, তার সন্তানেরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে।" জয়গৌরবমণ্ডিত মুহূর্তে নেল্‌সনের মৃত্যু ঘটল, কিন্তু তাঁর এই কীর্তিকে ইংরেজরা লণ্ডনের নেল্‌সন-স্তম্ভ ও ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, যে কীর্তি ধূলিসাৎ করে দিল নেপোলিয়নের ইংলণ্ড-আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা।

ইউরোপ থেকে ইংলণ্ডে যাবার পথে সমস্ত বন্দর বন্ধ করবার আদেশ দিয়ে নেপোলিয়ন এই পরাজয়ের উত্তর দিলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ রক্ষা করা চলবে না, 'দোকানদারের দেশ' ইংলণ্ডকে এমনি করে দমন করার তোড়জোড় চলল। অন্য দিকে ইংলণ্ড আবার এই বন্দর-গুলো দিয়ে আমেরিকা যাবার পথ আটকে দিল—আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে নেপোলিয়নের বাণিজ্যও অগত্যা গেল বন্ধ হয়ে। ইংলণ্ডও বহুপ্রকার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইউরোপে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগল, তাঁর শত্রুদের ও নিরপেক্ষ দলকে প্রচুর অর্থ দিয়ে হাত করতে লাগল, আর এই সোনার জোগান দিতে লাগল ইউরোপের কয়েকটি বিরাট ধনাগার, বিশেষ করে রথ্‌চাইল্ড্‌-বংশ।

আরও-একটি পন্থা ইংলণ্ড অবলম্বন করেছিল, সে হচ্ছে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার—যাকে বলে 'প্রোপাগাণ্ডা'। সে যুগের তুলনায় এ ফন্দিটা বেশ নূতন রকমেরই হয়েছিল, তবে অধুনা এটা অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক 'ছাপাখানার অভিযান' শুরু হল। নব নব পুস্তিকা, সংবাদপত্রী, নূতন সম্রাটের সব ব্যঙ্গচিত্র, মিথ্যায়-ভরা সব 'স্মৃতিকথা' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়ে গোপনে পাঠানো হত ফ্রান্সে। আজকাল তো এই ছাপার যুদ্ধ আসল রণপদ্ধতির সঙ্গে অভিন্নই হয়ে গেছে। ১৯১৪-১৮ অব্দের বিগত মহাযুদ্ধে সকল দেশের সকল শাসননিয়ন্তারা সম্পূর্ণ অকুণ্ঠভাবে কত মিথ্যাই যে রটনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, আর এদের মধ্যে ইংরেজ-সরকারই বোধ হয় অনায়াসে শীর্ষস্থানের অধিকারী হবে। নেপোলিয়নের যুগ থেকে আজ অবধি এঁরা এক শো বছরের শিক্ষা পেয়েছে এ বিষয়ে। আমরা ভারতবাসীরাই বেশ জানি, কেমন করে আমাদের দেশের সমস্ত সত্য চাপা দিয়ে এ দেশে ও ইংলণ্ডে অসংখ্য মিথ্যা প্রচার করা হয়।

১০৫

নেপোলিয়ন (২)

৬ই নভেম্বর, ১৯৩২

গত চিঠিতে যেখানে থেমেছিলাম তার পর থেকে আবার নেপোলিয়নের কাহিনীর জের টানতে হবে।

নেপোলিয়ন যেখানেই যেতেন তাঁর সঙ্গে ফরাসি-বিপ্লবের কী-একটা যেন থাকত; তাই যে দেশের লোকেদের তিনি পরাভূত করেছিলেন তাদের খুব বেশি অনিচ্ছা ছিল না তাঁর অধীনে আসতে। তাদের উপরে গুরুভার হয়ে বসেছিল যে প্রাচীন সামন্ত-শাসকের দল তাদের উপরে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল এরা। এতে নেপোলিয়নের প্রচুর সুবিধা হল, তাঁর সদম্ভ পদক্ষেপের সামনে ধ্বসে পড়ল জায়গির-প্রথা। বিশেষ করে, জর্মনিতে জায়গির-প্রথার অবসান হল; স্পেনে উচ্ছেদ সাধিত হল তথাকথিত পাপী-দলনার্থ প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত বিচারালয় 'ইন্‌কুইজিশন'-এর। কিন্তু যে জাতীয়তাবোধকে তিনি জাগিয়ে তুললেন অজ্ঞাতভাবে তাই পরে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁকে পরাস্ত করল। বুড়ো বুড়ো রাজারাজড়াকে তিনি হারাতে পারতেন, কিন্তু সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে জেতা তাঁর অসাধ্য। স্পেনীয়েরা রুখে উঠল, বহু বছর ধরে শুষে নিল তাঁর শক্তি, তাঁর রসদপত্র। জর্মনরাও নেপোলিয়নের অন্যতম শত্রু ব্যারন ফন স্টীনের নেতৃত্বে নিজেদের প্রস্তুত করে নিল, বাধল সেখানে মুক্তিযুদ্ধ। এইভাবে নৌশক্তির সঙ্গে একত্রিত এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধেই তাঁর পতন হল। তবে এমনিতেও তাঁর ডিক্টেটরি চাল বোধ হয় ইউরোপের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত। অথবা হয়তো এ বিষয়ে নেপোলিয়নের পরবর্তী উক্তিই সত্য : "আমার পতনের জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। আমিই আমার প্রবলতম শত্রু, আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের একমাত্র কারণ।"

বড়ো অদ্ভুত সব ত্রুটি ছিল এই লোকটির প্রতিভায়। 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'এর একটা ভাব ছিল তাঁর, হৃতগৌরব ঐসব রাজারাজড়ারা তাঁকে নিজেদের সমকক্ষ বলে মনে করবে, এই ছিল তাঁর বাসনা। অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজের ভাইদের অন্যায়রকম পদোন্নতি করে দিয়েছিলেন। ওঁদের মধ্যেই একটু ভালো ছিলেন লুসিয়েঁ। ১৭৯৯ অব্দে কু-দেতার সময়ে নেপোলিয়নের অবস্থা যখন সঙ্গীন, তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য পরে ঝগড়া করে তিনি ইতালিতে চলে যান। আর-সমস্ত ভাইরা ছিলেন নির্বোধ, দাম্ভিক, তবু নেপোলিয়ন তাঁদের রাজার গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের পরিবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবার মতো নীচ প্রবৃত্তি ছিল তাঁর। তবে তাঁদের সকলেই তাঁর সঙ্গে চাতুরী করেছিলেন, তাঁর বিপদের সময়ে সবাই তাঁকে ছেড়ে যান। নিজের একটা বংশ প্রতিষ্ঠিত করতে নেপোলিয়ন বরাবরই ছিলেন উৎসুক। সমৃদ্ধির আগেই, ইতালিতে গিয়ে খ্যাতি-অর্জনের আগেই, তিনি জোসেফিন দ্য বোহার্নে নামে রূপসী, চপলমতি একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। এ বিয়েতে সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি বিষম নিরাশ হয়ে পড়েন, কারণ বংশ-প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁর বরাবরের ঝোঁক। তাই ভালোবাসা সত্ত্বেও জোসেফিনকে ত্যাগ করে আর-একজনকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করেন। রুশদেশের এক 'গ্র্যান্ড ডাচেস'কে বিয়ে করতে চাওয়ায় জার তাতে অসম্মত হলেন; কারণ, ইউরোপের প্রভু হলেও নেপোলিয়ন যে রুশ-রাজবংশে বিয়ে করবেন, এ তাঁর স্পর্ধা বলেই মনে হয়েছিল। নেপোলিয়ন তখন অস্ট্রিয়ার হাপ্‌স্‌বুর্গ-সম্রাটকে একরকম বাধ্যই করলেন তাঁর মেয়ে মারি লুইকে দিতে। এইবারে তাঁর একটি ছেলে হয়, কিন্তু মারি ছিলেন বুদ্ধিহীনা, স্নেহহীনা। নেপোলিয়নকে তিনি একটুও ভালোবাসতেন না, নিজেকে অযোগ্য বলেই প্রমাণ করেছিলেন তিনি। নেপোলিয়ন বিপন্ন হলে তিনি তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন, ভুলে গেলেন তাঁকে চিরদিনের মতো।

বড়োই আশ্চর্য লাগে যে, সাধারণের চেয়ে বহু উচ্চে দাঁড়িয়েও এই লোকটি প্রাচীন রাজাদের ফাঁকা জৌলুসের এত ভক্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও তিনি প্রায়ই বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে এই রাজাদের উপহাস করতে ছাড়তেন না। স্বেচ্ছায় তিনি বিপ্লব থেকে সরে এসেছিলেন। নূতন, পুরোনো কোনো যুগধর্মই তাঁর মনোমতো হল না, তিনি রয়ে গেলেন ঠিক মধ্যস্থলে।

ধীরে ধীরে তাঁর বিজয়গৌরব দুঃখময় সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাঁর নিজের মন্ত্রীরাই বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাঁর বিরুদ্ধে চালাতে লাগল ষড়যন্ত্র। তালিরাঁ রুশ-সম্রাট জারের সঙ্গে কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হল। আর ফুশে ইংলন্ডের সঙ্গে। নেপোলিয়ন তাদের ধরে ফেললেন, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাদের ধমকে দিয়েই ছেড়ে দিলেন, পদচ্যুতও করলেন না। বার্নাদোৎ নামে তাঁর জনৈক সেনানায়ক তাঁরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর কঠিন শত্রু হয়ে দাঁড়াল। ভাই লুসিয়েঁ আর মা বাদে নিজের পরিবারের আর সকলেই যথাপূর্ব দুর্ব্যবহার ও বিরুদ্ধাচরণ করে চলল। ফ্রান্সে অশান্তি ধূমায়িত হয়ে ওঠে, নেপোলিয়নের শাসনও হয়ে ওঠে কঠোরতর, নিষ্করুণ; বহু লোক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়। তাঁর ভাগ্যের জ্যোতিষ্ক এবারে সুনিশ্চিত ভাবে অস্তাচলে হেলে পড়েছে, আর সেই দুরবস্থা দেখে বহু 'মূষিক জাহাজ ছেড়ে পলায়ন করে'। তাঁর শরীর-মনও ক্ষয়ে আসে, যদিও বয়সে তিনি তখনও তরুণ। যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে তাঁর হঠাৎ ভীষণ শূল-বেদনা শুরু হয়। শক্তিসামর্থ্যও আসে কমে। অল্পবয়সের চট্‌পটে-ভাব কিছু কিছু থাকলেও এখন তাঁর পদক্ষেপ আরও ভারি হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিধা, ইতস্ততভাব জাগে, আর তাঁর রণসজ্জা, ব্যূহ ইত্যাদিও জটিলতর হয়ে আসে।

১৮১২ অব্দে 'গ্রাঁদ আর্মি' নামে শক্তিশালী এক সেনাদল নিয়ে তিনি রুশদেশ আক্রমণ করতে চললেন। রুশীয়দের হারাতে হারাতে বিনা বাধায় এগিয়ে চললেন। রুশীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক, তারা কেবলই পিছু হটে। শুধু শুধুই গ্রাঁদ আর্মি তাদের সন্ধান করে মস্কো পৌঁছয়। জার হার মানতে ইচ্ছুক হলে নেপোলিয়নের পুরোনো সহকারী ও সেনাপতি বার্নাদোৎ ও জর্মন জাতীয় নেতা ব্যারন ফন স্টীন—যাকে নেপোলিয়ন নির্বাসিত করেছিলেন—এই দুটি লোক তাঁকে তা করতে বারণ করল। ধোঁয়া দিয়ে শত্রু তাড়াবার জন্যে রুশীয়েরা নিজেদের প্রিয় নগরী মস্কোতে আগুন লাগিয়ে দিল। এ খবর সেন্ট্ পিটার্স্‌বার্গে যখন পৌঁছয় স্টীন তখন খাবার টেবিলে বসে তার গ্লাস তুলে বলেছিল, "এর পূর্বেও আমার সম্পত্তি আমি ৩।৪ বার হারিয়েছি। এসব ফেলে দিতে আমাদের অভ্যেস হয়ে আসা চাই। মরতে যখন হবেই তখন এসো, আমরা সবাই বীরের মতো মরি।"

শীতের সূচনা তখন। দগ্ধ মস্কো ত্যাগ করে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করলেন। অতএব শ্রান্ত হয়ে ফিরে চলল গ্রাঁদ আর্মি তুষারের মধ্য দিয়ে—পাশে পাশে, পিছনে পিছনে রুশ কশাকেরা চলল তাদের খোঁচা দিয়ে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করতে করতে, কেউ দলছাড়া হয়ে পড়লেই আর নিস্তার ছিল না তাদের হাতে। সুতীব্র শীত আর কশাকদের কবলে প্রাণ গেল হাজার হাজার। গ্রাঁদ আর্মি হয়ে উঠল প্রেতের শোভাযাত্রার মতো—নগ্নপদ, জীর্ণবাস, তুহিনাহত, পরিক্ষীণ সৈন্যদল। সৈন্যদের সঙ্গে নেপোলিয়ন স্বয়ং চললেন পায়ে হেঁটে। ভীষণ হৃদয়বিদারক এ যাত্রা, বিপুল বাহিনী ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ফিরে এল অবশেষে।

এই রুশ-অভিযানের ফলে ক্ষতি হল অপরিমেয়। ফ্রান্সের পুরুষ-শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল; নেপোলিয়নকেও বৃদ্ধ, অতিসতর্ক, রণবিমুখ করে তুলল। চার দিকে ঘিরে রইল শত্রুদল, আর অল্পবয়সের সেই রণজয়কৌশল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বেড়াজাল যেন চার দিক থেকেই লাগল এগিয়ে আসতে। ওদিকে তালির্‌াঁর কূটচক্রান্ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বহু বিশ্বাসী সহকর্মীও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উন্মুখ। শ্রান্ত হতাশ মনে ১৮১৪ অব্দে সিংহাসন ত্যাগ করলেন নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়ন সরে দাঁড়াতে ইউরোপের শক্তিসমুদয়ের এক বিরাট অধিবেশন বসল ভিয়েনাতে, ইউরোপের এক নূতন মানচিত্র গঠনের জন্যে। ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপ এল্‌বাতে নেপোলিয়নকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর-এক বুরবোঁ, এক লুই—গিলোটিনে নিহত সম্রাটের ভাই সে—কোথায় ছিল নির্জনে, তাকে ডেকে এনে সপ্তদশ লুই নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হল। আবার ফিরে এল বুরবোঁদের কাল, নিয়ে এল তার সঙ্গে বিগত দিনের অত্যাচার-লীলা। অতএব বাস্তিলের পতনের পর পঁচিশ বছর ধরে যা ঘটেছিল, মোটামুটি এই তার সারাংশ। ভিয়েনায় ইতিমধ্যে চলল রাজায়-মন্ত্রিতে আলোচনা ঝগড়া-বিবাদ, আর বিশ্রামের সময়টুকুতে প্রচুর আমোদপ্রমোদ। তাঁদের এখন খুব আরাম। এক বিভীষিকা দূর হয়েছে, আবার তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কৃতঘ্ন তালির্‌াঁ এই রাজমন্ত্রীর ভিড়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়ল, এই মহাসভায় তার প্রতিপত্তি হল প্রচুর। অস্ট্রিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী মেতের্নিশও নাম কিনলেন রাজনৈতিক কূটচালে নিপুণ বলে।

বছর-খানেকের মধ্যেই এল্‌বায় নেপোলিয়ন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, বুরবোঁ-রাজত্বও ফ্রান্সকে অস্থির করে তুলল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছোট্ট একটা নৌকোয় করে পালিয়ে, বলতে গেলে একলাই নেপোলিয়ন রিভিয়েরা নদীর কূলে কান্নিতে এসে নামলেন। চাষিদের হাতে তাঁর সম্বর্ধনা হল প্রচুর। তাঁর বিরুদ্ধে যে সৈন্যদলকে পাঠানো হয়েছিল তারা তাদের 'ক্ষুদে সেনাপতি'কে আবার দেখে 'সম্রাটের জয় হোক' এই ধ্বনির মধ্যে তাঁর পক্ষেই যোগ দিল। কাজেই জয়গৌরবমণ্ডিত রূপে তিনি ফিরে এলেন প্যারিসে, বুরবোঁ-রাজা ততক্ষণে পলাতক। কিন্তু ইউরোপের আর-সব রাজধানীতে তখন আতঙ্ক, বিমূঢ়তা। ভিয়েনায় তখনও মহাসভা চলছিল, সেখানে নাচ গান ভোজ হঠাৎ থেমে গেল। শঙ্কাকুল রাজা-মন্ত্রীর দল সব ছেড়েছুড়ে মন

দিলেন নেপোলিয়নকে ধ্বংস করার একমাত্র কাজে। সমগ্র ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে এল। কিন্তু ফরাসিদেশ তখন রণক্লান্ত আর ছেচল্লিশ বছর বয়সেই নেপোলিয়ন ভেঙে পড়েছেন, তাঁর স্ত্রী মারি লুইও তাঁকে ভুলে গেছেন। প্রথম কয়েকটা যুদ্ধে তিনি জিতলেন বটে, কিন্তু অবতরণের ঠিক একশো দিন পরে ওয়েলিংটন, আর ব্লুশির নায়কত্বে ইংরেজ ও প্রুশীয় সেনাদলের হাতে ব্রুসেল্সের কাছে ওয়াটার্লুতে ঘটল তাঁর চরম পরাজয়। তাঁর ফিরে আসার পর এই 'শতদিন' চিরস্মরণীয়। কঠিন যুদ্ধ হয়েছিল ওয়াটার্লুতে, জয়পরাজয় ছিল বহুক্ষণ অনির্দিষ্ট। নেপোলিয়নের দুরদৃষ্ট! জয়লাভের সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবুও তো কিছুকাল পরে সারা ইউরোপের কাছে তাঁকে হার মানতেই হত। পরাজিত হলে তাঁর পক্ষীয় অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চাইল। আর যুদ্ধ করা বৃথা, অতএব এই দ্বিতীয় বার তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন, আর ফরাসি-বন্দরে দাঁড়ানো এক ইংরেজ-জাহাজে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বললেন, অবশিষ্ট জীবনটুকু তিনি শান্তিতে ইংলন্ডে কাটাতে চান।

কিন্তু ইউরোপ বা ইংলন্ডের কাছ থেকে উদার বা ভদ্র ব্যবহার আশা করা তাঁর পক্ষে ভুল হয়েছিল। তারা তাঁকে বড়ো ভয় করত, আর এল্বা থেকে তাঁর পলায়নের নমুনা দেখেই তারা বুঝেছিল যে তাঁকে খুব সাবধানে এঁটে রাখতে হবে। তাই তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে অল্প কয়েকটি সঙ্গী দিয়ে তাঁকে বন্দীরূপে দক্ষিণ-আটলান্টিকের সুদূর সেন্ট-হেলেনা দ্বীপে পাঠানো হল। 'ইউরোপের বন্দী' বলে তাঁকে গণ্য করা হত, সেন্ট-হেলেনায় তাঁকে চোখে-চোখে রাখার জন্যে একাধিক শক্তি তাদের প্রতিনিধি পাঠাল, কিন্তু আসলে তাঁকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব রইল ইংলন্ডের হাতে। বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন সেই সুদূর দ্বীপেও তাঁকে পাহারা দেবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল ছোটোখাটো একটি সেনাবাহিনী। সে সময়ে সেখানে নিযুক্ত রুশীয় কমিশনার কাউন্ট বাল্মেন সেন্ট-হেলেনার যে অংশে নেপোলিয়ন অবরুদ্ধ ছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন : "বিষাদময়, নিভৃততম, দুর্গম, রক্ষণের পক্ষে খুব অনুকূল, আবার তেমনিই দুরতিক্রম্য, আর অতীব নির্বান্ধব......।" দ্বীপের ইংরেজ শাসনকর্তা ছিল একটা বর্বর, নেপোলিয়নের প্রতি তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অশিষ্ট। দ্বীপের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গায় একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে তাঁকে রাখা হত, নানারকম বিরক্তিকর বিধিনিষেধ চাপানো ছিল তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের উপর। মাঝখানে তাঁর ভালোরকম খাওয়াও জুটত না। ইউরোপের কোনো বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সংবাদ আদানপ্রদান করা বারণ ছিল, এমনকি তাঁর নিজের ছোট্ট ছেলেটি, সমৃদ্ধির সময়ে তিনি যাকে 'রোমের রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন, তার কোনো খবরও তাঁর কাছে পৌঁছত না।

নেপোলিয়নের প্রতি কদর্য ব্যবহার সত্যই আশ্চর্যজনক। কিন্তু সেন্ট-হেলেনার শাসনকর্তা তো তার উপরওয়ালাদের যন্ত্র মাত্র, আর ইংরেজ-সরকারের স্বেচ্ছাকৃত অভিসন্ধিই ছিল বোধ হয় ওঁকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করার। জরাজীর্ণা তাঁর মা সেন্ট-হেলেনায় তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে চাইলে বিশ্বের মহাশক্তিগুলি বলে উঠল, 'না!' এই নীচ ব্যবহার তাঁর প্রতি করা হয় সম্ভবত তিনি ইউরোপে তখনও যেরকম ভীতির সঞ্চার করতেন তারই প্রতিদানস্বরূপ, যদিও তিনি তখন ছিন্নপক্ষ, দুরাবস্থিত এক দ্বীপে অসহায় বন্দী।

সাড়ে-পাঁচ বছর সেন্ট-হেলেনায় তাঁকে এমনি জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। প্রাণোচ্ছল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেই মানুষকে ঐ পাহাড়ে দ্বীপে প্রতিদিনের অপমান-লাঞ্ছনার মধ্যে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর মৃত্যুর পরেও শাসনকর্তার ঘৃণা তাঁর পিছু পিছু চলেছিল, ফলে এক সামান্য কবরে তাঁর স্থান হয়। কিন্তু এই দুর্ব্যবহার-অত্যাচারের কাহিনী যেমন ধীরে ধীরে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল (সে যুগে সংবাদবহনে প্রচুর সময় লাগত), এর বিরুদ্ধে বহু দেশে, এমনকি ইংলন্ডেও তুমুল প্রতিবাদ উঠল। ইংরেজ-বৈদেশিক মন্ত্রী কাস্ল্রি এই অত্যাচারের জন্যে দায়ী বলে জনপ্রিয়তা হারালেন, অবশ্য তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির কঠোরতাও এর অপর এক কারণ। এতে তাঁর প্রাণে এত বেজেছিল যে, তিনি আত্মহত্যা করলেন।

বড়ো বড়ো লোকেদের বিচার করা দুঃসাধ্য। আর, এক দিক থেকে নেপোলিয়ন যে মহৎ ও

অসামান্য ছিলেন তাও নিঃসংশয়ে স্বীকার্য। তিনি ছিলেন প্রাকৃতিক কোনো শক্তির মতোই মৌলিক নানান কল্পনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু সে কল্পনার বা নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যগুলির মূল্য তিনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি। অর্থ দিয়ে, যশ দিয়ে তিনি মানুষকে অভিভূত করবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই শক্তি-সম্মান কমে এলে পর যাদের তিনি এ-যাবৎ সাহায্য করে এসেছেন তাদেরই ধরে রাখবার মতো আর-কোনো আদর্শ রইল না, তাই কাপুরুষের মতো তাঁকে ছেড়েও গেল অনেকে। দীনদরিদ্রের স্বীয় দুর্ভাগ্য নিয়েই তৃপ্ত থাকবার উপায় বলেই তিনি ধর্মকে গণ্য করতেন। খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "সক্রেটিস আর প্লেটোকে যে ধর্ম গোল্লায় পাঠায় তাকে আমি কেমন করে বরণ করি?" মিশরে থাকতে ইসলামধর্মের প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব দেখান, যাতে তাদের জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নিশ্চয় সেইজন্যেই। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে অধার্মিক, কিন্তু তবুও ধর্মকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন, কারণ তাকে তিনি বর্তমান সামাজিক বিধিব্যবস্থার অবলম্বন বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম স্বর্গের সঙ্গে একটা সাম্যের কল্পনা এনে দেয়, তার ফলে দরিদ্রেরা আর ধনীদের উপর অত্যাচার করে না। ধর্মের সার্থকতা রোগে টিকা দেওয়ার মতো। অসাধারণের প্রতি সে আমাদের অন্তরকে কৃতজ্ঞ রাখে, আবার হাতুড়েদের হাত থেকেও সে আমাদের রক্ষা করে। সম্পত্তির অসাম্য ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। আবার ধর্ম ছাড়া এই অসাম্যের অস্তিত্বও থাকে না। যখন একজন চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-তে তৃপ্ত তখনই যদি আর-একজন অনশন-ক্লিষ্ট অবস্থায় থাকে, কোনো পরমশক্তিতে বিশ্বাস রাখলে তবেই সে বাঁচতে পারে; সে বাঁচতে পারে, যদি মনে করে, পরলোকে ভাগ-বাঁটোয়ারা অন্যরকম হবে।" শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, "আকাশ যদি আমাদের ওপর ভেঙে পড়ে, হাতিয়ারের ফলায় তাকে আমরা ধরে রাখব।"

মহাপুরুষের আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর, অনেকের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন বিশ্বস্ততা ও সৌহার্দ্য। আকবরেরই মতো তাঁর দৃষ্টির মধ্যে ছিল আকর্ষণের একটা ক্ষমতা। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, "চোখ দিয়েই আমি যুদ্ধ জয় করেছি, অস্ত্র দিয়ে নয়।" সারা ইউরোপে যিনি বাধিয়ে দিলেন রণতাণ্ডব তাঁর পক্ষে এ উক্তি বিস্ময়কর। আরও পরে নির্বাসিত অবস্থায় তিনি নাকি বলেছিলেন যে, বাহুবলে কোনো ফল হয় না, মানুষের অন্তরের তেজস্বিতা তলোয়ারের চেয়েও বড়ো। তিনি বলতেন, "জানো, সবচেয়ে বেশি আমায় কী অবাক করে দেয়? কোনো-কিছুর সংগঠনে বাহুবলের অক্ষমতা। জগতে মাত্র দুটি শক্তি আছে—মনোবল আর অস্ত্রবল। ধীরে ধীরে অস্ত্রবল হেরে যাবে মনোবলের কাছে।" কিন্তু তাঁর পোষাত না ঐ ধীরে ধীরে কিছু করা। সব-কিছুই তাড়াহুড়ো করে করাই ছিল তাঁর অভ্যাস, আর গোড়ার থেকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন হাতিয়ারের জোরকেই। ঐ হাতিয়ারের জোরেই ঘটেছিল তাঁর উত্থান ও পতন। তিনি এও বলেছিলেন, "এই যুদ্ধ জিনিষটাই অসাময়িক। এমন দিনও আসবে যখন কামান-সঙিন ছাড়াই যুদ্ধ জেতা যাবে।" তাঁর জীবনে গ্রহের ফেরের প্রভাব ছিল অনেক—তাঁর অভ্রংলিহ উচ্চাশা, রণজয়ে সাফল্য, এই 'হঠাৎ বড়ো' লোকটির প্রতি ইউরোপের ঘৃণা ও ভয়, তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেয় নি। যুদ্ধে মানুষের প্রাণকে উৎসর্গ করতে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন; কিন্তু তবুও জানা যায়, কাউকে কষ্টভোগ করতে দেখলে তিনি নাকি অভিভূত হয়ে পড়তেন।

দৈনন্দিন জীবনে তিনি ছিলেন সরল। অতিমাত্রায় কিছুই তিনি করতেন না—কাজ ছাড়া। তাঁর মতে: "মানুষ যত কমই খাক না কেন, খাওয়া তার বড়ো বেশি হয়। অতিভোজনে অসুখ হতে পারে, কিন্তু অল্পভোজনে হয় না।" এই অনাড়ম্বর জীবনই ছিল তাঁর চমৎকার স্বাস্থ্য ও উচ্ছল প্রাণশক্তির উৎস। তিনি যখন খুশি, যেখানে খুশি, যত খুশি ঘুমতে পারতেন, সকালে-বিকালে এক শো মাইল ঘোড়ায় চড়া তাঁর পক্ষে কিছুই ছিল না।

তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন তাঁকে ইউরোপীয় মহাদেশের ওপারে নিয়ে গেল, তিনি ইউরোপকে ভাবতে লাগলেন এক দেশ, এক রাজ্য -রূপে—একই রীতি, একই শাসনের অন্তর্গত। "সব জাতকে আমি একত্রিত করব," সেণ্ট-হেলেনায় নির্বাসন-কালে এই স্বপ্ন তাঁর মনে এসেছিল, কিন্তু তার মধ্যে অহং-ভাবটা আর ছিল না—"আগেই হোক পরেই হোক, এই (ইউরোপীয় জাতিগুলির) ঐক্য ঘটনাচক্রে সাধিত হবেই। তার সূচনা দেখা দিয়েছে; আর আমার শাসনপ্রণালীর অবসানে এ

সম্ভব হতে পারে একমাত্র একটি মহাজাতি-সভা বা 'লীগ অব্ নেশন্‌স্'-এর সাহায্যে।" তার পরে এক শো বছর কেটে গেছে, ইউরোপ আজও পরীক্ষা চালাচ্ছে 'লীগ অব্ নেশন্‌স্' নিয়ে।

তাঁর যে ছেলেকে তিনি 'রোমের রাজা' নাম দিয়েছিলেন, যার সংবাদ তাঁর কাছ থেকে নিষ্ঠুরভাবে চেপে রাখা হত, তার জন্যে তিনি এক শেষ দলিল লিখে রেখে যান। তাঁর বড়ো আশা ছিল তাঁর ছেলেই একদিন রাজা হবে, তাই তাঁকে তিনি লিখে গিয়েছিলেন শান্তিতে শাসন চালাতে, হিংসার পথ যেন সে অবলম্বন না করে। "অস্ত্র দিয়ে ইউরোপকে ভয় দেখাতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু আজকের পন্থা হচ্ছে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে জয়লাভ।" কিন্তু ছেলের অদৃষ্টে ছিল না রাজ্যশাসন। পিতার মৃত্যুর এগারো বছর পরে যৌবনেই সে ভিয়েনা-শহরে মারা যায়।

কিন্তু এসব চিন্তা তাঁর মনে আসে পরে, নির্বাসিত অবস্থায়। তখন তিনি অনেক সংযত হয়েছেন, আর তা ছাড়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় ভাবীকালের মানুষদের প্রভাবিত করা। তাঁর প্রতিপত্তির দিনে তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, দার্শনিক হবার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর পূজা ছিল শক্তির বেদিমূলে; তাঁর একমাত্র প্রকৃত ভালোবাসা ছিল শক্তির প্রতি—সে ভালোবাসা রুক্ষ নয়, শিল্পীমনের প্রকাশ ছিল তাতে। "আমি ভালোবাসি শক্তি," তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু শিল্পীর মতো, যেমন বীন্‌কার তার বীণাকে ভালোবাসে, সুর তান প্রকাশ করবার জন্যে। কিন্তু অতিমাত্রায় শক্তির সাধনা বিপজ্জনক, তার সাধক পুরুষ বা জাতির এক সময়ে ঠিক পতন হবেই।" কাজেই নেপোলিয়নের পতন হল, বোধ হয় ভালোই হল।

ইতিমধ্যে ফরাসিদেশে চলে বুরবোঁ-রাজত্ব। কিন্তু একটি উক্তি প্রচলিত আছে যে, বুরবোঁরা কোনোদিন কিছু শেখে নি, তাই ভোলেও নি কিছু। নেপোলিয়নের মৃত্যুর নয় বছর পরে, ফ্রান্স অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সরিয়ে দিল। আর-এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল, আর নেপোলিয়নের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভেঁদোম-স্তম্ভ থেকে অপসৃত তাঁর মূর্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। তাঁর দুঃখিনী জরাজীর্ণা দৃষ্টিহীনা মা তখন বলেছিলেন, "আবার সম্রাট ফিরে এসেছেন প্যারিসে।"

১০৬

বিশ্ব-আলোচন

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩২

এতদিন কর্তৃত্বের পর জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হল নেপোলিয়নকে। তার পর এক শো বছরেরও বেশি কেটে গেছে, পুরোনো বিবাদ-বিসংবাদের ঝড়ে যে ধুলো উড়ছিল তা আবার মাটিতে থিতিয়ে গেছে। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর সম্বন্ধে আজও লোকের মতভেদ ঘোচে নি। হয়তো অধিকতর শান্তিময় অন্য কোনো যুগে নেপোলিয়নের জন্ম হলে তিনি কেবল সেনাপতি বলেই পরিচিত হতেন, চিরকাল হয়তো অলক্ষ্যেই রয়ে যেতেন সবার। কিন্তু বিপ্লব আর পরিবর্তন, এগুলিই তাঁকে সুযোগ দিয়েছিল জোর করে এগিয়ে যাবার, সে সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেন নি। তাঁর পতন ও ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে অন্তর্ধানের পর ইউরোপবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল নিশ্চয়, যুদ্ধের প্রতি তাদের তখন এমনি বিতৃষ্ণা! পুরো একপুরুষ ধরে তারা শান্তির মুখ দেখে নি, তাই শান্তিই ছিল তখন তাদের একমাত্র কাম্য। ইউরোপের রাজামহারাজারাই স্বস্তি অনুভব করল সবচেয়ে বেশি, নেপোলিয়নের নামে যারা এতকাল ছিল থরহরি-কম্পমান।

বহুদিন ধরে তো ফ্রান্স আর ইউরোপেই কাটালাম, এখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা বেশ এগিয়ে গেছি। একবার পৃথিবীটা ঘুরে দেখে আসি, নেপোলিয়নের পতনের পর তার আকার কীরকম হয়েছে।

তোমার মনে পড়বে, ইউরোপে তখন পুরোনো রাজারা ও তাঁদের মন্ত্রীর দল ভিয়েনার সম্মিলনে সমবেত। যাঁকে তাঁদের ভয় তিনিই আর নেই; আবার তাঁরা পুরোনো খেলায় মাততে পারেন, লক্ষকোটি মানুষের ভাগ্যনির্ধারণ করতে পারেন তাঁদের খেয়ালখুশি অনুসারে। জনসাধারণ কী চায় তা জেনে কী যায়-আসে? কী আসে-যায় দেশের প্রাকৃতিক ও ভাষানুযায়ী সীমারেখা কীভাবে হওয়া উচিত তা জেনে? রুশদেশের জার, ইংলণ্ড (প্রতিনিধি—কাস্‌ল্‌রি), অস্ট্রিয়া (প্রতিনিধি—মেতের্নিশ) ও প্রাশিয়া, এঁরাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক। আর তা ছাড়া চতুর, সুরসিক, জনপ্রিয় তালির‍াঁ তো ছিলই—অতীতে নেপোলিয়নের মন্ত্রী, পরে বুরবোঁ-রাজার। নৃত্যগীত-পানাহারের মধ্যে এঁরা নেপোলিয়নের দ্বারা আমূল-পরিবর্তিত ইউরোপের মানচিত্রকে আবার নূতন ছাঁচে ঢালাই করতে লাগলেন।

বুরবোঁ অষ্টাদশ লুইকে আবার ফরাসিদেশের উপর চাপানো হল। স্পেনে 'ইন্‌কুইজিশন' হল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। ভিয়েনার মহাসভায় সমাগত রাজন্যদের পছন্দ হত না গণতন্ত্র, তাই হল্যাণ্ডে তাঁরা আর প্রাচীন ওলন্দাজ-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন না। পরিবর্তে তাঁরা 'নেদারল্যাণ্ড্‌স্' নাম দিয়ে হল্যাণ্ড আর বেলজিয়মকে করলেন একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। স্বতন্ত্র রাজ্য পোল্যাণ্ডকে গ্রাস করল প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ও প্রধানত রাশিয়া। ভেনিস ও উত্তর-ইতালি গেল অস্ট্রিয়ার কবলে। সুইজারল্যাণ্ড ও রিভিয়েরার মধ্যে ইতালি ও ফ্রান্সের এক-এক খণ্ড করে মিলিয়ে স্থাপিত হল সার্ডিনিয়া-রাজ্য। মধ্য-ইউরোপে এক অদ্ভুত জর্মন-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল বটে, তবে তার শীর্ষে রইল প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া। অন্যান্য অনেক পরিবর্তনও সাধিত হল। তাই ভিয়েনা-মহাসভার পণ্ডিতেরা এখানে-সেখানে জনগণকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে বিজাতীয় এক-এক ভাষা ব্যবহার করাতে লাগলেন, অর্থাৎ পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহের বীজ বপন করা হল।

১৮১৪-১৫ অব্দ ব্যাপী ভিয়েনার মহাসম্মেলনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, নৃপতিবর্গের নিরাপত্তা-রক্ষা। ফরাসি-বিপ্লব এনে দিয়েছিল তাদের প্রাণের ভয়। রাজারা এবার নির্বোধের মতো ভাবল, বিপ্লবী মতবাদের বিস্তারকে তারা বন্ধ করতে পারবে। রাশিয়ার জার, অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রাশিয়ার অধিপতি এক 'পুণ্য সন্ধি'র প্রতিষ্ঠা করলেন নিজেদের ও অন্যান্য নরপতিদের নিরাপদে রাখবার জন্যে। দেখে মনে হয় যেন চতুর্দশ কি পঞ্চদশ লুইয়ের সময়ে আমরা ফিরে এসেছি। সারা ইউরোপে, এমনকি ইংলণ্ডেও সকল স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধের চেষ্টা। ইউরোপের প্রাগ্রসর জনগণ কতই-না-জানি কষ্ট অনুভব করেছিল জেনে যে, ফরাসি-বিপ্লবের এত দুঃখসহন বৃথাই গেছে!

পূর্ব-ইউরোপে তুরস্কদেশ তখন অতিমাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তুর্কি-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়েও মিশর তখন অর্ধস্বাধীন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীস বিদ্রোহ ঘোষণা করল তুরস্কের বিরুদ্ধে, আর আট বছর যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহায্যে অর্জন করল তার স্বাধীনতা। এই যুদ্ধেই গ্রীসের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ইংরেজ কবি বায়রনের মৃত্যু হয়। গ্রীসের উদ্দেশে তাঁর সুন্দর কয়েকটি কবিতা আছে, জানো বোধ হয়।

১৮৩০ অব্দে ইউরোপে আরও দুটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। বুরবোঁদের অত্যাচারে নিপীড়িত ফরাসিদেশ আবার তাদের তাড়িয়ে দিল। কিন্তু গণতন্ত্রের পরিবর্তে এলেন আর-এক নূতন রাজা। এঁর নাম লুই ফিলিপ। এঁর ব্যবহার ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো, কতকটা প্রজাদের মতামত নিয়েই চলতেন। ১৮৪৮ পর্যন্ত রাজত্ব করতে তিনি সমর্থ হলেন, তার পরে ঘটল আর-একটি বৃহত্তর অসন্তোষের অভিব্যক্তি।

১৮৩০ সালে বেলজিয়মেও বিদ্রোহ ঘটল, ফলে হল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের বিচ্ছেদসাধন। গণতন্ত্র-স্থাপনে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির ছিল তীব্র অমত, তাই এক জর্মন 'প্রিন্স্'কে বেলজিয়মের সিংহাসনে বসানো হল। আর-একজন হলেন গ্রীসের রাজা। জর্মনির প্রদেশগুলিতে এইসব প্রিন্সদের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, কোনো সিংহাসন খালি হলেই তাঁদের মেলে। ইংলণ্ডের বর্তমান রাজবংশও যে জর্মনির হ্যানোভার-বংশ থেকে উদ্ভূত তা তুমি জানো।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দকে ইউরোপীয় বিদ্রোহের বছরই বলা চলে—জর্মনি, ইতালি, পোল্যাণ্ড, সর্বত্রই বিদ্রোহ। কিন্তু রাজারা তাদের দমন করে ফেললেন। রুশীয়রা পোল্যাণ্ডে অত্যাচার করল

নিষ্ঠুরভাবে, পোলিশভাষার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হল। ইউরোপে ১৮৪৮ অব্দে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, ১৮৩০ হয়ে রইল তারই ভূমিকাস্বরূপ।

এই তো গেল ইউরোপের কথা। আটলাণ্টিকের ওপারে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমে ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করছিল। ইউরোপীয় রেষারেষি ও যুদ্ধবিবাদের থেকে তফাতে নিজেদের অধিকারে অপর্যাপ্ত ভূখণ্ড পেয়ে সে প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল ইউরোপের সমকক্ষ হতে। দক্ষিণ-আমেরিকায় ঘটছিল বহু পরিবর্তন, একে নেপোলিয়নের পরোক্ষ-ক্রিয়া বলা যেতে পারে। নেপোলিয়ন স্পেন জয় করে যখন নিজের ভাইকে সিংহাসনে বসান, দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করেছিল। এমনি করে প্রাচীন স্পেনীয় রাজবংশের প্রতি উপনিবেশবাসীদের এই ভক্তিই তাদের স্বাধীনতার সুযোগ এনে দেয়। তবে এ হল আকস্মিক কারণ—আসলে কিছুদিন পরে হলেও এ বিদ্রোহ বাধত; কারণ, দক্ষিণ-আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এই মুক্তিরণের বীর নেতা সাইমন বলিভার অভিহিত হয়েছিলেন 'মুক্তিপথপ্রদর্শক' বলে। তাঁরই নামানুসারে দক্ষিণ-আমেরিকার 'বলিভিয়া'-রাষ্ট্রের নাম। নেপোলিয়নের পতনের পরে স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্পেনীয় আমেরিকা চালাল তার সংগ্রাম, নেপোলিয়ন সরে গেলেও থামল না তা, সমভাবেই চলল নূতন স্পেনের বিরুদ্ধে অনেক বছর ধরে। এই বিদ্রোহীদের দমন করতে কোনো কোনো ইউরোপীয় রাজা প্রতিবেশী স্পেনকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্যের ব্যাপারে মাথা-ঘামানো একদম থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র। তার তৎকালীন সভাপতি মনরো ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, আমেরিকার যে-কোনো অংশে যদি তারা হস্তক্ষেপ করে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়তে হবে তাদের। এতে ভয় পেয়ে গেল ইউরোপীয় শক্তিগুলি, আর তার পর থেকে বরাবরই তারা দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে দূরেদূরেই থেকেছে। সভাপতি মনরোর এই ভীতিপ্রদর্শন ইতিহাসে 'মনরো নীতি' নামে খ্যাত হয়ে আছে। ইউরোপের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে দক্ষিণ-আমেরিকাকে স্বীয় পক্ষপুটে বহুদিন রক্ষা করে এসেছে, বাড়বার সুযোগ দিয়েছে এ। ইউরোপের কাছ থেকে দক্ষিণ-আমেরিকা রক্ষা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রক্ষকটির হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে কেউই ছিল না—অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে। আজ যুক্তরাষ্ট্রই দক্ষিণ-আমেরিকাকে শাসন করে চলেছে, আর ক্ষুদ্রতর গণতন্ত্রগুলির অধিকাংশই সম্পূর্ণ তার হাতের মুঠোয়।

সুবৃহৎ দেশ ব্রেজিল ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। এও স্পেনীয় আমেরিকার সম-সময়েই স্বাধীন হয়েছিল। অতএব ১৮৩০ অব্দে সমগ্র দক্ষিণ-আমেরিকাই ইউরোপের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেল। উত্তর-আমেরিকায় অবশ্য কানাডা ছিল ইংরেজের হাতে।

এবার এশিয়ায় একবার ঘুরে যাই। ভারতবর্ষে ইংরেজের এখন একাধিপত্য। ইউরোপে যখন নেপোলিয়ন-ঘটিত যুদ্ধগুলি চলছিল ইংরেজ তখন এখানে দৃঢ় করে তাদের স্থান গড়ে নিয়েছে, যবদ্বীপেও বিস্তার করেছে প্রভুত্ব। মহীশূরের টিপু সুলতান পরাস্ত হলেন, ১৮১৯ অব্দে মারাঠা-শক্তির ঘটল চরম পরাজয়। পাঞ্জাবে কিন্তু তখনও শিখ-অধিকার, রণজিৎসিংহের নেতৃত্বে। সারা ভারত জুড়ে ইংরেজরা অগ্রসর হচ্ছিল ধীরে ধীরে। পূর্বাঞ্চলে আসাম অধিকৃত হল, আরাকান ও ব্রহ্মদেশ প্রস্তুত হয়ে রইল পরবর্তী গ্রাসের জন্যে।

ভারতে যখন ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তার করছে, মধ্য-এশিয়ায় তখন আর-একটি ইউরোপীয় শক্তির প্রসার হচ্ছিল—সে রুশদেশ। চীন ও পূর্বাঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল স্পর্শ করেছিল তার অধিকার। এ দিকেও মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্য দিয়ে আফগানিস্থানের সীমান্তে এসে সে উপস্থিত। ভারতের ইংরেজ-শক্তি এই দৈত্যের আগমনে শঙ্কিত হয়ে অকারণে আফগানিস্থানের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসল। কিন্তু এতে তাদের ক্ষতি হল বিস্তর।

চীনের শাসনভার ছিল মাঞ্চুদের হাতে। বিদেশ থেকে ধর্ম বা বাণিজ্য উপলক্ষ্য করে কেউ এলেই এরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখত, চেষ্টা করত বাইরে রাখবার জন্যে। কিন্তু বিদেশীরা এর প্রবেশদ্বারে খুব হৈ-হল্লা চালাল, বিশেষ করে আফিমের ব্যবসা যাতে বেশ ভালো চলে তারই জন্যে সেটাকে তারা খুব উৎসাহ দিতে লাগল। ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যের অধিকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছিল একচেটিয়া। চীন-সম্রাট আফিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে আদেশ দিলেন,

কিন্তু তলে তলে চলল গোপন অন্যায় ব্যবসা বিদেশীদের কারসাজিতে। ফলে হল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ। তার 'আফিমের যুদ্ধ' এ নাম ঠিকই হয়েছিল, ইংরেজরা জোর করে চীনাদের আফিম ধরাল।

১৬৩৪ অব্দে জাপানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কাহিনী তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভেও সকল বিদেশীর কাছে সে রুদ্ধই ছিল। কিন্তু এই বেড়ার মধ্যে প্রাচীন শোগান-বংশ দুর্বল হয়ে এসেছিল, তাই নূতন যুগধর্ম জাগ্রত হয়ে পুরোনোর অবসানের সূচনা করছিল। আরও দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপীয় শক্তিগুলি এক-এক করে সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার করে নিচ্ছিল। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ তখনও স্পেনের অধিকারে। ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভিয়েনার মহাসভার পর ওলন্দাজেরা যবদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপগুলি ফিরে পেল। সিংগাপুর ও মালয়-উপদ্বীপে ইংরেজ স্বীয় শক্তি প্রসারিত করতে ব্যস্ত, ও দিকে চীনের কাছে মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন পাঠানো সত্ত্বেও আনাম, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ তখনও স্বাধীন।

ওয়াটার্লু থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ, এই পনেরো বছরের মধ্যে এই ছিল মোটামুটি পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা। ইউরোপই যে পৃথিবীর প্রভুরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল, এ কথা নিশ্চিত। ইউরোপেও প্রতিক্রিয়ারই জয় হল। সম্রাটেরা, রাজারা, এমনকি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টও মনে করল, সমস্ত স্বাধীন মতামতকে তারা চূর্ণ করেছে। এই মতগুলিকে তারা বোতলে পুরে আটকে রাখতে চেয়েছিল। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা অকৃতকার্য হল, বারংবার ঘটতে লাগল বিদ্রোহ।

রাজনৈতিক পরিবর্তনই এই ঘটনাচক্রের নিয়ন্তা বলে মনে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের বিপ্লব বা 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে'র সঙ্গে উৎপাদন বিতরণ ও যানবাহনের রীতিতে যে ঘোর বিপ্লব বেধেছিল তার প্রাধান্য ঢের বেশি। নিঃশব্দে অথচ অদম্যভাবে এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকায়, লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আনছিল পরিবর্তন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্বন্ধও যাচ্ছিল বদলে। যন্ত্র-ঘর্ঘরের মধ্য হতে আবির্ভূত হচ্ছিল নব নব কল্পনার, নূতন এক জগতের হচ্ছিল সৃষ্টি। ইউরোপ ক্রমেই নিপুণ ও ভয়ংকর, ক্রমেই লোভী ও রাজকীয় এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিল, যেন তার হাওয়ায় মেশা নেপোলিয়নের তেজ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর এক মনোভাবেরও সৃষ্টি হচ্ছিল ইউরোপেই।

এ যুগের সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, তারাও মানুষের মনকে মুগ্ধ করে। তবে, আর আমার কলমকে আমি ছুটে চলতে দিতে পারি না। আজকের কাজ সে যথেষ্ট করেছে।

১০৭

মহাসমরের পূর্বের শতবর্ষ

২২শে নভেম্বর, ১৯৩২

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতন হল। পরের বছরে এল্‌বা থেকে ফিরে আবার তাঁর পরাজয় ঘটেছিল বটে, কিন্তু তাঁর শাসনপ্রণালী ১৮১৪ অব্দেই ধ্বসে পড়েছিল। আর ঠিক এক শো বছর পরে ১৯১৪ সালে বাধল মহাযুদ্ধ, চার বছর ধরে জগৎ জুড়ে ঘটল ভীষণ ধ্বংসলীলা। এই একশোটি বছর আমাদের সবিশেষ পর্যালোচনা করতে হবে। গত পত্রেই এ যুগের কিছু আভাস আমি তোমাকে দিয়েছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে খণ্ড খণ্ড করে এ যুগটি আলোচনা করার আগে একটা পূর্ণাঙ্গ আভাস গ্রহণ করায় উপকার হবে বলেই মনে করি। এতে এই শত বর্ষের ঘটনাবলীর প্রধান ধারাটাকে অনুসরণ করা যাবে—তরুলতাগুলি তো দেখা যাবেই, পুরো অরণ্যটিও বাদ পড়বে না।

১৮১৪ থেকে ১৯১৪, এই এক শো বছর জানোই তো প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই পড়ে। অতএব ঠিক না হলেও একে আমরা উনবিংশ শতকই বলব।

ঊনবিংশ শতাব্দী একটি চমৎকার যুগ। কিন্তু এর আলোচনা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। বিরাট দৃশ্যপট এটি, আমরা এর এত কাছে বলেই হয়তো একে বৃহত্তর ও পূর্ণতর বোধ হয় আগের শতাব্দীগুলির তুলনায়। এই সহস্র গ্রন্থির জট যখন আমরা ছাড়াতে চেষ্টা করব তখন এই বিপুলতা, এই জটিলতা সময়ে সময়ে আমাদের অবাক করে দেবে।

যান্ত্রিক অগ্রগতি এই শতাব্দীতেই দ্রুততম। শ্রমশিল্পের বিপ্লব সঙ্গে নিয়ে এল যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবকে, মানুষের জীবনে যন্ত্র অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল। পূর্বে মানুষ যা করত এখন যন্ত্রই সেগুলি করতে লাগল, ফলে কাজ করার দরুণ একঘেয়ে শ্রমের লাঘব হল, প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর তার নির্ভরশীলতা দিল কমিয়ে, এমনকি অর্থও আনতে লাগল তার ঘরে। বিজ্ঞানের সাহায্যে যানবাহন-সমস্যা দ্রুত সরলতর হয়ে আসতে লাগল। রেলপথ এসে হটিয়ে দিল পুরোনো ঘোড়ার গাড়িকে। পাল-তোলা জাহাজের জায়গা জুড়ে নিল কলের জাহাজ, আর তার পরে এল বিরাট অর্ণবপোত—বিপুল, উত্তুঙ্গ—মহাদেশ থেকে মহাদেশে তারা দ্রুতবেগে ও যথানিয়মে পাড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগল। শতাব্দীর শেষ ভাগে এল কলের গাড়ি, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল হাওয়াগাড়ি—'মোটর-কার'; আর সবশেষে বিমানপোত। আবার এমনি সময়েই মানুষ আর-এক নূতন বিস্ময়কে ব্যবহার ও অধিকার করতে লাগল—তড়িৎশক্তি; আবির্ভূত হল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। পৃথিবীর রূপ আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল এর ফলে। যানবাহনের উন্নতি ও মানুষের যাত্রা সুগম ও দ্রুত হওয়ার ফলে পৃথিবী যেন সংকুচিত হয়ে ছোটো হয়ে গেল। আজ আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, খুব কমই ভাবি এদের কথা। কিন্তু এসব উন্নতি, এই পরিবর্তন আমাদের পৃথিবীতে নবাগত, গত এক শো বছরের মধ্যেই তাদের জন্ম হয়েছে।

এ শতাব্দী ইউরোপের শতাব্দী, অথবা পশ্চিম-ইউরোপের শতাব্দী, বিশেষত ইংলণ্ডের। সেখানে শ্রমশিল্পের ও যন্ত্রশিল্পের হয়েছিল সূচনা ও প্রসার, পশ্চিম-ইউরোপের অগ্রগতিতে তা অনেক সাহায্য করল। নৌশক্তি ও বাণিজ্যে ইংলণ্ডই ছিল সবার উপরে, কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি তার সমকক্ষ হয়ে উঠল। এই যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র উন্নত হল, রেলপথ চলল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি, বিরাট দেশটিকে করে তুলল ঐক্যবদ্ধ এক জাতি। নিজেদের নানা সমস্যা ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তারা এত ব্যস্ত ছিল যে ইউরোপ ও পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে পেরে উঠল না। গত চিঠিতে 'মনরো নীতি' সম্বন্ধে তোমাকে তো কিছু শুনিয়েছি। মনরোর সেই বাণী ইউরোপের লোলুপ দৃষ্টির থেকে দক্ষিণ-আমেরিকাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে বলা হয় 'লাতিন-রাষ্ট্র', কারণ স্পেন ও পর্তুগালবাসীরা এদের প্রতিষ্ঠাতা। আর ফ্রান্স, ইতালি এবং এই দুটি দেশ হচ্ছে ইউরোপের 'লাতিন জাতি'। ইউরোপের উত্তর-ভাগের দেশগুলি আবার 'টিউটন জাতি'; ইংরেজ টিউটন জাতির অ্যাংলো-স্যাক্সন শাখা। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রথম ঔপনিবেশিকেরা এই অ্যাংলো-স্যাক্সন শাখা থেকেই উৎপন্ন, যদিও পরে সকল দেশের লোকেই ওখানে গিয়েছে।

বাণিজ্যশিল্প ও যন্ত্রশিল্পে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ তখনও ছিল পিছিয়ে, পশ্চিমের নবীন যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিতে তারা তখন অক্ষম। পুরোনো কুটিরশিল্পের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি ও সুপ্রচুর পরিমাণে মালপত্র তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এই তৈরি করায় লাগে কাঁচা মাল, আর পশ্চিম-ইউরোপে তার অল্পই পাওয়া যায়। তা ছাড়া তৈরি হওয়ার পরে তাদের বিক্রি করতে হবে, সেজন্যে চাই বাজার। সুতরাং পশ্চিম-ইউরোপকে সন্ধান করে বেড়াতে হল এমন দেশের যারা কাঁচা মালও জোগাবে, আর উৎপন্ন দ্রব্যাদিও কিনবে। এশিয়া আর আফ্রিকা ছিল দুর্বল, ইউরোপ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেমন করে বাজপাখি ধরে তার শিকার। এই সাম্রাজ্যের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড তার নৌশক্তি ও বাণিজ্যশক্তির ফলে সহজেই প্রথম হয়ে গেল।

তোমার স্মরণ থাকবে, ইউরোপের চাহিদা মেটানোর জন্যে মশলা ও অন্যান্য বস্তু কিনবার উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয়েরা ভারত এবং প্রাচ্যে প্রথম আসে। এমনি করে প্রাচ্যের মাল চলত ইউরোপে ও প্রাচ্যদেশের তাঁতে-বোনা বহু জিনিষ চলত পশ্চিমে। কিন্তু এখন যন্ত্রযুগের

সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল পাল্টে। পশ্চিম-ইউরোপের শস্তা মাল এল প্রাচ্যদেশে, ভারতের সুপ্রাচীন কুটিরশিল্প ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইচ্ছে করে নষ্ট করল, যাতে বিলিতি মালের ব্যবসার উন্নতি হয় এ দেশে।

বিশাল এশিয়ার উপর বসে রইল ইউরোপ। উত্তরে রুশ-সাম্রাজ্য সমগ্র মহাদেশ জুড়ে এগুতে লাগল। দক্ষিণের সব-সেরা রত্নটির উপর কঠিন মুঠি চেপে রাখল ইংলণ্ড—সে রত্ন ভারতবর্ষ। পশ্চিমে তুর্কি-সাম্রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা, তুরস্ককে বলা হত 'ইউরোপের রোগী'। পারশ্য নামেমাত্র স্বাধীন হয়ে রইল ইংলণ্ড ও রুশদেশের কবলে। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার সর্বাংশই, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ ইউরোপ শোষণ করে নিল, বাকি রইল কেবল শ্যামদেশের একাংশ। সুদূর পূর্বে চীনদেশের দিকে সমস্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলি ছোঁ মারছিল, একটির পর একটি স্বীকৃতি তার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নেওয়া হচ্ছিল। একমাত্র জাপান খাড়া দাঁড়িয়ে ইউরোপের সমশক্তিরূপে তার মুখোমুখি হল। তার নিভৃত আবাস থেকে বেরিয়ে এসে নূতন যুগধর্মের সঙ্গে নিজেকে সে আশ্চর্যরকম তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিয়েছিল।

মিশর বাদে আফ্রিকার বাকি অংশ ছিল পিছিয়ে। ইউরোপকে সে বিশেষ কোনোরকম বাধা দিতে পারল না। তাই সাম্রাজ্যের জন্যে এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় ইউরোপের শক্তিগুলি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। ইংলণ্ড অধিকার করে নিল মিশর, কারণ ও দেশটি ভারতে যাবার পথেই পড়ে আর ব্রিটিশ নীতির প্রধান আকাঙ্ক্ষা হল ভারতবর্ষে স্বীয় অধিকার বজায় রাখা। ১৮৬৯ অব্দে সুয়েজখাল কাটা হল, এতে ইউরোপের পক্ষে ভারতবর্ষ আরও সুগম হয়ে এল। এর ফলে ইংলণ্ডের কাছে মিশরের মূল্যও গেল বেড়ে, কারণ মিশরের হাত ছিল এই খালের ব্যাপারে, ভারতে যাবার সমুদ্রপথ ছিল তারই নিয়ন্ত্রণে।

সুতরাং এই যন্ত্রবিপ্লবের পরিণামরূপে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবী জুড়ে, সর্বত্রই কর্তৃত্ব রইল ইউরোপের। আর, ধনতন্ত্রের ফল হল সাম্রাজ্যবাদ। তাই এই শতকটিকে 'সাম্রাজ্যবাদী শতাব্দী' বলা চলে। কিন্তু এই নূতন যুগটির সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন রোম, চীন, ভারত, আরবীয়, বা মঙ্গোলদের সাম্রাজ্যবাদ থেকে অনেক পৃথক। এ সাম্রাজ্য এক নূতন ধরনের, কাঁচা মাল ও বাজার, এই এদের একমাত্র কাম্য। নূতন শ্রমশিল্পবাদেরই সন্তান এই নূতন সাম্রাজ্যবাদ। সেকালে বলা হত, 'বাণিজ্য পতাকার অনুসরণ করে', আর অনেক সময় বাইবেলের অনুসরণ করেছে এই পতাকা। ধর্ম বিজ্ঞান দেশপ্রেম, সব-কিছুরই ঐ এক উদ্দেশ্য হল—বাণিজ্যশিল্পে যারা পশ্চাৎপদ, যারা দুর্বল, তাদের দূর করে দিয়ে যন্ত্রের প্রভুরা, কোটিপতিরা দিন দিন অর্থবৃদ্ধি করবেন। সত্য ও প্রেমের নামে খৃষ্টান মিশনারিরা গিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি গাড়ত আর তাদের কোনো অনিষ্ট হলেই তাদের দেশবাসীরা দেশ-জয়ের পেত বিপুল সুযোগ।

শ্রমশিল্প ও সভ্যতার পিছনে এই ধনতান্ত্রিক দল সহজেই সাম্রাজ্যবাদের কোঠায় পা দিল; আবার এই ধনতন্ত্রই পথ দেখাল মানুষের মনে নিবিড়ভাবে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত হওয়ার; তাই এই শতাব্দীটিকে 'জাতীয়তাবাদী শতাব্দী' আখ্যাও দেওয়া যায়। এই জাতীয়তাবাদ কেবল স্বদেশের প্রতি প্রেম নয়, অন্য সকলের প্রতি ঘৃণাও এর অঙ্গ। নিজের ভূখণ্ডটুকুকে মহাগৌরবমণ্ডিত করে অন্যের অংশের প্রতি সঘৃণ দৃষ্টিপাতের পরিণাম যে হবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘাত ও সংগ্রাম, এ অবশ্যম্ভাবী। শ্রমশিল্পে ও সাম্রাজ্যবাদে নানা ইউরোপীয় রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একে আরও ঘোরালো করে তুলল। ১৮১৪-১৫ সালে ভিয়েনার মহাসভায় নির্ধারিত ইউরোপের মানচিত্র হল আর-এক বিরক্তির বস্তু। এই মানচিত্র অনুসারে কতকগুলি দেশকে দমন করে, বলপূর্বক অন্যের কবলে রাখা হয়েছিল। পোল্যাণ্ড জাতি হিসাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বিবেচনাশূন্যরূপে নির্বাচিত এক সাম্রাজ্য, তাতে নানা জাতির লোক পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপে বল্কান-উপদ্বীপে তুর্কি-সাম্রাজ্যে বহু লোক ছিল যারা জাতিতে তুর্কি নয়। ইতালিকে খণ্ডে খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল, তার কয়েক খণ্ড ছিল অস্ট্রিয়ার অধিকারে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বারবার ইউরোপের এই আকৃতি বদলাবার চেষ্টা হতে লাগল। গত

চিঠিতে ভিয়েনা-সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পরে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের উল্লেখ করেছি। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইতালি, উত্তরে অস্ট্রিয়া ও মধ্যে পোপের অধিকার থেকে নিজেকে মুক্ত করল, পরিণত হল একজাতিরূপে। এর পরেই আবার ঘটল প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জর্মানির ঐক্যবন্ধন। জর্মানির হাতে ফরাসিদেশের ঘটল বিষম পরাভব ও লাঞ্ছনা। তার দুটি সীমান্তদেশ আলসাস আর লোরেন কেড়ে নেওয়া হল। সেদিন থেকে তার চিন্তা হল, কী করে 'রেভাঁশ' (প্রতিশোধ) নেওয়া যায়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই নেওয়া হয়েছিল শোণিতাপ্লুত এক ভীষণ প্রতিশোধ।

ইংলণ্ড তার প্রাধান্যের সুযোগের ফলে ছিল সবচেয়ে ভাগ্যবান। লোভনীয় সব কিছুই পড়েছিল তারই ভাগে, যা পেয়েছিল তাই নিয়েই সে ছিল তৃপ্ত। নূতন ধরনের এই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আদর্শ ছিল ভারতবর্ষ, তাকে জয় করার ফলে তার থেকে এক সোনার প্রস্রবণ অশ্রান্তধারায় বয়ে চলেছিল ইংলণ্ডের দিকে। অন্যসমস্ত সাম্রাজ্যস্থাপনোন্মুখ দেশগুলি ইংলণ্ডকে ঈর্ষা করত তার এই ভারতাধিকারের জন্যে। অন্য কোথাও তারা এই ভারতবর্ষের আদর্শে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। ফরাসিরা কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য হয়েছিল, জর্মনরা বড়ো দেরি করে ফেলেছিল বলে তাদের ভাগে আর ছিল না বিশেষ কিছুই। কাজেই সারা পৃথিবী জুড়ে চলছিল এই রাজনৈতিক সংঘাত। বৃহত্তর ভূখণ্ড-গ্রাসের প্রয়াসী ইউরোপের এই মহাশক্তিদের প্রত্যেকটিই তার ফলে নিজেদেরই মধ্যে লাগাচ্ছিল গোলমাল। বিশেষ করে ইংরেজ ও রুশীয়দের মধ্যে বারবার বাধছিল ঝগড়া, কারণ মধ্য-এশিয়া থেকে ইংলণ্ডের এত সাধের ভারতবর্ষ অধিকার করবার সম্ভাবনা ছিল রুশীয়দের। তাই রুশদেশের অগ্রগতিকে সংযত করার দিকে ইংলণ্ড ছিল সদাসতর্ক। এই শতকের মাঝামাঝি রুশদেশ যখন তুরস্ককে হারিয়ে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ প্রত্যাশা করছিল, ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষে যোগ দিয়ে রুশীয়দের হটিয়ে দিয়েছিল। তুরস্কের প্রতি ভালোবাসা ছিল বলে ইংলণ্ড এ কাজ করে নি, করেছিল ভারতবর্ষ-হারানোর ও রুশদের ভয়ে।

ইংলণ্ডের বাণিজ্যঘটিত শ্রেষ্ঠতা ক্রমেই কমে আসতে লাগল, জর্মানি ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র তার কাছে ঘেঁষে আসবার সঙ্গে সঙ্গে। শতাব্দীর শেষ দিকে এল চরম বোঝাপড়ার অবস্থা। এইসব ইউরোপীয় শক্তির বিপুল উচ্চাশা রাখবার মতো স্থান এই ছোট্ট পৃথিবীটুকুতে ছিল না। প্রত্যেকে পরস্পরকে করত ভয়, ঘৃণা, হিংসা; আর সেইজন্যে প্রত্যেকেই অন্যের চেয়ে বেশি সৈন্য ও রণপোত তৈরির চেষ্টা করতে লাগল। এই ধ্বংসের যন্ত্র-নির্মাণে চলল ভীষণ প্রতিযোগিতা। অন্য দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হতে লাগল, শেষে ইউরোপে এইরকম দুটি মিত্রশক্তি পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল—একটির নায়ক ফরাসিদেশ, ইংলণ্ডও একে গোপনে সাহায্য করত; আর-একটির পুরোভাগে জর্মানি। ইউরোপ হল এক রণশিবির। শ্রমশিল্পে, বাণিজ্যে, অস্ত্রশস্ত্রে চলল আরও ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। আর প্রত্যেকটি পাশ্চাত্যদেশে এক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ জাগানো হল, তার ফলে প্রতিটি লোক ঘৃণা করতে লাগল অন্য দেশের অধিবাসীদের, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল সদাসর্বদা।

এই অন্ধ জাতীয়তাবাদই ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করল। এটা সত্যিই অদ্ভুত, কারণ যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশগুলি নিকটতর হয়ে এসেছিল, অনেক বেশি লোক এখন পর্যটন করত। মনে করা সম্ভব যে, কোনো লোক তার প্রতিবেশীদের যত বেশি জানবে তার কুসংস্কার ততই কেটে যাবে, সংকীর্ণতার পরিবর্তে আসবে উদার দৃষ্টিভঙ্গি। কিঞ্চিৎপরিমাণে তা হয়েছিল বটে, কিন্তু বর্তমান শ্রমশিল্প ও ধনতন্ত্রবাদী সমাজের আকারই এমন যে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, মানুষে মানুষে সংঘাত তার ফলে অবশ্যম্ভাবী।

প্রাচ্যেও জাগ্রত হচ্ছিল জাতীয়তাবাদ। অত্যাচারী বিদেশী শাসককে বাধা দেওয়ার রূপ নিচ্ছিল এ। প্রথমে পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন জমিদার-বংশ বিদেশী শাসনকে বাধা দিল, কারণ তাদের ভয়, নিজেদের পদ থেকে চ্যুত হবার অবস্থা হয়েছে তাদের। তারা সফল হল না, না হবারই কথা। নূতন জাতীয়তাবাদ উঠল, ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গি-মেশানো। আস্তে আস্তে এই ধর্মের রঙ মিলিয়ে গেল, পাশ্চাত্য-প্রধানুযায়ী একজাতীয়তাবাদের আবির্ভাব হল। বিদেশী শাসন থেকে অব্যাহত রইল জাপান, অর্ধসামন্ততান্ত্রিক একজাতীয়তাবাদ প্রচারিত হতে লাগল।

প্রথম থেকেই ইউরোপীয় আক্রমণকে এশিয়া বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষমতা যেদিন বোঝা গেল সেদিন থেকে বাধাদানে তেমন আর জোর রইল না। তদানীন্তন ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতি তার সেনাদলকে যেরকম শক্তিমান করে তুলেছিল, প্রাচ্যে তখন সেরকম কিছুই ছিল না। পূর্বের দেশগুলি নিজেদের শক্তিহীনতা অনুভব করে বেদনার সঙ্গে মাথা নোয়াল তাদের সামনে। কোনো কোনো লোকে বলে, প্রাচী অধ্যাত্মবাদী আর প্রতীচী জড়বাদী। এ ধরনের মত ভ্রান্তিজনক। প্রাচী-প্রতীচীর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য ছিল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে, ইউরোপ যখন আক্রমণকারীরূপে এসেছিল—সে হচ্ছে প্রাচ্যদেশের মধ্যযুগীয় ধারা ও প্রতীচীর যান্ত্রিক অগ্রগতি। ভারতবর্ষ ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ প্রথমে চমকে গিয়েছিল—কেবল পশ্চিমের রণ-কৌশলেই নয়, তার বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতিতেও। এর ফলে তারা উপলব্ধি করেছিল নিজেদের দৈন্য। তা সত্ত্বেও জাতীয় ভাব দিন দিন বেশি করে জাগতে লাগল, বাড়তে লাগল বিদেশীদের আক্রমণে বাধাদানের ও তাদের বিতাড়নের আকাঙ্ক্ষা। বিংশ শতকের প্রারম্ভে একটা ঘটনা সারা এশিয়ার মনে পরিবর্তন আনে। সে হল জাপানের হাতে জারশাসিত রাশিয়ার পরাজয়। ইউরোপের অন্যতম সুবৃহৎ শক্তিকে ছোটো জাপানের পক্ষে হারিয়ে দেওয়ার খবর অধিকাংশ লোককেই চমকে দিল। এশিয়াতেই এ চমক সবচেয়ে বেশি লেগেছিল। সবাই জাপানকে দেখতে লাগল যেন সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধি, পশ্চিমের আক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। জাপান সে সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়ল সারা পূর্বাঞ্চলে। আসলে জাপান যে মোটেই এশিয়ার প্রতিনিধি ছিল না সে তো ঠিকই—যে-কোনো ইউরোপীয় শক্তির মতোই সেও স্বার্থের জন্যেই যুদ্ধ করছিল। মনে আছে, জাপানের জয়-সংবাদ এলে আমি কীরকম উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। বয়সে তখন আমি তোমার মতোই হব।

এমনি করে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ যতই সমরোন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল, প্রাচ্যেও তার বিরুদ্ধে বাধা দেবার জন্যে জেগে উঠল জাতীয়তার ভাব। সারা এশিয়া জুড়ে, পশ্চিমে আরবদের দেশ থেকে সুদূর পূর্বে মঙ্গোলীয়দের দেশ পর্যন্ত, প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে চরম রূপ নিল জাতীয় আন্দোলন। 'জাতীয় কংগ্রেসে'র সূচনা হল ভারতবর্ষে। শুরু হল এশিয়া জুড়ে বিদ্রোহ।

উনবিংশ শতাব্দীর এ আলোচনা আমাদের শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। কিন্তু এ চিঠিখানা বেশ দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, এবারে থামা উচিত।

১০৮

উনবিংশ শতাব্দীর অনুপূর্ব

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩২

আগের চিঠিখানিতে, উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিরাট যন্ত্রগুলির আবির্ভাবের পরে পশ্চিম-ইউরোপ জুড়ে নিল যে শ্রমশিল্পঘটিত ধনতন্ত্রবাদ, তারই পরিণামের কথা বলেছি। পশ্চিম-ইউরোপের এই শ্রেষ্ঠতার অন্যতম কারণ, তার অধিকারে ছিল প্রচুর কয়লা ও লোহা; আর প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলি চালাতে কয়লা ও লোহার প্রভূত প্রয়োজন।

এই ধনতন্ত্রবাদের পরিণাম হল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদ নূতন কিছু নয়, আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখন এ প্রগাঢ়তর ও সংকীর্ণতর হয়ে উঠল। একই সময়ে এ সৃষ্টি করছিল নৈকট্যের ও দূরত্বের। একই জাতীয়তার গণ্ডীর মধ্যে বাস করত যারা তারা ক্রমশ সংহত হয়ে আসতে লাগল, কিন্তু তেমনি দূরে পড়ে যেতে লাগল তারা অন্য জাতির কাছ থেকে। প্রত্যেক দেশে যেমন দেশপ্রেম জাগতে লাগল, তারই সঙ্গে এল বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ। ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত দেশগুলি পরস্পরের প্রতি চোখ-রাঙিয়ে রইল হিংস্র পশুর মতো। লুটের মাল ইংলন্ডই পেল সর্বাধিক, তাকেই আঁকড়ে রইল সে। কিন্তু জর্মনি প্রভৃতি অন্যান্য দেশের

পক্ষে ইংলণ্ডের এই ক্ষমতা হয়ে উঠল অসহ্য। কাজেই সংঘাত বাড়ল, শুরু হল প্রকাশ্য সংগ্রাম। শ্রমশিল্পগত ধনতন্ত্রবাদ ও তার প্রশাখা সাম্রাজ্যবাদ, এরা শুধু নিয়ে যায় সংঘাত ও সংগ্রামের দিকে: এদের মধ্যে নিহিত আছে প্রতিযোগিতা ও দেশ-জয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংগতিহীন বিরোধ। তাই প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের সন্তান জাতীয়তাবাদ হল তার কঠিন শত্রু।

এইসব বিরোধ সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক সভ্যতা বহু আবশ্যক শিক্ষা দান করেছিল। শৃঙ্খলা শিখিয়েছিল সে, কারণ বিরাট যন্ত্রপাতি ও বিপুল শ্রমশিল্প চালাতে প্রভূত শৃঙ্খলা-রক্ষা প্রয়োজন। সুবৃহৎ কর্মাদিতে সহযোগিতা-শিক্ষাও হল তার কল্যাণের, নৈপুণ্য ও সময়ানুবর্তনও এল তার থেকে। এসব গুণাবলী ছাড়া বড়ো বড়ো কারখানা বা রেলপথ চালানো সম্ভব নয়। কখনও কখনও বলা হয়, এগুলি পুরো পাশ্চাত্য গুণ, প্রাচ্যদেশে এ গুণ দেখা যায় না। অন্যান্য বহু প্রশ্নের মতো এতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কথাই ওঠে না। বাণিজ্যশিল্পের ফলেই এই গুণগুলির বিকাশ, আর সে শিল্পে পাশ্চাত্যদেশ উন্নত বলেই সে এই গুণসম্পন্ন। প্রাচ্যদেশ এখনও কৃষিপ্রধান, বাণিজ্যপ্রধান নয়; এবং সেইজন্যেই এই গুণ-রহিত।

ব্যবসায়িক ধনতন্ত্রবাদ আরও একটা বড়ো কাজ করেছিল। শক্তির সাহায্যে অর্থলাভের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল সে। শক্তি অর্থাৎ, বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি, কয়লা, বাষ্প ইত্যাদি। পৃথিবীতে সবাইকার ভোগ করার মতো জিনিষ বোধ হয় নেই, ফলে বহু লোক সর্বদাই দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে থাকবে—এই যে একটা আশঙ্কা অনেকদিন থেকেই ছিল এর মূলভিত্তি নষ্ট হয়ে গেল। বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শিল্পের সাহায্যে প্রচুর আহার্য, বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ পৃথিবীর জনসংখ্যার জন্যে উৎপন্ন করা সম্ভব। উৎপাদন-সমস্যার এভাবে সমাধান হল, অন্তত কল্পনায়। অথচ ঐখানেই ঘটল তার অবসান। অর্থ অবশ্য নিঃসংশয়েই প্রচুর উৎপন্ন হল, কিন্তু গরিবেরা সেই গরিবই রইল, দারিদ্র্য আরও বেশি করে পীড়া দিতে লাগল তাদের। ইউরোপ-অধিকৃত পূর্বাঞ্চলে ও আফ্রিকাদেশে অবশ্যই অত্যাচার তার নির্লজ্জ নগ্নমূর্তি নিয়ে দেখা দিল। সে দেশের হতভাগ্য অধিবাসীদের জন্যে মাথা ঘামানোর কেউ ছিল না। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপেও দারিদ্র্য ঘুচল না, বরং প্রকাশ পেল স্পষ্টতররূপে। কিছুদিন পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ সেঁচে তার ধন এসেছিল পশ্চিম-ইউরোপে। তবে তার অধিকাংশই রইল শীর্ষস্থানীয় ধনী-সম্প্রদায়ের ঝুলিতে, কেবল সামান্য একটু ফুটো দিয়ে ঝরে পড়ল দরিদ্রদের হাতে, তাদের জীবনযাত্রার মান একটু উন্নত হল। লোকসংখ্যাও হু হু করে গেল বেড়ে।

কিন্তু এই অর্থবৃদ্ধি, এই জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন, এর অধিকাংশই হতে লাগল শিল্পে বাণিজ্যে অনগ্রসর এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি বিজিত দেশবাসীর ব্যয়ে। ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা কিছুদিন চেপে রাখল এই জয়লাভ, এই অর্থের প্রবাহ। তবু, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে বিভেদ ও দূরত্ব তা শুধু বেড়েই চলল। তারা ছিল যেন দুটি বিভিন্ন দলীয় লোক, দুটি পৃথক জাতি। বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি ঊনবিংশ শতাব্দীর যশস্বী ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌। তিনি এই দুটি দলকে বর্ণনা করে গেছেন :

"দুটি জাতি; তাদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি, কোনো সম্পর্ক নেই; একে অন্যের অভ্যাস, অন্যের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যেন তারা ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী, যেন ভিন্ন গ্রহে তাদের বাস। ভিন্ন অবস্থায় তাদের জন্ম, ভিন্নরকম তাদের আহার, ভিন্নরকম তাদের আচরণ, ভিন্ন-রকম তাদের নিয়মকানুন—এক ধনী, আর-এক দরিদ্র।"

শ্রমশিল্পের এই নূতন অবস্থায় বিরাট কারখানাগুলিতে কাজ করতে এল অসংখ্য মজুর, ফলে আর-একটা নূতন শ্রেণী জেগে উঠল—শ্রমিকশ্রেণী। চাষিদের থেকে এরা নানারকমে ভিন্ন ছিল। ঋতুভেদে ও বৃষ্টিপাতের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে কৃষকেরা। এ দুটি জিনিষ তাদের আয়ত্ত নয়, তাই তাদের মনে হয় দুঃখদারিদ্র্যের মূল অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয় সে, আর্থিক কারণগুলিকে অগ্রাহ্য করে এক নৈরাশ্যময় জীবন-যাপন করে অমোঘ নিষ্ঠুর এক শক্তির উপর সব ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু শ্রমিকের কাজ মানুষেরই গড়া যন্ত্র নিয়ে। ঋতুভেদ, বৃষ্টিপাত তার মাল-উৎপাদনে বাধ সাধতে পারে না। অর্থ উৎপন্ন করে সে, কিন্তু দেখতে পায় যে তার

অধিকাংশই চলে যায় অন্যের হাতে, সে গরিবই রয়ে যায়। সে কতকটা দেখে, কেমন করে অর্থনৈতিক বিধান তার কাজ করে যায়। তাই সে অপার্থিব কোনো শক্তির কথা ভাবে না, কৃষিজীবীর মতো তার মন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। তার দারিদ্র্যের জন্যে সে দেবতাদের দোষ দেয় না। দোষ দেয় সমাজকে, সামাজিক নিয়মকে, বিশেষ করে যে পুঁজিবাদী মালিক তার লাভের অংশে ভাগ বসিয়ে নিজের অর্থবৃদ্ধি করে, তাকে। সে হয় শ্রেণী-সচেতন; দেখে যে, তার উপর ওৎ পেতে বসে রয়েছে অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণী। আর এর ফলে সৃষ্টি হয় অশান্তির, সৃষ্টি হয় বিদ্রোহের। সে ক্ষোভের প্রথম সূচনা হয় অস্ফুট অর্থহীন ধ্বনির মধ্য দিয়ে, প্রথম বিদ্রোহ হয় অন্ধ চিন্তাহীন দুর্বল; অনায়াসে শাসকেরা তাকে দমন করে ফেলে, কারণ বর্তমানের শাসক-সম্প্রদায়-গঠিত এই নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী, বড়ো বড়ো কারখানা যারা চালায়, তাদের নিয়ে। কিন্তু বুভুক্ষাকে তো দমন করা যায় না, হতভাগ্য শ্রমিক নূতন শক্তির সন্ধান পায় তার সঙ্গীদের সঙ্গে দৃঢ়তর ঐক্যের মধ্যে, আবার জেগে ওঠে সে। তাই মজুরদের রক্ষা করবার জন্যে, তার অধিকারের পক্ষ নিয়ে লড়াই করবার জন্যে প্রতিষ্ঠা হয় শ্রমিক-সংঘের। প্রথমে তাদের কর্মধারা চলে গোপনে; কারণ সরকার দেবে না তাদের সংঘবদ্ধ হতে। ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এই সত্য যে, শাসক-সম্প্রদায় শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিমাত্র, এবং সেই শ্রেণীকে রক্ষা করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিধিবিধান সেও শ্রেণীবিশেষের জন্যে। ধীরে ধীরে শ্রমিকেরা শক্তিসঞ্চয় করে, তাদের সংঘ হয়ে ওঠে শক্তিমান, সুসমঞ্জস। নানারকম শ্রমিকেরা সবাই দেখতে পায়, তাদের উদ্দেশ্য এক—অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। অতএব, বিভিন্ন সংঘগুলি একত্র হয়ে সারা দেশের কারখানার মজুরেরা ঐক্যবদ্ধ একটি দলে পরিণত হয়। এর পরের কার্যভার হল অন্যান্য দেশের মজুরদেরও নিজেদের সঙ্গে একত্রিত করা, কারণ তারাও বোঝে যে তাদের একই উদ্দেশ্য, একই শত্রু। রব ওঠে, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ গঠিত হয়। এদিকে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যও প্রসারলাভ করে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায় সেও। এবার শ্রমিকের দল ধনতন্ত্রকে রুখে দাঁড়ায় সর্ব জায়গায়, যেখানেই প্রসারিত হয়েছে ধনতন্ত্র।

আমি বড়োই দ্রুততালে এগিয়ে গিয়েছি, এবারে একটু পিছিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী বিভিন্ন (মধ্যে মধ্যে পরস্পরবিরোধী) মতবাদের এমনই এক জটিল মিশ্রণ যে, তাদের সবগুলিকে দৃষ্টির সামনে রাখা কঠিন। ভাবতেই পারছি না, এই জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, অর্থ ও দারিদ্র্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ থেকে তুমি কী করবে। কিন্তু জীবনটাই তো তাই। অতএব, যেমন আছে তেমনি অবস্থাতেই তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে; তার পর তাকে উন্নত করে তুলতে হবে।

এই রাশিকৃত অসামঞ্জস্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোককে ভাবিয়ে তুলেছিল। এ শতাব্দীর সূচনায় যখন নেপোলিয়নের পতন হল, কোনো ইউরোপীয় দেশই তখন বিশেষ স্বাধীন ছিল না। কোনো কোনো দেশে চলছিল রাজার অত্যাচার, আবার ইংলণ্ডের মতো কয়েকটিতে ক্ষুদ্র এক ধনী-সম্প্রদায়ই ছিল শক্তির আসনে। আগেই বলেছি, সর্বত্রই উদারপন্থীদের দমন করে রাখা হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয় উদার-পন্থী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নজরে পড়েছিল, এবং সে সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাও জন্মেছিল। বাস্তবিক, সাধারণতন্ত্র জিনিষটা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সর্ববিধ রোগের মহৌষধ বলে বিবেচিত হত। সাধারণতন্ত্রের আদর্শ ছিল এই যে, বিশেষ অধিকার বলে কিছু থাকা উচিত নয়; রাষ্ট্রের চোখে সবারই সামাজিক এবং রাজনৈতিক মূল্য সমান থাকবে। অবশ্য নানা দিক দিয়ে একের সঙ্গে অন্যের যথেষ্ট প্রভেদ থাকে; কেউ-বা অন্যের চেয়ে সবল, কেউ বেশি জ্ঞানী, কেউ-বা অধিকতর নিঃস্বার্থ। কিন্তু সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মতে লোকের মধ্যে এমনি প্রভেদ যতই থাক-না কেন, সকলেরই রাজনৈতিক অধিকার সমান হতে হবে। এবং এই অবস্থার আগমন হবে সকলকে নির্বাচনের অধিকার দিয়ে। প্রগতিপন্থী এবং উদারমতাবলম্বীরা সাধারণতন্ত্রে প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং এর জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দল তাঁদের বাধা দিল, এবং এর ফলে বিপুল কলহের সৃষ্টি হল। কোনো কোনো দেশে বিপ্লব হল। ইংলণ্ড প্রায় বিপ্লবের মুখে এসে

পড়েছিল, এমন সময় নির্বাচনাধিকার বৃদ্ধি করা হল, অর্থাৎ অধিকসংখ্যক লোককে পার্লামেণ্টে সভ্য-নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হল। ক্রমে কিন্তু গণতন্ত্রের জয় হল অধিকাংশ স্থলেই, এবং পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকাতে এই শতাব্দীর শেষ ভাগে অধিকাংশ লোকেরই অন্তত নির্বাচনাধিকার জন্মাল। উনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রই ছিল মহান আদর্শ, এবং সেই সূত্রে একে 'গণতন্ত্র-শতাব্দী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পরিণামে গণতন্ত্রের জয় হল, কিন্তু এই পরিণাম যখন এল তখন লোকে গণতন্ত্রে আস্থা হারাতে আরম্ভ করেছে। তারা দেখল, গণতন্ত্রের ফলে দারিদ্র্য এবং দুর্দশা দূরে হয় নি, ধনতান্ত্রিক রীতির অনেক বৈপরীত্য যেমন তেমনিই রয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত লোকের কাছে নির্বাচনাধিকারের মূল্য কী? একবার আহারের পরিবর্তে যার নির্বাচনাধিকার অথবা আনুগত্য ক্রয় করা যায় তার স্বাধীনতার অর্থ কী? ফলে গণতন্ত্রের দুর্নাম ঘটল, অথবা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেল। কিন্তু সে ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর বাইরে।

গণতন্ত্রের বিবেচ্য বিষয় ছিল, স্বাধীনতার রাজনৈতিক রূপ। এ ছিল একতন্ত্র এবং অনুরূপ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। যেসব যন্ত্রশিল্প-সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হচ্ছিল সে সম্বন্ধে অথবা দারিদ্র্য সম্বন্ধে অথবা শ্রেণীবিরোধ সম্বন্ধে গণতন্ত্র কোনো সমাধান দিতে পারে নি। এর বিশেষ জোর ছিল ব্যষ্টির নিজের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবার পুঁথিগত স্বাধীনতার দিকে, এই আশায় যে, সে নিজের স্বার্থের দিক দিয়ে নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করবে, এবং তার ফলে সমাজের প্রগতি ঘটবে। একেই বলে Laissez-faire নীতি; এর সম্বন্ধে আগে একটা চিঠিতে তোমাকে লিখেছি। কিন্তু ব্যষ্টি-স্বাধীনতার মতবাদ ব্যর্থ হল, কারণ যে মানুষের মজুরির বিনিময়ে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই তাকে স্বাধীন বলা চলে না।

যন্ত্রশিল্পগত ধনতন্ত্রের ফলে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হল তা হল এই—যারা খেটে জনসাধারণের সেবা করছিল তাদের আয় ছিল অল্প, কিন্তু পুরস্কার জুটত তাদের ভাগ্যে যারা কাজ করত না। ফলে পুরস্কারের সঙ্গে কাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর ফল এক দিক দিয়ে হল শ্রমিকদের দুরবস্থা এবং দারিদ্র্য; অন্য দিক দিয়ে এমন-একটি শ্রেণীর উৎপত্তি হল যা যন্ত্রশিল্পের সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জন করতে লাগল, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে। এ হল অনেকটা জমিদার-কৃষাণ সম্প্রদায়ের মতো—এক দল খেতে কাজ করে, অন্য দল নিজেরা কাজ না করে অপরের আয়াসলব্ধ ফসল নিজে ভোগ করে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, পরিশ্রমের ফলের বিভাগ ন্যায়সংগতভাবে হয় নি। তা ছাড়া, শ্রমজীবীরা কৃষাণ-সম্প্রদায়ের মতো মুখ বুজে সহ্য করে নি, অবিচার অনুভব করে তার প্রতিবাদ করেছে। যতই দিন গেল, অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি হতে লাগল। পশ্চিমের সংগঠিত-শিল্প দেশগুলিতে এই বৈপরীত্য অধিকতর প্রকট হয়ে উঠল, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। এর ফলে যে আদর্শসমূহের উৎপত্তি হল তাই হল সমাজতন্ত্রবাদ, যার জন্ম হল ধনতন্ত্রের থেকে, এবং যার উদ্দেশ্য হল ধনতন্ত্রের শত্রুতাসাধন, এবং সম্ভবত কালে ধনতন্ত্রের স্থান-গ্রহণ। ইংলণ্ডে এই সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষাকৃত নরম রূপ নিল, ফ্রান্স এবং জর্মনিতে এর রূপ হল বৈপ্লবিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, বিরাট দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প জনসংখ্যার ফলে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ ছিল, তাই ধনতন্ত্রের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে যে অবিচার-দুর্দশার আগমন হয়েছিল তার ততটা উপলব্ধি আমেরিকায় বহুকাল পর্যন্ত হয় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জর্মনিতে একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হল, যিনি সমাজতন্ত্রবাদের গুরু এবং যে সমাজতন্ত্রবাদ এখন কমিউনিজ্‌ম্‌ বা সাম্যবাদ বলে পরিচিত তার জন্মদাতা। তাঁর নাম কার্ল মার্ক্‌স্‌। তিনি একজন অস্পষ্ট দার্শনিক মতবাদে আস্থাবান অথবা পুঁথিগত মতামতের আলোচনাকারী অধ্যাপকমাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন বাস্তববাদী দার্শনিক, এবং তাঁর পদ্ধতি ছিল বিজ্ঞানের শৈলী দিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা অনুধাবন করা এবং এইরূপে পৃথিবীর দুর্দশার প্রতিকার করা। দর্শনশাস্ত্র তাঁর মতে এতদিন শুধু পৃথিবীর ব্যাখ্যা করতেই ব্যস্ত ছিল। সাম্যবাদী দর্শন পৃথিবীর দুঃখমোচন করতে আগ্রহান্বিত হবে। এঙ্গেল্‌স্‌ নামে আর-একজনের সঙ্গে তিনি 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করলেন, যাতে তাঁর দর্শনের মূলসূত্রগুলি থাকল। তার পরে তিনি জর্মন ভাষায় একখানি বিরাট বই বের করলেন,

এর নাম 'ডাস্ ক্যাপিটাল', যাতে তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেন এবং দেখালেন, সমাজ কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং কী করে সেই অগ্রগতি দ্রুততর করা যায়। এখানে মার্ক্সীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব না। কিন্তু মনে রেখো যে, মার্ক্সের এই বই সমাজতন্ত্রবাদের পরিস্ফুরণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং ইহাই বর্তমানে সাম্যবাদী রাশিয়ার বাইবেল।

আর-একটি বিখ্যাত বই ইংলণ্ডে এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল, তার নাম 'ওরিজিন অব স্পেসিজ', ডারুইনের লেখা। ডারুইন ছিলেন প্রকৃতিবিদ্, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিকে, বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে, পর্যবেক্ষণ করতেন। বহু উদাহরণ-সহ তিনি দেখালেন, কীরূপে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল, কেমন করে একটি জাতি প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসারে আর-এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল, কেমন করে সরল প্রাণীদেহ কালক্রমে জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ছিল ধর্মশিক্ষা অনুসারে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং পৃথিবীর সৃষ্টি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন আরম্ভ হল বৈজ্ঞানিক ও ধর্মমতে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড তর্ক। বিরোধের প্রকৃত কারণ তথ্য নিয়ে ততটা নয়, যতটা জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা নিয়ে। ধর্মমতের সংকীর্ণ বিশ্বাসের মূলে ছিল কুসংস্কার এবং ইন্দ্রজালের ভীতি। বিচার জিনিষটাকে মোটেই উৎসাহিত করা হত না, এবং সাধারণকে যা বলা যায় তাই বিশ্বাস করতে বলা হত, কারণ তর্ক করে লাভ নেই। কতকগুলি বিষয় ছিল পবিত্রতার রহস্যময় আবরণে আবৃত, তাদের ছোঁয়া বা নিরাবরণ করা নিষিদ্ধ। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, বিজ্ঞানের কাজ সব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা দেখানো। সে কিছুই মেনে নেবে না অথবা কোনো বিষয়ের কাল্পনিক পবিত্রতা দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবে না। সব জিনিষের মধ্যেই সে কারণ অনুসন্ধান করত, এবং শুধু তাইতেই বিশ্বাস করত যা পরীক্ষা অথবা বিচারের ফলে যথার্থ বলে নির্ণীত হয়েছে।

এই প্রাচীন প্রাণহীন ধর্মমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিচারে বৈজ্ঞানিক চেতনাই জয়ী হল। যে-সব লোক এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে আগে চিন্তা করেছিল, এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও, তাদের অধিকাংশই যুক্তিবাদী হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে যে দার্শনিক চিন্তার তরঙ্গ এসেছিল সে কথা তোমার মনে থাকবে। কিন্তু এখন পরিবর্তন সমাজের অভ্যন্তরে গভীরতরভাবে প্রবেশ করল। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে আরম্ভ করল। খুব সম্ভবত সে বিষয়টি সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে নি, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও হয়তো বেশি-কিছু জানত না। কিন্তু তার চোখের সামনে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সে দেখতে লাগল তাতে তার মনে বেশ খানিকটা সম্ভ্রমের উদয় হল। রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফোনোগ্রাফ, এবং আরও কতশত জিনিষ একটির পর একটি এল, এবং এ সবেরই উৎপত্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে। বিজ্ঞানের জয়চিহ্ন বলে এদের সাদরে গ্রহণ করা হল। দেখা গেল, বিজ্ঞান যে শুধু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধি করে তা নয়, প্রকৃতির উপরে তার অধিকারও বাড়িয়ে দেয়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, বিজ্ঞানের জয় হল এবং লোকে তাকে সর্বশক্তিমান নূতন দেবতা বলে তার সামনে মাথা নত করল। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা নিজেদের সম্বন্ধে অতিরিক্তমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন, তাঁদের মতবাদ বড়ো বেশি নিশ্চিত হয়ে পড়ল। অর্ধশতাব্দী পূর্বের সে যুগ থেকে বিজ্ঞান বহু দূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের মনোভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিত-জ্ঞানের মনোভাব থেকে অনেক ভিন্ন। আজকের দিনে প্রকৃত বিজ্ঞানী অনুভব করেন যে, জ্ঞান-মহার্ণব বিশাল এবং অপার; এবং যদিও তিনি এতে পাড়ি দেবার চেষ্টা করেন, তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে তিনি অনেক বেশি নম্র ও বিনয়ী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর-একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, পাশ্চাত্যদেশে সাধারণের শিক্ষার অগ্রগতি। শাসক-সম্প্রদায়ের অনেকে বিপুল উদ্যমে এর বিপক্ষতা করেন, কারণ তাঁদের মতে এর ফলে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট, রাজদ্রোহী, অবাধ্য এবং অখৃষ্টান হয়ে পড়বে! এই বিচারে খৃষ্টধর্ম হচ্ছে—অজ্ঞতা, এবং ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের বিনা আপত্তিতে দাসত্ব করা। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রচলিত হল এবং শিক্ষার প্রসার ঘটল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক জিনিষের

মতো এটা ছিল নূতন ব্যবহারিক শিল্পের প্রচলনের ফল। কারণ, বড়ো কারখানা ও বড়ো যন্ত্রে শিল্প-বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন, এবং তা পাওয়া যায় শুধু শিক্ষা থেকে। এই যুগের সমাজে সর্বপ্রকার দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। সাধারণের শিক্ষাপ্রসারণে সে অভাব ঘুচল।

এই বহুলপ্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ফলে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। তাদের ঠিক শিক্ষিত বলা চলে না, কিন্তু তারা লিখতে-পড়তে পারত এবং সংবাদপত্র-পাঠের অভ্যাস প্রসারিত হল। শস্তা সংবাদপত্র বের হতে লাগল, আর তাদের প্রচার-সংখ্যা হল বিপুল। লোকের মনের উপরে তারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তারা লোককে ভুল পথে চালিত করত এবং প্রতিবেশী দেশের উপরে উষ্মা জাগিয়ে পরিণামে যুদ্ধের সৃষ্টি করত। সে যাই হোক, 'প্রেস' বা সংবাদপত্রসমূহ সত্যই খুব একটা ক্ষমতাশালী জিনিষ হয়ে দাঁড়াল।

এই চিঠিতে যা লিখেছি তা প্রধানত ইউরোপের উপর, বিশেষ করে পশ্চিম-ইউরোপের উপর প্রযোজ্য। উত্তর-আমেরিকার সম্বন্ধেও এ কথা খানিকটা খাটে। জাপান বাদে অবশিষ্ট এশিয়া এবং আফ্রিকা ছিল নিষ্ক্রিয় এবং ইউরোপের শাসনরীতির তলে নির্যাতিত। ইউরোপই যেন সব; পৃথিবীর রংগমঞ্চে ইউরোপ প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। অতীতে সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল ধরে এশিয়া ইউরোপে প্রভুত্ব করেছে। এমন যুগ ছিল যখন সভ্যতা ও অগ্রগতির কেন্দ্র ছিল মিশর, বা ইরাক, বা ভারত, বা চীন, বা গ্রীস, বা রোম, বা আরব। কিন্তু এসব প্রাচীন সভ্যতার আয়ু শেষ হয়ে তার জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ কঠিন প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তন ও প্রগতির প্রাণশক্তি তাদের ত্যাগ করেছিল, এবং সে প্রাণ অন্য দেশে চলে গিয়েছিল। এবার ইউরোপের পালা, এবং ইউরোপ আরও বেশি প্রভুত্বপরায়ণ হল, কারণ যাতায়াতের উপায়ের উন্নতির ফলে পৃথিবীর সব অংশই নিকট এবং সুগম হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতা, যাকে এখন বলা হয় বুর্জোয়া-সভ্যতা, তার প্রস্ফুটন হল। একে বুর্জোয়া-সভ্যতা বলার কারণ, যে মধ্যশ্রেণী ব্যবহারিক শিল্পের ধনবাদের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এতে তাদের আধিপত্য ছিল। আমি তোমাকে এই সভ্যতার পরস্পরবিরোধী ভাব এবং আপত্তিকর বিষয়সমূহের কথা বলেছি। আমাদের ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যে আমরা এই আপত্তিকর বিষয়গুলি দেখেছি এবং তার দুর্ভোগ ভুগেছি। কিন্তু কোনো দেশই বড়ো হতে পারে না, যদি সেই বড়ো হওয়ার মতো উপকরণ তার মধ্যে না থাকে, এবং পশ্চিম-ইউরোপে এই উপকরণের অভাব ছিল না। ইউরোপের মানের কারণ তার সামরিক শক্তি ততটা নয়, যতটা তার এই বড়ো হওয়ার গুণগুলির অস্তিত্ব। সর্বত্র কর্মতৎপরতা ও জীবনীশক্তির প্রাচুর্য ছিল। শ্রেষ্ঠ কবি, লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সংগীতকার, স্থপতি এবং সত্যকার কাজের লোকের উদ্ভব হয়েছিল অজস্র পরিমাণে। এবং জনসাধারণের অবস্থা পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এই যুগে যে উন্নততর হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিরাট রাজধানীগুলি, যথা—লণ্ডন প্যারিস বার্লিন নিউইয়র্ক, এরা আরও বড়ো হতে লাগল, তাদের প্রাসাদসমূহের শীর্ষদেশ উচ্চতর হল, বিলাসিতা বাড়ল, বিজ্ঞানের সাহায্যে কায়িক শ্রমের পরিমাণ কমল, জীবনের উপভোগের উপায় বাড়ল। সচ্ছলশ্রেণীর মধ্যে জীবন হল সুসংস্কৃত ও মৃদুভাবাপন্ন, এবং তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে আত্মসন্তোষ ও পরিতৃপ্তির ভাব এল। মনে হয় যেন, সভ্যতার আরামদায়ক অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যা।

এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের রূপ ছিল প্রীতিকর ও সুসমৃদ্ধ, এবং অন্তত উপরে-উপরে মনে হল, এ সভ্যতা টি‍ঁকবে এবং ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু বহিরাবরণের নীচে উঁকি মারলে দেখা যেত অনেক অপ্রীতিকর দৃশ্য এবং তুমুল আলোড়ন। কারণ, এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভোগ করছিল বেশির ভাগ ইউরোপের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা, এবং এর ভিত্তি ছিল বহু জাতি ও বহু দেশের শোষণের উপরে। আমি যেসব পরস্পরবিরোধী ভাবের কথা বলেছি তা যদি দেখতে পেতে; তাহলে দেখতে জাতিগত ঘৃণা এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর মুখশ্রী। তখন আর তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার স্থায়িত্ব অথবা মধুরতা সম্বন্ধে অত নিশ্চিত থাকতে পারতে না। বাইরে দেহ ছিল সুশ্রী, কিন্তু হৃদয়ে ছিল দুষ্টক্ষত। স্বাস্থ্য ও প্রগতি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা বলা হত, কিন্তু বুর্জোয়া-সভ্যতার প্রাণশক্তি ক্রমে ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

১৯১৪ সালে দুর্যোগ এল। সওয়া চার বছর যুদ্ধের পরে ইউরোপ বেঁচে রইল বটে, কিন্তু তার সে গভীর ক্ষত এখনও শুকোয় নি। সে সম্বন্ধে পরে বলব।

১০৯

ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোহ

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩২

ঊনবিংশ শতকের ঘটনাবলী আমরা তো বেশ ভালো করেই পর্যালোচনা করলাম। এবার পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ দেশের দিকে একটু ভালো করে নজর দেওয়া যাক। গোড়াতে তা হলে ভারতবর্ষের কথা দিয়ে শুরু করি।

কয়েকটা চিঠি আগে তোমায় তো বলেছি, কীভাবে ইংরেজ ভারতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিয়ে আধিপত্য স্থাপন করে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ফরাসিরা ভারতে সাম্রাজ্য-বিস্তারের আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। কিছুটা কাল মারাঠিরা, মহীশূরে টিপু সুলতান ও পাঞ্জাবে শিখেরা ইংরেজদের ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু সে আর কটা দিন! যুদ্ধবিক্রমে ও জনবলে-অর্থবলে ইংরেজরা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল ভালো, ব্যবস্থা ছিল ভালো, আর তা ছাড়া সমুদ্রের উপর ছিল তাদের একাধিপত্য। দু-চার বার পরাজিত হলেও তারা হটে যাবার পাত্র ছিল না—কারণ, সমুদ্রপথের উপর তাদের একচেটিয়া দখল থাকাতে তারা প্রয়োজন হলেই জলপথে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রসম্ভার এনে হাজির করতে পারত। কিন্তু দেশীয় শক্তিগুলি একবার হার মানলে আর তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জো ছিল না। ইংরেজদের কেবল অস্ত্রসজ্জা বা সামরিক ব্যবস্থাদি উৎকৃষ্ট ছিল যে তা নয়, ছলে কৌশলেও তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা ভারতীয় রাজ্যগুলির পক্ষে শক্ত ছিল। দরকার হলে ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে গৃহশত্রুতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে দ্বিধা করত না। সুতরাং একপ্রকার অনিবার্যভাবেই ইংরেজদের আধিপত্য ক্রমেই বেড়ে চলল। আজ যার সহায়তায় সে জয়ী হল কাল আবার তারই সর্বনাশ করতে উঠে-পড়ে লাগল ইংরেজ; এইভাবে গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ তার রাজত্ব কায়েম করল। তখনকার যুগের ভারতের সামন্ত-রাজাদের অদূরদর্শিতার কথা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে একতাবদ্ধ হয়ে লড়বে এ যেন তারা কল্পনাতেও মনে স্থান দেয় নি। যে-যার মতো একা-একা লড়েছে ও হেরেছে—তাদের পরাজয়ের জন্যে দায়ী তারা নিজেরাই।

শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের কলহপ্রবৃত্তিও যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তারা নানা অছিলায় পরস্বাপহরণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে লাগল। এইরকম বিনা কারণে অন্যের বহু রাজ্য ইংরেজ আক্রমণ করেছে। সেসব অকারণ রক্তপাতের বীভৎস বর্ণনা দিয়ে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। যুদ্ধ জিনিষটা আনন্দের জিনিষ নয়, তা সত্ত্বেও দেখি ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধকে একটা অনর্থক বড়ো স্থান দেওয়া হয়। সে যাই হোক, এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর যদি কিছু না বলি তা হলে তখনকার দিনের ছবিটা সম্পূর্ণ মিলবে না।

মহীশূরের হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যে দুটো সংঘর্ষ হয় তার সম্বন্ধে তোমাকে তো আগেই বলেছি। এ দুই যুদ্ধে হায়দার আলি বহুল অংশে কৃতকার্য হন। তাঁর ছেলে টিপু সুলতান ছিলেন ইংরেজের চিরশত্রু। ১৭৯০ থেকে ৯২ পর্যন্ত, আবার ১৭৯৯ অব্দে দু-দুটো যুদ্ধের পর এই বহুকালব্যাপী সংঘর্ষের অবসান হয়—দ্বিতীয় যুদ্ধে টিপু অসিহস্তে সম্মুখসমরে বীরের মতো রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মহীশূর-শহরের অনতিদূরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাবে—এই শহরেই টিপুকে সমাধিস্থ করা হয়।

এর পর মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের শক্তিপরীক্ষা হয়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পশ্চিম ভাগে ছিলেন পেশোয়া, সিন্ধিয়া ছিলেন গোয়ালিয়রে, ইন্দোরে ছিলেন হোলকার। এঁরা এবং আরও কয়েকজন মারাঠা সামন্ত-নৃপতি ইংরেজকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের দুজন প্রখ্যাতনামা কূটনীতিকের মৃত্যুর পর মারাঠাশক্তি দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে—এই দুজনের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহাদাজি সিন্ধিয়া ১৭৯৪ অব্দে মারা যান, এবং পেশোয়ার অমাত্য নানা ফড়নবিশ মারা যান ১৮০০ অব্দে। নানা দুর্বিপাক সত্ত্বেও মারাঠারা কিন্তু খুব সহজে ইংরেজের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নি; ইংরেজদের অনেকবার তারা ছোটো ছোটো যুদ্ধে হটিয়ে দিয়েছে। মারাঠা-শক্তির সত্যি সত্যি পতন হয় ১৮১৯ অব্দে। ইংরেজ এদের সংহত শক্তিকে পরাজিত করতে পারে নি, কিন্তু আলাদা আলাদা প্রত্যেককে সহজেই হারাতে পেরেছে। এই-যে এক-একটি রাজ্যের পৃথকভাবে পরাজয়—এইটাই সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। সিন্ধিয়া ও হোলকার শেষ পর্যন্ত ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে কোনোমতে সামন্ত-নৃপতির মতো টি'কে থাকলেন। বরোদার গাইকোয়াড় তো ইতিপূর্বেই ইংরেজকে প্রভুহিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

মারাঠাদের কথা শেষ করার আগে, মধ্য-ভারতের একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নামের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চাই। ইনি হলেন মহারানী অহল্যাবাঈ; ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৫ অবধি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই মহিয়সী রমণী ইন্দোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। যখন গদিতে অধিরোহণ করেন তখন তিনি ছিলেন ত্রিশ-বৎসর-বয়স্কা হিন্দু বিধবা। কী নিপুণভাবে তিনি রাজকার্য চালিয়ে গেছেন তা ভাবতেও আশ্চর্য মনে হয়। এ কথা বলাই বাহুল্য, তিনি পর্দা মানতেন না, মারাঠিদের মধ্যে এই বিশ্রী পর্দাপ্রথা নেই। রাজ্যশাসনের যাবতীয় খুঁটিনাটি অহল্যাবাঈ নিজেই দেখতেন, খোলা দরবারে বসে তিনি প্রজাদের আর্জি-আবেদন শুনে নিজের বিচারবুদ্ধিমতো তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করতেন। এইভাবে সামান্য গণ্ডগ্রাম ইন্দোরকে তিনি একটি ঐশ্বর্যময়ী নগরীতে পরিণত করেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ভালোবাসতেন না; নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে ইন্দোর তাঁর রাজত্বকালে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। অথচ ঠিক সেই সময়েই প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ঝগড়া-বিবাদ-যুদ্ধবিগ্রহের অন্ত ছিল না। অহল্যাবাঈ যে এখনও মধ্য-ভারতে দেবীর মতন সর্বসাধারণের পূজনীয়া হয়ে আছেন, এটা মোটেই আশ্চর্য নয়।

শেষ মারাঠা-যুদ্ধের অনতিপূর্বে ১৮১৪ থেকে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ অবধি নেপালের সঙ্গে ইংরেজের একটি সংঘর্ষ হয়। পার্বত্য-অঞ্চলে যুদ্ধ করা ইংরেজের পক্ষে সহজ হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয় এবং আজ যে দেরাদুন জেলার অন্তর্গত জেলে বসে আমি এই চিঠি লিখছি—সেই দেরাদুন, কুমায়ুন এবং নৈনিতাল জেলা ঐ যুদ্ধের ফলে ইংরেজের অধীনে আসে। তোমার হয়তো মনে আছে, চীন সম্বন্ধে চিঠি লিখতে গিয়ে তোমায় চীন-সৈন্যদলের যুদ্ধতৎপরতার একটা আশ্চর্য কাহিনী লিখেছিলাম, কেমন করে তারা তিব্বত পেরিয়ে পায়ে হেঁটে হিমালয় অতিক্রম করে গুর্খাদের তাদের নিজ-বাসভূমি নেপালে হারিয়ে দিয়ে যায়। এটা ঘটেছিল ইঙ্গ-নেপাল সংঘর্ষের ঠিক বাইশ বছর আগে। সেই থেকে নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করে এসেছে, আজকাল বোধ হয় আর করে না। নেপাল একটা অদ্ভুত দেশ, শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে খুবই অনুন্নত, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, নেপালের ভৌগোলিক সংস্থান নাকি অতীব মনোরম, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে নাকি এ দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। কাশ্মীর কিংবা হায়দ্রাবাদের মতো নেপাল ইংরেজের অধীনস্থ দেশ নয়। একে যদিচ স্বাধীন নেপাল বলা হয়, তবু বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজ-কর্তারা সতর্ক নজর রাখেন যাতে সে স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে না যায়। নেপালের পরাক্রান্ত ও যুদ্ধনিপুণ গুর্খারা ভারতে এসে ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগ দেয়, তাদের তখন কর্তব্য হয় ভারতীয়দের দাবিয়ে রাখা।

ভারতের পূর্ব-ভূখণ্ডে ব্রহ্ম এসেছিল প্রায় আসাম পর্যন্ত এগিয়ে। রাজ্যবিস্তারলোভী ইংরেজের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধল; পর পর তিনটি যুদ্ধের ফলে ইংরেজ একটু একটু করে ব্রহ্মদেশের অংশবিশেষ অধিকার করতে লাগল।

১৮৫৭ সালের
মহাবিদ্রোহের সময়কার
ভারতবর্ষ
আফগানিস্থান
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
মিরাট
দিল্লি
নেপাল
লক্ষ্ণৌ
অযোধ্যা
সিন্ধু
গোয়ালিয়র
ইন্দোর
বরোদা
আসাম
বঙ্গদেশ
ব্রহ্মদেশ
আভা
বোম্বাই
নিজাম
মহীশূর
মাদ্রাজ
ব্রিটিশ-অধিকৃত
অংশ
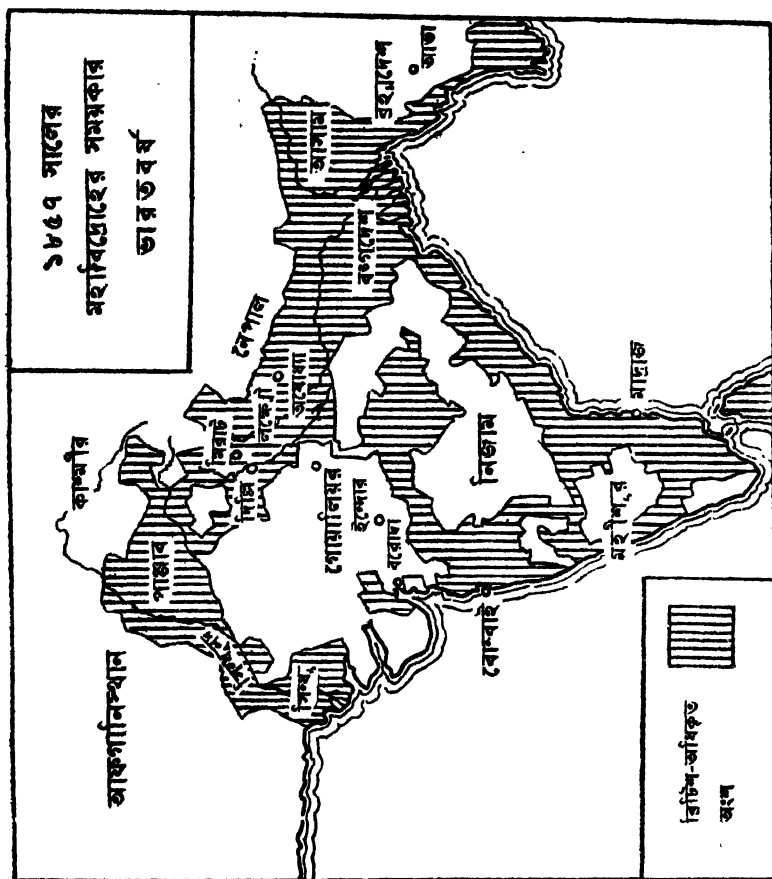
১৮২৪-২৬এর প্রথম যুদ্ধের ফলে আসামদেশ ইংরেজের আয়ত্ত হয়। ১৮৫২ অব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্ম-যুদ্ধের পর দক্ষিণ-ব্রহ্ম ইংরেজের অধিকারে আসে। মান্দালয়ে অবস্থিত উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী আভা এইভাবে ব্রহ্মের সমুদ্রতীরবর্তী ভূখণ্ড থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—যে-কোনো মুহূর্তে উত্তরভাগ ইংরেজের কবলস্থ হবার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। সর্বনাশ হল ১৮৮৫ অব্দে; তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পরে সমস্ত ব্রহ্মদেশ পরাজয় স্বীকার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে গেল। কিন্তু নেপালের মতো ব্রহ্মদেশও ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে চীনদেশের সামন্ত-রাজ্য—ব্রহ্ম থেকে নিয়মিত রাজকর দেওয়া হত চীনকে। খুবই আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রহ্ম তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করার কালে ইংরেজ কিন্তু চীনকে নিয়মিত রাজস্বপ্রদানের কথা স্বীকার করে নেয়। এ থেকেই বোঝা যাবে, ১৮৮৫ অব্দেও অর্থাৎ এই সেদিনও পর্যন্ত চীনের সামরিক শক্তির প্রতি ইংরেজ প্রভূত মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু চীন তখন নিজেই গৃহবিবাদে বিপর্যস্ত, কাজেই বিপদের সময় সে তার শরণাগত সামন্তদেশ ব্রহ্মকে সাহায্য করতে পারে নি। ১৮৮৫ অব্দের পর মাত্র এক বছরের মতো ইংরেজ চীনকে ব্রহ্ম-বাবদ রাজকর দেয়—অতঃপর কর দেওয়া বন্ধ করে।

ব্রহ্মযুদ্ধের কথা বলতে বলতে আমরা ১৮৮৫ অব্দে এসে পৌঁচেছি। সবকয়টি যুদ্ধের কথা আমি একসঙ্গে একযোগে সেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। এখন এসো আবার উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের উত্তরভাগে কী কী ঘটল তার আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। সে সময় পাঞ্জাবে রণজিৎসিংহের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী শিখ-রাজ্য অকস্মাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এই শতকের প্রায় প্রারম্ভেই রণজিৎসিংহ অমৃতসরের অধিপতিরূপে স্বীকৃত হন। বিশ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৮২০ অব্দে, রণজিৎসিংহ প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার করে বসেন। ১৮৩৯ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এর অব্যবহিত পরেই শিখ-রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে ও তাতে ভাঙন ধরতে আরম্ভ হয়। একটা পুরোনো প্রবচন আছে-না?—দুঃখের মধ্যে, বিপদের মধ্যে আমাদের সদ্‌গুণগুলি বিকাশলাভ করে এবং কৃতকার্য হয়ে যখনই আমরা আরামের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই অমনি আমাদের অধঃপতন শুরু হয়। যখন শিখরা অত্যাচারিত সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়-রূপে ছিল তখনও কিন্তু মোগল-বংশের শেষ সম্রাটেরা তাদের কাবু করতে পারে নি। কিন্তু রাজনীতিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাতীয় শক্তির বনিয়াদ দুর্বল হতে আরম্ভ করে। ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের দুটি যুদ্ধ হয়, প্রথমটি ১৮৪৫-৪৬ অব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৪৮-৪৯ অব্দে। চিলিয়ানওয়ালার দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধে ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়। কিন্তু তা হলে কী হয়? কূটনীতিবিদ্ ইংরেজরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় এবং পাঞ্জাব তারা অধিকার করে বসে। তুমি কাশ্মীর-কন্যা—তোমার জেনে রাখা ভালো যে, ইংরেজ পঁচাত্তর লাখ টাকার বিনিময়ে কাশ্মীর দেশটাকেই একজন রাজা জম্মু-অধিপতি গুলাবসিংহের কাছে বিক্রয় করে। গুলাবসিংহ বড়ো দাঁও মেরেছিল! গরিব কাশ্মীরি জনসাধারণ অবশ্য এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। কাশ্মীর এখন একটি ব্রিটিশ-অধীন দেশ এবং সেখানকার যিনি রাজা তিনি হলেন সেই গুলাবসিংহেরই বংশধর।

পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে ছিল আফগানিস্থান। তারই অপর দিকে ছিল রাশিয়া। মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার দ্রুত সাম্রাজ্যবিস্তার দেখে ইংরেজ তখন বিভীষিকাগ্রস্ত। তাদের ভয় ছিল, রাশিয়া হয়তো ভারত আক্রমণ করতে পারে। উনবিংশ শতকের সবচেয়ে বড়ো কথাটাই ছিল যাকে বলা হয় 'রুশ-আতঙ্ক'। এই আতঙ্ক-নিবারণ-কল্পেই বোধ হয় ইংরেজ ১৮৩৯ অব্দে অকারণে আফগানিস্থান আক্রমণ করে। তখনকার দিনে আফগান-সীমান্ত ছিল ব্রিটিশ-ভারত থেকে বহু দূরে. মাঝখানে ছিল স্বাধীন শিখ-রাজ্য। শিখরা ইংরেজ-সৈন্যের অগ্রগমনে বাধা দেয়। কিন্তু তা হলে কী হয়? কৌশলী ইংরেজ শিখ-রাজ্যের সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে শিখদের সাহায্য নিয়েই কাবুলে এসে উপস্থিত হয়। আফগানরা এই অকারণ আক্রমণের চরম প্রতিশোধ নেয়। অন্যান্য দিক থেকে অনুন্নত হলে কী হয়, স্বাধীনতা আফগানদের কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, মরিয়া হয়ে তারা তাদের দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্যে এগিয়ে এল। এর পর থেকে যে-কোনো বিদেশী শক্তিই আফগানদের স্বাধীনতা হরণ করতে এসেছে তারাই টের পেয়ে গেছে যে, এ হল ভিমরুলের চাকে হাত দেবার মতো ব্যাপার। যদিচ ইংরেজ কাবুল ও তৎসন্নিকটবর্তী আরও অনেক অঞ্চল অধিকার করে নেয়,

তবু এ জয় তাদের স্থায়ী হতে পারে নি। চারি দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল—আফগানরা ইংরেজদের হটিয়ে দিল দেশ থেকে, একটি বিরাট অক্ষৌহিনী শত্রুর হাতে সম্পূর্ণ ধ্বংসলাভ করল। প্রতিশোধলিপ্সায় ইংরেজ আর-একবার কাবুলের উপর আক্রমণ চালায়। কাবুল শহর অধিকার করে তারা সেখানকার প্রকাণ্ড একটি বাজার বোমার আঘাতে উড়িয়ে ফেলে, ইংরেজ-সৈন্য ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে ধনসম্পত্তি লুট করে, ধ্বংসের বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজ বুঝতে পারে যে, একাদিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে না গেলে আফগানিস্থান দখলে রাখা মুশকিল। তাই শেষ পর্যন্ত তারা আফগানিস্থান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়।

এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১৮৭৮ অব্দে আফগানিস্থানের ব্যাপার নিয়ে ইংরেজের আবার একটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে। তদানীন্তন আফগান-শাসনকর্তা আমীর রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন, এরকম একটা সংবাদ এল। আবার ঘটল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আবার বাধল যুদ্ধ; ইংরেজ আফগানিস্থান আক্রমণ করল। মনে হল, ইংরেজই বুঝি জয়লাভ করেছে। সন্ধির শর্ত আলোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ দূত ও তার সঙ্গীরা নৃশংসভাবে নিহত হল, ইংরেজদের একটি সৈন্যদল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। আবার সেই প্রতিহিংসা ও অতঃপর ভিমরুলের চাক থেকে দূরে সরে যাওয়া। এর পর কয়েকটা বছর আফগানিস্থানে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি চলতে থাকে। ইংরেজ জোর করতে লাগল যে, আমীর অন্য কোনো বিদেশী শক্তির সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ পাততে পারবে না, সেইসঙ্গে বছর বছর আমীরকে মোটা টাকাও দিতে লাগল। প্রায় তেরো বছর আগে, ১৯১৯ অব্দে, তৃতীয় বার আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে এবং তার ফলে আফগানিস্থান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সে কথা এখন না-হয় তোলা যাক—সে অনেক পরেকার কথা।

বড়ো বড়ো যুদ্ধ ছাড়া আরও অনেকগুলি ছোটোখাটো যুদ্ধ হয় ঊনবিংশ শতকে। এর মধ্যে একটি যুদ্ধ ইংরেজের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর, সে হল ১৮৪৩ অব্দে সিন্ধুদেশের সঙ্গে যুদ্ধ। সিন্ধুদেশের ব্রিটিশ প্রতিনিধি সিন্ধিদের এমনভাবে ভয় দেখান যাতে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অতঃপর বিরুদ্ধ দলকে নিষ্পেষিত করে তাদের দেশ কেড়ে নেওয়া—এ তো ইংরেজের পক্ষে নিতান্ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার! সিন্ধু-বিজয়ের জন্যে যেসব ইংরেজ অফিসার এই যুদ্ধে যোগদান করে তারা প্রত্যেকেই মোটা টাকা পুরস্কার লাভ করে। একা ব্রিটিশ প্রতিনিধিই (সার চার্লস্ নেপিয়ার) দক্ষিণা পান সাত লক্ষ টাকা! কাজেকাজেই বিবেকবুদ্ধিহীন দুঃসাহসিক ইংরেজ যে সেযুগে ভারতে আসতে প্রলুব্ধ হবে—এ আর বিচিত্র কী!

অযোধ্যা ইংরেজের কুক্ষিগত হয় ১৮৫৬ অব্দে। সে সময় অযোধ্যায় অরাজক অবস্থা। তখন দেশ-শাসন করতেন যাঁরা তাঁদের বলা হত নবাব-উজির। গোড়াতে নবাব-উজির নিযুক্ত হন মোগল-বাদশাহের সুবেদাররূপে। কিন্তু মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে অযোধ্যার নবাব-উজির নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সে স্বাধীনতা খুব বেশি দিন টেঁকে নি। পরবর্তী নবাব-উজিরদের না ছিল শাসনক্ষমতা, না ছিল চরিত্রশক্তি। তাঁরা ভালো কাজ করতে চাইলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে কিছুই করতে পারতেন না। সত্যকার ক্ষমতা নবাব-উজিরদের ছিল না। অযোধ্যার আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে কীভাবে উন্নতি হতে পারে কোম্পানি সেদিকে কোনো দৃষ্টিই দেয় নি। ফলে অযোধ্যা-রাজ্য ক্রমেই অবনতি লাভ করে এবং একপ্রকার অপরিহার্যভাবেই যেন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকার সম্বন্ধে অনেক-কিছুই বলা হল। এগুলি আসলে আভ্যন্তরীণ দুরবস্থার একটা বাহ্যিক প্রকাশ। এটা একহিসেবে ছিল অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজদের আগমনের প্রায় সমসময়ে দেখি যে, ভারতের পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেন একটা ভাঙন ধরেছে। সামন্ত-তন্ত্রের তখন প্রায় অন্তিম অবস্থা। বাইরে থেকে কোনো বিদেশী শক্তির আগমন না হলেও সামন্ত-প্রথা এ দেশে অচল হয়ে যেত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মতন এ দেশেও ক্রমে একটি নূতন শ্রেণী মাথা-চাড়া দিয়ে উঠত—সে হল ধন-উৎপাদনকারী বণিক-সম্প্রদায়। এই ভাঙনের মুখে আসার দরুন ইংরেজ অতি সহজেই ভারত অধিকার করতে সমর্থ হয়। যেসব রাজরাজন্যদের সঙ্গে

ইংরেজের যুদ্ধ বাধল তাঁরা তখনই যেন প্রাক্-আধুনিক বিলীয়মান একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক-স্বরূপ হয়ে গেছেন—তাঁদের সামনে সত্যকারের ভবিষ্যৎ বলে কোনো-কিছু সম্ভাবনা ছিল না। তাঁরা কালের নিয়মেই ধ্বংস পেতে বাধ্য হলেন; সুতরাং ইংরেজের এই কৃতকারিতায় বিস্মিত হবার কিছু নেই। এক দিক থেকে বলতে গেলে বলা চলে যে, তারা সামন্ত-সম্প্রদায়ের সত্বর বিলোপ-সাধনে সহায়তা করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ইংরেজই আবার অন্য দিক থেকে এই অসময়োচিত প্রথা অন্তত বাহ্যিক দিক থেকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। এর পিছনকার কারণ আর-কিছুই নয়, সময়ের স্রোতের সংগে ভারত যাতে প্রগতির দিকে অগ্রসর না হতে পারে, ইংরেজদের মনোগত ইচ্ছাই হল তাই।

এইভাবে ইংরেজরা ইতিহাসের একটা অনিবার্য অভিব্যক্তি-প্রকাশে সহায়তা করল—সামন্ততন্ত্র থেকে শিল্পপতি-প্রতিষ্ঠিত ধনিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল ভারতবর্ষে। এই পরিবর্তনের নিমিত্ত হলেও ইংরেজরা নিজেরা জানত না যে, ইতিহাসের এই প্রগতি তাদের দ্বারাই সম্ভবপর হল। যেসব ভারতীয় রাজরাজন্য তাদের বিরুদ্ধতা করেছিল তারাও জানত না যে, এইরকম একটা বিরাট পরিবর্তন ভারতে সংঘটিত হবে। যুগ-পরিবর্তন যখন আসে তখন সে কালের অমোঘ ছাড়পত্র নিয়েই আসে। কালের নিয়মে যা জীর্ণ পুরাতন তার ধ্বংস অবধারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যুগান্তরের এই স্বাভাবিক নীতিটুকু আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না, এবং বুঝলেও স্বীকার করে নিতে পারি না। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় যা কালের গতির সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না তার মানে-মানে পিছিয়ে পড়াই কর্তব্য, নতুবা তার স্থান নির্দিষ্ট হয় যাকে একজন লেখক বলেছেন 'ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে'। ভারতের সামন্ত-সম্প্রদায় এই সহজ সত্যটি বুঝতে চায় নি এবং তার ফলে নূতন কালের অগ্রদূত ইংরেজের কাছে তাদের পদে পদে হার মানতে হয়েছে। আজ ইংরেজও ঠিক এই ভুলটাই করছে তাদের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যে। সাম্রাজ্যবাদের দিন যে ফুরিয়েছে এবং কালের রথচক্রের নির্মম নিষ্পেষণে তা যে গুঁড়ো হয়ে যেতে বাধ্য, এ কথা ইংরেজ মেনে নিতে চায় না। সুদূরপ্রসারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও একদিন এই 'ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে' লুপ্ত হতে হবে।

ভারতের এই সামন্ত-সম্প্রদায় ইংরেজের রাজ্য-বিস্তার-প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্যে একবার চরম প্রয়াস করে। বিদেশীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। একেই বলা হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহি-বিদ্রোহ। তখন দেশের সর্বত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে নিদারুণ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল টাকা রোজগার; এক দিকে তাদের শোষণনীতি, অন্য দিকে অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারীর ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অর্থলিপ্সা—এই দুয়ের সংমিশ্রণে একটি শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমনকি ভারতস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদলের মধ্যেও একটি তিক্ততা ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ও ছোটোখাটো অনেকগুলি সেনা-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সামন্ত-রাজন্য ও তাঁদের বংশধরদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ তো ছিলই। এইভাবে একটা বিরাট রাজদ্রোহ সকলের অলক্ষ্যে তলায়-তলায় রূপায়িত হতে থাকে। এই বিদ্রোহের আগুন সবচেয়ে দ্রুত বিস্তারলাভ করে যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে। অথচ ভারতবাসীরা কী করে, কী ভাবে, এসব বিষয়ে ব্রিটিশ মহাপ্রভুরা এমনি উদাসীন ছিলেন যে, তলায়-তলায় এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার যে সংঘটিত হচ্ছে তা সরকারবাহাদুর ঘুণাক্ষরেও টের পান নি। ভারতের সর্বত্র যাতে একসংগে একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা হয় তার জন্যে একটি বিশেষ তারিখও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। অধৈর্যবশত মীরাটের একদল ভারতীয় সৈন্য যথানির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই ১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে তারিখে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অকাল অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় লোকদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ও তাঁদের কার্য-সূচীতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে, সরকারও সাবধান হবার সুযোগ পান। সে যাই হোক, বিদ্রোহ অতি সত্বর যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লিতে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিস্তৃত হয়। এটাকে কেবল সেনা-বিদ্রোহ বললে ভুল বলা হবে, এ বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযান। মোগল-বংশের শেষ নৃপতি বৃদ্ধ কবি বাহাদুর শাহ্‌কে কেউ কেউ সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। ঘৃণিত বিদেশীর কবল থেকে মুক্তি-সংগ্রামের রূপ নিল এই সেনা-বিদ্রোহ। কিন্তু এই স্বরাজ-

সাধনার মূলে ছিল স্বৈরতন্ত্রী সম্রাটকে পুরোভাগে রেখে সামন্ত-শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণের স্বরাজ লাভ এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য যদিচ ছিল না, তবু তারা কাতারে কাতারে বিদেশী-বিতাড়ন-যজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এর কারণ ছিল মূলত দুটি—জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল, তাদের দুঃখদুর্গতির মূলে হল ইংরেজ-শাসন; দ্বিতীয়ত, ভারতের নানা স্থানে জমিদারদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। এ ছাড়া ছিল বিধর্মী-ধ্বংসের একটা স্বাভাবিক প্ররোচনা। এর ফলে দেখি যে, হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে যোগদান করেছিল এই জন-যুদ্ধে।

বেশ কয়েকটা মাস উত্তর ও মধ্য -ভারতে ইংরেজ-শাসনব্যবস্থা টলটলায়মান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ-নিবারণ করে কতকটা ভারতীয়েরা নিজেরাই। শিখ ও গুর্খারা ছিল ইংরেজের অনুরক্ত। দক্ষিণ-ভারতে নিজাম, উত্তর-দেশে সিন্ধিয়া, এবং আরও অনেক দেশীয় রাজরাজন্য ইংরেজের সহায়তা করার জন্যে এগিয়ে আসেন। বিদ্রোহে ভাঙন ধরে কেবল বিভীষণ-বৃত্তির ফলে যে এমন নয়, এই বিদ্রোহের মধ্যেই এমন একটি দৌর্বল্য ছিল যার ফলে এটা সার্থক হতে পারে নি। পূর্বেই বলেছি, যুদ্ধ ঘটেছিল সামন্ত-রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে, সুতরাং এর মধ্যে প্রগতির স্বাক্ষর ছিল না। বিদ্রোহ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে নি উপযুক্ত নেতার অভাবে। সংগঠনের মধ্যে অনেক ত্রুটি তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ। কোনো কোনো দল নিষ্ঠুরভাবে নির্বিচারে নিরস্ত্র ও অসহায় ইংরেজদের হত্যা করে এই বিদ্রোহকে কলঙ্কিত করেছিল। এই অমানুষিক বর্বরতা ইংরেজ বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেবে তা তো হয় না; একদিন তারা সুদে-আসলে এই নিষ্ঠুরতার বহুগুণিত প্রতিশোধ নিয়েছিল। তাদের জাতক্রোধের কারণ হয়েছিল কানপুরের হত্যাকাণ্ড—নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েও পেশোয়ার বংশধর নানাসাহেব বিশ্বাসঘাতকতা করে কানপুরের বাসিন্দা ইংরেজদের স্ত্রীপুরুষশিশু-নির্বিশেষে হত্যা করার আদেশ দেন। কানপুরের একটি কূপ আজও এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের স্মারকরূপে রক্ষিত আছে।

প্রত্যন্তঃপাতী অঞ্চলের বহু স্থানে ইংরেজ অধিবাসীদের ভারতীয়েরা ঘেরাও করে। কখনও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার দেখানো হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো হয় নি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইংরেজরা বেশ সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে লড়েছিল বলতে হবে। ব্রিটিশ শৌর্য বীর্য ও সহনক্ষমতার উজ্জ্বল উদাহরণ হল লক্ষ্ণৌর অবরোধ-পর্ব। এই অধ্যায়ের সঙ্গে আউটরাম ও হ্যাভলকের নাম চিরকাল জড়িয়ে থাকবে। দিল্লি-অবরোধ ও ১৮৫৭ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লির পতনের সঙ্গে এই বিদ্রোহের মোড় ঘুরে যায়। এই সময় থেকে বেশ কয়েকটা মাস ধরে ইংরেজ বিদ্রোহ দমন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। দেশের সর্বত্র একটা নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়, বহু লোককে বিনাপরাধে গুলি করে মারা হয়, কামান দেগে অনেক লোকের দেহ টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া হয়, হাজার হাজার লোককে পথিপার্শ্বের গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। নীল নামে একজন ইংরেজ-সেনাপতি এলাহাবাদ থেকে কানপুর অবধি মার্চ করে যাওয়ার কালে রাস্তার দু ধারের গাছে গাছে বহুসংখ্যক লোককে ফাঁসিতে লটকে দিয়েছিল; শোনা যায়, সে রাস্তায় হেন গাছ ছিল না যা ফাঁসিকাঠে রূপান্তরিত হয় নি। সমৃদ্ধ গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ইতিহাসের এ এক বীভৎস ও বেদনাদায়ক অধ্যায়—এর সবটুকু সত্য তোমার কাছে প্রকাশ করে বলি আমার সে দুঃসাহস নেই। ধরা যাক, নানাসাহেব বর্বরোচিতভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন, কিন্তু বর্বরতা ও নৃশংসতায় অনেক অনেক ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ নানাসাহেবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নেতৃবিহীন বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদল অনেক জায়গায় নির্মম ও জঘন্য ভাবে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু ইংরেজ-সেনাধ্যক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ইংরেজ-সৈন্য ততোধিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল। দু দলের মধ্যে তুলনা করতে আমার রুচি হয় না, দু পক্ষেরই দোষত্রুটি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মিথ্যাভাষী ইতিহাস দুষেছে কেবল ভারতীয়দের, অপর পক্ষ সম্বন্ধে ইতিহাসের পাতায় কোনো নজির মিলবে না। এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বরতার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সুচিন্তিত নিষ্ঠুরতার

কোনো তুলনা হতে পারে না। আমাদের যুক্তপ্রদেশের অনেক গ্রামে তুমি গিয়ে দেখতে পাবে, আজও প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের কথা মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি।

এই নৃশংসতার অন্ধকারে একটি নাম আলোকশিখার মতো দেদীপ্যমান থাকবে—সে নাম হল ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের। লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন বালবিধবা, সিপাহি-বিদ্রোহের সময় তাঁর বয়স ছিল মোটে কুড়ি। পুরুষের পোশাক ধারণ করে তিনি তাঁর সৈন্যদলের নেত্রীস্বরূপিণী হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁর অমিত সাহস, অসামান্য দক্ষতা ও অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেম সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এমনকি, যে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি পর্যন্ত বলেছেন যে, বিদ্রোহীদলের নেতাদের মধ্যে লক্ষ্মীবাঈই ছিলেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ ও সকলের অপেক্ষা সাহসী'। তিনি সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৫৭-৫৮ অব্দের বিদ্রোহ ভারতে সামন্ত-শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টা। নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মতো আচমকা জ্বলে উঠে এই আগুন চিরকালের মতো নিভে যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে যায় ভারতের অনেক-কিছু। এই বিদ্রোহের ফলেই মোগল-সম্রাট-বংশ নির্বংশ হয়। বন্দী অবস্থায় দিল্লি নিয়ে যাবার পথে হাডসন নামে একজন ইংরেজ অফিসার অকারণে বাহাদুর শাহ্‌-এর দুই ছেলে ও একজন পৌত্রকে গুলি করে হত্যা করে। তৈমুর, বাবর ও আকবরের বংশ শোচনীয়ভাবে নির্মূল হল।

এই বিদ্রোহের ফলেই ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে ভারত-শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ-বড়োলাটবাহাদুর ভাইসরয় অথবা রাজ-প্রতিনিধিরূপে পরিচিত হন। উনিশ বছর পরে ১৮৭৭ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী কাইজার-ই-হিন্দ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। রোমের সিজারদের এবং কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের সম্রাটদের ছিল এই উপাধি। মোগলবংশ আর রইল না; কিন্তু স্বৈরতন্ত্রী মোগল-সম্রাটদের মনোবৃত্তি এমনকি তাদের প্রতীক-চিহ্নাদিও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এই মহারানী গ্রহণ করলেন।

১১০

ভারতের শিল্পজীবীদের দুর্দশা

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩২

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল সেসবের কথা বলা হল। এখন আমরা ঐ সময়কার অন্যান্য ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। এক দিক থেকে সেগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহের চেয়েও বড়ো ঘটনা। মনে রাখতে হবে যে, সেসব যুদ্ধে লাভ হয়েছে ইংলণ্ডের, কিন্তু তার ব্যয় বহন করতে হয়েছে ভারতবর্ষের। ইংরেজরা বারবার এই চালাকিটি করে এসেছে। যুদ্ধ করে তারা ভারতবর্ষকে জয় করেছে, আবার ভারতবাসীদের কাছ থেকেই তার খরচা উশুল করেছে। এমনকি আশপাশের রাজ্য—যেমন, ব্রহ্মদেশ কিংবা আফগানিস্থান—যাদের সঙ্গে কোনোকালে আমাদের ঝগড়াবিবাদ ছিল না, তাদের সঙ্গে ইংরেজ যখন যুদ্ধ করেছে তখনও ভারতবাসীকে রক্ত এবং অর্থ দিয়ে তার যুদ্ধজয়ে সহায়তা করতে হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ধনসম্পত্তির ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং এসব যুদ্ধে ভারতবর্ষের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া যুদ্ধের পরে বিজেতারা আবার পরাজিতের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করে থাকে, ইতিপূর্বে সিন্ধুদেশে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখেছি। নানা কারণে দেশের সম্পদ বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেশের সোনা রুপো পূর্ববৎ অকাতরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জঠরে গিয়ে প্রবেশ করতে লাগল এবং কোম্পানির অংশীদারদের মোটা লাভ ক্রমেই মোটা হয়ে উঠল।

তোমাকে বোধকরি আগেই বলেছি যে, ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ইংরেজ বণিকদেরই ছিল আধিপত্য। এরা এক দিকে ব্যবসা করেছে, আর-এক দিকে নির্বিচারে টাকা লুটেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা কত-যে টাকা লুট করেছে তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের দিক থেকে এক কাণাকড়িও লাভ হয় নি। সাধারণত ব্যবসার বেলায় লাভালাভটা দু পক্ষেই ভাগাভাগি হয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের পর থেকে লাভের অংশটা ষোলো আনাই গিয়েছে ইংলণ্ডের হাতে। এইভাবে ভারতবর্ষের বহু সম্পদ নষ্ট হল, আর সেই অর্থে ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্য হু হু করে বেড়ে চলল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ধরনের একতরফা ব্যবসা আর নির্লজ্জ লুটপাট চলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। এখন থেকে ভারতবর্ষকে তারা কাঁচামাল সরবরাহের একটি বিরাট কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে লাগল। সেসব মাল তাদের কারখানায় প্রেরিত হত। ক্রমে তাদের কারখানা-জাত দ্রব্যাদি এসে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলল। এর ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদিচ একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান মাত্র, তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশের শাসনভার তাদেরই উপর ন্যস্ত ছিল। অবশ্য, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দৃষ্টি ক্রমশই এ দিকে বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছিল। তার পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হল বিদ্রোহ। সে কথা তোমাকে গত চিঠিতে লিখেছি। বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষের শাসনভার সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নিল। কিন্তু তাতে শাসনপ্রণালীর কোনোই পরিবর্তন হল না। কারণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব যে ধনিক-শ্রেণীর হাতে ছিল, ব্রিটেনের শাসনক্ষমতাও তাদেরই হস্তগত ছিল।

ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী হতে বাধ্য। যখনই স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে তখনই লাভের দিকটা ষোলো আনা ইংলণ্ডের পক্ষে গিয়েছে; কারণ, সর্ব ক্ষমতা তাদেরই হাতে ছিল। ইংলণ্ডে যখন শিল্পের প্রসার মোটে শুরু হয় নি তখনই একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ভারতে কোম্পানির শাসনের কুফল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। এঁর নাম অ্যাডাম স্মিথ, বলতে গেলে ইনিই অর্থনীতি-শাস্ত্রের জনক। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ওয়েল্থ্ অব নেশন্স্' -নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন :

"কেবলমাত্র কোনো বণিক-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত যে শাসনব্যবস্থা তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যবস্থা আর হতে পারে না।......শাসকহিসেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তব্য, ইউরোপীয় দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে নিয়ে যতটা সম্ভব শস্তা দরে বিক্রি করা আর ভারতীয় দ্রব্য এ দেশে এনে যথাসম্ভব উঁচু দরে বিক্রি করা। কিন্তু বণিকহিসেবে ঠিক এর উল্টোটা করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। শাসকহিসেবে এদের মনে রাখা উচিত যে, শাসিতের কল্যাণেই শাসকের কল্যাণ। কিন্তু বণিকের স্বার্থ ঠিক তার উল্টো।"

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, ইংরেজ যখন এ দেশে আসে তখন আমাদের পুরোনো সামন্ততন্ত্র ভাঙতে শুরু করেছে। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষের নানা অংশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তার কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। এখানকার তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি এশিয়া এবং ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি হত। ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্ত এসব কথা লিখে গিয়েছেন। পূর্ববর্তী কোনো কোনো চিঠিতে তোমাকে বলেছি যে, বহু প্রাচীন কালেও ভারতীয় বণিকরা বিদেশে বাণিজ্যবিস্তার করেছিল। চার হাজার বৎসর পূর্বে মিশরের মমী ভারতীয় মসলিনের দ্বারা আবৃত হত। ভারতীয় শিল্পজীবীদের খ্যাতি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য -দেশসমূহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি রাজনৈতিক পতনের পরেও এইসব শিল্পজীবীরা বহুকাল তাদের শিল্পদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশী বণিকরা যখন এ দেশে আসত তখন নিজেদের জিনিষ বিক্রি করতে আসত না, এ দেশ থেকে সুদৃশ্য দ্রব্যাদি নিয়ে গিয়ে নিজের দেশে বিক্রি করত আর প্রচুর লাভ করত। ইউরোপীয় বণিকরা প্রথমটায় কাঁচা মালের লোভে

এ দেশে আসে নি, এসেছিল শিল্পজাত দ্রব্যের লোভে। এ দেশ জয় করবার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ব্যবসা ছিল ভারতে-প্রস্তুত সুতোর, পশমের এবং রেশমের বস্ত্র নিজ দেশে নিয়ে বিক্রি করা। বিশেষ করে বয়নশিল্পেই ভারতবর্ষ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "বয়নশিল্পই তখন আমাদের জাতীয় শিল্প ছিল, এবং মেয়েরা ঘরে ঘরে চরকায় সুতো কাটত।" ভারতীয় বস্ত্র শুধু ইংলণ্ডে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যেত। তা ছাড়া, চীন জাপান ব্রহ্মদেশ আরব পারশ্য এবং আফ্রিকার কোনো কোনো অংশে ভারতীয় বস্ত্রের প্রচলন ছিল।

বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ নগর সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছেন যে, "এই শহর লণ্ডন শহরের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ এবং জনবহুল ছিল, তবে মুর্শিদাবাদ নগরে কোনো কোনো ব্যক্তি এরূপ প্রভূত ধনের অধিকারী ছিলেন যে তাঁদের ন্যায় বিত্তশালী ব্যক্তি তখন লণ্ডন শহরে ছিল না।" ক্লাইভ এ কথা বলেছেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর পলাশির যুদ্ধ জয় ক'রে ইংরেজরা বাংলাদেশ অধিকার করে। দেখা যাচ্ছে, সেই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তেও বাংলাদেশ ধনে জনে পরিপূর্ণ এবং বহু শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র। বিশেষ করে ঢাকা নগরী মসলিনের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছিল; ঢাকাই মসলিন দেশদেশান্তরে রপ্তানি হত।

এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ তখন কৃষিজীবী অবস্থা ছাড়িয়ে শিল্পোন্নতির পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিজীবী দেশ, বরাবর তাই ছিল, এখনও আছে এবং আরও বহুকাল তাই থাকবে। কিন্তু দেশটা যদিচ কৃষিপ্রধান এবং গ্রামপ্রধান তথাপি শহর এবং নগরও ধীরে ধীরে এখানে গড়ে উঠছিল। শিল্পজীবীর দল এসব শহরে এসে জমা হত। শহরে ছোটো ছোটো কারখানা ছিল, তার কোনো-কোনোটিতে শতাধিক কারুশিল্পী কাজ করত। অবশ্য পরবর্তীকালে আমাদের যান্ত্রিক-যুগে যেসব বিরাট বিরাট কারখানার সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় এগুলো কিছুই নয়। যন্ত্রযুগের আগে ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে নেদারল্যাণ্ডে, এরকম ছোটো ছোটো বহু কারখানা ছিল।

গোড়ার দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় শিল্পকে কিছু কিছু উৎসাহ দিয়েছিল। কারণ, ওটা তাদের অর্থাগমের একটা পন্থা ছিল। ভারতীয় পণ্য বিদেশে প্রচলিত হওয়াতে এ দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের শিল্পজীবীরা ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতায় ভীত হয়ে ঐসব পণ্যের উপর মোটা কর বসাবার জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে লাগল। ভারতীয় কোনো কোনো দ্রব্যের ইংলণ্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল, সেসব জিনিষের ব্যবহার অত্যন্ত দোষাবহ বলে গণ্য হতে লাগল। আইনের সাহায্যে সেই বর্জন-নীতি খুব কড়াভাবে চালু করে দিল। আর, ভারতবর্ষে বিলিতি বস্ত্র বর্জন করবার কথা মুখে উচ্চারণ করলেও জেলে যেতে হয়! কেবলমাত্র ইংলণ্ড ভারতীয় দ্রব্য বর্জন করলেও আমাদের বিশেষ-কিছু ক্ষতি হত না, কারণ ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য বহু দেশে আমাদের পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মারফত ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ তখন ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে এসে গিয়েছিল। সেই সুযোগে তারা ভারতীয় শিল্পকে পঙ্গু করে এ দেশে ব্রিটিশ শিল্পবিস্তারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ও দিকে ব্রিটিশ পণ্যের উপর কোনোরূপ শুল্ক ছিল না, তারা বিনা বাধায় আমাদের দেশে প্রবেশ করতে লাগল। ভারতীয় কারুশিল্পীদের জোরজবরদস্তি করে বাধ্য করা হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে। ইংরেজরা আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেও পঙ্গু করবার জন্যে নানারকম বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। দেশের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রব্যাদি প্রেরণ করতে হলে নানারকম শুল্ক দিতে হত।

ভারতের বয়নশিল্প এতই উন্নত প্রণালীর ছিল যে, ইংলণ্ডের যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। ইংলণ্ডের বয়নশিল্পকে রক্ষা করবার জন্যে ভারতীয় পণ্যের উপর শতকরা আশি টাকা হারে শুল্ক বসানো হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেও ভারতীয় রেশমি এবং অন্যান্য বস্ত্র ব্রিটিশ বস্ত্রাদির তুলনায় অল্প মূল্যে ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রি হত। কিন্তু এটা বেশি দিন চলে নি, আমাদের ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয় শিল্প বিনষ্ট করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল। এমনিতেও যন্ত্রশিল্পের যেমন দ্রুত উন্নতি হতে লাগল তাতে আমাদের

কুটিরশিল্প বেশি দিন প্রতিযোগিতায় টি'কে থাকতে পারত না। কুটিরশিল্পের চেয়ে যন্ত্রজাত দ্রব্য পরিমাণে অধিক এবং দামের দিক দিয়ে শস্তা হতে বাধ্য। ও দিকে ভারতীয় শিল্পজীবীরা যে আপন শিল্পপ্রসারের দ্বারা এই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে তারও উপায় ছিল না। ইংলণ্ড জোর করে আমাদের শিল্পপ্রসারের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

যে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে বলতে গেলে প্রাচ্যদেশসমূহের ল্যাংকাশায়ারের স্থান গ্রহণ করেছিল এবং অষ্টাদশ শতকে দেশে দেশে প্রচুর বস্ত্র সরবরাহ করেছে, সে এখন বয়নশিল্প ত্যাগ করে বিলিতি বস্ত্রের খদ্দের হয়ে দাঁড়াল। নূতন-উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলো অনায়াসেই ভারতবর্ষে আসতে পারত, কিন্তু তা না এসে কেবলমাত্র যন্ত্রজাত পণ্যই এ দেশে আসতে লাগল। এতদিন ভারতীয় পণ্য বিদেশে যেত আর তার বিনিময়ে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনারুপোর আমদানি হত। এখন ঠিক তার উল্টো ব্যাপার হল। বিদেশী মালের বিনিময়ে আমাদেরই সোনারুপো বিদেশে চালান হতে লাগল।

বিদেশী বাণিজ্যের আক্রমণে আমাদের বস্ত্রশিল্পই সর্বপ্রথম বিনাশপ্রাপ্ত হল। ইংলণ্ডে যান্ত্রিক শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য শিল্পেরও একে একে পতন হতে লাগল। দেশের শিল্পবাণিজ্যকে রক্ষা করা এবং উৎসাহ দেওয়া দেশের গবর্মেণ্টের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু রক্ষা করা বা উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, যখনই ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে তখনই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নির্মমভাবে ভারতীয় শিল্পকে আঘাত করেছে। এইভাবে ভারতবর্ষে পোত-নির্মাণের কার্য বন্ধ হয়ে গেল, ধাতুদ্রব্যের ব্যবসা নষ্ট হল এবং আস্তে আস্তে কাঁচ এবং কাগজের ব্যবসাও লোপ পেয়ে গেল।

গোড়ার দিকে শুধু বড়ো বড়ো বন্দর এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহেই বিদেশী দ্রব্যের প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে রাস্তাঘাট এবং রেলপথ -নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পণ্য বহুদূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে তথাকার শিল্পজীবীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদসাধন করল। সুয়েজখাল খননের ফলে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যবধান কমে গেল এবং পূর্বাপেক্ষা অল্প খরচে বিলিতি দ্রব্য আমদানির রাস্তা হল। ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে যন্ত্রজাত বিদেশী দ্রব্য এসে আমাদের নগর গ্রাম সব ছেয়ে ফেলল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে শেষ অবধি এই কাণ্ড চলেছে এবং আজ পর্যন্তও তার জের চলছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই বিদেশী পণ্যের বন্যাটাকে কিঞ্চিৎ রোধ করা গিয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

এই ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বাণিজ্য (বিশেষ করে বিলিতি-বস্ত্র-ব্যবসায়) একে একে আমাদের সমস্ত হস্তচালিত শিল্পের বিনাশ সাধন করেছিল। এ ছাড়াও এই ব্যাপারের আর-একটা দিক আছে, সেটা আরও সাংঘাতিক। এই-যে লক্ষ লক্ষ শিল্পজীবীর জীবিকার উপায়টি নষ্ট হল, তাদের তখন কী অবস্থা হয়েছিল! অগণিত লোক, যারা কেউ-বা তাঁতের কাপড় বুনে কিংবা অন্য কাজ করে জীবিকা অর্জন করত তাদের কী ঘটল? ইংলণ্ডে যখন প্রথম বড়ো বড়ো কারখানার পত্তন হল তখন ও দেশেও বহু শিল্পজীবীর এই দুর্দশাই হয়েছিল। তাদেরও যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া যে এরা পরে ঐসব কারখানাতেই কাজ পেয়েছে এবং নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তো সে উপায় ছিল না। এখানে কারখানাই নেই। ইংরেজ চায় নি যে, ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি হয়; কাজেই এখানে কারখানা গড়ে তোলবার কোনো সুযোগসুবিধেই দেওয়া হয় নি। এখন এই দরিদ্র উপবাসক্লিষ্ট বেকার শিল্পজীবীরা অনন্যোপায় হয়ে কৃষিকার্যে ফিরে গেল। কিন্তু সেখানেই-বা অত লোকের স্থান হবে কেন? অত জমি কোথায়? খুব অল্পসংখ্যক শিল্পজীবীই চাষবাসের কাজে নিযুক্ত হল। বেশির ভাগ লোক ভূমিহীন শ্রমজীবীর ন্যায় চাকরির উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহু লোক না খেতে পেয়ে মারা গেল। তখন যিনি এ দেশের বড়োলাট তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন, "দেশময় যে দুঃখদুর্দশা দেখা দিয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তাঁতিদের হাড়গোড়ে দেশের মাঠঘাট ছেয়ে গেছে।"

এইসব তাঁতি এবং শিল্পজীবীর দল বেশির ভাগ থাকত শহরে-বন্দরে। এখন তাদের ব্যবসা উঠে যাবার ফলে এরা দলে দলে জমির খোঁজে গ্রামে ফিরে যেতে লাগল। এইভাবে শহরের লোক-সংখ্যা কমে গিয়ে গ্রামগুলি জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। অর্থাৎ এখন থেকে ভারতবর্ষে শহুরে-জীবনের চেয়ে গ্রাম্য-জীবনই প্রধান হয়ে উঠল। এই গ্রামমুখী গতি সারা ঊনবিংশ শতক ধরেই চলেছিল, এমনকি এখনও চলছে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটি ঘটেছে। যন্ত্রচালিত শিল্পোৎপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র লোকজন গ্রাম ছেড়ে বরং শহরের দিকেই ধাওয়া করেছে। ভারতবর্ষে হয়েছে এর উল্টো। শহর-বন্দরের লোকসংখ্যা কমে গিয়ে ক্রমেই সেগুলো নির্জীব হয়ে এসেছে। কৃষিজীবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল এবং জীবনধারণ ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

প্রধান প্রধান শিল্পগুলো লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোখাটো কুটিরশিল্পগুলিও একে একে উঠে যেতে লাগল। তুলো পেঁজা, রঙ করা, ছাপ দেওয়া, এমনকি চরকায় সুতো কাটা বন্ধ হয়ে গেল। আগে প্রতি ঘরে ঘরে যে চরকা দেখা যেত সে যেন হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। গরিব চাষিদের যে উপরি-আয়টুকু ছিল তাও বন্ধ হল, কারণ বাড়ির মেয়েছেলেরাই সুতো কেটে পরিবারের খানিকটা আয় বৃদ্ধি করত। যান্ত্রিক শিল্পের আরম্ভকালে ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলেও এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার পরিবর্তনটা হয়েছিল স্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ পুরোনো প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটা নূতন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই পরিবর্তনটা হল একটা অঘটনের মতো। পূর্বপ্রচলিত কুটিরশিল্পগুলি উঠে গেল, অথচ তার জায়গায় নূতন কিছুর জন্ম হল না। ব্রিটিশ শিল্প রক্ষার জন্য ইংরেজ কর্তারাই তা হতে দিলেন না।

ইংরেজরা যখন আমাদের দেশ অধিকার করে তখন ভারতবর্ষ শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধই ছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে আশা করা যাচ্ছিল, ইংরেজরা আধুনিক কল-কারখানার সাহায্যে দেশের শিল্পকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তুলবে। কিন্তু ব্রিটিশ কূটনীতির ফলে দেশ উন্নতির পথে না এগিয়ে অবনতির পথে গেল। বরং যেটুকু দেশজ শিল্প ছিল তাও জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতবর্ষ পুরোপুরি কৃষিজীবী দেশে পরিণত হল।

অসংখ্য বেকার শিল্পজীবীকে এখন চাষবাসের উপর নির্ভর করতে হল। একেই জমিতে কুলোয় না, তার উপরে ক্রমেই অধিকসংখ্যক লোক এসে জমিতে ভর করতে লাগল। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য-সমস্যার এই হচ্ছে গোড়ার কথা, আমাদের সকল দুঃখদুর্দশার মূল এইখানে। যতদিন-না এই মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততদিন ভারতীয় চাষি এবং গ্রামবাসীদের দুঃখ কখনও দূর হবে না।

অসংখ্য লোক জমি আঁকড়ে পড়ে আছে, চাষবাস ছাড়া আয়ের আর-কোনো পন্থা নেই, ফলে জমি ভাগ ভাগ করে এক-এক খণ্ডকে শতধাবিভক্ত করা হয়েছে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, আর ভাগ করা চলে না। এক-একজন চাষির ভাগে যেটুকু জমি পড়েছে তাতে একটা পরিবারের ভরণপোষণ কিছুতেই চলতে পারে না। যে বৎসর খুব ভালো ফসল হয় সে বৎসরও এদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। আর তেমন ভালো ফসল খুব কম বছরেই হয়ে থাকে। প্রকৃতিদেবীর দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, মৌসুমী বৃষ্টির দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। বিপদে-আপদে বেনিয়া কিংবা মহাজনের কাছে গিয়ে টাকার জন্যে হাত পাততে হয়। সেই ধারের টাকা জমে জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, তা শোধ করা এখন এদের পক্ষে অসাধ্য। প্রত্যেকটি চাষির জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ-শাসনের ফলে ভারতীয় জনগণের এমনি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে।

ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামী

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩২

আগের চিঠিতে তোমাকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের নীতির কথা বলেছি। এই নীতির ফলে ভারতের কুটিরশিল্পগুলি নষ্ট হয়ে গেল; শিল্পীরা কৃষির কাজ ধরল, গ্রামে গিয়ে বাস শুরু করল। অন্য কোনো জীবিকা নেই এমন বহু সংখ্যক মানুষ গিয়ে চাপল জমির উপরে—ভারতের এইটেই হয়েছে বড়ো সমস্যা, এও তোমাকে বলেছি। প্রধানত এইজন্যেই ভারতবর্ষ গরিব দেশ হয়ে আছে। এই লোকগুলোকে যদি জমি থেকে খসিয়ে নিয়ে অন্যরকম উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেত তবে শুধু যে দেশের অর্থসম্পদই বেড়ে যেত তাই নয়, জমির উপরে চাপটাও অনেক কমে যেত, এবং তার ফলে কৃষির অবস্থাও অনেক উন্নত হয়ে উঠত।

অনেকে বলেন, জমির উপরে এই-যে অতিরিক্ত চাপ পড়েছে, এর হেতু ব্রিটিশ নীতি ততটা নয়; এর কারণ হচ্ছে, ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। গত এক শো বছরে ভারতের লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে সত্যি, কিন্তু আরও প্রায় সমস্ত দেশেরই বেড়েছে। বরং ইউরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে বেলজিয়মে হল্যাণ্ডে জর্মনিতে লোকসংখ্যা বেড়েছে ভারতের তুলনায় অনেক বেশি হারে। কোনো দেশের বা সমস্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা কতটা বাড়ল, তার দরুন কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে কী করেই-বা এটা ঠেকিয়ে রাখা যায়? এটা একটা খুবই জরুরি সমস্যা। এখানে তার আলোচনা আমি করতে পারছি না, কারণ তাতে অন্য কথাগুলো একত্র জড়িয়ে গোল পাকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ কথাটা আমি পরিষ্কার করেই বলে দিতে চাই, ভারতে জমির উপরে যে চাপ পড়েছে তার যথার্থ হেতু লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নয়; তার হেতু হচ্ছে, কৃষি ছাড়া প্রজার আর অন্য কোনো জীবিকা নেই। অন্যান্যরকম জীবিকা ও শিল্প যদি গড়ে তোলা যায় তা হলে ভারতে এখন যা লোক আছে এদের বোধ হয় অতি সহজেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায় বা আরও বাড়িয়ে তোলা যায়। হতে পারে, হয়তো পরে আবার এই লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

এবারে আমরা ভারতে ব্রিটিশ নীতির অন্য কয়েকটা দিক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে গ্রামের কথা ধরা যাক।

ভারতের গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের কথা আমি অনেকবার তোমাকে লিখেছি; বহিঃশত্রুর অনেক আক্রমণ এবং অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও এরা টি'কে রয়েছে। বেশি দিনের কথা নয়, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেও ভারতের একজন ব্রিটিশ-গভর্নর, সার চার্ল্স্ মেট্‌কাফ, এই গ্রাম্য-সমাজকে বর্ণনা করে বলেছেন:

"গ্রামগুলি ছোটো ছোটো প্রজাতন্ত্র; এদের যা-কিছু প্রয়োজন প্রায় সমস্তই এদের নিজেদের মধ্যে আছে; বাইরের কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এদের প্রায় প্রয়োজনই হয় না। যেখানে অন্য কিছুই টি'কে থাকে না সেখানেও এরা বেশ টি'কে রয়েছে। গ্রামগুলির এই প্রজাসমাজ, এদের প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রবিশেষ—প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রভূত ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, এবং এদের কল্যাণে প্রজারা প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ও স্বরাজ-ক্ষমতা ভোগ করতে পাচ্ছে।"

এই বর্ণনাতে পুরোনো গ্রাম-ব্যবস্থার সত্যিই বেশ প্রশংসা দেখা যাচ্ছে। জীবনযাত্রার যে ছবি এতে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয়, এসব প্রায় কল্পনার স্বর্গলোক! গ্রামের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত, সেটা খুবই ভালো জিনিষ ছিল সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও অনেক ভালো বস্তু এর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোকেও আমাদের না দেখলে চলবে না। সমস্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রাম তার নিজস্ব স্বাধীন জীবন যাপন করত; এর ফলে কোনো ব্যাপারেই বেশিদূর প্রগতির আশা ছিল না। প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমেই বাড়বে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে, পরস্পর-সাহায্য থাকবে, এর ফলেই প্রগতি আর উন্নতি আসে।

ব্যক্তিই হোক বা জনসংঘই হোক, যতই সে নিজেকে নিয়ে একা একা থাকতে চাইবে ততই তার আত্মপরায়ণ, স্বার্থপর এবং সংকীর্ণচেতা হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ঘটবে। শহরের লোকের তুলনায় গ্রামের লোকেরা অনেক সময়েই বেশি সংকীর্ণমনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এইজন্যেই গ্রামা-সমাজগুলোর এতসব ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও এরা প্রগতির কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে নি। বরং এগুলো ছিল পুরোনো ধরনধারণের স্থান ও অনুন্নত। কারুশিল্প এবং কারখানা গড়ে উঠেছিল প্রধানত শহরগুলোতেই। গ্রামে গ্রামে বহুসংখ্যক তাঁতি অবশ্য ছড়িয়ে ছিল।

গ্রাম্য-সমাজগুলি একা-একা নিজস্ব জীবন যাপন করত, অন্যদের সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক রাখত না। এর প্রকৃত কারণ ছিল, পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থার অভাব। বিভিন্ন গ্রামকে একত্র সংযুক্ত করেছে এমন ভালো রাস্তা প্রায় ছিলই না। বস্তুত এই ভালো রাস্তাঘাটের অভাবেই দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে গ্রামগুলির ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করা কঠিন ছিল। যেসমস্ত শহর বা গ্রাম বড়ো বড়ো নদীর তীরে বা কাছে অবস্থিত, সেসব জায়গায় তবু নৌকোয় করে যাতায়াত করা যেত; কিন্তু এভাবে যাতায়াত করা চলে এমন নদীর সংখ্যাও বেশি ছিল না। সহজ যানবাহনের এই-যে অভাব, এর ফলে দেশের মধ্যেকার ব্যবসাবাণিজ্যও তেমন বেড়ে উঠতে পারে নি।

অনেক বছর ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল টাকা আয় করা আর অংশীদারদের লাভের টাকা তুলে দেওয়া। রাস্তাঘাটের জন্যে টাকা তারা সামান্যই ব্যয় করেছে; শিক্ষা স্বাস্থ্য হাসপাতাল এসবের জন্যে তো মোটেই ব্যয় করে নি। কিন্তু পরে যখন ব্রিটিশরা এ দেশে কাঁচামাল কেনা আর ব্রিটিশ কলের তৈরি মাল বেচার দিকে নজর দিল তখন যানবাহনের সম্বন্ধেও নূতন রকমের নীতি খাড়া করা হল। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বেড়ে উঠছিল, এই বাণিজ্যকে গড়ে তোলবার জন্যে ভারতের সমুদ্রোপকূলে নূতন নূতন শহর সৃষ্টি করা হল। যেমন—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, এবং তার পরে করাচি। এইসব শহরে তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল এসে জমা হত, হয়ে বাইরের দেশে রপ্তানি হয়ে যেত; আবার বাইরে থেকে, বিশেষ করে ইংলণ্ড থেকে কলের তৈরি মাল এসে এখানে হাজির হত, হয়ে সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে গিয়ে বিক্রি হত। পাশ্চাত্যদেশে লিভারপুল ম্যাঞ্চেস্টার বার্মিংহাম শেফিল্ড্ প্রভৃতি যেসমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পপ্রধান শহর গড়ে উঠছিল, তাদের সঙ্গে ভারতের এই নূতন শহরগুলোর অনেক পার্থক্য। ইউরোপের শহরগুলো ছিল পণ্য উৎপাদনের স্থান, আর বন্দর; সেখানে বড়ো বড়ো কারখানায় মাল তৈরি হচ্ছে, তার পর সেই মাল বিদেশে রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের নূতন শহরগুলোতে উৎপন্ন হত না কিছুই: এগুলো ছিল বিদেশী বাণিজ্যের গুদাম, আর বিদেশী শাসনের পরিচায়ক প্রতীক।

তোমাকে বলেছি, ব্রিটিশ নীতির ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই বেশি করে গ্রামপ্রধান হয়ে পড়ছিল, লোকেরা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বাস করছিল, কৃষি শুরু করছিল। তা সত্ত্বেও, এবং সে ব্যাপারটাকে ব্যাহত না করেই, সমুদ্রের ধারে ধারে এই নূতন শহরগুলো গজিয়ে উঠল। এদের সৃষ্টির ফলে গ্রামের অস্তিত্বের কোনো বাধা ঘটল না, মারা পড়ল ছোটো ছোটো শহর-বন্দরগুলো। জনসাধারণ যে গ্রামমুখী হতে চলেছিল সেটা চলতেই লাগল।

সমুদ্রতীরের এই নবগঠিত শহরগুলোকে দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হয়েছিল; কারণ, দেশের ভিতর থেকে কাঁচামাল কুড়িয়ে এনে শহরে জমা করতে হবে; আবার শহর থেকে বিদেশী মালকে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। ও দিকে রাজধানী বা বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকেন্দ্র বলেও কতকগুলো শহরের পত্তন হল। এইরকম করে যানবাহনের ভালো ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশ তীব্র হয়ে উঠল। রাস্তা তৈরি করা শুরু হল, তার পরে এল রেলপথ। প্রথম রেলপথ নির্মিত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে।

ভারতের শিল্পগুলো ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবার ফলে দেশের সর্বত্র যে নূতন অবস্থার আবির্ভাব হল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেওয়াও পুরোনো ধরনের গ্রাম্য সমাজের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন দেশময় অনেক ভালো ভালো রাস্তা তৈরি হল, রেলপথ তৈরি হল, তখন তার ধাক্কায় পুরোনো গ্রাম-ব্যবস্থা, এতদিন টিঁকে এসেও, এবার সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে ধ্বসে বিনষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী তার দোরে এসে ধাক্কা দিয়েছে, সে-পৃথিবী থেকে নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করে একা-একা টি'কে থাকার সামর্থ্য আর সে ক্ষুদ্র গ্রাম্য গণতন্ত্রের রইল না। এক গ্রামের পণ্যের যে দর দাঁড়াচ্ছে তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই অন্য গ্রামের পণ্যের দরকে নাড়া দিতে লাগল, কারণ এখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সহজেই পণ্য চালান করা যায়। এমনকি, দেখা গেল, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যানবাহনের উন্নতি ঘটার ফলে কানাডাতে বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গম কী দরে বিক্রি হল তার দ্বারাই ভারতবর্ষেও গমের বাজার-দর স্থির হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ঘটনাচক্রের আবর্তনে ভারতবর্ষের গ্রামগুলোও সমস্ত পৃথিবীর পণ্যমূল্যের আওতায় এসে পড়ল। গ্রামের যে পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সেটা ভেঙেচুরে খান খান হয়ে গেল; কৃষক অবাক হয়ে দেখল, কোথা থেকে একটা নূতন ব্যবস্থা এসে তার ঘাড়ে চেপে বসছে। আগে সে মাত্র তার গ্রামের বাজারের জন্যেই খাদ্যদ্রব্য ও অন্য সব জিনিষ উৎপাদন করত; এখন পণ্য উৎপাদন করতে লাগল পৃথিবীর বাজারের জন্যে। পৃথিবীব্যাপী উৎপাদন আর পণ্যমূল্যের ঘূর্ণির মধ্যে সে পড়ে গেছে, ক্রমেই সে আরও অধিকতরভাবে নীচে তলিয়ে যেতে লাগল। আগেও ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হত—যখন মাঠের ফসল যেত নষ্ট হয়ে, অন্য কোনো খাদ্যের সংস্থান থাকত না, দেশের অন্য জায়গা থেকে খাদ্য আনাবারও ভালো ব্যবস্থা করা যেত না। সেটা ছিল খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ। এখন ঘটতে লাগল একটা অদ্ভুত ব্যাপার—খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো তার প্রাচুর্যও আছে, তবু তার মধ্যেও মানুষ অনাহারে মরে যাচ্ছে। ঠিক সেই জায়গাটিতে খাদ্য যদি নাও থাকে, অন্য জায়গা থেকে ট্রেনে করে বা অন্যরকমের দ্রুত যানে করে খাদ্য নিয়ে আসা সম্ভব; খাদ্য মজুত রয়েছে, কিন্তু নেই সে খাদ্য ক্রয় করবার মতো টাকা। কাজেই এই দুর্ভিক্ষ খাদ্যের নয়, এটা হচ্ছে টাকার দুর্ভিক্ষ। এর চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে—ফসল খুব ভালো হয়েছে এবং শুধু তার ফলেই কৃষকের পরম দুর্দশা উপস্থিত! গত তিন বছরই এর নমুনা আমরা দেখেছি।

এমনি করে পুরোনোকালের গ্রাম-ব্যবস্থার অবসান হল; পঞ্চায়েতেরও আর অস্তিত্ব রইল না। এর জন্যে খুব বেশি-পরিমাণ শোকপ্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই; যে কালে এই ব্যবস্থাটা কার্যকরী ছিল, সে বহুদিন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল; আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে এর তাল মেলে নি বলেই এ টি'কল না। কিন্তু ব্যবস্থাটা এখানে ভেঙেই পড়ল শুধু; নূতন পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে কোনো নূতনতর গ্রাম-ব্যবস্থার জন্ম হল না। এই নূতন সৃষ্টি, নূতন ব্যবস্থার কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে, সে ভার আমাদের উপরে। (বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলে আমরা বাঁধা; সে শৃঙ্খল থেকে যে দিন মুক্তি পাব তার পরে আমাদের করবার কত কাজই যে জমে রয়েছে!)

জমি আর কৃষকের উপরে ব্রিটিশ নীতির পরোক্ষ ফল কী হয়েছে তারই আলোচনা এতক্ষণ করলাম। এই পরোক্ষ ফলগুলোই যথেষ্ট-পরিমাণে সাংঘাতিক। এবারে দেখা যাক, জমি সম্বন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাস্তব নীতিটা কী ছিল—যে নীতির ফল প্রত্যক্ষভাবে কৃষককে এবং জমির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের সকলকেই ভুগতে হয়েছে। আলোচনাটা জটিল, এবং বেশ একটু নিরস। কিন্তু আমাদের সমস্ত দেশটাই এই দরিদ্র কৃষকে পরিপূর্ণ; তাদের কী কী অভিযোগ, কী করে আমরা তাদের কিছু কাজে লাগতে পারি, তাদের ভাগ্যকে একটু ভালো করে তুলতে পারি, সেটা জানবার জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার আমাদের করতেই হবে।

জমিদার, তালুকদার, প্রজা—এই নামগুলো আমরা শুনি। প্রজা হয় অনেক রকমের; আবার কোল-রায়ত, মানে প্রজার প্রজাও আছে। এর সমস্ত খুঁটিনাটি তত্ত্বের গোলকধাঁধায় আমি তোমাকে ফেলব না। মোটামুটি বলা যায়, এখনকার জমিদাররা হচ্ছেন মধ্যস্থ দালাল, মানে কৃষক এবং রাষ্ট্রের মাঝখানে আছেন এ'রা। কৃষক এ'দের প্রজা, জমি ব্যবহারের দরুন সে এ'দের খাজনা বা একরকমের কর দেয়; কারণ জমিটাকে জমিদারের সম্পত্তি বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই খাজানা থেকে একটা অংশ জমিদার রাজস্ব বলে রাষ্ট্রকে দিয়ে দেন, তার নিজের হাতে যে জমি রয়েছে তার কর-বাবদ। এইভাবে জমি থেকে উৎপন্ন ফসল তিন ভাগ হয়ে যাচ্ছে—একটা অংশ নেন জমিদার, একটা পায় রাষ্ট্র, আর বাকি একটা অংশ থেকে যায় কৃষক-প্রজার ভাগে। এই তিনটি অংশই যে সমান এমন মনে করো না। কৃষক জমি চাষ করে, জমিতে যা-কিছু ফসল হয় তা তারই শ্রমের—চাষ বপন এবং আরও নানারকম কাজের ফলে। তার শ্রমের এই ফল ভোগ করার অধিকার স্বভাবতই তার নিজের। রাষ্ট্র

সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি; সমস্ত প্রজার কল্যাণের জন্য তাকে কতকগুলো দরকারি কাজ করতে হয়, যেমন—সমস্ত ছেলেপিলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা সে করবে, ভালো ভালো রাস্তাঘাট তৈরি ও অন্যান্য যানবাহনের ব্যবস্থা করবে, হাসপাতাল বসাবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করবে, পার্ক ও যাদুঘর তৈরি করবে, আরও নানারকমের কত কাজকর্ম তাকে করতে হবে। এর জন্যে তার টাকা চাই, এবং জমির যা ফসল হয় তা থেকে একটা অংশ সে আদায় করে নেবে এটাও ন্যায্য কথা। সে অংশ কতখানি হবে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রশ্ন। রাষ্ট্রকে প্রজা যা দেয় সেটা বস্তুত তার কাছেই আবার ফিরে চলে আসে, অন্তত আসা উচিত—রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-বিধান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রের প্রতিভূ হচ্ছে একটা বিদেশী সরকার, কাজেই আমরা স্বভাবতই এই রাষ্ট্রকে ভালো চোখে দেখছি না। কিন্তু স্বাধীন ও যথাযথভাবে সুসংহত যে দেশ, সেখানে রাষ্ট্র বলতে সমস্ত প্রজাকেই বোঝায়।

জমির ফসলের দুটো অংশের বিলি আমরা করলাম—একটা অংশ পাচ্ছে কৃষক, আর একটা পাচ্ছে রাষ্ট্র। আমরা দেখেছি, তৃতীয় একটা অংশ চলে যাচ্ছে জমিদার বা মধ্যস্থ দালালের হাতে। এমন কী কাজ তিনি করেন যার দরুন এটা তিনি পান বা পেতে পারেন? একেবারে কিছুই নয়, বা বস্তুত প্রায় কিছুই নয়। উৎপাদনের কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করেন না তিনি, অথচ না করেই তাঁর খাজনা বলে ফসলের একটা বৃহৎ অংশকে নিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গাড়ির তিনি হয়ে আছেন একটি পঞ্চম চাকা—অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, রীতিমতো একটা জঞ্জাল, জমির উপরে একটা বৃহৎ বোঝা। আর এই অনাবশ্যক বোঝার ভার সবচেয়ে বেশি পীড়ন করছে যাকে সে হচ্ছে চাষি স্বয়ং—নিজের আয়ের একটা অংশ তাকে এঁর হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। এই জন্যই অনেকে মনে করেন, জমিদার বা তালুকদার একটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মধ্যস্থ ব্যক্তি। জমিদারি প্রথাটাই খারাপ, এবং এটাকে এমন ভাবে বদলে ফেলতে হবে যেন এই মধ্যস্থ ব্যক্তিরা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়।

বাঙলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, প্রধানত ভারতবর্ষের এই তিনটি প্রদেশেই বর্তমানে জমিদারি-প্রথা প্রচলিত আছে।

অন্য সব প্রদেশে এরকম কোনো মধ্যস্থ দালাল নেই, চাষি-প্রজা সাধারণত তাদের ভূমি-রাজস্বটা সরাসরিই রাষ্ট্রকে দিয়ে দেয়। সাধারণত এদের বলা হয় কৃষক-ভূস্বামী; কোথাও-বা বলা হয় জমিদার, যেমন পাঞ্জাবে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ, বাঙলা ও বিহারের বড়ো বড়ো জমিদার আর এরা কিন্তু এক নয়।

এই দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে, এবার আমি তোমাকে আর-একটি কথা বলব। বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে যে জমিদারি-প্রথা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাকে নিয়ে আজকাল এত আলোচনা-আন্দোলন চলেছে, সেটা ভারতবর্ষে একেবারেই একটা নূতন বস্তু। এর সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশরা, তাদের আসবার আগে এর অস্তিত্ব ছিল না।

প্রাচীনকালে এ দেশে এরকম কোনো জমিদার, ভূস্বামী বা মধ্যস্থ মালিক ছিল না। চাষিরা তাদের ফসলের একটা অংশ সোজাসুজি রাষ্ট্রকে দিয়ে দিত। অনেক সময় গ্রাম্য-পঞ্চায়েত গ্রামের সমস্ত চাষির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত। আকবরের কালে তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন রাজা টোডরমল; তিনি খুব ভালো করে সমস্ত দেশটার একটা জরিপ করিয়ে নিলেন। চাষির কাছ থেকে সরকার বা রাষ্ট্র ফসলের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করে নিত; চাষি ইচ্ছে করলে নগদ টাকাতেও রাজস্ব জমা দিতে পারত। মোটের উপর, প্রজার উপরে করের বোঝা খুব বেশি ছিল না; করের চাপ বাড়ানোও হত খুব আস্তে আস্তে। তার পর মোগল-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি কমে গেল, সে আর ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারে না। তখন রাজস্ব আদায়ের একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করা হল। কর আদায়ের জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত হতে লাগল; এরা মাইনে পাবে না, পাবে আয়ের অংশ; যা কর আদায় করল তার দশ ভাগের এক ভাগ এরা নিজের পারিশ্রমিক বলে নিয়ে নেবে। এদের নাম দেওয়া হল রাজস্ব-ঠিকাদার। অনেক সময়ে জমিদার বা তালুকদারও এদের বলা হত। কিন্তু মনে রেখো, আজকাল এই নাম বলতে যা বোঝায় তখন তা বোঝাত না।

কেন্দ্রীয় সরকার ধ্বংসের পথে যত এগিয়ে চলল, রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটাও ততই আরও খারাপ হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল, এক-একটা অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদারি কাজটাকেই নিলামে তুলে দেওয়া হত; যে সবচেয়ে বেশি দর দেবে সেই এই পদ পাবে। তার মানে হল, যে লোকটি এই পদ কিনে নিল, দুর্ভাগা প্রজাকে শোষণ করে যতখানি সম্ভব আদায় করে নেবারও পুরো স্বাধীনতা সে পেয়ে যেত, এবং এই ক্ষমতার ব্যবহারও এরা যথাসাধ্য করত। এদের আবার এই পদ থেকে সরিয়ে দেবার মতো শক্তি সরকারের ছিল না, ফলে এই রাজস্ব-ঠিকাদারের পদটা ক্রমে পুরুষানুক্রমিক হয়ে উঠল।

বাঙলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম যে তথাকথিত আইনসম্মত অধিকার পেল, বাস্তবিকপক্ষে সেটাও ছিল মোগল-সম্রাটের নামে এই রাজস্ব-আদায়ের ঠিকাদারি মাত্র। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানিকে 'দেওয়ানি' মঞ্জুর করা হয়। এর ফলে কোম্পানি দিল্লির মোগল-সম্রাটের অধীনস্থ দেওয়ান বলে গণ্য হল। কিন্তু আসলে এর সবই ছিল কথার ফাঁকি। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ হল, তার পর থেকেই বাঙলাদেশে ব্রিটিশরা সর্বেসর্বা হয়ে উঠল, বেচারি মোগল-সম্রাটের প্রায় কোথাও কোনো ক্ষমতাই আর থাকল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর তার কর্মচারীরা সকলেই ছিল ভয়ংকররকম অর্থলোভী। এরা বাঙলাদেশের রাজকোষ শূন্য করে দিল, যেখানে যার হাতে টাকার সন্ধান পেল তাই জোর-জবরদস্তি করে কেড়ে নিতে লাগল। বাঙলা ও বিহার প্রদেশকে নিংড়ে যতখানি সম্ভব রাজস্ব আদায় করে নিতে এরা চেষ্টা করল। ছোটো ছোটো অনেক রাজস্ব-ঠিকাদার খাড়া করল, তাদের উপরে ধার্য রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত বেশিরকম বাড়িয়ে দিল। খুব অল্পকালের মধ্যেই ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হল। এই রাজস্ব আদায় করাও হত একেবারে নির্মমভাবে, ঠিক সময়মতো যে রাজস্ব জমা দিতে পারত না তারই জমি কেড়ে নেওয়া হত। রাজস্ব-ঠিকাদাররাও আবার তেমনিভাবে চাষির উপরে উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন চালাতে লাগল, রাজস্বের নামে তাদের যথাসর্বস্ব শুষে নেওয়া হল, জমি থেকে তাদের উৎখাত করে তাড়ানো হতে লাগল। পলাশির যুদ্ধের পর বারো বছরও কাটল না, দেওয়ানি পাবার পর চার বছরও পার হল না—এক দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই রাজস্বনীতি আর-এক দিকে অনাবৃষ্টি, দুয়ে মিলে বাঙলা আর বিহার জুড়ে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করল। এই দুর্ভিক্ষে এদের মোট প্রজার এক-তৃতীয়াংশ মারা গেল। এর আগের একটা চিঠিতে আমি তোমাকে এই ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কথা বলেছি। এও বলেছি যে, এই দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার রাজস্ব একেবারে পুরোমাত্রায় আদায় করে চলেছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এই কাজে যে অপূর্ব দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়েছিল তার জন্যে তাদের নাম সসম্মানে স্মরণ করবার যোগ্য হয়ে আছে! কোটি কোটি মানুষ, স্ত্রীপুরুষ-শিশু মারা গেছে; তা যাক, তবু সেই মৃতদেহগুলোর কাছ থেকেও তারা টাকা আদায় করে নিচ্ছিল—ইংলণ্ডের বড়ো বড়ো ধনী ব্যক্তিরা রয়েছেন, তাঁদের প্রাপ্য মুনাফা ঠিকমতো মিটিয়ে দিতে হবে তো!

আরও কুড়ি বছর বা তারও বেশিকাল ধরে এই ব্যাপার চলল। দুর্ভিক্ষের মধ্যেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি টাকা আদায় করতে লাগল, সোনার দেশ বাঙলা শ্মশান হয়ে গেল। বড়ো বড়ো রাজস্ব-ঠিকাদাররা পর্যন্ত ভিখারি হয়ে গেল; গরিব চাষিদের অবস্থা কী দাঁড়াল তা এর থেকেই ধারণা করা যায়। অবস্থা ক্রমে এত খারাপ হয়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও ঘুম ভাঙল, তারা এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা শুরু করল। এই সময়ে গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড কর্নওআলিশ, তিনি নিজেও ছিলেন ইংলণ্ডের একজন বড়ো ভূস্বামী। তিনি চাইলেন, এ দেশেও ব্রিটেনের মতো একদল ভূস্বামী সৃষ্টি করে দেবেন। কিছুদিন থেকে রাজস্ব-ঠিকাদাররা ঠিক ভূস্বামীর মতোই আচরণ করছিল। কর্নওআলিশ এদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললেন। ভূস্বামী বলেই এদের স্বীকার করে নিলেন। এর ফলে সেই প্রথম, ভারতবর্ষে এই নূতন ধরনের ভূস্বামীর আবির্ভাব ঘটল; চাষিরা হয়ে গেল একেবারেই এদের অধীনস্থ প্রজা মাত্র। ব্রিটিশ সরকার এই ভূস্বামী বা জমিদারদের কাছ থেকে সোজাসুজি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করে নিল। প্রজাদের

সঙ্গে যা-খুশি তাই ব্যবস্থা করে নেবার স্বাধীনতা এদের দিয়ে দেওয়া হল। ভূস্বামীর অত্যাচার আর শোষণ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই আর গরিব প্রজার থাকল না।

১৭৯৩ খৃস্টাব্দে বাঙলা ও বিহারের জমিদারদের সঙ্গে কর্নওআলিশ এই বন্দোবস্ত করেন, একে বলা হয় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। 'বন্দোবস্ত' কথাটার মানে হচ্ছে, কোন্ জমিদার সরকারকে কত টাকা ভূমি-রাজস্ব দেবে তার পরিমাণ নির্ধারণ। বাঙলায় ও বিহারে এই রাজস্বের পরিমাণ একেবারে চিরকালের মতো স্থির করে দেওয়া হল; এর আর কোনো দিন কোনো নড়চড় হবে না। এর পরে উত্তর-পশ্চিমে অযোধ্যা এবং আগ্রাতে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, ব্রিটিশের নীতিও তখন বদলে নেওয়া হল। সেখানে তারা জমিদারদের সঙ্গে বাঙলাদেশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন না, করলেন 'মেয়াদী বন্দোবস্ত'। প্রত্যেক মেয়াদী বন্দোবস্তই একটা নির্দিষ্ট কাল অন্তর অন্তর—সাধারণত এর সময় ছিল ত্রিশ বছর—নূতন করে স্থির করা হত, ভূমি-রাজস্ব বাবদ জমিদারের কত দিতে হবে তার পরিমাণও নূতন করে ধার্য করে দেওয়া হত। প্রত্যেক নূতন বন্দোবস্তেই সাধারণত রাজস্বের পরিমাণ কিছু বেড়ে যেত।

দক্ষিণ-ভারতে, মাদ্রাজ ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে, জমিদারি-প্রথা ছিল না। সেখানে প্রজাই ছিল ভূস্বামী; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও সরাসরি প্রজার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু সমস্ত জায়গার মতো সেখানেও তাঁদের অপরিসীম অর্থলোভ প্রকট হয়ে উঠল; কোম্পানির কর্মচারীরা অত্যন্ত উঁচু হারে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করে দিলেন এবং সে রাজস্ব অতি নিষ্ঠুরভাবে আদায় করা হতে লাগল। রাজস্ব না দিলে প্রজার জমি তৎক্ষণাৎ কেড়ে নেওয়া হত। কিন্তু সে বেচারি যাবে কোথায়? জমির উপরে বহু লোক নির্ভর করে আছে, ফলে জমির জন্যে রয়েছে কাড়াকাড়ি। বহু অন্নহীন মানুষ সর্বদাই মিলত, যারা যে-কোনো শর্তে জমি বন্দোবস্ত নিতে রাজি আছে। এর ফলে প্রায়ই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত; চিরকাল কষ্ট সয়ে সয়ে নিরীহ প্রজারও শেষে এক-এক সময়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখন হত কৃষক-বিদ্রোহ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলাদেশে আর-একটি নূতন ধরনের অত্যাচার শুরু হল। কতকগুলো ইংরেজ এ দেশে এসে ভূস্বামী হয়ে বসল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নীলের ব্যবসা করা। এরা এদের প্রজাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর শর্তে নীলচাষের ব্যবস্থা করে নিল। প্রজা তার জমির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশে নীলের চাষ করতে বাধ্য থাকবে, এবং তার পর সেই নীল তাকে তার ইংরেজ-ভূস্বামীর কাছে একটা নির্দিষ্ট দরে বেচতে হবে। এই ভূস্বামীদের নাম ছিল নীলকর। এই প্রথাটাকে বলা হত 'নীলকর-প্রথা'। প্রজাদের উপরে যেসমস্ত শর্ত দেওয়া হত তা এত কঠিন যে, তা যথাযথ পালন করা প্রজার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠত। এর উপর আবার ব্রিটিশ সরকার এলেন নীলকরদের সাহায্য করতে। এমনসব বিশেষ রকমের আইনকানুন তৈরি করে দিতে লাগলেন যার ফলে গরিব প্রজা শর্তের কথা অনুযায়ী নীলের চাষ করতে বাধ্য হত। এইসমস্ত আইন এবং এদের অন্তর্গত শাস্তি-ব্যবস্থার ফলে এই নীলকরদের প্রজারা অনেক ব্যাপারে একেবারে নীলকরদের দাস বা ভূমিদাসে পরিণত হয়ে গেল। নীলকুঠির কর্মচারীদের নামেই এরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেত, কারণ সে ইংরেজ বা ভারতীয় কুঠিয়ালরা কিছুরই পরোয়া করে চলত না, স্বয়ং সরকার বাহাদুর ছিলেন তাদের রক্ষক। অনেক সময় নীলের বাজারদর নেমে যেত; প্রজার পক্ষে তখন ধান বা ঐরকম অন্য কোনো ফসলের চাষ করায় অনেক বেশি লাভ; কিন্তু সে চাষ করবার অধিকার তাদের থাকত না। চাষির দুঃখদুর্দশার আর অন্ত রইল না। শেষে এক দিন অত্যাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়ে সেই নিরীহ কেঁচোও ফণা তুলে উঠল। নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষিরা বিদ্রোহ করল, একটা নীলকুঠি তারা লুট করে নিল। সে বিদ্রোহ দমন করা হল অত্যন্ত কঠোর হস্তে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশে কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল তার একটা চিত্র আমি এই চিঠিতে তোমাকে দিতে চেষ্টা করলাম—হয়তো একটু বেশি লম্বাই হয়ে গেল চিঠিটা। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি কীরকম করে ভারতের চাষির অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে এসেছে; কীরকম করে যে যে দিক দিয়ে তার সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই তাকে খানিকটা শুষে নেবার ব্যবস্থা করেছে—

রাজস্ব-আদায়কারী, ভূস্বামী, বেনিয়া, নীলকর ও তার কর্মচারী, এবং সকলের চেয়ে বড়ো বেনিয়া ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং—কখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মারফত পরোক্ষভাবে, কখনও সোজাসুজিই। তার কারণ, এইসমস্ত শোষণেরই মূলে ছিল ভারতে ব্রিটিশদের নীতি, এই নীতি এরা সংকল্প করেই চালাচ্ছিল। কুটিরশিল্পগুলোকে ভেঙে নষ্ট করে দেওয়া হল, তার জায়গাতে নূতনরকম শিল্প গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করা হল না; বেকার শিল্পীকে তাড়া করে গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া হল, এবং তার ফলে জমির উপরে প্রজার চাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল; ভূস্বামী-প্রথা ও নীলকর-প্রথার আমদানি করা হল; ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে প্রজার উপরেও অত্যন্ত বেশি হারে খাজনা ধরা হল এবং সেটা নির্মমহস্তে আদায় করা হতে লাগল। দারিদ্র্যের চাপে প্রজা বাধ্য হয়ে বেনিয়া মহাজনদের কাছে টাকা ধার করলে এবং তার লৌহমুষ্টি থেকে আর কোনোদিনই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। যথাসময়ে খাজনা ও রাজস্ব দিতে না পারার দরুন অসংখ্য প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করে দেওয়া হল; এবং সকলের উপরে পুলিশ, তহশিলদার, জমিদারের গোমস্তা আর নীলকরের গোমস্তা, সবাই মিলে প্রজার চার দিকে এমনই একটা স্থায়ী বিভীষিকার রাজত্ব গড়ে তুলল যে, তার মন বা আত্মা বলতে যেখানে যেটুকু ছিল সমস্ত ভেঙে মরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অপরিহার্য দুর্দশা এবং ভয়াবহ সর্বনাশ ছাড়া এর ফল কী হওয়া সম্ভব?

এক-একটা ভয়ানক দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। এবং এইটেই আশ্চর্য, যখন দেশে খাদ্যের অভাব, খাদ্য না পেয়ে যখন বহু লোক শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, এমন সময়েও এ দেশ থেকে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য অন্য দেশে চালান হয়ে গিয়েছে। বড়োলোক বণিকের লাভ করা চাই তো! সত্যিকার দুর্দশা ঘটেছে খাদ্যের অভাবে নয়, খাদ্য হয়তো দেশের অন্য স্থান থেকে ট্রেনে করে আনা যেত। লোক মরেছে সে খাদ্য কিনবার অর্থের অভাবে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে, বিশেষ করে আমাদের এই প্রদেশে, একটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হল; শোনা যায়, সে দুর্ভিক্ষে সমস্ত অঞ্চলটির মোট লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮½ জনই মারা গিয়েছিল। পনরো বছর পরে, ১৮৭৬ সনে, এবং তার পর পুরো দু বছর ধরে আর-একটা ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এর ক্ষেত্র ছিল উত্তর মধ্য এবং দক্ষিণ-ভারত। এবারেও সবচেয়ে বেশি লোক মরল যুক্তপ্রদেশে; মধ্যপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবের কতক অংশেও বহু লোক মারা গেল। এই দুর্ভিক্ষে মোট লোক মরেছিল প্রায় এক কোটি! এর কুড়ি বছর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় এই একই অঞ্চলে আবার দুর্ভিক্ষ হয়; ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার চেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর হয় নি। এই সাংঘাতিক দুর্দৈবের ফলে উত্তর ও মধ্য -ভারত একেবারেই নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দেও আবার দুর্ভিক্ষ হয়।

চল্লিশ বছরের মধ্যে চারটি বিরাট দুর্ভিক্ষ হয়েছে। একটিমাত্র ছোট্ট অনুচ্ছেদের মধ্যে আমি তোমাকে তার হিসেব দিলাম। এই ইতিবৃত্তের মধ্যে যে কতখানি দুঃখদুর্দশা আর বিভীষিকার কাহিনী লুকিয়ে আছে তার বর্ণনা আমি তোমাকে দিতে পারব না, তুমিও সে বুঝবে না। বস্তুত তুমি তা বুঝতে পার এও বোধ হয় আমি ঠিক চাই নে; কারণ, বুঝলে তোমার মন ভরে উঠবে ক্রোধে আর অপরিসীম বিদ্বেষে। এই বয়সেই তোমার মন বিদ্বেষে ভরে যাক, এ আমি চাই নে।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নাম শুনেছ তুমি—এই মহীয়সী ইংরেজ মহিলাই প্রথম যুদ্ধে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার সুব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বহুকাল পূর্বে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি লিখেছিলেন: "পূর্বাঞ্চলে—কেবল পূর্বাঞ্চলে নয়, সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীতেই—সর্বাপেক্ষা করুণ দৃশ্য যা মানুষের চোখে পড়ে, সে হচ্ছে আমাদের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের কৃষকের আকৃতি।" বলেছিলেন, "আমাদের রচিত আইনগুলোর ফলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উর্বর দেশে সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রাণহারী স্থায়ী অর্ধ-অনশনের—এমন বহু স্থানে, যেখানে তথাকথিত দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বমাত্র নেই।"

সত্যই তো, আমাদের কৃষাণদের চোখ গেছে গর্তে ঢুকে, সে চোখে ভীত আশাহীন দৃষ্টি—এর চেয়ে আর মর্মান্তিক দৃশ্য কী হতে পারে! এই এতকাল ধরে শোষণের কী বিপুল বোঝাই না আমাদের চাষিরা বহন করে এসেছে! আর এ কথা যেন না ভুলি, আমরা যারা তাদের চেয়ে একটু সচ্ছল অবস্থায় আছি তার সেই বোঝারই অন্তর্গত। কী দেশী কী বিদেশী, সকলেই আমরা

এই চিরপীড়িত কৃষাণকে শুষে মোটা হবার চেষ্টা করেছি, তার কাঁধে চেপে বসে আছি। বোঝার চাপে তার সে কাঁধ যদি ভেঙেই পড়ে, আশ্চর্য হবার কী আছে!

কিন্তু সব শেষে এতকাল পরে তার জন্যে বুঝি এসেছে একটুখানি আশার আলো, এল বুঝি শুভ দিনের আভাস, এল দুঃখমোচনের আশ্বাস। একজন ছোট্ট মানুষ এসে দাঁড়ালেন তার সামনে; সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন একেবারে তার চোখের মধ্যে, তার বিশীর্ণ সংকুচিত অন্তরের অন্তস্তলে; তার দীর্ঘকাল-সঞ্চিত বেদনাকে নিলেন অনুভব করে। তাঁর সে দৃষ্টিতে ছিল যাদু; তাঁর স্পর্শে ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সহানুভূতি, ছিল আগ্রহ, ছিল অসীম প্রেম, ছিল মৃত্যুপণ-করা বিশ্বাস। তাঁর দিকে চেয়ে দেখল, তাঁর কথা শুনল চাষি, শুনল মজুর—যারা এতদিন পায়ের তলায় ছিল পড়ে, শুনল তারা সবাই; তাদের মৃত প্রাণ আবার নূতন করে বেঁচে উঠল রোমাঞ্চিত হয়ে, অপূর্ব এক আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তারা হেঁকে বললে, 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়!' উৎপীড়নের অবসাদের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পা বাড়াল তারা। কিন্তু যে প্রাচীন যন্ত্র এতকাল ধরে তাদের পিষে এসেছে সেও তো অত সহজে তাদের ছেড়ে দেবে না! সে যন্ত্র আবার নড়ে উঠল, তৈরি করতে লাগল নূতন নূতন অস্ত্র; তাদের পিষে ফেলবার জন্যে কত নূতন নূতন আইন আর অর্ডিন্যান্স, বাঁধবার জন্যে কত নূতন ধরনের শৃঙ্খল। তার পর? কী হল তার পরে? সেটা আমার আজকের গল্প বা কাহিনীর অন্তর্গত নয়। সেটা আগামী কালের কথা; সেই কাল যখন আজ হয়ে উঠবে তখনই সেটা জানতে পাব আমরা। কিন্তু তার সম্বন্ধে কি সংশয় আছে কারও মনে!

১১২

ব্রিটেনের ভারত-শাসন

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের কী অবস্থা ছিল, সে নিয়ে তোমাকে ইতিমধ্যেই তিনটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছি। দীর্ঘ দিনের কাহিনী এটা, দীর্ঘকালের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস; আমার ভয় হচ্ছে যে, খুব বেশি সংক্ষেপ করে যদি বলতে যাই তবে হয়তো ব্যাপারটাকে আরও বেশি দুর্বোধ্য করে তুলব। অন্যান্য দেশের ইতিহাস বা ভারতেরই অন্য কালের ইতিহাসের তুলনায় হয়তো ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায়টির উপরে আমি অনেক বেশি ঝোঁক দিয়ে বলেছি। সেটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আমি ভারতবাসী, এটার সঙ্গে তাই আমার সম্পর্ক বেশি; এটাকে আমি বেশি করে জানি, তাই এর সম্বন্ধে বলতেও পারি বেশি। শুধু তাই নয়, কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহল ছাড়াও এই অধ্যায়টিতে আমাদের পক্ষে অনেক বেশি দরকারি জিনিষ রয়েছে। আধুনিক কালের যে ভারতবর্ষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেও জন্মলাভ করেছিল, বেড়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বেদনার মধ্যেই। ভারতবর্ষকে তার যথার্থ রূপটি-সুদ্ধ যদি চিনতে চাই তবে যেসমস্ত [illegible] ও ঘটনা তাকে ভেঙেছে বা গড়ে তুলেছে তাদের কথাও কিছু কিছু জেনে নিতে হবে। জানলে পর তখনই শুধু আমরা বুদ্ধিমানের মতো তার সেবা করতে পারব; জানতে পারব কী আমাদের করা দরকার, কোন্ পথেই-বা চলা দরকার।

ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে কথা আমার শেষ হয় নি, এখনও অনেক কথা তোমাকে বলার আছে। এই চিঠিগুলোতে আমি এর এক-একটা করে দিক ধরে নিয়ে তার সম্বন্ধে খানিকটা তোমাকে বলে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা দিক আলাদা করে বলছি, যেন তুমি সহজে বুঝতে পারো। কিন্তু এটা তুমি অবশ্যই বুঝবে, যে সকল ঘটনা ও পরিবর্তনের কথা আমি তোমাকে বলেছি, বা এই চিঠিতে এবং এর পরের চিঠিপত্রে বলব, সেগুলো ঘটেছে অল্পবিস্তর একই সঙ্গে; একটার প্রভাব

আর-একটার উপরে এসে পড়েছে, এবং সবগুলো একসঙ্গে মিলে তবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের এইসমস্ত কাজ এবং অকাজের কথা পড়তে পড়তে এক-এক সময়ে দেখবে তোমার রাগ হচ্ছে। এ দেশে যে অত্যাচার তারা করেছে এবং তার ফলে যে দুঃখদুর্দশা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তার দরুন রাগ। কিন্তু এটা ঘটেছিল কার অপরাধে? আমাদেরই দুর্বলতা আর অজ্ঞতার জন্যে নয় কি? দুর্বলতা আর মূঢ়তা যেখানেই থাকবে সেখানেই স্বেচ্ছাচারী শাসক এসে আসন গেড়ে বসবে। আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারি না বলেই ব্রিটিশরা লাভ গুছিয়ে নিচ্ছে; তাই যদি হয় তবে দোষ আমাদেরই—আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি কেন? আমাদের প্রত্যেকটা ভিন্ন দলের স্বার্থবুদ্ধিকে তারা নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে আমাদের পরস্পর থেকে বিভক্ত করে ফেলছে, দুর্বল করে ফেলছে। কিন্তু এটা তারা পারে কেন? আমরা তাদের এ করতে দিচ্ছি এটাই তো প্রমাণ যে, তারা আমাদের চেয়ে বড়ো। কাজেই রাগ যদি করতে হয় করো দুর্বলতার উপরে, অজ্ঞতার উপরে, পরস্পর-সংগ্রামের উপরে—আমাদের দুঃখদুর্দশার মূল তো এরাই।

আমরা বলি, ব্রিটিশদের অত্যাচার, কিন্তু আসলে কার অত্যাচার এটা? এতে লাভ হয় কার? সমস্ত ব্রিটিশজাতির নয়; তাদেরও মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিজেরাই অসুখী, অত্যাচারিত। ভারতবাসীদের মধ্যে এমন অনেক ছোটো ছোটো দল ও শ্রেণী আছে যারা, ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যে শোষণ চালাচ্ছে, তার থেকে খানিকটা নিজের লাভ গুছিয়ে নিয়েছে। তা হলে আমরা দু দলের মধ্যে সীমারেখা টানব ঠিক কোনখানে? এটা ব্যক্তির ব্যাপারই নয় মোটে; এটা হচ্ছে একটা প্রথার দোষ। আমরা বাস করছি প্রকাণ্ড একটা যন্ত্রের ছায়ায়, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে সে যন্ত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তাদের রক্ত শুষে নিয়েছে। এই যন্ত্রটার নাম 'নূতন সাম্রাজ্যবাদ'; শিল্পাশ্রয়ী ধনিকতন্ত্রের ফল এটা। এই শোষণের ফলে যে লাভ হচ্ছে তার অধিকাংশই চলে যাচ্ছে বিলাতে; কিন্তু বিলাতেও এর প্রায় সমস্তটাই গিয়ে পৌঁচচ্ছে মাত্র বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর হাতে। এই লাভের খানিকটা অংশ আবার ভারতেও থেকে যাচ্ছে, এখানেও কয়েকটা শ্রেণী এর ভাগ পাচ্ছে। অতএব এর জন্যে বিশেষ কোনো ব্যক্তির উপরে বা জাতহিসেবে সমস্ত ইংরেজদের উপরে যদি রাগ করি, সেটাও বোকামি। যে প্রথাটা দোষদুষ্ট, ক্ষতিকর, তাকে বদলে ফেলতে হবে। কে তাকে চালাচ্ছে সে তত্ত্বে খুব বেশি যায়-আসে না; আর মন্দ প্রথার পাকে পড়লে ভালো মানুষরাও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। হাজার সদিচ্ছা তোমার মনে থাক্, পাথরকে বা মাটিকে সুখাদ্য বানিয়ে তুলতে পারবে না তুমি, যতই কেন-না তাকে রান্না করো আর জ্বাল দাও। সাম্রাজ্যবাদ আর ধনিকতন্ত্রের ব্যাপারটাও এইরকম বলেই আমার ধারণা। একে শুধ্রে ভালো করে তোলবার কোনো উপায়ই নেই; সত্যিকার সংশোধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে একে একেবারেই ভেঙে লুপ্ত করে দেওয়া। কিন্তু সেটা আমার নিজের অভিমত মাত্র। অন্যরকম মতও অনেকের আছে। কানে শুনে এর কোনোটাকেই তোমার মেনে নেবার দরকার নেই; সময় যখন আসবে তখন নিজের বুদ্ধিমতো সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই করে নিতে পারবে। একটা কথা কিন্তু প্রায় সকলেই স্বীকার করেন; দোষ আসলে এই প্রথাটারই, ব্যক্তি-বিশেষের উপর রাগ করে লাভ নেই। পরিবর্তন যদি চাই তবে এই প্রথাটাকেই আক্রমণ করতে হবে, ভেঙে বদলে ফেলতে হবে। ভারতবর্ষে এই প্রথার কুফল কী হয়েছে তার কিছু কিছু আমরা দেখেছি। চীন, মিশর এবং অন্যান্য দেশের কথা যখন আমরা আলোচনা করব তখন দেখা যাবে সেখানেও এই একই প্রথা বর্তমান, একই ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্র; অন্যান্য জাতিকে শুষে নেবার কাজে সে যন্ত্র নিযুক্ত হয়ে রয়েছে।

আমাদের আগের কথায় ফিরে আসা যাক। ব্রিটিশরা যখন প্রথম এল তখন ভারতে কুটির-শিল্পগুলো খুব উন্নত ছিল, সে কথা তোমাকে বলেছি। পণ্যনির্মাণের কাজে প্রগতি যদি স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারত, বাইরে থেকে যদি এর বাধা না আসত, তবে খুব সম্ভবত একদিন-না-একদিন ভারতেও যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটত। দেশে লোহা ছিল, কয়লা ছিল; ইংলণ্ডে দেখা গেছে এরাই নূতন শিল্পব্যবস্থাকে অত্যন্তরকম সাহায্য করেছে, এমনকি কিছু পরিমাণে গড়েও তুলেছে। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষেও তাই ঘটত। তবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছিল, তার ফলে একটু দেরি

হয়তো-বা হত। কিন্তু কিছুই হল না, ব্রিটিশরা মাঝখান থেকে এসে বাধা দিল। তারা এল অন্য একটি দেশের ও জাতির প্রতিনিধি হয়ে, সেখানে তার আগে থেকেই পণ্য-উৎপাদনের পদ্ধতি বদলে গেছে, বড়ো বড়ো কলকারখানার যুগ এসে গেছে। এ থেকে মনে হতে পারত, ভারতেও তারা এই-রকমের পরিবর্তনই আনতে চাইবে, ভারতে যে শ্রেণীর লোকের এই ধরনের পরিবর্তন আনবার কাজে ব্রতী হবার সম্ভাবনা তাদের উৎসাহিত করবে। সেরকম কিছুই তারা করল না, বরং তার ঠিক উল্টো পথেই চলল। তারা ধরে নিল, ভারতবর্ষ একদিন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। অতএব তারা ভারতের শিল্পগুলোকে ভেঙেচুরে নষ্ট করে দিল, যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠাকেও রীতিমতো বাধাই দিতে লাগল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে একটা অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার ইউরোপে ব্রিটিশরা ছিল সবচেয়ে অগ্রণী জাতি। ভারতবর্ষে তারাই একত্র সম্মিলিত হল এখানকার সবচেয়ে অনুন্নত এবং রক্ষণশীল শ্রেণীগুলোর সঙ্গে। মুমূর্ষু সামন্ত-ভূপতি-শ্রেণীকে তারা আবার জাগিয়ে তুলল, একটা ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্টি করল, তাদের অধীনে যে শত শত দেশীয় রাজা অর্ধ-সামন্তিক রাষ্ট্র শাসন করছিল ঠেকো দিয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখল। বস্তুত ভারতবর্ষে সামন্ত-প্রথাটাকেই তারা জোরালো করে তুলল। অথচ ইউরোপে এই ব্রিটিশরাই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর বা বুর্জোয়া-বিপ্লবের অগ্রদূত; এই বিপ্লবের ফলে তারা শাসন-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়েছিল। তারাই ছিল শিল্পবিপ্লবের প্রবর্তক, যে বিপ্লবের ফলে পৃথিবীতে শিল্পাত্মক ধনতন্ত্রের জন্ম। এইসব ব্যাপারে অগ্রণী ছিল বলেই তারা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল, বিরাট একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা এরকম উল্টো আচরণ কেন করল তা বোঝা শক্ত নয়। ধনিকতন্ত্র বস্তুটা দাঁড়িয়ে আছে যে ভিত্তির উপরে সে হচ্ছে—অপরের গলা কেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর শোষণের বাজারে জয়লাভ; সাম্রাজ্যবাদও এরই পরিণতরূপ মাত্র। ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতা ছিল, অতএব তারা বাস্তবিক প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিল তাদের মেরে ফেলল, এবং নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ গজিয়ে উঠতে না পারে জেনেশুনেই তার ব্যবস্থা করে নিল। প্রজাসাধারণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ, ভারতবর্ষে তারা এসে বসেছিল শুধু সেই প্রজাকেই শোষণ করে নেবার জন্যে। শোষক আর শোষিতের স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না। কাজেই ব্রিটিশরা সহায় বলে ধরে বসল ভারতবর্ষে সামন্ত-প্রথার যে ধ্বংসাবশেষটুকু তখনও বাকি ছিল তাকে। ব্রিটিশরা যখন এ দেশে প্রথম এল তখনই এর প্রাণশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু তাকেই আবার ঠেকো দিয়ে ঠেলে তোলা হল, দেশের শোষণকার্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে দেওয়া হল। এই শ্রেণীটার যখন সমাজে প্রয়োজনীয়তা ছিল সে দিন তখন অনেককাল পার হয়ে গেছে, কাজেই এই ঠেকোর ফলে এরা মরতে মরতে সাময়িকভাবেই মাত্র একটুখানি রেহাই পেতে পারে; ঠেকো সরিয়ে নেওয়ামাত্র এরা হুড়মুড় করে পড়ে যাবে, অথবা নূতনতর অবস্থা অনুসারে এদের নিজেদের ঢেলে সেজে নিতে হবে। ছোটো বড়ো মিলে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল সাত শো; ব্রিটিশদের অনুগ্রহের উপরেই এদের অস্তিত্ব নির্ভর করত। এর মধ্যে কতকগুলো বড়ো বড়ো রাজ্যের নাম তুমি জানো : হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি। এটা কিন্তু আশ্চর্য, এই দেশীয় রাজ্যগুলোর বেশির ভাগই শাসিত হচ্ছে এমনসব লোকের দ্বারা যাঁরা কেউই এদের পুরোনো সামন্ত-অভিজাতদের বংশধর নয়, ঠিক যেমন অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারই বিশেষ কোনো প্রাচীন কুলজির বড়াই করতে পারেন না। একজন রাজা অবশ্য আছেন, যিনি তমসাচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তাঁর বংশাবলীর হিসেব দেখাতে পারেন—ইনি হচ্ছেন উদয়পুরের মহারাণা; সূর্যবংশী অর্থাৎ সূর্যের বংশধর রাজপুতদের প্রধান। সম্ভবত এ বিষয়ে এঁর সংগে পাল্লা দিতে পারেন এমন জীবিত মানুষ একজন মাত্র আছেন—জাপানের মিকাডো।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ধর্মসংক্রান্ত রক্ষণশীলতাও বেড়ে গেল। এটা শুনতে অদ্ভুত লাগে। ব্রিটিশরা দাবি করত তারা খৃষ্টানধর্মের প্রসার বাড়াচ্ছে, অথচ তাদের আগমনের ফলেই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান -ধর্মের গোঁড়ামি অনেক বেড়ে উঠল। এই প্রতিক্রিয়ার খানিকটা স্বাভাবিক, কারণ

বিদেশীর আবির্ভাবের সঙ্গে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। ঠিক এইজন্যেই মুসলিম-আক্রমণের পরে হিন্দুধর্মে গোঁড়ামি এসেছিল, জাতিভেদও পূর্ণতর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবার হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মই এই পন্থা অবলম্বন করল। কিন্তু এ ছাড়াও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার এই দুই ধর্মের মধ্যে রক্ষণশীলতা যেটুকু ছিল তাকে হাতেকলমেই বাড়িয়ে তুললেন—কোথাও-বা না জেনে, কোথাও-বা জেনেশুনে ইচ্ছে করেই। ধর্ম নিয়ে, বা ধর্মে লোককে দীক্ষা দেওয়া নিয়ে ব্রিটিশদের মাথাব্যথা ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল টাকা আয় করা। ধর্মের ব্যাপারে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে তারা ভয় পেত, পাছে লোকেরা চটে গিয়ে তাদের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই, ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এমন সন্দেহও যাতে কেউ না করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তারা এ দেশের ধর্মগুলোকে অর্থাৎ, ধর্মের বাইরের রূপগুলোকে রক্ষা এবং সাহায্য করবার কাজেই লেগে গেল। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল, ধর্মের বাইরের আকারটি ঠিক টিঁকে রয়েছে, যদিও তার মধ্যে আসল বস্তু প্রায় কিছুই বেঁচে নেই।

গোঁড়া লোকেরা পাছে চটে যায় এই ভয়ে সংস্কার-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সরকার তাদেরই পক্ষ টেনে চলতে লাগল। এর ফলে সংস্কারের কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ল। বিদেশী সরকারের পক্ষে সামাজিক সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ, সে যে পরিবর্তন ঘটাতে চাইবে তাতেই লোকেরা আপত্তি তুলবে। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু-আইন অনেক ব্যাপারে পরিবর্তনশীল এবং প্রগতিশীল ছিল, যদিও ঠিক এর আগের কয়েক শতাব্দী ধরে সে প্রগতির বেগ অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়েছিল। হিন্দু-আইন বস্তুটাই প্রধানত হচ্ছে প্রচলিত প্রথার ব্যাপার; প্রথা বদলায় এবং এগিয়ে চলে। বৃটিশ শাসনের আওতায় এসে হিন্দু-আইনের এই স্থিতিস্থাপকতা অন্তর্হিত হয়ে গেল, তার জায়গায় এসে জুড়ে বসল যত অপরিবর্তনীয় আইনের বিধি; প্রজাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত বেশি গোঁড়া রক্ষণশীল তাদের মতামত অনুসারেই এগুলো রচিত হয়েছিল। হিন্দু-সমাজের অগ্রগতির বেগ এমনিই মন্থর ছিল। এবার সে গতি একেবারেই থেমে গেল। মুসলমানরা নূতন পরিবেশকে মেনে নিতে আরও জোর আপত্তি করল এবং একেবারেই হাত-পা গুটিয়ে শামুকের মতো নিজের খোলার মধ্যে ঢুকে বসে রইল।

হিন্দু বিধবারা মৃত স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতেন। এই 'সতী'-প্রথাটি (কিছুটা ভুল করেই এর এই নাম দেওয়া হয়েছে) রহিত করে দিয়েছেন বলে ব্রিটিশরা খুব বাহাদুরি করে থাকেন। এর কিছুটা গৌরব তাঁদের প্রাপ্য বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ ভারতীয় সংস্কারকরা বহু বছর ধরে এর জন্যে আন্দোলন চালাবার পরে তবেই সরকার এ বিষয়ে হাত দিয়েছিলেন। তাঁদের আগেও অন্যান্য রাজারা, বিশেষ করে মারাঠারা, এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন; পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক গোয়াতে এটা বন্ধ করেছিলেন। ভারতীয়দের আন্দোলন আর খৃষ্টান মিশনারিদের চেষ্টায় ব্রিটিশরা এটা রহিত করে দিয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ধর্মমত সম্বন্ধে এই একটি মাত্র সংস্কার-কার্য ব্রিটিশ সরকার এ দেশে করেছেন।

দেশের মধ্যকার সমস্ত প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল ব্যাপারের সঙ্গে এইভাবে ব্রিটিশরা মৈত্রী স্থাপন করল। ভারতবর্ষকে করে তুলতে চাইল একটা পুরোপুরি কৃষিপ্রধান দেশ, সে শুধু তাদের কারখানাগুলোর জন্যে কাঁচা মালই উৎপাদন করবে। ভারতবর্ষে যাতে কারখানা গড়ে উঠতে না পারে তার জন্যে তারা রীতিমতো আইন করে দিল, বাইরে থেকে এ দেশে কলকব্জা আমদানি করলে তার উপর শুল্ক ধার্য করা হবে। অন্যান্য সমস্ত দেশ তাদের শিল্পগুলোকে বাড়িয়ে তুলছিল। জাপান তো কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একবারে লাফে লাফে এগিয়ে যাচ্ছিল—সে কথা আমরা পরে বলব। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার গোঁ ধরে বসে রইলেন কিছুতেই কলকারখানা বাড়তে দেবেন না। কলকব্জার উপরে যে শুল্ক বসানো হয়েছিল সেটা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখা হল। এই শুল্কের ফলে ভারতবর্ষে একটা কারখানা বসানোর খরচ পড়ছিল, ইংলণ্ডে বসাতে যা খরচ তার চারগুণ; অথচ এখানে শ্রমিকের মজুরি অনেক শস্তা। এই বাধাদানের নীতির ফলে অবশ্য কাজকে মাত্র কিছুদিনের মতো দেরি

করিয়েই দেওয়া হল, যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী তাকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য এর ছিল না। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠা শুরু হল। বাঙলাদেশে পাটের কারখানা শুরু হল ব্রিটিশ মূলধন নিয়েই। রেলওয়ে তৈরি হবার ফলে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়ে গেল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বোম্বাই ও আহমেদাবাদে অনেক কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠিত হল; এর মূলধন ছিল বেশির ভাগই ভারতীয়। এর পরে এল খনিশিল্প। অতি ধীরে ধীরে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ চলছিল, একমাত্র কাপড়ের কলগুলো ছাড়া প্রায় এর অধিকাংশ কারখানাই বসছিল ব্রিটিশ মূলধনের জোরে; এবং এর প্রায় সমস্তখানি কাজই চলছিল একেবারে সরকারের নীতির সঙ্গে লড়াই করে। সরকার মুখে 'অবাধ-বাণিজ্য'-নীতির বুলি কপচাচ্ছিলেন; বলছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য যে যেমন পারে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠুক, স্বাধীন ব্যবসায়ীর কাজে কোথাও কোনোরকম বাধা দেওয়া হবে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বাজারে ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ভারতবর্ষ। তখন ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার প্রচুর হস্তক্ষেপ করেছিলেন, শুল্ক বসিয়ে পণ্য আমদানি নিষেধ করে সে বাণিজ্যকে একেবারে ভেঙে বিনষ্ট করে তবে ছেড়েছিলেন। এখন তাঁরাই বড়ো হয়ে বসেছেন, এখন তো আর 'অবাধ বাণিজ্যের' বক্তৃতা দেবার কোনো বাধা নেই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে শুধু উদাসীন হয়েই বসে রইলেন; কতকগুলো ভারতীয় শিল্পের রীতিমতো বিরোধিতাই করতে লাগলেন; বিশেষ করে বোম্বাই আর আহমেদাবাদে যে কাপড়ের মিল গড়ে উঠছিল তার। এই ভারতীয় কলগুলোতে উৎপন্ন কাপড়ের উপরে একটা কর বা শুল্ক বসানো হল, নাম দেওয়া হল 'তুলোর উপরে ধার্য উৎপাদন-শুল্ক'। এর উদ্দেশ্য ছিল ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে বিলাতি কাপড়ের আমদানি-ব্যবসায়ে সাহায্য করা, যেন সে কাপড় ভারতীয় কাপড়ের চেয়ে শস্তায় বিকোতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই শুল্ক বসায় বিদেশী জিনিষের উপরে, বসিয়ে তার নিজের শিল্পকে রক্ষা করে বা রাজস্বের আয় বাড়ায়। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা করতে লাগলেন একটি অসাধারণ এবং আশ্চর্য কাজ—তাঁরা শুল্ক বসালেন ভারতের নিজের তৈরি জিনিষের উপরেই। তুলোর কাপড়ের উপরে এই উৎপাদন-শুল্কের বিরুদ্ধে প্রচুর-পরিমাণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা হয়েছে; তবুও এটাকে এই দীর্ঘকাল ধরেই টিঁকিয়ে রাখা হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছর হল একে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এইভাবে সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। এ দেশের ধনী-সম্প্রদায় শিল্প-প্রসারের জন্যে ক্রমেই বেশি জোর করে দাবি জানাতে লাগলেন। সরকার মাত্র অতি অল্পদিন হল একটা শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ খুলেছেন; বোধ হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু খোলার পরেও একে দিয়ে কাজ অতি অল্পই হয়েছে, অন্তত বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আগে। শিল্পপ্রগতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা কারখানার মজুর-শ্রেণী গড়ে উঠছিল, এরা শহর-অঞ্চলের কারখানাগুলোতে কাজ করত। জমির উপরে অত্যধিক চাপের কথা আগেই বলেছি; তার উপর গ্রাম-অঞ্চলগুলোতে তো আধা-দুর্ভিক্ষের দশা লেগেই ছিল। এর ফলে বহু গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে কাজ করতে এল এই কারখানাগুলোতে, কতক-বা চলে গেল বাংলায় আর আসামে যে বড়ো বড়ো বাগানগুলো গড়ে উঠছিল সেইখানে। এই চাপের ফলে অনেকে আবার দেশ ছেড়ে একেবারে অন্য দেশেই চলে গেল; তারা শুনেছিল সেখানে খুব বেশি মাইনে পাওয়া যায়। এরা বিশেষ করে যেত দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফিজি, মরিসস্ ও সিংহলে। কিন্তু এই স্থান-পরিবর্তনের ফলেও এদের ভাগ্য বিশেষ ফিরল না। দেশ ছেড়ে যারা নূতন দেশে চলে গেল, কোনো কোনো স্থানে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হত প্রায় ক্রীতদাসের মতো। আসামের চা-বাগানেও এদের অবস্থা তার চেয়ে ভালো ছিল না। এর ফলে বিরক্ত হয়ে পরে একসময় আবার এরা বাগান থেকে নিজের গ্রামে ফিরে আসতে চাইলে। কিন্তু তখন গ্রামেও তাদের ভাগ্যে বিশেষ সম্বর্ধনা জুটল না; গ্রামে এসে জমি পাবে কোথায়?

কারখানায় যারা মজুর হল তারাও অল্পদিনের মধ্যেই দেখল, সেখানে মাইনে অল্প-একটু বেশি বটে, কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ নেই। শহরে সব জিনিষেরই দর চড়া; সবসুদ্ধ

জীবিকা-নির্বাহের ব্যয় শহরে অনেক বেশি। তাদের বাস করতে হত কদর্য সব বস্তিতে; নোংরা স্যাঁৎসেতে, অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর সেগুলো। কাজও করতে হত অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায়। গ্রামে তাদের পেট ভরে খাওয়া হয়তো অনেকসময় জুটত না, কিন্তু সূর্যের আলো আর খোলা হাওয়ার তাদের অভাব ছিল না। কিন্তু কারখানার মজুরের ভাগ্যে খোলা হাওয়া জোটে না, আলোর দেখাও ক্বচিৎ মেলে। জীবনযাত্রার ব্যয় বেশি, মাইনেতে সে ব্যয় সংকুলান হয় না। স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরও দীর্ঘকাল ধরে খাটতে হত। মায়ের কোলে ছোটো ছেলেপিলে থাকলে তারা সে শিশুকে মাদকদ্রব্য খাইয়ে অচেতন করে রাখতো, নইলে সে মাকে কাজে যেতে দেয় না। কারখানাতে এই মজুররা যে অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ করত, এই হচ্ছে তার স্বরূপ। সুখী যে তারা ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই; ফলে তাদের অসন্তোষও ক্রমে বেড়ে উঠল। সময় সময় একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েই তারা ধর্মঘট করে বসত, অর্থাৎ কাজকর্ম বন্ধ করে দিত। কিন্তু তারা দুর্বল অসহায়; মনিবরা ধনী, এবং তাদের পিছনে আবার অনেক সময়েই থাকত সরকারের সমর্থন; কাজেই এদের পিটিয়ে শায়েস্তা করা মনিবের পক্ষে শক্ত হত না। অতি আস্তে আস্তে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে তারা একত্র দাঁড়াবার মূল্য বুঝল, ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠল।

এটাকে কেবল অতীত কালের বর্ণনা মনে কোরো না। ভারতবর্ষে শ্রমিকের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে; দুঃস্থ শ্রমিককে সামান্য একটুখানি রক্ষা করবার মতো দুটো-চারটে আইনও তৈরি করা হয়েছে। তবু এখনও যদি কানপুরে বা বোম্বাইতে বা অন্যান্য যে-সব জায়গাতে কারখানা আছে, তার কোথাও যাও, শ্রমিকরা যে ঘরগুলোতে বাস করে তার দশা দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে।

এই চিঠিতে এবং আরও অনেক চিঠিতে আমি তোমাকে ভারতবর্ষে-আগত ব্রিটিশদের কথা এবং ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কথা বলেছি। এই সরকার কী রকমের ছিল, কীরকম ভাবেই বা শাসন করত? প্রথমে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তার পিছনে ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, বিদ্রোহের পরে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সোজাসুজিই নিজের হাতে শাসনভার নিয়ে নিলে। তার পরে ইংলণ্ডের অধিপতি (ঠিক ঠিক বলতে গেলে—রানী, কারণ তখন ব্রিটেনের সিংহাসনে একজন রানীই অধিষ্ঠিত ছিলেন) ভারত সম্রাজ্ঞী (কাইজার-ই-হিন্দ) বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। ভারতে সবার উপরে ছিলেন গভর্নর জেনারেল, তিনি রাজপ্রতিনিধি বলেও গণ্য হলেন। তাঁর অধীনে থাকল অসংখ্য কর্মচারী। ভারতবর্ষকে ভাগ ভাগ করে কতকটা এখনকারই মতো কতকগুলো বড়ো বড়ো প্রদেশ আর রাজ্যে পরিণত করা হল। ভারতীয় রাজাদের অধীনে যে রাজ্যগুলো থাকল সেগুলো নামে ছিল অর্ধ-স্বাধীন; কিন্তু আসলে তারা পুরোপুরিই বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ ছিল। বড়ো রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিতে একজন করে ইংরেজ কর্মচারী থাকতেন, এঁর নাম ছিল রেসিডেণ্ট; শাসন-ব্যাপারটাকে তিনিই সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত করতেন। রাজ্যের ভিতরে সংস্কার-সাধন নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না; রাজ্যের শাসনব্যবস্থা যতই খারাপ বা সেকেলে হোক-না কেন, তাতেও তাঁর কিছু যেত-আসত না। তাঁর লক্ষ্য থাকত শুধু একটি বিষয়ে, সেটি হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলা।

ভারতবর্ষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানকে এইসব রাজ্যে পরিণত করা হল। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ থাকল সোজাসুজি ব্রিটিশদের শাসনে। এই দুই-তৃতীয়াংশের নাম দেওয়া হল ব্রিটিশ-ভারত। ব্রিটিশ-ভারতের বড়ো বড়ো রাজকর্মচারীদের পদগুলো সমস্তই থাকত সাহেবদের হাতে। এর ব্যতিক্রম ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে পৌঁছে; তখন দু-চারজন ভারতবাসীও কায়ক্লেশে এর মধ্যে ঢুকে গেলেন। কিন্তু তখনও সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব স্বভাবতই রয়ে গেল ব্রিটিশদের হাতে; এখনও তাই আছে। এক সেনাবিভাগ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিভাগের এই বড়ো বড়ো কর্মচারীরা ছিলেন তথাকথিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত সদস্য। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত শাসন-ব্যাপারটাই চলত এদের—এই আই. সি. এস-দের ইঙ্গিতে। কর্মচারীদের দ্বারা এই প্রকারের শাসন—যেখানে তারাই একজন আর-একজনকে নিযুক্ত করে এবং তাদের কাজের জন্যে প্রজার কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই—একে বলা হয়

ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র। ব্যুরো কথাটার অর্থ শাসনের দপ্তর বা অফিস, তার থেকেই কথাটার সৃষ্টি হয়েছে।

এই আই. সি. এস. সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনি। এরা আশ্চর্য রকমের লোক। কোনো কোনো দিক দিয়ে এরা খুবই কর্মদক্ষ। এরা শাসন-ব্যবস্থাটাকে সুসংহত করে তুলল, ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি কায়েমি করে দিল, এবং তার দ্বারা ফাঁকতালে নিজেদেরও বেশ একটু লাভ গুছিয়ে নিল। সরকারি বিভাগগুলির মধ্যে যেটা-যেটা দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে কায়েমি করা হবে আর যেটা-যেটা দিয়ে রাজস্ব আদায় করা হবে তার সমস্তগুলিকে খুব ভালো করে গড়ে তুলল এরা। অন্যগুলোর ভাগ্যে জুটল চরম অবহেলা।

এই আই. সি. এস. প্রজার দ্বারা নিযুক্ত নয়, তাদের কাছে এদের জবাবদিহিও নেই; কাজেই অন্যান্য যে বিভাগগুলির উপরে প্রধানত প্রজাদের ভালোমন্দ নির্ভর করছে সেগুলোর দিকে এরা একেবারে নজরই দিল না। এ অবস্থায় যা হওয়া স্বাভাবিক, এরা অত্যন্ত দুর্বিনীত এবং কর্তৃত্ব-ভাবাপন্ন হয়ে উঠল, প্রজার মতামতকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে চলল। এদের দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ; কাজেই এরা মনে করতে লাগল যে, এদের চেয়ে বিজ্ঞ লোক আর পৃথিবীতে নেই। এদের কাছে ভারতের কল্যাণ বলতে বোঝাত প্রধানত এদের নিজেদের চাকরির কল্যাণ। সবাই মিলে একটা পরস্পরের বাহবা-দেওয়ার দল গড়ে নিল এরা, সারা ক্ষণই একে অন্যের প্রশংসা করে বেড়াত। অপরিসীম শক্তি আর প্রভুত্ব কারও হাতে থাকলে তার ফল এরকম না হয়ে পারে না; ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিল বস্তুত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র প্রভু। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট থাকে বহু দূরে; সেখান থেকে তার পক্ষে এদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে আসা সম্ভব ছিল না, আর তা ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে আসবার দরকারও তার কিছু ছিল না। কারণ, এরা সেই পার্লামেণ্টের এবং ব্রিটিশ শিল্পগুলির স্বার্থই কায়েম করছিল। আর ভারতবর্ষের লোকদের স্বার্থের কথা যদি বলো, সেজন্য এদের খুব বেশি মাথা ঘামাবার কোনো উপায়ই ছিল না। এদের কাজের সামান্য একটু সমালোচনা করলেও এরা খেপে যেত, এতই ছিল এদের অসহিষ্ণুতা।

অথচ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে সাধু এবং যোগ্য ভালোমানুষও অনেক আছেন। তাঁরা চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু যে নীতি এবং যে ঘটনার স্রোত ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার গতিকে ব্যাহত করতে পারেন নি। আসলে এই আই. সি. এস. ছিল ইংলণ্ডের শিল্প-ব্যবসায়ী এবং মূলধনওয়ালাদের স্বার্থের সংরক্ষক; তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ভারতবর্ষকে শোষণ করা।

এদের নিজেদের বা ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেইখানেই ভারতের এই ব্যুরোক্রেটিক সরকার অপূর্বরকম কর্মদক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হাসপাতাল এবং আরও নানারকম কাজ, যেগুলো জাতিকে স্বাস্থ্যবান এবং সমৃদ্ধিশালী করে তোলে, এগুলোকে তারা আগাগোড়া অবহেলা করে এসেছে। বহু বছর ধরে এগুলোর কথা কেউ ভেবেই দেখে নি; গ্রাম-অঞ্চলের পুরোনো বিদ্যালয়গুলো মরে শেষ হয়ে গেল। তার পর খুব ধীরে ধীরে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে একটুখানি কাজ আরম্ভ হল। শিক্ষাদানের এই আরম্ভ করা হয়েছিল অনেকটা এদের নিজের প্রয়োজনেই। বড়ো বড়ো সমস্ত কর্মচারীর পদে সাহেবরাই অধিষ্ঠিত থাকত, কিন্তু ছোটোখাটো কর্মচারী আর কেরানির কাজ তো সাহেব দিয়ে চলে না! কেরানির প্রয়োজন; কেরানি তৈরি করে নেবার জন্যেই প্রথম ব্রিটিশরা এ দেশে স্কুল কলেজ খুলল। সেই থেকে আজ পর্যন্তও ভারতবর্ষে শিক্ষার এইটেই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে রয়েছে। এই শিক্ষার ফলে যে মানুষ তৈরি হচ্ছে তাদের অধিকাংশ একমাত্র কেরানিগিরিরই উপযুক্ত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, সরকারি এবং অন্যান্য আপিসে মোট যত কেরানি দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি কেরানি তৈরি করা হয়ে গেছে। অনেকের ভাগ্যে কাজ জুটল না, এদের নিয়ে নূতন একটা 'শিক্ষিত বেকার'-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেল।

এই ইংরেজি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল বাংলাদেশে, তাই প্রথমদিকের কেরানিরাও বেশির ভাগই ছিল বাঙালি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়—কলিকাতা,

বোম্বাই ও মাদ্রাজে। একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো। মুসলমানরা এই নূতন শিক্ষাকে ভালো চোখে দেখে নি। এর ফলে কেরানিগিরি আর সরকারি চাকরি পাবার প্রতিযোগিতায় তারা পিছনে পড়ে রইল। পরে আবার এইটেই হল তাদের একটা বড়ো রকমের অভিযোগ।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে—শিক্ষার আয়োজন যখন সরকার শুরু করলেন তখনও মেয়েদের শিক্ষার একেবারে কোনো ব্যবস্থাই করা হল না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লোককে তখন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল শুধু কেরানি তৈরি করবার জন্যে; পুরুষ কেরানিই তারা চাইত। আর সমাজের বিধিনিয়ম তখনও সেকেলে ধরনের, তখন একমাত্র পুরুষরাই চাকরি করতে আসত, কাজেই মেয়েদের শিক্ষার দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। তাদের শিক্ষার অতি সামান্য আয়োজন যখন শুরু করা হল সে এর অনেক কাল পরের কথা।

১১৩

ভারতের পুনর্জাগরণ

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কীভাবে কায়েমি হয়ে বসল এবং তাদের নীতির ফলে কীভাবে এ দেশের প্রজার দারিদ্র্য এবং দুর্দশা বেড়ে উঠল সে কথা তোমাকে বলেছি। শান্তি অবশ্য এসেছিল দেশে, এসেছিল সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা। মোগল-সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলার যুগ শুরু হয়েছিল তার পরে আবার এই শান্তি-শৃঙ্খলা পেয়ে মানুষ বেঁচেও গেল। চোর এবং ডাকাতদের সুসংবদ্ধ দলগুলোকে দমন করা হল। কিন্তু মাঠে আর কারখানায় কাজ করছিল যে শ্রমিকরা তাদের ভাগ্যে এই শান্তি-শৃঙ্খলার সুফল প্রায় কিছুই জুটল না, নূতন শাসনের ভীষণ চাপে তারা একেবারে পিষে মারা যাচ্ছিল। কিন্তু তবুও আমি আবার তোমাকে কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি—কোনো-একটা দেশ বা জাতির উপরে, ব্রিটেন বা ব্রিটিশ জাতির উপরে রাগ করাটা নিছক মূর্খতা। আমরা যেমন, তারাও তেমনি অবস্থার দাসমাত্র ছিল। ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা এটা শিখেছি, মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা অনেক সময়েই হয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন। তা নিয়ে রাগারাগি করা বা শুধুশুধু কাউকে গালাগাল দেওয়া একেবারেই বোকামি, তাতে কোনো লাভই হয় না। তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমানের মতো কাজ হচ্ছে, দারিদ্র্য দুঃখ শোষণ কেন হচ্ছে তার কারণটি বুঝে নেওয়া এবং তাকে দূর করতে চেষ্টা করা। এ যদি করতে না পারি, ঘটনার স্রোতে যদি গা ভাসিয়ে দিই, তবে দুর্দশায় পড়তে আমরা বাধ্য। ভারতবর্ষ এইভাবেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ছোটোখাটো একটি অচলায়তন হয়ে উঠেছিল সে। তার সমাজ-জীবন প্রাচীন প্রথা আর বিধির দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ, তার সামাজিক রীতিনীতি প্রাণ এবং শক্তির অভাবে মুমূর্ষু। দুঃখ তার এসেছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ব্রিটিশরা দৈবক্রমে এই দুর্দশার নিমিত্ত হয়েছিল মাত্র। তারা যদি না থাকত, হয়তো অন্য কোনো জাতি এসে বসত; তারাও ঠিক এই কাজই করত।

এ দেশের একটা খুব বড়ো উপকার কিন্তু ইংরেজরা সত্যই করেছিল। তাদের নূতন এবং জোরালো জীবনযাত্রার ধাক্কা এসে এ দেশে লাগল; সেই ধাক্কায় ভারতবর্ষের জড়তা কাটল, তার মধ্যে রাজনৈতিক একতা এবং জাতীয়তাবোধের স্পৃহা জেগে উঠল। এই আঘাতের মধ্যে বেদনা আছে। তবুও আমাদের এই প্রাচীন দেশ ও জাতিকে জরা ঘুচিয়ে তাকে আবার নবীন যৌবনে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে এমন একটা বেদনাদায়ক আঘাতেরই হয়তো প্রয়োজন ছিল।

ইংরেজি-শিক্ষার আমদানি করা হয়েছিল কেরানি তৈরি করবার জন্যে; কিন্তু সেই শিক্ষারই ফলে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্যদেশের প্রচলিত চিন্তাধারারও সন্ধান পেয়ে গেল। এর ফলে একটা

নূতন শ্রেণী গড়ে উঠল—ইংরেজি-শিক্ষিতের দল; এরা সংখ্যায় অল্প, দেশের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তবু ভাগ্যের নির্দেশে নূতন যুগের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব এরাই গ্রহণ করল। প্রথমদিকে এ'রা ইংলণ্ডকে, তথা ইংলণ্ডে প্রচলিত স্বাধীনতার মতবাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডেও এক দল লোক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র নিয়ে খুব মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আসলে কিন্তু তার অনেকখানিই ভুয়ো; ভারতবর্ষে ইংলণ্ড তার নিজের লাভের জন্য পুরোদস্তুর স্বেচ্ছাচারী শাসন চালাচ্ছিল। কিন্তু তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবাসীরা ছিলেন খানিকটা আশাবাদী। এ'দের ভরসা ছিল, সময় যখন আসবে ইংলণ্ড নিজেই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে।

পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতবর্ষকে এসে নাড়া দিচ্ছিল, এর ফল হিন্দুধর্মের উপরেও খানিকটা প্রভাব দেখা গেল। জনসাধারণের উপরে এর প্রভাব বিশেষ কিছু ছিল না; এবং ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল বস্তুত গোঁড়াদেরই পৃষ্ঠপোষণ। কিন্তু সরকারি চাকুরে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী লোকদের নিয়ে নূতন একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল, তারা এর প্রভাব এড়াতে পারল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত অনুসারে হিন্দুধর্মের সংস্কার ঘটাবার একটা চেষ্টা বাঙলাদেশে করা হল। অতীত কালেও অবশ্য হিন্দুধর্মের সংস্কারক অসংখ্য এসেছেন, এ'দের অনেকের কথা আমিও এইসব চিঠিপত্রে তোমাকে বলেছি। কিন্তু এই-যে নূতন চেষ্টাটি হল, এর মধ্যে খুব স্পষ্ট প্রভাব ছিল খৃষ্টানধর্ম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার। এর উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অতি মহান্ পুরুষ ছিলেন তিনি, অতি বিরাট পণ্ডিত; এ'র নাম আমরা ইতিপূর্বেই একবার দেখেছি, 'সতী'-প্রথা নিবারণের সম্পর্কে। তিনি সংস্কৃত, আরবি এবং আরও অনেক ভাষা খুব ভালো করে জানতেন, এবং খুবই মনোযোগ দিয়ে সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রগুলোকে খুঁটিয়ে শিখেছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা প্রভৃতির তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন, 'সমাজকে সংস্কৃত করো, নারীদের শিক্ষিত করো।' তিনি যে সমাজটি স্থাপন করেন, তার নাম ছিল ব্রাহ্মসমাজ। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে এটি একটি ছোটো প্রতিষ্ঠান ছিল, এখনও তাই আছে, বাঙলাদেশের ইংরেজি-জানা লোকদের মধ্যেই এর গণ্ডি সীমাবদ্ধ। বাঙলাদেশের জীবনের উপরে এর প্রভাব পড়েছে অত্যন্ত পরিমাণে। ঠাকুর-পরিবার এই ধর্ম গ্রহণ করলেন, এবং বহুদিন ধরে কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রাণস্বরূপ হয়ে ছিলেন। এর আর-একজন মান্যগণ্য নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন।

এই শতাব্দীতেই আর কিছুদিন পরে আর-একটি ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলন হয়। এর স্থান ছিল পাঞ্জাব, এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। আর-একটি নূতন সমাজ এ'রা প্রতিষ্ঠা করলেন, এর নাম হল আর্যসমাজ। হিন্দুধর্মের যেসব ফ্যাকড়া শেষ দিকে গজিয়েছিল তার অনেকগুলোকে এতে বর্জন করা হল, জাতিভেদও তুলে দেওয়া হল। এর কথা ছিল 'বেদের যুগে ফিরে যাও।' এটা ছিল একটা সংস্কার-আন্দোলন, এবং এর মূলে নিঃসন্দেহ ছিল মুসলিম এবং খৃষ্টান মতের প্রভাব তবুও আসলে এটা একটা উগ্র সংগ্রামাত্মক আন্দোলন। এর ফলে একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখা গেল : হিন্দুদের নানাবিধ দল-উপদলের মধ্যে এই আর্য-সমাজেরই জীবনধারণ মুসলমানধর্মের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মেলে, অথচ এইটেই হয়ে উঠল একেবারে মুসলমানধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরোধী। নিষ্ক্রিয় ও স্থাণু হিন্দুধর্মকে একটা সক্রিয় সকর্মক ধর্ম বানিয়ে তোলাই হল এর উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মকে এ আবার বাঁচিয়ে তুলতে চাইল। এর মধ্যে একটু জাতীয়তার ছোঁয়াচও ছিল, তার ফলেই আন্দোলনটা কিছুটা শক্তি পেয়ে গেল। এটা ছিল বস্তুত হিন্দু-জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের প্রতীক। এবং হিন্দু-জাতীয়তা-বাদের সমর্থক বলেই এটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপ নিতে পারল না।

ব্রাহ্মসমাজের তুলনায় আর্যসমাজ অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছিল, বিশেষ করে পাঞ্জাবে। কিন্তু এটা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্যে। শিক্ষার প্রসারের দিকে আর্য-সমাজ প্রচুর পরিমাণ কাজ করেছে, ছেলেদের জন্যে এবং মেয়েদের জন্যে অনেক স্কুল এবং কলেজ স্থাপন করেছে।

এই শতাব্দীতে আরও একজন আশ্চর্য ধার্মিক লোকের আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। এই চিঠিতে অন্যান্য যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের থেকে ইনি ছিলেন একেবারে আলাদা ধরনের লোক। ইনি সংস্কারের জন্যে কোনো সক্রিয় সমাজ স্থাপন করলেন না; বললেন, 'মানুষের সেবা করো।' দেশের বহু স্থানে এখন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমগুলি তাঁর এই দুর্বল ও দরিদ্রকে সেবা করার ব্রত পালন করছে। রামকৃষ্ণের একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ইনি অত্যন্ত বাগ্মিতা এবং তেজের সঙ্গে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করে গিয়েছেন। এঁর কথায় কোথাও মুসলমানধর্ম বা অন্য কারও সম্বন্ধে বিরোধ-প্রচার ছিল না। আর্যসমাজের জাতীয়তাবাদ কিছুটা সংকীর্ণ; এতে সে সংকীর্ণতাও ছিল না। কিন্তু তা হলেও বিবেকানন্দের প্রচারিত জাতীয়তাবাদ হিন্দু-জাতীয়তার কথাই বলেছে। এর মূল প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির উপরে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতীয়তার যে প্রথম সূত্রপাত হল সেটা এল ধর্ম ও হিন্দুসমাজকে আশ্রয় করে। মুসলমানরা এই হিন্দু-জাতীয়তাবাদে স্বভাবতই যোগ দিতে পারল না, দূরে সরে রইল। ইংরেজি-শিক্ষাকে তারা গ্রহণ করে নি, নূতন চিন্তাধারাগুলোও তাদের বেশিদূর স্পর্শ করে নি, কাজেই তাদের মনে দোলাও লেগেছিল অনেক কম। খোলস ছেড়ে তারা বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আরও অনেক বছর পরে; তখন হিন্দুদেরই মতো তাদেরও জাতীয়তাবাদ একটা মুসলমান-জাতীয়তাবাদের রূপেই আত্মপ্রকাশ করল, ইসলামের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির উপরে তার ভিত্তি, সংখ্যাপ্রধান হিন্দুদের চাপে পড়ে সে রীতিনীতি সংস্কৃতি পাছে নষ্ট হয়ে যায় এই তাদের ভয়। এই মুসলিম আন্দোলন কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল অনেক দিন পরে, এই শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে এসে।

এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এই সব-যে সংস্কার আর প্রগতির আন্দোলন এল, এরা সকলেই পাশ্চাত্য জগৎ থেকে যে নূতন বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক মতামত এ দেশে এসে পৌঁচচ্ছিল তার সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন ধর্মগত মতামত আর অভ্যাসগুলোকে একত্র মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। এই পুরোনো ধারণা এবং অভ্যাসগুলোকে নির্ভীকদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ক'রে তার দোষগুণ বিচার করবার সাহস এদের ছিল না; আবার বিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের যে নূতন জগৎ তাদের চার দিকে চেপে গিয়েছিল তাকেও এরা অস্বীকার করতে পারছিল না। কাজেই এরা চাইল এই দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে; বোঝাতে চাইল যে, যত আধুনিক মতামত এবং প্রগতি দেখা যাচ্ছে, সমস্তেরই মূল তাদের ধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য, এতে শুধু মানুষকে সহজ পথে ভেবে দেখার থেকে নিবৃত্ত করে রাখা হল। কোথায় বেশ সোজাসুজি সব কথা ভেবে দেখবে, যেসমস্ত নবীন শক্তি আর মতামত জগৎটাকেই নূতন করে গড়ে তুলছিল তাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করবে, তা না করে তারা প্রাচীনকালের মত আচার আর প্রথার ভারে স্থবির হয়ে বসে রইল। সামনে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখল না তারা, চলল না সামনে এগিয়ে। সারা ক্ষণই খালি লুকিয়ে লুকিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে লাগল। কেবলই যদি মাথা ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে থাকি তা হলে সামনে এগিয়ে চলা হয় না।

ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীটা বেড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে, বড়ো বড়ো শহরগুলোতে। এরই সঙ্গে সঙ্গে নূতন একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়ে উঠল, এর মধ্যে ছিল সব বিভিন্ন পেশার লোক—আইনজীবী, ডাক্তার ইত্যাদি; আর ছিল ব্যবসায়ী ও বণিকরা। আগের কালেও অবশ্য একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এ দেশে, কিন্তু প্রথম যুগের ব্রিটিশ নীতির ধাক্কায় তার বেশির ভাগই ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নূতন বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীটার জন্ম হল ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে; এই শাসনকে অবলম্বন করেই এটা বেঁচে রইল বলা যায়। জনসাধারণের উপরে যে শোষণ চলছিল তার কিছু ছিটেফোঁটা-ভাগ এরা পাচ্ছিল; ব্রিটিশ শাসক-প্রভুদের ভোজের বিপুল আয়োজন থেকে যা এক-আধ টুকরো উদ্‌বৃত্ত পাতে পড়ে থাকত সেটুকু এরাই কুটিয়ে খেত। এরা ছিল ছোটোখাটো কর্মচারী, দেশ-শাসনের ব্যাপারে ব্রিটিশকে এরা সাহায্য করত।

এদের অনেকে ছিল উকিল, বিচারশালার কাজকর্ম চালাতে তারা সাহায্য করত আর লোকের মধ্যে মামলা বাধিয়ে নিজেদের টাকার সিন্ধুক ভর্তি করল; কেউ-বা ছিল বণিক, ব্রিটিশ শিল্প আর বাণিজ্যের তারা দালাল, লাভ বা কমিশনের আশায় বিলাতি মাল বাজারে চালিয়ে দিতে লাগল।

এই নূতন বুর্জোয়া-দলের অধিকাংশ লোকই ছিল হিন্দু। তার কারণ, মুসলমানদের তুলনায় তাদেরই আর্থিক অবস্থা একটু ভালো ছিল; আর ইংরেজি-শিক্ষাটাকেও তারাই গ্রহণ করেছিল, সে শিক্ষা থাকলে তবেই সরকারি চাকরি মেলে, অন্যান্য পেশাগুলো চালানো যায়। মুসলমানরা সাধারণত ছিল এদের চেয়ে গরিব। ব্রিটিশদের হাতে ভারতের শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে তাঁতিরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল; এদের প্রায় সকলেই মুসলমান। ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাঙলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি, এরা ছিল গরিব প্রজা বা অতি ক্ষুদ্র ভূস্বামী। জমিদার সাধারণত হত হিন্দু, গ্রামের বানিয়াও তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মুদি। কাজেই এই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারও করে নিতে ছাড়ত না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার, কেন না, হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ তার মূল রয়েছে এইখানে।

ঠিক একই ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, বিশেষ করে দক্ষিণ-ভারতে, শুষে নিতেন তথাকথিত 'অনুন্নত' জাতিদের, তাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। সম্প্রতি কিছুদিন ধরে, এবং বিশেষ করে 'বাপু'র প্রায়োপবেশনের পর থেকে, এই অনুন্নত জাতিদের সমস্যাটা নিয়ে আমরা অনেক আলাপ-আলোচনা করছি। সমস্ত ক্ষেত্রেই অস্পৃশ্যতাকে দূর করবার চেষ্টা চলেছে, শত শত মন্দিরে এবং অনুরূপ স্থানে এইসমস্ত শ্রেণীকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সমস্যাটির একেবারে তলায় যে কারণ বর্তমান সে হচ্ছে এই আর্থিক শোষণ; সেটা যতক্ষণ দূর না হবে ততক্ষণ অনুন্নত জাতিরা অনুন্নতই থেকে যাবে। অস্পৃশ্য জাতিরা ছিল কৃষিজীবী ভূমিদাস; এদের নিজস্ব জমি রাখবার অধিকার ছিল না। তা ছাড়া আরও অনেক অধিকার থেকে এদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তার জনসাধারণ গরিব হয়ে যেতে লাগল; অথচ তারই সঙ্গে সঙ্গে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে মুষ্টিমেয় ক'জন লোক তাদের অবস্থা একটু ভালো হয়ে উঠল, তারা দেশের শোষণ-লব্ধ অর্থের কিছুটা ভাগ পাচ্ছিল। উকিলরা, অন্যান্য পেশা-জীবীরা, বণিকরা কিছু টাকা জমিয়ে ফেলল। এখন এই টাকা আবার খাটাতে হয়, তা হলেই সুদ-বাবদ কিছু আয় হবে। ভূস্বামীরা গরিব হয়ে পড়েছিল, এদের অনেকে তাদের জমি কিনে নিল, নিয়ে নিজেরাই ভূস্বামী হয়ে বসল। অন্যেরা দেখল, ইংরেজরা শিল্প থেকে আশ্চর্যরকম লাভ করে নিচ্ছে; দেখে তারা ঠিক করল, নিজের টাকায় এ দেশে কারখানা খুলবে। এইভাবে ভারতীয় মূলধন দিয়ে বড়ো বড়ো কল-কারখানা তৈরি হল; এবং তার ফলে একটা ভারতীয় শিল্পপতি ধনিক-শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। এর শুরু হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে।

বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এই বুর্জোয়াদের ক্ষুধাও বেড়ে যেতে লাগল। এখন তারা চাইল—আরও এগিয়ে চলবে আরও টাকা আয় করবে, সরকারি দপ্তরে আরও বেশি চাকরি দখল করবে, কারখানা চালাবার আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করবে। কিন্তু দেখল, যে দিকেই যেতে চায়, ব্রিটিশরা সব জায়গাতে তাদের বাধা দিচ্ছে। বড়ো বড়ো চাকরি সমস্তই তোলা রয়েছে সাহেবদের জন্যে, ব্যবসাবাণিজ্যও চালানো হচ্ছে সাহেবদেরই লাভের জন্যে। দেখে তারা আন্দোলন শুরু করল। এই হল নূতন জাতীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহটাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাতে দমন করা হয়েছে, তার ফলে দেশের প্রজারা অত্যন্তরকম ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, তারা আর আন্দোলন বা সক্রিয় কর্মক্রমের মধ্যে যেতে চাইত না। আবার নূতন করে জেগে উঠতে তাদের বহু বছর লেগে গেল।

স্বদেশীর হাওয়া দেখতে দেখতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল; বাঙলাদেশই এ বিষয়ে অগ্রণী হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালি লেখক একটি উপন্যাস লিখলেন, তার নাম 'আনন্দমঠ'। বইটিতে এই জাতীয়তাবাদের কথা ছিল, এর দ্বারা সে মতামত আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ল। বাঙলাভাষায় এ ধরনের বই এর আগে কখনও লেখা হয় নি। বাঙলাদেশের উপরে এর প্রভাব হল অসামান্য, জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার দিকেও এর প্রচণ্ড প্রভাব হল। এই বইতেই আমাদের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' গানটি আছে। এখানে একটি কথা বলতে পারি,—একখানি বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিকে নিয়েও খুব হৈচৈ হয়। এইটির নাম ছিল 'নীলদর্পণ' অর্থাৎ, 'নীলচাষের স্বরূপ দেখবার আয়না'। নীলচাষের সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটুখানি বলেছি; নীলচাষের ফলে বাঙলাদেশের চাষিরা কী দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছিল তার একটি মর্মান্তিক চিত্র এই বইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় মূলধনেরও ইতিমধ্যে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল, তার জন্যে আরও জায়গা চাই। শেষে ১৮৮৫ সনে এইসমস্ত নূতন বুর্জোয়ারা একত্র হয়ে স্থির করলেন, নিজেদের বক্তব্য পেশ করবার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এইরূপে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হল। তুমি বেশ জানো, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়ে জানে, আধুনিক কালে এই প্রতিষ্ঠানটি অতি বৃহৎ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের হয়ে কথা বলতে গিয়ে এ খানিকটা তাদেরই প্রতিনিধি-যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল ভিত্তি নিয়েই সে আপত্তি প্রকাশ করেছে, করে তার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গণ-আন্দোলন চালিয়েছে। স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়েছে আকাশে, স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো যুদ্ধও করেছে। আজও এই সংগ্রাম সে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সমস্তই পরবর্তী কালের কথা। প্রথম যখন জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি করা হয় তখন সে ছিল একটি অত্যন্ত নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান, অতি সাবধানে ভয়ে ভয়ে কথা বলত, ব্রিটিশের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা খুব জোর দিয়ে নিবেদন করত এবং অত্যন্ত বিনীত ভাষায় অতি সামান্য দু-চারটি সংস্কারের জন্য প্রার্থনা জানাত। অপেক্ষাকৃত বেশি ধনী বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্র ছিল এটা, অপেক্ষাকৃত-দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীদেরও এখানে জায়গা ছিল না। আর জনসাধারণের, চাষি-মজুরের কথা যদি বলো, তাদের তো কোনো সম্পর্কই ছিল না এর সঙ্গে। এটা ছিল প্রধানত ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীদেরই প্রতিষ্ঠান; এর কাজকর্মও চলত আমাদের বিমাতৃ-ভাষায়, অর্থাৎ, ইংরেজি ভাষায়। যেসব দাবি নিয়ে এ লড়াই করত সে হচ্ছে, ভূস্বামীদের ও ভারতীয় শিল্পপতিদের দাবি, বেকার শিক্ষিত লোকদের চাকরি পাবার দাবি। দেশের জনসাধারণ দারিদ্র্যের চাপে পিষে মারা যাচ্ছিল, তাদের সে দারিদ্র্য বা তাদের প্রয়োজন নিয়ে এ আদৌ মাথা ঘামাত না। এর দাবি ছিল, সরকারি চাকরিগুলোকে 'ভারতীয়' করো—তার মানে সরকারি চাকরিতে সাহেবের বদলে বেশি করে ভারতবাসী নিযুক্ত করো। ভারতের সত্যকার ব্যাধি হচ্ছে তার শোষণের জন্যে যে কলটি বসানো হয়েছে সেইটি; সে কল কে চালাচ্ছে, সাহেব না ভারতবাসী, তাতে কিছুই যায়-আসে না—এই সোজা কথাটা এদের মাথায় ঢুকত না। আরও একটি অভিযোগ এই কংগ্রেসের ছিল—সেনাবিভাগে ও শাসনবিভাগে ইংরেজ কর্মচারীদের দরুন অত্যন্ত বেশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, আর ভারত থেকে সোনা রুপো কেবলই ইংলণ্ডে চালান হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম যুগের কংগ্রেস কী রকম নরমপন্থী ছিল বলতে গিয়ে আমি তার নিন্দা করছি বা তাকে ছোটো করে দেখাতে চাইছি, এমন কথা মনে করো না। সেরকম উদ্দেশ্য আমার নেই, কারণ, আমি বিশ্বাস করি, তখনকার দিনেও কংগ্রেস ও তার নেতারা বিরাট কার্য সাধন করছিলেন। ভারতের রাজনীতির কঠিন সত্যের আঘাতে আঘাতে প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেই, কংগ্রেস ক্রমে অধিকতর চরমপন্থী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই প্রথম যুগে তার পক্ষে সে যা ছিল তার চেয়ে বেশি কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তখনকার দিনে এর নেতাদের পক্ষে এগিয়ে যেতে বেশ সাহসের প্রয়োজন হত। আজ দেশের জনসাধারণ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, স্বাধীনতার কথা বলছি বলে আমাদের প্রশংসা করছে—এখন বুক ফুলিয়ে স্বাধীনতার কথা বলা খুবই সোজা। কিন্তু প্রকাণ্ড একটা কাজের প্রথম গোড়াপত্তন করা একটা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাইতে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। প্রথমবারের সভাপতি ছিলেন বাঙলাদেশের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রথম যুগের অন্যান্য বড়ো বড়ো নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন তায়েবজি, ফিরোজ শাহ্ মেটা। কিন্তু সকলের উপরে মাথা তুলে আছে একটি নাম—দাদাভাই নৌরজি। ইনি হয়ে গিয়েছিলেন 'ভারতের বুড়ো দাদামশাই', ভারতের চরম লক্ষ্য 'স্বরাজ' কথাটিও ইনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। আর একটি নাম আমি তোমাকে বলব, কংগ্রেসের পুরোনো দলের একমাত্র তিনিই আজও বেঁচে আছেন; তুমি বেশ ভালো করেই চেন তাঁকে। তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে তিনি ভারতের জন্যে সংগ্রাম করে এসেছেন; এখন জরায় ও চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন, তবু এখনও তাঁর যৌবনে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে তিনি কাজ করে চলেছেন।

এমনি করে বছরের পর বছর কংগ্রেস কাজ করে চলল, তার শক্তিও ক্রমে বাড়তে লাগল। আগের দিনের হিন্দু-জাতীয়তাবাদের মতো এর দৃষ্টি সংকীর্ণ ছিল না। কিন্তু তবুও এটা প্রধানত ছিল হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। দু-চারজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান এতে যোগ দিয়েছিলেন, এর সভাপতিও হয়েছিলেন; কিন্তু মোটের উপর মুসলমানরা এর থেকে দূরেই সরে থাকল। এই সময়কার একজন বড়ো মুসলমান নেতা ছিলেন সার সৈয়দ আহ্মদ খাঁ। তিনি দেখলেন, শিক্ষার বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষার অভাবে মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে, পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। তিনি স্থির করলেন তিনি তাদের বোঝাবেন, যেন রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাতে যাবার আগে তারা শিক্ষা নিয়ে নেয়, যেন শিক্ষালাভের দিকেই সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দেয়। মুসলমানদের তিনি কংগ্রেস থেকে দূরে সরে থাকতে উপদেশ দিলেন, এবং সরকারের সঙ্গে একত্র হয়ে আলিগড়ে চমৎকার একটি কলেজ স্থাপন করলেন। এই কলেজ পরে বড়ো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সার সৈয়দের উপদেশ মেনে নিলেন, কংগ্রেসে যোগ দিলেন না। কিন্তু অল্প কয়েকজন মুসলমান বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে গেলেন। মনে রেখো, অধিকাংশ বা অল্পসংখ্যক বলতে আমি বোঝাচ্ছি—উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত এবং ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ বা অল্পসংখ্যক। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সাধারণ জনতা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না, তখনকার দিনে তাদের কেউ বড়ো-একটা কংগ্রেসের নামও জানত না। নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরেও তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের কোনো প্রভাব পড়ে নি।

কংগ্রেস বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। তার চেয়েও তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল স্বদেশী-মতামত আর স্বাধীনতার কামনা। কংগ্রেস শুধু ইংরেজি-জানা লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং তার কথাও ছিল স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। এর ফলেই কিন্তু বিভিন্ন পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে এসে একত্র হওয়া এবং সকলে মিলে একটা সর্বগ্রাহ্য মতামত স্থির করে নেওয়া কতকটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ প্রজার যেখানে জীবনযাত্রা তত গভীরে এর দৃষ্টি পেঁছিয় নি, কাজেই এর শক্তিও তেমন ছিল না। এই সময়ে একটি ঘটনাতে সমস্ত এশিয়া জুড়ে মস্ত সাড়া পড়ে যায়। এর কথা তোমাকে আর-একটি চিঠিতে বলেছি। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে বিপুলাকৃতি রাশিয়ার উপরে ক্ষুদ্রায়তন জাপানের জয়লাভ। এই জয় দেখে এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশের মতো ভারতবর্ষও একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ, ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তাঁদের আত্মপ্রত্যয়ও বেড়ে উঠল। ইউরোপের অত্যন্ত শক্তিশালী দেশগুলির একটিকে যদি জাপান যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারে, ভারতবর্ষই বা পারবে না কেন? বহুকাল ধরে ভারতবাসীরা ইংরেজদের নামেই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থেকেছে। ব্রিটিশের দীর্ঘকালব্যাপী শাসন, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের পরে তাদের হিংস্র উৎপীড়ন, এর ফলে ভারতবাসীরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। একটা অস্ত্র-আইন বানানো হয়েছিল, তার ফলে ভারতবাসীরা কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারত না। ভারতবর্ষে যা-কিছু ঘটছে সমস্তর মধ্য দিয়েই তাদের কেবলই মনে করিয়ে দেওয়া হত, তোমরা অধীন জাতি, হীনতর জাতি। যে শিক্ষা তাদের দেওয়া হত তাতে পর্যন্ত এই ধারণাই তাদের

মধ্যে ঢ়ুকিয়ে দেওয়া হত, তোমরা ছোটো। দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করে, মিথ্যে করে তাদের পড়ানো হত; পড়ে তারা শিখত, ভারতবর্ষ চিরকালই অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলার দেশ, হিন্দু আর মুসলমান চিরকাল এ-ওর গলা-কাটাকাটিই করেছে: শেষ কালে ব্রিটিশরাই এসে এই দেশকে সে দুরবস্থা থেকে রক্ষা করেছে, দেশে শান্তি আর সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছে। বস্তুত, সমস্ত এশিয়াটাই একটা অত্যন্ত অসভ্য মহাদেশ, এবং একে ইউরোপের অধীনস্থ হয়েই চিরদিন থাকতে হবে, এই কথা তখনকার ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত এবং জোর গলায় প্রচার করত। প্রকৃত সত্য বা ইতিহাস নিয়ে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

অতএব জাপানিদের এই জয়ে এশিয়ার মনে নূতন করে ভরসা জাগল। ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই জানত, তারা হীনজাতি; সে ভাবটাও কমে গেল। জাতীয়তাবাদ আরও বেশি বিস্তারলাভ করল, বিশেষ করে বাঙলাদেশে ও মহারাষ্ট্রে। ঠিক এই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল, যার ফলে বাঙলাদেশের একেবারে মর্মস্থলে আঘাত লাগল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই একটা বিক্ষোভ জেগে উঠল। বাঙলাদেশ-নামক বৃহৎ প্রাদেশটিকে (তখন বিহারও এর অন্তর্গত ছিল) ব্রিটিশ সরকার ভেঙে দুটি অংশে বিভক্ত করে দিলেন; এর একটির নাম হল পূর্ববঙ্গ। বাঙলাদেশে বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বেড়ে উঠছিল। তাঁরা এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন; তাঁদের সন্দেহ হল, এইভাবে বিভক্ত করে তাঁদের দুর্বল করে ফেলাই হচ্ছে ব্রিটিশের উদ্দেশ্য। পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীরা অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং, এই বিভাগের ফলে একটা হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও মাথা তুলে দাঁড়াল। বাঙলাদেশে প্রচণ্ড একটা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশ ভূস্বামী এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, ভারতীয় ধনিকরাও যোগ দিলেন। সেই প্রথম 'স্বদেশী'র বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল; তার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি পণ্য বর্জন। এর ফলে স্বভাবতই ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়ে গেল। এই আন্দোলন কিছু পরিমাণ জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। এর খানিকটা প্রেরণা এসেছিল হিন্দুধর্ম থেকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে একটা হিংসাত্মক বিপ্লবী দলও গড়ে উঠল; ভারতের রাজনীতিতে বোমার সেই প্রথম আবির্ভাব। বাঙলাদেশের আন্দোলনের একজন খুব বড়ো নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তিনি এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু বহু বৎসর ধরে তিনি ফরাসি-ভারতের পণ্ডিচেরিতে নিভৃত জীবন যাপন করছেন।

পশ্চিম-ভারতে মহারাষ্ট্রদেশেও এই সময়ে একটা বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, একটা উগ্র জাতীয়তাবাদ আবার জেগে উঠছিল। এরও মধ্যে ছিল হিন্দুয়ানির গন্ধ। এখানে একজন বড়ো নেতার আবির্ভাব হল—বাল গঙ্গাধর তিলক। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি 'লোকমান্য', অর্থাৎ, 'সমস্ত লোকের সম্মানের পাত্র' বলে পরিচিত ছিলেন। তিলক খুব বড়ো পণ্ডিত ছিলেন; প্রাচ্যের প্রাচীন রীতিনীতি এবং পাশ্চাত্যজগতের নবীন রীতিনীতি দুটোই তিনি সমান জানতেন। খুব বড়ো রাজনীতিকও ছিলেন তিনি; কিন্তু সকলের উপরে তিনি ছিলেন একজন অতি বড়ো জননেতা। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এতদিন শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছেই তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতেন, সাধারণ প্রজা তাঁদের প্রায় চিনত না। তিলকই নবীন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নেতা, যিনি দেশের জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে তাঁর বাণী প্রচার করলেন, তাদের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যে-ভরা ব্যক্তিত্ব দেশ জুড়ে একটা নূতন শক্তি আর অদম্য সাহসের জোয়ার এনে দিল; এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল বাঙলাদেশের নবীন জাতীয়তার চেতনা আর আত্মোৎসর্গ—দুয়ে মিলে ভারতীয় রাজনীতির চেহারাই একেবারে বদলে দিল।

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই-যে দেশ জুড়ে সাড়া জাগল, কংগ্রেস সে সময়ে কী করছিল? জাতীয় চেতনার সেই জাগরণের মুহূর্তে কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারলেন না, পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের অভ্যাস ছিল বেশ-একটা শান্তশিষ্ট রকমের রাজনীতি, জনসাধারণ তার মধ্যে এসে যেন গোল না পাকায়। বাঙলাদেশে যে উদ্দীপনার শিখা জ্বলে উঠেছিল সেটা তাঁদের ঠিক পছন্দ হল না; মহারাষ্ট্রের যে অদম্য চেতনা তিলককে আশ্রয় করে জেগে উঠছিল তাকে দেখেও তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। স্বদেশীকে তাঁরা

ভালো বলতেন, কিন্তু বিলাতি পণ্য বর্জনের নামে দ্বিধাবোধ করতেন। কংগ্রেসের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। এক দলে থাকলেন চরমপন্থীরা, এ'দের নেতা হলেন তিলক এবং কয়েকজন বাঙালী নেতা; অন্য দলে রইলেন নরমপন্থীরা, এ'দের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের পুরোনো নেতারা। নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন একজন তরুণ যুবক, তাঁর নাম গোপাল কৃষ্ণ গোখলে; অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি, সমস্ত জীবনটাই ইনি কাজের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। গোখলেরও বাড়ি ছিল মহারাষ্ট্রে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল থেকে তিলক আর গোখলে পরস্পরের মুখো-মুখী হয়ে দাঁড়ালেন; এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল কংগ্রেসের ভাঙন; ১৯০৭ সনে কংগ্রেস দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। নরমপন্থীরাই কংগ্রেসের কর্ণধার হয়ে রইলেন, চরমপন্থীরা তাড়া খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। নরমপন্থীরা যুদ্ধে জিতলেন, কিন্তু তার ফলে দেশের মধ্যে তাঁদের প্রতিপত্তি হারাতে হল; কারণ, দেশের জনসাধারণের কাছে তিলকের দলই ছিল অনেক বেশী প্রিয়। কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ল, কয়েক বছর পর্যন্ত দেশের উপরে তার প্রায় কোনো প্রভাবই রইল না।

আর সরকার কী করছিলেন এই ক'বছর ধরে? ভারতীয় জাতীয়তার এই জাগরণকে তাঁরা কীভাবে গ্রহণ করলেন? নিজে যেটা পছন্দ করেন না এমন যুক্তি বা দাবির জবাব দিতে সমস্ত সরকারই একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করেন—ডাণ্ডার গুঁতো। এখানেও সরকার জোর অত্যাচার চালালেন—লোককে ধরে ধরে জেলে দিলেন, ছাপাখানার সম্বন্ধে আইন বানিয়ে সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করলেন, যাঁদের তাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদেরই পিছনে ঝাঁকে ঝাঁকে গুপ্ত পুলিশকর্মচারী আর গুপ্তচর লেলিয়ে দিলেন। সেই কাল থেকে আজও পর্যন্ত ভারতের সি. আই. ডি'র লোকেরা সমস্ত প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতার নিত্য সহচর হয়ে রয়েছে। বাঙলাদেশের নেতাদের অনেককেই জেলে দেওয়া হল। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মামলা হল—লোকমান্য তিলকের বিচার। তাঁকে ছ'বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মান্দালয় জেলে বসে বসে তিনি একটি বিখ্যাত বই রচনা করেন। লালা লাজপত রায়কেও ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করা হল।

অত্যাচার করে কিন্তু বাঙলাদেশকে দমানো গেল না। কাজেই তখন অন্তত কতক লোককে শান্ত করবার জন্যে তাড়াহুড়ো করে শাসনপদ্ধতির খানিকটা সংস্কারের ব্যবস্থা খাড়া করা হল। সরকারের নীতি তখন যা ছিল পরেও তাই, এখনও তাইই রয়েছে—জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা ভাঙন ধরিয়ে দেওয়া। স্থির হল, নরমপন্থীদের 'হাত' করে নিতে হবে আর চরমপন্থীদের পিষে মারতে হবে। ১৯০৮ সনে এই নূতন শাসনসংস্কার ঘোষণা করা হল, এর নাম—মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার। নরমপন্থীরা এই সংস্কার পেয়ে খুশিই হলেন এবং হাত হয়ে গেলেন। চরম-পন্থীদের নেতারা তখন জেলে, চরমপন্থীরা তাই নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন; জাতীয় আন্দোলনেরও জোর কমে গেল। বাঙলাদেশে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সমানভাবেই চলতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হল। ১৯১১ সনে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-বিচ্ছেদ রহিত করে দিলেন। এই জয়লাভের ফলে বাঙালির প্রাণে নূতন উদ্যম জাগল। কিন্তু ১৯০৭ সনের আন্দোলনের গতিবেগ তখন থেমে গেছে; ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা আবার নিষ্ক্রিয়তার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

১৯১১ সনেই আরও একটি ঘোষণা প্রচার করা হল, ভারতের নূতন রাজধানী হবে দিল্লি—সেই দিল্লি, যেখানে কত কত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, আবার কত সাম্রাজ্য ভেঙে ধুলায় মিশে গেছে।

১৯১৪ সনে এই ছিল ভারতবর্ষের অবস্থা। ১৯১৪ সনে ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল, এবং এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্যেও অতিবৃহৎ পরিবর্তন ঘটে গেল, কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি পরে বলব।

এতক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের কাহিনী বলা আমার শেষ হল। আজ থেকে আঠারো বছর পূর্বের দিন পর্যন্ত আমি তোমাকে এনে পৌঁছে দিলাম। এবার আমাদের ভারত ছেড়ে একটু বাইরে যেতে হবে। এর পরের চিঠিতে আমরা চীনে চলে যাব, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আর-একটা চেহারা দেখতে পাব সেখানে।

১১৪

চীনে ব্রিটেনের আফিম-বিক্রয়

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

শিল্প এবং যন্ত্র -বিপ্লবের ফলাফল ভারতের উপরে কীরকম হল এবং নূতন সাম্রাজ্যবাদ ভারতে কী রূপ ধারণ করল তার বিস্তৃত বর্ণনা আমি তোমাকে দিয়েছি। ভারতবাসী হিসাবে আমিও একটা বিশেষ পক্ষের লোক; সে পক্ষের দিকে না টেনে কথা বলা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু, তবুও আমি বৈজ্ঞানিকের নির্বিকার বিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়েই এই সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি, এর বিশেষ একটি পক্ষের সমর্থনে অবতীর্ণ জাতীয়তাবাদীর ভঙ্গি নিয়ে কথা বলি নি। আমার ইচ্ছে, তুমিও ঠিক সেইভাবেই একে দেখতে চেষ্টা করো। জাতীয়তার চেতনা বস্তু হিসাবে ভালো, কিন্তু বন্ধু হিসাবে সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং ঐতিহাসিক হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই চেতনার ফলে অনেক ঘটনা আমাদের চোখে পড়তে চায় না, অনেক সময় সত্য যা তা বিকৃত হয়ে দেখা দেয়—বিশেষ করে যেখানে আমাদের নিজেদের নিয়ে বা আমাদের দেশকে নিয়ে কথা। কাজেই ভারতবর্ষের আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমাদের দুঃখদুর্দশার সমস্তখানি অপরাধই ব্রিটিশদের ঘাড়ে এক কথায় চাপিয়ে না দিই।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শিল্পপতি আর ধনিকরা ভারতবর্ষকে কীভাবে শোষণ করছিল তা আমরা দেখলাম। এবার আলোচনা করব এশিয়াতে আর-একটি যে বৃহৎ দেশ আছে তার কথা; ভারতবর্ষের সে পুরোনোকালের বন্ধু, সমস্ত জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন জাতি—চীন। এখানে পাশ্চাত্য জাতিরা আর-একটা নূতন কায়দায় শোষণ চালাচ্ছিল। ভারতবর্ষের মতো চীন কোনো ইউরোপীয় দেশের উপনিবেশ বা অধীন হয়ে যায় নি। সমস্ত দেশটাকে একত্র বেঁধে রাখতে পারে এমন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল চীনে; তার ফলে এবং বিদেশী আগন্তুকদের সঙ্গে কিছু-পরিমাণ লড়াই করে সে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বিদেশীর অধীনতাকে এড়িয়ে চলতে পেরেছিল। এর এক শো বছরেরও বেশি আগে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল, সে আমরা আগেই দেখেছি। উনবিংশ শতাব্দীতে চীনও দুর্বল হয়ে পড়ল, তবু সে শেষ পর্যন্ত অখণ্ডতা বজায় রেখে চলল, ও দিকে বিদেশী জাতি যারা তাকে হাত করতে চাইছিল তাদের মধ্যে ছিল পরস্পর-রেষারেষি, ফলে তাদের কোনো-একজনই চীনের দুর্বলতাটাকে পুরোপুরি নিজের কাজে লাগিয়ে নিতে পারল না।

চীন সম্বন্ধে শেষ যে চিঠি তোমাকে লিখেছি (৯৪), তাতে, ব্রিটিশরা চীনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য বাড়াবার যে চেষ্টা করছিল তার কথা বলেছি। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের চিঠির উত্তরে মাঞ্চু-সম্রাট চিয়েন লুঙ অত্যন্ত ভারিক্কি মুরুব্বিয়ানা চালে যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকেও অনেকখানি আমি সে চিঠিতে উদ্ধৃত করে দিয়েছিলাম। এটা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের কথা। তারিখটা শুনেই নিশ্চয় তোমার মনে পড়বে, এই সময়ে ইউরোপে প্রচণ্ড একটা ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছিল—এটা হচ্ছে ফরাসিবিপ্লবের যুগ। আর তার পরেই এলেন নেপোলিয়ন, এল নেপোলিয়নের যত যুদ্ধবিগ্রহ। এই সমস্তটা সময় ধরেই ইংলণ্ডকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, নেপোলিয়নের সঙ্গে একেবারে মরিয়া হয়ে লড়াই করতে হচ্ছিল তাকে। নেপোলিয়নের পতনের পর তবেই ইংলণ্ড একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল; তার আগে পর্যন্ত চীনের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়িয়ে তোলার কোনো কথা তোলাই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর অতি অল্পদিন পরেই, ১৮১৬ সনে, চীনে আবার একটি ব্রিটিশ দৌত্য পাঠানো হল। কিন্তু সেখানে পালনীয় কায়দাকানুন নিয়ে একটু গোল বাধল। ফলে চীন-সম্রাট ব্রিটিশ দূত লর্ড আমহার্স্টের সঙ্গে দেখা করতেই রাজি হলেন না।

ব্রিটেন ও চীন
পর্বত ও
মালভূমি
পিকিঙ
তিয়েন্‌সিন
কোরিয়া
নান্‌কিঙ
সাংহাই
নিংপো
হ্যাংকাও
ক্যান্টন
আময়
হংকঙ
ফরাসি
ইন্দো
চীন
ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের
প্রধান কেন্দ্র
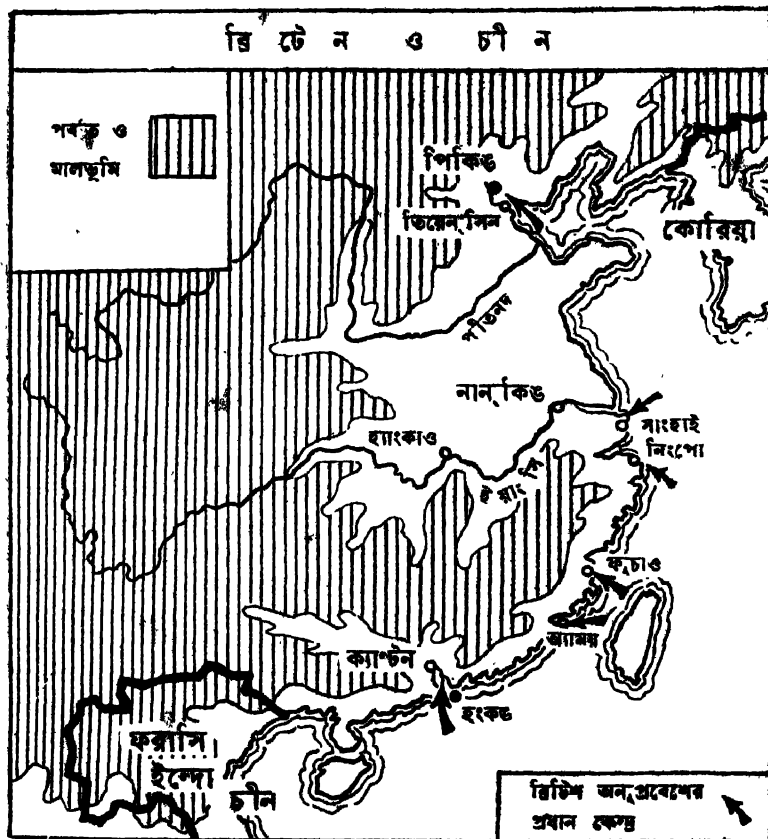
সোজা হুকুম দিলেন—ফিরে চলে যাও। যে অনুষ্ঠানটি তাঁকে করতে বলা হয়েছিল তার নাম ছিল 'কোটাউ'—এটা একরকমের ভূমিষ্ঠ-প্রণাম। তুমিও হয়তো 'কাউ-টাউ' কথাটা শুনেছ।

সুতরাং কাজ কিছুই হল না। ইতিমধ্যে নূতন একটা ব্যবসা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠছিল, সে হচ্ছে আফিমের ব্যবসা। একে ঠিক নূতন ব্যবসা বোধ হয় বলা চলে না, কারণ ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রথম আফিম আমদানি হয়েছিল বহুকাল পূর্বে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে। আগের দিনে ভারতবর্ষ থেকে বহু ভালো জিনিষই চীনে পাঠানো হয়েছে। সত্যকার মন্দ জিনিষ যে-কটি সে পাঠিয়েছিল আফিম তার মধ্যে একটি। এই ব্যবসার পরিমাণ কিন্তু বেশি ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর আয়তন বেড়ে গেল—বাড়িয়ে তুলল ইউরোপীয়রা, এবং বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি; ব্রিটিশ তরফ থেকে ব্যবসায়ের একচেটে অধিকার এদেরই ছিল। শোনা যায়, প্রাচ্য অঞ্চলের ওলন্দাজরা প্রথম এর ব্যবহার শুরু করে; তারা তামাকের সঙ্গে আফিম মিশিয়ে তার ধূমপান করত, তাতে নাকি ম্যালেরিয়া হয় না। ওলন্দাজদের মারফত আফিমের ধূমপানের অভ্যাস চীনে গিয়ে পৌঁছল; কিন্তু গেল অনেক বেশি খারাপ রূপে; চীনে লোকেরা খাঁটি আফিমেরই ধূমপান করত। এর ফলে দেশের লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছিল এবং আফিমের দরুন দেশ থেকে বহু টাকা বাইরে চলে যাচ্ছিল বলে চীনা সরকার এই অভ্যাস বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করলেন।

১৮০০ সনে চীনা সরকার বিজ্ঞপ্তি বা হুকুম জারি করলেন, কোন কারণেই দেশে আফিম আমদানি করা চলবে না। কিন্তু বিদেশীদের কাছে এটা অত্যন্ত লাভের ব্যবসা; তারা লুকিয়ে দেশে আফিম আমদানি করতে লাগল, চীনা রাজকর্মচারীদের ঘুষ খাইয়ে হাত করে নিল যাতে তারা এই চোরাই ব্যবসাকে বাধা না দেয়। চীনা সরকার তখন আইন করলেন, তাঁদের কোনো কর্মচারী কোনো বিদেশী বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। কোনো বিদেশীকে চীনা বা মাঞ্চু-ভাষা শেখানোকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে; সেজন্য অত্যন্ত গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আফিমের ব্যবসা ঠিকই চলতে লাগল; ঘুষ এবং দুর্নীতিও পুরোদমে চলল। ১৮৩৪ সনে ব্রিটিশ সরকার চীনের ব্যবসায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে একচেটে অধিকার ছিল সেটা তুলে দিয়ে সমস্ত ব্রিটিশ বণিককেই এই ব্যবসা চালাবার স্বাধীনতা দিলেন। এর ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। আফিমের চোরাই ব্যবসা হঠাৎ বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চীন-সরকার স্থির করলেন, একে বন্ধ করবার জন্যে জোর ব্যবস্থা করবেন। বেশ ভালো একটি লোককেই খুঁজে বার করা হল, তাঁর নাম লিন সে-সি। আফিমের চোরাই ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে এঁকে স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করা হল। তিনিও খুব দ্রুত এবং কড়া হাতে কাজ শুরু করলেন। দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টন ছিল এই বেআইনি ব্যবসার বড়ো আড্ডা। লিন নিজে ক্যাণ্টনে চলে গেলেন; সেখানকার সমস্ত বিদেশী বণিকদের উপর আদেশ জারি করলেন, যার হাতে যত আফিম আছে সমস্ত তাঁর হাতে জমা দিয়ে দিতে হবে। প্রথমে এরা আদেশ মানতে অস্বীকার করল। লিন জোর করে তাদের আদেশ মানিয়ে ছাড়লেন। এদের তিনি যে-যার কুঠিতে আটকে ফেললেন; এদের চীনা কর্মচারী, মজুর এবং চাকর-বাকরদের সরিয়ে নিয়ে এলেন, বাইরে থেকে এদের কাছে কোনোরকম খাদ্যদ্রব্য পৌঁছতে না পারে তার ব্যবস্থা করলেন। এই জোরালো এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে শেষ পর্যন্ত বিদেশী বণিকরা কথা শুনতে বাধ্য হল; কুড়ি হাজার বাক্স আফিম তারা চীনাদের হাতে সমর্পণ করল। চোরাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত এইসমস্ত আফিম লিন নষ্ট করে ফেললেন। বিদেশী বণিকদের তিনি জানালেন, কোনো জাহাজকেই ক্যাণ্টনে ভিড়তে দেওয়া হবে না, যদি-না তার ক্যাপ্টেন প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি আফিম আমদানি করবেন না। এই প্রতিশ্রুতি কেউ ভাঙলে চীনা সরকার সে জাহাজ এবং তার সমস্ত মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেবেন। কমিশনার লিন কাজে ত্রুটি রাখতেন না। যে কাজের ভার তাঁর উপরে দেওয়া হয়েছিল তা সুষ্ঠুভাবেই তিনি সম্পন্ন করলেন। কিন্তু জানতেন না এর ফলে চীনকে বিষম বিপদে পড়তে হবে।

ফল হল—ব্রিটেনের সঙ্গে বাধল যুদ্ধ, চীন হেরে গেল, একটা খুব অপমানকর শর্তে সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য হল; আফিম-আমদানিকে চীন সরকার বাধা দিতে চেয়েছিলেন, সেই আফিমই জোর করে তার গলায় ঠেসে দেওয়া হল। আফিম বস্তুটা চীনাদের পক্ষে ভালো ছিল কি মন্দ ছিল

সে প্রশ্ন অবান্তর; চীন-সরকার কী করতে চেয়েছিলেন সে কথারও বিশেষ মূল্য নেই; বড়ো কথা হল, চীনে আফিমের চোরাই ব্যবসাটা ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষে প্রকাণ্ড লাভের ব্যাপার; সে আয় বন্ধ হয়ে যাবে এটা সহ্য করতে ব্রিটেন রাজি নয়। কমিশনার লিন যে আফিম নষ্ট করে দেন তার অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ বণিকদের সম্পত্তি। সুতরাং তাদের জাতীয় সম্ভ্রমে আঘাত লেগেছে এই দোহাই দিয়ে ব্রিটেন ১৮৪০ সনে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। এই যুদ্ধকে বলা হয় 'আফিমের যুদ্ধ'; নামটা মিথ্যা নয়, কারণ চীনকে জোর করে আফিম কেনাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই যুদ্ধ শুরু এবং জয় করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ রণতরীর বহর ক্যান্টন এবং আরও অনেক বন্দর অবরোধ করল; চীনারা তার সঙ্গে পেরে উঠল না। দু বছর লড়াই করে শেষে সে বাধ্য হয়ে হার মানল। ১৮৪২ সনে নানকিঙে সন্ধি হল, তাতে এই শর্ত করা হল যে, চীনের পাঁচটি বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্যের অধিকার থাকবে। এখানে বাণিজ্য মানে বিশেষ করে আফিমের বাণিজ্য। এই পাঁচটি বন্দর হচ্ছে—ক্যান্টন সাংহাই অ্যাময় নিংপো এবং ফুচাও। এদের নাম দেওয়া হল 'সন্ধি-ভুক্ত বন্দর'। এ ছাড়া ক্যান্টনের নিকটবর্তী হংকঙ-দ্বীপটি ব্রিটেন দখল করে বসল, এবং যে আফিমগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল তার মূল্য বাবদ, আর সে নিজেই চীনের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধিয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা বিরাট-পরিমাণ টাকা চীনের কাছ থেকে আদায় করে নিল।

এইভাবে ব্রিটেন আফিমের রণজয় সম্পূর্ণ করল। তখন ইংলণ্ডের রানী ছিলেন ভিক্টোরিয়া; চীন-সম্রাট স্বয়ং তাঁর কাছে একটি ব্যক্তিগত আবেদনপত্র পাঠালেন; অত্যন্ত ভদ্রভাষায় বুঝিয়ে বললেন, আফিমের যে ব্যবসায় জোর করে চীনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল তার কী মারাত্মক ফল হচ্ছে। মহারানী ভিক্টোরিয়া সে চিঠির জবাবই দিলেন না। ঠিক এর পঞ্চাশ বছর আগে এই সম্রাটের পূর্বপুরুষ চিয়েন লুঙ ইংলণ্ডের রাজাকে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির ভাষা ছিল একেবারেই অন্যরকম।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির হাতে চীনের লাঞ্ছনা এই শুরু হল। তার সে নিভৃত একক জীবন আর রইল না। বিদেশী বাণিজ্যকে তার মেনে নিতে হল, আর মেনে নিতে হল খৃষ্টান মিশনারিদের অশুভাগমনকে। সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত হিসাবে এই মিশনারিরা চীনদেশে অনেক কাণ্ডই করে গেছে। এর পর থেকে চীনকে যতবার যত বিপদে পড়তে হয়েছে তার অনেক ব্যাপারেরই মূলে ছিল মিশনারিরা। এদের আচরণ প্রায়ই ছিল অভদ্র এবং অসহনীয়, অথচ চীনা আদালত এদের বিচার করতে পারত না। নূতন সন্ধিটির শর্ত ছিল, পাশ্চাত্যদেশ থেকে যে বিদেশীরা চীনে আসবে তারা চীনা আইন বা চীনা বিচারালয়ের অধীন থাকবে না; তাদের বিচার হবে তাদের নিজস্ব আদালতে। এই প্রথার নাম ছিল 'বহির্দেশীয়-সংক্রান্ত নীতি'। প্রথাটি এখনও টিঁকে রয়েছে, এর সম্বন্ধে অভিযোগেরও অন্ত নেই। মিশনারিরা যে চীনাদের খৃষ্টান বানিয়েছে তারাও এই 'বহির্দেশীয়-সংক্রান্ত নীতি'র দোহাই দিয়ে বিশেষ ব্যবহারের দাবি জানাত। এই বিশেষ ব্যবহার চাইবার অধিকার তাদের কোনো দিক দিয়েই ছিল না, কিন্তু তাতে কী যায়-আসে। তাদের পিছনে রয়েছে স্বয়ং মিশনারি প্রভু; শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জাতির মহামান্য প্রতিনিধি সে! অনেক সময় এরা এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের লোকের বিবাদ বাধিয়ে দিত। এইসব কাণ্ডের ফলে মরিয়া হয়ে গিয়ে গ্রামবাসী প্রজারা ক্ষেপে উঠত, মিশনারিকে আক্রমণ করত, কখনও-বা মেরেই ফেলত। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত এদের পৃষ্ঠরক্ষক সাম্রাজ্যবাদী সেনা; সে অপরাধের একেবারে ভয়ংকর প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়ত। ইউরোপীয় জাতিগুলোর পক্ষে চীনে তাদের যে মিশনারিরা থাকত তাদের কেউ নিহত হওয়াটা যেরকম লাভের ব্যাপার ছিল তেমন লাভ বোধ হয় আর কিছুতেই তাদের হয় নি। এইসব হত্যার প্রত্যেকটিকে উপলক্ষ করে তারা আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দাবি করত এবং আদায় করে নিত।

চীনে আজ পর্যন্ত যত বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং নিষ্ঠুর একটি বিদ্রোহেরও শুরু করেছিল একজন খৃষ্টান চীনা। এই বিদ্রোহের নাম 'তাইপিং বিদ্রোহ'; ১৮৫০ সনের কাছাকাছি সময়ে এর আরম্ভ হয়। এটি আরম্ভ করেছিল একটি অর্ধ-উন্মাদ লোক, তার নাম

হুঙ্ সিউ-চুয়ান। এই ধর্মোন্মাদ লোকটি একেবারে অদ্ভুত কাণ্ড বাধিয়ে দিল; 'পৌত্তলিকদের হত্যা করো' বলে জিগির দিয়ে সে দেশময় ঘুরে বেড়াত। এর ফলে অসংখ্য মানুষ নিহত হল। এই বিদ্রোহের ফলে চীনের অর্ধেকেরও বেশি স্থান লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, বারো বছর বা ঐরকম কালের মধ্যে এর ফলে অন্তত দু কোটি লোক মারা গিয়েছিল। এই বিশৃংখলা এবং মৃত্যু-তাণ্ডব, এর জন্যে অবশ্য খৃষ্টান মিশনারি বা বিদেশী জাতিদের দায়ী করতে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রথম দিকে বোধ হয় মিশনারিরা এর জয়-কামনা করেছিল; পরে তারাও আর হুঙকে নিজেদের লোক বলে স্বীকার করল না। চীন-সরকারের কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টান মিশনারিরাই এর মূলে রয়েছে। এই ধারণা থেকেই আমরা বুঝতে পারি, সে সময়ে এবং তার পরের যুগেও, মিশনারিদের কাজকর্মকে চীনারা কতখানি বিদ্বেষের চোখে দেখত। ধর্ম এবং কল্যাণ-কামনার দূত হয়ে মিশনারিরা এসেছে, এ কথা তারা মনে করতে পারে নি; তাদের চোখে মিশনারি ছিল সাম্রাজ্যবাদের চর। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, "প্রথমে মিশনারি, তার পরে রণতরী, তার পরে জমি দখল—চীনাদের মতে এই হচ্ছে ঘটনার পরম্পরা।" কথাটা মনে করে রাখা ভালো; কারণ চীনদেশের অশান্তি-বিগ্রহের মূল খুঁড়তে গেলে মিশনারির সাক্ষাৎ প্রায়ই মিলে যায়।

একটা ধর্মোন্মাদ পাগল যে বিদ্রোহের নেতা, সম্পূর্ণভাবে দমিত হওয়ার পূর্বেই তাতে এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল, এটা কেমন আশ্চর্য লাগে। এর সাফল্যের প্রকৃত কারণ হচ্ছে, চীনে তখন প্রাচীনকালের রীতিনীতিগুলো ভেঙে পড়ছিল। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আমি বোধ হয় তোমাকে বলেছি, চীনে তখন করের চাপ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল, অর্থনীতিক ব্যবস্থাটা বদলে যাচ্ছিল, মানুষেরও মনে অসন্তোষ জমে উঠছিল। দেশের সর্বত্র মাঞ্চু-সরকারের বিরোধী গুপ্তসমিতি গড়ে উঠছিল; দেশের বাতাসেই তখন বিপ্লবের বীজ ভেসে বেড়াচ্ছে। বিদেশীদের বাণিজ্য, আফিম ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসা—এরা অবস্থা আরও খারাপ করে তুলল। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য অবশ্য চীন প্রাচীনকাল থেকেই করেছে। কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরকম। পাশ্চাত্যদেশের বড়ো বড়ো কলের কারখানায় অতি দ্রুতবেগে রাশি রাশি মাল তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তার সমস্ত মাল সে দেশের মধ্যে কাটানো যায় না। কাজেই তাদের অন্যত্র মাল বেচবার বাজার খুঁজে নিতে হবে। এইজন্যেই হল ভারতবর্ষ এবং চীনের বাজার দখল করবার প্রয়োজন। এইসব মাল, বিশেষ করে আফিম আমদানি হয়ে বাণিজ্যের পুরোনো ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল, তার ফলে আর্থিক বিশৃংখলা আরও বেড়ে গেল। ভারতবর্ষের মতো চীনেও বাজারে পণ্যের বাজার-দর পৃথিবীর বাজারের তালে তালে উঠতে-পড়তে লাগল। এইসমস্তর ফলে লোকের অসন্তোষ আর দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলল, তাইপিং বিদ্রোহেরও জোর বেশি হয়ে উঠল।

পাশ্চাত্যজাতিদের ঔদ্ধত্য আর হস্তক্ষেপ ক্রমশ বেড়ে চলবার সেই যুগে এই ছিল চীনের অবস্থা। এদের সমস্ত দাবি মেনে নেবার মতো সামর্থ্য চীনের ছিল না। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চীনের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা আর বিপদ-আপদের সুযোগ নিয়ে এই ইউরোপীয় জাতিরা তার কাছ থেকে যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধা এবং জমি আদায় করে নিচ্ছিল; এর অনেক পরে জাপানও এসে এই বিদ্যা শুরু করল, সে আমরা পরে দেখব। চীনেরও হয়তো ভারতের দশাই হত, সেও খুব সম্ভব কোনো-একটি বা একাধিক পাশ্চাত্যজাতির আর জাপানের অধীন দেশ বা সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে যেত। রক্ষা পেয়ে গেল সে শুধু একটি কারণে, এই জাতিগুলোর মধ্যে পরস্পর-রেষারেষি আর বিদ্বেষের কল্যাণে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনদেশের ইতিহাসের এই পশ্চাৎপট। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙন, তাইপিং বিদ্রোহ, মিশনারির দল, বিদেশীর আক্রমণ—এদের কথা বলতে গিয়ে আমি আমার মূল বক্তব্য ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু এর খানিকটা জানা থাকা দরকার, নইলে ঘটনার ধারাটাকে ঠিক-মতো বোঝা যাবে না। ইতিহাসের ঘটনা আকস্মিক বিস্ময়ের মতো হঠাৎ ঘটে না; ঘটে তার কারণ, তার গোড়ায় অনেকগুলো কারণ একত্র হয়ে তাকে ঘটিয়ে তোলে। কিন্তু এই কারণগুলোকে সব সময়ে চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না, এরা থাকে বাইরের নানাবিধ ব্যাপারের তলায় লুকিয়ে। চীনের মাঞ্চু-সম্রাটরা এর অতি অল্পদিন আগে পর্যন্ত বিপুল পরাক্রমে রাজত্ব করে এসেছেন; হঠাৎ

যে দিন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল সে দিন তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এটা তাদের নিশ্চয়ই খেয়াল হয় নি যে, তাঁদের পতনের মূল নিহিত ছিল তাঁদেরই অতীত আচরণের মধ্যে; পাশ্চাত্যজগতে যে শিল্প-প্রগতি চলেছিল তার স্বরূপ কী, বা তার ধাক্কায় চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে কী সর্বনাশা ভাঙন দেখা দেবে, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। 'বর্বর' বিদেশীদের অভ্যাগমনকে তাঁরা অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। এদের আগমন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে এই সময়কার চীন-সম্রাট প্রাচীন চীনা ভাষায় একটি ভারি চমৎকার কথা ব্যবহার করেছিলেন; বলেছিলেন, "আমার বিছানায় আমার পাশে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আমি কাউকেই দেব না!" কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান আর রসিকতার দ্বারা গভীর আত্মপ্রত্যয় আর দুঃখে পরম সহিষ্ণুতাই লাভ করা যায়; বিদেশীর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখবার শক্তি তার নেই।

নানকিঙের সন্ধির ফলে চীনে ব্রিটেনের প্রবেশদ্বার খুলে গেল। কিন্তু তার সমস্তখানি ক্ষীর ননী একা খাওয়া ব্রিটেনের ভাগ্যে জুটল না। ফ্রান্স আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এসে জুটল; এসে তারাও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করে নিল। আপত্তি করবার শক্তি চীনের ছিল না; কিন্তু তার উপরে এইসমস্ত জোরজুলুমের জন্যে বিদেশীদের উপরে তার ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই জন্মায় নি। এই 'বর্বর'দের উপস্থিতিটাকেই সে বিষদৃষ্টিতে দেখছিল। ও দিকে সে বিদেশীরাও মোটেই তৃপ্ত হতে পারছিল না। চীনকে শোষণ করবার স্পৃহা তাদের দিন দিন বেড়ে চলল। এবারেও ব্রিটেনই অগ্রণী হল।

বিদেশীদের পক্ষে সেটা অত্যন্ত সুসময়। চীন তাইপিং বিদ্রোহ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, বিদেশীকে রোখবার তখন তার ক্ষমতাই নেই। কাজেই ব্রিটেন যুদ্ধ বাধাবার একটা ছুতো খুঁজতে লেগে গেল। ১৮৫৬ সনে ক্যান্টনের চীনা রাজপ্রতিনিধি বোম্বেটেগিরি করার অপরাধে একটা জাহাজের চীনা খালাসিদের গ্রেপ্তার করলেন। জাহাজটা চীনাদের, কোনো বিদেশীই তার সঙ্গে জড়িত নয়। কিন্তু সে জাহাজে ব্রিটিশ-পতাকা উড়ছিল, কারণ হংকঙের ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া একটি অনুমতি-পত্র তাদের কাছে ছিল; সে অনুমতি-পত্রেরও আবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে। তা হোক, রূপকথার নেকড়ে আর ভেড়ার গল্পের মতো, এই ব্যাপারটারই ছুতো ধরে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল।

ইংলণ্ড থেকে চীনে সৈন্য পাঠানো হল। ঠিক এই সময়েই আবার ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ শুরু হল, কাজেই এইসমস্ত সৈন্যকে আবার ঘুরিয়ে ভারতবর্ষে নিয়ে যাওয়া হল। ভারতের বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত চীন-যুদ্ধটাকে বাধ্য হয়েই স্থগিত রাখতে হল। এই দ্বিতীয় চীন-যুদ্ধ শুরু হল ১৮৫৮ সালে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সও এই যুদ্ধে যোগ দেবার একটু ছুতো আবিষ্কার করে বসেছে। চীনের কোথায়-এক-জায়গাতে একজন ফরাসি মিশনারিকে লোকেরা মেরে ফেলে। অতএব ইংরেজ আর ফরাসি দুজনে মিলে চীনাদের আক্রমণ করল; সে বেচারিরা তখন তাইপিং বিদ্রোহ সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আর ফরাসি সরকার আবার রাশিয়া আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকেও বুঝিয়েসুঝিয়ে নিজেদের সঙ্গে ভেড়াবার চেষ্টা করল, তারা রাজি হল না। অথচ লুটের ভাগ নেবার বেলা দেখা গেল তারা খুব রাজি! যুদ্ধ বাস্তবিকপক্ষে প্রায় হলই না; এই চারটি জাতিই চীনের সঙ্গে নূতন করে সন্ধিপত্র বানিয়ে নিল, সে সন্ধির জোরে অনেক নূতন সুযোগসুবিধাও আদায় করে নিল। আরও অনেক বন্দর বিদেশী বণিকদের জন্যে খুলে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় চীন-যুদ্ধের কাহিনী কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। এই অভিনয়ের আরও একটি অঙ্ক আছে, সেটি আরও অনেক বেশি করুণ। দুই দেশের মধ্যে যখন সন্ধি হয়, নিয়ম হচ্ছে, যারা সন্ধি করল তাদের প্রত্যেক দেশের সরকারই সে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর বা অনুমোদন করবে। স্থির হল, এদের এই নূতন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হবে পিকিঙে, এক বছর কালের মধ্যে। সময় যখন হল, রাশিয়ার দূত রাশিয়া থেকে ডাঙা-পথে সোজাসুজি পিকিঙে চলে এলেন। অন্য তিন পক্ষ এলেন সমুদ্রপথে; জানালেন, তাঁরা পিহো নদী দিয়ে জাহাজ একেবারে পিকিঙের ঘাটে নিয়ে যাবেন। ঠিক সেই সময়ে তাইপিং বিদ্রোহীরা এই শহরটি আক্রমণের উদ্যোগ করছে; তাই নদীটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। অতএব চীনা সরকার ব্রিটিশ ফরাসি আর আমেরিকার দূতদের

অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন সে নদীর পথে না এসে আরও উত্তরের একটা স্থলপথ দিয়ে আসেন। এটা কিছুমাত্র অন্যায় অনুরোধ নয়। আমেরিকার দূত রাজি হলেন। ব্রিটিশ ও ফরাসি দূত কিন্তু রাজি হলেন না; সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা সত্ত্বেও সেই নদীর পথেই জোর করে চলতে গেলেন। চীনারা তখন গুলি ছুঁড়ে তাদের বাধা দিল, খানিক মার খেয়েই তাঁরা ফিরে এলেন।

এ'রা হচ্ছেন উদ্ধত আর অতিমাত্রায় গর্বিত সরকারের প্রতিনিধি; চীনা সরকার মাত্র যাওয়ার পথটা বদলাতে অনুরোধ করেছিলেন, সেটুকুও শুনতে এ'রা চান নি; গালের উপর এত বড়ো থাপ্পড় খেয়ে এ'রা হজম করবেন কেন? প্রতিশোধ নেবার জন্যে এ'রা আরও সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। ১৮৬০ সনে এরা প্রাচীন নগরী পিকিঙ আক্রমণ করল; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল এরা নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদকে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠন এবং অগ্নিদগ্ধ করে। এই প্রাসাদটির নাম 'ইউয়েন-মিং-ইউয়েন'; এটি ছিল সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস, সম্রাট চিয়েন লুঙের রাজত্বকালে এটির নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। এই প্রাসাদে ছিল শিল্প আর সাহিত্যের দুর্লভ সমস্ত সৃষ্টি, এমন মূল্যবান সব রত্ন চীনে আর তৈরি হয় নি। প্রাচীনকালের অপূর্ব সুন্দর সব ব্রোঞ্জের মূর্তি ছিল এখানে; ছিল অপরূপ কারুকার্য-খচিত চীনামাটির বাসন, ছিল বহু দুর্লভ পুঁথির পাণ্ডুলিপি, ছিল ছবি, ছিল সর্বপ্রকার আশ্চর্য বস্তু, আর শিল্পকলার চরম সৃষ্টি—যে কলার জন্যে চীন হাজার বছর ধরে বিখ্যাত হয়ে ছিল। ইংরেজ আর ফরাসি সৈনিকেরা, মূর্খ দুর্বৃত্তের দল, এইসমস্ত অমূল্য সম্পদ লুটে নিল, নিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুন জেবলে সেগুলো পুড়িয়ে মজা দেখল; সে আগুন অনেক দিন ধরে জবলেছিল। চীনাদের পিছনে ছিল হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আর সংস্কৃতি। আশ্চর্য হবার কী আছে যদি এই গুণ্ডামি দেখে তাদের মন বেদনার্ত হয়ে উঠে থাকে, যদি তারা মনে করে থাকে এই ধ্বংসকারীরা নেহাতই অজ্ঞ বর্বরমাত্র, হত্যা আর ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই করতে জানে না এরা? হুন মোগল এবং প্রাচীনকালের আরও বহু ধ্বংসপরায়ণ বর্বরের নাম নিশ্চয়ই তাদের মনে পড়েছিল সে দিন।

কিন্তু চীনারা তাদের কী ভাবল তা নিয়ে এই বিদেশী বর্বরদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তাদের আছে রণতরী, আছে কত আধুনিক সমরোপকরণ, তারা ভয় করবে কাকে? কী তাদের যায়-আসে, শতশত বৎসর ধরে যে মহার্ঘ ও দুর্লভ রত্নরাজি আহরিত হয়েছিল তা যদি নষ্ট হয়ে গিয়েই থাকে? চীনাদের শিল্প বা সংস্কৃতির মূল্য তাদের কাছে কতটুকু?

"হোক-না সে যা হবার,
আমাদের দেখো এই
কলের কামান আছে—
ওদের তো কিছু নেই!"

১১৫

বিপন্ন চীন

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

গত চিঠিতে আমি বলেছি, কীরকম করে ১৮৬০ সনে ব্রিটিশ আর ফরাসিরা পিকিঙের অপরূপ গ্রীষ্ম-প্রাসাদটিকে ধ্বংস করেছিল। এরা বলে, চীনারা সন্ধিজ্ঞাপক নিশানের মর্যাদা রাখে নি, তাই তাদের শাস্তিস্বরূপই এটা করা হয়েছিল। হতে পারে হয়তো দু-চারজন চীনা সৈনিক সত্যিই এইরকম কোনো অন্যায় করেছে; কিন্তু তা হলেও ব্রিটিশ আর ফরাসিরা মিলে যে ইচ্ছাকৃত গুণ্ডামির নমুনা দেখিয়েছিল তা প্রায় মানুষের কল্পনার বাইরে। এ কাজ কয়েকজন অজ্ঞ সৈনিকের নয়,

এ কর্তা-ব্যক্তিদেরই কাজ। এরকম কাণ্ড ঘটে কেন? ইংরেজ ও ফরাসিরা সভ্য, সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি, অনেক দিক থেকে এরাই আধুনিক সভ্যতার অগ্রগামী। ঘরোয়া জীবনে এরা সভ্য ও বিবেচক, তবু বাইরের আচরণে এবং অন্য জাতির সঙ্গে লড়াইয়ের বেলায় এরা সমস্ত সভ্যতা ভব্যতা একেবারেই ভুলে যায়। আমার মনে হয়, পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিদের আচরণ আর পরস্পরের প্রতি জাতিদের আচরণ, এ দুয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত তফাত আছে। ছোটো শিশুদের, ছেলেমেয়েদের আমরা শেখাই অতিরিক্ত স্বার্থপর হতে নেই, অন্যের মঙ্গল চিন্তা করবে, লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে। এই কথা আমাদের শেখাবার জন্যেই আমাদের যত লেখাপড়ার আয়োজন; খানিক পরিমাণে এ আমরা শিখেও থাকি। তার পর আসে যুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেসমস্ত পুরোনো পড়া একদম ভুলে যাই, আমাদের মধ্যেকার জন্তুটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন ভদ্রজাতিরাও অবিকল পশুর মতো আচরণ শুরু করে দেয়।

এক গোত্রের দুটি জাতি, যেমন ফরাসি আর জর্মন, যখন পরস্পর লড়াই লাগায় তখনও এই ব্যাপার ঘটে। অবস্থা আরও অনেক ভয়ানক হয়ে ওঠে যখন যুদ্ধ বাধে দুটি ভিন্ন গোত্রের জাতির মধ্যে, ইউরোপীয় জাতিরা যখন এশিয়া আর আফ্রিকার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নামে। তখন দুই পক্ষের দুই জাতি পরস্পরের সম্বন্ধে কেউই কিছুমাত্র জানে না, প্রত্যেকেই থাকে অপরের কাছে না-খোলা বইয়ের শামিল হয়ে। পরস্পরকে যেখানে জানি না সেখানে সমবেদনারও স্থান নেই। প্রত্যেকেরই মনে অন্যজাতির উপরে ঘৃণা আর দ্বেষ জমে উঠতে থাকে; তার পর যখন সে দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধে, সেটা শুধু রাজনৈতিক যুদ্ধ থাকে না; হয়ে ওঠে তার চেয়েও অনেক খারাপ জিনিষ, জাতিগত যুদ্ধ। ভারতে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল, ইউরোপের প্রবল জাতিরা এশিয়া আর আফ্রিকাতে যে নিষ্ঠুরতা ও দুর্বৃত্ততার পরিচয় দিয়েছে, তার অনেকখানি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই।

এর সমস্তটাই মনে হয় বড়ো দুঃখের আর ভারি বোকামির কথা। কিন্তু যেখানেই এক দেশ অন্য দেশের উপরে, এক জাতি অন্য জাতির উপরে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপরে প্রভুত্ব করছে সেইখানেই আসবে অসন্তোষ সংঘর্ষ আর বিদ্রোহ; সেইখানেই সে শোষিত দেশ জাতি বা শ্রেণী শোষকদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চেষ্টা করবে। একের হাতে অপরের এই শোষণ, এরই উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আধুনিক কালের সমাজ। এর নাম ধনিকতন্ত্র, এবং এর থেকেই জন্ম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের।

উনবিংশ শতাব্দীতে বড়ো বড়ো কলকারখানা আর শিল্পের প্রগতির কল্যাণে পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ধনশালী ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা মনে করতে লাগল, সমস্ত পৃথিবীর তারাই প্রভু, অন্যান্য জাতিগুলো তাদের চেয়ে অনেক ছোটো, অতএব তাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে তারা খানিকটা অধীন করে ফেলেছে; তারই জোরে তারা গর্বিত হয়ে উঠল, অন্যের উপরে মুরুব্বিয়ানা করতে শুরু করল। ভুলে গেল, সভ্য মানুষ যে হবে তার কেবল প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করলেই হবে না, নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তার নিজেকেও। এইজন্যেই দেখি, এই উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রগতিবাদী জাতিগুলো অনেক দিক থেকে অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল তারাই অনেক সময়ে এমনসব আচরণ করছে যা করতে অনুন্নত অসভ্যরাও লজ্জা পায়। কেবল গত শতাব্দীতে নয়, আজকালও ইউরোপীয় জাতিগুলো এশিয়াতে এবং আফ্রিকাতে যে আচরণ করে বেড়াচ্ছে, এই থেকেই সম্ভবত তুমি তার অর্থ বুঝতে পারবে।

এ কথা মনে করো না যে, আমি আমাদের নিজেদের বা অন্য জাতিদের সঙ্গে ইউরোপীয় জাতিদের তুলনা করে তাদের ছোটো প্রমাণ করতে চাইছি। সে ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। দোষ ত্রুটি আমাদের সকলেরই আছে। আমাদেরই কতকগুলি দোষ তো একেবারে মারাত্মক; তা না হলে যতখানি অধঃপতন আমাদের হয়েছে এতখানি হয়তো হত না। এই চিঠি লিখতে লিখতেই যে প্রশ্নটি আমার মনকে জুড়ে রয়েছে সে হচ্ছে বাপুজির আসন্ন উপবাস; যাদের এখন 'হরিজন' বলা হচ্ছে আমাদের সেই দুর্গত শ্রেণীগুলোকে দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার আদায় করে দেবার জন্যে তিনি

উপবাস করবেন। মন্দিরে তারা যাক বা না যাক সে নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই নে। কিন্তু জোর করে তাদের বাইরে ঠেলে রাখবার মানেই হচ্ছে তাদের ছোটো বলে, অশুচি জীব বলে চিহ্নিত করে রাখা। সেজন্যেই এই প্রশ্নটা একটা গুরুতর প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে কোনো দুর্গত বা শোষিত শ্রেণী থাকবে না এরকম চরম ব্যবস্থা যত দিন আমরা সম্পূর্ণ করতে না পারছি ততদিন অন্যেরা যদি আমাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করেই তা নিয়েও নালিশ করবার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

এবার আবার চীনে ফিরে যাওয়া যাক। গ্রীষ্ম-প্রাসাদ ধ্বংস করে ব্রিটিশ আর ফরাসিরা খুব-একটা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরে তারা জোর করে চীনকে, পুরোনো সন্ধির শর্তগুলোকে নূতন করে ঝালিয়ে দিতে বাধ্য করল, করে তার কাছ থেকে আবার কিছু সুযোগসুবিধা আদায় করে নিল। এই সন্ধি অনুসারে চীন-সরকার সাংহাইতে চীনের বাণিজ্য-শুল্ক বিভাগটিকে নূতন করে গড়ে নিলেন, এর কর্তা হল বিদেশী কর্মচারীরা। এই বিভাগটির নাম দেওয়া হল 'রাজকীয় নৌবাণিজ্য-শুল্ক-বিভাগ'।

তাইপিং বিদ্রোহের ফলেই চীন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং বিদেশীরা তাকে ঘায়েল করবার সুযোগ পাচ্ছিল; সে বিদ্রোহ তখনও শেষ হয় নি। শেষে ১৮৬৪ সনে একজন চীনা শাসনকর্তা একে একেবারে দমন করে দিলেন। এঁর নাম ছিল লি হুঙ চ্যাঙ; পরে ইনি চীনের একজন প্রধান রাজনীতিক হয়ে উঠেছিলেন।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স ভয় দেখিয়ে চীনের কাছ থেকে নানারকম সুযোগসুবিধা ও অধিকার আদায় করে নিচ্ছিল; ও দিকে উত্তর-চীনে রাশিয়া বেশ ভালো কাজ গুছিয়ে নিল অনেক বেশি সহজ উপায়ে। এর মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে রাশিয়া কনস্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ দখল করবার লোভে ইউরোপীয় তুর্কি দেশ আক্রমণ করে বসেছিল। রাশিয়ার শক্তি বেড়ে যাচ্ছে এই ভয়ে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স ছুটে এসে তুর্কির সঙ্গে যোগ দিল; ফলে রাশিয়া হেরে গেল। এই যুদ্ধের নাম 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধ', এর কাল হচ্ছে ১৮৫৪-৫৬ সন। পশ্চিম দিকে বাধা পেয়ে রাশিয়া পূব দিকে ফিরে তাকাল, এখানে তার ভাগ্যে ভালো ফলই জুটল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে চীনকে বুঝিয়েসুঝিয়ে সে প্রসন্ন করে ফেলল, চীন তাকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সমুদ্রতীরের একটি প্রদেশ দিয়ে দিল। এর মধ্যে ছিল ভ্ল্যাডিভস্টক-নামক নগর ও বন্দর। রাশিয়ার এই কার্যোদ্ধার হয়েছিল একজন খুব বিচক্ষণ তরুণ সেনানীর জন্যে; তাঁর নাম মুরাভিয়েফ। এইভাবে শুধু বন্ধুত্বের জোরে রাশিয়া যে কাজ আদায় করে নিল, ইংলণ্ড আর ফ্রান্স তিনটি বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ আর উন্মত্ত ধ্বংসলীলা চালিয়েও তা আদায় করতে পারে নি।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই ছিল দেশের অবস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাঞ্চু-বংশের বিরাট চীন-সাম্রাজ্য প্রায় অর্ধেক এশিয়া জুড়ে প্রবল প্রতাপে অধিষ্ঠিত ছিল; সে সাম্রাজ্য তখন হীনবল, অবমানিত হয়ে পড়েছে। সুদূর ইউরোপ থেকে পাশ্চাত্যজাতিরা এসে চীনাদের পরাজিত লাঞ্ছিত করেছে; দেশের মধ্যে একটা বিষম বিদ্রোহ সাম্রাজ্যটাকেই প্রায় ভেঙে ফেলবার উপক্রম করে তুলেছিল। এইসমস্ত কাণ্ডের ফলে চীন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। বোঝা গেল, কোথাও একটা বড়ো গোল বেধেছে। নূতনতর পরিস্থিতি আর বিদেশীর আক্রমণকে যাতে সামলানো যায় এমনভাবে দেশটাকে নূতন করে গড়ে নেবার কিছু চেষ্টাও করা হল। এক হিসেবে এই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দটাকে প্রায় একটা নূতন যুগের আরম্ভকাল বলে ধরা যায়; কারণ, সেই প্রথম চীন বিদেশীর আক্রমণকে রোখবার জন্যে তৈরি হল। এই সময়ে চীনের প্রতিবেশী-দেশ জাপানেও ঠিক এই কাণ্ডই চলছিল, তাকে দেখেও চীন খানিকটা উৎসাহ পেয়ে গেল। চীনের চেয়ে জাপানের সাফল্য হল অনেক বেশি; তবু কিছু দিনের মতো চীনও বিদেশী জাতিদের দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল।

চীনের একজন বড়ো বন্ধু ছিলেন বার্লিঙ্গেম-নামক একজন আমেরিকান; এঁকে মুখপাত্র করে সন্ধিবদ্ধ জাতিদের কাছে চীনের একটি দৌত্য পাঠানো হল। তাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো শর্তও তিনি আদায় করে নিয়ে এলেন। ১৮৬৮ সনে আমেরিকার সঙ্গে চীনের একটি নূতন সন্ধি হল। এই সন্ধির মধ্যে একটা লক্ষ করবার মতো বস্তু আছে। এতে চীনা সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রীতি ও অনুগ্রহের স্বরূপ চীনা শ্রমিকদের দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। যুক্তরাষ্ট্র তখন তার পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোকে গড়ে তুলতে ব্যস্ত, যুক্তরাষ্ট্রে মজুরের অভাব হয়েছিল। কাজেই তারা চীনা মজুরদের নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এতেও আবার নূতন বিপত্তির সৃষ্টি হল। শস্তায় চীনা মজুর আমদানি করা হচ্ছে বলে আমেরিকানরা আপত্তি তুলল, ফলে দুই দেশের সরকারের মধ্যে খিটিমিটি লেগে গেল। এর কিছু দিন পরে যুক্তরাষ্ট্র-সরকার চীন থেকে লোক আসা নিষিদ্ধ করে দিলেন। এই অপমানে চীনের প্রজা অত্যন্ত চটে গেল; তারা আমেরিকার পণ্য বর্জন করল। কিন্তু এটা অতি দীর্ঘ কাহিনী, বলতে বলতে আমরা বিংশ শতাব্দীতে এসে যাচ্ছি। এ কাহিনী এখানে থাক্।

তাইপিং বিদ্রোহ ভালো করে দমিত হতে-না-হতে মাঞ্চু-সম্রাটের বিরুদ্ধে আবার একটি বিদ্রোহ শুরু হল। এর ঘটনাস্থল ঠিক চীনে নয়, বহুদূর পশ্চিমে, তুর্কিস্তানে—এশিয়ার একেবারে মধ্য-প্রদেশ সেটা। এর অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। ১৮৬৩ সনে এই মুসলমান উপজাতিরা বিদ্রোহ করে বসল, এদের নেতা ছিল ইয়াকুব বেগ নামে এক ব্যক্তি। চীনা কর্তৃপক্ষকে এরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। আমাদের পক্ষে এই স্থানীয় বিদ্রোহটি দেখবার মতো দুটো কারণে। রাশিয়া এই সুযোগে কিছু কাজ গুছিয়ে নিতে চাইল; চীনের খানিকটা স্থান সে দখল করে বসল। এটা অবশ্য ছিল ইউরোপীয়দের একটা প্রচলিত চাল। চীন যখনই কোনোরকম মুশকিলে পড়ত তখনই এরা এই কর্ম করে বসত। কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, চীন এতে রাজি হল না, এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়াকে সে জায়গাটুকু আবার উগরে দিতে হল। এটা সম্ভব হয়েছিল চীনা সেনাপতি সো-সুং-তাঙ-এর অপূর্ব অভিযানের ফলে। এই সেনাপতিটি সমস্ত কাজই করতেন অতি ধীরেসুস্থে। মধ্য-এশিয়াতে বিদ্রোহী ইয়াকুব বেগের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন। ভারি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন, বিদ্রোহীদের কাছে গিয়ে পেঁছতে তাঁর পথেই অনেক বছর লেগে গেল। এমনকি দু-দুবার তিনি পথের মধ্যে দীর্ঘকালের মতো সৈন্যদলকে থামিয়ে দিলেন, দিয়ে জমি চাষ করে শস্যের ফসল তুলে নিলেন। সৈন্যদলকে খেতে হবে তো! সৈন্যদলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করাটা সর্বত্রই একটা বড়ো সমস্যা; তাঁর কাছে এটা নিশ্চয়ই একটা অতি কঠিন সমস্যা ছিল; কারণ, পথে তাঁকে গোবি-মরুভূমি পার হয়ে যেতে হবে। সেনাপতি সো অভিনব উপায়ে সে সমস্যার সমাধান করে নিলেন। তার পর তিনি ইয়াকুব বেগকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন, বিদ্রোহও শেষ করে দিলেন। কাশগর তুরফান ইয়ারকন্দ প্রভৃতি স্থানে তিনি যে অভিযান চালিয়েছিলেন, রণনীতির দিক থেকে সেটা নাকি অপূর্ব।

মধ্য-এশিয়াতে রাশিয়ার সংগে বোঝাপড়াটা বেশ ভালোই হল। কিন্তু এর অল্পদিন পরেই আবার চীন-সরকারকে নূতন হাঙগামায় পড়তে হল। বিরাট সাম্রাজ্য, অথচ তার বন্ধন তখন শিথিল হয়ে আসছে। এবার বিপত্তি উঠল সে সাম্রাজ্যের আর-এক দিকে—আনামে। আনাম ছিল চীনের অধীন সামন্ত-রাজ্য। ফরাসিরা এর দিকে হাত বাড়াল, অতএব লাগল চীনে আর ফ্রান্সে যুদ্ধ। এবারও চীন সবাইকে অবাক করে দিল; যুদ্ধে সে বেশ অনায়াসে জিতে গেল, ফরাসিদের ভয়ে মোটেই ঘাবড়ে গেল না। ১৮৮৫ সনে বেশ ভদ্র শর্তেই দুয়ের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল।

চীনের এই নবজাগ্রত শক্তির পরিচয় পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা বেশ একটু মুষড়ে পড়ল। ভাবল, ১৮৬০ সনের আগে পর্যন্ত যে দুর্বলতা চীনের ছিল, এবার বুঝি সে দুর্বলতা তার ঘুচেই যায়। দেশেও সংস্কারের কথাবার্তা উঠল; অনেকেই মনে করলেন, এত দিনে চীনের ভাগ্যে আবার মোড় ফিরল। এইজন্যেই ১৮৮৬ সালে ইংলণ্ড যখন ব্রহ্মদেশ দখল করে নিল, সংগে সংগেই চীনকে সে প্রতিশ্রুতি দিল, প্রতি দশ বছর অন্তর চীনের প্রাপ্য রাজ-কর সে চীনকে পাঠিয়ে দেবে।

বাস্তবিক পক্ষে চীনের কিন্তু মোড় ফিরতে তখনও অনেক দেরি। তখনও তার ভাগ্যে প্রচুর-পরিমাণ অসম্মান দুর্দশা আর গৃহবিবাদ তোলা রয়েছে। চীনের যেখানে বস্তুত গলদ ছিল সে শুধু তার সেনা বা নৌ-বাহিনীর দুর্বলতা নয়, তার দুর্দশার মূল কারণ ছিল অনেক বেশি গভীর। তার সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন-ব্যবস্থা তখন ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে।

আমি আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনের অবস্থা অতি খারাপ হয়েছিল; মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে তখন বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠছিল। বিদেশী বাণিজ্য আর শিল্পপ্রধান দেশগুলোর সংস্পর্শের ফলে তার অবস্থা আরও মন্দ হয়ে উঠল। ১৮৬০ সনের পর কিছুদিন যাবৎ চীনের সর্বত্র যে শক্তির পরিচয় দেখা দিয়েছিল তার তলায় সত্য প্রায় কিছুই ছিল না। এখানে সেখানে উৎসাহী রাজকর্মচারীরা ছিটেফোঁটা রকমের সমাজ-সংস্কার করছিলেন, এর মধ্যে বিশেষ করে অগ্রণী ছিলেন লি হুঙ চ্যাঙ। কিন্তু এদের সে চেষ্টা প্রকৃত সমস্যার মূল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচছিল না; যে রোগের দরুন চীন অবসন্ন হয়ে পড়েছে তাকে সারাবার সাধ্যও এর ছিল না।

এই ক'বছর ধরে চীন বাইরে যে শক্তির পরিচয় দেখিয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল, সমস্ত দেশের মাথার উপরে একজন শক্তিমান শাসকের আবির্ভাব। ইনি এক জন মহীয়সী নারী, সম্রাট-মাতা জু সি। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি শাসনভার হাতে তুলে নেন; প্রকৃত সম্রাট তাঁর পুত্র তখন একেবারেই শিশু। সাতচল্লিশ বছর-কাল ধরে তিনি দক্ষহস্তে চীনদেশ শাসন করলেন। বেছে বেছে সব যোগ্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন, তাঁর নিজের দক্ষতা ও শক্তির খানিকটা দিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত করে তুললেন। প্রধানত তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নীতির ফলেই চীন এতটা মহত্তর শক্তির খেলা সেদিন দেখিয়েছিল—এমন শক্তির পরিচয় সে বহুকাল দেয় নি।

এই সময়েই কিন্তু আবার সংকীর্ণ সমুদ্ররেখার অন্য পারে জাপান একেবারে আশ্চর্য কাণ্ড শুরু করে দিয়েছিল; এমনভাবে তার সমস্ত জীবনযাত্রাকে বদলে ফেলছিল যে, তাকে আর দেখে চেনাই যায় না। অতএব চলো এবার আমরা জাপানকে দেখতে যাই।

১১৬

জাপানের অগ্রগতি

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

জাপান সম্বন্ধে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, তার পর অনেক দিন চলে গেছে। পাঁচ মাসেরও বেশি হল আমি তোমাকে লিখেছিলাম (৮১নং চিঠি) সপ্তদশ শতাব্দীতে এই দেশটি কী অদ্ভুত ভাবে নিজেকে সকলের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। ১৬৪১ সনের পর থেকে দু শো বছরেরও বেশি কাল ধরে জাপানের লোকেরা বাইরের পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছে। এই দু শো বছরে ইউরোপে এশিয়ায় এবং আমেরিকায়, এমনকি আফ্রিকাতে পর্যন্ত বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেল। এই সময়ে যেসমস্ত আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে তার কিছু কিছু কাহিনী আমি তোমাকে বলেছি। কিন্তু এদের কোনো সংবাদই এই নিভৃতবাসী জাতিটির কানে এসে পৌঁছয় নি; জাপান যে প্রাচীন সামন্ত-প্রথার রাজত্ব, বাইরের কোনো বার্তা এসে তার বাতাসে চাঞ্চল্য জাগায় নি। তাকে দেখলে মনে হত যেন কাল আর বিবর্তনের গতি তার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে. মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর যুগটিকে যেন চিরতরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে। কালপ্রবাহ বয়ে চলে পৃথিবী জুড়ে, কিন্তু জাপানের চেহারা মোটেই যেন বদলাচ্ছে না। সেখানে তখনও সামন্ত-প্রথা টিঁকে আছে। সেখানে ভূস্বামীশ্রেণীই সমাজের প্রভু। সম্রাটের ক্ষমতা প্রায় কিছুই নেই; শাসনের ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হয়ে বসে আছে শোগানরা, বড়ো বড়ো উপজাতিগুলোর সর্দার তারা। ভারতবর্ষে যেমন ক্ষত্রিয় তেমনি জাপানেও একটা যোদ্ধার শ্রেণী ছিল, এদের নাম সামুরাই। সামন্ত-রাজারা আর সামুরাইরাই দেশ শাসন করত। অনেক সময় আবার বিভিন্ন সামন্ত বা উপজাতির মধ্যেও ঝগড়া বাধত। চাষিদের এবং অন্যসকল প্রজাদের উৎপীড়ন এবং শোষণ করবার বেলা কিন্তু এরা সবাই একজোট হয়ে থাকত।

তবুও একসময়ে জাপানে শান্তি স্থাপিত হল। দীর্ঘকাল ধরে গৃহবিবাদের ফলে দেশ একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, এমন সময় এই শান্তি-স্থাপনের ফলে সকলেই একটু স্বস্তি পেয়ে বাঁচল। বড়ো বড়ো যোদ্ধা নায়কদের—এদের নাম ছিল দাইমিও—অনেককে দমন করে ফেলা হল। গৃহবিবাদের ফলে জাপান বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে সে ক্ষতি আবার সে পূরণ করে নিতে শুরু করল। মানুষের মন আবার শিল্প ও কলা, সাহিত্য ও ধর্মের দিকে ফিরতে লাগল। খৃষ্টানধর্মের প্রতিপত্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল; বৌদ্ধধর্ম আবার জেগে উঠল। তার পরে আবার বড়ো হয়ে উঠল শিন্টো; এটা জাপানের নিজস্ব ধর্ম, এর মূলকথা—পূর্বপুরুষদের পূজা। সামাজিক আচারব্যবহার এবং নৈতিক জীবনের ব্যাপারে আদর্শ করে নেওয়া হল চীনা ঋষি কনফুসিয়সের উপদেশকে। রাজা এবং সামন্ত-নায়কদের আশ্রয়ে কলাচর্চার উন্নতি হতে লাগল। কোনো কোনো দিক দিয়ে তখনকার জাপানের অবস্থা ছিল ঠিক মধ্যযুগের ইউরোপের মতো।

কিন্তু পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখা অত সহজ নয়। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে রাখা হল, তবু জাপানের নিজের মধ্যে পরিবর্তন চলতে লাগল। অবশ্য অন্য অবস্থায় যেমন হতে পারত তার চেয়ে মন্দগতিতে। অন্যসব দেশের মতো জাপানেও সামন্ত-প্রথার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বার উপক্রম হল। প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। সমস্ত ব্যাপারের কর্তাব্যক্তি ছিলেন শোগান, তাই অসন্তোষটাও পড়ল গিয়ে তাঁরই উপর। শিন্টো পুজোর চলন বেড়ে গেছে, প্রজারা ক্রমেই বেশি করে সম্রাটের দোহাই দিতে লাগল, কারণ, তাদের ধারণা সম্রাটই হচ্ছেন সূর্যের একেবারে সাক্ষাৎ বংশধর। এইভাবে চতুর্দিকের অসন্তোষ-অশান্তির মধ্য থেকে জন্মলাভ করল একটা জাতীয়তাবোধ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙন থেকেই এর সৃষ্টি, তাই এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল দেশময় একটা বিরাট পরিবর্তন—বাইরের জগতের কাছে জাপানের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

জাপানে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বিদেশী জাতিরা বহুবার চেষ্টা করেছে, তার কোনো চেষ্টাই সফল হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল। তখন তারা পশ্চিমে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সদ্য প্রভাব বিস্তার করেছে; সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো একটা বড়ো বন্দর হয়ে উঠছে ক্রমশ। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের নূতন পত্তন হয়েছে, তার আকর্ষণ তাকে টানছে অথচ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সে যাত্রাপথ অতি দীর্ঘ। কাজেই আমেরিকা চাইল, জাপানের কোনো-একটা বন্দরে যদি একবার থেমে যাওয়া যায়—তাতে দীর্ঘ পথের মাঝখানে একবার হাঁফ ছেড়ে বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে। দরকারি জিনিসপত্রও কিছু জোগাড় করে নেওয়া যাবে। এইজন্যেই আমেরিকা জাপানের ক্ষমতা বুঝবার জন্যে বারংবার চেষ্টা করছিল।

১৮৫৩ সনে আমেরিকার একটি রণতরীর বহর জাপানে এল, নিয়ে এল আমেরিকার প্রেসিডেন্টের একটি চিঠি। জাপানিরা সেই প্রথম বাষ্পকলের জাহাজ দেখল। এর এক বছর পরে শোগান দুটি বন্দর আমেরিকানদের জন্যে খুলে দিতে রাজি হলেন। এই খবর পেয়ে ইংরেজ রুশ আর ওলন্দাজরা অল্পদিনের মধ্যেই ছুটে এল, এসে তারাও শোগানের সঙ্গে অনুরূপ ধরনের সন্ধি করে নিল। এইভাবে ২১৩ বছর পরে জাপান আবার বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল।

কিন্তু এর পরেই বিপদ বাধল। বিদেশীদের কাছে শোগান নিজেকেই সম্রাট বলে জাহির করেছিলেন। প্রজারা তাঁর উপর চটে গেল; তাঁর বিরুদ্ধে, এবং বিদেশীদের সঙ্গে তিনি যেসমস্ত সন্ধি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হল। কয়েকজন বিদেশী মারা পড়ল; সুতরাং বিদেশী জাতিরা রণতরী নিয়ে জাপানকে আক্রমণ করল। অবস্থা ক্রমেই বেশি সঙ্গিন হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে পড়ে ১৮৬৭ সনে শোগান পদত্যাগ করলেন। তোকুগাওয়া-বংশের শোগান-পদ এইভাবে শেষ হয়ে গেল; তোমার মনে থাকতে পারে, ১৬০৩ সনে ইয়েয়াসুকে দিয়ে এর আরম্ভ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, শোগান-প্রথাটা একেবারে উঠে গেল; প্রায় সাত শো বছর ধরে এই প্রথা টিঁকে ছিল।

জাপানের অগ্রগতি
রাশিয়া
সাখালিন
ভ্লাডিভস্টক
মঙ্গোলিয়া
পিকিং
পোর্ট আর্থার
কোরিয়া
নানকিং
সাংহাই
চীন
ক্যাণ্টন
ফরমোসা
চীন (১৮৯৫) ও রাশিয়ার (১৯০৫) সঙ্গে যুদ্ধের ফলে জাপানের অধিকারভুক্ত রাজ্য
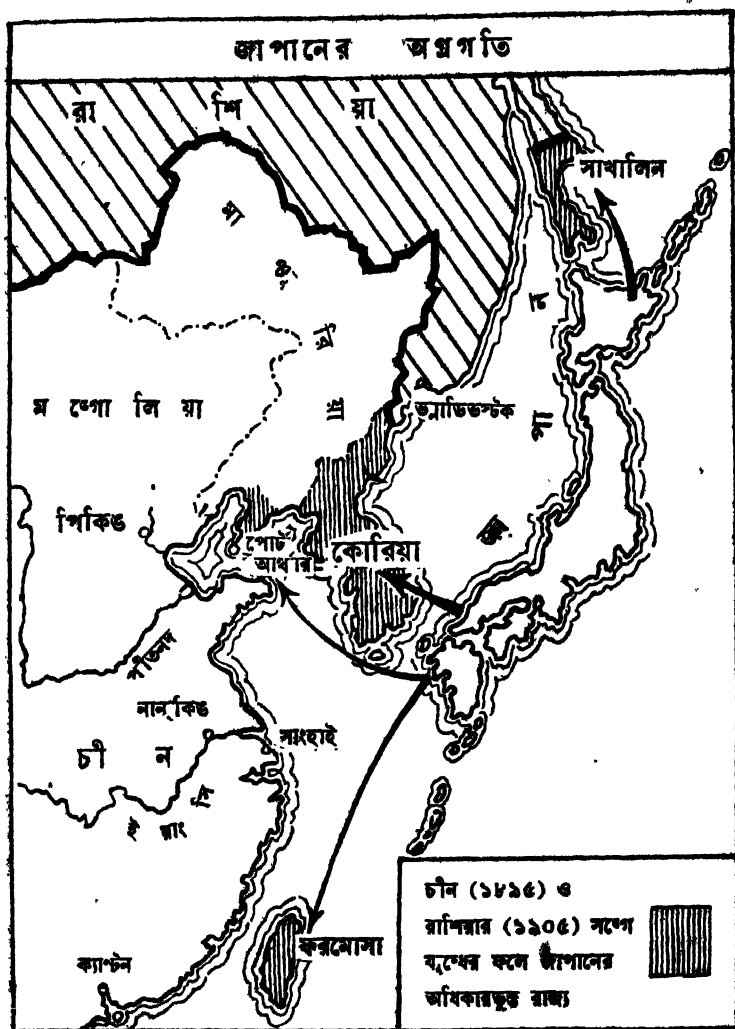
নূতন সম্রাট এবার ক্ষমতা হাতে পেলেন। ইনি ছিলেন একজন ১৪ বছর বয়সের বালক, সদ্য সিংহাসনে বসেছেন। এঁর নাম ছিল সম্রাট মুৎসিহিতো। পঁয়তাল্লিশ বছর-কাল ইনি রাজত্ব করলেন—১৮৬৭ থেকে ১৯১২ সন পর্যন্ত। এই কালটাকে বলা হয়—মেইজি বা 'আলোকিত-শাসন' যুগ। এঁর রাজত্বকালেই জাপান একেবারে হু হু করে এগিয়ে চলল, পাশ্চাত্যজাতিদের ধরনধারন অনুকরণ করে নিয়ে অনেক দিক থেকে একেবারে তাদের সমকক্ষই হয়ে উঠল। এক-পুরুষের মধ্যে এত বড়ো একটা বিরাট পরিবর্তন-সাধন রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার; ইতিহাসেও এর জুড়ি নেই। শিল্পে ব্যবসায়ে শক্তিশালী জাতি হয়ে উঠল জাপান; তার পর পাশ্চাত্যদেশগুলির দেখাদেখি সাম্রাজ্যবাদী এবং লুণ্ঠনব্রতীও হয়ে উঠল। প্রগতির সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণই তার মধ্যে দেখা গেল। শিল্পে সে তার শিক্ষকদেরও ছাড়িয়ে চলে গেল। তার লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বেড়ে চলল। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তার জাহাজ চলতে লাগল। একটি 'বৃহৎ শক্তি' বলে সে পরিচিত হয়ে গেল, আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও তার কথা সকলে মন দিয়ে শোনে। কিন্তু তবুও এই-যে এত বড়ো পরিবর্তন, জাতির হৃদয়ের গভীর তলদেশে তার মূল গিয়ে পৌঁছল না। এই পরিবর্তনগুলোকে উপর-উপর বললে ভুল হবে, তার চেয়ে এটা নিশ্চয়ই অনেক বড়ো জিনিস ছিল। কিন্তু শাসকদের মন-বুদ্ধি তখনও সেই সামন্ত-যুগেই রয়ে গেছে, আধুনিক সংস্কারকে সেই সামন্ত-যুগের খোলার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেই এঁরা চেষ্টা করছিলেন। কিছু পরিমাণে সে চেষ্টা সফলও হয়েছিল বলে মনে হয়।

জাপানে এইসমস্ত বিরাট পরিবর্তন ঘটল যাঁদের কল্যাণে তাঁরা হচ্ছেন দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের একদল দূরদর্শী ব্যক্তি। এঁদের বলা হত 'প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের দল'। বিদেশীদের তাড়াবার জন্যে যখন জাপানে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হল এবং তার শোধ নিতে বিদেশী রণতরী জাপানের উপরে কামান চালাল, জাপানিরা তখনই টের পেল, তারা কতখানি অসহায়; অপমানে লজ্জায় যেন মরে গেল তারা। তবু কিন্তু তারা কেবল ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বুক চাপড়াতে বসল না; স্থির করল, এই পরাজয় এবং গ্লানি থেকেই যেটুকু শিক্ষা হল তাকে তাদের কাজে লাগাবে। প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞেরা দেশের সংস্কার-সাধন কীভাবে হবে তার একটা কর্মসূচী খাড়া করে দিলেন; জাপানিরা প্রাণপণ করে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল।

প্রাচীন সামন্তযুগের দাইমিও-প্রথা তুলে দেওয়া হল। সম্রাটের রাজধানী কিয়োটো থেকে সরিয়ে ইয়েদোতে নিয়ে যাওয়া হল, এর নূতন নাম দেওয়া হল টোকিও। নূতন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা হল; এতে ব্যবস্থাপক সভায় দুটি পরিষৎ থাকল—নিম্ন-পরিষদের সভ্যরা হবেন নির্বাচিত, উচ্চ-পরিষদের সভ্যরা হবেন মনোনীত। শিক্ষা, আইন, শিল্প ইত্যাদি করে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই অনেক অদলবদল ঘটানো হল। বড়ো বড়ো সেনাবাহিনী এবং রণতরী-বহর গড়ে তোলা হল। বাইরের সমস্ত দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়ে আসা হল; জাপান থেকে ইউরোপ আর আমেরিকায় ছাত্র পাঠানো হতে লাগল—ভারতীয় ছাত্রদের মতো ব্যারিস্টার বা ঐরকম কিছু হবার জন্যে নয়, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প-বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে।

এইসমস্ত কাজই চালাচ্ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞরা, সম্রাটের নামে। নূতন ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি যত যাই হোক, সম্রাট কিন্তু তখনও আইনত জাপান-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হয়েই রইলেন। ও দিকে আবার এক দিকে যেমন এইসব সংস্কার ঘটিয়ে তোলা হচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা সম্রাটকে দেবতা বলে পূজা করার নীতিটাকে প্রচার করতে লাগলেন। এই দুটো অল্পদিনের জন্যেও কী করে একসঙ্গে চলতে পারে বুঝতে আমাদের ধাঁধা লাগে। অথচ জাপানে দুটি ব্যাপার বেশ পাশাপাশি চলে গেল; আজ পর্যন্তও এদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় নি। সম্রাটের প্রতি জাপানিদের একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধা আছে, এই শ্রদ্ধাটাকে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞরা দুই ভাবে কাজে লাগালেন। রক্ষণশীল এবং সামন্তপন্থী শ্রেণীগুলোকে তাঁরা জোর করেই সংস্কার-নীতি মেনে নিতে বাধ্য করলেন; এমনিতে হয়তো এরা তাঁদের বাধা দিত, কিন্তু সম্রাটের নাম-মাহাত্ম্যে এদের আর সে সাহস হল না। আবার যে অধিকতর-অগ্রণী দলগুলো আরও বেশি জোরে এগিয়ে চলতে চাইল, সমস্ত সামন্ত-প্রথাটাকেই উৎখাত করে দিতে চাইল, তাদেরও এরই জোরে তাঁরা সংযত করে রাখলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ-অর্ধেকে চীন এবং জাপানের মধ্যে যে তফাত দেখা গেল, সে অতি আশ্চর্য। জাপান অতি দ্রুতবেগে নিজেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিয়েছিল, চীনের কথা আমরা আগেই দেখেছি, পরেও আবার আরও বেশি করে দেখব—সে ক্রমেই অত্যন্ত জটিল সব সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়ছিল। এটা কেন হল? চীন প্রকাণ্ড দেশ, বিপুল তার লোকসংখ্যা, বিরাট তার আয়তন। তার এই বিরাটত্বের জন্যেই সেখানে কোনোরকম পরিবর্তন ঘটানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। বৃহৎ আয়তন, বিরাট জনতা—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এগুলো শক্তির উৎস। অথচ এর ভারেই ভারতবর্ষও বিপন্ন। হাতিকে ঠেলে চালানোই শক্ত; অবশ্য একবার যখন সে চলা শুরু করে তখন দেখা যায়, ক্ষুদ্রতর জীবের তুলনায় তার শক্তিও অনেক বেশি, গতির বেগও অনেক বেশি। চীনের সরকারও তখন খুব বেশি কেন্দ্রায়ত্ত ছিল না; অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক অঞ্চলেই অনেকখানি স্বায়ত্ত-শাসন চলিত ছিল। কাজেই জাপানের মতো এদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং বড়োরকমের কোনো পরিবর্তন সাধন করা চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতটা সহজ ছিল না। তার উপরে আবার চীনের ছিল একটা বিরাট সভ্যতা, হাজার হাজার বছর ধরে তিলে তিলে সে সভ্যতা গড়ে উঠেছে; প্রজার জীবনযাত্রার সঙ্গে সে সভ্যতার এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে, তাকে হঠাৎ বর্জন করা মোটেই সহজ নয়। এ দিক থেকেও আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের তুলনা করতে পারি। ও দিকে জাপান শুধু চীনের সভ্যতাকে ধার করে নিয়েছিল; তাকে বদলে নূতন জিনিস আমদানি করা তার পক্ষে অনেক বেশি সহজ। ইউরোপীয় জাতিগুলো সারা ক্ষণই চীনের সমস্ত ব্যাপারে এসে হস্তক্ষেপ করছিল; চীনের অসুবিধার সেটাও একটা কারণ। চীন প্রকাণ্ড দেশ, প্রায় এক মহাদেশ বললেই হয়। জাপান দ্বীপের দেশ, তারা বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ করে রাখতে পেরেছে। চীনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিমে রাশিয়া তার একেবারে গা ছুঁয়ে রয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইংলণ্ড তার গায়ে ঘেঁষে বসেছে, দক্ষিণে ফ্রান্স ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এই ইউরোপীয় জাতিগুলো চীনকে কায়দায় ফেলে তার কাছ থেকে বড়ো বড়ো সুযোগসুবিধা আদায় করে নিয়েছে, নিয়ে নিজেদের খুব বৃহৎরকমের একটা বাণিজ্য-স্বার্থ গড়ে তুলেছে। এই স্বার্থের দোহাই দিয়ে চীনের উপর হস্তক্ষেপ করবার তাদের প্রচুর সুযোগ রয়ে গিয়েছিল।

কাজেই জাপান উল্কার বেগে সামনে ছুটে চলল। ও দিকে চীন তখন অন্ধের মতো ধস্তাধস্তি করে মরছে, নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু ফল কিছুই হচ্ছে না। অথচ এর মধ্যেও একটি আশ্চর্য বস্তু দেখবার আছে। জাপান পাশ্চাত্যদেশের কলকব্জা-শিল্পকে আয়ত্ত করে নিল, আধুনিক সেনা এবং নৌবহর ইত্যাদির জোরে বেশ-একটা অগ্রণী শিল্পপ্রধান জাতি সেজে বসল। ইউরোপের নূতন চিন্তাধারাকে মতামতকে কিন্তু সে তত সহজে মেনে নিল না—ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা, জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, এগুলোকে গ্রহণ করল না। মনেপ্রাণে সে থেকে গেল সেই সামন্ত-নীতি আর স্বৈর-তন্ত্রেরই উপাসক; বাকি সমস্ত জগৎ যাকে বহুকাল পিছনে ফেলে চলে এসেছে এমন একটা অদ্ভুত রাজপূজাকে আঁকড়ে ধরে রইল জাপানিদের উন্মত্ত ও আত্মঘাতী দেশভক্তি, এই রাজভক্তিরই অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়মাত্র। জাতীয়তাবাদ এবং দেবতা-জ্ঞানে সম্রাটের পূজা, দুটো ধর্ম পাশাপাশিই চলল জাপানে। ও দিকে আবার চীন বড়ো বড়ো কলকারখানাকে শিল্প-বাণিজ্যকে অত সহজে আয়ত্ত করে নিল না, অথচ চীনারা, অন্তত আধুনিক কালের চীনারা, পাশ্চাত্যদেশের মতামত, চিন্তাধারাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আগ্রহভরে স্বীকার করে নিল। এই চিন্তাধারা আর তাদের নিজের চিন্তাধারার মধ্যে খুব বেশি তফাত ছিল না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আধুনিক চীন পাশ্চাত্য-সভ্যতার মূলতত্ত্বটিকে বেশি ভালো করে শিখে নিয়েছে; তবুও কিন্তু তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে জাপান—কারণ, সে সেই সভ্যতার বাইরের বর্মটাকে গায়ে এঁটে নিয়েছে, যদিও তার মূল-তত্ত্বের দিক দিয়েই তাকায় নি। আবার এই বর্ম পরে তার গায়ের জোর বেড়ে গিয়েছে বলেই সমস্ত ইউরোপও তারিফ করল জাপানেরই; তাকে তারা নিজেদের সমতুল্য বলেই মেনে নিল। কিন্তু চীন দুর্বল; তার কলের কামান নেই, কিচ্ছু নেই। অতএব চীনকে তারা অপমান করতে লাগল,

তার ঘাড়ে চেপে বসে থাকল, তাকে খুব বিজ্ঞের মতো উপদেশ শোনাতে লাগল, তার ধনসম্পদ শুষে নিতে লাগল; তার চিন্তাধারাকে মতামতকে মোটে আমলই দিল না।

কেবল শিল্প-ব্যবসায়ের প্রণালীতে নয়, সাম্রাজ্যবাদী উগ্র নীতিতেও জাপান ইউরোপের অনুসরণ করল। শুধু ইউরোপীয় জাতিদের মেধাবী শিষ্য হয়েই থাকল না, অনেক সময়ে বিদ্যায় গুরুদেরও ছাড়িয়ে গেল সে। জাপানের পক্ষে বড়ো বিপদ বাধাচ্ছিল তার নূতন শিল্পতন্ত্র আর পুরোনো সামন্ততন্ত্রের অসামঞ্জস্য। একসঙ্গে দুটোকেই নিয়ে চলতে গিয়ে সে কোনোমতেই তার অর্থনৈতিক জীবনে একটা সুশৃঙ্খলা আনতে পারছিল না। করের ভার অত্যধিক, তাই নিয়ে প্রজা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্যে সে একটি পুরোনো কৌশলের আশ্রয় নিল—বিদেশে যুদ্ধের আর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন দিয়ে লোকের মনকে সেই দিকে আটকে রাখতে চাইল। তখন তার নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্য বেড়ে উঠছে, এদের জন্যেও তাকে বাধ্য হয়ে কাঁচা মাল আর বাজারের সন্ধানে ছুটতে হল—ঠিক যেমন শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলন্ডকে এবং তার পরে অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশগুলিকে বাণিজ্য আর রাজ্যজয় করতে বিদেশে বেরোতে হয়েছিল। জাপানে পণ্যের উৎপাদন বাড়ল, লোকসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলল। ক্রমেই আরও বেশি বেশি খাদ্য, আরও বেশি বেশি কাঁচা মালের প্রয়োজন হতে লাগল। কোথায় সে পাওয়া যায়? সবচেয়ে কাছের দেশ আছে চীন আর কোরিয়া। চীনে বাণিজ্য করবার সুযোগ আছে, কিন্তু চীনের নিজেরই লোক-সংখ্যা অত্যধিক; কিন্তু চীন-সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মাঞ্চুরিয়াতে প্রচুর জায়গা রয়েছে, সেখানে গেলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, আর উপনিবেশ-স্থাপন বেশ চলতে পারে। অতএব জাপানের ক্ষুধিত দৃষ্টি পড়ল কোরিয়া আর মাঞ্চুরিয়ার উপরে।

চীনের কাছ থেকে পাশ্চাত্যজাতিরা সকল রকমের সুযোগসুবিধা আদায় করে নিচ্ছিল, কিছু কিছু-বা জমিও দখল করে বসবার চেষ্টা করছিল—দেখে জাপান চকিত হয়ে উঠল। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগল না তার। ঠিক তার মুখোমুখি দেশের উপরে যদি এই জাতিরা একবার পাকারকম আসন গেড়ে বসে যায় তবে হয়তো একদিন তারও অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, অন্তত মহাদেশের উপর তার প্রতিপত্তি-বিস্তারে বাধা পড়বেই। তা ছাড়া এই লুটের বাজারে বড়ো ভাগটা হস্তগত করবার ইচ্ছেও তার মনে ছিল।

বাইরের জগৎকে তার দরজা খুলে দেবার পর পুরো কুড়িটি বছরও কাটল না, জাপান চীনের উপর জুলুম চালানো শুরু করল। জন-কয়েক জেলে নৌকোডুবি হয়ে চীনাদের হাতে মারা পড়েছিল; সেই তুচ্ছ বিবাদকে উপলক্ষ্য করে জাপান চীনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসল। চীন প্রথমটা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু তার পর দেখল, জাপান যুদ্ধ বাধাবার উপক্রম করছে; ও দিকে আবার ঠিক সেই সময়টাতেই আনামে ফরাসিদের নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত; বাধ্য হয়ে সে জাপানের দাবি স্বীকার করে নিল। এটা ১৮৭৪ সনের কথা। এই জয়ে জাপান উল্লসিত হয়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন জয়যাত্রার সুযোগ খুঁজতে লেগে গেল। কোরিয়াকে মনে হল বেশ ভালো জায়গা; কী সামান্য একটু খুঁটিনাটি নিয়ে জাপান তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল, তার পরই তাকে আক্রমণ করে বসল। এর ফলে কোরিয়া বাধ্য হয়ে জাপানকে কিছু টাকা সেলামি দিল, আর তার কয়েকটা বন্দরে জাপানিদের বাণিজ্য করবার অধিকার দিয়ে দিল। পাশ্চাত্য-জাতিদের সুযোগ্য শিষ্য সে, তার প্রমাণ জাপান ভালো করেই দিচ্ছিল।

বহুকাল ধরে কোরিয়া চীনের অধীনস্থ রাজ্য হয়ে ছিল। তার আশা ছিল চীন তাকে রক্ষা করবে; কিন্তু সাহায্য দেবার ক্ষমতা চীনের ছিল না। চীন-সরকারের ভয় হল, জাপান বড়ো বেশি প্রবল হয়ে উঠবে। কোরিয়াকে তাঁরা উপদেশ দিলেন, এখনকার মতো জাপানের কথা মেনে নাও, [illegible] পাশ্চাত্যজাতিগুলোর সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করে নাও, তখন তারাই জাপানকে ঠেকিয়ে দেবে। এইভাবে ১৮৮২ সনে কোরিয়ার দরজা বাইরের জগৎকে খুলে দেওয়া হল। কিন্তু জাপান এত অল্পে তুষ্ট হবার পাত্র নয়। চীন তখন বিব্রত, সেই সুযোগ নিয়ে জাপান আবার কোরিয়ার সমস্যাটিকে খুঁচিয়ে তুলল; [illegible] বাধ্য হয়ে স্বীকার করল, কোরিয়া তাদের দুই দেশের যৌথ-কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে; অর্থাৎ, হতভাগ্য কোরিয়াদেশটি চীন আর জাপান একসঙ্গে এই

২৬

দুই দেশেরই অধীনস্থ বলে গণ্য হয়ে গেল। বেশ বোঝা যায়, এ ধরনের ব্যবস্থাতে সকল পক্ষেরই সমান অসুবিধা। এর ফলে হাঙ্গামা না বেধে পারে না। আর জাপানের তো ইচ্ছেই তাই, হাঙ্গামা বাধানো; ১৮৯৪ সনে সে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দিল।

১৮৯৪-৯৫ সনের এই চীন-জাপান যুদ্ধ জাপানের পক্ষে হল একেবারে ছিনিমিনি খেলা। জাপানের সেনা আর নৌবহর আধুনিক রীতিতে সজ্জিত; চীনের সেনা তখনও সেকেলে, অকর্মণ্য। সমস্ত ক্ষেত্রেই জাপান অনায়াসে যুদ্ধ জিতে গেল; চীনের উপরে সন্ধির এমনসব শর্ত চাপিয়ে দিল যে তার ফলে জাপানের মর্যাদা একেবারে পাশ্চাত্যজাতিদের সমান দাঁড়িয়ে গেল। কোরিয়াকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সেটা আসলে হল জাপানিকর্তৃত্বের একটা অবগুণ্ঠন মাত্র। এ ছাড়াও, মাঞ্চুরিয়াতে পোর্টআর্থার-সহ লিয়াওতুং-উপদ্বীপ এবং ফরমোজা প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দিতে চীন বাধ্য হল।

ক্ষুদ্র জাপানের হাতে চীনের এই নিদারুণ পরাজয় দেখে সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত হয়ে গেল। দূরপ্রাচ্যে নূতন একটা শক্তিমান জাতির এই অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্যজাতিরা মোটেই খুশি হল না। চীন-জাপান যুদ্ধ যখন চলছে, যখন জাপান সে যুদ্ধে জিতে চলেছে, সেই সময়েই এরা জাপানকে সতর্ক করে দিয়েছিল, খাস চীনদেশের কোনো বন্দর জাপান হস্তগত করে নিলে এরা তা সহ্য করবে না। সে সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করেই জাপান লিয়াওতুং-উপদ্বীপ আর তার সঙ্গে একটি ভালো বন্দর পোর্টআর্থার আত্মসাৎ করে নিল। কিন্তু এগুলো ভোগ করতে সে পেল না। রাশিয়া, জর্মনি ফ্রান্স, এই তিনটি বৃহৎ জাতি জেদ ধরে বসল, ও জায়গা তাকে ফেরত দিতেই হবে। জাপানকেও সেটা ফেরত দিতেই হল, তার ক্ষোভ এবং রাগের আর অবধি রইল না। কী করবে, এই তিনজনের সঙ্গে একা ঝগড়া করবার মতো শক্তি তার ছিল না।

কিন্তু এই অপমান জাপান ভুলল না। তার মনের মধ্যে স্মৃতির আগুন জ্বলে রইল, তার জ্বালায় সে আরও বড়োরকমের একটা লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। সে লড়াই এল ন বছর পরে, রাশিয়ার সঙ্গে।

চীনের বিরুদ্ধে জয়-লাভের ফলে ইতিমধ্যেই জাপান দূরপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি বলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। চীনেরও সমস্তখানি দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; পাশ্চাত্য-জাতিরা তাকে যেটুকু ভয় করে চলছিল সে ভয়ও গেছে ভেঙে। মৃত বা মুমূর্ষু দেহের উপর যেভাবে শকুনি পড়ে ঠিক তেমনি করেই তারা এসে চীনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, চীনের দেহ থেকে যে যতখানি পারে ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করল। ফ্রান্স রাশিয়া ইংলন্ড জর্মনি সবাই মিলে চীনের উপকূলস্থিত বন্দর আর চীনে ব্যবসার সুযোগসুবিধা নিয়ে একেবারে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিল। নানা রকমের অধিকার আদায় করবার জন্যে যে মারামারি তারা শুরু করল তা যেমন অন্যায় তেমনি কুৎসিত। প্রত্যেকটা অতি সামান্য খুঁটিনাটি কথার ছুতো ধরে এরা আরও খানিকটা করে সুবিধা বা অধিকার আদায় করে নিতে লাগল। দুজন মিশনারিকে চীনারা মেরে ফেলেছিল এই অজুহাতে জর্মনি জোর করে পূর্ব-চীনে শানতুং-উপদ্বীপের কিয়াওচাও-বন্দর দখল করে নিল। জর্মনি কিয়াওচাও নিয়েছে, অতএব অন্যেরাও তাদের ভাগ আদায় করে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। রাশিয়া পোর্টআর্থার দখল করে বসল—ঠিক তিন বছর আগে সে নিজেই জাপানকে এই বন্দরটি নিতে দেয় নি। রাশিয়া পোর্টআর্থার নিয়েছে; অতএব ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে ইংলন্ড নিল ওয়েই-হাই-ওয়েই। ফ্রান্সও আনামের একটা বন্দর আর খানিকটা জায়গা দখল করে নিল। এর উপরে আবার রাশিয়া উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে একটা রেলপথ তৈরি করবার অনুমতি আদায় করল—এটা হল ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের একটা নূতন শাখা।

এই নির্লজ্জ ছেঁড়াছিঁড়ি কাড়াকাড়ি—এ এক অপূর্ব ব্যাপার! নিজের জমি আর অধিকার এইরকম করে ছেড়ে দিতে হচ্ছে, চীনের অবশ্যই সেটা খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তবু প্রতি বারেই তাকে রাজি হতে হচ্ছিল, কারণ, অন্য পক্ষ বিপুল নৌবহর নিয়ে আসছে, কামান চালাবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। এই লজ্জাকর আচরণের কী নাম দেব [illegible]? ডাকাতি? রাহাজানি? এইই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ। কখনও এটা একটু গোপনে কাজ [illegible] নেয়; কখনও-বা প্রবল ধর্মনিষ্ঠার

আবরণ বা পরোপকারের ছদ্মভান দিয়ে তার দুষ্কর্মকে একটুখানি ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখে। কিন্তু ১৮৯৮ সনে চীনে যা করা হল তার উপরে কোনো আবরণ বা ঢাকা ছিল না। সেখানে একেবারে নগ্ন বস্তুটাই তার সমস্তখানি কদর্যতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

১১৭

জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

দূর-প্রাচ্যের কথা তোমাকে বলছিলাম, আজকের চিঠিতেও সেই কাহিনীই বলব। তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ, অতীত কালের সব যুদ্ধ আর বিরোধের গল্প শুনিয়ে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করছি কেন। সুশ্রাব্য গল্প এগুলো নয়; এরা ঘটেও গেছে বহুদিন আগে। এদের খুব বেশি বড়ো করে দেখাতে আমিও চাই নে। কিন্তু আজকের দিনে দূর-প্রাচ্যে যেসব কাণ্ড ঘটছে, তার অনেকখানিরই মূলে রয়েছে পুরোনো কালের এইসব হাঙ্গামা। কাজেই আধুনিক কালের সমস্যা-গুলোকে বোঝবার জন্যেই সেগুলোর সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার হচ্ছে। চীনের পরিস্থিতি ভারতের মতোই বর্তমান জগতের গুরুতর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এই চিঠি আমি যখন বসে লিখছি, ঠিক এই মুহূর্তেই জাপানিদের মাঞ্চুরিয়া-জয় নিয়ে একটা বিশ্রী কলহ চলেছে।

আগের চিঠিতে বলেছি, ১৮৯৮ সনে চীনে নানারকম অধিকার নিয়ে কীরকম কাড়াকাড়ি পড়েছিল; তার পিছনে ছিল পাশ্চাত্যজাতিদের রণতরীর বহর। সমস্ত ভালো ভালো বন্দরগুলো তারা গ্রাস করে নিল; বন্দরের সংলগ্ন প্রদেশগুলোতেও তারা সকলপ্রকার অধিকার আর স্বত্ব হস্তগত করে বসল — খনি চালানো, রেলপথ তৈরি করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু তাদের ক্ষুধা মিটল না, আরও নূতন নূতন অধিকারের দাবি দিন দিন বেড়েই চলল। বিদেশী সরকাররা একটা নূতন বুলি ধরলেন—চীনের মধ্যে তাঁদের 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' চাই। এটি একটি ভদ্র পন্থা, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের আবিষ্কার; এর দ্বারা তারা যে-কোনো দেশকে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিতে পারে। এইসব অধিকার এবং 'নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা'র আবার অনেক রকম-ফের আছে। 'অন্তর্ভুক্ত' করে নেওয়া মানে অবশ্য একেবারেই গ্রাস করে নেওয়া। 'রক্ষিত অঞ্চলে' নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে তার চেয়ে সামান্য একটু কম। 'প্রভাবাধীন অঞ্চলে' আরও কম। তবু এর সবগুলোরই লক্ষ্য এক; একটি ধাপ থেকে অন্য একটিতে অতি সহজেই এগিয়ে যাওয়া যায়। বস্তুত এ কথাটা নিয়ে হয়তো আমরা পরে আবার আলোচনা করব; 'অন্তর্ভুক্ত' করে নেওয়াটা অতি প্রাচীন কালের পদ্ধতি, এখন এটা প্রায় বাতিলই হয়ে গেছে, কারণ এ করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি হাঙ্গামা এসে হাজির হয়। তার চেয়ে অনেক সহজ পন্থা হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা দখল করে নেওয়া, এবং অন্য দিকগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানো।

মনে হল, পাশ্চাত্যজাতিরা চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবার উপক্রম করছে। জাপান অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। চীনকে সে পরাজিত করেছিল, তার ফল সবখানিই কেড়েকুড়ে নিয়েছে এই পাশ্চাত্যজাতিরা। এখন আবার চীনদেশটাকেই তারা ভাগবিলি করে নিয়ে নিচ্ছে—জাপান অক্ষম ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল। সবচেয়ে বেশি রাগ হল তার রাশিয়ার উপর, সেই তো জাপানকে পোর্ট আর্থার নিতে দেয় নি, তার পর নিজেই সেটি দখল করে বসেছে।

একটি কিন্তু বড়ো জাতি ছিল যে তখন পর্যন্ত চীনে অধিকারের জন্যে এই কাড়াকাড়িতে বা চীনকে ভাগ করে নেবার মতলবে যোগ দেয় নি। এটি হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এরা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল; অন্যদের চেয়ে এরা বেশি ধার্মিক বলে নয়, নিজেদের বিরাট দেশটিকে সমৃদ্ধ

করে তোলা নিয়েই ব্যস্ত ছিল বলে। দেশের পশ্চিম-অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যতই তাদের রাজ্য বাড়তে লাগল, দেখা গেল, ততই নূতন নূতন অঞ্চলকে গড়ে তুলতে হচ্ছে, তাদের সমস্তখানি উদ্যম আর সমস্তখানি সংগতি এই কাজেই নিযুক্ত হয়ে রইল। বস্তুত ইউরোপেরও প্রচুর-পরিমাণ টাকা তখন আমেরিকার এই কাজে আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষাশেষি এসে আমেরিকাও বিদেশের দিকে চোখ ফেরাল—কোথায় কিছু মূলধন খাটানো যায় কি না। চীনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ইউরোপীয় জাতিগুলো তাকে ভেঙে ভেঙে যে-যার মতো 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' তৈরি করে নেবার উপক্রম করছে; হয়তো শেষ পর্যন্ত তাকে নিজেদের খাসদখলের 'অন্তর্ভুক্ত' করে নেওয়াই এদের মতলব। ব্যাপারটা আমেরিকার ভালো লাগল না—তাকে বাদ দিয়েই এরা সবাই ভোজে বসে গেল এ কীরকম কথা! অতএব আমেরিকা তখন একটি আইন জারি করল, একে বলা হয় চীনে 'মুক্ত-দ্বার' নীতি। এর কথা হচ্ছে, চীনে ব্যবসা এবং বাণিজ্য চালাবার ব্যাপারে সমস্ত জাতিকেই ঠিক সমান সুযোগসুবিধা দিতে হবে। অন্যান্য জাতিরাও এতে রাজি হয়ে গেল।

বিদেশীদের এই বারংবার অভিযানে চীন-সরকার অত্যন্তরকম ভয় পেয়ে গেলেন। এবার তাঁরা বুঝলেন, নিজেদের সংস্কার এবং পুনর্গঠন করে না নিলে আর চলছে না। চেষ্টাও করলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বেশিদূর করাই গেল না, কারণ বিদেশী জাতিরা ক্রমশই আরও বেশি বেশি অধিকারের দাবি তুলছিল। সম্রাট-মাতা জু সি কয়েক বছর ধরে অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। প্রজাদের বিশ্বাস হল একমাত্র তিনিই তাদের রক্ষা করতে পারেন। সম্রাটের এই সময়ে সন্দেহ হল, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে; তিনি সম্রাট-মাতাকে কারারুদ্ধ করতে চাইলেন। তার উত্তরে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী তাঁকেই পদচ্যুত করলেন, করে রাজ্যের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। জাপানের মতো তিনি কিন্তু দেশের মধ্যে আমূল সংস্কার-সাধনের কোনো চেষ্টা করলেন না; সমস্তখানি মনোযোগ দিলেন চীনে একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলবার দিকে। তাঁর উৎসাহ পেয়ে দেশের সর্বত্র ছোটোখাটো আত্মরক্ষী সেনাদল গড়ে উঠল। এইসব স্থানীয় রক্ষীদল নিজেদের নাম বলত 'ই-হো-তুয়ান'—অর্থাৎ, ন্যায়সংগত ঐক্যের সেনা। অনেকসময় আবার এদের বলা হত 'ই-হো-চুয়ান' বা ন্যায়সংগত ঐক্যের মুষ্টি। এই শেষের নামটা বন্দরের শহরগুলিতে কয়েকজন ইউরোপীয়ের কানে গিয়ে পৌঁছল; তারা এর অনুবাদ করল 'বক্সার' বা 'মুষ্টিযোদ্ধা' বলে। সুন্দর একটা কথার একটা অসুন্দর অনুবাদ!

এই বক্সারদের নাম বিখ্যাত হয়ে উঠল; নামটির প্রকৃত তত্ত্ব জানতে যতদিন পাই নি ততদিন আমিও অনেকসময় ভেবেছি, এমন অসাধারণ নাম এদের কেন হল। চীনের উপর বিদেশীরা আক্রমণ চালিয়েছে, চীনকে ও চীনাদের অসংখ্য রকমে অসম্মান অপমান করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশভক্ত চীনাদের এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এদের চোখে এই বিদেশীরা ছিল দুর্বৃত্তের জীবন্ত প্রতীক; তাদের এরা ভালোবাসতে পারে নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ করে অপছন্দ করত এরা মিশনারিদের। অনেক অন্যায়, অনেক অভদ্রতা তারা করেছে। আর চীনা খৃষ্টানদের কথা যদি বলো, সেগুলোকে এরা জানত দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে। নূতন যুগের প্লাবন থেকে প্রাচীন চীনের আত্মরক্ষা করবার শেষ চেষ্টার প্রতীক ছিল এরা। কিন্তু এইভাবে সে চেষ্টা সফল হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

এই বিদেশী-বিদ্বেষী, মিশনারি-বিদ্বেষী, রক্ষণশীল দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে পাশ্চাত্য-আগন্তুকদের সংঘর্ষ না হয়ে পারে না। সংঘর্ষ বাধল; একজন ইংরেজ মিশনারি নিহত হল; অনেক ইউরোপীয় এবং বহুসংখ্যক চীনা খৃষ্টান মারা পড়ল। বিদেশী সরকাররা দাবি জানাল, এই দেশ-প্রেমিক বক্সার-আন্দোলনকে দমন করতে হবে। যথার্থ নরহত্যার দায়ে যারা অপরাধী তাদের ধরে চীন-সরকার শাস্তি দিলেন; কিন্তু এরকম করে নিজেরই সৃষ্ট আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে সে পেরে উঠবে কি করে? বক্সার-আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে বিদেশী মন্ত্রীরা তাঁদের রণতরী থেকে সৈন্য এনে হাজির করলেন; তাই দেখে আবার চীনারা ভাবল, বিদেশীরা বুঝি চীন-আক্রমণই শুরু করল। লড়াই বাধতে দেরি হল না। চীনারা জর্মন মন্ত্রীকে মেরে ফেলল, পিকিঙে বিদেশীদের দূতাবাসগুলোকে অবরোধ করে বসল।

দেশপ্রেমিক বক্সারদের আন্দোলনের দেখাদেখি চীনের একটা বৃহৎ অংশ বিদেশীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান ঘোষণা করল। কিন্তু কয়েকটি প্রদেশের শাসনকর্তারা নিরপেক্ষ হয়ে রইলেন এবং এইভাবে বিদেশীদেরই সাহায্য করলেন। বক্সারদের কাজে সম্রাট-মাতার সমর্থন ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি তাদের সংগে যোগ দিলেন না। বিদেশীরা প্রতিপন্ন করতে চাইল যে, এই বক্সাররা দস্যুর দল মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ১৯০০ সনের এই বিদ্রোহ ছিল বিদেশীদের হস্তক্ষেপ থেকে চীনকে মুক্ত করবার জন্যে দেশপ্রেমিকদের একটা প্রয়াস। চীনে এই সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর নাম সার রবার্ট হার্ট। তিনি এই সময়ে ছিলেন বৈদেশিক-বাণিজ্য-শুল্ক বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল; দূতাবাসগুলো যখন অবরোধ করা হয়, তিনিও তার মধ্যে পড়েছিলেন। তিনি লিখে গেছেন, চীনাদের মনে আঘাত করার অপরাধে বিদেশীরা, বিশেষ করে মিশনারিরাই ছিল অপরাধী; তাঁর মতে এই বিদ্রোহটার "মূলে ছিল দেশপ্রেম; এর স্বপক্ষে যুক্তিও আছে, কারণ এর যা লক্ষ্য ছিল তাতে অন্যায় কিছুই নেই, এবং তার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না।"

কেঁচোর এইভাবে ফণা তুলে ওঠা দেখে বিদেশীরা অত্যন্ত চটে গেল। তারা তাড়াহুড়ো করে সৈন্য এনে হাজির করল; আনবার যুক্তিও ছিল, কারণ, সে সৈন্যরা পিকিঙে অবরুদ্ধ বিদেশীদের উদ্ধার এবং রক্ষা করতে আসছে। এদের সকল জাতির একটি মিলিত বাহিনী একজন জর্মন সেনাধ্যক্ষের অধীনে দূতাবাসগুলিকে মুক্ত করবার জন্যে যুদ্ধযাত্রা করল। চীনে জর্মনির যেসব সৈন্য ছিল জর্মনির কাইজার তাদের প্রতি উপদেশ পাঠালেন, হুনের মতো আচরণ করবে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা সমস্ত জর্মনদের হুন বলে ডাকত, খুব সম্ভবত এই কথাটা থেকেই তার উৎপত্তি।

কাইজারের উপদেশটা কেবল তাঁর নিজের সেনারা নয়, মিলিত বাহিনীর সমস্ত সেনারাই মেনে চলল। পিকিঙের দিকে এগিয়ে যাবার পথে সর্বত্র তারা দেশের লোকের প্রতি এমন আচরণ করতে লাগল যে, বহু লোক তাদের হাতে পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করাকেই বরং সহজ বলে জেনে নিল। তখনকার দিনে চীনা মেয়েরা পা ছোটো করত; তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। তারা অনেকেই আত্মহত্যা করল। এইভাবে যুক্ত-বাহিনী পথ অতিক্রম করে চলল, পিছনে তাদের পদচিহ্ন লেখা রইল মৃত্যু আত্মহত্যা আর গ্রামদাহনের আগুন দিয়ে। এই বাহিনীর সংগে একজন ইংরেজ যুদ্ধ-সাংবাদিক গিয়েছিলেন; তিনি লিখলেন :

"এমন অনেক ব্যাপার আছে যা আমার লেখবার অধিকার নেই এবং যা ইংলণ্ডে ছাপা হতে পারে না; সেগুলো প্রকাশিত হলে প্রমাণ হবে, আমাদের এই পাশ্চাত্যসভ্যতা বর্বরতারই উপরের একটা পাতলা আবরণ মাত্র। কোনো যুদ্ধের সম্বন্ধেই প্রকৃত সত্য কথা কোনোদিন লেখা হয় নি; এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।"

যুক্ত-বাহিনী পিকিঙে গিয়ে পেঁছিল, দূতাবাসগুলোকে মুক্ত করল। তার পর তারা পিকিঙ শহর লুঠ করল—"পিজারোর যুগের পরে এতবড়ো লুণ্ঠন-মহোৎসব আর হয় নি।" পিকিঙে সঞ্চিত শিল্পকলার মহার্ঘ রত্নরাজি পড়ল অভব্য অশিক্ষিত যত লোকের হাতে, তাদের মূল্যও তারা জানত না। দুঃখের কথা, এই লুঠতরাজে মিশনারিরাও বেশ ভালো করেই যোগ দিয়েছিল। দলে দলে লোক হৈ-হৈ করে এক-বাড়ি থেকে অন্য-বাড়ি করে ঘুরতে লাগল। বাড়ির গায়ে তারা 'এই বাড়ি আমাদের' বলে একটা ইস্তাহার টাঙিয়ে দেয়, দিয়ে তার ঘর থেকে সমস্ত দামি মালপত্র বাইরে এনে বিক্রি করে, তার পর আবার আর-একখানা বড়ো বাড়ির দিকে পা বাড়ায়!

এইসমস্ত জাতিদের মধ্যে পরস্পর-রেষারেষি, আর কিছুটা-বা যুক্তরাষ্ট্র-সরকারের নীতি, এর জন্যেই সেবার ভাগাভাগির হাত থেকে চীন রক্ষা পেল। কিন্তু অপমানের তার একেবারে চরম করে ছাড়ল এরা। যত দিক থেকে যতরকম সম্ভব অপমান আর অসম্ভ্রম তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হল। একটি স্থায়ী বিদেশী সেনাবাহিনী পিকিঙে কারেমি হয়ে বসে থাকবে, রেলপথটাকেও পাহারা দেবে; চীনের অনেকগুলো দুর্গকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে; কোনো বিদেশী-বিরোধী সংগঠনের কেউ সভ্য হলে তার শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড; বাণিজ্যের আরও

অনেকরকম অধিকার বিদেশীরা নিয়ে নিল, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বলে একটা বিরাট-পরিমাণ টাকা আদায় করে নিল; এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক আঘাত হল বক্সার-আন্দোলনের দেশ-প্রেমিক নেতাদের 'বিদ্রোহী' বলে প্রাণদণ্ড দিতে চীন-সরকারকে বাধ্য করা হল। এই হচ্ছে তথাকথিত 'পিকিঙ-সন্ধিপত্র'; ১৯০১ সনে এটি স্বাক্ষর করা হয়।

খাস চীনে এবং বিশেষ করে পিকিঙের চার দিকে যখন এইসব কাণ্ড ঘটছে, সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রুশ সরকার বিপুল-পরিমাণ সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এই সৈন্যরা সাইবেরিয়া পার হয়ে একেবারে মাঞ্চুরিয়াতে এসে জুড়ে বসল। চীন কেবল মুখেই এর প্রতিবাদ করল, তার বেশি কিছু করবার তার সাধ্য ছিল না। কিন্তু দৈবাৎ আবার আর-এক কাণ্ড হল; রুশ সরকার এইরকম করে মস্তবড়ো একপ্রস্থ স্থান দখল করে বসেছে, অন্যান্য জাতিরা এতে ঘোরতর আপত্তি তুলল। তাদের চেয়েও এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত ও ভীত হয়ে উঠল জাপান-সরকার। এরা সকলে মিলে রাশিয়ার উপর চাপ দিল—ফিরে যাও। রাশিয়া শুনে সমস্ত মুখেচোখে একটা অকৃত্রিম বেদনা আর বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল; তার সদভিসন্ধি সম্বন্ধে কেউ এরকম করে সংশয় প্রকাশ করতে পারে, এ যে ধারণার অতীত ব্যাপার! সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে বলল, ভয় নেই, চীনের রাষ্ট্রীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করবার কোনো ইচ্ছেই নেই আমাদের; মাঞ্চুরিয়াতে রুশদের রেলপথ-অঞ্চলটাতে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলেই আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাব। এই উত্তর শুনে সকলেই একদম খুশি হয়ে উঠল; নিজেদের এই অতুলনীয় নিঃস্বার্থতা আর পরোপকারপ্রবৃত্তি নিয়ে পরস্পরকে নিশ্চয়ই খুব-একচোট বাহবাও দিয়ে নিল! তা হোক, রাশিয়ার সৈন্যদলটা কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতেই থেকে গেল, তার পর আরও এগোতে এগোতে একেবারে কোরিয়ার মধ্যে গিয়ে হাজির হল।

মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়াতে রাশিয়ার এই আবির্ভাব দেখে জাপান ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। নিঃশব্দে অথচ অতিযত্নে সে যুদ্ধের আয়োজনে লেগে গেল। ১৮৯৫ সনে চীন-যুদ্ধের পর জাপান পোর্ট আর্থার দখল করেছিল, তখন তাদের বিরুদ্ধে তিনটি শক্তি একত্র হয়েছিল, তাকে পোর্ট আর্থার তারা নিতে দেয় নি—সে কথা জাপানিরা ভোলে নি। এবারেও যাতে সেরকম না ঘটতে পারে, তারা সেই চেষ্টা করতে লাগল। তারা দেখল, রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংলণ্ডও ভয় পেয়েছে, তাকে বাধা দিতে চাইছে। অতএব ১৯০২ সনে ইংলণ্ডের সঙ্গে জাপানের সন্ধি হল, তার উদ্দেশ্য, যেন অন্যান্য জাতিরা একত্র হয়েও দূর-প্রাচ্যে এদের কাউকে জব্দ করতে না পারে। এবার জাপান একটু নিশ্চিন্ত হল, হয়ে রাশিয়ার প্রতি একটু অধিকতর উগ্র নীতি অবলম্বন করল। বলল, মাঞ্চুরিয়া থেকে সমস্ত রুশ সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু তখনকার জারের সরকার ছিল মূর্খদের হাতে; তারা জাপানকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, সেও আবার যুদ্ধ করতে পারে এ কথা তাদের বিশ্বাসই হল না।

১৯০৪ সনের প্রথম দিকে দুই দেশে যুদ্ধ বাধল। জাপান যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে; জাপান-সরকারের উৎসাহবাণী আর তাদের সম্রাট-পূজার নিষ্ঠা, দুয়ে মিলে জাপানিদের দেশপ্রেমও একেবারে আগুনের শিখার মতো জ্বলে উঠেছে। ও দিকে রাশিয়া একেবারেই প্রস্তুত হয় নি; তার স্বৈরতন্ত্রী সরকার দেশশাসন করতে জানে শুধু প্রজার উপর একটানা পীড়ন চালিয়ে। দেড় বছর ধরে যুদ্ধ চলল, সমস্ত এশিয়া ইউরোপ আর আমেরিকা চেয়ে চেয়ে দেখল, জলে স্থলে সর্বত্রই জাপানিরা কী অনায়াসে জিতে যাচ্ছে। জাপানি সৈন্যদের অপূর্ব আত্মোৎসর্গ এবং অগণিত নরহত্যার পরে পোর্ট আর্থার জাপানের হস্তগত হল। রাশিয়া ইউরোপ থেকে প্রকাণ্ড একটি রণতরীর বহর পাঠাল, সমুদ্র-পথ ঘুরে সে বহর দূর-প্রাচ্যে এসে পৌঁছল। অর্ধেক পৃথিবী পার হয়ে হাজার হাজার মাইল যাত্রার ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে এই বিরাট বহরটি জাপান-সমুদ্রে এসে হাজির হল; সেখানে জাপান আর কোরিয়ার মাঝখানের সরু খাঁড়ির মধ্যে আটকে ফেলে জাপানিরা একে জলে ডুবিয়ে দিল, সেনাপতিকে-সুদ্ধ। এই বিপর্যয়ে বহরটির প্রায় সমস্ত জাহাজই একসঙ্গে মারা পড়ল।

বারবার পরাজয়ে রাশিয়া, মানে জার-শাসিত রাশিয়া, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তখনও কিন্তু রাশিয়ার প্রচুর-পরিমাণ সঞ্চিত শক্তি রয়েছে; এই রাশিয়াই কি এর এক শো বছর আগে নেপোলিয়নকে

নাজেহাল করে দেয় নি? কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে সত্যকার রাশিয়া, মানে রাশিয়ার জনসাধারণ জেগে উঠেছিল।

এই চিঠিগুলোতে আমি আগাগোড়াই রাশিয়া ইংলন্ড ফ্রান্স চীন জাপান ইত্যাদি করে নাম বলে যাচ্ছি, যেন এর প্রত্যেক দেশই এক-একটি জীবন্ত ব্যক্তি। এটা আমার একটা কু-অভ্যাস, বই আর খবরের কাগজ পড়ে পড়ে শেখা। এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাই অবশ্য সেই সময়কার রুশ সরকার, ইংরেজ সরকার প্রভৃতিকে। এই সরকারগুলো হয়তো দেশের একটি অতি ক্ষুদ্র দলের মাত্র প্রতিনিধি, হয়তো-বা কোনো একটি শ্রেণীরই প্রতিনিধি। সমগ্র দেশের লোকের প্রতিনিধি একে ভাবলে বা বললে ভুল হবে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সরকারকে বলা যেত একটি ক্ষুদ্র ধনী-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—এরা ছিল দেশের ভূস্বামী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত -শ্রেণী। এরাই পার্লামেন্টে কর্তৃত্ব করত। দেশের লোকের অধিকাংশের কোনো কথাই খাটত না এ ব্যাপারে। ভারতবর্ষে আমরা এখন মাঝেমাঝে শুনি, জাতি-সঙ্ঘে বা গোল টেবিল বৈঠকে বা ঐরকম কোনো ব্যাপারে ভারত থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে। এটা একেবারেই অর্থহীন কথা। এই তথাকথিত প্রতিনিধিরা ভারতের প্রতিনিধি বলে গণ্য হতে পারেন না, যতদিন-না ভারতের জনসাধারণ এদের নির্বাচিত করে দিচ্ছে। এরা হচ্ছে শুধু ভারত-সরকারের মনোনীত ব্যক্তি; নামে ভারত-সরকার হলেও আসলে সেটা ব্রিটিশ সরকারেরই একটা বিভাগ মাত্র। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ছিল একটা স্বৈরতন্ত্রী দেশ। জার ছিলেন 'সমস্ত রাশিয়ার একচ্ছত্র প্রভু', এবং একটা অত্যন্ত মূর্খ প্রভু। সেনার সাহায্যে শ্রমিক এবং কৃষকদের জোর করে দমিয়ে রাখা হত; দেশের শাসন-ব্যাপারে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীদেরও কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু বীর রুশ যুবক মাথা তুলে, বাহু তুলে দাঁড়াতে গিয়েছে, এবং স্বাধীনতার জন্যে সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। অনেক মেয়েও এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই আমি যখন বলছি 'রাশিয়া' করল, ঐ করল, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করল, সে রাশিয়া বলতে বোঝাচ্ছে মাত্র জারের তার বেশি কাউকে নয়।

জাপান-যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণের দুঃখকষ্ট আরও বেড়ে গেল। সরকারকে কথা শোনাবার জন্যে সমস্ত কারখানার শ্রমিকরা প্রায়ই ধর্মঘট করতে লাগল। ১৯০৫ সনের ২২শে জানুয়ারি তারিখে কয়েক হাজার কৃষক এবং শ্রমিক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করে জারের শীত-প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হল, একজন পুরোহিত তাদের নেতা। জারের কাছে তারা প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিল, যেন তাদের দুঃখকষ্ট তিনি কিছুটা দূর করে দেন। জার তাদের কথা মোটে শুনলেনই না, ঢালা হুকুম দিলেন—সব গুলি করে মারো।

একটা ভয়ংকর হত্যাকান্ড ঘটল, পিটার্সবার্গের রাজপথে শীতের শাদা বরফ মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেল। এই দিনটি ছিল রবিবার; সেই দিন থেকেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'রক্তস্নাত রবিবার'। দেশে একটা গভীর আলোড়ন উঠল। বহু স্থানে শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, শেষ পর্যন্ত সমস্ত মিলে একটা বিপ্লবেরই চেষ্টা করা হল। ১৯০৫ সনের এই বিপ্লবকে জারের সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাতে দমন করে দিল। আমাদের পক্ষে এই ঘটনাটি অনেক কারণেই দেখবার মতো। বারো বছর পরে, ১৯১৭ সনের বিরাট বিপ্লবে রাশিয়ার চেহারাই একেবারে বদলে গেল—এটা ছিল সেই বিপ্লবের একটা মহড়া-বিশেষ। তা ছাড়া ১৯০৫ সনের এই ব্যর্থ বিপ্লবের সময়েই বিপ্লবী কর্মীরা একটি নূতন সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন; পরবর্তীকালে সেটি অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারই নাম হচ্ছে সোভিয়েট।

যেমন আমার স্বভাব, চীন আর জাপানের কথা, রুশ-জাপান যুদ্ধের কথা বলতে বলতে একেবারে ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লবের কথা এনে ফেলেছি। কিন্তু এর কথা খানিকটা তোমাকে বলতেই হল, নইলে মাঞ্চুরিয়ার এই যুদ্ধের সময় রাশিয়ার অবস্থা কী ছিল তা বুঝতে পারতে না। প্রধানত এই বিপ্লবের প্রচেষ্টা আর প্রজাদের মতিগতির চাপে পড়েই জার জাপানের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন।

১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পোর্টস্‌মাউথে সন্ধি হল, এর দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের

সমাপ্তি হল। পোর্টস্‌মাউথ জায়গাটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট দুই পক্ষকেই সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন; সেখানেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হল। এই সন্ধির ফলে জাপান শেষ পর্যন্ত পোর্টআর্থার এবং লিয়াওতুং-উপদ্বীপ ফিরে পেল; তোমার মনে থাকতে পারে, চীন-যুদ্ধের পর এ দুটো তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়া যে রেলপথ তৈরি করেছিল তার একটা বৃহৎ অংশ, এবং জাপানের উত্তর দিকে অবস্থিত সাখালিন দ্বীপেরও আধখানা জাপান পেয়ে গেল। তা ছাড়া, কোরিয়ার উপরেও রাশিয়া সমস্ত দাবি ছেড়ে দিল।

জাপান যুদ্ধে জিতেছে; এবার জাপান পৃথিবীর প্রবল শক্তিদের সঙ্গে এক-পঙ্‌ক্তিতে ঠাঁই পেল। এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশ জাপান, তার এই জয়ে এশিয়ারও সমস্ত দেশেই একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল। আমি তোমাকে বলেছি, শিশুকালে এই গল্প শুনে আমিও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতাম। এশিয়ার বহু বালকবালিকা এবং বয়স্ক ব্যক্তিরই মধ্যে এই উদ্দীপনা দেখা যেত। মস্ত-বড়ো একটা ইউরোপীয় জাতিকে জাপান হারিয়ে দিয়েছে; তা হলে তো এখনও এশিয়া ইউরোপকে হারিয়ে দিতে পারে, প্রাচীন কালে যেমন বহুবার দিয়েছে! প্রাচ্যদেশগুলিতে 'জাতীয়তাবাদ' আরও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল; 'এশিয়াতে এশিয়াবাসীরই অধিকার' এই ধ্বনিরও তখনই সৃষ্টি হল। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ অর্থ শুধু অতীত যুগে প্রত্যাবর্তন নয়, প্রাচীন রীতিনীতি আর মতামতকে আঁকড়ে ধরে থাকা নয়। সবাই দেখল জাপানের জয় হয়েছে তার কারণ, সে পাশ্চাত্যজগতের নূতন শিল্পপ্রণালীকে আয়ত্ত করে নিয়েছে। সুতরাং প্রাচ্যজগতের সর্বত্রই লোকেরা এই তথাকথিত পাশ্চাত্য মতামত এবং প্রণালীকে সাগ্রহে আয়ত্ত করে নিতে চাইল।

১১৮

চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

আমরা দেখেছি, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ে এশিয়ার সমস্ত দেশ আনন্দিত এবং গর্বিত হয়ে উঠেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু এর ফল দেখা গেল; জগতের যুদ্ধকামী সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের ক্ষুদ্র দলে আর-একটি সভ্য বাড়ল। এর প্রথম কোপ পড়ল কোরিয়ার উপর। জাপানের অভ্যুত্থান অর্থই হল কোরিয়ার পতন। নূতন করে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার পর থেকেই জাপান জেনে রেখেছিল, কোরিয়া এবং কিছু-পরিমাণে মাঞ্চুরিয়া তারই সম্পত্তি। মুখে অবশ্য সে বারবার ঘোষণা করেছে, চীনের অখণ্ডতাকে সে ক্ষুণ্ন করবে না, কোরিয়ার স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করবে না। এটা সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের একটা অপূর্ব কায়দা; অন্যকে যখন লুঠ করে নিতে থাকে তখনও তারা বড়ো গলায় বলে, তাদের প্রতি তার সদভিপ্রায়ের অন্ত নেই; মানুষকে হত্যা করতে করতেই তারা জীবনের জয়গান করে থাকে।

জাপানও গম্ভীরমুখে বলতে লাগল, কোরিয়ার দিকে সে হাত বাড়াবে না, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই কোরিয়া দখল করবার জন্যে তার পুরোনো চাল-চালতে শুরু করল। চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে তার যেসমস্ত যুদ্ধ হল তার সমস্তগুলোরই প্রধান লক্ষ্য ছিল কোরিয়া আর মাঞ্চুরিয়া। এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে এসেছে, চীন অকেজো হয়ে পড়েছে, রাশিয়াও হেরে গেল, এবার জাপানের পথ খোলা।

সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে চলতে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন নিয়ে জাপান কখনও মাথা ঘামায় নি। পরের দেশ কেড়ে নেবার কাজটি সে খোলাখুলিই করে চলল, তার উপরে ঈষৎ একটু অবগুণ্ঠন পর্যন্ত রাখল না। অনেককাল আগে, ১৮৯৪ সনে, অর্থাৎ চীন-যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে, জাপানিরা জোর করে কোরিয়ার রাজধানী সিওউল-শহরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিল, রানীকে

ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি জাপানিদের আদেশ পালন করতে রাজি হন নি! রুশ-যুদ্ধের পরে ১৯০৫ সনে, জাপান-সরকারের জুলুমে কোরিয়ার রাজা বাধ্য হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন; তাঁর দেশের স্বাধীনতা লোপ করে দিয়ে জাপানের কর্তৃত্ব মেনে নিলেন। এতেও কিন্তু জাপানের খাঁই মিটল না। পাঁচটি বছরও যেতে-না-যেতে এই হতভাগ্য রাজাকে একেবারেই সিংহাসনচ্যুত করে কোরিয়াকে জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। এটা ১৯১০ সনের কথা। দীর্ঘকাল—তিন হাজার বছরেরও বেশি দিন স্বাধীনভাবে থেকে এসে অবশেষে কোরিয়া-রাজ্যের মৃত্যু ঘটল। এই-যে রাজাটিকে এইভাবে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল, এঁদেরই বংশ পাঁচ শো বছর আগে যুদ্ধ করে মঙ্গোলদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চীনের মতো কোরিয়ারও জীবনপ্রবাহ প্রাণহীন পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল, তার প্রায়শ্চিত্তও তাকে করতে হল।

কোরিয়ার প্রাচীন নাম ছিল চো-সেন বা প্রভাতশান্তির দেশ; আবার তাকে সেই নাম দেওয়া হল। জাপানিরা দেশে কিছু-কিছু আধুনিক সংস্কারও আমদানি করল, কিন্তু কোরিয়া-বাসীদের আত্মচেতনাকে তারা নির্মমভাবে পিষে মেরে ফেলল। বহু বছর ধরে কোরিয়ার লোকেরা স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা চালাল, বহুবার বিদ্রোহ করল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ হয় ১৯১৯ সনে। জিতবার কোনো আশাই নেই, তবু কোরিয়ার প্রজারা, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা, বীরের মতো লড়াই করতে লাগল। একবার কোরিয়ার একটি স্বাধীনতাকামী দল জাপানিদের অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে; শোনা যায়, তারা নাকি তৎক্ষণাৎ পুলিশকে টেলিফোন করে তাদের এই কাজের কথা জানিয়ে দিয়েছিল! এইভাবে জেনেশুনেই তারা তাদের আদর্শের জন্যে নিজেদের বলি দিচ্ছিল। এমন ধীরেসুস্থে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা কাজ করত, দেখে অনেকসময় মনে হয় সে যেন ঠিক বাপুর কর্মপদ্ধতিরই প্রতিধ্বনি। জাপানিরা যেভাবে এই কোরিয়ানদের দমন করল, ইতিহাসে সেটি একটি অত্যন্ত করুণ এবং মসীলিপ্ত অধ্যায়। শুনে তোমার আনন্দ হবে, এই যুদ্ধে কোরিয়ার তরুণী মেয়েরা খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের অনেকে তখন সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এখন আবার চীনের কথা বলা যাক। বক্সার-বিদ্রোহ-দমন এবং ১৯০১ সনের পিকিঙ-সন্ধির কথা বলেই, হঠাৎ তার কথা ছেড়ে চলে এসেছিলাম। চীনের তখন অপমানের আর বাকি রইল না, আবার দেশে সংস্কারের কথা উঠল। বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা পর্যন্ত বোধ হয় বুঝলেন, এবার ঐরকমের কিছু না করলে আর চলে না। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় চীন নিরপেক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, যদিও যুদ্ধটা হচ্ছিল চীনেরই এলাকার মধ্যে, মাঞ্চুরিয়াতে। জাপানের জয় দেখে চীনের সংস্কারপন্থীদের উৎসাহ বাড়ল। শিক্ষার ব্যবস্থাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজা হল; আধুনিক বিজ্ঞান শেখবার জন্যে বহু ছাত্রকে ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে পাঠানো হল। এতদিন সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হত লেখাপড়ার পরীক্ষা নিয়ে; সে প্রথা তুলে দেওয়া হল। এই আশ্চর্য প্রথাটি ঠিক চীনের প্রকৃতির অনুযায়ী বস্তু; দু হাজার বছর ধরে, সেই হান-বংশের রাজত্বকাল থেকে এই প্রথা চীনে চলে এসেছে। কবে একদা এর সার্থকতা ছিল সে দিন বহুকাল পার হয়ে গেছে; এখন এটা শুধু চীনের অগ্রগতিকেই বাধা দিচ্ছিল—কাজেই এটা তুলে দেওয়াতে চীনের ভালোই হল। তবু কিন্তু একহিসেবে এটা ছিল দীর্ঘকালের একটা বিস্ময়কর বস্তু। জীবন সম্বন্ধে চীনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল; এশিয়া এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশের মতো তাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি সামন্তপন্থীও নয়, পুরোহিতপন্থীও নয়; তার প্রতিষ্ঠা ছিল যুক্তির উপরে। চীনাদের উপরে চিরকালই ধর্মের প্রভাব সমস্ত জাতির চেয়ে কম; অথচ তবুও তারা নীতি ও সংযম-প্রধান এই জীবনযাত্রার রীতিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে। কোনো ধর্মপ্রধান জাতিও তেমন পারে নি। তাদের সংকল্প ছিল সমাজকে যুক্তিবাদী করে গড়ে তুলবে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণের চতুঃসীমার মধ্যে তাকে আটকে রাখতে গিয়েই তারা প্রয়োজনমতো পরিবর্তনগুলো ঘটিয়ে উঠতে পারল না, ফলে সমস্ত বস্তুটাই হয়ে উঠল জড়, প্রাণহীন। ভারতে আমাদের, চীনাদের এই যুক্তিবাদ থেকে অনেক শিখে নেবার আছে; আমরা এখনও জাতিভেদ, ধর্মের গোঁড়ামি, পুরোহিতের বুজরুকি আর সামন্তযুগের মতামতের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। চীনের প্রসিদ্ধ ঋষি

কন্‌ফুসিয়স তাঁর শিষ্যদের প্রতি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন, সেটি স্মরণ করে রাখবার মতো : "অতীন্দ্রিয়কে নিয়ে যারা কাজ-কারবারের ভান করে তাদের সঙ্গে কখনও সম্পর্ক রেখো না। অতীন্দ্রিয়বাদ যদি দেশে একবার আসন গাড়তে পারে, তার ফল হবে ভয়ংকর সর্বনাশ।" দুর্ভাগ্য আমাদের, এ দেশে এখনও অসংখ্য লোক মাথার টিকি, চুলের জটা, লম্বা দাড়ি, কপালে হিজিবিজি-চিহ্ন বা গেরুয়া পোশাকের জোরে অতীন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিচ্ছে এবং সাধারণ লোককে বোকা বানিয়ে শোষণ করে নিচ্ছে।

চীনের ছিল প্রাচীনকালের যুক্তিবাদ, ছিল সংস্কৃতি। কিন্তু আধুনিক জগতের সঙ্গে সে তাল মেলাতে পারে নি। বিপদে যখন সে পড়ল, তার প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি কোনো কাজেই এল না। চতুর্দিকের ঘটনাপ্রবাহ তার বহু সন্তানের মনে কাজের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল; আলোর সন্ধানে এরা নিষ্ঠার সঙ্গে অন্য দেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এদের চাপে পড়ে বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা পর্যন্ত জেগে উঠলেন; প্রজাদের একটা নূতন শাসনতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রস্তুত হলেন, এবং অন্যান্য দেশের শাসনপ্রণালী জেনে আসবার জন্যে একটি কমিশনকে বাইরের সমস্ত দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

এতদিনে বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা-শাসিত চীন-সরকার সচল হয়ে উঠল। কিন্তু প্রজারাও আরও বেশি বেগে এগিয়ে চলেছিল। অনেক দিন আগে, ১৮৯৪ সনেই, ডক্টর সুন-ইয়াৎ-সেন বলে একজন চীনবাসী 'চীনা নবজাগরণ-সংঘ' স্থাপন করেছিলেন। বিদেশী জাতিরা চীনের উপরে নানারকমের অন্যায় এবং একপক্ষ-টানা সন্ধি চাপিয়ে দিচ্ছিল, চীনারা এগুলোকে বলত 'অসমান সন্ধি'। এই-সমস্ত সন্ধির প্রতিবাদে বহু লোক তাঁর এই সংঘে এসে যোগ দিল। সংঘটি ক্রমে বেড়ে উঠল, দেশের যুবশক্তি এর দিকে আকৃষ্ট হল। ১৯১১ সনে সংঘের নাম বদলে করা হল কুওমিন্‌টাঙ— প্রজাদের জাতীয়দল; এইটিই হল চীনবিপ্লবের কেন্দ্র ও সংগঠক। এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা ডাঃ সুন আদর্শ হিসেবে ধরলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্ত্র; ইংলন্ডের মতো প্রজাধীন রাজতন্ত্র নয়, জাপানের মতো সম্রাট-পূজা তো নয়ই। চীনারা কোনো দিনই তাদের সম্রাটকে দেবতা বানিয়ে তোলে নি; আর তখন যে রাজবংশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল তারা জাতে মোটে চীনাই নয়, তারা মাঞ্চু। প্রজারাও তখন দারুণরকম মাঞ্চু-বিদ্বেষী। প্রজাদের মধ্যে এই বিদ্রোহের লক্ষণ দেখেই সম্রাট-মাতা শাসন-সংস্কার করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু আগামী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ঘোষণা করবার অল্প দিন পরেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। যে চীন-সম্রাটকে তিনিই সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন—আশ্চর্যের কথা—সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরও মৃত্যু হল। ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসে এঁদের মৃত্যু হয়। এবার নামে সম্রাট হলেন একটি নবজাত শিশু।

আবার দেশে তুমুল কোলাহল উঠল, 'ব্যবস্থাপক সভা' ডাকা হোক। মাঞ্চু-বিদ্বেষ আর রাজ-বিদ্বেষও বেড়ে গেল। বিপ্লবীদের শক্তি বাড়তে লাগল। তখন এদের রুখবার মতো শক্তিমান লোক একজনমাত্র ছিলেন, ইনি একটি প্রদেশের শাসনকর্তা, নাম য়ুআন শিহ্‌-কাই। অত্যন্ত ধূর্ত ধড়িবাজ লোক, কিন্তু দৈবক্রমে এঁরই হাতে ছিল চীনের একমাত্র আধুনিক ও শক্তিশালী সেনা-বাহিনীটি; তার নাম 'আদর্শ বাহিনী'। মাঞ্চু-শাসকরা একটি অত্যন্ত মূর্খের মতো কাজ করলেন; য়ুআনকে তাঁরা চটিয়ে দিলেন এবং বরখাস্ত করলেন। যে একটিমাত্র মানুষ তাঁদের কিছুকাল অন্তত রক্ষা করতে পারত সেও হাতছাড়া হয়ে গেল। ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে ইয়াংসি-নদীর উপত্যকার তীরবর্তী অঞ্চলে বিপ্লব শুরু হল; অল্প দিনের মধ্যেই মধ্য এবং দক্ষিণ-চীনের একটা বৃহৎ অংশ বিদ্রোহে যোগ দিল। ১৯১২ সনের নববর্ষের দিনে এই বিদ্রোহী প্রদেশগুলি নিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল, তার রাজধানী হল নানকিঙ। ডাঃ সুন-ইয়াৎ-সেনকে এর প্রেসিডেন্ট করা হল।

য়ুআন শিহ্‌-কাই এতদিন চুপচাপ বসে দেখছিলেন; তাঁর মতলব, নিজের সুবিধা বুঝলেই রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়বেন। রিজেন্ট (শিশু সম্রাটের পিতা, ইনিই পুত্রের হয়ে রাজ্যশাসন করছিলেন) যেভাবে য়ুআনকে বরখাস্ত করলেন এবং তার পর আবার ডেকে ফিরিয়ে নিলেন, সে ভারি মজার

গল্প। প্রাচীন চীনে সব-কিছুই কথা হত যথাসাধ্য বিনয় এবং ভদ্রতা -সহকারে। য়ুআনকে যখন বরখাস্ত করতে হবে, ঘোষণা করা হল, য়ুআনের একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে! এ কথাও অবশ্য সকলেই জানত যে, য়ুআনের পা বেশ আস্তসুস্থই আছে, এটা তাঁকে পদচ্যুত করবার একটা চলিত রীতি মাত্র। য়ুআনও আবার এর পাল্টা শোধ নিলেন। দু বছর পরে, ১৯১১ সনে যখন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল, রিজেন্ট ভয় পেয়ে য়ুআনকে ডেকে পাঠালেন। য়ুআনের তখনই ছুটে যাবার কোনো মতলবই নেই; আগে তাঁর সব শর্ত মেনে নেওয়া হোক, তার পর দেখা যাবে। আর তখন তো তিনিই বড়োকর্তা। রিজেন্টকে তিনি জবাব পাঠালেন, অত্যন্ত দুঃখিত, ঠিক তখনই বাড়ি ছেড়ে যাত্রা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; তাঁর খোঁড়া পা তখনও ভালো করে সারে নি, পথ চলবেন কী করে! এর এক মাস পরে রিজেন্ট তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন, খবর পেয়েই য়ুআনের খোঁড়া পা আশ্চর্যরকম চট্‌পট্‌ সুস্থ হয়ে গেল।

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, বিপ্লবকে আর নিরস্ত করা সম্ভব নয়। য়ুআন বিচক্ষণ লোক, তিনি কোনো-এক পক্ষের সঙ্গেই যোগ দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করতে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি মাঞ্চু-রাজাদের পরামর্শ দিলেন, সিংহাসন ছেড়ে দাও। প্রজাতন্ত্র তখন একেবারে সামনে এসে হাজির হয়েছে, ও দিকে আবার তাঁদের সেনাপতিও সরে দাঁড়ালেন, মাঞ্চু-রাজাদের আর গত্যন্তর রইল না। ১৯১২ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি সিংহাসন-ত্যাগের নির্দেশপত্র বার করা হল। এইভাবে চীনের রঙ্গমঞ্চ থেকে মাঞ্চু-রাজবংশ বিদায় গ্রহণ করলেন। আড়াই শো বছরেরও বেশি-কাল ধরে এই বংশ চীনে রাজত্ব করেছে; সে রাজত্বের ইতিহাস মনে রাখবার মতো। এরূপ একটি চীনা প্রবাদবাক্য আছে: "তারা এসেছিল বাঘের মতো গর্জন করে, চলে গেল ঠিক সাপের লেজের মতো করে।"

নবীন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হল নানকিঙ; আবার প্রথম মিঙ-সম্রাটের সমাধিস্তম্ভও ছিল এই নানকিঙ-শহরেই। সেই দিন, সেই ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখেই নানকিঙে একটি অদ্ভুত উৎসবের আয়োজন করা হল। এই উৎসবে প্রাচীন ও নবীনের একত্র মিলন হল, এদের পৃথক রূপও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সুন-ইয়াৎ-সেন তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে সেই সমাধিস্থলে চলে গেলেন, প্রাচীন পদ্ধতিতে সেখানে পুজো দিলেন। এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা তিনি দিলেন তাতে বললেন, "প্রজাতান্ত্রিক শাসনবিধির একটি দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব-এশিয়াতে প্রতিষ্ঠা করছি। যারা সংগ্রাম করতে পারে, আজ হোক কাল হোক, সাফল্য তাদের হবেই। তবে আর আজ আমরা, আমাদের জয়লাভে বিলম্ব ঘটেছে বলে বিলাপ করব কেন?"

স্বদেশে ও নির্বাসনে, বহু বহু বৎসর ধরে ডাঃ সুন চীনের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে এসেছেন; অবশেষে এত দিনে বুঝি তাঁর সে চেষ্টা সফল হল! কিন্তু স্বাধীনতা বড়ো চঞ্চল বন্ধু। সাফল্য অর্জন করতে হলে আগে তার সম্পূর্ণ মূল্যটি চুকিয়ে দিতে হয়। অনেক সময় বৃথা আশা দেখিয়ে সে আমাদের বঞ্চনা করে; নানারকম দুঃখে কষ্টে ফেলে আমাদের পরীক্ষা করে নেয়; তার পর তবেই সে আমাদের হাতে ধরা দেবে। চীনের এবং ডাঃ সুনের যাত্রাপথ তখনও শেষ হয় নি। তার পরও অনেক বছর ধরে সেই নবীন প্রজাতন্ত্রকে প্রাণপণ লড়াই করে বেঁচে থাকতে হল; আজ একুশ বছর পরে যখন এত দিনে তার সাবালক হয়ে যাবার কথা, এখনও চীনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে।

মাঞ্চু-রাজারা সিংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু য়ুআন তখনও প্রজাতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কী করবেন কেউ জানে না। উত্তর-চীন, প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ-চীন, সমস্তই তাঁর ইঙ্গিতে চলছে। ডাঃ সুন চান, দেশে শান্তি আসুক, গৃহযুদ্ধ না বাধুক। তিনি নিজেকে একেবারেই মুছে ফেললেন, প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করলেন, য়ুআন শিহ্-কাইকে প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত করিয়ে দিলেন। কিন্তু য়ুআন মোটেই প্রজাতান্ত্রিক নন। তাঁর মতলব হচ্ছে শক্তি সংগ্রহ করা, নিজেকে বড়ো করে তোলা। তিনি বিদেশী জাতিদের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন, তাই দিয়ে যে প্রজাতন্ত্র তাঁকে সম্মান দেখিয়ে প্রেসিডেন্টের পদে বরণ করেছে তাকেই ভেঙে দিতে চেষ্টা

করলেন। ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিলেন তিনি; কুওমিনটাঙকেও ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এর ফলে বিরোধ বাধল, দক্ষিণ-চীনে য়ুআন-এর বিরোধী একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, ডাঃ সুন তার নেতা। ডাঃ সুন তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে যে বিরোধ এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই বিরোধই এসে উপস্থিত হল; বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল তখনও চীনে পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র রয়েছে। য়ুআন সম্রাট হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হল। তার অল্পদিন পরেই তিনি মারা গেলেন।

১১৯

বৃহত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে দূর-প্রাচ্যের কথা বলা শেষ হল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অবস্থা কী ছিল তারও কিছু কিছু আমরা দেখেছি। এবার পশ্চিমে ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকার কথা বলতে হবে। কিন্তু অত দূর পশ্চিমে চলে যাবার আগে তোমাকে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণটির কথা একটুখানি বলে নিই, যাতে এর সম্বন্ধেও তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ না থাকে। এই দেশগুলোর কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম অনেক দিন আগে। আগেকার কতকগুলো চিঠিতে আমি এদের কতকটা অস্পষ্ট এবং বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছি—মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইস্ট-ইণ্ডিজ, বৃহত্তর-ভারত ইত্যাদি বলে; হয়তো সে নামগুলো খুব নির্ভুলও নয়। এর কোনো-একটা নামেই এই অঞ্চলটির সমস্তখানিকে বোঝায় কি না সন্দেহ। তবু আমরা দুজনে যখন পরস্পরের কথা বুঝতে পারছি তখন যে নামেই একে ডাকি-না কেন, কিছুমাত্র যায়-আসে না।

মানচিত্র আছে একটা হাতের কাছে? থাকে তো চেয়ে দেখো। এশিয়ার দক্ষিণ-পূবে দেখবে একটি উপদ্বীপ আছে; এর মধ্যে পড়ে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, এবং এখন যার নাম ফরাসি-ইন্দোচীন। ব্রহ্মদেশ আর শ্যামের মাঝখান থেকে সরু জিভের মতো একফালি জমি বেরিয়ে এসেছে, তার নাম মালয়-উপদ্বীপ; শেষের দিকে গিয়ে জমিটা চওড়া হয়ে গেছে, ঠিক তার ডগাটিতে বসে আছে সিঙাপুর শহর। মালয় থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সমুদ্র জুড়ে ছোটো এবং বড়ো নানা বিচিত্র আকারের বহু দ্বীপ ছড়িয়ে রয়েছে; দেখলে মনে হয় যেন একদা এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার জন্যে কে একটা বিরাট পুল তৈরি করেছিল, এগুলো তারই ধ্বংসাবশেষ। এই দ্বীপগুলোর নাম হচ্ছে ইস্ট-ইণ্ডিজ; এদের উত্তরে আছে ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ। নূতন একটা মানচিত্র নিলে দেখবে, ব্রহ্মদেশ আর মালয় হচ্ছে ব্রিটিশের রাজ্য; ইন্দোচীন ফরাসিদের; আর মাঝখানে শ্যাম রয়েছে একটি স্বাধীন দেশ। ইস্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ—সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও দ্বীপের একটা বৃহৎ অংশ সেলিবিস এবং মালাক্কা ওলন্দাজদের অধীন—এগুলি হচ্ছে বিখ্যাত মশলার দ্বীপ, যার লোভে হাজার হাজার মাইল বিপজ্জনক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপ থেকে বণিকরা এসে জুটত। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধীন।

এই হচ্ছে পূর্ব-সমুদ্রের এই দেশগুলির বর্তমান অবস্থা। অথচ মনে করে দেখো, আমিই তোমাকে বলেছি, প্রায় দু হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের লোকেরা এইসব দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন; দীর্ঘকাল ধরে এখানে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; অতি অনুপম প্রাসাদ-মালায় সজ্জিত কতশত সুন্দর শহর গড়ে উঠেছিল; ব্যবসা এবং বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; ভারতীয় ও চীনা সংস্কৃতি ও সভ্যতার একত্র মিলন হয়েছিল এইখানে। এই দেশগুলোর সম্বন্ধে তোমাকে শেষ যে চিঠি আমি লিখেছি (৭৯-সংখ্যক), তাতে বলেছি, কীরকম করে প্রাচ্যে পর্তুগীজদের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল, এবং ব্রিটিশ আর ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিপত্তি বেড়ে উঠল। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে তখনও স্পেনিয়ার্ডরা রাজত্ব করছে।

পর্তুগীজদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ আর ওলন্দাজরা একত্র মিলিত হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হল। কিন্তু এদের দুই জাতির মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল না; এদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাধতে লাগল। একবার তো, ১৬২৩ সনের কথা সেটা, মালাক্কা-দ্বীপের অ্যাম্বয়না শহরের ওলন্দাজ শাসনকর্তা ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত ইংরেজ কর্মচারীকে ধরে এনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন; তাদের নামে অভিযোগ, তারা ওলন্দাজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এই ঘটনাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'অ্যাম্বয়নার হত্যাকাণ্ড'।

একটি কথা কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, আমি আগেও কয়েকটি চিঠিতে তোমাকে এ কথা বলেছি। এই সময়টাতে, অর্থাৎ, সপ্তদশ শতাব্দী এবং তার পরেও, ইউরোপ শিল্পপ্রধান দেশ ছিল না। বাইরে রপ্তানি করবার মতো পণ্য সে বিশেষ তৈরি করত না। বড়ো কলকারখানা আর শিল্পবিপ্লবের যুগ আসতে তখনও অনেক দেরি। তখন ইউরোপের তুলনায় বরং এশিয়াই অনেক বেশি জিনিষপত্র তৈরি করত এবং বাইরে রপ্তানি করত। এশিয়ার যে মালপত্র ইউরোপে যেত, ইউরোপ তার মূল্য কতক দিত তার মালপত্র দিয়ে, কতক-বা দিত স্পেনের অধিকৃত আমেরিকা থেকে লব্ধ ধনরত্ন দিয়ে। এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে এই বাণিজ্য চালানো ছিল খুবই লাভজনক কাজ। পর্তুগীজরা দীর্ঘকাল ধরে এই বাণিজ্যের বাজারে আধিপত্য করেছে এবং তার দ্বারা বড়োলোক হয়ে গিয়েছে। এই বাণিজ্যে ভাগ বসাবার জন্যেই তৈরি হল ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু পর্তুগীজরা এই বাণিজ্যটাকে তাদেরই নিজস্ব অধিকার বলে মনে করত, তারা অন্য কাউকে এর ভাগ দিতে রাজি হল না। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে যে স্প্যানিয়ার্ডরা ছিল তাদের সঙ্গে এদের বেশ সদ্ভাবই ছিল, কারণ স্প্যানিয়ার্ডরা বাণিজ্যের চেয়ে ধর্ম নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকত। ব্রিটিশ আর ওলন্দাজ ভাগ্যান্বেষীরা এল নূতন দুটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে; ধর্মের বালাই এদের ছিল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুই দলে লড়াই বাধল।

সওয়া-শো বছরেরও বেশি কাল ধরে পর্তুগীজরা প্রাচ্য-অঞ্চলে রাজত্ব করে এসেছে। শাসিত প্রজারা এদের মোটেই পছন্দ করত না; অসন্তোষও লেগেই ছিল। ইংলণ্ড আর হল্যাণ্ডের বণিক-প্রতিষ্ঠান দুটি এসে এই অসন্তোষকে কাজে লাগাল; এদের সাহায্যে অধীন প্রজারা পর্তুগীজদের শাসন থেকে মুক্তি অর্জন করল। তার কিছু দিন পরেই কিন্তু এরা নিজেরা পর্তুগীজদের শূন্য আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিল। ভারতবর্ষ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিপতি হিসেবে এরা প্রজাদের কাছ থেকে, খুব মোটারকম কর বসিয়ে এবং আরও অনেক উপায়ে, রাজস্ব আদায় করে নিত; এর দ্বারা ইউরোপের উপর বিশেষ দায় না চাপিয়েও বিদেশী বাণিজ্য চালাবার ভারি সুবিধা হয়ে গেল। এর আগে ইউরোপের পক্ষে বড়ো মুশকিলই ছিল প্রাচ্যদেশগুলি থেকে যত মাল যাচ্ছে তার দাম চুকিয়ে দেওয়া; সেটা এখন আর কঠিন থাকল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংলণ্ড ভারতীয় পণ্যের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে খুব মোটা হারে শুল্ক বসিয়ে তার আমদানি কমাতে চেষ্টা করেছিল, সে ইতিহাস আমরা দেখেছি। এই অবস্থা অনেক দিন চলল, তার পর এল শিল্পবিপ্লব।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশের সঙ্গে ওলন্দাজদের কলহ বেশি দিন চলল না; ব্রিটিশরা পিছিয়ে চলে এল। তারা তখন ভারতবর্ষে নূতন কাজের সন্ধান পেয়েছে, তাই নিয়ে তাদের হাত জোড়া। সুতরাং, ইস্ট-ইণ্ডিজের এই দ্বীপগুলি সমস্তই রয়ে গেল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে। বাদ গেল একমাত্র ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ, সেটা তখনও স্পেনের অধীন। স্প্যানিয়ার্ডরা ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে বড়ো-একটা যেতে চায় না, নূতন জায়গা দখলেরও চেষ্টা করছিল না তারা। কাজেই এই অঞ্চলটিতে এখন আর ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ রইল না।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেমন করেছিল, এই ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও ঠিক তেমনি করে গ্যাঁট হয়ে বসল; তাদের চেষ্টা, কী করে যথাসম্ভব টাকা আয় করে নেওয়া যায়, ...ত বড়োলোক হয়ে ওঠা যায়। এক শো পঞ্চাশ বছর ধরে এই বণিক-দল এই দ্বীপগুলোতে রাজত্ব ...। প্রজার মঙ্গলের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি দিল না এরা; খালি তাদের বুকের উপর চেপে বসে ...কে পীড়ন করতে লাগল, আর যতখানি সম্ভব রাজস্ব নিংড়ে আদায় করতে লাগল। যেখানে দেখা
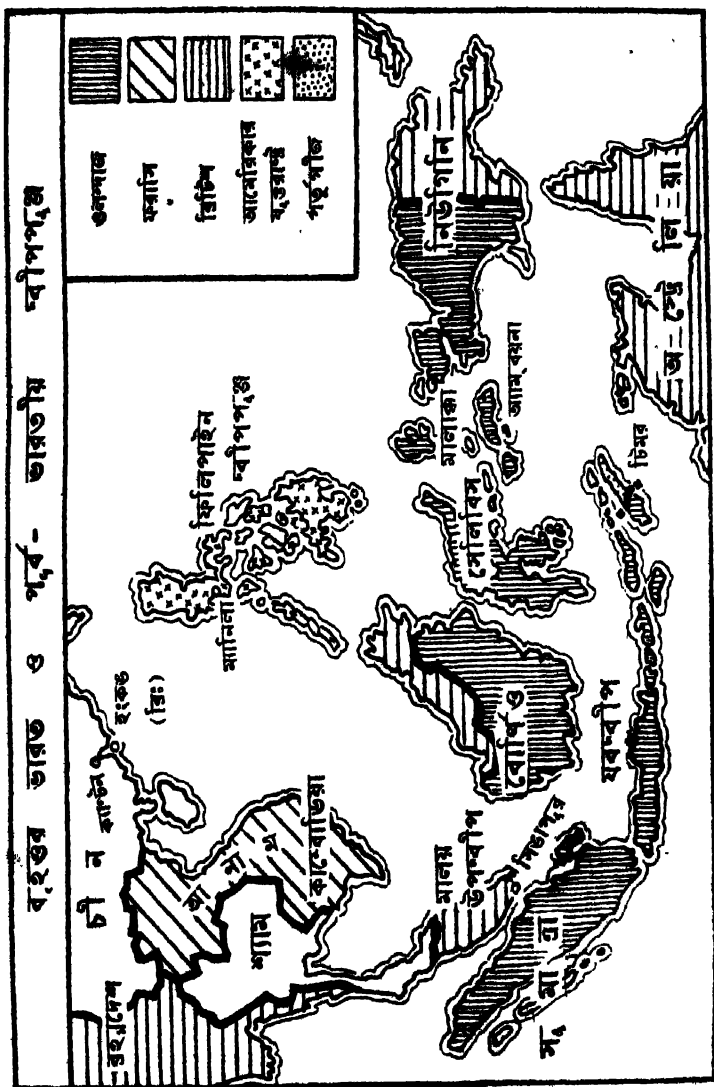
গেল রাজস্ব বলেই সহজে টাকা আদায় করা যাচ্ছে সেখানে বাণিজ্যও হয়ে উঠল গৌণ বস্তু, সেটা অযত্নেই নষ্ট হয়ে গেল। শাসনব্যাপারে এদের অক্ষমতার সীমা ছিল না; এদের চাকরি নিয়ে যে ওলন্দাজরা সেখানে যাচ্ছিল তারাও ছিল ঠিক ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সদস্য বা কর্মচারীদেরই মতো ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশূন্য ভাগ্যান্বেষী দুর্বৃত্ত। সদুপায়ে হোক অসদুপায়ে হোক, টাকা আয় করাটাই ছিল এদের একমাত্র লক্ষ্য। ভারতবর্ষে তবু দেশের অর্থসম্পদ অনেক বেশি, সেখানে হয়তো অনেকখানি কুশাসনকেও তার জোরে সামলে নেওয়া চলত; তা ছাড়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের অনেকে যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন, তার ফলে তথাকার প্রজার উপর পীড়ন পড়লেও উপরকার শাসনব্যবস্থাটা অন্তত কর্মক্ষম হত। তবু মনে রেখো, এখানেও ১৮৫৭ সনের বিরাট বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়ে গিয়েছিল।

ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুর্বৃত্ততা ক্রমেই চরমে উঠল। শেষে ১৭৯৮ সনে নেদারল্যাণ্ডের শাসনকর্তৃপক্ষ প্রাচ্যদেশের এই দ্বীপগুলির শাসনভার সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। এর কিছু দিন পরেই, ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হল, হল্যাণ্ড নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়ে গেল। ইংরেজ সরকার সেই সুযোগে এই দ্বীপগুলো দখল করে বসলেন। পাঁচ বছর যাবৎ এদের গণ্য করা হল ব্রিটিশ-ভারতের একটি প্রদেশ বলে। এই সময়ে এখানে অনেকখানি সংস্কারসাধন করা হয়। নেপোলিয়নের পতনের ফলে ইস্ট-ইণ্ডিজ আবার হল্যাণ্ডের হাতে ফিরে চলে গেল। যে পাঁচ বছর কাল জাভা ব্রিটিশ-ভারতের সরকারের হাতে ছিল, সেই সময়ে জাভার লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট্ গভর্নর ছিলেন একজন ইংরেজ, তাঁর নাম টমাস স্ট্যাম্‌ফোর্ড্ র‍্যাফ্‌ল্‌স্। এই উপনিবেশে ডাচদের শাসনপ্রথার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এর ইতিহাস হচ্ছে একটা অভূতপূর্ব প্রবঞ্চনা, ঘুষ, নরহত্যা ও নীচতার কাহিনী।" নানারকম অসৎকাজই এই ডাচ কর্মচারীরা করত, তার মধ্যে একটি বেশ নিয়মিত ব্যাপার ছিল, সেলিবিস থেকে মানুষ চুরি করে এনে জাভায় তাদের ক্রীতদাস বলে ব্যবহার করা। এই মানুষ-চুরি-অভিযানের একটি অঙ্গই ছিল লুণ্ঠন ও নরহত্যা।

নেদারল্যাণ্ডের সরকার যখন স্বয়ং শাসন করতে গেলেন, তারও স্বরূপ এই কোম্পানির শাসনের চেয়ে বিশেষ ভালো দাঁড়াল না। বরং কোনো কোনো ব্যাপারে প্রজার উপরে পীড়ন আরও বেড়ে গেল। বাঙলাদেশে নীলচাষের কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম, হয়তো মনে আছে, চাষির তাতে দুঃখকষ্টের চরম হয়েছিল। জাভাতে এবং অন্যান্য জায়গাতেও ঠিক ঐ রকমের একটা প্রথা প্রবর্তিত করা হল, বরং সেটা ছিল আরও খারাপ। কোম্পানির আমলে প্রজাদের জোর করে মাল সরবরাহ করানো হত। এখন একটি নূতন প্রথা প্রবর্তন করা হল, এর নাম 'কাল্‌চার সিস্‌টেম'। এতে প্রজা বছরে কিছু দিন করে কাজ করে দিতে বাধ্য থাকত। নামে এই সময়টা ছিল, চাষি মোট যতক্ষণ কাজ করতে পারে তার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের মতো। কাজে কিন্তু অনেক সময়ে প্রজার প্রায় সমস্তটা সময়ই তাকে খাটিয়ে নেওয়া হত। ডাচ সরকার কাজ চালাতেন ঠিকাদার দিয়ে; সরকার থেকে এই ঠিকাদারদের বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়া হত। ঠিকাদাররা সেই জোর-করে-খাটানো লোকদের দিয়ে দেশের জমি চাষ করাত। জমির ফসল সরকার ঠিকাদার আর চাষি, এই তিনজনের মধ্যে ভাগ হবার কথা থাকত, কে কতটা অংশ পাবে তারও একটা হিসেব স্থির করা ছিল। চাষির অংশটা নিশ্চয়ই হত সকলের চেয়ে কম; ঠিক কতখানি সেটা আমি জানি নে। এর উপর সরকার আবার আইন করে দিলেন, দেশের জমির খানিক অংশে বিশেষ কতকগুলো জিনিষের চাষ করতেই হবে, কারণ ইউরোপের বাজারে তার দরকার আছে। এইসব জিনিষের মধ্যে ছিল চা কফি চিনি নীল ইত্যাদি। বাঙলাদেশের নীলচাষের মতো এখানেও এই ফসলগুলোর চাষ প্রজাকে করতেই হত, অন্যান্য ফসলের চেয়ে এতে তার লাভ যদি কম থাকে তবুও।

ডাচ সরকারের বিপুলরকম লাভ হতে লাগল, ঠিকাদাররা ফেঁপে উঠল, চাষিরা অনাহারে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভয়ংকর একটা দুর্ভিক্ষ হয়ে অসংখ্য লোক মারা পড়ল। কর্তারা সেই প্রথম ভাবলেন, চাষিদের বাঁচাবার জন্যেও কিছু

ব্যবস্থা করা দরকার। ধীরে ধীরে চাষির অবস্থার উন্নতিও হল। কিন্তু ১৯১৬ সন পর্যন্ত সেখানে জোর করে চাষিকে খাটানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-অর্ধেকে ডাচরা শিক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপারে কতকগুলি সংস্কার-সাধন করেছে। ইতিমধ্যে দেশে নূতন একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে, স্বাধীনতার দাবি নিয়ে একটা জাতীয় আন্দোলনও শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের মতো এখানেও এরা ধীরে ধীরে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছে; কয়েকটি দুর্বল ব্যবস্থাপক সভাও সৃষ্টি করা হয়েছে, যদিও আসলে তাদের ক্ষমতা প্রায় কিছুই নেই। বছর-পাঁচেক হল ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজে একটা বিপ্লব হয়েছিল, তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাতে দমন করা হয়েছে। কিন্তু জাভায় এবং এরই অন্যান্য দ্বীপগুলিতে স্বাধীনতার কামনা মানুষের মনে জেগে উঠেছে; হাজার নিষ্ঠুরতা আর পীড়ন দিয়েও আর তাকে রোধ করা সম্ভব হবে না।

ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজকে এখন বলা হয় নেদারল্যাণ্ড্স্-ইণ্ডিয়া। প্রতি পনেরো দিন অন্তর একখানি করে ডাচ বিমান হল্যাণ্ড থেকে ইউরোপ এবং এশিয়া পার হয়ে জাভার ব্যাটাভিয়া-শহর পর্যন্ত চলাচল করে।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলির সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ হল। এবার সমুদ্র পার হয়ে আবার এশিয়া মহাদেশে এসে ওঠো। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলবার নেই। এই দেশটা অনেক সময়েই উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যেত, তার পর দুটো অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকত। কখনও-বা এক-একজন শক্তিশালী রাজা এসে দুটোকে একত্র করে ফেলতেন; এমনকি পাশের রাজ্য শ্যামকে পর্যন্ত জয় করে বসতেন। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাধল ব্রিটিশের সঙ্গে ব্রহ্মের যুদ্ধ। ব্রহ্মের রাজা নিজের শক্তির অহংকারে দৃপ্ত হয়ে আসাম আক্রমণ এবং দখল করে বসলেন। এর ফলে ১৮২৪ সনে ভারতবর্ষের ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রথম যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে আসাম আবার ব্রিটিশের অধিকারে চলে এল। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা জেনে ফেলেছে যে, ব্রহ্মের সরকার ও তার সেনার শক্তি বিশেষ কিছু নেই। অতএব সমস্ত দেশটাকেই জয় করে নেবার ইচ্ছে তাদের জেগে উঠল। অদ্ভুত সব ছুতোনাতা ধরে ব্রহ্মের সঙ্গে পর পর আরও দুবার যুদ্ধ বাধানো হল; ১৮৮৫ সনের মধ্যে সমস্ত রাজ্যটাই ব্রিটিশরা জয় করে ফেলল এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। তখন থেকেই ব্রহ্মের ভাগ্য ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; এখন আমরা বাঁচি তো একসঙ্গে বাঁচব, মরলেও একসঙ্গেই মরব।

ব্রহ্মের দক্ষিণে মালয়-উপদ্বীপেও ব্রিটিশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই সিঙাপুর-দ্বীপ তাদের হস্তগত হয়। অবস্থানটি খুব ভালো বলে এটি অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটি বড়ো বাণিজ্য-প্রধান শহর হয়ে উঠল; দূর-প্রাচ্যের দিকে যত জাহাজ যায় তারা সকলেই এর বন্দরে একবার করে ভিড়ে যেতে লাগল। এই উপদ্বীপের আরও উপর দিকে ছিল পুরোনো দিনের বন্দর মালাক্কা; সেও অল্প দিনের মধ্যেই পিছনে পড়ে গেল। সিঙাপুর থেকে ব্রিটিশরা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। মালয়-উপদ্বীপের মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল, তাদের অনেকেই শ্যামের অধীনস্থ সামন্ত-রাজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে দেখা গেল, এই রাজ্যগুলো সমস্ত ব্রিটিশের রক্ষণাধীন হয়ে গেছে—এদের একত্র করে ব্রিটিশরা একটা যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাজ্য সৃষ্টি করল, তার নাম হল 'মালয়-যুক্তরাষ্ট্র'। এর কতগুলি রাজ্যে শ্যামের কিছু কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেসমস্ত অধিকার শ্যাম ব্রিটিশকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

ইউরোপীয় জাতিরা এইভাবে শ্যামকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলছিল। পশ্চিমে আর দক্ষিণে, ব্রহ্মে আর মালয়ে ইংরেজরা রাজত্ব করছে; পূর্বে ফরাসিরা যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং আনামকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আনাম নিজেকে চীনের প্রজা বলে স্বীকার করত, কিন্তু চীনের দোহাই দিয়েও বিশেষ কিছু কাজ হল না। আনাম দোহাই দিয়ে বলল, সে চীনের অধীন, কিন্তু তাতে তার উপায় হল না—চীন নিজেই তখন বিপন্ন। ফরাসিদের আনাম-আক্রমণ নিয়ে ফ্রান্স আর চীনের মধ্যে যুদ্ধ বাধল; চীন সম্বন্ধে অল্পদিন আগের একটি চিঠিতে আমি তোমাকে এই যুদ্ধের

বলেছি, মনে আছে বোধ হয়। যুদ্ধের ফলে ফরাসিরা একটু বাধাও পেয়ে গেল, কিন্তু সে অতি অল্পকালের জন্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-অর্ধেকে ফরাসিরা আনাম ও কাম্বোডিয়াকে একত্র করে প্রকাণ্ড একটি উপনিবেশ গড়ে তুলল, তার নাম হল 'ফরাসি-ইন্দোচীন'। কাম্বোডিয়া ছিল শ্যামের অধীন-রাজ্য; এই কাম্বোডিয়াতেই প্রাচীনকালে যশস্বী সম্রাট আঙ্কোরের সাম্রাজ্য ছিল। শ্যামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার হুমকি দিয়ে ফরাসিরা কাম্বোডিয়া হস্তগত করে নিল। একটা কথা লক্ষ্য করবার মতো; এইসব দেশে প্রথম দিকে ফরাসিরা যত কূটনীতির চাল দেখিয়েছে তার সবই হয়েছে ফরাসি মিশনারিদের হাত দিয়ে। কে জানে কী কারণে এইরকম একজন ফরাসি মিশনারিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়; এর দরুন ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্যেই প্রথমবার ফরাসি-সেনার অভিযান হয় ১৮৫৭ সনে। এই সেনা দক্ষিণে সাইগন-বন্দরটি দখল করে নিল। তার পর সেখান থেকে ফরাসিদের আধিপত্য ক্রমে আরও উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়ে গেল।

এশিয়ার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রগতির এই কদর্য কাহিনী বলতে গিয়ে একই গল্প বারবার আবৃত্তি করতে হচ্ছে। এদের কর্মপন্থা সর্বত্র প্রায় একই রকমের হত; প্রায় সমস্ত জায়গাতেই এরা সিদ্ধিও লাভ করল। আমি তোমাকে একটির পর একটি করে দেশের কথা বলেছি, এবং তাদের কোনো-একটা ইউরোপীয় জাতির অধীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বলে অন্তত তখনকার মতো সে কাহিনীটা শেষ করেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটিমাত্র দেশকে এই দুর্ভাগ্য সইতে হয় নি, সেটি হচ্ছে শ্যাম।

ব্রহ্মদেশে ইংরেজ, আর ইন্দোচীনে ফরাসি, শ্যাম পড়ে গিয়েছিল এই দুইয়ের মাঝখানটিতে। তবু সে স্বাধীন থাকতে পেরেছে, এটা ভাগ্যের কথা। খুব সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুটি ইউরোপীয় জাতির ডাইনে-বাঁয়ে অবস্থিতির জন্যেই সে বেঁচে গিয়েছিল। তার এই সৌভাগ্যের আরও একটা কারণ ছিল, তার শাসনব্যবস্থাটি ছিল মোটামুটি ভালো, আর অন্যান্য দেশের মতো তার আভ্যন্তরীণ জীবনেও কোনোরকম অশান্তি ছিল না। শুধু শাসনব্যবস্থা ভালো বলেই অবশ্য কেউ বিদেশীর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় না। শ্যামের কপালগুণে ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত ছিল ভারতবর্ষ আর ব্রহ্মদেশ নিয়ে; ফরাসি ব্যস্ত ছিল ইন্দোচীন নিয়ে। এরা দুজন ধীরে ধীরে এগিয়ে শ্যামের সীমান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছল ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে; অন্যের দেশ দখল করে নেবার দিন তখন প্রায় চলেই গেছে। প্রাচ্যদেশে তখন বিদ্রোহের চেতনা জেগে উঠেছে, উপনিবেশ আর অধীন রাজ্যগুলিতেও স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে। কাম্বোডিয়া নিয়ে শ্যাম এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটে উঠেছিল, শ্যাম কাম্বোডিয়া ছেড়ে দিয়ে সে যুদ্ধকে এড়িয়ে গেল। পশ্চিম দিকে একটি দুর্গম পর্বতশ্রেণী শ্যামকে ব্রহ্মদেশে অবস্থিত ব্রিটিশদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিল।

আমি বলেছি, অতীতকালে অন্তত দুবার ব্রহ্মের রাজারা শ্যাম আক্রমণ করেছিলেন, দখল পর্যন্ত করেছিলেন। এর শেষ আক্রমণ হয় ১৭৬৭ সনে, তাতে শ্যামের রাজধানী অযুথিয়া বা অযুধিয়া (ভারতীয় নাম এইসব দেশে কতখানি পাওয়া যায় সেটা দেখবার মতো) -শহর ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যেই প্রজারা বিদ্রোহ করে এবং বর্মীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়; ১৭৮২ সনে রাজা প্রথম রাম শ্যামদেশের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, নূতন একটি রাজবংশের সেই শুরু হয়। তখন থেকে আজ ঠিক এক শো পঞ্চাশ বছর হল, আজও সেই বংশেরই রাজারা শ্যামে রাজত্ব করছেন; বোধ হয় এঁদের প্রত্যেক জন রাজারই নাম 'রাম'। এই নূতন রাজবংশের আমলে শ্যামের শাসনব্যবস্থা বেশ ভালো—যদিও বোধ হয় একটু পিতৃত্বভাবাপন্ন—হয়ে উঠল। এঁরা একটা খুব বড়ো সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন, বিদেশী জাতিদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলবার চেষ্টা করলেন। শ্যামের বন্দরগুলোতে বিদেশীদের বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হল, কতকগুলো বিদেশী জাতির সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপন করা হল, শাসনব্যবস্থাতেও কিছু কিছু সংস্কারসাধন করা হল। দেশের নূতন রাজধানী বসানো হল ব্যাঙ্কক-শহরে; এখনও রাজধানী ব্যাঙ্ককেই আছে। কিন্তু এত করেও সাম্রাজ্যবাদী নেকড়েদের দূরে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ইংরেজরা মালয়ে রাজ্য-বিস্তার করল, এবং সেখানে শ্যামের কিছু জমি দখল করে বসল; পূর্বে ফরাসিরা কাম্বোডিয়া এবং

আরও কিছু শ্যামের জমি নিয়ে নিল। ১৮৯৬ সনে শ্যামকে নিয়েই ইংরেজ আর ফরাসিদের মধ্যে হাতাহাতি বাধবার উপক্রম হল। যুদ্ধ অবশ্য হল না, সাম্রাজ্যবাদীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে দুজনেই অঙ্গীকার করল, শ্যামের রাজ্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার অক্ষুন্নতা এরা দুজনে মিলে রক্ষা করবে; তার পর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই এই স্থানটুকুকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে তিনটি 'কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে' পরিণত করল! এর পুব দিকের খণ্ডটি থাকল ফরাসিদের কর্তৃত্বে, পশ্চিমের অংশটি ব্রিটিশদের হেপাজতে, আর দুয়ের মাঝখানে রইল একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল, সেখানে এরা দুজনেই ইচ্ছেমতো চরে খেতে পারবে। এইভাবে শ্যামের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখবার আশ্বাসবাক্য অত্যন্ত নিষ্ঠা-সহকারে উচ্চারণ করে, ঠিক তার অল্প কয়েক বছর পরেই ফরাসিরা পুব দিকে শ্যামের আর-খানিকটা জমি দখল করে নিল; ইংলণ্ড আর করে কী, তাকেও বাধ্য হয়েই তখন ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু জমি নিয়ে নিতে হল।

তবু এত কাণ্ড সত্ত্বেও শ্যামের একটা অংশ আজ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের অধীন না হয়ে টি'কে আছে; এশিয়ার এই অঞ্চলে এইটেই একমাত্র দেশ যে এটা পেরেছে। ইউরোপীয়দের রাজ্য-বিস্তারের প্রবাহ এখন শেষ হয়েছে; এর পরেও এশিয়াতে তারা আরও জায়গা দখল করবে এমন সম্ভাবনা বিশেষ নেই। এশিয়াতে এখন যে ইউরোপীয়রা রাজত্ব করছে এদেরও পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে দেশে ফিরে যেতে হবে; সে দিনেরও আর দেরি নেই।

অল্পদিন আগেও শ্যামে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল। কিছু কিছু শাসন-সংস্কার হয়েছে, তবু সামন্ত-প্রথা অনেকখানিই টি'কে ছিল। কয়েক মাস হল শ্যামে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে, একটা অহিংস বিপ্লব; এতে বোধ হয় উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই অগ্রণী হয়েছিল। যেমন হোক একটা ব্যবস্থাপক সভাও তৈরি হয়েছে। শ্যামের রাজা, ইনি প্রথম রামের বংশধর, বুদ্ধিমানের মতো এই পরিবর্তনে সম্মতি দিয়েছেন, কাজেই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় নি। অতএব শ্যামে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার আর মাত্র একটি দেশের কথা আমাদের আলোচনা করতে হবে—ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ। এই চিঠিতেই তারও কথা আমি লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু রাত অনেক হল, আমিও পরিশ্রান্ত, আর চিঠিও এমনিতেই অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এ বছর, এই ১৯৩২ সনে, তোমাকে আমার এই শেষ চিঠি লেখা। পুরোনো বছর শেষ হয়ে গেছে, এখন শেষ নিশ্বাস পড়ছে তার। ঠিক আর তিনটি ঘণ্টা পরেই তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে, থাকবে শুধু তার অতীত স্মৃতি!

১২০

আর-একটি নববর্ষের দিন

নববর্ষ, ১৯৩৩

আজ নববর্ষ। সূর্যের চতুর্দিক ঘিরে পৃথিবীর আর-একটি চক্কর দেওয়া সম্পূর্ণ হল। পৃথিবীর কোনো পর্বদিন নেই, নেই কোনো ছুটি; অবিরাম গতিতে সে শূন্যপথে ছুটে চলেছে। তার বুকের উপরে অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণী ঘুর্‌ঘুর্‌ করে বেড়াচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করছে, বুদ্ধিহীন দর্পের ভরে নিজেদের মনে করছে সৃষ্টির সারবস্তু, বিশ্বের নিয়ন্তা—তাদের ভাগ্যে কী হল না-হল সে নিয়ে পৃথিবীর কিছুমাত্র চিন্তা নেই। পৃথিবী তার সন্তানদের কথা ভাবে না; কিন্তু আমরা নিজেদের কথা না ভেবে পারি না তো! নববর্ষের দিনে অনেকেই আমরা জীবনের যাত্রাপথে একটুক্ষণ থেমে বিশ্রাম নিই, একবার পিছন ফিরে তাকাই, অতীতের হিসেব-নিকেশ করি; আবার সামনে মুখ ফেরাই, ভবিষ্যতের জন্যে আশা-সঞ্চয়ের চেষ্টা করি। আমিও

তাই আজ অতীতের কথা ভাবছি। কারাগারে এই আমার পর পর তৃতীয়বার নববর্ষের দিন এল; মাঝখানে একবার অবশ্য বেশ কয়েকটা মাস বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে যেতে পেরেছিলাম। আরও বেশি আগের কথা যদি বলি, দেখা যাচ্ছে গেল এগারো বছরের মধ্যে আমার পাঁচটি নববর্ষের দিনই কেটেছে কারাগারে। আরও কত দিন, আরও কত নববর্ষের দিন এমনি করে কারাগারে আমার কাটাতে হবে, বসে বসে তাই ভাবছি।

কিন্তু জেলখানার ভাষায় আমি এখন একজন 'দাগি' হয়ে গেছি, তাও বহু বারের দাগি, জেলখানায় থাকা আমার বেশ অভ্যাসও হয়ে গেছে এতদিনে। আমার বাইরের জীবনের সঙ্গে এর আশ্চর্য তফাত। বাইরে আমার দিন কাটে কাজকর্ম, বড়ো বড়ো সভা-সমিতি, বক্তৃতা আর এখানে-ওখানে ছুটোছুটি নিয়ে। এখানে তার কিছু নেই; সমস্ত শান্ত, নড়াচড়ারও বালাই নেই আমার; দীর্ঘ কাল ধরে আমি চেয়ারে বসে বসে কাটাই, অনেক সময় চুপ করেই বসে থাকি। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আসে আর চলে যায়, একটা থেকে আর-একটাকে আলাদা করে দেখবার মতো বৈচিত্র্যও কিছু থাকে না তাদের মধ্যে। অতীতটাকে মনে হয় যেন একটা আবছায়া ছবি, তার কোনো-কিছুই স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে না। গত কাল বলতে মনে পড়ে গ্রেপ্তার হওয়ার দিনটিকে; তার পরে আজ পর্যন্ত মাঝখানের দিনগুলো সমস্তই যেন ফাঁকা, তার কোনো চিহ্নই মনের উপর পড়ে নি। এ যেন একেবারে উদ্ভিদের জীবন, একই জায়গাতে শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছি, বেঁচে আছি; সে অস্তিত্বের কোনো বর্ণনা নেই, যুক্তি নেই, নিঃশব্দ নিশ্চল অস্তিত্ব। অনেকসময় বাইরের জগতের ঘটনাগুলো কারাগারে আবদ্ধ বন্দীর কাছে আশ্চর্য, একটু-বা বিস্ময়কর বলেই, মনে হয়; সে যেন কত দূরের কত অবাস্তব ঘটনা, যেন ছায়ামূর্তির অভিনয়। তখন আমাদের মধ্যে দুটো প্রকৃতি গজিয়ে ওঠে, একটা সক্রিয় একটা নিষ্ক্রিয়; আসে দু রকমের জীবনযাত্রা, আলাদা দুটো ব্যক্তিত্ব, ঠিক যেন ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইড। রবার্ট লুই স্টিভেন্‌শনের লেখা এই গল্পটি তুমি পড়েছ নিশ্চয়?

তবু সময়ে সবই অভ্যাস হয়ে যায়, জেলখানার কর্মসূচী আর একঘেয়েমি পর্যন্ত। তা ছাড়া বিশ্রামও দেহের পক্ষে প্রয়োজন, শান্তি প্রয়োজন মনের পক্ষে—এর ফলে আমরা ভাবতে শিখি।

এবার হয়তো তুমি বুঝবে, তোমাকে এই চিঠিগুলো আমি লিখেছি কেন। তোমার হয়তো এগুলো পড়তে ভালো লাগে না; মনে হয়, কী বিরক্তিকর আর কী লম্বা! কিন্তু এই চিঠিগুলোই আমার কারাজীবনের দিনগুলোকে ভরে তুলেছে, একটা করবার মতো কাজ দিয়েছে আমাকে, সে কাজে প্রচুর আনন্দ। আজ থেকে ঠিক দু বছর আগে, এমনি একটি নববর্ষের দিনে নাইনি জেলে বসে আমি এই চিঠি লেখা শুরু করেছিলাম। আবার জেলে ফিরে এসেও সেই চিঠি লেখাই আমি চালিয়ে যাচ্ছি। কখনও-বা আমি একটানা অনেক সপ্তাহ ধরে মোটেই চিঠি লিখি নি, আবার কখনও-বা প্রত্যেক দিনই লিখেছি। লেখার ঝোঁক যখন চেপেছে, কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছি, তখন যেন বিচরণ করেছি অন্য একটি জগতে, সেখানে তুমি আছ আমার প্রিয়সঙ্গিনী, জেলখানা আর তার কাণ্ড-কারখানাকে একেবারেই ভুলে গেছি। কাজেই এই চিঠিগুলো আমার কাছে ছিল যেন জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতীক।

এই-যে চিঠিটা এখন লিখছি এটার ক্রমিক-সংখ্যা হচ্ছে ১২০। মাত্র নয় মাস হল বেরিলি জেলে বসে এই সংখ্যার প্রথম চিঠিটা লিখেছিলাম। এর মধ্যেই এতখানি লিখে ফেলেছি, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। এই পর্বতপ্রমাণ চিঠি যখন একেবারে একসঙ্গে গিয়ে তোমার ঘাড়ে অবতীর্ণ হবে তখন তুমি কী ভাববে আর বলবে, সেটা ভেবেও ভয় পাচ্ছি। কিন্তু জেলখানাকে একটুখানি ফাঁকি দিলাম, একটুখানি বাইরে বেড়িয়ে এলাম, এতে তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে না! মানিক আমার, তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে সাত মাসেরও বেশি হল। কী দীর্ঘ এই সময়টা!

আমার চিঠিতে যে গল্প বলেছি সে শ্রুতিমধুর নয়। ইতিহাস বস্তুটাই অমধুর। অসীম প্রগতি হয়েছে মানুষের, তার দরুণ তার গর্বেরও অবধি নেই; কিন্তু আজও সে একটা অত্যন্ত অকরুণ স্বার্থপর জানোয়ারই হয়ে আছে। তবুও হয়তো মানুষের সেই স্বার্থপরতা কলহপ্রিয়তা

আর অকরুণোর দীর্ঘ এবং কালিমাচ্ছন্ন ইতিহাস ভেদ করে প্রগতির অরুণ আলোর দেখা মেলে। আমি লোকটা একটু আশাবাদী, একটু ভরসার দৃষ্টি নিয়েই সব-কিছুকে দেখতে চাই আমি। কিন্তু আশাবাদী হয়েও এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের চার পাশে পাপের আর অন্ধকারের অভাব নেই; ভুললে চলবে না যে, না ভেবেচিন্তে আশা করতে গেলে সেই আশাই অস্থানে গিয়ে ন্যস্ত হবার ভয়। আমাদের এই জগৎটা চিরকাল যা ছিল এবং এখনও যা আছে, তা দেখে এখনও আশা করবার মতো জোর বিশেষ খুঁজে পাই নে। আদর্শবাদীর পক্ষে, এবং যা শোনে তাই নির্বিচারে বিশ্বাস করে নিতে যার দ্বিধা আছে তার পক্ষে, বড়ো কঠিন স্থান এটা। নানান রকমের প্রশ্ন জেগে ওঠে যার কোনো সহজ উত্তর নেই; নানান রকমের সংশয় জেগে ওঠে যার সহজ মীমাংসা নেই। এতখানি মূঢ়তা, এতখানি দুঃখ জগতে থাকবে কেন? অতি পুরোনো প্রশ্ন; আমাদেরই এই দেশে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে এই প্রশ্নটিই ব্যাকুল করে তুলেছিল। গল্প শোনা যায়, এই প্রশ্ন তিনি বার বার নিজেকে করেছিলেন; তার পরে, তবেই এল তাঁর সত্যের উপলব্ধি, তিনি বুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নাকি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছিলেন :

"এ কী করে হয় যে, ব্রহ্ম জগৎকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তাকে দুঃখে রেখেছেন ডুবিয়ে? কারণ, সর্বশক্তিমান হয়েও যদি তিনি একে দুঃখেই রেখে থাকেন তবে তিনি মঙ্গলময় নন। আর শক্তিমানই যদি না হন তিনি তবে ঈশ্বর হবেন কী করে?"

আমাদের এই দেশে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চলেছে; তবু আমাদেরই বহু দেশবাসী তার দিকে আদৌ মনোযোগ দিচ্ছেন না, নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি ঝগড়া করে দিন কাটাচ্ছেন, নিজের নিজের দল বা ধর্মগত সম্প্রদায় বা সংকীর্ণ শ্রেণীকে নিয়েই তাঁদের চিন্তা সীমাবদ্ধ; সমগ্র জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথা তাঁরা ভুলে বসে আছেন। আবার অনেকে আছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁদের চোখে নেই, তাঁরা—

> "অত্যাচারীর সঙ্গে মিত্রতা করলেন, তাদের পোষ মানলেন,
> তাদের ফেলে-দেওয়া মুকুট আর মন্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে করলেন পরিধান,
> নিজেকে সজ্জিত করলেন ছিন্ন বস্ত্র আর নূতন-রঙ-করা খোলামকুচি দিয়ে।"

আইন আর শৃঙ্খলার ছদ্মবেশে এখানে রাজত্ব চলেছে অত্যাচারের; যারা তার কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয় তাদেরই ভেঙে চূর্ণ করবার তার চেষ্টা। আশ্চর্য, যে জিনিষটা হবে দুর্বল আর উৎপীড়িতের রক্ষা পাবার আশ্রয়, সেই হয়ে বসেছে উৎপীড়কের হাতের অস্ত্র। এই চিঠিতে আমি ইতিমধ্যেই অন্যদের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করেছি; তবু আরও একটি বচন আমি উদ্ধৃত করব। কথাটি আমার বড়ো ভালো লাগে; আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে এটি ভারি সুন্দর মিলে যায়। এটি যে বইয়ের কথা সেটি মঁতেস্কুর লেখা; ইনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন ফরাসি দার্শনিক, আমার আগের একটি চিঠিতে আমি তোমাকে এঁর নাম বলেছি। কথাটি হচ্ছে :

"আইনের ছায়ার তলায় এবং বিচারের আবরণে যে অত্যাচার সাধিত হয় তার চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার আর নেই; কারণ, সেখানে যে নৌকো তাদের জল থেকে টেনে তুলল তারই তলায় হতভাগ্যদিগকে চেপে ডুবিয়ে মারা হচ্ছে।"

চিঠিটা বড়ো বেশি দুঃখের সুরে লেখা হল; নববর্ষের চিঠির পক্ষে এটা অত্যন্ত অশোভন। বাস্তবিক কিন্তু আমি দুঃখার্ত নই; দুঃখিত হব আমরা কিসের জন্যে? আমরা কাজ করে যাচ্ছি, সংগ্রাম চালাচ্ছি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই তো আমাদের আনন্দ! আমাদের আছেন একজন মহান নেতা, একজন প্রিয় বন্ধু, একজন বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক; তাঁর দৃষ্টি আমাদের মনে শক্তির সঞ্চার করে, তাঁর স্পর্শ এনে দেয় উন্মাদনা; আমরা জানি, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে নিশ্চিত সাফল্য, আজ হোক কাল হোক, তাকে আয়ত্ত আমরা করবই। জীবনের পথে চলতে প্রতি পদে বাধা ভেঙে চলতে হয়, যুদ্ধ করে জয়লাভ করে করে এগোতে হয়। এই যুদ্ধ, এই বাধা যদি না থাকত তবে জীবনটাই হয়ে যেত নিরানন্দ, বৈচিত্র্যহীন।

আর তুমি, আমার প্রিয় কন্যা, তুমি আছ জীবনের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়িয়ে—দুঃখকে বিষাদকে নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার কোনোই প্রয়োজন নেই। জীবনকে এবং তার সমস্ত দানকে তুমি গ্রহণ করবে আনন্দিত প্রসন্ন মুখে; যেসব বাধাবিঘ্ন তোমার পথে থাকবে তাদেরও অভ্যর্থনা করে নেবে, তাদের জয় করে তুমি যে আনন্দ পাবে তার ভরসায়।

আজ তা হলে বিদায় নিই। 'পুনর্দর্শনায় চ'—আশা করা যাক, তার যেন খুব বেশি দেরি না থাকে!

১২১

ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৩

নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে একটু অন্য কথা বলে নেওয়া গেল, এখন আমাদের গল্পটা আবার বলা যাক। এবার বলব ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের কথা; তা হলেই এশিয়ার পূর্ব-অঞ্চলটার কথা বলা শেষ হয়ে যায়। এই দ্বীপগুলোর দিকে আমরা বিশেষ করে মনোযোগ দিচ্ছি কেন? এশিয়াতে এবং অন্যত্র আরও তো কত দ্বীপ রয়েছে, এই চিঠিগুলোর মধ্যে তাদের আমি নাম পর্যন্ত উল্লেখ করছি না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ এশিয়াতে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোর উপরে তার কীরকম প্রতিক্রিয়া হল তাই লক্ষ্য করা। এই অধ্যয়নের পক্ষে আদর্শ সাম্রাজ্য হচ্ছে ভারতবর্ষ; এই শিল্পতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের আর-একটি নূতন এবং খুব লক্ষ্য করবার মতো রীতির দেখা পেলাম আমরা চীনদেশে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসেও আমাদের শিখবার বস্তু আছে। ঠিক এইভাবেই ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসও আমাদের নেড়ে দেখা দরকার। সে দরকার আরও বেশি এই জন্যে যে, এখানে আমরা নূতন একটি জাতির কার্যকলাপ দেখতে পাব। সেদেশটি হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

আমরা দেখেছি, চীনে রাজ্যবিস্তার করতে অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্র ততটা আগ্রহ দেখায় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের বাধা দিয়ে, চীনকেই সাহায্য করেছে। এর কারণ অবশ্য এ নয় যে, তার সাম্রাজ্যবিস্তারে অরুচি ছিল বা চীনের উপরে খুব ভালোবাসা ছিল। এর কারণ হচ্ছে তার নিজের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যার দরুন ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে তার অবস্থার তফাত ছিল। এই ইউরোপীয় দেশগুলো ছিল ছোট্ট একটি মহাদেশের মধ্যে গায়েগায়ে ঠাসাঠাসি হয়ে; এদের লোকসংখ্যাও ছিল বহু, ফলে এদের কারোই হাত-পা মেলে থাকবার জায়গা ছিল না। পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি আর অশান্তিও তাই লেগেই থাকত। শিল্পতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলল, পণ্য-উৎপাদনও ক্রমেই আরও বেড়ে যেতে লাগল, অত পণ্য দেশের বাজারে কাটানো যায় না। লোক বেড়ে যাচ্ছে, তাদের জন্যে খাবার চাই, কারখানার জন্যে কাঁচা মাল চাই, উৎপন্ন পণ্য বেচবার জন্যে বাজার চাই। এইসব প্রয়োজন মেটাবার জরুরি অর্থনৈতিক তাগিদে পড়ে তারা দেশ ছেড়ে দূর-বিদেশে গিয়ে হাজির হল এবং সাম্রাজ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করল।

এইসব প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না। তার দেশের আয়তন প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান; তার প্রজার সংখ্যা তখন বেশি নয়। দেশের মধ্যে সকলের জন্যই প্রচুর জায়গা পড়ে আছে; দেশের অনেক বড়ো বড়ো অঞ্চল তখনও অনাবাদী, সেগুলোকে চাষ-আবাদ করে গড়ে তোলার দিকে প্রজার কর্মশক্তি নিযুক্ত করবারও সুযোগ রয়েছে প্রচুর। রেলপথ তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিমদিকে যাত্রা করল, অগ্রসর হতে হতে ক্রমে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে

পৌঁছল। নিজের দেশে এই সমস্ত কাজ নিয়েই তখন আমেরিকানরা ব্যস্ত ছিল, উপনিবেশ স্থাপন করতে যাবার মতো সময়ও তাদের ছিল না, গরজও ছিল না। একবার তো ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল অঞ্চলে মজুরের এমনই প্রয়োজন পড়ল যে, আমেরিকানরা বাধ্য হয়ে চীনা-সরকারের কাছে অনুরোধ জানাল, আমেরিকায় চীনা মজুর পাঠানো হোক। চীন-সরকার অনুরোধ রাখলেন। পরে আবার এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অনেক ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হল—এর কথা আমি তোমাকে বলেছি। নিজের দেশকে নিয়ে এইরকম ব্যতিব্যস্ত ছিল বলেই আমেরিকানরা ইউরোপীয় জাতিদের সঙ্গে সাম্রাজ্য-অর্জনের পাল্লায় তখন যোগ দেয় নি। চীনের ব্যাপারেও তারা হস্তক্ষেপ করেছিল শুধু তখনই যখন দেখেছে সে না করে আর উপায় নেই, যখন তাদের আশঙ্কা হয়েছে অন্য জাতিরা সে দেশটাকে বুঝি একেবারেই ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করে নিল।

ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ কিন্তু আমেরিকার নিজ শাসনাধীনে এসে গেছে। লোকে বলে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ চালাচ্ছে, কাজেই আমরাও তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এ কথা কিন্তু মনে কোরো না যে, ফিলিপাইন ছাড়া আমেরিকার আর কোনো সাম্রাজ্য নেই। বাইরে থেকে দেখতে অবশ্য এইটেই তার একমাত্র সাম্রাজ্য। আসলে কিন্তু আমেরিকানরা বুদ্ধিমান, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের যেসব অভিজ্ঞতা আর হাঙ্গামা সইতে হচ্ছে তাই দেখে তারা সাবধান হয়ে গেছে, পুরোনো পন্থার কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছে। ব্রিটেন ভারতবর্ষ দখল করে বসে আছে; আমেরিকা সেরকম করে কোনো দেশকে দখল করার হাঙ্গামা স্বীকার করতে চায় না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ধনলাভ, কাজেই তারা অন্য দেশের ধন-সম্পদকে আয়ত্তে আনবারই শুধু চেষ্টা করে। ধন-সম্পদ আয়ত্ত হলেই তখন দেশের প্রজা সহজেই আয়ত্তে চলে আসে, তার পর দেশের জমিও আসতে দেরি হয় না। কাজেই এইভাবে অতি সহজে তারা সে দেশের উপর কর্তৃত্ব করে, তার সম্পদে ভাগ বসায়; সেজন্যে তাকে বেশি কষ্টও করতে হয় না, দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে লড়াইও করতে হয় না। এই অভিনব পন্থাটির নাম হচ্ছে—অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। মানচিত্রে এর ছবি থাকে না। ভূগোল বা মানচিত্র খুলে দেখো, একটা দেশকে হয়তো মনে হবে সে স্বাধীন স্বাবলম্বী। অথচ তার অবগুণ্ঠন খুলে যদি দেখতে পারো দেখবে, সে অন্য কোনো দেশের বা শেষোক্ত দেশের ব্যাঙ্কার আর বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের করায়ত্ত হয়ে আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আছে এই অদৃশ্য সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য অদৃশ্য, কিন্তু এর ফলপ্রসূতা কারও চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র একেই ব্রিটেন নিজের জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে; বাইরে সে দেখাচ্ছে যেন দেশের রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা সেই দেশেরই প্রজার হাতে ছেড়ে দিল। এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার, এর সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

আপাতত অবশ্য আমাদের এই অদৃশ্য অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনার দরকার নেই, কারণ ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে যে সাম্রাজ্য সে মোটেই অদৃশ্য নয়।

ফিলিপাইন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আগ্রহ বাড়বার আরও একটি কারণ আছে, যদিও কারণটা তেমন বৃহৎ নয়। কিছুটা বরং ভাবপ্রবণতারই ব্যাপার। আজকের দিনে এর চেহারাটা স্পেন ও আমেরিকার ধরনে গড়া। কিন্তু এদের পুরোনো সংস্কৃতির সমস্তটাই এসেছিল ভারতবর্ষ থেকে। সুমাত্রা এবং জাভার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ফিলিপাইনে গিয়ে পৌঁচেছিল এবং সমাজ ধর্ম রাজনীতি ইত্যাদি করে এর জীবনযাত্রার প্রায় প্রত্যেকটি দিককেই নূতন করে গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের পুরাণের কাহিনী আর গল্প, এবং আমাদের সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এরা নিজস্ব করে নিয়েছিল। এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অনেক আছে। এদের শিল্পকলার উপরে ভারতীয় প্রভাব খুব স্পষ্ট; এদের আইন এবং কারুশিল্প সম্বন্ধেও সে কথা সত্য। এমনকি, এদের পোশাকপরিচ্ছদ-অলংকারাদিতেও ভারতীয় রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। স্প্যানিয়ার্ডরা তিন শো বছরেরও বেশি দিন এখানে রাজত্ব করেছে এবং এই দীর্ঘ কাল ধরে এই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্নকে নষ্ট করে ফেলতে চেষ্টা করেছে; এইজন্যেই এখন এর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে।

স্পেন এই দ্বীপগুলোকে দখল করতে আরম্ভ করে বহুকাল আগে, ১৫৬৫ সনে। কাজেই এশিয়ার যেসব জায়গাতে ইউরোপের সর্বপ্রথম পদার্পণ হয়, ফিলিপাইন তাদেরই অন্যতম। পর্তুগীজ ব্রিটিশ বা ডাচদের উপনিবেশের তুলনায় এর শাসনব্যবস্থা একেবারেই অন্য রকমের ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যকে এখানে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত না। শাসনপ্রণালীর গোড়ার ভিত্তি ছিল ধর্ম, সরকারি কর্মচারীরাও প্রায় সকলেই ছিলেন মিশনারি বা পাদ্রি। লোকে তাই একে বলতেন 'মিশনারিদের সাম্রাজ্য'। প্রজাদের অবস্থার উন্নতি-সাধনের কোনো চেষ্টাই করা হত না। কুশাসন, অত্যাচার এবং অত্যধিক কর আদায় তো ছিলই, লোককে জোর করে খৃষ্টান বানাবার চেষ্টাও চলত। এইসব কারণে স্বভাবতই প্রজারা অনেকবার বিদ্রোহ করল। ব্যবসা করবার জন্যে চীন থেকে অনেক লোক এইসব দ্বীপে এসে বাড়ি করেছিল। তারা খৃষ্টান হতে রাজি হল না, সুতরাং তাদের উপর প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড চালানো হল। ইংরেজ এবং ডাচ বণিকদের এখানে ঢুকতে দেওয়া হত না। তার এক কারণ, অনেক সময়েই তারা শত্রু বলে গণ্য হত; আর-একটি কারণ তারা ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট। স্প্যানিয়ার্ড্রা রোমান-ক্যাথলিক, অতএব এদের চোখে তারা ছিল স্বধর্মবিরোধী।

অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হতে লাগল। কিন্তু এর একটা সুফল দেখা দিল। অত্যাচারের চাপে দ্বীপগুলোর বিভিন্ন অঞ্চল এবং দল একত্র মিলিত হল, ঊনবিংশ শতাব্দীতেই একটা জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠল। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই দ্বীপগুলোতে বিদেশী বণিকদের প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপারের কিছু কিছু সংস্কার করা হল; ব্যবসাবাণিজ্যেরও উন্নতি হল। ফিলিপাইনবাসীদের একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল। স্প্যানিয়ার্ড্ এবং ফিলিপাইনবাসীদের মধ্যে বিবাহ হত; অনেক ফিলিপাইনবাসীরই দেহে স্প্যানিয়ার্ডের রক্ত ছিল। স্পেনকে ফিলিপাইনবাসীরা তাদের স্বদেশ বলেই জানত, স্পেনের মতামতও দেশে প্রসার লাভ করল। কিন্তু তবুও দেশে স্বাধীনতার কামনা ক্রমে বেড়ে উঠল: এই কামনাকে জোর করে দমন করা হল, সুতরাং তখন এটা হয়ে উঠল বিপ্লবপন্থী। প্রথম দিকে এরা স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা মোটেই ভাবত না; এরা চাইত, এদের একটা স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হোক, আর স্পেনের ব্যবস্থাপক সভায় এদের দু-চারজন প্রতিনিধি নেওয়া হোক। স্পেনের এই সভার নাম ছিল 'কর্টিস্', যদিও এর কর্মশক্তি ছিল সামান্য। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। প্রত্যেক জায়গাতেই জাতীয় আন্দোলনটা শুরু হয় অতি অল্প দাবি নিয়ে; তার পর বাধ্য হয়ে সে ক্রমে চরমপন্থী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত একেবারেই শাসকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন হয়ে উঠতে চায়। প্রজা যেখানে মুক্তির কামনা জানাচ্ছে, সে কামনাকে জোর করে দমন করলে পরে একদিন তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ সুদ্ধই মিটিয়ে দিতে হবে। ফিলিপাইনেও প্রজাদের দাবি বেড়ে চলল, সে দাবি নিয়ে লড়াই করবার জন্যে অনেক স্বদেশী সংগঠন গড়ে উঠল, বহু গুপ্ত সমিতিরও সৃষ্টি হতে লাগল। এই ব্যাপারে খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করেছিল একটি সমিতি—'ইয়ং ফিলিপিনো পার্টি'। তার নেতার নাম ডাঃ জোস রাইজাল। স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনটিকে চেপে মারতে চেষ্টা করলেন। এসব কাজে শাসন-কর্তৃপক্ষদের একটিমাত্র পন্থাই জানা থাকে, তাঁরাও সেই পন্থাই অবলম্বন করলেন—বিভীষিকার সৃষ্টি। রাইজাল এবং আরও বহু নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এটা ১৮৯৬ সনের কথা।

প্রজার ধৈর্য এবার ভাঙল। স্প্যানিশ সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলিই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল; ফিলিপাইনবাসীরা তাদের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করে দিল। পুরো একটি বছর ধরে লড়াই চলল, স্প্যানিয়ার্ডরা কিছুতেই বিপ্লবকে দমন করতে পারল না। তখন তারা অনেকখানি শাসন-সংস্কারের আশ্বাস দিল। বিপ্লবও তাই আপাতত স্থগিত রাখা হল। কাজে কিন্তু স্পেন কিছুই করল না, সুতরাং ১৮৯৮ সনে আবার নূতন করে বিপ্লব আরম্ভ হল।

ইতিমধ্যে অন্য কী-একটা ব্যাপার নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের ঝগড়া হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। ১৮৯৮ সনের এপ্রিল মাসে একটি মার্কিণ নৌবহর

ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করল। ফিলিপাইনের বিদ্রোহী নেতাদের খুব বড়ো আশা ছিল, আমেরিকা এতবড়ো একটা প্রজাতন্ত্রী দেশ, ফিলিপাইনবাসীদের স্বাধীনতা-অর্জনে তারা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। কাজেই এ'রা এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করতে লাগলেন। আবার তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, একটি প্রজাতন্ত্রী সরকারও প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ফিলিপিনো কংগ্রেসের অধিবেশন হল; নভেম্বরের শেষাশেষি একটি শাসনতন্ত্রও খাড়া করা হল। কিন্তু এই কংগ্রেস যখন শাসনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে, ও দিকে স্পেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিল। স্পেনের শক্তি কিছুই ছিল না, বছর শেষ হবার আগেই তারা পরাজয় স্বীকার করল, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল; এই সন্ধির শর্ত অনুসারে স্পেন ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জটি যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিল। এই বিরাট দানকার্যটি করতে তার অবশ্য লোকসান কিছুমাত্র সইতে হল না; ফিলিপাইনের বিদ্রোহীরা তার বহু পূর্বেই সেখানে স্পেনের কর্তৃত্ব খতম করে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবার এই দ্বীপগুলো দখল করবার আয়োজন শুরু করলেন। ফিলিপাইনবাসীরা আপত্তি জানিয়ে বলল, এই দ্বীপগুলো অন্যকে দেবার কোনো অধিকারই স্পেনের নেই। কারণ, সে সময়ে তার দান করবার মতো কোনো স্বত্বই এখানে ছিল না। সে আপত্তি অবশ্য কেউই কানে তুলল না। ঠিক যখন সদ্য-অর্জিত স্বাধীনতার আনন্দে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সেই সময়টিতেই তাদের আবার যুদ্ধ শুরু করতে হল—এবার যুদ্ধ স্পেনের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশি বলবান একটা দেশের সঙ্গে। পুরো সাড়ে-তিনটি বছর ধরে তারা বীরের মতো সংগ্রাম করল, এর মধ্যে কয়েকটি মাস তারা যুদ্ধ করেছিল একটা সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র হিসেবে, তার পরে করেছে গেরিলা-যুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হেরে গেল, দেশে আমেরিকানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। অনেক দিকে অনেক সংস্কার এরা সাধন করল, বিশেষ করে শিক্ষার ব্যবস্থায়। তবু কিন্তু ফিলিপিনোদের স্বাধীনতার দাবি বেঁচে রইল। ১৯১৬ সনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 'জোন্‌স্ বিল' বলে একটি আইন তৈরি করলেন; এর দ্বারা ফিলিপাইনে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হল, কিছু কিছু ক্ষমতাও তার হাতে দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু আমেরিকান বড়োলাটের এই সভার কাজে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আছে; অনেকবার এ'রা হস্তক্ষেপ করেওছেন।

এখন পর্যন্ত এই দ্বীপগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র-সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ হয় নি। কিন্তু তাদের বর্তমান অবস্থাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে ফিলিপিনোরা রাজি নয়; স্বাধীনতার জন্যে তাদের দাবি আর আন্দোলন তারা সমানেই চালিয়ে আসছে। আমেরিকানরা অবশ্য খাঁটি সাম্রাজ্য-বাদীর ভাষায় বহু বার এদের আশ্বাস দিয়েছে—এখানে আমরা রয়েছি কেবল তোমাদেরই ভালোর জন্যে; নিজেদের ভার নিজেরা বহন করার মতো শক্তি তোমরা অর্জন করবামাত্র আমরা তক্ষুনি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব। ১৯১৬ সনের 'জোন্‌স্ বিল'-এ এও বলা হয়েছিল, "যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য চিরদিন যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে—ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সে তৎক্ষণাৎ এদের উপর থেকে তার কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়ে যাবে, এদের স্বাধীন অধিকার স্বীকার করে নেবে।" অবশ্য এত কথা সত্ত্বেও এখনও আমেরিকায় বহু লোক আছে যারা খোলাখুলিই ফিলিপাইনের স্বাধীনতার বিরোধী।

এই কথা লিখতে লিখতেই সংবাদপত্রে খবর দেখছি, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটা সিদ্ধান্ত না ঐরকম কী-একটা ঘোষণাবাক্য প্রকাশ করেছেন; তাতে বলেছেন, আর দশ বছরের মধ্যেই ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হবে।

ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে তার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বিশেষ করে তার গরজের বস্তু হচ্ছে ফিলিপাইনের রবার-বাগান; রবার একটি অত্যন্ত দরকারি জিনিষ যা আমেরিকার নিজের নেই। কিন্তু আমার ধারণা, এই দ্বীপগুলো দখলে রাখতে আমেরিকার যে আগ্রহ তার প্রধান কারণ হচ্ছে, জাপানের ভয়। জাপান দেশটি ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের অত্যন্ত কাছে; জাপানের লোকসংখ্যাও ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, দেশের

মধ্যে আর জায়গা কুলোচ্ছে না তাদের। কাজেই এই দ্বীপগুলোর উপরে জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি থাকা খুবই সম্ভব। আমেরিকার সঙ্গেও জাপানের এমন-কিছু সদ্ভাব নেই। কাজেই ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ কী সে প্রশ্নটা হয়ে পড়ছে অনেক বৃহত্তর একটা প্রশ্নের একটি অংশমাত্র। এর ভাগ্য স্থির হবে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বৃহত্তর জাতিদের পরস্পর-সম্পর্ক কী দাঁড়াবে তাই দিয়ে।

১২২

তিনটি মহাদেশের মিলনস্থল

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৩

পনেরো দিন হল নববর্ষের চিঠি লিখেছি। নববর্ষে যে কামনাগুলি প্রকাশ করেছিলাম তার একটি এরই মধ্যে সফল হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবি নি। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি। তোমাকে এবং আর সবাইকে দেখলাম, এই আনন্দ অনেক দিনের মতো আমার মনকে পূর্ণ করে দিয়েছে, আমার রোজকার কর্মপদ্ধতি উলটে গেছে, আমার নিয়মিত কাজকর্মে পর্যন্ত আমি ফাঁকি দিচ্ছি। ছুটির হাওয়া লেগেছে আমার মনে। আমাদের দেখা হয়েছে চার দিন মাত্র হল, এরই মধ্যে মনে হচ্ছে সে যেন কত যুগ আগেকার কথা! এরই মধ্যে আবার ভবিষ্যতের দিকে ফিরে তাকাচ্ছি, ভাবছি আবার কবে কোথায় আমাদের দেখা হবে।

যাক, ততক্ষণ তো আমার 'মনকে-ধোঁকা-দেওয়া'র খেলা খেলতে পারব আমি, জেলখানার আইনের সাধ্য নেই সে খেলায় বাধা দেয়। তোমাকে এই-যে চিঠিগুলো লিখছিলাম, তাই আবার লিখব বসে বসে।

কিছুদিন ধরে তোমাকে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা লিখছি। প্রথমে চেষ্টা করেছি এই শতাব্দীটি, অর্থাৎ, নেপোলিয়নের পতনের পর শ-খানেক বছর-কাল সম্বন্ধে তোমাকে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে। তার পরে বলেছি কয়েকটি দেশের অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্ণনা। ভারতবর্ষকে আমরা বেশ-একটু ভালো করেই দেখে নিয়েছি; তার পর দেখেছি চীন আর জাপানকে, তারও পরে দেখলাম বৃহত্তর-ভারত এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে। অতএব আমাদের এই বিশদ আলোচনা এখন পর্যন্ত করা হয়েছে শুধু এশিয়ার খানিকটা অংশকে নিয়ে; তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীটাই এখনও দেখতে বাকি। এ অতি দীর্ঘ ইতিহাস; ঋজু এবং স্পষ্ট ভাষায় একে বলে যাওয়া সহজ নয়। আমি একটি একটি করে দেশ ও মহাদেশের নাম করছি, পৃথকভাবে তার কাহিনী বলে যাচ্ছি। বারবার আমাকে পুরোনো দিনের কথায় ফিরে যেতে হচ্ছে, অন্য একটি স্থান সম্বন্ধে একই কালের কথা আবার বলতে হচ্ছে। এর ফলে গল্পগুলো খানিকটা জড়িয়ে যাবেই। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের এই-যে নানা রকমের ঘটনা, এরা ঘটেছে একই সঙ্গে, মোটামুটি একই সময়ে; একটার উপরে আর-একটার প্রভাব এবং প্রতিঘাতও অনেক পড়েছে। এইজন্যই কোনো-একটি দেশের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে; যেসমস্ত ঘটনা এবং বস্তুর জোরে পৃথিবীর অতীত জীবন চলেছে এবং বর্তমান জীবন গড়ে উঠেছে তাদের স্বরূপ ঠিকমতো বুঝতে হলে একেবারে সমগ্র পৃথিবীরই ইতিহাস একসঙ্গে পড়তে হয়। সমগ্র পৃথিবীর তেমন একটা ইতিহাস এই চিঠির মধ্য দিয়ে বলব এমন স্পর্ধা করি নে। তত বড়ো কাণ্ড করার মতো শক্তিও আমার নেই, সে সম্বন্ধে বইয়েরও অভাব নেই বাজারে। এই চিঠিগুলো দিয়ে আমি শুধু চেষ্টা করছি, জগতের ইতিহাসের দিকে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করে দিতে, এর কতকগুলো ব্যাপার তোমাকে বুঝিয়ে দিতে, এবং অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ

পর্যন্ত মানুষের কীর্তিকলাপ যে নানা পথ ধরে বয়ে এসেছে, তারই বিশেষ দু-চারটে সূত্র তোমাকে ধরিয়ে দিতে। সে কাজ কত দূর করতে পারব জানি নে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো-বা আমার শ্রমের ফল হবে এই যে, এগুলো তোমার কাছে একটা জগাখিচুড়ি হয়ে দাঁড়াবে—যাতে সঠিক বিচারবুদ্ধির উন্মেষে তোমাকে যতটা সহায়তা না করবে তার চেয়ে বেশি দিবে তাকে গুলিয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীর জীবনকে ইউরোপই ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; জাতীয়তাবাদের রাজত্ব ছিল সেখানে; সেইখান থেকেই জন্মলাভ ক'রে শিল্পতন্ত্র পৃথিবীর দূরতম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, আবার কোথাও-বা সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করছিল। এই শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে আমরা প্রথমেই যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তাতেই এ আমরা দেখেছি। তার পর ভারতবর্ষে এবং পূর্ব-এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের কী ফল দাঁড়িয়েছে তার বিশদ আলোচনাও খানিকটা করেছি। আবার ইউরোপকে আরও একটু ভালো করে দেখতে যাব আমরা; কিন্তু তার আগে একবার পশ্চিম-এশিয়াটাকে একটুখানি দেখে নিতে হবে। কাহিনীর এই অংশটাকে আমি অনেক দিন ধরেই এড়িয়ে চলে এসেছি। প্রধানত তার কারণ, এই অঞ্চলটির পরবর্তী কালের ইতিহাস আমার নিজেরই তেমন ভালো করে জানা নেই।

পূর্ব-এশিয়া এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার অনেক তফাত। অতি প্রাচীন কালে অবশ্য মধ্য এবং পূর্ব -এশিয়া থেকে বহু জাতি ও উপজাতি এসে এই অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলেছিল। তুর্কিরাও এসেছিল এইভাবেই। খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের আগে বৌদ্ধধর্মও একেবারে এশিয়া-মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে দেশে তার প্রতিষ্ঠা গভীর হয়েছিল মনে হয় না। চিরকাল ধরেই পশ্চিম-এশিয়া তাকিয়ে রয়েছে ইউরোপের দিকে; এশিয়ার বা প্রাচ্যের দিকে ততটা তাকায় নি। সে যেন হয়ে ছিল এশিয়ার ইউরোপ-অভিমুখী বাতায়ন। এশিয়ার বহু স্থলে ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে, কিন্তু তাতেও এর এই পাশ্চাত্য-দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ভারত, চীন বা এদের প্রতিবেশী দেশগুলো কখনও তেমন করে ইউরোপের দিকে তাকায় নি। এরা এশিয়াকে নিয়েই মগ্ন হয়ে ছিল। ভারত আর চীনের মধ্যে প্রভেদ অনেক—জাতিতে দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সংস্কৃতিতে। চীন কোনোদিন ধর্মের দাসত্ব স্বীকার করে নি, পুরোহিতের প্রাধান্যও কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেখানে। ভারতবর্ষ চিরদিন তার ধর্মকে নিয়েই গর্ব করেছে; তার সমাজও চিরকাল রয়েছে পুরোহিতদের মুষ্টিগত হয়ে; বুদ্ধ স্বয়ং শত চেষ্টা করেও তার এই মোহ ঘোচাতে পারেন নি। এমনিতর আরও অনেক ব্যাপার নিয়েই ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের অমিল; তবুও কিন্তু ভারতবর্ষ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত একতা রয়েছে। এই একতার জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে; এইসমস্ত বিভিন্ন জাতিকে সে কাহিনীর সূত্র একত্র বেঁধে দিয়েছে, এদের শিল্প সাহিত্য কলা ও সংগীতের মধ্যে একই ধরনের চেতনার সঞ্চার করেছে।

ইসলামধর্মের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার খানিকটা প্রভাব ভারতবর্ষে এসে পেঁছিল। এই সংস্কৃতির প্রকৃতিই আলাদা; জীবন সম্বন্ধে সে এক নূতন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ার এই-যে রীতি ভারতবর্ষে এসে হাজির হল, সে সরাসরি বা তার নিজস্ব স্বাভাবিক রূপে আসে নি। সেটা হত, যদি আরবরা ভারতবর্ষ জয় করত। এ এল বহু বহু কাল পরে, মধ্য-এশিয়ার জাতিগুলোকে বাহন করে—তারা নিজেরাই এর সমস্তখানিকে আয়ত্ত করতে পারে নি। তবুও কিন্তু এই ইসলাম ভারতবর্ষ আর পশ্চিম-এশিয়াকে একত্র সংযুক্ত করে দিল; ফলে ভারতবর্ষ হয়ে উঠল এই দুটি মহান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। ইসলামধর্ম চীনেও গিয়ে পেঁচেছিল, চীনে বহু লোক এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু চীনের প্রাচীন সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে সে কোনোদিন চেষ্টা করে নি। সেই চেষ্টা ভারতবর্ষে হয়েছে, কারণ, দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলাম ছিল এখানকার রাজাদের ধর্ম। সুতরাং ভারতবর্ষ হয়ে উঠল এই দুটি সংস্কৃতির মুখোমুখি শক্তি-পরীক্ষার স্থান; এই কঠিন সমস্যার সমাধান এবং এদের সমন্বয় ঘটাবার জন্যে নানাবিধ চেষ্টাই করা হয়েছে, তার কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি। সে চেষ্টা অনেকখানি সফলও হয়ে এসেছিল; এমন সময় আবির্ভাব হল একটি নূতনতর বিপদ এবং বাধার—ব্রিটেন ভারতবর্ষ জয় করে বসল। আজকের

অটোম্যান-সাম্রাজ্য
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে
বুদাপেস্ট
হাঙ্গেরি
দানিয়ুব
ওয়ালাশিয়া
বেসারাবিয়া
ক্রিমিয়া
কৃষ্ণসাগর
সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
কনস্টান্টিনোপল
আলবেনিয়া
রুমেলিয়া
আনাতোলিয়া
আর্মেনিয়া
গ্রীস
স্মার্না
টাইগ্রিস
মেসোপটেমিয়া
ইউফ্রেটিস
সাইপ্রাস
সিরিয়া
বাগদাদ
ক্রীট
কায়রো
মিশর
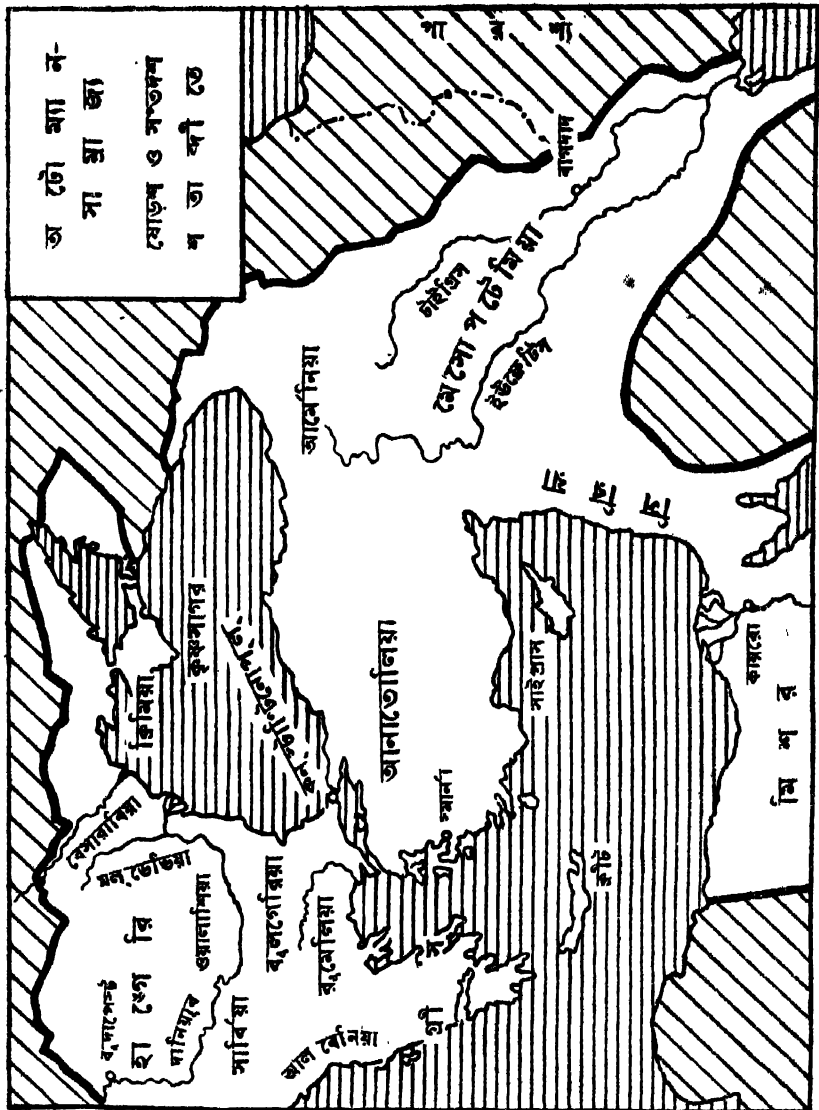
দিনে এই দুটি সংস্কৃতিরই মূল রূপের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয়তাবাদ আর বড়ো বড়ো কলকারখানা, শিল্পতন্ত্র, সবাই মিলে পৃথিবীর চেহারাটা বদলে দিয়েছে; পুরোনো কালের সংস্কৃতি এখন টিঁকে থাকতে পারবে মাত্র নূতন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে যতটুকু মিলিয়ে নিতে পারবে ততটুকু পরিমাণেই। তাদের ফাঁকা খোলসটাই শুধু পড়ে আছে এখনও, ভিতরকার প্রাণবস্তু চলে গেছে। পশ্চিম-এশিয়াই হচ্ছে ইসলামের নিজের জন্মভূমি, সেখানেও কী বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। চীন এবং দূর-প্রাচ্যে তো ক্রমাগতই সমস্ত ওলটপালট হয়ে চলেছে। আর ভারতবর্ষে কী হচ্ছে সে আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

পশ্চিম-এশিয়া সম্বন্ধে আমি এত দিন ধরে কোনো আলোচনাই করি নি। এখন তার কাহিনীর সূত্র খুঁজে পাওয়াই কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে। তোমার মনে আছে, আমি তোমাকে আরবদের বিরাট সাম্রাজ্য বাগদাদের কথা বলেছি। বাগদাদ জয় করল তুর্কিরা—এরা ছিল সেলজুক তুর্কি, অটোম্যান নয়। তার পর চেঙ্গিস খাঁর মঙ্গোল-বাহিনী একে একেবারে ধ্বংস করে দিল। খোরাশান-সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, পারশ্যদেশও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল—একেও এই মঙ্গোলরাই ভেঙে দিয়ে গেল। আরও পরে এলেন খঞ্জ তাইমুর, অল্প কিছুদিন যুদ্ধজয় এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তিনিও শেষ হয়ে গেলেন। পশ্চিমে কিন্তু তখন নূতন একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠছিল; তাইমুর একে পরাজিত করেছিলেন, তবুও সে বেড়েই চলল। এটি হচ্ছে অটোম্যান তুর্কিদের সাম্রাজ্য। পারশ্যের পশ্চিমে সমস্ত এশিয়া, মিশর, এবং দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপের অনেকখানি স্থান এরা দখল করে বসল। অনেক পুরুষ ধরে ইউরোপের দেশগুলি এদের আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ছিল; ইউরোপ তখন মধ্য-যুগটিকে সদ্য পার হয়ে আসছে। তখনকার ইউরোপের ধর্ম আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের ধারণা ছিল, এই তুর্কিরা হচ্ছে ঈশ্বরের অভিশাপস্বরূপ, পাপীর শাস্তিবিধানের জন্যে তিনিই এদের পাঠিয়েছেন।

অটোম্যানদের শাসনকালে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা থেকে পশ্চিম-এশিয়ার নাম প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গেল; জগতের মূল জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে হয়ে উঠল একটা নিশ্চল জলাভূমির মতো। শত শত, তাও নয়, হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশ ছিল ইউরোপ আর এশিয়ার সংযোগক্ষেত্র; এর নগর আর মরুভূমি অতিক্রম করেছিল অসংখ্য বণিকদলের যাত্রাপথ—এক মহাদেশ থেকে তারা অন্য মহাদেশে পণ্যসম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু এই তুর্কিরা বাণিজ্য পছন্দ করত না। আর করলেও তখন জগতে একটি নূতন বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে, তার সঙ্গে এঁটে ওঠবার শক্তি তাদের ছিল না। এই নূতন কাণ্ডটি হচ্ছে এশিয়া থেকে ইউরোপে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার। এখন থেকে সমুদ্রই হয়ে উঠল বণিকদের নূতন রাজপথ, মরুভূমির উটের স্থান গ্রহণ করল সমুদ্রের জাহাজ। এই পরিবর্তনের ফলে জগতে পশ্চিম-এশিয়ার যে স্থান-গৌরব ছিল তার অনেকখানিই হ্রাস পেয়ে গেল। একাকী, নিঃসঙ্গ জীবন হয়ে উঠল তার। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সুয়েজখাল কাটা হল, তার ফলে সমুদ্রপথের মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান রাজপথ হয়ে উঠল এই খালটি; এই দুইটি জগৎকে সে পরস্পরের আরও নিকটবর্তী করে দিল।

আর আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের চোখের সামনেই আবার একটি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে; ডাঙার সঙ্গে সমুদ্রপথের আছে প্রাচীন কাল থেকে রেষারেষি, এখন আবার ডাঙাই সে পাল্লায় জিতে যাচ্ছে, পৃথিবীর যাত্রাপথ হিসেবে সমুদ্রের প্রাধান্য আবার যাচ্ছে কমে। মোটর আর রেলগাড়ি আবিষ্কারের ফলে এই পার্থক্য বেড়ে গেল; এরোপ্লেন এসে তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পুরোনো কালের যে বাণিজ্যপথগুলো দীর্ঘ কাল শূন্য পড়ে ছিল এখন আবার তারা যাত্রীর কোলাহলে মুখর হয়ে উঠছে। অবশ্য এখন আর সে মন্থরগামী উটের দিন নেই, তার বদলে এখন মরুভূমির ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায় মোটরগাড়ি; মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায় এরোপ্লেন।

এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশই এসে একত্রিত হয়েছিল অটোম্যান-সাম্রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার বহু আগে থেকেই সে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল;

এই শতাব্দীতে এসে সে একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার নাম ছিল 'ঈশ্বরের অভিশাপ', এখন তার নাম হল 'ইউরোপের রুগ্‌ণ ব্যক্তিটি'। ১৯১৪-১৮ সনের বিশ্বযুদ্ধে এর অবসান হয়েছে; এর চিতাভস্ম থেকে জন্মলাভ করেছে নবীন তুর্কি—আত্মপ্রত্যয়ী, শক্তিমান এবং প্রগতিপন্থী একটি জাতি; জন্মলাভ করেছে আরও অনেকগুলি নূতন রাষ্ট্র।

আমি আগেই বলেছি, পশ্চিম-এশিয়া হচ্ছে এশিয়ার ইউরোপ-অভিমুখী বাতায়ন। পশ্চিমে এর সীমা ভূমধ্যসাগর; এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশকে এই সাগরটি আলাদা করে রেখেছে, আবার সংযুক্ত করেও দিয়েছে। অতীত কালে এই সংযোগ অতি নিবিড় ছিল; ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর মধ্যে অনেকখানিই মৈত্রী এবং সাদৃশ্য ছিল। এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব। তিন মহাদেশের উপকূলের সর্বত্র প্রাচীন গ্রীস বা হেলাস তার উপনিবেশ স্থাপন করেছিল; এই সাগরকে ঘিরেই রোমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল; খৃষ্টানধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এই ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকে; আরবরা এর পূর্ব-উপকূল থেকে গিয়ে তাদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করল সিসিলিতে, তার পর সেখান থেকে আফ্রিকার উত্তর-উপকূল ধরে বরাবর পশ্চিমে একেবারে স্পেন পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল; সাতশো বছর তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল।

এবার দেখলে তো, এশিয়ার ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ-ইউরোপ আর উত্তর-আফ্রিকার দেশদের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ! অতীত কালে এশিয়া এবং ঐ দুটি মহাদেশের মধ্যে একটা বড়ো বন্ধন হয়ে উঠেছিল এই পশ্চিম-এশিয়া। অবশ্য খুঁজতে চেষ্টা করলেই এরকমের বন্ধন-সূত্র সমস্ত পৃথিবীময়ই পাওয়া যায়। জাতীয়তাবাদ মানুষের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে এনেছে, আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে—পৃথিবীর সমস্ত দেশই আলাদা, একাকী। আসলে সমস্ত জগৎটাই একত্র গাঁথা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বার্থের মিলও প্রচুর।

১২৩

অতীতের স্মৃতি

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩

সম্প্রতি দুখানা বই পড়লাম, ভারি ভালো লাগল এবং বড়োই ইচ্ছে হচ্ছিল তুমিও তার একটু ভাগ নাও। দুটি বইই একজন ফরাসি ভদ্রলোকের লেখা, এঁর নাম René Grousset (রেনে গ্রুসে), প্যারিসে Musée Guimet (মিউসে গুইমে)-এর ইনি সংরক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক। প্রাচ্য, বিশেষ করে বৌদ্ধ-শিল্পকলার এই চমৎকার যাদুঘরটি তুমি কি দেখেছ? আমার সঙ্গে তুমি গিয়েছিলে বলে তো মনে পড়ছে না। মঁসিয়ে গ্রুসে প্রাচ্যদেশের অর্থাৎ এশিয়ার দেশগুলোর সভ্যতা নিয়ে একটি আলোচনী লিখেছেন। বইটির চারটি খণ্ড; এক-একটি খণ্ডে যথাক্রমে ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রাচ্য (অর্থাৎ পশ্চিম-এশিয়া ও পারশ্য), চীন ও জাপানের কথা বলা হয়েছে। শিল্পকলাতেই তাঁর উৎসাহ; শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা কীভাবে পরিণতি লাভ করল সেই দিক থেকেই প্রধানত তিনি আলোচনা করেছেন; অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবিও দিয়েছেন বইয়ে। যুদ্ধবিগ্রহ আর রাজারাজড়াদের কূটচক্রের গল্প মুখস্থ করার চেয়ে এই রকমের ইতিহাস পড়ার আনন্দও অনেক বেশি, শিক্ষাও এতেই বেশি হয়।

আমি এখন পর্যন্ত বইটির মোটে দুটি খণ্ড পড়েছি, ভারতবর্ষ এবং মধ্য-প্রাচ্য নিয়ে লেখা খণ্ডদুটি। আমার খুবই ভালো লেগেছে পড়ে। চমৎকার সব প্রাসাদ, অপূর্ব প্রস্তরমূর্তি, আশ্চর্য সুন্দর প্রাচীরচিত্র, আর ছবি—এদের প্রতিলিপি দেখতে দেখতে দেরাদুন জেল ছেড়ে বহু দূরে চলে গেছি আমি, বহু দূরের দেশে, বহু দূর অতীত কালে।

অনেক দিন হল তোমাকে উত্তর-পশ্চিম-ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার কথা লিখেছিলাম; এরা যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ সে বেঁচে ছিল পাঁচ হাজার বছর আগে। দূর অতীতের সেই দিনে, যখন মহেঞ্জোদারোতে জীবন্ত মানুষ বাস করত, কাজ করত, খেলা করে বেড়াত, পৃথিবীতে তখন আরও অনেকগুলো সভ্যতার উদয় হয়েছিল। এদের সম্বন্ধে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই; আমরা মাত্র দেখি কতকগুলো ধ্বংসস্তূপ, এশিয়া আর মিশরের বিভিন্ন স্থানে এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। হয়তো আরও বেশি জায়গাতে আরও বেশি করে খুঁড়লে আমরা এইরকম আরও অনেক ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাব। কিন্তু এটুকু আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, তখনকার দিনেও বড়ো বড়ো সভ্যতার প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে হয়েছিল—মিশরে নীলনদের তীরে; ক্যাল্‌ডিয়াতে (মেসোপটেমিয়া); সেখানে এলাম-রাজ্যের রাজধানী ছিল সুসা; পূর্ব-পারস্যের পার্সিপোলিসে; মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থানে; চীনে পীত-নদ বা হোয়াঙ-হো'র তীরভূমিতে।

এই সময়ে তামার ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছে; মাজা-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের যুগ চলে যাচ্ছে। মিশর থেকে চীন অবধি বিস্তৃত এইসমস্ত স্থানগুলোতেই সভ্যতা সম-স্তরে উন্নীত হয়েছিল বলে মনে হয়। বাস্তবিক আগাগোড়া সমস্ত এশিয়া জুড়েই একটামাত্র বিশেষ রকমের সভ্যতা ছড়িয়ে আছে দেখলে বিস্ময় লাগে; এ দেখে বোঝা যায়, সভ্যতার এই বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো মোটেই স্ব-সর্বস্ব ছিল না, এরা সকলেই ছিল পরস্পর-সম্পৃক্ত। কৃষির তখন খুব আদর, গৃহপালিত পশু রাখা হত, কিছু কিছু বাণিজ্যও চলত। লেখার বিদ্যা তখন আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সেসব প্রাচীন চিত্র-লিপির পাঠোদ্ধার আমরা এখনও করতে পারি নি। বহু দূর-দূর বিস্তৃত সব অঞ্চলে একই প্রকারের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে; তাদের শিল্পকলার সৃষ্ট বস্তুগুলোও আশ্চর্যরকম এক-প্রকারের। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখনকার চিত্রিত হাঁড়িকুড়ি এবং নানারকম নক্‌শা আর কারুকার্য-শোভিত সুন্দর সুন্দর পাত্র। এই চিত্রিত হাঁড়িকুড়ি এত বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে যে, এই সমগ্র যুগটিরই নাম দেওয়া হয়েছে 'চিত্রিত পাত্রের সভ্যতা'। এ ছাড়া, সোনা-রুপোর গয়না ছিল, শ্বেতপাথর আর মর্মর-পাথরের পাত্র ছিল, এমনকি সুতি-কাপড়ও ছিল। মিশর থেকে সিন্ধুনদের তীর এবং চীন পর্যন্ত ছড়ানো প্রাচীন সভ্যতার এই কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব কিছু-না-কিছু একটা বিশেষত্ব ছিল। প্রত্যেকে এরা স্বাধীন ভাবেই নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল, তবু একটি সার্বজনীন এবং পরস্পর-সম্পৃক্ত সভ্যতার সূত্র এদের সকলকে যেন একত্র গেঁথে রেখেছিল।

এ হচ্ছে মোটামুটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। কিন্তু এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায়, এই-যে সভ্যতা, এটা অনেকখানি উন্নত ধরনের জিনিষ, এবং পরিণত হয়ে এই রূপ পেতে এর নিশ্চয়ই কয়েক হাজার বছর লেগেছিল। নীল-উপত্যকা এবং ক্যাল্‌ডিয়ার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত আরও দু হাজার বছর আগে থেকে পাওয়া যায়; স্থানগুলির সভ্যতার বয়সও খুব সম্ভবত এদের মতোই ছিল।

মহেঞ্জোদারোর কাল প্রায় খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের মতো। প্রথম তাম্রযুগের সেইসমস্ত একরূপ অথচ বহুদূরবিস্তৃত সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যের চারটি সভ্যতার প্রকৃতি আলাদা, এগুলো পৃথক রূপেই গড়ে উঠেছিল। এই চারটি হচ্ছে মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা। এই শেষোক্ত সময়েই মিশরের বিখ্যাত পিরামিডগুলো এবং গিজের বিরাট স্ফিংকস্ মূর্তি তৈরি হয়। তারও পরে এল মিশরে থিব্‌সের যুগ, যখন থিব্‌সের সাম্রাজ্য বড়ো হয়ে উঠল। সেটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সন এবং তার পরের কথা। এই সময়ে অনেক আশ্চর্য-সুন্দর প্রস্তরমূর্তি এবং প্রাচীরচিত্র তৈরি হয়। শিল্পকলার এটা ছিল খুব বড়ো একটা পুনরুজ্জীবনের যুগ। এরই কাছাকাছি সময়ে লাক্সরের বিরাট মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। থিব্‌সের ফ্যারাওদের অন্যতম ছিলেন তুতানখামেন; এঁর নামটা মনে হয় যেন সবাইই জানে, এঁর সম্বন্ধে আর-কিছু না জানলেও।

ক্যাল্‌ডিয়ার দুটি জায়গাতে বেশ পরাক্রান্ত এবং সুসংহত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, এদের নাম—সুমের আর আক্কাদ। ক্যাল্‌ডিয়ার বিখ্যাত শহর ছিল উর, মহেঞ্জোদারোর যুগেই এখানে শিল্পকলার অতি সুন্দর সব বস্তু তৈরি হচ্ছিল। প্রায় সাত শো বছর আধিপত্য করবার পর উরের

পতন হয়। এবার নূতন রাজা হল বেবিলোনীয়রা—এরা জাতে সেমিটিক (অর্থাৎ, ইহুদি বা আরবদের জাত-ভাই), সিরিয়া থেকে এসেছিল। বাবিলন-শহরকে কেন্দ্র করে এবার একটি নূতন সাম্রাজ্য গড়ে উঠল, বাইবেলে এর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে সাহিত্যের একটা নূতন প্রেরণা আসে; অনেক মহাকাব্য রচিত ও প্রচারিত হয়। এই মহাকাব্যগুলোতে সৃষ্টির আরম্ভ এবং বিরাট একটা জলপ্লাবনের বর্ণনা আছে। অনেকে মনে করেন, এদের এই গল্পগুলোকে অবলম্বন করেই বাইবেলের গোড়ার কটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল।

তার পর বাবিলনেরও পতন হল। বহু শতাব্দী পরে (প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সন এবং তার পর থেকে) আসিরীয়দের আবির্ভাব হল। এরা একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করল, তার রাজধানী হল নিনেভে। বড়ো আশ্চর্য জাতি ছিল এরা। বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার এদের সীমা ছিল না। এদের সমস্ত শাসনকার্যটাই চলত নিছক বিভীষিকার জোরে; হত্যা এবং ধ্বংসলীলার দ্বারা এরা সমস্ত মধ্য-প্রাচ্য জুড়ে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এরাই ছিল সেই যুগের সাম্রাজ্যবাদী। অথচ এই বন্য পশুর মতো হিংস্র জাতিটাই আবার অনেক দিকে ছিল অত্যন্ত সভ্য! নিনেভে-শহরে প্রকাণ্ড একটি পুস্তকাগার করেছিল এরা, সেখানে তখনকার দিনের সমস্তরকম জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই বই এনে জড়ো করা হয়েছিল। সে পুস্তকাগারে কাগজের তৈরি পুঁথি ছিল না, এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য; আজকাল আমরা বই বলতে যা বুঝি তাও কিছু ছিল না সেখানে। তখনকার যুগে বই লেখা হত শিলা-ফলকের উপর। নিনেভের সেই প্রাচীন পুস্তকাগার থেকে সংগ্রহ-করা এই রকমের হাজার হাজার শিলালিপি এখন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এনে রাখা হয়েছে। এর অনেকগুলো পড়তে রীতিমতো গা শিউরে ওঠে; রাজারা তাতে জ্বলন্ত বর্ণনা দিচ্ছেন, শত্রুর উপর কীরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছেন এবং তাই দেখে তিনি কী বিপুল আনন্দ পেয়েছেন!

ভারতবর্ষে আর্যরা আসেন মহেঞ্জোদারো-যুগের পরে। এঁদের সেই প্রথম যুগের কোনো ধ্বংসস্তূপ বা প্রস্তরমূর্তি আজও আবিষ্কৃত হয় নি; কিন্তু এঁদের সবচেয়ে বড়ো স্মৃতিস্তম্ভ হচ্ছে এঁদের প্রাচীন পুঁথিগুলো—বেদ ইত্যাদি। সেই পুঁথি থেকেই আমরা ভারতবর্ষের সমতল-ভূমিতে আগন্তুক এই ভাগ্যবান যোদ্ধাদের মনোবৃত্তির নিগূঢ় পরিচয় পাই। এই বইগুলো খুব জোরালো প্রাকৃতিক-কাব্যে ভরা; এদের দেবতারা পর্যন্ত প্রকৃতি-দেবতা। এদেব শিল্পকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে প্রকৃতির প্রতি এই আকর্ষণের প্রভাব গভীর হয়ে পড়বে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এদের শিল্পকলার যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কটির মধ্যে একটি হচ্ছে, সাঁচির তোরণদ্বার। এটি ভূপালের কাছে অবস্থিত। এটি নির্মিত হয়েছিল প্রথম বৌদ্ধযুগে; এই তোরণস্তম্ভের উপরে যেসব সুন্দর ফুল পাতা আর জীবজন্তু খোদাই করা রয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়, এটি যাদের তৈরি সেই শিল্পীরা প্রকৃতিকে কতখানি ভালোবাসতেন, কতখানি মন দিয়ে উপলব্ধি করতেন।

তার পর এল উত্তর-পশ্চিম থেকে গ্রীকদের প্রভাব। তোমার মনে আছে, আলেকজাণ্ডারের কালে গ্রীকদের সাম্রাজ্য একেবারে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁচেছিল। তার পরে আবার সীমান্ত-প্রদেশে আবির্ভূত হল কুশানদের সাম্রাজ্য, এরও উপরে গ্রীকদের প্রভাব খুব স্পষ্ট ছিল। বুদ্ধ ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী। তিনি কখনও নিজেকে দেবতা বলে জাহির করেন নি বা পুজো পেতে চান নি। পুরোহিতবৃত্তির ফলে সমাজে যেসমস্ত অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তিনি চেয়েছিলেন তার হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে; তিনি সংস্কারক; তাঁর চেষ্টা ছিল, পতিত এবং দুর্গতকে তিনি টেনে তুলবেন। বারাণসীর কাছে ইসিপতন বা সারনাথে তিনি তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দেন; সে দিন তিনি বলেছিলেন, "আমি এসেছি জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত করতে......প্রকৃত মানুষের নাম সার্থক হবে শুধু তখনই যখন সে প্রাণীর কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে, দুঃস্থকে সান্ত্বনা দান করবে।......আমার ধর্ম করুণার ধর্ম; এইজন্যই জগতের সুখী ব্যক্তিরা একে কঠিন বলে মনে করে। মুক্তির পথ সকলের জন্যই মুক্ত রয়েছে। চণ্ডালের সম্মুখে মুক্তির পথ ব্রাহ্মণ বন্ধ করে রেখেছে, সেই চণ্ডালের মতোই সেও কি নারীর গর্ভজাত নয়? হস্তী যেরূপ তৃণনির্মিত কুটির ভেঙে ফেলে, সেইরূপে তোমার প্রবৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করো......অন্যায়ের একমাত্র

প্রতিকার হচ্ছে—ধীর স্থির বাস্তব চেতনা।” এমনি করে বুদ্ধ সদাচরণের এবং জীবনের পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন, কিন্তু মূর্খ শিষ্যের রীতিই হচ্ছে, তারা গুরুর কথার প্রকৃত অর্থ বোঝে না; বুদ্ধেরও অনেক শিষ্য তাঁর বর্ণিত আচরণের বাইরের নীতিগুলোকেই পালন করতে লাগল, তার মধ্যের অর্থ তলিয়ে দেখলে না। বুদ্ধের উপদেশ তারা পালন করল না, তাঁকেই দেবতা বানিয়ে পুজো শুরু করল। কিন্তু তখনও বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তাঁর প্রতিকৃতি গড়া হয় নি।

তার পর এসে পৌঁছল গ্রীস এবং অন্যান্য হেলেনিক দেশের অধিবাসীদের চিন্তাধারা। এইসব দেশে দেবতাদের খুব সুন্দর প্রস্তরমূর্তি গড়া হত। সেইগুলোকে পুজো করা হত। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার-প্রদেশে এদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল, এইখানে পাথর খোদাই করে শিশু-বুদ্ধের মূর্তি রচনা করা হল। গ্রীকদের নিজেদের ক্ষুদ্র অথচ মনোহারী দেবতা কিউপিডের মতো হল তাঁর রূপ, অথবা হল পরের যুগে শিশু-খৃষ্টের মূর্তি যেমন করে গড়া হয়েছিল—ইতালীয়রা তাঁর নাম দিয়েছিল Sacro Bambino (স্যাক্রো ব্যাম্বিনো)। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মূর্তিপুজো শুরু হল; ক্রমেই এ বাড়তে বাড়তে শেষে এমন অবস্থা হল যে, প্রত্যেক বৌদ্ধমন্দিরই বুদ্ধের অসংখ্য মূর্তিতে ভরে উঠল।

ভারতীয় শিল্পকলার উপরে ইরান বা পারশ্যের প্রভাবও এসে পড়েছিল। বৌদ্ধদের জাতক এবং হিন্দুদের সমৃদ্ধ পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে ভারতীয় শিল্পীরা অফুরন্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়ে গেলেন; অন্ধ্রদেশে অমরাবতী, বোম্বাইর কাছে এলিফাণ্টা গুহা, অজন্তা ও ইলোরা, এবং এমনি আরও অনেক জায়গাতে প্রস্তরলিপি এবং ছবিতে জাতক এবং পুরাণের এইসব প্রাচীন কাহিনী এখনও অমর হয়ে রয়েছে। এই জায়গাগুলো আশ্চর্যরকম দেখবার মতো, আমার মনে হয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকেরই এর অন্তত কিছুটা দেখে আসা উচিত।

সমুদ্র পার হয়ে ভারতের পৌরাণিক কাহিনী চলে গেল বৃহত্তর-ভারতে। জাভার বোরোবুদুরে অনেকগুলো ধারাবাহিক প্রস্তরনির্মিত প্রাচীরচিত্রে বুদ্ধের সমস্ত ইতিহাসটা এঁকে রাখা হয়েছে। আঙ্কোর ভ্যাটে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও অনেক সুন্দর মূর্তি পাওয়া যায়। সেগুলোকে দেখলে মনে পড়ে আট শো বছর আগেকার কথা, যখন পূর্ব-এশিয়াতে এই নগরীটির নাম ছিল ‘সমৃদ্ধিশালী আঙ্কোর’। এই মূর্তিগুলোর ভাব অতি প্রশান্ত এবং প্রাণবস্তুতে পরিপূর্ণ; এদের অনেকের মুখে একটি অদ্ভুত রহস্যময় হাসি দেখতে পাওয়া যায়, তার নামই হয়ে গেছে ‘আঙ্কোরের হাসি’। মূর্তি-গুলোর মধ্যে নানারকম জাতির প্রতিকৃতি আছে, কিন্তু এই হাসিটি সর্বত্রই সমানভাবে ফুটে রয়েছে, একে দেখতে কখনই ক্লান্তি লাগে না।

শিল্পকলা হচ্ছে কোনো একটি যুগের জীবনযাত্রা এবং সভ্যতার অতি সত্য প্রতিবিম্ব। ভারতের সভ্যতায় যখন প্রাণের প্রাচুর্য ছিল, তখন সে অপূর্বসুন্দর সব বস্তু সৃষ্টি করেছে, তার শিল্পকলার সমৃদ্ধি ঘটেছে, সে কলার প্রতিধ্বনি বহুদূর বিদেশেও গিয়ে পৌঁচেছে। তার পরে আবার তার জীবনযাত্রার শৈথিল্য, ধ্বংস; দেশটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পকলারও ঘটল অধঃপতন। শক্তি এবং প্রাণ হারিয়ে গেল তার, তখন তার ক্রমেই বেড়ে উঠল খুঁটিনাটি জবড়জঙের বোঝা, কখনও-বা সে হয়ে উঠল একেবারেই অস্বাভাবিক। মুসলমানরা আসবার ফলে আবার সে একটু গা-নাড়া দিয়ে জেগে উঠল; অধঃপতিত ভারতীয় শিল্প কেবল অলংকারবাহুল্য নিয়েই মত্ত হয়ে ছিল, মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতনতর প্রভাব দেশে এল সে তাকে সেই বাহুল্য থেকে মুক্তি দিল। তখনকার সৃষ্টিতে পিছনে থাকল ভারতের পুরোনো আদর্শ, কিন্তু তার বাইরের রূপ সহজ এবং শোভন হয়ে উঠল, আরব এবং পারশ্যের নবাগত সজ্জা ধারণ করে। প্রাচীন কালে ভারত থেকে হাজার হাজার ওস্তাদ শিল্পী পশ্চিম-এশিয়া মধ্য-এশিয়ায় গিয়েছিলেন। এবার পশ্চিম-এশিয়া থেকে স্থপতি আর চিত্রকররা এলেন ভারতবর্ষে। পারশ্য এবং মধ্য-এশিয়াতে তখন শিল্পকলার একটা পুনরুজ্জীবন হয়েছে; কনস্টাণ্টিনোপলে বড়ো বড়ো স্থপতিরা বিরাট সব প্রাসাদ তৈরি করছেন। এইটেই ছিল আবার ইতালিরও পুনরুজ্জীবনের প্রথম যুগ, সেখানে তখন অপূর্ব প্রতিভাশালী বহু শিল্পী চমৎকার সুন্দর চিত্র এবং মূর্তি সৃষ্টি করছেন।

তখনকার দিনে তুর্কির বিখ্যাত স্থপতি ছিলেন সিনান, তাঁর প্রিয় শিষ্য ইউসুফকে বাবর এ দেশে নিয়ে এলেন। ইরানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন বিহ্‌জাদ, তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে এসে আকবর তাঁর রাজকীয় চিত্রকর করে রাখলেন। ভারতের স্থাপত্যে এবং চিত্রশিল্পে পারস্যের প্রভাব ক্রমেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে মোগল-ভারতের এই হিন্দু-মুসলিম শিল্পের সৃষ্ট কয়েকটি বড়ো বড়ো প্রাসাদের কথা বলেছি, তুমিও এদের অনেকগুলো দেখেছ। এই ভারতীয়-পারশিক শিল্পের সবচেয়ে বড়ো গৌরবের সৃষ্টি হচ্ছে তাজমহল। বহু বিখ্যাত শিল্পী একত্র হয়েছিলেন একে গড়ে তুলতে। শোনা যায়, এর প্রধান স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ ইশা নামক একজন তুর্কি বা পারশ্যবাসী; বহু ভারতীয় স্থপতিও তাঁর সহকারী ছিলেন। এর ভিতরকার কারুকার্য নাকি সম্পন্ন করেছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় শিল্পী, বিশেষ করে একজন ইতালীয় শিল্পী। বিভিন্ন জাতির ও রীতির এতজন শিল্পী একত্রে একে তৈরি করেছেন, তবু কিন্তু এর কোথাও কোনো অসংলগ্নতা বা অমিল নেই। বিভিন্ন রকমের সমস্ত রীতি একত্র মিলে গিয়ে একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে, এইটেই আশ্চর্য! কত দেশের কত লোকই যে তাজের নির্মাণে সহায়তা করেছে তার হিসাব নেই। কিন্তু এর মধ্যেও যে দুটি দেশের প্রভাব বড়ো হয়ে রয়েছে সে হচ্ছে পারশ্য এবং ভারত; মঁসিয়ে গ্রুসে তাই একে বলেছেন "ভারতের দেহে ইরানের আত্মার আবির্ভাব"।

১২৪

ইরানের প্রাচীন রীতিনীতি

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩৩

এবার আমরা পারশ্যদেশকে দেখতে যাব, এর আত্মা ভারতবর্ষে এসেছিল এবং তাজের মধ্যে সার্থক-বিকাশ লাভ করেছিল। পারশ্যের শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য একটি প্রাচীন রীতি আছে। দু হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে, একেবারে সেই আসিরীয়দের যুগ থেকেই, তা সেখানে চলে এসেছে। শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন হয়েছে ইতিমধ্যে—বহু রাজবংশ, বহু ধর্ম এসেছে আর চলে গেছে, দেশে কখনও-বা বিদেশীরা রাজত্ব করেছে, কখনও-বা করেছে তার নিজেরই রাজারা; তার পর ইসলামধর্ম এসে তার মধ্যে অনেকখানি পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তবু কিন্তু এই রীতিটি আগাগোড়া বরাবরই টিঁকে রয়েছে। বদল অবশ্য এরও হয়েছে, যুগে যুগে নূতনতর পরিণতিও এর লাভ হয়েছে। তবুও যে এটা এইভাবে টিঁকে আছে, অনেকে বলেন, তার কারণ হচ্ছে, পারশ্যে তার দেশের মাটি এবং নৈসর্গিক দৃশ্যের সঙ্গে শিল্পকলার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

তোমাকে আমি নিনেভের আসিরীয় সাম্রাজ্যের কথা বলেছি, পারশ্যও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টজন্মের পাঁচ-ছ শো বছর আগে ইরানিরা—এরা জাতিতে আর্য—নিনেভে দখল করে, আসিরীয় সাম্রাজ্যটাও শেষ হয়ে যায়। তার পর এই পারশ্যবাসী আর্যরা নিজেদের একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে; এই সাম্রাজ্য সিন্ধুনদের তীর থেকে একেবারে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার সেই প্রাচীন জগতে এরাই প্রবল হয়ে উঠল, গ্রীকদের পুঁথিপত্রে বহু স্থানে এদের রাজাদের উল্লেখ করা হয়েছে 'বড়ো রাজা' বলে। এই 'বড়ো রাজা'দের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন কাইরাস, দারিয়ুস, জেরিক্সিস ইত্যাদি। এঁদের নাম হয়তো তোমার মনে আছে, দারিয়ুস এবং জেরিক্সিস গ্রীস জয় করার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন। এই রাজবংশের নাম ছিল একিমেনিড বংশ। ২২০ বছর ধরে এই বংশের রাজারা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে ছিলেন; তার পর মাসিডনের বীর আলেকজান্ডার এই সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন।

আসিরীয় এবং বাবিলনীয়দের পরে পারস্য-রাজাদের পেয়ে দেশের প্রজারা নিশ্চয়ই একটু স্বস্তিলাভ করেছিল। প্রভু হিসাবে এ'রা ছিলেন সভ্য এবং সহিষ্ণু, বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে এ'রা অবাধে বাড়তে দিয়েছিলেন। এ'দের এই বিশাল সাম্রাজ্যটির শাসনব্যবস্থা বেশ ভালো ছিল; এর সমস্ত স্থানের মধ্যে যানবাহনের সুব্যবস্থা আনবার জন্যে রাজারা এর সর্বত্রই অনেক ভালো ভালো রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন। পারস্যবাসীরা জাতিতে আর্য, ভারতে যাঁরা এসেছিলেন সেই ভারতীয়-আর্যদের সঙ্গে এ'দের অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল, এ'দের ধর্ম ছিল জোরোআস্টার বা জরথুস্ত্রের ধর্ম, বেদের প্রাচীন ধর্মের সঙ্গেও তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরিষ্কার বোঝা যায়, এই দুটি জাতিরই উৎপত্তি হয়েছিল এক জায়গাতে, আর্যদের আদি বাসস্থানে, সে স্থানটি যেখানেই হয়ে থাক্।

এিকমেনিড রাজারা বাড়িঘর তৈরি করার খুব ভক্ত ছিলেন, এ'দের রাজধানী পার্সিপোলিস শহরে এ'রা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ—মন্দির এরা তৈরি করতেন না—তৈরি করালেন, তাতে মস্ত বড়ো বড়ো সব হলঘর, তার অসংখ্য স্তম্ভ। এখনও এর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, তা দেখে এগুলো কী প্রকাণ্ড বস্তু ছিল তার খানিকটা ধারণা করা যায়। দেখে মনে হয়, এিকমেনিডদের এই শিল্পের সঙ্গে মৌর্যযুগের (অশোক প্রভৃতি) ভারতীয় শিল্পের যোগ ছিল, তার উপরে এর প্রভাবও অনেক পড়েছিল।

আলেকজাণ্ডার 'বড়ো রাজা' দারিয়ুসকে পরাজিত করলেন, এিকমেনিড-রাজবংশের শেষ হয়ে গেল। এর পর অল্প কিছুদিন এখানে গ্রীকরা রাজত্ব করল, এদের রাজা ছিলেন সেলিউকস (ইনি আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি ছিলেন) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা। তার পর আরও কিছু দীর্ঘতর কাল ধরে কয়েকজন অর্ধ-বিদেশী রাজা এখানে রাজত্ব করলেন, এ'দের সময়েও হেলেনিক সংস্কৃতির প্রভাব এখানে টি'কে রইল। এ'দেরই সমসাময়িক ছিলেন ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে অবস্থিত কুশান রাজারা; দক্ষিণে বারাণসী এবং উত্তরে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত তাঁদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁদের উপরেও হেলেনিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রচুর। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলেকজাণ্ডারের পরে পাঁচ শো বছরেরও বেশি কাল, খৃষ্টজন্মের পরবর্তী একেবারে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত, ভারতের পশ্চিমে সমগ্র এশিয়া মহাদেশই ছিল গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাবাচ্ছন্ন। এই প্রভাব বেশি করে দেখা যেত শিল্পকলায়। পারস্যের ধর্মমতের কোনো ব্যাঘাত এর দ্বারা হয় নি, ধর্মে পারস্য জরথুস্ত্রের মতাবলম্বীই থেকে গেল।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পারস্যে একটা জাতীয় জাগরণ এল, নূতন একটি রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করল। এর নাম সসানিদ বংশ, এর রাজারা ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী; এ'রা বলতেন, এ'রা প্রাচীন কালের এিকমেনিড-রাজাদের বংশধর। উগ্র জাতীয়তাবাদের যা দোষ স্বভাবতই দেখা যায়, এ'দের মতামত বড়ো সংকীর্ণ এবং অসহিষ্ণু ছিল। না হয়ে উপায়ও ছিল না তার; পশ্চিমে রোমান-সাম্রাজ্য এবং কনস্টান্টিনোপলের বাইজানটিনা সাম্রাজ্য আর পূর্ব দিকে তুর্কি উপজাতিদের অগ্রগতি, এই দুয়ের চাপে পড়ে তার তখন কাহিল অবস্থা। তবুও সে চার শো বছরেরও বেশি কাল, একেবারে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত, কোনোক্রমে টি'কে রইল। সসানিদ-রাজাদের আমলে জরথুস্ত্রীয় পুরোহিতদের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল; তাদেরই ইঙ্গিতে রাষ্ট্র চলত; কোনোরকম বিরোধিতাই সহ্য করবার মতো উদারতা তাদের ছিল না। এই সময়েই তাদের ধর্মপুস্তক আবেস্তা'র শেষ সংস্করণ রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়।

ভারতবর্ষে এই সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্য রয়েছে, সেটাও ছিল কুশান এবং বৌদ্ধ -যুগের পরে একটা জাতীয় জাগরণের প্রতীক। শিল্পকলা এবং সাহিত্যের এই সময়ে একটা পুনরুজ্জীবন হয়েছিল; এই সময়েই কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃতভাষার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সসানিদ-রাজাদের অধীন পারস্য আর গুপ্ত-রাজাদের শাসিত ভারতবর্ষের শিল্পকলার মধ্যে একটা সংযোগ ছিল, এবং এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সসানিদ-যুগের ছবি বা প্রস্তর-মূর্তি আজ পর্যন্ত অতি অল্পই টি'কে আছে; কিন্তু যে দু-চারটে পাওয়া গেছে তাতে জীবনীশক্তি

এবং গতির প্রাচুর্য রয়েছে, অজন্তার প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে এর পশুর মূর্তিগুলোর একেবারে আশ্চর্য মিল। সসানিদ-যুগের শিল্পকলার প্রভাব একেবারে চীন এবং গোবি-মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয়।

দীর্ঘ কাল রাজত্ব করে শেষ দিকে সসানিদ-রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লেন, পারশ্যেরও অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। অনেকদিন ধরে বাইজানটিনা-সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলল, ফলে দুই পক্ষই একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তখন এল আরব-বাহিনী, তাদের নূতন ধর্মের উৎসাহে তাদের মন ভরপুর, পারশ্য জয় করতে তাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হল না। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি, হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর দশ বছরের মধ্যে, পারশ্যদেশ খলিফার অধীন হয়ে গেল। আরব-বাহিনী ক্রমে মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত এগিয়ে গেল, সঙ্গে বহন করে নিয়ে গেল কেবল তাদের নূতন ধর্মকে নয়, একটি নবীন এবং প্রাণবান সংস্কৃতিকে। সিরিয়া মেসোপটেমিয়া মিশর, আরব-সভ্যতা সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। আরবের ভাষা হয়ে গেল এদের ভাষা; জাতিহিসেবেও এরা আরবদের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আরব-সংস্কৃতির বড়ো বড়ো কেন্দ্র হল বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো; এই নবীন সভ্যতার উৎসাহে এইসব জায়গাতে চমৎকার সব প্রাসাদ গড়ে উঠল। আজ পর্যন্ত এইসমস্ত দেশ আরব-দেশ হয়েই রয়েছে; পরস্পর থেকে এরা পৃথক, কিন্তু সকলে একত্র হয়ে যাওয়াই হচ্ছে এদের মনের স্বপ্ন।

পারশ্যকেও আরবরা এদের মতোই জয় করে নিয়েছিল, কিন্তু সিরিয়া বা মিশরের লোকেরা যেমন আরবদের মধ্যে অবলুপ্ত বা বিলীন হয়ে গিয়েছিল, পারশ্যে তা হল না। ইরানিরা জাতিতে ছিল প্রাচীন আর্য-বংশীয়; আরবরা সেমিটিক জাতি; দুয়ের মধ্যে তফাত ছিল অনেক বেশি। তাদের ভাষাও ছিল আর্যভাষা। কাজেই জাতিহিসেবে ইরানিরা পৃথক হয়েই রইল, তাদের ভাষাও বেশ টিঁকে থাকল। ইসলামধর্ম অবশ্য খুব দ্রুত বিস্তৃত হয়ে পড়ল, জরথুস্ত্রের ধর্মকে একেবারেই হটিয়ে দিল, তাকে শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিতে হল ভারতবর্ষে। কিন্তু ইসলামকেও পারশ্যবাসীরা গ্রহণ করল তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। ইসলামধর্ম গ্রহণ করেও পারশ্যবাসীরা তাদের নিজস্ব ধারা বজায় রাখল। এর ফলে একটা মতভেদ হল, দুটো দলের সৃষ্টি হল, মুসলমানরা শিয়া আর সুন্নি, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল। পারশ্য হল প্রধানত শিয়া-দেশ। এখনও সে তাই রয়েছে। অন্যান্য দেশের মুসলমান প্রায় সকলেই সুন্নি।

কিন্তু আরব-সংস্কৃতি পারশ্যকে গ্রাস করতে না পারলেও আরব-সভ্যতার প্রভাব তার উপরে প্রচুর পরিমাণেই পড়ল। ভারতবর্ষের মতো এখানেও ইসলামধর্ম শিল্পকলার চর্চায় নূতন প্রাণের সঞ্চার করল। আরবদের শিল্পকলা এবং সংস্কৃতিতেও আবার পারশ্যের প্রভাব সমানভাবেই দেখা দিল। আরবরা মরুভূমির সন্তান, সহজ সরল ছিল তাদের জীবনযাত্রা। পারশ্যের বিলাসবৃদ্ধি তাদের সেই সকল গার্হস্থ্য জীবনকেও প্লাবিত করে দিল; আরব খলিফার রাজসভা অন্য যে-কোনো সাম্রাজ্যের রাজসভার মতোই ঐশ্বর্য আর জাঁকজমকে ভরে উঠল। সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ হল তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। বাগদাদের উত্তরে টাইগ্রিস-তীরে সামারা-নগরে খলিফারা নিজেদের জন্যে বিরাট এক মসজিদ আর প্রাসাদ তৈরি করালেন, এর ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। মসজিদটিতে অতি প্রকাণ্ড সব হল-ঘর ছিল, বড়ো বড়ো চত্বর ছিল, সেখানে ফোয়ারা বসানো। প্রাসাদটি ছিল চতুষ্কোণ, তার একটা দিকেরই দৈর্ঘ্য ছিল এক কিলোমিটারেরও (প্রায় $\frac{2}{3}$ মাইল) বেশি।

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের সাম্রাজ্য ভেঙে গেল, এর এক-একটা টুকরো নিয়ে অনেকগুলো রাজ্য গড়ে উঠল। পারশ্য স্বাধীন হয়ে গেল। পূর্ব-অঞ্চলের তুর্কি-উপজাতিরা অনেকগুলো রাজ্য স্থাপন করল, শেষ পর্যন্ত এরা পারশ্যকেই জয় করে বসল, বাগদাদের নামমাত্র খলিফা যিনি ছিলেন তিনিও এদের হুকুমে চলতে লাগলেন। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হলেন গজনির মাহ্‌মুদ। তিনি ভারত জয় করলেন, খলিফাকেও সন্ত্রস্ত করে তুললেন। মাহ্‌মুদ একটি সাম্রাজ্যও স্থাপন করলেন; সে সাম্রাজ্য কিন্তু বেশি দিন বাঁচল না, তাকে ভেঙে ফেলল আর-একটি তুর্কি-উপজাতি; এদের নাম সেলজুক। সেলজুকরা দীর্ঘকাল ধরে খৃষ্টান-ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চালাল, যুদ্ধে জয়ও তাদেরই হল। তাদের সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল দেড় শো বছর। দ্বাদশ

শতাব্দীর শেষ দিকে আবার আর-একটি তুর্কি-উপজাতি এসে সেলজুকদের পারশ্য থেকে তাড়িয়ে দিল, দিয়ে প্রতিষ্ঠা করল খোয়ারিশম বা খিভা রাজ্যের। এই রাজ্যটিরও আয়ু ছিল অতি অল্প। খোয়ারিশমের শাহ্‌ চেঙ্গিস খাঁর দূতকে অপমান করেছিলেন; সেই রাগে চেঙ্গিস খাঁ তাঁর মোগল-সেনা নিয়ে একে আক্রমণ করলেন এবং দেশটিকে ও উহার লোকদিগকে একেবারেই বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলেন।

সংক্ষিপ্ত কটি কথার মধ্যে অনেক পরিবর্তন অনেকগুলো সাম্রাজ্যের কাহিনী বলে গেলাম, নিশ্চয়ই তুমি যথেষ্ট পরিমাণ ধাঁধায় পড়ে গেছ। নানা রাজবংশ ও নানা জাতির উত্থান-পতনের এই গল্প বললাম অবশ্য তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলবার জন্যে নয়; আমি তোমাকে দেখাতে চাইছি, এত সমস্ত কাণ্ডের মধ্যেও পারশ্য তার প্রাচীন শিল্পকলার রীতি এবং জীবনের ধারাকে কীরকম করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পূর্বদেশ থেকে একটার পর একটা তুর্কি-উপজাতি এসেছে, এসে তারা আরব ও পারশ্যের মিশ্রিত সভ্যতার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে—সে সভ্যতা তখন বোখারা থেকে ইরাক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। পারশ্য থেকে দূরে এশিয়া-মাইনরে গিয়ে পৌঁচেছিল যে তুর্কিরা তারা কিন্তু নিজেদের পুরোনো রীতিনীতিকেই বজায় রেখেছিল, আরব-সংস্কৃতিকে মেনে নিতে তারা রাজি হয় নি। এশিয়া-মাইনরকে তারা প্রায় তাদের নিজের দেশ তুর্কিস্থানেরই মতো করে তুলেছিল। কিন্তু পারশ্যে এবং তার আশেপাশে প্রাচীন ইরানি সংস্কৃতির জোর এতই বেশি ছিল যে, এই তুর্কিরাও তাকে মেনে নিল, তার ধরনে নিজেদেরও নূতন করে গড়ে নিল। বহু তুর্কি-রাজবংশ পারশ্যে রাজত্ব করে গেছে, কিন্তু পারশ্যের শিল্পকলা আর সাহিত্য তার আগা-গোড়াই নিজের সমৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে। পারশ্যের কবি ফিরদৌসির কথা বোধ হয় তোমাকে বলেছি; গজনির সুলতান মাহ্‌মুদের সময়ে এঁর আবির্ভাব হয়েছিল। মাহ্‌মুদের অনুরোধে ইনি পারশ্যের বিরাট একটি জাতীয় মহাকাব্য রচনা করেন, তার নাম শাহ্‌নামা। এই কাব্যে বর্ণিত ঘটনাগুলির কাল প্রাগ্‌-ইসলামীয় যুগ, এর প্রধান বীর হচ্ছেন রুস্তম। এর থেকেই বোঝা যায়, দেশের প্রাচীন জাতীয় ইতিহাস আর কিংবদন্তীর সঙ্গে পারশ্যের শিল্পকলা এবং সাহিত্যের কতখানি নিবিড় যোগ ছিল। পারশ্যে যেসব ছবি আর প্রতিমূর্তি রচিত হত তারও অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া হত শাহ্‌নামার কোনো গল্প থেকে।

ফিরদৌসি বেঁচে ছিলেন দুটি শতাব্দী তথা সহস্রাব্দীর মিলনক্ষণে—৯৩২ সন থেকে ১০২১ সন পর্যন্ত। তাঁর অল্পদিন পরেই এলেন পারশ্যের অন্তর্গত নিশাপুরের অধিবাসী জ্যোতিষী-কবি ওমর খৈয়াম—ফার্সি এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই এঁর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। ওমরের পরে এলেন শিরাজের কবি শেখ সাদি। পারশ্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের ইনি অন্যতম, অনেক পুরুষ ধরে ভারতবর্ষের সমস্ত মক্তবে ছাত্ররা এঁর কাব্য গুলিস্তান আর বুস্তান মুখস্থ করে আসছে।

অনেক বড়ো বড়ো নামের মধ্যে অল্প কয়েকটা মাত্র বললাম। প্রকাণ্ড লম্বা একটা নামের তালিকা তোমাকে দেবার কোনো সার্থকতা নেই। আমি চাই তুমি এইটে শুধু লক্ষ্য করে দেখো, এই এতগুলো দীর্ঘ শতাব্দী ধরে পারশ্য থেকে মধ্য-এশিয়ার ট্রান্স-অক্সিয়ানা পর্যন্ত দেশ জুড়ে পারশ্যের শিল্প আর সংস্কৃতির শিখা কী উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে গেছে। শিল্পকলা এবং সাহিত্যচর্চার দিক থেকে পারশ্যের নগরগুলির বড়ো বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী নগরীরও অভাব ছিল না, যেমন বোখারা এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানার শহর বল্‌খ্‌। বোখারাতে দশম শতাব্দীর শেষ দিকে ইবুনে সিনা বা আবিসেন্না জন্মগ্রহণ করেন, আরব দার্শনিকদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর দু শো বছর পরে বল্‌খ্‌-শহরে জন্মগ্রহণ করেন পারশ্যের আর-একজন বিখ্যাত কবি, জালালুদ্দিন রুমি। রুমিকে খুব বড়ো একজন রহস্যময় অধ্যাত্মতত্ত্ব-বাদী বলা হয়; তিনিই নৃত্য-পর দরবেশ-সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এইভাবে এক দিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল, অথচ তা সত্ত্বেও অন্য দিকে আরব-পারশ্যের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে রইল, সাহিত্যে চিত্রে ভাস্কর্যে অপূর্ব সব বস্তু সৃষ্টি করে চলল। তার পর এল সর্বনাশা ধ্বংস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২২০ সনের কাছাকাছি সময়ে) চেঙ্গিস খাঁ খোয়ারিশম এবং ইরাণ আক্রমণ ও ধ্বংস করলেন।

এর অল্প কয়েক বছর পরেই হুলাগু বাগদাদ ধ্বংস করলেন। বহু দীর্ঘ শতাব্দী-ব্যাপী উচ্চস্তরের সংস্কৃতির ফলে যে রত্নভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছিল তা সেই বন্যাপ্লাবনে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মোগলরা মধ্য-এশিয়াকে প্রায় মরুপ্রান্তরে পরিণত করল; এর বড়ো বড়ো শহরগুলো, সমস্ত লোক পালিয়ে যাওয়াতে, যেন একেবারেই জনহীন হয়ে পড়ল—এর আগের কোনো একটি চিঠিতে আমি তোমাকে এর কথা বলেছি।

এই দুর্দৈবের আঘাত মধ্য-এশিয়া আর কোনোদিনই পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি। তবু যে পর্যন্ত সামলে নিয়েছিল তাই আশ্চর্য। তোমার মনে আছে, চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য অনেক ভাগ হয়ে গেল। পারশ্য এবং তার আশপাশের অঞ্চলটি পড়ল হুলাগুর ভাগে। তিনিও প্রথমটা প্রাণ-ভরে ধ্বংসলীলা চালালেন; তার পর কিন্তু বেশ শান্তিপ্রিয় এবং সহিষ্ণু রাজা হয়েই বসলেন; তাঁকে দিয়ে ইল্‌খান-রাজবংশটির আরম্ভ হয়। এই ইল্‌খান-রাজারা কিছুদিন পর্যন্ত মোগলদের প্রাচীন 'শূন্য'-ধর্ম অনুসরণ করলেন, তার পর মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু মুসলমান হবার আগে ও পরেও, এঁরা বরাবরই অন্যের ধর্মমতকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন। চীনে এঁদের জ্ঞাতিরা—'বড়ো খাঁ' এবং তাঁর পরিজনবর্গ ছিলেন বৌদ্ধ; তাঁদের সঙ্গে এঁদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি অত দূরবর্তী চীনদেশ হতেও এঁরা বিয়ের জন্য মেয়ে আনতেন! মোগলদের, পারশ্য এবং চীনের অধিবাসী এই দুটি শাখার মধ্যে, এইরকম সম্পর্ক থাকার ফল শিল্পকলার উপরেও প্রচুর দেখা দিল। চীনা শিল্পের প্রভাব ক্রমে পারশ্যে এসে পড়ল, তখনকার চিত্রকলায় আরব পারশ্য ও চীন, তিন দেশেরই প্রভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও, নানারকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, পারশ্যেরই কলার প্রতিপত্তি বড়ো হয়ে উঠল। চতুর্দশ শতাব্দীতে পারশ্যে আর-একজন বড়ো কবির আবির্ভাব হল। এঁর নাম হাফিজ; এঁর রচনা ভারতবর্ষে আজও জনপ্রিয়।

মোগল ইল্‌খানদের রাজত্ব বেশি দিন চলে নি। এঁদের শেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিধ্বস্ত করে দিলেন আর-একজন বড়ো যোদ্ধা; ইনি ট্রান্স্‌-অক্সিয়ানার অন্তর্গত সমরকন্দের রাজা—তাইমুর। এঁর কথা আমি তোমাকে বলেছি। এই বর্বর যোদ্ধা যেমন ছিলেন ভয়ানক, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠুরতায় অতুলনীয়। অথচ ইনিই আবার শিল্পকলারও পরম অনুরাগী ছিলেন; বেশ একজন পণ্ডিতলোক বলেও এঁর খ্যাতি ছিল! এঁর শিল্পানুরাগের বোধ হয় প্রধান প্রমাণ ছিল এই, দিল্লি শিরাজ বাগদাদ দামাস্কাস ইত্যাদি বহু বড়ো বড়ো শহর ইনি লুণ্ঠন করলেন, এবং সমস্ত লুণ্ঠিত জিনিষপত্র নিয়ে গিয়ে নিজের রাজধানী সমরকন্দকে সজ্জিত করে তুললেন। সমরকন্দের সবচেয়ে আশ্চর্য এবং মনোহর অট্টালিকা হচ্ছে তাইমুরের সমাধি—গুর আমির। তাইমুরেরই উপযুক্ত সমাধিস্তম্ভ এটি; এর বিশাল আয়তনের প্রতিটি রেখায় তাইমুরের বিরাট ব্যক্তিত্ব শক্তি আর উগ্রতার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাইমুর একটা বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে সেটা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু অল্প-খানিকটা রাজ্য তাঁর বংশধরদের হাতে থেকে গেল, এর মধ্যে পড়ল ট্রান্স-অক্সিয়ানা আর পারশ্য। পুরো এক শো'টি বছর, সম্পূর্ণ পঞ্চদশ শতাব্দীটি ধরে, এই 'তাইমুরিদ'-রাজারা ইরান বোখারা এবং হিরাটে রাজত্ব করলেন। এটা কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই নির্মম যোদ্ধার বংশধর এই রাজারা বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের দানশীলতা, করুণা এবং শিল্পানুরাগের জন্যে। এঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড়ো ছিলেন তাইমুরেরই পুত্র—শাহ্ রুখ। তাঁর রাজধানী হিরাট-শহরে তিনি চমৎকার একটি পুস্তকাগার তৈরি করেন; অসংখ্য পণ্ডিত ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি এখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন।

তাইমুরিদ-রাজারা এক শো বছর রাজত্ব করেন, এই সময়টাতে শিল্পকলা আর সাহিত্যের এতদূর উন্নতি হয়েছিল যে, এর নামই হয়ে গেল 'তাইমুরিদ-আমলের পুনরুজ্জীবন'। পারশ্যের সাহিত্য অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই সময়ে; সুন্দর সুন্দর ছবিও অনেকই আঁকা হল। চিত্রকলার একটি বিশেষ ধরনের প্রবর্তন করলেন তখনকার বিখ্যাত চিত্রকর বিহ্‌জাদ। এটা লক্ষ্য করবার বস্তু, তাইমুরিদ-রাজাদের সাহিত্য-চক্রের হাতে পারশ্য-সাহিত্যের যেমন উন্নতি হল, ঠিক তার পাশাপাশিই

উন্নতি ঘটল তুর্কি-সাহিত্যেরও। মনে রেখো, ঠিক এই সময়টাই ছিল ইতালিতেও পুনরুজ্জীবনের যুগ।

তাইমুরিদরা জাতিতে তুর্কি; পারশ্যের সংস্কৃতি তাঁদের অনেকখানি অভিভূত করে ফেলেছিল। তুর্কি এবং মোগলদের অধীনে থেকেও ইরান সেই বিজেতাদের জয় করে নিল তার সংস্কৃতি দিয়ে। তারই সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পারশ্য চেষ্টা করতে লাগল; তাইমুরিদ-রাজারা ক্রমেই আরও বেশি পুব দিকে হটে যেতে বাধ্য হলেন, তাঁদের রাজ্যও ক্রমে ছোটো হয়ে গেল, মাত্র ট্রান্স-অক্সিয়ানার চার পাশ নিয়ে থাকল তার অস্তিত্ব। ষোড়শ শতাব্দীতে ইরানিদের জাতীয়তাবাদেরই জয় হল; তাইমুরিদ-রাজারা পারশ্য থেকে চিরদিনের মতোই চলে গেলেন। এবার পারশ্যের সিংহাসনে বসল তার দেশেরই একটি রাজবংশ, এর নাম সাফাভি বা সাফাভিদ্-বংশ। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন প্রথম তাহ্‌মাস্প্; শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন যখন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যান তখন ইনিই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

১৫০২ থেকে ১৭২২ সন পর্যন্ত দু শো কুড়ি বছর ধরে সাফাভি-রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়টাকে বলা হয় পারশ্যের শিল্পকলার স্বর্ণযুগ। রাজধানী ইস্পাহান-শহর অপূর্বসুন্দর অট্টালিকায় ভরে উঠল; শিল্পকলা, বিশেষ করে চিত্রকলারও বিখ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠল সে। এই বংশের সবচেয়ে বড়ো রাজা ছিলেন শাহ্ আব্বাস; পারশ্যদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে এঁকে একজন বলে ধরা হয়। ইনি ১৫৮৭ থেকে ১৬২৯ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁর সময়ে এক দিক থেকে উজবেগরা এবং অন্য দিক থেকে অটোম্যান-তুর্কিরা পারশ্যকে চেপে ধরছিল। তিনি এদের দুই পক্ষকেই পরাজিত করে দূরে তাড়িয়ে দিলেন, নিজের একটি পরাক্রান্ত রাজ্য গড়ে তুললেন, পশ্চিমে এবং অন্যান্য দিকেও দূরস্থিত রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপন করলেন, তার পর নিজের রাজধানীটিকে শোভন ও সুন্দর করে তোলবার দিকে মন দিলেন। ইস্পাহানে শাহ্ আব্বাস যে নগর-পরিকল্পনা করেছিলেন তাকে বলা হয়েছে 'প্রাচীন শুচিতা ও সুরুচির চরম নিদর্শন'। তিনি যে অট্টালিকাগুলি তৈরি করেছিলেন সেগুলি যে শুধু নিজেরা সুন্দর এবং সুসজ্জিত ছিল তাই নয়, সাজানোর কায়দার জন্যও তাদের সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে যেসব ইউরোপীয় পর্যটক পারশ্যে গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অতি উচ্ছ্বসিত ভাষায় এর রূপ-বর্ণনা করেছেন।

পারশ্যে শিল্পকলার এই স্বর্ণযুগে এর স্থাপত্য, সাহিত্য, প্রাচীর ও আলেখ্য -চিত্র, সুন্দর গালিচা-নির্মাণ, মিনার কাজ, সমস্ত কিছুরই উন্নতি হয়েছিল। এর মধ্যে কতকগুলো প্রাচীরচিত্র এবং আলেখ্যচিত্র ছিল একেবারে অপরূপ সুন্দর। শিল্পকলা কখনও দেশ বা জাতির সীমা নিয়ে গণ্ডিবদ্ধ থাকে না, থাকা উচিতও নয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর এই পারশিক শিল্পকে বহু দেশের বহু প্রভাবই নিশ্চয় এসে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। অনেকে বলেন, ইতালির প্রভাব নাকি এর মধ্যে সুস্পষ্ট। কিন্তু এই সব-কিছুরই পিছনে রয়েছে ইরানের প্রাচীন শিল্পরীতি। দু হাজার বছর ধরে সে রীতি ইরানে টিঁকে রয়েছিল। ইরানি সংস্কৃতিরও কর্মক্ষেত্র শুধু পারশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—পশ্চিমে তুর্কি ও পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত অতি বিরাট স্থান নিয়ে সে বিস্তার-লাভ করেছিল। ইউরোপে ফরাসিভাষার মতো, ভারতে মোগল-সম্রাটদের দরবারে এবং পশ্চিম-এশিয়ারও সর্বত্রই, সংস্কৃতিপ্রাপ্ত সমাজের ভাষা হয়েছিল ফার্সিভাষা। আগ্রার তাজমহলে পারশিক শিল্পকলার প্রাচীন রীতির পরিচয় আজও অমর হয়ে রয়েছে। ঠিক একই ভাবে এই শিল্পকলা অটোম্যানদের স্থাপত্যশিল্পকেও প্রভাবান্বিত করেছিল, পশ্চিমে কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ পর্যন্ত তার প্রমাণ দেখা যায়; সেখানকার অনেক প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় পারশিক প্রভাবের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

পারশ্যের সাফাভি-রাজারা মোটামুটি হিসেবে ভারতের মোগল-সম্রাটদের সমসাময়িক ছিলেন। ভারতের প্রথম মোগল-সম্রাট বাবর ছিলেন সমরকন্দের তাইমুরিদ-রাজপুত্রদের একজন। পারশিকদের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা তাইমুরিদ-রাজবংশকে দূর করে দিয়েছিল; ট্রান্স-অক্সিয়ানা এবং আফগানিস্থানের খানিক অংশমাত্র বিভিন্ন তাইমুরিদ-রাজার অধীন হয়ে ছিল। বারো বছর বয়স থেকেই বাবরকে এইসব ক্ষুদ্র রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়াতে হয়েছে। যুদ্ধে এদের হারিয়ে তিনি কাবুলের সিংহাসন অধিকার করলেন; তার পর এলেন ভারতবর্ষে। এই সময়কার তাইমুরিদ-

রাজারা কতখানি সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন বাবরকে দেখেই তা বোঝা যায়। এর আগের একটি চিঠিতে আমি তোমাকে তাঁর আত্মজীবনী থেকে কিছু কিছু কথা উদ্ধৃত করে পাঠিয়েছি। সাফাভি-বংশের সবচেয়ে বড়ো রাজা শাহ্ আব্বাস ছিলেন আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। দুটি দেশের মধ্যে আগাগোড়া খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব নিশ্চয় বজায় ছিল। বহুদিন ধরে এদের সীমান্ত-রেখাও এক ছিল, কারণ আফগানিস্থান ছিল মোগলদের ভারত-সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ।

১২৫

পারশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৩

আমার নামে একটা নালিশ তুমি করতে পার—ইতিহাসের নানান অলিগলিতে হুড়মুড় করে একবার এ দিক একবার ও দিক ছুটোছুটি করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এতে রাগ হবারই কথা। নানা পথ বেয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম ঊনবিংশ শতাব্দীতে; তার পর আবার হঠাৎ পিছিয়ে চলে গেলাম কয়েক হাজার বছর আগে, লাফ মেরে মেরে বেড়িয়ে বেড়ালাম, মিশর ভারতবর্ষ চীন আর পারশ্য করে। এতে নিশ্চয়ই যেমন গেছ চটে, তেমনি পড়েছ ধাঁধায়; অনুযোগ করছ সেটা প্রায় কানেই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তার ভালো কিছু জবাব আমার দেবার নেই। মঁসিয়ে গ্রুসের বইটি পড়তে পড়তে হঠাৎ অনেকগুলো চিন্তার ধারা একসঙ্গে আমার মাথার মধ্যে জেগে উঠেছিল, তোমাকে তার গোটাকতকের ভাগ না দিয়ে পারলাম না। এ কথাও ভেবেছিলাম যে, এই চিঠিগুলোতে আমি পারশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলি নি, সেই ত্রুটিটাও খানিকটা পূরণ করতে চেয়েছিলাম। আর পারশ্যের কথা বলতে যখন শুরুই করেছি তখন তার গল্পটাকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত বলে শেষ করলেই তো হয়।

পারশ্যের সংস্কৃতির প্রাচীন রীতিনীতি, তার অত্যুচ্চ গুণগরিমা, পারশ্যের শিল্পকলার স্বর্ণ-যুগ ইত্যাদি অনেক কথাই তোমাকে বলেছি। এই কথাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে কিন্তু আমার মনে হয়, ভাষাটা বড়ো বেশিরকম কাব্যিক, হয়তো-বা একটু ভ্রান্তিজনকও। হঠাৎ মনে হতে পারে, সত্যই বুঝি পারশ্যের লোকেদের ভাগ্যে একটা স্বর্ণযুগ নেমে এসেছিল, তাদের দুঃখদুর্দশার অবসান হয়ে তারা বুঝি একেবারে রূপকথার দেশের প্রজাদের মতো সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেছিল। এ রকমের অবশ্য কিছুই ঘটে নি। তখনকার দিনে সংস্কৃতি আর কলা-চর্চা ছিল অতি অল্পসংখ্যক ক'টি লোকের একচেটে (এখনও অনেকটা তাই); দেশের জনসাধারণ বা সাধারণ লোকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিন থেকেই সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার অর্থ ছিল শুধু খাদ্যের আর জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্যে অবিশ্রাম সংগ্রাম; পশুর জীবনের সঙ্গে তার খুব বড়ো প্রভেদ কিছু ছিল না। অন্য কিছু করবার মতো সময় বা অবসর তাদের হত না; তাদের প্রতিটি দিন আকণ্ঠপূর্ণ হয়ে থাকত সেই দিনেরই গ্লানিতে আর কদর্যতায়। শিল্পকলা আর সংস্কৃতির কথা ভাববে তারা কখন? পারশ্যে ভারতে চীনে ইতালিতে ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশে শিল্পকলার উন্নতি হয়েছিল, সে তাদের রাজারাজড়া ধনী এবং অবসরবিলাসী শ্রেণীদের সময় কাটাবার ব্যসন হিসেবে। ধর্মসংক্রান্ত শিল্প হিসেবে হয়তো-বা তার একটুখানি স্পর্শ সাধারণ লোকের জীবনেও গিয়ে লাগত, এই পর্যন্ত।

কিন্তু রাজা শিল্পোৎসাহী হলেই যে রাজ্যের শাসনব্যবস্থাও ভালো হবে, এমন কোনো কথা নেই; শিল্পকলা আর সাহিত্যের পোষক বলে যে রাজারা জাঁক করতেন তাঁদেরই অনেকে আবার ছিলেন রাজা হিসেবে অকর্মণ্য আর নিষ্ঠুর। তখনকার দিনের প্রায় সকল রাষ্ট্রের মতো পারশ্যেও তখন সমাজের রূপ ছিল অল্পবিস্তর সামন্ত-পন্থী। শক্তিশালী রাজাদের প্রজারা পছন্দ করত,

কারণ, সামন্ত-প্রভুদের অনেক খ‍ুঁটিনাটি আদায় ও উৎপীড়ন থেকে তিনি তাদের রক্ষা করতেন। সময়ের ফেরে কখনও-বা বেশ ভালো শাসন হত, আবার কখনও-বা অত্যন্তরকম কুশাসনই চলত।

১৭২৫ সনের কাছাকাছি সময়ে সাফাভি-রাজবংশের পতন হল; ভারতে মোগলদের প্রভুত্বও তখন শেষ হয়ে এসেছে। যেমন হয়, সাফাভি-বংশেরও জীবনীশক্তি ফ‍ুরিয়ে গিয়েছিল। সামন্ততন্ত্র তখন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে; দেশের মধ্যে কতকগ‍ুলো অর্থনৈতিক অবস্থার স‍ৃষ্টি হয়েছে যা প‍ুরোনো ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। রাজারা খ‍ুব চড়া হারে কর বসাচ্ছিলেন, তার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে লাগল। আফগানরা তখন ছিল সাফাভি-রাজার অধীন। তারা বিদ্রোহ করল; নিজেদের দেশে তো জয়লাভ করলই, এগিয়ে এসে ইস্পাহান পর্যন্ত দখল করল, শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করল। এইভাবে সাফাভিদের রাজত্ব শেষ হল। এর অল্পদিন পরেই আবার আফগানদের তাড়িয়ে দিলেন একজন পারশিক সেনাপতি, তাঁর নাম নাদির শাহ্‌। এর পরে ইনি নিজেই রাজা হয়ে বসলেন। জরাজীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ দিকে এই নাদির শাহ্‌ই ভারত আক্রমণ করেছিলেন, দিল্লির সমস্ত লোককে নিহত করেছিলেন, এবং বিপ‍ুল ধনরত্ন ল‍ুটে নিয়ে গিয়েছিল; তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শাহ্‌জাহানের ময়‍ূর-সিংহাসন। পারশ্যের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস কেবল গ‍ৃহয‍ুদ্ধ, রাজা-বদল আর কুশাসনের দ‍ুঃখময় কাহিনীতে প‍ূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার ন‍ূতনতর বিপদ এসে দেখা দিল। ইউরোপের বিস্তারশীল এবং উগ্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পারশ্যের সংঘাত বাধল। উত্তরে রাশিয়া তার উপরে চাপ দিচ্ছে; দক্ষিণে পারশ্য-উপসাগর ধরে ব্রিটিশরা উঠে আসছে। ভারতবর্ষ থেকে পারশ্যের দ‍ূরত্ব বেশি নয়; এদেরও সীমান্তরেখা ক্রমেই পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছিল; বস্তুত এখন এদের দ‍ুই দেশেরই সীমান্ত-রেখা এক হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে আসবার সোজা স্থলপথটি চলে গেছে পারশ্যেরই মধ্য দিয়ে; ভারতে আসবার সম‍ুদ্রপথটিও একেবারে পারশ্যের হাতের তলায়। ব্রিটিশ নীতির সমস্ত শক্তি তারা তখন নিয‍ুক্ত করছিল তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যকে এবং সে সাম্রাজ্যে পৌঁছবার সমস্ত পথগ‍ুলোকে রক্ষা করবার দিকে। রাশিয়া রয়েছে ব্রিটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; সে যে হঠাৎ এসে এই পথটির উপর জ‍ুড়ে বসবে আর ভারতের দিকে লোল‍ুপ দ‍ৃষ্টি দেবে, এমনটাও ঘটতে দিতে ব্রিটেন কিছ‍ুতেই রাজি নয়। কাজেই ব্রিটেন আর রাশিয়া দ‍ু পক্ষই পারশ্যের দিকে খ‍ুব প্রখর মনোযোগ নিবিষ্ট করল, নানান রকমে সে বেচারিকে উৎপীড়ন করতে লাগল। শাহ্‌রা ছিলেন একেবারেই অকর্মণ্য আর ম‍ূর্খ; তাঁরা প্রায়ই এদের কারও হাতের প‍ুতুল হয়ে পড়তেন—কখনো-বা অসময়ে এদের সঙ্গে য‍ুদ্ধ বাধিয়ে, কখনও-বা নিজেদেরই প্রজাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। ব্রিটেন আর রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে তাই, নইলে পারশ্য হয়তো একেবারেই রাশিয়ার বা ব্রিটেনের কবলে চলে যেত, গিয়ে তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ত বা মিশরের মতো এদের একটা কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল হয়ে থাকত।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে আবার একটা কারণে ন‍ূতন করে পারশ্যের উপর সকলের লোভ পড়ল। পারশ্যে তেল, অর্থাৎ, পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হল; তেল তখন একটা অত্যন্ত ম‍ূল্যবান বস্তু হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে মোটরগাড়ির ব্যবহার বেড়ে যাবার পর থেকে। ব‍ৃদ্ধ শাহকে প্রভাবিত করে রাজী করা হল; ১৯০১ সনে তিনি ডি-আর্কি-নামক একজন ইংরেজকে খ‍ুব উদার একটি সনদ মঞ্জ‍ুর করলেন, ষাট বছর ধরে পারশ্যের সমস্ত খনি থেকে তেল তুলে নেবার অধিকার দিয়ে। এর কয়েক বছর পরে এই তেলের খনিগ‍ুলোতে কাজ চালাবার জন্যে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি গড়া হল, এর নাম 'দি অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানি'। সেই থেকে আজও পর্যন্ত এই কোম্পানিটি সেখানে কাজ চালাচ্ছে, তেলের ব্যবসা করে প্রচুর পরিমাণে লাভও তুলে নিয়েছে। এই লাভের ক্ষ‍ুদ্র অংশ পারশ্য সরকার পেতেন; বেশির ভাগই চলে যেত দেশের বাইরে, কোম্পানির অংশীদারদের হাতে; এর সবচেয়ে বড়ো অংশীদারদের মধ্যে একজন হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং। পারশ্যের বর্তমান সরকার চরম জাতীয়তাবাদী, বিদেশীদের এই ল‍ুণ্ঠনের এঁরা অত্যন্ত বিরোধী। ১৯০১ সনে ডি-আর্কির সঙ্গে যে ষাট বছরের চুক্তি হয়েছিল তার জোরেই 'অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানি' ব্যবসা
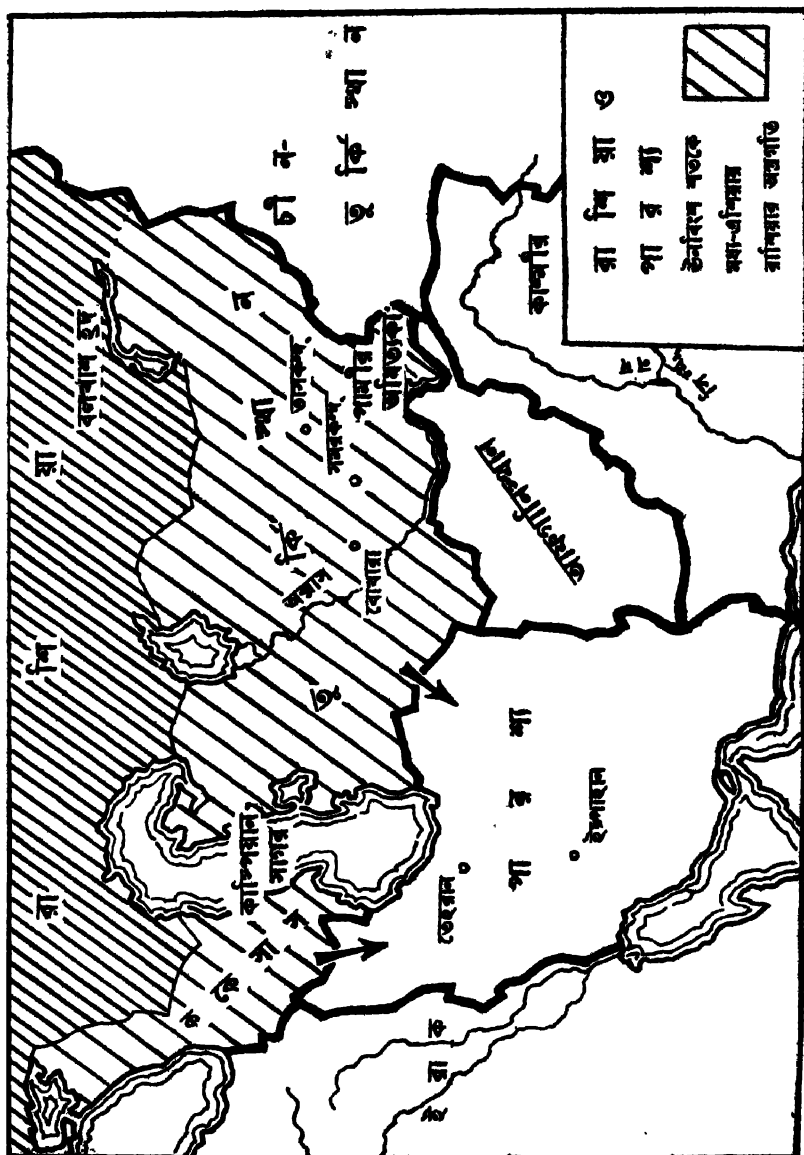
চালাচ্ছিল; এ'রা সে চুক্তিটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার এতে স্বভাবতই খুব চটে গেল, পারশ্যকে ভয় দেখিয়ে জবরদস্তি করে বাধ্য করবার চেষ্টাও করল—ভুলে গেল যে, দিনকালের পরিবর্তন হয়েছে, এখন আর এশিয়ার লোকেদের উপর জবরদস্তি চালানো অত সোজা নয়।*

কিন্তু এও পরের কথা আগে বলে যাচ্ছি। পারশ্যের দিকে সাম্রাজ্যবাদীরা যত এগিয়ে আসতে লাগল, শাহ্ যতই ক্রমে এদের হাতের পুতুল হয়ে উঠতে লাগলেন, দেশের মধ্যে এর অবশ্যম্ভাবী ফল, জাতীয়তাবাদ, ততই বেড়ে উঠল। একটি জাতীয়তাবাদী দল সৃষ্টি হল। এই দলটি বিদেশীদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করল না, আবার শাহ্‌দের স্বৈরতন্ত্রী শাসন সম্বন্ধে ঠিক সমান জোরেই আপত্তি জানাল। এরা দাবি করল, দেশে একটি প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা এবং আধুনিক রীতিতে সব সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দেশে তখন শাসন বলে কিছু নেই, প্রজার উপরে করের ভার অত্যধিক হয়ে উঠেছে, ব্রিটিশ এবং রাশিয়ানরা সমস্ত ব্যাপারেই এসে হস্তক্ষেপ করছে। তখনকার শাহ্ ছিলেন প্রগতি-বিরোধী; তাঁর প্রজারা খানিকটা স্বাধীন অধিকার পেতে চাইছে অতএব তাদের চেয়ে এই বিদেশীদেরই তিনি নিজের বন্ধু বলে মনে করলেন। দেশের লোকে প্রজাতন্ত্রী শাসন চাইছিল, এই দাবি প্রধানত আসছিল নূতন মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীগুলোর কাছ থেকে। ১৯০৪ সনে জাপানের হাতে জার-শাসিত রাশিয়া পরাজিত হল; দেখে পারশ্যের জাতীয়তাবাদীরা অত্যন্তরকম মুগ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল; তার এক কারণ, এটা একটা এশিয়াবাসী জাতির হাতে একটা ইউরোপীয় জাতির পরাজয়; আর-একটা কারণ, এই জার-শাসিত রাশিয়াই ছিল তখন পারশ্যের উগ্রপন্থী এবং কলহপরায়ণ প্রতিবেশী। রাশিয়ায় ১৯০৫ সনের বিপ্লব বিফল হল, সরকার নির্মম অত্যাচার চালিয়ে তাকে নষ্ট করে দিল; কিন্তু সেই বিপ্লব দেখে পারশ্যের জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহ আর কর্মের প্রেরণা বাড়িয়ে তুলল। শাহ্‌এর উপরে এরা এত জোর চাপ দিতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ১৯০৬ সনে একটি প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে রাজি হলেন। পারশ্যের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হল, এর নাম হচ্ছে 'মজলিশ'; মনে হল যেন পারশ্যের বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু বিপদও ঘনিয়ে আসছিল। নিজেকে অবলুপ্ত করে দেবার ইচ্ছা শাহ্‌এর মোটেই ছিল না; রুশ এবং ব্রিটিশরাও পারশ্যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে পছন্দ করল না; কেননা, একদিন সে প্রজাতন্ত্র সবল হয়ে উঠতে পারে, তাদের স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। শাহ্ এবং 'মজলিশ'এর মধ্যে ঝগড়া লাগল; শাহ্ একেবারে কামান ছুঁড়ে নিজেরই ব্যবস্থাপক সভাকে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু প্রজা আর সেনা ছিল মজলিশ এবং জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে; শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সেনাই এসে শাহ্‌কে রক্ষা করল। কোনো-না-কোনো একটা ছুতো ধরে, সাধারণত তাদের নিজেদের প্রজাদের রক্ষার নাম করে, রাশিয়া এবং ইংলণ্ড দুই পক্ষই নিজের নিজের সেনা এনে হাজির করছিল এবং তাদের দেশের মধ্যেই বসিয়ে রাখছিল। রাশিয়ার ছিল ভয়ংকর কশাক-বাহিনী; ব্রিটিশরা পারশিকদের উপর জুলুম চালাচ্ছিল ভারতীয় সেনার জোরে; অথচ পারশ্যের সঙ্গে আমাদের কোনোই ঝগড়া নেই।

পারশ্য বিষম বিপদে পড়ে গেল। তার টাকা নেই, প্রজার অবস্থাও খুবই খারাপ। প্রজার অবস্থার উন্নতির জন্যে মজলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু তাদের প্রায় সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিল হয় ব্রিটিশরা নয়তো রুশরা, নয়তো দু দলে মিলে। শেষ পর্যন্ত পারশ্য সাহায্য চাইতে গেল আমেরিকার কাছে; তার অর্থনৈতিক অবস্থার সুব্যবস্থা করবার জন্যে একজন দক্ষ আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞকে নিযুক্ত করা হল। এই আমেরিকান ভদ্রলোকটির নাম মর্গান শুস্টার। তিনি এই কাজের জন্যে প্রাণপাত করতে লাগলেন, কিন্তু সব সময়েই দেখা গেল, হয় রাশিয়া নয় ব্রিটেন তাঁর সামনে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্ত ও হতাশ হয়ে তিনি ওদেশ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। পরবর্তী কালে শুস্টার একটি বই লিখেছিলেন, তাতে তিনি বেশ খুলেই বলেছিলেন, কীরকম করে রাশিয়া এবং ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা পারশ্যকে পিষে তার প্রাণ শেষ করে দিচ্ছে।

---

* অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ও অয়েল কোম্পানীকে একটা নূতন চুক্তি মেনে নিতে হয়েছে এবং সেটা পারশ্য সরকারের পক্ষে পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল হয়েছে।

বইটির নামটিই খুব অর্থপূর্ণ, এই নাম দেখেই এর কাহিনীটি বোঝা যায়। নামটি হচ্ছে— *The Struggling of Persia* বা 'পারশ্যের সংগ্রাম'।

ব্যাপার দেখে মনে হল, পারশ্যের আর অব্যাহতি নেই, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব এবার শেষ। এ দিকে খানিকটা পথ ব্রিটেন আর রাশিয়া ইতিমধ্যেই এগিয়েও গিয়েছিল; দেশটাকে তারা দু ভাগ করে তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় পরিণত করে নিয়েছিল। দেশের বড়ো বড়ো কেন্দ্র-স্থলগুলোতে তাদের সেনা মজুত; একটি ব্রিটিশ কোম্পানি তার তৈল-সম্পদ শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। পারশ্যের দুর্দশার একেবারে চরম হল। এর চেয়ে যদি কোনো বিদেশী তাকে সোজাসুজিই নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিত, বোধ হয় সেটাও তার পক্ষে এর চেয়ে ভালো হত, কারণ, তা হলে সেই বিদেশীর তার দরুন কিছুটা দায়িত্বও স্বীকার করতে হত। এই অবস্থায় শুরু হল ১৯১৪ সনের বিশ্বযুদ্ধ।

পারশ্য ঘোষণা করল, এই যুদ্ধে সে কোনো পক্ষেই যোগ দেবে না। কিন্তু প্রবলের কাছে দুর্বলের ঘোষণার কোনো মূল্যই নেই। পারশ্য বলেছিল, সে নিরপেক্ষ থাকবে। সে কথা যুদ্ধরত জাতিরা কেউ কানেই তুলল না; দুর্বল পারশ্য-কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রাহ্যমাত্র না করে বিদেশী সেনারা পারশ্যের মধ্যেই এসে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। পারশ্যের চার দিকেই তখন যুদ্ধরত জাতিরা রয়েছে—এক পক্ষে ইংলণ্ড আর রাশিয়ার মৈত্রী, অন্য দিকে তুরস্ক হচ্ছে জর্মানির মিত্র। তখন আবার ইরাক আর আরব ছিল তুর্কি-রাজ্যের অন্তর্গত। ১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হল, ইংলণ্ড ফ্রান্স ও তাদের মিত্রজাতিরা জিতে গেল, পারশ্যের সর্বত্রই তখন ব্রিটিশ সেনা জুড়ে বসে রয়েছে। ইংলণ্ড পারশ্যকে তার একটা 'রক্ষণাধীন অঞ্চল' বলে ঘোষণা করতে উদ্যত—তাকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেবারই একটা রকম-ফের এটা। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে বেলুচিস্থান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রিটিশের বিশাল একটি মধ্য-প্রাচ্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নও সে তখন দেখছে। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হল না। ব্রিটেনের দুর্ভাগ্যক্রমে রাশিয়াতে তখন জারের শাসন অন্তর্হিত হয়েছে, তার জায়গাতে এসেছে সোভিয়েট রাশিয়া। ব্রিটেনের দুর্ভাগ্যক্রমেই তুর্কিতেও তার সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেল; মিত্রশক্তির একেবারে মুখের ভিতর থেকে কামাল পাশা তাঁর দেশকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন।

এইসমস্ত ব্যাপারেই পারশ্যের জাতীয়তাবাদীদের খুব সুবিধা হল; দেশহিসেবে পারশ্য স্বাধীনই থেকে গেল। ১৯২১ সনে রেজা খাঁ নামক একজন পারশিক সৈনিক হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। অতর্কিতে অভিযান করলেন তিনি; সেনাকে আয়ত্ত করে নিলেন, তার পর প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। ১৯২৫ সনে প্রাচীন শাহ্‌ সিংহাসনচ্যুত হলেন; একটি শাসন-ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠিত হল; এই পরিষদ রেজা খাঁকেই নূতন শাহ্‌ নির্বাচিত করল। রাজা হয়ে তিনি নাম নিলেন 'রেজা শাহ্‌ পহ্‌লবি'।

শান্তিপূর্ণ উপায়েই রেজা শাহ্‌ সিংহাসন অধিকার করেছেন; যে নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন সেটা অন্তত বাইরের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রী। মজলিশ এখনও টিঁকে আছে; নবীন শাহ্‌ নিজেকে মোটেই স্বৈরতন্ত্রী রাজা বলে জাহির করতে চান না। তবু এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পারশ্য-সরকারের গোড়ায় শক্ত হাতে হাল ধরে বসে আছেন তিনিই। গত কয়েক বছরের মধ্যে পারশ্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে; দেশকে আধুনিক রীতিতে গড়ে তোলবার জন্যে রেজা শাহ্‌ নানান রকমের সংস্কারসাধন করতে লেগে গেছেন। পারশ্যের খুব-একটা জাতীয় জাগরণ হয়েছে, দেশের সর্বত্র নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে; যেখানেই পারশ্যে বিদেশীদের স্বার্থ নিয়ে কথা সেইখানেই এটা উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করছে।

এটাও খুব লক্ষ্য করবার বিষয়, পারশ্যের এই-যে জাতীয় জাগরণ, এটা চলেছে ঠিক তার সেই দু হাজার বছরের প্রাচীন রীতিনীতিরই পথ ধরে। অতি প্রাচীন কালে, ইসলামের আবির্ভাবেরও পূর্বে, পারশ্য খুব বড়ো জাতি ছিল; তার দিকেই ফিরে তাকাচ্ছে তারা, সেই যুগের কাহিনী থেকেই সংগ্রহ করছে চলার পথের প্রেরণা। রেজা শাহ্‌ তাঁর বংশের নূতন নাম গ্রহণ করেছেন 'পহ্‌লবি'— এই নামটিও সেই প্রাচীন কালকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পারশ্যের প্রজারা অবশ্য মুসলমান, শিয়া

মনুসলমান। কিন্তু দেশের কথা যেখানে সেখানে তাদের মনে ধর্মের চেয়েও অনেক বড়ো প্রভাব দেখা যাচ্ছে জাতীয়তার। এশিয়ার সর্বত্রই এই ব্যাপার ঘটছে। ইউরোপে এ ঘটেছিল এক শো বছর আগে, উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু সেখানে এর মধ্যেই অনেকে মনে করছে, জাতীয়তাবাদ একটা পুরোনো সেকেলে মতবাদ মাত্র; তারা এখন খুঁজছে আরও নূতন মতামত, আরও নূতনতর বিশ্বাস, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য আরও অনেক বেশি।

পারশ্যের সরকারি নাম এখন ইরান। রেজা শাহ্ আদেশ জারি করেছেন যে 'পারশ্য' নামটি আর ব্যবহার করা চলবে না।

১২৬

বিপ্লব, এবং বিশেষ করে ইউরোপে ১৮৪৮ সনের বিপ্লব

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৩

ঈদল-ফেতর

এবার আমরা আবার ইউরোপে ফিরে যাব; উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহাদেশটির অবস্থা কীরকম জটিল এবং নিত্যপরিবর্তনশীল হয়ে উঠেছিল তাই দেখব। মাস দুই আগে লেখা কয়েকটি চিঠিতে আমি এই শতাব্দীটির সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করেছি, এর প্রধান কয়েকটি বিশেষত্বের কথাও তোমাকে বলেছি। তখন যতগুলো মতবাদের নাম করেছিলাম তার সমস্ত তোমার মনে থাকবার কথা নয়; শিল্পতন্ত্রবাদ ধনিকতন্ত্রবাদ সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতীয়তাবাদ, আরও কত রকমের নাম! গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞানের কথাও তোমাকে আমি বলেছি, বলেছি যানবাহনের ব্যবস্থা ও লোকশিক্ষার কথা যার ফল আধুনিক সংবাদপত্র। এইসব ব্যাপারে কী বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এইসমস্ত এবং আরও অনেক কিছু কাণ্ড একত্র মিলে তবেই হয়েছিল তখনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি—বুর্জোয়া সভ্যতা, যেখানে নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা ধনিকতন্ত্রী রীতিতে শিল্প ও কলকারখানা চালাচ্ছে। বুর্জোয়া ইউরোপের এই সভ্যতার ক্রমেই আরও উন্নতি হতে লাগল; ক্রমেই প্রগতির উচ্চ হতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করল সে। তার পর এই শতাব্দীর শেষ দিকে গিয়ে, যখন তার শক্তির বেগে সে নিজেকে এবং সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, ঠিক এমনি সময় এল সর্বনাশ।

এশিয়াতেও এই সভ্যতা কী কার্যকলাপ শুরু করেছিল তার খানিকটা খুঁটিনাটি আমরা দেখেছি। ইউরোপে শিল্পতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে; তার তাগিদে পড়ে ইউরোপ হাত বাড়িয়ে দিল দূরের দেশগুলির পানে, চেষ্টা করল তাদের মুঠোয় পুরতে, আয়ত্ত করে রাখতে, এবং মোটামুটি তাদের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করে নিজের সুবিধা গুছিয়ে নিতে। ইউরোপ বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি বিশেষ করে পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোকে; শিল্পতন্ত্রের উন্নতিতে এরাই অগ্রণী হয়েছিল। এইসমস্ত পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে আবার ইংলণ্ডই ছিল বহুকাল ধরে একেবারে নেতৃস্থানীয়; অন্যদের অনেক পিছনে ফেলে সে এগিয়ে চলেছিল, এবং এই অগ্রগতির ফলে প্রচুর-পরিমাণ লাভও করে নিচ্ছিল।

ইংলণ্ডে এবং পাশ্চাত্য জগতে এই-যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, এ শতাব্দীর প্রথম দিককার রাজা এবং সম্রাটরা কিন্তু তার স্বরূপ ভালো করে জানতেন না। নূতন যেসব শক্তির তখন জন্ম হচ্ছিল তার প্রকৃত গুরুত্ব কতখানি, তা তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেন নি। নেপোলিয়নের চরম পরাজয়ের পরে ইউরোপের এই রাজাদের একমাত্র চিন্তাই হল, কী করে নিজেদের এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের প্রভুত্ব চিরদিনের মতো কায়েমি করে রাখবেন, পৃথিবীতে কী করে স্বৈরতন্ত্রের আসনকে অক্ষয় করে তুলবেন। ফরাসি-বিপ্লব আর

নেপোলিয়নকে দেখে ভয়ে তাঁদের আত্মাপুরুষ খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করেছিল, সে ভয় তখনও ভালো করে কাটে নি। আবার সেইরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে তাঁরা চাইলেন না। আগের একটি চিঠিতে বলেছি, এঁরা সকলে মিলে 'পবিত্র মৈত্রী' ইত্যাদি সব বস্তু গড়ে তুললেন, যেন রাজাদের যা ইচ্ছে তাই করবার 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা'কে টি'কিয়ে রাখা যায়, যেন প্রজারা কিছুতেই আবার মাথা তুলে উঠতে না পারে। আগেও যেমন বহুবার হয়েছে, এবারেও এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্বৈরতন্ত্রী রাজা এবং ধর্মগুরুরা একত্র হাত ধরে দাঁড়ালেন। এইসমস্ত মৈত্রী-স্থাপনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার। নূতন শিল্পতন্ত্র এবং নবীন যুগের কণামাত্র স্পর্শ তাঁর রাজ্যে তখনও গিয়ে পৌঁছয় নি; রাশিয়া ছিল তখনও সামন্তপন্থী এবং অত্যন্তরকম অনুন্নত দেশ। তার বড়ো শহরের সংখ্যা অতি সামান্য, বাণিজ্যের সুব্যবস্থা প্রায় কিছুই নেই। এমনকি তার কারুশিল্পেরও বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নি। দেশে স্বৈরতন্ত্রী রাজার অপ্রতিহত প্রতাপ। ইউরোপের অন্য দেশগুলির অবস্থা ঠিক এরকম ছিল না। যতই পশ্চিমে এগিয়ে চলবে ততই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাক্ষাৎ বেশি করে পাওয়া যেত। ইংলণ্ডে স্বৈরতন্ত্র ছিল না, আগেই বলেছি। রাজা ছিলেন পার্লামেন্টের অধীন; সেই পার্লামেন্ট আবার চলত অল্প কয়েকজন ধনীর ইঙ্গিতে। রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী সম্রাট আর ইংলণ্ডের এই ধনী অভিজাত শাসকগোষ্ঠী, এদের মধ্যে প্রভেদ ছিল প্রচুর। কিন্তু একটি জায়গাতে এদের মিল ছিল, সে হচ্ছে জনসাধারণকে এবং বিপ্লবকে তাঁদের ভয়।

এইভাবে ইউরোপের সর্বত্র প্রগতি-বিরোধী দলের জয় হল; যা-কিছুর মধ্যে প্রগতির নামগন্ধ আছে তাকেই নির্মমভাবে পিষে মারা হতে লাগল। ১৮১৫ সনে ভিয়েনা-কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্ত স্থির হল তার বলে ইতালি পূর্ব-ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেকগুলো ছোটো ছোটো জাতিকে কোনো বিদেশীর অধীন করে দেওয়া হল। এই শাসন এদের মানতে বাধ্য করা হল জোর করে। কিন্তু এরকমের ব্যাপার দীর্ঘকাল ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়া যায় না; এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবেই। এ যেন ফুটন্ত কেটলির ঢাকনাটাকে জোর করে চেপে বসিয়ে রাখা। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে অসন্তোষের বাষ্পের অস্ফুট ধ্বনি শোনা যেতে লাগল, বারবার সে বাষ্প ঢাকা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে ১৮৩০ সনের বিদ্রোহগুলির কথা বলেছি; এর ফলে ইউরোপে অনেক পরিবর্তন সাধিত হল; বিশেষ করে ফ্রান্সে, সেখানে বুর্বোঁ রাজাদের চিরদিনের মতোই তাড়িয়ে দেওয়া হল। এইসব বিদ্রোহ দেখে রাজারা সম্রাটরা আর তাঁদের মন্ত্রীরা আরও ভয় পেয়ে গেলেন; আরও বেশি পরাক্রমে তাঁরা প্রজাদের পীড়ন এবং পেষণ করতে লাগলেন।

এই চিঠিগুলোর মধ্যে আমরা অনেকবার দেখেছি, কীভাবে যুদ্ধ এবং বিপ্লবের ফলে বহু দেশে বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতকালের যুদ্ধবিগ্রহ কখনও হত ধর্ম নিয়ে, কখনও-বা হত রাজপদ নিয়ে, মানে রাজবংশের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রভুত্ব নিয়ে লড়াই, কখনও-বা যুদ্ধ হত এক জাতি অন্য এক জাতির রাজ্য আক্রমণ করার ফলে। আবার, এইসব কারণের পিছনে কিছুটা অর্থনৈতিক কারণও সাধারণত থাকত। যেমন, মধ্য-এশিয়ার উপজাতিরা যে বারবার ইউরোপ এবং এশিয়া আক্রমণ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে খাদ্যের অন্বেষণে তাদের পশ্চিম দিকে অভিযান। আবার, অর্থনৈতিক সম্পদবৃদ্ধির ফলেও হয়তো এক-একটা দেশ বা জাতির শক্তি বেড়ে যায়, তখন তারা অন্যের উপরে প্রভুত্ব করার অবসর পায়। আমি তোমাকে দেখিয়েছি, ইউরোপে এবং অন্যত্র যেসব তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ হয়েছে তারও পিছনে অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান ছিল। আধুনিক কালে এসে আমরা দেখছি, ধর্ম এবং রাজপদ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধ অবশ্য শেষ হয় নি; বরং দুর্ভাগ্যক্রমে তার তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু সে যুদ্ধের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সেটা এখন স্পষ্টই দেখা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক কারণগুলোর উৎপত্তি হয় প্রধানত জাতীয়তাবাদ থেকে, একটা জাতি অন্য একটা জাতিকে পদানত করে রাখবার ফলে, বা দুটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশের মধ্যে বিরোধ বাধবার ফলে। আবার এই বিরোধেরও অনেকখানিই সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক কারণে;

যেমন আধুনিক কালের শিল্পতন্ত্রী দেশেরা যখন কাঁচা মাল এবং বাজারের সন্ধানে অন্যত্র গিয়ে হানা দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে এখন অর্থনৈতিক কারণেরই গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; বাস্তবিক পক্ষে আজকালকার দিনে অন্যান্য কারণের তুলনায় এইটেই হয়ে উঠেছে মুখ্য।

বিপ্লবেরও প্রকৃতিতে অতীতকালে এইরকমের পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন কালের বিপ্লব সাধারণত ছিল প্রাসাদ-বিপ্লব; রাজবংশের বিভিন্ন ব্যক্তিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং খুনাখুনি করল; অথবা হয়তো অত্যাচারে মরিয়া হয়ে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং অত্যাচারী রাজাকে শেষ করে দিল; কিংবা হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক সেনার সাহায্যে নিজেই সিংহাসন অধিকার করে বসল। এই প্রাসাদ-বিপ্লবের অধিকাংশই ঘটত রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তরের কয়েকজনের মধ্যে। সাধারণ প্রজার উপরে এর প্রভাব বিশেষ পড়ত না, তারাও একে নিয়ে মাথা ঘামাত না। এক রাজা যেত, অন্য রাজা আসত, কিন্তু শাসনব্যবস্থা একই থেকে যেত, প্রজাদের জীবনযাত্রাও একইভাবে বয়ে চলত। অবশ্য উপরে যিনি রাজা হয়ে বসে আছেন তিনি লোক খারাপ হলে প্রজার উপর অত্যাচার চালাতেন, প্রজারও ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠত। ভালো লোক হলে প্রজারা তাঁকে পছন্দ করত। কিন্তু রাজা ভালো লোক হোন মন্দ লোক হোন, শুধু সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের দরুনই প্রজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো ইতর-বিশেষ প্রায়ই হত না। সামাজিক বিপ্লব কিছুই এতে হত না।

জাতীয় বিপ্লবে এর চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তন আসে। এক জাতি যখন অন্য এক জাতির অধীনে থাকে তখন তার মাথার উপরে বসে থাকে একটা বিদেশী শাসক শ্রেণী। এটা অনেক দিক দিয়েই ক্ষতিকর। অধীন দেশটাকে শাসন করা হয় আর-একটা দেশের, বা এই শাসনে যার লাভ এমন একটা বিদেশী শ্রেণীর, লাভের জন্য। এতে স্বভাবতই সেই পরাধীন জাতির আত্মসম্ভ্রমে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তা ছাড়া বিদেশী শাসক শ্রেণীটা পরাধীন জাতির সমস্ত উচ্চতর শ্রেণীদের সকলরকম ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে, এরা না থাকলে সেই পদগুলো তাদেরই আয়ত্ত থাকত। জাতীয় বিপ্লব সফল হলে তার ফলে অন্তত এই বিদেশীরা দেশ থেকে দূর হয়ে যায়, তাদের স্থান তৎক্ষণাৎ অধিকার করে দেশেরই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা। কাজেই উপরস্থ বিদেশী শ্রেণীকে সরিয়ে দিতে পারলে তাতে দেশের প্রভাবশালী শ্রেণীগুলোর প্রচুর লাভ; দেশটারও সাধারণত লাভই হয় কারণ তখন আর তাকে আর-একটা দেশের প্রয়োজন অনুসারে শাসিত হতে হয় না। নিম্নতর শ্রেণীদের লাভ তেমন কিছু নাও হতে পারে, যদি-না সে জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাজবিপ্লবও দেশে এসে যায়।

অন্যান্য ধরনের বিপ্লবে কেবলমাত্র উপরকার ব্যবস্থাই বদলায়। তাতে আর সমাজবিপ্লবে অনেক তফাত। এর মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবও জড়িয়ে থাকে। কিন্তু শুধু তার চেয়ে এটা অনেক বৃহৎ একটা ব্যাপার; কারণ, এতে সামাজিক গঠনেরই পরিবর্তন হয়। ইংলণ্ডের বিপ্লবে পার্লামেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু সেটা শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, খানিক পরিমাণে সমাজবিপ্লবও। কারণ, এর ফলে ধনী বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের সমন্বয় ঘটেছিল। উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর কাজেই এতে পদোন্নতি ঘটল, নিম্নতর বুর্জোয়া এবং সাধারণ প্রজাদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হল না। ফরাসি-বিপ্লবে সমাজবিপ্লব ঘটেছিল আরও বেশি। আমরা দেখেছি এর ফলে সমাজের গোটা ব্যবস্থাটাই উলটে গেল; এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রজাসাধারণও উপরে চলে এল। শেষ-পর্যন্ত এখানেও বুর্জোয়াদেরই জয় হল; প্রজাসাধারণকে আবার একেবারে তলায় তার পুরোনো জায়গায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কারণ, বিপ্লবে তাদের যা করবার ছিল তারা শেষ করে ফেলেছে, আর তাদের দিয়ে প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে একেবারে মাথার উপরে বসে ছিলেন যে ক্ষমতাশালী অভিজাতরা তাঁদেরও সেখান থেকে বিচ্যুত করা হল।

এটা সহজেই বোঝা যায়, এইরকমের সমাজবিপ্লব মানে শুধু একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি বিশদ ব্যাপার; সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। একটিমাত্র অত্যুৎসাহী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বা দলের সাধ্য নেই একটা সমাজবিপ্লব ঘটিয়ে তোলে, যদি-না পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে জনসাধারণ নিজেই তার জন্যে তৈরি হয়ে থাকে। তৈরি

হওয়া মানে অবশ্য এ নয় যে, তাদের এর জন্যে তৈরি থাকতে বলা হবে এবং তারাও সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সেইভাবে তৈরি হয়ে যাবে। আমার কথা হচ্ছে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হওয়া চাই যার দরুন জীবন তাদের পক্ষে দুর্বহ বোঝা হয়ে ওঠে, এইরকমের একটা পরিবর্তন না এলে আর মুক্তি পাবার বা সামঞ্জস্যবিধানের কোনো ভরসা দেখতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে বহু যুগ যুগ ধরে অসংখ্য সাধারণ লোকের পক্ষে জীবন এমনিতর দুর্বহ হয়ে রয়েছে; কীভাবে তারা একে সহ্য করে চলেছে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এক-এক সময় খেপে গিয়ে তারা বিদ্রোহ করেছে, এগুলো হত প্রধানত জ্যাকোয়ারি বা কৃষকদের বিদ্রোহ; উন্মত্ত ক্রোধে তারা যা-কিছু হাতের কাছে পেত তাই নির্বিচারে ধ্বংস করে দিত। কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করবার কোনো ইচ্ছা বা চেতনা এদের থাকত না। এই অজ্ঞতা সত্ত্বেও কিন্তু অতীতকালে বারবার সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার বিনাশ ঘটেছে প্রাচীন রোমে, মধ্য-যুগের ইউরোপে, ভারতে, চীনে; এর দরুন বহু বহু সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

আগের দিনে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটত ধীরে ধীরে; যুগ যুগ ধরে উৎপাদন-বণ্টন আর যানবাহনের পদ্ধতি প্রায় একই রকম থেকে যেত। কাজেই পরিবর্তন যেটুকু-বা ঘটত তাও জনসাধারণের নজরে পড়ত না; তারা জানত সমাজের পুরোনো ব্যবস্থাটাই স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। এই ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও মতামতগুলোর সঙ্গে আবার ধর্ম জুড়ে গিয়ে এদের একেবারে ঈশ্বরপ্রণীত বস্তু করে তুলত। এই বিশ্বাস লোকের মনে এত গভীর হত যে, অবস্থার পরিবর্তনের ফলে যখন সে ব্যবস্থা একেবারেই অচল হয়ে উঠেছে, তখনও তাকে পরিবর্তন করবার কথা তারা ভাবতেই পারত না। শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের পদ্ধতি অত্যন্তরকম বদলে গেল, সামাজিক পরিবর্তনেরও গতি অনেক দ্রুত হয়ে উঠল। নূতন কতকগুলো শ্রেণী সমাজে প্রতিপত্তিশালী এবং ধনী হয়ে উঠল। নূতন একটি শিল্প-শ্রমিক-শ্রেণীর সৃষ্টি হল, কারুশিল্পী এবং কৃষাণদের সঙ্গে তাদের অনেক তফাত। এইসমস্ত ব্যাপারের দরুন নূতন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। পশ্চিম-ইউরোপে দেখা গেল একটা অদ্ভুত অসামঞ্জস্য। সমাজের যদি বুদ্ধি থাকে তবে সে যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে, সেই পরিবর্তিত ব্যবস্থার ফলে যেটুকু লাভ হওয়া সম্ভব তা পুরোপুরি ভোগ করে নেয়। কিন্তু সমাজের নিজের বুদ্ধি নেই; এবং কোনো সমাজই একমন হয়ে চিন্তা করে না। ব্যক্তিরা চিন্তা করে তাদের নিজেদের কথা, ভাবে—কিসে তাদের কিছু লাভ হবে; যেসব শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ মোটামুটি এক সেই শ্রেণীরাও ঠিক তাই করে। যে শ্রেণীটা কোনোক্রমে সমাজের মাথায় উঠে বসেছে সে চেষ্টা করে সেইখানেই টিঁকে থাকতে আর নিচেকার অন্যান্য শ্রেণীগুলোকে শোষণ করে নিজের লাভ গুছিয়ে নিতে। বুদ্ধি এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি থাকলে বোঝা যায়, শেষ পর্যন্ত নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজে যে সমাজটির অঙ্গ হয়ে আছি সমগ্রভাবে তারই লাভের ব্যবস্থা করা। কিন্তু যে ব্যক্তি বা শ্রেণী একবার ক্ষমতা হাতে পেয়ে বসেছে, সে যেটুকু পেয়েছে তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চায়। সেটা করবার সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে অন্যান্য শ্রেণী এবং লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া যে, সমাজের যে ব্যবস্থাটি বর্তমান রয়েছে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। মানুষকে এই কথা বিশ্বাস করবার জন্যে টেনে আনা হয় ধর্মকে; শিক্ষার ভিতর দিয়েও এটাই তাদের শেখানো হয়; শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেরই মনে এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে বসে যায়। সে ব্যবস্থাকে বদলানোর কথা আর তারা ভাবে না—কথাটা শুনতে আশ্চর্য, কিন্তু সত্য। এমনকি একেবারে তলায় যারা পড়ে আছে সে মানুষরা পর্যন্ত বাস্তবিকই বিশ্বাস করে, এইটেই ঠিক—তারা সেইখানে পায়ের তলায়ই থাকবে, লাথি ঘুষি খাবে, অন্যরা যখন বিলাসব্যসনে দিন কাটাচ্ছে তখন তারই পাশাপাশি অনাহারে দিনযাপন করবে।

এইভাবে লোকের মনে ধারণা হয়ে যায় যে, একটা অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থা আছে; তার চাপে যদি অধিকাংশ মানুষকে কষ্টে দিন কাটাতে হয় তবু তার জন্যে কেউ দায়ী নয়; এটা তাদের নিজেদেরই অপরাধের শাস্তি, এর নাম কিসমৎ, এর নাম ভাগ্য, এটা হচ্ছে অতীত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত। সমাজ চিরদিনই রক্ষণশীল; পরিবর্তন সে পছন্দ করে না। যে গর্তে পড়েছে সেই গর্তে পড়ে থাকতেই সে ভালোবাসে, প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে সেইখানে তার পড়ে থাকাটাই হচ্ছে বিধাতার অভিপ্রেত। এই বিশ্বাস তার এত গভীর যে, তার অবস্থার উন্নতিসাধন করবার ইচ্ছা নিয়ে যারা তাকে সে গর্ত ছেড়ে উঠে আসতে বলে তাদেরই সে শাস্তি দেয় সবচেয়ে বেশি।

এই নিজের-অবস্থায়-সন্তুষ্ট আর চিন্তাবিমুখ লোকদের মুখ চেয়ে কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনড় হয়ে বসে থাকে না। সে সামনে এগিয়ে চলে, লোকেদের মতামত বদলাতে না চাইলেও। এইসব সেকেলে মতামত আর বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যায়; সে ব্যবধান কমিয়ে দুটোকে আবার একত্র করবার ব্যবস্থা যদি না করা হয় তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভেঙেচুরে যায়, একটা বিষম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সত্যকার সমাজবিপ্লব আসে এরই জন্যে। অবস্থা এরকম হয়ে উঠলে তার ফলে বিপ্লব আসবেই, যদিও প্রাচীনপন্থী মতামতের টানে পড়ে তার এসে পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। আর এই অবস্থাই যদি না আসে তবে দুজন-চারজন লোক হাজার চেষ্টা করেও বিপ্লব ঘটিয়ে তুলতে পারে না। বিপ্লব একবার যখন শুরু হয় তখন, যে অবগুণ্ঠন দিয়ে মানুষের দৃষ্টি থেকে সত্যকার অবস্থাটা গোপন করে রাখা হয়েছিল সেটা, খুলে পড়ে যায়; তখন আসল অবস্থাটা বুঝে নিতেও আর তাদের দেরি হয় না। একবার গর্ত থেকে উঠে আসতে পারলে তখন তারা দ্রুতবেগে সামনে ছুটে চলে। এইজন্যেই বিপ্লবের যুগে মানুষের অগ্রগতির বেগ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিপ্লব হচ্ছে রক্ষণশীলতা আর প্রগতিবিমুখতার অবশ্যম্ভাবী ফল। একটা অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থা আছে এই মূঢ় ভ্রান্তিটাকে সমাজ যদি এড়িয়ে চলতে পারত, এবং প্রতিক্ষণে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলতে পারত, তবে সমাজবিপ্লব মোটে হতই না। তখন পৃথিবীতে চলত ক্রমান্বিত বিবর্তনের রাজত্ব।

বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলবার আমার মতলব ছিল না, তবু অনেক কথাই বলে ফেললাম। বিষয়টা আমি জানবার মতো বলে মনে করি; কারণ, আজকের দিনে সমস্ত পৃথিবী জুড়েই অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, বহু স্থানে মনে হচ্ছে যেন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। অতীত কালে এইটেই হয়েছে সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত; তাই স্বভাবতই মনে হচ্ছে পৃথিবীতে বুঝি আবার বিরাট রকমের সব পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এল। বিদেশীর পদানত সমস্ত দেশের মতো ভারতবর্ষেও জাতীয়তাবাদ এবং বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করবার কামনা প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের এই প্রেরণা বেশির ভাগই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে অবস্থাপন্ন শ্রেণীগুলোর মধ্যে। চাষি মজুর আর অন্যরা, যারা চিরদিন অভাবে দিন কাটায়, তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের আবছায়া-স্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি দরকারি কথা হচ্ছে তাদের শূন্য উদরের জন্যে খাদ্যের সংস্থান করা। জাতীয়তাবাদ বা স্বরাজের কোনো মানেই তাদের কাছে নেই যদি-না সে স্বরাজ আসবার ফলে তাদের ভাগ্যে বেশি খাদ্য বেশি সচ্ছলতা জোটে। কাজেই ভারতবর্ষেও আজ আমাদের যে সমস্যা সেটা শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং আরও বেশি করেই একটা সামাজিক সমস্যা।

আসল কথা ছেড়ে এসে বিপ্লব সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, আমি আলোচনা করছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অবস্থা। সেখানে এই সময়টাতে অনেক বিদ্রোহ ও অন্য রকমের বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। এইসব বিদ্রোহের অনেকগুলো, বিশেষ করে এই শতাব্দীর প্রথম-অর্ধেকে যেগুলো ঘটেছিল তারা, ছিল বিদেশীর শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্যে অধীন জাতির বিদ্রোহ। ঠিক এরই পাশাপাশি আবার যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশগুলিতে জাগল সমাজবিপ্লবের চেতনা, ধনতান্ত্রিক প্রভুদের বিরুদ্ধে নূতন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের চেতনা। লোকেরা সমাজবিপ্লবের কথা ভাবতে শিখল, তার জন্যে সজ্ঞানে চেষ্টা শুরু করল।

১৮৪৮ সনটিকে বলা হয় ইউরোপের বিপ্লবের বছর। এই বছর অনেক দেশে অনেক বিদ্রোহ হয়; তার কতক-বা আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করল, কতক-বা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। পোল্যান্ডে ইতালিতে বোহেমিয়ায় হাঙ্গেরিতে যেসব বিদ্রোহ হল তাদের মূলে ছিল এদের জাতীয়তাবাদকে জোর করে দমিয়ে রাখবার চেষ্টা। পোল্যান্ড বিদ্রোহ করল প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে, বোহেমিয়া আর উত্তর-

ইতালি করল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। এর সব-কটা বিদ্রোহই দমন করা হল। সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ হল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির বিদ্রোহ। এর নেতা ছিলেন লোজস কোসুথ, দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতার বীর সৈনিক বলে হাঙ্গেরির ইতিহাসে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। দু বছর ধরে লড়াই চালাবার পরে এই বিদ্রোহটিও দমিত হয়ে গেল। এর কয়েক বছর পরে হাঙ্গেরি তার কাম্য ফলের অনেকগুলো পেয়ে গেল একটি নূতন নীতিতে যুদ্ধ চালিয়ে; এর চালক ছিলেন আর-একজন বড়ো নেতা, তাঁর নাম ডিক। এটা লক্ষ্য করবার বিষয়, ডিকের নীতি ছিল অহিংস প্রতিরোধ। ১৮৬৭ সনে হাঙ্গেরি আর অস্ট্রিয়াকে মোটামুটি সমান অধিকার দিয়ে একত্র যুক্ত করা হল; ফলে তৈরি হল একটা 'দ্বৈত-রাজত্ব'; এর রাজা হলেন হাপ্‌স্‌বুর্গের সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ। ডিক যে অহিংস প্রতিরোধের নীতি প্রবর্তন করলেন, অর্ধ শতাব্দী পরে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে একেই আদর্শ করে নিয়েছিল। ১৯২০ সনে যখন ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন অনেকেরই ডিকের সংগ্রামের কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদও ছিল অনেক।

১৮৪৮ সনে জর্মানিতেও কয়েকবার বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো তেমন বৃহৎ নয়; সে বিদ্রোহ দমন করা হল এবং কিছু কিছু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। ফ্রান্সে বেশ বড়ো-একটা পরিবর্তন হল। ১৮৩০ সনে বুর্বোঁ-রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল, তার পর থেকেই ফ্রান্সের রাজা ছিলেন লুই ফিলিপ, কতকটা অর্ধ-নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে তিনি রাজত্ব করতেন। ১৮৪৮ সনে দেখা গেল, প্রজারা তাঁকেও আর চায় না, তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হল। আবার একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। বড়ো বিপ্লবের পরে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই এটির নাম দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র। এইসব হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে লুই বোনাপার্ট -নামক নেপোলিয়নের এক ভাইপো প্যারিসে এসে হাজির হলেন, এবং নিজেকে স্বাধীনতার একজন মস্ত-বড়ো বন্ধু বলে জাহির করে প্রজাতন্ত্রের সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। আসলে এটা ছিল শক্তি হস্তগত করবার জন্যে তাঁর একটা ভান মাত্র। নিজেকে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে তিনি সেনাকে হস্তগত করলেন, তার পর ১৮৫১ সনে একটি 'অতর্কিত অভিযান' করে বসলেন। তাঁর সৈন্যদের দেখিয়ে তিনি প্যারিস-শহরকে ভয়ে বিহ্বল করে ফেললেন, বহু লোককে গুলি করে মারলেন, এবং ব্যবস্থাপক সভাকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করলেন। পরের বছর তিনি নিজেকে সম্রাট বলে অভিষিক্ত করলেন, নাম নিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন, যদিও বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়নের পুত্র কখনও রাজা হন নি, তবু তাঁকেই দ্বিতীয় নেপোলিয়ন বলে মনে করা হত। এইভাবে মাত্র চার বছরের কিছু বেশি দিনের একটা সংক্ষিপ্ত এবং অখ্যাত অস্তিত্বের পর দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র শেষ হয়ে গেল।

ইংলণ্ডে ১৮৪৮ সনে কোনো বিদ্রোহ হয় নি, কিন্তু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা অনেকই হয়েছিল। ইংলণ্ডের একটি নিজস্ব কায়দা আছে, সত্যি করে বিপদ এসে পড়লে সে একটু অবনত হয়ে তাকে এড়িয়ে যায়। তার শাসনব্যবস্থাটা পরিবর্তনশীল, তাতে এর সুবিধা হয়; এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইংরেজরা যখন আর-কোনো উপায় নেই তখন একটা মাঝামাঝি মিটমাটকে মেনে নিতে শিখেছে। এরই জন্যে তারা চিরদিন বৃহৎ এবং আকস্মিক পরিবর্তনকে এড়িয়ে চলতে পেরেছে; অন্যান্য দেশে যেখানে শাসনব্যবস্থা অনমনীয় এবং লোকেরা মিটমাটে ততটা রাজি নয়, সেখানে এই পরিবর্তন বহু-বার এসেছে। ১৮৩২ সনে একটি সংস্কার-আইনকে উপলক্ষ করে সমস্ত ইংলণ্ডে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল; এই আইনে পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচন করবার জন্যে ভোট দেবার অধিকার আরও কিছু বেশি লোককে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক কালের হিসাবে দেখলে এই আইনটি খুবই নরমপন্থী এবং নিরীহ প্রকৃতির ছিল। এতে মাত্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর-কিছু লোক ভোটের অধিকার পেল, শ্রমিকরা এবং সাধারণ লোকের বেশির ভাগ তখনও সে অধিকার পায় নি। কিন্তু পার্লামেণ্ট তখন ছিল অল্প কয়েকজন ধনী ব্যক্তির হাতের মুঠোয়; তাঁদের ভয় হল, এতে করে বুঝি তাঁদের সমস্ত সুযোগসুবিধা আর তাঁদের যে 'পচা বরোগুলো' থেকে তাঁরা বিনা হাঙ্গামায় হাউজ অব কমন্সের সভ্য নির্বাচিত

হয়ে যাচ্ছিলেন সেগুলো তাঁদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। কাজেই এ'রা এ'দের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই রিফর্ম-বিলকে বাধা দিতে লাগলেন; বলতে লাগলেন, এই আইন যদি প্রণয়ন করা হয় তবে ইংলন্ড একেবারে গোল্লায় চলে যাবে, আর সমস্ত পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে! ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়ে উঠল; তার পর এই বিলের স্বপক্ষে জনতা তীব্র আন্দোলন শুরু করল, দাঙ্গাহাঙ্গামাও শুরু হল; দেখেশুনে আইনের বিরোধীরা ভয় পেয়ে গেল, আইনও প্রণীত হয়ে গেল। এ কথা অবশ্য না বললেও চলবে যে, এর পরেও পৃথিবীটা ঠিক টি'কে রইল, পার্লামেণ্টও মরল না, এবং ধনীরা আগের মতোই সেখানে কর্তৃত্ব করতে লাগল। অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা শুধু আরও বেশি অধিকার অর্জন করল।

১৮৪৮ সনের কাছাকাছি সময়েই আরও একটি বিরাট আন্দোলনের ফলে দেশটা কে'পে উঠল। এটির নাম ছিল চার্টিস্ট আন্দোলন, কারণ এর প্রস্তাব ছিল অনেকরকম সংস্কার দাবি করে একটি 'প্রজাদের চার্টার' রচনা করে সেই চার্টার-সমেত একটি বিরাট দরখাস্ত পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করা হবে। শাসকশ্রেণীরা এতে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন; তার পর আন্দোলনটিকে দমন করা হল। তখন কারখানার মজুরদের দুর্দশা এবং অসন্তোষের আর অন্ত ছিল না। এই সময়ে কতকগুলো শ্রমিক-আইন তৈরি করা শুরু হল; তার ফলে মজুরদের অবস্থারও কিছুটা উন্নতি ঘটল। ইংলণ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য তখন খুব বেড়ে চলেছে, ঘরে টাকাও আসছে প্রচুর। ইংলণ্ড তখন হয়ে উঠেছিল 'পৃথিবীর কারখানা'। এই লাভের প্রায় সমস্তটাই যেত কারখানার মালিকদের হাতে; অতি সামান্য কিছু ছি'টেফোঁটা মজুরদের ভাগ্যে গড়িয়ে পড়ত। তবু এইসমস্ত মিলেই ১৮৪৮ সনে দেশে বিদ্রোহ ঘটতে দিল না। কিন্তু বিদ্রোহ তখন খুবই আসন্ন বলে সবাই মনে করেছিলেন।

১৮৪৮ সনের সমস্ত কথা আমার এখনও বলা হয় নি; এই বছরে রোমে যা ঘটেছিল তার গল্পটি বলতে বাকি আছে। সে গল্প আমি এর পরের চিঠিতে বলব।

১২৭

ইতালির ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জন

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩৩
বসন্ত পঞ্চমী

১৮৪৮ সনের কাহিনী বলতে গিয়ে আমি ইতালির কথাটি শেষের জন্যে রেখেছি। ১৮৪৮ সনে যত উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার ঘটল তার মধ্যে রোমের বীর-সংগ্রামের কাহিনীটাই সবচেয়ে মুগ্ধকর।

নেপোলিয়নের আবির্ভাবের আগে ইতালি ছিল একটা জোড়াতালি-দেওয়া দেশ; তার মধ্যে অনেক ছোটোছোটো রাজ্য, অনেক ছোটোছোটো রাজা। নেপোলিয়ন এদের একত্র করেছিলেন, অল্প-দিনের মতো। তার পর ইতালি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে আগের মতো বা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় ফিরে যায়। ১৮১৫ সনের ভিয়েনা-কংগ্রেসে বিজয়ী মিত্রশক্তি বেশ বিবেচকের কাজ করলেন, ইতালি দেশটিকে ভাগ-ভাগ করে নিজেদের মধ্যে বে'টে নিলেন। অস্ট্রিয়া নিল ভেনিস আর তার আশপাশের অনেকখানি অঞ্চল; অস্ট্রিয়ার কয়েকজন সামন্ত-রাজাকে ইতালি থেকে বাছাবাছা এক-এক টুকরো করে জায়গা দিয়ে দেওয়া হল; রোম আর তার চার পাশের খানিক জায়গা আবার পোপের অধিকার-ভুক্ত হল, এর নাম হল 'পোপের রাজ্য'; নেপ্‌ল্‌স্‌ আর দক্ষিণ-ইতালিকে নিয়ে তৈরি হল সিসিলির রাজ্যদুটি, এর মালিক হলেন একজন বুর্বো-বংশীয় রাজা; উত্তর-পশ্চিমে ফরাসি-সীমান্তের কাছে তৈরি হল পীড্‌মণ্ট্‌ ও সার্ডিনিয়ার অধীশ্বর একজন রাজার রাজ্য। একমাত্র পীড্‌মণ্ট্‌ ছাড়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর রাজারা সকলেই অত্যন্তরকম স্বৈরতন্ত্রী নীতিতে শাসন করতে লাগলেন,

প্রজাদের উপর এত পীড়ন চালালেন যে নেপোলিয়নের আগেও তাঁরা বা আর-কেউ কোথাও তত পীড়ন করেন নি। কিন্তু নেপোলিয়নের অভিযানের ধাক্কায় ইতালিতে বড়ো-একটা নাড়াচাড়া লেগেছিল, তার যুবকরা স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ইতালির স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল। রাজাদের পীড়ন সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সেই পীড়নের ফলেই, অনেক জায়গাতে ছোটোখাটো বিদ্রোহ দেখা দিল, ইতালির সর্বত্র বহুসংখ্যক গুপ্তসমিতিও গড়ে উঠল।

অল্পদিনের মধ্যেই এ'দের ভিতর থেকে দেখা দিলেন একজন উৎসাহী যুবক, তাঁকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা বলে সকলেই স্বীকার করে নিল। ইনিই হচ্ছেন গিসেপ ম্যাট্‌সিনি, ইতালির জাতীয়তাবাদের ঋষি। ১৮৩১ সনে তিনি একটি সমিতি স্থাপন করলেন, তার নাম ছিল 'গিওভানে ইতালিয়া' বা 'তরুণ ইতালি'; এর উদ্দেশ্য ছিল ইতালিতে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা। বহু বৎসর ধরে তিনি এই লক্ষ্য নিয়ে ইতালির মধ্যে কাজ চালালেন, নির্বাসনে গেলেন, বারবার নিজের জীবনকেও বিপন্ন করলেন। এ'র অনেক লেখা জাতীয়তাবাদের সাহিত্যের প্রামাণ্য রচনা বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। ১৮৪৮ সনে উত্তর-ইতালির সর্বত্রই বিদ্রোহ শুরু হল। ম্যাট্‌সিনি দেখলেন, এই তাঁর সুযোগ; তিনি রোমে চলে এলেন। পোপকে তাঁরা তাড়িয়ে দিলেন, দিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করলেন; এর কর্তাব্যক্তি হলেন তিনজন—এ'দের নাম দেওয়া হল ট্রায়াম্‌ভির্‌স্, কথাটি রোমের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেওয়া। এই তিনজন ট্রায়াম্‌ভিরের একজন ছিলেন ম্যাট্‌সিনি। এই নবজাত প্রজাতন্ত্রটির উপর একেবারে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হল; এল অস্ট্রিয়ানরা, এল নিয়াপোলিটান্‌রা; এমনকি ফরাসিরাও এসে একে আক্রমণ করল, পোপকে তারা আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে। রোমের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যোদ্ধা ছিলেন গ্যারিবল্ডি। অস্ট্রিয়ানদের তিনি ঠেকিয়ে রাখলেন, নিয়াপোলিটান সেনাকে হারিয়ে দিলেন, এমনকি ফরাসিরাও তাঁকে ঠেলে অগ্রসর হতে পারল না। এইসমস্ত কাণ্ড তিনি করেছিলেন তাঁর স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর সাহায্যে; রোমের এই সবচেয়ে সাহসী আর গুণবান যুবকরা প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যে অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করল। শেষ পর্যন্ত খুবই বীরের মতো যুদ্ধের পরে রোমান-প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সের কাছে হেরে গেল; তারা পোপকে আবার রোমে এনে বসিয়ে দিল।

ইতালির সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় এইভাবে শেষ হল। ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডি নানা উপায়ে তাঁদের কাজ চালাতে লাগলেন; আবার একটা বড়ো চেষ্টা করবার জন্যে প্রচার এবং প্রস্তুতি চলল। এ'রা দুজন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক; ম্যাট্‌সিনি ছিলেন চিন্তাবীর এবং আদর্শবাদী; আর গ্যারিবল্ডি ছিলেন বীর যোদ্ধা, গেরিলা-যুদ্ধে তাঁর আশ্চর্যরকম মাথা খেলত। দুজনেই ইতালির স্বাধীনতা আর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনপণ করেছেন। এই সময়ে এই বিরাট খেলার আর-একজন খেলোয়াড় বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এ'র নাম কাভুর, পীড্‌মণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের ইনি প্রধানমন্ত্রী। কাভুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভিক্টর ইমানুয়েলকে সমগ্র ইতালির রাজা করা। সেটা করতে গেলেই ইতালির ছোটো ছোটো রাজ্যগুলির রাজাদের অনেককে দমন করা এবং সরিয়ে দেওয়া দরকার। অতএব কাভুর ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডির কার্যকলাপের সুযোগ নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেন। তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। কাভুর ফরাসিদের সঙ্গে চক্রান্ত করলেন; করে তাঁর শত্রু অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। এটা ১৮৫৯ সনের কথা। অস্ট্রিয়ানরা ফরাসিদের কাছে হেরে গেল। গ্যারিবল্ডি সেই সুযোগে তাঁর নিজস্ব একটি আশ্চর্য অভিযান চালালেন নেপ্‌ল্‌স্ ও সিসিলির রাজার বিরুদ্ধে। এইটেই গ্যারিবল্ডি আর তাঁর এক হাজার লালকোর্তা সৈন্যের সেই বিখ্যাত অভিযান। এই লালকোর্তারা ছিল অশিক্ষিত সেনা, তাদের ভালো অস্ত্রশস্ত্র নেই, মালপত্র নেই; তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য। লালকোর্তাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাদের ছিল উৎসাহ, আর তাদের পিছনে ছিল সমস্ত প্রজার সহানুভূতি—এরই জোরে তারা যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে চলল। গ্যারিবল্ডির নাম ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর নামের এমন জাদু ছিল যে, তিনি কাছে এসে পড়েছেন শুনলেই বড়ো বড়ো সেনাবাহিনী পালিয়ে হাওয়া হয়ে যেত। তবু তাঁর কাজ অত্যন্ত কঠিন হল; বহুবার তিনি এবং তাঁর স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর পরাজয় এবং সর্বনাশ একেবারে আসন্ন হয়ে এসেছিল। কিন্তু
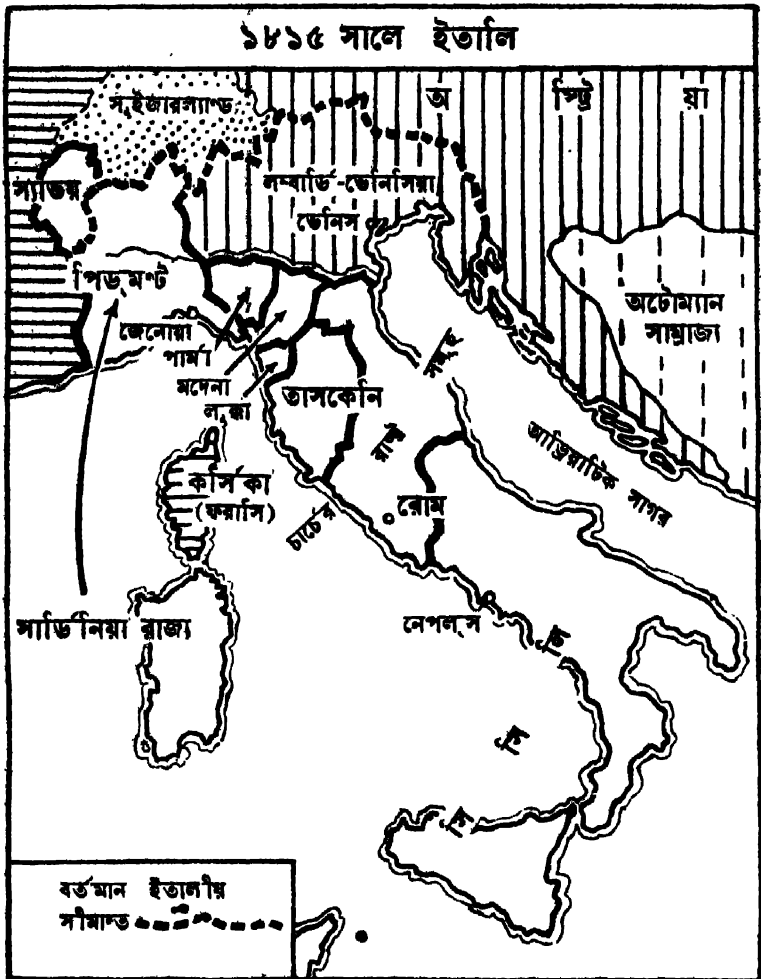
১৮১৫ সালে ইতালি
সুইজারল্যাণ্ড
অ স্ট্রি য়া
স্যাভয়
লম্বার্ডি-ভেনিসিয়া
ভেনিস
পিডমণ্ট
জেনোয়া
পার্মা
মদেনা
লুক্কা
তাসকেনি
অটোম্যান সাম্রাজ্য
কর্সিকা
(ফরাসি)
আড্রিয়াটিক সাগর
রোম
সার্ডিনিয়া রাজ্য
নেপলস
বর্তমান ইতালীয় সীমান্ত

সর্বস্বপণ করে লাগতে পারলে যেমন হয়, বহুবার নিশ্চিত পরাজয়ের মুহূর্তেও জয়লক্ষ্মী তাঁর প্রতি প্রসন্ন স্মিত মুখে ফিরে চাইলেন; তাঁর পরাজয় অতর্কিত-জয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

গ্যারিবল্ডি এবং তাঁর সহস্র সেনা সিসিলিতে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে ধীর-গতিতে অগ্রসর হয়ে এসে ইতালিতে পেঁাছলেন। দক্ষিণ-ইতালির গ্রাম-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কুচ্ করে অগ্রসর হতে হতে গ্যারিবল্ডি সেখানকার লোকদের কাছে স্বেচ্ছাসেবক চাইতে লাগলেন; যে পুরস্কারের আশা তাদের সামনে মেলে ধরলেন সে অপূর্ব। তিনি বললেন, "এসো, এসো! আজ যে বাড়িতে বসে থাকবে সে কাপুরুষ। আমার সংগে এলে পাবে ক্লান্তি, পাবে কঠোর শ্রম, পাবে যুদ্ধ। কিন্তু আমরা হয় জিতব, না হয় মরব।" সাফল্যের মতো কাজ-উদ্ধারের অস্ত্র আর দ্বিতীয় নেই। গ্যারিবল্ডির যুদ্ধজয় দেখে ইতালিয়ানদের মনেও দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। জলস্রোতের মতো জনস্রোত এসে তাঁর স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীকে বড়ো করে তুলল। গ্যারিবল্ডির রচিত গান গেয়ে তারা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলল :

> "সমাধির ঢাকা খুলিয়া গিয়াছে, বহু দূর হতে মৃতেরা আসে,
> আমাদের মৃত বীরেরা আজিকে জাগিয়া উঠিছে মহোল্লাসে।
> হস্তে তাদের শানিত কৃপাণ, ললাটে তাদের যশের টিকা,
> মৃতের হৃদয়ে জ্বলন্ত হেরো ইতালির নাম—অগ্নিশিখা!
> এসো, হও আজি সংগী তাদের, দেশের যুবারা এসো হে আজি,
> উড়াও গগনে বিজয়পতাকা, সৈনিকদল, দাঁড়াও সাজি।
> হস্তে ঝলুক হিম তরবারি, বক্ষে জ্বলুক অনল-জ্বালা,
> আজ ইতালির মনের কামনা তোমাদেরি বুকে জ্বলার পালা।
> ইতালি ছাড়িয়া চলে যাও, ছেড়ে আমাদের দেশ চলে যাও—
> ইতালি ছাড়িয়া চলে যাও, ওহে বিদেশীরা, যাও, চলে যাও!"

সমস্ত দেশেরই জাতীয় সংগীতের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল!

গ্যারিবল্ডির যুদ্ধজয়টাকে কাভুর কাজে লাগিয়ে নিলেন, ফলে ১৮৬১ সনে পীড্‌মণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ইতালির রাজা হয়ে বসলেন। রোম তখনও ফরাসি-সেনার দখলে রয়েছে, ভেনিস রয়েছে অস্ট্রিয়ানদের হাতে। দশ বছরের মধ্যে ভেনিস রোম দুটোই এসে বাকি ইতালির সংগে মিশে গেল; রোম হল তার রাজধানী। এতদিনে ইতালি একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হল। ম্যাট্‌সিনি কিন্তু এতে তৃপ্ত হলেন না। সমস্ত জীবন ধরে তিনি সংগ্রাম করেছেন প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের জন্যে; ইতালি এখন হল শুধু পীড্‌মণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের রাজ্য। এ কথা অবশ্য সত্য, এই নূতন রাজ্যটির শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিকই ছিল; ভিক্টর ইমানুয়েলের সিংহাসনে আরোহণের ঠিক পরেই তুরিনে ইতালির পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়েছিল।

এইভাবে ইতালিজাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হল, বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হল। এই ব্যাপার ঘটিয়ে তুললেন তিনজন মানুষ—ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডি আর কাভুর। এঁদের কোনো-একজনও যদি না থাকতেন তবেই হয়তো দেশের স্বাধীনতা আসতে আরও অনেক দেরি লাগত। বহু বছর পরে ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ মেরিডিথ লিখেছিলেন :

> "ভাগ্যচক্রে উঠিতে পড়িতে ইতালিকে মোরা দেখেছি যারা
> আধেক উঠিয়া আবার তখনি মাটিতে আছাড়ি হইতে সারা
> আজ হেরি তারে গৌরবময়ী; একদা যেখানে চলেছে হল
> আজিকে সে ভূমি রূপের বিভায় ও সমৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল।
> স্মরি তাহাদের, মৃত সে তনুতে জাগাল যাহারা নূতন প্রাণ
> কুশলী কাভুর, ঋষি ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি সে বীর্যবান—
> বুদ্ধি, আত্মা, তরবারি তার একত্র এক-লক্ষ্য হয়ে
> আত্মধ্বংসী বিভেদ নাশিয়া স্বাধীনতা-ধন আনিল বয়ে।"

সংক্ষেপে মোটামুটি আভাসে ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রামের গল্পটি তোমাকে বললাম। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি পড়ে তোমার মনে হবে, এটাও মৃত ইতিহাসের অন্য যে-কোনো একটা গল্পের মতোই রসহীন। কিন্তু কী করলে এই গল্পটিই জীবন্ত হয়ে উঠবে, এর এই সংগ্রামের সমস্তখানি আনন্দ আর উৎকণ্ঠা দিয়ে তোমার মনকে ভরে তুলবে, তার সন্ধান আমি তোমাকে বলতে পারি। আমার অন্তত তাই হয়েছিল; অনেক, অনেক বছর আগের কথা, আমি তখন স্কুলের ছেলে। এই ইতিহাস আমি তখন পড়েছিলাম তিনটি বইয়ে। বই তিনটি জি এম ট্রেভেলিয়নের লেখা—তাদের নাম হচ্ছে 'গ্যারিবল্ডি ও রোমান প্রজাতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম', 'গ্যারিবল্ডি ও তাঁর একহাজার যোদ্ধা', এবং 'গ্যারিবল্ডি ও ইতালির সৃষ্টি'।

ইতালির এই যুদ্ধের সময়ে ইংলন্ডের লোকেরা গ্যারিবল্ডি আর তাঁর লালকোর্তা সৈন্যদের সহানুভূতি দেখিয়েছে; বহু ইংরেজ কবি সে যুদ্ধ নিয়ে চমৎকার কবিতা লিখেছেন। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার—মুক্তির জন্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত জাতির প্রতি ইংরেজের সহানুভূতির অন্ত থাকে না, অবশ্য যদি তাদের নিজেদের স্বার্থহানির ভয় না থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক গ্রীসকে সাহায্য করতে তারা পাঠাল কবি বায়্‌রনকে এবং আরও অনেককে; ইতালিতে পাঠাল সর্বরকমের শুভ কামনা আর উৎসাহবাক্য; এ দিকে বাড়ির পাশের দেশ আয়র্ল্যান্ডে, দূরের দেশ মিশরে ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য স্থানে তার দূতেরা বহন করে নিয়ে গেল ম্যাক্সিম বন্দুক আর ধ্বংসের বাণী! এই সময়ে ইতালিকে নিয়ে সুইন্‌বার্ন, মেরিডিথ আর এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। মেরিডিথ এই বিষয় নিয়ে উপন্যাসও লিখেছিলেন কয়েকখানা।—সুইন্‌বার্নের একটি কবিতা থেকে আমি কয়েকটি ছত্র তোমাকে শোনাচ্ছি; কবিতাটির নাম 'দি হল্ট বিফোর রোম' (রোমের সামনে বিরাম)। এই কবিতাটি যখন তিনি লেখেন তখন ইতালি যুদ্ধ করে চলেছে এবং তাকে নানাবিধ বাধার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, তার বহু দেশদ্রোহী প্রজা বিদেশী প্রভুদের সেবা করছে :

"তোদের প্রভুরা দিতে পারে বহু পুরস্কার।
স্বাধীনতা—তার দেবার মতন কিছুই নেই—
নেই তার গৃহ, রাজসম্মান নেই তো তার,
নেই তার সীমা, বাধা-বিপত্তি একেবারেই।
সে কেবল বলে, ঘুমিয়ে পোড়ো না, এগিয়ে চলো,
সেনারা তাহার শীর্ণ ক্ষুধায়, রক্তপাতে
জীবনশোণিত মাটিতে ঢালিয়া তবুও বলে,
মোদের চিতায় জন্ম লভুক নবীন জাতি
মোদের আত্মা জ্বালুক নবীন তারার ভাতি।"

১২৮

জার্মানির অভ্যুত্থান

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৩

ইউরোপের যে বড়ো বড়ো জাতিগুলোকে এখন আমরা দেখছি, তার একটির জন্মবৃত্তান্ত আগের চিঠিতে তোমাকে বলেছি। এবার তোমাকে আজকালকার আর-একটি বড়ো জাতির ইতিহাস বলব—সেটি হচ্ছে জর্মানি।

জর্মানির সর্বত্র একই ভাষা একই রকমের জীবনধারা প্রচলিত; তবু কিন্তু বহু কাল ধরে এই জাতিটা ছোটো-বড়ো অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ছিল। অনেক শো বছর যাবৎ জর্মনদের মধ্যে প্রধান ছিল হাপ্‌স্‌বুর্গ-রাজাদের রাজ্য অস্ট্রিয়া। তার পর প্রাশিয়া বড়ো হয়ে উঠল; জর্মনজাতির নেতা কে হবে তাই নিয়ে এই দুয়ের মধ্যে লাগল রেষারেষি। নেপোলিয়ন দু পক্ষেরই গর্ব খর্ব করে দিলেন। তাঁর পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়েই জর্মানিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত তার ফলে নেপোলিয়ন হেরে গেলেন। এমনি করে ইতালি এবং জর্মানি এই দুই দেশেই নেপোলিয়ন জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিলেন, যদিও তিনি নিজে সেটা টেরও পান নি, করতে তো চানই নি। নেপোলিয়নের সময়ে জর্মানিতে জাতীয়তাবাদের প্রধান পাণ্ডা যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজনের নাম হচ্ছে ফিখ্‌টে। ইনি ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক এবং অত্যুগ্র স্বদেশ-ভক্ত লোক; তাঁর দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি অনেক কিছুই করেছিলেন।

নেপোলিয়নের পতনের পরও অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত জর্মানির ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো টিঁকে রইল, এদের একত্র করে একটি যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করতে অনেকে অনেকবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া এই দুই রাজ্যের রাজারাই সে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তা হয়ে বসতে চাইলেন। ফলে সে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে সকল প্রকারের প্রগতিবাদীদের উপর নিদারুণ পীড়ন চলতে লাগল। ১৮৩০ সনে একবার এবং ১৮৪৮ সনে একবার বিদ্রোহ হল, সে বিদ্রোহও সফল হল না। প্রজাদের স্তোক দেবার জন্যে সামান্য কিছু সংস্কারও সাধন করা হল।

ইংলণ্ডের মতো জর্মানিরও স্থানে স্থানে কয়লা এবং লোহার খনি ছিল, সুতরাং তার শিল্প-প্রগতিরও সুযোগ বর্তমান ছিল। এ ছাড়া জর্মানির আরও এক ব্যাপারে খ্যাতি ছিল, সে হচ্ছে তার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের দল, আর তার সেনার পরাক্রম! দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হল, একটি শিল্পজীবী মজুরশ্রেণীও গড়ে উঠল।

এই সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে, প্রাশিয়াতে একটি লোকের আবির্ভাব হল; বহু বছর ধরে কেবল জর্মানিতে নয়, সমস্ত ইউরোপের রাজনৈতিক জগতেই তিনি প্রভুত্ব করে গেলেন। এঁর নাম ওটো ফন বিস্‌মার্ক; ইনি ছিলেন একজন জাংকার, মানে প্রাশিয়ার একজন ভূস্বামী। ওয়াটার্লুর যুদ্ধের বছরেই এঁর জন্ম হল। অনেক বছর যাবৎ ইনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে ইউরোপের বহু রাজ্যের রাজসভায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬২ সনে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন, এবং তার পর থেকেই তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তুললেন। প্রধানমন্ত্রী হবার এক সপ্তাহও পার হতে-না-হতে তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন: "এ যুগের বড়ো বড়ো সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে বক্তৃতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ-দলের প্রস্তাব দিয়ে নয়, অস্ত্র দিয়ে আর রক্ত দিয়ে।"

রক্ত আর অস্ত্র! কথা-কটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে; এই কথা-কটিই হচ্ছে তাঁর নীতির যথার্থ পরিচায়ক; দূরদৃষ্টি এবং নির্মম নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। গণতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন; পার্লামেণ্ট এবং প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাঁর ছিল অপরিসীম অবজ্ঞা। তিনি যেন অতীত যুগের মানুষ, দৈবক্রমে এ যুগে এসে পড়েছেন; অথচ বর্তমান যুগটাকেই তিনি একেবারে নিজের ইচ্ছামতো করে গড়ে নিলেন, এমনি ছিল তাঁর কর্মশক্তি আর সংকল্পের জোর। আধুনিক জর্মানিকে সৃষ্টি করে গেলেন তিনি; ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-

অর্ধেক কাল ধরে ইউরোপের যা ইতিহাস তাও তাঁরই হাতে গড়া হল। জর্মানির জীবনের প্রধান ছিলেন তার দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকেরা, সে জর্মানি পিছনে গিয়ে আত্মগোপন করল; সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করল নবীন জর্মানি, রক্ত আর অস্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সে জর্মানি, তার পরিচয় তার সামরিক প্রতিভা। সেই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ জর্মন বলেছিলেন, "বিস্‌মার্ক জর্মানিকে বড়ো করছেন, জর্মনদের ছোটো করছেন।" জর্মানিকে ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা বড়ো শক্তি করে তুলবেন, তাঁর এই নীতিতে জর্মনরা অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল; জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির আনন্দে তারা তাঁর সমস্তরকম পীড়ন সহ্য করতে রাজি হয়ে গেল।

বিস্‌মার্ক যখন ক্ষমতা হাতে পেলেন তখন, কী তিনি করতে চান সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে—কীভাবে তা করবেন তারও পরিকল্পনা তিনি করে ফেলেছেন। স্থির সংকল্প নিয়ে তিনি কাজে লেগে গেলেন, এবং আশ্চর্যরকম সাফল্য অর্জন করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জর্মানিকে, এবং জর্মানির নামে প্রাশিয়াকে, ইউরোপে সর্বেসর্বা করে তুলবেন। ইউরোপে তখন সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি বলে পরিচিত ছিল ফ্রান্স, তার রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন। অস্ট্রিয়াও ছিল একটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এইসমস্ত দেশের সঙ্গে বিস্‌মার্ক নানা রকমের খেলা খেললেন, তার পর আবার একে একে এদের উচ্ছেদসাধন করলেন—আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং কূটনীতির প্রাচীন রীতির পাঠ হিসাবে এটি একটি চমৎকার অধ্যায়। তাঁর প্রথম কাজ হল, জাতিহিসেবে যে জর্মানিই সকলের উপরে, সেই সত্যটি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। বিস্‌মার্ক দেখলেন, প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল, তাকে এবার শেষ করে দিতে হবে। এর অবসান হবে অবশ্য প্রাশিয়াকেই জিতিয়ে, অস্ট্রিয়াকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাকে দ্বিতীয় স্থান নিয়েই খুশি থাকতে হবে। প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান ঘটাতে গেলে প্রথমেই দরকার হচ্ছে অস্ট্রিয়ার পতন; তার পরে আসবে ফ্রান্সের পালা। (এ কথা কিন্তু মনে রেখো, প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া বা ফ্রান্স বলতে আমি বোঝাচ্ছি এদের শাসন-কর্তৃপক্ষকে। এই কর্তৃপক্ষরা সকলেই ছিলেন অল্প-বিস্তর স্বৈরতন্ত্রী; এদের পার্লামেন্টদের আসলে ক্ষমতা প্রায় কিছুই ছিল না।)

কাজেই বিস্‌মার্ক নিঃশব্দে তাঁর সামরিক আয়োজনকে সম্পূর্ণ করে তুললেন। ইতিমধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ এবং পরাজিত করলেন। অস্ট্রিয়ার এই পরাজয়ের ফলেই দক্ষিণ-ইতালিতে গ্যারিবল্ডির অভিযান শুরু হল, শেষ পর্যন্ত ইতালি স্বাধীনই হয়ে গেল। বিস্‌মার্কের এতে খুব সুবিধা, কারণ অস্ট্রিয়ার এতে শক্তি কমে যাচ্ছে। পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার অধীন-অঞ্চলে জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহ করল, বিস্‌মার্ক জারকে তাঁর সাহায্য দিতে চাইলেন, দরকার হলে তিনি এই পোলদের মেরে শেষ করে দিতে পারেন। অত্যন্ত লজ্জাকর প্রস্তাব, কিন্তু বিস্‌মার্কের এতে কাজ হাশিল হল; ভবিষ্যতে ইউরোপে যদি কোনোরকম জটিল সমস্যা ওঠে, সে দিন জারের বন্ধুত্ব বিস্‌মার্কের পাওনা হয়ে রইল। এর পরে তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে ডেনমার্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। তার অল্পদিন পরেই আবার অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধালেন, এবার তাঁর মিত্র করে নিলেন ফ্রান্স আর ইতালিকে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করল; এটা হল ১৮৬৬ সনে। জর্মানিই ইউরোপের নেতৃস্থানীয় এবং জর্মানির মধ্যে বড়োকর্তার আসন প্রাশিয়ার, এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা হল। বিস্‌মার্ক বিচক্ষণ লোক, এবার তিনি অস্ট্রিয়ার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার দেখাতে লাগলেন; যেন দুয়ের মধ্যে কোনোরকম মনোমালিন্য না থাকে। এবার রাস্তা খোলা, উত্তর-জর্মানি জুড়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হল, তার নেতা হল প্রাশিয়া (অস্ট্রিয়া অবশ্য বাদ পড়ল)। বিস্‌মার্ক হলেন এই যুক্তরাষ্ট্রের চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী। এখনকার দিনে আমাদের বড়ো বড়ো রাজনীতি আর আইনের পণ্ডিতরা যুক্তরাষ্ট্র আর শাসনতন্ত্র কীরকম হবে তাই নিয়ে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে বক্তৃতা আর তর্কাতর্কির কচ্‌কচি চালাচ্ছেন; আর এই উত্তর-জর্মানির যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বিস্‌মার্ক রচনা করেছিলেন ঠিক পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে। এই শাসনতন্ত্রটিই পুরো পঞ্চাশ বছর ধরে জর্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল, এই সময়ের মধ্যে এর অতি সামান্যই অদল-বদল করার প্রয়োজন হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ১৯১৮ সনে জর্মানিতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল তখনই মাত্র এর অবসান হয়েছে।

বিস্‌মার্কের প্রথম উদ্দেশ্যটি সফল হল, প্রাশিয়া তখন জর্মানির প্রধান শক্তি হয়ে বসেছে। এর পরের কাজ হল তাঁর, ফ্রান্সের শক্তি খর্ব করে ইউরোপে জর্মানির প্রতিপত্তি বড়ো করে তোলা। নিঃশব্দে কোনোরকম হৈচৈ না করে তিনি এর আয়োজন করলেন, সমস্ত জর্মনদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করলেন, এবং ইউরোপের এবং অন্যান্য দেশের সন্দেহও নিরসন করলেন। অস্ট্রিয়া তাঁর হাতে পরাস্ত হয়েছিল, তার প্রতিও তিনি এত ভদ্র ব্যবহার দেখালেন যে দু পক্ষের মধ্যে প্রায় কোনো অসদ্ভাবই আর রইল না। চিরকাল ধরেই ইংলন্ড ছিল ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী, তৃতীয় নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ফন্দিফিকির সে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। কাজেই ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াই করবার ব্যাপারে ইংলন্ডের বন্ধুত্ব বাগিয়ে নিতে বিস্‌মার্কের মোটেই বেগ পেতে হল না। যুদ্ধের জন্য সবরকমে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে তিনি শেষে এমনি ওস্তাদের মতো চাল দিলেন যে, ১৮৭০ সনে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। সমস্ত ইউরোপ জানল, প্রাশিয়ার কোনো দোষ নেই, ফ্রান্স ওপরপড়া হয়ে তার সঙ্গে এসে যুদ্ধ বাধাচ্ছে। প্যারিসে লোকের মুখে ধ্বনি উঠল, 'বার্লিন চলো', 'বার্লিন চলো'। তৃতীয় নেপোলিয়নের মনে মনে ভরসা ছিল, তিনি ধরে নিলেন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বিজয়ী সেনা বার্লিনে গিয়ে হাজির হবে। আসলে কিন্তু ঘটল ঠিক তার উলটো। বিস্‌মার্কের সেনা সুশিক্ষিত; ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব-সীমান্তে সেই সেনা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল, তার বিক্রমে ফ্রান্সের সেনা একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেডানে তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং সসৈন্যে জর্মনদের হাতে বন্দী হলেন।

ফ্রান্সের দ্বিতীয় নেপোলিয়ন-সাম্রাজ্যের এইভাবে অবসান হল; এর পরেই প্যারিসে আবার একটি প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন হয়েছিল অনেক কারণে; কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল, তাঁর প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ। তাঁর অত্যাচার ও পীড়ননীতির জন্য তারা তাঁকে মোটেই দেখতে পারত না। অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তিনি প্রজাদের মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করতেন; বিপদ আসন্ন দেখলে রাজারা এবং শাসনকর্তারা অনেক সময়েই এই পন্থাটি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু তাঁর এই ফন্দি খাটল না; শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে উপলক্ষ করেই তাঁর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেল।

প্যারিসে একটি দেশরক্ষী সরকার স্থাপিত হল। এ'রা প্রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। কিন্তু বিস্‌মার্ক সন্ধির যেসব শর্ত দিলেন তা এমন অপমানকর যে এ'রা স্থির করলেন, যুদ্ধই চালিয়ে যাবেন, যদিও তখন এ'দের সেনা বলতে আর বস্তুত কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে প্যারিসের অবরোধ চলল, শহরের চতুর্দিকে এবং ভার্সাইতে জর্মন সেনা ঘাঁটি করে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত প্যারিস পরাজয় স্বীকার করল; নূতন প্রজাতন্ত্রকে পরাজয় এবং বিস্‌মার্কের দেওয়া সন্ধির কঠিন শর্তগুলোই মেনে নিতে হল। যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ-বাবদ একটা বিরাট-পরিমাণ টাকা এ'রা জর্মানিকে দিতে স্বীকৃত হলেন। আলসেস্ এবং লোরেন এই প্রদেশ-দুটি জর্মানিকে ছেড়ে দিতে তাঁরা বাধ্য হলেন; সন্ধির শর্তের মধ্যে এইটিই ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক; কারণ, এই প্রদেশ-দুটি দু শো বছরেরও বেশিকাল ধরে ফ্রান্সের অঙ্গ হয়ে ছিল।

প্যারিসের অবরোধ শেষ হবার আগেই কিন্তু ভার্সাইতে নূতন একটি সাম্রাজ্যের পত্তন হল। তৃতীয় নেপোলিয়নের ফরাসি-সাম্রাজ্যের শেষ হয় ১৮৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৮৭১ সনের জানুয়ারী মাসেই ভার্সাইয়ের প্রাসাদে, সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের প্রসিদ্ধ সভাগৃহে, মিলিত জর্মানির একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল; তার কাইজার অর্থাৎ সম্রাট হলেন প্রাশিয়ার রাজা। জর্মানির সমস্ত অঞ্চলের রাজা আর প্রতিনিধিরা সেই সভায় সমবেত হয়ে তাঁদের নূতন সম্রাট কাইজারকে তাঁদের আনুগত্য নিবেদন করলেন। প্রাশিয়ার রাজবংশ হোহেন্‌জোলার্ন এবার হয়ে গেল সম্রাট-বংশ; মিলিত জর্মানি এবার হয়ে উঠল সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেই শক্তিশালী জাতিদের অন্যতম।

ভার্সাইতে আনন্দ এবং উৎসবের ধুম পড়ে গেল; অথচ তার ঠিক পাশেই প্যারিসে তখন

জর্মানির সম্প্রসারণ
ডেনমার্ক
লীজউইগ
১৮৬৪
হ্যানোভার
এলব
বার্লিন
ডানজিগ
ওডার
রাশিয়া
কলোন
রাইন
স্যাক্সনী
অস্ট্রিয়া
ব্যাভেরিয়া
উরতমবর্গ
মিউনিক
দানিয়ুব
আলসাস
লোরেন
১৮৭১
প্রাশিয়া
উত্তর-জর্মন রাষ্ট্র-
গোষ্ঠীর সীমারেখা
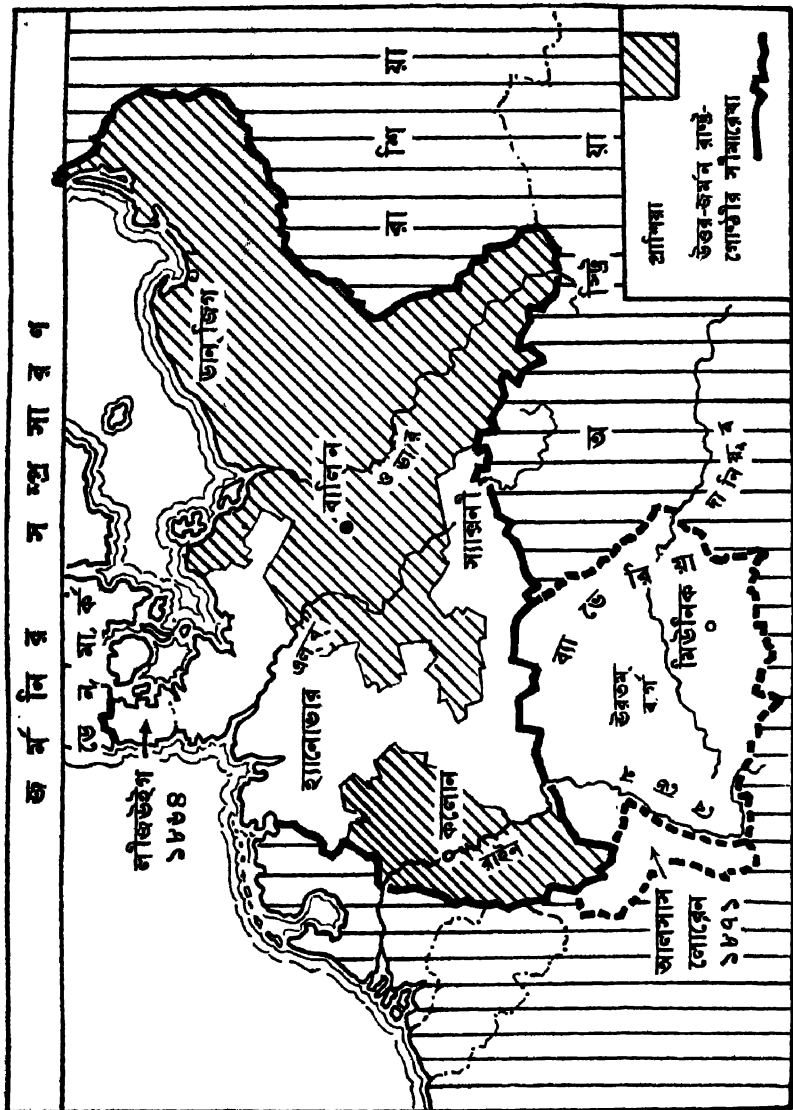
চলেছে দুঃখ দুর্দশা আর চরম গ্লানির রাজত্ব। ক্রমাগত একটির পর একটি সর্বনাশের আঘাতে প্রজারা তখন বিভ্রান্ত, বিহ্বল; স্থায়ী বা সুপ্রতিষ্ঠ শাসনব্যবস্থাও তাদের কিছু নেই। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে বহু সংখ্যক রাজপন্থী লোক ঢুকে বসেছে, তারা চক্রান্ত করছে আবার একজন রাজাকে সিংহাসনে বসাতে। পথের বাধা সরাবার জন্যে তারা জাতীয় রক্ষী-বাহিনীকে নিরস্ত্র করে দিতে চেষ্টা করল; তাদের ধারণা ছিল সে বাহিনীটি প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী। শহরের সমস্ত প্রজাতন্ত্রী এবং বিপ্লবীরাই বুঝলেন, এর মানে হচ্ছে আবার পুরোনো পন্থার প্রবর্তন, আবার অত্যাচারের আবির্ভাব। সুতরাং, এ'রা বিদ্রোহ করলেন; ১৮৭১ সনের মার্চ মাসে প্যারিসের 'কমিউন' প্রতিষ্ঠিত হল। এটা ছিল একটা পৌরসভার (মিউনিসিপালিটি) মতো বস্তু; এর আদর্শ ছিল অতীতের সেই বিরাট ফরাসি-বিপ্লব। কিন্তু বস্তুত এর মধ্যে তার চেয়েও বৃহত্তর জিনিষের আভাস ছিল, তখন সেটা তেমন স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে নি, কিন্তু আধুনিক কালে যে সমাজতন্ত্রবাদের দেখা আমরা পেয়েছি তার বীজ এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল। এক দিক থেকে বলা যায়, রাশিয়াতে যে সোভিয়েটগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্যারিস-কমিউন ছিল তাদেরই অগ্রদূত।

কিন্তু ১৮৭১ সনের এই প্যারিস-কমিউন বেশিদিন বাঁচল না। সাধারণ প্রজাদের এই জাগরণ দেখে রাজতন্ত্রী এবং বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গেল; প্যারিসের যে অংশটি কমিউনের অধীনে তাকে তারা অবরোধ করে বসল। ভার্সাই এবং অন্যান্য নিকটবর্তী অঞ্চলে বসে জর্মন সেনা নিঃশব্দে শুধু চেয়ে দেখতে লাগল। যেসব ফরাসি সেনা জর্মনদের হাতে বন্দী হয়ে ছিল তাদের এবার ছেড়ে দেওয়া হল; প্যারিসে ফিরে এসে তারা তাদের পুরোনো দিনের মনিবদের পক্ষ নিয়ে কমিউনের সংগে যুদ্ধে লেগে গেল। কমিউন-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে এরা অভিযান করল, ১৮৭১ সনে মে মাসের শেষাশেষি একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করল এবং প্যারিস শহরের রাস্তায় ত্রিশ হাজার নরনারীকে গুলি করে বধ করল। বহুসংখ্যক কমিউনপন্থী বন্দী হল, এদেরও পরে বেশ ধীরেসুস্থে গুলি করে মারা হল। এইভাবে প্যারিস-কমিউনের শেষ হল; সে সময়ে এই কমিউন ইউরোপে একটা বিরাট সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল, সে সাড়া শুধু, একে যেরকম নৃশংস রক্তপাতের দ্বারা লুপ্ত করা হয়েছিল তার দরুন নয়; বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এইটিই ছিল প্রথম সমাজতন্ত্রী বিদ্রোহ। ধনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্ররা বহু বারই বিদ্রোহ করে; কিন্তু সমাজের যে ব্যবস্থার ফলে তাদের দারিদ্র্য তাকেই বদলে ফেলবার কথা তারা এর আগে আর কখনও ভাবে নি। এই কমিউন ছিল একাধারে একটি প্রজাতন্ত্রী এবং অর্থনৈতিক বিদ্রোহ; তাই ইউরোপে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে। ফ্রান্সে তখন কমিউনকে বিনষ্ট করবার জন্যে যে প্রচণ্ড পীড়ন চালানো হল তার ফলে সমাজতন্ত্রবাদ অলক্ষ্যে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হল; তার আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে বহুকাল লেগেছিল।

কমিউনকে উচ্ছেদ করা হল, কিন্তু রাজতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সে আর হল না। কিছু-দিন পর ফরাসিরা নিশ্চিতভাবেই প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নিল; ১৮৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করে ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হল। তখন থেকে এই প্রজাতন্ত্রটিই চলে আসছে, এখনও সে টি'কে রয়েছে। এখনও ফ্রান্সে এমন লোক কিছু কিছু আছে যারা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই অল্প; ফ্রান্স চিরকালের মতোই প্রজাতন্ত্রকে গ্রহণ করে নিয়েছে বলে মনে হয়। ফরাসি প্রজাতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্র; অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই এখানে প্রভুত্ব করছে।

১৮৭০-৭১ সনের জর্মন-যুদ্ধের ধাক্কা ফ্রান্স ক্রমে সামলে উঠল, সেই বিরাট-পরিমাণ ক্ষতিপূরণও মিটিয়ে দিল। কিন্তু তার প্রজাদের মাথায় যে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার আগুন তাদের মনের মধ্যে জ্বলে রইল। ফরাসিরা গর্বিত জাতি, তাদের স্মৃতিও প্রখর; প্রতিশোধ নেবার চিন্তায় তারা অধীর হয়ে উঠল। আলসেস এবং লোরেন প্রদেশ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এই আঘাতটাই তাদের খুব বেশি বেজেছিল। অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করবার পরে বিস্‌মার্ক তার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার দেখিয়েছিলেন, সেটা তাঁর বিচক্ষণতার প্রমাণ।

কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি তিনি যে কঠোর আচরণ করলেন তার মধ্যে সহৃদয়তা বা বিচক্ষণতার পরিচয় কোথাও ছিল না। গর্বিত জাতির গর্ব খর্ব করলেন তিনি, তার পরিবর্তে অর্জন করলেন সেই জাতিটির ভয়ানক এবং অবিস্মৃত প্রতিহিংসা। এই যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নি, সেডানের যুদ্ধটির ঠিক পরে, বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী কার্ল্ মার্ক্স্ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন; তাতে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আলসেস্‌কে এভাবে দখল করে নেবার ফলে "এই দুই দেশের মধ্যে মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি করা হবে; শান্তির বদলে প্রতিষ্ঠা করা হবে মাত্র একটা সাময়িক সন্ধির।" মার্ক্সের আরও বহু বাণীর মতো তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

জর্মনিতে বিস্‌মার্ক তখন সর্বেসর্বা প্রভু, সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর 'রক্ত আর অস্ত্র' নীতি তখনকার মতো জয়যুক্ত হয়েছে; জর্মনি সে নীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল, উদারপন্থী মতামতকে তারা তখন অবজ্ঞা করে। গণতন্ত্রের উপরে বিস্‌মার্কের শ্রদ্ধা ছিল না; তিনি রাজার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন। ও দিকে আবার জর্মনিতে শিল্প-কারখানা এবং শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সব সমস্যা এসে উপস্থিত হল; শ্রমিকশ্রেণীর তখন শক্তি বেড়ে যাচ্ছে, তারা আমূল পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে। বিস্‌মার্ক এর সমাধান করলেন দুই উপায়ে : শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং সমাজতন্ত্রবাদের দমন। সমাজকল্যাণের জন্য কিছুটা আইনকানুন রচনা করলেন তিনি, এবং তার লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের হাত করে নিতে, অন্তত তারা চরমপন্থী না হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করে নিতে চাইলেন। এইভাবে জর্মনিই প্রথম এই ধরনের আইনকানুন বানাতে শুরু করল; শ্রমিকদের বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন্ দেবার, তাদের চিকিৎসা এবং জীবনবীমার ব্যবস্থা করবার, এবং আরও নানাবিধ উপায়ে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করবার জন্যে আইন তৈরি হল। তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডও এ দিকে বিশেষ কিছু কাজ করে নি, অথচ তার কল-কারখানা এবং শ্রমিক-আন্দোলন, এর অনেক আগেই শুরু হয়েছে। বিস্‌মার্কের এই নীতিতে কিছুটা ফল হল। তবুও শ্রমিকদের সংগঠন বেড়ে চলল। শ্রমিকরা তখন কয়েকজন খুব ভালো নেতা পেয়ে গিয়েছিল, এ'দের কয়েকজনের নাম বলছি : ফার্ডিন্যান্ড ল্যাসেল, অত্যন্ত মেধাবী লোক; অনেকের মতে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। অতি অল্প-বয়সে ইনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন। উইলহেল্‌ম্ লীব্‌নেক্‌ট্, সাহসী এবং প্রবীণ যোদ্ধা ও বিদ্রোহী। ইনিও আর-একটু হলেই বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছিলেন, অল্পের জন্যে বেঁচে যান এবং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তই বেঁচে থাকেন। তাঁর পুত্র কার্ল্; স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চালাতে চালাতেই ইনি অল্পদিন মাত্র পূর্বে ১৯১৮ সনে জর্মন-প্রজাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সময়ে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তার পর কার্ল্ মার্ক্স্, এ'র সম্বন্ধে আমি তোমাকে অনেক কথা বলব, আর একটি চিঠিতে। মার্ক্স্ অবশ্য জীবনের বেশির ভাগই কাটিয়েছিলেন জর্মনির বাইরে, নির্বাসনে।

শ্রমিকদের সংঘগুলি বেড়ে উঠল; ১৮৭৫ সনে এরা সমস্ত একত্র হয়ে সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক দলে পরিণত হল। সমাজতন্ত্রবাদের এই বিস্তার বিস্‌মার্ক সইতে পারলেন না। এই সময়ে সম্রাটকে হত্যা করবার একটা চেষ্টা হয়; সেই অজুহাত ধরে বিস্‌মার্ক সমাজতন্ত্রবাদীদের উপরে একেবারে হিংস্র আক্রমণ চালালেন। ১৮৭৮ সনে বহু সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন রচিত হল, তার ফলে সমস্ত রকমের সমাজতন্ত্রী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সমাজতন্ত্রবাদীদের সম্বন্ধে যেসকল আইন করা হল কঠোরতায় সেগুলো প্রায় সামরিক আইনের কাছাকাছি; হাজার হাজার লোককে কারাদণ্ড দেওয়া হল বা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল। নির্বাসিতদের অনেকে আমেরিকায় চলে গেলেন এবং সেখানে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক দল এই আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও সে বেঁচে রইল, এবং পরে আবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়াল। বিস্‌মার্কের পীড়ননীতি তাকে মারতে পারল না, বরং সে নীতির সাফল্যেরই ফল হল বেশি খারাপ! শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দলটি একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল, তার প্রচুর ধনসম্পত্তি, হাজার হাজার বেতনভোগী কর্মচারী। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যখন ধনী হয়ে ওঠে তখনই তার মধ্যের বিপ্লবী মনটি মরে শেষ হয়ে যায়। জর্মনির এই সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক দলেরও অবস্থা ঠিক তাই হয়।

কূটনীতিতে বিস্‌মার্কের নৈপুণ্য তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টি‍ঁকে ছিল; তাঁর সময়কার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি এক বিরাট খেলা খেলে গেছেন। এখন যেমন, তখনকার দিনেও তেমনি, সে রাজনীতির সমস্তটাই ছিল চক্রান্ত আর প্রতিচক্রান্ত, প্রতারণা আর ধাপ্পাবাজির একটা আশ্চর্য ও জটিল জালবিস্তার, তার সমস্তখানিই গোপনে চলে, আবরণের তলায় ঢাকা থাকে। দিনের আলোতে প্রকাশ পেলেই আর তার অস্তিত্ব থাকে না। বিস্‌মার্কের তখন ভয় ধরেছে, ফরাসিরা হয়তো প্রতিশোধ না তুলে ছাড়বে না; তাই তিনি অস্ট্রিয়া আর ইতালির সঙ্গে একটা মৈত্রী স্থাপন করলেন, তার নাম হল 'ত্রিশক্তির মৈত্রী'। এমনি করে দুই পক্ষই অস্ত্র-সংগ্রহ আর চক্রান্ত করতে লাগল আর পরস্পরের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল।

১৮৮৮ সনে একটি যুবাপুরুষ জর্মানির কাইজার হয়ে বসলেন, ইনি সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম্‌। নিজেকে তিনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি বলে মনে করতেন, সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যেই বিস্‌মার্কের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া লাগল। বৃদ্ধ বয়সে সেই লৌহের মত কঠিন ও দৃঢ়চেতা প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হল। বিস্‌মার্কের রাগের আর শেষ রইল না। একটুখানি সান্ত্বনা হিসাবে কাইজার তাঁকে 'প্রিন্স' উপাধি দান করলেন। বিস্‌মার্ক কিন্তু রাগে দুঃখে, এবং সমস্ত রাজা-জাতটারই উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একেবারে তাঁর নিজের বাড়িতে গিয়ে বাস শুরু করলেন। একজন বন্ধুর কাছে তিনি বলেছিলেন, "যেদিন এই পদ গ্রহণ করেছিলাম সেদিন আমার সহায় ছিল, রাজার প্রতি একটা গভীর আনুগত্য এবং ভক্তি। আমার ভাগ্য খারাপ, এখন দেখছি সে প্রীতি এবং ভক্তির ভাণ্ডার দিন দিন ক্রমেই কমে আসছে।......তিন-তিনজন রাজাকে আমি উলঙ্গ দেখেছি; সকল ক্ষেত্রে সে দৃশ্যটা মনোরম ছিল না!"

রোষে ক্ষোভে ভরা মন নিয়ে বৃদ্ধ বিস্‌মার্ক আরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন; ১৮৯৮ সনে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কাইজার কর্তৃক পদচ্যুত হবার পরে, এমনকি মৃত্যুর পরেও, তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়া জর্মানির উপরে ছড়িয়ে ছিল; তাঁর পরবর্তীরাও তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কালে যাঁরা এসেছেন তাঁরা মানুষ হিসাবে বিস্‌মার্কের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র।

১২৯

কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

কাল তোমাকে জর্মানির অভ্যুদয়ের কথা লিখতে লিখতে মনে হল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জর্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধেই তোমাকে কিছু বলা হয় নি। এই লোকটি হচ্ছেন গ্যেটে। অতি বিখ্যাত লেখক ইনি, কয়েক মাস মাত্র আগে জর্মানির সর্বত্র এ'র মৃত্যুতিথির শতবার্ষিকী-উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। তার পর আবার ভাবলাম, এই সময়ে ইউরোপের বড়ো বড়ো লেখক যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের সম্বন্ধেই কিছু কথা তোমাকে বললে হত। কিন্তু আমার পক্ষে এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার; বিপজ্জনক বললাম তার কারণ, বলতে গেলে খালি আমার এ বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রমাণ হয়ে যাবে। শুধু কতকগুলো বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আউড়ে যাবার কোনো মানে হয় না; আবার তার চেয়ে বেশি বলতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেই আমার জ্ঞান অতি অল্প; ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বিদ্যার দৌড় হচ্ছে মাত্র দু-চারখানা অনুবাদ পড়া পর্যন্ত। কী এখন করি, বলো তো।

এ বিষয়ে খানিকটা তোমাকে বলতেই হবে, দেখলাম এই সংকল্পটা ভূতের মতো আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে, কিছুতেই তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। তখন ভাবলাম, অন্তত এ দিকের পথে

একটা ইঙ্গিত তোমাকে দিয়ে দেব যদিও সে রূপকথার রাজ্যের পথে সঙ্গে করে তোমাকে বেশিদূর এগিয়ে দিয়ে আসা আমার সাধ্যে কুলোবে না। একটা জাতির ভিতরকার মনটিকে বুঝতে হলে তার জনতার বাইরের কার্যকলাপের চেয়েও বেশি করে দেখতে হয় তার শিল্প আর সাহিত্যকে। মনের সন্ধান এরই মধ্যে মেলে, তার শান্ত গম্ভীর চিন্তাধারার সাক্ষাৎ, কোনো-একটি মুহূর্তের সাময়িক উত্তেজনা বা সংস্কার তাকে ব্যাহত করতে পারে না। অথচ এখনকার দিনে কবিকে বা শিল্পীকে আর আমরা ভবিষ্যৎ-দিনের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে মনে করি না; সমাজে তাদের মর্যাদাও নেই। মর্যাদা যদি-বা দৈবাৎ কারও ভাগ্যে মিলে যায়, তাও মেলে সাধারণত মৃত্যুর পরে।

অতএব আমি মাত্র কয়েকজনের নামই তোমাকে শোনাব। এদের অনেকের নাম তুমি নিশ্চয়ই আগে থেকে জান। আর কথাও আমি বলব শুধু এই শতাব্দীটির প্রথম দিকটি নিয়ে। এটা হচ্ছে শুধু তোমার জানবার ইচ্ছাকে শানিয়ে তোলা। মনে রেখো, ইউরোপের বহু দেশেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু চমৎকার সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার ভাণ্ডার এখনও পূর্ণ।

গ্যেটে বস্তুত ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক; তাঁর জন্ম হয় ১৭৪৯ সনে। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন, তিরাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীরও এক-তৃতীয়াংশ কাল তিনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন। গ্যেটের জীবনকালটা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে একটা অতি প্রচণ্ড বিপর্যয়ের যুগ; তাঁর নিজের দেশটিকেই তিনি নেপোলিয়নের সেনার হাতে বিজিত হতে দেখেছিলেন। নিজের জীবনেও তিনি অনেক দুঃখ অনেক আঘাত পেয়েছেন; কিন্তু তারই ফলে ক্রমে জীবনের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে জয় করবার মতো একটা মনের জোর তিনি অর্জন করলেন, অর্জন করলেন একটা আশ্চর্য নির্লিপ্ততা এবং প্রশান্তি; তার ফলে তাঁর মনেও তিনি শান্তি পেলেন। নেপোলিয়ন যখন প্রথম তাঁকে দেখলেন তখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। দরজার মুখে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর মুখে এবং সর্বাঙ্গে এমন একটা-কিছু ছিল, এমন একটা অনুদ্বিগ্ন দৃষ্টি একটা মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে, দেখে নেপোলিয়ন চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই এক জন মানুষ দেখলাম!" গ্যেটে অনেক রকম কাজ করে গেছেন; যাতে তিনি হাত দিতেন সেইটিই চমৎকার ভাবে সম্পন্ন করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, ন্যাট্যকার এবং বৈজ্ঞানিক—বহু বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর চর্চা ছিল; এর উপর আবার তাঁর জীবিকা-নির্বাহের উপায় ছিল চাকুরি—জর্মানির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার তিনি মন্ত্রী ছিলেন। আমরা প্রায় সকলেই তাঁকে চিনি একজন লেখক বলে; তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম হচ্ছে ফাউস্ট। দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন তিনি, তাঁর জীবনকালেই তাঁর খ্যাতি বহুদূরে দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল; তাঁর নিজস্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে একজন দেবতুল্য ব্যক্তি বলেই তাঁর দেশবাসীরা মনে করত।

গ্যেটেরই সময়কার, অবশ্য তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু ছোটো, আর-একজন ছিলেন, তাঁর নাম শিলার। ইনি একজন খুব বড়ো কবি। জর্মানির আর-এক জন কবি—হায়েনরীখ হাইন, তাঁর বয়স এঁদের চেয়ে অনেক কম ছিল। হাইন অনেকগুলো খুব চমৎকার গীতিকবিতা লিখে গেছেন। গ্যেটে শিলার এবং হাইন, এঁরা তিনজনেই গ্রীসের প্রাচীন সংস্কৃতির পরম ভক্ত ছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরে জর্মানি দার্শনিকের দেশ বলে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, দু-একজন দার্শনিকের নামও তোমাকে শোনাতে পারি, যদিও এ হয়তো তোমার তেমন ভালো লাগবে না। এঁদের লেখা বইগুলোতে খুবই জটিল এবং কঠিন তত্ত্বের আলোচনা থাকে, তাই—যাদের এই বিষয়টা বিশেষ ভালো লাগে তারাই শুধু সে বই পড়তে চেষ্টা করে। তবুও এই দার্শনিকদের বইগুলো পড়ে আনন্দ এবং শিক্ষা দুটোই পাওয়া যায়; কারণ, এঁরাই চিরকাল জ্ঞানের আর চিন্তার দীপ-শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন। এঁদের বই পড়েই লোকে জগতের চিন্তাধারার গতির হদিশ পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্মানির বড়ো দার্শনিক ছিলেন ইমানুয়েল কাণ্ট; এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁর বয়স আশি বছর। দার্শনিকদের মধ্যে আর-একটি বড়ো পণ্ডিতের নাম হেগেল। হেগেল মতামতের ব্যাপারে কাণ্টের অনুবর্তী ছিলেন; অনেকের মতে কমিউনিজমের প্রবর্তক কার্ল্ মার্ক্সের উপরে তাঁর মতামতের খুব বড়ো প্রভাব দেখা যায়। দার্শনিকদের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই আমি ক্ষান্ত হব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু সংখ্যক কবির আবির্ভাব হয়েছিল, বিশেষ করে ইংলণ্ডে। রাশিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জাতীয় কবি পুশ্‌কিনও এই সময়েই জীবিত ছিলেন। ইনি অল্পবয়সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান। ফ্রান্সেও অনেক কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁদের মধ্যে মাত্র দু জনের নাম এখানে করব। এ'দের এক জন হচ্ছেন ভিক্টর হিউগো, ১৮০২ সনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গোটের মতো ইনিও তিরাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, এবং ঠিক গ্যেটের মতোই এ'কেও এ'র দেশবাসীরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন দেবতাস্বরূপ বলে মনে করত। লেখক হিসাবে এবং রাজনীতিক হিসাবে, উভয়তই এ'র জীবনটা ছিল ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। প্রথম-জীবনে ইনি ছিলেন একজন উগ্র রাজতন্ত্রী, এবং প্রায় স্বৈরতন্ত্রেরই সমর্থক। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে তাঁর মত বদলাতে লাগল; ১৮৪৮ সনে তিনি প্রজাতন্ত্রবাদী হয়ে দাঁড়ালেন। লুই নেপোলিয়ন যখন ক্ষণজীবী দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হলেন তখন তিনি হিউগোকে তাঁর প্রজাতন্ত্রী মতামতের অপরাধে নির্বাসিত করে দিলেন। ১৮৭১ সনে ভিক্টর হিউগো প্যারিস-কমিউনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। রক্ষণশীলতার চরমপন্থী ছিলেন তিনি; ধীরে ধীরে কিন্তু স্থির গতিতে বদলাতে বদলাতে তিনি হয়ে গেলেন সমাজতন্ত্রবাদেরই চরম উপাসক। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী হয়ে ওঠে। হিউগোর বেলায় হল ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু আমরা এখানে ভিক্টর হিউগোকে দেখছিলাম লেখক হিসাবে। তিনি ছিলেন বড়ো কবি, ঔপন্যাসিক এবং ন্যাট্যকার।

দ্বিতীয় যে ফরাসি লেখকটির নাম তোমাকে বলব তিনি হচ্ছেন অনর দ্য বাল্‌জাক। ইনি ভিক্টর হিউগোর সমসাময়িক, কিন্তু দু জনের মধ্যে অনেক তফাত। উপন্যাস লেখায় বাল্‌জাকের অদ্ভুত শক্তি ছিল; খুব বেশি দিন তিনি বাঁচেন নি অথচ তারই মধ্যে বহুসংখ্যক উপন্যাস লিখে গেছেন। তাঁর গল্পগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো, একই চরিত্রের দেখা তাঁর অনেক গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সময়কার ফ্রান্সের সমগ্র জীবনযাত্রার স্বরূপটি তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবেন; তাঁর সমস্ত রচনাবলীর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'মানুষের জীবননাট্য'। সংকল্পটা খুবই বড়ো সন্দেহ নেই; দীর্ঘকাল ধরে অতি কঠোর পরিশ্রম করেও তিনি তাঁর এই বিরাট স্বেচ্ছাকৃত কর্তব্যকে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের কবিদের মধ্যে তিন জন তরুণ ও গুণী কবি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। এ'রা ছিলেন সমসাময়িক, তিন জনেই মারাও যান অল্প বয়সে, পরস্পর থেকে ঠিক তিনটি বছরের মধ্যে। এই তিনজন হচ্ছেন কীট্‌স্‌ শেলি আর বায়রন্‌। কীট্‌স্‌কে দারিদ্র্য এবং নিরাশার সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল, ১৮২১ সনে ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি রোমে মারা যান, তখনও তাঁর নাম বিশেষ কেউ জানত না। তবু কিন্তু তিনি কতকগুলো খুব চমৎকার কবিতা লিখে গেছেন। কীট্‌স্‌ ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; পয়সার অভাবে যদি তাঁরই কাব্যচর্চায় এত বাধা পড়ে থাকে, তবে দরিদ্রের পক্ষে কবি এবং সাহিত্যিক হওয়া আরও কত কঠিন ব্যাপার, সেটা ভেবে দেখবার মতো। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক তিনি এ সম্বন্ধে একটি ভারি যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন; "এটা নিশ্চিত আমাদের এই সমাজটিরই মধ্যে কোথাও একটা গলদ রয়েছে, যার ফলে দরিদ্র কবির পক্ষে সাফল্যের কোনো আশা থাকে না, গত দু শো বছর ধরেই এমনি চলেছে। আমার কথা বিশ্বাস করুন—দশটি বছর কালের অধিকাংশ সময় আমি প্রায় তিন শো কুড়িটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছি—আমরা গণতন্ত্রের বুলি আওড়াই, কিন্তু কার্যত, বুদ্ধি-বৃত্তির যে স্বাধীনতা থাকলে বড়ো উঁচুদরের সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয় সে স্বাধীনতা অর্জনের ভরসা এথেন্সের ক্রীতদাসদের যতটুকু ছিল, ইংলণ্ডের দরিদ্র শিশুদের তার চেয়ে মোটেই বেশি নেই।"

এ'র কথাটি আমি উদ্ধৃত করলাম তার কারণ, আমরা স্বভাবতই ভুলে যাই যে, কাব্য ও সৎ-সাহিত্য রচনা এবং সংস্কৃতি, এগুলো সবই সাধারণত রয়েছে অবস্থাপন্ন শ্রেণীদের হাতে এক-চেটিয়া হয়ে। দরিদ্রের কুটিরে কাব্য আর সংস্কৃতির স্থান হয় না; শূন্য উদরে চর্চা করবার বস্তু এগুলি নয়। তাই আমাদের আধুনিক কালের সংস্কৃতি হয়েছে অবস্থাপন্ন বুর্জোয়া

মনেরই প্রতিলিপি মাত্র। হয়তো এর মধ্যেও প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন আসবে, যেদিন শ্রমিকরা নূতনতর সমাজব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এর ভার হাতে তুলে নেবে; সে ব্যবস্থাতে সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ এবং অবসর তারও থাকবে। আজকালকার সোভিয়েট রাশিয়াতে এই রকমেরই একটা পরিবর্তন চলছে, আমরা মুগ্ধ হয়ে তার গতি নিরীক্ষণ করছি।

এর থেকেই আরও একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—গত কয়েক পুরুষ ধরে ভারতবর্ষে আমাদের সংস্কৃতির যে দৈন্য দেখা দিয়েছে তারও কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশবাসীদের চরম দারিদ্র্য। যে মানুষের ঘরে খাবার সংস্থান নেই তার কাছে সংস্কৃতির কথা বলতে যাওয়া মানেই তাকে নিছক অপমান করা। যে দু-চারজন দৈবাৎ একটু অবস্থাপন্ন থাকে, দারিদ্র্যের এই প্লানি তাদেরও জীবনকে অবসন্ন করে আনে, সেইজন্যই দেখছি ভারতবর্ষে এখন এই শ্রেণীর লোকেরাও অত্যন্তরকম সংস্কৃতিহীন হয়ে পড়েছে। বিদেশী শাসন আর সামাজিক পশ্চাদ্‌গতির কী অপরিসীম কুফল! তবু এই নিদারুণ দারিদ্র্য এবং বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষে আজও গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো এক-এক জন অপূর্ব মানুষ, সংস্কৃতির এক-এক জন বিরাট প্রতীক জন্মগ্রহণ করেছেন, এ কি কম কথা!

আমার আসল কথাটা ছেড়ে চলে এসেছি।

শেলি ছিলেন একজন সত্যি করে ভালোবাসবার মতো লোক। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন উৎসাহ-উদ্যমে ভরপুর। প্রত্যেক স্থানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত যোদ্ধা। 'নাস্তিকতার প্রয়োজন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তাঁকে অক্সফোর্ডের কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি (এবং কীট্‌সও) তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনটি কাটিয়ে গেছেন, ঠিক কবির জীবন যেমনটি হওয়া উচিত বলে লোকের ধারণা তেমনিভাবে—কল্পনার রাজ্যে, হাওয়ায় পাখা মেলে, বাস্তব পৃথিবীর বাধাবিঘ্নকে গ্রাহ্যমাত্র না করে। কীট্‌সের মৃত্যুর এক বছর পরে ইতালির উপকূলে জলে ডুবে শেলির মৃত্যু হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলোর নাম তোমাকে শোনাবার দরকার নেই, তুমি নিজেই অনায়াসে সে জেনে নিতে পারবে। কিন্তু তাঁর একটি ছোটো কবিতা আমি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাঁর খুব ভালো রচনা যেগুলি তার মধ্যে অবশ্য এটি পড়ে না। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান সভ্যতার আমলে দরিদ্র শ্রমিকের কী নিদারুণ দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছে তার একটি সুন্দর বর্ণনা এই কবিতাটিতে আছে। আগের দিনের ক্রীতদাসের চেয়ে তার অবস্থা মোটেই কম খারাপ নয়। কবিতাটি যে দিন লেখা হয়েছিল তার পর এক শো বছরেরও বেশি দিন চলে গেছে; কিন্তু বর্তমান কালের অবস্থার সঙ্গেও এর কথা বেশ মিলে যায়। কবিতাটির নাম হচ্ছে 'অরাজকতার মুখোশ' :

স্বাধীনতা কাকে বলে?—তোমরা তো শুধু জানো,
দাসত্ব যার নাম, তারেই কেবল মানো।
তার নাম হয়ে গেছে, বহু অভ্যাসে জানি,
তোমারই নামের ছায়া, তাহারই প্রতিধ্বনি।
তার মানে সারাদিন খেটে যাওয়া আর পাওয়া
যেটুকু বেতনে চলে পেটেভাতে দুটি খাওয়া,
কোনোমতে দেহ নিয়ে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা
মনিবের প্রয়োজনে প্রাণটুকু ধরে রাখা।
তাহাদের প্রয়োজনে তুমি হও সকলই—
তাঁত বা লাঙল হও, তরবারি, কোদালি;
তোমাদের সম্মতি কে পুছে আছে বা নাই—
তাদের রক্ষা আর বিলাস তো মেটা চাই!
তোমাদের শিশুগুলি অনাহারে হীনবল,
তাহাদের মায়েদের পেটে জ্বালা, চোখে জল,

অনাবৃত দেহে যবে শীত আসে নামিয়া,
যায় ক্ষীণ হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া।
তোমরা ক্ষুধায় মরো, লোভে ভরা চক্ষে
দেখো সেই খাদ্যেরে, বিলাসীর কক্ষে,
ধনী যারে হেলাভরে দেয় নিত্য ছুঁড়ে
তাহার আদরে-পোষা স্ফীতকায় কুকুরে।
তোমাদের অন্তরও দাসত্বে বাঁধা ভাই,
নিজের ইচ্ছা সেও তোমার অধীন নাই,
তোমার জীবনধারা তাই হয়ে রয়েছে
অন্যেরা তোমাদের যেমনটি গড়েছে।
অভিযোগ কোনোদিন কর যদি তার পর
দুর্বল ক্ষীণ দেহ, অশ্রুত ক্ষীণ স্বর—
অমনি ছুটিয়া আসে মনিবের অনুচর,
পীড়ন তোমার 'পরে, তোমার নারীর পর—
শিশিরের মতো ঘাসে জমে রুধিরের সর!

বায়রনও স্বাধীনতার স্তুতি গান করে অনেক সুন্দর কবিতা লিখেছেন; কিন্তু তাঁর সে স্বাধীনতা হচ্ছে জাতির স্বাধীনতা, শেলির মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়। বায়রন মারা যান তুর্কির বিরুদ্ধে গ্রীকদের স্বাধীনতা-সমরে যুদ্ধ করে, শেলির মৃত্যুর দুই বছর পরে। মানুষ হিসাবে বায়রনের উপরে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তবু তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে একটা সহানুভূতি আছে। তিনি ছিলেন হ্যারো স্কুল এবং কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র। আমিও এই স্কুলে আর কলেজে পড়েছি। বায়রন কিন্তু প্রথম বয়স থেকেই কবি বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, কীট্‌স্‌ আর শেলির সে ভাগ্য হয় নি। লণ্ডনের পাঠকসমাজ তাঁকে একেবারে মাথায় করে তুলেছিল, তার পর আবার ধপাস্‌ করে ধুলোয় আছড়ে ফেলে দিয়েছিল।

এই সময় আরও দুজন নাম-করা কবির আবির্ভাব হয়, এঁরা দুজনেই এই তিন যুবক-কবির চেয়ে অনেক দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ১৭৭০ থেকে ১৮৫০ সন, আশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁকে একজন বলে ধরা হয়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, তাঁর কবিতারও অনেকখানিই প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা। এঁদের অন্যজন হচ্ছেন কোল্‌রিজ; তাঁর কয়েকটি কবিতা খুবই ভালো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকেরও জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন ওয়াল্‌টার স্কট; তাঁর ওয়েভার্লি উপন্যাসগুলো লোকেরা খুব আগ্রহ করে পড়ত। তুমিও বোধ হয় তাঁর কিছু কিছু পড়েছ। আমার মনে আছে, ছোটো ছেলে যখন ছিলাম তখন আমারও সেগুলো পড়তে বেশ লাগত। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পছন্দও বদলায়; এখন পড়লে সেগুলো নিশ্চয়ই আমার ভালো লাগবে না। অন্য দুজন ঔপন্যাসিকের নাম হচ্ছে থ্যাকারে আর ডিকেন্স। আমার মতে এঁরা দুজনেই স্কটের চেয়ে অনেক ভালো লিখতেন। তোমারও এঁদের লেখা ভালো লাগে আশা করি। থ্যাকারে ১৮১১ সনে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সেখানেই কেটেছিল। তাঁর কয়েকখানা বইয়ে ভারতীয় 'নবাব'দের খুব চমৎকার বর্ণনা আছে—নবাব মানে হচ্ছে, ভারতবর্ষে যে ইংরেজরা এসে বিপুল ধনসম্পত্তি অর্জন করে মোটা আর বদমেজাজি হয়ে উঠত, তার পর ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে বড়োমানুষি করে দিন কাটাত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের সম্বন্ধে এর বেশি কথা আমি বলব না। খুব বড়ো একটা বিষয় সম্বন্ধে এ খুব অল্প একটুখানি বলা, এই বিষয়টি সম্বন্ধে যাঁর জানাশোনা আছে এমন কেউ হলে হয়তো এ নিয়ে বেশ সুন্দর ক'রে গুছিয়ে লিখতে

পারতেন; তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে এই যুগের সংগীত এবং শিল্পকলার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলতেন। কিন্তু সে করতে হলে জানাও চাই বলতে পারাও চাই; সেটা আমার বিদ্যার বাইরে, কাজেই আমি বুদ্ধিমানের মতো চুপ করে গেলাম, অজানা জায়গায় পা বাড়ালাম না।

গ্যেটের ফাউস্ট্ থেকে একটি কবিতা উদ্ধৃত করে দিয়ে আমি এই চিঠি শেষ করছি। এটা অবশ্য তাঁর জর্মন থেকে অনুবাদ করা :

হায়, হায়—
পৃথিবীকে আঘাত হেনেছ তুমি,
তুমি তাকে দিয়েছ ধুলোয় লুটিয়ে,
বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত করে,
অনস্তিত্বের অতলে ফেলেছে তাকে ছুঁড়ে—
দেবকল্পের আঘাতে সে চূর্ণীকৃত!
আমরা সেইগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যাই
পৃথিবী ভাঙা খোলামকুচিগুলোকে,
আমরা গাই তার বিদায়-সংগীত
যে মাধুরী গেল অন্তর্হিত হয়ে
যে সৌন্দর্য গেল মৃত্যুর মাঝে তলিয়ে!
আবার তুমি গড়ে তোলো তাকে
হে পৃথিবীর বিরাট সন্তান,
আবার গড়ে তোলো পৃথিবীকে,
গড়ো তাকে আরও মহত্তর করে
তোমার নিজের বুকের আশ্রয়ে, আরও উচ্চতর পাদপীঠে!
আবার তোমার জীবনযাত্রা শুরু করো,
আবার ছুটে চলো তোমার পথ বেয়ে।
আরও উচ্চ, আরও স্পষ্ট স্বরে
আরও সুন্দরতর সুরে
আবার বাজাও তোমার বাঁশি
যেমনটি কেউ কখনও শোনে নি!

১৩০

ডার্উইন : বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

কবিদের ছেড়ে এবার বৈজ্ঞানিকদের কথা বলা যাক। কবিদের আজকাল লোকে মনে করে—অকেজো জীব; এখনকার যুগে বৈজ্ঞানিকরা হচ্ছেন আশ্চর্য জাদুবিদ্যার ওস্তাদ, তাঁরাই পাচ্ছেন যত প্রতিপত্তি আর সম্মান। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কিন্তু এমন ছিল না। এর আগের যুগে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক হওয়ার মানেই ছিল বিপদকে ডেকে আনা; অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিকরা জল্লাদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! গিওর্দানো ব্রুনোকে রোমের পাদ্রিরা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল, সে গল্প তোমাকে বলেছি। এর কয়েক বছর পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও জল্লাদের হাতে মরতে মরতে কোনোক্রমে বেঁচে যান; তাঁর অপরাধ, তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে। এইসমস্ত উক্তি প্রত্যাহার করলেন এবং পাদ্রিদের কাছে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা-

প্রার্থনা করলেন বলেই তাঁর প্রাণ বাঁচল, নইলে তাঁকেও ধর্মের অবমাননা করার দায়ে আগুনে পুড়ে মরতে হত। এমনি করে ইউরোপে পাদ্রিসাহেবরা সারাক্ষণ বৈজ্ঞানিকদের সংগে খিটিমিটি বাধাত এবং সমস্ত নূতন মতামত আর আবিষ্কারকে দমবন্ধ করে মারত। ইউরোপেই হোক আর অন্যত্রই হোক, সংঘবদ্ধ ধর্মমতের মধ্যে সর্বত্রই নানা রকমের অন্ধ ধারণা জড়িয়ে থাকে; ধরে নেওয়া হয় যে সেই ধর্মের সেবকরা এইগুলোকে বিনা সংশয়ে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে চলবে। বিজ্ঞান সমস্ত জিনিষকে বিচার করে দেখতে চায় এর ঠিক উল্টো রকমে। কোনো কিছুকেই সে স্বতঃসিদ্ধ বলে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে রাজি হয় না; তার কোনো অন্ধ সংস্কার নেই, থাকা উচিতও নয়। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে চলবার পক্ষপাতী; বারবার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হবে, এই তার লক্ষ্য। ধর্ম যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে তার সংগে এর একেবারে আকাশপাতাল তফাত, কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাতও লেগেই ছিল।

অবশ্য সমস্ত যুগেই নানা জনে নানা রকমের পরীক্ষা করে দেখেছে। প্রাচীন ভারতে রসায়নশাস্ত্র আর অস্ত্রচিকিৎসার খুব উন্নতি হয়েছিল বলে শোনা যায়; হাতে-কলমে প্রচুর-পরিমাণ পরীক্ষার ফলেই শুধু এটা হওয়া সম্ভব। প্রাচীন কালের গ্রীকরাও কিছু কিছু পরীক্ষা আর গবেষণা চালাতেন। আর চীনের কথা যদি বল, সম্প্রতি আমি একটি আশ্চর্য প্রবন্ধ পড়ছিলাম, তাতে দেড় হাজার বছর আগেকার চীনা লেখকদের রচনা থেকে অনেকগুলো জায়গা উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে, তখনকার চীনারা বিবর্তনবাদ এবং দেহের মধ্যে রক্তস্রোতের আবর্তনের কথা জানত। তখনকার চীনা অস্ত্রচিকিৎসকেরা রোগীকে অচেতন করে নিতেন। কিন্তু তবুও সেই প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে আমরা এমন বেশি কিছু জানি নে যার থেকে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত খাড়া করা সম্ভব হয়। সেই প্রাচীন সভ্যতার যুগে মানুষ যদি এইসমস্ত প্রণালী আবিষ্কার করেই থাকে, তবে পরে আবার তারা সেগুলোকে ভুলে গেল কেন? এর থেকেই আরও বৃহত্তর আবিষ্কার করে করে কেন এগিয়ে চলল না? অথবা এই কি তার কারণ যে, এই ধরনের প্রগতিকে তারা বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করত না? এমনি ধারা নানা রকমের প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে, তার জবাব ভেবে বার করবার মতো তত্ত্ব আমাদের জানা নেই।

আরবরাও এইসব গবেষণার খুব ভক্ত ছিল; মধ্যযুগের ইউরোপ তাদেরই অনুসরণ করেছে। কিন্তু এদের সমস্ত গবেষণাকে ঠিক বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। এরা সারাক্ষণই খুঁজে বেড়াত 'পরশমণি', এদের ধারণা ছিল তার স্পর্শে সাধারণ ধাতু সোনা হয়ে যায়। ধাতুকে পরিবর্তন করার এই গোপন রহস্য আবিষ্কার করবার আশায় বহু লোক নানাবিধ জটিল রাসায়নিক পরীক্ষা করে করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে; এই বিদ্যাকে তারা বলত আল্‌কেমি। আরও একটি বস্তু আবিষ্কারের জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, সেটি হচ্ছে 'জীবন-রসায়ন' বা অমৃত, তা খেলে অমর হওয়া যায়। এই অমৃত বা পরশমণি কেউ কখনও খুঁজে পেয়েছে, এমন কাহিনী কোথাও পাওয়া যায় না, একমাত্র রূপকথার গল্পে ছাড়া। আসলে এর সমস্তটাই ছিল অর্থ শক্তি আর দীর্ঘ আয়ু লাভের আশায় নানারকমের বুজরুকি আর ভেল্‌কির চর্চা। সত্যকার বিজ্ঞানের সংগে এর কোনো সম্পর্কই ছিল না। জাদুবিদ্যা ভোজবাজি প্রভৃতির সংগে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

তবুও ইউরোপে সত্যকার বিজ্ঞানের চর্চা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে-কটি মানুষের নাম সবচেয়ে বড়ো হয়ে রয়েছে তাদের একজন হচ্ছেন ইংরেজ, আইজাক নিউটন—১৬৪২ থেকে ১৭২৭ সন পর্যন্ত ইনি বেঁচে ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ, মানে জিনিস কেন পড়ে যায় এই তত্ত্বটি তিনি আবিষ্কার করেন; এই সূত্রটি এবং এর আগেকার আবিষ্কৃত আর কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে তিনি সূর্য এবং গ্রহনক্ষত্রদের গতিবিধির একটা ব্যাখ্যা রচনা করেন। দেখা গেল, পৃথিবীর ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারই তাঁর আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের সংগে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। নিউটন একটা বিরাট সম্মান আর প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

ধর্মপ্রসূত গোঁড়ামির উপরে বিজ্ঞানের বুদ্ধি ক্রমে জয়লাভ করতে লাগল। বিজ্ঞানকে তখন আর জোর করে দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তার সেবকদের দেওয়া চলছে না মৃত্যুদণ্ড। বহু

বৈজ্ঞানিক বিপুল অধ্যবসায় নিয়ে গবেষণা আর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন, তত্ত্ব আর জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন। বিশেষ করে এদের কর্মক্ষেত্র ছিল ইংলণ্ড আর ফ্রান্স; তার পরে হল জর্মানি আর আমেরিকা। এইভাবে বৈজ্ঞানিক বিদ্যা আর জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীটিই ছিল শিক্ষিত-শ্রেণীদের মধ্যে যুক্তিবাদ-বিস্তারের যুগ। এই শতাব্দীতেই জন্মেছিলেন ভল্‌টেয়ার, রুশো এবং ফ্রান্সের আরও বহু বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি। সমস্ত প্রকারের বিষয় নিয়েই এ'রা পুঁথিপত্র রচনা করলেন, মানুষের মনে নূতন একটা অশান্ত উন্মাদনা এনে দিলেন। এই শতাব্দীটির গর্ভেই বিখ্যাত ফরাসি-বিপ্লবের বীজ গোপনে পরিপুষ্ট হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এ'দের এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো অসামঞ্জস্য ছিল না; বরং একটা জায়গাতে এই দুয়ের মধ্যে চমৎকার মিল দেখা গেল, এই দুই পক্ষই ধর্মধ্বজীদের গোঁড়ামির সমান বিরোধী ছিলেন।

তোমাকে বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীটা ছিল আরও নানা জিনিষের মতো বিজ্ঞানেরও চর্চার যুগ। শিল্পবিপ্লব, যন্ত্রবিপ্লব এবং যানবাহনের প্রণালীতে যত আশ্চর্য পরিবর্তন, সমস্তই সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানের প্রসাদে। অসংখ্য কারখানা তৈরি হবার ফলে পণ্য-উৎপাদনের প্রণালীটাই বদলে গেল; রেলগাড়ি আর বাষ্পের জাহাজ পৃথিবীর আয়তনটাকে হঠাৎ ছোটো করে ফেলল; এবং এর চাইতেও বড়ো বিস্ময়কর বস্তু হল বিদ্যুৎচালিত টেলিগ্রাফ। ইংলণ্ডের বহুদূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্বত্র থেকে ধনসম্পদের স্রোত চলে আসতে লাগল। এর ফলে স্বভাবতই মানুষের প্রাচীন কালের সব মতামতের দারুণ পরিবর্তন হয়ে গেল; মানুষের উপরে ধর্মের প্রভাবটাও কমে গেল। জমিকে আশ্রয় করে মানুষ কৃষিকর্মে জীবিকা অর্জন করত, তার বদলে এল কারখানার জীবন; সে জীবন তাকে অনেক বেশি করে বুঝিয়ে দিল, মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কটাই হচ্ছে বড়ো কথা, ধর্মের গোঁড়ামির স্থান মানুষের জীবনে বড়ো নয়।

এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, ১৮৫৯ সনে, ইংলণ্ডে একটি বই প্রকাশিত হয়; এই বইকে উপলক্ষ করে গোঁড়ার দল আর বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে সংঘর্ষটা একেবারে চরমে উঠে গেল। এই বইটি চার্লস্ ডার্‌উইনের লেখা,—'ওরিজিন অব স্পেসিজ' বা 'জীবজাতির উৎপত্তি'। পৃথিবীর খুব বড়ো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ডার্‌উইনের নাম পড়ে না, তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে নূতনত্ব তেমন-কিছু ছিল না। ডার্‌উইনের আগেও অন্যান্য বহু ভূতত্ত্ববিদ এবং প্রকৃতিতত্ত্ববিদ গবেষণা করেছেন, অনেক তথ্য আহরণ করেছেন। তবুও কিন্তু ডার্‌উইনের বইটি একেবারে একটা নূতন যুগের প্রবর্তন করল। সে বই পড়ে সমস্ত মানুষ মোহিত হয়ে গেল, সামাজিক জীবন সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেও এই বইটি এমন করে বদলে দিল যে, অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক তেমন পারে নি। পৃথিবী জুড়ে মানুষের মনে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টি করল বইখানি। ডার্‌উইনেরও নাম প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

প্রকৃতিতত্ত্ববিদ হিসাবে ডার্‌উইন দক্ষিণ-আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন; তথ্য এবং প্রমাণও অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। সেই তথ্য-প্রমাণের জোরে তিনি দেখিয়ে দিলেন, কীরকম করে স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের ভিতর দিয়ে প্রত্যেক জাতের জীবজন্তু বদলে বদলে পরিণত রূপ ধারণ করেছে। তার আগে পর্যন্ত অনেক লোকেরই ধারণা ছিল, প্রত্যেক প্রকারের জীবজন্তুকে এবং মানুষকেও, পৃথক ভাবেই ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন; সেই থেকেই এরা প্রত্যেকে পরস্পর থেকে পৃথক এবং অপরিবর্তনীয় রূপ নিয়ে টি'কে রয়েছে; তার মানে এক জাতের জীবের কিছুতেই অন্য জাতের জীবে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। ডার্‌উইন একেবারে রাশিকৃত বাস্তব উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন, এক জাতের জীব সত্যিই অন্য জাতের জীবে রূপান্তরিত হতে পারে, এবং এইটেই হচ্ছে রূপ-পরিণতির স্বাভাবিক পন্থা। এই পরিবর্তন আসে স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের ফলে। কোনো-একটি জাতের জীবের মধ্যে সামান্য একটু বৈচিত্র্যের ফল দেখা গেল, এতে তাদের কোনোরকমে সুবিধা হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য জাতের তুলনায় টি'কে থাকবার শক্তি বেড়ে যাচ্ছে; তখন ক্রমে সেই বৈচিত্র্যটিই তাদের স্থায়ী অঙ্গ দাঁড়িয়ে যাবে, কারণ জীবনসংগ্রামে এই বৈচিত্র্যওয়ালা জীবগুলোই বেশি পরিমাণ টি'কে থাকবে।

এমনি করে কিছুদিন পরে দেখা যাবে, এই বৈচিত্র্যওয়ালা জীবরাই সংখ্যায় বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদের চাপে পড়ে অন্যগুলো একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এমনি করে একটির পর একটি বৈচিত্র্য আর পরিবর্তন জীবের মধ্যে আসতে থাকে, কিছুদিন পরে এইভাবে প্রায় পুরোপুরি নূতন একটি জাতেরই সৃষ্টি হয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের ফলে, যে যোগ্যতম হয়ে উঠল জীবনযুদ্ধে অন্যদের হারিয়ে সেই টিঁকে থাকবে; এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এইভাবে বহু নূতন জাতি কালক্রমে গজিয়ে ওঠে। গাছপালা, জীবজন্তু এমনকি মানুষের সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। এই মতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন, আজকার দিনে যত বিভিন্ন রকমের গাছপালা আর জীবজন্তু দেখা যাচ্ছে তারা সকলেই মূলত একটি মাত্র পূর্বপুরুষের বংশধর, এমন হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

এর কয়েক বছর পরে ডারউইন আর-একটা বই বার করলেন, তার নাম—'দি ডিসেণ্ট্ অব ম্যান'—'মানুষের জন্মকথা'। এই বইয়ে তিনি তাঁর মতটি মানুষের সম্বন্ধে প্রয়োগ করে দেখালেন। বিবর্তন এবং স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের এই সত্য এখন প্রায় সকল মানুষই মেনে নিয়েছে, যদিও ডারউইন এবং তাঁর শিষ্যরা যে ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন ঠিক সেই আকারে নয়। বস্তুত লোকেরা কৃত্রিম উপায়ে পশুপক্ষীর প্রজনন, গাছপালার ফলফুলের চাষ করতে গিয়ে এই নির্বাচনের নীতিটিকে কাজে লাগাচ্ছে। এটা আজকাল হামেশাই দেখা যায়। আজকাল খুব বাছাই-করা জীবজন্তু এবং গাছপালা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি তার অনেকগুলোই হচ্ছে নূতন রকমের জাত, কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা। মানুষ যদি অল্প সময়ের মধ্যে এই রকমের পরিবর্তন ঘটাতে, নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি করতে পেরে থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ধ'রে এই ভাবে চেষ্টা করে প্রকৃতি নানা আশ্চর্য ফল সৃষ্টি করবে এতে বিস্ময়ের কী আছে! লণ্ডনের সাউথ-কেন্‌সিংটন মিউজিয়মের মতো যে-কোনো একটা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জাদুঘরে যদি যাও, দেখবে কীরকম করে গাছপালা আর জীবজন্তুরা ক্রমাগত বদলে বদলে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

আমরা এখন এই কথা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমাদের কাছে এটা খুবই সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু সত্তর বছর আগে এটা এত সহজ মনে হত না। তখনও ইউরোপে বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করত বাইবেলের উপাখ্যান—খৃষ্টের জন্মের ঠিক ৪০০৪ বছর আগে জগৎ সৃষ্টি করা হয়, প্রত্যেকটি গাছপালা এবং জীবজন্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন এবং সকলের শেষে সৃষ্টি করেছিলেন মানুষকে। তারা বিশ্বাস করত, পৃথিবীতে বিরাট একটা জলপ্লাবন হয়েছিল, সে সময়ে নোয়া তাঁর জাহাজে করে প্রত্যেক জীবের একটি করে জোড়া বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যেন কোনো জাতের জীবই প্লাবনে একেবারে লুপ্ত হয়ে না যায়। এর কোনো গল্পই ডারউইনের মতবাদের সঙ্গে মিলল না। ডারউইন এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বললেন, পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর, মাত্র ছ হাজার বছর নয়। অতএব সমস্ত নরনারীর মনে বিষম ধাঁধা লেগে গেল; অনেকেই ভেবে পেলেন না কী এখন করা যায়। তাঁদের প্রাচীন ধর্মমত তাঁদের বলছে এক কথা বিশ্বাস করতে, যুক্তি বলছে অন্য কথা। মানুষ যখন অন্ধের মতো কতকগুলো গোঁড়ামিকে বিশ্বাস করে বসে থাকে এবং সেই গোঁড়ামির গোড়ায় যখন নাড়া লাগে, তখন তারা একেবারেই অসহায় বিপন্ন হয়ে পড়ে, পায়ের তলায় আর ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্ত জমি খুঁজে পায় না। কিন্তু তবু যে ঝাঁকুনি আমাদের ঘুম ভেঙে দেয়, সত্যের সন্ধান এনে দেয়, সে আমাদের পক্ষে কল্যাণের বস্তু।

কাজেই ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য বহু স্থানে বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে দারুণ তর্কাতর্কি এবং দারুণ বিরোধ বেধে গেল। এই বিরোধের ফল কী হবে, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নূতন জগতের প্রধান বস্তু ছিল শিল্প আর যান্ত্রিক যানবাহন, এদের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান; অতএব বিজ্ঞানকে তখন বর্জন করা চলতেই পারে না। তাই এই বিরোধে সর্বত্রই বিজ্ঞানের জয় হল; 'স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচন' আর 'যোগ্যতমের টিঁকে থাকা' হয়ে উঠল সমস্ত লোকের কথাবার্তায় চলতি বুক্‌নি; মানে ভালো করে না বুঝেও কথা-

গুলোকে তারা খুব করে বলে বেড়াতে লাগল। 'ডিসেন্ট্ অব ম্যান' বইয়ে ডারউইন বলেছিলেন, মানুষ এবং বিশেষ কয়েকটি জাতের বাঁদর হয়তো একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। রূপ-পরিণতির বিভিন্ন স্তরকে প্রত্যক্ষ করে দেখাতে পারে, এমন কতকগুলো উদাহরণ দিয়ে এই কথাটাকে প্রমাণ করাও গেল না। লোকে তামাশা করে যে মিসিং লিঙ্ক্ বা লুপ্ত স্তরের কথা বলে, সে কথাটা এই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, শাসক-শ্রেণীর লোকেরা আবার ডারউইনের মতবাদটাকেই ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের কাজে লাগিয়ে নিল; জোর গলায় বলতে লাগল তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর-একটা নূতন প্রমাণ এই মতবাদ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার ব্যাপারে তারাই হচ্ছে যোগ্যতম ব্যক্তি; অতএব 'স্বাভাবিক অবস্থা নির্বাচন'এর দ্বারাই তারা মানুষ-জাতের একেবারে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে, শাসক-শ্রেণী হয়ে বসেছে। এই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হল, একটি শ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীর উপরে প্রভুত্ব করবে, একটি জাতি আর-একটি জাতিকে শাসন করবে, এইটেই হচ্ছে স্বাভাবিক এবং সংগত। সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃথিবীতে শ্বেতজাতিদের প্রভুত্বের স্বপক্ষেও এইটেই হয়ে উঠল একেবারে চরম যুক্তি! পাশ্চাত্য দেশের বহু লোক সত্যিই মনে করতে লাগল, অপরের উপরে তারা যত বেশি জবরদস্তি চালাবে, যত বেশি পরাক্রম এবং নির্মমতার পরিচয় দেবে, মনুষ্যজাতির মধ্যে তারা ততই উচ্চস্তরের বলে প্রমাণিত হবে। যুক্তিটা শুনতে ভালো নয়; কিন্তু এশিয়া আর আফ্রিকাতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা যে নৃশংস আচরণ দেখিয়েছে, তার অনেকখানি ব্যাখ্যা এর থেকে বোঝা যায়।

পরবর্তী কালে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা ডারউইনের মতবাদের অনেক দোষত্রুটি বার করে দেখিয়েছেন; তবু তাঁর মোটামুটি সিদ্ধান্তগুলো এখনও লোকে স্বীকার করছে। তাঁর মতবাদকে সমস্ত লোকেই স্বীকার করে নিয়েছিল, তার একটা ফল হচ্ছে, লোকে প্রগতির কথা বিশ্বাস করতে শিখেছে। এই প্রগতির মানে, সমস্ত জগৎটা, বা মানুষ এবং সমাজরা, ক্রমে ক্রমে একটা পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, ক্রমেই আরও উৎকৃষ্ট হয়ে উঠছে। প্রগতির এই ধারণাটা কেবল ডারউইনের মতবাদেরই ফল নয়। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা, এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে এবং তার পরেও পৃথিবীতে যত রকমের পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাই দেখেই মানুষ এর কথা ভাবতে শিখেছিল। ডারউইনের মতবাদ ব্যাপারটাকে আরও স্পষ্ট করে প্রমাণ করল; লোকেদের মনে ধারণা হল, তারা বীরের মতো পা ফেলে ফেলে একটির পর একটি যুদ্ধ জয় করে এগিয়ে চলেছে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের একেবারে চরম পরিণত রূপ, তার স্বরূপ যাই হোক। এটা লক্ষ করো, এই প্রগতির কল্পনাটা ছিল একটা একেবারেই নূতন ব্যাপার। পুরোনো দিনের ইউরোপে এশিয়াতে বা প্রাচীন যুগের অন্য কোনো সভ্যতার মধ্যে এ রকমের কোনো কল্পনা কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। ইউরোপে একেবারে শিল্পবিপ্লবের মুহূর্ত পর্যন্ত লোকেরা অতীতকেই তাদের আদর্শ যুগ বলে জানত। তাদের মতে গ্রীস আর রোমের প্রাচীন গৌরবের যুগটাই ছিল পরবর্তী সমস্ত কালের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত, সুসভ্য এবং সমৃদ্ধ যুগ। তাদের বিশ্বাস ছিল, মানুষজাতি ক্রমেই অবনতির দিকে, হীনতার পথে এগিয়ে চলেছে; অন্তত বলবার মতো কোনো বৃহৎ পরিবর্তন তার মধ্যে ঘটছে না।

ভারতবর্ষেও এই ক্রমান্বিত অবনতির একটা ধারণা লোকের মনে আছে; যে রামরাজত্বের দিন বহুকাল পার হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আমরা আজও বিলাপ করি। ভারতীয় পুরাণের উপাখ্যানে সময়ের হিসাব ধরা হয়েছে খুব দীর্ঘ দীর্ঘ সব যুগের মাপে, ঠিক ভূতত্ত্ববিদ্যার মতো। কিন্তু সে মাপের হিসাব সর্বদাই শুরু হচ্ছে অতীত কালের সেই মহান্ সত্যযুগকে দিয়ে; তার শেষ হচ্ছে এখনকার এই পাপে-ভরা দিনে এসে, এর নাম হচ্ছে কলিযুগ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানুষের ক্রমপ্রগতির ধারণাটাই হচ্ছে একটা একেবারে আধুনিক কালের বস্তু। অতীত কালের ইতিহাস যেটুকু আমরা জানি তা থেকেও আমাদের বিশ্বাস হয়, এই প্রগতির কথাটাই সত্য। অবশ্য আমাদের জ্ঞানের দৌড় এখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; হতে পারে হয়তো আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করলে তখন আমাদের এই মত বদলে যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 'প্রগতি' কথাটাকে নিয়ে মানুষ যতখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, আজকালই

আমরা ঠিক ততখানি উঠছি না। প্রগতির মানে যদি এই হয় যে, আমরা পরস্পরকে অতি ব্যাপকভাবে ধ্বংস করতে থাকব, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যেমন করা হল, তা হলে বলতে হবে, সেই প্রগতিরই মধ্যে কোথাও একটা বড়ো গলদ রয়ে গেছে। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে;- ডারউইন বলেছিলেন, "যোগ্যতম ব্যক্তিই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়ে টি'কে থাকবে"—কিন্তু যোগ্যতম মানেই গুণে সর্বোত্তমকে বোঝায় না, সে হয়তো টি'কতে নাও পারে। অবশ্য এ সমস্তই পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার। আমাদের পক্ষে লক্ষ করবার কথা হচ্ছে, সমাজের জীবন স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হয়ে রয়েছে, বা এমনকি ক্রমেই অবনতির পথে চলেছে, এই রকমের একটা ধারণা এতদিন সর্বত্র চলতি ছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞান এসে সে ধারণাটাকে ধাক্কা মেরে ভেঙে দিল; তার জায়গাতে এল নূতন ধারণা—সমাজের মধ্যে একটা প্রাণশক্তি আছে, পরিবর্তনের প্রবৃত্তি আছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এল প্রগতিরও ধারণা। আর বাস্তবিকই এই যুগটিতে সমাজের রূপ এতখানি বদলে গিয়েছিল যে, তাকে আর দেখে চেনা যায় না।

জীবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদের কথা তোমাকে বলছিলাম। আড়াই হাজার বছর আগে একজন চীনা দার্শনিক এবিষয়ে কী লিখে গিয়েছেন, শুনবে? এই লোকটির নাম ছিল সন্ সে; খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি এই কথা লিখেছিলেন, অর্থাৎ, প্রায় বুদ্ধের জীবনকালে—"একটিমাত্র জাতি থেকে সমস্তপ্রকার জীবের সৃষ্টি হয়েছে। সেই একটি জাতি ক্রমান্বয়ে এবং ক্রমাগত নানা রকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে; এবং তারই ফলে হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত জীবদেহের সৃষ্টি। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জীব একেবারেই পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় নি; বরং এদের পার্থক্যের লক্ষণগুলো এরা অর্জন করেছে অতি ক্রমান্বিত পরিবর্তনের ফলে বহু পুরুষ ধরে।" কথাগুলো ডারউইনের মতবাদের অত্যন্ত কাছাকাছি। আর এ কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে, চীনের এই প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদ্ কী করে এই সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে আবার নূতন করে আবিষ্কার করতে পৃথিবীর মানুষের পাক্কা আড়াইটি হাজার বছর লেগে গেল!

ঊনবিংশ শতাব্দী যত শেষের দিকে এগোতে লাগল, পরিবর্তনের গতিবেগও ততই ক্রমে বেড়ে চলল। বিজ্ঞান একটার পর একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি করে চলল; নিত্য নূতন আবিষ্কারের একটা অফুরন্ত মিছিল মানুষের চোখে একেবারে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। এর অনেক আবিষ্কার মানুষের জীবনে বিরাট এক-একটা পরিবর্তন এনে দিল, যেমন—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মোটরগাড়ি, এবং তার পর এরোপ্লেন। বিজ্ঞানের সাহস বাড়তে লাগল, সে আকাশের দূরতম কোণ পর্যন্ত মেপে আনতে চায়, অদৃশ্য পরমাণুকে আর তার মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রতর উপকরণের হিসাব কষে বার করে। মানুষের শ্রমের কঠোরতা কমিয়ে দিল সে; লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেল। বিজ্ঞানের কল্যাণেই পৃথিবীর জনসংখ্যা, বিশেষ করে শিল্পপ্রধান দেশগুলির জনসংখ্যা বিপুল-পরিমাণে বেড়ে গেল। এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার ধ্বংসেরও অত্যন্ত নিখুঁত সব ব্যবস্থা বিজ্ঞান আবিষ্কার করে ফেলল। সেটা কিন্তু আসলে বিজ্ঞানের অপরাধ নয়। বিজ্ঞানের কাজ হল, প্রকৃতির উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা। মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল, অথচ শিখল না তার নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে। কাজেই সে ফাঁক পেলেই অন্যায় পথে চলতে লাগল, বিজ্ঞানের দানগুলোর অপব্যবহার করতে লাগল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কিন্তু অব্যাহত গতিতেই এগিয়ে চলল; দেড় শো বছরের মধ্যে পৃথিবীতে এতখানি পরিবর্তন সে এনে দিল যে, তার আগের বহু হাজার বছরেও তা সম্ভব হয় নি। বস্তুত জীবনের প্রত্যেকটি দিকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে বিজ্ঞান একেবারে বিরাট বিপ্লব এনে দিয়েছে, পৃথিবীর চেহারাই দিয়েছে বদলে।

বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা আজও শেষ হয় নি, বরং তার গতির বেগ যেন দিন দিন আরও বেড়েই চলেছে। সে গতির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। একটা রেলওয়ে তৈরি করা হল। ঠিকঠাক হয়ে যখন তার কাজ শুরু করা হবে, দেখা গেল, ইতিমধ্যেই সেটা সেকেলে, বাতিল হয়ে গেছে! একটা কল নিলাম, তোড়জোড় করে চালাতে শুরু করলাম; এক বছর কি দু বছর না যেতেই দেখি,

তার চেয়ে অনেক ভালো অনেক বেশি কাজের কল তৈরি হয়ে গেছে। এমনি করে এই আবিষ্কারের পাল্লা উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। এখন এই আমাদেরই যুগে বাষ্পের জায়গা এসে দখল করছে বিদ্যুৎ; তার ফলে এমন একটা বিরাট বিপ্লবের সূচনা হয়েছে যে তার গুরুত্ব দেড় শো বছর আগেকার সেই শিল্পবিপ্লবের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

বিজ্ঞানের অসংখ্য রাজপথ, অসংখ্য গলিপথ; সেই পথে পথে অসংখ্য পরিমাণ বৈজ্ঞানিক আর বিশেষজ্ঞের দল তাঁদের নানাবিধ কাজ নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন। এখনকার দিনে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিরাট ব্যক্তিটির নাম হচ্ছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন; নিউটনের বিখ্যাত মতবাদেরও খানিকটা সংশোধন ইনি বার করেছেন।

আধুনিক কালের মধ্যেই বিজ্ঞানের বিপুল-পরিমাণ উন্নতি হয়েছে; বৈজ্ঞানিক সব মতবাদের এতখানি পরিবর্তন আর পরিবর্ধন হয়ে যাচ্ছে যে, দেখেশুনে বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই হতভম্ব হয়ে গেছেন। প্রাচীন কালে যে আত্মতৃপ্তি আর নিশ্চয়তার গর্ব তাঁদের ছিল তার কিছুই আর তাঁদের অবশিষ্ট নেই। এখন তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা সম্বন্ধেই দ্বিধাগ্রস্ত; নিজেদের উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধেই এখন তাঁদের মনে সংশয় জেগেছে।

কিন্তু সেটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কথা, আমাদের এই কালের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তখনও মানুষের মনে পূর্ণ আশ্বাস ছিল; অসংখ্য সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে বিজ্ঞান তখন জোর করেই মানুষের উপরে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করছিল; মানুষও কায়মনে তার সামনে নিজেকে অবনত করে দিচ্ছিল, ঠিক যেমন করে সে তার দেবতাকে প্রণাম করে।

১৩১

গণতন্ত্রের অগ্রগতি

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কীরকম উন্নতি হয়েছিল তার একটু আভাস আমি গত চিঠিতে দিতে চেষ্টা করেছি। এবার দেখব এই শতাব্দীর আর একটি দিকের ইতিহাস—গণ-তান্ত্রিক মতবাদের অভ্যুত্থান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে নানা মতবাদের মধ্যে একটা জোর লড়াই চলেছিল, এর কথা তোমাকে আমি বলেছি। সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর এবং লেখক ভলটেয়ার এবং আরও অনেক ফরাসি মনীষী তখন ধর্ম এবং সমাজের বহু প্রাচীন ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কোনো কিছুকে ভয় না করে নূতন নূতন সব মতবাদ প্রচার করছিলেন। সে সময়ে এই ধরনের রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ প্রধানত ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র এর তেমন চর্চা হয় নি। জর্মনিতে ছিলেন দার্শনিকরা, তাঁরা দর্শনশাস্ত্রের জটিলতর তত্ত্বের আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ইংলণ্ডে ব্যবসাবাণিজ্য বেড়ে চলছিল, সেখানে লোকেরা চিন্তা করতে ভালোবাসত না, নেহাত যদি অবস্থার ফেরে পড়ে করতে হয় সে আলাদা কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিন্তু ইংলণ্ডে একটি খুব উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হল। এটি হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথের লেখা,—'ওয়েল্থ্ অব্ নেশন্স্'। এটা ঠিক রাজনীতির বই নয়, অর্থনীতির বই। তখনকার দিনের অন্য সমস্ত বিষয়ের মতোই এই বিদ্যাটাও ধর্ম আর নীতি -শাস্ত্রের সঙ্গে খিচুড়ি পাকিয়ে ছিল, ফলে এর সম্বন্ধে মানুষের মনে রাশিকৃত খট্কাও লেগেই থাকত। অ্যাডাম স্মিথ পুরোদস্তুর বৈজ্ঞানিকের ঢঙে এর ব্যাখ্যা দিলেন, এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রের অনাবশ্যক বাহুল্যকে বর্জন করে, অর্থনৈতিক জীবন যার জোরে চলে সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মগুলোকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলেন। অর্থনীতির নাম তুমি বোধ হয় জান, দেশের প্রজার বা সমস্ত দেশটারই আয়

আর ব্যয়ের বিলিব্যবস্থা, তার প্রজারা কী কী বস্তু তৈরি করছে, কী কী বস্তু ভোগ করছে, পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য দেশের ও জাতির সঙ্গে তাদের কী রকম সম্পর্ক, এইসব কথা নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়। অ্যাডাম স্মিথের ধারণা হল, এইসমস্ত জটিল ব্যাপারই চলছে কতকগুলো ধরাবাঁধা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে; এই কথাই তাঁর বইয়ে তিনি লিখলেন। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল, শিল্পের পূর্ণ পরিণতি যদি চাই তবে মানুষকে কাজকর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, যেন এইসব নিয়ম কোথাও বাধা না পায়। 'লেইজে ফেয়ার্' বা 'স্বাধীন জীবিকা' মতবাদের এইখানেই শুরু হল; এঁর কথা আমি আগেই তোমাকে খানিকটা বলেছি। ফ্রান্সে এই সময়টাতে গণতন্ত্রের নূতন সব মতামত গজিয়ে উঠছে; তার কোনো আলোচনা অ্যাডাম স্মিথের বইয়ে ছিল না। কিন্তু মানুষ এবং জাতির জীবনের একটি অত্যন্ত জরুরি সমস্যাকে নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করলেন, এই থেকেই বোঝা যায়, এর আগে যেমন সমস্ত-কিছুকেই ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা হত, সে পথ ছেড়ে দিয়ে মানুষ নূতন পথে চলতে চাইছে। অ্যাডাম স্মিথকে বলা হয় অর্থনীতি-বিজ্ঞানের স্রষ্টা; উনবিংশ শতাব্দীর বহু ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ই তাঁর কাছে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন।

অর্থনীতির এই নূতন বিজ্ঞানের চর্চা কেবল অধ্যাপকদের আর অতি অল্প দু-চারজন সুশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ও দিকে তখন গণতন্ত্রের সব নবীন মতামত ছড়িয়ে পড়ছে; আমেরিকা আর ফ্রান্সের বিপ্লব তার জোর আর খ্যাতি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল। আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' এবং ফ্রান্সের 'প্রজার অধিকারের ঘোষণাপত্র' যে ভাষায় রচিত হল তার ধ্বনি এবং বাক্যসৌষ্ঠব মানুষের মনের একেবারে তলায় পর্যন্ত গিয়ে নাড়া লাগাল। লক্ষ লক্ষ মানুষ এতদিন শুধু পীড়ন আর শোষণই সয়ে এসেছে; এই ঘোষণা-পত্রের ভাষা শুনে তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তাদের মুক্তির বার্তা বহন করে এনেছে তারা! এই দুইটি ঘোষণাপত্রেই উচ্চারিত হয়েছিল স্বাধীনতার বাণী, সাম্যের বাণী, এবং সুখভোগের যে অধিকার সমস্ত মানুষেরই রয়েছে তার বাণী। অবশ্য এই মহার্ঘ অধিকারগুলির নাম তখন সদর্পে ঘোষণা করা হয়েছিল ব'লেই সে অধিকার সমস্ত মানুষের করায়ত্ত হয় নি। সে ঘোষণাপত্র প্রচার করবার পর দেড় শো বছর কেটে গেছে, তবু আজও অতি অল্পসংখ্যক মানুষই সে অধিকার অর্জন করেছে, তবু সেই নীতিটা যে স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হল এইটেই ছিল একটা আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষের দেহে নবীন প্রাণের সঞ্চার করল সে ঘোষণা।

অন্যান্য সমস্ত দেশের মতো ইউরোপেও, অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মতো খৃষ্টান ধর্মেও, মানুষের চিরদিন ধারণা ছিল, পাপ এবং দুঃখ মানুষের স্বাভাবিক এবং অলঙ্ঘ্য ললাটলিপি। ধর্মশাস্ত্রে বরং এই পার্থিব জীবনে দারিদ্র্য এবং দুঃখভোগকেই সনাতন এমনকি একটা লোভনীয় বস্তু বলে বর্ণনা করা হত। ধর্মশাস্ত্রে মানুষকে যে শান্তি আর পুরস্কারের আশ্বাস দেওয়া হত তার সমস্তই মিলবে অন্য কোনো পারলৌকিক জগতে। মানুষকে বোঝানো হত, এই জীবনে যে ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য দেখা গেল তাকে প্রসন্নমনে শুধু সহ্য করে যাও, বিরাট কোনো পরিবর্তন এতে আনবার চেষ্টা কোরো না। দান-দাক্ষিণ্যকে, দরিদ্রকে দু মুঠো খেতে দেওয়াকে, এরা প্রশংসা করত; কিন্তু দারিদ্র্যকে, বা যে সমাজব্যবস্থার ফলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে তাকে, বিলুপ্ত করে দেবার কোনো কথা কেউ বলত না। ধর্মমত এবং সমাজ যে কর্তৃত্বের দৃষ্টি নিয়ে সমাজব্যবস্থা চালাতেন তার কাছে স্বাধীনতা এবং সাম্যের নামটা পর্যন্ত ছিল অপরাধের শামিল।

সমস্ত মানুষই বস্তুত একেবারে সমান, এমন কথা অবশ্য গণতন্ত্রও বলত না, বলা সম্ভবও নয়। কারণ, এটা সহজেই বোঝা যায় যে, মানুষে মানুষে কিছু তফাত থাকবেই; দৈহিক শক্তির তফাতের ফলে একজন আর-একজনের চেয়ে বেশি বলবান হবে, মানসিক শক্তির তফাতের ফলে একজনের চেয়ে আর-একজন বেশি কর্মক্ষম বা বিচক্ষণ হবে; নৈতিক শক্তির তফাতের ফলে একজন স্বার্থপর হবে, একজন হবে না। এইসমস্ত অসাম্যের অনেকখানিই আসে লালনপালন এবং শিক্ষার তফাতের ফলে, বা শিক্ষার অভাবে—এটা হওয়া খুবই সম্ভব। দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ের বুদ্ধিবৃত্তি এক সমান; এক জনকে ভালো করে শিক্ষা দাও, এক জনকে দিয়ো না। কয়েক বছর পরে দেখবে দু জনের

মধ্যে অনেকখানি তফাত হয়ে গেছে; কিংবা এদের এক জনকে ভালো স্বাস্থ্যকর খাবার দাও, অন্য জনকে খারাপ এবং অপ্রচুর খাদ্য দিতে থাকো। প্রথম জন ঠিকমতো পরিপুষ্ট হবে, আর দ্বিতীয় জন হবে দুর্বল রুগ্ণ এবং অপরিপুষ্ট। এইভাবেই মানুষের পালন পরিবেশ এবং শিক্ষাদীক্ষার ফলে তার অনেকখানি তফাত এসে যায়; সকলকেই যদি ঠিক এক রকমের শিক্ষা আর সুযোগ আমরা দিতে পারতাম তবে হয়তো এখনকার তুলনায় মানুষে-মানুষে পার্থক্যও অনেক কম হত। এটা হওয়া অবশ্য খুবই সম্ভব। কিন্তু গণতন্ত্রের কথা যদি ধর, তাতে স্বীকার করা হল যে, বাস্তবিকই সকল মানুষ পরস্পর সমান নয়, অথচ এও আবার বলা হল যে, প্রত্যেক মানুষেরই রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ঠিক সমান মর্যাদা আছে বলে মেনে নিতে হবে। গণতন্ত্রের এই মতবাদকে যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে চাই তবে তার ফলে আমরা নানান রকমের সব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হব। এর সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই মতবাদটির একটি সহজ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শাসক-সভা বা পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবার ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষেরই একটি করে ভোট দেবার অধিকার থাকবে। এই ভোট দেবার ক্ষমতাটাই হয়েছিল রাজনৈতিক অধিকারের প্রতীক; সুতরাং ধরে নেওয়া হল, প্রত্যেক লোকের যদি একটা করে ভোট দেবার অধিকার থাকে তবে এই লোকেরা প্রত্যেকেই ঠিক সমান-পরিমাণ রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক হবে। অতএব সমস্তটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে গণতন্ত্রের একটি প্রধান দাবি হল, আরও বেশি বেশি লোককে ভোট দেবার অধিকার দিয়ে দেওয়া হোক। 'সাবালকের ভোটাধিকার' বলতে বোঝাবে তাকে, যখন প্রত্যেক সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোট দেবার অধিকার লাভ করেছে। দীর্ঘ কাল যাবৎ এই অধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল; তার পর তারা বিশেষ করে ইংলণ্ডে একটা প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করল—সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। এখন প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই পুরুষ এবং মেয়ে দু দলেরই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে।

কিন্তু এইটেই আশ্চর্য, অধিকাংশ মানুষ যখন ভোট দেবার অধিকার অর্জন করেছে তখন দেখা গেল, এতে করে তাদের অবস্থার বিশেষ কিছুই ইতরবিশেষ হয় নি। ভোটের অধিকার তারা পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই, বা দৈবাৎ থাকলেও সে অতি সামান্য। পেটে যার খাদ্য নেই ভোটের ক্ষমতা তার কোনো কাজেই আসে না। সত্যকার ক্ষমতা থাকল সেই লোকদের হাতে যারা এর এই বুভুক্ষার সুযোগ নিতে পারল, তাদের নিজেদের প্রয়োজনমতো এদের শ্রমিক হিসেবে বা অন্য কোনো রকমে খাটিয়ে নিতে পারল। অতএব দেখা গেল, ভোটের অধিকার পাবার ফলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষের হাতে আসে বলে লোকের ধারণা ছিল, সে ক্ষমতাটা একেবারেই একটা কায়াহীন ছায়ামাত্র, যদি-না তার সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও যুক্ত থাকে। ভোটের ক্ষমতা সকলের আয়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, প্রথম যুগের গণতন্ত্রবাদীরা এই স্বপ্ন দেখতেন; সে স্বপ্ন একেবারেই মিথ্যা হয়ে গেল।

এও অবশ্য অনেক দিন পরের কথা। প্রথম যুগে—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—প্রজাতন্ত্রবাদীদের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র একবার প্রতিষ্ঠিত হোক, তখন দেশের প্রত্যেকটি লোক স্বাধীন এবং সমান মর্যাদার নাগরিক বলে গণ্য হবে; দেশের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে চলবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা এবং শাসনকর্তৃপক্ষের হাতে স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা ছিল এবং তাঁদের সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার তাঁরা অনেক অপব্যবহার করেছিলেন। এবারে তার একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এরই ফলে লোকেরা তাদের ঘোষণাপত্রগুলোতে প্রজাদের ব্যক্তিগত অধিকারগুলি খুব স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করতে লাগল। আমেরিকা আর ফ্রান্সের ঘোষণাপত্রে ব্যক্তির এইসমস্ত অধিকার সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হল তাতে সম্ভবত আবার অন্য দিকে বাড়াবাড়ি করে বলা হয়েছিল। জটিল একটা সমাজ-জীবনের মধ্যে তার প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে আলাদা করে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই রকমের যে-কোনো একজন ব্যক্তির স্বার্থ আর সমাজের স্বার্থ এক না হতে পারে, দুয়ের মধ্যে সংঘাতও বেধে ওঠে। কিন্তু সে যাই হোক, ব্যক্তির পক্ষে অনেকখানি স্বাধীনতার ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রবাদীরা করতে চেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে অনেক পিছনে পড়ে ছিল। আমেরিকা আর ফ্রান্সের বিপ্লব স্বভাবতই তাকে একটা নাড়া দিয়ে গেল। এর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল ভয়—নূতন প্রজাতান্ত্রিক মতামতের সম্বন্ধে, আর তাদেরও দেশে যদি আবার সমাজবিপ্লব ঘটে যায় তার সম্বন্ধে ভয়। এই ভয়ে শাসকশ্রেণীরা আরও বেশি রক্ষণপন্থী এবং প্রগতিবিমুখ হয়ে উঠলেন। তবুও কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এইসব নূতন মতামত ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময়কার একজন উল্লেখযোগ্য ইংরেজ ছিলেন টমাস পেইন। স্বাধীনতা-সমরের সময়টাতে তিনি আমেরিকাতেই ছিলেন, যুদ্ধে আমেরিকানদের সাহায্যও করেছিলেন। পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছা আমেরিকানদের মাথায় ঢোকানোর ব্যাপারেও এঁর খানিকটা হাত ছিল বলে মনে হয়। ইংলণ্ডে ফিরে তিনি 'দি রাইট্‌স্ অব ম্যান' বা 'মানুষের অধিকার' নামে একটি বই লিখলেন; ফ্রান্সে তখন বিপ্লব সদ্য আরম্ভ হয়েছে, এই বইটিতে তিনি সেই বিপ্লবের পক্ষ সমর্থন করলেন। বইয়ে তিনি রাজতন্ত্রের দোষত্রুটি দেখালেন এবং গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যুক্তি দিলেন। এই অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আইনের অরক্ষণীয় 'আউট-ল' বলে ঘোষণা করলেন; বাধ্য হয়ে তিনি পালিয়ে ফ্রান্সে চলে গেলেন। প্যারিসে গিয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় পরিষদের সভ্য বলে গণ্য হলেন; কিন্তু ১৭৯৩ সনে জ্যাকোবিনরা তাঁকে কারারুদ্ধ করল, কারণ তিনি ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডে আপত্তি করেছিলেন। প্যারিসে জেলে বসে তিনি আর-একটি বই লেখেন, তার নাম 'দি এজ অব রিজ্‌ন' বা 'যুক্তির যুগ'; এই বইয়ে তিনি ধর্মধ্বজী দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি বিশ্লেষণ করে দেখালেন। ইংলণ্ডের আদালত পেইনকে হাতের নাগালে পেল না (রোবেস্পিয়েরে-এর মৃত্যুর পরে প্যারিসের কারাগার থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়); এই বইটি প্রকাশ করবার অপরাধে ইংলণ্ডে তাঁর প্রকাশককে কারাদণ্ড দেওয়া হল। এ ধরনের বইকে তখন সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হত; তখনকার কর্তারা জানতেন, ধর্ম একটা খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ ধর্মের দোহাই দিয়েই গরিবদের তাদের নিজের জায়গাতে আটকে রাখতে হয়। পেইনের বই যাঁরা প্রকাশ করেছেন এমন অনেক লোককে জেলে যেতে হল, এঁদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। কবি শেলি এর প্রতিবাদ করে সেই বিচারকের কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। ঘটনাটি লক্ষ করবার মতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসকল গণতান্ত্রিক মতামত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, ইউরোপে তার জন্ম হয় ফরাসি-বিপ্লব থেকে। বস্তুত, পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা অতিদ্রুত বদলে যাচ্ছিল, তবুও বিপ্লবের ধারণাটা অনেক দিন টিঁকে রইল। রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের মনে যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল, এই গণতান্ত্রিক মতামতগুলো ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ; এদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল শিল্পতন্ত্র-প্রবর্তনের আগের যুগের অবস্থার উপরে। কিন্তু নূতন যুগের শিল্পতন্ত্র, বাষ্প আর কলের কারখানা, সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাকে একেবারেই বদলে ফেলছিল। অথচ এইটেই আশ্চর্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের প্রগতিবাদী এবং প্রজাতন্ত্রবাদীরা সেসব পরিবর্তনকে মোটে লক্ষই করলেন না, 'বিপ্লব' আর 'মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণাবাক্যের' ভালো ভালো বুক্‌নিগুলোকেই শুধু আউড়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের বোধ হয় ধারণা ছিল, এইসব পরিবর্তন নেহাতই পার্থিব ব্যাপার মাত্র; যেসমস্ত উচ্চস্তরের আত্মিক নৈতিক এবং রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে গণতন্ত্রের কারবার তার সংগে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পার্থিব কাণ্ড-কারখানার একটা বদ অভ্যাস আছে, তাদের গ্রাহ্য করতে না চাইলেও তারা অগ্রাহ্য হয়ে থাকতে চায় না। পুরোনো মতামত ছেড়ে দিয়ে নূতন মতামত গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে কী আশ্চর্যরকম শক্ত, সেটাও লক্ষ করবার বস্তু। চোখ বুজে মন বুজে তারা বসে থাকবে ও কিছুই দেখতে চাইবে না; প্রাচীন কালের বস্তু যখন স্পষ্টই তাদের ক্ষতি করছে, তখনও তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করবে। যা তাদের করতে বল তাই তারা করবে, শুধু একটি কাজ ছাড়া—নূতন মতামতকে মেনে নেবে না, নূতনতর অবস্থার সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে না। অপরিসীম ক্ষমতা মানুষের এই রক্ষণশীলতার! যারা প্রগতিবাদী, যারা মনে করে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে চলেছে, তারা পর্যন্ত অনেক সময়ে পুরোনো এবং বাতিল সব মতামতকে কামড়ে পড়ে থাকে, চার ধারের অবস্থা যে বদলে যাচ্ছে কিছুতেই চোখ খুলে তাকিয়ে সেটা দেখতে রাজি হয় না।

ক্রমে তাঁদের ধারণা হল, সমস্ত মানুষের মধ্যে ধনসম্পদ আরও ভালো করে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই সুখ আসা সম্ভব। এর থেকেই সমাজতন্ত্রবাদের কথা এসে পড়ে; তার আলোচনা আমরা এর পরের চিঠিতে করব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-অর্ধেকে যেখানেই পরাধীন জাতি বা প্রজারা স্বাধীনতালাভের জন্যে যুদ্ধ করেছে সেইখানেই গণতন্ত্রবাদ এসে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ইতালির ম্যাট্‌সিনি ছিলেন এই ধরনের গণতন্ত্রী দেশপ্রেমিকের চমৎকার নমুনা। এই শতাব্দীর শেষের দিকে গিয়ে জাতীয়তাবাদ ক্রমে এই গণতন্ত্রী প্রকৃতিকে বর্জন করল এবং উত্তরোত্তর উগ্রপন্থী আর কর্তৃত্বাভিলাষী হয়ে বসল। রাষ্ট্র হয়ে উঠল দেবতা, প্রত্যেক লোকেরই তাকে পূজা করতে হবে।

নূতন শিল্পজগতের নেতা হলেন ইংলণ্ডের ব্যবসাদাররা। উচ্চস্তরের গণতান্ত্রিক নীতি আর প্রজাদের স্বাধীনতার অধিকার, এসব নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু একটা তত্ত্ব তাঁরা বুঝে ফেললেন, মানুষকে আরও বেশি স্বাধীনতা দিয়ে দিলে ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা হবে। এর ফলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়, তাদের মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আসে যে, তারা খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করছে, এবং তারা কাজে আরও বেশি নৈপুণ্য অর্জন করে। কাজে নৈপুণ্য আনবার জন্যেই সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলাও প্রয়োজন। এইসমস্ত উপকারিতা হিসাব করেই ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা খুব একটা মহত্ত্ব দেখিয়ে দিলেন, প্রজাদের এইসমস্ত অধিকার মঞ্জুর করতে রাজি হয়ে গেলেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-অর্ধেকে ইংলণ্ডে এবং পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে মোটামুটি একরকমের শিক্ষা খুব দ্রুতবেগে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

১৩২

সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

গণতন্ত্রবাদের অগ্রগতির কথা তোমাকে বললাম। কিন্তু মনে রেখো, তাকে এগিয়ে চলতে হয়েছে নিদারুণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বর্তমান ব্যবস্থাটার সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে তারা তার পরিবর্তন পছন্দ করে না, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয়। অথচ প্রগতি বা উন্নতি লাভ করতে হলে সে পরিবর্তন আনতে হবে, প্রতিষ্ঠান বা শাসনব্যবস্থাকে বদলে তার জায়গায় উন্নততর বস্তুকে এনে বসাতে হবে। যারা প্রগতি কামনা করে তাদের কাজেকাজেই সে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বা প্রাচীন রীতিকে ভেঙে ফেলতে হয়; পায়ে পায়ে সারাক্ষণ বর্তমান সব অবস্থা-ব্যবস্থার উচ্ছেদ আর সে ব্যবস্থায় যাদের লাভ তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হয়। পশ্চিম-ইউরোপের শাসকশ্রেণীরা সকলরকম অগ্রগতিকে প্রতি পদে বাধা দিচ্ছিল। ইংলণ্ডে তারা সে অগ্রগতিকে স্বীকার করতে রাজি হল শুধু তখনই যখন দেখল, আর তাকে না মেনে নিলে দেশে ভয়ংকর বিপ্লব ঘটে যাবে। ইংলণ্ডের অগ্রগতির আর-একটু কারণ হচ্ছে, তার নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণীদের মনে ধারণা হয়েছিল, খানিকটা গণতন্ত্রের আমদানি হলে তাতে ব্যবসাবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও সুবিধা বাড়বে।

তবুও কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেক কাল পর্যন্ত এই গণতন্ত্রী মতামত প্রধানত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্পতন্ত্রের প্রসারের ফলে সাধারণ প্রজার জীবন-যাত্রায় তখন প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটছে, জমি ছেড়ে তারা কারখানায় ঢুকতে বাধ্য হচ্ছে। একটি শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিকশ্রেণী দেশে গড়ে উঠছে; কারখানার সংলগ্ন কুৎসিত অস্বাস্থ্যকর শহরে তারা গাদাগাদি হয়ে বাস করছে। সাধারণত এই শহরগুলি ছিল সব কয়লাখনির কাছাকাছি অঞ্চলে। এই শ্রমিকদের মধ্যে তখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, নূতন একটা মনোভাব গড়ে উঠছিল। অনাহারের তাড়নায় যে কৃষক আর কারুশিল্পীরা কারখানাতে এসে ভিড় করেছিল তাদের থেকে এরা

সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের লোক। কারখানা-তৈরির ব্যাপারে যেমন ইংলণ্ড প্রথম পথ দেখিয়েছিল, তেমনি এই শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তিও ইংলণ্ডেই প্রথম হল। কারখানাগুলোর অবস্থা ছিল একেবারে ভয়াবহ; শ্রমিকদের বাসস্থান বা কুটিরগুলোর অবস্থা ছিল আরও খারাপ। দুঃখ-দুর্দশার তাদের আর অন্ত ছিল না। ছোটো ছোটো শিশু এবং নারীদেরও এত দীর্ঘ কাল ধরে খাটানো হত যে শুনলেও তা বিশ্বাস হয় না। অথচ আইন করে এইসব কারখানা বা বস্তির অবস্থা ভালো করতে গেলেও মালিকরা তাতে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছিল। সত্যিই তো, তাদের মালিকানা-স্বত্বের উপরে এই হস্তক্ষেপ, এটা কী একটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার নয়! লোকের নিজস্ব বাড়িঘরে স্বাস্থ্যব্যবস্থার আবশ্যিক বিধানের যখন চেষ্টা করা হল, তাতেও এরা এই যুক্তি দেখিয়েই আপত্তি প্রকাশ করল। আজকালকার ভারতবর্ষেও অনেকটা এই ধরনের মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেবল কারখানার মালিক আর ভূস্বামীদের মধ্যে নয়, প্রতিক্রিয়াপন্থী সমাজনেতা এবং ধর্মধ্বজীদের মধ্যেও—ধর্ম এবং প্রাচীন প্রথার দোহাই দিয়ে এরা সংস্কারের পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

দীর্ঘকাল ধরে স্বল্পাহার এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের চাপে ইংলণ্ডের হতভাগ্য শ্রমিকরা একেবারে মারা যাচ্ছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেশটা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে, ব্যবসার বাজারে মন্দা পড়েছে; এবং তার ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্দশা হয়েছে শ্রমিকদের। নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে এবং লড়াই করে নিজেদের অবস্থার একটু উন্নতি করে নেবার জন্যে শ্রমিকরা স্বভাবতই সংঘবদ্ধ হতে চাইল। প্রাচীন কালেও কারুশিল্পীদের এবং গুণী কর্মীদের 'গিল্ড' ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল একেবারেই অন্য রকমের জিনিষ। তবুও সম্ভবত সেই গিল্ডের কথা মনে করেই কারখানার শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব সংঘ গড়বার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিন্তু সংঘ গড়তে তাদের দেওয়া হল না। ফ্রান্সের বিপ্লব দেখে ব্রিটেনের শাসক-শ্রেণীদের ভয় ধরে গিয়েছিল; সেই ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা আইন তৈরি করলেন—শ্রমিকরা তাদের দুঃখদুর্দশার কথা আলোচনা করবার জন্যে একত্র মিলিত পর্যন্ত হতে পারবে না! এই আইনের নাম হল কম্বিনেশন অ্যাক্ট। কর্তৃত্ব যাদের হাতে রয়েছে সেই মুষ্টিমেয় ক'জন লোকের অর্থ এবং স্বার্থ-রক্ষার মহান কার্যটি সাধন করতে চিরদিনই 'আইন ও শৃঙ্খলা'র অসীম উপকারিতা দেখা গেছে—কী এখনকার ভারতবর্ষে, কী তখনকার ইংলণ্ডে।

কিন্তু সভাসমিতি নিষিদ্ধ করবার জন্যে রচিত এই আইনে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কোনো ব্যবস্থা হল না। শ্রমিকরা এতে শুধু আরও ক্ষুব্ধ হল, মরিয়া হয়ে উঠল। তারা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করতে লাগল, তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা গোপন রাখবার জন্যে কঠিন শপথ গ্রহণ করল, গভীর রাত্রে নিভৃত স্থানে এদের সভা বসতে লাগল। এরা অনেকে ধরাও পড়ল, বা এদের মধ্যেরই কেউ হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করে এদের ধরিয়ে দিল। যারা ধরা পড়ল তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা করা হল এবং অতি ভয়ানক শাস্তি হল তাদের। অনেক সময় আবার এরাই রাগের বশে কল ভেঙে ফেলল, কারখানা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল, এমনকি মনিবদেরও দু-চার জনকে মেরে ফেলল। অবশেষে ১৮২৫ সনে শ্রমিকদের সংঘ-সমিতি সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা হ্রাস করা হল, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন শুরু হল। এইসব ইউনিয়ন গড়ছিল একটু বেশি মাইনের গুণী শ্রমিকরা। সাধারণ অপটু শ্রমিকরাই সংখ্যায় অনেক বেশি, তারা দীর্ঘ কাল যাবৎ অসংঘবদ্ধই থেকে গেল। এইভাবে শ্রমিক-আন্দোলন রূপ গ্রহণ করল ট্রেড ইউনিয়নের; তার উদ্দেশ্য—সমস্ত শ্রমিকের পক্ষ থেকে মালিক-পক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষি করে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা। শ্রমিকদের হাতে একমাত্র সত্যকার অস্ত্র ছিল ধর্মঘট—কাজ বন্ধ করে দিয়ে কারখানা বা যেখানে তারা কাজ করছে তাকেই অচল করে দেওয়া। এটা খুব বড়ো অস্ত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু মালিকদের হাতে এর চেয়েও বড়ো একটা অস্ত্র ছিল। মাইনে না দিয়ে নিছক অনাহারের চাপেই এদের বশ্যতা স্বীকার করাবার শক্তি তাঁরা রাখতেন। শ্রমিকশ্রেণী এইভাবে সংগ্রাম করে চলল, শ্রমিকদের বিপুল-পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করতে হল। ধীরে ধীরে কিছু কিছু জয়ও লাভ করল তারা। পার্লামেন্টের উপরে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না, কারণ, তাদের তখন ভোট দেবার অধিকার পর্যন্ত নেই। ১৮৩২ সনে বিখ্যাত রিফর্ম-বিল নিয়ে প্রচণ্ড

চেঁচামেচি হল, সে বিলেও ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল মাত্র অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীকে। শ্রমিকরা শুধু নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী পর্যন্ত তখন ভোট দেবার অধিকার পায় নি।

এরই মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানাওয়ালাদের মধ্যে একজন লোকের আবির্ভাব হল। তিনি ছিলেন মানুষের হিতকামী, শ্রমিকদের ভয়ানক দুর্দশা দেখে তাঁর মন ব্যথিত হয়ে উঠল। এঁর নাম ছিল রবার্ট ওয়েন। তাঁর নিজের কারখানাতে তিনি অনেক রকমের সংস্কার প্রবর্তন করলেন, শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভালো করে দিলেন। তাঁর সমশ্রেণীর মালিকদের মধ্যেও তিনি আন্দোলন শুরু করলেন; যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে তাঁরাও শ্রমিকদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কতকটা তাঁরই চেষ্টায় মালিকদের লোভ আর স্বার্থপরতার হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রথমবার আইন প্রণয়ন করল। এই আইনটি হচ্ছে ১৮১৯ সনের ফ্যাক্টরি-অ্যাক্ট। এই আইনে বলা হল, ন' বছর বয়সের শিশুদের দিনে বারো ঘণ্টার বেশি খাটানো চলবে না! আইনের এই বিধিটি থেকেই কিছুটা বুঝতে পারবে, কী ভয়ানক অবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে হত।

শোনা যায়, রবার্ট ওয়েনই নাকি 'সমাজতন্ত্রবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, ১৮৩০ সনের কাছাকাছি কোনো সময়ে। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে তফাতটাকে কমিয়ে আনা, এবং ধনসম্পত্তি মোটামুটি একটা সমানভাবে বণ্টন করা, এ কথাটা অবশ্য মোটেই নূতন ছিল না; এর আগেও বহু লোক এর প্রবর্তনের কথা বলেছেন। প্রথম যুগের মানবসমাজে তো সাম্যবাদের মতোই একটা বস্তু চলতি ছিল, জমি এবং অন্যান্য ধনসম্পদ একেবারে সমস্ত সমাজ বা গ্রামটিরই সাধারণ সম্পত্তি বলে গণ্য হত। একে বলা হয়, আদিমযুগের সাম্যবাদ; এখনও বহু দেশে এর সাক্ষাৎ মেলে, ভারতবর্ষে পর্যন্ত। কিন্তু নূতন যে সমাজতন্ত্রবাদ এল সে শুধু সমস্ত মানুষকে এক সমান করে দেবার একটা অস্পষ্ট কামনা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কথা তার মধ্যে রয়েছে। এর সংকল্প ও কার্য-পদ্ধতি অনেক বেশি স্পষ্ট। প্রথমেই একে নূতন উৎপাদনপদ্ধতি অর্থাৎ কারখানা-প্রথার উপরে খাটানো হবে বলে স্থির হল। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিল্পতন্ত্রের রীতি থেকেই এই বস্তুটি জন্মগ্রহণ করেছে। ওয়েনের অভিপ্রায় ছিল শ্রমিকদের নিয়ে সমবায়-সমিতি স্থাপন করা, কারখানাতেও শ্রমিকদের অংশীদারি থাকবে। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকাতে তিনি কতকগুলি আদর্শ কারখানা ও বসতি স্থাপন করলেন; তাঁর সংকল্প কিছুটা সফলও হল। কিন্তু অন্যান্য মালিকরা এবং শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁর মত মেনে নিতে রাজি হলেন না। তবুও যত দিন বেঁচেছিলেন তত দিন তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল, 'সমাজতন্ত্রবাদ' বলে একটি কথাকে তিনিই চালিয়ে দিয়ে গেলেন, তার পর থেকে কোটি কোটি লোককে এই শব্দটি মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

ধনিকপ্রধান শিল্পতন্ত্র ওদিকে সমানেই বেড়ে চলছিল; তার উত্তরোত্তর সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর সম্বন্ধে সমস্যাটাও বড়ো হয়ে উঠছিল। ধনিকতন্ত্রের ফলে পণ্য-উৎপাদন ক্রমেই বাড়তে লাগল; তার ফলে জনসংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুতবেগে বেড়ে চলল, কারণ এখন ক্রমেই আরও বেশি-সংখ্যক মানুষের খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান করা যাচ্ছে। খুব বড়ো বড়ো ব্যবসা গড়ে তোলা হল, তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সহযোগিতার ব্যবস্থা; এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ছোটো ছোটো ব্যবসাগুলো একেবারেই মারা পড়তে লাগল। বাইরে থেকে জলস্রোতের মতো ধনসম্পদ ইংলণ্ডে এসে জমতে লাগল, কিন্তু এর অনেকখানিই ব্যবহৃত হল আরও নূতন নূতন কারখানা রেলওয়ে বা ঐরকমের অন্যান্য ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্যে। নিজেদের অবস্থা একটু ভালো করে নেবার আশায় শ্রমিকরা বহু ধর্মঘট করল, সে ধর্মঘট একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার পর তারা ১৮৪০ সনের পরবর্তী আমলের চার্টিস্ট আন্দোলনে যোগ দিল। বিপ্লব যেবার হয়, অর্থাৎ ১৮৪৮ সনে, এই চার্টিস্ট আন্দোলনটি বন্ধ হয়ে যায়।

ধনিকতন্ত্রের সমৃদ্ধি দেখে লোকের চোখে ধাঁধা লেগে গেল; কিন্তু তবুও কিছু কিছু লোক ছিলেন যাঁরা প্রগতিকামী, যাঁদের মতামত একটু আধুনিক ধরনের, বা যাঁরা মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী— ধনিকতন্ত্রের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গলা-কাটাকাটি থাকে, বা এতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও

শ্রমিকদের যে দুর্দশার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, সেটা তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না। ইংলণ্ডে জর্মানিতে ফ্রান্সে এই ধরনের লোকরা ধনিকতন্ত্রের পরিবর্তে অন্য নানাবিধ পদ্ধতির নাম উদ্‌ভাবন করতে লেগে গেলেন। অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব উত্থাপন করলেন; এর সমস্তগুলোকে একত্রে নাম দেওয়া হল সমাজতন্ত্রবাদ বা যৌথস্বত্ববাদ (কলেক্‌টিভিজ্‌ম্‌) বা সমাজ-গণতন্ত্রবাদ। এর সব ক'টা নামে প্রায় একই বস্তুকে বোঝাত। একটা বিষয়ে এই সংস্কারকরা সকলেই একমত ছিলেন যে সমস্ত দোষত্রুটির মূলে রয়েছে শিল্প-ব্যবসায়ে মালিকের ব্যক্তিগত স্বত্ব আর কর্তৃত্ব। এর বদলে যদি এর মালিকি স্বত্ব এবং কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকত, অন্তত জমি এবং প্রধান প্রধান শিল্প ইত্যাদি, উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলো, তা হলে আর শ্রমিকের উপরে শোষণ চলবার সম্ভাবনা থাকত না। অতএব ঠিক স্পষ্ট ধারণা না নিয়েও লোকেরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা পছন্দসই পরিবর্তনের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের এভাবে মরে যাবার কোনো অভিপ্রায়ই দেখা গেল না; দিনের পর দিন তার শক্তি বেড়েই চলছিল।

সমাজতন্ত্রবাদের এইসব মতামতের প্রথম প্রবর্তন করলেন বুদ্ধিজীবীরা; রবার্ট ওয়েন নিজে ছিলেন একজন কারখানার মালিক। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিছুকাল বিভিন্ন দিক ধরে এগিয়ে চলল; এর তখন উদ্দেশ্য ছিল, শুধু মজুরির হার কিছু বাড়িয়ে নেওয়া আর কাজের শর্তের কিছু সুবিধা করে নেওয়া। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদী মতামতের প্রভাব এরও উপরে স্বভাবতই এসে পড়ল; আবার সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের উপরেও এর প্রভাব পড়ল অনেকখানি। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মানি, ইউরোপের এই প্রধান তিনটি শিল্পপ্রধান দেশে কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ কিছুটা বিভিন্ন রূপ ধারণ করল প্রত্যেক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃতি এবং শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে। মোটের উপর বলা যায়, ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদীরা ছিল রক্ষণপন্থী। এদের বিশ্বাস ছিল বিবর্তনের পথে এবং ধীরগতিতে এগিয়ে চলাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদীরা ছিলেন এদের তুলনায় বেশিমাত্রায় প্রগতি এবং বিপ্লব পন্থী। আমেরিকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার দেশের আয়তন অতি বৃহৎ, শ্রমিকও তার অনেক প্রয়োজন হল; কাজেই সেখানে বহু কাল যাবৎ তেমন কোনো শ্রমিক-আন্দোলন বেড়ে উঠল না।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখান থেকে শুরু করে এক পুরুষ যাবৎ পৃথিবীতে শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে ব্রিটেনই আধিপত্য বিস্তার করে রইল; বাইরে থেকে অর্থের স্রোতও তার ঘরে আসতে লাগল; ব্যবসাবাণিজ্যের লাভ হিসেবে এবং ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অধীন দেশের শোষণের ফলে এই বিপুল-পরিমাণ ধনের খানিকটা গিয়ে শ্রমিকদেরও হাতে পৌঁছল; তাদের জীবনযাত্রার এত উন্নতি ঘটল যা আগে কোনোদিন হয় নি। ধনসমৃদ্ধির সঙ্গে বিপ্লবের সাদৃশ্য কিছুই নাই। ব্রিটেনের শ্রমিকদের মধ্যে যে বিপ্লব-কামনা একদা দেখা গিয়েছিল তা একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেল, এমনকি সমাজতন্ত্রবাদেও ব্রিটিশ নমুনাটি হল সকলের চেয়ে নরমপন্থী। এর নাম দেওয়া হল ফেবিয়ানিজ্‌ম্‌। নামটি একজন রোমান সেনাপতির নাম থেকে নেওয়া— ইনি শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং দূরে থেকে ধীরে ধীরে তাদের অবসন্ন করে এনেছিলেন। ১৮৬৭ সনে ব্রিটেনে ভোটের অধিকার আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল, এবার শহর-অঞ্চলের শ্রমিকরাও অনেকে এই অধিকার পেয়ে গেল। ট্রেড ইউনিয়নগুলো এত সভ্যভব্য এবং সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল যে, শ্রমিকরা সাধারণত ব্রিটেনের উদারনৈতিক দলকেই ভোট দিত। এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ বলেছিলেন : "ইংলণ্ডের শ্রমিক-নেতা না হওয়াই বরং মর্যাদাসূচক; কারণ, এই নেতাদের অধিকাংশই উদারপন্থীদের ক্রীত অনুচর মাত্র।"

ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ড যখন বেশ হৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়েই ইউরোপের মহাদেশে একটি নূতন মতবাদ নিয়ে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। এটি হচ্ছে অ্যানার্কিজ্‌ম্‌ বা অরাজকবাদ। অনেক লোক আছে যারা এর সম্বন্ধে কিছুই জানে না, অথচ এর নাম শুনেও ভয় পায়। অ্যানার্কিজ্‌ম্‌ বলতে বোঝাত এমন একটা সমাজকে, যেখানে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা যতদূর সম্ভব বর্জন করে চলা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি প্রচুর-পরিমাণ

স্বাধীনতা ভোগ করবে। অ্যানার্কিজ্‌মের আদর্শ হচ্ছে অত্যন্তরকম উচ্চ : "এ'রা একটি আদর্শ সমাজে বিশ্বাস করেন; সে সমাজ আশাবাদ, সংহতি এবং পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভ্রমবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।" সেখানে রাষ্ট্র ব্যক্তির উপরে কোনোরকম পীড়ন বা জোরজুলুম চালাবে না। থোরো-নামক একজন আমেরিকান বলেছেন, "সর্বাপেক্ষা ভালো হচ্ছে সেই শাসন যা মোটেই শাসন করে না; মানুষ যখন তাকে পাবার মতো যোগ্যতা অর্জন করবে তখন সেই রকমের শাসনব্যবস্থাই তারা গড়ে নেবে।"

আদর্শটিকে খুবই চমৎকার বলে মনে হয়—প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে, প্রত্যেকে অপরের মর্যাদা রক্ষা করে চলছে, সকলেই স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত, সকলে স্বেচ্ছায় সানন্দে পরস্পরের সহযোগিতা করছে। কিন্তু আধুনিক জগৎ সে আদর্শ থেকে এখনও বহু দূরে পড়ে রয়েছে, এখানে আজও স্বার্থপরতা আর হানাহানির রাজত্ব। অ্যানার্কিস্ট্‌রা চায়, কোনোরকম কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকবে না, বা থাকলেও তার ক্ষমতা যথাসম্ভব কম হবে; এতকাল ধরে স্বৈরতন্ত্র আর স্বেচ্ছাচারের ফলে প্রজারা যে পীড়ন সহ্য করেছে, এটা নিশ্চয়ই তার প্রতিক্রিয়া থেকে জাত। শাসনকর্তৃপক্ষ তাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। দূরে হোক, শাসনকর্তৃপক্ষ থেকেই দরকার নেই আমাদের! অ্যানার্কিস্ট্‌রা এ কথাও ভাবত যে, সমাজ-তন্ত্রবাদের এমন কতকগুলো রূপ আছে যেগুলোর আমলে রাষ্ট্র সমস্ত উৎপাদন-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবে এবং তার পর হয়তো নিজেই অত্যাচারী হয়ে উঠবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অ্যানার্কিস্ট্‌রাও ছিল বিশেষ এক ধরনের সমাজতন্ত্রবাদী, প্রত্যেক স্থান এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার উপরে তারা খুব বেশি জোর দিত। ও দিকে আবার সমাজতন্ত্রবাদীদের অনেকে অ্যানার্কিস্ট্‌দের মতটাকে একটা অতিদূরবর্তী আদর্শ বলে স্বীকার করতে রাজি ছিল; কিন্তু তাদের মতে কিছুকালের জন্য অন্তত সমাজতন্ত্রবাদের নীতিতে গঠিত একটা কেন্দ্রায়ত্ত এবং শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রবাদ আর অ্যানার্কিজ্‌মের মধ্যে তফাত অনেক ছিল বটে, কিন্তু তবুও প্রত্যেকটার মধ্যেই এমন অনেকগুলো উপাদান ছিল যারা ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

আধুনিক শিল্পতন্ত্র থেকে জন্ম হল একটা সুসংহত শ্রমিকশ্রেণীর। অ্যানার্কিজ্‌ম্ বিশেষ সুসংহত আন্দোলন হয়ে উঠতে পারে নি, সেটা তার প্রকৃতিরই বিরোধী হত। কাজেই ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন যেখানে গড়ে উঠছে এমন-সব শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে অ্যানার্কিজ্‌ম্ বিশেষ প্রসার লাভ করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব ইংলণ্ডে অ্যানার্কিস্ট্‌দের সংখ্যা মোটেই বেশি ছিল না, জর্মনিতেও নয়। কিন্তু ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের দেশগুলোতে শিল্পতন্ত্র ততটা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি; এইসব দেশে এদের মতবাদ বেশ বেড়ে উঠল। তার পর দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলেও আবার আধুনিক শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হল, অ্যানার্কিজ্‌মেরও প্রতিপত্তি ততই কমে যেতে লাগল। এখনকার দিনে এই মতবাদটা বস্তুত মৃত; কিন্তু এখনও স্পেন প্রভৃতি অনুন্নত এবং শিল্পবিমুখ দেশে এর কিছু কিছু সাক্ষাৎ মেলে।

আদর্শ হিসেবে হয়তো অ্যানার্কিজ্‌ম্ খুবই চমৎকার জিনিষ ছিল। কিন্তু বহু অযোগ্য ব্যক্তি এর আশ্রয় গ্রহণ করল—সহজে উত্তেজিত এবং নিজের অবস্থাতে অসন্তুষ্ট লোকরাই শুধু নয়, এমন বহু স্বার্থপর লোকও, যারা এই আদর্শের দোহাই দিয়ে নিজেদের লাভ গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল, এবং তার ফলেই এমন একটা অশুভ হানাহানির সৃষ্টি হল, এখনও অ্যানার্কিজ্‌ম্ বলতে প্রত্যেক লোকে সেই ব্যাপারকেই বোঝে; অ্যানার্কিজ্‌মের নামটাই একটা কুখ্যাতি অর্জন করে বসেছে। সমাজকে তাদের ইচ্ছামতো বদলে গড়ে নেবার মতো বৃহৎ একটা-কিছু করে উঠতে না পেরে, কতক অ্যানার্কিস্ট্ স্থির করল, তারা একটি অভিনব উপায়ে তাদের মতবাদ প্রচার করে যাবে। এই পন্থাটার নাম ছিল 'কাজ দেখিয়ে প্রচার করা'; এদের পদ্ধতি হল—সাহসের প্রমাণ দেখানো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বীরের মতো লড়াই করা, নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে এরা বহু স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এইসব বিদ্রোহে যারা যোগ দিল তারা সে বিদ্রোহ তখনই সফল হবে এমন ভরসা রাখত না। তাদের আদর্শকে এই অভিনব

উপায়ে প্রচার করবার জন্যেই শুধু আগ্রহে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল। এইসব বিদ্রোহ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই দমন করা হল। \অ্যানার্কিস্ট্রা তখন শুরু করল ব্যক্তিগতভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে; বোমা ফেলা, রাজা এবং বড়ো বড়ো কত রাজকর্মচারীকে গুলি করে মারা ইত্যাদি। তাদের দুর্বলতা এবং হতাশা বেড়ে যাচ্ছে, এই অর্থহীন নরহত্যা অবশ্য ছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পেঁাছে, আন্দোলন হিসাবে অ্যানার্কিজ্ম্ ক্রমে একেবারেই মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অ্যানার্কিস্ট্দের মধ্যেও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বোমা-ছোঁড়া বা 'কাজ দেখিয়ে প্রচার করা' প্রভৃতি অনুমোদন করতেন না, তাঁরা এগুলো বর্জন করে চললেন।

কয়েকজন খুব প্রসিদ্ধ অ্যানার্কিস্টের নাম তোমাকে বলছি। এই অ্যানার্কিস্ট্-নেতাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন আশ্চর্যরকম নম্রস্বভাব, আদর্শবাদী এবং শ্রদ্ধা-আকর্ষণ করবার মতো লোক—এটা ভাবতে বিস্ময় লাগে। অ্যানার্কিস্ট্দের প্রথম নেতা ছিলেন একজন ফরাসি, তাঁর নাম পিয়েরে প্রুধোঁ। এঁর জীবনকাল হচ্ছে ১৮০৯ থেকে ১৮৬৫ সন পর্যন্ত। এঁর চেয়ে বয়সে সামান্য ছোটো ছিলেন মিচেল বাকুনিন, ইনি একজন অভিজাত রাশিয়ান। ইউরোপের ইনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় শ্রমিক-নেতা, বিশেষ করে দক্ষিণ-অঞ্চলের। মার্ক্সের সঙ্গে এঁর মতের বিরোধ হয়: মার্ক্স্ তাঁর গঠিত আন্তর্জাতিক সংঘ থেকে এঁকে এবং এঁর অনুচরদের তাড়িয়ে দেন। তৃতীয় যাঁর নাম করব তিনি প্রায় আমাদের সময়কারই লোক, পিটার ক্রাপটকিন—ইনিও ছিলেন রাশিয়ান এবং একজন সামন্তরাজবংশের লোক! অ্যানার্কিজ্ম্ এবং অন্যান্য কত বিষয় নিয়ে ইনি অনেকগুলো খুব ভালো বই লিখেছেন। চতুর্থ এবং শেষ নামটি আমি যাঁর করব তিনি হচ্ছেন একজন ইতালিয়ান—এন্রিকো মালাটেস্টা। ইনি আজও বেঁচে আছেন, এখন এঁর বয়স প্রায় আশি বছর। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান্ অ্যানার্কিস্ট্দের মধ্যে একা ইনিই অবশিষ্ট রয়েছেন।

মালাটেস্টা সম্বন্ধে একটি ভারি চমৎকার গল্প আছে, তোমাকে সেটি বলছি। ইতালির একটি আদালতে তাঁর বিচার হচ্ছিল। সরকারি উকিল তাঁর নামে অভিযোগ করে বললেন, এই অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে মালাটেস্টার প্রচণ্ড প্রতিপত্তি; তাঁর প্রভাবে পড়ে তাদের স্বভাব-চরিত্রই একদম বদলে গেছে। তাদের অপরাধপ্রবণতা তিনি কমিয়ে ফেলেছেন; ফলে অপরাধের পরিমাণ একেবারেই কমে গেছে। অথচ সমস্ত অপরাধ করাই যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে আদালতগুলো থাকবে কী করতে? অতএব মালাটেস্টার জেল হওয়া উচিত! বাস্তবিকই মালাটেস্টাকে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হল।

দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যানার্কিজ্ম্ আর নৃশংস হানাহানি, দুটো বস্তুর নাম বড়ো বেশি একত্র জড়িয়ে গেছে। লোকে ভুলেই গেছে যে, এটারও একটা নিজস্ব দর্শন, একটা আদর্শ ছিল; সে আদর্শ একদা বহু জ্ঞানী ব্যক্তিকেও সচকিত করে তুলেছে। আদর্শ হিসেবে এটা এখনও আমাদের এই বর্তমান যুগের অতিমাত্রায়-দোষত্রুটিতে-ভরা জগৎ থেকে বহুদূর উচ্চে অবস্থিত; আমাদের আধুনিক সভ্যতা এখনও এত জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ যে, অ্যানার্কিজ্মের সহজ প্রতিকারপন্থা তার সম্বন্ধে খাটে না।

কার্ল্ মার্ক্স্ এবং শ্রমিক সংগঠনের উৎপত্তি

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে শ্রমিক-আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রবাদের ক্ষেত্রে একটি নূতন এবং অপূর্ব মানুষের আবির্ভাব হল। এঁর নাম কার্ল্ মার্ক্স্; এই চিঠিগুলোর মধ্যে আমি বহুবার তাঁর নাম করেছি। মার্ক্স্ ছিলেন একজন জর্মন ইহুদি; ১৮১৮ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং আইন ইতিহাস ও দর্শনের ছাত্র হয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। তিনি একটি সংবাদপত্র বার করেছিলেন, তাই নিয়ে জর্মনির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হল, তিনি দেশ ছেড়ে প্যারিসে চলে গেলেন। প্যারিসে তিনি নূতন নূতন লোকের সংস্পর্শে এলেন, সমাজ-তন্ত্রবাদ আর অ্যানার্কিজ্ম্ সম্বন্ধে নূতন নূতন সব বই পড়লেন, এবং নিজেও সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। এই প্যারিসেই তাঁর আর-একজন জর্মনের সঙ্গে পরিচয় হয়; এঁর নাম ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স্। ইনিও দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করছিলেন এবং ধনী কাপড়ের কল-ওয়ালা হয়ে উঠেছিলেন। ইংলণ্ডে তখন কাপড়ের কল নূতন বেড়ে উঠছে। সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে এঙ্গেল্স্ও ব্যথিত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; চার পাশে যে দারিদ্র্য আর শোষণের রাজত্ব চলেছে, তাঁর মন তার প্রতিকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সংস্কারসাধনের যে পরিকল্পনা আর চেষ্টা রবার্ট ওয়েন করেছেন এঙ্গেলসের সেটা খুব ভালো লাগল; তিনিও একজন ওয়েনাইট হয়ে উঠলেন— ওয়েনের অনুসারীদের এই নামে ডাকা হত। প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে কার্ল্ মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেল্সের প্রথম দেখা হল, ফলে তাঁরও মতামতের পরিবর্তন হল। তখন থেকেই মার্ক্স্ আর এঙ্গেল্স্ পরস্পরের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহকর্মী হয়ে গেলেন; দু জনে একই মতামত পোষণ করেন, একই লক্ষ্য নিয়ে দু জনে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে চলেন। এঁদের বয়সও প্রায় এক ছিল। এঁদের সহযোগিতা এত নিবিড় ছিল যে এঁরা যে বইগুলো বার করলেন তারও প্রায় সবগুলোই হল দু জনের একত্রে লেখা।

ফ্রান্সে তখন লুই ফিলিপ্স্ রাজত্ব করছেন। ফরাসি-সরকার মার্ক্স্কে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। মার্ক্স্ লণ্ডনে চলে গেলেন; বহু বৎসর সেখানে বাস করলেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে বইপত্র নিয়ে খুব পড়াশোনা করে নিলেন। অত্যন্ত কঠিন শ্রম করতেন তিনি; খেটেখুটে তাঁর মতামতগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ করে তুললেন এবং সেগুলো লেখার মধ্য দিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। নিছক অধ্যাপক বা দার্শনিক যাঁরা হন, মতামত নিয়ে খালি কল্পনার জাল বুনে চলেন, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনার কোনো খোঁজই রাখেন না, মার্ক্স্ কিন্তু মোটেই তাঁদের মতো ছিলেন না। সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের আদর্শটা কিছু অস্পষ্ট ছিল, তিনি তাকে সম্পূর্ণ এবং প্রাঞ্জল করে তুললেন, তার সমস্ত মতামত এবং উদ্দেশ্যকে সহজ এবং পরিষ্কার ভাষায় নির্দিষ্ট করে দিলেন; আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনটির এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠনের ব্যাপারেও একজন সক্রিয় নেতার পদ অধিকার করে বসলেন। বিপ্লবের বছরে, অর্থাৎ ১৮৪৮ সনে, ইউরোপের সর্বত্র যেসব কাণ্ড ঘটল তা দেখে স্বভাবতই মার্ক্সের মনে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য দেখা দিল। সেই বছরেই তিনি আর এঙ্গেল্স্ দু জনে মিলে একটি ইস্তাহার বার করলেন, এটি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এইটিই হচ্ছে সেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ফরাসি বিপ্লব এবং তার পরের ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সনের বিদ্রোহগুলির পিছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, এই ইস্তাহারে তাঁরা তার বিশদ বিশ্লেষণ করলেন, এবং দেখিয়ে দিলেন, বাস্তব অবস্থার প্রতিকার করবার দিক থেকে এই আয়োজন কতখানি অ-যথেষ্ট এবং অপ্রযুক্ত হয়েছিল। তখনকার গণতন্ত্রবাদীরা 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'র হুংকার ছাড়তেন; এঁরা তার সমালোচনা করলেন; যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে সাধারণ লোকের পক্ষে এই কথাগুলো একেবারেই অর্থহীন।

এগুলো হচ্ছে শুধু বুর্জোয়া-চালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরে একটা ভদ্র চেহারার আবরণ। তার পরে তাঁরা তাঁদের নিজেদের অনুসৃত নীতি, সমাজতন্ত্রবাদের কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন; এর কথা আমি তোমাকে পরে আবার বলব। ইস্তাহার শেষ করলেন তাঁরা সমস্ত শ্রমিকদের উদ্দেশে একটি আবেদনবাক্য দিয়ে: "জগতের সমস্ত শ্রমিক, এক হও! তোমাদের হারাবার কিছুই নেই, শুধু পায়ের শিকল ছাড়া; জয় করে নেবার আছে সমস্ত জগৎ!"

এই আবেদনটি ছিল কাজে নামবার আহ্বান। মার্ক্স্ শুধু আবেদন প্রচার করেই ক্ষান্ত হলেন না, সংবাদপত্রে লিখে, পুস্তিকা প্রকাশ করে অবিরাম প্রচারকার্য চালিয়ে চললেন, শ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে একত্র সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি যেন মনে মনে বুঝতে পেরেছিলেন, ইউরোপে একটা বিপুল সংকটের দিন আসন্ন হয়ে এসেছে; সেই সংকটের মুহূর্তটিকে ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে যাতে তাদের কাজ উদ্ধার করে নিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিকদের প্রস্তুত করে রাখতে চাইলেন। তিনি যে সমাজতন্ত্রী মতবাদ খাড়া করেছিলেন তার কথা অনুসারে ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাতে এই সংকট না এসেই পারে না। ১৮৫৪ সনে নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রে মার্ক্স্ লিখলেন:

"তবুও এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না, ইউরোপে একটি ষষ্ঠ শক্তি বর্তমান রয়েছে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সে তথাকথিত 'পঞ্চ মহাশক্তির' প্রত্যেকটির উপরেই তার আধিপত্য বিস্তার করে, এবং তাদের ভয়ে কম্পিত করে দেয়। এই শক্তিটির নাম বিপ্লব। দীর্ঘকাল সে নিঃশব্দে বিরাম ভোগ করছিল; এখন আবার অর্থসংকট এবং অনাহারে বিপর্যস্ত মানুষের আর্তনাদ তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করছে।...... এখন মাত্র একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা, তার পরই ইউরোপের সেই ষষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শক্তি উজ্জ্বল বর্ম এবং শানিত তরবারিতে সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, অলিম্পাসের রাজার (স্বর্গরাজের) বিদীর্ণ ললাট থেকে মিনার্ভার আবির্ভাবের মতো। সেই ইঙ্গিত তাকে জানাবে ইউরোপের আসন্ন মহাসমর।"

ইউরোপের আসন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নি। ইউরোপের খানিক অংশে বিপ্লব এসেছে, কিন্তু সে মার্ক্স্ এই কথা যখন লিখেছিলেন তার ষাট বছর পরে, বিশ্বযুদ্ধকে আশ্রয় করে। ১৮৭১ সনে একবার চেষ্টা হয়েছিল, প্যারিসের কমিউন সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে চেষ্টা নির্মম আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার ইতিহাস আমরা দেখেছি।

১৮৬৪ সনে মার্ক্স্ লণ্ডনে একটা সভা আহ্বান করলেন, নানা বিচিত্র প্রকারের লোক সেখানে এসে একত্র হল। বহু দলের লোক এল, তারা সকলেই নিজেকে কিছুটা অস্পষ্টভাবে 'সমাজতন্ত্রবাদী' বলে পরিচয় দেয়। এক দিকে এল ইউরোপের কতকগুলো বিদেশী-শাসিত দেশ থেকে গণতন্ত্রী এবং দেশপ্রেমিকের দল, এদের সমাজতন্ত্রবাদে নিষ্ঠা ছিল খুবই দূরের বস্তু, আপাতলক্ষ্য হিসাবে এদের অনেক বেশি গরজ দেখা গেল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন নিয়ে। অন্য দিকে এল অ্যানার্কিস্ট্রা, তারা তখনই যুদ্ধে নামবার জন্যে ব্যাকুল। মার্ক্সের পরেই এই সভায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে খুব বিখ্যাত ছিলেন অ্যানার্কিস্ট্ নেতা বাকুনিন; দীর্ঘ কাল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে কাটিয়ে তিনি এর তিন বছর মাত্র আগে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। বাকুনিনের দলবর্তীরা ছিলেন সাধারণত দক্ষিণ-ইউরোপের, ইতালি স্পেন প্রভৃতি 'ল্যাটিন'দেশের লোক। এই দেশগুলি ছিল শিল্পপ্রগতির দিক থেকে পশ্চাদ্বর্তী ও অনুন্নত। এঁরা সকলেই ছিলেন বেকার-বুদ্ধিজীবী বা অন্যান্য পরিমিশেলি রকমের বিপ্লবপন্থী, বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে এঁরা আশ্রয় খুঁজে পান নি। মার্ক্সের দলের লোকেরা ছিলেন সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশের, বিশেষ করে জর্মনির লোক; সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভালো। কাজেই মার্ক্স্ হলেন, নবজাগ্রত সুসংহত এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিভূ; আর বাকুনিন হলেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অসংহত শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী আর অসন্তুষ্ট লোকদের প্রতিনিধি। মার্ক্সের মত ছিল, কাজের মুহূর্ত যখন আসবে তার প্রতীক্ষায় শ্রমিকদের ধৈর্যসহকারে সুসংবদ্ধ করে এবং তাঁর সমাজতন্ত্রী মতবাদে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে—সে মুহূর্ত শীঘ্র আসবে বলে

তার ভরসা। বাকুনিন এবং তাঁর অনুচররা ছিলেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে দেবার পক্ষপাতী। মোটের উপর মার্ক্সেরই মত বজায় রইল। একটি 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ' স্থাপিত হল। এইটেই হচ্ছে শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক (সংঘ)।

এর তিন বছর পরে ১৮৬৭ সনে, জর্মনভাষায় মার্ক্সের বিখ্যাত বই 'ডাস্ ক্যাপিটাল' বা 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হল। লন্ডনে বসে তিনি বহু বৎসর ধরে যে শ্রম করেছিলেন এই বইখানা তারই ফল। এই বইয়ে তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রচলিত মতামতগুলোর বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করলেন, এবং তাঁর নিজের মত সমাজতন্ত্রবাদের বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। এটি একটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক পুঁথি। সমস্ত অস্পষ্টতা এবং সমস্ত আদর্শবাদ বাদ দিয়ে নির্বিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি ছাঁকা কাজের কথায় ইতিহাস এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের ক্রমপরিণতির সূত্র ব্যাখ্যা করলেন। বিশেষ করে আলোচনা করলেন বড়ো বড়ো কল-কারখানার সাহায্যে যে শিল্পপ্রধান সভ্যতা গড়ে উঠছিল তার জন্মকথা নিয়ে; এবং বিবর্তন ইতিহাস আর মানব-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তার সম্বন্ধে কতকগুলো অতি দূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত খাড়া করলেন। পরিষ্কার ভাষায় উচ্চারিত এবং সুসংবদ্ধ যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সের এই নূতন সমাজতন্ত্রবাদের নাম দেওয়া হল 'বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ', এতদিন যে অস্পষ্ট-করে-বলা 'ইউটোপিয়ান' (কল্পনাবহুল) বা 'আদর্শবাদী' সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত ছিল তার থেকে এটা একেবারেই আলাদা জিনিষ। মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' বইটি পড়া অবশ্য সহজ নয়; বস্তুত হাল্‌কা খুশিতে পড়বার মতো বই আর এই বইয়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব তফাত। তা হোক, পৃথিবীর যে দু-চারখানা বাছাই-করা বই অসংখ্য লোকের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে তাদের জীবনের সমস্ত আদর্শটাকেই বদলে দিয়েছে এবং মানবজাতির অগ্রগতিকেই গড়ে তুলতে চেয়েছে, এই বইটি তার মধ্যে একটি।

১৮৭১ সনে প্যারিস-কমিউনের সেই মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটল; জগতের ইতিহাসে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের বোধ হয় সেই প্রথম সজ্ঞান চেষ্টা। এর ফলে ইউরোপের সমস্ত দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে গেল, শ্রমিক-আন্দোলনের উপর আরও কঠোর পীড়ন চালাতে শুরু করল। এর পরের বছর মার্ক্সের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকদের 'আন্তর্জাতিক'এর একটি সভা হল; মার্ক্সের চেষ্টায় এর প্রধান কেন্দ্র আটলাণ্টিকের ওপারে নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করা হল। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, মার্ক্স এটা করেছিলেন বাকুনিনের অ্যানার্কিস্ট্ অনুচরদের এড়িয়ে চলবার জন্যে; তা ছাড়া তিনি হয়তো এও ভেবেছিলেন, ইউরোপের তুলনায় নিউইয়র্কেই আপাতত এর পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে, কারণ প্যারিস-কমিউনের পর থেকে ইউরোপের সরকারর সকলে একেবারে রাগে আগুণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকের প্রাণশক্তির সমস্ত বড়ো বড়ো কেন্দ্র ইউরোপে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতদূরে গিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার শক্তি সমস্তটাই সংগ্রহ করছিল যে ইউরোপ সেই ইউরোপেই শ্রমিক আন্দোলনকে প্রাণপণ লড়াই করে বেঁচে থাকতে হচ্ছিল। অতএব 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ক্রমে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মার্ক্সবাদ বা মার্ক্স-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদ ইউরোপের সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ করে জর্মনি আর অস্ট্রিয়াতে। সেখানে একে লোকে সাধারণত জানত 'সমাজ-গণতন্ত্রবাদ' এই নামে। ইংলন্ড কিন্তু একে তেমন আমল দিল না। তার তখন অনেক ধন-ঐশ্বর্য, সমাজপ্রগতির মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার তার অবসর নেই। ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতীক ছিল ফেবিয়ান সোসাইটি; অতিদূর ভবিষ্যতে অতি নিরীহ রকমের খানিক পরিবর্তন নিয়েই তার কল্পনার শেষ। শ্রমিকদের সঙ্গে ফেবিয়ানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এঁরা ছিলেন প্রগতিবাদী উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক। সেই প্রথম যুগের ফেবিয়ানদের মধ্যে এক জন হচ্ছেন—জর্জ বার্নার্ড শ; আর-এক জন বিখ্যাত ফেবিয়ান—সিড্‌নি ওয়েব; তাঁর একটি প্রসিদ্ধ বাক্য থেকে এঁদের নীতিটার স্বরূপ জানা যায়—"পরিবর্তনের মন্থর গতি অপরিহার্য"।

কমিউন-ধ্বংসের পর ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদ অতি ধীরে ধীরে পুনর্জীবন লাভ করে আবার সবল হয়ে উঠতে বারোটি বছর লেগে গেল। কিন্তু তখন সে দেখা দিল একটি নূতন রূপে,

সেটা হচ্ছে অ্যানার্কিজ্‌ম্ আর সমাজতন্ত্রবাদের একটা মিশ্রফল। এর নাম দেওয়া হল 'সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্'—কথাটা এসেছে ফরাসি শব্দ 'সিণ্ডিক্যাট' থেকে, তার মানে হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন। সমাজতন্ত্রবাদের কথা ছিল, সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি-হিসাবে রাষ্ট্রই জমি, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণগুলির স্বত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হবে। সমস্ত জিনিষ রাষ্ট্রের আয়ত্ত করে দেবার এই কাজটা কতদূর ব্যাপক হবে সে সম্বন্ধে খানিকটা মতদ্বৈধও ছিল। এ কথা সহজেই বোঝা যায়, হাতে চালাবার যন্ত্রপাতি, ঘরোয়া কলকব্জা প্রভৃতি বহু ব্যক্তিগত জিনিষ থাকে যা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই পাগলামি। কিন্তু একটা বিষয়ে সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদীই একমত ছিলেন; অন্য মানুষকে খাটিয়ে ব্যক্তিগত লাভ তুলে নেবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন সমস্ত যন্ত্রপাতি-উপকরণকেই সমাজের আয়ত্ত করে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করে, নিতে হবে। অ্যানার্কিস্ট্‌দের মতোই সিণ্ডিক্যালিস্ট্‌রাও রাষ্ট্রকে বিশেষ ভালো চোখে দেখত না, তার ক্ষমতা সংকোচ করে দিতে চাইত। এরা বলল, প্রত্যেকটি শিল্প ও কারখানার নিয়ন্ত্রণ-ভার থাকবে তারই নিজের শ্রমিকদের হাতে, তার 'সিণ্ডিক্যাটের' হাতে। এদের মতটা ছিল : প্রত্যেক সিণ্ডিক্যাট থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটা সাধারণ ব্যবস্থাপক সভা তৈরি হবে; সেই সভা সমস্ত দেশের শাসনব্যাপারের তত্ত্বাবধান করবে; রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাপারে এইটেই হবে পার্লামেণ্ট, কিন্তু কোনো শিল্প ও ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাতে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা এর থাকবে না। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবার উপায় বলে যে কর্মপন্থাটি সিণ্ডিক্যালিস্ট্‌রা স্থির করল সে হচ্ছে 'সাধারণ ধর্মঘট'—তার মানে, সমস্ত শিল্প কারখানা যানবাহন প্রভৃতি একত্র মিলে হরতাল বা ধর্মঘট করবে, সমস্ত রাষ্ট্রের জীবনযাত্রাকে একেবারে অচল করে তুলবে, এবং এই চাপ দিয়ে তাদের অভীষ্ট ব্যবস্থা আদায় করে নেবে। মার্ক্স্‌বাদীরা সিণ্ডিক্যালিজম্‌কে মোটেই সমর্থন করত না; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, সিণ্ডিক্যালিস্ট্‌রা মার্ক্স্‌কে (তাঁর মৃত্যুর পরে) তাদেরই একজন বলে মনে করত।

কার্ল্ মার্ক্স্ মারা যান ১৮৮৩ সনে, আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে। তার মধ্যেই ইংলণ্ড জর্মানি এবং অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশে বড়ো বড়ো শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। শিল্পসমৃদ্ধির বাজারে ব্রিটেনের চরম সুখের দিন তখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জর্মানি আর আমেরিকার শক্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, ব্রিটেনের প্রতিপত্তি কমে আসছে। আমেরিকার অবশ্য বিপুল-পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও সুযোগ ছিল, তার ফলে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিল্পবাণিজ্য বাড়িয়ে ফেলল। জর্মানিতে রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র (দুর্বল এবং শক্তিহীন পার্লামেণ্টের ফল) এবং শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটা অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেল। বিস্‌মার্কের আমলে এবং তার পরবর্তী কালেও, জর্মন-সরকার শিল্পবাণিজ্যকে নানা রকমে সাহায্য করছিলেন, এবং সমাজ-সংস্কারের নানাবিধ ব্যবস্থা করে শ্রমিকশ্রেণীকে করায়ত্ত করে রাখবার চেষ্টা করছিলেন; এইসব ব্যবস্থার ফলে তাদের অবস্থার খানিকটা উন্নতিও হয়েছিল। ঠিক সেইভাবে ইংলণ্ডেও উদারপন্থী দল কিছু কিছু সমাজ-সংস্কার-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করলেন; তার ফলে তাদের খাটুনির সময় কিছু কম হল, অন্য দিক দিয়েও তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। ব্যবসার সমৃদ্ধি যতদিন বজায় রইল, ততদিন এই ফন্দিটিতে বেশ ভালো ফল পাওয়া গেল, ইংলণ্ডের শ্রমিকরা নরমপন্থী এবং শান্ত হয়ে রইল, নিষ্ঠা-সহকারে উদারপন্থী দলকে তাদের ভোট দিয়ে চলল। কিন্তু ১৮৮০ সনের পরে অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইংলণ্ডের এতকালের সমৃদ্ধির যুগ শেষ হয়ে গেল, ইংলণ্ডে বাণিজ্যের বাজারে মন্দা পড়ল, শ্রমিকদেরও বেতন কমে গেল। কাজেই তখন আবার শ্রমিকশ্রেণীর ঘুম ভাঙল, বাতাসে আবার বিপ্লবের আভাস দেখা দিল। ইংলণ্ডে বহু লোক মার্ক্স্‌বাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

১৮৮৯ সনে আর-একবার একটা শ্রমিকদের 'আন্তর্জাতিক' তৈরি করবার চেষ্টা করা হল। ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদলদের মধ্যে অনেকগুলোই তখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তাদের অসংখ্য বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে। মার্ক্স্ এবং বাকুনিনের যুগের তুলনায় তখন এদের মানমর্যাদা অনেক বেশি। ১৮৮৯ সনে এই-যে আন্তর্জাতিকটি তৈরি হল (আমার ধারণা এটার

নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রমিক এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের আন্তর্জাতিক') একেই বলা হয় 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'। এটা বছর পঁচিশেক টিঁকে রইল, তার পর এল বিশ্বযুদ্ধ, তার ধাক্কা এ সামলাতে পারল না। এই আন্তর্জাতিকে বহু লোক যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা পরে নিজের নিজের দেশে বড়ো বড়ো চাকরি নিয়ে বসে গেলেন, দেখে মনে হয়, এ'দের ঠেলে তুলে একটা বড়ো জায়গাতে বসিয়ে দেবার জন্যেই শ্রমিকশক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন, তার পর নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে তার ভাগ্যে যা হয় হোক বলে সরে পড়লেন। এ'রা এক-এক জন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হয়ে বসলেন, জীবনযুদ্ধে জয়ীর আসন দখল করলেন; যে লক্ষ লক্ষ লোক সে আসন অধিকার করতে এ'দের সাহায্য করেছিল, এ'দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদের এ'রা অকাতরে ত্যাগ করলেন, তারা যেখানকার সেইখানেই পড়ে রইল। এইসব নেতারা, এ'দের অনেকে মার্ক্সের নাম করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, অনেকেই ছিলেন প্রচণ্ড উৎসাহী সিণ্ডিক্যালিস্ট, তাঁরা পর্যন্ত পার্লামেন্টের সভ্য বা মোটা বেতনের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারী হয়ে বসলেন; হটকারিতা করে তাঁদের সে সুখের চাকরিকে বিপন্ন করা তাঁদের পক্ষে ক্রমেই কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠল। কাজেই তাঁরা শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক হয়ে গেলেন। সাধারণ শ্রমিকের দল যখন হতাশায় মরীয়া হয়ে বিপ্লবপন্থী হয়ে উঠল এবং কাজ আরও করতে চাইল তখন এ'রাই তাদের দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন। জর্মনিতে (মহাযুদ্ধের পরে) সমাজ-গণতন্ত্রী-নেতারা সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং চ্যান্সেলর হয়ে বসলেন। ফ্রান্সে ব্রিয়াঁ একদা ছিলেন খুব তেজস্বী সিণ্ডিক্যালিস্ট, সাধারণ ধর্মঘটের কথা জোর গলায় প্রচার করতেন। তিনি এগারো বার প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং তারই পুরোনো সহকর্মীদের একটি ধর্মঘটকে ভেঙে চূর্ণ করে দিলেন; ইংলণ্ডে হলেন র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌-ডোনাল্ড্‌ প্রধানমন্ত্রী, যদিও তাঁকে যারা বড়ো করে তুলেছিল তাঁর নিজের সেই শ্রমিকদলকে তিনি ত্যাগ করেছেন। সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, অস্ট্রিয়া সর্বত্রই এই ব্যাপার। পশ্চিম-ইউরোপের সর্বত্র ভরে রয়েছেন সব ডিক্‌টেটর আর শাসনকর্তারা; এ'রা সকলেই প্রথম-বয়সে সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন, তার পর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ'রা শান্ত হয়ে গেছেন, নিজেদের পুরোনো লক্ষ্যের জন্য একদা যে আগুন মনে জ্বলেছিল তাকে গেছেন ভুলে, এমনকি অনেকসময় তাঁদেরই এককালের সহকর্মীদের সর্বনাশ-সাধনে ব্রতী হয়েছেন। ইতালির ডুচে মুসোলিনি একদা সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন; পোল্যাণ্ডের ডিক্‌টেটর পিল্‌সুদ্‌স্‌কিও তাই।

শ্রমিক-আন্দোলন, এবং প্রায় সমস্ত দেশেরই স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন এইভাবে তার নেতা এবং প্রধান কর্মীদের স্বধর্মচ্যুতির ফলে বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে। কিছু দিন পরে এ'রা শ্রান্ত হয়ে পড়েন, অসাফল্যে হন ভগ্নাশ্বাস; শহিদদের শূন্য মুকুট আর তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। ক্রমে এ'দের তেজ কমে আসে, উৎসাহের শিখা আসে নিষ্প্রভ হয়ে। এ'দেরই মধ্যে যাঁরা আবার বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা যাঁরা চক্ষুলজ্জার ধার কম ধারেন, তাঁরা সোজাসুজিই বিপক্ষ দলে গিয়ে যোগ দেন, এতদিন যাঁদের সঙ্গে বিরোধিতা বা সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁদের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে সন্ধি-স্থাপন করে নেন। মানুষ যে কাজ নিজেই করতে চায় তার সঙ্গে বিবেককে মিলিয়ে নেওয়া শক্ত নয়। এদের এই দলত্যাগের ফলে আন্দোলনটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একটুক্ষণের জন্য পিছিয়ে পড়ে। যারা শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াই করে অধীনস্থ জাতিতে পরিণত করে রাখে তারাও একথা ভালো করেই জানে; তাই তারা সমস্তরকম লোভ দেখিয়ে মিষ্টি কথা বলে এ পক্ষের ব্যক্তিদের নিজেদের পক্ষে টেনে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এরা বেছে বেছে দু-চার জন ব্যক্তিকে খাতির দেখালে বা কিছু ভালো ভালো কথা বললেও তাতে সাধারণ শ্রমিকের জনতা বা স্বাধীনতা-কামী পরাধীন জাতির দুর্দশার প্রতিকার হয় না। কাজেই দু-চার জন হয়তো তাকে ছেড়ে চলে যায়, মাঝে মাঝে হয়তো বিপর্যয় আসে, তবুও সে সংগ্রাম সমানেই চলতে থাকে, যতদিনে না তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৮৮৯ সনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক স্থাপিত হল, তার লোকবল এবং মর্যাদাও ক্রমে বাড়তে লাগল। পার্লামেন্টে সভ্য নির্বাচন করবার জন্য যে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে তার সদ্‌ব্যবহার করতে তাঁরা স্বীকৃত হন নি, এই যুক্তি দেখিয়ে কয়েক বছর পরে মালাটেস্টা প্রমুখ

অ্যানার্কিস্ট্‌দের এই আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল। আন্তর্জাতিকের মধ্যে যে সমাজতন্ত্রবাদীরা রইল তারা স্পষ্টই প্রমাণ করল, একত্র দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালাবার ব্যাপারে তারা তাদের পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে দল বাঁধার চেয়ে পার্লামেন্টে ঢোকাই বেশি পছন্দ করে। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলে তখন সমাজতন্ত্রবাদীদের কী কর্তব্য হবে, সে বিষয়ে এরা খুব লম্বাচওড়া ঘোষণা প্রচার করতে লাগল। তাদের কাজের দিক থেকে সমাজতন্ত্রবাদীরা দেশ বা জাতির সীমানাকে স্বীকার করত না। সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদী বলতে যা বোঝায় তাও তারা ছিল না। তারা জোরগলায় প্রচার করল, তারা যুদ্ধের বিরোধিতা করবে। কিন্তু ১৯১৪ সনে যুদ্ধ যখন সত্যই শুরু হল, দেখা গেল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত কাঠামোটাই ভেঙে পড়েছে; প্রত্যেক দেশের সমাজতন্ত্রবাদী এবং শ্রমিক দলেরা, এমনকি ক্রোপটকিনের মতো অ্যানার্কিস্ট্‌রা পর্যন্ত অন্য সকলের মতোই উন্মত্ত জাতীয়তাবাদী এবং অন্য দেশের দারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে। দু-চার জন মাত্র লোক তখনও সত্যই যুদ্ধের বিরোধী হয়ে রইলেন; তাঁদের নানা রকমে দারুণ নির্যাতন সইতে হল, অনেকে দীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হলেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, ১৯১৯ সনে, মস্কো-শহরে লেনিন নূতন একটি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সৃষ্টি করলেন। এটি হল একটি খাঁটি কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান; যাঁরা প্রকাশ্যভাবে কমিউনিস্ট বলে নাম লিখিয়েছেন তাঁরাই মাত্র এর সভ্য হতে পারবেন। এটি এখনও টিঁকে আছে, এর নাম হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধ্বংসাবশেষ যারা ছিল তারাও যুদ্ধের পরে ধীরে ধীরে আবার একত্র গুছিয়ে বসল। এদের কতক মস্কোর নূতন তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিল; কিন্তু এদের অধিকাংশই মস্কো এবং তার মতবাদকে মনেপ্রাণে অপছন্দ করত। এরা তার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে রাজি হল না। এরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককেই আবার গড়ে তুলল। এটাও এখনও বেঁচে রয়েছে। সুতরাং এখনকার দিনে শ্রমিকদের দুটি আন্তর্জাতিক সংঘ বর্তমান রয়েছে, এদের সংক্ষেপে বলা হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক। আশ্চর্যের বিষয়, এরা উভয়েই নীতি বলে স্বীকার করে মার্ক্সের মতকে: দু পক্ষই সে মতের নিজস্ব ব্যাখ্যা খাড়া করে নিয়েছে।

ও দিকে কিন্তু এরা আবার পরস্পর সম্বন্ধে এতখানি বিদ্বেষ পোষণ করে যে, উভয়ের শত্রু ধনিকতন্ত্র সম্বন্ধেও এদের বিদ্বেষ তত নিদারুণ নয়।

পৃথিবীতে যেখানে যত ট্রেড ইউনিয়ন আর শ্রমিক-সংঘ আছে তার সবগুলো এই দুটি আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নয়; এদের অনেকগুলোই আছে যারা নিরপেক্ষ, স্বাধীন রয়ে গেছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলো দূরে সরে আছে, কারণ তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অতিমাত্রায় রক্ষণপন্থী। ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এর কোনো আন্তর্জাতিকে যোগ দেয় নি।

'ইণ্টারন্যাশনাল' গানটি হয়তো তুমি জান। সমস্ত পৃথিবীতে এইটিই হচ্ছে শ্রমিক আর সমাজতন্ত্রবাদীদের নিজস্ব সংগীত।

১৩৪

মার্ক্‌স্‌বাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের ক্ষেত্রে মার্ক্‌সের মতামত একেবারে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। গেল চিঠিতেই এর কথা তোমাকে খানিকটা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু সে চিঠিটা এমনিতেই দারুণ লম্বা হয়ে গেল, কাজেই এটা মুলতবি রাখতে হল। আমার পক্ষে এর কথা লেখা অবশ্য সহজ নয়, কারণ আমি এটার সম্বন্ধে খুব বিশেষজ্ঞ নই; আর এটা এমনই বস্তু, বিশেষজ্ঞ আর পণ্ডিতদের মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। আমি তোমাকে শুধু মার্ক্‌স্‌বাদের মূল নীতি কয়েকটাই বলব, শক্ত অংশগুলো বাদ দিয়ে যাব। তুমি এর থেকে একটি জোড়া-তালি-দেওয়া ছবি মাত্র পাবে; কিন্তু এই চিঠিগুলোতে কোনো-কিছুরই তো আমি সম্পূর্ণ এবং বিশদ চিত্র দিচ্ছি না!

সমাজতন্ত্রবাদেরও অনেক রকম আছে, সে কথা তোমাকে বলেছি। এক জায়গাতে অবশ্য সবাই একমত; এর লক্ষ্য হচ্ছে—জমি, খনি, কারখানা ইত্যাদি সমস্ত রকমের উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলো, রেলওয়ে প্রভৃতি বণ্টন প্রণালী,—এবং ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্তই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মানে কথাটা হচ্ছে, এইসব প্রক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠানকে আয়ত্ত করে বা অন্যের শ্রমশক্তিকে নিজের করায়ত্ত করে নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার সুযোগ কোনো ব্যক্তিকেই দেওয়া হবে না। এখনকার দিনে এর প্রায় সমস্তই রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের হাতে, এরা তাকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করছে। তার ফলে কতক লোকের ধনসম্পত্তি বেড়ে চলেছে, ওদিকে সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সাধারণ লোক সকলেই দরিদ্র হয়ে থাকছে। আবার উৎপাদন-সঙ্গতির এইসব মালিক ও নিয়ন্ত্রকদেরও অনেকখানি উদ্যম নষ্ট হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে—এদের মধ্যে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর গলা-কাটাকাটিরই সম্পর্ক। এইভাবে পরস্পর মারামারি করে মরবার বদলে যদি ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে উৎপাদন আর ধনবণ্টনের একটা ভালো ব্যবস্থা খাড়া করা যেত তবে সমাজের অবস্থা ফিরে যেত, অপচয় আর অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন থাকত না, বিভিন্ন শ্রেণী ও ব্যক্তির মধ্যে ধনসম্পত্তির যে বিপুল বৈষম্য এখন রয়েছে সেটাও অন্তর্হিত হয়ে যেত। এইজন্যই উৎপাদন, ধনবণ্টন এবং আরও কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজকর্মকে প্রধানত সমাজের আয়ত্ত করে, অর্থাৎ, রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের অধীন করে দেওয়া উচিত। এইটেই হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের মূল তত্ত্ব।

সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তখন রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থার রূপ কী হবে, সে প্রশ্নটা আলাদা; খুব দরকারি প্রশ্ন নিশ্চয়ই, কিন্তু আপাতত তার আলোচনা করতে যাওয়া আমাদের দরকার নেই।

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ সম্বন্ধে যদি একমত হওয়া গেল, তার পরের কথাটি হচ্ছে, কী করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার উপায় স্থির করা। এইখানে এসে সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে মতভেদ হল, নানান দল নানান রকমের পন্থার নির্দেশ দিল। মোটামুটি এদের দুটি ভাগে দেখা যায় : (১) ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটানোর পক্ষপাতী বিবর্তনবাদী দলগুলি; এরা আস্তে আস্তে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাবার এবং পার্লামেণ্টের ভিতরে থেকে কাজ করবার পক্ষপাতী; এদের দৃষ্টান্ত—ব্রিটেনের শ্রমিক-দল বা ফেবিয়ান সোসাইটি। (২) বিপ্লবপন্থী দলগুলি; পার্লামেণ্টের মধ্যে গিয়ে বিশেষ-কিছু হবে বলে এদের বিশ্বাস নেই। এই দলগুলির অধিকাংশই মার্ক্‌স্‌বাদী।

এর মধ্যে প্রথমগুলি অর্থাৎ বিবর্তনপন্থী দলগুলি এখন অত্যন্ত ছোটো; ইংলণ্ডে পর্যন্ত এদের শক্তি ক্রমশ কমে আসছে, উদারপন্থীদল এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলদের সঙ্গে এর তফাতও ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আজকাল মার্ক্‌স্‌বাদকেই সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদীদের সাধারণ ধর্ম

বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মার্ক্স্‌বাদীদের মধ্যেও আবার ইউরোপে প্রধানত দুইটি ভাগ—একদিকে হচ্ছে রাশিয়ার কমিউনিস্ট্‌রা; আর অন্য দিকে রয়েছে জর্মনি, অস্ট্রিয়া এবং আরও সব দেশের পুরোনো সমাজ-গণতন্ত্রবাদীরা; এদের মধ্যে সদ্ভাবও মোটেই নেই। এই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলো এদের যেসব উদ্দেশ্য ইত্যাদির নাম করে হাঁকডাক করত, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরবর্তী কালে তাকে এরা কার্যে পরিণত করতে পারে নি; তার ফলে এককালে এদের যে সম্মান-প্রতিপত্তি ছিল তারও অনেকখানিই এরা এখন হারিয়েছে। এদের মধ্যে একটু বেশি উৎসাহী যারা তাদের অনেকে এখন গিয়ে কমিউনিস্টদের দলে যোগ দিয়েছে; কিন্তু এখনও পশ্চিম-ইউরোপের বড়ো বড়ো ট্রেড-ইউনিয়নগুলো চলছে এদেরই ইঙ্গিতে। রাশিয়াতে সাফল্য অর্জন করবার ফলে কমিউনিজ্‌মের এখন উঠতি-দশা। ইউরোপে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এইটেই আজকাল হয়ে উঠেছে ধনিকতন্ত্রের প্রধান শত্রু।

এখন এই—মার্ক্স্‌বাদ বস্তুটি কী? এটা হচ্ছে, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রা, মানুষের কামনা-বাসনা, সমস্ত-কিছুকেই ব্যাখ্যা করবার একটা ধারা। এটা একই সঙ্গে একটা তত্ত্বদর্শন এবং একটা কর্মসূচী। এ এক রকমের দর্শনশাস্ত্র, মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত কার্যকলাপ নিয়েই এর আলোচনা। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—মানুষের সমগ্র ইতিহাসকে একটা স্থির যুক্তিসম্মত ধারাতে পরিণত করতেই এ চেষ্টা করেছে; সে ধারার মধ্যে ভাগ্য বা কিস্‌মৎ'এর মতো একটা অলঙ্ঘ্য ব্যাপার কিছু আছে। জীবন বস্তুটা সত্যই এতখানি যুক্তিযুক্ত পথে এবং কতকগুলো শর্তে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং পদ্ধতি মেনে চলে কি না, সে কথাটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না; অনেকে এ সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মার্ক্স্‌ অতীত ইতিহাসকে একেবারে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন এবং তার থেকে বিশেষ কতকগুলো সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, সেই প্রথম দিন থেকেই মানুষকে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে; এক দিকে যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে, অন্য দিকে তেমনি অন্য মানুষেরও সঙ্গে তার সে সংগ্রাম। খাদ্য এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে সে পরিশ্রম করেছে; সে পরিশ্রমের পদ্ধতি কালে কালে ক্রমে ক্রমে বদ্‌লে চলেছে, ক্রমেই বেশি জটিল ও উন্নত-ধরনের হয়ে উঠেছে। মার্ক্সের মতে, জীবিকা-উৎপাদনের এই পদ্ধতিগুলিই হচ্ছে প্রত্যেক যুগের মানুষের জীবনে এবং সমাজের জীবনে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার। ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগেই এদের প্রভাব সুস্পষ্ট; প্রতি যুগে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ, সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধের উপরে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট; এদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসে এবং সমাজে বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। এইসব পরিবর্তনের ফল কতদূর ব্যাপক হয় তার কিছু কিছু নমুনা আমরা এই চিঠিগুলোর মধ্যেই দেখেছি। যেমন, প্রথম যখন কৃষির প্রবর্তন হল, তার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা অনেকখানি বদ্‌লে গেল। যাযাবর মানুষ এক জায়গাতে ঘর বেঁধে বসল, গ্রাম এবং শহর সৃষ্টি হল। কৃষিতে উৎপাদন বেশি হয়। সুতরাং কিছু উদ্‌বৃত্ত ফসল পাওয়া গেল; তার ফলে বাড়ল লোকসংখ্যা, বাড়ল মানুষের ধনসম্পদ আর অবসর; তার ফলেই আবার জন্ম হল কলাশিল্প আর কারুশিল্পের। এর আর-একটি বড়ো দৃষ্টান্ত হচ্ছে শিল্পবিপ্লব; সেখানে উৎপাদনের কাজে বড়ো বড়ো কল-কারখানা প্রবর্তন করবার ফলে প্রচণ্ড একটা পরিবর্তন এসে গেল। এমনিতর দৃষ্টান্ত আরও বহু রয়েছে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রতিটি যুগেই উৎপাদনের যে রীতিপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর মানুষ পরিণতির পথে চলতে যে স্তরটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, এই দুয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান থাকে। এই উৎপাদনের কাজকে সম্পূর্ণ করতে হলেই, এবং এর ফলেও, মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে নানারকম কাজকারবারের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় (যেমন পণ্য-বিনিময়, পণ্য-ক্রয়বিক্রয়, মুদ্রা-বিনিময় ইত্যাদি); এইসব কাজ কী রকমের হবে তাও স্থির হয় তার উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসারে। মানুষের মধ্যে এই নানা রকমের সব সম্পর্ক আর কাজকারবারকে একত্র করে যে বস্তুটি দাঁড়ায় তারই নাম হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। আবার সেই অর্থনৈতিক জীবনকে আশ্রয় করেই তার আইন, রাজনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ, মতামত ইত্যাদি

সমস্ত ব্যাপার গড়ে ওঠে। কাজেই মার্ক্‌সের এই মত অনুসারে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের পদ্ধতি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা বদলে যায়, তার ফলে আবার মানুষের চিন্তাধারা মতামত আইন রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেও পরিবর্তন ঘটে।

ইতিহাসের আরও একটি রূপ মার্ক্‌সের চোখে ধরা পড়ল; তিনি বললেন, এ হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংগ্রামের বিবরণ। "অতীত বা বর্তমান, সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাসই আসলে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।" উৎপাদনের সঙ্গতি যার করায়ত্ত, সেই শ্রেণীটিই সমাজে প্রভুত্ব করে। অন্যান্য শ্রেণীদের সে নিজের কাজে খাটিয়ে নেয়, নিজের লাভের সংস্থান করে নেয়। পরিশ্রম যারা করছে তারা সে শ্রমের পুরো মূল্য বুঝে পায় না। তার খানিকটা অংশমাত্র তারা পায়; তাই দিয়ে কোনোমতে নেহাত যেটুকু না হলে নয় তাই জোগাড় করে জীবনযাপন করে; বাকি উদ্‌বৃত্ত অংশটা চলে যায় শোষকশ্রেণীর হাতে। এই উদ্‌বৃত্ত অংশটার দৌলতে শোষকশ্রেণীটা ক্রমশই ধনসম্পদে ফেঁপে উঠতে থাকে। রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থাও এরাই চালায়, কারণ উৎপাদনের ব্যাপারটা এদের করায়ত্ত; সুতরাং রাষ্ট্রেরও প্রধান লক্ষ্যই হয়ে ওঠে, এই শাসক শ্রেণীটিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে চলা। মার্ক্‌স্‌ বলেছেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি, এর কাজই হল শাসক-শ্রেণীটার সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থা করা।" এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইন রচনা করা হয়; শিক্ষা ধর্ম এবং আরও নানাবিধ উপায়ে লোককে ভাবতে শেখানো হয় যে, এই শ্রেণীটা সমাজে প্রভুত্ব করবে এইটেই হচ্ছে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। শাসনব্যবস্থা এবং আইন যে আসলে একটিমাত্র শ্রেণীর প্রয়োজনে চলছে সে তথ্যটিকে এইসব বিষয়ের সাহায্যে যথাসম্ভব ঢাকাচুকি দিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়। যেন অন্যান্য যেসমস্ত শ্রেণীকে শোষণ করা হচ্ছে তারা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে না পারে, বুঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে না উঠতে পারে। তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি নেহাত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এই ব্যবস্থার দোষত্রুটি দেখাবার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় সমাজের শত্রু, নৈতিকতার শত্রু, প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রীতিনীতির উচ্ছেদকামী। এই অভিযোগ দেখিয়ে রাষ্ট্র তাকে বিচূর্ণ করে দেয়।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও একটা শ্রেণী কখনও চিরদিন সমাজের মাথায় চড়ে বসে থাকতে পারে না। যে কারণগুলো একদিন তাকে উপরে তুলে বসিয়েছিল সেইগুলোই পরে আবার তাকে দুর্বল করে ফেলে। উৎপাদনের তৎকালীন সঙ্গতিগুলো একদা তার আয়ত্তে ছিল, সেইজন্যেই সেও শাসক এবং শোষক হয়ে বসতে পেরেছিল। কিন্তু তার পর আবার উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়; এগুলো যেসব নূতনতর শ্রেণীর করায়ত্ত তাদের কাজেকাজেই প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, তারা আর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে রাজি হয় না। নূতন নূতন চিন্তাধারা এসে মানুষের মনকে দোলা দিয়ে যায়; আসে এমন একটা বস্তু, যাকে বলা যেতে পারে একটা আদর্শের বিপ্লব; মানুষের পায়ে প্রাচীন মতামত আর সংস্কারের শৃঙ্খল তার আঘাতে ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে যায়। তখন লাগে লড়াই; এক দিকে এই নবাগত শ্রেণী, যে সদ্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; অন্য দিকে প্রাচীন শ্রেণী, যে তার পুরোনো শক্তিকে প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চাইছে। এই সংগ্রামে নূতন শ্রেণীটির জয় অবশ্যম্ভাবী, কারণ, এখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা এরই করায়ত্ত রয়েছে; পুরোনো শ্রেণীটিকে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে মার খেয়ে বেরিয়ে যেতে হয়—সে মঞ্চে তার যে ভূমিকা ছিল তার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

নূতন শ্রেণীটির এই জয়টা একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রণজয়; উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি পুরোনো পদ্ধতিকে পাল্লায় হারিয়ে দিয়েছে, এটা হচ্ছে সেই জয়ের প্রতীক। অতএব এর সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন আসতে থাকে—নূতন চিন্তাধারা, নূতন রাজনৈতিক কাঠামো, আইন, রীতিনীতি, প্রত্যেক ব্যাপারেই এর প্রভাব পড়ে। এই নূতন শ্রেণীটিই এখন তার অধীনস্থ অন্যান্য শ্রেণীদের শোষক হয়ে ওঠে, যত দিনে না আবার তাদের কেউ বড়ো হয়ে উঠে একে হটিয়ে দেয়। এমনি করে এই লড়াই চলতে থাকে; যত দিন একটি শ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীকে শোষণ করবে তত দিনই এই লড়াই চলবে। এর অবসান হবে শুধু সেই দিনই যে দিন সমস্ত শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়ে একটিমাত্র শ্রেণী সমাজে টিঁকে থাকবে, কারণ সে দিন আর একজনের আর-একজনকে শোষণ করবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না—নিজেকে নিজে শোষণ করার সাধ্য কারোই নেই। তখনই শুধু আসবে সমাজে শক্তির সাম্য, আসবে মানুষে মানুষে পূর্ণ

সহযোগিতা; এখনকার দিনে যে অবিরাম সংগ্রাম আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ চলেছে তার অবসান হবে। রাষ্ট্রের এখন প্রধান কাজই হচ্ছে দণ্ডবিধান। সেটাও আর থাকবে না, কারণ, যাকে দণ্ড দিতে হবে এমন কোনো শ্রেণীরই তো আর অস্তিত্ব থাকল না! তখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিজেই "শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে" যাবে; এবং এইভাবেই ক্রমে অ্যানার্কিস্ট্‌রা যে আদর্শ প্রচার করেছিল তারও কাছাকাছি আমরা গিয়ে উপস্থিত হব।

কাজেই দেখো, মার্ক্‌স্‌ ইতিহাসকে দেখলেন বিবর্তনের একটা বিরাট মিছিল বলে; একটির পর একটি অপরিহার্য শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে তার শোভাযাত্রা। রাশিকৃত তথ্য আর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন অতীত কালে এই সংগ্রাম কীভাবে চলেছে, কীরকম করে বড়ো বড়ো কলকারখানার আবির্ভাবের ফলে সামন্ত-যুগ বদলে গিয়ে ধনিকতন্ত্রী-যুগে রূপান্তরিত হয়েছে, সামন্তশ্রেণী লুপ্ত হয়ে গিয়ে তার স্থান দখল করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী। তাঁর মতে এই শ্রেণীসংগ্রামের শেষ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের এই যুগেই, বুর্জোয়া আর শ্রমিক এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে। ধনিকতন্ত্র নিজেই এই নূতন শ্রমিকশ্রেণীটির সৃষ্টি করেছে, এর লোকসংখ্যা এবং শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে; শেষ পর্যন্ত এক দিন এই শ্রেণীটিই তাকে পরাভূত করবে, করে শ্রেণীবিহীন সমাজ এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করবে।

ইতিহাস-অধ্যয়নের এই-যে নূতন ভঙ্গিটিকে মার্ক্‌স্‌ ব্যাখ্যা করলেন, এর নাম দেওয়া হল 'ইতিহাসের বস্তুতন্ত্রী ব্যাখ্যা'। 'বস্তুতন্ত্রী' একে বলা হল তার কারণ, এটা 'আদর্শবাদী' নয়। মার্ক্‌সের কালের দার্শনিকরা ঐ কথাটিকে বিশেষ একটি অর্থে খুব বেশি ব্যবহার করছিলেন। বিবর্তনবাদটা তখন মানুষে আগ্রহভরে শুনছে। বিভিন্ন জীব-জাতির উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে ডারুউইন এর কথা বলেছিলেন, সাধারণ লোকেরাও তাঁর সে মত স্বীকার করে নিয়েছিল—সে কথা তোমাকে বলেছি। কিন্তু তাঁর সে মতামত দিয়ে সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ তার স্বরূপ নির্ণয় করা যেত না। দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে মানুষের প্রগতির ব্যাখ্যা করতে চাইলেন অস্পষ্ট সব আদর্শবাদী মতামত দিয়ে, মনের উৎকর্ষ ইত্যাদি বলে। মার্ক্‌স্‌ বললেন, এসব কথা একদম ভুল। তিনি বললেন, হাওয়ায়-ভাসা কল্পনা আর অস্পষ্ট আদর্শবাদ, এগুলো রীতিমতো বিপজ্জনক জিনিষ; কারণ, এর ফলে মানুষ এমন-সমস্ত ব্যাপার কল্পনা করে নিতে চায় যার মূলে কিছুমাত্র সত্য নেই। অতএব তিনি এর চেয়ে অনেকখানি হাতেকলমে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে বসলেন। এই থেকেই 'বস্তুতন্ত্র' নামটার সৃষ্টি।

মার্ক্‌স্‌ আগাগোড়াই শোষণ আর শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেছেন। আমরাও অনেকে বলি এবং বলতে বলতে তাই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। কিন্তু মার্ক্‌সের মতে এটা রাগ করবার কথা নয়, কিংবা ভালো সদুপদেশ দেওয়ার ব্যাপার নয়। শোষণ ক্রিয়াটি যে লোকটি শোষণ করছে তার অপরাধ নয়। একটা শ্রেণী আর-একটার উপরে প্রভুত্ব করছে এটা ঐতিহাসিক অগ্রগতিরই স্বাভাবিক ফল; যথাসময়ে আবার এই নিয়ম বদলে গিয়ে আর-একরকম নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হবে। কোনো-একটি ব্যক্তি যদিই সেই প্রভু-শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে এবং সে হিসাবে অন্যদের শোষণে ব্যাপৃত থেকে থাকে, সেটাও তার পক্ষে মারাত্মক পাপ কিছু নয়। সে শুধু এই ব্যবস্থাটার একটা অংশ মাত্র; তার জন্য তাকে কতকগুলো বিশ্রী গালাগাল দেওয়ার কোনোই মানে হয় না। ব্যক্তি আর ব্যবস্থা এক নয়, দুয়ের মধ্যে এই প্রভেদটা আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন, আমরা সে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করছি। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথাটিকে যে-ইংরেজরা টিঁকিয়ে রাখছে তাদের তো কোনো দোষ নেই! তারা শুধু প্রকাণ্ড একটা কলের ছোটো ছোটো কতকগুলো চাকার দাঁত, সে কলের গতির কোনোরকম তারতম্য ঘটানোর সাধ্য তাদের নেই। ঠিক সেইরকম আমাদের অনেকের হয়তো ধারণা আছে, জমিদারি-প্রথাটা একেবারেই খারাপ, প্রজাদের তাতে নিদারুণ ক্ষতি হয়, তাদের ভয়ানক রকম শোষণ করে নেওয়া হয়। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে, ব্যক্তিহিসাবে জমিদারই এর জন্যে দায়ি। তেমনি ধনিকদেরও অনেক সময়ে শোষক বলে গালাগাল দেওয়া হয়। কিন্তু এর সর্বত্রই দোষ আসলে ব্যবস্থাটার, ব্যক্তির নয়।

শ্রেণীরা সংগ্রাম করো, এ কথা মার্ক্‌স্‌ কখনও বলেন নি। তিনি দেখিয়েছিলেন, এই সংগ্রাম

বস্তুত চলছে, চিরকালই কোনো-না-কোনো রূপে চলে এসেছে। 'ক্যাপিটাল' বইটি তিনি লিখেছিলেন "আধুনিক সমাজ যে গতিবেগ নিয়ে চলছে তার মধ্যকার অর্থনৈতিক সূত্রটিকে অনাবৃত করে দেবার" উদ্দেশ্যে। এই অনাবৃত করে দেবার ফলেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে হিংস্র সংগ্রাম চলেছে সেটা আবিষ্কৃত হয়ে পড়ল। এই সংগ্রামগুলোকে সর্বত্র শ্রেণীসংগ্রাম বলে স্পষ্ট বোঝা যায় না; কারণ, যে শ্রেণীটি প্রভুত্ব করছে সে সর্বদাই, সেও যে একটা বিশেষ শ্রেণী, এই তথ্যটা গোপন করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন বর্তমান ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়, তখন সে তার সমস্ত ভান আর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে একেবারে তার প্রকৃত স্বরূপ ধারণ করে; তখনই সেই বিভিন্ন শ্রেণীদের মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে যায়। এ যখন ঘটে তখন গণতন্ত্রের যেসব রূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাধারণ আইনকানুন, কাজকর্মের প্রকারপদ্ধতি, সমস্ত কোথায় মিলিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, এই শ্রেণী-সংগ্রামের মূলে থাকে মানুষের ভুল-বোঝা, বা আন্দোলনকারীদের শয়তানি। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। এই সংগ্রামের মূল সমাজের নিজের মধ্যেই মিশে আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থে কোথায় সংঘাত, সেটা মানুষ যত ভালো বুঝতে পারে, এই সংগ্রামের তীব্রতাও বস্তুত ততই বেড়ে যায়।

মার্ক্সের এই মতটাকে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে একটু মিলিয়ে দেখা যাক। ব্রিটিশ সরকার বহুদিন ধরেই বলে আসছে, তারা যে ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে সেটা শুধু ন্যায়ধর্ম আর ভারতের প্রজার কল্যাণের খাতিরে। একসময়ে আমাদের দেশের বহু লোক এই কথাটার অন্তত কিছুটা সত্য বলে বিশ্বাস করত, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এই শাসনের বিরুদ্ধে প্রজারা একটা খুব বড়ো আন্দোলন শুরু করেছে, অতএব সে শাসনের সত্য স্বরূপটিও একেবারে রূঢ় নগ্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে; এই-যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থা নিছক সঙিনের জোরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে, আজকের দিনে তার যথার্থ স্বরূপটি আর নেহাত জড়বুদ্ধি মানুষেরও চোখে পড়তে দেরি হয় না। যত সাচ্চা চুম্‌কির আবরণ আর মিষ্টি কথার ভান তার এত দিন ছিল, এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। নানান রকমের স্পেশাল অর্ডিন্যান্স; কথা বলবার, সভাসমিতি করবার, বই ছেপে বার করবার যে অতিসাধারণ অধিকার মানুষের থাকে সেগুলোকে যথাসাধ্য চেপে মারবার ব্যবস্থা, এইসবই হয়ে উঠেছে দেশের সাধারণ আইনকানুন আর ক্রিয়াকলাপের নমুনা। যে কর্তৃপক্ষ দেশে অধিষ্ঠিত রয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন যত প্রবল হয়ে ওঠে, এইসব ব্যাপারও ততই বেড়ে চলে। একটি শ্রেণী যখন সত্যি করে আর-একটি শ্রেণীকে নষ্ট করে দিতে চায় তখনও ঠিক এই ব্যাপারই হয়। আমাদের দেশেই আজকাল তাও ঘটছে; চাষি-মজুরদের প্রতি, এবং তাদের ভালোর জন্যে যে কর্মীরা কাজ করছেন তাঁদের প্রতি যে বর্বরোচিত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হচ্ছে, সে এরই প্রমাণ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মার্ক্স্ ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিলেন সেটি হচ্ছে এই : সমাজ অবিশ্রাম পরিবর্তন এবং অগ্রগতির পথে বয়ে চলেছে। তার মধ্যে স্থির কিছু নেই; এটা একেবারেই একটা গতিপ্রধান বস্তু। যাই ঘটুক-না কেন, সে তার পথে এগিয়ে চলবে, অপ্রতিহত সে গতি। একটি সমাজব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়ে আর-একটি ব্যবস্থা এসে তার স্থান অধিকার করবে। কিন্তু একটি ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাবে শুধু তখনই যখন সে তার সম্পূর্ণ পরিণত রূপে গিয়ে পৌঁচেছে, যখন তার সমস্ত কর্তব্য করা শেষ হয়ে গিয়েছে। সমাজ যে ক্ষেত্রে এর পরে আরও বেড়ে চলে সেখানে তাকে বস্ত্র-পরিবর্তন করে নিতে হয়—পুরোনো রীতিনীতি-শৃঙ্খলার যে পরিচ্ছদ এত দিন সে পরে ছিল সেটা এখন গায়ে অতিরিক্ত খাটো হয়ে গেছে, তার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করছে; কাজেই তখন সে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, নূতনতর এবং বৃহত্তর পরিচ্ছদ ধারণ করে।

মার্ক্স্ বলেন, ক্রম-পরিণতির এই-যে বিরাট ঐতিহাসিক জয়যাত্রা চলেছে, মানুষের কাজ হচ্ছে একে সাহায্য করা। এর প্রথম দিকের সমস্ত স্তরগুলি আমরা পার হয়ে চলে এসেছি। শেষ শ্রেণীসংগ্রামটি এখন চলেছে, এই সংগ্রাম হচ্ছে ধনিকতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। (এটা অবশ্য অগ্রগামী শিল্পতন্ত্রী দেশগুলির কথা, যেখানে ধনিকতন্ত্র পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে। অন্যান্য যেসব দেশে ধনিকতন্ত্র এখনও ততটা পরিণত নয় সেগুলো এদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে;

তাদের মধ্যে যে সংগ্রাম চলেছে সেটাও কাজেই এর চেয়ে একটু ভিন্ন, খানিকটা মিশ্র প্রকৃতির। কিন্তু মূলত সেখানেও এই সংগ্রামেরই খানিকটা প্রকাশ দেখা যাবে, কারণ এখন সমস্ত পৃথিবীটাই ক্রমশ একত্র গাঁথা হয়ে যাচ্ছে।) মার্ক্স্‌ বললেন, একটির পর একটি বাধা, একটির পর একটি মারাত্মক বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে করে ধনিকতন্ত্রকে চলতে হবে; তার পর এক দিন সে সবসুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, কারণ ভারসাম্যের একটা অভাব তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে। মার্ক্স্‌ যেদিন এই কথা লিখেছিলেন তার পর ষাট বছরেরও বেশি কাল চলে গেছে। ধনিকতন্ত্রকেও এর মধ্যে অসংখ্য মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে। কিন্তু শেষ তার হয় নি; সমস্ত বিপদ কাটিয়ে আজও সে বেঁচে আছে, বরং আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে রাশিয়ায়, সেখানে আর এর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আজ ঠিক এই মুহূর্তটিতে, তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতেই দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ধনিকতন্ত্র অত্যান্তরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে; ডাক্তাররা বিষণ্নমুখে মাথা নেড়ে বলছেন, সেরে ওঠবার ভরসা বিশেষ কিছু দেখছি নে।

কেউ কেউ বলেন, ধনিকতন্ত্রের জীবন আগেই শেষ হয়ে যেত; আয়ু বাড়িয়ে বাড়িয়ে সে যে আমাদের যুগ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে তার মূলে আছে একটি কারণ, এটির কথা বোধ হয় মার্ক্স্‌ ভালো করে ভেবে দেখেন নি। সে কারণটি হচ্ছে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থেকে রস-শোষণ—তারই জোরে পাশ্চাত্য জগতের শিল্পতন্ত্রী দেশগুলো টিঁকে যাচ্ছে। এর ফলে তারা নূতন জীবনীশক্তি, নূতন সমৃদ্ধি লাভ করছে; অবশ্য এরই ফলে সেই শোষিত দরিদ্র দেশগুলোর জীবনীশক্তি যাচ্ছে কমে।

আধুনিক যুগের ধনিকতন্ত্রে ধনী দরিদ্রকে, মালিক শ্রমিককে শোষণ করে মোটা হচ্ছে; এই শোষণের অনেক নিন্দাই আমরা করি। শোষণ সত্যই চলছে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর অপরাধ ধনিকের নয়, অপরাধ আসলে এই ব্যবস্থাটিরই, এইরকম শোষণের উপরেই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ও দিকে আবার এটা একমাত্র ধনিকতন্ত্রেরই অন্তর্গত একটা অভিনব ব্যাপার, এমন কথাও যেন মনে না করি। অতীত কালেও সমস্তরকম সমাজব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমিকরা আর দরিদ্ররা শোষিত হয়ে এসেছে, এই সুকঠিন দুর্ভাগ্য তাদের নিত্যসহচর হয়েই রয়েছে। বরং বলা যায়, ধনিকতন্ত্রের শোষণ সত্ত্বেও, অতীত যে-কোনো যুগের তুলনায় এখনকার দিনেই তারা অনেক বেশি সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। অবশ্য তার মানে খুব বেশি কিছু ব্যাপার নয়।

আধুনিক যুগে মার্ক্স্‌বাদ প্রচারের কাজে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন লেনিন। তিনি কেবল এর ব্যাখ্যা আর ভাষ্যই রচনা করেন নি, নিজের জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগও দেখিয়ে গেছেন। অথচ তার পরও কিন্তু তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন; মার্ক্স্‌-বাদকে যেন আমরা, যার আর নড়চড় নেই এমন একটা, স্থির-সিদ্ধান্ত বলে মনে না করি। এর মধ্যকার সত্যটিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। না ভেবেচিন্তে সর্বত্র এর সমস্ত খুঁটিনাটিকে সত্য বলে স্বীকার করতে বা প্রয়োগ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলেছেন :

"মার্ক্সের মতামতকে আমরা একেবারে সম্পূর্ণ এবং সমালোচনার অতীত বস্তু বলে মোটেই মনে করি না। বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মার্ক্সের মতবাদ একটি নূতন বিজ্ঞানের প্রথম সোপান মাত্র; সমাজতন্ত্রবাদীরা যদি জীবনের যাত্রাপথে পিছিয়ে পড়ে থাকতে না চান তবে সেই বিজ্ঞানটিকে তাঁদের সমস্ত দিক থেকেই পরিণত করে তুলতে হবে। আমাদের মনে হয়, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র-বাদীদের পক্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে মার্ক্সের মতবাদটাকে একেবারে স্বাধীনভাবে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করে নেওয়া। তার কারণ, সে মতবাদে মার্ক্স্‌ মাত্র কতকগুলো মোটা মোটা মূল সূত্রেরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন; সে সূত্র ইংলন্ড সম্বন্ধে যেভাবে প্রযোজ্য, ফ্রান্সে ঠিক সেভাবে প্রযোজ্য নয়, ফ্রান্সে যেভাবে প্রযোজ্য, জর্মনিতে সেভাবে প্রযোজ্য নয়; জর্মনিতে যেভাবে প্রযোজ্য, রাশিয়াতে সেভাবে প্রযোজ্য নয়।"

মার্ক্সের মতবাদ সম্বন্ধে কিছু কথা এই চিঠিতে তোমাকে বলবার চেষ্টা করলাম। অনেক টুকরো টুকরো কথা জোড়াতাড়া দিয়ে বলেছি, জানি নে এর মানে তুমি বিশেষ বুঝতে পারবে কি না, বা এর থেকে তেমন একটা স্পষ্ট ধারণা তোমার হবে কি না। এই মতবাদগুলোকে

একটু জেনে রাখা দরকার। কারণ, এখনকার দিনে অগণিত নরনারী এই মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে; আর হয়তো-বা আমাদের দেশেই এগুলো আমাদের কাজে লেগে যাবে। রাশিয়ার মতো একটা বিশাল জাতি, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের লোকরাও, মার্ক্‌স্‌কেই তাদের সবচেয়ে বড়ো সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে মেনে নিয়েছে। পৃথিবী আজ ডুবে আছে বিষম বিপর্যয়ের প্লাবনে; সে বিপর্যয়ের প্রতিকার যাঁরা অন্বেষণ করছেন এমন বহু লোকই পথের ইঙ্গিতের জন্যে চেয়ে আছেন মার্ক্‌সের দিকে।

ইংরেজ কবি টেনিসনের রচিত কয়েকটি ছত্র উদ্‌ধৃত করে আমি এই চিঠির উপসংহার করছি : "পুরোনো নিয়ম বদলে যায়, তার জায়গাতে আসে নূতন নিয়ম—ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাকে নানা বিচিত্র পথে কার্যে পরিণত করেন, যেন একটি ভালো প্রথা সমস্ত বিশ্বজগৎকে ঘুণ ধরিয়ে না দিতে পারে।"

১৩৫

ভিক্‌টোরিয়ার যুগে ইংলণ্ড

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

আমার যে চিঠিগুলোতে সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশের বিবরণ দিয়েছি, তাতে এ কথাও তোমাকে বলেছি, সমাজতন্ত্রবাদের যে রূপটি ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে নরমপন্থী। ইউরোপে তখনকার দিনে যেসব আদর্শ মতবাদ চলতি ছিল, এইটেই তার মধ্যে সবচেয়ে কম বিপ্লবপন্থী; এর লক্ষ্য ছিল, অত্যন্ত ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবস্থার উন্নতি-সাধন করা। এক-এক সময় বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হত, ব্যবসার জগতে মন্দা পড়ত, বেকার-সমস্যা বাড়ত, মজুরির হার কমে যেত, মানুষেরও দুঃখদুর্দশা বাড়ত—তখন হয়তো ইংলণ্ডেও একটা বিপ্লবের হাওয়া বইতে শুরু করত। কিন্তু অবস্থা আবার ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাওয়াও থেমে যেত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চিন্তাধারা যে এইরকম নরমপন্থী ছিল, তার একটা মুখ্য কারণ হচ্ছে, তার ধনসমৃদ্ধি; ধনসমৃদ্ধি যাদের থাকে তারা বিপ্লবের পথে পা বাড়ায় না। বিপ্লবের মানেই হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন; বর্তমান অবস্থা নিয়েই যারা মোটামুটি সন্তুষ্ট রয়েছে, হয়তো-বা সে অবস্থার আরও উন্নতি হবে এই ভরসায় বিপদের এবং দুঃসাহসিক অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দেবার আগ্রহ তাদের থাকে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীটাই ছিল বস্তুত ইংলণ্ডের চরম সমৃদ্ধির যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্যসব দেশের আগেভাগেই সে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে এবং নূতন আধুনিক কলকারখানা তৈরি করে সকলের অগ্রণী হয়ে বসেছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় জুড়েই তার সেই স্থান সে বজায় রাখতে পেরেছে। এ ছিল সমস্ত পৃথিবীর যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা; দূর দূর দেশ থেকেও ধনরত্নের স্রোত এসে তার ঘরে জমা হতে লাগল। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে শোষণ করেও তার প্রচুর এবং অফুরন্ত আয়ের পথ খুলে গেল; মানসম্ভ্রমও অনেক বাড়ল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই তখন নানা রকমের পরিবর্তন ঘটছিল, অথচ তারই মাঝখানে ইংলণ্ড যেন ঠিক পাহাড়ের মতো দৃঢ় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মধ্যে বিপ্লব বা উদ্‌বেগের কোনো আভাসই নেই। সময়ে সময়ে তারও সংকট আসন্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু আরও-কিছু বেশি লোককে ভোটের অধিকার দিয়ে সে সংকটকে সে পার হয়ে গেছে। ও দিকে ফ্রান্সে ঠিক এই সময়টাতেই একবার প্রজাতন্ত্র আর-একবার সাম্রাজ্য করে করে দ্রুত আবর্তন চলেছে; ইতালিতে একটি নবীন জাতি জন্মলাভ করেছে এবং বহু দীর্ঘ যুগের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে সমগ্র দেশটিকে আবার একত্র সংবদ্ধ করে তুলেছে; জর্মনিতে একটি নূতন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। বেলজিয়ম ডেনমার্ক গ্রীস প্রভৃতি ছোটো ছোটো দেশ-

গুলিতেও অনেক রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাপ্‌স্‌বুর্গ-রাজবংশ তখনও অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে; সেই অস্ট্রিয়াকেও ফ্রান্স ইতালি আর প্রাশিয়ার হাতে বার বার পরাজয় সইতে হয়েছে। একমাত্র পূর্বাঞ্চলে রাশিয়াতে তেমন কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে না; সেখানে স্বৈরতন্ত্রী জার ঠিক মোগল-বাদশার মতোই বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করছেন। কিন্তু রাশিয়া তখনও শিল্পের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুন্নত দেশ, কৃষকের দেশ; নূতন যুগের মতামত আর কলকারখানার হাওয়া তখনও তাকে স্পর্শ করে নি।

ধনসম্পত্তি সাম্রাজ্য আর নৌবহরের শক্তির জোরে ইংলণ্ড ইউরোপে এবং পৃথিবীতে একটা বড়ো জায়গা দখল করে বসল। জাতিদের মধ্যে সেই তখন অগ্রণী, তার নাগপাশ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তখনও তার নিজের সব সমস্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত; দেশের মধ্যে অবস্থার উন্নতি নিয়ে সে যতটা মাথা ঘামাচ্ছে, বাইরের পৃথিবীর ব্যাপার নিয়ে মোটেই ততটা করছে না। যানবাহনের ব্যবস্থাতে এমনসব আশ্চর্য পরিবর্তন এসে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীটাই যেন অনেক ছোটো আর সুসংবদ্ধ হয়ে গেল। এরই ফলে আবার ইংলণ্ডও দূরবর্তী দেশগুলির উপরে তার মুষ্টি আরও দৃঢ় করে নিতে পারছে। অথচ এই এতসমস্ত পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা ঠিক একই রয়ে গেল—একজন প্রজাধীন রাজা অর্থাৎ এমন একজন রাজা যার কোনো ক্ষমতাই প্রায় নেই, আর একটা পার্লামেণ্ট, যাকে সর্বশক্তিমান বলেই সকলের ধারণা। প্রথম প্রথম পার্লামেণ্টের সভ্য-নির্বাচন করত মুষ্টিমেয় ক'জন ভূস্বামী আর ধনী বণিক। তার পর দেখা গেল, যখন একটা সংকট আসন্ন হয়ে উঠছে তখনই বিপদ এড়াবার জন্যে কিছু বেশি করে লোককে ভোটের অধিকার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই গোটা শতাব্দীটি ধরেই বহুবার এই ব্যাপার ঘটল।

এই শতাব্দীর একটা বড়ো অংশ ধরে ইংলণ্ডের রানী ছিলেন ভিক্টোরিয়া। জর্মনির হ্যানোভার-বংশে তাঁর জন্ম; অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বংশের অনেকজন জর্জ-নামধারী রাজা ইংলণ্ডে রাজত্ব করেছেন। ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি আঠারো বছরের তরুণী। তেষট্টি বছর কাল তিনি রাজত্ব করে গেছেন, এই শতাব্দীর একেবারে শেষে ১৯০০ সনে সে রাজত্ব শেষ হয়। এই দীর্ঘ সময়টিকে ইংলণ্ডে অনেক সময়েই অভিহিত করা হয় 'ভিক্টোরিয়ার যুগ' বলে। ইউরোপে এবং অন্যত্র অনেক বড়ো বড়ো পরিবর্তন রানী ভিক্টোরিয়া ঘটতে দেখেছেন; দেখেছেন, কীরকম করে জগতের পুরোনো স্মৃতিস্তম্ভগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, নূতন নূতন স্তম্ভ এসে তার স্থান অধিকার করছে। ইউরোপের সমস্ত বিপ্লব, ফ্রান্সের পরিবর্তন, ইতালির রাজ্য এবং জর্মনির সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, সবই তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। যখন মারা গেলেন তখন তিনি সমস্ত ইউরোপ আর ইউরোপের রাজাদের ঠাকুরমা-বিশেষ হয়ে উঠেছেন। ইউরোপের আরও একজন রাজার ঠিক এইরকম কাহিনী আছে, ইনিও ভিক্টোরিয়ারই সময়ের লোক। ইনি হচ্ছেন অস্ট্রিয়ার হাপ্‌স্‌বুর্গ-বংশীয় রাজা ফ্রান্সিস জোসেফ। ইনিও ঠিক আঠারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; বিপ্লবের বছর অর্থাৎ ১৮৪৮ সনে এ'র অভিষেক হয়, তখন এ'র সাম্রাজ্যের দশা একেবারেই নড়বড়ে হয়ে গেছে। আটষট্টি বছর ধরে ইনি রাজত্ব করলেন, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত অংশগুলোকে তাঁর শাসনে একত্র করেই ধরে রাখলেন। কিন্তু শেষে বিশ্ব-যুদ্ধের ধাক্কায় তিনি স্বয়ং এবং তাঁর সাম্রাজ্য, দুয়েরই অবসান ঘটল।

ভিক্টোরিয়ার ভাগ্য এর চেয়ে ভালো ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে গেল, তাঁর সাম্রাজ্য বহুদূরে বিস্তৃত হল। ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে বসলেন তখন কানাডাতে গোলমাল চলছে। সে উপনিবেশটি খোলাখুলি বিদ্রোহ করেছে; তার অনেক বাসিন্দাই ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রতিবেশী-রাজ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইছে। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধেই ইংলণ্ডের শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল; সে তাড়াতাড়ি কানাডাবাসীদের হাতে অনেকখানি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তুলে দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করল। এর অল্পদিনের মধ্যেই কানাডার এই অধিকার আরও বেড়ে গিয়ে সে একেবারে সম্পূর্ণ একটি স্বয়ং-শাসিত ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উঠে গেল। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এটি একটি নূতন অধ্যায়; কারণ,

স্বাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদ একত্র চলতে পারে না। কিন্তু তখন অবস্থার ফেরে পড়ে ইংলণ্ডকে এই ব্যাপারে রাজি হতেই হল, নইলে কানাডা একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যায়। কানাডার বেশির ভাগ অধিবাসীই জাতে ইংরেজের বংশধর; সে দিক থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে তার নাড়ির একটা নিবিড় যোগ ছিল। কানাডা নূতন দেশ, তার বিশাল আয়তন জুড়ে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ তখনও অনাবিষ্কৃত, লোকসংখ্যাও অল্প। কাজেই সে সম্পদকে আয়ত্ত করবার জন্যে তাকে ইংলণ্ডের কারখানাওয়ালা আর ইংলণ্ডের মূলধনের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই এই দুটি দেশের মধ্যে তখন স্বার্থের কোনো সংঘাত ছিল না; উভয়ের মধ্যে যে আশ্চর্য এবং অভিনব সম্পর্ক তখন স্থাপিত হল সে সম্পর্কও বেশ অনায়াসেই টি‌ঁকে রইল।

এই শতাব্দীতেই আরও পরের দিকে গিয়ে ব্রিটেনের বিদেশী উপনিবেশ হিসাবে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার অস্ট্রেলিয়াকেও দান করা হল। এই শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ছিল নির্বাসিত অপরাধীদের উপনিবেশ; শতাব্দীর শেষ দিকেই সে হয়ে গেল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন।

অথচ অন্য দিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের মুষ্টি ক্রমেই আঁট হয়ে বসছে; যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে ব্রিটেন ভারতবর্ষে তার সাম্রাজ্য ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের সম্পূর্ণ অধীন দেশ। স্বায়ত্তশাসনের নামগন্ধও তার ছিল না। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহটিকে দমন করবার পরে, সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝায় তার মজাটা ভারতবর্ষকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল। কীরকম করে নানান কায়দাতে ব্রিটেন তাকে শোষণ করছিল তা তোমাকে আগেই বলেছি। ভারতবর্ষই অবশ্য ছিল ব্রিটেনের সত্যিকার সাম্রাজ্য; সেই কথাটিকে পৃথিবীর সামনে প্রচার করবার জন্যে রানী ভিক্টোরিয়া 'ভারতসম্রাজ্ঞী' নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর বহু স্থানে আরও বহু ক্ষুদ্র দেশ ব্রিটেনের অধীনে ছিল।

অতএব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা হয়ে উঠল দুরকম দেশের একটা অদ্ভুত খিচুড়ি; এক দিকে স্বায়ত্ত-শাসিত দেশগুলি, এরাই পরে স্বাধীন ডোমিনিয়ন হয়ে উঠল; অন্য দিকে সমস্ত অধীনস্থ দেশ আর রক্ষাধীন অঞ্চল। প্রথম দলের দেশগুলো ছিল কতকটা একই পরিবারভুক্ত, একই মূল দেশের নেতৃত্ব স্বীকার করে চলছে; আর শেষের দলের দেশগুলোর নিশ্চিত পরিচয় ছিল সেই বাড়ির চাকর আর ক্রীতদাস বলে—তারা শুধু এদের অবজ্ঞা দুর্ব্যবহার আর শোষণ সইবার পাত্র। স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়নগুলির প্রজারা জাতে ব্রিটিশ বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশের লোক কিংবা তাদের বংশধর; অধীন দেশগুলি সমস্তই অ-ব্রিটিশ এবং অ-ইউরোপীয়। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দুটি অংশের মধ্যে এই তফাত আজও পর্যন্ত টি‌ঁকে রয়েছে।

ইংলণ্ডের তখন ধনসম্পদ আছে, সাম্রাজ্য আছে, নিজের অবস্থায় সে মোটের উপর সন্তুষ্ট। তবুও সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হল না; কারণ, সাম্রাজ্যবাদীর কামনা কোনো সীমান্তরেখা পর্যন্ত পৌঁছেই তৃপ্ত হয় না, আরও বেশি এগিয়ে চলতে চায়। তবে ইংলণ্ডের তখন প্রধান সমস্যা আরও বেশি জায়গা দখল করা নিয়ে নয়, যেটুকু সে পেয়েছে তাকে কী করে টি‌ঁকিয়ে রাখবে তাই নিয়ে। বিশেষ করে ভারতবর্ষই ছিল তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি, একে সে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করে রাখতে চাইল। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যত নীতি আর কূটকৌশল, সমস্তই চলত একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে—কী করে ভারতবর্ষকে দখলে রাখা যায়, আর প্রাচ্যদেশে আসবার সমুদ্রপথগুলোকে নিরাপদ রাখা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে মিশরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করল, এবং শেষ পর্যন্ত সে দেশটিতে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করল; এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে পারশ্য এবং আফগানিস্থানেরও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলাতে গেল। খুব-একটা ধূর্ত চাল দিয়ে সে সুয়েজখাল-কোম্পানির অংশীদারি কিনে নিল এবং খালটির কর্তৃত্ব নিজের করায়ত্ত করে বসল।

উনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ই ইউরোপ মহাদেশের প্রায় কোনো দেশকে নিয়েই ব্রিটেনকে উদ্‌বিগ্ন হতে হয় নি। তারা সকলে তখন নিজের নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত, অনেক সময়ে-বা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। প্রাচীন কাল থেকে ইংলণ্ডের খেলা ছিল ইউরোপে শক্তিসাম্য রক্ষা করা, সেই খেলাই সে আগাগোড়া খেলে চলল—বসে বসে এ দেশের সঙ্গে ও দেশের

ঝগড়া লাগিয়ে দেয়, আর এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফাঁক-তালে নিজের কিছু লাভ গুছিয়ে নেয়। ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নকে বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু তাঁর পতন ঘটল এবং সেই ধাক্কা সামলাতে ফ্রান্সের বেশ কিছু দিন লেগে গেল। জর্মানি তখনও শিশু, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভয় করবার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল, একটি দেশ হয়তো তার সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করতে আসবে—সে হচ্ছে জারশাসিত রাশিয়া; অনুন্নত দেশ, কিন্তু বিরাট দেশ, পৃথিবীর মানচিত্রের অনেকখানি জায়গা সে জুড়ে রয়েছে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ-এশিয়াতে সাম্রাজ্য স্থাপন করছিল; রাশিয়া তেমনি সাম্রাজ্যবিস্তার করেছে উত্তর এবং মধ্য-এশিয়াতে, তার সীমান্তও ভারতবর্ষ থেকে বেশি দূরে নয়। রাশিয়া তার সাম্রাজ্যের এত কাছে চলে এসেছে, এইটেই ব্রিটেনের সারক্ষণের আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের কথা বলবার সময় আমি তোমাকে ব্রিটেনের আফগানিস্থান-আক্রমণ এবং আফগান-যুদ্ধের কথা বলেছি। সে যুদ্ধ সে করতে গিয়েছিল শুদ্ধ এই রাশিয়ার ভয়ে।

ইউরোপেও ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার কলহ বাধল। রাশিয়ার ইচ্ছা, একটি ভালো সামুদ্রিক-বন্দর তার থাকে, যেটা সমস্ত বছরই খোলা থাকবে, শীতকালে বরফ জমে বন্ধ হয়ে যাবে না। বিশাল সাম্রাজ্য তার, কিন্তু বন্দর তার যে ক'টি ছিল সবগুলোই মেরু-অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গাতে; বছরে কিছু কাল সেগুলো বরফে বন্ধ হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ বা আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছতে ব্রিটেন তাকে দিল না; পারশ্যেও তাই হল। কৃষ্ণ-সাগরের মুখ জুড়ে বসে রয়েছে তুর্কি; বস্‌ফরাস আর দার্দানেলিশ তার দখলে। অতীত কালে একবার কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ দখল করবার চেষ্টা রাশিয়া করেছিল, কিন্তু তুর্কিদের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। এখন তুর্কিরা দুর্বল হয়ে পড়েছে; রাশিয়া ভাবল, এত দিনের লোভের বস্তুটি এবার বুঝি হাতের গোড়ায় এল! তাকে হস্তগত করতে সে চেষ্টাও করল। কিন্তু ইংলণ্ড এসে বাধা দিল, সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থের খাতিরেই সে সেধে তুর্কির সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ১৮৫৪ সনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ করে, এবং পরে আর-একবার যুদ্ধ বাধাবার হুমকি দিয়ে রাশিয়াকে সে দূরে ঠেকিয়ে রাখল।

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সন পর্যন্ত ক্রিমিয়ার এই যুদ্ধ চলেছিল; এই যুদ্ধের সময়েই ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিংগেল এক দল বীরনারীকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা করতে যান। তখনকার দিনে এটা একটা আশ্চর্য কীর্তি; কারণ, ভিক্টোরিয়ার যুগে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ঘরেই বন্ধ থাকতেন। ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিংগেল তাঁদের সামনে বাস্তব জনসেবার একটা নূতন দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন; তাঁর আকর্ষণে পড়ে অনেক মেয়েই ড্রইংরুম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এ দিক থেকে নারীপ্রগতির ইতিহাসে তিনি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

ব্রিটেনে যে শাসনপদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল তার নাম হচ্ছে নিয়মাধীন রাজতন্ত্র বা 'মুকুটধারী প্রজাতন্ত্র'। এই নামটির অর্থ হচ্ছে, মুকুট যে ব্যক্তির মাথায় রয়েছে তাঁর প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নেই, তিনি হচ্ছেন শুধু পার্লামেন্টের বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীদের বক্তব্য প্রকাশ করবার যন্ত্র। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে তাঁকে ধরে নেওয়া হত মন্ত্রীদের হাতের একটি নিছক পুতুল বলে; বলা হত 'সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে' তাঁর স্থান। বাস্তবিক পক্ষে কিছুমাত্র বুদ্ধি বা মনের জোর যার আছে এমন কোনো ব্যক্তিই নিছক পরের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে পারে না; ইংলণ্ডের রাজা বা রানীও রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ অনেকই পেতেন। সাধারণত এই হস্তক্ষেপের কাজটা সম্পন্ন হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে; বহু দিন অতিক্রান্ত হবার আগে এর কথা প্রজারা প্রায় কখনও জানতেই পায় না। রাজ্যের ব্যাপারে এঁরা খোলাখুলি হস্তক্ষেপ করতে গেলে হয়তো তা নিয়ে প্রবল আপত্তির সৃষ্টি হবে; রাজার রাজাগিরিও তার ফলে ঘুচে যাওয়া অসম্ভব নয়। নিয়মাধীন রাজার পক্ষে যে গুণটি থাকা সবচেয়ে বেশি আবশ্যক সে হচ্ছে বুদ্ধিচাতুর্য; এ যদি থাকে তবে তিনি অনায়াসেই সব দিক বজায় রেখে চলতে পারেন এবং নিজের প্রভুত্বও অনেক দিক দিয়েই খাটিয়ে নিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক নিয়মের এবং আইনের দিক থেকে পার্লামেন্ট-শাসিত দেশের মুকুটধারী রাজাদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা থাকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টদের (যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট)। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের ঘন ঘন বদল হয়; রাজারা দীর্ঘ কাল ধরে রাজত্ব করেন, কাজেই

তাঁর নিজের প্রভাব খাটিয়ে, হোক না নিঃশব্দে, রাজ্যের ব্যাপারকে ক্রমান্বিত গতিতেই একটা বিশেষ পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এ ছাড়া কূটচক্র বিস্তার করবার এবং সামাজিক জীবনের মারফত তাঁর মতামত জারি করবার সুযোগও তাঁরা প্রচুর পান; কারণ সামাজিক ব্যাপারে রাজাই হচ্ছেন সর্বময় কর্তা। বস্তুত রাজাদের দরবারের সমস্ত আবহাওয়াটাই প্রভুত্বের ছোঁওয়াতে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে; সেখানে শুধু আপেক্ষিক মর্যাদা, পদগৌরব, আর শ্রেণীগত পরিচয়ের লীলা। এই লীলা থেকেই সমস্ত দেশটারও জীবনযাত্রার একটা প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে যায়। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাম্যপ্রতিষ্ঠা বা শ্রেণীবিভাগ-বর্জনের কল্পনার সঙ্গে এর খাপ খায় না। ইংলণ্ডে একটি রাজ-দরবার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই ইংরেজজাতির যে মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাই সেটি তেমন করে গড়ে উঠেছে এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকাটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে—এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। অথবা হয়তো এই কথা বললেই আরও সত্য বলা হবে : একটির উপরে আর-একটি শ্রেণীর স্থান, এই ব্যবস্থাটাকে ইংরেজরা মেনে নিয়েছে বলেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বৃহৎ দেশ থেকে রাজতন্ত্র লোপ পেয়ে যাবার পরেও ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র আজও পর্যন্ত টি'কে থাকতে পেরেছে। ইংলণ্ডে একটি পুরোনো প্রবচন আছে, "লর্ডকে (সম্ভ্রান্ত জমিদারকে) প্রত্যেক ইংরেজই ভালোবাসে।" কথাটা অত্যন্ত সত্য। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্যের ব্যাপারটা ইংলণ্ডে যেমন স্পষ্ট, ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও তেমন নয়; একমাত্র জাপান ও ভারতবর্ষ ছাড়া বোধ হয় এশিয়ারও কোথাও এর জোড়া নেই। অতীত যুগে ইংলণ্ডই রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং শিল্পতন্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে ছিল, অথচ সমাজ-জীবনের দিক থেকে সে আজও এতখানি পশ্চাদ্‌বর্তী এবং এমন পাকা রক্ষণপন্থী হয়ে রয়েছে, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

ব্রিটেনের পার্লামেণ্টকে বলা হয় 'সমস্ত পার্লামেণ্টের জননী'। এর জীবনের ইতিহাস দীর্ঘ এবং গৌরবান্বিত ইতিহাস; বহু ব্যাপারে রাজার স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই পার্লামেণ্টই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। রাজার স্বৈরতন্ত্র ঘুচে গিয়ে তার জায়গা দখল করল পার্লামেণ্টের ধনিকতন্ত্র তার মানে ক্ষুদ্র একটা ভূস্বামী এবং শাসকশ্রেণীর শাসন। তার পর আবার খুব তুরিভেরী বাজিয়ে এসে হাজির হল গণতন্ত্র; অনেক মারামারি-হুড়োহুড়ির পরে দেশের অধিকাংশ লোকই হাউজ অব কমন্সের সভ্য নির্বাচন করার জন্যে ভোট দেবার অধিকার পেয়ে গেল। কাজে কিন্তু এর ফলে দেশে সত্য করে প্রজার প্রভুত্ব স্থাপিত হল না; পার্লামেণ্টের কর্তৃত্বভার গিয়ে পড়ল ধনী শিল্পপতিদের হাতে। গণতন্ত্রের বদলে প্রতিষ্ঠিত হল ধনতন্ত্র।

দেশ-শাসন এবং আইন-প্রণয়নের কাজটি চালাবার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটা অদ্ভুত রীতি গড়ে তুলল; সে হচ্ছে দুটি দলের রীতি। দলদুটির মধ্যে তফাত বিশেষ-কিছু ছিল না; কোনো পরস্পরবিরোধী নীতির প্রতীক এরা নয়। এরা দুটিই বড়োলোকদের দল, দুটিই বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিচ্ছে। তবে এদের একটি দলে পুরোনো ভূস্বামীশ্রেণীর লোক বেশি ছিল, অন্যটিতে বেশির ভাগ ছিল ধনী কারখানাওয়ালা। কিন্তু সে তফাত নেহাতই নামের তফাত। এই দুটি দলের নাম ছিল টোরি এবং হুইগ দল; পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদের নাম বদলে নূতন নাম হল রক্ষণপন্থী আর উদারপন্থী দল।

ইউরোপের অন্যান্য দেশে অবস্থা মোটেই এরকম ছিল না। সেখানে ছিল কতকগুলো সত্যকার বিভিন্ন দল, তাদের কর্মসূচী এক নয়, আদর্শ এক নয়। এরা পার্লামেণ্টের ভিতরে এবং বাইরে পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত নিষ্ঠা-সহকারে লড়াই করত। ইংলণ্ডে কিন্তু এর সমস্তটাই ছিল একটা ঘরোয়া ব্যাপারের মতো; বিরোধী পক্ষের বিরোধটাও হয়ে উঠত বস্তুত সহযোগিতারই শামিল; এবং দুটি দলই পালা করে একবার শাসকের, একবার বিরোধীর, ভূমিকা অভিনয় করে যেত। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে সত্যকার বিরোধ এবং শ্রেণীসংগ্রাম বর্তমান রয়েছে, পার্লামেণ্টে তার দেখা কখনও মিলত না; কারণ, সেখানে দুটি বড়ো দলই ছিল ধনীদের দল। প্রজার মনকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে এমন কোনো গুরুতর ধর্মসংক্রান্ত সমস্যা ব্রিটেনে ছিল না; প্রজাদের মধ্যে জাতি বা বংশের বৈষম্য নিয়েও কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না (যেমন ছিল ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে)। প্রজার মনে উত্তেজনা ঘটাবার মতো ব্যাপার একটিমাত্র দেখা গিয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষ দিকে জাতীয়তাবাদী

আইরিশ সভ্যরা পার্লামেণ্টে এর অবতারণা করেন। তাঁদের কাছে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নটা একটা জাতীয় সমস্যাই ছিল।

এই রকমের দুটি বৃহৎ দল যখন পার্লামেণ্টে নির্বাচনের জন্যে প্রার্থী খাড়া করতে থাকে তখন সমস্ত দলের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে বা অন্য কোনো ছোটো দলের পক্ষ থেকে যে প্রার্থীরা দাঁড়াচ্ছেন তাঁদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। যতই গণতন্ত্র আর ভোটের অধিকারের দোহাই দিই-না কেন, দরিদ্র ভোটদাতার এ বিষয়ে প্রায় কোনো স্বাধীনতাই বস্তুত থাকে না। সে হয় এর কোনো-একটা দলের প্রার্থীকে ভোট দেবে, আর না-হয় বাড়িতে বসে থাকবে— কাউকেই ভোট দেবে না। এই দলদের তরফ থেকে যে সভ্যরা পার্লামেণ্টে গেলেন তাঁদেরও নিজস্ব স্বাধীনতা বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। তাঁরা শুধু তাঁদের দলের কর্তাদের আদেশ পালন করবেন এবং তাঁদেরই নির্দেশমতো ভোট দেবেন; এর বেশি তাঁদেরও বিশেষ-কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না। তার কারণ, এ'রা একমাত্র এইভাবে চললে তবেই দলের মধ্যে সংহতি বাড়তে পারে, সে দল বিপক্ষ দলকে পরাজিত করবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারে এবং তাকে হটিয়ে দিয়ে শাসনক্ষমতা অধিকার করতে পারে। এই সংহতি এবং একতাটা বস্তু-হিসাবে খুবই ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যকার গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তাতে আর এতে অনেক তফাত।

আর এও দেখা যাচ্ছে, অগ্রগতির দৃষ্টান্ত হিসাবে সর্বদাই ইংলণ্ডের নাম ঘোষণা করা হয়, অথচ সেই ইংলণ্ডেও গণতন্ত্র খুব-কিছু বিরাট সাফল্য অর্জন করে নি। দেশ-শাসনের বড়ো সমস্যাই হচ্ছে প্রজারা কী করে তাদের শাসক করবার জন্যে দেশের একেবারে সবচেয়ে ভালো লোক ক'টিকে বেছে বার করবে। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ইংলণ্ডে করা হয় নি। কার্যত যে গণতন্ত্র সেখানে দেখা গেল তার মানে দাঁড়াল, লোকেরা প্রচুর-পরিমাণ চিৎকার করবে আর বক্তৃতা দেবে. ভোটার বেচারিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এমন একজন লোককে ভোট দেওয়াতে হবে যার সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। এখানকার সাধারণ নির্বাচনগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটা প্রকাশ্য নিলাম বলে, সেখানে যে যত পারছে লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তবু এতসমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই নকল বা মিথ্যা গণতন্ত্র সেখানে বেশ চালু হয়ে রইল। তার কারণ, ব্রিটেনের ধনসমৃদ্ধি ছিল, আর এই সমৃদ্ধির জোরেই তার শাসনপ্রথায় কোনোদিন ভাঙন ধরল না, তার প্রজাও খানিকটা সন্তুষ্ট হয়েই রইল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলদুটির প্রধান নেতা ছিলেন ডিস্‌রেলি আর গ্ল্যাডস্টোন। ডিস্‌রেলি পরে আর্ল্‌ অব বীকন্‌স্‌ফিল্ড্‌ নামে পরিচিত হন। ইনি ছিলেন রক্ষণপন্থী দলের নেতা, বহুবার ইনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে একটু আশ্চর্য কীর্তির ব্যাপার, কারণ তিনি ছিলেন ইহুদি—দেশের মধ্যে মাতব্বর আত্মীয়স্বজন তাঁর কেউ ছিল না, আর জাতহিসাবে ইহুদিকে ইংরেজরা পছন্দও করে না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লোকের মনে যে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস ছিল, নিছক যোগ্যতা আর অধ্যবসায়ের জোরেই ডিস্‌রেলি তাকে জয় করলেন এবং দেশের একেবারে শীর্ষস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন পরম সাম্রাজ্যবাদী; ভিক্টোরিয়াকে তিনিই 'ভারতসম্রাজ্ঞী' বলে অভিষিক্ত করেন। গ্ল্যাডস্টোনের জন্ম হয় ইংলণ্ডের একটি প্রাচীন ধনীবংশে। তিনি উদারপন্থী দলের নেতা; তিনিও অনেক বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ এবং বৈদেশিক নীতির দিক থেকে গ্ল্যাডস্টোন আর ডিস্‌রেলির মধ্যে মতামতের তেমন কিছু তফাত ছিল না। তবে ডিস্‌রেলি তাঁর সাম্রাজ্যপ্রিয়তার কথা খোলাখুলিই প্রকাশ করতেন: আর গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন একেবারে খাঁটি ইংরেজ, তিনি তাঁর সাম্রাজ্যবাদের কথাকে ভালো ভালো কথা আর মস্ত মস্ত উপদেশবাণী দিয়ে আবৃত করে রাখতেন, এমন ভাব প্রকাশ করতেন যেন ঈশ্বরই হচ্ছেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা, তিনি যা-কিছু করছেন ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই করছেন। বল্‌কান-অঞ্চলে তুর্কিরা নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে গ্ল্যাডস্টোন একটি বিরাট অভিযান শুরু করলেন; বিরোধী পক্ষ হিসাবে ডিস্‌রেলিকে কাজেই তখন তুর্কিদের পক্ষ সমর্থন করতে হল। বাস্তবিক পক্ষে অবশ্য তুর্কিরা আর বল্‌কান-অঞ্চলে তাদের বিভিন্ন জাতির প্রজারা, এর দু দলেরই সমান দোষ

ছিল; একবার এরা একবার ওরা এরূপ করে দুই পক্ষই অত্যন্ত ভয়াবহ নরহত্যা আর অত্যাচারের উৎসবে মেতে উঠত।

আয়ার্ল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন চাইছিল, গ্ল্যাডস্টোন তাদেরও পক্ষ সমর্থন করলেন। এই সংগ্রামে জয়ী তিনি হতে পারলেন না; ইংলণ্ডের জনসাধারণ এর এমনি বিরোধিতা করল যে, তার ধাক্কায় উদারপন্থী দলটাই ভেঙে দু ভাগ হয়ে গেল। এর এক ভাগ গিয়ে যোগ দিল রক্ষণপন্থী দলের সঙ্গে। আজকাল এদের বলা হয় ইউনিয়নিস্ট বা মিলনকামী দল, কারণ এরা আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের মিলনটাকেই টিঁকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

কিন্তু এই সম্বন্ধে এবং ভিক্টোরিয়ার যুগের অন্যান্য বহু ব্যাপার সম্বন্ধে আরও কথা তোমাকে বলবার আছে; পরে আর-একটা চিঠিতে আমি সে কথা তোমাকে বলব।

১৩৬

ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসল

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যে সমৃদ্ধি দেখা গেল তার মূলে ছিল তার কলকারখানা, আর তার উপনিবেশ এবং অধীন দেশগুলোকে শোষণ করে পাওয়া টাকা। বিশেষ করে চারটি শিল্পকে আশ্রয় করেই তার ধনসম্পত্তি বেড়ে উঠছিল। এই শিল্পগুলোকে তার 'প্রধান' শিল্প বলা যায়—এরা হচ্ছে তার কাপড় কয়লা লোহা আর জাহাজ-তৈরির শিল্প। এগুলো ছাড়াও এদেরই আশেপাশে আরও হাজারো রকমের ছোটো-বড়ো শিল্প গড়ে উঠল। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক তৈরি হল। ব্রিটেনের বাণিজ্যজাহাজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যেতে লাগল, তারা শুধু ব্রিটেনের তৈরি মাল বহন করে নেয় না, অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেরও সমস্ত ভালো ভালো পণ্যদ্রব্য নিয়ে যায়। পৃথিবীতে পণ্যদ্রব্যের এরাই হয়ে উঠল প্রধান বাহক। লণ্ডনের বড়ো বীমা-কোম্পানি ছিল লয়েড্‌স্‌; সেটা সমস্ত পৃথিবীর সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল। এইসব শিল্প এবং বাণিজ্যের কর্তারাই পার্লামেন্টেও প্রভুত্ব করতে লাগলেন।

বাইরে থেকে জলস্রোতের মতো ধনরত্ন আসতে লাগল; উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত-শ্রেণীদের ধনসম্পদ ক্রমেই আরও বেড়ে চলল; এই সম্পদের কিছুটা শ্রমিকশ্রেণীর হাতেও গিয়ে পৌঁছল এবং তাদের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত করে তুলল। প্রশ্ন উঠল, এই-যে বিপুলপরিমাণ অর্থ ধনীদের হাতে আসছে, একে দিয়ে কী করা যায়। একে ব্যবহার না করে ফেলে রাখা মূর্খতা; সবাই বলল, ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বাড়াও, আরও বেশি পণ্য উৎপাদন করো, আরও বেশি লাভ হোক। এই ধনের অনেক-খানি দিয়ে ইংলণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে নূতন নূতন কারখানা রেলওয়ে ইত্যাদি গড়ে তোলা হল। কিছু দিনের মধ্যেই অনেক কারখানা তৈরি হয়ে গেল, দেশটা সম্পূর্ণরূপে শিল্পপ্রবণ হয়ে উঠল; এবং তৎসঙ্গে স্বভাবতই লাভেরও হার বেড়ে চলল; কারণ তখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় নেই। যে ধনিক-দের হাতে তখনও টাকা জমে রয়েছে তাদের তখন দৃষ্টি পড়ল বিদেশের দিকে—বিদেশে কোথাও টাকা লাগিয়ে আরও বেশি লাভ তুলে নেবার মতো জায়গা পাওয়া যায় কি না। সুযোগেরও অভাব হল না। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই তখন রেলওয়ে তৈরি হচ্ছে, টেলিগ্রাফের তার আর কেব্‌ল্‌ এবং কারখানা বসানো হচ্ছে। ব্রিটেনের উদ্‌বৃত্ত টাকাটা এই রকমের অনেক কাজে নিযুক্ত করা হল, ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকায় ব্রিটেনের সমস্ত অধীন দেশের সর্বত্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই; তার জোরেই সে তখন উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে; রেলওয়ে প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে ব্রিটেনের অনেকখানি মূলধন সে নিয়ে নিল। দক্ষিণ-আমেরিকাতে, বিশেষ করে আর্জেণ্টিনাতে, খুব বড়ো বড়ো সব বাগান ব্রিটেন করল। কানাডা আর অস্ট্রেলিয়া দেশকে তো গড়েই তোলা হল

আগাগোড়া ব্রিটিশ মূলধন দিয়ে। চীনে ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার নিয়ে যে সংগ্রাম হল তার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। ভারতবর্ষে অবশ্য ব্রিটিশরাই ছিল প্রভু; রেলওয়ে এবং অন্যান্য কাজের জন্যে তারা টাকা ধার দিল এখানে; সে ধারের শর্তও তারা নিজেদেরই ইচ্ছামতো খুব উঁচু হারে স্থির করে দিল।

এমনি করে ব্রিটেন সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসল; লণ্ডন হল পৃথিবীর টাকার বাজার। কিন্তু টাকা ধার দিচ্ছে বলে মস্ত মস্ত বস্তায় পুরে সোনা রুপো বা নগদ টাকা ইংলণ্ড থেকে অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এমন কিন্তু মনে কোরো না। আধুনিক যুগের ব্যবসা এরকমভাবে চলে না; সে চালাতে গেলে যত সোনা রুপো লাগে অত নগদ সোনা-রুপোর সম্বলই নেই পৃথিবীতে। অজ্ঞ লোকেরা সোনা বা রুপোকেই একটা পরম প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করে; কিন্তু আসলে এগুলো হচ্ছে পণ্য-বিনিময়ের এবং জিনিষপত্র কেনা-বেচার সহায়ক উপকরণ মাত্র। সোনারুপো মানুষ খেতে পারে না, পরতে পারে না, বা অন্য-কোনো ভাবে ব্যবহার করতে পারে না— এক, গয়না করে অবশ্য পরতে পারে; কিন্তু তাতে মানুষের উপকার বিশেষ কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে সম্পদ বলতে বোঝায় এমন জিনিষ থাকা যা ব্যবহারের কাজে লাগে। কাজেই ইংলণ্ড অর্থাৎ ব্রিটিশ ধনিকরা যে ক্ষেত্রে অন্যকে টাকা ধার দিল, তার মানে দাঁড়াল, তারা বিদেশের কোনো শিল্পে বা রেলওয়েতে টাকা ন্যস্ত করছে, এবং তার জন্যে নগদ টাকা পাঠাচ্ছে না, পাঠাচ্ছে বিলাতি মাল। এইভাবে ব্রিটেন থেকে কলকব্জা বা রেলওয়ে তৈরি করবার মালপত্র অন্যান্য দেশে পাঠানো হতে লাগল। এর ফলে এক দিকে ব্রিটেনের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হল, অন্য দিকে ব্রিটেনে যাদের হাতে মূলধন জমে ছিল তারাও সে বাড়তি টাকাটা বেশ লাভজনক শর্তেই খাটিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে গেল।

টাকা লগ্নী করাটা খুব লাভের ব্যবসা; এই ব্যবসা ব্রিটেন যত বেশি করে গ্রহণ করল, তার ধনসম্পদও ততই বেড়ে চলল। এর ফলে সৃষ্টি হল প্রকাণ্ড একটা অবসরী-শ্রেণীর; উৎপাদনের কোনো কাজই এদের করতে হয় না, এরা খালি বসে বসে থাকে আর এই লগ্নী-ব্যবসার লাভ আর ডিভিডেণ্ড ভোগ করে। রেলওয়ে কোম্পানি বা চা-বাগান বা ঐরকম অন্যসব প্রতিষ্ঠানের এরা অংশীদার হয়ে বসল; ডিভিডেণ্ডও নিয়মিতভাবেই পেতে লাগল। ফ্রান্সের অন্তর্গত রিভিয়েরা, ইতালি সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু চমৎকার জায়গাতে অবসরী-শ্রেণীয় ইংরেজদের বহু উপনিবেশ গড়ে উঠল, এই অবসরী লোকেরা তার মালিক—এরা নিজেরা অবশ্য প্রায় সকলেই ইংলণ্ডেই বসে থাকত।

ইংলণ্ডের কাছ থেকে যেসব দেশ এইভাবে টাকা ধার করল সে টাকার দরুন সুদ বা ডিভিডেণ্ড তারা ইংলণ্ডকে পৌঁছে দিত কীরকম করে? তারাও কিন্তু সোনারুপো পাঠাতে পারত না; বছরের পর বছর ধ'রে দিয়ে যাবার মতো এত সোনারুপো তো তাদের ছিল না। তারাও কাজেই দিত মালপত্র, কারখানার তৈরি মাল নয়, কারখানার রাজা তো ইংলণ্ড নিজেই হয়ে আছে। এরা তাকে দিত খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচা মাল। এদের কাছ থেকে ইংলণ্ডে আসত গম চা কফি মাংস ফল মদ তুলো পশম ইত্যাদি। সে আসার আর বিরাম ছিল না।

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলার মানে হচ্ছে এদের উভয়ের জিনিষপত্র বদলাবদলি করে নেওয়া। একটি দেশ কেবল কিনেই যাবে আর অন্যটি খালি বেচতেই থাকবে, এ কখনও সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করতে গেলে সমস্ত দামই সোনা বা রুপো দিয়ে দিতে হবে; দু দিন পরেই দেখা যাবে, আর দেবার মতো সোনারুপো অবশিষ্ট নেই, সুতরাং এই একপেশে বাণিজ্য নিজে থেকেই থেমে যাবে। দুই দেশে পরস্পর বাণিজ্য যখন চলে তখন দু পক্ষের মধ্যে পণ্য-বিনিময় হয়, তার সামঞ্জস্যও সে নিজেই খাড়া করে নেয়—কখনও সে বাণিজ্যের লাভের পাল্লা এ দেশের দিকে বেশি ঝুঁকে যায়, কখনও-বা ও দেশের দিকে ঝোঁকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড যে বাণিজ্য করত তার হিসাব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মোটের উপর সে যত মাল রপ্তানি করত তার চেয়ে আমদানি করত বেশি। অর্থাৎ খুব বিরাট-পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করেও, বস্তুত সে আমদানি করত তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার জিনিষ। তফাতের মধ্যে ছিল শুধু এই—রপ্তানি সে করত কলের তৈরি জিনিষ, আমদানি করত প্রধানত খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচা মাল। কাজেই বাইরে থেকে দেখলে মনে হত, ইংলণ্ড যত মাল বেচছে তার চেয়ে

কিনছে বেশি; ব্যবসা চালাবার দিক থেকে সেটাকে খুব ভালো ব্যবস্থা বলে মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই-যে বাড়তি-পরিমাণ আমদানিটা তার হত এটা ছিল, যে টাকা সে বিদেশে ধার দিয়েছে তার দরুন লাভের বাবদে পাওনা। ঋণী দেশরা এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন দেশরা এই-ভাবেই তাকে তার প্রাপ্য নজরানা মিটিয়ে দিত।

টাকা খাটিয়ে যত লাভ হত তার সবখানিই ইংলণ্ডে চলে আসত না; অনেকখানিই থেকে যেত সেই ঋণী দেশে, ব্রিটিশ ধনিকরা সেটাকে সেইখানেই আবার নূতন করে লগ্নী করত। এর ফলে ইংলণ্ড থেকে আবার নূতন টাকা বা মালপত্র বাইরে না পাঠিয়েও বিদেশে ব্রিটেনের লগ্নি-মূলধনের মোট পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে চলল। ভারতবর্ষে আমাদের প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এখানকার রেলওয়ে, খাল এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে ইংলণ্ডের কী বিপুল-পরিমাণ টাকা নিহিত রয়েছে; শোনা যায়, এদের দরুন ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষের যে 'ঋণ' রয়েছে তার পরিমাণ নাকি অতি বৃহৎ। আমরা অবশ্য অনেক দিক থেকেই এই কথাটাতে আপত্তি প্রকাশ করছি; কিন্তু এখানে সে আলোচনা আমাদের দরকার নেই। তবে এটা লক্ষ করবার মতো : এই-যে বিরাট-পরিমাণ লগ্নি টাকা, এটা ইংলণ্ড থেকে নূতন মূলধন এ দেশে আসবার ফলে গড়ে ওঠে নি; ভারতবর্ষে যে লাভ তাদের হয়েছে সেইটেকেই শুধু এ দেশে আবার লগ্নি করা হয়েছে। পলাশির যুদ্ধ এবং ক্লাইভের শাসনের আমলে বরং ভারতবর্ষ থেকেই বহু সোনা আর ধনরত্ন ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। তার পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষকে শোষণের ব্যাপারটা কিছু অন্য এবং অস্পষ্ট রূপ নিয়েছে; সে শোষণের ফলে যে লাভ হচ্ছিল তারও খানিকটা এই দেশেই আবার লগ্নি করা হয়েছে।

ইংলণ্ড দেখল, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই তেজারতির কারবার চালাতে হলে একটিমাত্র উপায় তার আছে, টাকার সুদের বিনিময়ে মালপত্র নিতে রাজি থাকা। সোনা দিয়েই দাম দিতে হবে এমন আবদার করলে চলবে না, সে কথা আগেই বলেছি। এর দুটি বড়ো ফল হল। ইংলণ্ডের প্রজার জন্যে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্যের চালান আনা হতে লাগল, সুতরাং ইংলণ্ডের নিজ দেশে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটল। ইংলণ্ড এতে আপত্তি করল না। শিল্প-কারখানার সাহায্যে বাইরের বাজারে বেচবার মতো মাল তৈরি করবার দিকেই সে তার সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করল; দেশের চাষিদের যে দুর্দশা হচ্ছিল তার দিকে তাকিয়েও দেখল না। বাইরে থেকে যদি শস্তায় খাদ্য পাওয়া যায় তবে হাঙ্গামা সয়ে নিজের তা উৎপাদন করতে যাবার দরকার? আর শিল্প থেকে যখন অনেক বেশি লাভ পাওয়া যাচ্ছে, কৃষি নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতেই বা সে যায় কেন? অতএব ইংলণ্ড একটি পুরোপুরি শিল্পাশ্রয়ী দেশ হয়ে উঠল; খাদ্যসামগ্রীর জন্যে থাকল অন্য দেশের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে, ইংলণ্ড অবাধ-বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করল; অর্থাৎ বাইরে থেকে যেসব মালপত্র ইংলণ্ডের বন্দরে এসে নামছে তার উপরে কোনো কর সে বসাল না, বা বসালেও অতি সামান্য পরিমাণেই বসাল। শিল্পাশ্রয়ী দেশদের মধ্যে সেই তখন সকলের অগ্রণী; বাইরে থেকে শিল্পজাত পণ্য তার বাজারে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করবে, সে ভয় তার তখনও অনেক কাল না করলে চলবে। তার পক্ষে বিদেশী জিনিষের উপরে কর বসানো মানেই হচ্ছে বাইরে থেকে যে খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচা মাল তার জন্যে আসছে তার উপরে কর বসানো। তার ফলে তার নিজের প্রজারই খাদ্যের দাম বাড়বে, আর বাড়বে তার তৈরি পণ্যের দাম। আর খুব বেশি কর বসিয়ে যদি সে বাইরে থেকে জিনিষপত্র আসাই বন্ধ করে দেয় তবে বাইরের যে দেশরা তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে তারা ইংলণ্ডকে তাদের দেয় নজরানা পাঠিয়ে দেবে কী করে? তারা তা দিতে পারে এক মালপত্র দিয়েই। এইজন্যেই ইংলণ্ড অবাধ-বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করল; যদিও তখন অন্যান্য সমস্ত শিল্পাশ্রয়ী দেশই রক্ষণ-শুল্কের নীতি গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ বাইরে থেকে যত পণ্য দেশে আসছে তার উপরে কর বসিয়ে নিজেদের নূতন নূতন শিল্পব্যবসাগুলোকে রক্ষা করছে। যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স জর্মানি, সকলেই তখন রক্ষণ-শুল্ক-পন্থী।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নীতি ছিল এই : কৃষির দিকে সে লক্ষ্য দেয় নি, সমস্তখানি মনোযোগ দিয়েছে শিল্পের দিকে, বাইরে থেকে খাদ্যসামগ্রী কিনেছে, এবং বিদেশ থেকে পাওয়া

আয়ের জোরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেছে। নীতি হিসাবে এটা বেশ লাভের আর আরামের বস্তু ছিল। কিন্তু এর বিপদও ছিল, সে বিপদ এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নীতিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল শিল্পব্যবসায়ে ব্রিটেনের প্রাধান্য আর তার বিপুল-পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর। কিন্তু সে প্রাধান্য যদি চলে যায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার বৈদেশিক বাণিজ্যেও যদি ভাঙন ধরে, তখন? তখন সে খাদ্যের দাম দেবে কী দিয়ে? আর দাম দেবার সংগতি যদিই-বা থাকে, বিদেশ থেকে সে খাদ্য দেশে আনবে কী করে, যদি কোনো বলশালী শত্রু রাস্তা জুড়ে দাঁড়ায়? গেল-বিশ্বযুদ্ধেই তো তার খাদ্য পাবার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তার সমস্ত প্রজা অনাহারে মারা যাবার উপক্রম! এর চেয়েও বড়ো বিপদের কথা, অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে পড়ে তার বৈদেশিক বাণিজ্যেরও অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে পড়ছে। ১৮৮০ সনের পর থেকেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে ওঠে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আর জর্মনি তখন বিদেশে মাল কাটাবার চেষ্টা শুরু করেছে। তার পর ক্রমে অন্যান্য দেশেরও শিল্পব্যবসায় গড়ে উঠল, তারাও বাজারের অন্বেষণে বেরোল। এখন তো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই কিছু-না-কিছু পরিমাণে শিল্পাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করছে তার নিজের জন্যে যেসব জিনিষ দরকার তার যতদূর পারে নিজেই তৈরি করে নেবে, বাইরে থেকে বিদেশী জিনিষকে দেশে ঢুকতে দেবে না। ভারতবর্ষ বিদেশী কাপড় কিনতে চায় না। কী করবে তা হলে ল্যাংকাশায়ার? কী দশা হবে ব্রিটেনের অন্যান্য সব শিল্পের, বিদেশে ছাড়া যাদের মাল কাটাবার উপায় নেই?

এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করা ব্রিটেনের পক্ষে শক্ত হয়ে উঠেছে; ভবিষ্যতে তার অনেকখানি দুঃখ সঞ্চিত রয়েছে বলে মনে হয়। হাত-পা গুটিয়ে যে নিজের খোলার মধ্যেই ঢুকে বসবে, একটা স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করবে, নিজের খাদ্য আর দরকারি জিনিষপত্র নিজেই তৈরি করে নেবে— তারও তো আর জো নেই! আধুনিক পৃথিবীর বড়ো জটিল ব্যাপার, সেখানে ও চলে না। আর যদিই-বা সে পারত নিজেকে তেমনি করে বিচ্ছিন্ন করে নিতে, তার পরও তার যে বিপুল লোকসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে তার প্রয়োজন মেটাবার মতো যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য নিজে উৎপন্ন করে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত কি না তাতেও সন্দেহ আছে। অবশ্য এসব সমস্যা হচ্ছে এখনকার দিনের; উনবিংশ শতাব্দীতে এগুলো তেমন গুরুতর হয়ে ওঠে নি। অতএব ইংলণ্ড তখন নিজের ভবিষ্যতকে নিয়ে জুয়ো খেলেই চলল; তার ভরসা ছিল, তার সে প্রাধান্য চিরকালই টিঁকে থাকবে। অতি বিরাট খেলা সে, তার দানও ছিল প্রকাণ্ড; হয় সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে উঠবে, আর না-হয় তো একেবারেই ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে; এর মাঝামাঝি কোনো গতি তার ছিল না। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার যুগের মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইংরেজ, আত্মপ্রত্যয় বা দম্ভের তাদের অভাব ছিল না। দীর্ঘ কাল ধরে তারা সাফল্য আর সমৃদ্ধির মধ্যে কাটিয়েছে, শিল্পে-বাণিজ্যে জগতে প্রধান হয়ে উঠেছে। তারা স্থির জানত, সমস্ত মানবজাতির মধ্যে তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত বিদেশীকেই তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। এশিয়া আর আফ্রিকার লোকগুলো তো একেবারেই অসভ্য বর্বর; মানুষের মধ্যে যত অনুন্নত জাতি আছে তাদের শাসন করবার, তাদের উন্নত সভ্য করে তোলবার প্রতিভা ইংরেজদের স্বভাবজাত; অনুন্নত জাতগুলোর সৃষ্টিই হয়েছে ইংরেজকে সেই প্রতিভার খেলা দেখাবার সুযোগ দেবার জন্যে। এমনকি ইউরোপেরও অন্যান্য দেশের লোকগুলো হচ্ছে অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদেশী; নেহাত এক-আধজন ছাড়া তারা কেউ ইংরেজি ভাষাটা পর্যন্ত জানে না! ইংরেজরাই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র; সভ্য জগতের একেবারে চূড়ায় উঠে তারা বসে আছে; ইউরোপের অগ্রগতিতে তাদেরই জায়গা সকলের আগে আগে; ইউরোপের স্থান হচ্ছে আবার বাকি পৃথিবীটার একেবারে পুরোভাগে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটাকে স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিও বলা যায়; ইংরেজরা যে সমস্ত জাতির মধ্যে বড়ো, তার তো এই কথাই চরম প্রমাণ! ত্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষের বড়োলাট ছিলেন লর্ড কার্জন; তাঁর সময়কার ইংরেজদের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর রচিত একটি বই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন "তাঁদের হাতে, যাঁরা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের দয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো মঙ্গলবিধাতা, পৃথিবীতে এমনটি আর কেউ কখনও দেখে নি।"

ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংরেজদের সম্বন্ধে এই যেসব কথা লিখছি, এগুলোকে একটু মনগড়া

বা অদ্ভুত কথা বলে মনে হয়; তুমি হয়তো ভাববে আমি তাদের নিয়ে তামাশা করছি। কোনো বুদ্ধি-ওয়ালা মানুষ এই রকমের আচরণ করতে পারে, এই রকম বিস্ময়কর গর্বিত এবং আত্মাভিমানী হয়ে উঠতে পারে, এইটেই আশ্চর্য লাগে। কিন্তু জাতির নামে যে দলের পরিচয়, তারা যে-কোনো জিনিষ বিশ্বাস করতে রাজি, যদি তাতে তাদের জাতীয় গর্বের কিছু ইন্ধন জোটে বা সেটা বিশ্বাস করায় তাদের কোনো লাভের ভরসা থাকে। ব্যক্তিহিসাবে কোনো মানুষই প্রতিবেশীর প্রতি এই ধরনের অমার্জিত এবং অভদ্র আচরণ করবার কথা ভাবতেও পারে না; কিন্তু 'জাতি'রা এতে সেরকম কোনো গ্লানি বোধ করে না। দুর্ভাগ্যবশত এ দোষটি আমাদের সকলেরই আছে, নিজেদের জাতের গুণের বড়াই করে আমরা খুব বুক ফুলিয়ে বেড়াই। ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংরেজরা যা ছিল, সে জাতের মানুষ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়, চেহারায় হয়তো সামান্য অদলবদল থাকে এই যা। ইউরোপের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এর অনুরূপ নমুনা পাওয়া যাবে; জর্মানিতে কুড়ি বছর আগে এদের দল খুবই উগ্র হয়ে উঠেছিল। আমেরিকাতে এশিয়াতেও এর অভাব নেই।

ইংল্যান্ড আর পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোর সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্পাশ্রয়ী ধনিকতন্ত্রের আবির্ভাব। সে ধনিকতন্ত্র লাভের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলল। মানুষের পূজার দেবতা হল মাত্র দুজন, সাফল্য আর লাভ; ধর্ম বা নীতির সঙ্গে ধনিকতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ হচ্ছে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধর্ম—মানুষরা আর জাতিরা যে যার পার গলা কাটো, পিছিয়ে যে পড়ে থাকল তারই সর্বনাশ! ভিক্টোরিয়ার যুগের এরা বড়াই করে বলত, এরা পরের ধর্মকে দ্বেষ করে না। তারা বিশ্বাস করত প্রগতি আর বিজ্ঞানকে; ব্যবসায়ে আর সাম্রাজ্যস্থাপনে তারা সাফল্য অর্জন করেছে, এইতেই তো প্রমাণ হয়, তারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, জীবনসংগ্রামে তারাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে রয়েছে। ডারউইন তাই বলে যান নি? ধর্মের ব্যাপারে দ্বেষাভাব যাকে তারা বলত, সেটা আসলে ছিল ঔদাসীন্য, ধর্ম নিয়ে তারা মাথাই ঘামাত না। আর. এইচ. টনি নামক একজন ইংরেজ লেখক এই অবস্থাটার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, ঈশ্বরকে এরা তাঁর নিজের জায়গাতে বসিয়ে রেখেছিল, পৃথিবীর কান্ডকারখানা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে। "পৃথিবীতে যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, স্বর্গেও ঠিক তাই!" এই ছিল সমৃদ্ধিশালী বুর্জোয়াদের মত। সাধারণ লোকের পক্ষে কিন্তু উপাসনা করা, ধর্মচর্চা করা প্রভৃতিকে উচিত কাজ বলা হত; ভরসা, যদি তার ফলে তারা বিপ্লবের বুদ্ধি থেকে বিরত হয়ে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে দ্বেষাভাব বলতে এ বোঝাত না যে, অন্যান্য ব্যাপারেও তারা দ্বেষ প্রকাশ করবে না। অধিকাংশ লোক যেসব ব্যাপারকে গুরুতর বলে মনে করল, সেখানে মোটেই সহিষ্ণুতা দেখানো হত না; আর স্বার্থে টান পড়লে তখন সমস্ত সহিষ্ণুতাই হাওয়া হয়ে উড়ে যায়। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার ধর্মমত সম্বন্ধে অত্যন্তরকম সহিষ্ণু; সে নিয়ে ঢাকঢোলও অনেক পেটা হয়। আসল কথা হচ্ছে, ধর্মের কী হল না-হল তা নিয়ে তাঁদের মোটেই মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তাঁদের রাজনীতির বা তাঁদের কোনো কৃতকর্মের এতটুকুন সমালোচনা কেউ করুক, তখনি তাঁরা কান খাড়া করে লাফিয়ে উঠবেন; দ্বেষবুদ্ধি নেই এমন অপবাদ তখন অতিবড়ো শত্রুতেও তাঁদের দিতে পারবে না! স্বার্থের টান যত বড়ো, লাফের জোরও ততই বেশি; টানটা যদি বেশ জোর হয় তবে তখন আমাদের সরকারবাহাদুর সহিষ্ণুতার সমস্ত ভান পরিত্যাগ করেন; খোলাখুলি এবং নির্লজ্জের মতো একেবারে চরম বিভীষিকার সৃষ্টি করতে লেগে যান। আজকেরই ভারতবর্ষে এই জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই তো অল্প ক'দিন মাত্র হল খবরের কাগজে পড়ছিলাম, কুড়ি বছরেরও কম বয়সী একটি বাচ্চা ছেলেকে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে; তার অপরাধ, সে ক'জন ব্রিটিশ কর্মচারীকে শাসিয়ে চিঠি লিখেছিল!

ধনিকতন্ত্রী শিল্পব্যবসায় গড়ে ওঠার ফলে অনেক পরিবর্তন হল। ধনিকতন্ত্র ক্রমেই বৃহত্তর আয়তনে কাজ-কারবার চালাতে লাগল; দেখা গেল, ছোটো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানদের কাজে যোগ্যতা এবং লাভ অনেক বেশি। কাজেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্বাইন এবং ট্রাস্ট গড়ে উঠল, এক-একটা শিল্পের সমস্তখানি আয়োজনই এদের কর্তৃত্বে চলতে লাগল; ছোটো ছোটো স্বাধীন শিল্পী এবং কারখানা যা ছিল তারা এদের মধ্যে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এক কালে লোকে 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা'র দোহাই দিত; এই ধাক্কায় সে মত ভেঙে হারিয়ে গেল—দেখা গেল, ব্যক্তি-

বিশেষের চেষ্টা বা আয়োজনের কোনো স্থান বা ভরসাই এখন আর নেই। দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত বড়ো বড়ো কম্বিনেশন আর কর্পোরেশনের ইঙ্গিতে চলতে লাগল।

ধনিকতন্ত্রের ফলে সাম্রাজ্যবাদও আর-একটি উগ্রতর রূপে আত্মপ্রকাশ করল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শিল্পতন্ত্রী দেশগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে গেল, তারা কাজেই বাজার আর কাঁচা মালের সন্ধানে আরও দূর দূর দেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সাম্রাজ্যের জন্যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা হিংস্র কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এশিয়ার সব দেশে—ভারতে, চীনে, বৃহত্তর ভারতে এবং পারস্যে কী ঘটল তার কিছু কিছু বিবরণ আমি তোমাকে আগেই বলেছি। এবার ইউরোপের জাতিগুলো শকুনির মতো ছোঁ মেরে পড়ল আফ্রিকার উপরে; দেশটাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিল। এখানেও ইংলণ্ডই সবচেয়ে বড়ো ভাগ হাতিয়ে নিল—উত্তরে মিশর, এবং পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ -আফ্রিকাতে অনেকগুলো বড়ো বড়ো অঞ্চল তার ভাগে পড়ল। ফ্রান্সও কম গেল না। ইতালিরও এই লুটের মালে কিছু ভাগ বসাবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আবিসিনিয়ার কাছে সে একেবারে গো-হারা হেরে এল। জর্মানি কিছুটা ভাগ পেল, কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট হল না। সর্বত্র জুড়ে খালি সাম্রাজ্যবাদ, চিৎকার শাসানি কাড়াকাড়ির বীভৎস তাণ্ডব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জনপ্রিয় কবি রুড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিং 'শাদা মানুষদের কর্তব্যভার' সম্বন্ধে প্রশস্তি গাইতে লাগলেন। ফরাসিরা ধুয়ো ধরল 'ফ্রান্সের সভ্যতা-প্রচার করবার মহান উদ্দেশ্যে'র। জর্মনদেরও কাজেই তখন তাদের 'কুল্‌টুর' বা সংস্কৃতি প্রচার করতে হয়। অতএব এই সভ্যতা-প্রচারক আর মানব-উন্নতি-বিধায়ক আর অন্যান্য-জাতিদের-বোঝা-বহনকারী মহাপুরুষেরা পরের জন্যে পরম আত্মোৎসর্গ করতে লেগে গেলেন, বাদামি আর পীত আর কৃষ্ণকায় মানুষদের কাঁধে খুব ঠেসে বসে রইলেন। কালো মানুষদের বোঝার কথা নিয়ে কিন্তু কোনো কবিই গান রচনা করলেন না।

সাম্রাজ্য নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বীরা কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু করেছে; এদের সকলের খাঁই মেটাবার মতো অত জমি পৃথিবীতে ছিল না। বাজারের খোঁজে ধনিকতন্ত্র উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তার ধাক্কায় প্রত্যেকটি দেশই খালি সামনে ছুটে চলেছে, থেকে থেকেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকিও লেগে যাচ্ছে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে তো অনেক বারই যুদ্ধ বাধতে বাধতে শেষে একটুর জন্যে বাধল না। কিন্তু সত্যকার স্বার্থের সংঘাত লাগল ব্রিটিশ আর জর্মন -শিল্পের মধ্যে। জর্মানি তখন শিল্প আর বাণিজ্য-জাহাজের পাল্লায় ইংলণ্ডের সমান হয়ে উঠেছে, প্রত্যেক দেশের বাজারেও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। কিন্তু পৃথিবীর ভালো ভালো জায়গাগুলো ইংলণ্ড তার অনেক আগে থেকেই হাত করে বসে আছে। জর্মানি গর্বিত এবং তেজি মানুষের দেশ; অন্যান্য জাতিরা তাকে নিজের ইচ্ছামতো বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না দেখে সে রাগে ফুলে উঠল; তাদের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড লড়াই করবার জন্যে প্রাণপণে তৈরি হতে লাগল। সমস্ত ইউরোপ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল, সেনাবাহিনী আর নৌবাহিনীও বেড়ে উঠল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ধি আর মৈত্রী স্থাপিত হল; শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুটিমাত্র সশস্ত্র বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে—এক দিকে জর্মানি অস্ট্রিয়া আর ইতালি এই ত্রিশক্তির সমন্বয়, আর-এক দিকে ফ্রান্স আর রাশিয়া এই দুয়ের মিলিত দল; ইংলণ্ডও গোপনে এদের সঙ্গে সংযুক্ত।

ইতিমধ্যে এই শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে, ইংলণ্ডকে দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তার নিজস্ব একটি ছোটোখাটো যুদ্ধ করতে হল। ট্রান্সভালে বুয়রদের প্রজাতন্ত্রে সোনার খনি আবিষ্কৃত হবার ফলে ১৮৯৯ সনে এই যুদ্ধটি বাধল। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জাতিটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুয়ররা পুরো তিনটি বছর ধরে যুদ্ধ চালাল, যুদ্ধে আশ্চর্য সাহস আর অধ্যবসায় দেখাল তারা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা বিধ্বস্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করল। ব্রিটেন কিন্তু এর অল্পদিন পরেই (তখন মন্ত্রিত্ব ছিল উদারপন্থী দলের হাতে) একটি খুব মহৎ এবং বিজ্ঞোচিত কাজ করল; বুয়ররা অল্পদিন আগেও তার শত্রু ছিল, তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সে নিজে থেকেই দিয়ে দিল। আরও কিছুদিন পরে সমস্ত দক্ষিণ-আফ্রিকাটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন বলে স্বীকৃত হল!

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

প্রাচীন জগতের অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ আর কূটকৌশল, রাজত্ব আর বিপ্লব, দ্বেষ-কলহ আর জাতীয়-সংগ্রাম, ইত্যাদি নিয়ে আমরা অনেক সময় ব্যয় করেছি। এবার চলো, আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে চলে যাই নূতন জগৎ আমেরিকায়; দেখি, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার পরে তার দশাটা কী দাঁড়াল। বিশেষ করে আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখব যুক্তরাষ্ট্রের কাহিনীকে। অতি ক্ষুদ্র আকারে তার আরম্ভ হয়েছিল; সেই থেকে ক্রমাগত বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে আজ সে পৃথিবীর মধ্যেই প্রায় সেরা দেশ হয়ে উঠেছে। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির গৌরব ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হয়েছে; এখন আর সে পৃথিবীকে টাকা ধার দেয় না—ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশের মতো সেও এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে খাতক; 'দয়া করে একটু আমার কথাটা বিবেচনা করো', বলে আমেরিকার কাছে কাকুতিমিনতি করতে হচ্ছে তাকে। জগতের মহাজনের আসনে এখন বসেছে আমেরিকা। পৃথিবীর সর্বত্র থেকে জলস্রোতের মতো ধনস্রোত এসে তার গায়ে উঠছে; এত অগুনতি লক্ষপতি আর কোটিপতি সে দেশে নিত্য গজিয়ে উঠছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীন কালের সেই রাজা মিডাসের গল্প জান তো, তাঁরই মতো আমেরিকাও দেবতার বর পেয়েছে, যা সে ছোঁয় তাই সোনা হয়ে যায়; কিন্তু মিডাসের মতোই সে বর পেয়ে তার শান্তি বাড়ে নি, এত অসংখ্য লক্ষপতি থাকা সত্ত্বেও তার সাধারণ লোকেরা অভাবে আর দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে রয়েছে।

১৭৭৫ সনে সমুদ্রতীরবর্তী তেরোটি রাজ্য ইংলণ্ডের অধীনতা থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। তখন তাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষেরও অনেক কম। আজকের দিনে এক নিউইয়র্ক-শহরেরই লোকসংখ্যা প্রায় আশি লক্ষ; সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা হচ্ছে সাড়ে-বারো কোটি। এখন আরও অনেক নূতন রাজ্য এই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এসে যোগ দিয়েছে; সমস্ত মহাদেশটা পার হয়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত গিয়ে এর এলাকা পৌঁচেছে। এই বিরাট দেশটি, এর এই শ্রীবৃদ্ধি ঘটল ঊনবিংশ শতাব্দীতে—কেবল আয়তনে আর লোকসংখ্যায় নয়, আধুনিক কল-কারখানা, বাণিজ্য, ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সমস্ত দিক দিয়েই সে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এই রাজ্যগুলোকে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে; ইউরোপের সঙ্গেও অনেক যুদ্ধ, অনেক মন-কষাকষি এদের হয়েছে; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা যেটি এদের উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল সে হচ্ছে নিজেদের মধ্যেই একটা অত্যন্ত হিংস্র এবং সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ; এর এক দিকে ছিল উত্তর-অঞ্চলের রাজ্যগুলি, আর-এক দিকে ছিল দক্ষিণ-অঞ্চলের রাজ্যগুলি।

আমেরিকা স্বাধীন হয়ে যাবার অল্প কয়েক বছর পরেই হল ফ্রান্সের বিপ্লব, তার পর এল নেপোলিয়নের যুদ্ধ। নেপোলিয়ন এবং ইংলণ্ড, দুজনেই পরস্পরের বাণিজ্যকে নষ্ট করতে চেষ্টা করলেন, এবং তাই করতে গিয়ে দুজনেরই আমেরিকার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল। সমুদ্রের পরপারে আমেরিকার যে বাণিজ্য ছিল তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল; অতএব ১৮১২ সনে ইংলণ্ডের সঙ্গে আবার তার যুদ্ধ বাধল। দু বছর ধরে যুদ্ধ চলল, কিন্তু ফল প্রায় কিছুই হল না। এই যুদ্ধ চলতে চলতেই নেপোলিয়ন এল্‌বায় নির্বাসিত হলেন, ইংলণ্ডের একটু ফুরসৎ মিলল। তখন তারা আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন-শহর দখল করল, করে তার সমস্ত বড়ো বড়ো সরকারি ইমারত আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিল; ক্যাপিটাল নামে যে বাড়িটিতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, এবং হোয়াইট হাউজ বলে যে বাড়িটিতে প্রেসিডেণ্টরা বাস করেন, এগুলিও এই ধ্বংসলীলার হাত এড়াল না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ব্রিটিশরাই যুদ্ধে হেরে গেল।

এই যুদ্ধের আগেই দক্ষিণ-অঞ্চলের বেশ বড়ো একটি এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়ে

গিয়েছিল। এটা হচ্ছে ফ্রান্সের পুরোনো উপনিবেশ লুইসিয়ানা; ব্রিটিশ নৌবহরের আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করতে পারছিলেন না বলে নেপোলিয়ন এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেচে দেন। এর কয়েক বছর পরে, ১৮২২ সনে, যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডা-রাজ্যটি স্পেনের কাছ থেকে কিনে নিল। ১৮৪৮ সনে মেক্সিকোর সঙ্গে তার যুদ্ধ হল; সেই যুদ্ধ-জয়ের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম-অঞ্চলে ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দক্ষিণ-পশ্চিম-অঞ্চলের অনেকগুলি শহরের স্প্যানিশ নাম আজ পর্যন্ত বজায় রয়েছে; একদা স্পেনবাসীরা বা স্প্যানিশ-ভাষী মেক্সিকানরা সেখানে রাজত্ব করত, তারই এটা স্মৃতিচিহ্ন। সিনেমা-শিল্পের জন্য বিখ্যাত বিরাট নগরী লস এঞ্জেলস্, সানফ্রান্সিস্কো—এসব নাম কে না শুনেছে!

ইউরোপে যখন বারবার করে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ-দমনের চেষ্টা চলেছে, যুক্তরাষ্ট্র তখন ক্রমাগত পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত হয়ে চলছিল। ইউরোপে পীড়ননীতির ফলে বহু লোক সেখান থেকে পালিয়ে আসতে লাগল; আমেরিকায় অফুরন্ত জমি আর প্রচুর বেতন মেলে, এই গল্প শুনেও ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে বহু লোক আমেরিকায় এসে হাজির হল। পশ্চিম-অঞ্চলের দিকে লোক-সংখ্যা বিস্তৃত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন নূতন রাজ্য গড়ে উঠল, এরাও যুক্তরাষ্ট্রেরই শামিল হয়ে রইল।

উত্তর আর দক্ষিণ -অঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম থেকেই অনেকগুলি তফাত ছিল। উত্তর-অঞ্চলটা ছিল শিল্পপ্রধান, সেখানে নূতন যুগের কলকারখানা দ্রুতবেগে বেড়ে উঠল; দক্ষিণ-অঞ্চলে ছিল বড়ো বড়ো কৃষি আর বাগান, সেখানে ক্রীতদাস খাটিয়ে কাজ হত। দেশের আইনে তখন ক্রীতদাস-প্রথা অন্যায় নয়; কিন্তু উত্তর-অঞ্চলের লোকেরা প্রথাটা পছন্দ করত না, এর চলনও সেখানে বিশেষ ছিল না। দক্ষিণ-অঞ্চলের কাজ-কারবার সমস্তই চলত ক্রীতদাস দিয়ে। ক্রীতদাসরা ছিল অবশ্য আফ্রিকা-থেকে-আনা নিগ্রো। শাদা-চামড়ার লোক কেউ ক্রীতদাস ছিল না। 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' বলা হয়েছিল—'সমস্ত মানুষই এক সমান হয়ে জন্মায়'—কিন্তু এ কথাটা প্রযোজ্য ছিল শ্বেতকায়দের সম্বন্ধে; কৃষ্ণকায়দের সম্বন্ধে নয়।

আফ্রিকা থেকে এই ক্রীতদাসদের যেভাবে ধরে আনা হত সে অতি করুণ কাহিনী। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দাস-ব্যবসায় শুরু হয়; ১৮৬৩ সন পর্যন্ত আমেরিকায় নিয়মিতভাবে ক্রীতদাসের চালান আসত। প্রথম দিকে দাস আসত মাল-টানা জাহাজে করে; আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূল ধরে যেসব জাহাজ মাল নিয়ে চলাচল করত, সুযোগ পেলেই তারা আফ্রিকার লোক ধরে আনত, এনে তাদের আমেরিকায় নিয়ে বিক্রি করত। এই উপকূলটির খানিকটা অংশকে এখনও ক্রীতদাসের উপকূল বলা হয়। আফ্রিকানদের নিজেদের মধ্যে দাসত্বের চলন বিশেষ ছিল না; যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছে বা মহাজনের দেনা যারা শোধ করতে পারে নি, শুধু সেইরকম লোককেই সেখানে দাসত্ব করতে হত। কিন্তু দেখা গেল, এইভাবে আফ্রিকানদের ধরে ধরে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে দাস বলে বিক্রি করাটা খুবই লাভের ব্যবসা। দাস-ব্যবসায় কাজেই বেড়ে চলল; প্রধানত ব্রিটিশ, স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজরাই এটাকে ব্যবসায় বলে গ্রহণ করেছিল। এর জন্যে বিশেষ রকমের জাহাজ তৈরি হত, তার নাম ছিল দাস-বাণিজ্যের জাহাজ। এই জাহাজে থাকত একের পর এক করে অনেক প্রস্থ ঘনঘন পাটাতন; প্রতি দুই প্রস্থের ফাঁকে ফাঁকে বড়ো বড়ো গ্যালারি। এই গ্যালারির মধ্যে বন্দী নিগ্রোদের পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হত, তাদের সকলেই শিকলে বাঁধা, আবার পাশাপাশি প্রতি দুজন পায়ে বেড়ি দিয়ে আটকানো। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পেঁছতে জাহাজের অনেক সপ্তাহ, কখনও-বা অনেক মাস লেগে যেত। এই দীর্ঘ কাল ধরে সে নিগ্রোরা এইসব সংকীর্ণ গ্যালারির মধ্যে শুয়েই থাকত, সকলের হাত-পা এক শিকলে বাঁধা; প্রত্যেকের জন্যে মোট যে জায়গার বরাদ্দ ছিল সে হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা আর ষোলো ইঞ্চি চওড়া!

এই দাস-ব্যবসার জোরেই লিভারপুল একটা বড়ো শহর হয়ে উঠেছিল। অনেক দিন আগের কথা, ১৭১৩ সনে ইংলন্ডের সঙ্গে স্পেনের সন্ধি হয়, এর নাম ইউট্রেক্টের সন্ধি। এর দ্বারা ইংলন্ড স্পেনের কাছ থেকে এই শর্ত আদায় করে নিল, আমেরিকাতে স্পেনের যেসমস্ত উপনিবেশ আছে, আফ্রিকা থেকে সেখানে দাস নিয়ে যাবার অধিকার একমাত্র ব্রিটেনেরই থাকবে। আমেরিকার ইংরেজ-

যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ
১৮৪৫-৪৮
১৮০৩
মিসৌরি
১৭৮৩
মূল
রাষ্ট্রসমূহ
১৭৭৬
ওহিয়ো
মিসিসিপি
লোহিত নং
১৮৫৩
১৮১৯
রায়োগ্র্যাণ্ড
গৃহযুদ্ধে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রসমূহ
এই ——— রেখার দক্ষিণে অবস্থিত

শাসিত অঞ্চলগুলোতে ইংলণ্ড তারও আগে থেকেই দাসের যোগান দিচ্ছিল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড চেষ্টা করল, যেন আমেরিকাতে দাস চালান দেবার ব্যবসাটা সে-ই একচেটিয়া করে নিতে পারে। ১৭৩০ সনে লিভারপুল-বন্দরের ১৫টি জাহাজ এই ব্যবসা চালাত। জাহাজের সংখ্যা বাড়তে লাগল; ১৭৯২ সনে দেখা গেল, লিভারপুলের ১৩২টি জাহাজ দাস-ব্যবসায়ে খাটছে। শিল্পবিপ্লবের যখন প্রথম পত্তন হল তখন ইংলণ্ডের ল্যাংকাশায়ারে সুতো-কাটার কারখানা খুব বেড়ে উঠল। অতএব তখন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেশি ক্রীতদাসের প্রয়োজন হল; কারণ ল্যাংকাশায়ারের কারখানাগুলোতে যে সুতো কাটা হত তার তুলো আসত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের বড়ো বড়ো বাগানগুলো থেকে। এইসব তুলোর বাগান হু হু করে বেড়ে চলল; আফ্রিকা থেকে ক্রমেই আরও বেশি করে ক্রীতদাস আনা হতে লাগল; গরু-ঘোড়ার মতো নিগ্রো জন্মাবার জন্যেও নানাবিধ চেষ্টা শুরু হল। ১৭৯০ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার; ১৮৬১ সনে এদের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০ লক্ষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দাস-প্রথা নিষিদ্ধ করে কতকগুলি খুব কঠোর আইন তৈরি করল। ইউরোপ এবং আমেরিকার অন্যান্য দেশও এর দেখাদেখি আইন করল। কিন্তু দাস-ব্যবসায় এইভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পরও আফ্রিকা থেকে আমেরিকাতে নিগ্রো দাস নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। তফাতের মধ্যে শুধু তাদের পথের দুর্দশা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। এখন আর তাদের প্রকাশ্যভাবে নিয়ে যাওয়া চলবে না; সুতরাং তাদের নেওয়া হতে লাগল গোপনে, মানুষের চোখে না পড়ে এমন করে একের পর এক করে আলগা তক্তার পাটাতন সাজিয়ে, তারই ফাঁকে ফাঁকে। একজন আমেরিকান লেখক বলেছেন, "অনেক সময়ে একজন আর-একজনের কোলের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকত, এর পা ওর পায়ের উপরে গিয়ে পড়ত, ঠিক যেন সবাই মিলে গাদাগাদি হয়ে ঠেলাগাড়িতে চড়েছে!" এর ভীষণতা কতখানি ছিল তা পুরোপুরি আন্দাজ করাও শক্ত। এত নোংরা হয়ে এদের থাকতে হত যে চার-পাঁচবার খেপ দেবার পরই জাহাজটাকে অব্যবহার্য বলে ফেলে দিতে হত। কিন্তু তবু এই ব্যবসায়ে লাভ ছিল দারুণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই ব্যবসায় সবচেয়ে জোর চলেছিল; এই সময়টাতে আফ্রিকার দাস-উপকূল থেকে প্রতি বছর অন্যূন এক লক্ষ করে দাস ধরে নিয়ে আসা হত। আরও একটি কথা মনে রেখো, এই দাসদের ধরে আনা হত গ্রাম লুঠ করে; সুতরাং যে পরিমাণ দাস ধরে আনা হত, তাদের ধরবার জন্যে তাদের চেয়ে আরও অনেক বেশি-সংখ্যক লোককে হত্যা করতে হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বা তারই কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো দেশেই দাস-ব্যবসায়কে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হল; যুক্তরাষ্ট্রেও। কিন্তু দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ হলেও দাস-প্রথা তখনও আমেরিকায় বৈধ বলে প্রচলিত রইল; মানে পুরোনো দাস যারা ছিল তারা তখনও দাসই রইল। এবং দাস-প্রথা বৈধ বলেই, আইনের বারণ সত্ত্বেও দাস-ব্যবসায়ও ঠিক চলতে লাগল। তার পর ব্রিটেনে দাস-প্রথাটাকেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। সুতরাং তখন নিউইয়র্ক'ই হয়ে উঠল দাস-ব্যবসায়ীদের মাল খালাস দেবার প্রধান বন্দর।

বহু বৎসর ধরে নিউইয়র্কের বন্দরে এই বাণিজ্য চলতে লাগল—ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে মাঝামাঝি পর্যন্ত। উত্তর-অঞ্চলের দেশগুলি তখন দাস-প্রথার বিরোধী। দক্ষিণ-অঞ্চলের দেশরা কিন্তু তখনও এই দাসদের কিনে নিচ্ছে, তাদের বাগানের জন্যে। অতএব দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই কতকগুলো রাজ্য দাস-প্রথা বর্জন করেছে, কতকগুলো একে টিঁকিয়ে রেখেছে। অনেক সময় আবার নিগ্রো দাসেরা দাসপ্রথাওয়ালা অঞ্চল থেকে পালিয়ে দাসপ্রথারহিত অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিত; তখন আবার তাই নিয়ে লাগত এদের মধ্যে ঝগড়া।

উত্তর এবং দক্ষিণ -অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন এবং স্বার্থ এক নয়; ১৮৩০ সনেই বাণিজ্য-শুল্ক প্রভৃতি নিয়ে দুয়ের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বাইরে চলে যাবে বলে হুমকি দেখাতে লাগল। রাজ্যগুলো নিজের নিজের অধিকার রক্ষা করতে ব্যস্ত; যুক্তরাষ্ট্র-সরকার তাদের উপর বেশি হস্তক্ষেপ করে এটা তাদের পছন্দ নয়। দেশের মধ্যে দুটো দল দাঁড়িয়ে গেল; এক দল রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষপাতী; অন্য দল চায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন।

এইসমস্ত ব্যাপারের ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ-অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলল; নূতন কোনো রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এসে যোগ দিতে গেলেই প্রশ্ন উঠতে লাগল, সে রাজ্য এদের কোন্ পক্ষে যাবে। দেশের জনাধিক্যই বা কোন্ দিকে? ইউরোপ থেকে ক্রমাগত লোক আমদানির ফলে উত্তর-অঞ্চলের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে; দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকদের ভয় হল, লোকসংখ্যায় উত্তর-অঞ্চল অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ছাড়িয়ে চলে যাবে; তার পর আর কোনো ব্যাপারেই তারা ভোটে জিততে পারবে না। এমনি করে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে শত্রুতার ভাব ক্রমশ বেড়ে চলল।

ইতিমধ্যে উত্তর-অঞ্চলে একটি আন্দোলন শুরু হল, দাস-প্রথাকে একেবারেই তুলে দেওয়া হোক। এর পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হত 'বর্জনপন্থী'; এ'দের প্রধান নেতার নাম ছিল উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসন। ১৮৩১ সনে গ্যারিসন 'লিবারেটর' নামে একটি পত্রিকা বার করলেন, এর লক্ষ্য ছিল তাঁর দাসত্ব-বর্জন আন্দোলনকে সমর্থন করা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই গ্যারিসন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, এই ব্যাপার নিয়ে কোনোরকম আপোষ-মীমাংসা করতে তিনি রাজি নন; এর সম্বন্ধে কোনো কারণেই তিনি নরম পন্থাও স্বীকার করবেন না। পত্রিকার এই সংখ্যাটিতে তাঁর যে প্রবন্ধটি ছিল তার কতকগুলো কথা সর্বত্র বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল; আমি সে কথা ক'টি এখানে উদ্ধৃত করছি :

"আমি সত্যের মতোই কঠোর, ন্যায়বিচারের মতোই নিষ্করুণ হব। এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় কথায় বা লেখায় আমি কিছুমাত্র নরমপন্থী হবার ইচ্ছা রাখি না। না! না! যার ঘরে আগুন লেগেছে তাকে বলো খুব আস্তে আস্তে সে লোকজন ডাকুক; বলো তাকে, ধর্ষণকারীর আ[illegible] থেকে তার স্ত্রীকে সে ভদ্রভাবে উদ্ধার করতে যাক; জননীকে বলো, তাঁর শিশু আগুনে পড়ে গিয়েছে, তাকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে টেনে তুলুন—তবু বর্তমান এই সমস্যাটির মতো একটা কাজে রয়ে-সয়ে অগ্রসর হবার সুযুক্তি আমাকে দিতে এসো না। এ আমার সমগ্র প্রাণের সাধনা—আমি দ্ব্যর্থক কথা বলব না, কোনো ওজর-আপত্তি তুলব না, এক তিলও পিছনে হটব না—আমার বক্তব্য আমি জগৎকে শোনাবই।"

এ'র মতো এই বীরোচিত নিষ্ঠা কিন্তু অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। দাসত্বের বিরোধী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত ছিল, যেখানে দাস-প্রথা বস্তুত টি'কে রয়েছে সেখানে তাকে ঘাঁটাতে গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু তবুও উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ বেড়ে চলল; কারণ, সে বিরোধের মূলে ছিল দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ। প্রধানত বাণিজ্যশুল্কের সমস্যাটা নিয়েই এদের সে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

১৮৬০ সনে আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ-অঞ্চল বিদ্রোহ ঘোষণা করল। লিংকন দাসত্বের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ কথাও তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে, যেখানে দাস-প্রথা বর্তমান রয়েছে সেখানে এর উপরে হস্তক্ষেপ তিনি করবেন না; তবে নূতন কোনো অঞ্চলে একে বিস্তৃত হতে দিতে, বা আইন করে একে বৈধ বলে স্বীকার করতে তিনি রাজি নন। তাঁর এই আশ্বাসবাক্যে দক্ষিণ-অঞ্চল তৃপ্ত হল না; একটির পর একটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। নূতন প্রেসিডেন্টের সামনে এই বিষম সমস্যা এসে উপস্থিত হল। দক্ষিণ-অঞ্চলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করবার, এই ভাঙাচোরাটাকে বন্ধ করবার জন্যে তিনি তখনও আবার চেষ্টা করলেন; দাস-প্রথাকে চলতে দেবেন বলে সব রকমের প্রতিশ্রুতি এদের দিলেন। এ পর্যন্ত বললেন, (যেখানে এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে সেখানে) একে তিনি রাজ্যের শাসনবিধিরই অন্তর্গত করে দিতে প্রস্তুত আছেন, তা হলেই এটা একেবারে চিরস্থায়ী বস্তু হয়ে যাবে। বস্তুত শান্তিস্থাপনের জন্যে তিনি প্রায় সমস্ত-কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু একটি বস্তু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হলেন না, সে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রটাকে ভেঙে খান্ খান্ করে দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাইরে চলে যাবার অধিকার কোনো রাজ্যের আছে, এ কথাটা তিনি কিছুতেই স্বীকার করলেন না।

কিন্তু এত চেষ্টা করেও লিংকন গৃহযুদ্ধকে ঠেকাতে পারলেন না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভেঙে বেরিয়ে যাবে বলে দক্ষিণ-অঞ্চল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে; এগারোটি রাজ্য সত্যিই বেরিয়ে গেল; সীমান্ত-অঞ্চলের আরও কয়েকটি রাজ্য এদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে লাগল। যে রাজ্যগুলি বেরিয়ে গেল

তারা নিজেদের নাম নিল 'রাজ্য-সংঘ' (Confederate States)। নিজেদের একজন প্রেসিডেন্টও তারা নির্বাচন করল, তাঁর নাম জেফারসন ডেভিস। ১৮৬১ সনের এপ্রিল মাসে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। দীর্ঘ চারটি বছর ধরে এই যুদ্ধ চলল; কত ভাই নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করল, কত বন্ধু নিজের বন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করল, তার হিসাব নেই। যুদ্ধ চলবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই পক্ষে বড়ো বড়ো সেনাবাহিনী গড়ে উঠল। উত্তর-অঞ্চলের অনেকগুলো সুবিধা ছিল; তার লোকসংখ্যা অনেক বেশি, ধনসম্পদও বেশি। সে হচ্ছে কলকারখানা এবং শিল্পের দেশ, তার সহায়-সম্পদ অনেক বেশি, রেললাইনও অনেক বেশি। ও দিকে দক্ষিণ-অঞ্চলের সেনা আর সেনাপতিরা ছিল অনেক ভালো; বিশেষ করে জেনারেল লী খুবই বড়ো সেনাপতি ছিলেন। প্রথম দিকের সমস্ত যুদ্ধেই দক্ষিণ-অঞ্চলের জয় হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-অঞ্চল লড়াই চালাতে পারল না। ইউরোপের বাজারের সঙ্গে দক্ষিণ-অঞ্চলের সমস্ত যোগাযোগ উত্তর-অঞ্চলের নৌবহরের বিক্রমে ছিন্ন হয়ে গেল; তার তুলো তার তামাক রপ্তানি করবার আর কোনো পথই রইল না। এর ফলে দক্ষিণ-অঞ্চল একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ল। আবার এরই ফলে কিন্তু ল্যাংকাশায়ারেরও অত্যন্ত দুর্দশা হল, তুলোর অভাবে সেখানে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ল্যাংকাশায়ারে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ল, তাদের কষ্টের আর সীমা রইল না।

এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের সহানুভূতি মোটের উপর ছিল দক্ষিণ-অঞ্চলের দিকে; অন্তত ইংলণ্ডের ধনীশ্রেণীগুলো দক্ষিণ-অঞ্চলের পক্ষই সমর্থন করছিলেন। প্রগতিবাদীরা ছিলেন উত্তর-অঞ্চলের সমর্থক।

এই গৃহযুদ্ধের প্রধান কারণ দাস-প্রথা নয়। তোমাকে বলেছি, লিংকন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশ্বাস দিচ্ছিলেন, যেসব জায়গাতে দাস-প্রথা বর্তমান আছে তার সর্বত্রই তিনি একে স্বীকার করে নেবেন। আসলে হাঙ্গামা বাধল উত্তর এবং দক্ষিণ-অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা থেকে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে স্বার্থ পরস্পরের বিরোধীও ছিল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে লিংকনকেই যুদ্ধ করতে হল। যুদ্ধ বাধবার পরেও কিন্তু লিংকন দাস-প্রথা সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট উক্তি করছিলেন না; তাঁর ভয় ছিল, উত্তর-অঞ্চলে যারা এই প্রথার পক্ষপাতী তারা এবং সীমান্ত অঞ্চলের রাজ্যগুলোও পাছে বেঁকে দাঁড়ায়। যুদ্ধ চলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ক্রমেই স্পষ্ট কথা বলতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি প্রস্তাব করলেন, সমস্ত দাসকে কংগ্রেস মুক্ত করে দেবে, তার আগে এদের দরুন ন্যায্য ক্ষতিপূরণ মালিকদের মিটিয়ে দেবে। তার পরে তিনি ক্ষতিপূরণের কথাটা বাতিল করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৬২ সনে তিনি তাঁর 'দাস-মুক্তির ঘোষণাপত্র' প্রচার করলেন; এতে বলা হল, সরকারের বিরুদ্ধে যেসব রাজ্য বিদ্রোহ করেছে, তাদের মধ্যে যেখানে যত দাস আছে সকলকেই ১৮৬৩ সনের পয়লা জানুয়ারি থেকে মুক্ত বলে গণ্য করা হবে। এই ঘোষণা-বাক্যটি প্রচার করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় দক্ষিণ-অঞ্চলের সামরিক শক্তি কমিয়ে আনা। এর ফলে চল্লিশ লক্ষ দাস মুক্ত হয়ে গেল: লিংকনের নিশ্চয়ই আশা ছিল এরা রাজ্য-সংঘের মধ্যেই গোলমাল সৃষ্টি করবে।

দক্ষিণ-অঞ্চল যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন হয়ে পড়ল। ১৮৬৫ সনে গৃহযুদ্ধের শেষ হল। যুদ্ধ বস্তুটা যে-কোনো অবস্থাতেই ভয়ানক; কিন্তু গৃহযুদ্ধ তার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক। চারবৎসরব্যাপী এই ভয়াবহ সংগ্রামের বোঝা সবচেয়ে বেশি পড়েছিল প্রেসিডেন্ট লিংকনেরই উপরে; এর যে ফল দাঁড়াল তারও কৃতিত্ব প্রধানত তাঁরই; অত্যন্ত ধীর শান্ত সংকল্প এবং অধ্যবসায় নিয়ে তিনি সমস্ত নিরাশা, সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও অটল হয়ে ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করাই নয়, সে জয় সম্পন্ন করবার পক্ষে দ্বেষবুদ্ধির সৃষ্টিও যথাসম্ভব অল্প করে চলা; যেন যে যুক্তরাষ্ট্রকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে তিনি সংগ্রাম করছেন সেটা কেবল গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত মিলন না হয়, সত্যকার মনের মিলনই হয়ে উঠতে পারে। কাজেই যুদ্ধ জয় করবার পরে তিনি দক্ষিণ-অঞ্চলের প্রতি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। কিন্তু এর কয়েক দিন মাত্র পরেই একটা মাথা-পাগলা লোক তাঁকে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করল।

আমেরিকার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীর যাঁরা তাঁদের মধ্যে আব্রাহাম লিংকন একজন। পৃথিবীর

মহামানবদের মধ্যেও তাঁর নাম আছে। তাঁর জীবনের আরম্ভ হয়েছিল অতি দীন অবস্থায়; বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ তাঁর প্রায় হয় নি; শিক্ষা যেটুকু তাঁর ছিল সে তাঁর নিজের চেষ্টাতেই অর্জিত। তবুও তিনি অতি বড়ো একজন রাষ্ট্রনীতিক এবং অতি বড়ো একজন বাগ্মী হয়ে উঠেছিলেন; একটি বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছিলেন।

লিংকন দক্ষিণদেশের শাদা-আদমিদের প্রতি যতটা সদয় ব্যবহার দেখাতে পারতেন, তাঁর মৃত্যুর পরে আমেরিকার কংগ্রেস তা দেখাল না। এই দক্ষিণ-অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের প্রতি নানা রকমে শাস্তির ব্যবস্থা হল; অনেককে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল, অর্থাৎ, তাদের আর ভোট দেবার ক্ষমতা রইল না। ও দিকে আবার নিগ্রোদের নাগরিক বলে স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত রকমের অধিকার দিয়ে দেওয়া হল; এই নীতিটিকে আমেরিকার মূল শাসনতন্ত্রেরই অন্তর্গত করে নেওয়া হল। জাতি, বর্ণ, বা একদা সে দাস ছিল এই কারণ, দেখিয়ে কোনো রাজ্য কোনো মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না, এই মর্মেও আইন তৈরি করা হল।

আইনত নিগ্রোরা এখন স্বাধীন হল; ভোটের অধিকারও তারা পেল। কিন্তু এতে লাভ তাদের প্রায় কিছুই হল না, কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। যত নিগ্রোকে মুক্ত করে দেওয়া হল তাদের কারোই কোনোরকম ধনসম্পত্তি নেই; তাদের নিয়ে কী করা যায় সেইটেই তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অনেকে বাসস্থান ছেড়ে উত্তর-অঞ্চলে চলে গেল। কিন্তু অধিকাংশই যেখানে ছিল সেইখানেই বসে রইল; সেখানে তারা ঠিক আগের মতোই দক্ষিণ-অঞ্চলের শাদা-মনিবদের অনুগ্রহভিখারি হয়ে রইল। আগের দিনের সেই বাগানগুলোতেই তখন তারা দিন-মজুর হয়ে খাটছে; মাইনে বলে শাদা-মনিবরা যা দয়া করে দিচ্ছে তাই গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। দক্ষিণ-অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গরাও নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল, এই নিগ্রোদের তারা বিভীষিকার দ্বারাই সব দিক দিয়ে জব্দ করে রাখবে। অদ্ভুত ধরনের একটা অর্ধগুপ্ত সমিতি স্থাপিত হল, তার নাম 'কু ক্লুক্স ক্ল্যান'; এর সভ্যরা মুখোশ পরে ছদ্মবেশে নিগ্রোদের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে বেড়াত; নির্বাচনে তাদের ভোট দিতে পর্যন্ত দিত না।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নিগ্রোদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তাদের অনেকে এখন কিছু ভূসম্পত্তিও করেছে; বেশ ভালো কতকগুলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও তাদের হয়েছে। কিন্তু তবু এখনও তারা পরাধীন জাত, সেটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এখন নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ, দেশের মোট লোকসংখ্যার ঠিক প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। যেখানে তাদের সংখ্যা কম সেখানে তাদের একরকম সয়ে নেওয়া হয়, যেমন উত্তর-অঞ্চলের কোনো কোনো অংশে। কিন্তু সংখ্যায় বেড়ে গেলেই অমনি শ্বেতকায়রা তাদের উপর উৎপীড়ন শুরু করে, বুঝিয়ে দেয় আগের দিনে তারা ক্রীতদাস ছিল, তাদের এখনকার অবস্থাও তার চেয়ে বিশেষ উন্নত কিছু নয়! দেশের প্রত্যেক জায়গাতে প্রত্যেক ব্যাপারে শ্বেতকায়দের থেকে তাদের আলাদা করে রাখা হয়—হোটেলে, রেস্তোরাঁতে, গির্জায়, কলেজে, পার্কে, সমুদ্র-তীরের স্নানের ঘাটে, ট্রামে, এমনকি দোকানে পর্যন্ত তাদের আলাদা বন্দোবস্ত! রেলগাড়িতে তাদের বিশেষ একরকমের কামরায় চড়ে যেতে হয়, তার নাম 'জিম্ ক্রো কার' (কাকের মতো কালোদের গাড়ি)! শাদা-আদমি এবং নিগ্রোর মধ্যে বিয়ে হতে পারে না, আইনের নিষেধ। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আশ্চর্যরকমের সব আইন আছে সে দেশে। এই তো সে দিন, ১৯২৬ সনে, ভার্জিনিয়া-রাজ্যে একটি আইন তৈরি করা হয়েছে, শাদা-আদমি আর কালো-আদমিরা একই ঘরের মেঝেতে একত্র বসতে পারবে না!

মাঝে মাঝে আবার শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রোদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা বাধে। দক্ষিণ-অঞ্চলে একটি ভয়ংকর ব্যাপার প্রায়ই হয়, তার নাম লিঞ্চিং। এর মানে হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ একটা অপরাধ করেছে এই সন্দেহে বহু লোক একত্র হয়ে তাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। অল্পদিন আগেও এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গদের ক্ষিপ্ত জনতা নিগ্রোকে ধরে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে।

আমেরিকার সর্বত্র, এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে, নিগ্রোদের ভাগ্য এখনও বড়ো দুঃখময়। অনেক সময় দেখা যায়, শ্রমিকের অভাব ঘটেছে, এই অবস্থাতে দক্ষিণ-অঞ্চলের

কোনো কোনো রাজ্যে নিরীহ কতকগুলো নিগ্রোকে সাজানো মামলায় ফেলে জেলে দেওয়া হয়, তার পর সেই 'কয়েদি'দের আবার বেসরকারি ঠিকাদারদের কাজে খাটবার জন্যে ভাড়া দেওয়া হয়! ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশ্রী; কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আরও যেসব দুর্দশা এদের সইতে হয় সে অবর্ণনীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শুধু আইনের দ্বারা যে স্বাধীনতা মানুষ পায় শেষ পর্যন্ত তার মানে খুব বেশি কিছু নেই।

হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র লেখা 'আঙ্কল্ টম্স্ কেবিন' বইটি তুমি পড়েছ বা তার নাম শুনেছ? বইটি প্রাচীন কালে দক্ষিণদেশে যে নিগ্রো দাসরা ছিল তাদের নিয়ে লেখা, তাদের করুণ কাহিনীতে ভরা। গৃহযুদ্ধ বাধবার দশ বছর আগে এই বইটি প্রকাশিত হয়; দাস-প্রথার বিরুদ্ধে আমেরিকার জনসাধারণকে অবহিত করে তুলতে বইটি খুবই সাহায্য করেছিল।

১৩৮

আমেরিকার অদৃশ্য সাম্রাজ্য

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

গৃহযুদ্ধে আমেরিকার অসংখ্য যুবক প্রাণ হারাল, দেশের উপরে বিরাট একটা ঋণের বোঝা চেপে পড়ল। কিন্তু সে নূতন দেশ, সতেজ তার প্রাণশক্তি, তাই এতেও তার অগ্রগতি ব্যাহত হল না। আমেরিকার ছিল প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ; বিশেষ করে খনিজ সম্পদের তার সীমা ছিল না। আধুনিক যন্ত্রশিল্প এবং সভ্যতার মূলে রয়েছে তিনটি বস্তু—কয়লা, লোহা আর পেট্রোলিয়াম। এই তিনটি তার প্রচুর ছিল। তা ছাড়া তার আছে বহু স্রোতস্বতী নদী, তার থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে নেওয়া যায়; এর একটি উদাহরণ তোমার সহজেই মনে পড়বে, সেটি হচ্ছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। প্রকাণ্ড দেশ আমেরিকা, লোকসংখ্যাও অল্প, কাজেই প্রত্যেকটি লোকের পক্ষেই প্রচুর সুযোগ-সুবিধা সেখানে বর্তমান। অতএব দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রশিল্প এবং কারখানার দিক দিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে একটা দেশের যা যা দরকার তার সমস্ত সুযোগই তার হাতে ছিল। বেড়েও সে উঠল একেবারে তড়িৎগতিতে। ১৮৮০ সনের মধ্যেই দেখা গেল, বিদেশের বাজারে আমেরিকার যন্ত্রশিল্প ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলেছে। এক শো বছর ধরে ব্রিটেন বৈদেশিক বাণিজ্যে অতি অনায়াসেই শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে ছিল; এবার আমেরিকা আর জর্মনির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার সে গৌরব ভেঙে পড়ল।

দেশদেশান্তর থেকে অজস্র লোক আমেরিকায় আসতে লাগল। ইউরোপ থেকে সকল জাতের সকল রকমের লোক এল—জর্মন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, আইরিশ, ইতালিয়ান, ইহুদি, পোল। এদের অনেকে এল নিজের দেশে রাজনৈতিক পীড়ন থেকে পালিয়ে, অনেকে এল একটু ভালো জীবনযাত্রার লোভে। ইউরোপে তখন জনবাহুল্য ঘটেছে, তার বাড়তি লোকসংখ্যা আমেরিকার দিকে চলে আসতে লাগল। নানাপ্রকার বংশ জাতি ভাষা আর ধর্মের সে এক অপূর্ব মিশ্রণ। ইউরোপে এরা সকলে আলাদা হয়ে বাস করত, যে যার নিজের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পরস্পরের দিকে ঘৃণা এবং দ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এখানে এসে নূতন একটা পরিবেশের মধ্যে পড়ে একত্র একটা নূতন পরিচয় এরা অর্জন করল, পুরোনো দিনের সে ঘৃণা আর দ্বেষ-বুদ্ধির এখানে যেন কোনো জায়গাই নেই! এ দেশের সর্বত্র একটা বাঁধা-ধরনের আবশ্যিক শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; সে শিক্ষার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এদের সকলের নিজস্ব জাতিগত কোণ আর খোঁচগুলো ঘসে পালিশ হয়ে গেল; তার পর সেই সর্বজাতির সমন্বয় থেকে জন্মলাভ করল নূতন এক আমেরিকান জাতি। প্রাচীন দিনের অ্যাংলো-স্যাক্সন-বংশীয় যারা ছিল তারা তখনও নিজেদের মনে করছে দেশের অভিজাতসম্প্রদায়; সামাজিক জীবনে তাদেরই

প্রাধান্য। ঠিক এদের পরে এবং মর্যাদায় এদেরই কাছাকাছি এল উত্তর-ইউরোপ থেকে আগত জাতিগুলো। দক্ষিণ-ইউরোপ থেকে, বিশেষ করে ইতালি থেকে যারা এসেছিল, এই উত্তর-ইউরোপীয়রা তাদের একটু নীচ স্তরের লোক বলে মনে করত; অবজ্ঞা করে এরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ডাগো'। নিগ্রোদের কথা অবশ্য একেবারেই আলাদা, তারা ছিল একেবারেই শেষ স্তরের লোক; এইসব শাদা জাতের কারও সঙ্গেই তাদের মেলামেশা ছিল না। পশ্চিম-উপকূলে ছিল কিছু-পরিমাণ চীনা, জাপানি এবং ভারতীয়; সে অঞ্চলে যখন মজুরের চাহিদা খুব বেশি ছিল সেই সময়ে এরা এ দেশে আসে। এই এশিয়াবাসী জাতিরাও অন্যান্য সকলের থেকে দূরে সরে রইল।

রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফের জাল দেশের সর্বত্র জুড়ে বিস্তৃত হল, তার ফলে এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল। প্রাচীন যুগে, যখন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে লোকের বহু সপ্তাহ বহু মাস লেগে যেত, তখন এ ব্যাপার সম্ভব ছিল না। আমরা দেখেছি, অতীত কালে এশিয়াতে এবং ইউরোপে বহুবার বহু বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এইসব সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, কারণ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংবাদ পাঠানো বা যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বস্তুত স্বাধীন হয়েই থাকত, যে যার নিজস্ব ধরনের পৃথক জীবনযাত্রা নির্বাহ করত; তফাতের মধ্যে শুধু, সকলেই তারা সেই এক সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করত ও তাঁকে কর দিত। এই সাম্রাজ্যগুলো ছিল শুধু একই রাজার অধীনস্থ বিভিন্ন দেশের একটা অদৃঢ় সমন্বয়। সকলে মিলে এক লক্ষ্য, এক জীবন নিয়ে চলার কোনো ব্যাপার এর মধ্যে ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু রেলওয়ে ছিল, যানবাহন আর বার্তা প্রেরণের আরও নানারকম ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল দেশের সর্বত্র একটা একই রীতির শিক্ষাপ্রণালী; তাই সেখানে বিভিন্ন জাতি এবং দলের মধ্যে সেই এক লক্ষ্য এবং এক জীবনযাত্রা গড়ে উঠল। তার মধ্যকার নানা জাতি ক্রমে ক্রমে একত্র মিশে গিয়ে একটা বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হল। এই মিলন অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আজও এর কাজ চলছে। এত বিভিন্ন প্রকার এবং এত বিরাট-পরিমাণ মানুষের এতবড়ো একটা মিলনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই।

ইউরোপের রাজনীতি এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কূটকৌশলের হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্র দূরে সরেই থাকতে চেষ্টা করল। ইউরোপকেও সে আমেরিকা থেকে—উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, দুই মহাদেশ থেকেই—দূরে ঠেলে রাখতে চাইল। মনরোর নীতির কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। দক্ষিণ-আমেরিকাতে স্পেনের সাম্রাজ্য টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে 'হোলি অ্যালায়েন্স' নামে পরিচিত কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র একত্র হয়ে দক্ষিণ-আমেরিকার উপরে হস্তক্ষেপ করতে আসে; সেই সময়ে মনরো এই নীতির উদ্‌বোধন করেন। মনরো ঘোষণা করলেন, ইউরোপের কোনো শক্তি সমগ্র আমেরিকার কোথাও কোনো ব্যাপারে যদি সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে আসে তবে তার সে অনধিকার চর্চা যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই সহ্য করবে না, এই ঘোষণার ফলে দক্ষিণ-আমেরিকার নবজাত প্রজাতন্ত্রগুলো ইউরোপের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। এর ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবারও উপক্রম একবার হয়েছিল। কিন্তু এক শো বছরেরও বেশি কাল ধরে আমেরিকা এই নীতি সমানে অনুসরণ করে এসেছে।

উত্তর-আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক তফাত ছিল; এক শো বছরেও সে তফাত কিছুমাত্র কমে নি। উত্তরে কানাডা দিন দিন ঠিক যুক্তরাষ্ট্রেরই মতো হয়ে উঠছে; কিন্তু দক্ষিণের প্রজাতন্ত্রদের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলবে না। তোমাকে আমি আগেও একবার বলেছি, দক্ষিণ-আমেরিকার এই প্রজাতন্ত্রগুলো হচ্ছে লাতিন-বংশজাতদের দেশ; মেক্সিকোর অবস্থান উত্তর-আমেরিকাতে, কিন্তু জাতে সেও এদেরই সগোত্র। যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর মধ্যে যে সীমান্ত-রেখাটি, তার দুই ধারে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি আর সংস্কৃতির বাস। এর দক্ষিণে, মধ্য-আমেরিকার সরু ফালিটির ওপারে এবং দক্ষিণ-আমেরিকার বিরাট মহাদেশটির সর্বত্র জুড়েই, লোকেদের ভাষা হচ্ছে স্প্যানিশ আর পর্তুগিজ। বস্তুত স্প্যানিশ ভাষাটাই চলিত বেশি; আমি

যতদূর জানি, পর্তুগিজ ভাষাটা একমাত্র ব্রাজিলের লোকরাই বলে। দক্ষিণ-আমেরিকার দৌলতেই স্প্যানিশ ভাষা পৃথিবীতে বড়ো বড়ো ভাষাগুলোর মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। লাতিন-আমেরিকা আজও তার সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে স্পেন থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডাতে জাতিগত তফাতকে যত বড়ো করে দেখা হয়, এখানে তা হয় না। স্প্যানিশ বংশীয়দের সঙ্গে এখানে আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিয়ে হয়। কিছু পরিমাণে নিগ্রোদেরও হয়। এর ফলে এ দেশে একটা মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

এক শো বছর ধরে এরা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে, তবু কিন্তু দক্ষিণ-দেশের এই লাতিন প্রজাতন্ত্রগুলো একটা ধীর স্থির জীবন নিয়ে গুছিয়ে বসতে রাজি নয়। থেকে থেকেই এখানে বিদ্রোহ বিপ্লব আর সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র শাসন দেখা দেয়; এদের রাজনীতি আর শাসনব্যবস্থার এই নিত্যপরিবর্তনশীল রূপ, এর গতিধারার হদিশ পাওয়াই কঠিন। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রধান তিনটি দেশ হচ্ছে আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল আর চিলি—নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে এদের বলা হয় এ বি সি দেশ-ত্রয়। উত্তর-আমেরিকার মেক্সিকোও প্রধান লাতিন-আমেরিকান দেশদের মধ্যে অন্যতম।

লাতিন-আমেরিকার উপরে যখন ইউরোপ হস্তক্ষেপ করতে এল তখন মনরো-নীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রই তাকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু নিজের ধনসম্পদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরও এবার খোঁজ পড়ল, বাইরে কোথায় নিজের প্রতিপত্তি বিস্তৃত করবার মতো নূতন জায়গা পাওয়া যায়। স্বভাবতই তার দৃষ্টি সর্বপ্রথমে পড়ল গিয়ে লাতিন-আমেরিকার দিকে। সাম্রাজ্য গঠনের প্রাচীন রীতি হচ্ছে, জোর করে অন্য দেশকে দখল করা; যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সেরকম করে এর কোনো দেশকে দখল করতে চেষ্টা করল না। সে শুধু এই-সব দেশে তার মাল পাঠিয়ে পাঠিয়ে এদের বাজার দখল করে ফেলল। দক্ষিণ-দেশের রেলওয়ে, খনি এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারেও সে তার মূলধন ন্যস্ত করল; এদের সব শাসনকর্তৃপক্ষকে, এবং কখনও বা বিপ্লবের সময়ে ষড়যন্ত্রকারী পক্ষদের, টাকা ধার দিল। 'সে' বা আমেরিকা বলতে আমি বোঝাচ্ছি আমেরিকার ধনিক এবং ব্যাঙ্কারদের; কিন্তু তাদের পিছনে থেকে তাদের এই কাজে উৎসাহ দিচ্ছিল আমেরিকার সরকার। যে টাকা এইভাবে ধার দেওয়া হল বা লগ্নি করা হল তার জোরেই ক্রমে ক্রমে এই ব্যাঙ্কাররা দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার বহু ছোটো ছোটো রাজ্যের সরকারকে একেবারে নিজেদের তাঁবেদার করে ফেলল। এমনকি একটি দলকে টাকা বা অস্ত্রশস্ত্র ধার দিয়ে, অন্যটিকে না দিয়ে এইসব দেশে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলবার শক্তি পর্যন্ত এরা রাখত। বিরাট দেশ উত্তর-আমেরিকা, তার সরকার স্বয়ং রয়েছে এইসব ব্যাঙ্কার আর ধনিকদের পিছনে; দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলো সবই ছোটো আর দুর্বল, তাদের এ ক্ষেত্রে কীই-বা করবার সাধ্য আছে! অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার একেবারে সৈন্য পাঠিয়েই এইসব দেশের মধ্যে একটি দলকে সাহায্য করত; মুখে বলত, শান্তি আর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে করছি।

এমনি করে আমেরিকার ধনিকরা দক্ষিণ-অঞ্চলের এই ছোটো ছোটো দেশগুলোকে একেবারে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলল; এদের ব্যাঙ্ক রেলওয়ে খনি চলতে লাগল তাদেরই ইঙ্গিতে, তাদেরই স্বার্থ এবং প্রয়োজন অনুসারে। লাতিন-আমেরিকার বড়ো বড়ো দেশগুলোতেও এদের বিরাট প্রতিপত্তি, কারণ সেখানেও এরা টাকা খাটাচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তার মানে হচ্ছে, এইসমস্ত দেশের ধনসম্পদ বা অন্তত তার একটা বৃহৎ অংশ, যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব করে নিয়েছে। এটা একটা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু; কারণ এ হচ্ছে এক নূতন ধরনের সাম্রাজ্য, আধুনিক ধরনের সাম্রাজ্য। এটা হচ্ছে একটা অদৃশ্য সাম্রাজ্য, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য; এতে শোষণ আছে, কর্তৃত্ব আছে, অথচ বাইরে থেকে দেখলে একে সাম্রাজ্য বলে চেনাই যায় না। রাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের চোখে দক্ষিণ-আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। মানচিত্রে দেখা যায় এরা খুব বড়ো বড়ো দেশ; কোথাও কোনো দিক থেকে এদের স্বাধীনতার ত্রুটি আছে এমন প্রমাণ কোথাও মিলবে না। অথচ এদের প্রায় সবগুলোই সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে রয়েছে।

ইতিহাসের এই পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন যুগে সাম্রাজ্যবাদের নানা বিভিন্ন রূপ দেখেছি। একেবারে প্রথম যুগে এক দেশের উপরে অন্য এক দেশের যুদ্ধে জয়লাভের অর্থ ছিল, বিজিত দেশের জমি আর মানুষদের নিয়ে বিজেতারা যা খুশি তাই করতে পারে। এর জমি আর প্রজা উভয়কেই তারা নিজেদের অধীন করে নিত, অর্থাৎ বিজিত জাতির লোকেরা বিজেতাদের দাসে পরিণত হত। এইটেই ছিল সাধারণত প্রচলিত রীতি। বাইবেলে দেখা যায়, ইহুদিরা ব্যাবিলনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছে, ব্যাবিলনীয়রা তাদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। এই রকমের দৃষ্টান্ত বাইবেলে আরও অনেক আছে। কালক্রমে এর বদলে আর-এক রকমের সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিল; সেখানে শুধু জমিটাকেই আয়ত্ত করে নেওয়া হচ্ছে, প্রজাদের দাসে পরিণত করা হচ্ছে না। মালিকরা বুঝে ফেলেছিল, মানুষকে দাস করে রাখার চেয়ে তাদের কর বসিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে শোষণ করে অনেক বেশি লাভ আদায় করা যায়। আমাদের অনেকেই এখনও সাম্রাজ্য বলতে একেই বোঝেন, ব্রিটিশরা যেমন ভারতবর্ষে এসে বসেছে; আমরা ভাবি, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শাসনভারটা যদি একবার ব্রিটেনের হাত থেকে খসে পড়ে তা হলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে, কিন্তু এই ধরনের সাম্রাজ্য এরই মধ্যে অন্তর্হিত হতে শুরু করেছে; এর জায়গাতে এসে বসছে আরও উন্নত এবং পূর্ণাঙ্গ একটি ধরন। এই অতি-নূতন ধরনের সাম্রাজ্যে জমিও দখল করা হয় না, এতে শুধু দেশের ধনসম্পদ বা ধনসম্পদ উৎপাদন করবার উপকরণগুলোকে আয়ত্ত করে নেওয়া হয়। এর ফলে সে দেশটিকে বেশ পরিপাটিরূপে শোষণ করে নিজের লাভ গুছিয়ে নেওয়া চলে, তাকে মোটের উপর নিজের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করা যায়, অথচ তার দরুন সে দেশকে শাসন করবার বা পীড়ন করবার কোনো দায়িত্বই স্বীকার করতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে এতে অতি সামান্য আয়াসে সে দেশের জমি এবং বাসিন্দাদের উপরে প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্ব করা যায়।

এইরূপে কালে কালে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে তুলেছে; আধুনিক কালের সাম্রাজ্য হচ্ছে অদৃশ্য অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য। দাস-প্রথা যখন উঠে গেল, তার পরে আবার সামন্তযুগের ভূমিদাস-প্রথাও যখন উঠে গেল, সবাই মনে করল, এতদিনে বুঝি মানুষের মুক্তি মিলবে। কিন্তু দু দিন না যেতেই দেখা গেল, মানুষকে তখনও শোষণ করা হচ্ছে; টাকার জোর যাদের হাতে তারাই অন্য সকলের উপরে শোষণ আর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। ক্রীতদাস বা ভূমিদাস হবার পরিবর্তে মানুষ এবার হল 'বেতনের দাস'; মুক্তি তাদের তখনও অনেক দূরে। দেশে-দেশে সম্পর্ক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। লোকে মনে করে, একটা দেশ আর-একটা দেশের উপরে প্রভুত্ব করছে, যত বিপত্তির মূল এইখানেই; এই প্রভুত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারলেই স্বাধীনতা আপ্‌সে এসে হাজির হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি করে তার লক্ষণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না; দেখতে পাচ্ছি, বহু দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয়েও শুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রভুত্বের ফলে অন্য দেশের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যটা বেশ স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ে। ব্রিটেন ভারতের উপরে রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধিকারী। এই দৃষ্টিগোচর সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এবং এরই একটা আবশ্যক অঙ্গ হিসাবে আবার ভারতবর্ষের উপরে অর্থনৈতিক প্রভুত্বও ব্রিটেন স্থাপন করেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটেনের এই দৃষ্টিগ্রাহ্য সাম্রাজ্য হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই চলে যাবে, কিন্তু তখনও এ দেশে তার অর্থনৈতিক প্রভুত্ব টি'কে থাকবে। সেই হবে তার অদৃশ্য সাম্রাজ্য, এমন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। সে যদি হয় তবে বুঝতে হবে, ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের শোষণ তখনও সমান ভাবেই চলছে।

প্রভু-দেশের পক্ষে প্রভুত্ব করবার সবচেয়ে কম হাঙ্গামার পথ হচ্ছে এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপন। রাজনৈতিক প্রভুত্বের মতো অমন তীব্র প্রতিবাদ এতে ওঠে না, কারণ এর স্বরূপ অনেকে টেরই পায় না। কিন্তু এর কামড় যখন গায়ে ফুটে বসে তখন এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে লোকে সচেতন হয়ে ওঠে, আপত্তিও প্রকাশ করে। লাতিন-আমেরিকার লোকেরা আজকাল আর যুক্ত-রাষ্ট্রকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখছে না; উত্তর-আমেরিকার এই প্রভুত্বকে প্রতিরোধ করবার জন্যে লাতিন-আমেরিকার দেশগুলোকে একত্র করে একটা দল গড়বার চেষ্টাও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু

বেশি কিছু এরা করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না, যতদিন-না এরা এদের ঘন ঘন প্রাসাদ-বিপ্লব ঘটানো আর পরস্পরের সঙ্গে কলহের বদ অভ্যাসটি ত্যাগ না করে।

যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য সাম্রাজ্য রয়েছে ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই দ্বীপপুঞ্জটি আমেরিকা কীভাবে দখল করে নিল, সে কাহিনী আগের একটি চিঠিতে বলেছি। ১৮৯৮ সনে আটলান্টিক মহাসাগরের কিউবা বলে একটি দ্বীপ নিয়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে কিউবা স্বাধীন হয়ে যায়, কিন্তু যে শুধু নামেই। কিউবা এবং হাইতি, দুই দ্বীপেই আমেরিকা প্রভুত্ব করছে।

বছর বারো হল পানামার খালটি খোলা হয়েছে। এর অবস্থান হচ্ছে, মধ্য-আমেরিকায় যেখানে দেশটি অতি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেইখানে; আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরকে এ সংযুক্ত করে দিয়েছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে এই খালের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল; সুয়েজখাল যাঁর কীর্তি সেই ফার্ডিনান্ড ডি লেসেপ্স্ এরও পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু নানা বিপত্তির চাপে পড়ে তিনি একে কার্যে পরিণত করতে পারলেন না; খালটি তৈরি করল এসে আমেরিকানরা। তাদেরও ম্যালেরিয়া আর হল্‌দে জ্বরের দরুন মুশকিলে পড়তে হয়েছিল; তার পর তারা ও অঞ্চলে এই ব্যাধিগুলোকেই নির্মূল করবে বলে সংকল্প করল সেটাকে কার্যেও পরিণত করল। ম্যালেরিয়াবাহী মশা এবং অন্যান্য রোগবাহী পোকা ইত্যাদি যেখানে জন্মাতে পারে এমন সমস্ত খানা ডোবা ইত্যাদি স্থান তারা নষ্ট করে দিল; খালের কাছাকাছি এলাকাটাকে রীতিমতো স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করল। পানামা-অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের এলাকাতে খালটি অবস্থিত। কিন্তু খালটি তথা সেই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রটি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেরই কর্তৃত্বাধীনে। আমেরিকার পক্ষে এই খালটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এই খাল না থাকলে তার জাহাজগুলোকে গোটা দক্ষিণ-আমেরিকাটাকে প্রদক্ষিণ করে চলতে হত। তবুও অবশ্য সুয়েজখালের গুরুত্ব যতখানি, পানামা-খালের ততটা নয়।

এমনি করে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি আর ধনসম্পদ ক্রমাগত বেড়ে চলল; অন্যান্য বহু জিনিষের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কোটিপতি আর আকাশস্পর্শী ইমারত সে সৃষ্টি করতে লাগল, অনেক ব্যাপারে তারা ইউরোপেরই সমকক্ষ হয়ে উঠল, এমনকি তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। শিল্পব্যবসায়ের দিক থেকে সে হল জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ। অন্যসব দেশের তুলনায় তার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও অনেক বেশি উন্নত। এই সমৃদ্ধির জন্যেই সমাজতন্ত্রবাদ বা অন্যান্য প্রগতি-মূলক মতবাদ এ দেশে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন হয়েছিল। আমেরিকার শ্রমিকরা অত্যন্তরকম নরমপন্থী আর রক্ষণপন্থী; এর ব্যতিক্রম থাকলেও ক্বচিৎ দু-চার জন। বেশ ভালো মাইনে পাচ্ছে তারা; হয়তো-বা অবস্থার আর-একটু উন্নতি হবে, এই অনিশ্চিত ভরসায় তারা বর্তমান সুখসোয়াস্তিকে বিপন্ন করবে কেন? এই শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ইতালিয়ান বা অন্যান্য জাতের 'ডাগো'—বিদ্রূপ করে এই নামে তাদের ডাকা হত। এরা ছিল দুর্বল, অসংহত; আমেরিকানরা এদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। একটু ভালো মাইনে যারা পাচ্ছে সেই ওস্তাদ মজুররা পর্যন্ত নিজেদের 'ডাগো'দের চেয়ে আলাদা একটি শ্রেণীর লোক বলে মনে করত।

আমেরিকাতে দুটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল—রিপাব্‌লিকান (প্রজাতন্ত্রবাদী) আর ডেমোক্র্যাটিক (গণতন্ত্রবাদী)। ইংলণ্ডে যেমন হয়েছিল, বা তার চেয়েও বেশি মাত্রায়, এখানেও এরা দু দলই হল একই ধনীশ্রেণীর লোক নিয়ে গড়া; নীতি বা মতামতের দিক থেকে দুই দলের মধ্যে তফাত প্রায় কিছুই ছিল না।

এই যখন অবস্থা, এমন সময় এল বিশ্বযুদ্ধ; শেষ-পর্যন্ত আমেরিকাকেও তার আবর্তে গিয়ে পড়তে হল।

ইংলণ্ডের সাথে আয়ার্ল্যাণ্ডের সাত শো বছরের সংগ্রাম

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৩

এবার চলো আবার আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে যাই। জাহাজে বা এরোপ্লেনে চড়ে যেতে যেতে প্রথম যে দেশটি চোখে পড়ে সে হচ্ছে আয়ার্ল্যাণ্ড; অতএব সেইখানেই প্রথম থামা যাক। ইউরোপের দূর-পশ্চিম প্রান্তে এই সবুজ সুন্দর দ্বীপটি আটলাণ্টিক মহাসাগরে পা ডুবিয়ে বসে রয়েছে। ছোটো একটি দ্বীপ, জগতের ইতিহাসের বড়ো বড়ো ধারা এসে একে স্পর্শ করে না। কিন্তু ছোটো হলেও এর জীবনে রহস্য আর রোমাঞ্চের অভাব নেই; বহুশত বৎসর ধরে এর মানুষরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অদম্য সাহস আর আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এসেছে। শক্তিশালী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে অধ্যবসায়ের সে এক অপূর্ব কাহিনী! এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সাড়ে-সাত শো বছর আগে, আজও তার শেষ হয় নি! ভারতবর্ষে চীনে এবং অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ আমরা দেখেছি। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডকে একেবারে সেই প্রথম যুগ থেকেই এর ধাক্কা সইতে হয়েছে। তবু সে কোনোদিন স্বেচ্ছায় এর কাছে মাথা নত করে নি; প্রায় প্রত্যেক পুরুষেই একবার করে তার অধিবাসীরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানেরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, অথবা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। অসংখ্য আইরিশম্যান তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত অন্য কোনো দেশের সেনাদলে যোগ দিয়েছে; যেন এই ভাবেও তারা তাদের মাতৃভূমিকে শাসন এবং পীড়ন করছে যে দেশ, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একহাত লড়ে নিতে পারে। আয়ার্ল্যাণ্ডের নির্বাসিত সন্তানরা বহু দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে; যেখানে গেছে সেইখানেই তারা বুকের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের একটি ছবিকে চিরকাল বহন করে নিয়ে গেছে।

অসুখী মানুষ আর পীড়নক্লান্ত ও সংগ্রামরত দেশ, যারা বর্তমানকে নিয়ে অতৃপ্ত, বর্তমান জীবনে যারা কোনো সান্ত্বনা বা শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না, তাদের একটা অভ্যাস আছে, তারা অতীতের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, তার মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজে। এই অতীতকে তারা কল্পনায় খুব বড়ো করে দেখে, অতীত দিনের ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করে মনে শান্তি পায়। বর্তমান যেখানে কেবল বিষাদ আর হতাশায় আচ্ছন্ন, অতীতই সেখানে হয়ে ওঠে ক্লান্ত মনের আশ্রয়স্থান, তার মধ্যেই সে শান্তি পায়, অনুপ্রেরণা পায়। পুরোনো দিনের আঘাত আর অভিযোগগুলোও তার মনে কেবলই বাজতে থাকে, তাকে সে ভুলতে পারে না। এইভাবে কেবলই পিছনদিকে ফিরে তাকানোটা জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। স্বাস্থ্যবান মানুষ আর স্বাস্থ্যবান জাতি কাজ করে চলে বর্তমানকে নিয়ে, চোখ মেলে তাকায় ভবিষ্যতের পানে। কিন্তু যে মানুষ বা যে জাতি স্বাধীনতা হারিয়েছে, সুস্থও সে নয়; তাই তার পক্ষে পিছন ফিরে তাকানো, কিছুটা অন্তত সেই অতীতের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

এইজন্যই আয়ার্ল্যাণ্ড আজও তার অতীতকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে; প্রাচীন কালে একদা যখন সে স্বাধীন ছিল সেই যুগের স্মৃতি আজও আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অতি গর্বের ধন; স্বাধীনতার জন্য যত অসংখ্য সংগ্রাম সে করেছে এবং বিজেতার হাতে যত উৎপীড়ন তাকে সইতে হয়েছে তার প্রতিটি কাহিনী তাদের মনে জীবন্ত হয়ে আছে। পিছন ফিরে তারা তাকায়, চোদ্দ শো বছর আগে, খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে—সেই যুগে আয়ার্ল্যাণ্ড ছিল পশ্চিম-ইউরোপে বিদ্যাচর্চার বড়ো কেন্দ্র, বহু দূর দেশ থেকে ছাত্ররা সেখানে পড়তে আসত। রোমের সাম্রাজ্য তখন ভেঙে পড়েছে; বর্বর ভ্যাণ্ডাল আর হূনের আক্রমণে রোমান সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

শোনা যায়, সেই দুর্দিনে সংস্কৃতি আর সভ্যতার শিখাকে যে-কটি দেশ সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আবার ইউরোপে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিবতে দেয় নি, আয়াল্যাণ্ড তাদের মধ্যে একটি। বহু কাল আগেই আয়ার্ল্যাণ্ড খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল। অনেকে বলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন ঋষি সেণ্ট প্যাট্রিক এই ধর্ম সে দেশে প্রচার করেন। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকেই এই ধর্ম উত্তর-ইংলণ্ডে বিস্তৃত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে বহু মঠ স্থাপিত হয়; ভারতের প্রাচীন আশ্রম বা বৌদ্ধমঠের মতো এগুলোও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল; এখানেও অনেক সময়ে খোলা মাঠে বসেই শিক্ষাদান করা হত। এইসব মঠ থেকে প্রচারকরা যেতেন উত্তর এবং পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে, সেখানকার পৌত্তলিকদের মধ্যে খৃষ্টের নূতন ধর্মের কথা প্রচার করতে। আয়াল্যাণ্ডের এইসব মঠের কয়েকজন সাধুর হাতের লেখা চমৎকার পুঁথি আছে, আর সেগুলো তাঁরা চিত্রিতও করেছিলেন। ডাব্‌লিনে আজকাল এইরকম একটি চমৎকার হস্তলিখিত পুঁথি আছে, এর নাম The Book of Kells (বুক অব্ কেল্‌স্); এটি সম্ভবত লেখা হয়েছিল প্রায় বারো শো বছর আগে।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে এই দুই বা তিন শো বছর-কালকে অনেক আইরিশম্যান আয়াল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ বলে মনে করেন; এই সময়েই গেলিক সংস্কৃতির চরম সমৃদ্ধি ঘটেছিল। হয়তো এতখানি সময়ের ব্যবধান আছে বলেই এইসব প্রাচীন দিনের কাহিনীগুলো আরও বেশি রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে, আসলে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মহৎ বলে মনে হয়। আয়াল্যাণ্ডে সে যুগে বহু বিভিন্ন জাতির বাস ছিল, এরা সারাক্ষণই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করত। ভারত-বর্ষের মতোই আয়াল্যাণ্ডেরও দুর্বলতার হেতু ছিল তার এই আভ্যন্তরীণ কলহ। তার পর এল ডেন আর নর্সম্যান্‌রা; ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মতো এখানেও তারা আইরিশম্যান্‌দের বিধ্বস্ত করে দিল, দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঞ্চল দখল করে বসল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রায়ান বোরুমা বলে আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন রাজা ডেনদের পরাজিত করলেন এবং কিছুকালের মতো সমস্ত আয়াল্যাণ্ডকে একত্র সংবদ্ধ করলেন। আয়াল্যাণ্ডের ইতিহাসে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে দেশটি আবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

একাদশ শতাব্দীতে নর্মানবাহিনী ইংলণ্ড জয় করে, তাদের অধিনায়ক ছিলেন বিজয়ী উইলিয়ম। এর এক শো বছর পরে অ্যাংলো-নর্মানরা আয়াল্যাণ্ড আক্রমণ করল; দেশের যে অংশটি তারা জয় করে নিল তার নাম দিল 'পেল'। ইংরেজি ভাষায় একটি চল্‌তি কথা আছে,— beyond the pale বা পেলের ও ধারে। এর মানে হচ্ছে, কোনো-একটি বিশেষ দল বা সামাজিক শ্রেণীর বহির্ভূত, বা জাতে ঠেলা; কথাটা সম্ভবত এই 'পেল্' নাম থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাংলো-নর্মানদের এই অভিযান হয় ১১৬৯ সনে। এর ফলে প্রাচীন গেলিক সভ্যতা অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। আইরিশ উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধও সেই থেকেই শুরু হল, সে যুদ্ধ প্রায় অবিশ্রাম গতিতে দীর্ঘকাল চলে এসেছে। প্রায় এক শো বছর ধরে যুদ্ধ চলল; বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার একেবারে চরম দেখা গেল এই যুদ্ধে। ইংরেজরা (অ্যাংলো-নর্মানদের তখন এই নামেই ডাকা চলত) চিরকালই আইরিশদের একটা অর্ধ-সভ্য জাতি বলে জানত। দুয়ের মধ্যে জাতির তফাত ছিল; ইংরেজরা বংশে অ্যাংলো-স্যাক্‌সন, আইরিশরা কেল্ট্। তার পর এল ধর্মেরও তফাত—ইংরেজ এবং স্কচরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট হয়ে গেল, আইরিশরা তখনও রোমান ক্যাথলিক ধর্মকেই নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রইল। অতএব ইংলণ্ড আর আয়াল্যাণ্ডের মধ্যে এই যেসব যুদ্ধ চলল, এর মধ্যে জাতিগত এবং ধর্মগত যুদ্ধের সমস্তখানি রূঢ়তা আর বিদ্বেষই প্রকাশ পাচ্ছিল। ইংরেজরা বেশ ইচ্ছা করেই এই দুই জাতির মধ্যে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। এমনকি, ইংরেজ এবং আইরিশের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করেও তারা একটি আইন জারি করল (কিল্‌কেনির একটি স্ট্যাটিউট্)।

আয়াল্যাণ্ডের প্রজারা বার বার বিদ্রোহ করল, প্রত্যেক বারই অত্যন্ত নিষ্ঠুর পীড়ন চালিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করা হল। আইরিশ প্রজারা স্বভাবতই তাদের এই বিদেশী শাসক আর পীড়কদের দ্বেষের চোখে দেখত; সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করে বসত, অনেক সময় ভালো

সুযোগ ছাড়াই করত। এদের একটি পুরোনো প্রবচন আছে—"ইংলণ্ডের দুর্দিন মানেই আয়ার্ল্যাণ্ডের সুদিন"। রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক দুইরকম বিরোধেই আয়ার্ল্যাণ্ড বহুবার ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতি দেশের পক্ষ অবলম্বন করল। ইংরেজরা এতে অত্যন্ত চটে গেল। মনে করল, আয়ার্ল্যাণ্ড তাদের পিছন থেকে এসে ছুরি মেরেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; সুতরাং তারাও যতদূর সম্ভব নৃশংস আচরণ করে আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর তার শোধ তুলল।

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে (ষোড়শ শতাব্দীতে) স্থির হল, আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করবার জন্যে সেখানে কতকগুলো ইংরেজ জমিদার বসিয়ে দেওয়া হবে, এরাই তাদের শায়েস্তা করে দেবে। অতএব আইরিশদের বহু জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল, আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন ভূস্বামীশ্রেণীকে উৎসন্ন করে দিয়ে সেখানে বিদেশী ভূস্বামীদের এনে বসানো হল। অতএব আয়ার্ল্যাণ্ড হয়ে পড়ল বস্তুত একটা চাষি-প্রজার দেশ, তার ভূস্বামীরা সকলেই বিদেশী। শত শত বৎসর চলে যাবার পরেও এই ভূস্বামীরা আইরিশ প্রজার কাছে সেই বিদেশীই হয়ে রইলেন, তাদের সঙ্গে মিশলেন না।

এলিজাবেথের পরে রাজা হলেন প্রথম জেম্‌স্‌। আইরিশদের শায়েস্তা করবার ব্যাপারে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি স্থির করলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদেশীদের একটা রীতিমতো উপনিবেশ বসিয়ে দিতে হবে। এর জন্য উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডে আল্‌স্টার অঞ্চলের ছ'টি কাউণ্টির প্রায় সমস্ত জমিই রাজা স্বয়ং বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। বিনা পয়সায় জমি পাওয়া যাচ্ছে, ইংলণ্ড আর স্কট্‌ল্যাণ্ড থেকে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে ভাগ্যান্বেষী আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে হাজির হল। এই ইংরেজ এবং স্কচদের অনেকেই জমি নিয়ে চাষ-আবাদ করতে বসে গেল। এই উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করতে লণ্ডন-শহরকেও অনুরোধ জানানো হল; "আল্‌স্টারে প্রজাবসতি নির্মাণের" এই নূতন কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে লণ্ডনে একটি বিশেষ সমিতি গড়া হল। এই জন্যই উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডের ডেরি-শহরটির নাম হয়ে গেল লণ্ডনডেরি।

এইভাবে আল্‌স্টার হয়ে উঠল আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটেনের একটি অংশবিশেষ; আইরিশরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আল্‌স্টারের এই নবীন অধিবাসীরাও আবার আইরিশদের দ্বেষ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত। আয়ার্ল্যাণ্ডকে ভেঙে দুটি বিরোধী অংশে পরিণত করবার জন্যে ইংলণ্ডের কী চমৎকার একটা সাম্রাজ্যবাদী শয়তানি চাল! তার পর তিন শো বছর চলে গেছে, আল্‌স্টারকে নিয়ে এই সমস্যার আজও সমাধান হয় নি।

আল্‌স্টারে এই প্রজাবসতি স্থাপন করার অল্পদিন পরেই ইংলণ্ডে প্রথম চার্ল্‌স্‌ আর পার্লামেণ্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধল। পার্লামেণ্টের পক্ষে ছিল পিউরিটান আর প্রোটেস্ট্যাণ্টরা। আয়ার্ল্যাণ্ড ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী, সে স্বভাবতই রাজার পক্ষ গ্রহণ করল। আল্‌স্টার গেল পার্লামেণ্টের দিকে। আইরিশদের ভয় হল, পিউরিটানরা ক্যাথলিক মতকে বিধ্বস্ত করে দেবে—এ ভয় করার সঙ্গত কারণও ছিল। অতএব তারা ১৬৪১ সনে একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহ করে বসল। এই বিদ্রোহ এবং এর দমন-ব্যাপারে, দুই পক্ষই এমন অমানুষিক হিংস্রতা আর বর্বরতার পরিচয় দিল, আগের কোনো বিদ্রোহেই তা হয় নি। আইরিশ ক্যাথলিকরা প্রোটেস্ট্যাণ্টদের একেবারে নির্মমভাবে হত্যা করল। ক্রম্‌ওয়েল তার যে প্রতিশোধ নিলেন সেও অত্যন্ত ভয়ানক। বহু স্থানে আইরিশদের এবং বিশেষ করে ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের নিঃশেষে কচুকাটা করা হল। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা আজও ক্রম্‌ওয়েলের নামে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

এতখানি বিভীষিকা এবং নৃশংসতার আঘাতেও কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড দমল না; ঠিক এক পুরুষ পরেই আবার বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধের দুটি ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে, লণ্ডনডেরি আর লিমেরিক শহরের অবরোধ। আল্‌স্টার-অঞ্চলের লণ্ডনডেরি-শহরে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বাস; ১৬৮৮ সনে ক্যাথলিকধর্মী আইরিশরা এই শহর অবরোধ করল। শহরের লোকদের সমস্ত খাদ্য ফুরিয়ে গেল, তবু অনাহারে থেকেও তারা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শহর

রক্ষা করতে লাগল। অবশেষে, চার মাস ধরে অবরোধ আর দুর্দশা চলবার পরে খাদ্য আর সাহায্য নিয়ে ইংলণ্ড থেকে জাহাজ এসে পৌঁছল। লিমেরিক-শহরে ১৬৯০ সনে অবস্থা হল এর বিপরীত; ইংরেজরা সেখানে ক্যাথলিকধর্মী আইরিশদের অবরোধ করে বসল। এই অবরোধে সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখালেন প্যাট্রিক সার্সফীল্ড্; নিদারুণ দুর্যোগ আর বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়হস্তে শহর রক্ষা করতে লাগলেন। আইরিশ মেয়েরা পর্যন্ত এই শহর রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিল; সার্সফীল্ড্ আর তাঁর বীর সৈনিকদের কাহিনী নিয়ে গেলিক ভাষায় বহু গান রচিত হয়েছিল; সে গান আজও আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রাম-অঞ্চলে শোনা যায়। শেষ-পর্যন্ত সার্সফীল্ড্ লিমেরিক শহর ব্রিটিশদের হাতে সমর্পণ করলেন, কিন্তু সেও তাদের সঙ্গে একটি মর্যাদাপূর্ণ শর্তে সন্ধি করে নিয়ে, তার আগে নয়। লিমেরিকের এই সন্ধির একটি শর্ত ছিল, আইরিশ ক্যাথলিকদের সমাজ এবং ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে।

লিমেরিকের এই সন্ধি কিন্তু টি'কল না। ইংরেজরা, বা ঠিক করে বলতে গেলে আয়ার্ল্যাণ্ডে যে ইংরেজ ভূস্বামী পরিবারদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তারা, এই সন্ধি ভেঙে ফেলল। এই পরিবারগুলো প্রোটেস্ট্যাণ্ট; ডাব্লিনে যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র পার্লামেণ্ট ছিল, সেখানে এরাই কর্তৃত্ব করত। লিমেরিকের সন্ধিতে ইংরেজরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সত্ত্বেও, এরা কিছুতেই সমাজ এবং ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্যাথলিকদের অধিকার দিতে রাজি হল না। তার বদলে তারা আরও ক্যাথলিকদের শাস্তিবিধান করবার বিশেষ আইন তৈরি করল; এবং জেনেশুনে ইচ্ছা করে এদের পশমের ব্যবসাটি নষ্ট করে দিল। প্রজাদের উপরে নির্মম পীড়ন চালিয়ে এরা জমি থেকে তাদের উৎখাত করে দিল। মনে রেখো, এটা করছিল মুষ্টিমেয় ক'জন বিদেশী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ভূস্বামী; আর এর ফল ভুগতে হচ্ছিল যাদের তারাই হচ্ছে দেশের প্রজার অধিকাংশ; এরা ক্যাথলিক, এবং এদের মধ্যে অনেকেই সেই ভূস্বামীদের প্রজা। কিন্তু এই ইংরেজ ভূস্বামীদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ভূস্বামীরাও আবার নিজের মহালে কেউ বাস করতেন না, থাকতেন দূরে; প্রজাদের সমর্পণ করে যেতেন তাঁদের নৃশংস অর্থলোভী কর্মচারী আর তহশীলদারদের হাতে।

লিমেরিকের সন্ধি এরা ভাঙল, সে তো পুরোনো ব্যাপার। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে দেশের লোকের মনে যে বিদ্বেষ এবং ক্রোধ জেগে উঠল সে আজও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি; আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরেজরা যত হীন আচরণ করেছে তার কাহিনী হিসাবে আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের মনে লিমেরিকের এই ব্যাপারটিই আজও সর্বাপেক্ষা কুৎসিত বলে বেঁচে রয়েছে। সে সময়ে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ধর্মমত নিয়ে পীড়ন ও অত্যাচার, এবং ভূস্বামীদের নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের বহু প্রজা দেশ ছেড়ে অন্যান্য দেশে চলে গিয়েছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের যুবকদের মধ্যে যারা সেরা তারাই সব বিদেশে চলে গেল, এবং যেখানে যে দেশ ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তারই সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করতে অনুমতি চাইল। ইংলণ্ডের সঙ্গে যেখানেই যার যুদ্ধ হোক, এই আইরিশম্যানদের সেইখানেই ঠিক দেখতে পাওয়া যেত।

'গালিভার্স্ ট্রাভ্ল্স্' বইয়ের লেখক জোনাথান সুইফ্ট্ এই সময়ে বেঁচে ছিলেন (১৬৬৭ থেকে ১৭৪৫ সন পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল)। ইংরেজদের উপরে তিনি কতখানি চটা ছিলেন তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি উক্তি থেকে; তাঁর আইরিশ দেশবাসীদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "ইংরেজদের যা পাও তাই পুড়িয়ে দেবে তোমরা, কেবল তাদের কয়লা ছাড়া।" ডাব্লিন শহরে সেণ্ট্ প্যাট্রিক্স্ ক্যাথিড্রালে তাঁর সমাধি রয়েছে; সমাধিস্তম্ভের উপরে যে স্মৃতিফলকটি আছে তার ভাষা আরও বেশি তীব্র। সম্ভবত এই স্মৃতিলিপি তিনি নিজেই রচনা করে গিয়েছিলেন :

> এইখানে সমাহিত হয়েছে জোনাথান সুইফ্টের দেহ; ত্রিশ বছর ধরে তিনি ছিলেন এই ক্যাথিড্রালের ডীন। হিংস্র ঘৃণা এখন আর তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করছে না। যাও, পথিক, যদি পার, তাঁর

অনুকরণ কোরো, যিনি স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে পুরুষের মতো লড়াই করে গেছেন।

১৭৭৪ সনে আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর শুরু হল। কাজেই আটলান্টিকের ও পারে ব্রিটিশ সেনা পাঠাতে হল। আয়ার্ল্যান্ডে তখন বস্তুত ব্রিটিশ সৈন্য বলে কিছুই নেই। ও দিকে আবার শোনা যাচ্ছে, ফ্রান্স এসে আয়ার্ল্যান্ড আক্রমণ করবে; কারণ ফ্রান্সও ইতিমধ্যে ইংলন্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অতএব আয়ার্ল্যান্ডের ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট, দুই পক্ষই দেশরক্ষার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তুলল। কিছুদিনের মতো তারা পুরোনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে একত্র মিলে কাজ করল, এবং তাই করতে গিয়েই নিজেদের শক্তির সন্ধান পেয়ে গেল। ইংলন্ডকে আবারও বিদ্রোহের শাসানি দেওয়া হল। ইংলন্ড দেখল, আমেরিকা তো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, আবার বুঝি আয়ার্ল্যান্ডও যায়! ভয়ে ভয়ে সে আয়ার্ল্যান্ডকে একটি নিজস্ব স্বাধীন পার্লামেন্ট গঠন করবার মঞ্জুরি দিয়ে দিল। কাজেই নামে অন্তত আয়ার্ল্যান্ড আর ইংলন্ডের অধীন থাকল না, যদিও এরা উভয়ে তখনও একই রাজার অধীন হয়ে রইল। কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডের পার্লামেন্ট তখনও সেই পুরোনোকালের মতোই ক্ষুদ্র, সেখানে তখনও আগের মতোই ভূস্বামীদের আধিপত্য বজায় রয়েছে, এবং তার সমস্ত আসনই রয়েছে প্রোটেস্ট্যান্টদের দখলে। অতীত কালে এরাই ক্যাথলিকদের উপরে দারুণ অত্যাচার করেছে। তখনও নানা রকমে ক্যাথলিকদের উপরে অত্যাচার চলেছে। তফাতের মধ্যে হল শুধু এই, প্রোটেস্ট্যান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে মনে হল যেন একটু সম্প্রীতির ভাব স্থাপিত হয়েছে। এই পার্লামেন্টের নেতা ছিলেন হেন্‌রি গ্র্যাটান। তিনি নিজে প্রোটেস্ট্যান্ট। ক্যাথলিকরা বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের সে-সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে দিতে ইনি অনেক চেষ্টা করলেন। সে চেষ্টা অবশ্য প্রায় সমস্তটাই বিফল হল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে গেল। তাই দেখে আয়ার্ল্যান্ডেও লোকের মনে বড়ো বড়ো আশা জেগে উঠল। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিপ্লবের বার্তাকে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়েই সমান আগ্রহে গ্রহণ করল। এই দুই পক্ষ ক্রমশই পরস্পরের মিত্র হয়ে উঠছিল। এদের দুই দলকে একত্র মিলিয়ে দেবার জন্যে এবং ক্যাথলিকদের মুক্তি দেবার জন্যে একটি সংঘ স্থাপিত হল, তার নাম 'ইউনাইটেড আইরিশ্‌মেন' বা 'মিলনসংঘ'। সরকার এই সংঘটিকে অনুমোদন করল না, ভেঙে দিল। অতএব আয়ার্ল্যান্ডের প্রচলিত অভ্যাস হিসাবে ১৭৯৮ সনে আবার বিদ্রোহ হল। আগের কালে যেসব বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো ছিল আল্‌স্টার আর দেশের বাকি-অংশের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে যুদ্ধ। এবারের বিদ্রোহটা সে রকমের নয়; এটা হল জাতীয়তা-বাদীদের বিদ্রোহ, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক উভয়েই এতে খানিক পরিমাণ যোগ দিল। এই বিদ্রোহও ইংরেজরা দমন করল; এর আইরিশ নেতা উল্‌ফ্‌ টোনকে তারা বিশ্বাসঘাতক বলে প্রাণদণ্ড দিল।

অতএব দেখা গেল, আয়ার্ল্যান্ডকে স্বাধীন পার্লামেন্ট দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে আইরিশদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তনই হয় নি। এই সময়ে ইংলন্ডের নিজের যে পার্লামেন্ট ছিল, সেও অতি সংকীর্ণ দোষদুষ্ট এবং তার সভ্যরা 'পকেট বারো' ইত্যাদি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হচ্ছে, পার্লামেন্টে প্রভুত্ব করছে ক্ষুদ্র একটি ভূস্বামীশ্রেণী আর অল্প দু-চার জন অতি ধনি বণিক। আইরিশ পার্লামেন্টেও এই দোষগুলি সবই বর্তমান; তার উপর আবার সে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব রয়েছে মুষ্টিমেয় ক'জন প্রোটেস্ট্যান্টের হাতে, অথচ দেশের সমস্ত লোকই ক্যাথলিক। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন, এই আইরিশ পার্লামেন্টকে তুলে দেওয়া হবে, এবং আয়ার্ল্যান্ডকে একেবারেই ব্রিটেনের শামিল করে নেওয়া হবে। আয়ার্ল্যান্ডের লোক এর তীব্র প্রতিবাদ করল; কিন্তু ডাব্‌লিন পার্লামেন্টের সভ্যরা প্রচুর পরিমাণ ঘুষ খেয়ে তাদের নিজের পার্লামেন্টেরই অস্তিত্ব-লোপ মঞ্জুর করে দিল! ১৮০০ সনে অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন প্রণয়ন করা হল। এইভাবে গ্র্যাটানের স্বল্পজীবী পার্লামেন্টটির অবসান হল; তার বদলে আয়ার্ল্যান্ড থেকে কয়েকজন সভ্যকে লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠানো হল।

আয়ার্ল্যাণ্ডের এই পার্লামেণ্টের দোষের অভাব ছিল না, একে লুপ্ত করায় খুব বেশি ক্ষতি সম্ভবত হয় নি; তবে বলা যায় কী, হয়তো একদিন এইটেই অনেক ভালো কিছু একটা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এই অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন-এর একটা খুব বড়ো কুফল হল; সেই অনিষ্টটি ঘটাবার জন্যেই এই আইন করা হয়েছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট আর ক্যাথলিকরা একত্র মিলনের পথে এগিয়ে চলেছিল, এই আইনে সে আশার অবসান হয়ে গেল। আল্‌স্টারের প্রোটেস্ট্যাণ্টরা আবার আয়ার্ল্যাণ্ডের বাকি অংশের উপর বিমুখ হয়ে উঠল; দেশের দুটি অংশের মধ্যে ভেদবুদ্ধি আবার বেড়ে চলল। ইতিমধ্যে এদের দুয়ের মধ্যে আরও একটা তফাত এসে গিয়েছিল। ইংলণ্ডের মতো আল্‌স্টারও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করেছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের বাকি অংশ তখনও কৃষিপ্রধান; দেশের ভূমি-প্রথা আর দেশ থেকে প্রজাদের ক্রমাগত বিদেশে চলে যাবার দরুন সে কৃষিরও অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কাজেই উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ড শিল্পপ্রধান হয়ে উঠল; দক্ষিণ, পূর্ব, এবং বিশেষ করে পশ্চিম -অঞ্চলগুলি শিল্পপ্রগতির পথে পিছিয়ে পড়ে রইল, তার অবস্থা তখনও মধ্যযুগের মতো।

অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন প্রণীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিবাদে আবার বিদ্রোহ হল। এই ব্যর্থ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন রবার্ট্ এমেট নামে একজন প্রতিভাশালী যুবক; পূর্বগামী তাঁর বহু দেশবাসীর মতো ইনিও বধ্যমঞ্চে প্রাণ দিলেন।

ব্রিটেনের হাউজ অব কমন্‌সে আয়ার্ল্যাণ্ডের সভ্য পাঠানো হল; কিন্তু ক্যাথলিকদের নয়। ইংলণ্ডে বা আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের পার্লামেণ্টে যাবার অধিকার ছিল না। ১৮২৯ সনে এই নিষেধ তুলে দেওয়া হল; ক্যাথলিকরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রবেশের অধিকার পেলেন। এই নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল আইরিশ নেতা ড্যানিয়েল ও' কোনেল'-এর চেষ্টার ফলে; তাঁকে তাই আইরিশরা নাম দিল 'মুক্তিদাতা'। আরও একটি পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটল; ভোট দেবার অধিকারটাকে বিস্তৃত করে ক্রমেই বেশি লোককে সে অধিকার দেওয়া হল। আয়ার্ল্যাণ্ড এখন ব্রিটেনের সঙ্গে একত্র হয়ে গেছে, একই আইন এই দুই দেশে সমানভাবে বলবৎ হবে। কাজেই ১৮৩২ সনের বিখ্যাত রিফর্ম-বিল ব্রিটেনের মতো আয়ার্ল্যাণ্ডেও প্রযোজ্য হয়ে গেল। তার পরে যখন ফ্রান্‌চাইজ-বিল প্রণীত হল, সেটিরও সেই দশা ঘটল। এমনি করে ব্রিটেনের হাউজ অব কমন্‌সে যে আইরিশ সভ্যরা যেতেন তাদের প্রকার বদলে যেতে লাগল। আগে এঁরা ছিলেন শুধু ভূস্বামীদের প্রতিনিধি, এখন এঁরা ক্রমে হয়ে উঠলেন ক্যাথলিক চাষি আর জাতীয়তাবাদী আইরিশম্যানদের মুখপাত্র।

ভূস্বামীর শাসন আর হাড়ভাঙা করের চাপে সর্বস্বান্ত আইরিশ চাষিরা গোল আলুকেই তাদের প্রধান খাদ্য বানিয়ে নিয়েছিল। বস্তুত গোল আলু খেয়েই তারা জীবন ধারণ করত; আজকালকার ভারতীয় কৃষকেরই মতো তাদেরও সঞ্চিত সম্বল বলতে এমন কিছু ছিল না, দুর্যোগের সময় যার সাহায্যে তারা বেঁচে যেতে পারে। কোনোক্রমে প্রাণধারণ করে তারা শুধু টিঁকেই থাকত; বিপদে আত্মরক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থাই তাদের ছিল না। ১৮৪৬ সনে গোল আলুর খন্দ নষ্ট হয়ে গেল; এবং তার ফলে হল একটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময়েও কিন্তু ভূস্বামীরা তাদের প্রজাদের বাকি খাজনার দায়ে জমি থেকে উৎখাত করে দিতে লাগল। অসংখ্য আইরিশম্যান দেশ ছেড়ে আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে চলে গেল, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রায় জনহীন দেশ হয়ে পড়ল। তার বহু জমিতে চাষ-আবাদই বন্ধ হয়ে গেল, সেগুলো ক্রমে পশুচারণের ভূমিতে পরিণত হল।

একদা যেখানে চাষ-আবাদ চলেছে সেই কৃষির জমিকে ভেড়া-চরানোর মাঠে পরিণত করবার এই ব্যাপারটা এক শো বছরেরও বেশি কাল ধরে ক্রমাগত চলতে লাগল; আমাদের এই আমলেও এর রেশ এসে পৌঁচেছে। এর প্রধান কারণ, ইংলণ্ডে পশমী কাপড় তৈরির কারখানা বেড়ে যাচ্ছিল। সে কারখানায় যত বেশি কলকব্জার আমদানি হল ততই বেশি কাপড় তৈরি হতে লাগল। পশমেরও প্রয়োজন ততই বাড়ল। আয়ার্ল্যাণ্ডের ভূস্বামীরা দেখলেন, চাষের জমিতে মানুষে কাজ করাতে তাঁদের যা লাভ থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি লাভ হয় সে জমিগুলোকে ভেড়া চরাবার

মাঠে পরিণত করলে। চারণভূমির জন্যে বেশি মজুরের প্রয়োজন নেই, শুধু ভেড়াগুলোর খবরদারি করতে পারে এমন দু-চার জন লোক থাকলেই যথেষ্ট। অতএব কৃষক-মজুরদের অস্তিত্বটাই অনাবশ্যক হয়ে উঠল; ভূস্বামীরা তাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আয়ার্ল্যান্ডে বস্তুত লোকসংখ্যা অল্প ছিল, এই কারণেই সেখানে মজুরের খুব 'বাহুল্য' ছিল; দেশের জনসংখ্যা এভাবে কমতে লাগল। আয়ার্ল্যান্ড শুধু হয়ে রইল 'শিল্প-জীবী' ইংলন্ডকে কাঁচা মাল যোগান দেবার মতো একটি জায়গা। চাষের জমিকে পশুচারণ-ভূমিতে পরিণত করবার এই প্রাচীন রীতি এখন উলটে গেছে; এখন আবার সেই লাঙল তার নিজের জায়গা এসে দখল করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এ বস্তুটা সম্ভব হয়েছে আয়ার্ল্যান্ড আর ইংলন্ডের মধ্যে একটা বাণিজ্যিক সংগ্রামের ফলে; ১৯৩২ সন থেকে এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

জমির সমস্যা, অনুপস্থিত ভূস্বামীর অধীনে অসহায় প্রজার দুর্দশা, উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধরে এইটাই ছিল আয়ার্ল্যান্ডের প্রধান সমস্যা। শেষ-পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন এই ভূস্বামীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে ফেলবেন, আবশ্যিক রীতি করে এদের সমস্ত জমি কিনে নিয়ে সে জমি এঁদের প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেবেন। ভূস্বামীদের অবশ্য এতে কোনোই ক্ষতি হল না। সরকারের কাছ থেকে তাঁবা জমির সম্পূর্ণ মূল্যই বুঝে পেলেন। প্রজারা জমি পেল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে জমির দাম মিটিয়ে দেবার দায়িত্বও তাদের উপরে এসে পড়ল। এই দাম তাদের একবারে চুকিয়ে দিতে হল না, দিতে হল ছোটো ছোটো বার্ষিক কিস্তিতে।

১৭৯৮ সনের জাতীয় বিদ্রোহের পরে প্রায় এক শো বছরের মধ্যে আর আয়ার্ল্যান্ডে কোনো বড়-গোছের বিদ্রোহ হয় নি। এর আগে বহু শতাব্দী যাবৎ মাঝে মাঝে এইরকমের কাণ্ড করাই ছিল আয়ার্ল্যান্ডের অভ্যস্ত রীতি; উনবিংশ শতাব্দীতে সে রীতির ব্যতিক্রম দেখা গেল। এর কারণ কিন্তু কোনোরকম সন্তুষ্টির বোধ নয়। শেষবারের বিদ্রোহের ফলে আয়ার্ল্যান্ড অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তার উপরে আবার এসেছিল দুর্ভিক্ষের আঘাত আর লোক-হ্রাস। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মানুষের মনও কিছুটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দিকে ঝুঁকেছিল; তাদের আশা ছিল পার্লামেন্টে আয়ার্ল্যান্ডের যে প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাঁরাই হয়তো কিছু করে কর্মে উঠতে পারবেন। তবুও কিন্তু মাঝে মাঝে একটা বিদ্রোহ ঘটাবার অভ্যাসটাকে কয়েকজন লোক টিঁকিয়ে রাখতে চাইলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, একমাত্র এই উপায়েই আয়ার্ল্যান্ডের মন এবং প্রাণশক্তি চিরদিন সতেজ ও অকলঙ্কিত থাকতে পারবে। আয়ার্ল্যান্ড থেকে যাঁরা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছিলেন তাঁরা আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তির জন্য সেখানে একটি সমিতি স্থাপন করলেন। এঁদের নাম ছিল 'ফেনিয়ান'। এঁরা আয়ার্ল্যান্ডে ছোটো ছোটো কয়েকটি বিদ্রোহের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এঁদের আন্দোলন দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করল না; অল্পদিনের মধ্যেই 'ফেনিয়ান'-দলটি ভেঙে গেল।

চিঠিটা অত্যন্ত বেশি লম্বা হয়ে গেল, এবার আমি এটাকে শেষ করব। আয়ার্ল্যান্ডের গল্প কিন্তু আমার এখনও বলা শেষ হয় নি।

আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম-রুল এবং সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন

৯ই মার্চ, ১৯৩৩

এত বারবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্বিপাকে বিপন্ন হয়ে, আয়ার্ল্যাণ্ড ক্রমে স্বাধীনতা অর্জনের এই পন্থাটির সম্বন্ধে একটু বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সভ্য-নির্বাচনের অধিকার ক্রমে বেশি লোকের হাতে ছড়িয়ে দেওয়া হল; অনেক জাতীয়তাবাদী আইরিশম্যান হাউজ অব কমন্‌সের সভ্য নির্বাচিত হয়ে গেলেন। লোকের মনে আশা জাগল, এ'রা হয়তো আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আনবার দিকে কিছুটা কাজ করে উঠতে পারবেন; আগের দিনের মতো সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিবর্তে এখন পার্লামেণ্টের মধ্যে থেকে বৈধ উপায়ে কাজ হাসিল হবে বলেই তারা ভরসা করে রইল।

উত্তর-অঞ্চলের আল্‌স্টার এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিরোধ আবার বেড়ে গিয়েছিল। জাতি এবং ধর্মের যে তফাত ছিল সেটা টি'কেই রয়েছে, তার উপরে আবার অর্থনৈতিক তফাতটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। আল্‌স্টার ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের মতো শিল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে বড়ো বড়ো কারখানায় পণ্য-উৎপাদন চলছে। দেশের বাকি অংশটা তখনও কৃষিজীবী, তার জীবনযাত্রা মধ্যযুগের মতো, তার জন-সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, যারা আছে তারাও দরিদ্র। আয়ার্ল্যাণ্ডকে দুই অংশে বিভক্ত করে ফেলবার জন্যে ইংলণ্ড যে চাল দিয়েছিল সেটা অতিমাত্রায় সফল হয়েছে; এতখানি, যে পরবর্তী কালে ইংলণ্ড নিজেই যখন আবার এদের একত্র করতে চাইল, তখন সেও পেরে উঠল না। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার পথে আল্‌স্টারই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে বড়ো বাধা। আল্‌স্টারের লোকেরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট এবং ধনী; তাদের ভয় ছিল, আয়ার্লাণ্ড স্বাধীন হয়ে গেলে তখন দরিদ্র ক্যাথলিক আয়ার্লাণ্ডের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে দুটি নূতন কথার আমদানি হল—হোম-রুল। আয়ার্লাণ্ড যা চাইছিল তারই নাম দেওয়া হয়েছিল হোম-রুল। সাত শো বছর ধরে যে স্বাধীনতার জন্যে আয়ার্ল্যাণ্ড লড়াই করে এসেছে, তাতে আর এতে অনেক তফাত, তার চেয়ে এর গণ্ডিও অনেক ছোটো। এর মানে ছিল, ব্রিটেনের অধীনে আয়ার্ল্যাণ্ডের একটা পার্লামেণ্ট থাকবে, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থানীয় সব ব্যাপার সে নিয়ন্ত্রণ করবে; আর বিশেষ কতকগুলো জরুরি ব্যাপারের কর্তৃত্ব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতেই থেকে যাবে। স্বাধীনতার যে পুরোনো দাবি তাদের ছিল তাকে এরকম ছাঁট-কাট করে নিতে আইরিশম্যানদের অনেকে রাজি হলেন না। কিন্তু বিদ্রোহ আর বিরোধ করে করে দেশের লোক শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; এ'রা কয়েকবার বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, সে চেষ্টায় তারা যোগ দিতে রাজি হল না।

আয়ার্ল্যাণ্ডের যে সভ্যরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ছিলেন তাঁদের একজনের নাম চার্ল্‌স্‌ স্টুয়ার্ট্‌ পার্নেল। তিনি দেখলেন, কনজার্‌ভেটিভ (রক্ষণপন্থী) বা লিবারেল (উদারপন্থী), পার্লামেণ্টের কোনো দলই আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্যার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছে না। দেখে তিনি সংকল্প করলেন, এমন-একটা অবস্থা সৃষ্টি করবেন যেন এদের এই মুখ-মিষ্টি পার্লামেণ্টী চালিয়াতির খেলা আর এরা চালাতে না পারে। আরও কয়েকজন আইরিশ সভ্যকে দলে টেনে নিয়ে তিনি পার্লামেণ্টের সমস্ত কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন; এ'রা প্রত্যেক ব্যাপারে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে লাগলেন, আরও নানারকম ফিকির-ফন্দি খাটাতে লাগলেন, যেন পার্লামেণ্টের সমস্ত কাজেই খালি দারুণ দেরি হয়ে যায়। এইসমস্ত ফিকিরফন্দির জ্বালায় ইংলণ্ডের লোক তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠল; বলল, এগুলো পার্লামেণ্টের রীতিসঙ্গত নয়, ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু এসব সমালোচনায় পার্নেল কর্ণপাত করলেন না। ইংরেজদেরই গড়া রীতি-নীতি অনুসারে ইংরেজদের অতিভদ্র পার্লামেণ্টী চাতুরীর খেলা খেলতে তো তিনি পার্লামেণ্টে আসেন নি; তিনি এসেছেন

মাঠে পরিণত করলে। চারণভূমির জন্যে বেশি মজুরের প্রয়োজন নেই, শুধু ভেড়াগুলোর খবরদারি করতে পারে এমন দু-চার জন লোক থাকলেই যথেষ্ট। অতএব কৃষক-মজুরদের অস্তিত্বটাই অনাবশ্যক হয়ে উঠল; ভূস্বামীরা তাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আয়ার্ল্যান্ডে বস্তুত লোকসংখ্যা অল্প ছিল, এই কারণেই সেখানে মজুরের খুব 'বাহুল্য' ছিল; দেশের জনসংখ্যা এভাবে কমতে লাগল। আয়ার্ল্যান্ড শুধু হয়ে রইল 'শিল্প-জীবী' ইংলণ্ডকে কাঁচা মাল যোগান দেবার মতো একটি জায়গা। চাষের জমিকে পশুচারণ-ভূমিতে পরিণত করবার এই প্রাচীন রীতি এখন উল্টে গেছে; এখন আবার সেই লাঙল তার নিজের জায়গা এসে দখল করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এ বস্তুটা সম্ভব হয়েছে আয়ার্ল্যান্ড আর ইংলণ্ডের মধ্যে একটা বাণিজ্যিক সংগ্রামের ফলে; ১৯৩২ সন থেকে এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

জমির সমস্যা, অনুপস্থিত ভূস্বামীর অধীনে অসহায় প্রজার দুর্দশা, ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধরে এইটাই ছিল আয়ার্ল্যান্ডের প্রধান সমস্যা। শেষ-পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন এই ভূস্বামীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে ফেলবেন, আবশ্যিক রীতি করে এদের সমস্ত জমি কিনে নিয়ে সে জমি এ'দের প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেবেন। ভূস্বামীদের অবশ্য এতে কোনোই ক্ষতি হল না। সরকারের কাছ থেকে তাঁরা জমির সম্পূর্ণ মূল্যই বুঝে পেলেন। প্রজারা জমি পেল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে জমির দাম মিটিয়ে দেবার দায়িত্বও তাদের উপরে এসে পড়ল। এই দাম তাদের একবারে চুকিয়ে দিতে হল না, দিতে হল ছোটো ছোটো বার্ষিক কিস্তিতে।

১৭৯৮ সনের জাতীয় বিদ্রোহের পরে প্রায় এক শো বছরের মধ্যে আর আয়ার্ল্যান্ডে কোনো বড়-গোছের বিদ্রোহ হয় নি। এর আগে বহু শতাব্দী যাবৎ মাঝে মাঝে এইরকমের কাণ্ড করাই ছিল আয়ার্ল্যান্ডের অভ্যস্ত রীতি; ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে রীতির ব্যতিক্রম দেখা গেল। এর কারণ কিন্তু কোনোরকম সন্তুষ্টির বোধ নয়। শেষবারের বিদ্রোহের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ড অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তার উপরে আবার এসেছিল দুর্ভিক্ষের আঘাত আর লোক-হ্রাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মানুষের মনও কিছুটা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দিকে ঝুঁকেছিল; তাদের আশা ছিল পার্লামেণ্টে আয়ার্ল্যান্ডের যে প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাঁরাই হয়তো কিছু করে কর্মে উঠতে পারবেন। তবুও কিন্তু মাঝে মাঝে একটা বিদ্রোহ ঘটাবার অভ্যাসটাকে কয়েকজন লোক টিঁকিয়ে রাখতে চাইলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, একমাত্র এই উপায়েই আয়ার্ল্যাণ্ডের মন এবং প্রাণশক্তি চিরদিন সতেজ ও অকলঙ্কিত থাকতে পারবে। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে যাঁরা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছিলেন তাঁরা আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য সেখানে একটি সমিতি স্থাপন করলেন। এ'দের নাম ছিল 'ফেনিয়ান'। এ'রা আয়ার্ল্যান্ডে ছোটো ছোটো কয়েকটি বিদ্রোহের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এ'দের আন্দোলন দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করল না; অল্পদিনের মধ্যেই 'ফেনিয়ান'-দলটি ভেঙে গেল।

চিঠিটা অত্যন্ত বেশি লম্বা হয়ে গেল, এবার আমি এটাকে শেষ করব। আয়ার্ল্যান্ডের গল্প কিন্তু আমার এখনও বলা শেষ হয় নি।

আয়াল্যাণ্ডের হোম-র্ল এবং সিন্ ফিন্ আন্দোলন

৯ই মার্চ, ১৯৩৩

এত বারবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্বিপাকে বিপন্ন হয়ে, আয়ার্ল্যান্ড ক্রমে স্বাধীনতা অর্জনের এই পন্থাটির সম্বন্ধে একটু বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সভ্য-নির্বাচনের অধিকার ক্রমে বেশি লোকের হাতে ছড়িয়ে দেওয়া হল; অনেক জাতীয়তাবাদী আইরিশম্যান হাউজ অব কমন্সের সভ্য নির্বাচিত হয়ে গেলেন। লোকের মনে আশা জাগল, এ'রা হয়তো আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আনবার দিকে কিছুটা কাজ করে উঠতে পারবেন; আগের দিনের মতো সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিবর্তে এখন পার্লামেণ্টের মধ্যে থেকে বৈধ উপায়ে কাজ হাসিল হবে বলেই তারা ভরসা করে রইল।

উত্তর-অঞ্চলের আলস্টার এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিরোধ আবার বেড়ে গিয়েছিল। জাতি এবং ধর্মের যে তফাত ছিল সেটা টি'কেই রয়েছে, তার উপরে আবার অর্থনৈতিক তফাতটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। আলস্টার ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের মতো শিল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে বড়ো বড়ো কারখানায় পণ্য-উৎপাদন চলছে। দেশের বাকি অংশটা তখনও কৃষিজীবী, তার জীবনযাত্রা মধ্যযুগের মতো, তার জন-সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, যারা আছে তারাও দরিদ্র। আয়ার্ল্যাণ্ডকে দুই অংশে বিভক্ত করে ফেলবার জন্যে ইংলণ্ড যে চাল দিয়েছিল সেটা অতিমাত্রায় সফল হয়েছে; এতখানি, যে পরবর্তী কালে ইংলণ্ড নিজেই যখন আবার এদের একত্র করতে চাইল, তখন সেও পেরে উঠল না। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার পথে আলস্টারই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে বড়ো বাধা। আলস্টারের লোকেরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট এবং ধনী; তাদের ভয় ছিল, আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন হয়ে গেলে তখন দরিদ্র ক্যাথলিক আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে দুটি নূতন কথার আমদানি হল—হোম-রুল। আয়ার্ল্যাণ্ড যা চাইছিল তারই নাম দেওয়া হয়েছিল হোম-রুল। সাত শো বছর ধরে যে স্বাধীনতার জন্যে আয়ার্ল্যাণ্ড লড়াই করে এসেছে, তাতে আর এতে অনেক তফাত, তার চেয়ে এর গণ্ডিও অনেক ছোটো। এর মানে ছিল, ব্রিটেনের অধীনে আয়ার্ল্যাণ্ডের একটা পার্লামেণ্ট থাকবে, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থানীয় সব ব্যাপার সে নিয়ন্ত্রণ করবে; আর বিশেষ কতকগুলো জরুরি ব্যাপারের কর্তৃত্ব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতেই থেকে যাবে। স্বাধীনতার যে পুরোনো দাবি তাদের ছিল তাকে এরকম ছাঁট-কাট করে নিতে আইরিশম্যানদের অনেকে রাজি হলেন না। কিন্তু বিদ্রোহ আর বিরোধ করে করে দেশের লোক শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; এ'রা কয়েকবার বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, সে চেষ্টায় তারা যোগ দিতে রাজি হল না।

আয়ার্ল্যাণ্ডের যে সভ্যরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ছিলেন তাঁদের একজনের নাম চার্লস্ স্টুয়ার্ট্ পার্নেল। তিনি দেখলেন, কনজারভেটিভ (রক্ষণপন্থী) বা লিবারেল (উদারপন্থী), পার্লামেণ্টের কোনো দলই আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্যার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছে না। দেখে তিনি সংকল্প করলেন, এমন-একটা অবস্থা সৃষ্টি করবেন যেন এদের এই মুখ-মিষ্টি পার্লামেণ্টী চালিয়াতির খেলা আর এরা চালাতে না পারে। আরও কয়েকজন আইরিশ সভ্যকে দলে টেনে নিয়ে তিনি পার্লামেণ্টের সমস্ত কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন; এ'রা প্রত্যেক ব্যাপারে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে লাগলেন, আরও নানারকম ফিকির-ফন্দি খাটাতে লাগলেন, যেন পার্লামেণ্টের সমস্ত কাজেই খালি দারুণ দেরি হয়ে যায়। এইসমস্ত ফিকিরফন্দির জ্বালায় ইংলণ্ডের লোক তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠল; বলল, এগুলো পার্লামেণ্টের রীতিসঙ্গত নয়, ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু এসব সমালোচনায় পার্নেল কর্ণপাত করলেন না। ইংরেজদেরই গড়া রীতি-নীতি অনুসারে ইংরেজদের অতিভদ্র পার্লামেণ্টী চাতুরীর খেলা খেলতে তো তিনি পার্লামেণ্টে আসেন নি; তিনি এসেছেন

আয়ার্ল্যাণ্ডের কাজ উদ্ধার করতে। সাধারণ রীতির পথে চলে যদি সেটা করতে না পারেন, তবে যে-কোনো রকমের অসাধারণ পন্থা তিনি অবলম্বন করবেন, এতে তাঁর কোনো অন্যায় আছে বলে তিনি মনে করতেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের মনোযোগ আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রয়োজনের দিকে আকৃষ্ট করে তবে তিনি ছাড়লেন।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আইরিশ হোম-রুল দলের পার্নেলই হলেন অধিনায়ক। এই দলটির উৎপাতে ব্রিটেনের প্রাচীন দল দুটি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। দুটি দলের জোর যখন প্রায় সমান সমান হয়ে উঠত তখনই এই আইরিশ হোম-রুলওয়ালাদের খাতির বেড়ে যেত, কেননা তারা যে পক্ষে যোগ দেবে তাদেরই জয় হবে। এমনি করে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রশ্নটিকে সারাক্ষণই লোকের চোখের সামনে এরা ধরে রাখল। শেষ-পর্যন্ত গ্ল্যাড্‌স্টোন আয়ার্ল্যাণ্ডকে হোম-রুল দিতে রাজি হলেন; ১৮৮৬ সনে তিনি হাউজ অব কমন্‌সে একটি হোম-রুল বিলের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এতে আয়ার্ল্যাণ্ডকে অতি মৃদুরকমের খানিকটা স্বায়ত্তশাসনই দেবার কথা বলা হয়েছিল; তবুও একে নিয়ে প্রতিবাদের একেবারে ঝড়বন্যা শুরু হয়ে গেল। রক্ষণপন্থী দল স্বভাবতই এর সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। এমনকি গ্ল্যাড্‌স্টোনের নিজের দল মানে উদারপন্থী দলও এটাকে ভালো চোখে দেখল না। দলের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল, এবং একটা ভাগ সত্যসত্যই আলাদা হয়ে গিয়ে রক্ষণপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিল। এদের নাম দেওয়া হল 'ইউনিয়নিস্ট' বা মিলনপন্থী, কারণ এরা ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের একত্র মিলনেরই পক্ষপাতী। হোম-রুল বিল ভোটে হেরে গেল, তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যাড্‌স্টোনেরও পতন হল।

এর সাত বছর পরে, ১৮৯৩ সনে, গ্ল্যাড্‌স্টোন আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন তাঁর চুরাশি বছর বয়স। আবার তিনি তাঁর দ্বিতীয় হোম-রুল বিলের প্রস্তাব আনলেন; হাউজ অব কমন্‌সে অতি সামান্য একটুখানি সংখ্যাধিক্যের জোরে এটা কোনোক্রমে গৃহীত হয়ে গেল। কিন্তু আইনে পরিণত হবার আগে সমস্ত বিলকেই আবার হাউজ অব লর্ডসেও গৃহীত হতে হবে; সে হাউজ অব লর্ড্‌স্‌টা ছিল রক্ষণপন্থী আর প্রতিক্রিয়াপন্থীতেই ভরা। হাউজ অব লর্ড্‌স-এর সভ্যরা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত নয়, এটা হচ্ছে বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের একটা পুরুষানুক্রমিক সভা তার সঙ্গে থাকেন কয়েকজন বিশপ। হাউজ অব কমন্‌স্‌ হোম-রুল বিলটিকে অনুমোদন করেছিল, হাউজ অব লর্ড্‌স্‌ তাকে বাতিল করে দিল।

দেখা গেল, পার্লামেণ্টী পন্থায় চেষ্টা করেও আয়ার্ল্যাণ্ডের কাম্য ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও হয়তো একদিন চেষ্টা সফল হবে এই আশা নিয়ে আইরিশ জাতীয়তাবাদী দল (বা হোম-রুল দল) পার্লামেণ্টে থেকেই কাজ করে চললেন; মোটের উপর আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরাও এঁদের নীতিকে সমর্থন করছিল। কিন্তু এমন লোকও অনেক ছিল যারা এই নীতি এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উপর সকল আস্থাই হারিয়ে ফেলল। সংকীর্ণ অর্থে রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, বহু আইরিশম্যান তার উপরেই কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল; সংস্কৃতিমূলক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডে জাতীয় সংস্কৃতির একটি পুনরুজ্জীবন ঘটল; বিশেষ করে চেষ্টা হল, দেশের প্রাচীন ভাষা গেলিকভাষাকে আবার জাগিয়ে তুলতে—পশ্চিম-আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রাম-অঞ্চলগুলিতে সে ভাষা তখনও চল্‌তি ছিল। এই প্রাচীন কেল্‌টিক ভাষার সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ; কিন্তু বহুশত বৎসর ধরে ইংরেজ-শাসন চলার ফলে এটা শহর-অঞ্চল থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে সমস্ত ভাষাটাই লোপ পেয়ে যাচ্ছিল। আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা বুঝলেন, আয়ার্ল্যাণ্ড যদি তার নিজস্ব প্রাণধারা এবং তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে টিঁকিয়ে রাখতে চায় তবে তা করতে হবে তার নিজস্ব ভাষার মধ্য দিয়েই। কাজেই তারা পশ্চিম-অঞ্চলের গ্রামগুলো খুঁজে খুঁজে এই ভাষাকে বার করে আনবার এবং আবার তাকে একটি জীবন্ত ভাষায় পরিণত করবার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে একটি গেলিক সমিতিও স্থাপিত হল। সমস্ত দেশেই, এবং বিশেষ করে সমস্ত পরাধীন দেশে, জাতীয় আন্দোলন নিজের ভিত্তি রচনা করে দেশের প্রাচীন ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। বিদেশী ভাষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত আন্দোলন দেশের

জনসাধারণের মনে সাড়া জাগায় না, দেশের মাটিতে শিকড় বসাতে পারে না। আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে ইংরেজি ভাষাটা ঠিক বিদেশী ভাষা ছিল না। দেশের প্রায় প্রত্যেক লোকই সে ভাষা জানত, সে ভাষায় কথা বলত; গেলিকের চেয়ে ইংরেজি ভাষার সঙ্গেই লোকের বেশি পরিচয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবুও আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা গেলিক ভাষাকেই পুনর্জীবিত করে তোলাটাকে অবশ্যপ্রয়োজন বলে মনে করলেন, যেন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা তখন একটা কথা বিশ্বাস করত—শক্তি আসে ভিতর থেকে, বাইরে থেকে নয়। পার্লামেণ্টে গিয়ে খাঁটি রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কাজ উদ্ধার হবে এ ভ্রম তখন ঘুচেছে; তাই আরও দৃঢ়তর একটা ভিত্তি নিয়ে জাতিটাকে গড়ে তোলবার চেষ্টা চলল। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যে নবীন আয়ার্ল্যাণ্ড জন্মগ্রহণ করল তার রূপ পুরোনো আয়ার্ল্যাণ্ডের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পুনরুজ্জীবনের প্রভাব নানান দিক দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠল; সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নূতনত্ব এল সে কথা আগেই বলেছি; অর্থনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব দেখা গেল, সেখানে কৃষকদের একত্র করে সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের সংঘবদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা হল; সে চেষ্টা সফলও হল।

কিন্তু এর সমস্ত ব্যাপারেরই পিছনে ছিল স্বাধীনতার কামনা; ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যে আইরিশ জাতীয়তাবাদী দল রয়েছে, বাইরে থেকে মনে হত তাঁরা আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকের আস্থাভাজন, কিন্তু আসলে তাঁদের উপরে সে আস্থাও ক্রমশ কমে আসছিল। লোকেরা ক্রমে তাঁদের মনে করতে লাগল শুধু রাজনীতিক নেতা বলে, যারা খালি মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিতেই ভালোবাসেন, তার বেশি আর কিছু করবার শক্তি রাখেন না। প্রাচীন কালের ফেনিয়ানরা এবং স্বাধীনতাকামী অন্যান্য দলরা অবশ্য কোনোদিনই এই পার্লামেণ্টপন্থীদের আর তাদের হোম-রুল আন্দোলনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করত না। কিন্তু এখন এই নবীন এবং তরুণ আয়ার্ল্যাণ্ডও আর পার্লামেণ্টের মুখাপেক্ষী হতে রাজি হল না। সমস্ত ব্যাপারেই তো স্বাবলম্বনের কথা শোনা যাচ্ছে; রাজনীতিতেও সেই নীতিরই প্রয়োগ করলে ক্ষতি কী? আবার সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা লোকের মনে জেগে উঠল। কিন্তু কাজে নামবার এই কল্পনাকে একটা নূতন রকমের রূপ দেওয়া হল। আর্থার গ্রিফিথ ব'লে একজন তরুণ আইরিশম্যান একটি নূতন নীতির কথা প্রচার করতে লাগলেন, পরে এর নাম হয়েছিল সিন্‌ফিন্‌ (Sinn Fein) অর্থাৎ 'আমরা নিজেরা'।

এই কথা কটি থেকেই এর পিছনকার নীতিটির স্বরূপ আন্দাজ করা যায়। সিন্‌ফিন্‌দের কথা ছিল, আয়ার্ল্যাণ্ডকে তার নিজের জোরেই উঠে দাঁড়াতে হবে, রক্ষা বা করুণার জন্যে ইংলণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকা চলবে না। এরা ভিতর থেকেই জাতিটার শক্তি গড়ে তুলতে চাইল। গেলিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যেটা চলছিল, তাকে এরা সমর্থন করল। রাজনীতির ব্যাপারে যে অর্থহীন পার্লামেণ্টী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল তাকে সমর্থন করল না। বলল, এর কাছে প্রত্যাশা করবার আমাদের কিছুই নেই। অন্য দিকে আবার সশস্ত্র বিদ্রোহও এরা সম্ভবপর ব'লে মনে করল না। পার্লামেণ্টী কার্যনীতির পরিবর্তে এরা প্রচার করতে লাগল একটি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' নীতি; ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক প্রকারের অসহযোগ চালিয়ে সে নীতিকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। আর্থার গ্রিফিথ হাঙ্গেরির দৃষ্টান্ত দেখালেন; সেখানে এরই ঠিক এক পুরুষ আগে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে প্রজারা জয়লাভ করেছিল। তিনি বললেন, আয়ার্ল্যাণ্ডেও তারই অনুরূপ একটি কর্মনীতি গ্রহণ করে, তার চাপে ইংলণ্ডকে কথা শুনতে বাধ্য করানো হোক।

ভারতবর্ষে গত তেরো বছরে অসহযোগের নানান প্রকার নিয়ে আমরা অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি; আমাদের পূর্বগামী আয়ার্ল্যাণ্ডের এই নীতিটির সঙ্গে আমাদের নিজেদের নীতিটিকে একটু তুলনা করে দেখা যাক। পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানে, আমাদের এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি হচ্ছে অহিংসা। আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্মনীতির এরকম কোনো ভিত্তি বা পশ্চাৎপট ছিল না; তবু

সেখানেও যে অসহযোগের প্রস্তাব করা হল তার শক্তির উৎস ছিল একটি শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি। এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ পথে চালাতে হবে, এইটেই ছিল এদের বড়ো কথা।

ধীরে ধীরে আয়ার্ল্যান্ডের যুবকদের মনে সিন্ ফিন্‌দের এই মতামত প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সে মতামত অকস্মাৎ একদিন সমস্ত আয়ার্ল্যান্ডে আগুন জেবলে দেয় নি। তখনও এমন লোক বহু ছিল যারা পার্লামেণ্ট কিছু তাদের দেবে বলে প্রত্যাশা করত; বিশেষ করে তার কারণ, ১৯০৬ সনে উদারপন্থী দল বিপুল ভোটাধিক্য পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। কিন্তু হাউজ অব কমন্‌সে উদারপন্থীরা সংখ্যায় বেশি হ'লেও, হাউজ অব লর্ড্‌সে রক্ষণপন্থী আর ইউনিয়নিস্টরাই স্থায়ীভাবে সংখ্যাবহুল হয়ে বসে রয়েছে; অল্পদিনের মধ্যেই এই দুটি হাউজের মধ্যে সংঘাত বাধল। সংঘাতের ফলে লর্ডদের ক্ষমতা অনেকটা ছেঁটে দেওয়া হল। টাকাকড়ি মঞ্জুর করার ব্যাপারে স্থির হল, হাউজ অব লর্ড্‌স্ আপত্তি করলেও হাউজ অব কমন্‌স্ সে আপত্তি ঠেলে যেতে পারবে; হাউজ অব লর্ড্‌স্ যে প্রস্তাবটি বাতিল করল হাউজ অব কমন্‌স্ সেটিকে পর পর তিনটি অধিবেশনে তিনবার মঞ্জুর করিয়ে নিতে পারলেই হল। এমনি করে ১৯১১ সনের পার্লামেণ্ট অ্যাক্টের দ্বারা উদারপন্থীরা হাউজ অব লর্ড্‌সের বিষদাঁত টেনে তুলে দিল। তখনও কিন্তু কাজে বাধা দেবার এবং হস্তক্ষেপ করবার অনেকখানিই ক্ষমতা হাউজ অব লর্ড্‌সের হাতে থেকে গেল।

হাউজ অব লর্ড্‌স্ বাধা দেবে জানা কথাই; সে বাধাকে অতিক্রম করবার ব্যবস্থা এইভাবে করে নিয়ে এবার উদারপন্থীরা এই তৃতীয়বার হোম-রুল বিল উপস্থিত করল; ১৯১৩ সনে হাউজ অব কমন্‌স্ এই বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করল। হাউজ অব লর্ড্‌স্ সে বিলকে বাতিল করবে, সে তো জানা কথাই ছিল। হাউজ অব কমন্‌স্ তাতে দমল না, ধৈর্য ধরে বসে পর পর তিনটি অধিবেশনে তিনবার তারা বিলটিকে বহাল রাখল। ১৯১৪ সনে এই বিলটি আইনে পরিণত হল; সমগ্র আয়ার্ল্যান্ডের প্রতিই এটি প্রযোজ্য হল, আল্‌স্টারও বাদ গেল না।

অবশেষে এতদিনে মনে হল, আয়ার্ল্যান্ড হোম-রুল পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে তখনও অনেকগুলো কিন্তু ছিল! ১৯১২-১৩ সনে পার্লামেণ্ট যখন হোম-রুল নিয়ে তর্কবিতর্কে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়টিতেই উত্তর-আয়ার্ল্যান্ডে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছিল। আল্‌স্টারের নেতারা ঘোষণা করলেন, হোম-রুলকে তাঁরা মেনে নেবেন না; এটা যদি আইনেও পরিণত হয় তবু তখনও একে প্রতিরোধ করবেন। তাঁরা বিদ্রোহের আভাসও দিলেন, এবং বিদ্রোহ করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এ কথা পর্যন্ত শোনা গেল, হোম-রুলের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তাঁরা দরকার হলে বিদেশী শক্তির, মানে জর্মনির, সাহায্য প্রার্থনা করতেও কুণ্ঠিত হবেন না। এটা একেবারেই প্রকাশ্য এবং নির্ভেজাল রাজদ্রোহ। তার চেয়েও মজার ব্যাপার, ইংলণ্ডের রক্ষণ-পন্থী দল এদের এই বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের জয়কামনা করতে লাগলেন, অনেকে একে সাহায্য পর্যন্ত করতে লাগলেন। ধনী রক্ষণপন্থী শ্রেণীরা প্রচুর টাকা আল্‌স্টারে পাঠিয়ে দিলেন। স্পষ্টই দেখা গেল, তথাকথিত 'উচ্চতর শ্রেণী' অর্থাৎ শাসকশ্রেণীগুলো মোটের উপর আল্‌স্টারেরই পক্ষে রয়েছে; সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীও এই দিকে ছিলেন, তাঁরাও সেই শাসক-শ্রেণীর লোক। বহু অস্ত্রশস্ত্র গোপনে আমদানি করা হল; স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী প্রকাশ্যভাবেই কুচকাওয়াজ করতে লাগল। সময় এলে পরে তখন শাসনভার গ্রহণ করবে ব'লে আল্‌স্টারে একটি অস্থায়ী সরকার পর্যন্ত গঠন করা হল। এটা লক্ষ করবার বিষয়, আল্‌স্টারের এই 'বিদ্রোহী' নেতাদের অন্যতম ছিলেন পার্লামেণ্টের একজন নামজাদা রক্ষণপন্থী সদস্য, তাঁর নাম এফ. ই. স্মিথ। পরবর্তী কালে ইনিই লর্ড বার্কেনহেড নামে পরিচিত হন, এবং ভারতসচিবের পদ ও আরও অনেক উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইতিহাসে বিদ্রোহ বস্তুটা প্রায় একটা দৈনন্দিন ঘটনা; বিশেষ করে আয়ার্ল্যান্ডেও প্রচুর-সংখ্যক বিদ্রোহ ঘটেছে। তবুও আল্‌স্টারে এই-যে বিদ্রোহের আয়োজন হল, আমাদের কাছে এটি বেশ মন দিয়ে দেখবার বস্তু, কারণ এর পিছনে ছিল সেই দলটি, যে চিরকাল নিজেকে নিয়মানুগ এবং রক্ষণপন্থী বলেই অহংকারে মত্ত হত। এই হচ্ছে সেই দল যারা সারাক্ষণই 'আইন এবং

শৃঙ্খলার' বুলি ঝাড়ত; সে আইন এবং শৃঙ্খলাকে যে পাপিষ্ঠরা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করল তাদের অতি কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত বলে চীৎকার করত। অথচ তখন এই দলেরই খ্যাতনামা ব্যক্তিরা প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহকর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন, সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করলেন; এর সাধারণ সভ্যরা তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। এটাও দেখতে হবে, এদের এই বিদ্রোহ এরা করতে চাইছিল পার্লামেন্টেরই বিরুদ্ধে, যে পার্লামেন্ট তখন হোম-রুল বিল নিয়ে আলোচনা করছিল এবং পরে তাকে আইনেই পরিণত করল। অতএব এরা গণতন্ত্রের একেবারে মূল ভিত্তিতেই আঘাত হানতে চাইল; চিরকাল ধরে ইংলণ্ডের লোকেরা বড়াই করে এসেছে, তারা আইনের প্রভুত্ব আর নিয়মানুবর্তী কার্যকলাপে বিশ্বাসী; সে কথার কোনো মূল্যই আর রইল না।

ইংরেজের এইসব বড়ো বড়ো ভান আর মস্ত মস্ত বাণী, ১৯১২-১৪ সনের আল্স্টার-'বিদ্রোহ' তার একেবারে মুখোশ খুলে ফেলে দিল; শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আধুনিক গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ কী, সেটাও বেশ উদ্ঘাটিত করেই দেখিয়ে দিল। 'আইন এবং শৃঙ্খলা' বলতে যতক্ষণ বোঝাবে যে তার দ্বারা শাসকশ্রেণীর সমস্ত অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে, ততক্ষণই সে আইন এবং শৃঙ্খলা অতি ভালো জিনিষ; গণতন্ত্র যতক্ষণ সে অধিকার এবং স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করছে ততক্ষণ গণতন্ত্রকেও স'য়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এইসব অধিকারে যদি কোথাও একটুকু আঘাত লাগে তবে তৎক্ষণাৎ এই শাসকশ্রেণীটি নখদন্ত খিঁচিয়ে লড়াই করতে লেগে যাবে। অতএব 'আইন এবং শৃঙ্খলা' আসলে হচ্ছে বেশ একটা গাল-ভরা কথা, তাদের কাছে এর মানে শুধু, তাদের নিজেদের স্বার্থ। এই ব্যাপারটা থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল, ব্রিটিশ সরকারও কার্যত একটি শ্রেণীগত সরকার মাত্র; পার্লামেন্টের সংখ্যাবহুল অভিমত এদের বিরুদ্ধে গেলেও এরা সহজে নিজের গদি ছাড়বে না। এই রকমের সংখ্যাবহুল দল, যদি এদের অধিকার খর্ব হয় এমন কোনো সমাজতান্ত্রিক আইন বিধিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে, তবে এরা তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করবে, গণতান্ত্রিক নীতি ইত্যাদিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করে চলবে। এই কথাটাকে বেশ ভালো করে বুঝে নিয়ো; কারণ, সমস্ত দেশের সম্বন্ধেই কথাটা খাটে, অথচ লম্বা লম্বা বচন আর সুমধুর বাণীর আবর্তে প'ড়ে আমরা অনেক সময়েই এই পরম সত্য কথাটিকে ভুলে যাই। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলোতে খুব ঘন ঘন বিপ্লব ঘটে, আর ইংলণ্ডে একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত; তবু এই ব্যাপারটির বেলায় এদের মধ্যে বিশেষ কোনোই তফাত নেই। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তার মানে হচ্ছে, শাসকশ্রেণী যেটি আছে সেটি দেশে বেশ গভীর করে শিকড় গেড়ে বসেছে, তাকে হঠাৎ উপ্‌ড়ে ফেলে দেবে এমন শক্তি অন্য কোনো শ্রেণীর আপাতত নেই। আত্মরক্ষার জন্যে যেসব ব্যবস্থা তারা খাড়া কর রেখেছিল তাদের একটি হচ্ছে হাউজ অব লর্ড্স্। ১৯১১ সনে একে দুর্বল করে ফেলা হয়েছিল। অতএব শাসকশ্রেণীটা ভয় পেয়ে গেল; আল্স্টারের ব্যাপারটা শুধু তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

ভারতবর্ষেও এই 'আইন এবং শৃঙ্খলা'র মন্ত্রোচ্চারণ আমরা প্রত্যহ, এবং দিনে বহুবার করে শুনছি। সেইজন্যেই এর প্রকৃত অর্থ কী সেটা মনে রাখা ভালো। এ কথাটাও মনে রাখলে ক্ষতি নেই, আমাদের প্রতি যাঁরা এইসব হিতোপদেশ বর্ষণ করছেন তাঁদের একজন (একজন ভারতসচিব) নিজেই ছিলেন আল্স্টার-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা!

এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র আর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগ্রহ করে আল্স্টারবাসীরা বিদ্রোহের আয়োজন করল; ব্রিটিশ সরকার শান্ত দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এদের এইসব আয়োজন বন্ধ করবার জন্যে কোনো অর্ডিন্যান্স সে দিন জারি করা হয় নি! কিছুদিনের মধ্যেই আয়ার্লাণ্ডের বাকি সমস্ত অঞ্চলও আল্স্টারের অনুকরণে লেগে গেল, 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী' গড়ে তুলল; কিন্তু এদের উদ্দেশ্য ছিল হোম-রুল আদায় করবার জন্যে যুদ্ধ করা, এবং দরকার হলে আল্স্টারেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আয়ার্লাণ্ডে এইভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী সেনাদলের সৃষ্টি হল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, আল্স্টার যখন বিদ্রোহ করবে বলে তার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন ইচ্ছা করেই চোখ বুজে থেকেছেন; এই 'জাতীয়

বাহিনী'কে দমন করবার বেলায় কিন্তু তাঁরাই খুব উঠে-পড়ে লাগলেন; অথচ এরা মোটেই হোম-রুল বিলের বিরোধিতা করছিল না। দেখা গেল, আয়ার্ল্যান্ডের এই দুটি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর মধ্যে একটা সংঘাত একেবারেই আসন্ন হয়ে উঠেছে; আর তার মানেই হচ্ছে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আর-একটা বৃহত্তর যুদ্ধ এসে হাজির হল। ১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল; তার বিরাট প্লাবনের মধ্যে অন্য সমস্ত ছোটোখাটো কলহ-বিবাদ কোথায় ডুবে চলে গেল। হোম-রুল-অ্যাক্টটি অবশ্য আইনে পরিণত হল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে দেওয়া হল, যুদ্ধ থামবার আগে এই আইনটিকে কাজে খাটানো হবে না! অতএব হোম-রুল যে দূরে ছিল সেই দূরেই থেকে গেল; যুদ্ধ শেষ হবার মধ্যে আয়ার্ল্যান্ডেও বহু ব্যাপার ঘটে গল।

বিভিন্ন দেশের এই কাহিনীগুলোকে আমি বিশ্বযুদ্ধের ঠিক গোড়া পর্যন্ত এনে পৌঁছে দিচ্ছি। আয়ার্ল্যান্ডেও আমরা এই জায়গাতে এসে ঠেকলাম; কাজেই এখনকার মতো আমাদের থামতে হবে। কিন্তু চিঠিটি শেষ করবার আগে আর-একটি কথা তোমাকে আমি না বলে পারছি না। আলস্টার-বিদ্রোহের নেতা যাঁরা ছিলেন, সে কাজের জন্যে তাঁদের কোনোরকম শাস্তি তো দেওয়া হলই না; বরং অল্প দিনের মধ্যেই এঁদের নানা রকমে পুরস্কৃত করা হল—কাউকে-বা করা হল ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, কেউ-বা হলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী!

১৪১

ব্রিটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং অধিকার

১১ই মার্চ, ১৯৩৩

আমেরিকা থেকে একটা লম্বা লাফ দিয়ে আটলাণ্টিক পার হয়ে আমরা আয়ার্ল্যান্ডে এসে পড়েছিলাম। এবার দাও আর-একটা লাফ, চলো যাই তৃতীয় মহাদেশ আফ্রিকাতে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর-একটি শিকার মিশরদেশে। আমার কয়েকটা চিঠিতে আমি মিশরের অতীত ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছি। সে উল্লেখ অতি সামান্য এবং ছেঁড়া ছেঁড়া, কারণ, এর সম্বন্ধে আমি নিজেই বিশেষ কিছু জানি না। অবশ্য এ বিষয়ে যেটুকু জানি তার চেয়ে বেশিও যদি জানতাম, তবু এখন আবার ফিরে সেই অতি প্রাচীন কালের কথা বলতে যাওয়া সম্ভব হত না। বহু দীর্ঘ পথ বেয়ে অবশেষে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর কাহিনীও বলা প্রায় শেষ করে এনেছি, এসে পৌঁচেছি বিংশ শতাব্দীর দ্বারে; এইখানেই আমরা এখন থাকব। সারা ক্ষণই কেবল একবার অতীতে আর-একবার বর্তমানে ছুটোছুটি করা যায় না। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশেরই যদি অতীতের সমস্ত কাহিনী বলতে বলতে যাবার চেষ্টা করি তবে এই চিঠিগুলো কী কোনো দিনই লেখা শেষ হবে?

তাই বলে কিন্তু এ কথা মনে কোরো না যে, মিশরের অতীত কাহিনীর মধ্যে শোনবার মতো কিছু নেই। সমস্ত জাতির মধ্যে মিশরই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন; অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় এর ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল অনেক বেশি আগে থেকে। এর ইতিহাসের যুগ গণনা করা হয় শতাব্দীর ক্ষুদ্র মাপে নয়, সহস্রাব্দের মাপে। তার আশ্চর্য অথচ ভীতিমিশ্র সম্ভ্রমদ্যোতক সব স্মৃতিচিহ্ন আজও সেই দূর অতীতকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পক্ষে মিশরই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বৃহৎ ক্ষেত্র; তার বালুস্তরের তলা থেকে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আর অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ যতই বার হতে লাগল, ততই তারা আমা[illegible] অপূর্ব এক কাহিনী বলতে লাগল—সে কাহিনী অতি প্রাচীন কালের. এই স্তম্ভগুলোর যে দিন বয়স কম ছিল সেই কালের কাহিনী। এই খনন এবং আবিষ্কারের কাজ আজও চলছে, এখনও মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে নিত্য নূতন পৃষ্ঠা যুক্ত হচ্ছে। সে ইতিহাস কবে এবং কীভাবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তা আমরা আজও জানি নে। এখন

থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে, তখনই নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করত সভ্য মানুষ, তাদের সেই সভ্যতার ইতিহাস তারও বহু দিন আগে থেকে আরম্ভ। এরা এদের চিত্রলিপি বা হায়রোগ্লিফিক্‌সের সাহায্যে নিজেদের কথা লিখে রেখে গেছে; তৈরি করে রেখে গেছে চমৎকার সব হাঁড়িকুড়ি আর পাত্র, সোনা তামা আর হস্তিদন্তের পাত্র, খোদাই-করা শ্বেতপাথরের জিনিষপত্র।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মাসিডনের আলেকজান্ডার মিশর জয় করেছিলেন; তার আগেই মিশরের একত্রিশটি রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করে গেছেন বলে শোনা যায়। এই চার-পাঁচ হাজার বৎসর-ব্যাপী কালের ইতিহাসে কয়েকজন আশ্চর্য পুরুষ এবং নারীর মূর্তি আজও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে; আজও যেন প্রায় জীবন্তই রয়েছে এরা—বহু কর্মনিষ্ঠ পুরুষ এবং নারী, বড়ো বড়ো স্থপতি, বড়ো বড়ো ঋষি এবং চিন্তাবীর, যোদ্ধা, স্বৈরতন্ত্রী এবং স্বেচ্ছাচারী রাজা, বলদৃপ্ত অহংকারী রাজা, সুন্দরী নারী। ফ্যারাওদের দীর্ঘ শোভাযাত্রা আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে চলে যায়—হাজার হাজার বছর ধরে তারা রাজত্ব করে গেছেন। নারীদেরও সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, তাঁরা অনেকে দেশশাসনও করেছেন। পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল এই দেশে; মিশরের মানুষরা সারা ক্ষণই মগ্ন হয়ে থাকত ভবিষ্যৎ আর পরলোকের চিন্তায়। মিশরের বিরাট পিরামিডগুলো প্রজাদের জোর করে খাটিয়ে এবং সেই শ্রমিকদের উপরে নিষ্ঠুর পীড়ন করে তৈরি করা হয়েছিল; এসগুলো ছিল ফ্যারাওদের সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা। মমি জিনিষটাও তাই মানুষের দেহকে ভবিষ্যতের জন্যে টিঁকিয়ে রাখবার একটা উপায়। এগুলোর কথা শুনতে বিষাদময় কঠোর আর আনন্দহীন বলে মনে হয়। কিন্তু আবার পাশাপাশি দেখতে পাই, তার পুরুষদের মাথায় পরচুলা, তারা মাথার চুল কামিয়ে ফেলত তাই; দেখতে পাই শিশুদের জন্যে তৈরি নানা রকমের খেলনা। এদের সে ভাণ্ডারে পুতুল আছে, বল আছে, ছোটো ছোটো জানোয়ারের মূর্তি আছে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানো যায়। এই খেলনাগুলোকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, প্রাচীন মিশরের এই অধিবাসীরাও সাধারণ মানুষের মতোই ছিল; যুগযুগান্তের ব্যবধান পার হয়ে তারা আমাদের একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, প্রায় বুদ্ধের জীবনকালে, পারশ্যবাসীরা মিশর জয় করল এবং একে তাদের নীলনদ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করল। এদের অধিনায়ক ছিলেন একিমেনিড-রাজবংশ; এঁদের রাজধানী ছিল পার্সিপোলিশ; এঁরাই গ্রীসকে জয় করবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এঁরাই দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্ডারের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। মিশরের লোকেরা আলেকজান্ডারকে প্রায় তাদের ত্রাণকর্তা বলে অভ্যর্থনা করল—পারশিকদের নির্মম শাসন থেকে তিনি তাদের মুক্তি দিয়েছেন! এই দেশের আলেকজান্দ্রিয়া-শহরে তিনি তাঁর কীর্তিস্তম্ভ গড়ে রেখে গেলেন; কালক্রমে এই শহরটি বিদ্যাচর্চা এবং গ্রীক সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

তোমার মনে আছে, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যটাকে তাঁর সেনাপতিরা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন; মিশর পড়েছিল টলেমির ভাগে। টলেমি-বংশের রাজারা অল্প দিনের মধ্যেই এই দেশের আবহাওয়াকে রপ্ত করে নিলেন। মিশরের সমস্ত রীতিনীতি তাঁরা নিজের বলে গ্রহণ করলেন, পারশিক রাজাদের মতো দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন না। মিশরের লোকেদের মতোই এঁরা আচার-ব্যবহার করতে লাগলেন; সুতরাং মিশরের প্রজাও এঁদের আপন জন বলে গ্রহণ করল, এঁরা যেন সেই প্রাচীন ফ্যারাওদেরই বংশধর। এই টলেমি-বংশেরই শেষ রানী ছিলেন ক্লিওপেট্রা। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিশর রোমান সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশে পরিণত হল। খৃষ্টের যুগ তার অল্প কয়েক বছর মাত্র পরের ঘটনা।

খৃষ্টানধর্ম রোমে প্রতিষ্ঠিত হবার বহু আগেই মিশর এই ধর্মকে গ্রহণ করেছি[illegible] রোমানদের হাতে মিশরের খৃষ্টানদের অনেক নির্যাতন সইতে হল, বাধ্য হয়ে তারা মরু-অঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করল। মরুভূমির মধ্যে গোপনে খৃষ্টানদের বহু মঠ গড়ে উঠল; এই সন্ন্যাসীরা কী-সব আশ্চর্য কাণ্ড সাধন করেছেন তার অসংখ্য বিস্ময়কর এবং রহস্যপূর্ণ গল্প সে সময়কার খৃষ্টানমহলে প্রচলিত ছিল। তার পর সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করলেন; খৃষ্টানধর্ম হয়ে উঠল রোমান

ব্রিটেনের মিশর অধিকার

সাইপ্রাস
(ব্রিটিশ
১৮৭৮)
আলেকজান্দ্রিয়া
খাল
প্যালেস্টাইন
(তুর্কি)
ত্রিপোলি
(তুর্কি)
কায়রো
সুয়েজ
মিশর
হেজাজ
মদিনা
মক্কা
লোহিত সাগর
বারবার
সুদান
ওমডারমান
খার্টুম
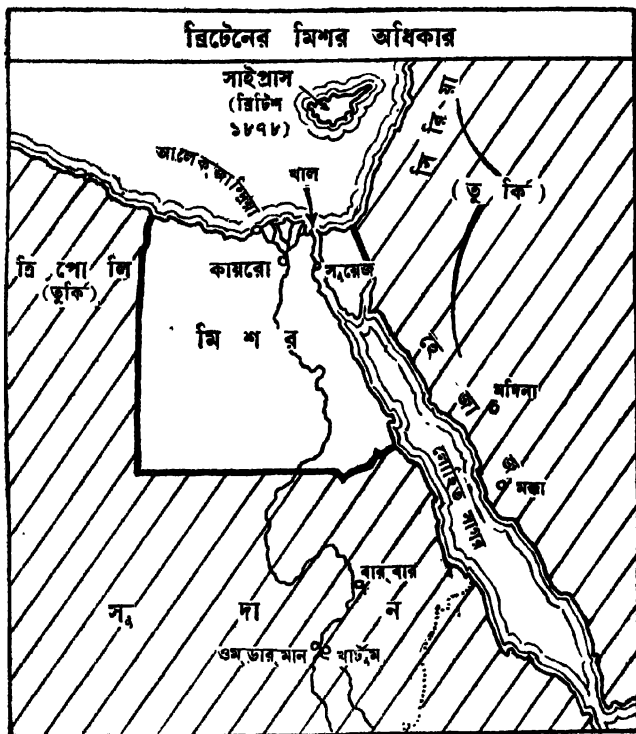
সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম। তখন আবার মিশরের এই খৃষ্টানরা তাদের উপরে একদা যে অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে চাইল; মিশরের প্রাচীন ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করত সেই অ-খৃষ্টান বা পৌত্তলিকদের উপরে একেবারে নৃশংস উৎপীড়ন শুরু করল। আলেকজান্দ্রিয়া এবার হয়ে উঠল খৃষ্টানদের একটি প্রসিদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র। খৃষ্টানধর্ম তখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম।

কিন্তু মিশরের খৃষ্টানরা বহু সম্প্রদায় আর বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল, সে দলে দলে সারাক্ষণ ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে, প্রত্যেক দলই অন্যদের উপরে প্রভু হয়ে বসবার জন্যে লড়াই করছে। এই মারামারি খুনোখুনি ক্রমে এমন বীভৎস রূপ ধারণ করল যে, দেশের লোকেরা খৃষ্টানদের সমস্ত সম্প্রদায়ের উপরেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল; সুতরাং এর পরে সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবরা নূতন একটি ধর্মের বাণী নিয়ে মিশরে এসে উপস্থিত হল, দেশের প্রজারা তাদের সাগ্রহে অভ্যর্থনা করে নিল। মিশর এবং উত্তর-আফ্রিকা যে আরবরা অত সহজে জয় করতে পেরেছিল তার একটি কারণ হচ্ছে এই। তখন আবার খৃষ্টানরাই হল নির্যাতিত সম্প্রদায়, তাদের উপরে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চলল।

এমনি করে মিশর খলিফার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আরবি ভাষা এবং আরবি সংস্কৃতি দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল; এত দ্রুত যে তার চাপে পড়ে মিশরের প্রাচীন ভাষা পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। এর দু শো বছর পরে নবম শতাব্দীতে বাগদাদের খলিফারা দুর্বল হয়ে পড়লেন; মিশর তখন তুর্কি-শাসনকর্তাদের অধীনে একটা অর্ধস্বাধীন রাজ্য হয়ে দাঁড়াল। এর তিন শো বছর পরে, ক্রুসেডের যুদ্ধের মুসলমান বীর সালাদিন এসে মিশরের সুলতান হয়ে বসলেন। সালাদিনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর একজন উত্তরাধিকারী ককেশাস-অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক তুর্কি ক্রীতদাস নিয়ে এলেন এবং তাদের দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী গঠন করলেন। এই শ্বেতকায় ক্রীতদাস-দের বলা হত মামেলুক। মামেলুক শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। সৈন্য হবার মতো লোক দেখেই এদের বেছে বেছে আনা হয়েছিল, এরা ছিল সত্যই বীর যোদ্ধা। অল্প কয়েকটা বছরও কাটতে না কাটতে এই মামেলুকরা বিদ্রোহ করল এবং নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে মিশরের সুলতানের আসনে বসিয়ে দিল। এইভাবে মিশরে মামেলুকদের রাজত্ব শুরু হল। আড়াই শো বছর ধরে এরা রাজত্ব করল, তার পর অর্ধস্বাধীন অবস্থাতেও এই দেশ শাসন করল আরও প্রায় তিন শো বছর। পাঁচ শো বছরেরও বেশি কাল ধরে এই বিদেশী ক্রীতদাসের দল মিশরে প্রভুত্ব করেছিল, এমন আশ্চর্য ঘটনা ইতিহাসে আর দেখা যায় নি।

গোড়াতে যে মামেলুকরা এ দেশে এসেছিল তারাই মিশরে একটা পুরুষানুক্রমিক বংশ বা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। এরা ক্রমাগতই নিজেদের দলে নূতন নূতন মানুষ এনে যোগ করছিল, ককেশাস-অঞ্চলের শ্বেতকায় জাতীয় ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা মুক্তিলাভ করেছিল তাদের মধ্য থেকে সেরা লোকদের এরা বেছে বেছে নিয়ে আসত। এই ককেশীয় জাতিগুলো আর্য-বংশীয়; কাজেই মামেলুকরাও ছিল আর্য। মিশরের জলবায়ু এই বিদেশীদের তেমন সহ্য হত না; কয়েক পুরুষ পরেই এরা পরিবারসুদ্ধ মরে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু সর্বদাই নূতন নূতন মামেলুক আমদানি করা হচ্ছিল বলে এই জাতিটির লোকসংখ্যা এবং বিশেষ করে এদের শক্তি ও তেজ সমানই টিঁকে থাকত। কাজেই দেখছ, এরা একটা পুরুষানুক্রমিক শ্রেণী ছিল না; কিন্তু তা হলেও এরা ছিল একটা অভিজাত শাসকশ্রেণী; অতি দীর্ঘ কাল ধরে এরা সে দেশে প্রভুত্ব করে গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কনস্টান্টিনোপলের তুর্কি-অটোম্যান সুলতান মিশর জয় করলেন, মামেলুক-সুলতানকে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বধ করলেন। মিশর অটোম্যান-সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হল। কিন্তু এর শাসনভার তখনও রইল মামেলুক অভিজাত-শ্রেণীর হাতে। পরে আবার ইউরোপে তুর্কিরা হীনবল হয়ে পড়ল, মামেলুকরা তখন মিশরে নিজেদের ইচ্ছামতোই শাসন করতে লাগল, যদিও নামে তখনও মিশর অটোম্যান-সাম্রাজ্যেরই অংশ মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নেপোলিয়ন মিশরে আসেন; তিনি এই মামেলুকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদের পরাস্ত করেছিলেন। তোমাকে এই যুদ্ধে একটি মামেলুক-যোদ্ধার গল্প বলেছিলাম মনে থাকতে পারে : ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি সোজা ফরাসি সেনার একেবারে সম্মুখে গিয়ে হাজির হলেন, মধ্যযুগের বীরদের

কায়দায় সদর্পে ঘোষণা করলেন, সাহস থাকে তো ফরাসি সেনার অধিনায়ক তাঁর সঙ্গে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করুন!

ইতিমধ্যে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পেঁছে গেছি। এই শতাব্দীর প্রথম-অর্ধেক কাল মিশরের শাসক ছিলেন মহম্মদ আলি। ইনি একজন আলবেনিয়াবাসী তুর্কি, এই দেশের শাসনকর্তা বা খেদিভ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই তুর্কি-শাসনকর্তাদের পদবি ছিল 'খেদিভ'। মহম্মদ আলিকে আধুনিক মিশরের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। তাঁর প্রথম কীর্তিই হল মামেলুকদের শক্তি খর্ব করা; বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি এদের বধ করালেন। মিশরের একটি ইংরেজ বাহিনীকেও তিনি পরাস্ত করলেন, তার পর নিজেই দেশের অধীশ্বর হয়ে বসলেন; বাইরের ঠাঁট বজায় রাখবার জন্য শুধু তুর্কির সুলতানকে তাঁর উপরস্থ সম্রাট বলে স্বীকার করে নিলেন। মিশরের একটি নূতন সেনাবাহিনী তিনি গঠন করলেন, এর লোক বেছে নিলেন চাষিদের মধ্য থেকে (মামেলুক নয়); অনেক নূতন নূতন খাল কাটালেন; এবং তুলোর চাষকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তুললেন—কালক্রমে এইটিই মিশরের প্রধান ব্যবসা হয়ে উঠেছে। নামে তাঁর প্রভু যিনি ছিলেন সেই সুলতানকে তাড়িয়ে দিয়ে কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-শহর দখল করবাব পর্যন্ত তিনি উপক্রম করেছিলেন; তার পর অবশ্য সে সংকল্প পরিত্যাগ করে তিনি শুধু সিরিয়া-দেশটাকে মিশরের অধীন করে নিলেন।

১৮৪৯ সনে আশি বছর বয়সে মহম্মদ আলির মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধররা ছিলেন দুর্বল, অমিতব্যয়ী এবং অকর্মণ্য। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি ভালো লোক যদি হতেন তবুও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের লোভ আর আন্তর্জাতিক ধনব্যবসায়ীদের অর্থগৃধ্নুতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তাঁদের হত কি না সন্দেহ। বিদেশীরা, বিশেষ করে ইংরেজ এবং ফরাসি মহাজনরা, খেদিভদের টাকা ধার দিতে লাগল। সে টাকার সুদ অত্যন্ত বেশি এবং সে ধারও খেদিভরা করতেন নিজেদেরই ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। তার পর সময়মতো সুদ দিতে পারতেন না, আর সঙ্গে সঙ্গেই সুদ আদায় করবার জন্যে ইংরেজ আর ফরাসিদের যুদ্ধজাহাজ এসে উপস্থিত হত! আন্তর্জাতিক কূটনীতির এ এক অপূর্ব কাহিনী, অন্য দেশকে লুণ্ঠন এবং অধিকার করবার উদ্দেশ্যে মহাজনরা আর শাসনকর্তৃপক্ষরা কেমন হাতে হাত ধরে কাজ করে থাকে তারই কাহিনী। কিন্তু খেদিভদের মধ্যে কয়েকজন খুবই অকর্মণ্য হওয়া সত্ত্বেও মিশর উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে গেল। ১৮৭৬ সনে ইংলন্ডের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র 'টাইম্‌স্‌' এ সম্বন্ধে লিখেছিল, "উন্নতিসাধনের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে মিশরে। সত্তর বছরের মধ্যে সে যতখানি অগ্রসর হয়েছে, অন্য কোনো দেশের তা করতে পাঁচ শত বছর লাগত।" কিন্তু তবুও বিদেশী মহাজনরা তাদের ভাগ আদায় না করে ছাড়বে না; তারা ধুয়ো তুলল, মিশরের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শীঘ্রই সে দেউলিয়া হয়ে যাবে, অতএব অবিলম্বে তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যদের হস্তক্ষেপ করা দরকার। হস্তক্ষেপ করবার জন্যে তো বিদেশী সরকাররা, বিশেষ করে ইংরেজ আর ফরাসিরা, উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল; অভাব ছিল শুধু একটা অছিলার। কারণ, মিশর অত্যন্ত লোভনীয় সম্পত্তি এবং ভারতে আসবার পথে অবস্থিত, তাকে এরকম করে স্বাধীন হয়ে থাকতে দেওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে জোর করে শ্রমিক ধরে এনে এবং একেবারে অমানুষিক অত্যাচারের তাড়নায় তাদের খাটিয়ে সুয়েজ খাল কাটা হয়েছে; ১৮৬৯ সনে সে খালে যাত্রী-যাতায়াত শুরু হল। (মিশরের প্রাচীন রাজাদের আমলে, অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ১৪০০ সনের কাছাকাছি সময়ে, লোহিতসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এইরকম একটা খাল ছিল বলে শোনা যায়, এটা জেনে রাখতে পারো!) এই খাল খোলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ আর এশিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যত যাত্রী আর বাণিজ্যজাহাজ চলাচল করত সকলেই সুয়েজের পথে যেতে লাগল; সুতরাং মিশরের মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে গেল। ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্য-জগতের সঙ্গে ইংলন্ডের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত; এই খাল তথা মিশরকে নিজের আয়ত্ত করে নেওয়া তার পক্ষে কাজেই অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল। ১৮৭৫ সনে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিস্‌রেলি অত্যন্ত চাতুর্যের পরিচয় দিলেন; খেদিভের তখন প্রায় দেউলিয়া-অবস্থা, সুয়েজ খালে তাঁর যত অংশীদারি ছিল সমস্তই ডিস্‌রেলি অত্যন্ত শস্তা দরে কিনে নিলেন। টাকা লগ্নির দিক থেকে এটা একটা খুব লাভের ব্যাপার হল; শুধু

তাই নয়, এর ফলে খালটার কর্তৃত্বেরও অনেকখানিই ব্রিটিশ সরকারের হাতে এসে পড়ল। খালের বাকি যে অংশীদারি মিশরের হাতে ছিল, সেটুকু গিয়ে পড়ল ফরাসি মহাজনদের কবলে। অতএব এই খালের মূলধন সম্বন্ধে বস্তুত কোনো কর্তৃত্বই আর মিশরের হাতে রইল না। এই অংশীদারিগুলো থেকে ব্রিটিশ এবং ফরাসিরা প্রভূত-পরিমাণ লাভ তুলে নিয়েছে; তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার খালটার উপরেও কর্তৃত্ব করেছে, মিশরকেও একেবারেই হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে। ব্রিটিশ সরকার তার অংশ গোড়াতে কিনেছিল মোট চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে; গত বৎসর (১৯৩২) তার একার ভাগেই সে লাভ পেয়েছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড।

অতএব এই দেশের উপরে তাদের কর্তৃত্ব তারা আরও বেশি বিস্তৃত করতে চেষ্টা করবে, এ না হয়েই পারে না। ১৮৭৯ সনে এরা মিশরের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে ক্রমাগত উপর-পড়া হয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল; তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নিজেদের লোক বসিয়ে দিল। মিশরের প্রজারা অনেকে স্বভাবতই এতে ক্ষুব্ধ হল; একটি জাতীয়তাবাদী দল গড়ে উঠল। তাদের সংকল্প, বিদেশীর হস্তক্ষেপ থেকে তারা মিশরকে মুক্ত করবে। এর নেতা ছিলেন একজন তরুণ সৈনিক, তাঁর নাম আরবি পাশা। ইনি দরিদ্র শ্রমিকের সন্তান, সাধারণ সৈনিক হিসাবেই ইনি মিশরের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেছিলেন। আরবি পাশার প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল; ক্রমে তিনি সমরসচিব হলেন। সমরসচিব হয়ে তিনি ইংরেজ এবং ফরাসি 'নিয়ন্ত্রক'দের নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করলেন। বিদেশীর আদেশ পালন করতে তাঁর এই অস্বীকৃতির উত্তর ইংলন্ড দিল যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৮২ সনে ব্রিটিশ নৌবহর কামান ছুঁড়ে এবং আগুন লাগিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া-শহর ধ্বংস করল। এমনি করে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে এবং তার পর স্থলযুদ্ধেও মিশরের সেনাকে পরাস্ত ক'রে ব্রিটিশরা মিশরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজেরা দখল করে বসল।

এইভাবে ব্রিটেনের মিশর-অধিকার শুরু হল। আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। মিশর ছিল তুর্কি-সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা অংশ। তুর্কির সঙ্গে ইংলন্ডের বন্ধুত্ব আছে বলেই লোকে জানত। অথচ সে বেশ শান্ত চিত্তে সেই তুর্কিরই খানিকটা এলাকা দখল করে বসল। মিশরে ইংলন্ড তার একজন প্রতিনিধি বসিয়ে দিল। ভারতবর্ষের ভাইস্‌রয়ের মতো, এই প্রতিনিধিটিই হলেন সেখানে সমস্ত লোকের উপরে বড়োকর্তা, একজন মোগলবাদশা-বিশেষ। এই ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে অগ্রাহ্য করে চলবার ক্ষমতা স্বয়ং খেদিভ বা তাঁর মন্ত্রীদেরও রইল না। ব্রিটেনের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন মেজর বেয়ারিং নামক এক ব্যক্তি—পঁচিশ বছর ধরে ইনি মিশর শাসন করেছিলেন। ইনি পরে লর্ড ক্রোমার নামে পরিচিত হন। ক্রোমার খাঁটি স্বৈরতন্ত্রী রাজার মতো মিশর শাসন করতেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্যই থাকত বিদেশী মহাজন আর উত্তমর্ণদের প্রাপ্য ডিভিডেন্ড্ মিটিয়ে দেওয়ার দিকে। এটা তিনি নিয়মিত চুকিয়ে দিতেন, অতএব মিশরের আর্থিক ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের মহা সুখ্যাতি পড়ে গেল। ভারতবর্ষের মতো মিশরেও শাসন-ব্যবস্থায় খানিকটা শৃঙ্খলা আনা হল। কিন্তু এই পঁচিশ বছরের শেষেও দেখা গেল, মিশরের পুরোনো ঋণের পরিমাণ আগে যা ছিল ঠিক তাই রয়ে গেছে। দেশে শিক্ষাপ্রচারের জন্যে বস্তুত কোনো ব্যবস্থাই করা হল না; মিশরবাসীরা নিজেরাই একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইল, সেটাও ক্রোমার করতে দিলেন না। ১৮৯২ সনে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড স্যালিসবারিকে ক্রোমার একটি চিঠি লিখেছিলেন, তার একটি বাক্য থেকেই তাঁর মনোভাবের স্বরূপ বোঝা যায়—"খেদিভ বড়ো বেশি মাত্রায় মিশরীয় হয়ে উঠছেন"! মিশরবাসীর পক্ষে যেরকম আচরণ সঙ্গত, কোনো মিশরবাসী তা করলে লর্ড ক্রোমারের চোখে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হত; ঠিক যেমন ভারতবাসীরা ভারতবাসীদের যোগ্য আচরণ করলে তাতে ব্রিটিশ প্রভুরা চটে যান, তাদের শাস্তি দেন।

ব্রিটিশরা মিশরে কর্তৃত্ব করছে, ফরাসিদের এটা ভালো লাগল না; লুটের মালে তারা কোনো বখরা পায় নি, এটা অন্যায়। ফ্রান্সেরই মতো ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও এ ব্যাপারটাতে খুশি হল না। মিশরের লোকেরা মোটেই খুশি হয় নি সে কথা তো বলাই বাহুল্য। ব্রিটিশ সরকার সবাইকে বলল, মন খারাপ কোরো না, আমরা তো দু-চার দিন মাত্র মিশরে আছি, শিগ্‌গিরই এ দেশ

আমরা ছেড়ে চলে যাব।' বারবার এই কথা যথাবিহিত ভাষায় এবং সরকারিভাবে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন, মিশর ছেড়ে তাঁরা চলে যাবেন। প্রায় পঞ্চাশ কি তারও বেশি বার এই মহাঘোষণা করা হয়েছে; কতবার তার হিসেব করা শক্ত। তবুও কিন্তু ব্রিটিশরা মিশরে থেকেই গেল, আজও তারা চলে যায় নি!

ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের মধ্যে অনেক ব্যাপার নিয়েই মন-কষাকষি চলছিল; ১৯০৪ সনে এদের মধ্যে একটা আপোস-মীমাংসা হল। ব্রিটিশরা মরক্কোতে ফরাসিদের বেশ-খানিকটা অবাধ অধিকার দিতে রাজি হল; বদলে ফরাসিরা মিশরে ব্রিটেনের দখলিস্বত্ব স্বীকার করে নিল। একটা অতি সহজ ও সৎ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। তুর্কি তখনও মিশরের উপরওয়ালা বলে লোকের ধারণা ছিল, শুধু সে বেচারির মতামত কেউই নিতে গেল না; আর মিশরের লোকদের মতামত যাচাই করবার তো কোনো কথাই উঠতে পারে না।

এই সময়ে মিশরের আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই, বিদেশীদের সম্বন্ধে কোনো হাত বা ক্ষমতা মিশরের আদালতের ছিল না। সাহেবদের বিচার করতে পারে এমন বিদ্যাবুদ্ধি তাদের থাকবার কথাই নয়! অতএব বিদেশীদের বিচার হবে তাদের নিজেদের আদালতে। সুতরাং সৃষ্টি হল তথাকথিত 'বহির্দেশীয় বিচারসভা'র। সেখানকার বিদেশী এবং তাঁদের মনে সেই বিদেশের স্বার্থেরই স্থান সবচেয়ে উপরে। এই বিচারসভারই একজন বিদেশী বিচারপতি এগুলির সম্বন্ধে লিখেছেন : "এই দেশটিকে শোষণ করবার জন্যে বিদেশীদের যে সমবায় গঠিত হয়েছিল, এই বিচার-সভার বিচার তার অতি চমৎকার সহায় হয়েছে।" মিশরে যে বিদেশীরা বাস করত, অধিকাংশ খাজনা এবং করও তাদের দিতে হত না বলে আমার ধারণা। অতি সুখের দশা সন্দেহ নেই—খাজনা দিতে হচ্ছে না, যে দেশে বাস করছি তার আইন বা আদালতকে মেনে চলবারও দরকার নেই, অথচ সে দেশকে শোষণ করবার সমস্তরকম সুযোগসুবিধা পেয়ে যাচ্ছি—আর কী চাই!

এইভাবে ব্রিটেন মিশরকে শাসন এবং শোষণ করতে লাগল; তার কর্মচারী আর প্রতিনিধিরা তাদের সরকারি বাসভবনে বাস করতে লাগল একেবারে স্বৈরতন্ত্রী রাজার মতো ঐশ্বর্য আর জাঁকজমক নিয়ে। এর ফলে স্বভাবতই দেশে জাতীয়তাবাদ বেড়ে উঠল, সংস্কার-আন্দোলন শুরু হল। উনবিংশ শতাব্দীতে মিশরের সর্বাপেক্ষা বড়ো সংস্কারক ছিলেন জামালুদ্দিন আফগানি—ইনি ছিলেন একজন ধর্মগুরু; আধুনিক অবস্থার সঙ্গে ইসলামধর্মের সামঞ্জস্যসাধন করে ইসলামকে ইনি পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করলেন। বললেন, সকলপ্রকার প্রগতিকেই ইসলামের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। ইসলামকে আধুনিক রীতিতে সজ্জিত করবার যে চেষ্টা ইনি করলেন, মূলত সেটা ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে আধুনিক রীতিতে সংস্কার করবার যেসব চেষ্টা হয়েছে তারই অনুরূপ। এই চেষ্টা করবার উপায় হচ্ছে, প্রাচীন ধর্মের কতকগুলো মূল নীতিকে ধরে নিয়ে তার অন্তর্গত প্রাচীন রীতি এবং বিশ্বাসের নূতন অর্থ ও ভাষ্য রচনা করা। এর ফলে আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান হয়ে ওঠে প্রাচীন যুগের ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত জ্ঞানবিজ্ঞানেরই নূতন অধ্যায় বা টীকা মাত্র। এই পন্থাটা অবশ্য বৈজ্ঞানিক পন্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; সে পন্থা সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলে, এ রকমের কোনো পূর্বগামী উক্তির ঐতিহ্য স্বীকার করে না। সে যাই হোক, কেবল মিশরে নয়, অন্যান্য সমস্ত আরবীয় দেশেও জামালুদ্দিন প্রভূত প্রতিপত্তি অর্জন করলেন।

বিদেশী বাণিজ্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মিশরে নূতন একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি হল; এই শ্রেণীটিই হল নবজাত জাতীয়তাবাদের প্রধান অবলম্বন। এর মধ্য থেকেই বর্তমান মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা সৈয়দ জগলুল পাশার আবির্ভাব হয়েছে। মিশরের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান; কিন্তু এখনও সে দেশে বহুসংখ্যক কপ্ট্ আছে; তারা খৃষ্টান। এই কপ্ট্‌রাই হচ্ছে মিশরের প্রাচীন অধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা খাঁটি বংশধর। নবজাত মধ্যবিত্তশ্রেণীটির মধ্যে মুসলমান এবং কপ্ট্ দুইই ছিল, সৌভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে কোনোরকম ঝগড়া বা শত্রুতা ছিল না। ব্রিটিশরা এদের মধ্যে কলহ বাধাতে চেষ্টা করল, সে চেষ্টা বিফল হল। জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করতেও ব্রিটিশরা চেষ্টা করল। ভারতবর্ষের মতো সেখানেও কখনও কখনও তারা নরমপন্থীদের দু-চার

জনকে ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেদের দলে টানতে পেরেছে। কিন্তু এর কথা আমি তোমাকে আরও বলব এর পরের কোনো চিঠিতে।

১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সে সময়ে এই ছিল মিশরের অবস্থা। এর তিন মাস পরে তুর্কি জর্মনির পক্ষে যোগ দিল, ব্রিটেন ফ্রান্স এবং এদের মিত্রদের বিপক্ষে চলে গেল। অতএব ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলল, মিশরকে দখল করে নিতে হবে। সেটা করতে গিয়ে কিছু বাধার উৎপত্তি হল, সুতরাং তার পরিবর্তে মিশরকে ব্রিটেনের রক্ষণাধীন অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হল।

মিশরের কথা এই পর্যন্ত থাক্। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে আফ্রিকার বাকি সমস্ত অঞ্চলও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে গিয়ে পড়ল। আফ্রিকাতে যাবার জন্যে মহা হুড়োহুড়ি পড়ল; এই বিরাট মহাদেশটিকে খণ্ড খণ্ড করে ইউরোপের জাতিরা ভাগাভাগি করে নিল। শকুনির মতো এর উপরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা; মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেও ভাগ নিয়ে লড়াই লাগিয়ে দিল। একে জয় করতে বাধা প্রায় কেউই বিশেষ পেল না; কেবল ইতালি ১৮৯৬ সনে আবিসিনিয়ার কাছে মার খেয়ে হেরে এল। আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানই রয়েছে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের দখলে; কিছু কিছু অংশ আবার বেলজিয়ম ইতালি আর পর্তুগালের অধীনেও আছে। জর্মনিরও সেখানে কিছু জমিজমা ছিল, যুদ্ধে হারবার ফলে সেগুলো তার হস্তচ্যুত হয়েছে। দুটিমাত্র স্বাধীন দেশ টিঁকে আছে আফ্রিকায়; পূর্ব-অঞ্চলে আবিসিনিয়া আর পশ্চিম-উপকূলে ক্ষুদ্র রাজ্য লাইবেরিয়া। মরক্কোতে ফ্রান্স আর স্পেন আধিপত্য করছে।

এইসব বিরাট দেশ যেভাবে অধিকার করা হয়েছে সে ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি লোমহর্ষক। আজও এর সমাপ্তি হয় নি। তার চেয়ে আরও কদর্য ছিল এই মহাদেশটির সম্পদ শোষণ করবার এবং বিশেষ করে এর কাছ থেকে রবার আহরণ করবার জন্যে যেসব পন্থা ইউরোপীয়রা গ্রহণ করত সেইগুলো। বেলজিয়ামের অধীন কঙ্গোপ্রদেশে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে তার গল্প অনেক বছর আগে একবার বাইরে প্রকাশ পেয়েছিল; সে গল্প শুনে তথাকথিত 'সুসভ্য জগৎ'ও আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। কালা আদমিদের বোঝার ভার সত্যই ভয়ংকর দুঃসহ।

আফ্রিকাকে বলা হয় অন্ধকারাবৃত মহাদেশ। এর অভ্যন্তর সম্বন্ধে প্রায় কেউই কিছু জানত না; ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে প্রথম তার কথা মানুষ জানতে পেরেছে। আফ্রিকার উপর দিয়ে বহুবার বহু দুঃসাহসী বীরকে বহু উত্তেজনাপূর্ণ অভিযান করতে হয়েছে, তার আগে এই রহস্যময় মহাদেশের সম্পূর্ণ মানচিত্র রচনা করা সম্ভব হয় নি। এই অভিযানকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ডেভিড লিভিংস্টোন, ইনি স্কট্ল্যাণ্ডের একজন মিশনারি। বহু বৎসর ধরে এই মহাদেশের মধ্যে তাঁর সন্ধান হারিয়ে গিয়েছিল, তাঁর এতটুকু সংবাদ পর্যন্ত বাইরের পৃথিবীতে এসে পেঁছয় নি। তাঁর নামের সঙ্গে আরও-একজনের নাম যুক্ত হয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন হেন্‌রি স্ট্যান্‌লি। স্ট্যান্‌লি ছিলেন সংবাদপত্রের কর্মচারী এবং অভিযানকারী; লিভিংস্টোনের সন্ধানে তিনি আফ্রিকায় যান এবং বহু কষ্টে অবশেষে এই মহাদেশের একেবারে মাঝখানে গিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করেন।

১৪২

'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' তুরস্ক

১৪ই মার্চ, ১৯৩৩

মিশর থেকে ভূমধ্যসাগর ডিঙিয়ে একটু পা বাড়ালেই তুরস্ক। ইউরোপে অটোম্যান-তুর্কিদের যে সাম্রাজ্য ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে সেটা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়ল। এর এই ক্রমান্বিত ভাঙন শুরু হয়েছিল তার আগের শতাব্দীতেই। তুর্কিরা একদা ভিয়েনা অবরোধ করেছিল, সে গল্প আমি তোমাকে বলেছি তোমার মনে থাকতে পারে। কিছু দিন পর্যন্ত তুর্কিদের তরবারির দাপটে ইউরোপের সমস্ত দেশের মনেই কাঁপুনি ধরেছিল। পশ্চিম-অঞ্চলের ধর্মনিষ্ঠ খৃষ্টানরা মনে করতেন, তুর্কিরা 'ঈশ্বরের চাবুক', খৃষ্টানদের পাপের শাস্তি দেবার জন্যেই ঈশ্বর এদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভিয়েনার রণক্ষেত্র থেকে তুর্কিরা শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে হটে গেল; যুদ্ধের ধারাও সেই থেকেই ফিরে গেল, তার পর থেকে ইউরোপের সর্বত্র তুর্কিদের আত্মরক্ষার জন্যেই লড়াই করতে হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপে বহুসংখ্যক জাতিকে তুরস্ক নিজের অধীন করে নিয়েছিল, এখন তারা তার পাঁজরে কাঁটা হয়ে ফুটে রইল। নিজের সঙ্গে এদের মিলিয়ে এক করে নেবার কোনো চেষ্টাই তুরস্ক করে নি; করলেও খুব সম্ভবত সে চেষ্টা সফল হত না। এইসমস্ত স্থানেই জাতীয়তাবোধ মাথা উঁচু করে উঠতে লাগল, তুর্কির জগদ্দল শাসনের সঙ্গে তার লড়াই বাধল। উত্তর-পূর্ব-অঞ্চলে জারের রাজ্য রাশিয়া তখন ক্রমেই আরও বড়ো হয়ে উঠছে, তুরস্কের সীমান্ত পার হয়ে তার এলাকার মধ্যে ঢুকে আসবার উপক্রম করছে। রাশিয়া হয়ে উঠল তুরস্কের নিত্যনিয়মিত শত্রু; প্রায় দু শো বছর ধরে দুই রাজ্যের মধ্যে অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ চলল। শেষে জার এবং সুলতান দুজনেরই প্রায় একসঙ্গে পতন ঘটল, এঁদের সাম্রাজ্য দুটিরও সেইসঙ্গে অবসান হল।

সাম্রাজ্যদের আয়ুর হিসাবে অটোম্যানদের সাম্রাজ্য বেশ দীর্ঘ কালই বেঁচে ছিল। এশিয়া-মাইনরে বহু দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবার পরে ১৩৬১ সনে এই সাম্রাজ্য ইউরোপেও প্রসারিত হল। কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-শহরটি অবশ্য ১৪৫৩ সনের আগে তুর্কিদের করায়ত্ত হয় নি; কিন্তু তার আশ-পাশের সমস্ত অঞ্চল এর বহু পূর্বেই তুরস্কের দখলে চলে গিয়েছিল। কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-শহরটা কিছুকালের মতো রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল তার কারণ, ঠিক এই সময়েই পশ্চিম-এশিয়াতে তাইমুর অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলন্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন, এবং ১৪০২ সনে অ্যাঙ্গোরার যুদ্ধে তুরস্কের সুলতানকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলেন। কিন্তু সে আঘাত তুর্কিরা অল্প দিনের মধ্যেই সামলে উঠল। অটোম্যান-সাম্রাজ্যের শেষ হয়েছে আমাদেরই আমলে—১৩৬১ সন থেকে এখন পর্যন্ত এই সাড়ে-পাঁচ শো বছর সে বেঁচেই ছিল, এটা একটা কম সময় নয়।

অথচ মধ্যযুগের অবসানের পর থেকে ইউরোপে যে নূতন অবস্থার বিকাশ হল তার সঙ্গে তুর্কিদের মোটেই মিল ছিল না। ইউরোপে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ছিল, ইউরোপের শিল্পপ্রধান শহরগুলোতে উৎপাদনের ব্যবস্থা ক্রমেই বহরে বড়ো হচ্ছিল। এসব ব্যাপারে কিন্তু তুর্কিদের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না। তারা ছিল চমৎকার যোদ্ধা—খুব ভালো যুদ্ধ করতে পারে, শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে, বিশ্রামের অবসর পেলে ভারি আরামে সে সময়টা কাটাতে পারে, আবার খুঁচিয়ে তুললে তখন অত্যন্ত হিংস্র আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। বড়ো বড়ো শহরে এরা বসতি স্থাপন করেছিল, চমৎকার সব বাড়িঘর তুলে তাদের সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছিল; কিন্তু তবু তখনও প্রাচীন যাযাবর-বৃত্তির খানিকটা রেশ তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, সেই ধাঁচেই তারা নিজেদের জীবনযাত্রাকে গড়ে নিয়েছিল। তুর্কিদের নিজের দেশে হয়তো এই ব্যবস্থাটা ছিল সবচেয়ে সুবিধার; কিন্তু ইউরোপ বা এশিয়া-মাইনরে তখন নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে এর ঠিক খাপ খায় না। সে নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের বদলে মিলিয়ে নিতে তুর্কিরা কিছুতেই রাজি হল না; অতএব এই দুই পক্ষের মধ্যে ক্রমাগতই ঠোকাঠুকি চলতে লাগল।

ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা—অটোম্যান-সাম্রাজ্য এই তিন মহাদেশকেই ঘিরে রেখেছিল; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে যতগুলি বাণিজ্যপথ ছিল তারা সমস্তই পড়ল এর এলাকায়। তুর্কিরা যদি চাইত এবং সে কাজ করবার মতো যোগ্যতা যদি তাদের থাকত তবে তারা এই সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিতে পারত, প্রকাণ্ড একটি ব্যবসায়জীবী জাতিতে পরিণত হয়ে পারত। কিন্তু এ রকমের কোনো বাসনা বা যোগ্যতা তাদের ছিল না; অতএব তারা নিজেদের পথ ছেড়ে বিপথে গিয়েও এই বাণিজ্যকে বাধা দিতে লাগল। খুব সম্ভবত তার কারণ, অন্যেরা এইভাবে বাণিজ্য করে লাভবান হবে, এটা তার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। কতকটা এইভাবে প্রাচীন বাণিজ্যপথগুলি বন্ধ হয়ে যাবার দরুনই ইউরোপের সমুদ্রগামী এবং বাণিজ্যজীবী জাতিরা বাধ্য হয়ে প্রাচ্যদেশে আসবার অন্য পথ খুঁজতে বার হল, এবং এরই ফলে নূতন নূতন পথের আবিষ্কার হল—কলম্বস পশ্চিমে এবং ডিয়াজ আর ভাস্কো-ডা-গামা পূর্ব-দেশে যাবার পথ আবিষ্কার করলেন। তুর্কিরা কিন্তু এসব ব্যাপারে মোটে ভ্রূক্ষেপই করল না; নিছক শৃঙ্খলা আর সামরিক দক্ষতার জোরেই তাদের সাম্রাজ্য শাসন করে চলল। এর ফল হল এই, অটোম্যান-সাম্রাজ্যের যে অংশটা ইউরোপে অবস্থিত ছিল সেখানে বাণিজ্য আর ধনোৎপাদনের কাজে ক্রমশই ভাটা পড়তে লাগল। জাতি এবং ধর্মের বৈষম্য নিয়ে যে লড়াই চলছিল, এটা কতকটা তারও ফল। ক্রুসেডের সময়ে এবং তারও আগে থেকে মুসলমান আর খৃষ্টানের মধ্যে লড়াই হয়েছে; তুর্কিরা আর বল্কান-অঞ্চলের খৃষ্টানরা সেই ধর্মগত যুদ্ধের বুদ্ধিটা পুরুষানুক্রমেই পেয়ে গিয়েছিল। তার উপরে আবার জাতীয়তাবোধের তখন নূতন সৃষ্টি হচ্ছে, সেও এসে এই আগুনে ইন্ধন জোগাল; দুয়ের মধ্যে ক্রমাগতই বিবাদ-বিসংবাদ চলতে লাগল। অটোম্যান-সাম্রাজ্যের ইউরোপে অবস্থিত অঞ্চলগুলি অবনতির পথে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল তার একটি দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই : প্রাচীন কালের সেই বিখ্যাত নগরী এথেন্স—১৮২৯ সনে গ্রীস যখন স্বাধীন হল তখন দেখা গেল, এথেন্স মাত্র একটি গ্রামে পর্যবসিত হয়েছে, তার লোকসংখ্যা দু হাজারের মতো। (তার পর এক শো বছর চলে গেছে, এখন এথেন্সের লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশি)।

বাণিজ্য এবং অন্যান্য সব উৎপাদনের ব্যাপারে এই অবনতির ফলে শেষ পর্যন্ত তুর্কি-সম্রাটদের নিজেদেরই অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল এবং দরিদ্র হয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকেও রোগ ধরল, ক্রমেই সে দুর্বল এবং রুগ্ণ হতে লাগল। এত সমস্ত অশান্তি এবং বিপত্তির মধ্যেও যে সাম্রাজ্যটা এত দিন টিঁকে রইল এইটেই আশ্চর্য।

বহুশত বৎসর ধরে অটোম্যান-সুলতানদের শক্তির উৎস ছিল তাঁদের 'জানিসারি' সেনাদল। এটি একটি তুর্কি-সেনাবাহিনী, খৃষ্টান ক্রীতদাস দিয়ে গঠিত, শিশুকাল থেকেই এদের সযত্নে শিক্ষিত করে তোলা হত। এই 'জানিসারি'দের দেখে মিশরের মামেলুকদের কথা মনে পড়ে; কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটি তফাতও ছিল। জানিসারিরা চিরদিন তুর্কির সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দল হয়ে রয়েছে, কিন্তু মিশরের মতো দেশের শাসনক্ষমতা কোনোদিন এদের হস্তগত হয় নি। মামেলুকদেরই মতো এরাও কিন্তু পুরুষানুক্রমিক জাতি নয়। ক্রীতদাস হিসাবে এদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ দেখানো হত, রাজ্যের বড়ো বড়ো চাকরি আর পদ এদের জন্যে আলাদা করে রাখা হত। এদের ছেলেরা কিন্তু গণ্য হত স্বাধীন মুসলমান বলে, বহুকাল যাবৎ এই অনুগৃহীত সেনাদলে যোগ দেবার অধিকার পর্যন্ত তাদের ছিল না, সে অধিকার শুধু ক্রীতদাসরাই পাবে। সেই সেনাদলে নূতন লোক নেওয়া হত সব সময়েই, নূতন শ্বেতকায় খৃষ্টান ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে। শুনতে খুব আশ্চর্য লাগছে, তাই না? কিন্তু মনে রেখো, এখনকার দিনে ক্রীতদাস বলতে আমরা যা বুঝি, তখনকার দিনে ইসলামধর্মী দেশগুলোতে কথাটা ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। ক্রীতদাসরা অনেক সময়েই হত নাম এবং আইনের দিক থেকে ক্রীতদাস, অথচ রাজ্যের অতি উচ্চ কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হবার পথও তাদের খোলা থাকত। ভারতবর্ষেই দিল্লিতে দাস-বংশ রাজত্ব করেছেন মনে করে দেখো; মিশরের সুলতান সালাদিনও প্রথম-জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তুর্কিদের বোধ হয় কথা ছিল শাসকশ্রেণীকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে শিক্ষাদীক্ষা দিতে হবে, যেন তারা যথাসম্ভব যোগ্যব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর মতো তারাও জানত, মানুষকে শিক্ষা দেবার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে তার প্রথম শৈশব,

ইউরোপে তুর্কিদের শেষ অধিকার
তুরস্কের হস্তচ্যুত ভূখণ্ড
উনবিংশ শতকে
...... বল্কান যুদ্ধের
পরে, ১৯১২-১৩
রাশিয়া
অস্ট্রিয়া-হাংগেরি
রুমানিয়া
বুখারেস্ট
বেলগ্রেড
বসনিয়া
বুলগেরিয়া
মণ্টেনিগ্রো
সোফিয়া
কনস্টান্টিনোপল
স্যালোনিকা
দার্দানেলিস
গ্রীস
এথেন্স
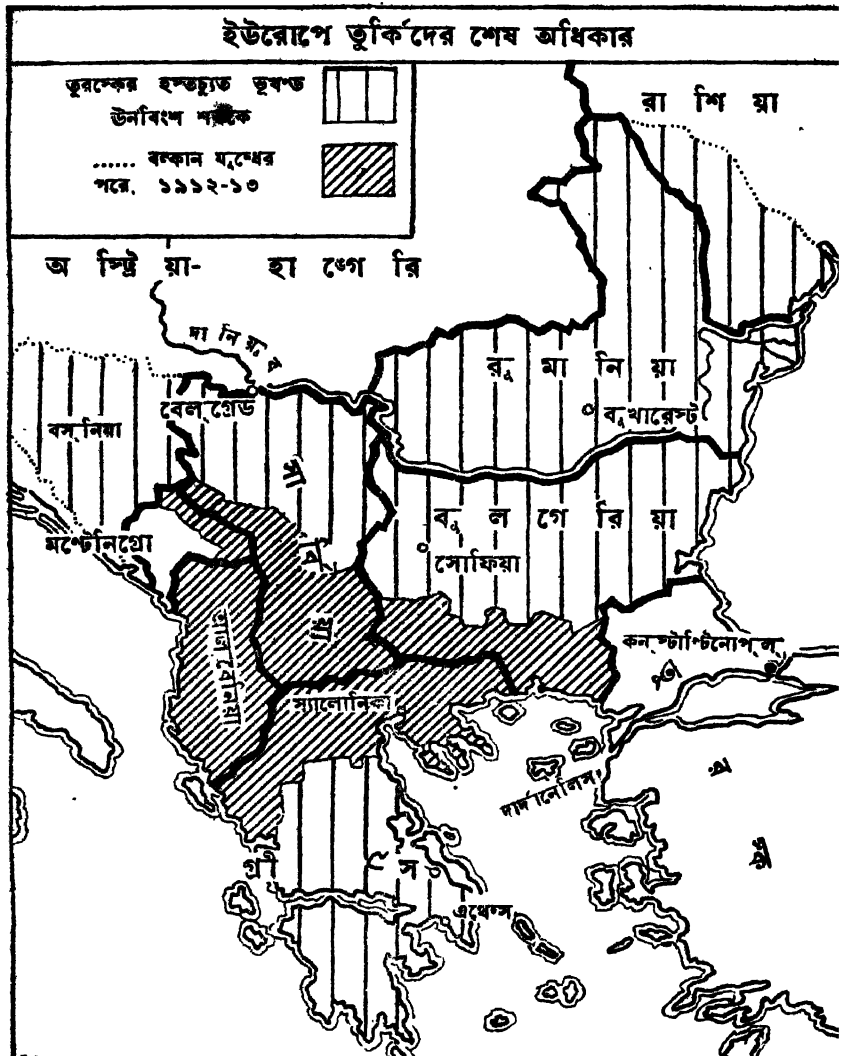
তখন থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হয়। দেশের মুসলমান প্রজাদের সন্তানদের নিয়ে গিয়ে বাপ-মার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রাখা বা ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়তো খুব সহজ ছিল না। কাজেই তারা খৃষ্টানদের ছোটো ছোটো ছেলে ধরে নিয়ে এসে সুলতানের দাস-মহলে ঢুকিয়ে নিত, তার পর অতি কঠোর শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলত। এই ছেলেরা অবশ্য বড়ো হয়ে উঠে সকলেই মুসলমান হয়ে যেত। স্বয়ং সুলতানদের সম্বন্ধেও এই রীতি প্রযোজ্য ছিল। সুলতান সাধারণ অর্থে বিবাহ করতেন না। খুব সযত্নে বাছাই-করা অনেক ক্রীতদাসীকে তাঁদের অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হত; এরাই হত তাঁদের সন্তানের জননী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত যত অটোম্যান-সুলতান সকলেই ছিলেন এইরূপ ক্রীতদাসীর পুত্র; দাস-মহলের অন্য যে-কোনো লোকেরই মতো সমান কঠোর শিক্ষা এবং কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এ'দেরও মানুষ হয়ে উঠতে হয়েছিল।

এইভাবে যত্ন করে ক্রীতদাসদের বেছে নেওয়া এবং নিয়মানুবর্তিতা আর শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের সুলতান থেকে নিম্নবর্তী সমস্ত বিশেষ পদের যোগ্য করে গড়ে তোলা, এর মধ্যে বেশ খানিকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আছে। এর ফলে সত্যই বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে বেশ দক্ষ লোক তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হল; নিত্য নূতন ক্রীতদাস আমদানি হওয়ার ফলে এর জীবনধারা বরাবরই সতেজ থেকে গেল, এবং বংশানুক্রমিক শাসকজাতি বলে কিছু গড়ে উঠতে পারল না। প্রথম যুগে এই সাম্রাজ্য যে দুর্জয় শক্তির পরিচয় দিয়েছিল তার উদ্ভব হয়েছিল বোধ হয় এই প্রথা থেকেই। কিন্তু ইউরোপ বা এশিয়াতে যে অবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা একেবারেই খাপ খাবে না, এও জানা কথা। সামন্ত-প্রথায় আর এতে প্রকাণ্ড তফাত। সামন্ত-প্রথার জায়গাতে নূতন যে সমাজ-প্রথার ইউরোপে তখন প্রবর্তন হচ্ছিল তার সঙ্গে এর তফাত আরও অনেক বেশি। এক দিকে এই প্রথা, আর-এক দিকে ব্যবসাবাণিজ্য বলতেও বিশেষ কিছু নেই; এর ফলে দেশে সত্যকার কোনো মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠা সম্ভব হল না। প্রথাটার মধ্যে গোড়াতে যে নিষ্ঠা আর পবিত্রতা ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের পরে তা আর পুরোপুরি টি'কে রইল না; তখন থেকেই দাস-মহলের মধ্যে একটা পুরুষানুক্রমের চেতনা ঢুকে পড়ল; সে মহলে যারা রয়েছে তাদের ছেলেরাও সেখানে থেকে যাবার এবং পিতার জীবিকা গ্রহণ করবার অধিকার পেয়ে গেল। আরও অনেক দিক দিয়েই এই নীতির মধ্যে ক্রমে শিথিলতা দেখা দিল। কিন্তু এর কাঠামোটি তখনও বজায় রইল, এবং এইজন্যেই বহুশত বৎসর পাশাপাশি বাস করবার পরেও ইউরোপ আর তুরস্ক একেবারেই আলাদা হয়ে রইল, ইউরোপে তুর্কি বিদেশী আগন্তুক বলেই পরিচিত হতে লাগল। তুর্কির নিজের মধ্যে যেসব বিদেশী বাস করত তারা সম্পূর্ণরূপেই দূরে সরে থাকল, তাদের নিজেদের আইন এবং সম্প্রদায়ের রীতি মেনে চলল।

তুর্কির এই অভিনব প্রাচীন প্রথাটির সম্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম তার কারণ, পৃথিবীতে এরকম প্রথা আর কোথাও নেই; অটোম্যান-সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারেও এটা অনেকখানিই সাহায্য করেছিল। এখন অবশ্য এই প্রথা আর বেঁচে নেই, এটা এখন অতীত ইতিহাসের সামগ্রী।

তুর্কির গত দু শো বছরের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস। এক দিকে রাশিয়া ক্রমাগতই তার সীমানা ভেঙে এগিয়ে এসেছে, আর-এক দিকে তার অধীনস্থ জাতিগুলো বারবার বিদ্রোহ করেছে। গ্রীস রুমানিয়া সার্বিয়া বুল্‌গেরিয়া মণ্টিনিগ্রো বস্‌নিয়া, এরা সবই ছিল বল্‌কান-অঞ্চলের দেশ, সকলেই অটোম্যান-সাম্রাজ্যের অংশ। ১৮২৯ সনে ইংলণ্ড ফ্রান্স আর রাশিয়ার সাহায্যে গ্রীস স্বাধীন হয়ে গেল। রাশিয়া শ্লাভদের দেশ, বলকান-অঞ্চলের বুল্‌গেরিয়া এবং সার্বিয়াও তাই। রাশিয়া এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে বল্‌কান-অঞ্চলের এই শ্লাভদের রক্ষাকর্তা এবং মুরুব্বি। রাশিয়ার আসলে লোভ ছিল কনস্টাণ্টিনোপ্‌লের উপর; সমস্ত কূটকৌশল খাটিয়ে সে এই প্রাচীন নগরীটিকে কোনোক্রমে হস্তগত করবার চেষ্টা করতে লাগল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌; রাশিয়ার জাররা বলতেন, তাঁরাই বাইজান্‌টাইন-সম্রাটদের প্রকৃত বংশধর। ১৭৩০ সনে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের প্রথম যুদ্ধ বাধল। তার পর থেকে মাঝে মাঝেই এদের মধ্যে যুদ্ধ হতে লাগল। কিছুদিন একটা শান্তি স্থাপিত হয়, আবার যুদ্ধ লাগে, এমনি করে

বহুবার যুদ্ধ হল—১৭৬৮, ১৭৯২, ১৮০৭, ১৮২৮, ১৮৫৩, ১৮৭৭ এবং অবশেষে ১৯১৪ সনে। ১৭৭৪ সনে রাশিয়া তুরস্কের হাত থেকে ক্রিমিয়া-অঞ্চলটি ছিনিয়ে নিল এবং ফলে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু এতে লাভ বিশেষ-কিছুই হল না, কারণ কৃষ্ণসাগরটা একটা বোতলের মতো বস্তু, তার বাইরে যাবার মুখ একটিমাত্র, এবং ঠিক সেই মুখটির উপরেই পাহারা দিয়ে বসে রয়েছে কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌। ১৭৯২ এবং ১৮০৭ সনের যুদ্ধে রাশিয়ার সীমান্তরেখা কন্স্টান্টিনোপ্‌লের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এল, তুর্কিদের সীমান্তরেখা পিছনে হটে গেল। গ্রীসের স্বাধীনতা-সমর যখন চলছে, জার সেই সুযোগটির সদ্‌ব্যবহার করবার চেষ্টা করলেন; তুর্কিরা যখন অন্যত্র ব্যতিব্যস্ত এমন সময় বুঝে তাদের আক্রমণ করলেন। ইংলণ্ড এবং অস্ট্রিয়া মাঝখানে এসে না পড়লে তখনই কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ তাঁর হস্তগত হত।

ইংলণ্ড আর অস্ট্রিয়া কেন রাশিয়ার হাত থেকে তুরস্ককে বাঁচাতে গেল? তুরস্ককে ভালোবেসে নয়; রাশিয়া তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, রাশিয়াকে তাদের ভয় ব'লে। এশিয়া এবং অন্যত্র সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ইংলণ্ড আর রাশিয়ার মধ্যে চিরদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এসেছে, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। বিশেষ করে ভারতবর্ষ দখল করবার ফলে ব্রিটিশরা একেবারে রাশিয়ার সীমান্তে এসে হাজির হল; রাশিয়ার জার কখন এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসেন তাই ভেবে ভেবে তাদের চোখের ঘুম ছুটে গেল। অতএব তখন তার নীতিই হল, যেখানে যেটুকু পারে রাশিয়াকে আঘাত হানবে, তার শক্তিসঞ্চয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ হস্তগত করতে যদি রাশিয়া পারে তবে তখন ভূমধ্যসাগরের উপরেই তার চমৎকার একটি বন্দর হবে, এবং তার ফলে ভারতে আসবার পথের ঠিক পাশেই একটি নৌবহর রাখবার সে সুযোগ পাবে। সেটা অত্যন্ত বিপদের কথা; অতএব তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযানকে ব্রিটেন বার বার বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল। রাশিয়াকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে অস্ট্রিয়ারও লাভ ছিল। এখন অস্ট্রিয়া ছোটো একটি রাজ্য; কিন্তু কয়েক বছর আগেও সে ছিল একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য, বল্‌কান-অঞ্চলের ঠিক গায়েই তার বাস। তার মতলব ছিল, তুরস্ক-সাম্রাজ্য যখন ভেঙে যাবে তখন বল্‌কান-অঞ্চলের দেশগুলির একটা বড়ো অংশ সে নিজেই দখল করে নেবে। কাজেই রাশিয়াকে সেখানে পৌঁছতে দিলে তার চলে না।

তুরস্ক-বেচারির কাহিল অবস্থা; তার এই শক্তিশালী প্রতিবেশীরা সকলেই ওৎ পেতে বসে আছে, কখন তার ভাগ্যবিপর্যয় হবে সেই ভরসায় প্রতীক্ষা করছে। তার কিছু হলেই অমনি এরা তার উপরে এসে লাফিয়ে পড়বে, তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। ১৮৫৩ সনে তুরস্কের সম্বন্ধে রাশিয়ার জার ব্রিটিশ দূতকে বলেছিলেন, "আমাদের হাতে রয়েছে একটি রুগ্‌ণ মানুষ, একজন অত্যন্ত রুগ্‌ণ মানুষ...যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের হাতের উপরেই সে হঠাৎ মারা যেতে পারে...।" জারের এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ল, তখন থেকেই তুরস্ক 'ইউরোপের রুগ্‌ণ লোকটি' বলে পরিচিত হয়ে গেল। কিন্তু সে রুগ্‌ণ লোকটির মরতে বড়ো বেশি সময় লেগে গেল!

সেই বৎসর, সেই ১৮৫৩ সনেই, জার এই রুগ্‌ণ মানুষটিকে মেরে ফেলতে আর-একবার চেষ্টা করলেন। এর ফলে হল রাশিয়াতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুগ্‌ণ লোকটি সেবারও বেঁচে গেল। একুশ বছর পরে ১৮৭৭ সনে জার আর-একবার তুরস্ককে আক্রমণ করলেন, পরাস্তও করলেন। কিন্তু আবার বিদেশীরা এসে মাঝখানে পড়ল; তুরস্ককে কিছু পরিমাণে তারা রক্ষাও করল, অন্তত কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌-শহরটিকে রাশিয়ার হাতে পড়তে দিল না। তুরস্কের ভাগ্য কী হবে তাই স্থির করবার জন্যে ১৮৭৮ সনে বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল, এর কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই সম্মেলনে বিস্‌মার্ক এলেন, ডিস্‌রেলি এলেন, ইউরোপের আরও অনেক বড়ো বড়ো রাজনীতিবিদ্‌ এলেন; সবাই মিলে তাঁরা পরস্পরকে শাসাতে আর পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লাগলেন। রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধে-বাধে এমনি অবস্থা; এমন সময় রাশিয়াই পিছিয়ে গেল। বার্লিনের এই সন্ধির ফলে বুল্‌গেরিয়া, সার্বিয়া, রুমানিয়া আর মণ্টিনিগ্রো, বল্‌কান-অঞ্চলের এই ক'টি দেশ স্বাধীন হয়ে গেল; বস্‌নিয়া আর হার্জেগোভিনা গেল অস্ট্রিয়ার দখলে (হার্জেগোভিনা তখনও নামে তুরস্ক-সম্রাটের অধীনেই রইল); আর ব্রিটেন নিল সাইপ্রাস-দ্বীপটি—ব্রিটেন খানিক পরিমাণে তুরস্কের পক্ষ টেনে চলেছিল, তার পুরস্কারস্বরূপ তুরস্কের হাত থেকে এটি তার প্রাপ্য।

এর পরে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের আবার যুদ্ধ হল ছত্রিশ বছর পরে ১৯১৪ সনে, বিশ্বযুদ্ধেরই একটা অংশ হিসাবে।

ইতিমধ্যে তুরস্কে বিরাট-সব পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। ১৭৭৪ সনে রাশিয়ার হাতে তুরস্কের বিষম পরাজয় হল। সেই ধাক্কায় তুর্কিদের প্রথম ঘুম ভাঙল; তারা টের পেল, ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। যোদ্ধার জাত, তাদের প্রথম কথাই মনে হল, সেনাবাহিনীটিকে আধুনিক করে তুলতে হবে। খানিকটা তাই করাও হল; এই নূতন সামরিক কর্মচারীদের মারফতই পাশ্চাত্য মতামত প্রথম তুরস্কে প্রবেশ করল। আমি তোমাকে বলেছি, মধ্যবিত্তশ্রেণী বলে তেমন-কিছু সে দেশে ছিল না; অন্য-কোনো সুসংহত শ্রেণীও ছিল না। ১৮৫৩-৫৬ সনের ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমদানি করবার একটা সত্যকার চেষ্টা দেশে দেখা দিল। প্রজাধীন শাসনব্যবস্থার (তার অর্থ ছিল, সুলতানের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের পরিবর্তে একটা গণতান্ত্রিক শাসনপরিষদের প্রতিষ্ঠা) পক্ষপাতী একটা আন্দোলন সৃষ্টি হল। এর নেতা ছিলেন মিধাত পাশা। 'শাসনতন্ত্র রচনা করে দেওয়া হোক' বলে ১৮৭৬ সনে কন্স্টান্টিনোপ্লে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হল। সুলতান শাসনতন্ত্র মঞ্জুরও করলেন। কিন্তু প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই বুল্গেরিয়াতে বিদ্রোহ হল, রাশিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধ বাধল; অতএব সে শাসনতন্ত্রও তখনই আবার মুলতুবি হয়ে গেল। এই যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে; শাসনব্যবস্থার শীর্ষপ্রদেশে অনেক সংস্কারসাধন করতে হচ্ছে, তারও খরচ আছে; অথচ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বা ব্যবস্থার বিশেষ-কোনো পরিবর্তনই করা হয় নি—এর চাপে পড়ে তুরস্ক-সরকার অর্থাভাবে পড়ে গেলেন। সুতরাং তখন পাশ্চাত্যদেশের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হল; অতএব তারা এসে দেশের রাজস্বব্যবস্থার উপরে খানিকটা কর্তৃত্ব করতে বসল। এর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমদানি আর সংস্কারসাধনের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল সে চেষ্টা সফল হল না। সাম্রাজ্যের পুরোনো কাঠামোর সঙ্গে একে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাসনতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে প্রজারা আবার জোর আন্দোলন শুরু করল। আগেকার মতো এবারও দেখা গেল, দেশের একমাত্র সুসংবদ্ধ লোক হচ্ছে সামরিক কর্মচারীরা; তাদের মধ্যেই নূতন দলটি দ্রুতবিস্তৃতি লাভ করল—এই দলের নাম ছিল 'নবীন তুর্কি দল'। অনেক গুপ্ত 'ঐক্য ও প্রগতিবাদী সমিতি' সৃষ্টি হল; সেনাবাহিনীরও একটা বড়ো অংশকে এরা হাত করে ফেলল। ১৯০৮ সনে এদের চাপে পড়ে সুলতান ১৮৭৬ সনের সেই পুরোনো শাসনতন্ত্রটিকে আবার চালু করতে বাধ্য হলেন। দেশে মহা উৎসব পড়ে গেল; এত দিন ধরে তুর্কি আর্মানি আর অন্যান্য জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি খুনোখুনি করে এসেছে, তারাও এবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগল—দেশে নবীন যুগের আবির্ভাব হয়েছে, এবার সকলেই এক-সমান হয়ে যাবে, অধীন জাতিরাও সমস্ত অধিকার আর প্রতিপত্তি লাভ করবে। এই রক্তহীন বিপ্লবের প্রধান নেতা ছিলেন আনোয়ার বে—সুদর্শন, অহংকারে পরিপূর্ণ, ও দিকে আবার দুর্জয় সাহস এবং বীরত্বের অধিকারী পুরুষ তিনি। মুস্তাফা কামাল পরবর্তী যুগে তুরস্কের ত্রাণকর্তা বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। ইনিও ছিলেন তরুণ তুর্কি দলের একজন বড়ো নেতা। কিন্তু আনোয়ারের তুলনায় তখনও তাঁর প্রতিপত্তি অনেক কম; এঁরা দুজনে পরস্পরকে মোটেই পছন্দ করতেন না।

তরুণ তুর্কিদের অনেক বাধাবিপত্তিই সইতে হল। সুলতান তাদের উৎপীড়ন করতে লাগলেন; শেষ-পর্যন্ত রক্তপাতও করতে হল। সুলতানকে পদচ্যুত করে তারা আর-একজনকে সিংহাসনে বসাল। টাকাকড়ির অভাবে এবং বিদেশী শক্তিদের সঙ্গে মনোমালিন্যের দরুনও তাদের অনেক মুশকিলে পড়তে হল। তুরস্কের মধ্যে গোলমাল চলছে, এই সুযোগে অস্ট্রিয়া ঘোষণা করে বসল, বস্নিয়া আর হার্জেগোভিনা সে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে (১৮৭৮ সনে বার্লিনের সন্ধির ফলে এদের সে দখল করে বসেছিল)। উত্তর-আফ্রিকাতে ত্রিপলিকে ইতালি জোর করে দখল করল এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তুরস্কের ভালোরকম একটা নৌবহর পর্যন্ত নেই। সে আর কী করবে, বাধ্য হয়েই সে ইতালির দাবি মেনে নিল। এটা শেষ হতে-না-হতেই আবার বাড়ির ধারে

নূতন এক বিপদ এসে হাজির। বুলগেরিয়া সার্বিয়া গ্রীস আর মণ্টিনিগ্রো, এদের মতলব ছিল ইউরোপ থেকে তুর্কিদের তাড়িয়ে দেবে, দিয়ে তার যা-কিছু আছে নিজেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে। তারা দেখল, এই তো চমৎকার সুযোগ; একত্র হয়ে একটা 'বলকান-লীগ' তৈরি করে তারা ১৯১২ সনের অক্টোবর মাসে তুরস্ককে আক্রমণ করে বসল। তুরস্কের তখন অত্যন্ত অবসন্ন এবং বিশৃংখল অবস্থা; দেশের মধ্যে শাসনতন্ত্রকামী আর প্রগতিবিরোধী দলের লড়াই চলছে। বলকান-লীগের আক্রমণে সে একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল; এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতি সইতে হল তাকে। প্রথম-বলকান-যুদ্ধ সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল; তুরস্ককে ইউরোপ থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বেরিয়ে চলে আসতে হল; একমাত্র কনস্টাণ্টিনোপল-শহরটি তার হাতে রইল। এমনকি, ইউরোপে তার সবচেয়ে পুরোনো শহর এড্রিয়ানোপল পর্যন্ত তার হাত মুচড়ে কেড়ে নেওয়া হল। তুরস্ক খুবই ক্ষুব্ধ হল এতে, কিন্তু হয়ে করবে কী!

অতি অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু বিজেতাদের নিজেদের মধ্যে লুটের ভাগ নিয়ে ঝগড়া লাগল; বুলগেরিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে তার পুরোনো মিত্রদেরই অকস্মাৎ আক্রমণ করল। এদের পরস্পরের মধ্যে তখন খুব-একটা মারামারি-কাটাকাটির ধুম পড়ে গেল। রুমানিয়া প্রথমটা দূরে সরে ছিল; এখন সে দেখল, বিশৃংখলা বেধেছে, লাভ গুছিয়ে নেবার এই তো সুযোগ, সেও এসে লড়াইয়ে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াল এই, বুলগেরিয়া যা-কিছু পেয়েছিল সমস্তই তাকে হারাতে হল; রুমানিয়া গ্রীস আর সার্বিয়া তাদের রাজ্য অনেকখানি করে বাড়িয়ে নিল। তুরস্কও এড্রিয়ানোপল আবার ফিরে পেল। বলকানের এই জাতিগুলো পরস্পরের প্রতি অদ্ভুতরকম বিদ্বেষ পোষণ করে। বলকান-অঞ্চলের রাজ্যগুলো ছোটো, কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে অনেক বড়ো বড়ো ঝড়ঝাপ্টার এইখান থেকেই শুরু হয়েছে।

১৯০৯ সনে তরুণ তুর্কিরা যে সুলতানকে পদচ্যুত করে, বড়ো আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর নাম ছিল দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ; ১৮৭৬ সনে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সংস্কার এবং আধুনিক সব কায়দাকানুনকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না; অথচ নিজে তিনি বেশ দক্ষ শাসক ছিলেন; পৃথিবীর বড়ো বড়ো শক্তিগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার বিদ্যায় পারদর্শী বলে তাঁর নাম ছিল। এটা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি, অটোম্যান-সুলতানরা সকলেই আবার খলিফা অর্থাৎ ইসলামের ধর্মগুরুও ছিলেন। ধর্মগুরু হিসাবে তাঁর যে খ্যাতির ছিল, আব্দুল হামিদ সেটিকে কাজে লাগিয়ে নিতে চাইলেন, একটি নিখিল ঐশ্লামিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য সব দেশের মুসলমানরাও এতে যোগ দেবে, সুতরাং তিনি তাদেরও সমর্থন পাবেন। বছর-কয়েক যাবৎ ইউরোপে এবং এশিয়াতে এই প্যান-ইসলাম নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা চলল। কিন্তু এর গোড়ায় কোনো সারবস্তু ছিল না; বিশ্বযুদ্ধ আসার সঙ্গে সঙ্গে এর একেবারেই অবসান হয়ে গেল। তুরস্কে জাতীয়তাবাদী প্যান-ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াল; শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুয়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদেরই জোর বেশি।

বুলগেরিয়া আর্মেনিয়া এবং অন্যান্য স্থানে যে নৃশংস অত্যাচার আর নরহত্যা চলছিল, লোকের ধারণা ছিল সুলতান আব্দুল হামিদই সেগুলো করাচ্ছেন; অতএব ইউরোপের লোক তাঁর নামে অত্যন্ত চটে গেল। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর নাম দিলেন 'মহান্ নরঘাতী'; এই নৃশংসতা বন্ধ করবার জন্যে তিনি ইংলণ্ডে আন্দোলন শুরু করলেন। তুর্কিরা নিজেরাই আব্দুল হামিদের রাজত্বকালকে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কুৎসিত অধ্যায় বলে মনে করে। বলকান-অঞ্চলে এবং আর্মেনিয়াতে নরহত্যা এবং অত্যাচার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল; দুই পক্ষই এতে পারদর্শী ছিল। তুর্কিরা বলকানবাসী আর আর্মেনিয়ানদের মেরে শেষ করত, তারাও সমানভাবেই তুর্কিদের মেরে ফেলত। জাতি এবং ধর্মমতের ব্যাপারে এই জাতিগুলো শত শত বৎসর ধরে পরস্পরকে শত্রু বলে জেনে এসেছে; সে শত্রুতার চেতনা একেবারে তাদের প্রকৃতির মধ্যেই শিকড় গেড়ে বসেছে; সেইটে একেবারে ভয়ংকর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করছিল। সবচেয়ে বেশি উৎপীড়ন সইতে হচ্ছিল আর্মেনিয়ার। এখন আর্মেনিয়া ককেশাসের নিকটবর্তী সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অন্যতম।

বল্‌কান-যুদ্ধের শেষে তুরস্ক দেখল, সে একেবারেই অবসন্ন, ইউরোপে তার নিজের বলতে অবশিষ্ট আছে একটিমাত্র পা রাখবার মতো স্থান। তার সাম্রাজ্যের বাকি অংশগুলোতেও তখন ফাটল ধরেছে। মিশর তো শুধু নামেই তার অধীন ছিল; বস্তুত তখন ব্রিটেনই তাকে দখল এবং শোষণ করছে। কিন্তু অন্যান্য আরবদেশগুলোতেও তখন জাতীয় আন্দোলনের আভাস দেখা দিয়েছে। দেখেশুনে তুরস্কের চোখ ফুটল এবং মন ভেঙে পড়ল। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ১৯০৮ সনে যত বড়ো বড়ো আশা তার মনে জেগে উঠেছিল, সমস্তই যেন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। ঠিক এই সময়ে তার মনে হল, জর্মানি তার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাচ্ছে। জর্মানি তখন পুব দিকে চোখ মেলে তাকাচ্ছে; এক দিন সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে সেই স্বপ্ন দেখছে। তুরস্কও জর্মানিকে বন্ধু বলে আঁকড়ে ধরল; দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠল। এই যখন অবস্থা, ঠিক সেই ক্ষণটিতে, ১৯১৪ সনে এল বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয়-বল্‌কান-যুদ্ধের পর তখন মাত্র একটি বছর শেষ হয়েছে। বিশ্রাম ভোগ করা তুরস্কের ভাগ্যে লেখা ছিল না।

১৪৩

জারের রাজ্য রাশিয়া

১৬ই মার্চ, ১৯৩৩

রাশিয়া এখন সোভিয়েট দেশ, তার শাসনকার্য চলছে শ্রমিক আর কৃষকদের প্রতিনিধিদের দিয়ে। কোনো কোনো দিক দিয়ে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। তার বাস্তব অবস্থা যাই হোক, তার শাসনব্যবস্থা আর সমাজের সমস্ত কাঠামোটাই দাঁড় করানো হয়েছে সমাজ-সাম্যের নীতির উপরে। এটা অবশ্য এখনকার কথা। কিন্তু কয়েক বছর আগেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া কাল, এবং তারও আগে থেকেই রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী এবং প্রগতিবিরোধী দেশ। স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কত্বের একেবারে চরম রূপটি সেখানে দেখা যেত; পশ্চিম-ইউরোপে যখন বহু বিপ্লব এবং পরিবর্তন ঘটে গেছে তখনও জারেরা রাজাদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার দোহাই দিতেন। রাশিয়ার ধর্ম ছিল পুরোনো গোঁড়া গ্রীক খৃষ্টানদের ধর্ম; রোমান ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্ম নয়। সে ধর্মমতও রাশিয়াতে একনায়কত্বের যতটা পৃষ্ঠপোষক ছিল তেমন বোধ হয় আর-কোথাও ছিল না; জারতন্ত্রী শাসনের সেও ছিল একটা বড়ো খুঁটি এবং বড়ো একটা অস্ত্র। দেশটার নামই ছিল 'হোলি রাশিয়া' বা 'ঈশ্বরের অনুগৃহীত দেশ', জার ছিলেন সমস্ত প্রজার 'স্নেহময় পিতা'; এইসমস্ত নামের ধাপ্পা দিয়ে ধর্মগুরুরা আর শাসনকর্তৃপক্ষরা প্রজাকে ধাঁধা লাগিয়ে রাখতেন, রাজনীতি আর অর্থনীতির চর্চা থেকে তাদের মনকে নিবৃত্ত করে রাখতেন। ইতিহাসে ঈশ্বরের কত বিচিত্র সাঙ্গোপাঙ্গেরই দেখা মেলে!

এই হোলি রাশিয়ার খাঁটি প্রতীক ছিল 'নাউট', আর তার অতি প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল 'পোগ্রোম'—রাশিয়ার জাররা এই দুটি কথা পৃথিবীর সাহিত্যকে উপহার দিয়ে গেছেন। 'নাউট' হচ্ছে এক রকমের চাবুক, ভূমিদাস এবং অন্যদের শাস্তি দেবার জন্যে ব্যবহৃত হত। 'পোগ্রোম' মানে হচ্ছে ধ্বংস এবং সুশৃঙ্খলে নির্যাতন; কার্যত এর মানে ছিল নির্বিচার নরহত্যা, বিশেষ করে ইহুদিদের হত্যা। আবার জারশাসিত রাশিয়ার ঠিক পিছনেই ছিল একটা বিস্তৃত নির্জন প্রান্তরদেশ, তার নাম সাইবেরিয়া—সাইবেরিয়া নামটা বলতেই আমরা বুঝি নির্যাতন, কারাদণ্ড আর হতাশা। হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে সাইবেরিয়ায় পাঠান হত; নির্বাসিতদের বড়ো বড়ো ক্যাম্প আর উপনিবেশ গড়ে উঠল সেখানে, আর তাদের প্রত্যেকটির পাশে পাশেই ছড়িয়ে রইল নির্বাসনের নির্যাতন সইতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের কবর। নির্বাসনে আর কারাবাসে দীর্ঘ কাল নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা একটা দুঃসহ যাতনা; তার কষ্ট সইতে না পেরে বহু সাহসী বীরের

মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যেত, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত। সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বন্ধুবান্ধব সহকর্মী যারা আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগ নেয়, কষ্টের বোঝা লঘু করে দেয়, সেই আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে বহু দূরে বাস করতে হলে প্রচুর-পরিমাণ মনের জোর দরকার হয়; দরকার হয় মনের এমন একটা গভীরতা যা শান্তি এবং স্থৈর্য এনে দেয়, এনে দেয় কষ্ট সইবার শক্তি। এমনি করে জারের শাসনে যে যেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইত তাকেই ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হত; যে যেখানে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা প্রকাশ করত তাকেই একেবারে চূর্ণ করে ফেলা হত। এমনকি দেশ থেকে বিদেশে বেড়াতে যাবার পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে রাখা হত, যেন বাইরে থেকে প্রগতির হাওয়া দেশে এসে ঢুকতে না পারে। কিন্তু স্বাধীনতার কামনাকে জোর করে রুদ্ধ করে রাখলে সে নিজে থেকেই চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলে; তার পর যখন সামনে এগিয়ে চলতে শুরু করে তখন আর হেঁটে চলে না, চলে একেবারে বড়ো বড়ো লাফ মেরে, সে লাফের ধাক্কায় সমাজের প্রাচীন জরাজীর্ণ রথ উল্টে পড়ে যায়।

এশিয়া এবং ইউরোপের বহু স্থানে—দূর-প্রাচ্যে, মধ্য-এশিয়ায়, পারস্যে এবং তুরস্কে জার-শাসিত রাশিয়া যেসব কাণ্ডকারখানা এবং নীতি অনুসরণ করেছে তার কিছু কিছু আভাস আমরা আগের কতকগুলো চিঠিতে পেয়েছি। এবারে সেই চিত্রটাকে আমরা কিছুটা সম্পূর্ণ করব; সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে একত্র করে মূল কাহিনীর সঙ্গে একত্র করে দেখব। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন যে তার চিরদিনই দু দিকে দুটো মুখ—এক মুখ পশ্চিমে, আর-এক মুখ পূর্ব দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই অবস্থানের সাহায্যে সে হয়ে উঠেছে একটা ইউরোপ-এশিয়া-ব্যাপী দেশ; কখনও সে পূর্বের দিকে বেশি ঝুঁকেছে, কখনও-বা পশ্চিমের দিকে; এই ভারকেন্দ্র-অদল-বদলের কাহিনীতেই তার শেষ দিকের ইতিহাস ভরা। পশ্চিমে বাধা পেয়ে সে মুখ ফিরিয়ে দেয় পূবের দিকে; পূব দিকে বাধা পেয়ে আবার মুখ ফিরিয়েছে পশ্চিমের দিকে।

মঙ্গোলদের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির কীভাবে অবসান হল, চেঙ্গিস খাঁর পরে তাঁর সাম্রাজ্যের কী দশা হল এবং মস্কোর রাজার নেতৃত্বে রাশিয়ার সমস্ত রাজারা একত্রিত হয়ে স্বর্ণরাজ্য (Golden Horde)-এর মঙ্গোলদের কীভাবে শেষপর্যন্ত রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করলেন, সে কাহিনী তোমাকে বলেছি। এটা ঘটেছিল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে। মস্কোর রাজারা ক্রমে সমস্ত দেশটারই স্বৈরতন্ত্রী রাজা হয়ে বসলেন; নিজেদের পদবী গ্রহণ করলেন 'জার' (অর্থাৎ সীজার) বলে। এঁদের মতামত এবং রীতিনীতি বহুলাংশে মঙ্গোলীয় ধরনেরই থেকে গেল; পশ্চিম-ইউরোপের সঙ্গে এঁদের অতি সামান্যই মিল দেখা যেত। পশ্চিম-ইউরোপের লোকরা রাশিয়াকে জানত বর্বর দেশ বলে। ১৬৮৯ সনে জার পিটার সিংহাসনে আরোহণ করলেন; এঁর নাম পিটার দি গ্রেট বা মহাত্মা পিটার। তিনি স্থির করলেন, রাশিয়ার মুখ পশ্চিমের দিকে ফেরাবেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অবস্থা অধ্যয়ন করবার উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘ কাল ধরে তার দেশে দেশে ভ্রমণ করলেন। সেখানে যা যা দেখলেন তার অনেকখানিই তিনি নিজের দেশে এসে অনুকরণ করলেন; পাশ্চাত্য রীতিনীতি আমদানি করার যে মতি তাঁর হয়েছিল সেটা জোর করেই তাঁর অভিজাত প্রজাদের উপরে চাপিয়ে দিলেন। এই অভিজাতরা ছিলেন এ বিষয়ে যেমন অজ্ঞ তেমনি অনিচ্ছুক, কিন্তু তাতে কী হয়। দেশের জনসাধারণের অবশ্য তখনও অত্যন্ত হীনাবস্থা; তাদের উপরে পীড়নও চলত নিদারুণ। পিটার যে সংস্কারের আমদানি করছেন তার সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী, সে নিয়ে পিটার বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালেন না। পিটার দেখেছিলেন, তাঁর সময়কার যে জাতিগুলো খুব বড়ো বলে পরিচিত তাদের প্রত্যেকেই প্রচণ্ড নৌবলের অধিকারী; বুঝেছিলেন, দেশকে বড়ো করে তুলতে হলে নৌশক্তি না হলে চলবে না। কিন্তু রাশিয়াদেশ বড়ো হলেও তার সমুদ্রে বার হবার পথ ছিল না; একমাত্র ছিল উত্তর-মহাসাগর, নৌশক্তির দিক থেকে সেটা বিশেষ কাজের নয়। কাজেই পিটার উত্তর-পশ্চিমে বাল্টিক-সাগর আর দক্ষিণে ক্রিমিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ক্রিমিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে তিনি পারলেন না (সেটা তাঁর পরবর্তী রাজারা পেরেছিলেন); কিন্তু সুইডেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বাল্টিক-সাগরে গিয়ে তিনি পৌঁছলেন। ফিনল্যান্ডের উপসাগর দিয়ে বাল্টিক-সাগরে বার হওয়া যায়; উপসাগরের নিকটে নেভা-নদীর উপরে তিনি নূতন একটি পশ্চিমীভাবাপন্ন শহর তৈরি করলেন, তার নাম হল সেন্টপিটার্স-

বার্গ। এই শহরে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন; মস্কোর সঙ্গে যেসব প্রাচীন রীতিনীতি জড়িয়ে ছিল, এমনি করে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইলেন। ১৭২৫ সনে পিটার মারা গেলেন।

এর অর্ধ শতাব্দীরও বেশি কাল পরে, ১৭৮২ সনে, রাশিয়ার আর-একজন শাসক তাকে পাশ্চাত্য দীক্ষায় দীক্ষিত করতে চেষ্টা করলেন। ইনি একজন নারী, এ'র নাম দ্বিতীয় ক্যাথারিন— এ'কেও 'দি গ্রেট' বলা হত। বড়ো অদ্ভুত নারী ছিলেন ইনি—শক্তিময়ী, নিষ্ঠুর, কর্মদক্ষ, এবং ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্তরকম নিন্দিতচরিত্র। নিজের স্বামী জারকে হত্যা করে তিনি রাশিয়ার সমগ্র সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে বসলেন, এবং চোদ্দ বছর ধরে দেশশাসন করলেন। নিজেকে তিনি সংস্কৃতির একজন উৎসাহী সমর্থক বলে জাহির করতেন; ভল্‌টেয়ারের সঙ্গেও বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রও লেখালেখি করতেন। তিনি কিছু-পরিমাণে ভার্সাইস্থিত ফরাসি রাজদরবারের ধরনধারণের অনুকরণ করতেন; দেশে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কারও সাধন করেছিলেন। কিন্তু এর সমস্তটাই ছিল রাজ্যের একেবারে শীর্ষস্থানীয় লোকদের নিয়ে, নিছক লোক-দেখানো ব্যাপার। সংস্কৃতি বস্তুটা হঠাৎ পরের নকল করে আসে না; ওটাকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে নিতে হয়। একটা অনুন্নত জাতি যেখানে একটা উন্নত জাতির রীতিনীতির কেবল বাঁদুরে নকল করতে চায়, তার ফলে সংস্কারের সোনা আর রূপোর গহনার বদলে তার আয়ত্ত হয় শুধু রাংতার সাজ। পশ্চিম-ইউরোপের সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছিল বিশেষ কতকগুলি সামাজিক অবস্থার ফলে। পিটার এবং ক্যাথারিন সে অবস্থাগুলো দেশে ঘটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন না; কেবল তার বাইরের সাজসজ্জাটাকেই নকল করতে চাইলেন। তার ফলে সে পরিবর্তনের বোঝাটা সমস্তই গিয়ে পড়ল সাধারণ প্রজাদের উপরে; ভূমিদাস-প্রথা আর জারের স্বৈরতন্ত্রের জোর এতে বস্তুত আরও বেড়েই গেল।

জারশাসিত রাশিয়াতেও তেমনি একটুখানি প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি করে প্রতিক্রিয়ার আমদানি হতে লাগল। রাশিয়ার কৃষকদের অবস্থা ছিল বস্তুত ক্রীতদাসেরই শামিল। জমির সঙ্গে তারা একেবারে বাঁধা; বিশেষ অনুমতি ছাড়া জমি ছেড়ে অন্যত্র যাবার অধিকার পর্যন্ত তাদের ছিল না। শিক্ষা বস্তুটা সীমাবদ্ধ ছিল জনকতক সরকারি কর্মচারী আর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে, এরা সকলেই ভূস্বামীশ্রেণীর ভদ্রলোক। মধ্যবিত্তশ্রেণী বলতে বস্তুত কিছু ছিল না; সাধারণ প্রজারা ছিল একেবারেই অশিক্ষিত এবং অনুন্নত। অতীত কালে দেশের কৃষকরা বহুবার বিদ্রোহ করেছে, রক্তপাতও অনেক হয়েছে। অতিমাত্রায় উৎপীড়নের ফলে অন্ধ হয়ে কৃষকরা বিদ্রোহ করত, সে বিদ্রোহ দমনও করা হত নিষ্ঠুর হাতে। এখন দেশের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে অল্প-একটু শিক্ষার বিস্তার হল; সুতরাং পশ্চিম-ইউরোপের সমস্ত দেশে যেসব চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারও ছিটেফোঁটা এদের মধ্যে এসে ঢুকল। সেটা ছিল ফরাসি-বিপ্লবের যুগ; তার পরেই আবার এল নেপোলিয়নের যুগ। নেপোলিয়নের পতনের ফলে ইউরোপের সমস্ত দেশেই একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার; তিনি এই প্রতিক্রিয়ার বড়ো পাণ্ডা হয়ে উঠলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য সম্রাটদের 'পবিত্র মৈত্রী' (Holy alliance)। আলেকজান্ডারের পরবর্তী জার অবস্থা তাঁর চেয়েও খারাপ করে তুললেন। শেষে আর সইতে না পেরে ১৮২৫ সনে একদল তরুণ সেনানী আর বুদ্ধিজীবী মিলে বিদ্রোহ করলেন। এ'রা সকলেই ভূস্বামীশ্রেণীর লোক; প্রজাসাধারণ বা সেনাদলকে এ'রা দলে টানতে পারেন নি; এ'দের বিদ্রোহও সফল হল না। ১৮২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে এ'রা বিদ্রোহ করেছিলেন, তাই এ'দের নাম হল ডিসেম্বরিস্ট বা ডিসেম্বরী দল। রাশিয়াতে রাজনৈতিক জাগরণ শুরু হয়েছে, এই বিদ্রোহটাই হল তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। এর আগে দেশে শুধু রাজনৈতিক গুপ্ত-দলই তৈরি হত; কারণ জারের শাসনে কোনোরকম প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনই চলবার উপায় ছিল না। এই গুপ্তদলগুলি তখনও টি'কে রইল; বিপ্লবী মতামত দেশে বিস্তার লাভ করতে লাগল; বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে হেরে যাবার পর রাশিয়াতে কিছু কিছু সংস্কারের প্রবর্তন করা হল। ১৮৬১ সনে ভূমিদাস-প্রথা তুলে দেওয়া হল। কৃষকদের পক্ষে এটা একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা। তবু

কিন্তু এতে তাদের দুঃখকষ্টের খুব বেশি লাঘব হল না, কারণ তাদের সকলে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে এত-পরিমাণ জমি এই মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের দেওয়া হল না। ইতিমধ্যে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীদের মধ্যে বৈপ্লবিক মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উপরে জারের পীড়নও চলতে লাগল। এইসব প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীদের কৃষকদের সঙ্গে কোনোরকম যোগ বা মৈত্রী ছিল না। তাই ১৮৭০ সনের পরে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী (এদের সকলেরই ধারণা এবং মতামত খুব অস্পষ্ট এবং আদর্শনৈতিক ছিল) ছাত্ররা স্থির করল, তারা কৃষকদের মধ্যে তাদের প্রচারকার্য চালাবে। হাজার হাজার ছাত্র গ্রামে গিয়ে হাজির হল। চাষিরা এদের চিনত না। এদের বিশ্বাসও করল না তারা, ভাবল এটা হয়তো ভূমিদাস-প্রথাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করবার কোনোরকম একটা চক্রান্ত। ছাত্ররা নিজের জীবন বিপন্ন করে চাষিদের কাছে এসেছিল; সন্দিগ্ধ চাষিরা তাদের অনেককে বস্তুত নিজেরাই গ্রেপ্তার করল, করে জারের পুলিশের হাতে সমর্পণ করল! জনসাধারণের সঙ্গে যোগ না রেখে শুধু হাওয়ায় ভর করে কাজ করতে গেলে তার কী দশা হয়, এটা তার একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

চাষিদের মধ্যে কাজ করবার চেষ্টা এইভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের মনে এতে দারুণ আঘাত লাগল; বিরক্তি এবং হতাশার বশে তারা তথাকথিত 'বিভীষিকাবাদ' শুরু করল; অর্থাৎ, বোমা ফেলে এবং অন্যান্য উপায়ে বড়ো বড়ো কর্তাব্যক্তিদের হত্যা করতে লাগল। রাশিয়াতে বিভীষিকাবাদ আর বোমার সেই প্রথম আবির্ভাব। এর সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক কার্যকলাপেরও একটা নূতন যুগ শুরু হল। এই বোমা-ওয়ালারা নিজেদের বলত 'বোমা-বাহী উদারপন্থী'; এদের বিভীষিকাবাদী দলের নাম এরা দিল 'প্রজাদের ইচ্ছা'। নামটাতে কিছু বাড়াবাড়ি ছিল, কারণ যে প্রজাদের নিয়ে এই দল, তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

এমনি করে শুরু হল লড়াই: এক দিকে এইসব দৃঢ়সংকল্প তরুণ আর তরুণীদের দল, আর-এক দিকে জারের শাসনযন্ত্র। রাশিয়াতে বহু অধীন জাতি এবং সংখ্যালঘু জাতির বাস, তাদের মধ্যে অনেকে এসে এই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিল। এইসব জাতি এবং সংখ্যালঘু দল, এদের সকলের প্রতিই রুশ-সরকার অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। এদের নিজেদের ভাষা প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করবার পর্যন্ত অধিকার ছিল না। আরও বহু উপায়ে এদের উৎপীড়ন এবং অপমান করা হত। শিল্পবাণিজ্যের দিক থেকে পোল্যান্ড ছিল রাশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত দেশ; অথচ পোল্যান্ডকে রাশিয়ার মাত্র একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়েছিল। পোল্যান্ড নামটা পর্যন্ত বস্তুত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। পোল-ভাষাটার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পোল্যান্ডেরই এই অবস্থা; অন্যান্য সংখ্যালঘু দল এবং অধীন জাতিদের প্রতি যে ব্যবহার করা হত সে আরও অনেক খারাপ। ১৮৬০ সনের পর পোল্যান্ডে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ হল। সে বিদ্রোহ একেবারে চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে দমন করা হল; পঞ্চাশ হাজার পোলকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হল। ইহুদিদের উপরে তো সারাক্ষণই 'প্রোগ্রোম' বা হত্যাকাণ্ড চালানো হত; অনেক ইহুদি রাশিয়া ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল।

জার তাদের সমস্ত জাতির উপরেই যে অত্যাচার করছিলেন তার ফলে এই ইহুদিরা এবং অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; এরা রাশিয়ার বিভীষিকাপন্থীদের দলে যোগ দেবে তাতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। এই বিভীষিকাবাদের নাম হল নিহিলিজ্‌ম্। এর দল ক্রমেই বাড়তে লাগল; জারও একে দমন করবার জন্যে একেবারে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেন। অসংখ্য রাজনৈতিক বন্দী সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হল; বহু লোক জল্লাদের হাতে প্রাণ দিল। এদের জব্দ করবার জন্যে জারের সরকার একটি নূতন পন্থা উদ্ভাবন করল, এবং তার বহুল প্রয়োগ করতে লাগল। সরকারের বহু কর্মচারী 'উত্তেজক-চর' হয়ে এই বিভীষিকাপন্থী আর বিপ্লবীদের দলে গিয়ে ঢুকল। এরা লোককে উত্তেজিত করে বোমা ফেলার ব্যবস্থা করত, অনেক সময় নিজেরাই বোমা ফেলত, তার পর সেই অপরাধে অন্যদের ধরিয়ে দিত। এই উত্তেজক-চরদের মধ্যে একজন অতি প্রসিদ্ধ লোকের নাম হচ্ছে আজেফ্; বোমাওয়ালা বিপ্লবীদের মধ্যে সে ছিল একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ও দিকে আবার রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশেরও সে ছিল একজন কর্তাব্যক্তি! এই রকমের আরও বহু দৃষ্টান্ত প্রমাণিত

হয়েছে; যেখানে জারের গুপ্ত-পুলিশের অন্তর্গত সেনাপতিরা পুলিশের চর হিসাবে নিজেরাই বোমা ফেলেছে, যেন অন্যদের সেই মামলায় জড়িয়ে দিতে পারে।

এক দিকে যখন এইসব ব্যাপার ঘটছে, ঠিক তখনই কিন্তু পূব দিকে রাশিয়ার রাজ্য ক্রমাগতই বিস্তৃত হয়ে চলছিল; শেষ পর্যন্ত সে রাজ্য একেবারে প্রশান্তমহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে পেঁাছল। মধ্য-এশিয়াতে রাশিয়া আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল; দক্ষিণেও সে ক্রমাগতই তুরস্কের সীমান্ত ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৬০ সনের পর থেকে আর-একটি বৃহৎ ব্যাপার ঘটল, সে হচ্ছে পাশ্চাত্য ধরনের শিল্পব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা। এই ব্যাপারটা কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল অতি অল্প খানিকটা জায়গার মধ্যেই, যেমন পিটার্স্‌বার্গের আশপাশের অঞ্চল, মস্কো, ইত্যাদি। দেশ হিসাবে রাশিয়া তখনও পুরোপুরি কৃষিধর্মীই হয়ে রইল। কিন্তু যে কারখানাগুলো দেশে গড়ে উঠল তারা সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত; সাধারণত এগুলো চালাত ইংরেজরা। এর ফল হল দুটি। এই-যে অল্প দু-চারটে জায়গাতে শিল্পপ্রচেষ্টা গড়ে উঠল, এখানে রাশিয়ার ধনিক-তন্ত্র খুব দ্রুত বেড়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্রমিকশ্রেণীও সমান দ্রুত গতিতেই বেড়ে উঠল। ব্রিটেনে কারখানা-প্রবর্তনের প্রথম যুগে যেমন হয়েছিল, রাশিয়াতেও তেমনি শ্রমিকদের একেবারে ভয়ানক ভাবে শোষণ করা হতে লাগল, দিন-রাতের মধ্যে প্রায় সারাক্ষণই তাদের খাটতে হত। কিন্তু তবু দুই দেশের মধ্যে একটি তফাত ছিল। জগতে ইতিমধ্যে নূতন নূতন মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে, এসেছে সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ ইত্যাদি। রাশিয়ার শ্রমিকদের মনে নূতন উৎসাহ, এইসব মতবাদকে তারা সহজেই গ্রহণ করতে পারল। ব্রিটিশ শ্রমিকরা ছিল দীর্ঘদিনের প্রাচীন প্রথা আর আচারে অভ্যস্ত; তার ফলে তারা রক্ষণপন্থী হয়ে পড়েছিল, পুরোনো কালের মতামতকে ছেড়ে আসা তাদের পক্ষে ততটা সহজ হয় নি।

রাশিয়াতে এই নূতন মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠা এবং আকার লাভ করতে লাগল; একটি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার-পার্টি তৈরি হল। এর অবলম্বন ছিল মার্ক্‌সের মতবাদ। এই মার্ক্‌বাদীরা নিজেদের বিভীষিকাপন্থী কার্যকলাপের বিরোধী বলে ঘোষণা করল। মার্ক্‌স্‌ বলে গেছেন, শ্রমিকশ্রেণীকেই সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে হবে; জনসাধারণের সেই সংগ্রাম যতদিন না শুরু হচ্ছে ততদিন তাদের সাফল্য লাভের আশা নেই। বিভীষিকাপন্থীরা যা করছে, সেভাবে বেছে বেছে কতকগুলো মানুষকে খুন করলেও তাতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সে সংগ্রামের চেতনা আসবে না; কারণ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে জারের শাসনেরই অবসান করা, শুধু জার বা তাঁর মন্ত্রীদের হত্যা করা নয়।

১৮৮০ সনে একটি তরুণ যুবক এই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। ইনি পরে সমস্ত পৃথিবীতে 'লেনিন' নামে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৮৭ সনে তাঁকে একটা প্রচণ্ড আঘাত সইতে হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। লেনিনের দাদা ছিলেন আলেকজাণ্ডার, লেনিন তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জারকে হত্যার চেষ্টা করবার অভিযোগে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু এত বড়ো আঘাত পেয়েও সেই সময়েই লেনিন বলেছিলেন, বিভীষিকার পথে স্বাধীনতা আসবে না; তাকে লাভ করবার একমাত্র পথ হচ্ছে প্রজাসাধারণের সংগ্রাম। স্থির মনে দাঁতে দাঁত চেপে এই তরুণ কিশোর স্কুলের পড়াশোনা করতে লাগলেন, স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। ত্রিশ বছর পরে দেশে যে বিপ্লব এল তার নেতা এবং স্রষ্টাটি ছিলেন এই ধাতুতে গড়া!

মার্ক্‌সের ধারণা ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারাই বিপ্লব আসবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করে গেলেন, সে বিপ্লব শুরু হবে জর্মানির মতো কোনো খুব বেশি শিল্পাশ্রয়ী দেশে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় এবং সংঘশক্তিতে প্রবল। রাশিয়া সেকেলে দেশ, সেখানে এখনও মধ্য-যুগের অবস্থা বর্তমান, কাজেই সে বিপ্লব ঘটবার পক্ষে রাশিয়া মোটেই উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। এই ছিল তাঁর মত। কিন্তু সেই রাশিয়াতেই তাঁর অনেক অনুরক্ত শিষ্য জুটল; রাশিয়ার তরুণরা প্রাণপণ উৎসাহ নিয়ে তাঁর বাণী অধ্যয়ন করতে লাগল; যে অসহ্য দুর্দশার মধ্যে তাদের দিন কাটছে তার অবসান ঘটাবার জন্যে কী তাদের করবার আছে তার পথের নির্দেশ তাদের

পাওয়াই চাই। জারের শাসনে রাশিয়াতে কোনোরকম প্রকাশ্য আন্দোলন বা নিয়মানুগ চেষ্টা চালাবার পথ তাদের খোলা ছিল না; সেইজন্যই বাধ্য হয়ে তারা প্রাণ দিয়ে মার্ক্সের কথা পড়তে লাগল, নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। দলে দলে লোক জেলে গেল, সাইবেরিয়াতে গেল, বিদেশে নির্বাসিত হল। কিন্তু যেখানেই গেল সেইখানেই তারা তাদের মার্ক্সবাদকে সঙ্গে নিয়ে গেল, এর অধ্যয়ন, এবং কাজের দিন যখন আসবে তার জন্যে প্রস্তুতি এদের সমানই চলতে লাগল।

১৪৪

রাশিয়ার ১৯০৫ সনের ব্যর্থ বিপ্লব

১৭ই মার্চ, ১৯৩৩

১৯০৩ সনে রাশিয়ার মার্ক্সবাদীদের—মানে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে একটি প্রকাণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হতে হল, একটি প্রশ্নের উত্তর স্থির করতে হল। কতকগুলো বিশেষ নীতি আর নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে যেসব দল গড়া হয়েছে তাদের সবাইকেই কোনো-না-কোনো সময়ে এই সমস্যাটির সমাধান করতে হয়েছে। বস্তুত, যে-কোনো পুরুষ বা নারী এই রকমের নীতি বা বিশ্বাস মেনে চলে যাবে তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এই রকমের সমস্যা বহুবার এসে উপস্থিত হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, তারা কি সম্পূর্ণ নিষ্ঠাভরে তাদের সেই নীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে বিপ্লব আনাবার জন্যেই প্রস্তুত হতে থাকবে, না বর্তমান অবস্থার সঙ্গেও একটা মিটমাট করে নিয়ে তারই মধ্য দিয়ে চরম বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে তুলবে? পশ্চিম-ইউরোপের সমস্ত দেশেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে; প্রত্যেক জায়গাতেই এর ফলে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল বা অনুরূপ দলগুলি অল্পবিস্তর দুর্বল হয়ে পড়ল, আভ্যন্তরীণ কলহ তাদের মধ্যে দেখা দিল। জর্মনিতে মার্ক্সবাদীরা বীরের মতো ঘোষণা করেছিল, বিপ্লবীর আদর্শই তাদের কাম্য, পূর্ণ সাফল্য না অর্জন করে তারা নিবৃত্ত হবে না। কার্যত কিন্তু তাদেরও সুর অনেক নামাতে হল, অনেকখানি নরমপন্থাই তারা স্বীকার করে নিল। ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দল ছেড়ে চলে গেলেন, ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হলেন। ইতালি বেলজিয়ম এবং অন্যান্য দেশেও তাই ঘটল। ব্রিটেনে মার্ক্সবাদের তেমন জোর ছিল না, এ সমস্যাও সেখানে ওঠে নি, কিন্তু সেখানেও একজন শ্রমিক প্রতিনিধি ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

রাশিয়ার অবস্থা অন্যরকম, কারণ সেখানে পার্লামেণ্টীয় কার্যকলাপের সুযোগ ছিল না। পার্লামেণ্টই ছিল না সেখানে। তা হলেও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার তথাকথিত বে-আইনি পন্থা ত্যাগ করা, এবং কিছুকালের মতো শান্তশিষ্ট রকমের মৌখিক আন্দোলন চালানো যেত। লেনিনের কিন্তু এ বিষয়ে মতামত ছিল একেবারেই স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। তাঁর কথা, কোনোরকম দুর্বলতা বা আপোস-মীমাংসার পথ তিনি খোলা রাখবেন না; কারণ তাঁর ভয় ছিল, সে পথ খোলা পেলেই সুযোগবাদীরা এসে তাঁর দলে ভিড় জমাবে। পশ্চিম-দেশের সমাজতন্ত্রবাদী দলগুলো যেসব পন্থায় কাজ চালাত তা তিনি দেখেছিলেন, দেখে তাঁর ভালো লাগে নি। পরে অন্য একটা বিষয় উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন : "পশ্চিম-দেশের সমাজতন্ত্রবাদীরা যেসব পার্লামেণ্টীয় রীতি অনুসরণ করে থাকেন তার ফল অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। কারণ তাতে প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রবাদী দলই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে এক-একটি ছোটো-খাটো টামানি-হলে, সেখানে সবাই নিজের পদবৃদ্ধি করে নিতে, নিজের চাকরী বাগিয়ে নিতে ব্যস্ত।" (টামানি-হল নিউইয়র্কের শাসনপরিষৎ। রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতির একটি পরম

দৃষ্টান্তস্থল)। তাঁর সঙ্গে লোক কজন রইল বা রইল না তা নিয়ে লেনিন ভ্রূক্ষেপ করতেন না; একবার তিনি সম্পূর্ণ একাই পথ চলবেন বলে পর্যন্ত শাসিয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল, দলে শুধু সেই লোকদেরই নেওয়া হবে যারা হবে 'সারাক্ষণের মানুষ'—যারা সংকল্পসিদ্ধির জন্যে তাদের যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, যারা জনসাধারণের কাছ থেকে কোনোরকম বাহবা পাওয়ারও প্রত্যাশা রাখবে না। তিনি এমন-একটি দক্ষ বিপ্লবীর দল গড়তে চাইলেন যারা আন্দোলনটাকে ঠিকমতো খাড়া করে তুলতে পারবে। মুখের সহানুভূতি দেখিয়ে যারা কাজ শেষ করবে বা সুদিনেই শুধু যাদের সাহায্য পাওয়া যাবে, সেসব লোককে দলে নিতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না।

বড়ো কঠিন পথ বেছে নিলেন লেনিন; অনেকেই মনে করলেন এটা তাঁর পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু লেনিনেরই জয় হল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ভেঙে দু ভাগ হয়ে গেল; দুটি ভাগ দুই নামে পরিচিত হল, এই নাম দুটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে—বলশেভিক আর মেনশেভিক। 'বলশেভিক' এই নাম শুনেই আজকাল অনেকে ভয় পেয়ে থাকেন। আসলে কিন্তু এর মানে হচ্ছে শুধু 'সংখ্যাগুরু দল'। মেনশেভিক মানে সংখ্যালঘু দল। ১৯০৩ সনে দলে এই ভাঙন এল; দলের মধ্যে লেনিনের ভাগটিই তখন সংখ্যায় বড়ো, তাই তার নাম হল বলশেভিক অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দল। এই সময়ে ট্রট্স্কির বয়স মাত্র ২৪ বছর। ১৯১৭ সনের বিপ্লবে ট্রট্স্কি ছিলেন লেনিনের বড়ো সহকর্মী। ১৯০৩ সনের এই ভাঙনের সময়ে কিন্তু ট্রট্স্কি ছিলেন মেনশেভিকদের পক্ষে।

এদের সমস্ত আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক কিন্তু ঘটছিল রাশিয়া থেকে বহুদূরে, লন্ডনে বসে! রাশিয়ার বিপ্লবীদের দলের সভা বসত লন্ডনে, কারণ জারশাসিত রাশিয়াতে তাদের জায়গা ছিল না; দলের সভ্যদেরও অনেকেই ছিলেন রাশিয়া থেকে নির্বাসিত বা সাইবেরিয়া থেকে পলাতক আসামী।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার মধ্যেও গোলমাল বেধে উঠছিল। সে গোলমালের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল রাজনৈতিক ধর্মঘটে। শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘট মানে হচ্ছে, তারা বেশি বেতন প্রভৃতি কোনোরকম অর্থনৈতিক সুবিধা চেয়ে ধর্মঘট করছে না, করছে সরকারের কোনো-একটা রাজনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। তার মানেই হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠেছে। যেমন, গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে, বা কোনোরকম একটা বিশেষ উৎপীড়ন করা হয়েছে ব'লে যদি ভারতবর্ষের কারখানার মজুররা ধর্মঘট করে, সেটা হবে রাজনৈতিক ধর্মঘট। আশ্চর্যের বিষয়, পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নরা প্রচণ্ড শক্তিশালী, শ্রমিক-সংগঠনেরও জোর অনেক, অথচ সেখানে রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রায় হয়ই নি। হয় নি কেন, হয়তো-বা তার কারণ, সেখানে শ্রমিক-নেতারা নিজেদেরই স্বার্থের খাতিরে সুর নরম করে ফেলেছিলেন। রাশিয়াতে কিন্তু জার ক্রমাগতই প্রজার উপরে উৎপীড়ন চালাচ্ছিলেন, সুতরাং সমস্ত ব্যাপারে রাজনৈতিক সমস্যাটাই সকলের উপরে বড়ো হয়ে উঠছিল। সেই ১৯০৩ সনেই দক্ষিণ-রাশিয়ার বহু স্থানে লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অনেকগুলি রাজনৈতিক ধর্মঘট করেছিল। এই আন্দোলন চলেছিলও একেবারে বহু প্রজার মধ্যে, ব্যাপকভাবে। কিন্তু ভালো নেতার অভাবেই এটা ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল।

এর পরের বছর দূরপ্রাচ্যে হাঙ্গামা বাধল। উত্তর-এশিয়ার স্তেপ-অঞ্চল ভেদ করে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অতি দীর্ঘ সাইবেরিয়ান রেলপথ তৈরি করা হল; ১৮৯৪ সনের পর থেকে জাপানের সঙ্গে কলহ শুরু হল; ১৯০৪-৫ সনে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ হল—এ-সব গল্প আগের চিঠিতে বলেছি। 'রক্তাপ্লুত রবিবার'-এর কথাও বলেছি—১৯০৫ সনের ২২শে জানুয়ারী, যেদিন জারের সৈন্যরা প্রজাদের একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপরে নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালিয়েছিল; তাদের অপরাধ, তারা 'স্নেহময় পিতা'র কাছে খাদ্য ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, তাদের নেতা ছিলেন একজন পাদ্রি। এই হত্যাকাণ্ডে সমস্ত দেশসুদ্ধ লোক আতঙ্কে

পিউরে উঠল; বহু স্থানে রাজনৈতিক ধর্মঘট হল। শেষ-পর্যন্ত সমগ্র রাশিয়া জুড়েই একটা ধর্মঘট হল। মার্ক্‌সের বর্ণিত নূতন যুগের বিপ্লব শুরু হয়ে গেল!

এই-যে শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, বিশেষ করে পিটার্স্‌বার্গ্‌ মস্কো প্রভৃতি বড়ো বড়ো কেন্দ্রে যারা ছিল, তারা মিলে এর প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করে নূতন সংগঠন তৈরি করল; এদের নাম হল 'সোভিয়েট'। প্রথম দিকে এই সোভিয়েট ছিল শুধু সাধারণ ধর্মঘটটাকে চালাবার জন্যে গড়া একটা সমিতি। পিটার্স্‌বার্গের সোভিয়েটটির নেতা হলেন ট্রট্‌স্কি। ধর্মঘটের ধাক্কায় জারের সরকার প্রথমটায় একেবারেই হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল; কিছু-পরিমাণ নতি স্বীকারও করল— একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভা তৈরি করা হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাকে ভোটের অধিকার দেওয়া হবে, ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিও দিল। দেখে মনে হল, স্বৈরতন্ত্রের অচলায়তন এতদিনে বুঝি ধ্বসল-বা। অতীত কালের কৃষক-বিদ্রোহ যা করতে পারেনি, বিভীষিকাপন্থীরা বোমা ছুড়ে যা করতে পারে নি, নরমপন্থী উদারনৈতিক নিয়মনিষ্ঠরা তাদের গা-বাঁচানো আবেদন নিবেদন দিয়েও যা করতে পারে নি, তাই সম্পন্ন করল শ্রমিকরা, তাদের সাধারণ ধর্মঘটের ধাক্কায়! জারতন্ত্রের ইতিহাসে সেই প্রথমবার জার সাধারণ প্রজার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। পরে অবশ্য দেখা গেল, প্রজার সে জয় একেবারেই শূন্যগর্ভ। কিন্তু তবুও তার কথা স্মরণ করেই শ্রমিকরা অন্ধকার পথে আলোর সন্ধান পেয়ে গেল।

জার প্রতিশ্রুতি দিলেন, একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভা তৈরি করে দেবেন। এর নাম হল ডুমা। ডুমা কথাটার মানে হচ্ছে চিন্তা করবার স্থান; 'পার্লামেণ্ট' (ফরাসি পার্‌লের্‌' থেকে) কথাটার মানে 'কথা বলবার আড্ডা'—তার চেয়ে ডুমা নামটা ভালো! এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই নরমপন্থী উদারনৈতিকরা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন, তাঁরা এইতেই মহা সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট হওয়াই অবশ্য তাঁদের অভ্যাস! বিপ্লব দেখে ভূস্বামীরা ভয় পেয়েছিলেন, তাঁরা কিছুটা সংস্কারসাধন করতে রাজি হলেন; তাতে উপকার হল অবস্থাপন্ন কৃষকদের। তার পর জারের সরকার সত্যকার বিপ্লবীদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাদের দুর্বলতা কোথায় সে কথা তখন তার জানা হয়ে গেছে, সেই দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে নিল। এক দিকে ছিল বুভুক্ষু শ্রমিকদের দল, রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রের চেয়ে তাদের কাছে বেশি জরুরি জিনিস হচ্ছে রুটি আর বেশি মাইনের সংস্থান; আর ছিল আরও দরিদ্র কৃষকরা, তারা একটা মারাত্মক রব তুলেছে, 'জমি দাও'। অন্য দিকে ছিল বিপ্লববাদীরা, তারা প্রধানত মাথা ঘামাচ্ছে এর রাজনৈতিক দিক নিয়ে; পশ্চিম-ইউরোপের ধরনে তাদেরও একটা পার্লামেণ্ট হবে এই তাদের মনের আশা; প্রজাসাধারণের সত্যকার প্রয়োজন বা কামনা কী, তা নিয়ে তারা তেমন ভাবছে না। একটু উচ্চশ্রেণীর ওস্তাদ শ্রমিক, যারা ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির মধ্যে ছিল, তাদেরও অনেকে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, কারণ তারা তার রাজনৈতিক দিকটার মূল্য বুঝত। কিন্তু শহরের বা গ্রামের সাধারণ লোকরা সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বুঝত না। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃপক্ষ চিরকাল যে পন্থা অবলম্বন করে এসেছে, দেখেশুনে জারের সরকার এবং পুলিশবাহিনীও সেই পন্থাই গ্রহণ করল। এদের মধ্যে তারা দলাদলি সৃষ্টি করে দিল, বুভুক্ষু জনসাধারণকে বিপ্লবী দলগুলোর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে লাগল। ইহুদিরা নিরীহ জাত, রাশিয়ানরা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল; তাতাররা বধ করতে লাগল আর্মানিদের; বিপ্লবী ছাত্রদল আর অধিকতর দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে পর্যন্ত লড়াই শুরু হল। এমনি করে দেশের বহু স্থানে বিপ্লবের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে, তার পর সরকার আক্রমণ চালাল বিপ্লবের বড়ো কেন্দ্রদুটি—পিটার্স্‌বার্গ আর মস্কোর উপরে। পিটার্স্‌বার্গের সোভিয়েট সহজেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মস্কোতে সৈন্যরা বিপ্লবীদের সাহায্য করছিল, সেখানে পাঁচদিন ধরে যুদ্ধ করে তবে সোভিয়েট পুরোপুরি পরাস্ত হল। তার পর এল প্রতিশোধ নেবার পালা। শোনা যায়, মস্কোতে সরকার এক হাজার লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, এদের কোনোরকম বিচার পর্যন্ত করা হয় নি। আর জেলে পাঠিয়েছিলেন সত্তর হাজার লোককে। এইসমস্ত বিদ্রোহের ফলে সমস্ত দেশে মোট চৌদ্দ হাজারের মতো লোক মারা গিয়েছিল।

এমনি করে পরাজয় এবং বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ১৯০৫ সনের রুশ-বিপ্লবের অবসান হল। এটাকে বলা হয় ১৯১৭ সনের বিপ্লবের ভূমিকা; সে বিপ্লব সফল হয়েছিল। "বড়ো বড়ো ঘটনার মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়", তবেই তাদের চেতনা জেগে ওঠে, তারা বড়ো-রকমের কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে তুলতে পারে। ১৯০৫ সনের ব্যাপারে তাদের এই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সে শিক্ষার ব্যয় পড়ল নিদারুণ।

ডুমা নির্বাচন করা হল, ১৯০৬ সনের মে মাসে তার অধিবেশন হল। বিপ্লবিষ্কের নামগন্ধও তার-মধ্যে ছিল না; তবু যেটুকু উদার পন্থা তার মধ্যে ছিল সেটুকুও জার বরদাস্ত করতে পারলেন না; আড়াই মাস পরে তিনি ডুমা ভেঙে দিলেন। বিপ্লব দমন করা হয়ে গেছে, এখন ডুমা তার উপরে চটল কি না তা নিয়ে তাঁর মোটেই দুর্ভাবনা ছিল না। ডুমাতে যে প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন তাঁরা পদচ্যুত হলেন, এ'রা ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক, উদারপন্থী এবং নিয়মতন্ত্রী। এ'রা গিয়ে ফিন্‌ল্যান্ডে আশ্রয় নিলেন (ফিন্‌ল্যান্ড পিটার্সবার্গের খুবই কাছে, এবং তখন সেটা ছিল জারের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটা অর্ধ-স্বাধীন দেশ)। সেখান থেকে তাঁরা রাশিয়ার প্রজার প্রতি আবেদন পাঠালেন—ডুমাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এর প্রতিবাদস্বরূপ তোমরা কর দেওয়া বন্ধ করো, সেনা-দলে বা নৌবাহিনীতে তোমাদের ভর্তি করতে চাইলেই বাধা দিয়ো। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এই প্রতিনিধিদের কোনো যোগ ছিল না, সুতরাং এ'দের এই আবেদনেও কেউই সাড়া দিল না।

এর পরের বছর, ১৯০৭ সনে, আবার একটা ডুমা নির্বাচন করা হল, প্রগতিবাদীরা যাতে এর সভ্যপদে নির্বাচিত হতে না পেরে, পুলিশ সেই চেষ্টা করতে লাগল; যত রকমে পারে বাধা সৃষ্টি করল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি সহজ উপায়টিই অবলম্বন করল, তাদের গ্রেফ্‌তার করে জেলে পুরে রাখল। কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও যে ডুমা তৈরি হল তাকেও জার ঠিক পছন্দ করতে পারলেন না, তিন মাস পরে তাকেও ভেঙে দিলেন। এবার জারের সরকার নির্বাচনের আইনটাকেই বদলে দিলেন, যেন কোনো অবাঞ্ছিত লোকই আর নির্বাচিত হতে না পারে। এবার তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তৃতীয় ডুমার সভ্যরা হলেন সকলেই খুব সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণপন্থী ব্যক্তি; অতএব সে ডুমাও দীর্ঘকাল বেঁচে রইল।

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ, এতসব কাণ্ড করবার কী দরকার ছিল; ১৯০৫ সনে বিপ্লব দমন করা হয়ে গেল, এবার তো জার নিজের ইচ্ছামতোই দেশ শাসন করবার মতো শক্তি অর্জন করেছেন; তবে আর এসব শক্তিহীন ডুমা তৈরি না করলেই বা কী। জার ডুমা তৈরি করছিলেন তার কারণ, এই দিয়ে তিনি রাশিয়ার মধ্যে গোটাকতক ছোটো সম্প্রদায়কে প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করছিলেন, এরা হচ্ছে প্রধানত ধনী ভূস্বামী আর বণিক। দেশের অবস্থা তখন ভালো নয়। প্রজাদের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে বটে, কিন্তু মনে মনে তারা গুম্ হয়ে রয়েছে। কাজেই জার ভাবলেন, অন্তত দেশের উপর-তলার লোকদের হাত করে রাখা ভালো। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি কারণ একটা ছিল, জার একজন উদারপন্থী রাজা, এই কথাটা ইউরোপের দেশ-গুলোকে বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া দরকার। জারের কুশাসন আর অত্যাচারের কথা তখন পশ্চিম-ইউরোপের সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথম ডুমা যখন তিনি ভেঙে দিলেন, সেই সংবাদ পেয়ে বোধ হয় হাউজ অব কমন্‌সেরই সভায়, ব্রিটিশ উদারপন্থী দলের একজন নেতা চীৎকার করে উঠেছিলেন, "ডুমার মৃত্যু হয়েছে, ডুমা দীর্ঘজীবী হোক।" এই থেকেই বোঝা যায়, ডুমার প্রতি লোকের কতখানি সহানুভূতি ছিল। তার পর আবার, জারের তখন টাকা দরকার, প্রচুর-পরিমাণ টাকা। ফরাসিরা সঞ্চয়ী জাত, তারা জারকে টাকা ধার দিচ্ছিল; বস্তুত ফ্রান্সের কাছে টাকা ধার নিয়ে তার দ্বারাই জার ১৯০৫ সনের বিপ্লব দমন করেছিলেন। বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার এটা—রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী রাজা রাশিয়ার প্রগতিবাদী আর বিপ্লববাদীদের বিচূর্ণ করছেন, আর তাঁকে সাহায্য যোগাচ্ছে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স! কিন্তু প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স বলতেও তো আসলে বোঝায় ফ্রান্সের ব্যাঙ্কারদের। যাই হোক, তবু বাইরের চেহারাটা একটু বজায় রেখে চলতে হয়; ডুমা থাকলে সে কাজটার সুবিধা।

ইতিমধ্যে ইউরোপের এবং পৃথিবীর অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ইংলণ্ড রাশিয়াকে

অত্যন্ত ভয় করত; জাপানের হাতে রাশিয়া পরাজিত হবার পর তার সে ভয় অনেক কমে গেল, ইংলন্ডের তখন একটা নূতন ভয়ের কারণ ঘটেছে জর্মানি। ব্যবসাবাণিজ্যে এবং নৌবলে জর্মানি প্রবল হয়ে উঠেছে; এতদিন সেখানে ইংলন্ডেরই একাধিপত্য ছিল। এই জর্মানির ভয়েই ফ্রান্সও অত মুক্তহস্তে রাশিয়াকে টাকা ধার দিচ্ছিল, এর নাম দেওয়া হল জর্মন-আতঙ্ক; এই আতঙ্কের ঠেলায় পড়ে চিরকালের শত্রু এই দুটি দেশ পরস্পরের মিত্র হয়ে উঠল। ১৯০৭ সনে ইংলন্ড আর রাশিয়ার মধ্যে একটা সন্ধি নিষ্পন্ন হল; তাতে তাদের মধ্যে আফগানিস্থানে, পারশ্যে এবং অন্যত্র যত-কিছু ব্যাপার নিয়ে বিরোধ ছিল সমস্তগুলোরই মীমাংসা হয়ে গেল। এর পরে হল ইংলন্ড ফ্রান্স আর রাশিয়ার মধ্যে একটা ত্রিশক্তি-মৈত্রী। বল্‌কান-অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ছিল রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী; অস্ট্রিয়া আবার জর্মানির বন্ধু; কাগজে কলমে ইতালিও ছিল তাই। কাজেই ইংলন্ড ফ্রান্স আর রাশিয়ার ত্রিশক্তি-মৈত্রীর বিপক্ষে এসে দাঁড়াল জর্মানি অস্ট্রিয়া আর ইতালির ত্রিশক্তি-মৈত্রী। দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, এ দিকে সকল দেশেরই নিরীহ প্রজারা নিরুদ্‌বেগে ঘুমিয়ে রইল, জানলও না কী ভয়ানক বিপদ তাদের ঘনিয়ে আসছে।

রাশিয়াতে ১৯০৫ সনের পরবর্তী এই ক'টা বছর ছিল প্রতিক্রিয়ার যুগ। বলশেভিক এবং অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলো একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। নির্বাসিত বলশেভিকদের মধ্যে লেনিন প্রভৃতি অনেকে অন্যান্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন; সেখানে বসে তাঁরা তখনও ধৈর্য-সহকারে কাজ চালাতে লাগলেন, বই এবং পুস্তিকা রচনা করে, মার্ক্‌সের মতবাদকে তখনকার অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। মেনশেভিকদের (মার্ক্‌স্‌বাদীদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর নরমপন্থী এবং সংখ্যালঘু দল) সঙ্গে বলশেভিকদের তফাত ক্রমেই বেড়ে চলল, এই প্রতিক্রিয়ার যুগে মেনশেভিকদেরই প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। নামে সংখ্যালঘু দল হলেও, এই সময়ে বস্তুত এদের দলেই লোক ছিল অনেক বেশি। ১৯১২ সনের পর থেকে আবার রাশিয়াতে অবস্থার পরিবর্তন হল; বিপ্লবীদের প্রতিপত্তি বাড়ল, বলশেভিকরাও আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। ১৯১৪ সনের মাঝামাঝি এসে পেট্রোগ্রাডের হাওয়ায় বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল; ১৯০৫ সনের মতো এবারেও বহু স্থানে রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হল। পিটার্স্‌বার্গের বলশেভিক কমিটিতে মোট সাতজন সভ্য, পরে দেখা গেল তার মধ্যে তিনজনই ছিল জারের গুপ্ত-পুলিশের লোক। অথচ তখন এদের নিয়েই বিপ্লবের আয়োজন করতে হয়। ডুমাতে বলশেভিকদের একটা ছোটো দল ঢুকে পড়েছিল, তাদের নেতা ছিলেন মেলিনোস্কি। দেখা গেল তিনিও পুলিশের লোক। লেনিন নিজেও তাঁকে বিশ্বাস করতেন।

১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। দেশের লোকের সমস্ত মনোযোগ হঠাৎ ঘুরে গিয়ে পড়ল সীমান্তে রণক্ষেত্রের দিকে। বিপ্লবের প্রধান কর্মীরা সেই হিড়িকে পড়ে উধাও হয়ে গেলেন, বিপ্লব-আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন যে দু-চারজন বলশেভিক তাঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প; দেশের লোকও তাঁদের উপরে অত্যন্ত বিরক্তই হয়ে উঠল।

আমাদের কথা ছিল, বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত এসে থামব। সেখানে পৌঁছে গেলাম, এবার আমাদের থামতে হবে। কিন্তু এই চিঠিটা শেষ করবার আগে আমি রাশিয়ার শিল্পকলা এবং সাহিত্যের সম্বন্ধে দু-একটা কথা তোমাকে বলে নেব। জার-শাসিত রাশিয়ার অনেক দোষ ছিল, তবু সবাই জানে সেই আমলেই রাশিয়াতে অপূর্বসুন্দর একটা নৃত্যকলার চর্চা বেঁচে ছিল। এই শাসনের আমলেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়াতে পর পর অনেকজন খুব বড়ো লেখকও জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা একটা বিরাট কাণ্ড ঘটিয়ে গেছেন। বৃহৎ উপন্যাস এবং ছোটো গল্প, দুয়েতেই এঁরা অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বায়্‌রন শেলি কীট্‌সের সময়ে রাশিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন পুশকিন, লোকে বলে রাশিয়ার কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন গোগল, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভ্‌স্কি এবং চেখভ্‌। আর ছিলেন লিও টল্‌স্টয়, বোধ হয় এঁদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কেবল উপন্যাস লেখবার অসামান্য

প্রতিভাই ছিল না তাঁর, ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রেরও একজন বড়ো উপদেষ্টা হয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রভাব বহু দূরে দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ-আফ্রিকায়, টল্‌স্টয়ের বাণী তাঁরও কাছে গিয়ে পৌঁছল। এঁরা দুজন পরস্পরের মূল্য বুঝলেন, এঁদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিলও প্রচুর ছিল। এঁদের মধ্যে নিবিড় মৈত্রী স্থাপিত হল, তার কারণ, দুজনেরই অপ্রতিরোধ বা অহিংসাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। টলস্টয় বলতেন, এই অহিংসাই হচ্ছে খ্রিস্টের মূল উপদেশ; গান্ধীজিও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র থেকে এই উপদেশই খুঁজে পেয়েছিলেন। তফাতের মধ্যে, টলস্টয় হয়ে রইলেন শুধু সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তাঁর বিশ্বাস ও মতকে তিনি নিজের জীবনে পালন করে গেলেন, কিন্তু বাস্তব জগৎ থেকে কিছুটা দূরেই সরে রইলেন। আর গান্ধীজি এই আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক নীতিটাকে বাস্তব কাজেই লাগালেন, দক্ষিণ-আফ্রিকাতে ও ভারতবর্ষে জনসাধারণের সমস্যা-সমাধানের কাজে একে প্রয়োগ করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখক যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন আজও বেঁচে রয়েছেন। ইনি ম্যাক্‌সিম গোর্কি*।

১৪৫

একটি যুগের অবসান

২২শে মার্চ, ১৯৩৩

উনবিংশ শতাব্দী! এই এক শো বছরের কাহিনী নিয়ে কী দীর্ঘ কালই আমরা কাটালাম! পুরো চারটি মাস ধরে আমি তোমাকে এই সময়ের ইতিবৃত্ত লিখেছি। এর কথা বলতে বলতে আমি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই চিঠিগুলো পড়তে পড়তে হয়তো তোমারও ক্লান্তি লাগবে। তোমাকে এই বলে আরম্ভ করেছিলাম যে, এই কাহিনী শুনতে ভারি চমৎকার; কিন্তু কাহিনীর চমৎকারিত্বও কিছুদিন পরে কমে আসে। বস্তুত আমরা উনবিংশ শতাব্দী ছেড়ে আরও এগিয়ে গেছি, বিংশ শতাব্দীর মধ্যেও অনেক দূর চলে এসেছি। আমরা কাহিনীর সীমা স্থির করেছিলাম ১৯১৪ সন। এই বছরই যুদ্ধের হিংস্র দানব ছাড়া পেয়ে গেল, ইউরোপে এবং পৃথিবীময় ভীষণ সংহারলীলা শুরু করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই বছরটা প্রকাণ্ড একটা সন্ধিক্ষণ। এই বছরেই একটি যুগের অবসান হয়েছে, নূতন একটি যুগ আরম্ভ হয়েছে।

উনিশ শো চোদ্দ সন! সে বছরটাও তোমার জন্মাবার আগে, অথচ সে আজ থেকে মাত্র উনিশ বছর আগের কথা। ইতিহাসে তো নয়ই, মানুষের জীবনেও এমন কিছু দীর্ঘ সময় সেটা নয়। তবু এই ক' বছরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীতে অতি বিরাট পরিবর্তন এসেছে, আজও সে পরিবর্তন ঘটে চলেছে; দেখে মনে হয়, যেন সেই বছরটির পরে এরই মধ্যে একটা আস্ত যুগই পার হয়ে এলাম আমরা। ১৯১৪ সন আর তার আগের বছরগুলো চলে গেছে একেবারে অতীত ইতিহাসের মধ্যে; সে যেন অতি প্রাচীন কালের কথা, তার কাহিনী আমরা শুধু ইতিহাসের বইয়েই পড়ে থাকি। আমাদের কাল আর সে কালের মধ্যে প্রকাণ্ড তফাত। এই-যে বড়ো বড়ো পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, এদের কথা আমি তোমাকে পরে খানিকটা বলব। একটি বিষয়ে কিন্তু তোমাকে আমি এখনই সতর্ক করে রাখছি। স্কুলে তুমি ভূগোল পড়। কিন্তু যে ভূগোল তুমি এখন পড়ছ, আর ১৯১৪ সনের আগে আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন যে ভূগোল আমাকে পড়তে হয়েছে, তাদের মধ্যে তফাত অনেক। যে ভূগোল তখন শিখেছিলাম তার অনেকখানিই আমাকে পরে আবার ভুলে যেতে হয়েছে। তুমি আজকে যে ভূগোল মুখস্থ করছ, অল্পদিন পরেই হয়তো তোমাকেও তা ভুলে গিয়ে নূতন করে শিখতে হবে। যুদ্ধের ধাক্কায় ইতিহাসের কত পুরোনো স্তম্ভ কত দেশ অন্তর্হিত হয়ে গেল, কত নূতন নূতন

* গোর্কি ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে মারা যান।

অনেক আর দেশ সৃষ্টি হল, এদের এই নূতন নামগুলো মনে করে রাখাও এক কঠিন ব্যাপার। কত শত শত শহরের নাম একেবারে রাতারাতি বদলে গেল; সেণ্ট পিটার্সবার্গ হল পেট্রোগ্রাড, তার পরে আবার হল লেনিনগ্রাড; কনস্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌কে এখন বলতে হবে ইস্তাম্বুল; পিকিঙের নাম হয়েছে পিপিঙ; বোহেমিয়ার শহর প্রাগ এখন হয়ে গেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার শহর প্রাহা!

উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে যে চিঠিগুলো লিখেছি তাতে আমি বাধ্য হয়েই প্রত্যেক মহাদেশ এবং দেশের কথা আলাদা করে লিখেছি; বিভিন্ন ব্যাপার এবং আন্দোলনের কথাও আলাদা করেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এটা অবশ্যই জানো, এর সমস্ত প্রায় ঘটেছিল মোটামুটি একই সঙ্গে; ইতিহাস তার সহস্র চরণে ভর করে একই সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র পা ফেলে হেঁটে গিয়েছে। বিজ্ঞান এবং শিল্প, রাজনীতি এবং অর্থনীতি, প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্য, ধনিকতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদ, ডারউইন এবং মার্ক্‌স্‌, স্বাধীনতা এবং বন্ধন, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, সংগ্রাম এবং শান্তি, সভ্যতা এবং বর্বরতা—এই বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে সকলেরই স্থান আছে। কাজেই, এই যুগের বা অন্য যে-কোনো যুগের একটি সমগ্র চিত্র মনে এঁকে নিতে যদি চাই, সে চিত্র অগত্যাই রচিত হবে বহু বস্তুর সমন্বয়ে; তার মধ্যে ক্রমাগতই স্পন্দন এবং পরিবর্তন চলবে, ক্রমাগত চলন্ত-চিত্রের মতো; কিন্তু আবার সে চিত্রের বহু অংশই অনুধাবন করতে আনন্দ পাওয়া যাবে না।

আমরা দেখেছি, এই যুগটির প্রধান বিশেষত্ব ছিল, এই সময়েই ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্যের সৃষ্টি হয়। সে শিল্প ছিল যন্ত্রচালিত, অর্থাৎ জল বাষ্প বিদ্যুৎ প্রভৃতি কোনোরকম যন্ত্রোৎপন্ন শক্তির সাহায্যে কলকারখানা চালিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হত। (এখনও বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের কারখানাকে আমরা 'পাওয়ার-হাউজ' বলি।) পৃথিবীর এক-এক দেশে এর এক-এক রকম ফল দেখা গেল; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই রকমের ফলই এর হল। ল্যাংকাশায়ারে কলের তাঁতে কাপড় তৈরি হচ্ছে, তার ফলে বহু দূরে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে মানুষের জীবনযাত্রা ওলটপালট হয়ে গেল, বহু মানুষের জীবিকা এবং বহু ব্যবসায়ই সেখানে নষ্ট হয়ে গেল। ধনিকতন্ত্রী শিল্পের একটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আছে, এর প্রকৃতিই হচ্ছে ক্রমশ বেড়ে বেড়ে চলা; এর ক্ষুধা কখনও মেটে না। এর বড়ো লক্ষণই হচ্ছে ধনার্জন করা; এর তখন কাজই ছিল ক্রমাগত আয় করা, সে ধনকে সঞ্চয় করা, তার পর আবার নূতন ধন আয় করা। ব্যক্তিহিসাবে এবং জাতিহিসাবে সকলেই এই চেষ্টায় লেগে গেল। এই প্রথার ফলে যে সমাজ গড়ে উঠল তার নাম তাই হল অর্জনব্রতী সমাজ। তার সারাক্ষণ লক্ষ্য রইল, আরও বেশি বেশি পণ্য উৎপাদন করবে। এইভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে বাড়তি ধন উৎপন্ন হল তা দিয়ে আরও বেশি করে কারখানা রেলওয়ে ইত্যাদি ব্যবসায় গড়ে তুলবে, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সে ধনের মালিকদেরও আরও ধনী করে তুলবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এরা অন্য সমস্ত-কিছুকেই বলি দিতে প্রস্তুত হল। কারখানাতে এই ধন যারা খেটে উৎপাদন করে সেই শ্রমিকদেরই ভাগ্যে এই লাভের ভাগ পড়ল সবচেয়ে কম; শ্রমিকদের—তাদের মধ্যে নারী এবং শিশুও কম ছিল না—অবস্থা একেবারে ভয়াবহ হয়ে উঠল। পরে অবশ্য এদের অবস্থার সামান্য একটু উন্নতি হয়েছে। এই ধনতান্ত্রিক শিল্পের এবং সে শিল্প যে দেশের সম্পত্তি তার লাভ বাড়াবার জন্যে তার উপনিবেশ এবং অধীনস্থ দেশগুলিকে একেবারেই মেরে শুষে নেওয়া হতে লাগল।

এইভাবে অন্ধ ও প্রচণ্ড গতিতে ধনিকতন্ত্রের রথ সামনে এগিয়ে চলল; তার পথের খোরাক জোগাল যে হতভাগ্যরা তাদের মৃতদেহে তার পিছনে পথের ধূলি আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তা হোক, এর যাত্রা কিন্তু হয়েছিল একেবারে নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে অসাধ্যসাধন করতে লাগল, তার সাফল্যের দ্যুতিতে বিশ্বসংসারের চোখে ধাঁধা লেগে গেল; মানুষের যে দুর্দশা সে সৃষ্টি করেছিল, মনে হল যেন তারও কিছুটা অপরাধ সেই সাফল্যের দ্বারাই ক্ষালন হয়ে গেছে। অবশ্য এরই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের পক্ষে কল্যাণকর বস্তুও অনেক সৃষ্টি করা হল, যদিও সেটা ঠিক জেনেশুনে সংকল্প করে নয়। কিন্তু বাইরের এই মঙ্গল-রচনা এবং উজ্জ্বল আবরণের তলায় আবার ছিল রাশিকৃত অমঙ্গল। বস্তুত এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দেখবার বস্তুই ছিল এর মধ্যেকার এই বিচিত্র ভেদব্যবস্থা। ধনিকতন্ত্রের সমৃদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গল আর অমঙ্গলের এই তফাতও বেড়ে যেতে লাগল। এক দিকে পরম ঐশ্বর্য, আর-এক দিকে চরম দৈন্য; এক দিকে

জঘন্য বস্তি, আর-এক দিকে আকাশস্পর্শী অট্টালিকা; এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, আর-এক দিকে তার পদানত শোষিত অবসন্ন উপনিবেশ। ইউরোপ হল শাসক এবং শোষকের দেশ, এশিয়া আর আফ্রিকা হল শোষিতের দেশ। এই শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় আমেরিকা জগতের এই ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু তারও শিল্পপ্রগতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল, বিরাট-পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়ে উঠছিল। ইউরোপে ইংলণ্ড ছিল ধনী গর্বিত এবং চালিয়াত দেশ, নিজের অবস্থায় নিজেই সে তৃপ্ত; ধনিকতন্ত্রের এবং বিশেষ করে তার অঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের সেই তখন অবিসংবাদী নেতা।

ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্য যে দ্রুতগতি এবং সর্বগ্রাসী প্রকৃতি নিয়ে এগিয়ে চলেছিল তার ফলেই তার অস্তিত্ব ক্রমে অসহ হয়ে উঠল; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং আন্দোলন শুরু হল, শেষ-পর্যন্ত তার উপরে কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করে শ্রমিককে কিছুটা রক্ষা করবার চেষ্টাও করা হল। কারখানা-পদ্ধতির প্রথম যুগে শ্রমিকদের উপরে একেবারে ভয়ংকর উৎপীড়ন চালানো হত; বিশেষ করে নারী এবং শিশু শ্রমিকদের উপরে। পুরুষের চেয়ে নারী এবং শিশু শ্রমিক নিযুক্ত করাই মালিকরা বেশি পছন্দ করত, কারণ তাদের মাইনের হার অল্প। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং কদর্য পরিবেশের মধ্যে এদের কাজ করতে হত, অনেকসময় দিনে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত এদের খাটানো হত। শেষ-পর্যন্ত রাষ্ট্রই এগিয়ে এসে এর উপরে হস্তক্ষেপ করল; দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না, তাদের যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে তারও উন্নতি করতে হবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা করে কতকগুলো আইন তৈরি করল। এই আইনগুলোকে বলা হয় কারখানা-সংক্রান্ত আইন। এই আইনে বিশেষ করে নারী এবং শিশু শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে তবেই এই আইন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কারণ, কারখানার মালিকরা প্রাণপণে একে বাধা দিচ্ছিল।

ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্যের ফলেই আবার সমাজতন্ত্রী এবং সাম্যতন্ত্রী মতবাদেরও সৃষ্টি হল; এরা নূতন যুগের কলকারখানাকে প্রয়োজনীয় বস্তু বলে স্বীকার করল, কিন্তু ধনিকতন্ত্রের মূল নীতিটিকেই দোষদুষ্ট বলে ঘোষণা করল। শ্রমিক-সংঘ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক—এদেরও সৃষ্টি এই থেকেই হল।

ধনিকতন্ত্র থেকে জন্মলাভ করল সাম্রাজ্যবাদ। পাশ্চাত্য জগতের ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্যের ধাক্কা এসে লাগল প্রাচ্য জগতের সমস্ত দেশে—অতি প্রাচীন কাল থেকে যেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল তার গায়ে। সে সব দেশে একেবারে সর্বনাশ ঘটিয়ে দিল। তার পর ধীরে ধীরে এই প্রাচ্যদেশগুলিতেও ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্য শিকড় মেলে বেড়ে উঠতে লাগল। পাশ্চাত্য জগতের আছে সাম্রাজ্যবাদ, তারই জবাব হিসাবে এ দেশে জাতীয়তাবাদও ক্রমে বেড়ে উঠল।

ধনিকতন্ত্র সমস্ত পৃথিবীতে একটা নাড়া লাগিয়ে দিল। এর ফলে মানুষের ভয়ংকর দুর্গতি হল সত্য, তবু মোটের উপর এর ফল ভালোই হল, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এল বিরাট একটা পার্থিব সমৃদ্ধি, মানুষের ভালো-থাকার মানটাও অনেক বেশি উঁচু হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এমন একটা মর্যাদা অর্জন করল যা এর আগে কোনোদিন হয় নি। 'ভোটের অধিকার' বলে একটা ফাঁকি তারা পেয়ে গিয়েছে, তার দরুন অবশ্য বাস্তবিক পক্ষে কোনো ব্যাপারেই বিশেষ-কিছু ক্ষমতা তার করায়ত্ত হয় নি। কিন্তু তবু তারই ফলে নামে অন্তত রাষ্ট্রের মধ্যে তার মর্যাদা কিছু বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মসম্ভ্রমও অনেক বেড়ে গেছে। এটা অবশ্য পাশ্চাত্য জগতের কথা, যেখানে ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিরাট হয়ে উঠল, বিজ্ঞান একেবারে আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল; সেই জ্ঞানবিজ্ঞানকে হাজার রকমে মানুষের কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক মানুষের জীবনযাত্রাকেই অনেক সহজ ও সুন্দর করে তোলা সম্ভব হল। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু উন্নতি হল, বিশেষ করে রোগ-প্রতিষেধের ব্যাপারে। সেই চিকিৎসা-শাস্ত্র আর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দ্বারা অনেক ব্যাধিকেই এখন দমন এবং নির্মূল করে ফেলা যাচ্ছে। এতদিন সেগুলি মানুষের জীবনে অভিশাপস্বরূপ হয়ে ছিল। একটি উদাহরণ দিই : ম্যালেরিয়া কীভাবে উৎপন্ন হয় এবং কীভাবে তাকে নিবারণ করা যায় সে তত্ত্ব এখন আমরা আবিষ্কার করেছি; প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

অবলম্বন করলে যে-কোনো স্থান থেকে একে একেবারেই উচ্ছেদ করে দেওয়া যায়, এখন আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র এখনও ম্যালেরিয়া আছে, এখনও এই রোগে লক্ষ লক্ষ লোক ভুগছে, মারা যাচ্ছে। কিন্তু সে অপরাধ বিজ্ঞানের নয়। অপরাধ শাসন-কর্তৃপক্ষের, তারা প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে উদাসীন। অপরাধ জনসাধারণের, তারা যেটুকু জানা উচিত তা জানে না।

এই শতাব্দীটির সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব বোধ হয় ছিল, যানবাহন এবং বার্তা-চলাচলের প্রণালীর আশ্চর্য উন্নতি। রেলওয়ে, বাষ্পীয় জাহাজ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আর মোটরগাড়ি আবিষ্কার হওয়ার ফলে পৃথিবীর রূপটাই বদলে গেল; মানুষের প্রয়োজনের দিক থেকে পৃথিবীটা যেন একেবারে নূতন রকমের জায়গা হয়ে উঠল। পৃথিবীর আয়তন কমে গেল, মানুষদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কমে গেল, পরস্পরের সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হল তারা; পরস্পরকে না চেনার ফলে মেলামেশার যেসব বাধা-সংকোচ এতকাল ছিল, এবার পরস্পরকে ভালো করে চেনবার জানবার সঙ্গে সঙ্গে তাও অন্তর্হিত হয়ে গেল। একই ধরনের চিন্তাধারা মতামত সর্বত্র বিস্তৃত হতে লাগল; তার ফলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবনে খানিকটা এক রকমের ধরনধারন এসে গেল। যে যুগটির কথা বলছি তার ঠিক শেষ দিকটাতে আবিষ্কৃত হল বেতার, টেলিগ্রাফ আর উড়োজাহাজ। এখনকার দিনে এগুলো সবাই চেনে; তুমি নিজেই এরোপ্লেনে অনেকবার চড়েছ, চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে গিয়েছ। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভেবেও দেখ নি। বেতার টেলিগ্রাফ আর উড়োজাহাজের ব্যবহার বেড়েছে বিংশ শতাব্দীতে, আমাদের এই যুগে। এর আগে অনেকে অনেকবার বেলুনে চড়ে শূন্যে উঠেছে, কিন্তু বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো জিনিষে চড়ে কেউ কখনও শূন্যে উড়তে পারে নি—একমাত্র পুরাণ আর রূপকথার গল্পেই এর নাম লোকে শুনত, যেমন আরব্য উপন্যাসের উড়ন্ত গালচে বা আমাদের ভারতীয় রূপকথার উড়ন-খাটুলি। হাওয়ার চেয়ে বেশি ভারী যন্ত্রে চড়ে শূন্যে উঠতে প্রথম পেরেছিলেন আমেরিকার দুটি লোক, দুই ভাই উইল্‌বার এবং অর্‌ভিল রাইট। এঁদের যন্ত্রটিই হচ্ছে বর্তমান কালের এরোপ্লেনের আদিপুরুষ। ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে এঁরা প্রথম ওড়েন; উড়েছিলেন তিন শো গজেরও কম। কিন্তু তা হলেও সে দিন যে কাজ তাঁরা করে দেখালেন, তার আগে কেউ কোনোদিন তা করতে পারে নি। এর পর থেকে উড়ন-কলের ক্রমশই উন্নতি হতে লাগল। ১৯০৯ সনে ব্লেরিয় বলে একজন ফরাসি ভদ্রলোক উড়ন-কলে চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে পেঁছিলেন। এ নিয়ে তখন যে বিরাট হৈচৈ হয়েছিল তার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এর অল্পদিন পরেই প্রথম এরোপ্লেন প্যারিসের ঈফেল টাওয়ারের উপর দিয়ে উড়ে যায়; এই ব্যাপারটি আমি দেখেছিলাম। এর বহু বছর পরে, ১৯২৭ সনের মে মাসে চার্ল্‌স্‌ লিণ্ড্‌বার্গ রূপোর একটি তীরের মতো আটলাণ্টিক পার হয়ে উড়ে চলে এলেন, প্যারিসের বিমানঘাঁটি লা বুর্গেতে এসে নামলেন; সে দিন তুমি আর আমিও প্যারিসে উপস্থিত ছিলাম।

ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবসায়ের প্রাধান্য ছিল এই যুগে; এইসমস্তই হচ্ছে তার ভালোর দিক। এই শতাব্দীতে মানুষ অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এর ভালোর খাতায় আরও একটি বস্তুর নাম আছে। ধনিকতন্ত্র তার দুর্দান্ত লোভ আর অর্থের জন্যে কাড়াকাড়ি-করা স্বভাব নিয়ে বেড়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার তার গতিকে ব্যাহত করবারও একটা পন্থা আবিষ্কৃত হল, এর নাম—সমবায়-আন্দোলন। এতে মানুষরা নিজেরাই একত্র হয়ে জিনিসপত্র কেনে বেচে, তার দরুন লাভ যা হয় সেটাও নিজেদেরই মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ধনিকতন্ত্রের সাধারণ পদ্ধতি ছিল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর গলা-কাটাকাটি করা; সেখানে প্রত্যেকটি লোকই অন্য-সবার উপরে টেক্কা দেবার চেষ্টা করছে। সমবায়-পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা। তুমিও নিশ্চয়ই সমবায়-সমিতির দোকান অনেক দেখেছ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে সমবায়-আন্দোলন খুব বিস্তৃত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি সাফল্য বোধ হয় এ অর্জন করেছিল ছোট্ট দেশ ডেনমার্কে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা বাড়ল; ক্রমেই বহুসংখ্যক লোক তাদের পার্লামেণ্ট এবং আইনসভায় সভ্য নির্বাচন করবার জন্যে ভোট দেবার অধিকার পেয়ে গেল। কিন্তু

এই ফ্রানচাইজ বা ভোট দেবার অধিকার মাত্র পুরুষদেরই দেওয়া হত; নারীরা অন্যসমস্ত ব্যাপারে হাজার দক্ষতা দেখালেও তাদের এই অধিকার দেওয়া হত না; বলা হত, এর সদ্ব্যবহার করবার মতো অতখানি সংবুদ্ধি বা বিচক্ষণতা তাদের নেই। অনেক নারীই এতে আপত্তি প্রকাশ করলেন; বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডে নারীরা এই নিয়ে একটা বিরাট আন্দোলন খাড়া করলেন। এই আন্দোলনের নাম ছিল 'নারীর ভোটাধিকার-আন্দোলন' (The Woman Suffrage Movement) পুরুষরা এটাকে তেমন আমল দিল না, এদের কথাতে কর্ণপাতই করল না। অতএব নারী আন্দোলনকারীরা তাদের এ দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করবার জন্যে জোরজুলুম, এমনকি দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্যন্ত শুরু করল। হৈ-হল্লা করে তারা পার্লামেন্টের কাজে বাধা দিতে লাগল, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের উপরে দৈহিক আক্রমণ পর্যন্ত করতে লাগল; মন্ত্রীদের সারাক্ষণ পুলিশ-পাহারা নিয়ে চলতে হল! বেশ সুশৃঙ্খল রীতিতে বিরাট-পরিমাণ দাঙ্গাহাঙ্গামারও আয়োজন করল তারা। এদের অনেককে ধরে জেলে পাঠানো হল; সেখানে তারা অনশন শুরু করল। বাধ্য হয়েই তখন তাদের ছেড়ে দিতে হল, তার পর সুস্থ হয়ে উঠবামাত্র আবার তাদের নিয়ে জেলে রাখা হল। এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে পার্লামেন্ট একটি বিশেষ আইন তৈরি করে দিল। লোকে সে আইনের নাম দিল 'বিড়াল আর ইঁদুরের আইন'। আন্দোলনকারীদের এইসব কাণ্ডকারখানার ফল কিন্তু ঠিকই ফলল। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ল। এর কয়েক বছর পরে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরে, মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল।

নারীদের এই আন্দোলনকে অনেক সময় 'ফেমিনিষ্ট মুভ্মেণ্ট' বলা হয়। এই আন্দোলন শুধু ভোটের অধিকার চেয়েই ক্ষান্ত হয় নি; সমস্ত ব্যাপারেই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে, এই ছিল এর দাবি। খুব অল্পদিন আগে পর্যন্তও পাশ্চাত্য জগতে নারীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে অধিকার বলতে তাদের প্রায় কিছুই ছিল না। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তার নারীদের নিজস্ব সম্পত্তি রাখবার পর্যন্ত অধিকার ছিল না; সমস্ত সম্পত্তিই হত স্বামীর, এমনকি স্ত্রী নিজে যা আয় করেছে সেটুকু পর্যন্ত। এখনকার দিনে হিন্দু-আইনে মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ; কিন্তু আইনের দিক থেকে ইংলণ্ডের মেয়েদের অবস্থা তখন তার চেয়েও অনেক খারাপ ছিল। এখনকার দিনে ভারতের নারীরা যেমন অনেক দিক থেকেই পুরুষের অধীন হয়ে রয়েছে, তখন পাশ্চাত্য জগতের নারীরাও ঠিক সেইরকমই পুরুষের অধীন হয়ে ছিল। ভোটের জন্যে এই আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ে পুরুষের সমান ব্যবহার দাবি করছিল। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ১৮৮০ সনের পরে ইংলণ্ডে মেয়েদের সম্পত্তি রাখবার কিছুটা অধিকার দেওয়া হল। এই অধিকার মেয়েরা পেল তার এক কারণ, কারখানার মালিকরা ছিল এর পক্ষপাতী; তাদের ধারণা ছিল, মেয়েরা যদি নিজের উপার্জনকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে রাখতে পারে তবে তারা আরও সহজেই কারখানায় চাকরি করতে রাজি হবে!

সমস্ত দিকেই বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটছিল, পরিবর্তন হল না শুধু শাসনকর্তৃপক্ষদের রীতিনীতি। বড়ো বড়ো জাতগুলো তখনও তাদের কূটচক্রান্ত আর ধাপ্পাবাজির খেলাই খেলে চলল; এই খেলার নীতি বহু প্রাচীন কালে তাদের শিখিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের কূটনীতিক মাকিয়াভেলি; তাঁরও আঠারো শো বছর আগে এই নীতির ব্যবহার করেছিলেন ভারতবর্ষের মন্ত্রী চাণক্য। দেশে দেশে সারাক্ষণ শত্রুতা আর রেষারেষি লেগেই রইল, সকলেই খালি অন্যদের সঙ্গে গোপন সন্ধি আর মৈত্রী স্থাপন করে, প্রত্যেক জাতিই কেবল অন্য-সকলের উপরে টেক্কা দিয়ে চলতে চায়। এই চক্রান্তের অভিনয়ে ইউরোপের ছিল সক্রিয় এবং আক্রমণাত্মক ভূমিকা, এশিয়ার ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় ফলভোগের, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। আমেরিকা তখনও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, পৃথিবীর রাজনীতিতে তখন পর্যন্ত সে বিশেষ মাথা গলাচ্ছে না।

জাতীয়তাবাদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, ন্যায় হোক অন্যায় হোক, আমার দেশের কথাই সকলের আগে—এই মতটাও প্রবল হয়ে উঠল। ব্যক্তির পক্ষে যেসব কাজ অন্যায় বা দুর্নীতি বলে মনে করা হয়, জাতির পক্ষে সেইগুলোই হয়ে উঠল গর্বের বস্তু। এইভাবে ব্যক্তিগত নীতিবোধ আর

জাতিগত নীতিবোধের মধ্যে একটা অদ্ভুত পার্থক্য ক্রমে গজিয়ে উঠল। দুয়ের মধ্যে তফাত ছিল অনেক; ব্যক্তির পক্ষে যেটা পাপ, জাতির পক্ষে সেইটাই হয়ে উঠল মহা পুণ্যকর্ম। স্বার্থপরতা লোভ অহংকার অসভ্যতা ব্যক্তিহিসাবে পুরুষ বা নারী উভয়ের পক্ষেই এগুলোকে মনে করা হত অত্যন্ত অন্যায় এবং অসহ্য আচরণ। অথচ বৃহত্তর দল বা জাতির বেলায় এইগুলোকেই দেশভক্তি স্বজাতি-প্রেম ইত্যাদি বড়ো বড়ো নামের পরিচ্ছদ পরিয়ে প্রশংসনীয় এবং আচরণীয় বস্তু করে তোলা হল। এখনকার দিনে ভারতবর্ষেও আমরা দেখছি সম্প্রদায়হিসাবে এমন অনেক অসভ্যতা স্বার্থপরতা দ্বেষবুদ্ধির চর্চা আমরা করছি, যেগুলোকে ব্যক্তির বেলায় আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত নই। খুন এবং নরহত্যা জঘন্য কাজ, কিন্তু বৃহত্তর সম্প্রদায় এবং জাতির নামে যখন আমরা খুনোখুনি নরহত্যা শুরু করি তখন সেইটে হয়ে ওঠে বাহাদুরির কাজ। অল্পদিন আগে একটি বই বেরিয়েছে, তাতে লেখক সত্যি কথাই বলেছেন : "ব্যক্তির পক্ষে যেগুলোকে অপরাধ বলে জানি, সভ্যতার নামে সেই-গুলোকেই আমরা বৃহত্তর জনসংঘের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি।"

১৪৬

বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ

২৩শে মার্চ, ১৯৩৩

আগের চিঠির শেষ দিকে আমি তোমাকে বলেছি, পরস্পরের প্রতি আচরণের বেলায় সমস্ত জাতিই অত্যন্ত ক্রূর এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। যেখানে যতখানি সম্ভব অন্যদের প্রতি অভদ্র এবং অসহিষ্ণুর মতো আচরণ করবে; নিজের সম্পত্তি ভোগ করবে না তবু অন্যকে সেখানে মাথা গলাতে দেবে না, এগুলোকে তারা স্বাধীন সত্তার একটা বড়ো লক্ষণ বলেই মনে করত। এমন করা উচিত নয় এ কথা তাদের বলবার মতো কেউ ছিল না—তারাও তো স্বাধীন দেশ, কাজেই তাদের উপরে সেরকম মোড়লি কেউ করতে এলে তারা সহ্য করবে কেন। একটিমাত্র জিনিসের দোহাই তারা মানত, সে হচ্ছে ফলাফলের ভয়। অতএব শক্তিমানদের তারা খানিকটা খাতির করে চলত, আর দুর্বলদের উপরে অত্যাচার চালাত।

জাতিতে জাতিতে এই রেষারেষি, এটা আসলে ছিল ধনিকতন্ত্রী শিল্পবাণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। ধনিকতন্ত্রী দেশদের বাজার আর কাঁচা মালের প্রয়োজন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, অতএব সাম্রাজ্যের সন্ধানে পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। এশিয়ায় গেল তারা, গেল আফ্রিকায়, যে যতখানি পারে জায়গা দখল করে বসে তাকে শোষণের ব্যবস্থা করে নিল। তার পর একদিন পৃথিবীটাই গেল ফুরিয়ে। তখন আর দখল করবার মতো নূতন দেশ নেই; কাজেই তখন সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা চোখ পাকিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করল; অন্যদের হাতের কোন্ সম্পত্তিটাতে কে কোন্ সুযোগে হস্তক্ষেপ করতে পারে তারই সুযোগ খুঁজতে লাগল। এশিয়াতে আফ্রিকাতে ইউরোপে সর্বদাই এদের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধতে লাগল, বেড়ে উঠল মনোমালিন্য—যুদ্ধ তখন শুধু বাধবার অপেক্ষা। কতকগুলো জাতির অবস্থা অন্যদের চেয়ে ভালো; সকলের চেয়ে বেশি ভালো অবস্থা ইংলণ্ডের, শিল্পবাণিজ্যে সেই অগ্রণী, সাম্রাজ্যও তারই প্রকাণ্ড। কিন্তু তবু সে ইংলণ্ডও তৃপ্ত নয়; যার যত আছে সেই তো তত আরও বেশি চায়! তার সাম্রাজ্যকে কী করে আরও বাড়িয়ে তোলা যায় তার নানা বড়ো বড়ো ফন্দি তার সাম্রাজ্যস্রষ্টাদের মাথায় গজিয়ে উঠতে লাগল; এঁরা জল্পনা আঁটতে লাগলেন, আফ্রিকাতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করতে হবে, উত্তর থেকে বরাবর দক্ষিণ, কায়রো থেকে একটানা কেপ-অব-গুড-হোপ অবধি বিস্তৃত হবে সে সাম্রাজ্য। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে জর্মানি আর যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, সে নিয়েও ইংলণ্ডের দুর্ভাবনা দেখা

দিয়েছিল। এই দুটি দেশ ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক শস্তায় মাল তৈরি করছিল এবং ইংলণ্ডের অনেক বাজার তার হাত থেকে খসিয়ে নিচ্ছিল।

ইংলণ্ডের এত ধনসম্পত্তি, তবু সেও তৃপ্ত নয়; অন্যরা যে আরও অনেক বেশি অতৃপ্ত থাকবে সে তো সোজা কথা। বিশেষ করে জর্মানি—বড়োদের দলে এসে উত্তীর্ণ হতে তার একটু দেরি হয়ে গেছে; এসে দেখছে, ভালো বস্তু যা-কিছু ছিল অন্যেরা সে আগেভাগেই হাত করে নিয়েছে। বিজ্ঞানে শিক্ষায় শিল্পে জর্মানি অসাধারণ উন্নতি অর্জন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটি চমৎকার সেনাবাহিনীও গড়ে তুলেছে। এমনকি শ্রমিকদের ভালোর জন্যে যে সামাজিক সংস্কারমূলক আইন রচনা, তার বেলাতেও সে অন্য দেশদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, ইংলণ্ডকে পর্যন্ত। জর্মানি যখন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল তার বহু আগে থেকেই অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা পৃথিবীর প্রায় সমস্তখানি জায়গা দখল করে বসে আছে, শোষণের রাস্তা তার পক্ষে আর বিশেষ খোলা নেই। তবু নিছক কঠিন পরিশ্রম আর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জোরেই সে এই যুগের শিল্পতন্ত্রী এবং ধনিকতন্ত্রী দেশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে কর্মদক্ষ বলে পরিচিত হয়ে উঠল। তার বাণিজ্য-জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত বন্দরে যাচ্ছে; তার নিজের বন্দর হামবুর্গ আর ব্রিমেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির মধ্যে গণ্য। জর্মন বাণিজ্য-জাহাজগুলি কেবল জর্মানির পণ্যই অন্যান্য দূরের দেশে নিয়ে যায় না, অন্যান্য দেশের পণ্য বহনের ব্যবসাও সে ক্রমে দখল করে বসল।

এই নূতন সাম্রাজ্যবাদী দেশ জর্মানি, এতখানি প্রতিপত্তি সে অর্জন করেছে, তার শক্তি সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ সচেতন। সে আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে তার পথে অন্যরা এমন বাধা সৃষ্টি করে বসে রয়েছে, এতে সে ক্ষেপে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জর্মন-সাম্রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান ছিল প্রাশিয়ার; তার কর্তৃত্ব ছিল ভূস্বামী এবং সামরিক-শ্রেণীর হাতে। নম্রতার অপবাদ এদের কেউ কোনো দিন দিতে পারে নি। অন্যের উপরে চড়াও হয়ে ঝগড়া বাধাতেই এরা পটু; সে ব্যাপারে একেবারে নির্মম হয়ে উঠতে পারে, এইটেই ছিল এদের বড়ো অহংকার। এদের এই আত্মম্ভরী এবং দর্পান্ধ মনোবৃত্তির একজন আদর্শ পুরুষ বলে এরা পেয়ে গেল এদের হোহেন্‌জোলার্ন-বংশীয় সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম্‌-কে। কাইজার সর্বত্র প্রচার করতে লাগলেন, জর্মানি অচিরেই সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে বসছে; সূর্যের তলায় তারও একটা যোগ্য জায়গা চাইই চাই; তার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি গড়ে উঠবে তার সামুদ্রিক শক্তিকে আশ্রয় করে; তার নিজের 'কুল্‌টুর' বা সংস্কৃতিকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে তার ব্রত।

এইসব বুলি আগেও বহুবার বহু জাতির মুখে শোনা গেছে। ইংলণ্ডের 'শাদা মানুষদের কর্তব্য' আর ফ্রান্সের 'সভ্যতা-প্রচারক মিশন'—এরাও এই জর্মন 'কুল্‌টুর'এরই জ্ঞাতিভাই। ইংলণ্ড বলত, সমুদ্রে তারই ক্ষমতা বড়ো; বাস্তবিক ছিলও তাই। ইংলণ্ডের নাম করে ইংরেজরা যে কথাটা বলত, জর্মানির নাম করে কাইজারও ঠিক সেই কথাই বলতে লাগলেন খুব চাঁছাছোলা আর লম্বাচওড়া ভাষায়। তফাতের মধ্যে শুধু, ইংলণ্ডের সত্যিই সমুদ্রে আধিপত্য ছিল, জর্মানির ছিল না। তা হলেও কাইজারের বড়ো বড়ো বচন শুনে ব্রিটিশদের মাথা বেজায় গরম হয়ে উঠল; অন্য-কোনো দেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠবার কল্পনাও পোষণ করবে, এই কথাটা ভাবতেই তাদের অত্যন্ত খারাপ লাগল। এ একরকমের অধার্মিক উক্তি, ইংলণ্ডের পক্ষে মানহানিকর কথা; ইংলণ্ডই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ, সে বিষয়ে তার নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর সমুদ্রের কথা যদি বলো, সেখানে তো ব্রিটেনেরই একচেটিয়া অধিকার। এক শো বছর আগে ট্রাফাল্‌গারের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে হারিয়ে দেবার পর থেকেই আর সমুদ্রে ব্রিটেনের প্রাধান্য সম্বন্ধে কেউ কোনো সংশয় প্রকাশ করে নি; এখন যদি জর্মানি বা অন্য-কোনো দেশ তার সে প্রাধান্য কেড়ে নেবার কথা ভাবে, ব্রিটেনের চোখে সেটা একটা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। সমুদ্রে তার যে প্রাধান্য রয়েছে তাই যদি আর না থাকে, তবে পৃথিবীর সর্বত্র-বিস্তৃত তার এতবড়ো সাম্রাজ্যটার দশা কী হবে?

কাইজার যেসব হুমকি আর শাসানি দিচ্ছিলেন সেইগুলোই অসহ্য; তার চেয়েও অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল যখন তিনি সে কথাকে কার্যে পরিণত করতে লাগলেন, তাঁর নৌশক্তিকে অনেক

ইউরোপ ১৯১৪-১৫
লণ্ডন
প্যারিস
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
বার্লিন
জর্মানি
পূর্ব-প্রাশিয়া
ওয়ারস
রাশিয়া
গ্যালিসিয়া
ভিয়েনা
অস্ট্রিয়া
রুমানিয়া
বুলগেরিয়া
দার্দানেলিস
ইতালি
১৯১৫ সালের শেষে কেন্দ্রীয় শক্তিপুঞ্জের অধিকৃত শত্রুরাজ্য

বাড়িয়ে তুললেন। ব্রিটিশদের এবার মন আর মেজাজ দুটোই একদম খারাপ হয়ে গেল; তারাও নিজেদের নৌ-বল বাড়াতে শুরু করল। দুই দেশের মধ্যে লাগল নৌ-শক্তি বাড়াবার পাল্লা। দুই দেশেরই সংবাদপত্রগুলো তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, আরও বেশি বেশি করে যুদ্ধজাহাজ তৈরি করা হোক; জাতিগত বিদ্বেষও তারা খুব করে বাড়িয়ে তুলতে লাগল।

ইউরোপে এটি হল বিপদ বাধাবার একটি প্রশস্ত স্থান। এ ছাড়া আরও অনেক ছিল। ফ্রান্স এবং জর্মানি তো পুরোনোকাল থেকেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রয়েছে; ১৮৭০ সনে জর্মনদের হাতে তারা পরাজিত হয়েছিল, সে দুঃখ তখনও কাঁটার মতো ফরাসিদের পাঁজরের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে উঠছে, তারা সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার স্বপ্নে বিভোর। বল্‌কান-অঞ্চলটি চিরদিনই একটি বারুদের গুদাম, নানা জাতি নানা শক্তির নিয়ত সংঘাত চলছে সেখানে, দয়া করে আগুন জ্বলে উঠলেই হল। জর্মানি আবার তুর্কির সঙ্গেও ভাব জমাতে শুরু করল; মতলব, পশ্চিম-এশিয়াতে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু বাড়িয়ে নেবে। কথা হল, বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেললাইন তৈরি করে শহরটিকে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ আর ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। করলে খুবই ভালো হত; কিন্তু সে বাগদাদ-রেলওয়েটিকে জর্মানি তার নিজের আয়ত্তে রাখতে চাইল, অতএব তাই নিয়ে দুই জাতির মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হল।

যুদ্ধের আতঙ্ক ক্রমে ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়ল; আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত দেশই অন্য দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে লাগল। বড়ো দেশগুলো দু দলে ভাগ হয়ে গেল; এক দিকে থাকল জর্মানি অস্ট্রিয়া আর ইতালির ত্রিশক্তি-মৈত্রী; আর-এক দিকে রইল ইংলণ্ড ফ্রান্স আর রাশিয়ার ত্রিশক্তি-মৈত্রী। ইতালি ত্রিশক্তি-মৈত্রীতে যোগ দিল কিন্তু তার এদের প্রতি টান খুব বেশি ছিল না; বাস্তবিকই যখন যুদ্ধ শুরু হল, সে তার প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে অমায়িকচিত্তে গিয়ে অন্য দিকে যোগ দিল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের তখন নড়বড়ে অবস্থা; মানচিত্রে সে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে, তার রাজধানী ভিয়েনা-শহর বিজ্ঞান সংগীত আর কলাচর্চার একটা বৃহৎ কেন্দ্র; কিন্তু সে সাম্রাজ্যের নিজেরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির অন্ত নেই। সুতরাং এদের এই ত্রিশক্তি বলতে আসলে বোঝাল শুধু জর্মানিকেই। বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধ বাধবার আগে অবশ্য কেউই জানত না, ইতালি বা অস্ট্রিয়া কী মূর্তি ধারণ করবে।

অতএব ইউরোপে ভয়ের থম্‌থমানি রাজত্ব করতে লাগল। ভয় জিনিসটাই ভয়ানক। প্রত্যেকটা দেশ যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগল, যার যতখানি সাধ্য অস্ত্রশস্ত্র-উপকরণের যোগাড় করে নিল। ইউরোপ জুড়ে দেশে দেশে রণসজ্জা সম্পূর্ণ করবার একটা পাল্লা লেগে গেল। এই পাল্লার মধ্যে বড়ো মজাই হচ্ছে, একটা দেশ যদি নিজের রণসজ্জা বাড়িয়ে নেয়, তখন অন্যান্য দেশদেরও বাধ্য হয়েই নিজের রণসজ্জা বাড়াতে হয়। রণসজ্জা, মানে বন্দুক কামান যুদ্ধজাহাজ গোলাগুলি এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ ইত্যাদি তৈরি করত যেসব কারখানা আর ব্যবসায়ীরা, তারা স্বভাবতই বিরাট-রকম দাঁও মেরে ফেঁপে ফুলে উঠল। তার চেয়ে আরও বেশি এগিয়ে গেল তারা; নিজেরাই বস্তুত যুদ্ধের গুজব আর আতঙ্ক রটাতে লাগল, যেন সেই ভয়ে পড়ে সমস্ত দেশ তাদের কাছ থেকে আরও বেশি বেশি করে রণসজ্জা কেনে। এই রণসজ্জার কারখানাগুলো ছিল অত্যন্ত ধনশালী এবং শক্তিশালী; ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মানি এবং অন্যান্য দেশের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মন্ত্রীদেরও এতে অংশীদারি ছিল; এই কারখানাগুলোর লাভ তাঁদেরই লাভ। রণসজ্জার কারখানার লাভ হয় যুদ্ধের আতঙ্ক বাড়লে এবং যুদ্ধ বাধলে! অতএব অবস্থাটা দাঁড়াল চমৎকার—অনেক দেশেরই মন্ত্রী এবং সরকারি কর্মচারীরা যুদ্ধ বাধাতে চাইছেন, কারণ বাধলে তাঁদের দু পয়সা হয়! সমস্ত দেশ যাতে যুদ্ধের দরুন আরও বেশি বেশি টাকা খরচ করতে বাধ্য হয় সেজন্য এই কারখানা-ওয়ালারা আরও নানারকম ফিকির-ফন্দি খাটাতে লাগল। সংবাদপত্র বার করে তাই দিয়ে দেশের জনমতকে যুদ্ধের স্বপক্ষে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করল; সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে হাত করল; মিথ্যা রিপোর্ট আর গুজব প্রচার করে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলল। কী ভয়ানক বস্তু এই রণসজ্জার ব্যবসা—মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে হয় এর জীবিকার সংস্থান; নিজের লাভ করে নেবার লোভে যুদ্ধের মতো ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়ে এবং বাড়িয়ে তুলতেও এতটুকু দ্বিধা বা সংকোচ এদের আসে না!

১৯১৪ সনের যুদ্ধ যে অত তাড়াতাড়ি বেধে উঠল তার মধ্যে অনেকখানি হাত ছিল এদের। আজও এরা এই খেলাই খেলে চলেছে।

চার দিকে এই যুদ্ধের জল্পনা, এরই মাঝখানে আবার শান্তিস্থাপনেরও একটি অদ্ভুত চেষ্টা হল, তার কথা বলছি। এই চেষ্টা করলেন কিন্তু আর-কেউ নয়, স্বয়ং রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস। তিনি সকলের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, সবাই মিলে আলোচনা করে জগতে একটা শান্তির যুগ প্রতিষ্ঠা করুন। ইনিই হচ্ছেন সেই জার, যিনি নিজের সাম্রাজ্যে সমস্ত উদারপন্থী আন্দোলনকে নির্মমভাবে ধ্বংস করছিলেন, রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দী পাঠিয়ে সাইবেরিয়াকে পূর্ণ করে তুলছিলেন! তিনিই এলেন শান্তির বাণী নিয়ে, এটা যেন একটা পরিহাসের মতো শোনায়। কিন্তু কে জানে, খুব সম্ভব এটা তাঁর মনের কথাই ছিল; কারণ তাঁর পক্ষে শান্তির অর্থ ছিল, বর্তমান অবস্থাটা টি'কে থাকবে, তাঁর নিজের স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতাও টি'কে থাকবে। তাঁর আহ্বানে হল্যাণ্ডের হেগ্-শহরে দুবার শান্তি-সম্মেলন বসল—একবার ১৮৯৯ সনে, আর-একবার ১৯০৭ সনে। কাজের কথা একদম কিছুই হল না সেখানে। শান্তি অকস্মাৎ আকাশ থেকে নেমে আসে না। শান্তি আসতে পারে শুধু তখনই যখন অশান্তির সমস্ত মূল কারণগুলোকে উপড়ে নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে।

বড়ো বড়ো দেশগুলোর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরস্পর-আতঙ্কের সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে বলেছি। ছোটো ছোটো জাতিও অনেক আছে, তাদের নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না—অবশ্য যারা এই বড়োদের অপ্রিয় কাজ করে তাদের ছাড়া! উত্তর-ইউরোপে কতকগুলো ছোটো ছোটো দেশ আছে, এদের কথা মন দিয়ে জানবার মতো। কারণ, লোভ আর লাভ নিয়ে পরস্পর হানাহানি করতে ব্যস্ত বড়ো বড়ো দেশদের সঙ্গে এদের অনেক তফাত। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে আছে নরওয়ে আর সুইডেন; ঠিক তাদের নীচেই রয়েছে ডেনমার্ক্। উত্তর-মেরু-অঞ্চল থেকে এই দেশগুলো বেশি দূরে নয়; এ দেশে শীত বেশি, বাস করাও কঠিন। অতি অল্প-পরিমাণ লোকই থাকতে পারে এখানে। কিন্তু বড়ো বড়ো দেশদের মধ্যে যে ঘৃণা বিদ্বেষ ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবর্ত, তার থেকে এরা বাইরে রয়ে গেছে; তাই এরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে, নিজেদের কর্মশক্তিকে সভ্যতার পথে চালিত করতে পারে। বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হয়েছে সেসব দেশে, এদের সাহিত্যও চমৎকার সমৃদ্ধ। নরওয়ে আর সুইডেনকে একত্র করে একটি রাষ্ট্র গড়া হয়েছিল, ১৯০৫ সন পর্যন্ত এরা একত্রই ছিল। ১৯০৫ সনে নরওয়ে স্থির করল, আলাদা হয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে থাকবে। অতএব এই দুটি দেশ বেশ শান্তভাবেই নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করবার ব্যবস্থা স্থির করে ফেলল। সেই থেকে এরা দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। এর জন্যে কোনো যুদ্ধ করতে হয় নি, এক দেশ অন্য দেশকে জোর করে নিজের কথা শোনাতে যায় নি। আজও এরা পরস্পরের বন্ধু প্রতিবেশী হয়ে রয়েছে।

ছোট্ট দেশ ডেনমার্ক একটি মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে যা বড়ো ছোটো সকল দেশেরই অনুকরণ করবার মতো—তার সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী একেবারেই তুলে দিয়েছে। ডেনমার্ক চাষির দেশ, তার অধিবাসী সকলেই ছোটোখাটো চাষি; বড়োলোক আর গরিবের তফাত বিশেষ নেই সে দেশে। এই দেশে সমবায়-আন্দোলন খুব বেশি বিস্তৃত; অধিবাসীদের মধ্যে এই সাম্য-প্রতিষ্ঠাও অনেকটা সেইজন্যেই সম্ভব হয়েছে।

ইউরোপের সমস্ত ছোটো দেশই অবশ্য ডেনমার্কের মতো ধর্মনিষ্ঠ নয়। হল্যাণ্ড নিজে ছোট্ট দেশ, কিন্তু ইস্ট-ইণ্ডিজে তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য (জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি)। তার পরেই আছে বেলজিয়ম, আফ্রিকার কঙ্গো-প্রদেশ তার শোষণাধীন সম্পত্তি। ইউরোপের রাজনীতিতে বেলজিয়মের প্রতিপত্তির প্রধান কারণ কিন্তু হচ্ছে তার ভৌগোলিক অবস্থান। ফ্রান্স থেকে জর্মনিতে যাবার বড়ো রাস্তাটির প্রায় উপরেই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অতএব এই দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধলেই বেলজিয়ম সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এটা প্রায় ধরা কথা। মনে করে দেখো, ওয়াটার্লু জায়গাটা হচ্ছে বেলজিয়মে, ব্রুসেল্স্-শহরের কাছে। এইজন্যেই বেলজিয়মকে বলা হত 'ইউরোপের cockpit (মুর্গীর লড়াই-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান বা দ্বন্দ্বভূমি)। বড়ো দেশদের মধ্যে প্রধানরা পরস্পর চুক্তি করলেন,

যুদ্ধ যদি বাধে, বেলজিয়মকে সকলেই নিরপেক্ষ দেশ বলে মেনে চলবেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন সত্যিই বাধল, এই চুক্তি আর প্রতিশ্রুতি কোথায় চলে গেল!

কিন্তু ঝঞ্ঝাট আর গোলমাল বাধাবার অদ্বিতীয় ওস্তাদ হচ্ছে বল্‌কান-অঞ্চলের ছোটো ছোটো দেশগুলো; এ ব্যাপারে এদের জুড়ি ইউরোপে বা পৃথিবীতেই আর-কোথাও নেই। নানা রকমের নানা জাতির মানুষের একটা জগাখিচুড়ি রয়েছে এখানে, পুরুষানুক্রমে তারা চিরদিন পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা আর রেষারেষি করে এসেছে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আর হিংসায় এদের মন পরিপূর্ণ। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সনের বল্‌কান-যুদ্ধ দুটিতে অদ্ভুতরকম রক্তপাত আর হানাহানি হয়েছিল; অতি অল্প সময় এবং ছোটো জায়গার মধ্যে এ যুদ্ধ দুটির দ্বারা বড়ো রকমের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তুর্কি'রা হেরে পিছিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল; অথচ শোনা যায়, তাদের উপরেও বুল্‌গেরিয়ানরা যে ভয়ানক নৃশংসতা চালিয়েছিল তার তুলনা হয় না। আগের যুগে তুর্কি'রাও ঠিক এমনিধারা অত্যাচারই করেছে। সার্বিয়া (এখন যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত) তো নরহত্যা করবার দক্ষতা দেখিয়ে রীতিমতো একটা খ্যাতিই অর্জন করে ফেলল। তথাকথিত দেশ-প্রেমিকদের একটা গোপন নরঘাতক-সমিতি ছিল, তার নাম 'দি ব্ল্যাক হ্যান্ড্'। তার সভ্যদের মধ্যে রাজ্যের অনেক বড়ো কর্মচারীও ছিলেন। এরা কতকগুলো একেবারে অত্যন্ত ভয়ংকর রকমের নর-হত্যা করল। দেশের রাজা আলেকজান্ডার এবং রানী দ্রাগা, রানীর ভাইরা, প্রধানমন্ত্রী এবং আরও অনেক লোক এদের হাতে মারা পড়লেন, সে হত্যার কাহিনী শুনলে মনে বিরক্তি ধরে যায়। এটা কিন্তু ছিল নিছক একটা প্রাসাদ-বিপ্লব; রাজাকে মেরে ফেলে তাঁর জায়গাতে আর-একজনকে রাজা করে দেওয়া হল।

এমনি করে বিংশ শতাব্দীর শুরু হল, ইউরোপের আকাশে বজ্র আর বিদ্যুতের আসন্ন আভাস নিয়ে। তার পর একটা একটা করে বছর কাটতে লাগল, বাতাসে ঝড়ের ছোঁয়াচও ক্রমেই বেড়ে চলল। নানা রকমের জটিলতা আর প্যাঁচের সৃষ্টি হতে লাগল, ইউরোপের জীবনযাত্রায় গিঁটের পর গিঁট পড়তে লাগল; শেষ পর্যন্ত সে গিঁট কাটতে হল যুদ্ধ করে। যুদ্ধ বাধবে এটা সকলেই তখন স্থির ধরে নিয়েছে, প্রত্যেক দেশই প্রাণপণে তার জন্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছে, যদিও যুদ্ধ বাধাবার আগ্রহ বোধ হয় কারোই ছিল না। যুদ্ধের নামে ভয়ও সকলেই অল্পবিস্তর পাচ্ছিল; যুদ্ধের ফল কী হবে সে কথা তো আগে থেকে কেউই নিশ্চয় করে বলতে পারে না! অথচ সেই ভয়ের ধাক্কাতেই তারা যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য হল। আগেই বলেছি, ইউরোপের মধ্যে দুটি পক্ষ পরস্পরের ঠিক সমান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিন কাটাচ্ছিল। এর নাম ছিল 'শক্তি-সাম্য'—বড়ো সূক্ষ্ম ভারসাম্য সেটা, একটুখানি ঠেলা লাগলেই অমনি কাৎ হয়ে পড়ে যায়। জাপান ইউরোপ থেকে বহু দূরের দেশ, ইউরোপের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সঙ্গেও তার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; তবু সেই জাপানও ছিল ইউরোপের এই মৈত্রী এবং ভারসাম্যের একজন অংশীদার; কারণ জাপান তখন ইংলন্ডের মিত্র। এই মৈত্রীর উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচ্যদেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ইংরেজের স্বার্থকে বজায় রাখা। ইংলন্ডের সঙ্গে যখন রাশিয়ার রেষারেষি, সেই প্রাচীন যুগে এই মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল। সে মৈত্রী তখনও টিঁকে রয়েছে, যদিও ইংলন্ড এবং রাশিয়া ইতিমধ্যে এক পক্ষে চলে এসেছে। ইউরোপের এইসমস্ত মৈত্রী আর ভারসাম্যের ব্যাপার থেকে একটিমাত্র বড়ো দেশ দূরে সরে রইল, সে হচ্ছে আমেরিকা।

১৯১৪ সনে এই ছিল পৃথিবীর অবস্থা। তোমার মনে আছে, আয়ার্ল্যান্ডের হোম-রুল বিল নিয়ে ইংলন্ডকে এই সময়ে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছিল। আল্‌স্টার বিদ্রোহ করছে, উত্তর এবং দক্ষিণ-আয়ার্ল্যান্ডে স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী কুচকাওয়াজ করে ফিরছে, আয়ার্ল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবে বলে শোনা যাচ্ছে। জর্মন-কর্তৃপক্ষ খুব সম্ভবত ভেবেছিলেন, আয়ার্ল্যান্ডের এই হাঙ্গামা নিয়েই ইংলন্ড ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকবে; ইউরোপে যদিই যুদ্ধ বাধে, ইংলন্ড তার মধ্যে মাথা গলাতে আসবে না। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ-সরকার তার আগে থেকেই ফ্রান্সকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছেন, যুদ্ধ বাধলে ইংলন্ড ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে লড়বে; কিন্তু সে কথা বাইরের লোকে জানত না।

১৯১৪ সনের ২৮শে জন—যে স্ফুলিঙ্গটি থেকে দাবানল জ্বলে উঠল, এই তারিখে সেটির সৃষ্টি হল। অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড্। বল্কান-অঞ্চলের রাজ্য বস্নিয়ার রাজধানী সেরাজেভো, তিনি গেলেন সেখানে বেড়াতে। এর অল্প ক' বছর আগে তরুণ তুর্কিরা যখন সুলতানকে পদচ্যুত করবার চেষ্টা করছে, সেই সুযোগে অস্ট্রিয়া এই বস্নিয়া-দেশটিকে দখল করে নিয়েছিল। সেরাজেভোর রাজপথে খোলা গাড়িতে করে আর্কডিউক চলেছেন, পাশে তাঁর স্ত্রী; এমন সময় তাঁদের উপরে গুলি ছোঁড়া হল, দুজনেই নিহত হলেন। অস্ট্রিয়ার সরকার এবং জনসাধারণ রাগে ক্ষেপে উঠল; এই কাজে সাহায্য করেছে বলে সার্বিয়া-সরকারের (সার্বিয়া বস্নিয়ার পাশের রাজ্য) নামে অভিযোগ করে বসল। সার্বিয়া-সরকার অবশ্যই এ অভিযোগ অস্বীকার করল। এর বহুকাল পরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, সার্বিয়া-সরকার স্বয়ং এই হত্যানুষ্ঠান করেন নি বটে, কিন্তু এর জন্যে যে আয়োজন চলছিল সে সংবাদও তাঁদের ঠিক অজানা ছিল না। প্রধানত অবশ্য এই হত্যার জন্যে দায়ী বলতে হবে সার্বিয়ার 'ব্ল্যাক হ্যান্ড্' দলকে।

কিছুটা রাগের বশে, এবং বেশির ভাগ কূটনীতির একটা দাঁও হিসাবে, অস্ট্রিয়া-সরকার সার্বিয়ার উপরে খুব জোর তম্বি শুরু করে দিল। এটা বোঝা কিছু শক্ত নয়, এই সুযোগে সার্বিয়ার বিষদাঁত একেবারে ভেঙে দেওয়াই ছিল তার মতলব; এর থেকে যদি বৃহত্তর যুদ্ধের সৃষ্টি হয় তবে তখন জর্মানির প্রবল শক্তি তার সহায় হবে, এ ভরসাও তার মনে ছিল। অতএব সার্বিয়া যে ক্ষমাপ্রার্থনা করল অস্ট্রিয়া সেটা গ্রহণ করল না। ১৯১৪ সনের ২৩শে জুলাই তারিখে সে সার্বিয়াকে শেষ চরমপত্র পাঠিয়ে দিল। এর পাঁচ দিন পরে, ২৮শে জুলাই তারিখে, অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

অস্ট্রিয়ার নীতি প্রধানত ছিল একজন দর্পান্ধ এবং মূর্খ মন্ত্রীর হাতে; ইনি যুদ্ধ না বাধিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফকে (১৮৪৮ সন থেকে ইনি অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসে ছিলেন) ইনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন; জর্মানি সাহায্য করবে বলে একটা আধা-প্রতিশ্রুতির মতো দিয়েছিল, সেইটের মানে তিনি ধরে নিলেন যেন সে পূর্ণ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু একমাত্র অস্ট্রিয়া ছাড়া বড়ো দেশদের কেউই বোধ হয় ঠিক সেই সময়টাতে যুদ্ধ বাধাবার জন্যে ব্যগ্র ছিল না। জর্মানি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, ঝগড়া বাধাতেও পটু, তবু যুদ্ধ আরম্ভ করতে তার উৎসাহ নেই: কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্ বরং যুদ্ধ তখন না বাধে সেইজন্যে খানিকটা চেষ্টাচরিত্র করলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স মোটেই যুদ্ধ বাধাবার জন্যে ব্যস্ত ছিল না। রাশিয়ার সরকার বলতে বোঝাত তার জারকে—একটি দুর্বল এবং মূর্খ ব্যক্তি। তাঁর নিজেরই বাছাই-করা কতকগুলো মূর্খ আর শয়তান লোক তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রয়েছে, তাদে বুদ্ধি নিয়ে ক্রমাগত আবোলতাবোল কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। অথচ এই লোকটির হাতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য ন্যস্ত রয়েছে! নিজে তিনি মোটের উপর যুদ্ধের বিরোধীই ছিলেন; কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে ভয় দেখাল, এখন দেরি করলেই সর্বনাশ। তাদের পাল্লায় পড়ে তিনি সৈন্য-সমাবেশ করতে সম্মতি দিলেন। এই সমাবেশ মানে হচ্ছে বাস্তব যুদ্ধের জন্যে সৈন্যদের ডেকে প্রস্তুত করে তোলা; রাশিয়ার মতো বিরাট দেশে তা করতে সময় লাগে। জর্মনরা এসে রাশিয়া আক্রমণ করবে এই ভয়েই বোধ হয় রাশিয়া তাড়াহুড়ো করে সৈন্যসমাবেশ করে নিচ্ছিল। এই সমাবেশ শুরু হল ৩০শে জুলাই তারিখে; এর খবর পেয়ে জর্মানির ভয় ধরল; সে তৎক্ষণাৎ দাবি জানাল, রাশিয়াকে সৈন্যসমাবেশ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের জগদ্দল রথ একবার চলা শুরু করেছে, তখন আর তাকে থামানো অসম্ভব। এর দু দিন পরে ১লা আগস্ট তারিখে জর্মানিও সৈন্য-সমাবেশ করল এবং রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল-পরিমাণ জর্মন সেনা বেলজিয়মের উপর গিয়ে চড়াও হল। সেই পথে তারা ফ্রান্সে যাবে, ফ্রান্সে যাবার সেইটেই সহজ পথ। বেচারি বেলজিয়ম জর্মানির কোনো ক্ষতিই করে নি; কিন্তু জাতিতে জাতিতে যখন জীবন-মরণ পণ করে লড়াই বাধে তখন এসব ক্ষুদ্র কথা বা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। বেলজিয়মের অপরাধ, জর্মন-সরকার বেলজিয়মের কাছে

অনুমতি চেয়েছিলেন, বেলজিয়মের মধ্য দিয়ে জর্মন সেনাকে যেতে দেওয়া হোক; স্বভাবতই বেলজিয়ম সে অনুরোধ বিরক্তভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

বেলজিয়ম নিরপেক্ষ দেশ, তার উপর এই আক্রমণে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে তুমুল প্রতিবাদ উঠল; এই ছুতো ধরে ইংলণ্ড নিজেও জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বাস্তবিক পক্ষে অবশ্য যুদ্ধ করবে সে সংকল্প ইংলণ্ড অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল; বেলজিয়মের ব্যাপারটা শুধু হল সে যুদ্ধ শুরু করবার একটা বেশ ভালো অজুহাত। এখন জানা যাচ্ছে, দরকার হলে বেলজিয়মের পথে সৈন্য চালিয়ে জর্মনিকে আক্রমণ করতে হবে, তার সমস্ত আটঘাট ফ্রান্সও যুদ্ধের আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল। যাই হোক, ইংলণ্ড একটা বিরাট ভেক ধরল, যেন সে ন্যায় ও সত্যের রক্ষার জন্য একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ছোটো ছোটো দেশদের সত্যকার বন্ধু; জর্মনি তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি আর সন্ধিকে ছেঁড়া কাগজের মতো তুচ্ছ করে চলেছে বলেই জর্মনির সঙ্গে তার বিরোধ। ৪ঠা আগস্ট দুপুর রাত্রে ইংলণ্ড জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল; কিন্তু তার এক দিন আগেই সে—'ব্রিটিশ অভিযানকারী সেনাদল'—নামে পরিচিত তার সেনাবাহিনীকে গোপনে ইংলিশ চ্যানেল পার করে এ পারে এনে তুলে দিয়েছিল; পাছে দেরি করলে বিঘ্ন ঘটে। কাজেই দেখছ, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যখন ভাবছে ইংলণ্ড যুদ্ধে যোগ দেবে কি দেবে না সে প্রশ্নটা তখনও অনিশ্চিত, ইংলণ্ডের সেনা তার আগেই রণক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেছে।

অস্ট্রিয়া রাশিয়া জর্মনি ফ্রান্স ইংলণ্ড, সবাই তখন যুদ্ধে নেমে গেছে; আর ছোটো দেশ সার্বিয়া তো নেমেছেই, কারণ এই যুদ্ধারম্ভের আপাত কারণ কতকটা সে নিজে। ইতালি কী করল—জর্মনি আর অস্ট্রিয়ার বন্ধু ইতালি? ইতালি চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ইতালি লক্ষ্য করে দেখতে লাগল, যুদ্ধে জিতবার সম্ভাবনা কোন্ পক্ষের বেশি; কে তাকে কতখানি দিতে রাজি আছে তাই নিয়ে দর-কষাকষি করতে লাগল সে; তার পর যুদ্ধ শুরু হবার ছ মাস পরে, ইতালি খোলাখুলিই ফ্রান্স ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করল, এতদিন যারা তার মিত্র ছিল তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াল।

১৯১৪ সনের আগস্ট মাসের প্রথম ক'টি দিনের মধ্যে ইউরোপের সমস্ত দেশের সেনারা সেজেগুজে যুদ্ধযাত্রা করল। আগের কালে সেনা বলতে বোঝাত এক দল পেশাদার সৈনিককে। তাদের চাকরি স্থায়ী চাকরি। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এ দিকেও একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন এসেছিল। বিদেশীদের আক্রমণে যখন বিপ্লব বিধ্বস্ত হয়ে যাবার উপক্রম হল তখন ফ্রান্সের সাধারণ নাগরিকদেরই বহুল সংখ্যায় সৈন্যদলে ভর্তি করে নিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। সেই থেকেই ইউরোপের সমস্ত দেশে এই প্রথা চলতি হয়ে আছে, সাধারণত যে নির্দিষ্টসংখ্যক পেশাদার এবং স্বেচ্ছাগত সৈনিক সেনাবাহিনীতে থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাদের পরিবর্তে সেনাবাহিনী গঠন করা হয় আবশ্যিক রীতিতে দলভুক্ত সৈন্য দিয়ে; অর্থাৎ এই সেনাদলে যোগ দিতে দেশের সমস্ত সমর্থ পুরুষকেই বাধ্য করা হয়। দেশের সুস্থদেহ পুরুষরা সকলেই দরকার হলে সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করবে, এই প্রথাটার জন্ম হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব থেকে। মহাদেশের সমস্ত দেশেই এই প্রথা ছড়িয়ে পড়ল; নিয়ম হল, দেশের প্রত্যেক যুবককেই দু বছর বা তার বেশি কাল ধরে সেনা-শিবিরে গিয়ে যুদ্ধ শিখতে হবে; তার পর ডাকলেই এসে সৈন্যদলে নাম লেখাতে সে বাধ্য থাকবে। কাজেই যুদ্ধে রত সক্রিয় সেনাবাহিনী বলতে বোঝাচ্ছে বস্তুত দেশের সমস্ত যুবাপুরুষকেই। ফ্রান্স জর্মনি অস্ট্রিয়া রাশিয়া সর্বত্রই এই ব্যাপার; এসব দেশে সেনা-সমাবেশ করার অর্থ দাঁড়াল, দেশের দূর দূর বিস্তৃত সমস্ত শহর এবং গ্রামের বাড়ি থেকে এই যুবকদের সকলকে ডেকে এনে একত্র করা। যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডে সমস্ত প্রজাকে সৈন্য সাজিয়ে নেবার এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ইংলণ্ডের নৌশক্তি প্রবল; তারই ভরসায় সে তার সাধারণ সেনাবাহিনী যেটা রেখেছিল তার আয়তন তেমন বড়ো নয়, তার সমস্ত সৈনিকই স্বেচ্ছাগত। যুদ্ধের সময়ে কিন্তু তাকেও বাধ্য হয়েই অন্যান্য দেশদের পন্থা অনুসরণ করতে হল; দেশে কন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন বা সকল প্রজাকে জোর করে সেনাদলে ভর্তি করার প্রথা প্রচলিত করতে হল।

এই সার্বজনীন সামরিকবৃত্তির অর্থ হচ্ছে, দেশের সমস্ত প্রজাই সৈন্য হয়ে গিয়েছে। সেনা-

সমাবেশের আদেশ প্রযোজ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শহর, গ্রাম, প্রত্যেকটি পরিবারের প্রতি। আগস্ট মাসের প্রথম ক'টি দিন ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে মানুষের জীবনযাত্রা যেন হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল; লক্ষ লক্ষ যুবাপুরুষ লক্ষ লক্ষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, আর তারা কোনো দিন সে ঘরে ফিরে গেল না। সমস্ত দেশ জুড়ে তখন খালি কুচকাওয়াজ আর সৈন্যের পদধ্বনি; সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে জনসাধারণের জয়ধ্বনি; দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসের বিপুল প্রকাশ; মানুষের হৃদয়তন্ত্রী কড়া করে বাঁধা হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আবার এসে মিশেছে খানিকটা হাল্‌কা স্ফূর্তি—পরের ক' বছরে যে নিদারুণ বিভীষিকা ইউরোপ জুড়ে নেমে এল তার কথা তখনও মানুষ কল্পনা করতে পারে নি।

সে দিন সেই দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত বন্যায় সমস্ত মানুষই যেন ভেসে গেল। সমাজতন্ত্রবাদীরা এতকাল জোরগলায় ঘোষণা করেছে, তারা আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পক্ষপাতী; মার্ক্‌স্‌বাদীরা জগতের সমস্ত শ্রমিককে ডেকে বলেছে, ধনিকতন্ত্র তোমাদের সকলেরই শত্রু, তার সঙ্গে যুঝবার জন্যে একত্র হও; এখন তারাও আর স্থির থাকতে পারল না, দেশপ্রেমের উৎকট আবেগে ধনিকদের সৃষ্ট এই যুদ্ধে যোগদান করল। এখানে সেখানে ক্বচিৎ দু-চার জন তখনও তাদের আদর্শকে আঁকড়ে রইল; তাদের ভাগ্যে জুটল সকলের ঘৃণা, বিদ্রূপ, অভিশাপ, কখনও জুটল শাস্তি। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষে সমস্ত মানুষ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। ইংলণ্ড আর জর্মানির শ্রমিকরা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল; এই দুই দেশের এবং অন্যান্য সকল দেশের পণ্ডিতরা বৈজ্ঞানিকরা অধ্যাপকরা পরস্পর গালাগালি দিতে লাগলেন, পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়ানক সব বানানো গল্প সত্য বলে মেনে নিতে লাগলেন।

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগ শেষ হয়ে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত মহিমা এবং শান্তির পথ ধরে বয়ে চলেছিল; সে স্রোত অকস্মাৎ যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে তলিয়ে গেল। প্রাচীন জগৎ বলে যাকে আমরা চিনতাম সে চিরকালের মতোই অন্তর্হিত হয়ে গেল। চার বছরেরও বেশি কাল পরে সে ঘূর্ণাবর্ত থামল, তার থেকে জন্মগ্রহণ করল একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি।

১৪৭

যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ

২৯শে মার্চ, ১৯৩৩

ভারতবর্ষের কথা অনেক দিন বলি নি। এবার আবার তার কথাই বলতে লোভ হচ্ছে—যুদ্ধ বাধবার ঠিক আগের সময়টিতে ভারতবর্ষের অবস্থা কী ছিল, সেই কথা বলবার লোভ। সে লোভটা সংবরণ করব না স্থির করেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনেরই বা আকৃতি কীরকম ছিল, সে কথা আমরা অনেকগুলো দীর্ঘ চিঠি জুড়ে আলোচনা করেছি। এই সময়কার সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারই হচ্ছে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশের আধিপত্য ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছিল এ দেশের শোষণ। পাশাপাশি তিনটি দখলকারী সেনাদল ভারতবর্ষের উপরে চেপে বসে ছিল—ব্রিটিশ সামরিকবাহিনী, শাসনবিভাগ, আর বণিক-দল। বিদেশীদের দখলকারী সেনাদল হিসাবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের অধীনে বেতনভোগী ভারতীয় সেনা—এরা তো ছিলই; কিন্তু এদের চেয়েও অনেক বেশি জোরে এ দেশকে চেপে ধরে ছিল সিভিল সার্ভিস, একটি অত্যন্ত কেন্দ্রায়িত আমলাতন্ত্র, যার উপরে এ দেশের লোকের কোনোরকম ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই। তৃতীয় বাহিনীটি, অর্থাৎ ব্রিটিশ বণিক-দল, দাঁড়িয়ে ছিল এদের দুটির উপরে ভর করে। তিনের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ বেশির ভাগ শোষণই চলত এদের দ্বারা বা এদের স্বার্থে;

এরা যে দেশটাকে শোষণ করছে সে তথ্যটাও অন্য দু দলের শোষণের মতো অত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ত না। বস্তুত বহু কাল ধরে ভারতের বড়ো বড়ো মনীষীরা অন্য দু দলের শোষণ সম্বন্ধেই বেশি আপত্তি প্রকাশ করতেন, এই তৃতীয়টিকে তেমন বৃহৎ কিছু বলে টেরই পেতেন না—এখনও খানিক পরিমাণে তাই হচ্ছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যে নীতি অনুসরণ করছিল তার একটি নিয়মিত পদ্ধতি ছিল, এ দেশে এমন কতকগুলো লোকের স্বার্থ সৃষ্টি করে দেওয়া যারা আসলে ব্রিটিশেরই সৃষ্টি; সুতরাং তারা সর্বব্যাপারে ব্রিটিশেরই মুখাপেক্ষী হবে, ভারতবর্ষে তাকেই টিঁকিয়ে রাখতে চাইবে। এইজন্যেই সামন্ত-রাজাদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে তোলা হল, বড়ো বড়ো জমিদার আর তালুকদার সৃষ্টি করা হল, ধর্মের ব্যাপারে উদারতার নাম নিয়ে সামাজিক জীবনেও রক্ষণশীল দলদেরই উস্‌কে তোলা হল। এইসমস্ত ব্যাপারে যাদের স্বার্থ জড়িত তারা নিজেরাই এই দেশের শোষণ করতে মনোযোগী ছিল, বস্তুত সেই শোষণ চলছে বলেই তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকছিল। ভারতবর্ষে এই রকমের যত স্বার্থধারী দল গড়ে তোলা হল তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল ব্রিটিশ মহাজনদের দল।

তখনকার দিনের ইংলণ্ডের একজন বড়ো রাজনীতিবিদ্ ছিলেন লর্ড স্যালিস্‌বারি; ভারত-সচিব ছিলেন তিনি। তাঁর একটি মন্তব্য বহুজনে উদ্‌ধৃত করেছেন; কথাটি আমাদের চোখ খুলে দেবার মতো, অতএব আমিও কথাটি এখানে উদ্‌ধৃত করছি। ১৮৭৫ সনে তিনি বলেছিলেন: "ভারতবর্ষের রক্ত আমাদের বার করে যখন নিতেই হবে, ছুরিটা এমনসব জায়গা বেছে ঢোকাও যেখানে অনেক রক্ত জমে রয়েছে, অন্তত যেখানে যথেষ্ট রক্তচলাচল হয়; রক্তের অভাবে যে অঙ্গগুলো আগে থেকেই দুর্বল হয়ে আছে সেখানে ছুরি বিঁধিয়ে কী হবে।"

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষ-অধিকার আর এখানে তাদের অনুসৃত নীতি, এর ফলে অনেকরকম ব্যাপারের সৃষ্টি হল যার কতকগুলো ব্রিটিশদের পছন্দসই নয়। কিন্তু কৃতকর্মের সমস্ত ফলাফলকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করবার সাধ্য ব্যক্তিদেরই থাকে না, জাতিদের তো থাকবেই না। অনেক সময়েই দেখা যায়, বিশেষ কোনো কাজের ফলে এমন কতকগুলো নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়ে গেছে যারা সেই কাজটরাই বিরোধিতা করছে, তাদের বাধা দিচ্ছে, তাকে পরাভূতই করে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদ থেকেই সৃষ্ট হয় জাতীয়তাবাদ; ধনিকতন্ত্রের ফলে বিপুল-পরিমাণ শ্রমিক কারখানাগুলিতে এসে একত্র হয়; তার পর এরাই মিলিত হয়ে ধনিকতন্ত্রী মালিকের সঙ্গে লড়াই করে। সরকার-পক্ষ যখন কোনো আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্যে বা কোনো জাতিকে দমন করবার জন্যে পীড়ন চালায়, সে পীড়নের ফলে তার শক্তি এবং সংকল্পই শুধু বেড়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত তারই ফলে সে সংগ্রামে জয়লাভ করে।

আমরা দেখেছি, ভারতে ব্রিটিশরা যে শিল্পনীতি অবলম্বন করেছিল তার ফল হল গ্রামের জনতাবৃদ্ধি; বহু লোক অন্য কাজ না পেয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেল। জমির উপরে চাপ বাড়ল; কৃষকদের জমি অর্থাৎ তাদের এক-এক জনের হাতে যে ক্ষেতখামার ছিল তার পরিমাণ আরও কমে গেল। এইসমস্ত ক্ষেতখামারের অনেকগুলোই আয়তনে এত ছোটো হয়ে পড়ল যে নেহাত বেঁচে থাকবার জন্যে যেটুকু আয় না হলে নয় সেটুকুও তা থেকে চাষি পায় না। কিন্তু তারও আর এ ছাড়া অন্য-কোনো পথ খোলা নেই, অতএব সে তখনও সেই জমি চাষ করেই চলল, আর ক্রমাগত ধারের উপর ধার করে খেতে লাগল। ব্রিটিশ সরকার যে ভূমিরাজস্ব-নীতি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে তালুকদারি আর জমিদারি -প্রথা সৃষ্টি করা হল সেখানে। এইসমস্ত অঞ্চলে, এবং যেসব অঞ্চলে প্রজাই জমির মালিক ছিল সেখানে, উভয়ত্রই সরকারকে রাজস্ব বা জমিদারকে খাজনা না দিতে পারলে সেই দায়ে কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে দেওয়া হতে লাগল। এক দিকে এই ব্যাপার, আর-এক দিকে ক্রমাগতই নূতন নূতন লোক এসে জমির উপরে চেপে বসছে; এই দুয়ের চাপে পড়ে গ্রাম-অঞ্চলে একটা বিরাট-পরিমাণ ভূমিহীন কৃষাণশ্রেণীর সৃষ্টি হল। অনেকগুলো অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষও হল, এর কথা আগেই বলেছি।

অসংখ্য লোকের হাতের জমি হাতছাড়া হয়ে গেল, এরা চাষের জন্যে জমি চায়। অথচ এদের সকলের প্রয়োজন মেটাবার মতো অত জমি নেই। জমিদারি-অঞ্চলে জমিদাররা এই সুযোগে খাজনার

হার বাড়িয়ে দিলেন। প্রজাদের রক্ষা করবার জন্যে কতকগুলো প্রজাস্বত্ব আইন ছিল, তার ফলে জমির খাজনা মূল খাজনার উপরে শতকরা একটা বিশেষ অংশের বেশি হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এইসব আইনকে নানাবিধ উপায়ে ডিঙিয়ে চলতে লাগলেন এঁরা, যতরকমে সম্ভব বেআইনি পাওনা প্রজার কাছ থেকে আদায় করা হতে লাগল। অযোধ্যার একটি তালুকদারি মহালে গিয়ে আমি একবার শুনেছিলাম, সেখানে নাকি পঞ্চাশেরও বেশি রকম বেআইনি আদায়ের ব্যবস্থা আছে! এর মধ্যে প্রধান ছিল 'নজরানা'—জমি নেবার গোড়াতেই প্রজাকে এই একটা আগাম টাকা জমা দিতে হয়। এত নানা রকমের আদায় গরিব প্রজারা দিয়ে উঠতে পারবে কেন? দিতে পারে তারা একটিমাত্র উপায়ে, বেনিয়া অর্থাৎ গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে। শোধ দেবার ভরসা বা সাধ্য যেখানে নেই সেখানে টাকা ধার করতে যাওয়াটাই বোকামি। কিন্তু সে বেচারিই বা কী করবে? আশার এতটুকু রশ্মি সে কোনো দিকে দেখতে পাচ্ছে না। যে করেই হোক চাষের জমিও তাকে জোগাড় করতেই হবে। আশা নেই জেনেও সে আশা করে, হয়তো কোনোখান দিয়ে একটা-কিছু লাভ তার এসে যাবে। এর ফল অনেক সময়েই দাঁড়ায়. এত ধারকর্জ করেও শেষ পর্যন্ত ভূস্বামীর সমস্ত পাওনা সে মিটিয়ে দিতে পারে না; কাজেই জমি থেকে আবার তাকে উৎখাত করে দেওয়া হয়. আবার সে ভূমিহীন কৃষাণের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ে।

ভূম্যধিকারী কৃষক বা অপরের প্রজা কৃষক, এবং ভূমিশূন্য কৃষাণ, সকলকেই বেনিয়ার খপ্পরে গিয়ে পড়তে হয়। তার দেনা শোধ দেবার সামর্থ্য এদের কোনো দিনই আর হয় না। যখনই একটা-কিছু আয় হয় তারা বেনিয়াকে টাকা বুঝিয়ে দেয়; কিন্তু সে টাকা সুদের হিসাবেই কাটা হয়ে যায়, আসল ঋণ যেমন তেমনি থাকে। এদের ছাল ছাড়িয়ে নেবার ব্যাপারে বেনিয়াকে বাধা দেবার ব্যবস্থাও বিশেষ-কিছুই নেই। অতএব কার্যত এরা হয়ে পড়ে তার ভূমিদাসের শামিল। একহিসাবে বলা যায়, এই গরিব প্রজারা একই সঙ্গে দুজনের ভূমিদাস—জমিদারের আর বেনিয়ার।

এ রকমের অবস্থা খুব বেশি দিন চলা সম্ভব নয়, এটা সহজেই বোঝা যায়। এমন একটা দিন আসবে যে দিন দেখা যাবে, প্রজার উপরে যত জনের যতরকম দাবি তার কিছুমাত্র পরিশোধ করবার ক্ষমতাই আর তার নেই, বেনিয়াও তাকে আর টাকা ধার দিতে রাজি নয়, জমিদারেরও কাজেই অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। এটা এমন-একটা প্রথা যার নিজের মধ্যেই ক্ষয় এবং অস্থায়িত্বের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি আমরা দেশের সর্বত্র কৃষকদের বিক্ষোভ দেখেছি; তাই থেকেই মনে হয়, এই রীতিতে এখন গলদ এসেছে. আর বেশি দিন এ টিকবে না। সত্যই যদি এর প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে এখন আর এখানে-সেখানে এক-আধটুকু জোড়াতালি দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের দেশে এখন দরকার হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন একটি ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। দোষ যা দেখা যাচ্ছে সেটা এখনকার এই ব্যবস্থাটারই দোষ; বেনিয়া বা জমিদারকে দোষ দেওয়া বৃথা।

আগের একটা চিঠিতেও এইসমস্ত কথাই তোমাকে বলেছিলাম মনে পড়ছে, তবে হয়তো একটু অন্য ভাষায়। এই কথাটাই আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় এই লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য কৃষককেই, মুষ্টিমেয় যে দু-চার জন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক আমাদের আসর জাঁকিয়ে বসে আছে তাদের নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই কথাটা মনে থাকে না।

নিজের জমি থেকে বিতাড়িত ভূমিশূন্য শ্রমিকদের এতবড়ো একটা বাহিনী দেশে ছিল বলেই বড়ো বড়ো কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়ে গেল। মাইনে নিয়ে কাজ করতে রাজি, এমন লোক যথেষ্ট পরিমাণে (তাও নয়, যথেষ্টেরও বেশি পরিমাণে) থাকলে তবেই এই রকমের কলকারখানা চালানো সম্ভব হয়। যে মানুষের একটুখানিও জমি আছে, সে সেই জমি ছেড়ে নড়তে চায় না। কাজেই কারখানা চালাতে গেলেই প্রচুর-পরিমাণ ভূমিশূন্য বেকার লোক দেশে থাকা দরকার; তেমন লোকের সংখ্যা যত বেশি থাকবে, কারখানার মালিকরাও ততই সহজে তাদের মাইনের হার কমাতে পারবে, তাদের উপরে কর্তৃত্ব চালাতে পারবে। এইজন্যেই বলেছি, যথেষ্টেরও বেশি পরিমাণ লোক থাকা দরকার।

ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষে নূতন একটি মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠল, ব্যবসায়ে খাটাবার মতো কিছু মূলধনও সঞ্চয় করে ফেলল। কাজেই টাকা এবং মজুর দুইই যখন আছে,

তখন আর কারখানা না হয়ে যায় কোথায়! কিন্তু তবুও ভারতবর্ষে যত মূলধন খাটছিল তার বেশির ভাগই ছিল বিদেশী অর্থাৎ বিলিতি। ব্রিটিশ সরকার এই কারখানাগুলোকে সুনজরে দেখতেন না। তাঁদের কথা ছিল, ভারতবর্ষ একটা নিছক কৃষিজীবী দেশ হয়ে থাকবে, ইংলণ্ডকে কাঁচা মালের যোগান দেবে, এবং ইংলণ্ডের তৈরি মাল কিনবে—ভারতবর্ষের নিজের কারখানা বসলে তার সে নীতিতে বাধা পড়ে। কিন্তু সবসুদ্ধ অবস্থাটাই তখন এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, তখন পণ্য-উৎপাদনের কল-কারখানা এ দেশে না বসেই পারে না; একে তাই ঠেকিয়ে রাখা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেও সহজ হল না। অতএব সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও বহু কারখানা গড়ে উঠল। এই আপত্তি প্রকাশের একটা উপায় হল, বাইরে থেকে যত কলকব্জা এ দেশে আসছে তার উপরে কর বসানো; আর-একটি হল তুলোর কাপড়ের উপরে উৎপাদন-কর, অর্থাৎ ভারতের কাপড়ের কলে যে কাপড় তৈরি হচ্ছে তারই উপরে কর বসানো।

ভারতবর্ষে সেই প্রথম যুগে যে শিল্পপতিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন জামশেদজি নসরওয়ানজি টাটা। তিনি অনেকরকম কারখানা তৈরি করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল টাটা আয়রন অ্যান্ড্ স্টীল কোম্পানি; বিহার-প্রদেশের সাক্‌চিতে এটি অবস্থিত। ১৯০৭ সনে এই কারখানা তৈরি করা শুরু হয়, ১৯১২ সনে এর কাজ আরম্ভ হয়। লৌহশিল্প হচ্ছে তথাকথিত 'মূল'শিল্পগুলোর মধ্যে একটি। এখনকার দিনে সমস্ত ব্যাপারেই লোহার দরকার এত বেশি যে, যে দেশের নিজের লোহার কারখানা নেই তাকে খুব বেশি পরিমাণে অন্য দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। টাটার লোহার কারখানা একটি অতি বিরাট ব্যাপার। সাকচি-গ্রামটি এখন রূপান্তরিত হয়েছে জামশেদপুর-শহরে; এর অল্প দূরেই যে রেল-স্টেশনটি তার নাম হচ্ছে টাটানগর। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে লোহার কারখানার দাম অনেক বেড়ে যায়, কারণ সে কারখানাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি হতে পারে। বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধল তখন টাটার কারখানা চালু অবস্থায় ছিল, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সেটা ভাগ্যের কথা।

ভারতের কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডের কারখানাগুলোতে যে অবস্থা দেখা গিয়েছিল ঠিক তারই মতো। বেকার ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বহু, অতএব মাইনের হার ছিল খুবই কম, খাটুনির সময়ও ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। ১৯১১ সনে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযোজ্য কারখানা-আইন তৈরি হয়। এই আইনেও খাটুনির সময় স্থির করা হয়েছিল বয়স্ক পুরুষদের পক্ষে দিনে বারো ঘণ্টা আর শিশুদের পক্ষে ছ ঘণ্টা বলে।

যত ভূমিহীন মজুর দেশে ছিল, এইসব কারখানাতে সকলের জায়গা হল না। অনেক মজুর আসাম এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে চা এবং অন্যান্য প্রকারের বাগানে খাটতে গেল। এইসব বাগানে তাদের যে নিয়মে খাটতে হত তাতে করে দেখা গেল, বাগানে যতদিন কাজ করছে ততদিন তারা বস্তুত মালিকদের ভূমিদাসই হয়ে থাকছে।

দারিদ্র্যের জ্বালায় কুড়ি লক্ষেরও বেশি ভারতীয় শ্রমিক ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল। এদের মধ্যে বেশির ভাগই গেল সিংহল আর মালয়ের বাগানে কুলি হয়ে। অনেকে আবার গেল মরিশাস্ (ভারত-মহাসাগরে, মাদাগাস্কারের কাছে,), ত্রিনিদাদ (দক্ষিণ-আমেরিকার ঠিক উত্তরে), এবং ফিজি-দ্বীপে (অস্ট্রেলিয়ার কাছে); অনেকে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব-আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ-গায়নাতে (দক্ষিণ-আমেরিকায়)। এর অনেক জায়গাতেই এরা গেল 'চুক্তিবদ্ধ' মজুর হিসাবে; তার অর্থ, তারা বস্তুত ভূমিদাসে পরিণত হল। চুক্তি মানে হচ্ছে এই মজুরদের মালিকরা যে শর্তে আবদ্ধ করল তার দলিল; এই শর্ত অনুসারে এরা একেবারেই মালিকদের ক্রীতদাসের শামিল হয়ে পড়ল। চুক্তিবন্দী-প্রথার সম্বন্ধে বহু লোমহর্ষণ কাহিনী ভারতবর্ষে এসে পৌঁছল, বিশেষ করে ফিজি থেকে। তাই নিয়ে এ দেশে আন্দোলন শুরু হল, তার ফলে এই প্রথাটিই পরে উঠে গেল।

এই গেল কৃষক মজুর আর দেশত্যাগী মজুরদের কথা। এরাই হচ্ছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ, দরিদ্র এরা, সে দারিদ্র্য নিয়ে এরা মুখ ফুটে অভিযোগও করে না; দীর্ঘ কাল ধরে এরা শুধু দুঃখ বহনই করে এসেছে। মুখ খুলে এদের হয়ে প্রতিবাদ শুরু যারা করল সে হচ্ছে নবজাত মধ্যবিত্ত-

শ্রেণী। বাস্তবিক পক্ষে ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের সংস্পর্শের ফলেই এদের জন্ম; তবু কিন্তু এরাই তার সমালোচনা শুরু করল। এই শ্রেণীটি ক্রমে বড়ো হয়ে উঠল; এদেরই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল স্বদেশী-আন্দোলন। সে আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল ১৯০৭-০৮ সালে; তখন একটা বিরাট গণ-আন্দোলন সমস্ত বাঙলাদেশটাকে তোলপাড় করে দিল; জাতীয় কংগ্রেসও ভেঙে চরমপন্থী আর নরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ব্রিটিশরা তাদের চিরন্তন কূটনীতি প্রয়োগ করল; যে দলটি আন্দোলনে অগ্রণী তাকে বিচূর্ণ করতে লেগে গেল, আর দু-চারটে ছোটোখাটো সংস্কার-সাধন করে নরমপন্থী দলকে হাত করে নিতে চেষ্টা করল। ঠিক এই সময়েই আরও একটা নূতন জিনিসের আবির্ভাব হল; মুসলমানরা দাবি তুলল, সংখ্যালঘুসম্প্রদায় হিসাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের জন্যে পৃথক এবং বিশেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এ কথা এখন সকলেই জেনে ফেলেছে যে, তখনকার দিনে এদের এই দাবিকে সরকারপক্ষই উস্‌কে তুলছিলেন; তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবে ভারতীয়দের মধ্যেই একটা দলাদলি সৃষ্টি করা এবং জাতীয়তাবোধ বেড়ে ওঠবার পথে বাধা সৃষ্টি করা।

তখনকার মতো ব্রিটিশ সরকারের এইসব ফিকির-ফন্দি কিছুটা সফলও হল। লোকমান্য তিলক তখন জেলে। তাঁর দলকেও পীড়নের চোটে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসনব্যবস্থার খানিকটা সংস্কার-সাধন করা হয়েছে, (তখনকার ভাইস্‌রয় এবং ভারতসচিবের নামে এর নামকরণ হয়েছিল 'মর্লি-মিণ্টো'র শাসন-সংস্কার), তাতে ভারতীয়দের হাতে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি; কিন্তু নরমপন্থীরা তাকেই অত্যন্ত আগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছেন। এর কিছুদিন পরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে দেওয়া হল; বাঙলাদেশের মনও কিছুটা শান্ত হল। ১৯০৭ সন থেকে শুরু করে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেশে চলছিল সেটা আবার বড়োলোকদের অবসর কাটাবার শখের বস্তু হয়ে উঠল। সুতরাং ১৯১৪ সনে যখন যুদ্ধ বাধল, ভারতবর্ষে তখন সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা ব'লে বিশেষ কিছু নেই। জাতীয় কংগ্রেস তখন শুধু নরমপন্থীদেরই প্রতিষ্ঠান; বছরে তার একটা করে অধিবেশন হয়, দুটো-চারটে পুঁথি-পড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, সারা বছর ধরে আর কিছুই সে করে না। জাতীয়তাবাদের গাঙে তখন ভাটা লেগেছে।

রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য-সংশ্রবের ফলে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। নবজাত মধ্যবিত্তশ্রেণীদের (জনসাধারণের নয়) ধর্মবিশ্বাসে নাড়া লাগল; ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতি নূতন নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হল, জাতিভেদ-প্রথারও কড়াকড়ি অনেক কমে এল। সংস্কৃতির একটা নূতন জাগরণ এল দেশে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে। বাঙালি লেখকরা বাংলা ভাষাকে ভারতে সমস্ত আধুনিক ভাষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ করে তুললেন; বাঙলাদেশেই এ যুগের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের আবির্ভাব হল। ইনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইনি আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।* বহু বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকেরও জন্ম হল বাঙলাদেশে, সার্‌ জগদীশচন্দ্র বসু, সার্‌ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি। আরও দু'জন বড়ো ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম আমি এখানে করতে পারি—একজন হলেন রামানুজম্‌ ও অন্যজন—সার্‌ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। এ'দের সকলেরই নাম পৃথিবীময় প্রসিদ্ধ। কাজেই দেখছ, যে বস্তুর জোরে ইউরোপ বড়ো হয়ে উঠেছিল সেই বিজ্ঞানের সাধনায়ও ভারতবর্ষ তার উৎকর্ষতা প্রমাণ করছিল।

এইখানে আরও একজন লোকের নাম আমি করব—সার মহম্মদ ইক্‌বাল। উর্দুতে এবং বিশেষ করে ফার্শি ভাষার একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন ইনি। ইনি অনেকগুলো অতি সুন্দর স্বদেশী কবিতা লিখেছেন। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ ইনি কবিতা লেখা একেবারে ছেড়েই দিয়েছেন, অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

যুদ্ধের আগের ক'বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা ঝিমিয়ে পড়েছিল, অথচ এই সময়েই অনেক দূরের একটা দেশে ভারতের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে একটা বীরোচিত এবং আশ্চর্য

* ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কবিগুরুর মৃত্যু হয়।

সংগ্রাম চলছিল। দেশটি হচ্ছে দক্ষিণ-আফ্রিকা; বহু ভারতীয় শ্রমিক এবং কিছু-সংখ্যক ভারতীয় বণিক সেখানে গিয়ে বাস স্থাপন করেছিল। এদের নানাবিধ উপায়ে অপমান এবং উৎপীড়ন করা হত, কারণ সে দেশে জাতিগত দ্বেষবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। দৈবক্রমে একজন তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টারকে একটি মামলা চালাবার জন্যে দক্ষিণ-আফ্রিকাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর স্বজাতীয়দের দুরবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত অপমানিত এবং দুঃখিত বোধ করলেন। স্থির করলেন, তাঁর সাধ্যে যতখানি কুলোয়, তিনি এদের সাহায্য করবেন। বহু বছর ধরে তিনি নিঃশব্দে কাজ করে চললেন, নিজের পেশা এবং বিত্তসম্পত্তি যা-কিছু ছিল সমস্ত ছেড়ে দিলেন, যে ব্রত জীবনে গ্রহণ করেছেন নিজেকে তারই জন্যে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিলেন। এই লোকটির নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। আজ ভারতের প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত তাঁর নাম জানে, তাঁকে ভালোবাসে; কিন্তু তখনকার দিনে দক্ষিণ-আফ্রিকার বাইরে তাঁর নামও বড়ো কেউ জানত না। তার পর হঠাৎ একদিন তাঁর নাম বিদ্যুতের মতো ভারতের কানে এসে পৌঁছল; তাঁর নাম আর তাঁর বীরোচিত সংগ্রামের কথা বলতে এ দেশের লোকের বুক বিস্ময়ে আনন্দে গর্বে ভরে উঠল। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার সেখানকার ভারতীয় বাসিন্দাদের অবস্থা আরও হীন করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের এই বন্ধুর নেতৃত্বে তারা সে হীনতা স'য়ে নিতে অস্বীকার করল। দরিদ্র পদদলিত নিরক্ষর শ্রমিক আর ক্ষুদ্র বণিক, নিজের দেশ থেকে বহু দূরে থেকেও এরা এমন বীরের মতো বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটেই হল একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার। তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল তাদের সে যুদ্ধের প্রণালীটা। যে প্রণালী তারা অবলম্বন করল সে অতি অপূর্ব, জগতের ইতিহাসে রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে তার ব্যবহার আর কেউ কখনও করে নি। তার পর থেকে এর নাম আমরা অনেক শুনেছি, এই হচ্ছে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ, এর অর্থ সত্যকে আঁকড়ে ধ'রে থাকা। অনেকে একে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বলেন, কিন্তু সেটা এর যথার্থ অনুবাদ নয়, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ সক্রিয় চেষ্টা আছে। শুধু অ-প্রতিরোধও এটা নয়, যদিও অহিংসা বা আঘাত-না-করা এর একটা বড়ো অংগ। এই অহিংস সংগ্রাম সৃষ্টি করে গান্ধীজি ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাতে একটা বিস্ময়ের চমক এনে দিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে আমাদেরই স্বদেশবাসী হাজার হাজার পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড বরণ করে নিল, তাদের কথা শুনে ভারতের জনসাধারণ গর্বে এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমাদের নিজের দেশে আমরা পদানত এবং অক্ষম হয়ে রয়েছি, সে কথা স্মরণ করে আমরাও লজ্জায় মরে গেলাম; আমাদেরই জাতভাইদের তরফ থেকে অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতবড়ো একটা যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জেনে আমাদেরও আত্মসম্ভ্রমবোধ বেড়ে উঠল। এই ব্যাপার নিয়েই অকস্মাৎ ভারতের রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠল; ভারতবর্ষ থেকে জলস্রোতের মতো অর্থসাহায্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাঠানো হতে লাগল। অবশেষে গান্ধীজি এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে সে সংগ্রাম থামল। তখনকার মতো ভারতীয়রাই জয়লাভ করল তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ভারতীয়দের যেসব অভাব-অভিযোগ ছিল তার অনেকগুলো আজও পর্যন্ত টিঁকে রয়েছে; তখন যে চুক্তি হয়েছিল, শোনা যায়, তারও অনেক শর্ত দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার পালন করেন নি। বিদেশস্থ ভারতবাসীদের সমস্যা আজও আমাদের সামনে জীবন্ত; ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন না হচ্ছে ততদিন সে সমস্যাও বেঁচেই থাকবে। নিজের দেশেই যখন ভারতবাসীদের মানমর্যাদা নেই, বিদেশে গিয়ে মর্যাদা তারা পাবে কী করে? আর আমরাই বা তাদের বিশেষ সাহায্য করব কী করে, যতক্ষণ আমরা নিজের দেশেই নিজেকে স্বাধীন করে নিতে না পারছি।

যুদ্ধের আগে এই ছিল ভারতের অবস্থা। ১৯১১ সনে ইতালি তুরস্ক আক্রমণ করল। ভারতবর্ষে তখন তুরস্কের প্রতি প্রবল সহানুভূতি দেখা দিল, কারণ তুরস্ক এশিয়ার এবং প্রাচ্য-অঞ্চলের দেশ, অতএব সব ভারতবাসীরা তার শুভ কামনা করত। বিশেষ করে বিচলিত হয়ে উঠলেন ভারতের মুসলমানরা; তাঁরা তুরস্কের সুলতানকেই খলিফা বা ইসলামের ধর্মগুরু ব'লে জানতেন। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদের প্রবর্তিত প্যান-ইস্‌লামের কথাও তখনকার দিনে চলতি ছিল। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সনে বল্‌কান-অঞ্চলে যুদ্ধ হল; ভারতের মুসলমানও এতে

আরও বেশি বিচলিত হয়ে উঠলেন; তাঁদের সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ, যুদ্ধে আহত তুর্কি সেনাদের সেবা করবার জন্যে একটি চিকিৎসক-দল ভারতবর্ষ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল, এর নাম ছিল রেড ক্রিসেন্ট মিশন।

তার পরই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল; সে যুদ্ধে তুরস্ক যোগ দিল ইংলন্ডের বিপক্ষ হিসাবে। কিন্তু সেটা যুদ্ধের সময়কার কাহিনী। এবার আমি এইখানেই থামব।

১৪৮

যুদ্ধ : ১৯১৪-১৯১৮

৩১শে মার্চ, ১৯৩৩

এই যুদ্ধের কথা আমি কী লিখব তোমাকে; এই বিশ্বযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধ, চার বছরেরও বেশি কাল ধ'রে যে সমস্ত ইউরোপকে এবং এশিয়া আর আফ্রিকার বহু স্থানকে শ্মশানে পরিণত করল, লক্ষ লক্ষ যুবককে তাদের প্রস্ফুট যৌবনেই নিশ্চিহ্ন করে মুছে নিয়ে গেল? যুদ্ধের কথা ভাবতে তো আরাম লাগে না! অতি কুৎসিত ব্যাপার এটা। তবুও অনেকসময়েই আমরা তাকে প্রশংসা করি, তার চিত্র অতি উজ্জ্বল রঙে অঙ্কিত করে দেখাই; বলি, ধাতু যেমন আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ হয়, আরামে আর বিলাসে জীবন যাপন করে করে যে জাতির মানুষেরা দুর্বল এবং নীতিহীন হয়ে পড়েছে, যুদ্ধের আগুনে পুড়ে সেই নিরুদ্যম জাতিরাও আবার পবিত্র এবং শক্তিমান হয়ে ওঠে। দুর্দমনীয় বীরত্ব আর মনোমুগ্ধকর আত্মোৎসর্গের কত উদাহরণ দেখাই, যেন যুদ্ধ থেকেই এই গুণগুলো জন্মলাভ করেছে!

এই যুদ্ধ কেন বেধেছিল, তার কতকগুলো কারণ আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি; বলেছি কীরকম করে ধনিকতন্ত্রী শিল্পজীবী দেশদের ধনলোভ, সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সংঘাতের সৃষ্টি হল এবং যুদ্ধও অপরিহার্য হয়ে উঠল। বলেছি কীভাবে এর প্রত্যেক দেশেরই বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা ক্রমাগতই তাঁদের শোষণ কার্য চালাবার মতো নূতন নূতন সুযোগ আর স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন; মহাজনরা আরও বেশি বেশি টাকা আয় করতে চাইল, রণসজ্জা-নির্মাতারা আরও বেশি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। অতএব এই ব্যক্তিরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এ'দের আদেশে এবং এ'দেরই প্রতিনিধিস্থানীয় দেশের প্রবীণ রাজনীতিকদের নির্দেশে প্রত্যেক দেশ পরস্পরকে হত্যা করতে মেতে উঠল। যেসব কারণে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তার সম্বন্ধে এই যুবকদের অধিকাংশই কিছু জানত না, সমস্ত দেশেরই সাধারণ লোকেরাও সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। বস্তুত এ যুদ্ধ তাদের ভালোর জন্যে নয়; যুদ্ধে হার হোক বা জিত হোক, তাদের ভাগ্যে এতে লোকসানই লেখা রয়েছে। এটা হচ্ছে একান্তই বড়োলোকদের একটা খেলা; সাধারণ লোকদের জীবন, বিশেষ করে যুবকদের জীবনকে তারা সে খেলার ঘুঁটি করে নিয়েছিল। কিন্তু তবুও জনসাধারণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হলে যুদ্ধ চলতে পারে না। আমি তোমাকে বলেছি, ইউরোপ মহাদেশের সকল দেশে কন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন বা জোর করেই সকল প্রজাকে সৈন্য বানিয়ে নেওয়ার প্রথা ছিল না, সেটা এল আরও পরে, যুদ্ধ চলতে চলতে। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রের হুকুম বা জবরদস্তি দিয়েও সমস্ত লোককে এভাবে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা যায় না, যদি তারা নিজেরা সত্যই যুদ্ধ করতে মোটামুটি অনিচ্ছুক থাকে।

অতএব সমস্ত যুদ্ধরত দেশেই জনসাধারণের উদ্যম এবং দেশপ্রেমকে উত্তেজিত ক'রে তোলবার বিপুল আয়োজন করা হল। দুই পক্ষই অপর পক্ষকে 'আক্রমণকারী' বলে অভিহিত করতে লাগল; এমন ভাব দেখাল যেন তারা নিজেরা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করবার জন্যেই অস্ত্রধারণ

করেছে। জর্মানি বলল তার চার দিকেই শত্রুর দল তাকে ঘিরে রয়েছে, তাকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করছে। বলল, দোষ ফ্রান্স আর রাশিয়ার, তারাই গায়ে প'ড়ে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। ইংলন্ড তার আচরণের সাফাই দিল ক্ষুদ্র বেলজিয়মের রক্ষা-রূপ সৎকার্যের দোহাই দিয়ে—সে বেচারী নিরপেক্ষ দেশ অথচ জর্মানি বর্বরের মতো এসে তাকে আক্রমণ করেছে, এ কী কখনও চোখ চেয়ে দেখা যায়! যুদ্ধে যত দেশ নেমেছিল সকলেই নিজেকে অতি সজ্জন ব'লে প্রচার করল, সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল শত্রুপক্ষের ঘাড়ে। প্রত্যেক দেশেরই জনসাধারণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হল, তাদের স্বাধীনতা একান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে যদি রক্ষা করতে চায় তো তাদের যুদ্ধ না ক'রে উপায় নেই। বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলি খুব তোড়জোড় ক'রে সমস্ত জায়গাতে এই যুদ্ধের পরিবেশ গড়ে তুলল, তার মানে প্রজাদের মনে শত্রু-দেশদের সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি ক'রে দিল।

এই উন্মত্ততার বন্যা এত প্রবল হয়ে উঠল যে তার বেগে আর সমস্ত-কিছুই ভেসে চলে গেল। অজ্ঞ জনতার মনে হুজুগ আর আবেগ ফেনিয়ে তোলা শক্ত নয়; কিন্তু বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান লোকেরাও এই নেশায় মেতে উঠলেন। কি পুরুষ কি নারী, যে-সব লোককে সাধারণত ধীর এবং স্থির বুদ্ধি-সম্পন্ন বলে মনে করা হয়—দার্শনিক লেখক অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক—যুদ্ধরত সমস্ত দেশের এইরকম লোকরাও সকলেই যেন ভালোমন্দের জ্ঞান হারিয়ে রক্তের পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, শত্রু জাতির লোকদের প্রতি দ্বেষে জ্বলে মরতে লাগলেন। পাদ্রিসাহেবরা ধর্মের সেবক, তাঁদের আমরা মনে করি শান্তির উপাসক; তাঁরাও অন্যদের মতোই কিংবা হয়তো অন্যদের চেয়েও বেশি রক্তপিপাসু হয়ে উঠলেন। এমনকি যুদ্ধবিরোধী এবং সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁদেরও মাথা ঠিক রইল না, তাঁরাও সকলেই তাঁদের সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে বসলেন। সকলেই—কিন্তু একেবারে সকলে নয়। প্রত্যেক দেশেই অতি সামান্য দু'চারজন লোক ছিলেন যাঁরা এই হুজুগের নেশায় মেতে উঠতে রাজি হলেন না, এই যুদ্ধের উন্মাদনা থেকে নিজেদের সংযত করে রাখলেন। দেশের লোকেরা তাঁদের টিটকারি দিল, কাপুরুষ ব'লে ঘৃণা করল, যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি হন নি এই অপরাধে এ'দের অনেককে জেলে পর্যন্ত পাঠানো হল। এ'দের অনেকে ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী, অনেকে আবার ছিলেন যাজকশ্রেণীভুক্ত, যেমন 'কোয়েকার'রা—যুদ্ধ বস্তুটার সম্বন্ধেই এ'দের নৈতিক আপত্তি আছে। একটা কথা আছে, আজকালকার দিনে যখন যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধরত জাতিদের সমস্ত মানুষ একেবারে পাগল হয়ে যায়—অতি সত্য কথা।

যুদ্ধ শুরু হতেই সমস্ত দেশের সরকারপক্ষ যুদ্ধের দোহাই দিয়ে সত্যকে গোপন করতে এবং যতরকমে সম্ভব মিথ্যা কথা প্রচার করতে লেগে গেলেন। সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত অধিকার-গুলোকেও খর্ব করে দেওয়া হল। অপর পক্ষের বক্তব্যটাকে একেবারেই তাদের কাছে পৌঁছতে দেওয়া হল না। কাজেই সাধারণ লোকেরা শুনতে লাগল ব্যাপারটার মাত্র এক তরফের কাহিনী; সে কাহিনী অত্যন্তরকম বিকৃত; অনেক সময়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানানো। এর ফলে জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে রাখাও খুব শক্ত হল না।

যুদ্ধ যখন শুরু হয় নি তখনও এইসব সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদীদের প্রচারবাণী আর সংবাদপত্রের মিথ্যা বার্তা প্রচারের দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করে যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। যুদ্ধ ব্যাপারটাকেই খুব মহৎ বস্তু বলে বর্ণনা করা হত। জর্মানিতে, বা ঠিক বলতে গেলে প্রাশিয়াতে, তো যুদ্ধকে এইভাবে বৃহৎ আদর্শ ক'রে তোলাই ছিল স্বয়ং কাইজার থেকে শুরু করে সমস্ত শাসন-কর্তৃপক্ষদের একেবারে ব্রতবিশেষ। পণ্ডিতরা বড়ো বড়ো বই লিখে প্রমাণ করলেন, যুদ্ধ অতি উচিত কাজ, একটা 'জৈবিক প্রয়োজন' অর্থাৎ মানুষের জীবনকে এবং প্রগতিকে চালু রাখবার জন্যেই যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কাইজারের নাম বিখ্যাত হয়ে গেল, কারণ তিনি সর্বদাই নিজেকে লোকচক্ষুর সামনে ধরে রাখতেন। ইংলন্ড এবং অন্যান্য দেশেও অবশ্য সামরিক এবং অন্যান্য দলের উচ্চস্তরের লোকদের এই রকমেরই সব ধ্যানধারণা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে যে-সমস্ত বড়ো লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, রাস্কিন তাঁদের অন্যতম। গান্ধীজি

ই উ রো প ১৯১৮
মস্কো
সো ভি য়ে ট
ব্রেস-লিটোভস্ক
জ র্ম নি
ই উ ক্রে ন
ফ্রা ন্স
অ স্ট্রি য়া
রুমানিয়া
বুলগেরিয়া
স্যালোনিকা
তু র স্ক
বাগদাদ
প্যালেস্টাইন
শান্তিচুক্তির পূর্বে মিত্রশক্তি-অধিকৃত ভূখণ্ড
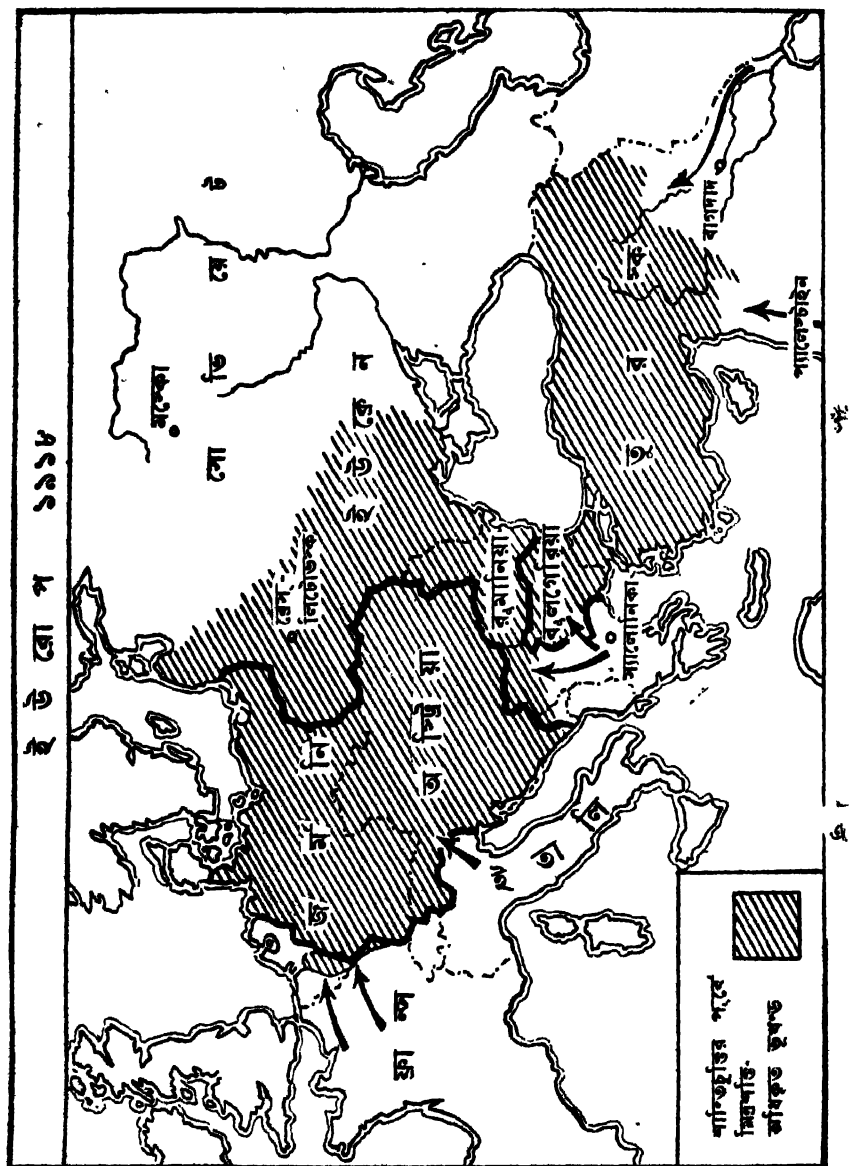
তাঁর বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। তুমিও সম্ভবত তাঁর কিছু কিছু বই পড়েছ। এই লোকটির মানসিক মহত্ত্বের সম্বন্ধে কারও সংশয় নেই; তাঁর একটি বইতে তিনি লিখেছেন :

"সংক্ষেপে বলতে পারি, আমি ইহাই দেখেছি, সমস্ত বড়ো জাতিই তাদের বাক্যের সত্যতা এবং চিন্তার দৃঢ়তা যুদ্ধের সময়ে শেখে এবং শান্তির সময়ে হারিয়ে ফেলে; যুদ্ধে তারা শিক্ষালাভ করে, শান্তিতে তারা প্রবঞ্চিত হয়; যুদ্ধে তাদের কর্মে দীক্ষা হয়, শান্তির সময়ে সে দীক্ষা তারা ভুলে যায়। এক কথায়, যুদ্ধে তাদের জন্ম এবং শান্তিতে তাদের মৃত্যু ঘটে।"

রাস্‌কিন ছিলেন স্পষ্টভাষী সাম্রাজ্যবাদী; তাঁর লেখা থেকে আর-একটি জায়গা আমি উদ্‌ধৃত করছি, তা থেকে তুমি তার পরিচয় পাবে।

"তাকে (ইংলণ্ডকে) এই করতে হবে, অন্যথা সে বিনষ্ট হবে। তাকে বহু উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে......যেখানে যতটুকু উর্বর জনশূন্য ভূমি তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব, সমস্তই দখল করতে হবে, সেখানে তার উপনিবেশবাসীদের শেখাতে হবে যে, তাদের প্রথম...... লক্ষ্যই হচ্ছে জলে স্থলে ইংলণ্ডের শক্তি সর্বতোভাবে বাড়িয়ে তোলা।"

আরেকটি বই থেকে খানিকটা জায়গা উদ্‌ধৃত করছি। এই বইটি একজন ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর লেখা, ইনি ব্রিটিশ সেনার একজন মেজর-জেনারেল হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "জেনেশুনে ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা আচরণ করা, বা ধাপ্পাবাজি ছাড়া" যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব। এ'র মতে, দেশের যে লোক "এই-সকল কাজ করতে অস্বীকৃত হয় সে......জেনেশুনেই নিজের সহকর্মী এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে",......এবং "তাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না।" "সুনীতি, দুর্নীতি—বড়ো বড়ো জাতিদের পক্ষে কী মূল্য আছে এদের, যখন তাদের ভাগ্য নিয়েই জুয়োর দান চলেছে?" জাতিকে "আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে, যে পর্যন্ত না তার শত্রুর একেবারে মর্মস্থল বিদ্ধ হয়।" আশ্চর্য হয়ে ভাবি, রাস্‌কিন এ'র লেখা পড়লে কী বলতেন! এ কথা অবশ্য মনে কোরো না যে এই কথাগুলোই ইংরেজ জাতির মনোবৃত্তির নির্ভুল নমুনা, বা কাইজার যেসব বড়ো বড়ো কথা বলে আস্ফালন করতেন সেইগুলোই জর্মানির সাধারণ লোকের মনের কথা। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, এই রকমের কথা যারা ভাবে দেশের কর্তৃত্ব অনেক সময়েই থাকে তাদেরই হাতে; এবং যুদ্ধের সময় এ'রাই দেশের মুখ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, এর ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায় না।

সাধারণত এত খোলাখুলি সত্য কথা লোককে না শুনিয়ে যুদ্ধ-ব্যাপারটাকেই একটা ধর্মানুষ্ঠানের ছদ্মবেশ পরিয়ে দেওয়া হয়। ইউরোপে এবং অন্যত্র শত শত মাইল-ব্যাপী রণক্ষেত্র জুড়ে যখন বিপুল হত্যাকাণ্ড চলেছে, প্রত্যেক দেশের মধ্যে তখন বড়ো বড়ো শ্রুতিমধুর বচন তৈরি করা হচ্ছিল, তাই দিয়ে নরহত্যাকে সমর্থন আর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রাখা হচ্ছিল। সে যুদ্ধ করা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা আর মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, "যুদ্ধ শেষ করবার জন্যে", গণতন্ত্রকে নিরাপদ করবার জন্যে, ছোটো ছোটো জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতার ব্যবস্থা করবার জন্যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মহাজনরা, শিল্পপতিরা, যুদ্ধোপকরণ নির্মাতারা যাঁরা ঘরে বসে ছিলেন এবং খাঁটি দেশপ্রেমের বশে এইসব চমৎকার বুলি আউড়ে দেশের যুবকদের যুদ্ধের দাবানলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করছিলেন, তাঁদের অনেকেই সারাক্ষণ প্রকাণ্ড লাভ পিটে নিচ্ছিলেন, লক্ষপতি কোটিপতি হয়ে যাচ্ছিলেন।

মাসের পর মাস বছরের পর বছর যুদ্ধ গড়িয়ে চলল, ক্রমেই আরও নূতন নূতন দেশ এর আবর্তে এসে পড়তে লাগল। দুই পক্ষই গোপনে ঘুষের লোভ দেখিয়ে নিরপেক্ষ দেশদের নিজের পক্ষে টানতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রকাশ্যভাবে অবশ্য সে কথা তারা বলত না, বললে ঘরের চালে দাঁড়িয়ে যেসব মস্ত মস্ত আদর্শ আর বড়ো বড়ো বুলি কপ্‌চে এরা চীৎকার করছিল তার শেষ হয়ে যাবে। জর্মানির তুলনায় ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের ঘুষ দেবার সংস্থান বেশি ছিল, কাজেই নিরপেক্ষরা যারা পরে যুদ্ধে যোগ দিল তাদের বেশির ভাগই গেল ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রাশিয়ার পক্ষে। জর্মানির পুরোনো বন্ধু ছিল ইতালি, তাকে এই মিত্রপক্ষ হাত করে

নিল একটি গোপন সন্ধি ক'রে; সে সন্ধিতে এশিয়া-মাইনরে এবং অন্যত্র অনেকগুলি জায়গা ইতালিকে দিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আর-একটি গোপন সন্ধি করে এরা রাশিয়াকে ভরসা দিল, কন্স্টান্টিনোপ্ল্ তাকেই ছেড়ে দেবে। সমস্তটা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে এইভাবে ভাগাভাগি করে নেওয়া বেশ আরামের কাজ সন্দেহ নেই। মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রনেতারা প্রকাশ্যে যেসব বিবৃতি প্রকাশ করছিলেন, এই গোপন সন্ধিগুলোর কথা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রাশিয়াতে বল্শেভিকরা যখন শাসনক্ষমতা হস্তগত করল তখন তারা এই-সব গোপন সন্ধির কথা প্রকাশ করে দিল; তা নইলে হয়তো এদের কথা কেউ কোনোদিন জানতেই পেত না।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মিত্রপক্ষের (আমি ইংরেজ ও ফরাসিদের পক্ষটাকে সংক্ষেপে মিত্রপক্ষ বলেই উল্লেখ করব) দলে পুরো এক ডজন বা তার চেয়েও বেশি দেশ এসে জুটেছে। এই দলে ছিল ব্রিটেন এবং তার সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, সার্বিয়া, জাপান, চীন, রুমানিয়া, গ্রীস এবং পর্তুগাল। (আরও হয়তো একটা-দুটো নাম ছিল, ঠিক মনে নেই)। জর্মানির দিকে ছিল জর্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক এবং বুল্গেরিয়া। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিল যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে। তার কথা আপাতত ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, জর্মনদের তুলনায় মিত্রপক্ষের সহায়-সম্বল ছিল অনেক বেশি। তাদের হাতে লোক বেশি, অনেক বেশি টাকা, অস্ত্রশস্ত্র রণসজ্জা তৈরি করবার অনেক বেশি কারখানা। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, সমুদ্রে তাদেরই আধিপত্য। কাজেই পৃথিবীর সমস্ত নিরপেক্ষ দেশ থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। সমুদ্রপথ হাতে ছিল বলেই মিত্রপক্ষ যুদ্ধের সরঞ্জাম বা খাদ্য আমদানি করতে পারছিল, আমেরিকা থেকে টাকা ধার করতে পারছিল। জর্মানি আর তার মিত্রদের সে সুবিধা নেই, তাদের চার দিকে ঘিরে রয়েছে শত্রুদের দেশ; জর্মানির মিত্ররাও নিজেরাই দুর্বল দেশ, খুব বেশি সাহায্য দেবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। অনেক সময় বরং তারাই হয়ে উঠেছে জর্মানির বোঝা, জর্মানিকেই ঠেক্নো দিয়ে তাদের খাড়া করে রাখতে হয়েছে। কাজেই যুদ্ধ বস্তুত হচ্ছিল একা জর্মানির সঙ্গে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সম্মিলিত শক্তির। সকল দিক থেকেই এটাকে একটা অত্যন্ত অসমান বিরোধ বলে মনে হয়। অথচ জর্মানিই চার-চারটা বছর ধরে সমস্ত পৃথিবীকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে রাখল, বারংবার যুদ্ধে চরম জয়েরই অত্যন্ত কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। বছরের পর বছর ধরে কোন্ পক্ষের জয় হবে সেটা অতিশয় অনিশ্চিত ছিল। একটিমাত্র জাতির পক্ষে এটা কম বাহাদুরির ব্যাপার নয়; জর্মানি যে অপূর্বসুন্দর সামরিক শক্তি গ'ড়ে তুলেছিল শুধু তার দরুনই এটা সম্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন জর্মানি এবং তার মিত্ররা সত্যই পরাজিত হল তখন জর্মন সেনা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এবং তার অনেকখানি অংশই রয়েছে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে।

মিত্রপক্ষের দিকে যুদ্ধের ধাক্কাটা গেল ফরাসি সেনার উপর দিয়ে; ফরাসিরাই প্রচণ্ড-পরিমাণ যুবক-প্রাণ আহুতি দিয়েও জর্মন বাহিনীর দুর্ধর্ষ অভিযানকে ব্যাহত করল। ইংলণ্ড বেশির ভাগ সাহায্য দিল তার সামুদ্রিক আধিপত্য আর নৌসেনা দিয়ে, আর তার কূটকৌশল এবং প্রচারকার্য দিয়ে। জর্মানি তার সেনার বল নিয়েই গর্বিত; নিরপেক্ষ দেশদের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রচারকার্য চালানোর ব্যাপারে সে একেবারেই সাদাসিধা পথে চলত। যুদ্ধের সময়ে মিথ্যা কথা এবং বিকৃত সত্য কথা প্রচারের নিপুণ এবং নিখুঁত ব্যবস্থার বাহাদুরি ইংলণ্ড যতখানি দেখিয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশই তা পারে নি এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। রাশিয়া, ইতালি, এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য দেশরা যুদ্ধে যেটুকু অংশ নিয়েছে সে এদের তুলনায় অনেক অল্প; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। অথচ সমস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সইতে হয়েছিল বোধ হয় রাশিয়াকে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে এসে যোগ দিল, জর্মানিকে পরাভূত করবার ব্যাপারে সেই এসে শেষ ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করল।

যুদ্ধের প্রথম ক'মাস ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে দারুণ মন-কষাকষি চলেছিল, এদের মধ্যে যুদ্ধ বাধবে এমন জল্পনাকল্পনাও শোনা গেছে। ইংলণ্ডের সন্দেহ ছিল, আমেরিকার

জাহাজে করে জর্মনিতে মালের জোগান যাচ্ছে, অতএব সে সমুদ্রপথে আমেরিকার জাহাজ-চলাচলে বাধা দিতে গেল—তাই নিয়েই বিবাদের উৎপত্তি। তার পরেই কিন্তু আবার ব্রিটেনের প্রচার-বিভাগ তৎপর হয়ে উঠল। আমেরিকাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দলে টানবার জন্যে বিশেষরকম চেষ্টাচরিত্র শুরু করল। প্রথম কাজই তারা শুরু করল জর্মনদের নৃশংসতার খবর প্রচার; জর্মন সেনা বেলজিয়মে কী ভয়ানক অত্যাচার করেছে তার সম্বন্ধে অতি লোমহর্ষক সব গল্প সর্বত্র রটানো হতে লাগল। একে নাম দেওয়া হল জর্মন হূনদের 'ভয়ানকত্ব'। এই গল্পের মধ্যে অল্প দু-চারটায় হয়তো মূলে কিঞ্চিৎ সত্য ছিল, যেমন লুভেনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুস্তকাগার-ধ্বংস। কিন্তু অধিকাংশ গল্পই ছিল নিছক বানানো। এর মধ্যে একটি আশ্চর্য গল্প ছিল, জর্মনরা নাকি একটি মৃতদেহের কারখানা চালাচ্ছিল! অথচ দুই শত্রুপক্ষের মানুষদের মনে পরস্পরের প্রতি এমন বিদ্বেষ তখন জেগে উঠেছে যে, যে-কোনো কথাই ব'লে তাদের বিশ্বাস করানো যেত।

আমেরিকাতে ব্রিটেন যে যুদ্ধসংক্রান্ত মিশন পাঠিয়েছিল তাতে ছিল পাঁচ শো কর্মচারী এবং দশ হাজার সহকারী। এই থেকেই বুঝবে, ব্রিটেনের প্রচারব্যবস্থার আয়তন কী বিপুল ছিল! এও তো গেল সরকারি হিসাবে; এ ছাড়াও বিরাট-পরিমাণ বেসরকারি কাজ চালানো হত। এই প্রচারকার্য চালাবার জন্য ন্যায় বা অন্যায় সকলপ্রকার পন্থাই অবলম্বন করা হত। সুইডেনের স্টক্‌হল্‌ম্‌ শহরে ব্রিটিশরা সরকারি তরফ থেকেই একটি ইংরেজি নাট্যশালা খুলল, সেখানে নানারকম সংগীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হল। সুইড্‌দের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে তো!

এই প্রচারব্যবস্থা আর জর্মন সাবমেরিনের অভিযান (এর কথা আমি পরে তোমাকে আরও বলব), অনেকটা এদের জন্যই আমেরিকা মিত্রপক্ষে এসে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো কারণ অবশ্য ছিল টাকার লেনদেন।

যুদ্ধটা টাকা-খরচের ব্যাপার, অতি ভয়ানকরকম টাকা খরচ হয় এতে। পাহাড়প্রমাণ মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজন হয় এতে, তার ফলে দেখা যায় শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। ও দিকে আবার যুদ্ধের সময় দেশের অর্থ এবং পণ্য-উৎপাদনের কাজ প্রায় সমস্তই যায় বন্ধ হয়ে; মানুষরা তাদের সমস্ত-খানি উদ্যম নিয়ে ধ্বংসের কাজেই মেতে ওঠে। এত টাকার দরকার, সে টাকা আসবে কোথা থেকে? মিত্রপক্ষের কথাই প্রথম ধরা যাক। এদের মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ড আর ফ্রান্সেরই অবস্থা সচ্ছল ছিল বলা যায়। নিজেরা যে যুদ্ধ করছিল শুধু তারই ব্যয় বহন করছিল না তারা, টাকা ধার দিয়ে মালমশলা ধার দিয়ে তাদের মিত্রদেরও অনেকখানি ব্যয় মিটিয়ে দিচ্ছিল। কিছুদিন পর প্যারিস আর পেরে উঠল না, তার সমস্ত আর্থিক সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। লণ্ডন তখন একাই মিত্রপক্ষের সমস্ত টাকাকড়ি জোগান দিতে লাগল। যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে লণ্ডনেরও হাত খালি হয়ে গেল। ১৯১৬ সনের শেষ দিকে এসে দেখা গেল, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের আর ধারের বাজারে খাতির নেই। তখন ইংলণ্ডের সবচেয়ে বাছাবাছা কৌশলী রাজনীতিকদের নিয়ে গড়া একটি দৌত্য-দলকে আমেরিকায় পাঠানো হল, সেখানে গিয়ে তাঁরা টাকা ধারের জন্য প্রার্থনা জানালেন। আমেরিকা টাকা ধার দিতে রাজি হল। তার পর থেকে আমেরিকার টাকার জোরেই মিত্রপক্ষ যুদ্ধ চালাতে লাগল। আমেরিকার কাছে মিত্রপক্ষের ঋণ দেখতে দেখতে মস্তবড়ো অঙ্কের কোঠায় গিয়ে পৌঁছল; ঋণের পরিমাণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার যে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কাররা আর মহাজনরা সে টাকা ধার দিচ্ছিলেন তাঁরা মিত্রপক্ষের যাতে জয় হয় সে দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। মিত্রপক্ষকে আমেরিকা এত বিরাট-পরিমাণ টাকা ধার দিয়েছে, এখন যদি মিত্রপক্ষ জর্মনির কাছে হেরে যায় তবে সে টাকার গতি কী হবে? আমেরিকার ব্যাঙ্ক্‌ওয়ালাদের পকেটে তখন হাত পড়েছে, তাতে তারা নড়েচড়ে উঠল। আমেরিকা মিত্রপক্ষের দিকে যোগ দিয়ে যুদ্ধে নামুক, এমনিতর একটা ভাবাবেগ দেশের মধ্যে এরা গ'ড়ে তুলল; শেষ পর্যন্ত আমেরিকাও যুদ্ধে যোগ দিল।

আমেরিকার কাছে এদের ঋণের সমস্যা নিয়ে আজকাল অনেক আলোচনা আমরা শুনতে পাই, সংবাদপত্রেও এই আলোচনারই ছড়াছড়ি। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের গলায় পাথরের জাঁতার মতো এই ঋণের ভার ঝুলে রয়েছে; সে ঋণ শোধ দেবার সাধ্যও এখন তাদের নেই—এই সমস্ত

খাপই হয়ে উঠেছিল সেই যুদ্ধের সময়ে। তখন যদি এই টাকা তারা না পেত, তবে অন্য দেশের কাছে তাদের ধার পাবার সম্ভাবনা একেবারেই ভেঙে পড়ত, এবং আমেরিকাও হয়তো তাদের দিকে এসে যোগ দিত না।

১৪৯

যুদ্ধের গতি

১লা এপ্রিল, ১৯৩৩

১৯১৪ সনে আগস্ট মাসের প্রথমে যুদ্ধ শুরু হল। পৃথিবীসুদ্ধ লোক চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বেলজিয়মের আর ফ্রান্সের উত্তর-সীমান্তের দিকে। বিরাট জর্মন বাহিনী ক্রমেই এগিয়ে চলেছে; পথে যা-কিছু বাধা বিঘ্ন পড়ছে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের মতো ক্ষুদ্র বেলজিয়মই তার গতিকে স্তব্ধ করে দিল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জর্মনরা বেলজিয়ানদের মনে ভয় জন্মিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বিভীষিকার সৃষ্টি হয় এমন-সব কাজ করতে লাগল—; এইসব কাজকে ভিত্তি করেই মিত্রপক্ষ তাদের 'নৃশংসতার গল্প'গুলো তৈরি করতে পেরেছিল। জর্মন সেনা প্যারিস-শহরের দিকে চলল; তাদের সম্মুখে ফ্রান্সের সেনা যেন হটে গিয়ে গুটিয়ে যেতে লাগল, ইংরেজদের ক্ষুদ্র বাহিনী ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ছিট্‌কে প'ড়ে রইল। যুদ্ধ শুরু হবার পর এক মাসের মধ্যেই মনে হল, প্যারিস-নগরীর আর রক্ষা নেই; ফরাসি সরকার পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত দপ্তরখানা আর দরকারি জিনিসপত্র বোর্দো-শহরে স্থানান্তরিত করবেন বলে প্রস্তুত হলেন। জর্মনদের অনেকের ধারণা হল, যুদ্ধ তাদের বস্তুত জয় করা হয়ে গেছে। আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই ছিল জর্মনির পশ্চিম-রণাঙ্গন অর্থাৎ ফরাসি রণাঙ্গনের অবস্থা।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার সেনা এসে পূর্ব-প্রাশিয়া আক্রমণ করেছে; পশ্চিম-সীমান্ত থেকে জর্মনদের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেবার যা-হোক-একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে লোকেরা খুব বেশিরকম আশা করল, রাশিয়ার সে 'স্টীম-রোলার' এবার গড়িয়ে একেবারে বার্লিন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু রাশিয়ার সৈন্যদের ভালো অস্ত্রশস্ত্র নেই, তাদের সেনানীরা একেবারেই অকর্মণ্য, এবং তাদের পিছনে রয়েছে জারের সরকার, দুর্নীতি আর ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। জর্মনরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের উপর গিয়ে পড়ল. পূর্ব-প্রাশিয়ায় হ্রদ এবং জলাভূমি-অঞ্চলের মধ্যে বিরাট একটি রুশ বাহিনীকে ফাঁদে আট্‌কে ফেলল, তার পর তাকে একেবারে নিঃশেষে বিনষ্ট করে দিল। জর্মনদের এই বিরাট জয়ের নাম হল—ট্যানেনবুর্গের যুদ্ধ; এতে যে প্রধান সেনানীরা এই অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফন হিণ্ডেনবুর্গ; ইনি পরে জর্মন-প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

অতি বৃহৎ রণজয়, কিন্তু এই জয় করতে গিয়ে অন্য দিক দিয়ে জর্মন সেনাকে ক্ষতিও সইতে হল অনেকখানি। এই যুদ্ধ জয় করবার জন্যে, এবং পূর্বদিকে রাশিয়ার অভিযানে একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ব'লে তারা তাদের অনেক সৈন্য ফ্রান্সের দিক থেকে রাশিয়ার দিকে এনে ফেলেছিল। এর ফলে পশ্চিম-রণাঙ্গনে জর্মনদের চাপ কিছুটা কমে গিয়েছিল; সেই সুযোগে ফরাসি সেনা একটা বিপুল উদ্যম দেখিয়ে আক্রমণকারী জর্মন সেনাকে পিছনে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ১৯১৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মার্নের যুদ্ধ হল, এই যুদ্ধে ফরাসিরা জর্মন সেনাকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল হটিয়ে দিল। প্যারিস-শহর রক্ষা পেয়ে গেল, ফরাসি আর ইংরেজ সেনারও একটু দম ফেলবার অবকাশ মিলল।

ফরাসিদের বাধা ভেঙে এগিয়ে যাবার আরও-একটা চেষ্টা জর্মনরা করল, প্রায় সফলও হল;

কিন্তু এবারও ফরাসিরা তাদের ঠেকিয়ে রাখল। তখন দুই দলের সৈন্যরাই মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকে বসল; নূতন একরকমের যুদ্ধ শুরু হল, এর নাম ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ। এ একটা দাবার কিস্তির মতো ব্যাপার; তিন বছরেরও বেশি কাল ধরে, এবং খানিক পরিমাণে যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যন্তই, পশ্চিম-রণাঙ্গনে এই ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ চলতে লাগল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী ছুঁচোর মতো গর্ত খুঁড়ে মাটির মধ্যে ঢুকে বসে রইল। নিছক ধর্না দিয়ে বসেই পরস্পরকে অবসন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই এই রণাঙ্গনে জর্মানি এবং ফ্রান্সের যে সেনা-বাহিনী এসে বসেছিল তার সংখ্যা বহু লক্ষ। ব্রিটিশ সেনার সংখ্যা প্রথমে অল্প ছিল, তার পর তারও সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলল, শেষে তারও হিসাব অনেক লক্ষের অঙ্কেই দাঁড়িয়ে গেল।

পূর্ব অর্থাৎ রুশ রণাঙ্গনে সৈন্যদের চলাচল হচ্ছিল অনেক বেশি। রুশ সেনারা বারবার অস্ট্রিয়ানদের হারিয়ে দিচ্ছিল, আবার নিজেরা প্রত্যেক যুদ্ধেই জর্মনদের কাছে হেরে যাচ্ছিল। এই রণাঙ্গনে হতাহতের সংখ্যা একেবারে বিপুল হয়ে উঠল। তাই বলে মনে কোরো না, পশ্চিম-রণাঙ্গনে ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ চলছিল বলে নরহত্যা সেখানেও বিশেষ কম হচ্ছিল। মানুষের জীবন নিয়ে যেন পরম হেলাভরেই ছিনিমিনি খেলা হচ্ছিল; শত্রু-সেনা যেখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কায়েমি হয়ে বসেছে সেই স্থানগুলি দখল করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল; অথচ ফল হচ্ছিল না কিছুই।

আরও বহু জায়গাতে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। তুর্কিরা সুয়েজখাল আক্রমণ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু বাধা পেয়ে হটে গেল। মিশরের কথা তো আগেই বলেছি; ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে মিশরকে ব্রিটেনের রক্ষণাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হল। তার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন সেখানকার নবসৃষ্ট ব্যবস্থাপক সভাকে মুলতুবি করে দিল, দেশের মধ্যে যেসব লোকের উপর তাদের সন্দেহ ছিল তাদের ধরে নিয়ে জেলখানা পূর্ণ করে ফেলল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করা হল; পাঁচজনের বেশি লোক একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। মিশরে চিঠিপত্র সেন্সরের যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হল, লন্ডনের টাইম্‌স্‌ পত্রিকা তার বর্ণনা দিয়েছিল "বর্বরের মতো নিষ্করুণ" বলে। বস্তুত যুদ্ধের আগাগোড়া সমস্ত সময়টা ধরেই মিশরে সামরিক আইন চালু রাখা হয়েছিল।

তুর্কির নড়বড়ে সাম্রাজ্য, তার দুর্বল জায়গা বেছে বেছে বহু স্থানে ব্রিটেন আক্রমণ করে বসল—ইরাকে, পরে আবার প্যালেস্টাইনে আর সিরিয়াতে। আরব দেশে আরবদের জাতীয় চেতনা জেগে উঠছিল তারই সুযোগ নিল ব্রিটেন; প্রচুর পরিমাণে টাকা আর মালমশলা ঘুষ দিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করল। এই বিদ্রোহের মূলে খুব বড়ো হাত ছিল কর্নেল টি. ই. লরেন্সের; ইনি ছিলেন আরবদেশে ব্রিটেনের একজন চর। এই ঘটনার পরবর্তী কালে তিনি একজন রহস্যময় ব্যক্তি বলে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এশিয়ার বহু আন্দোলনেই নিজে গোপনে থেকে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছেন।

তুরস্কের একেবারে কেন্দ্রস্থলে সরাসরি আঘাত হানা কিন্তু শুরু হল ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। ব্রিটিশ নৌবহর দার্দানেলিস-প্রণালী আক্রমণ করল, সেই পথে উঠে গিয়ে তারা কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ দখল করবে। এ যদি তারা করে উঠতে পারত তবে কেবল যুদ্ধে তুর্কির অংশগ্রহণই শেষ হয়ে যেত না, পশ্চিম-এশিয়াতে জর্মানির প্রভাবও আর পৌঁছবার পথ পেত না। কিন্তু যুদ্ধে তারা হেরে গেল। তুর্কিরা বিপুল বিক্রমে লড়াই করল, এবং তাদের এই জয়ের কৃতিত্বের একটা বড়ো ভাগ মুস্তাফা কামাল পাশার প্রাপ্য। প্রায় এক বছর ধরে ব্রিটিশরা গ্যালিপলিতে এই চেষ্টা চালাল, তার পর অনেক সৈন্য ও অর্থ সেখানে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এল।

পশ্চিম এবং পূর্ব-আফ্রিকাতে জর্মনদের যেসব উপনিবেশ ছিল, মিত্রপক্ষ তাদেরও আক্রমণ করল। এই উপনিবেশগুলি আর জর্মানির মধ্যে যোগাযোগের কোনো রাস্তাই ছিল না; জর্মানি থেকে কোনো রাস্তাই তারা পেল না। একে একে তারা সকলেই পরাজিত হল। চীনে কিয়াওচাও-প্রদেশটা জর্মনদের 'কনসেশন' (ইজারা) ছিল, জাপান অতি সহজেই সেটা দখল করে

নিল। বাস্তবিক জাপানেরই তখন মজা। দূর-প্রাচ্যে যুদ্ধবিগ্রহ তেমন কিছু ছিল না। অতএব জাপান এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল, একমাত্র জুলুম আর চোখ-রাঙানির চোটেই চীনের কাছ থেকে নানা রকমের ইজারা এবং সুযোগসুবিধা আদায় করে নিল।

ইতালি অনেক মাস ধ'রে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করে দেখল, কোন্ পক্ষের জিতবার সম্ভাবনা তাই বুঝে নেবার চেষ্টা করল। তার পর যখন তার স্থির ধারণা হল মিত্রপক্ষেরই জিতবার ভরসা দেখা যাচ্ছে তখন মিত্রপক্ষ তাকে যে ঘুষ দিতে চাচ্ছিল তা গ্রহণ করতে রাজি হয়ে গেল, মিত্রপক্ষের সঙ্গে তার একটা গোপন সন্ধি হল। ১৯১৫ সনের মে মাসে ইতালি যথারীতি মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল। দু বছর ধরে ইতালি আর অস্ট্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে চলল, বিশেষ ফল কোনোদিকেই কিছু দেখা গেল না। তার পর জর্মনরা অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করতে এল; এদের মিলিত আক্রমণে ইতালি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। জর্মনি আর অস্ট্রিয়ার মিলিত বাহিনী প্রায় ভেনিস-শহর পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল।

১৯১৫ সনের অক্টোবর মাসে বুল্‌গেরিয়া জর্মনির পক্ষে যোগ দিল। এর অল্পদিন পরেই অস্ট্রিয়া-জর্মনির সেনা বুল্‌গেরিয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে সার্বিয়াকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিল। সার্বিয়ার রাজা হতাবশিষ্ট সেনা সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, মিত্রপক্ষের জাহাজে এসে আশ্রয় নিলেন। সার্বিয়া জর্মনির অধীন হয়ে গেল।

রুমানিয়া বল্‌কান-যুদ্ধের সময় যে কাণ্ড করেছে তার পর থেকেই তার সুবিধাবাদী ব'লে একটা বিশেষ খ্যাতি রটে গিয়েছিল। দু বছর সে লক্ষ্য করে দেখল মহাযুদ্ধের গতি কোন্ দিকে যায়; তার পর ১৯১৬ সনে আগস্ট মাসে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল। এর শাস্তি পেতেও তার দেরি হল না; জর্মন সেনা ঝড়ের মতো তার উপরে গিয়ে পড়ল, তার সমস্ত বাধাকে নিঃশেষে চূর্ণ করে দিল। রুমানিয়াও অস্ট্রিয়া-জর্মনির অধীনে চ'লে গেল।

এমনি করে কেন্দ্রস্থ দুটি দেশ, অস্ট্রিয়া আর জর্মনি বেলজিয়ম, ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের খানিক অংশ, পোল্যান্ড, সার্বিয়া এবং রুমানিয়া অধিকার করে নিল। ছোটোখাটো রণাঙ্গনগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জয় হল। কিন্তু যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম-রণাঙ্গনে আর সমুদ্রে, সেখানে তারা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। পশ্চিম-রণাঙ্গনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনী মরণ-আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে বসে রইল। সমুদ্রে মিত্রশক্তিরই শক্তি অপরাজেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে কতকগুলো জর্মন ক্রুজার ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছিল, মিত্রপক্ষের জাহাজ-চলাচলে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এদের একটি হচ্ছে সেই বিখ্যাত 'এম্‌ডেন', সে মাদ্রাজে পর্যন্ত এসে গোলা ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু এটা মূল ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ক্ষুদ্র ঘটনামাত্র; সমুদ্রপথগুলিতে সর্বত্রই মিত্রপক্ষ কর্তৃত্ব করছিল, সে কর্তৃত্ব এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না। এই কর্তৃত্বের জোরেই তারা চেষ্টা করছিল, বাইরে থেকে কোনোরকম খাদ্যদ্রব্য বা অন্য বস্তু এই কেন্দ্রীয় জাতিদের কাছে গিয়ে পেঁছিতে দেবে না। এদের এই অবরোধ জর্মনি এবং অস্ট্রিয়ার পক্ষে একেবারে অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ হয়ে উঠল; তাদের খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দিল, সমস্ত লোক অনাহারে মরবে এমনি একটা সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠল।

ওদিকে জর্মনিও তার সাবমেরিন দিয়ে মিত্রপক্ষের জাহাজ ডুবিয়ে দিতে আরম্ভ করল। এই সাবমেরিনের যুদ্ধে সে এতটা কৃতিত্ব দেখাল যে, ইংলণ্ডের খাদ্যের জোগান কমে গেল, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটল। ১৯১৫ সনের মে মাসে একটি জর্মন সাবমেরিন ইংলণ্ডের বিখ্যাত আটলান্টিক-যাত্রী জাহাজ লুসিটানিয়াকে ডুবিয়ে দিল; এই জাহাজে বহু লোক ডুবে মারা গেল। অনেক আমেরিকানও এই জাহাজের সঙ্গে মারা গিয়েছিল; কাজেই এই ব্যাপারে আমেরিকাতেও প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হল।

আকাশপথেও জর্মনি ইংলণ্ডকে আক্রমণ করল। বিপুলদেহ জেপেলিন উড়োজাহাজ চাঁদনী রাতে এসে লণ্ডনে এবং যেসব জায়গাতে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা ছিল সেখানে বোমা ফেলে যেতে লাগল। পরের দিকে এই বোমা ফেলার কাজ হতে লাগল এরোপ্লেন দিয়ে; প্লেনের ঘর্ঘর শব্দ, বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজ, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মানুষের ছুটোছুটি করে মাটির

তলায় গুদাম-ঘরে আর আশ্রয়কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া, এ সমস্তই একেবারে অভ্যস্ত ব্যাপার হয়ে উঠল। জর্মনরা অসামরিক লোকদের উপরে বোমা ফেলেছিল বলে ব্রিটিশ জাতি রাগে খেপে উঠল। রেগে ওঠা অন্যায়ও নয়, কারণ এটা সত্যই খুব ভয়ানক আচরণ। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে বা ইরাকে যখন ব্রিটিশ এরোপ্লেনরা বোমা ফেলে যায় বা বিশেষ করে সেই শয়তানির চরম আবিষ্কার কাল-বিলম্বী বোমা (time bomb) ফেলে, ব্রিটেনের লোকরা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হয় না। একে বলা হয় শান্তিরক্ষার কাজ, তথাকথিত শান্তির সময়েও এ কাজ চালানো হয়ে থাকে।

এমনি করে যুদ্ধ এগিয়ে চলল, মাসের পর মাস অতিক্রম করে—দাবানল যেমন পতঙ্গের পালকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তেমনি করে লক্ষ মানুষের জীবনকে ভস্মসাৎ করে যত এগিয়ে চলল ততই সে আরও বেশি ক'রে ধ্বংসলীলা আর বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে লাগল। জর্মনরা বিষ-বাষ্প বার করল; দু দিন না যেতে দুই পক্ষই বিষ-বাষ্প ব্যবহার শুরু করল। বোমা ফেলবার জন্যেই এরোপ্লেনের ব্যবহার বাড়ল; তার পরেই এল ট্যাঙ্ক্। ট্যাঙ্কের ব্যবহার প্রথম করে ব্রিটেন; বিশালাকৃতি যন্ত্রদানব এরা, শুঁয়োপোকার মতো গতিতে সমস্ত-কিছুকে দ'লে চলে যায়। সমস্ত রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাতে লাগল, আর তাদের পিছনে তাদের নিজের দেশে নারী আর শিশুরা ক্ষুধা এবং অভাবের তাড়নায় জর্জর হয়ে উঠল। বিশেষ করে জর্মানি আর অস্ট্রিয়াতে অবরোধের ফলে খাদ্যাভাব ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠল। সবসুদ্ধ এটা দাঁড়িয়ে গেল একটা সহনশক্তির পরীক্ষা; এই পরীক্ষায় কোন্ পক্ষ অপর পক্ষের পরেও টিঁকে থাকতে পারবে? কোনো পক্ষের সেনাই কি সত্যি করে অপর পক্ষকে অবসন্ন করে ফেলতে পারবে? মিত্রপক্ষ জর্মানিকে অবরোধ করেছে, জর্মানির মনের জোর কি তাতে ভাঙবে? অথবা কি জর্মনদের সাবমেরিন-অভিযানের ফলে ইংলণ্ডই অনাহারে কাতর হবে, তার মনের এবং সংকল্পের জোর শিথিল হয়ে আসবে? প্রত্যেক দেশেরই পিছনে রয়েছে আত্মত্যাগ এবং দুঃখভোগের একটা বিরাট কাহিনী। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল, এই ভয়াবহ আত্মবলি আর দুঃখভোগ এ কি বৃথাই যাবে? আমাদের মৃত আত্মীয়দের কি ভুলে যাব আমরা, শত্রুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করব? যুদ্ধের আগের দিনকে মনে হচ্ছে যেন সে কত যুগ যুগ আগের কথা; যুদ্ধ কেন বেধেছিল সে কথাও ভুলে গেল লোকে। স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মন শুধু একটি কথাতেই আচ্ছন্ন হয়ে রইল—প্রতিশোধ নিতেই হবে, জয়লাভ করতেই হবে।

মৃতদের আহ্বান, সে বড়ো নিদারুণ ডাক; তাদের পরম প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তারা নিজেদের বলি দিয়ে গেছে! পুরুষ হোক নারী হোক, যার মধ্যে কিছুমাত্র চেতনা বোধ আছে, সে কী করে এই ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে? যুদ্ধের এই শেষ ক'টি বছর, চারি দিক তখন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। যুদ্ধরত দেশদের প্রতিটি অধিবাসীর গৃহে মৃতজনের জন্য বিলাপ শোনা যাচ্ছে; মানুষের মনে মনে এসেছে ক্লান্তি, এসেছে মনোভঙ্গের বেদনা; কিন্তু তখনও মানুষের আর কী করবার ছিল, সংকল্পের উল্কাদ্যুতিকেই মাথার উপর তুলে ধরা ছাড়া? এই কবিতাটি পড়ো, এটি মেজর ম্যাক্‌ক্রে-নামক একজন ব্রিটিশ সেনানীর লেখা। পড়ো, তার পর ভেবে দেখো, যুদ্ধের সেই অন্ধকার এবং ক্লান্তিময় দিনে তাঁর দেশবাসী নরনারী যারা এই কবিতা পড়েছিল তাদের মনে কতবড়ো নাড়া লেগেছে, এবং মনে রেখো বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় এরূপ কবিতা লেখা হয়েছিল :

আমরা মৃতের দল। বেশিদিনের কথা নয়
আমরাও ছিলাম বেঁচে, প্রভাতের স্পর্শ পেয়েছি, দেখেছি সূর্যাস্তের রক্তরাগ,
ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি, আজ আমরা শুয়ে আছি
ফ্ল্যান্ডার্সের রণক্ষেত্রে।
শত্রুর সাথে আমাদের যে বিরোধ তাই তোমরা চালিয়ে যাও :
আমাদের বাহুর শক্তি ফুরিয়ে গেছে, তোমাদের 'পরে দিয়ে যাই
হাতের মশাল; অর্জন কোরো একে উঁচু করে রাখবার কৃতিত্ব।

এই নির্ভরের মর্যাদা যদি না রাখো, আমরা যারা মরে গেলাম,
আমরা ঘুমাব না, তখনও নয়, যখন পপির ফুল ফুটে উঠবে
ফ্ল্যান্ডার্সের রণক্ষেত্রে।

১৯১৬ সনের শেষ দিকে দেখা গেল, বিজয়লক্ষ্মী মিত্রপক্ষের দিকেই হেলে যাচ্ছেন। নূতন ট্যাঙ্ক-বাহিনীর জোরে তারা পশ্চিম-রণক্ষেত্রে এগিয়ে আক্রমণ চালাতে পারছে; ইংলণ্ডে বোমা ফেলতে আসছিল যে জেপেলিন উড়োজাহাজরা, তারা বিপন্ন হচ্ছে। জর্মন সাবমেরিনের পাহারা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ দেশদের জাহাজে করে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে এসে পৌঁচচ্ছে। ১৯১৬ সনের মে মাসে উত্তর-সাগরে একটি নৌযুদ্ধ হল (জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ), মোটের উপর এতে ব্রিটেনেরই খুব সুবিধা হয়ে গেল। জর্মানির চার দিকে যে অবরোধ বসানো হয়েছিল তার ফলে ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া আর জর্মানির প্রজাদের পক্ষে অনশন আসন্ন হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছিল যেন কালের গতিই কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে চ'লে গেছে। এখন খুব তাড়াতাড়ি এই জয়কে সপূর্ণ করে তোলা দরকার। জর্মানি কয়েকবার শান্তিস্থাপনের প্রস্তাবও করে পাঠাল, কিন্তু মিত্রশক্তি সে কথা মোটে কানেই তুলল না। বিভিন্ন দেশকে নিজেদের মধ্যে কীভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হবে সে বিষয়ে নানাবিধ গোপন চুক্তি করে করে মিত্রপক্ষের সরকাররা নিজেদের বেশ আবদ্ধ করে ফেলেছে; এখন পূর্ণ জয়লাভ না করে তৃপ্ত হবার আর তার উপায় নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সনও শান্তিস্থাপন করবার চেষ্টা কয়েকবার করলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

জর্মন রণনায়করা তখন স্থির করলেন, সাবমেরিনের আক্রমণ আরও তীব্র করে তুলবেন, অনাহারের তাড়নাতেই ইংলণ্ডকে হার মানতে বাধ্য করবেন। ১৯১৭ সনের জানুয়ারি মাসে তাঁরা ঘোষণা করলেন, সমুদ্রের বিশেষ কতকগুলো অংশে গেলে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজকেও তাঁরা ডুবিয়ে দেবেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, এই নিরপেক্ষ দেশরাও যেন ইংলণ্ডে খাদ্যের জোগান দিতে না পারে। এই ঘোষণা শুনে আমেরিকা অত্যন্ত চটে গেল। তার জাহাজও এইভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এটা সে সহ্য করতে পারে না। এর ফলে যুদ্ধে তার যোগদান অনিবার্য হয়ে উঠল। বস্তুত সাবমেরিন-আক্রমণ চালাবার বেলায় কোনো বাছবিচার রাখবেন না, এই সিদ্ধান্ত যখন জর্মন-সরকার করেছিলেন তখন তার ফলে এ সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই তাঁদের অজানা ছিল না। হয়তো তাঁরা বুঝেছিলেন, অন্য-কোনো পথ তাঁদের আর খোলা নেই, অতএব এটুকু ঝুঁকিও নিতেই হবে। অথবা হয়তো ভেবেছিলেন, এমনিতেই তো আমেরিকার মহাজনরা মিত্রপক্ষকে প্রচুর সাহায্য করছেন। যাই হোক, ১৯১৭ সনের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করল। তার রণসম্ভার প্রচুর; তা ছাড়া সে তখনও একেবারেই তরতাজা; অন্যান্য দেশেরা সকলেই শ্রান্ত। কাজেই আমেরিকা যুদ্ধে নামতেই জর্মনদের পরাজয় একেবারে নিশ্চিত হয়ে উঠল।

তা ছাড়া, আমেরিকা যুদ্ধে নামবার আগেই আরও একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসে প্রথম রুশ-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হল; ১৫ই মার্চ জার সিংহাসন ত্যাগ করলেন। এই বিপ্লবের কথা আমি তোমাকে আলাদা করে লিখব। এখনকার মতো এইটুকু শুধু জেনে নাও, এই বিপ্লবের ফলে যুদ্ধের গতিতে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন এল। রাশিয়ার পক্ষে তখন আর জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালানো সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কি না তাই সন্দেহ। তার মানেই হল, পূর্ব-রণাঙ্গন নিয়ে জর্মানির আর দুশ্চিন্তার কারণ রইল না। পূর্ব-অঞ্চলের সমস্ত, অন্তত অধিকাংশ সেনাকে সে তখন পশ্চিম-রণাঙ্গনে চালান করতে পারে, সেখানে ফরাসি আর ব্রিটিশ সেনার উপরে নিয়ে ফেলতে পারে। হঠাৎ পরিস্থিতিটা জর্মানির পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠল। রাশিয়াতে এই বিপ্লব হবে, এই সংবাদটা যদি বিপ্লবের অন্তত ছ-সাত সপ্তাহ আগেও জর্মানি জানতে পেত তা হলে কী হত? তা হলে হয়তো জর্মানি তার সাবমেরিন-আক্রমণের নীতি পরিবর্তন করত না, সুতরাং আমেরিকাও হয়তো নিরপেক্ষই থেকে যেত। রাশিয়া আর রণক্ষেত্রে নেই এবং আমেরিকা নিরপেক্ষ হয়ে আছে, এরকম সুযোগ পেলে জর্মানি ব্রিটিশ আর ফরাসি সেনাকে একেবারে চূর্ণ করে দিতে পারত, এটা খুবই সম্ভব। যে অবস্থা বস্তুত ছিল তাইতেই দেখা গেল,

পশ্চিম-রণাঙ্গনে জর্মনদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে; জর্মন সাবমেরিন মিত্রপক্ষ আর নিরপেক্ষ দুই দেশেরই বহু জাহাজ ধ্বংস করে তাদের বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে, রুশ-বিপ্লবে জর্মানিরই সুবিধা হয়ে গেল। কাজে কিন্তু দেখা গেল, জর্মানির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা-সৃষ্টির একটা প্রধান কারণ ছিল এই বিপ্লব। প্রথম বিপ্লবের পর আট মাসের মধ্যেই এল দ্বিতীয় বিপ্লব, এর ফলে ক্ষমতা পড়ল গিয়ে সোভিয়েট আর বল্‌শেভিকদের হাতে। তাদের কথা ছিল, শান্তি চাই। সমস্ত যুদ্ধরত দেশের সেনাদের উদ্দেশ করে তারা বলতে লাগল, এবার যুদ্ধ থামাও; তাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, এ যুদ্ধ আসলে ধনিকদের যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীদের সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্যে শ্রমিকদের কামানের খাদ্যস্বরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে, শ্রমিকরা যেন কিছুতেই এটা ঘটতে না দেয়। এদের এইসব উক্তি আর আবেদনের খানিকটা অন্তত অন্যান্য দেশের যে সৈন্যেরা রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল তাদের কানে গিয়ে পেঁাছল; সেখানে এর প্রভাবও হল অসামান্য। ফরাসি সেনার মধ্যে অনেকবার বিদ্রোহ হল, কর্তৃপক্ষ সে বিদ্রোহ কষ্টেসৃষ্টে দমন করে রাখলেন। জর্মন সেনার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল আরও বেশি; কারণ, বিপ্লবের পরে তাদের অনেকগুলি সেনাদল বস্তুত রাশিয়ার সেনার প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। এইসব সেনাদলকে যখন পশ্চিম-রণাঙ্গনে চালান করা হল, এরা সেই নূতন বাণীকে সেখানে বহন করে নিয়ে গেল, অন্যান্য সেনাদলের মধ্যেও এই বাণী প্রচার করল। জর্মানি তখন রণশ্রান্ত, একান্ত-রকম ভগ্নোৎসাহ; রাশিয়া থেকে যে বীজ তার জমিতে এসে পড়ল তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে নেবে বলে সে জমি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। এইভাবে রুশ-বিপ্লব জর্মানির মধ্যেই দুর্বলতার সৃষ্টি করে দিল।

জর্মানির সামরিক-কর্তৃপক্ষ কিন্তু এইসব অশুভ লক্ষণ দেখেও দেখলেন না। ১৯১৮ সনের মার্চ মাসে তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়ার উপরে একটি অত্যন্ত কঠোর এবং অপমানকর সন্ধি চাপিয়ে দিলেন। সোভিয়েটদের এই সন্ধি মেনে নিতেই হল, কারণ তাদের তা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, আর তখন তাদের যে করেই হোক যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার। ১৯১৮ সনের মার্চ মাসেই পশ্চিম-রণাঙ্গনেও জর্মানি তার শেষ বড়ো অভিযান শুরু করল। ইংরেজ এবং ফরাসি সেনার রেখা ভেদ করে জর্মনবাহিনী এগিয়ে চলল, চলার পথে এদের বহু সেনাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেল, আবার সেই মার্ন-নদীর তীরে গিয়ে হাজির হল; সাড়ে তিন বছর আগে এইখান থেকেই তাদের হটে যেতে হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা বীরত্বের খেলা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তাদের শেষ অভিযান—জর্মানির শক্তি তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকা থেকে বহু সৈন্য এসে পেঁাছল; এবং বহু তিক্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফলে এবার পশ্চিম-রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের যত সেনা ছিল, ব্রিটিশ আমেরিকান ফরাসি ইত্যাদি সবাইকে একটিমাত্র চরম কর্তৃপক্ষের অধীন করে দেওয়া হল—যেন এদের মধ্যে যথাসাধ্য সহযোগিতা আর কর্মের ঐক্য থাকতে পারে। পশ্চিম-রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সমস্ত সেনার উপরে প্রধান সেনাপতি হলেন ফ্রান্সের মার্শাল ফশ। ১৯১৮ সনের মাঝামাঝি এসেই দেখা গেল, যুদ্ধের গতি একেবারেই উল্‌টো পথে চলছে; এখন মিত্রপক্ষই এগিয়ে এসে আক্রমণ চালাচ্ছে, ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে, জর্মন সেনা তাদের ধাক্কায় কেবলই পিছনে হটে যাচ্ছে। অক্টোবর মাসে বোঝা গেল, যুদ্ধ শেষ হতে আর দেরি নেই। যুদ্ধ-বিরতির কথাও উঠল।

৪ঠা নভেম্বর তারিখে কিয়েল্‌ বন্দরে জর্মন নৌসেনার মধ্যে বিদ্রোহ হল। এর পাঁচ দিন পরে বার্লিনে জর্মন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ঠিক সেই দিন, সেই ৯ই নভেম্বরই, কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্‌ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং লজ্জাকর ভাবে জর্মানি থেকে পালিয়ে হল্যাণ্ডে চলে গেলেন; তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই হোহেনজোলার্ন-রাজবংশেরও শেষ হয়ে গেল। চীনের মাঞ্চু-রাজাদের মতো এঁরাও 'এসেছিলেন বাঘের মতো গর্জন করে, চলে গেলেন সাপের লেজের মতো নিঃশব্দে।'

১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি-পত্র স্বাক্ষর করা হল, যুদ্ধ থামল। এই যুদ্ধবিরতি-পত্র রচিত হয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের নির্ধারিত 'চৌদ্দ দফা শর্ত'কে আশ্রয় করে।

এই চৌদ্দ দফার মধ্যে কতকগুলি বড়ো বড়ো কথা ছিল; যেমন, ছোটো ছোটো জাতিদেরও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে, সকল দেশেরই রণসজ্জা হ্রাস করতে হবে, কেউ কারও সঙ্গে গোপন কূট-চক্রান্ত চালাতে পারবে না, সকল জাতিরই রাশিয়াকে সাহায্য করতে হবে, এবং একটি জাতি-সংঘ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। পরে আমরা দেখব, বিজয়ী পক্ষ এই চৌদ্দ দফার অনেকগুলি শর্তই কেমন অনায়াসে ভুলে গিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌবহর জর্মনিকে অবরোধ করে বসে ছিল, সে অবরোধ তখনও সরিয়ে নেওয়া হল না; জর্মনির অনাহার-পীড়িত নারী ও শিশুদের কাছে তখনও খাদ্য পৌঁছতে দেওয়া হল না। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ এবং সে দেশের ক্ষুদ্র শিশুদের পর্যন্ত শাস্তি দেওয়ার এই অপূর্ব অনুষ্ঠান—ব্রিটেনের বিখ্যাত সব রাষ্ট্রনীতিক এবং জননেতারা, বড়ো বড়ো সংবাদপত্ররা, এমনকি তথাকথিত উদারপন্থী পত্রিকারা পর্যন্ত একে সমর্থন করতে লাগল। বস্তুত ইংলণ্ডে তখন প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন একজন উদারপন্থী—লয়েড জর্জ। সওয়া-চার বছর ব্যাপী এই যুদ্ধের ইতিহাস উন্মত্ত পাশবিকতা এবং নৃশংসতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু যুদ্ধ থামবার পরেও নিছক পাশবিক প্রতিহিংসার বশে জর্মনির এই অবরোধ চালিয়ে যাওয়া, এর তুলনা বোধ হয় সে ইতিহাসেও আর নেই। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে, অথচ তখনও একটা সমগ্র জাতি অনাহারে মরে যাচ্ছে, তার ক্ষুদ্র শিশুরা পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরছে, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এবং জোর করে তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছতে দেওয়া হচ্ছে না। যুদ্ধ আমাদের মনকে কতখানি বিকৃত করে তোলে, কতখানি উন্মত্ত বিদ্বেষবুদ্ধি দিয়ে ভরে তোলে, দেখলে তো? জর্মনির বয়োবৃদ্ধ চ্যান্সেলর বেথ্‌ম্যান হল্‌ভেগ বলেছিলেন, "ইংলণ্ড আমাদের উপরে যে অবরোধের বেড়া চাপিয়ে রেখেছে, নিষ্ঠুরতার সে মার্জিত রূপকে একেবার নারকীয় ছাড়া আর-কিছুই বলা চলে না; আমাদের সন্তানদের এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও এর ক্ষতচিহ্ন চিরদিন বেঁচে থাকবে।"

বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনায়করা আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এই অবরোধকে অনুমোদন করছিলেন; সাধারণ ব্রিটিশ সৈনিকরা, যারা নিজেরা সে যুদ্ধ করেছিল, তারা কিন্তু এর দৃশ্য সইতে পারল না। সন্ধির পরে রাইন্‌ল্যাণ্ডের কোলন-শহরে একটি ব্রিটিশ বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল; এই বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ সেনাপতি প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে "জর্মন নারী এবং শিশুদের যে কষ্ট সইতে হচ্ছে তা দেখে ব্রিটিশ সৈনিকদের মনে কতখানি বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে" তার খবর জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধবিরতির পরেও সাত মাসের বেশি কাল ধরে ইংলণ্ড জর্মনিকে এইভাবে অবরোধ করে রেখেছিল।

এই দীর্ঘ কাল ধরে যুদ্ধ দেখে দেখে যুদ্ধরত জাতিদের মানুষরা পশুর মতোই হয়ে উঠেছিল। বহু লোকের মন থেকে নীতি-দুর্নীতির বোধ লুপ্ত হয়ে গেল; বহু সাধারণ লোকেরও স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে অর্ধ-অপরাধীর মন হয়ে উঠল। নৃশংসতা নরহত্যা এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথায় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল; তাদের সমস্ত মন ভরে গিয়েছিল শুধু ঘৃণা বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে।

যুদ্ধের জমা-খরচের হিসাব দেখেছ? সে হিসাব পুরোপুরি আজও কেউ জানে না; এখনও সে হিসাব কষে দেখা হচ্ছে! তার থেকে গোটাকতক অঙ্ক আমি তোমাকে শোনাচ্ছি; শুনে বুঝবে, এখনকার দিনে যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়।

যুদ্ধে মোট যত লোক হতাহত হয়েছে তার হিসাব এইরকম পাওয়া গেছে :

মৃত বলে জানা গেছে এমন সৈনিক	১,০০,০০,০০০
মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এমন সৈনিক ...	৩০,০০,০০০
মৃত অসামরিক লোক	১,৩০,০০,০০০
আহত	২,০০,০০,০০০
বন্দী	৩০,০০,০০০
যুদ্ধের ফলে পিতৃমাতৃহীন শিশু	৯০,০০,০০০

যুদ্ধের ফলে বিধবা ৫০,০০,০০০
আশ্রয়প্রার্থী সর্বস্বান্ত ১,০০,০০,০০০

এই প্রকাণ্ড অঙ্কগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, কল্পনা করতে চেষ্টা করো, মানুষের কতখানি দুঃখকষ্টের কাহিনী এই অঙ্কের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। অঙ্কগুলোকে যোগ করে দেখো। কেবল হত ও আহতেরই মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে চার কোটি ষাট লক্ষ; যুক্তপ্রদেশের মোট লোকসংখ্যার প্রায় সমান।

আর এর ব্যয়ের অঙ্ক? সে আজও গুণে শেষ করা যায় নি! আমেরিকাতে একবার হিসাব করে বলা হয়েছিল, মিত্রপক্ষের মোট ব্যয় পড়েছে ৪০,৯৯,৯৬,০০,০০০ পাউণ্ড—প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। জর্মনদের পক্ষে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫,১২,২৩,০০,০০০ পাউণ্ড—প্রায় সওয়া-কুড়ি হাজার কোটি টাকা। দুই পক্ষের মোট ব্যয় পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা! এইসব অঙ্কের পুরোপুরি ধারণা করে ওঠাই আমাদের পক্ষে শক্ত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এর একেবারেই কোনো মিল নেই। দেখলে মনে হয় যেন জ্যোতিষের অঙ্ক কষছি, পৃথিবী থেকে সূর্যের বা নক্ষত্রের দূরত্বের হিসাব মাপছি! বহু দিন আগে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, বিজয়ী ও বিজিত, যুদ্ধরত কোনো জাতিই আজও সেই যুদ্ধকালীন ব্যয়ের পরবর্তী ফলের ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না—এতেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

'যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্যে', 'পৃথিবীতে গণতন্ত্রের আসন নিরাপদ করবার জন্যে', 'ছোটো ছোটো জাতিদেরও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে', 'আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সকলের আয়ত্ত করে দেবার জন্যে', এবং সাধারণভাবেই স্বাধীনতা ও অনেক বড়ো বড়ো আদর্শের জন্যে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধ শেষ হল; ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকা ইতালি এবং এদের ক্ষুদ্রতর উপগ্রহরা (রাশিয়ার অবশ্যই আর এদের মধ্যে স্থান নেই) জয়ী হল। এদের এইসব বৃহৎ এবং মহৎ আদর্শকে এরা কীভাবে ও কতখানি কার্যে পরিণত করেছে তা আমরা পরে দেখব। ইতিমধ্যে ইংরেজ কবি সাদে'র কবিতা থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করি। অনেক আগের দিনের আর-একটা যুদ্ধজয় সম্বন্ধে তিনি কবিতাটি লিখেছিলেন :

সবাই শুনে বলল, ডিউক কী মহাবীর,
এমন বিরাট যুদ্ধ করল জয়!
"কিন্তু তাতে লাভ কী হল এ পৃথিবীর?"
ছোট্টো ছেলে পিটারকিন্ যে কয়।
ডিউক বলে, "সেটা তো ঠিক নেই জানা,
কিন্তু ভারি জবর আমার জয়খানা!"

১৫০

রাশিয়াতে জারতন্ত্রের অবসান

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৩

যুদ্ধের গতি বর্ণনা উপলক্ষ্যে আমি রুশ-বিপ্লব এবং যুদ্ধের উপরে তার ফলের কথা বলেছি। যুদ্ধের উপরে ফলের কথা ছেড়ে দিলেও, এই বিপ্লবটা নিজেই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার—পৃথিবীর ইতিহাসে এর আর জুড়ি নেই। এই ধরনের বিপ্লব এর আগে আর হয় নি, কিন্তু এর অনুরূপ বিপ্লব হয়তো অল্প দিনের মধ্যেই আবার কোথাও হবে। তার কারণ, অন্যান্য দেশদের পিছনে ফেলেই এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, পৃথিবীর সর্বত্র বহু বিপ্লবী এর অনুকরণ করবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। অতএব এই বিপ্লবটিকে আমাদের খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। যুদ্ধের ফলে যত বস্তুর আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে এইটিই বৃহত্তম তাতে সন্দেহ নেই; অথচ

যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন সেই সরকার আর রাজনীতিকরা এর সম্ভাবনা মোটেই মনে করেন নি, প্রার্থনা তো করেনই নি। অথবা হয়তো এই বললেই ঠিক কথা বলা হবে—রাশিয়াতে সে সময়ে যেসব ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা প্রবল ছিল তাই থেকেই এই বিপ্লবের জন্ম; যুদ্ধের দরুন রাশিয়াকে যে বিপুল ক্ষতি এবং বেদনা সইতে হচ্ছিল তার ফলে সে অবস্থাগুলো অকস্মাৎ একটা চরম রূপ ধারণ করল এবং রাশিয়ার মহামানব ও প্রতিভাশালী বিপ্লবী লেনিন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিলেন।

রাশিয়াতে ১৯১৭ সনে বস্তুত দুবার বিপ্লব হয়েছিল, একবার মার্চ মাসে, আর একবার নভেম্বরে। অথবা বলা যায়, এইসমস্ত কালটা ধরেই বিপ্লবের একটা একটানা প্রবাহ চলেছিল। সে প্রবাহে দুবার ভরা জোয়ারের উচ্ছ্বাস এসেছিল।

রাশিয়া সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আমি তোমাকে ১৯০৫ সনের বিপ্লবের কথা বলেছি। সে বিপ্লবও হয়েছিল একটা যুদ্ধ এবং পরাজয়ের মুহূর্তকে আশ্রয় করে। সে বিপ্লবকে নির্মম অত্যাচারের দ্বারা দমন করা হল; জার তাঁর অবাধ স্বৈরতন্ত্রী শাসনই চালিয়ে গেলেন; কোথায় কোন্ লোক এতটুকু উদারপন্থী মতামত পোষণ করছেন খুঁজে খুঁজে বার করে তাঁদের সকলকে বিনষ্ট করতে লাগলেন। মার্ক্স্বাদীরা, বিশেষ করে বলশেভিকরা, একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন, স্ত্রীপুরুষনির্বিচারে তাঁদের প্রধান প্রধান কর্মীরা সাইবেরিয়ার কয়েদী-উপনিবেশে বা বিদেশে নির্বাসিত হলেন। কিন্তু এই-যে অল্প দু-চার জন লোক বিদেশে গেলেন, সেখানে বসেও তাঁরা তাদের প্রচারকার্য আর পড়াশোনা চালাতে লাগলেন। তাঁদের নেতা হলেন লেনিন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মার্ক্স্বাদে দৃঢ়বিশ্বাসী। কিন্তু মার্ক্স্ তাঁর মতবাদ রচনা করেছিলেন ইংলণ্ড বা জর্মনির মতো শিল্পসমৃদ্ধ দেশকে সামনে রেখে। রাশিয়া তখনও মধ্যযুগের রীতিনীতি আর কৃষিকার্য নিয়েই পড়ে রয়েছে, তার বড়ো বড়ো শহরগুলোতে শুধু ঈষৎ-একটু শিল্পতন্ত্রের ছোঁয়া লেগেছে। মার্ক্সের মূল সূত্রগুলোকে সেই রাশিয়ার সঙ্গেই মিলিয়ে গড়ে নেবার কাজে লেগে গেলেন লেনিন। এই বিষয় নিয়ে তিনি অনেক লেখালেখি করলেন; নির্বাসিত রাশিয়ানদের মধ্যেও এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হল। এমনি করে তাঁরা বিপ্লবের মতবাদে নিজেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে নিলেন। লেনিনের মত ছিল, কাজ সমাপ্ত করতে হয় দক্ষ এবং শিক্ষিত লোকদের দিয়ে, কেবলমাত্র উৎসাহী হলেই তারা কাজের যোগ্য হয় না। বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা যদি করতেই হয় তবে সে কাজের জন্যেও লোককে দস্তুরমতো শিক্ষিত করে নিতে হবে; যেন কাজের সময় যখন আসবে তখন কী করা উচিত সে সম্বন্ধে তাদের মনে কোনোরকম দ্বিধা বা সন্দেহ না থাকে। ১৯০৫ সনের পরবর্তী ক' বছর দেশে অত্যাচারের রাজত্ব চলল; সেই অন্ধকার যুগটাকে লেনিন আর তাঁর সহকর্মীরা কাজে লাগালেন ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলবার সাধনায়।

১৯১৪ সনেই দেখা গিয়েছিল, রাশিয়ায় শহর-অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, আবার তারা বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক ধর্মঘট করল তারা। তার পর এল যুদ্ধ; মানুষের সমস্ত মনোযোগ গিয়ে সেই দিকে পড়ল। শ্রমিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ছিল তাদের সৈন্য করে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীরা (এই নেতাদের অধিকাংশই তখন রাশিয়ার বাইরে নির্বাসিত) একেবারে প্রথম থেকেই যুদ্ধের বিরোধিতা করতে লাগলেন। অন্যান্য দেশের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রবাদীই যুদ্ধের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন। এঁরা তা হলেন না। এঁরা ঘোষণা করলেন, এই যুদ্ধ ধনিকতন্ত্রীদেরই যুদ্ধ; এর সঙ্গে শ্রমিকদের কোনো সংশ্রব নেই, একমাত্র এই যুদ্ধের সুযোগে যদি তারা নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে পারে।

রণক্ষেত্রে যে রুশ সেনা গিয়েছিল তাদের নিদারুণ ক্ষতি সইতে হল; বোধ হয় যুদ্ধরত আর-কোনো দেশেরই সেনা এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। সামরিক কর্মচারীদের সাধারণতই তেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে লোকে মনে করে না; কিন্তু তার মধ্যেও আবার রাশিয়ার সেনাপতিরাই ছিলেন বুদ্ধিহীনতা আর অকর্মণ্যতায় একেবারে অতুলনীয়। রুশ সেনাদের ভালো অস্ত্রশস্ত্র নেই; অনেক সময় তাদের গুলিবারুদ পর্যন্ত থাকত না, পিছনে কোনো সহায় বা অবলম্বন থাকত না। অথচ এঁরা এই-

রকমেরই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, অর্থাৎ জেনেশুনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই পেট্রোগ্রাড, সেণ্ট পিটার্সবার্গ তখন এই নামে পরিচিত হয়েছে, এবং অন্যান্য বড়ো শহরে ফাটকা-ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড লাভ আর ঐশ্বর্য হাতিয়ে নিচ্ছে! এই 'দেশপ্রেমিক' ব্যবসায়ী এবং লাভান্বেষীরা স্বভাবতই খুব জোরগলায় বলছিল, যুদ্ধ থামানো চলবে না, একেবারে জয়লাভ করে তবেই আমরা নিরস্ত হব! যুদ্ধ চিরকাল ধরে চললেই তাদের সুবিধা হত সবচেয়ে বেশি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সৈন্য শ্রমিক আর চাষিরা (এদের মধ্য থেকেই সৈন্য নেওয়া হত) ক্রমে অবসন্ন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, অসন্তোষে তাদের মন ভরে উঠল।

জার নিকোলাস ছিলেন অত্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি। তিনি আবার চলতেন একেবারেই তাঁর স্ত্রীর অধীন হয়ে। জারিনা (জারপত্নী) নিজেও ঠিক স্বামীরই মতো নির্বোধ, তবে তাঁর ইচ্ছার জোরটা কিছু বেশি ছিল। দুজনে মিলে তাঁদের চার দিকে একটি ধূর্ত এবং মূর্খের দল গড়ে তুলেছিলেন; এঁদের সমালোচনা করবার সাহস কারও ছিল না। ক্রমে অবস্থা চরমে উঠল; গ্রেগরি রাস্‌পুটিন বলে একটা অত্যন্ত পাজি বদমাইশ লোক জারিনার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল; আর জারিনার প্রিয়পাত্র মানেই জারেরও প্রিয়পাত্র হওয়া। রাস্‌পুটিন ('রাস্‌পুটিন' কথাটার মানেই হচ্ছে 'নোংরা কুকুর') ছিল এক-জন গরিব চাষি; ঘোড়া-চুরির অপরাধে একবার ধরাও পড়েছিল সে। তার পর সে ভোল বদলে সাধু সন্ন্যাসী সেজে বসল। সে ব্যবসায়ে অনেক লাভ। ভারতবর্ষের মতো রাশিয়াতেও তখন সন্ন্যাসী হওয়াটা পয়সা-আয়ের একটা সহজ পন্থা ছিল। রাস্‌পুটিন লম্বা চুল রাখল; চুল যত বাড়তে লাগল তার খ্যাতিও ততই বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে শেষে স্বয়ং সম্রাটের কানেও গিয়ে পৌঁছল। জার এবং জারিনার একমাত্র পুত্র, তাঁর নাম জারেভিচ্, কিছুটা পঙ্গু ছিলেন। রাস্‌পুটিন পাকেচক্রে জারিনার বিশ্বাস জন্মিয়ে দিল, রাজপুত্রকে সে আরাম করে দেবে। রাস্‌পুটিনের কপাল খুলে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, জার আর জারিনা তারই ইঙ্গিতে উঠছেন বসছেন; তারই নির্দেশমতো রাজ্যের বড়ো বড়ো সব পদে লোক নিযুক্ত করা হচ্ছে। রাস্‌পুটিন অত্যন্ত কদর্য জীবন যাপন করত। দারুণ ঘুষ খেত সে, অথচ বহু বৎসর ধরেই রাশিয়াতে সে তার এই কর্তৃত্ব চালাতে লাগল।

এই ব্যাপারে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ চটে গেল। নরমপন্থীরা এবং অভিজাতরা পর্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। একটা প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটাবার, অর্থাৎ জোর করে জারকে সরিয়ে দিয়ে অন্য লোককে সিংহাসনে বসাবার কথা পর্যন্ত উঠল। ইতিমধ্যে জার নিকোলাস নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বলে ঘোষণা করেছেন এবং সবসুদ্ধ একটা বিরাট ভণ্ডুল সৃষ্টি করে চলেছেন। ১৯১৬ সন শেষ হবার অল্প কয়েক দিন আগে রাস্‌পুটিন নিহত হল, তাকে হত্যা করলেন জারেরই পরিবারের এক ব্যক্তি। রাস্‌পুটিনকে ইনি খাবার নিমন্ত্রণ করলেন, সেখানে তাকে বললেন, তুমি আত্মহত্যা করো। রাস্‌পুটিন অস্বীকার করল। তখন তিনি তাকে গুলি করে মারলেন। রাস্‌পুটিনের হত্যায় দেশের সকল প্রজাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু এর দরুন জারের গুপ্ত পুলিশরা আরও বেশি অত্যাচার শুরু করল।

সংকট ক্রমেই বেড়ে উঠল। দেশে খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হল; পেট্রোগ্রাডে খাদ্যপ্রার্থী জনতা দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করল। তার পর মার্চ মাসের প্রথম দিকে শ্রমিকদের দীর্ঘ কালের সঞ্চিত বেদনা অকস্মাৎ স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের রূপে আত্মপ্রকাশ করল। মার্চ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ, এই পাঁচটি দিন ধরে বিপ্লবেরই জয়জয়কার চলল। সে বিপ্লব শুধু প্রাসাদ-বিপ্লব নয়, সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ বিপ্লবও সে ছিল না, মাথার উপরে বসে কোনো নেতা তার কার্যক্রম বিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করে দেন নি। এ বিপ্লব যেন জেগে উঠল সমাজের একেবারে তলাকার স্তর থেকে, শ্রমিকদের মধ্যে যারা সকলের নীচে তাদেরই মধ্য থেকে; অন্ধের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে সে এগিয়ে চলল, তার পথের কোনো নির্দেশ জানা নেই, তাকে পথ দেখিয়ে নেবার মতো কোনো নেতাও নেই। নানাবিধ বিপ্লবী দল ছিল দেশে, বল্‌শেভিকদের স্থানীয় দলও ছিল; এরা কেউই এই বিপ্লবের সম্ভাবনা জানত না। এর আকস্মিক আবির্ভাবে তারাও সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, কী করে

একে চালিয়ে নিতে হবে তাও তাদের জানা ছিল না। দেশের সাধারণ লোকেরা নিজেরাই এই বিপ্লব শুরু করেছে। পেট্রোগ্রাডে অবস্থিত সেনাদল তাদের পক্ষ অবলম্বন করবামাত্রই তাদের সে চেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও এই বিপ্লবী জনসাধারণকে ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত অসংহত জনতা বলে ভুল করলে চলবে না—অতীত কালের কৃষকদের বিদ্রোহ অনেক সময়েই সেই রূপ গ্রহণ করেছিল। এই মার্চ-বিপ্লবের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল কারখানার শ্রমিক-শ্রেণীরা, যাদের বলা হয় প্রোলিটারিয়েট—ইতিহাসে এরকম ঘটনা এই প্রথম। সে সময়ে এই শ্রমিকদের সংগে তেমন বড়ো নেতা বলতে কেউই ছিলেন না (লেনিন প্রভৃতি নেতারা সকলেই তখন হয় জেলে না-হয় নির্বাসনে); কিন্তু তবুও এদেরই মধ্যে অনেক অজ্ঞাতনামা কর্মী ছিলেন, তাঁরা লেনিনের দলের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। বহু কারখানাতেই এরকমের লোক ছিল। এইসব অজ্ঞাতনামা কর্মীরাই সমগ্র আন্দোলনটিকে খাড়া করে রাখলেন, নির্দিষ্ট পথে একে চালিয়ে নিয়ে চললেন।

শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিকরা কার্যক্ষেত্রে কতখানি কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে পারে তার যা নমুনা এই ব্যাপারে দেখা গেল এমন আর কোথাও দেখা যায় নি। রাশিয়ার অবশ্য অধিকাংশ প্রজাই ছিল কৃষিজীবী; সে কৃষিও আবার চলত একেবারেই মধ্যযুগীয় রীতিতে। দেশহিসাবে রাশিয়াতে আধুনিক শিল্পকারখানা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না; যা দু-চারটে কারখানা ছিল তাও ছিল অল্প কয়েকটা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পেট্রোগ্রাডে এইরকমের অনেকগুলো কারখানা ছিল, অতএব বহুপরিমাণ শিল্পজীবী শ্রমিকও সেখানে বাস করত। মার্চ মাসের বিপ্লব এরাই ঘটিয়েছিল;— পেট্রোগ্রাডের এই শ্রমিকরা আর শহরে অবস্থিত সেনাদলরা একত্র হয়ে।

৮ই মার্চ তারিখে বিপ্লবের গুরু গর্জন প্রথম শোনা গেল। এতে অগ্রণী হল নারীরা; কাপড়ের কারখানার নারী শ্রমিকরা বেরিয়ে এল, রাস্তায় শোভাযাত্রা করে ঘুরতে লাগল। পরদিন ধর্মঘট আরও ছড়িয়ে পড়ল, অনেক পুরুষ শ্রমিকও বেরিয়ে এল সে দিন। খাদ্যের দাবি জানিয়ে, এবং 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক' এই ধ্বনি করে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে কর্তারা কশাক সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন; অতীতে চিরদিন এই কশাক-বাহিনীই ছিল জারের শক্তির প্রধান স্তম্ভ। দেখা গেল, কশাকরা লোকদের ধাক্কাধুক্কি দিচ্ছে, কিন্তু গুলি ছুঁড়ছে না। দেখে শ্রমিকরা উল্লসিত হয়ে উঠল; সরকারি পোশাকের আবরণেও কশাকরা আসলে হয়েছে তাদেরই বন্ধু! জনসাধারণের উৎসাহ তৎক্ষণাৎ বেড়ে উঠল; কশাকদের সংগে বন্ধুত্ব-স্থাপন করতে তারা এগিয়ে এল। পুলিশকে কিন্তু সবাই ঘৃণা করছে, ইঁট ছুড়ে মারছে। তৃতীয় দিন, ১০ই মার্চ, কশাকদের সংগে এই বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়েছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, পুলিশরা লোকদের উপর গুলি ছুঁড়েছিল, কশাকরা নাকি তাদেরই উপর গুলি চালিয়েছে। পুলিশ রাস্তা ছেড়ে সরে গিয়েছে। নারী শ্রমিকরা সৈন্যদের কাছে গিয়ে সনির্বন্ধ আহ্বান জানাচ্ছে; সৈন্যরা সঙিন আকাশমুখো করে রেখেছে।

তার পরদিন, ১১ই মার্চ রবিবার। শ্রমিকরা এসে শহরের কেন্দ্রস্থলে জমায়েত হচ্ছে। পুলিশরা ইতস্তত লুকিয়ে তাদের উপরে গুলি ছুঁড়ছে। কয়েকজন সৈন্যও লোকদের উপর গুলি ছুঁড়ল। লোকরা সেই সেনাদলদের ব্যারাকেই গিয়ে হাজির হল, তাদের নামে নালিশ করল। তাদের কথায় বিচলিত হয়ে সমস্ত রেজিমেণ্ট সুদ্ধ লোক তাদের রক্ষা করতে বেরিয়ে এল, তাদের চালিয়ে নিয়ে এল সৈন্যবিভাগের সাধারণ অফিসাররা। এই রেজিমেণ্টটিকে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু তখন আর করেও লাভ নেই। ১২ই মার্চ অন্যান্য রেজিমেণ্টও বিদ্রোহী হয়ে উঠল, রাইফেল আর মেশিনগান নিয়ে সৈন্যরা বেরিয়ে এল। রাস্তায় প্রচুর গুলিগোলা-বর্ষণ হল সে দিন; কিন্তু কে কাকে মারছে তা স্থির করা কঠিন। তার পর সৈন্যরা আর শ্রমিকরা মিলে জনকতক মন্ত্রীকে (অন্যেরা ইতিমধ্যেই পালিয়ে গেছে) পুলিশকে এবং গুপ্ত বাহিনীর গোয়েন্দাকে গ্রেপ্তার করল। আগের দিনের রাজনৈতিক বন্দী যাঁরা জেলখানাতে ছিলেন তাঁদেরও এরা ছেড়ে দিল।

পেট্রোগ্রাডে বিপ্লবের জয় হল। এর ক' দিন পরেই মস্কোতেও বিপ্লব হল। গ্রামের লোকেরা বসে বসে নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল ঘটনার গতি কোন্ দিকে যায়। ধীরে ধীরে কৃষকরাও এই

নূতন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিল, তবে তেমন উৎসাহভরে নয়। তাদের পক্ষে দরকারি কথা ছিল মাত্র দুটি; জমি পাওয়া আর শান্তিতে বাস করতে পাওয়া।

আর জার? বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ এই ক'টি দিন তিনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন? পেট্রোগ্রাডে ছিলেন না তিনি; ছিলেন অতি দূরের একটি ছোট্ট শহরে, সেখান থেকে প্রধান সেনাপতি হিসাবে তাঁর সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করবার কথা। কিন্তু তাঁর দিন তখন শেষ হয়ে গেছে; বেশি-পাকা ফলের মতোই তিনি টুপ্ করে ঝরে পড়লেন, কেউ বিশেষ লক্ষ্যও করল না। মহান জার, সমগ্র রাশিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট, যাঁর ভ্রূভঙ্গিতে কোটি কোটি মানুষ ভয়ে কম্পিত হত, 'পবিত্র রাশিয়া'র পরম পিতা, ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেলেন। অতি বড়ো বড়ো সব বিধান আর রীতিরও যেদিন দিন ফুরিয়ে যায়, ভাগ্য বিমুখ হয়, সেদিন তারা কীরকম সহজে ভেঙে পড়ে যায় সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার। শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং পেট্রোগ্রাডের হাঙ্গামার খবর পেয়ে জার হুকুম জারি করেছিলেন, সামরিক আইন চালু করা হোক। ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি সে আদেশ ঘোষণাও করেছিলেন। তবু শহরে সে ঘোষণা প্রচার করা হয় নি বা লিখিত ইস্তাহারে দেওয়ালে সাঁটা হয় নি, কারণ সে কাজ করবার মতো কেউ ছিল না! সরকারি শাসনযন্ত্র একেবারেই ভেঙে শতখান হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারখানা কী হচ্ছে জার তখনও কিছুই জানতেন না; তিনি পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসবার চেষ্টা করলেন। রেলশ্রমিকরা তাঁর গাড়িখানাকে পথের মধ্যেই আটকে রেখে দিল। জারিনা তখন ছিলেন পেট্রোগ্রাডের উপকণ্ঠে একটি স্থানে। জারকে তিনি একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। টেলিগ্রাফ-অফিস থেকে সেটি ফেরত এল, তার উপরে পেন্সিল দিয়ে মন্তব্য লেখা—'প্রাপকের ঠিকানা অজ্ঞাত!'

এইসমস্ত ব্যাপার দেখে রণক্ষেত্রস্থ সেনাপতিরা আর প্রেট্রোগ্রাডে-অবস্থিত উদারপন্থী নেতারা ভয় পেয়ে গেলেন। ভরাডুবি থেকে যেটুকু বাঁচানো যায় তাই লাভ, এই ভরসায় তাঁরা জারকে মিনতি করে পাঠালেন—সিংহাসন ত্যাগ করুন। জার তাই করলেন; তাঁর একজন আত্মীয়কে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী বলে মনোনীত করে গেলেন। কিন্তু তখন আর জারের আসনে কারও বসবার দিন নেই; তিন শো বছর স্বৈরতন্ত্রী শাসন চালিয়ে রোমানফ-রাজবংশ চিরকালের মতোই রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হলেন।

অভিজাতসম্প্রদায়, বিভিন্ন ভূস্বামীশ্রেণী, উচ্চতর মধ্যবিত্তশ্রেণী, এমনকি উদারপন্থী এবং সংস্কারপন্থীরা পর্যন্ত সকলেই শ্রমিকদেব এই আকস্মিক জাগরণ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁদের বড়ো ভরসা ছিল সেনাবাহিনী; তারাই গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দেখে তাঁদের মনে আর তিলমাত্র আশাভরসা রইল না। তখনও কিন্তু কোন্ পক্ষের জয় হবে সে সম্বন্ধে তাঁরা ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না; কে জানে হয়তো জার রণক্ষেত্র থেকেই একটি সেনাবাহিনী নিয়ে এসে আবার হাজির হবেন, তারই সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলবেন। তাঁরা এক দিকে শ্রমিকদের ভয় করছেন, আর-এক দিকে জারকেও ভয় করছেন; তার উপরে রয়েছে তাঁদের নিজেদের গা বাঁচাবার অতিরিক্ত ব্যাকুলতা—সমস্ত মিলে তাঁদের অবস্থা নিদারুণ হয়ে উঠল। ডুমা তখনও আছে, ভূস্বামীশ্রেণী এবং উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়েই সে গড়া। শ্রমিকরাও তার উপরে কিছু কিছু আস্থা রাখত। কিন্তু এই বিপদে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব নেওয়া বা কোনো-কিছু করবারই উদ্যম তার প্রেসিডেন্ট বা সভ্যরা দেখালেন না; বসে বসে শুধু ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, এখন কী তাঁদের কর্তব্য স্থির করেই উঠতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট গড়ে উঠল। শ্রমিকদের প্রতিনিধির সঙ্গে এবার সৈন্যদেরও প্রতিনিধি এতে নেওয়া হল। এই নূতন সোভিয়েট বিশাল টরিড-প্রাসাদের একটি বাহু দখল করে বসল; এই প্রাসাদেরই অন্য-এক অংশে ডুমার অধিবেশন হত। শ্রমিক এবং সৈনিকেরা জয়লাভ করেছে, তারা তখন উৎসাহে ভরপুর। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠল, সে জয় নিয়ে তারা এখন করবে কী? শক্তি তারা অর্জন করেছে, সে শক্তিকে প্রয়োগ করবে কে? সোভিয়েট নিজেই সে কাজ করতে পারে, এ কথা তাদের মনেই হল না; তারা ধরে নিল, বুর্জোয়াদেরই এবার শাসনভার হাতে নেওয়া উচিত। অতএব সোভিয়েটের প্রেরিত একটি প্রতিনিধি-দল ডুমার দরজায় গিয়ে হাজির হল,

তাদের বলতে গেল, এবার আপনারা দেশশাসন শুরু করুন। ডুমার প্রেসিডেণ্ট আর সভ্যরা ভাবলেন, এঁরা তাঁদের গ্রেপ্তার করতে এসেছে! ক্ষমতার বোঝা বইবার কোনোরকম ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না; তার সঙ্গে সঙ্গে যে বিপদের ঝুঁকি আসবে তার নামেই তাঁরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এখন কীই-বা করা যায়! সোভিয়েটের প্রতিনিধিরা জোর পীড়াপীড়ি করছেন, 'না' বলে তাঁদের চটাতেও যে ভয় করে! কাজেই অত্যন্ত অনিচ্ছাভরে, নেহাত বিপদে পড়বার ভয়েই, ডুমার একটি কমিটি দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। বাইরে থেকে সমস্ত পৃথিবীর লোক মনে করল, ডুমাই বিপ্লবের অধিনায়কত্ব করছে! কী অপূর্ব একটা হ-য-ব-র-ল কাণ্ড; গল্পে পড়লে আমাদের বিশ্বাসই হত না এরকম ব্যাপার সত্যি হতে পারে। কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় কাল্পনিক কাহিনীর চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য হয়ে থাকে।

অস্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলে ডুমার কমিটি যাদের নিযুক্ত করলেন সে দলটি ছিল অত্যন্ত রকম রক্ষণপন্থী। তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন রাজকুমার। সেই প্রাসাদেরই আর-একটি দিকে সোভিয়েট আড্ডা গেড়ে বসে রইল; অস্থায়ী সরকারের কাজকর্মের উপরে ক্রমাগত মোড়লি করতে লাগল। এই সোভিয়েট নিজে কিন্তু গোড়াতে নরমপন্থী ছিল; তার মধ্যে বলশেভিক যারা ছিল তাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। কাজেই দেখা গেল, দেশে দুটো কর্তৃপক্ষ এক সঙ্গে শাসন করছে, অস্থায়ী সরকার এবং সোভিয়েট; এদের দুয়েরই পিছনে আবার রয়েছে বিপ্লবী জনসাধারণ; বিপ্লবকে তারাই সম্পূর্ণ করেছে, এবং আশা করছে সে বিপ্লব থেকে তাদের খুব বড়ো ফল লাভ হবে। ক্ষুধার্ত এবং রণশ্রান্ত এই জনসাধারণকে একটিমাত্র কথা এই নূতন সরকার বুঝিয়ে দিলেন, জর্মনরা একেবারে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ তাদের চালিয়ে যেতেই হবে। তারা শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবল, এত হাঙ্গামা করে বিপ্লব ঘটাল তারা, জারকে দিল তাড়িয়ে, সে কি শুধু এরই জন্যে?

ঠিক এই সময়ে ১৭ই এপ্রিল তারিখে লেনিন এসে তাদের মধ্যে পৌঁছলেন। যুদ্ধের প্রথম থেকে শুরু করে আগাগোড়াই লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। বিপ্লবের কথা শুনবামাত্র তিনি রাশিয়াতে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আসবেন কী করে? ইংরেজ এবং ফরাসিরা তাঁকে তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে দেবে না; জর্মন এবং অস্ট্রিয়ানরাও দেবে না। শেষ পর্যন্ত জর্মনরা তাঁকে একটি রুদ্ধ গাড়িতে করে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে রুশ-সীমান্তে গিয়ে পৌঁছবার অনুমতি দিল; কেন দিল সে তারাই ভালো জানে। তাদের অবশ্যই আশা ছিল, লেনিন রাশিয়াতে পৌঁছলে অস্থায়ী সরকারের শক্তি কমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সমর্থক দলেরও শক্তি হ্রাস পাবে। তাদের এ আশা অযৌক্তিকও নয়; কারণ, লেনিন ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী; জর্মনদের তাতে কিছু লাভ হবে বলে তাদের ভরসা ছিল। এই অখ্যাতনামা বিপ্লবীই এক দিন সমস্ত ইউরোপ আর পৃথিবীতে একটা ভূমিকম্প সৃষ্টি করবেন, এ কথা সে দিন তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

লেনিনের মনে কোনো সন্দেহ বা সংশয় ছিল না। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী; জনসাধারণের মনের ভাব কী তা তিনি সহজেই দেখে নিলেন। তাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সে বুদ্ধির দ্বারা তিনি তাঁর সুচিন্তিত এবং সুগঠিত নীতিকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। তাঁর ছিল অদম্য সংকল্প; তার বলে তিনি নিজের জন্যে যে পথ স্থির করেছিলেন সেই পথেই অটল হয়ে টিকে রইলেন, তার ফলে অচিরাৎ যে বিঘ্ন-বিপদের সৃষ্টি হবে তার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে। যে দিন এসে পৌঁছলেন সেই দিনই তিনি বলশেভিক-দলকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগিয়ে দিলেন, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে বলে তাদের ত্রুটি ধরলেন, এখন তাদের কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। লেনিনের বক্তৃতা ছিল ঠিক বিদ্যুতের স্পর্শের মতো। তাতে ব্যথা লাগে কিন্তু চেতনাও জাগে। তিনি বললেন, "কেবল বাক্‌সর্বস্ব হাতুড়ে আমরা নই; জনসাধারণের চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে তারই উপরে আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের যদি সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হয়, নাহয় তাই থাকব। কিছুক্ষণের মতো নেতার আসন ছেড়ে থাকাও বেশ ভালো জিনিষ; সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে ভয় করলে আমাদের চলবে না।" তাঁর

নীতিকে অবলম্বন করে তিনি দৃঢ় হয়ে বসে রইলেন, কিছুতেই আপোস-মীমাংসা করতে রাজি হলেন না। বিপ্লব এত দিন নেতা এবং পথপ্রদর্শকের অভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছিল; এবার তার সেই নেতার দর্শন মিলল। কাজের ক্ষণ আসবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াতে কাজের মানুষেরও আবির্ভাব হল।

মতবাদের যে প্রভেদ নিয়ে বলশেভিকরা সে সময়ে মেনশেভিক এবং অন্যান্য বিপ্লবী দল থেকে পৃথক হয়ে ছিলেন সে প্রভেদ কী? লেনিন এসে পৌঁছবার আগে স্থানীয় বলশেভিকরা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল তারই বা কী কারণ? তার পর, নিজের হাতে ক্ষমতা পেয়েও সোভিয়েট তাকে আবার একটা সেকেলে এবং রক্ষণপন্থী ডুমার হাতে তুলে দিল, তাই-বা কেন? এইসব প্রশ্নের বিশদ আলোচনা আমি এখানে করতে পারছি না। কিন্তু ১৯১৭ সনে পেট্রোগ্রাডে এবং রাশিয়াতে ঘটনার যে ক্রমান্বিত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল তাকে বুঝতে হলে এই প্রশ্নগুলোকে একটুখানি নেড়েচেড়ে দেখতেই হবে।

মানুষের পরিবর্তন আর প্রগতি সম্বন্ধে কার্ল্ মার্ক্সের যে মতবাদ তার নাম 'ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ভাষ্য'। সমাজ জীবনের প্রাচীন রীতিনীতিগুলো যখন পুরোনো অকর্মণ্য হয়ে যায় তখন নূতন রীতিনীতি এসে তার স্থান দখল করে, এই তথ্যটিকে আশ্রয় করেই এই মতবাদ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। পণ্য-উৎপাদনের রীতিনীতি প্রণালীর যেই উন্নতি হল, সমাজের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনব্যবস্থাও তারই সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বদলে তার অনুরূপ হয়ে উঠল। এই ব্যাপারটা ঘটেছে শোষক প্রভুশ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণীদের মধ্যে ক্রমাগত শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। যেমন পশ্চিম-ইউরোপে প্রাচীন কালের সামন্তশ্রেণী আর নেই, তাদের স্থান দখল করেছে বুর্জোয়ারা; ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মানি প্রভৃতি দেশে এখন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে তাদেরই প্রভুত্ব। এরাও আবার এক দিন মুছে যাবে, এদের জায়গা দখল করবে এসে শ্রমিকশ্রেণী। রাশিয়াতে সামন্ত-শ্রেণী তখনও প্রভুত্ব করছে; যে পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে সে পরিবর্তন রাশিয়াতে তখনও ঘটে নি। সুতরাং মার্ক্সবাদীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল, রাশিয়াকেও অবশ্যই সেই বুর্জোয়া এবং পার্লামেণ্টি রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই এক দিন সে এর শেষ স্তরে শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্রে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে। তাঁদের মতে মাঝখানটার এই স্তরটিকে লাফ মেরে ডিঙিয়ে যাবার কোনো পন্থা নেই। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসের বিপ্লবের আগে, লেনিন নিজেও একটা মধ্যবর্তী নীতির কর্মসূচী রচনা করেছিলেন; তাতে এরূপ নির্দেশ ছিল—কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা (বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধ করে নয়), করে জার এবং ভূস্বামীদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, এবং এইভাবে একটি বুর্জোয়া-বিপ্লব ঘটিয়ে তুলতে হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বলশেভিক মেনশেভিক এবং মার্ক্সের মতবাদে বিশ্বাসী অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি, সকলেরই মনে এই ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল, ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মতো একটা বুর্জোয়া-প্রধান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে নিতেই হবে। শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও একে অপরিহার্য বলেই জানতেন, এবং এইজন্যেই সোভিয়েট শাসনক্ষমতা নিজের হাতে না রেখে সেটা ডুমার হাতে তুলে দিয়েছিল। আমাদের সকলেরই যে দশা মাঝে মাঝে হয়—নিজেদের সৃষ্ট নীতির এঁরা একেবারে অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন; নূতন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যার জন্যে এখন নূতনতর নীতির প্রয়োজন, অন্তত পুরোনো নীতিটাকে কিছু বদলে নেওয়া প্রয়োজন, এ কথা তাঁদের মনেই হয় নি। নেতাদের তুলনায় বরং জনসাধারণের মনেই বিপ্লবের চেতনা ছিল অনেক বেশি। সোভিয়েটের মধ্যে তখন মেনশেভিকরা প্রবল; তারা এতদূর পর্যন্ত বলল, শ্রমিকশ্রেণী যেন সে সময়টাতে কোনোরকম সামাজিক সমস্যার কথা না তোলে; তাদের তখন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। বলশেভিকরা বলছিল, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হোক। মার্চ মাসের বিপ্লব সফল হল, কিন্তু তার নেতারা ছিলেন অতি সাবধানী, দ্বিধাগ্রস্ত।

লেনিন এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বদলে গেল। দেশে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে তিনি এক নিমেষে বুঝে ফেললেন; খাঁটি নেতার যোগ্য প্রতিভাবলে সেই অবস্থা অনুসারে মার্ক্সের

নীতিকে ঢেলে সেজে নিলেন। বললেন, লড়াই এবার করতে হবে ধনিকতন্ত্রেরই বিরুদ্ধে; শাসনভার আয়ত্ত করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর; তাদের সঙ্গে থাকবে অধিকতর দরিদ্র কৃষকরা। বল্‌শেভিকদের আপাতকর্তব্য কী তার ইঙ্গিত মিলল তাদের দলগত ধ্বনিতে : (১) গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপন কর, (২) সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রের আয়ত্ত করে নাও, (৩) শ্রমিকদের কাজের সময় দিনে আট ঘণ্টার অনধিক হোক। এই ধ্বনি কৃষক এবং শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিল, তারা যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তার মধ্যে একটা বাস্তব লক্ষ্য আছে। তাদের পক্ষে সে সংগ্রাম শুধু একটা অস্পষ্ট এবং শূন্যগর্ভ আদর্শ নয়; তাদের সে এনে দেবে জীবন, এনে দেবে আশা।

লেনিনের নীতি ছিল, বল্‌শেভিকরা শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশ লোককে নিজের পক্ষে টেনে নেবে এবং এইভাবে সোভিয়েটের কর্তৃত্ব হস্তগত করবে; তার পর সেই সোভিয়েট অস্থায়ী সরকারের হাত থেকে শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেবে। তখনই আর-একটা বিপ্লব ঘটাবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জোর দিয়ে বললেন, অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করবার সময় যখন আসবে, তার আগেই শ্রমিকদের এবং সোভিয়েটের মধ্যে বল্‌শেভিকদের সংখ্যা-গৌরব অর্জন করে নিতে হবে। এই সরকারের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করতে চাইছিলেন তিনি তাঁদের উপরে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন; তিনি বলতেন, সেটা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সময় আসবার আগেই যারা হুড়মুড় করে এই সরকারকে ভেঙে দেবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের প্রতিও তিনি সমানই বিরাগ প্রকাশ করলেন; বললেন, "কাজের সময় বলে যেটাকে জানি সেটা 'বামপন্থায় অল্প একটুখানি বেশি দূর চলে যাওয়ার' সময় নয়। সেটাকে আমরা সবচেয়ে বড়ো অপরাধ বলেই মনে করি। তার নাম হচ্ছে—শৃঙ্খলা-ভাঙা।"

এমনি করে শান্ত অথচ অনমনীয় গতিতে এই অদ্ভুত মানুষটি তাঁর বিধিনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চললেন। ঈশ্বরের একটি অলঙ্ঘ্য বিধানের অমোঘ প্রতিপালক তিনি; তাঁকে বাইরে থেকে দেখায় বরফের চাঙড়ের মতো, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আগুনের জ্বলন্ত কুণ্ড!

১৫১

বল্‌শেভিকদের ক্ষমতালাভ

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৩

বিপ্লবের সময়ে ইতিহাস যেন খুব বড়ো বড়ো লম্বা পা ফেলে হাঁটে। বাইরের জগতে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে; জনসাধারণের মনে পরিবর্তন আসে তার চেয়েও বেশি। পুঁথিপত্রের শিক্ষা লাভের সুযোগ তাদের বেশি দূর নয়, কাজেই বই পড়ে বেশি-কিছু তারা শেখেও না; তা ছাড়া বইয়ে সত্য কথা শেখায় যতটুকু, গোপন করে তার চেয়ে অনেক বেশি। জনসাধারণের শিক্ষা হয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে; সে শিক্ষা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু সেই শিক্ষাই অধিকতর সত্য। বিপ্লবের সময়ে দেশের শাসনক্ষমতা নিয়ে জীবন ও মৃত্যু পণ করে লড়াই চলতে থাকে; সাধারণত যে ভণ্ডামির মুখোশ পরে মানুষরা তাদের সত্যকার মনোবৃত্তিকে গোপন করে রাখে সে মুখোশ যায় খুলে; তার পিছন থেকে বেরিয়ে পড়ে বাস্তব সত্য, গোটা সমাজেরই ভিত্তিমূলে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাস্তব সত্য। রাশিয়াতে ১৯১৭ সনটি ছিল এমনি একটি যুগসন্ধিক্ষণ; জনসাধারণ, বিশেষ করে শহর-অঞ্চলের শিল্পজীবী শ্রমিকরা, যারা বিপ্লবের একেবারে মধ্যকার মানুষ, তারা বাস্তব ঘটনাচক্র থেকেই তাদের জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করল; প্রায় দিনকের দিন তাদের জ্ঞান আর মতামত বদলে যেতে লাগল। স্থায়িত্ব বা ভারসাম্য বলে কোথাও কিছু সে দিন ছিল না। মানুষের জীবনে জেগেছে গতির স্পন্দন, লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া; লোকেরা আর শ্রেণীরা যে যে দিকে পারে টানাটানি আর ঠেলাঠেলি করে বেড়াচ্ছে। তখনও অনেক লোক আশা

করছে, জারের রাজত্ব আবার ফিরে আসবে, তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে; কিন্তু তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য দল এর পিছনে ছিল না, তাই এদের কথা আমরা বাদ দিয়েই যেতে পারি। বিরোধ প্রধানত বাধল অস্থায়ী সরকার আর সোভিয়েটের মধ্যে; যদিও তখনও সোভিয়েটের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং আপোসের পক্ষপাতী। এই আপোসকামীদের ভয় ছিল, পাছে শাসনভার এবং রাষ্ট্রক্ষমতার বোঝা তাদের ঘাড়ে এসে চাপে। "সরকারের পরিত্যক্ত জায়গা দখল করবে কে? আমরা? কিন্তু আমাদের হাত যে কাঁপে......।" সোভিয়েটের একজন সভ্য তাঁর বক্তৃতায় এই উক্তি করেছিলেন। এরকম উক্তি শুনতে আমরাও অভ্যস্ত আছি; ভারতবর্ষেও কম্পিতবাহু এবং ভীরুহৃদয় বহু ব্যক্তির মুখে এরকম উক্তি আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু তাই বলে সময় যে দিন সত্যই আসে, সবল বাহু আর সাহসী হৃদয়েরও অভাব হয় না সে দিন।

অস্থায়ী সরকার আর সোভিয়েটের মধ্যে বিরোধ না বাধে, দুই পক্ষেরই আপোসকামীরা সেজন্যে অনেক চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সে বিরোধ না বেধে পারেই না। সরকারের অভিপ্রায় ছিল—যুদ্ধ চালিয়ে তারা মিত্রপক্ষকে খুশি রাখবে, রাশিয়ার ধনীশ্রেণীদের খুশি রাখবে তাদের যা-কিছু সম্পত্তি আছে সমস্ত যথাসম্ভব রক্ষা করে দিয়ে। জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক বেশি নিবিড় ছিল। জনসাধারণ শান্তি চায়, কৃষকদের জন্যে জমি চায়; শ্রমিকরাও দিনে আট ঘণ্টার অনধিক কাজ প্রভৃতি অনেক ব্যবস্থা চায়—এসব সোভিয়েট টের পাচ্ছিল। অতএব দেখা গেল, সোভিয়েটের চাপে পড়ে সরকার বিহ্বল হয়ে গেছে, আবার সোভিয়েট নিজেও জনসাধারণের চাপে পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল; কারণ, এইসব দল আর নেতাদের তুলনায় জনসাধারণের মধ্যেই বিপ্লবের চেতনা অনেক বেশি জোরালো ছিল।

সরকারকে টেনে সোভিয়েটের সঙ্গে আরও একটু খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করা হল; কেরেন্‌স্কি-নামক একজন প্রগতিবাদী আইনজীবী এবং সুবক্তা সরকারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। অনেক চেষ্টার ফলে তিনি একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করলেন। সোভিয়েটের মধ্যে সংখ্যাগুরু দল ছিল মেন্‌শেভিকরা, তাদেরও কয়েকজন প্রতিনিধি এই সরকারে এসে যোগ দিলেন। জর্মনির বিরুদ্ধে একটা অভিযান করে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সকে প্রসন্ন করতেও কেরেন্‌স্কি অনেক চেষ্টা করলেন। সে অভিযান ব্যর্থ হল; সেনাবাহিনী বা জনসাধারণের আর যুদ্ধ করবার আগ্রহ ছিল না।

ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাডে নিখিল রাশিয়ার সোভিয়েট কংগ্রেসের অনেক অধিবেশন হল; প্রত্যেক অধিবেশনেই পূর্ববারের চেয়ে বেশি চরমপন্থী মতামত প্রকাশ পেল। ক্রমেই বেশিসংখ্যক বল্‌শেভিক এই কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হতে লাগল। মেন্‌শেভিক আর সোশ্যাল রেভোল্যুশনারি (সমাজবিপ্লবী—কৃষকদের একটি দল) এই দুটি দলই এত দিন প্রবল ছিল, তাদের সংখ্যাগৌরব ক্রমে হ্রাস পেয়ে এল। বিশেষ করে পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকদের মধ্যে বল্‌শেভিক-দের প্রভাব খুব বেড়ে উঠল। দেশের সর্বত্র তখন বহু সোভিয়েট গড়ে উঠছে; সরকারের কোনো হুকুমই তারা মানতে রাজি নয়, যদি-না তাতে সোভিয়েটেরও স্বাক্ষর থাকে। রাশিয়াতে কোনো বলশালী মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল না; অস্থায়ী সরকার এত দুর্বল হবার সেও একটা বড়ো কারণ।

রাজধানীতে যখন শাসনক্ষমতা নিয়ে এই কাড়াকাড়ি চলেছে, কৃষকরা ও দিকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে শুরু করল। আগেই বলেছি, মার্চ মাসের বিপ্লব নিয়ে এই কৃষকরা তেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি; আবার এর বিরোধীও তারা ছিল না। তারা শুধু অপেক্ষা করছিল, দেখছিল জল কোন্ দিকে গড়ায়। কিন্তু বড়ো বড়ো ভূস্বামী আর জমিদারদের ভয় ধরল, তাদের জমি বুঝি এবার কেড়েই নেওয়া হবে। সেই ভয়ে এ'রা এ'দের জমিকে ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে বহু নকল মালিকের হাতে ছড়িয়ে দিলেন, যেন তারা জমিটাকে বেনামিতে তাঁদেরই জন্যে বজায় রাখে। অনেক জমি বিদেশীদের হাতেও তুলে দিলেন তাঁরা। এমনি করে তাঁরা নিজেদের ভূসম্পত্তি টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন। কৃষকদের এটা মোটেই পছন্দ হল না, তারা সরকারকে অনুরোধ জানাল, আইন করে সমস্ত রকমের জমি বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হোক। সরকার ইতস্তত করতে লাগলেন—এ অবস্থায় কী করা যায়? তাঁরা তো কোনো পক্ষকেই চটাতে চান না। কৃষকরা তখন নিজেরাই যা করবার করতে লেগে গেল। এপ্রিল মাসেই অনেক জায়গাতে তারা ভূস্বামীদের গ্রেপ্তার করল,

তাঁদের জমি দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করল রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈন্যরা (তারা সকলেই কৃষকশ্রেণীর লোক)। এই আন্দোলন বাড়তে লাগল, ক্রমে একেবারে ব্যাপক ভাবেই জমি দখল করা হতে লাগল। জুন মাস নাগাদ দেখা গেল, সাইবেরিয়ার স্তেপ-অঞ্চলে পর্যন্ত এর ধাক্কা গিয়ে পৌঁচেছে। সাইবেরিয়াতে কোনো বড়ো জমিদার ছিল না; কাজেই সেখানে কৃষকরা দখল করে বসল যত গির্জা আর মঠের জমি।

এটা লক্ষ্য কোরো, এই-যে বড়ো বড়ো জমিদারিগুলো কেড়ে নেওয়া, এটা কিন্তু করছিল সম্পূর্ণভাবেই কৃষকরা, একেবারেই নিজের উদ্যমে। বলশেভিক-বিপ্লব এসেছে এরও অনেক মাস পরে। লেনিনের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত জমি অবিলম্বে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, কিন্তু সুশৃঙ্খল প্রণালীতে। যেখানে যেমন খুশি বিশৃঙ্খলভাবে জমি দখল করার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। এর বহু দিন পরে বলশেভিকরা শাসনক্ষমতা হস্তগত করল, রাশিয়ার সমস্ত জমি তার আগেই কৃষকের মালিকানা সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

লেনিনের প্রত্যাবর্তনের ঠিক এক মাস পরে আর-একজন প্রসিদ্ধ নির্বাসিত নেতা পেট্রোগ্রাডে এসে পেঁছলেন। ইনি হচ্ছেন ট্রট্স্কি। তিনি ফিরে এলেন নিউইয়র্ক থেকে। পথের মধ্যে আবার ব্রিটিশরা তাঁকে আটকে দিয়েছিল। ট্রট্স্কি পুরোনো বলশেভিক-দলের লোক ছিলেন না; তখন তিনি মেনশেভিকও নন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি লেনিনের পক্ষে যোগ দিলেন, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের সবচেয়ে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। ট্রট্স্কি ছিলেন অতি চমৎকার বক্তা, খুব ভালো লেখক, এবং ঠিক একটা ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতোই প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁকে দলে পেয়ে লেনিনের শক্তি অত্যন্ত বেড়ে গেল।

ট্রট্স্কি একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন, তার নাম 'আমার জীবন'। এই বই থেকে একটি দীর্ঘ উক্তি আমি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 'মডার্ন সার্কাস' -নামক একটি গৃহে তিনি বহু সভায় বক্তৃতা করেছিলেন, এতে তারই একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এটা যে শুধু একটা সুন্দর রচনা তাই নয়, ১৯১৭ সনে সেই অদ্ভুত বিপ্লবের দিনে পেট্রোগ্রাডের অবস্থা কী ছিল, তারও একটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং জীবন্ত চিত্র তাঁর এই লেখা থেকে আমরা পাচ্ছি :

"নিশ্বাসে এবং প্রতীক্ষায় গৃহের বায়ু ভারাক্রান্ত; সে বায়ুমণ্ডল চিৎকারে এবং হর্ষধ্বনিতে একেবারে ফেটে পড়ত—মডার্ন সার্কাসের শ্রোতাদের এই ছিল বিশেষত্ব। আমার উপরে, আমার চার পাশে অসংখ্য মানুষ, বাহুতে বাহুতে বক্ষে বক্ষে মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়েছে। আমি বক্তৃতা করতাম অসংখ্য মানবদেহের মধ্যবর্তী একটি উষ্ণ গহ্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে; যখনই একটু-খানি হস্তপ্রসারণ করি, সে হাত কারও-না-কারও অঙ্গ স্পর্শ করে; উত্তরে সে ব্যক্তি যেন কৃতজ্ঞ বিহ্বল হয়ে নড়ে ওঠে। দেখে বুঝি, আমার বক্তৃতার সাফল্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো হেতু নেই, বক্তৃতা আমার এখন বন্ধ করলে চলবে না, শুধু বলেই যেতে হবে। উচ্ছ্বসিত জনতার সেই সান্নিধ্য যে বৈদ্যুতিক চেতনার সঞ্চার করে তার আকর্ষণ রোধ করার সাধ্য কোনো বক্তারই নেই, তিনি যতই শ্রান্ত, অবসন্ন হোন-না কেন। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, পথের নির্দেশ পেতে চায়। এক-এক সময় মনে হত যেন এই জনতার উগ্র অনুসন্ধিৎসার স্পর্শ আমি আমার মুখের উপরে অনুভব করছি; জনতার সমস্ত মানুষ যেন একাগ্রতার নিবিড়তায় মিলে একটি দেহে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায়, আগে থেকে যেসমস্ত যুক্তি এবং বাক্য ভেবে রেখেছি, আমার মনের ব্যাকুল আবেগের চাপে তা ভেঙে বিলুপ্ত হয়ে যেত; তার পরিবর্তে নূতনতর কথা নূতন যুক্তি যেন আমার অবচেতন মনের তলদেশ হতে সুশৃঙ্খলভাবে বার হয়ে আসত—সে কথা বক্তার পক্ষে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, অথচ শ্রোতাদের পক্ষে তারই প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় আমার মনে হত যেন আমি নিজেই বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তার কথা শুনছি, তার চিন্তাধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করছি; ভয় হত যেন আমার সচেতন যুক্তির স্পর্শ লাগলে তিনি নিদ্রা-যোগে ভ্রমণকারীর মতো অতর্কিতে চমকে ছাদের কিনারা থেকে পড়ে যাবেন।

"এই ছিল মডার্ন সার্কাসের সভার রূপ। এর আকৃতি-প্রকৃতি এরই নিজস্ব বস্তু—উৎসাহে জ্বলন্ত, বেদনায় কোমল, উদ্দীপনায় উন্মত্ত। শিশুরা নিশ্চিন্তমনে মাতাদের বক্ষোলগ্ন হয়ে দুগ্ধ-

পান করছে, সে মাতাদের কণ্ঠে তখন অনুমোদন বা ভয়প্রদর্শনের চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত জনতাটারই রূপ ছিল এই : ক্ষুধার্ত শিশু সে, শুষ্ক পিপাসিত ওষ্ঠ বিপ্লবের স্তনবৃন্তে সংলগ্ন করে দুগ্ধপান করছে। সে শিশু কিন্তু অতি দ্রুতগতিতে বড়ো হয়ে উঠল।"

এইভাবে পেট্রোগ্রাডে এবং রাশিয়ার অন্যান্য শহরে ও গ্রামে বিপ্লবের নাটক অভিনীত হয়ে চলল, সে নাটকের দৃশ্যপটের ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে। সর্বত্রই দেখা গেল, যুদ্ধের দরুন যে নিদারুণ চাপ দেশের উপরে পড়ছিল তার ফলে আর্থিকব্যবস্থার একটা বিরাট ভাঙন আসন্ন হয়ে উঠেছে। অথচ তখনও ব্যবসাদারেরা তাদের যুদ্ধের বাজারের লাভ ঠিকই গুছিয়ে নিচ্ছে।

কারখানা এবং সোভিয়েটগুলিতে বল্‌শেভিকদের শক্তি এবং প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলল। দেখে-শুনে কেরেন্‌স্কি ভয় পেলেন; স্থির করলেন, এদের দমন করতে হবে। প্রথমটা লেনিনের নামে কুৎসাপ্রচারের একটা চেষ্টা করা হল; বলা হল, তিনি জর্মনির গুপ্তচর, রাশিয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার জন্যেই জর্মানি তাঁকে পাঠিয়েছে। সুইজারল্যান্ড থেকে তিনি কি জর্মনির মধ্য দিয়েই রাশিয়ায় আসেন নি? জর্মন-কর্তৃপক্ষের সাহায্য না থাকলে এলেন কী করে? মধ্যবিত্ত-শ্রেণীরা লেনিনের উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠল, তারা তাঁকে দেশদ্রোহী বলেই বুঝে নিল। লেনিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যেও পরোয়ানা বার করলেন কেরেন্‌স্কি—লেনিন বিপ্লবী বলে নয়, জর্মনির সহায়ক দেশদ্রোহী বলে। লেনিনের খুবই ইচ্ছা ছিল, তাঁর সত্যি একটা বিচার হোক, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নামে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করবেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা তাতে রাজি হলেন না, তাঁদের পীড়াপীড়িতে পড়ে লেনিন আত্মগোপন করলেন। ট্রট্‌স্কিকে গ্রেপ্তার করা হল; কিন্তু পরে পেট্রোগ্রাড-সোভিয়েটের নির্বন্ধে পড়ে আবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। বল্‌শেভিক-দলের আরও অনেকে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের সংবাদপত্রগুলো জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হল; বল্‌শেভিকদের পক্ষপাতী বলে যাদের উপর সন্দেহ হল সেই শ্রমিকদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল। এই শ্রমিকদের মনের ভাব ক্রমেই বেশি উগ্র এবং অস্থায়ী সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল; বার বার এরা সে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে বড়ো বড়ো শোভাযাত্রা ইত্যাদি বার করছিল।

কিছুদিনের মতো একটা ছেদ পড়ল, সেই ফাঁকে বিপ্লববিরোধী দল মাথা তুলে দাঁড়াল। কর্নিলভ নামক একজন বৃদ্ধ সেনাপতি একটি সেনাবাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন; তাঁর উদ্দেশ্য, অস্থায়ী সরকার সুদ্ধ সমস্ত বিপ্লবটিকেই তিনি ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু শহরের কাছে পেঁছে দেখলেন, তাঁর সমস্ত সৈন্য হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। বিপ্লবের পক্ষেই গিয়ে যোগ দিয়েছে তারা।

ঘটনার স্রোত তখন দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে। সোভিয়েট ক্রমেই সরকারের একটি বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে; অনেক সময় সরকারি আদেশ পর্যন্ত সে নাকচ করে দিচ্ছে, বা তার উল্‌টো আদেশ জারি করছে। তখন স্মল্‌নি ইন্‌স্টিটিউটের বাড়িটাই হয়েছে সোভিয়েটের দপ্তরখানা; পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবও সেইখান থেকেই চালানো হচ্ছে। এই স্মল্‌নি ইন্‌স্টিটিউট ছিল অভিজাত-বংশের মেয়েদের জন্যে একটা বেসরকারি বিদ্যালয়।

লেনিন পেট্রোগ্রাডের উপকণ্ঠে এসে পেঁছলেন। বল্‌শেভিকরা স্থির করল, অস্থায়ী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় এবার এসেছে। এই বিদ্রাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করবার ভার দেওয়া হল ট্রট্‌স্কিকে। কোন্ কোন্ মর্মস্থল দখল করে নিতে হবে, কখন নিতে হবে, ইত্যাদি সমস্ত পরিকল্পনাই অতি যত্নে ছক কেটে কেটে স্থির করা হল। ৭ই নভেম্বরকে বিদ্রোহের দিন বলে ধার্য করা হল। সেই দিন রাশিয়ার সমস্ত সোভিয়েটের একটি যুক্ত অধিবেশন হবার কথা ছিল। লেনিনই এই দিনটিকে স্থির করলেন; যে যুক্তি দেখালেন সে চমৎকার। তিনি নাকি বলেছিলেন, "৬ই নভেম্বর করতে গেলে বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। বিদ্রোহ করতে হলে সমস্ত রাশিয়াকে একত্র ধরেই করতে হবে; ৬ই তারিখে কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধিরা এসে পেঁছবেন না। আবার ৮ই করতে গেলেও খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে—সে দিন দেখা যাবে কংগ্রেস রীতিমতো সুশৃঙ্খল হয়ে অধিবেশন শুরু করেছে কিন্তু এইরকম খুব বৃহৎ একটা জনসংঘের

পক্ষে দ্রুত এবং নিশ্চিত কাজ করা সহজ নয়। অতএব আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে ৭ই তারিখে। কংগ্রেসের সভ্যরা সেই দিনই এসে মাত্র একত্র হবেন। আমরা তাদের গিয়ে বলব, 'এই-যে, ক্ষমতা হস্তগত করেছি! এখন একে নিয়ে কী করবে তোমরা তাই বলো।" এই ছিল সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি কুশলী বিপ্লবীর যুক্তি; তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, বাইরের দৃষ্টিতে যেসব ঘটনা অতি তুচ্ছ, অনেক সময়ে তারই উপর বিপ্লবের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে। *

৭ই নভেম্বর এল। সোভিয়েটের সৈন্যরা গিয়ে সরকারি বাড়িগুলো দখল করল; বিশেষ করে টেলিগ্রাফ অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকারি ব্যাঙ্ক্ ইত্যাদি স্থানগুলি। এদের কেউ বাধাই দিল না। একজন ব্রিটিশ চর এর সম্বন্ধে যে সরকারি বিবরণ ইংলণ্ডে পাঠালেন তাতে তিনি এর বর্ণনা দিলেন এই বলে; "অস্থায়ী সরকার শুধু শূন্যে মিলিয়ে গেল!"

নূতন সরকারের বড়োকর্তা হলেন লেনিন; তিনি এর প্রেসিডেন্ট, আর ট্রট্স্কি এর পররাষ্ট্রসচিব। পরদিন, ৮ই নভেম্বর, লেনিন স্মল্নি ইন্স্টিটিউটে সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশনে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সন্ধ্যাবেলা। কংগ্রেস বিপুল কোলাহল ক'রে তার নেতাকে অভ্যর্থনা করল। রীড-নামক একজন আমেরিকান সাংবাদিক সেদিন উপস্থিত ছিলেন; বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে উঠবার সময় 'মহাত্মা লেনিন'কে কেমন দেখাচ্ছিল তিনি তার এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন :

"বেঁটে জোয়ান চেহারা, কাঁধের উপরে একটা মস্ত বড়ো মাথা বসানো, ছোটো ছোটো চক্ষু, ঈষৎ চ্যাপ্টা নাক, বিস্তৃত প্রসন্ন মুখ, ভারী চিবুক; মুখ আপাতত কামানো, কিন্তু এর মধ্যেই আবার দাড়ি গজাতে শুরু করেছে—অতীত কালে এবং পরবর্তী কালে তাঁর সে দাড়ি সকলেরই পরিচিত ছিল। ঢোলাঢালা বেমানান পোশাক, ট্রাউজারটা অত্যধিক বড়ো। অজ্ঞ জনসাধারণ মুগ্ধ হতে পারে এমন চমকপ্রদ কিছুই তাঁর আকৃতিতে নেই। আশ্চর্য একজন জনপ্রিয় নেতা—তিনি নেতা হয়েছেন শুদ্ধ তাঁর বুদ্ধির জোরে। তাঁর মধ্যে কোথাও রূপের দীপ্তি নেই, রসিকতার লেশমাত্র নেই, অপরের সঙ্গে আপোস করে চলবার প্রবৃত্তি নেই। কারও অন্তরঙ্গ বন্ধুও হবার অভ্যেস নেই, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কোনোই ব্যক্তিগত অভ্যেস বা বাতিকও নেই। কিন্তু তাঁর আছে অত্যন্ত গভীর তত্ত্বকেও অতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা, আছে যে-কোনো বাস্তব অবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা। আর ছিল, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—সঙ্গে সঙ্গে সে বুদ্ধিকে পরিচালনার জন্য দুরন্ত দুঃসাহস।"

একই বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিপ্লব সফল হল; এই দ্বিতীয় বিপ্লবটা তখন পর্যন্ত আশ্চর্যরকম বিনা হাঙ্গামায় সম্পন্ন হয়েছে। শাসনশক্তি হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু সেজন্য রক্তপাতের প্রায় প্রয়োজনই হয় নি। বরং মার্চের বিপ্লবে অনেক বেশি যুদ্ধ, অনেক বেশি নরহত্যা করতে হয়েছিল। মার্চের বিপ্লব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংযত; নভেম্বরের বিলম্ব করা হল সযত্নে-রচিত পরিকল্পনা অনুসারে। দরিদ্রতম শ্রেণীদের, বিশেষ করে শিল্পজীবী শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই একটি দেশের কর্তৃত্বভার আয়ত্ত করে বসল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কখনও হয় নি। কিন্তু তাই বলে সিদ্ধিলাভ তাদের পক্ষে খুব সহজও হল না। চার দিকে ঝড়ের মেঘ ভরে উঠছিল। সে ঝড় একেবারে দুর্দান্ত আক্রোশে তাদের উপর এসে ভেঙে পড়ল।

* বল্শেভিকদের ক্ষমতা দখল করবার দিন বলে ৭ই নভেম্বর তারিখটি লেনিনই স্থির করে দিয়েছিলেন, এই কথাটি আমাদের বলেছেন আমেরিকান সাংবাদিক রীড; ইনি সে সময়ে পেট্রোগ্রাডে ছিলেন। কিন্তু অন্য যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। লেনিন তখন আত্মগোপন করে রয়েছেন; তাঁর ভয় ছিল, অন্যান্য বল্শেভিক নেতারা হয়তো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব বলে বসে থাকবেন, এবং ঠিক ক্ষণটি এসেও নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি সারাক্ষণ তাঁদের তাড়া দিচ্ছিলেন, 'কাজে নেমে পড়ো'। ৭ই তারিখে অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠল, এবং তাই দেখে সেই দিনই এঁরা কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন।

লেনিন এবং তাঁর নবসৃষ্ট বল্‌শেভিক-সরকারের সামনে তখন অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে দেখা যাক। জর্মন-যুদ্ধ তখনও চলছে, যদিও রাশিয়ার সেনাবাহিনী তখন একেবারেই বিধ্বস্ত; জর্মানির সঙ্গে সে আরও যুদ্ধ করবে এমন সম্ভাবনা নেই। দেশের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, ইতস্তত-বিচ্ছিন্ন সেনাদল এবং গুণ্ডা-ডাকাতের দল যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি একেবারেই ভেঙে পড়েছে। দেশে খাদ্য নেই, লোকেরা অনাহারে পীড়িত। লেনিনের চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন যুগের প্রতিনিধিরা, তারা বিপ্লবকে ভেঙে নষ্ট করতে উদ্যত। রাষ্ট্রের সংগঠনব্যবস্থা তখনও ধনিকতন্ত্রী, অতএব পুরোনো সরকারি কর্মচারী যারা আছে তাদের প্রায় কেউই এই নূতন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি নয়; ব্যাঙ্ক্‌রা একে টাকা দিচ্ছে না; টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারীরা পর্যন্ত এদের টেলিগ্রাম পাঠাতে রাজি হয় না। অত্যন্ত কঠিন অবস্থা, এতে অতিবড়ো সাহসী লোকেরও ভয় ধরে যায়।

লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীরা কিন্তু ভয় পেলেন না, কাজে লেগে গেলেন। তাঁদের প্রথম চিন্তা হল, জর্মানির সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে হবে; একটুও দেরি না করে তাঁরা যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে ফেললেন। ব্রেস্ট্‌লিটভস্ক্‌-শহরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের আলোচনা-সভা বসল। জর্মনরা ভালো করেই জানত, বল্‌শেভিকদের আর যুদ্ধ করবার শক্তি নেই। সেই গর্ব এবং মূর্খতার বশে তারা অতি প্রচণ্ড এবং অপমানকর সমস্ত সন্ধির শর্ত দাবি করে বসল। বল্‌শেভিকরা শান্তি-স্থাপনের জন্যে ব্যগ্র, কিন্তু জর্মনদের দাবির বহর দেখে তারাও স্তম্ভিত হয়ে গেল; তাদের অনেকে স্পষ্টই বলল, এ শর্ত মেনে নেওয়া চলতেই পারে না। লেনিন বললেন, তা হয় না, যেমন করে হোক সন্ধি করতেই হবে। একটি গল্প আছে : শান্তি-আলোচনায় রাশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে ট্রট্‌স্কিও একজন ছিলেন। জর্মনরা জানাল, কোনো-একটি ব্যাপারে তাঁকে সান্ধ্য-পরিচ্ছদ পরে যেতে হবে। ট্রট্‌স্কি মুশকিলে পড়লেন; শ্রমিকদের প্রতিনিধি তিনি, তাঁর কী এইরকমের বড়োলোকি পোশাক পরে যাওয়া উচিত হবে? কী করবেন নির্দেশ চেয়ে তিনি লেনিনকে টেলিগ্রাম করলেন। লেনিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "শান্তিস্থাপনের যদি সুবিধা হয়, পেটিকোট পরেও যেতে পারো!"

সোভিয়েট যখন সন্ধির শর্ত নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে, জর্মানি সেই ফাঁকে পেট্রোগ্রাডের দিকে অভিযান শুরু করল; সন্ধির শর্তও আরও অনেক কঠিন করে তুলল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট লেনিনের উপদেশই মেনে নিল; ১৯১৮ সনের মার্চ মাসে ব্রেস্ট্‌লিটভস্ক্‌-শহরে তারা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল, যদিও অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে। এই সন্ধির ফলে পশ্চিম দিকে রাশিয়ার একটা প্রকাণ্ড অঞ্চল জর্মানির দখলে চলে গেল। তবুও যে-কোনো মূল্যে সন্ধি তখন স্বীকার করে নিতেই হয়েছিল; কারণ, লেনিনের ভাষায়, "রুশ সেনা সন্ধির স্বপক্ষেই ভোট দিয়েছিল, পা দেখিয়ে।"

বিশ্বযুদ্ধে যত দেশ যোগ দিয়েছে সকলের সঙ্গেই একটা সর্বব্যাপী সন্ধিস্থাপন করা যায় কি না, সোভিয়েট প্রথমে সেই চেষ্টাই করেছিল। ক্ষমতা হাতে পাবার পরদিনই তারা সমস্ত পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের সংকল্প প্রকাশ করে একটি বিজ্ঞপ্তি বার করল; স্পষ্ট করেই বলল, জার যেসব গোপন সন্ধি করেছিলেন তার দরুন রাশিয়ার সমস্ত দাবি এবং অধিকার সোভিয়েট ছেড়ে দিচ্ছে। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ তুর্কিদেরই থাকবে; অন্যের জায়গাও রাশিয়া আর দখল করবে না। সোভিয়েটের এই আহ্বানে কেউই কর্ণপাত করল না, কারণ তখনও দুই পক্ষেরই মনে জয়ের আশা রয়েছে, দুই পক্ষই যুদ্ধজয়ের লাভটা হাতিয়ে নিতে উৎসুক। অবশ্য সোভিয়েট যে এই শান্তির কথা তুলল, এর পিছনে খানিকটা উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বিজ্ঞাপনপ্রচার, তাতে সন্দেহ নেই। সমস্ত দেশেরই জনসাধারণ এবং যুদ্ধশ্রান্ত সেনার উপরে সে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল; যাতে তারাও অন্যান্য দেশে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে তোলে। সোভিয়েটের লক্ষ্যই ছিল সমস্ত পৃথিবীময় বিপ্লব ঘটানো; সোভিয়েটের নেতাদের ধারণা ছিল, সেই হচ্ছে তাঁদের নিজেদের বিপ্লবটিকে টিঁকিয়ে রাখবার একমাত্র পন্থা। সোভিয়েটের প্রচারবাণীর ফলে ফরাসি এবং জর্মন সেনা অনেকখানি বিচলিত হয়ে উঠেছিল, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

লেনিনের বিশ্বাস ছিল, জর্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট্‌লিটভস্কে যে সন্ধি করা হল সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র, বেশি দিন সে টিকবে না। বাস্তবিকই এর ন' মাস পরে পশ্চিম-রণাঙ্গনে

মিত্রপক্ষের হাতে জর্মানি পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট এই সন্ধিকে বাতিল করে দিল। লেনিনের শুধু উদ্দেশ্য ছিল, পরিশ্রান্ত শ্রমিকদের আর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের একটু বিশ্রাম, একটু অবসর দেওয়া, যেন তারা একবার বাড়ি যেতে পারে, বিপ্লব দেশে কতখানি কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছে সেটা একবার নিজের চোখে দেখে আসতে পারে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কৃষকরা বুঝুক জমিদাররা আর নেই, জমি এখন তাদেরই হয়ে গেছে; শিল্পজীবী শ্রমিকরাও টের পাক যে, তাদের যারা এতদিন শোষণ করছিল তাদের আর অস্তিত্ব নেই। তা হলেই তারা বুঝবে, বিপ্লব থেকে যে লাভ তাদের হল তার মূল্য কতখানি; তখন সেই বিপ্লবকে রক্ষা করবার জন্যে তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে; তাদের আসল শত্রু কারা তাও আর তাদের অজানা থাকবে না। এই ছিল লেনিনের মনের অভিপ্রায়; তিনি ভালো করেই জানতেন দেশে গৃহযুদ্ধের দিন আসন্ন হয়ে আসছে। তাঁর এই নীতির সার্থকতা পরে সগৌরবে প্রমাণিত হয়েছে। এই কৃষক এবং শ্রমিকরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে চলে গেল তাদের ক্ষেত আর কারখানায়; বলশেভিক বা সমাজতন্ত্রবাদী এরা ছিল না, তবুও তারাই হয়ে উঠল বিপ্লবের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু এবং সমর্থক, কারণ বিপ্লবের ফলে যা তারা পেয়েছে তাকে আবার হারাতে তাদের ইচ্ছা ছিল না।

জর্মনদের সঙ্গে যেমন করে হোক একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা যখন তাঁরা করছিলেন, ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই বলশেভিক-নেতারা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকেও মনোযোগ দিলেন। বহুসংখ্যক প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী এবং গুণ্ডাশ্রেণীর লোক মেশিনগান এবং রণসজ্জা নিয়ে দেশের মধ্যে ডাকাতি-ব্যবসা করে বেড়াচ্ছিল; বড়ো বড়ো শহরগুলোর মধ্যে পর্যন্ত এরা মানুষ খুন এবং লুটতরাজ করে বেড়াত। পুরোনো দিনের অ্যানার্কিস্ট দলেরও কিছু লোক ছিল, তারা সোভিয়েটের উপর প্রসন্ন নয়, তারাও নানান হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে লাগল। সোভিয়েট-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত কঠোর হস্তে এইসমস্ত দস্যুদল এবং অন্যান্য বিঘ্নকারীকে বিচূর্ণ করে দিলেন।

সোভিয়েট-শাসনের একটা বড়ো বিপদের কারণ হল দেশের সমস্ত সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীরা। এদের অনেকে বলশেভিকদের অধীনে কাজ করতে বা কোনোরকমেই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। লেনিন নিয়ম করলেন, যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না; কাজ না করো, খাদ্যও নেই। যে সরকারি কর্মচারীরা সহযোগিতা করছিল না তাদের সকলকেই অবিলম্বে বরখাস্ত করা হল। ব্যাঙ্কাররা সিন্দুক খুলতে রাজি হয় নি, সে সিন্দুক ডিনামাইট দিয়ে খোলা হল। পুরোনো যুগের যে কর্মচারীরা সহযোগিতা করতে সম্মত হন নি তাঁদের সম্বন্ধে লেনিনের অবজ্ঞা কতখানি ছিল তার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় একটি ঘটনায়: দেশের প্রধান সেনাপতি তাঁর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন। লেনিন তাঁকে বরখাস্ত করলেন, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্রিলেংকো-নামক একজন তরুণ বলশেভিক লেফ্‌টন্যান্টকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলেন।

এতসব পরিবর্তন সত্ত্বেও কিন্তু রাশিয়াতে পুরোনো ব্যবস্থার অনেকখানিই তখনও টিকে রইল। প্রকাণ্ড একটা দেশকে একেবারে হঠাৎ এক দিনে সমাজতন্ত্রী করে ফেলা সহজ নয়: খুব সম্ভবত রাশিয়াতেও এই কাজ সম্পূর্ণ করতে বহু বছর লেগে যেত, যদি-না ঘটনাচক্রে এর গতি দ্রুত হয়ে উঠত। কৃষকরা ভূস্বামীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল; বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরাও তাদের পুরোনো মালিকদের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল, কলকারখানা দখল করে বসল। সোভিয়েট সে কারখানা আবার সেই পুরোনো ধনিকতন্ত্রী মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারে না, অতএব সে নিজেই এই কারখানাগুলি অধিকার করে নিল। এর কিছুদিন পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধের সময়ে অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো মালিকরা তাদের কারখানার কলকব্জা জখম করে দিতে চেষ্টা করল। তখন আবার সোভিয়েট-সরকার এসে তাদের বাধা দিল, এবং কারখানাগুলোকে রক্ষা করবার জন্যেই সেগুলোকে নিজের অধিকারভুক্ত করে নিল। উৎপাদন-সঙ্গতিকে রাষ্ট্রের আয়ত্ত করে নেওয়া, এও একরকমের রাষ্ট্রায়ত্ত-সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ এতে কলকারখানা ইত্যাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে যায়। এইভাবে সে কাজটি রাশিয়াতে অত্যন্ত দ্রুতবেগে সম্পন্ন হতে লাগল। স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুতেই এটা এত দ্রুত করা যেত না।

সোভিয়েট-শাসনের প্রথম ন' মাসে রাশিয়াতে মানুষের জীবনযাত্রার বিশেষ কোনো তফাত হল না। বল্‌শেভিকরা সমালোচনা এমনকি বিশ্রী গালাগালিও নীরবে সহ্য করে চলল; বল্‌শেভিক-বিরোধী পত্রিকাগুলি তখনও প্রকাশিত হচ্ছিল। সাধারণ লোকের তখন প্রায় উপবাসে দিন কাটছে। ধনীদের হাতে তখনও জাঁকজমক এবং বিলাসিতা করবার মতো প্রচুর অর্থ রয়েছে। নৈশ-প্রমোদাগারে তখনও ভিড় হচ্ছে, ঘোড়দৌড় এবং অন্যান্য খেলাধুলাও চলছে। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে তখনও বহু ধনী বুর্জোয়া সগৌরবে বাস করছেন, সোভিয়েট-সরকারের পতন হতে আর দেরি নেই বলে তাঁরা খোলাখুলিই আনন্দপ্রকাশ করছেন। জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে এই ঘোর দেশ-প্রেমিকরা একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন; এখন পেট্রোগ্রাডের অভিমুখে জর্মনদের অভিযান ক্রমেই এগিয়ে আসছে দেখে এ'রা রীতিমতো উৎসব লাগিয়ে দিলেন। জর্মন সেনা আঁচরাৎ এসে তাঁদের রাজধানী দখল করে বসবে, ভাবতে তাঁদের মনে আর আনন্দ ধরে না। তাঁদের কাছে বিদেশীর অধীনতার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ের বস্তু ছিল সমাজবিপ্লব। এই ব্যাপার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, বিশেষ করে যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম।

কাজেই তখন জীবনপ্রবাহ মোটামুটি প্রায় স্বাভাবিকই ছিল; সে সময়ে বল্‌শেভিক-শাসনের আতঙ্ক বলতেও কিছু ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। মস্কোর বিখ্যাত ব্যালে-নৃত্য তখনও প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, নৃত্যশালায় তখনও মানুষের ভিড়ের কমতি নেই। জর্মনরা যখন পেট্রোগ্রাডের খুব কাছে এসে পড়ল তখন সোভিয়েট-সরকারের দপ্তর মস্কোতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তখন থেকে মস্কোই তাদের রাজধানী হয়ে রয়েছে। মিত্রপক্ষের রাজদূতরা তখনও রাশিয়া ছেড়ে যান নি। পেট্রোগ্রাড যখন জর্মনদের হাতে পড়বার উপক্রম হল, এ'রা পেট্রোগ্রাড থেকে পালিয়ে গিয়ে ভোলোগ্‌ডা-শহরে নিরাপদ আশ্রয় রচনা করলেন। এটি মফঃস্বলের একটি ছোট্ট শহর, যুদ্ধবিগ্রহের ধুমধড়াক্কা এর কাছেও পৌঁছয় না। এইখানে একত্র জড়ো হয়ে বসে তাঁরা নানারকমের আজগুবি গুজব শুনতে লাগলেন আর ক্রমাগত বিচলিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁরা কেবলই উদ্‌বিগ্নচিত্তে ট্রট্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন, গুজব কি সত্য? এই প্রবীণ কূটনীতিকদের স্নায়বিক চাঞ্চল্যের ধাক্কায় ট্রট্‌স্কি শেষে বিরক্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "ভোলোগ্‌ডার এই সম্মানিত ব্যক্তিদের স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করবার জন্যে আমি একটা ব্রোমাইড-মিক্‌চারের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছি।" ব্রোমাইড একরকম ওষুধ; যে রোগীরা বাতিকে ভোগে বা অল্পে উত্তেজিত হয় তাদের স্নায়ু শান্ত রাখবার জন্যে ডাক্তাররা এই ওষুধ দেন।

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক শান্ত গতিতেই বয়ে চলেছে; কিন্তু বাইরের সেই প্রশান্তির তলায় বহু স্রোত এবং ঘূর্ণি তখন ফেনিয়ে উঠছিল। বল্‌শেভিকরা বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে এ আশা সে দিন কেউই করে নি, তারা নিজেরাও নয়। সকলেই তখন কূট-চক্রান্ত করতে ব্যস্ত। দক্ষিণ-রাশিয়াতে ইউক্রেনে জর্মনরা একটা তাঁবেদার-রাষ্ট্র খাড়া করেছে; সন্ধি হওয়া সত্ত্বেও তারা কেবলই যেন হুমকি দেখাচ্ছে, তাদের হাতে সোভিয়েটের রক্ষা নেই। মিত্রপক্ষ স্বভাবতই জর্মানির উপরে রুষ্ট; কিন্তু বল্‌শেভিকদের উপরে তাদের দ্বেষ হল আরও বেশি। ১৯১৮ সনের প্রথম দিকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন সোভিয়েট-কংগ্রেসকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনিও যেন পরে সেজন্যে অনুতপ্ত হলেন, সোভিয়েটের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। অতএব রাশিয়ার মধ্যে যেসব বিপ্লববিরোধী ছিল তাদের কার্যকলাপকে মিত্রপক্ষ গোপনে উৎসাহ দিতে লাগল, টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল, অনেক সময়ে সে কাজে নিজেরাও গোপনে অংশ-গ্রহণ করতে লাগল। বিদেশী গুপ্তচরে মস্কো-শহর ছেয়ে গেল। ব্রিটেনের গুপ্তচর-বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি—এ'কে বলা হত ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ চর—এ'কে পর্যন্ত মস্কোতে পাঠানো হল, সেখানে গিয়ে ইনি সোভিয়েট-সরকারের কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন বলে। যেসব অভিজাত আর বুর্জোয়াদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা ক্রমাগত বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন; মিত্রপক্ষ এ'দের টাকা জোগাতে লাগল।

১৯১৮ সনের মাঝামাঝি সময়ে এই ছিল অবস্থা। সোভিয়েটের জীবন তখন অতি সূক্ষ্ম সুতোর উপর ঝুলছে।

১৫২

সোভিয়েটের জয়লাভ

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৩

১৯১৮ সনের জুলাই মাসে রাশিয়াতে অবস্থার বিস্ময়কর পরিবর্তন হল। বলশেভিকদের চার পাশ থেকে সংকটের বেড়াজাল ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। দক্ষিণে ইউক্রেন থেকে জর্মনরা আক্রমণের উদ্যোগ করছে; রাশিয়াতে আগে থেকেই বহুসংখ্যক চেকোস্লোভাকিয়ান যুদ্ধবন্দী ছিল, মিত্রপক্ষের উৎসাহ পেয়ে তারা মস্কোর দিকে অভিযান করল। ফ্রান্সে পশ্চিম-রণাঙ্গনের সর্বত্র জুড়ে তখনও মহাযুদ্ধ চলছে; অথচ সোভিয়েট রাশিয়াতে দেখা গেল আশ্চর্য ব্যাপার; সেখানে মিত্রপক্ষ আর জর্মানি, দু জনে যে যার স্বাধীন ভাবে একই কাজ করতে লেগে গেছে—সেটি হচ্ছে, বলশেভিকদের উচ্ছেদসাধন। জাতিগত বিদ্বেষই অত্যন্ত বিষদিগ্ধ এবং কুৎসিত ব্যাপার; জাতিগত বিদ্বেষের চেয়েও শ্রেণীগত বিদ্বেষের জোর কত বেশি হতে পারে এখানে আমরা তারই প্রমাণ দেখছি। সরকারিভাবে এরা কেউই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল না; অন্য নানা প্রকারে সোভিয়েটকে উত্ত্যক্ত উৎপীড়িত করতে লাগল, বিশেষ করে বিপ্লববিরোধী নেতাদের উৎসাহিত করে এবং টাকাকড়ি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করে। জারের আমলের প্রাচীন সেনাপতি যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকে এবার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

জার এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে উরালপর্বতের কাছে এক জায়গাতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল; তাঁদের ভার ছিল সেখানকার সোভিয়েটের হাতে। চেক সৈন্যরা এই প্রদেশে এগিয়ে আসছে দেখে স্থানীয় সোভিয়েট ভয় পেয়ে গেল; ভূতপূর্ব জারকে তারা এসে মুক্ত করে দেবে এবং বিপ্লববিরোধীদের তিনি আবার একটা মস্তবড়ো অবলম্বন হয়ে উঠবেন, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল। অতএব তারা নিজেদের বুদ্ধিমতো কাজ করে বসল, জারের সমস্ত পরিবারটিকেই হত্যা করল। সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় কমিটি এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ছিলেন না বলেই মনে হয়; লেনিন নিজেও এর বিরোধী ছিলেন—আন্তর্জাতিক কূটনীতির দিক থেকে ভূতপূর্ব জারের এবং মানবোচিত করুণার দিক থেকে তাঁর পরিবারের প্রাণনাশ তিনি উচিত মনে করেন নি। তবুও কাজ যখন সম্পন্ন হয়েই গেছে তখন কেন্দ্রীয় সরকারও কাজেই সেটা অনুমোদন করলেন। সম্ভবত এরই ফলে মিত্রপক্ষীয় সরকাররা আরও বেশি বিচলিত হয়ে পড়লেন, তাঁদের বিদ্বেষ আরও তীব্র হয়ে উঠল।

আগস্ট মাসে অবস্থা আরও খারাপ হল; দুটি ঘটনার ফলে লোকের মনে ক্রোধ হতাশা এবং ভয় অত্যন্ত বেড়ে গেল। এর একটি হচ্ছে লেনিনের প্রাণনাশের চেষ্টা; অন্যটি উত্তর-রাশিয়ার আর্চ-এঞ্জেল বন্দরে একটি মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর অবতরণ। মস্কোতে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হল; সকলেই ভাবল, সোভিয়েটের আয়ু শেষ হতে আর দেরি নেই। বস্তুত মস্কো-শহরের চার দিকেই তখন শত্রুসেনারা এসে ঘিরে ধরেছে—জর্মন, চেক, বিপ্লববিরোধী, কেউই বাকি নেই। মস্কোর আশপাশে মাত্র সামান্য ক'টি জেলা তখন সোভিয়েট-শাসনের অধীন। এর উপরে আবার মিত্রপক্ষের সেনা এসে হাজির হয়েছে দেখে সকলেই বুঝল, এবার আর মস্কোর রক্ষা নেই। বলশেভিকদের সেনাবাহিনী বলতে তেমন কিছুই ছিল না; ব্রেস্ট্-লিটভস্কের সন্ধি হয়েছে মাত্র মাস-পাঁচেক আগে; আগেকার সেনাবাহিনী যা ছিল তার অধিকাংশই অন্তর্হিত হয়ে আবার কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে জুটেছে। মস্কো-শহরের মধ্যেও তখন নানাবিধ চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র চলেছে; সোভিয়েটের পতন আসন্ন বলে বুর্জোয়ারা খোলাখুলিই আনন্দ-উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে।

এমনিতর ভয়ানক ছিল সে দিন সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্রের অবস্থা, তখন তার বয়স ন মাস মাত্র। হতাশায় ভয়ে বলশেভিকরা অভিভূত হয়ে পড়ল; স্থির করল, মরতে যখন হবেই দেখা যাচ্ছে তখন যুদ্ধ করেই মরব। কোণঠাসা বন্য জন্তুর মতো তারা পিছন ফিরে একেবারে শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে

পড়ল—এর সওয়া শো বছর আগের তরুণ ফরাসি প্রজাতন্ত্রও ঠিক তাই করেছিল। এবার আর তারা কোনোরকম ক্ষমা দেখাবে না, দয়া দেখাবে না। সমস্ত দেশে সামরিক আইন জারি করা হল; সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সোভিয়েট কমিটি 'রক্ত বিভীষিকা'র নীতি ঘোষণা করল—'সমস্ত দেশদ্রোহীকে বধ করা হবে, বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে কোনো দয়ামায়া দেখানো হবে না'। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা, এবার একই সঙ্গে দেশের ভিতরকার শত্রু এবং বাইরের শত্রুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে এক দিকে রইল সোভিয়েট, আর অন্য দিকে রইল সমস্ত পৃথিবী এবং রাশিয়ার নিজেরও বিপ্লববিরোধীরা। নূতন একটি কর্মধারার যুগ শুরু হল, একে বলা হয়েছে 'সমরতন্ত্রী কমিউনিজ্‌ম্‌'। গোটা দেশটাকেই প্রায় একটা অবরুদ্ধ সেনাশিবিরে পরিণত করা হল। লালফৌজকে (Red Army) গড়ে তোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চলতে লাগল; এর ভার দেওয়া হল ট্রট্‌স্কির হাতে।

এটা মোটামুটি ১৯১৮ সনের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের কথা; পশ্চিম-রণাঙ্গনে তখন জর্মনদের রণসজ্জায় ভাঙন ধরেছে, যুদ্ধবিরতির কথাবার্তাও চলছে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর চৌদ্দ-দফা শর্ত ঘোষণা করেছেন; লোকে মনে করছে, মিত্রপক্ষের মনের কথা তার মধ্যেই বলা হয়েছে। মজার কথা এই, এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল, রাশিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে বাইরের সেনা সরিয়ে আনতে হবে, অন্য-সমস্ত দেশের সহায়তা নিয়ে নিজেকে গড়ে তোলবার সম্পূর্ণ সুযোগ রাশিয়াকে দিতে হবে। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মিত্রপক্ষ হস্তক্ষেপ করছে, সেখানে তাদের সৈন্য নামিয়েছে, এগুলো এই শর্তটির অতি অপূর্ব ভাষ্য। বলশেভিক সরকার প্রেসিডেন্ট উইলসনকে একটি চিঠি পাঠালেন, তাতে তাঁর 'চৌদ্দ-দফা' শর্তের অত্যন্ত কটু সমালোচনা করলেন। এই চিঠিতে তাঁরা বললেন: "পোল্যান্ড সার্বিয়া বেলজিয়ম স্বাধীন হবে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির লোকেরা স্বাধীনতা অর্জন করবে, এই দাবি আপনি করছেন......কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আপনার এই দাবির মধ্যে আয়ার্ল্যান্ড মিশর ভারতবর্ষ, এমনকি ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জকেও স্বাধীনতা দেবার কোনো ইঙ্গিত আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।"

মিত্রপক্ষের সঙ্গে জর্মনির সন্ধি হল, ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর এ'রা যুদ্ধবিরতি-পত্রে স্বাক্ষর করলেন। রাশিয়াতে কিন্তু গোটা ১৯১৯ এবং ১৯২০ সন ধরেই গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। অসংখ্য শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট একাই লড়তে লাগল। একবার তো সতেরোটি বিভিন্ন দিক থেকে একই সঙ্গে লালফৌজের উপর আক্রমণ করা হল। ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, সার্বিয়া চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বাল্‌টিক-অঞ্চলের রাজ্যগুলি, পোল্যান্ড এবং রাশিয়ারই অগুন্তি বিপ্লববিরোধী সেনাপতি—সবাই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে; সাইবেরিয়ার পূর্বপ্রান্ত থেকে শুরু করে বাল্‌টিক সাগর এবং ক্রিমিয়া পর্যন্ত সর্বত্রব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। বরাবর লোকের মনে হল, সোভিয়েটের এবার শেষ। মস্কো-শহর পর্যন্ত শত্রুরা আক্রমণ করতে উদ্যত হল, পেট্রোগ্রাড-শহর তো একেবারেই শত্রুদের হাতে পড়বার উপক্রম হল; তবু সমস্ত সংকট সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে চলল সোভিয়েট। এক-একটি সংকটে জয়লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রত্যয় এবং শক্তিও অনেকখানি করে বাড়তে লাগল।

বিপ্লববিরোধীদের একজন নেতা ছিলেন অ্যাডমিরাল কোল্‌চাক। তিনি নিজেকে রাশিয়ার শাসক বলে অভিহিত করলেন, মিত্রপক্ষও বাস্তবিকই তাঁকে তাই বলেই স্বীকার করে নিল, প্রচুরপরিমাণে সাহায্য করতে লাগল। সাইবেরিয়াতে তিনি যে আচরণ দেখিয়েছিলেন, তাঁরই একজন মিত্রের বর্ণনা থেকে আমরা তার পরিচয় পাই। এই লোকটির নাম জেনারেল গ্রেভ্‌স্‌, যুক্তরাষ্ট্রের যে সেনাবাহিনীটি কোল্‌চাকের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছিল ইনি ছিলেন তার অধিনায়ক। এই আমেরিকান সেনাপতিটি বলেছেন:

"বহু ভয়াবহ নরহত্যা করা হয়েছিল; সে হত্যা বলশেভিকদের অনুষ্ঠিত নয়, যদিও পৃথিবীর লোকে এটা তাদেরই কাজ বলে জানে। বলশেভিকরা যে কজন লোক হত্যা করেছে তার জনপ্রতি একশো মানুষ পূর্ব-সাইবেরিয়াতে নিহত হয়েছে বলশেভিক-বিরোধীদের হাতে, এ কথা বললে আমি বিন্দুমাত্র অত্যুক্তির অপরাধে অপরাধী হব না।"

বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা বড়ো বড়ো জাতির ভাগ্যকে পরিচালনা করেন, পৃথিবীতে যুদ্ধ এবং শান্তির সৃষ্টি করেন কী সব জ্ঞান আর খবরের উপর নির্ভর করে সেটা এক মজার ব্যাপার। এই সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ, তখন বোধ হয় সমগ্র ইউরোপের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তি। ব্রিটেনের হাউজ অব কমন্‌সে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি কোল্‌চাক এবং রাশিয়ার অন্যান্য সেনাপতিদের নাম উল্লেখ করছিলেন। এদেরই সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তিনি নাম করলেন 'জেনারেল খারকভ'-এর। খারকভ অবশ্য সেনাপতি নন, একটি বড়ো শহর, ইউক্রেনের রাজধানী। প্রাথমিক ভূগোলের এই সামান্য জ্ঞানটুকুও রাষ্ট্রনীতির এই-সব মহারথীদের ছিল না, অবশ্য তাই বলে ইউরোপকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে বা এর সম্পূর্ণ নূতন একটা মানচিত্র প্রণয়ণে এঁদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি।

রাশিয়ার চার দিক ঘিরে মিত্রপক্ষ অবরোধও বসিয়ে দিল; এই অবরোধ এত প্রচণ্ড ছিল যে সমস্ত ১৯১৯ সনের মধ্যে রাশিয়া বাইরের কোনো দেশের সঙ্গে কিছুমাত্র পণ্য কেনাবেচা করতে পারে নি।

অথচ এত-সমস্ত প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি, এত অসংখ্য শক্তিমান শত্রুসেনার সঙ্গে লড়াই করেও সোভিয়েট রাশিয়া শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইল, জয়লাভ করল। ইতিহাসে যত অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী আছে এটি তার অন্যতম। এটা করল তারা কিসের জোরে? এ কথা অবশ্য নিঃসন্দেহ, মিত্রপক্ষের জাতিরা যদি একত্র হয়ে বলশেভিকদের চূর্ণ করবার জন্য উদ্যোগ করতে পারত তা হলে প্রথম দিকেই বলশেভিকদের শেষ হয়ে যেত। জর্মনি উচ্ছন্ন হয়ে গেছে; তখন তাদের হাতে অজস্র সৈন্য, কিন্তু সে সেনাকে তখনই আবার অনাত্র এবং বিশেষ করে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো তত সহজ ছিল না। সৈন্যরা সকলেই তখন রণশ্রান্ত; সেই সময়ে আবার নূতন করে আর-একটা যুদ্ধ করতে বললে তারা সবাই অস্বীকার করে বসত। তা ছাড়া সকল দেশেরই শ্রমিকদের মনে নবজাত রাশিয়ার প্রতি একটা বিপুল সহানুভূতি দেখা দিয়েছিল; সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাদের নিজেদের দেশের মধ্যেই হাঙ্গামা বেধে যাবে, এ ভয়ও মিত্রপক্ষের সরকাররা না করে পারছিলেন না। এমনিতেই তখন ইউরোপের সর্বত্র বিদ্রোহের আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, মিত্রপক্ষের দেশদের মধ্যেও পরস্পর-রেষারেষির কিছু অভাব ছিল না। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের মধ্যে খোঁচাখুঁচি শুরু করে দিয়েছিল। এইসমস্ত ব্যাপারের দরুনই এরা তেমন জোর করে বলশেভিকদের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হতে পারে নি। এরা চাইছিল, নিজেরা সামনে না এসে, যতটা সম্ভব আড়ালে-আবডালে থেকেই কাজ উদ্ধার করবে, এদের হয়ে অন্যদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে এবং নিজেরা শুধু পিছন থেকে তাদের টাকাকড়ি অস্ত্রশস্ত্র আর বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে। সোভিয়েটের আয়ুর জোর বেশি নয়, এ বিষয়ে এদের মনে সন্দেহমাত্র ছিল না।

সোভিয়েটের এতে নিশ্চয়ই খুব সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেদের শক্তি গুছিয়ে বাড়িয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তবুও শুধু বাইরের পরিবেশের এইসব সুবিধার জন্যই জয়লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এ কথা মনে করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। মুখ্যত এদের জয় হয়েছিল রাশিয়ার জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মোৎসর্গ এবং অদম্য সংকল্পের বলে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হচ্ছে এই, এই জাতটাকে পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে জানত অলস, অজ্ঞ, দুর্বলচেতা এবং কোনোরকম বৃহৎ উদ্যমের অনুপযুক্ত বলে—সে ধারণা একেবারে মিথ্যাও ছিল না। স্বাধীনতা আসলে একটা অভ্যাস; দীর্ঘকাল এতে বঞ্চিত হয়ে থাকলে আমরা ক্রমে এর নামই ভুলে যাই। রাশিয়ার এই অজ্ঞ কৃষক আর শ্রমিকরা—এদের সে বস্তুতে অভ্যস্ত হবার বিশেষ কারণ কোনোদিন ঘটে নি। তবুও সেদিনের রাশিয়াতে নেতারা এমনই কর্মপটু ছিলেন যে এই দীনহীন জনতাকেও গড়ে তুলে তাঁরা একটি শক্তিশালী সুসংহত জাতিতে পরিণত করেছিলেন; তাদের লক্ষ্যে তাদের সবল বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে তাদের অগাধ নির্ভর। কোল্‌চাকরা এবং তাঁদের সমধর্মী বিরোধীরা যে পরাজিত হয়েছিলেন সে কেবল বলশেভিক নেতারা কর্মদক্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলে নয়, রাশিয়ার কৃষকরা আর তাঁদের সহ্য করতে রাজি হল না বলেও। কৃষক জানত—

তার হাতে সদ্য যে খানিকটা জমি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা এসে পড়েছে, এই কোল্‌চাকরা, পুরোনো দিনের ব্যবস্থার প্রতিনিধি, তাদের সে জমি এবং সুবিধা আবার কেড়ে নিতেই এসেছে। অতএব সেও স্থির করল, প্রাণ দিয়েও সে একে রক্ষা করবে।

আর সকলের উপরে ছিলেন লেনিন স্বয়ং। তাঁর অধিনায়কত্বে আপত্তি বা সংশয় প্রকাশ করতে পারে এমন কেউ ছিল না। রাশিয়ার প্রজারা তাঁকে জেনে নিয়েছিল একজন অর্ধ-দেবতা বলে—আশা এবং নির্ভরের প্রতীক তিনি; তিনিই জ্ঞানীপুরুষ, যিনি প্রতিটি সংকটে তাদের উদ্ধার করবার উপায় জানেন; কোনো বিপদেই যিনি বিভ্রান্ত বা বিচলিত হন না। তখনকার দিনে (এখন রাশিয়াতে তাঁর প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়েছে) লেনিনের ঠিক পরেই স্থান ছিল ট্রট্‌স্কির—লেখক এবং বক্তা ট্রট্‌স্কি, যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর আগের অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র নেই, অথচ তখন তিনিই গৃহযুদ্ধ এবং অবরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছেন। ট্রট্‌স্কির ছিল দুরন্ত দুঃসাহস, যুদ্ধে তিনি বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন। কারও মধ্যে কাপুরুষতা বা শৃঙ্খলাজ্ঞানের অভাব দেখলে তিনি তাকে তিল-মাত্র দয়া দেখাতেন না। গৃহযুদ্ধের একটি সংকট-মুহূর্তে তিনি এই আদেশ জারি করেছিলেন :

"আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যদি কোনো সেনাদল বিনা আদেশে রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করে তবে সর্বপ্রথম সেই দলের কমিশারীকে এবং তার পরেই তার সেনানায়কদের গুলি করে মারা হবে; তাদের স্থানে অন্য সাহসী এবং বীর সৈনিককে নিযুক্ত করা হবে। কাপুরুষ ভীরু এবং বিশ্বাসঘাতকরা কিছুতেই মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে না। সমগ্র লাল ফৌজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি এই স্থির সংকল্প করছি।"

এই কথা তিনি পালনও করেছিলেন। ১৯১৯ সনের অক্টোবর মাসে প্রচারিত ট্রট্‌স্কির আর-একটি বিজ্ঞপ্তিও আমাদের প্রণিধানের যোগ্য; এতে দেখা যায়, বলশেভিকরা সর্বদাই প্রজাসাধারণ আর ধনিকতন্ত্রী সরকারের মধ্যের তফাতটা মনে রাখত, তারা কোনো দিনই খাঁটি জাতীয়তাবাদী বলে নিজেকে পরিচিত করে নি। এই বিজ্ঞপ্তিটি হচ্ছে :

"কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, যখন ইংলণ্ডের ভাড়াটে যোদ্ধা জুডেনিক-এর সঙ্গে আমরা তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত, এই মুহূর্তেও আমি বলছি, তোমাদের এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না যে আসলে ইংলণ্ড আছে দুটি। একটি ইংলণ্ড তার লাভান্বেষণ, অত্যাচার, ঘুষ আর রক্তপিপাসুতার জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু ঠিক তারই পাশাপাশি আরও একটি ইংলণ্ড আছে, সে ইংলণ্ড শ্রমিকদের ইংলণ্ড, আধ্যাত্মিক শক্তির দেশ ইংলণ্ড, আন্তর্জাতিক ঐক্যবন্ধনের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ইংলণ্ড। আমাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করছে সে হচ্ছে নীচ এবং অসাধুর দেশ ইংলণ্ড, তার জীবনসূত্র নিয়ন্ত্রিত করে ব্যবসার বাজারের ফড়িয়ারা। কিন্তু শ্রমিকদের ইংলণ্ড এবং জনসাধারণের ইংলণ্ড আমাদেরই পক্ষ সমর্থন করছে।"

কী অটল সংকল্প নিয়ে লালফৌজকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালানো হত তাব কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে পেট্রোগ্রাড শহর রক্ষা করবার সিদ্ধান্ত থেকে। পেট্রোগ্রাড তখন জুডেনিক-এর হাতে পড়বার আসন্ন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে; দেশরক্ষা-সমিতি (Council of Defence) আদেশ জারি করলেন—"শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে পেট্রোগ্রাডকে রক্ষা করতে হবে, এক পাও পিছনে হটলে চলবে না, শহরের প্রতিটি রাস্তায় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে।"

রাশিয়ার প্রসিদ্ধ লেখক গোর্কি বলেছেন, লেনিন নাকি একবার ট্রট্‌স্কির সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"বেশ তো, আমাকে এমন আর একজন লোক দেখাও যে একটি বৎসরের মধ্যে একটি প্রায় ত্রুটিহীন সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সমরনীতি-বিশারদগণেরও দৃষ্টিতে মর্যাদা অর্জন করবে। সেই রকমের একটি লোক আমাদের আছে। আমাদের সমস্ত কিছুই আছে। এখনও আরও বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে, দেখো।"

এই লালফৌজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠল। ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসে,

বলশেভিকরা ক্ষমতা হস্তগত করবার ঠিক পরে, এই বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল ৪,৩৫,০০০। ব্রেস্ট্-লিটভস্কের সন্ধির পরে নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক লোক স'রে পড়েছিল এবং বাহিনীটিকে আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। ১৯১৯ সনের মাঝামাঝি সময়ে এর লোকসংখ্যা হল ১৫,০০,০০০। ঠিক একবছর পরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৩,০০,০০০।

১৯১৯ সনের শেষাশেষি দেখা গেল, গৃহযুদ্ধে সোভিয়েট তার শত্রুদের নিঃসংশয়ে কাবু করে এনেছে। তার পরেও অবশ্য আরও এক বছর ধরে যুদ্ধ চলল; বহুবার বহু সংকট-মুহূর্তও এসে উপস্থিত হল। ১৯২০ সনে নবসৃষ্ট পোল্যাণ্ড-রাজ্য (জর্মনদের পরাজয়ের পর নূতন করে একে গড়া হয়েছিল) রাশিয়ার সঙ্গে এসে ঝগড়া বাধাল, দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। ১৯২০ সনের শেষ দিকে এসে এই সমস্ত যুদ্ধই বস্তুত শেষ হয়ে গেল; এতদিনে রাশিয়ার অদৃষ্টে একটু শান্তির দেখা মিলল।

ইতিমধ্যে দেশের মধ্যেও নানা বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধ অবরোধ ব্যাধি আর দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। পণ্য-উৎপাদন অনেক কমে গেছে। কারণ পরস্পরবিরোধী সেনাদল বারবার ক্ষেত আর কারখানার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল, কৃষকরা জমি চাষ করতে পারে না, শ্রমিকরাও কারখানা চালাতে পারে না। "সমরতন্ত্রী কমিউ-নিজ্‌মের" জোরে দেশটা কোনোমতে এতদিন সামলে চলে এসেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই ক্রমাগত কম-খাওয়া অভ্যাস করতে করতে চলতে হয়েছে, এখন সেটা সকলের পক্ষেই প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। চাষিরা বেশি ফসল উৎপাদন করতে চায় না; বলে, দেশে সামরিক কমিউনিজ্‌মের রাজত্ব চলেছে, যেটুকু বাড়তি ফসল তারা উৎপাদন করবে তাই তো রাষ্ট্র কেড়ে নিয়ে যাবে তবে আর অত হাঙ্গামা করে তাদের কী লাভ? দেশে ক্রমশই একটা অত্যন্ত কঠিন এবং বিপজ্জনক অবস্থা আসন্ন হয়ে উঠছে। পেট্রোগ্রাডের কাছে ক্রন্‌স্টাডে নাবিকরা বিদ্রোহ পর্যন্ত করল, খোদ পেট্রোগ্রাড শহরেও শ্রমিকদের ধর্মঘট হল।

মূল কর্মনীতিকে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করার ব্যাপারে লেনিনের অপূর্ব প্রতিভা; তিনি অবিলম্বে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন। সমরতন্ত্রী কমিউনিজ্‌ম্ তিনি বন্ধ করে দিলেন; নূতন একটি নীতির প্রবর্তন করলেন, এর নাম হল নূতন অর্থনৈতিক নীতি বা (New Economic Policy), সংক্ষেপে NEP (কথাক'টির প্রথম অক্ষর নিয়ে)। কৃষকরা এতে ফসল উৎপাদন এবং বিক্রয় করবার অনেক বেশি স্বাধীনতা পেয়ে গেল; ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার অধিকারও এতে লোককে দেওয়া হল। কমিউনিজ্‌মের খুব খাঁটি নীতির এটা কিছুটা ব্যতিক্রম; কিন্তু লেনিন এর পক্ষে যুক্তি দিয়ে বললেন, এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। লোকের দুঃখকষ্টের অনেকখানি লাঘব এতে হল, সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রাশিয়াকে আবার একটা ভয়ংকর দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হল। দেশে একটা প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি হল, রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অতি বিস্তীর্ণ স্থানের ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে গেল এবং তার ফলে এল দুর্ভিক্ষ। অতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এত বড়ো দুর্ভিক্ষের কথা খুব বেশি শোনা যায় না—বহু লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা গেল। এর ঠিক আগেই দেশে একটানা বহু বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে, চলেছে গৃহযুদ্ধ, অবরোধ আর অর্থ-নৈতিক অসচ্ছলতা; তার উপর আবার সোভিয়েট-সরকার তখন পর্যন্ত শান্তিকালীন কার্য-কলাপের দিকে মন দেবারও সময় পায় নি—কাজেই মাঝখানে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আঘাতে শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙেচুরে পড়া কিছুই বিচিত্র ছিল না। তবু কিন্তু আগেকার বহু বিপদের মতো এই বিপদকেও সোভিয়েট উত্তীর্ণ হয়ে এল। এই দুর্ভিক্ষে রাশিয়াকে সাহায্য করতে কে কী দিতে পারে তার আলোচনা করবার জন্য ইউরোপের সমস্ত দেশদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি মন্ত্রণাসভা বসল। এঁরা ঘোষণা করলেন, অতীতে জাররা এঁদের কাছে যত ঋণ করেছিলেন সোভিয়েট সে ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করেছে; এখন সেই ঋণ যদি সে শোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তবেই তাঁরা তাকে সাহায্য করতে পারেন, নইলে নয়। মানবধর্মীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল মহাজনের প্রবৃত্তি; অনাহারে মুমূর্ষু শিশুদের জন্য খাদ্য চেয়ে রাশিয়ার মায়েরা

সে মর্মভেদী আবেদন জানাল তাতেও এরা কেউ কর্ণপাত করল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এরকমের কোনো শর্ত খাড়া করল না, রাশিয়াকে অনেকখানি সাহায্য সে পাঠাল।

ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো রাশিয়ার দুর্ভিক্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল; অথচ ঠিক সেই সময়েও কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তারা রাশিয়ার সংশ্রব বর্জন করছিল না। ১৯২১ সনের প্রথম দিকে ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা বাণিজ্য-চুক্তি হয়েছিল; দেখাদেখি আরও বহু দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করল।

চীন, তুরস্ক, পারস্য এবং আফগানিস্তান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলোর প্রতি সোভিয়েট অত্যন্ত উদার নীতি অবলম্বন করল। জারেরা এই সব দেশে যে-সব সুযোগ-সুবিধা আদায় ক'রে নিয়েছিলেন সোভিয়েট সে-সব ছেড়ে দিল। এদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করল। সোভিয়েটের নীতি ছিল সমস্ত পরাধীন এবং শোষিত জাতির স্বাধীনতা অর্জন, এটা সেই নীতিরই ফল। কিন্তু তার চেয়ে আরও বড়ো একটা উদ্দেশ্য সোভিয়েটের ছিল, সে হচ্ছে তাদের নিজের অবস্থাটা একটু মজবুত করে নেওয়া। সোভিয়েট রাশিয়ার এই উদার নীতির ফলে ইংলণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনেক সময় বড়ো বিব্রত হয়ে পড়ছিল, প্রাচ্য দেশগুলিতে এদের দুই পক্ষের মধ্যে যে তুলনা করা হত তাতে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য বড়ো দেশগুলো হীন প্রতিপন্ন হয়ে যেত।

১৯১৯ সনে আরও একটি বড়ো ঘটনা হয়, এর কথা তোমাকে বলা দরকার। এটি হচ্ছে কমিউনিস্ট দল কর্তৃক মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা। আগের কয়েকটি চিঠিতে আমি তোমাকে প্রথম এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কথা বলেছি। প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কার্ল মার্ক্স্; আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে, শেষে ১৯১৪ সনের যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙেচুরে যায়। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যাদের সৃষ্টি সেই পুরোনো কর্মীরা এবং সমাজতন্ত্রবাদী দলগুলো শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন, এই ছিল বলশেভিকদের মত। অতএব তারা তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করল। এর দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষরূপেই বিপ্লবাত্মক, এবং এর উদ্দেশ্য ধনিকতন্ত্র আর সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, যে সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রী মধ্য-পন্থা ধরে চলার নীতি অনুসরণ করেন তাদের সঙ্গেও সংগ্রাম করা। এই আন্তর্জাতিকটিকে অনেক সময়ে 'কমিনটার্ন্' ('কমিউনিস্ট-ইণ্টারন্যাশনাল' থেকে) বলা হয়। কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের কাজে বহু দেশেই এ বিপুল কাজ দেখিয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যায় এটি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, বহু বিভিন্ন দেশের বহু কমিউনিস্ট দলের নির্ধারিত সদস্য নিয়ে তৈরি। কিন্তু রাশিয়াই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে কমিউনিজ্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং স্বভাবতঃ কমিনটার্নে রাশিয়াই কর্তৃত্ব করে থাকে। এই কমিনটার্ন্ আর সোভিয়েট সরকার অবশ্যই এক বস্তু নয়; যদিও অনেক লোক আছেন যাঁরা এর দুটিতেই নেতৃস্থানীয় হয়ে কাজ করছেন। কমিনটার্ন্ খোলাখুলি বলে সে বিপ্লবতন্ত্রী কমিউনিজ্ম্ প্রচারের জন্য গঠিত হয়েছে; অতএব সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো একে অত্যন্ত অপছন্দ করে, নিজেদের এলাকার মধ্যে এর কার্যকলাপে তারা সর্বদাই বাধা দিতে চেষ্টা করছে।

পশ্চিম-ইউরোপে যুদ্ধের পরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককেও ('শ্রমিক এবং সমাজতন্ত্রবাদী-দের আন্তর্জাতিক') আবার বাঁচিয়ে তোলা হল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য বহুলাংশে এক, অন্তত নামে। কিন্তু এদের মতবাদ এবং কর্মনীতিতে অনেক তফাত; দু'য়ের মধ্যে কোনোপ্রকার সম্প্রীতিও নেই। পরস্পর এরা যে-পরিমাণ কলহ যুদ্ধ আর আক্রমণ চালায়, এদের দু'য়েরই শত্রু ধনিকতন্ত্রের উপরেও ততটা আক্রমণ এরা করে না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আজকাল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান, বহুবার এর বহু সভ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মন্ত্রিসভায় পর্যন্ত স্থানলাভ করেছেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকটা এখনও বিপ্লবপন্থীই হয়ে রয়েছে, সুতরাং এটা আর সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

রাশিয়াতে গৃহযুদ্ধের আগাগোড়া কালটাই রক্ত-বিভীষিকা আর শ্বেত-বিভীষিকার মধ্যে কে কতখানি নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে তার পাল্লা লেগে গিয়েছিল; এই পাল্লায় সম্ভবত শেষের দলই প্রথম দলকে বহুদূর পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। সাইবেরিয়াতে কোলচাক্-কৃত নৃশংসতার যে বিবরণ আমেরিকার সেনাপতিটি দিয়েছেন (এই বিবরণ আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি) সেটি এবং অন্যান্য লোকেরও প্রদত্ত বিবরণ পড়লে এই কথাই মনে হয়। তবু রক্ত-বিভীষিকাও বেশ নিদারুণ ব্যাপার ছিল এবং তাদের হাতেও নিশ্চয়ই বহু নিরীহ লোকের দুর্গতি সইতে হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। বল্‌শেভিকরা তখন চতুর্দিক থেকেই আক্রান্ত, তাদের ঘিরে অসংখ্য চক্রান্ত আর গুপ্তচরের খেলা, এতে তাদেরও মন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল; অতি সামান্য সন্দেহ হলেই তারা অত্যন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করছিল। তাদের পুলিশ বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগটির নাম ছিল 'চেকা', এই বিভীষিকা-সৃষ্টির ব্যাপারে সেটি রীতিমতো কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এটা ছিল ঠিক ভারতবর্ষের সি. আই. ডি.'র সমশ্রেণীর বস্তু; তবে এদের চেয়ে তাদের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি।

চিঠিটা বড্ড বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা শেষ করবার আগে আমি লেনিন সম্বন্ধে আরও কিছু কথা তোমাকে বলব। ১৯১৮ সনের আগস্ট মাসে তাঁর প্রাণনাশ করবার একটা চেষ্টা হয়। তিনি এতে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও বিশেষ বিশ্রাম তিনি নিলেন না; অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ সমানে করে যেতে লাগলেন। এর যা ছিল অবশ্যম্ভাবী তাই হল, ১৯২২ সনের মে মাসে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তখন অল্প একটু বিশ্রাম নিলেন, তারপরই আবার কাজে লেগে গেলেন। কিন্তু বেশিদিন আর তাঁকে কাজ করতে হল না। ১৯২৩ সনে আবার তাঁর শরীর আগের চেয়েও খারাপ হয়ে পড়ল। এই অসুস্থতা আর সারল না; ১৯২৪ সনের ২১শে জানুয়ারী মস্কো শহরের কাছে তাঁর মৃত্যু হল।

অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর দেহ মস্কো শহরেই রাখা হল। সেটা শীতকাল, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহটাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছিল। রাশিয়ার সর্বত্র থেকে, সুদূর সাইবেরিয়ার স্তেপ অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল—সাধারণ প্রজা, কৃষক ও শ্রমিক, পুরুষ নারী ও শিশুদের, প্রতিনিধি তারা; তাদের সেই প্রিয় সহকর্মীকে তাদের শেষ অভিবাদন জানাতে—দৈন্যের অতল গহ্বর থেকে যিনি তাদের টেনে তুলেছেন, পূর্ণতর জীবনের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। মস্কোর সুন্দর রেড্ স্কোয়ারে তারা তাঁর জন্য একটি সহজ এবং কারুকার্য বর্জিত সমাধিমন্দির রচনা করল; আজও সেখানে একটি কাচের আধারে তাঁর দেহ সংরক্ষিত রয়েছে; প্রতি সন্ধ্যায় মানুষের একটি অফুরন্ত শোভাযাত্রা নিঃশব্দে তাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম জানিয়ে যায়। তিনি মারা গেছেন পুরো দশ বছরও হয় নি, কিন্তু এরই মধ্যে লেনিনের নাম একটা বিশাল ঐতিহ্য সম্পদে পরিণত হয়েছে, কেবল তাঁর নিজের দেশ রাশিয়াতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই। দিন যত চলে যাচ্ছে মানুষের চোখে লেনিন ততই বড়ো হয়ে উঠছেন; পৃথিবীতে মানুষ যে ক'জন লোককে অমর বলে জেনে রেখেছে তিনিও তাঁদেরই একজন। পেট্রোগ্রাডের নাম হয়েছে লেনিনগ্রাড্; রাশিয়াতে এমন গৃহস্থ প্রায় নেই যার ঘরে একটি লেনিনের বেদী বা লেনিনের ছবি পাবে না। কিন্তু লেনিন বেঁচে রয়েছেন স্মৃতিস্তম্ভ বা ছবির মধ্যে নয়; তিনি যে বিরাট কার্য সাধন করে গেছেন তারই মধ্যে; বেঁচে রয়েছেন আজকের কোটি-কোটি শ্রমিকের বুকের মধ্যে, যারা তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে, মহত্তর জীবনের আশ্বাস পাচ্ছে।

তাই বলে লেনিন একটা অমানুষিক কাজের যন্ত্র মাত্র ছিলেন, নিজের কাজ নিয়েই মগ্ন থাকতেন এবং অন্য কিছুর কথাই ভাবতেন না, এমন মনে কোরো না। তাঁর নিজের কাজ, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য তাঁর সারাক্ষণের সাধনা ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ছিলেন একেবারেই আত্মভোলা মানুষ; একটা আদর্শ যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর মধ্যে। অথচ অন্যদিকে আবার তিনি ছিলেন একেবারেই সহজ মানুষ; মানুষের প্রকৃতিতে যেটি সহজতার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, প্রাণখুলে উচ্চৈস্বরে হাসতে জানতেন তিনি। সোভিয়েটের প্রথম যুগের বিপদের দিনে মস্কোতে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর নাম লকহার্ট। তিনি বলেছেন,

যাই কেন হোক না, লেনিনের মন সর্বদাই প্রসন্ন থাকত। "জীবনে যত জন নেতাকে আমি দেখেছি, তাঁর মতো শান্ত মেজাজ আর কারও দেখি নি।"—এই হচ্ছে এই ব্রিটিশ কূটনীতিক ভদ্রলোকের উক্তি। কথায় এবং কাজে লেনিন ছিলেন যেমন সহজ তেমনই ঋজু; বড়ো বড়ো কথা আর ভড়ংকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন তিনি। সংগীত বড়ো ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন যে তাঁর প্রায় ভয় ছিল সংগীতপ্রিয়তাই তাঁর কাল হবে, তাঁর মনকে এত কোমল করে ফেলবে যে তাঁর কাজ-কর্মেরই শেষে ব্যাঘাত হবে।

লেনিনের একজন সহকর্মী ছিলেন লুনাচারস্কি, বহু বছর ধরে ইনি বলশেভিক সরকারের শিক্ষা-বিভাগের কমিশার ছিলেন। ইনি একবার লেনিনের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য উক্তি করেছিলেন। লেনিন ধনিকতন্ত্রীদের উচ্ছেদসাধন করেছেন; খৃষ্টও সুদখোর মহাজনদের পূজামন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন। এই দুটি ঘটনার তুলনা দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন : "খৃষ্ট যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি বলশেভিক হতেন।" ধর্মকে যারা মানে না তাদের মুখে এটা আশ্চর্য উপমা, সন্দেহ নেই।

নারীদের সম্বন্ধে লেনিন একবার বলেছিলেন : "কোনো জাতিই স্বাধীন হতে পারে না, যতক্ষণ তার জনসংখ্যার অর্ধেক লোক রান্নাঘরে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য থাকে।" একদিন কতকগুলি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে আদর করতে করতে একটা কথা তিনি বলেছিলেন, কথাটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। তাঁর পুরোনো বন্ধু ম্যাক্সিম গোর্কী বলেন, তিনি নাকি বলেছিলেন : "এদের জীবন সুখের জীবন হবে, তত সুখ আমরা পাই নি। আমাদের অনেক দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে, তা এদের সইতে হবে না। এদের জীবনে অতখানি নিষ্ঠুরতার অস্তিত্ব থাকবে না।" সবাই আমরা সেই আশা করছি।

এই চিঠিটি আমি শেষ করব রাশিয়ার একটি গান উদ্ধৃত করে। এই গানটি অল্পদিন আগে রচিত হয়েছে, পূর্ণ অর্কেস্ট্রা এবং লোকেদের কোরাস গানের জন্য। যাঁরা এই গানটি শুনেছেন তাঁরা বলেন এর সুরটি প্রাণ এবং শক্তিতে ভরপুর। গানটিই যেন বিদ্রোহী জনগণের উন্মাদনার প্রতীক। এর যে অনুবাদটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি তাতেও এই উন্মাদনার কিছুটা পরিচয় রয়েছে। গানটির নাম 'অক্টোবর'—তার মানে হচ্ছে ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসের বলশেভিক বিপ্লব। তখনকার দিনে রাশিয়াতে যে পঞ্জিকা ব্যবহৃত হত সেটা তথাকথিত অসংশোধিত পঞ্জিকা; পাশ্চাত্য জগতে সাধারণত যে পঞ্জিকা প্রচলিত তার থেকে এটা তেরো দিন পিছিয়ে থাকত। এই পঞ্জিকা অনুসারে ১৯১৭ সনের মার্চমাসের বিপ্লব ঘটেছিল ফেব্রুয়ারি মাসে, অতএব তারা তাকে নাম দিয়েছে "ফেব্রুয়ারির বিপ্লব।" তেমনি আবার, বলশেভিক বিপ্লব ঘটেছিল ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, এদের হিসেবে তার নাম হয়েছে "অক্টোবরের বিপ্লব"। এখন রাশিয়া তার পঞ্জিকা বদলে এখনকার সংশোধিত পঞ্জিকা প্রবর্তিত করেছে; কিন্তু এই পুরোনো নামগুলো তারা এখনও ব্যবহার করে। এবার 'অক্টোবর' গানটির অনুবাদটা দিই :

আমরা ঘুরে বেড়াতাম, কাজ আর খাদ্য প্রার্থনা ক'রে,
আমাদের হৃদয় বেদনায় অবসন্ন হয়ে থাকত,
কারখানার চিমনিগুলো আকাশের দিকে ইঙ্গিত করত,
সে যেন ক্লান্ত হাত, তাতে মুষ্টি বন্ধ করবার মতো জোর নেই।
নিস্তব্ধতা ভেঙে যেত আমাদের দুঃখের কথায় বেদনার আর্তনাদে,
তোপধ্বনির চেয়েও তা তীব্র।
হে লেনিন, খেটে খেটে কড়া-পড়া হাত যাদের তাদেরই আকাঙ্ক্ষার তুমি মূর্ত প্রতীক।
আমরা বুঝেছি, লেনিন, আমরা বুঝেছি আমাদের ভাগ্যটাই
হচ্ছে শুধু একটা সংগ্রাম! সংগ্রাম! সংগ্রাম!
শেষ যুদ্ধে তুমিই আমাদের চালিত করেছিলে। সংগ্রাম!
তুমি আমাদের হাতে এনে দিলে শ্রমিকদের জয়।

অজ্ঞতা আর অত্যাচারের উপরে আমাদের এই জয়,
একে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে কেউ পারবে না।
কেউ না! কেউ নয়! কখনও নয়! কখনও না!
সবাই আজ তরুণ হয়ে উঠুক, উঠুক সংগ্রামের সাহসী বীর হয়ে,
কারণ আমাদের জয়ের নামই যে অক্টোবর!
অক্টোবর! অক্টোবর!
অক্টোবর বার্তা বহন করে এনেছে সূর্যের কাছ থেকে।
অক্টোবর হচ্ছে শত-শতাব্দীর বিদ্রোহী চেতনার প্রতীক!
অক্টোবর! এটা একটা পরিশ্রম, একটা আনন্দ, একটা সংগীত।
অক্টোবর! চাষের মাঠ আর কারখানার কলের পক্ষে সে
একটা পরম সৌভাগ্য!
তাই আমাদের পতাকায় নাম জেগে রইল নবীন যুগের
মানুষের আর লেনিনের!

১৫৩

চীনের উপর জাপানের জুলুম

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৩

এদিকে যখন মহাযুদ্ধ চলছে, দূর প্রাচ্যে তখন কতকগুলো ব্যাপার ঘটছিল, তাদের কথা আমাদের জানা দরকার। অতএব আমি এবার তোমাকে নিয়ে যাব চীনদেশে। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আমি তোমাকে বলেছি কী করে সেখানে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল এবং তার পরে আবার কীভাবে সব বিঘ্ন-বিপত্তির সৃষ্টি হল। সম্রাটকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টাও অনেকবার হয়েছিল। সে চেষ্টা সফল হল না, কিন্তু সমগ্র দেশ জুড়ে প্রজাতন্ত্র তার অধিকার বিস্তৃত করতে পারল না; বা বলা যায় কোনো একটি সরকারই সে কাজ করে উঠতে পারল না। সেই থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত চীনে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ দেখা দেয় নি যে চীনের সমস্ত স্থানে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কয়েক বছর এই দেশে দুটি প্রধান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উত্তর এবং দক্ষিণ চীনের সরকার। দক্ষিণে ডক্টর সুন-ইয়াৎ-সেন আর তাঁর জাতীয়তাবাদী দল কুওমিনটাঙ প্রধান ছিলেন। উত্তরে শাসন করছিলেন য়ুআন শিহ্-কাই, তাঁর পরেও পর পর কয়েকজন সেনাপতি এবং সামরিক-কর্মচারী সে-অঞ্চল শাসন করেন। এই দুঃসাহসী রণ-বিশারদদের বলা হত টুচুন, এখনও এরা এই নামেই পরিচিত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ এরা চীনদেশের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ হয়ে উঠেছে।

চীনের তখন কাজেই সঙিন অবস্থা; দেশের মধ্যে একটানা বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলেছে, তার উপরে আবার আছে গৃহযুদ্ধ; উত্তর এবং দক্ষিণ-অঞ্চলের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী টুচুনদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি লেগে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে চক্রান্ত-বিস্তারের সে এক পরম সুযোগের মুহূর্ত, একবার এ পক্ষকে বা টুচুনকে, একবার ও পক্ষকে বা অন্য একজন টুচুনকে সাহায্য করে করে দেশের মধ্যেকার কলহকে টিকিয়ে রাখা এবং সেই ফাঁকে নিজেদের কিছু লাভ গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ভারতবর্ষেও ইংরেজরা এইরকম করেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এখানেও ইউরোপের জাতিরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল, চক্রান্ত বিস্তার করতে এবং একজন টুচুনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে উস্কে তুলতে শুরু করল। কিন্তু অল্পদিনের

মধ্যেই তারা নিজেদের ঘরোয়া বিপদ আর বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল, বাধ্য হয়েই দূর প্রাচ্যে এদের এইসব কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল।

জাপানের বেলায় কিন্তু তা হল না। মহাযুদ্ধের বড়ো বড়ো যুদ্ধবিগ্রহ যা কিছু, সে সবই ঘটছে বহু দূরে দেশে; জাপান দেখল চীনে তার পুরোনো নীতি আবার সে স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভয়ে অনুসরণ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে তখনই সে কাজ করবার সুযোগ তার পক্ষে আগের চেয়েও বেশি; কারণ অন্যান্য সমস্ত জাতি অন্যত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে, তার কাজে বাধা দিতে তারা আসবে এমন কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। জাপান জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সে শুধু চীনে কিয়াওচাও জর্মনদের ইজারা-মহল হস্তগত করবার এবং তার পর চীনদেশের মধ্যে আরও বেশিদূর ঢুকে পড়বার মতলবে।

চীন সম্বন্ধে জাপানের কূটনীতি গত দু'কুড়ি বছর যাবৎ আশ্চর্যরকম একপথে চলেছে। সেনাবাহিনীকে আধুনিক শিক্ষা এবং সজ্জায় দীক্ষিত করবার এবং দেশে শিল্প-প্রগতির প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান স্থির করল, চীনকে তার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে হবে, তার প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার জন্য জায়গা চাই; কোরিয়া এবং চীন দুটিই তার হাতের কাছে এবং দুটিই দুর্বল দেশ, অতএব সেখানে গিয়ে প্রভুত্ব আর শোষণ চালাবার লোভ জাপানের হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম চেষ্টা সে করল ১৮৯৪-৯৫ সনে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে। সে যুদ্ধে তার জয়ও হল, কিন্তু যতখানি সে আশা করেছিল ততখানি স্থল দখল করে নিতে সে পারল না, ইউরোপের কয়েকটি জাতি তাকে এসে বাধা দিল। তার পর এল একটি কঠিনতর সংগ্রাম—১৯০৪ সনে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও সে জয়লাভ করল, কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ায় দৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠিত করে বসল। এর অল্পদিন পরেই কোরিয়াকে সে দখল করে নিল; কোরিয়া জাপান সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হল।

মাঞ্চুরিয়া কিন্তু তখনও চীনেরই অংশ বলে গণ্য রয়ে গেল। চীনের পূর্ব-অঞ্চলের তিনটি প্রদেশ নিয়ে মাঞ্চুরিয়া গঠিত; তার নাম উল্লেখও করা হয় তাই বলেই। জাপানিরা শুধু রাশিয়ার সেখানে যে ইজারা-স্বত্ব ছিল সেইটা দখল করে নিল। রাশিয়ানরা যে রেলপথটি তৈরি করেছিল তার নাম এতদিন ছিল চাইনিজ ইস্টার্ন রেলওয়ে। জাপানিরা এটিকেও হস্তগত করল, এর নাম বদলে রাখা হল সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ে। এবার জাপান মাঞ্চুরিয়াকে বেশ এঁটেসেটে চেপে ধরবার উদ্যোগ শুরু করল। চীনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি; ইতিমধ্যে এই রেলওয়ের কল্যাণে চীনের অন্যান্য সমস্ত অঞ্চল থেকে বহু লোক এখানে চলে এসেছে, বহু চীনা কৃষকও এসে উপস্থিত হচ্ছে। মাঞ্চুরিয়াতে 'সয়াবিন্' বলে একরকম বরবটি খুব ভালো ফলত; এই বরবটির অনেক ভালো গুণ আছে বলে পৃথিবীর সর্বত্রই এর চাহিদা বেড়ে গেল। এই বর থেকে নানারকমের জিনিস তৈরি হতে পারে, তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে এক রকমের তেল। এই সয়াবিন চাষের উপলক্ষ্যেও বাইরে থেকে বহু লোক আমদানি হতে লাগল। অতএব জাপানিরা যখন উপরে এসে চেপে বসে মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত করে নিতে চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সময়েই ওদিকে দক্ষিণ-চীন থেকে চীনারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে দেশটাকে ভর্তি করে ফেলল। এই চীনা কৃষক এবং অন্যান্য আগন্তুকদের সমুদ্রে পুরোনো কালের মাঞ্চু বাসিন্দা ক'জন একেবারে ডুবে তলিয়ে গেল; সংস্কৃতি এবং মনোভাবের দিক দিয়ে তারা নিজেরাই পুরাদস্তুর চীনবাসী বনে গেল।

চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এটা জাপানের ঠিক পছন্দ হয় নি। চীনের শক্তি যাতে বাড়তে পারে এমন সকল ব্যাপারেই তার আপত্তি। তার সমস্ত কূটনৈতিক চালেরই লক্ষ্য ছিল, চীন যাতে সুসংহত হয়ে একটি শক্তিমান রাষ্ট্র হয়ে উঠতে না পারে, তার পথ বন্ধ করা। অতএব জাপান মহা-উৎসাহে এক টুচুনকে অন্য টুচুনের সঙ্গে লড়তে সাহায্য করতে লাগল, যেন দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাটা বেশ বজায় থাকতে পারে।

চীনের নবীন প্রজাতন্ত্রের সামনে তখন অনেক বিরাট বিরাট সমস্যা। সে শুধু মুমূর্ষু সাম্রাজ্য সরকারের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নই নয়। কেন্দ্রীয় সরকার

বলতে তখন প্রায় কিছু নেই; কাজেই কেড়ে নেবার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতাও বিশেষ কিছুই ছিল না। সে ক্ষমতা এদেরই তখন গড়ে নিতে হবে। প্রাচীন চীন নামেই শুধু একটা সাম্রাজ্য, আসলে এটা ছিল বহুসংখ্যক স্বাধীন অঞ্চলের একটা সমন্বয়, তাদের মধ্যে পরস্পর-বন্ধনও অতি শিথিল। প্রদেশগুলি অল্পবিস্তর স্বাধীন, এমন কি শহর এবং গ্রামগুলোও তাই। কেন্দ্রীয় সরকার বা সম্রাটের প্রভুত্ব এরা মুখে স্বীকার করত; কিন্তু স্থানীয় ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে সে সরকার যেত না। 'এককেন্দ্রিক' রাষ্ট্র বলতে যা আমরা বুঝি, তাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং বাস্তবিক শাসনকর্তৃত্ব একটি কেন্দ্রে এসে সুসংহত হয়ে থাকে, দেশশাসনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যেও একটা ঐক্য থাকে। সেরকমের কিছুই ছিল না এখানে। পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-বাণিজ্য আর সাম্রাজ্যবাদীদের লোভের ধাক্কায় এই শিথিল-বন্ধন রাষ্ট্রটাই (রাষ্ট্রনীতির ভাষায়) ভেঙে পড়েছিল। চীন বুঝল, তাকে যদি এই ধাক্কা সামলে আবার বেঁচে উঠতে হয়, তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে চীনদেশকে একটি শক্তিমান এককেন্দ্রায়ত্ত রাষ্ট্রে পরিণত করা, তার সর্বত্র ঠিক একই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে। অতএব নবজাত প্রজাতন্ত্র ঠিক এই রকমের একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চাইল। এটা সে দেশের পক্ষে একটা নূতন জিনিস, সুতরাং এ কাজ সম্পন্ন করতে প্রজাতন্ত্রকে নানারকম কঠিন সমস্যায় পড়তে হল। দেশে তখন বার্তা চলাচলের ভালো ব্যবস্থা নেই, ভাল রাস্তাঘাট রেলওয়ে নেই—দেশে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের পথে এইগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি প্রকাণ্ড বাধা।

রাজনৈতিক ক্ষমতা যাকে বলে, অতীত কালের চীনবাসীরা তাকে তেমন একটা দরকারি বস্তু বলেই মনে করত না। তাদের সে বিরাট সভ্যতার সমস্তটাই দাঁড়িয়ে ছিল তার সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে; মানুষের প্রতি তার শিক্ষা ছিল সুন্দর সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপায়—পৃথিবীতে তার সমকক্ষ শিক্ষা আর কোথাও কোনোদিন দেখা যায় নি। নিজেদের এই প্রাচীন সংস্কৃতি তাদের সমগ্র চেতনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোটা যখন একেবারেই ভেঙে পড়ল তখনও তারা সেই প্রাচীন সংস্কৃতির ধরনধারণকেই আঁকড়ে ধরে বসে রইল। জাপান নিজের ইচ্ছাতেই পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতি গ্রহণ করে নিয়েছিল, অথচ মনেপ্রাণে সে তখনও সামন্ত-প্রথারই উপাসক রয়ে গেছে। চীন সামন্ত-প্রথায় বিশ্বাসী নয়; তার মন ভরা ছিল যুক্তিবাদ আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দিয়ে; বিজ্ঞান আর শিল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ যে বিপুল প্রগতি দেখাচ্ছে তার দিকে সে ব্যগ্রনেত্রে তাকিয়ে ছিল। তবু কিন্তু জাপানের মতো সে সভ্যতাকে নিজস্ব করে নিতে চীন ছুটে গেল না। অবশ্য সে করতে যাবার পথে বাধাও তার অনেক, জাপানের সে বালাই নেই। কিন্তু তা ছাড়াও, প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এমন কিছু করতে যেতেই তার মনে দ্বিধা ছিল। চীনের মন ছিল দার্শনিকের মন; দার্শনিকরা তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। তার মনের মধ্যে অবশ্য তখন তুমুল তোলপাড় চলছিল, আজও চলছে; কারণ—তার সামনে যে সমস্যাগুলো এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে বিব্রত করে তুলছিল, সেগুলো শুধু রাজনৈতিক সমস্যাই নয়, অর্থনীতি সমাজ-নীতি বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই তাকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল।

তার পর আবার চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের পক্ষে, তার এই বৃহৎ আয়তন থেকেই বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরা দেশ হয়েও আসলে এক-একটা মহাদেশের শামিল, একটা মহাদেশের মতোই এদের গুরুভার দেহ, সে দেহ সামলে নিয়ে নড়া চড়া সোজা নয়। হাতি যখন আছাড় খায়, আবার উঠে দাঁড়াতে তার সময় লাগে; বিড়াল বা কুকুরের মতো এক লাফে উঠে দাঁড়ানো তার সাধ্যের বাইরে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই জাপান মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল, জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিয়াওচাও দখল করে নিল সে, তার পর শানটুং প্রদেশের উপর দিয়ে দেশের মধ্যে রাহু বিস্তার করতে শুরু করল। এই শানটুং প্রদেশেই কিয়াওচাও অবস্থিত। জাপানের এই অগ্রগতির মানেই হল, জাপানিরা খাস চীনদেশের উপর অভিযান করেছে। জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কথাই উঠল না; কারণ এই অঞ্চলের সঙ্গে জর্মানির কোনো সম্পর্ক নেই। চীন সরকার

খুব ভদ্রভাবে তাদের অনুরোধ জানাল, ফিরে যাও। জাপানিরা শুনে বলল, এতদূর আস্পর্ধা! তারা তৎক্ষণাৎ একটি সরকারি চিঠি চীনের কাছে দাখিল করল, তাতে তাদের একুশ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

'একুশ দফা দাবি' একটা বিখ্যাত ব্যাপার হয়ে উঠল। এখানে আমি সে দাবিগুলো উল্লেখ করব না। এর সোজা কথাটা ছিল, চীনদেশে সমস্ত রকমের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা জাপানকে ছেড়ে দিতে হবে, বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়ায় মঙ্গোলিয়ায় আর শানটুং প্রদেশে। এই দাবিগুলো সমস্ত মেনে নিলে চীন বস্তুত জাপানের একটা উপনিবেশে পরিণত হয়ে যায়। উত্তর-চীনের কর্তৃপক্ষের গায়ে জোর নেই, তাঁরা এই দাবিতে আপত্তি জানালেন, কিন্তু জাপানের সেনা দুর্ধর্ষ, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই বা তাঁরা কী করবেন। তার পর আবার, উত্তর-দেশের এই চীনা সরকারটিকেও তার নিজের প্রজারাই বিশেষ ভালোবাসত না। যাই হোক, একটি কাজ এঁরা করলেন, তাতে চীনের খুব উপকার হল। জাপানিদের দাবিগুলো এরা বাইরে প্রকাশিত করে দিলেন। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চীনে তার একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। অন্যান্য বৃহৎ জাতি তখন যুদ্ধ করতে ব্যতিব্যস্ত, তবু তারা পর্যন্ত এতে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আমেরিকা তো বিশেষ করেই আপত্তি প্রকাশ করল। এর ফলে জাপান তার কতগুলো দাবি প্রত্যাহার করল, এবং আর কতকগুলোর বহর হ্রাস করল। বাকিগুলোর জন্য অবশ্য চীন সরকারের উপর সে জোর জুলুম চালাতে লাগল; বাধ্য হয়ে ১৯১৫ সনের মে মাসে চীন সরকার সেগুলি মেনে নিলেন। এর ফলে চীনের সর্বত্র প্রবল জাপান-বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেল।

১৯১৭ সনের আগস্ট মাসে, যুদ্ধ শুরু হবার তিন বছর পরে, চীনও মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল, জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটা প্রায় একটা হাসির ব্যাপার; জর্মানিকে কোনো আঘাত হানবার সাধ্য চীনের ছিল না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মিত্রপক্ষের সঙ্গে একটা সদ্ভাব স্থাপন করা এবং জাপানের আরও দৃঢ়তর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

এর অল্পদিন পরেই, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, এল বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে উত্তর-এশিয়ার সর্বত্রই নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সোভিয়েট এবং সোভিয়েট-বিরোধীদের সংগ্রামের একটি রণক্ষেত্র হল সাইবেরিয়া। রাশিয়ার শ্বেতদলের সেনাপতি কোলচাক্ সাইবেরিয়াতে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। সোভিয়েটের জয়লাভ দেখে জাপানের ভয় ধরল, সে একটি বৃহৎ সেনাবাহিনী সাইবেরিয়াতে পাঠিয়ে দিল। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সেনাও পাঠানো হল সেখানে। কিছুকালের মতো সাইবেরিয়া এবং মধ্য-এশিয়াতে রাশিয়ার প্রভাবপ্রতিপত্তি বলতে কিছুই রইল না। এই-সব অঞ্চলে রাশিয়ার সমস্ত মানমর্যাদা একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত করে দিতে ব্রিটিশ সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। মধ্য-এশিয়া কেন্দ্রস্থলে কাশগড়ে ব্রিটিশরা একটি বেতার ঘাঁটি স্থাপন করল, সেখান থেকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নানারকমের প্রচারকার্য চালাতে লাগল।

মঙ্গোলিয়াতেও সোভিয়েটের সমর্থক এবং সোভিয়েটের বিরোধী লোকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। অনেক দিন আগে, ১৯১৫ সনে, মহাযুদ্ধ তখন চলছে, মঙ্গোলিয়া একটি কাজও করেছিল; জার শাসিত রাশিয়ার সাহায্যে সে চীন-সরকারের কাছ থেকে অনেকখানি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। তখনও কিন্তু চীনই তার উপরস্থ প্রভু হয়ে রইল; আবার মঙ্গোলিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের দিক থেকে রাশিয়াকেও সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই দেওয়া হল। এ একটা আশ্চর্য ব্যবস্থা। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে মঙ্গোলিয়াতেও গৃহযুদ্ধ বাধল, তিন বছর বা তারও বেশিদিন সংগ্রাম চালিয়ে শেষে সেখানকার স্থানীয় সোভিয়েটরাই সে যুদ্ধে জয়লাভ করল।

বিশ্বযুদ্ধের পরে যে শান্তি-সম্মেলনটা বসল, তার কথা এখন পর্যন্ত তোমাকে কিছু বলি নি। তার সম্বন্ধে আলোচনা আমি আর একটি চিঠিতে করব। কিন্তু একটি কথা এইখানেই বলতে পারি; এই সম্মেলনে যে বৃহৎ জাতিগুলো উপস্থিত ছিল, তার মানেই বিশেষ করে ইংলণ্ড ফ্রান্স আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এরা সাব্যস্ত করল, চীনের শানটুং প্রদেশটি জাপানকেই এরা উপহার

দেবে। এভাবে মহাযুদ্ধের ফলে মিত্রশক্তিবর্গের অন্যতম চীন তার দেশের একটি অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এর কারণ হল, যুদ্ধের সময় নাকি ইংলণ্ড ফ্রান্স আর জাপানের মধ্যে কী একটা গোপন সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু কারণ এর যাই থাক, চীনের উপরে এই যে কদর্য চালাকিটি এরা খেলল, তার ফলে চীনের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; পিকিঙ সরকারকে তারা জানিয়ে দিল, সরকার যদি এটা স্বীকার করে নেন তবে তারা দেশে বিপ্লব ঘটিয়ে ছাড়বে, জাপানের পণ্যও এরা একেবারেই বর্জন করে বসল; বহু জায়গাতে জাপানিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও শুরু হল। চীন সরকার (এই নাম দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি উত্তর-অঞ্চলে পিকিঙ-এর সরকার, এইটাই তখন প্রধান) সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন।

এর দু'বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে একটি সম্মেলন হল; সেখানে এই শানটুং-এর প্রশ্নটি আবার উঠল। এই সম্মেলনটা হচ্ছিল, দূর প্রাচ্যের সমস্যার সঙ্গে পৃথিবীর যত জাতির স্বার্থ জড়িত আছে তাদের সকলকেই নিয়ে; এদের আলোচনার বস্তু ছিল প্রত্যেকের নৌবহরের শক্তির পরিমাণ। ১৯২২ সনের এই ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীন এবং জাপান সম্বন্ধে কতকগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা করা হল। জাপান শানটুং প্রদেশ চীনকে ফেরত দিতে রাজি হল; দীর্ঘকাল ধরে এই প্রশ্নটি চীনকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে রেখেছিল, তার অবসান হল। সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে দুটি খুব জরুরি চুক্তিও সম্পন্ন হল।

এর একটির নাম হচ্ছে 'চতুঃশক্তি চুক্তি', এটি হয়েছিল আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান এবং ফ্রান্সের মধ্যে। এই চারটি জাতি পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরে এ'দের যার যত সম্পত্তি আছে, পরস্পর তাদের সীমানার মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন; অর্থাৎ এ'রা কেউ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে আশ্বাস দিলেন। অন্য চুক্তিটির নাম ছিল 'নব-শক্তি সন্ধি'; সম্মেলনে যে নয়টি জাতি যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই এই সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন—এ'দের নাম হচ্ছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল এবং চীন। এই সন্ধিপত্রের একেবারে প্রথম ধারাটিই শুরু হয়েছে এইভাবে :

"চীনের সার্বভৌম অধিকার, স্বাধীনতা, এবং দেশায়তন ও শাসনব্যাপারে অক্ষুণ্ণ ক্ষমতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলা......"

দেখেই বোঝা যায়, এই দুটি চুক্তিরই উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতে চীনের উপরে যাতে আর কেউ জুলুম না করে তার ব্যবস্থা করা। এতদিন ধরে সমস্ত জাতিগুলো চীনে ইজারা আদায় এমনকি তার জমি দখল করে পর্যন্ত নিচ্ছিল, তাদের সেই চিরকেলে খেলাকে বন্ধ করে দেবার জন্যই এই চুক্তি করা হয়েছিল। নানাবিধ যুদ্ধোত্তর সমস্যা নিয়ে তখন পাশ্চাত্য দেশগুলো ব্যতিব্যস্ত, তখন চীনের উপর জুলুম করবার মতো অবসরও তাদের নেই। জাপানও এই প্রতিশ্রুতি স্বীকার করে নিল, যদিও বহু বৎসর ধরে সে চীনের প্রতি যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে এটা তার একেবারেই উলটো। কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই স্পষ্ট দেখা গেল, এত সমস্ত চুক্তি আর প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও জাপান তার সেই পুরোনো নীতিই সমানে অনুসরণ করে চলেছে এবং জাপান একবার চীন আক্রমণ করল। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ব্যাপারে মিথ্যাভাষণ আর ভণ্ডামির এটি একটি চমৎকার নির্লজ্জ উদাহরণ হয়ে রয়েছে। পৃথিবীতে কী ঘটছে তার পশ্চাৎপটটা যাতে তুমি বুঝতে পার, সেইজন্যেই তোমাকে ওয়াশিংটনের সম্মেলনের ইতিহাস বলতে হল।

ওয়াশিংটনে যখন সম্মেলন হচ্ছিল, তারই কাছাকাছি সময়ে সাইবেরিয়া থেকেও সমস্ত বিদেশী সেনা সরিয়ে নেওয়া শেষ হল। সকলের শেষে গেল জাপান। তারপরই স্থানীয় সোভিয়েটেরা সামনে এগিয়ে এল, রাশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রদের সঙ্গে যোগ দিল।

প্রথম থেকেই রাশিয়ায় সোভিয়েট এগিয়ে গিয়ে চীন সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিল; বলেছিল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মতো চীনের মধ্যে যে-সব বিশেষ অধিকার জারশাসিত রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল, এরা সেগুলো ছেড়ে দিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ আর কমিউনিজ্‌ম কখনোই একসঙ্গে চলতে পারে না; তা ছাড়াও প্রাচ্য জগতের যে দেশগুলি দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর শোষণ এবং শাসানি সয়ে এসেছে, তাদের প্রতি একটা উদার নীতি

সোভিয়েট ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছিল। এটা শুধু সুনীতির দিক থেকেই ভালো কাজ নয়, কূটনীতির দিক থেকেও সুবুদ্ধির কাজ; কারণ এর ফলে প্রাচ্য জগতে সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক বন্ধু তৈরি হয়ে গেল। বিশেষ অধিকারগুলো সোভিয়েট ছেড়ে দিতে চাইছিল তার সঙ্গে কোনো শর্ত সে আরোপ করেনি, বদলে কিছুই সে দাবি করছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চীন সরকার তাদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে ভয় পেল, পাছে পশ্চিম-ইউরোপের জাতিরা তার উপরে চটে যায়। তবু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এবং চীনের প্রতিনিধিদের একত্র সাক্ষাৎ হল, ১৯২৪ সনে এঁরা কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিলেন। এই চুক্তির কথা শুনে ফরাসি আমেরিকান এবং জাপানি সরকার পিকিঙ সরকারকে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল; পিকিঙ সরকার এত ভয় পেয়ে গেল যে চুক্তিপত্রে তার প্রতিনিধি যে স্বাক্ষর করেছিল সেটাকে পর্যন্ত সাফ অস্বীকার করে বসল। এতখানি দুরবস্থাই বেচারি পিকিঙ সরকারের দাঁড়িয়েছিল! রুশ প্রতিনিধি তখন সে চুক্তিপত্রের সমস্ত ভাষাটাই কাগজে বার করে দিলেন। তাই নিয়ে প্রকাণ্ড একটা কোলাহল পড়ে গেল। সবাই দেখল, সে চুক্তিপত্রে চীনের প্রতি অতি সম্ভ্রমপূর্ণ এবং ভদ্র ব্যবহার দেখানো হয়েছে, তার সমস্ত অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—বৃহৎ জাতিগুলোর সঙ্গে তার যতদিনের সংশ্রব তার মধ্যে তার এর আগে কেউ কখনও তা করে নি। বড়ো একটা জাতির সঙ্গে সমান-সমান দাঁড়িয়ে এই তার প্রথম সন্ধি। দেখে চীনের প্রজারা উল্লসিত হয়ে উঠল; বাধ্য হয়ে তখন সরকারকেও সে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হল। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো এতে ক্ষুব্ধ হবে সে তো অতি সহজ কথাই; কারণ এতে তারা তুলনায় অনেকখানি খাটো প্রমাণ হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়া উদার হস্তে সকলকে দান করেছে, আর তারই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা তাদের সমস্ত বিশেষ অধিকারকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রেখেছে কিছুতেই একতিল হাতছাড়া করতে চাইছে না।

দক্ষিণ-চীনে সুন-ইয়াৎ-সেন যে সরকার স্থাপন করেছেন তার রাজধানী ছিল ক্যাণ্টন। তাদের সঙ্গেও সোভিয়েট সরকার কথাবার্তা চালাল; এদের মধ্যেও একটা পরস্পর বোঝাপড়া হল। এই সময়টার অধিকাংশ ধরেই উত্তর এবং দক্ষিণ -চীনের মধ্যে, এবং উত্তর-চীনের নানা সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে একটা ক্ষীণ রকমের গৃহযুদ্ধ চলছিল। উত্তর-চীনের এই টুচুনরা, বা মহা-টুচুনরা (এদের অনেকে এই নামে পরিচিত ছিল) কোনো নীতি বা কর্মসূচীর খাতিরে যুদ্ধ করছিল না, এরা যুদ্ধ করছিল শুধু নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য। এরা পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করত তার পর আবার হঠাৎ দল ছেড়ে বিপক্ষ দলে গিয়ে ভিড়ত, সেখানে গিয়ে আবার নূতন দল গড়ত। এই ক্রমাগত দল বদ্‌লাবদ্‌লির ব্যাপারটা বাইরের লোকে ভালো বুঝেই উঠতে পারত না। এই টুচুন বা যুদ্ধব্যবসায়ী গুণ্ডারা তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করত, প্রজার উপর নিজস্ব প্রয়োজনে কর বসাত, নিজস্ব কারণেই যুদ্ধ-বিগ্রহ করত; অথচ তার দরুন সমস্ত বোঝা বইতে হত চীনের নিরীহ প্রজাদের। দীর্ঘকাল ধরে এরা খালি উৎপীড়নই সয়ে এসেছে। শোনা যায় এই মহা-টুচুনদের অনেকের পিছনে নাকি আবার ছিল বিদেশী জাতিগুলো, বিশেষ করে জাপান। সাংহাইতে বিদেশীদের যে-সব বড়ো বড়ো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ছিল সেখান থেকেও এদের কাছে সাহায্য এবং টাকা এসে পেঁছিত।

সমস্ত চীনে একটি মাত্র স্থান মালিন্যমুক্ত ছিল, সে হচ্ছে দক্ষিণ-চীন, সেখানে ডক্টর সুন-ইয়াৎ-সেনের সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই সরকারের একটা আদর্শ ছিল, একটা স্থির নীতি ছিল; উত্তর-চীনের টুচুনদের অনেকেই শাসনের নামে যে গুণ্ডামি আর ডাকাতির ব্যবসা চালাচ্ছিল, এটা মোটেই তা নয়। ১৯২৪ সনে প্রজাদের দল 'কুওমিন্‌টাঙ'-এর প্রথম জাতীয় অধিবেশন হল; সে অধিবেশনে ডক্টর সুন একটি ইস্তাহার দাখিল করলেন। এই ইস্তাহারে তিনি যে-সব নীতি অনুসারে এখন জাতির জীবনযাত্রাকে চালিত করা প্রয়োজন, তার একটা ফিরিস্তি দিলেন। সেই থেকে শুরু করে এই ইস্তাহার এবং এই নীতিগুলো কুওমিনটাঙ-এর মূল আদর্শ হয়ে রয়েছে; অনেকের মতে এখনও চীনের জাতীয় সরকারের সাধারণ কর্মনীতি এদের অনুসারেই চালিত হচ্ছে।

১৯২৫ সনের মার্চ মাসে ডক্টর সুনের মৃত্যু হয়। চীনের সেবার জন্য তিনি জীবনপাত করে গেছেন, চীনের অধিবাসীরা আজও তাঁকে ভালোবাসে।

১৫৪

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৩

ভারতবর্ষ অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ হিসাবে সোজাসুজিই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বা কাছে কোনো যুদ্ধ হয় নি। তাহলেও ভারতবর্ষের অগ্রগতির উপরে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা প্রকারেই যুদ্ধের প্রভাব এসে পড়েছিল, ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় অনেক বড়ো বড়ো পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল। মিত্রপক্ষের সাহায্য করবার জন্য তার সমস্ত সম্পদকেই যথাসম্ভব কাজে লাগানো হয়েছিল।

ভারতবর্ষের যুদ্ধ এ নয়। জর্মন পক্ষের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো ঝগড়া ছিল না; আর তুরস্কের কথা যদি বলো, তার উপরে বরং ভারতবর্ষের প্রচুর সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ—ব্রিটেনের অধীন দেশ মাত্র; বাধ্য হয়েই তাকে তার সাম্রাজ্যবাদী অধীশ্বরীর পদসেবা করতে হয়। অতএব দেশের লোকের মনে প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনারা—তুর্কি, মিশরবাসী এবং অন্যান্য জাতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে গেল; পশ্চিম-এশিয়ার সর্বত্র ভারতের নাম অপ্রিয় করে দিয়ে এল।

আগের একটি চিঠিতেও বলেছি, যুদ্ধ যখন বাধে তখন ভারতের রাজনৈতিক চেতনার স্রোতে ভাঁটা চলেছে। যুদ্ধ বাধবার ফলে মানুষের মনোযোগ সেদিক থেকে আরও বেশি স'রে গেল; যুদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার নানাবিধ বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন, তার ফলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলন চালানো কঠিন হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময়টা শাসন-কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বত্রই সুবিধার মরশুম; যুদ্ধের দোহাই দিয়ে তারা অন্য সকলকেই নিষ্পেষিত করতে পারে, নিজেদের যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতে পারে। স্বাধীন কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র একটি ক্ষেত্রে, তাদের নিজেদের বেলায়। সংবাদ ও চিঠিপত্রের উপরে সেন্সরের পাহারা বসানো হয; তার জোরে সত্যকে গোপন কবা হয়, অনেক সময়েই মিথ্যা কথা প্রচার করা হয় এবং সমালোচনার পথ বন্ধ করা হয়। বিশেষ প্রকারের আইন এবং অনুশাসন সৃষ্টি কবে জাতীযতাবাদীদের প্রায় সকলপ্রকার কার্যকলাপকেই নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়। প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশেই এই কাজ করা হযেছিল; স্বভাবতই ভারতবর্ষেও হল। এখানে একটি 'ভারত-রক্ষা আইন' তৈরি করা হল। যুদ্ধ বা তার সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেরই সমালোচনা যাতে জনসাধাবণ কবতে না পারে, তার কণ্ঠ এই আইনে ভালো কবেই বোধ করে দেওয়া হল। তবুও কিন্তু মনে মনে এদেশেব প্রায় সকল লোকই জর্মন পক্ষের এবং বিশেষ করে তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল; কিংবা হয়তো এই বললেই ঠিক বলা হবে—মনে মনে সকলেই কামনা করছিল ব্রিটেন একটা বড়ো রকমের ঠ্যাঙানি খাক্। নিজেরা যারা প্রচুর ঠ্যাঙানি এতদিন খেয়ে এসেছে সেই অক্ষমদের পক্ষে এরকমের কামনা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ কামনাকে বাইরে কেউ প্রকাশ করল না।

বাইরে অনেকে ব্রিটেনের প্রতি রাজভক্তি জানিযে উচ্চ চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করতে লাগল। এই চীৎকাবের বেশির ভাগই করছিল এদেশী-রাজাদের রাজারা; খানিকটা উচ্চারিত হচ্ছিল উচ্চতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের কণ্ঠে, সরকারের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। কিছু পরিমাণে বুর্জোয়ারাও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, মিত্রপক্ষ গণতন্ত্র স্বাধীনতা এবং ক্ষুদ্র জাতিদের স্বাধীন অধিকার ইত্যাদি নিযে যে-সব লম্বা বুলি আওড়াচ্ছিলেন তাই শুনে। এ'দের ভরসা হযেছিল, হয়তো এদের এই-সব আশ্বাসবাক্য এরা ভারতবর্ষকেও লক্ষ্য করে বলছে; আশা করছিলেন তখন যদি ব্রিটেনের সেই সংকটের মুহূর্তে ভারতবর্ষ তাকে সাহায্য করে, তবে হয়তো পরে একদিন ব্রিটেনও ভারতবর্ষকে তার যোগ্য পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হবে না। আর সেটা হোক না হোক, নিজের ইচ্ছামত কিছুই তো করবার যো ছিল না তখন, কাজ চালাবার জন্য কোনো নিরাপদ পন্থাও ছিল না।

অতএব এ'রা ভাবলেন যা পাওয়া যাচ্ছে সেই ছাই মুঠোকেই উড়িয়ে দেখা যাক যদি তলায় কিছু থাকে।

ভারতবর্ষে রাজভক্তির এই যে বাহ্যিক প্রকাশ, তখনকার দিনে ইংলণ্ডের লোক তা দেখে খুবই মুগ্ধ হল, নানা প্রকারে তারা এজন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করল। ইংলণ্ডে তখন কর্তৃপক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁরাও বললেন, হ্যাঁ, এবার থেকে ইংলণ্ডও ভারতবর্ষের দিকে 'একটু নূতনতর দৃষ্টি' নিয়ে চেয়ে দেখবে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে তখনও কিছু সংখ্যক ভারতবাসী ছিলেন, যাঁরা এই 'রাজভক্তি' প্রকাশ করলেন না। এদেশের অধিকাংশ লোকের মতো চুপ করে এবং নিষ্ক্রিয় হয়েও বসে রইলেন না তাঁরা। তাঁদের বিশ্বাস ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের সেই পুরোনো নীতিটিই সত্য, ইংলণ্ড মুশকিলে পড়লেই তাঁদের দেশের সুযোগ। বিশেষ করে জর্মনিতে এবং ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে কয়েকজন ভারতবাসী ছিলেন, এ'রা বার্লিনে এসে একত্র হয়ে ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করবার উপায় উদ্‌ভাবন করতে লেগে গেলেন, একটি কমিটিও তৈরি করলেন এজন্য। জর্মন সরকার তখন স্বভাবতই সকল প্রকার সাহায্য নিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে; এই ভারতীয় বিপ্লবীদের তারা সাগ্রহে অভ্যর্থনা করল। জর্মন সরকার এবং ভারতীয় কমিটি, এই দুই পক্ষের মধ্যে একটা রীতিমতো লিখিত চুক্তিপত্র তৈরি হল, উভয়েই তাতে স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তিপত্রে অনেক কথাই ছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ভারতীয়রা যুদ্ধে জর্মন সরকারকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এই শর্তে যে, যুদ্ধে যদি জর্মনির জয় হয় তবে তখন জর্মনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এর পর থেকে যতদিন যুদ্ধ চলল, তার আগাগোড়া সময়টাই এই ভারতীয় কমিটি জর্মনির পক্ষ হয়ে কাজ করে চললেন। ভারত থেকে যে-সব ভারতীয় সৈন্যদের বিদেশে পাঠানো হচ্ছিল তাদের মধ্যে এ'রা প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন; এদিকে একেবারে আফগানিস্তান এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এ'দের কার্যকলাপ বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা শুধু ব্রিটেনকে অনেকখানি উদ্‌বিগ্ন করে তোলা ছাড়া আর বেশি কিছু এ'রা করে উঠতে পারলেন না। সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার একটা চেষ্টাও এ'রা করেছিলেন, সে চেষ্টা ব্রিটিশরা ব্যর্থ করে দিল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধে জর্মনি হেরে গেল; এই কমিটি এবং সমস্ত আশাভরসারও সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের মধ্যেও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ কিছু কিছু প্রকাশ পেল; স্পেশাল ট্রাইবুনাল খাড়া করে অনেক ষড়যন্ত্র মামলার বিচার করা হল; বহু লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, বহু লোককে দীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হল। সেই সময়ে যাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁদের অনেকে আজও জেলে রয়েছেন—এই আঠারো বছর পরেও!

যুদ্ধ যত এগিয়ে চলল, অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও অল্প কজন লোক বিরাটরকম লাভ করে নিতে লাগল; ওদিকে অধিকাংশ লোকের দুর্দশা ক্রমেই বাড়তে লাগল; লোকের মনে অসন্তোষও বেড়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য ক্রমেই আরও বেশি লোকের দরকার হতে লাগল; সেনাবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করার তৎপরতাও ক্রমে খুবই বেড়ে গেল। সৈন্য সংগ্রহ করে যারা দেবে তাদের যতরকম সম্ভব লোভ আর পুরস্কারের আশা দেখানো হতে লাগল; জমিদারদের উপরে হুকুম হল তাদের প্রত্যেককে নিজের প্রজাদের ভিতর থেকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য জোগাড় করে দিতে হবে। সেনাদল এবং সামরিক শ্রমিকদের লোক সংগ্রহ করবার জন্যে এই সব জবরদস্তির ব্যবস্থা বিশেষ করে প্রয়োগ করা হল পাঞ্জাবে। সৈন্য এবং শ্রমিকবাহিনী হিসাবে ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যত লোক পাঠানো হয়েছিল তাদের মোট সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি। এই ভাবে যাদের যুদ্ধের কাজে ভর্তি করে নেওয়া হল তারা এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল; অনেকে বলেন যুদ্ধের পরে পাঞ্জাবে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এইটাই তার অন্যতম কারণ।

আরও একটা দিক থেকে পাঞ্জাবকে ক্ষতি সইতে হল। বহু পাঞ্জাবী, বিশেষ করে শিখ, দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়াতে এবং পশ্চিম-কানাডার অন্তর্গত ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে চলে গিয়েছিল। এখন থেকে ক্রমাগতই সেখানে লোক যেতে লাগল; শেষে আমেরিকা এবং কানাডার

কর্তৃপক্ষ এদের যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এই আগন্তুকদের বাধা দেবার জন্য কানাডা সরকার আইন করলেন, যারা পথে জাহাজ না বদলে একেবারে একটানা এদেশের বন্দর থেকে কানাডার বন্দরে গিয়ে পৌঁছবে, কেবল তাদেরই কানাডাতে ঢুকতে দেওয়া হবে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ভারতীয় আগন্তুকদের সে দেশে যেতে না দেওয়া; চীনে বা জাপানে জাহাজ বদল না করে এদের কানাডাতে পৌঁছবার পথ ছিল না। দেখেশুনে বাবা গুরুদিৎ সিং নামক একজন শিখ একটি আস্ত জাহাজই ভাড়া করে নিলেন, তার নাম 'কোমাগাতা মারু'। সেই জাহাজে করে বিরাট একদল লোক নিয়ে তিনি কলিকাতা থেকে সোজা কানাডার ভ্যানকুভার বন্দরে গিয়ে হাজির হলেন। কানাডার আইনকে তিনি এই ফন্দি খাটিয়ে এড়িয়ে গেলেন। তাহলেও কানাডা সরকার তাঁকে দেশে ঢুকতে দিতে রাজি হল না, এই জাহাজের কোনো আরোহীকেই তারা সেখানে নামতে দিল না। সেই জাহাজে করেই তাঁদের ফিরে আসতে হল; একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে এঁরা ভারতে এসে পৌঁছলেন। কলিকাতার কাছে বজবজে পুলিশের সঙ্গে এঁদের বেশ একটি ছোটোখাটোরকমের যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে বহু লোক মারাও পড়ল, বিশেষ করে শিখদের পক্ষে। এর পরেও আবার এই শিখদের অনেককে পুলিশ সর্বত্র অনুসরণ করে বেড়াল, পাঞ্জাবের মধ্যেও সর্বত্র খুঁজে খুঁজে এদের গ্রেপ্তার করা হল। এই লোকগুলো পাঞ্জাবে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ এবং অসন্তোষ প্রচার করে বেড়াল; 'কোমাগাতা মারু' সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই ভারতের সর্বত্র লোকের বিক্ষোভের কারণ হয়ে উঠল।

সেই যুদ্ধের দিনে কত কী ঘটেছিল তার সমস্ত বিবরণ জানতে পাওয়া কঠিন; কারণ সেন্সরের চাপে তখন অনেক রকম সংবাদই প্রকাশিত হতে পারত না, সুতরাং মানুষের মুখে মুখে নানারকমের অদ্ভুত গুজব ছড়াত। তবে এটুকু জানা গেছে, সিংগাপুরে একটি ভারতীয় রেজিমেন্টের মধ্যে একটা বেশ বড়ো বিদ্রোহ হয়েছিল; অন্যান্য বহু স্থানেও ছোটোখাটো রকমের হাঙ্গামা দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগান দেওয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সাহায্য তো ছিলই; এ ছাড়া নগদ টাকা দিতেও ভারতবর্ষকে বাধ্য করা হল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষের 'দান'। একবার এইভাবে দেওয়া হল দশকোটি পাউন্ড; আরেকবারও আরেকটা প্রচণ্ড পরিমাণ টাকা দেওয়া হল। দরিদ্র দেশের কাছ থেকে এইভাবে জোর করে টাকা আদায় করে নিয়ে তাকে আবার 'দান' বলে প্রচার করা, এতে প্রমাণ হয় ব্রিটিশ সরকারেরও রসবোধ আছে।

এখন পর্যন্ত যা বলেছি সে সবই হচ্ছে যুদ্ধের ছোটোখাটো ফলাফলের কথা, মানে ভারতবর্ষের দিক থেকে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ফলে অনেক বড়ো একটা মৌলিক পরিবর্তনও এসে যাচ্ছিল। যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেরও বৈদেশিক বাণিজ্য একদম ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষে যে বিপুল পরিমাণ মালপত্র আসত তার বেশিরভাগই আসা বন্ধ হয়ে গেল। ভূমধ্যসাগরে এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে জর্মন সাবমেরিনগুলো সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে; সে অবস্থায় ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো যায় না। অতএব বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে হল, তার যা কিছু দরকার নিজেরই তৈরি করে নিতে হল। আবার যুদ্ধের কাজে দরকার হয় এমন বহু জিনিস তৈরি করে সরকারকেও যোগান দিতে হল তার। এর ফলে ভারতবর্ষে নানারকমের শিল্প অতি দ্রুত বেড়ে উঠল—কাপড়ের কল পাটের কল প্রভৃতি পুরোনো শিল্প এবং যুদ্ধকালীন বহু নূতন শিল্প দুইই। টাটার লোহা আর ইস্পাতের কারখানাটিকে সরকার এতদিন অবজ্ঞার চোখেই দেখে আসছিলেন, এবার তারও খাতির অত্যন্তরকম বেড়ে গেল। সে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করবার ক্ষমতা রাখে। এখন কিছুটা সরকারি তত্ত্বাবধানেই সে কারখানাটিকে চালানো হতে লাগল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের কটা বছর—ভারতবর্ষের যত ধনিক, ব্রিটিশ বা ভারতীয় সকলেই একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল, বিদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ও বিশেষ ছিল না তাদের। এই সুযোগের তারা সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল, প্রচুর টাকা লাভ করে নিল, অবশ্য সে টাকা যোগাতে হল এদেশের দরিদ্র জনসাধারণকেই। জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হল; সকল ব্যবসায়েরই

অংশীদারদের লভ্যাংশ এত বেশি হারে দেওয়া হতে লাগল যে শুনলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যাদের পরিশ্রমে এই লভ্যাংশ আর লাভের সৃষ্টি, সেই শ্রমিকদের দুর্দশা যেমন তেমনই থেকে গেল। তাদের মাইনে সামান্য একটু বাড়ল বটে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর মূল্য বাড়ল তার চেয়ে অনেক বেশি, সুতরাং তাদের অবস্থা বস্তুত আগের চেয়ে আরও খারাপই হয়ে পড়ল।

ধনিকদের কিন্তু সমৃদ্ধির আর সীমা রইল না। তাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ লাভ, সেই টাকা জমিয়ে ফেলল তারা; জমিয়ে আবার সেই টাকা ব্যবসায়ে খাটাতে চাইল। তখন তাদের জোর বেড়েছে, সরকারের উপরে পর্যন্ত তারা চাপ দিতে লাগল এজন্য—ভারতবর্ষে এ ঘটনা এই প্রথম। এদের চাপ ছাড়াও অবশ্য শুধু ঘটনাপ্রবাহের চাপে পড়েই যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করতে হচ্ছিল। দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা আরও বাড়ানো হবে, অতএব বাইরে থেকে আরও বেশি বেশি যন্ত্রপাতি এদেশে আমদানি হতে লাগল, তখন পর্যন্ত সে-সব যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে তৈরি করবার ব্যবস্থা ছিল না। অতএব দেখা গেল, ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে এখন কলের তৈরি পণ্যদ্রব্যের বদলে বেশি আসছে যন্ত্রপাতি।

এই-সব ব্যাপারের ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের নীতিরও অনেক পরিবর্তন হল; এর আগের একশো বছর ধরে যে নীতি তারা চালিয়েছিল সেটা বর্জন করে এবার তারা নূতন একটা নীতির প্রবর্তন করল। অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও একেবারেই ভোল বদলে ফেলল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ কীরকম ছিল তোমাকে বলেছি। তোমার হয়তো সেকথা মনে আছে। প্রথমে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ, তখন তারা শুধু লুটপাট করত আর নগদ টাকা নিয়ে যেত। তার পর এল দ্বিতীয় অধ্যায়; ব্রিটিশ রাজত্ব তখন এদেশে কায়েমী হয়ে বসেছে—সে যুগটা টিকে রইল একশো বছরেরও বেশি কাল, একেবারে মহা-যুদ্ধের সময় পর্যন্ত। এই সময়কার নীতি ছিল ভারতবর্ষকে শুধু একটা কাঁচামাল যোগান দেবার ক্ষেত্র এবং ব্রিটেনের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রি করবার বাজারে পরিণত করে রাখা। এদেশে যে কোনো বড়ো রকমের কল-কারখানা বসাবার চেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া হত; ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রগতির পথও রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এবার এই যুদ্ধের সময়ে এল তার তৃতীয় যুগ : ভারতবর্ষে বড়ো বড়ো কল-কারখানা বসানোর চেষ্টাকে ব্রিটিশ সরকার উৎসাহ এবং সাহায্য দিতে লাগল; ব্রিটেনের উৎপাদন-শিল্পের স্বার্থ তাতে কিছুটা ব্যাহত হবে, তা সত্ত্বেও। ল্যাংকাশায়ারের কাপড় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত ভারতবর্ষে; অতএব ভারতবর্ষে যদি কাপড়ের কল বাড়িয়ে তোলা হয় তবে সেই পরিমাণে ল্যাংকাশায়ারের ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে ল্যাংকাশায়ার এবং ব্রিটেনের অন্যান্য শিল্পের স্বার্থহানি স্বীকার করে নিয়েও ব্রিটিশ সরকার তাঁদের নীতির এই পরিবর্তন সাধন করলেন কেন? করলেন, যুদ্ধের দরুন নানা অবস্থার চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে। এই পরিবর্তন কেন করা হল তার সমস্ত কারণ আমি তোমাকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি :

(১) যুদ্ধের সময় বহু জিনিসপত্রের প্রয়োজন বেড়েছে, অতএব সেই প্রয়োজন মেটাতে স্বভাবতই এদেশে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠাও অনেক বেড়ে গেছে।

(২) এর ফলে ভারতবর্ষের ধনিকদের সংখ্যা এবং শক্তি বেড়েছে, সুতরাং তারা তখন আবার আরও বেশি বেশি কল-কারখানা বসাবার সুবিধা আদায় করে নিতে চেয়েছে, যেন এইভাবে তাদের বাড়তি লাভের টাকাটাকে তারা আবার খাটাতে পারে। এদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলবার মতো সাহস তখন ব্রিটেনের ছিল না; তা করতে গেলে হয়তো এরা সরকারের উপর একেবারে চটে যাবে; চটে গিয়ে দেশের মধ্যে যে-সব চরমপন্থী এবং বিপ্লবপন্থী প্রতিষ্ঠান তাদেরই দলে গিয়ে ভিড়বে—তাদেরও তখন শক্তি ক্রমে বেড়ে উঠছিল। অতএব ব্রিটিশ সরকার দেখলেন, যদি সম্ভব হয় তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়াবার কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েও এদের নিজের পক্ষে টেনে রাখাই যুক্তিসংগত।

(৩) ইংলণ্ডের ধনিকদের হাতে যে বাড়তি টাকা জমে গিয়েছে সে টাকাও তারা আবার খাটাতে চায়; যে দেশের নিজস্ব কল-কারখানা বিশেষ নেই এমন দেশেই যাবার সুযোগ তারা খুঁজছে, কারণ সেইখানে গেলেই লাভ বেশি হবে। ইংলণ্ড শিল্পবাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত দেশ, সেখানে টাকা খাটিয়ে বিশেষ সুবিধার ভরসা নেই। লাভের হার কম দাঁড়াবে সেখানে; তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনও সুসংহত হয়ে উঠছে। শ্রমিকদের নিয়ে প্রায়ই মুশকিলে পড়তে হচ্ছে। অনুন্নত দেশে শ্রমিকদেরও তেমন কোনো শক্তি নেই; অতএব সেখানে মজুরি কম দিয়ে পারা যায়, লাভও বেশি থাকে। স্বভাবতই ব্রিটিশ ধনিকরা ব্রিটেনে টাকা না খাটিয়ে বরং ব্রিটেনের অধীনস্থ কোনো অনুন্নত দেশে এসে টাকা খাটানো বেশি পছন্দ করে; ভারতবর্ষ ঠিক তেমনি একটি দেশ। অতএব ব্রিটেন থেকে বহু মূলধন ভারতে এসে হাজির হল, এবং তার ফলেই এদেশে আরও বেশি কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল।

(৪) যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা গিয়েছিল, শিল্পপ্রগতিতে যে-সব দেশ অত্যন্ত এগিয়ে গেছে তারাই সত্য করে যুদ্ধ চালাবার শক্তি রাখে। যুদ্ধে জারশাসিত রাশিয়ার শেষপর্যন্ত পরাজয় হয়েছিল তার কারণ, রাশিয়াতে শিল্পব্যবস্থা ভালো ছিল না, তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের ভয়, এর পরের বারে হয়তো তাকে যুদ্ধ করতে হবে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে, ভারতের সীমান্তদেশে। ভারতবর্ষে তার নিজস্ব কল-কারখানা যদি না থাকে, তবে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারত-সীমান্তে ঠিকমত যুদ্ধ চালাতেই পারবে না। সেটা অত্যন্ত বিপদের কথা। অতএব সেজন্যও ভারতবর্ষে কলকারখানা বাড়িয়ে তুলতে হয়।

এই-সব কারণে বাধ্য হয়েই ব্রিটেনকে তার নীতি পাল্টাতে হল; ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে তুলতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তর প্রয়োজনেই এটা করা দরকার হয়ে উঠল; সেজন্য যদি ল্যাংকাশায়ার বা ব্রিটেনের আরও দু'চারটা শিল্পের কিছু ক্ষতি হয়ও, সে ক্ষতিও সইতে তাঁরা রাজি হলেন। বাইরে অবশ্য ব্রিটেন বলতে লাগল, এই পরিবর্তন করা হচ্ছে শুধু ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে অত্যন্ত বেশি ভালোবাসেন বলে নিছক তারই মঙ্গলের জন্য। নীতির এই পরিবর্তন যখন করা হবে স্থির হল, তারপরই অবশ্য ব্রিটেন এমন ব্যবস্থা করে নিল যাতে ভারতবর্ষের এই-সব নূতন শিল্পের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাটা ব্রিটিশ ধনিকদের হাতেই থেকে যায়। ভারতীয় ধনিকদের শুধু এই ব্যবসায়ের মধ্যে নেওয়া হল অতি ক্ষুদ্র অংশীদার হিসাবে, তাইতেই তাদের কৃতার্থ হওয়া উচিত।

যুদ্ধের সময়ে, ১৯১৬ সনে একটি ভারতীয় শিল্প কমিশন বসানো হল। দু' বছর পরে এ'রা রিপোর্ট দাখিল করলেন; তাতে বললেন শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারেরই সকলকে সাহায্য করতে হবে এবং কৃষিকার্যেও আধুনিক শিল্প-তন্ত্রী কায়দাকানুন প্রবর্তন করতে হবে। আরও বললেন; দেশের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা করা দরকার। কর্মপটু শ্রমিক যাতে পাওয়া সম্ভব হয়, এই জন্যই এ'রা জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন; ইংলণ্ডেও কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

যুদ্ধের পরে এই কমিশনের পিঠোপিঠ আরও অনেকগুলো কমিশন এবং কমিটি বসানো হল। একথাও বলা হল, বিদেশী পণ্যের উপরে শুল্ক বসিয়ে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করতে হবে; এই শুল্কের নাম হচ্ছে রক্ষাশুল্ক। ভারতীয় শিল্পের পক্ষে এই-সব ব্যাপারকে একটা বিরাট রণজয়ের শামিল বলেই লোকে মনে করল। বাস্তবিক পক্ষে এটা ছিলও তাই, অন্তত কতক পরিমাণে। কিন্তু একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যেও অনেক মজার ফাঁকি ছিল। সরকারপক্ষ থেকে বলা হল, বিদেশ থেকে যাতে ভারতবর্ষে মূলধন আসতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে : বিদেশ থেকে অর্থ ছিল কার্যত ব্রিটেন থেকে। হুড়হুড় করে ব্রিটিশ মূলধন ভারতে এসে হাজির হল। কেবল যে বহু-পরিমাণে এল তাই নয়, বাজার একেবারে দখলই করে ফেলল। বড়ো বড়ো কল-কারখানা যেগুলো হল তার প্রায় সমস্তই চলল ব্রিটিশ মূলধনের জোরে। অতএব ভারতবর্ষে রক্ষাশুল্কে আর রক্ষাকবচের মানে দাঁড়াল,

এদেশে ব্রিটিশ মূলধনের স্বার্থরক্ষা। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নীতির যে বিরাট পরিবর্তন করা হয়েছিল, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তার ফল ব্রিটিশ ধনিকদের পক্ষে বিশেষ মন্দ হয় নি। তারা বরং বেশ একটা নিরাপদে সংরক্ষিত বাজার হাতে পেয়ে গেছে, সেখানে সে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত করতে পারবে, শ্রমিকদের খুব কম মাইনেয় খাটিয়ে প্রচুর লাভ করে নিতে পারবে। আরও একটা দিক থেকে এতে তাদের সুবিধা হয়ে গেল। ভারতবর্ষ চীন মিশর প্রভৃতি দেশে মজুরির হার শস্তা। এই-সব দেশে এসে তারা তাদের মূলধন খাটাতে লাগল; তার পর ইংলণ্ডে গিয়েও ইংরেজ শ্রমিকদের উপর হুমকি দিল, তাদেরও মজুরি কমিয়ে দেওয়া হবে। তাদের বলল, ভারতবর্ষ চীন ইত্যাদি দেশে মজুরির হার এত কম; কাজেই সেখানে পণ্যের দরও অল্প; এখন ইংলণ্ডে মজুরি না কমাতে পারলে তো সে-সব দেশের পণ্যের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না। তার পরও যেখানে ইংরেজ শ্রমিক তার মাইনে কমানোতে আপত্তি প্রকাশ করল, ধনিক তাকে বলল, তাহলে আর কী করা যাবে, অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তেই তাকে তার ইংলণ্ডের কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে, দিয়ে মূলধনটা নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতে হবে!

ভারতবর্ষের শিল্প প্রভৃতিকে নিজের আয়ত্তে রাখবার আরও অনেক ব্যবস্থা ভারতের ব্রিটিশ সরকার করলেন। এটা অতি জটিল বিষয়, এর আলোচনাও আমি করতে চাই না। এর খুব বিশদ বিশ্লেষণ আমাদের দরকারও নেই। একটি জিনিসের কথাই এখানে আমি বলছি। আধুনিক শিল্পের জীবনে ব্যাঙ্কের প্রচণ্ড প্রভাব, কারণ বড়ো বড়ো ব্যবসা চালাতে গেলে প্রায়ই মূলধন ধার করবার দরকার হয়। এই ধার না পেলে অতি বড়ো ব্যবসায়ও হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে। এই ধার দেয় ব্যাঙ্ক; কাজেই বুঝতেই পার তাদের ক্ষমতা কতখানি। ব্যাবসায়ের জীবনমরণ তাদেরই হাতে। যুদ্ধ শেষ হবার অল্পদিন পরেই ব্রিটিশ সরকার দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং প্রথাটিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এলেন। এই ভাবে, এবং মুদ্রানীতির কারসাজিদ্বারা ভারত সরকার ভারতবর্ষের শিল্প এবং কারখানাগুলির উপরে অনেকখানি কর্তৃত্ব-ক্ষমতা নিজের হস্তগত করে নিয়েছেন। অধিকন্তু ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য আরও বেশি চালু করবার জন্য তাঁরা Imperial Preference বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যজাত দ্রব্যের উপর বাণিজ্য-শুল্কের ব্যাপারে অধিক সুবিধা দানের নীতি প্রবর্তন করেন। এর মানে হচ্ছে, রক্ষাশুল্ক হিসাবে যদি বিদেশী পণ্যের উপরে কর বসানো হয়, তবে সেখানে ব্রিটিশ পণ্যের উপরে কিছু কম হারে কর বসানো হবে বা মোটেই কর বসানো হবে না; যেন অন্য দেশগুলোর পণ্যের তুলনায় ব্রিটিশ পণ্য এখানে একটু বেশি সুবিধা পায়।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের ধনিক শ্রেণীর এবং উচ্চতর বুর্জোয়াদের শক্তি ক্রমে বেড়ে উঠছিল। সে শক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। যুদ্ধের প এবং প্রথমদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ঝিমিয়ে ছিল; তার সে তন্দ্রা ক্রমে কেটে গেল, স্বায়ত্ত-শাসন এবং অনুরূপ আরও নানা দাবি আবার ধ্বনিত হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল কারাবাস শেষ করে লোকমান্য তিলক বাইরে বেরিয়ে এলেন। তোমাকে বলেছি জাতীয় কংগ্রেস তখন ছিল নরমপন্থীদের হাতে; ছোটো একটি বস্তু, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ কিছুই নেই। জন-সাধারণের সঙ্গেও প্রায় কোনো যোগ নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী তাঁরা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন হোম-রুল লীগ। এই রকমের দুটি লীগ প্রতিষ্ঠিত হল; একটি প্রতিষ্ঠা করলেন লোকমান্য তিলক, অন্যটি করলেন মিসেস্ অ্যানি বেসাণ্ট। কয়েক বছর ধরেই মিসেস বেসাণ্ট ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে ছিলেন; তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা এবং অতিতীক্ষ্ম যুক্তিতর্ক এদেশের মানুষের মনে আবার রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর বক্তৃতা প্রভৃতিকে সরকার এতই বিপজ্জনক মনে করতেন যে তাঁকে অন্তরীণ পর্যন্ত করে রাখা হল। তাঁর আরও দুজন সহকর্মীর সঙ্গে তিনি কয়েক মাস অন্তরীণ হয়ে ছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন, কংগ্রেসের তিনিই প্রথম নারী সভানেত্রী। এর কয়েক বছর পরে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভানেত্রী হন, কংগ্রেসের তিনি দ্বিতীয় নারী সভানেত্রী।

কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুটি দল, নরমপন্থী আর চরমপন্থী। ১৯১৬ সনে এ'দের মধ্যে একটা আপোষ হল; ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হল, সেখানে দুই দলই উপস্থিত হলেন। সে আপোষ কিন্তু বেশিদিন টিকল না। দু' বছরের মধ্যেই আবার এ'দের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল। নরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, সেই থেকে তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই রয়েছেন। এখন এ'রা নাম নিয়েছেন উদারপন্থী।

১৯১৬ সনের লক্ষ্মৌ অধিবেশন থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের পুনর্জীবন শুরু হয়েছে। সেই দিন থেকেই সে ক্রমশ অধিকতর শক্তি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করে চলল; জীবনে সেই প্রথম সে সত্য ক'রে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল। জনসাধারণ বলতে যা বুঝি তার সঙ্গে অবশ্য তার বিশেষ সংস্রব ছিল না; তারাও একে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না—সে সংস্রব স্থাপন করেছেন গান্ধীজি এসে। কাজেই তখন তথাকথিত নরমপন্থী এবং চরমপন্থী, দু'টি দলই অল্পবিস্তর একটিমাত্র শ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত ছিল, সে হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণী। অতি সামান্য ক'জন বিত্তশালী লোক, এবং যাঁরা সরকারি চাকুরেদের ঠিক গায়ে গায়ে রয়েছেন, এমন লোকদের সাক্ষাৎই নরমপন্থী দলের মধ্যে মিলত; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ এবং তাঁদের দলেরই বহু বেকার বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির সমর্থন ছিল চরমপন্থীদের দিকে। এই বুদ্ধিজীবীরা (কথাটা দিয়ে আমি শুধু বোঝাচ্ছি অল্পবিস্তর শিক্ষিত ব্যক্তিদের) নিজেদের সংকল্পে দৃঢ় হয়ে রইলেন; বিপ্লবীদের দলেও এ'দের মধ্য থেকেই বহু লোক গিয়ে যোগ দিল। নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের উদ্দেশ্য বা আদর্শের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। দুই দলই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের কথা বলতেন; দুই দলই তখনকার মতো সে স্বায়ত্তশাসনের খানিক অংশ পেয়ে খুশী থাকতেও রাজি ছিলেন। তবে নরমপন্থীদের তুলনায় চরমপন্থীরা একটু বেশী অধিকার চাইতেন, একটু বেশি গরম ভাষায় কথা বলতেন। বিপ্লবীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তাঁরা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই কামনা করতেন; কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের প্রায় আমলই দিতেন না। নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ ছিল এই : নরমপন্থীরা সঙ্গতিপন্ন দল, 'আছে'দের এবং যাঁরা 'আছে'-দের কাছে কাছে ঘোরাফেরা করেন তাঁদের দল; আর চরমপন্থীদের দলে 'নেই'-শ্রেণীর লোকও কিছু কিছু ছিল; তাছাড়া অধিকতর চরমপন্থী দল বলেই স্বভাবত এ'দের দলে দেশের যুবকরাও এসে জুটেছিল, তাদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল হাতে কলমে কাজ করার বদলে বেশ গরম গরম কথা কিছু বলতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। অবশ্য এই সাধারণ মন্তব্যটা কোনো পক্ষেরই প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নয়। তার প্রমাণ স্বয়ং গোপালকৃষ্ণ গোখলে, নরমপন্থী দলের একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং আত্মত্যাগী নেতা ছিলেন তিনি, কিন্তু বিত্তশালী তিনি মোটেই ছিলেন না। তিনিই ভারত-ভৃত্য সমিতির (Servants of India Society) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সত্যকার 'নেই'-শ্রেণী যারা, সেই শ্রমিক আর কৃষকদের সঙ্গে নরমপন্থী বা চরমপন্থী কোনো দলেরই কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিলক নিজে অবশ্য জনসাধারণের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন।

১৯১৬ সনের লক্ষ্মৌ কংগ্রেস আরও একটি পুনর্মিলনের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, সে হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। কংগ্রেস চিরদিনই সমগ্র জাতির ভিত্তি অবলম্বন করে চলেছে, কিন্তু কার্যত এটা ছিল হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান, কারণ এর প্রায় সব সভাই ছিলেন হিন্দু। যুদ্ধের কয়েক বছর আগে, খানিকটা সরকারের কাছে প্রেরণা পেয়েই, মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান খাড়া ক'রেছিলেন, এর নাম অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ্। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কংগ্রেসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু মুসলিম লীগ্ কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হল; ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা কী হবে সে বিষয়ে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। এই চুক্তিটির নাম ছিল কংগ্রেস-লীগ্ পরিকল্পনা; এতে আরও অনেক কথার মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য কী অনুপাতে আসন সংরক্ষিত রাখা হবে তারও অঙ্ক স্থির করে দেওয়া

হয়েছিল। এই কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা তখন দুটি প্রতিষ্ঠানেরই কর্মসূচীতে পরিণত হল; সমগ্র দেশের দাবি এরই মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে বলে সকলেই স্বীকার করে নিলেন। এই পরিকল্পনাতে বুর্জোয়াদের অভিমতই ব্যক্ত হয়েছিল, কারণ সে সময়ে দেশে একমাত্র তাঁরাই রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন। এই পরিকল্পনাকে আশ্রয় করে দেশে আন্দোলন বেড়ে উঠল।

মুসলমানরা রাজনীতির ব্যাপারে বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন, তার বড়ো কারণ ছিল ক্রোধ—তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেন যুদ্ধ করছে দেখে তাঁরা চটে গিয়েছিলেন। তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা এবং সেকথা অতিশয় উচ্চরবে প্রকাশ করবার অপরাধে যুদ্ধের প্রথম দিকেই দুজন মুসলমান নেতাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল, এ'রা হচ্ছেন মৌলানা মহম্মদ আলি এবং মৌলানা শৌকত আলি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও অন্তরীণ করা হয়েছিল, আরব দেশগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে; তাঁর রচনাবলীর জন্য সেদেশে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এই-সব ব্যাপারে মুসলমানরা খুবই ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হলেন, ক্রমেই বেশি করে সরকারের বিরোধী হয়ে উঠলেন।

ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের দাবি বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারও নানাবিধ ভরসা আর প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলেন, এদেশে নানাবিধ তত্ত্বসন্ধান করতে লাগলেন, তাই দিয়ে লোকের মনোযোগ আটকে রাখলেন। ১৯১৮ সনের গ্রীষ্মকালে তখনকার ভারতসচিব এবং বড়োলাট দুজনে মিলে একটি যুক্ত-রিপোর্ট দাখিল করলেন, এ'দের দুজনের নাম অনুসারে তার নাম হল মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট। এই রিপোর্টে ভারতের শাসনব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন এবং সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলো প্রস্তাব এ'রা করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষা-মূলক প্রস্তাবগুলো নিয়ে দেশের মধ্যে প্রচণ্ড একটা তর্কবিতর্ক শুরু হল। কংগ্রেস এগুলোর সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তি প্রকাশ করলেন, বললেন এতে কিছুই দেওয়া হল না। উদারপন্থীরা এগুলোকে সাগ্রহে স্বীকার করে নিলেন, এবং এদের উপলক্ষ্য করেই তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

এই যখন ভারতের অবস্থা, এমন সময়ে যুদ্ধ শেষ হল। সর্বত্রই লোকের মনে একটা বিরাট আশা জাগল, এবার না-জানি কী পরিবর্তনই আসে। দেশের রাজনৈতিক হাওয়া গরম হয়ে উঠল; নরমপন্থীরা যে শান্ত কোমল মৃদুস্বরে কথা বলতেন, তাতে প্রচুর বিনয় থাকত এবং ফল কিছুই হত না; সে ভাষা অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে তার জায়গাতে ধ্বনিত হতে লাগল চরমপন্থীদের ভীষণ চীৎকার, ঋজু সংগ্রামাত্মক এবং আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর তাদের ভাষা। নরমপন্থী আর চরমপন্থী দুই দলই রাষ্ট্রনীতির পুঁথির ভাষায় চিন্তা করতে লাগলেন, কথা বলতে লাগলেন, শাসনব্যবস্থার বাইরের রূপ কী হবে তার বিশ্লেষণে মগ্ন রইলেন; আর পিছনে বসে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন নিঃশব্দে এদেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপরে তার মুষ্টির বাঁধনকে আরও দৃঢ়তর করে তুলতে লাগল।

১৫৫

ইউরোপের নূতন মানচিত্র

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৩

যুদ্ধের গতি সংক্ষেপে আলোচনা করবার পর আমরা রাশিয়ার বিপ্লবের কথা দেখেছি, তার পর আবার দেখেছি যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের অবস্থা কী ছিল। এবার আবার ফিরে যেতে হবে যুদ্ধবিরতিতে; দেখতে হবে যুদ্ধ শেষ হবার পরে বিজেতা পক্ষ কি প্রকার আচরণ করলেন। জর্মনির অবস্থা তখন শোচনীয়। কাইজার পালিয়ে গেছেন, দেশে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। তবুও জর্মন সেনার যাতে আর কিছুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট না থাকে সেজন্য যুদ্ধবিরতির
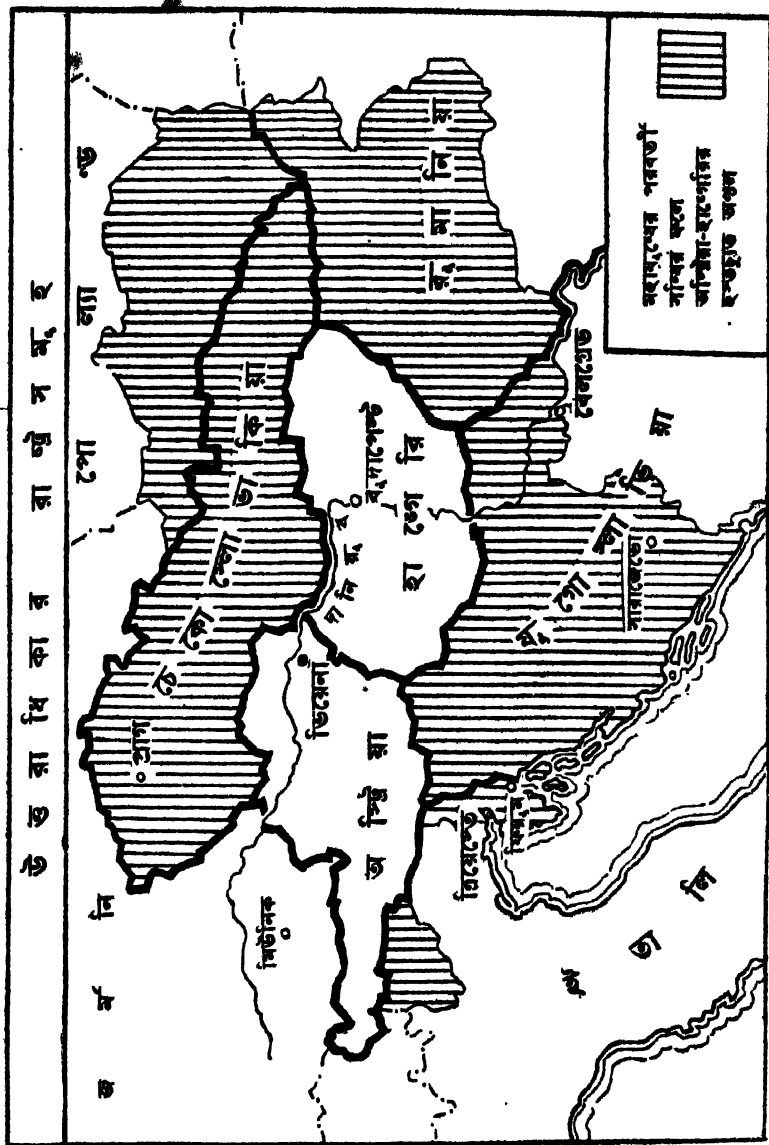
সন্ধিপত্রে অনেকগুলো অত্যন্ত কঠিন শর্ত দিয়ে দেওয়া হল। বলা হল, জর্মন সেনা এগিয়ে এসে যত জায়গা দখল করেছিল শুধু সেগুলো নয়, আলসেস্-লোরেন এবং রাইন নদী পর্যন্ত জর্মনির অন্তর্গত এলাকা তাদের ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে হবে। রাইনল্যান্ড্ মানে কলোনের আশেপাশের অঞ্চলটি মিত্রপক্ষের দখলে থাকবে। এছাড়া জর্মনির যুদ্ধজাহাজ, সমস্ত ইউ বোট্—(জর্মন সাবমেরিনদের এই নামে অভিহিত করা হত), এবং হাজার হাজার ভারী কামান এরোপ্লেন রেলওয়ে-ইঞ্জিন মোটরলরী এবং আরও বহু জিনিসপত্র মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

ফ্রান্সের উত্তর-অঞ্চলে কোঁপিয়েঁ (Compiègne) -এর অরণ্যে যে স্থানটিতে বসে যুদ্ধবিরতি পত্র স্বাক্ষর করা হয়েছিল, সেখানে এখন একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তার উপরে এই কথাটি লেখা :

"এইখানে, ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর তারিখে জর্মন সাম্রাজ্যের অন্যায় অহংকার ধূলিসাৎ হয়েছিল; যাদের সে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল সেই স্বাধীন জাতিগুলোর হাতেই তার পরাজয় ঘটেছে।"

জর্মন সাম্রাজ্য অবশ্য আর নেই, অন্তত বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়। প্রাশিয়ার সামরিক ঔদ্ধত্যও খর্ব হয়েছে। এরও আগে রুশ সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছিল, রোমানফ রাজবংশ রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—সে রঙ্গমঞ্চে তাঁরা অতি দীর্ঘকাল নানা অসৎ লীলা দেখিয়েছেন। যুদ্ধের ফলে আরও একটি সাম্রাজ্য, আরও একটি প্রাচীন রাজবংশের পতন ঘটল, সে হচ্ছে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে হাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের সাম্রাজ্য। কিন্তু তখনও বহু সাম্রাজ্য টিকে রইল—সেগুলি হচ্ছে বিজেতাদের সাম্রাজ্য। যুদ্ধে জিতেছেন বলে তাদের অহংকার কিছুমাত্র কমল না। অন্যান্য যে-সব জাতিকে তারা দাসে পরিণত করে রেখেছে, তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তারা একটুও বেশি সচেতন হয়ে উঠল না।

১৯১৯ সনে প্যারিস শহরে বিজয়ী মিত্রপক্ষ তাদের শান্তি-সম্মেলন বসালেন। প্যারিসে বসেই তাঁরা সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ রূপ রচনা করবেন; অনেক মাস ধরে এই প্রসিদ্ধ নগরীটির দিকে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল। পৃথিবীর সর্বত্র সকল দেশ থেকে নানা-বিধ লোক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। রাষ্ট্রনীতিবিদ আর রাজনৈতিক পান্ডারা তো থাকবেনই, তাঁরা তখন নিজেদের এক-একটা কেষ্টবিষ্টু মনে করছেন। আরও গেল যত কূটনীতি-বিশারদ, বিশেষজ্ঞ সমর-বিশারদ, মহাজন, এবং লাভান্বেষীর দল; এদের সকলেরই সঙ্গে অসংখ্য সহকারী, টাইপিস্ট এবং কেরাণী। তারপর, সংবাদপত্রসেবীদের একটা বিরাট দল থাকবে সেখানে, সে তো জানা কথাই। এল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে যে-সব জাতি, তাদের প্রতিনিধিরা—আইরিশ, মিশরীয়, আরব এবং আরও কত দেশ তাদের সকলের নামও এর আগে কেউ কোনোদিন শোনে নি; এল পূর্ব-ইউরোপের লোকেরা, অস্ট্রিয়া এবং তুরস্কের বিধ্বস্ত সাম্রাজ্য থেকে এরা নিজেদের কতকগুলো পৃথক রাষ্ট্র কেটে বার করে নিতে চায়। এ ছাড়া দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীও গেল কম নয়। গোটা পৃথিবীটাকেই কেটেকুটে নূতন করে ভাগ করা হচ্ছে এখানে; সে ভোজের সুযোগ ছেড়ে শকুনরা দূরে বসে থাকবে কেন!

শান্তি সম্মেলনে কী হবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরকম আশা জাগল। লোকে ভাবল, যুদ্ধের এত বড়ো একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে এবার নিশ্চয়ই একটা ন্যায়সঙ্গত এবং দীর্ঘস্থায়ী সন্ধির ব্যবস্থা করা হবে। নিদারুণ কষ্টের বোঝা তখনও জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে রয়েছে; শ্রমিকদের মনে বিরাট অসন্তোষ জমে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে, তার ফলে লোকের কষ্ট আরও বেড়েছে। সমাজ-বিপ্লব ঘটতে আর দেরি নেই, ১৯১৯ সনে ইউরোপে এমন বহু আভাসই পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনেকের মনকেই বিচলিত করে তুলছে।

এমনিতর পশ্চাৎপটের মধ্যে শান্তি-সম্মেলনের বৈঠক বসল, ভার্সাই শহরের ঠিক সেই ঘরটিতে, যেখানে আটচল্লিশ বছর আগে জর্মন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়েছিল। সে বিরাট জনসংঘের পক্ষে দিনের পর দিন অধিবেশন করা সহজ নয়; অতএব তাকে ভেঙে অনেক-

গুলো কমিটি তৈরি করা হল; এই কমিটিগুলো গোপনে বৈঠক বসাতে লাগলেন, এ'দের মধ্যেকার সমস্ত কূটকচাল আর কলহ-বিবাদকে বুদ্ধিমানের মতো অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখলেন। সমস্ত সম্মেলনটিকে নিয়ন্ত্রিত করছিল একটি 'দশজনের সভা'—মিত্রপক্ষের দেশগুলো নিয়ে গড়া। পরে এর সভ্যসংখ্যা কমে গিয়ে হল পাঁচ; এদের নাম হল 'পঞ্চ মহারথী'—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি আর জাপান। তারপর জাপানও এর মধ্য থেকে খসে পড়ল; বাকি রইল একটা 'চার-জনের সভা'। শেষপর্যন্ত 'ত্রিমূর্তি'—আমেরিকা, ব্রিটেন আর ফ্রান্স। এই তিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন প্রেসিডেণ্ট উইলসন, লয়েড্ জর্জ এবং ক্লেমেঁশো; সমস্ত পৃথিবীকে নূতন করে ঢেলে সাজবার, তার দেহের ভয়ংকর ক্ষতগুলোকে নিরাময় করবার, গুরুদায়িত্ব পড়ল এই তিনজনেরই উপরে। এ দায়িত্ব বইবার যোগ্যতা আছে অতিমানব বা অর্ধ-দেবতার, এ'রা কেউই তার ধারেকাছের জীবও নন। রাজা রাষ্ট্রনীতিবিদ সেনাপতি ইত্যাদি যে-সব ব্যক্তিরা কর্তার আসনে বসে থাকেন, সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁদের নাম এতই বিজ্ঞাপিত করা হয় এবং এমনই আড়ম্বরে ঘোষণা করা হয় যে, দেখেশুনে সাধারণ লোকের অনেক সময়েই ধারণা হয় এ'রা চিন্তা এবং কার্যের রাজ্যে এক-একটা মহামানব বিশেষ। একটা স্বর্গীয় দ্যুতি যেন এ'দের ঘিরে প্রকাশ পেতে থাকে; অজ্ঞ আমরা, মনে মনে এমন সব গুণই এ'দের মধ্যে কল্পনা করে নিই যা বস্তুত এ'দের মোটেই নেই। কিন্তু একটু কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখ, দেখা যাবে এ'রা অতি সাধারণ মানুষের বেশি কিছুই নন। অস্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ একবার বলেছিলেন, পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেত, যদি তারা জান্‌ত কতখানি কম-বুদ্ধির দ্বারা তাদের শাসন করা হয়। এই তিনজন, এই 'বড়ো তিন জন'—এ'দের খুব বড়ো বড়ো ব্যক্তি বলেই মনে হত,—এ'দেরও দৃষ্টি ছিল অদ্ভুত রকম সংকীর্ণ, আন্তর্জাতিক কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধেও এ'রা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পৃথিবীর ভূগোলটা পর্যন্ত এ'রা ভালো করে জানতেন না।

প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন এলেন, তাঁর বিরাট খ্যাতি, জনসাধারণ তাঁর নামে মুগ্ধ। বক্তৃতায় এবং চিঠিপত্রে তিনি এতসব সুন্দর এবং আদর্শমূলক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন যে লোকের বিশ্বাস হয়েছিল তিনি একটা পয়গম্বর-বিশেষ, পৃথিবীতে যে নূতন স্বাধীনতার আবির্ভাব হবে তিনি তারই বার্তা বহন করে এনেছেন। লয়েড জর্জ গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী; ভালো ভালো বুলি কপচাতে ইনিও ওস্তাদ; তবে এ'র আবার সুবিধাবাদী বলেও একটু খ্যাতি ছিল। ক্লেমেঁশোর নামই ছিল 'বাঘ', আদর্শ বা আধ্যাত্মিক বচনের তিনি ধার ধারতেন না। তাঁর কথা ছিল ফ্রান্সের পুরোনো শত্রু জর্মনিকে তিনি বিচূর্ণ করবেন; সকল দিক থেকেই তাকে এমনভাবে বিধ্বস্ত, ধূলিসাৎ করে দেবেন যেন আর কোনোদিন সে মাথা খাড়া করতে না পারে।

অতএব এই তিনজনে মিলে পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন, যে যার নিজের কোলে ঝোল টেনে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, প্রত্যেকেই আবার সম্মেলনের ভিতরে এবং বাইরে অন্য বহু লোকের হাতে টান এবং ধাক্কা খেতে লাগলেন। আর এদের সকলেরই পিছনে বিভীষিকা বিস্তার করে রইল সোভিয়েট রাশিয়ার করাল ছায়া। সম্মেলনে রাশিয়াকে ডাকা হয় নি, জর্মনিকেও না। কিন্তু প্যারিসের সম্মেলনে যে ধনিকতন্ত্রী জাতিগুলো এসে একত্র হয়েছিল, রাশিয়ার অস্তিত্বটাই যেন সারাক্ষণ তাদের জীবন বিপন্ন করে রাখছিল।

শেষপর্যন্ত ক্লেমেঁশোই জয়লাভ করলেন, লয়েড জর্জের সাহায্যে। উইলসন একটি জিনিস নিয়ে খুব লড়াই করেছিলেন, একটা জাতিসংঘ। সেটা তিনি পেয়ে গেলেন। এবং তাঁর এই প্রস্তাবটি অন্যেরা মেনে নেবার ফলে অন্য প্রায় কোনো বিষয় নিয়েই তিনি বিশেষ জেদ দেখালেন না, এ'দের মতেই মত দিলেন। মাসের পর মাস ধরে তর্কবিতর্ক আর আলোচনা চালিয়ে অবশেষে শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত মিত্রপক্ষ একটা সন্ধিপত্রের খসড়া খাড়া করলেন; এবং নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে নিয়ে তারপর তাঁরা জর্মনির প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন, তাঁদের আদেশগুলি শুনে যেতে। ৪৪০টি ধারা-সমন্বিত সেই বিরাট সন্ধিপত্রটি এই জর্মনদের

ইউরোপের নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহ
নরওয়ে
ফিনল্যান্ড
এস্তোনিয়া
ল্যাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
ডেনমার্ক
ডানজিগ
জর্মানি
পোল্যান্ড
চেকোস্লোভাকিয়া
রুমানিয়া
মস্কো
সোভিয়েত রাশিয়া
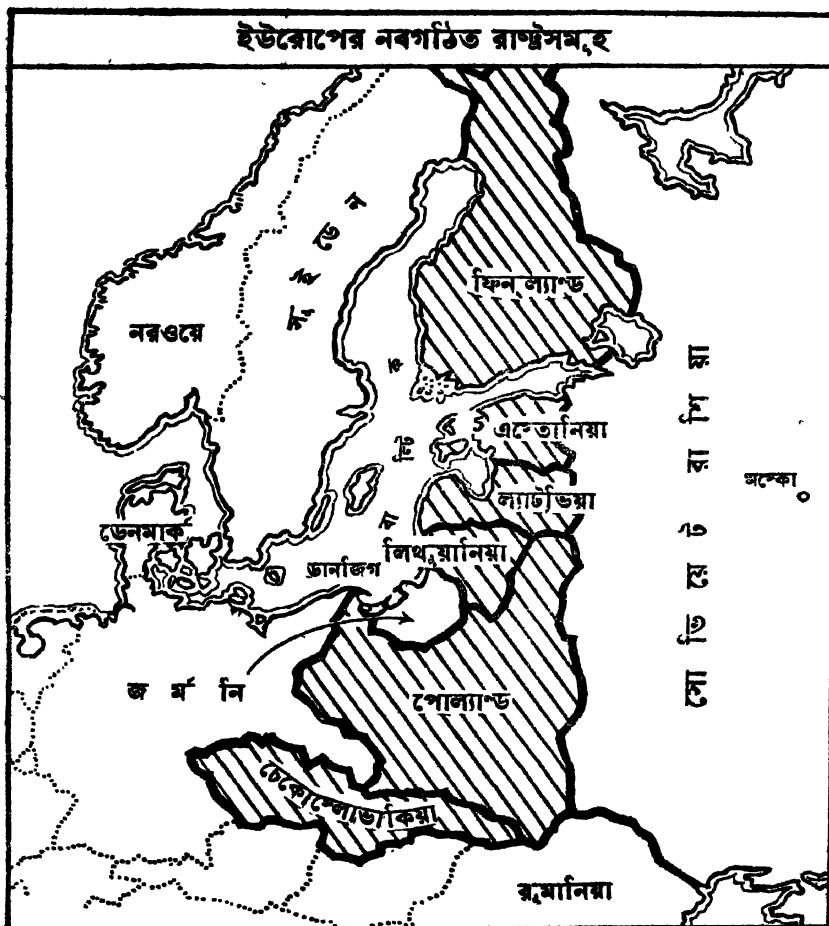
সামনে ফেলে দিয়ে এ'রা হুকুম করলেন, সই কর। আর কোনো আলোচনাই তাঁদের সঙ্গে হল না, নূতন কোনো প্রস্তাব বা পরিবর্তনের কথা মুখে আনবার অবসর পর্যন্ত তাঁরা পেলেন না। এ সন্ধি মানে হল এ'দের হুকুম-মাফিক সন্ধি; জর্মনিকে হয় এটি যেমন আছে তেমনই-ভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, অথবা অস্বীকার করবার ফল ভোগ করতে হবে। জর্মনির নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা এতে আপত্তি করলেন; অবশেষে মনস্থির করবার জন্যে তাঁদের যে সময়টা দেওয়া হয়েছিল তার একেবারে শেষ দিনটিতে তাঁরা এই ভার্সাই-সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি বুলগেরিয়া এবং তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষ আলাদা আলাদা সন্ধিপত্র রচনা এবং স্বাক্ষর করলেন। তুরস্কের সঙ্গে যে সন্ধি করা হল তুরস্কের সুলতান সেটা মেনে নিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু কামাল পাশা আর তাঁর বীর সঙ্গীদের প্রচণ্ড বাধা দেবার ফলে সে সন্ধি হতে পারল না। সে গল্প আমি তোমাকে আলাদা করে বলব।

এই-সব সন্ধির ফলে কী কী পরিবর্তন হল? ভূমি-বিভাগের পরিবর্তন যা হল, তার বেশির ভাগই হল পূর্ব-ইউরোপ, পশ্চিম-এশিয়া আর আফ্রিকায়। আফ্রিকাতে জর্মনদের যে-সব উপনিবেশ ছিল, মিত্রপক্ষ সেগুলোকে যুদ্ধের লুঠের মাল বলে হস্তগত করে নিলেন; সবচেয়ে ভাল জায়গাগুলো ফেলা হল ইংলণ্ডের ভাগে, টাঙ্গানাইকা এবং পূর্ব-আফ্রিকার আরও কতকগুলো অঞ্চল হস্তগত হবার ফলে ইংলণ্ডের দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন সফল হল, উত্তরে মিশর থেকে শুরু করে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত আফ্রিকার একেবারে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত বিস্তৃত একটানা একটি সাম্রাজ্য সে প্রতিষ্ঠা করল।

ইউরোপে পরিবর্তন হল অনেক; ইউরোপের মানচিত্রে একসঙ্গে বহুসংখ্যক নূতন রাজ্যের আবির্ভাব হল। ইউরোপের একটা পুরোনো আর একটা নূতন মানচিত্র পাশাপাশি মিলিয়ে দেখ; কতখানি পরিবর্তন তার হয়েছে সেটা একনজরেই বুঝতে পারবে। এর কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল রুশ-বিপ্লবের ফলে; রাশিয়ার ঠিক সীমান্তদেশে অনেকগুলো জাতির বাস ছিল যারা নিজেরা রাশিয়ান নয়, তাঁরা সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। সোভিয়েট সরকারও এদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিল, এদের উপরে হস্তক্ষেপ করল না। ইউরোপের নূতন মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে দেখো। একটা বড়ো রাজ্য ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি; সেটা একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে, তার জায়গাতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাজ্য, এদের অনেক সময় বলা হয় অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী রাজ্য-সমূহ। এই রাজ্যগুলোর পরিচয় : অস্ট্রিয়া, আগে সে মস্ত বড়ো রাজ্য ছিল এখন তারই একটি ক্ষুদ্র টুক্‌রোতে পরিণত হয়েছে, পৃথিবীর অন্যতম অতি বৃহৎ শহর ভিয়েনা তার রাজধানী; হাঙ্গেরি, এরও আকার অনেক ছোটো হয়ে গেছে; চেকোস্লোভাকিয়া, আগের দিনের বোহেমিয়া রাজ্য এখন এর অন্তর্গত হয়েছে; আমাদের পূর্ব-পরিচিত কুখ্যাত রাজ্য, যুগো-স্লাভিয়ার খানিক অংশ, সার্বিয়া, কিন্তু তার চেহারা এত স্ফীত হয়েছে যে দেখে চেনাই যায় না; এবং বাকি খানিক অংশ গিয়ে যুক্ত হয়েছে রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড আর ইতালির সঙ্গে। অতি সম্পূর্ণ একটা শব-ব্যবচ্ছেদ!

এর অনেকখানি উত্তরে আরেকটা নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, বা বলা যায় একটা পুরোনো রাজ্যের পুনরাবির্ভাব হয়েছে—পোল্যাণ্ড। এটাকে তৈরি করা হল প্রাশিয়া, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়ার খানিক করে অংশ ছে'টে নিয়ে। পোল্যাণ্ডকে সমুদ্রে পে'ছবার একটা পথ করে দেবার জন্য একটা অদ্ভুত কাণ্ড করা হল; জর্মনি বা প্রাশিয়াকে কেটে দুই টুক্‌রো করে, তাদের মাঝখানে বারান্দার মতো সরু লম্বা এক ফালি জমি পোল্যাণ্ডকে দিয়ে দেওয়া হল, সেই পথে সে সমুদ্রে পে'ছতে পারবে। অতএব এখন পশ্চিম-প্রাশিয়া থেকে পূর্ব-প্রাশিয়াতে কেউ যেতে চাইলে তাকে পোল্যাণ্ডের অধীন এই সংকীর্ণ স্থানটি পার হয়ে যেতে হয়। এই স্থানটির উত্তর পাশেই বিখ্যাত ডানজিগ্ শহর অবস্থিত। এটিকে একটি স্বাধীন নগরীতে পরিণত করা হয়েছে;

মানে এটা এখন জার্মানিরও অন্তর্গত নয়, পোল-রাজ্যেরও সম্পত্তি নয়; এ নিজেই এখন একটা রাজ্যবিশেষ, সোজাসুজিই জাতি-সঙ্ঘের অধীনে।

পোল্যাণ্ডের উত্তরে আছে বল্‌টিক অঞ্চলের রাজ্যগুলি, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড; এরা সকলেই জারের প্রাচীন সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ নিয়ে তৈরি। ছোটো ছোটো রাজ্য, কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব পৃথক ভাষা আছে। একটা জানবার মতো খবর তোমাকে দিতে পারি, লিথুয়ানিয়ানরা জাতে আর্য (ইউরোপের আরও অনেক জাতির মতো); এদের ভাষারও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে খুব নিকট-সম্পর্ক।· ব্যাপারটা লক্ষ্য করবার মতো, যদিও খুব সম্ভব ভারতের অনেক লোকই এর সন্ধান রাখে না। বহু দূরবর্তী জাতিগুলোর মধ্যেও যে একটা সম্পর্কের যোগসূত্র থাকতে পারে, এর থেকে তার কিছুটা আভাস আমরা পাই।

ইউরোপের ভূভাগে আর একটিমাত্র বড়ো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; সে হচ্ছে আলসেস এবং লোরেন প্রদেশ দু'টিকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া। এ ছাড়া আরও কয়েকটা পরিবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু তার বিবরণ দিয়ে তোমাকে আর বিব্রত করব না। এটা দেখলে, এই সব পরিবর্তনের ফলে অনেকগুলো নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোই অত্যন্ত ছোটো ছোটো রাজ্য। পূর্ব-ইউরোপের চেহারা এখন প্রায় বল্‌কান-অঞ্চলের মতোই হয়ে গেছে; অনেক সময়ে তাই বলা হয়, সন্ধিপত্রগুলো ইউরোপ মহাদেশটাকে বল্‌কান বানিয়ে দিয়েছে। আবার তুলনায় এখন দেশে দেশে সীমান্তরেখার পরিমাণ অনেক বেশি. এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর মধ্যে খিটিমিটির ঠোকাঠুকিও লেগেই রয়েছে। পরস্পরের প্রতি এদের যা তীব্র বিদ্বেষ বিশেষ করে দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। এর অপরাধ অনেকখানিই হচ্ছে মিত্রপক্ষের; ইউরোপকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কতকগুলো খণ্ডে তাঁরা বিভক্ত করেছেন, এবং তাই করে অসংখ্য নূতনতর সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। ছোটো ছোটো অনেকগুলো জাতিগত সম্প্রদায়কে বিদেশী শাসনের অধীন করে দেওয়া হয়েছে, তারা এদের উপর অত্যাচার করছে। পোল্যাণ্ডকে একটা মস্ত বড়ো অঞ্চল দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আসলে ইউক্রেনের অংশ; সেখানকার নিরীহ ইউক্রেনিয়ানদের জোর করে পোল বানিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাদের উপরে নানা রকমের উৎপীড়ন করা হচ্ছে। যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, ইতালি, প্রত্যেকেই এই ভাবে কিছু কিছু সংখ্যালঘু বিদেশী সম্প্রদায়কে হাতে পেয়েছে, তাদের উপরে এদের দুর্ব্যবহারের অন্ত নেই। ওদিকে আবার অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির গায়ের একেবারে সবখানি মাংস চেঁছে নিয়ে হাড়টুকু মাত্র বাকি রাখা হয়েছে; তাদের নিজের লোকদের অধিকাংশকেই তাদের হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিদেশী শাসনের অধীনস্থ এই সমস্ত স্থানে স্বভাবতই জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তার ফলে চলে সারাক্ষণ মারামারি-হানাহানি।

মানচিত্রটার দিকে আবার তাকাও। দেখবে পশ্চিম-ইউরোপ থেকে রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এদের মাঝখানে রয়েছে পর পর এক সার রাজ্য,—ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া। তোমাকে বলেছি, এই রাজ্যগুলোর অধিকাংশই জন্মলাভ করেছিল, ভার্সাই সন্ধি থেকে নয়—সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে। কিন্তু তাহলেও এদের উদ্‌ভব দেখে মিত্রপক্ষ খুবই খুশী হল; কারণ এরা রাশিয়া আর অ-বলশেভিক ইউরোপের মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা যেন একটা 'স্বাস্থ্য রক্ষার সীমারেখা' (যা দিয়ে সংক্রামক রোগাক্রান্ত স্থানকে অন্য স্থান থেকে আলাদা করে রাখা হয়); বলশেভিক-সংক্রমণকে এরা ইউরোপ থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবে! বল্‌টিক-অঞ্চলের এই রাজ্যগুলি সকলেই অ-বলশেভিক তা নইলে এরা অবশ্যই গিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দিত।

পশ্চিম-এশিয়াতে যে প্রাচীন তুর্কি সাম্রাজ্য ছিল, তার কোনো কোনো অংশের উপর পাশ্চাত্য জাতিগুলোর লোভ পড়ল। যুদ্ধের সময় ব্রিটেন আরবদের উৎসাহ দিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়েছিল; তাদের ভরসা দিয়েছিল, আরবদেশ প্যালেস্টাইন আর সিরিয়া ব্যাপী একটা সংযুক্ত আরব-রাজ্য তারা গড়ে দেবে। অথচ আরবদের যখন তারা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল,

ঠিক সেই সময়েই আবার ফ্রান্সের সঙ্গেও ব্রিটেন একটা গোপন সন্ধি সম্পন্ন করছিল, তাতেও ঠিক এই জায়গাগুলোই ফ্রান্সের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবার ব্যবস্থা করে। খুব ভদ্রোচিত কাজ এটা নয়; ব্রিটেনের একজন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড একে অভিহিত করেছিলেন একটা 'অভদ্র দুমুখো-পনার' কাহিনী বলে। কিন্তু সে দশ বছর আগের কথা। তখন তিনি মন্ত্রী হন নি, কাজেই এক আধ সময়ে সত্যি কথা বললেও বলতে পারতেন।

কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়াল, যখন ব্রিটিশ সরকারের মাথায় খেলল, কেবল আরবদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেইটাই ভাঙা নয়, ফ্রান্সের সঙ্গে যে গোপন সন্ধিটা হল সেটাকেও ভাঙতে হবে। তাঁদের সামনে তখন বিরাট একটা স্বপ্ন জেগে উঠেছে : মধ্য-প্রাচ্যে একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, ভারতবর্ষ থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তার সীমানা, ভারতীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে আফ্রিকাতে তাদের অধীনে যে বিপুল ভূভাগ রয়েছে তাকে একত্র জুড়ে নিয়ে সে এক বিপুল ব্যাপার। প্রকাণ্ড স্বপ্ন এ, এর লোভ সংবরণ করা সহজ নয়। অথচ তখন একে বাস্তবে পরিণত করাও খুব কঠিন মনে হচ্ছিল না। সে সময়ে, ১৯১৯ সনে, এই বিশাল ভূখণ্ডের সর্বত্রই ব্রিটিশ সেনা জুড়ে বসে রয়েছে—পারশ্য, ইরাক, প্যালেস্টাইন, আরবের কতক অংশ, মিশর, সবই তাদের দখলে। সিরিয়া থেকে ফরাসিদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখতেও তারা চেষ্টা করছিল। খোদ কনস্টান্টিনোপল্ শহরটা পর্যন্ত তখন ব্রিটিশদের দখলে। কিন্তু ১৯২০, ১৯২১, ১৯২২ সনে অনেক অপূর্ব ঘটনার আবির্ভাব হল; ব্রিটেনের সে স্বপ্নও হাওয়ায় মিশে গেল। পিছনে সোভিয়েট আর সামনে কামাল পাশা, দু'য়ের চাপে পড়ে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের এত সাধের কল্পনা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল।

কিন্তু তখনও ব্রিটেন পশ্চিম-এশিয়ার অনেকখানি জায়গা—ইরাক এবং প্যালেস্টাইন জুড়ে বসে রয়েছে। আরবেও তারা ঘুষ দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে ঘটনাচক্রকে তাদের ইচ্ছামতো চালাবার চেষ্টা করছে। সিরিয়া পড়ল ফরাসিদের ভাগে। আরব দেশগুলিতে যে নবীন জাতীয়তার উদ্ভব হচ্ছিল তার কথা এবং স্বাধীনতার জন্য এদের সংগ্রামের কাহিনী আমি তোমাকে অন্য এক সময়ে বলব।

এখন আমাদের আবার ভার্সাই সন্ধির কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই সন্ধিপত্রে বলা হল, জর্মনিই অপরাধী, সেই যুদ্ধ বাধিয়েছে। অতএব জর্মনদের জোর করে সেই সন্ধিপত্রে সই করিয়ে তাদের নিজেদের সে যুদ্ধ-বাধাবার অপরাধ স্বীকার করানো হল। এরকমের জবরদস্তি স্বীকারোক্তির মূল্য কিছুই নেই, এতে শুধু মনোমালিন্যই বাড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

জর্মনির উপরে আরও একটি হুকুম জারি হল; তাকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে। ছোটো একটি সেনাদল মাত্র সে রাখতে পারবে, মোটামুটি দেশের মধ্যের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য। তার সমস্ত নৌবহরটিকেও মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণের জন্য যখন জর্মনির নৌবহরকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময়ে তার কর্মচারী এবং নাবিকরা স্থির করলেন, ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে বরং সে বহরকে তাঁরা নিজেরাই সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন, এর দরুন যা কিছু দায়িত্ব সেও তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করে নিচ্ছেন। অতএব ১৯১৯ সনের জুন মাসে স্কাপা ফ্লো নামক স্থানে সমগ্র জর্মন নৌবহরটিকে তার নিজের নাবিকরাই তলা ফুটো করে ডুবিয়ে দিলেন—ব্রিটিশ সেনার একেবারে চোখের সামনে, তারা তখন সে বহরের হিসাব বুঝে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে!

তার পর আবার, যুদ্ধের দরুন জর্মনিকে একটা জরিমানা দিতে হবে; যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে-সব ক্ষতি এবং লোকসান সইতে হয়েছে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এর নাম দেওয়া হল 'ক্ষতিপূরণ' বা Reparations। বহু বৎসর পর্যন্ত এই কথাটা ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হবে তার কোনও নির্দিষ্ট অংক সন্ধিপত্রে বলা হল না, তবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করবার ব্যবস্থা খাড়া করা হল। যুদ্ধের দরুণ মিত্র-পক্ষের যত ক্ষতি হয়েছে সমস্ত পূরণ করবার এই প্রতিশ্রুতি—এ একটা বিরাট বোঝা। জর্মনি পরাজিত, বিধ্বস্ত দেশ; তখন তার পক্ষে ঘর সামলাবার নানাবিধ সমস্যাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এর

উপরে আবার যদি মিত্রপক্ষের হুকুম বোঝাও তার ঘাড়ে এসে চাপে, তবে তার পক্ষে সামাল দেওয়াই অসম্ভব; সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু মিত্রপক্ষ তখন বিদ্বেষে আর প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে মাতাল হয়ে উঠেছে; তারা শুধু তাদের "একপাউণ্ড মাংস" কেটে নিয়েই ক্ষান্ত হবে না, জর্মনির ভূলুণ্ঠিত দেহটাকে নিংড়ে শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত আদায় করে তবে ছাড়বে। ইংলণ্ডে তখন লয়েড্ জর্জ একটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, শুধু 'কাইজারকে ফাঁসি দাও' এই ধ্বনির জোরে। ফ্রান্সে লোকের দ্বেষবুদ্ধি তখন এর চেয়েও প্রবল।

সন্ধিপত্রের এত সব শর্তের মোট উদ্দেশ্যটা ছিল, যতদিক দিয়ে সম্ভব জর্মনিকে নাগপাশে বেঁধে একেবারে পঙ্গু করে রাখা, যেন আর কোনোদিন সে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে। পুরুষানুক্রমে তারা শুধু মিত্রপক্ষের অর্থনৈতিক দাস হয়ে থাকবে, কর হিসাবে প্রচুর পরিমাণ টাকা বছর বছর তাদের গুণে দেবে। একটা বড়ো জাতিকে এরকম ভাবে দীর্ঘকাল হাত পা বেঁধে রাখা সম্ভব নয়, ইতিহাসে একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সে সোজা কথাটা এই অতিবিজ্ঞ মহা-রাষ্ট্রনীতিধুরন্ধরদের মগজে প্রবেশ করল না; ভার্সাইতে তাঁরা এই প্রতিহিংসা-ধর্মী সন্ধির ভিত্তি স্থাপন করলেন। আজ তাঁরা সেজন্য অনুতাপ করছেন।

সকলের শেষে তোমাকে আরেকটি বস্তুর কথা বলতে হবে : সে হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সৃষ্ট, লীগ্ অব নেশন্‌স্, ভার্সাই সন্ধির ফলেই জগতে তার আবির্ভাব হয়েছে। কথা ছিল, এটা হবে একটা স্বাধীন এবং স্ব-শাসিত রাষ্ট্রদের মিলনক্ষেত্র; এর লক্ষ্য হবে, "ন্যায় বিচার এবং উপযুক্ত মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে রোধ করা, এবং জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে বাস্তব এবং মানসিক সহ-যোগিতার প্রতিষ্ঠা করা।" অতি প্রশংসনীয় সংকল্প! লীগের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষনিষ্পত্তির সমস্তরকম সম্ভাবনা একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে তাঁরা কিছুতেই কেউ অন্য কোনো সহযোগী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না, এবং সে ক্ষেত্রেও যুদ্ধ ঘোষণা করবেন নয়মাস কাল অপেক্ষা করে তার পরে। লীগের অন্তর্ভুক্ত কোনো রাষ্ট্র যদি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত প্রকার টাকাকড়ি লেনদেন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ করে দেবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা করলেন। কাগজেকলমে কথাগুলো শুনতে ভারি চমৎকার; কার্যত যা দাঁড়িয়েছে সে একেবারেই ভিন্ন বস্তু। এটা কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো; লীগ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একেবারে শেষ করে দেবার চেষ্টা করে নি; শুধু যুদ্ধ বাধাবার পথে কিছু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতেই চেয়েছে; যেন এই ভাবে কিছু সময় কেটে যাবার ফলে এবং ইতিমধ্যে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টার ফলে মানুষের মনে যুদ্ধ বাধাবার উত্তেজনাটা নিজে থেকে কমে আসতে পারে। যে-সব কারণে যুদ্ধ বাধে, সেগুলোকে দূর করবার চেষ্টাও এতে করা হয় নি।

স্থির হল এই লীগের মধ্যে একটি অ্যাসেম্বলি এবং একটি কাউন্সিল থাকবে। অ্যাসেম্বলি তৈরি হবে এর অন্তর্ভুক্ত দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে; আর কাউন্সিলে বড়ো জাতি ক'টির প্রতিনিধিদের জন্য স্থায়ী আসন থাকবে; এ ছাড়া অন্য কয়েকজন সভ্যও থাকবেন, অ্যাসেম্বলি তাঁদের নির্বাচন করে দেবে। আর থাকবে একটি সরকারি দপ্তরখানা বা সেক্রেটারিয়েট, তুমি জান তার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে জেনেভাতে। এছাড়া আরও কতকগুলি কাজের জন্য এক-একটা বিভাগ থাকবে; একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিস, এ'রা শ্রমিকদের সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করবেন; আন্তর্জাতিক বিচারের জন্য একটি স্থায়ী আদালত, এটি হেগে অবস্থিত; বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান ও সহযোগিতার জন্য একটি কমিটি। এর সমস্ত কাজ লীগ গোড়া থেকে শুরু করে নি। কতকগুলো কাজ পরে যোগ করা হয়েছে।

লীগের সংগঠন-পদ্ধতির মূল সূত্রটি ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই ছিল। এর নাম হচ্ছে "লীগ-অব-নেশন্‌স্ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র" (Covenant of the League of Nations)। এই চুক্তিপত্রেই একথাও বলা হয়েছিল, সমস্ত দেশেরই রণসজ্জা কমিয়ে দিতে হবে, নেহাৎ

নিজের নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য যেটুকু নইলে নয় তার বেশি রণসজ্জা কেউ রাখতে পারবে না। জর্মনিকে নিরস্ত্রীকরণের (সেটা অবশ্য বাধ্যতামূলক ছিল) ব্যাপারটাকে এরই প্রথম ধাপ বলে বর্ণনা করা হল; অন্যান্য দেশও ক্রমে এর অনুসরণ করবে। আরও বলা হল, কোনো রাষ্ট্র যদি অন্যকে আক্রমণ করে তবে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আক্রমণ বলতে কী বোঝায়, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হল না। দুটি দেশ বা দুটি জাতির মধ্যে যখন যুদ্ধ বাধে, দুজনই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়, বলে ও-ই এসে আমাকে আক্রমণ করেছে।

বড়ো বড়ো জরুরি ব্যাপারে লীগ তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারত, শুধু সকল সভ্য একমত হলে। কাজেই একটিমাত্র রাষ্ট্রও কোনো একটা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যেত। এর অর্থ ছিল, কেবল ভোটের সংখ্যাধিক্যের জোরে কাউকে জুলুম করে বাধ্য করা হবে না। তাছাড়া, এর ফলে প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্র ঠিক আগের মতোই স্বাধীন এবং প্রায় আগের মতোই দায়িত্বশূন্য থেকে গেল, লীগ সকলের উপরে একটা উপরওয়ালা কর্তা গোছের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারল না। এই ব্যবস্থাটির দরুনই লীগের শক্তি খুবই কমে গেল, সেটা বস্তুত দাঁড়িয়ে গেল শুধু একটা উপদেশ-দাতা প্রতিষ্ঠানে।

যে-কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রেরই লীগে যোগ দেবার অধিকার ছিল। কিন্তু চারটি দেশকে একেবারে নাম করে এর বাইরে ঠেলে রাখা হল—এরা হচ্ছে পরাজিত তিনটি দেশ, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, আর বলশেভিক দেশ রাশিয়া। একথা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলা হল, পরে এরাও বিশেষ কতকগুলি শর্তাধীনে লীগে যোগ দিতে পারবে। আশ্চর্য ব্যাপার এই, ভারতবর্ষ একেবারে গোড়া থেকেই লীগের একজন সভ্য হয়ে আছে; কেবলমাত্র স্বাধীন দেশরাই এর সভ্য হতে পারবে এই নীতিটিকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করে। 'ভারতবর্ষ' বলতে অবশ্য বোঝানো হয়েছিল ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে; এই চাতুরিটি খেলে ব্রিটিশ সরকার লীগে তাঁদের একজন বাড়তি লোক ঢুকিয়ে নিলেন। ওদিকে আবার, আমেরিকাকে এক হিসাবে বলা যায় লীগের জন্মদাতা; অথচ সেই এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে বসল। প্রেসিডেন্ট উইলসনের কার্যকলাপ এবং ইউরোপের দেশগুলোর কূটকচাল আর জটিল প্যাঁচ দেখে দেখে আমেরিকার লোকেরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল; তারা স্থির করল এর ধারে কাছেও আসবে না।

লীগের দিকে অনেকেই খুব উৎসাহভরে চেয়ে রইল, আশা করল এখনকার দিনে জগতে আমাদের মধ্যে যত বৈষম্য যত বিবাদ-বিসংবাদ, লীগ তার অবসান করবে, অন্তত অনেকখানি হ্রাসের ব্যবস্থা করবে; পৃথিবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধির একটা যুগ এনে দেবে। লীগের নাম লোকের কাছে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত বস্তুকে দেখবার অভ্যাস লোকের মধ্যে জন্মিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে, বহু দেশে বহু লীগ অব নেশন্‌স্ সমিতি স্থাপিত হল। অন্যদিকে আবার অনেক লোকে বলতে লাগল, লীগটা একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামির ব্যাপার, শুধু বড়া বড়ো জাতি ক'টার মতলব হাশিল করবার উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন আমরা লীগের সম্বন্ধে কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি; এর কার্যকারিতা কতখানি সেটা বিচার করা হয়তো এখন আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। ১৯২০ সনের নববর্ষের দিনে লীগের কার্যারম্ভ হয়েছিল; এর বয়স এখন পর্যন্ত খুব বেশি হয় নি বটে, কিন্তু এই নাতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই লীগ নিজেকে অকেজো ও অসার বলে প্রমাণিত করে ফেলেছে। আধুনিক জীবনের বহুবিধ ক্ষুদ্র ব্যাপারে লীগ বেশ ভালো কাজই দেখিয়েছে সন্দেহ নেই; আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য বিভিন্ন জাতি বা তাদের সরকারসমূহকে সে টেনে এনে একত্র বসিয়েছে, শুধু এই বস্তুটাই প্রাচীন জগতের রীতির তুলনায় অনেকখানি অগ্রগতির পরিচয়। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য ছিল জগতে শান্তি রক্ষা করা, অন্তত যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা; সে কাজ করতে সে একেবারেই অক্ষম হয়েছে।

মূলত একে নিয়ে প্রেসিডেন্ট উইলসনের মনে কী অভিপ্রায় ছিল জানি নে; কিন্তু এসম্বন্ধে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই যে লীগ এখন হয়ে উঠেছে বড়ো শক্তিদের, বিশেষ করে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের হাতের যন্ত্রমাত্র। এর মূল কথাটাই হচ্ছে বর্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে

রাখা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়বিচারের এবং পরস্পর-মর্যাদার কথা এ বলে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমানে রয়েছে, সেটা সত্যই ন্যায়বিচার এবং মর্যাদার উপরে প্রতিষ্ঠিত কিনা, সে খোঁজ এ নিতে চায় না। বলে, জাতিগুলোর 'ঘরোয়া ব্যাপারে' হস্তক্ষেপ করতে সে যাবে না। সাম্রাজ্যবাদী জাতির অধীনে যে-সব জাতি আছে, তাদের কথা তার পক্ষে ঘরোয়া ব্যাপারই বটে। অতএব লীগ বলবে, এই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্য চিরকাল ধরেই শাসন করতে থাক, এইটাই তারও কাম্য। তার পরে আবার, জর্মানি এবং তুর্কির হাত থেকে বহু নূতন জায়গা কেড়ে নিয়ে মিত্রপক্ষের দেশগুলোকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ম্যাণ্ডেট্'—রক্ষাধীন। এই কথাটাই ঠিক লীগ অব নেশন্‌সের প্রকৃতির যোগ্য কথা; কারণ এর মধ্যেকার ইঙ্গিতটাই হচ্ছে, পুরোনোদিনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকবে, অবশ্য একটা মধুরতর নামের আবরণে। বলা হয়, এই অঞ্চলগুলির রক্ষার ভার এদের হাতে দেওয়া হয়েছে, রক্ষণীয় অঞ্চলের প্রজাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে। বহুস্থানে সে প্রজারা এই রক্ষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছে, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়েছে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, অবশেষে বোমা এবং কামানের গোলা খেয়ে আবার এদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। প্রজাদের অভিপ্রায় যাচাই করবার পন্থাটা ভালোই ছিল বলতে হবে!

সুন্দর সুন্দর শব্দ আর ভাষা অবশ্য অনেকই বলা হত তখন। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো হচ্ছে 'অভিভাবক' বা জিম্মাদার, রক্ষাধীন অঞ্চলের প্রজাদের ভার তাদের জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে; সে জিম্মার সমস্ত শর্ত যাতে যথাযথ পালিত হয় সেটা দেখবার ভার হচ্ছে লীগের উপর। বস্তুত এতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল; অথচ তাদের বাইরে রইল একটা খুব মহৎ কর্তব্যের ছদ্মবেশ, অজ্ঞ লোকদের বিবেক সেই বেশ দেখেই মুগ্ধ হয়ে বসে রইল। কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যখন কোনো রকম অন্যায় করে, লীগ তখন খুব গম্ভীর ভাব ধারণ করে, তার ক্রোধের হুমকি দেখিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। আর বড়ো জাতিগুলোর কেউ যখন অপরাধ করে, লীগ তখন যথাসম্ভব অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে, বা তার সে অপরাধটাকে যতদূর পারে লঘু বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।

এমনি করেই বড়ো জাতিগুলো লীগকে নিজের ইচ্ছেমতো চালাতে লাগল; একে দিয়ে যেখানে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে সেখানে একে কাজে লাগাল, আর যেখানে একে উপেক্ষা করে চলা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক সেখানে একে সবাই উপেক্ষা করেই চলল। তবু হয়তো সে অপরাধ লীগের নয়; অপরাধ ছিল আসলে সেই ব্যবস্থাটারই; লীগকে নিজের প্রকৃতিবশেই তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই হচ্ছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অতি তীব্র রেষারেষি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা; প্রত্যেকেই তারা পৃথিবীটাকে যে যতখানি পারে শোষণ করে নিতে চায়। একটা সমাজের প্রত্যেকটি সভ্য যদি সারাক্ষণই পরস্পরের পকেট মারতে চায়, পরস্পরের গলা কাটবে বলে ছুরি শানাতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে খুব বেশি সহযোগিতা গড়ে উঠবে বা সে সমাজের খুব বেশি উন্নতি হবে এমন আশা করাই ভুল। এই জন্যই খুব ভারিক্কি জাঁকালো মাতব্বর মুরুব্বি আর অভিভাবক গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও লীগ যে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ভার্সাইতে যখন সন্ধির শর্ত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলছে, জাপান সরকারের তরফ থেকে তখনই বলা হয়েছিল, সমস্ত জাতিরই মর্যাদা সমান, এই মর্মে একটি ধারা সে সন্ধিপত্রের অন্তর্গত করে দেওয়া হোক। সে প্রস্তাব তখন গৃহীত হল না। জাপানকে অবশ্য শান্ত করে রাখা হল চীনের কিয়াওচাও প্রদেশ তাকে দান করে। চীনের মতো একটি দুর্বল এবং বিনীত মিত্রদেশের ঘাড় ভেঙে 'বৃহৎ ত্রিশক্তি' খুব মস্ত একটা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে দিলেন। এই ক্ষোভে চীন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল না।

যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্য অনুষ্ঠিত যুদ্ধটির শেষ হয়েছিল ভার্সাই সন্ধিতে; এই হচ্ছে সে সন্ধির স্বরূপ। ফিলিপ স্নোডেন, পরে তিনি হয়েছিলেন ভাইকাউণ্ট স্নোডেন। ইনি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও একজন মন্ত্রী ছিলেন। এই সন্ধিটির সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন :

"দস্যু, সাম্রাজ্যবাদী এবং সমর-ব্যবসায়ীদের এই সন্ধিপত্র দেখে সন্তুষ্ট হবার কথা। যারা আশা করেছিল এই যুদ্ধের অবসানে শান্তি আসবে, তাদের সে আশা এতে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এটা শান্তি স্থাপনের সন্ধিপত্র নয়, আরেকটা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র। গণতন্ত্রের প্রতি এবং যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের প্রতি এতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। মিত্রপক্ষের প্রকৃত মনোভাবটিই এই সন্ধিপত্রে ফুটে উঠেছে।"

বস্তুত মিত্রপক্ষ সেদিন দ্বেষবুদ্ধি অহংকার আর লোভের খেলায় অত্যধিক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। পরবর্তী কালে তার জন্যে তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে উঠেন, যখন দেখতে পেলেন যে তাঁদের নিজেদের বুদ্ধির ত্রুটিতে নিজেরাই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তখন খুবই দেরি হয়ে গেছে।

১৫৬

যুদ্ধোত্তর জগৎ

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৩

এতদিনে আমরা দীর্ঘপথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম; আধুনিক যুগের গোড়ায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এবার আমরা দেখব যুদ্ধোত্তর জগৎকে, মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগের জগৎকে। এটা আমাদের নিজেদের যুগ, তোমারও নিজের জীবনের যুগ! আমাদের যাত্রাপথের এইটাই শেষ ক্ষেপ; কালপ্রবাহের হিসাবে এর দৈর্ঘ্য অতি সামান্য। কিন্তু তবুও এটি বড়ো কঠিন যাত্রা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ ঠিক সাড়ে-চৌদ্দ বছর হল, ইতিহাসের যে দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ আমরা পার হয়ে এসেছি তার তুলনায় এই ক্ষুদ্র কালটি কতটুকুই বা? কিন্তু আমরা নিজেরাই রয়েছি এর ঠিক মধ্যখানে নিমগ্ন হয়ে; এত কাছাকাছি থেকে ঘটনাচক্রের স্বরূপ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা বড়ো কঠিন। যে রকম ভাবে দেখলে এর যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়বে, এখান থেকে আমরা সেভাবে একে দেখবার অবসর পাইনে; ইতিহাস আলোচনার জন্য মনের যে শান্ত নির্বিকারত্ব প্রয়োজন, তাও আমাদের আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক ব্যাপার নিয়েই আমরা অত্যন্ত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠি, তখন বহু ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের চোখে মস্ত বড়ো হয়ে ওঠে; আবার অনেক সত্যকার বড়ো জিনিসেরও আমরা গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারি না। অসংখ্য গাছের ভিড় দেখে আমরা দিশাহারা হয়ে যাই, বনটা যে কোথায় সে আর চোখেই পড়ে না।

তার পর আরও এক মুশকিল আছে, কোন্ জিনিসটার গুরুত্ব কতখানি, তা জানব কী করে? কোন্ মাপকাঠি দিয়ে একে মাপা যায়? একথা সহজেই বুঝি, কোন্ দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত ব্যাপারকে দেখব, তার উপরে অনেকখানিই ফল নির্ভর করে। একদিক থেকে দেখলে যে ঘটনাটা অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে হয়, আরেক দিক থেকে দেখলে হয়তো সেইটাকেই মনে হবে একেবারে বাজে, তুচ্ছ ব্যাপার। তোমাকে যত চিঠি আমি লিখেছি তার মধ্যে এই কথাটিকে আমি খানিকটা এড়িয়ে চলেছি; এর সোজা এবং সম্পূর্ণ উত্তরটি তোমাকে আমি দিই নি। অথচ তা সত্ত্বেও যা কিছু আমি লিখেছি, তার সব-কিছুর উপরেই আমার সাধারণ মতামতের একটা ছাপ পড়েছে। এই একই যুগ এবং ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে আরেকজন লোক হয়তো একেবারেই ভিন্নরকমের কথা বলতেন।

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি রকমের হওয়া উচিত, সে প্রশ্ন নিয়ে আমি এখানেও আলোচনা করব না। আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটা গত ক'বছরে অনেকখানি বদলে গেছে। এই ব্যাপারটি এবং আরও বহু ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যেমন আমার মত বদলে নিয়েছি, আরও বহুজনের মতও তেমনিভাবেই বদলেছে। তার কারণ, যুদ্ধের ধাক্কায় পৃথিবীর

প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিতে একটা অত্যন্ত জোর ঝাঁকুনি লেগেছে। প্রাচীন কালের যে জগৎ আমাদের ছিল যুদ্ধ তাকে একেবারেই ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেছে; তার পর থেকেই সে প্রাচীন জগৎ আবার কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। যে-সব ধারণা আর মতামত নিয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠেছিলাম সেগুলোতে আগাগোড়া ফাটল ধরেছে; আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতার গোড়ায় আদৌ কোনো সত্য আছে কিনা, সেই বিষয়েই আমাদের মনে সংশয় জেগে উঠেছে। অসংখ্য তরুণ প্রাণের ভয়াবহ অপচয় ঘটতে দেখেছি আমরা, দেখেছি মিথ্যা ভাষণ, অত্যাচার, পাশবিক মনোবৃত্তি আর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব; বিস্মিত হয়ে ভেবেছি এই কি সভ্যতার শেষ হয়ে গেল? রাশিয়াতে সোভিয়েটের আবির্ভাব হল, নূতন একটা বস্তু সে, নূতন একটা সমাজ-ব্যবস্থা, প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বীর রূপে সে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। আরও বহু নূতন মতবাদ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা-চোরার যুগ ছিল সেটা, প্রাচীন কালের যত মতামত রীতিনীতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল; মানুষের মন ভরে উঠল সংশয়ে আর সমস্যায়: যুগান্তর আর দ্রুত পরিবর্তনের যুগে সেটা না হয়েই পারে না।

এই-সব কারণেই যুদ্ধের পরবর্তী কালটাকে ঠিক ইতিহাসের বস্তু বলে মনে করা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন। নানারকমের মতবাদ এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে সংশয় প্রকাশ করতে আমরা পারি; তার মধ্যে কোনো একটাকে সবাই প্রাচীন কালের বস্তু বলে জানে শুধু এই জন্যই সেটাকে মেনে নিতেও আমরা বাধ্য নই; কিন্তু তাই বলে মতবাদ আর সিদ্ধান্ত নিয়ে খালি নাড়াচাড়ার খেলা করে দিন কাটাবারও অধিকার আমাদের নেই, আমাদের নিজেদেরই যথাসাধ্য নিবিষ্ট মনে চিন্তা করে দেখতে হবে, আমাদের কী কর্তব্য সেটা স্থির করে নিতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা যুগ-পরিবর্তনের কাল, এই সময়েই বিশেষ করে আমাদের দেহ এবং মনের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাবার প্রয়োজন আসে। এই হচ্ছে সময়, যখন দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন ধারা অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে, নূতনতর আবিষ্কারের আহ্বান হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকতে থাকে, নবীন জগতের সৃষ্টির কাজে আমরা সবাই গিয়ে একটুখানি হাত লাগাবার অবসর পেয়ে যাই। এই রকম সময়েই চিরদিন দেশের যুবশক্তি এগিয়ে এসেছে, কাজ সম্পন্ন তারাই করতে পেরেছে। চিন্তাধারা আর পরিবেশ যখন বদলে যেতে থাকে যুবকরাই সহজে তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে পারে; যারা বৃদ্ধ, যাদের মন কঠিন হয়ে গেছে, প্রাচীন মতামত আর রীতিনীতি যাদের মজ্জাগত, তারা সেটা পারে না।

যুদ্ধের পরবর্তী এই কালটিকে একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোধ হয় ক্ষতি নেই। কিন্তু এই চিঠিতে আমি তোমাকে শুধু এর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সাধারণ ধারণা দিয়ে দিতে চাই। নেপোলিয়নের পতনের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। ১৮১৫ সনের ভিয়েনা-সন্ধি এবং তার ফলাফলের কথা আমাদের স্বভাবতই মনে জাগে, ১৯১৯ সনের ভার্সাই সন্ধি এবং তার ফলাফলের সঙ্গে এর তুলনাও না করে আমরা পারি না। ভিয়েনার সন্ধির ফল ভালো হয় নি, ইউরোপে ভবিষ্যতে আবার যুদ্ধ বাধবে তার বীজ সেই সন্ধির মধ্যেই লাগানো হয়েছিল। সেবার ঠেকেও কিন্তু আমাদের কালের রাষ্ট্রনীতিবিদরা কিছুই শিখলেন না; ভার্সাইর সন্ধি করলেন তার চেয়েও বিশ্রী করে—এর স্বরূপ আমরা গত চিঠিতে দেখেছি। এই তথাকথিত সন্ধি বা শান্তি-পত্রের নিবিড় ছায়া যুদ্ধোত্তর যুগের পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে।

এই গত চৌদ্দটি বছরের মধ্যে পৃথিবীতে বড়ো ঘটনা কী ঘটেছে দেখা যাক। আমার মতে এই সময়কার সবচেয়ে বৃহৎ এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যুত্থান এবং সংহতিলাভ: এর নাম ইউ. এস্. এস্. আর বা ইউনিয়ন অব সোস্যালিস্ট অ্যান্ড সোভিয়েট রিপাবলিক্স্। পৃথিবীতে টিকে থাকবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে কী কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল, তার কিছুটা কাহিনী তোমাকে আমি আগেই বলেছি। এত সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঠেলেও যে সে জয়ী হতে পেরেছে, এইটাই হচ্ছে এই শতাব্দীর একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এশিয়ার

যতখানি জায়গা নিয়ে ভূতপূর্ব জার-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল, তার সর্বত্র জুড়েই সোভিয়েট-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সাইবেরিয়াতে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত; মধ্য এশিয়াতে ভারত সীমান্তের অত্যন্ত কাছে পর্যন্ত। গোড়াতে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল; তার পর তারা সকলে একত্র সংঘবদ্ধ হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে; এরই এখন নাম হয়েছে ইউ. এস্. এস্. আর। ইউরোপ আর এশিয়ার অতি বিরাট স্থান নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত; এর আয়তন পৃথিবীর ভূপরিমাণের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগের সমান। অতি বৃহৎ আয়তন, কিন্তু শুধু আয়তন দিয়েই রাষ্ট্রের মর্যাদার মাপ হয় না। রাশিয়া খুবই অনুন্নত দেশ ছিল, সাইবেরিয়া এবং মধ্য-এশিয়া ছিল আরও বেশি অনুন্নত। দ্বিতীয় যে আশ্চর্য ব্যাপারটি সোভিয়েটরা করল সে হচ্ছে এই দেশের রূপ পরিবর্তন : দেশ-উন্নয়নের অপূর্ব সব পরিকল্পনা খাড়া করে এই বিপুল দেশের অতি বৃহৎ অঞ্চলের রূপ তারা এমনই বদলে দিয়েছে যে তাদের দেখে আর চেনা যায় না। একটা জাতির দ্রুত অগ্রগতির এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই। মধ্য-এশিয়ার অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলো পর্যন্ত এমনই বিদ্যুদ্বেগে উন্নত হয়ে উঠেছে, যে দেখে ভারতবর্ষে আমাদের ঈর্ষান্বিত হবার কথা। সবচেয়ে উন্নতি এরা দেখিয়েছে শিক্ষা এবং শিল্পে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে রাশিয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ একেবারে হুড়মুড় করে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে, বিরাট বিরাট সব কারখানা তৈরি করা হয়েছে সে দেশে। দেশের লোককে অবশ্য খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এর জন্য; বিলাস এবং আরাম তো বটেই, প্রয়োজনের বস্তু থেকেও তাদের স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়েছে, যেন তাদের আয়ের বৃহত্তর অংশ পৃথিবীর এই প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশের প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এর বোঝা বিশেষ করে বহন করতে হয়েছে কৃষকদেরই।

এই সোভিয়েট দেশটি ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে, আর পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলো নিত্য নূতন বিপদ আর সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে, এদের মধ্যেও তফাতটা বড়ো স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ে। বিঘ্ন-বিপদ তার যতই থাক, পশ্চিম-ইউরোপের ধন-ঐশ্বর্য এখনও রাশিয়ার চেয়ে অনেক বেশি। দীর্ঘ কাল তার সম্পদে কেটেছে, তার মধ্যে সে দেহে অনেকখানি মেদ সঞ্চয় করে নিয়েছে, এখন কিছুকাল তার উপরেই নির্ভর করে সে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু এর প্রত্যেকটি দেশই ঋণের ভারে পীড়িত, ভার্সাই সন্ধিতে জর্মনির উপরে যে ক্ষতিপূরণের দায় চাপানো হয়েছিল তার দরুন চিন্তাগ্রস্ত এবং এর ছোটো বড়ো সকল দেশের মধ্যেই ক্রমাগত রেষারেষি আর কলহ চলেছে। এই সমস্ত মিলে ইউরোপের অবস্থা ভয়াবহ করে তুলেছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় আবিষ্কারের জন্য অবিরাম আলোচনা-বৈঠক বসছে, উপায় কিছুই আবিষ্কার করা যাচ্ছে না, দিন দিন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠছে। আজকের দিনে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম-ইউরোপের তুলনা করতে যাওয়া, এ যেন যুবার সঙ্গে বৃদ্ধের তুলনা; যুবার কাঁধে ভারী বোঝা কিন্তু তার দেহ মন স্বাস্থ্য আর শক্তিতে ভরপুর; বৃদ্ধের জীবনে আশা বা উদ্যম বলে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, মনে তার আজও অহংকার আছে; কিন্তু সে অহংকারের বশে এগিয়ে চলেছে সে এই জীবনের নিশ্চিত অবসানেরই দিকে।

যুদ্ধের পরে মনে হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের এই ব্যাধির সংক্রমণ স্পর্শ করতে পারে নি। দশ বছর পর্যন্ত তার একেবারে অদ্ভুত সমৃদ্ধি দেখা গেল। টাকা-লগ্নীর বাজারে এককালে ইংলণ্ডই কর্তাব্যক্তি ছিল, যুদ্ধের সময় আমেরিকা তার সে স্থানটি দখল করে নিয়েছে। এখন আমেরিকাই হয়েছে সমস্ত পৃথিবীর মহাজন, পৃথিবীর সমস্ত দেশ তার কাছে টাকা ধারে । অর্থনীতির দিক থেকে বলা যায় পৃথিবীতে এখন তারই কর্তৃত্বের আসন। সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে যে নজরানা মিলছে তার উপর নির্ভর করে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই সে কাটিয়ে যেতে পারত; এর আগে ইংলণ্ডও কতকটা তাই করেছে। কিন্তু সেটা করার পথে আমেরিকার দুটি বড়ো মুশকিল ছিল। তার খাতক দেশে সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে, নগদ টাকায় ধার শোধ দেবার শক্তি তাদের নেই। অবশ্য অবস্থা ভালো থাকলেও এই বিরাট-পরিমাণ দেনা নগদ টাকায় মিটিয়ে দেবার সাধ্য তাদের হত না। ধার শোধ দেবার

একমাত্র উপায় তাদের হচ্ছে, মালপত্র তৈরি করা এবং সেইগুলোই আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু বিদেশী পণ্য তার বাজারে এসে হাজির হবে এটা আমেরিকার পছন্দ নয়; সে প্রকাণ্ড উঁচু রকমের রক্ষাশুল্কের পাঁচিল গেঁথে দিল—ফলে এর অধিকাংশ মালই আমেরিকায় ঢুকতে পেল না। তাহলে সে খাতক বেচারীরা তাদের দেনা শোধ করে কী করে? একটা ভারি চমৎকার পন্থা আবিষ্কার করে ফেলল আমেরিকা; সে নিজেই তাদের আরও বেশি টাকা ধার দেবে, যেন সেই টাকায় তারা প্রাপ্য সুদ মিটিয়ে দিতে পারে! ঋণ শোধ আদায় করবার অতি অপূর্ব উপায়; এতে মহাজন ক্রমেই আরও বেশি করে টাকা দিতে থাকবে, আর ঋণের মোট পরিমাণও ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকবে। রকম দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, এই ঋণের বোঝা থেকে এই খাতক দেশগুলো কোনোদিনই মুক্ত হতে পারবে না। তার পর একদিন হঠাৎ আমেরিকা এদের টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই এদের কাগজপত্রে যেটুকু বা আর্থিক সংস্থান ছিল সবসুদ্ধ একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। তার পর আবার আরও একটি ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। আমেরিকা, ধনসম্পদ সমৃদ্ধ আমেরিকা, টাকায় আর সোনায় তার ঘর একেবারে কানায় কানায় ভরা—হঠাৎ দেখা গেল সেই আমেরিকাতেই অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে; শিল্প-ব্যবসায়ের রথের চাকা গেছে থেমে, দেশের মধ্যে নিদারুন দৈন্য আর দুর্দশার রাজত্ব দেখা দিয়েছে।

আমেরিকা ধনের দেশ, তারই যখন এই দুর্দশা, ইউরোপের অবস্থা কি হয়েছিল বুঝতেই পারো। প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করতে লাগল বিদেশী পণ্য কিনবে না; অত্যন্ত উচুঁহারে রক্ষাশুল্ক বসিয়ে আরও নানা ফিকির-ফন্দি খাটিয়ে, 'স্বদেশী মাল কেনো' বলে ধুয়ো তুলে, তারা বিদেশী পণ্য আসবার পথ বন্ধ করতে লাগল। প্রত্যেক দেশই তখন চাচ্ছে অন্যের কাছে শুধু নিজের মাল বেচবে, অন্যের মাল নিজে কিনবে না, অন্তত যথাসম্ভব কম কিনবে। ব্যবসায় এবং বাণিজ্য মানেই হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে পণ্য-বিনিময়; কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৃত্যু না ঘটিয়ে এই ধরনের কাণ্ড বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। এই নীতিটির নাম হচ্ছে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। এর হিড়িক সমস্ত দেশেই লাগল; উগ্র জাতীয়তাবাদের অন্যান্য প্রকাশও দেখা যেতে লাগল । ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্পে মন্দা পড়ল; তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের দৈন্য-দারিদ্র্য বাড়তে লাগল; বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে বিদেশে শোষণের বহর আরও বাড়িয়ে দিল এবং নিজের দেশে শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দিতে লাগল। পৃথিবীর সর্বত্র সকল দেশেই প্রত্যেকে তার শোষণের বহর বাড়িয়ে নেবার কামনা এবং চেষ্টা করছে; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে ক্রমেই সংঘাত বেড়ে উঠল। লীগ অব নেশনস্ বসে বসে অস্ত্র-বর্জনের বড়ো বড়ো বুলি আওড়াতে লাগল এবং কাজে আর কিছুই করল না; ওদিকে পৃথিবীতে যুদ্ধের করাল ছায়া ক্রমেই আসন্ন হয়ে আসতে লাগল। আবার সবাই বুঝল যুদ্ধ না বেধে যায় না; আবার পৃথিবীর সমস্ত দেশ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগল, নিজেদের মধ্যে দল-গড়া শুরু করল।

দেখে শুনে মনে হচ্ছে, যে যুগে ধনিকতন্ত্রী সভ্যতা পশ্চিম-ইউরোপে আর আমেরিকায় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল এবং বাকি পৃথিবীটাকেও নিজের কর্তৃত্বের অধীন করে ফেলেছিল, সে যুগটার অবসান হতে আর বেশি দেরি নেই। যুদ্ধের পর প্রথম দশটা বছর সবাই ভেবেছিল, হয়তো ধনিকতন্ত্র আবার এই ধাক্কা সামলে সবল হয়ে উঠবে, আবার কিছুকালের মতো সুস্থ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু গত তিন বছরের ব্যাপার দেখে সে সম্বন্ধে সকলেই এখন অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছে। ধনিকতন্ত্রী দেশগুলোর মধ্যে পরস্পর রেষারেষি তো ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁচোচ্ছেই, তা ছাড়া প্রত্যেকটি দেশের ভিতরেও বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর, শ্রমিকশ্রেণী আর শাসনব্যবস্থা যাদের করায়ত্ত সেই ধনিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। অতএব বড়ো বড়ো দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ এবং প্রত্যেক দেশের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ, দুইটি বিপদেরই আশঙ্কা এখন দেখা দিয়েছে। অবস্থা যেখানে অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠছে সেইখানেই মালিক শ্রেণী মরিয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখছে, শ্রমিক শ্রেণীর

অভ্যুদয়টাকে কোনোমতে ভেঙেচুরে দেওয়া যায় কি না। এদের এই চেষ্টা রূপ গ্রহণ করছে ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এ। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ দেখা দিচ্ছে সেইখানেই, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ অতি তীব্র হয়ে উঠেছে; মালিক শ্রেণী এতদিন যে প্রভুত্বের আসনে বসে ছিল সে আসন তার করচ্যুত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধের অতি অল্পদিন পরে, ইতালিতে ফ্যাসিজ্‌মের প্রথম আবির্ভাব হয়। শ্রমিকরা সেখানে ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় ফ্যাসিস্টরা এসে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করল, তাদের নেতা মুসোলিনি। সেই থেকেই তারা দেশের শাসনকর্তৃত্ব অধিকার করে রয়েছে। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ মানে হচ্ছে একেবারে উলঙ্গ একনায়কত্ব। প্রজাতন্ত্রী রীতিনীতি সম্বন্ধে এরা খোলাখুলিই অবজ্ঞা প্রকাশ করে। ইউরোপের বহু দেশেই ফ্যাসিস্ট রীতিনীতি অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে; একনায়ক-প্রথাও অনেক জায়গাতেই দেখা দিয়েছে। ১৯৩৩ সনের প্রথমভাগে জর্মানিতে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ জয়লাভ করেছে। ১৯১৮ সনে জর্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অবসান হয়েছে, শ্রমিকদের আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য বর্বর দণ্ডনীতির একেবারে চরম প্রয়োগ চলেছে সেখানে।

কাজেই ইউরোপে এখন ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এসে দাঁড়িয়েছে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী শক্তিবর্গের মুখোমুখি হয়ে: আর ওদিকে ধনিকতন্ত্রী দেশগুলোর পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। প্রাচুর্য আর দৈন্যের পাশাপাশি অবস্থান, এই অপূর্ব দৃশ্য শুধু ধনিকতন্ত্রের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়; একদিকে রাশীকৃত খাদ্য পচে যাচ্ছে, ফেলে দেওয়া হচ্ছে এমনকি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, আর একদিকে মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে।

ইউরোপের একটি প্রাচীন দেশ স্পেন; মাত্র কয়েক বছর হল সে নিজেকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে, তার হাপ্‌স্‌বুর্গ বুর্বোঁ-বংশীয় রাজাকে দিয়েছে তাড়িয়ে। ইউরোপের এবং পৃথিবীর রাজার সংখ্যাও একজন কমেছে।

গত চৌদ্দ বছরের তিনটি প্রধান ঘটনার কথা তোমাকে আমি বলেছি; সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা; অর্থনীতির ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবীতে আমেরিকার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তার বর্তমান সংকট; ইউরোপের জটিল পরিস্থিতি। এই সময়কার চতুর্থ বৃহৎ ঘটনা হচ্ছে, প্রাচ্য জগতের দেশগুলির পূর্ণ জাগরণ এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের উদগ্র প্রয়াস। প্রাচ্য জগত এবার স্পষ্ট করেই জগতের রাজনীতির রাজ্যে এসে পদার্পণ করেছে। এই প্রাচ্য দেশগুলোকে দুটি ভাগে ফেলা যেতে পারে; যেগুলিকে স্বাধীন দেশ বলে মনে করা হয়, আর যেগুলি উপনিবেশ-বিশেষ, অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীন। এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকার এই সবগুলি দেশেই জাতীয় চেতনা সবল হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার জন্য এদের আকাঙ্ক্ষাও স্পষ্ট এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দেশেই বড়ো বড়ো আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে; অনেক স্থানে বিদ্রোহও হয়েছে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এর বহু দেশকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সরাসরি সাহায্য করেছে, বা তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা জাতীয় সংগ্রামের সংকটমুহূর্তে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে এদের মনে সাহস এবং উৎসাহ যুগিয়েছে।

একটা জাতির পুনর্জন্ম লাভের সবচেয়ে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাল তুরস্ক; সবাই ভেবেছিল তার একেবারেই অবসান হয়ে গেছে। এর দরুন কৃতিত্ব অনেকখানিই মুস্তাফা কামাল পাশার প্রাপ্য; সমস্ত মানুষ সমস্ত পরিবেশ যখন তাঁর বিরুদ্ধে, তখনও এই বীর নেতা মাথা নত করতে রাজি হন নি। নিজের দেশকে শুধু বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তই করেন নি তিনি, তাকে সম্পূর্ণ আধুনিক করে তুলেছেন, এমন ভাবে তার সমস্ত চেহারাটাকে বদলে দিয়েছেন যে দেখে আর চেনাই যায় না। সুলতান এবং খলিফার রাজত্বের তিনি বিলোপ সাধন করেছেন; মেয়েদের পর্দা এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন প্রথাও তুলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সোভিয়েটের নৈতিক এবং বাস্তব সমর্থন তাঁকে অনেকখানিই সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশদের প্রভাব থেকে পারশ্য মুক্তিলাভের চেষ্টা করছিল, তাকেও সোভিয়েট অনেক সাহায্য করেছে। পারশ্যেও একজন দুর্ধর্ষ লোকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর নাম রেজা খাঁ। এখন তিনিই পারশ্যের রাজা। এই সময়েই আফগানিস্তানও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

একমাত্র নিজ আরব ছাড়া, আরব-অঞ্চলের সমস্ত দেশই বিদেশীর অধীন। আরবরা সবাই একত্র হবার দাবি জানিয়েছে, সে দাবি মেটানো হয় নি। আরবদেশের বৃহত্তর অংশটা স্বাধীন হয়ে গেছে, তার অধীশ্বর হচ্ছেন সুলতান ইব্‌নে সৌদ। ইরাক নামে স্বাধীন, কিন্তু কার্যত সে ব্রিটিশের প্রভাব এবং প্রভুত্বের অধীনে বাস করছে। প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্স-জর্ডন এইদুটি ক্ষুদ্র-রাজ্য, ব্রিটিশ ম্যানডেট্; সিরিয়া ফরাসি ম্যানডেট্। সিরিয়াতে ফরাসিদের বিরুদ্ধে একটি আশ্চর্যরকম বীরোচিত বিদ্রোহ হয়েছিল, সে বিদ্রোহ খানিকটা সফলও হয়েছে। মিশরও অনেকবার বিদ্রোহ করেছে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সে দীর্ঘকাল ধরেই সংগ্রাম চালাচ্ছে। সে সংগ্রাম আজও চলছে, যদিও নামে এখন তাকে স্বাধীন বলা হয়। মিশরে এখন রাজত্ব করছেন একজন রাজা, কার্যত ইনি ব্রিটিশদেরই হাতের পুতুল। উত্তর-আফ্রিকার বহু দূরে পশ্চিম-অঞ্চলে মরক্কো দেশও স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো লড়াই করেছিল, তার নেতা ছিলেন আবদুল করিম। স্পেনীয়দের তিনি দেশ থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর ফ্রান্স তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করল, তাঁকে একেবারে চূর্ণ করে দিল।

পৃথিবীতে একটা নূতন চেতনা এসেছে, প্রাচ্য জগতের অতি দূরবর্তী দেশগুলিতেও একই সঙ্গে সমস্ত নরনারীর মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছে,—এশিয়া আর আফ্রিকার দেশে দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্য এই যুদ্ধগুলি তারই প্রমাণ। এদের মধ্যে আবার দুটি দেশ বিশেষ করে চোখে পড়ে, কারণ পৃথিবীর মধ্যেই এদের স্থান বড়ো। এরা হচ্ছে চীন এবং ভারতবর্ষ। এর কোনো দেশে কোনো প্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর যে বণ্টনব্যবস্থা রয়েছে তার উপরেও গিয়ে পড়ে; পৃথিবীর রাজনীতিতে তার ফলে বিরাট রকম পরিবর্তন না এসেই পারে না। এই জন্যই চীন এবং ভারতবর্ষে যে সংগ্রাম চলছে সেটা শুধু এই দুটি দেশের লোকদের ঘরোয়া সংগ্রাম নয়, তার চেয়ে ঢের বড়ো জিনিস। চীন যদি এই সংগ্রামে জয়ী হয়, তবে তার মানে হবে পৃথিবীতে আর একটি বিরাট রাষ্ট্রের আবির্ভাব। বর্তমানে যে তথাকথিত শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এর ফলে তার অনেকখানিই ব্যতিক্রম ঘটবে; এবং তারই ফলে আবার চীনে এখন সাম্রাজ্যবাদীরা যে শোষণ চালাচ্ছে সেটাও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনি আবার, ভারতবর্ষ যদি সংগ্রামে জয়লাভ করে, তাহলেও জগতে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, অন্তত সে বৃহত্ত্বের সম্ভাবনা তার মধ্যে নিহিত রয়েছে; তাছাড়া তার প্রত্যক্ষ ফল যেটা সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে সে হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান।

গত দশ বছরে চীনের ভাগ্যে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। কুওমিন্‌টাঙ আর চীনা কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল, সেটা ভেঙে গেছে; তার পর থেকেই চীনে টুচুন আর ঐরকমের অন্যান্য দস্যু সর্দারদের উপদ্রব চলছে; বহু বিদেশী শক্তিও এদের পিছনে রয়েছে; চীনে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকলেই তাদের লাভ। গত দুবছর যাবৎ জাপানিরা বস্তুত চীনের উপরে আক্রমণই চালাচ্ছে, তার কয়েকটি প্রদেশ দখলও করে নিয়েছে। এই অ-ঘোষিত-যুদ্ধ এখনও চলছে। ইতিমধ্যে আবার চীনের অভ্যন্তরস্থ বহু অঞ্চল কমিউনিস্ট হয়ে গেছে; সেখানে একপ্রকার সোভিয়েট শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে গত চৌদ্দ বছরে অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে; একটি উগ্র অথচ অহিংস জাতীয় সংগ্রামের আবির্ভাব হয়েছে। যুদ্ধের অতি অল্পদিন পরে, শাসন-ব্যবস্থার এবার বড়ো বড়ো সংস্কার করে দেওয়া হবে এই আশায় যখন সকলে উল্লসিত, এমন সময়ে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হল, জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল। ভারতের জনসাধারণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; তুরস্ক এবং খলিফার প্রতি ব্রিটিশদের আচরণ দেখে মুসলমানরাও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এর ফলে এল অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলল, এর নেতা ছিলেন গান্ধীজি। বস্তুত সেই ১৯২০ সন থেকেই আজও পর্যন্ত গান্ধীজিই ভারতের জাতীয় সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা হয়ে রয়েছেন।

এটা হচ্ছে গান্ধী-যুগ। তিনি যে অহিংস বিদ্রোহের নীতি প্রবর্তন করেছেন তার

অভিনবত্ব এবং শক্তি দেখে সমস্ত পৃথিবী উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছে। কিছুদিন অপেক্ষাকৃত শান্ত কার্যকলাপ এবং প্রস্তুতির পরে ১৯৩০ সনে আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করা হল, এবার কংগ্রেস স্পষ্ট করেই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে তার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। তখন থেকেই দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন চলেছে, জেলখানাগুলো মানুষে ভরে গেছে, আরও বহু ব্যাপার ঘটছে, এর কথা তুমিও জানো। ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা যে নীতি অবলম্বন করেছে সেটা হচ্ছে, দু'টো একটা খুচরো সংস্কারের আয়োজন দেখিয়ে সম্ভব হলে দু'চার জন লোককে হাত করে নেওয়া, আর জাতীয় আন্দোলনটাকে একেবারে পিষে গুঁড়ো করে দেওয়া।

ব্রহ্মদেশে ১৯৩১ সনে বুভুক্ষা-ক্লিষ্ট কৃষকরা প্রকাণ্ড একটা বিদ্রোহ করেছিল। সে বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে। জাভা এবং ইস্ট-ইণ্ডিজেও বিদ্রোহ হয়েছিল। শ্যামেও গোলমাল চলেছে, শাসন-ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে, রাজার ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফরাসি-ইন্দোচীনেও জাতীয় আন্দোলন জেগে উঠছে।

কাজেই দেখছ, প্রাচ্য জগতের সর্বত্রই জাতীয়তাবাদ বিকাশলাভের পথ খুঁজছে, কোনো কোনো স্থানে আবার একটুখানি কমিউনিজ্‌ম্‌ এর সঙ্গে এসে মিশেছে। এই দুটি মতবাদই সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষী; এছাড়া কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় কোথাও মিল নেই। সোভিয়েট রাশিয়া তার নিজের মধ্যেকার এবং বাইরেরও সমস্ত প্রাচ্য দেশের প্রতিই অতি বিজ্ঞোচিত এবং উদার আচরণ দেখাচ্ছে; এর ফলে আজ অনেক দেশই তার বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি বহু অ-কমিউনিস্ট দেশও।

গত ক'বছরে পৃথিবীতে আরও একটি বৃহৎ ব্যাপার ঘটেছে, সে হচ্ছে নারীদের মুক্তি—আইন, সমাজ এবং প্রাচীন রীতিনীতির বহু বন্ধনে এতকাল তাঁরা বাঁধা ছিলেন, সে নাগপাশ এখন খুলে পড়েছে। পাশ্চাত্য জগতে এই বন্ধনমোচনের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ধাক্কায়। কিন্তু তুরস্ক থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে চীনে, প্রাচ্যজগতেরও সর্বত্রই নারীরা এখন জেগে উঠেছেন, জাতীয় এবং সামাজিক সংস্কারের কাজে প্রকাণ্ড একটা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরা।

যে যুগে আমরা বাস করছি এই হচ্ছে তার পরিচয়। প্রতিদিনই আমরা সংবাদ পাচ্ছি, পৃথিবীতে কত কী পরিবর্তন হচ্ছে; বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে; জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধছে, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী এবং ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ ঘটছে; মানুষের দারিদ্র্য বাড়ছে, বাড়ছে সর্বহারাদের দৈন্য, আর সবার উপরে পড়েছে যুদ্ধের করাল ছায়া, সে যুদ্ধ দিন-দিনই আসন্ন হয়ে উঠছে।

ইতিহাসের এটি একটি অতি চাঞ্চল্যময় যুগ; এই যুগে বেঁচে থাকবার, এর জীবনযাত্রার অংশগ্রহণ করবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে—সে অংশগ্রহণ মানে যদি দেরাদুনের জেলখানায় নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন করা হয়, তবুও।

১৫৭

প্রজাতন্ত্রের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রাম

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৩

গত ক'বছরে যে-সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে, এবার আমরা সেগুলো নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করব। আয়ার্ল্যাণ্ডকে নিয়েই আমি কথা শুরু করছি। পৃথিবীর ইতিহাস এবং পৃথিবীর জীবনশক্তির দিক থেকে ইউরোপের দূর পশ্চিম-প্রান্তের এই ক্ষুদ্র দেশটির বর্তমানে বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড বীরের দেশ, অদম্য তার মন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

তার সমস্তখানি শক্তি নিয়েও এর মনের জোরকে ভাঙতে পারে নি, ভয় দেখিয়ে একে বশ মানাতে পারে নি।

আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে তোমাকে আমি বলেছি, মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি হোম-রুল বিল প্রণয়ন করেছিলেন। আল্‌স্টারের প্রোটেস্ট্যাণ্ট নেতারা এবং ইংলণ্ডের রক্ষণপন্থীদল এতে ক্রুদ্ধ হলেন; এই বিলের বিরুদ্ধে একটি রীতিমতো বিদ্রোহের আয়োজন করা হল। তাই দেখে তখন দক্ষিণ-আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীরাও তাদের "জাতীয় স্বেচ্ছা-সৈনিক বাহিনী" গড়ে তুলল, প্রয়োজন হলে তারা আল্‌স্টারের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অবস্থা দেখে মনে হল, আয়ার্ল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল; সমস্ত মানুষের সমস্তখানি মনোযোগ গিয়ে পড়ল বেলজিয়াম আর উত্তর-ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের উপর। পার্লামেণ্টে যে আইরিশ নেতারা ছিলেন তাঁরা যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা করলেন; কিন্তু দেশের লোক তখন এবিষয়ে উদাসীন, তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়াই মিলল না। ইতিমধ্যে আল্‌স্টারের 'বিদ্রোহী'রা ব্রিটিশ সরকারের বড়ো বড়ো পদে এসে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তার ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা আরও বেশি চটে গেল।

আয়ার্ল্যাণ্ডে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠল, সকলেই মনে করতে লাগল, এটা ইংলণ্ডেরই যুদ্ধ, এতে তাদের বলি দেওয়া কোনো মতেই চলবে না। এর মধ্যেই প্রস্তাব তোলা হল, ইংলণ্ডের মতো আয়ার্ল্যাণ্ডেও বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি প্রবর্তিত করা হবে, দেশের সমস্ত সমর্থ-দেহ যুবাপুরুষকেই জোর করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হবে। শুনে দেশের সর্বত্র লোকেরা ক্রোধে জ্বলে উঠল, স্পষ্ট ভাষায়ই এর প্রতিবাদ জানাল। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেও তারা এতে বাধা দেবে, তার জন্যও আয়ার্ল্যাণ্ড প্রস্তুত হয়ে উঠল।

১৯১৬ সনের ইস্টার-পর্বের সপ্তাহে ডাব্‌লিন শহরে বিদ্রোহ হল; একটি আইরিশ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল। অল্প কয়েকদিন যুদ্ধ করবার পর এই প্রজাতন্ত্র ব্রিটিশ সেনার হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তার পরে সামরিক আদালত বসল এবং এই সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহে যোগ দেবার অপরাধে আয়ার্ল্যাণ্ডের সবচেয়ে বীর এবং সবচেয়ে গুণী যুবাদের কয়েকজনকে গুলি করে মারা হল। এই বিদ্রোহটি 'ইস্টার বিদ্রোহ' বলে পরিচিত। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাবার চেষ্টা একে ঠিক বলা যায় না। এটা শুধু ছিল একটা বীরত্বের প্রকাশ, জগৎকে তারা হাতে কলমে দেখিয়ে দিল আয়ার্ল্যাণ্ড তখনও প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছে, স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ প্রভুত্বের কাছে মাথা নত করতে সে তখনও রাজি নয়। বিদ্রোহ যারা ঘটিয়েছিল সেই বীর যুবকেরা জেনেশুনেই নিজেদের জীবন বলি দিতে গিয়েছিল, শুধু জগতের সামনে এই কথাটি স্পষ্ট করে বলবার জন্য: তারা জানত সেবারে তাদের হার হবে, তবু তাদের মনে আশা ছিল তাদের সেই আত্মবলি ভবিষ্যতে একদিন ফল প্রসব করবে, দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই বিদ্রোহের কাছাকাছি সময়েই আরও একজন আইরিশম্যান ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন। ইনি জর্মানি থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করবার চেষ্টা করছিলেন। এঁর নাম সার্ রোজার কেস্‌মেণ্ট্, দীর্ঘকাল ধরে ইনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত-বিভাগে চাকরি করছিলেন। লণ্ডনে এঁর বিচার হল, বিচারের রায় হল, মৃত্যুদণ্ড। আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেস্‌মেণ্ট্ একটি লিখিত জবানবন্দি পাঠ করলেন; তার কথা আশ্চর্যরকম উন্মাদনা আর ভাষা-কুশলতায় পরিপূর্ণ; আইরিশদের মনে দেশপ্রেমের কী উচ্ছ্বাস বইছিল তার একটা বিরাট পরিচয় সেই লিপিতে তিনি দিয়ে গেলেন।

ইস্টার-বিদ্রোহ বিফল হল; কিন্তু সেই বিফলতাই হল তার জয়স্বরূপ। এর পরেই ব্রিটিশ সরকার যে নিদারুণ দণ্ডনীতি শুরু করলেন তার ফলে, এবং বিশেষ করে বিদ্রোহের সেই তরুণ নেতাদের গুলি করে মারার ফলে, আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। উপর থেকে মনে হল আয়ার্ল্যাণ্ড অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট হয়ে আছে; তলায় তলায় কিন্তু ক্রোধের অনির্বাণ অগ্নি জ্বলতে লাগল; অল্পদিনের মধ্যেই সে আগুন বাইরে আত্মপ্রকাশ করল 'সিন্-

ফিন্'-এর রূপ নিয়ে। সিন্ফিন্-এর মতামত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আয়ার্ল্যান্ড সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আমি তোমাকে এই সিন্ফিনের কথা বলেছি। প্রথমদিকে এই আন্দোলন তেমন সফল হয় নি; এবার এটা একেবারে দাবানল হয়ে জ্বলে উঠল।

মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরেই ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র লণ্ডনের পার্লামেণ্টের জন্য সভ্য নির্বাচনের হিড়িক পড়ল। আয়ার্ল্যান্ডে সিন্ফিন্ দল বেশির ভাগ আসন দখল করে ফেলল; পুরোনোকালের জাতীয়তাবাদীরা ঠেলা খেয়ে হটে গেলেন, এঁরা ব্রিটিশের সঙ্গে খানিকটা সহযোগিতা করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সিন্ফিন্ দলের লোকেরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হলেন, সেখানে গিয়ে বসবেন বলে নয়—তাঁদের নীতি ছিল একেবারেই উল্টো; তাঁরা অসহযোগ আর বর্জন নীতিতে বিশ্বাসী। অতএব এই নির্বাচিত সিন্ফিন্-পন্থীরা লণ্ডনের পার্লামেণ্টে গিয়ে হাজির হলেন না; তার বদলে ১৯১৯ সনে ডাবলিন শহরে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্রী আইনসভা প্রতিষ্ঠা করলেন। এঁরা ঘোষণা করলেন—আয়ার্ল্যান্ডে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে; এঁদের আইনসভার এঁরা নাম দিলেন 'ডেইল আয়ারিয়ান'। নামে এটি সমস্ত আয়ার্ল্যান্ডেরই প্রতিনিধি-সভা হল, আল্স্টারকেও সঙ্গে ধরে। আল্স্টার অবশ্য স্বভাবতই এর থেকে দূরে সরে রইল। ক্যাথলিক আয়ার্ল্যান্ডের প্রতি তার কিছুমাত্র সম্প্রীতি ছিল না। ডেইল আয়ারিয়ান ডি'ভ্যালেরাকে তার প্রেসিডেণ্ট এবং গ্রিফিথস্কে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করল। নবীন প্রজাতন্ত্রের এই দুই জন কর্ণধারই তখন ছিলেন ব্রিটেনের জেলখানাতে বন্দী।

তার পর শুরু হল একটি অত্যন্ত আশ্চর্য সংগ্রাম। আয়ার্ল্যান্ড আর ইংলণ্ডের মধ্যে এর আগেও অসংখ্যবার যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এমন অপূর্ব যুদ্ধ আর কখনও হয় নি; এ একেবারেই নূতন বস্তু। মুষ্টিমেয় কজন তরুণ আর তরুণী, তাদের পিছনে রয়েছে সমস্ত দেশবাসীর শুভকামনা: নিজের জোরেই দাঁড়িয়ে তারা লড়তে লাগল—অপরিমেয় বিঘ্ন-বিপদ তাদের চার-দিকে বিরাট একটি সুসংহত সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। সিন্ফিনদের সংগ্রামের নীতি ছিল একরকমের অসহযোগ, তার সঙ্গে সঙ্গে সহিংস কার্যকলাপও যুক্ত থাকত। এরা প্রচার করতে লাগল ইংরেজদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্রব বর্জন করো; যেখানে পারল সেইখানেই নিজেদের পাল্টা প্রতিষ্ঠান খাড়া করল; যেমন, সাধারণ আদালত তুলে দিয়ে তার জায়গাতে এরা নিজেদের সালিসী আদালত বসাল। গ্রাম-অঞ্চলে এরা গরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে পুলিশের ফাঁড়িগুলো নষ্ট করে দিতে লাগল। সিন্ফিন্ বন্দীরা পর্যন্ত জেলখানার মধ্যে অনশন করে ব্রিটিশ সরকারকে একেবারে নাজেহাল করে তুলল। এই অনশনের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে কর্ক শহরের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনির অনশন : সমস্ত আয়ার্ল্যাণ্ডে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গেল ঘটনাটি। ম্যাকসুইনিকে যখন জেলে পোরা হল, তিনি বললেন, 'জীবন্তই হোক আর মরেই হোক, জেলখানা থেকে বেরিয়ে আমি আসবই'। তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। পঁচাত্তর দিন উপবাসের পর তাঁর মৃতদেহ জেলখানার বাইরে বয়ে নিয়ে আসা হল।

সিন্ফিন্-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মাইকেল কলিন্স্। সিন্ফিন্দের রণকৌশলে আয়ার্ল্যান্ডে ব্রিটিশ সরকারের অধিকাংশ কাজকর্ম অচল হয়ে গেল; গ্রাম-অঞ্চলগুলোতে তো তার প্রায় অস্তিত্বই রইল না। ক্রমে দুই পক্ষই হিংসাবৃত্তিতে সুনিপুণ হয়ে উঠল, প্রায়ই পরস্পরকে আক্রমণ করে প্রতিশোধ নিতে লাগল। আয়ার্ল্যান্ডে পাঠাবার জন্য একটি বিশেষ ধরনের ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তৈরি করা হল। এর লোকদের খুব বেশি হারে মাইনে দেওয়া হত; যুদ্ধকালীন সেনাদলগুলি থেকে যে-সব সৈন্যকে সম্প্রতি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে মরিয়া এবং হিংস্রপ্রকৃতির লোকদেরই এই বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। এই বাহিনীর সৈন্যদের পোষাকের রং ছিল কালো আর বাদামি, তাই থেকে এই বাহিনীটিরই নাম হয়ে গেল 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান্'। এই ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যানরা দেশে রীতিমতো একটা হত্যাকাণ্ডের অভিযান শুরু করে দিল। বিছানায় নিদ্রিত লোককে পর্যন্ত এরা

গুলি করে মারত। এদের ভরসা ছিল, এমনি করে বিভীষিকা সৃষ্টি করলেই এরা সিন্‌ফিন্‌ দলকে কাবু করে ফেলবে। সিন্‌ফিন্‌রা কিন্তু তবুও হার মানতে রাজি হল না, সমানেই গরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান্‌রা তখন একেবারে ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করল, গ্রামকে গ্রামই তারা পুড়িয়ে দিতে লাগল, অনেক শহরেরও অধিকাংশ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল। গোটা আয়ার্ল্যান্ড দেশটাই একটা বিরাট রণক্ষেত্রে পরিণত হল, সেখানে দুই পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেয় কে কতখানি হিংসা আর ধ্বংসের বাহাদুরি দেখাতে পারে। এর এক পক্ষের পিছনে রয়েছে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সমস্ত সুসংহত শক্তি; অন্য পক্ষের সম্বল মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষের বজ্রকঠিন সংকল্প। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সনের অক্টোবর পর্যন্ত, পুরো দুইটি বছর ধরে এই ইঙ্গ-আইরিশ যুদ্ধ চলল।

ইতিমধ্যে ১৯২০ সনে ব্রিটিশ সরকার তাড়াহুড়ো করে নূতন একটি হোম-রুল বিল প্রণয়ন করে ফেললেন। মহাযুদ্ধের ঠিক আগে যে পুরোনো আইনটি তৈরি করা হয়েছিল, যেটাকে উপলক্ষ্য করে আল্‌স্টারে বিদ্রোহের উপক্রম হয়েছিল, সেটাকে নিঃশব্দে পরিত্যাগ করা হল। নূতন আইনটিতে আয়ার্ল্যান্ডকে আল্‌স্টার বা উত্তর-আয়ার্ল্যান্ড এবং দেশের বাকী অংশ —এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হল। এই দুই অংশে পৃথক দুইটি পার্লামেন্ট বসবে। আয়ার্ল্যান্ড এমনিতেই ছোটো দেশ; তার উপর আবার ভাগ হয়ে গিয়ে এর দুটি অংশই দাঁড়াল, ছোটো একটি দ্বীপের দুটি অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে। উত্তর-অঞ্চলের জন্য আল্‌স্টারে নূতন পার্লামেন্ট বসানো হল। কিন্তু দক্ষিণে, মানে আয়ার্ল্যান্ডের বাকি অংশটুকুতে, এই হোম-রুল বিলের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না। সেখানকার লোকেরা সকলেই তখন সিন্‌ফিন্‌-বিদ্রোহ চালাতে ব্যস্ত।

১৯২১ সনের অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড্‌ জর্জ সিন্‌ফিন্‌ নেতাদের কাছে একটি যুদ্ধ-বিরতির আবেদন পাঠালেন, বললেন দুপক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতে পারে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা করে দেখা হোক। নেতারা এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। ব্রিটেনের সহায়-সম্পদ প্রচুর, শেষপর্যন্ত আয়ার্ল্যান্ডের এই সিন্‌ফিন্‌কে নিঃশেষে চূর্ণ করে দিতেও সে পারত তাতে সন্দেহ নেই, সমস্ত দেশটাকেই একটা মরুভূমিতে পরিণত করে দেবার মতো শক্তি তার ছিল। কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডে যে নীতি সে অবলম্বন করেছিল তার দরুন আমেরিকায় এবং অন্যত্র লোকজন তার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠছিল। যুদ্ধ চালাবার সাহায্য হিসাবে আমেরিকার বাসিন্দা আইরিশদের কাছ থেকে, এমনকি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলো থেকে পর্যন্ত, জলস্রোতের মতো টাকাকড়ি আয়ার্ল্যান্ডে এসে হাজির হচ্ছিল। ওদিকে আবার সিন্‌-ফিন্‌রাও তখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে—তাদেরও অনেকখানিই কষ্ট সয়ে চলতে হচ্ছিল।

লন্ডনে ইংরেজ এবং আইরিশ প্রতিনিধিদের বৈঠক বসল; দু'মাস ধরে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর একটা অস্থায়ী চুক্তিপত্র রচিত হল, ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে এঁরা সে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এই সন্ধিপত্রে আইরিশ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করা হল না; কিন্তু দুটি একটি ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আয়ার্ল্যান্ডকে এতে অনেকখানিই স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হল; তখন পর্যন্ত কোনো ডোমিনিয়নও ততখানি স্বাধীনতা পায় নি। তবুও কিন্তু আইরিশ প্রতিনিধিরা সে সন্ধি মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। একে মেনে নিতে তাঁরা রাজি হলেন শুধু তখনই, যখন ইংলন্ড ভয় দেখাল, তখনও রাজি না হলে সে অবিলম্বে আয়ার্ল্যান্ডের সঙ্গে একেবারে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু করে দেবে।

এই সন্ধি নিয়ে আয়ার্ল্যান্ডে তুমুল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল; কতক লোক এর পক্ষে গেল, অন্যরা এতে ভয়ংকর আপত্তি তুলল। এই প্রশ্নটি নিয়ে মতভেদ হয়ে সিন্‌ফিন্‌ দলও দুই ভাগ হয়ে গেল। অবশেষে ডেইল আয়ারিয়ান্‌ এই সন্ধিকে স্বীকার করে নিল, আইরিশ ফ্রী স্টেটের সৃষ্টি হল—আয়ার্ল্যান্ডের সরকারি ভাষায় এর নাম 'সাওরস্টাট আয়ারিয়ান'। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই সিন্‌ফিন্‌ দলের দুই ভাগের মধ্যে, পুরোনো দিনের সেই সহকর্মীদের মধ্যেই, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ডেইল্‌ আয়ারিয়ানের প্রেসিডেন্ট ডি'ভ্যালেরা এবং আরও অনেকেই ইংলন্ডের সঙ্গে এই সন্ধির বিরোধী ছিলেন; গ্রিফিথ্‌স্‌ এবং মাইকেল কলিন্‌স্‌

প্রভৃতিরা ছিলেন এর পক্ষে। অনেক মাস ধরে দেশে গৃহযুদ্ধ চলল; সন্ধি এবং ফ্রী স্টেটের যারা পক্ষপাতী, বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করবার জন্য ব্রিটিশ সেনা তাদের সাহায্য করতে লাগল। মাইকেল কলিন্‌স্‌ প্রজাতন্ত্রীদের গুলিতে নিহত হলেন; তেমনই আবার প্রজাতন্ত্রীদলেরও বহু নেতা ফ্রী স্টেট্‌ দলের লোকদের গুলিতে মারা পড়লেন। প্রজাতন্ত্রী বন্দীতে জেলখানাগুলো ভরে গেল। স্বাধীনতার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ড চিরকাল বীরের মতো সংগ্রাম করে এসেছে; এই গৃহযুদ্ধ, পরস্পর-বিদ্বেষ সে সংগ্রামের অতি ভয়ংকর শোকাবহ পরিণতি। দেখা গেল, ইংরেজের অস্ত্র যেখানে ব্যর্থ হয়েছিল তার কূটনীতি সেখানে জয়ী হয়েছে; এখন আইরিশম্যানরাই নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরছে, ইংলণ্ড তাদের একপক্ষকে নিঃশব্দে খানিকটা সাহায্য করছে, আর সাধারণত বেশ নিস্পৃহ দৃষ্টিতেই তাকিয়ে মজা দেখছে। এই নূতনতর পরিস্থিতিতে তার আনন্দের অবধি নেই।

গৃহযুদ্ধ ক্রমে থেমে এল। কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা তখনও ফ্রী স্টেটকে মেনে নিতে রাজি নয়। এমনকি প্রজাতন্ত্রী যাঁরা ডেইলের (ফ্রী স্টেটের পার্লামেণ্ট) সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত ডেইলের সভায় উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন; তার কারণ আনুগত্যের শপথের মধ্যে রাজার নাম আছে, অতএব সে শপথ গ্রহণ করতে তাঁদের আপত্তি। অতএব ডি'ভ্যালেরা আর তাঁর দল ডেইল থেকে দূরে সরে রইলেন; আর অন্য দলটি মানে ফ্রী স্টেট দল, প্রজাতন্ত্রীদের বিধ্বস্ত করবার জন্য নানা রকম চেষ্টা-চরিত্র করতে লাগল—এর নেতা ছিলেন কসগ্রেভ, ফ্রী স্টেটের প্রেসিডেণ্ট।

আইরিশ ফ্রী স্টেট্‌ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য-নীতিতে কতকগুলি অতি দূর-প্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। আইরিশ সন্ধিতে আয়ার্ল্যাণ্ডকে যতখানি স্বাধীন অধিকার দেওয়া হয়েছিল, সে সময়ে অন্য কোনো ডমিনিয়ন আইনত ততখানি স্বাধীনতা পায় নি। আয়ার্ল্যাণ্ড এই অতিরিক্ত অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ডমিনিয়নগুলোও স্বভাবতই এগুলো পেয়ে গেল, অতএব ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস্‌ কথাটারই মানে খানিকটা বদলে গেল। তারপর ইংলণ্ড আর ডমিনিয়নগুলোর মধ্যে কয়েকটা সাম্রাজ্যিক সম্মেলন বসল, তার ফলে এর আবার আরও পরিবর্তন হল, ডমিনিয়নগুলো আরও কিছু বেশি অধিকার লাভ করল। আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্রীরা জোর আন্দোলন চালাচ্ছে, সে সারাক্ষণই পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করে নেবার জন্য চেষ্টা করছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকাও সেই চেষ্টা করছে, সেখানে বুয়ররা সংখ্যাগুরু। এমনি করে ডমিনিয়নগুলোর অবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং উন্নত হতে লাগল, শেষে একদিন তারা ব্রিটিশ জাতি-সংঘের অন্তর্স্থিত ব্রিটেনের সমান জাতি বলেই গণ্য হয়ে গেল। কথাটা শুনতে ভারি সুন্দর লাগে; এদের মধ্যে রাজনৈতিক মর্যাদার একটা সাম্য সাধনের ক্রমান্বিত চেষ্টারও আভাস এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের সে সমানত্ব নামে যতখানি কাজে ততখানি নয়। অর্থ-নৈতিক জীবনের দিক থেকে ডমিনিয়নগুলো এখনও ব্রিটেন আর ব্রিটিশ মহাজনদের তাঁবেদার; এদের উপরে অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে এদের বশে রাখবারও বহু উপায় ব্রিটেনের হাতে রয়েছে। ওদিকে আবার, ডমিনিয়নগুলোর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে ইংলণ্ডের স্বার্থের সংঘাত লাগবার সম্ভাবনা; তার ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে। বস্তুত সাম্রাজ্যটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে দেখেই ইংলণ্ড তার বন্ধন শিথিল করতে, ডমিনিয়নগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক সমতা স্বীকার করে নিতে রাজি হয়েছে। বুদ্ধিমানের মতো সময় থাকতে এইটুকু এগিয়ে গিয়ে সে অনেকখানি ক্ষতির হাত এড়িয়েছে। কিন্তু তবু সে বেশিদিনের জন্য নয়। ইংলণ্ডের কাছ থেকে ডমিনিয়নগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে যে-সব কারণে, সেগুলো এখনও বর্তমান; প্রধানত সে কারণগুলো অর্থনৈতিক। এরা ক্রমশই সাম্রাজ্যটাকে শক্তিহীন করে ফেলছে। এরই জন্য, এবং ইংলণ্ডের গতি এখন নিশ্চিত অবনতির দিকে জেনেই, আমি তোমাকে লিখেছিলাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। ডমিনিয়নগুলোর ইংলণ্ডের সঙ্গে অনেক মিল, তাদের জাতি এক, সংস্কৃতি এক, রীতিনীতি এক; তাদের পক্ষেই যদি ইংলণ্ডের সঙ্গে আর বেশিদিন একত্র থাকা কঠিন হয়ে থাকে, তবে ভারতবর্ষের

পক্ষে সেটা আরও কত বেশি কঠিন, বুঝতেই পার। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক স্বার্থ সোজাসুজিই ব্রিটিশ স্বার্থের বিরোধী; কাজেই এর এক পক্ষকে অপরের কাছে হার মানতেই হবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখবার মানেই হচ্ছে তার নিজের অর্থনৈতিক জীবন-নীতিকে ব্রিটেনের নীতির অনুগামী করে রাখা, স্বাধীন ভারতবর্ষ তা করতে রাজি হবে এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ জাতি-সংঘ বলতে আমারা বুঝি স্বাধীন ডমিনিয়নগুলোকে, দরিদ্র, পরাধীন ভারতবর্ষকে নয়। কাজেই এতে বোঝাচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যাদের আছে এমন কয়েকটা দেশকে। কিন্তু এরা সকলেই এখনও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে রয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে যে সন্ধি ব্রিটেন করল, তাতেও ব্রিটিশ মূলধনের হাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের এই শোষণকার্য খানিকটা চলতেই থাকবে তার ব্যবস্থা ছিল। এইখানেই আয়ার্ল্যাণ্ডের সত্যকার আপত্তি; এইজন্যই তারা প্রজাতন্ত্রের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিল। ডি'ভ্যালেরা এবং প্রজাতন্ত্রীরা ছিলেন দরিদ্রতর কৃষক, নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি। আর কসগ্রেভ এবং ফ্রী স্টেটওয়ালারা ছিলেন ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনী কৃষকদের প্রতিনিধি— ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য এই দুটি শ্রেণীর পক্ষেই লাভজনক, ব্রিটিশ ধনিকরা এদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসুক।

কিছুদিন পরে ডি'ভ্যালেরা স্থির করলেন তাঁর রণকৌশল পরিবর্তন করবেন। তাঁর দল-বল নিয়ে তিনি ডেইল আয়ারিয়ান-এ ঢুকলেন, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিলেন, সেটা তাঁরা করছেন শুধুমাত্র প্রচলিত রীতির খাতিরে; ডেইলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলেই তৎক্ষণাৎ তাঁরা এই শপথ-গ্রহণের রীতিটাকে তুলে দেবেন। এর পরের নির্বাচন হল ১৯৩২ সনের প্রথমদিকে। ডি'ভ্যালেরার দলই এবার ফ্রী স্টেট্ পার্লামেণ্টে অধিকাংশ আসন দখল করল। সঙ্গে সঙ্গেই ডি'ভ্যালেরা তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করতে লেগে গেলেন। ঠিক হল প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তখনও সমানে চালিয়ে যাওয়া হবে, তবে সে সংগ্রামের পদ্ধতি হবে অন্য রকম। ডি'ভ্যালেরা প্রস্তাব করলেন আনুগত্যের শপথটাকে তুলে দেওয়া হোক; ব্রিটিশ সরকারকে একথাও তিনি জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে আর তিনি ব্রিটেনকে জমির দরুন বার্ষিক কিস্তির টাকা দেবেন না। এই কিস্তির ব্যাপারটা কী, বোধ হয় তোমাকে একবার লিখেছিলাম। আয়ার্ল্যাণ্ডের বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের জমি যখন ব্রিটিশ সরকার নিজস্ব করে নেন, তখন সে জমির দরুন ভূস্বামীদের প্রচুর মূল্য চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল; তার পর আবার, যে কৃষকরা সে জমি চাষ করতে নিল তাদের কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে সেই টাকাটা কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করে নেওয়া হচ্ছিল। এক পুরুষেরও বেশি কাল ধরে এই ব্যাপার চলে এসেছে, তখনও চলছিল। ডি'ভ্যালেরা বললেন, আর টাকা দিতে তিনি রাজি নন।

শুনবামাত্র ইংলণ্ডে তুমুল আর্তনাদ উঠল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ডি'ভ্যালেরার ঝগড়া বাধল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম কথাই বললেন, ডি'ভ্যালেরা আনুগত্যের শপথ তুলে দিতে চাইছেন, এতে ১৯২১ সনের আইরিশ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে। ডি'ভ্যালেরা বললেন, তোমরাই তো বলছ ডমিনিয়নগুলো আর ইংলণ্ড সমান মর্যাদা-সম্পন্ন দেশ। তাই যদি হয়, তবে আয়ার্ল্যাণ্ড আর ইংলণ্ড তো দুটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত জাতির মতো; এবং উভয়েরই নিজের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করবারও অধিকার আছে। আনুগত্যের শপথটা আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত বস্তু; তাহলে আয়ার্ল্যাণ্ডেরও নিশ্চয়ই সেটা পরিবর্তন বা বর্জন করবার অধিকার আছে। ১৯২১ সনের সন্ধির কথা এখানে মোটে উঠতেই পারে না। আর এই অধিকারই যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের না থাকে তবে আর সে স্বাধীন হল কোথায়, তাকে তো তা'হলে ঐ পরিমাণে ইংলণ্ডের অধীন হয়েই থাকতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বার্ষিক কিস্তির টাকা বন্ধ করা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার আরও অনেক বেশি চেঁচামেচি শুরু করলেন। বললেন, এটা একটা প্রকাণ্ড অন্যায়। আয়ার্ল্যাণ্ড তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, দেনার টাকা দিতে অস্বীকার করছে। ডি'ভ্যালেরা একথা স্বীকার করলেন না, অতএব এই নিয়ে একটা আইনের তর্ক বাধল। সে তর্ক নিয়ে আমাদের প্রয়োজন

নেই। কিস্তির টাকা দেবার সময় এল, ডি'ভ্যালেরা টাকা দিলেন না। ইংলণ্ড তখন আয়াল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নূতন করে যুদ্ধ শুরু করল। এটা হল একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধ। আয়াল্যাণ্ড থেকে যত পণ্য ইংলণ্ডে আসত সকলের উপরেই অত্যন্ত বেশি করে রক্ষাশুল্ক বসানো হল। আইরিশ কৃষকরা তাদের কৃষিজাত পণ্য ইংলণ্ডের কাছে বেচত; এই শুল্ক বসালে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে, এবং সেই চাপে পড়ে তখন আইরিশ সরকার নিজের জিদ ছাড়তে বাধ্য হবে। যা তার চিরকেলে নিয়ম, অপর পক্ষকে বাধ্য করবার জন্য ইংলণ্ড তার ডাণ্ডা চালাতে শুরু করল। কিন্তু ডাণ্ডাবাজিতে এককালে যেমন কাজ হত, এখন আর তা হয় না। এর পাল্টা জবাব হিসাবে আইরিশ সরকারও ব্রিটেন থেকে যে-সব পণ্য আয়াল্যাণ্ডে যায় তার উপরে শুল্ক বসিয়ে দিলেন। এই অর্থনৈতিক যুদ্ধে দুপক্ষেরই কৃষক এবং কারখানাওয়ালাদের প্রচুর ক্ষতি সইতে হয়েছে। কিন্তু তবুও কোনো পক্ষই হার স্বীকার করতে পারছে না, আহত জাতীয়তাবোধ আর মর্যাদাবোধ এসে বাধা দিচ্ছে।

১৯৩৩ সনেরই প্রথম দিকে, আয়াল্যাণ্ডে আবার একটি নির্বাচন হয়ে গেছে; তার ফল দেখে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। এবারের নির্বাচনে ডি'ভ্যালেরা আগের বারের চেয়েও বৃহত্তর সাফল্য লাভ করেছেন; এবারকার পার্লামেণ্টে তাঁর দলের লোক আরও বেশি সংখ্যায় ঢুকে পড়েছে। এই থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে, ব্রিটেন যে অর্থনৈতিক উৎপীড়নের চাপ দিচ্ছিল, তার সে কূটচাল ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, ব্রিটিশ সরকার তারস্বরে চীৎকার করছেন আইরিশরা তাদের ঋণের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে না, অতএব তারা অতি পাষণ্ড; অথচ তাঁরা নিজেরাও কিন্তু আমেরিকার কাছে তাঁদের যে পর্বত-প্রমাণ ঋণ রয়েছে সেটা শোধ দেবার ইচ্ছা রাখেন না।

ডি'ভ্যালেরা এখন আইরিশ সরকারের পরিচালক; এক পা এক পা করে তাঁর দেশকে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রজাতন্ত্রের দিকে। আনুগত্যের শপথটাকে ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক কিস্তির টাকা দেওয়াও চিরতরেই বন্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো কাল থেকেই একজন গভর্নর-জেনারেল আয়াল্যাণ্ডে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তিনিও আর নেই—সে পদটিতে ডি'ভ্যালেরা বসিয়েছেন তাঁর নিজেরই দলের একজন লোককে, পদটারও গুরুত্ব এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আয়াল্যাণ্ড এখনও সংগ্রাম চালাচ্ছে, তবে সে সংগ্রামের রীতি এখন বদলে গেছে। বহু শতাব্দী ধরে ইংলণ্ডের সঙ্গে আয়াল্যাণ্ডের যুদ্ধ চলে আসছিল সে যুদ্ধ আজও বন্ধ হয় নি, এখন সেটা রূপ নিয়েছে একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধের।

হয়তো আর অল্পদিনের মধ্যেই আয়াল্যাণ্ড একটা প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে। কিন্তু তার পথে একটি বড়ো বাধা। ডি'ভ্যালেরা আর তাঁর দলের সবচেয়ে বড়ো কামনা হচ্ছে একটি সমগ্র আয়াল্যাণ্ড, একটি দেশব্যাপী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা; সমস্ত দ্বীপটিকে নিয়েই একটি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁরা স্থাপন করতে চান, তার মধ্যে আলস্টারও থাকবে এই তাঁদের ইচ্ছা। অতি ছোটো দেশ আয়াল্যাণ্ড, তাকে দুই খণ্ড করে রাখা যায় না। কিন্তু সেই আলস্টারকে কী করে বাকি আয়াল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগ দেয়ানো যায়, এইটাই হচ্ছে এখন ডি'ভ্যালেরার বড়ো সমস্যা। গায়ের জোরে সম্পন্ন হবার বস্তু এ নয়। ১৯১৪ সনে ব্রিটিশ সরকার একবার সে চেষ্টা করে দেখেছিলেন, তার ফলে দেশে বিদ্রোহের উপক্রম হয়েছিল। আলস্টারকে গায়ের জোরে বাধ্য করবার শক্তি ফ্রী স্টেটের নিশ্চয়ই নেই, সে চেষ্টা করবার ইচ্ছাও সে রাখে না। ডি'ভ্যালেরার আশা, হয়তো তিনি আলস্টারের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারবেন, এবং সেই সম্প্রীতির সূত্র দিয়েই দেশের দুটি অংশকে একত্র বেঁধে দিতে পারবেন। তাঁর এই আশাটাকে একটু অযৌক্তিক বলেই মনে হয়—এ যেন বড়ো বেশি আশা করা। প্রোটেস্ট্যাণ্টের দেশ আলস্টার, ক্যাথলিক আয়াল্যাণ্ডের উপরে তার চিরদিন তীব্র অবিশ্বাস, সে অবিশ্বাস এখনও ঘোচে নি।

মন্তব্য (১৯৩৮):—দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম কয়েক বছর চলার পরে, দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এক চুক্তিসম্পাদনের দ্বারা শেষ হয়েছে। এই চুক্তিটা ফ্রী স্টেটের পক্ষে খুবই

অনুকূল হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা বার্ষিক করদান ও অন্যান্য আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মিঃ ডি'ভ্যালেরা সাধারণতন্ত্রের পথে আরও এগিয়ে গেলেন এবং ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ও ব্রিটিশরাজের সহিত আরও কয়েকটি যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেললেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের নাম এখন আয়ার। আয়ারের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হল ঐক্যবিধান অর্থাৎ যাতে আলস্টার তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আলস্টার এখনও রাজী হচ্ছে না।

১৫৮

ভস্মস্তূপ থেকে নবীন তুরস্কের আবির্ভাব

৭ই মে, ১৯৩৩

গত চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ড কী দারুন যুদ্ধই করেছে। আয়ার্ল্যাণ্ড এবং তুরস্কের মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই; তবু আজ আমার মনে নবীন তুরস্কের কথাই জেগে উঠেছে, তাই তার কথাই আজ তোমাকে আমি বলব। আয়ার্ল্যাণ্ডের মতোই তুরস্কেরও সামনে বিরাট পরিমাণ বাধা-বিঘ্ন ছিল, আয়ার্ল্যাণ্ডেরই মতো সেও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য সংগ্রাম চালিয়েছে। মহাযুদ্ধের ফলে তিনটি সাম্রাজ্যের বিলোপের ইতিহাস আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি—রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্মনি। আরও একটি বড়ো সাম্রাজ্য এই ধাক্কায় ভেঙে পড়েছিল, সে হচ্ছে তুরস্কের অটোম্যান-সাম্রাজ্য। ছ'শো বছর আগে অটোম্যান আর তাঁর বংশধরেরা এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন। কাজেই দেখছ, রাশিয়ার রোমানফ বংশ বা প্রাশিয়া এবং জর্মনির হোহেনজোলার্ন বংশের তুলনায় এই রাজবংশটি অনেক বেশি প্রাচীন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম হাপ্স্বুর্গ রাজবংশ আর অটোম্যান রাজবংশ প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এই দুটি প্রাচীন রাজবংশের পতনও হল একই সঙ্গে।

মহাযুদ্ধে জর্মনির অল্প কয়েকদিন মাত্র আগে তুরস্ক পরাস্ত হল, মিত্রপক্ষের সঙ্গে সে আলাদা ভাবেই সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করল। দেশটা তখন বস্তুত ভেঙে একেবারে টুক্রো টুক্রো হয়ে গেছে, সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব গেছে লুপ্ত হয়ে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে। ইরাক এবং আরব-অঞ্চলের দেশগুলো, সমস্ত তার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেগুলো বেশির ভাগই তখন মিত্রপক্ষের দখলে। খোদ কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ শহরটাও তখন মিত্রপক্ষের হাতে গিয়ে পড়েছে; আর শহরের ঠিক সামনে, বসফরাসের বুকের উপর ব্রিটিশ রণতরীগুলো নোঙর করে আছে—বিজয়ের গৌরব ঘোষণা করছে। যেদিকে চাও সেই দিকেই ইংরেজ ফরাসি আর ইতালীয় সেনা; দেশের সর্বত্র ব্রিটেনের গুপ্তচর কিলবিল করছে। তুরস্কের দুর্গগুলোকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হচ্ছে, সেনা বলতে যে কজন তখনও অবশিষ্ট ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এন্‌ভার পাশা, তালাত বেগ প্রভৃতি তরুণ তুর্কি দলের নেতারা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেছেন। সুলতান সিংহাসনে বসে আছেন পুতুল-খলিফা ওয়াহিদ্‌উদ্দীন; তাঁর চেষ্টা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেমন করে পারেন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, দেশ রসাতলে যায় যাক। ব্রিটিশ সরকারের অনুগৃহীত আরেকটি পুতুলকে প্রধান উজীর করে দেওয়া হয়েছে। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

১৯১৮ সনের শেষ এবং ১৯১৯ সনের প্রথম দিকে এই দাঁড়িয়েছিল তুরস্কের অবস্থা। তুর্কিরা তখন একেবারেই শ্রান্তক্লান্ত, মনও ভেঙে পড়েছে তাদের। কী ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাদের লড়ে আসতে হয়েছিল মনে করে দেখো। বিশ্বযুদ্ধ চলেছে চার বছর ধরে, তার আগেই গিয়েছে বল্কান যুদ্ধ, তারও আগে আবার গেল ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ; আর এই সমস্তগুলোই এল তরুণ তুর্কি-বিপ্লব শেষ হতে না হতেই—যে বিপ্লবে সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসন-

চ্যুত করা হয়েছিল, দেশে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তুর্কিরা চিরদিনই আশ্চর্য সহনশক্তি দেখিয়ে এসেছে; তবু এই প্রায় একটানা আট বছর ধরে যুদ্ধ; এর ধাক্কা তারা সামলাতে পারল না—যে-কোনো জাতির পক্ষেই এ সামলানো অসম্ভব ছিল। অতএব এবার তারা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ল; দুরদৃষ্টকেই স্বীকার করে নিয়ে, মিত্রপক্ষ তাদের সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্ত করে তার প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে রইল।

এর বছর দুই আগে, যুদ্ধের মাঝখানে, মিত্রপক্ষ ইতালির সঙ্গে একটা গোপন সন্ধি করেছিলেন, স্মার্না এবং এশিয়া-মাইনরের পশ্চিম-অঞ্চলটা ইতালিকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এরও আগেই কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ শহরটি রাশিয়াকে উপহার দেওয়া হয়ে গেছে—অবশ্য কাগজ-কলমে; আরব দেশগুলোকেও মিত্রপক্ষের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করা শেষ। এশিয়া-মাইনর ইতালিকে দেবেন বলে এই-যে শেষ সন্ধিটি এঁরা করলেন, রাশিয়াকে বাধ্য হয়েই তাতে সম্মতি দিতে হল। কিন্তু ইতালির ভাগ্য খারাপ, শুভকাজটা সম্পন্ন হবার আগেই রাশিয়া বল্‌শেভিকদের হাতে চলে গেল; সন্ধির প্রতিশ্রুতিও আর রক্ষিত হল না। ইতালি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল, মিত্রদের উপরে দারুন চটে গেল।

এই তো দশা। তুর্কিরা তখন একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে, মিত্রপক্ষের পা-চাটা সুলতানটি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম প্রজা পর্যন্ত সবাই। 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিটির' এতদিনে মৃত্যু হল, অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখনো দু'চারজন তুর্কি মাথা নত করতে রাজি নয়, তার সঙ্গে লড়াই করে জেতবার আশা যতই সামান্য হোক। নিঃশব্দে এবং গোপনে তাঁরা কাজ করে চললেন। রণসম্ভারের সমস্ত গুদাম তখন বস্তুত মিত্রপক্ষের হাতে গিয়ে পড়েছে, সেই গুদাম থেকেই এঁরা অস্ত্রশস্ত্র রণসজ্জা সরিয়ে আনতে লাগলেন, এনে সেগুলোকে জাহাজে করে কৃষ্ণসাগরের পথে আনাতোলিয়ার (এশিয়া-মাইনর) অভ্যন্তর প্রদেশে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। এই গোপন কর্মীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মুস্তাফা কামাল পাশা, এঁর নাম আমি অনেকগুলো চিঠিতেই বলেছি।

ইংরেজরা মুস্তাফা কামালকে মোটেই পছন্দ করত না। তাঁর উপরে তাদের সন্দেহ পড়ল, তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই চাইল তারা। সুলতান তো একেবারেই ইংরেজের হাতের লোক, তিনিও কামালকে দেখতে পারতেন না। তিনি ভাবলেন, কামালকে দেশের বহুদূর অভ্যন্তর অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেই তিনি নিরাপদ হতে পারবেন। অতএব কামাল পাশাকে পূর্ব-আনাতোলিয়াতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল করে পাঠানো হল। পরিদর্শন করবার মতো সেনা-বাহিনী বলতে সেখানে বস্তুত কিছুই ছিল না। আসলে সেখানে কামালের কাজ হবে, তুর্কি সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আদায় করে নিয়ে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করা। কামালের পক্ষে এটা একটা অপূর্ব সুযোগ, তিনি একে হাতছাড়া হতে দিলেন না, অবিলম্বে রওয়ানা হয়ে চলে গেলেন। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে ভালোই করেছিলেন বলতে হবে, কারণ তাঁর যাত্রা করবার ঘণ্টা কয়েক পরেই আবার সুলতানের মত বদলে গেল। কামালের ভয়ে আবার তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন; দুপুর রাত্রে তিনি ইংরেজদের কাছে খবর পাঠালেন, কামালের যাওয়া বন্ধ কর। কিন্তু তখন পাখী উড়ে গেছে।

মুষ্টিমেয় কজন তুর্কি সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কামাল পাশা জাতি-সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন, আনাতোলিয়াতে মিত্রপক্ষকে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রথমটা তাঁরা নিঃশব্দে এবং অতি সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলেন; তাঁদের লক্ষ্য হল, আনাতোলিয়াতে যে সেনাবাহিনী অবস্থিত ছিল তার বড়ো কর্তাদের নিজের দলে টেনে নেওয়া। বাইরে তাঁরা সুলতানের কর্মচারী বলেই পরিচয় দিতেন, কিন্তু কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ থেকে যে আদেশ ও নির্দেশ আসত তার দিকে তাঁরা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করতেন না। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রের গতিও তাঁদের সহায়ক হয়ে উঠল। ককেশাস-অঞ্চলে ইংরেজরা একটা আর্মানি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিল, কথা দিয়েছিল তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ-গুলিকেও তার অন্তর্গত করে দেবে। (এই আর্মানি প্রজাতন্ত্র এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা অংশে পরিণত হয়েছে)। আর্মানি আর তুর্কিদের মধ্যে নিদারুন শত্রুতা, অতীত কালে

মুস্তাফা কামালের তুরস্ক-রক্ষা
সোভিয়েট রাশিয়া
টিফ্লিস
আর্মেনিয়া
ইর্জেরাম
ট্রেবিজন্ড
সাম্সুন
সাকারিয়া
অ্যাঙ্গোরা
সিবাস
কাইসারি
ইস্কেসেহির
অ্যাফিয়াম
কারাহিসার
স্মার্না
দিয়ারবেকর
আদালিয়া
আলেপ্পো
ইউফ্রেটিস
সিরিয়া
মসুল
টাইগ্রিস
ইরাক
রেলপথ (কামালের পূর্বে)
তীরচিহ্ন দ্বারা কামালের
আক্রমণ ও গ্রীকদের
পলায়ন নির্দেশিত হয়েছে

এদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিও বহুবার হয়েছে। তুর্কিরা যতদিন দেশের রাজা ছিল ততদিন এই রক্তপাতের খেলায় তারাই বরাবর জিতেছে, বিশেষ করে আবদুল হামিদের আমলে। এখন যদি সেই তুর্কিদের এনে আর্মানিদের অধীন করে দেওয়া হয়, তার মানেই প্রায় দাঁড়াবে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু। অতএব আনাতোলিয়ার পূর্ব-অঞ্চলের তুর্কিরা অতি আগ্রহভরেই কামাল পাশার আহ্বান এবং যুক্তিতর্ক কান পেতে শুনতে লাগল।

ইতিমধ্যে আরও একটা নূতন এবং বৃহত্তর ব্যাপার ঘটল; তার ধাক্কায় তুর্কিরা একেবারে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের সঙ্গে ইতালি যে গোপন সন্ধি করেছিল তার শর্ত পূরণ হয় নি; ১৯১৯ সনের প্রথমদিকে ইতালি তাকে কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করল, এশিয়া-মাইনরে এনে তার সেনা নামিয়ে দিল। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের এটা মোটেই ভালো লাগল না; তখন ইতালির প্রশ্রয় বাড়িয়ে দিতে তারা রাজি নয়। অন্য কোনো পন্থা ভেবে না পেয়ে তারা এরূপ ব্যবস্থায় রাজী হল যে, ইতালি এসে পড়বার আগেই গ্রীক সেনা স্মার্না দখল করে বসবে, যাতে ইতালির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই কাজের জন্য গ্রীকদেরই তারা মনোনীত করল কেন? ফরাসি এবং ইংরেজ সেনারা রণশ্রান্ত, তারা তখন প্রায় বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়ে রয়েছে। তারা চাইছে—সেনাদল ভেঙে দেওয়া হোক, আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র বাড়িতে ফিরে যেতে চাই। গ্রীকদের ওদিকে হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে; তাছাড়া গ্রীক সরকারও তখন স্বপ্ন দেখছেন এশিয়া-মাইনর এবং কন্স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ দুটোকেই তাঁরা দখল করে নেবেন, নিয়ে প্রাচীন বাইজান্‌টিন-সাম্রাজ্যকে আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। লয়েড জর্জ তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, মিত্রপক্ষের পরামর্শসভাতেও তাঁর দারুন প্রতিপত্তি। দৈবক্রমে গ্রীসের দুজন অত্যন্ত কর্মদক্ষ লোক ছিলেন তাঁর বন্ধু। এঁদের একজন হচ্ছেন ভেনিজেলস্‌, গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী। অন্যজন একটি অত্যন্ত রহস্যে ঢাকা মানুষ। এখন এঁকে সবাই সার্‌ বেসিল জাহারফ্‌ বলে জানে; কিন্তু এঁর আগের নাম ছিল বেসিলীয়স্‌ জ্যাকেরিয়াস্‌। ১৮৭৭ সনে ইনি একটি ব্রিটিশ রণসজ্জা-নির্মাণের কারখানার প্রতিনিধি হয়ে বল্‌কান-অঞ্চলে যান, তখন এঁর অল্প বয়স। বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল ইনি ইউরোপের মধ্যে, এবং হয়তো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে বসেছেন; বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনীতিবিদ আর সমস্ত দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ এঁকে একটু খাতির দেখাতে পারলে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন। ইংলণ্ড থেকে খুব বড়ো বড়ো খেতাব এঁকে দেওয়া হল, ফ্রান্সও অনেক খেতাব এঁকে দিল। অনেকগুলি সংবাদপত্রের তিনি মালিক; নিজে আড়ালে থাকতেন; কিন্তু বহু দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ অনেকখানি তাঁরই ইঙ্গিতে চলত বলে লোকের ধারণা। সাধারণ লোকে এঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না, তিনি নিজেও লোকের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে থাকতেন। বস্তুত ইনি ছিলেন আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক মহাজনের একটি খাঁটি নমুনা; দেশে দেশে এঁদের আদর এবং প্রতিপত্তি, এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের সরকাররা পর্যন্ত কিছু পরিমাণে এঁদের ইঙ্গিতে চলেন। এই-সব দেশের লোকেরা মনে করে তারা নিজেরাই নিজেদের শাসন করছে; কিন্তু তাদের পিছনে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকে রাজ্যের সত্যকার শাসক—সে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহাজনের টাকার জোর।

এত ধন, এত প্রতিপত্তি জাহারফের এল কোথা থেকে? তাঁর ব্যবসায় ছিল সকল রকমের রণসজ্জা বিক্রি করা; সে ব্যবসাতে প্রচুর লাভ, বিশেষ করে বল্‌কান দেশে। অনেকের কিন্তু ধারণা, একেবারে প্রথম থেকেই তিনি ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের লোক ছিলেন। এতে তার ব্যবসায়ের খুব সুবিধে হত, রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবারও সুযোগ মিলত। পৃথিবীতে বারবার যুদ্ধ বাধবার ফলে তাঁর কোটি কোটি টাকা আয় হতে লাগল; এবং এমনি করেই তিনি ক্রমে আজকের এই রহস্যময় বৃহৎ ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এই অদ্ভুত ধনশালী এবং রহস্যময় ব্যক্তিটি এবং ভেনিজেলস্‌, এঁদের পাল্লায় পড়ে লয়েড জর্জ এশিয়া-মাইনরে গ্রীক সেনা পাঠানোর ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। জাহারফ বললেন, এই অভিযানের সমস্ত টাকা তিনিই যোগাবেন। ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি যে-কবার লোকসান দিয়েছেন

তার মধ্যে এই ব্যাপারটি অন্যতম; শোনা যায় তুর্কিদের সঙ্গে এই যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের দশ কোটি ডলার ধার দিয়েছিলেন, সে টাকা আর তিনি ফিরে পান নি।

ব্রিটিশ জাহাজে করে গ্রীক সেনা এশিয়া-মাইনরে গিয়ে পৌঁছল। ১৯১৯ সনের মে মাসে তারা স্মার্নায় অবতরণ করল, ব্রিটিশ ফরাসি আর আমেরিকান রণতরীর পাহারার আড়াল দিয়ে। তীরে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের প্রীতি-উপহার এই গ্রীক সেনারা একেবারে ভয়াবহ রকমের নরহত্যা আর অত্যাচার শুরু করে দিল। এমনই একটা বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করল এরা যে, তা দেখে যুদ্ধশ্রান্ত পৃথিবীর অবসন্ন মনও আতঙ্কে শিউরে জেগে উঠল। খাস তুরস্কে তো এ হল একেবারে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; কারণ মিত্রপক্ষের হাতে তাদের ভালো কী ফল সঞ্চিত হয়ে আছে তার স্বরূপ এবার তুর্কিরা ভালো করেই দেখতে পেল। এমনি করে তাদের নিহত লাঞ্ছিত করাচ্ছে তারা, আর করাচ্ছে তাদেরই পুরোনো শত্রু গ্রীকদের হাত দিয়ে, এই সেদিন পর্যন্ত যারা ছিল তাদেরই অধীন প্রজা! তুর্কিদের হৃদয়ে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল; দেশে জাতীয় আন্দোলন বেড়ে উঠল। অনেকে সত্যই বলেছেন, কামাল পাশা এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সৃষ্টি করেছিল স্মার্না দখলকারী গ্রীক সেনা। তুর্কি সেনানীদের মধ্যে অনেকে তখন পর্যন্ত মন স্থির করতে পারছিলেন না কোন দিকে যাবেন, এবার তাঁরাও এসে আন্দোলনের পক্ষে যোগ দিলেন, যদিও তখন তার মানে হচ্ছে সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—সুলতান ইতিমধ্যে কামাল পাশাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়ে বসেছেন।

১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, আনাতোলিয়ার মধ্যে সিবাস্ নামক একটা স্থানে, প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। এই সভা তুর্কিরা যে নূতন প্রতিরোধাত্মক যুদ্ধ করছে তাকে সংগত বলে অনুমোদন করল; একটি কার্যকরী সমিতি তৈরি করল, কামাল তার সভাপতি। একটি 'জাতীয় সন্ধিপত্র'ও এঁরা রচনা এবং মঞ্জুর করলেন, তাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধির শর্ত যথাসম্ভব কম করে বলা হল, সুতরাং সে সন্ধির অর্থ দাঁড়াল প্রায় তুরস্কের পূর্ণ স্বাধীনতা। দেখে শুনে কনস্টান্টিনোপ্‌লে সুলতান প্রভাবিত হয়ে পড়লেন, একটু ভয়ও পেলেন। তিনি কথা দিলেন, পার্লামেন্টের একটি নূতন অধিবেশন বসাবেন; নির্বাচনেরও হুকুম জারি করলেন। এই নির্বাচনে সিবাস কংগ্রেসের সভ্যরাই খুব বেশির ভাগ আসন দখল করে বসলেন। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের কর্তাদের কামাল বিশ্বাস করতেন না; এই সদ্য-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিনি উপদেশ দিলেন, কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে যেয়ো না। এঁরা কিন্তু সেকথা মানতে চাইলেন না, রাউফ বেগকে দলপতি করে এঁরা ইস্তাম্বুলে (এখন থেকে আমি কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লকে এই নামেই উল্লেখ করব) গিয়ে হাজির হলেন। এঁদের যাবার একটা কারণ ছিল এই, মিত্রপক্ষ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন, নূতন পার্লামেন্টের অধিবেশন যদি ইস্তাম্বুলে বসে এবং সুলতান তার সভাপতি থাকেন, তবে সে পার্লামেন্টকে তাঁরা বৈধ বলে স্বীকার করে নেবেন। কামাল নিজেও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গেলেন না।

১৯২০ সনের জানুয়ারি মাসে ইস্তাম্বুল শহরে নূতন পার্লামেন্টের অধিবেশন হল। সিবাস কংগ্রেসে যে 'জাতীয় সন্ধিপত্র' রচিত হয়েছিল, এই পার্লামেন্ট অবিলম্বে সেইটিকেই মঞ্জুর বলে গ্রহণ করল। ইস্তাম্বুলে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এতে মোটেই প্রসন্ন হলেন না; এই পার্লামেন্ট আরও অনেকগুলো কাজ করল যা তাঁদের পছন্দ নয়। অতএব মিশরে এবং অন্যত্র এঁরা যে কদর্য চাল চিরকাল দেখিয়ে এসেছেন, ছ'সপ্তাহ পরে এখানেও তাঁরা সেইটেই প্রয়োগ করে বসলেন। ইংরেজ সেনাপতি সৈন্য নিয়ে ইস্তাম্বুলে এসে প্রবেশ করলেন, শহর দখল করলেন, সেখানে সামরিক আইন জারি করলেন, রাউফ বেগ সমেত চল্লিশজন জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করলেন, এবং তাঁদের মাল্‌টা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রিটিশদের এই অতি নম্র আচরণটা আর কিছুই নয়, তুরস্ককে এর দ্বারা তাঁরা শুধু এইটুকুই ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে 'জাতীয় সন্ধিপত্রটা' মিত্রপক্ষের ঠিক মনঃপূত হয় নি।

আবার তুর্কিরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার সকলেই স্পষ্ট বুঝল সুলতান

একেবারেই ব্রিটিশের হাতের পুতুল হয়ে গেছেন। বহু তুর্কি প্রতিনিধি পালিয়ে আঙ্গোরাতে চলে গেলেন। সেখানে পার্লামেন্টের অধিবেশন হল; এই পার্লামেণ্ট নিজের নামকরণ করল, "তুর্কির জাতীয় মহাসভা' (Grand National of Turkey)। এই মহাসভা নিজেকে দেশের শাসনকর্তা বলে প্রচার করল; ঘোষণা করল, ব্রিটিশরা যেদিন ইস্তাম্বুল শহর দখল করেছে সেই দিন থেকেই সুলতান এবং তাঁর ইস্তাম্বুলস্থ সরকারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে।

সুলতান এর জবাবে কামাল পাশাকে এবং অন্যান্য সভ্যদের 'আইনের আশ্রয়বহির্ভূত দুর্বৃত্ত' বলে ঘোষণা করলেন, ধর্মগত সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত 'একঘরে' করে দিলেন, এবং তাঁদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করলেন। এরও উপরে আবার তিনি প্রচার করলেন, কামালকে এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের কাউকে যদি কেউ খুন করে, তবে সেটা একটা ধর্মগত কর্তব্য পালন করা হবে, সে ব্যক্তি তার জন্য ইহলোকে পুরস্কার এবং পরলোকে পুণ্যের অধিকারী হবে। মনে রেখো, এই সুলতানই আবার খলিফা অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। তাঁর নিজের মুখ থেকে এই নরহত্যার প্রকাশ্য আহ্বান, এ বড়ো ভয়ংকর বস্তু। কামাল পাশা কেবল পলাতক রাজবিদ্রোহী নন, ধর্মদ্রোহী পতিত ব্যক্তি, যে কোনো ধর্মান্ধ বা ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি তাঁকে অবাধে হত্যা করতে পারে। জাতীয়তাবাদীদের বিচূর্ণ করবার জন্য সুলতান তাঁর যেখানে যতটুকু শক্তি সমস্ত প্রয়োগ করলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি একটা জেহাদ্ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন; তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অসামরিক প্রজাদের নিয়ে একটা 'খলিফার সেনা' গড়ে তুললেন। দেশের সর্বত্র ধর্মপ্রচারকদের পাঠিয়ে দিলেন, তারা এ'দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য লোককে উত্তেজিত করতে লাগল। সর্বত্রই বিদ্রোহ দেখা দিল; কিছু দিন ধরে তুরস্কের সর্বত্র জুড়েই গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। এ অত্যন্ত নৃশংস যুদ্ধ, এক শহরের সঙ্গে অন্য শহরের যুদ্ধ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের যুদ্ধ; দুই পক্ষই সে যুদ্ধে একেবারে নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখাতে লাগল।

এদিকে আবার স্মার্নায় যে গ্রীকরা এসে বসেছিল, তারা এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন তারাই দেশের চিরকালের মনিব, আর সে মনিবও বড়ো বর্বর মনিব। বহু উর্বর উপত্যকা-ভূমিকে তারা শস্যহীন প্রান্তরে পরিণত করল, হাজার হাজার গৃহহীন তুর্কিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। তাদের সে অগ্রগতিকে তুর্কিরা প্রায় কোনো বাধাই দিতে পারল না।

জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে সেটা একটা চরম সংকটের মুহূর্ত : দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলেছে, সে যুদ্ধে ধর্মের অনুশাসন রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে; ওদিকে আবার একটা বিদেশী সেনার অভিযান তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে; এবং সে সুলতান আর গ্রীকসেনা, দু'য়েরই পিছনে থেকে শক্তি যোগাচ্ছে প্রবল মিত্রশক্তি। জর্মনির পরাজয়ের ফলে এখন জগৎজুড়ে তাদেরই প্রভুত্ব। তবুও কামাল দমলেন না, তাঁর অনুগামীদের প্রতি তাঁর বাণী ছিল, 'জিতব, না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব'। একজন আমেরিকান এই সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জাতীয়তা-বাদীরা যদি হেরে যায় তবে তখন তিনি কী করবেন। কামাল উত্তর দিয়েছিলেন : "জীবন এবং স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মোৎসর্গ করতে পারে যে জাতি, সে হারে না। হারলে বুঝতে হবে সে জাতিটা বেঁচে নেই।"

তুরস্কের জন্য মিত্রপক্ষ যে সন্ধিপত্র খাড়া করেছিলেন, ১৯২০ সনের আগস্ট মাসে সেটি প্রকাশ করা হল। এর নাম ছিল সেভার্স-এর সন্ধি। এই সন্ধির মানে ছিল তুরস্কের স্বাধীনতার অবসান, স্বাধীন জাতি হিসাবে তুরস্কের প্রতি এতে একেবারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সন্ধিতে দেশটাকে তো কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল, ইস্তাম্বুল শহরের মধ্যে পর্যন্ত একটি মিত্রপক্ষীয় কমিশন বসে থাকবে, দেশের উপর কর্তৃত্ব করবে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশের সর্বত্র শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল; একটি দিন দেশসুদ্ধ লোক প্রার্থনা আর হরতাল করে অর্থাৎ সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে, জাতীয় শোকপ্রকাশ-দিবস পালন করল। সংবাদপত্রগুলোর চার ধারে কালো রেখা ছেপে দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু তাহলে হবে কি, সুলতানের প্রতিনিধিরা যে সে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে বসে আছেন। জাতীয়তাবাদীরা স্বভাবতই

এই সন্ধিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। সন্ধিটি সাধারণের কাছে প্রকাশ করার ফলে তাঁদেরই শক্তি বেড়ে উঠল, দলে দলে তুর্কিরা তাঁদের দলে গিয়ে যোগ দিল, এই চরম দুর্গতি থেকে দেশকে রক্ষা করবার তাঁরাই একমাত্র লোক।

সন্ধি তো হয়েছে, এখন এই বিদ্রোহোন্মুখ তুর্কিদের উপরে সে সন্ধি জারি করবে কে? মিত্রপক্ষ নিজে সে কাজ করতে যেতে রাজি নন। তাঁদের সেনাবাহিনী তখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নিজের নিজের দেশের মধ্যে কর্মচ্যুত সৈন্য আর শ্রমিকরা খাপ্পা হয়ে রয়েছে, তার ধাক্কা সামলাতেই তাঁরা অস্থির। পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে তখনও হাওয়ায় বিপ্লবের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। তার উপর আবার মিত্রপক্ষের নিজেদের মধ্যেই ইতিমধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেছে, যুদ্ধে যা লুঠের মাল মিলেছে তার কে কতখানি ভাগ পাবে তাই নিয়ে তারা কলহ করছে। প্রাচ্য দেশে ইংলণ্ড একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, ফ্রান্সের দশাও কতকটা তাই। সিরিয়া ছিল ফ্রান্সের ম্যান্‌ডেট্‌, সেখানে নিদারুন অসন্তোষ আর উত্তেজনা চলেছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা। মিশরে ইতিমধ্যেই একটা বিদ্রোহ হয়ে গেছে; প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়ে তবেই সে বিদ্রোহ ইংরেজদের দমন করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সনের পর—সেই প্রথম—আবার নূতন করে একটা বিরাট বিদ্রোহের আয়োজন গড়ে উঠছে; অবশ্য এবারের বিদ্রোহ অহিংস বিদ্রোহ। এইটাই হচ্ছে গান্ধীজি-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন। যে-ক'টি বস্তুকে আশ্রয় করে এই আন্দোলন গড়ে উঠছিল তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে খলিফার পদ বা 'খিলাফৎ' সংক্রান্ত সমস্যা এবং তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের অন্যায় আচরণ।

কাজেই দেখছো মিত্রপক্ষ নিজেরা যে সন্ধিপত্র রচনা করেছিলেন সেটা তুরস্কের উপরে জোর করে খাটাতে যাবার মতো অবস্থা তখন তাঁদের নয়; আবার তুর্কি-জাতীয়তাবাদীরা সেটাকে খোলাখুলিই অগ্রাহ্য করে চলবে, তাও তাঁরা সহ্য করতে রাজি নন। বিপদে পড়ে তাঁরা পুরোনো বন্ধু ভেনিজেলস আর জাহারফের শরণ নিলেন; গ্রীসের পক্ষ হয়ে এই কাজের ভার নিতে এঁরা দুজনও সম্পূর্ণই প্রস্তুত ছিলেন। তুর্কিদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, তারা বিশেষ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে এমন আশঙ্কা কেউই করেন নি; আর এশিয়া-মাইনর জায়গাটাও লোভ করবার মতোই বটে। অতএব আরও বহু গ্রীক সৈন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তুরস্কে গিয়ে হাজির হল; গ্রীক-তুর্কি যুদ্ধ এবার বেশ ভালো করেই আরম্ভ হল। ১৯২০ সনের গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে হেমন্তকাল পর্যন্ত আগাগোড়াই গ্রীকদের জয় হল, তুর্কিদের তাড়িয়ে নিয়ে তারা সমানে এগিয়ে চলল। কামাল পাশা আর তাঁর সহকর্মীদের তখন সম্বল শুধু সেনাবাহিনীর কতকগুলো ভাঙাচোরা টুক্‌রো; তাই দিয়েই একটা শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত চেষ্টা করতে লাগলেন। সাহায্যের প্রয়োজন যখন তাঁদের সবচেয়ে বেশি হয়ে পড়েছে, ঠিক এমনি সময়ে তাঁরা সাহায্য পেলেন, অতি চমৎকার সাহায্য। সোভিয়েট রাশিয়া তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা যোগাতে এগিয়ে এল। ইংলণ্ড ছিল এদের উভয়েরই শত্রু।

কামালের শক্তি বাড়তে লাগল। যুদ্ধে কোন্‌ পক্ষের জয় হবে সে বিষয়ে এবার মিত্র-পক্ষের মনে সন্দেহ দেখা দিল, সন্ধির জন্য তাঁরা কিছু ভালো শর্ত দাখিল করলেন। কিন্তু সে শর্তও কামাল-পন্থীদের পছন্দ হল না, তাঁরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব তখন মিত্রপক্ষ গ্রীক-তুর্কি যুদ্ধের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, নিজেদের নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করলেন। গ্রীকদের তাঁরাই টেনে এই যুদ্ধের আবর্তে এনে ফেলেছেন, এখন তাকে দায়ে ফেলে নিজেরা দিব্যি সরে পড়লেন। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স, এবং খানিকপরিমাণে ইতালিও এবার গোপনে চেষ্টা করতে লাগল, তুরস্কের সঙ্গেই খাতির জমানো যায় কিনা। ইংরেজরা তখনও অল্পবিস্তর গ্রীকদের পক্ষেই রইল, অবশ্য সরকারিভাবে নয়।

১৯২১ সনের গ্রীষ্মকালে গ্রীকরা তুরস্কের রাজধানী আঙ্গোরা শহর দখল করতে একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা করল। একটির পর একটি করে শহর দখল করতে করতে তারা আঙ্গোরার খুব কাছে এসে পেঁছিল; শেষে সাকারিয়া নদীর ধারে তুর্কিরা তাদের আট্‌কে দিল। এই নদীর তীরে তিন সপ্তাহ ধরে দু পক্ষের লড়াই চলল; বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জাতিগত বিদ্বেষ

নিয়ে অবিশ্রাম যুদ্ধ করতে লাগল তারা, পরস্পরের প্রতি তিলমাত্র করুণা কেউ দেখাল না। ধৈর্য আর সহ্যশক্তির সে একটা ভয়ংকর পরীক্ষা; তুর্কিরা প্রাণপণ লড়ে কোনোমতে টিকে রয়েছে এমন সময়ে গ্রীকরা হাল ছেড়ে দিয়ে হটে গেল। গ্রীক সেনার যা নিয়ম, পিছিয়ে যেতে যেতে তারা যেখানে যা পেল সমস্ত পুড়িয়ে এবং নষ্ট করে দিয়ে গেল, দু'শো মাইল ব্যাপী স্থানের উর্বর জমি একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল।

সাকারিয়া নদীতীরের যুদ্ধে তুরস্ক কোনোক্রমে জিতে গিয়েছিল। যুদ্ধের চরম জয় এটা নয়; তবুও আধুনিক কালে যে কটি যুদ্ধে ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়েছে এটি তার অন্যতম। যুদ্ধের স্রোত এইখান থেকেই মোড় ফিরল। অতীত কালে দু' হাজার বছর বা তারও বেশিকাল ধরে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বার বার মহাসংঘাত হয়েছে, এশিয়া-মাইনরের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে—এই যুদ্ধটিও তারই মধ্যে একটি।

যুদ্ধে দুই পক্ষের সেনাই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল; এবার দুই দলই স্থির হয়ে বসে আবার নিজেকে পরিপুষ্ট এবং পুনর্গঠিত করে নিতে লাগল। কিন্তু কামাল পাশার ভাগ্য তখন ফিরে গেছে। ফরাসি সরকার আঙ্গোরার সঙ্গে একটি সন্ধি করলেন। আঙ্গোরা এবং সোভিয়েটের মধ্যেও একটি সন্ধি হল। ফ্রান্স তাকে তুরস্কের প্রতিভূ বলে স্বীকার করেছে, এতে মুস্তাফা কামালের মনের জোর অনেক বেড়ে গেল, বাস্তব শক্তিও বাড়ল। সিরিয়ার সীমান্তে যে তুর্কি সেনা বসিয়ে রাখা হয়েছিল, এই সন্ধির ফলে তাদের আর সেখানে থাকার দরকার রইল না, তাদের তখন গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে লাগানো সম্ভব হল। ব্রিটিশ সরকার তখনও পুতুল সুলতান আর ইস্তাম্বুলের জরাজীর্ণ সরকারকে সমর্থন করছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে এই সন্ধিটি তার যেন গালে চড় কসিয়ে দিল।

সযত্নে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে, ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে তুর্কি সেনা অতর্কিতে গ্রীক সেনাকে আক্রমণ করল, একেবারে ঝড়ের মতো তাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিল। আট দিনে গ্রীক সেনা ১৬০ মাইল পিছন হটে গেল। কিন্তু যেতে যেতেও তারা সে পরাজয়ের শোধ তুলল, যাবার পথে যত তুর্কি পুরুষ নারী শিশু তাদের সামনে পড়ল সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে রেখে গেল। নির্দয়তার দিক দিয়ে তুর্কিরাও কম যায় নি, তারাও গ্রীক সেনার যত লোককে পেল, মেরে ফেলল, যুদ্ধের বন্দী বলে বিশেষ কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না। কিন্তু তবু বন্দী যারা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি আর তাঁর সহকারীবৃন্দ। গ্রীক সেনার বেশির ভাগ লোকই স্মার্না থেকে সমুদ্রপথে পালিয়ে গেল; কিন্তু স্মার্না শহরটির অধিকাংশ তারা পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

এই যুদ্ধ জয়ের পরই কামাল পাশা তাঁর সেনাকে ইস্তাম্বুলের দিকে চালিত করলেন। শহরের কাছে, চানক বলে একটা জায়গাতে ব্রিটিশ সেনা তাঁকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। সেটা ১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাস; তখন কয়েক দিন ধরে জল্পনা-কল্পনা শোনা গেল, এবার তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেনের লড়াই বাধবে। কিন্তু সে লড়াই হল না; তুর্কিরা যা যা দাবি করেছিল ব্রিটিশরা তার প্রায় সমস্তই মেনে নিল। দুই পক্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধবিরতিপত্র স্বাক্ষরিত হল; সে পত্রে মিত্রপক্ষ স্পষ্টই প্রতিশ্রুতি দিলেন, থ্রেসে তখনও যত গ্রীক সৈন্য রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁরা সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন। নবীন তুরস্কের পিছন থেকে তখন সোভিয়েট রাশিয়ার জুজুবুড়ী সারাক্ষণ উঁকি মারছে; তুরস্কের সাহায্য করতে রাশিয়া এগিয়ে আসতে পারে, এমন কোনো যুদ্ধ বাধাতে মিত্রপক্ষের তখন আদৌ আগ্রহ ছিল না।

মুস্তাফা কামালের জয় হল; ১৯১৯ সনের সেই মুষ্টিমেয় ক'জন বিদ্রোহী বীর এবার বড়ো বড়ো দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমান মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। অনেকগুলো ঘটনাই এই বীরদলের রণজয়ে সাহায্য করেছিল—যুদ্ধোত্তর যুগের প্রতিক্রিয়া, মিত্রপক্ষের নিজেদের মধ্যে কলহ, ভারতবর্ষ এবং মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলমাল নিয়ে ইংরেজদের বিব্রতভাব, সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য, ইংরেজদের হাতে তুরস্কের অপমান। কিন্তু রণজয় করতে

এ'দের সবচেয়ে বড়ো সম্বল হয়েছিল এ'দের নিজেদের বজ্রকঠিন সংকল্প, স্বাধীন হবার উগ্র কামনা এবং তুর্কি কৃষক ও সৈনিকদের যথার্থই আশ্চর্য রণনৈপুণ্য।

লুজোঁতে শান্তি সম্মেলনের বৈঠক বসল; মাসের পর মাস ধরে তার আলোচনা চলতে লাগল। দুটি লোকের মধ্যে সে এক অপূর্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধ—ইংলণ্ডের পক্ষে ছিলেন লর্ড কার্জন, একে দাম্ভিক, তদুপরি অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চিরাভ্যস্ত; তুরস্কের পক্ষে এলেন ইস্‌মেৎ পাশা —একটুখানি কানে খাটো এবং শান্ত হয়ে বসে বসে হাসেন, যা তাঁর শোনবার ইচ্ছা নেই সেটা কিছুতেই শুনতে পান না; আর কার্জন কেবলই চটে লাল হতে থাকেন। কার্জন ভারতবর্ষে বড়োলাটগিরি করে গেছেন, সেই চালেই তিনি অভ্যস্ত; তাছাড়া এমনিতেও তিনি অত্যন্ত জবরদস্ত লোক। তিনি খুব কসে তর্জনগর্জন করে ইসমেৎ পাশাকে কাবু করে ফেলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইসমেৎ পাশার তাতে কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তিনি কিছু কানে শুনতে পান না, খালি হাসেন। শেষে কার্জন রেগে অস্থির হয়ে ধুত্তোর বলে চলে এলেন, সম্মেলন ভেঙে গেল। কিছুদিন পরে আবার সম্মেলন বসল, কার্জনের বদলে এবার আরেকজন লোক ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হয়ে এলেন। 'জাতীয় চুক্তিপত্রে' তুর্কিরা যা যা দাবি জানিয়েছিলেন, তার শুধু একটি বাদে সমস্তগুলোই ইংরেজরা স্বীকার করে নিলেন; ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে লুজোঁ-সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। এবারেও সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন আর মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোর পরস্পর ঈর্ষার ফলে তুরস্কের কাজ সহজ হয়ে গেল।

কামাল পাশা—গাজী, বিজয়ী কামাল পাশা, যে কটি ফল কামনা করে যুদ্ধে নেমেছিলেন তার প্রায় সকলগুলোই তাঁর করায়ত্ত হল। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি একটি প্রকাণ্ড সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর ন্যূনতম দাবি যেটুকু, সেইটাই বাইরে ঘোষণা করেছিলেন। এখন জয়ের মুহূর্তেও তিনি সেই দাবিই অপরিবর্তিত রাখলেন। আরব ইরাক প্যালেস্টাইন সিরিয়া প্রভৃতি অ-তুর্কি দেশের উপরে তুর্কির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, এ কল্পনাকে তিনি বর্জন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তুর্কি জাতির যেখানে বাস, সেই খাস তুরস্ক দেশটাকে স্বাধীন করে নেবেন। তুর্কিরা অন্য কোনো জাতির উপরে হস্তক্ষেপ করতে যাক এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না; অন্য কোনো বিদেশী এসে তুরস্কের উপরে হস্তক্ষেপ করবে এটাও সহ্য করতে তিনি রাজি ছিলেন না। এইভাবে তুরস্ককে তিনি একটি সুসংহত, একজাতি-প্রধান দেশে পরিণত করলেন। এর কিছুদিন পরে গ্রীকদের প্রস্তাব অনুসারে এই দুই দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের লোক-বিনিময় করে নেওয়া হল। আনাতোলিয়াতে তখনও যে গ্রীকদের বাস ছিল তাদের সবাইকে গ্রীসে পাঠিয়ে দেওয়া হল; তার বদলে গ্রীস থেকে সেখানকার বাসিন্দা তুর্কিদের সরিয়ে নিয়ে আসা হল। গ্রীস আর তুরস্কে মিলে প্রায় পনেরো লক্ষ লোককে এইভাবে বিনিময় করে নেওয়া হল; প্রায় প্রত্যেকটা পরিবারই বহু পুরুষ, বহু শতাব্দী ধরে যথাক্রমে আনাতোলিয়ায় আর গ্রীসে বসবাস করে এসেছে। মানুষকে তার শিকড় ছিঁড়ে অন্যত্র চালান করার এ এক অপূর্ব কাহিনী। তুরস্কের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাও এর ফলে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল; বিশেষ করে তার কারণ, তুরস্কের ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেকখানিই চালাত এই গ্রীকরা। কিন্তু এই লোক-বিনিময়ের ফলে তুরস্ক আগের চেয়েও বেশি একজাতি-প্রধান দেশে পরিণত হল; এশিয়ায় বা ইউরোপে এতখানি একজাতি-প্রধান দেশ আজকাল বোধ হয় বেশি নেই।

আমি বলেছি, লুজোঁ-সন্ধিতে তুর্কিদের দাবির সমস্তগুলিই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শুধু একটি বাদে। সেই একটি হচ্ছে 'বিলায়ৎ' বা ইরাক-সীমান্তের নিকটে অবস্থিত মসুল প্রদেশটি। একে নিয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে দু'পক্ষের মতের মিল হল না, অতএব ব্যাপারটার মীমাংসার ভার দেওয়া হল লীগ অব নেশন্‌সের উপরে। মসুলে তেলের খনি আছে; কিন্তু তার চেয়েও এর গুরুত্ব বেশি হচ্ছে এর অবস্থানের জন্য। সমরনীতির দিক থেকে অবস্থানটির দাম আছে। মসুলের পর্বতগুলো হাতে থাকা মানেই হচ্ছে, তুরস্ক, ইরাক, পারশ্য এমনকি রাশিয়ার অন্তর্গত ককেশাস অঞ্চলকে পর্যন্ত কিছুটা হাতের মুঠোয় রাখবার সুযোগ পাওয়া। কাজেই তুরস্কের পক্ষে একে দখলে পাওয়া খুবই দরকার। আবার ব্রিটেনের পক্ষেও একে হাত

করা সমানই প্রয়োজন : ভারতবর্ষে পৌঁছবার রাস্তা এবং বিমানপথ অব্যাহত রাখবার জন্য এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা দুয়েরই পথ হিসাবে। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝবে, অবস্থার দিক থেকে মসুলের দাম কতখানি। লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ সিদ্ধান্ত করলেন, মসুল ব্রিটেনের হাতেই থাকা উচিত। তুর্কিরা এটা মেনে নিতে রাজি হল না, অতএব আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। ঠিক এই সময়ে, ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে, রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের একটা নূতন সন্ধি হল। শেষপর্যন্ত আঙ্গোরা সরকার তাঁদের জিদ্ ছেড়ে দিলেন; মসুল নূতন রাজ্য ইরাকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ইরাক দেশটা নামে স্বাধীন; কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা বস্তুত ব্রিটিশদের রক্ষাধীন হয়েই রয়েছে, দেশের সর্বত্র ব্রিটিশ কর্মচারী আর উপদেষ্টা গিজ্‌গিজ করছে।

গ্রীকদের উপরে মুস্তাফা কামালের বিরাট জয়ের খবর শুনে আমরা কী দারুন উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম সেকথা আমার স্পষ্ট মনে আছে—সে আজ প্রায় এগারো বছর আগের কথা। সে যুদ্ধটার নাম 'আফিউম কারাহিসার'এর যুদ্ধ। ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কামাল গ্রীকসেনার অগ্রগামী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেন, গ্রীক সেনাকে তাড়া করে নিয়ে একেবারে স্মার্না আর সমুদ্র পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসেন। আমরা অনেকেই তখন ছিলাম লক্ষ্ণৌয়ের ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে; তুর্কিদের এই জয়ে আমরাও উৎসব করেছিলাম; হাতের কাছে টুকিটাকি যা কিছু পেলাম তাই জড়ো করে আমাদের জেলখানার ব্যারাকটাকে সাজিয়েছিলাম; সন্ধ্যাবেলায় আলোকসজ্জা খাড়া করবারও একটা আয়োজন করেছিলাম, অবশ্য সে অতি ক্ষীণ রকমের আয়োজন।

১৫৯

মুস্তাফা কামাল : অতীতকে অতিক্রম করে অভিযান

৮ই মে, ১৯৩৩

পরাজয়ের তমসাচ্ছন্ন রজনী থেকে শুরু করে জয়ের ভাস্বর প্রভাত পর্যন্ত তুরস্কের ভাগ্য-বিবর্তন আমরা দেখতে দেখতে এলাম। দেখলাম, তাদের দমন করবার, শক্তিহীন করে ফেলবার উদ্দেশ্যে যে কূটনীতি মিত্রপক্ষ এবং বিশেষ করে ব্রিটিশরা অবলম্বন করেছিল, তার ফল হল ঠিক বিপরীত; তাই আঘাতে জাতীয়তাবাদীরা শক্তিমান হয়ে উঠলেন, এদের প্রতিরোধ করবার সংকল্প তাঁদের দৃঢ়তর হয়ে উঠল। মিত্রপক্ষ তুরস্কের অংগচ্ছেদ করবার আয়োজন করলেন; স্মার্নাতে গ্রীক সেনা পাঠানো হল; ১৯২০ সনের মার্চ মাসে ব্রিটিশরা একটা রাজনীতির প্যাঁচ্ খেলল, জাতীয়তাবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিল; ব্রিটিশরা তাদের হাতের পুতুল সুলতানকে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহায্য করতে লাগল—এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই তুর্কিদের রাগ আর উৎসাহের বহ্নিতে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করল। বীরের জাতিকে অবমানিত, বিধ্বস্ত করতে গেলে ফল এইরকম না হয়েই পারে না।

মুস্তাফা কামাল আর তাঁর সহকর্মীদের জয় হয়েছে, সে জয়কে নিয়ে তাঁরা কী করলেন? প্রাচীন যুগের নেমিবর্ত্যকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবার পাত্র কামাল পাশা ছিলেন না; তাঁর ইচ্ছা, তুরস্ককে একেবারেই নূতন করে ঢেলে সাজবেন, কিন্তু সে কাজ করা সোজা নয়। জয়ের পরে দেশের লোকের কাছে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে গেছে; তবুও তাঁকে অত্যন্ত সাবধানে একটু একটু করে অগ্রসর হতে হল— দীর্ঘদিনের যে প্রথা আর ধর্মের অনুশাসন জাতি প্রাচীন কাল থেকে মেনে এসেছে, তার মূল উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। সুলতান এবং খলিফা, এই দুটি পদই কামাল খতম করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এতে

সায় দিলেন না, সম্ভবত তুর্কির জনসাধারণও এরকম পরিবর্তনকে মনে মনে সমর্থন করত না। পুতুল-সুলতান ওয়াহিদ্উদ্দীন তখনও গদিতে বসে থাকেন, এটা অবশ্য কারোই ইচ্ছা ছিল না। তাঁকে সবাই তখন দেশদ্রোহী বলে ঘৃণা করছে, বিদেশীদের কাছে তিনি নিজের দেশকে বেচে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকে বললেন, একটা প্রজাধীন সুলতানতন্ত্র এবং খলিফাতন্ত্র স্থাপিত হোক্, সেখানে সত্যকার ক্ষমতা থাকবে জাতীয় পরিষদের হাতে। কামাল কিন্তু এরকমের কোনো আপোষ-ব্যবস্থা করতে রাজি নন, তিনি ধৈর্য ধরে বসে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

চিরদিন যা হয়েছে, সে সুযোগ ব্রিটিশরাই সৃষ্টি করে দিল। লুজোঁতে শান্তি-সম্মেলন বসাবার যখন আয়োজন চলছে, ব্রিটিশ সরকার ইস্তাম্বুলের সুলতানকে সে সম্মেলনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন আবার আঙ্গোরাতে এই নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেন। আঙ্গোরাতে যে জাতীয় সরকার রয়েছে, যুদ্ধে জয় হয়েছে তাঁদেরই; তাঁদের প্রতি এই রকমের তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ এবং জেনেশুনেই পুতুল-সুলতানকে সে কাজটি করতে ঠেলে দেওয়ায়, তুরস্কে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, লোকেরাও চটে গেল। তাদের সন্দেহ হল, ব্রিটিশ আর দেশদ্রোহী সুলতানের মধ্যে নিশ্চয়ই আবার নূতন কোনো চক্রান্ত চলছে। দেশব্যাপী এই উত্তেজনার সুযোগে কাজ হাসিল করে নিতে মুস্তাফা কামাল একমুহূর্তও বিলম্ব করলেন না; তাঁরই কথামতো ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষৎ সুলতানের পদটি বিলুপ্ত করে দিলেন। খলিফার পদটি কিন্তু তখনও টিকে রয়েছে; এঁরা ঘোষণা করেছেন, সে পদটিতে অটোম্যান বংশের লোকেরাই উত্তরাধিকারী। এর অল্পদিন পরেই ভূতপূর্ব সুলতান ওয়াহিদ্-উদ্দীনের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। প্রকাশ্য বিচারের চেয়ে পলায়নকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করলেন; ইংরেজদের একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে চড়ে তিনি গোপনে পালিয়ে গেলেন, সে গাড়ি তাঁকে একটি ব্রিটিশ রণতরীতে নিয়ে তুলে দিল। জাতীয় পরিষৎ তাঁর জ্ঞাতি-ভাই আবদুল মজিদ এফেন্দীকে নূতন খলিফার পদে নির্বাচিত করল; ইনি হলেন শুধু ধর্মগুরু, আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেই এঁর কর্তৃত্ব; রাজনৈতিক কোনো ক্ষমতার কিছুই এঁর রইল না।

এর পরের বছর, ১৯২৩ সনে, তুর্কি-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যথারীতি ঘোষণা করা হল; আঙ্গোরা তার রাজধানী। মুস্তাফা কামাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে একত্রিত করে নিলেন। ফলে তিনিই এখন হলেন রাজ্যের একচ্ছত্র নায়ক; পরিষৎ শুধু তাঁর আদেশ প্রতিপালন করবে। এবার তিনি আরও বহু প্রাচীন প্রথাকে ভাঙতে লেগে গেলেন; ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিও বিশেষ সদ্ব্যবহার দেখালেন না। অতএব তাঁর কান্ডকারখানা আর তাঁর একাধিপত্য দেখে বহু লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল, বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানকারিগণ। এরা গিয়ে নূতন খলিফাকে ঘিরে দল বাঁধল; যদিও সে বেচারা ছিলেন অতি শান্ত এবং নিরীহ প্রাণী। কামাল পাশা এটা মোটেই পছন্দ করলেন না। তিনি খলিফার প্রতি রীতিমতো দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন, এবং এর পরের বৃহৎ কার্যটি করবার জন্য একটা যোগ্য সুযোগের অপেক্ষা করে রইলেন।

এবারও তাঁর সে সুযোগ আসতে দেরি হল না; এলও সেটা একটা অদ্ভুত পথে। লন্ডন থেকে আগা খাঁ এবং আমীর আলি বলে ভারতবর্ষের একজন ভূতপূর্ব বিচারপতি তাঁকে একত্রে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। বললেন, আমরা ভারতবর্ষের বহু-কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে কথা বলছি; খলিফার প্রতি কামাল যে আচরণ করছেন আমরা তার প্রতিবাদ করছি, খলিফার পদমর্যাদার সম্ভ্রম রাখা হোক, তাঁর প্রতি সদাচরণ করা হোক। এই চিঠির প্রতিলিপি তাঁরা ইস্তাম্বুলের কয়েকটি পত্রিকাকেও পাঠিয়ে দিলেন; বস্তুত মূল চিঠি আঙ্গোরাতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই সে প্রতিলিপি কাগজে ছাপা হয়ে গেল। চিঠিটার মধ্যে অন্যায় কথা কিছুই ছিল না। কিন্তু কামাল পাশা সেটাকে নিয়ে মহা হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন। এতদিন পরে তাঁর সুযোগ এসেছে, এর যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করে নিতে তিনি ছাড়বেন কেন। অতএব তিনি ঘোষণা করলেন, এই চিঠির ব্যাপারটা আগাগোড়াই ইংরেজদের একটা চক্রান্ত, তুর্কিদের মধ্যে

তারা দলাদলি সৃষ্টি করতে চায়। বললেন, আগা খাঁ তো ইংরেজদের চর; ইংলণ্ডেই তিনি থাকেন, তাঁর দিনই কাটে প্রধানত ইংলণ্ডের ঘোড়-দৌড় নিয়ে। ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদদের মহলেই তাঁর সারাক্ষণ আনাগোনা। এমনকি গোঁড়া মুসলিমও তো তাঁকে বলা চলে না, কারণ তিনি হচ্ছেন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তার পর এটাও দেখতে হবে, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা তাঁকে প্রাচ্য-অঞ্চলে সুলতান-খলিফারই একজন সমতুল্য ব্যক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, প্রচারকার্য চালিয়ে এবং আরও নানা উপায়ে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তাঁকেই ভারতীয় মুসলমানদের নেতা বলে খাড়া করতে চেয়েছিলেন, যেন এই করে তাদের হস্তগত করে রাখা যায়। খলিফার জন্য এতই যদি আগা খাঁর মাথাব্যথা, তবে যুদ্ধের সময়ে যখন খলিফা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি খলিফার পক্ষ নেন নি কেন? তখন তো বেশ খলিফার বিরুদ্ধেই তিনি ইংরেজদের পক্ষে যেতে পেরেছেন!

এমনি ভাবে এই যুক্ত চিঠিটিকে উপলক্ষ্য করে কামাল পাশা রীতিমতো একটি ছোটো-খাটো খণ্ডপ্রলয় বাধিয়ে দিলেন; লণ্ডনে বসে এর লেখকরা যখন চিঠিটি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা ভাবতেও পারেন নি এ নিয়ে এত কাণ্ড গড়াবে। আগা খাঁ যে বিশেষ সুবিধের লোক নন এটা প্রমাণ করে দিলেন কামাল। ইস্তাম্বুলের যে কাগজগুলোতে এই চিঠি ছাপা হয়েছিল, তার সম্পাদক বেচারীদের দেশদ্রোহী এবং ইংলণ্ডের গুপ্তচর আখ্যায় ভূষিত করা হল, তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হল। এইভাবে দেশের লোকের মনে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর তিনি জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব আনলেন, খলিফার পদটি তুলে দেওয়া হোক। সেই দিনই আইনটি মঞ্জুর হয়ে গেল, সে ১৯২৪ সনের মার্চ মাসের কথা। আধুনিক জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এইভাবে অন্তর্হিত হয়ে গেল; একদা জগতের ইতিহাসে সে অনেকখানিই কর্তৃত্ব করেছে। এখন থেকে আর 'ধর্মবিশ্বাসীদের অধিনেতা' বলে কেউ থাকবে না, অন্তত তুর্কিদেশে। তুরস্ক এবার থেকে হয়ে গেল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

এর অল্পদিন আগের কথা; যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা খলিফার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল; তখন সেই ব্যাপার নিয়ে ভারতবর্ষে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের সর্বত্র 'খিলাফৎ কমিটি' গড়ে উঠেছিল; ব্রিটিশ সরকার ইসলামের একটা ক্ষতি সাধন করছেন, এই বিশ্বাসে বহু সংখ্যক হিন্দুও মুসলমানদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এবার তুর্কিরা নিজেরাই ইচ্ছা করে খলিফা-পদের অবসান ঘটাল; ইসলামের আর খলিফা বলে কেউ রইল না। কামাল পাশার দৃঢ় অভিমত ছিল, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আরব-অঞ্চলের কোনো দেশের বা ভারতবর্ষের সঙ্গে তুর্কির জড়িয়ে পড়া কিছুতেই চলবে না। তাঁর দেশ বা তিনি নিজে ইসলামের নেতৃত্ব অধিকার করে বসবেন, এরূপ কোনো অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না। ভারতবর্ষ আর মিশরের লোকেরা তাঁকে নিজেই খলিফা হয়ে বসতে অনুরোধ জানিয়েছিল, তাতেও তিনি রাজি হন নি। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পশ্চিমে, ইউরোপের দিকে; তুরস্ককে যথাসম্ভব শীঘ্র পাশ্চাত্য রাজনীতিতে দীক্ষিত করে তোলাই তাঁর কামনা। প্যান-ইসলাম মতবাদের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এবার তাঁদের নূতন আদর্শ হল প্যান-তুরাণী-বাদ; কারণ তুর্কিরা জাতিতে তুরাণী। অর্থাৎ ইসলামের যে আন্তর্জাতিক ঐক্যের আদর্শ এতদিন ছিল—তার গণ্ডি বৃহত্তর, বন্ধনও শিথিল; তার পরিবর্তে কামাল চাইলেন বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করতে, তার বন্ধন দৃঢ়তর, তার সংহতি গভীরতর।

আমি বলেছি, তুরস্ক তখন একটা অত্যন্তরকম একজাতি-প্রধান দেশে পরিণত হয়েছে, অন্য জাতির লোক অতি সামান্যই আছে সেখানে। কিন্তু পূর্ব-তুরস্কে ইরাক এবং পারশ্য সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে, তখনও একটি অ-তুর্কি জাতির বাস ছিল। এরা হচ্ছে কুর্দ, অতি প্রাচীন জাতি, এদের ভাষা হচ্ছে একটি ইরাণী ভাষা। এই জাতিটির বাসস্থান কুর্দিস্তানকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে তুরস্ক, পারশ্য, ইরাক এবং মসুল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। কুর্দদের মোট লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষের মতো, তার প্রায় অর্ধেক লোক তখনও খাস তুরস্কের মধ্যে

বাস করছে। ১৯০৮ সনে তরুণ তুর্কি-বিপ্লব ঘটল, তার অল্পদিন পরেই সেখানে কুর্দদের মধ্যেও একটা আধুনিক জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এমনকি ভার্সাই-এর শান্তি-সম্মেলনেও কুর্দ প্রতিনিধিরা তাঁদের জাতির স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিলেন।

১৯২৫ সনে তুরস্কের কুর্দি অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ হল। ঠিক সেই সময়টাতেই ওদিকে মসুলের সমস্যা নিয়ে ইংলণ্ড আর তুরস্কের মধ্যে ঠোকাঠুকি বেধেছে। এই মসুলও ছিল একটা কুর্দি অঞ্চল, তুরস্কের যে-অংশটাতে বিদ্রোহ হয়েছে তার ঠিক লাগাও। অতএব তুর্কিরা স্বভাবতই ধরে নিল, এই বিদ্রোহের পিছনে ইংলণ্ড রয়েছে, কুর্দদের মধ্যে যারা একটু বেশি ধর্মধ্বজী, ব্রিটিশ গুপ্তচররা এসে তাদের কামাল পাশার অনুষ্ঠিত সংস্কার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সত্যই এই বিদ্রোহের মধ্যে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের কোনো হাত ছিল কিনা সেকথা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু ঠিক ঐ সময়টিতে তুরস্কে কুর্দদের হাঙ্গামা বাধার ফলে ব্রিটিশ সরকারের খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, এটা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য একথাও ঠিক, এই বিদ্রোহের মূলে ধর্মের গোঁড়ামির হাত ছিল অনেকখানিই; আবার কুর্দদের জাতীয়-চেতনাও এতে অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব এর কারণগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণাটা ছিল সর্বপ্রধান।

কামাল পাশা তৎক্ষণাৎ সোরগোল তুললেন, তুর্কি জাতির বিপদ আসন্ন, কুর্দদের পিছনে ইংরেজরা রয়েছে। জাতীয় পরিষদকে দিয়ে তিনি আইন তৈরি করিয়ে নিলেন, তার মর্ম: বক্তৃতায় হোক বা লেখায় হোক, ধর্মের দোহাই দিয়ে যদি কেউ জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করে, তার সে কাজকে রাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে, এবং সেই হিসেবে তার প্রতি একেবারে চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করা হবে। প্রজাতন্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যেতে পারে, মসজিদের মধ্যে এমন কোনো ধর্মোপদেশ প্রচার করাও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এর পরে তিনি একেবারে নির্মমহস্তে কুর্দদের শায়েস্তা করতে লেগে গেলেন। বিশেষ একধরনের 'স্বাধীনতার আদালত' বসানো হল, সেখানে একসঙ্গে হাজার হাজার কুর্দ আসামীর বিচার হতে লাগল। শেখ সৈয়দ, ডক্টর ফুয়াদ এবং আরও বহু কুর্দ নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার কামনা উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করলেন।

দুদিন আগে পর্যন্ত তুর্কিরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে; এবার তারাই কুর্দদের বিধ্বস্ত বিচূর্ণিত করে দিল, তারাও স্বাধীন হতে চেয়েছে এই অপরাধে। আত্মরক্ষায় উৎসুক জাতি কী করে আক্রমণ-ব্রতী হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার জন্য অনুষ্ঠিত যুদ্ধ কেমন অনায়াসে অপরের স্বাধীনতা হরণ করবার যুদ্ধে পরিণত হয়ে যায়—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ১৯২৯ সনে কুর্দরা আবার বিদ্রোহ করল, আবার সে বিদ্রোহ দমন করা হল—অন্তত তখনকার মতো। যে-জাতি স্বাধীনতা অর্জন করবে বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তার জন্য ন্যায্য মূল্য দিতেও সে প্রস্তুত, তাকে চিরকালের মতো দমন করা কি কখনও সম্ভব?

এবার কামাল পাশা দৃষ্টি ফেরালেন তাঁদের প্রতি, যাঁরা জাতীয় পরিষদের মধ্যে, বা বাইরে, তাঁর নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। একচ্ছত্র শাসক তাঁর ক্ষমতা যত ব্যবহার করেন, ক্ষমতার লোভ তাঁর ততই বেড়ে যায়; কোনো রকম প্রতিবাদ বা বাধা সে সহ্য করতে পারে না। মুস্তাফা কামালও তাঁর ইচ্ছার বিরোধীমাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। এর উপর আবার একজন ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করল, সুতরাং অবস্থা একেবারে চরমে উঠল। স্বাধীনতার আদালতগুলো এবার দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, গাজী পাশার বিরুদ্ধে যে-কেউ কোনো রকম মতপ্রকাশ করছে সকলকেই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করতে লাগল। পরিষদের অতি বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা, স্বাধীনতার যুদ্ধে একদিন যাঁরা কামালের সহকর্মী ছিলেন, কামালের বিরোধিতা করে তাঁদেরও কেউ নিস্তার পেলেন না। রাউফ বেগকে ব্রিটিশরা একদা মাল্টাতে নির্বাসিত করেছিল, পরে তিনি আবার তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীও হয়েছিলেন; তাঁর প্রতি তাঁর অসাক্ষাতেই দণ্ডাদেশ প্রচার করা হল। তুরস্কের স্বাধীনতার সময়ে যাঁরা একদা যুদ্ধ করেছেন এমন আরও বহু বড়ো বড়ো নেতা এবং সেনাপতির ভাগ্যে লাঞ্ছনা এবং শাস্তি জুটল, কয়েকজনের

মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হল। এ'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ'রা নাকি কুর্দদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন; হয়তো-বা দেশের প্রাচীন শত্রু ইংলণ্ডের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করেছেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করেছেন।

দেশের মধ্যে তাঁর বিরোধী যে যেখানে ছিল সবাইকেই কামাল উচ্ছেদ করেছেন, এবার তিনিই দেশের অবিসংবাদী একচ্ছত্র শাসক; আর ইসমেৎ পাশা হলেন তাঁর প্রধান সহায়। এতদিন ধরে যে-সব কল্পনা তাঁর মগজের মধ্যে ছিল, এবার তিনি সেগুলোকে কার্যে পরিণত করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কাজ শুরু হল একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে, কিন্তু সেইটা থেকেই সে কাজের স্বরূপ বোঝা যায়। ফেজ-টুপির ব্যবহার তিনি তুলে দিলেন : এই মস্তকাবরণটি তুর্কিত্বের, এবং কিছু পরিমাণে মুসলমানত্বেরই পরিচায়ক পরিচ্ছদে পরিণত হয়েছিল। প্রথমে তিনি কাজটা সাবধানে আরম্ভ করলেন, সেনাদলকে নিয়ে। তার পর একদিন নিজেই হ্যাট মাথায় দিয়ে বাইরে বেরোলেন, দেখে সমস্ত মানুষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত তিনি ফেজ-পরাটাকে একটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। মাথার টুপি নিয়ে এত কাণ্ড করা, এটাকে কেমন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। মাথার মধ্যে কী আছে সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা, মাথার উপরে কী পরা হল সেটা বড়ো নয়। কিন্তু অনেকসময়ে ছোটো ছোটো জিনিসই অনেক বৃহত্তর জিনিসের দ্যোতক হয়ে ওঠে; নিরীহ ফেজ-টুপিকে উপলক্ষ্য করে কামাল আসলে প্রাচীন রীতিনীতি এবং গোঁড়ামির প্রতিই আক্রমণ ঘোষণা করেছিলেন। এই ফেজ-টুপির ব্যাপার নিয়ে দেশের মধ্যে বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামাও বাধল। কামাল সমস্ত দাঙ্গা দমন করলেন, দাঙ্গা-কারীদের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হল।

যুদ্ধের এই প্রথম পর্বে জয়লাভ করে, এবার কামাল তার পরের পর্বে পা বাড়ালেন। দেশে যত মঠ আর ধর্মমন্দির ছিল সমস্ত তিনি বন্ধ এবং ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, মঠের সমস্ত ধনসম্পত্তি রাষ্ট্রের বলে বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। এই-সব স্থানে যে দরবেশরা বাস করত তাদের বলা হল, খেটে খাও। যে বিশেষ ধরনের পোষাক তারা পরত, সে পোষাক পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এরও আগে থেকেই তিনি মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুরস্কে বিদেশীদের বহু স্কুল ও কলেজ ছিল। এদের প্রতিও হুকুম হল, কোনো রকম ধর্মশিক্ষা দিতে পারবে না; যারা এতে স্বীকৃত হল না তাদের জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হল।

দেশের আইনকে একেবারে সম্পূর্ণরূপেই বদলে ফেলা হল। এতদিন বহু ব্যাপারেই আইনের বিধান চলত কোরানের উক্তিকে আশ্রয় করে—এই উক্তির নাম শরিয়ৎ। এবার সুইজার্ল্যাণ্ডের দেওয়ানি আইন, ইতালির ফৌজদারি আইন—আর জর্মনির বাণিজ্য আইনবিধিকে একেবারে আস্তই এনে তুরস্কে চালু করা হল। যে-সব ব্যক্তিসংক্রান্ত আইনের দ্বারা বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হত, তার সমস্তটাই এর ফলে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই-সব বিষয়ে ইসলামের যে প্রাচীন আইন ছিল, তাকে বদলে দেওয়া হল। বহু-বিবাহ তুলে দেওয়া হল।

আরও একটি নূতন বস্তুর আমদানি করা হল যেটা প্রাচীন ধর্মগত রীতির বিরোধী; সে হচ্ছে মনুষ্য দেহের রেখাচিত্র, বর্ণচিত্র এবং মূর্তি নির্মাণ। ইসলাম ধর্মে এটা নিষিদ্ধ। এই-সব বিষয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য মুস্তাফা কামাল বহু কলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন।

সেই তরুণ তুর্কি দলের সময় থেকেই তুর্কি নারীরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। সকল রকমের বন্ধন থেকে এ'দের মুক্তি দেবার ব্যাপারে কামাল পাশার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'নারীদের অধিকার' রক্ষার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করলেন তিনি; সকল রকমের পেশা ও কাজকর্ম করবার পথ তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হল। প্রথমেই কামাল 'পর্দা' আর অবগুণ্ঠন তুলে দেবার জন্য জোর অভিযান চালালেন; আশ্চর্যরকম দ্রুতবেগে এই দুটো প্রথা দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই অবগুণ্ঠনের বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলবার জন্য নারীরা উন্মুখ হয়ে থাকেন, ছেঁড়বার শুধু অবসরটি আসবার অপেক্ষা। কামাল পাশা

সে অবসর সৃষ্টি করে দিলেন, পর্দা ছি'ড়ে ফেলে তুর্কি নারীরা বাইরে বেরিয়ে এলেন। ইউরোপীয় নাচ প্রবর্তনের তিনি খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। এই নাচ তিনি নিজে খুবই ভালোবাসতেন; শুধু তাই নয়, তাঁর মনের চোখে এটা ছিল নারীর মুক্তি আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক। হ্যাট-টুপি আর নাচ হয়ে উঠল প্রগতি আর সভ্যতার দ্যোতক। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রতীক হিসাবে বস্তুদুটো বড়ো খেলো, সন্দেহ নেই, তবু বাইরে অন্তত এদের আশ্রয় করেই কাজ বেশ এগিয়ে চলল; তুর্কিজাতি তার শিরস্ত্রাণ বদলাল, পরিচ্ছদ বদলাল, ক্রমে জীবনযাত্রার রীতিনীতিই বদলে ফেলল। সেই এক-পুরুষের পর্দানশীন নারীরা অল্প ক'টি মাত্র বছরের মধ্যে হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, আইনজীবী শিক্ষয়িত্রী চিকিৎসক আর বিচারকের রূপে তাঁরা এবার দেখা দিলেন। ইস্তাম্বুলের রাস্তায় এখন নারী পুলিশ পর্যন্ত দেখতে পাবে! একটা বস্তুর ধাক্কায় আরেকটা বস্তু কীভাবে বদলে যায়, সেটাও দেখবার মতো ব্যাপার। তুর্কিভাষার পুরোনো বর্ণমালা বদলে কামাল লাতিন বর্ণমালার প্রচলন করলেন; তার ফলে তুরস্কে টাইপরাইটার যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেল; তার ফলে বাড়ল শর্ট-হ্যাণ্ড টাইপিস্টের প্রয়োজন, এবং তারও ফলে আবার বাড়ল চাকুরিজীবী নারীর সংখ্যা।

প্রাচীন কালের ধর্মধ্বজী বিদ্যালয়ে শিশুদের শুধু খানিক পড়া মুখস্থ করিয়েই কাজ সারা হত; তার পরিবর্তে এখন শিশুদের জন্য নানা অভিনব উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল, যেন তারা নিজেদের আত্মপ্রত্যয়ী এবং কর্মক্ষম নাগরিক হিসাবে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারে। এর মধ্যে একটি অতি চমৎকার ব্যাপার ছিল 'শিশু-সপ্তাহ'। শোনা যায় নাকি প্রতি বৎসর একটি সপ্তাহে প্রত্যেকটি সরকারি কর্মচারী সরিয়ে নিয়ে নামে তাঁর স্থানে একটি শিশুকে বসিয়ে দেওয়া হত, সেই এক সপ্তাহ কাল ধরে দেশটাকে শাসন করার সমস্ত ভারই থাকত শিশুদের হাতে। এই ব্যবস্থাটা কতদূর কার্যকরী হয়েছে আমার জানা নেই, কিন্তু কথাটা শুনতে ভারি চমৎকার। এই শিশুদের অনেকে হয়তো বোকা বা অনভিজ্ঞ; কিন্তু আমাদের চারদিকে বয়স্ক, গম্ভীর ভারিক্কি-চালওয়ালা শাসক আর সরকারি কর্মচারীরা যে-সব কাণ্ড হামেশাই করে বেড়াচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বোকামি কাণ্ড তারা কিছুতেই করে উঠতে পারে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

তুরস্কের শাসনকর্তারা 'সেলাম' করার রীতিটাও তুলে দিয়েছিল; ক্ষুদ্র জিনিস, কিন্তু এই থেকেই তাঁরা যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে চাইছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা দেশের লোককে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, নমস্কার হিসাবে করমর্দন করাটাই অনেক বেশি সভ্য রীতি, ভবিষ্যতে যেন সেইটাই তারা অভ্যাস করে নেয়।

কামাল পাশা এবার একটা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলেন তুর্কি ভাষার উপরে; তা ঠিক নয়, সে ভাষার মধ্যে যেটুকুকে বিদেশী বস্তু বলে তিনি মনে করতেন তার উপরে। তুর্কিভাষা লেখা হত আরবি হরপে। কামাল পাশার ধারণা, এটা শক্ত তো বটেই, তার উপরে আবার বিদেশী। মধ্য-এশিয়াতে সোভিয়েটকেও কতকটা এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, সেখানকার বহু তাতার জাতি এমন হরপ ব্যবহার করত যেটা আরবি বা ফার্শি হরপ থেকে নেওয়া। এই সমস্যাটির সমাধান বের করবার জন্য ১৯২৪ সনে বাকু শহরে সমস্ত সোভিয়েটদের একটি আলোচনা-সভা বসল। সভায় স্থির হল, মধ্য-এশিয়ার তাতার ভাষা এখন থেকে লাতিন হরপে লেখা হবে। তার মানে, ভাষা যেমন ছিল তেমনই রইল, শুধু সেগুলো এখন থেকে লেখা হতে লাগল লাতিন বা রোমান অক্ষরে। এই-সব ভাষায় কতকগুলো বিশেষ ধ্বনি আছে, সেগুলো বোঝাবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরনের সংকেত সৃষ্টি করা হল। এই ব্যবস্থাটির দিকে কামালের দৃষ্টি পড়ল। তিনি রীতিটি শিখে নিলেন। তার পর তুর্কি ভাষার বেলায়ও একে প্রয়োগ করলেন, একে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি নিজেই খুব জোর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। দু'বছর ধরে এর স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালানো হল, দেশের লোককে নূতন হরপ শেখানো হল। তার পর আইন করে একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল, সেই তারিখের পর থেকে আরবি অক্ষর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত লেখাপড়াই

ল্যাতিন অক্ষরে করতে হবে। ষোলো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্কুলে গিয়ে ল্যাতিন বর্ণমালা শিখে আসতে বাধ্য করা হল। বলা হল, যে সরকারি কর্মচারীরা এই অক্ষর ব্যবহার করতে জানবেন না তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। জেলে যে-সব কয়েদী রয়েছে তারা দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ছাড়া পাবে না, যদি না দেখা যায় এই নূতন অক্ষরে তারা পড়তে এবং লিখতে জানে! অত্যন্তরকম খুঁটিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ সম্পন্ন করবার ক্ষমতা একাধিনায়কের থাকে, বিশেষ করে তিনি যদি জনপ্রিয় হন। প্রজাদের জীবনযাত্রায় এতখানি হস্তক্ষেপ করবার সাহস অন্য কটা দেশের শাসনকর্তৃপক্ষের হত, বলা শক্ত।

তুরস্কে ল্যাতিন অক্ষর প্রবর্তিত করা হল, তার পরই এল আরেকটি নূতন পরিবর্তন। দেখা গেল, আরবি ও ফার্শি কথা এই অক্ষরে লেখা কঠিন, এই ভাষায় যে-সব বিশেষ ধ্বনি আর চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এই অক্ষরে তা প্রকাশ করা যায় না। খাঁটি তুর্কি কথায় তত সূক্ষ্মতা নেই, সেগুলো বেশি কর্কশ, বেশি সহজ এবং বেশি জোরাল—তাকে সহজেই এই নূতন অক্ষরে লেখা যায়। অতএব স্থির হল, তুর্কি ভাষা থেকে সমস্ত আরবি আর ফার্শি কথা বাদ দিতে হবে, তার বদলে খাঁটি তুর্কি কথা চালানো হবে। এই সিদ্ধান্তের মূলে প্রকৃত কারণ অবশ্য ছিল জাতীয়তাবাদ। তোমাকে বলেছি, কামাল পাশার সংকল্পই ছিল, তুরস্ককে আরব আর প্রাচ্য জগতের প্রভাব থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত করে আনবেন। প্রাচীন তুর্কি ভাষা আরবি আর ফার্শি শব্দে বাক্যে সমৃদ্ধ, অটোম্যান সম্রাটের দরবারের বিচিত্র জাঁকজমকে পরিপূর্ণ জীবন-যাত্রার সঙ্গে হয়তো তার মিল ছিল। এখনকার এই প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্রী নবীন তুরস্কের পক্ষে একে একেবারেই বেমানান বলে এঁরা মনে করলেন। অতএব এই সমস্ত সূক্ষ্ম মধুর বাক্যকে এঁরা ভাষা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন; বড়ো বড়ো উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক প্রভৃতি বহু লোকে গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের নিজস্ব ভাষা শিখে নিতে লাগলেন, পুরোনো দিনের খাঁটি তুর্কি কথা যেখানে যা পান খুঁজে বার করতে লাগলেন। এই ভাষা পরিবর্তনের কাজ আজও চলেছে। উত্তর-ভারতে আমরা যদি এইভাবে ভাষা পরিবর্তন করতে যেতাম তার মানে হত, দিল্লী বা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের যে সমৃদ্ধ এবং খানিকটা কৃত্রিম হিন্দুস্থানী ভাষা আমরা ব্যবহার করছি (সে ভাষা বস্তুত প্রাচীন মোগল দরবারের সৃষ্টি), তার অনেকখানি আমরা বাদ দিয়ে চলব, এবং তার পরিবর্তে গ্রাম-অঞ্চলের বহু অমার্জিত 'গেঁয়ো' কথা ব্যবহার করতে শিখব।

ভাষার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই শহর এবং মানুষের নামও বদলে যাচ্ছে। তুমি জান, কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্ শহরের নাম এখন হয়েছে ইস্তাম্বুল। আঙ্গোরা হয়েছে আন্‌কারা, স্মার্না হয়েছে ইস্‌মির। তুরস্কে সাধারণত মানুষের নামও আরবি ভাষা থেকেই নেওয়া হয়—মুস্তাফা কামাল এই নামটাও আরবি নাম। এখন সকলেই খাঁটি তুর্কি নাম রাখবার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন।

আর-একটা পরিবর্তন এঁরা সাধন করেছেন, সেটা নিয়ে কিছু হাঙ্গামারও সৃষ্টি হয়েছে। আইন করা হয়েছে, ইসলামের (নামাজ) প্রার্থনা এবং 'আজান' বা প্রার্থনাতে যোগ দেবার আহ্বানও তুর্কি ভাষায় উচ্চারণ করতে হবে। এই প্রার্থনা মুসলমানরা চিরিদনই মূল আরবি ভাষায় উচ্চারণ করে এসেছে, এখনও ভারতবর্ষে তাই করা হয়। অতএব মৌলবীরা এবং মস্‌জিদের অধ্যক্ষরা অনেকেই একে একটা অন্যায় পরিবর্তন বলে মনে করলেন, তাঁরা আরবি ভাষাতেই প্রার্থনা করে যেতে লাগলেন। এই প্রশ্নটি নিয়ে বহুবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত হল, এখনও এ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঙ্গা হয়। কিন্তু কামাল পাশা পরিচালিত তুর্কি সরকার আরও বহু ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও বিরোধীদলকে দমন করেছেন।

গত দশ বৎসরের এই-সব বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের ফলে তুর্কি জাতির জীবনধারাই একেবারে বদলে গেছে; এখনকার ছেলেমেয়েরা যারা বড়ো হয়ে উঠছে, প্রাচীনকালের সে-সব রীতিনীতি আর ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয়ই নেই। এই পরিবর্তনগুলো খুবই গুরুতর, তবুও কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এর দ্বারা বিশেষ ব্যাহত হয় নি। একেবারে উপরতলায় গিয়ে এক-আধটা ছোটো খাটো পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল ভিত্তি

প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে। কামাল পাশা অর্থনীতিবিদ নন; সোভিয়েট রাশিয়াতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেরকম প্রগতিমূলক পরিবর্তন রাতারাতি ঘটিয়ে ফেলা হয়েছে, তার পক্ষপাতীও তিনি নন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনীতির দিক থেকে তিনি সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলেও অর্থনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে তিনি কমিউনিজম্‌কে সযত্নে পরিহার করে চলছেন। রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যা মতামত, দেখে মনে হয় সেগুলো তিনি আহরণ করেছেন ফরাসি-বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে।

তুরস্কে এখনও কোনো শক্তিমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি, একমাত্র চাকুরি আর পেশাজীবী শ্রেণীটা ছাড়া। গ্রীক এবং অন্যান্য বিদেশীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বলহানি ঘটেছে। কিন্তু তুর্কি সরকারের স্পষ্ট অভিমত হচ্ছে, জাতি হিসাবে তাঁরা দরিদ্র হয়ে থাকবেন, শিল্প-প্রগতির পথে অতি ধীরে ধীরেই এগিয়ে চলবেন, সেও তাঁদের ভালো, তবু দেশকে অর্থনৈতিক জীবনের দিক থেকে স্বাধীন হয়েই থাকতে হবে, বিদেশীর পায়ে সে স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া চলবে না। বিদেশ থেকে যদি বৃহৎ পরিমাণে মূলধন এসে তুরস্কে হাজির হয়ে তবে শেষপর্যন্ত সেই বলির ব্যাপারই দাঁড়িয়ে যাবে, সেই বিদেশীরাই দেশটাকে শুষে নিতে থাকবে, এ ভয় তাঁদের মনে আছে; সুতরাং তাঁরা দেশের মধ্যে বিদেশীদের এসে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার সুযোগ বিশেষ দিতে চান না। বিদেশী পণ্যের উপরে খুব উঁচুহারে শুল্ক বসানো হয়েছে। বহু শিল্প ও কারখানাকে জাতির সম্পত্তি করে নেওয়া হয়েছে; তার মানে সমস্ত প্রজার পক্ষ থেকে সরকারই সেগুলোর মালিক হয়ে বসেছেন, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। রেলপথ নির্মাণের কাজ বেশ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে।

শিল্পের তুলনায় কৃষির দিকেই কামাল পাশার নজর বেশি; কারণ তুরস্কের কৃষকরাই চিরদিন তুর্কি জাতি এবং তুর্কি সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড স্বরূপ হয়ে রয়েছে। দেশে বহু 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র' তৈরি করা হয়েছে, ট্রাক্‌টরের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছে, সমবায়-সমিতি গড়তে কৃষকদের সাহায্য করা হচ্ছে।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের মতো তুরস্কও আজ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-সংকটের আবর্তে পড়ে গিয়েছে; এই বিপদের মধ্যে নিজেকে সামলে চলা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। মুস্তাফা কামাল আজও দেশের প্রধান কর্তাব্যক্তি হয়ে রয়েছেন; তাঁর পরিচালনায় তুরস্ক ধীর কিন্তু দৃঢ়-পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে 'আতাতুর্ক' বা 'দেশের পিতা' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি এখন এই নামেই পরিচিত।

১৬০

ভারতে গান্ধীজির নেতৃত্ব

১১ই মে, ১৯৩৩

ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে-সব ব্যাপার ঘটে গেছে, তার কথা এবার তোমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। দেশের বাইরের ঘটনার চেয়ে স্বভাবতই এই ঘটনাগুলো সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বেশি; আমাকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে যেন খুব বেশি খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে না বসি। কেবল আমাদের নিজেদের গরজ বলেই কথা নয় অবশ্য। আজকের দিনে জগতের সামনে যে-কটি দেশের সমস্যা অতি বৃহৎ, ভারতবর্ষ তারই একটি হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্য যাকে বলে এই দেশটি তার একটি ইতিহাসবিশ্রুত দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোটা কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে একে আশ্রয় করে; সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রিটেনের এই সকল প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত দেখে আরও বহু দেশ সাম্রাজ্য স্থাপনের দুঃসাহসিক পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ হয়েছে।

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে তার কথা আমি তোমাকে বলেছি : বলেছি, কী করে ভারতের শিল্প-ব্যবসায় এবং ভারতের ধনিকশ্রেণী গড়ে উঠল, ভারতীয় শিল্প-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ব্রিটিশের নীতি কীরকম বদলে গেল। শিল্প এবং বাণিজ্যের দিক থেকে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের উপরে যে চাপ দিচ্ছিল তার বহর ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যাচ্ছিল রাজনীতির ব্যাপারেও তার চাপ। সমগ্র প্রাচ্য জগৎ জুড়েই তখন একটা রাজনৈতিক জাগরণের হাওয়া বইছে; যুদ্ধের পরে পৃথিবীময় দেখা দিয়েছে একটা চাপা অসন্তোষের লক্ষণ, একটা যেন রুগ্ন অবস্থা। ভারতবর্ষেও মাঝে মাঝেই বিপ্লবীদের সহিংস কার্যকলাপ আত্মপ্রকাশ করছে; সমস্ত মানুষের মন একটা বিপুল আশায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকার নিজেও বুঝেছেন এবার কিছু একটা না করলে নয়, সে কাজ করবার ব্যবস্থাও খানিকটা তাঁরা করছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা একটা তত্ত্বনির্ণয়ী কমিটি বসালেন, তার পর কতকগুলো সংস্কার-সাধনের প্রস্তাব করলেন, সে প্রস্তাবগুলো মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশিত হল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা নবজাগ্রত বুর্জোয়াশ্রেণীকে নানা রকমের টুক্‌রো-টাক্‌রা খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুললেন, অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য রাখলেন যেন শক্তি এবং শোষণের মূল কেন্দ্রস্থলগুলো তাঁদের নিজেদের আয়ত্তেই থেকে যায়।

যুদ্ধের পরে অল্প কিছুদিন যাবৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হল, একটা বেশ রীতিমতো তেজীর বাজারই দেখা গেল কিছুদিন, ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড রকম লাভ তুলে নিল, বিশেষ করে বাঙলা দেশে পাটের কারবারে; বহুক্ষেত্রে এতে মূলধনের উপরে শতকরা বার্ষিক একশো টাকারও বেশি লভ্যাংশ দেওয়া হল। জিনিসপত্রের দর চড়তে লাগল; মজুরির হারও কিছুটা বাড়ল, তবে অতখানি নয়। পণ্য-মূল্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা জমিদারকে যে খাজনা দিত তারও হার বেড়ে গেল। তার পর এল মন্দার বাজার, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভাঙন ধরল। শিল্পজীবী মজুর আর কৃষক, দুয়েরই অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল, দেশের সর্বত্র অসন্তোষ দ্রুত বেড়ে উঠল; শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছিল, তার ফলে অনেক কারখানাতে ধর্মঘট হল। অযোধ্যাতে তালুকদারি প্রথার অধীনে প্রজাদের অবস্থা বিশেষ রকম খারাপ ছিল, সেখানে প্রায় নিজে থেকেই একটা প্রবল কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল। শিক্ষিত নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা বেড়ে গেল, তার ফলে তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবধি রইল না।

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকে এই ছিল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা : এইটাকে মনে রাখলে সহজেই বুঝতে পারবে দেশের রাজনৈতিক ঘটনার প্রবাহ কোন্‌দিকে চলেছিল। দেশের মনে তখন একটা বিদ্রোহের ভাব এসেছে, নানা রকমে সেটা বাইরে আত্মপ্রকাশ করছে। শিল্পজীবী শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, ট্রেড্-ইউনিয়ন গড়েছে, তার পর তাই থেকেই গড়ে উঠেছে একটা নিখিল ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস; ছোটো ছোটো জমিদাররা আর জমির-মালিক কৃষকরা সরকারের আচরণে ক্ষুব্ধ, তাঁরা দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রীতির চোখে দেখছেন; কৃষক প্রজারা পর্যন্ত গল্পের সেই কেঁচোর মতো মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াতে চাইছে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা, বিশেষ করে তার বেকার লোকরা, নিঃসংশয়েই রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠছে, তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক বিপ্লবী-দলেই গিয়ে যোগ দিচ্ছে। হিন্দু মুসলমান শিখ সকলেরই তখন সমান দুরবস্থা, কারণ অর্থনৈতিক দুর্দশা জাতি বা ধর্মের বিভেদকে খাতির করে চলে না। কিন্তু এরও উপরে আবার মুসলমানদেরই তখন মনের অবস্থা খারাপ; তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে যুদ্ধ করতে দেখে তাদের মনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, আশঙ্কা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার বুঝি এবার সত্যই জাজিরাত-উল-আরব অর্থাৎ আরব দেশের দ্বীপগুলোকে এবং পবিত্র নগরী মক্কা মদিনা এবং জেরুজালেমকে (জেরুজালেম হচ্ছে ইহুদি, খৃষ্টান এবং মুসলমান তিন সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান) দখল করে নেয়।

অতএব যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রতীক্ষা করে রইল; তারা ইংরেজের প্রতি প্রসন্ন নয়, হয়তো-বা ঝগড়া বাধাতেই উৎসুক, মনে খুব বেশি আশাও তারা রাখে না, তবু তারা ফলের প্রত্যাশা করছে। ব্রিটিশ সরকার এবার কী নীতি অবলম্বন করেন তাই দেখবার জন্য

সবাই পরম আগ্রহে অপেক্ষা করছিল; মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁদের সে নূতন নীতির প্রথম ফলটি দেখা দিল—বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হবে, এই প্রস্তাবের রূপে। কিছু বেশি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম আমরা, তার বদলে এল কিছু বেশি উৎপীড়নের ব্যবস্থা। এই বিলগুলো রচনা করা হয়েছিল একটি কমিটির রিপোর্ট অনুসারে; এর নাম রাউলাট বিল। কিন্তু দুদিন না যেতেই দেশের সর্বত্র এগুলো 'কালো বিল' বলেই পরিচিত হয়ে গেল; প্রত্যেকটি ভারতবাসী তারস্বরে এর নিন্দা করতে লাগল, নরমপন্থীদের মধ্যে যারা একেবারে নরমতম, তাঁরাও সুব্ধ। এই আইনে সরকার এবং পুলিশের হাতে বিপুল ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল; এর বলে যে কোনো লোককে তাঁরা অপরাধী বলে, এমন কি সন্দেহভাজন বলে মনে করবেন, তাদেরই গ্রেপ্তার করতে পারবেন, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে পারবেন, বা গোপন-আদালত বসিয়ে বিচার করতে পারবেন। এই সময়ে এই বিলের স্বরূপ বর্ণনা করে একটি বাক্য রচিত হয়েছিল, কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে : 'না উকিল, না আপীল, না দলিল।' এই আইনের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিবাদ যখন ক্রমেই প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে, এমন সময় আবির্ভাব হল একটি নূতন বস্তুর: রাজনৈতিক গগনের দিকচক্রবালে ক্ষুদ্র একটি মেঘবিন্দু দেখা গেল, তার পর সেই মেঘ বেড়ে বেড়ে এবং দ্রুত বিস্তারলাভ করে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশ ছেয়ে ফেলল।

এই নূতন বস্তুটি হচ্ছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যুদ্ধের মধ্যেই গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন, সবরমতীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুচরদের নিয়ে সেইখানে বসবাস করছিলেন। রাজনীতির প্রবাহ থেকে দূরেই সরে ছিলেন তিনি; যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে সরকারকে সাহায্য পর্যন্ত করেছিলেন। ভারতবর্ষে অবশ্য দক্ষিণ-আফ্রিকার সেই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের পর থেকেই তাঁর নাম সকলের অত্যন্ত পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। বিহারের চম্পারন জিলায় ইউরোপীয় নীলকর সাহেবরা দীনদরিদ্র চাষি প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছিল; ১৯১৭ সনে তিনি সেই প্রজাদের হয়ে লড়াই শুরু করলেন, অত্যাচারের অবসান ঘটালেন। তার পরে আবার তাঁকে সংগ্রাম করতে হল গুজরাটে কয়রা অঞ্চলের চাষিদের জন্য। ১৯১৯ সনের প্রথম দিকে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। অসুখ ভালো করে সেরেছে কি সারে নি, এমন সময়ে রাউলাট বিল নিয়ে সমস্ত দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলন জেগে উঠল। দেশসুদ্ধ লোকের মিলিত প্রতিবাদের সঙ্গে এবার গান্ধীজিও তাঁর কণ্ঠ মেলালেন।

অন্যদের কণ্ঠ থেকে কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের কোথায় যেন একটা তফাত ছিল। সে স্বর শান্ত, অনুচ্চ, তবু জনতার উন্মত্ত চীৎকার আর গর্জন ছাপিয়েও সে ধ্বনি মানুষের কানে এসে পৌঁছয়; কোমল এবং নম্র তাঁর কথা, তবু যেন তার মধ্যে কোথায় খানিকটা ধারালো ইস্পাত লুকিয়ে আছে; অত্যন্ত বিনয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেন, অথচ সে কথার মধ্যে অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ানক কী একটার আভাস পাওয়া যায়; তাঁর কথার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, তার মধ্যে থেকে একটা মৃত্যুপণ করা সংকল্প আত্মপ্রকাশ করছে। শান্তি এবং মৈত্রীর বাণী নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন, সে বাণীর পিছনে রয়েছে শক্তি, রয়েছে বাস্তব কর্মের স্পন্দনশীল ছায়া, রয়েছে দৃঢ় সংকল্প, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা কিছুতেই চলবে না। আজ তাঁর সে স্বর শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি; গত চৌদ্দ বছরে সে স্বর আমরা বহুবারই শুনেছি। কিন্তু সেই ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে, আমাদের কানে তাঁর সে বাণী তখন নূতন ছিল; তাকে নিয়ে কী করব আমরা ভেবে পাই নি, তবু তার ধ্বনি আমাদের মনে সেদিন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এ একেবারে আলাদা জিনিস, আমরা যে কোলাহল-সর্বস্ব রাজনীতিকে চিনতাম এ তা নয়। সে রাজনীতিতে থাকে শুধু প্রতিপক্ষের প্রতি নিন্দার বিষোদ্‌গার, শুধু দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা, তার শেষে সেই নিত্য একধরনের অর্থহীন মূল্যহীন প্রতিবাদ-প্রস্তাব, সে প্রস্তাবকে কেউই বিশেষ কাজের কথা বলেও মনে করে না। দেখ্‌লাম, গান্ধীজির এ রাজনীতি কথার রাজনীতি নয়, কাজের রাজনীতি।

বেছে বেছে কতকগুলো আইনকে ভেঙে কারাদণ্ড বরণ করতে প্রস্তুত আছেন, এমন লোকদের

নিয়ে গান্ধীজি একটি 'সত্যাগ্রহ সভা' গঠন করলেন। তখনকার দিনে এটা একটা অভিনব ব্যাপার; আমাদের মধ্যেই অনেকে আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন, অনেকে আবার ভয়ে পিছিয়েও গেলেন। আজ এটা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার; আমাদের মধ্যে অধিকাংশের পক্ষে তো এটা জীবনযাত্রার একটা নিশ্চিত এবং নিয়মিত অংশই হয়ে উঠেছে।

চিরদিনই যা তাঁর নিয়ম, প্রথমে গান্ধীজি বড়োলাটকে একটি অতি বিনীত নিবেদন এবং সাবধানবাক্য পাঠিয়ে দিলেন। তার পর যখন দেখলেন ব্রিটিশ সরকার একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁরা এই আইন তৈরি করবেনই, তখন তিনি বললেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটি শোকপ্রকাশের দিন পালন করা হোক—এই বিল যেদিন আইনে পরিণত হবে তার পরের রবিবারটি দেশব্যাপী হরতাল হবে. সমস্ত কাজকর্ম সভাসমিতি সেদিন বন্ধ থাকবে। এটা হল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা। অতএব ১৯১৯ সনের ৬ই এপ্রিল, রবিবার দিন দেশের সর্বত্র সমস্ত শহরে এবং সমস্ত গ্রামে হরতাল হল। এই ধরনের সমগ্র ভারতব্যাপী অনুষ্ঠান এর আগে আর কখনও হয় নি। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল আশ্চর্যরকম ফলপ্রসূ, সমস্ত জাতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ দিয়েছিল। আমরা যারা এই হরতাল ঘটাবার আয়োজন করেছিলাম, এর সাফল্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমরা এর আবেদন জানাতে পেরেছিলাম মাত্র অতি অল্প সংখ্যক লোকের কাছে, শহর-অঞ্চলে। কিন্তু বাতাসে তখন নূতন ভাবের জোয়ার এসেছে; কী করে জানি না এর বার্তা এই বিশাল দেশের দূরতম প্রদেশের গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত পেঁাছে গেল। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম, শহরের কর্মী আর গ্রামের অধিবাসীরা একত্র হয়ে একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ঘটিয়ে তুলল, একেবারে সমগ্র জনগণের সে অনুষ্ঠান।

দিল্লীর লোকেরা ৬ই এপ্রিল তারিখটা বুঝতে ভুল করেছিলেন, সেখানে হরতাল হল তার আগের রবিবারে, ৩১শে মার্চ তারিখে। দিল্লীর হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সেটা ছিল একটা অপূর্ব সৌহার্দ আর মৈত্রীর যুগ; অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখা গেল সেদিন—আর্য-সমাজের প্রবীণ নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীর প্রসিদ্ধ জুম্মা-মসজিদে দাঁড়িয়ে বিরাট জনতার কাছে বক্তৃতা করছেন। সেই ৩১শে মার্চ তারিখে পুলিশ এবং সৈন্যরা দিল্লীর রাস্তায় বিশাল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার চেষ্টা করল, জনতার উপরে গুলি ছুঁড়ল, কয়েকজন মারাও গেল তাতে। চাঁদনী চকে দেখা গেল, দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে অপরূপ মহিমা-দীপ্ত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বুকের জামা খুলে ফেলেছেন, অনাবৃত বক্ষে এবং নিষ্কম্প নেত্রে গুর্খাদের সঙীনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। গুর্খারা তাঁকে মারল না; এই ঘটনায় সমস্ত ভারতবর্ষের চমক লেগে গেল। কিন্তু দুঃখের কথা এই, এর পর আটটি বছরও কেটে যেতে না যেতে সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হলেন; একজন ধর্মান্ধ মুসলমান বন্ধুর ছদ্মবেশে গিয়ে তাঁকে ছুরির আঘাতে হত্যা করল, তখন তিনি রোগশয্যায় শায়িত।

৬ই এপ্রিলের সেই সত্যাগ্রহ-দিবসের পরই ঘটনার স্রোত দ্রুত এগিয়ে চলল। ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে হাঙ্গামা হল। পঞ্জাবের নেতা ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার দরুণ শোকপ্রকাশ করে একটি নিরস্ত্র জনতা অনাবৃতমস্তকে শোভাযাত্রা করেছিল, তাদের উপরে সৈন্যরা গুলি চালাল, অনেক লোক মারা গেল। তখন সে জনতাও প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত হয়ে উঠল, অফিসে বসে কর্ম-রত পাঁচ-ছ'জন নিরীহ ইংরেজকে হত্যা করল, তাদের ব্যাঙ্কের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। এর পরেই পঞ্জাব প্রদেশ একটা ঘন যবনিকার অন্তরালে চলে গেল। চিঠিপত্র ও সংবাদের উপরে কড়া পাহারা বসিয়ে পঞ্জাবকে বাকি ভারতবর্ষ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল; পঞ্জাবের আর কোনো খবরই প্রায় বাইরে এসে পেঁাছল না, বাইরে থেকে কারও সেখানে যাওয়া বা সেখান থেকে বেরিয়ে আসাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। সামরিক আইন জারি করা হল সেখানে; একটানা অনেক মাস ধরে তার পীড়ন পঞ্জাবকে সইতে হল। তার পর অতি ধীরে ধীরে, বহু সপ্তাহ বহু মাস উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর একদিন সে যবনিকা উঠে গেল; তখন আমরা জানতে পেলাম কী ভয়াবহ ব্যাপার সেখানে ঘটে গেছে।

পঞ্জাবে সেই সামরিক আইনের যুগে যে-সব বীভৎস কাণ্ড ঘটেছিল, তার বিশদ বিবরণ এখানে আমি বলব না। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৩ই এপ্রিল তারিখে যে হত্যানুষ্ঠান হয়েছিল, তার কথা পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে; হাজার হাজার মানুষ হত এবং আহত হয়েছিল সেখানে, সেই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালাবার কোনো পথই ছিল না। অমৃতসর কথাটাই এখন প্রায় 'নরহত্যা'র সমার্থক হয়ে গেছে। সে হত্যাকাণ্ডটা খুবই দুষ্কর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বহুগুণে কুৎসিত ব্যাপার পঞ্জাবের সর্বত্র তখন ঘটেছে।

তার পর বহু বছর চলে গেছে, আজও সেই সমস্ত বর্বরতা আর বীভৎস আচরণকে ক্ষমা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু এর অর্থ বোঝা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শাসন তারা যেভাবে চালাচ্ছে, তারই গুণে তারা সারাক্ষণ মনে করে তারা একেবারে আগ্নেয়গিরির ধারে বসে রয়েছে। ভারতবর্ষের মনকে, হৃদয়কে তারা বোঝে নি, বোঝবার চেষ্টাও করে নি কোনোদিন। আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থেকেই তারা চিরকাল জীবন যাপন করছে; নির্ভর করছে শুধু তাদের যে বিশাল এবং জটিল সংগঠন আছে আর তার পিছনে তাদের যে শক্তি আছে, তারই উপরে। কিন্তু তাদের এত সমস্ত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেও তাদের মনে অপরিচিতের সম্বন্ধে একটা ভয় জেগে রয়েছে; ভারতবর্ষে তারা দেড় শো বছর ধরে রাজত্ব করছে, তবু এটা এখনও তাদের কাছে অপরিচিত দেশ। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের স্মৃতি আজও তাদের মনে স্পষ্ট; তারা সারাক্ষণ মনে করছে, তারা একটা অজ্ঞাত দেশে, শত্রুর দেশে বাস করছে, যে-কোনো মুহূর্তে সে দেশ তাদের আক্রমণ করবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এই হচ্ছে তাদের সাধারণ মনোভাব। কাজেই তারা যখন দেখল দেশে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন জেগে উঠছে, আর সে আন্দোলনও তাদেরই বিরুদ্ধে, স্বভাবতই তাদের ভয় বেড়ে গেল। ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে যে নৃশংস কাণ্ড ঘটেছিল তার সংবাদ যখন লাহোরে পঞ্জাবের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের কানে গিয়ে পৌঁছল, তাঁরা ভয়ে একেবারেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এবারও ঠিক ১৮৫৭ সনের মতোই আরেকটা অতিবৃহৎ নরঘাতী বিদ্রোহ শুরু হল, ভারতবর্ষে যত ইংরেজ আছে সকলেরই এবার প্রাণ গেল? ভেবে তাঁদের মাথার ঠিক রইল না, স্থির করলেন বিভীষিকা সৃষ্টি করেই একে থামিয়ে দিতে হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সামরিক আইন এবং আরও যত ব্যাপার তখন ঘটেছিল, সে সমস্তই হচ্ছে এদের এই মানসিক বিকৃতি থেকে সৃষ্ট।

এদের ভয় পাবার কারণ সত্যই কিছু ছিল না। তবু ভয়ার্ত মানুষ যদি উচ্ছৃংখল আচরণ করেই ফেলে, তার অর্থটা সহজেই বোঝা যায়, যদিও সে আচরণকে তাই বলে সমর্থন করা চলে না। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক আরও বেশি আশ্চর্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল তখন, যখন দেখা গেল এই কাণ্ডের বহু মাস পরেও জেনারেল ডায়ার অতি অবজ্ঞার সুরে তাঁর সে আচরণের সাফাই দিচ্ছেন। অমৃতসরে ডায়ারই গুলি চালিয়েছিলেন, তার পর সেই হাজার হাজার আহত নরনারীকে একেবারে বর্বরোচিত অবহেলাভরে সেখানেই ফেলে রেখেছিলেন। বলেছিলেন "তাদের শুশ্রূষা করা আমার কাজ নয়।" ইংলণ্ডে সামান্য দু'চারজন লোক এবং সরকার তাঁর এই কাজের অতি মৃদু সমালোচনাও করলেন; কিন্তু ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর সাধারণ অভিমত এবিষয়ে কী তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল হাউস অব লর্ডসের একটি বিতর্ক সভায়—সেখানে ডায়ারের উপরে একেবারে প্রশংসার অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করা হল। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভারতবর্ষের রোষবহ্নিতে ইন্ধন জোগাতে লাগল; পঞ্জাবের অনাচার নিয়ে দেশের সর্বত্র তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হল। পঞ্জাবে বস্তুত কী ঘটেছিল, তার তথ্য নির্ণয় করবার জন্য সরকার এবং কংগ্রেস, দুই পক্ষ থেকেই অনুসন্ধান কমিটি বসানো হল। সমস্ত দেশ এঁদের রিপোর্টের প্রতীক্ষা করে রইল।

সেই বছর থেকেই ১৩ই এপ্রিল তারিখটি ভারতবর্ষের একটি জাতীয় দিবস হয়ে রয়েছে; ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত এই আটটি দিন হয়েছে তার জাতীয় সপ্তাহ। জালিয়ানওয়ালাবাগ এখন ভারতের একটা রাজনৈতিক তীর্থক্ষেত্র। চমৎকার একটি ফুলের বাগানে পরিণত করা হয়েছে একে, একদিন এর নামেই যে আতঙ্ক মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত

তারও অনেকখানিই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতি অত সহজে মরে না। সেদিনের কাহিনী আমরা ভুলি নি।

দৈবের আশ্চর্য বিধানে সে বছর কংগ্রেসেরও অধিবেশন বসল অমৃতসরেই; ১৯১৯ সনের ডিসেম্বর মাস সেটা। এই কংগ্রেসে তেমন বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত স্থির হল না, কারণ সবাই তখন অনুসন্ধান কমিটি কী রিপোর্ট দেন তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তবুও একটা কথা স্পষ্টই বোঝা গেল : কংগ্রেসের পরিবর্তন ঘটেছে। জনসাধারণের ছোঁয়াচ লেগেছে তার মধ্যে; এসেছে একটা নূতন প্রাণশক্তির জোয়ার, পুরোনো কালের কংগ্রেসী যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারও কারও পক্ষে সেটা অস্বস্তিকরও। সেই কংগ্রেসে দেখা গেল লোকমান্য তিলককে, চিরদিনের মতোই উদ্ধত শির তাঁর, কোনো আপোষ-মীমাংসার তিনি ধার ধারেন না। সেই তাঁর জীবনে শেষবার কংগ্রেসে যোগদান; পরের বার কংগ্রেসের অধিবেশন হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। সেখানে গেলেন গান্ধীজি, জনগণের প্রিয় নেতা, কংগ্রেস এবং ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল তিনি যে একনায়কত্ব করে চলেছেন, সেই তাঁর প্রথম যাত্রা। এলেন আরও বহু নেতা, জেলখানা থেকে তাঁরা সদ্য বেরিয়ে এসেছেন—সামরিক আইনের শাসনকালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের মামলাতে জড়িয়ে ফেলে এঁদের প্রতি দীর্ঘ কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল; এবার যুদ্ধবিরতি উপলক্ষে এঁদের দণ্ড মাপ করা হয়েছে। এলেন সুবিখ্যাত আলি ভ্রাতৃদ্বয়—বহু বৎসর বন্দী থেকে তাঁরা সেইমাত্র ছাড়া পেয়েছেন।

এর পরের বছরই কংগ্রেস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গান্ধীজির নির্দিষ্ট অসহযোগের কর্মসূচীকে গ্রহণ করে। কলকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন করে একে গ্রহণ করে নেওয়া হল; তার পর নাগপুরে বার্ষিক অধিবেশনে সেটা অনুমোদন করা হল। এই যুদ্ধ যে প্রণালীতে চলল সেটি সম্পূর্ণরূপেই শান্তিপূর্ণ, এর নামই ছিল অহিংস সংগ্রাম; এর গোড়ার কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষকে শাসন এবং শোষণ করার কাজে সরকারকে আমরা কোনোরকম সাহায্যই করব না। একেবারেই অনেকগুলো জিনিস আমাদের বর্জন করতে হবে; যেমন, এই বিদেশী সরকারের প্রদত্ত সমস্ত উপাধি এবং খেতাব বর্জন, সরকারি চাকরি প্রভৃতি বর্জন, উকিল এবং মামলাকারী উভয়েরই আদালত বর্জন। সরকারি স্কুল এবং কলেজ বর্জন, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডকৃত সংস্কার-ব্যবস্থার ফলে নূতন যে কাউন্সিল তৈরি করা হয়েছে সেগুলো বর্জন। এর পরে ক্রমে অসামরিক এবং সামরিক বিভাগের চাকরিও বর্জন করা হবে, কর দেওয়া বন্ধ করা হবে। গঠন-প্রচেষ্টার দিকে খুব জোর দেওয়া হল হাতে সুতো কাটা আর খদ্দরের উপরে, আর সরকারি আদালতের পরিবর্তে সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করার উপরে। এই কর্মসূচীর আর দুটি অত্যন্ত বড়ো কথা ছিল—হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধন আর হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ।

কংগ্রেস তার নিজের গঠনতন্ত্রও বদলে নিল। এবার সে সত্যকার একটি কর্মক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল; জনসাধারণও এর সভ্য হতে পারবে তারও ব্যবস্থা করা হয়ে গেল।

এতদিন কংগ্রেস যা করে এসেছে, তার থেকে এই কর্মসূচী একেবারেই ভিন্ন বস্তু। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীতেই এটা হল একটা অভিনব বস্তু; কারণ দক্ষিণ-আফ্রিকাতে যে সত্যাগ্রহ হয়েছিল তার গণ্ডি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। এর মানে হল, কতক লোককে তখনই অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি বরণ করে নিতে হবে, যেমন আইনজীবীদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে হবে, ছাত্রদের সরকারি কলেজে পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এর স্বরূপ বিচার করা সেদিন কঠিন ছিল, কারণ এর সঙ্গে তুলনা করে এর দাম যাচাই করা যায় এমন দ্বিতীয় বস্তু হাতের কাছে ছিল না। প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ কংগ্রেসী নেতারা একে দেখে ইতস্তত করছিলেন, সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিলেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ব্যক্তি ছিলেন লোকমান্য তিলক, তিনি এর অল্প কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য বড়ো নেতা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মতিলাল নেহরুই প্রথম দিকে গান্ধীজির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা বা রাস্তার লোকেরা বা দেশের জনসাধারণ কী মত পোষণ করছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। গান্ধীজির আহ্বানে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, যেন

মন্ত্রমোহিত হয়ে পড়ল, 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' বলে উচ্চ চীৎকার করে অহিংস অসহযোগের এই নূতন মন্ত্রে তাদের অচল নিষ্ঠা ঘোষণা করল। মুসলমানরাও এবিষয়ে অন্যদের সমানই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত খিলাফৎ-কমিটি কংগ্রেসেরও বহু আগেই এই কর্মসূচীকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জনসাধারণের উৎসাহ দেখে এবং প্রথম-দিকে এই আন্দোলন যে সাফল্য অর্জন করল তাই দেখে, দু' দিন না যেতেই পুরোনো কংগ্রেসী নেতারাও প্রায় সকলেই এসে এর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এই আন্দোলনের দোষ ও গুণ কী ছিল, বা কোন্ দার্শনিক যুক্তির উপরে এর প্রতিষ্ঠা, সে আলোচনা এই চিঠিপত্রে করা সম্ভব নয়। সেটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল আলোচনা; একমাত্র এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা গান্ধীজি নিজে ছাড়া অন্য কেউই বোধ হয় সে নিয়ে সুষ্ঠুরকম আলোচনা করবার শক্তি রাখে না। তা হোক, এসো আমরা বাইরের লোকের দৃষ্টি নিয়েই একে তাকিয়ে দেখি, এত দ্রুতবেগে এবং এত সাফল্যের সঙ্গে এটা দেশে বিস্তারলাভ করল কী করে, সেটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি।

আমি তোমাকে বলেছি, বিদেশীর শোষণ আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের আর্থিক দৈন্য দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছিল। কী করে এর প্রতিকার হতে পারে? জাতীয় চেতনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকে বুঝল, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাদের চাইই। স্বাধীনতা পাওয়া তাদের প্রয়োজন—শুধু পরাধীন এবং অ-স্বাধীন হয়ে থাকাটা হীনতার পরিচায়ক বলেই নয়; তিলকের ভাষায় সে স্বাধীনতা "আমাদের জন্মগত অধিকার সুতরাং তাকে আমাদের অর্জন করতেই হবে" কেবল এই বলেও নয়; আমাদের দেশবাসীর কাঁধ থেকে দারিদ্র্যের বোঝাটাকে নামিয়ে ফেলবার জন্যেও স্বাধীনতা আমাদের প্রয়োজন। স্বাধীনতা অর্জন করব আমরা কী করে? নিজেই সে একদিন হেঁটে এসে হাজির হবে, এই ভেবে চুপ করে প্রতীক্ষায় বসে থাকলে সে আসবে না, এটা সহজ কথা। এটাও স্পষ্টই বোঝা যায়, কংগ্রেস এতদিন ধরে যে নিছক আর্তনাদ আর ভিক্ষা-প্রার্থনার নীতি অল্পবিস্তর চেঁচামেচি করে চালিয়ে এসেছে, সেটা একটা জাতির পক্ষে অমর্যাদাকর তো বটেই, তাতে কাজ উদ্ধার হবারও কোনো আশা নেই। এই-সব কাণ্ড-কারখানার ফলে কেউ কোথাও সাফল্য লাভ করেছে, নিছক কান্নাকাটি শুনেই শাসক বা ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণী তার হাতের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোথাও নেই। ইতিহাসে বরং এই কথাই সর্বত্র দেখা যাচ্ছে, যে-সব জাতি বা শ্রেণী পরের দাস হয়ে ছিল তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে সহিংস বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়েই।

ভারতের লোকদের পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার কথা উঠতেই পারে না। আমাদের অস্ত্রহীন করে রাখা হয়েছে, আমাদের মধ্যে খুব বেশির ভাগ লোকই অস্ত্র ব্যবহার করতে পর্যন্ত জানে না। তাছাড়া শুধু হিংস্র শক্তির লড়াইই যদি করতে হয়, ব্রিটিশ সরকারের বা যে কোনো রাষ্ট্রেরই, শক্তি সুসংহত—তার বিরুদ্ধে যেটুকু শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব তার চেয়ে তার জোর অনেক বেশি। সেনাবাহিনীও বিদ্রোহ করতে পারে; কিন্তু নিরস্ত্র জনসাধারণ বিদ্রোহ করতে পারে না, সশস্ত্র সৈন্যের সম্মুখীন হয়ে লড়তে পারে না। অন্যদিকে আবার ব্যক্তিগতভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করা, বোমা বা পিস্তল দিয়ে দু'চারজন সরকারি কর্মচারীকে খুন করা—এটাও একটা দেউলিয়া নীতি। এতে দেশের লোকের মানসিক অবনতি ঘটায়; আর ব্যক্তিহিসাবে মানুষ এতে যতই ভয় পাক না কেন, একটা শক্তিশালী সুসংহত সরকারকে এর দ্বারা বিধ্বস্ত করে দেওয়া যাবে, এমন কল্পনা করাই পাগলামি। এই ধরনের ব্যক্তিগত খুনখারাবি করার নীতি রাশিয়ার বিপ্লবীরাও পরিত্যাগ করেছিলেন, সেকথা তোমাকে বলেছি।

তাহলে বাকি রইল কী? রাশিয়ার বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, সে শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছে; তার কাজের প্রণালী ছিল জনসাধারণের জাগরণ এবং তার পিছনে সেনা-বাহিনীর সমর্থন। কিন্তু রাশিয়াতেও সোভিয়েটেরা জয়লাভ করেছে এমন একটা মুহূর্তে, যখন যুদ্ধের ফলে সমস্ত দেশটা এবং তার পুরোনো শাসন-ব্যবস্থাটা ভেঙে একেবারে ছত্রখান হয়ে

পড়েছে, এদের বাধা দেবার মতো কেউ বড়ো একটা বেঁচেই ছিল না। তাছাড়া ভারতবর্ষে অতি অল্প দু'একজন লোকই তখন রাশিয়া বা মার্ক্সবাদের নাম শুনেছে, বা শ্রমিক এবং কৃষকদের কথা ভাবতে শিখেছে।

অতএব দেখা গেল, এর কোনো পথই আমাদের জন্যে খোলা নয়; মনে হল, হীন দাসত্বের এই অসহ্য দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবার কোনো আশাই আমাদের নেই। যাঁদের মনে কিছুমাত্র স্পর্শচেতনা ছিল তাঁরা ভয়ানক হতাশ হলেন। নিজেদের একেবারেই অসহায় ভাবতে লাগলেন। ঠিক এই মুহূর্তটিতে এলেন গান্ধীজি, তাঁর অসহযোগের কর্মসূচীটিকে সামনে মেলে ধরলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের মতো এই কর্মসূচীও আমাদের শেখাল নিজের উপরে নির্ভর করতে, নিজেদের শক্তিকে গড়ে তুলতে; সরকারকে চাপ দিয়ে কথা শোনাবার কায়দা হিসাবে এর শক্তি প্রচুর, সেও সহজেই বোঝা যায়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ভারতবাসীরা নিজেরাই সরকারকে সকল কাজকর্ম চালাতে সাহায্য করছে, ভারত-সরকার অনেকখানিই টিকে আছে তাদের সেই সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এদের এই সহযোগিতা যদি সে আর না পায়, সমস্ত ব্যাপারে তাকে যদি আমরা বর্জন করে চলতে পারি, তবে যুক্তির দিক থেকে অন্তত বলব, সরকারের সমস্ত কাঠামোটি অনায়াসে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এটা কিছুই অসম্ভব নয়। এমন কি অতদূর পর্যন্ত যদি অসহযোগ আমরা নাও করি, তবু যেটুকু করব তাইতেই সরকার অত্যন্ত রকম ফাঁপরে পড়ে যাবেন, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে জনগণেরও শক্তি অনেক বেড়ে উঠবে—এতেও সন্দেহ নেই। সে অসহযোগ হবে সম্পূর্ণরূপে অহিংস; তবু কিন্তু এটা শুধুমাত্র অ-প্রতিরোধই নয়। সত্যাগ্রহ মানে হচ্ছে, যাকে আমরা অন্যায় বলে মনে করছি তাকে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিরোধ করা, অবশ্য অহিংস উপায়ে। কার্যত এটা হচ্ছে একটা অহিংস বিদ্রোহ, অত্যন্ত সুসভ্য রীতিতে একটা যুদ্ধঘোষণা, অথচ, রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলবার শক্তি এ রাখে। জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলবার এটা একটা অতি চমৎকার উপায়; দেখে মনে হল, ভারতীয় প্রজার নিজস্ব প্রকৃতি ও প্রতিভার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল আছে। এতে আমরা যথাসম্ভব সদ্‌ব্যবহারই দেখিয়ে বলব, অপরাধ এবং ত্রুটি যা কিছু, সমস্ত গিয়ে পড়বে বিপক্ষের ঘাড়ে। আমরা এতদিন ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকতাম, এর দ্বারা সে ভয়কে আমরা জয় করব, মুখ তুলে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শিখব, যা এর আগে কোনো দিন তেমন করে পারি নি; আমাদের মনের কথা সম্পূর্ণ এবং সরলভাবে খুলে বলতে পারব। আমাদের মনের উপরে একদিন যে জগদ্দল পাথর চেপে বসে ছিল সেটা এবার সরে যাবে, বাক্য এবং কার্যের এই নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের মনকে আত্মপ্রত্যয়ে আর শক্তিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে। শেষকথা, এই ধরনের সংগ্রামে চিরদিনই অতি তীব্র জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে এসেছে; এই নূতন পথটা হবে শান্তির পথ, এতে সেরকম বিদ্বেষ-সৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে, সুতরাং দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের চরম মীমাংসা করাও সহজতর হয়ে উঠবে।

অসহযোগের এই অভিনব কর্মসূচী, এর সঙ্গে আবার রয়েছে গান্ধীজির অপূর্ব ব্যক্তিত্ব; অতএব একে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের মন আকৃষ্ট হল, আশায় ভরে উঠল, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অসহযোগের মন্ত্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল, আর এর স্পর্শ লাগামাত্রই এতদিন যে হীন দুর্বলতা আমাদের ঘিরে ছিল সেটা অন্তর্হিত হয়ে যেতে লাগল। নবরূপে-জাত এই কংগ্রেস দেশের প্রাণস্বরূপ ব্যক্তি যিনি যেখানে ছিলেন সকলকেই নিজের ক্রোড়ে আকর্ষণ করে নিল; দিন দিন এর শক্তি আর মর্যাদা বাড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রচিত শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা অনুসারে নূতন রকমের সব কাউন্সিল আর অ্যাসেম্বলি তৈরি করা হয়েছে। নরমপন্থীদের তখন নাম হয়েছে উদারপন্থী; তাঁরা এই-সব ব্যাপারকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন; এই শাসন-ব্যবস্থার অধীনে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মচারীর পদ অধিকার করে বসেছেন। তাঁরা বস্তুত সরকারেরই গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেছেন, দেশের লোকও আর তাঁদের সমর্থন করছে না। কংগ্রেস এই-সব আইন-সভাকে বর্জন করেছে, দেশের লোকে এগুলোর দিকে মোটে দৃষ্টিপাতই করছে না। এর বাইরে দেশের প্রতি

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যে সত্যকার সংগ্রাম তখন চলেছে, সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তারই দিকে। সেই প্রথম বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মী গ্রামগুলিতে গিয়ে হাজির হয়েছেন, সেখানে কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলছেন।

অবস্থা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে দুই পক্ষে সংঘাত বাধল—বাধবেই জানা কথা। এই সংঘাতের আপাত-উপলক্ষ্য ছিল প্রিন্স অব ওয়েল্সের (ইংলণ্ডের যুবরাজের) ভারতে আগমন। কংগ্রেস একে বর্জন করল। ভারতের সর্বত্র দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার করা হল, হাজার হাজার 'রাজনৈতিক বন্দী'তে সমস্ত জেলখানা ভরে গেল। আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রথমবার স্বাদ পেলাম, জেলখানার মধ্যে গেলে কেমন লাগে। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হল; তাঁর স্থানে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন হাকিম আজমল খাঁ। স্বয়ং গান্ধীজিকে কিন্তু তখন গ্রেপ্তার করা হল না। আন্দোলন ক্রমেই বাড়তে লাগল; যত লোক গ্রেপ্তার হবার জন্য সেধে এগিয়ে গেল, দেখা গেল তাদের সংখ্যা সর্বদাই যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি। বড়ো বড়ো প্রসিদ্ধ নেতারা এবং কর্মীরা জেলে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের জায়গাতে এসে বসতে লাগল যত নূতন অনভিজ্ঞ এবং বহুক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত লোক (অনেক সময় পুলিশের গুপ্তচররা পর্যন্ত!); তার ফলে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিংসাও অনুষ্ঠিত হল। ১৯২২ সনের প্রথম দিকে যুক্তপ্রদেশে গোরক্ষপুরের কাছে চৌরী-চৌরাতে একদল কৃষক আর পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হল; শেষপর্যন্ত কৃষকরা পুলিশের থানাটিকেই পুড়িয়ে দিল—থানার মধ্যে কয়েকজন পুলিশের লোক ছিল, তাদের সুদ্ধ। এই ব্যাপারে এবং আরও কয়েকটি ঘটনার ফলে গান্ধীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই-সব ব্যাপারে প্রমাণ হল, আন্দোলনের মধ্যে হিংসাত্মক বৃত্তি এসে পড়ছে। গান্ধীজির কথামতো কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেকার আইন-ভাঙার অংশটুকু বন্ধ করে দিলেন। এর অল্পদিন পরেই গান্ধীজি নিজেও গ্রেপ্তার হলেন, বিচারে তাঁর প্রতি ছ'বছর কারাদণ্ডের আদেশ হল। সেটা ১৯২২ সনের মার্চ মাসের কথা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় এইখানে শেষ হল।

১৬১

ভারতবর্ষ : ১৯২০ সনের পরে

১৪ই মে, ১৯৩৩

১৯২২ সনে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হল, অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ও সেই সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আন্দোলন এভাবে বন্ধ করে দেওয়াতে কংগ্রেসের কর্মীরা অনেকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। প্রকাণ্ড একটা জাগরণ এসেছিল দেশে, প্রায় ত্রিশ হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছেন। এই সমস্তর কী কোনোই মূল্য নেই? চৌরী-চৌরাতে ক'জন দরিদ্র উত্তেজিত কৃষক একটা অন্যায় করে ফেলেছে, শুধু তাই বলেই এত বড়ো একটা আন্দোলনকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আগেই মাঝপথে হঠাৎ থামিয়ে দিতে হবে? স্বরাজ এখনও বহু দূরে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্ম আগের মতোই চলছে। দিল্লীতে এবং প্রদেশগুলোতে কতকগুলো আইন-সভা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কংগ্রেস সেগুলোকে বর্জন করে চলেছে। এই সব কাউন্সিলের প্রকৃত ক্ষমতা বলতে কিছু ছিল না। গান্ধীজি তখন জেলে।

পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে বিস্তর বাদানুবাদ হল এবং কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন সমর্থনকারী একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল, এর নাম হল 'স্বরাজ্য-দল'। এঁরা বললেন, অসহযোগনীতির কর্মসূচীতে যে বর্জন-সংকল্প আছে তাকে একটি বিষয়ে একটুখানি

বদলে নেওয়া দরকার—কাউন্সিল-বর্জনের সিদ্ধান্তটা উঠিয়ে দিতে হবে। এতে কংগ্রেসের মধ্যে একটা দলাদলির সৃষ্টি হল, কিন্তু শেষপর্যন্ত 'স্বরাজ্য-দল'ই অধিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়ে দাঁড়াল।

কংগ্রেসকর্মীগণ আইনসভায় প্রবেশ করে খুব গরম গরম বক্তৃতা করলেন এবং সরকারি বাজেট মঞ্জুর হতে দিলেন না। সরকার অবশ্য এ'দের সে-সব প্রস্তাব ও ভোট গ্রাহ্য করলেন না এবং যে বাজেট আইনসভায় না-মঞ্জুর হয়েছিল বড়োলাট সেটাকেই সার্টিফিকেটের বলে নিজে মঞ্জুর করে দিলেন। আইন-সভার ভিতরে কংগ্রেসকর্মীদের এসব কার্যকলাপ কিছুদিনের মতো দেশের মধ্যে আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে রাখল বটে কিন্তু এতে আন্দোলনের আদর্শ কতকটা খাটো হয়ে গেল; কেননা একাজের সংগে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ছিল না, এবং এতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাথে অরুচিকর আপোষ-রফা করতে হল।

১৯২০ সনের পরবর্তী এই কালটাতে যে-সব বিভিন্ন ব্যাপার এবং আন্দোলন ভারতবর্ষকে চঞ্চল করে রেখেছিল, তার খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। প্রায় সকলের চেয়ে বড়ো কথাই ছিল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো ইত্যাদি সামান্য সব ব্যাপার নিয়ে উত্তর-ভারতের বহু স্থানে বহু দাংগাও ঘটে গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দুয়ের মধ্যে যে অপূর্ব ঐক্য দেখা গিয়েছে, তার পরে আবার এই পরিবর্তন যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর। এই পরিবর্তন এল কেন? আগের দিনের সে ঐক্যই-বা ঘটেছিল কিসের জোরে?

জাতীয় আন্দোলন দাঁড়িয়ে ছিল প্রধানত দেশের আর্থিক দুর্গতি এবং বেকার-সমস্যাকে ভিত্তি করে। এই দুর্গতির আঘাতে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়েরই মনে একসংগে একটা ব্রিটিশ-সরকার-বিরোধী ভাব এবং স্বরাজের জন্য একটা অস্পষ্ট কামনা জেগে উঠেছিল। এই বিরোধের প্রবৃত্তিই সকলকে টেনে একত্র করেছিল, সেই বন্ধনের জোরেই সকলে একত্র হয়ে লড়েছিল; কিন্তু বিভিন্ন দলের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন। স্বরাজ বলতে এর এক-এক দল এক-এক রকম জিনিস বুঝত—বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝত, স্বরাজ হলেই তাদের চাকরি মিলবে, চাষি ভাবত জমিদার তার উপরে যে বহুবিধ বোঝা চাপিয়ে রেখেছে তার থেকে সে মুক্তি পাবে—ইত্যাদি। ধর্মগত সম্প্রদায়ের দিক থেকে এর দিকে তাকালে দেখা যাবে, মুসলমানরা জাতি হিসাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, সে প্রধানত খিলাফতের খাতিরে। এটা একটা বিশুদ্ধ ধর্মগত বস্তু, একমাত্র মুসলমানদেরই ব্যাপার—অমুসলমানদের এর সংগে কোনো সম্পর্কই ছিল না। গান্ধীজি কিন্তু তবুও একে স্বীকার করে নিলেন, অন্যদেরও একে মেনে নিতে যুক্তি দিলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল বিপন্ন ভাইকে সাহায্য করাই তাঁর কর্তব্য। এর দ্বারা হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হয়ে উঠবে, এ আশাও তাঁর মনে ছিল। মুসলমানদের সাধারণ মনোভাবটা ছিল একটা মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম আন্তর্জাতীয়তাবাদ; খাঁটি জাতীয়তাবাদ নয়। তবে এই দুয়ের মধ্যের প্রভেদটা সেদিন স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে নি।

অন্যদিকে আবার, হিন্দুরা জাতীয়তাবাদ বলতে যা বুঝত সেটাও নিঃসন্দেহে ছিল একটা হিন্দু-জাতীয়তা। এ ক্ষেত্রে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর প্রকৃত জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্যের একটা স্পষ্ট রেখা টেনে দেওয়া সহজ ছিল না (মুসলমানদের বেলায় সেটা সহজ ছিল)। এরা দুটোতে পরস্পর জড়িয়ে গিয়েছিল, কারণ ভারতবর্ষই হচ্ছে হিন্দুদের একমাত্র বাসস্থান এবং এদেশে তাদেরই সংখ্যা বেশি। কাজেই মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা বেশি সহজ খাঁটি জাতীয়তাবাদীর রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল, মুসলমানদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। আসলে দুই দলেরই কার্য ছিল তাদের নিজস্ব প্রকারের জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

তৃতীয়ত ছিল, যাকে বলা যায় প্রকৃত বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ; জাতীয়তাবাদের এই দুটি ধর্মগত বা সম্প্রদায়গত নমুনা থেকে সে একেবারেই আলাদা বস্তু। সত্য কথা বলতে গেলে এইটাই হচ্ছে এর একমাত্র রূপ, যাকে আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদ বলা চলে। এই তৃতীয় দলে অবশ্য হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত,

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে, এই তিন দল জাতীয়তাবাদীই দৈবক্রমে এসে একত্র হয়ে গেলেন। এ'দের তিন দলের পথ বিভিন্ন, কিন্তু তখনকার মতো সে পথগুলো পরস্পরের পাশাপাশি বয়ে চলেছিল।

১৯২১ সনের সেই গণ-আন্দোলন দেখে ব্রিটিশ সরকার একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল। বহু-দিন আগে থেকেই এর কথা তারা জেনেছে, তবু কী করে একে দমানো যায় তারা ভেবেই উঠতে পারল না। চিরদিন যা তাদের অভ্যস্ত অস্ত্র, গ্রেপ্তার করা আর শাস্তি দেওয়া—সেটা এক্ষেত্রে চলবে না, কারণ কংগ্রেস নিজেও ঠিক তাইই চেয়েছে। অতএব সরকারের গুপ্তপুলিশ বিভাগ ভেবেচিন্তে এমন একটি কায়দা বার করল যাতে ভিতর থেকেই কংগ্রেসকে দুর্বল করে আনা যাবে। পুলিশের বহু চর, গুপ্ত বিভাগের বহু কর্মচারী কংগ্রেস কমিটিগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল, সেখানে বসে গোলমাল সৃষ্টি করতে লাগল; লোককে তারা হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করতে লাগল। আরও একটি ফন্দি আবিষ্কার করল; সাধু এবং ফকিরের ছদ্মবেশে তাদের গুপ্তচররা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, সাম্প্রদায়িক কলহ উস্‌কে তুলতে লাগল।

জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে-সব সরকার রাজ্য শাসন করেন, তাঁরা অবশ্য সর্বত্রই এমনিতর সব ফিকির-ফন্দির ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলোর ব্যবসায়ের মূলধন। এই ফিকির-ফন্দি যদি সফল হয়, সেটা সরকারের পাপিষ্ঠতার প্রমাণ ততখানি নয়, যতখানি প্রমাণ সেই প্রজাদেরই দুর্বলতা আর অকর্মণ্যতার। অন্য একটা জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাদের নিজেদের মধ্যেই বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া, আত্মকলহে দুর্বল করে ফেলে তার পর তাদের শোষণ করে নেওয়া—এ যদি কেউ পারে তবে সেইটেই তো তার বৃহত্তর শক্তি এবং সংগঠন-ব্যবস্থার অকাট্য প্রমাণ। এই নীতি সফল হতে পারে শুধু সেইখানে, যেখানে অন্য পক্ষের নিজের মধ্যেই দলাদলি ভাগাভাগি রয়েছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা ব্রিটিশ সরকারই সৃষ্টি করেছে, এ কথা বললে নিছক মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু তেমনই আবার, সেই বিরোধটাকে বাঁচিয়ে রাখবার, এই দুটি সম্প্রদায়ের মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবার যে চেষ্টা তারা আগাগোড়াই করে আসছে, সেটাকেও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

১৯২২ সনে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হল; এই শ্রেণীর চক্রান্ত চালাবার তখন একটা সুবর্ণ সুযোগ। অত্যন্ত কঠিন একটা অভিযান অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেছে, তার কোনো ফলও আমরা পাই নি—তার পরই এসেছে তার দরুন একটা উল্‌টো প্রতিক্রিয়া। দুই দলের দুই বিভিন্ন পথ এতদিন পাশাপাশি চলেছিল, এবার সেদুটো ক্রমেই বেঁকে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। খিলাফৎ সমস্যার কথা তখন আর ওঠে না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গণ-উন্মাদনার চাপে পড়ে কী হিন্দু কী মুসলমান সমস্ত সাম্প্রদায়িক নেতারাই একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন, এবার এ'রা আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, আবার বিষ ছড়াতে শুরু করলেন। বেকার মধ্যবিত্ত মুসলমানরা দেখল, হিন্দুরাই সমস্ত চাকরিবাকরি একচেটিয়া দখল করে বসে আছে, তাদের উন্নতির পথ আটকে রেখেছে। অতএব তারা দাবি তুলল, তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে, সমস্ত ব্যাপারে তাদের আলাদা করে ভাগ দিতে হবে। রাজনীতির দিক থেকে বলা যায়, এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা আসলে ছিল মধ্যবিত্ত-শ্রেণীরই ব্যাপার, চাকরি নিয়ে ঝগড়া। কাজে অবশ্য এর ফলে জনসাধারণেরও মন ক্রমে বিষিয়ে উঠল।

সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদেরই অবস্থা ভালো ছিল। ইংরেজি শিক্ষা তারা আগে গ্রহণ করেছে, সুতরাং সরকারি চাকরি বেশির ভাগ তারাই দখল করে বসেছে। টাকা-কড়িও তাদেরই বেশি। গ্রামের মহাজন বা ব্যাঙ্কার হচ্ছে বানিয়া, ছোটোখাটো ভূস্বামী এবং প্রজাদের সে শোষণ করে ক্রমে ক্রমে তাদের একেবারে ভিক্ষুকে পরিণত করে ফেলে, তাদের জমিটুকু নিজে হাতিয়ে নেয়। বানিয়ারা অবশ্য সকল জাতের প্রজা এবং ভূস্বামীকেই সমানভাবে শোষণ করত, হিন্দু বা মুসলমান বলে তফাত করত না। তবু তার হাতে মুসলমানের শোষণটা ক্রমে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করল, বিশেষ করে যে-সব প্রদেশে চাষিরা প্রধানত মুসলমান সেইখানে। কলের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলেও বোধ হয় হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদেরই দুর্দশা

বাড়ল বেশি, কারণ কারুশিল্পীর সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যেই বেশি ছিল। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারের ফলেই ভারতবর্ষের এই বড়ো দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই বেড়ে উঠল, মুসলমানদের জাতীয়তাবাদেরও জোর বাড়ল—সে জাতীয়তাবাদ দেশকে চিনল না, চিনল সম্প্রদায়কে।

এই সাম্প্রদায়িক নেতারা এমন সব দাবি খাড়া করলেন, যার ধাক্কায় ভারতে খাঁটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত আশাভরসা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন তাঁদের সেই সাম্প্রদায়িকতার সমুচিত উত্তর দেবার আগ্রহে হিন্দুদেরও সাম্প্রদায়িক সংগঠন বড়ো হয়ে উঠল। এ'রা খাটি জাতীয়তাবাদী বলে ভান করতেন, অথচ ঠিক বিপক্ষদলেরই সামনে সাম্প্রদায়িক এবং সংকীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে চলতেন।

কংগ্রেস মোটের উপর এই-সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে দূরেই সরে ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীরা অনেকে ব্যক্তিগতভাবে এর পাকে জড়িয়ে পড়লেন। খাঁটি জাতীয়তাবাদী যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ সফল হল না; দেশের অনেক জায়গাতেই বড়ো বড়ো দাঙ্গা হল।

এর উপরে আবার নূতন একটা দলগত জাতীয়তাবাদ এসে দেখা দিল—শিখদের জাতীয়তাবাদ। শিখ আর হিন্দুদের মধ্যে তফাত ঠিক কোথায়, আগে সেটা বিশেষ স্পষ্ট ছিল না। শিখরা প্রাণশক্তিতে বলীয়ান্; জাতীয়তাবাদের হাওয়া তাদেরও জাগিয়ে তুলল, তারাও নিজস্ব একটা স্পষ্ট এবং পৃথক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় লেগে গেল। শিখদের মধ্যে বহু লোক ছিল যারা একদা সৈনিক ছিল; ক্ষুদ্র অথচ সুসংগঠিত এই সম্প্রদায়টিকে তারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলল : ভারতবর্ষের অধিকাংশ দলের সঙ্গেই শিখদের একটা জায়গাতে তফাত আছে—এরা কথার চেয়ে কাজ দেখাতেই অভ্যস্ত বেশি। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পঞ্জাবের কৃষক ভূস্বামী, এদের আশঙ্কা, শহর অঞ্চলের মহাজন এবং অন্যান্য লোকেরা এদের বিপন্ন করে তুলছে। আসলে এই জন্যই এরা একটা পৃথক সম্প্রদায় বলে পরিচিত হতে চাইছিল। প্রথমেই ধরা যাক, আকালি আন্দোলনের কথা। শিখদের মধ্যে আকালিরাই হচ্ছে অধিকতর কর্মঠ এবং উদ্যোগী দল; তাদের নাম থেকেই এই আন্দোলনের নাম হয়েছে আকালি দল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা, তার মানে ধর্মমন্দিরগুলোর যে-সব সম্পত্তি ছিল সেগুলো ছিনিয়ে আনা। এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে এদের বিরোধ বাধল, অমৃতসরের কাছে গুরু-কা-বাগ, সেখানে সাহস এবং ধৈর্যের এক অপূর্ব পরীক্ষা দেখাল এরা। আকালি জাঠাদের উপরে পুলিশ একেবারে অত্যন্ত নৃশংসভাবে মারপিট চালাল, তবু তারা একটি পাও পিছন হটে গেল না, একটিবারও পুলিশের উপরে হাত তুলল না, শেষপর্যন্ত আকালিদেরই জয় হল, মন্দিরগুলো তাদের দখলে এল। তার পর তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হল; সেখানেও নিজেদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চরম দাবি উপস্থিত করার ব্যাপারে এরা অন্যান্য সমস্ত সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনা, আমি এর নাম দিয়েছি দলগত জাতীয়তাবাদ। এটা একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হয়, আসলে এ ছিলও তাই। অথচ এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতের সর্বত্রই একটা জোর নাড়াচাড়া পড়েছিল; সেই আলোড়নেরই প্রথম ফল হল এই-সব দলগত আত্মচেতনা, হিন্দু মুসলমান শিখদের এই জাতীয়তাবাদ। এ ছাড়াও আরও বহু ছোটো ছোটো দল ছিল, তারাও আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল; এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তথাকথিত 'অনুন্নত শ্রেণী'-গুলো। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দীর্ঘ কাল ধরে এই জাতিগুলোকে অবজ্ঞাত করে রেখেছে। এরা ছিল প্রধানত ভূমিহীন কৃষক। আত্ম-সচেতন হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই, এতদিন ধরে যে-সব সামাজিক অধিকার এবং মর্যাদা থেকে এদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সেগুলো আয়ত্ত করবার জন্য এরা অধীর হয়ে উঠবে, বহু শতাব্দী ধরে যে হিন্দুরা এদের পদানত করে রেখে এসেছে তাদের উপরে একটা তীব্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, এ তো অতি স্বাভাবিক কথা।

এই-সব নব-জাগ্রত সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকে, জাতীয়তাবাদ আর দেশ-প্রেমের অর্থ বুঝে নিল যে যার নিজেরই স্বার্থের দিক থেকে। জাতি যেমন নিজের স্বার্থটিই বোঝে, দল বা সম্প্রদায়ও

তেমনই নিজের স্বার্থটাকে বড়ো করে দেখে—অবশ্য সে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে বিশেষ কতকগুলি ব্যক্তি নিঃস্বার্থ বুদ্ধি নিয়েও চলতে পারেন। সুতরাং প্রত্যেক দলই নিজের যা ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশি চাই বলে গোঁ ধরে বসল; তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘাত অপরিহার্য হয়ে উঠল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি কলহ বেড়ে উঠল, তার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে গেল প্রত্যেক দলের উগ্র সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধিওয়ালা নেতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি : রাগের মুহূর্তে প্রত্যেক দলই তার যোগ্য প্রতিনিধি বলে মেনে নেয় সেই লোকটিকে, যিনি দলগত দাবিগুলোকে একেবারে চরমে ঠেলে তুলতে পারেন এবং বিপক্ষ-দলগুলির সবচেয়ে বেশি জোরগলায় গালাগাল দিতে জানেন। এর ফলেই কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। সরকার নানাবিধ উপায়ে এদের এই ঝগড়া-বিবাদকে উস্‌কে তুলতে লাগলেন; এ'দের বিশেষ একটা কায়দা ছিল, সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে যাঁরা বেশি চরমপন্থী তাদের উৎসাহিত করা। অতএব বিদ্বেষের বিষ ক্রমেই বেশি ছড়িয়ে পড়তে লাগল; মনে হল আমরা একটা দুষ্ট-বৃত্তের আবর্তে পড়ে গেছি, তার পাক ভেঙে বেরিয়ে আসবার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভারতবর্ষের মধ্যে যখন এই-সব নূতন বস্তু এবং আত্মবিনাশী কলহের আবির্ভাব হচ্ছে, সেই সময়ে যারবেদা জেলে গান্ধীজি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অস্ত্র করা হল। ১৯২৪ সনের প্রথমদিকে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন; এর কয়েক মাস পরে একটা খুব বড়ো দাঙ্গা হল, দেখে তিনি এত আঘাত পেলেন যে একেবারে অনশন শুরু করে দিলেন, একুশ দিন সে অনশন চলল। শান্তিস্থাপনের জন্য অনেক 'ঐক্য'-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল, কিন্তু কাজ কিছুই হল না।

এই-সব সাম্প্রদায়িক বিবাদ এবং দলগত জাতীয়তাবাদের ফলে কংগ্রেসের বলহানি ঘটল, স্বরাজ্য দলের কর্মী যাঁরা কাউন্সিলে ঢুকেছিলেন, তাঁদেরও সেখানে প্রতিপত্তি কমে গেল। স্বরাজের আদর্শ চাপা পড়ে রইল, বেশির ভাগ লোকই যে যার দলগত ভাষায় চিন্তা করতে, কথা বলতে লাগল। কংগ্রেসের তখন চেষ্টা হল যাতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে তার পক্ষপাত না ঘটে; সুতরাং সমস্ত সম্প্রদায়ই চারদিক থেকে একসঙ্গে তাকে গালাগালি দিতে লাগল। এই সময়টাতে কংগ্রেসের প্রধান কাজ ছিল চুপচাপ থেকে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া, কুটির-শিল্পকে (খদ্দর) গড়ে তোলা, ইত্যাদি। এর ফলে কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে তার সংযোগটা সহজেই বজায় থেকে গিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথাই বললাম; তার কারণ হচ্ছে ১৯২০ সনের পর থেকে আমাদের রাজনৈতিক জীবন এই সমস্যার ভারে অত্যন্ত নিপীড়িত হয়েছে। তবুও একে অতিরিক্ত বড়ো করে দেখলে চলবে না। যেটুকু গুরুত্ব এর বর্তমান, তার চেয়ে অনেকখানি গুরুতর বলে একে মনে করার প্রকৃতি আমাদের আছে; একটা হিন্দু ছেলে আর একটা মুসলমান ছেলের মধ্যে ঝগড়া হলেই আমরা তৎক্ষণাৎ সেটাকে সাম্প্রদায়িক কলহ বলে ধরে নিই, কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র দাঙ্গা হলে অমনি তাকে মহা প্রকাণ্ড ব্যাপার বলে ঢাকঢোল পিটোতে বসি। একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না,—ভারতবর্ষ একটা অতি বৃহৎ দেশ, এর হাজার হাজার গ্রামে আর শহরে হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে বন্ধুভাবে বাস করছে, এদের মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই। সাধারণত এই ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ অল্প কটা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, কখনও কখনও অবশ্য এর ধাক্কা গ্রাম অঞ্চল পর্যন্তও পৌঁচেছে। একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের এই সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই নিজস্ব সমস্যা; কংগ্রেসে কাউন্সিলে সংবাদপত্রে এবং আরও প্রায় সবরকম ব্যাপারেই আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য; সেই জন্যই এর উপরে অনেকটা অনাবশ্যক পরিমাণেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এদেশের চাষিরা তো প্রায় বাক্‌শক্তি-রহিত; রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে মাত্র এই গেল ক'বছরের মধ্যে, গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটি, কোনো কোনো স্থানের কৃষাণ সভা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। শহর অঞ্চলের, বিশেষ করে বড়ো বড়ো কারখানাগুলোর শ্রমিকরা তবু এদের চেয়ে অল্প একটুখানি বেশি জেগে উঠেছে, নিজেদের

সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়ন গড়েছে। কিন্তু এই শিল্পজীবী শ্রমিকরাও জেনে রেখেছে তাদের নেতার আবির্ভাব হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকেই, চাষিদের তো এই বিশ্বাস আরও বেশি। এবার দেখা যাক, এই সময়টাতে জনসাধারণের, চাষি আর শিল্পজীবী শ্রমিকদের, অবস্থা কী ছিল।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টা অতি দ্রুতবেগে বেড়ে গিয়েছিল। সন্ধির পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত তার সে অগ্রগতি অব্যাহত রইল। ব্রিটেন থেকে প্রচুর মূলধন ভারতে এসে হাজির হল; নূতন নূতন কারখানা এবং শিল্প চালাবার জন্য বহুসংখ্যক কোম্পানির নাম রেজিস্টারি করা হয়েছিল। শিল্প-কারখানার মধ্যে যেগুলো বড়ো সেগুলো, বিশেষ করে বড়ো বড়ো কারখানাগুলো চলত বিদেশী মূলধনের জোরে; অতএব এদেশে বড়ো মাপের শিল্প যা ছিল সেগুলোকে ব্রিটিশ ধনিকরাই বস্তুত নিয়ন্ত্রণ করত। বছর কয়েক আগে একবার হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, এদেশে যত কোম্পানি আছে তার মোট মূলধনের শতকরা ৮৭ ভাগই হচ্ছে ব্রিটিশ মূলধন; খুব সম্ভব এই হিসাবেও অনুপাতটা কম করেই ধরা হয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষের উপরে ব্রিটেনের যে সত্যকার অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ছিল সেটা আরও বেড়ে গেল। বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠল দেশে; তার টানে ভাঙন ধরল ছোটো ছোটো শহরগুলোতে, গ্রামগুলোতে নয়। বিশেষ করে সমৃদ্ধি দেখা গেল বস্ত্র-শিল্পের, আর খনি-শিল্পের।

শিল্প-প্রচেষ্টার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন সমস্যারও আবির্ভাব হচ্ছিল, তাদের সমাধান করবার জন্য সরকার বহু কমিটি এবং কমিশন বসালেন। এ'রা বললেন, বিদেশ থেকে মূলধন আমদানি আরও বেশি করে হওয়া দরকার; সাধারণত এ'রা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ধনিকদের যে-সব কাজকারবার ছিল তারই পক্ষ টেনে কথা বলতেন। ভারতীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করবে বলে একটি টেরিফ্ বোর্ড সৃষ্টি করা হল। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এদের এই রক্ষার অর্থ দাঁড়াল, ভারতবর্ষের বাজারে ব্রিটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষা। এই সংরক্ষিত পণ্যগুলির উপরে শুল্ক আদায় করা হত, অতএব বাজারে এদের দাম স্বভাবতই চড়ে গেল; তার ফলে আবার লোকের জীবিকার ব্যয়ও সেই পরিমাণে বেড়ে গেল। সুতরাং সে রক্ষাব্যবস্থার বোঝাটা গিয়ে চাপল জনসাধারণের, অর্থাৎ সেই-সব পণ্যের ক্রেতাদের ঘাড়ে; আর কারখানার মালিকরা ফাঁকতালে একটি বেশ নিরাপদ বাজার হাতে পেয়ে গেল, সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিল তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা শক্তি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কল-কারখানা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মাইনে করা মজুরদের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সনেই সরকারি হিসাবে ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা দেখা গিয়েছিল দু'কোটির মতো। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন বেকার যারা ছিল তারা শহরে এসে এই শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল; সর্বত্রই তাদের যা শোষণ আর পীড়ন সহ্য করে চলতে হল সে রীতিমতো লজ্জাকর ব্যাপার। একশো বছর আগে, কারখানা-পদ্ধতির একেবারে প্রথম যুগে, ইংলণ্ডে এদের যে অবস্থাতে কাটাতে হত, ঠিক সেই অবস্থাই এবার ভারতবর্ষেও দেখা দিল—ভয়ানক দীর্ঘকাল ধরে একটানা খাটুনি, অতি সামান্য মাইনে, স্বাস্থ্য এবং সম্ভ্রমবোধ নষ্ট হয়ে যায় এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা। কারখানার মালিকদের জীবনে একটিমাত্র লক্ষ্য থাকত, ব্যবসা-বাণিজ্যের এই তেজীর বাজারটা থাকতে থাকতে যথাসম্ভব লাভ তুলে নেওয়া। কয়েক বছর ধরে তারা খুব বড়ো রকমেরই লাভ পেতে লাগল, অংশীদারদের অত্যন্ত মোটা রকমের লভ্যাংশ দিতে লাগল; ওদিকে মজুরদের অবস্থা যেমন শোচনীয় ছিল তেমনই রয়ে গেল। এই বিরাট পরিমাণ লাভ যা থেকে হল সে পণ্য সেই শ্রমিকরাই সৃষ্টি করছে, তবু সে লাভের এতটুকু অংশও তাদের বরাতে জুটল না। অথচ এর পরে আবার যখন তেজীর বাজারটা শেষ হয়ে গিয়ে মন্দার দিন এল, ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ল, তখন মালিকরা অক্লেশে শ্রমিকদের বলে দিলেন, ব্যবসায়ের সে দুর্দিনের ভাগ তাদেরও কিছুটা বইতে হবে, মাইনের হার কিছু কমিয়ে নিতে হবে।

শ্রমিকদের সংগঠন মানে ট্রেড ইউনিয়ন বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলনও বেড়ে উঠল—খাটুনির সময় কমিয়ে দেওয়া হোক, মজুরির হার বাড়ানো হোক, ইত্যাদি বলে দাবি জানানো হল। ওদিকে পৃথিবী জুড়েও তখন দাবি উঠেছে, শ্রমিকদের

প্রতি সুবিচার করতে হবে। এই দুইয়ের চাপে পড়ে ভারত সরকার কয়েকটি আইন তৈরি করে দিলেন, তার ফলে কারখানার মজুরদের অবস্থার কিছু উন্নতি হল। তখন যে কারখানা আইন তৈরি হয়েছিল তার কথা আমি এর আগের আরেকটি চিঠিতেই তোমাকে বলেছি। এই আইনে বলে দেওয়া হল, যে শিশুদের বয়স বারো থেকে পনরোর মধ্যে, তাদের দিনে ছ'ঘণ্টার বেশি খাটানো চলবে না। মেয়েদের আর শিশুদের রাত্রে কাজ করানো যাবে না। বয়স্ক পুরুষ আর মেয়েদের জন্য কাজের দীর্ঘতম সময় বেঁধে দেওয়া হল দিনে এগারো ঘণ্টা এবং সপ্তাহে (কাজের সপ্তাহ মানে ছ'দিন) ষাটঘণ্টার অনধিক বলে। এই ফ্যাক্টরি আইনটি এখনও চালু রয়েছে, অবশ্য পরে এর কিছু কিছু অদলবদল করা হয়েছে।

খনিতে, বিশেষ করে কয়লার খনিতে, মাটির তলায় নেমে কাজ করে যে হতভাগ্যরা, তাদের খানিকটা বাঁচবার জন্য ১৯২৩ সনে একটি 'ভারতীয় খনি আইন' তৈরি করা হল। যে শিশুদের বয়স তেরো বছরের কম, তাদের পক্ষে মাটির তলায় নেমে কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা কিন্তু তখনও মাটির নীচে কাজ করতে লাগল, বস্তুত মোট যত মজুর খনিতে খাটত তার প্রায় অর্ধেকই ছিল নারী। বয়স্কদের জন্য ছ'দিনের-সপ্তাহে কাজের দীর্ঘতম সময় বেঁধে দেওয়া হল, মাটির উপরে কাজ করলে ষাট ঘণ্টা, মাটির তলায় কাজ করলে চুয়ান্ন ঘণ্টা। একটি দিনের দীর্ঘতম সময় ছিল বোধ হয় বারো ঘণ্টা। খাটুনির সময়ের এই-সব অঙ্ক তোমাকে শোনাচ্ছি, এর থেকে হয়তো তুমি খানিকটা ধারণা করতে পারবে কী অবস্থায় তাদের খাটতে হত। তবুও এর থেকে যে ধারণা তোমার হবে সেটা সম্পূর্ণ নয়; সমস্ত ব্যাপারটার সম্বন্ধে একটা সত্য ধারণা পেতে হলে এ ছাড়াও আরও বহু জিনিস জানতে হয়, যেমন মাইনের পরিমাণ, বাসস্থানের অবস্থা, ইত্যাদি। এখানে সে-সব কথার আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই থেকেই তুমি মোটামুটি একটুখানি বুঝে নিতে পারবে এই শ্রমিক ছেলেরা মেয়েরা পুরুষরা নারীরা কী ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে—দিনে এগারো ঘণ্টা তারা কারখানায় খাটে, যা সামান্য মাইনে পায় তাতে কোনো ক্রমে খেয়ে বাঁচাই শুধু চলে। তাছাড়া কারখানাতে যে একঘেয়ে ধরনের কাজ তাদের সারাক্ষণ করতে হয় তার ফলে তাদের মনও ভয়ানক অবসন্ন হয়ে পড়ে, সে কাজের মধ্যে কোথাও এতটুকু আনন্দ তারা পায় না; তার পর ক্লান্তিতে মরমর হয়ে বাড়ি ফিরে যখন যায়, সেখানেও সাধারণত একটা গোটা পরিবারকেই বস্তির একটা মাত্র ছোটো কুঠুরির মধ্যে গাদাগাদি হয়ে থাকতে হয়, তাতে না আছে হাত-পা মেলে বসবার জায়গা, না আছে স্বাস্থ্যরক্ষার কোনোরকম ব্যবস্থা।

আরও কতগুলো আইন সরকার তৈরি করলেন, তাতে শ্রমিকদের অনেক উপকার হল। ১৯২৩ সনে একটা 'শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন' তৈরি হল; তাতে বলা হল, কারখানাতে যদি কোনো দৈব-দুর্ঘটনা প্রভৃতি হয়, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত মজুরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ১৯২৬ সনে একটা ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট তৈরি হল, এতে ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি এবং স্বীকার করে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এই সময়টাতে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনটা বেশ দ্রুত বেড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বোম্বাইতে। একটা নিখিল-ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও স্থাপিত হল, কিন্তু বছর কয়েক পরেই সেটা আবার ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেল। যুদ্ধ এবং রুশ-বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র দুইটি দল শ্রমিকদের দুই হাত ধরে দুই দিকে টানছে। একদিকে রয়েছে পুরোনো কালের গোঁড়া এবং নরমপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলো, এরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি), আর অন্যদিকে রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া আর তৃতীয় আন্তর্জাতিক, তার বয়স কম, আকর্ষণেরও জোর প্রচণ্ড। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে যারা নরমপন্থী এবং সাধারণত যাদের অবস্থা একটু ভালো, তারা ঝুঁকে পড়েছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দিকে, কারণ সেদিকে বিপদ কম; আর যারা একটু বেশিমাত্রায় বিপ্লবকামী তারা ঝুঁকছে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দিকে। ভারতবর্ষেও এই টানাটানি ঘটল, তার পর ১৯২৯ সনের শেষদিকে শ্রমিকদের মধ্যেই ভাগাভাগি হয়ে গেল। তার পর থেকেই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনটা দুর্বল হয়ে রয়েছে।

কৃষকদের কথা আমি আগের সব চিঠিতে তোমাকে যা বলেছি, তার উপরে এখানে আর বেশি কিছু বলা যাবে না। এদের অবস্থা দিন দিনই আরও খারাপ হয়ে উঠছে, ক্রমেই এরা আরও বেশ করে মহাজনের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। ছোটোদরের ভূস্বামী, মালিক-কৃষক এবং রায়ত প্রজা, 'বানিয়া' বা 'সাহুকর' মহাজনের খপ্পর থেকে কেউই পরিত্রাণ পাচ্ছে না। একবার দেনা করে বসলে আর তারা সে দেনা শোধ করে উঠতে পারে না, তার পর ক্রমে তাদের জমিটাই চলে যায় সেই মহাজনের হাতে; প্রজা তখন, দুইদিক থকেই তার ভূমিদাসে পরিণত হয়—একবার সে ভূস্বামী বলে, আর-একবার সে সাহুকর বলে। এই বানিয়া ভূস্বামীরা সাধারণত শহরেই বাস করে, এদের প্রজাদের সঙ্গে এদের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। এদের সারাক্ষণের চেষ্টাই থাকে, কী করে সেই বুভুক্ষা-পীড়িত চাষিদের নিংড়ে যতখানি সম্ভব টাকাকড়ি আদায় করে নেওয়া যায়। পুরোনো কালের জমিদাররা তাঁর প্রজাদের মাঝখানেই বাস করতেন, কালেভদ্রে হয়তো-বা একটু দয়া-দাক্ষিণ্যও দেখাতে পারতেন। এই মহাজন-জমিদাররা শহরে বাস করেন, কর্মচারী পাঠিয়ে টাকা আদায় করে আনেন— দয়া টয়া? ও-সব দুর্বলতার প্রশ্রয় এঁরা দেন না।

কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির মোট ঋণের পরিমাণ কত, সরকারের নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি তার বিভিন্ন রকমের সরকারি হিসাব দিয়েছেন। ১৯৩০ সনে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, (ব্রহ্মদেশ বাদে) ভারতের সর্বত্র এই শ্রেণীর সমস্ত ঋণের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৮০৩ কোটি টাকা। ভূস্বামী এবং কৃষক, দু'দলের ঋণই এর মধ্যে ধরা হয়েছে। আর্থিক দুর্গতির বছরগুলিতে এবং পরে এই ঋণের অঙ্ক আরও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

এমনি করে আমাদের কৃষিজীবী শ্রেণীগুলো দিনের পর দিন আরও গভীর করে চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে; ছোটোখাটো জমিদার আর প্রজা দুয়েরই এখানে সমান দশা। এর থেকে তাদের উদ্ধার পাবারও আর কোনো পথ নেই একমাত্র বর্তমানের এই ভূমি-ব্যবস্থাটারই মূলোচ্ছেদ করে দেবে এমন কোনো একটা বৃহৎ পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া। দেশে কর-বসানো এমনভাবে হচ্ছে যেন তার বেশির ভাগ বোঝা গিয়ে চাপে দরিদ্রতম শ্রেণীটারই উপরে, যে বোঝা বহন করবার শক্তি তাদেরই সবচেয়ে কম। এই রাজস্বের অধিকাংশই ব্যয় করা হচ্ছে সেনাবাহিনী, সিভিল সার্ভিস আর ব্রিটিশদের অন্যান্য দাবির বাবদে; দেশের জনসাধারণের তাতে তিলমাত্র উপকার নেই। শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে মাথাপিছু নয় পেনির মতো; ব্রিটেনে ব্যয় করা হয় মাথাপিছু দু-পাউন্ড পনর শিলিং। তার মানে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু যা ব্যয় করা হচ্ছে, ব্রিটেনে ব্যয় হয় তার ৭৩⅓ গুণ।

এদেশের লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় কত, তার পরিমাণ হিসাব করতে অনেকে অনেক-বার চেষ্টা করেছেন। শক্ত কাজ, বিভিন্ন লোকের কষা হিসেবের মধ্যেও তফাত হয় অনেকখানি। ১৮৭০ সনে দাদাভাই নওরোজী এর পরিমাণ স্থির করেছিলেন মাথাপিছু ২০৲ টাকা বলে। সম্প্রতি যে-সব হিসাব করা হয়েছে তাতে এই অঙ্কটা বেড়ে ৬৭ টাকা হয়েছে। দু'একজন ইংরেজ এর যে অঙ্ক কষে বার করেছেন তাতে আয়ের পরিমাণটা অনেক বেশি, কিন্তু সে অঙ্কও কোনো ক্ষেত্রেই ১১৬৲ টাকার উপরে ওঠে নি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে অঙ্কটা তুলনা করে দেখবার মতো। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক হচ্ছে ১,৯২৫ টাকা; হিসাব কষার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। ব্রিটেনের অঙ্ক হচ্ছে মাথাপিছু ১,০০০ টাকা।

১৬২

ভারতে অহিংস বিদ্রোহ

১৭ই মে, ১৯৩৩

ভারতবর্ষ এবং তার অতীত কাহিনী নিয়ে অনেকগুলো চিঠি তোমাকে আমি লিখেছি, অন্য কোনো দেশের সম্বন্ধেই এত কথা লিখি নি। কিন্তু সে অতীত এখন এগিয়ে এসে ক্রমে বর্তমানের সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে; আজ এই যে চিঠিটা আমি শুরু করলাম এর মধ্যেই বোধ হয় আমার গল্প একেবারে আজকের দিন পর্যন্ত এসে পৌঁছবে। সম্প্রতি যে-সব ব্যাপার ঘটে গেছে তারই মধ্যে কয়েকটার কথা আমি বলব, এখনও তাদের স্মৃতি আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। তাদের সম্বন্ধে লেখবার দিন অবশ্য আজও আসে নি, সে কাহিনী আজও শুধু অর্ধ-সমাপ্ত। কিন্তু ইতিহাসের সমস্ত কাহিনীই বর্তমান পর্যন্ত এসে অকস্মাৎ থেমে শেষ হয়ে যায়, তার বাকি অধ্যায়গুলো থাকে ভবিষ্যতের মধ্যে লুকিয়ে। আর শেষও কোনোদিন হয় না এ গল্পের— দিনের পর দিন এ কেবল বেড়ে বেড়েই চলে।

১৯২৭ সনের শেষদিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন, তাঁরা ভারতে একটি কমিশন পাঠাবেন, এঁরা ভবিষ্যতে এদেশে কী শাসন-সংস্কার হতে পারে, শাসন-ব্যবস্থার কোথায় কোন্ পরিবর্তন ঘটানো দরকার ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করবেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এই ঘোষণা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, এর প্রতিবাদ করল। কংগ্রেস জোর আপত্তি করল : কিছুদিন অন্তর অন্তর ভারতবর্ষকে পরীক্ষা করে দেখা হবে সে স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা, এই কথাটাই তার অপছন্দ। এই দেশে যতদিন সম্ভব টিকে থাকবার ইচ্ছা ব্রিটিশের আছে, সে ইচ্ছাটাকে তারা এই কথাটার আবরণ দিয়েই ঢেকে রাখছিল। কংগ্রেস বহুদিন থেকেই বলে এসেছে এদেশকে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার দিতে হবে; সমস্ত জাতির এই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা নিয়েই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষ এত হৈ চৈ করেছে। ভারতবর্ষকে হুকুম দিয়ে চালাবার, বা তার ভবিষ্যৎ ভাগ্য কী হবে তার চরম রায় দেবার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতে থাকবে, এই কথাটা স্বীকার করতেই কংগ্রেস রাজি ছিল না। এই-সব কারণ দেখিয়েই কংগ্রেস এই নূতন পার্লামেণ্টারি কমিশন সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করল। ভারতের নরমপন্থী দল কমিশন সম্বন্ধে আপত্তি করলেন অন্য কারণে; তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল, এর মধ্যে কোনো ভারতীয়কে নেওয়া হয়নি, এটা সম্পূর্ণই একটা সাহেবদের কমিশন। আপত্তি যুক্তি সকলের এক নয়, তবু কাজের কথাটা একই থাকল; ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি দলই সমস্বরে এই কমিশনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল, একে বর্জন করবার সংকল্প ঘোষণা করল—একেবারে সবচেয়ে নরমপন্থী যাঁরা, তাঁরাও বাদ রইলেন না।

প্রায় এই সময়েই, ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে, মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হল। সেখানে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল—কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা। সেই প্রথম কংগ্রেস স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করল। অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃঢ় ভাষাতেই সে বক্তব্য প্রকাশ করল। স্বাধীনতাকেই জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য বলে সিদ্ধান্ত করা হল এরও দু'বছর পরে, লাহোর অধিবেশনে। মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে সৃষ্টি হল একটি সর্বদল-সম্মেলনের; সেটি অল্পদিন মাত্র টিকে ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে অনেক কাজ দেখিয়ে গেছে।

এর পরের বছর, ১৯২৮ সনে, সেই ব্রিটিশ কমিশন ভারতবর্ষে এলেন। দেশের লোকেরা সর্বত্রই তাকে বর্জন করল। যেখানে তাঁরা গেলেন সেইখানেই তাঁদের সম্বন্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে বড়ো বড়ো শোভাযাত্রা হল। কমিশনের সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশনটিকে বলা হত সাইমন কমিশন; 'সাইমন ফিরে যাও' এই ধ্বনি ভারতের সর্বত্র লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। বহু জায়গাতে বহুবার পুলিশ এই শোভাযাত্রাকারীদের উপরে লাঠি চালাল; লাহোরে

লালা লাজপৎ রায়কে পুলিশ মারল পর্যন্ত। এর কয়েক মাস পরে লালাজী মারা গেলেন; ডাক্তাররা বললেন, পুলিশের সেই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু অত তাড়াতাড়ি হয়েছে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। এই-সব ব্যাপারে দেশের লোক স্বভাবতই অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

ওদিকে তখন সর্বদল-সম্মেলনে শাসনতন্ত্রের একটা খসড়া খাড়া করবার এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সমাধান বের করবার চেষ্টা চলছে। সর্বদল-সম্মেলন একটা রিপোর্ট দাখিল করলেন, তাতে তাঁরা শাসনতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত ও প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করলেন। এই রিপোর্টটির নাম 'নেহরু রিপোর্ট', কারণ যে কমিটি এটি রচনা করেছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ছিলেন তার সভাপতি।

এই বছরেরই আরেকটি বৃহৎ ঘটনা হল গুজরাটের বার্দোলিতে কৃষকদের একটি প্রকাণ্ড অভিযান: সরকার তাদের রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে এরা অভিযান করল। গুজরাটে যুক্তপ্রদেশের মতো বড়ো বড়ো জমিদারি নেই, সেটা হচ্ছে কৃষক-মালিকদের দেশ। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে এই কৃষকরা একটা আশ্চর্য বীরোচিত যুদ্ধ চালাল, বেশ বড়ো রকমের একটা জয়লাভ করল।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হল। কলিকাতা কংগ্রেসে স্বীকার করে নেওয়া হল নেহরু রিপোর্ট বর্ণিত শাসনতন্ত্রটিকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়ন-গুলোর শাসনতন্ত্রের সংগে এর একটা মিল ছিল। কিন্তু এই শাসনতন্ত্রটিকে স্বীকার করবার সংগে সংগেই কংগ্রেস বলল এটিকে শুধু সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই মেনে নেওয়া হচ্ছে; এর দরুন এক বছরের একটা মেয়াদও ঘোষণা করা হল। এক বছরের মধ্যে যদি ব্রিটিশ সরকারের সংগে কোনো বোঝাপড়া না হয়ে যায়, এর মধ্যে যদি শাসনতন্ত্রকে মেনে নিতে ব্রিটিশ সরকার রাজি না হন, তবে কংগ্রেস আবার তার পূর্ণস্বাধীনতার সংকল্পই গ্রহণ করবে। এমনি করে কংগ্রেস এবং সমস্ত দেশ একটা অপরিহার্য সংকট-মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলল।

শ্রমিকরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল; মালিকরা মাইনে কমাবার চেষ্টা করার ফলে বড়ো বড়ো কয়েকটা শিল্প-কেন্দ্রে শ্রমিকরা লড়াই বাধাবারই উপক্রম করছিল। বোম্বাইতে এদের সংহতি বিশেষরকম ভালো ছিল, সেখানে বড়ো বড়ো কটা ধর্মঘট হল, এক লক্ষ বা তারও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিল। শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ এবং কিছুটা কমিউনিজমের মতামত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শ্রমিকদের মতিগতি বিপ্লব-ঘেঁষা হয়ে উঠছে এবং তাদের শক্তিও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে সরকারের ভয় ধরল। ১৯২৯ সনের প্রথম দিকে শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করলেন, তাঁদের নামে একটা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে দিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র এই মামলাটি মীরাট মামলা বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে। প্রায় চার বছর মামলা চলবার পর এর শেষ হয়েছে, অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই অতি দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই, এদের কারও নামেই বাস্তবিক কোনো বিদ্রোহ-মূলক কাজ, এমনকি সামান্য একটু শান্তিভংগেরও অভিযোগ ছিল না। এ'রা কমিউনিজমের মতবাদে বিশ্বাস করতেন, সে মতবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করতেন, এইটেই বোধ হয় এ'দের একমাত্র অপরাধ। আপিলে তাঁদের দণ্ড খুব কমে যায়।

আরও এক ধরনের কার্যকলাপ তলায় তলায় তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল, মাঝে মাঝে বাইরেও শিখা মেলে আত্মপ্রকাশ করছিল। এটা হচ্ছে হিংসাবাদীদের কথা। এ'দের বিশ্বাস ছিল হিংসার পথেই বিপ্লব ঘটাতে পারবেন। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলাদেশ; কিছু পরিমাণে পঞ্জাবে এবং অতি সামান্য পরিমাণে যুক্তপ্রদেশেও এর অস্তিত্ব ছিল। ব্রিটিশ সরকার নানাবিধ উপায়ে একে দমন করতে চেষ্টা করলেন, অসংখ্য ষড়যন্ত্রের মামলা করা হল। সরকার একটা বিশেষ আইন জারি করলেন, তার নাম 'বেংগল অর্ডিন্যান্স'—এই আইনের বলে যাকে তাঁরা দয়া করে সন্দেহ করবেন তাঁকেই গ্রেপ্তার করতে এবং বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে পারবেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে শত শত বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখা হল। এ'দের বলা হত রাজবন্দী বা ডেটেনিউ, কতদিন এ'দের জেলে থাকতে হবে তারও কোনো

মেয়াদ নির্দিষ্ট ছিল না। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই অপূর্ব আইনটি যখন তৈরি করা হয়, তখন ইংলন্ডের মন্ত্রিত্ব ছিল শ্রমিকদের হাতে, সুতরাং এই অর্ডিন্যান্সটি জারি করবার কৃতিত্ব তাঁদেরই।

এই বিপ্লববাদীরা অনেকগুলো সন্ত্রাসমূলক কান্ড-কারখানা করলেন, বেশির ভাগই বাঙলা-দেশে। এর মধ্যে তিনটি ঘটনা বিশেষ করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম ঘটনা, লাহোরে পুলিশের একটি ব্রিটিশ কর্মচারীকে গুলি করে মারা হল, সাইমন কমিশন-বিরোধী শোভাযাত্রীর মধ্যে এই লোকটিই লালা লাজপৎ রায়কে আঘাত করেছিল বলে লোকের ধারণা। দ্বিতীয় ঘটনা, দিল্লীতে অ্যাসেম্বলি-কক্ষে ভগৎ সিংহ এবং বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপ। সে বোমাতে ক্ষতি অবশ্য প্রায় কিছুই হল না; এ'দের বোধ হয় অভিপ্রায় ছিল শুধু একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করা, দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটল চট্টগ্রামে, ১৯৩০ সনে ঠিক যখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে, সেই সময়টাতে। সেখানে সরকারি অস্ত্রাগারটিকে লুঠ করে নেবার একটা খুব বড়ো রকমের এবং দুঃসাহসিক চেষ্টা করা হল, সে চেষ্টা কিছুটা সফলও হল। এই আন্দোলনটিকে বিধ্বস্ত করবার জন্য যতরকম উপায় অবলম্বন করা সম্ভব সরকার তার সমস্ত করেছেন। সরকারের বহু গুপ্তচর এবং সংবাদদাতা ছিল। বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হল, বহু ষড়যন্ত্র-মামলা করা হল, বহু লোককে রাজবন্দী করে রাখা হল (অনেক সময়ে, আদালতের মামলায় যারা খালাস পেয়ে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার গ্রেপ্তার করে অর্ডিন্যান্সের বলে রাজবন্দী করে রাখা হল)। পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলো জায়গা সৈন্যদের দখলে গেল; সেখানে লোকেরা অনুমতিপত্র ছাড়া চলাচল করতে পারত না, সাইকেলে চড়তে পারত না, এমনকি নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক পর্যন্ত পরে বেড়াবার অধিকার তাদের ছিল না। পুলিশকে সংবাদ দিয়ে ফেরারীকে ধরিয়ে দেয় নি, এই অপরাধে বহু শহর এবং গ্রামের একেবারে সমস্ত অধিবাসীদের উপরেই প্রচুর জরিমানা ধার্য হল।

১৯২৯ সনে লাহোরে একটি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। জেলে তাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করা হত তার প্রতিবাদে আসামীদের মধ্যে একজন অনশন অবলম্বন করেন, এ'র নাম যতীন্দ্রনাথ দাস। এই ছেলেটি একেবারে শেষ পর্যন্তই অনশন চালিয়ে গেলেন, একষট্টি দিনের দিন তাঁর মৃত্যু হল। যতীন দাসের এই আত্ম-বলিতে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য দেখা দিল। আরও একটি ঘটনাতে দেশের লোক আহত এবং ব্যথিত হয়ে উঠল, সে হচ্ছে ভগৎ সিংহের মৃত্যুদণ্ড—১৯৩১ সনের গোড়ার দিকে তাঁর ফাঁসি হয়।

এবার আবার কংগ্রেসী রাজনীতির রাজ্যে ফিরে যেতে হচ্ছে। কলিকাতা কংগ্রেসে সরকারকে মনস্থির করবার যে সময় দেওয়া হয়েছিল সেটা তখন শেষ হয়-হয়। এর যে গুরুতর পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাকে প্রতিরোধ করবার একটা চেষ্টা ১৯২৯ সনের শেষদিকে সরকার করলেন : ভবিষ্যতে শাসন-ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধন করা তাঁদের অভিপ্রায় তার সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট বিবৃতি প্রচার করলেন। তখনও কংগ্রেস জানালেন তাঁরা এতে সহযোগিতা করতে রাজি আছেন, কয়েকটি শর্তে। সরকার সে শর্ত পূরণ করলেন না। তখন আর কংগ্রেসের কোনো গত্যন্তর রইল না; ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত স্থির হল, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, এবং তাকে অর্জন করবার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

আসন্ন সংগ্রামের নিবিড় ছায়া আকাশে নিয়ে ১৯৩০ সনের প্রভাত হল। আইন-অমান্য আন্দোলনের আয়োজন চলতে লাগল। অ্যাসেম্বলি এবং কাউন্সিল আবার বর্জন করা হল; কংগ্রেসী সভ্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা পদত্যাগ করলেন। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে দেশের সর্বত্র শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য সভা হল, সেই-সব সভায় স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প প্রকাশ করে একটি বিশেষ শপথ গ্রহণ করা হল। এখনও প্রতি বছর সেই দিনটির বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে, এর নাম হয়েছে 'স্বাধীনতা দিবস'। মার্চ-মাসে গান্ধীজীর বিখ্যাত ডাণ্ডি-অভিযান শুরু হল : সমুদ্রের তীরে ডাণ্ডি, সেখানে গিয়ে তিনি লবণ-আইন ভাঙলেন। লবণ-আইনটিকে ভেঙেই তিনি তাঁর অভিযানের উদ্‌বোধন করবেন স্থির করেছিলেন, কারণ এই আইনটিতে দরিদ্রদের উপরেই খুব বেশি চাপ পড়ে, সেদিক থেকে এটি একটি বিশেষ খারাপ আইন।

১৯৩০ সনের এপ্রিল মাসেই দেখা গেল আইন-অমান্য আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলেছে; দেশের সর্বত্র শুধু লবণ আইন নয়, অন্যান্য বহু আইনও ভাঙা হচ্ছে। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা অহিংস বিদ্রোহ দেখা দিল; সে বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য সরকারও অতি দ্রুতবেগে বহু নূতন নূতন আইন এবং অর্ডিন্যান্স তৈরি করে ফেললেন। তখন আবার এই অর্ডিন্যান্স-গুলোকেই ভেঙে আইন অমান্য করা হতে লাগল। সত্যাগ্রহীদের দলকে-দলসুদ্ধ গ্রেপ্তার করা হতে লাগল, তাদের উপরে বর্বরের মতো লাঠি চালানো তো দৈনন্দিন ঘটনাই হয়ে উঠল; অহিংস জনতার উপরে গুলি চালানো হল, কংগ্রেস কমিটিগুলোকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল, চিঠিপত্রের উপর সেন্সর বসল, সত্যাগ্রহীদের উপর মারপিট চলল, জেলখানায় কয়েদীদের উপরে দুর্ব্যবহার করা হতে লাগল। এর একদিকে ছিল অর্ডিন্যান্সের জোরে শাসন; আর একদিকে ছিল দৃঢ় সংকল্প আর শৃঙ্খলার সঙ্গে অর্ডিন্যান্সকে অমান্য করে চলা এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কাপড় আর ব্রিটিশ পণ্য বর্জন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ লোক কারাবরণ করল, কিছুদিন পর্যন্ত সমস্ত জগতের বিস্মিত দৃষ্টি ভারতের এই অহিংস অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে রইল।

তিনটি ঘটনার কথা আমি তোমাকে এখানে বলব। প্রথমটি হচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনার একটা অপূর্ব জাগরণ। এই আন্দোলন ঠিক আরম্ভ হবার সময়টিতে, ১৯৩০ সনের এপ্রিল মাসে, পেশাওয়ারে একটা প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড হল, অহিংস জনতার উপরে গুলি চালিয়ে বহু লোককে মেরে ফেলা হল। তারপরও সারাটা বছর ধরেই সেখানকার লোকের উপর একেবারে নৃশংস অত্যাচার চলল, আমাদের সীমান্ত-অঞ্চলের দেশবাসীরা বীরোচিত ধৈর্যের সঙ্গে সে অত্যাচার সহ্য করল। এটা একটা বিশেষ আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে, কারণ সীমান্ত-প্রদেশের এই অধিবাসীরা মোটেই শান্তপ্রকৃতির নয়, সামান্য একটু খোঁচাতেই এরা একেবারে আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। অথচ তারাই সে অত্যাচারের মধ্যেও শান্ত-সংযত হয়ে রইল। পাঠানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই প্রথম পদার্পণ; প্রথম থেকেই তারা সংগ্রামের একেবারে সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল, এমন বীরের মতো যুদ্ধ করতে লাগল—এটা যেমন বিস্ময়কর তেমনই বাহাদুরির কাজ।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হচ্ছে ভারতের নারীদের অপূর্ব জাগরণ—বৃহৎ ঘটনাতে পরিপূর্ণ সেই বছরটির মধ্যেও এইটেই ছিল সবচেয়ে বড়ো ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ লক্ষ নারী তাঁদের অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করে গৃহের নিভৃত আশ্রয় ত্যাগ করে প্রকাশ্য রাজপথে এবং বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের সহকর্মী ভাইদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন, বহুস্থলে এঁরা এমন শক্তি এবং সাহসের পরিচয় দিলেন যে তার পাশে পুরুষ কর্মীরাও নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। এ এমন একটা জিনিস যে, যারা একে স্বচক্ষে না দেখেছে তারা এর কথা বিশ্বাস করতেই পারে না।

লক্ষ্য করবার মতো তৃতীয় বস্তুটি হচ্ছে : আন্দোলনের জোর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক যুক্তিও এর সঙ্গে এসে জুটল, অন্তত কৃষকদের দিক থেকে। ১৯৩০ সনেই বিশ্বব্যাপী একটি প্রকাণ্ড অর্থসংকট প্রথম আরম্ভ হল, কৃষিজাত ফসলের দাম অত্যন্ত কমে গেল। কৃষকদের নিদারুণ ক্ষতি হল এতে, কারণ, ফসল বেচেই তাদের যা-কিছু আয়। অতএব দেখা গেল, তাদের সে দুর্দশার দিনে কর বন্ধ করার ব্যাপারটা তাদের পক্ষে খুবই জুৎসই জিনিস। স্বরাজ তাদের কাছে তখন আর একটা অতি দূরবর্তী রাজনৈতিক লক্ষ্য মাত্র রইল না, সেটা হয়ে উঠল একটা অতি-আসন্ন অর্থনৈতিক প্রশ্ন—তাদের কাছে এরই গুরুত্ব অনেক বেশি। এদের পক্ষে কাজেই আন্দোলনটার একটা নূতন এবং অধিকতর ঘনিষ্ঠ অর্থ দাঁড়িয়ে গেল; তার মধ্যে একটুখানি শ্রেণী-সংগ্রামের আভাসও এসে পড়ল—ভূস্বামী এবং প্রজার সংগ্রাম। যুক্তপ্রদেশে এবং পশ্চিম-ভারতেই এই জিনিসটা বিশেষ করে দেখা গেল।

ভারতবর্ষে যখন আইন-অমান্য আন্দোলন জোর চলেছে, ঠিক সেই সময়েই সমুদ্রের ওপারে লণ্ডনে বসে ব্রিটিশ সরকার মহা হৈ চৈ আর ধুমধাম করে একটা গোল-টেবিল বৈঠক বসালেন। এই বৈঠকের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ভারতবাসী যাঁরা এতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি। পুতুল-নাচের পুতুল বা কায়াহীন ছায়া-মূর্তির মতোই এ'রা লণ্ডনের সেই রঙ্গমঞ্চে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিলেন; মনে মনে তাঁরা ভালো করেই জানতেন সত্যকার যুদ্ধটা এখানে হবে না, সে যুদ্ধ হচ্ছে ভারতবর্ষে। বৈঠকের আলোচনায় সরকারপক্ষ সারাক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্যাটাকেই সামনে তুলে ধরে রাখলেন, তাই দিয়েই তাঁরা প্রমাণ করতে চাইলেন ভারতবর্ষের দুর্বলতা কোথায়। বৈঠকে যোগ দেবার জন্য খুব বেশি উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং প্রগতি-বিরোধী ব্যক্তিদেরই বেশ যত্নসহকারে বেছে বেছে ডাকা হয়েছিল, যেন তাদের মধ্যে চরম মীমাংসা হবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে।

১৯৩১ সনের মার্চ মাসে কংগ্রেস আর সরকারের মধ্যে একটা যুদ্ধ-বিরতি বা সাময়িক আপোষ ঘোষণা করা হল, যেন এদের মধ্যে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। এ হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হল, হাজার হাজার আইন অমান্যকারী বন্দী মুক্তি পেয়ে গেলেন, অর্ডিন্যান্সগুলোকেও বাতিল করে দেওয়া হল।

১৯৩১ সনে গান্ধীজি লণ্ডনে গেলেন, কংগ্রেসের তরফ থেকে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের মধ্যে তখন তিনটি সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে; কংগ্রেস এবং সরকার দু'পক্ষেরই মনোযোগ সেইদিকে নিবদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে বাঙলাদেশকে নিয়ে : সেখানে সন্ত্রাসবাদ দমন করার নাম নিয়ে সরকার সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীরই বিরুদ্ধে একটা নৃশংস অভিযান চালাচ্ছেন। নূতন একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে, সেটা আগেরটার চেয়েও অনেক বেশি কঠোর। দিল্লীতে ইতিমধ্যে দু'পক্ষের মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙলাদেশের ভাগ্যে মোটেই স্বস্তি জুটছে না।

দ্বিতীয় সমস্যাটার স্থান হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশ; সেখানে নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার উৎসাহে লোকেরা তখনও কিছু কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ'র নেতৃত্বে পরিচালিত একটি প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খল অথচ অহিংস প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র শাখা বিস্তার করেছে। এদের নাম ছিল 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার'; অনেকে এদের 'লাল-কোর্তার দল'ও বলত, এরা লাল রঙের উর্দি পরত বলে (সমাজতন্ত্রবাদী বা কমিউনিস্টদের সঙ্গে এদের কোনো সংশ্রব ছিল বলে নয়)। সরকারপক্ষ এই আন্দোলনটিকে মোটেই পছন্দ করলেন না। একে দেখে তাঁদের ভয় ধরেছিল; ভালো একজন পাঠান সৈনিকের মূল্য কী সেটা তাঁদের অজানা ছিল না।

তৃতীয় সমস্যাটির উদ্‌ভব হল যুক্তপ্রদেশে। পৃথিবীময় আর্থিক সংকট আর পণ্যের মূল্যহ্রাসের ফলে দরিদ্র প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হয়েছিল। এরা জমির খাজানাও দিতে পারছিল না। সরকার কিছুটা খাজানা মকুব করলেন, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। কংগ্রেস প্রজাদের পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা করতে গেল, তাতেও বিশেষ ফল ফলল না; এর উপরে আবার খাজানা তহশীলের সময় এসে পড়ল, তখন অবস্থা একেবারে চরমে উঠল। সেটা ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসের কথা। কংগ্রেস এলাহাবাদ জেলাতে প্রথম আন্দোলন শুরু করলেন; প্রজা এবং জমিদার দু'পক্ষকেই তাঁরা উপদেশ দিলেন, এখন কেউ খাজানা বা রাজস্ব দিও না, খাজানা মকুবের প্রশ্নটার কী মীমাংসা হয় দেখে নাও। সঙ্গে সঙ্গেই সরকারপক্ষও এর জবাব দিলেন, যুক্তপ্রদেশে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হল। এই অর্ডিন্যান্সের বিধান যেমন ছিল কঠিন তেমনই ছিল ব্যাপক—সকল রকম রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে বিধ্বস্ত করবার, এমনকি মানুষের ইচ্ছেমতো চলাফেরা পর্যন্ত বন্ধ করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা এতে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

এরই সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত-প্রদেশেও দুটি অদ্ভুত অর্ডিন্যান্স জারি করা হল; যুক্তপ্রদেশ এবং সীমান্ত-প্রদেশ, দুই জায়গাতেই নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হতে লাগল।

এই বছরের শেষ সপ্তাহে গান্ধীজি লণ্ডন থেকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলেন, এসে দেখলেন দেশে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তিনটি প্রদেশে অর্ডিন্যান্সের শাসন প্রতিষ্ঠিত; তাঁর সহকর্মীদের অনেকে ইতিমধ্যেই জেলে চলে গেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস আবার আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিল; সরকারও আবার কংগ্রেস কমিটিগুলোকে এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও বহু প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করলেন।

১৯৩০ সনের তুলনায় এবারকার সংগ্রাম অনেক বেশি তীব্র। সরকারপক্ষ এর জন্য সযত্নেই তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন, আগের বারের অভিজ্ঞতাটা এবার তাঁদের কাজে লেগেছে। বৈধতার অবগুণ্ঠন এবং আইনকানুনের রীতিনীতিকে এবার তাঁরা নিঃসংকোচে বর্জন করেছেন; কতকগুলো সর্বশক্তিধর অর্ডিন্যান্স বানিয়ে অসামরিক কর্মচারীদের দ্বারাই দেশে একটা পুরোদস্তুর সামরিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের মধ্যেও আসলে পশুশক্তি লুকিয়ে থাকে, এবার সেটা একেবারে নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হবেই জানা কথা; জাতীয় আন্দোলনের শক্তি যত বাড়তে থাকে, বিদেশী শাসকের উচ্ছেদের আশঙ্কা ততই বেড়ে ওঠে, তার প্রতিঘাতও ততই অধিকতর হিংস্র হয়ে ওঠে। সদ্ভাব আর অভিভাবকত্ব ইত্যাদি যত বড়ো বড়ো বুলি এতদিন তারা কপ্চে এসেছে সেগুলো হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়, তার জায়গাতে দেখা দেয় ডাণ্ডা আর সঙিনের ফলা—বিদেশী শাসনের এরাই প্রকৃত অবলম্বন। তখন আইনের স্থান অধিকার করে খেয়াল-খুশি—কেবল সবার মাথার উপরে যিনি বসে আছেন সেই বড়োলাটের খেয়াল নয়, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কর্মচারীরই খেয়াল—যা তার ইচ্ছে তাই সে অবাধে করে চলে; জানে, তার উপরস্থ কর্তারা তারই পক্ষ হয়ে সাফাই দেবেন। পুলিশের গুপ্তচর, বিশেষ করে সি. আই. ডি.'র লোকে চতুর্দিক ভরে যায়, এদের শক্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে—যেমন হয়েছিল জারের যুগে রাশিয়াতে। এদের কার্যকলাপে বাধা দেবার কেউ থাকে না; ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে করতেই এদের ক্ষমতার লোভ ক্রমে আরও বেশি বেড়ে ওঠে। যে সরকার প্রধানত তার গুপ্তচর-বিভাগের মারফত রাজ্যশাসন করেন, এবং যে দেশে সেই শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে তার নৈতিক অবনতি ঘটতে সময় লাগে না। কারণ চক্রান্ত, চরবৃত্তি, মিথ্যাচরণ, ত্রাসসৃষ্টি, লোককে উত্তেজিত করে অন্যায় করানো, সাজানো মামলায় জড়িয়ে জব্দ করা, বা জব্দ করবার ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায় করা, ইত্যাদি নানাবিধ কাজেই গুপ্তচর-বিভাগের আনন্দ। গত তিন বছর যাবৎ ভারতবর্ষে ছোটোদরের সরকারি কর্মচারী, পুলিশ আর সি. আই. ডি.'র হাতে অত্যন্ত বেশি ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে, এরাও সে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। এর ফলে এই বিভাগগুলোর কর্মচারীদের মধ্যে পশুবৃত্তি এবং দুর্নীতি দিনদিনই বেড়ে চলেছে। এর উদ্দেশ্য, সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা।

এর বিস্তৃত বিবরণ আমাদের দরকার নেই। এবারে সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাপকভাবে সম্পত্তি, অর্থাৎ ঘরবাড়ি মোটর গাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া—প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উভয়েরই। এর উদ্দেশ্য ছিল, মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর লোক যাঁরা কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছেন, তাঁদের উপরে আঘাত হানা। এর একটি অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, নাবালক পোষ্য যদি অপরাধ করে, তবে তার দরুন পিতামাতা এবং অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া হবে!

ভারতবর্ষে যখন এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে ঠিক তারই সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের প্রচার-বিভাগ মহাকলরব করে পৃথিবীময় বলে বেড়াচ্ছে, ভারতবর্ষ একেবারে সোনার দেশ, নন্দনকানন! ভারতবর্ষের মধ্যেকার কোনো সংবাদপত্রই সত্য যা ঘটছে তা ছেপে বার করতে সাহস পাচ্ছে না, শাস্তির ভয়ে—কে কোথায় গ্রেপ্তার হল তাদের নাম প্রকাশ করাটা পর্যন্ত অপরাধ!

কিন্তু ব্রিটিশ কূটনীতির প্রকৃত রূপ সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে গেছে একটি ব্যাপারে—ভারতে যে দলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রগতিবিরোধী, তাদের সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করছেন। প্রগতির প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই যুদ্ধ, সে যুদ্ধে সে সহায় বলে অবলম্বন করেছে সামন্তপন্থী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চরমপন্থীদের। এই

দেশে যাদের 'কায়েমী স্বার্থ' আছে তাদের নিজের দলে টেনে নেবার চেষ্টাই সরকার করছেন, তাদের ভয় দেখাচ্ছেন, ব্রিটিশের প্রভুত্ব যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ দেশে সমাজ-বিপ্লব ঘটে যাবে, তাতে এদের সর্বনাশ। ব্রিটিশের আত্মরক্ষাবাহিনীর এখন প্রথম সারির সেনা-দল হচ্ছেন সামন্ত রাজারা, তার পরেই আছেন বড়ো বড়ো জমিদাররা। কূটকৌশলের নানাবিধ চাতুরী খেলিয়ে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঠেলেঠুলে সামনে এনে খাড়া করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাটাকে বেশ ফাঁপিয়ে বড়ো করে এ'রা তুলেছেন, যেন স্বাধীনতার পথে ভারতের অভিযান তাইতে বেধেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। সম্প্রতি আবার ভারি সুন্দর একটি দৃশ্য আমরা দেখলাম : হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুসমাজের প্রগতিবিরোধী উগ্র ধর্মধ্বজীদের প্রতি একেবারে পরম সহানুভূতি ও আন্তরিক প্রীতিতে বিগলিত হয়ে পড়েছেন! সর্বত্রই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের দলবৃদ্ধি করবার চেষ্টা করছেন প্রগতিবিরোধ সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা আর বিভ্রান্ত স্বার্থপরতার সাহায্য নিয়ে।

গণ-সংগ্রামের একটা খুব বড়ো সুবিধা আছে। এর মধ্যে হয়তো আঘাত থাকে, বেদনা থাকে, তবু জনসাধারণকে রাজনীতি শিক্ষায় দীক্ষিত করে তুলবার এমন ভালো এমন দ্রুত পন্থা আর নেই। জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হয় 'বড়ো বড়ো ঘটনার বিদ্যালয়ে'। শান্তির সময়ে যে-সব সাধারণ রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলতে থাকে, যেমন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন, তাতে সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝেই উঠতে পারে না ব্যাপারটা আসলে কী। চতুর্দিকে বড়ো-বড়ো বক্তৃতা, তার প্লাবনে সে হাবুডুবু খাচ্ছে; নির্বাচন-প্রার্থী প্রতিটি ব্যক্তিই মস্ত মস্ত চাঁদ ধরে দেবার প্রতিশ্রুতি বৃষ্টি করছেন—ভোটার বেচারী নিরীহ জীব, মাঠে বা কারখানায় বা দোকানে কাজ করেই তার দিন কাটে, দেখেশুনে তার একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। এদল থেকে ওদলের যে তফাতটা আসলে কোথায়, সে তার ভালো করে জানাও নেই। কিন্তু গণ-সংগ্রাম যখন আসে, বা বিপ্লব যখন ঘটে, তখন প্রকৃত অবস্থাটা যেন বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার চোখেও তার স্বরূপ স্পষ্ট ধরা পড়ে যায়। সেই সংকটের মুহূর্তে কোনো দল কোনো শ্রেণী কোনো ব্যক্তিই তার সত্যকার মনোভাব বা চরিত্রকে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। সত্য কখনও গোপন থাকে না, প্রকাশ সে পাবেই। বিপ্লবের দিনে শুধু যে মানুষের চরিত্রবল, সাহস, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ আর শ্রেণীগত চেতনারই অগ্নিপরীক্ষা হয় তাই নয়; বিভিন্ন শ্রেণী আর দলের মধ্যকার যে প্রভেদকে যে বিরোধকে এতকাল সুশ্রাব্য এবং অস্পষ্ট ভাষার জালে ঘিরে ঢেকে রাখা হচ্ছিল, সেও তখন স্পষ্ট হয়েই আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের আইন-অমান্য আন্দোলন একটি জাতীয় সংগ্রাম; শ্রেণী-সংগ্রাম এটা কিছুতেই নয়। এই আন্দোলন চালিয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই, তাদের পিছনে ছিল কৃষকরা। সুতরাং শ্রেণীগত আন্দোলনে যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীকে আলাদা করে ফেলা হয়, এতে সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবু এই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী কিছুপরিমাণে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এদের কতক, যেমন সামন্ত নৃপতি তালুকদার এবং বড়ো বড়ো জমিদাররা সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিলেন; জাতির স্বাধীনতার তুলনায় শ্রেণীগত স্বার্থই এ'দের কাছে বেশি দরকারি বস্তু।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের ফলে দলে দলে কৃষকগণ কংগ্রেসে যোগ দিল ও তাদের বহু অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হল। এতে কংগ্রেসের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস প্রকৃত গণপ্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। নেতৃত্বের ভার অবশ্যই মধ্যবিত্তদের হাতে রয়ে গেল কিন্তু নিম্নস্তরের চাপে এর রূপ পরিবর্তন হল এবং ক্রমশই কংগ্রেসের মনোযোগ ভূমিসংক্রান্ত ও সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি বেশী করে নিবন্ধ হতে লাগল। সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণও ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। ১৯৩১ সনে করাচি কংগ্রেসে যে মানুষের মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্বন্ধে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের স্বাধীনতার কতকগুলো সর্বসম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার ও সংখ্যা-

শ্রমিকদের স্বার্থের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক শিল্প-ব্যবসাগুলি সবই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকেই বুঝায় না, আরও অনেক কিছুই এতে অনুস্যূত, সে ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং একটা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোও এতে যোজনা করা হল। আসল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল—কি করে জনগণের শোষণ ও দারিদ্র্য দূর করা যায় এবং স্বাধীনতাটা এই চরম লক্ষ্যেরই একটা পন্থা মাত্র হয়ে উঠল।

যে সময়ে ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলন চলছিল এবং রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশই জেলে ছিল, ঠিক সে-সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করল। প্রস্তাবগুলোর মর্ম হল—প্রদেশে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন ও কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র (যাতে সামন্ত নৃপতিগণের প্রভাবই প্রবলতর থাকবে) প্রতিষ্ঠা। কাজটি অতি সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ, বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যেদিকে যতটুকু রক্ষাকবচ ভেবে বার করতে পারে ব্রিটিশ সরকার তার কিছুই এতে বাদ দেন নি। এই রক্ষাকবচের জোরে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কায়েমী স্বার্থই বজায় থাকবে, বিশেষতঃ ব্রিটেন ভারতের জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক, অসামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে দখলী-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, সেটা আরও বেশী কায়েমী করে তোলা সম্ভব হবে। এতে ৩৫ কোটিরও বেশী ভারতবাসীদের স্বার্থই কেবল উপেক্ষিত হবে বলে মনে হল। এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশের কথা আমি এতক্ষণ কিছু বলি নি; এবার তার কথাও কিছু বলতে হয়। ১৯৩০ বা ১৯৩২ সনের আইন-অমান্য আন্দোলনে ব্রহ্মদেশ যোগ দেয় নি। কিন্তু ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সনে উত্তর-ব্রহ্মে প্রকাণ্ড একটা কৃষক-বিদ্রোহ হয়ে গেছে; চরম আর্থিক দৈন্য থেকেই তার উদ্ভব বলে মনে হয়। ব্রিটিশ সরকার একেবারে বর্বরোচিত পীড়ন চালিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেছেন। এখন ব্রিটিশ সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে।

মন্তব্য (অক্টোবর, ১৯৩৮) :

সাড়ে পাঁচ বছর আগে জেল থেকে এই চিঠি লেখার পরে ভারতে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সে সময়েও আইন-অমান্য আন্দোলন চলছিল—যদিও তার গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল, এবং বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মী জেলে ছিলেন। স্বয়ং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান উহার সহস্র সহস্র শাখাসমিতি ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ বে-আইনী বলে বিঘোষিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সনে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিল, সরকারও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল। আইন-সভা বর্জনের পুরোনো নীতি পরিবর্তিত করে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন-সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করল।

১৯৩৫ সনে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ করল। এই আইনের দ্বারাই ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা হল। এই শাসনতন্ত্রের ধারা-গুলোর দ্বারা বহুবিধ রক্ষাকবচসহ খানিকটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ ও প্রদেশসমূহের একটা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা হল। কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র বর্জন করাতে ইহার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন হল। বড়োলাট ও প্রাদেশিক লাটদের হস্তে যে রক্ষাকবচ ও 'বিশেষ ক্ষমতা' ন্যস্ত হল সেটাই বিশেষ আপত্তিজনক হয়ে দাঁড়াল, কেননা এগুলো থাকার দরুনই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাটি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে বলে মনে হল। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বেলায় আপত্তি আরও ঘোরতর হয়ে দাঁড়াল, কারণ এতে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, তদুপরি স্বেচ্ছাচারী সামন্ত-শাসিত রাজ্য-গুলির সঙ্গে অর্ধ-প্রজাতান্ত্রিক ধরনে শাসিত প্রদেশগুলির একটা অস্বাভাবিক ও অকেজো সংযোগ ব্যবস্থা এতে ছিল। এটাকে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে গলা টিপে মারবার জন্যে এবং ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে (মুখ্যভাবে ও সামন্ত নৃপতির মারফতে গৌণভাবে)

আরও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে রাখবার জন্যে একটা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা বলে মনে করা হল। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে বহুসংখ্যক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টির ব্যবস্থাও এই নূতন শাসনতন্ত্রে স্থান পেল। কোন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করল, কারণ এতে তারা কতকাংশে লাভবান হল, কিন্তু গণতন্ত্র ও প্রগতির প্রতিকূল বলে এটা নিন্দনীয়রূপেই গণ্য হল।

১৯৩৭ সনের গোড়ার দিকে ভারত-শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত অংশটুকু কার্যে প্রযুক্ত হল এবং এর বিধানানুসারে সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই আইন বর্জন করা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই সব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তাই সারা দেশব্যাপী একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনাপূর্ণ নির্বাচনী আন্দোলন চালান হল। অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস অতিমাত্রায় সাফল্য অর্জন করল এবং নূতন প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে কংগ্রেসকর্মীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গঠন করল। প্রাদেশিক সরকারের অধীনে তাঁরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন কি না—এই প্রশ্ন নিয়া তুমুল তর্কবিতর্ক হল। পরিশেষে কংগ্রেস সরকারি পদগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কিন্তু এটাও পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করল যে, ইতিপূর্বে স্থিরীকৃত লক্ষ্য স্বাধীনতা ও সেটা লাভ করার জন্য যে নীতি পূর্বে গৃহীত হয়েছে তা বজায় থাকবে; সরকারি পদ গ্রহণ করা হল শুধু সেই নীতি অনুসরণদ্বারা শক্তি সঞ্চয় করে দেশ যাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য। আরও বলা হল যে প্রাদেশিক লাটদিগকে রক্ষাকবচগুলি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে সাতটি প্রদেশে, যথা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করল। কিছুদিন বাদে কংগ্রেস আসামে একটি যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করল। দুইটি প্রধান প্রদেশ, বাঙলা ও পাঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার ফলে ঐ সব অঞ্চলে রাজনৈতিক বন্দীগণ মুক্তিলাভ করল এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যেসব বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছিল সেগুলো প্রত্যাহার করা হল। জনসাধারণ এই পরিবর্তনে উল্লসিত হল এবং তাদের অবস্থার তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে বলে আশায় বুক বাধল। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত জাগ্রত হল এবং কৃষক-মজুরদের আন্দোলনগুলো চলার শক্তি সংগ্রহ করল। বহু ধর্মঘট হল। কৃষককুলের উপর ন্যস্ত গুরুভার লঘু করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভাগুলো অগোণে ভূমি ও ঋণ সংক্রান্ত আইনকানুন তৈরী করতে লেগে গেল এবং বিবিধ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের অবস্থার উন্নতিকল্পে মনোযোগ দিল। কিছুটা অবশ্যই তাঁরা করলেন, কিন্তু যেরূপ পরিবেশে তাঁরা অবস্থিত ছিলেন এবং ভারত-শাসন আইনের যে সব বাধা-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থেকে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল, তাতে সুদূরপ্রসারী ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনে হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

লাটসাহেবদের সঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত ও এরূপ দুটি ঘটনার সময় মন্ত্রিগণ পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন। এইসব পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বড়ো রকমের সংঘর্ষ বেঁধে যেত। ব্রিটিশ সরকারের এটা অভিপ্রেত ছিল না, তাই মন্ত্রীদের মতই শেষপর্যন্ত বজায় থেকে গেল। যাহোক, অবস্থাটা কিন্তু খুবই সংকীর্ণ ও নড়বড়ে, তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। কংগ্রেসের পক্ষে এটা একটা অস্থায়ী চলমান অবস্থা এবং কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য যে স্বাধীনতা সেটা ঠিকই আছে।

ব্রিটিশ সরকার যদি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাটা জোর করে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে বড়ো রকমের একটা সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসবে। প্রবল বিরুদ্ধ জনমতের দরুনই এটা এখনও করা হয় নি। এটা তুচ্ছ করা যায় না যে কংগ্রেস বর্তমানে যতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ইতিপূর্বে তার ইতিহাসে কখনও সেরূপ হয় নি। প্রস্তাবিত যৌথরাষ্ট্রকে ইহা কিছুতেই মেনে নেবে না বলে দৃঢ়সংকল্প। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র তৈরী করবে—ইহাই কংগ্রেসের দাবি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি পুনরায় ভারতে বিশেষ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সংঘর্ষ বাধিয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে অধিকতর প্রাধান্য দেবার একটা মনোভাব দেখা যাচ্ছে—তাতে জনসাধারণের মনোযোগ ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ভেদবিবাদ থেকে অন্যদিকে সরে আসবে।

ভারতের গণজাগরণের ছোঁয়াচ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোতেও লেগেছে এবং অনেকগুলি রাজ্যে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রধান প্রধান রাজ্যগুলোর মধ্যে এটা মহীশুর, কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুরে আরম্ভ হয়েছে। এই দাবির পাল্টা উত্তরে রাজ্যের কর্তৃপক্ষগণ অতি নিষ্ঠুর হিংস্র দমননীতি অবলম্বন করেছে—বিশেষ করে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। এসব অর্ধ-সামন্ত রাজ্যের অনেকগুলোতেই (যেমন কাশ্মীরে) ব্রিটিশ কর্মচারিগণ রাজ্যের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

বিগত কয়েক বছর ধরে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দিচ্ছে এবং তার নিজের সমস্যাটিকে বিশ্ব-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার চেষ্টা করছে। আবিসিনিয়া, স্পেন, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলীর আঘাত ভারতীয়দের প্রাণে খুবই বেজেছে এবং কংগ্রেস একটা পররাষ্ট্রনীতি প্রবর্তনের সূত্রপাত করেছে। এই নীতির ভিত্তি হচ্ছে যেমন শান্তি ও প্রজাতন্ত্রের সমর্থন, তেমনই আবার সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের বিরোধী।

১৯৩৭ সনে ব্রহ্মদেশকে ভারত হতে পৃথক করা হয়। একে একটি আইনসভা পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই আইনসভা ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলোরই শামিল।

১৬৩

মিশরের স্বাধীনতা-সমর

২০শে মে, ১৯৩৩

এবার চলো মিশরে যাওয়া যাক; সেখানেও নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর মধ্যে সংগ্রাম চলছে, তাকে একটু দেখে আসি। ভারতবর্ষেরই মতো সেখানেও প্রভু হল ব্রিটেন। ভারতবর্ষ আর মিশরের মধ্যে অনেক দিক থেকেই খুব বেশি তফাত আছে, মিশরে ব্রিটেনের রাজত্বও চলেছে অনেক অল্প দিন। তবুও এই দুটি দেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য এবং মিলও দেখা যায়। ভারতবর্ষ এবং মিশরের জাতীয় আন্দোলন এক পথ ও পন্থা ধরে চলে নি; কিন্তু স্বাধীনতার কামনা বস্তুত দুয়ের পক্ষেই মূলত এক, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদের লড়াই সেও একই। এদের এই জাতীয় আন্দোলনকে দমন করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনও দুই দেশে ঠিক একই রকমের কাণ্ড-কারখানা করে চলেছে। অতএব এই দুটি দেশই পরস্পরের অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। আমরা যারা ভারতবর্ষে আছি আমাদের পক্ষে বিশেষ করে শিখবার মতো বস্তু হচ্ছে একটি : মিশরকে দেখেই আমরা জানতে পারি, ব্রিটেন যে 'স্বাধীনতা' দান করে তার প্রকৃত স্বরূপ কী, এবং তার পরিণতিই বা কোথায়।

আরব-অঞ্চলের দেশগুলির (আরব, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন) মধ্যে মিশরই সভ্যতায় সকলের অগ্রণী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে মিশরই হচ্ছে যাতায়াতের রাজপথ—সুয়েজ খাল তৈরি হবার পর থেকে সমস্ত জাহাজ এই পথেই যাতায়াত করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নবীন ইউরোপের জন্ম হল, তার সঙ্গে মিশরের যতখানি ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, পশ্চিম-এশিয়ার কোনো দেশেরই তা ছিল না। জাতিগত দেশ হিসাবেও মিশরের একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে; আরব-অঞ্চলের অন্যান্য দেশ থেকে সে সম্পূর্ণরূপেই পৃথক জীবন যাপন করছে, অথচ তাদের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক বন্ধনও অত্যন্ত নিবিড়—এদের সকলেরই এক ভাষা, এক রীতি-নীতি,

এক ধর্ম। কায়রোর দৈনিক পত্রিকাগুলি আরব-অঞ্চলের প্রত্যেক দেশেই যায়, সেখানে এদের প্রচণ্ড প্রভাব। এই দেশগুলির মধ্যে মিশরেই জাতীয় আন্দোলন প্রথম গড়ে উঠেছিল, সুতরাং মিশরের সেই জাতীয়তাবাদকে আরব-অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো স্বভাবতই তাদের আদর্শস্থানীয় বলে গ্রহণ করেছে।

১৮৮১-৮২ সনে আরবী পাশার নেতৃত্বে একটি জাতীয় আন্দোলন দেখা দেয়, ব্রিটিশ-সরকার সে আন্দোলনকে দমন করে—এর কথা আমি মিশর সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে তোমাকে বলেছি। প্রথম যুগের সংস্কারকদের কথাও বলেছি—জামালুদ্দিন আফগানির কথা, গোঁড়া ইসলামপন্থীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশ থেকে আমদানি নূতন মতামতের সংঘাতের কথা। এই সংস্কারকরা ইসলাম আর আধুনিক জগতের প্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে চাইলেন; ধর্মমতের একেবারে প্রাচীন মূলনীতিগুলোকেই তাঁরা সত্য বলে স্বীকার করলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু নূতনতর আনুষঙ্গিক বাহুল্য প্রত্যেক ধর্মমতের সঙ্গেই জমে ওঠে, তার অনেক বাহুল্যকে এঁরা বর্জন করে চললেন। প্রগতিবাদী মানুষদের পক্ষে এর ঠিক পরের কাজটিই হচ্ছে ধর্মকে সব সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করে ফেলা। সমস্ত প্রাচীন ধর্মমতেরই একটা বিশেষত্ব আছে, তারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি ব্যাপারকেই নিয়ে কথা বলে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম, দুয়ের মধ্যেই খাঁটি ধর্মনৈতিক শিক্ষা যেটুকু আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে আছে বহু সামাজিক আইন-কানুন রীতি-নীতি—মানুষের বিবাহ, উত্তরাধিকার, দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এককথায় জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্বন্ধেই তার কর্তৃত্ব। তার অর্থ, এই ধর্মশাস্ত্রগুলোতে সমাজজীবনের একটি সম্পূর্ণ কাঠামো গড়ে দেওয়া হয়েছে, সে কাঠামোকে চিরস্থায়ী করে রাখবার জন্য তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মের অনুশাসন আর অনুজ্ঞা। এবিষয়ে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী হচ্ছে হিন্দুধর্ম, তার অচলায়তন জাতিভেদ-প্রথা হয়েছে তার মস্ত বড়ো সহায়। সমাজ-ব্যবস্থাকে যেখানে এইভাবে ধর্মের দ্বারা কায়েমী করে রাখা হচ্ছে, সেখানে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটানো স্বভাবতই কঠিন হয়ে ওঠে। তাই অন্যান্য দেশের মতো মিশরেরও প্রগতিকামীরা চাইলেন, ধর্ম আর সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে ফেলবেন। এঁরা যুক্তি দেখালেন, অতীত কালে ধর্মমত ও প্রচলিত প্রথার মধ্য দিয়ে লোকেরা এই-সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শাস্ত্রগ্রন্থ যখন রচিত হয়েছিল তখন দেশের এবং সমাজের যে অবস্থা ছিল তার দিক থেকে এইগুলোই ছিল অত্যন্ত সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন অবস্থা অনেকখানিই বদলে গেছে, এই আধুনিক অবস্থার সঙ্গে সেই প্রাচীন রীতিনীতি, ব্যবস্থা আর খাপ খাচ্ছে না। গরুর গাড়ি চলার জন্য যে আইন তৈরি হয়েছিল, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির পক্ষে সেটা মোটেই প্রযোজ্য নয়, এ তো সহজ কথা!

এইটাই ছিল এই প্রগতিপন্থী আর সংস্কারকদের যুক্তি। এর ফলে রাষ্ট্র এবং বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্রমেই বেশিমাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠল, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক রইল না। এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশিদূর এগিয়েছে তুরস্কে—সে কাহিনী আমরা আগেই শুনেছি। তুর্কি-প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এখন পদগ্রহণের শপথটা পর্যন্ত ঈশ্বরের নাম নিয়ে গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করেন তাঁর নিজের আত্মমর্যাদার নামে। মিশরে ব্যাপার এতদূর গড়ায় নি, কিন্তু তারও যাবার প্রবৃত্তি এই দিকেই। অন্যান্য ইসলামপন্থী দেশেরও তাই অবস্থা। তুরস্ক মিশর সিরিয়া পারশ্য সর্বত্রই এখন লোকে কথা বলছে এক নূতন ভাষায়—সে হচ্ছে জাতীয়তাবাদের ভাষা। ধর্মবাদের প্রাচীন ভাষায় কেউই আর কথা বলতে চায় না। এই জাতীয়করণের গতিকে ভারতের মুসলমানরা যতখানি ঠেকিয়ে চলেছে এত বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ই করে নি। ইসলামপন্থী দেশগুলিতে এদের যে-সব ধর্মভাইরা রয়েছে তাদের তুলনায় এরা অনেক বেশি রক্ষণপন্থী এবং ধর্মে বিশ্বাসী। এটা একটা অদ্ভুত এবং আশ্চর্য ব্যাপার। সাধারণত সর্বত্রই এই নূতন জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম ও বৃদ্ধিকে আশ্রয় করে—বুর্জোয়া অর্থ ধনিকতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে মধ্যবিত্ত-

শ্রেণীগুলো টিকে থাকে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এই বুর্জোয়াশ্রেণী তেমন গড়ে ওঠে নি; হয়তো এই অভাবটির জন্যই জাতীয়তাবাদের পথেও তাদের অগ্রগতিতে বাধা পড়েছে। আবার এও হতে পারে, ভারতবর্ষে তারা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে তাদের মন সর্বদাই ভয়ে আচ্ছন্ন; তাই তারা অন্যদের চেয়ে বেশি রক্ষণপন্থী, প্রাচীন রীতি-নীতির আঁচল ছেড়ে চলতে তাদের অত্যন্ত আপত্তি, নূতনতরো মতবাদ আর রীতি-নীতিকে তারা স্বভাবতই সংশয়ের চোখে দেখে থাকে। প্রায় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম আবির্ভাব। হিন্দুরা তখন শামুকের মতো নিজের খোলার মধ্যে হাত-পা সর্বাঙ্গ গুটিয়ে নিয়ে, জাতিভেদ-প্রথা দিয়ে নিজেদের সর্বাঙ্গ বেঁধেছেঁধে একটা অত্যন্ত অনড়-অচল জাতিতে পরিণত হয়েছিল—নিশ্চয়ই তারও মূলে ছিল ঠিক এই গোছেরই একটা মনোভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং তার পর থেকেই, বিদেশী বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিশরে নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী বেড়ে উঠল। এই শ্রেণীরই একজন লোক ছিলেন সৈয়দ জগলুল—একটি 'ফেলা' বা কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৮৮১-৮২ সনে আরবী পাশা ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, জগলুল তখন তরুণ যুবা। আরবী পাশার অধীনে তিনিও যুদ্ধে যোগ দিলেন। সেই দিন থেকে শুরু করে ১৯২৭ সন পর্যন্ত, তাঁর একেবারে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, ৪৫ বৎসর ধরে মিশরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছেন তিনি, মিশরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নেতা। মিশরে তাঁর নেতৃত্ব একচ্ছত্র : কৃষক বংশে তাঁর জন্ম—দেশের কৃষকরা তাঁকে নিজের জন বলে ভালোবাসত; নিজে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে শ্রেণীর লোকেরা তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করত। কিন্তু দেশের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়, অর্থাৎ প্রাচীন সামন্তপন্থী ভূস্বামীশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে সুনজরে দেখত না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন জেগে উঠছে; দেশে এতদিন এঁরাই প্রভুত্ব করে আসছিলেন, সে প্রভুত্বের আসন থেকে এঁদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, কাজেই তার প্রতি এঁরা প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁদের চোখে জগলুল ছিলেন ভুঁইফোঁড়; দেশের নেতা এবং তাঁর নিজের শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে এদের সঙ্গে দারুন লড়াই করে চলতে হয়েছিল। ভারতবর্ষেরই মতো মিশরেও ব্রিটিশরা এই সামন্তপন্থী ভূস্বামী শ্রেণীকে নিজেদের সহায় বলে অবলম্বন করতে চাইল। বস্তুত এই শ্রেণীর মধ্যে মিশরীয়দের চেয়ে তুর্কিই ছিল বেশি; পুরোনো দিনের অভিজাত শাসক শ্রেণীদের এরা বংশধর।

চিরকাল ধরে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা যে নীতিকে সুষ্ঠু বলে জেনেছে, ব্যবহার করে এসেছে, মিশরেও ব্রিটেন সেই নীতিই অনুসরণ করল; দেশের বিশেষ একটা সামাজিক সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলকে নিজের বন্ধু করে রাখল, এবং দেশের মধ্যে দলে-দলে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবার পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। ভারতবর্ষের মতো মিশরেও তারা একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করল—খৃষ্টান কপ্‌ট্‌রা ছিল মিশরের একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। আর এই সমস্ত কাণ্ডই তারা করতে লাগল ঠিক রীতিসঙ্গত পদ্ধতিতে : মুখে তাদের বড়ো বড়ো বাণী আর বুলি—যা কিছু আমরা করছি সে-সব তোমাদেরই ভালোর জন্যে; দেশের 'লক্ষ লক্ষ মূক অধিবাসীর' স্বার্থের আমরাই হচ্ছি সংরক্ষক এবং অভিভাবক; 'আন্দোলনকারী' এবং এই রকমের অন্যান্য লোক যাদের 'দেশের সঙ্গে কোনো রকম নাড়ীর যোগ নেই', এরা যদি গোলমাল সৃষ্টি না করে তবে তো সমস্তই একেবারে ঠিক হয়ে যায়! অবশ্য দেশের লোকের এই উপকার করবার জন্যই অনেক সময় সেই উপকৃতদের বহু লোককে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলতে হত। হয়তো এর ফলে তারা ইহজগতের দুঃখগ্লানির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত, অনন্ত স্বর্গের অনন্ত সুখলোকে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারত।

যুদ্ধের সময়টা আগাগোড়াই, এবং তার পরেও দীর্ঘকাল ধরে মিশরে সামরিক আইন চালু রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে একটা নিরস্ত্রীকরণ আইন এবং একটা বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তির আইনও তৈরি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সৈন্যে দেশটাকে ভরে ফেলা হয়েছিল। যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকেই মিশরকে ব্রিটেনের একটা রক্ষাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হল। মিশরের জাতীয়তাবাদীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন : মিশর কেন স্বাধীনতা পাবার অধিকারী, তার সমস্ত যুক্তিতর্ক দেখিয়ে নথিপত্র খাড়া করা হল—ব্রিটিশ সরকার এবং প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের কাছে সে দাবি তাঁরা পেশ করবেন। মিশরে তখন সত্যকার রাজনৈতিক দল বলে কিছু ছিল না। 'ওয়াতনিস্ট' বলে একটি জাতীয়তাবাদী দল শুধু ছিল, তারও সভ্যসংখ্যা অতি অল্প। তখন স্থির হল, বৃহৎ একটি প্রতিনিধিদলকে দেশ থেকে পাঠানো হবে, তার নেতা হবেন জগলুল পাশা। লন্ডনে এবং প্যারিসে গিয়ে এ'রা মিশরের স্বাধীনতার দাবি পেশ করবেন। এই প্রতিনিধিদলটি যাতে সমস্ত জাতিরই প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়, দেশের লোকের পূর্ণ সমর্থন যাতে এর পিছনে থাকে, এই উদ্দেশ্যে দেশ জুড়ে সংগঠন শুরু করল। এই থেকেই মিশরের বিখ্যাত ওয়াফদ্ দলের সৃষ্টি; ওয়াফদ্ কথাটার মানে হচ্ছে প্রতিনিধি-দল। ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিনিধিদলকে লন্ডনে যাবার অনুমতি দিলেন না; ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে জগলুল এবং অন্যান্য বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এর ফলে দেশে সহিংস বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। জনকতক সাহেবকে মেরে ফেলা হল; কায়রো শহর এবং দেশের আরও অনেক কেন্দ্রস্থল বিপ্লবী কমিটির দখলে চলে গেল। বহুস্থানে জনসাধারণের নিরাপত্তা-বিধায়ক জাতীয় কমিটি তৈরি করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই বিপ্লবে খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রথমদিকে এতখানি সাফল্য অর্জন করলেও পরে কিন্তু আবার এই বিপ্লবের অনেকখানিই দমন করা হল, অবশ্য তখনও মাঝে মাঝেই ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের খুন করা হতে লাগল। কিন্তু বাইরের বিদ্রোহটা দমন করা হলেও আন্দোলনের মৃত্যু হল না—সে পূর্ণোদ্যমেই বেঁচে রইল। শুধু তার যুদ্ধের নীতিটা বদলে গেল; এবার সে শুরু করল আর-এক রকমের যুদ্ধ—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অভিযান। এই অভিযান এতদূর সফল হল যে, শেষে বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ সরকারকে মিশরের দাবি খানিকটা মেটাবার ব্যবস্থা করতে হল। ইংলন্ড থেকে একটি কমিশন পাঠানো হল, লর্ড মিলনার তার নেতা। মিশরের জাতীয়তাবাদীরা স্থির করলেন তাঁরা এই কমিশনকে বয়কট করবেন। বয়কটের চেষ্টাটি একেবারে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করল। মিলনার কমিশনকে বয়কটের ব্যাপারেও ছাত্ররাই ছিলেন খুব বড়ো উদ্যোক্তা। সমস্ত জাতির এই অপূর্ব সংগ্রাম দেখে কমিশন অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন, শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনেকগুলো খুবই দূরপ্রসারী ব্যবস্থা তাঁরা অনুমোদন করে গেলেন। ব্রিটিশ-সরকার তাঁদের সে কথা কানে তুললেন না, অতএব আন্দোলনও চলতে থাকল। ১৯১৯ সনের প্রথম থেকে ১৯২২ সনের প্রথম দিক পর্যন্ত তিন বছর ধরে এই সংগ্রাম চলল' মিশরের লোকেরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কোনো জোড়াতালির ব্যবস্থা মেনে নিতে তাঁরা রাজি নন, তাঁদের দাবি হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা—ইস্তিকলাল এল-তাম।

১৯১৯ সনে জগলুল পাশাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার কিছু দিন পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯২১ সনে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠানো হল। কিন্তু ব্রিটিশদের দিক থেকে এতে মিশরের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হল না; বাধ্য হয়েই তাঁরা মিশরীয়দের শান্ত করবার কিছু ব্যবস্থা করতে বসলেন। আপোষ-মীমাংসার যত চেষ্টা করা হয়েছিল সে চেষ্টা প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছে; যদিও জগলুল নিজে মোটেই আপোষবিরোধী বা চরমপন্থী ছিলেন না। বস্তুত একবার কয়েকজন লোক জগলুলকে হত্যা করতেই চেষ্টা করেছিল—তাদের অভিযোগ ছিল, তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে অত্যন্ত নিরীহরকমের আপোষ-মীমাংসা করতে চেষ্টা করছেন, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। ব্রিটিশ সরকার আর মিশরের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মতের মিল হচ্ছিল না, তার প্রকৃত কারণটি ছিল অনেক বেশি গভীর—এখনও এই জন্যই এদের মতে মিলছে না। ভারতবর্ষে যে কারণে দু'পক্ষের মধ্যে মীমাংসা সম্ভব হচ্ছে না, মিশরেও ঠিক সেই কারণটিই বর্তমান ছিল। মিশরে ব্রিটেনের যতরকম স্বার্থ নিহিত ছিল তার সমস্তখানিকে উপেক্ষা বা বিনষ্ট করবেন এমন কোনো অভিপ্রায়ই মিশরের জাতীয়তাবাদীদের মনে ছিল না। সে স্বার্থ সংরক্ষণের কথা নিয়ে আলোচনা করতে তাঁরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন; বাণিজ্য, সেনাচলাচলের পথ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রিটেনের যে-সব

বিশেষ প্রয়োজন মিশরে ছিল তারও দরুন ব্যবস্থা করতে তাঁরা রাজি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথা ছিল, আগে তাঁদের পূর্ণ-স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে; তারপর এবং সেই স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যতদূর সম্ভব, এই সমস্ত সমস্যার কথা তাঁরা ভেবে দেখবেন। ওদিকে ইংলণ্ডের ধারণা, ঠিক কতটুকু স্বাধীনতা মিশরকে দেওয়া হবে তার পরিমাণ মেপে স্থির করে দেওয়াই হচ্ছে তার কাজ; আর সে স্বাধীনতাও দেওয়া হবে ইংলণ্ডের নিজের স্বার্থকে আগে সামলে রেখে তার পরে—সে স্বার্থকে রক্ষার ব্যবস্থা সকলের আগেই করা চাই।

অতএব দুপক্ষের মতের মিল হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের তখন ধারণা হয়েছে যা-হোক একটা কিছু তাড়াতাড়িই করে ফেলা দরকার; অতএব দুয়ের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া না করেই তাঁরা ১৯২২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি ঘোষণা প্রচার করলেন। তাতে বললেন, এখন থেকে মিশরকে একটি 'স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' বলে তাঁরা স্বীকার করবেন, কিন্তু—সে অতি বড়ো 'কিন্তু',—চারটি বিষয়কে এর বাইরে রাখা হবে, সে নিয়ে পরে আরও বিবেচনা করে তবেই মতপ্রকাশ করা হবে। এই চারিটি বিষয় হচ্ছে :

১। মিশরের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সব যানবাহন এবং সংবাদ চলাচলের পথ আছে, তার নিরাপত্তা-রক্ষণ।

২। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যে-কোনো প্রকারে, যে কোনো বিদেশী জাতির আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ থেকে মিশরকে রক্ষা করা।

৩। মিশরে যে-সব বিদেশী লোক এবং বিদেশীদের যে-সব কাজকারবার আছে তার রক্ষা; এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের স্বার্থরক্ষা।

৪। সুদানের অবস্থা ভবিষ্যতে কী হবে, সেই প্রশ্নের সমাধান।

ভারতবর্ষের যে বিষয়গুলি আমাদের আয়ত্তের বাইরে রাখা হয়েছে, মিশরের এই সংরক্ষিত বিষয়গুলি তারই সমগোত্রীয়। এদেশে আমরা এদের নাম দিয়েছি 'রক্ষাকবচ'; এখানে এদের সংখ্যাও অনেক বেশি। মিশরবাসীরা তখন এই সংরক্ষণগুলোকে স্বীকার করে নেয় নি, কারণ এগুলোকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ সহজ সরল এবং নিরীহ বলে মনে হলেও আসলে এদের মানেই হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনো ব্যাপারেই মিশরের প্রকৃত স্বাধীনতা থাকবে না। ১৯২২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের এই স্বাধীনতা ঘোষণা, এটা একেবারেই একটা একতরফা ব্যাপার—ব্রিটিশ সরকার এর স্রষ্টা। মিশর একে কোনো দিনই স্বীকার করে নিল না। ব্রিটেনের প্রয়োজনমাফিক গুটিকতক সংরক্ষণ বা রক্ষাকবচ তার মধ্যে থাকলে সে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী দাঁড়ায়, পরবর্তী বছরগুলিতে মিশরে তার চমৎকার পরিচয় পেয়েছি।

এই 'স্বাধীনতা' দিয়ে দেবার পরও কিন্তু পুরো দেড়টি বছর ধরে মিশরে সামরিক আইন-চালু রাখা হল, সে আইন প্রয়োগ করার ভার রইল ব্রিটিশ কর্মচারীদের হাতে। মিশর সরকার একটা দায়-মুক্তির আইন তৈরি করবার পর তবেই শুধু সামরিক আইন তুলে নেওয়া হল। দায়-মুক্তির আইন মানে হচ্ছে, সামরিক আইনের আমলে যত কর্মচারী যতরকমের অন্যায় এবং বেআইনি কাণ্ড-কারখানা করেছেন তার দরুন সমস্ত অপরাধ এবং দায় থেকে তাঁদের নির্বিচারে মুক্তি দেওয়া হল।

মিশর এবার 'স্বাধীন' হয়েছে—তার জন্য একটি অতি চমৎকার প্রগতি-বিরোধী শাসনতন্ত্র তৈরি করে দেওয়া হল, তাতে রাজার হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা মানে হচ্ছেন রাজা ফুয়াদ। মিশরের অধিবাসীদের ঘাড়ে জোর করেই তাঁকে চাপিয়ে দেওয়া হল। রাজা ফুয়াদ আর ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে ভারি সদ্‌ভাব ছিল; এ'রা দু'পক্ষই জাতীয়তাবাদী-দের অপছন্দ করতেন, প্রজাদের স্বাধীনতা থাকবে একথায় দুপক্ষেরই সমান আপত্তি, এমনকি সত্যকার পার্লামেণ্টী শাসন-ব্যবস্থাতে পর্যন্ত এ'দের আপত্তি। ফুয়াদের ধারণা ছিল তিনিই

হচ্ছেন দেশের শাসক—তাঁর যা খুশি তাই করতে লাগলেন, পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন এবং একেবারে স্বৈরতন্ত্রী একাধিনায়কের মতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। এইসব ব্যাপারে তাঁর বড়ো নির্ভরের বস্তু ছিল ব্রিটিশ সেনার শক্তি : সে সেনা কখনোই তাঁকে সাহায্য করতে আলস্য প্রকাশ করে নি।

মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে ব্রিটিশ সরকার প্রথমেই একটি অতি নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখালেন : বললেন, নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে যে ব্রিটিশ কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অতি প্রকাণ্ড পরিমাণ টাকা মিশরকে দিতে হবে। মিশর-সরকার অর্থাৎ রাজা ফুয়াদ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। এদের ক্ষতিপূরণ বলে মোট ৬,৫০০,০০০ পাউন্ড দেওয়া হল; এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই পেয়েছিলেন ৮,৫০০ পাউন্ড! তার চেয়েও মজার ব্যাপার হল, চাকরি ছাড়বার দরুন এই বিরাটপরিমাণ ক্ষতিপূরণ যাদের মিটিয়ে দেওয়া হল, সেই কর্মচারীদের অনেককে আবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ চুক্তি অনুসারে সরকারি চাকরিতে বহাল করা হল। মনে রেখো মিশর মোটেই বড়ো দেশ নয়, এর মোট লোকসংখ্যা যুক্তপ্রদেশের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম।

মিশরের শাসনতন্ত্রে জোরগলায় বলা হয়েছে, 'সমগ্র জাতির সম্মতি থেকেই সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উদ্ভব হবে।' কার্যত কিন্তু, নূতন শাসনতন্ত্র চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত মিশরের পার্লামেণ্টের কোনোদিনই বিশেষ কিছু কাজ করতে হয় নি। আমি যতদূর জানি, একটি পার্লামেণ্টও তার স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে নি। রাজা ফুয়াদের হাতে বার বার পার্লামেণ্টের হঠাৎ অবসান ঘটেছে; শাসনতন্ত্রকে মুলতুবি করে রেখে তিনি স্বৈরতন্ত্রী রাজার মতোই দেশ শাসন করে চলেছেন।

নূতন পার্লামেণ্টের প্রথম নির্বাচন হল ১৯২৩ সনে। জগলুল পাশা আর তাঁর দল—তখন তার নাম হয়েছে ওয়াফ্দ্ দল—দেশের সর্বত্রই জয়লাভ করলেন। শতকরা নব্বুই জন লোক তাঁদের পক্ষে ভোট দিল; পার্লামেণ্টে মোট ২১৪ জন সভ্যের স্থান, তার মধ্যে এঁদেরই লোক নির্বাচিত হলেন ১৭৭ জন। ইংলণ্ডের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি করবার চেষ্টা এঁরা করলেন; কথাবার্তা চালাবার জন্য জগলুল স্বয়ং লণ্ডনে গেলেন। কিন্তু দু'পক্ষের মতামতকে কিছুতেই মেলানো গেল না। অনেকগুলো ব্যাপার নিয়েই আলোচনা ব্যর্থ হল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুদানের কথা। সুদান মিশরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত একটি দেশ। মিশরের সঙ্গে এর অনেক তফাত, এদের লোকদের জাতি এক নয়, ভাষাও এক নয়। নীল নদের গোড়ার দিকটা বয়ে এসেছে এই সুদানের মধ্য দিয়ে। মিশরের যতদিনের ইতিহাস আমরা পাই তার একেবারে গোড়া থেকেই, তার মানে সাত-আট হাজার বছর ধরে, এই নীল নদই মিশরের ধমনীতে রক্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে। প্রতিবছর নীল নদের বন্যা হয়, সেই বন্যার জলের সঙ্গে আবিসিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধুয়ে আসে পলি মাটি, মরুভূমির দেশকে উর্বর শস্যশ্যামল করে তোলে; মিশরের কৃষি, মিশরের জীবন সমস্তটাই গড়ে উঠেছে এই নীল নদের বন্যাকে আশ্রয় করে। (সেই বয়কট-করা কমিশনের সভাপতি) লর্ড মিল্নার নীল নদের সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"এই বৃহৎ নদটি থেকে যে নিয়মিত জলের যোগান আসে, মিশরের পক্ষে সেটা শুধু সুবিধা আর সমৃদ্ধির ব্যাপার নয়, মিশরের জীবনই নির্ভর করছে তার উপরে। এই নদের উপরদিকটা যতদিন মিশরের আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে, নিয়মিত জল পাবার ব্যাপারেও তাকে ততদিনই খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হবে—এই বিপদের কথা ভাবতেও অস্বস্তি লাগে।"

নীল নদের সেই উপর-দিকটা হচ্ছে সুদানের এলাকার মধ্যে। এই জন্যই মিশরের দিক থেকে সুদানের সমস্যা একটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার।

আগের দিনে লোকে জানত, সুদান দেশটা ইংলণ্ড এবং মিশরের মিলিত কর্তৃত্বের অধীন। এর নামই ছিল ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান। ব্রিটেন তখন বস্তুতই মিশরে রাজত্ব করছে, কাজেই মিশরের রাশিকৃত টাকা প্রতি বৎসর সুদানের পিছনে ব্যয় করা হত। ১৯২৪ সনে লর্ড কার্জন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, মিশর যে টাকা সুদানের পিছনে ব্যয় করছে তা যদি

না করত, তবে সুদান কোন্ কালে দেউলিয়া হয়ে যেত। ব্রিটেনকে এবার মিশর ছেড়ে চলে যাবার কথা বলা হচ্ছে; সুদানকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল। ওদিকে মিশরের লোকরাও দেখল, সুদানের মধ্যেই রয়েছে নীল নদের গোড়া; তার জলকে যে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে মিশরের অস্তিত্বও নির্ভর করবে তারই মরজির উপরে। এইটেই হচ্ছে এদের স্বার্থের বিরোধ।

১৯২৪ সনে সৈয়দ জগলুল এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সুদানের কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সুদানের প্রজারা তখন নানাবিধ উপায়ে মিশরের প্রতি তাদের প্রীতি প্রকাশ করেছে। এই অপরাধে ব্রিটিশরাও তাদের উপরে যথেচ্ছ উৎপীড়ন চালিয়েছে; সুদানে তারা যা ইচ্ছা তাই করে বেড়িয়েছে, মিশর সরকারকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে নি। অথচ সুদানের কর্তৃত্ব ছিল এদের দুজনের হাতে একত্র; সুদানের দরুন মিশরকে টাকাও অনেকই ব্যয় করতে হত।

মিশরের তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে কটি সংরক্ষিত বিষয়ের নাম ছিল, তার আরেকটি হচ্ছে, বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষা। বিদেশীদের এই স্বার্থ বলতে কী বোঝাত? আগের একটি চিঠিতেও এর কথা আমি একটুখানি বলেছি। তুর্কি-সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন ইউরোপের বড়ো বড়ো শক্তিমান দেশগুলো তার উপরে নানাবিধ আইন-কানুন চাপিয়ে দিল। এই আইনে বলা হল, তুরস্কে এই-সব দেশের যে-সব প্রজা বাস করছে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ইউরোপীয় বিদেশীরা যে-কোনো অপরাধই করুক না কেন, তুর্কি আইন বা তুর্কি আদালতে তাদের বিচার হতে পারবে না। এদের বিচার করবেন এদের নিজেদের দেশের কনসাল বা কূটনীতির রাষ্ট্রদূতেরা, অথবা হবে কোনো বিশেষ আদালতে, সে আদালত বিদেশীদের নিয়েই তৈরি হবে। আরও অনেকরকম বিশেষ সুবিধা এরা ভোগ করত, যেমন, বেশির ভাগ করই এরা না দিয়ে পারত। বিদেশীদের এই-সব বিশেষ এবং অতি-মূল্যবান অধিকারকে এক কথায় বলা হত 'ক্যাপিচুলেশন'—কথাটার সৃষ্টি হয়েছে 'ক্যাপিচুলেট' বা 'সমর্পণ' কথা থেকে, কারণ এর মানেই হচ্ছে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম অধিকার এক্ষেত্রে খানিকটা খর্ব করল বা বিদেশীদের হাতে সমর্পণ করল। তুরস্ককে এই সমস্ত জুলুম মেনে নিতে হল, কাজেই তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলগুলি এগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হল। মিশর তখন সম্পূর্ণরূপেই ব্রিটিশ শাসনের অধীন হয়ে গেছে, নামেও তার উপরে তুরস্কের কোনো প্রভুত্ব আর প্রতিষ্ঠিত নেই। তবু এই বিষয়ে তাকেও ঠিক তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ বলেই ধরে নেওয়া হল—তারও উপরে এই ক্যাপিচুলেশনের শর্তগুলো চাপিয়ে দেওয়া হল। এই শর্তের ফলে বিদেশী ব্যবসাদার আর ধনিকদের মস্ত সুবিধা হয়ে গেল, মিশরের সব বড়ো বড়ো শহরে তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঠি গড়ে তুলল। এমন অপূর্ব ব্যবস্থা, যাতে তাদের স্বার্থকে সর্বদিক দিয়েই টিঁকিয়ে রাখা হচ্ছে, চতুর্দিক থেকে লাভের টাকা খেয়ে খেয়ে তারা মহা আনন্দে ফেঁপে ফুলে উঠছে, প্রজার দেয় সাধারণ কর এবং রাজস্বের টাকা পর্যন্ত তাদের দিতে হচ্ছে না—এই ব্যবস্থাকে তুলে দেবার চেষ্টাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবে—এ তো অতি সহজ কথা। মিশরে বিদেশীদের 'কায়েমী স্বার্থ' ছিল, ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলোকে রক্ষা করবে। অথচ, এটা এমন একটা ব্যবস্থা স্বাধীনতার সঙ্গে যার কোনোখানেই মিল নেই; শুধু তাই নয়, এর ফলে তার রাজস্বেরও নিদারুন লোকসান হচ্ছে—এই ব্যবস্থাকে মিশরেরও স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। দেশের মধ্যে সবচেয়ে যারা ধনী ব্যক্তি তারাই যদি কর দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে সামাজিক ব্যবস্থার কোনো বড়ো রকমের সংস্কার ঘটাতে যাবার চেষ্টা করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ প্রভুরা দীর্ঘকাল ধরে দেশে প্রত্যক্ষ শাসন চালিয়ে এসেছে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার বা স্বাস্থ্যোন্নতি বা গ্রামের উন্নতি প্রভৃতির প্রায় কোনো ব্যবস্থাই তারা করে নি।

তার উপরে আবার মজার ব্যাপার, যে তুরস্ককে উপলক্ষ্য করেই এই ক্যাপিচুলেশনের সৃষ্টি করা হয়েছিল, কামাল পাশার জয়ের পরে সেই তুরস্কে এর অবসান ঘটল; অথচ ব্রিটিশের রক্ষাধীন অঞ্চল মিশরে এগুলো আজও টিকে রয়েছে। এখানে আরও একটি কথা বলি, চীনেও আজ পর্যন্ত কতকটা এই ধরনেরই কতকগুলো ব্যাপার টিকে আছে, চীন তার সঙ্গে আজও লড়াই

করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অল্প কিছুকালের জন্য জাপানেও এর প্রবর্তন হয়েছিল; কিন্তু জাপান শক্তিশালী হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোকে নাকচ করে দিয়েছে।

অতএব ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে বোঝাপড়ার পথে এই বিদেশীদের কায়েমী স্বার্থের সমস্যাটাই হয়ে দাঁড়াল আরেকটা বড়ো বাধা। কায়েমী স্বার্থগুলো চিরদিনই স্বাধীনতার পরিপন্থী।

মিশরে আরও একটা ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের অভ্যস্ত মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন; বলেছিলেন, দেশের মধ্যে যে-সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে তাদের স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করবেন। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে এই হচ্ছে আরেকটি সংরক্ষিত বিষয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের মধ্যে প্রধান ছিল কপ্ট্‌রা। এরা প্রাচীনকালের মিশরবাসীদের বংশধর বলে পরিচিত, তার মানে এরাই হচ্ছে মিশরের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। এরা খৃষ্টান; খৃষ্ট ধর্মের একেবারে প্রথম যুগেই এরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, ইউরোপ তখন পর্যন্ত খৃষ্টান ধর্মকে চিনতও না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ব্রিটেনের এমন মহৎ মাথাব্যথা, এই অকৃতজ্ঞ কপ্ট্‌রা কিন্তু তার জন্য মোটেই তাকে গদগদকণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল না—সাফ বলে দিল, আমাদের নিয়ে তোমাকে মোটেই মাথা ঘামাতে হবে না। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘোষণা প্রচারের অতি অল্পদিন পরেই কপ্ট্‌রা একটা প্রকাণ্ড সভার অনুষ্ঠান করল; সে সভায় সিদ্ধান্ত স্থির করল, 'জাতীয় ঐক্যের খাতিরে এবং জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্যকে আয়ত্ত করবার খাতিরে, আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক নির্বাচন বা পৃথক সংরক্ষণের কোনো রকম ব্যবস্থাই মেনে নিতে অস্বীকার করছি।' কপ্ট্‌দের এই সিদ্ধান্ত শুনে ব্রিটিশরা ক্ষুব্ধ হল, বলল, এটা একটা অত্যন্ত মূর্খের মতো কথা। কিন্তু কথাটা মূর্খের মতোই হোক আর বিজ্ঞের মতোই হোক, এর ফলে ব্রিটেন তাদের রক্ষা করবার যে-সব তোড়জোড় করছিল সেটা একদম ভেস্তে গেল; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে আর আলাপ-আলোচনারও অবসর রইল না দেশে। বাস্তবিকই স্বাধীনতার সংগ্রামে কপ্ট্‌রা অনেকখানিই অংশ গ্রহণ করেছিল; ওয়াফ্‌দ্‌ দলে জগলুল পাশার সবচেয়ে বিশ্বাসী সহকর্মী যে ক'জন ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কপ্ট্‌।

দুই পক্ষের মধ্যে মতের তফাত এবং স্বার্থের সংঘাত যেখানে এতখানি তীব্র, সেখানে আপোষ হয় না। ১৯২৪ সনে মিশরের প্রতিনিধি হিসাবে সৈয়দ জগলুল আর তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে ব্রিটিশের আলাপ-আলোচনা বসল; এই তফাতের জন্যই সে আলোচনা ভেঙে গেল। ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এতদিন তাঁরা মিশরে নিজেদের যা ইচ্ছা তাই করে এসেছেন, খেয়ালমাফিক চলতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এখন কায়রোর নূতন পার্লামেণ্ট, বিশেষ করে ওয়াফ্‌দ্‌ নেতারা কিছুতেই বাগ মানছেন না—এতে রাগ হবারই কথা। অতএব তাঁরা স্থির করলেন, এই ওয়াফ্‌দ্‌ দলকে, মিশরের পার্লামেণ্টকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে—অবশ্য শিক্ষাটা দেওয়া হবে তাঁদের অভ্যস্ত সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতেই। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষা দেবার একটা ভালো সুযোগও হাতে এসে পড়ল। কী অপূর্ব উপায়ে তাঁরা সে সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করলেন এবং নিজেদের কাজ হাশিল করে নিলেন, সে কাহিনী আমি এর পরের চিঠিতে বলব। ঘটনাটি অপূর্ব; আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদ কোন পথে কাজ করে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেখাবার একটি চমৎকার দর্পণ হয়ে রয়েছে সেটি। তাকে নিয়ে একটি আস্ত চিঠি না লিখলে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

১৬৪

ব্রিটেনের অধীনস্থ স্বাধীনতার স্বরূপ

২২শে মে, ১৯৩৩

১৯২৪ সনে মিশর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ আর ব্রিটিশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বসল। এই আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল, এবং তার ফলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত চটে গেলেন। এর ফলে যে-সব অভিনব কাণ্ড ঘটল তার কথা তোমাকে বলব, কিন্তু তার আগে একটি কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, তথাকথিত 'স্বাধীনতা' পেয়েও কিন্তু মিশর রয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দখলে। শুধু যে ব্রিটিশ সেনাই মিশরে অবস্থিত ছিল তাই নয়, মিশরের নিজের সেনাবাহিনীটিও ছিল ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন; এর বড়ো কর্তা একজন ইংরেজ, তাঁর পদবী হচ্ছে সেনাবাহিনীর সর্দার। পুলিশেরও প্রধান প্রধান কর্মচারীরা সকলেই ছিলেন ইংরেজ। মিশরে অবস্থিত বিদেশীদের স্বার্থরক্ষা করা হচ্ছে এই অজুহাত দিয়ে ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব, বিচার এবং আভ্যন্তরীণ শাসন বিভাগটিকে নিজের কর্তৃত্বে রেখে চালাচ্ছিলেন; তার মানেই, দেশ শাসনের মধ্যে যে কটা বস্তুর গুরুত্ব খুব বেশি তার প্রত্যেকটাই ছিল এদের হাতে। মিশরবাসীরা স্বভাবতই দাবি করছিল, এই-সব প্রভুত্ব ব্রিটিশের হাত থেকে খসিয়ে আনতে হবে।

১৯২৪ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে সার্ লী স্ট্যাক বলে একজন ইংরেজকে কয়েকজন মিশরবাসী হত্যা করল। ইনি ছিলেন মিশরের সেনাবাহিনীর সর্দার, আবার সুদানেরও বড়োলাট ছিলেন ইনিই। স্বভাবতই এই হত্যা ব্যাপারে মিশরে এবং ইংলণ্ডে ইংরেজরা বিচলিত হয়ে উঠল। কিন্তু তার চেয়েও বোধ হয় ঢের বেশি বিচলিত হলেন মিশরের জাতীয়তাবাদী দল ওয়াফ্দ্-এর নেতারা—তাঁরা বুঝলেন, এবার তাঁদের উপরে একটা পাল্টা আক্রমণ না করে ব্রিটিশরা ছাড়ছে না। সে আক্রমণ হতেও দেরি হল না। তিনটি দিনও কাটল না, ২২শে নভেম্বর তারিখে মিশরের ব্রিটিশ হাই কমিশনার লর্ড অ্যালেনবি মিশর সরকারকে একটি চরমপত্র পাঠালেন, এতে বলা হল, মিশরকে অবিলম্বে এই কটি দাবি পূরণ করতে হবে :

১। ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

২। অপরাধীদের দণ্ড দিতে হবে।

৩। বিক্ষোভ প্রদর্শনাদি সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হবে।

৪। ৫,০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫। সুদানে মিশরের যত সৈন্য আছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৬। সুদানের যে অঞ্চলটিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে মিশরের স্বার্থের খাতিরে কতগুলো বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল, সে-সব বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।

৭। মিশরে অবস্থিত সমস্ত বিদেশীর স্বার্থরক্ষার যে অধিকার ও ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার আয়ত্ত করে নিতে চান, তার সম্বন্ধে আর কোনোরকম আপত্তি বা আন্দোলন করা চলবে না। বিশেষ করে এর মানে ছিল, রাজস্ব বিচার আর আভ্যন্তরীণ শাসন বিভাগে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

এই দাবি সাতটি লক্ষ্য করে দেখবার মতো বস্তু। কোথায় কজন লোক মিলে সার্ লী স্ট্যাককে খুন করেছে, অতএব ব্রিটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ সমস্ত মিশর সরকার অর্থাৎ মিশরের সমস্ত প্রজার প্রতিই এমন একটা ভাব ধারণ করলেন যেন হত্যাটা তাঁরাই করেছেন—এত তাড়াতাড়ি হুকুম জারি করলেন যে, প্রকৃত অপরাধ কার সে সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব নির্ণয়ের পর্যন্ত অবসর রইল না। তাছাড়া এই ব্যাপারটাকে ভাঙিয়ে তাঁরা বেশ মোটা সোটা রকমের একটা টাকার দাঁও মেরে নিলেন; তার চেয়েও বড়ো কথা, এই হত্যাটাকেই উপলক্ষ্য করে তাঁদের সংগে মিশর সরকারের যেখানে যা কিছু নিয়ে মতভেদ চলছিল স্রেফ গায়ের জোরেই তার অবসান করে

নিলেন—মাসকয়েক মাত্র আগে এই কথাগুলো নিয়েই লণ্ডনে এ'দের আলোচনা ভেঙে গিয়েছিল। এতেও তাঁদের তৃপ্তি হল না, এর উপরে তাঁরা আবার লেজও জুড়লেন, দেশের মধ্যে কোনোরকম রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি চলতে দেওয়া হবে না—মানে দেশটার সাধারণ জীবনযাত্রার স্বাভাবিক পথে চলা বন্ধ হয়ে গেল।

সার্ লীর হত্যাকাণ্ড থেকে এত সব বিচিত্র ফল দাঁড়ালো, এটা বাস্তবিকই আশ্চর্য ব্যাপার—একটা মাত্র নরহত্যা থেকে ব্রিটিশজাতির এতখানি লাভের ব্যবস্থা করে নেওয়া, এ একটা রীতি-মতো জোরালো এবং উর্বর বুদ্ধিশক্তির পরিচয়। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে এই, যে-দুজন প্রধান কর্মচারীর (নামে মিশর সরকারের অধীন) উপরে অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলা নিবারণের দায়িত্ব ছিল বলে ধরা যেতে পারত, কায়রোর পুলিশের বড়ো সাহেব আর জনসাধারণের নিরাপত্তা বাহিনীর ইউরোপীয় বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, এ'রা দুজনেই ছিলেন ইংরেজ। সার্ লীর হত্যাকাণ্ড তাঁদেরও অক্ষমতার পরিচয়, এমন কথা কেউই ভেবে দেখল না। বেচারী মিশর সরকার এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গভীর দুঃখ এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন; ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তাঁদেরই ঘাড়ে—যে রাগের বোঝাটা শুধু ভারীই নয়, বেশ হিসাব করে এবং ব্রিটেনের পক্ষে লাভজনক করেই তাকে তৈরি করা হয়েছিল।

ব্রিটিশদের এই কাজে প্রতিবাদ জানিয়ে জগলুল পাশা এবং তাঁর মন্ত্রিসভা অবিলম্বে পদত্যাগ করলেন। ১৯২৪ সনের সেই নভেম্বর মাসেই রাজা ফুয়াদ পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন। ব্রিটেনেরই জিত—জগলুল এবং তাঁর ওয়াফ্দ্ দলকে তারা মন্ত্রিত্বের গদি থেকে সরিয়ে দিয়েছে, পার্লামেণ্টেরও শেষ হয়েছে, অন্তত তখনকার মতো। তাছাড়া সুদানও তাদের হাতে এসে গেছে: এখন তারা ইচ্ছা করলেই সুদানে নীল নদের জলস্রোত বন্ধ করে দিয়ে মিশরকে গলা টিপে মারতে পারে।

"একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন সিদ্ধ করে নেওয়া হচ্ছে"—এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মিশরের পার্লামেণ্ট লীগ অব নেশন্সের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের বড়ো কটি শক্তির বিরুদ্ধে কেউ নালিশ করতে গেলে লীগ তৎক্ষণাৎ অন্ধ আর কালা হয়ে যায়।

সেই দিন থেকে শুরু করে মিশরে ক্রমাগত লড়াই আর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে—তার একদিকে রয়েছেন ওয়াফ্দ্ দল, বস্তুত তাঁরাই সমস্ত জাতিটার প্রতিনিধি; আর অন্যদিকে রয়েছেন রাজা ফুয়াদ আর ব্রিটিশ হাই কমিশনার, তাঁদের পিছনে রয়েছে অন্যান্য বিদেশী শক্তি এবং রাজসভার অনুগৃহীত ফেউয়ের দল। এর বেশির ভাগ সময়ই দেশটাকে শাসন করা হয়েছে একাধিপত্যের নীতিতে। রাজা ফুয়াদ রীতিমতো স্বৈরতন্ত্রী রাজা হিসাবেই রাজ্য-শাসন করছেন, দেশের শাসনতন্ত্র যেটা ছিল তাকে কেউই মেনে চলছে না। মাঝে মাঝে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকা হয়েছে, প্রত্যেকবারই সে অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট বোঝা গেছে দেশসুদ্ধ লোকের সমর্থন রয়েছে ওয়াফ্দ্ দলের প্রতি; অতএব তখনই আবার সে পার্লামেণ্টকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই-সব কাণ্ড করার কোনো ক্ষমতাই ফুয়াদের হত না, যদি না ব্রিটিশরা তাঁর পিছনে থাকত এবং সেনাবাহিনী আর পুলিশবাহিনী ব্রিটিশের হাতের মুঠোয় থাকত। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলো যেমন ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের ইঙ্গিতে চলে, মিশরের—'স্বাধীন' মিশরেরও অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা তারই মতো; সত্যকার ক্ষমতা যার হাতে পিছন থেকে সেই সুতো টেনে তাকে চালাচ্ছে।

১৯২৪ সনের নভেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ সনের মার্চ মাসে নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন হল। এর মধ্যে ওয়াফ্দ্ দলেরই সংখ্যাধিক্য। অধিবেশনের শুরুতেই এই পার্লামেণ্ট জগলুল পাশাকে চেম্বার অব্ ডেপুটিজ্-এর প্রেসিডেণ্ট বলে নির্বাচিত করল। ইংরেজদের এবং রাজা ফুয়াদের এটা পছন্দ হল না; অতএব ঠিক সেই দিনই সেই আনকোরা নূতন পার্লামেণ্টকে ভেঙে দেওয়া হল—একদিন মাত্র তখন তার বয়স! এর পর পুরো একটি বছরের মধ্যে আর পার্লামেণ্ট ডাকা হল না। শাসনতন্ত্র? ছিল, কিন্তু তাকে

নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে। ফুয়াদ স্বৈরতন্ত্রী একাধিনায়ক হয়ে শাসন করতে লাগলেন; আসলে অবশ্য তাঁর পিছনে থেকে শক্তি যোগালেন ব্রিটিশ কমিশনার। দেশসুদ্ধ লোক এতে ক্ষেপে উঠল; রাজা ফুয়াদ আর ইংরেজদের মধ্যে যে মিতালি চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়বে বলে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এসে একত্র মিলিত হল—এই মিলন ঘটালেন সৈয়দ জগলুল। ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসে পার্লামেন্টের সভ্যরা মিলে একটি অধিবেশন পর্যন্ত করলেন—সরকারের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই; পার্লামেন্ট বাড়িটিতে সৈন্য বসিয়ে রাখা হয়েছিল, অতএব এই সভা বসল অন্যত্র।

ফুয়াদ এবারে শুধু তাঁর প্রাসাদ থেকে একটা হুকুম জারি করেই দেশের গোটা শাসন-তন্ত্রটাকে বদলে ফেলবার চেষ্টা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটাকে আরও বেশি রক্ষণপন্থী করে তোলা, যেন ভবিষ্যতে পার্লামেন্টকে আরও বেশি রকম হাতের মুঠোয় রেখে চালানো যায়, আর জগলুলের দলের বেশির ভাগ লোকেরই এতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশে একেবারে অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল; স্পষ্টই বোঝা গেল, এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে যদি নির্বাচন ডাকা হয়, তবে দেশের লোক সে নির্বাচনে আদৌ যোগ দেবে না। দেখেশুনে রাজা ফুয়াদকে বাধ্য হয়েই হার মানতে হল; পুরোনো নিয়ম অনুসারেই নির্বাচন ব্যবস্থা করা হল। নির্বাচনের ফলে দেখা গেল, জগলুলের দলের লোক নির্বাচিত হয়েছেন ২০০ জন, বাইরের লোক মাত্র ১৪ জন! সমগ্র জাতির উপরে জগলুলের কী অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল, বা মিশরের লোকরা কি চাইছিল, তার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর হতে পারে না। কিন্তু এর পরেও ব্রিটিশ কমিশনার (এর নাম লর্ড লয়েড, এককালে ইনি ভারতের একজন প্রাদেশিক লাট ছিলেন) বললেন, জগলুল প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে তাঁর আপত্তি আছে। অতএব তখন আরেকজন লোককে প্রধানমন্ত্রী করা হল। এই ব্যাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ করতে যাবার কী প্রয়োজন ছিল বুঝে ওঠা শক্ত। সে যাক। নূতন যে মন্ত্রিসভা তৈরি হল তারও কিন্তু অনেকখানিই চলত জগলুলের দলের ইঙ্গিতে। অতএব নরমপন্থায় চলবার সমস্ত রকমের চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও প্রায়ই এর সঙ্গে লয়েডের ঝগড়া হতে লাগল। লয়েড ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক এবং প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তি; থেকে থেকেই তিনি হুমকি ছাড়তেন, ব্রিটিশ রণতরী নিয়ে এসে তার গুঁতোয় মিশরকে শায়েস্তা করে ছাড়বেন।

১৯২৭ সনে ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করবার আরেক দফা চেষ্টা করা হল। কিন্তু ব্রিটেন যে-সব শর্ত দিল তা দেখে রাজা ফুয়াদের সেই অতি-নরমপন্থী প্রধানমন্ত্রী মশাইয়েরও চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কাগজে-কলমে একটা 'স্বাধীনতা' দিয়ে তার তলায় আসলে যে বস্তুটি এতে খাড়া করা হচ্ছিল তাতে মিশর বস্তুত ব্রিটেনের একটা রক্ষাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়ে যাবে। অতএব এবারেও আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেল।

এই-সব আলাপ-আলোচনা যখন চলেছে, এমন সময়ে, ১৯২৭ সনের ২৩শে আগস্ট তারিখে সত্তর বছর বয়সে, মিশরের মহান নেতা সৈয়দ জগলুল পাশার মৃত্যু হল। জগলুল মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি বেঁচে রয়েছে। মিশরের পক্ষে সেটা একটা উজ্জ্বল এবং অমূল্য উত্তরাধি-কারলব্ধ সম্পদ, মিশরের লোকে আজও তাঁর নামে স্বাধীনতার সমরে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠছে। তাঁর স্ত্রী মাদাম সফিয়া জগলুল আজও বেঁচে আছেন; সমগ্র জাতির প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী তিনি, তারা তাঁকে নাম দিয়েছে 'জাতির জননী' বলে। কায়রো শহরে জগলুলের যে বাড়ীটি আছে তার নাম 'জাতির বাড়ি'—দীর্ঘকাল ধরে সে বাড়িটি মিশরের জাতীয়তাবাদীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে রয়েছে।

জগলুলের পরে ওয়াফ্‌দ্‌ দলের নেতা হলেন মুস্তাফা নাহাস পাশা। ১৯২৮ সনের মার্চমাসে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে, প্রজাদের নাগরিক অধিকার এবং অস্ত্র ধারণের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কয়েকটা সাদাসিদা রকমের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করলেন। সামরিক আইনের আমলে ব্রিটিশরা এই অধিকারগুলো খর্ব করে দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব নিয়ে মিশরের পার্লামেন্টে আলোচনা শুরু হতে না হতেই

ইংলণ্ড থেকে শাসানি এসে পৌঁছল, এ-সব কিছুতেই করা চলবে না। মিশরের এটা একটা সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপার, এ নিয়েও ইংলণ্ড এইভাবে হস্তক্ষেপ করতে আসবে এটা কেমন অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু লর্ড লয়েড যথাবিহিত প্রাচীন রীতিতে একখানা চরমপত্র ঝাড়লেন; মাল্টা থেকে বহু ব্রিটিশ রণতরী আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে এসে হাজির হল। নাহাস পাশা তখন খানিকটা নতি স্বীকার করলেন, এই প্রস্তাবের আলোচনাটাকে পার্লামেণ্টের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবি রাখতে রাজি হলেন। সে অধিবেশন কয়েকমাস পরে হবার কথা।

কিন্তু পার্লামেণ্টের সে পরবর্তী-অধিবেশন আর হল না। রাজা ছিলেন, ছিলেন ব্রিটিশ কমিশনার—একজন প্রগতিবিরোধিতার আর একজন সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। পার্লামেণ্ট আর কখনও এ-সব দুষ্টামি করবার ফুরসুৎ না পায়, এ'রাই তার ব্যবস্থা দেখলেন। এ'দের ষড়-যন্ত্রটিকে গড়েও তোলা হল একটা অদ্ভুত উপায়ে। নাহাস পাশার প্রচণ্ড সুনাম ছিল তাঁর সচ্চরিত্রতা আর সাধুতার জন্য। কী একটা চিঠির নজির দেখিয়ে (পরে আবার প্রমাণ হয়েছে চিঠিটা জাল ছিল) হঠাৎ একদিন নাহাস পাশা এবং ওয়াফ্‌দ্‌ দলের একজন কপ্ট্ নেতার নামে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হল। রাজসভার ফেউয়েরা আর ব্রিটিশরা এই নিয়ে বিরাট একটা হৈ চৈ শুরু করে দিল। মিশরে শুধু নয়, অন্যান্য দেশে পর্যন্ত ব্রিটিশ দূতরা আর সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা এই মিথ্যা অপবাদগুলো আড়ম্বরে প্রচার করতে লাগল। এই অভিযোগের ছুতো ধরে রাজা ফুয়াদ নাহাস পাশাকে হুকুম দিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দাও। নাহাস পাশা বললেন, দেব না। ফুয়াদ তখন তাঁকে বরখাস্ত করলেন। লয়েড-ফুয়াদ চক্রান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়টির এবার পত্তন হল। প্রকাণ্ড একটা রাজনৈতিক চাল দিলেন এ'রা; একটি হুকুমনামা জারি করে রাজা পার্লামেণ্টকে মুলতুবি করে দিলেন, শাসনতন্ত্রকে বদলে ফেললেন। শাসন-তন্ত্রের যে ধারাগুলোতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং প্রজাদের অন্যান্য সব অধিকারের কথা ছিল, সেগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল; রাজ্যে একনায়কতন্ত্র ঘোষণা করা হল। ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্রে এবং মিশরে যে-সব ইউরোপীয় ছিল তাদের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে গেল।

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তবুও তাকে অগ্রাহ্য করে পার্লামেণ্টের সভ্যরা একত্র হয়ে সভা করলেন। নূতন সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। লয়েড এবং ফুয়াদ অবশ্য এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপারকে আমলই দিলেন না। 'আইন এবং শৃঙ্খলা'র কাজই তো হচ্ছে প্রগতি-বিরোধ আর সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখা, তাকে ভাঙার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া নয়।

নাহাস পাশার নামে সরকার অভিযোগ এনেছিলেন; কিন্তু সমস্ত প্রকারের সরকারি চাপ আর তদ্বির সত্ত্বেও সে মামলা টিকল না। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেগুলো সবই মিথ্যা প্রমাণিত হল। সরকার তখন হুকুম জারি করলেন (কী অপূর্ব সাধুত্ব আর বীরত্ব!), সে মামলার রায় কেউ ছেপে বার করতে পারবে না। রায়ের খবর অবশ্য ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না—দেশের সর্বত্র আনন্দ আর উল্লাসের ধুম পড়ে গেল।

দেশে তখন একনায়কতন্ত্র চলছে, তার পিছনে আছেন লয়েড আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। ওয়াফ্‌দ্‌ দলকে মেরে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেষ্টা হল—ওয়াফ্‌দ্‌ দল মানেই মিশরের জাতীয়তাবাদীরা। দেশে রীতিমতো একটা ত্রাসের সৃষ্টি করা হল; সমস্ত রকম সংবাদের উপরে অত্যন্ত কড়া সেন্সর বসল। কিন্তু এত-সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে প্রকাণ্ড জাতীয় বিক্ষোভ-প্রদর্শন হতে লাগল; এই-সব কাজে দেশের মেয়েরাও একটা খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করলেন। একবার তো প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই একটা হরতাল চালানো হল, আইনজীবীরা এবং আরও অনেকে এতে যোগ দিলেন। কিন্তু এমনই সেন্সরের মহিমা, হরতালের সংবাদটা পর্যন্ত কোনো কাগজে ছেপে বার করতে পারল না।

এমনি করে ঝড়ঝাপ্‌টা হৈ চৈ'র মধ্য দিয়ে ১৯২৮ সনটি পার হয়ে গেল। এই বছরের শেষদিকে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটল, মিশরের উপরেও তার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল। ইংলণ্ডে একটি শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভা গদি দখল করে বসেছিলেন; গদিতে বসে প্রথমেই তাঁরা যে কটি কাজ করলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে লয়েডকে

মিশর থেকে সরিয়ে আনা—লয়েডের আচরণ ব্রিটিশ সরকারের কাছে পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। লয়েডকে সরিয়ে নেবার ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে ফুয়াদের যে মিতালি ছিল সেটা কিছুকালের মতো ভেঙে গেল। ইংলণ্ডের সাহায্য ছাড়া ফুয়াদের এক পা চলবার সাধ্য ছিল না; অতএব ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি আবার নূতন করে পার্লামেণ্ট নির্বাচনের অনুমতি দিলেন। এবারেও ওয়াফ্‌দ্‌ দল পার্লামেণ্টের প্রায় সবগুলো আসনই দখল করে বসল।

ইংলণ্ডের শ্রমিক মন্ত্রিদল আবার মিশরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। আলোচনা চলবার জন্য ১৯২৯ সনে নাহাস পাশা লণ্ডনে গেলেন। পূর্ববর্তীদের তুলনায় শ্রমিক মন্ত্রিদল এবার কিছু বেশিদূর অগ্রসর হলেন, সংরক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে তিনটি সম্বন্ধে নাহাস পাশার অভিমতই তাঁরা মেনে নিলেন। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি ছিল সুদান-সমস্যা—এর সম্বন্ধে এবারেও দুপক্ষের মত মিলল না, কাজেই এবারেও আলোচনা ব্যর্থ হল। কিন্তু এবারে অন্য অন্য বারের তুলনায় দুপক্ষের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণ মতের মিল দেখা গিয়েছিল; আলোচনা ভেঙে যাবার পরেও তাই দুই পক্ষের সৌহার্দ্য ঠিক বজায় রইল; দু'পক্ষই প্রতিশ্রুতি দিলেন, পরে এই নিয়ে আবার তাঁদের আলোচনা হবে। মোটের উপর এটাকে নাহাস পাশা এবং ওয়াফ্‌দ্‌ দলের পক্ষে সাফল্যই বলা যায়; মিশরে যে-সব ব্রিটিশ এবং অন্যদেশীয় ব্যাবসাদার ও মহাজন বসে ছিল তাদের এটা মোটেই পছন্দ হল না। রাজা ফুয়াদেরও না। এর মাস কয়েক পরে, ১৯৩০ সনের জুন মাসে, রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বাধল; নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন।

এই ভাঙনের সুযোগে ফুয়াদ আবার তাঁর একাধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন—তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে সেই তৃতীয়বার তাঁর একনায়কত্ব। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল; ওয়াফ্‌দ্‌ দলের সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল; মোটের উপর বেশ দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গেই তিনি তাঁর একনায়কী শাসন চালাতে লাগলেন। পার্লামেণ্টের দু'টি ভাগ চেম্বার এবং সেনেট : দুই অংশেরই একেবারে প্রত্যেকজন সভ্য সরকারের আদেশ উপেক্ষা করে চললেন; জোর করে পার্লামেণ্ট-বাড়িতে ঢুকে সেখানে পার্লামেণ্টের একটা অধিবেশন করলেন। গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাঁরা সকলে শপথ গ্রহণ করলেন, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা অচলা থাকবে; তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে সে শাসনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাঁরা লড়বেন প্রতিশ্রুতি দিলেন—১৯৩০ সনের ২৩শে জুন তারিখে এই অধিবেশন হয়। দেশের সর্বত্র খুব বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল; সৈন্যরা সেসব জোর করে ভেঙে দিল, রক্তপাতও প্রচুর হল। নাহাস পাশা নিজেও আহত হলেন। এমনি করে ব্রিটিশ কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত সৈন্য আর পুলিশবাহিনী দেশের একনায়কী শাসনকে বাঁচিয়ে রাখল—দেশের সমস্ত লোক তখন ফুয়াদের উপরে অত্যন্ত চটে গিয়েছে; তাঁর পক্ষে আছে মাত্র মুষ্টিমেয় কজন অভিজাত আর ধনীব্যক্তি, এরা তখনও রাজাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কেবল ওয়াফ্‌দ্‌ দল নয়, দেশের অন্যান্য সমস্ত দলও তখন এই একনায়কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছেন—নরমপন্থী এবং উদারপন্থীরা পর্যন্ত; যদিও ভারতবর্ষেরই মতো মিশরেও এ'রা সাধারণ প্রজার তরফ থেকে কোনো রকম বিশেষ কড়া কার্যকলাপ চালানোর বিরোধী বলেই নিজেদের পরিচয় দিতেন।

আর কিছুদিন পরে, সেই ১৯৩০ সনের মধ্যেই, রাজা একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন; এতে নূতন একটি শাসনতন্ত্র জারি করা হল, তাতে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে রাজার নিজের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজ করতে হাঙ্গামা কিছুই ছিল না। শুধু একটি ঘোষণাপত্র জারি করে দাও, ব্যস, আর ভাবতে হবে না; কারণ রাজার পিছনে ঘোর কালো ছায়ামূর্তির বিভীষিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের শক্তি।

১৯২২ থেকে ১৯৩০ সন, মিশরের এই ন'বছরের ইতিহাস আমি তোমাকে কিছুটা খুঁটিয়েই বললাম; তার কারণ, আমার এটাকে একটা অদ্ভুত গল্প বলে মনে হয়। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে ঘোষণা করেছিলেন তার বয়ান অনুসারে বলতে হয়, এই ক'টা বছরই ছিল মিশরের 'স্বাধীনতা' ভোগের যুগ। মিশরের লোকেরা নিজেরা কী চাইছিল,

সে সম্বন্ধে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না। যখনই তারা মত প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে, মুসলমান এবং কপ্ট্ নির্বিচারে দেশের অধিকাংশ প্রজা ওয়াফ্‌দ্ দলকেই তাদের প্রতিনিধি বলে নির্বাচিত করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের যা কাম্য ছিল সে হচ্ছে, বিদেশীরা, বিশেষ করে ব্রিটিশরা, দেশটাকে শোষণ করবার যে ক্ষমতা অধিকার করে বসে ছিল তাকে খানিকটা খর্ব করা। অতএব এই সমস্ত কায়েমী স্বার্থের মালিক বিদেশীরাও যতভাবে পারে তাদের সে কাজে বাধা দিচ্ছিল জোর করে, অত্যাচার করে, জালজুয়াচুরি করে, ষড়যন্ত্র করে—দেশের সিংহাসনেও তারা এমন দেখেই একটা পুতুল-রাজাকে বসিয়ে রেখেছিল, যে তাদের হুকুম ছাড়া এক পা চলবে না।

ওয়াফ্‌দ্ আন্দোলনটা চিরদিনই একটা খাঁটি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের আন্দোলন হয়ে রয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যই এ'রা লড়াই করেছেন, সামাজিক সমস্যা যেগুলো আছে তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যান নি। পার্লামেণ্ট যখনই চালু ছিল তখনই সে শিক্ষা এবং অন্যান্য বিভাগে খানিকটা করে ভালো কাজ করে গিয়েছে। বস্তুত জাতীয় সংগ্রাম চালাবার ফাঁকে ফাঁকেও এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে পার্লামেণ্ট এদিকে যতটুকু কাজ দেখিয়েছে, এর আগের চল্লিশ বছরে ব্রিটিশ সরকার ততটা দেখায় নি। কৃষক জনসাধারণ ওয়াফ্‌দ্ দলের প্রতি অনুরক্ত—নির্বাচনগুলোর ফল এবং বড়ো বড়ো শোভাযাত্রার বহর দেখলেই সেকথা প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও এই আন্দোলনটি মুখ্যত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিরই আন্দোলন; সামাজিক পরিবর্তন কামনা করে আন্দোলন চালালে তার ফলে দেশের জনসাধারণ যতখানি জেগে উঠতে পারত, এই আন্দোলনে ততটা হয় নি।

এই চিঠিটা এবার শেষ করব, কিন্তু তার আগে মিশরে নারীদের আন্দোলনের কথাটা তোমাকে বলে নিতেই হচ্ছে। বোধ হয় একমাত্র খাস আরব দেশ ছাড়া, আরব-অঞ্চলের সমস্ত দেশগুলোতেই নারীদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জাগরণ এসেছে। অন্য বহু ব্যাপারের মতোই এইদিক দিয়েও ইরাক, সিরিয়া বা প্যালেস্টাইনের তুলনায় মিশর অনেক বেশি দূর এগিয়ে গেছে। তবু কিন্তু এর প্রত্যেকটা দেশেই নারীদের একটা করে সুসংহত আন্দোলন গড়ে উঠেছে; ১৯৩০ সনের জুলাই মাসে দামাস্কাস শহরে 'আরব নারী কংগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। এ'রা রাজনৈতিক প্রশ্ন অপেক্ষা সংস্কৃতি এবং সমাজগত প্রগতির উপরেই ঝোঁক দিয়েছেন বেশি। মিশরে নারীরা রাজনীতি নিয়ে এ'দের চেয়ে একটু বেশি মাথা ঘামান। রাজনৈতিক শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে তাঁরা যোগ দিয়ে থাকেন; একটি বেশ শক্তিশালী নারীদের ভোটাধিকার সংঘও এ'দের আছে। এ'রা দাবি করছেন, বিবাহের আইনকে এমনভাবে সংস্কার করা হোক যেন নারীদের অধিকার তাতে বেড়ে যায়; ব্যবসায় ও চাকরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া হোক, ইত্যাদি। এ বিষয়ে মুসলমান এবং খৃস্টান নারীরা পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে চলেছেন। অবগুণ্ঠন-প্রথা সর্বত্রই কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে মিশরে। তুরস্কের মতো এখানে অবগুণ্ঠন এখনও একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায় নি, কিন্তু ক্রমেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

মন্তব্য (অক্টোবর ১৯৩৮):

১৯৩০ সন থেকে আরম্ভ করে মিশর রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ন্ত্রিত এক একনায়ক গভর্নমেণ্টের অধীনে ছিল। শুধু নামেমাত্র ইহা 'সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র' ছিল, কিন্তু বস্তুত ইহা গ্রেটব্রিটেনের একটি উপনিবেশের প্রায় শামিল ছিল, কেননা কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়াতে বিদেশী সৈন্য (ব্রিটিশ) অধিকৃত দুর্গ ছিল এবং সুয়েজখাল ও সুদানের নিয়ন্ত্রণভার ছিল ব্রিটেনের ওপর। এই ক'টি বছর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সময় ছিল এবং তুলার মূল্য কমে যাওয়াতে মিশরের দুঃখকষ্টের অন্ত ছিল না।

১৯৩৫ সনে ফ্যাসিস্তপন্থী ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করল। এ ব্যাপারে মিশর এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হল, সঙ্গে সঙ্গে নীলনদের ঊর্ধ্ব উপত্যকায় ব্রিটিশ স্বার্থহানিরও সম্ভাবনা দেখা দিল। এর ফলে ইংলণ্ড ও মিশরের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে গেল। শত্রুভাবাপন্ন ও বিদ্রোহী মিশরকে এখন পরাধীন করে রাখাটা ইংলণ্ড সমীচীন মনে করল না

এবং মিশরের জননায়কগণ ইংলণ্ডকে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে গণ্য করতে লাগল। পার্লামেন্টের নির্বাচনে ওয়াফ্দ্ দল জয়ী হল এবং নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী হলেন। আবিসিনিয়াতে ইতালির আক্রমণজনিত নূতন আবহাওয়ার (পরিবেশের) সৃষ্টি হওয়াতে মিশর ও ইংলণ্ডের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হল এবং ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। পূর্বে মিশর যতখানি পাওয়ার জন্য দাবি করেছিল, শান্তির জন্য সে তার অনেকখানি ছেড়ে দিতে রাজী হল এবং এর জন্যই সে সুয়েজখালের উপর ইংরেজ-আধিপত্য ও সুদানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেরূপ পূর্বে ছিল তাই চলতে দিতে সম্মতি দিল। তার উপরে মিশর তার পররাষ্ট্রনীতি ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ করে চলতে স্বীকৃত হল। অপরপক্ষে, ইংলণ্ড কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তার সৈন্যসামন্ত সরিয়ে আনল, মিশ্রিত বিচারালয়গুলি তুলে দেওয়ার জন্য সাহায্য করতে এবং মিশরের জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) প্রবেশ সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতি দিল।

এই নিষ্পত্তির ব্যবস্থায় খুবই উল্লাসের সৃষ্টি হল কিন্তু এসব আমোদ-উল্লাসের বাহ্যিক প্রদর্শনের সময় তখনও ঠিক আসে নি। রাজার পরিবর্তন হলেও রাজপ্রাসাদ (অর্থাৎ রাজশক্তি) ওয়াফদ্‌দলকে পূর্ববৎ ঘৃণা করতে এবং ইহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। পর্দার আড়ালে তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই কাজ করতে লাগল। মিশরের ভূখণ্ডের অনেকখানি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের দখলে এবং রাজপরিবারেরও এতে প্রচুর অংশ আছে। এই ভূ-স্বামিগণ প্রগতিমূলক আইন প্রণয়নের এবং গণশক্তির অভ্যুত্থানের একান্ত বিরোধী। তাই ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে লাগল—রাজা নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করলেন এবং পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন।

শাসনকার্য রাজপ্রাসাদ থেকে (অর্থাৎ রাজা কর্তৃক) কিছুকাল চালিত হওয়ার পরে নূতন নির্বাচনের অনুষ্ঠান হল। এতে ওয়াফ্দ্ দল বেজায় হেরে গেল দেখে প্রত্যেকেই বিস্মিত হল। পরে জানা গেল যে, এই নির্বাচন বহুলাংশে একটা ভুয়া ব্যাপার ছিল এবং ভোটগণনার কাগজপত্রাদি মিথ্যা করে লিখান হয়েছিল। নাহাস পাশার নেতৃত্ব এখনও বেশ জনপ্রিয় আছে কিন্তু বর্তমানে গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় রাজপ্রাসাদ থেকেই গুটিকয়েক রাজানুগ্রহপুষ্ট লোকের দ্বারা চালিত হচ্ছে।

১৬৫

বিশ্ব-রাজনীতির মঞ্চে পশ্চিম-এশিয়ার পুনঃপ্রবেশ

২৫শে মে, ১৯৩৩

একদিকে মিশর আর আফ্রিকা, আরেকদিকে পশ্চিম-এশিয়া—এর মাঝখানে রয়েছে শুধু অতি সরু একফালি নীল জল। এই সুয়েজ খালকে পাড়ি দিয়ে চলো, দেখে আসি আরব প্যালেস্টাইন সিরিয়া আর ইরাককে। এরা সবই হচ্ছে আরব-অঞ্চলের দেশ। আর এদের একটু-খানি পরেই আছে পারশ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে পশ্চিম-এশিয়ার স্থান নগণ্য নয়; বহুযুগে বহুবার জগতের জীবন-চক্র একেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তার পর আবার এল একটা অন্ধকার যুগ; অনেক শো বছর ধরে এই দেশটি পৃথিবীর রাজনীতির ক্ষেত্র হতে দূরে সরে রইল। এটা হয়ে উঠল যেন একটা স্রোতহীন জলাশয়, বিশ্বজীবনের প্রখর স্রোত এর পাশ কাটিয়ে খর বেগে বয়ে চলল, কিন্তু এর নিষ্কম্প স্থির জলে একটি তরঙ্গও সৃষ্টি করতে পারল না। তার পর আবার এখনকার দিনে আমরা আরেকবার এর রূপের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলি আবার পৃথিবীর জীবনস্রোতের আবর্তে এসে পড়ছে; প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের মধ্যে যাতয়াতের রাজপথ আবার এরই বুকের উপর দিয়ে তৈরি হয়েছে। এই বস্তুটিকে আমাদের ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার।

পশ্চিম-এশিয়ার কথা ভাবতে গেলেই আমার মন প্রাচীন দিনের কাহিনীর অরণ্যে হারিয়ে যায়; পুরোনো সেই দিনের এত সমস্ত কথা আর ছবি আমার মনে জেগে ওঠে, তার মোহ কাটানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই মোহকে যতদূর পারি এড়িয়ে চলতে আমি চেষ্টা করব; তবুও একটি কথা আরেকবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি পাছে তুমি ভুলে যাও—সে হচ্ছে পৃথিবীর এই অংশটির মর্যাদার কথা; হাজার হাজার বছর ধরে, মানবজাতির ইতিহাসের একেবারে গোড়ার যুগ থেকেই, এই দেশটি পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব মর্যাদার স্থান দখল করে এসেছে। সাত হাজার বছর আগের ইতিহাসেও প্রাচীন চ্যাল্‌ডীয়া রাজ্যের অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় (এই রাজ্যটি যেখানে ছিল সেইখানেই আধুনিক ইরাক অবস্থিত)। তার পরে এল বাবিলন; বাবিলনীয়দের পরে এল নিষ্ঠুর আসিরীয়দের যুগ, এদের রাজধানী ছিল বিশাল নিনেভে শহর। তার পর আবার সেই আসিরীয়রাও ধাক্কা খেয়ে সরে গেল; পারশ্য থেকে একটি নূতন রাজবংশ একটি নূতন জাতি এসে ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত সমগ্র মধ্য প্রাচ্য অঞ্চলব্যাপী তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। এঁরা হচ্ছেন পারশ্যের একিমেনিড্ রাজবংশ, এঁদের রাজধানী ছিল পার্সিপোলিস। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'বৃহৎ রাজা'র দল, কাইরাস, দারিয়ুস, জারেক্‌সেস—এঁরা ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রীসকে জয় করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এঁদের আবার পতন হল যাঁর হাতে তিনি ছিলেন গ্রীসেরই সন্তান—ঠিক গ্রীসের নয়, মাসিডোনিয়ার সন্তান—আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডারের জীবনের একটি বিচিত্র কাহিনী আছে: এশিয়া এবং ইউরোপের এই মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তিনি একটি অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন, বললেন, এই দুই মহাদেশের বিয়ে দেবেন। তিনি নিজে পারশ্য-রাজের কন্যাকে বিবাহ করলেন (অবশ্য তাঁর আরও কয়েকটি স্ত্রী তখনই বর্তমান ছিলেন); তাঁর সেনানী এবং সৈনিকদের মধ্যেও হাজার হাজার লোক পারশি মেয়ে বিবাহ করল।

আলেকজাণ্ডার মধ্য প্রাচ্যে গ্রীক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করলেন; বহু শতাব্দী ধরে ভারত-সীমান্ত থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে সে সংস্কৃতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। এই সময়েই রোমেরও শক্তির অভ্যুত্থান হল, ক্রমে ক্রমে সে শক্তি এশিয়ার দিকে প্রসারিত হল। তার বিস্তারে বাধা দিল একটি নবজাত পারশ্য সাম্রাজ্য—সসানিদ রাজাদের সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্য যেটা ছিল সেইটেই ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্য হল এদের নাম। কালক্রমে এই প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী হল কনস্টাণ্টিনোপ্‌ল্। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে সংগ্রাম চলে এসেছে, পশ্চিম-এশিয়ার এই সমতলভূমিতেও সে সংগ্রাম চলতে লাগল। এই যুদ্ধের প্রধান দুই পক্ষ ছিল কনস্টাণ্টিনোপ্‌লের বাইজান্‌টিনা সাম্রাজ্য, আর পারশ্যের সসানিদ সাম্রাজ্য। আর এই সমস্তটা যুগ ধরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বণিকের দল উটের পিঠে মালপত্র বোঝাই দিয়ে এই সমতলভূমি অতিক্রম করে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্ত্য আর পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রাচ্য দেশে যাতায়াত করতে লাগল; কারণ মধ্য-প্রাচ্যের এই অঞ্চলটিই ছিল তখনকার দিনে পৃথিবীর বড়ো বড়ো যাত্রাপথের অন্যতম।

পশ্চিম-এশিয়ার এই দেশে জগতের তিনটি প্রধান ধর্মমতের জন্ম হয়েছে—জুডা-ধর্ম (মানে ইহুদিদের ধর্ম), জরথুস্ত্রীয় ধর্ম (আধুনিক পারশীরা যে ধর্মমত মানেন), আর খৃষ্টান ধর্ম। এবার আরবের মরুভূমিতে চতুর্থ একটি ধর্মমতের সৃষ্টি হল, অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর এই অংশটিতে সে ধর্ম অন্য তিনটিকে হারিয়ে দিয়ে বড়ো হয়ে উঠল। তার পর এল বাগদাদের আরব-সাম্রাজ্য, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের পুরোনো যুদ্ধটাও এবার নূতন রূপ গ্রহণ করল—এবার যুদ্ধ আরবদের সঙ্গে বাইজান্‌টিনার। বহুদিন অতি প্রখর অস্তিত্ব যাপন করবার পর আরব-সভ্যতা ভেঙে পড়ল সেলজুক তুর্কিদের আগমনে; শেষপর্যন্ত চেঙ্গিস খাঁর পরবর্তী আগন্তুক মোগলদের হাতে সে সভ্যতা একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

মোগলদের আসবার আগেই কিন্তু, এশিয়ার পশ্চিম সমুদ্রকূলে পাশ্চাত্ত্য দেশের খৃষ্টান আর প্রাচ্য জগতের মুসলমানদের মধ্যে একটা মর্মান্তিক সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধের নাম ক্রুসেড; কখনও চলে কখনও বা থামে এমনি করে এই যুদ্ধ পুরো আড়াই শো বছর

ধরে চলতে লাগল, প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝখান পর্যন্ত এর জের চলল। এই ক্রুসেডকে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ; বাস্তবিক ছিলও তাই। কিন্তু তবু ধর্ম এই যুদ্ধের কারণ নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। তখনকার দিনে প্রাচ্য জগতের তুলনায় ইউরোপের লোকেরা অনেক পিছিয়ে পড়ে ছিল; ইউরোপের সেটা 'অন্ধকার যুগ'। কিন্তু ইউরোপ তখন জেগে উঠছে; প্রাচ্য জগতের সমৃদ্ধি বেশি, সভ্যতা মহত্তর; ইউরোপকে সে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করছে। প্রাচ্য জগতের প্রতি এই আকর্ষণ নানা-রূপে আত্মপ্রকাশ করছিল, তার মধ্যে এই ক্রুসেডই ছিল সবচেয়ে গরিষ্ঠ রূপ। এই যুদ্ধের ফলে পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলির কাছ থেকে ইউরোপ অনেক কিছুই শিখে নিল। শিখল বহু সূক্ষ্মকলা শিল্পকলা আর বিলাসের বহু প্রণালী; তার চেয়েও বড়ো কথা, শিখল কাজ এবং চিন্তার বহু বৈজ্ঞানিক ধারা আর পদ্ধতি।

ক্রুসেড সদ্য শেষ হয়েছে কি হয়নি এমন সময়ে মোগলরা এসে বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পশ্চিম-এশিয়ার উপরে, সঙ্গে নিয়ে এল ধ্বংসের সংহারমূর্তি। তবু কিন্তু মোগলদের শুধুই ধ্বংসের পূজারী বলে জেনে রাখলে আমাদের ভুল হবে। চীন থেকে রাশিয়া পর্যন্ত যে বিরাট অভিযান তারা চালিয়েছিল, তারই ফলে বহু দূরে দূরে দেশের মানুষের একত্র সমন্বয় ঘটেছিল, বেড়ে গিয়েছিল বাণিজ্যের প্রসার আর মানুষে-মানুষে মিলন। এরা যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করল তার শাসনে যাত্রীদল চলাচলের পুরোনো পথগুলো আর বিপদ-সঙ্কুল রইল না; যাত্রীরা সে পথে নিরাপদে নির্ভয়ে যাতায়াত করতে লাগল—শুধু বণিক নয়, কূটতন্ত্রী রাষ্ট্রদূত, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি সকল প্রকারের মানুষই সে পথ বেয়ে দীর্ঘযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে পারল। প্রাচীন জগতের এই-সব রাজপথ চলে গিয়েছে মধ্য প্রাচ্য প্রদেশের একেবারে বুকের উপর দিয়ে; অতএব সে দেশ হয়ে উঠল এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যেকার বন্ধনসূত্র।

তোমার হয়তো মনে পড়বে, এই মোগলদের সময়েই মার্কো পোলো তাঁর স্বদেশ ভেনিস থেকে সমস্ত এশিয়া পাড়ি দিয় চীনে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা একটি বই আছে; তাঁর লেখা ঠিক নয়, তিনি বলে গিয়েছিলেন এবং অন্য লোকে লিখে গিয়েছিলেন। এই বইয়ে তিনি তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলেছেন; এই জন্যই আমরাও তাঁর নাম জেনে রেখেছি। কিন্তু আরও বহু লোক নিশ্চয়ই এই রকমের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু সে ভ্রমণের কথা তাঁরা লিখে রেখে যান নি, বা লিখে থাকলেও হয়তো সে বই বিনষ্ট হয়ে গেছে, কারণ সে যুগে বই হাতে লিখেই রাখা হত। মালপত্র নিয়ে বণিক আর যাত্রীর দল সারাক্ষণই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করত; সে যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য, কিন্তু নিছক ভাগ্য এবং দুঃসাহসিক অভিযানের অন্বেষণেও বহু লোক সে বণিকদলের সঙ্গী হত। প্রাচীন কালের আরও একজন খুব বড়ো ভ্রমণকারীর নাম মার্কো পোলোর মতোই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এর নাম হচ্ছে ইব্‌ন্ বতুতা। জাতে আরব, মরক্কোর অন্তর্গত তাঞ্জিয়ার শহরে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ'র জন্ম হয়। কাজেই তিনি ছিলেন মার্কো পোলোর ঠিক এক-পুরুষ পরের লোক। বিশাল জগতের বুকে তাঁর এই বিচিত্র ভ্রমণে যেদিন তিনি প্রথম বার হলেন তখন তিনি মাত্র একুশ বছরের তরুণ যুবা; পথের সম্বল বলতে তাঁর ছিল শুধু নিজের তীক্ষ্ম বুদ্ধি, আর ছিল একজন মুসলমান কাজী বা ধর্মোপদেষ্টা বিচারকের শিক্ষা। মরক্কো থেকে তিনি সোজাসুজি উত্তর-আফ্রিকা পার হয়ে এসে পৌঁছলেন মিশরে; সেখান থেকে গেলেন আরবে, সিরিয়াতে, পারস্যে; তার পর গেলেন আনাতোলিয়াতে (তুরস্ক), তার পর দক্ষিণ-রাশিয়া (তখন সে দেশে মোগলবংশীয় খাঁ-দের রাজত্ব) তার পর কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লে (সেটা তখনও বাইজান্‌টিনা সাম্রাজ্যের রাজধানী), সেখান থেকে মধ্য-এশিয়াতে এবং ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে পাড়ি দিয়ে তিনি গেলেন মালাবার এবং সিংহলে; সেখান থেকে চীনে। ফেরার পথে আফ্রিকার মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়ালেন, সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত পার হলেন। এখনকার দিনে আমাদের যানবাহনের এতরকম সুবিধা, তবু এই যুগেও এরকমের ভ্রমণ-কাহিনীর জোড়া মেলা কঠিন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধেকটাতে পৃথিবীর অবস্থা কোথায় কীরকম ছিল তার বিস্ময়কর বিবরণ আছে এই ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে; তখনকার দিনে দেশভ্রমণ যে কতখানি সাধারণ ব্যাপার

পশ্চিম-এশিয়ার পুনর্জাগরণ
সোভিয়েট রাশিয়া
আলেপ্পো
সিরিয়া
মসুল
তেহরান
আলেকজান্দ্রিয়া
বাগদাদ
কায়রো
পারস্য
আফগানিস্থান
দিল্লি
হেজাজ
মদিনা
বাহ্‌রিন
মক্কা
সৌদি আরব
এলাহাবাদ
করাচি
ভারতবর্ষ
বোম্বাই
মাদ্রাজ
রেলপথ
বিমানপথ
ব্রিটিশ
ফরাসি
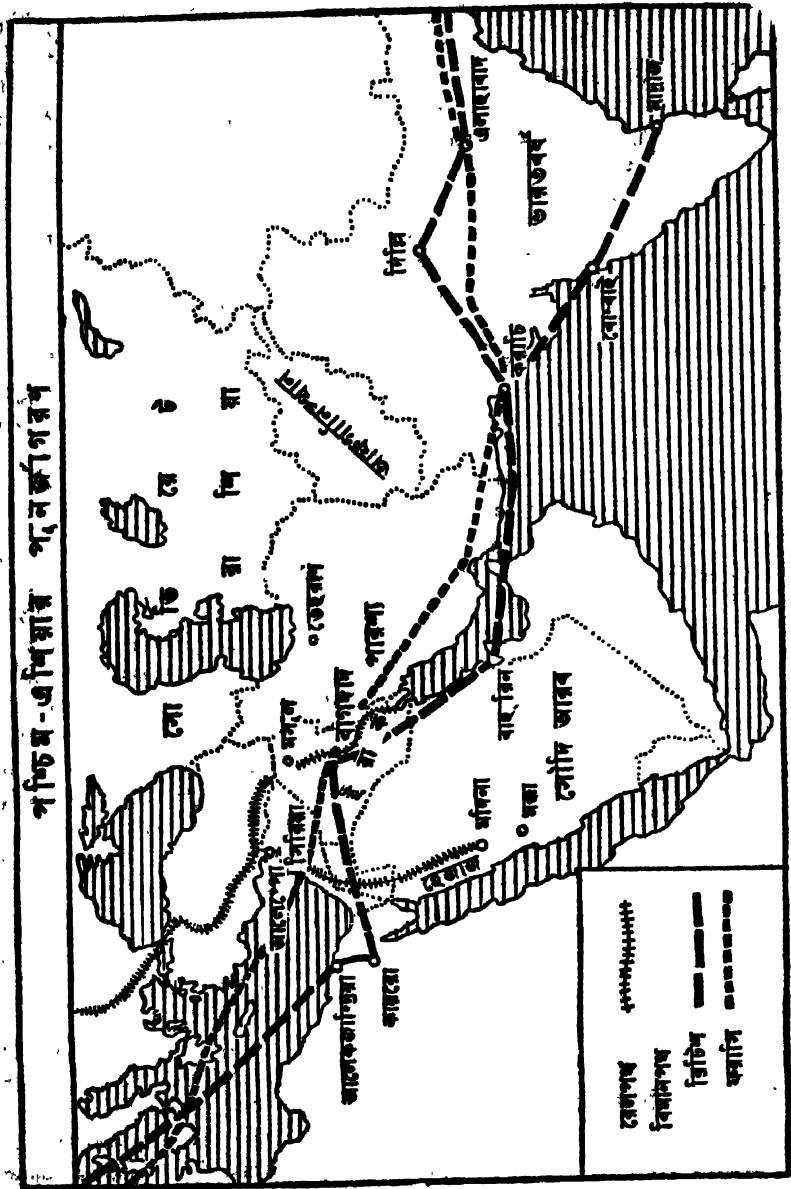
ছিল তারও প্রমাণ এই কাহিনী থেকেই পাওয়া যায়। আর যাই হোক, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে-কজন অতিবড়ো ভ্রমণকারীর আবির্ভাব হয়েছে, ইব্‌ন্ বতুতার নাম তাঁদের মধ্যে ধরতেই হবে।

ইব্‌ন্ বতুতার বইয়ে, তিনি যে-সব জাতি আর দেশ দেখেছিলেন, তাদের সম্বন্ধে অতি চমৎকার সব তথ্য লিখে গেছেন। মিশর তখন সমৃদ্ধ দেশ, কারণ পাশ্চাত্ত্য জগতের সংগে ভারতবর্ষের যত বাণিজ্য সমস্তই তখন চলত মিশরের পথে; তার পক্ষে এটা ছিল একটা খুবই লাভের ব্যাপার। সেই লাভের টাকায় তারা কায়রোকে প্রকাণ্ড শহর করে গড়ে তুলল, চমৎকার সুন্দর সব স্মৃতিস্তম্ভ দিয়ে তাকে সাজানো হল। ভারতবর্ষের জাতিভেদ-প্রথা, সতী-দাহ, অতিথিকে পান-সুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করবার প্রথা—এর সমস্ত কথাই ইব্‌ন্ বতুতা তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন। তাঁর বই থেকেই জানতে পাই, তখন ভারতীয় বণিকরা বিদেশের বন্দরে বন্দরে বিরাট বাণিজ্য চালাত, পৃথিবীর সমুদ্রে সমুদ্রে ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ চলাচল করত। কোথায় কোথায় তিনি সুন্দরী নারী দেখেছেন, তারা কীরকমের পোশাক পরে, কোন্ রকমের সুগন্ধি আর অলংকার ব্যবহার করে, তার বিবরণ তিনি খুব লক্ষ্য করে দেখেছেন এবং লিখে গেছেন। দিল্লী শহরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, দিল্লী হচ্ছে, "ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র; যেমন বিশাল তার আয়তন তেমনই জমকালো তার সমৃদ্ধি; সৌন্দর্য আর শক্তির তার মধ্যে একত্র মিলন ঘটেছে।" ভারতবর্ষে তখন পাগ্‌লা সুলতান মহম্মদ তুগ্‌লক রাজত্ব করছেন। হঠাৎ রাগের মাথায় তিনি তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন দক্ষিণ-ভারতের দৌলতাবাদ শহরে; তার ফলে এই 'বিশাল এবং জমকালো শহরটি' পরিণত হল একটি মরুভূমিতে—"শূন্য এবং জনহীন, দু'চারজন মাত্র তার মধ্যে ইতস্তত বাস করছে"—সেই দু'চারজন মানুষও অতি ভয়ে ভয়ে শহরে এসে ঢুকেছিল বহু দীর্ঘকাল পরে।

ব্যস, ইব্‌ন্ বতুতার কথা বলতে বলতে আসল কথাটা ছেড়েই চলে গেছি। প্রাচীন কালের এই ভ্রমণ-কাহিনীগুলো আমাকে বড়ো বেশি মুগ্ধ করে ফেলে।

যাক, এটা দেখা গেল, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মধ্য-প্রাচ্য বা পশ্চিম-এশিয়া পৃথিবীর জীবনযাত্রায় একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করে ছিল, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের মধ্যে এইটেই ছিল প্রধান যোগসূত্র। এর পরের একশো বছরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। অটোম্যান তুর্কি কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ দখল করল, মধ্য-প্রাচ্যের এই সমস্ত দেশগুলিতে তাদের রাজ্য বিস্তার করল, মিশরও বাদ গেল না। দুই মহাদেশের মধ্যে যে বাণিজ্য চলত, এরা তার মোটেই পক্ষপাতী ছিল না। তার এক কারণ, এই বাণিজ্য প্রধানত চালাত ভিয়েনা আর জেনোয়ার অধিবাসীরা; ভূমধ্যসাগরে এরাই ছিল তুর্কিদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর বাণিজ্যও তখন নূতন পথে চলা শুরু করেছে; ইউরোপ থেকে এশিয়াতে আসবার নূতন সব সমুদ্র-পথ খোলা হচ্ছে; আগের দিনে বাণিজ্য চলত সার্থবাহ বণিকদলের হাতে, ডাঙার পথে, এখন তার জায়গা দখল করছে এই সমুদ্র-পথ। পশ্চিম-এশিয়ার উপর দিয়ে যে স্থলপথ ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে সে পথ মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে। এবার সে পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল; যে দেশের মধ্য দিয়ে সে পথ চলে গিয়েছে, জগতের রঙ্গমঞ্চেও তার স্থান আর লোকচক্ষুর গোচরে রইল না।

প্রায় চার শো বছর ধরে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত, সমুদ্র-পথগুলিই হয়ে রইল পৃথিবীর প্রধান পথ; ডাঙা-পথের তুলনায় এরাই গৌরব আর মর্যাদা পেল অনেক বেশি, বিশেষ করে যেখানে রেলপথ নেই। পশ্চিম-এশিয়াতে রেলপথ ছিল না। বিশ্ব-যুদ্ধ বাধবার অল্প কিছুদিন আগে প্রস্তাব উঠল, কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ থেকে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেললাইন তৈরি করা হবে। এই প্রস্তাবের পিছনে ছিলেন জর্মন সরকার। জর্মনি এই রেলওয়ে তৈরি করতে যাচ্ছে শুনে অন্যান্য দেশগুলো ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল, কারণ এর ফলে মধ্য-প্রাচ্যে জর্মনির প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে। ইতি-মধ্যে যুদ্ধ বাধল, সে রেললাইন আর তৈরি হল না।

১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হল। পশ্চিম-এশিয়াতে তখন ব্রিটেনই সর্বেসর্বা। তখন কিছু

দিন ব্রিটিশ রাজনীতি-ধুরন্দরদের চোখেও ধাঁধা লেগেছিল, ভারতবর্ষ থেকে তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল একটি মধ্য-প্রাচ্যদেশীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নও তাঁরা দেখছিলেন। সেটা অবশ্য হয়ে উঠল না। বলশেভিক রাশিয়া, কামাল পাশা, এবং আরও অনেক ব্যাপারের ধাক্কায় ব্রিটেনের সে স্বপ্ন ভেঙে গেল। তখনও কিন্তু ব্রিটেন পাকেচক্রে এর অনেকখানি জায়গাই হাত করে বসে রইল। ইরাক প্যালেস্টাইন ব্রিটেনের প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীনই রয়ে গেল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সে বিরাট কামনা তার পূর্ণ হয় নি; তবু কিন্তু ব্রিটেন এখনও তার সেই পুরোনো দিনের নীতিটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে—ভারতবর্ষে আসবার সমস্ত পথ আর প্রণালী এখনও তারই হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে। মনে এই উদ্দেশ্য ছিল বলেই যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনা মেসোপটেমিয়া আর প্যালেস্টাইনে গিয়ে লড়াই করেছে, তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আরবদের সাহায্য করেছে। এই জন্যই যুদ্ধের পরে মোসুলের কথা নিয়ে ইংলণ্ড আর তুরস্কের মধ্যে বিষম বিবাদ বেধেছিল। ইংলণ্ড আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে এখন এত মন-কষাকষি, তারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এইটেই; ভারতবর্ষে আসবার পথের পাশে, দেয়ালের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে থাকবে রাশিয়ার মতো একটা শক্তিশালী দেশ, এটা ভাবতেই ব্রিটেনের গা বিষিয়ে ওঠে।

বাগদাদ রেলওয়ে আর হেজাজ রেলওয়ে—এই দু'টি রেললাইন তৈরি করা নিয়ে যুদ্ধের আগে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল। লাইন দু'টি এখন তৈরি হয়ে গেছে। বাগদাদ রেলওয়েটি বাগদাদ শহরকে ভূমধ্যসাগর আর ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। হেজাজ রেলওয়েটি আরবের মদিনা শহর থেকে চলে এসে আলেপ্পোতে বাগদাদ রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে (আরবদেশের মধ্যে হেজাজের গুরুত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কারণ মক্কা আর মদিনা, মুসলমানদের এই দু'টি তীর্থস্থানই এই অঞ্চলের অন্তর্গত)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রেলপথ তৈরি হবার ফলে পশ্চিম-এশিয়ার বহু বড়ো বড়ো শহরই এখন ইউরোপ আর মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, সেখান থেকে সহজেই এই-সব শহরে আসা যায়। আলেপ্পো শহরটিও ক্রমে প্রকাণ্ড একটি রেলওয়ে জংশনে পরিণত হচ্ছে; তিনটি মহাদেশের রেলপথ এখানে এসে একত্র হবে—একটা পথ আসবে ইউরোপ থেকে, একটা আসবে এশিয়া থেকে বাগদাদ হয়ে, আর একটা আসবে আফ্রিকা থেকে কায়রো হয়ে। এশিয়ার পথটিকে যদি বাগদাদের পরে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে হয়তো সে একেবারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেই পেঁাছতে পারবে। আফ্রিকার পথটি সম্বন্ধে কর্তাদের মনের ইচ্ছা, সেটিকে কায়রো থেকে সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ পার হয়ে একেবারে সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে কেপ টাউন অবধি নিয়ে পেঁাছে দেওয়া। কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত, বিস্তৃত এই রাঙা লাইনটি তৈরি করা—এর স্বপ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বহুদিন ধরেই দেখে আসছেন; এবার সে স্বপ্ন সিদ্ধ হবার ভরসাও অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। একে রাঙা বললাম, তার কারণ—দীর্ঘ পথের আগাগোড়াই এই পথটি চলে যাবে ব্রিটিশ অধিকারের মধ্য দিয়ে, মানচিত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছবিটাই শুধু লাল রঙে ছাপা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে কিন্তু এই সমস্ত সংকল্প কাজে পরিণত হতে পারে, নাও হতে পারে—রেলওয়ের এখন দু'টি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যানের আবির্ভাব হয়েছে, মোটর গাড়ি আর এরোপ্লেন। ইতিমধ্যে একথাটা মনে রাখতে হবে, বাগদাদ আর হেজাজ লাইন, পশ্চিম-এশিয়ার এই দু'টি নূতন রেলওয়েরই কর্তৃত্ব বেশির ভাগ ব্রিটিশদের হাতে রয়েছে; ব্রিটিশের নীতি ছিল, নিজেদের আয়ত্তাধীনে ভারতবর্ষে যাবার একটা নূতন সংক্ষিপ্ত রাস্তা বানিয়ে নেওয়া, সে নীতি এরাই সফল করে তুলেছে। বাগদাদ রেলওয়ের খানিকটা গিয়েছে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে। সিরিয়া আছে ফরাসিদের অধিকারে। ফরাসিদের অনুগ্রহের উপরে এই নির্ভর করে থাকাটা ব্রিটিশের পছন্দ নয়; তাদের ইচ্ছা, এর বদলে প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে তারা নূতন একটা লাইন খুলবে। আরবেও নূতন একটা ছোটো রেললাইন খোলা হচ্ছে, এটা লোহিতসাগরের তীরস্থিত বন্দর জেড্ডা থেকে মক্কা পর্যন্ত যাবে। প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী মক্কায় যান, তাঁদের এতে খুব সুবিধা হবে।

রেলপথের কল্যাণে পশ্চিম-এশিয়ার এই দেশগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে, এই গেল সে রেলপথের কথা। যে কাজের জন্য এর সৃষ্টি সে কাজ এখনও সারা হয় নি; তবু কিন্তু এরই মধ্যে রেলওয়ের উপকারিতা খানিকটা কমে যাচ্ছে; তাকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা এসে দখল করছে মোটর গাড়ি আর এরোপ্লেন। মরুভূমির পথে চলতে মোটর গাড়ির কিছুমাত্র কষ্ট নেই; যাত্রিদলের যে-সব পায়ে-হাঁটা পথে হাজার হাজার বছর ধরে উটেরা অসীম ধৈর্যসহকারে মন্থর গতিতে পথ চলত, এখন সেখানে ধুলো উড়িয়ে হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে মোটর গাড়ি। রেলওয়ে চালাবার খরচ অনেক, সে বসাতে সময়ও লাগে প্রচুর। মোটর গাড়ি সস্তায় মেলে, যখন দরকার তখনই সে চলতে পারে। মোটর গাড়ি বা লরি অবশ্য খুব লম্বা দৌড়ের পথ সাধারণত চলে না; ছোটো খানিকটা জায়গা, খুব বেশি হলে শ'খানেক মাইল পথের মধ্যেই তারা ঘুরে ফিরে ক্ষেপ দিয়ে থাকে।

দূরপাল্লার পথের জন্য রয়েছে এরোপ্লেন। এটাও রেলওয়ের তুলনায় সস্তা, চলেও অনেক বেশি তাড়াতাড়ি। যানবাহনের প্রয়োজনে এরোপ্লেনের ব্যবহার পৃথিবীতে খুবই দ্রুতবেগে বেড়ে চলবে, এতে সংশয়ের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আয়োজনের অনেকখানি উন্নতি দেখা যাচ্ছে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ নিয়মিতভাবে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ক্ষেপ দিচ্ছে। এই-সব বড়ো বড়ো বায়ু-পথেরও একটা চৌমাথা হয়ে উঠেছে পশ্চিম-এশিয়া; বিশেষ করে বাগদাদ শহর তার কেন্দ্র।

লন্ডন থেকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল এয়ার-ওয়েজ চলে গেছে সেটা, আমস্টারডাম থেকে বাটাভিয়া পর্যন্ত যে কে, এল্, এম্ ডাচ লাইন চলে গেছে সেটা এবং প্যারিস থেকে ইন্দোচীন পর্যন্ত বিস্তৃত ফরাসি এয়ার লাইন (এয়ার ফ্রান্স), এই তিনটারই ঘাঁটি বাগদাদে আছে। মস্কো ও ইরানও বাগদাদের সাথে বায়ু-পথে সংযুক্ত। (ইউরোপ থেকে) চীন ও সুদূর প্রাচ্যের বিমানের যাত্রীকে বাগদাদের উপর দিয়ে যেতে হয়। বাগদাদ থেকে বিমান কায়রো পর্যন্তও যায়—তদ্দ্বারা উহা আফ্রিকার বিমানপথের মারফতে কেপ টাউনের সঙ্গেও যুক্ত।

এসব বিমানপথের বেশির ভাগ থেকেই বিশেষ কিছু আয় হয় না, বরং এদের প্রচুর সরকারি সাহায্য দিতে হয়, কারণ সাম্রাজ্যগুলোর নিকট এখন বিমানশক্তির বিশেষ কদর। বৈমানিকশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৌ-শক্তির গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। যে ইংলন্ড পূর্বে তার নৌ-শক্তির এতো বড়াই করত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে খুবই নিরাপদ মনে করত, আত্মরক্ষার ব্যবস্থার দিক থেকে বিবেচনা করলে সেও আর এখন একটি দ্বীপমাত্র নয়। ফ্রান্স বা অন্য যে কোনও দেশের মতোই আকাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাকেও ঘায়েল করা সহজসাধ্য হয়েছে। তাই সব বড়ো বড়ো দেশগুলিই বিমানশক্তিতে প্রবল হয়ে উঠতে চাইছে, পূর্বে সমুদ্র-পথের আধিপত্য নিয়ে দেশে দেশে যে রেষারেষি চলত, তার জায়গা এখন দখল করেছে বিমানশক্তির রেষারেষি। শান্তির সময়ে বায়ুপথে যাত্রী-চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেক দেশই উৎসাহ আর সরকারি সাহায্য দিয়ে তাকে বাড়িয়ে তুলছে; কারণ, এর ফলে এমন কতোজন সুশিক্ষিত বৈমানিক তৈরী হবে যাদের যুদ্ধ বাধলে কাজে লাগানো চলবে। অ-সামরিক বিমানবিভাগ সামরিক বিমানবিভাগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই অসামরিক বিমান-বিভাগের উন্নতি খুব দ্রুতভাবে করা হচ্ছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে শত শত বিমান-বর্ত্ম গড়ে উঠেছে। এব্যাপারে যেখানে যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার বেশির ভাগই হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েট ইউনিয়নেও এর যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাচ্ছে—দূরদূরান্তে অবস্থিত এই রাষ্ট্রের অংশগুলোর উপর দিয়ে বহু বিমানপথের বিমানগুলো যাতায়াত করে থাকে।

এখন এসেছে বিমানশক্তির যুগ—এযুগে পশ্চিম-এশিয়া আব্যর নূতনভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে, তার কারণ এস্থানের উপর দিয়ে বহু সুদূরপ্রসারী বিমানপথ চলে গেছে। পুনরায় ইহা বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করে মহাদেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথাতে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে এদেশ এখন বড়ো বড়ো দেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়েছে, কেননা, তাদের পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষার

মধ্যে সংঘাত হয় এবং প্রত্যেকেই অপরের উপর টেক্কা মারতে চেষ্টা করে। এই কথাটা আমরা যদি মনে রাখি তাহলেই মধ্য-প্রাচ্যে এবং অন্যত্র ব্রিটিশের ও অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের মূলে যে কূটনীতি রয়েছে তার অনেকখানিই আমরা বুঝে নিতে পারব।

ভারতে যাবার এই নূতন সদর রাস্তার ঠিক উপরেই মোসুল অবস্থিত, তাছাড়া এখানে তেল আছে। বিমানশক্তির যুগে এখন তেল আগের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে পড়েছে। ইরাকেও মূল্যবান তেলের খনি আছে, এবং সেটাও এই বিমানপথগুলির একেবারে মাঝখানে পড়েছে। কাজেই ইরাককে আপন আয়ত্তে রাখাটা যে ব্রিটেনের পক্ষে কতটা আবশ্যক সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। পারস্যে বহু তেলের খনি আছে; অনেকদিন ধরে ঐ খনিগুলির তেল তুলে নিচ্ছে একটা ইংরেজ কোম্পানি; এর নাম হল এ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানি। ব্রিটিশ সরকার এই কোম্পানির একটি অংশীদার।

তেল বা পেট্রোলের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বেড়ে চলেছে এবং এর দ্বারা সাম্রাজ্যিক নীতি প্রভাবিত হচ্ছে। বস্তুত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে 'তেলের সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আবার নূতন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, আবার বিশ্ব-রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়ছে যে-সব কারণে তার কয়েকটা কারণ নিয়ে আমি এই চিঠি আলোচনা করলাম। কিন্তু এই সব-কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ বা প্রাচ্যের জাগরণ।

১৬৬

আরব-অঞ্চলের দেশ—সিরিয়া

২৮শে মে, ১৯৩৩

প্রত্যেক দেশেই মানুষের কতকগুলো সম্প্রদায় আছে, যাদের ভাষা এক রীতি-নীতি এক। এদের একত্র বেঁধে শক্তিশালী করে তুলবার কতখানি শক্তি জাতীয়তাবাদের আছে, তার অনেক প্রমাণ আমরা দেখেছি। এই জাতীয়তাবাদ এইরকম একটা সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে একত্র মিলিত করে দেয়; আবার অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে একে আরও বেশি করে আলাদা করে ফেলে। জাতীয়তা-বাদের উৎসাহে ফ্রান্স একটা শক্তিশালী এবং সংহত জাতিতে পরিণত হয়েছে; তার লোকদের মধ্যে পরস্পরের বন্ধন অতি দৃঢ়, পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশকে তারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের বলেই জানে। জর্মন-অঞ্চলের সমস্ত দেশগুলোও আবার এই জাতীয়তাবাদের বন্ধনেই একত্র বাঁধা পড়ে একটি প্রবল জর্মন জাতিতে পরিণত হয়েছে। ওদিকে আবার ফ্রান্স এবং জর্মানি দুজনে আলাদা আলাদা ভাবে সংহত হয়ে উঠেছে, তারই ফলে দুয়ের মধ্যেকার তফাত আরও বেশি বেড়ে গেছে।

দেশের মধ্যে যদি একাধিক আলাদা জাতিগত সম্প্রদায় থাকে, সেখানে জাতীয়তাবাদের ফলে অনেক সময়েই আসে পরস্পর-বিরোধ; দেশটাকে একত্র বেঁধে সবল করে তুলবার পরিবর্তে সে জাতীয়তাবাদ বরং তাকে দুর্বলই করে ফেলে, ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেয়। বিশ্ব-যুদ্ধের আগে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের ঠিক সেই দশা ছিল। বহু জাতির বাস ছিল সেখানে, তাদের মধ্যে জর্মন-অস্ট্রিয়ান আর হাঙ্গেরিয়ান, এই দুটি জাতি প্রধান; বাকিগুলো ছিল এদের অধীন। অতএব জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল; জাতীয়তাবাদের প্রভাবে এদের প্রত্যেকটি জাতিই নূতন করে প্রাণ পেয়ে তাজা হয়ে উঠল, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে এরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। যুদ্ধের দরুন অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে উঠল, যুদ্ধে হার হওয়া মাত্রই দেশটা ভেঙে বহু ছোটো ছোটো টুক্‌রোতে পরিণত হল, প্রত্যেকটি জাতিই নিজের নিজের এলাকা নিয়ে একটা করে স্বাধীন

রাষ্ট্র তৈরি করে বসল। দেশটাকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছিল সেটা ঠিক যুক্তিযুক্তভাবে হয় নি, তার ফলও ভালো হয় নি—কিন্তু সে আলোচনায় আপাতত আমাদের দরকার নেই। ওদিকে জর্মনিরও নিদারুণ পরাজয় হয়েছিল, কিন্তু সে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল না। শত দুর্দশা-দৈন্যের মধ্যেও সে এক অখণ্ড দেশ হয়েই বেঁচে রইল, কারণ তাকে বেঁধে রাখবার জন্য ছিল জাতীয়তাবাদের সুদৃঢ় বন্ধন।

বিশ্বযুদ্ধের আগে তুর্কি সাম্রাজ্যও ছিল ঠিক অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিরই মতো বহু জাতির একটা বিচিত্র সমন্বয়। বল্‌কান অঞ্চলের জাতিগুলো ছিল তার মধ্যে, তা ছাড়া ছিল আরব, আর্মানি এবং আরও অনেক জাতি। অতএব জাতীয়তাবাদের চেতনা এই সাম্রাজ্যটিকেও ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলল। এই জাতীয়তাবাদের প্রথম আবির্ভাব হল বল্‌কান অঞ্চলে; উনবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া সময়টাই তুরস্ককে একের পর এক করে বল্‌কান অঞ্চলের প্রত্যেকটা জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে—গ্রীসকে দিয়ে সে যুদ্ধের আরম্ভ। ইউরোপের বড়ো জাতিগুলো, বিশেষ করে জারশাসিত রাশিয়া, এদের এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে নিজের কাজে লাগিয়ে নিতে চেষ্টা করল। এর সঙ্গে নানারকম ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। আর্মানিদের ক্ষেপিয়ে তুলে, তাদের আঘাতে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলতে চাইল তারা; এই জন্যই তুর্কি সরকারের সঙ্গে আর্মানিদের বরাবর যুদ্ধ হয়েছে, সে যুদ্ধে নিদারুণ রক্তপাত আর নরহত্যাও হয়েছে। বড়ো জাতিগুলো এই আর্মানিদের নিজের কাজে লাগিয়ে নিয়েছে, তাদের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের প্রচার-কার্য চালিয়েছে; তার পর বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর যখন দেখেছে এদের দিয়ে আর তাদের প্রয়োজন নেই, তখন অম্লানবদনে তাদের সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করেছে। আর্মানি দেশটি তুরস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীকালে এই দেশটিতে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে; এখন এটি রুশ সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত।

আরবদের সঙ্গে তুর্কিদের কোনোদিনই সদ্‌ভাব ছিল না; তবু কিন্তু তুর্কি সাম্রাজ্যের আরব-জাতিবহুল অংশগুলোর জেগে উঠতে অনেক বেশি সময় লেগেছে। প্রথমে এল একটা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন; আরবি ভাষা এবং সাহিত্যকে নূতন করে উজ্জীবিত করে তুলল তারা। এই কাজ প্রথম আরম্ভ হয় সিরিয়াতে, ১৮৬০ সনের পরবর্তী কালে। সেখান থেকে এর হাওয়া মিশরে এবং অন্যান্য আরবি-ভাষাভাষী দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯০৮ সনে তুরস্কে 'তরুণ তুর্কি বিপ্লব' হল, সুলতান আবদুল হামিদের পতন ঘটল—এই দেশগুলোতে রাজনৈতিক আন্দোলন বেড়ে উঠল তার পরে। মুসলমান এবং খৃষ্টান নির্বিশেষে সমস্ত আরববাসীদের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ল। আরব-অঞ্চলের দেশগুলোকে তুর্কির অধীনতা থেকে মুক্ত করে এনে তাদের নিয়ে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র তৈরি করা হবে, এই স্বপ্নও এসে দানা বেঁধে উঠল। মিশরও আরবি-ভাষাভাষীর দেশ; কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে সে ছিল এদের থেকে খানিকটা আলাদা। তাই এইযে আরব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছে এর মধ্যে সেও এসে যোগ দেবে এমন প্রত্যাশা কেউই করে নি। কথা ছিল, এই আরব রাষ্ট্র তৈরি হবে আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং ইরাক দেশ নিয়ে। আরবরা এককালে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নেতৃস্থানীয় ছিল, সেই মর্যাদা তারা আবার ফিরে পেতে চাইল : বলল, খলিফার পদ অটোম্যান সুলতানের হাত থেকে এনে আরবের কোনো বংশের হাতে দেওয়া হোক। আরবজাতির গৌরব এবং মর্য্যাদা এতে অনেক বেড়ে যাবে, অতএব এটাকেও সবাই ধর্মগত আন্দোলন না ভেবে বরং একটা জাতীয় আন্দোলন বলেই মেনে নিল; সিরিয়াতে আরব খৃষ্টান যারা ছিল তারাও এই আন্দোলনের সমর্থন করল।

বিশ্ব-যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ব্রিটেন আরবদের এই জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল। বিশাল একটি আরব-সাম্রাজ্য স্থাপিত করে দেওয়া হবে ইত্যাদি রকমের বহু লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতি যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন দিতে লাগল। মক্কার শরীফ হুসেন-এর মনে আশা জাগল, বিশাল একটি রাজ্যের আধিপত্য এবং খলিফার পদ দু'টিই এবার তাঁর হাতে এসে পড়ল বুঝি। আশায় আশায় তিনি ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দিলেন; আরবদের

আরব রাষ্ট্রসমূহ
তুরস্ক
ইরান
সিরিয়া
ইরাক
সৌদি আরব
মরুভূমি
আলেকজান্দ্রেত্তা
আলেপ্পো
মসুল
কিরকুক
টাইগ্রিস
ইউফ্রেটিস
বাগদাদ
বসরা
বেইরুত
লেবানন
দামাস্কাস
জবল
এদ্-দ্রুজ
হাইফা
প্যালেস্টাইন
জেরুজালেম
ট্রান্স-
জর্ডন
সুয়েজ
আকাবা

উস্‌কানি দিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকান্ড একটি বিদ্রোহ সৃষ্টি করলেন। সিরিয়াবাসী আরবরা মুসলমান-খৃষ্টান-নির্বিশেষে হুসেনের এই বিদ্রোহে যোগ দিল; তাদের নেতারা অনেকে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রাণ দিয়ে—তুর্কি'রা তাদের ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিল। ৬ই মে তারিখে দামাস্কাস এবং বেইরুত শহরে এ'দের ফাঁসি হয়; সিরিয়াতে আজও এই দিনটিতে এই জাতীয় শহীদদের স্মৃতিরক্ষা দিবস পালন করা হচ্ছে।

আরবদের বিদ্রোহ সফল হল—বিদ্রোহীদের গোপনে টাকা যোগাচ্ছিল ব্রিটেন; আর বিশেষ করে একে সাহায্য করছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি; ব্রিটেনের রহস্যময় লোক এবং বিটিশ গুপ্তচর বিভাগের প্রসিদ্ধ কর্মী বলে এ'র নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। নামটি হচ্ছে কর্নেল লরেন্স। যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল আরব-অঞ্চলের যত দেশ তুর্কি-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তার প্রায় সকলেই তুরস্কের হাত ছাড়িয়ে ব্রিটেনের হাতে এসে পড়েছে। তুর্কি সাম্রাজ্য ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আমি তোমাকে বলেছি, মুস্তাফা কামাল তুরস্কের স্বাধীনতা চেয়েই যুদ্ধ করেছিলেন; কোনো অ-তুর্কি দেশকে জয় করে নেবার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না (একমাত্র কুর্দিস্তানের খানিকটা অংশ ছাড়া)। খাস তুরস্ককে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট রইলেন; তাঁর পক্ষে সেটা একটা অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো কাজ হয়েছিল।

অতএব যুদ্ধের পরে প্রশ্ন উঠল, আরব-অঞ্চলের এই যে দেশগুলো, এদের এখন কী গতি হবে। বিজয়ী মিত্রপক্ষ, তার মানে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার, খুব সদিচ্ছার সহিত এই দেশগুলো সম্বন্ধে তাঁদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন: "এতদিন এর প্রজারা তুর্কিদের হাতে নির্যাতন সয়ে এসেছে, এবার তাদের তাঁরা সম্পূর্ণ এবং সম্যক্ স্বাধীনতার অধিকারী করে দেবেন, এই-সব দেশে এমনতরো জাতীয় সরকার এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যার পিছনে থাকবে দেশেরই প্রজাদের স্বাধীন অভিমত এবং নিজস্ব প্রেরণা।" এই মহৎ উদ্দেশ্যটি কার্যে পরিণত করবার আয়োজন এ'রা করলেন, আরব-অঞ্চলের এই দেশগুলির অধিকাংশ স্থান নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে। জমি-দখল করবার যতরকম ফিকির সাম্রাজ্যবাদীদের আছে তার মধ্যে নূতন একটা প্রকার হচ্ছে ম্যান্‌ডেট্-প্রথা; এক্ষেত্রেও ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে ম্যান্‌ডেট্ দিয়ে দেওয়া হল, তার পিছনে রইল লীগ অব নেশন্সের আশীর্বাদ। ফ্রান্স পেল সিরিয়া; ইংলণ্ড পেল প্যালেস্টাইন আর ইরাক। আরবদেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অঞ্চল হচ্ছে হেজাজ, তাকে মক্কার শরীফ হুসেন-এর অধীন করে দেওয়া হল—ব্রিটেনের তিনি পোষ্যপুত্র-বিশেষ। একটি মাত্র অখণ্ড আরব রাষ্ট্র তৈরি করে দেওয়া হবে বলে যত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সে-সব প্রতিশ্রুতি কোথায় ভেসে গেল—আরব-অঞ্চলের এই দেশগুলোকে এইভাবে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কতকগুলো আলাদা আলাদা ম্যান্‌ডেটে পরিণত করা হল; তৈরী করা হল একটা রাষ্ট্র—হেজাজ, বাইরে থেকে দেখতে সে স্বাধীন, কিন্তু আসলে সে রইল ব্রিটেনের অধীনে। এই-সব ভাগাভাগি দেখে আরবরা অত্যন্ত মর্মাহত হল; এ তাদের প্রত্যাশার বাইরে। এই ভাগবাটোয়ারাকে চরম ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। কিন্তু এর চেয়েও অনেক নূতনতর বিস্ময় এবং বৃহত্তর আশাভঙ্গ তাদের কপালে লেখা ছিল; কারণ এই ম্যান্‌ডেট্‌গুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুরোনো খেলা খেলতে শুরু করল, প্রজাদের মধ্যে ভাগাভাগি দলাদলির সৃষ্টি করে দিল, নইলে তাদের শাসনটা সহজে চলবে কেন। এবারে আমরা এর প্রত্যেকটা দেশের কাহিনী আলাদা করে দেখব, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ফ্রান্সের ম্যান্‌ডেট্ সিরিয়ার কথা আমি প্রথম বলব।

১৯২০ সনের গোড়াতেই ব্রিটিশদের সাহায্যে সিরিয়াতে একটি আরবি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হল, তার রাজা হলেন আমীর ফয়জল (ইনি হেজাজের রাজা হুসেনের পুত্র)। সিরিয়ায় একটি জাতীয় কংগ্রেস তৈরি হল; কংগ্রেস অখণ্ড সিরিয়া রাজ্যের একটি প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্র রচনা করলেন। কিন্তু এর সমস্তটাই মাসকয়েকের ব্যাপার। ১৯২০ সনেরই গ্রীষ্মকালে ফরাসিরা এসে হাজির হল, লীগ অব নেশন্সের ম্যান্‌ডেট্-রূপী পরোয়ানা তাদের হাতে। রাজা ফয়জলকে তারা তাড়িয়ে দিয়ে সিরিয়া রাজ্য

গায়ের জোরেই দখল করে বসল। সবসুদ্ধ ধরলেও সিরিয়া অতি ছোটো দেশ, এর লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও কম। তবু ফরাসিদের পক্ষে দেশটা একটা রীতিমতো ভীমরুলের চাক হয়ে উঠল। সিরিয়াবাসী আরবরা মুসলমান এবং খৃষ্টান-নির্বিশেষে সকলেই তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছে স্বাধীনতা অর্জন না করে তারা ছাড়বে না; অন্য কোনো দেশের শাসন এত সহজে মেনে নিতে তারা কিছুতেই রাজি হল না। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি লেগেই রইল, আজ এখানে বিদ্রোহ হয়, কাল ওখানে বিদ্রোহ হয়—ফরাসি শাসন চালাবার জন্য বিরাট একটা ফরাসি সেনাবাহিনীকে সারাক্ষণই মোতায়েন করে রাখতে হল সিরিয়াতে। দেখে শুনে ফরাসি সরকার তখন সাম্রাজ্যবাদীদের সনাতন নীতি খাটাতে লেগে গেলেন; সিরিয়ার জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করে ফেলবার জন্য তাঁরা দেশটাকে ভেঙে আরও ছোটো ছোটো কতগুলো রাষ্ট্রে পরিণত করলেন, ধর্ম এবং সম্প্রদায়গত বিভেদকেও ফেনিয়ে বড়ো করে তুলতে চাইলেন। 'শাসন করবার সুবিধার জন্য দেশকে বহুধা বিভক্ত করার' এই নীতি তাঁরা জেনেশুনে অবলম্বন করলেন। নীতিটাকে প্রায় সরকারিভাবে স্পষ্ট ঘোষণাই করলেন তাঁরা।

ছোটো দেশ সিরিয়া—এবার সেটা ভেঙে পরিণত হল পাঁচটা আলাদা রাষ্ট্রে। পশ্চিম-সমুদ্রকূল এবং লেবানন পর্বতশ্রেণীর কাছে তৈরি হল লেবানন রাষ্ট্র। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল একটা খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত, এদের নাম মেরোনাইট। সিরিয়াবাসী আরবদের থেকে আলাদা করে নিজের পক্ষে টেনে নেবার উদ্দেশ্যে ফরাসিরা এদের খানিকটা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিল।

লেবাননের উত্তরে, সমুদ্রের উপকূলেই পার্বত্য অঞ্চলে আরেকটা ছোটো রাষ্ট্র তৈরি করা হল, সেখানে 'আলাবি' বলে একদল মুসলমানের বাস। তারও উত্তরে প্রতিষ্ঠিত হল আর একটা রাষ্ট্র, তার নাম অ্যালেক্‌জান্দ্রেতা : এটা ঠিক তুরস্কের গায়ে অবস্থিত, এর অধিবাসীরা অধিকাংশই তুর্কি-ভাষাভাষী।

অতএব খাস সিরিয়া বলতে যেটুকু অবশিষ্ট রইল, দেশের বেশির ভাগ উর্বরা জমিই তার বাইরে চলে গিয়েছে; তার চেয়েও বিপদের কথা সমুদ্রের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগই নেই। অনেক হাজার বছর ধরে সিরিয়া ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী প্রবল রাজ্যগুলোর অন্যতম; সমুদ্রের সঙ্গে তার সেই প্রাচীনকালের বন্ধন এবার ছিন্ন হল, এখন তার বাইরে যাবার পথ হল ঊষর মরুভূমির উপর দিয়ে। তার পর আবার এই সিরিয়া থেকেও একটি পাহাড়ী অঞ্চলকে কেটে নেওয়া হল, সেখানে তৈরি করা হল আরেকটি রাষ্ট্র, জবল-এদ্-দ্রুজ; দ্রুজ বলে একটি উপজাতির সেখানে বাস।

প্রথম থেকেই সিরিয়াবাসীরা ফরাসি ম্যান্‌ডেট্‌টাকে প্রীতির চোখে দেখে নি। একে নিয়ে অনেক হাঙ্গামা করেছে তারা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড়ো বড়ো মিছিল-শোভাযাত্রা ইত্যাদি বার করেছে, সে শোভাযাত্রায় আরবি মেয়েরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে। ফরাসিরাও সে শোভাযাত্রা কঠোর হস্তে ভেঙে দিতে কসুর করে নি। তার পর ফরাসিরা দেশটাকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করল, এবং সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়দের নিয়ে দলাদলি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করল—এর ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, প্রজারা ক্রমেই আরও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যেমন করেছে, সিরিয়াতে তেমনি এই অসন্তোষ দমন করবার জন্য ফরাসিরা প্রজাদের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপহরণ করল, গুপ্তচর এবং গুপ্তপুলিশের লোক দিয়ে দেশটাকে ভরে ফেলল। বেছে বেছে 'বিশ্বস্ত' সিরিয়াবাসীদের নিয়ে তারা সরকারি কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করতে লাগল; প্রজাদের মধ্যে এই 'বিশ্বস্তদের' কোনো মর্যাদা বা প্রতিপত্তিই ছিল না, তারা এদের সাধারণত দলত্যাগী বলেই জানত। অবশ্য এর সমস্তই করা হচ্ছিল অত্যন্ত সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে; ফরাসিরা তারস্বরে ঘোষণা করতে লাগল, "রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের শিক্ষায় সিরিয়াবাসীদের শিক্ষিত করে তোলাই তারা তাদের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে"—আমরা যারা ভারতবর্ষে আছি, আমাদের কানে কথাটার সুর কেমন চেনা-চেনা শোনায়!

অবস্থা ক্রমেই সঙিন হয়ে উঠল; বিশেষ করে ক্ষেপে গেল জবল-এদ্-দ্রুজের লোকেরা;

এরা জাত-যোদ্ধা, এবং জাতি হিসাবে খানিকটা আদিমপ্রকৃতির (আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিদের সঙ্গে এদের অনেকখানি মিল আছে)। এই দ্রুজদের নেতাদের সঙ্গে ফরাসি গবর্ণর একটা হীন চাল চাললেন। এ'দের তিনি নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন, তার পর এ'দের বন্দী করে রাখলেন, গোলমাল হলে এ'রা রইলেন তার জামিনস্বরূপ। এটা ১৯২৫ সনের গ্রীষ্মকালের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই জবল-এদ্-দ্রুজে বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহ ক্রমে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল; স্বাধীনতা এবং ঐক্যকামী সিরিয়ার একটা সর্বব্যাপী বিদ্রোহেই পরিণত হল।

সিরিয়ার এই স্বাধীনতা-সমর ইতিহাসে একটা অপূর্ব বস্তু হয়ে রয়েছে। ছোটো একটা দেশ, ভারতবর্ষের দু'টো কি তিনটে জেলাকে একত্র করলে যা হয় সেইটুকু মাত্র তার আয়তন; সে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে—তখনকার দিনে ফ্রান্সেরই সামরিক শক্তি ছিল পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশি। ফ্রান্সের বিপুল সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তারা, তার সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করবার সামর্থ্য অবশ্য সিরিয়াবাসীদের ছিল না। কিন্তু গ্রাম-অঞ্চলে সে বাহিনীর টিকে থাকাই এরা দুষ্কর করে তুলল। বড়ো বড়ো শহরগুলোই শুধু ফরাসিদের দখলে রইল, সেখানেও সিরিয়ানরা প্রায়ই গিয়ে হানা দিতে লাগল। ভয় দেখিয়ে দেশের লোককে কাবু করে ফেলতে ফরাসিরা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করল না—অসংখ্য লোককে তারা গুলি করে মেরে ফেলল, অসংখ্য গ্রাম জ্বালিয়ে দিল। প্রাচীন কালের বিখ্যাত শহর দামাস্কাস, তাকে পর্যন্ত তারা কামানের গোলা ছুঁড়ে অনেকখানি বিধ্বস্ত করে দিল—১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসের ঘটনা এটা। গোটা সিরিয়া দেশটাই একটা যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত হয়ে গেল। কিন্তু এত কাণ্ড করেও বিদ্রোহকে দমন করা গেল না, পুরো দুটি বছর ধরে সে বিদ্রোহ চলতে লাগল। ফ্রান্সের বিপুল সমরায়োজনের চাপে শেষপর্যন্ত অবশ্য বিদ্রোহ দমন হল, কিন্তু সিরিয়াবাসীরা যে বিরাট আত্মোৎসর্গ করেছিল তা বৃথা হল না। স্বাধীনতালাভে তাদের অধিকার তারা নিঃসংশয়েই প্রতিষ্ঠিত করে গেল; সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে দেখল এই দেশের মানুষরা কী দুর্ধর্ষ ধাতুতে গড়া।

এর মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু হচ্ছে এই : ফরাসিরা এই বিদ্রোহটাকে একটা ধর্মগত ব্যাপার বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিল, দ্রুজদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিল; আর সিরিয়াবাসীরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তারা যুদ্ধ করছে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, ধর্মগত কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বিদ্রোহের একেবারে গোড়াতেই দ্রুজ-দেশে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হল; সে সরকার প্রজাদের উদ্দেশ করে একটি ঘোষণা প্রচার করলেন, তাতে বললেন, সিরিয়ার সমস্ত অধিবাসী এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এসে যোগ দিক, তাদের অভীষ্ট ফল জয় করে নিক—সে অভীষ্ট হচ্ছে, 'এক এবং অবিভাজ্য সিরিয়া দেশের স্বাধীনতা,......প্রজাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে একটি গণপরিষৎ নির্বাচন করা,—যে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করবে; যে বিদেশী সেনারা দেশটাকে দখল করে বসে রয়েছে তাদের অপসারণ; একটা জাতীয় সেনাবাহিনীর সৃষ্টি করা, যার কাজ হবে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করা, এরা ফরাসি-বিপ্লবের যে মূলনীতিগুলি ছিল সেগুলিকে এবং মানুষের অধিকারগুলিকে দেশে প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠিত করা।' অতএব দেখা যাচ্ছে, ফরাসি সরকার আর ফরাসি সেনাবাহিনী এমন একটা জাতিকে দমন করতে চেষ্টা করছিলেন, ফরাসি-বিপ্লবের মূল সূত্রগুলিকে এবং সে বিপ্লবে মানুষের যেসব অধিকার থাকা চাই বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেইগুলোকেই প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করছিল।

১৯২৮ সনের প্রথমদিকে সিরিয়াতে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হল; সংবাদপত্রের উপরে যে সেন্সর বসানো হয়েছিল সেটাও তুলে দেওয়া হল। অনেক রাজনৈতিক বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হল। জাতীয়তাবাদীদের দাবি অনুসারে একটি গণপরিষৎ তৈরি করা হল, দেশের শাসনতন্ত্র সে রচনা করবে। কিন্তু এর মধ্যেও গোলমালের একটি বীজ ফরাসি সরকার পুরে দিল—প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দিয়ে (ভারতবর্ষে এখন যেমন আছে)। মুসলমান, গ্রীক ক্যাথলিক, গ্রীক গোঁড়া খৃষ্টান, ইহুদি প্রত্যেকের জন্যই আলাদা

আলাদা খুপরি তৈরি করা হল; প্রত্যেক ভোটারকেই তার নিজস্ব ধর্মগত দলের মধ্যে থেকে ভোট দিতে হবে, তার বাইরে যাবার কারও স্বাধীনতা নেই। দামাস্কাসে একটি চমৎকার কাণ্ড ঘটল, ব্যাপারটি শিক্ষাপ্রদ। জাতীয়তাবাদীদের নেতা যিনি ছিলেন, তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট্, অতএব যে কটি বিশেষ নির্বাচন-কেন্দ্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কোনোটারই মধ্যে পড়েন না; অতএব নির্বাচিত হবারও তাঁর পথ খোলা নেই—অথচ দামাস্কাসে যে কটি লোক সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি তাঁদেরই মধ্যে একজন। মুসলমানদের দশটা আসন ছিল; তাঁরা নিজে থেকেই বললেন, একটা আসন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, সেটা প্রোটেস্ট্যাণ্টদের জন্য ধরে দেওয়া হোক। কিন্তু ফরাসি সরকার কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না।

তবু ফরাসিদের এত সমস্ত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও গণপরিষদে জাতীয়তাবাদীরাই প্রাধান্য লাভ করলেন : এমন একটি শাসনতন্ত্র এঁরা রচনা করলেন যেটা রীতিমতো একটা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই যোগ্য। এই শাসনতন্ত্রে বলা হল, সিরিয়া হবে একটি প্রজাতন্ত্রী দেশ, সরকার তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা লাভ করবেন প্রজার হাত থেকে। এই শাসনতন্ত্রের খসড়ার মধ্যে ফরাসিদের বা তাদের ম্যানডেটের নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করা হল না। ফরাসিরা এতে আপত্তি তুলল; কিন্তু পরিষৎ এক চুল পরিমাণও পিছন হটতে রাজি হলেন না, মাসের পর মাস ধরে দু'পক্ষে ধস্তাধস্তি চলল। অবশেষে ফরাসি হাই কমিশনার প্রস্তাব করলেন, বেশ, এই খসড়া শাসনতন্ত্রকেই স্বীকার করে নেওয়া হবে, শুধু তার সঙ্গে একটি অস্থায়ী ধারা যোগ করে দেওয়া হবে—তার মর্ম হচ্ছে, ম্যান্‌ডেটের মেয়াদ যতদিন রয়েছে তার মধ্যে এই শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো ধারাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা চলবে না যাতে করে ম্যান্‌ডেট্ অনুসারে ফ্রান্সের উপরে যেসব কর্তব্য এবং দায়িত্ব চাপানো আছে তার কোনোরকম ব্যতিক্রম হতে পারে। কথাটার মানে একটু অস্পষ্ট; তবুও এই কথা বলতে আসা মানেই ফরাসিদের পক্ষে অনেকখানি নতি স্বীকার। গণপরিষৎ কিন্তু এটুকুও মানতে রাজি হলেন না। তাই দেখে তখন ১৯৩০ সনের মে মাসে, ফরাসি সরকার এই পরিষৎ ভেঙে দিলেন; তার সঙ্গেই ঘোষণা করলেন, পরিষৎ যে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন সেটি দেশে বহাল হল, সরকার তার সঙ্গে যে অস্থায়ী ধারাটি জুড়ে দিতে চেয়েছেন সেটিও এর সঙ্গে যুক্ত থাকল।

খাস সিরিয়া দেশ যা যা চেয়েছিল তার অনেকখানিই পেয়ে গেল; অথচ তার জন্যে তাকে কোনোরকম আপোষ-মীমাংসার মধ্যে যেতে হয় নি, যে-সব দাবি নিয়ে সে লড়াই শুরু করেছিল তার মধ্যে একটিকেও ছেড়ে দিতে হয় নি। এখন বাকি রইল দুটি প্রশ্ন; ম্যান্‌ডেটের মেয়াদ শেষ হওয়া, অস্থায়ী ধারাটিরও অস্তিত্ব তার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবে; আর, সিরিয়ার ঐক্য-সাধন, এটি একটি বৃহত্তর কথা। এইটুকু বাদ দিয়ে দেখলে, শাসনতন্ত্রটি খুবই প্রগতিমূলক বস্তু, সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি দেশের উপযোগী করেই তাকে রচনা করা হয়েছে। এই বিরাট বিপ্লবের সময়ে সিরিয়ার লোকেরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে, তারা বীর এবং দৃঢ়-সংকল্প যোদ্ধা। এর পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে, আলাপ-আলোচনা দর-কষাকষির ব্যাপারেও তাদের দৃঢ়তা এবং ধৈর্য কিছুমাত্র কম নয়; পূর্ণ স্বাধীনতার যে দাবি তারা একদা তুলেছিল তাকে কোনোমতে একতিল প্রত্যাহার করতে বা ক্ষুন্ন করতে তারা কিছুতেই রাজি হয় নি।

১৯৩৩ সনের নভেম্বরে ফ্রান্স সিরিয়ার প্রতিনিধিসভার নিকট (Chamber of Deputies) এক সন্ধির প্রস্তাব করল। এই সভা বাছাই-করা লোকে ভর্তি ছিল এবং এদের মধ্যে ছিল অধিকাংশই নরমপন্থী ও ফরাসি সরকারের সমর্থক। ইহা সত্ত্বেও সভা ঐ সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। এর কারণ হল—ফ্রান্স সিরিয়াকে বর্তমানের মতোই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করে রাখতে ও সেখানে নিজের সেনাবাহিনীর জন্য ছাউনি, ব্যারাক এবং বিমানঘাঁটি রক্ষা করতে জেদ করছিল।

মন্তব্য (অক্টোবর), ১৯৩৮ :

চেকোশ্লোভাকিয়াতে নাৎসির জয়লাভ এবং ইউরোপে জর্মনির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বিস্তার ও তার উপনিবেশ দাবি—এগুলো সব মিলে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একটা নূতন পরিবেশের

সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তির ধাপে নেমে গেছে এবং দীর্ঘকালের জন্য একটা বড়ো রকমের বিদেশী সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারবে কি না সন্দেহ। প্যালেস্টাইনের ঘোরাল পরিস্থিতির দরুন এরূপ প্রস্তাবনা হয়েছে যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডনকে নিয়ে একটা আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হোক।

১৬৭

প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডন

২৯শে মে, ১৯৩৩

সিরিয়ার পাশেই প্যালেস্টাইন, এর উপরে লীগ অব নেশন্‌সের নির্দেশে ব্রিটিশ সরকার একটা ম্যান্‌ডেট্‌ পেয়েছে। সিরিয়ার চেয়েও ছোটো এই দেশটি, এর মোট লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও কম। তবু মানুষের চোখে এর বিরাট প্রতিষ্ঠা, তার কারণ এর গৌরবময় অতীত ইতিহাস এবং কাহিনী। ইহুদি এবং খৃষ্টান দুই সম্প্রদায়েরই এটা তীর্থস্থান, খানিক পরিমাণে মুসলমানদেরও। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান আরব; এরা স্বাধীন হতে এবং সিরিয়াতে যে আরব মুসলমানরা রয়েছে তাদের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ব্রিটিশের কূটনীতির ফলে এখানেও একটি বিশেষ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ঘটিত সমস্যা গজিয়ে উঠেছে, সে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানে ইহুদিরা। ইহুদিরা ব্রিটিশের পক্ষে, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা-অর্জনে তারা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে—তাদের ভয় স্বাধীন হলেই দেশে আরবদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। দু'টি জাতের ধরনধারনে মিল নেই, তাই ঝগড়াবিবাদও এদের মধ্যে লেগেই আছে। আরবরা সংখ্যায় বেশি, ইহুদিদের ধনসম্পদ বেশি, তার উপরে তাদের পিছনে রয়েছে ইহুদি জাতের বিশ্বজোড়া সংগঠন। অতএব ইংলণ্ড আরবদের জাতীয়তাবাদকে রুখবার অস্ত্র হিসাবে খাড়া করে দিয়েছে ইহুদিদের ধর্মগত জাতীয়তাবাদকে; দিয়ে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন এদের দু'য়ের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখবার এবং দেশে শান্তি রক্ষা করবার জন্যই তাদের এখানে থাকা প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদীদের অধীন অন্যান্য সব দেশেও এই পুরোনো খেলা আমরা দেখেছি; কত রূপে কতবার যে এর পুনরাবৃত্তি তারা করেছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অদ্ভুত জাত এই ইহুদিরা। গোড়াতে এরা ছিল প্যালেস্টাইনের বাসিন্দা ছোটো একটি উপজাতি, বা কয়েকটি উপজাতির সমষ্টি। বাইবেলের ওল্ড্‌ টেস্টামেণ্টে এদের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। এদের ধারণা—এরাই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয় জাতি; সেদিক থেকে এদের মনে একটু অহংকারও আছে। কিন্তু সে অহংকার পৃথিবীর সকল জাতিই কখনও না কখনও করেছে। বহুবার বহু বিজেতার হাতে এরা পরাজিত হয়েছে, তাদের পদানত হয়েছে, দাসে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় যে-সব অত্যন্ত সুন্দর এবং করুণ কবিতা আছে তার কতকগুলো হচ্ছে এই ইহুদিদেরই গান এবং বিলাপ অবলম্বন করে লেখা। বাইবেলের যে অনুবাদটি প্রচলিত, তার মধ্যেই এই-সব গান আর বিলাপোক্তি পাওয়া যায়। মূল হিব্রুভাষাতেও বোধ হয় এই কবিতাগুলি ঠিক এই রকমই বা এর চেয়েও সুন্দর। একটি গান (Psalm) থেকে অল্প ক'টিমাত্র ছত্র আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি :

বাবিলনের সেই উপকূলে বসে বসে আমরা কাঁদতে লাগলাম,
তোমার কথা মনে পড়ে, হে সিয়ন।
আমাদের বীণাগুলোকে আমরা ঝুলিয়ে রেখে দিলাম,
সেখানে যে গাছগুলো ছিল তাদের শাখায়।

আমাদের যারা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা আদেশ করল,
গান গাইতে হবে, সুর সৃষ্টি করতে হবে,
আমাদের সেই দুঃখকে নিয়ে—
বলল, "সিয়নের গান একটি আমাদের গেয়ে শোনাও!"
কিন্তু প্রভুর সেই গান, তাকে কী করে আমরা গাইব,
সেই অপরিচিত বিদেশের ভূমিতে?
তোমাকে যদি কখনও ভুলে যাই, হে জেরুজালেম,
সেদিন আমার দক্ষিণ হস্ত যেন ভুলে যায় তার শিল্পচাতুর্য,
তোমার কথা যদি কোনোদিন বিস্মৃত হই, আমার জিহ্বা
যেন আবদ্ধ হয়ে যায় আমার মুখের তালুর সঙ্গে;
হ্যাঁ, তাই যেন ঘটে, যদি আনন্দের মুহূর্তেও
জেরুজালেমই আমার মনে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে না জেগে থাকে।

শেষ পর্যন্ত এই ইহুদিরা সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। স্বদেশ বা স্বজাতি বলতে এদের কিছু ছিল না; যেখানে যেত সেইখানেই লোকেরা এদের জেনে নিত বিদেশী বলে, অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলে। শহরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে এদের বাস করতে হত, অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে, যেন এদের সঙ্গে মিশে অন্যরা কলুষিত না হয়। এই অঞ্চলগুলিকে বলা হত 'ঘেটো'। অনেকসময়ে এদের বিশেষ একরকমের পোশাক পরে চলাফেরা করতে হত। অন্যরা এদের অপমান করত, গালাগাল করত, নির্যাতন করত এবং নৃশংসভাবে হত্যা করত; 'ইহুদি' এই কথাটাই হয়ে উঠল একটা গালাগালের ভাষা, তার মানে কৃপণ এবং অর্থপিশাচ মহাজন। অথচ এত সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেও এই আশ্চর্য জাতিটা বেঁচে রইল; বেঁচে রইল শুধু নয়, তাদের নিজস্ব জাতিগত সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সুদ্ধ বাঁচিয়ে রাখল; বিপুল ধনসম্পত্তির সমৃদ্ধি অর্জন করল, এবং অসংখ্য মহামানবের জন্ম হল এদের মধ্য থেকে। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, সাহিত্যিক, মহাজন, ব্যবসাদার হিসাবে এরাই পৃথিবীর শীর্ষ-স্থান অধিকার করে বসে আছে; সমাজতন্ত্রবাদ আর সাম্যবাদের সবচেয়ে বড়ো নেতা যাঁরা তাঁরাও ছিলেন ইহুদি। এদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য অতি দরিদ্র; পূর্ব-ইউরোপের শহরগুলোতে এরা গাদাগাদি হয়ে বাস করছে, থেকে থেকেই এদের উপরে একটা করে 'পোগ্রোম' বা হত্যা-মহোৎসবও চলছে। এই গৃহহীন দেশহীন মানুষের জাত, বিশেষ করে এদের মধ্যে যারা গরীব তারা, কোনোদিনই তাদের সেই পুরোনো দিনের স্বপ্নকে ভুলে যায় নি; আজও তারা জেরুজালেমের স্বপ্ন দেখছে—তাদের কল্পনার সে জেরুজালেম, এত বড়ো এত তার জাঁকজমক, সত্যিকার জেরুজালেমের তা কোনোদিন নেই। জেরুজালেমকে তারা নাম দিয়েছে সিয়ন বা জিয়ন; তার মানে একটা প্রতিশ্রুত দেশবিশেষ—জিয়নিজ্‌ম্‌ মানেই হচ্ছে সেই অতীত দিনের আহ্বান, তার টানে আজও তারা জেরুজালেম এবং প্যালেস্টাইনের প্রতি সারাক্ষণ আকৃষ্ট হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই জিয়ন-বাদী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়াল একটা উপনিবেশ-স্থাপনের আন্দোলনে; বহু ইহুদি প্যালেস্টাইনে চলে গিয়ে সেখানে বাসা বাঁধল। হিব্রু ভাষাটাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনা প্যালেস্টাইন আক্রমণ করল। জেরুজালেমে যখন তারা গিয়ে প্রবেশ করছে এমন সময়ে, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, ব্রিটিশ সরকার একটি ঘোষণা প্রচার করলেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে ব্যালফোর ঘোষণা। এই ঘোষণাতে বলা হল, প্যালেস্টাইনে "ইহুদিদের একটি জাতীয় বাসস্থান" প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায়। পৃথিবীর সর্বত্র যে ইহুদিরা ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সকলের সম্প্রীতি লাভ করাই সম্ভবত ছিল এই ঘোষণার উদ্দেশ্য; টাকাকড়ির ব্যাপারের দিক থেকে এর গুরুত্বও ছিল অনেকখানি। ইহুদিরা এই ঘোষণা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। কিন্তু একটুখানি ছোট্টো ত্রুটি এর মধ্যে ছিল; ব্যাপারটা খুব ছোটো নয়, তবু মনে হল কী

করে সেটি সকলের চোখ এড়িয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে : প্যালেস্টাইন দেশটা নির্জন প্রান্তর নয়, জনশূন্য প্রজাশূন্য দেশ নয়। সে দেশে তার আগে থেকেই মানুষের বাস ছিল। অতএব ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের প্রতি এই যে মহৎ উদারতার ভাব দেখালেন, আসলে সেটা করা হল প্যালেস্টাইনে আগে থেকেই যেসব লোকের বাস ছিল তাদের ঘাড় ভেঙে। এদের মধ্যে 'আরব ছিল, অনারব ছিল; মুসলমান ছিল, খৃষ্টান ছিল। এরা সকলেই, মানে ইহুদি ছাড়া বস্তুত আর সকলেই, এই ঘোষণাবাক্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল। সমস্যাটা আসলে ছিল অর্থ-নৈতিক। এই লোকগুলো বুঝল, নবাগত ইহুদিরা এবার সমস্ত কাজেকর্মেই এদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। ইহুদিদের পিছনে রয়েছে বিপুল ধনবল, অতএব অচিরাৎ তারাই হয়ে উঠবে সমস্ত দেশটার মালিক। তাদের মুখ থেকে ইহুদিরা খাদ্য কেড়ে নিয়ে যাবে, কৃষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে জমি—এই ভয়ে তারা অধীর হয়ে উঠল।

প্যালেস্টাইনের গত বারো বছরের ইতিহাস, আরব আর ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষের কাহিনীতে ভরা। ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজন বুঝে একবার এদের পক্ষ নিয়েছে, একবার ওদের পক্ষ নিয়েছে; তবে সাধারণত তারা ইহুদিদেরই পক্ষে। দেশটার প্রতি এমন ব্যবহার দেখানো হচ্ছে যেন সে একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ মাত্র, তার স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার কিছুমাত্র নেই। আরবরা স্বায়ত্ত-শাসন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করছে; খৃষ্টানরা এবং অন্যান্য অনিহুদি জাতিগুলোও তাদের পক্ষে রয়েছে। ম্যানডেট্ সম্বন্ধে এরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছে; বাইরে থেকে আরও নূতন লোক আমদানি সম্বন্ধেও এদের আপত্তি, বলছে—আরও লোকের মতো জায়গা দেশে নেই। বাইরে থেকে জলস্রোতের মতো আগন্তুক ইহুদিরা দেশে এসে হাজির হচ্ছে দেখে তাদের ভয় এবং ক্রোধ আরও বেড়ে গেছে। এরা (আরবরা) খোলাখুলিই বলছে, "জিয়নিজম্ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহকারী বন্ধু। জিয়নিস্ট নেতাদের মধ্যে যাঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁরাও বরাবরই বলে আসছেন, ইহুদিদের একটা শক্তিশালী জাতীয় বাসস্থান যদি তৈরি করে দেওয়া হয়, সেটা হবে ইংরেজদের অতি বৃহৎ সহায়,—ভারতবর্ষে আসবার পথটাকে সেই পাহারা দিয়ে রাখবে, কারণ আরবদের মধ্যে যে জাতীয় চেতনা এবং কামনা দেখা দিয়েছে, সে হবে তাকে ব্যাহত করবার অস্ত্র।" অতর্কিতে এক-একটা জায়গাতে ভারতবর্ষের নাম কেমন করে গজিয়ে ওঠে—দেখেছ!

আরবদের কংগ্রেস স্থির করলেন, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁরা অসহযোগিতা অবলম্বন করবেন; ব্রিটিশরা একটা ব্যবস্থা-পরিষৎ খাড়া করবার চেষ্টায় ছিল, তার দরুন নির্বাচনটাকেই তাঁরা বয়কট করবেন। এই বয়কট অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ হল, পরিষৎ মোটে তৈরিই করা গেল না। কয়েক বছর ধরে একটা অসহযোগের নীতি এ'রা চালিয়ে গেলেন। তার পর সে আন্দোলনে কিছু মন্দা পড়ল; দু-একটা দল ব্রিটিশের সঙ্গে খানিকটা সহযোগিতা শুরু করল। কিন্তু তখনও নির্বাচিত পরিষৎ তৈরি করবার সামর্থ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হল না; হাই কমিশনার স্বয়ংই সর্বশক্তিমান সুলতানস্বরূপ হয়ে শাসন করতে লাগলেন।

১৯২৮ সনে আরবদের বিভিন্ন দল আবার আরব কংগ্রেসের মধ্যে এসে একত্র হল; 'জনগণের স্বাভাবিক অধিকারের বলেই' একটি গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টী শাসন-প্রথার প্রতিষ্ঠা দাবি করল। নির্ভীকতার আরও বেশি পরিচয় দিল তারা একটি কথা বলে—"যে স্বৈরতন্ত্রী ঔপনিবেশিক শাসন বর্তমানে চালানো হচ্ছে, প্যালেস্টাইনের লোকেরা তা সহ্য করে চলতে পারে না, আর সহ্য করে চলবে না।" আরবদের জাতীয়তাবাদের এই নূতন উচ্ছ্বাসটির মধ্যে একটা বড়ো লক্ষ্য করবার জিনিস আছে : এরা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতি অনেকখানি নজর দিয়েছে। এই বস্তুটা যেখানে দেখা যায়, সেইখানেই বুঝতে হবে, বাস্তব অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের চোখ ফুটেছে।

১৯২৯ সনের আগস্ট মাসে আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হল। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, ইহুদিদের সংখ্যা এবং ধনসম্পদ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে আরবদের ক্রোধ এবং ভয় বেড়ে উঠেছিল, তা ছাড়া আরবরা যে স্বাধীনতার দাবি

তুলেছে ইহুদিরা তাতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু উপস্থিত যা নিয়ে হাঙ্গামা বাধল, সে হচ্ছে একটা বিশেষ বস্তু নিয়ে বিবাদ, সেটাকে বলা হয় 'আর্তনাদের প্রাচীর'। প্রাচীন কালে হেরডের মন্দির যে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, এটা সেই পুরোনো প্রাচীরের একটা অংশ। কাজেই ইহুদিদের কাছে এটা একটা পবিত্র বস্তু; একদা তারা জাতিহিসাবে অতি বৃহৎ ছিল, এটাকে তারা সেই যুগেরই একটা স্মৃতিস্তম্ভ বলে মনে করে। পরবর্তীকালে আবার সেখানে একটা মসজিদ তৈরি হয়েছিল, এই প্রাচীরটাও তারই ইমারতের একটা অংশে পরিণত হয়েছিল। ইহুদিরা এই প্রাচীরের কাছে এসে তাদের প্রার্থনা এবং স্তবস্তোত্র পাঠ করে, বিশেষ করে তাদের বিলাপোক্তিগুলোকে খুব চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে—তাই থেকেই এর নাম হয়েছে 'আর্তনাদের প্রাচীর'। মুসলমানরা কাজেই এতে আপত্তি করে; তাদের অন্যতম অতি-বিখ্যাত মসজিদের একটা অংশে এইরকম কাণ্ড করলে তাদেরই বা সইবে কেন।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করা হল; তখনও অন্য নানা পথে সংগ্রাম চলতে লাগল। এর মধ্যে মজার ব্যাপার ছিল এই, প্যালেস্টাইনে খৃষ্টানদের যতগুলি সম্প্রদায় ছিল সকলেই এই সংগ্রামে আরবদের পূর্ণ সমর্থন করতে লাগল। মুসলমান এবং খৃষ্টানরা একত্র হয়ে বড়ো বড়ো হরতাল আর শোভাযাত্রা করতে লাগল। মেয়েরা পর্যন্ত এই আন্দোলনে বড়ো একটা অংশ গ্রহণ করল। এই থেকেই বোঝা যায়, সত্যকার বিরোধ যেটা সেটা ধর্ম নিয়ে নয়, তা ছিল নূতন আগন্তুক আর পুরোনো অধিবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে। ম্যানডেটের দ্বারা ব্রিটিশদের উপরে যে কর্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে কর্তব্য তারা পালন করে নি; বিশেষ করে ১৯২৯ সনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আগে থেকে নিবারণ করতে পারে নি, লীগ্ অব নেশন্স্ এজন্য ব্রিটিশ শাসকবর্গকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন।

অতএব প্যালেস্টাইন এখনও ব্রিটিশদের একটা উপনিবেশের শামিল হয়ে রয়েছে; অনেক বিষয়ে তার অবস্থা বরং পুরোদস্তুর উপনিবেশের চেয়েও অনেক খারাপ; আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে ব্রিটিশরা এই অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখছে। ব্রিটিশ কর্মচারীতে প্যালেস্টাইন পরিপূর্ণ, দেশের সমস্ত বড়ো কর্মচারীর পদ ব্রিটিশরাই দখল করে বসে আছে। ব্রিটিশের অধীনস্থ দেশের সর্বত্রই যা অবস্থা হয় —শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি, যদিও আরবরা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। ইহুদিদের অনেক টাকাকড়ি, তাদের ভালো ভালো সব স্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে। দেশে ইহুদিদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছে; মুসলমানের তুলনায় তাদের আর্থিক শক্তিও অনেক বেশি। প্যালেস্টাইনে একদিন তারাই প্রভুত্বের আসন দখল করে বসবে, সেই দিনের প্রত্যাশা যেন তারা এখন থেকেই করছে। জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক শাসন-প্রথা চেয়ে আরবরা সংগ্রাম চালাচ্ছে। সে সংগ্রামে ইহুদিদের সহযোগিতা পাবার অনেক চেষ্টাই তারা করেছিল; কিন্তু সে আহ্বানে ইহুদিরা কর্ণপাত করে নি। তার চেয়ে বিদেশী শাসকের পক্ষ সমর্থন করাই তাদের বেশি পছন্দ; দেশের অধিকাংশ লোককে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখার কাজে এরা তাকে সাহায্য করছে। সেই অধিকাংশ দলের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই হচ্ছে মুসলমান—তারা এবং খৃষ্টানরা ইহুদিদের এই মনোভাবকে অত্যন্ত বিরক্তির চোখে দেখছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ট্রান্স-জর্ডন

প্যালেস্টাইনের পাশে, জর্ডন নদীর ওপারে আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সেটি সৃষ্টি করেছিল। এর নাম হচ্ছে ট্রান্স-জর্ডন। অতি ক্ষুদ্র একটুখানি দেশ, মরুভূমির একেবারে গায়ে; তার এক পাশে সিরিয়া অন্য পাশে আরব। রাজ্যটির মোট লোকসংখ্যা তিন লক্ষের মতো—মাঝারি আকারের একটা শহরের প্রায় সমান বলা যায়। ব্রিটিশ সরকার অনায়াসেই একে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে জুড়ে এক করে দিতে পারতেন। কিন্তু একত্র করবার চেয়ে ভেঙে আলাদা করার নীতিটাই সাম্রাজ্যবাদীরা বেশি পছন্দ করে। ভারতবর্ষে আসবার ডাঙ্গা-পথ এবং

বায়ু-পথের মধ্যে একটা ঘাঁটি হিসাবে এই রাজ্যটির একটা বড়ো স্থান আছে। একদিকে মরুভূমি আর একদিকে পশ্চিমের সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত উর্বর দেশ, মাঝখানে এটা হয়ে রয়েছে একটা সীমানার খুঁটি, সেদিক থেকেও এর গুরুত্ব ক্ষুদ্র নয়।

রাজ্যটি ছোটো। কিন্তু আশপাশের বড়ো বড়ো দেশগুলোতে যেসব ঘটনার পরম্পরা চলেছে, এটিও তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। দেশের প্রজারা সবাই চাইছে গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোক; কর্তারা সে প্রার্থনায় কান দিচ্ছেন না; অতএব প্রজারা আন্দোলন করছে এবং সে আন্দোলন এ'রা দমন করছেন, সেন্সর বসাচ্ছেন, নেতাদের নির্বাসিত করছেন। প্রজারাও সরকারি ব্যবস্থা অমান্য এবং বর্জন করে চলেছে, ইত্যাদি কাণ্ড এখানেও পুরাদমেই ঘটছে। ব্রিটিশরা একটি ভালো চাল চেলেছে এখানে। আমির আবদুল্লাকে (হেজাজের রাজা হুসেনের আরেকজন পুত্র, ফয়জলের ভাই) ট্রান্স-জর্ডনের রাজা বানিয়ে দিয়েছে। তিনিও একেবারেই ব্রিটেনের হাতের পুতুল হয়ে আছেন, তারা যা বলে তাই করেন। কিন্তু কাজকর্ম চলছে তাঁরই নামে। প্রজাদের ক্রোধটা ঠিক ব্রিটেনের উপরে গিয়ে পড়ছে না, মাঝখানে তিনি আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এদিক থেকে ব্রিটেনের তিনি খুবই কাজে লাগছেন সন্দেহ নেই। যা কিছু ঘটে তার দরুন বেশির ভাগ দোষই পড়ছে তাঁর ঘাড়ে; প্রজারা তাঁর উপরে দারুন চটা। ভারতবর্ষে আমাদের অনেক ছোটো ছোটো দেশীয় রাজ্য আছে; আবদুল্লা-শাসিত ট্রান্স-জর্ডন রাজ্যের অবস্থা বস্তুত অনেকটা তাদেরই মতো।

নামে এটি স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু ১৯২৮ সনে ব্রিটিশদের সঙ্গে আবদুল্লার একটি সন্ধি হয়েছে, তাতে সামরিক এবং অন্যান্য ব্যাপারে যতরকম সম্ভব সুযোগ এবং অধিকার তিনি ব্রিটেনকে দিয়ে দিয়েছেন। ট্রান্স-জর্ডন বস্তুত পরিণত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই একটি অংশে। ব্রিটিশের অধীনে থেকে নূতন ধরণের স্বাধীনতা পাবার যে রীতি সৃষ্টি হয়েছে, এটি তারই আরেকটা ছোটো নমুনা। এই সন্ধি এবং মোটের উপর এই অবস্থাটার দরুনই প্রজারা অত্যন্ত ক্ষেপে উঠেছে, মুসলমান এবং খৃষ্টান, সকলেই। সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করল, সে আন্দোলন দমন করা হল; যে সংবাদপত্রগুলো সে আন্দোলনকে সমর্থন করছিল সেগুলোকে পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল, আন্দোলনের নেতাদের নির্বাসনে পাঠানো হল। তার ফলে প্রজার বিরোধিতা আরও বাড়ল; একটি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হল, কংগ্রেস একটি 'জাতীয়-সন্ধিপত্র' রচনা করলেন এবং রাজার সন্ধিকে অন্যায় বা অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। তারপর যখন নূতন নির্বাচনের জন্য ভোটারের তালিকা তৈরি করবার চেষ্টা হল, দেশের প্রায় সমস্ত প্রজাই তাকে বয়কট করল, ভোটার বলে নাম লেখাতে অস্বীকার করল। আবদুল্লা এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্য হাল ছাড়লেন না, কোনোমতে দু-চার জন লোক দলে জুটিয়ে নিয়ে তাদের দিয়েই সন্ধিটাকে একটা লোক-দেখানো অনুমোদন করিয়ে নিলেন।

১৯২৯ সনে প্যালেস্টাইনে যখন গোলমাল চলেছিল, ট্রান্স-জর্ডনেও তখন বড়ো বড়ো শোভাযাত্রা ইত্যাদি হয়েছে, ব্রিটিশ-শাসন এবং ব্যালফোর ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রজারা প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে যাচ্ছি; দেখে মনে হবে সেগুলো একটি মাত্র গল্পেরই বারবার পুনরাবৃত্তি। তবু সে গল্প বারবার করে বলছি, একটি কথা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই বলে; নিজের দেশে বসে সবাই আমরা মনে করি, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বিশেষত্বগুলো নিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হবে; কিন্তু আসলে আমাদের দ্রষ্টব্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে তারই গতি—সমস্ত প্রাচ্য জগৎ জুড়ে জাতীয়তাবাদের হাওয়া জেগে উঠেছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা একই অস্ত্র সর্বত্র প্রয়োগ করছে। জাতীয়তাবাদের শক্তি বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে তার প্রসার; তার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের ফন্দি-ফিকিরেরও একু-আধটুকু পরিবর্তন হচ্ছে; বাইরে থেকে তারা সে জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্ট করবার একটা লোক-দেখানো ভড়ং করছে, এমন ভান দেখাচ্ছে যেন তাদের দাবিই মেনে নেওয়া হল, অন্তত নামে। ওদিকে আবার দেশে দেশে এই জাতীয় সংগ্রাম যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সমাজের

ভিতরকার সংগ্রাম, প্রত্যেক দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম। সে সংগ্রামে সামন্ত শ্রেণী, এবং কিছু পরিমাণে বিত্তশালী শ্রেণীও ক্রমেই আরও বেশি করে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মন্তব্য (অক্টোবর ১৯৩৮):

প্যালেস্টাইনে আরবি জাতীয়তাবাদ, ইহুদি ধর্মরাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা ত্রয়ী-সংঘাত চলেছে এবং ক্রমশই তা জটিলতর হয়ে আসছে। জর্মনিতে নাৎসিদের ক্ষমতালাভের দরুন মধ্য-ইউরোপ হতে বহুসংখ্যক ইহুদি বিতাড়িত হয়েছে, ফলে প্যালেস্টাইনের উপর ইহুদিদের চাপ বেড়ে গেছে। আরবদের মনে আশঙ্কা বেড়ে গেল যে ইহুদিদের বাস্তুভূমিতে প্রত্যাবর্তনের হিড়িকে যে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে তারা একেবারেই ভেসে যাবে ও প্যালেস্টাইন ইহুদিদেরই কবলে চলে যাবে। আরবগণ এর বিরুদ্ধে লড়াই করল এবং তাদের মধ্যে কতকলোক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হল। পরবর্তী কালে অত্যুগ্র ইহুদি ধর্মরাজ্যবাদিগণ অনুরূপ কার্যের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

১৯৩৬ সনের এপ্রিলে প্যালেস্টাইনের আরবগণ ধর্মঘট ঘোষণা করল। ইহা পণ্ড করার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করল—সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করল—তা সত্ত্বেও ইহা ছয় মাস চলেছিল। সুবিদিত নাৎসি দৃষ্টান্তের অনুকরণে বড়ো বড়ো বন্দীশালা (Concentration Camps) গড়ে উঠল। এসব প্রচেষ্টা বিফল হল; তার পর সরকার প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলী তদন্ত করার জন্য একটা রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করল। এই কমিশন রিপোর্টে জানিয়ে দিল,—অন্যের আদেশে (এখানে লীগ অব্ নেশন্সের) এদেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ নিষ্ফল হয়েছে এবং এ-দায়িত্ব পরিত্যাগ করাই সংগত। কমিশন আরও প্রস্তাব করল যে, দেশটি এরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করা দরকার—আরবদের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটা বড়ো অঞ্চল, ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমুদ্রতীরবর্তী একটা ছোটো অঞ্চল, এবং তৃতীয় আর একটি অঞ্চল—যার মধ্যে থাকবে জেরুজালেম শহর ও সেটি থাকবে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে। আরব হোক আর ইহুদি হোক, প্রায় প্রত্যেকেই এরূপ দেশবিভাগের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল কিন্তু অনেক ইহুদি আবার এটাকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখতে রাজী হল। যাহোক, আরবগণ এ পরিকল্পনার কাছ দিয়েও ঘেঁষল না এবং তাদের জাতিগত বৈরিতা বেড়েই চলল। গত কয়েকমাসের মধ্যে এটা একটা বিরাট জাতীয় আন্দোলনের রূপপরিগ্রহ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ শত্রুতাচরণ করছে এবং ক্রমশ প্যালেস্টাইনের বড়ো বড়ো অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ কবলমুক্ত হয়ে আরবি জাতীয়তাবাদীদের হাতে গিয়ে পড়ছে। দেশটাকে পুনর্বার দখল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করেছে এবং সেখানে এখন একটা ভীতি ও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি বিরাজমান।

দুর্ভাগ্যক্রমে আরবগণ অতিমাত্রায় সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছে; ইহুদিগণও কতকাংশে আরবগণেরই পদ্ধতি অনুকরণ করছে। ব্রিটিশ সরকার নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসলীলার প্রচণ্ড নীতি অবলম্বন করে চলেছে—উদ্দেশ্য, স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন এভাবে দাবিয়ে দেবে। আয়ার্লান্ডের 'ব্ল্যাক ও ট্যান' (Black and Tan) যুগে অবলম্বিত পন্থার চেয়েও জঘন্যতর পন্থা এখন প্যালেস্টাইনে অনুসৃত হচ্ছে এবং খবরবার্তা আদান-প্রদানের উপর কড়া 'সেন্সর-শিপে'র (বার্তা-নিয়ন্ত্রণ) ব্যবস্থা থাকাতে ওখানকার ঘটনাবলী বাকী জগতের অগোচর। তবুও যতটুকু কোনো প্রকারে বহির্জগতে বেরিয়ে আসছে ততোটুকুই যথেষ্ট খারাপ। আমি এইমাত্র পড়লাম—ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিগণ সন্দেহভাজন আরবদের দলবদ্ধভাবে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা প্রকাণ্ড বড়ো লোহার খাঁচায় পুরে রাখে—এরূপ প্রতিটি খাঁচায় ৫০ থেকে ৪০০ জন বন্দী থাকে, আর এদের আত্মীয়স্বজনেরা এদের খাদ্যাদি জোগায়, ঠিক যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুদের প্রতি মানুষ আচরণ করে।

ইতিমধ্যে সমগ্র আরব্যজগৎ ঘৃণায় ও ক্রোধে জ্বলে উঠেছে এবং প্রাচ্যজগতের মুশ্লিম অমুশ্লিম

উভয় অঞ্চলই স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত একটা জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এরূপ পাশবিক প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে দেখে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছে। এই লোকগুলি অবশ্যই অনেক জঘন্য ও হিংসাত্মক কাজ করেছে বটে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে তারা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক শক্তিকর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

মহা দুঃখ ও পরিতাপের কথা হচ্ছে যে, দুটি নিপীড়িত জাতি, ইহুদি ও আরবগণ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ইহুদিগণ যে ভয়াবহ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে ইউরোপে—যেখানে তাদের অগণিত নরনারী বাস্তুহারা ভবঘুরের দলে পরিণত হচ্ছে, যাদের কোনও দেশেই ঠাঁই নাই—তাতে প্রত্যেকেই তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে। প্যালেস্টাইনের প্রতি তারা কেন আকৃষ্ট হচ্ছে তাও বেশ বোঝা যায়। এবং এটাও ঠিক যে ইহুদি আগন্তুকগণই ঐ দেশের উন্নতিবিধান করেছে, ওখানে শিল্প-বাণিজ্যের গোড়াপত্তন করেছে ও সাধারণ জীবনযাত্রার মান উচ্চস্তরে উঠিয়েছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে প্যালেস্টাইন হচ্ছে আসলে আরবভূমি এবং তাকে ওরূপ থাকতেই হবে এবং আরবগণকে তাদের স্বদেশে অমনভাবে নির্যাতিত ও বিধ্বস্ত করা চলবে না। স্বাধীন প্যালেস্টাইনে এই দুই জাতি, পরস্পরের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থে অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে, পরস্পরের সাথে ভালোভাবে সহযোগিতা করে, একটি সমুন্নত দেশ গড়ে তুলতে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারত।

দুর্ভাগ্যবশত, ভারত ও প্রাচ্যদেশে আসার নৌ ও বায়ু-পথের মধ্যে অবস্থিত বলে প্যালেস্টাইন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-পরিকল্পনার মধ্যে একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে আরব ও ইহুদি, উভয় জাতিকেই শোষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আগেকার দেশবিভাগ পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং একটি বড়ো আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র—যাতে ইহুদিদের স্বায়ত্তশাসিত এলাকাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে—গঠিত হওয়ার কথাবার্তা চলছে। যাহোক এটা সুনিশ্চিত যে প্যালেস্টাইনে আরব জাতীয়তাবাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং কেবলমাত্র আরব-ইহুদি-সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদ অবলোপরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই দেশটির ভবিষ্যৎ রচিত হতে পারে।

১৬৮

আরব দেশ—মধ্যযুগ হতে বর্তমান যুগে উত্তরণ

৩রা জুন, ১৯৩৩

আরব-অঞ্চলের অন্যান্য দেশের কথা তোমাকে বলেছি, কিন্তু খাস আরব-দেশটির সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কিছু বলি নি। আরবি ভাষা, আরবি সংস্কৃতি এবং ইসলামধর্মের জন্মস্থান হচ্ছে এই দেশটি। আরবি সংস্কৃতি এইখানেই জন্মলাভ করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, অথচ দেশটি নিজে রয়ে গেল অত্যন্ত সেকেলে এবং মধ্যযুগীয় হয়ে; আমাদের আধুনিক সভ্যতার হিসাবে মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক প্রভৃতি আরব-অঞ্চলের এর প্রতিবেশী দেশগুলি সকলেই একে বহুদূর পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। আরব অতি বিশাল দেশ, এর আকার এবং আয়তন প্রায় ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। অথচ এই সমস্ত দেশটির মোট লোকসংখ্যা মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষের মতো; তার মানে ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার প্রায় সত্তর বা আশি ভাগের এক ভাগ। এই থেকেই বোঝা যায় এদেশের জনবসতি মোটেই ঘন নয়; বস্তুত এর বেশির ভাগ জায়গাই হচ্ছে মরুভূমি। এই জন্যই ধনলোভী দিগ্বিজয়ীরা কোনোদিন এদেশে পদার্পণ করে নি; সমস্ত পৃথিবী যখন আধুনিক সভ্যতার আবর্তে পড়ে দিনের পর দিন বদলে

প্যালেস্টাইন
ট্রান্স-জর্ডন
ইরাক
ইরান
সুয়েজ
নীলনদ
মিশর
সিরীয় মরুভূমি
কুয়েৎ
পারস্য উপসাগর
বাহ্‌রিন
হেজাজ
মদিনা
রিয়াদ
নেজ্‌দ্‌
ওমান
জেদ্দা
মক্কা
লোহিত সাগর
বৃহৎ আরবীয় মরুভূমি
হাদ্রামাউত
ইয়েমেন
ইতালীয় ইথিওপিয়া
এডেন
ইব্‌নে সৌদের আরব-সাম্রাজ্য
ব্রিটিশ প্রভাবান্বিত অঞ্চল

গেছে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দেশটি চিরদিন সেই মধ্যযুগেরই একটি স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বেঁচে রয়েছে, এখানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভৃতি কিছুই নেই। এর অধিবাসীদের বেশির ভাগই ছিল গৃহহীন যাযাবর জাতির লোক, তাদের নাম বেদুইন। বালুকাচ্ছন্ন মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে এরা ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াত, এদের বাহন 'মরুসাগরের জাহাজ' দ্রুতগামী উট, আর ছিল এদের চমৎকার সুন্দর আরবি ঘোড়া—সৌন্দর্য আর গতির জন্য তারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। এদের সমাজ ছিল পিতৃ-পুরুষ-প্রধান; হাজার বছর ধরে সে সমাজের জীবনযাত্রা ঠিক একই ভাবে চলে এসেছে। তার পর এল বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর আরও নানা বস্তুর মতো সে জীবন-যাত্রাকেও একেবারেই বদলে দিয়ে গেল।

মানচিত্রের দিকে তাকালেই আরবের বিরাট উপদ্বীপটিকে দেখতে পাবে, তার একদিকে লোহিত-সাগর, অন্যদিকে পারশ্য-উপসাগর। এর দক্ষিণে আরব-সাগর, উত্তরে প্যালেস্টাইন ট্রান্স-জর্ডন এবং সিরিয়ার মরুভূমি, এর উত্তর-পূর্ব কোণে ইরাকের তৃণশ্যামল উর্বর উপত্যকাভূমি। পশ্চিম-সমুদ্রতীরে, লোহিত সাগরের ঠিক গায়েই হচ্ছে হেজাজ প্রদেশ, ইসলাম ধর্মের আদি জন্মভূমি। এরই মধ্যে রয়েছে পবিত্র নগরী মক্কা এবং মদিনা, রয়েছে জেদ্দা বন্দর—মক্কায় যাবার পথে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী প্রতিবৎসর এই বন্দরে এসে নামে। আরবদেশের মাঝখান এবং পূর্বদিকে একেবারে পারশ্য সাগর পর্যন্ত স্থান জুড়ে আছে নেজ্‌দ্‌। হেজাজ আর নেজ্‌দ্‌ই হচ্ছে আরবের প্রধান দুটি বিভাগ। দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ইয়েমেন, প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের কালে এর নাম দেওয়া হয়েছিল আরেবিয়া ফেলিক্স—মানে সৌভাগ্যশালী আরব বা সুখী আরব। আরবের বেশির ভাগ জায়গাই ঊষর মরুভূমি, শুধু এই অঞ্চলটাই উর্বর এবং শস্যপ্রসূ—তাই এই নাম। এই অঞ্চলটাতে লোকের বসতিও ঘন, তা অনুমান করাই যায়। প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তভাগে হচ্ছে এডেন। এটা আছে ব্রিটিশদের দখলে; প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে যত জাহাজ চলাচল করে সকলেই তারা এই বন্দরে একবার থেমে যায়।

বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রায় গোটা দেশটাই তুর্কির অধীন ছিল, অন্তত তুর্কিকে তার উপরস্থ প্রভু বলে স্বীকার করত। কিন্তু নেজ্‌দ্‌-অঞ্চলে আমির ইব্‌নে সৌদ তখন স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছিলেন, একটু একটু করে দেশ জয় করে পারশ্য-উপসাগরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলছিলেন। ইব্‌নে সৌদ ছিলেন মুসলমানদের একটি বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের নেতা। এই সম্প্রদায়টির নাম ওয়াহাবি সম্প্রদায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবদুল ওয়াহাব এর প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্যই এঁদের আন্দোলন, কতকটা খৃস্টান ধর্মে পিউরিটানদের মতো। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে অনেকগুলো উৎসব-অনুষ্ঠান এবং পয়গম্বর-পূজা খুব বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা বিশিষ্ট পীর পয়গম্বরদের কবর এবং দেহাবশেষকে পূজা করত। ওয়াহাবিরা ছিল এর বিরোধী, তারা একে বলত পৌত্তলিকতা। ইউরোপেও রোমান ক্যাথলিকরা সেন্ট্‌দের মূর্তি এবং দেহাবশেষ পুজো করত বলে পিউরিটানরা তাদের 'পৌত্তলিক' নাম দিয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে, আরবের অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের যে সংগ্রাম তার মূলে শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, ধর্মগত বিরোধও তার মধ্যে ছিল।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবে ব্রিটিশরা বিষম চক্রান্ত শুরু করল; আরবের সমস্ত সর্দার আর নেতাদের সাহায্য এবং ঘুষ দিয়ে হাত করবার জন্য ব্রিটেনের এবং ভারতের টাকা সেখানে জলের মতো ঢালা হতে লাগ্‌ল। এই সর্দারদের যত রকম সম্ভব আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি দিল ব্রিটেন, এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এদের উস্‌কে তুলল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল দুজন সর্দার আছে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, পরস্পরের সঙ্গে তারা লড়াই করছে, এবং দু-জনেই লড়াই করছে ব্রিটেনের গোপন অর্থসাহায্যের জোরে! শেষপর্যন্ত ব্রিটেনের উস্‌কানির জোরে মক্কার শরীফ হুসেন আরব-বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন। হুসেন স্বয়ং হজরত মহম্মদের বংশধর, অতএব আরবদেশে তাঁর প্রচুর সম্মান-সম্ভ্রম; এই জন্যই ব্রিটেন তাঁকে যোগ্যব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সমগ্র আরবদেশকে একত্র সংহত করে তাঁকেই সেই রাজ্যের রাজা করে দেওয়া হবে।

ইব্‌নে সউদ ছিলেন অনেক বেশি চতুর লোক। তাঁর চাপে পড়ে ব্রিটেন তাঁকে স্বাধীন নরপতি বলে স্বীকার করল। ব্রিটেনের কাছ থেকে যৎসামান্য একটা অর্থসাহায্যও তিনি দয়া করে গ্রহণ করতে রাজি হলেন, তার পরিমাণ প্রতি মাসে ৫,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ মাসে প্রায় ৭০,০০০ টাকা। এর বদলে ব্রিটেনকে তিনি আশ্বাস দিলেন, যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন, কোনোপক্ষেই যোগ দেবেন না। অতএব অন্যরা যুদ্ধ করতে লাগল, আর সেই অবসরে তিনি নিজের প্রতিপত্তিটাকে কায়েমী করে নিলেন, শক্তি বাড়িয়ে নিলেন—অবশ্য কাজটা সম্পন্ন হয় অনেকটা ব্রিটেনের টাকা দিয়েই। তুরস্কের সুলতান তখনও খলিফা বলে স্বীকৃত; তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন বলে মুসলমান দেশগুলি ইতিমধ্যে শরীফ হুসেনের উপর চটে গেছেন, ভারতবর্ষও সেই দলে। ইব্‌নে সউদ্ শুধু নিরপেক্ষ হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন; পৃথিবীর অবস্থার যে পরিবর্তন হচ্ছিল সেটাকে বেশ ভালো করেই কাজে লাগিয়ে নিলেন তিনি। ধীরে ধীরে নিজের একটা প্রচণ্ড সুনাম গড়ে তুললেন, সবাই জানল তিনিই হচ্ছেন মুসলমানধর্মের রুস্তম, একমাত্র ভরসার স্থল।

দক্ষিণে ছিল ইয়েমেন। ইয়েমেনের রাজা বা ইমাম যুদ্ধের প্রথম থেকেই একেবারে শেষদিন পর্যন্ত তুরস্কের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখালেন, কিছুতেই সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করলেন না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হতে তিনি ছিলেন বহু দূরে, বেশি কিছু করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। তুরস্কের পরাজয়ের পর তিনি স্বতঃই স্বাধীন হয়ে গেলেন। ইয়েমেন এখনও স্বাধীন রাষ্ট্র।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল আরবে ইংরেজরাই প্রভুত্ব করছে, হুসেন এবং ইব্‌নে সউদ্ দুজনকেই তাদের কার্যসিদ্ধির যন্ত্র বলে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। ইব্‌নে সউদ্ বুদ্ধিমান লোক, ব্রিটেনের হাতের পুতুল হবার কোনো মতলবই তাঁর ছিল না। শরীফ হুসেনের পরিবারটি কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে রাজকীয় মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল—তার পিছনে অবশ্য ছিল ব্রিটেনের শক্তির ঠেলা। হুসেন নিজে হেজাজের রাজা হলেন; এক ছেলে ফয়জল হলেন সিরিয়ার রাজা; আরেক ছেলে আবদুল্লাকে ব্রিটিশরা ট্রান্স-জর্ডন বলে যে নূতন একটি ছোটো রাজ্য তৈরি হয়েছে তার রাজা বানিয়ে দিল। এঁদের এই মহিমা অবশ্য বেশিদিন টিকল না। ফরাসিরা ফয়জলকে সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দিল; ইব্‌নে সউদের ওয়াহাবি সেনার অভিযানের মুখে হুসেনের রাজাগিরি হাওয়া হয়ে উবে গেল। ফয়জল আবার বেকার হয়ে পড়েছেন দেখে ব্রিটিশরা আবার তাঁর একটা হিল্লে করে দিল, ইরাকের রাজার চাকরিটা দিয়ে। ফয়জল এখনও ইরাকের রাজা, ব্রিটিশের অনুগ্রহেই অবশ্য আজও তিনি সেখানে রাজত্ব করছেন।

হুসেন অল্পদিন মাত্র হেজাজে রাজত্ব করেছিলেন। তারই মাঝখানে, ১৯২৪ সনে, আঙ্গোরাতে তুর্কি পার্লামেণ্ট খলিফার পদ উচ্ছেদ করে দিল। খলিফা বলে তখন আর কেউ নেই। হুসেনের দুঃসাহসের অভাব ছিল না, তিনি লাফ দিয়ে সেই শূন্য সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়লেন, ঘোষণা করলেন তিনিই ইসলাম-ধর্মের খলিফা। ইব্‌নে সউদ্ দেখলেন এতদিনে তাঁর সুযোগ এসেছে। জাতীয়তাবাদী আরব এবং আন্তর্জাতিক মুসলমান সম্প্রদায়, সকলকেই তিনি হুসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাতিয়ে তুললেন। হুসেন দুঃসাহসী অনধিকারী, জোর করে খলিফার আসনে বসেছেন অথচ সে আসন ন্যায়ত তাঁর নয়—হুসেনের বিরুদ্ধে তিনিই হয়ে উঠলেন ইসলামের রক্ষাকারী বীর। অতি সযত্নে প্রচারকার্য চালিয়ে অন্যান্য সকল দেশের মুসলমানদেরও সমর্থন তিনি আয়ত্ত করে নিলেন। ভারতবর্ষ থেকেও খিলাফৎ কমিটি তাঁকেই তাঁদের শুভকামনা জ্ঞাপন করলেন। বাতাস কোন্‌দিকে বইছে ব্রিটিশদের সেটা চোখ এড়াল না, তারা বুঝল এতদিন যাকে তারা পিছন থেকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে তার জয়ের আর আশা নেই। দেখেশুনে তারা হুসেনের পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল। হুসেনকে যে অর্থসাহায্য তারা করছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। বেচারি হুসেনকে এতদিন বহু আশ্বাস বহু প্রতিশ্রুতিই তারা দিয়ে এসেছে; হঠাৎ তিনি অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর সঙ্গী বা সম্বল বলে কিছুই আর নেই, ওদিকে প্রবল একজন শত্রু তাঁকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে, ওয়াহাবিরা মক্কা শহরে এসে প্রবেশ

করল; তাদের গোঁড়া ধর্মমতের প্রমাণস্বরূপ গোটাকতক কবর তারা নষ্ট করে ফেলল। এই অনাচারের সংবাদে মুসলমান দেশগুলিতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল; ভারতবর্ষেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। এর পরের বছর ইব্‌নে সউদ্‌ মদিনা এবং জেড্ডা দখল করলেন, হুসেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে হেজাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ১৯২৬ সনের গোড়াতে ইব্‌নে সউদ্‌ নিজেকে হেজাজের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর এই নূতন পদটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার এবং বিদেশস্থ মুসলমানদের সমর্থন লাভ করবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি নিখিল-বিশ্ব মুসলমান কংগ্রেসের আয়োজন করলেন। ১৯২৬ সনের জুন মাসে মক্কা শহরে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এই কংগ্রেসে তিনি অন্যান্য সমস্ত দেশ থেকেও মুসলমান প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। নিজে খলিফা হয়ে বসবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল বলে মনে হয় না; তা ছাড়া তিনি নিজে ওয়াহাবি, হতে চাইলেও বহু মুসলমানই তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করতে রাজি হতেন না। মিশরের রাজা ফুয়াদের জাতীয়তা-বিরোধী এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসনের কাহিনী আমরা আগেই দেখেছি; তাঁর অবশ্য খলিফা হবার জন্য খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাঁকে খলিফা বলে মানতে কেউই রাজি নয়, এমনকি মিশরের তাঁর নিজের প্রজারা পর্যন্ত নয়। হুসেন খলিফার আসনে উঠে বসেছিলেন; যুদ্ধে হারবার পর সে আসন তিনি ছেড়ে দিলেন।

মক্কার সে ইসলামী কংগ্রেসে বিশেষ কোনো জরুরি সিদ্ধান্ত স্থির হল না। সেরকম কিছু করবার জন্যও সম্ভবত তা ডাকা হয় নি। ওটা ছিল শুধু ইব্‌নে সউদের একটা চাল, নিজের প্রতিষ্ঠাটাকে দৃঢ়তর করে নেবার একটা ফিকির, বিশেষ করে বিদেশী শক্তিদের সামনে। ভারতবর্ষ থেকে খিলাফৎ কমিটির প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা নিরাশ হয়ে এবং ইব্‌নে সউদের উপরে চটে-মটে ফিরে এলেন; আমার যতদূর মনে পড়ছে মওলানা মহম্মদ আলিও এঁদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ইব্‌নে সউদের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হল না। ভারতীয় খিলাফৎ কমিটির সাহায্য যখন তাঁর প্রয়োজন ছিল তখন তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়েছেন; এখন আর সে তাঁর উপরে প্রসন্ন না থাকলেও তাঁর যায় আসে না।

অল্পদিনের মধ্যে ইব্‌নে সউদ্‌ প্রায় সমস্ত দেশটাই দখল করে নিলেন। বাকি রইল শুধু ইয়েমেন, সেটা তার প্রাচীন ইমামের স্বাধীন রাজ্যই হয়ে রইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের এই স্থানটি বাদে সমগ্র দেশটাতেই ইব্‌নে সউদ্‌ রাজা হয়ে বসলেন। তারপর তিনি নিজেকে নেজ্‌দের রাজা বলে ঘোষণা করলেন; অতএব এবার তিনি হলেন ডবল রাজা—হেজাজের রাজা এবং নেজ্‌দের রাজা। বিদেশী শক্তিগুলোও তাঁকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করে নিল। মিশরে এখনও বিদেশীরা নানারকমের বিশেষ অধিকার ভোগ করছে, তাঁর রাজ্যে কিন্তু বিদেশীদের সেরকম কোনো অধিকারই তিনি দিলেন না। এমনকি সে রাজ্যের এলাকায় বসে মদ বা অন্য রকমের উত্তেজক পানীয় খাবার পর্যন্ত ক্ষমতা তাদের ছিল না।

সৈনিক এবং যোদ্ধা হিসাবে ইব্‌নে সউদ্‌ নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করেছেন; এবার তিনি আরও কঠিনতর একটা কাজে ব্রতী হলেন, তাঁর রাজ্যে আধুনিক যুগের অবস্থা এবং ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান করতে লেগে গেলেন। আরবদেশ পিতৃ-পুরুষপ্রধান সমাজের সেই প্রাচীন যুগে বাস করছিল, সেখান থেকে এক লাফে তাকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে নিয়ে আসা—কাজ বড়ো সহজ নয়। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ কাজটিতেও ইব্‌নে সউদ্‌ প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন; পৃথিবীসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখছে, দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবেও তিনি বড়ো কম যান না।

প্রথমেই যে কাজটি তিনি সম্পন্ন করলেন সে হচ্ছে দেশের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা নিবারণ। বণিক এবং তীর্থযাত্রীদের চলাচলের যে বড়ো বড়ো পথগুলো ছিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে পথে চলাফেরা তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুললেন। এটা তাঁর একটা প্রকাণ্ড কীর্তি। অসংখ্য তীর্থযাত্রী সর্বদাই এই-সব পথে চলাচল করে, এতদিন এরা পথের সর্বত্রই দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে পথ চলত—তারা এখন তাঁর উপরে স্বভাবতই আশীর্বাদ বর্ষণ করছে।

এর চেয়েও অনেক বেশি বাহাদুরির কাজ হয়েছে তাঁর, যাযাবর বেদুইনদের গৃহবাসী করে তোলা। হেজাজ জয়েরও আগে থেকে তিনি এদের স্থায়ী বাসস্থানে বসিয়ে দেওয়া শুরু করেছিলেন; এমনি করেই একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি। বেদুইনরা স্বভাবত অস্থির-প্রকৃতি, ভ্রমণবিলাসী এবং স্বাধীনতা-প্রিয়; তাদের একজায়গাতে স্থির করে বসানো সহজ ব্যাপার নয়। তবু এই কাজেও ইব্‌নে সউদ্ অনেকখানিই সাফল্য অর্জন করেছেন। দেশের শাসন-ব্যবস্থার বহুদিকে বহু উন্নতি সাধন করেছেন তিনি। এরোপ্লেন মোটরগাড়ি টেলিফোন ইত্যাদি করে আধুনিক সভ্যতার বহু নিদর্শনেরই আবির্ভাব আরবে হয়েছে। অতি ধীরে ধীরে, তবু অতি নিশ্চিত গতিতে, হেজাজ আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠছে। মধ্যযুগ থেকে এক লাফে বর্তমান যুগে পার হয়ে চলে আসা সহজ কথা নয়; এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে মানুষের মন আর মতামতের পরিবর্তন ঘটানো। দেশে যে নূতনতরো প্রগতি এবং পরিবর্তনের আমদানি করা হচ্ছে, আরবরা অনেকে তা ভালো চোখে দেখে নি; পাশ্চাত্ত্য জগতের সব নূতন ধরনের কল-কারখানা তাদের ইঞ্জিন মোটরগাড়ি এরোপ্লেন দেখে তারা ভড়্‌কে গেছে, বলেছে এগুলো ঠিক শয়তানের সৃষ্টি। এইসব নূতন বস্তু আমদানির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানাল; ১৯২৯ সনে একবার ইব্‌নে সউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করল। ইব্‌নে সউদ্ অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে, যুক্তিতর্ক দিয়ে, বুদ্ধি খেলিয়ে এদের বুঝিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করলেন, অনেককে টানতে পারলেনও। কতক লোক তখনও বিদ্রোহী হয়ে রইল, ইব্‌নে সউদ্ তাদের যুদ্ধে পরাভূত করে দিলেন।

এর পরে ইব্‌নে সউদ্‌কে আরেকটি নূতন বিপদে পড়তে হল; সে বিপদে অবশ্য তখন পৃথিবীসুদ্ধ মানুষকেই পড়তে হয়েছিল। ১৯৩০ সন থেকে সমস্ত জগৎ জুড়ে ব্যবসায় বাণিজ্যের একটা প্রকাণ্ড মন্দা শুরু হয়ে গেছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের বড়ো বড়ো শিল্পাশ্রয়ী দেশগুলোরই এতে ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি—এখনও দিন দিন এই মন্দার জোর বাড়ছে, এখনও এর চাপে দমবন্ধ হয়ে তারা ছট্‌ফট্ করছে। পৃথিবী-জোড়া বাণিজ্যের বাজারের সঙ্গে আরবের বিশেষ সম্পর্ক নেই; কিন্তু এই মন্দার আঘাত তার উপরে গিয়ে পড়েছে আর একটা ভাবে। বছর বছর বহু তীর্থযাত্রী মক্কায় হজ করতে যায়; এদের কাছ থেকে যে আয় হয় সেইটেই হচ্ছে ইব্‌নে সউদের রাজস্বের প্রধান উৎস। সাধারণত প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে প্রায় এক লক্ষের মতো তীর্থযাত্রী মক্কায় যেত। ১৯৩০ সনে এদের সংখ্যা হঠাৎ কমে গিয়ে দাঁড়াল চল্লিশ হাজারে; এখনও দিন দিন এদের সংখ্যা কমেই চলেছে। এর ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে; আরবের বহু স্থানে লোকের চরম দৈন্য দেখা দিয়েছে। টাকার অভাবে ইব্‌নে সউদ্‌কেও নানা দিক থেকেই মুশকিলে পড়তে হয়েছে, সংস্কার সাধনের যে-সব পরিকল্পনা তাঁর ছিল তার অনেকখানিই আর চলাতে পারছে না। ইব্‌নে সউদ্ বিদেশীদের তাঁর রাজ্যে কোনো অধিকার বা ইজারা দিতে কিছুতেই রাজি হন নি; তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেবার সুযোগ বিদেশীদের দিলে সঙ্গে সঙ্গেই দেশে বিদেশীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। এবং তার ফলেই আবার বিদেশীরা দেশের প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসবে, রাজ্যেরও স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যাবে। তাঁর সে ভয় অমূলকও নয়; উপনিবেশ এবং অধীন দেশগুলি যত দুঃখ আজ পর্যন্ত সয়েছে তার প্রায় সব কিছুরই উৎপত্তি হয়েছে এই বিদেশীদের শোষণ আর প্রতিপত্তি থেকে। ইব্‌নে সউদের কথা ছিল, হোক দারিদ্র্য তবু স্বাধীন থাকাই আমাদের ভালো; স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তার বদলে কিছুটা প্রগতি আর ধনসম্পদে আমাদের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এবার এই বাণিজ্য-সংকটের চাপে পড়ে সেই ইব্‌নে সউদ্‌ও তাঁর নীতি একটুখানি বদলাতে বাধ্য হয়েছেন, বিদেশীদের খানিকটা সুযোগ-সুবিধা দিতে এখন তিনি প্রস্তুত। কিন্তু তাহলেও তাঁর রাজ্যের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার দিকে তাঁর লক্ষ্যের অভাব নেই; তার দরুন যথোচিত শর্ত এবং ব্যবস্থাও তিনি গোড়া থেকেই করে রাখছেন। এখনকার মতো এইসব ইজারা ইত্যাদি দেওয়া হবে শুধু বিদেশের মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে। যেমন, একেবারে প্রথমেই

যে-কটি অধিকার তিনি দিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে একটি পেয়েছে ভারতবর্ষের একটি মুসলমান ধনিকদল—জেড্ডা বন্দর থেকে মক্কা পর্যন্ত একটি রেলওয়ে তৈরি করবার অনুমতি এ'দের দেওয়া হয়েছে। আরবদেশে এই রেলওয়েটি হবে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার—কারণ এর ফলে বাৎসরিক হজ তীর্থযাত্রার প্রকৃতিটাই একদম বদলে যাবে। শুধু যে তীর্থযাত্রীদেরই এতে উপকার হবে তা নয়, আরববাসীদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই আধুনিক করে তোলার ব্যাপারে এতে অনেকখানি সাহায্য হবে।

আরবদেশে বর্তমানে একটিমাত্র রেলওয়ে আছে, এর কথা আমি আগের একটি চিঠিতেই তোমাকে বলেছি। এর নাম হচ্ছে হেজাজ রেলওয়ে। সিরিয়ার মধ্যে আছে বাগদাদ রেলওয়ের স্টেশন আলেপ্পো; এই হেজাজ রেলওয়ের গাড়ি মদিনা থেকে আলেপ্পো পর্যন্ত যায়।

এই চিঠির গোড়ার দিকে বলেছি, আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দেশ ইয়েমেনকে 'আরেবিয়া ফেলিক্স' বলা হত। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু দক্ষিণ আরবের প্রায় পারশ্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বিরাট অংশকেই এই নামে অভিহিত করা হত। অথচ সে অঞ্চলটির পক্ষে নামটা একেবারেই মানায় না, কারণ সেটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত ঊষর মরুভূমি। সম্ভবত প্রাচীন কালে এর কথা লোকের ভালো করে জানা ছিল না, তাই থেকেই এই ভুলটার উৎপত্তি। অতি অল্পদিন আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলটা ছিল একটা অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত দেশ—পৃথিবীর বুকে যে দু-চারটা স্থানের আজও মানুষ হিসাব পায় নি, মানচিত্র আঁকতে পারে নি, তারই মধ্যে এটাও একটা।

১৬৯

ইরাক : বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মাহাত্ম্য

৭ই জুন, ১৯৩৩

আরব-অঞ্চলের আরএকটি দেশের কথা বলতে বাকি আছে। এই দেশটি হচ্ছে ইরাক বা মেসোপটেমিয়া। অতি উর্বর এবং ধনেজনে সমৃদ্ধ দেশ এটা—এর এক পাশে টাইগ্রিস অন্য পাশে ইউফ্রেটিস নদী একে ঘিরে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এ হচ্চে প্রাচীন রূপকথার দেশ; বাগদাদের হারুন-অল-রশিদের, আরব্য-উপন্যাসের দেশ। এর একদিকে পারশ্য আরেকদিকে আরবের মরুভূমি; দক্ষিণে রয়েছে এর প্রধান বন্দর বসরা, পারশ্য উপসাগর থেকে নদী বয়ে খানিক দূর উঠে এসে সে বন্দরে পেঁছিতে হয়; উত্তরে এর সীমা তুরস্কের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। ইরাক আর তুরস্কের সীমান্ত মিশেছে যেখানে তার নাম কুর্দিস্তান, কুর্দ জাতি বাস করে সেখানে। এখন এই কুর্দদের বেশির ভাগই বাস করছে তুরস্কের এলাকার মধ্যে; তুর্কিদের বিরুদ্ধে এরা যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাচ্ছে তার কথা তোমাকে বলেছি। কিন্তু ইরাকের মধ্যেও বহু কুর্দ আছে, সেখানে এরা একটি বেশ বড়ো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য। মোসুল নিয়ে তুরস্কের আর ইংলণ্ডের মধ্যে বহুকাল ধরে ঝগড়া চলেছে; এখন সে মোসুল রয়েছে ইরাকের এই উত্তর-কুর্দি অঞ্চলের অন্তর্গত হয়ে। তার মানে সেটা এখন ব্রিটেনের অধীন। আসিরীয়দের প্রাচীন নগরী ছিল নিনেভে, মোসুলের কাছেই তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

লীগ অব নেশন্সের হাত থেকে ইংলণ্ড যে দেশ-ক'টির উপরে খবরদারি করবার ম্যান্‌ডেট্ পেয়েছিল, ইরাক তাদের মধ্যে একটি। লীগের ভাষায় ধর্মজ্ঞানের অভাব নেই; সে ভাষায় 'ম্যান্‌ডেট্' কথাটার অর্থ হচ্ছে, লীগের তরফ থেকে ন্যস্ত একটা সভ্যতা প্রচারের পবিত্র কর্তব্য-ভার। কথাটার মধ্যেকার ইঙ্গিত হচ্ছে এই : যে অঞ্চলটির উপরে ম্যান্‌ডেট্ জারি করা হল তার অধিবাসীরা তেমন সভ্য বা উন্নত নয়, নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝে চলবার যোগ্যতাও তাদের

নেই; অতএব বড়ো শক্তিদের কারও উপরে ভার দেওয়া হচ্ছে তাঁরা একে হাতে ধরে সেইভাবে চলতে সাহায্য করবেন। এ যেন বাঘের উপরে ভার দেওয়া হল, গরু বা হরিণের এই পালটি, এর রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই করো। এই ম্যানডেট জারি করা হচ্ছে উক্ত অ-সভ্য দেশের প্রজাদেরই প্রার্থনাক্রমে; এইরূপ একটা কথাও ধরে নেওয়া হত। মহাযুদ্ধের ফলে পশ্চিম-এশিয়ার যে দেশগুলো তুর্কির আসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল, তাদের ম্যানডেট গিয়ে জুটল ব্রিটেন আর ফ্রান্সের কপালে। এঁরা দুপক্ষই ঘোষণা করলেন, এঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে "জনগণের পূর্ণ ও সুনিশ্চিত মুক্তি...এবং দেশীয় প্রজাবৃন্দের স্বাধীন ইচ্ছা ও সমর্থন হইতে প্রাপ্ত শক্তির ভিত্তিতে গঠিত শাসনতন্ত্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা।" এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের কী কী ব্যবস্থা গত বারো বছরে করা হয়েছে, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, এবং ট্রান্স-জর্ডনে তার কিছু কিছু নমুনা আমরা দেখেছি। বার বার বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সেখানে, প্রজারা অসহযোগ করেছে, বয়কট করেছে। তখন প্রজাদের 'স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণাকে' উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁদের উপর বেপরোয়া গুলি চালানো হয়েছে, তাদের নেতাদের বন্দী এবং নির্বাসিত করা হয়েছে, তাদের অসংখ্য শহর এবং গ্রাম ভেঙে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, অনেক সময়ে সামরিক আইনও জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ইতিহাসের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা উৎপীড়ন ধ্বংস এবং ত্রাসসৃষ্টির লীলা দেখিয়ে আসছে। আধুনিক কালে যে নূতন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিয়েছে তার অভিনবত্ব শুধু একটি ব্যাপারে; ত্রাসসৃষ্টি এবং শোষণ সে ঠিকই করে, কিন্তু সে কাজটাকে আবৃত করে রাখতে চায় বড়ো বড়ো কথার আড়াল দিয়ে, 'ন্যস্ত কর্তব্যভার', 'জনসাধারণের কল্যাণ সাধন', 'অনুন্নত জাতির মানুষদের স্বায়ত্তশাসনের বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা' ইত্যাদি গালভরা বুলি আউড়ে। তারা গুলি চালায়, মানুষ মারে, ধ্বংস করে, তবে সেটা শুধু যে-লোকদের গুলি করে মারা হচ্ছে তাদেরই ভালোর জন্য। কে জানে, হয়তো এই ভণ্ডামি সভ্যতার প্রগতিরই একটা লক্ষণ, কারণ ভণ্ডামিও মহত্ত্বের অর্চনা; এর দ্বারা প্রমাণ হয়, সত্য কথাটা অপ্রিয়, তাই তাকে এইসব সান্ত্বনাবাক্য এবং মন-ভোলানো কথা দিয়ে আবৃত করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর স্বরূপটা প্রকাশ না পায়। কিন্তু তবুও কেমন যেন মনে হয়, এই ধর্মধ্বজী ভণ্ডামি, এর চেয়ে নির্মম সত্যকথাও শতগুণে ভালো ছিল।

এবারে দেখা যাক, দেশবাসীদের কামনাকে কতখানি পূরণ করা হয়েছে ইরাকে, ব্রিটিশের ম্যানডেটে থেকে এই দেশটি স্বাধীনতার পথে কত পা এগিয়ে গেল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা ইরাকে—তখন তারা একে বলত মেসোপটেমিয়া—ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, এইখান থেকেই তারা তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধ চালাত। ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্য দিয়ে দেশটাকে প্লাবিত করে ফেলল তারা। ১৯১৬ সনের এপ্রিল মাসে তারা একটা বড়ো রকমের মার খেল; কুত-আল-আমারাতে বৃহৎ একটি ব্রিটিশ বাহিনী তুর্কিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল টাউনসেন্ড। এই মেসোপটেমিয়ার অভিযানে আগাগোড়াই ভয়ংকর অপচয় এবং অব্যবস্থা দেখা গেল। এর মূলে প্রধানত ছিল ভারত-সরকারের ত্রুটি; সুতরাং অক্ষমতা এবং মূর্খতার জন্য অনেক কটূক্তিই তাঁদের সইতে হল। কিন্তু সে যাই হোক, ব্রিটেনের হাতে ছিল অফুরন্ত যুদ্ধসম্ভার, শেষপর্যন্ত তারই জিত হল। তুর্কিদের তারা উত্তরে হটিয়ে দিল, বাগদাদ দখল করল, শেষপর্যন্ত প্রায় মসুল পর্যন্তই গিয়ে পৌঁছল। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন ইরাকের গোটা দেশটাই ব্রিটিশ সেনার দখলে এসে গেছে।

ইরাকের উপরে খবরদারি করবার জন্য ব্রিটেনকে ম্যানডেট দেওয়া হল; ১৯২০ সনের গোড়ার দিকেই এর প্রথম ফল দেখা দিল। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশে তীব্র প্রতিবাদ উঠল; প্রতিবাদ থেকে অবিলম্বেই শুরু হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আবার পরিণত হল বিদ্রোহে—সে বিদ্রোহ সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২০ সনের এই প্রথম ভাগটাতে মিশর তুরস্ক সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইরাক এবং পারশ্য সর্বত্রই একসঙ্গে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, এটা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। ভারতবর্ষেও ঠিক এই সময়টাতেই অসহযোগ আন্দোলনের

আয়োজন চলছিল। ইরাকের বিদ্রোহকে শেষপর্যন্ত দমন করা হল, প্রধানত ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য নিয়ে তাদেরই দ্বারা। বহুকাল থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজ হয়ে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজনে যেখানে যেটুকু নোংরা কাজ আছে তাই করে করে বেড়ানো। এই জন্যই মধ্য-প্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে আমাদের দেশটির প্রতি অশ্রদ্ধার অন্ত নেই।

ইরাকের বিদ্রোহ ব্রিটিশরা শান্ত করল, কিছুটা বলপ্রয়োগ করে, কিছুটা-বা ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এবার তারা কয়েকজন আরব মন্ত্রী নিয়ে একটা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু প্রত্যেক মন্ত্রীরই পিছনে রইল একজন করে ব্রিটিশ উপদেষ্টা; প্রকৃত ক্ষমতা কাজেই থাকল এদেরই হাতে। কিন্তু এই পোষমানা মনোনীত মন্ত্রীরাও আবার এমন উগ্র ও অবাধ্য হয়ে উঠলেন যে এদেরও ব্রিটিশ কর্তারা সইতে পারলেন না। ব্রিটিশদের মতলব ছিল, ইরাক সম্পূর্ণরূপেই তাদের আজ্ঞাবহ হবে। মন্ত্রীরা কেউ কেউ এই চক্রান্তের সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। অতএব ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশরা মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিটিকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠাল। এঁর নাম সৈয়দ তালিব শাহ্, মন্ত্রীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম ব্যক্তি। স্বাধীনতার জন্য দেশটিকে প্রস্তুত করবার পথে ব্রিটেন এইভাবে আরেক পা এগিয়ে গেল। ১৯২১ সনের গ্রীষ্মকালে তারা হেজাজের রাজা হুসেনের ছেলে ফয়জলকে ইরাকে এনে হাজির করল; ইরাকবাসীদের জানিয়ে দিল, এঁকে চিনে নাও, ইনিই ভবিষ্যতে তোমাদের রাজা হবেন। তোমার হয়তো মনে আছে, ফয়জল সিরিয়াতে রাজা হতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফরাসিদের আক্রমণে সে রাজত্বের ইতি হয়ে গেল। অতএব তিনি তখন বেকার বসে আছেন। ব্রিটিশের তিনি বিশ্বাসী বন্ধু; বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবে যে বিদ্রোহ হয় তাতেও তাঁর অনেকখানি হাত ছিল। অতএব ইরাকী মন্ত্রীদের এ পর্যন্ত যা ভাবগতিক দেখা গেছে, তাদের তুলনায় এঁকে দিয়েই ব্রিটিশের মতলব সহজে হাসিল হবে, এইরকম একটা আশা ব্রিটেন স্বভাবতই করছিল। দেশের 'গণ্যমান্য ব্যক্তিরা', মানে ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, ফয়জলকে রাজা বলে মেনে নিতে রাজি হলেন; কিন্তু একটি শর্তে—দেশের শাসন-ব্যবস্থাটা হবে নিয়মতান্ত্রিক, তার মধ্যে একটি গণতন্ত্রী পার্লামেণ্ট থাকতে হবে। মেনে না নিয়ে অবশ্য গত্যন্তরও তাঁদের ছিল না। তাঁদের ইচ্ছা ছিল একটি সত্যকার পার্লামেণ্ট তৈরি হোক; যখন দেখলেন তাঁরা চান বা না চান, ফয়জল এবারে রাজা হচ্ছেনই, তখন অগত্যা এই পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠার শর্তটা তাঁরা আদায় করে নিলেন—দেশের জনসাধারণের মতামত বিশেষ যাচাই করা হল না। এই ভাবে, ১৯২১ সনের আগস্ট মাসে, ফয়জল ইরাকের রাজা হয়ে বসলেন।

কিন্তু আসল সমস্যার এতে মোটেই সমাধান হল না। ইরাকের প্রজারা ছিল ব্রিটিশ ম্যানডেটের অত্যন্ত বিরোধী; তারা চাইছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তার পর তারা আরব-অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে একত্র হয়ে যাবে এই তাদের ইচ্ছা। আন্দোলন এবং বিক্ষোভ প্রকাশ চলতে লাগল; এর ঠিক এক বছর পরে, ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে, অবস্থা একেবারে চরমে উঠল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন ইরাকিদের আরও একটুখানি স্বাধীনতার পড়া শিখিয়ে দিলেন। ইরাকে ব্রিটিশ হাই কমিশনার ছিলেন সার্ পার্সি কক্স্। তিনি রাজার (রাজা তখন অসুস্থ), মন্ত্রিসভার এবং ইরাককে একটা কাউন্সিল গোছের ব্যাপার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা সরিয়ে নিয়ে শাসন-ব্যাপারের সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। বস্তুত তিনিই তখন হলেন ইরাকের একচ্ছত্র ডিক্টেটর। নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে লাগলেন তিনি; ব্রিটিশ সেনার, বিশেষ করে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর সাহায্যে সমস্ত বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দমন করলেন। ভারতবর্ষ, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি সর্বত্র একই পুরোনো কাহিনী আমরা বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হল, রাজনৈতিক দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হল, নেতাদের নির্বাসনে পাঠানো হল, ব্রিটিশ এরোপ্লেনগুলি বোমা বর্ষণ করে দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করল।

কিন্তু এবারেও সমস্যা মিটল না। মাস কয়েক পরে সার্ পার্সি কক্স্ আবার রাজা এবং মন্ত্রিসভাকে তাঁদের কাজকর্ম করে যাবার অনুমতি দিলেন, অন্তত বাইরের দৃষ্টিতে। তার পর এ'দের উপরে চাপ দিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সন্ধিতে সম্মতি দিতে এ'দের বাধ্য করলেন। আবার আশ্বাস দেওয়া হল, ইংলণ্ড ইরাককে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে, এমনকি তাকে লীগ অব নেশন্সের সভ্য পর্যন্ত বানিয়ে দেবে। এইসব সুন্দর এবং সান্ত্বনাদায়ক আশ্বাসবাণীর পিছনে জেগে রইল একটি কঠিন সত্য কথা : ইরাক সরকার চাপে পড়ে স্বীকার করেছিলেন, ব্রিটিশ কর্মচারী বা ব্রিটেন কর্তৃক অনুমোদিত কর্মচারীদের সাহায্যেই তাঁরা দেশ শাসন করবেন। ১৯২২ সনের অক্টোবর মাসের এই সন্ধিটি করা হয়েছিল প্রজাদের কিছুমাত্র না জানিয়ে; প্রজারা একে স্বীকার করল না। স্পষ্টই বলল, ইরাক-সরকার বলে যেটাকে বসানো হয়েছে সে তো একটা ভুয়া সরকার; আসল ক্ষমতা এখনও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেই রয়ে গেছে। দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র রচনা করবার জন্য একটা জাতীয় ব্যবস্থাপক পরিষৎ তৈরি করার আয়োজন করা হল; নেতারা স্থির করলেন তার নির্বাচনে কেউ অংশ গ্রহণ করবেন না। এ'দের এই অসহযোগ সফল হল, পরিষৎ তৈরি করাই গেল না। দেশের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে লাগল, কর আদায় করাও কঠিন হয়ে উঠল।

এক বছরেরও বেশি কাল ধরে, ১৯২৩ সনের একেবারে শেষ পর্যন্তই, এই-সব হাঙ্গামা চলতে লাগল। অবশেষে সন্ধিটার খানিকটা সংশোধন করা হল, ইরাকের তাতে কিছু সুবিধা হল। আন্দোলনকারীদের নেতা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে নির্বাসনেও পাঠানো হল। আন্দোলনের তীব্রতা কিছু তখন কমে এল; ১৯২৪ সনের প্রথমদিকে ব্যবস্থা পরিষৎ তৈরি করবার জন্য নির্বাচন করাও সম্ভব হল। কিন্তু নির্বাচনের ফলে যে পরিষৎ তৈরি হল, সেও ব্রিটিশের সেই সন্ধিটির বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করল। সন্ধিকে মেনে নেবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিষদের উপরে দারুণ চাপ দিতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত পরিষদের মোট সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি লোক মিলে সন্ধিটাকে মঞ্জুর করে দিলেন; প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই সে অধিবেশনে উপস্থিত পর্যন্ত থাকলেন না।

ব্যবস্থাপক পরিষৎ ইরাকের জন্য একটা নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করলেন। কাগজ-পত্রে দেখে মনে হল এটি বেশ ভালো জিনিসই হয়েছে; এতে বলা হল ইরাক একটি সার্বভৌম স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে, সেখানে পুরুষানুক্রমিক এবং প্রজাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে, পার্লামেণ্টী রীতিতে দেশ শাসন করা হবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পার্লামেণ্টের দু'টি বিভাগ, তার একটির, সিনেটের সভ্যদের মনোনীত করবেন রাজা স্বয়ং। অতএব রাজার হাতে অনেকখানিই ক্ষমতা থেকে গেল, এবং রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রিটিশ কর্মচারীরা, দেশের সমস্ত প্রধান ব্যাপারের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে। ১৯২৫ সনের মার্চমাসে এই শাসনতন্ত্র চালু করা হল। নূতন পার্লামেণ্ট কয়েক বছর ধরে কাজ করে গেল; কিন্তু ম্যান্ডেট্ সম্বন্ধে যে আপত্তি ছিল সেটাও চলতে লাগল। মসুল নিয়ে তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে তুরস্কের বিবাদ চলেছে; তার দিকে এদের অনেকখানি মনোযোগ নিবিষ্ট হয়ে রইল, কারণ এই অঞ্চলটির উপরে ইরাকও একজন দাবিদার। শেষপর্যন্ত ১৯২৬ সনের জুনমাসে ইংলণ্ড, ইরাক এবং তুরস্কের মধ্যে একটি মিলিত সন্ধি হয়ে এই বিবাদের শেষ মীমাংসা হয়ে গেল। মসুল ইরাকের হাতে চলে এল; ইরাক নিজেই বাস করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া আশ্রয় করে, অতএব ব্রিটেনের স্বার্থেরও কোনো হানি ঘটল না।

১৯৩০ সনের জুন মাসে ব্রিটেন এবং ইরাকের মধ্যে নূতন করে একটা মৈত্রী-সূচক সন্ধি হল। এবারেও দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সমস্ত ব্যাপারেই ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্রিটেন স্বীকার করে নিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন কতকগুলো রক্ষাকবচ আর ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হল যে সে স্বাধীনতা কার্যত পরিণত হল একটি ঘোমটা-ঢাকা রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে। ইরাকের মধ্য দিয়ে গেছে ভারতে আসবার পথ; সন্ধিপত্রের ভাষায় এটা ব্রিটেনের "অত্যাবশ্যক যানবাহন ব্যবস্থা।' এই পথকে নিরাপদ রাখতে হবে, অতএব ইরাক ব্রিটেনকে

বিমানঘাঁটি তৈরি করবার জন্য কতকগুলো জায়গা দিয়ে দিচ্ছে। মসুল এবং অন্যান্য স্থানে ব্রিটেন তার সেনাও বসিয়ে রেখেছে। সৈন্যদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য ইরাক ব্রিটিশ শিক্ষক রাখতে পারবে; ইরাকের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শদাতা হিসাবে থাকবেন ব্রিটিশ সেনানীরা। অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি এরোপ্লেন ইত্যাদি যা দরকার ইরাককে ব্রিটেনের কাছ থেকেই কিনতে হবে। যুদ্ধ বাধলে তখন দেশের মধ্যে ব্রিটেনকে সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিতে হবে, যেন শত্রুর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধের আয়োজন অবাধে চলতে পারে। এর ফলে, মসুলের চারপাশে যে সামরিক ঘাঁটি আছে সেখান থেকে ব্রিটেন সহজেই তুরস্ক পারশ্য বা আজারবাইজানে অবস্থিত সোভিয়েট এলাকাগুলোর উপর আঘাত হানতে পারবে।

এই সন্ধির পরে, ১৯৩১ সনে ব্রিটেন আর ইরাকের মধ্যে আবার একটা বিচার-সম্পর্কীয় চুক্তি হল। এই চুক্তিপত্রে ইরাক প্রতিশ্রুতি দিল, সে একজন ব্রিটিশ জুডিসিয়াল অ্যাডভাইজার নিয়োগ করবে, তার আপীল-আদালতে একজন ব্রিটিশকে প্রেসিডেন্ট করে বসাবে, বাগদাদ, বসরা, মসুল এবং আরও কয়েকটা জায়গাতে প্রেসিডেন্টের আসনে ব্রিটিশ কর্মচারী নিযুক্ত করবে।

এই-সব ব্যবস্থা তো আছেই; এ ছাড়াও দেশের বহু উচ্চ পদ ব্রিটিশ কর্মচারীরা দখল করে বসে আছে বলে দেখা যায়। অতএব এই 'স্বাধীন' দেশটি কার্যত পরিণত হয়েছে ইংলণ্ডের একটি রক্ষাধীন অঞ্চলে। এই ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়া হয়েছে ১৯৩০ সনের মৈত্রী-সূচক সন্ধিতে, মেয়াদ পুরো পঁচিশটি বছর ধরে চলবে।

১৯২৫ সনে নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হল, তারপর থেকেই নূতন পার্লামেণ্ট কাজ শুরু করল। কিন্তু প্রজারা তখনও মোটেই সন্তুষ্ট নয়; বাইরের দিকের অঞ্চলগুলোতে মাঝে-মাঝেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। বিশেষ করে এটা ঘটল কুর্দদের এলাকায়। সেখানে তারা বরাবর বিদ্রোহ করছিল। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী সে বিদ্রোহ দমন করল অতি সুষ্ঠু উপায়ে, বোমা ফেলে এবং গ্রামের পর গ্রাম আস্ত উড়িয়ে দিয়ে। ১৯৩০ সনের সন্ধির পরে কথা উঠল, এবার তো ব্রিটিশের আশ্রয়ে ইরাককে লীগ অব নেশনসের সভ্য করে নিতে হয়। কিন্তু দেশে তখন শান্তি নেই, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলা চলেছে। সেটা কারও পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়—না ম্যানডেটের ক্ষমতা যার হাতে দেওয়া হয়েছে সেই ব্রিটেনের পক্ষে; না দেশে তখন রাজা ফয়জলের যে সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার পক্ষে। দেশে এইসব বিদ্রোহ চলেছে, এর থেকেই তো স্পষ্ট প্রমাণ হয়, দেশের লোকেদের ঘাড়ে ব্রিটিশরা যে সরকারটিকে বসিয়ে দিয়েছে তার কাজকর্মে প্রজারা সন্তুষ্ট নয়। এখন এইসব কথা যদি আবার লীগ অব নেশনসের কানে গিয়ে ওঠে, সে তো ভয়ানক অন্যায় ব্যাপার হবে। অতএব তখন বলপ্রয়োগ আর ত্রাসসৃষ্টি করে এইসব বিশৃঙ্খলা থামিয়ে দেবার একটা খুব বিশেষ রকমের চেষ্টা করা হল। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হল; শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের যে চেষ্টা এরা করল, তার স্বরূপ খানিকটা জানা যায় বড়ো একজন ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রদত্ত বর্ণনা থেকে। ১৯৩২ সনের ৮ই জুন তারিখে লণ্ডন শহরে রয়াল এসিয়ান সোসাইটির বার্ষিক উৎসব হল, সেখানে বক্তৃতা দিতে উঠে লেফটেনাণ্ট কর্নেল সার্ আর্নল্ড উইলসন বললেন :

"কী দৃঢ় সংকল্পসহকারে (জেনেভাতে অবশ্য একথা কোনোদিনই স্বীকার করা হয় নি) রাজকীয় বিমানবাহিনী গত দশ বৎসর যাবৎ এবং বিশেষ করে গত ছয় মাস ধরে কুর্দ প্রজাদের উপরে বোমাবর্ষণ চালিয়ে এসেছে। 'টাইমস' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা একে বলেছেন সর্বত্র একটি সমান ধরনের সভ্যতার বিস্তার—অসংখ্য বিধ্বস্ত গ্রাম, নিহত পশুপাল, অঙ্গহীন নারী ও শিশু সে সভ্যতা বিস্তারের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।"

দেখা গেল, গ্রামের লোকগুলো একেবারেই গ্রাম্য; এরোপ্লেন আসছে দেখলেই তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে, বোমাগুলো এত কষ্ট করে তাদের মারতে আসছে অথচ তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞান পর্যন্ত তাদের নেই। দেখেশুনে তখন এক নূতন ধরনের বোমা ফেলা হতে লাগল, তার নাম কাল-বিলম্বী বোমা। এই বোমা মাটিতে পড়েই ফেটে যায় না। এতে দম দেওয়া থাকে, পরে যে-কোনো একটা সময়ে ফাটে। গ্রাম-

বাসীদের ঠকানোর জন্য এই শয়তানি ফন্দি খাটানো হল; এরোপ্লেন চলে গেল দেখে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তার পর হঠাৎ একসময়ে বোমা ফেটে তাদের ঘায়েল করে। যারা এতে মরল তাদেরই বরং ভাগ্য ভালো বলতে হবে। যারা অঙ্গহীন হয়ে বেঁচে রইল, যাদের হাত-পা একটা বোমার ঘায়ে উড়ে গেল বা অন্য কোনো রকমের নিদারুণ আঘাত লাগল, তাদের ভাগ্য অনেক বেশি খারাপ, কারণ দূর মফঃস্বলের সেই গ্রাম্য অঞ্চলে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই তাদের ছিল না।

এমনি করে দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা হল; তার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আশীর্বাণী শিরে ধারণ করে ইরাক সরকার লীগ অব নেশন্সের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, লীগের সভ্য বলে তাকে গণ্য করে নেওয়া হল। ব্যাপারটাকে ব্যঙ্গ করে একজন বলেছিলেন, ইরাক সম্বন্ধে 'বোমার ঘায়েই' লীগের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। অতি সত্য কথা।

ইরাক এখন লীগ অব নেশন্সের সভ্য। অতএব তার উপরে ব্রিটেন যে ম্যান্‌ডেট্ পেয়েছিল তারও মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তার জায়গাতে তৈরি হয়েছে ১৯৩০ সনের সন্ধিপত্র। ব্রিটিশরা যাতে রাজ্যটাকে ঠিকমতো হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারে, তার সব ব্যবস্থাই এতে করা হয়েছে। এর ফলে প্রজার অসন্তোষও সমানই টিকে রয়েছে; ইরাকের প্রজাদের কাম্য হচ্ছে স্বাধীনতা এবং আরব অঞ্চলের সমস্ত জাতিগুলোর একত্র মিলন। ইরাক লীগ অব নেশন্সের সভ্য হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে তাদের বিশেষ উৎসাহ নেই। প্রাচ্য-দেশের প্রায় সমস্ত পদানত জাতিরই মনে লীগ অব নেশন্স্ সম্বন্ধে যে ধারণা, ইরাকীদেরও ধারণা ঠিক তাই—তারা জানে লীগ হচ্ছে শুধু ইউরোপের বড়ো বড়ো জাতিগুলোর হাতের একটা যন্ত্র, একে দিয়ে তারা নিজেদের উপনিবেশ এবং অন্যান্য ব্যাপার-সংক্রান্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে নিচ্ছে।*

আরব-অঞ্চলের জাতিগুলোর কথা বলা আমাদের শেষ হল। এটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্য-জগতের আরও অনেক দেশের মতো, এই দেশগুলিও জাতীয়তাবাদের প্রবল বন্যায় কীরকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ, একই সঙ্গে তাদের সকলেরই মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। আরেকটি লক্ষ্য করবার বস্তু হচ্ছে, প্রত্যেকেই এরা আন্দোলন চালাবার যে-সব রীতি ও নীতি গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য ছিল। এর অনেক দেশেই সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু তারপর ক্রমশ এরা সকলেই বেশি করে নির্ভর করেছে অসহযোগ এবং বয়কট-নীতির উপরে। একথা নিঃসন্দেহ, প্রতিরোধের এই নূতন পন্থাটির প্রবর্তন করেছিল ভারতবর্ষ, ১৯২০ সনে যখন কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্ব মেনে নিল তখন থেকে। অসহযোগ এবং আইন-পরিষৎ বর্জনের বুদ্ধিটা ভারতবর্ষ থেকেই প্রাচ্য-জগতের অন্যান্য দেশে সংক্রামিত হয়েছে। এখন এটি জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি প্রকৃষ্ট রীতি বলে গণ্য, এর প্রয়োগও প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী প্রভু হিসাবে অধীন দেশকে করায়ত্ত রাখবার জন্য যে নীতি ইংলণ্ড খাটায় এবং যে নীতি ফ্রান্স খাটায়, এদের মধ্যে একটা চমৎকার প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডের যেখানে যে উপনিবেশ আছে তার প্রত্যেক জায়গাতেই সে চেষ্টা করে, সামন্তপন্থী, ভূস্বামী এবং প্রজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্ষণপন্থী এবং অনগ্রসর শ্রেণীগুলোর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে। ভারতবর্ষে, মিশরে এবং আরও বহু দেশে তার এই খেলাই আমরা দেখেছি। অধীন দেশে সে একটা করে অত্যন্ত নড়বড়ে সিংহাসন খাড়া করে, অত্যন্ত প্রগতিবিরোধী একটা লোককে এনে সেই সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, বেশ জানে সে লোকটা প্রাণের দায়েই তার পক্ষ টেনে চলবে। এই জন্যই সে মিশরের সিংহাসনে ফুয়াদকে বসিয়ে রেখেছে; ইরাকে বসিয়েছে ফয়জলকে, ট্রান্স-জর্ডনে আবদুল্লাকে; এই জন্যই হেজাজে সে হুসেনকে রাজা করতে চেয়েছিল। ফ্রান্সের

* ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বরে রাজা ফয়জল পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র প্রথম গাজী সিংহাসন লাভ করেন। তিনি আবার ১৯৩৯ সনে এক দুর্ঘটনার ফলে মারা যান এবং তাঁর শিশুপুত্র তাঁর স্থলে রাজা হন।

নীতি আলাদা। ফ্রান্স হচ্ছে খাঁটি বুর্জোয়ার দেশ; তাই সে চেষ্টা করে অধীন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অংশকে, নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, হাত করে নিতে। সিরিয়াতে সে খৃষ্টান মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর সমর্থন লাভ করবার চেষ্টা করেছিল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অধীনে যত দেশ এবং উপনিবেশ আছে, তার সর্বত্র এরা দু'জনে একটি নীতিই প্রধানত অনুসরণ করছে; সে হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে উঠছে তাকে দুর্বল করে ফেলা—এর জন্য তারা সে দেশের মধ্যে দলাদলি ভাগাভাগির সৃষ্টি করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে নানা রকমের জটিল সমস্যা তৈরি করে দেয়। কিন্তু প্রাচ্য-জগতের সর্বত্রই আজ জাতীয়তা-বাদের চেতনা এই সব ভাগাভাগির বুদ্ধিকে ক্রমশ ডিঙিয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। মধ্য-প্রাচ্যের এই আরব দেশগুলিতে এই জয়ের লক্ষণ যতখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এমন বোধ হয় আর কোথাও হয় নি—সেখানে এক-জাতিত্বের আদর্শের সামনে পড়ে ধর্মগত সম্প্রদায়-বুদ্ধি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ইরাকে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনী যে বিষম বীরত্ব দেখিয়েছে তার কথা তোমাকে বলেছি। গেল বছর বারো যাবৎ ব্রিটিশ সরকারের নীতিই হয়ে উঠেছে, তাদের অধীনে যে-সব আধা-উপনিবেশশ্রেণীর দেশ আছে, সেখানে 'পুলিশের কাজ' করতে এইভাবে বিমান-বাহিনীকে ব্যবহার করা। এটা আবার বিশেষ করে করা হচ্ছে সেই-সব জায়গাতে, যেখানে খানিকটা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতএব যেখানে দেশ-শাসনের ভার আছে প্রধানত সেই দেশবাসীদেরই হাতে। এখন আর ব্রিটেন এইসব দেশে দখলকারী সেনা-বাহিনী বসিয়ে রাখছে না; বা রাখলেও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। এর অনেকগুলি সুবিধা। এতে তাদের প্রচুর পরিমাণ টাকা বেঁচে যায়; দেশটাকে যে সৈন্য দিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে তারও প্রমাণ আর তেমন চোখে পড়ে না। অথচ এরোপ্লেন আর বোমার জোরে দেশটাতে তাদের প্রভুত্ব এবং নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। এইভাবে এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণের ব্যবস্থা আছে বলেই ব্রিটেন এখন আরও বহু স্থানকে 'স্বাধীনতা' দিয়ে দিতে পেরেছে; বোমা বর্ষণের নীতিটা ব্রিটেনই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে, অন্য কোনো দেশ এতটা করে না। ইরাকের কথা তোমাকে আমি বলেছি। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধেও ঠিক এই গল্পই বলা চলে, সেখানে এই রকম বোমাবর্ষণ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

আগের দিনে বিদ্রোহী প্রজাকে শায়েস্তা করতে সেনাবাহিনী পাঠানো হত। বোমা বর্ষণ করাতে হয়তো তার চেয়ে খরচ কম, হয়তো ফলও বেশি দ্রুত হয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থা, অমানুষিক পন্থা। বোমা ফেলে, বিশেষত, কাল-বিলম্বী বোমা ফেলে, আস্ত এক একটা গ্রামকে ধ্বংস করা, দোষী-নির্দোষ-নির্বিচারে সমস্ত লোককে হত্যা করা, এর চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ এবং অধিকতর বর্বরোচিত আচরণ কল্পনা করাও সত্যই কঠিন। তা ছাড়া এই উপায়ে অন্য দেশের উপরে আক্রমণ করাও অত্যন্ত সহজ। অতএব এখন এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ শুরু হয়েছে; বিমান দিয়ে অসামরিক জনতার উপরে আক্রমণ চালানোকে বর্বরোচিত ব্যাপার বলে নিন্দা করে জেনেভাতে লীগ অব নেশনসের সভাগৃহে খুব মস্ত মস্ত বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। অন্য সমস্ত দেশের প্রতিনিধিই বিমান থেকে বোমাবর্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হোক বলে জোর দাবি জানিয়েছেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এই মতই প্রকাশ করছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে রাজি হচ্ছেন না; তাঁদের দাবি, উপনিবেশগুলিতে 'পুলিশী ব্যবস্থা'র জন্য বিমান-ব্যবহারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা হোক। এই দাবির দরুনই লীগের সভাতে এবং ১৯৩৩ সালের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে মতৈক্য হতে পারে নি।

আফগানিস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ

৮ই জন্, ১৯৩৩

ইরাকের প্র্বদিকে রয়েছে ইরান বা পারশ্য; পারশ্যের প্রবে আফগানিস্তান। পারশ্য এবং আফগানিস্তান দুইই ভারতবর্ষের প্রতিবেশী—(বেলুচিস্তানে) কয়েক শো মাইল ধরেই পারশ্যের সীমান্ত ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে চলেছে; বেলুচিস্তানের একেবারে পশ্চিম-প্রান্ত থেকে শুরু করে উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল ধরে আফগানিস্তান আর ভারতবর্ষ পরস্পরের গায়ে ঠেকে রয়েছে। মধ্য-এশিয়ার এই হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোলেই ভারতবর্ষ তার তুষার-ধবল মাথাটি রেখে আরামে শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে সোভিয়েটদের এলাকার দিকে তাকিয়ে দেখছে। এই তিনটি দেশ শুধু প্রতিবেশী নয়, জাতি হিসাবেও এরা পরস্পরের জ্ঞাতি, কারণ এই তিনটি দেশেই প্রাচীন আর্যদের বংশধরদের প্রাধান্য। সংস্কৃতির দিক থেকে সুদূর অতীত কালেও এদের মধ্যে অনেকখানি মিল ছিল, সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি। অল্পদিন আগেও পারসী-ভাষাই ছিল উত্তর ভারতের পণ্ডিতব্যক্তিদের ভাষা; এখনও এদেশে এই ভাষার বহুল প্রচলন আছে, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে। আফগানিস্তানের দরবারে এখনও পারসী ভাষাই চলছে; আফগানদের জনসাধারণের ভাষা হচ্ছে পুশ্তু।

পারশ্য সম্বন্ধে তোমাকে আমি আগের চিঠিগুলোতে যা বলেছি, তার বেশি আর এখানে কিছু বলব না। কিন্তু আফগানিস্তানে যে-সব ব্যাপার সম্প্রতি ঘটে গেল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দরকার। আফগানিস্তানের ইতিহাস বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই একটা অধ্যায়; বাস্তবিক বহুদিন ধরে আফগানিস্তান ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে এবং বিশেষ করে গত একশো বছর বা কিছু বেশিকাল ধরে, আফগানিস্তান হয়েছে রাশিয়া আর ইংলণ্ডের বিরাট দুই সাম্রাজ্যের মাঝে, দুদিকেরই ধাক্কা আটকাবার প্রাচীর রাষ্ট্র। রাশিয়ার সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, তার জায়গাতে এসেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন; কিন্তু আফগানিস্তান এখনও তার সেই পুরনো ভূমিকা, প্রাচীরের ভূমিকাই অভিনয় করে চলেছে—ইংরেজরা আর রুশরা এই দেশে এসে নানা ষড়যন্ত্র ফিকির-ফন্দী আঁটছে, অন্যকে হটিয়ে দিয়ে দেশটাকে হাতের মুঠোয় পুরবার চেষ্টা করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এদের এই-সব চক্রান্তের ফলেই ইংলণ্ড আর আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে ইংরেজরা বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য তাদেরই হল। আফগান রাজবংশের বহু লোক আজও রাজবন্দী হিসাবে উত্তর-ভারতের বহুস্থানে আটক হয়ে আছেন, আফগানিস্তানে যে ইংরেজের হস্তক্ষেপ ঘটেছিল এ'রা তারই স্মৃতিচিহ্ন। তারপর সিংহাসন গেল ব্রিটেনের মিত্রস্থানীয় আমীরদের দখলে; আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণরূপেই ব্রিটিশের নির্দেশ অনুসারে চলতে লাগল। কিন্তু ইংরেজের প্রতি বন্ধুভাব এ'দের যতই থাক, তবু এই আমীরদের পুরোপুরি বিশ্বাস করা যেত না; অতএব এ'দের প্রসন্ন এবং ব্রিটিশের অনুগত করে রাখবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকা এ'দের সাহায্য বলে দিতে লাগলেন। এই রকমেরই বৃত্তিভোগী রাজা ছিলেন আমীর আবদুর রহমান, ১৯০১ সনে এ'র দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের অবসান হয়। তাঁর পরে এলেন আমীর হবিবুল্লা, ব্রিটিশের সঙ্গে তাঁরও সম্প্রীতি ছিল।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আফগানিস্তান এত অনুগত কেন, তার একটা কারণ হচ্ছে সে দেশটির অদ্ভুত অবস্থিতি। মানচিত্রে দেখবে, সমুদ্রের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগ নেই, তার আর সমুদ্রের মাঝখানে রয়েছে বেলুচিস্তান, অতএব এটার অবস্থা হচ্ছে একটা বন্ধ বাড়ির মতো, যার অন্য কারও জমির উপর দিয়ে ছাড়া বড়ো রাস্তায় বেরোবার পথ নেই। সেটা একটা মুশকিলের অবস্থা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার এর সবচেয়ে সোজা

পথটাই ছিল ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে। আফগানিস্তানের উত্তরদিকে রাশিয়ার যে অঞ্চলটি, আগের দিনে সেখানে যানবাহনের কোনো ভালো ব্যবস্থাই ছিল না। আজকাল বোধ হয় সোভিয়েট সরকার সেখানে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন, রেলওয়ে তৈরি করেছেন এবং বিমান ও মোটর চলাচলের সহায়তা করছেন। ভারতবর্ষই হল আফগানিস্তানের পক্ষে বাইরের হাওয়া পাবার জানালা; অতএব ব্রিটিশ সরকার সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে নিতে পারতেন, নানা দিক থেকেই আফগানিস্তানের উপরে জুলুম চালাতেন। আফগানিস্তানের পক্ষে সমুদ্রে বেরোনো মুশকিল, এইটাই এখনও এই দেশটির পক্ষে একটা বড়ো সমস্যা হয়ে রয়েছে।

আফগান দরবারের ভিতরে সারাক্ষণই চক্রান্ত আর রেষারেষি লেগে ছিল; ১৯১৯ সনের প্রথম দিকে সেটা বাইরে ফুটে বেরুল, খুব অল্পদিনের মধ্যে পরপর দুটো প্রাসাদ-বিপ্লব ঘটে গেল। বাইরে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার নেপথ্যে কী ছিল, বা এই-সব পরিবর্তনের মূলে কার হাত ছিল, সেটা আমার ঠিক জানা নেই। প্রথমে আমীর হবিবুল্লাকে কে একজন খুন করল। তাঁর ভাই নসরুল্লা তখন আমীর হয়ে বসলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার নসরুল্লাকেও সরিয়ে দেওয়া হল। এবারে আমীর হলেন আমানুল্লা, হবিবুল্লার কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে একজন। এর ঠিক পরেই, ১৯১৯ সনের মে মাসে, তিনি ভারতবর্ষের উপর একটি ছোটো খাটো আক্রমণ চালালেন। সে আক্রমণ করবার আপাত কারণ কী ঘটেছিল, বা তার প্রথম উদ্যোক্তা কে ছিলেন, তাও আমি জানিনে। খুব সম্ভবত, ব্রিটিশের প্রতি কোনো প্রকার আনুগত্য স্বীকার করে থাকাটাই আমানুল্লা পছন্দ করতেন না, তাই তিনি তাঁর দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এটাও সম্ভবত আশা করেছিলেন তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তাঁরই অনুকূল হবে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ঠিক সেই সময়ের কথা, যখন পাঞ্জাবে সামরিক আইনের শাসন চলেছে, ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, এবং খিলাফৎ সমস্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠছে। যাই হোক, কারণ এবং লোভ এর গোড়ায় যাই থাক, এই আক্রমণের ফলে ব্রিটিশদের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধ কিন্তু চলল আশ্চর্যরকম অল্পদিন, আর লড়াই বলতে বিশেষ কিছু হলই না এতে। সমরনীতির দিক থেকে অবশ্য বলতে হবে, ভারতের ব্রিটিশ সরকারের শক্তি আমানুল্লার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করবার মতো প্রবৃত্তি তখন তাঁদের নেই, অতএব দুটো-চারটে খুচরো মারামারি হবার পরেই তাঁরা আফগানদের সঙ্গে সন্ধি করতে এগিয়ে গেলেন। এর ফলে আফগানিস্তানকে তাঁরা স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করে নিলেন, অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণ ক্ষমতাও তাঁর নিজের হাতেই থাকবে। আমানুল্লা যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেলেন, ইউরোপ এবং এশিয়ার সর্বত্র তাঁর মানমর্যাদাও অনেক বেড়ে গেল। স্বভাবতই ব্রিটিশরা আর তাঁর উপরে প্রসন্ন রইল না।

মানুষের দৃষ্টি এর চেয়েও বেশি আকর্ষণ করলেন আমানুল্লা আরেকটি কাজের জন্য—দেশে তিনি একটি নূতন নীতির প্রবর্তন করলেন। এই নীতিটি হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে দেশের দ্রুত সংস্কার সাধন—একে নাম দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানের 'পাশ্চাত্ত্যীকরণ'। আমানুল্লার স্ত্রী রাণী সৌরিয়া এই কাজে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। সৌরিয়ার খানিকটা শিক্ষা হয়েছিল ইউরোপে, অবগুণ্ঠন এবং বোরখার আড়ালে মেয়েদের যেভাবে আবদ্ধ করে রাখা হত তার উপরে তিনি নিদারুণ চটা ছিলেন। অতএব শুরু হল একটা অদ্ভুত অভিযান; অত্যন্ত সেকেলে একটা দেশকে অতি অল্প দিনের মধ্যে আগাগোড়া বদলে ফেলার অভিযান, প্রাচীন রীতির যে নেমিরেখা ধরে চলতে আফগানরা এতদিন অভ্যস্ত ছিল, তার মোহ কাটিয়ে নূতন পথে তাকে চলতে শেখানোর অভিযান। মুস্তাফা কামাল পাশাকেই তাঁর আদর্শ বলে আমানুল্লা মেনে নিয়েছিলেন সেটা বেশ বোঝা যায়; অনেক ব্যাপারেই তিনি কামালকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেন—আফগানদের তিনি কোট প্যান্টলুন এবং সাহেবী টুপি পরালেন, দাড়ি কামাতে পর্যন্ত বাধ্য করলেন তাদের। কিন্তু মুস্তাফা কামালের বিশেষত্ব যে দৃঢ়তা বা কর্ম-ক্ষমতা, আমানুল্লার সেটা ছিল না। কামাল পাশা দেশময় সংস্কারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন,

আ ফ গা নি স্থা ন
সো ভি য়ে ট রা শি য়া
তাশখন্দ
বোখারা
সমরকন্দ
মার্ভ
সিন্কিয়াঙ
পা মি র
আ ফ গা নি স্থা ন
হিরাট
কাবুল
খাইবার
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
কোয়েটা
মুলতান
বেলুচিস্থান
ভা র ত ব র্ষ
করাচি
রেলপথ
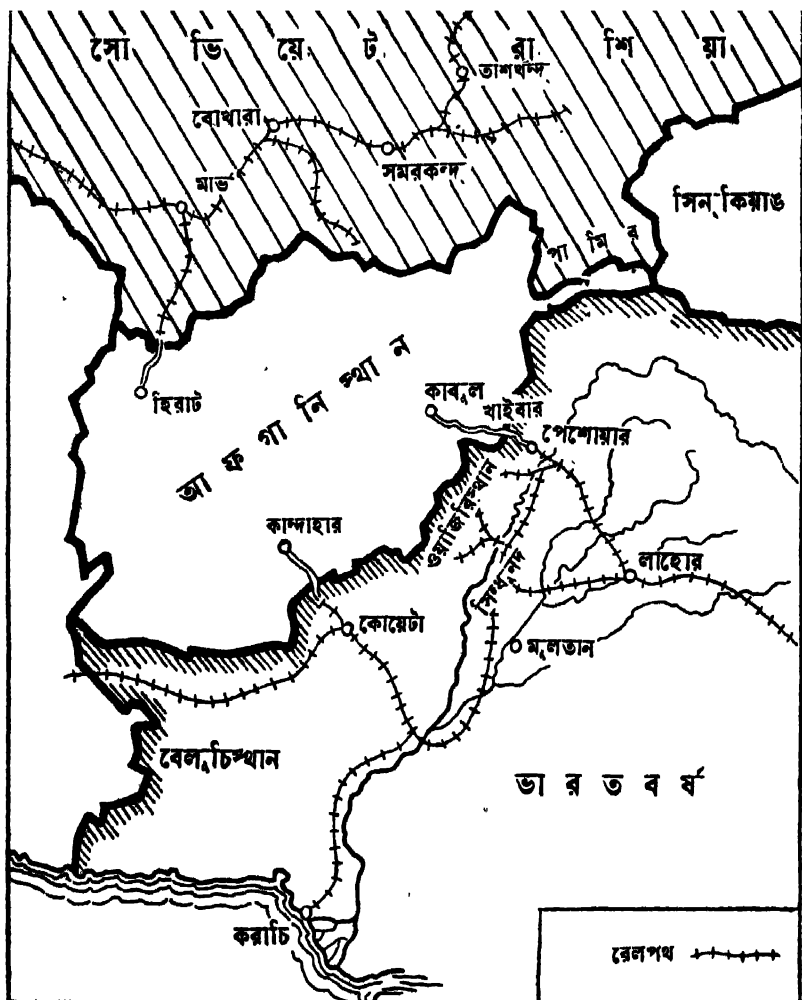
কিন্তু সে চেষ্টা শুরু করবার আগে তিনি দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে উভয়ত্রই তাঁর নিজের আসন সম্পূর্ণ দৃঢ় করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর পিছনে ছিল একটি সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী; দেশের সমস্ত লোকের মনেও তাঁর প্রতি একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ছিল। আমানুল্লা এ-সব কোনো ব্যবস্থাই করলেন না, সোজা এগিয়ে চললেন। কামালের তুলনায় তাঁর কাজও ছিল অনেক বেশি কঠিন, কারণ তুর্কিদের তুলনায় আফগানরা ছিল অনেক বেশি সেকেলে।

কাজ ঘটে যাবার পর অবশ্য বিজ্ঞের মতো উপদেশ সবাই দিতে পারে। আমানুল্লার অভিযানের সেই প্রথম কটি বছর মনে হল যেন তিনি যা দিয়ে যা করবেন তাইই হয়ে যাবে। বহু আফগান ছেলে ও মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখতে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন। শাসন-ব্যাপারেও বহু সংস্কার তিনি ঘটাতে আরম্ভ করলেন। প্রতিবেশী রাজ্যদের সঙ্গে এবং তুরস্কের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর আসন দৃঢ় করে নিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া ভেবেচিন্তেই চীন থেকে তুরস্ক পর্যন্ত প্রাচ্য জগতের সমস্ত দেশের প্রতি—একটা খুব উদার এবং বন্ধুত্বের নীতি অবলম্বন করেছিল; তুরস্ক এবং পারস্য বিদেশীর কবল থেকে মুক্তি অর্জন করল, তার মধ্যেও সোভিয়েটের এই বন্ধুত্ব এবং সাহায্যের হাত ছিল অনেকখানি। ১৯১৯ সনে ইংলণ্ডের সঙ্গে অল্পদিনমাত্র যুদ্ধ করেই আমানুল্লা অতি সহজে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিয়েছিলেন, তারও মূলে নিশ্চয়ই একটা বড়ো কারণ ছিল এই সোভিয়েটের বন্ধুত্ব। এর পরবর্তী কয়েকটি বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, তুরস্ক, পারস্য আর আফগানিস্তান, এই চারটি দেশের মধ্যে পরস্পর অনেকগুলো সন্ধি এবং মৈত্রী স্থাপিত হল। এদের চারজনের মধ্যে একত্র, বা কোনো তিনজনকে নিয়ে একত্র, কোন সন্ধি হয় নি। প্রত্যেকেই অন্য তিনজনের সঙ্গে আলাদা আলাদা সন্ধি করেছে, সন্ধির শর্ত যদিও মোটামুটি প্রায় সকলের বেলাই এক। এইভাবে মধ্য-প্রাচ্যে একটা সন্ধির জাল তৈরি হয়ে গেল, তার ফলে এর প্রত্যেকটি দেশেরই শক্তি বেড়ে গেল। এই সন্ধিগুলোর এবং কোন্ সন্ধি কবে হয়েছিল, তার তারিখের একটা তালিকা আমি তোমাকে দিচ্ছি :

তুর্কি-আফগান	সন্ধি	...	...	...	১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২১
সোভিয়েট-তুর্কি	”	...	...	...	১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৫
তুর্কি-পারস্য	”	...	...	...	২২শে এপ্রিল, ১৯২৬
সোভিয়েট-আফগান	”	...	...	...	৩১শে আগস্ট, ১৯২৬
সোভিয়েট-পারস্য	”	...	...	...	১লা অক্টোবর, ১৯২৭
পারস্য-আফগান	”	...	...	...	২৮শে নভেম্বর, ১৯২৭

এই সন্ধিগুলো হল আসলে সোভিয়েটের কূটনীতিরই ফলে; তার পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড জয়লাভ। মধ্য-প্রাচ্যে ব্রিটিশের প্রতিপত্তিও এর ফলে প্রচণ্ড একটা আঘাত খেল। বলাই বাহুল্য, ব্রিটিশ সরকার এই-সব সন্ধি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করলেন; সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আমানুল্লার প্রীতি এবং আকর্ষণ তাঁরা বিশেষভাবেই অপছন্দ করলেন।

১৯২৮ সনের গোড়ার দিকে আমানুল্লা এবং রাণী সৌরিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে ইউরোপ-ভ্রমণে বার হলেন। ইউরোপের অনেক দেশের রাজধানীতেই গেলেন তাঁরা—রোম, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন, মস্কো। প্রত্যেক জায়গাতেই তাঁরা বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। দেখা গেল প্রত্যেক দেশই আমানুল্লার সঙ্গে সদ্ভাব-স্থাপন করতে ব্যগ্র, নিজের বাণিজ্যের এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের গরজে। বহু মূল্যবান উপহারও এঁদের কাছে তিনি পেলেন। কিন্তু আমানুল্লা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মতোই চুপ করে রইলেন, কারও কোনো কথায় ধরা-ছোঁওয়া দিলেন না। দেশে ফিরবার পথে তিনি তুরস্ক আর পারস্য দেশ বেড়িয়ে এলেন।

আমানুল্লার দীর্ঘ দেশভ্রমণ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমানুল্লার সম্মান-প্রতিপত্তি এতে অনেক বাড়ল। কিন্তু আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থা বিশেষ ভালো

যাচ্ছিল না। দেশে অতি বৃহৎ রকমের সব পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে, লোকের জীবনযাত্রার প্রাচীন পদ্ধতিটাই তার ফলে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে—এমন একটা সংকট-মুহূর্তে দেশ ছেড়ে বাইরে গিয়ে আমানুল্লা প্রকাণ্ড একটা অন্যায় দুঃসাহসের কাজ করেছিলেন। এই ঝুঁকি মুস্তাফা কামাল কখনও নেন নি। দীর্ঘকাল আমানুল্লা দেশের বাইরে গিয়ে রইলেন; দেশের মধ্যে যেখানে যত প্রগতি-বিরোধী লোক ছিল, তাঁর যত বিরুদ্ধ পক্ষ ছিল, তাঁর সেই অনুপস্থিতির সুযোগে তারা সবাই ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে জেগে উঠল। দেশে নানা রকমের চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র শুরু হল; আমানুল্লাকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্য নানারকমের গুজব রটানো হতে লাগল। বেশ বোঝা গেল, আমানুল্লার বিরুদ্ধে এই প্রচারকার্য চালাবার জন্য রাশি রাশি টাকা জলস্রোতের মতো এসে হাজির হচ্ছে; কিন্তু কোথা থেকে সে টাকা আসছে তা কেউ জানে না। বহু মোল্লা বা পুরোহিত এই কাজের জন্য রীতিমতো টাকা পেতে লাগল, দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এরা প্রচার করতে লাগল, আমানুল্লা কাফের, ধর্মদ্রোহী। গ্রামে গ্রামে রাণী সৌরিয়ার অদ্ভুত সব ছবি হাজারে হাজারে বিলানো হতে লাগল—তার কোনটাতে তিনি ইউরোপীয় সান্ধ্য-পরিচ্ছদ প'রে রয়েছেন, কোনোটাতে বা শুধু একটা ঢিলে অন্তর্বাস মাত্র তাঁর পরনে—এই ছবি দিয়ে লোককে বোঝানো হতে লাগল, কী রকম অশোভন শালীনত্ব-হীন পোশাক প'রে তিনি বাইরে বেড়াচ্ছেন। এই বহু-ব্যাপক এবং বহুব্যয়সাধ্য প্রচারকার্য চালাচ্ছিল কে? আফগানদের এ চালাবার মতো টাকাও ছিল না, শিক্ষাও ছিল না—তারা শুধু হয়েছিল এই বস্তু গলাধঃকরণ করবার যোগ্য পাত্র। মধ্য-প্রাচ্যের এবং ইউরোপের অনেক লোকই তখন বিশ্বাস করত এবং বলত, এই প্রচারকার্যের পিছনে রয়েছে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ। এ-সব ব্যাপার অবশ্য কোনোদিনই প্রমাণ করা যায় না; এই কাজের সঙ্গে ব্রিটিশদের সংস্রব প্রমাণ করা যেতে পারে এমন কোনো নিশ্চিত অভিজ্ঞানও তখন পাওয়া যায় নি। কিন্তু শোনা যায় নাকি আফগান বিদ্রোহীরা সজ্জিত ছিল ব্রিটিশ রাইফেল দিয়েই। সে যাই হোক, আফগানিস্তানে আমানুল্লার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করে ফেলাতে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, একথাটা তখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

আফগানিস্তানে যখন তাঁর পায়ের তলায় মাটি এমনি করে ধ্বসিয়ে ফেলা হচ্ছে, আমানুল্লা তখন ইউরোপের রাজধানীতে রাজধানীতে বিরাট রকমের অভ্যর্থনা নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সংকল্পিত সংস্কার সাধনের জন্য নূতন উদ্যমে ভরপুর হয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন, নূতন নূতন কল্পনায় তাঁর মন ভরা; আঙ্গোরাতে কামাল পাশার সঙ্গে এবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে এসেই তিনি সেই-সব নূতন সংস্কার প্রবর্তনের আয়োজনে লেগে গেলেন। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যে-সব পুরুষানুক্রমিক পদবী ছিল সেগুলো তুলে দিলেন; মোল্লা-মৌলবী ইত্যাদি ধর্মগুরুদের ক্ষমতা কমিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। শাসনকার্যের জন্য প্রজার কাছে দায়ী একটা মন্ত্রিপরিষৎ বা ক্যাবিনেট পর্যন্ত গড়তে চাইলেন, যদিও তা করার মানেই ছিল তাঁর নিজের স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতাকে অনেকখানি খর্ব করা। নারীদের মুক্তির ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন।

আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, অকস্মাৎ একদিন সে আগুন একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল—১৯২৮ সনের শেষদিকে দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। বিদ্রোহ ক্রমে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, বাচ্চা-ই-সাকো নামক একজন সাধারণ ভিস্তিওয়ালা তার নেতা। ১৯২৯ সনে বিদ্রোহীরা জয়লাভ করল। আমানুল্লা এবং রাণী সৌরিয়া দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন; ভিস্তিওয়ালা বাচ্চা-ই-সাকো এবার আমীর হয়ে বসল। পাঁচ মাস ধরে বাচ্চা-ই-সাকো কাবুলে রাজত্ব করল; তার পর তাঁকে আবার সরিয়ে দিলেন নাদির খাঁ—আমানুল্লার তিনি ছিলেন একজন সেনাপতি এবং মন্ত্রী। নাদির খাঁ নিজের তরফ থেকেই লড়ছিলেন; জয়লাভ করবার পরে তিনি নিজেই দেশের রাজার আসনে উঠে বসলেন, তাঁর নাম হল নাদির শা। দেশে পুনঃ পুনঃ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটতে লাগল, কিন্তু নাদির শার রাজত্বও চলতে লাগল, যেহেতু তিনি ইংলণ্ডের মিত্র ছিলেন এবং তার কাছ থেকে সাহায্য পেলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁকে অনেক টাকা বিনাসুদে ধার দিল এবং রাইফেল ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেও সাহায্য করল। আফগানিস্তানের বিশৃঙ্খল

অবস্থার জন্যে দায়ী অনেকটা তার ভৌগোলিক অবস্থান—দুটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের মাঝখানে প্রাচীরের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে।*

আফগানিস্তান, পশ্চিম-এশিয়া এবং দক্ষিণ-এশিয়ার কথা আমার বলা শেষ হল। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সম্প্রতি কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে, এবার আমি তার কথা সংক্ষেপে বলে এই চিঠিটা শেষ করে দেব।

ব্রহ্মদেশের পূর্বদিকে আছে শ্যাম—পৃথিবীর এই অঞ্চলে একমাত্র এই দেশটিই আজ পর্যন্ত তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে। দেশটি রয়েছে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ আর ফরাসি-ইন্দোচীনের মাঝখানে চাপ খেয়ে। প্রাচীন ভারতীয় রীতির স্মৃতিতে দেশটি পরিপূর্ণ; এর প্রাচীন রীতিনীতি সংস্কৃতি এবং উৎসব অনুষ্ঠানে আজও প্রাচীন ভারতের ছাপ স্পষ্ট। অল্পদিন আগেও শ্যামে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সামাজিক ব্যবস্থায় সামন্তনীতির অনেকখানিই সাক্ষাৎ মিলত, ছোটো একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ক্রমে গড়ে উঠছিল। এর রাজাদের নাম বোধ হয় প্রায়ই হত 'রাম' দিয়ে; এই নামটা দেখেও ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে যায়। প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম, ইত্যাদি নামের রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন দেখা গেল মিত্রপক্ষের জয় প্রায় নিশ্চিত হয়েই উঠেছে, তখন শ্যাম গিয়ে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল; পরে সে জাতি-সঙ্ঘের সভ্য হয়ে গেল।

১৯৩২ সনের জুনমাসে শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে একটা প্রাসাদ-বিপ্লব ঘটল, যার ফলে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্রের অবসান হল এবং শ্যাম পিপল্‌স্‌ পার্টির (বা শ্যাম-প্রজা-সমিতির) কর্তৃত্বাধীনে প্রজাতান্ত্রিক শাসন শুরু হল। লুয়াঙ্‌ প্রাদিত নামে জনৈক আইনব্যবসায়ীর নেতৃত্বে শ্যামের একদল তরুণ সেনানী ও অপর কয়েকজন মিলে রাজা, রাজপরিবার এবং রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীদের বন্দী করে ফেলল এবং রাজ-প্রজাধিপককে একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে বাধ্য করল। এর ফলে রাজার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হল এবং জনগণের নির্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদের সৃষ্টি হল। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন ছিল বটে, কিন্তু এটা গণ-বিপ্লবের ফলে ঘটেনি। তরুণ-তুর্কিদল যেভাবে সুলতান আবদুল হামিদের স্বেচ্ছাচার দূর করেছিল, শ্যামের এই ব্যাপারটাও অনেকটা তার মতোই। রাজা খুব চটপট করে এদের দাবি স্বীকার করে নিলেন বলেই সংকটের অবসান হয়ে গেল বটে, কিন্তু রাজা যে অত তাড়াতাড়ি পরিবর্তনটা মেনে নিলেন তার মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা ছিল না। ১৯৩৩ সনের এপ্রিল মাসে রাজা হঠাৎ প্রজা-পরিষৎ ভেঙে দিলেন ও লুয়াঙ্‌ প্রাদিতকে নির্বাসিত করলেন। দুমাস বাদে আরেকটি আকস্মিক বিপ্লব ঘটল এবং প্রজা-পরিষৎ আবার মাথা জাগিয়ে উঠল। শ্যামের এই নূতন সরকার ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক-স্থাপন করে নি, বরং জাপানের প্রতি তারা বেশী আকৃষ্ট।†

শ্যামের পূর্বদিকে ফরাসি ইন্দো-চীন, সেখানেও জাতীয়তাবাদ বিস্তার লাভ করছে, দিন দিন তার শক্তি বাড়ছে। ফরাসি-সরকার এই জাতীয়তাবাদকে পিষে মারতে চেষ্টা করছেন, বহু ষড়যন্ত্র-মামলা খাড়া করেছেন, অসংখ্য লোককে দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ১৯৩৩ সনের মার্চ মাসে জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলনের একটি বৈঠক হয়; এই সভাতে ফরাসি প্রতিনিধি যে উক্তি করেন তাই থেকেই এর চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রতিনিধিটির নাম মঁসিয়ে সারাউ, ইনি নিজেই এককালে ফরাসি ইন্দো-চীনের গভর্নর ছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "অধীনস্থ উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এই-সব দেশ শাসন করা দিন দিন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠছে।" প্রমাণ স্বরূপ তিনি ফরাসি ইন্দো-চীনের দৃষ্টান্ত

*১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে নাদির শা আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং তাঁর তরুণ পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন পেলেন—তাঁর নাম হল রাজা জাহির শা।

†১৯৩৩ সনের অক্টোবর মাসে নরম-পন্থীদের একটা বিদ্রোহ হয়েছিল কিন্তু সেটাকে দমন করা হল এবং লুয়াঙ্‌ প্রাদিতের নেতৃত্বেই শাসন চলতে লাগল।

সেখান—সেখানে এখন শান্তিরক্ষার জন্য ১০,০০০ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে; তিনি যখন সেখানে গভর্নর ছিলেন তখন সৈন্য রাখা হত মাত্র ১,৫০০।

সকলের শেষে জাভার কথা বলছি। জাভা হচ্ছে ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দেশ। চিনি আর রবারের জন্য প্রসিদ্ধ; আবার এর বাগিচা ও ক্ষেতগুলোতে মজুরদের উপরে যে ভয়ংকর শোষণ চালানো হত, তার জন্যও জায়গাটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ভারতবর্ষের মতো এখানেও জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পখানিকটা শাসন-সংস্কার এসেছে, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনেকখানি দমন-ব্যবস্থা। জাভাবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ে পশ্চিম এশিয়াতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে এরা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারা ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিল। ১৯১৬ সনে ওলন্দাজ-সরকার জাভাবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা শাসন-সংস্কার করবে এবং বাটাভিয়াতে জন-পরিষৎ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই পরিষদের সভ্যগণ অধিকাংশই মনোনীত ছিল এবং তাদের হাতে অতি সামান্যই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তাই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে লাগল। ১৯২৫ সনে এক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হল, কিন্তু তাতেও বিশেষ সুফল পাওয়া গেল না, কারণ জনগণ সন্তুষ্ট হল না। জাভা ও সুমাত্রাতে ধর্মঘট ও ঘরোয়া মারামারি হল। ১৯২৭ সনে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে একটা বড়ো বিদ্রোহ হয়েছিল, সে বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। সে যা হোক, জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে যেতে লাগল। গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীগণ গড়ে তুললেন বহু জাতীয় বিদ্যালয় এবং ভারতের অনুকরণে, কুটীরশিল্প ও কারিগরিবিদ্যা প্রসারে উৎসাহ দিতে লাগলেন। স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলছে। জাভার শর্করা-শিল্পের খুব ক্ষতি হয়েছে, তার কারণ সারা পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক সংকট ও গুরু সংরক্ষণ কর ধার্যের দরুন বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র-সংকোচন।

জাভার পূর্বদিকের সমুদ্রে ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে। ওলন্দাজদের একখানা যুদ্ধ-জাহাজের নাবিকদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল; প্রতিবাদ হিসাবে তারা জাহাজখানাকেই দখল করে নিল, জাহাজ খুলে বন্দর থেকে চলে গেল। জাহাজের কোনো ক্ষতি কিন্তু তারা করল না; পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল তারা শুধু তাদের মাইনেটা ঠিক করে নেবার জন্যই এ-সব করছে। এ একরকমের উগ্র ধর্মঘট বিশেষ। অতএব তখন ওলন্দাজ এরোপ্লেনরা গিয়ে সে যুদ্ধজাহাজটির উপরে বোমাবর্ষণ করল, নাবিকদের বহু লোককে মেরে ফেলল, এবং এইভাবে জাহাজ আবার দখল করে আনল।

এশিয়ার সর্বত্রই সেই একই গল্পের চিরন্তন পুনরাবৃত্তি—জাতীয়তাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংগ্রাম। এবার এশিয়া ছেড়ে আমরা ইউরোপে যাব—ইউরোপকে দেখা আমাদের দরকার হয়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ইউরোপের অবস্থা নিয়ে আমরা এখনও আলোচনা করি নি; অথচ এখনও সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইউরোপের অবস্থা থেকেই। অতএব এর পরের কয়েকখানা চিঠিতে আমি ইউরোপের কথাই বলব।

এশিয়ার দুটি অংশের কথা এখনও বলতে বাকি আছে, দুটি বৃহৎ দেশের কথা—চীন দেশ, আর তার উত্তরে সোভিয়েটের দেশ। পরে একসময়ে আমরা এদের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১৭১

যে বিপ্লব হল না

১৩ই জুন, ১৯৩৩

জি. কে. চেস্টারটন বর্তমান ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি একজায়গাতে বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হচ্ছে,-যে-বিপ্লব ঘটে নি সেইটি। তোমার মনে আছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কয়েকবারই বিপ্লব একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছিল, বিপ্লব মানে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া আর শ্রমিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাজ-বিপ্লব। কিন্তু প্রত্যেক বারেই শাসক শ্রেণীরা একেবারে শেষ মুহূর্তে একটুখানি মাথা নিচু করেছে, ভোটের অধিকার বাড়িয়ে দিয়ে পার্লামেণ্টী শাসন-ব্যবস্থায় একটুখানি লোকদেখানো অংশ প্রজাদের দিয়েছে, বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে যে লাভ করে আসছিল তার একটুখানি অংশও তাদের বিলিয়ে দিয়েছে, এবং এইভাবে আসন্ন বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রেখেছে। সাম্রাজ্যের আয়তন তখন দিন দিন বেড়ে চলেছে, সে সাম্রাজ্য থেকে তাদের লাভও হচ্ছে প্রচুর, সুতরাং এই ব্যবস্থা করতে তাদের কোনোই অসুবিধা ছিল না। কাজেই বিপ্লব ইংলণ্ডে হল না; শুধু তার আসন্ন আভাস বার বার করে দেশের উপরে ছায়া বিস্তার করল, এবং সেই বিপ্লবের ভয়েই যা ঘটবার তা ঘটতে লাগল। এই জন্যই চেস্টারটন বলেছেন, যে-ঘটনাটা বস্তুত ঘটে নি সেইটাই ছিল গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা।

ঠিক এইভাবেই হয়তো একথাও বলা যেতে পারে, যুদ্ধোত্তর যুগে পশ্চিম-ইউরোপের বৃহত্তম ঘটনা হচ্ছে, যে বিপ্লব শেষপর্যন্ত ঘটে উঠল না সেইটি। রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লব ঘটল যে কারণে, সে কারণগুলো মধ্য এবং পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতেও বর্তমান ছিল, অবশ্য-কিছু অল্প পরিমাণে। পশ্চিম-ইউরোপেরই ইংলণ্ড, জর্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি শিল্পপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার প্রধান তফাত ছিল একটি জায়গাতে,—রাশিয়াতে কোনো শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল না। মার্ক্সের মত অনুসারে বিপ্লব প্রথম শুরু হবার কথা ছিল বাস্তবিক-পক্ষে এই শিল্প-প্রচেষ্টায় অগ্রণী দেশগুলোতে; সেকেলে দেশ রাশিয়াতে নয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় জারতন্ত্রের পুরোনো পচা কাঠামোটা ভেঙে ধ্বসে পড়ল; এবং সেই মুহূর্তে তার জায়গাতে এসে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্ত্য-দেশদের ধরনের একটা পার্লামেণ্ট খাড়া করে শাসন কার্য চালিয়ে নিতে পারে, এমন শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে কিছু দেশে ছিল না বলেই তখন শ্রমিকদের সোভিয়েটেরা এসে ক্ষমতা দখল করে বসল। রাশিয়া ছিল অনুন্নত দেশ, সেটা তার দুর্বলতারই হেতু; অথচ তারই দরুন সে সামনের দিকে এমন একটা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল যা তার চেয়ে বেশি অগ্রণী দেশরা পারে নি—এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা এ কাজে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু কোনোরকম ভ্রান্ত আশা তাঁদের মনে ছিল না। তাঁরা জানতেন, রাশিয়া অনগ্রসর দেশ, এগিয়ে গিয়ে অধিকতর অগ্রসর দেশদের ধরে ফেলতে তার সময় লাগবে। তবে তাঁদের আশা ছিল, এই যে শ্রমিক-চালিত প্রজাতন্ত্র তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন, এর দৃষ্টান্ত থেকেই ইউরোপের অন্যান্য সব দেশেরও শ্রমিকরা উৎসাহিত হয়ে উঠবে, তারাও তাদের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাঁরা জানতেন, ইউরোপের সর্বত্র জুড়ে যদি এই সমাজ-বিপ্লব দেখা দেয় তবেই তাঁদের বাঁচবার যা-কিছু ভরসা; তা নইলে পৃথিবীর সমস্ত ধনিকতন্ত্রী দেশগুলো মিলে রাশিয়ার সে নবজাত সোভিয়েট সরকারকে একেবারে পিষে মেরে ফেলে দেবে।

এই আশা এবং বিশ্বাস তাঁদের ছিল বলেই বিপ্লবের প্রথম দিকে তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকের কাছে তাঁদের আহ্বান-বাণী প্রচার করতে লেগে গিয়েছিলেন। অপরের জমি দখল করে নেবার যে চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অহরহ আঁটছে তার তীব্র নিন্দা করলেন তাঁরা; বললেন,

জারশাসিত রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের যে-সব গোপন সন্ধি হয়েছিল তার জোরে কোনোরকম দাবি-দাওয়া তাঁরা উপস্থিত করবেন না; স্পষ্ট করে লোককে বুঝিয়ে দিলেন, কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ শহর তুর্কিদেরই থাকবে, তাকে হস্তগত করতে তাঁরা চান না। প্রাচ্য-জগতের দেশগুলিকে এবং জারের সাম্রাজ্যের মধ্যে যে বহুসংখ্যক উৎপীড়িত পদানত জাতি ছিল তাদের, তাঁরা অত্যন্ত উদার শর্তে মিত্রতার আহ্বান জানালেন। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, সমগ্র পৃথিবী-জোড়া শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা, সমস্ত জায়গার শ্রমিকদের ডেকে বললেন আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো, সমাজতন্ত্রবাদী প্রজাতন্ত্রী জাতীয়তা-বাদের প্রতিষ্ঠা করো। দেশ হিসাবে একা রাশিয়ার কোনো বিশেষ মূল্যই ছিল না তাঁদের কাছে সে শুধু পৃথিবীর সেই অংশটা, যেখানে মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটা শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তার যা কিছু দাম সে এই জন্যই।

বলশেভিকরা যে আহ্বানবাণী প্রচার করছিলেন, জর্মন সরকার এবং মিত্রপক্ষীয় সরকাররা তাকে যথাসাধ্য চাপা দিয়ে চললেন; তবু তাঁদের আঙুলের ফাঁক গলে তার ছিঁটেফোটা গিয়ে সমস্ত রণক্ষেত্রে আর কারখানা-অঞ্চলে পেঁছিল। সর্বত্রই তার ফল হল অতি প্রচণ্ড; ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে তো ভাঙনের আভাস স্পষ্টই দেখা যেতে লাগল। জর্মনির সেনা আর শ্রমিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল আরও বেশি। জর্মনিতে হাঙ্গারিতে—মানে পরাজিত পক্ষের দেশগুলোতে—অনেকবার হাঙ্গামা এবং বিদ্রোহ পর্যন্ত হল। অনেক মাস, প্রায় আস্ত একটা কি দু'টো বছর ধরেই মনে হল, ইউরোপে প্রচণ্ড একটা সমাজ-বিপ্লব একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। বিজয়ী মিত্রপক্ষের দেশদের অবস্থা এই পরাজিত দেশদের তুলনায় অল্প একটুখানি ভালো ছিল; যুদ্ধে জয়লাভ করবার ফলে তাদের তখন মনে উৎসাহ কিছু বেড়েছে; আশা জেগেছে (পরবর্তী কালে অবশ্য দেখা গেছে সে আশা একেবারেই ভুয়ো), যুদ্ধে তাদের যা ক্ষতি সইতে হয়েছে, পরাজিত পক্ষের ঘাড় ভেঙে তার খানিকটা পূরণ করে নেয়া যাবে। কিন্তু সেই মিত্রপক্ষের দেশগুলিতেও লোকের মনে বিপ্লবের হাওয়া লাগল। বস্তুত ইউরোপ আর এশিয়ার সর্বত্র তখন বাতাস অসন্তোষে বিক্ষোভে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে; বাইরে হয়তো তখন পৃথিবীর রূপ প্রশান্ত কিন্তু তার তলায় বিপ্লবের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, তার অস্পষ্ট গর্জন শোনা যাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে সে আগুন একেবারে সংহারমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে তারও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে আবার, এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে, অসন্তোষের প্রকারটাতে, এবং যে শ্রেণীগুলো বিপ্লব ঘটাতে উদ্যত তাদের প্রকৃতিতে, একটি তফাত ছিল। এশিয়ার বিদ্রোহ হচ্ছে, পাশ্চাত্য জাতিরা এখানে যে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে তার বিরুদ্ধে; সে জাতীয় বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী; ইউরোপের বিদ্রোহ ঘটাতে চাইছে শ্রমিক শ্রেণীরা। বুর্জোয়া ধনিকতন্ত্রীদের প্রতিষ্ঠিত যে সমাজব্যবস্থা বর্তমান ছিল তারা তাকেই ধ্বসিয়ে দিতে চায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়।

এত তর্জনগর্জন, এত আভাস-আয়োজন সত্ত্বেও কিন্তু রুশ বিপ্লবের মতো কোনো কাণ্ডই মধ্য বা পশ্চিম -ইউরোপে ঘটল না। প্রাচীন ইমারতের উপরে যে আক্রমণ সেখানে করা হচ্ছিল তা সয়ে টিকে থাকবার মতো জোর তার তখনও ছিল। তবু সে আঘাত তাকে দুর্বল করে ফেলল, ভয় ধরিয়ে দিল; এবং তার দরুনই সোভিয়েট রাশিয়া রক্ষা পেয়ে গেল। নেপথ্য থেকে এই অলক্ষ্য শক্তি যদি তার সাহায্য না করত, তবে খুব সম্ভবত ১৯১৯ বা ১৯২০ সনেই সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়ার শেষ হয়ে যেত।

যুদ্ধের পর একটা একটা করে বছর কেটে যেতে লাগল, মনে হল পৃথিবীতেও আবার ক্রমে ক্রমে খানিকটা শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। একদিকে প্রগতিবিরোধী রক্ষণপন্থী, রাজতন্ত্রবাদী, এবং সামন্ত-নীতিবাদী ভূস্বামীরা, অন্যদিকে নরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী বা সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা, এদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মৈত্রী স্থাপিত হল; এদের মিলিত আক্রমণে বিপ্লববাদীরা পরাজিত হয়ে গেল। এদের মৈত্রী একটা আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই, কারণ সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদে এবং শ্রমিকচালিত শাসন-ব্যবস্থায় আস্থাশীল বলে জাহির করত। অতএব বাইরে

থেকে দেখতে তাদের আদর্শটা ঠিক সোভিয়েট বা কমিউনিস্ট্‌দেরই সংগে এক ছিল। অথচ ধনিকতন্ত্রীরা কমিউনিস্ট্‌দের যতখানি ভয় করত এই সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা করত তার চেয়েও বেশি; অতএব ধনিকতন্ত্রীদের সংগে একত্র হয়ে তারা কমিউনিস্ট্‌দের বিচূর্ণ করতে ব্রতী হল। অথবা এও হতে পারে, হয়তো ধনিকতন্ত্রীদেরই এরা এতখানি ভয় করে চলত যে তাদের বিরুদ্ধে যাবার সাহসই তারা পায় নি; এদের হয়তো আশা ছিল, শান্তিপূর্ণ রীতিতে এবং নিয়মতান্ত্রিক নীতিতে চলে এরা নিজেদের ভিত্তি মজবুত করে নেবে, এবং এইভাবে প্রায় অলক্ষ্য-গতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। কিন্তু মনের উদ্দেশ্য তাদের যাই হোক, কাজে তারা বিপ্লবী শক্তিকে চূর্ণ করতে প্রগতিবিরোধীদের সাহায্য করল, এবং তাই করতে গিয়ে ইউরোপের বহু দেশে বস্তুতই একটি প্রতি-বিপ্লবের সৃষ্টি করে ফেলল। সেই প্রতি-বিপ্লব আবার উলটে এই সোশ্যাল ডেমোক্রাট্ দলগুলোকেই বিধ্বস্ত করে দিল; এবং তখন ক্ষমতা অধিকার করে বসল নূতন কতকগুলি উগ্র সমাজতন্ত্রবিরোধী দল। মোটের উপর বলতে গেলে, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এই কয় বছর ধরে ইউরোপে ঘটনার গতি এই পথেই চলেছে।

কিন্তু সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি; ধনিকতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে লড়াই এখনও সমানেই চলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে সাময়িক সন্ধি বা আপোষ-ব্যবস্থা এর আগেও হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে; তবু এদের মধ্যে কোনো স্থায়ী আপোষ হওয়া কোনো-ক্রমেই সম্ভব নয়। রাশিয়া তার কমিউনিজ্‌ম্ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে, অন্যদিকে দাঁড়িয়েছে পশ্চিম--ইউরোপ আর আমেরিকার বড়ো বড়ো সব ধনিকতন্ত্রী দেশ—দু'য়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য মহাসমুদ্র। এদের মাঝখানে পড়ে উদারপন্থী, নরমপন্থী ইত্যাদি মধ্যবর্তী দলগুলো সর্বত্রই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে, মানুষের দুঃখদুর্দশা দিনদিন বেড়ে চলেছে, সংগ্রাম এবং বিক্ষোভের সেইটাই প্রকৃত কারণ। এর একটা বিহিত যতদিন না হচ্ছে, একটা ভারসাম্য যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন এই মারামারিও চলবেই।

যুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত যেখানে যত বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে, তার মধ্যে জর্মানির কাহিনীটাই সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মতো, তার মধ্যে শিখবারও বস্তু অনেক আছে। এর কথা খানিকটা তোমাকে বলছি। আগেই বলেছি, যুদ্ধ যখন এল, তার আবর্তে পড়ে ইউরোপের কোনো দেশেরই সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁদের আদর্শ আর প্রতিশ্রুতি অক্ষুন্ন রেখে চলতে পারলেন না। প্রত্যেক দেশেই উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র স্রোতে এ'রা খরবেগে ভেসে গেলেন; সমাজতন্ত্র-বাদের যে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ এ'দের ছিল সে-সব একদম ভুলে গিয়ে যুদ্ধের নেশায় আর রক্তপিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে, ১৯১৪ সনের ৩০শে জুলাই তারিখে, জর্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন, হাপ্‌স্‌বুর্গ্‌দের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সিদ্ধ করবার জন্য "একজন জর্মন সৈনিকের একটিমাত্র রক্তবিন্দুও" পাত করতে তাঁরা দেবেন না (তখন ঝগড়াটা চলছিল অস্ট্রিয়া আর সার্বিয়ার মধ্যে, অস্ট্রিয়ার আর্ক-ডিউক ফ্রাঞ্জ-ফার্ডিন্যাণ্ডের হত্যাকে উপলক্ষ্য করে)। এর ঠিক পাঁচটি দিন পরে এই দলই যুদ্ধকে সমর্থন করতে লাগলেন; অন্যান্য দেশে এ'দের অনুরূপ অন্য যে-সব দল ছিল সকলেই তাই করলেন। অস্ট্রিয়ার সমাজতন্ত্রীদের নেতা যিনি ছিলেন, তিনি তো পোল্যাণ্ড আর সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেবার কথাই বলতে লাগলেন; বললেন এতে পরের ভূমি দখল করা হবে না!

বলশেভিকরা ইউরোপের শ্রমিকদের প্রতি আহ্বানবাণী প্রচার করছিলেন; ১৯১৮ সনের গোড়ার দিকে সে আহ্বানে জর্মানির শ্রমিকরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল; অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করবার কারখানাগুলোতে কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো ধর্মঘট হল। জর্মন সম্রাটের সরকার অত্যন্ত বিপদে পড়ে গেলেন, হয়তো তখনই সর্বনাশ হয়ে যেত তাঁদের। রক্ষা করলেন সমাজতন্ত্রী নেতারা : তাঁরা এসে ধর্মঘট কমিটির মধ্যে ঢুকলেন, এবং ভিতর থেকে গোলমাল পাকিয়ে ধর্মঘট ভেঙে দিলেন।

১৯১৮ সনের ৬ঠা নভেম্বর তারিখে, উত্তর-জর্মানিতে কিয়েল বন্দরে নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করল। জর্মন নৌবাহিনীর বড়ো বড়ো রণতরীদের প্রতি সমুদ্রে বার হবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল; খালাসীরা এবং স্টোকাররা তাতে অসম্মত হল। এদের দমন করবার জন্য সৈন্য পাঠানো হল; তারাও গিয়ে এদের দলেই ভিড়ল, একসঙ্গে ধর্মঘট করে বসল। সেনানীদের এরা পদচ্যুত করল বা বন্দী করল; শ্রমিকদের এবং সৈনিকদের সব কাউন্সিলও (সোভিয়েট) তৈরি করা হল। ব্যাপারটা দাঁড়াল, রাশিয়াতে সোভিয়েট বিপ্লব যেভাবে প্রথম শুরু হয়েছিল ঠিক তারই মতো; এর হাওয়া সমস্ত জর্মানিতেই ছড়িয়ে পড়বে এমনও আভাস দেখা গেল। সোশ্যাল ডেমোক্রাট্ নেতারা কিয়েলে গিয়ে দেখা দিলেন; নানারকম কলকৌশল করে শেষপর্যন্ত নাবিক এবং শ্রমিকদের মনোযোগটাকে অন্যান্য দিকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। বিদ্রোহ থেমে গেল। কিন্তু এই বিদ্রোহী নাবিকরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কিয়েল ছেড়ে চলে গেল; দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে লাগল।

বিপ্লব-আন্দোলন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। ব্যাভেরিয়াতে (দক্ষিণ-জর্মানি) একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল। কাইজার তখনও হাল ছাড়লেন না। ৯ই নভেম্বর তারিখে বার্লিন শহরে একটি সর্বজনীন ধর্মঘট শুরু হল। শহরের সমস্ত কাজকর্ম থেমে গেল; দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলতে কিছুই হল না, কারণ শহরের সমস্ত সৈন্যই গিয়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, পুরোনো ব্যবস্থা যেটা ছিল সে ভেঙে পড়বে। প্রশ্ন উঠল, তার জায়গা এখন কে নেবে, কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা মিলে একটি সোভিয়েট বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট্-নেতা তাঁদের ঠেকিয়ে দিলেন, ওদের আগেই একটি পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে দিলেন।

এমনি করেই জর্মন প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হল। কিন্তু, প্রজাতন্ত্র হল এটা শুধু নামেই; কোনো ব্যবস্থাই বস্তুত পরিবর্তন হল না। সোশ্যাল ডেমোক্রাট্রা তখন কর্তৃত্ব করছেন, তাঁরা যেখানে যেটি যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই প্রায় রেখে দিলেন। নিজেরা গোটাকতক বড়ো বড়ো পদ, মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি হাতিয়ে নিলেন; সেনাবাহিনী, সিভিল-সার্ভিস, বিচার-বিভাগ, এবং দেশের সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাটা কাইজারের আমলে যেমন ছিল ঠিক তাইই রয়ে গেল। সম্প্রতি একটি বই বেরিয়েছে, তার নাম অনুসারে, "কাইজার গেছেন : কিন্তু সেনাপতিরা আছেন"। এভাবে বিপ্লব হয় না বা তার শক্তি বাড়ে না। বিপ্লবের কাজই হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক কাঠামোটাকে ঢেলে সাজা। বিপ্লবের যারা শত্রু তাদেরই হাতে যদি শক্তিটা তুলে দেওয়া হয়, তবে তার পরেও বিপ্লব বেঁচে থাকবে এটা আশা করাই পাগলামি। জর্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাট্রা কিন্তু ঠিক তাইই করলেন : বিপ্লবের যাঁরা বিরুদ্ধ পক্ষ, তাঁদেরই হাতে সম্পূর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলেন, যাতে তাঁরা আটঘাট বেঁধে উদ্যোগ আয়োজন করে সে বিপ্লবের তলা ধ্বসিয়ে দিতে পারেন। জর্মানিতে তখনও আগের দিনের সমর-নায়করাই হয়ে রইলেন সমস্ত ব্যাপারের বড়ো কর্তা।

কিয়েলের নাবিকরা দেশময় ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। নূতন সোশ্যাল ডেমোক্রাট্ সরকারের এটা পছন্দ হল না। বার্লিনে তাঁরা এই নাবিকদের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন; তার ফলে ১৯১৯ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে নিদারুণ হাঙ্গামার সৃষ্টি হল। জর্মানির কমিউনিস্ট্রা সেই ফাঁকে একটা সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন : শহরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানালেন, "এসো, আমাদের সাহায্য করো" জন-সাধারণের কাছে কিছুটা সাহায্য পেলেনও। সরকারি দপ্তরখানা এবং বাড়িগুলো তাঁরা দখল করে বসলেন, সেই জানুয়ারী মাসের সপ্তাহ খানিক সময় তাঁরাই শহরের কর্তা হয়ে বসলেন। এই সপ্তাহটি বার্লিনের 'লাল সপ্তাহ' বলে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে যতখানি সাড়া পাওয়া এঁদের প্রয়োজন ছিল ততখানি এঁরা পেলেন না—তার কারণ জন-সাধারণের মধ্যে অধিকাংশ লোক একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কী তাদের করা দরকার সেইটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। বার্লিনে যে-সব সৈন্য ছিল তারাও হতভম্ব হয়ে গেল,

নিরপেক্ষ হয়ে রইল। এই সৈন্যদের উপরে আর নির্ভর করা যাচ্ছে না দেখে, সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা তখন কতকগুলো বিশেষ ধরনের স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী তৈরি করে নিল; তাদের সাহায্যে কমিউনিস্টদের এই বিদ্রোহ দমন করল। অত্যন্ত নিষ্ঠুর যুদ্ধ করল এরা, কারও প্রতি এতটুকু দয়া দেখাল না। কার্ল লিয়েব্‌নেখট্‌ এবং রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ্‌ বলে দুজন কমিউনিস্ট নেতা এক জায়গাতে লুকিয়ে ছিলেন; যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন পরে এরা খুঁজে খুঁজে সেইখানে গিয়ে তাঁদের ধরে ফেলল এবং অত্যন্ত ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মেজাজে সেইখানেই তাঁদের হত্যা করল। যারা এঁদের হত্যা করেছিল, পরে বিচারেও তাদের বেকসুর খালাস দেওয়া হল। এই হত্যাকাণ্ড আর এই বিচারের ফলে কমিউনিস্ট আর সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌দের মধ্যে অতি তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি হল। কার্ল লিয়েব্‌নেখ্‌ট্‌ ছিলেন উইল্‌হেল্‌ম্‌ লিয়েব্‌নেখ্‌টের পুত্র। উইল্‌হেল্‌ম্‌ ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত এবং প্রাচীন সমাজতন্ত্রী যোদ্ধা, এঁর নাম আমি আগের একটি চিঠিতেই তোমাকে বলেছি। রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ্‌ও প্রাচীন কর্মী, এবং লেনিনের একজন খুব বড়ো বন্ধু। মজা হল এই, কমিউনিস্ট বিদ্রোহের ফলে লিয়েব্‌নেখ্‌ট্‌ এবং লুক্সেম্‌বুর্গের প্রাণ গেল, অথচ এঁরা দুজনেই ছিলেন সে বিদ্রোহের বিরোধী।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক প্রজাতন্ত্রের হাতে কমিউনিস্টরা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এর অল্পদিন পরেই হ্বাইমার শহরে বসে সে প্রজাতন্ত্রের একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা হল—তাই তার নাম হয়েছে "হ্বাইমারের শাসনতন্ত্র"। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই আবার নূতন একটি বিপদ এসে এই প্রজাতন্ত্রকে উলটে দেবার উপক্রম করল; এবার বিপদ এল অন্য দিক থেকে। প্রগতি-বিরোধীরা মিলে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতি-বিপ্লব খাড়া করলেন: প্রাচীন সেনাপতিরাই এর মধ্যে অগ্রণী হয়ে উঠলেন। এই বিদ্রোহের নাম 'কাপ্‌-পুট্‌শ্‌'—কাপ হচ্ছে এর নেতার নাম, আর জর্মন ভাষায় পুট্‌শ্‌ কথাটার মানে বিদ্রোহ। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সরকার বার্লিন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু বার্লিনের শ্রমিকরা এই 'পুট্‌শ্‌'কে খতম করে দিল হঠাৎ একটি ব্যাপক ধর্মঘট করে—শহরের সমস্ত ব্যাপারে কাজকর্মে সম্পূর্ণ হরতাল শুরু হয়ে গেল, বিশাল সেই শহরের জীবনযাত্রা একেবারেই থমকে থেমে গেল। এবার এই সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের তাড়া খেয়ে কাপ এবং তাঁর বন্ধুদেরই আবার শহর ছেড়ে পালাতে হল; সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা তখন আবার ফিরে এসে সরকারি কাজকর্ম বুঝে নিলেন। কমিউনিস্টদের প্রতি এঁদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না; কাপ্‌-পন্থী বিদ্রোহীদের প্রতি কিন্তু এই সরকার অপূর্ব ভদ্রতা দেখালেন। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পেন্‌সন-ভোগী সেনানী; বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁদের সে পেন্‌সন পর্যন্ত যথারীতিই দেওয়া হতে লাগল।

ব্যাভেরিয়াতে ঠিক এই রকমেরই একটা প্রতি-বিপ্লবী 'পুট্‌শ্‌' বা বিদ্রোহের আয়োজন করা হল। সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হল; কিন্তু একটি কারণে সে বিদ্রোহটি আমাদের লক্ষ্য করবার মতো। এর আয়োজন করেছিলেন একজন নিম্নপদস্থ অস্ট্রিয়ার সেনানী, তাঁর নাম হিট্‌লার। তিনিই এখন হয়েছেন জর্মানির ডিক্‌টেটর বা সর্বময় কর্তা।

এই-সব ব্যাপারের ফল হল এই, জর্মন প্রজাতন্ত্র নামেমাত্র টিকে রইল, কিন্তু দিনদিনই সে বলহীন হয়ে পড়তে লাগল। সোশ্যাল ডেমোক্রাট আর কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী দলের এই দুই পক্ষ আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে দুপক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ল। ওদিকে প্রগতি-বিরোধীরা, যারা খোলাখুলিই প্রজাতন্ত্রকে গালাগাল দিচ্ছিল, তারা ক্রমেই বেশি সংঘবদ্ধ এবং উগ্র হয়ে উঠতে লাগল। যে দু-চারজন সমাজতন্ত্রবাদী তখনও সরকারের মধ্যে টিকে ছিলেন, বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা—জর্মানিতে এদের নাম হচ্ছে "জাংকার"—এবং বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা মিলে তাদের ক্রমে ঠেলে বার করে দিলেন। ভার্সাই-র সন্ধিপত্র দেখে জর্মানির জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত হল; প্রগতি-বিরোধীরা এই ব্যাপারটাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে নিল। এই সন্ধিপত্রের শর্ত ছিল, জর্মানিকে অস্ত্রসজ্জা ত্যাগ করতে হবে, তার যে প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী ছিল তাও ভেঙে দিতে হবে। মাত্র একলক্ষ সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী রাখবার অনুমতি তাকে দেওয়া হল। এর ফল হল এই, বাইরে বাইরে জর্মানি অস্ত্র ত্যাগ করল, এবং বাস্তবিক পক্ষে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র দেশের

মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিল। বিভিন্ন দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম করে বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেসরকারি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হল। রক্ষণপন্থী জাতীয়তাবাদীদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম হল 'স্টীল হেল্‌মেট' বাহিনী; কমিউনিস্ট শ্রমিকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম হল 'রেড ফ্রন্ট' বাহিনী; এর পরে আবার হিটলারের অনুচররা গড়ে তুলল 'নাৎসী' বাহিনী।

জর্মানিতে যুদ্ধোত্তর যুগের প্রায় কয়েকটি বছর সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে বললাম। দেশের বাতাসে বিপ্লবের আভাস কীভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল এবং প্রতি-বিপ্লবের সঙ্গে তার কীভাবে সংগ্রাম চলছিল, তার প্রমাণ হিসাবে আরও অনেক কথাই বলতে পারি। জর্মানির বহু স্থানে, ব্যাভেরিয়াতে এবং স্যাক্‌সানিতেও বিদ্রোহ দেখা দিল। সন্ধিপত্রের চোটে অস্ট্রিয়া তার পুরোনো আয়তনের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ-মাত্রে পরিণত হয়েছিল; সেখানেও অবস্থা অনেকটা এই রকমই দাঁড়াল। ছোটো দেশ অস্ট্রিয়া, বিশাল ভিয়েনা শহর তার রাজধানী—ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেশটি পুরোপুরিই জর্মানির শামিল। ১৯১৮ সনের ১২ই নভেম্বর তারিখে, মানে যুদ্ধবিরতি যেদিন হল তার পরদিন, অস্ট্রিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। অস্ট্রিয়ার ইচ্ছা ছিল জর্মানির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু মিত্রপক্ষ সেটা অতি কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। অবশ্য অবস্থাদৃষ্টে এইটাই ছিল স্বাভাবিক কাজ। অস্ট্রিয়া এবং জর্মানির একত্র মিলনের এই-যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাকেই জর্মান 'আন্‌শ্‌লুস্‌'* কথাটির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

জর্মানির মতো অস্ট্রিয়াতেও সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রাই গোড়াতে ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। কিন্তু তাদের মনে না ছিল সাহস না ছিল নিজেদের উপরে বিশ্বাস। অতএব তারা বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে একটা আপোষ করে চলবার নীতি অবলম্বন করল। তার ফলে এখন সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, দেশের শাসনক্ষমতা গিয়ে পড়েছে অন্যের হাতে। জর্মানির মতো এখানেও বহু বেসরকারি সেনাবাহিনী গ'ড়ে উঠল; শেষপর্যন্ত একটা প্রগতিবিরোধীদের ডিক্‌টেটরি বা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ভিয়েনা শহর সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী, গ্রাম-অঞ্চলের কৃষকরা রক্ষণপন্থী, দুয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ চলেছে। ভিয়েনার মিউনিসিপ্যালিটি সমাজতন্ত্রীদের হাতে; শ্রমিক শ্রেণীদের জন্য চমৎকার সব ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য পরিকল্পনা রচনা করবার দরুন এঁরা বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন।

হাঙ্গেরিতে প্রথম বিপ্লব হল ১৯১৮ সনের ৩রা অক্টোবর তারিখে, মানে যুদ্ধ শেষ হবার পাঁচ সপ্তাহ আগে। নভেম্বর মাসে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল। চার মাস পরে, ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে, দ্বিতীয়বার বিপ্লব হল, এটা সোভিয়েট বিপ্লব, এর নেতা ছিলেন বেলা কুন্‌ বলে একজন কমিউনিস্ট, এককালে তিনি লেনিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একটি সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, কয়েক মাস যাবৎ সে সরকার দেশ শাসন করল। তার পর দেশের মধ্যেকার রক্ষণপন্থী এবং প্রগতিবিরোধীরা একত্র হয়ে রুমানিয়ার একটি সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন, আমাদের একটু সাহায্য করে দিয়ে যাও। রুমানিয়ানরা খুব খুশী হয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এল, বেলা কুনের সরকারকে বিধ্বস্ত করল, তার পর ধীরে সুস্থে বসে দেশে লুটপাট শুরু করে দিল। শেষে মিত্রপক্ষ হুমকি দিলেন তাঁরাই গিয়ে শায়েস্তা করে দেবেন, সেই তাড়া খেয়ে তবেই তারা হাঙ্গেরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল। রুমানিয়ানরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হাঙ্গেরির রক্ষণপন্থীরা একটা বেসরকারি সেনাবাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুললেন; দেশের মধ্যে যেখানে যত উদারপন্থী বা প্রগতিবিরোধী ব্যক্তি বা দল ছিলেন, এদের লেলিয়ে সকলকে ঠাণ্ডা করে দিলেন যেন আর কেউ বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা না করতে পারে। এমনি করে ১৯১৯ সনের হাঙ্গেরির প্রসিদ্ধ 'শ্বেত-আতঙ্ক'-এর শুরু হল; অনেকের মতে এর কাহিনীটা "যুদ্ধোত্তর কালের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত শোণিতসিক্ত পৃষ্ঠা"। হাঙ্গেরিতে এখনও খানিকটা সামন্ত-প্রথা টিকে আছে। যুদ্ধের সময়ে বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা দারুণ লাভ খেয়ে ফেঁপে উঠেছিলেন; এই সামন্ত ভূস্বামীরা তাঁদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন। তার পর

*এই 'আন্‌শ্‌লুস্‌' ঘটেছিল ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে।

এ'রা মিলে হত্যা এবং বিভীষিকার যজ্ঞ শুরু করলেন—কেবল কমিউনিস্ট নয়, সাধারণ ভাবেই সমস্ত শ্রমিকরা, এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা, উদারপন্থীরা, শান্তিকামীরা, এমনকি ইহুদিরা পর্যন্ত সকলেই হলেন সে যজ্ঞের বলি। সেই থেকে আজও পর্যন্ত হাঙ্গেরিতে ডিক্‌টেটারি শাসন চলছে। লোককে দেখাবার জন্য একটা পার্লামেন্ট এখনও রাখা হয়েছে; কিন্তু ভোট দেবার খামটা খোলা থাকে, মানে পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচনের সময় কে কাকে ভোট দিচ্ছে সেটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে হয়; ডিকটেটর-কর্তাদের অপছন্দসই কোনো লোক যাতে নির্বাচিত না হতে পারে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীই সেদিকে নজর রাখে। রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা নিয়ে কোনো প্রকাশ্য সভা করতে দেওয়া হয় না।

যুদ্ধের পরবর্তী কালে মধ্য-ইউরোপে কী সব কাণ্ড ঘটেছে এবং মধ্য-ইউরোপীয় শক্তি বলতে যে দেশগুলোকে বোঝাত, যুদ্ধ, পরাজয় এবং রুশ বিপ্লবের কী প্রতিক্রিয়া তাদের উপরে হয়েছে, তার খানিকটা আলোচনা এই চিঠিতে আমি করলাম। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে যুদ্ধের কী বিস্ময়কর ফল দেখা দিয়েছে, এবং তার ফলেই ধনিকতন্ত্রের কী বিষম দুর্দশা বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে, তার আলোচনা আমরা পৃথকভাবে করব। এই চিঠিটিতে যা যা লিখেছি তার মোট সারাংশ হচ্ছে এই : যুদ্ধের পরবর্তী সেই সময়টাতে ইউরোপে সমাজ-বিপ্লব একেবারে আসন্ন বলে মনে হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার এতে সুবিধা হয়ে গেল; কারণ বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে কেউই ঠিক পুরোপুরি মন স্থির করে একে আঘাত করতে সাহস পাচ্ছিলেন না, তাঁদের ভয় ছিল তা করতে গেলে তাঁদের নিজেদের শ্রমিকরাই একেবারে ক্ষেপে যাবে। সে বিপ্লব কিন্তু এল না। এখানে সেখানে টুক্‌রো-টাক্‌রা আকারেই সে দেখা দিল, কিন্তু সে-সব চেষ্টা স্রেফ মার খেয়েই থেমে গেল। এই সমাজ-বিপ্লবকে বিচূর্ণ করবার এবং এড়িয়ে চলবার ব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা অনেকখানিই অংশ গ্রহণ করল; অথচ তাদের দলের ভিত্তিই ছিল এই রকমের একটা সমাজ-বিপ্লব-মূলক মতবাদ। ভাব দেখে মনে হয়, এই সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌দের হয়তো-বা আশা বা বিশ্বাস ছিল, ধনিকতন্ত্র যথাসময়ে স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতএব জোর আক্রমণ চালিয়ে তাকে ধ্বংস করবার পরিবর্তে এ'রা বরং তাকে তখনকার মতো বাঁচিয়ে রাখতেই সাহায্য করলেন। অথবা হয়তো তাঁদের দলের যে বিরাট এবং ধনশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেই তাঁরা বেশ আরামে দিন কাটাতে পারছিলেন; বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গেও তাঁদের স্বার্থ অনেকখানিই জড়িয়ে পড়েছিল, অতএব তখন একটা সমাজ বিপ্লবের ঝুঁকি আর তাঁরা নিতে চান নি। একটা মধ্য পন্থা ধরে চলতে চেষ্টা করলেন তাঁরা, তার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারেই ভণ্ডুল করে ফেললেন। যেটুকু তাঁদের ছিল তাও শেষপর্যন্ত হারিয়ে বসলেন। জর্মনিতে সম্প্রতি যে-সব ব্যাপার ঘটেছে তা থেকে এই কথাটাই আরও বেশি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

যুদ্ধ-পরবর্তী এই কটি বছরের আর একটি বৃহৎ ব্যাপার হচ্ছে এই; হিংসা হানাহানির প্রবৃত্তিটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষে যখন অহিংসার মন্ত্র প্রচারিত হচ্ছিল ঠিক সেই সময়টাতেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জুড়ে চলেছে হিংসার রাজত্ব, সে হিংসার উপরে এতটুকু আবরণও নেই, তার অনুষ্ঠানে লজ্জাবোধ নেই, বরং তাকেই যেন একটা মহৎ কাজ বলে সবাই গৌরববোধ করছে। এটা অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে যুদ্ধের কল্যাণে; তারপর আবার বিভিন্ন শ্রেণীদের মধ্যে বেধেছে স্বার্থের সংঘাত। সে সংঘাত যত স্পষ্ট যত তীব্র হয়ে উঠেছে, হিংসাবৃত্তিও তার সঙ্গে সঙ্গে ততই বেড়ে চলেছে। ঔদার্য বস্তুটাই পৃথিবী থেকে প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে; উনবিংশ শতাব্দীতে যে গণতন্ত্রের আদর্শে মানুষ বিশ্বাসী ছিল তারও উপরে আর এখন কারও আস্থা নেই। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ এখন অধিকার করে বসেছে ডিক্‌টেটররা।

যুদ্ধে যাদের পরাজয় হয়েছিল, তাদের কথাই এই চিঠিতে আমি বলেছি। বিজয়ী দেশদেরও একই ধরনের সংকটে পড়তে হয়েছে, অবশ্য ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে মধ্য-ইউরোপের মতো কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটে নি। ইতালিতে একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয় ঘটেছিল, তার ফলও হয়েছে অদ্ভুত—সে কাহিনীটা আলাদা করে দেখবার মতো।

পুরোনো ঋণ শোধের নূতন উপায়

১৫ই জুন

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ, এবং কতক পরিমাণ সমস্ত পৃথিবীটাই, যেন একটা ... কড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল, ভার্সাই সন্ধি এবং অন্যান্য সব সন্ধির ফলে অবস্থা বরং আরও খারাপ হল। ইউরোপের যে নূতন মানচিত্র রচনা করা হল তাতে আগের দিনের কয়েকটা জাতীয় সমস্যা মিটল : পোল, চেক এবং বাল্‌টিক-অঞ্চলের জাতিগুলো স্বাধীনতা পেয়ে গেল। কিন্তু তারই সংগে সংগে আবার নূতন কতকগুলো জাতীয় সমস্যার সৃষ্টিও করা হল এতে : অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত টাইরোলের খানিকটা চলে গেল ইতালির হাতে, ইউক্রেনের কতক অংশ হল পোল্যাণ্ডের অধীন; পূর্ব-ইউরোপে এই রকমের আরও কতকগুলো অন্যায় দেশ-বিভাগ করা হল। এর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত এবং সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হয়েছিল পোলিশ করিডর (পোল্যাণ্ডের সমুদ্রতীর অবাধ যাতায়াতের জন্য জর্মানির অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রস্তুত সংকীর্ণ পথ) এবং ডানজিগ্ সম্বন্ধে কৃত ব্যবস্থা। মধ্য এবং পূর্ব-ইউরোপকে 'বল্‌কানে রূপান্তরিত' করা হল—অনেকগুলো ছোটো ছোটো নূতন দেশ তৈরি করা হল সেখানে; তার মানেই আরও বেশি করে সীমান্তরেখা এবং আরও বেশি শুল্ক-প্রাচীর সৃষ্টি করা হল; এবং তারপর তাই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা আর বিদ্বেষের পথ খুলে দেওয়া হল।

১৯১৯ সনের এই সন্ধিগুলো তো রইলই তাছাড়া আবার রুমানিয়া পাকেচক্রে বেসারাবিয়া দখল করে বসল—এতদিন এটা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ার একটা অংশ। এই নিয়ে তখন থেকেই সোভিয়েট রাশিয়া আর রুমানিয়ার সংগে তর্কাতর্কি এবং কলহ চলছে। বেসারাবিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'নীপার-তীরের আলসেস-লোরেন'।

দেশ-বিভাগের এই-সব পরিবর্তনের চেয়েও বড়ো সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের সমস্যা—মানে যুদ্ধের ব্যয় এবং ক্ষতির দরুন খেসারৎ বলে সে টাকাটা বিজয়ী মিত্রপক্ষকে চুকিয়ে দেবার দায় বিজিত জর্মানির ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার সমস্যা। ভার্সাই সন্ধিতে এই টাকার কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক স্থির করে দেওয়া হয় নি; কিন্তু পরবর্তীকালে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৬০০,০০০,০০০ পাউণ্ড বলে, কতকগুলো বার্ষিক কিস্তিতে এই টাকা জর্মানির শোধ করতে হবে। এই বিরাট পরিমাণ টাকা মিটিয়ে দেওয়া যে-কোনো দেশের পক্ষেই অসম্ভব; জর্মানি যুদ্ধে পরাজিত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, তার তো কথাই নেই। জর্মানি এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানাল, অবশ্য সে প্রতিবাদে ফল কিছুই হল না। শেষে উপায়ান্তর না দেখে সে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টাকা ধার করে দুটি কি তিনটি কিস্তির টাকা মিটিয়ে দিল। এটা সে করল শুধু কিছু সময় পাবার উদ্দেশ্যে, যেন সেই অবসরে কথাটাকে নিয়ে আবার একটু আলাপ আলোচনা করে দেখতে পারে। বহু পুরুষ ধরে একাদিক্রমে এই বৃহৎ টাকার অঙ্ক দিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়, এটা সে বেশ ভালো করেই জানত, অন্য দেশরাও অনেকেই বুঝত।

অল্পদিনের মধ্যেই জর্মানির রাজস্ব-ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়ল; যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বাইরের ঋণ শোধ করা বা দেশের মধ্যেকার ব্যয় মেটানো, দুইই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশকে যে টাকা তার দেবার, সেটা দিতে হবে সোনা দিয়ে। নির্দিষ্ট তারিখে সে টাকা সে দিতে পারল না। অতএব কিস্তির খেলাপ হল। জর্মানির এলাকার মধ্যেই যে টাকা দেবার আছে, সেটা অবশ্য সরকার কারেন্সি-নোট দিয়েই মিটিয়ে দিতে পারেন; অতএব তখন তাঁরা ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে নোট ছাপতে শুরু করলেন। কিন্তু কাগজের নোট ছেপে টাকা তৈরি হয় না, তৈরি হয় ঋণপত্র। লোকেরা সে নোট ব্যবহার করে,

কারণ তারা জানে চাইলেই সে নোট ভাঙিয়ে সোনা বা রুপো পাওয়া যাবে। এই নোটের পিছনে সবসময়েই খানিকটা সোনা ব্যাঙ্কে মজুত করে রাখতে হয়, তা নইলে নোটের দাম ঠিক থাকবে না। এই কাগজের টাকা খুবই কাজের জিনিস সন্দেহ নেই; প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য যতখানি সোনা বা রুপোর টাকা দেশে দরকার তার অনেকখানির প্রয়োজন এতে কমে যায়; ঋণ-মুদ্রারও পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু তাই বলে সরকার যদি কেবলই নোট ছেপে চলেন, পরিমাণের সীমা না রেখে এবং ব্যাঙ্কে সোনা কত মজুত রইল তার দিকে লক্ষ্য না রেখে সে নোট অবাধে বাজারে ছাড়তে থাকেন, তাহলে এই নোট-টাকার দাম কমে যেতে বাধ্য। তখন যত বেশি নোট ছাপা হবে ততই তার দাম কমবে, তাকে দিয়ে ঋণও ক্রমেই কম শোধ হবে। এই অবস্থাটার নাম হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। জর্মনিতে ১৯২২ এবং ১৯২৩ সনে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। ব্যয়-নির্বাহের জন্য জর্মন সরকারের আরও বেশি টাকার প্রয়োজন। অতএব তাঁরা ক্রমেই বেশি বেশি করে নোট ছাপতে লাগলেন। এর ফলে অন্য সমস্ত জিনিসপত্রেরই দর হু হু করে চড়ে গেল; শুধু জর্মন মার্কের দাম পাউন্ড, ডলার বা মার্কের তুলনায় কমে যেতে লাগল। সুতরাং তখন জর্মন সরকারকে আরও বেশি করে মার্ক ছাপতে হল, তার ফলে আবার মার্কের দাম আরও নেমে গেল। এই ব্যাপার এত বেশিদূর গড়াল যে শেষপর্যন্ত একটা ডলার বা একটা পাউন্ডের বাজার দর দাঁড়াল কোটি-কোটি মার্কের সমান। কাগজের মার্কের বস্তুত প্রায় কোনো মূল্যই রইল না। একখানা চিঠি পাঠাবার মতো একটা ডাক-টিকিটের দাম পড়তে লাগল দশ লক্ষ কাগজের মার্ক! সমস্ত জিনিসপত্রেরই দর এই রকম হয়ে উঠল, প্রতিমুহূর্তে সে দরের পরিবর্তন হতে লাগল।

জর্মনির এই মুদ্রাস্ফীতি এবং মার্কের এই বিস্ময়কর মূল্য-হ্রাস অবশ্য নিজে থেকে ঘটে নি। আর্থিক দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য জর্মন সরকার ইচ্ছে করেই এটা ঘটিয়েছিলেন; সে উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধও হয়েছিল। সরকার মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য ঋণী পক্ষদের জর্মনির মধ্যে যার যত দেনা ছিল, এই মূল্যহীন কাগজের মার্ক দিয়ে অতি সহজেই তাঁরা সমস্ত শোধ করে দিলেন। অন্য দেশের লোকের কাছে বা অন্য দেশের কাছে যে-সব দেনা তাঁদের ছিল সেটা অবশ্য এভাবে শোধ করা সম্ভব ছিল না; দেশের বাইরের কেউই এই কাগজের টাকা নিতে রাজি হবে না। জর্মনির মধ্যের লোককে এই টাকা গছানো সহজ, না নিতে চাইলে, আইনের ভয় আছে। এইভাবে সরকার এবং দেশের প্রত্যেকটি ঋণী ব্যক্তি অনেকখানি ঋণের বোঝা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেললেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে জর্মনিকে অনেকখানি কষ্টই সয়ে নিতে হল। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমস্ত লোককেই কষ্ট পেতে হল, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি দুর্দশা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের; কারণ এদের সকলেরই বাঁধা মাইনে বা অন্যরকম বাঁধা আয়ের উপরে নির্ভর করে চলতে হয়। মার্কের দাম কমবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এদের মাইনেও কিছু বেড়েছিল, কিন্তু এত বেশি বাড়ে নি যাতে করে মার্কের দাম যে রকম হু হু করে নেমে যাচ্ছিল তার তাল সামলানো যায়। এই মুদ্রাস্ফীতির আঘাতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দেশ থেকে; পরবর্তী কালে জর্মনিতে যে-সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে তার কারণ বুঝতে হলে এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। এই ক্ষুব্ধ, উচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা এবার একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হল, তাদের মন সবারই প্রতি বিরূপ, অতএব যে-কোনো মুহূর্তে তারা বিপ্লব ঘটিয়ে বসতে পারে। দেশের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোকে আশ্রয় করে যে-সব বড়ো বড়ো বেসামরিক সেনাবাহিনী তখন গড়ে উঠছিল, এরা ক্রমে তার এক-একটাতে গিয়ে ভিড়ল; এদের অধিকাংশই গিয়ে জুটল হিটলারের নূতন দলটিতে যার নাম ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট্ বা নাৎসী দল।

পুরোনো মার্ক একেবারে সকল কাজেরই অযোগ্য হয়ে গেছে দেখে তখন সেটাকে বাতিল করে দেওয়া হল, 'রেণ্টেন-মার্ক' বলে একটা নূতন মুদ্রার প্রবর্তন করা হল। এটাকে আর অতিরিক্ত স্ফীত করা হল না; এর দাম এর সমপর্যায়ের সোনারই সমান রইল। এইভাবে তার

নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের একেবারে উচ্ছিন্ন করে দেবার পর জর্মানি আবার একটা নির্ভরযোগ্য মুদ্রামানের ব্যবস্থা করে নিল।

জর্মানি যে অর্থসংকটে পড়েছিল তার ফলে পৃথিবী জুড়ে অনেক কাণ্ডই হয়ে গেল। জর্মানি মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে পারল না। মিত্রপক্ষের দেশরা এই ক্ষতিপূরণের টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিত; সবচেয়ে বড়ো ভাগটা উঠত ফ্রান্সের ঘরে। রাশিয়া এর অংশ গ্রহণ করত না; বস্তুত এতে তার যদি-বা কোনো দাবি থাকে সে দাবিও সে নিজে থেকেই ছেড়ে দিয়েছিল। জর্মানি টাকা দেবার কিস্তি খেলাপ করল দেখে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ম সৈন্য পাঠিয়ে জর্মানির রুঢ়-অঞ্চলটি দখল করে বসল। ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে মিত্রপক্ষ আগে থেকেই রাইনল্যাণ্ড দখল করে নিয়েছিল। এবার, ১৯২৩ সনের জানুয়ারি মাসে, আরও একটা নূতন অঞ্চল ফরাসি আর বেলজিয়ানরা দখল করল। (ইংলণ্ড এই অভিযানে এদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করেছিল)। এই রুঢ়-অঞ্চলটা রাইনল্যাণ্ডের একেবারে সংলগ্ন; এখানে খুব ভালো ভালো কয়লার খনি আর কারখানা আছে। ফরাসিদের মতলব ছিল, এখানকার এই কয়লা এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যই তাদের প্রাপ্য বাবদ হস্তগত করে নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি মুশকিল দেখা দিল। জর্মন-সরকার স্থির করলেন, ফরাসিরা রুঢ় দখল করে নিয়েছে, তাঁরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে তাদের বাধা দেবেন। রুঢ়ের যত খনির মালিক আর শ্রমিকদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, কাজ বন্ধ করে দাও, ফরাসিদের কোনো রকমেই সাহায্য কোরো না। কাজবন্ধ করাতে এই খনির-মালিক এবং শিল্পপতিদের যে লোকসান হল তার ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকার তাঁদের লক্ষ লক্ষ মার্ক নগদ ধরে দিতে লাগলেন যেন ধর্মঘট অবাধে চলতে পারে। নয় কি দশমাস কাল ধরে এই লড়াই চলল, ফরাসি এবং জর্মন দুপক্ষেরই নিদারুণ অর্থব্যয় হল এর জন্য। এর পরে জর্মন সরকার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি প্রত্যাহার করলেন, ফরাসিদের সঙ্গে একত্র হয়েই রুঢ়-অঞ্চলের সমস্ত খনি আর কারখানা চালাতে লাগলেন। ১৯২৫ সনে ফরাসিরা এবং বেলজিয়ানরা রুঢ় ছেড়ে চলে গেল।

রুঢ়ে জর্মনরা যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়েছিল সেটা শেষপর্যন্ত সফল হয় নি; কিন্তু তাই থেকেই একথাটা স্পষ্ট প্রমাণ হল, যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের সমস্যাটা আবার নূতন করে আলোচনা করে দেখা দরকার, ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণটা এমন করে স্থির করা দরকার যাতে সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়। অতএব তখন অল্পদিনের মধ্যে পর পর অনেকগুলো কনফারেন্স্ আর কমিটি বসানো হল; একটার পর একটা করে বহু নূতন পরিকল্পনা খাড়া করা হল। ১৯২৪ সনে হল ডয়েজ্ প্ল্যান; পাঁচ বছর পরে, ১৯২৯ সনে হল ইয়ং প্ল্যান; আরও তিন বছর পরে, ১৯৩২ সনে, সংশ্লিষ্ট পক্ষরা সকলেই বস্তুত স্বীকার করলেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ আর টাকা দেওয়ার কোনো কথাই উঠতে পারে না—ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটাই সেই থেকে তুলে দেওয়া হল।

১৯২৪ সনের পর থেকে এই ক'বছর জর্মানি নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে এসেছে। জর্মানির হাতে টাকা নেই, বাজারে সে দেউলিয়া, তবে সে টাকা দিল কি করে? দিল অতি সহজ উপায়ে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধার করে। মিত্রপক্ষ (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি) আমেরিকার কাছে টাকা ধারতেন—সে টাকা তাঁরা যুদ্ধের সময়ে ধার নিয়েছিলেন। জর্মানি মিত্রপক্ষের কাছে টাকা ধারত ক্ষতিপূরণের দেনা বাবদ। অতএব আমেরিকা টাকা ধার দিল জর্মানিকে; জর্মানি সেই টাকা মিত্রপক্ষকে দিল; অতএব মিত্রপক্ষ আবার আমেরিকাকে টাকা দিতে পারল। ভারি চমৎকার বন্দোবস্ত; দেখা গেল এই বন্দোবস্তে সকলেই সমান খুশি! বস্তুত প্রাপ্য টাকা আদায় করবার এছাড়া আর উপায়ও কিছু ছিল না। অবশ্য এই ধার-নেওয়া আর ধার-দেওয়ার সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছিল একটি মাত্র বস্তুর উপরে—সেটি হচ্ছে আমেরিকার ক্রমাগত জর্মানিকে টাকা ধার দিতে থাকা। আমেরিকা টাকা দেওয়া বন্ধ করলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই তৎক্ষণাৎ ধ্বসে পড়ে যেত।

এই-সব ধার-দেওয়া আর ধার-নেওয়া মানে কিন্তু নগদ-টাকার লেন-দেন নয়; এর সবটাই ছিল শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপার। আমেরিকা একটা টাকার অঙ্ক জর্মানির নামে

হিসাবে লিখে রাখত; জর্মানি সেইটা চালান করে দিত মিত্রপক্ষের নামে; মিত্রপক্ষ আবার সেটাকে ফিরে চালান করত আমেরিকার কাছে। টাকা চালাচালি মোটেই হত না আসলে; হত খালি খাতাপত্রে কতকগুলো হিসাব লেখালেখি। এই-সব সর্বস্বান্ত দরিদ্র দেশ, পুরোনো দেনার দরুন সুদের টাকাপর্যন্ত মিটিয়ে দেবার সামর্থ্য যাদের ছিল না, আমেরিকা এদের ক্রমাগত টাকা ধার দিয়ে যাচ্ছিল কেন? দিচ্ছিল তার কারণ আমেরিকা এদের কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল, যেন এরা একেবারে দেউলিয়া হয়ে না যায়। আমেরিকার ভয় ছিল ইউরোপ পাছে একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। সেটা হলে অন্য নানাবিধ বিপর্যয় তো দেখা দেবেই, আমেরিকার নিজের কাছে এদের যার যত দেনা আছে, সে টাকাও পাবার আশা তার চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞ মহাজনের মতো আমেরিকা তার খাতকদের জীবিত এবং সবল করে রাখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত টাকা ধার দিতে দিতে বছর কয়েক পরে আমেরিকা নিজেও বিরক্ত হয়ে উঠল; আর টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল। ক্ষতি-পূরণ আর ঋণ ইত্যাদি নিয়ে যে বিশাল ব্যাপারটি খাড়া করা হয়েছিল, সেটি তৎক্ষণাৎ একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল; কেউই আর কারও প্রাপ্য শোধ করতে পারল না; ইউরোপ আর আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশ সেই বিপর্যয়ের ধাক্কায় একেবারে বিষম একটা পঙ্কদহে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

কাজেই দেখছ, যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ নিয়ে একটা বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, যুদ্ধের পর বারো বছরেরও বেশিদিন ধরে সে সমস্যার ছায়া ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্যদিকে ছিল যুদ্ধ-ঋণের সমস্যা, অর্থাৎ জর্মানি ছাড়া অন্যান্য দেশদের যে ঋণ ছিল, তার। আগের একটা চিঠিতে বিশ্বযুদ্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে তোমাকে বলেছি, যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যুদ্ধের ব্যয়ের সংস্থান করছিল, তাদের ক্ষুদ্রতর মিত্র-জাতিদের টাকা ধার দিচ্ছিল। তারপর ফ্রান্সের টাকা ফুরিয়ে গেল, সে আর অন্যকে ধার দিতে পারল না। ইংলণ্ড কিন্তু তখনও ধার দিয়ে চলল। তারপর আবার ইংলণ্ডেরও সম্বল শেষ হয়ে গেল, তখন সেও আর ধার দিতে পারে না। তখন ধার দেবার মতো টাকা আছে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের; ইংলণ্ডকে, ফ্রান্সকে, মিত্রপক্ষের অন্যান্য দেশকে, সে মুক্তহস্তে ধার দিতে লাগল, দিয়ে নিজেরই লাভ গুছিয়ে নিল। অতএব যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, কতকগুলো দেশ ফ্রান্সের কাছে টাকা ধারে; অনেক দেশ ইংলণ্ডের খাতকের তালিকায় নাম লিখিয়েছে, এবং মিত্র-পক্ষের প্রত্যেক দেশেরই আমেরিকার কাছে বহু টাকা দেনা। আমেরিকাই তখন একমাত্র দেশ যার অন্য কোনো দেশের কাছে দেনা নেই। সে তখন একটি বিরাট উত্তমর্ণ জাতি। যে মর্যাদা একদা ইংলণ্ডের ছিল সেটা এখন সেই দখল করে নিয়েছে; সমস্ত পৃথিবীরই মহাজন হয়ে বসেছে। কয়েকটা অঙ্কের হিসাব দিই, এ থেকে হয়তো ব্যাপারটা তুমি আরও স্পষ্ট বুঝতে পারবে। যুদ্ধের আগে আমেরিকা নিজেই ছিল ঋণী দেশ; অন্যান্য দেশের কাছে তার তখন ৩,০০,০০,০০,০০০ ডলার দেনা। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন তার এ ঋণ তো শোধ হয়েই গেছে; উলটে আমেরিকাই রাশিকৃত টাকা অন্যান্য দেশদের ধার দিয়ে বসে আছে। ১৯২৬ সনে অন্যান্য দেশদের কাছে আমেরিকার মোট পাওনার পরিমাণ ছিল ২৫,০০,০০,০০,০০০ ডলার।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ঋণী দেশগুলোর পক্ষে এই যুদ্ধ-ঋণ একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছিল; কারণ এর সমস্তটাই সরকারি ঋণ, সে ঋণ শোধ দেবার দায় এই-সব দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষের। আমেরিকার কাছ থেকে এ'রা ঋণশোধের কিছু বিশেষ রকম সুবিধাজনক শর্ত আদায় করতে চেষ্টা করলেন, খানিকটা অনুগ্রহ পেলেনও। তবু সে ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামে না। জর্মানি যতদিন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে চলল, ততদিন এই ঋণী দেশরাও সেই টাকাটাই (আসলে সেটা আমেরিকারই প্রদত্ত ঋণ-মুদ্রা) আমেরিকার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারলেন। কিন্তু জর্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় যখন অনিয়মিত হয়ে উঠল বা বন্ধ হয়ে গেল, তখন এ'দের পক্ষেও ঋণ শোধ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠল। ইউরোপের এই ঋণী দেশরা তখন ধুয়ো তুললেন, জর্মানির প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আর এ'দের দেয়

যুদ্ধ-ঋণ, দুটো বস্তু আসলে পরস্পর সংশ্লিষ্ট; ওটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে এটা দেওয়াও কাজেকাজেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমেরিকা কিন্তু দুটোকে একত্র মিলিয়ে ফেলতে রাজি হল না। বলল, আমরা টাকা ধার দিয়েছি, সে টাকা আমরা ফেরৎ চাই—ব্যস্। জর্মনির দেয় ক্ষতিপূরণ তো একেবারেই আলাদা জিনিস। সে ক্ষতিপূরণ তোমরা পেলে কি না পেলে তার সঙ্গে আমাদের টাকার সম্পর্ক কী? আমেরিকার এই মনোভাবে ইউরোপের দেশরা অত্যন্ত চটে গেল, তার নামে খুব কঠিন কঠিন কুকথা বলতে লাগল। আমেরিকা একটা শাইলক, তার এক পাউন্ড মাংস না আদায় করে সে ছাড়বে না এই তো? অনেকে, বিশেষ করে ফ্রান্স, রব তুললেন, কেন, আমেরিকার কাছ থেকে যে টাকা আমরা ধার করেছিলাম সে তো যুদ্ধের জন্যই খরচ করা হয়েছে, যুদ্ধটা আমাদের সকলেরই ব্যাপার, আমেরিকারও তাতে ভাগ ছিল। কাজেই এখন সেটাকে একটা সাধারণ দেনা বলে মনে করা আমেরিকার মোটেই উচিত হয় না। ওদিকে আবার, যুদ্ধের পরে ইউরোপে যে নিদারুণ রেষারেষি আর চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল তার রকম দেখে আমেরিকাও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। সে দেখল, ফ্রান্স ইংলণ্ড ইতালি তখনও তাদের সেনা-বাহিনী আর নৌবাহিনীর পিছনে অজস্র টাকা ঢেলে চলেছে; কতকগুলো ছোটো ছোটো দেশকেও অস্ত্রসজ্জা করবার জন্য টাকা ধার দিচ্ছে। তা, অস্ত্রসজ্জা করবার বেলায় যদি এত টাকাই ইউরোপের এই দেশদের থেকে থাকে, তবে আমেরিকাই বা এদের কাছে তার যা প্রাপ্য আছে সেটা ছেড়ে দেবে কিসের খাতিরে? আর ছেড়ে যদি দেয়, তবে তো সে টাকাটাও নিশ্চয় যাবে এদের অস্ত্রসজ্জার তহবিলে। এই হল আমেরিকার যুক্তি; অতএব সেও পণ ক'রে রইল, তার পাওনা টাকা সে আদায় করবেই।

ক্ষতিপূরণের টাকার মতো, যুদ্ধ-ঋণের এই টাকাও শোধ করে দেওয়া এমনিতেই খুব কঠিন ছিল। আন্তর্জাতিক ঋণ শোধ হতে পারে নগদ সোনা দিয়ে, বা মালপত্র এবং কাজ (যেমন যানবাহন, জাহাজ-চলাচল ইত্যাদি বহুরকমের কাজ) দিয়ে। এই বিরাট পরিমাণ টাকা শুধু সোনা দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার; অত সোনা জুটবে কোথা থেকে। তার উপর আবার ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধ-ঋণ দুটোর বেলাতেই জিনিসপত্র বা কাজ দিয়ে দেনা শোধ করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল; কি আমেরিকা কি ইউরোপের দেশরা, সকলেই তখন প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু বাণিজ্য-শুল্কের প্রাচীর তুলে বসে আছে, সে পাঁচিল ডিঙিয়ে বিদেশী মালপত্র ঢোকবারই পথ নেই। এর ফলে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল; দেনা শোধের আসল মুশকিল হল এইখানেই। অথচ এই অবস্থাতেও কোনো দেশই তার শুল্ক-প্রাচীর এতটুকু নিচু করতে বা তার প্রাপ্য টাকা বাবদ মালপত্র নিতে রাজি হল না; সে করতে গেলে তার নিজের দেশের শিল্পের ক্ষতি হবে। অদ্ভুত একটা দুষ্ট-চক্র।

অবশ্য একমাত্র ইউরোপের দেশরাই যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টাকা ধারত, এমন নয়। আমেরিকার ব্যাঙ্কাররা এবং ব্যবসায়ীরা কানাডা এবং লাতিন আমেরিকাতেও (তার মানে দক্ষিণ এবং মধ্য-আমেরিকা এবং মেক্সিকো) বিপুল পরিমাণ টাকা লগ্নী করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আধুনিক শিল্প এবং কল-কারখানার শক্তির দাপট দেখে লাতিন আমেরিকার এই দেশগুলি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। অতএব তারা প্রাণপণ করে তাদের শিল্প প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলতে লেগে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের টাকার অভাব নেই, সেখান থেকে হুড়হুড় করে টাকা আসতে লাগল। এরা ক্রমে এত টাকা ধার করে বসল, যে তার দরুন সুদ মিটিয়ে দেওয়াই তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল; লাতিন আমেরিকাতে বহু ডিক্‌টেটর গজিয়ে উঠল। আমেরিকা থেকে যতক্ষণ টাকা ধার পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এদের অসুবিধাও কিছুই ছিল না; ঠিক যেমন জর্মনিকে যতদিন আমেরিকা ধার দিয়ে দিয়ে চলছিল ততদিন সুবিধাই ছিল। তার পর একদিন আমেরিকা লাতিন আমেরিকাকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল; সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের মতো সেখানেও ভাঙনের হিড়িক পড়ে গেল।

লাতিন আমেরিকাকে কী-পরিমাণ টাকা আমেরিকা ধার দিচ্ছিল এবং তার পরিমাণ কীরকম দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠছিল, দুটি অঙ্ক দিয়ে তোমাকে সেটা একটুখানি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ১৯২৬

সনে এই টাকার মোট পরিমাণ ছিল ৪,২৫,০০,০০,০০০ ডলার। ঠিক তিন বছর পরে, ১৯২৯ সনে এর পরিমাণ দাঁড়াল ৫,৫০,০০,০০,০০০ ডলারেরও বেশি।

অতএব যুদ্ধ-পরবর্তী এই কটি বছর আমেরিকাই ছিল সমস্ত পৃথিবীর মহাজন, তাতে সন্দেহ নেই। ধনী, সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ আমেরিকা—এত টাকা তখন তার হয়েছে যে টাকার ভারেই তার ফেটে পড়বার উপক্রম। পৃথিবীতে তখন তারই কর্তৃত্ব; ইউরোপের দিকে এবং তার চেয়েও বেশি করে এশিয়ার দিকে, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে তাকাচ্ছে; তার দৃষ্টিতে এরা সেকেলে বুড়ো, জরাগ্রস্ত এবং কলহপরায়ণ, ভীমরতিতে পেয়েছে এদের। ১৯২০ সনের পর থেকে আমেরিকার সমৃদ্ধি ক্রমে চরমে উঠল; সে সময়ে তার কী পরিমাণ টাকা হয়েছিল তার একটা আন্দাজ তোমাকে দিচ্ছি। ১৯১২ সনে আমেরিকার মোট জাতীয় সম্পদের পরিমাণ ছিল ১,৮৭,২৩,৯০,০০,০০০ ডলার; পনর বছর পরে ১৯২৭ সনে এর পরিমাণ দাঁড়াল, ৪,০০,০০,০০,০০,০০০ ডলার। ১৯২৭ সনে তার লোকসংখ্যা ছিল ১১৭০ লক্ষের মতো; অতএব জনপ্রতি সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩,৪২৮ ডলার। এত তাড়াতাড়ি তার সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে যে এই-সব অঙ্ক প্রত্যেক বছরই বদলে যাচ্ছে। এর আগের একটি চিঠিতে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের বার্ষিক আয় তুলনা করে দেখিয়েছি, সে চিঠিতে আমি আমেরিকার ঘরের অঙ্কটা অনেক ছোটো বলে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে অঙ্কটা ছিল বার্ষিক আয়ের অঙ্ক, মোট সম্পদের পরিমাণ নয়। তাছাড়া খুব সম্ভবত সে অঙ্কটাও এর আগের কোনো বছরের। ১৯২৭ সনের যে অঙ্কটা এখানে দেখালাম, সেটা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কুলিজ সাহেবের প্রদত্ত একটা বিবরণ থেকে তৈরি করা হয়েছে—১৯২৬ সনের নভেম্বর মাসে কুলিজ এই বিবরণ প্রকাশ করেন।

আরও কয়েকটা অঙ্ক এই সঙ্গেই তোমাকে শুনিয়ে দিই। এর সবগুলোই ১৯২৭ সনের অঙ্ক। যুক্তরাষ্ট্রে মোট পরিবার ছিল—২,৭০,০০,০০০। এদের যতগুলি ইলেট্রিক-আলো-ওয়ালা বাড়ি ছিল তার মোট সংখ্যা ১,৫৯,২৩,০০০। ১৭,৭৫০,০০০টি টেলিফোন চালু ছিল। মোটর গাড়ি ব্যবহার হত ১,৯২,৩৭,১৭১ খানা; সমস্ত পৃথিবীতে যত মোটরকার চলত এটা তার একশো ভাগের ৮১ ভাগ। পৃথিবীতে মোট যত মোটরগাড়ি সে বছর তৈরি হয়েছে, একা আমেরিকাতেই তৈরি হয়েছে তার শতকরা ৮৭ খানা; পৃথিবীতে মোট পেট্রোলিয়ামের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ উৎপন্ন হয়েছে আমেরিকায়; যত কয়লা উৎপন্ন হয়েছে তার শতকরা ৪৩ ভাগ হয়েছে আমেরিকাতেই। অথচ আমেরিকাতে মোট যা লোক ছিল তার পরিমাণ ছিল পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ৬ জন। অতএব সেখানে মানুষের জীবনযাত্রার সাধারণ মানটাই ছিল অত্যন্ত উঁচু। তবু কিন্তু যতখানি উঁচু সেটা হওয়া সম্ভব ছিল ততটা উঁচু নয়; কারণ বহু ধনই গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছিল অল্প কয়েক হাজার লক্ষপতি এবং কোটিপতির হাতে। এই 'বড় ব্যবসাদাররাই' দেশটাকে শাসন করছিলেন। এঁরাই প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করেন; এঁরাই আইন বানান; আবার এঁরাই বহু ক্ষেত্রে সে আইন ভেঙে থাকেন। এই বড়ো ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্তরকম দুর্নীতির রাজত্ব চলত; কিন্তু আমেরিকার লোকরা তা নিয়ে মাথা ঘামাত না—তারা মোটের উপর যতক্ষণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারছে ততক্ষণ তাদের কী যায় আসে।

১৯২০ সনের পরবর্তী কালে আমেরিকার যে সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছে, তার সম্বন্ধে এই অঙ্কগুলো আমি তোমাকে শোনালাম দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। তার প্রথমটি হচ্ছে, আধুনিক শিল্প-প্রধান সভ্যতার জোরে এই দেশটি যে প্রচণ্ড সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, তার সঙ্গে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি শিল্প-বিমুখ পশ্চাৎপদ দেশদের তুলনা করে দেখানো। আরেকটা উদ্দেশ্য, এই সমৃদ্ধি এবং এর পরবর্তী কালে আবার সেই আমেরিকাতেই যে বিষম সংকট এবং ভাঙন দেখা দিয়েছে, এদের মধ্যে তুলনা করা। এই সংকটের কথা আমি তোমাকে পরে বলব।

সংকট এল আরও পরে। ১৯২৯ সন পর্যন্ত সকলেই ভাবছিল, ইউরোপ আর এশিয়া যে দুর্গতিতে পড়েছে আমেরিকা বুঝি তার হাত এড়িয়েই যেতে পারল। পরাজিত দেশগুলোর অবস্থা তো নিতান্তই খারাপ হয়ে উঠেছিল। জর্মনির দৈন্য-দুর্দশার কথা আমি তোমাকে খানিকটা বলেছি। মধ্য-ইউরোপের অধিকাংশ ছোটো ছোটো দেশের, বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার অবস্থা হল

তার চেয়েও বহুগুণে বেশি খারাপ। তার উপর আবার অস্ট্রিয়াতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল; পোল্যাণ্ডেও তাই। এদের দুজনকেই নিজেদের মুদ্রামান বদলে ফেলতে হল।

কিন্তু দুর্দশা যে শুধু পরাজিত দেশগুলোরই হল, তা নয়। বিজয়ী দেশগুলোও ক্রমে ক্রমে এর আবর্তে এসে জড়িয়ে পড়ল। দেনাদার হয়ে থাকাটা ভালো কথা নয়, এটা চিরদিনেরই জানা কথা। এবারে একটা নূতন এবং অদ্ভুত জ্ঞান এরা লাভ করল : পাওনাদার হওয়াটাও বিশেষ সুখের কথা নয়। জর্মানির কাছ থেকে এই বিজয়ী দেশদের ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্য ছিল; এই ক্ষতিপূরণকে উপলক্ষ্য করেই এদের বিষম বিপদ উপস্থিত হল; আবার সে ক্ষতিপূরণের টাকা পাবার ফলেই এরা আরও বেশি করে বিপন্ন হয়ে পড়ল। তার কাহিনী আমি তোমাকে পরের চিঠিতে বলছি।

১৭৩

টাকার অদ্ভুত আচরণ

১৬ই জুন, ১৯৩৩

যুদ্ধের পরবর্তী কালে পৃথিবীতে যে কটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে টাকার অদ্ভুত আচরণ। যুদ্ধের আগে প্রত্যেক দেশেরই টাকার একটা মোটামুটি স্থির মূল্য ছিল। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব মুদ্রা ছিল, যেমন ভারতবর্ষে টাকা, ইংলণ্ডে পাউণ্ড, আমেরিকাতে ডলার, ফ্রান্সে ফ্রাংক, জর্মানিতে মার্ক্, রাশিয়াতে রুব্‌ল, ইতালিতে লিরা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মুদ্রাগুলির আবার পরস্পরের মধ্যে একটা দর বাঁধা ছিল, সে দর বদলাত না। 'আন্তর্জাতিক স্বর্ণ-মান' যাকে বলে, তারই দ্বারা এরা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত—তার মানে প্রত্যেকটি মুদ্রারই একটা নির্দিষ্ট মূল্য ছিল, সোনার দরে নির্ধারিত মূল্য; প্রত্যেক দেশের মুদ্রা তার নিজের সীমানার মধ্যে চলবে; কিন্তু বাইরে চলবে না। দুই দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার ঠিক হত, কোন্ মুদ্রায় কতখানি সোনা আছে তাই দিয়ে। অতএব দুই দেশের মধ্যে যত লেন-দেন, যত হিসাব-নিষ্পত্তি, তাও করা হত সোনা দিয়ে। প্রত্যেক দেশের মুদ্রার স্থির স্বর্ণমূল্য যতক্ষণ বজায় থাকছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিক বিনিময় বা লেন-দেনের অঙ্কও বিশেষ বদলাত না; কারণ সোনার দর মোটের উপর সর্বদাই প্রায় এক থাকে।

যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে পড়ে সমস্ত যুদ্ধ-রত দেশের সরকাররা স্বর্ণ-মান ছেড়ে দিলেন, তার ফলে তাঁদের মুদ্রার দাম কমে গেল। খানিকটা মুদ্রাস্ফীতিও ঘটানো হল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার সুবিধা হল, কিন্তু বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে যে পরস্পর সম্পর্ক ছিল সেটা ওলটপালট হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় সমস্ত পৃথিবীটাই দুটি বৃহৎ ভাগ হয়ে গিয়েছিল—একদিকে মিত্রপক্ষ, একদিকে জর্মন-পক্ষ। প্রত্যেক পক্ষেরই মধ্যেকার দেশদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমানুবর্তন চলত, কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনকেই অন্য সব কিছুর চেয়ে বড়ো করে দেখা হচ্ছিল তখন। কিন্তু যুদ্ধের পরে মুশকিল বাধল। অর্থনৈতিক অবস্থা তখন বদলে যাচ্ছে, কোনো দেশই অন্য দেশকে বিশ্বাস করছে না; এর ফলে সকল দেশেরই মুদ্রার বিচিত্র রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এখনকার দিনে টাকা-কড়ির বাজারটা বেশির ভাগই চলছে ঋণ-মুদ্রা দিয়ে। ব্যাঙ্ক নোট এবং চেক দুটোই আসলে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিপত্র; টাকার সামিল বলেই তাকে লোকে মেনে নেয়। ঋণ বস্তুটা চলে বিশ্বাসের উপরে: বিশ্বাস যখন ভেঙে যায় তখন ঋণও অচল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পর থেকে টাকার বাজারে যে এত গোলমাল চলছে, এইটেই তার একটা কারণ : ইউরোপের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাছাড়া এখনকার পৃথিবীতে সবাইকে অন্য সবাইর উপরে নির্ভর করতে হয়, প্রত্যেক দেশই অন্য প্রত্যেক দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত হয়ে আছে; দেশে দেশে সারাক্ষণই নানারকমের কাজ কারবার চলছে। তার মানেই হচ্ছে, একটি দেশে যদি কোনো গোলমাল

হয়, সে গোলমালের ফল অবিলম্বে অন্যান্য দেশেও আত্মপ্রকাশ করে। জর্মনির মার্কের যদি দাম কমে যায় বা জর্মনির একটা ব্যাঙ্ক যদি লালবাতি জ্বালে, তবে হয়তো তার ফলে লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্কের লোকেরাও নানান-রকমের মুশকিলে পড়ে যাবে।

এই-সব কারণেই (এবং আরও অনেক কারণে, সেগুলো তোমাকে এখানে বলবার দরকার নেই), প্রায় সমস্ত দেশে তখন মুদ্রা-নীতি বা টাকার বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেল, শিল্পপ্রগতির দিক থেকে যে দেশ যত বেশি অগ্রণী, বিপদও হয়েছে তারই তত বেশি। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। শিল্প-প্রগতিতে অগ্রণী হবার মানেই হচ্ছে, সে দেশটি আরও নানা দেশের সঙ্গে বহুবিধ বন্ধনে বাঁধা রয়েছে, সে বন্ধন যেমন জটিল তেমনই সূক্ষ্ম। তিব্বত অনগ্রসর দেশ, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কও তেমন নেই, মার্ক বা পাউণ্ডের দর চড়ল কি পড়ল তাতে তার কিছুমাত্র যাবে আসবে না—একথা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু ডলারের দর যদি হঠাৎ কমে যায়, তবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই জাপানে কান্নাকাটি পড়ে যাবে।

তার পর আবার, প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেরই মধ্যে এক-একদল লোকের স্বার্থ ছিল এক-একরকম। অনেকে চাইছিল টাকার দর কমুক, মুদ্রাস্ফীতি হোক (অবশ্য জর্মনির মতো অমন মাত্রাহীন সীমাহীন মুদ্রাস্ফীতি নয়); অনেকে আবার চায় ঠিক তার উল্টোটি, মুদ্রা-সংকোচন করা হোক তার মানেই সোনার অঙ্কে টাকার দাম বাড়ুক। যেমন ধরো, যারা পরের কাছে টাকা পাবে, মানে ব্যাঙ্কার ইত্যাদিরা, তারা ছিল টাকার দর বাড়বার পক্ষপাতী—তারা টাকা পাবে, অতএব টাকার দাম বেশি হলেই তাদের লাভ। তেমনি আবার, যাদের দেনা আছে তারা স্বভাবতই চাইবে টাকার দাম কমে যাক—সস্তা টাকা দিয়ে দেনা শোধ করায় তাদের সুবিধা। শিল্পপতিরা কারখানাওয়ালারা সস্তা টাকার পক্ষপাতী, কারণ এরা ছিল সাধারণত খাতকের দল, ব্যাঙ্কদের কাছে এদের দেনা। তার চেয়েও বড়ো কথা, এর ফলে বিদেশে তাদের তৈরি মাল বেচার সুবিধা হবে। ব্রিটেনের টাকার যদি দাম কমে যায়, তবে তার ফলে বিদেশের বাজারে জর্মনি বা আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের মালের তুলনায় ব্রিটেনের মালের দর কম হবে, সুতরাং সে বাজারে ব্রিটেনের মালই বেশি বিকোবে, ব্রিটিশ শিল্পপতিদের তাইতেই লাভ। কাজেই দেখছ, এক-একদল টাকার দরটাকে এক-একদিকে টানতে লাগল; এই দড়িটানাটানির খেলায় প্রধান দুইপক্ষ হল শিল্পপতিরা আর ব্যাঙ্কাররা। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করে আমি কথাটা বলবার চেষ্টা করলাম। আসলে অবশ্য আরও অনেক জটিল ব্যাপার এর মধ্যে ছিল।

ফ্রান্সে এবং ইতালিতে মুদ্রাস্ফীতি হল, ফ্রাঙ্ক আর লিরার দাম কমে গেল। ফ্রাঙ্কের আগের দর ছিল প্রতি পাউণ্ড স্টার্লিং-এ (ব্রিটিশ পাউণ্ডের সরকারি নাম) ২৫ ফ্রাঙ্কের মতো। সেটা কমে হল প্রতি পাউণ্ডে ২৭৫ ফ্রাঙ্ক। শেষ পর্যন্ত সেটাকে পাউণ্ডে ১২০ ফ্রাঙ্কের কাছাকাছি একটা স্থির দর বেঁধে দেওয়া হল।

যুদ্ধের পরে আমেরিকা ব্রিটেনকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিল, তার ফলে পাউণ্ডেরও দর অল্প একটু পড়ে গেল। ইংলণ্ডের তখন একটি সমস্যা উপস্থিত হল। এখন সে কী করবে? পাউণ্ডের মূল্য স্বাভাবিক কারণেই যেটুকু কমেছে, এই মূল্য-হ্রাসকেই স্বীকার করে নেবে, এই নূতন দরেই পাউণ্ডের দাম ধার্য করে দেবে? তা করলে জিনিসপত্রের দাম কমবে, শিল্পপতিদের সুবিধা হবে; কিন্তু ব্যাঙ্কার এবং উত্তমর্নদের তাতে লোকসান হবে। তার চেয়েও বড়ো কথা, লণ্ডন এতদিন ছিল সমস্ত পৃথিবীর টাকার বাজারের কেন্দ্রস্থল, তার সে প্রতিষ্ঠারও অবসান হবে এতে। তখন তার সেই জায়গাতে এসে দাঁড়াবে নিউইয়র্ক; পৃথিবীর লোক টাকা ধার করতে আর লণ্ডনে আসবে না, নিউইয়র্কে যাবে। আর এ যদি না হয়, তবে অন্য পন্থাটি হচ্ছে পাউণ্ডের দরকে ঠেলে তুলে তার পুরোনো অঙ্কেই কায়েমি করে রাখা। পাউণ্ডের তাতে মর্যাদা বাড়বে, লণ্ডনও আগের মতোই টাকার বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকতে পারবে। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হবে এতে; তা-ছাড়া আরও অনেক অবাঞ্ছিত ফল এর দেখা দেবে—কার্যকালে দেখা দিয়েওছিল।

১৯২৫ সনে ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন তাঁরা দ্বিতীয় পন্থাটিই নেবেন। পাউণ্ডের স্বর্ণ-মূল্যকে বাড়িয়ে তাঁরা ঠিক আগের অঙ্কে পৌঁছে দিলেন। এই ভাবে ব্যাংকারদের রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থকে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করলেন। কিন্তু আসল সমস্যা যেটি তখন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আরও অনেক গুরুতর—তাঁদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়েই টান পড়বার উপক্রম ঘটেছিল তখন। পৃথিবীর টাকার বাজারে লণ্ডনই এতদিন প্রভুত্ব করে এসেছে। আজ যদি সে আসন থেকে সে বিচ্যুত হয়, তবে আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ নেতৃত্ব বা সাহায্যের আশায় তার কাছে ছুটে আসবে না; এতবড়ো সাম্রাজ্যটাই ধীরে ধীরে মিলিয়ে শেষ হয়ে যাবে। অতএব এই প্রশ্নটা হয়ে উঠল একটা সাম্রাজ্যিক নীতির প্রশ্ন; ব্রিটেনের শিল্প-বাণিজ্য এবং দেশের লোকের আপাত-স্বার্থকে বলি দিয়েও এই বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদকেই তখন বাঁচিয়ে রাখা হল। তোমার হয়তো মনে আছে, ঠিক এই ভাবেই সাম্রাজ্য রক্ষার কথা চিন্তা করে যুদ্ধের পরে ব্রিটেন ভারতবর্ষের শিল্প-প্রচেষ্টাকে উৎসাহ এবং সাহায্য দিয়েছে; ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্প এবং ব্রিটেনের অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের অনেকটা ক্ষতি স্বীকার করেও।

নেতৃত্ব এবং সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখবার জন্য ব্রিটেন খুব একটা বীরোচিত চেষ্টাই করল সন্দেহ নেই। কিন্তু এর দরুন তাকে ভয়ানক লোকসান সইতে হল; শেষপর্যন্ত চেষ্টাটা সফলও হল না। অর্থনৈতিক জীবনে যে অনিবার্য ভাগ্য-বিপর্যয় তার আসন্ন হয়ে উঠেছিল তার প্রতিরোধ করবার সাধ্য ব্রিটিশ সরকারের হল না, কোনো সরকারেরই হয় না। কিছুদিনের মতো অবশ্য পাউণ্ড তার পুরোনো মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু তার মূল্য দিতে হল নিদারুণ—দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমে যেন পক্ষাঘাতে অচল হয়ে পড়ল। বেকার-সমস্যা বাড়ল, বিশেষ করে কয়লা-শিল্পের খুব বেশি রকম ক্ষতি হল। পাউণ্ডের সংকোচনই (স্বর্ণ-মূল্য বাড়াবার এই কায়দাটিকে এই নামেই ডাকা হয়) ছিল এর প্রধান হেতু। অন্যান্য কারণও অবশ্য ছিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জর্মানির কাছ থেকে খানিকটা কয়লা নেওয়া হয়েছিল, তার মানেই ব্রিটিশ কয়লার প্রয়োজন আর ততটা রইল না; সুতরাং কয়লার খনিতে যে শ্রমিকরা খাটত তাদের মধ্যে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ল। বিজেতা অতএব পাওনাদার দেশরা এইভাবে ধীরে ধীরে বুঝতে লাগল, বিজিত দেশের কাছে এই ধরনের রাজস্ব আদায় করে নেওয়াটা ঠিক অবিমিশ্র সুখলাভের ব্যাপার নয়। ব্রিটেনের কয়লা-শিল্পের বন্দোবস্তও ছিল অত্যন্ত খারাপ। বহু শত শত ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা ভাবে খনি চালাত; ইউরোপ মহাদেশের এবং আমেরিকার খনি চলত অনেক বেশি বড়ো বড়ো এবং অনেক বেশি সুসংহত সব প্রতিষ্ঠানের হাতে—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলা ক্ষুদ্রকায় এবং বিশৃঙ্খল ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানদের পক্ষে সহজ ছিল না।

কয়লা-শিল্পের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হতে লাগল; খনির মালিকরা তখন স্থির করলেন শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দেবেন। খনি-শ্রমিকরা এতে ভয়ানক আপত্তি জানাল; অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরাও তাদেরই সমর্থন করল। ব্রিটেনের সমগ্র শ্রমিক-বাহিনী খনি-শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল; একটি 'কর্ম-পরিষৎ' গঠন করা হল। এর কিছুদিন আগে দেশের প্রধান তিনটি ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে একটি খুব বড়ো রকমের 'ত্রি-শক্তি মৈত্রী' স্থাপিত হয়েছিল; এই তিনটি ট্রেড-ইউনিয়ন হচ্ছে খনি-শ্রমিক, রেলওয়ে-শ্রমিক এবং যান-বাহন-শ্রমিকদের ইউনিয়ন—লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত এবং সুসংহত শ্রমিক এদের মধ্যে ছিল। শ্রমিকরা এইরকম মারমুখো হয়ে উঠেছে দেখে সরকার একটু ভয় পেয়ে গেলেন; খনিওয়ালাদের একটা মোটারকম অর্থসাহায্য দিয়ে তাঁরা আসন্ন সংকটটাকে তখনকার মতো ঠেকিয়ে দিলেন—সেই সাহায্যের টাকায় মালিকরা আরও এক বছর পর্যন্ত পুরোনো হারেই বেতন দিয়ে চলতে পারবে। ইতিমধ্যে অবস্থা বুঝবার জন্য একটা তদন্ত কমিশনও বসানো হল। কিন্তু আসল কাজের কিছুই হল না এতে। পরের বছর মানে ১৯২৬ সনে খনিওয়ালারা আবার বেতন কমাতে চেষ্টা করলেন। অতএব সংকটও আবার আসন্ন হয়ে উঠল। সরকার এবার আর ভয় পেলেন না; শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়েই দাঁড়ালেন—গত কয়েক মাসে এই লড়াইয়ের জন্য তাঁরা সমস্ত রকম আয়োজন করে নিয়েছেন।

কয়লা-ওয়ালারা স্থির করলেন, মজুররা বেতন কাটাতে রাজি হচ্ছে না, অতএব তাঁরা খনি তালাবন্ধ করে দেবেন। এর ফলে অবিলম্বে সারা ইংলণ্ড জুড়ে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। এই ধর্মঘটের নির্দেশ দিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এঁদের আহ্বানে দেশে আশ্চর্য সাড়া জেগে উঠল; দেশের যেখানে যত সুসংহত শ্রমিকসংঘ ছিল, প্রায় প্রত্যেকেই কাজ বন্ধ করে দিল। ইংলণ্ডের সমস্ত জীবনযাত্রাটাই প্রায় থমকে থেমে গেল—রেলগাড়ি চলে না, খবরের কাগজ ছাপানো যায় না, কোনো কাজকর্মই প্রায় চলছে না দেশে। দুটো চারটে অত্যন্ত অপরিহার্য কাজ শুধু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দ্বারা সরকার কোনোক্রমে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। এই দেশব্যাপী ধর্মঘট শুরু হয় ১৯২৬ সনের ৩রা-৪ঠা মে দুপুররাত্রে কিন্তু ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা এই শ্রেণীর বৈপ্লবিক ধর্মঘট পছন্দ করতেন না; দশদিন ধর্মঘট চালাবার পর হঠাৎ এঁরা ধর্মঘট বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন; কে কোন্ অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তাঁদের দিয়েছে ইত্যাদি অজুহাত দেখালেন। খনি শ্রমিকরা একেবারে দমে পড়ে গেল; তবু বহু দীর্ঘকাল, বহু মাস ধরে অনেক কষ্ট সয়েও তারা নিজেরা ধর্মঘট চালিয়ে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনাহার আর পীড়নের চোটেই তাদের হার মানতে হল। কেবল খনি-শ্রমিক নয়, ব্রিটেনের সমস্ত শ্রমিকেরই সেটা একটা নিদারুণ পরাজয়। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হল; অনেক কারখানাতে খাটুনির সময় বাড়িয়ে দেওয়া হল; শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান আরও নিচু হয়ে গেল। সরকার পক্ষের জয় হয়েছিল, সেই সুযোগে তাঁরা অনেকগুলো নূতন আইন তৈরি করে নিলেন, যেন তাই দিয়ে শ্রমিকদের জোর কমিয়ে দেওয়া যায়, যেন ভবিষ্যতে আর এরকমের কোনো দেশব্যাপী ধর্মঘট ঘটবার সম্ভাবনা না থাকে। ১৯২৬ সনের এই দেশজোড়া ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছিল তার কারণ, শ্রমিকদের নেতাদের মনের জোর এবং মতির স্থিরতা ছিল না, ধর্মঘটের জন্য তাঁরা ঠিকমতো প্রস্তুতও হয়ে নেন নি। বস্তুত এঁদের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মঘটকে এড়িয়ে চলা; সেটা যখন পেরে উঠলেন না তখন প্রথম সুযোগটি পাবামাত্রই একে তাঁরা ভেস্তে দিলেন। অন্য দিকে সরকার পক্ষ এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ছিলেন; এবং তাঁদের পিছনে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের সমর্থন।

ইংলণ্ডের এই ব্যাপক ধর্মঘট এবং কয়লার খনির দীর্ঘকালব্যাপী তালাবন্ধ ধর্মঘট দেখে সোভিয়েট রাশিয়াতে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল; ইংলণ্ডের খনি-শ্রমিকদের সাহায্যার্থে রাশিয়ার ট্রেড-ইউনিয়নরা একেবারে রাশি রাশি টাকা পাঠিয়ে দিলেন—রাশিয়ার শ্রমিকরাই চাঁদা করে সে টাকা তুলে দিয়েছিল।

তখনকার মতো ইংলণ্ডে শ্রমিকরা পরাভূত হল। কিন্তু দেশের শিল্পপ্রচেষ্টায় তখন ভাঙন ধরেছে, বেকার-সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে—তার সমাধান এ দিয়ে হয় না। বেকার-সমস্যা মানেই হচ্ছে শ্রমিকদের ব্যাপক দুঃখদুর্দশা; তাছাড়া রাষ্ট্রের উপরেও এটা একটা প্রচণ্ড বোঝা হয়ে উঠেছিল; কারণ ইতিমধ্যে বহু দেশেই একটা বেকার-বীমার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। সকলেই তখন স্বীকার করছে, যে শ্রমিক তার নিজের কোনো দোষ ছাড়াই বেকার হয়ে রইল, তাকে ভরণপোষণ জোগাবার ভার বা কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের। অতএব বেকার বলে যারা খাতায় নাম লিখিয়েছে তাদের সাহায্য বা ভিক্ষা বলে কিছু দিতেই হত; অতএব সরকার এবং স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানদের প্রকাণ্ড পরিমাণ টাকা এই জন্য ব্যয় করতে হচ্ছিল।

এই-সমস্ত ব্যাপার ঘটছিল কেন? শুধু ইংলণ্ডে বলে নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই কেন তখন শিল্পের অবনতি ঘটছিল, বাণিজ্যে মন্দা পড়েছিল, বেকার-সমস্যা বেড়ে চলেছিল? মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল? কত কন্ফারেন্সের পর কন্ফারেন্স হল, অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য রাষ্ট্রনীতিবিদরা আর শাসকরা স্পষ্টতই ব্যগ্রতা দেখাতে লাগলেন, কিন্তু ফল কিছুই হল না। এমন নয় যে ভূমিকম্প বন্যা বা অনাবৃষ্টির মতোই একটা কী প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে আঘাত হেনেছে পৃথিবীকে, বয়ে নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ আর দুর্দশা। পৃথিবী তো তখনও আগে যেমন চলত প্রায় তেমনই চলেছে! বাস্তবিকই তখন পৃথিবীতে আগের চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য ছিল, অনেক বেশি কারখানা ছিল, যা কিছু মানুষের প্রয়োজন সবই অনেক বেশি বেশি ছিল। অথচ মানুষের দৈন্য-দুর্দশাও আগের চেয়ে ছিল

অনেক বেশি। এই উল্‌টো ফল, এর মূলে কোথাও খুব প্রচণ্ড একটা ভুল রয়েছে, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারেই তখন বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত চলেছে। সমাজতন্ত্র-বাদীরা ও কমিউনিস্টরা বলছে, এর সবই হচ্ছে ধনিকতন্ত্রের কুফল; তার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। প্রমাণ হিসাবে তারা দেখাচ্ছিল রাশিয়াকে—বহু বিপত্তি বহু বাধাবিঘ্ন রয়েছে সেখানে, কিন্তু বেকার-সমস্যা অন্তত নেই।

এ-সব বড়ো জটিল আলোচনা; আর ব্যাধি কি করে সারবে সে সম্বন্ধে ডাক্তার আর পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও একবার সমস্যাটাকে নেড়েচেড়ে দেখা যাক; এর মধ্যে খুব বড়ো বড়ো কথা যে-কটা আছে তার দু-একটাকে আলোচনা করে দেখি।

সমস্ত পৃথিবী এখন দিন দিন একটিমাত্র অখণ্ড রূপ গ্রহণ করছে, এই রূপান্তর তার অনেকখানি সম্পূর্ণও হয়েছে। তার মানে, মানুষের জীবন, কার্যকলাপ, পণ্য-উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ—সমস্তই একটা আন্তর্জাতিক বা সর্ব-জাগতিক ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে, এই পরিণতির বেগও দিনদিনই বাড়ছে। বাণিজ্য, শিল্প, মুদ্রা-নীতি, এদেরও প্রকৃতি হয়েছে অনেকখানিই আন্তর্জাতিক। এসব ব্যাপারে সকল দেশই এখন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা; পরস্পরের উপর নির্ভর করেই তারা বাঁচছে, একদেশে কোনো কিছু ঘটলে অন্য দেশদের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অথচ এই এতখানি আন্তর্জাতিকতার মধ্যেও প্রত্যেক দেশের সরকার আর তার কূটনীতি এখনও চলেছে জাতীয়তার সংকীর্ণ পথ ধরে। বস্তুত যুদ্ধের পরবর্তী এই কটি বছরের মধ্যে এদের এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ক্রমেই উত্তরোত্তর বিকৃত এবং উগ্র হয়ে উঠেছে; আজকের দিনে পৃথিবীর অনেকখানি ব্যাপারই চলছে এর ইঙ্গিতে। তার ফলে বাধছে বিরোধ—একদিকে জগতের বাস্তব আন্তর্জাতিক জীবনের সব ঘটনা, আর একদিকে বিভিন্ন দেশের সরকারপক্ষের জাতীয় কূটনীতি—এই দুয়ের মধ্যে সারাক্ষণই সংঘাত চলেছে। মনে করো পৃথিবীর এই আন্তর্জাতিক জীবনধারা, এ যেন একটা নদী সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে; আর বিভিন্ন জাতির নিজস্ব কূটনীতি যেন সেই নদীকে বাঁধবার চেষ্টা—তার স্রোতকে সে থামিয়ে দিতে চায়, বাঁধ দিয়ে আটকাতে চায়, পথ ছেড়ে অন্যপথে ঘুরিয়ে নিতে চায়, এমনকি পিছন ফিরেও যাওয়াতে চায়। সে নদী পিছন ফিরে যাবে না, বা তাকে থামিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এতো সোজা কথা। কিন্তু তবু হঠাৎ একবার হয়তো তার গতি খানিকটা ঘুরিয়ে দেওয়া যেতেও পারে, বা একটা বাঁধ দেবার ফলে হয়তো সে ফুলে উঠে বন্যারই সৃষ্টি করতে পারে। ঠিক এমনি করেই আজকালকার এই জাতীয়তাবাদ নদীর সহজ ধারাটিকে ব্যাহত করছে, বন্যা ঘূর্ণি বা পঙ্কিল পল্বলের সৃষ্টি করছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার নিজের পথে বয়ে চলবেই, তাকে ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য এদের নেই।

বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাই আবির্ভাব হয়েছে তথাকথিত 'অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদের'। এর মানে হচ্ছে, দেশ অন্যদের কাছ থেকে যতটা পণ্য কিনল তার চেয়ে তাদের কাছে তার বেচতে হবে বেশি; যতটা পণ্যসামগ্রী সে ভোগ করে তার চেয়ে তাকে উৎপাদন করতে হবে বেশি। প্রত্যেক দেশই তার নিজের পণ্য অপরের কাছে বেচতে চাইছে—কিন্তু তাই যদি হয়, সে পণ্য কিনবে কে? মাল বেচতে গেলেই, বিক্রেতা যেমন থাকবে তেমনই ক্রেতাও তো থাকা চাই। কেবলমাত্র বিক্রেতা দিয়েই ভরা একটা জগৎ—এ অতি অসম্ভব কল্পনা। অথচ এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। প্রত্যেক দেশ তার চারদিকে বাণিজ্য-শুল্কের প্রাচীর খাড়া করে দিচ্ছে, বিদেশী পণ্য দেশে ঢুকতে না পারে এই শুল্ক তার পথ বন্ধ করবার অর্থনৈতিক বেড়া। আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে, তার নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা। আধুনিক জগৎ গড়েই উঠেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আশ্রয় করে; এই শুল্ক-প্রাচীরগুলো সে বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাকে হত্যা করছে। বাণিজ্যে মন্দা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পেরও দুর্দশা ঘটে, বেকার-সমস্যা বেড়ে যায়। তাই দেখে তখন আবার উগ্রতর উৎসাহে বিদেশী পণ্যকে বাইরে ঠেলে রাখবার চেষ্টা শুরু হয়—বলা হয়, এই পণ্যই এসে দেশের শিল্পকে বাড়তে দিচ্ছে না। শুল্ক-প্রাচীর আরও উঁচু করে তোলা

হয়। অতএব তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরও বেশি বাধা পড়ে; এমনি করেই এই সংকট চক্র পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে।

আধুনিক জগতের শিল্প-জীবন বস্তুত জাতীয়তাবাদের যুগকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। পণ্য-উৎপাদন এবং বণ্টনের যে আয়োজন পৃথিবীতে গ'ড়ে উঠেছে, বিশেষ কোনো দেশ বা সরকারের জাতীয় গণ্ডির এলাকাতে আর তার স্থান-সঙ্কুলান হয় না। ভিতরকার দেহটা ক্রমশ বেড়ে বড়ো হয়ে উঠছে, তার তুলনায় খোলাটা ছোটো; অতএব সে খোলা ফেটে ভেঙে যাচ্ছে।

বাণিজ্যের পথে এই যে-সব শুল্ক-প্রাচীর প্রভৃতির বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, এতে বস্তুত প্রত্যেক দেশের কয়েকটি মাত্র শ্রেণীর উপকার। কিন্তু দেশের মধ্যে সেই শ্রেণীদেরই হাতে প্রভুত্ব; অতএব দেশ কোন্ পথে চলবে তাও এরাই স্থির করবে। প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করছে লাফ দিয়ে অন্যকে ডিঙিয়ে যাবে; ফলে সবাই মিলেই হুড়োহুড়ি ঠোকাঠুকি করে মরছে, দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া মেটাবার জন্য এখন বার বার করে চেষ্টা করা হচ্ছে, কত সভা কত কনফারেন্স ডাকা হচ্ছে; সভায় সকল দেশেরই রাষ্ট্রনীতিবিদরা খুব ভালো ভালো সংকল্প ব্যক্ত করছেন; তবু শান্তিস্থাপন তাঁরা কিছুতেই করতে পারছেন না। শুনে যেন ঠিক, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান-শিখের সমস্যা মেটাবার জন্য যে বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার কথাই মনে পড়ে যায়—তাই না? সম্ভবত দুটি ক্ষেত্রেই চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে একই কারণে : ভুল ধারণা আর ভুল তথ্য নিয়ে এঁরা তর্ক করছেন, ভুল উদ্দেশ্য তো রয়েছেই।

শুল্ক-প্রাচীর এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সহায়ক আরও যত ফিকির-ফন্দি আছে, যেমন শিল্পকে সরকারি অর্থ-সাহায্য, পণ্যের রেল ভাড়ার বিশেষ সস্তা দর, ইত্যাদি—এর ফলে লাভ হয় কোন্ শ্রেণীদের? মালিক এবং উৎপাদক শ্রেণীদের। শুল্ক ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে দেশের বাজারটিকে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, সেই বাজারের লাভটা এরা তুলে নেয়। এমনি করে বাণিজ্য-সংক্ষরণ শুল্ক-প্রাচীর ইত্যাদির আচরণে কতকগুলো কায়েমী-স্বার্থ গড়ে তোলা হয়; তারপর কায়েমী-স্বার্থওয়ালাদের যা নিয়ম, তাদের তিলমাত্র ক্ষতি ঘটতে পারে এমন কোনো পরিবর্তনের কথা উঠলেই এরা ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করতে থাকে। বাণিজ্য-শুল্ক একবার বসানো হলে সে শুল্ক যে আর তুলে দেওয়া হয় না, চলতেই থাকে, এইটাই হচ্ছে তার একটা কারণ। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদে সকলেরই ক্ষতি একথাটা এখন প্রায় সকল মানুষই বুঝে নিয়েছে; কিন্তু তবুও সে বস্তুটা পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে না—তারও কারণ এই। কতকগুলো কায়েমী-স্বার্থ একবার সৃষ্টি করে নিলে, তারপর তাকে উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। কোনো একটি দেশের পক্ষে একাকী এই কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া আরও বেশি শক্ত। পৃথিবীর সকল দেশ যদি একত্র হয়ে কাজ করতে রাজি হত, শুল্ক-প্রাচীর বস্তুটাকেই একেবারে তুলে দিতে, বা অন্তত অনেকখানি ছেঁটে দিতে রাজি হত, তাহলে হয়তো বা কাজটা হতেও পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কাজ সহজ হত না; তার কারণ, শিল্প-প্রচেষ্টায় যে দেশগুলি পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের এতে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ত—যে-দেশটা অনেক বেশি এগিয়ে গেছে তাদের সঙ্গে সমানতালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হত না। অনেকসময়ে সংরক্ষণ-শুল্কের আড়াল দিয়েই দেশে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা হয়।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে বাধা দেয়, বন্ধ করে দেয়, তার ফলে পৃথিবীর বাজারে বেচাকেনা ঠিকমত চলতে পারে না। প্রত্যেক দেশই একটি একচেটিয়া এলাকাতে পরিণত হয়। তার বাজার তার নিজের জনাই সংরক্ষিত; পৃথিবীতে অবাধ বাণিজ্যের খোলা বাজার ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বড়ো বড়ো ট্রাস্ট, বড়ো বড়ো কারখানা, বড়ো বড়ো দোকানদার, ছোটো ছোটো উৎপাদক বা ছোটো ছোটো দোকানদার যারা ছিল তাদের গিলে হজম করে ফেলে; বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে কিছু আর থাকে না। আমেরিকাতে ব্রিটেনে জর্মনিতে জাপানে এবং অন্যান্য সকল শিল্প-প্রধান দেশে এই রকমের জাতীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানরা ভয়ানক তীব্র গতিতে বেড়ে উঠেছে;

ফলে দেশের সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে একত্রিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কটিমাত্র মানুষের হাতে। পেট্রল, সাবান, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রণসম্ভার, ইস্পাত, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি করে কত জিনিসই যে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়েছে তার হিসাব নেই। এর আবার একটা অদ্ভুত ফল আছে। এই একচেটিয়া ব্যবসায় হচ্ছে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং ধনিকতন্ত্রের প্রগতির অপরিহার্য ফল; অথচ সেই ধনিকতন্ত্রেরই মূল শিকড় এ কেটে দেয়। ধনিকতন্ত্রের শুরুই হয়েছিল পৃথিবী-জোড়া বাজার আর অবাধ-বাণিজ্যকে আশ্রয় করে। প্রতিযোগিতাই ছিল ধনিকতন্ত্রের প্রাণবায়ু। এখন যদি সে পৃথিবী-জোড়া বাজার আর না থাকে, দেশের গণ্ডির মধ্যেও যদি অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা আর বেঁচে না থাকে, তবে ধনতান্ত্রিক সমাজের এই যে পুরোনো ইমারৎ, এর তলাটাই একদম ফেঁসে যাবে। এর জায়গাতে তখন আবার কে এসে বসবে সে আলাদা কথা; কিন্তু এই-যে পরস্পর-বিরোধী কাণ্ড-কারখানা চারদিকে চলেছে, এ অবস্থায় পুরোনো দিনের ব্যবস্থাও আর বেশিদিন চলতে পারবে না বলেই মনে হয়।

বিজ্ঞান আর শিল্প এতদূর এগিয়ে চলেছে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। বিজ্ঞান আর শিল্প মিলে বিপুল-পরিমাণ খাদ্য এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী তৈরি করছে; তত জিনিস নিয়ে কী করা যায় সেইটাই ধনিকতন্ত্র ভেবে উঠতে পারছে না। বস্তুত, প্রায়ই সে তার খানিকটা নষ্ট করে ফেলতে বা উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে দিতে রত হয়। অতএব আমরা একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি: ধনের প্রাচুর্য আর মানুষের দৈন্য একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আর যন্ত্রশিল্পের পাল্লা যতদূর, ততখানি এগিয়ে চলবার শক্তি যদি ধনিকতন্ত্রের না থাকে, তবে তার পরিবর্তে আরেকটা এমন ব্যবস্থা বার করতে হবে যা বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশি তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। আর এ যদি করতে না চাই, তবে আর একটিমাত্র করবার জিনিস থাকে, সে হচ্ছে বিজ্ঞানকে গলাটিপে মেরে ফেলা, তাকে আর এগিয়ে যেতে না দেওয়া। কিন্তু সেটা কিঞ্চিৎ বোকার মতো কাজ হবে; সত্যিই সে কাণ্ড আমরা করতে যাব এটা ভাবাও শক্ত।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, একচেটিয়া ব্যবসায় এবং দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বৃদ্ধি, এবং ক্ষয়িষ্ণু ধনিকতন্ত্রের অন্যান্য যত অপসৃষ্টি—এদের ফলে পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদও আসলে এই ধনিক-তন্ত্রেরই একটা রূপ; প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী দেশই অন্যান্য দেশকে শোষণ করে তার নিজের সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। এর ফলে আবার সৃষ্টি হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদী দেশদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধিতা। পৃথিবীটাই যেন কেমন উল্টো-পাল্টা হয়ে গেছে আজ-কাল, এর সব-কিছু থেকেই খালি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়!

এই চিঠির শুরুতে আমি বলেছিলাম, যুদ্ধের পরবর্তী কালটিতে টাকার বড়ো অদ্ভুত আচরণ দেখা গেছে। কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত জিনিসই যেখানে অত্যন্ত অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা করে বেড়াচ্ছে, সেখানে টাকার আর দোষ দিই কী করে?

১৭৪

চাল এবং পাল্‌টা চাল

১৮ই জুন, ১৯৩৩

আগের দুটি চিঠিতে আমি অর্থনীতি আর মুদ্রানীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। দুটিই রহস্যময় এবং দুর্বোধ্য বিষয় বলে লোকের ধারণা। খুব সহজ নয় এটা ঠিকই; বুঝতে হলে একটু ভালো করে ভাবতেও হয়। তবু তাই বলে খুব ভয়ংকর ব্যাপারও এরা মোটেই নয়; এই বিষয়গুলির চারদিকে যে রহস্যের আবরণ ঘেরা রয়েছে তার খানিকটা হচ্ছে অর্থনীতিবিদ আর বিশেষজ্ঞদেরই সৃষ্টি। প্রাচীন কালে রহস্যের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ছিল পুরোহিতদের: নানান রকমের আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সাহায্যে এরা অজ্ঞ জনসাধারণকে নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে নিত; অনেকসময়েই কেউ বোঝে না এমন একটা প্রাচীনভাষায় মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করত, এমন ভাব দেখাত যেন অলক্ষ্য দেবতাদের সঙ্গে তাদের কথাবর্তা কাজকারবার চলছে। এখনকার দিনে পুরোহিতদের আর তেমন প্রতিপত্তি নেই; শিল্পপ্রধান দেশে তো এদের প্রতিপত্তি প্রায় লোপই পেয়ে গেছে। পুরোহিতদের জায়গা দখল করেছে এখন অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ, ব্যাঙ্কার ইত্যাদিরা—এঁরা রহস্যে-ঢাকা ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা প্রধানত কটমট সাঙ্কেতিক কথায় পরিপূর্ণ, সাধারণ মানুষ তার মাথামুণ্ডুও বোঝে না। অতএব এই-সব সমস্যার সমাধানের ভার সাধারণ মানুষরা বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞরা আবার অনেক সময়েই জেনেই হোক অজান্তেই হোক, ভিড়ে যান শাসক-শ্রেণীদের দলে; তাদের যাতে লাভ সেই কথাই বলে বেড়ান। বিশেষজ্ঞদেরও আবার পরস্পর মতের মিল থাকে না।

ওদিকে আবার, রাজনীতি বল অন্য যা-কিছু বল, সবই আজকাল চলছে অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। তাই অর্থনীতির এই তত্ত্বগুলো আমাদের সকলেরই খানিকটা জেনে নিতে চেষ্টা করা ভালো। মানুষের মধ্যে দল এবং শ্রেণী ভাগ করবার নানা উপায় আছে। একটি হচ্ছে মানুষ জাতকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা; তার একদল ঠিক তৃণের মতো, নিজের ইচ্ছা বা সংকল্প বলে তাদের কিছু নেই। স্রোতের মুখে তারা ঘাটে ঘাটে ঠেলা খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্য দল তা নয়, জীবনযাত্রার গতি নির্ধারণ তারা নিজের ইচ্ছামতোই করতে চায়, চারপাশের পরিবেশকে নিজে ইচ্ছামতো গড়তে চায়। জ্ঞান এবং বুদ্ধি না থাকলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির একটুও চলে না, কারণ একমাত্র জ্ঞান এবং বুদ্ধি থাকলে তবেই মানুষ নিজের ইচ্ছামতো কাজ ঘটিয়ে তুলতে পারে। শুধু সদিচ্ছা বা উচ্চাশা দিয়েই সব কাজ হয় না। কোথাও যখন একটা প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটে, বা মহামারী লাগে বা অনাবৃষ্টি হয় বা প্রায় যে-কোনো রকমেরই বিপদ উপস্থিত হয়, তখন শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপে পর্যন্ত দেখা যায়, লোকেরা সে বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণে প্রার্থনা করতে বসে যায়। প্রার্থনা করে যদি মন শান্ত হয়, মনে যদি বিশ্বাস বা সাহস আসে, তবে সে প্রার্থনা অতি ভালো বস্তু, তাতে কারও আপত্তি করবারও কারণ থাকে না। কিন্তু কেবল প্রার্থনার জোরেই মহামারী বা ব্যাধির আক্রমণ থেমে যাবে, এ ধারণা এখন আর লোকের নেই; এর জায়গাতে আসছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; ব্যাধির মূল কারণকে উচ্ছেদ করে ফেলতে হবে স্বাস্থ্য-বিধি পালন এবং অনুরূপ উপায়ের দ্বারা। কারখানার একটা কল হঠাৎ ভেঙে যায়, গাড়ির চাকার টায়ার হঠাৎ ফুটো হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে কে কোথায় শুনেছে, মানুষ তখন শুধু চুপ করে বসে থাকে, বসে বসে খালি আশা করে বা জোর কামনা করে বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে ভাঙা কল নিজে থেকে আস্ত হয়ে যাক বা সে চাকার ফুটো নিজে থেকেই জুড়ে যাক? তা তো করে না তারা—তারা চট্‌পট কাজে লেগে যায়, কলকে টায়ারকে মেরামত করে ফেলে; তারপরই আবার সে কল চলতে থাকে, সে গাড়ি রাস্তা বয়ে চমৎকার ছুটে চলে যায়।

মানুষ আর সমাজের এই-যে জীবনযাত্রার কল, এর বেলাও ঠিক তাই—এখানেও শুধু সৎ-সংকল্প দিয়ে কাজ হয় না, তার উপরেও দরকার হয় জ্ঞানের,—সে কল কী করে চলে, তাকে দিয়ে কী হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান। এই জ্ঞান কখনোই ঠিক নির্ভুল হয় না, তার কারণ এর কারবারই হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা, কামনা, সংস্কার প্রয়োজন, ইত্যাদি কতকগুলো অনিশ্চিত বস্তু নিয়ে; এক সঙ্গে বহু লোকের জনতাকে নিয়ে, সমগ্র সমাজকে বা মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করতে যাই সেখানে এগুলো আরও অনেক বেশি অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। তবু অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির ফলে ক্রমে এই অনিশ্চিত তত্ত্বপুঞ্জের মধ্যেও শৃঙ্খলার সন্ধান মেলে; মানুষের জ্ঞান ক্রমে বেড়ে ওঠে; তারই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে আমাদের শক্তি—পরিবেশকে নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি।

যুদ্ধের যুগের এই সময়টাতে ইউরোপের রাজনৈতিক জীবন কোন্ পথে চলেছে, এবার আমি তোমাকে তার সম্বন্ধে কিছু বলব। প্রথমেই যে জিনিসটা মনে পড়ে সে হচ্ছে, সমগ্র মহাদেশটিকে তিনটি অংশে ভাগ করে ফেলা হয়েছে; যুদ্ধের বিজেতা পক্ষ, বিজিত পক্ষ, এবং সোভিয়েট রাশিয়া। নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি কয়েকটা ছোটো ছোটো দেশ অবশ্য ছিল, যারা এই তিনটি ভাগের কোনোটিতেই পড়ে নি। কিন্তু দেশ হিসাবে এরা ক্ষুদ্র, বৃহত্তর রাজনীতির দিক থেকে এদের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়া স্বভাবতই তার শ্রমিক-চালিত সরকার নিয়ে নিজস্ব মহিমায় একা দাঁড়িয়ে রইল; তাকে দেখে বিজেতা জাতিরা সারাক্ষণ বিব্রত হয়ে আর গাত্রদাহে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। এদের সে গাত্র-দাহের একটা কারণ হচ্ছে রাশিয়ার অভিনব শাসন-প্রণালী—অন্যান্য দেশের শ্রমিকরাও তার দৃষ্টান্ত দেখে বিপ্লব ঘটাতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। তবু সেইটাই গাত্রদাহের একমাত্র কারণ নয়। প্রাচ্য জগতে অনেক কাণ্ড ঘটাবার কুমতলব বিজেতা দেশদের ছিল; রাশিয়ার এই আবির্ভাবে তার অনেকগুলোতে বাধা পড়ে গেছে—গাত্রদাহের সেটাও একটা হেতু। ১৯১৯ এবং ১৯২০ সনে যে-সব যুদ্ধ হল তার কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি; এই বিজেতা দেশগুলির প্রায় সকলেই তখন সোভিয়েটগুলোকে বিচূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এদের আক্রমণ স'য়েও সোভিয়েট রাশিয়া বেঁচে রইল; ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে বাধ্য হয়েই তার অস্তিত্বকে সহ্য করে চলতে হল—কিন্তু সেটা সয়ে নিল তারা যথাসম্ভব অপ্রসন্ন এবং বিদ্বিষ্ট মনে। বিশেষ করে ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার রেষারেষি সেই জারদের আমল থেকে চলে এসেছে; সেই রেষারেষি সমানেই টিকে রইল; ফাঁক পেলেই এমন সব ঘটনা এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হতে লাগল যে লোকে ভাবল এই বুঝি যুদ্ধ বাধে। সোভিয়েটেরা ভালো করেই জানত ইংলণ্ড সারাক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে, ইউরোপে সোভিয়েট-বিরোধী জাতিদের একটা দল পাকিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কয়েকবারই এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আতঙ্ক দেখা দিল।

পশ্চিম এবং মধ্য-ইউরোপে বিজেতা আর বিজিত জাতিদের মধ্যের তফাতটা খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল; বিজয়ীর মনোভাবটা বিশেষ করে প্রখর হয়ে দেখা দিল ফ্রান্সের মধ্যে। সন্ধিপত্রে যে-সব শর্ত দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অনেকগুলো স্বভাবতই বিজিত জাতিদের মনঃপূত হয় নি। প্রতিকার বলে কিছু করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না; তবু ভবিষ্যতে একদিন হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হবে, এ স্বপ্ন তারা দেখছিল। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি তখন প্রায় মরণাপন্ন, মনে হল তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। ওদিকে সার্বিয়াকে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য সৃষ্ট করা হয়েছিল; সেটা হল নানারকম ভিন্নপ্রকৃতি মানুষ আর জাতির একটা জগাখিচুড়ি। দু'দিন না যেতেই তার মধ্যেকার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপরে বিরক্ত হয়ে উঠল; নিজের নিজের মতো আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের উন্নতি সাধনের জন্য এরা ব্যগ্র হয়ে উঠল। বিশেষ করে ক্রোয়াটিয়ায় (এটা এখন যুগোশ্লাভিয়ার একটা প্রদেশে পরিণত হয়েছে), একটা জোর স্বাধীনতা-আন্দোলন চলেছে; সার্বিয়া-সরকার বেশ জোর-হাতেই সে আন্দোলনকে দমিয়ে রাখছে। পোল্যান্ড এখন রীতিমতো একটা বড়ো দেশ; তবু এর সাম্রাজ্যবাদী নেতারা অপূর্ব সব দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন। ১৭৭২ সনে প্রাচীন পোল্যান্ড
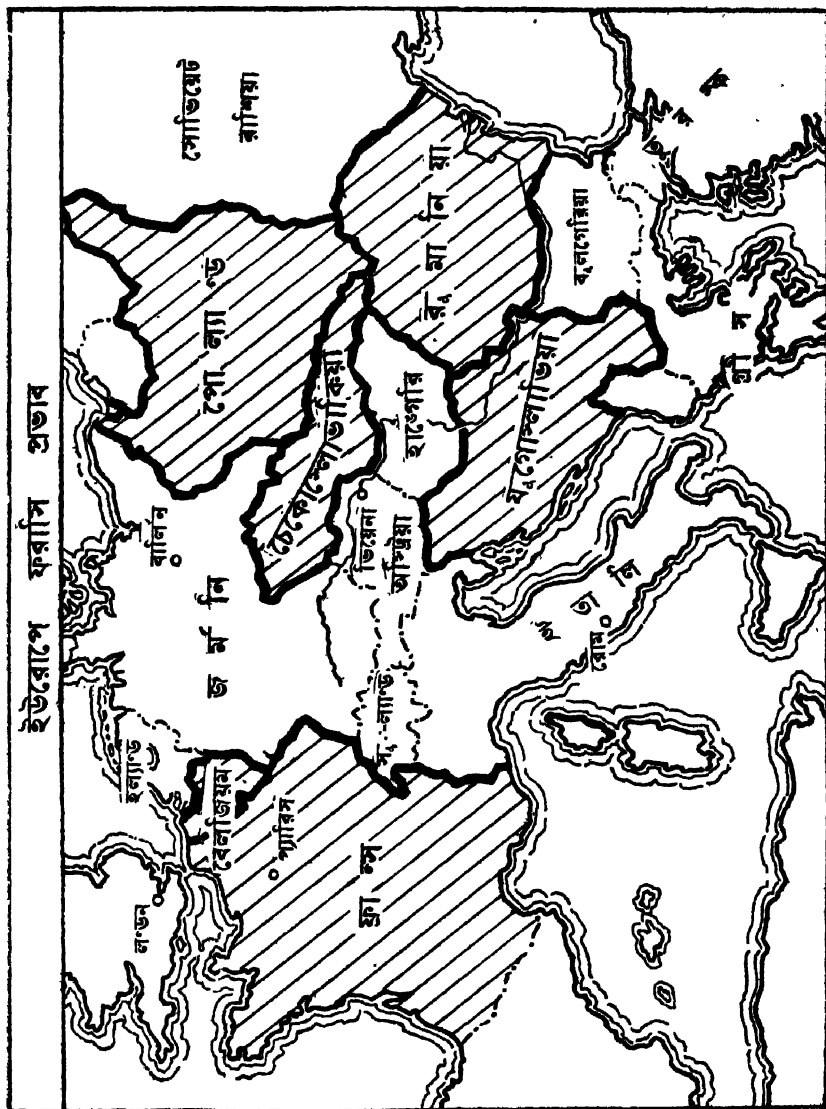
রাজ্যের সীমান্ত দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের তীর অবধি বিস্তৃত ছিল; এখনও সেই সমস্ত এলাকা আবার দখল করে প্রাচীন কালের সেই লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবেন এই তাঁদের স্বপ্ন। এদিকে রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেন প্রদেশের একটা অংশকে পোল্যান্ডের অন্তর্গত করে দেওয়া হয়েছে; সেখানে প্রজাদের উপরে নির্যাতন, মৃত্যুদণ্ড এবং আরও বহু বর্বরোচিত শাস্তি চালিয়ে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করে সে দেশটাকে 'শান্ত' বা 'পোলায়িত' করবার চেষ্টা করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পূর্ব-ইউরোপের স্থানে স্থানে বহু ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড ধিক-ধিক জ্বলছে, এই হচ্ছে তার কয়েকটির পরিচয়। ক্ষুদ্র হলেও এই কুণ্ডগুলো অবহেলার বস্তু নয়, কারণ এর আগুন বৃহত্তর ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়বার আশঙ্কা প্রচুরই রয়েছে।

রাজনীতি এবং বাস্তব-তত্ত্বের দিক থেকে, যুদ্ধের পরবর্তী কটি বছর ফ্রান্সই ছিল ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী দেশ। তার যা-কিছু কাম্য ছিল তার অনেকখানিই সে পেয়ে গিয়েছিল—প্রচুর জায়গা পেয়েছে সে, যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণেরও অন্তত আশ্বাস পেয়েছে; কিন্তু তবুও তার মন প্রসন্ন হয় নি। প্রকাণ্ড একটা ভয়ে সে জড়োসড়ো হয়ে ছিল—ভয়টা হচ্ছে, জর্মানি হয়তো আবার প্রবল হয়ে উঠবে, আবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, হয়তো তাকে হারিয়েই দেবে। জর্মানির লোকসংখ্যা ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি, এইটাই হচ্ছে ফ্রান্সের ভয় পাবার প্রধান হেতু। আয়তনে ফ্রান্স বস্তুতই জর্মানির চেয়ে বড়ো, তার জমিও বোধ হয় বেশি উর্বর। তবু কিন্তু ফ্রান্সের লোকসংখ্যা চার কোটি দশ লক্ষেরও কম; আর সে সংখ্যা বিশেষ বাড়েও না। জর্মানির লোকসংখ্যা ছয় কোটি দুই লক্ষেরও বেশি; সে সংখ্যাও আবার দিনদিনই বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া উগ্র এবং যুদ্ধ-কুশল জাতি বলেও জর্মানির খ্যাতি আছে; স্মরণীয়কালের মধ্যেই দু'দুবার সে ফ্রান্সকে আক্রমণ করেছে।

অতএব জর্মানি পাছে তার উপরে প্রতিশোধ তোলে এই ভয়েই ফ্রান্স বিহ্বল হয়ে পড়ল; তার সমস্ত কূটনীতির ভিত্তি এবং মূল কথাই হয়ে উঠল 'নিরাপত্তা-বিধান'—মানে ফ্রান্স যা পেয়েছে সেটা দখল এবং ভোগ করবার ব্যবস্থাটা অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যবস্থা। অন্য দেশদের তুলনায় ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বেশি; ভার্সাই সন্ধির শর্ত দেখে যে-সব দেশরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, ফ্রান্সের সামরিক শক্তির চাপেই তাদের তখন সংযত করে রাখা হয়েছে—কারণ ফ্রান্সের 'নিরাপত্তার' জন্য সে সন্ধিটিকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন ছিল। তার শক্তিকে আরও দৃঢ় করে তোলবার জন্য ফ্রান্স একটি দলও গ'ড়ে তুলল—ভার্সাই সন্ধি টিকিয়ে রাখায় যাদের স্বার্থ রয়েছে, এই রকমের সব দেশদের নিয়ে সে দল গড়া হল। এই দেশগুলি হচ্ছে বেলজিয়ম, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া।

এই ভাবে ফ্রান্স ইউরোপে তার অধ্যক্ষতা বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। ইংলণ্ডের এটা পছন্দ হল না; সে নিজে ছাড়া অন্য কোনো দেশ ইউরোপে প্রবল হয়ে উঠবে, এটা ইংলণ্ডের ইচ্ছা নয়। মিত্ররাজ্য ফ্রান্সের প্রতি ইংলণ্ডের যে দারুণ প্রীতি ও বন্ধুত্ব ছিল তার অনেকখানিই উবে গেল; ইংলণ্ডের খবরের কাগজে ফ্রান্সকে স্বার্থপর নির্মম বলে অভিহিত করা হতে লাগল; সেই সঙ্গেই পুরোনো শত্রু জর্মানির সম্বন্ধেও বহু প্রীতিপূর্ণ উক্তি করা হতে লাগল। ইংরেজরা তখন বলতে লাগল, অতীত শত্রুতা মনে করে রাখতে নেই, সেটা ভুলে যেতে হয়, ক্ষমা করতে হয়; শান্তির সময়েও অতীত যুদ্ধের দিনের স্মৃতি নিয়ে চলা আমাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না। অতি চমৎকার কথা; ইংরেজদের দিক থেকে একেবারে দ্বিগুণ চমৎকার, কারণ তখন এই কথাগুলো দিয়েই ইংরেজদের কূটনীতি সিদ্ধ হবার ভরসা। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড যেখানেই সুযোগটুকু পায়, বা ব্রিটিশ সরকার কূটনীতির যে চালটিই চালে, ইংলণ্ডের প্রজারা শ্রেণীনির্বিশেষে তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চ-স্তরের নৈতিক যুক্তি দেখিয়ে সেটাকে সমর্থন করে; কাউন্ট স্ফোর্জা নামক ইতালির একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ একবার বলেছিলেন, "ঈশ্বর স্বয়ং এই একটি মহামূল্য গুণে ব্রিটিশ জাতিকে ভূষিত করেছেন"।

১৯২২ সনের গোড়ার দিক থেকেই ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের বিরোধ শুরু হল; ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে এটি একটি স্থায়ী ব্যাপার হয়ে পড়ল। বাইরে এরা মিষ্টি হেসে কথা কয়, অত্যন্ত

ভদ্র ভাষায় আলাপ করে; এদের রাষ্ট্রনায়করা এবং প্রধানমন্ত্রীরা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, একত্র হয়ে ফটোগ্রাফ তোলেন; অথচ এই দুটি দেশের কর্তৃপক্ষ প্রায় সময়েই পরস্পরের উল্‌টা দিকে চলতে চেষ্টা করেন। ১৯২২ সনে জর্মনি ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে পারল না, সেই অপরাধে মিত্রশক্তি রুঢ়-উপত্যকা দখল করে নিল। ইংলণ্ড এই দখল করার পক্ষপাতী ছিল না; কিন্তু ফ্রান্স ইংলণ্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই নিজের ইচ্ছা পূরণ করল। ব্রিটেন কিন্তু তার সে দখলদাবিতে কোনো অংশ গ্রহণ করল না।

তার পর আবার আরও একটি প্রাচীন মিত্রজাতির সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ বাধল; দুই দেশের মধ্যে সারাক্ষণই ঠোকাঠুকি চলতে লাগল। এই দেশটি হচ্ছে ইতালি। ইতালিতে ১৯২২ সনে মুসোলিনী শাসন-কর্তৃত্ব হস্তগত করলেন, তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের কামনা ছিল ফ্রান্স তাতে বাধা দিল—এই থেকেই বিরোধের উদ্‌ভব। মুসোলিনী আর তাঁর ফ্যাসিজ্‌মের কথা আমি তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব।

যুদ্ধের পরবর্তী কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও ভাঙন ধরার কতগুলো লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এর সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা আমি আগের কয়েকটা চিঠিতে করেছি। এখানে শুধু এর একটা দিক সম্বন্ধে কথা বলব। অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা, এই দুটি দেশই উত্তরোত্তর আমেরিকার সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের কবলে গিয়ে পড়ছিল; জাপানিদের উপরে, বিশেষ করে জাপান থেকে এই-সব দেশে যে লোক বসবাস করতে আসছে তার উপরে এরা তিনটি দেশই সমান ক্ষ্যাপা ছিল। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার এই ভয় খুবই বেশি : অস্ট্রেলিয়ার অজস্র জমি পড়ে আছে যেখানে বাস করবার লোক নেই; ওদিকে জাপান তার থেকে বেশি দূরে নয়, সেখানে লোক এত বেশি হয়ে গেছে যে দেশে তাদের জায়গা হচ্ছে না। জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ড মৈত্রী-স্থাপন করেছে; এই দুটি ডোমিনিয়নের এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেটা পছন্দ নয়। মহাজন হিসাবে, এবং অন্য দিক দিয়েও আমেরিকা ইতিমধ্যে পৃথিবীতে প্রবল হয়ে উঠেছে—অতএব ইংলণ্ড তখন তাকে প্রসন্ন রাখতে চায়। সাম্রাজ্যটাকেও যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখাই তার কাম্য। অতএব ১৯২২ সনের ওয়াশিংটন কনফারেন্সে সে ইঙ্গ-জাপানি মৈত্রী বিসর্জন দিল। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিটিতে আমি তোমাকে এই কনফারেন্সের কথা বলেছি। এইখানেই চতুঃশক্তি-চুক্তি এবং নব-শক্তি সন্ধি করা হয়েছিল। এই সন্ধিগুলো হয়েছিল চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি সম্বন্ধে। সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থ এর সঙ্গে অনেকখানিই জড়ানো, তবু কিন্তু তাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হল না—রাশিয়া এই অবহেলার প্রতিবাদ জানাল, তবুও না।

এই ওয়াশিংটন কনফারেন্সেই, প্রাচ্য জগতে ইংলণ্ড যে কূটনীতি এতদিন চালিয়ে এসেছে তার একটা পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন যাবৎ ইংলণ্ড জাপানকে বন্ধু বলে জানত; তার ভরসা ছিল, দূর প্রাচ্যে, বা ভারতবর্ষেও যদি তার কোনো বিপদ হয়, সে বিপদে জাপান তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু এখন দেখা গেল, পৃথিবীর রাজনৈতিক জীবনে দূর প্রাচ্য অঞ্চল ক্রমেই একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করছে; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত লেগেছে। চীন প্রবল হয়ে উঠছে, অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছে; জাপান আর আমেরিকার মধ্যে বৈরিতাও ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। অনেকের তখন ধারণা ছিল, এর পরের বারে যে মহাযুদ্ধ বাধবে, প্রশান্ত মহাসাগরই হবে তার প্রধান কেন্দ্রস্থল। জাপান আর আমেরিকার মধ্যে তখন একপক্ষকে বেছে নিতে হয়—ইংলণ্ড জাপানকে ছেড়ে আমেরিকার দলে গিয়ে ভিড়ল। কিংবা তাও ঠিক নয়; সত্যি করে বলতে গেলে বলতে হয়, জাপানের পক্ষ সে পরিত্যাগ করল। তার নীতিটা তখন হল, আমেরিকার শক্তি বেশি, টাকা অনেক, অতএব আমেরিকার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবে, কিন্তু কাগজে-কলমে কোনো কথা কাউকে দেবে না। জাপানের সঙ্গে মৈত্রীকে খতম করে দিয়ে ব্রিটেন এবার, দূর প্রাচ্য অঞ্চলে যদি যুদ্ধ বাধে ভেবে সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আয়োজন শুরু করল। সিঙ্গাপুরে অজস্র টাকা ঢেলে জাহাজ মেরামতের অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডক তৈরি করল সে; এই স্থানটিকে সে নৌবাহিনীর একটি প্রকাণ্ড ঘাঁটিতে পরিণত করল। এই ঘাঁটি থেকে এখন সে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সমস্ত চলা-

জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। একদিকে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ, অন্যদিকে ফরাসি ও ডাচ উপনিবেশগুলিকে সে এখন আয়ত্তে রাখতে পারছে; সবচেয়ে বড়ো কথা, এখন যদি প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধে সে যুদ্ধে ব্রিটেন বেশ ভালো রকমই লড়াই দিতে পারবে—তা সে যুদ্ধ জাপানের সঙ্গেই হোক বা আর কারও সঙ্গেই হোক।

১৯২২ সনে ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-জাপানি মৈত্রী ভেঙে গেল; এর ফলে জাপান একেবারে একা হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়েই জাপানিরা তখন চোখ ফেরাল রাশিয়ার দিকে, সোভিয়েটদের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করতে লাগল। তিন বছর পরে, ১৯২৫ সনের জানুয়ারি মাসে, জাপান এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হল।

যুদ্ধের পর প্রথম ক'বছর বিজয়ী জাতিরা জর্মনিকে আচারে-ব্যবহারে প্রায় একঘরে করেই রাখল। এদের কাছে বিশেষ সদ্‌ব্যবহার পাচ্ছে না দেখে, এবং এদের একটুখানি ভয় দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে, জর্মনি তখন সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে মুখ ফেরাল; ১৯২২ সনের এপ্রিল মাসে রাশিয়ার সঙ্গে সে সন্ধি স্থাপন করল। এই সন্ধির নাম রাপাল্লোর সন্ধি। এই সন্ধির সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন গোপনেই করা হয়েছিল; অতএব সন্ধির কথা যখন বাইরে প্রকাশ করা হল, মিত্রপক্ষের সরকাররা একটা অতর্কিত ধাক্কা খেলেন। বিশেষ করে ইংলণ্ডের শাসক-শ্রেণী সোভিয়েট সরকারের উপর নিদারুণ চটা। জর্মনির সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার না করলে, তাকে প্রসন্ন না রাখলে, সে হয়তো রাশিয়ার সঙ্গেই গিয়ে যোগ দেবে—বাস্তবিক পক্ষে এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম হবার ফলেই ব্রিটিশরা জর্মনির প্রতি তাদের নীতি বদলে ফেলল। জর্মনিকে যেসব অসুবিধা আর দুর্দশা সইতে হচ্ছিল, সেগুলো অকস্মাৎ তারা অত্যন্ত-রকম বুঝে ফেলল; তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নানাবিধ চেষ্টা করতে লাগল, অবশ্য বেসরকারি ভাবে। রুঢ় দখল করার ব্যাপার থেকেও তারা দূরে স'রে রইল। এ-সব অবশ্য তারা করছিল, হঠাৎ রাতারাতি তারা জর্মনিকে ভয়ানক ভালোবেসে ফেলেছিল বলে নয়; জর্মনিকে তারা রাশিয়ার কাছ থেকে দূরে টেনে রাখতে, সোভিয়েট-বিদ্বেষী জাতিদের দলেই ভিড়িয়ে রাখতে, চাইছিল বলে। কয়েকবছর ধরে এইটাই হয়ে রইল ব্রিটেনের কূটনীতির মূলমন্ত্র; অবশেষে ১৯২৫ সনে লোকার্নোতে তাদের এই চেষ্টা সফল হল। লোকার্নোতে সমস্ত দেশদের মধ্যে একটা কনফারেন্স হল; যুদ্ধের পর সেই প্রথমবার বিজয়ী জাতিদের আর জর্মনির মধ্যে কতকগুলো ব্যাপারে মতের একটা সত্যকার মিল দেখা গেল—কথাগুলোকে নিয়ে একটা সন্ধি-পত্র রচিত হল। সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ মতৈক্য অবশ্য হয় নি; ক্ষতিপূরণের বিরাট সমস্যাটারই সেখানে মীমাংসা হল না, এছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল। তবু আরম্ভটা ভালোই হল বলতে হবে; দুই পক্ষের মধ্যে আশ্বাসবাক্য এবং প্রতিশ্রুতিও অনেকগুলো দেওয়া-নেওয়া হল। জর্মনির পশ্চিমে অর্থাৎ ফ্রান্সের দিকে যে সীমান্তরেখা ভার্সাই সন্ধিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, জর্মনি সেটা স্বীকার করে নিল। প্রাচ্য সীমান্ত এবং সমুদ্র পর্যন্ত পোলিশ করিডর সম্বন্ধে ভার্সাই সন্ধির নির্দেশকেই চরম বলে মেনে নিতে সে রাজি হল না; তবে এই প্রতিশ্রুতি দিল, সে নির্দেশ বদলে নেবার চেষ্টা যা করবার তা সে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়েই করবে। প্রত্যেকেই অঙ্গীকার করল, কোনো পক্ষ যদি এই সন্ধির শর্ত ভাঙে, তবে অন্যরা একত্র হয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করবে।

লোকার্নো সন্ধি ব্রিটিশ কূটনীতির জয়ের নিদর্শন। এই সন্ধির ফলে ব্রিটেনের মর্যাদা বেড়ে গেল—ফ্রান্স আর জর্মনির মধ্যে বিরোধ বাধলে ব্রিটেন তার বিচার করবে, তারই খানিকটা ব্যবস্থা এতে হয়ে গেল। জর্মনিকেও এতে রাশিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হল। লোকার্নো সন্ধির সব চেয়ে বড়ো গুরুত্বই বস্তুত ছিল এই : এর ফলে পশ্চিম-ইউরোপের জাতিগুলো একত্র হয়ে একটি সোভিয়েট-বিরোধী দলে পরিণত হল। রাশিয়া ভয় পেয়ে গেল; মাসকয়েকের মধ্যেই সেও এর পাল্টা জবাব দিল তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হল ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে; লীগ্‌ অব নেশন্‌স্‌ মসুলের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবার ঠিক দুই দিন পরে। তোমার মনে আছে,

লীগের এই সিম্ধান্তটি করা হয়েছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জর্মানি লীগ্‌ অব নেশন্‌সে প্রবেশ করল; খুব একটা প্রচণ্ডরকম কোলাকুলি আর করমর্দনের হিড়িক লেগে গেল, লীগের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই খুব মিষ্টিরকম হাসতে লাগলেন আর অন্য সবাইকে প্রচুর পরিমাণ প্রশংসাবাক্য শুনিয়ে আপ্যায়িত করতে লাগলেন।

এমনি করেই ইউরোপের জাতিদের মধ্যে কিস্তির চাল এবং পাল্টা-কিস্তির চাল চলতে লাগল; অনেক সময় আবার এদের আভ্যন্তরীণ নীতির ধাক্কাও সে চালের উপর এসে পড়তে লাগল। ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে একটা সাধারণ নির্বাচন হল। নির্বাচনে রক্ষণপন্থী দল হেরে গেল। পার্লামেণ্টে যে শ্রমিকদল ছিল তারা সংখ্যাগৌরবে সকলের চেয়ে বড়ো নয়, তবু তারাই মন্ত্রিসভা গঠন করল—শ্রমিকদলের ইতিহাসে সেই প্রথমবার। প্রধানমন্ত্রী হলেন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এই মন্ত্রিসভা মাত্র সাড়ে ন'মাস কাল টিকে ছিল। কিন্তু সেই স্বল্প কালের মধ্যেই এরা সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে একটা বোঝাপড়া করে ফেলল; দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। রক্ষণশীল দল সোভিয়েটদের কোনো রকমে স্বীকার করে নেবারই বিরোধী ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই আবার নূতন নির্বাচন এল; সে নির্বাচনে রাশিয়ার কথাটাই প্রধান হয়ে উঠল। তার কারণ এই নির্বাচনের সময় রক্ষণশীল দল একখানা চিঠি প্রকাশ করে বসলেন, সেইটাই হল তাঁদের টেক্কা তুরুপ। এই চিঠিটির নাম জিনোভিয়েবের চিঠি। এতে বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যে গুপ্ত কার্যকলাপ চালাবার জন্য ইংলণ্ডের কমিউনিস্টদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জিনোভিয়েব ছিলেন সোভিয়েট সরকারের অন্তর্ভুক্ত একজন নেতৃস্থানীয় বলশেভিক। তিনি এই চিঠি লেখার কথা সাফ অস্বীকার করলেন, বললেন এটা নিশ্চয়ই জাল চিঠি। কিন্তু ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল তবুও চিঠিটাকে নিয়ে যথাসম্ভব হৈ চৈ করতে লাগলেন; খানিকটা এর সাহায্যেই তাঁরা নির্বাচনেও জয়লাভ করলেন। এবার রক্ষণশীল দলই মন্ত্রীসভা গঠন করলেন, তার প্রধানমন্ত্রী হলেন স্ট্যানলি বলডুইন। এই সরকারকে বারবার করে বলা হল, 'জিনোভিয়েবের চিঠিটা' আসলে সত্য না মিথ্যা সে সম্বন্ধে তদন্ত করা হোক, কিন্তু সরকার সে তদন্ত করতে অস্বীকার করলেন। এর কিছুকাল পরে বার্লিনে কতকগুলো রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ল, তার থেকে জানা গেল চিঠিটা সত্যই জাল; এর মূলে ছিল একজন 'শ্বেত' রাশিয়ান—মানে দেশ থেকে পলাতক বলশেভিক-বিরোধী রাশিয়ান। তবু ইংলণ্ডে এই চিঠিটা তার কাজ উম্ধার করেছিল; একটি সরকারকে উচ্ছেদ করে তার জায়গাতে আরেকটি সরকারকে বসিয়ে দিয়েছিল। এমনিতর সব সামান্য বস্তু দিয়েই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বড়ো বড়ো ব্যাপার চালানো হয়।

সেই বছরেরই শেষের দিকে আবার নূতন একটা ব্যাপার ঘটল, তার ফলে ব্রিটিশ সরকার খুব চটে উঠলেন। এবারের ব্যাপারটা ঘটেছিল দূর প্রাচ্য-অঞ্চলে। চীনে হঠাৎ একটা শক্তিশালী মিলিত জাতীয় সরকারের আবির্ভাব হল; ভাব দেখে মনে হল সোভিয়েটদের সংগে সে সরকারের খুবই অন্তরঙ্গতা। অনেক মাস ধরে চীনে ব্রিটিশদের অত্যন্ত বিপদের মধ্যে কাটাতে হল; বহু অপমান লাঞ্ছনা হজম করতে হল, অনেক কাজই করতে হল যা তাদের পছন্দ নয়। তার পর অল্পদিন মাত্র বেঁচে থেকে চীনাদের সে আন্দোলন হঠাৎ ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। আন্দোলনে প্রগতিপন্থী যাঁরা ছিলেন, সেনাপতিরা তাঁদের নিঃশেষে নিহত এবং বিতাড়িত করলেন; এদের পরিবর্তে সাংহাইতে যে বিদেশী মহাজনরা ছিল নির্ভরস্থল বলে তাদেরই গিয়ে আশ্রয় করলেন। আন্তর্জাতিক কূটনীতির খেলায় রাশিয়ার এটা হল একটা বিরাট পরাজয় : চীনের এবং অন্যান্য দেশের চোখে তার মানমর্যাদা অনেক কমে গেল। ইংলণ্ডের পক্ষে এটা একটা রণজয় বিশেষ; সোভিয়েটের পরাজয়টাকে সে আরও বেশি প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেষ্টা করল, তাই পারলেই তার আরও বেশি সুবিধা হয়ে যায়। সোভিয়েট বিরোধীদের দলটাকে সে আবার গড়ে তুলল, চারদিক থেকে এরা রাশিয়াকে ঘিরে ফেলবারও চেষ্টা করল।

১৯২৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর বহুস্থানে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল। ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে, একই দিনে পিকিঙ-এর সোভিয়েট দূতাবাসে এবং সাংহাইয়ের

সোভিয়েট কন্‌সালের দপ্তরে খানাতল্লাস করা হল। এই দুটি স্থানে পৃথক দুটি চীনা সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে এরা একত্র হয়েই কাজে নামল। দূতাবাস খানাতল্লাস করা বা বিদেশী দূতকে অপমান করা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার; এর ফলে প্রায় সর্বত্রই যুদ্ধ বেধে যায়। রাশিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই কাজ আসলে চীনা সরকারের নয়, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সোভিয়েট-বিরোধীরাই তাদের তাড়া দিয়ে এটা করাচ্ছে—রাশিয়াকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করাই তাদের মতলব। কিন্তু সে মতলব ব্যর্থ হল, রাশিয়া যুদ্ধ করল না। এর একমাস পরে, ১৯২৭ সনের মে মাসে, রাশিয়ার বাণিজ্য-দপ্তরগুলির উপরে অদ্ভুতরকম খানাতল্লাস চালানো হল, এবার হল লণ্ডনে। এর নাম 'আর্কসের' খানাতল্লাসী, কারণ ইংলণ্ডে রাশিয়ার যে সরকারি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ছিল তার নাম ছিল আর্কস। এই খানাতল্লাসের ফলে সংগে সংগেই রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যত কূটনীতি এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত সম্পর্ক ছিল সমস্ত ছিন্ন হয়ে গেল। এর পরের মাসেই অর্থাৎ জুন মাসে, পোল্যাণ্ডে অবস্থিত সোভিয়েট মন্ত্রীকে ওয়ারস'তে খুন করা হল। (এর চার বছর আগে রোমে অবস্থিত সোভিয়েট মন্ত্রীকে লুজো শহরে হত্যা করা হয়েছিল)। পরপর অত্যন্ত দ্রুতবেগে এই সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে দেখে রাশিয়ার লোকরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল এবার সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা সকলে একত্র হয়েই রাশিয়াকে আক্রমণ করবে। রাশিয়াতে প্রবল একটা যুদ্ধাতঙ্ক দেখা দিল। পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশেই শ্রমিকরা শোভা-যাত্রা ইত্যাদি করে রাশিয়ার পক্ষে এবং যে যুদ্ধটা আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল তার বিপক্ষে মতপ্রকাশ করল। কিন্তু আতঙ্ক ক্রমে কেটে গেল, যুদ্ধ হল না।

ঠিক সেই বছর, সেই ১৯২৭ সনেই রাশিয়াতে খুব ধুমধাম করে রুশ-বিপ্লবের দশম বার্ষিক স্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করা হল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তখন রাশিয়ার উপর অত্যন্ত চটা। কিন্তু প্রাচ্য জগতের দেশগুলির সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার কতখানি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গেল; পারশ্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান এবং মংগোলিয়া থেকে সরকারি-ভাবে প্রতিনিধিদল এসে রাশিয়ার উৎসবে যোগ দিলেন।

ইউরোপে এবং অন্যত্র যখন এই-সব আতঙ্ক আর যুদ্ধের আয়োজন চলেছে, ঠিক তখনই আবার নিরস্ত্রীকরণ নিয়েও প্রচুর জল্পনাকল্পনা চলছিল। লীগ অব নেশন্‌সের অনুষ্ঠান-পত্রে বলা হয়েছিল "লীগের সভ্যরা স্বীকার করেন, শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতির অস্ত্রসজ্জা কমিয়ে জাতির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেটুকু একান্ত অপরিহার্য তাহার অনতিরিক্ত বলিয়া পরিমিত করা প্রয়োজন, এবং সকলের মিলিত চেষ্টার দ্বারা সকলের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" এই সাধু নীতিটি ব্যক্ত করার বেশি আর কিছুই লীগ তখন করল না; কিন্তু এবিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিধানের জন্য তার কাউন্সিলকে নির্দেশ দিল। জর্মনি এবং অন্যান্য বিজিত দেশদের অবশ্য সন্ধিপত্রের দ্বারাই অস্ত্রত্যাগ করানো হয়েছিল। বিজয়ী দেশরাও আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁরাও অস্ত্রত্যাগ করবেন; কিন্তু সে নিয়ে কন্‌ফারেন্সের পর কন্‌ফারেন্সই শুধু চলতে লাগল, হাতে কলমে কাজ কিছুই হল না। আশ্চর্য হবার কিছুই এতে নেই, কারণ প্রত্যেক দেশই চাইছিল নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারটা এমনভাবে সম্পন্ন হোক যেন অন্যদের তুলনায় তার নিজের শক্তি কিছু বেশি থেকে যায়, অন্যরা স্বভাবতই তাতে রাজি নয়। ফরাসিরা তো আগাগোড়াই তাদের সেই এক গোঁ ধরে রইল—আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোক, তার পর অস্ত্রত্যাগের কথা ভাবা যাবে।

বড়ো বড়ো দেশদের মধ্যে আমেরিকা বা সোভিয়েট ইউনিয়ন লীগের সভ্য ছিল না। বস্তুত সোভিয়েটের দৃষ্টিতে লীগ ছিল তার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরোধী পক্ষ; একদল ধনিকতন্ত্রী দেশ নিয়ে সেখানে একজোট হয়েছে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াই তাদের ব্রত। আবার সোভিয়েট ইউনিয়নকেও (ঠিক যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অনেকে বলে) একটা লীগ অব নেশন্‌স্ গোছের ব্যাপার বলেই মনে করা হত, কারণ সে ইউনিয়নের মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতন্ত্রী অঞ্চল এসে একত্র সংঘবদ্ধ হয়েছে। প্রাচ্য অঞ্চলের দেশরাও লীগ অব নেশন্‌স্‌কে সন্দেহের চোখে দেখত, মনে করত সেটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের কার্য উদ্ধারের একটা যন্ত্র মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরস্ত্রীকরণের কথা আলোচনা করবার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্য দেশদেরও প্রায় সকলেই লীগ অব

নেশন্‌সের কনফারেন্সগুলোতে গিয়ে যোগ দিলেন। ১৯২৫ সনে লীগ একটি উদ্যোগকারী কমিশন নিয়োগ করলেন; এ'রা প্রকাণ্ড একটি নিখিল-বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলনের পথ পরিষ্কার করবেন। এই কমিশন ক্রমাগত সাত বৎসর ধরে কাজ করে চললেন, একটার পর একটা করে অসংখ্য পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু ফল কিছুই হল না। ১৯৩২ সনে খোদ বিশ্ব-সম্মেলনের সভা বসলো এবং বহু মাসব্যাপী বৃথা আলোচনার পরে তার অন্তর্ধান হল।

আমেরিকা শুধু-যে এই নিরস্ত্রীকরণের আলোচনাতে যোগ দিল তাই নয়; পৃথিবীর অর্থনীতির বাজারে তার যে নূতন প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছে তার খাতিরে ইউরোপ এবং ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধেও তার উৎসাহ বেড়ে গেল। সমস্ত ইউরোপই তখন তার খাতক; অতএব তার তখন লক্ষ্য হল, ইউরোপের দেশরা যাতে আবার পরস্পরের গলা কাটতে লেগে না যায় তারই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখা। শুধু উচ্চতর নীতিবোধের কথা বলে নয়, এরা যদি সত্যই মারামারি করে মরে তবে আমেরিকার পাওনা টাকা আর ব্যবসায়ের কী গতি হবে? নিরস্ত্রীকরণের আলোচনাতে কোনো দ্রুত ফলের সম্ভাবনা নেই দেখে, ১৯২৮ সনে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থার একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করা হল। এই প্রস্তাবটির সৃষ্টি হয়েছিল ফরাসি আর আমেরিকান সরকারের মধ্যে আলোচনার ফলে। এতে একটা খুব বড়ো কথা বলা হল 'যুদ্ধ ব্যাপারটাকেই বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হোক'। কথাটা প্রথমে উঠেছিল শুধু ফ্রান্স আর আমেরিকার মধ্যে এইরকম একটা চুক্তি-স্থাপনের সংকল্প নিয়ে; কিন্তু ক্রমে কথাটা বড়ো হয়ে উঠল এবং শেষপর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশকেই এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। ১৯২৮ সনের আগস্ট মাসে প্যারিস শহরে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হল; তাই এর নাম হল ১৯২৮ সনের প্যারিস চুক্তি; বা কেলগ-ব্রীয়াঁ চুক্তি, বা সংক্ষেপে কেলগ-চুক্তি। কেলগ ছিলেন আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট্; এই ব্যাপারে তিনিই প্রথম অগ্রণী হন; আর আরিস্তিদে ব্রীয়াঁ ছিলেন ফ্রান্সের বৈদেশিক-মন্ত্রী। এই চুক্তিপত্রটি বেশ ছোটোখাটো একটি সুরচিত দলিল বিশেষ। এতে বলা হল, দেশে দেশে মতান্তর হলে তার সমাধানের জন্য যুদ্ধ শুরু করা অতি গর্হিত ব্যাপার; এই প্যাক্টে যাঁরা সই করলেন—তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য যদি কেউ জাতীয় নীতি হিসাবে যুদ্ধের আশ্রয় নিতে চান, সেটা একেবারেই চলবে না। এই কথাগুলো প্রায় চুক্তিপত্রের নিজেরই ভাষায় আমি বললাম। কথাগুলো শুনতে ভারি চমৎকার; সত্যই খোলা মনে যদি একথা বলা হত তবে যুদ্ধের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যেত। কিন্তু দু দিন না যেতেই দেখা গেল, স্বাক্ষরকারীরা মোটেই খোলামনে এতে সই করেন নি, স্রেফ ধাপ্পাবাজি করেছেন। সই করবার আগে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন দুই পক্ষই, বিশেষ করে ব্রিটিশ নিজেদের তরফ থেকে নানা রকমের রেহাই এবং অব্যাহতির ব্যবস্থা রেখে দিলেন; তার ফলে এ'দের পক্ষে চুক্তির শর্তগুলো প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। ব্রিটিশ সরকার বললেন, তাঁদের সাম্রাজ্যের জন্য যদি কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁদের করতে হয়, সে যুদ্ধ এই চুক্তিপত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হবে না। তার মানেই হচ্ছে, ব্রিটেন যখন চাইবে বস্তুত তখনই অবাধে যুদ্ধ শুরু করতে পারবে। তার নিজের শাসন এবং কর্তৃত্ব পৃথিবীর যত জায়গাতে চালু আছে, সেই-সব অঞ্চল সম্বন্ধে ব্রিটেন এর দ্বারা একটা নিজস্ব 'মন্‌রো নীতি'র ব্যবস্থা করে নিল।

প্রকাশ্য দরবারে যখন এইভাবে যুদ্ধকে 'বেআইনি' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই—১৯২৮ সনে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটি নৌবাহিনী সংক্রান্ত গোপন চুক্তি হল। এই চুক্তির খবর কী রকম করে প্রকাশ পেয়ে গেল; শুনে ইউরোপ আর আমেরিকা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের বাইরে, পর্দার নেপথ্যে আসলে কীসব ব্যাপার ঘটে, এইটাই হল তার যথেষ্ট প্রমাণ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কেলগ-চুক্তি মেনে নিল, তাতে সই করল। এরূপ করবার মূলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল; এই চুক্তির আবরণ নিয়ে সোভিয়েটকে আক্রমণ করে বসবে এমন কোনো সোভিয়েট-বিরোধী দল যদি কেউ গড়ে তুলতে চায়, তার সে চেষ্টাকে এইভাবে ব্যর্থ করা, অন্তত খানিক পরিমাণে বাধা দেওয়া। চুক্তির শর্ত থেকে অব্যাহতির যে ব্যবস্থাগুলি ব্রিটেন করে নিয়েছে,

অনেকের ধারণা হয়েছিল তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েট। চুক্তিপত্রে সই করবার সময় রাশিয়া ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের এই-সব অব্যাহতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্র আপত্তি প্রকাশ করল।

যুদ্ধের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে রাশিয়ার খুব বেশি আগ্রহ ছিল। শুধু এই চুক্তি নিয়েই সে সুস্থ হল না; সাবধানতার বাড়তি ব্যবস্থা হিসাবে তার প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড, রুমানিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, তুরস্ক এবং পারশ্যের সঙ্গেও একটা বিশেষ রকমের শান্তি-মূলক চুক্তি নিষ্পন্ন করল। এই চুক্তির নাম লিট্‌ভিনফ্‌ চুক্তি। এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে; কেলগ-চুক্তি যখন আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হল, তার ছ'মাস আগে।

পৃথিবীর সর্বত্র কলহ বিবাদ এবং ভাঙন শুরু হয়ে গেছে; তাকে স্থির করে টিকিয়ে রাখবার প্রবল আগ্রহ নিয়ে এই-সব চুক্তি-মৈত্রী সন্ধি তৈরি করা হতে লাগল; যেন বাইরে থেকে এই-সব চুক্তি বা তালি-তাপ্পি সেঁটেই এতবড়ো একটা গভীর ব্যাধিকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। এটা ১৯২০ সনের পরবর্তী কালের কথা; এই সময়ে ইউরোপের বহু দেশেই শাসন-কর্তৃত্ব ছিল সমাজতন্ত্রী বা সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের হাতে। কিন্তু সরকারি পদমর্যাদা আর শক্তির স্বাদ এ'রা যত বেশি পেতে লাগলেন, ততই বেশি করে এ'রা ধনিকতন্ত্রী রীতির মধ্যে নিজের সত্তা হারিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলেন। বস্তুত এ'রাই ক্রমে হয়ে উঠলেন ধনিকতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখবার সবচেয়ে বড়ো পাণ্ডা; অনেক সময়ে এ'রা এতখানি সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠলেন যে কোনো রক্ষণপন্থী বা অন্য কোনো প্রগতিবিরোধী ব্যক্তিও সে বিদ্যায় এ'দের ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। যুদ্ধের পর প্রথম কটা বছর ইউরোপে বিপ্লবের ঢেউ লেগেছিল, সে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস তখন অনেকটা থেমেছে, ইউরোপের জীবনযাত্রা খানিকটা শান্ত নিস্তরঙ্গ হয় এসেছে। অবস্থা দেখে তখন মনে হচ্ছিল, ধনিকতন্ত্র আবার কিছুকালের মতো সেই নূতনতর অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে; ইউরোপের কোথাও হঠাৎ তখনই আবার বিপ্লব শুরু হবে, এমন সম্ভাবনা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

১৯২৯ সনে এই ছিল ইউরোপের অবস্থা।

১৭৫

ইতালি : মুসোলিনি ও ফ্যাসিজ্‌ম্‌

২১শে জুন, ১৯৩৩

ইউরোপ সম্বন্ধে আমার গল্প ১৯২৯ সন অর্থাৎ ইতালিতে মুসোলিনি ও ফ্যাসিজ্‌ম্‌ পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এর একটি বড়ো অধ্যায় এখন পর্যন্ত একেবারেই বলতে বাকি রয়ে গেছে; সেটা বলবার জন্য তোমাকে খানিকটা আগের দিনে চলে যেতে হবে। যুদ্ধের পরে ইতালিতে যে-সব ব্যাপার ঘটেছে এ হচ্ছে তারই গল্প। ব্যাপারগুলো আমাদের জানা দরকার, কিন্তু শুধু ইতালিতে কী হয়েছে তার কাহিনী হিসাবেই নয়—জানা দরকার তার কারণ, এগুলো একটু নূতন রকমের ব্যাপার, পৃথিবীর সর্বত্র একটা অভিনব ধরনের কাণ্ডকারখানা এবং সংগ্রাম দেখা দিচ্ছে, তারই আভাস এর মধ্যে মিলবে। এই জন্যই এই গল্পগুলো শুধু একটি বিশেষ জাতির গল্প নয়; এবং এই জন্যই আমি এগুলো সম্বন্ধে এতদিন কথা বলি নি, এর আলোচনা আলাদা একখানা চিঠিতে করব বলে তুলে রেখেছি। এই চিঠিতে আমি তোমাকে বলব মুসোলিনির কথা—এখনকার জগতে যে ক'টি মানুষ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সম্মান পাচ্ছেন তিনি তাঁদেরই একজন। আর বলব ইতালিতে ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থানের কথা।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবারও আগে থেকেই ইতালিতে নিদারুণ আর্থিক দুর্গতি চলছিল। ১৯১১-১২ সনে তুরস্কের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে তারই জয় হল। উত্তর-আফ্রিকার

ত্রিপোলি অঞ্চল তার দখলে চলে এল;\ইতালির সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের উল্লাসের অবধি রইল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র যুদ্ধটির ফল ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থার পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয় নি; তার আর্থিক অবস্থারও কোনো উন্নতি এতে হয় নি। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠল, ১৯১৪ সনে, অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ ঠিক শুরু হবার মুখে, ইতালিতে বিপ্লব একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। বহু কারখানাতে বড়ো বড়ো ধর্মঘট হল; শ্রমিকদের সামলে রাখা গেল, শুধু নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী শ্রমিকনেতারা ছিলেন বলে—এ'রা কোনোক্রমে সে ধর্মঘট বন্ধ করে দিলেন। তার পরেই এল যুদ্ধ। ইতালির মিত্র ছিল জর্মানি, কিন্তু ইতালি তার পক্ষে যোগ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করল; নিরপেক্ষ থেকে, সেই সুযোগে দুই পক্ষকেই মোচড় দিয়ে খানিকটা সুবিধা আদায় করে নিতে চেষ্টা করল। যে বেশি দর হাঁকবে তারই পক্ষ হয়ে লড়তে যাব—এই মনোভাবটা খুব ভালো নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশগুলোর ধর্মজ্ঞান বলে বিশেষ কিছুই নেই, অনেক সময়েই তারা এমন সব আচরণ করে থাকেন যা করতে যে কোনো সাধারণ মানুষ লজ্জায় মরে যাবে। নগদ টাকাই বল আর যুদ্ধের পরে জমি দেবার প্রতিশ্রুতিই বল, জর্মানির তুলনায় মিত্র-পক্ষের, মানে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের ঘুষ কচলাবার শক্তি ছিল অনেক বেশি। অতএব ১৯১৫ সনের মে মাসে ইতালি মিত্রপক্ষের দিকে হয়ে যুদ্ধে যোগ দিল। স্মার্না এবং এশিয়া-মাইনরের খানিকটা অংশ ইতালিকে দিয়ে দেওয়া হবে বলে একটা গোপন সন্ধি এর কিছুদিন পরে করা হয়েছিল তার কথা বোধ হয় তোমাকে আমি বলেছি। এই সন্ধিটি অনুমোদিত হবার আগেই রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ঘটে গেল; তার ফলে কূটচালের এই খেলাটিও ভেস্তে গেল। এইটাই হল ইতালির মনস্তাপের একটা কারণ। প্যারিসে যে সন্ধিপত্র রচিত হল তাতেও ইতালি কিছুটা অসন্তুষ্ট হল, তার ধারণা হল ইতালির ন্যায্য 'অধিকার'গুলো এতে স্বীকার করা হয় নি। এবার কিছু নূতন উপনিবেশ দখল এবং শোষণ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, দেশের যে অর্থকষ্ট চলছে তার খানিকটা সুরাহা করে নেওয়া যাবে, এই আশাতেই ইতালির সাম্রাজ্যবাদীরা আর বুর্জোয়ারা বুক বেঁধে বসে ছিলেন।

তার কারণও ছিল। যুদ্ধের পর ইতালির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল; যুদ্ধে ইতালি যতটা অবসন্ন হয়েছিল মিত্রপক্ষের আর কোনো দেশই তা হয় নি। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রমে দাঁড়িয়েছে; লোকেরা ক্রমেই বেশি করে সমাজতন্ত্রবাদ আর কমিউনিজ্‌মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রাশিয়াতে বলশেভিকরা যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত স্বভাবতই তাদের উৎসাহিত করে তুলছিল। দেশের মধ্যে একদিকে আছে কারখানার শ্রমিকরা; অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে তাদের দুর্দশা একেবারে চরমে উঠেছে; অন্যদিকে রয়েছে বহু সংখ্যক সৈনিক, এদের বাহিনী ছত্রভংগ করে দেওয়া হয়েছে, এদের অধিকাংশই তখন বেকার। বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বেড়ে চলল। শ্রমিকদের শক্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; তাদের বাধা দেবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতারা এই সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯২০ সনের গ্রীষ্মকালে একটি সংকট-মুহূর্ত এসে উপস্থিত হল। ধাতুর কারখানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, পাঁচ লক্ষ লোক তার মধ্যে। এই ইউনিয়ন দাবি তুলল, শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। দাবি নামঞ্জুর হল; অতএব এই শ্রমিকরা স্থির করল, তারা একটি অভিনব পন্থায় ধর্মঘট করবে—এই পন্থাটির নাম দেওয়া হল 'কাজে বসে ধর্মঘট করা'। তার মানে শ্রমিকরা যে যার কারখানায় ঠিক চলে যাবে, কিন্তু কাজ কিছুই না করে স্রেফ ব'সে থাকবে, এমনকি কাজে ব্যাঘাত পর্যন্ত ঘটাবে। এটা হচ্ছে সিণ্ডিক্যালিস্টদের রচিত কর্মপন্থা—বহুকাল আগে ফ্রান্সের শ্রমিকরা এর নীতি প্রচার করেছিল। কারখানার মালিকরা এই বাধাসৃষ্টিকারী ধর্মঘটের জবাব দিল 'তালা-বন্ধ' নীতি দিয়ে—মানে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে। শ্রমিকরা তখন নিজেরাই কারখানাগুলো দখল করে নিল, নিয়ে সমাজতন্ত্রী রীতিতে সে কারখানা চালাবার চেষ্টা করল।

শ্রমিকদের এই কাজটা বিপ্লবগন্ধী তাতে সন্দেহ নেই; স্থির থেকে চালিয়ে গেলে এর ফলে অবশ্যই সমাজ-বিপ্লব ঘটে যেত, আর না হয় চেষ্টাটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। এর মাঝামাঝি কোনো অবস্থা বেশিদিন চলা সম্ভব ছিল না। ইতালিতে তখন সমাজতন্ত্রী দল খুবই প্রবল।

ট্রেড ইউনিয়নগুলো তো এর ইঙ্গিতে চলতই; তাছাড়া দেশের তিন হাজার মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এদেরই হাতে; পার্লামেন্টেও এদের তরফের সভ্য ছিল ১৫০ জন, মানে মোট সভ্যসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যে রাজনৈতিক দল শক্তি এবং স্থির প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, প্রচুর সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র-শাসনের বহু উচ্চপদ অধিকার করে বসে, সে প্রায়ই আর বিপ্লবপন্থী থাকে না। তবুও কিন্তু এই দলটি, এর নরমপন্থী সভ্যরা পর্যন্ত, শ্রমিকদের সমর্থন করল; বলল কারখানা দখল করে নিয়েছে তারা, ঠিকই করেছে। কিন্তু সমর্থন করা পর্যন্তই, তার বেশি আর কিছুই করল না এরা। পিছিয়ে যাবার ইচ্ছা এদের ছিল না; কিন্তু এগিয়ে চলবার সাহসও ছিল না; যেখানে বাধাবিঘ্ন সবচেয়ে কম সইতে হয় সেই মধ্যপন্থাটিই আঁকড়ে ধরে রইল। যারা সংশয়ী, যারা কার্যকালে ইতস্তত করে, ঠিক সময়টিতে মন স্থির করে উঠতে পারে না, তাদের অবস্থা সর্বত্র যা হয়ে থাকে এদেরও ঠিক তাইই হল। শুভ মুহূর্তটিকে এরা বেশ চলে যেতে দিল, তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারল না—অতএব সেই কালচক্রের রথের চাকায় নিজেরাই চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। শ্রমিকরা কারখানাগুলো দখল করে নিয়েছিল; শ্রমিক নেতারা এবং প্রগতিপন্থী দলগুলো মন স্থির করতে পারল না বলে তাদের সে চেষ্টাটিও ব্যর্থ হল।

বিত্তশালী শ্রেণীদের এতে সাহসও অত্যন্ত বেড়ে গেল। শ্রমিকদের এবং তাদের নেতাদের শক্তি তারা যাচাই করে দেখে নিয়েছে; বুঝেছে, যতটা শক্তি তাদের আছে বলে ভেবেছিল আসলে শক্তি আছে তার চেয়ে অনেক কম। এবার এরা স্থির করল, একটা প্রতিশোধ নিতে হবে, শ্রমিক আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রী দলকে ভেঙে চূর্ণ করে দিতে হবে। এই কাজের সহায় বলে এরা বিশেষ করে বরণ করল কতকগুলো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে—১৯১৯ সনে কর্মচ্যুত সৈনিকদের নিয়ে বেনিটো মুসোলিনি এই বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এদের নাম ছিল "ফ্যাসি ডি কম্‌ব্যাটিমেণ্টি" অর্থাৎ লড়ুয়ে দল; এদের কাজ ছিল ফাঁক পেলেই সমাজতন্ত্রী এবং প্রগতি-পন্থীদের আর তাদের পরিচালিত সব প্রতিষ্ঠানের উপরে আক্রমণ চালানো। যেমন, সমাজ-তন্ত্রবাদীরা খবরের কাগজ বার করলে তারা সে কাগজ ছাপবার ছাপাখানাটিকে নষ্ট করে দেবে; কোনো মিউনিসিপ্যালিটিতে বা সমবায় প্রতিষ্ঠানে সমাজতন্ত্রী বা প্রগতিপন্থীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখলে তাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করবে। শ্রমিক এবং সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এই 'লড়ুয়ে দলরা' লড়াই চালাচ্ছে; বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা এবং উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সকলেই এদের উৎসাহ দিতে এবং টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করলেন। শাসনকর্তৃপক্ষ পর্যন্ত এদের প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ দেখাতে লাগলেন, কারণ সমাজতন্ত্রী দলের শক্তি ভেঙে দেওয়াই তাঁদেরও কাম্য।

এই লড়ুয়ে দল বা 'ফ্যাসি ডি কম্‌ব্যাটিমেণ্টি', সংক্ষেপে ফ্যাসিস্ট বাহিনী, একে যিনি গড়ে তুললেন, কে সেই বেনিটো মুসোলিনি? তখন তাঁর অল্প বয়স (এখন তাঁর বয়স ঠিক পঞ্চাশ বছর; ১৮৮৩ সনে তাঁর জন্ম হয়)। নানারকম বিচিত্র এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাতে তাঁর জীবনকাহিনী পরিপূর্ণ। তাঁর বাবা ছিলেন কর্মকার এবং একজন সমাজতন্ত্রবাদী; অতএব মুসোলিনিও সমাজতন্ত্রবাদের পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন একেবারে আগুনমার্কা আন্দোলনপন্থী; বিপ্লবের বাণী প্রচার করার অভিযোগে সুইজার্ল্যাণ্ডের একাধিক ক্যাণ্টন থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতেন, তাঁরা নরমপন্থী এই জন্যই। বোমা ফেলে এবং অনুরূপ উপায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ত্রাসসৃষ্টির চেষ্টাকে তিনি খোলাখুলিই সমর্থন করতেন। তুরস্কের সঙ্গে যখন ইতালির যুদ্ধ হয় তখন সমাজতন্ত্রী নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সে যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। মুসোলিনি কিন্তু করলেন না, তিনি সে যুদ্ধের বিরোধিতাই করতে লাগলেন; কতকগুলো হিংসামূলক কার্যকলাপের অপরাধে তাঁকে কয়েকমাসের জন্য কারাদণ্ডও ভোগ করতে হল। নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা যুদ্ধকে সমর্থন করছিলেন বলে তিনি অতি তীব্র ভাষায় এঁদের আক্রমণ করলেন; তাঁরই চেষ্টার ফলে এঁরা সমাজতন্ত্রী দল থেকে বিতাড়িত হলেন। সমাজতন্ত্রীদের দৈনিক পত্রিকা ছিল মিলান শহর থেকে প্রকাশিত 'আভাণ্টি'; তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বসলেন; দিনের পর দিন ধরে শ্রমিকদের উপদেশ দিতে লাগলেন, হিংসার জবাব

হিংসা দিয়েই দাও। এদের এইভাবে তিনি হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করতে প্ররোচনা দিচ্ছেন; নরমপন্থী মার্ক্‌স্‌বাদী নেতারা এতে অত্যন্ত আপত্তি প্রকাশ করলেন।

তার পর এল বিশ্বযুদ্ধ। কয়েকমাস পর্যন্ত মুসোলিনি যুদ্ধের বিরোধী হয়ে রইলেন, বলতে লাগলেন, নিরপেক্ষ হয়ে থাকাই ইতালির উচিত। তার পর একদিন, একটু হঠাতই বলতে হবে, তিনি মতামত পরিবর্তন করলেন, অন্তত সে মত প্রকাশ করবার ভাষাটা পাল্‌টে ফেললেন; ঘোষণা করলেন, ইতালির মিত্রপক্ষের দিকে যোগ দেওয়াই উচিত। সমাজতন্ত্রী পত্রিকাটির সংস্রব ছেড়ে দিয়ে তিনি নূতন একটি কাগজের সম্পাদনা শুরু করলেন; সে কাগজে এই নূতন নীতির কথাই প্রচার করা হত। সমাজতন্ত্রী দল থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হল। এর কিছুদিন পরে তিনি স্বেচ্ছায় একজন সাধারণ সৈনিক বলে নাম লেখালেন; ইতালির রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করলেন, যুদ্ধে আহতও হলেন।

যুদ্ধের পরে মুসোলিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া বন্ধ করলেন। তাঁর তখন একটু বিপন্ন অবস্থা: তাঁর পুরোনো দল আর তাঁর উপরে প্রসন্ন নয়, শ্রমিক শ্রেণীদের উপরেও তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নেই। শান্তিকামীদের এবং সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি নিন্দা করতে লাগলেন, ওদিকে আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রকেও গালাগাল দিতে লাগলেন। সকল প্রকার রাষ্ট্রকেই তিনি খারাপ বলে ঘোষণা করলেন, নিজেকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী' বলে পরিচয় দিয়ে 'অরাজকতন্ত্রের' প্রশংসা করতে লাগলেন। এই হচ্ছে তিনি যা লিখতেন তার কথা। কাজে তিনি যা করলেন সে হচ্ছে: ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে তিনি ফ্যাসিজ্‌মো বা ফ্যাসিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং বেকার সৈনিকদের তাঁর যোদ্ধা-দলে ভর্তি করে নিলেন। এই দলগুলির নীতি ছিল হিংসা ও বলপ্রয়োগ; সরকার এদের উপরে বড়ো একটা হস্তক্ষেপ করতেন না, অতএব এদের সাহস এবং অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলল। অনেক সময়ে শহর অঞ্চলে শ্রমিকরা এদের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করত এবং শহর থেকে এদের তাড়িয়ে দিত। কিন্তু সমাজতন্ত্রী নেতারা শ্রমিকদের এই লড়াই-করবার বুদ্ধিটাকে অনুচিত ব'লে প্রচার করলেন, তাদের যুক্তি দিলেন, ফ্যাসিস্ট্‌রা যে ত্রাসসৃষ্টি করছে, তোমরা শান্তভাবে এবং নিষ্ক্রিয় ধৈর্য সহকারে তাকে সহ্য করে যাও। এ'দের আশা ছিল, এই ভাবে চললেই ফ্যাসিস্ট্‌রা ক্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু তা মোটেই হল না; এবং ফ্যাসিস্টদেরই শক্তি দিন দিন বাড়তে লাগল, কারণ তারা দুইদিক থেকেই সাহায্য পাচ্ছিল—একদিকে দেশের ধনী ব্যক্তিরা তাদের টাকা যোগাচ্ছেন, অন্যদিকে সরকার তাদের কার্যকলাপে বাধা দিতে রাজি নন। ওদিকে জনসাধারণের মধ্যে এদের রুখবার বুদ্ধি যেটুকু বা ছিল তাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে গেল। শ্রমিকদের যা অস্ত্র, সেই ধর্মঘট দিয়েও ফ্যাসিস্ট্‌দের অত্যাচারের জবাব দেবার একটা চেষ্টা পর্যন্ত করা হল না।

মুসোলিনির নেতৃত্বে পরিচালিত এই ফ্যাসিস্ট বাহিনী একই সঙ্গে দুটি পরস্পরবিরোধী বুলি আয়ত্ত করে নিল। সর্বপ্রথম কথা, এরা হল সমাজতন্ত্রবাদ আর কমিউনিজ্‌মের শত্রু; অতএব বিত্তশালী শ্রেণীরা এদের সমর্থন করতে লাগল। কিন্তু মুসোলিনি এককালে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনকারী এবং বিপ্লবপন্থী ছিলেন; ধনিকতন্ত্র-বিরোধী বহু জনপ্রিয় বুলি তাঁর কণ্ঠস্থ—দরিদ্রতম শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই সে বুলিগুলো শুনলে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে যায়। আন্দোলন চালাবার বিদ্যায় খুব বড়ো ওস্তাদ হচ্ছে কমিউনিস্টরা, তাদের কাছ থেকে সে-বিদ্যার কারিকুরিও তিনি অনেকখানিই শিখে নিয়েছিলেন। অতএব ফ্যাসিজ্‌ম্‌ হয়ে উঠল নানাবিধ মতামতের একটা বিচিত্র সমন্বয়, তার অনেকরকম ব্যাখ্যা খাড়া করা চলে। মূলত এটা একটা ধনিকতন্ত্রী আন্দোলন; অথচ এমন বহু ধ্বনি এরা উচ্চারণ করত যা ধনিকতন্ত্রের পক্ষে একেবারে মারাত্মক। এমনি করে এর মধ্যে নানাবিধ লোক এসে একত্র হল। এর মেরুদণ্ড ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো—বিশেষ করে বেকার নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বেকার এবং অপটু শ্রমিকের দল, যারা সংঘবদ্ধ নয়, শ্রমিক ইউনিয়ন-ভুক্ত নয়, ফ্যাসিজ্‌মের শক্তি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও একে একে এসে এর মধ্যে ভিড়ে গেল। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়—সাফল্য দেখিয়ে মানুষকে যত সহজে দলে টানা যায় এমন আর কিছুতেই হয় না। ফ্যাসিস্টরা জবরদস্তি করেই দোকানদারদের জিনিসপত্রের

দাম কমিয়ে রাখতে বাধ্য করল, ফলে দরিদ্র লোকদেরও প্রীতি তারা অর্জন করল। বহু দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীও স্বভাবতই ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে এসে জুটল। কিন্তু এত সব কাণ্ড সত্ত্বেও ফ্যাসিজ্‌ম্ একটা অল্পসংখ্যক লোকের আন্দোলনই হয়ে রইল।

সমাজতন্ত্রী নেতারা সংশয় আর দ্বিধা নিয়ে রইলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করতে লাগলেন, তাঁদের দলের মধ্যে ভাঙাভাঙি আর ভাগাভাগি চলতে লাগল; ওদিকে ফ্যাসিস্টদের শক্তি বেড়ে চলল। সরকারি সেনাবাহিনী যেটা ছিল তার ফ্যাসিজ্‌মের প্রতি খুব সদ্‌ভাব ছিল, বাহিনীর সেনাপতিদেরও মুসোলিনি নিজের দলে টেনে নিয়েছিলেন। এত রকমের সব বিভিন্ন প্রকৃতির এবং পরস্পরবিরোধী মানুষকে মুসোলিনি তার পক্ষে টেনে নিলেন এবং একত্র ধরে রাখলেন; তাঁর সে বাহিনীর মধ্যে যত দল ছিল প্রত্যেককেই বুঝিয়ে দিলেন বিশেষ করে তার ভালোর জন্যই ফ্যাসিজ্‌মের সৃষ্টি হয়েছে—এটা তার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড কৃতিত্বের নিদর্শন। ধনী ফ্যাসিস্ট জানত, মুসোলিনি হচ্ছেন তারই সম্পত্তির রক্ষাকর্তা; তিনি যে-সব ধনিকতন্ত্র-বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে এবং ধ্বনি উচ্চারণ করে বেড়াচ্ছেন সেগুলো শুধুই শূন্যগর্ভ কথা, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বলা। দরিদ্র ফ্যাসিস্ট বিশ্বাস করত, সেই ধনিকতন্ত্র-বিরোধী কথাগুলোই হচ্ছে ফ্যাসিজ্‌মের আসল তত্ত্ব; বাকিটা শুধু বাইরের ভড়ং, ধনীদের বোকা ভুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা। এই ভাবেই মুসোলিনি এদলকে ওদলের বিরুদ্ধে উস্‌কে দিতে চেষ্টা করলেন; একদিন তিনি ধনীদের পক্ষ টেনে কথা বলেন, পরদিন আবার বলেন দরিদ্রের পক্ষ টেনে। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন বিত্তশালী শ্রেণীদেরই প্রতিনিধি এবং রক্ষাকর্তা—এরাই তাঁকে টাকা যোগাচ্ছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের সকল শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া—দীর্ঘকাল ধরে তারা এই ধনীদের উচ্ছেদ করবে বলে ভয় দেখিয়ে এসেছে।

অবশেষে ১৯২২ সনের অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্ট বাহিনী রোম শহরের দিকে অভিযান করল; তাদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন সরকারি সেনাবাহিনীর সেনাপতিরা। প্রধানমন্ত্রী এতদিন ফ্যাসিস্ট্‌দের কার্যকলাপ সহ্য করে এসেছেন, এবার তিনি সামরিক আইন জারি করে দিলেন। কিন্তু তখন আর তার সময় নেই; রাজা নিজেই তখন মুসোলিনির পক্ষে। তিনি (রাজা) সামরিক আইন জারির সে আদেশ নাচক করে দিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন, এবং মুসোলিনিকেই প্রধানমন্ত্রী হবার এবং মন্ত্রিসভা গঠন করবার আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯২২ সনের ৩০শে অক্টোবর তারিখে ফ্যাসিস্ট বাহিনী রোমে এসে পৌঁছল. সেই দিনই মিলান থেকে ট্রেনে করে মুসোলিনিও এসে পৌঁছলেন—প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসবার জন্য।

ফ্যাসিজ্‌মের জয় হল, দেশে মুসোলিনির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল, কীই বা ছিল তাঁর কর্মসূচী এবং নীতি? বড়ো বড়ো আন্দোলনগুলো প্রায় সর্বত্রই গড়ে ওঠে কোনো একটা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আদর্শবাদকে আশ্রয় করে, সে আদর্শবাদের মূলে থাকে কতকগুলো স্থির নীতি; কতকগুলো নিশ্চিত উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীও তার থাকে। ফ্যাসিজ্‌মের ছিল একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব—তার কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই, আদর্শবাদ নেই, তার পিছনে কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বা চিন্তাধারা নেই—এক যদি সমাজতন্ত্রবাদ কমিউনিজম্ উদারপন্থা প্রভৃতির বিরোধিতা করাটাকেই একটা ভাবদর্শন বলে ধরা হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। ১৯২০ সনে, মানে ফ্যাসিস্ট দলগুলি যখন প্রথম গড়া হল তার একবছর পরে, মুসোলিনি ফ্যাসিস্টদের সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"কোনো নির্দিষ্ট নীতির সঙ্গে এরা বাঁধা নেই; তাই এরা অবিশ্রাম গতিতে একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলতে পারে; যে লক্ষ্যটি হচ্ছে ইতালির প্রজাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ।"

সেটাকে অবশ্যই বিশেষ একটা কোনো নীতি বলা চলে না; নিজের জাতের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা তো প্রত্যেক ব্যক্তিই করতে রাজি থাকে। ১৯২২ সনে, রোম-অভিযানের ঠিক এক মাস আগে মুসোলিনি বলেছিলেন, "আমাদের কর্মসূচী অতি সহজ : আমরা ইতালিকে শাসন করতে চাই"।

সম্প্রতি ইতালির একটি এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে মুসোলিনি ফ্যাসিজ্‌মের উৎপত্তি সম্বন্ধে

একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে কথাটাকে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। বলেছেন, রোমের অভিযান যখন শুরু করেন তখন ভবিষ্যতে কী করবেন সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না। একদা তিনি সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার ফলে সেই রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে একটা কিছু করবার প্রেরণা তাঁর মনকে অভিভূত করে ফেলেছিল—তারই তাগিদে পড়ে তিনি সেই দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী হয়েছিলেন।

ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এবং কমিউনিজ্‌ম্‌ পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধী; তবু এদের কতকগুলো কার্য-কলাপ ঠিক একই প্রকার, অথচ নীতি এবং আদর্শবাদের কথা যদি বল, সে দিক দিয়ে এরা পরস্পরের একেবারে বিপরীত। ফ্যাসিজ্‌মের মূলে কোনো নীতি নেই আমরা দেখেছি, একেবারে শূন্য থেকেই এর আরম্ভ। অন্যদিকে কমিউনিজ্‌ম্‌ বা মার্ক্‌স্‌বাদ হচ্ছে জটিল অর্থনীতিশাস্ত্রসমস্ত মতবাদ, এবং ইতিহাসের একটা ভাষ্যবিশেষ; তাকে আয়ত্ত করতে হলে আগে মনকে অত্যন্ত কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিতে হবে।

ফ্যাসিজ্‌মের কোনো নীতি বা আদর্শ ছিল না, কিন্তু অত্যাচার এবং সন্ত্রাসবাদ চালাবার একটা বিশেষ কায়দা এর ছিল। আর ছিল অতীত সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি—তার থেকেই এর স্বরূপ খানিকটা বোঝা যায়। এর প্রতীক ছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের একটা প্রতীক, রোমের সম্রাট এবং শাসনকর্তারা যখন পথে বার হতেন, তাঁদের আগে আগে এই প্রতীকটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। জিনিসটা হচ্ছে এক-আঁটি কাঠি, (এর নাম ছিল ফ্যাসেস্‌, তাই থেকেই ফ্যাসিজ্‌মো কথাটার উৎপত্তি), তার মাঝখানে একটা কুড়ুল গোঁজা। ফ্যাসিস্ট্‌দের সংগঠনটিও সেই প্রাচীন রোমের আদর্শে গড়া; এরা যে নামগুলো ব্যবহার করে তা পর্যন্ত সেই পুরোনো রোম থেকে নেওয়া হয়েছে। ফ্যাসিস্ট্‌দের নমস্কার-বিধির নাম ফ্যাসিস্টা; প্রাচীন রোমেও এই ভাবেই নমস্কার করা হত, হাতটাকে তুলে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে। কাজেই দেখছ, ফ্যাসিস্টরা প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল রোমের সাম্রাজ্য থেকে—এদের মনোভাবই ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। এদের নীতিবাক্য ছিল : তর্ক কোরো না—শুধু আদেশ মেনে চলো। সে নীতি সেনাবাহিনীর পক্ষে হয়তো ভালো, কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে সেটা নিশ্চয়ই খাপ খায় না। এদের নেতা মুসোলিনির পদবী ছিল ইল্‌ ডুচে—বা ডিক্‌টেটর। এদের উর্দি ছিল একটা কালো শার্ট; তাই এদের নামই হয়ে গিয়েছিল কালো-শার্টের দল।

ফ্যাসিস্ট্‌দের একমাত্র নির্দিষ্ট কর্মনীতি ছিল শক্তি অর্জন করা; মুসোলিনি প্রধানমন্ত্রী হবার ফলে সে উদ্দেশ্য তাদের সিদ্ধ হয়ে গেল। মুসোলিনি এবার তাঁর নিজের আসন দৃঢ় করে নেবার কাজে লেগে গেলেন—তাঁর বিরুদ্ধ দলদের বিচূর্ণ করে। দেশে অত্যাচার এবং ত্রাসসৃষ্টির একটা অদ্ভুত তাণ্ডব শুরু হল। অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণত লোকে একে একটা অপ্রিয় কর্তব্য বলেই জানে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই এর ব্যাখ্যা বা সাফাইও দিতে চেষ্টা করে। ফ্যাসিস্ট্‌রা কিন্তু উৎপীড়ন সম্বন্ধে এরকম কোনো সংকোচ বা সাফাইয়ের প্রয়োজন বোধ করত না। তারা একে নীতি বলেই স্বীকার করে নিল, খোলাখুলি এর প্রশস্তি গাইতে লাগল; কেউ কোথাও তাদের বাধা দিচ্ছিল না তবুও উৎপীড়ন চালাতে লাগল। পার্লামেন্টের যে-সব সভ্য এদের বিপক্ষে ছিলেন স্রেফ লাঠিপেটা করেই তাঁদের ঠাণ্ডা করে রাখা হল; গায়ের জোরেই এমন একটা নূতন আইন তৈরি করে নেওয়া হল যার ফলে দেশের শাসনতন্ত্রটাই বদলে গেল। এইভাবে খুব বেশির ভাগ ভোট মুসোলিনির স্বপক্ষে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা হল।

ফ্যাসিস্টরাই তখন দেশ শাসন করছে, পুলিশ, রাষ্ট্র সমস্তই তাদের হাতে; তখনও যদি তারা লোকের উপরে বেআইনি মামলা চালাতে চায়, সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। অথচ ঠিক সেইটেই করল তারা; সামনে বাধাও তদের কিছুই ছিল না, কারণ সরকারি পুলিশ তাদের উপরে হস্তক্ষেপ করবে না। নরহত্যা, নির্যাতন, প্রহার, সম্পত্তি-নষ্ট করা সমানে চলতে লাগল। বিশেষ করে নির্যাতনের একটা নূতন কায়দা ফ্যাসিস্ট্‌রা খুব বেশি প্রয়োগ করত—তাদের বিপক্ষে যে কথা বলতে সাহস করত তাকেই ধরে একেবারে অনেকখানি ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দিত।

১৯২৪ সনে গিয়াকোমো মাত্তেওতি নিহত হলেন; তাঁর হত্যার সংবাদে ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে গেল। মাত্তেওতি ছিলেন সমাজতন্ত্রীদলের একজন নেতৃস্থানীয় লোক, পার্লামেন্টেরও সভ্য ছিলেন তিনি। দেশে অল্পদিন আগেই একটা নির্বাচন হয়ে গেছে; নির্বাচনের ব্যাপারে ফ্যাসিস্ট্‌রা যে-সব কায়দা খাটিয়েছিল, পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাত্তেওতি তার সমালোচনা করেছিলেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে খুন করা হল। লোক-দেখানো ঠাট বজায় রাখবার খাতিরে হত্যাকারীদের একটা বিচারেরও ভড়ং করা হল, বিচারে তারা বস্তুত একেবারে বিনা সাজাতেই খালাস পেয়ে গেল। উদারপন্থী দলের একজন নরমপন্থী নেতা ছিলেন আমেণ্ডোলা; তাঁকে ফ্যাসিস্ট্‌রা এমন ঠ্যাঙানি দিল যে তিনি মরেই গেলেন। নিত্তি ছিলেন উদারপন্থী এবং দেশের একজন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী; তিনি কোনোক্রমে ইতালি থেকে পালিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু তাঁর বাড়িটি এরা ধ্বংস করে দিল। এই রকমের অত্যাচার দেশের সর্বত্র সারাক্ষণই চলছিল; যা বললাম এ হচ্ছে তার দু'চারটি নমুনামাত্র—সেই নমুনা দেখেই সমস্ত জগৎসুদ্ধ লোক চঞ্চল হয়ে উঠল। আর আইনের বলে যেখানে যাকে দমন করা সম্ভব তার ত্রুটি তো হচ্ছিলই না; এই উৎপীড়নটা ছিল তার বাইরে, ফাউ-স্বরূপ। অথচ এটা শুধু একটা উত্তেজিত জনতার বিশৃঙ্খল অত্যাচার নয়; এ রীতিমতো সুসংহত পদ্ধতিতে চালানো অত্যাচার, বেশ ভেবেচিন্তেই সমস্ত বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি এর প্রয়োগ করা হচ্ছিল—সে বিরুদ্ধপক্ষ মানেও শুধু সমাজতন্ত্রবাদী বা কমিউনিস্ট নয়, শান্তিপ্রিয় এবং অত্যন্ত নরমপন্থী উদারপন্থীরাও এর হাত থেকে রেহাই পেল না। মুসোলিনির আদেশই ছিল, যারা তাঁর বিরোধী তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাটাকেই কঠিন বা 'অসম্ভব' করে তুলতে হবে। সে আদেশ ফ্যাসিস্টরা পরম নিষ্ঠা সহকারে পালন করল। অন্য কোনো দল, অন্য কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান দেশে বেঁচে থাকতে পারবে না। সব কিছুই হবে ফ্যাসিস্ট্‌পন্থী। আর সরকারি চাকরিও সমস্তই যাবে ফ্যাসিস্টদের হাতে।

মুসোলিনি হলেন ইতালির সর্বশক্তিমান ডিক্‌টেটর। কেবল প্রধানমন্ত্রীই হলেন না তিনি—তিনিই বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী, আভ্যন্তরীণ শাসন, উপনিবেশ, যুদ্ধ, বাণিজ্য, বিমান এবং শ্রমিক মন্ত্রী। কার্যত তিনিই তখন সমগ্র মন্ত্রীসভা হয়ে বসলেন। রাজা বেচারী কোন্‌ পিছনে অন্তরালে পড়ে রইলেন, তার নামও আর লোকের কানে পেঁছয় না। পার্লামেণ্টও ক্রমে ঠেলা খেয়ে একপাশে সরে গেল; নিজের একটা ম্লান ছায়ামাত্রে পরিণত হল। ইতালির রঙ্গমঞ্চে তখন ফ্যাসিস্ট্‌ গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলই সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছে; আর সেই ফ্যাসিস্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল চলছে মুসোলিনির ইঙ্গিতে।

বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে মুসোলিনি প্রথম দিকেই যে-সব বক্তৃতা দিতে লাগলেন, তা শুনে ইউরোপে প্রচণ্ড বিস্ময় এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হল। আশ্চর্য বক্তৃতা সে—আস্ফালনে, শাসানিতে পরিপূর্ণ; রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা যেরকম বিচক্ষণ উক্তি সাধারণত করে থাকেন তার সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই। শুনে মনে হল তিনি সারাক্ষণই একটা যুদ্ধ বাধাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। ইতালির ভাগ্যে আছে সে একদিন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবে, তারই কথা তিনি বলতে লাগলেন; বলতে লাগলেন, ইতালির এত এরোপ্লেন হবে যে তাদের ছায়ায় আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রতিবেশী রাজ্য ফ্রান্সকে তো তিনি কয়েকবার খোলাখুলিই শাসানি শুনিয়ে দিলেন। ফ্রান্সের শক্তি অবশ্যই ইতালির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তখন কেউ যুদ্ধ করতে চাইছিল না। অতএব মুসোলিনি যত গরম গরম কথা বললেন অন্যরা সেগুলো সহ্য করেই চললেন। ইতালি লীগ অব নেশন্‌সের সভ্য, অথচ বিশেষ করে সেই লীগকেই লক্ষ্য করে মুসোলিনি তাঁর ব্যঙ্গ এবং অবজ্ঞার বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, একবার তো অত্যন্ত উগ্র ভাষাতেই তার কথা অগ্রাহ্য করে বসলেন। তখনও লীগ এবং অন্যান্য দেশরা চুপ করে রইল।

ইতালির বাইরের রূপে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; দেশের সর্বত্র এমন একটা শৃঙ্খলা এবং সময়ানুবর্তিতার ভাব বিরাজ করছে যে সে দেখে বিদেশী ভ্রমণকারীর মনে ইতালি সম্বন্ধে খুবই ভালো ধারণা জন্মে যায়। রোম একদা সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিল, তাকে আবার সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে; দেশের উন্নতি সাধনের বহু দূরপ্রসারী পরিকল্পনা কার্যে

পরিণত করা হচ্ছে। আবার নূতন করে একটি রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নই যেন মুসোলিনির চোখে লেগেছে বলে মনে হয়।

পোপের সঙ্গে ইতালি সরকারের দীর্ঘকাল ধরে কলহ চলে আসছিল; ১৯২৯ সনে মুসোলিনি এবং পোপের প্রতিনিধির মধ্যে একটি চুক্তি হয়ে সে কলহের অবসান হয়ে গেছে। ১৮৭১ সনে রোমকে ইতালির রাজধানী বলে ঘোষণা করা হল; সেই থেকেই চিরদিন পোপরা সে ঘোষণা মেনে নিতে বা রোমে তাঁদের যে সার্বভৌম ক্ষমতা আছে তার দাবি ছেড়ে দিতে, অস্বীকার করে এসেছেন। রোমের মধ্যেই ভ্যাটিকানে পোপদের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, সেণ্ট্ পিটার্স্‌ও তার অন্তর্গত। অতএব নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক পোপ সোজা সেই প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করতেন, জীবনে আর তার বাইরে আসতেন না, ইতালি-রাজ্যের মাটিতে পদার্পণ করতেন না। নিজেদের ইচ্ছাতেই এঁরা এইভাবে বন্দী হয়ে থাকতেন। ১৯২৯ সনের চুক্তিতে রোমের এই ক্ষুদ্র ভ্যাটিকান-অঞ্চলটিকে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজ্য বলে স্বীকার করা হল। পোপ এই রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান অধীশ্বর; এর প্রজাদের মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। এই রাজ্যের নিজস্ব আদালত আছে, মুদ্রা আছে, ডাক-টিকিট আছে, সরকারি কর্মচারী বাহিনী আছে, এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল এর একটি অতিক্ষুদ্র রেলওয়ে আছে। পোপ এখন আর স্বকৃত বন্দীদশায় কালযাপন করেন না; মাঝেমাঝে ভ্যাটিকান থেকে বাইরেও বেরিয়ে আসেন। পোপের সঙ্গে এই সন্ধিটি করেছেন বলে ক্যাথলিকরা মুসোলিনির প্রতি প্রসন্ন। ফ্যাসিস্টরা যে বেআইনি উৎপীড়ন চালাচ্ছিল বছরখানিক তার প্রচণ্ডতা খুবই বেশি ছিল; তার পরও প্রায় ১৯২৬ সন পর্যন্ত সেটা কিছু কিছু চলেছে। ১৯২৬ সনে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের শাসন করবার জন্য কতকগুলো 'বিশেষ ধরনের আইন' তৈরি করা হল, তার ফলে রাষ্ট্রের হাতে একেবারে প্রচণ্ড ক্ষমতা এসে পড়ল—বেআইনি কাণ্ডকারখানা চালাবার আর প্রয়োজন থাকল না। ভারতবর্ষে আমরা অসংখ্য অর্ডিন্যান্স এবং সেই অর্ডিন্যান্সের বলে নির্মিত আইন দেখেছি; এই আইনগুলোও ছিল কতকটা তারই অনুরূপ। এখনও এই-সব 'বিশেষ ধরনের আইনে'র বলে বহুসংখ্যক লোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, জেলে পোরা হচ্ছে, নির্বাসিত করা হচ্ছে। সরকারি বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৯২৬ সনের নভেম্বর থেকে ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১০,০৪৪ জন লোককে বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হয়েছে। পঞ্জা, ভেণ্টোলিনি এবং ট্রেমিতি বলে তিনটি দ্বীপকে বন্দীনিবাসে পরিণত করা হয়েছে, নির্বাসিত বন্দীদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শোনা যায় নাকি এখানে তাদের থাকবার ব্যবস্থাও খুব খারাপ।

এখনও এত লোককে ক্রমাগত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এই থেকেই বেশ বোঝা যায়, এত পীড়ন-উৎপীড়ন সত্ত্বেও দেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী একটা গোপন এবং বিপ্লবী শক্তি বেঁচে রয়েছে। ব্যয়ের বোঝা দিন দিন বেড়ে চলেছে, দেশের আর্থিক অবস্থাও আবার খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে।

গণতন্ত্র ও একাধিনায়কতন্ত্র

২২শে জুন, ১৯৩৩

বেনিটো মুসোলিনি নিজেকে ইতালির ডিক্‌টেটর রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে ইউরোপে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই একটি করে সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে; একজন যোগ্য ব্যক্তি এসে বসবার প্রতীক্ষা করছে।" ইউরোপের অনেক দেশেই ডিক্‌টেটরের আবির্ভাব হয়েছে; পার্লামেণ্টগুলোকে হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, না হয় তো জোর করেই ডিক্‌টেটরের আজ্ঞা মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্পেন।

স্পেন বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় নি। সে যুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিদের কাছে মালপত্র বেচে সে বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছিল। কিন্তু তার নিজস্ব আপদ-বিপদের অভাব ছিল না; শিল্প-প্রচেষ্টার দিক থেকেও সে ছিল অত্যন্ত অনুন্নত দেশ। এককালে ইউরোপের মধ্যে তার প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, সেদিন আমেরিকা আর প্রাচ্য জগতের ধনভাণ্ডার তারই ঘরে এসে ঢেলে পড়েছে। কিন্তু সে কাল বহুদিন আগে চলে গেছে, তাকে ইউরোপের মধ্যে কোনোরকম সম্ভ্রান্ত দেশ বলেই কেউ গণ্য করে না। দুর্বল শক্তিহীন একটা পার্লামেণ্ট ছিল তার, তার নাম কর্টেস্‌। রোমান ক্যাথলিকরা দেশে প্রবল ছিল। ইউরোপের অন্যান্য যেসব দেশ শিল্প-প্রচেষ্টায় বিশেষ অগ্রণী নয় তাদের দশা যা হয়েছে স্পেনেরও তাই হল—সিণ্ডিকালিজ্‌ম্‌ আর অ্যানার্কিজ্‌মই সে দেশে প্রসার লাভ করল, জর্মনিতে যে নিশ্ছিদ্র মার্ক্‌স্‌বাদ বা ইংলণ্ডে যে নরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিশেষ কদর স্পেনে হল না। ১৯১৭ সনে, রাশিয়াতে বলশেভিকরা যখন ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য লড়াই করছিল, তখন স্পেনের শ্রমিকরা এবং প্রগতিবাদীরাও একটা দেশব্যাপী ধর্মঘট শুরু করল—তাদের উদ্দেশ্য, দেশে একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপন করবে। রাজকীয় সরকার এবং সেনাবাহিনী সে ধর্মঘটকে এবং সমস্ত আন্দোলনটাকেই ভেঙে তছনছ করে দিল; এবং তার ফলে সেনাবাহিনীই দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠল। সেনাবাহিনীর জোরে রাজাও একটু বেশি স্বাধীন এবং স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠলেন।

ফ্রান্স এবং স্পেন, দু'জনে মিলে মরক্কো দেশটাকে মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত করে দুটো প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করে নিয়েছিল। ১৯২১ সনে মরক্কোতে রিফ্‌দের মধ্যে আবদুল করিম নামে একজন দক্ষ নেতার আবির্ভাব হল; স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে ইনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বিরাট যোগ্যতা এবং পরাক্রম দেখালেন তিনি, বারবার করে স্পেনের সৈন্যকে পরাজিত করলেন। এর ফলে স্পেনের মধ্যে একটা সংকট উপস্থিত হল। রাজা এবং সেনানায়করা, দুপক্ষই চাইলেন, এই শাসনতন্ত্র এবং পার্লামেণ্টকে খতম করে দেওয়া হোক, দিয়ে একটা ডিক্‌টেটরি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হোক। এ পর্যন্ত এঁদের মতের মিল ছিল। মতের অমিল হল পরের কথাটি নিয়ে: সে ডিক্‌টেটর হবেন কে? রাজার ইচ্ছা তিনিই ডিক্‌টেটর বা সর্বশক্তিমান রাজা হয়ে যাবেন। সৈন্যদের ইচ্ছা, ডিক্‌টেটরের আসনটা সেনাবাহিনীর হাতেই থাকে। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। সেনাবাহিনীরই জয় হল; জেনারেল প্রাইমো ডি রিভেরা দেশের ডিক্‌টেটর হয়ে বসলেন। কর্টেস্‌ অর্থাৎ পার্লামেণ্টকে তিনি বাতিল করে দিলেন, দিয়ে খোলাখুলিই গায়ের জোরে, মানে সেনাবাহিনীর জোরে দেশ শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু মরক্কোতে রিফ্‌দের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছিল সেটা সফল হল না, আবদুল করিম তখনও বেশ সদর্পেই স্পেনের শাসনকে অগ্রাহ্য করে চললেন। স্পেন সরকার তাঁকে খুব লাভজনক শর্তে সন্ধি করতে পর্যন্ত আহ্বান জানালেন, কিন্তু আবদুল করিম তাতে কান দিলেন না—পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই লড়ে যেতে লাগলেন। খুব সম্ভবত একা

হাতে তাঁকে দমন করা স্পেন সরকারের সাধ্যে কুলিয়ে উঠত না। কিন্তু মরক্কোতে ফরাসিদেরও অনেকখানি স্বার্থ ছিল; ১৯২৫ সনে তারাও এসে স্পেনের সঙ্গে যোগ দিল; ফ্রান্সের বিরাট রণসজ্জা নিয়ে তারা আবদুল করিমের বিরুদ্ধে অভিযান করল। ১৯২৬ সনে আবদুল করিম পরাজিত হলেন; ফরাসিদের কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে দীর্ঘ এবং বীরোচিত সংগ্রামের অবসান হয়ে গেল।

স্পেনে এই আগাগোড়া সময়টাই প্রাইমো ডি রিভেরা ডিক্‌টেটর হয়ে শাসন করছিলেন; সামরিক শক্তি, সেন্সর, নিপীড়ন এবং মাঝেমাঝে সামরিক আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি যে-সব ব্যাপার ডিক্‌টেটরি শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ, এখানেও তার কোনোটারই অভাব ছিল না। একটি কথা মনে রেখো, স্পেনের এই ডিক্‌টেটরি শাসন আর মুসোলিনির শাসন এক বস্তু নয়; এটা দাঁড়িয়ে ছিল একমাত্র সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে, আর ইতালিতে মুসোলিনির শক্তির মূলে ছিল প্রজাদেরই মধ্যে কয়েকটা শ্রেণীর সমর্থন। অতএব সেনাবাহিনী যখন প্রাইমো ডি রিভেরার উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, তাঁর আর দাঁড়িয়ে থাকবার দ্বিতীয় অবলম্বন রইল না। ১৯৩০ সনের প্রথম দিকে রাজা তাঁকে পদচ্যুত করলেন। সেই বছরই দেশে একটা বিপ্লব হল। সে বিপ্লব দমনও করা হল, কিন্তু প্রজাতন্ত্র এবং বিপ্লবের জন্য যে ব্যাপক উৎসাহ দেশে দেখা দিয়েছিল তাকে দমানো সম্ভব হল না। ১৯৩১ সনে প্রজাতন্ত্রীরা তাদের শক্তির বহর দেখিয়ে দিল, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনগুলো তারা অক্লেশে জিতে নিল। "দূরদৃষ্টিই বীরত্বের সবচেয়ে বড়ো অংশ", রাজা অ্যালফন্‌সো এই মহাজনবাক্য শিরোধার্য করে নিলেন : সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন। দেশে একটা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। স্পেন ছিল ইউরোপের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসন এবং ধর্মযাজকদের শাসনের প্রাচীন নিদর্শন; সে এবারে পরিণত হল ইউরোপের সর্বকনিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রে। ভূতপূর্ব রাজা অ্যালফন্‌সোকে আইনের শত্রু বলে ঘোষণা করা হল; ধর্মযাজকদের প্রতিপত্তিও হ্রাস করবার জন্য চেষ্টা চলল।

কিন্তু আমি বলছিলাম ডিক্‌টেটরদের কথা। ইতালি এবং স্পেন ছাড়া আরও বহু দেশে গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে দিয়ে ডিক্‌টেটরি শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হল : এদের নাম হচ্ছে, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি এবং অস্ট্রিয়া। পোল্যান্ডে জারের যুগের বৃদ্ধ সমাজতন্ত্রী নেতা পিলসুদ্‌স্কি ডিক্‌টেটর হয়ে বসলেন, কারণ সেনাবাহিনী তাঁরই হাতে। পোল্যান্ডের পার্লামেন্টের সভ্যদের প্রতি তিনি অত্যন্ত অপূর্বরকম বিশ্রী গালাগালি-পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন; মাঝে মাঝে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বোঁচকাবুঁচকিসুদ্ধ তাড়িয়ে দিতেন। যুগোশ্লাভিয়াতে রাজা আলেকজান্ডার নিজেই ডিক্‌টেটর হয়ে বসেছেন; শোনা যায় সে দেশের বহুস্থানে নাকি অবস্থা এত খারাপ, লোকের উপরে এত উৎপীড়ন চলছে, যে তুর্কিরা যখন দেশের প্রভু ছিল সেযুগেও এতটা হয় নি।

যতগুলো দেশের আমি নাম করলাম তার সব দেশে হয়তো এখন প্রকাশ্য ডিক্‌টেটরি শাসন প্রচলিত নেই। এদের শাসন-ব্যবস্থার এত ঘনঘন পরিবর্তন হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই মুশকিল। এক-একবার এদের পার্লামেন্টরা দুদিনের মতো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, হয়তো কিছুদিন কাজকর্মও চালিয়ে যায়। এক-একবার আবার সরকার পক্ষ হঠাৎ কমিউনিস্ট ইত্যাদি যে-সব প্রতিনিধিদের তাঁরা পছন্দ করেন না তাদের দলকে-দলসুদ্ধ গ্রেপ্তার করে বসেন, পার্লামেন্ট থেকে জোর করেই তাদের তাড়িয়ে দেন; অন্য যারা বাকি থাকে, তারাই তখন যেমন পারে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে : বুলগেরিয়াতে সম্প্রতি ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে। এই-সব দেশের প্রজারা সারাক্ষণই বাস করছে ডিক্‌টেটরি শাসনের অধীনে বা তার ঠিক কাছাকাছি একটা অবস্থায়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র দলের পরিচালিত এই-সব সরকারপক্ষ নিছক গায়ের জোরের উপরেই টিকে রয়েছেন; অতএব আত্মরক্ষার খাতিরেই এঁদের সারাক্ষণ বিরোধী পক্ষের লোকদের পীড়ন, হত্যা বা কারারুদ্ধ করতে হচ্ছে, সংবাদ প্রচারের ব্যাপারে কঠোর সেন্সর বসাতে হচ্ছে, বহুবিস্তৃত একটা গুপ্তচর বাহিনী রাখতে হচ্ছে।

ইউরোপের বাইরেও বহু ডিক্‌টেটরের আবির্ভাব হয়েছিল। তুরস্ক এবং কামাল পাশার

কথা তোমাকে আগেই বলেছি। দক্ষিণ-আমেরিকাতেও অনেক ডিক্‌টেটর ছিল; তবে সেখানে ওটা পুরোনো কাল থেকেই আছে—দক্ষিণ-আমেরিকার প্রজাতন্ত্ররা কোনোদিনই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিশেষ ভক্ত নয়।

যে-সব দেশে ডিক্‌টেটরি শাসন আছে বলে বলেছি, তার মধ্যে আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম করি নি। তার কারণ সেখানে যে ডিক্‌টেটরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নির্মমতা অন্য যে-কোনো দেশেরই সমান হলেও, তার প্রকৃতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অন্যরকম। রাশিয়ার ডিক্‌টেটরি শাসন কোনো একজন ব্যক্তি বা একটা ছোটো দলের শাসন নয়, একটি সুসংহত রাজনৈতিক দলের শাসন, সে শাসন প্রধানত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীদের উপর নির্ভর করে। এর নাম তারা দিয়েছে "সর্বহারা শ্রমিকদের একাধিনায়কত্ব"। অতএব আমরা মোট তিনরকমের ডিক্‌টেটরি শাসন দেখতে পাচ্ছি—কমিউনিস্টদের, ফ্যাসিস্টদের এবং সেনাবাহিনীর শাসন। সেনা-বাহিনীর শাসনের মধ্যে অবশ্য বিশেষ অভিনবত্ব কিছুই নেই, ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই সে বস্তু পৃথিবীতে চলে এসেছে। কমিউনিস্ট এবং ফ্যাসিস্টদের শাসনরীতিটাই হচ্ছে পৃথিবীতে নূতন বস্তু; আমাদের এই যুগের দুটি বিশেষ সৃষ্টি।

একটি জিনিস সকলের আগেই চোখে পড়ে : এই ডিক্‌টেটরতন্ত্র এবং এর যত নানাবিধ প্রকারভেদ দেখা দিয়েছে, এরা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং পার্লামেণ্টী শাসনতন্ত্রের ঠিক বিপরীত বস্তু। তোমাকে বলেছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীটা ছিল গণতন্ত্রের যুগ—এই শতাব্দীতেই ফরাসি-বিপ্লবের প্রচারিত 'মানুষের অধিকার' সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হয়ে উঠেছিল সমস্ত মানুষের লক্ষ্য। তাই থেকেই ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে নানা-রূপে পার্লামেণ্টী শাসন-ব্যবস্থার উদ্‌ভব হয়েছিল। অর্থনীতির রাজ্যেও এরই থেকে জন্ম হল 'লেইজে ফেয়ার্' বা অবাধ বাণিজ্য নীতির। বিংশ শতাব্দীতে, ঠিক তাই নয়, বরং বলা যায় যুদ্ধোত্তর যুগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বিরাট ঐতিহ্যের অবসান হয়ে গেল; নিয়মানুগ গণতন্ত্রের উপরে লোকের শ্রদ্ধা এখন দিন দিনই কমে চলেছে। গণতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই তথাকথিত উদারপন্থী দলদেরও মর্যাদা লুপ্ত হয়েছে; এখন আর এদের কোনো গুরুত্ব আছে বলেই লোকে মনে করে না।

কমিউনিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট দুই দলই গণতন্ত্রের সমালোচনা এবং বিরোধিতা করে; কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কারণে। যে-সব দেশ কমিউনিজ্‌ম্ বা ফ্যাসিজ্‌মে বিশ্বাসী নয়, সেখানেও গণতন্ত্রের এখন আর আগের মতো আদর নেই। পার্লামেণ্ট এককালে যা ছিল এখন আর তা নেই, লোকে তাকে আর বিশেষ শ্রদ্ধা করে না। শাসন বিভাগের বড়ো কর্তাদের হাতে বিপুল ক্ষমতা তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা যা দরকার মনে কর তাই করে যাও, পার্লামেণ্টের মতামত আর যাচাই করতে হবে না। এর খানিকটা কারণ হচ্ছে যুগমাহাত্ম্য—এমন একটা সংকট-মুহূর্তে আমরা বাস করছি যেখানে দ্রুত ব্যবস্থারই প্রয়োজন; নির্বাচিত প্রতিনিধিগুলোর সভা ডেকে সে দ্রুত ব্যবস্থা সর্বদা করা সম্ভব হয় না। জর্মানি সম্প্রতি তার পার্লামেণ্টকে একেবারেই বাতিল করে দিয়েছে, ফ্যাসিস্ট শাসনের এমন একটা রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছে যার চেয়ে খারাপ আর হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চিরদিনই তার প্রেসিডেণ্টের হাতে অনেকখানি ক্ষমতা তুলে দিয়ে এসেছে : সম্প্রতি তার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স, এই দুটি মাত্র দেশই বোধহয় এখন আছে যেখানে পার্লামেণ্ট আগের দিনের মতোই কাজ করে যাচ্ছে, অন্তত বাইরের দৃষ্টিতে; ফ্যাসিস্টপন্থী কার্যকলাপ যেটুকু এদের আছে সেটা ঘটছে এদের অধীনস্থ দেশ এবং উপনিবেশগুলিতে—ভারতবর্ষে আমরা ব্রিটিশ ফ্যাসিজ্‌মের নমুনা দেখতে পাচ্ছি, ইন্দোচীনে ফ্রান্সের ফ্যাসিজ্‌ম্ 'শান্তিপ্রতিষ্ঠা' করছে। কিন্তু লণ্ডন এবং প্যারিসেও এখন পার্লামেণ্ট দিন দিন হয়ে উঠছে শুধু একটা শূন্য খোলা। এই তো গত মাসেই ইংলণ্ডের উদারপন্থীদের একজন প্রধান ব্যক্তি বলেছেন :

"আমাদের এই নির্বাচন-সৃষ্ট পার্লামেণ্ট অতি দ্রুতবেগে একটি যন্ত্রমাত্রে পরিণত হয়ে

যাচ্ছে; তার কাজ হচ্ছে শাসনকর্তৃত্বাধিকারী একটি ক্ষুদ্র দলের আদেশগুলোকে লিপিবন্ধ করে রাখা। ত্রুটিবহুল এবং কর্মাক্ষম একটি নির্বাচন-ব্যবস্থার দ্বারা সে শাসকমণ্ডলী নির্বাচিত।"

উনবিংশ শতাব্দীতে যে গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টের জন্ম হয়েছিল, এখন সর্বত্রই তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। অনেক দেশে একে খোলাখুলি এবং বেশ রূঢ়ভাবেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে; অনেক দেশে আবার এর সত্যকার তাৎপর্যটাই শুধু গেছে অন্তর্হিত হয়ে, সেখানে এটা একটা "গম্ভীর এবং শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠান" মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। পার্লামেন্টের এই অবনতি, একজন ঐতিহাসিক একে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের যে অবনতি ঘটেছিল তারই সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইনি বলেন, ইংলন্ডের এবং অন্যান্য দেশের রাজারা প্রকৃত ক্ষমতা হারিয়ে প্রজাধীন রাজায় পরিণত হয়েছেন, শুধু খানিকটা লোক-দেখানো ব্যাপার হিসাবেই এখনও টিকে আছেন; ঠিক এদেরই মতো পার্লামেন্টও একদিন শক্তিহীন এবং মর্যাদাশালী প্রতীকমাত্রে পরিণত হবে, সেদিন বাইরে থেকেই তাকে দেখতে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু তার মধ্যে বস্তু কিছুই থাকবে না। সে অবনতি তার ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে।

কিন্তু এটা হল কেন? পুরো একটা শতাব্দী, বা তার চেয়েও বেশিকাল ধরে গণতন্ত্র অসংখ্য মানুষের জীবনের আদর্শ হয়ে রয়েছে, তাদের প্রেরণা জুগিয়েছে; হাজার হাজার মানুষ এরই জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে; আজ কেন সে গণতন্ত্র এমন অনাদরের বস্তু হয়ে উঠল? এত-বড়ো একটা পরিবর্তন তো বিনা কারণে ঘটে না; শুধু চঞ্চলমতি জনসাধারণের সাময়িক হুজুগ বা খেয়ালের জন্য এটা নিশ্চয়ই হয় নি। এখনকার দিনে আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যেই এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যেটা উনবিংশ শতাব্দীর সেই নিয়মানুগ গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু জটিল। এর বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়; তবু দুটো একটা কথা তোমাকে বলছি।

গণতন্ত্রকে আমি 'নিয়মানুগ' বলেছি। কমিউনিস্টরা বলেন, এই গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নয়; এটা শুধু একটা গণতন্ত্রবেশী খোলস, একটি শ্রেণী অন্যদের উপরে প্রভুত্ব করছে এই তত্ত্বটি এর আবরণে লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁরা বলেন, ধনিকশ্রেণীর যে ডিক্‌টেটরি শাসন সমাজে চলছিল তাকেই এই গণতন্ত্র দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছিল। বস্তুত এটা ছিল ধনতন্ত্র, বড়ো লোকদের শাসন। জন-সাধারণকে যে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে ঢাকঢোল অনেক পেটা হয়েছে; আসলে তার দ্বারা জনসাধারণকে চার বা পাঁচবছরে একবার মতপ্রকাশ করবার অনুমতি দেওয়া হত—বলো, 'ক' নামক ব্যক্তিটি তোমাদের শাসন এবং শোষণ করবেন, না 'খ' নামক ব্যক্তিটি করবেন। কিন্তু নাম যারই উঠুক, শাসক শ্রেণীর হাতে জনসাধারণের শোষণটা ঠিকই চলবে। সত্যকার গণতন্ত্র আসতে পারে শুধু তখনই, যখন এই ধরনের শ্রেণীবিশেষের শাসন এবং শোষণ অন্তর্হিত হয়ে যাবে, একটিমাত্র শ্রেণী পৃথিবীতে থাকবে। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যদি করতে চাই, তবে তার আগে কিছুকালের জন্য 'সর্বহারা জনগণের একাধিনায়কতন্ত্রী' শাসন চলতেই হবে, যেন প্রজাদের মধ্যে যেসব ধনিকতন্ত্রী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক আছে তারা মাথা তুলতে না পারে, শ্রমিকদের শাসিত সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বিস্তার করতে না পারে। এই এক-নায়কতন্ত্রেরই প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে সোভিয়েটগুলিতে—সমস্ত শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য 'কর্মী' ব্যক্তিদের প্রতিনিধি দিয়েই সে সোভিয়েটগুলি গড়া। তাই এই শাসন হচ্ছে দেশের লোকের শতকরা ৯০ বা ৯৫ জনের ডিক্‌টেটরি শাসন, বাকি শতকরা ৫ বা ১০ জনের উপরে। এই গেল এদের নীতির কথা। কার্যত দেখা যাচ্ছে, কমিউনিস্ট দল সোভিয়েটগুলোকে চালাচ্ছে, দলটাকে চালাচ্ছে কমিউনিস্টদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মাতব্বর। আর সেন্সর-ব্যবস্থা, চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা যদি বল, সেখানে এদের ডিক্‌টেটরি শাসন অন্য যে-কোনো ডিক্‌টেটরির মতোই কঠোর। তবুও এই শাসন শ্রমিকদের সদিচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, অতএব শ্রমিকদের ভালোর দিকে একে তাকাতেই হচ্ছে। শেষ কথা, এখানে শ্রমিককে, বা এক শ্রেণীর ভালোর জন্য অন্য শ্রেণীকে, শোষণ করার কোনো ব্যাপার নেই, শোষক শ্রেণী বলে কাউকে অবশিষ্টই রাখা হয় নি। শোষণ যদি এর কোথাও থাকেই, তবে সে শোষণ করছে রাষ্ট্র স্বয়ং,

সকলেরই ভালোর জন্য। একথা মনে রেখো, রাশিয়াতে কোনোদিনই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৯১৭ সনে সে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র থেকেই এক লাফে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর রাজ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

ফ্যাসিস্টদের কথা এর একেবারে উল্‌টো। আগের চিঠিতেই বলেছি, ফ্যাসিস্টদের নীতিটা কী তা বোঝা শক্ত; তার কারণ, নির্দিষ্ট নীতি কিছু তাদের আছে বলেই মনে হয় না। গণতন্ত্রের তারা বিরোধী তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কমিউনিস্টরা যে কারণে গণতন্ত্রে আপত্তি করে এদের কারণ তা নয়। কমিউনিস্টরা বলে, এই গণতন্ত্র সত্যকার জিনিস নয়, তার একটা ভানমাত্র। গণতন্ত্রের গোড়ায় যে মূল নীতিটা আছে তার সম্বন্ধেই ফ্যাসিস্টদের আপত্তি যেটুকু জোর তাদের গলায় আছে সবখানি দিয়ে তারা গণতন্ত্রকে গালাগালি দেয়। মুসোলিনি একে বলেছেন একটা "গলিত মৃতদেহ"! ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামও ফ্যাসিস্টরা সবাই অপছন্দ করে। তাদের মতে রাষ্ট্রই হচ্ছে সব; ব্যক্তির কোন দামই নেই। (ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কমিউনিস্টরাও বিশেষ মূল্যবান বস্তু বলে মনে করে না)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক উদারনীতির বার্তা বহন করে এনেছিলেন ঋষি ম্যাট্‌সিনি; আজ তাঁরই স্বদেশবাসী মুসোলিনিকে দেখলে সে বেচারী কী বলতেন কে জানে!

কেবল কমিউনিস্ট আর ফ্যাসিস্টরা নয়, বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খলা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করে দেখেছেন, এমন আরও অনেকেই এখন ক্ষুব্ধ; আগের দিনের কথা ছিল লোককে একটা ভোট দেবার অধিকার দাও, তাহলেই গণতন্ত্র হয়ে গেল—এটা এ'রা আর মানতে চাইছেন না। গণতন্ত্রের মানেই হচ্ছে সাম্য; সমাজের মধ্যে সকলে সমান হলে তবেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এটা এখন সবাই বুঝেছে, শুধু প্রত্যেকটা লোককে ভোট দেবার অধিকার দিয়ে দিলেই সমাজে সাম্যের সৃষ্টি হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে, আরও কত কি হয়েছে, তবু তো আজও মানুষে মানুষে প্রচণ্ড বৈষম্য দেখা যাচ্ছে! কাজেই গণতন্ত্রকে যদি সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে সেই সাম্য-প্রধান সমাজ আগে সৃষ্টি করতেই হবে। এই যুক্তি ধ'রে এ'রা অন্য বহু রকমের আদর্শ এবং কর্মপন্থা স্থির করেছেন। মত অনেক, পথও অনেক—কিন্তু একটি ব্যাপারে এ'রা সকলেই একমত: এখনকার দিনে যে পার্লামেণ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো দিয়ে কোনো কাজই হবে না।

ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক, দেখি এই বস্তুটা কী, তার হদিশ মেলে কি না। হিংসাবৃত্তিকে এরা গৌরবের বলে মনে করে, শান্তিকামীদের ঘৃণা করে। 'এনসাইক্লো-পিডিয়া ইটালিয়ানা'তে মুসোলিনি লিখেছেন :

"চিরস্থায়ী শান্তির প্রয়োজন বা উপকারিতা আছে বলে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বিশ্বাস করে না। অতএব যুদ্ধবিরোধিতাকে সে অন্যায় বলে মনে করে; কারণ তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সংগ্রাম করতে অস্বীকৃতি এবং একটা মূলগত কাপুরুষতা—আত্মবলির যেখানে প্রয়োজন সেইখানে কাপুরুষতা প্রদর্শন। যুদ্ধ, একমাত্র যুদ্ধই, মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টাকে তার চরম শিখরে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে; সে যুদ্ধকে স্বীকার করে নেবার সাহস যাদের আছে তাদের কপালে সে গৌরবের টীকা পরিয়ে দেয়। অন্য যে-সব পরীক্ষা মানুষের জীবনে আসে সেগুলো এরই লঘুতর বিকল্প মাত্র; জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বাছাই করে নেবার অগ্নিপরীক্ষায় তারা মানুষকে ফেলে না।"

ফ্যাসিজ্‌ম্‌ জাতীয়তাবাদের উগ্র উপাসক; কমিউনিজ্‌ম্‌ আন্তর্জাতিক ঐক্যে বিশ্বাসী। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বাস্তবিকই আন্তর্জাতিকতার বিরোধী। রাষ্ট্রকে সে বসিয়েছে দেবতার আসনে, সে দেবতার পূজাবেদীর সামনে ব্যক্তির সমস্ত স্বাধীনতাকে এবং অধিকারকে বলি দিতেই হবে—রাষ্ট্রের বাইরে আর যত দেশ আছে সকলেই তার পক্ষে বিদেশী, প্রায় শত্রুরই শামিল। ইহুদিদের এরা বিদেশী বলেই জানে, অতএব তাদের উপর সাধারণত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। ফ্যাসিস্টরা কতকগুলো ধনিকতন্ত্র-বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণ করে, কতকগুলো বিপ্লবী-সুলভ রীতিনীতিও তাদের আছে; তবু মূলত তারা বিত্তশালী মালিকশ্রেণী এবং প্রগতিবিরোধীদেরই মিত্র।

ফ্যাসিজ্‌মের এগুলো অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ। দর্শন বলে কিছু যদি এর মধ্যে থাকেও, তাকে ধরা-ছোঁয়া একটা দুরূহ ব্যাপার। আমরা দেখেছি, ফ্যাসিজ্‌মের উৎপত্তি হয়েছিল নিছক প্রভুত্বের কামনা থেকে তারপর সিদ্ধি যখন মিলল, তখন একে অবলম্বন করে একটা নিজস্ব দর্শন খাড়া করবার চেষ্টা হল। সবসুদ্ধ সে দর্শনটা কতখানি প্যাঁচালো তার খানিকটা নমুনা তোমাকে দেখাবার এবং তোমাকে একটু ধাঁধা লাগিয়ে দেবার জন্যই, ফ্যাসিস্টদের একজন বড়ো দার্শনিকের লেখা থেকে খানিকটা জায়গা তোমাকে শোনাব। এঁর নাম গিওভান্নি জেণ্টিলে; এঁকে ফ্যাসিস্ট-দর্শনের সরকারি বিশেষজ্ঞ বলা হয়। ফ্যাসিস্ট সরকারে ইনি মন্ত্রীর পদেও এককালে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জেণ্টিলে বলেন, গণতন্ত্রে যেমন হয় সেভাবে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত সত্তার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা মানুষের করা উচিত নয়; ফ্যাসিজ্‌মের মত হচ্ছে, সেটা তাদের করতে হবে জগতের আত্ম-চেতনাস্বরূপ সেই জ্ঞানাতীত অহং-এর মধ্য দিয়ে (এর মানে যাই হোক না—তার অর্থ বোঝা আমার সাধ্যাতীত)। এই মতবাদের মধ্যে মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বের কোনোই স্থান নেই; কারণ এদের মতে ব্যক্তির প্রকৃত সত্তা এবং স্বাধীনতা হচ্ছে সেইটাই, যা সে অর্জন করবে অন্য একটা বস্তুর মধ্যে—মানে রাষ্ট্রের মধ্যে—নিজেকে অবলুপ্ত করে দিয়ে।

"পরিবার, রাষ্ট্র এবং আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত এবং প্রত্যাহৃত হবার ফলে আমার ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হবে না, বরং উন্নীত হবে, শক্তিশালী হবে, বৃহত্তর হবে।"

আরেক জায়গায় জেণ্টিলে বলছেন :

"সকল বলই নৈতিক বল, কারণ ইচ্ছাকে সে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি রাখে—যুক্তিহিসাবে সে উপদেশ বা ডাণ্ডা, যাই প্রয়োগ করুক না কেন।"

অতএব এবার বুঝতে পারছি, ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ সরকার একটা লাঠি-চার্জ চালায়, কী বিপুল পরিমাণ নৈতিক বলেরই প্রয়োগ করা হয় সেখানে!

আসলে এর সবটাই হচ্ছে, যে ব্যাপার ঘটে গেছে, পরে ধীরেসুস্থে সে তার একটা ব্যাখ্যা বা সাফাই খাড়া করবার চেষ্টা। অনেকে আবার বলেন, ফ্যাসিজ্‌মের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি "সমবায় রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করা। সে রাষ্ট্রে বোধহয় সকলেই একত্র হয়ে সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইতালিতে বা আর কোথাও সেরকম রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। ধনিকতন্ত্র অন্যান্য ধনিকতন্ত্রী দেশে যেভাবে চলে থাকে ইতালিতেও প্রায় সেই একই ভাবে চলছে।

ফ্যাসিজ্‌ম্ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, অতএব এটা এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটা ইতালিরই কোনো নিজস্ব বিশেষত্ব নয়; বিশেষ কতকগুলো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা দেশে প্রবল থাকলেই সেখানে এর আবির্ভাব হতে পারে। শ্রমিকরা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, ধনিকতন্ত্রী রাষ্ট্রকে বস্তুত ভেঙে দেবার উপক্রম করে, স্বভাবতই তখন ধনিকতন্ত্রী শ্রেণীও নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করে। শ্রমিকদের তরফ থেকে এই শাসানি সাধারণত আসে প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের সময়ে। মালিক এবং শাসক শ্রেণী সাধারণ গণতান্ত্রিক রীতিতে অর্থাৎ পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে তাদের সে বিদ্রোহ দমন করতে চেষ্টা করে—এদের দিয়েও যখন কাজ হয় না তখনই সে আশ্রয় নেয় ফ্যাসিস্ট রীতির। সে রীতিটি হচ্ছে : জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলন শুরু করা হয়, এমন কতকগুলো ধ্বনির আমদানি করা হয় যা জনতার পক্ষে শ্রুতি-রোচক; কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য থাকে বিত্তশালী ধনিকশ্রেণীকে রক্ষা করা। এই আন্দোলনের শক্তির যোগান প্রধানত আসে নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে; তাদের অধিকাংশ লোকই বেকার-সমস্যার দ্বারা পীড়িত, ক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক চেতনা-বিহীন এবং অসংহত শ্রমিক এবং কৃষক যারা আছে তাদেরও মধ্যে অনেকে এর দিকে আকৃষ্ট হয়—বড়ো বড়ো ধ্বনি শুনে তারা মুগ্ধ হয়, এবার তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে এই আশায় তারা প্রলুব্ধ হয়। বৃহত্তর বুর্জোয়াদের এই আন্দোলনে লাভের আশা আছে, অতএব তারা একে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। এই আন্দোলন হিংসাবৃত্তিকে তার নীতি বলে গ্রহণ করে, দৈনন্দিন আচরণে পরিণত করে; তবু দেশের ধনিকতন্ত্রী সরকার একে অনেকখানিই ক্ষমা করে চলে, কারণ এই আন্দোলন উভয়েরই শত্রুপক্ষের

সঙ্গে লড়াই করছে,—সে শত্রুপক্ষ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদল। দল হিসাবেই, এবং দেশের শাসনকর্তৃত্ব যদি এদের অধিকারে আসে তবে আরও বেশি করেই এরা শ্রমিকদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে-চুরে দেয়, সমস্ত বিপক্ষ দলকে ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে রাখে।

অতএব ফ্যাসিজ্‌মের জন্ম হয় তখনই, যখন অগ্রসারী সমাজতন্ত্রবাদ আর শত্রুবেষ্টিত ধনিকতন্ত্রবাদের মধ্যে সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র এবং মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সমাজের মধ্যেকার এই সংগ্রামের সৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণা থেকে হয় না; আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যেই যে-সব স্বার্থের বিভেদ এবং বিরোধ নিহিত রয়েছে, তাকে ভালো করে বোঝাবার ফলেই এর সৃষ্টি। কেবল অবজ্ঞা করে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলা যায় না। বর্তমান অবস্থা যে লোকদের পক্ষে দুর্দশার কারণ, তারা স্বার্থের বিভেদটাকে যত ভালো করে বুঝতে পারে, যেটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য বলে তাদের ধারণা সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে তাদের আপত্তিও ততই বেড়ে ওঠে। মালিক শ্রেণীরও যেটাকে হাতে পেয়ে গেছে তাকে ছেড়ে দেবার কোনো অভিপ্রায় নেই, অতএব সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ধনিকতন্ত্রীরা যতদিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানদের সাহায্যে শাসন-ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্ত করে রাখতে এবং শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখতে পারছে, ততদিন গণতন্ত্রকেও তারা জীইয়ে রাখে। সেটা যখন আর সম্ভব হয় না, তখন ধনিকতন্ত্রীরা গণতন্ত্রকে অকেজো বলে পরিত্যাগ করে, অনাবৃত ফ্যাসিস্ট নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে—তার অস্ত্র পীড়ন এবং ত্রাসসৃষ্টি।

বোধহয় একমাত্র রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর সমস্ত দেশেই বিভিন্ন পরিমাণে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বর্তমান রয়েছে। এর সবচেয়ে শেষ বিজয়-অভিযান দেখা গেল জর্মনিতে। ইংলণ্ডে পর্যন্ত শাসক শ্রেণীদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করছে; ভারতবর্ষে হামেশাই তার প্রয়োগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধনিকতন্ত্রের শেষ অবলম্বন এই ফ্যাসিজ্‌ম্‌; জগতের রঙ্গমঞ্চে সে আজ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিজ্‌মের।

কিন্তু এর অন্য সব কথা যদি ছেড়েই দিই, যে অর্থনৈতিক দুর্গতি আজ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তার অবসান ঘটাবার কোনো আশ্বাসবাক্যও ফ্যাসিজ্‌মের মধ্যে নেই। জগতের গতি এখন পরস্পর-নির্ভরতার দিকে; ফ্যাসিজ্‌ম্‌ তার নিবিড় জাতীয়তাবাদ নিয়ে ঠিক তার বিপরীত মুখে চলেছে। ধনিকতন্ত্রের ক্রমান্বতি ক্ষয়ের ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, ফ্যাসিজ্‌ম্‌ তাকে আরও তীব্র করে তুলছে। উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় সে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষকেই বাড়িয়ে তুলছে, তার থেকেই অনেক সময় সৃষ্টি হচ্ছে যুদ্ধের।

১৭৭

চীনে বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব

২৬শে জুন, ১৯৩৩

ইউরোপ আর তার ঝগড়াঝাঁটির কথা ছেড়ে চলো এবার আরেক দেশে যাই; সেখানে অশান্তি এর চেয়েও বেশি—সে হচ্ছে দূরপ্রাচ্য, চীন এবং জাপান। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আমি বলেছি, চীনের নবজাত প্রজাতন্ত্রকে কী বিষম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। চীনের সভ্যতা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ সভ্যতা; তার কাঁধের উপরে এই আধুনিক প্রজাতন্ত্রকে বসানো হল, যেন এক গাছের উপরে আরেক গাছের কলমের চারা। দেশটার তখন এমন অবস্থা, সে যেন ভেঙে শতখান হয়ে যাবে। টুচুন ও মহা-টুচুন ইত্যাদি নীতিজ্ঞানবর্জিত সেনানায়করা দেশে প্রবল হয়ে উঠছে; বহুক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ এবং সাহায্য জোগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা—চীনকে দুর্বল এবং আত্মকলহে বিভক্ত করে রাখতে পারলেই

তাদের লাভ। এই টুচুনদের নীতি বলে কোনো বালাই ছিল না; এদের প্রত্যেকেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি। দেশের মধ্যে ছোটোখাটো গৃহযুদ্ধ সারাক্ষণই চলছিল, সে যুদ্ধে এরা ক্রমাগতই একবার এপক্ষ একবার ওপক্ষকে আশ্রয় করত। গরিব চাষিদের উপরে জুলুম করে এরা নিজেদের এবং নিজেদের সেনাবাহিনীর জীবিকার সংস্থান করে নিত। চীনের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জীবন ধরে সংগ্রাম করে গেলেন ডক্টর সুনইয়াৎ-সেন; দক্ষিণ-চীনের ক্যান্টন শহরে তিনি যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন তার কথাও তোমাকে বলেছি।

দেশজুড়ে তখন চলেছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রাধান্য; সাংহাই, হংকঙ প্রভৃতি বড়ো বড়ো বন্দর-শহরে এরা জুড়ে বসেছে, সেখান থেকে চীনের সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্যটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ডক্টর সুন সত্যই বলেছিলেন, চীন হয়েছে এই বিদেশীদের অর্থনৈতিক উপনিবেশ। একজন মনিবের অধীন হয়ে থাকাই বিশ্রী ব্যাপার; একসঙ্গে বহু মনিব জুটলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। শিল্পপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে দেশটার উন্নতিবিধান এবং দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন করবার জন্য ডক্টর সুন বিদেশীর কাছ থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টা করলেন। বিশেষ করে তাঁর ভরসা ছিল আমেরিকা আর ব্রিটেনের উপর। কিন্তু এরা কেউই তাঁকে সাহায্য করল না, অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশও করল না। তাদের সকলেই চাইছে চীনকে শোষণ করতে, তার মঙ্গল-বিধান বা শক্তি বৃদ্ধিতে তাদের স্বার্থ নেই। দেখেশুনে ১৯২৪ সনে ডক্টর সুন সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

চীনের ছাত্রসম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের মধ্যে কমিউনিজ্‌ম্‌ গোপনে এবং দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৯২০ সনে একটি কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়েছিল; কোনো সরকারই তাকে প্রকাশ্যভাবে কাজ করতে দিতে রাজি নয় অতএব গুপ্ত-সমিতি হিসাবেই সে কাজকর্ম চালাচ্ছিল। ডক্টর সুন মোটেই কমিউনিস্ট ছিলেন না; তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদে মৃদু-বিশ্বাসী—তাঁর বিখ্যাত বই "জনগণের তিনটি নীতি" থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশদের প্রতি সোভিয়েট সরকার যে উদার এবং সরল আচরণ করছিলেন তাই দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন, এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। কয়েকজন রুশ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন তিনি; এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন একজন অত্যন্ত কর্মদক্ষ বলশেভিক, তাঁর নাম বোরোদিন। বোরোদিনকে পেয়ে ক্যান্টনের কুওমিন্‌টাঙের অনেকখানি শক্তি বাড়ল; তিনি জনসাধারণের সমর্থনের সাহায্যে একটা শক্তিশালী জাতীয় দল সংগঠন করবার চেষ্টা করলেন। আগাগোড়া শুধু কমিউনিস্ট নীতি ধরেই কাজ করতে চেষ্ট করেন নি তিনি। দলের মূলগত জাতীয়তাবাদকে তিনি অক্ষুন্ন রাখলেন, তবে এখন কমিউনিস্টরাও কুওমিন্‌টাঙের সভ্য বলে গণ্য হতে পারল। জাতীয়তাবাদী কুওমিন্‌টাঙ আর কমিউনিস্ট দলের মধ্যে এইভাবে একটা বেসরকারি মৈত্রী গোছের ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। কুওমিন্‌টাঙের রক্ষণপন্থী এবং ধনী সভ্যদের মধ্যে অনেকে, বিশেষ করে ভূস্বামীরা, কমিউনিস্টদের সঙ্গে এই মেলামেশাটা পছন্দ করতেন না। ওদিকে আবার কমিউনিস্টদেরও মধ্যে অনেকের এটা পছন্দ নয়, কারণ এতে তাঁদের কর্মসূচীর প্রাখর্য কমিয়ে আনা হচ্ছে, অন্যথায় যা তাঁরা করতে চাইতেন এমন অনেক কাজ এর দরুন তাঁরা করতে পারছেন না। অতএব এই মৈত্রীর বাঁধন বিশেষ শক্ত হল না; পরে একটা অত্যন্ত সংকট-মুহূর্তের মাঝখানে এই মৈত্রী ভেঙে গেল, এবং তার ফলে চীনের একেবারে সর্বনাশ উপস্থিত হল—সেটা আমরা পরে দেখব। যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এমন দুটি বা আরও বেশি শ্রেণীকে একই দলের মধ্যে একত্র ধরে রাখা সর্বত্রই কঠিন ব্যাপার। তবু এদের এই মৈত্রী যে-কদিন টিকে রইল ততদিন এর চমৎকার সমৃদ্ধি দেখা গেল, কুওমিন্‌টাঙ এবং ক্যান্টন-সরকারেরও শক্তি অনেক বেড়ে গেল। প্রজাদের সংগঠন গড়তে উৎসাহ দেওয়া হল, দেশে দ্রুতগতিতে বহু সংগঠন গড়ে উঠল; শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নও অনেক তৈরি হল। জনসাধারণের এই সমর্থন পেয়ে ক্যান্টনের কুওমিন্‌টাঙ সত্যকার শক্তি সঞ্চয় করল, আবার একে দেখেই ভূস্বামী নেতারা ভয় পেয়ে চুপ করে রইলেন, আরও কিছুকাল পরে এই ভয়েই তাঁরা দলটাকে ভেঙে দিলেন।

চীনের অবস্থা অনেক দিক দিয়েই ভারতবর্ষের অনুরূপ; অবশ্য দুই দেশের মধ্যে মূলত বহু প্রভেদও রয়েছে। চীন স্বভাবত কৃষিপ্রধান দেশ, অসংখ্য কৃষকের বাসভূমি। ধনিকতন্ত্রী শিল্প-কারখানা যাও আছে সে প্রধানত গোটা পাঁচ-ছয় বড়ো বড়ো শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার কর্তৃত্বও রয়েছে বিদেশীদের হাতে। দেশের কোটি কোটি কৃষক আর প্রজা বিপুল-পরিমাণ ঋণের চাপে একেবারে পিষে মারা যাচ্ছে। জমির খাজনার হার অত্যন্ত বেশি; এবং ভারতবর্ষেরই মতো চীনেও বছরের একটা দীর্ঘ সময় চাষিদের বাধ্য হয়েই অলস হয়ে বসে থাকতে হয়, কারণ তখন মাঠে তাদের করবার কাজ কিছু থাকে না। অতএব এই সময়টাকে কাজে লাগাবার এবং আয় বাড়াবার জন্য তাদের পক্ষে কুটির-শিল্প অত্যন্ত দরকার। এখন অবশ্য বহু কুটির-শিল্প দেশে গড়ে উঠেছে। বড়ো মহালের সংখ্যা অতি অল্প। বড়ো মহাল যেখানে-বা কেউ একটা গড়ে তোলে, দুদিন না যেতেই সেটা বহু উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কৃষকদের মধ্যে প্রায় আধাআধি লোকের নিজস্ব ক্ষেত-খামার আছে, বাকি অর্ধেক লোক ভূস্বামীদের অধীনে চাকরি করে। চীনদেশ তাই অসংখ্য ছোটো ছোটো ক্ষেত-খামারে ভরা। চীনের কৃষকদের খ্যাতি আছে, তারা জমি থেকে যথাসম্ভব বেশি ফসল আদায় করে নিতে জানে—এই খ্যাতি বহু শত বৎসর ধরে চলে এসেছে। প্রত্যেকের যেটুকু জমি আছে তার পরিমাণ অতি সামান্য, কাজেই বাধ্য হয়েই চিরদিন এদের সে জমি থেকে যথাসম্ভব বেশি ফসল তোলবার চেষ্টা করতে হয়েছে; অতএব তারা আশ্চর্য উদ্ভাবনী-বুদ্ধির পরিচয় দিত, খাটতও একেবারে নিদারুণ রকম। আধুনিক যুগে কৃষিকর্মে মানুষের শ্রম লাঘব করবার যে-সব কল-কায়দা ব্যবহার করা হয় সে-সব কিছুই তাদের ছিল না; এই জন্যই তাদের ফলের অনুপাতে যতটুকু খাটা দরকার তার চেয়েও অনেক বেশি খাটতে হত।

তবু এতখানি বুদ্ধি, এতখানি কঠিন পরিশ্রম খাটিয়েও তাদের প্রায় অর্ধেক লোকের ঠিকমতো গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হত না। ভারতবর্ষের অসংখ্য কৃষকের মতোই তাদেরও জীবন অনশনে অর্ধাশনে কেটে যেত, সে জীবন হ্রস্ব এবং বিকাশের সুযোগের অভাবে পঙ্গু। চরম দুর্গতিকে একেবারে সামনে নিয়ে এদের দিন কাটত; তার উপরে আবার আসত নানাবিধ দুর্বিপাক—আসত দুর্ভিক্ষ, আসত বন্যা, তার আঘাতে লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেত। বোরোদিনের উপদেশক্রমে ডক্টর সুন-এর প্রতিষ্ঠিত সরকার কৃষক এবং শ্রমিকদের রক্ষাকল্পে বহু নির্দেশ জারি করলেন। জমির খাজানা শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হল; শ্রমিকদের খাটুনির সময় আটঘণ্টার অনধিক বলে স্থির করা হল, বেতনের একটা সর্বনিম্ন হারও বেঁধে দেওয়া হল, কৃষকদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হল। জনসাধারণ এই-সব সংস্কার প্রচেষ্টা দেখে স্বভাবতই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়ে উঠল। দলে দলে তারা এই নূতন ইউনিয়নগুলিতে গিয়ে যোগ দিল, ক্যাণ্টন সরকারের সমর্থন করতে লাগল।

এইভাবে ক্যাণ্টন সরকার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিলেন, তারপর উত্তর-অঞ্চলের টুচুনদের সঙ্গে একটা লড়াই করবার জন্য তৈরি হলেন। একটি সামরিক বিদ্যালয় খোলা হল, দেশে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হল। শুধু ক্যাণ্টনে নয়, চীনের সর্বত্রই, এবং কিছু-পরিমাণে সমস্ত প্রাচ্য-জগতেই, তখন একটা নূতন বস্তুর আবির্ভাব হচ্ছিল; সেটি হচ্ছে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের গৌরব কমে গিয়ে তার জায়গাতে পার্থিব-প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। ধর্ম কথাটার যে সংকীর্ণ অর্থ আমরা জানি, সে অর্থে অবশ্য চীন কোনোদিনই খুব ধর্মপ্রাণ দেশ ছিল না। এবার সে আরও বেশি করে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠল। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারটা ধর্ম-প্রধান ছিল, সেটাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হল। প্রাচীনকালের বহু মন্দিরকে এখন যে-সব কাজে লাগানো হচ্ছে, তাই থেকেই এই ব্যাপারটার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্যাণ্টনে প্রাচীন-কালের একটি প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ছিল, এখন সে মন্দিরকে একটা পুলিশদের শিক্ষায়তন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে! আরেক জায়গাতে কতকগুলো মন্দিরকে পরিণত করা হয়েছে শাক-সব্জী বেচবার দোকানে।

১৯২৫ সনের মার্চ মাসে ডক্টর সুন ইয়াৎ-সেন মারা গেলেন। কিন্তু ক্যাণ্টন-সরকার

চীন বিপ্লব

মঙ্গোলিয়া
গোবি মরুভূমি
মাঞ্চুরিয়া
পিকিং
কোরিয়া
চ্যাঙ সো লিন
পীতনদ
কিয়াওচাও
চীন
নানকিং
সাংহাই
হ্যাংকাও
ইয়াংসি
চুংকিং
কুয়োমিন্-টাঙ
ফুচাও
ক্যান্টন
হংকং
ক্যান্টন জাতীয় সরকার

তখনও শক্তি সঞ্চয় করে চলছেন, বোরোদিন তাঁদের উপদেষ্টা। এর অল্পদিন পরেই এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল, যার ফলে চীনের জনসাধারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের উপরে, বিশেষ করে ব্রিটিশদের উপরে, রাগে জ্বলে উঠল। সাংহাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে ধর্মঘট হল; ১৯২৫ সনের মে মাসে একটা শোভাযাত্রা উপলক্ষে একজন শ্রমিক মারা পড়ল। তার নাম করে একটা প্রকাণ্ড স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন করা হল; তাকেই উপলক্ষ্য করে ছাত্ররা এবং শ্রমিকরা একটা সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী শোভাযাত্রা বার করল। একজন ব্রিটিশ পুলিশ-কর্মচারী তাঁর অধীনস্থ শিখ পুলিশ-বাহিনীকে এই জনতার উপর গুলি চালাবার হুকুম দিলেন—আদেশটা ছিল "প্রাণবধ করবার মতো করে গুলি ছোঁড়ো"। কয়েকজন ছাত্র গুলিতে মারা পড়ল। চীনের সর্বত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। এর পর আরেকটা ব্যাপারে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, এই ব্যাপারটা ঘটে ১৯২৫ সনের জুন মাসে, ক্যাণ্টনের বিদেশী এলাকাতে (এটা শামীন এলাকা বলে পরিচিত)। সেখানে চীনাদের একটি জনতার উপরে—তার বেশির ভাগই ছিল ছাত্র—মেশিন-গান চালানো হল; বায়ান্ন জন মারা গেল, আরও বহু লোক আহত হল। এই ঘটনাটির নাম দেওয়া হল "শামীনের হত্যাকাণ্ড"—ব্রিটিশদেরই এর জন্য প্রধানত দায়ী করা হল। ক্যাণ্টনে ঘোষণা করা হল, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করো। বহু মাস ধরে হংকঙ-এর সঙ্গে যত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত সমস্ত বন্ধ হয়ে রইল; ব্রিটিশ কারবারগুলির এবং ব্রিটিশ সরকারের নিদারুণ ক্ষতি হল তাতে। বোধ হয় জান, হংকঙ হচ্ছে ব্রিটিশদের অধিকৃত দক্ষিণ-চীনের একটি শহর। জায়গাটা ক্যাণ্টনের খুব কাছেই; এর মারফৎ বিপুল পরিমাণ ব্যবসাবাণিজ্য চলে থাকে।

ডক্টর সুনের মৃত্যুর পর ক্যাণ্টন সরকারের রক্ষণশীল দক্ষিণ-পন্থী আর প্রগতিকামী বামপন্থী দলের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগল। শাসনক্ষমতাও একবার এদের একবার ওদের হাতে যেতে লাগল। ১৯২৬ সনের মাঝামাঝি সময়ে চিয়াং কাই-শেক নামে একজন দক্ষিণপন্থী ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি হলেন; কমিউনিস্টদের তিনি সরকার থেকে ঠেলে বার করতে আরম্ভ করলেন। তখনও কিন্তু দুই দল কতকটা একত্রই কাজ করে যাচ্ছে, যদিও পরস্পরকে তারা মোটেই বিশ্বাস করছে না। এর পরে শুরু হল ক্যাণ্টনের সেনাবাহিনীর উত্তর-অঞ্চলে অভিযান; সেখানকার সমস্ত টুচুনদের তারা যুদ্ধ করে বিতাড়িত করবে, সমগ্র চীন জুড়ে একটিমাত্র জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে, এই তাদের সংকল্প। উত্তর-অঞ্চলে এদের এই অভিযান একটা আশ্চর্য ব্যাপার; দুদিন না যেতেই সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এর দিকে আকৃষ্ট হল। যুদ্ধ বস্তুত বিশেষ হলই না; দক্ষিণী সেনা অতি দ্রুত গতিতে একটার পর একটা জয়লাভ করে এগিয়ে চলল। উত্তর-অঞ্চলে অবশ্য সংহতি বলে কিছু ছিল না। কিন্তু দক্ষিণী-সরকারের শক্তির প্রকৃত উৎস ছিল কৃষক এবং প্রজাদের প্রীতি। সেনাবাহিনীর আগে আগে চলত একটি প্রচারক এবং আন্দোলনকারীর দল, এরা কৃষক এবং শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়তে গড়তে পথ চলত, তাদের বোঝাত, ক্যাণ্টন সরকারের অধীনে এলে তারা কতখানি সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। অতএব যে শহরে বা গ্রামে গিয়ে সেনাবাহিনী উপস্থিত হত সেইখানেই প্রজারা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিত, যতরকমে পারে তাদের সাহায্য করত। ক্যাণ্টনী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে সৈন্য পাঠানো হত তারা যুদ্ধ প্রায় করতই না, অনেক সময় পোঁটলা-পুঁটলিসুদ্ধ তাদের সঙ্গেই গিয়ে যোগ দিত। ১৯২৬ সন শেষ হবার আগেই জাতীয়তাবাদী বাহিনী অর্ধেক চীন পার হয়ে চলে গেল, ইয়াংসি নদীর তীরে বিশাল শহর হ্যাংকাও দখল করে নিল। ক্যাণ্টন থেকে রাজধানী সরিয়ে তারা হ্যাংকাওয়ে নিয়ে এল, হ্যাংকাও-এর নূতন নামকরণ হল উহান। উত্তর-অঞ্চলের যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সেনানীরা পরাজিত এবং বিতাড়িত হয়েছিল; সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন, নূতন এবং উগ্র-উৎসাহী একটি জাতীয়তাবাদী চীনদেশ তাঁদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে; তাঁদের সঙ্গেই সমান-সমান মর্যাদা দাবি করছে, তাঁদের চোখ-রাঙানি আর মানতে চাইছে না। জেনে তাঁদের দুঃখ-ক্ষোভের অন্ত রইল না।

১৯২৭ সনের প্রথমদিকে চীনাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বিরোধ বাধল, হ্যাংকাওতে ব্রিটিশদের যে ইজারা জমি ছিল, জাতীয়তাবাদীরা সেটা দখল করে নিতে চাইছিল। সাধারণ অবস্থায় চীনারা এরকমের উগ্রভাব দেখালে, তা নিয়ে যুদ্ধ হত, ব্রিটিশ সরকার তাদের সে ঔদ্ধত্যকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিত, ভয় দেখিয়েই তাদের কাছ থেকে আরও কিছু ক্ষতিপূরণ আর ইজারা ইত্যাদি আদায় করে নিত। আমরা দেখেছি, ১৮৪০ সনের সেই আফিম যুদ্ধের পর থেকে এইটাই ছিল সেখানে বাঁধা নিয়ম। কিন্তু দেখা গেল সময় বদলে গেছে, তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক নূতন চীন। অতএব চীনের ইতিহাসে সেই প্রথমবার ব্রিটিশদের নীতিরও পরিবর্তন ঘটল; এবার তারা এই নূতন চীনকে প্রসন্ন রাখবার নীতি গ্রহণ করল। হ্যাংকাও-এর ইজারা নিয়ে যে বিরোধ সেটা ক্ষুদ্র ব্যাপার, তার মীমাংসাও সহজেই করে ফেলা গেল। কিন্তু হ্যাংকাও-এর খুব কাছেই এবং জাতীয়তাবাদী বাহিনী যে পথে এগিয়ে আসছে তার ঠিক পথের উপরেই রয়েছে সাংহাইয়ের বিরাট বন্দর—চীনে বিদেশীদের যত ইজারা আছে তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে দামী। সাংহাইয়ের ভাগ্যের উপরে বিদেশীদের বিপুল পরিমাণ কায়েমী-স্বার্থের ভাগ্য নির্ভর করছে। খোদ শহরটা, মানে তার ইজারা এলাকাটা ছিল বিদেশীদের অধীন, চীনা সরকারের যেখানে বস্তুত কোনো হাতই নেই। জাতীয়তাবাদী সেনা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে দেখে সাংহাইয়ের এই বিদেশীরা এবং তাদের দেশের সরকাররা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল; চারদিক থেকে ছুটোছুটি করে বহু রণতরী আর সৈন্য সাংহাই বন্দরে গিয়ে হাজির হল। বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার একটা খুব বড়ো অভিযানকারী বাহিনী পাঠালেন, তার কতক ছিল ভারতীয় সেনা। ১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসের গোড়াতে এরা সাংহাইতে গিয়ে পেঁছিল।

জাতীয়তাবাদী সরকারের এখন রাজধানী হয়েছে হ্যাংকাও বা উহান; তাঁরা একটা কঠিন সমস্যায় পড়ে গেলেন—এখন কী করা যায়, আরও এগিয়ে যাবেন কি যাবেন না, সাংহাই দখল করবেন কি করবেন না। এতদিন এত সহজে দেশ জয় করে এসে এসে তাঁদের সাহস এবং উৎসাহ বেড়ে গেছে; সাংহাই বন্দরটাও দামী জায়গা, দখল করবার লোভ সামলানো কষ্ট। ওদিকে আবার এতদিন ধরে তাঁরা খালি ক্রমাগত সামনেই এগিয়ে চলেছেন, প্রায় পাঁচশ মাইলেরও বেশি জায়গা দখল করে চলে এসেছেন, কিন্তু সে জায়গাতে নিজেদের অধিকার বা শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করেন নি। সাংহাই আক্রমণ করলে হয়তো বিদেশী শক্তিদের সঙ্গে কলহ বেধে যাবে, এবং তার ফলে যেটুকু এপর্যন্ত জয় করে এসেছেন সেটাও হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। বোরোদিন পরামর্শ দিলেন খুব সাবধানে এগোও, আগে ঘর সামলে নাও। তাঁর মত ছিল, জাতীয়তাবাদীদের এখন উচিত হবে সাংহাই থেকে দূরে সরে থাকা, চীনদেশের দক্ষিণার্ধ ইতিমধ্যেই তাঁদের দখলে এসে গেছে সেখানে নিজেদের আসন দৃঢ় করে নেওয়া, এবং উত্তর-অঞ্চলে প্রচারকার্য চালিয়ে অভিযানের পথ সহজ করে নেওয়া। তাঁর আশা ছিল, এইভাবে চললে অল্পদিনের মধ্যেই, হয়তো বছর খানেকের মধ্যেই, চীনের সর্বত্র অবস্থা তাঁদের অনুকূল হয়ে উঠবে; তার পর যদি জাতীয়তাবাদীরা অভিযান করে, সর্বত্রই তারা খুব সহজে অভ্যর্থনা লাভ করবে। সেইটাই হবে ঠিক সময়—তখন সাংহাই দখল কর, পিকিঙ পর্যন্ত এগিয়ে যাও, এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সামনাসামনি গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। বোরোদিন, বিপ্লবী বোরোদিন, এমনি করে সাবধানে এগোবার পরামর্শ দিলেন; কারণ পরিস্থিতির সকল দিক বিবেচনা করে দেখবার মতো অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। কিন্তু কুওমিন্‌টাঙের দক্ষিণপন্থী নেতারা, এবং বিশেষ করে প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাই-শেক, তাতে রাজি নন—এঁরা জিদ ধরলেন, না, সাংহাই আক্রমণ করতেই হবে। সাংহাই দখল করতে এঁদের এতখানি অধীর আগ্রহ কেন, তার সত্যকার কারণটা বোঝা গেল আরও পরে, যখন কুওমিন্‌টাঙ ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল। কৃষকপ্রজা এবং শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলির শক্তি দিন দিন বেড়ে উঠছিল। এই দক্ষিণপন্থী নেতাদের সেটা পছন্দ হচ্ছিল না। সেনাপতিদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই ছিলেন ভূস্বামী। অতএব এঁরা স্থির করেছিলেন, এই ইউনিয়নগুলোকে ভেঙেচুরে দিতেই হবে, তাতে যদি দল ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায় যাক, জাতীয়তাবাদীদের সংকল্প-সিদ্ধির অন্তরায় ঘটে ঘটুক আপত্তি নেই। সাংহাই ছিল চীনদেশের বড়ো বড়ো বুর্জোয়াদের একটা

প্রধান কেন্দ্র। এই দক্ষিণপন্থী সেনাপতিদের আশা ছিল, দলের মধ্যে যারা অধিকতর অগ্রণী বা উগ্রপন্থী তাদের সঙ্গে, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হলে সে যুদ্ধে এরা টাকা দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁদের সাহায্য করবে। আর সে রকমের যুদ্ধ যদি বাধেই, তখন সাংহাইয়ে যেসব বিদেশী ব্যাঙ্কার আর শিল্পপতি রয়েছে তারাও তাঁদেরই সাহায্য করবে, এটাও তাঁদের জানা ছিল।

অতএব তাঁরা সাংহাই আক্রমণ করলেন। ১৯২৭ সনের ২২শে মার্চ তারিখে শহরের চীনা-অঞ্চল তাঁদের দখলে চলে এল; বিদেশীদের যে-সব ইজারা অঞ্চল ছিল তা তাঁরা আক্রমণ করলেন না। সাংহাই জয় করতেও এ'দের বিশেষ যুদ্ধটুদ্ধ করতে হল না। বিপক্ষদলের সমস্ত সৈন্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেই এসে যোগ দিল; শহরের সমস্ত শ্রমিক জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হয়ে ব্যাপক ধর্মঘট ঘোষণা করল, অতএব সাংহাইয়ে যে সরকার বর্তমান ছিল তার আর লড়াই করবার শক্তিই রইল না। এর দুদিন পরেই বিশাল শহর নানকিংও জাতীয়তাবাদী বাহিনীর দখলে এসে পড়ল। তার পরেই এল কুওমিনটাঙের ভাঙন—কুওমিনটাঙ ভেঙে বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। জাতীয়তাবাদীদের জয়লাভের সেইখানেই ইতি ঘটল, চীনের সর্বনাশ আসন্ন হয়ে উঠল। বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এবার শুরু হল প্রতি-বিপ্লবের পালা।

চিয়াং কাই-শেক সাংহাই আক্রমণ করেছিলেন, হ্যাংকাও সরকারের অনেক সভ্যের মতের বিরুদ্ধে। এই দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লেগে গেল। হ্যাংকাওতে যারা ছিল তারা চেষ্টা করতে লাগল সেনাবাহিনীর উপরে চিয়াঙের যে প্রতিপত্তি আছে তাকে নষ্ট করে দিতে, তা হলেই চিয়াংকে সরিয়ে দেওয়া যায়। চিয়াং এদিকে নানকিংএ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করলেন। এই সমস্ত ব্যাপারই ঘটে গেল সাংহাই জয়ের পর অতি অল্প কয়েকটি মাত্র দিনের মধ্যে। যে হ্যাংকাও সরকারের তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার বিরুদ্ধেই চিয়াং বিদ্রোহ করেছেন; এবার তিনি খোলাখুলিই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন—কমিউনিস্ট, বামপন্থী, ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী, সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। যে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে তাঁর সাংহাই-জয় সহজ করে দিয়েছিল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল, তাদেরই এবার তিনি তাড়া করে করে ধ্বংস করতে লাগলেন। অসংখ্য লোককে গুলি করে মারা হল, বহু লোকের মাথা কেটে ফেলা হল; হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হল। সাংহাইয়ের লোকেরা ভেবেছিল জাতীয়তাবাদীরা তাদের জন্য স্বাধীনতার বাণী বহন করে এনেছে; দুদিন না যেতেই সে স্বাধীনতা পরিণত হল একটা রক্তক্ষয়ী বিভীষিকায়।

এটা ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসের কথা। এই এপ্রিল মাসেই একই দিনে পিকিঙের সোভিয়েট দূতাবাসে আর সাংহাইয়ে যে সোভিয়েট কনসাল ছিলেন তাঁর দপ্তরে চীনারা গিয়ে চড়াও হল। এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল, উত্তর-চীনের সমর-নায়ক চ্যাং সো লিনের সঙ্গে চিয়াং কাই-শেক একযোগে কাজ করছেন; অথচ লোকে জানত তাঁর সঙ্গেই চিয়াং-এর যুদ্ধ চলছে। পিকিঙ এবং সাংহাইয়ের কমিউনিস্ট আর প্রগতিপন্থী শ্রমিকদের একেবারে 'সাফ করে' দেওয়া হল। সাম্রাজ্য-বাদী জাতিরা অবশ্য এই ব্যাপারে খুবই খুশি হয়ে উঠল। তাদের তো খুশি হবারই কথা, কারণ এর ফলে চীনা জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভাঙন ধরল, শক্তি হ্রাস পেয়ে গেল। সাংহাইতে এই বিদেশীদের যে-সব প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে চিয়াং কাই-শেক সহযোগিতা করতে চাইলেন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, এরই কাছাকাছি সময়ে, ১৯২৭ সনের মে মাসে, ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনস্থ সোভিয়েট প্রতিষ্ঠানদের উপরে 'আর্কসের খানাতল্লাসী' চালিয়েছিল, এবং তার পরেই রাশিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল।

এইভাবে, মাত্র একটি কি দুটি মাসের মধ্যে চীনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কুওমিনটাঙ ছিল একটি অখণ্ড জয়দৃপ্ত দল, সমস্ত চীনের প্রতিনিধি, যুদ্ধের পর যুদ্ধ সে অবলীলাক্রমে জয় করে চলেছে, বিদেশীরা পর্যন্ত তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। সে এখন পরিণত হল কতকগুলো ভাঙা-চোরা উপদলে,—তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছে; কুওমিনটাঙের প্রাণ এবং শক্তির উৎস

ছিল যে শ্রমিকরা আর কৃষকরা, তাদেরই সে এখন পীড়ন করছে, তাড়া করে করে বধ করছে। সাংহাইতে যে বিদেশীরা ছিল তারা আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, অতি উদারচিত্তে এক দলকে অন্য দলের সঙ্গে লড়তে সাহায্য করতে লাগল—বিশেষ করে শ্রমিকদের পীড়ন এবং নির্যাতন করার এমন চমৎকার এবং লাভজনক ব্যসন চালাতে। সাংহাইয়ের (শুধু তাই নয়, চীনের সর্বত্রই) কারখানাগুলোতে এই-যে শ্রমিকরা কাজ করত, মালিকরা এদের ভয়ানকভাবে শোষণ করত; এরা যেভাবে খেত পরত বাস করত তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের কল্যাণে এদের শক্তি বেড়েছিল, ইতিমধ্যেই এরা মালিকের হাত মুচড়ে কিছু বেশি হারে মাইনে আদায় করে নিয়েছিল। অতএব কারখানার মালিকরা কেউই সে ট্রেড ইউনিয়নদের উপরে প্রসন্ন ছিল না—তা সে মালিক জাতে ইউরোপীয় জাপানি বা চীনা যাই হোক।

চীনে অবস্থার গতি যে দিকে চলছে তার দরুন মস্কোতে সকলে বোরোদিনের উপরে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন; ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে বোরোদিন রাশিয়ায় চলে গেলেন। তাঁর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাংকাওতে কুওমিন্‌টাঙের যে বামপন্থী দল ছিল সেটি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। নানকিং সরকার এবার সম্পূর্ণরূপেই কুওমিন্‌টাঙের উপর প্রভুত্ব করতে লাগলেন; বিশেষ করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত বামপন্থী এবং শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান তাঁরা চালাচ্ছিলেন সেটাও সমানই চলতে লাগল। এই সময়ে যাঁরা চীন ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন বা চীন থেকে বিতাড়িত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাদাম সুন, মহাবীর নেতা সুন ইয়াৎ-সেনের শ্রদ্ধেয়া বিধবা। অতি শোকার্ত মনে তিনি বললেন, চীনের স্বাধীনতার জন্য আমার স্বামী যে বিরাট আয়োজন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন, এই সমরনায়করা এবং অন্যরা মিলে তাকে নষ্ট করে দিল। অথচ তখনও এই সমরনায়করা ডক্টর সুন-এর বিখ্যাত নীতিগুলোরই দোহাই মুখে উচ্চারণ করছিল—জাতীয়তা, প্রজাতন্ত্র, সামাজিক সুবিচার।

আবার চীন একটা বিষম বিশৃঙ্খলার রাজ্যে পরিণত হল, তার সর্বত্র সমর-নায়করা এবং সেনাপতিরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে ফিরতে লাগলেন। ক্যান্টন নানকিং-সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দক্ষিণ চীনে তার নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করল। ১৯২৮ সনে পিকিঙ শহর নানকিং সরকারের হস্তগত হল। তার নামটাকে বদলে করা হল পিপিং, এর মানে হচ্ছে 'উত্তর-অঞ্চলের শান্তি'। পিকিঙ নামটার মানে ছিল 'উত্তর অঞ্চলের রাজধানী'—কিন্তু তখন আর তা রাজধানী নয়।

পিকিঙকে এখন থেকে আমাদের পিপিং বলে ডাকতে হবে—পিপিঙের পতনের পরও কিন্তু দেশের বহু স্থানে গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। ক্যান্টন তার নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল; কিন্তু উত্তর অঞ্চলেও সমরনায়করা সকলেই যার যা খুশি করে বেড়াতে লাগলেন; নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটি চালাতে লাগলেন, আবার মাঝে মাঝে দুদিনের মতো পরস্পরের সঙ্গে আপোষও করতে লাগলেন। নামে নানকিঙের তথাকথিত 'জাতীয়' সরকার সমস্ত চীন শাসন করছিলেন, একমাত্র ক্যান্টন বাদে। কিন্তু দেশের বহু অঞ্চল ছিল যেখানে সে সরকারের কিছুমাত্র ক্ষমতা বজায় ছিল না। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরস্থ একটা খুব বড়ো অঞ্চল, সেখানে একটি কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নানকিং সরকার আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রধানত সাংহাইয়ের ব্যাঙ্কারদের উপরেই নির্ভর করতেন। বিভিন্ন সেনাপতিদের অধীনস্থ বিরাট সব সেনাবাহিনীর খাঁই মেটাতে মেটাতে কৃষকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। যে-সব সেনাদল ভেঙে গিয়েছিল তাদেরও অসংখ্য লোক চাকরির সন্ধানে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং চাকরি না পেয়ে প্রায়ই ডাকাতি-লুঠতরাজ করে পেট ভরাচ্ছিল।

১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে নানকিং সরকার আর সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হল; সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের সহায়তা নিয়ে নানকিং সরকার একটা উগ্র সোভিয়েট-বিরোধী নীতি অবলম্বন করলেন। এই নিয়ে ১৯২৭ সনেই যুদ্ধ বাধত, শুধু রাশিয়া কিছুতেই যুদ্ধ করতে রাজি হল না বলেই যুদ্ধ হল না। ১৯২৯ সনে চীন সরকার আবার উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন,

এবার রঙ্গমঞ্চ হল মাঞ্চুরিয়া। মাঞ্চুরিয়াতে সোভিয়েট কনসালের দপ্তর চড়াও করা হল; চাইনীজ ইস্টার্ন রেলওয়েতে যে-সব রুশ কর্মচারী ছিলেন তাঁদের বরখাস্ত করা হল। এই রেলওয়েটার বেশির ভাগ ছিল রাশিয়ারই সম্পত্তি; অতএব সোভিয়েট সরকার অবিলম্বে চীনাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। কয়েকমাস ধরে দুই দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধ গোছেরই ব্যাপার চলল; তার পর চীনা সরকার সোভিয়েট সরকারের দাবিই মেনে নিতে রাজি হলেন, পুরোনো যে ব্যবস্থা ছিল তাকেই আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মাঞ্চুরিয়াকে নিয়ে, এবং মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে যে রেলপথটি চলে গেছে, তাকে নিয়ে, বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; কারণ অনেকেরই স্বার্থ এখানে এসে একত্র হয়েছে এবং ঠোকাঠুকি করে মরছে—বিশেষ করে চীন জাপান এবং রাশিয়া তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জাপান এই স্থানটিতে তার পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে—পৃথিবীসুদ্ধ সকলেই তার এই কাজের প্রতিবাদ করেছে, তবুও। এর কথা আমি তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব।

বলেছি, চীনের খানিকটা জায়গা নিয়ে একটা কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যতদূর মনে হয়, প্রথম কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসে, দক্ষিণ-চীনের কোয়ান্টুং প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেং জিলাতে। এর নাম ছিল হাইফেং সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র; অনেকগুলো কৃষক ইউনিয়নকে একত্র করে এর সৃষ্টি হয়েছিল। চীনের অভ্যন্তরদেশে সোভিয়েট-শাসিত অঞ্চলের আয়তন ক্রমেই বেড়ে চলল; ১৯৩২ সনের মাঝামাঝি এসে দেখা গেল, নিজ চীন দেশের মোট যা আয়তন তার প্রায় ছ'ভাগের একভাগ, মানে ২,৫০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান, এর অন্তর্গত হয়ে গেছে—এর জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। কমিউনিস্টরা এখানে ৪,০০,০০০ সৈন্য নিয়ে একটি লাল-বাহিনী গড়ে তুলেছে; এই বাহিনীর সঙ্গে আবার ছেলেদের মেয়েদের নিয়ে গড়া কতকগুলো সাহায্যকারী বাহিনী আছে। চীনদেশের এই সোভিয়েটগুলোকে বিচূর্ণ করতে নানকিং সরকার এবং ক্যান্টন সরকার উভয়েই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, এবং চিয়াং কাই-শেক তাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযান চালিয়েও বিশেষ সফল হন নি। এই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলি কখনও কখনও পিছু হটে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে অন্যত্র নিজেদিগকে সুসংহত ও শক্তিমান করে গড়ে তুলেছে।*

১৭৮

জাপানের ঔদ্ধত্য

২৯শে জুন, ১৯৩৩

চীন কীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তার করুণ কাহিনী আমরা দেখলাম: একবার মনে হল তার বিপ্লব বুঝি সত্যই জয়যুক্ত হল; তার পরই হঠাৎ আবার সে বিপ্লব অতি হিংস্র একটা প্রতি-বিপ্লবের আবর্তে পড়ে কোথায় তলিয়ে গেল। এই কাহিনীর আজও অবসান হয় নি, এর আরও অনেক কিছুই ঘটতে বাকি রয়েছে। চীনের বিপ্লব ব্যর্থ হল তার কারণ, জাতীয়তাবাদের বন্ধন সেখানে যতটুকু দৃঢ় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সচেতন সংগ্রাম। ধনী ভূস্বামীরা এবং অন্যান্য স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা জাতীয়তাবাদী

* পুস্তকের শেষে যে অংশটুকু পরে যুক্ত হয়েছে তাতে চিয়াং কাই-শেক ও চীনের সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষ, এই দুদলের সম্মিলিতভাবে জাপানের সামরিক অভিযানের প্রতিরোধ, জাপানের চীন আক্রমণ ও পরবর্তী যুদ্ধ ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনটাকেই বরং ভেঙে দেওয়া শ্রেয় মনে করেছিলেন, তবু কৃষক এবং শ্রমিক জনসাধারণের প্রভুত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিপদের ঝুঁকি নিতে তাঁরা সাহস করেন নি।

কেবল নিজের আভ্যন্তরীণ বিপদই নয়, চীনকে এবার একটা বিদেশী শত্রুর প্রবল আক্রমণও রুখতে হল। এই শত্রুটি হচ্ছে জাপান; চীন দুর্বল হয়ে পড়ছে, অন্যান্য জাতিরা অন্যত্র ব্যস্ত, এই সুযোগে সেও নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল।

আধুনিক শিল্পতন্ত্র আর মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের; পার্লামেণ্টী পদ্ধতি, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র আর সেনানায়কদের প্রাধান্যের, অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে জাপানে। দেশের শাসন ব্যাপারে ভূস্বামী এবং সমরনায়কদেরই প্রাধান্য; তারা সজ্ঞানেই রাষ্ট্রটাকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে একটা বংশগত গোষ্ঠীর ধারায়; সে গোষ্ঠীর তারাই হবে সর্দার, এবং সম্রাট হবেন সকলের উপরে প্রভু। ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারকেই এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেন তার দ্বারা এই ব্যবস্থার সাহায্য হয়। ধর্ম ব্যাপারটাকে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দেবালয় মন্দির প্রভৃতিও সোজাসুজিই সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীন, পুরোহিতদের চাকরিও সরকারি চাকরি। দেবমন্দির এবং বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়ে একটি বিরাট প্রচারকার্য সারাক্ষণ চালানো হচ্ছে; দেশের লোককে অবিরত শুধু দেশভক্তি নয়, রাজভক্তিও শেখানো হচ্ছে—রাজার আদেশ সর্বথা পালনীয়, কারণ রাজা প্রায় দেবতারই সমতুল্য। প্রাচীনকালে বীরদের মধ্যে যে শৌর্যের চর্চা ছিল, তারই প্রায় সমার্থক একটি কথা জাপানে আছে—'বুশিদো'; এর মানে হচ্ছে বংশ-মর্যাদার প্রতি নিষ্ঠা। এই কথাটাকেই ব্যাপক অর্থে সমগ্র রাষ্ট্রের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে; সকলের উপরে একেবারে স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত এর অন্তর্গত। সম্রাট হচ্ছেন বস্তুত একটা প্রতীক মাত্র; তার নাম নিয়ে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা এবং সামরিকশ্রেণী দেশ শাসন করে থাকেন। শিল্পতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে জাপানেও একটা বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা বড়ো বড়ো দিকপাল, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারের লোক; অতএব এখন পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণী বলে নূতন কোনো শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় নি। বস্তুত জাপানে সমস্ত ব্যাপারেই এই একচেটিয়াতন্ত্র চলছে; জাপানের শিল্পতন্ত্র এবং জাপানের রাজনীতি সমস্তই চলছে মাত্র গুটি দুই-চার শক্তিশালী পরিবারের ইঙ্গিতে।

বহুদিন ধরেই জাপানের জনসাধারণের ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু আরও একটা ধর্ম আছে, শিণ্টো। এটা কতকটা জাতীয়তামূলক ধর্ম; পূর্বপুরুষের পূজাই এর বড়ো কথা। এই পূজার মধ্যে অতীতকালের সব সম্রাট এবং দেশপ্রাণ বীরদেরও পূজা করা হয়, বিশেষ করে যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের। এমনি করে এই ধর্মটা দেশপ্রেম এবং সম্রাটের প্রতি ভক্তি এবং নিষ্ঠা প্রচারের একটা খুব জোরালো এবং খুব কর্মকুশল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জাপানিরা তাদের আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এদের এই দেশপ্রেমের প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র, এর কাম্য হচ্ছে একটি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা—এ খবরটা লোকে তেমন বেশি জানে না। ১৯১৫ সনের কাছাকাছি সময়ে জাপানে একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। এর নাম 'ওমোটো কিয়ো' সম্প্রদায়; দেশের সর্বত্র দ্রুতবেগে এটা ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়টির প্রধান কথা ছিল : জাপান সমগ্র পৃথিবীর প্রভু হবে, তার সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন জাপান-সম্রাট স্বয়ং। এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল :

"আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের সম্রাটকে সমস্ত পৃথিবীর শাসন এবং প্রভুর আসনে স্থাপন করা। স্বর্গলোকে অবস্থিত জাতির প্রথমতম পূর্বপুরুষের নিকট হতে যে ঐশী প্রেরণা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাপান-সম্রাটের মধ্যেই সেটা আজও বর্তমান রয়েছে।"

আমরা দেখেছি, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান চীনের উপরে কিছু জুলুমবাজির চেষ্টা করেছিল, তার উপরে একুশ দফা দাবি চাপাতে চেয়েছিল। আমেরিকা আর ইউরোপ হৈ চৈ শুরু করল বলে যতখানি সে চেয়েছিল তার সবখানি আদায় করতে পারল না, তবুও অনেকখানি সে

পেয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে জাপান দেখল, জারের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, এশিয়াতে জাপানের রাজ্য-বিস্তার করে নেবার তখন একটা সুবর্ণ সুযোগ। জাপানের সেনা সাইবেরিয়াতে ঢুকে পড়ল; জাপানের অনুচররা মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দ এবং বোখারা পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল। কিন্তু সে অভিযান তার ব্যর্থ হল। তার এক কারণ, সোভিয়েট রাশিয়া বিপর্যয় থেকে সামলে উঠল; আরেক কারণ জাপানের প্রতি আমেরিকার অবিশ্বাস ও বাধা। একথা সর্বদাই মনে রেখো, জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব নেই। এরা পরস্পরকে অত্যন্ত অপছন্দ করে, প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তীর থেকে এই দুটি দেশ সারাক্ষণ পরস্পরের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। ১৯২২ সনে ওয়াশিংটনে যে কনফারেন্স হল তার ফলে জাপানের রাজ্যবিস্তারের আশায় প্রকাণ্ড বাধা পড়ল, আমেরিকার কূটনীতির সে একটা বৃহৎ জয়। এই কনফারেন্সে ন'টি জাতি—তার মধ্যে জাপানও ছিল—একত্র হয়ে প্রতিশ্রুতি দিল, সকলেই চীনের অক্ষুণ্ণতা বজায় রেখে চলবে। তার মানেই হল, চীনের মধ্যে রাজ্যবিস্তার করবার যে আশা জাপান পোষণ করছিল সেটা তাকে ছাড়তে হবে। তাছাড়া এই কনফারেন্সেই ইংলণ্ডের সঙ্গেও জাপানের মৈত্রীর অবসান হল, অতএব দূরপ্রাচ্যে জাপান একেবারে নির্বান্ধব হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার সিঙ্গাপুরে একটি বিশাল নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ আরম্ভ করলেন; বেশ বোঝা গেল এটা জাপানকেই ভয় দেখানোর ব্যবস্থা। ১৯২৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটি জাপানি-আগন্তুক-বিরোধী আইন তৈরি হল, জাপান থেকে বহু শ্রমিক যুক্তরাষ্ট্রে আসছিল, তাদের আসতে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা নয়। এই জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থাতে জাপান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল; তখন এ নিয়ে প্রাচ্য-জগতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু করবারই সামর্থ্য জাপানের ছিল না। জাপান দেখল সে নেহাতই একা পড়ে গেছে, ওদিকে তাকে ঘিরে শত্রুপক্ষের একটি ব্যূহ ক্রমে গড়ে উঠছে। বাধ্য হয়ে সে তখন রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল; ১৯২৫ সনের জানুয়ারি মাসে রাশিয়ার সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করল।

এই সময়ে জাপানে একটা প্রচণ্ড দৈবদুর্যোগ ঘটে, তার আঘাতে জাপানের শক্তি অত্যন্ত কমে যায়। ব্যাপারটা একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প। ১৯২৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এই ভূমিকম্প হল, তার পরই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ডাঙার উপর এসে পড়ল, এবং রাজধানী টোকিও শহরে একটা প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড হল। বিশাল শহর টোকিও আর ইয়াকোহামা বন্দর এই দুর্যোগে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষ মরল এক লক্ষেরও বেশি; ধনসম্পত্তি যে কত নষ্ট হল তার হিসাব নেই। তবু এত বড়ো সর্বনাশের মুখেও জাপানিরা সাহস এবং দৃঢ়তা হারাল না; পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপের উপরে আবার তারা নূতন করে টোকিও শহরকে গড়ে তুলল।

বিপদে পড়ে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল; কিন্তু তাই বলে কমিউনিজ্‌মকে সে সমর্থন করত এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। কমিউনিজ্‌ম্ গ্রহণের মানে হচ্ছে সম্রাটের পূজা, সামন্ততন্ত্র, শাসক শ্রেণী কর্তৃক জনসাধারণকে শোষণ, এক কথায় বর্তমান অবস্থা বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার প্রায় সবকিছুরই অবসান। জাপানে এই কমিউনিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা দিন দিন বেড়ে চলেছিল; তার কারণ প্রজাদের দুঃখদুর্দশার বৃদ্ধি—শক্তিশালী শিল্পপতিদের শোষণের তীব্রতা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। দেশের লোকসংখ্যাও তখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে; দেশ ছেড়ে তারা যে আমেরিকায় কানাডায় এমন কি অস্ট্রেলিয়ার ঊষর প্রান্তরভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেবে তারও উপায় নেই, সব দেশেরই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। চীনদেশটা অবশ্য হাতের কাছে; কিন্তু চীনের নিজেরই লোক এত বেশি যে তাদেরই দেশে জায়গা কুলোয় না। কিছু কিছু লোক জাপান থেকে কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়াতে চলে যাচ্ছিল। এসব তো গেল তার নিজস্ব দুশ্চিন্তা; তার উপর আবার তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিল্পতন্ত্রের যে-সব সার্বজনীন বিঘ্ন-বিপদ আর বাণিজ্যের বাজারে মন্দা চলছিল তারও ধাক্কা তাকে সইতে হচ্ছিল। দেশের ভিতরে অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠবার ফলে কমিউনিস্ট এবং সমস্ত প্রগতিবাদীদের উপরে নিদারুণ পীড়ন শুরু হল। ১৯২৫ সনে একটি 'শান্তি-রক্ষা আইন' তৈরি হল।

আইনের ভাষাটিই ছিল চমৎকার, আমি এর প্রথম অনুচ্ছেদটি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। অনুচ্ছেদটির ভাষা হচ্ছে :

"দেশের শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটাইবার, বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা উচ্ছেদ করিবার, উদ্দেশ্যে যাহারা কোনোরূপ সংঘ বা সম্প্রদায় গঠন করিবে, কিংবা যাহারা এইরূপ সংঘ ইত্যাদির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অবগত হইয়া ইহাতে যোগ দিবে, তাহারা দণ্ডার্হ হইবে—এই অপরাধে পাঁচ-বৎসরের অধিককাল ব্যাপী কারাদণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারিবে।"

কেবল কমিউনিজম্ নয়, সকল রকমের সমাজতন্ত্রবাদী বা প্রগতিবাদী বা শাসনসংস্কার-মূলক কর্মপ্রচেষ্টাকেই এই আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনটার চরম কঠোরতা দেখেই বোঝা যায়, কমিউনিজমের অভ্যুত্থান দেখে জাপান সরকার কতখানি ভয় পেয়েছিল।

কিন্তু কমিউনিজমের জন্ম হয় মানুষের ব্যাপক দুঃখ-দুর্দশা থেকে; সে দুঃখ-দুর্দশার মূলে থাকে সামাজিক অব্যবস্থা। সেই অব্যবস্থার যতদিন প্রতিকার না হচ্ছে, ততদিন শুধু পীড়ন দিয়ে একে রোখা যায় না। জাপানে বর্তমানে প্রজার ভয়ংকর দুরবস্থা। চীন এবং ভারতবর্ষের মতো সেখানেও কৃষকরা বিপুল-পরিমাণ ঋণের চাপে পিষে মারা যাচ্ছে। প্রজার কাছ থেকে খুব বেশি কর আদায় করা হচ্ছে, বিশেষ করে বিপুল-পরিমাণ সামরিক ব্যয় এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য। বহুস্থানে অনাহার-ক্লিষ্ট কৃষকরা ঘাস এবং গাছের শিকড় খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। নিজের সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে এমন খবরও শোনা যাচ্ছে। বেকার-সমস্যার দরুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীদেরও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠেছে; আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অভিযান খুব তোড়জোড় করে শুরু হল ১৯২৮ সনের প্রথম দিকে। একটি রাত্রির মধ্যে এক হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু এক মাসেরও মধ্যে সংবাদপত্রগুলি সে খবর ছেপে বার করবার অনুমতি পেল না। বছরের পর বছর প্রায়ই দেশের সর্বত্র পুলিশের খানাতল্লাসী আর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের হিড়িক চলেছে। পুলিশের সবচেয়ে বড়ো অভিযানটি হয়েছে ১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে—তখন ২২৫০ জন লোককে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। এই লোকেরা শ্রমিক নয়। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছাত্র এবং শিক্ষক। এদের মধ্যে শত শত গ্র্যাজুয়েট এবং নারীও রয়েছে। এর মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার বস্তু, জাপানে বহু ধনীর-ঘরের যুবক-যুবতী কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সব দেশের মতো, জাপানেও প্রগতিবাদী চিন্তাবীরদের চোর-ডাকাত-খুনী প্রভৃতি অপরাধীর চেয়েও ভয়ংকর ব্যক্তি বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের মীরাট-মামলার মতো, জাপানেও কমিউনিস্টদের নিয়ে কয়েকটা মামলা বছরের পর বছর ধরে চলেছে।

জাপানের অবস্থা সম্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম, যেন জাপান মাঞ্চুরিয়াতে যে অভিযান চালাচ্ছে তার পশ্চাৎপটটি কী, সে সম্বন্ধে তুমি খানিকটা ধারণা করে নিতে পার। এবার তোমাকে মাঞ্চুরিয়া-অভিযানের কথা বলছি।

এশিয়ার মহাদেশ-ভূমিতে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্য জাপান ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছে—এর কথা তোমাকে আগের কতকগুলো চিঠিতে বলেছি। প্রথম সে কোরিয়া দখল করতে চাইল, তারপর হাত বাড়াল মাঞ্চুরিয়ার দিকে। ১৮৯৪ সনে চীনের সঙ্গে এবং তার দশ বছর পরে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হল; সে যুদ্ধও সে করেছিল এই উদ্দেশ্য নিয়েই। ধীরে ধীরে জাপানের চেষ্টা সফল হতে লাগল, এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে চলল। কোরিয়া তার দখলে চলে এল, জাপান-সাম্রাজ্যেরই একটা অংশমাত্রে পরিণত হয়ে গেল। চীনের পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশকে একত্রে মাঞ্চুরিয়া বলা হয়। মাঞ্চুরিয়াতে পোর্ট আর্থারের আশপাশে খানিকটা জায়গা রাশিয়া পত্তন এবং ইজারা বলে ভোগ করত, সেগুলো জাপানকে দিয়ে দেওয়া হল। মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়া একটি রেলওয়ে তৈরি করেছিল, তার নাম চাইনীজ ইস্টার্ন রেলওয়ে। তারও খানিকটা অংশ জাপানের হাতে চলে এল; জাপানিরা তার নাম দিল সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে। কিন্তু এত সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও মাঞ্চুরিয়া দেশটা মোটের উপর

চীন-সরকারেরই অধীনে রইল; রেলওয়ে ছিল বলে বহু চীনা সেখানে এসে বাস স্থাপন করতে লাগল। বস্তুত চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এই তিনটি প্রদেশে এত লোক এসে বাস স্থাপন করেছিল যে অনেকের মতে পৃথিবীর ইতিহাসে দেশান্তরের এত বড়ো অভিযান খুব বেশি হয় নি। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সন, এই সাতটি বছরের মধ্যে পঁচিশ-লক্ষেরও বেশি চীনা দেশ ছেড়ে মাঞ্চুরিয়ায় চলে গেল। মাঞ্চুরিয়ার বর্তমান লোকসংখ্যা তিন কোটির মতো, এদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই হচ্ছে চীনা। অতএব এই প্রদেশ তিনটির আপাদমস্তকই চীনদেশ। শতকরা যে পাঁচজন বাকি রইল তার মধ্যে রাশিয়ান আছে, মঙ্গোল যাযাবর আছে, কোরিয়ান আছে, জাপানি আছে। পুরোনো কালের মাঞ্চু যারা ছিল তারা চীনাদের সঙ্গেই মিলেমিশে গেছে, তাদের পুরোনো ভাষাটা পর্যন্ত আর তারা জানে না।

১৯২২ সনে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে নয়টি জাতির মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, তার কথা তোমাকে বলেছি। এই সন্ধিটা করা হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য জাতিদের নির্বন্ধক্রমে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, চীনে রাজ্যবিস্তারের যে সংকল্প জাপানের আছে তাকে বাধা দেওয়া। অতি স্পষ্ট এবং অ-দ্ব্যর্থক ভাষায় এই নয়টি জাতি (এদের মধ্যে জাপানও ছিল) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, "চীনের সার্বভৌম অধিকার, তার স্বাধীনতা, এবং তার রাজ্যের এলাকা ও শাসন-ব্যবস্থার অক্ষুণ্ণ মর্যাদায়" তারা কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

এর পরে কয়েকটা বছর জাপান হাত গুটিয়ে বসে রইল। গোপনে গোপনে অবশ্য তখনও সে টাকা দিয়ে অন্যান্য ভাবে চীনের সমরনায়ক বা টুচুনদের সাহায্য করছিল, যেন তারা গৃহযুদ্ধটা চালাতে পারে, চীনকে দুর্বল করে ফেলতে পারে। বিশেষ করে সে সাহায্য করছিল চ্যাং সো লিনকে—মাঞ্চুরিয়াতে, এবং দক্ষিণী জাতীয়তাবাদীরা এসে পিকিঙ দখল করবার আগে পর্যন্ত পিকিঙেও, চ্যাং সো লিনেরই আধিপত্য ছিল। ১৯৩১ সনে জাপান সরকার মাঞ্চুরিয়াতে খোলাখুলিই একটা উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। হয়তো এর কারণ, জাপানের তখন দারুণ অর্থ-সংকট উপস্থিত হয়েছিল, অতএব দেশের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল তার খানিকটা লাঘব করবার, এবং দেশের মানুষের মনোযোগকে অন্য দিকে নিবিষ্ট করবার জন্যই তাঁদের বাধ্য হয়ে দেশের বাইরে কোথাও একটা কিছু কাণ্ড বাধাতে হচ্ছিল। অথবা হয়তো জাপান সরকারের মধ্যে সামরিক দলের যে অতিরিক্ত প্রতিপত্তি ছিল তার থেকেই এই অভিযানের সৃষ্টি। কিংবা হয়তো জাপান ভেবেছিল, অন্যান্য দেশরা সকলেই যে-যার নিজের আপদ-বিপদ আর বাণিজ্য সংকট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে, এই ফাঁকে সে যাই করে নিক তারা বাধা দিতে আসতে পারবে না। খুব সম্ভবত এই সমস্তগুলো কারণ একত্র হয়েই জাপান সরকারকে এমন একটি কাজ করতে প্রলুব্ধ করল, যার গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ এই কাজটির দ্বারা ১৯২২ সনের নব-শক্তি চুক্তিকে স্পষ্টতই ভাঙা হল। লীগ অব নেশন্‌সের মূলনীতি-সম্বলিত সনদের চুক্তি এতে ভঙ্গ করা হল, কারণ চীন এবং জাপান দুজনই লীগের সভ্য, অতএব লীগকে না জানিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করবার অধিকার তাদের নেই। সর্বশেষ কথা, ১৯২৮ সনের প্যারিস (বা কেলগ) চুক্তিও এতে খোলাখুলিই ভাঙা হল—সে চুক্তিতে যুদ্ধকে বেআইনি ব্যাপার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অতএব চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করে জাপান সরকার জেনেশুনেই এই সমস্ত সন্ধি এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন; সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে সে একটা অদ্ভুত ঔদ্ধত্য প্রকাশ।

মুখে অবশ্য তাঁরা মোটেই সেকথা বললেন না। কতকগুলো ক্ষীণ, এবং স্পষ্টতই মিথ্যা অছিলা গড়ে তুললেন—মাঞ্চুরিয়াতে ডাকাতের দল বড়ো উৎপাত করছে, কতকগুলো ছোটো-খাটো ডাকাতি ইত্যাদিও হয়ে গেছে; অতএব বাধ্য হয়েই জাপান সরকারকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য এবং জাপানের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য পাঠাতে হচ্ছে। খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করা হল না; অথচ মাঞ্চুরিয়াতে জাপানিদের অভিযান ঠিকই শুরু হয়ে গেল। চীনের লোকেরা এতে অত্যন্ত চটে গেল। চীন সরকার এর প্রতিবাদ জানালেন; লীগ অব নেশন্‌সের কাছে এবং অন্যান্য জাতিদের কাছে নালিশ করলেন; কিন্তু সে নালিশে কেউই কর্ণপাত করল না। করবেই বা কে—প্রত্যেক দেশই তখন যে-যার নিজের ধান্দা সামলাতে

সোভিয়েট রাশিয়া
মঙ্গোলিয়া
মাঞ্চুরিয়া
("মাঞ্চুকুও")
জেহোল
অন্তর্মঙ্গোলিয়া
সিন্‌কিয়াঙ
পিঁপিঙ
কোরিয়া
জাপান
চীন
নানকিঙ
হ্যাংকাও
সাংহাই
তিব্বত
ভারতবর্ষ
ব্রহ্মদেশ
ক্যান্টন
চীনে জাপানের যুদ্ধ
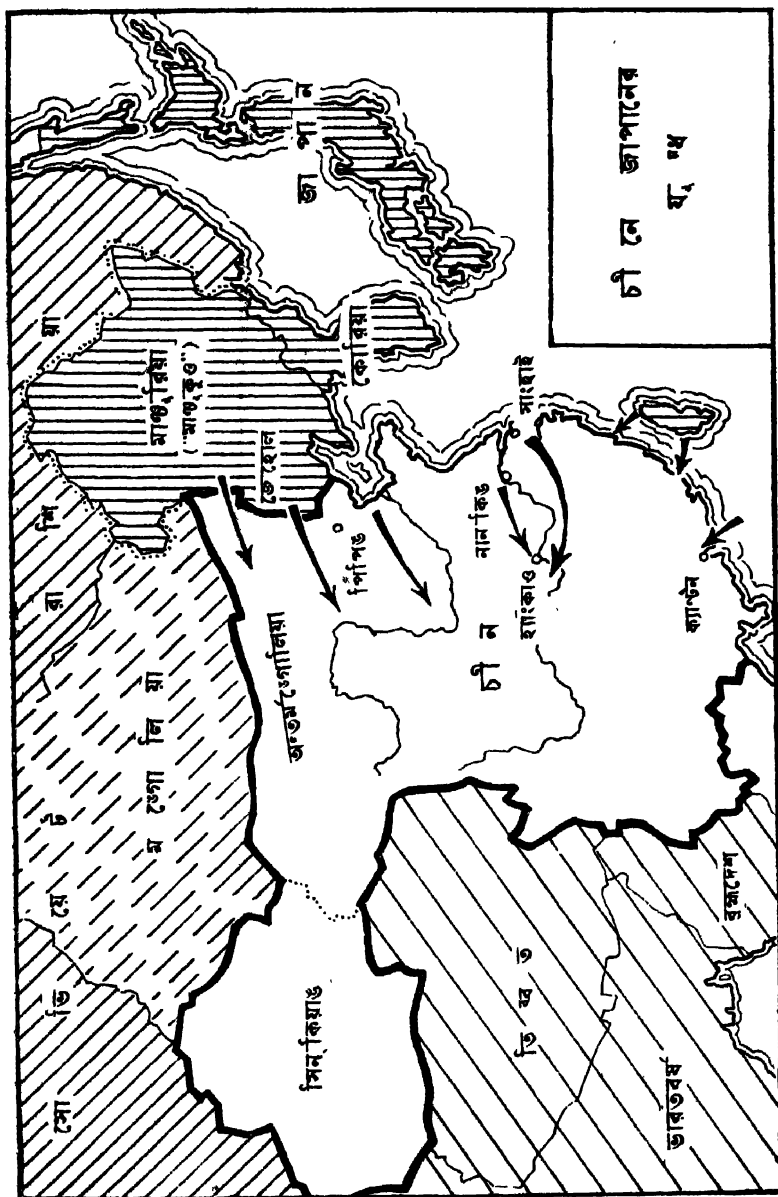
অস্থির; তার উপরে আবার জাপানকে ঘাঁটিয়ে যন্ত্রণা বাড়াতে কারোই উৎসাহ নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে ব্রিটেন, জাপানের সঙ্গে একটা গোপন বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, এমন হওয়াও খুবই সম্ভব। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের যে সৈন্য ছিল, চীনাদের বেসরকারি বাহিনী—তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তখনও কিন্তু দুই দেশের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে এমন কথা কেউ স্বীকার করছে না! এর চেয়েও বেশি মুশকিল হল জাপানের আরেকটা ব্যাপারে—চীনের সর্বত্র জাপানি পণ্য বর্জন করবার একটা বিরাট আন্দোলন জেগে উঠল।

১৯৩২ সনের জানুয়ারি মাসে একটি জাপানি বাহিনী হঠাৎ এসে সাংহাইয়ের কাছে চীনের এলাকার উপর পড়ল, এমন বীভৎস একটা হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করল যে আধুনিক জগতে তার তুলনা বেশি মেলে না। বিদেশীদের কোনো ইজারা অঞ্চলে তারা পদার্পণ করল না। অতএব বিদেশীদেরও চটবার কারণ ঘটল না। যে-সব অঞ্চলে চীনাদের বসতি খুব ঘন, বেছে বেছে সেই জায়গাগুলিই আক্রমণ করল। সাংহাইয়ের কাছে একটা খুব বড়ো এলাকা (এর নাম বোধহয় চাপেই) তারা বোমা দিয়ে কামানের গোলা দিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিল; হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ল সেখানে, অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে গেল। মনে রেখো, এটা তারা কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিল না; এ শুধু নিরপরাধ অসামরিক লোকদের বোমা দিয়ে হত্যা করা। এই মহাবীরোচিত কাণ্ডের পরিচালক ছিলেন যে জাপানি নৌ-সেনাধ্যক্ষটি, তাঁকে যখন এসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেন, জাপান খুব দয়াপরবশ হয়ে স্থির করেছে, "অসামরিক লোকদের উপরে এই রকম বেপরোয়া বোমাবর্ষণ আর মাত্র দুটি দিন চালানো হবে"! সাংহাইতে লণ্ডনের 'টাইম্স্' পত্রিকার যে সংবাদদাতা ছিলেন তিনি জাপানিদের সমর্থক, অথচ জাপানিদের হাতে চীনাদের এই (তাঁর ভাষায়) 'পাইকারী হত্যাকাণ্ড' দেখে তিনিও ঘৃণায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চীনাদের মনের অবস্থা কী হল সে তো বুঝতেই পার। চীনের সর্বত্র আতঙ্ক এবং ক্রোধের একটা বন্যা বয়ে গেল; চীনের যেখানে যত সরকার আর সমরনায়ক ছিলেন, বিদেশীদের এই নৃশংস অভিযানের আঘাতে তাঁরাও পরস্পর যত রেষারেষি কলহ তাঁদের ছিল সমস্ত ভুলে গেলেন—অন্তত মনে হল যেন ভুলে গেছেন। সকলে একত্র হয়ে জাপানিদের বিরুদ্ধে লড়বেন এমন কথাও উঠল; এমনকি চীনের অভ্যন্তরদেশে যে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা পর্যন্ত নানকিং সরকারকে বলে পাঠাল, দেশরক্ষার জন্য নানকিঙের অনুগত হয়ে তারা লড়তে রাজি আছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, নানকিং সরকার—বা তার অধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক—জাপানি সেনার আক্রমণ থেকে সাংহাইকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। একটিমাত্র কাজ নানকিং সরকার করলেন, লীগ অব নেশন্সের কাছে একটি অভিযোগ দাখিল করলেন। জাপানিদের বাধা দেবার জন্য সকলকে নিয়ে একটা মিলিত বাহিনী গড়ে তুলবার চেষ্টা পর্যন্ত তাঁরা করলেন না। লম্বা-চওড়া কথা অবশ্য তাঁরা অনেকই বলছিলেন, দেশের লোকও রাগে ক্ষোভে জ্বলে মরছিল; কিন্তু দেখেশুনে মনে হয় আসলে জাপানিদের বাধা দেবার কোনো ইচ্ছাই নানকিং সরকারের ছিল না।

ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ থেকে একটি অদ্ভুত সেনাবাহিনী সাংহাইতে এসে আবির্ভূত হল—এর নাম হচ্ছে উনিশ সংখ্যক রুট্ বাহিনী বা উনিশ-নম্বর পথচারী বাহিনী। এই বাহিনীটি ক্যাণ্টনের লোক নিয়ে গড়া; কিন্তু নানকিং বা ক্যাণ্টন, কোনো সরকারেরই আদেশে এরা পরিচালিত নয়। সে এক অদ্ভুত পাঁচমিশেলি সৈন্যের দল—তাদের রণসজ্জা বলতে বিশেষ কিছুই নেই, বড়ো কামান নেই, ভালো উর্দি নেই, চীনদেশের সেই মারাত্মক শীত থেকে রক্ষা পাবার মতো কাপড়-জামা পর্যন্ত নেই। অনেক ছেলে এর মধ্যে ছিল যাদের বয়স চৌদ্দ থেকে ষোলো বছরের মধ্যে; কয়েকজনের বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। এই অপূর্ব সেনাবাহিনীর দৃঢ় সংকল্প, চিয়াং কাই-শেকের আদেশ অগ্রাহ্য করেই তারা যুদ্ধ করবে, জাপানিদের রুখবে। ১৯৩২ সনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পুরো দু'টি সপ্তাহ ধরে এরা লড়াই করল, নানকিং সরকার এদের কোনো সাহায্যই করল না। অথচ এমন আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে এরা লড়াই করতে লাগল যে জাপানি সেনা তার অনেক বেশি শক্তি, অনেক ভালো রণসজ্জা নিয়েও অবাক হয়ে থেমে রইল,

এদের ঠেলে এগুতেই পারল না। শুধু জাপানিরা বলে নয়, এদের এই অপূর্ব বীরত্ব দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল; বিদেশী জাতিরা এবং চীনারা নিজেরাও পর্যন্ত। একা হাতে দুই সপ্তাহ যুদ্ধ চালাবার পর, যখন চতুর্দিকে সকল লোকই এই বাহিনীটির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে, তখন চিয়াং কাই-শেক এদের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।

উনিশ সংখ্যক রুট্ বাহিনী ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে গেল; পৃথিবীর সর্বত্র এর নাম ছড়িয়ে পড়ল। এদের ধাক্কা খেয়ে জাপানিদের সমস্ত পরিকল্পনা উলটে গেল। সাংহাইতে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের অনেকখানি স্বার্থ রয়েছে, তারাও সেগুলো টিকিয়ে রাখতে ব্যগ্র; অতএব তারপর ধীরে ধীরে জাপান সাংহাই-অঞ্চল থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নিল, জাহাজে করে তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিল। একটা কথা লক্ষ্য করবার মতো; এই পাশ্চাত্ত্য জাতিরা তাদের নিজেদের অর্থসম্পদ বা অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা দেখিয়েছিল; কিন্তু চাপেইতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হল, হাজার হাজার চীনাকে বধ করা হল তা নিয়ে বা তাদের সঙ্গে এতগুলো সন্ধি জাপান ভাঙল, আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসন অমান্য করল, এ-সব নিয়ে, তারা মোটেই অতটা মাথা ঘামাল না। এই-সব নিয়ে বারবার করে লীগ অব নেশন্‌সের কাছে অনুযোগ করা হল; লীগ প্রত্যেকবারেই সে আলোচনাকে মুলতুবি করে রাখবার একটা করে অছিলা খুঁজে বার করল। বাস্তবিক একটা যুদ্ধ চলছে, হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছে, মারা যাচ্ছে, তবু এ-সব ব্যাপারকে লীগ মোটে জরুরি বলেই মনে করল না। বলল, সত্যিকার যুদ্ধ তো কই হচ্ছে না, সরকারিভাবে একে তো কেউ যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে নি! লীগের এই দুর্বলতা, এবং অন্যায় অত্যাচারের এই প্রায় সজ্ঞান সমর্থন করার ফলে, লীগের সুনাম এবং মর্যাদা অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেল। এর জন্য অবশ্য দায়ী ছিল অবশ্য বড়ো বড়ো জাতিদের মধ্যে কয়েকজন; বিশেষ করে ইংলণ্ড তো লীগের মধ্যে জাপানের পক্ষ হয়েই কথা বলছিল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত লীগ মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করলেন, তার সভাপতি হলেন লর্ড লিটন। এই ব্যবস্থায় সকল জাতিই অতি হৃষ্টমনে সম্মতি জ্ঞাপন করল, কারণ কমিশন বসানোর মানেই হচ্ছে, এ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করার ব্যাপারটাকে আপাতত বহু মাসের মতো মুলতুবি করে রাখা গেল। মাঞ্চুরিয়া অনেক দূরের দেশ, কমিশনের সেখানে যেতে, দেখেশুনে রিপোর্ট খাড়া করতে, দীর্ঘকাল লেগে যাবে—হয়তো বা ততদিনে যুদ্ধের ব্যাপারটাই সারা হয়ে যাবে!

জাপানিরা সাংহাই থেকে সরে গেল, কিন্তু এবার তারা মাঞ্চুরিয়ার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিল। মাঞ্চুরিয়াতে একটা পুতুল-সরকার খাড়া করল তারা; ঘোষণা করে দিল. মাঞ্চুরিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবলেই সে সরকার গঠন করেছে! এই নূতন খেলনা রাষ্ট্রটির নাম তারা দিল মাঞ্চুকুও; চীনের প্রাচীন মাঞ্চু রাজাদের বংশধর একটি শীর্ণকায় যুবককে এই নূতন রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দিল। অবশ্য এর সমস্তটাই হল লোক-দেখানো ব্যাপার; আসলে জাপানই দেশটিকে শাসন করতে লাগল। সকলেই জানত, জাপানি সৈন্য যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তবে একদিনের মধ্যেই সে মাঞ্চুকুও রাজ্য উলটে পড়ে যাবে।

মাঞ্চুরিয়াতে জাপানিদের দিন মোটেই স্বস্তিতে কাটছিল না; চীনাদের বহু স্বেচ্ছাসৈনিক দল সারাক্ষণই তাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাচ্ছিল। জাপানিরা এই দলদের নাম দিয়েছে 'দস্যু'। মাঞ্চুকুও রাজ্যের সেনাবাহিনী প্রধানত চীনাদের নিয়েই গড়া; তাঁকে শিক্ষিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তুলেছে জাপানিরা। এই-সব সৈন্যদের যখন 'দস্যু'দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠানো হল, এরা সোজা গিয়ে সেই দস্যুদের সঙ্গেই যোগ দিল—তাদের সমস্ত আধুনিক রণসজ্জা ইত্যাদি নিয়ে! দুপক্ষের মধ্যে এই যুদ্ধ অবিশ্রাম চলার ফলে মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। সয়াবীন চালানের কারবারও প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল।

বহু মাস ধরে তদন্ত চালাবার পরে, লিটন-কমিশন লীগ অব নেশন্‌সের কাছে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করলেন। রিপোর্টটি অত্যন্ত সাবধানে, খুব ছেঁটে-কেটে, এবং বিজ্ঞোচিত ভাষায় রচিত, তবুও এতে পুরোপুরি দোষই জাপানের ঘাড়ে ফেলা হয়েছিল। তাই দেখে ব্রিটিশ সরকার মহা ব্যস্ত

হয়ে পড়লেন; তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টাই ছিল জাপানকে সমর্থন করা। এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার ব্যাপারটাকে আবার মাস কতকের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হল। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার আলোচনা করতে লীগকে বসতেই হল। ইংলণ্ড এ ব্যাপারে যে মনোভাব প্রকাশ করছিল আমেরিকার ভাব ছিল ঠিক তার উলটো; আমেরিকা ছিল জাপানের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। আমেরিকা স্পষ্টই বলে দিয়েছিল, মাঞ্চুরিয়াতে বা অন্যত্র জাপান গায়ের জোরে যে-সব পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমেরিকা তাকে স্বীকার করে নেবে না। কিন্তু আমেরিকার এই দৃঢ় মনোভাব সত্ত্বেও, ইংলণ্ড, এবং কিছু পরিমাণে ফ্রান্স ইটালি আর জর্মানি, তখনও জাপানকে সমর্থন করল।

লীগ যখন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবার দায়টাকে এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, ঠিক এমনি সময়ে জাপান এক নূতন কাণ্ড করে বসল। ১৯৩৩ সনের নববর্ষের দিনে একটি জাপানি বাহিনী হঠাৎ খাস চীনদেশের উপর গিয়ে চড়াও হল, শানহাইকোয়ান্ শহর আক্রমণ করল। এই শহরটি মহাপ্রাচীরের পার্শ্বে চীন এলাকায় অবস্থিত। বড়ো বড়ো কামান থেকে এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলা ছুঁড়তে লাগল জাপানিরা, এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে লাগল শহরে—সে একেবারে পুরোদস্তুর আধুনিক আক্রমণ। দেখতে দেখতে শানহাইকোয়ান শহর একটি 'ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপে' পরিণত হল; এর অসামরিক অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোক মৃত এবং মুমূর্ষু হয়ে সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে পড়ে রইল। তার পর জাপানি সৈনা আরও এগিয়ে গিয়ে চীনের জেহোল প্রদেশে প্রবেশ করল, পিপিং শহরের কাছে গিয়ে হাজির হল। তাদের অজুহাত ছিল, 'দস্যু'রা জেহোলকে তাদের প্রধান ঘাঁটি করে সেখান থেকে মাঞ্চুকুওর উপরে আক্রমণ চালাচ্ছে; আর তাছাড়া জেহোল তো মাঞ্চুকুওরই অংশ মাত্র!

এই নূতন অভিযান এবং নববর্ষের দিনের এই হত্যাকাণ্ড দেখে লীগের ঘুম ভাঙল; প্রধানত ক্ষুদ্রতর জাতিদের জিদ এড়াতে না পেরেই লীগ লিটন-রিপোর্টের মন্তব্য স্বীকার করে এবং জাপানকে দোষী বলে ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। জাপান সরকার অবশ্য এর দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, (করবার দরকারই বা কি তার—সে কি জানে না বড়ো বড়ো জাতিদের অনেকে, ব্রিটেন পর্যন্ত, গোপনে তাকেই সমর্থন করছে?) সোজা লীগ থেকে বেরিয়ে গেল। লীগের সভ্য-পদে ইস্তফা দিয়ে জাপান ধীরেসুস্থে পিপিংএর দিকে এগিয়ে চলল। পথে তাকে কেউই প্রায় বাধা দিল না; এবং ১৯৩৩ সনের মে মাসে জাপানি সেনা যখন প্রায় পিপিং শহরের ফটকে গিয়ে পৌঁচেছে, এমন সময় চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হল। জাপান সরকারেরই জয় হল। নানকিং সরকার আর বর্তমান কুওমিনটাঙের উপরে চীনের জনসাধারণ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই—জাপানিদের আক্রমণের মুখে এঁরা যে অপূর্ব কসরৎ দেখিয়েছেন তার পরেও লোক বিরক্ত না হওয়াই আশ্চর্য।

মাঞ্চুরিয়ার এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে বললাম। ব্যাপারটা গুরুতর, কারণ চীনের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা এর উপরে নির্ভর করে। তার চেয়েও বেশি গুরুতর এটা আরেকটি কারণে : লীগ অব নেশন্সের প্রকৃত স্বরূপ কী, এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেই অন্যায় অত্যাচারেরও প্রতিকার করতে এটা কতখানি অক্ষম এবং অসহায়, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই ঘটনাতেই পাওয়া গেছে। ইউরোপের বড়ো বড়ো জাতিদের দুমুখো নীতি এবং তাদের চক্রান্ত-কৌশলেরও নমুনা এর মধ্যেই দেখা গেল। বিশেষ করে এই ব্যাপারটি উপলক্ষ্যে আমেরিকা (সে কিন্তু লীগের সভ্যও নয়) জাপানের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল, এবং তার ফলে প্রায় তার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবারই উপক্রম করেছিল। কিন্তু তার পরই দেখা গেল ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশরা গোপনে জাপানকেই সমর্থন করছে; দেখে আমেরিকারও সে দৃঢ়তা আর রইল না—জাপানের বিরুদ্ধে গেলে এরা সকলেই তাকে একা ফেলে সরে দাঁড়াবে বুঝে সে সতর্ক হয়ে গেল। লীগ খুব ধর্মপ্রাণ ভাষায় জাপানকেই অপরাধী বলে ঘোষণা করল; কিন্তু তার দণ্ডাদেশটা কার্যে পরিণত করবার জন্য কিছুই করল না। মাঞ্চুকুওর পুতুল-রাজ্যটিকে অবশ্য লীগের সভ্যরা এখনও স্বীকার করে নেবে না—কিন্তু সে অ-স্বীকৃতির ব্যাপারটা সবসুদ্ধ একটা প্রহসনেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

লীগ জাপানকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু ব্রিটেনের মন্ত্রীরা আর রাজদূতেরা এখনও নানাবিধ উপায়ে জাপানের আচরণেরই সাফাই গাইছেন। রাশিয়ার সম্বন্ধে ইংলণ্ড যে ব্যবহার দেখাচ্ছে, সেটা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মাস দুই আগে রাশিয়াতে কয়েকজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের বিচার হয়েছিল, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। বিচারে কয়েকজন খালাস পেয়েছে, দুজনের প্রতি অল্পকালের মতো কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। কিন্তু তাই নিয়ে ব্রিটেনে মহা চেঁচামেচি পড়ে গেছে; ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে হুকুম জারি করেছেন, রাশিয়ার কোনো পণ্য ব্রিটেনে ঢুকতে পাবে না। তার জবাবে রাশিয়াও ব্রিটিশ পণ্য রাশিয়াতে প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছে।*

অতএব মাঞ্চুরিয়া চীনের হস্তচ্যুত হল এবং চীন আরও অনেক কিছুই হারাল। জাপান চীনের বাকী অংশও দখল করবার চেষ্টা করতে লাগল। তিব্বত এখন স্বাধীন। মঙ্গোলীয় সোভিয়েটশাসিত দেশ, রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত।

আরও একটা বৃহৎ প্রদেশ নিয়ে চীনকে বিব্রত হতে হয়েছে। প্রদেশটির নাম সিন্‌কিয়াং বা চীনা-তুর্কিস্তান—তিব্বত আর সাইবেরিয়ার মাঝখানে এটি অবস্থিত। ইয়ারকন্দ আর কাশগড় এই প্রদেশটির অন্তর্গত; কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে লাডখ্-এর লে হয়ে বহু বণিকদল নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করে। এই প্রদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই তুর্কিজাতীয় মুসলমান। তাদের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, এমন কি নাম পর্যন্ত চীনাদের মতো। কিন্তু চীনের কেন্দ্রস্থল হতে তারা খুবই দূরে আছে, গোবি মরুভূমিই এই ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। চলাচলের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন ধরণের। চীনের সঙ্গে তাদের ঐক্যবন্ধন তেমন দৃঢ় নয় এবং তাদের মধ্যে তুর্কি জাতীয়তাবাদ মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মহাযুদ্ধের পর থেকে এই বিরাট অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মার-প্যাঁচ খেলার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও জাপান চীনের বিরুদ্ধে ও নিজেদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গোয়েন্দাগিরি করে, এবং স্থানীয় নেতাদের পরস্পর-বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে।

১৯৩৩ সনের গোড়ার দিকে সিন্‌কিয়াঙ প্রদেশে তুর্কিদের এক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইয়ারকন্দ ও কাশগড়ের পতন হল এবং একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। ব্রিটিশ পক্ষ অভিযোগ করলেন, এই বিদ্রোহের পিছনে রয়েছে সোভিয়েটের হাত। ওদিকে আবার সোভিয়েট খোলাখুলিই বলছেন, এই বিদ্রোহ খুঁচিয়ে তুলেছে কয়েকজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী; তাদের মতলব হচ্ছে সিন্‌কিয়াঙকে চীন ও রাশিয়ার মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ প্রাচীর-রাষ্ট্রে পরিণত করা, যেমন হয়েছে মাঞ্চুকুও। সিন্‌কিয়াঙে এই বিদ্রোহ ঘটিয়ে তুলেছেন যে ব্রিটিশ সেনানীটি, তাঁর নাম পর্যন্ত এরা প্রকাশ করে দিয়েছে।

মন্তব্য:—চীনা সরকারের সমর্থকগণ সিন্‌কিয়াঙের এই বিদ্রোহ দমন করে দিয়েছিল—খুবই সম্ভবতঃ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করে থাকবেন। ফলে মধ্য-এশিয়াতে সোভিয়েটের মর্যাদা গেল বেড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের মর্যাদা গেল কমে।

* পরবর্তী কালে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এই বাণিজ্যযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল।

সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র

৭ই জুলাই, ১৯৩৩

এবার ফিরে যাব রাশিয়াতে, সোভিয়েটের দেশে; যেখানে তার গল্পটি ছেড়ে এসেছিলাম সেইখান থেকেই আবার খেই ধরব। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে বিপ্লবের নেতা এবং প্রাণ-সঞ্চারক লেনিন মারা গেলেন সেই পর্যন্ত আমি বলেছিলাম। তার পরের অনেকগুলো চিঠি লিখেছি অন্যান্য দেশের কথা নিয়ে, কিন্তু সে চিঠিতেও বহুবার রাশিয়ার নাম উল্লেখ করেছি। ইউরোপের সমস্যা, বা ভারতের সীমান্তরেখা, বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশ তুরস্ক এবং পারশ্য, বা দূর-প্রাচ্যের দেশ চীন এবং জাপানের কথা বলতে গিয়ে রাশিয়ার নাম বার বার করে উঠে পড়েছে। এটা তুমি এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, একটিমাত্র দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবনকে অন্যান্য সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অত্যন্ত কঠিন, কঠিনই বা কেন বলি, রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক এবং পরস্পর-নির্ভরতা গত কবছর প্রচণ্ডরকম বেড়ে গেছে; অনেক দিক থেকে এই সমস্ত পৃথিবীটাই একটামাত্র অখণ্ড দেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। *ইতিহাস এখন পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে, সমগ্র জগতের ইতিহাসে;* সমগ্র পৃথিবীর দিকে একসঙ্গে তাকাতে পারলে তবেই এখন একটিমাত্র দেশেরও ইতিহাসকে ঠিকমতো বোঝা সম্ভব হয়।

ইউরোপ আর এশিয়া জুড়ে যে বিশাল অঞ্চলটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত হয়ে আছে, ধনিকতন্ত্রী জগৎ থেকে সে আলাদা; অথচ তবুও সর্বত্রই সেই অন্য জগৎটির সঙ্গে তার সারাক্ষণ সংশ্রব ঘটছে, সংঘাতও হচ্ছে অনেক সময়ে। আগের অনেক চিঠিতে তোমাকে বলেছি, প্রাচ্য জগতের প্রতি সোভিয়েট সরকার একটা অতি উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তুরস্ক, পারশ্য এবং আফগানিস্তানকে সাহায্য দিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন, তার পর হঠাৎ একদিন সে বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। বলেছি, কী করে ইংলণ্ডে আর্কস খানাতল্লাসী হল, জিনোভিয়েবের চিঠি আবিষ্কৃত হল—পরে জানা গেল সে চিঠিটা জাল, তবু কিন্তু সেই চিঠিটা ব্রিটেনে একটা সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছিল। এবার তোমাকে আমি নিয়ে যাব সোভিয়েট রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে—দেখবে, সেখানে সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে যে অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর পরীক্ষা চলছিল তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস।

বিপ্লবের পর প্রথম চারটি বছর, ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত, রাশিয়াকে নানাবিধ অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ থেকে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হল। দেশের ইতিহাসে সে একটা অভিনব উত্তেজনা এবং নাটকীয় ঘটনার যুগ—যুদ্ধ, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, অনাহার এবং মৃত্যুর কাহিনীতে ভরপুর; তার আকাশকে ভাস্বর করে রেখেছিল জনসাধারণের আত্মোৎসর্গের পরম আগ্রহ, এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাদের অপূর্ব বীরত্ব। সে বীরত্ব, সে আত্মোৎসর্গের তখনই পুরস্কার কিছু মিলবে না তারা জানত; তবু তাদের মনে ভরা ছিল প্রকাণ্ড আশা এবং ভবিষ্যতের ভরসা—সেই আশার প্রেরণাতেই তারা তাদের সেদিনের সেই অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশাকে সহ্য করতে পেরেছিল, শূন্য উদরের তাড়নাকেও কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। এই যুগটার নাম 'সামরিক কমিউনিজ্‌মের যুগ'।

তার পর ১৯২১ সনে লেনিন 'নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' বা NEP-এর (নেপ-এর) উদ্‌বোধন করলেন, দেশের লোকের সে সংগ্রামেরও উগ্রতা ঈষৎ একটু কমল। এটা হল কমিউনিজ্‌মের আদর্শ থেকে একটুখানি পিছন হটে যাওয়া, দেশে বুর্জোয়া যারা আছে তাদের সঙ্গে একটা মীমাংসাস্থাপন। তার মানে অবশ্য এ নয় যে বলশেভিক নেতারা তাঁদের উদ্দেশ্যটাকে বদলে ফেলেছিলেন। এটা শুধু ছিল তাঁদের ক্ষণিক বিরাম—এক পা পিছিয়ে গিয়ে তাঁরা একটুখানি

বিশ্রাম করে নিলেন, নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে নিলেন, যেন পরে আবার একসঙ্গে অনেক-পা সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। অতএব সোভিয়েটরা তখন স্থির হয়ে বসল; জাতির অনেকটাই তখন ধ্বংস, বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তাকে আবার গড়ে তোলবার বিপুল কর্তব্যে হাত দিল। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বানাবার জন্য তখন তাদের চাই কলকব্জা, চাই মালপত্র—রেলওয়ে ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, মোটর ট্রাক, ট্র্যাক্টর, কারখানা বসাবার যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম। এগুলো সবই তাদের কিনতে হবে বিদেশের কাছ থেকে, অথচ কিনবার টাকা তাদের মোটেই নেই। অতএব তারা এই-সব বিদেশিদের কাছে ধার পাবার চেষ্টা করল, যেন যে-সব মাল তারা কিনছে তার দামটা পরে সুবিধামত কিস্তি করে শোধ দিতে পারে। ধার পাওয়া যায় শুধু সেইখানেই যেখানে দুটো দেশের মধ্যে সদ্‌ভাব আছে; যেখানে তারা সরকারিভাবে পরস্পরকে স্বীকারই করতে রাজি নয় সেখানে কে কাকে ধার দেবে! অতএব সোভিয়েট রাশিয়া তখন ইউরোপের বড়ো বড়ো জাতিদের কাছে আমল পাবার জন্য, তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু এই বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মন বলশেভিকদের এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপের উপরে বিদ্বেষে ভরা; তারা জানে কমিউনিজ্‌ম্ একটা বীভৎস ব্যাপার, যে করেই হোক তাকে উচ্ছেদ করতেই হবে। বিদেশীদের হস্তক্ষেপজনিত যুদ্ধের সময়েই অবশ্য তারা এর উচ্ছেদ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, সে চেষ্টা সফল হয় নি। সোভিয়েটের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে পারলেই তারা খুশি হত। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ যে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন তাকে অবহেলা করে চলা কঠিন কাজ। তার চেয়েও বড়ো কঠিন হচ্ছে খদ্দেরকে অবহেলা করা—সে খদ্দের প্রকাণ্ড পরিমাণ দামী দামী কলকব্জা কিনতে চাইছে। রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, জর্মানি ইংলণ্ড আমেরিকা শিল্পপ্রধান দেশ, এদের মধ্যে বাণিজ্য চললে দু'পক্ষেরই তাতে লাভ, কারণ রাশিয়া তখন কলকব্জা কিনতে চায়, তার বদলে শস্তাদরে খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল দেবার সামর্থ্য রাখে।

শেষপর্যন্ত প্রমাণ হল, কমিউনিজ্‌ম্-বিদ্বেষের চেয়ে পয়সার টানই বড়ো; প্রায় সমস্ত দেশই সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নিল, এদের অনেকে তার সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধিও করে ফেলল। শুধু একটিমাত্র দেশ আগাগোড়াই সোভিয়েট সরকারকে মেনে নিতে আপত্তি জানিয়ে এসেছে, সে হচ্ছে আমেরিকা। রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য অবশ্য কিছু কিছু চলেছে।*

এমনি করে সোভিয়েট সরকার ধনিকতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশদের প্রায় সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করে ফেললেন; এদের মধ্যে যে পরস্পর রেষারেষি চলছে তার সুযোগ নিয়ে নিজেদের খানিকটা লাভও গুছিয়ে নিলেন; ১৯২২ সনে যখন পরাজিত জর্মানি তাঁদের মৈত্রী কামনা করল এবং রাপালো সন্ধি স্থাপিত হল, তখনও ঠিক এই সুযোগই রাশিয়ার এসেছিল। কিন্তু এদের এই আপোষের স্থায়িত্ব কিছুই ছিল না; ধনিকতন্ত্র ও কমিউনিজ্‌ম্, এই দুটি প্রথার মধ্যে মূলত একটা অসামঞ্জস্য ছিল। বলশেভিকরা সারাক্ষণই উৎপীড়িত এবং শোষিত মানুষকে আত্মরক্ষায় উৎসাহিত করছিল; উপনিবেশ-দেশগুলির অধীন জাতি এবং কারখানার শ্রমিক, সকলকেই ডেকে বলছিল—জাগো, শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। এটা তারা সরকারি-ভাবে করত না, করত কমিণ্টার্ন বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মারফত। ওদিকে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা, বিশেষ করে ইংলণ্ড, সোভিয়েটের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করবার উদ্দেশ্যে সারাক্ষণ চক্রান্ত বিস্তার করছিল। অতএব এদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হতে বাধ্য; প্রায়ই বাধতও ঠোকাঠুকি—তখন দু'পক্ষের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিত। ১৯২৭ সনে আর্কস্ খানাতল্লাসীর ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, এর কথা তোমাকে [illegible]। এর কারণ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়; ইংলণ্ড হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে প্রধান,

* ১৯৩৩ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে মেনে নিলে পর উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।
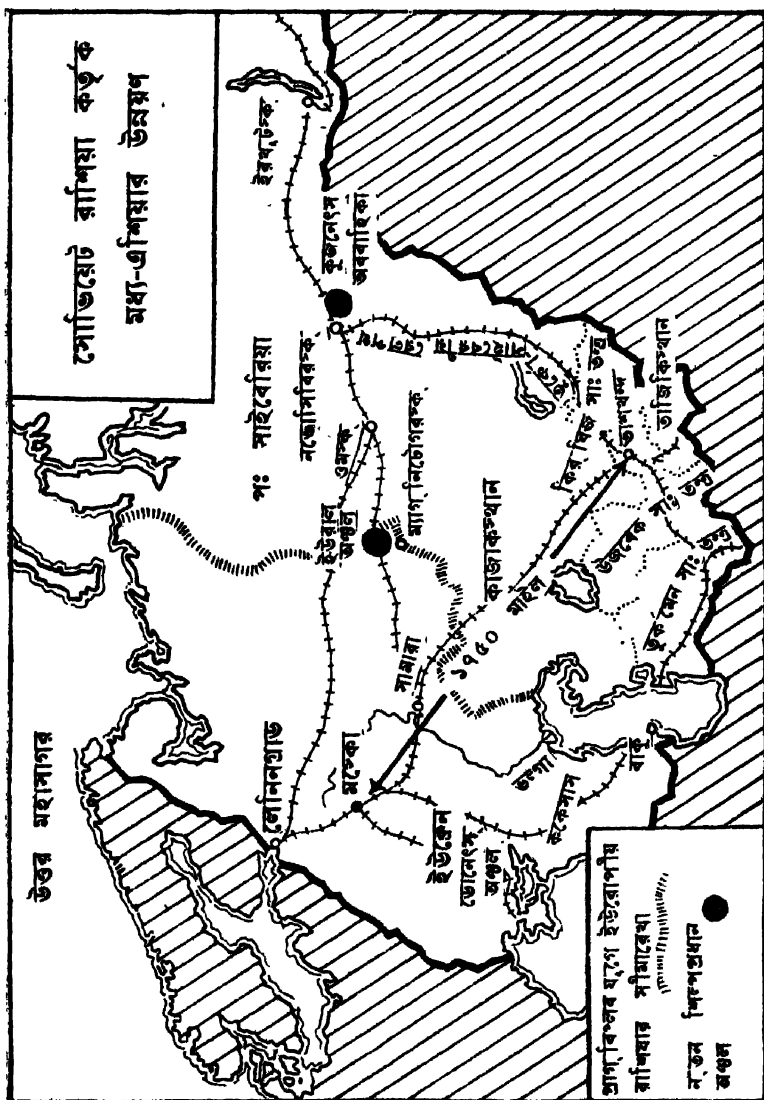
আর সোভিয়েট রাশিয়া হচ্ছে এমন একটা মতবাদের প্রতীক যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদেরই মূলোচ্ছেদ করতে চায়। কিন্তু এই দুটি শত্রু দেশের মধ্যে বিবাদের এর চেয়েও বেশি কারণ কিছু আছে বলে মনে হয়—জারশাসিত রাশিয়া আর ইংলণ্ডের মধ্যে বহু পুরুষ ধরে যে বংশানুক্রমিক এবং কুল-প্রথানুযায়ী শত্রুতা চলে এসেছে, এতেও হয়তো তারই রেশ বর্তমান।

ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা এখন ভয়ে বিহ্বল : সে ভয় সোভিয়েটের সেনা-বাহিনীকে ততটা নয়, যতটা তার তুলনায় অলক্ষ্য অথচ তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান এবং বিপজ্জনক একটি বস্তুকে—সে বস্তুটা হচ্ছে সোভিয়েটের মতবাদ আর কমিউনিস্টদের প্রচারকার্য। এর পাল্টা জবাব হিসাবে এরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা অবিশ্রাম এবং অনেকাংশে মিথ্যা প্রচারকার্য চালাচ্ছে; সোভিয়েটদের দুর্বৃত্ততা সম্বন্ধে অত্যন্ত আশ্চর্য সব গল্প রটাচ্ছে। সোভিয়েট নেতাদের সম্বন্ধে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনীতিবিদরা এমন সব ভাষা ব্যবহার করছেন, যা একমাত্র যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের সম্বন্ধে ছাড়া তাঁরা কখনোই কারও সম্বন্ধে উচ্চারণ করতেন না। লর্ড বার্কেনহেড্ সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিবিদদের বর্ণনা দিয়েছিলেন 'একটা খুনির দল' বলে, 'একদল পেটমোটা ব্যাং' বলে; অথচ সেটা এমন একটা সময়ে যখন লোকে জানত এই দুই দেশের মধ্যে শুধু মৈত্রী নয়, কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত আছে। এরকম অবস্থাতে সোভিয়েট এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে কোনো সত্যকার বন্ধুত্ব থাকতে পারে না, এটা সহজেই বোঝা যায়। এদের দু'পক্ষের যে প্রভেদ সে একেবারে গোড়ার নীতি নিয়েই। বিশ্বযুদ্ধের বিজেতা আর বিজিত জাতিরাও হয়তো আবার একদিন একত্র মিলতে পারবে, কিন্তু কমিউনিস্ট আর ধনিকতন্ত্রীতে মিল কোনোদিনই হবার নয়। সন্ধি এদের মধ্যে যদি-বা হয়, সে শুধু [illegible]য়ক সন্ধিই হতে পারে; সে সন্ধি আসলে একটা যুদ্ধ-বিরতি মাত্র।

বিদেশীদের কাছে রাশিয়ার যত ঋণ ছিল সোভিয়েট রাশিয়া তার টাকা দিতে অস্বীকার করেছে; এই নিয়েই তার সঙ্গে ধনিকতন্ত্রী দেশদের বারবার করে ঝগড়া-তর্ক হয়েছে। এখন আর এ প্রশ্নটা তেমন জ্যান্ত ব্যাপার নয়, কারণ যা দুঃসময় পৃথিবীতে পড়েছে তার ধাক্কায় প্রায় কোনোদেশই তার ঋণের টাকা ঠিকমতো মিটিয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু তবুও থেকে থেকেই এই আলোচনাটা এখনও উঠে পড়ছে। বলশেভিকদের আগে জার অন্যান্য দেশদের কাছে যত টাকা ধার করেছিলেন, বলশেভিকরা শাসনভার হাতে নিয়েই বলল, সেটা আমাদের দেনা নয়, আমরা শোধ করব না। এই নীতি এরা অনেক আগেই ঘোষণা করেছিল—১৯০৫ সনে, যে বিপ্লবটা তখন ব্যর্থ হল তার সময়েই। এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের কাছে তাদের যে টাকা পাওনা ছিল, তারও দাবি সোভিয়েটেরা ছেড়ে দিল। তাছাড়া জর্মানি যে ক্ষতিপূরণ দেবে তারও কোনো অংশ তারা দাবি করল না। ১৯২২ সনে এই-সব দেশের টাকা সম্বন্ধে মিত্র-পক্ষের সরকাররা সোভিয়েটদের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন। উত্তরে সোভিয়েটরা বলল, অতীতকালেও বহু ধনিকতন্ত্রী দেশই বহুবার এইভাবে দেনা এবং দায়িত্ব অস্বীকার করেছে, বিদেশীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—সেই কথা আমরা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। "বিপ্লব থেকে যে সরকার বা যে ব্যবস্থার উৎপত্তি, যে-সরকার বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তার কোনো দায়িত্ব বা দেনা মেনে নিতে সে বাধ্য নয়।"। বিশেষ করে একটি কথা সোভিয়েট সরকার মিত্র-পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—মিত্রপক্ষেরই একটি দেশ, ফ্রান্স তার প্রসিদ্ধ বিপ্লবের সময়ে কী করেছিল ভেবে দেখ :

"ফ্রান্স বলে, সে-ই ফরাসি কনভেনশনের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী। এই কনভেনশনে, ১৭৯২ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করা হয়েছিল 'স্বেচ্ছাচারী রাজারা যে-সব সন্ধি স্থাপন করে গেছে, প্রজাদের সার্বভৌম ক্ষমতা তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে না।' এই ঘোষণা অনুসারে বিপ্লবী ফ্রান্স শুধু পূর্ববর্তী রাজাদের আমলে অন্যান্য দেশদের সঙ্গে যে-সব রাজনৈতিক সন্ধিপত্র রচিত হয়েছিল সেইগুলোকেই ছিঁড়ে ফেলে দিল না, অন্যদের কাছে তার যে জাতীয় ঋণ ছিল তাও শোধ করতে অস্বীকার করল।"

ঋণ অস্বীকার করে সোভিয়েট সরকার এইভাবে তার সাফাই দিল; কিন্তু অন্যান্য দেশদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে তার তখন এতখানি আগ্রহ যে এর পরেও ঋণের প্রশ্নটা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রইল। কিন্তু এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল যে: সেই দেশের সরকারপক্ষ আগে সোভিয়েটকে বিনাশর্তে স্বীকার করে নেবেন, তবেই সে আলোচনা হতে পারবে নইলে নয়। বাস্তবিকই ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং আমেরিকাকে তাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেবে বলে বহু প্রতিশ্রুতি সোভিয়েট সরকার দিয়েছিলেন; কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে এই ধনিকতন্ত্রী দেশদের তরফ থেকে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল না।

রাশিয়ার কাছে ব্রিটেন যে টাকার দাবি দিচ্ছিল, সোভিয়েট সরকার তার পালটা আবার ব্রিটেনের কাছেই একটা মজার দাবি করে বসল। সরকারি ঋণ, যুদ্ধ-সংক্রান্ত ঋণ, রেলওয়ে বণ্ড এবং ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত লগ্নী ইত্যাদি নিয়ে রাশিয়ার কাছে ব্রিটেনের মোট দাবির পরিমাণ ছিল ৮৪,০০,০০,০০০ পাউণ্ডের মতো। বলশেভিকরা পাল্টা দাবি খাড়া করল: রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা সোভিয়েটের বিরোধীপক্ষকে সাহায্য করেছিল; অতএব গৃহযুদ্ধে রাশিয়ার যে ক্ষতি হয়েছে তার দরুন ক্ষতিপূরণের একটা অংশ ব্রিটেনকে মিটিয়ে দিতে হবে। হিসাব কষে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল ৪,০৬,৭২,২৬,০৪০ পাউণ্ড; রাশিয়া বলল এর মধ্যে ব্রিটেনের দেয় অংশের পরিমাণ হচ্ছে মোটামুটি ২,০০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড। অতএব ব্রিটেন যে-টাকার দাবি দিয়েছিল, তার উপরে রাশিয়ার পাল্টা দাবির পরিমাণ দাঁড়াল তার প্রায় আড়াই গুণ।

বলশেভিকদের এই পাল্টা দাবির পিছনে যুক্তির জোরও নেহাৎ কম ছিল না। নজির হিসাবে তারা দেখিয়েছিল 'আলাবামা ক্রুজার' সংক্রান্ত বিখ্যাত কাহিনীটিকে। ১৮৬০ সনের পরে আমেরিকাতে যে গৃহযুদ্ধ হয়, সেই সময়ে দক্ষিণ-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির জন্য এই জাহাজখানি ইংলণ্ডে তৈরি করা হয়। গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পরে এই জাহাজখানা লিভারপুল থেকে যাত্রা করল; উত্তর-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির জাহাজ এবং বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করল। তাই নিয়ে ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হল। আমেরিকা বলল, যুদ্ধের মধ্যে এই ক্রুজারটিকে দক্ষিণ-অঞ্চলের রাষ্ট্রদের হাতে সমর্পণ করা ইংলণ্ডের পক্ষে খুবই অন্যায় কাজ হয়েছে; অতএব এই ক্রুজার তাদের যত ক্ষতি করেছে তার সমস্তখানিরই দরুন ক্ষতিপূরণ তারা ব্রিটেনের কাছে দাবি করল। ব্যাপারটাকে মীমাংসার জন্য সালিশীতে দেওয়া হল; শেষপর্যন্ত ইংলণ্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩২,২৯,১৬৬ পাউণ্ড যুক্তরাষ্ট্রকে মিটিয়ে দিতে বাধ্য হল।

একটিমাত্র জাহাজ বানিয়ে দিয়ে তার দরুনই এতখানি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল ইংলণ্ডকে; রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে সে যতখানি অংশ গ্রহণ করেছে তার গুরুত্ব এবং ফল আরও অনেক বেশি। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন, বিদেশীদের হস্তক্ষেপের ফলে রাশিয়াতে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল, তাতে লোকই মারা গেছে ১৩,৫০,০০০ জন।

রাশিয়ার এই পুরোনো ঋণের সমস্যাটির আজও পর্যন্ত চরম মীমাংসা হয় নি; শুধু বহুকাল অতিক্রম হয়ে গেছে বলেই এখন এর গুরুত্বও আর বিশেষ নেই। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে, রাশিয়ার ক্ষেত্রে যে ঋণ-অস্বীকার করা দেখে ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মনি ইতালি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ধনিকতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাও কতকটা সেই 'অন্যায়' আচরণটাই করতে লেগে গেছে। একথা অবশ্য সত্য, তারা তাদের ঋণকে অস্বীকার করছে না, বা ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থারও মূল উচ্ছেদ করতে চাইছে না। তারা শুধু টাকা দেবার কিস্তিটা খেলাপ করছে এবং টাকা দিচ্ছে না।

অন্যান্য দেশদের প্রতি সোভিয়েট সরকার যে নীতি অবলম্বন করলেন সে হচ্ছে, প্রায় যে-কোনো প্রকারে হোক শান্তিস্থাপনের নীতি। তাঁদের তখন সময় পাওয়া দরকার, শক্তিসঞ্চয় করে নেবার সময়। আর বিরাট একটা দেশকে সমাজতন্ত্রের ধারায় তাঁরা গড়ে তুলতে চাইছেন, তাঁদের সমস্তখানি মনোযোগ তখন সেই দিকেই নিবদ্ধ। অন্যান্য দেশে আশু কোনো সমাজ বিপ্লব ঘটে যাবে এমন ভরসা দেখা যাচ্ছিল না, অতএব "জগৎব্যাপী বিপ্লব" ঘটাবেন বলে যে ধারণা

তাঁদের ছিল সেটা তখনকার মতো ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। প্রাচ্য জগতের দেশদের সঙ্গে রাশিয়া বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করল; এই-সব দেশ ধনিকতন্ত্রী রীতিতে শাসন করা হচ্ছিল তা সত্ত্বেও। রাশিয়া তুরস্ক পারশ্য আর আফগানিস্তানের মধ্যে যে বহু সন্ধি আর চুক্তির জাল রচিত হয়েছিল তার কথা তোমাকে বলেছি। বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলোর প্রতি এদের সকলেরই সমান ভয় এবং বিতৃষ্ণা, সেইটাই হল এদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের বড়ো বন্ধন।

১৯২১ সনে লেনিন যে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত করলেন তার উদ্দেশ্য ছিল, ধনসম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করবার কাজে মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীকে দলে টেনে আনা। ধনী কৃষক বা কুলকদের—'কুলক' কথাটার মানে হচ্ছে হাতের মুষ্টি—চাঙ্গা করে রাখা হচ্ছিল না, কারণ কুলকরা ছিল ছোটো ছোটো রকমের ধনিক, ধনসম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করার কাজে তারা বাধা দিচ্ছিল। গ্রাম-অঞ্চলের সর্বত্র বিদ্যুৎশক্তির ব্যবস্থা করবারও একটা বিরাট আয়োজন লেনিন খাড়া করলেন; বিদ্যুৎ-তৈরির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কারখানা বসানো হল। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করা এবং দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করা। সকলের উপরে, এর দ্বারা তিনি কৃষকদের মধ্যে একটা শিল্পাশ্রয়ী মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেন তারা মনের দিক দিয়েও শহর অঞ্চলের শ্রমিক বা প্রোলেটারিয়েটদের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। কৃষকদের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের আলো জ্বলতে লাগল, তাদের ক্ষেত-খামারের অনেকখানি বিদ্যুতের শক্তিতে নিষ্পন্ন হতে লাগল; দেখেশুনে তারাও ক্রমে অভ্যস্ত সেকেলে আর কুসংস্কারের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারল, নূতন রকমে ভাবতে শিখল। শহর এবং গ্রামের মধ্যে, শহুরে লোকের আর কৃষকদের স্বার্থের মধ্যে সর্বত্রই একটা বিরোধ রয়েছে। শহরের শ্রমিক চায়, গ্রাম থেকে সে শস্তায় খাদ্য কিনবে কাঁচা মাল কিনবে, আর কারখানাতে যে-সব পণ্য সে তৈরি করছে সেগুলো চড়া দামে বিকোবে; আবার কৃষকও চায়, শহর থেকে সে যন্ত্রপাতি এবং কারখানার তৈরি অন্যান্য মালপত্র শস্তায় কিনবে, সে যে খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচামাল উৎপাদন করছে সেগুলো চড়া দরে বেচবে। চার বছর ধরে সামরিক কমিউনিজ্‌ম্‌ চলবার ফলে রাশিয়াতে এদের এই বিরোধটা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছিল। প্রধানত এই জন্যই, এই বিরোধের উগ্রতা কমিয়ে দেবার জন্যই লেনিন 'নেপ'-এর প্রবর্তন করলেন, কৃষকদের নিজস্বভাবে মালপত্র বিক্রি করবার সুযোগ দেওয়া হল।

দেশে বিদ্যুতের প্রচলন বাড়াবার জন্য লেনিনের অদ্ভুত উৎসাহ ছিল; এ সম্বন্ধে একটি সাঙ্কেতিক অঙ্ক তিনি খাড়া করেছিলেন, সেটা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অঙ্কটা হচ্ছে, "বিদ্যুত+সোভিয়েট=সমাজতন্ত্র"। লেনিনের মৃত্যুর পরেও এই বিদ্যুত-প্রবর্তনের কাজ প্রচণ্ড বেগে চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কৃষকদের মনে নেশা ধরাবার এবং কৃষিকার্যের প্রণালীর উন্নতি-সাধন করার উদ্দেশ্যে আরেকটি কাজ তিনি করলেন, চাষ এবং অন্যান্য কাজের জন্য বহু সংখ্যক ট্র্যাক্টর কাজে লাগিয়ে দিলেন। এই ট্র্যাক্টর যোগান দিল আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানি। এ ছাড়াও সোভিয়েট সরকার ফোর্ডের সঙ্গে একটা মস্ত বড়ো চুক্তি নিষ্পন্ন করলেন, তার ফলে রাশিয়াতে প্রকাণ্ড একটা মোটর-তৈরির কারখানা বসানো হল। সেখানে বছরে একলক্ষ মোটরগাড়ি তৈরি করা যেত। এই কারখানাটিতে প্রধানত ট্র্যাক্টর তৈরি করা হত।

সোভিয়েট সরকার আরেকটি কাজ করলেন, যার ফলে বিদেশী জাতিদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ উপস্থিত হল। কাজটি হচ্ছে তেল এবং পেট্রোল উৎপাদন করা এবং দেশের বাইরে গিয়ে বিক্রি করা। আজারবাইজানে এবং ককেশাস অঞ্চলের জর্জিয়াতে একটা অঞ্চল আছে সেখানে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। এর কাছাকাছি অনেক বড়ো একটা তেলপ্রধান অঞ্চল আছে. তার এলাকা পারশ্য মোসুল এবং ইরাক নিয়ে বিস্তৃত। হয়তো এই অঞ্চলটাও তারই একটা অংশ। আবার কাস্পিয়ান সাগরের তীরে আছে বাকু, সে হল দক্ষিণ-রাশিয়ার বিখ্যাত তেল-তৈরির শহর। পৃথিবীর বড়ো বড়ো তেলের কোম্পানিরা যে দরে তেল বেচত, সোভিয়েট সরকার তাঁদের তেল এবং পেট্রোল তার চেয়ে অনেক কম দরে বিদেশের বাজারে বেচতে শুরু করলেন। এই-সব বড়ো

বড়ো তেলের কোম্পানি, যেমন আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি, অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানি, রয়েল ডাচ শেল কোম্পানি ইত্যাদি—এদের প্রচণ্ড শক্তি; পৃথিবীর সমস্ত তেল-জোগানোর কাজ বস্তুত এদেরই হাতে ছিল। সোভিয়েট সরকার এদের চেয়ে কম দরে তেল বেচার ফলে এদের দারুণ ক্ষতি হল, অতএব এদের ক্রোধের সীমা রইল না। সোভিয়েটের তেলের বিরুদ্ধে এরা একটা যুদ্ধই ঘোষণা করল; তার নাম এরা দিল 'চোরাই তেল', কারণ ককেশাস অঞ্চলে যে তেলের খনিগুলো আছে, সোভিয়েট সরকার সেগুলোকে পূর্বতন ধনিক মালিকদের হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য এরাও এই 'চোরাই তেলে'র সঙ্গেই এসে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নিল।

এই চিঠিতে এবং অন্যান্য চিঠিতেও আমি সারাক্ষণই 'সোভিয়েট' বা সোভিয়েটদের নাম করেছি। অনেক সময়ে বলেছি, 'রাশিয়া' এই করল, 'রাশিয়া' ওই করল। কথাগুলোকে আমি কতকটা না-ভেবে চিন্তে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। বস্তুটা আসলে কী, তাই তোমাকে এবার বলব। এটা জান, বলশেভিক বিপ্লবের পর, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, পেট্রোগ্রাড শহরে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জারের সাম্রাজ্যটা একটা দৃঢ়সংবদ্ধ একজাতিপ্রধান রাষ্ট্র ছিল না—ইউরোপ এবং এশিয়া, দুই মহাদেশেরই অনেকগুলো অধীন জাতি এর অন্তর্গত ছিল, খাস রাশিয়া ছিল তাদের সকলের উপরে প্রভু। এই-সব অধীন জাতির মোট সংখ্যা প্রায় দু'শোর কাছাকাছি; এদের মধ্যে ধরন-ধারনের তফাত ছিল প্রচুর। জারের আমলে এদের অধীনস্থ জাতি বলেই গণ্য করা হত; এদের ভাষা, এদের সংস্কৃতিকেও অল্পবিস্তর পরিমাণে দাবিয়ে রাখা হত। মধ্য-এশিয়াতে যে অনুন্নত জাতিগুলো ছিল তাদের উন্নতির জন্য বস্তুত কোনো চেষ্টাই করা হত না। ইহুদিদের নিজের দেশ বলে কিছু ছিল না; কিন্তু সংখ্যালঘু জাতিদের মধ্যে এদের উপরে যতখানি নির্যাতন করা হত এমন বোধ হয় অনেককেই সইতে হয় নি; ইহুদিদের 'পোগ্রোম' বা ব্যাপক হত্যা-উৎসব ইতিহাসে কুখ্যাতি লাভ করেছে। এরই ফলে এই-সব নির্যাতিত জাতির বহু লোক রাশিয়ার বিপ্লব-আন্দোলনে গিয়ে যোগ দিয়েছিল, যদিও এদের প্রধান কাম্য ছিল জাতীয় বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব নয়। ১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবের পরে যে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হল, তাঁরা এই-সব ক্ষুদ্র জাতিদের অনেক রকম আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু কার্যত এদের জন্য কিছুই করলেন না। ওদিকে লেনিন কিন্তু বলশেভিক দলের প্রথম যুগ থেকে, মানে বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই, খুব জোর দিয়ে বলছিলেন, প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিতে হবে, তাতে যদি তারা সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্ক ছেদ করে, স্বাধীন হয়ে চলে যায়, তাতেও আপত্তি নেই। এটা ছিল বলশেভিকদের পুরোনো কর্মসূচীরই একটা অংশ। বিপ্লবের পরই বলশেভিকরা—তখন তারাই দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ—ঘোষণা করল, আত্মনিয়ন্ত্রণের এই নীতিতে তারা এখনও আগের মতোই বিশ্বাসী রয়েছে।

গৃহযুদ্ধের সময়েই জারের সাম্রাজ্য ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল; কিছুদিন যাবৎ সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অধীনে রইল শুধু মস্কো আর লেনিনগ্রাডের আশপাশে অল্প খানিকটা জায়গা। পশ্চিম-ইউরোপের দেশদের সাহায্য পেয়ে বাল্‌টিক সাগরের তীরদেশে অবস্থিত কয়েকটি দেশ—ফিনল্যান্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া—স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে গেল। পোল্যান্ড তো গেলই। তার পর গৃহযুদ্ধে রুশ সোভিয়েটের জয় হতে লাগল, বিদেশীদের বাহিনীগুলো দেশ ছেড়ে চলে যেতে লাগল; তারই সঙ্গে সঙ্গে সাইবেরিয়া এবং মধ্য-এশিয়াতে কতকগুলি পৃথক এবং স্বাধীন সোভিয়েট সরকার গড়ে উঠল। এই সরকারদের সকলেরই লক্ষ্য এক, অতএব স্বভাবতই এরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ১৯২৩ সনে এরা একত্র হয়ে 'সোভিয়েট ইউনিয়ন' গঠন করল এর আস্ত সরকারি নামটি হচ্ছে, দি ইউনিয়ন অব সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিক্‌স্। সাধারণত একে উল্লেখ করা হয় কথাগুলোর প্রথম অক্ষর কটা ধরে—U.S.S.R. (ইউ. এস. এস. আর)।

১৯২৩ সনের পরে এপর্যন্ত, ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্রদের সংখ্যার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে; কারণ দু-এক ক্ষেত্রে একটা প্রজাতন্ত্র ভেঙে একাধিকে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়নের মধ্যে প্রজাতন্ত্র আছে এই সাতটা :

(১) রাশিয়ান সোশ্যালিস্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েট রিপাবলিক বা আর. এস্. এফ্. এস্. আর.।

(২) হোয়াইট রাশিয়া এস্. এস্. আর.।

(৩) ইউক্রেন এস্. এস্. আর।

(৪) ট্রান্স-ককেশিয়ান সোশ্যালিস্ট ফেডারেটিভ্ এস্. আর.।

(৫) তুর্কমেনিস্তান বা তুর্কমেন এস্. এস্. আর.।

(৬) উজবেক এস্. এস্. আর।

(৭) তাজিকিস্তান বা তাজিক এস্. এস্. আর.।

মঙ্গোলিয়াও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কী একটা মৈত্রীসূত্রে আবন্ধ রয়েছে।

কাজেই দেখছ, সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে কয়েকটি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গড়া একটি যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এই প্রজাতন্ত্রদের মধ্যে কয়েকটি আবার নিজেরাই যুক্তরাষ্ট্র। যেমন রুশ এস্. এফ্. এস্. আর. হচ্ছে দুটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র। ট্রান্স-ককেশিয়ান এস্. এফ্. এস্. আর-এর মধ্যে তিনটি প্রজাতন্ত্র আছে—আজারবাইজান এস্. এস্. আর., জর্জিয়া এস্. এস্. আর, এবং আর্মেনিয়া এস্. এস্. আর। এই এতগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত এবং পরস্পর-নির্ভর প্রজাতন্ত্র; এছাড়া সে প্রজাতন্ত্রদের মধ্যে আবার বহু 'জাতিগত' এবং 'স্বতন্ত্র' অঞ্চল আছে. সর্বত্রই এত বেশি পরিমাণে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; প্রত্যেকটি জাতি যেন তার নিজের সংস্কৃতি এবং ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, যেন যতখানি সম্ভব স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। একটি জাতি বা গোষ্ঠী অন্য একটির উপরে যাতে প্রভুত্ব করতে না পারে, সে বিষয়ে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের সমস্যার এই যে মীমাংসার ব্যবস্থা সোভিয়েট সরকার করেছেন এটা আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করে দেখবার মতো কারণ আমাদের নিজেদেরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা সমাধান করবার আছে। বরং আমাদের যা সমস্যা তার তুলনায় সোভিয়েট সরকারের সমস্যা ছিল অনেক বেশি জটিল, কারণ তাঁদের ১৮২টি বিভিন্ন জাতিকে নিয়ে চলতে হচ্ছিল। সে সমস্যার যে সমাধান তাঁরা করেছেন সেটিও অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। প্রত্যেকটি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রত্যেককে তার নিজের কাজকর্ম নিজের শিক্ষা তার নিজেরই ভাষায় চালাতে উৎসাহ দিয়েছেন। এটা তাঁরা করেছেন শুধু এই সংখ্যালঘু জাতিদের মধ্যে যে পরস্পর থেকে পৃথক থাকবার বুদ্ধি আছে তাকেই প্রসন্ন রাখবার জন্য নয়; তাঁরা বুঝেছিলেন, এ-সব ব্যাপারে নিজস্ব দেশী ভাষা ব্যবহার করলে তবেই শুধু জনসাধারণের সত্যকার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব হয়। এই পন্থায় চলে ইতিমধ্যেই যা ফল তাঁরা পেয়েছেন সে অপূর্ব।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তাঁরা সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেন নি, বরং সে ঐক্য থেকে সকলকে অব্যাহতি দেবারই আয়োজন করেছেন। তবু কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ ক্রমশই পরস্পরের আরও নিকটে আকৃষ্ট হয়ে আসছে—এতখানি ঐক্য জারের কেন্দ্রায়িত শাসনের যুগেও তাদের মধ্যে কোনোদিন দেখা যায় নি। এর কারণ হচ্ছে, তারা সকলেই বিশেষ কতকগুলো আদর্শে বিশ্বাসী, একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে কাজ করছে। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেরই ইচ্ছা মাত্র সে ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে যাবার অধিকার আছে, তবু কেউ সেভাবে আলাদা হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা প্রায় দেখা যায় না। তার কারণ চারদিকে ধনিকতন্ত্রী জগতের শত্রুতা, এর মাঝখানে যে সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্ররা দাঁড়িয়ে আছে তাদের পক্ষে একত্র এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকবার সুবিধা অনেক।

ইউনিয়নের মধ্যে যে কটি প্রজাতন্ত্র আছে তার মধ্যে প্রধান স্বভাবতই হচ্ছে রুশ প্রজাতন্ত্রটি—আর. এস্. এফ্. এস্. আর.। এর এলাকা লেনিনগ্রাড থেকে একেবারে সাইবেরিয়ার

ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত। হোয়াইট রাশিয়া এস্‌. এস্‌. আর অবস্থিত পোল্যান্ডের ঠিক গায়ে। ইউক্রেন হচ্ছে দক্ষিণে, কৃষ্ণসাগরের তীরভূমি ধরে—এইটাই হচ্ছে রাশিয়ার শস্যভাণ্ডার। ট্রান্স-ককেশিয়ার তো নাম শুনেই বোঝা যায় ওটা ককেশাস পর্বত পেরিয়ে কাস্পিয়ান সাগর আর কৃষ্ণ সাগরের মাঝখানে অবস্থিত। ট্রান্স-ককেশিয়ান প্রজাতন্ত্রদের মধ্যে একটি হচ্ছে আর্মেনিয়া—সেই যেখানে দীর্ঘকাল ধরে তুর্কিরা আর আর্মানিরা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এসেছে। এখন সে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, দেখে মনে হয় এখন সে শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপ নিয়েই থিতিয়ে বসে গেছে। কাস্পিয়ান সাগরের অন্য পারে রয়েছে মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্র-তিনটি—তুর্কমেনিস্তান; উজবেকিস্তান, বোখারা আর সমরকন্দ এই দুটি প্রসিদ্ধ নগরী তার অন্তর্গত; আর তাজিকিস্তান। তাজিকিস্তান হচ্ছে আফগানিস্তানের ঠিক উত্তরে: এইটাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে নিকটবর্তী সোভিয়েট এলাকা।

মধ্য-এশিয়ার এই প্রজাতন্ত্র কটি আমাদের বিশেষ করে চিনে রাখবার বস্তু; কারণ বহু যুগ ধরেই মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে আমাদের সংশ্রব আছে। গত অল্পকয়েকটি মাত্র বছরের মধ্যে যে অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়েছে, তারই জন্য এরা মনকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে। জারদের আমলে এগুলো ছিল অত্যন্ত অনুন্নত স্থান, কুসংস্কারে ভরা, শিক্ষা বলে প্রায় কিছুই ছিল না এখানে, মেয়েরা বেশির ভাগই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকত। এখন তারা অনেক ব্যাপারে ভারতবর্ষকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

১৮০

পিয়াটিলেট্‌কা বা রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা

৯ই জুলাই, ১৯৩৩

লেনিন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার একচ্ছত্র নেতা। তাঁর সিদ্ধান্তকেই সকলে চরম বলে মেনে নিত; কোথাও বিবাদ বিসংবাদ হলে তাঁর কথাই হত আইন, সেই নির্দেশ শিরোধার্য করে কমিউনিস্ট দলের পরস্পর বিরোধী অংশরা আবার একত্র মিলে যেত। তাঁর মৃত্যুর পরে স্বভাবতই গোল বেধে গেল, প্রতিদ্বন্দ্বী দলরা, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদের কর্তৃত্ব হস্তগত করবার জন্য মারামারি শুরু করে দিল। বাইরের জগতের চোখে, এবং তার চেয়ে কিছু কম পরিমাণে রাশিয়ার মধ্যেও, লেনিনের পরে বলশেভিকদের মধ্যে ট্রট্‌স্কিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ট্রট্‌স্কিই ছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম নেতা; গৃহ-যুদ্ধে এবং বিদেশীদের হস্তক্ষেপকে ব্যাহত করে জয়ী হল যে লাল-ফৌজ, বিরাট বাধাবিপত্তির মধ্যে দাঁড়িয়েও তার সৃষ্টি ট্রট্‌স্কিই করেছিলেন। অথচ ট্রট্‌স্কি বলশেভিক দলে অল্পদিন মাত্র এসেছেন; লেনিন বাদে অন্যান্য পুরোনো বলশেভিকরা তাঁকে পছন্দও করতেন না, খুব বেশি বিশ্বাসও করতেন না। এই পুরোনো বলশেভিকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্টালিন। কমিউনিস্ট দলের তিনি তখন জেনারেল সেক্রেটারি, অতএব রাশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী এবং শক্তিশালী সংগঠনটি তাঁরই নির্দেশে চলত। ট্রট্‌স্কি এবং স্টালিনের মধ্যে মোটেই সদ্‌ভাব ছিল না। পরস্পরকে তাঁরা ঘৃণা করতেন, মানুষ হিসাবেও দুজনে ছিলেন একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। ট্রট্‌স্কি ছিলেন চমৎকার একজন লেখক এবং বক্তা; সংগঠনকর্তা এবং কাজের লোক হিসাবেও তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ম এবং ভাস্বর তাঁর বুদ্ধি, সেই বুদ্ধির জোরে তিনি বিপ্লবের সব দর্শনবাদ খাড়া করতেন; আবার বিরোধী পক্ষকে এমন ভাষায় আক্রমণ করতেন যে সে কথা চাবুকের মতো, বৃশ্চিক-দংশনের মতো গায়ে গিয়ে বিঁধত, রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দিত। তাঁর পাশে স্টালিনকে দেখে মনে হত অতি সাধারণ মানুষ, তাঁর কোনো

আড়ম্বর নেই, প্রাখর্য তো নেইই; অথচ তিনিও ছিলেন প্রকাণ্ড সংগঠনবিশারদ, মহাবীর যোদ্ধা; লোহের মতো কঠিন তাঁর সংকল্প। বস্তুত তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'ইস্পাতের মানুষ'। এত বড়ো দুজন ব্যক্তিকে একসঙ্গে ধরবার মতো স্থান কমিউনিস্ট দলের মধ্যে ছিল না।

স্টালিন এবং ট্রট্স্কির মধ্যে বিরোধটা ব্যক্তিগত, কিন্তু আরও বেশি কথাও তার মধ্যে ছিল। এ'রা দুজনে দুটি বিভিন্ন নীতিতে বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবকে দুটি বিভিন্ন পন্থায় সম্পূর্ণ করে তোলবার স্বপ্ন দেখতেন। বিপ্লবের বহু বছর আগেই ট্রট্স্কি 'চিরস্থায়ী বিপ্লবের' একটা মতবাদ রচনা করেছিলেন। তাঁর মত ছিল, একটিমাত্র দেশ একার চেষ্টায় পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে কিছুতেই পারে না, তা সে তার সুযোগ-সুবিধা যতই থাকুক। আগে একটা পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব হয়ে গেলে তবেই সত্যকার সমাজতন্ত্রবাদের দিন আসবে; কারণ তখনই শুধু কৃষকদের সত্য করে সমাজপন্থী করে তোলা যাবে। অর্থনৈতিক ক্রমবিবর্তনের পথে ধনিকতন্ত্রের ঠিক পরবর্তী উচ্চতর ধাপ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনিকতন্ত্র নিজেই ভেঙে পড়ে যায়—পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে আজকাল আমরা তারই সূচনা দেখতে পাচ্ছি। একমাত্র সমাজতন্ত্রই এই আন্তর্জাতিক ইমারতকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারে, তাই সমাজতন্ত্রবাদ সমাজে অপরিহার্য। এই ছিল মার্ক্সের মতবাদ। কিন্তু একটি মাত্র দেশে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক না হয়ে জাতিগত ভিত্তিতে যদি সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তবে তার মানে হবে অর্থনৈতিক বিবর্তনের একটা নিম্নতর ধাপে নেমে যাওয়া। সমস্ত প্রগতিরই, সামাজিক প্রগতিরও, প্রতিষ্ঠা অবশ্যই করতে হবে আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপরে, তার থেকে পিছিয়ে চলে যাওয়াটা সম্ভবও নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়। অতএব ট্রট্স্কির মত ছিল, একটিমাত্র পৃথক দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অর্থনীতির দিক থেকেই সম্ভব নয়; সোভিয়েট ইউনিয়ন অতি বৃহৎ দেশ, তবু সেখানেও নয়। সোভিয়েট এলাকাদেরও তো বহু জিনিসের জন্যই পশ্চিম-ইউরোপের শিল্পতন্ত্রী দেশদের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এটা যেন ঠিক শহর আর গ্রাম বা গ্রাম্য অঞ্চলদের মধ্যে যে সহযোগিতা চলে থাকে তারই মতো; শিল্পতন্ত্রী পশ্চিম-ইউরোপ হচ্ছে শহর, আর রাশিয়া তো প্রধানত গ্রামধর্মী দেশ। ট্রট্স্কি বললেন, রাজনীতির দিক থেকেও যদি বলি, চতুর্দিকে বহু ধনিকতন্ত্রী দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে একটি মাত্র পৃথক সমাজতন্ত্রী দেশের পক্ষে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এদের দু'য়ের মধ্যে মিল কোনো মতেই হতে পারে না। এই কথাটা কতখানি সত্য তার প্রমাণ আমরা প্রচুর পাচ্ছি। তখন হয় ধনিকতন্ত্রী দেশরা সে সমাজতন্ত্রী দেশকে ধ্বংস করে দেবে, আর না হয় ধনিকতন্ত্রী দেশগুলিতেও সমাজ-বিপ্লব ঘটে যাবে, সর্বত্রই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিছুকাল অবশ্য, হয়তো কয়েকটা বছর, এরা দুপক্ষ পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে, একটা অনিশ্চিত ভারসাম্য বজায় রেখে।

বিপ্লবের আগে এবং পরে, সমস্ত বলশেভিক নেতাদেরই মত মোটের উপর এইরকম ছিল মনে হয়। এ'রা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, কখন জগৎব্যাপী বিপ্লব, অন্তত ইউরোপের কতকগুলো দেশে বিপ্লব ঘটবে, তার প্রত্যাশায়। অনেকমাস ধরে ইউরোপের আকাশ বজ্রগর্ভ মেঘে ঢেকে রইল, কিন্তু তবু সে মেঘ ক্রমে কেটে গেল, ঝড় এল না। রাশিয়া তখন থিতিয়ে বসে 'নেপ' নিয়ে কাজ শুরু করল, অল্পবিস্তর একটা গতানুগতিক জীবনযাত্রাকেই আশ্রয় করে। তাই দেখে ট্রট্স্কি হাঁক ছাড়লেন, হুঁশিয়ার হও, জগৎ-ব্যাপী বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এর চেয়েও উগ্রতর একটা কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে, নইলে আমাদের এই বিপ্লবই ব্যর্থ হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁর এই ত্রুটি-নির্দেশের ফলেই ট্রট্স্কি এবং স্টালিনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হল—কয়েক বছর পর্যন্ত সে যুদ্ধের ধাক্কায় কমিউনিস্ট দলের ভিত্তি থরথর করে কাঁপতে লাগল। এই যুদ্ধের অবসান হল স্টালিনের সম্পূর্ণ জয়লাভে; তাঁর জয়ের প্রধান কারণ, দলের যন্ত্রটি তাঁরই ইঙ্গিতে চলত। ট্রট্স্কি এবং তাঁর সহযোগীদের বিপ্লবের শত্রু বলে গণ্য করা হল, দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ট্রট্স্কিকে প্রথমে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হল, তার পর আবার ইউনিয়নের এলাকা থেকেই বাইরে নির্বাসিত করা হল।

স্টালিন এবং ট্রট্স্কির মধ্যে বিরোধ শুরু হবার আপাত কারণ হল স্টালিনের প্রস্তাব। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, "কৃষকদের সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী করে তুলতে হবে, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে একটি কর্মোৎসাহী নীতি পরিবর্তন করা হোক। এর দ্বারা তিনি অন্যান্য দেশে কী ঘটল না ঘটল তার অপেক্ষায় না থেকেই রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। ট্রট্স্কি এই প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন, তার 'চিরস্থায়ী বিপ্লবের' ধুয়োটিকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন, বললেন, সে না হলে কৃষকদের পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া সম্ভব হবে না। কার্যত অবশ্য ট্রট্স্কির অনেকগুলো নির্দেশই স্টালিন মেনে নিলেন, কিন্তু নিলেন তাঁর নিজস্ব রীতিতে, ট্রট্স্কির নির্ধারিত রীতিতে নয়। এই সম্বন্ধে ট্রট্স্কি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "রাজনীতি ক্ষেত্রে 'কী' করা হল সেইটাই একমাত্র কথা নয়; 'কোন্ পন্থায়' সেটা করা হল, 'কার' সিদ্ধান্ত অনুসারে করা হল—একথাগুলোরও গুরুত্ব কম নয়।"

দুই মহাবীরের বিরাট দ্বন্দ্বের এইভাবে পরিসমাপ্তি হল; যে রঙ্গমঞ্চে ট্রট্স্কি এতকাল এমন বীরোচিত, এমন উজ্জ্বল ভূমিকা অভিনয় করেছেন, সেখান থেকে তাঁকে মার খেয়ে বিদায় নিতে হল। সোভিয়েট ইউনিয়নও তাঁকে ছেড়ে যেতে হল; সে ইউনিয়ন গড়ে তোলবার প্রধান উদ্যোগী যে কজন ছিলেন তিনি তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর বিদ্যুৎবর্ষী ব্যক্তিত্বকে প্রায় সমস্ত ধনিকতন্ত্রী দেশই ভয় করত, কেউই তাঁকে স্থান দিতে রাজি হল না। ইংলণ্ডে তিনি ঢুকবার অনুমতি পেলেন না, ইউরোপের অন্যান্য দেশরাও প্রায় সকলেই আপত্তি জানাল। অবশেষে তাঁর অস্থায়ী আশ্রয় মিলল তুরস্কে। তিনি বাস করতে লাগলেন প্রিন্‌কিপো-তে—এটা হচ্ছে ইস্তাম্বুলের কাছে একটা ছোটো দ্বীপ। এখন তিনি সম্পূর্ণ ভাবে লেখার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন এবং একখানি চমৎকার বই লিখলেন। সে হচ্ছে 'রুশ বিপ্লবের ইতিহাস'। তখনও তাঁর অন্তর স্টালিনের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল এবং তিনি স্টালিন আর তাঁর সহকর্মীদের মর্মভেদী ভাষায় সমালোচনা করতে লাগলেন; পৃথিবীর বহু স্থানে রীতিমতো একটি ট্রট্স্কি-পন্থী দল ইতিমধ্যেই গড়ে উঠল। এই দলটি সরকারি কমিউনিস্ট দলের ও কমিণ্টার্নের সরকারি কমিউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

ট্রট্স্কিকে সরিয়ে দিয়ে এবার স্টালিন তাঁর কৃষিসংক্রান্ত নূতন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে লেগে গেলেন। এই কাজে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিলেন তিনি। বিঘ্ন-বিপদ তাঁর সামনে অনেক ছিল। বুদ্ধিজীবীরা দুর্দশা আর বেকার-সমস্যায় পীড়িত, শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট চলছে। কুলক বা ধনী কৃষকদের উপরে তিনি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে কর বসালেন, তারপর সেই টাকা দিয়ে গ্রাম-অঞ্চলে বহু যৌথ-কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুললেন—যৌথ-কৃষিক্ষেত্র মানে বড়ো বড়ো সমবায়-চালিত ক্ষেত্র, সেখানে বহু সংখ্যক কৃষক একত্র হয়ে কাজ করে, আয়টাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কুলকরা এবং অধিকতর ধনী কৃষকরা তাঁর এই নীতিতে ক্ষুব্ধ হল; সোভিয়েট সরকারের উপরই অত্যন্ত চটে গেল তারা। তাদের ভয় হল, তাদের সমস্ত গরুবাছুর এবং ক্ষেতখামারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হয়তো তাদের দরিদ্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বণ্টন করে দেওয়া হবে; এই ভয়ে তারা বস্তুত তাদের সমস্ত জন্তু-জানোয়ারগুলোকে মেরেই ফেলল। এত পশু মেরে ফেলল এরা, যে পরের বছর দেশে খাদ্যদ্রব্য মাংস এবং দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ভয়ংকর অভাব পড়ে গেল।

এরকমের একটা আঘাত স্টালিনের প্রত্যাশার বাইরে ছিল। কিন্তু তবুও তিনি দৃঢ়চিত্তে তাঁর কার্যসূচী চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই কার্যসূচীকে আরও অনেক বাড়িয়ে তুলে একে একটা বিরাট পরিকল্পনাতে পরিণত করলেন তিনি; কৃষি এবং শিল্প দুই ব্যাপারেই সমগ্র ইউনিয়ন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাষ্ট্রচালিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এবং যৌথ-কৃষিক্ষেত্র তৈরি করে কৃষককে যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা হবে; বড়ো বড়ো কারখানা, জলচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র, খনি ইত্যাদি তৈরি করে সমস্ত দেশটাকে শিল্প প্রচেষ্টায় দীক্ষিত করে তুলতে হবে, এরই পাশাপাশি আবার আরও অসংখ্য রকমের কাজকর্ম শুরু করে দেওয়া হবে, যেমন শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান-চর্চা, সমবায় পদ্ধতিতে কেনা এবং বেচার রীতি প্রবর্তন, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া এবং সর্বদিক দিয়েই তাদের জীবনযাত্রার

মানকে উন্নত করে তোলা, ইত্যাদি। এই হচ্ছে রাশিয়ার বিখ্যাত 'পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা' বা রাশিয়ার নিজের ভাষায় 'পিয়াটিলেট্‌কা', অতি বিরাট পরিকল্পনা, আকাশস্পর্শী এর আকাঙ্ক্ষা। ধনশালী এবং উন্নত দেশের পক্ষেও পুরো এক-পুরুষ কালের মধ্যে একে কার্যে পরিণত করা কঠিন ব্যাপার; রাশিয়া অনুন্নত দেশ, দরিদ্র দেশ—সে যাচ্ছে এই কাজে হাত দিতে, এ যেন একটা চরম মূর্খতারই পরিচয়!

কিন্তু এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাটি রচনা করা হয়েছিল যথাসম্ভব সতর্কভাবে ভেবে-চিন্তে এবং তত্ত্বানুসন্ধান করে নিয়ে। এর আগে বৈজ্ঞানিকরা এবং ইঞ্জিনীয়াররা সমস্ত দেশটাকে মেপেজুখে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন; পরিকল্পনার একটি অংশকে আরেকটির সঙ্গে কীভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, অসংখ্য বিশেষজ্ঞ মিলে সে প্রশ্নের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে নিয়েছেন। তার কারণ, এই খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই ছিল সত্যকার কঠিন ব্যাপার। প্রকাণ্ড একটা কারখানা গড়ে তোলার কোনো মানেই থাকবে না, যদি তাকে চালাবার মতো কাঁচামাল না জোটে; তারপর কাঁচামাল যদি থাকেই, তাকেও আবার সে কারখানা পর্যন্ত এনে পৌঁছাতে হবে। অতএব তখন যানবাহন সমস্যার মীমাংসা করতে হল, রেলওয়ে তৈরি করতে হল। রেলওয়ে চালাতে আবার কয়লা লাগে, অতএব কয়লার খনি খোলবার ব্যবস্থা করতে হল। কারখানাটা চলবে, তার জন্যও শক্তির যোগান চাই। সেই শক্তি যোগাবার জন্য তৈরি করতে হল বিদ্যুৎ—সে বিদ্যুৎ এল জলের শক্তি থেকে, এবং জলের স্রোত পাবার জন্য বড়ো বড়ো নদীতে বাঁধ দিতে হল। তার পর আবার সেই বিদ্যুৎশক্তিকে তার খাটিয়ে কারখানা এবং কৃষিক্ষেত্রগুলো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল; শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে তাই দিয়ে আলো জ্বালানো হল। এত সমস্ত কাজ চালাতে হলেই বহু ইঞ্জিনীয়ার, মিস্ত্রী এবং দক্ষ শ্রমিক চাই; অল্পদিনের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারীকে এইভাবে শিক্ষিত করে নেওয়া বড়ো সহজ কথা নয়। মোটর ট্রাক্টর না হয় তৈরি করে কৃষিক্ষেত্রগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হল, সে ট্রাক্টর চালাবে কে?

এ শুধু দু'চারটে দৃষ্টান্ত দিলাম, এই থেকেই বুঝতে পারবে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তার জটিলতা কতখানি। এর কোথাও একটিমাত্র ভুল থেকে গেলে তার ফল অনেকদূর পর্যন্ত গড়াত; কাজেই এই শেকলের কোথাও একটিমাত্র আংটা দুর্বল বা ভাঙা থাকলে তার ফলে একত্রে বহু কাজেই দেরি হয়ে যেত বা বাধা পড়ে যেত। কিন্তু একটি প্রকাণ্ড সুবিধা রাশিয়ার ছিল যা ধনিকতন্ত্রী দেশদের নেই। ধনিকতন্ত্রী দেশে এই ব্যাপারটা সমস্তটাই ছেড়ে দেওয়া হয় ব্যক্তিবিশেষের আগ্রহ বা দৈবচক্রের উপরে; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতার ফলে চেষ্টা এবং শ্রমের অপব্যয়ও হয় অনেকখানি। সেখানে বিভিন্ন উৎপাদক ও বিভিন্ন শ্রমিকদলের মধ্যে কোনো পরস্পর সংযোগ বা সহযোগিতা নেই; যেটুকু সংযোগ দেখা যায় তাও ঘটে দৈবাৎ, বহু ক্রেতা এবং বহু বিক্রেতা একই বাজারে এসে একত্র হবার ফলে। এককভাবে এক একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা খাড়া করে নিতে পারে, নেয়ও। কিন্তু সে একক পরিকল্পনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানে হচ্ছে শুধু, অন্যান্য একক প্রতিষ্ঠানদের ডিঙিয়ে যাওয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের হারিয়ে দেওয়া। জাতির দিক থেকে, এর ফল হয় পরিকল্পনা করে চলার ঠিক বিপরীত; কারণ এর মানেই হচ্ছে দেশে পণ্যের বাহুল্য ঘটবে অথচ মানুষের অভাবও ঘুচবে না। সোভিয়েট সরকারের সুবিধা ছিল এই: সমগ্র ইউনিয়নের মধ্যে যেখানে যত বিভিন্ন প্রকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, কাজকর্ম চলছে—সমস্তকেই তাঁরা নিজের আয়ত্তে রেখে চালাতে পারেন; অতএব একটিমাত্র সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাও তাঁরা রচনা করতে পারলেন, কাজে খাটাতে পারলেন, সে পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যেকটি কাজই ঠিক তার যোগ্য জায়গাটি বেছে পেয়েছে। এর মধ্যে অপচয় ঘটবার কোথাও সম্ভাবনা ছিল না, এক হিসাবের ভুলে বা কাজের ত্রুটি থেকে যেটুকু অপচয় হতে পারে তাই ছাড়া। এখানে সমস্ত ব্যাপারই একটি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে অতএব সে ভুলও খুব তাড়াতাড়ি শুধরে নেওয়া যেত—অন্যত্র যেটি সম্ভব নয়।

এই পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য ছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টার ভিত্তি বেশ দৃঢ় করেই স্থাপন করা। কাপড়চোপড় ইত্যাদি যে-সব জিনিস সকল মানুষের দরকার, শুধু তাই তৈরি করবার কতকগুলো কারখানা খাড়া করে দিতেই এ'রা চান নি। সেটা খুব সহজেই করা যেত, বিদেশ থেকে কলকারখানা কিনে এনে বসিয়ে দিলেই হত—ভারতবর্ষে যেমন করা হচ্ছে। ভোগ্য পণ্য তৈরি করবার এই-সব শিল্পকে বলা হয় 'হালকা শিল্প'। এই 'হালকা শিল্পদের' স্বভাবতই নির্ভর করতে হয় 'ভারী শিল্প'দের উপরে—মানে লোহা, ইস্পাত এবং কল-কব্জা তৈরির শিল্প, যারা হালকা-শিল্পদের প্রয়োজনমতো কলকব্জা যন্ত্রপাতি ইঞ্জিন ইত্যাদির যোগান দেয়। সোভিয়েট সরকার তার চেয়েও অনেক বেশি দূরে সামনে তাকালেন, স্থির করলেন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা তাঁরা এই মূল বা ভারী শিল্পগুলোকেই গড়ে তুলবেন। সেটা করতে যদি পারেন, তবেই শিল্পতন্ত্রের ভিত্তি দেশে খুব দৃঢ় করে বসানো হয়ে যাবে; তার পর হালকা শিল্পগুলিকেও সহজেই তৈরি করে নেওয়া যাবে। তাছাড়া এই ভারী শিল্পগুলো গড়ে তোলা হয়ে গেলে কলকব্জা বা যুদ্ধের উপকরণের জন্যও রাশিয়াকে আর অন্য দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না।

অবস্থাদৃষ্টে তখন এই ভারী-শিল্প প্রতিষ্ঠার সংকল্পটাই রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এ করতে যাওয়ার মানেই ছিল অনেকখানি বেশি উদ্যোগ আয়োজন করা, দেশের লোকের উপরে প্রচণ্ড একটা চাপ ফেলা। হালকা শিল্পের তুলনায় ভারী শিল্প বানানোর এবং চালানোর ব্যয় অনেক বেশি; দুয়ের মধ্যে তার চেয়েও বড়ো তফাত, হালকা শিল্প থেকে যে-সময়ের মধ্যে লাভ আসতে শুরু করে, ভারী শিল্পের তার চেয়ে অনেক বেশি দেরি লাগে। কাপড়ের কলে কাজ শুরুই হয় কাপড় তৈরি করা দিয়ে; সে কাপড় তখনই লোকের কাছে বেচে ফেলা যায়। ভোগ্য পণ্য তৈরি করবার যতরকম হালকা শিল্প, সকলের পক্ষেই এই কথা খাটে। কিন্তু লোহা ইস্পাতের কারখানায় হয়তো তৈরি হবে ইস্পাতের রেল আর রেল ইঞ্জিন। রেলওয়ে লাইন যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ এগুলোকে ভোগ করা এমন কি কাজে লাগানোই সম্ভব হয় না। সে লাইন বসাতে সময় লাগে, ততক্ষণ প্রচুর পরিমাণ টাকা এই কারখানাতে আটকে পড়ে থাকে, দেশটাও সেই পরিমাণে টাকার অভাবে কষ্ট পায়।

অতএব রাশিয়ার পক্ষে প্রচণ্ড বেগে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার এই আয়োজনের মানেই দাঁড়াল বিরাট একটা কৃচ্ছ্রসাধন। এত সমস্ত ব্যাপার গড়ে তোলা হচ্ছে, বিদেশ থেকে এত সমস্ত কলকব্জা কিনে আনা হচ্ছে—এর দাম দিতে হবে, নগদ টাকা এবং সোনা দিয়েই দিতে হবে। কিন্তু দেবার উপায় কী? সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকেরা পেটের কাপড় কষে টেনে বাঁধল, অনাহারে অর্ধাহারে রইল, অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পর্যন্ত ব্যবহার না করে রইল, যেন এদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া যায়। নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তারা বিদেশের বাজারে বেচতে পাঠাল, বেচে যা দাম পেল তাই দিয়ে কলকব্জার দাম শোধ করে দিল। যা কিছু যেখানে বেচবার পথ আছে সমস্তই পাঠিয়ে দিতে লাগল তারা—গম, সর্ষে, যব, শস্য, তরিতরকারি, ফল, ডিম, মাখম, মাংস, হাঁসমুরগী, মধু, মাছ, নোনামাছ, চিনি, তেল, মিঠাই, ইত্যাদি। এই-সব ভালো জিনিস বাইরে পাঠাবার মানেই হল নিজেরা এ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা। রাশিয়ার লোকেরা মাখম খেতে পেত না বা পেলেও অতি সামান্যই পেত—কারণ তাদের সব মাখম বাইরে চালান যাচ্ছে, তাই দিয়ে কলকব্জার দাম শোধ করা হচ্ছে। বহু জিনিস সম্বন্ধেই এই অবস্থা।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত এই বিরাট প্রচেষ্টার শুরু হল ১৯২৯ সনে। আবার দেশে বিপ্লবের চেতনা জেগে উঠল। আদর্শের আহ্বানে দেশের জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠল, এই নূতনতর সংগ্রামের মধ্যে তাদের সমস্তখানি উদ্যম এবং শক্তি নিঃশেষে ঢেলে দিল তারা। এ সংগ্রাম বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, দেশের ভিতরকার শত্রুর সঙ্গেও নয়। এ হল রাশিয়াতে যে প্রগতির অভাব তখনও টিকে রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধনিকতন্ত্রের যে ভগ্নাবশেষ তখনও বেঁচে [illegible] বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জীবনযাত্রার মান তখনও যে নিম্নস্তরে পড়ে রয়েছে তার বিরুদ্ধে সং[illegible] অপূর্ব উৎসাহভরে তারা আরও বৃহত্তর আত্মোৎসর্গ স্বীকার করে নিল, তপস্বীর বাহুল্যবর্জি[illegible]

কঠোর জীবন যাপন করতে লাগল, মহান ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে বলি দিল তারা—সে ভবিষ্যৎ তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবার অধিকার এবং গৌরব তাদেরই নিজস্ব।

এর আগেও বহু জাতি বহুবার একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের সমস্তখানি প্রয়াস একত্র করে ঢেলে দিয়েছে; কিন্তু সে শুধু যুদ্ধের সময়ে। বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে জর্মানি ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রত্যেকেই একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে—যুদ্ধে জিততে হবে। এই উদ্দেশ্যের কাছে অন্য-সবকিছু প্রয়োজনকেই তারা গৌণ বলে জেনেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়াই সর্বপ্রথম জাতির সমস্তখানি শক্তি একত্রিত করে ঢেলে দিল ধ্বংস করবার কাজে নয়, গড়ে তোলবার শান্ত সমাহিত ব্রতে—অনুন্নত একটি দেশকে তারা শিল্পপ্রচেষ্টায় অগ্রণী করে তুলবে, সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কিন্তু এর দরুন যে আত্মনিগ্রহ তাদের করতে হল, বিশেষ করে উচ্চতর এবং মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর যে কষ্ট সইতে হল সে একেবারে অপরিসীম—অনেকবার মনে হল যেন এদের এই আকাশস্পর্শী উচ্চাশা নিয়ে গড়া পরিকল্পনা এবার ভেঙে পড়বে, হয়তো সেই সঙ্গেই সোভিয়েট সরকারও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই সংগ্রাম সমানে চালিয়ে যেতে বিপুল সাহসের প্রয়োজন ছিল। বলশেভিকদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো চাঁইরাও ভেবেছিলেন, কৃষি-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার ফলে যে চাপ এবং দুর্দশা লোকের সইতে হচ্ছে তার বোঝা তারা সইতে পারবে না; অতএব এর খানিকটা লাঘব করা দরকার। কিন্তু স্টালিন সে পাত্র নন। নিঃশব্দে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি কাজ চালিয়ে গেলেন। কথা কইতে জানতেন না তিনি, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাও প্রায় করতেন না। স্থির হয়ে তিনি পথ চললেন, যেন অলঙ্ঘ্য ভাগ্য দেবতার তিনি লৌহময় প্রতিমূর্তি, নিয়তিনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই সংকল্পের ছোঁয়াচ কমিউনিস্ট এবং রাশিয়ার অন্যান্য কর্মীদেরও গায়ে লাগল, তাদেরও উদ্দীপ্ত করে তুলল।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকে সমর্থন করে সারাক্ষণ প্রচারকার্য চালানো হচ্ছিল; তার ফলে দেশের লোকের উৎসাহও প্রবল হয়েই রইল, নূতনতর উদ্যমে কাজে লাগবার প্রেরণা অনুভব করল তারা। বড়ো বড়ো জলচালিত বিদ্যুতের কারখানা তৈরি করা হচ্ছে, নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, পুল দেওয়া হচ্ছে, কারখানা এবং সার্বজনীন কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে—দেশের লোকেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই-সব চেয়ে চেয়ে দেখছিল। লোকের সবচেয়ে বড়ো কামনা ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া; স্থপতিবিদ্যার খুব বড়ো বড়ো নিদর্শন দেশে যা তৈরি হচ্ছে তার খুঁটিনাটি তথ্যে সংবাদ-পত্রের পাতা ভরা থাকত। মরুভূমি এবং স্তেপ-অঞ্চলে প্রজা বসানো হল, প্রত্যেকটি বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বড়ো বড়ো নূতন শহর গড়ে উঠল। দেশময় নূতন নূতন রাস্তা, নূতন নূতন খাল, নূতন নূতন রেলওয়ে তৈরি হল, তার অধিকাংশই বৈদ্যুতিক রেলওয়ে। বিমান-পথও তৈরি হল অনেক। রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, যুদ্ধসজ্জা তৈরির কারখানা, যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা তৈরি করা হল। ট্রাক্টর, মোটর গাড়ি, বড়ো বড়ো রেলওয়ে ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন, টারবাইন, এরোপ্লেন, সবই সোভিয়েট ইউনিয়নে তৈরি হতে লাগল। দেশের বিরাট বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রচলিত হল; লোকেরা ঘরে ঘরে রেডিও রাখতে লাগল। বেকার-সমস্যার চিহ্নমাত্র বাকি রইল না দেশে—এতরকমের ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং অন্যান্য সব কাজকর্ম চলেছে, দেশের যেখানে যত শ্রমিক ছিল সকলেই তার মধ্যে কোনো না কোনোটাতে লেগে গেল। বিদেশ থেকেও বহু দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার রাশিয়াতে চলে এল, রাশিয়া এদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিল। একথা মনে রাখতে হবে, ঠিক এই সময়টাতেই সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে বাণিজ্য সংকটের হিড়িক লেগেছিল, বেকারের সংখ্যা অদ্ভুতরকম বেড়ে যাচ্ছিল।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ খুব সহজে নিষ্পন্ন হয় নি। বহুবারই বহু বিষম বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঘটেছে, বহু চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বহু অপচয় হয়েছে। তবু সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঠেলেও কাজের গতি ক্রমেই দ্রুততর হয়ে উঠল, ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে কাজের তাগিদ আসতে লাগল। তার পর লোকেরা রব তুলল: "পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকে চার বছরে সম্পূর্ণ করা চাই,"—যেন সে বিরাট কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত

করার পক্ষে পাঁচবছর সময়ই যথেষ্ট কম ছিল না। সরকারিভাবে এই পরিকল্পনার পরিসমাপ্তিও হল ১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে, মানে ঠিক চার বছরের অন্তে। এবং তারই ঠিক সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে আবার নূতন একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করা হল।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কথা নিয়ে লোকের মধ্যে অনেকসময় মতভেদ দেখা যায়; কেউ বলেন সেটা অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে, কেউবা বলেন—না, একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। কোথায় কোথায় তার ব্যর্থতা, সেটা দেখিয়ে দেওয়া খুবই সহজ, কারণ অনেক ব্যাপারে এটাতে ঠিক আশার অনুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। রাশিয়াতে এখনও বহু ব্যাপারে প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্য বর্তমান; সবচেয়ে বড়ো অভাব হচ্ছে শিক্ষিত এবং কর্ম-বিশারদ শ্রমিকের। যত কারখানা দেশে তৈরি হয়েছে, তাদের চালাবার মতো অত শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার দেশে নেই; যত রেস্ত'রা আর রন্ধনাগার আছে অত ওস্তাদ রাঁধুনী নেই। এ-সব অসামঞ্জস্য অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই দূর হয়ে যাবে, অন্তত কমে আসবে। একটা কথা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে : এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ধাক্কায় রাশিয়ার স্বরূপটাই একদম বদলে গেছে। রাশিয়া ছিল সামন্ততন্ত্রী দেশ, হঠাৎ রাতারাতি সে একটা অগ্রণী শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়ে গেছে। সংস্কৃতির দিক দিয়েও আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে তার, তার সমাজ-সেবার ব্যবস্থা, সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী এবং দৈব-দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি ব্যাপার এত ব্যাপক এবং উন্নত যে পৃথিবীতে তার তুলনা মিলবে না। রাশিয়াতেও লোকের অভাব আছে অভিযোগ আছে; কিন্তু বেকারত্ব এবং অনাহারের মৃত্যুর যে বিষম আতঙ্ক অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার ছায়ামাত্র এখানে নেই। মানুষের মনে আর্থিক নিশ্চিন্ততার একটা নূতন স্পন্দন জেগে উঠেছে।

'পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা' সফল হয়েছে বা বিফল হয়েছে, সে নিয়ে তর্ক করাটা অনেকটা অর্থহীন বাক্যব্যয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থাটাই হচ্ছে সে তর্কের প্রকৃত জবাব। আরেকটা জবাব হচ্ছে এই: এই পরিকল্পনা পৃথিবীসুদ্ধ মানুষের কল্পনাকে মুগ্ধ, অভিভূত করে ফেলেছে। প্রত্যেকেই এখন 'পরিকল্পনা' করার কথা বলছে, পাঁচ বছর দশ বছর তিন বছর ব্যাপী পরিকল্পনার নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। কথাটার মধ্যে একটা যাদুর ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছেন সোভিয়েট সরকার।

১৮১

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিঘ্নবিপদ, তার সফলতা ও বিফলতার কাহিনী

১১ই জুলাই, ১৯৩৩

সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা একটা বিরাট ব্যাপার। এটা ছিল বস্তুত অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিপ্লবের একটা সমষ্টি; তার মধ্যে বিশেষ করে ছিল একটা কৃষি-বিপ্লব, সেকেলে ছোটো মাপের কৃষিপদ্ধতিকে উচ্ছিন্ন করে তার বদলে বড়ো মাপের যৌথ এবং যন্ত্রাশ্রয়ী কৃষিপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করল সে। আর ছিল একটি শিল্প-বিপ্লব—অত্যন্ত দ্রুতবেগে রাশিয়াকে শিল্প-তন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলা হল। কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দেখবার বস্তু ছিল এর পশ্চাতে যে প্রাণশক্তিটি কাজ করছিল তাই—রাজনীতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে সে এক নূতন চেতনার আবির্ভাব। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের চেতনা, সমাজকে গড়ে তোলবার কাজে সুচিন্তিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে প্রয়োগ করবার চেষ্টা। এর আগে আর কোনো দেশেই এমন চেষ্টা হয় নি, অত্যন্ত অগ্রগামী দেশগুলোতেও না। মানব-জীবন এবং সমাজ-জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে এইভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ব্যবহার—এইটাই হল সোভিয়েটদের সে পরিকল্পনার প্রধান বিশেষত্ব।

এই জন্যই আজ পৃথিবীসুদ্ধ লোক পরিকল্পনার কথা বলছে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার মতো, যেখানে সমাজ-ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়েই আছে প্রতিযোগিতাকে এবং ধনসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার বজায় রাখবার চেষ্টাকে ভিত্তি করে, সেখানে ঠিকমতো পরিকল্পনা খাড়া করা এবং চালানো কঠিন।

কিন্তু এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়াতে অজস্র কৃচ্ছ্রসাধন, অসংখ্য বিপত্তি এবং অপরিসীম বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হল। দেশের লোককে ভয়ংকর মূল্য দিতে হল এর জন্য। তাদের অধিকাংশই সে মূল্য সাগ্রহে দিল; যে ত্যাগ এবং দুঃখ এর জন্য সইতে হল তাকে, তা সে কিছু দিনের মতো সহজ মনেই স্বীকার করে নিল; তাদের আশা ছিল দুটো চারটে বছর যদি এই দুঃখ মেনে চলা যায় তবে পরে এর থেকে তাদের সুদিনেরই আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু কতক লোক এমনও ছিল যারা সে মূল্য দিল নেহাত অনিচ্ছাক্রমে; শুধু সোভিয়েট সরকার সেটা দিতে তাদের বাধ্য করছেন বলেই। সবচেয়ে বেশি কষ্ট যাদের সইতে হল তাদের মধ্যেই ছিল কুলক বা অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকরা। তাদের টাকা বেশি, বিশেষ রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাদের ছিল; তাই যে নূতন রীতিতে সমস্ত ব্যাপারকে গড়ে তোলা হচ্ছিল তার সঙ্গে তাদের খাপ খাচ্ছিল না। এরা ছিল ধনিকতন্ত্রী; যৌথকৃষিক্ষেত্রগুলি সমাজতন্ত্রী রীতিতে গড়ে উঠবার পথে এদের সেই অস্তিত্বই হল একটা বড়ো বাধা। এই যৌথীকরণের চেষ্টাটাকে এরা অনেক সময়ে বাধা দিত; অনেক সময়ে আবার নিজেরাই সে যৌথ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢুকে পড়ত—ভেতর থেকে তাদের শক্তি-হ্রাস ঘটাবার বা সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসেই অন্যায় উপায়ে কিছু ব্যক্তিগত লাভ হাতিয়ে নেওয়ার মতলবে। সোভিয়েট সরকারও এদের একেবারে নির্মম দণ্ড দিতে লাগলেন। মধ্যবিত্তশ্রেণীরও বহু লোকের প্রতি সরকার অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন, তাঁদের সন্দেহ, এরা শত্রুপক্ষের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে বা তাঁদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের চেষ্টা করছে। এই সন্দেহের বশেই বহু ইঞ্জিনীয়ারকে শাস্তি দেওয়া হল, জেলে পোরা হল। অথচ তখন এত রকমের বড়ো বড়ো কাজ তাঁরা হাতে নিয়েছেন, সে কাজের জন্য ইঞ্জিনীয়ারেরই বিশেষ করে প্রয়োজন। তাই এই নীতির ফলে তাঁদের পরিকল্পনাটিরও কার্যহানি ঘটছিল।

আনুপাতিক অসামঞ্জস্য তো সর্বত্রই দেখা যাচ্ছিল। যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি পিছিয়ে পড়ে রইল, সুতরাং কারখানা ও ক্ষেতে যত পণ্য উৎপন্ন হচ্ছিল, যানবাহনের অভাবে সেগুলোকে অনেক সময় আটকে পড়ে থাকতে হল; এর ফলে সর্বত্রই কাজকর্মে বিঘ্ন হতে লাগল। যোগ্য বিশেষজ্ঞ এবং ইঞ্জিনীয়ারের অভাব ছিল, এইটাই হল তাঁদের সবচেয়ে বড়ো মুশকিল।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা যখন চলছিল সেই সময়েই পৃথিবী জুড়ে, মানে পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রী দেশগুলিতে, চলছিল বাণিজ্য-সংকট—এত বড়ো সংকট পৃথিবীতে আর কখনও আসে নি, বাণিজ্যের হ্রাস ঘটছে, কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকার-সমস্যা বেড়ে চলেছে। খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামালের দর অত্যন্ত নেমে গিয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষকদের দুর্গতি একেবারে চরমে এসে ঠেকেছে। সমস্ত দেশে কর্মাভাব আর বেকার-সমস্যা, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে চলল অসম্ভব কর্মব্যস্ততা আর কাজের হিড়িক—এ একটা আশ্চর্য প্রভেদ। দেখে মনে হল পৃথিবীব্যাপী এই সংকটের হাওয়া সোভিয়েট ইউনিয়নকে স্পর্শ করতেই পারে নি—তার অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিটাই একেবারে অন্য রকমের। কিন্তু তবুও সে সংকটের ফল সোভিয়েট ইউনিয়ন একেবারে এড়িয়ে যেতে পারল না; পরোক্ষভাবে এবং অলক্ষ্যে তার ছোঁওয়া সোভিয়েটের গায়েও এসে লাগল, যে-সব বিঘ্নবিপত্তি তার ছিল তাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল। তোমাকে বলেছি, সোভিয়েট ইউনিয়ন বিদেশ থেকে কলকব্জা কিনছিল, তার দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল নিজের কৃষিজাত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রি করে। পৃথিবীর বাজারে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির দাম কমে যাবার ফলে সোভিয়েটও তার পণ্যের দরুণ কম কম টাকা পেতে লাগল। অথচ যে কলকব্জা সে কিনেছে তার দাম দিতে হবে, সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণ সোনার যোগাড় করা চাই। সুতরাং তখন তাকে আরও বেশি বেশি করে খাদ্যদ্রব্য বাইরে রপ্তানি করতে হল। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-সংকট এবং পণ্য-মূল্য হ্রাসের ফলে এইভাবে

সোভিয়েটকেও অনেকখানি ক্ষতি সইতে হল, যে-সব হিসাবমতো সে চলছিল তার অনেকখানিই ওলট-পালট হয়ে গেল। এরই জন্য আবার দেশের মধ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রাপ্য পরিমাণ আরও কমিয়ে দিতে হল, মানুষের কষ্ট আরও বেশি বেড়ে গেল।

একদিকে খাদ্য-দ্রব্যের সংস্থান দিন দিন কমে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অন্য দিকে ইউনিয়নের সর্বত্র জনসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলেছিল। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক অল্প; তার তুলনায় এতবেশি দ্রুত হারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধিই হয়ে উঠল সোভিয়েট সরকারের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমানে যা এলাকা, বিপ্লবের পূর্বে তার লোকসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি। গৃহযুদ্ধে বিপুল পরিমাণ লোক নিহত হয়েছে; তবু বিপ্লবের পরবর্তী কালে কী বিষম গতিতে প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে একবার দেখ :

১৯১৭	সনে লোকসংখ্যা ছিল	...	...	...	১৩,০০ লক্ষ
১৯২৬	” ” ”	...	...	...	১৪,৯০ ”
১৯২৯	” ” ”	...	...	...	১৫,৪০ ”
১৯৩০	” ” ”	...	...	...	১৫,৮০ ”
১৯৩৩	” (বসন্তকালের গৃহীত হিসাবে)		...	...	১৬,৫০ ”

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, পনরো বছরের সামান্য কিছু বেশি কালের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি লোক বেড়েছে দেশে, তার মানে শতকরা ২৬ জন বেড়েছে—বৃদ্ধির এটা একটা অসাধারণ হার।

শুধু যে দেশ হিসাবেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র ব্যেপে লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল তাই নয়; বিশেষ করে শহরগুলির লোকসংখ্যা ভয়ানকরকম বেড়ে চলেছিল। পুরোনো যে শহরগুলো ছিল তাদের আয়তন দিন দিনই বাড়তে লাগল; মরুভূমি এবং স্তেপ-অঞ্চলে পর্যন্ত নূতন নূতন শিল্পপ্রধান শহর গড়ে উঠল। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছিল; সেই কাজে লাগবার আশায় অসংখ্য কৃষক গ্রাম ছেড়ে শহরগুলিতে গিয়ে হাজির হতে লাগল। ১৯১৭ সনে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ২৪টি শহর ছিল যার প্রত্যেকের লোকসংখ্যা এক লক্ষের উপরে। ১৯২৬ সনে এইরকম শহরের সংখ্যা দেখা গেল ৩১; ১৯৩৩ সনে এদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও উপরে উঠেছে। পনেরোটি বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া একশোটিরও বেশি শিল্প-প্রধান শহর গড়ে তুলেছে। ১৯১৩ থেকে ১৯৩২ সনের মধ্যে মস্কো শহরের লোকসংখ্যা দু'গুণ হয়ে গেল—১৯১৩ সনে তার লোকসংখ্যা ছিল ১৬,০০,০০০; ১৯৩২ সনে হল ৩২,০০,০০০। লেনিনগ্রাডে দশ লক্ষ লোক বেড়েছে, এখন তার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষের কোঠায় গিয়ে পেঁাছেছে। ট্রান্স-ককেশীয় অঞ্চলে বাকু শহরেরও লোকসংখ্যা দু'গুণ হয়েছে—৩,৩৪,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,৬০,০০০। মোটের উপর শহর-বাসী লোকদের সংখ্যা ১৯১৩ সনে ছিল ২ কোটি, ১৯৩২ সনে হয়েছে সাড়ে তিন কোটি।

কৃষক যখন গ্রামে থাকে তখন সে খাদ্য উৎপাদন করে; শহরে গিয়ে যখন সে শ্রমিকে পরিণত হয় তখন সে আর খাদ্য-উৎপাদক থাকে না। কারখানার শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে সে হয়তো কল-জাত পণ্য বা যন্ত্রপাতি তৈরি করছে, কিন্তু খাদ্য-সামগ্রীর দিক থেকে সে এখন একজন ভোক্তা মাত্র। অতএব গ্রাম থেকে এত বেশি পরিমাণ কৃষক শহরে চলে যাওয়ার মানে দাঁড়াল, খাদ্য-উৎপাদকদের শুধু খাদ্য-ভোক্তাতে পরিণতি। খাদ্য-সংস্থানের সমস্যাটা এই ব্যাপারে আরও বেশি জটিল হয়ে উঠল।

আরও একটি কারণ এর ছিল। দেশের শিল্প-প্রচেষ্টা দিন দিন বেড়ে চলেছে, তার কারখানা-গুলোর জন্য ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে কাঁচামাল চাই। যেমন কাপড়ের কলের জন্য দরকার হয় তুলো। অতএব বহু জমিতে খাদ্য-শস্যের বদলে তুলো এবং অন্যান্য কাঁচামালের চাষ করা হল। এর ফলেও খাদ্য-সংস্থান কমে গেল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে যে প্রচণ্ড হারে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল সেইটাই তার সমৃদ্ধির

একটা স্পষ্ট প্রমাণ। আমেরিকার জনসংখ্যা বেড়েছিল বাইরে থেকে লোক এসে, সোভিয়েটের তা নয়। এতে বোঝা গেল, লোকের অভাব এবং কষ্ট অনেক ছিল তবু বাস্তবিকপক্ষে অনাহারে তাদের থাকতে হয় নি। পরিমিত খাদ্য-বণ্টনের একটি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন সরকার, তার দ্বারাই লোকের ঠিক যেটুকু খাদ্যদ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাই তাদের যোগান দিয়ে চলতে পেরেছিলেন। বিচক্ষণ বিচারকদের মতে, লোকের সংখ্যা যে এত দ্রুতগতিতে বাড়তে পেরেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে, লোকের মনে আর্থিক সংস্থানের একটা আশ্বাস ও নিশ্চয়তা ছিল। শিশুরা আর এখন পরিবারের পক্ষে ভারস্বরূপ নয়, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের খাদ্য-সংস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য রাষ্ট্র স্বয়ং প্রস্তুত রয়েছে। আরেকটি কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য-বিধি এবং চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি, এর ফলে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ২৭ থেকে নেমে শতকরা ১২তে দাঁড়িয়েছে। মস্কোতে ১৯১৩ সনে সাধারণত মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৩ জনের উপরে। ১৯৩১ সনে এই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ১৩ জনেরও কম।

খাদ্যের অনটন নিয়ে যে-সব অসুবিধা চলছিল, ১৯৩১ সনে আবার তার উপরে নূতন এক বিপদ এসে যোগ হল—ইউনিয়নের কতকগুলো স্থানে অনাবৃষ্টি হল। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সনে দূরপ্রাচ্য-অঞ্চলে যুদ্ধের আতঙ্কও দেখা দিল। জাপানিরা অন্যান্য ধনিকতন্ত্রী দেশদের সঙ্গে একত্র হয়ে তাকে আক্রমণ করবে, এই ভয়ে সোভিয়েট রাশিয়া প্রয়োজনের সময় সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য শস্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলেন। অন্য দেশরা সোভিয়েটকে আক্রমণ করবে, যুদ্ধ বাধাবে, এই ভয় সত্যই আছে, সারাক্ষণই এর সম্ভাবনা রয়েছে। বলশেভিকরা এই ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত, থেকে থেকেই তারা যুদ্ধের আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, 'ভয়ের চোখ বড়ো বড়ো'—কথাটা অত্যন্তরকম সত্য, তা ছোটো ছোটো ছেলেদের সম্বন্ধেই বল, আর দেশ বা জাতিদের সম্বন্ধেই বল! কমিউনিজ্‌ম্‌ আর ধনিকতন্ত্রের মধ্যে সত্যকার সন্ধি কখনোই হতে পারে না; কমিউনিজ্‌ম্‌কে বিধ্বস্ত, বিনষ্ট করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের আগ্রহের অভাব নেই, সারাক্ষণই তারা এর জন্য তোড়জোড় এবং চক্রান্ত করছে। তাই বলশেভিকদেরও স্নায়ুগুলি সারাক্ষণ উত্তেজিত হয়েই আছে, সামান্য একটু কারণ ঘটলেই তাদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। উদ্‌বেগের কারণও তাদের প্রায়ই ঘটে থাকে; দেশের মধ্যেও 'স্যাবোটেজ' অর্থাৎ বড়ো বড়ো কারখানা বা অন্যান্য বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করবার ব্যাপক ষড়যন্ত্র তাদের বহুবার ব্যর্থ করতে হয়েছে।

১৯৩২ সনটা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বড়ো সংকটের বছর গেছে; ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে এই চিঠি আমি লিখছি, সে সংকট আজও কাটে নি। 'স্যাবোটেজ' এবং সার্বজনীন সম্পত্তি চুরির বিরুদ্ধে সরকার অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন; সার্বজনীন কৃষিক্ষেত্র থেকে বহু জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে বলেই তাঁদের এই ব্যবস্থা। সাধারণত রাশিয়াতে মৃত্যু-দণ্ডের প্রচলন নেই; কিন্তু প্রতি-বিপ্লবের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করেছেন, সার্বজনীন সম্পত্তি চুরি করাটা প্রতিবিপ্লবেরই সামিল, অতএব সে অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। স্টালিন বলেন : "ধনিকতন্ত্রীরা বলেছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পবিত্র বস্তু, তাতে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ। এই নীতি প্রচার করেই তারা ধনিকতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। অতএব এবার আমরা কমিউনিস্টরাও আরও বেশি জোর দিয়ে বলব, সার্বজনীন সম্পত্তিই পবিত্র বস্তু, তাতে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ—যেন এই নীতির দ্বারাই আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই নূতন সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিগুলোকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।"

অভাব মোচনের জন্য সোভিয়েট সরকার আরও অনেক রকম ব্যবস্থা করলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি হচ্ছে যৌথ এবং একক যত কৃষিক্ষেত্র ছিল, তাদের অনুমতি দেওয়া হল, তাদের বাড়তি ফসলটা তারা সোজাসুজিই শহরের বাজারে নিয়ে বেচতে পারবে। ১৯২১ সনের সামরিক কমিউনিজ্‌মের যুগের পর যে NEP (নেপ)-এর প্রবর্তন করা হয়েছিল, একে দেখে কতকটা তার কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদিন যা ছিল আর এখন যা হয়েছে, দুয়ের

মধ্যে তফাৎ অনেক। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অনেকখানিই এগিয়ে গেছে সে; দেশে শিল্পতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছে, দেশের কৃষিকে বহুলাংশেই সমাজের আয়ত্ত করে আনা হয়েছে।

গত চার বছরের মধ্যে যৌথ-কৃষিক্ষেত্র গঠন করা হয়েছে ২,০০,০০০টি; রাষ্ট্রের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রও ছিল প্রায় ৫,০০০। রাষ্ট্রের এই কৃষিক্ষেত্রগুলিকে অন্যদের পক্ষে আদর্শস্বরূপ বলে গণ্য করা হয়। এদের এক একটির আয়তন প্রকাণ্ড; একটি ক্ষেত্রের নাম আছে জায়গাণ্ট্ (দৈত্য)—তার জমির পরিমাণ হচ্ছে ৫০,০০,০০০ একর। এই সময়টুকুর মধ্যে আরও ১,২০,০০০টি ট্রাক্টর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক এখন এই-সব যৌথ-কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করছে।

আরও একটি কাজ আশ্চর্যরকম বিস্তারলাভ করেছে, সে হচ্ছে সমবায় আন্দোলন। ১৯২৮ সনে ভোক্তাদের সমবায় সমিতির (Consumers' Co-operative Society) সভ্যসংখ্যা ছিল ২,৬৫ লক্ষ; ১৯৩২ সনে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৫০ লক্ষ। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে অসংখ্য পাইকারী এবং খুচরা দোকান, শিকলের মতো পরস্পর গাঁথা—এই শিকল ইউনিয়নের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, দেশের দূরতম কোণে পর্যন্ত এর সাক্ষাৎ মিলবে।

১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। এরও আকাঙ্ক্ষা দূরপ্রসারী। কিন্তু প্রথমবারের পরিকল্পনার তুলনায় এর কাজ সহজ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কতকগুলি হালকা-শিল্প গড়ে তোলা, যার দ্বারা লোকের জীবনযাত্রার প্রণালীর দ্রুত উন্নতি সাধন করা চলবে। গত চার বছর ধরে দেশের লোকরা অনেক কষ্ট অনেক অভাব সয়েছে; এবার তাদের কিছু বেশি আরাম, জীবনযাত্রার কিছু উন্নততর ব্যবস্থা দেওয়া চলবে বলে আশা করা যাচ্ছে—সেইটাই হবে তাদের সে কৃচ্ছ্রসাধনের পুরস্কার। প্রয়োজনীয় কলকব্জার জন্য বিদেশের কাছে যাবার দরকার এখন আর প্রায় নেই, কারণ সোভিয়েটের নিজের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানরাই সে কলকব্জার যোগান দিতে পারে। এতে আরও এক দিক দিয়ে সোভিয়েটের কষ্ট কমবে, বিদেশ থেকে জিনিস কিনে তার দামবাবদ নিজের প্রচুর পরিমাণ খাদ্য বাইরে পাঠিয়ে দিতে আর তার হবে না।

সম্প্রতি যৌথ-কৃষিক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত কৃষকদের একটি কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্টালিন বলেছেন :

"আমাদের আশু কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত যৌথ-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ, কমরেড্‌রা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য...লোকে অনেক সময় বলে : সমাজতন্ত্রই যদি হয়ে গেছে তবে এখনও আর আমরা খাটছি কেন? আগেও খাটতাম আমরা, এখনও খেটে যাচ্ছি। খাটুনি থেকে অব্যাহতি পাবার দিন কি আজও আসে নি?......না। সমাজতন্ত্র গড়েই ওঠে শ্রমের উপরে।......সমাজতন্ত্রের কথাই হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষ নিষ্ঠাভরে কাজ করবে—কাজ করবে অন্যের জন্য নয়, ধনীদের জন্য নয়, শোষকদের জন্য নয়, করবে তার নিজের জন্য, তার সমাজের জন্য।"

কাজ আছে, থাকবেও। তবে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সেই চার বছর যে বিষম কষ্ট সয়ে লোককে কাজ করতে হয়েছে, ভবিষ্যতে তার তুলনায় তাদের কাজ অনেক বেশি আনন্দদায়ক এবং লঘু হবে বলে আশা করা যায়। বস্তুত সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতিই হচ্ছে; 'যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না।' শুধু তাই নয়, কাজের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণা যোগ করে দিয়েছে বলশেভিকরা, সে হচ্ছে সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রেরণা। অতীত-কালেও আদর্শবাদীরা বা ক্বচিৎ এক-আধজন ব্যক্তিবিশেষ এই প্রেরণা নিয়ে কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু সমগ্র সমাজ একত্রে এই উদ্দেশ্যকে তার ব্রত বলে গ্রহণ করেছে, একে কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত অতীতকালের ইতিহাসে নেই। ধনিকতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল প্রতিযোগিতা, আর অন্যদের মেরে ব্যক্তিবিশেষের লাভের সংস্থান করা। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই লাভ সংগ্রহের প্রবৃত্তি মরে গিয়ে তার স্থান অধিকার করছে সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি। আমেরিকার একজন লেখক বলেছেন : রাশিয়ার শ্রমিকরা ক্রমেই বুঝতে পারছে, 'পরস্পর-নির্ভরতাকে

স্বীকার করে নিতে যদি পারি, তবে তার থেকেই মিলবে অভাব আর ভয় থেকে অব্যাহতি।' পৃথিবীর সর্বত্র জনসাধারণ দৈন্য আর অনিশ্চয়তার বিষম আতঙ্কে মুমূর্ষু হয়ে রয়েছে; রাশিয়া সে ভয় আতঙ্ককে দূরীভূত করেছে এইটাই তো তার একটা প্রকাণ্ড কীর্তি। শোনা যাচ্ছে, এই স্বস্তি লাভের ফলে নাকি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে মানসিক ব্যাধির প্রকোপ এখন প্রায় অন্তর্হিতই হয়ে গেছে।

কৃচ্ছ্রসাধনের সেই চারটি বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্রই, এবং প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই নূতন জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। হয়তো তার মধ্যে বেদনা আছে, অসামঞ্জস্য আছে। তবু তার শক্তি অসীম : নূতন নূতন শহর গড়ে উঠেছে দেশে, গড়ে উঠেছে নানাবিধ শিল্প, বড়ো বড়ো যৌথ-কৃষিক্ষেত্র, বড়ো বড়ো সমবায় প্রতিষ্ঠান; বেড়েছে বাণিজ্য, বেড়েছে লোকসংখ্যা, প্রতিষ্ঠা হয়েছে সংস্কৃতির, বিজ্ঞানের, বিদ্যাচর্চার। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এবং মধ্য-এশিয়ার পামির আর হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যত অসংখ্য মানুষ আর জাতির বাস, এই কটি বছরে তাদের মধ্যে একটা অপূর্ব ঐক্য এবং মিলনের বন্ধন গড়ে উঠেছে, সে বন্ধন অচ্ছেদ্য।

শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির যে ব্যাপক উন্নতি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নে হয়েছে তার কথা তোমাকে লিখতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু সে লোভকে বাধ্য হয়েই সংবরণ করতে হল। দু'চারটে খুচরো খবর মাত্র বলছি, শুনতে হয়তো তোমার ভালো লাগবে। রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থাই এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং আধুনিক, বহু বিজ্ঞ বিচারকের এই মত। নিরক্ষরতা দেশ থেকে প্রায় অন্তর্হিতই হয়ে গেছে; মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলে পর্যন্ত অত্যন্ত আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেছে। মধ্য-এশিয়ার এই অঞ্চলটিতে ১৯১৩ সনে ১২৬টি বিদ্যালয় ছিল, এদের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬২০০। ১৯৩২ সনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ৬৯৭৫, ছাত্রের সংখ্যা ৭,০০,০০০—এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মেয়ে। সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। এটা কী আশ্চর্য উন্নতির পরিচয় তা বুঝতে হলে একটি কথা মনে রাখতে হবে : অল্পদিন আগেও এই-সব দেশে মেয়েদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখা হত, বাড়ির বাইরে জনসমক্ষে বার হবার তাদের অনুমতি ছিল না। শিক্ষা-বিস্তারে এই-যে দ্রুত সাফল্য, শোনা যায় এর কারণ নাকি ভাষায় লাতিন বর্ণমালার ব্যবহার। এখানে যে নানাবিধ স্থানীয় বর্ণমালা চলিত ছিল, তার তুলনায় লাতিন বর্ণমালা প্রবর্তিত হবার ফলে প্রাথমিক শিক্ষাটা অনেক বেশি সহজ ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমাকে বলেছি, কামালপাশাও প্রাচীন আরবি বর্ণমালা তুলে দিয়ে লাতিন অক্ষর বা বর্ণমালার প্রচলন করেছিলেন। এই বুদ্ধিটি তিনি পেয়েছিলেন রাশিয়ার কাছ থেকে; অন্যান্য ভাষার উপযোগী করে লাতিন অক্ষরকে ঢেলে সাজাও হয়েছিল রাশিয়ারই পরীক্ষাগারে—এইখান থেকেই কামাল সেটা গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সনে ককেশাস অঞ্চলের প্রজাতন্ত্ররা আরবি অক্ষর ত্যাগ করে লাতিন অক্ষরে লেখা শুরু করে। এর দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করার কাজ খুবই সহজ হয়ে গেল; দেখে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত জাতিই ক্রমে লাতিন অক্ষর ব্যবহার করতে আরম্ভ করল—চীনা, মঙ্গোল, তুর্কি, তাতার, বুরিয়াত, বশ্‌কির, তাজিক, ইত্যাদি কেউই বাদ গেল না। স্থানীয় ভাষা যেটা ছিল সেইটাই সর্বত্র চলতি রইল, বদলে গেল খালি লেখার হরফটা।

একটা ভালো খবর দিই তোমাকে : সোভিয়েট ইউনিয়নে যত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে, তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশি জনকে স্কুলে গরম-গরম জলখাবার খেতে দেওয়া হয়। এর জন্য কোনো দাম অবশ্য নেওয়া হয় না। শিক্ষার জন্যও কোনো বেতন দিতে হয় না তাদের—শ্রমিকদের রাষ্ট্রে সেটা তো হতেই হবে।

অক্ষর-পরিচয় এবং শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটি পাঠক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে দেশে, রাশিয়াতে যত বই এবং সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে এত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো দেশেই হয় না। এই বইয়ের প্রায় সমস্তই হচ্ছে গম্ভীর বা 'ভারী' বিষয়ের বই; অন্য দেশের মতো হালকা উপন্যাস নয়। ইঞ্জিনীয়ারিং এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে রাশিয়ার শ্রমিকের জানবার

আগ্রহ অত্যন্ত বেশি, গল্পের বইয়ের চেয়ে এদের সম্বন্ধে বই পড়তেই সে বেশি ভালোবাসে। শিশুদের জন্য অবশ্য খুব চমৎকার সব বইও আছে, তার মধ্যে রূপকথার বই পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে গোঁড়া বলশেভিকরা বোধহয় তাদের রূপকথা পড়তে দেওয়াটার পক্ষপাতী নন।

বিজ্ঞানে সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে; বিজ্ঞানের খাঁটি আলোচনা এবং তার নানাবিধ বাস্তব প্রয়োগ, দুই দিক দিয়েই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। লেনিনগ্রাডে বিপুল একটি উদ্ভিদ্‌-চর্চা-প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ২৮,০০০টি বিভিন্ন প্রকারের গম দেখতে পাওয়া যায়। এরোপ্লেনের সাহায্যে ধানের বীজ বপন করার বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে এখানে পরীক্ষা চলছে।

জারদের এবং অভিজাতদের যে-সব প্রাচীন প্রাসাদ ছিল সেগুলো এখন পরিণত হয়েছে যাদুঘরে বা প্রজাদের জন্য বিশ্রামাগার এবং স্বাস্থ্যনিবাসে। লেনিনগ্রাডের কাছে একটি ছোটো শহর আছে, তার নাম ছিল জারকো সেলো (মানে 'জারের গ্রাম')। এখানে সম্রাটের দুটি প্রাসাদ ছিল, গ্রীষ্মকালে জার এইখানে বাস করতেন। এখন এর নামটাকে বদলে করা হয়েছে দেৎসকো সেলো ('শিশুদের গ্রাম'); প্রাচীন প্রাসাদ দুটি বোধ হয় এখন ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুদের এবং তরুণ-তরুণীদের প্রয়োজনে। সোভিয়েট রাজ্যে এখন শিশু এবং তরুণবয়স্কদেরই সবচেয়ে বেশি খাতির : সমস্ত কিছুই ভালোটি তাদের জন্যে তোলা থাকছে, তার দরুন অন্যরা যদি অভাবেও কষ্ট পায়তো পাক। এদেরই জন্য বর্তমানের মানুষরা খেটে চলেছে, কারণ সমাজতন্ত্রী এবং বিজ্ঞান-সম্মত রাষ্ট্র যদি শেষপর্যন্ত আসেই, সেদিন এরাই হবে তার উত্তরাধিকারী। মস্কোতে প্রকাণ্ড একটি 'জননী ও শিশুদের রক্ষার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান' আছে।

অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় বোধহয় রাশিয়াতে নারীদের স্বাধীনতা বেশি; তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের রক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হয়েছে। সকল রকম পেশাই তারা গ্রহণ করছে, নারী-ইঞ্জিনীয়ার অনেক আছে সেদেশে। বলশেভিক দলের প্রাচীন কর্মী মাদাম কোলোন্‌তাই হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম নারী যিনি রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। লেনিনের বিধবা পত্নী ক্রুপ্‌স্কায়া বোধহয় সোভিয়েট শিক্ষাবিভাগের একটি শাখার প্রধানা কর্ত্রী।

বিস্ময়ের দেশ এই সোভিয়েট ইউনিয়ন; প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি ঘণ্টায় সেখানে এত সব নূতন নূতন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কিন্তু এর মধ্যেও সবচেয়ে বেশি বিস্মিত আর মুগ্ধ হতে হয় যে অঞ্চলটিকে দেখে সে হচ্ছে সাইবেরিয়ার মরু স্তেপভূমি আর মধ্য-এশিয়ার উপত্যকা-ভূমি, যেখানে প্রাচীন পৃথিবীর রেশ এখনও বেঁচে রয়েছে। এই দুটি অঞ্চলই বহু পুরুষ ধরে মানবজীবনের পরিবর্তন আর প্রগতির স্রোত থেকে বহুদূরে রয়ে গিয়েছিল; দুটিই এখন উল্কার বেগে সামনে ছুটে চলেছে। এইসব পরিবর্তন কতখানি দ্রুতবেগে ঘটছে তার খানিকটা ধারণা তুমি যাতে করে নিতে পার, তার জন্য আমি তোমাকে তাজিকিস্তান সম্বন্ধে খানিকটা গল্প শোনাচ্ছি। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এইটেই বোধহয় ছিল সবচেয়ে অনুন্নত স্থানগুলির একটি।

তাজিকিস্তান অবস্থিত পামির পর্বতমালার উপত্যকাতে অক্সাস নদীর উত্তরে, আফগানিস্তান এবং চীনা তুর্কিস্তানের সীমান্ত ঘেঁষে, ভারত-সীমান্ত থেকেও এর দূরত্ব বেশি নয়। এককালে এটা বোখারার আমীরদের রাজ্য ছিল, তাঁরা আবার ছিলেন রাশিয়ার জারের অধীনস্থ সামন্ত-পতি। ১৯২০ সনে বোখারাতে একটি স্থানীয় বিপ্লব হল, আমীর পদচ্যুত হলেন, বোখারায় প্রজাদের সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এর পরেই এল গৃহযুদ্ধ; এইসব বিশৃঙ্খলার সময়েই তুরস্কের এককালীন জনপ্রিয় নেতা এনভার পাশার মৃত্যু হল। বোখারারা প্রজাতন্ত্রটির নাম হল উজ্‌বেক সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিক; যে-কটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র মিলে ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. গঠিত হয়েছে এটিও তাদেরই একটি বলে গণ্য হল। ১৯২৫ সনে উজবেক অঞ্চলের মধ্যেই আবার একটি স্বতন্ত্র তাজিক প্রজাতন্ত্র তৈরি করা হল। ১৯২৯ সনে তাজিকিস্তান একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল, ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সাতটি রাষ্ট্রের একটি বলে গণ্য হল।

এতখানি মর্যাদার অধিকারী হল তাজিকিস্তান, কিন্তু তখনও সে ক্ষুদ্র এবং অনুন্নত দেশ, তার লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও কম, ভালোরকম পথঘাট বলে কিছুই নেই তার, যাতায়াতের একমাত্র পথ হচ্ছে উট-চলার রাস্তা। এই নূতন শাসনের আমলে আসবার পর অবিলম্বে রাস্তা-ঘাট, জলসেচ এবং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য-বিধির উন্নতির ব্যবস্থা করা হল। মোটরগাড়ি চলবার রাস্তা তৈরি হল, তুলার চাষ শুরু হল, জলসেচ-ব্যবস্থার কল্যাণে সে-চাষে অত্যন্ত ভালো ফসল পাওয়া যেতে লাগল। ১৯৩১ সনের মাঝামাঝি সময়েই দেখা গেল, তুলার বাগান যত আছে, তার শতকরা ষাটটিরও বেশি ইতিমধ্যেই যৌথসম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে; শস্যক্ষেত্রেও একটা বৃহৎ অংশ সার্বজনীন কৃষিপ্রচেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটি কারখানা বসানো হল; আটটি কাপড়ের কল এবং তিনটি তেলের কল গড়ে উঠল। একটি রেলওয়ে লাইনও তৈরি হল—লাইনটি এই দেশটিকে উজ্‌বেকিস্তানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। একটি বিমানপথও খোলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিমানপথগুলির সঙ্গে তার যোগ।

১৯২৯ সনে এই দেশে একটিমাত্র ঔষধালয় ছিল। ১৯৩২ সনে ছিল ৬১টি হাসপাতাল এবং ৩৭টি দন্ত-চিকিৎসাগার; সেখানে ২১২৫ জন রোগী রাখবার স্থান আছে। ২০ জন ডাক্তার আছেন। শিক্ষার বিস্তার কতখানি হয়েছে তা এই অঙ্কগুলো দেখেই বুঝতে পারবে :

১৯২৫ সনে	:	মাত্র ৬টি আধুনিক বিদ্যালয়।
১৯২৬ সনের শেষে	:	১১৩টি বিদ্যালয়, ২৩০০ জন ছাত্র।
১৯২৯ সনে	:	৫০০টি বিদ্যালয়।
১৯৩২ সনে	:	শিক্ষায়তনের সংখ্যা ২,০০০ এরও উপরে, ছাত্রদের সংখ্যা ১,২০,০০০-এরও বেশি।

শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তার অঙ্ক স্বভাবতই একলাফে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। ১৯২৯-৩০ সনে বিদ্যালয়গুলির জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৮০ লক্ষ রুবল (একটি রুবলের দর হচ্ছে প্রায় ২ শিলিং, বা ১/৬); ১৯৩০-৩১ সনে বরাদ্দ হয়েছে ২৮০ লক্ষ রুবল। সাধারণ স্কুল শুধু নয়। কিণ্ডারগার্টেন, ট্রেনিং স্কুল, পুস্তকাগার এবং পাঠাগারও বহু খোলা হচ্ছিল; ১৯৩২ সনে এদের সঙ্কল্প ছিল, আর দুটি বছরের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা একেবারে দূর করে দিতে হবে। লোকদের মনে জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য একটি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে মেয়েদের আর পর্দার আড়ালে আটকে রাখা সম্ভব নয়। পর্দাপ্রথা অতি দ্রুতবেগে উচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

এ-সব কথা শুনলেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। প্রগতির এতখানি বিদ্যুৎ-বেগ, এ কী সত্যই হতে পারে? আর দেশটিও তো তেমনি—এর লোকসংখ্যা মাত্র দশলক্ষের সামান্য বেশি, মানে শুধু এলাহাবাদ জেলাটিতে যা লোক আছে তার চেয়েও অনেক কম! এই-সব তথ্য এবং অঙ্ক আমি নিয়েছি একজন বিচক্ষণ আমেরিকান পর্যবেক্ষকের প্রদত্ত বিবরণ থেকে; ১৯৩২ সনের প্রথমদিকে ইনি তাজিকিস্তানে গিয়েছিলেন। তার পরও নিশ্চয়ই আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে।

এই নবীন তাজিক প্রজাতন্ত্রকে শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে; কারণ ইউনিয়নের নীতিই হচ্ছে অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতি-সাধন। দেশটিতে কিন্তু খনিজ সম্পদ আছে প্রচুর। সোনা, তেল এবং কয়লার খনি এখানে পাওয়া গেছে; সে সোনার ভাণ্ডারটাও অতি বৃহৎ বলেই অনেকের ধারণা। প্রাচীন কালে, চেঙ্গিস্ খাঁর আমল পর্যন্ত, এই খনিগুলো থেকে সোনা তোলা হত; কিন্তু তার পর আর এ পর্যন্ত এগুলোতে কোনো কাজকর্ম হয় নি বলেই মনে হয়।

১৯৩১ সনে তাজিকিস্তানে একটি প্রতি-বিপ্লবপন্থী বিদ্রোহ হয়। অধিকতর ধনী ভূস্বামী শ্রেণীর লোকেরা যারা দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাও অনেকে একত্র হয়ে দেশটাকে আক্রমণ করে। কিন্তু সে বিদ্রোহ নিজে থেকেই ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ কৃষকরা তাকে সমর্থন করল না।

চিঠিটা বড়ো বেশী লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আর একসঙ্গে অনেক কথা এর মধ্যে খিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। তবু আরও কিছু কথা এরই মধ্যে আমি বলব। এবার বলছি আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরবারে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থান কোথায়। তোমাকে বলেছিলাম, সোভিয়েট-সরকার কেলগ-শান্তি-চুক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন—এই চুক্তির দ্বারা যুদ্ধকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আবার হল ১৯২৯ সনে লিট্‌ভিনফ্‌ চুক্তি সোভিয়েট ও তার প্রতিবেশী দেশদের মধ্যে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া সত্যই অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল, তাই এর পরে আবার তার প্রতিবেশী দেশদের সঙ্গেও সে কতকগুলো 'অনাক্রমণ' চুক্তি করল। ১৯৩২ সনে ফ্রান্সের সঙ্গে এই রকমের একটা অনাক্রমণ চুক্তি স্থাপন করল সে। ইউরোপের রাজনীতিতে এটা হল একটা বৃহৎ ব্যাপার। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিবেশীদের মধ্যে বোধ হয় জাপানই ছিল একমাত্র দেশ যে তার সঙ্গে কোনোরকম অনাক্রমণ চুক্তি করতে অস্বীকার করল। ১৯৩২ সনের নভেম্বরে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়া এক অনাক্রমণ চুক্তি করল। বিশ্ব-রাজনীতিতে এটা হল একটা বৃহৎ ব্যাপার, কারণ এর দ্বারা রাশিয়া পশ্চিম-ইউরোপীয় রাজনৈতিক চক্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করল।

চীন দীর্ঘকাল ধরে নিঃশব্দে তার শত্রুতাচরণ করল, তার সঙ্গে কোনোরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করল না; তার পর আবার নূতন করে সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নিল। এটা সে করল জাপানের চাপে পড়ে; জাপান যখন মাঞ্চুরিয়াতে তাকে বেশি কোণঠাসা করে ফেলল, তখন। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে পূর্বাপর সদ্ভাবের অভাব। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানের প্রভুত্ব বিস্তারের পক্ষে সোভিয়েট প্রধান অন্তরায়স্বরূপ এবং প্রায়ই সীমান্ত-সংঘর্ষ ঘটে থাকে। জাপান সবসময়েই সোভিয়েটকে খুঁচিয়ে উত্যক্ত করে তুলছে এবং প্রায়ই এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু রাশিয়া, এমনকি অপমান পর্যন্তও হজম করে গেছে, তবুও যুদ্ধে নামতে রাজি হয় নি।

ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ তো আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৩ সনের এপ্রিল মাসে মস্কোতে কয়েকজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারের বিচার হয়; সেই উপলক্ষ্যে এদের মধ্যে বিরোধটাও বেশ ঘনিয়ে উঠেছিল—এরা পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পাল্‌টা আঘাত দিতে উদ্যত হচ্ছিল; কিন্তু শেষটায় ঝড় থেমে গেল এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হল। কিন্তু ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার সোভিয়েটকে অপছন্দ করে এবং তাদের মধ্যে মন-কষাকষি সবসময়েই লেগে আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার প্রতি মৈত্রীভাব বেড়ে যাচ্ছে ও রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট স্বাভাবিক সম্পর্ক-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। পৃথিবীর কুত্রাপি আমেরিকা ও রাশিয়ার পরস্পর-স্বার্থের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা যায় না।

রাশিয়ার আর একটি নূতন এবং উগ্র উদ্ধত শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে জর্মনিতে—তার নাম নাৎসী সরকার। এখনও অবশ্য সোজাসুজি রাশিয়ার বিশেষ ক্ষতি করবার সামর্থ্য তার নেই; কিন্তু ভবিষ্যতে এর থেকে বিষম আশঙ্কা আছে। ইউরোপে ফ্যাসিস্ট-নীতির প্রসার দিন দিনই বেড়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া এমন আচরণ দেখাচ্ছে যেন সে রীতি-মতো আত্মতৃপ্ত দেশ, কোনো রকম হাঙ্গাম-হুজ্জুতের মধ্যে সে যেতে চায় না, যে করেই হোক শান্তিরক্ষা করে চলতেই তার চেষ্টা। এটা অবশ্যই বিপ্লবী নীতির ঠিক বিপরীত; বিপ্লবীর নীতি হচ্ছে অন্যান্য দেশেও বিপ্লব ঘটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা। কিন্তু এটা হচ্ছে তার একটা জাতীয় নীতি—একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বাইরের সব বিরোধ এড়িয়ে চলা। কিন্তু এর ফলে বাধ্য হয়েই তাকে ধনিকতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে আপোষ-রফা

করতে হচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে সাম্যবাদ তা ঠিকভাবেই চলছে এবং এই যে সফলতা এটাই হচ্ছে সাম্যবাদের পক্ষে অনুকূলে সবচেয়ে বড়ো যুক্তিপ্রদর্শন।

১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে রাশিয়ার পরিস্থিতি এরূপ ছিল। সে-সময়ে লণ্ডনে একটি নিখিল-বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন চলছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই প্রতিনিধিরা এখানে সমবেত হয়েছিলেন, এই সুযোগে সোভিয়েট রাশিয়া নিজের কাজ হাশিল করে নিল; প্রতিবেশী দেশদের সঙ্গে নিজের আবার একটা অনাক্রমণ চুক্তি সকলকে দিয়ে সই করিয়ে নিল। আফগানিস্তান, এস্তোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, পারশ্য, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক এবং লিথুয়ানিয়া এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করল। জাপান আগের মতোই এবারও দূরে সরে রইল।

১৮২

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

১৩ই জুলাই, ১৯৩৩

যুদ্ধের পর এ ক'বছরে পৃথিবীতে যে-সব রাজনৈতিক ব্যাপার ঘটেছে তার সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথাই লিখেছি; অর্থনৈতিক পরিবর্তন যা হয়েছে তার কথাও কিছু কিছু লিখেছি। এই চিঠিতে তোমাকে বলব অন্যান্য ব্যাপারের কথা, বিশেষ করে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং তার ফলাফলের কথা।

কিন্তু বিজ্ঞানের কথা শুরু করবার আগে, বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নারীদের অবস্থার যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে তার কথা তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেব। আইন সমাজ এবং প্রচলিত প্রথার বন্ধন থেকে নারীদের এই তথাকথিত 'মুক্তিলাভের' শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, বড়ো বড়ো শিল্পের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নারী শ্রমিক নিযুক্ত করা হত। সে বন্ধনমোচনের কাজ অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল, তার পর যুদ্ধের সময়ে অবস্থার চাপে পড়ে তার গতি অতি দ্রুত হয়ে উঠল; এখন যুদ্ধোত্তর যুগে সেটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। আগের চিঠিতে তোমাকে তাজিকিস্তানের কথা বলেছি—সেখানেও এখন নারীরা চিকিৎসক হয়েছে, শিক্ষক হয়েছে, ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে—মাত্র কয়েক বছর আগেও এরা পর্দার অন্তরালে বাস করত। তুমি এবং তোমার সমবয়সীরা সম্ভবত একে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরে নেবে। অথচ এটা আসলে একটা অত্যন্ত অভিনব ব্যাপার শুধু এশিয়াতে নয়, ইউরোপেও। একশো বছরেরও কম সময় আগের কথা, ১৮৪০ সনে লণ্ডনে 'পৃথিবীর দাসত্ব-বিরোধী সংঘের' প্রথম অধিবেশন হয়। আমেরিকাতে তখন নিগ্রোদের দাসত্ব নিয়ে বহু লোক চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন; আমেরিকা থেকে প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকজন নারী এই অধিবেশনে যোগ দিতে এলেন। কিন্তু সম্মেলনের কর্তারা সে 'নারী প্রতিনিধিদের' সেখানে ঢুকতেই দিলেন না; তাঁদের যুক্তি, কোনো নারীর পক্ষে একটা প্রকাশ্য সভায় যোগ দেওয়া অতি অশোভন ব্যাপার, নারীত্বের অবমাননাকর!

এবার বিজ্ঞানের কথা বলা যাক। সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি তোমাকে বলেছি, সেখানে বিজ্ঞানের চেতনাকে সামাজিক ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছিল। গত দেড়শো বছর বা তার কাছাকাছি সময় যাবৎ এই চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার পিছনে কিছু পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করে এসেছে—অবশ্য আংশিকভাবে মাত্র। বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি যত বেড়েছে, অযুক্তি ভেল্‌কি এবং কুসংস্কারের উপরে রচিত যে-সব মতামত ছিল সেগুলোও ততই বাতিল হয়ে গিয়েছে; বিজ্ঞানবিরোধী রীতি-নীতি এবং কার্যক্রম যা ছিল তাদের সম্বন্ধে মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অযুক্তি ভেল্‌কি এবং কুসংস্কারকে বৈজ্ঞানিক চেতনা একেবারেই পরাভূত করতে পেরেছে একথা অবশ্য বলছি না। সে দিন এখনও বহু দূরে। কিন্তু বিজ্ঞানের

সে জয়যাত্রা অগ্রসর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তার অনেকগুলো খুব বড়ো বড়ো জয়-লাভ আমরা দেখেছি।

শিল্প এবং মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পরিবর্তন এসেছিল, তার কথা তোমাকে আগেই লিখেছি। সমস্ত পৃথিবীর, বিশেষ করে পশ্চিম-ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার রূপ এমন বদলে গেল যে দেখে আর চেনাই যায় না; এর আগের হাজার হাজার বছরে যেটুকু রূপ পরিবর্তন এদের ঘটেছিল সেও তুলনায় কিছুই নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা যে বিরাট হারে বেড়ে গেল, সেইটাই তো একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। ১৮০০ সনে সমগ্র ইউরোপের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। ধীরে ধীরে, বহু যুগ ধরে সে সংখ্যা এই অঙ্কে এসে পেঁছেছিল। তার পর হঠাৎ তীরবেগে তার পরিমাণ বৃদ্ধির পথে ছুটে চলল—১৯১৪ সনে এর অঙ্ক দাঁড়াল ৪৬ কোটি। ঠিক এই সময়েই আবার ইউরোপ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক অন্যান্য মহাদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, চলে যাচ্ছিল; এদের সংখ্যাও আমরা ৪ কোটির মতো বলে ধরতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে, মাত্র একশো বছরের অতি সামান্য বেশি কালের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যা ১৮ কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ৫০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বৃদ্ধিও বিশেষ করে দেখা গেল ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ, পশ্চিম-ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডই ছিল সর্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ। অথচ সে-ই হয়ে উঠল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ, তার লোকসংখ্যা বেড়ে হল ৪ কোটি।

এই জনবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধির মূলে ছিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে মানুষের নিজের ইচ্ছামতো চালাবার ক্ষমতার, বা সে প্রক্রিয়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বৃহত্তর ব্যাপ্তি; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু তাই বলেই মনে করো না জ্ঞান বাড়লেই মানুষের বিজ্ঞতাও বাড়ে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত করতে, নিজের কাজে লাগাতে লাগল; অথচ জীবনে তাদের লক্ষ্য কী, বা কী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই তখন তাদের নেই। বেশ জোরালো একখানা মোটর গাড়ি খুবই কাজের জিনিস, কামনার জিনিস; কিন্তু সে গাড়িতে করে কোথায় যাব সেটাও তো জানা থাকা চাই। ঠিকমতো যদি চালাতে না পারি তবে হয়তো সে খাদের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশান অব সায়ান্সের প্রেসিডেণ্ট গত বৎসর বলেছিলেন : "নিজেকে কী করে চালাতে হয় সেটা জানবার আগেই প্রকৃতিকে চালাবার ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।"

বিজ্ঞানের সব সৃষ্টি—রেলওয়ে, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ, বেতার, আরও হাজার হাজার রকমের জিনিস আমরা প্রায় সকলেই ব্যবহার করি; কিন্তু কী করে তাদের সৃষ্টি হল সেটা একবারও ভেবে দেখি না। সেগুলোকে আমরা স্বাভাবিক বস্তু বলেই ধরে নিই, যেন আমরা কোনো একটা জন্মগত দাবির বলেই তাদের ব্যবহার করবার অধিকারী। আমরা একটা অতি উন্নত যুগে বাস করছি, আমরা নিজেরাও কী দারুণ রকম 'উন্নত', একথা ভেবেও আমরা বিরাট গর্ব অনুভব করি। অতীত সব যুগের তুলনায় আমাদের যুগটা একেবারেই ভিন্ন রকমের, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই; সেযুগের তুলনায় এযুগটা অনেক বেশি উন্নত, এ কথা বললেও নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না। কিন্তু তাই বলেই, মানুষ বা দল হিসাবে আমরা আগের চেয়ে বেশি উন্নত হয়েছি, একথাটা সত্য নাও হতে পারে। ইঞ্জিনচালক একটা ইঞ্জিনকে চালাতে পারে, প্লেটো বা সক্রেটিস পারতেন না। অতএব প্লেটো বা সক্রেটিসের চেয়ে এই ইঞ্জিনচালকটি একজন অধিকতর উন্নত বা মহত্তর ব্যক্তি, একথা বললে আহাম্মুকিরই চরম করা হবে। অথচ যান হিসাবে ইঞ্জিনটা প্লেটোর রথের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ধরনের বস্তু, এটাও খুবই সত্য কথা।

এখনকার দিনে অসংখ্য বই পড়ি আমরা; আমার আশঙ্কা হয় তার বেশির ভাগই বাজে বই। প্রাচীন কালের লোকেরা অতি অল্প বইই পড়তেন; কিন্তু সে বইগুলো ছিল ভালো বই, তাঁরা সে-গুলোকে পড়তেনও খুব ভালো করে। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে একজন ছিলেন

স্পিনোজা—বিদ্যা এবং বিজ্ঞতার তিনি প্রতিমূর্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, আমস্টারডমে বাস করতেন। শোনা যায় তাঁর গ্রন্থাগারে নাকি পুরো ষাটখানা বইও ছিল না।

অতএব একথাটা আমাদের জেনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে বলেই যে আমরাও মহত্তর বা বিজ্ঞতর হয়ে গেছি তার কোনো মানে নেই। সে জ্ঞানকে কী ভাবে ব্যবহার করা যায় সেটাও আমাদের জানতে হবে, তবেই তাকে আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব। গাড়িখানা আমাদের ভালো, কিন্তু সে গাড়িতে চড়ে সামনে ছুট দেবার আগে জেনে নিতে হবে, কোথায় আমরা যেতে চাই। তার মানে, জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত, তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমাদের থাকা দরকার। এখনকার অনেক লোকেরই সে ধারণা কিছুমাত্র নেই, নেই বলে তাদের কোনো দুশ্চিন্তাও দেখা যায় না। বিজ্ঞানের যুগে তারা বাস করছে, কিন্তু যে-সব ধারণা আর মতামত নিয়ে তারা চলে ফেরে কাজকর্ম করে সেগুলো অতি প্রাচীন, বিগত যুগের বস্তু। তার ফলে স্বভাবতই হাঙ্গামা বাধে, সংঘাতের সৃষ্টি হয়। চালাক বাঁদর হয়তো গাড়ি চালানো শিখতে পারবে, কিন্তু তার হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

আধুনিক যুগের জ্ঞান অত্যন্ত জটিল এবং ব্যাপক ব্যাপার। হাজার হাজার গবেষক ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন, প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব বিভাগে বসে নানারকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন, প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব জমিটিতে সুড়ঙ্গ কাটছেন, কণা কণা করে জ্ঞান আহরণ করে জ্ঞানের প্রকাণ্ড পাহাড়কে আরও উঁচু করে তুলছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্র এত বিশাল যে প্রত্যেকজন কর্মীকেই তাঁর নিজস্ব ধরনের কাজে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে নিতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই; কোনো কোনো বিষয়ে হয়তো তাঁর অগাধ বিদ্যা, অথচ অন্য কতকগুলো বিষয়ে তাঁর একেবারে কোনো বিদ্যাই নেই। সেক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপের সমগ্র ক্ষেত্রটির সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞোচিত ধারণা করে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। প্রাচীন জগতে 'সভ্যতা' বা 'শিক্ষা' কথাটার যা অর্থ ছিল, সে অর্থে তিনি 'সভ্য' বা 'শিক্ষিত' মানুষ নন।

অবশ্য এমন মানুষও আছেন, যাঁরা এইরকম সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন; তাঁরা নিজেরাও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, তবু একটা বৃহত্তর দৃষ্টি নিয়ে জগতকে দেখবার শক্তি তাঁরা রাখেন। যুদ্ধের বিশৃঙ্খলা বা মানবসুলভ বাধাবিঘ্ন, সমস্ত কিছুকেই অগ্রাহ্য করে এঁরা এঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন; গত পনর বছর বা ঐরকম সময়ের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে অপূর্ব সব রত্ন এঁরা উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সবচেয়ে বড়ো বৈজ্ঞানিক বলা হয় অ্যালবার্ট আইন্‌স্টাইনকে। ইনি একজন জর্মন ইহুদি; নবসৃষ্ট হিটলার সরকার সম্প্রতি এঁকে জর্মানি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ তারা ইহুদিদের প্রতি প্রসন্ন নয়।

আইন্‌স্টাইন গণিতশাস্ত্রের সূক্ষ্ম হিসাব কষে পদার্থবিদ্যার নূতন কতকগুলো মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করেছেন, যার প্রভাব সমস্ত বিশ্বসংসারের উপরে দেখা যাচ্ছে। দুশো বছর ধরে নিউটনের সূত্রগুলোকেই আমরা বিনা দ্বিধায় সত্য বলে স্বীকার করে এসেছি। আইন্‌-স্টাইনের আবিষ্কারে তারও কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটল। আইন্‌স্টাইনের এই সিদ্ধান্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে একটা অত্যন্ত আশ্চর্য উপায়ে। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, আলোর বিকীরণের একটা বিশেষ রীতি আছে; সেটার সত্যতা পরীক্ষা করা যায় সূর্যগ্রহণের সময়ে। তার পর যখন একবার সূর্য-গ্রহণ হল, দেখা গেল সত্যই আলোর রেখাগুলো সেই ভাবেই চলছে। অঙ্ক কষে যে সিদ্ধান্ত আইন্‌স্টাইন স্থির করেছিলেন, সেটা সত্য প্রমাণ হল বাস্তব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

আইন্‌স্টাইনের এই সিদ্ধান্তটি কী, তা আমি তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। বিষয়টা অত্যন্ত জটিল, আর এর সম্বন্ধে আমার ধারণাও মোটেই স্পষ্ট নয়। এর নাম হচ্ছে 'আপেক্ষিক তত্ত্ব'। বিশ্বজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আইন্‌স্টাইন দেখলেন, কাল এবং স্থান বলে যে ধারণা আমাদের আছে, তাকে আলাদা আলাদা করে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অতএব তিনি এই দুটি ধারণাকেই বাতিল করে দিলেন, দিয়ে একটি নূতন তত্ত্ব প্রচার করলেন, এর মধ্যে স্থান এবং কাল, দুটিকেই তিনি একত্র গেঁথে দিলেন। এইটাই হল তাঁর আবিষ্কৃত 'স্থান-কালে'র তত্ত্ব।

আইন্‌স্টাইনের গবেষণা ছিল সমগ্র বিশ্ব-জগতকে নিয়ে। উল্‌টো দিকে আছেন আবার অন্য সব বৈজ্ঞানিকরা, এঁরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। ধরো একটা আলপিনের ডগা—এত ক্ষুদ্র জিনিস যে খালি চোখে তাকে প্রায় দেখাই যায় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এঁরা প্রমাণ করলেন, এই পিনের ডগাটিও একদিক থেকে একটা আস্ত বিশ্ব-জগতেরই সামিল! এর মধ্যে আছে অসংখ্য অণু, তারা পরস্পরকে ঘিরে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে; প্রত্যেক অণুর মধ্যে আবার অনেক পরমাণু, তারাও পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে অথচ কেউ কাউকে স্পর্শ করছে না; এক একটি পরমাণুর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো করে বিদ্যুতের টুকরো বা চার্জ বা যাই বল, এদের নাম প্রোটন আর ইলেকট্রন, এরাও সারাক্ষণই অতি প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। এদেরও মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতর অংশ আছে, তাদের বলে পজিট্রন, নিউট্রন, ডেণ্টন; হিসাব করে দেখা গেছে একটি পজিট্রনের আয়ুর গড়পড়তা দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক সেকেণ্ডের প্রায় একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। এর সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে, শূন্যপথে যেমন গ্রহ-নক্ষত্রেরা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তারই মতো ব্যাপার—তবে অনেকখানি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে। মনে রেখো, অণু জিনিসটাই এত ছোটো যে সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও তাকে দেখা যায় না। আর পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন, এদের কথা তো কল্পনাতে আনাই কঠিন ব্যাপার। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার এতদূর উন্নতি এখন হয়েছে যে এই প্রোটন ইলেকট্রনদের সম্বন্ধেও রাশিকৃত তত্ত্ব আমরা জেনে ফেলেছি। সম্প্রতি পরমাণুকেও ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা গেছে।

বিজ্ঞানের যে-সব তত্ত্ব এখন বেরিয়েছে তার কথা ভাবতে গেলেই মাথা ঘুরে যায়; তার মূল্য নিরূপণ করা তো খুবই শক্ত কাজ। এর চেয়েও আশ্চর্য কথা কিছু তোমাকে শোনাচ্ছি। আমরা জানি, আমাদের এই পৃথিবীটাকে আমরা এত বড়ো বলে মনে করি, অথচ এটাও সূর্যের একটা ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র; সে সূর্য নিজেই আবার একটা অতি মানমর্যাদাহীন ক্ষুদ্র নক্ষত্র। সমগ্র সৌরজগৎটাই হচ্ছে স্থান-মহাসমুদ্রে একটি জলবিন্দু মাত্র। নিখিল বিশ্বের এক স্থান থেকে আরেক স্থানের দূরত্ব এত বেশি যে, এর কোনো কোনো জায়গা থেকে আমাদের এখানে এসে পৌঁছতে আলোরও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়। রাত্রে যখন একটা তারা দেখি, কাকে দেখতে পাই জান? এই মুহূর্তে সে তারাটির যে রূপ আছে তাকে নয়। দেখি, তার যে আলোর রশ্মিটি আমাদের কাছে এখন এসে পৌঁছচ্ছে, সে যখন সেই তারাটি ছেড়ে আমাদের দিকে যাত্রা করেছিল, সেই সময়ে তারাটির যে রূপ ছিল, তাকে। অতি দীর্ঘ তার সে যাত্রাপথ—সে পথ অতিক্রম করে আসতে হয়তো তার শত শত বা হাজার হাজার বছর লেগেছে। স্থান এবং কাল সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তা দিয়ে এর হদিশ মেলে না। সেই জন্যই আইন্‌-স্টাইনের স্থান-কালের তত্ত্ব দিয়ে এ-সব ব্যাপার বোঝা অনেক বেশি সহজ হয়। স্থানকে বাদ দিয়ে যদি কালের কথা ভাবি, তবে অতীত আর বর্তমানে তালগোল পাকিয়ে যাবে। যে তারাটিকে আমরা এই মুহূর্তে দেখছি আমাদের কাছে সে বর্তমান; অথচ আসলে আমরা দেখছি তার অতীত রূপকে। কে জানে হয়তো-বা তার অস্তিত্বই বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার সে আলোর রশ্মিটি যাত্রা শুরু করবার পরে কোনো একসময়ে।

বলেছি, আমাদের সূর্যটি একটি মানমর্যাদাহীন ক্ষুদ্র নক্ষত্র। এই রকম আরও প্রায় এক লক্ষ নক্ষত্র আছে, এদের সকলকে নিয়ে তৈরি হয় একটি নক্ষত্রপুঞ্জ। আমরা রাত্রে যে তারাগুলোকে দেখতে পাই তারা প্রায় সকলেই এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে। কিন্তু খালি-চোখে আমরা এই তারাদের অতি অল্প কয়েকটিকেই দেখতে পাই। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়ে আরও অনেক বেশি তারা দেখা যায়। এই বিজ্ঞানে যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন, বিশ্বজগতে এই রকম নক্ষত্রপুঞ্জ আছে মোট প্রায় এক লক্ষ।

আরেকটি বিস্ময়কর তথ্য বলছি। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই বিশ্বজগতের আয়তন ক্রমেই বাড়ছে। গণিতশাস্ত্রবিদ্‌ সার্‌ জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ একে তুলনা করেছেন একটা সাবানের বুদ্‌বুদের সঙ্গে: দিনদিনই সে বৃহত্তর হচ্ছে, এই বিশ্বজগত সেই বুদ্‌বুদের বাইরের আবরণ। এই

বুদ্বুদাকৃতি বিশ্বজগতের আয়তন এত বড়ো যে এর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে আলোরই বহু লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়।

তোমার বিস্মিত হবার ক্ষমতা যদি এখনও ফুরিয়ে গিয়ে না থাকে, তবে বাস্তবিকই বিস্ময়কর এই বিশ্বজগত সম্বন্ধে আরও একটি কথা শোনো। কেম্ব্রিজের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আছেন, তাঁর নাম সার্ আর্থার এডিংটন। তিনি বলেন, আমাদের এই বিশ্বজগত ক্রমশই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক দম-ফুরিয়ে-যাওয়া ঘড়ির মতো। আবার যদি কোনো প্রকারে এতে দম দিয়ে না দেওয়া হয়, তবে একদিন এটা একেবারেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অবশ্য এ-সব কাণ্ড ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে, কাজেই আপাতত আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞান ছিল পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন। এদের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বা বাইরের জগতকে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারত। তার পর বিজ্ঞান-ভক্ত মানুষ ভিতরের দিকে চোখ ফেরাল, নিজেকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ভ করল। জীব-বিদ্যার কদর বাড়ল—এটা হচ্ছে মানুষ জীবজন্তু গাছপালার মধ্যে জীবন কী ভাবে থাকে তারই বিদ্যা। ইতিমধ্যেই এর আশ্চর্যরকম উন্নতি হয়েছে; জীবতত্ত্ববিদ্‌রা বলছেন, আর অল্পদিনের মধ্যেই ইনজেকশন দিয়ে বা অন্য উপায়ে মানুষের চরিত্র বা প্রকৃতি বদলে দেওয়া সম্ভব হয়ে যাবে। হয়তো তখন কাপুরুষকে সাহসী বীরে পরিণত করা যাবে; কিংবা হয়তো তখন সরকারপক্ষ তাঁদের যারা সমালোচনা করছে বা বিরোধিতা করছে তাদের ধরে ধরে ইনজেকশন দিয়ে দেবেন, সরকারের কাজে বাধা দেবার শক্তিটাকেই তাদের কমিয়ে দেবেন—এইটাই হওয়া বেশি সম্ভব, কি বল?

জীববিদ্যার ঠিক পরের ধাপই হচ্ছে মনস্তত্ত্ববিদ্যা। এর কারবার মন নিয়ে, মানুষের চিন্তা, অভিপ্রায়, ভয় আর কামনা নিয়ে। বিজ্ঞানের অভিযান এইভাবে নিত্য নূতন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ক্রমেই বেশি কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, হয়তো এইভাবে আমাদের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তিই যুগিয়ে দিচ্ছে। সুজননবিদ্যাও জীববিদ্যা থেকে একটি মাত্র পরের ধাপ। এটা হচ্ছে জাতির উন্নতি-বিধানের বিজ্ঞান। বিশেষ কতকগুলো জীবকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানের কতখানি উন্নতি সাধন করা গেছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্যাঙকে কেটে দেখা হয়েছে, জীবের দেহে স্নায়ু এবং পেশীগুলো কীরকম-ভাবে কাজ করে। বেশি পাকা কলার উপরে অতি ক্ষুদ্র একরকম মাছি পড়ে, তার নামই হয়ে গেছে কলার-মাছি। এদের বিশ্লেষণ করে বংশানুক্রম সম্বন্ধে যত জিনিস জানা গেছে এমন আর কিছু থেকেই হয়নি। এই মাছিকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, কী ভাবে এক-পুরুষের দোষগুণ বংশানুক্রমে পরবর্তী পুরুষেও আত্মপ্রকাশ করে। এই থেকে মানুষ-জাতির মধ্যেও পুরুষানুক্রমের গতিটাকে বোঝা অনেকখানি সহজ হয়েছে।

এর চাইতেও অদ্ভুত একটা জীব থেকে আমরা অনেকখানি জ্ঞান লাভ করেছি, সে হচ্ছে সাধারণ ফড়িং। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘকাল ধরে এবং অতি যত্নে ফড়িঙের গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন; তার ফলে জানা গেছে, জীবজন্তুদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ কী ভাবে নিষ্পন্ন হয়। জীবনের একেবারে প্রথম দিন থেকেই ক্ষুদ্র প্রাণ কী ভাবে পুরুষ বা স্ত্রী ভ্রূণে পরিণত হয়, ধীরে ধীরে পরিণত হয় ক্ষুদ্র একটি স্ত্রী বা পুরুষ জীবে, ক্ষুদ্র একটি বালক বা বালিকাতে—তার সম্বন্ধে এখন আমরা অনেক কথাই জানি।

এই রকমের আরেকটি জীব আমাদের সাধারণ পোষা কুকুর। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আছেন পাভ্‌লভ্; এখন তাঁর চুরাশি বছর বয়স তবু এখনও তিনি সমানে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি খুব যত্ন করে কুকুরদের ভাবভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন; বিশেষ করে লক্ষ্য করলেন, খাদ্য দেখলে তাদের মুখ থেকে কীরকম করে লালা বেরোয়। কুকুরের মুখের লালার পরিমাণ পর্যন্ত তিনি মেপে দেখলেন। খাদ্য দেখলে কুকুরের এই জিভে জল আসা—এটা একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার, যাকে বলে একটি নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (unconditioned reflex)। ঠিক যেমন ছোট্টো শিশু হাঁচে বা হাই তোলে বা আড়মোড়া ভাঙে—সেজন্য আগে থেকে শেখার তার দরকার হয় না। আগের অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার আটকায় না।

এর পর পাভ্‌লভ্‌ আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া (conditioned reflex) জন্মাবার চেষ্টা করলেন। তার মানে কুকুরকে তিনি শেখালেন বিশেষ একটি সংকেত হলেই সে খাদ্য প্রত্যাশা করতে পারে। এর ফলে সেই সংকেতটি কুকুরের মনে খাদ্যের কথা জাগিয়ে দিতে লাগল; খাদ্য কাছে নেই তবু শুধু সংকেত শুনেই কুকুরের মুখে লালা ঝরতে লাগল, যেন সত্যই খাদ্য তার সামনে হাজির।

কুকুর আর তার লালাস্রাব নিয়ে এই-যে গবেষণা, একে ভিত্তি করেই মানব-মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অতি শৈশবে মানুষের মধ্যে কতকগুলো নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া থাকে; তার পর বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বেশি করে আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে জন্মাতে থাকে। বস্তুত যা কিছু আমরা শিখি, সবই শিখি এইভাবে। এইভাবেই আমাদের সব অভ্যাস গড়ে ওঠে, এইভাবেই আমরা ভাষা শিখি। আমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের প্রতিক্রিয়া দ্বারা; তা অবশ্য মধুর ও তিক্ত দুরকমেরই হয়। যেমন, মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া আছে, ভয়। পায়ের কাছে সাপ দেখলে, বা সাপের মতো চেহারার একটা দড়ির টুকরোও দেখলে, আমরা কিছু না ভেবেচিন্তেই তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে সরে যাই—সেজন্য পাভ্‌লভের গবেষণার তত্ত্ব জানা থাকবার প্রয়োজন হয় না।

পাভ্‌লভের গবেষণা মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সর্বত্রই একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। তাঁর কতকগুলো গবেষণা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, কিন্তু এ নিয়ে এখানে আর আলোচনা করা যাচ্ছে না। তবু একটি কথা বলছি, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষণের এছাড়া আরও কতকগুলো খুব ভালো প্রণালী আছে।

তোমাকে এই অল্পক'টা উদাহরণ দিলাম, যেন এর থেকেই তুমি খানিকটা ধারণা করতে পার বিজ্ঞানের কাজ কীরকম প্রণালীতে চলে। আগের দিনের দার্শনিকদের রীতি ছিল বড়ো বড়ো সব বিষয় নিয়ে আবছা অস্পষ্ট কথা বলে যাওয়া; অথচ সে বিষয়কে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা বা উপলব্ধি করা সহজ নয়, হয়তো বা সম্ভবই নয়। এদের কথা নিয়ে লোকেরা খালি তর্কের পর তর্ক করত, তর্ক করতে করতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠত; কিন্তু তাদের সে তর্ক এবং যুক্তির সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার কোনো চরম উপায় ছিল না, সুতরাং শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা না-স্বর্গে না-মর্তে হয়েই শূন্যে ঝুলে থাকত, ব্যাপারটার কোনো মীমাংসাই হত না। পরলোক সম্বন্ধে যুক্তিজাল বিস্তার করতেই এ'রা এত বেশি ব্যস্ত থাকতেন, যে এই পৃথিবীতে যে-সব সাধারণ বস্তু রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতেও তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের রীতি ঠিক এর বিপরীত। অতি সামান্য, অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলে যেগুলোকে মনে হয়, বৈজ্ঞানিকরা তাকেই অত্যন্ত যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করেন, তাই থেকেই অতি বড়ো বড়ো তথ্যের সন্ধান মিলে যায়। তার পর সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে এ'রা সূত্র রচনা করেন; সে সূত্রকে আবার আরও নূতনতর পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে নেওয়া হয়।

আমি বলছি না—বিজ্ঞান কখনও ভুল করে না। ভুল সে অনেক করে, তখন আবার তাকে গোড়ার দিকে ফিরে যেতে হয়। আবার গোড়া থেকে শুরু করে। কিন্তু তবুও কোনো প্রশ্নকে বিচার করতে হলে বৈজ্ঞানিক পন্থাটাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল পন্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের মনে অহঙ্কার ছিল, নিজেকে সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ মনে করত। এখন তার সে অহঙ্কার একেবারেই নেই। যতখানি সিদ্ধিলাভ তার হয়েছে তার জন্য সে গৌরব বোধ করে। কিন্তু জ্ঞানের যে বিশাল এবং চির-বিস্তারণশীল সমুদ্র তার সম্মুখে আজও অনুত্তীর্ণ পড়ে রয়েছে, তার দিকে তাকিয়েও সে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করছে। জ্ঞানীব্যক্তি জানেন তাঁর জ্ঞান কত সামান্য; মূর্খ ব্যক্তিই ভাবে তার অজানা কিছু নেই। বিজ্ঞানের অবস্থাও তাই। সে যত সামনে এগিয়ে চলেছে, তার গোঁড়ামিও ততই কমে যাচ্ছে; তাকে কোনো প্রশ্ন করলে তার জবাব দিতে সে ততই বেশি দ্বিধাবোধ করছে। এডিংটন বলেছেন: "বিজ্ঞানের প্রগতি কতদূর হল সেটা মাপতে হবে, কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারছি তা দিয়ে নয়; কতকগুলো প্রশ্ন আমরা করতে পারছি তাই দিয়ে।" হয়তো তাই। তবু বিজ্ঞান এখন ক্রমেই বেশি করে প্রশ্নের

উত্তর দিতে পারছে, জীবনের স্বরূপ আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, যথাযোগ্য লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত একটা মহত্তর জীবন যাপন করবার শক্তি আমাদের যুগিয়ে দিচ্ছে—সে জীবনযাপন করতে আমরা চাইব কি না কে জানে। অযৌক্তিকতার অস্পষ্ট জটিলতা নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার নয়; সে জীবনের অন্ধকার কোণগুলিকেও আলোকের ধারায় উদ্ভাসিত করে তোলে, সনাতন সত্যের মুখোমুখি এনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়।

১৮৩

বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার

১৪ই জুলাই, ১৯৩৩

বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারগুলির ফলে বিস্ময়ের যে মায়ালোকের দ্বার আমাদের সামনে খুলে গেছে, তার একটুখানি রূপ তোমাকে আমি আগের চিঠিতে দেখিয়েছি। জানি না, সেইটুকু দেখার ফলে তোমার মনে কৌতূহল জাগবে কি না, চিন্তা এবং কার্যের সেই রাজ্যের দিকে তুমি আকৃষ্ট হবে কি না। এই-সব বিষয় সম্বন্ধে আরও বেশি যদি জানতে চাও সেটা বই পড়ে সহজেই পারবে; এ সম্বন্ধে বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো : মানুষের চিন্তা আর জ্ঞান প্রতিমুহূর্তেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, প্রকৃতি এবং বিশ্বজগতের সমস্যাগুলোকে নিয়ে সারাক্ষণই নাড়াচাড়া করছে, বুঝতে চেষ্টা করছে; আজ তোমাকে যা বলছি কাল হয়তো সেটা একেবারেই অপ্রচুর এবং সেকেলে প্রমাণ হয়ে যাবে। মানুষের মন বিশ্ব-প্রকৃতিকে যুদ্ধে আহ্বান করে ফিরছে : বিশ্বজগতের দূর দূরতম কোণেও সে অবলীলাক্রমে উড়ে চলে যায়, তার রহস্যগুলোর মর্মভেদ করবার চেষ্টা করে; সাধারণ চোখে যেটা অপরিসীম বৃহৎ বা অনণুমেয় ক্ষুদ্র হয়ে আছে, তাকে পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে মেপে দেখতে সাহস করে—এর এই বীরত্বের কথা যখন ভাবি, আমি মুগ্ধ হয়ে যাই।

এই সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে 'খাঁটি' বিজ্ঞান; অর্থাৎ এমন বিজ্ঞান, পৃথিবীর জীবনের উপরে যার কোনো প্রত্যক্ষ বা আপাত প্রভাব নেই। আপেক্ষিক তত্ত্ব বা স্থান-কালের পরিমাপ, বা বিশ্বজগতের আয়তন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা সহজেই বুঝি। এই সিদ্ধান্তগুলির বেশির ভাগই দাঁড়িয়ে আছে উচ্চতর গণিতের উপরে; গণিতের সে জটিল এবং উচ্চতর অধ্যায়গুলি এই অর্থে 'খাঁটি' বিজ্ঞানের অন্তর্গত। বেশির ভাগ মানুষই এ ধরনের বিজ্ঞান নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না; প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ করা চলে বা দেখা যায়, স্বভাবত তার দিকেই তারা আকৃষ্ট হয় বেশি। এই ফলিত বিজ্ঞানই গত দেড় শো বছর ধরে মানুষের জীবনযাত্রাতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বস্তুত এখনকার দিনে মানুষের জীবনটাই সম্পূর্ণরূপে চালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিজ্ঞানের এ-সব শাখা-প্রশাখার সাহায্যে; এদের বাদ দিয়েও টিকে রয়েছি, এমন কথা চিন্তা করাই আমাদের পক্ষে কঠিন। লোকের মুখে অনেক সময় অতীত কালের সেই সুন্দর শুভ্র দিনগুলির নাম শোনা যায়, শোনা যায় একটি স্বর্ণযুগের নাম যা দীর্ঘকাল অতীত হয়ে গেছে। অতীত ইতিহাসের কোনো কোনো যুগের কাহিনী সত্যই অত্যন্তরকম মনোমুগ্ধকর; কোনো কোনো দিক দিয়ে হয়তো সে যুগ আমাদের যুগ থেকে অনেক ভালোও ছিল। কিন্তু এর প্রতি এই-যে আকর্ষণ আমরা অনুভব করি, সেও বোধ হয় অন্য কারণে ততটা নয় যতটা এরা দূরের যুগ, খানিকটা অস্পষ্টতার রহস্যে আবৃত যুগ বলে। বিশেষ কোনো বড়ো মানুষ একটা বিশেষ যুগে জন্মেছিলেন বা প্রভুত্ব করে গিয়েছেন বলেও সে-যুগটাকেই খুব বড়ো বলে মনে করবার নেশাও আমাদের আছে। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা আগাগোড়া উলটে দেখো, দেখবে সাধারণ

মানুষের অবস্থা চিরদিনই শোচনীয় থেকে এসেছে। যুগ-যুগ ধরে যে-সব বোঝা তারা বয়ে এসেছে, তার থেকে বিজ্ঞানই খানিকটা নিষ্কৃতি তাদের এনে দিয়েছে।

তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখো; দেখবে যা-কিছু তোমার চোখে পড়ছে তার প্রায় সব জিনিসেরই কোনো-না-কোনো ভাবে বিজ্ঞানের সংগে যোগ আছে। আমরা পথ চলি ফলিত বিজ্ঞানের প্রবর্তিত রীতিতে; পরস্পরের কাছে খবর পাঠাই সেই পথে; অনেক সময়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্য ঐ একই উপায়ে প্রস্তুত হয়, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গাতে বাহিত হয়। যে সংবাদপত্র আমরা পড়ি, যে বই আমরা কিনি, যে কাগজে আমরা লিখি, যে কলম দিয়ে লিখি—বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো পথেই এগুলো তৈরি করা যেত না। স্বাস্থ্যবিধি, জনস্বাস্থ্য, ব্যাধির প্রতিকার, এগুলোও নির্ভর করে বিজ্ঞানেরই উপরে। ফলিত বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আধুনিক জগতে একটি পা-ও চলা একেবারেই অসম্ভব। অন্যান্য কারণের কথা ছেড়েই দিই, একটিমাত্র কারণ এর চরম এবং পরম কারণ : বিজ্ঞান যদি না থাকত তবে পৃথিবীর এই বিপুল জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্যেরই সংস্থান করা যেত না, পৃথিবীর অর্ধেক বা তারও বেশি মানুষ শুধু অনাহারেই মরে যেত। গত এক শো বছরের মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কী তীব্রবেগে বেড়ে চলেছে, সেকথা তোমাকে বলেছি। খাদ্য উৎপাদনের এবং সে খাদ্যকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানোর কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য নিলে তবেই এই বিপুল জনতার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

প্রথম যেদিন বিজ্ঞান মানুষের জীবনে বড়ো কলকব্জার আমদানি করে দিল, তার পর থেকেই ক্রমাগত সে কলের উন্নতি সাধন চলেছে। প্রতি বছর, এমনকি প্রতি মাসেই অসংখ্য ছোটো ছোটো নূতন আবিষ্কার, ছোটো ছোটো পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলে সে কলের কর্মক্ষমতা দিন দিন যতই বেড়ে চলেছে, মানুষের শ্রমের উপরে তাকে ততই কম নির্ভর করতে হচ্ছে। আজকের এই উন্নতি, যন্ত্রশিল্পের এই প্রগতি, এর বেগ বিশেষ করে দ্রুত হয়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীরই এই গত ত্রিশটি বছরে। সম্প্রতি বছর কয়েক ধরে এই পরিবর্তনের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়েছে—আজও সে বেগ থেমে যায় নি; এর ফলে শিল্পে এবং উৎপাদনের প্রণালীতে এমন বিপ্লবই ঘটে যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল একমাত্র তারই সংগে এর তুলনা দেওয়া চলে। এই নূতন বিপ্লবের প্রধান কারণ হচ্ছে, উৎপাদনের কাজে বিদ্যুৎ-শক্তির ক্রমশই অধিকতর ব্যবহার। বিংশ শতাব্দীতে বিরাট একটি বিদ্যুৎ-বিপ্লব পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ঘটেছে; এর ফলে জীবনযাত্রার রীতিটাই সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছিল যন্ত্র-যুগের; বিদ্যুৎ-বিপ্লবের ফলে আমরা এখন ছুটে চলেছি শক্তি-যুগের দিকে। সমস্ত ব্যাপারই এখন চলছে বিদ্যুতের কৃপায়—এর ব্যবহার করছি আমরা শিল্পে, করছি রেলগাড়ি চালাতে, করছি আরও অসংখ্য কাজেকর্মে। এই জন্যই লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বত্র জুড়ে মস্তমস্ত জল-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিলেন—তাঁর দূরপ্রসারী দৃষ্টি বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎকেও দেখতে পেয়েছিল।

শিল্পে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার এবং তার সংগে অন্যান্য যন্ত্রোন্নতির ফলে অনেক সময়েই উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়; অথচ ব্যয় বিশেষ পড়ে না এতে। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতির পরিচালন-ব্যবস্থায় সামান্য একটু অদলবদল করলেই হয়তো তার উৎপাদনক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এর প্রধান কারণ, যন্ত্রের উন্নতির সংগে সংগে মানুষ নিযুক্ত করবার প্রয়োজনটা ক্রমেই অন্তর্হিত হয়ে যেতে থাকে; মানুষ কাজ করে ধীরে, তার ভুল করবার সম্ভাবনাও থাকে। অতএব যন্ত্রের যতই উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে সে-যন্ত্র চালাতে শ্রমিকও ততই কম নিযুক্ত করা হয়। একটিমাত্র মানুষ আজকাল কতকগুলি হাতল আর বোতামের সাহায্যে বিরাট বিরাট যন্ত্রকে চালাচ্ছে। এর ফলে যন্ত্রোৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ অত্যন্তরকম বেড়ে যায়; আবার ঠিক তারই সংগে সংগে কারখানা থেকে বহু মানুষকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, কারণ সে যন্ত্র চালাতে আর তাদের প্রয়োজন হবে না। ওদিকে আবার যন্ত্রপাতির উন্নতিও এত দ্রুতবেগে ঘটে চলেছে যে, অনেক সময়ে

দেখা যায়, নূতন একটা যন্ত্র কারখানায় এনে বসিয়ে দিতে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যেই সে যন্ত্রটা খানিক পরিমাণে বাতিলের মধ্যে পড়ে গেছে, কারণ ইতিমধ্যেই আরও অধিকতর উন্নত ধরনের যন্ত্র তৈরি হয়ে গেছে।

শ্রমিককে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গাতে যন্ত্রের প্রবর্তন—এটা অবশ্য যন্ত্রশিল্পের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই চলে এসেছে। তখনকার দিনে এ নিয়ে বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে, ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা সে নূতন কলকে ভেঙেচুরে দিয়েছে—এর কথা বোধ হয় তোমাকেও বলেছি। কিন্তু তার পরে দেখা গেল, যন্ত্র-ব্যবহারর ফলে শেষপর্যন্ত আরও বেশি মানুষেরই চাকরি জুটে যায়। যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমিক অনেক বেশি বেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারে; তার ফলে তার বেতনও বেড়ে গেল, এবং পণ্যের মূল্য কমে গেল। অতএব তখন শ্রমিকরা এবং সাধারণ লোকেরা সে-পণ্য আরও বেশি করে কিনতে পারল। তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়ে চলল, যন্ত্রোৎপন্ন পণ্যেরও চাহিদা বাড়তে থাকল। এর ফলে আবার আরও বেশি কারখানা তৈরি করা হল, আরও বহু শ্রমিক সেখানে নিযুক্ত হয়ে গেল। অতএব দেখছ, যন্ত্র-ব্যবহারের ফলে প্রত্যেকটা কারখানায় বহু শ্রমিকের কাজ চলে গেল বটে, কিন্তু কারখানার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবার ফলে মোটের উপর আরও বেশি পরিমাণ শ্রমিকই কাজ পেয়ে গেল।

এই ব্যাপার বহু কাল ধরে চলেছে; কারণ শিল্পতন্ত্রী দেশগুলো দূরবর্তী অনুন্নত দেশগুলোর বাজারে মাল বেচে সেখান থেকে লাভ আহরণ করত, তাতেও এই প্রক্রিয়াটারই চলবার সুবিধা বেড়েছে। সম্প্রতি বছর কয়েক যাবৎ ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। হয়তো বর্তমান ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থায় এর প্রসার আর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না; এখন সে ব্যবস্থাটাকেই একটু বদলে নেওয়া দরকার হয়েছে। আধুনিক শিল্পের ঝোঁকই হচ্ছে 'প্রচুর পণ্য উৎপাদনের' দিকে। কিন্তু যে পণ্য উৎপন্ন হল সেটা জনসাধারণ কিনে নিতে থাকলে, তবেই শুধু সেটা চলতে পারে। জনসাধারণ যদি অত্যন্ত দরিদ্র হয় বা বেকার হয়ে থাকে, তবে সে-পণ্য কিনবার সামর্থ্যও তাদের থাকে না।

তা হোক, তবু এখনও যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন অবিরাম গতিতেই চলেছে; ক্রমাগতই নূতন নূতন যন্ত্র এসে মানুষের স্থান দখল করছে, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। গত চার বছর যাবৎ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যেপে বিরাট একটা বাণিজ্য-সংকট চলেছে; তবু তাতেও যন্ত্রশিল্পের উন্নতি-সাধন বন্ধ হয় নি। শোনা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে নাকি ১৯২৯ সনের পর থেকে এই সময়টুকুর মধ্যেই এমন সব উন্নতি ঘটানো হয়েছে, যে তার ফলে দেশে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার বসে রয়েছে তাদের আর কোনো দিনই কাজ পাবার আশা নেই; ১৯২৯ সনে যত পণ্য দেশে উৎপন্ন হচ্ছিল ঠিক সেই পরিমাণেই যদি উৎপাদন চলতে থাকে, তবুও না।

পৃথিবীর সর্বত্র, এবং বিশেষ করে শিল্পতন্ত্রে অগ্রণী দেশগুলিতে বেকার শ্রমিকদের নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে—এইটেই হচ্ছে তার একটা কারণ। অবশ্য আরও বহু কারণ তার আছে। এটা একটা অদ্ভুত এবং বিপরীত সমস্যা। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অধিকতর পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে, এর অর্থই হচ্ছে, অন্তত অর্থ হওয়া উচিত, জাতির পক্ষে আরও বেশি ধনের সংস্থান হল—প্রত্যেকেই এখন আরও ভালোরকম খেতে পরতে পাবে। কিন্তু তা তো হয় নি, বরং এর মূলে দেখা দিয়েছে দারিদ্র্য আর ভয়ংকর দুর্দশা। হঠাৎ মনে হবে, এই সমস্যার একটা বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করা কঠিন নয়। সত্যিই হয়তো নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, যুক্তিসম্মত উপায়ে এর সমাধানের চেষ্টা করতে হবে—আসল মুশকিল এই খানেই। কারণ সেটা করতে গেলেই বহু জনের বহু রকম কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগবে; তাঁদের হাতে অনেকখানি শক্তি আছে, দেশের সরকারকে ইঙ্গিতে চালানোর ক্ষমতা তাঁরা রাখেন। তাছাড়া সমস্যাটা সম্পূর্ণই আন্তর্জাতিক; অথচ এখনকার দিনে জাতিতে জাতিতে এমন রেষারেষি চলেছে যে সকলে মিলে এর একটা আন্তর্জাতিক সমাধান করতে যাবার পথই মোটে খোলা নেই। সোভিয়েট রাশিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ধরনের সব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পৃথিবীর বাকি সমস্ত দেশই ধনিকতন্ত্রী এবং তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন;

তাই তাকেও বাধ্য হয়েই চলতে হচ্ছে শুধু জাতিগত ভাবে। এর ফলে তাকে অসুবিধাও অনেক বেশি সইতে হচ্ছে, অন্যথা হয়তো কাজটা তার পক্ষে অনেক সহজ হত। পৃথিবীটা এখন সত্যই একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে; অথচ তার রাজনৈতিক গঠনটা পড়ে রয়েছে পেছনে, সে এখনও চলছে জাতীয়তার অতি-সংকীর্ণ পথ ধরে। সমাজ-তন্ত্রকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতেই হয়, তবে তাকে অবশ্যই হতে হবে আন্তর্জাতিক, বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র। কালের স্রোতকে যেমন উজানে চালানো যায় না; তেমনই বর্তমান জগতে যে আন্তর্জাতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে এখনও সে সম্পূর্ণ নয়; তবু একে উচ্ছিন্ন করে আবার নিঃসংগ জাতিকেই আশ্রয় করে পৃথিবীকে গড়ে নেওয়াও অসম্ভব। অনেক দেশেই এখন ফ্যাসিস্টরা জাতীয়তাবাদকেই উগ্রতর, গভীরতর করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ ধরনের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই; কারণ জগতের অর্থনৈতিক জীবন এখন চলছে মূলত একটা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে, এই চেষ্টাটা ঠিক তার বিপরীত মুখে চলবার চেষ্টা। এই ব্যর্থতায় সে পৃথিবীসুদ্ধ সংগে নিয়েই ভেঙে পড়বে, আমরা যাকে আধুনিক সভ্যতা বলছি তাকেই সবসুদ্ধ একটা ব্যাপক সর্বনাশের মুখে এনে ফেলবে—এমন হওয়া অবশ্য মোটেই অসম্ভব নয়।

এরকম একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা যে খুবই সুদূরপরাহত বা অচিন্ত্যনীয়, তাও মোটেই নয়। বিজ্ঞান তার সংগে সংগে ভালো জিনিস আমাদের এনে দিয়েছে আমরা দেখেছি; কিন্তু যুদ্ধের ভীষণতাকেও বিজ্ঞানই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। বিশুদ্ধ এবং ফলিত বিজ্ঞানের বহু শাখা, বহু অংগকেই বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো এবং সরকারপক্ষ অবহেলা করে এসেছেন। কিন্তু যুদ্ধের কাজে বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেদিকটাকে তাঁরা তাই বলে অবহেলা করেন নি; বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের সাহায্যে নিজেদের রণসজ্জা এবং শক্তিকে সম্পূর্ণ করে নিতে তাঁদের উৎসাহের ত্রুটি নেই। স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এখনকার বেশির ভাগ রাষ্ট্রই দাঁড়িয়ে আছে নিছক শক্তিকেই আশ্রয় করে; বৈজ্ঞানিক সজ্জার দ্বারা এই-সব সরকাররা এতখানি শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছেন যে, কোনোরকম প্রতিপ্রহারের ভয় না করেই তাঁরা প্রজাদের উপরে অত্যাচার চালাতে পারবেন। আগের কালে অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের প্রজারা বিদ্রোহ করত, শহরের রাস্তায় ইটকাঠ দিয়ে প্রাচীর খাড়া করে তার আড়াল থেকে যুদ্ধ করত। ফরাসি-বিপ্লবের সময়েও এই ভাবেই তারা লড়েছে। কিন্তু সেদিন বহুকাল আগে চলে গেছে। এখন আর সুসংহত এবং সুসজ্জিত একটি সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা নিরস্ত্র, এমনকি সশস্ত্র, জনতার পক্ষেও সম্ভব নয়। সে সরকারি বাহিনী নিজেই সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, রুশ-বিপ্লবের সময়ে তাই হয়েছিল। সে যদি হয় তো আলাদা কথা; নইলে শুধু গায়ের জোরে তাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এই জন্যই এখন যে প্রজারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে চায় তাদের পক্ষে গণ-আন্দোলন চালাবার অন্যরকম এবং অধিকতর শান্তিপূর্ণ রীতি আবিষ্কার করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

এমনি করে বিজ্ঞানের বলেই এক-একটা দল বা ধনী-সম্প্রদায় রাষ্ট্রে প্রভুত্ব বিস্তার করছে; ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে এই রকম ধনী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটছে; কোথাও এরা গণতন্ত্রের নীতিকেই মুখে স্বীকার করে নিচ্ছে, কোথাও-বা খোলাখুলিই তাকে বাতিল করে দিচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই ধনী সম্প্রদায়দের মধ্যে আবার পরস্পর বিবাদ লাগে, তার ফলে জাতিতে জাতিতে বাধে যুদ্ধ। এখনকার দিনে বা ভবিষ্যতে যদি এই রকমের একটা বড়ো যুদ্ধ বাধে, তার ফলে শুধু ধনী সম্প্রদায় নয়, সমস্ত মানব সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আবার এও হতে পারে, হয়তো এই সভ্যতার ভস্মস্তূপ থেকেই জন্মলাভ করবে একটি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা—মার্ক্‌সের মতবাদে যে সম্ভাবনার প্রত্যাশা করা হয়েছে।

যুদ্ধের বাস্তব রূপ বড়ো ভয়ংকর; সে রূপ কল্পনা করা মোটেই সুখপ্রদ নয়। এই জন্যই তার সে বাস্তব রূপকে সুন্দর সুন্দর বাক্য, বীরত্ব-ব্যঞ্জক সংগীত আর সেনাবাহিনীর

উজ্জ্বল পরিচ্ছদের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু এখনকার দিনে যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়, তার খানিকটা জ্ঞান আমাদের থাকা প্রয়োজন। গত যুদ্ধে—বিশ্বযুদ্ধে—যুদ্ধের ভীষণতা কতখানি সেটা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। অথচ শোনা যাচ্ছে, এর পরের বারের যুদ্ধটা নাকি এমন ভয়াবহ হবে যে তার তুলনায় গতবারের যুদ্ধটা একেবারে কিছুই নয়। গত কয়েকবছরে শিল্প-কৌশলের উন্নতি যদি আগের দশগুণ হয়ে থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক রণ-কৌশলের উন্নতি হয়েছে একশো-গুণ। যুদ্ধ এখন আর পদাতিক সেনার আক্রমণ বা অশ্বারোহী সেনার দ্রুতধাবনের ব্যাপার নয়; পুরোনো যুগের তীরধনুকের মতোই পুরোনো যুগের সে পদাতিক আর অশ্বারোহী সেনাও এ যুগে একেবারেই অচল। যুদ্ধ এখন চলছে যন্ত্রচালিত ট্যাঙ্ক (একরকমের চলন্ত যুদ্ধজাহাজ, শুঁয়োপোকার পায়ের মতো খাঁজওয়ালা চাকার উপর চলে), বিমান আর বোমা দিয়ে—বিশেষ করে শেষের দুটি দিয়ে। এরোপ্লেনের গতিবেগ আর কার্যক্ষমতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে।

এখন আমাদের ধারণা হয়েছে, যুদ্ধ যদি সত্যই বাধে, তবে যুদ্ধরত জাতিগুলো সঙ্গে সঙ্গেই বিপক্ষ-দলের বিমানবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবে। যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যেই সে এরোপ্লেনরা এসে হাজির হবে; বা হয়তো যুদ্ধ ঘোষণার আগেই অতর্কিতে শত্রুর বড়ো বড়ো শহর আর কারখানাগুলোর উপরে তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করবে। এদের সে আক্রমণকে ব্যাহত করবার কোনো উপায়ই বস্তুত থাকবে না। শত্রু-পক্ষের দু'চারখানা এরোপ্লেনকে হয়তো-বা ধ্বংস করতে পারবে; তবু যেগুলো বাকি থেকে যাবে শহরটিকে ধ্বংস করে দেবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। এরোপ্লেন থেকে যে বোমা ফেলা হবে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে বিষাক্ত বাষ্প; বাতাসে মিশে সেই বিষবাষ্প সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে যে-কোনো জীবন্ত প্রাণী তার স্পর্শের মধ্যে আসবে সকলেই দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে। অসামরিক প্রজাবৃন্দকে এইভাবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞে আহুতি দেওয়া হবে, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এবং বেদনা দিয়ে হত্যা করা হবে তাদের, অসহ্য সে-মৃত্যুর যন্ত্রণা, তার সংবাদেও মানুষের মন বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়বে! যে জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে মত্ত, তাদের দুই পক্ষেরই বড়ো বড়ো শহরগুলিতে হয়তো একই সঙ্গে এই ভয়াবহ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হতে থাকবে। গতবারের মতো যদি আবার ইউরোপে যুদ্ধ বাধে, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন হয়তো কয়েকটি মাত্র দিন বা সপ্তাহের মধ্যেই ভস্মাবৃত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

এর পর আরও আছে। এরোপ্লেন থেকে যে বোমা ফেলা হবে, তার মধ্যে হয়তো থাকবে নানারকম ভয়ানক রোগের বীজাণু; সে বোমা ফেললে হয়তো একটা সমগ্র শহরেই সেই সব রোগ সংক্রামিত হয়ে যাবে। এই রকমের 'বীজাণু-যুদ্ধ' অন্যান্য উপায়েও চালানো যায় : খাদ্যে এবং পানীয় জলে বীজাণু মিশিয়ে দিয়ে, বা জীবজন্তুর সাহায্যে এগুলো ছড়িয়ে দিয়ে—যেমন ইঁদুরের সাহায্যে প্লেগের বীজাণু ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

এ-সব কথা শুনলেও বিশ্বাস হয় না, মনে হয় যেন কোনো নৃশংস পিশাচের গল্প। সত্যই তাই। পিশাচও বোধ হয় এমন কাজ করতে চায় না। কিন্তু মানুষ যখন অত্যন্ত বেশি ভয় পায়, জীবন-মরণ-যুদ্ধে মেতে ওঠে, তখন অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারই ঘটতে থাকে। শত্রুপক্ষ হয়তো এইরকমের অন্যায় বা পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করবে, এই ভয়েই প্রত্যেক দেশ আগে থাকতে সেই উপায়টি নিজে অবলম্বন করে বসে। তার কারণ, এই অস্ত্রগুলি এত ভয়ংকর যে, যে-দেশ একে প্রথম প্রয়োগ করে বসতে পারে তারই একটা প্রকাণ্ড সুবিধা। ভয়ের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী!

বস্তুত গত যুদ্ধেই বিষবাষ্পের প্রচুর ব্যবহার হয়েছিল। সকলেই জানে, পৃথিবীর বড়ো দেশগুলোর প্রত্যেকেরই এখন মস্ত মস্ত কারখানা আছে, সেখানে যুদ্ধের জন্য এই বাষ্প তৈরি করে রাখা হচ্ছে। এর একটা আশ্চর্য ফল দাঁড়াবে : আগামীবারের মহাযুদ্ধে সত্যকার লড়াই চলবে রণক্ষেত্রে নয়—সেখানে হয়তো কতকগুলো সেনাদল মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পরস্পরের মুখো-মুখী হয়ে বসে থাকবে; আসল যুদ্ধটা হবে রণক্ষেত্রের পেছনে, শহরগুলোতে, অসামরিক প্রজাবৃন্দের ঘরে ঘরে। কে জানে, হয়তো-বা সে যুদ্ধে রণক্ষেত্রটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান;

কারণ সেইখানেই বিমান-আক্রমণ, বিষ-বাষ্প এবং জীবাণুর সংক্রমণ থেকে সৈন্যদের রক্ষা করবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে! আর পিছনে পড়ে রইল যে মানুষরা, যে নারীরা বা যে শিশুরা, তাদের রক্ষার জন্য সেরকম কোনো ব্যবস্থাই করা হবে না।

কিন্তু এর ফল শেষপর্যন্ত দাঁড়াবে কী? সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস? শত শত বৎসরের চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলে যে সংস্কৃতি আর সভ্যতার যে বিরাট সৌধ গড়ে উঠেছে, তার অবসান?

কী-যে হবে তা কেউ জানে না। ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠন জোর করে কেড়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এখনকার পৃথিবীতে আমরা ঘটনার দুটি প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি—দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিপরীত প্রবাহ। একদিকে দেখছি সহযোগিতা আর যুক্তির জয়যাত্রা, সভ্যতার কাঠামোকে তিলে তিলে গড়ে তোলার প্রয়াস; অন্যদিকে ধ্বংসের সাধনা, যেখানে যা-কিছু আছে সমস্ত কিছুকে ভেঙেচুরে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার আয়োজন, সমগ্র মানবজাতির আত্মহত্যা করবার দুরন্ত প্রয়াস। দুটি প্রবাহেরই গতিবেগ দিন দিন দ্রুততর হচ্ছে, দুই পক্ষই নিজেকে সুসজ্জিত করে নিচ্ছে বিজ্ঞানের অস্ত্র আর কৌশল দিয়ে। কিন্তু এদের মধ্যে জয় হবে কার?

১৮৪

বাণিজ্য-মন্দা এবং বিশ্ব-সংকট

১৯শে জুলাই, ১৯৩৩

বিজ্ঞানের বলে মানুষ কতখানি শক্তির অধিকারী হয়েছে, সে শক্তি দিয়ে কী অসাধ্য সাধন করছে, তার কথা যত ভাবি ততই অবাক হয়ে যাই। ধনিকতন্ত্রী জগতের এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সে সত্যই বিস্ময়কর। রেডিওর সাহায্যে আমাদের কণ্ঠস্বর দূর দূর দেশে গিয়ে পেঁাচচ্ছে. বেতার টেলিফোনের দ্বারা আমরা পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলছি, অল্পদিনের মধ্যেই টেলিভিশনের প্রসাদে তাদের আমরা চোখেও দেখতে পাব। বিজ্ঞানের কার্য-ক্ষমতা অপূর্ব; এর দ্বারা সে মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুই প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করতে পারে; দূর অতীত কাল থেকেই মানুষের জীবনে প্রধান অভিশাপ হচ্ছে দারিদ্র্য, তার হাত থেকেও জগতকে মুক্ত করবার শক্তি রাখে। মানুষের ইতিহাসের যেদিন প্রথম আরম্ভ, সেই দিন থেকেই মানুষকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সে পরিশ্রমের যথেষ্ট মূল্য তারা কোনোদিনই পায় নি। সেই দৈনন্দিন দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় সে স্বপ্ন দেখেছে একটা স্বর্ণময় জগতের—সেখানে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের ছড়াছড়ি, যা চাও তাই সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাবে। অতীত দিনের একটা স্বর্ণ-যুগের কল্পনা করেছে সে, তার নাম সত্য-যুগ; কল্পনা করেছে আবার একদিন একটা স্বর্গ-লোক পৃথিবীতে নেমে আসবে, সেখানে শান্তির আর সুখের মধ্যে তাদের এতকালের এই দৈন্যের উপবাসের অবসান ঘটবে। তার পর এল বিজ্ঞান, প্রচুর পরিমাণ ধনসৃষ্টির উপায় তার করায়ত্ত করে দিল। অথচ সেই সম্ভাব্য এবং বাস্তব প্রাচুর্যের মাঝখানেও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজও রয়েছে দুঃখ আর দৈন্যের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে। কথাটা শুনলে অসম্ভব বলেই মনে হয়, তবুও এটা সত্য। আশ্চর্য নয় কি?

আমাদের বর্তমান দিনের মানবসমাজ বিজ্ঞান আর তার অজস্র দানকে নিয়ে বাস্তবিকই বিব্রত হয়ে পড়েছে। এদের একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই; ধনিকতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের সর্বশেষ কর্মপদ্ধতি আর উৎপাদন প্রণালীর চলেছে বিরোধ। ধন কী করে উৎপাদন করতে হয় সেইটাই শুধু আমরা শিখেছি, উৎপন্ন ধন কী করে বণ্টন করতে হবে সেটা শিখি নি।

এই গেল ক্ষুদ্র একটু ভূমিকা; এর পরে চলো আবার ইউরোপ আর আমেরিকাকে একটুখানি দেখে আসি। বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় দশটা বছর যাবৎ এরা যে-সব অসুবিধা আর মুশকিলে পড়েছিল,

তার কথা খানিকটা তোমাকে ইতিপূর্বেই বলেছি। যুদ্ধোত্তর যুগে যে অবস্থাটা পৃথিবীতে দেখা দিল তার আঘাতে বিজিত দেশগুলোর—জর্মনির এবং মধ্য-ইউরোপের ছোটো ছোটো দেশগুলির—দশা সংকটাপন্ন হয়ে উঠল; তাদের মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ইউরোপের বিজয়ী এবং উত্তমর্ণ জাতিদের অবস্থাও এর চেয়ে খুব বেশি ভালো ছিল না। প্রত্যেকেই এরা আমেরিকার কাছে টাকা ধারে, দেশের মধ্যেও এদের অজস্র যুদ্ধ-ঋণ; এই দুই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। একমাত্র আশা ছিল এদের, জর্মনির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা পাবে, সেই টাকা দিয়ে অন্তত বাইরের দেনাটা শোধ করতে পারবে। কিন্তু সে আশাটা বিশেষ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ জর্মনির তখন নিজের খরচা সামলাবারও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সে মুশকিলের আসান করে দিল আমেরিকা : জর্মনিকে সে টাকা ধার দিতে লাগল, জর্মনি সেই টাকায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতিকে তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিল; এরা আবার সেই টাকা দিয়েই আমেরিকার ঋণের খানিকটা শোধ করে দিল।

এই দশ বছর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই ছিল একমাত্র সঙ্গতিপন্ন দেশ। ধন-ঐশ্বর্যের তখন তার অবধি নেই; সেই ঐশ্বর্যের মোহেই তাদের আশাও একেবারে মেঘস্পর্শী হয়ে উঠল, লগ্নি আর শেয়ারের বাজারে ফাটকা খেলা শুরু হয়ে গেল।

ধনিকতন্ত্রী দেশগুলোর সকলেরই ধারণা ছিল, আগের সব বারের মন্দা যেমন দুদিন পরেই কেটে গেছে এবারের সংকটটাও তেমনিভাবেই কেটে যাবে; পৃথিবীর অবস্থা আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তার পর আবার আর-একটা সমৃদ্ধির যুগ শুরু হবে। বস্তুত ধনিকতন্ত্রী ব্যবসায়ের জীবনধারাটাই চলে বন্ধুর পথে, একবার সমৃদ্ধি আর একবার সংকটের মধ্যে দোল খেয়ে খেয়ে। বহুকাল আগেই একথা বলা হয়েছে যে, ধনিকতন্ত্রের রীতিটাই হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক এবং পরিকল্পনাবিহীন, এটা তার সেই প্রকৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। শিল্প-ব্যবসায় যখন ভালোভাবে চলে, তার থেকে সৃষ্টি হয় বাজার; সেই বাজারে মাল বেচে দু'পয়সা করে নেবে এই আশায় সকলেই যতদূর সম্ভব বেশি বেশি পণ্য উৎপাদন করতে লেগে যায়। তার ফলে হয় উৎপাদন-বাহুল্য, মানে যতটা পণ্য বাজারে চলবে তার চেয়ে বেশি পণ্য উৎপন্ন হয়ে যায়। পণ্যের গুদাম জমে বেড়ে উঠতে থাকে; তার পর আসে সংকট—আবার শিল্পে ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে যায়। কিছুদিন উৎপাদনের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে; সেই সময়ে পণ্যের যে স্তূপ জমে উঠেছিল সেটা ধীরে ধীরে বেচে ফেলা হয়। তার পর আবার ঘুম ভেঙে ব্যবসার উৎসাহ জেগে ওঠে, দুদিন না যেতেই আবার একটা তেজীর বাজার শুরু হয়ে যায়। এই হচ্ছে বাজারের স্বাভাবিক চক্রাবর্তন; মন্দার বাজারেও তাই বেশির ভাগ মানুষ আশা করে রইল, আজ হোক কাল হোক আবার সমৃদ্ধির দিন ফিরে আসবেই।

কিন্তু ১৯২৯ সনে অবস্থা হঠাৎ আরও খারাপ হয়ে পড়ল। আমেরিকা জর্মনিকে এবং দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল; এর ফলে ঋণ এবং ঋণশোধের যে ব্যবস্থা কাগজে-পত্রে খাড়া করা হয়েছিল, সেটা ধ্বসে পড়ে গেল। সকলেই বুঝল, আমেরিকার মহাজনরা চিরকাল ধরে এভাবে টাকা ধার দিয়ে দিয়ে চলতে রাজি নয়; কারণ এতে শুধু তাদের অধমর্ণদের দেনাই বাড়ছে, আবার কোনোদিন তারা এই দেনা শোধ করবে তার সম্ভাবনাটাই দূর হয়ে যাচ্ছে। এতদিন তারা ধার দিয়ে এসেছে তার একমাত্র কারণ, তাদের হাতে অত্যন্ত বেশি নগদ টাকা জমে গিয়েছিল, সে টাকা তারা অন্যভাবে ব্যবহার করে উঠতে পারছিল না। বাড়তি টাকার এই বাহুল্যের জন্যই তারা শেয়ারের বাজারেও একেবারে বিষম-পরিমাণে ফাটকা খেলা শুরু করে দিল। দেশময় রীতিমতো একটা জুয়াখেলার হিড়িক পড়ে গেল, সকলেই রাতারাতি বড়োলোক হয়ে উঠতে চায়।

জর্মনিকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সংকট দেখা দিল; জর্মনির কয়েকটা ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল। ক্ষতিপূরণ আর ঋণশোধের যে চক্রাবর্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটাও ক্রমে থেমে গেল। দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো রাষ্ট্ররা অনেকেই দেনার কিস্তি খেলাপ করতে লাগল। ঋণ-ব্যবস্থার সমস্ত কাঠামোটাই ভেঙে পড়বার

উপক্রম হয়েছে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুভার ভয় পেয়ে গেলেন; ১৯৩১ সনের জুলাই মাসে তিনি এক বছরের মতো একটা ঋণশোধ-বিরতি ঘোষণা করলেন। তার অর্থ, এক দেশের কাছে আরেক দেশের যত ঋণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাওনা ছিল, এই এক বছরের মধ্যে তার কোনো টাকাই আদায় করা চলবে না—যেন ঋণী দেশগুলো সকলেই একটু দম নেবার ফুরসৎ পায়।

ইতিমধ্যে, ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় একটি বিষম ব্যাপার ঘটে গেল। শেয়ারের বাজারে জুয়াখেলার চোটে শেয়ার প্রভৃতির দর একেবারে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়েছিল; তার পর হঠাৎ একদিন হুড়মুড় করে সেটা সবসুদ্ধ ভেঙে পড়ল। নিউইয়র্কের মহাজন-মহলে বিষম সংকট দেখা দিল; আমেরিকাতে একটা সমৃদ্ধির যুগ চলছিল, সেই দিন থেকেই তারও অবসান হল, ব্যবসাতে মন্দা পড়ার ফলে অন্যান্য দেশদের দুর্গতি উপস্থিত হয়েছিল, এবার যুক্তরাষ্ট্রও তাদের দলে গিয়ে ভিড়ল। ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে যে মন্দা চলছিল এবার সেটা পরিণত হল এক মহাসংকটে; দেখতে দেখতে পৃথিবীময় সে সংকট ছড়িয়ে পড়ল। নিউইয়র্কের শেয়ারের বাজারে যে জুয়াখেলা চলেছিল বা নিউইয়র্কে যে অর্থ-সংকট ঘটেছিল, আমেরিকার অধঃপতন বা বিশ্বব্যাপী মহাসংকট ঘটেছিল তারই ফলে, এমন কথা মনে কোরো না। সেটা ছিল শুধু বোঝার উপরের শেষ শাকের-আঁটি। এর আসল কারণ ছিল আরও অনেক তলায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই বাণিজ্যের পরিমাণ ক্ষীণ হয়ে এল; পণ্যের মূল্য, বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কমে যেতে লাগল। সবাই বললেন, পৃথিবীর প্রায় সবরকম পণ্যেরই উৎপাদন-বাহুল্য ঘটেছে। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, যত পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে তার সবখানি কিনে নেবে এমন টাকা মানুষের হাতে নেই—একে বলে ভোগ-স্বল্পতা। কারখানার তৈরি মাল বেচা যাচ্ছে না, অতএব তার স্তূপ জমে উঠল; অতএব স্বভাবতই তখন সে কারখানাগুলোকেই বন্ধ করে দিতে হল। যে মাল বিকোবে না তাই ক্রমাগত তৈরি করে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর ফলে ইউরোপে আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ল, এমন বিরাট বেকার-সমস্যা ইতিহাসে আর কোনোদিন দেখা যায় নি। সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশই অত্যন্ত দুর্দশায় পড়ে গেল। পৃথিবীর বাজারে খাদ্য-পণ্য বা কারখানার-ব্যবহার্য কাঁচামাল বিক্রি করত যে কৃষিপ্রধান দেশগুলো, তাদের অবস্থাও তাই। ভারতবর্ষের শিল্প-প্রতিষ্ঠানদেরও কিছুটা ক্ষতি সইতে হল, কিন্তু পণ্য-মূল্য হ্রাসের ফলে আমাদের কৃষকশ্রেণীদেরই দুর্দশা বাড়ল অনেক বেশি। সাধারণত খাদ্যদ্রব্যের দাম এরকমভাবে কমে গেলে জনসাধারণের পক্ষে সেটা হয় বরস্বরূপ, তারা একটু শস্তায় খেয়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার কল্যাণে আমাদের জগৎটাই হয়ে গেছে উলটো রাজার দেশ; সেখানে এই বরটাই হয়ে উঠল একটা প্রকাণ্ড অভিশাপ। কৃষককে ভূস্বামীর খাজানা বা সরকারের রাজস্ব মিটিয়ে দিতে হয় নগদ টাকায়, সে টাকা তারা পায় উৎপন্ন ফসল বেচে। কিন্তু জিনিসপত্রের দর তখন এত কমে গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল, যত ফসল ঘরে উঠেছে তার সমস্তখানি নিঃশেষে বেচে দিয়েও তাদের শুধু সেই খাজানার টাকাটাই উঠছে না। অতএব বহু ক্ষেত্রে তাদের জমি থেকে উৎখাত করে দেওয়া হল; তাদের মাটির কুঁড়েঘর, এমনকি গৃহস্থালির সামান্য দুচারখানা বাসনকোসন যা ছিল সেটা পর্যন্ত খাজানার দায়ে নীলামে তোলা হল। খাদ্য তখন অত্যন্ত শস্তা অথচ সে খাদ্য যারা উৎপাদন করেছে তারাই মরল উপবাসে, গৃহহীন হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল তারাই।

পৃথিবীর সমস্ত দেশ এখন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলেই এই সংকটটাও পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। এর হাত থেকে অব্যাহতি পেল বোধ হয় একমাত্র তিব্বত, যার বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। মাসের পর মাস চলে গেল, সংকট ক্রমেই আরও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্রমেই অচল হয়ে উঠল। সমাজের দেহে সে যেন একটা পক্ষাঘাতের আক্রমণ—একটু একটু করে সমস্ত দেহটা সে আক্রমণে চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ল। লীগ অব নেশনস্ কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব-বাণিজ্যের এই হিসাবগুলো দেখলেই হ্রাসের পরিমাণটা বোধ হয় সবচেয়ে ভালো করে বুঝতে পারবে। এই অঙ্কগুলো লেখা হয়েছে দশ-লক্ষ সোনার ডলারের

হিসাবে; প্রত্যেক বছরের প্রথম তিনটি মাসে যত কেনা-বেচা পৃথিবীতে হয়েছে তারই হিসাব এই অঙ্কগুলো :

কোন্ সনের প্রথম তিনমাস	মোট আমদানি	মোট রপ্তানি	আমদানি-রপ্তানির মোট পরি
১৯২৯	৭৯৭২	৭৩১৭	১৫২৮৯
১৯৩০	৭০৬৪	৬৫২০	১৩৮৮৪
১৯৩১	৫১৫৪	৪৫৩১	৯৬৮৫
১৯৩২	৩৪৩৪	৩০২৭	৬৪৬১
১৯৩৩	২৮২৯	২৫৫২	৫৩৮১

এই হিসাব থেকেই দেখা যায়, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ কীরকমভাবে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে; ১৯৩৩ সনের প্রথম তিনমাসে যত টাকার পণ্য কেনা-বেচা হয়েছে, তার পরিমাণ চার বছর আগের অঙ্কের ঠিক শতকরা ৩৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান।

বাণিজ্যের হিসাবের এই-সব দুর্বোধ্য অঙ্ক, এর থেকে মানুষের খবর আমরা কী জানতে পাচ্ছি? জানতে পাচ্ছি, পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই এত দরিদ্র হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেরাই যা উৎপাদন করছে তাও কেনবার সামর্থ্য তাদের নেই। জানতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে অসংখ্য শ্রমিক বেকার বসে আছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। একমাত্র ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রেই বেকার শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন কোটি; এর মধ্যে একা ব্রিটেনেই ত্রিশ লক্ষ লোক বেকার বসে আছে, যুক্তরাষ্ট্রে আছে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। ভারতবর্ষে বা এশিয়ার অন্যান্য দেশে বেকারের সংখ্যা কত তা কেউ জানে না। খুব সম্ভব একমাত্র ভারতবর্ষেই এত লোক বেকার রয়েছে যে তাদের সংখ্যা ইউরোপ আর আমেরিকার মোট সংখ্যাকেও অনেকদূর ছাড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর সর্বত্র এই-যে অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে এদের কথা ভাবো; ভাবো, এদের পরিবারবর্গের কথা যারা এদের উপরেই নির্ভর করে বাঁচে, বাণিজ্য-সংকটের ফলে মানুষের কতখানি দুর্দশা হয়েছে তার খানিকটা আন্দাজ হয়তো পাবে। ইউরোপের বহু দেশে একটা সরকারি বীমার ব্যবস্থা আছে, বেকার বলে যারা নাম লিখিয়েছে তাদের সকলকে তাই থেকে একটা প্রাণ-বাঁচানোর মতো ভাতা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রেও বেকারদের ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ভাতা এবং ভিক্ষাতেও বেশিদিন কুলোয় না; এবং এও আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে না। মধ্য এবং পূর্ব-ইউরোপের বহু স্থানে অবস্থা একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

বড়ো বড়ো শিল্পপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকাতেই সংকট শুরু হয়েছিল সকলের শেষে; কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া সেখানে যত প্রচণ্ড হল অন্য কোথাও তা হয় নি। আমেরিকার লোকেরা দীর্ঘকালব্যাপী বাণিজ্য-সংকট এবং দৈন্য সইতে অভ্যস্ত ছিল না। গর্বিত আমেরিকা, টাকার দর্পে দর্পী আমেরিকা এই আঘাত খেয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল; দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই লক্ষ থেকে কোটির ঘরে গিয়ে পৌঁছতে লাগল; দেশের সর্বত্র অগণিত মানুষ ক্ষুধায় আর্তনাদ করছে তিলে তিলে অনাহারে শুকিয়ে মরছে, দেখে সমস্ত জাতিটারই মনের জোর একেবারে ভেঙে পড়ল। ব্যাঙ্কে এবং কারবারে টাকা রেখে আর লোকের ভরসা নেই; ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে তারা ঘরে জমিয়ে রাখতে লাগল। ব্যাঙ্কের প্রাণই হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস আর ধার। সে বিশ্বাস যদি মরে যায়, তবে ব্যাঙ্কও আর বাঁচে না। যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংকটের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল, অবস্থাটা আরও বেশী খারাপ হয়ে উঠল।

বহু বেকার স্ত্রী পুরুষ যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করল, তারা এক শহর থেকে আর-এক শহর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—বড়ো রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে, পথচলতি মোটর গাড়িতে কাকুতি-মিনতি করে একটু জায়গা যোগাড় করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধীরগতি মাল-টানা রেলগাড়িতে লাফিয়ে উঠে,

এবং পাদানি ধরে ঝুলে ঝুলে এরা পথ চলত। এর চেয়েও মর্মস্পর্শী দৃশ্য ছিল অসংখ্য কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা, এমনকি ছোটো ছোটো শিশুদের পর্যন্ত নিরুদ্দেশ-যাত্রা—একা একা কিংবা ছোটো ছোটো দল বেঁধে এরা সেই বিশাল দেশটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক, শক্তসমর্থ পুরুষমানুষরা কাজের অভাবে বেকার বসে রইল। চাকরি পাবে বলে আশা আর প্রতীক্ষা করে রইল; বহু আদর্শস্থানীয় কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ ধনিকতন্ত্রের এমনই মাহাত্ম্য, ঠিক এরই মাঝখানে দেশের সর্বত্র গজিয়ে উঠল বহু 'ঘর্ম-নিষ্কাশনী দোকান'—(sweat-shops, যেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি অথচ মজুরি কম) যেমন সেগুলো অন্ধকার ঘুপঘুট্টি তেমনই কদর্য নোংরা। এই-সব দোকানে নিযুক্ত করা হল বারো থেকে ষোলো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের—অতি সামান্য মাইনেয় এদের দিনে দশ থেকে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হত। বেকার জীবনের দুঃসহ চাপে এই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অভিভূত হয়ে পড়েছে, অনেক মালিক এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নিল, তাদের কলে কারখানায় এদের দীর্ঘকালব্যাপী এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়ে নিতে লাগল। এমনি করে বাণিজ্য-সংকটের ফলে আমেরিকায় আবার শিশু-শ্রমিকের ব্যবহার প্রচলিত হয়ে গেল; শিশু-শ্রমিক নিয়োগ এবং অন্যান্য কুপ্রথা নিষিদ্ধ করে যে-সব শ্রম-আইন তৈরি হয়েছিল সেগুলোকে লোকে খোলাখুলিই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে লাগল।

মনে রেখো, আমেরিকাই বল আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশই বল, খাদ্যসামগ্রী বা শিল্পোৎপন্ন পণ্যের অভাব কোনোখানেই ছিল না। বরং প্রয়োজনের তুলনায় জিনিস বেশি হয়ে গেছে, উৎপাদন-বাহুল্য ঘটেছে, এইটাই ছিল সকলের অভিযোগ। ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ অর্থ-নীতিবিদ্ আছেন সার্ হেন্রি স্ট্রাকোশ; তিনি বলেন, ১৯৩১ সনের জুলাই মাসে, অর্থাৎ বাণিজ্য-সংকটের দ্বিতীয় বছরেও, নাকি পৃথিবীর বাজারে এত মালপত্র মজুত ছিল যে, তার দ্বারা পৃথিবীসুদ্ধ মানুষকে, তারা যে যেরকম খেতে পরতে অভ্যস্ত ছিল সেই ভাবেই আরও দু'বছর তিনমাস কাল খাইয়ে পরিয়ে রাখা যেত—এই সময়টার মধ্যে কোথাও কেউ একবিন্দু কাজ যদি না করত তবুও। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। অথচ ঠিক সেই সময়টাতেই পৃথিবীতে এমন ভয়াবহ অভাব আর অনাহারের খেলা আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্পতন্ত্রী জগতে তেমন আর কখনও দেখা যায় নি। একদিকে মানুষ অভাবে শুকিয়ে মরেছে, অন্যদিকে ঠিক তারই পাশাপাশি রাশিকৃত খাদ্যসামগ্রী দস্তুরমতো স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পাকা শস্য ইচ্ছা করেই কেটে তোলা হয় নি, ক্ষেতের শস্য ক্ষেতেই পচে গেছে; গাছের ফল গাছেই ফেলে পচানো হয়েছে, বহু জিনিসপত্র বাস্তবিকই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তোমাকে : ব্রাজিলে ১৯৩১ সনের জুন মাস থেকে ১৯৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ১,৪০,০০,০০০ বস্তারও বেশি কফি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এক বস্তায় ১৩২ পাউন্ড করে কফি থাকে, অতএব এইভাবে মোট কফি নষ্ট করা হয়েছে ১,৮৪,৮০,০০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি! প্রত্যেকজন মানুষকে মাথাপিছু এক-পাউন্ড করে দিলেও এতে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষকে দিয়ে আরও কিছু বেঁচে যেত। অথচ আমরা জানি বহু লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা একটুখানি কফি পেলে বেঁচে যায় অথচ তা কেনবার তাদের পয়সা নেই।

শুধু কফি নয়—গম, তুলো, এবং আরও অনেক জিনিস এইভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তুলো, রবার, চা ইত্যাদির বীজ বপনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে, ভবিষ্যতে যাতে উৎপাদনের পরিমাণ কম হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে জিনিসপত্র নষ্ট করা, উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস, এর সবকিছুই করা হচ্ছে কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—জিনিসের টান পড়লে তখন মানুষের চাহিদা বাড়বে, এবং জিনিসপত্রের দর চড়ে যাবে। যে কৃষক বাজারে এই পণ্য তখন বেচবে তার এতে লাভ। কিন্তু ক্রেতার? আমাদের এই পৃথিবীটা সত্যিই জায়গা ভালো—এখানে প্রয়োজনের চেয়ে যদি কম মাল উৎপন্ন হয়, তবে দাম বেড়ে যাবে; এমন বেড়ে যাবে যে বেশির ভাগ মানুষই জিনিসপত্র কিনতে পারবে না, অতএব মানুষ অভাবে অনশনে দিন কাটাবে। আবার প্রয়োজনের চেয়ে যদি বেশি তৈরি হয়, তখন জিনিসপত্রের দর

এত কমে যাবে যে, শিল্প এবং কৃষি মোটে চলতেই পারবে না, শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে আর বেকার মানুষরা জিনিসপত্র কিনবেই-বা কি দিয়ে, কেনবার পয়সাই যে তাদের নেই! মানে যেদিক দিয়েই তাকাও, জিনিসপত্রের প্রাচুর্যই থাক আর অনটনই থাক, জনসাধারণের ভাগ্যে অনশনই লেখা রয়েছে।

বলেছি, সংকটের সময়েও আমেরিকায় বা অন্য কোথাও জিনিসপত্রের কোনো অভাব ছিল না। কৃষকদের হাতে কৃষিজাত পণ্য ছিল, সেটা তারা বেচতে পারছিল না; শহরের লোকদের হাতে ছিল শিল্পজাত পণ্য, সে পণ্যও তারা বেচতে পারছিল না। অথচ দুপক্ষই চাইছিল অন্যদের হাতের জিনিসটা পেতে, সেইটাই তার দরকার। কেনাবেচার ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে রইল, কারণ দুইপক্ষেরই হাতে টাকার অভাব। তখন আমেরিকাতে, শিল্পপ্রগতির চরম নিদর্শন আমেরিকা, সুসভ্য ধনিকতন্ত্রী দেশ আমেরিকাতে—বহু লোক সেই প্রাচীন যুগের মতো পণ্য বিনিময় করতে আরম্ভ করল; অতি প্রাচীন কালে, যখন মুদ্রার ব্যবহার মানুষ শেখে নি, তখন পৃথিবীতে পণ্য-বিনিময়ের প্রচলন ছিল। আমেরিকাতে শত শত পণ্য-বিনিময়-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, জিনিসপত্র কেনাবেচার যে রীতি ধনিকতন্ত্রী সমাজে প্রচলিত ছিল, টাকার অভাবে সেটা অচল হয়ে গেল; অতএব তখন মানুষরা টাকা ছাড়াই কাজ চালাতে আরম্ভ করল, জিনিসে জিনিসে, কাজে কাজে বদলাবদলি করে নিতে লাগল। বহু বিনিময়-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল দেশে, এরা রসিদ এবং ছাড়পত্র দিয়ে এই পণ্য-বিনিময়ের সাহায্য করতে লাগল। পণ্য-বিনিময়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে আছে একটি গোয়ালার কাহিনী: তার ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তার দাম বাবদ সে বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিল দুধ, মাখম এবং ডিম।

অন্যান্য দেশেও পণ্য-বিনিময় কিছু পরিমাণে দেখা দিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের জটিল ব্যবস্থাটিও ভেঙে পড়েছে, অতএব দেশে-দেশেও পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা কিছু কিছু দেখা গেল। ইংলণ্ড কয়লা দিয়ে তার বদলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কাছ থেকে কাঠ কিনল; কানাডা তার এলুমিনিয়ম দিয়ে কিনল সোভিয়েট রাশিয়ার তেল; যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলকে গম দিল, বদলে নিল কফি।

ব্যবসা-মন্দার ফলে আমেরিকার কৃষকরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ল; ক্ষেতখামার বন্ধক রেখে তারা ব্যাঙ্কের কাছে টাকা ধার করেছিল, সে টাকা শোধ করতে পারল না। ব্যাঙ্কগুলো তখন তাদের ক্ষেতখামার বিক্রি করিয়ে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কৃষকরা তাতে রাজি নয়, তারা দল বেঁধে দাঁড়াল, সংগ্রাম-পরিষৎ গড়ল, যেন এইভাবে এরা জমি বিক্রি করে নিতে না পারে। তার ফলে কৃষকের জমি যেখানে-বা নীলামে তোলা হল, সে নীলাম ডাকতে কেউই সাহস করল না; বাধ্য হয়েই ব্যাঙ্কগুলো তখন কৃষকদের শর্তই মেনে নিতে রাজি হল। মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। সংকটের তীব্রতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার এই রক্ষণপন্থী প্রাচীন কৃষকরাও ক্রমেই বেশি রকম উগ্র এবং বিপ্লবপন্থী হয়ে উঠেছে।

আমেরিকার কৃষকদের এই আন্দোলনটি লক্ষ্য করে দেখবার মতো, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপেই সেই দেশের নিজস্ব সৃষ্টি, সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজ্‌মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই কৃষকরা হচ্ছে আমেরিকার প্রাচীন বাসিন্দা, এরাই চিরদিন দেশের রক্ষণপন্থী মেরুদণ্ড স্বরূপ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এরা ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক, জমিতে এদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল; আর্থিক দুর্গতির ফলে এরা ক্রমে পরিণত হয়ে যাচ্ছে মজুর-চাষিতে, শুধু জমি চাষই করছে, নিজের সম্পত্তি বলে এদের বিশেষ কিছু থাকছে না। এদের রব হচ্ছে, 'আইনের অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকারের চেয়ে মানুষের বাঁচবার অধিকার অনেক বড়ো'; 'জমির প্রথম বন্ধক রয়েছে স্ত্রী আর সন্তানদের হাতে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা নিয়ে অনেক কথা বললাম; কারণ আমেরিকা অনেক দিক দিয়েই একটি আশ্চর্য দেশ। ধনিকতন্ত্রী দেশদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি উন্নত; ইউরোপ এবং এশিয়াতে যেমন একটা অতীত-ধর্মী সামন্তপ্রথা রয়েছে এখানে তা নেই। এইজন্যই এখানে পরিবর্তন খুব দ্রুতবেগে ঘটতে পারে। অন্যান্য দেশের লোকেরা জনসাধারণের অভাব-অনটন দেখতে অভ্যস্ত;

আমেরিকাতে জনসাধারণের ব্যাপক দুর্গতি এর আগে কখনও দেখা যায় নি, তাই এর আবির্ভাবে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। আমেরিকার সম্বন্ধে যা যা বললাম তাই থেকেই বুঝে নিতে পারবে, সংকটের সময়ে অন্যান্য দেশের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল। অনেক দেশেরই অবস্থা ছিল এর চেয়েও ঢের বেশী খারাপ; কোনো কোনো দেশের অবস্থা ঈষৎ একটু ভালোও ছিল। মোটের উপর বলা যায়, উন্নত শিল্পতন্ত্রী দেশগুলোর অবস্থা যতখানি খারাপ হয়েছিল, কৃষিপ্রধান এবং অনুন্নত দেশগুলোর ততটা হয় নি। অনুন্নত বলেই তারা এর হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পেয়েছে। এদের প্রধান বিপদ ছিল কৃষিজাত পণ্যের মূল্যহ্রাস, কৃষকরা তার ফলে খুব বেশি অসুবিধায় পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষিজাত পণ্যের দর নেমে গেল বলেই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের কাছে তার যে দেনা ছিল সেটা সে শোধ করতে পারল না, তার তখন প্রায় দেউলিয়া হবার উপক্রম। নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে বাধ্য হয়েই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কাররা যে শর্ত দিল তাইই মেনে নিতে হল; অত্যন্ত কঠিন সে শর্ত। সংকটের মুহূর্তে যে শ্রেণীটার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অন্যদের উপরে প্রভুত্ব করবার সুযোগ আসে, সে হচ্ছে ব্যাঙ্কওয়ালা শ্রেণী।

দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে টাকা ধার পাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল; তার ফলে এবং বাণিজ্য-মন্দার ফলে সেদেশে বিষম সংকট উপস্থিত হল। প্রায় সবগুলি প্রজাতন্ত্রী সরকারই সেই ধাক্কায় উলটে পড়ে গেল—সরকার মানে অবশ্য, যে-সব ডিক্‌টেটররা সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা। দক্ষিণ-আমেরিকার সর্বত্রই বিপ্লব ঘটতে লাগল। এর বড়ো তিনটি দেশ হচ্ছে আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল আর চিলি—যাদের সংক্ষেপে বলা হয় এ. বি. সি. দেশ—তারাও বিপ্লবের হাত থেকে রেহাই পেল না। অবশ্য দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত বিপ্লবে যা হয় এগুলোও তার বেশি নয়—এ শুধু প্রাসাদ-বিপ্লব, এতে শুধু মাথার উপরে যে কর্তৃপক্ষ বা ডিক্‌টেটররা বসে ছিলেন তাঁদেরই বদল হল। সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী যে ব্যক্তি বা দলের ইঙ্গিতে চলছে—তাঁরাই সেখানে দেশ শাসন করছেন। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই অতি-গভীর ঋণে নিমজ্জিত; এদের প্রায় সকলেই দেনার কিস্তি খেলাপ করেছে, টাকা দিতে পারেনি।

১৮৫

সংকটের হেতু

২১শে জুলাই, ১৯৩৩

বিশ্ব-সংকট সমস্ত পৃথিবীর টুঁটি চেপে ধরেছে, যেখানে যা কিছু কাজকর্ম চলছিল সব নির্বন্ধ করে মেরে ফেলেছে, বা তার গতি প্রায় থামিয়ে দিয়েছে। বহুস্থানে শিল্পের রথের চাকা গিয়েছে থেমে; যে ক্ষেতে একদা খাদ্য বা অন্য শস্য জন্মাত সে পড়ে আছে ঊষর অকর্ষিত; রবারের গাছ থেকে রবারের রস গড়িয়ে পড়ছে তাকে কেউ আহরণ করছে না; একদা যে পাহাড়ের দেহ সযত্ন-রক্ষিত চায়ের বাগানে ঢাকা ছিল এখন তা জংলা হয়ে পড়েছে, তার যত্ন করবার লোক নেই। এইসমস্ত কাজ যারা এতকাল করে এসেছে তারা গিয়ে ভিড় করছে বেকারের দলে; অপেক্ষা করছে কাজের, চাকরির—সে চাকরি আসছে না; ইতিমধ্যে সহায়হীন আশাহীন এই মানুষের দল ক্ষুধায়, অভাবে ক্লান্তপদে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। অনেক দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যন্ত-রকম বেড়ে গিয়েছে।

আমি বলেছি, সমস্ত শিল্পেরই উপরে এই সংকটের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু না, একটি শিল্প ছিল যার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি,—সে হচ্ছে রণসজ্জা নির্মাণের শিল্প। তারা সমানেই কাজ করে যাচ্ছিল, সমস্ত দেশের জাতীয় সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমানবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র রণসম্ভার যোগান দিচ্ছিল। এদের ব্যবসা বরং বাড়তে লাগল, সে ব্যবসার অংশীদারেরা খুব

মোটা মোটা লভ্যাংশ পেতে লাগল। বাণিজ্যসংকটে এই ব্যবসায়ের হানি হয় নি, কারণ এর কারবারই হচ্ছে জাতিতে জাতিতে রেষারেষি আর বিদ্বেষ নিয়ে—সংকটের চাপে পড়ে সে রেষারেষি বিদ্বেষের তীব্রতা আরও বেড়েই চলছিল।

পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ অঞ্চলও এই সংকটের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, সে হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। সেখানে বেকার-সমস্যা দেখা দিল না; বরং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দরুন কাজকর্ম আরও বেশি জোর চলতে লাগল। এই দেশটি ছিল ধনিকতন্ত্রের আয়ত্তের বাইরে, এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ভিন্ন রকমের। তবু সংকটের ফলে পরোক্ষভাবে কিছু ক্ষতি তাকেও সইতে হল; কারণ বাইরে সে যে কৃষিজাত পণ্য বেচত, তার দাম গেল কমে।

এই বিপুল বাণিজ্য-হানি, এই বিশ্বব্যাপী মহাসংকট, বিশ্বযুদ্ধের মতোই এর ভয়াবহতা—এর উদ্ভব হল কী করে? আমরা একে বলছি ধনিকতন্ত্রের সংকট, কারণ ধনিকতন্ত্রের বিরাট এবং জটিল যন্ত্রটি এর চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ধনিকতন্ত্রের এভাবে ভাঙন ধরল, কেন? আর এই সংকট, এ কী শুধু একটা সাময়িক ব্যাধিমাত্র, এর প্রকোপ কাটিয়ে আবার কি ধনিকতন্ত্র সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠবে? না এইই তার মৃত্যুবাণ—এতকাল ধরে পৃথিবীতে প্রভুত্ব চালিয়ে এল যে বিরাট ব্যবস্থা, এইবারেই কি তার শেষ হয়ে যাবে? এই রকমের বহু প্রশ্নই আজ জেগে উঠছে, আমাদের মনকে অভিভূত করে ফেলছে; কারণ এর উত্তরের উপরেই নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদেরও ভবিষ্যৎ। ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার সরকারকে একটি পত্র পাঠান, তাতে মিনতি জানান, যুদ্ধের দরুন তাঁদের যে দেনা আমেরিকার কাছে রয়েছে সেটা শোধ দেবার দায় থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। এই চিঠিতে তাঁরা বলেন, এই ব্যাধি সারাবার জন্যে যে-সব ঔষধ আমরা প্রয়োগ করেছিলাম, তাতে শুধু ব্যাধিই বেড়ে গেছে। "প্রত্যেক জায়গাতেই আমরা করের পরিমাণ নির্মমভাবে বাড়িয়ে দিয়েছি, ব্যয়ের অঙ্কও যথাসম্ভব ছেঁটে কমিয়ে এনেছি। কিন্তু বিপদ থেকে মুক্তি পাবার আশায় যে ব্যয়-সংকোচের অনুশাসন খাড়া করেছি, তার ফলে শুধু বিপদেরই তীব্রতা বেড়ে চলেছে।" চিঠির আরেক জায়গাতে বলা হয়েছে, "মানুষের এই ক্ষতি বা দুঃখভোগ, এটা বিশ্বপ্রকৃতির কার্পণ্যের ফলে আসে নি। বস্তুবিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, ধন-উৎপাদনের যে অসীম সম্ভাবনা আমাদের হাতে ছিল তারও অস্তিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।" দোষ বিশ্বপ্রকৃতির নয়—দোষ মানুষের, সে যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে দোষ তার।

ধনিকতন্ত্রের এই ব্যাধি, এর নির্ভুল কারণ নির্দেশ করা বা তার অব্যর্থ ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া সহজ কথা নয়। আমরা ভাবি—অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয়ই এর সবখানি জানেন বোঝেন; অথচ তাঁদেরই মধ্যে এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই, এক-একজনে এক-একরকম কারণ নির্দেশ করছেন, এক-একজনে এক-একরকম প্রতিকারের পন্থা বাতলাচ্ছেন। এর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে বোধ হয় একমাত্র কমিউনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের: তারা ধনিকতন্ত্রের এই ভাঙন-ধরাকে তাদের মতবাদেরই সত্যতার প্রমাণ বলে ধরে নিচ্ছে। ধনিকতন্ত্রী পণ্ডিতরা তো স্পষ্টই স্বীকার করছেন, তাঁরা বিস্মিত হয়ে গেছেন, এর হদিশ খুঁজে পাচ্ছেন না। ব্রিটেনের মহাজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যোগ্যতম ব্যক্তিদের একজন হচ্ছেন মণ্টেগু নর্‌ম্যান, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের তিনি গভর্নর। মাসকয়েক আগে একটি প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বলেছেন: "অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার বিশ্লেষণ করা আমার শক্তির বাইরে। যে-সব বিঘ্নবিপত্তির সৃষ্টি এতে হয়েছে তার পরিমাণ এত বিপুল, এমন অভিনব, এবং এমন অভূতপূর্ব যে, এর আলোচনা আমাকে করতে হবে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে। এ আমার বোঝবার শক্তির বাইরে। ভবিষ্যতের কথা বলতে হলে, হয়তো আমরা অন্ধকার সুড়ঙ্গের পরপারে আলোর রশ্মি দেখতে পাব—কেউ কেউ ইতিমধ্যেই সে আলোকের আভাস দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের দেখাতে পারছেন।" কিন্তু সে আলো শুধুই আলেয়ার দীপ্তি, মিথ্যা মরীচিকা; আমাদের মনে সে আশা জাগিয়ে তুলছে কেবল আবার নিরাশ করবে বলে। ব্রিটেনের একজন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ সার্ অকল্যাণ্ড

গৌডিস্। তিনি বলেছেন : "চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধারণা হয়েছে, সমাজের ভাঙন এই শুরু হল। আমরা যারা ইউরোপে আছি, আমরা জানি একটা যুগের মৃত্যু হচ্ছে।"

জর্মনরা বলত, এই সংকটের আসল কারণ হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়। অন্য অনেকে বলে, সংকটের জন্ম হয়েছে যুদ্ধ-ঋণ থেকে : এক দেশের কাছে অন্য দেশের ঋণ এবং দেশের মধ্যেকার ঋণ—এই ঋণের বোঝা ক্রমে এত ভারী হয়ে উঠেছে যে তাকে আর বহন করা যাচ্ছে না, তার চাপেই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এইভাবে পৃথিবীর এই অশান্তির জন্য যুদ্ধটাকেই প্রধানত দায়ী করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ্‌রা অনেকে মনে করেন, আসলে গোল বেধেছে টাকার অদ্ভুত আচরণ এবং পণ্য-মূল্যের অত্যধিক হ্রাসের ফলে; সেটার মূলে আবার রয়েছে সোনার টানাটানি—সোনার অভাব পড়েছে পৃথিবীতে, তার এক কারণ, পৃথিবীর যত সোনা দরকার তত সোনা খনি থেকে উঠছে না; তার চেয়েও বড়ো কারণ, প্রত্যেক দেশেরই সরকারপক্ষ যতখানি সম্ভব সোনা ঘরে মজুত করে রাখছেন। অন্যরা আবার বলেন, সমস্ত গোলযোগেরই মূল হচ্ছে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, বাণিজ্য-শুল্ক এবং পণ্য-শুল্ক; এর ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা পড়ে যাচ্ছে। আরেকদল বলেন : না, এর কারণ হচ্ছে উৎপাদন-পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালীর অত্যধিক উৎকর্ষসাধন; তারই ফলে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, বেকার-সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ এর অনেকে নির্দেশ করছেন। এই-সব কারণ দেখানোর গোড়ায় যুক্তিও হয়তো আছে; হয়তো এর সবগুলো কারণ একত্র মিলেই পৃথিবীর এই দুর্বিপাক ঘটিয়ে তুলেছে। কিন্তু তবুও এই সংকট সৃষ্টির অপরাধটা এর কোনো একটা কারণের, বা একত্রে এদের সকলেরও ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা উচিত বা যুক্তিযুক্ত হবে না। বস্তুত, কারণ বলে এই যতগুলো ব্যাপারের নাম করা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো হচ্ছে এই সংকটেরই ফল; অবশ্য তার প্রত্যেকটাই আবার সংকটের নিদারুণতাকে বাড়িয়েও তুলেছে। এর মূল কারণকে খুঁজতে হবে নিশ্চয়ই আরও অনেক তলায় গিয়ে। কেবল যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এ সংকট আসে নি, কারণ বিজয়ীরাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে; শুধু জাতির দারিদ্র্য থেকে এর জন্ম নয়, কারণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ আমেরিকাতেও এর প্রকোপ কারও তুলনায় কম নয়। বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই সংকটের আগমন দ্রুততর হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের ফলেই ঋণের বিষম বোঝা সকলের কাঁধে চেপেছে, এবং সে ঋণের টাকা উত্তমর্ণদের মধ্যে ভাগ হয়েছে যেভাবে সেটাও যুদ্ধেরই সৃষ্টি। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কয়েক বছর যাবৎ জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি ছিল, সেটা ছিল মানুষেরই গড়া, কৃত্রিম—তার পরে আবার একটা উল্‌টো ভাঙন না এসে পারে না। কিন্তু না, আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক।

শোনা যাচ্ছে, পণ্য-বাহুল্যই নাকি এর আসল কথা। কথাটা গোলমেলে; লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুটুকুও পাচ্ছে না, সেখানে পণ্য-বাহুল্য থাকতেই পারে না। ভারতবর্ষে আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের পরবার কাপড়টুকুও জুটছে না; অথচ শুনছি ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলোতে, খাদি-ভাণ্ডারগুলোতে নাকি প্রচুর কাপড় জমে গেছে, কাপড়ের নাকি উৎপাদন-বাহুল্য ঘটেছে এদেশে। আসল কথা হচ্ছে, লোকেরা এত গরিব হয়ে গেছে যে কাপড় কেনবার সামর্থ্যই তাদের নেই—কাপড়ের প্রয়োজন তাদের নেই একথা ভুল। মানুষের অভাব হয়েছে টাকার। টাকার অভাব মানে এ নয় যে পৃথিবী থেকে সমস্ত টাকা উধাও হয়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের মধ্যে টাকা যে ভাবে ছড়িয়ে ছিল তার সেই বণ্টন-রীতিটা বদলে গেছে, এখনও ক্রমাগত বদলে চলছে; তার মানে ধনের বণ্টনে দেখা দিয়েছে অসমতা। একদিকে গড়ে উঠছে ধনের বাহুল্য, অত ধন নিয়ে কী করবে সেইটেই তার মালিকরা ভেবে পাচ্ছে না; বাধ্য হয়ে তারা শুধু সে-ধন জমিয়েই চলেছে, ব্যাংকের খাতায় জমার হিসাব খালি ফেঁপেই উঠছে তাদের। এই টাকা জমছে, বাজারে পণ্য কেনার কাজে এর ব্যবহার হচ্ছে না। অন্যদিকে তেমনই দেখা দিয়েছে ধনের বৃহত্তর অভাব; যে-পণ্য মানুষের একান্ত দরকার তাও তারা কিনতে পারছে না, টাকার অভাবে।

এ-যেন, পৃথিবীতে ধনী আর দরিদ্রের প্রভেদ আছে—এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা হল; কিন্তু এ কথা তো সবাই জানে, এর জন্য যুক্তি-প্রমাণের আবশ্যক নেই। ধনী আর দরিদ্রের এই তফাত, এ তো ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিন থেকেই চলে এসেছে। তবে এবারের এই সংকটের অপরাধটাও এর ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া কেন? বোধ হয় এর আগের একটা চিঠিতেই তোমাকে বলেছি, ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রকৃতিই হচ্ছে ধন-বণ্টনের এই বৈষম্যকে আরও প্রখর করে তোলা। সামন্ততন্ত্রের যুগে এদের তফাতটা প্রায় ধরাবাঁধা গোছের ছিল, বা বদলালেও এ অতি সামান্যই বদলাত। আর ধনিকতন্ত্রের আছে বড়ো বড়ো কল-কারখানা, আছে পৃথিবী-জোড়া বাজার; তার গতিবেগ প্রচণ্ড। অতএব ব্যক্তি বা দলবিশেষের হাতে ধনসম্পত্তি জমে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের মধ্যেও অতি দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল। ধনবণ্টনের মধ্যে বৈষম্য বাড়ল, তার সঙ্গে এসে যোগ দিল আরও নানাবিধ কারণ, সকলে মিলে সৃষ্টি করল একটা নূতনতর সংগ্রামের—শিল্পতন্ত্রী দেশগুলিতে শ্রমিক আর ধনিকের মধ্যে লড়াই লাগল। এই-সব দেশের ধনিকরা তখন নিজের দেশের শ্রমিকদের কিছু বেশি বেতন, কিছু ভালো জীবনযাত্রার ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুগ্রহ দিয়ে বিরোধের তীব্রতাটাকে কমিয়ে আনল—এর টাকা সংগ্রহ করা হল উপনিবেশ এবং অনুন্নত দেশদের শোষণ করে। এইভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা আর পূর্ব-ইউরোপকে শোষণ করে পশ্চিম-ইউরোপ এবং উত্তর-আমেরিকার দেশগুলো টাকাকড়ি জমিয়ে নিল, সে টাকার কিছুটা অংশ তাদের শ্রমিকদের দিতে পারল। নূতন নূতন বাজার আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শিল্পও গড়ে তোলা হল, বা পুরোনো শিল্পগুলোকেই বাড়িয়ে তোলা হল। সাম্রাজ্যবাদের তখন আত্মপ্রকাশ ঘটল এই-সব বাজার আর কাঁচামাল কোথায় মিলবে তার উগ্র অন্বেষণে; বিভিন্ন শিল্পতন্ত্রী দেশের মধ্যে বাধল এই নিয়ে রেষারেষি, তার পর তাই থেকে এল বিরোধ। ক্রমে সমস্ত পৃথিবীটাই ধনিকতন্ত্রী দেশদের এই শোষণের কবলে এসে পড়ল; তখন আর কারও নূতন করে হাত-পা মেলবার জায়গা মিলছে না, অতএব তখন এদের সংঘর্ষ থেকেই সৃষ্টি হল যুদ্ধের।

এর সব কথাই আমি তোমাকে আগেও বলেছি। তবুও আবার বললাম, যেন বর্তমান সংকটের স্বরূপ তুমি ঠিকমতো বুঝতে পার। ধনিকতন্ত্র যখন গড়ে উঠছিল, সাম্রাজ্যবাদ যখন বেড়ে উঠছিল, সে যুগেও একদিকে অতিমাত্রায় সঞ্চয় এবং অন্যদিকে ব্যয় করবার মতো টাকার অভাবের দরুন পাশ্চাত্ত্য জগতে বহুবার এই সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে সংকট আবার কেটেও গেছে, কারণ ধনিকদের হাতে যে বাড়তি টাকা ছিল, সেই টাকা দিয়ে তারা তখন অনুন্নত দেশকে গড়ে তুলেছে, শোষণ করেছে, সেখানে নূতন বাজারের সৃষ্টি করেছে, সেই বাজারে তাদের মাল কাটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদকে নাম দেওয়া হয়েছিল ধনিকতন্ত্রের চরম রূপ। সাধারণ অবস্থায়, সমস্ত পৃথিবী শিল্পতন্ত্রী হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত এই শোষণের এই প্রক্রিয়াটি চলতে পারত। কিন্তু তার অনেক বিঘ্ন, অনেক বাধা এসে হাজির হল। সবচেয়ে বড়ো বিঘ্ন ছিল সাম্রাজ্যবাদী জাতিদেরই মধ্যে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রত্যেকেই চায় সবচেয়ে বড়ো ভাগটা সে নেবে। আরেকটি বিঘ্ন হল ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান। তার পর আবার উপনিবেশগুলির নিজস্ব সব শিল্প গড়ে উঠল, তাদের বাজার তাদেরই মালে ভরে যেতে লাগল। এই-সব ব্যাপারের ফলেই যুদ্ধটা বেধে উঠেছিল। কিন্তু সে যুদ্ধে ধনিকতন্ত্রের সমস্যাগুলোর সমাধান হল না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। প্রকাণ্ড একটি দেশ, মানে সোভিয়েট ইউনিয়ন, একেবারেই ধনিক-তন্ত্রী জগতের বাইরে চলে গেল; সেখানে আর তাদের মাল বেচা চলবে না। প্রাচ্যজগতে জাতীয়তাবাদ ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, শিল্পতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা বেড়ে উঠল। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগবিধির যে প্রচণ্ড উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তার ফলেও ধনবণ্টনের বৈষম্য আরও বেড়ে গেল, বেকার-সমস্যাও বেড়ে গেল। এর উপরে আবার ছিল যুদ্ধ-ঋণ।

এই যুদ্ধ-ঋণের পরিমাণটা বিপুল; তাছাড়া এই ঋণের পেছনে অন্য কোনো প্রকার বাস্তব ধনের অস্তিত্ব ছিল না। একটা দেশ যেখানে রেলওয়ে বা জলসেচের খাল বা দেশের পক্ষে

হিতকর অন্য কোনো বস্তু তৈরি করবার জন্য টাকা ধার করছে, সেখানে যে-টাকাটা সে ধার করল এবং ব্যয় করল তার বদলে সত্যিকারের জিনিসও সে পেয়ে যাচ্ছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, এই বস্তুটিকে গড়ে তুলতে যে টাকা লেগেছিল, একে কাজে খাটিয়ে ধন উৎপন্ন হচ্ছে বস্তুত তার চেয়ে অনেক বেশি; তাই এদের বলা হয়—'ফলপ্রসূ আয়োজন'। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যে টাকা ধার করা হয়েছিল তা এরকম কোনো কাজে ব্যয় করা হয় নি। সে টাকা অফলপ্রসূ তো বটেই, ধ্বংসপ্রসূও। অপরিমিত টাকা যুদ্ধে ব্যয় করা হল, সে-টাকার পদচিহ্ন লেখা রইল শুধু ধ্বংস আর হত্যালীলায়। এই জন্যই যুদ্ধ-ঋণটা হয়ে রইল পৃথিবীর স্কন্ধে একটা অবিমিশ্র এবং অলঘুকৃত বোঝা। এই যুদ্ধ-ঋণ আবার ছিল তিন রকমের : যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ—বিজিত জাতিদের জোর করেই এই টাকা দিতে রাজি করা হয়েছিল; আন্তর্জাতিক ঋণ—মিত্রপক্ষের সরকাররা পরস্পরের কাছে এবং বিশেষ করে আমেরিকার কাছে এই টাকা ধারতেন; আর জাতীয় ঋণ—প্রত্যেক দেশেরই মধ্যে সরকার-পক্ষ তাঁদের নিজের প্রজাদের কাছ থেকে এই টাকা ধার করেছিলেন।

এই তিনরকম ঋণের প্রত্যেকটারই পরিমাণ ছিল বিপুল; কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই পক্ষে সবচেয়ে বড়ো ঋণের অঙ্ক ছিল তার জাতীয় ঋণ। যেমন, যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬,৫০,০০,০০,০০০ পাউন্ড। এই যেখানে ঋণের বহর, তার দরুন সুদের টাকা মিটিয়ে দেওয়াও একটা বিরাট ব্যাপার, সে দিতে হলে দেশে অত্যন্ত বেশিরকম কর না বসিয়ে উপায় নেই। জর্মনি তার আভ্যন্তরীণ ঋণটাকে মুছে ফেলল মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে—মুদ্রাস্ফীতির ফলে তার পুরোনো মার্কটারই আয়ু শেষ হয়ে গেল। এদিক থেকে বলা যায়, জর্মনি তার বোঝার দায় থেকে অব্যাহতি পেল তার প্রজাদের—যে প্রজারা দুর্দিনে তাকে টাকা ধার দিয়েছিল—তাদের সর্বনাশ করে। ফ্রান্সও সেই মুদ্রাস্ফীতির নীতিই অবলম্বন করল, অবশ্য অতখানি পরিমাণে নয়। ফ্রাঙ্কের দাম সে কমিয়ে পুরোনো দাম যা ছিল তার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগে এনে ফেলল; এক ধাক্কায় তার আভ্যন্তরীণ জাতীয় ঋণের পরিমাণটাকেও মূলের এক-পঞ্চমাংশে পরিণত করে দিল। কিন্তু অন্যান্য দেশের কাছে যার যা ঋণ ছিল (ক্ষতিপূরণ বা আন্তর্জাতিক ঋণ) তার বেলায় এই চাল চালা সম্ভব ছিল না, সে টাকা এদের নগদ সোনা দিয়েই মিটিয়ে দিতে হল।

এই-সব আন্তর্জাতিক ঋণের টাকা এক দেশের অন্য দেশকে মিটিয়ে দেবার মানেই হল, যে-দেশ টাকা দিচ্ছে, তার ঐ-পরিমাণ টাকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অতএব সে দরিদ্র হয়ে পড়ছে। কিন্তু দেশের মধ্যে যে জাতীয় ঋণ ছিল সেটা শোধ করার ফলে দেশের অবস্থার এরকম কোনো পরিবর্তন হয় না, কারণ সে টাকা পাকেচক্রে দেশের মধ্যেই থেকে যায়। অথচ এক্ষেত্রেও একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সরকারপক্ষ এই ঋণ শোধ করলেন দেশের সমস্ত করদাতাদের উপরেই কর বসিয়ে টাকা তুলে—ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে। যে মহাজনশ্রেণী রাষ্ট্রকে টাকা ধার দিয়েছিল তারা হচ্ছে ধনীর দল। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াল এই; ধনী বা দরিদ্র সকলের উপরেই কর বসিয়ে টাকা তোলা হল এবং সে টাকাটা দেওয়া হল ধনীদের; ধনীরা কর বলে যে-টাকা রাষ্ট্রকে দিয়েছিল সেটা তো ফেরৎ পেলই, তার চেয়ে বেশিও কিছু পেল। গরিবরা শুধু করই দিল, ফেরৎ কিছুই পেল না। ধনীদেরই ধনবৃদ্ধি ঘটল, দরিদ্ররা হল দরিদ্রতর।

ইউরোপের ঋণী দেশরা আমেরিকার কাছে তাদের ঋণেরও খানিকটা শোধ করছিল; কিন্তু সে-টাকাও সবটাই গিয়ে পৌঁছল আমেরিকার বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কার আর মহাজনদের হাতে। অতএব এই যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধের ফলে খারাপ অবস্থাটাই আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠল; ধনীরা অতিরিক্ত টাকার ভারে বিব্রত হয়ে পড়ল এবং সে-টাকা এল দরিদ্রদের বঞ্চিত করে। ধনীরা আবার এই টাকা কারবারে খাটাতে চাইল, কারণ কোনো ব্যবসাদার লোকই তার টাকাকে অলস ফেলে রাখতে চায় না। নূতন নূতন কারখানা বসিয়ে কলকব্জা কিনে এবং অন্যান্য মূলধনে তারা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা খাটিয়ে বসল; দেশের প্রজারা তখন সকলেই দরিদ্র হয়ে

পড়েছে, সে অবস্থায় অত টাকা খাটাতে যাবার কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। শেয়ারের বাজারেও তারা ফাটকা খেলতে শুরু করল। জনসাধারণের জন্য আরও অনেক বেশি বেশি পরিমাণে মাল তৈরি করবার জন্য প্রস্তুত হল তারা; কিন্তু তার সার্থকতা কোথায়, সে মাল কেনবার টাকাই তো জনসাধারণের হাতে নেই। অতএব হল পণ্য-বাহুল্য, মালপত্র বেচা গেল না, শিল্পদের টাকা লোকসান হতে লাগল, অনেক কারখানাতে কাজই বন্ধ হয়ে গেল। লোকসানের বহর দেখে ব্যবসাদাররা ভয় পেল; শিল্পে ব্যবসায়ে টাকা খাটানো বন্ধ করে দিয়ে তারা টাকার পুঁটুলি আঁকড়ে ধরে বসে রইল, সে টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে পচতে লাগল। তার ফলেই ব্যাপক হয়ে উঠল বেকার-সমস্যা, সংকটের ঢেউ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

সংকটের কারণ বলে যে-সব ব্যাপারকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমি তাদের নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করলাম। কিন্তু বস্তুত এরা সকলে একত্র হয়েই সংকটটিকে ঘটিয়েছিল; সেইজন্যই সে-বাণিজ্য-সংকট এত বিরাট হয়ে উঠল যে এর আগে কোনো দিন তেমন হয় নি। মূলত এর কারণ ছিল, ধনিকতন্ত্রের আমলে যে অতিরিক্ত লাভ উৎপন্ন হয় তার অসম বণ্টন। অন্য ভাষায় বলা যায়, জনসাধারণ তাদের নিজেদের শ্রম দিয়ে যে-সব পণ্য তৈরি করছিল, তা কিনে নেবার মতো টাকা তারা বেতন বা মাইনে বলে পাচ্ছিল না। তাদের মোট যা আয়, তার তুলনায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্য ছিল অনেক বেশি। টাকাটা যদি জনসাধারণের হাতে থাকত তবে সেই টাকা দিয়ে তারা এই-সব পণ্য কিনতে পারত। কিন্তু সে টাকা গিয়ে জমেছে অল্প ক'জন অত্যন্ত ধনীব্যক্তির হাতে; সে টাকা দিয়ে কী করবে তাই তারা ভেবে পাচ্ছে না। এই বাড়তি টাকাটাই ঋণের আকারে আমেরিকা থেকে চলে যাচ্ছিল জর্মনিতে, মধ্য-ইউরোপে, দক্ষিণ-আমেরিকায়। বিদেশ থেকে পাওয়া এই ঋণের জোরেই যুদ্ধ-জীর্ণ ইউরোপ এবং ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাটা আরও কয়েকটা বছর খাড়া হয়ে থাকতে পেরেছিল; অথচ সংকটেরও একটা বড়ো হেতু হল এই টাকাটাই। এবং শেষকালে এই বিদেশী ঋণ বন্ধ হয়ে গেল বলেই এদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

ধনিকতন্ত্রের যে সংকট দেখা দিয়েছে তার এই কারণ নির্দেশ যদি সত্য হয়, তবে এর প্রতিকার হতে পারে মাত্র একটি উপায়ে—সকল মানুষের আয় সমান করে দেওয়া, বা অন্তত তার দিকে চলতে চেষ্টা করা। পুরোপুরি এটা করার মানে দাঁড়াবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; নেহাৎ অবস্থার চাপে পড়ে যতদিন একান্ত বাধ্য না হচ্ছে, ততদিন ধনিকতন্ত্র সেটাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেবে এমন সম্ভাবনা নেই। অনেকে পরিকল্পনা-সমন্বিত ধনিকতন্ত্রের কথা বলছেন, বলছেন অনুন্নত দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য আন্তর্জাতিক মিলিত-প্রচেষ্টার কথা। কিন্তু এই-সব কথার আড়ালেই উগ্র হয়ে জেগে উঠছে দেশে দেশে রেষারেষি, পৃথিবীর বাজার দখল করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে পরস্পর সংগ্রাম। পরিকল্পনা, কিসের জন্য? একজনকে মেরে আরেকজনের লাভ বাড়াবার জন্য? ধনিকতন্ত্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তিগত লাভ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মূল-মন্ত্র—প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর পরিকল্পনা একত্র চলতে পারে না।

সমাজতন্ত্রবাদী এবং কমিউনিস্টদের কথা ছেড়েই দিই; অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এখন অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বর্তমান অবস্থাতে ধনিকতন্ত্র কি সত্যই কার্যকরী? এক-একজন এ'রা অদ্ভুত সব প্রস্তাব তুলছেন, শুধু বর্তমানের এই লাভের রীতিটাকেই নয়, যে মূল্য-প্রদানের রীতিতে মানুষকে টাকা দিয়ে জিনিসপত্রের দাম দিতে হয়, তাকেই বাতিল করে দেবার কথা বলছেন। এসব খুব জটিল বিষয়, তার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কতগুলো প্রস্তাব প্রায় আজগুবি। আমি এদের কথা উল্লেখ করছি এজন্য যাতে তুমি স্পষ্টরূপে বুঝতে পার যে মানুষের মন কীভাবে ঘা খেয়ে নব নব ভাবে সাড়া দিচ্ছে এবং এই বিপ্লবাত্মক প্রস্তাবগুলি যারা উত্থাপন করছে তারা মোটেই বিপ্লববাদী নয়।

জেনেভার আই. এল্. ও. (ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর) অল্পদিন হল একটি প্রস্তাব করেছেন—শ্রমিকদের খাটুনির মেয়াদটাকে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টার অনধিক বলে বেঁধে দেওয়া হোক, তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও অনেকখানি কমে আসবে।

কাজের মেয়াদ কমলেই আরও বহু লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পেয়ে যাবে, অতএব বেকার-সমস্যাও সেই পরিমাণে কমবে। শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা সকলেই এই প্রস্তাবটিকে সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, জর্মানি এবং জাপানের সাহায্যে কোনোক্রমে এটাকে ধামাচাপা দিয়ে দিলেন। যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত আগাগোড়াই আই. এল্. ও.-র কাজকর্মে ব্রিটেন সমস্ত ব্যাপারে প্রগতি-বিরোধী মনোবৃত্তি দেখিয়ে আসছে।

মন্দা এবং সংকট পৃথিবী জুড়েই দেখা দিয়েছে, তাই স্বভাবতই মনে হয় এর প্রতিকারটাও করতে হবে সবাই মিলে, একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর জন্য। অনেক দেশই সকলকে একত্র করে কাজে নাবার একটা উপায় করা যায় কিনা তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখন পর্যন্ত সে পথ খুঁজে কেউ পায় নি। অতএব একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীজুড়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে এ আশা পরিত্যাগ করে এখন প্রত্যেক দেশই তার নিজের মতো প্রতিকারের সন্ধান করছে, সে প্রতিকারের উপায় বলে জেনেছে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদকে। বলছে পৃথিবীর বাণিজ্য যদি শুকিয়ে মরে যায় যাক; আমরা অন্তত আমাদের নিজের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যটাকে আমাদের হাতেই রেখে দেব, বিদেশী পণ্যকে এদেশের বাজারে আসতে দেব না। রপ্তানি ব্যবসা কতদূর চলবে বলা কঠিন এবং চললেও তার পরিমাণের ঠিক নেই, অতএব প্রত্যেক দেশই তার নিজের মধ্যেকার বাজারটাকে মাল কাটাবার প্রধান বাজার বলে ধরে নিচ্ছে। বাণিজ্য-শুল্ক বসিয়ে বা বাড়িয়ে বিদেশী পণ্যকে দেশের বাইরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছে, সে চেষ্টা সফলও হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর, কারণ প্রত্যেক দেশের বাণিজ্য-শুল্কই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে একটা প্রতিবন্ধক। ইউরোপ, আমেরিকা, এবং কিছু পরিমাণে এশিয়াও এই-সব অত্যুচ্চ শুল্ক-প্রাচীরে ভরে উঠেছে। শুল্ক-প্রাচীরের আরেকটা ফল হয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়ের বৃদ্ধি, কারণ সে প্রাচীর বসানোর ফলে খাদ্য-সামগ্রী এবং প্রাচীর দিয়ে রক্ষিত সমস্ত জিনিসপত্রের দাম অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। শুল্ক-প্রাচীর বসালেই দেশের মধ্যে একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন হয়, বাইরে থেকে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব, অন্তত কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যবসা একচেটিয়া হলে পণ্যের দাম বাড়বেই। শুল্ক-প্রাচীর গড়ে যে বিশেষ শিল্পটিকে রক্ষা করা হচ্ছে, সে রক্ষার ফলে তার হয়তো লাভ হয়—মানে তার মালিকদের হয়তো লাভ হয়। কিন্তু সে লাভ প্রধানত আসে, যারা সেই পণ্য কিনছে তাদের ঘাড় ভেঙে, কারণ তাদের সে-পণ্য বেশী দরে কিনতে হয়। অতএব দেখছ, শুল্ক-প্রাচীর বসালে কয়েকটা শ্রেণীর লোকদের কিছুটা সুরাহা হয়, দেশে কতকগুলো কায়েমী স্বার্থেরও সৃষ্টি হয়, কারণ সে শুল্ক-প্রাচীরের ফলে যে শিল্পগুলির লাভ হচ্ছে তারা একে টিকিয়েই রাখতে চায়। ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করা হচ্ছে জাপানের কাপড়ের উপরে গুরুভার শুল্ক বসিয়ে। ভারতীয় কলওয়ালাদের এতে খুব সুবিধা হচ্ছে, কারণ এই শুল্ক না থাকলে তারা জাপানের সঙ্গে মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠত না; এই শুল্ক আছে বলে তারা কাপড়ের দামও বাড়িয়ে দিতে পারছে। এদেশের চিনি-শিল্পকেও এই ভাবে রক্ষা করা হচ্ছে; তার ফলে ভারতের সর্বত্র বহু সংখ্যক চিনির কল গজিয়ে উঠেছে,—বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে আর বিহারে। এমনি করে নূতন একটি কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে; এখন যদি এই চিনি-শুল্কটি তুলে দেওয়া হয় তবে এদের স্বার্থে আঘাত লাগবে, নূতন চিনির কারখানাগুলোও সম্ভবত ভেঙে পড়বে।

দু'রকমের একচেটিয়া ব্যবসা বেড়ে উঠল : শুল্ক-প্রাচীরের দ্বারা যে-সব দেশ নিজেদিগকে রক্ষা করছিল তাদের মধ্যে একচেটিয়া বহির্বাণিজ্য; আর প্রত্যেক দেশের মধ্যে একচেটিয়া কারবারের অভ্যুত্থান, সেখানে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠানগুলোকে গিলে খেয়ে ফেলল। একচেটিয়া ব্যবসায়ের বৃদ্ধিটা অবশ্য অভিনব ব্যাপার কিছু নয়। বহু বছর ধরেই এটা ঘটে আসছিল, বিশ্বযুদ্ধেরও আগে থেকেই। এবার শুধু এর গতিটা দ্রুততর হল। শুল্ক-প্রাচীরও বহু দেশেই আগে থেকে বসানো ছিল। ইংলণ্ডই ছিল একমাত্র বড়ো দেশ যে এতদিন পর্যন্ত অবাধ-বাণিজ্যে নির্ভর করে এসেছে, শুল্ক-প্রাচীর বসায় নি। কিন্তু এবার তাকেও তার সে প্রাচীন প্রথা ভাঙতে হল, আমদানির পণ্যের উপরে শুল্ক বসিয়ে অন্যান্য দেশদের সঙ্গে হাতে

হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে হল। এই শুল্ক বসানোর ফলে তার কতকগুলো শিল্পের দুর্গতির আপাতত একটু লাঘব হল।

কিন্তু স্থানীয় এবং সাময়িক নিষ্কৃতি একটুখানি মিললেও, আসলে এর ফলে সমগ্র পৃথিবীর দুর্দশা আরও বেড়ে উঠল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ তো এতে আরও কমে গেলই; শুধু তাই নয়, ধনবণ্টনে যে বৈষম্য পৃথিবীতে ছিল সেটাও এর ফলে আরও ভালো করে টিকে রইল, বেড়ে চলল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশদের মধ্যে এর ফলে সারাক্ষণ ঠোকাঠুকি চলতে লাগল, প্রত্যেকেই অন্যের পণ্যের বিরুদ্ধে তার শুল্কের প্রাচীর আরও উঁচু করে গেঁথে তুলতে লাগল—এর নাম দেওয়া হয়েছে শুল্ক-যুদ্ধ। পৃথিবীব্যাপী বাজারের সংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল, প্রত্যেক দেশের বাজার ক্রমেই বেশি করে রক্ষার প্রাচীরে আটকা পড়তে লাগল; তারই সঙ্গে সঙ্গে সে বাজারে ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলিরও তীব্রতা বাড়তে লাগল; মনিবরা ক্রমেই শ্রমিকদের মাইনে আরও ছেঁটে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, তা নইলে তারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠছে না। অতএব তার ফলে মন্দা ক্রমেই বেড়ে চলল, বেকারদের সংখ্যাও বেড়ে চলল। প্রতিবারে বেতন কাটার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের ক্রয়-ক্ষমতাও আরও কমে যেতে লাগল।

১৮৬

নেতৃত্ব নিয়ে আমেরিকা আর ইংলণ্ডের লড়াই

২৫শে জুলাই, ১৯৩৩

তোমাকে বলেছি, এবারের সংকটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমতে কমতে প্রায় তিনভাগের একভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকদের কেনবার ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে বলে দেশের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক হ্রাস পেয়ে গেল। বেকার-সমস্যা বেড়েই চলল; এই লক্ষ লক্ষ বেকার শ্রমিককে খাইয়ে রাখা সবদেশেরই সরকারের পক্ষে একটা বিষম ব্যাপার হয়ে উঠল। অত্যন্ত উঁচু হারে কর বসিয়েও অনেক দেশের সরকারই ব্যয় কুলিয়ে উঠতে পারলেন না; নানা-রকমে ব্যয়সংকোচ এবং কর্মচারীদের বেতন ছাঁটাই করা সত্ত্বেও এদের ব্যয়ের অংকটা বিরাট হয়ে রইল। এই ব্যয়ের বেশির ভাগটাই চলে যাচ্ছিল সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমানবাহিনীর পিছনে, এবং দেশের বাইরে বা ভেতরে যে-সব সরকারী দেনা ছিল তাই শোধ করতে। দেশের বাজেটে ঘাটতি পড়তে লাগল, মানে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হতে লাগল। এই ঘাটতি মেটাবার একমাত্র উপায় ছিল আরও টাকা ধার করা কিংবা অন্য যেখানে সঞ্চিত টাকা আছে সেখান থেকে টাকা এনে ব্যয় করা। এর ফলে এই-সব দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল।

এরই সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে আবার প্রকাণ্ড পরিমাণ মালপত্র অবিক্রীত থেকে যাচ্ছিল, কারণ সে মালপত্র কেনবার মতো টাকা লোকের নেই। বহু ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বাস্তবিকই নষ্ট করে ফেলা হল, অথচ অন্যত্র তখন সে মালের অভাবে মানুষের চরম দুর্দশা চলেছে। সংকট এবং ভাঙন সমস্ত পৃথিবীকেই (সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে) আক্রমণ করে বসেছে; অথচ সে সংকটের অবসান ঘটাবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখনও পর্যন্ত একত্র হয়ে সহযোগিতার পথে চলতে পারে নি। প্রত্যেক দেশই তার নিজের মতো ব্যবস্থা করে নিয়েছে, অন্যদের ডিঙিয়ে চলতে চাইছে, এমন কি অন্যের বিপদের সুযোগে নিজের লাভ গুছিয়ে নেবারও চেষ্টা করছে। এই একক এবং স্বার্থপর কার্যকলাপের ফলে, এবং অন্যান্য যে-সব অর্ধসম্পূর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার ফলে, দুরবস্থার তীব্রতাই আরও বেড়ে গেছে। পৃথিবীতে এখন দুটি বৃহৎ ব্যাপার বা প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়েছে—এই বাণিজ্য-সংকট থেকে তারা আলাদা অথচ এর তীব্রতাকে তারা অনেকখানিই বাড়িয়ে তুলছে। এর একটি

হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ধনিকতন্ত্রী দেশদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা; আরেকটি হচ্ছে ইংলণ্ড আর আমেরিকার রেষারেষি।

ধনিকতন্ত্রের এই সংকটের আঘাতে ধনিকতন্ত্রী দেশরা সকলেই দুর্বল এবং দরিদ্র হয়ে পড়েছে, এক দিক থেকে এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনাও কিছু কমেছে। প্রত্যেক দেশই এখন নিজের ঘর সামাল দিতে ব্যস্ত; দুঃসাহসিক অভিযানে বেরোবার মতো টাকাও কারও হাতে নেই। অথচ মজা এই, এই সংকটই আবার আরেক দিক দিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাড়িয়েও তুলছে—সংকটের চাপে পড়ে সকল জাতি এবং তাদের শাসনকর্তৃপক্ষরা মরীয়া হয়ে উঠছে; মানুষ যখন মরীয়া হয় তখন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান তারা অনেক সময়ে করতে চায় দেশের বাইরে যুদ্ধ বাধিয়ে। বিশেষ করে যেখানে দেশশাসনের কর্তৃত্ব একজন ডিক্‌টেটর বা একটি ছোটো ধনীদলের হাতে, সেখানে এই সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে; কারণ শাসনকর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে সে ডিক্‌টেটর বরং তাঁর দেশকে যুদ্ধের মধ্যেই নিমজ্জিত করে দিতে চান, জানেন, সে যুদ্ধের ধাক্কায় প্রজাদের মন অন্যত্র গিয়ে পড়বে, দেশের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে আর তারা মাথা ঘামাবে না। এই জন্যই সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ এরা এখন যে-কোনো মুহূর্তে ঘোষণা করে দিতে পারে, হয়তো এরা মনে করবে সেই জেহাদের নামে বহু ধনিকতন্ত্রী দেশের একত্র সম্মিলিত হবার একটা ভরসা করা যেতেও পারে। তোমাকে বলেছি, ধনিকতন্ত্রের এই সংকটের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব সোভিয়েট ইউনিয়নের উপরে পড়ে নি। সে তার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত, যে করেই হোক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সে তখন এড়িয়ে চলতে চায়।

ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধের পরে না বেধে উপায় ছিল না। এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো দুটি শক্তি; দুজনেই পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারে প্রভুত্ব খাটাতে চায়। বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি ছিল অবিসংবাদী। যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং শক্তিমান দেশ হয়ে উঠল; স্বভাবতই সে তখন, পৃথিবীতে যেটা তার ন্যায্য আসন বলে তার ধারণা, মানে নেতৃত্বের আসন, সেটি দখল করে বসতে চাইল। ভবিষ্যতে আর ইংলণ্ডকেই সবার উপরে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে দিতে সে রাজি নয়। দিনকাল বদলে গেছে, ইংলণ্ড নিজেও সেটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিল; সেই নূতন অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল, আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইল। আমেরিকাকে খুশি করবার জন্য সে জাপানের সঙ্গে তার মৈত্রী পর্যন্ত ভেঙে দিল, আরও অনেকরকম মনভোলানো চালটাল দিয়ে দেখল। কিন্তু তার যে-সব বিশেষ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে ছিল, বিশেষ করে টাকার বাজারে এতদিনের যে নেতৃত্ব তার ছিল, সেগুলোকে সে তাই বলে কিছুতেই হস্তান্তর করতে রাজি ছিল না—সে জানত এগুলো গেলে তার প্রভাবপ্রতিপত্তি তার সাম্রাজ্য, সবই সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। অথচ ঠিক এই টাকার বাজারের নেতৃত্বটিকে হস্তগত করাই ছিল আমেরিকার অভিপ্রায়। অতএব তখন এই দুটি দেশের মধ্যে সংঘাতও অপরিহার্য হয়ে উঠল। মুখে অতি মৃদু মৃদু সদালাপ আর প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণের জাল ছড়াতে লাগল এই দুই দেশের ব্যাঙ্কাররা; তার আড়ালে চলল দুই পক্ষের মধ্যে নিঃশব্দ দ্বন্দ্বযুদ্ধ—যে যুদ্ধে দুই দেশের সরকারপক্ষও রইলেন ব্যাঙ্কারদের পিছনে। সে যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে একটি বিরাট বস্তু—মূলধন এবং শিল্পের বাজারে সমস্ত জগতের নেতৃত্ব। ভাগ্যকে বাজি রেখে এদের এই দ্যূতক্রীড়া : সবাই দেখল, খেলার পাকা ঘুঁটিগুলো প্রায় সবই গিয়ে উঠেছে আমেরিকার হাতে। কিন্তু ইংলণ্ডও তাই বলে নিঃসহায় নয়—তার আছে সে খেলায় দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, ভাগ্যের এই খেলায় সে ওস্তাদ খেলুড়ী।

যুদ্ধ-ঋণকে উপলক্ষ্য করে এই দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্য আরও বেড়ে উঠল। ইংলণ্ডের লোকরা আমেরিকানদের গাল পাড়তে লাগল; শাইলকের জাত, কড়ার-মতো এক পাউণ্ড মাংস মেপে আদায় করবার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু সে ঋণের টাকাটা ব্রিটিশ সরকার ধারতেন আমেরিকার বেসরকারি ব্যাঙ্কারদের কাছে; যুদ্ধের সময়ে এরাই ব্রিটেনকে

সে টাকা ধার দিয়েছিল, মানে ধারে মাল দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র-সরকার শুধু সে টাকার জন্য জামীন হয়েছিলেন। কাজেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে সে ঋণ মকুব করে দেবার কোনো ব্যাপারই ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সে টাকার দরুন জামীন রয়েছেন; অতএব সে টাকা শোধ করবার দায় থেকে ব্রিটেনকে যদি তাঁরা তখন অব্যাহতি দিতে যেতেন তবে, সে টাকা শোধ দিতে হত যুক্তরাষ্ট্র সরকারকেই। এই অতিরিক্ত দেনার দায় গছে নিতে, বিশেষ করে সেই সংকটের মুহূর্তে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার কেন যাবেন, তার কোনো যুক্তি আমেরিকার কংগ্রেস খুঁজে পেলেন না।

এমনি করে ইংলণ্ড আর আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থের ধারা দুই বিপরীত মুখে চলতে লাগল; আর অর্থনৈতিক স্বার্থের টান অন্য যে-কোনো টানের চেয়েও বেশি জোরালো। এই দুটি দেশের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই অত্যন্ত নিবিড় মিল, অথচ এদেরই মধ্যে এই অনিবার্য সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে আমেরিকার শক্তি এবং সঙ্গতি ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। এই সংঘর্ষ কঠিনতর সংগ্রামের নানারূপ ধারণ করতে পারে অথবা তা যদি না হয় তবে ইংলণ্ডের পৃথিবীময় যে-সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, ক্রমে ক্রমে কিন্তু অব্যাহত গতিতে তার সবখানিই তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের কাছে যেটা অত্যন্ত মূল্যবান এমন অনেকখানি বস্তু স্বেচ্ছায় পরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; প্রাচীনকাল থেকে যে সম্মান-সম্ভ্রমের সে অধিকারী তাকে, এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে যে লাভ সে এতদিন পেয়ে এসেছে তাকে হারাতে হবে; পৃথিবীতে সমস্ত জাতির মধ্যে পিছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমেরিকার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হবে; এ কল্পনাটা ইংরেজদের কাছে মধুর নয়—একটা মরণ-পণ লড়াই না করেই তারা হার স্বীকার করবে, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। এইটাই হচ্ছে ইংলণ্ডের বর্তমান অবস্থাটা—করুণ অবস্থা সন্দেহ নেই। একদা যে-সব উৎস থেকে তার শক্তির অজস্র যোগান আসত সে উৎসগুলো যাচ্ছে শুকিয়ে; নিয়তি তাকে অঙ্গুলি-নির্দেশে চালাচ্ছে ক্ষয়ের পথে, সে পথকে এড়িয়ে যাবার তার উপায় নেই। কিন্তু বহু পুরুষ ধরে ইংরেজ জাতি পরের উপরে প্রভুত্ব করতে অভ্যস্ত, আজ এই ভাগ্যকেও সহজে স্বীকার করে নিতে তারা রাজি নয়। সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে তারা বীরের মতো দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, যতদিন পারবে লড়াই করবেও।

পৃথিবীতে আজকাল যে দুটি প্রবল রেষারেষির খেলা চলছে তার কথা তোমাকে বললাম। পৃথিবীতে এখন যা কিছু ঘটছে তার অনেকখানিরই ব্যাখ্যা মিলবে এই রেষারেষির মধ্যে। অবশ্য দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বত্রই আছে; গোটা ধনিকতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর রেষারেষির উপরে।

সংকটের বাজারে ঘটনাচক্র কোনদিকে চলেছিল তার কথা বলছিলাম। ১৯৩০ সনের জুনমাসে ফরাসিরা রাইনল্যাণ্ড ছেড়ে সরে এল। জর্মনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল; কিন্তু এটা ঘটেছে অত্যন্ত দেরি করে, ফরাসিদের মৈত্রী-প্রকাশের লক্ষণ বলে একে তারা মেনে নিতে পারল না; সংকটের করাল ছায়ায় তখন সব কিছুই অন্ধকার দেখাচ্ছে। বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঋণীদের হাতে টাকার অভাব বেড়ে গেল; ক্ষতিপূরণ এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করা ক্রমেই বেশি শক্ত, এমনকি অসম্ভব হয়ে উঠল। টাকা দেবার সেই মুশকিলটার অবসান করবেন বলে প্রেসিডেণ্ট হুভার এক বছরের মতো ঋণশোধ-বিরতি ঘোষণা করলেন। যুদ্ধ-ঋণের সমস্ত ব্যাপারটাকেই আবার নূতন করে বিচার করে দেখা যায় কিনা, সেজন্যও চেষ্টা চলল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এ সম্বন্ধে নূতন করে বিবেচনা করতে অস্বীকার করলেন। জর্মনির কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য ছিল, তার সম্বন্ধেও ফরাসি সরকার ঠিক একই রকম কঠিন হয়ে রইলেন। ব্রিটিশ সরকারের দেনা ও পাওনা দুইই সমান আছে, অতএব তাঁরা বললেন, ও ক্ষতিপূরণ আর যুদ্ধঋণ দুটোকেই মুছে ফেলা হোক, নূতন করে যাত্রা শুরু করি। প্রত্যেক দেশই ভাবছে তার নিজের গরজ অনুসারে, তাই সকলের মধ্যে কাজের কোনো ঐক্যই দেখা গেল না। ১৯৩১ সনের মাঝামাঝি এসে জর্মনিতে একটা অর্থসংকট দেখা দিল, অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল। এর ফলে ইংলণ্ডেও সংকট সৃষ্টি হল, সেও তার দেনা মেটাতে পারল না। সেখানেও আর্থিক

ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। এই সংকটের ভয়ে পড়ে শ্রমিক মন্ত্রীসভার অধিনায়ক ম্যাক্‌ডোনাল্ড নিজেই সে মন্ত্রীসভার আয়ু শেষ করে দিয়ে একটি 'জাতীয় মন্ত্রীসভা' গঠন করলেন, সেখানে রক্ষণপন্থীদেরই প্রাধান্য। কিন্তু সে জাতীয় সরকারও পাউণ্ডকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। ঠিক এই সময়েই অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ নৌবহরের নাবিকরা বেতন কাটার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে বসল। ব্রিটেন এবং ইউরোপের উপরে এই অহিংস বিদ্রোহের বিরাট ফল দেখা গেল। লোকের মনে পড়ে গেল রুশ বিপ্লবের কথা, সে বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ার নাবিকরা বিদ্রোহ করেছিল তার কথা; তাদের ভয় ধরল, ব্রিটেনেও বুঝি এবার বলশেভিজমেরই আবির্ভাব হয়। ব্রিটেনের ধনিকরা স্থির করলেন, তেমন কোনো সর্বনাশ এসে উপস্থিত হবার আগেই তাঁদের মূলধনটাকে সামলে নিতে হয়: প্রচুর পরিমাণ মূলধন তাঁরা অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে দিলেন। বড়োলোকদের দেশপ্রেমটা টাকা লোকসানের ধাক্কা সইতে পারে না।

ব্রিটেন থেকে মূলধন বাইরে চালান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ডেরও দর কমে যেতে লাগল। অবশেষে ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে হল—মানে হাতের সোনাটাকে বাঁচাবার জন্য পাউণ্ডকে সোনা থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। এতদিন যার হাতে পাউণ্ড স্টার্লিং আছে সেই তার বদলে নগদ সোনা চাইতে পারত; এখন থেকে সেটা আর চলবে না।

ব্রিটেন সাম্রাজ্যের দিক থেকে, এবং পৃথিবীতে ইংলণ্ডের যে আসন ছিল তার দিক থেকে, পাউণ্ডের এই মর্যাদাহানি একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। এর মানেই হল, টাকার বাজারে যে নেতৃত্বের বলে টাকাকড়ির ব্যাপারে লণ্ডন শহর সমস্ত পৃথিবীর কেন্দ্র এবং রাজধানী হয়ে বসেছিল, সে নেতৃত্ব এবার ব্রিটেন ছেড়ে দিচ্ছে—অন্তত তখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছে। এই নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্যই ১৯২৫ সনে ইংলণ্ড তার স্বর্ণমানকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেছিল : তা করতে গিয়ে তার শিল্প-বাণিজ্যকে লোকসান সইতে হয়েছে, দেশে বেকার-সমস্যার উদ্‌ভব হয়েছে, কয়লার খনিতে ধর্মঘট হয়েছে, আরও কত কি হয়েছে, তবু সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু এত করেও কাজ হল না; অন্যান্য দেশের কার্যকলাপের ফলেই বাধ্য হয়ে পাউণ্ড আর সোনা সম্পর্ক আবার ছিন্ন হয়ে গেল। দেখে মনে হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসেরই সেই শুরু হল; পৃথিবীর সর্বত্র এর এই ভাষ্যই সেদিন সকলে করছিল। ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর—দিনটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার তরিখ বলে প্রসিদ্ধ হয়ে রইল।

কিন্তু ইংলণ্ড অত সহজে হারবার পাত্র নয়; তখনও তার হাতে একটি অধীন এবং অসহায় সাম্রাজ্য রয়েছে, সেখান থেকে সে শক্তি-সংগ্রহ করতে পারে। ভারতবর্ষ এবং মিশর এই দুটি দেশ ছিল তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে; প্রধানত এই দুটি দেশ থেকে সোনা টেনে নিয়েই সে সংকটকে সে কাটিয়ে উঠল। পাউণ্ডের দর কমে যাওয়াতে তার শিল্পদের সুবিধাই হয়ে গিয়েছিল, কারণ ব্রিটেনের মাল তখন বিদেশের বাজারে আরও শস্তা দরে বেচা যাচ্ছে। সংকট থেকে সে এক আশ্চর্য পরিত্রাণ।

ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধ-ঋণের প্রশ্নটার তখনও সমাধান হয়নি। ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া জর্মনির পক্ষে আর সম্ভব নয় সেটা সবাইই বুঝতে পারছিল; আর জর্মনিও সরকারিভাবেই সে টাকা দিতে অস্বীকার করল। শেষপর্যন্ত ১৯৩২ সনে লুজোঁতে একটি সভা করে ক্ষতিপূরণের দাবিটাকে কমিয়ে একটা নামমাত্র অঙ্কে এনে খাড়া করা হল; এঁদের আশা এবং ভরসা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রও তার প্রাপ্য ঋণের অঙ্কটাকে এইভাবেই কমিয়ে দেবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুদ্ধ-ঋণ এবং ক্ষতিপূরণকে একত্র গুলিয়ে ফেলতে, বা যুদ্ধ-ঋণ মকুব করে দিতে, সাফ অস্বীকার করে বসলেন। অতএব এত যত্নে সজ্জিত 'আপেল-গাড়ী' আবার উল্‌টে পড়ে গেল (অর্থাৎ সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনই পণ্ড হল); ইউরোপের লোকেরা আমেরিকার উপরে ভয়ংকর চটে গেল।

যুক্তরাষ্ট্রকে টাকা দেবার একটা কিস্তি এল ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে। আমেরিকা বলল, টাকা দিতেই হবে; ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তরফ থেকে অনেক ওকালতি করা হল, কিন্তু আমেরিকার তাতে মন ভিজল না। অনেক তর্কাতর্কির পর ইংলণ্ড টাকা দিল; কিন্তু

সেই সঙ্গেই বলে দিল, এই শেষবার, আর আমরা টাকা দেব না। ফ্রান্স এবং আর কয়েকটা দেশ টাকা দিতে অস্বীকার করল, কিস্তি খেলাপ করল তারা। এ নিয়ে আর নূতন বন্দোবস্ত তখন কিছুই হল না। গত মাসে মানে ১৯৩৩ সনের জুন মাসে ঋণ শোধের পরবর্তী কিস্তি এল। ফ্রান্স এবারেও টাকা দিতে অস্বীকার করল। আমেরিকা কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতি খুব একটা উদারতা দেখাল; টাকা দেওয়ার প্রমাণ হিসাবে খুব সামান্য পরিমাণ টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে বলে দিল, বাকি বৃহত্তর পরিমাণটার সম্বন্ধে পরে যা হয় একটা সিদ্ধান্ত করা যাবে।*

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী এবং বিত্তশালী ধনিকতন্ত্রী দেশরাও নিজের নিজের নীতিবোধ এবং রীতি অনুসারে দেনার টাকা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে; দেখে স্বভাবতই সোভিয়েটের কথা মনে পড়ে যায়। সোভিয়েট রাশিয়াও তার দেনা অস্বীকার করেছিল, তখন এরা তার সে অন্যায় আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। ভারতবর্ষেও কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ইংলণ্ডের কাছে ভারতের যত দেনা আছে, তা পরিশোধের সমগ্র ব্যাপারটারই বিচারের ভার আমাদের নির্জস্ব একটি নিরপেক্ষ বিচারকসভার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে; কিন্তু এ-সব কথা বলবামাত্রই সরকারি মহল অমনি ধর্মনিষ্ঠ আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠেন। জাতির উপরে যে ঋণভার চাপিয়ে রাখা হয়েছে তার পরিশোধ সম্বন্ধে এই গোছের একটা সমস্যা নিয়েই আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের তুমুল কলহ বেধেছে; দুইদেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি।

টাকার বাজারে ইংলণ্ড জগতের নেতৃত্ব করত, সে নেতৃত্ব কেড়ে নেবার জন্য আমেরিকা লড়াই শুরু করল; ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে সংকট উপস্থিত হল, বহু দেশের আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল—এ-সব কথা আমি বহুবার বলেছি। তুমি প্রশ্ন করতে পার, এই-সব হিজিবিজি কথার মানে কী। এগুলো তুমি বুঝতে পেরেছ কিনা আমার মনেও সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো এগুলো শুনতেও তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এর সম্বন্ধে এতখানি যখন বলেই ফেলেছি, তখন একে আরও একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়াই আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে। আর্থিক জগতের এই-সব ঘটনাবলী, এদের কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক, কী জাতি হিসাবে আর কী ব্যক্তি হিসাবে, এর প্রভাব আমাদের উপরে অনেকখানিই পড়ে। যে বস্তুটা আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে গড়ে তুলছে তার স্বরূপটা একটু জেনে রাখা ভালো। ধনিকতন্ত্রী জগতের এই আর্থিক ব্যবস্থার রহস্যময় কার্যকলাপ দেখে অনেকে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান, যে এর দিকে তাঁরা তাকান রীতিমতো ভয় আর ভক্তি মেশানো দৃষ্টিতে। তাঁদের মনে ধারণা, এটা এমনই বিষম জটিল, সূক্ষ্ম এবং প্যাঁচালো ব্যাপার যে একে বুঝবার চেষ্টাও তাঁদের না করাই ভালো; অতএব তাঁরা সে কাজটা তুলে রেখে দেন বিশেষজ্ঞ, ব্যাঙ্কার ইত্যাদিদের জন্য। ব্যাপারটা সত্যই জটিল এবং প্যাঁচালো তাতে সন্দেহ নেই; আর প্যাঁচালো হলেই যে সে জিনিসটা ভালোও হয়ে যাবে এমনও কোনো কথা নেই। তবু আমাদের এই এখনকার পৃথিবীকে যদি বুঝতে চাই তবে এর সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা না থাকলেও আমাদের চলবে না। সমস্ত ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করে তোমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টাও আমি করব না। সেটা করা আমার সাধ্যেই কুলোবে না—আমি এ বিষয়ে মোটেই বিশেষজ্ঞ নই, একজন শিক্ষার্থী মাত্র। আমি শুধু দুটো চারটে তথ্য তোমাকে শোনাতে পারি : পৃথিবীতে যা ঘটছে এবং সংবাদপত্রে যেসব খবর আমরা দেখছি, তার খানিকটার মানে বুঝতে হয়তো এতে তোমার একটু সাহায্য হবে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ধনিকতন্ত্রের রাজত্ব : এখানে আছে সব বেসরকারি কোম্পানি আর তার শেয়ার, আছে বেসরকারি ব্যাঙ্ক, আছে স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে শেয়ার কেনাবেচা করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থা এবং শিল্পব্যবস্থা একেবারেই অন্য রকম। সেখানে এরকমের

* পরবর্তী পাঁচ বছরের অর্থাৎ ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে ইংলণ্ড বা ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ-শোধ বাবদ আর কিছু দেয় নি, এমনকি নামমাত্র দেনাও শোধ করে নি। মনে হয় এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দেনাটা অস্বীকার করে না দিলেও চলবে।

কোনো কোম্পানি বা বেসরকারি ব্যাঙ্ক বা স্টক এক্সচেঞ্জ নেই; প্রায় সমস্ত কিছুই সেখানে স্টেটের সম্পত্তি, স্টেটের নিয়ন্ত্রণে চলে; বৈদেশিক বাণিজ্য যেটা তার সঙ্গে সেটা প্রধানত চলছে পণ্য-বিনিময়ের মারফৎ।

তুমি জান প্রত্যেক দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সবটাই চালানো হয় চেক দিয়ে, এবং তার চেয়ে কিছু কম পরিমাণে ব্যাঙ্কের নোট দিয়ে; একমাত্র খুচরো কেনাবেচা ছাড়া সোনা-রুপোর ব্যবহার প্রায় হয়ই না। (আর সোনার তো দেখা পাওয়াই মুশকিল)। এই কাগজের টাকা হচ্ছে ঋণের প্রতীক; ব্যাঙ্কের উপরে বা যে সরকার সে কারেন্সি নোট ছেপে বার করছে তার উপরে যতক্ষণ লোকের আস্থা ঠিক থাকে ততক্ষণ এই কাগজ দিয়েই নগদ-টাকার কাজ চলে যায়। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশকে টাকা দেবার বেলায় এই কাগজের টাকা একেবারেই অচল, কারণ প্রত্যেক দেশেরই তার নিজস্ব মুদ্রা আছে। অতএব আন্তর্জাতিক লেনদেন চলে সোনার অঙ্কে—দুর্লভ ধাতু হিসাবেই তার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এই লেনদেনের কাজে সোনার মুদ্রা বা তাল-সোনা (একে বলা হয় বুলিয়ন) দুইই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুটি দেশের মধ্যে যেখানে যত লেনদেন হয় সবই যদি নগদ সোনা দিয়ে মেটাতে হত তবে সেটা হত একটা বিষম বিপত্তির ব্যাপার; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও আদৌ গড়ে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। তাছাড়া নগদ সোনা পৃথিবীতে যেটুকু বর্তমান আছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও তার চেয়ে বেশি হতে পারত না; কারণ সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেই তারপর আর দাম দেবার মতো টাকার সংস্থান থাকত না—যে সোনা দাম বাবদ দিয়ে দেওয়া হল তার খানিকটা অন্তত যতক্ষণ আবার ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরে না আসছে, ততক্ষণ আর বাইরের সঙ্গে কোনোরকম কেনাবেচাই করা চলত না।

কিন্তু আসলে তা হয় না। ১৯২৯ সনে পৃথিবীতে সোনার টাকার মোট পরিমাণ ছিল এগারো-শো কোটি ডলার। সেই বছরই একদেশ থেকে অন্যদেশে মোট যত মালপত্র পাঠানো হয়েছে তার দাম বত্রিশ-শো কোটি ডলার; এক দেশ থেকে অন্য দেশ টাকা ধার নিয়েছে চার-শো কোটি ডলার; ভ্রমণকারীদের ব্যয়, মালপত্র বহনের মাশুল, বিদেশে যারা বাস করছে তাদের বাড়িতে-পাঠানো টাকা, ইত্যাদিরও মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় চার-শো কোটি ডলারের মতো। অতএব আন্তর্জাতিক লেনদেনের মোট পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় চল্লিশ-শো কোটি ডলার, মানে মোট যা সোনার টাকা ছিল তার চার গুণের কাছাকাছি।

তাহলে বিদেশের দেনা শোধ করা হল কী করে? এর সমগ্র টাকা নগদ সোনায় মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। সাধারণত এই দেনা মেটানো হয়েছে একরকমের সরকারি মুদ্রা দিয়ে, অথবা চেক বা হুণ্ডীর ন্যায় ঋণপত্র দিয়ে, বণিকরা তাদের দেয় মূল্যের স্বীকৃতিপত্র হিসাবে সেগুলো বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এই কাজটা চলছিল, যে ব্যাঙ্কগুলো মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ করে, তাদের মারফৎ। বিনিময় ব্যাঙ্করা বিভিন্ন দেশে যেখানে যত ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে তাদের সঙ্গে সংশ্রব রাখে; তাদের কাছ থেকে যে হুণ্ডীগুলো পায় তারই মারফৎ এদের প্রদত্ত এবং প্রাপ্ত টাকার মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে। যদি কোনো সময়ে দেখা যায় ব্যাঙ্কের হাতে আর দেবার মতো হুণ্ডী নেই, তখন সে সুপরিচিত সরকারি ঋণপত্র (Securities) বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতির দ্বারা ঋণ শোধ করতে পারে। শুধু টেলিগ্রাফের বার্তা পাঠিয়েই এই সব শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায়, কাজেই এর দ্বারা পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও অবিলম্বেই টাকার দাবি মিটিয়ে দেওয়া চলে।

অতএব দেখছ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের টাকা বাস্তবিকপক্ষে মিটিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বিনিময় ব্যাঙ্কদের মারফতে, বাণিজ্য-সংক্রান্ত দলিল (হুণ্ডী ইত্যাদি) এবং ঋণসংক্রান্ত দলিল (Securities ইত্যাদি) দিয়ে। ব্যবসায়ের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এই ব্যাঙ্কদের হুণ্ডী এবং সিকিউরিটি এই দুই রকমের দলিলই প্রচুর পরিমাণে মজুত রাখতে হয়। নগদ সোনা এবং এই-সব বিদেশী দলিল হাতে কতখানি আছে তার পরিমাণ দেখিয়ে এরা প্রতিসপ্তাহে একটা করে ইস্তাহার বার করে। সাধারণ অবস্থায় বিদেশের দেনা

শুধবার বাবদ নগদ টাকা এরা কিছুতেই দেশের বাইরে পাঠাবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় অন্য-ভাবে দেনা শোধ করার চাইতে সোনা পাঠিয়ে দিলেই বাস্তবিক খরচ কম পড়ে, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কাররাও সোনাই পাঠিয়ে দেবে।

স্বর্ণমান যে-সব দেশে ছিল সেখানে দেশের মুদ্রার দামটাকে সোনার দরে স্থির করে দেওয়া হয়েছিল; যে কোনো লোক বলতে পারত তার পাওনা নগদ সোনায় মিটিয়ে দিতে হবে। অতএব এই-সব দেশের মুদ্রার মূল্য ছিল ধরাবাঁধা; এর একটার সঙ্গে আরেকটার বিনিময়ও করা চলত, কারণ এর প্রত্যেকটাকেই বদলে সোনা করে নেওয়া যায়। দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে যে দর বাঁধা তার একমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারত, এক দেশ থেকে অন্য দেশে সোনা পাঠাবার যেটুকু খরচা, সেই-টুকুর মাপে; কারণ তার নিজের দেশে সোনার দাম বেশি হয়েছে দেখলে ব্যবসায়ীরা সহজেই অন্য দেশ থেকে সোনা আনিয়ে নিতে পারত। এর নাম হচ্ছে স্বর্ণ-মান ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যতদিন অব্যাহত ছিল ততদিন বিভিন্ন দেশের নিজস্ব মুদ্রার মূল্যও স্থির ছিল; এর কল্যাণেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শুরু পর্যন্ত, পৃথিবীর আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, এখন এই ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়েছে; তার ফলে টাকাও অদ্ভুত আচরণ শুরু করেছে, অধিকাংশ দেশেরই মুদ্রার মূল্যের স্থিরতা বলে কিছু নেই।

বাইরে থেকে একটা দেশে যত মাল আমদানি হয়, তার রপ্তানির পরিমাণটাও মোটামুটি হয় তারই সমান। তার মানেই, যে মাল সে বাইরে থেকে পাচ্ছে তার দাম সে চুকিয়ে দেয়, যে মাল সে নিজে বাইরে পাঠাচ্ছে তাই দিয়ে। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়; অনেক সময়েই দেখা যায় এপক্ষে বা ওপক্ষে টাকার হিসাবে কিছু বাড়তি-কমতি দেখা যাচ্ছে। রপ্তানির চেয়ে যেখানে বেশি টাকার মাল আমদানি হয়েছে সেটাকে বলা হয় 'প্রতিকূলস্থিতি'—তখন হিসাব মেটাবার জন্য সে দেশটিকে কিছু নগদ টাকাও এর উপরে ধরে দিতে হয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের যে প্রবাহ চলছে সেটা কোনো দিনই খুব নিয়মিত নয়। এই স্রোতের আয়তন প্রায়ই বদলে যায়; কখনও বেশি মাল বিক্রি হয় কখনও হয় না; আবার এর বদলের সঙ্গে সঙ্গেই হুণ্ডীর প্রয়োজন এবং পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে। অনেক সময় দেখা যায়, যে রকমের হুণ্ডী তার তখন দরকারে লাগবে না এমন হুণ্ডীই একটা দেশের হাতে অনেক জমে গেছে; আরেক রকম হুণ্ডী তার তখন দরকার অথচ সেটা তার যথেষ্ট পরিমাণে হাতে নেই। ফ্রান্সের হাতে হয়তো জর্মন মার্কের অঙ্কে এবং জর্মনির দেয় হুণ্ডীই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আছে; আবার আমেরিকার সঙ্গে ডলারের অঙ্কে হিসাব মেটাতে পারে এত পরিমাণ হুণ্ডী তার হাতে নেই। ফ্রান্স তখন স্বভাবতই প্রথমোক্ত হুণ্ডী-গুলোকে বেচে ফেলতে চাইবে তার বদলে কিনতে চাইবে এমন হুণ্ডী যার টাকা ডলারের অঙ্কে এবং আমেরিকার কাছে প্রাপ্য। কিন্তু সেটা যদি করতে হয় তবে তার জন্য হুণ্ডী কেনাবেচার একটা কেন্দ্রীয় বাজার থাকা চাই, যেখানে এই ধরণের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় করা চলে। সেরকম বাজার থাকতে পারে মাত্র সেই দেশে যার এই তিনটি গুণ আছে ঃ

১। তার বৈদেশিক বাণিজ্য খুব ব্যাপক এবং বিচিত্র রকমের হবে, যেন সকল প্রকার হুণ্ডীই তার হাতে প্রচুর পরিমাণ মজুত থাকে।

২। সকল রকম সিকিউরিটিই (Securities অর্থাৎ সরকারি বা আধা-সরকারি সংরক্ষিত ঋণপত্র) সেখানে পাওয়া যেতে হবে, মানে পৃথিবীতে সেই হবে মূলধনের সবচেয়ে বড়ো বাজার।

৩। সোনারও সেইটিই হবে সবচেয়ে বড়ো বাজার; যেন হুণ্ডী আর সিকিউরিটি দুটোরই যদি অভাব ঘটে, তবে সোনাও সহজে যোগাড় করে নেবার পথ থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া সময়টা ইংলণ্ডই ছিল একমাত্র দেশ যার এই তিনটি গুণেই একত্র বর্তমান ছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে সেই প্রথম নেমেছে, তাছাড়া প্রকাণ্ড একটা সাম্রাজ্যের সে মালিক, সেখানে তারই একচেটিয়া ব্যবসা; অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও তারই দাঁড়াল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। কৃষির উচ্ছেদ সাধন করে সে দেশময় শিল্পকে গড়ে তুলল। তার জাহাজে করে পৃথিবীর প্রত্যেক বন্দর থেকেই পণ্য আর হুণ্ডী পাঠানো হতে

লাগল। শিল্পে এই প্রচণ্ড উন্নতির ফলে স্বভাবতই ইংলণ্ড হয়ে উঠল মূলধনের সবচেয়ে বড়ো বাজার; সমস্ত প্রকার বিদেশী সিকিউরিটিই তার হাতে এসে জমা হতে লাগল। আরও একটি ব্যাপারে তার এই প্রতিষ্ঠালাভ সহজ হয়ে উঠল; পৃথিবীতে যত সোনা উৎপন্ন হয় তার দুই-তৃতীয়াংশই হচ্ছিল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের এলাকার মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়াতে, কানাডায়, ভারতবর্ষে। এই সমস্ত খনিরই সোনা সরাসরি লণ্ডনে গিয়ে হাজির হত, কারণ যত সোনা তারা উৎপন্ন করছিল সমস্তটাই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড একটা বাঁধা দরে কিনে নিচ্ছিল।

এইভাবে লণ্ডন শহর পৃথিবীর মধ্যে হুণ্ডী, সিকিউরিটি এবং সোনার সর্বপ্রধান বাজারে পরিণত হল। টাকাকড়ির ব্যাপারে সেই হল পৃথিবীর রাজধানী; যেখানেই কোনো দেশের সরকার বা ব্যাঙ্কওয়ালা দেখল, বিদেশের সঙ্গে একটা লেনদেন তার চুকিয়ে ফেলা দরকার অথচ সেটা করবার মতো সঙ্গতি তার নিজের দেশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, সেইখানেই তারা ছুটে এল লণ্ডনে—সেখানে সমস্ত রকমের বাণিজ্য এবং ঋণ-সংক্রান্ত কাগজপত্র কিনতে পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়। পাউণ্ড স্টার্লিং হয়ে উঠল ব্যবসা-বাণিজ্যের জীবন্ত প্রতীক। ডেনমার্ক বা সুইডেনের হয়তো দক্ষিণ-আমেরিকার কাছ থেকে কিছু কেনা দরকার; সে কেনাবেচার চুক্তিপত্র লেখা হত পাউণ্ড স্টার্লিং-এর অঙ্কে, যদিও সে মালপত্র কোনোদিনই লণ্ডনে এসে হাজির হত না।

ইংলণ্ডের পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড লাভের ব্যবসা; কারণ এই কাজের দরুন পৃথিবীর সকল দেশই তাকে খানিকটা নজরানা যোগাচ্ছিল, ব্যবসায়ের সহজ লাভটা তো ছিলই। তা ছাড়া বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরা, মালের মূল্য বাবদ বা আমদানি-রপ্তানির হিসাব কাটান দিয়ে বাড়তি প্রাপ্য বাবদ যে টাকা পেত সেটাও তারা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখত, তাহলে ভবিষ্যতে যদি আবার কাউকে টাকা দিতে হয় সেটাও ঐখান থেকেই দিয়ে দেওয়া যাবে। এই ব্যাঙ্করা আবার সে টাকা অন্যান্য মক্কেলদের অল্পদিনের মেয়াদে ধার দিত, তাতেও এদের বেশ লাভ হত। তাছাড়া, বিদেশের শিল্পপতিদের ব্যবসার অবস্থা সম্বন্ধেও ইংলণ্ডের এই ব্যাঙ্করা সমস্ত তত্ত্বই জেনে ফেলত। তাদের হাত দিয়ে যে-সব হুণ্ডী পার হয়ে যাচ্ছে, তাই পড়েই তারা জেনে নিত জর্মনরা বা অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা কী দরে মাল দিচ্ছে; এমনকি অন্যান্য দেশে কাদের কাছে এরা মাল বেচছে তাদের নাম-ধাম পর্যন্ত এরা জেনে নিতে লাগল। এই তথ্য জানতে পেরে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের ভারি সুবিধা হয়ে গেল, কারণ তারা তখন সহজেই তাদের বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মক্কেল ভাঙিয়ে নিতে পারল।

এই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়কে বাড়িয়ে এবং সুপ্রতিষ্ঠ করে তোলবার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্করা পৃথিবীর সর্বত্র শাখা এবং প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান বসাতে শুরু করল। অন্যান্য দেশদের ব্রিটিশ শিল্পের প্রভাবের আওতায় এনে তো তারা ফেলছিলই; তা ছাড়া ব্রিটেনের স্বার্থের দিক থেকে আরও একটা অত্যন্ত বড়ো কাজ এই ব্যাঙ্করা উদ্ধার করছিল। দেশের যেখানে যত নামকরা কারখানা বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের সম্বন্ধে এরা সারাক্ষণই খোঁজখবর নিত, যা কিছু খবর পাওয়া গেল সব লিখে রাখত। তার পরে ধর, এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান যখন একটা হুণ্ডী জারি করল, ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক বা তার প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান যিনি সেখানে আছেন তিনি সে হুণ্ডীর দাম জানেন; অতএব নিরাপদ মনে করলে তিনিই সেটার জামীন হতে পারতেন। এর নাম হল 'স্বীকার করা', কারণ ব্যাঙ্ক সে বিলটির উপরে 'স্বীকৃত' কথাটি লিখে দিত। ব্যাঙ্ক সে হুণ্ডীর দরুন দায়িত্ব স্বীকার করলেই আর ভাবনা রইল না; সে হুণ্ডী তখন অতি সহজেই বিক্রি বা হস্তান্তর করা চলবে, কারণ তার পিছনে রয়েছে সেই ব্যাঙ্কটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। এরকমের জামীননামা বা স্বীকৃতিপত্র না থাকলে, লণ্ডনে বা অন্যত্র কোনো দূর-দেশের বাজারে অজ্ঞাত-কুলশীল বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সে হুণ্ডীর ক্রেতাই জুটবে না—যে প্রতিষ্ঠানকে কেউ চেনেই না, তার দলিল কিনবে কে? যে ব্যাঙ্ক সে হুণ্ডী স্বীকার করল তাকেও এর দরুন খানিকটা ঝুঁকি নিতে হত; কিন্তু সেটা সে নিত সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে; সেই দেশে তার নিজের যে শাখা আছে তাকে দিয়েই সে খোঁজখবর নিত। এমনি করে এই 'স্বীকৃতি'র ব্যবস্থাটির ফলে হুণ্ডী কেনা-বেচার

কাজ এবং সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোই অনেকটা সহজ হয়ে উঠল; আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরে লণ্ডন-শহরের মুষ্টিবন্ধনও দৃঢ়তর হয়ে চেপে বসল। অন্য কোনো দেশই এই স্বীকৃতির ব্যবসা এতখানি বৃহৎ পরিমাণে চালাতে পারত না, কারণ অন্যান্য দেশে শাখা প্রতিষ্ঠান বলতে এদের প্রায় কারোই কিছু ছিল না।

এইভাবে এক-শো বছরেরও বেশিকাল ধরে টাকাকড়ি আর অর্থনীতির ব্যাপারে লণ্ডনই হয়ে রইল সমস্ত পৃথিবীর রাজধানী; আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং বাণিজ্যের সমস্ত ব্যাপারই চলতে লাগল তার ইঙ্গিতে। লণ্ডনের বাজারে প্রচুর টাকা, তাই অন্য জায়গার তুলনায় সেখানে টাকা মিলতও সস্তাদরে। এই আকর্ষণে পড়ে সমস্ত ব্যাঙ্কওয়ালারা ক্রমে লণ্ডনে গিয়ে জমায়েৎ হল। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে, বাণিজ্য এবং টাকাকড়ির লেনদেন যেখানে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তার সমস্ত সংবাদ এসে হাজির হত ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গভর্নরের কাছে; তাঁর খাতাপত্রের দিকে একবারমাত্র তাকিয়েই তিনি বলে দিতে পারতেন, কোন দেশের আর্থিক অবস্থা কি রকম যাচ্ছে। এমন কি অনেক সময় দেখা যেত, এ সম্বন্ধে তিনি যতটা জানেন, সে দেশের সরকারপক্ষেরও ততখানি জানা নেই। কাজেই যে-সব সিকিউরিটির সঙ্গে অন্য কোনো দেশের সরকারের স্বার্থ জড়িত তারই খানিকটা কেনা বা বেচার ভান বা কারসাজি করে, বা বিশেষ একটা কায়দায় অল্প-মেয়াদী ঋণ দিয়ে বা না দিয়ে, সে বিদেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে এঁরা নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারতেন। এর নাম ছিল উচ্চতর আর্থিক নীতি; সাম্রাজ্যবাদী জাতি যে-সব উপায়ে অন্য দেশের উপরে জুলুম চালায় এইটাই ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থাদের অন্যতম; এখনও এর শক্তি লুপ্ত হয় নি।

বিশ্বযুদ্ধের আগে এই ছিল পৃথিবীর অবস্থা। লণ্ডন শহর ছিল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল এবং প্রতীক। তারপর যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন ঘটল, প্রাচীন ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ল। ব্রিটেন প্রকাণ্ড একটা জয়লাভ করল, কিন্তু লণ্ডনকে এবং ইংলণ্ডকে সে জয়ের দামও দিতে হল অনেকখানি।

যুদ্ধের পরে কী কী হল, সে কথা আমি তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব।

১৮৭

ডলার, পাউণ্ড, টাকা

২৭শে জুলাই, ১৯৩৩

বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীটা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল : যুদ্ধরত দুই পক্ষ গেল দুই পক্ষে, আর তৃতীয় ভাগে রইল নিরপেক্ষ দেশগুলো। যুদ্ধরত দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য বা অন্য কোনো বিষয়েই সম্পর্ক রইল না; রইল শুধু একটিমাত্র গোপন সম্পর্ক, পরস্পরের উপরে গুপ্তচরবৃত্তি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তো স্বভাবতই একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল। ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং মিত্রপক্ষের দেশগুলো তখন সমুদ্র-পথের প্রভু, তাই এরা নিরপেক্ষ দেশগুলোর সঙ্গে আর উপনিবেশদের সঙ্গে খানিকটা ব্যবসা-বাণিজ্য তখনও চালাতে পারছিল; কিন্তু জর্মন সাবমেরিনের উপদ্রবে সে বাণিজ্যেও বিপুল রকম বাধা পড়তে লাগল।

যুদ্ধরত দেশগুলোর যেটুকু সম্পত্তি-সংস্থান ছিল সমস্তই ঢেলে দেওয়া হল যুদ্ধের প্রয়োজনে; অপরিমিত অর্থ এই দিকে ব্যয় হতে লাগল। বছর দেড়েক পর্যন্ত ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তাদের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মিত্রদেশগুলিকে অর্থসাহায্য করে গেল—এর জন্যে এরা দুজনকেই নিজের লোকদের কাছে টাকা ধার করতে হল; আমেরিকার কাছেও বহু টাকা বাকি ফেলতে হল। তারপর ফ্রান্সের টাকা ফুরিয়ে গেল, তখন আর সে অন্যদের সাহায্য করতে পারে না। ইংলণ্ড

এই বোঝা আরও সওয়া-এক বছর ধরে টেনে চলল; তার পর তারও টাকা ফুরিয়ে গেল। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসে তার আমেরিকাকে পাঁচ কোটি পাউণ্ডের একটা দেনা শোধ দেবার কথা ছিল, সে টাকা সে দিতে পারল না। ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং তাদের মিত্রদের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সংকটের মুহূর্তে আমেরিকা এসে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ দিল—আমেরিকা ছাড়া অন্য কারোই তখন কোনো রকম টাকাকড়ির সংস্থান বাকি ছিল না। তখন থেকে যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই মিত্রপক্ষের সকল দেশকে যুদ্ধের দরুন ব্যয়ের সমস্ত টাকা যুগিয়ে এল। 'স্বাধীনতা' ঋণ এবং 'জয়' ঋণ দিয়ে সে নিজের লোকদের কাছ থেকেই বিপুল-পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করল; নিজে দরাজ হাতে টাকা খরচ করল, এবং মিত্রপক্ষকেও টাকা ধার দিল। এর ফল যা হল যে তোমাকে আগেই বলেছি; যুদ্ধ যখন সারা হল তখন দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রই সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসেছে, সব দেশই তার কাছে টাকা ধারে। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ইউরোপের কাছে আমেরিকা-সরকার পাঁচ-শো কোটি ডলার ধারতেন; যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন ইউরোপই উলটে আমেরিকার কাছে হাজার কোটি ডলার ধারছে।

যুদ্ধে আমেরিকার এইটেই একমাত্র আর্থিক লাভ নয়। আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যও অত্যন্ত বেড়ে গেছে, ইংলণ্ড এবং জর্মানির বাণিজ্যকে হঠিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করেছে, তখন আমেরিকার বাণিজ্যের পরিমাণ ব্রিটেনেরই সমান। পৃথিবীতে মোট যা সোনা ছিল তারও দুই-তৃতীয়াংশ গিয়ে জমল আমেরিকার ঘরে। বিদেশী সরকারদের স্টক এবং বণ্ডও প্রচুর পরিমাণ তার হাতে গিয়ে উঠল।

পৃথিবীর টাকার বাজারে তখন যুক্তরাষ্ট্র একজন কর্তাব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু 'আমার দেনা শোধ করে দাও' বলেই তার খাতক দেশদের যে-কোনোটিকে সে তখন দেউলিয়া করে দিতে পারে। অতএব তখন সমস্ত পৃথিবীর টাকাকড়ির বাজারে লণ্ডনকেই প্রভুর পদে দেখে স্বভাবতই তার ঈর্ষা জাগল, সে আসনটা নিজে দখল করবার ইচ্ছা প্রবল হল। তার ইচ্ছা, নিউইয়র্ক তখন পৃথিবীর সব চেয়ে ধন-সমৃদ্ধ শহর, অতএব সে-ই লণ্ডনের জায়গাটা দখল করুক। কাজেই নিউইয়র্ক আর লণ্ডনের ব্যাঙ্কমালিক এবং মহাজনদের মধ্যে বাধল একটা মরণ-পণ সংগ্রাম; এদের পিছনে রইল এই দুই দেশের সরকারপক্ষ।

আমেরিকার চাপে পড়ে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের গোড়া নড়ে গেল। ব্যাঙ্ক্ অব ইংলণ্ড তার টাকার বাবদ সোনা দিয়ে কুলোতে পারল না; পাউণ্ড স্টার্লিঙের (সেটা তখন স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে) দর বদলাতে, পড়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সের টাকা ফ্রাঙ্কেরও দাম কমে গেল। চতুর্দিকে ভাঙনের খেলা, তার মাঝখানে একা আমেরিকার ডলারটাই দাঁড়িয়ে রইল যেন পাহাড়ের মতো দৃঢ় হয়ে।

দেখে মনে হবে, এ অবস্থাতে তো পৃথিবীর সমস্ত টাকাকড়ির কারবার আর সোনা লণ্ডনের বদলে নিউইয়র্কেই গিয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেটা মোটেই হল না; অন্যান্য দেশের যত হুণ্ডী আর খনির যত সোনা, সবই তখনও আগের মতোই লণ্ডনে গিয়ে জুটতে লাগল। এটা হচ্ছিল অবশ্য লোকে ডলারের চেয়ে পাউণ্ড পেতেই বেশি পছন্দ করছিল বলে নয়, ডলার সহজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে।

আমি তোমাকে "স্বীকৃতি" ব্যবস্থার কথা বলেছি; ব্রিটিশ-ব্যাঙ্কগুলো তাদের শাখা এবং প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানদের মারফত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ব্যবসা চালাচ্ছিল। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলোর সেরকম কোনো শাখা বা বিদেশে তেমন প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান নেই; তাই বিদেশী হুণ্ডী "স্বীকার" করে সেগুলো নিজের হস্তগত করবার উপায়ও তার কিছু ছিল না—স্বভাবতই সে হুণ্ডীগুলো ব্রিটিশ-ব্যাঙ্কগুলোর মারফত লণ্ডনে গিয়ে হাজির হচ্ছিল। এই বিপদ দেখে আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলো অবিলম্বে অন্যান্য সব দেশে নিজেদের শাখা আর প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান খুলতে লেগে গেল; বহু স্থানে চমৎকার সব অট্টালিকা তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু আরও একটি মুশকিল ছিল তার। স্থানীয় অবস্থা এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যারা সমস্ত খবর রাখে, এমন এক দল দক্ষ শিক্ষিত লোক না হলে 'স্বীকৃতি'র কাজ চালানো

যায় না। ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলো এক-শো বছর ধরে এই রকমের একটি কর্মী-বাহিনী গড়ে তুলেছে; এদিক দিয়ে রাতারাতি তাদের সমান হয়ে ওঠা সহজ ছিল না।

আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলো তখন ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডের কতকগুলো ব্যাঙ্কের সঙ্গে দল পাকিয়ে লণ্ডনের বিরুদ্ধে লড়তে গেল, কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হল না। ফ্রান্স খুবই ধনী দেশ, প্রচুর পরিমাণ মূলধন সে বাইরে রপ্তানি করে, কিন্তু বিদেশী হুণ্ডী নিয়ে একটা ব্যবসা গড়ে তোলবার দিকে সে কোনো দিনই নজর দেয় নি। এইভাবে নিউইয়র্ক আর লণ্ডনের মধ্যে লড়াই চলতে লাগল, সে লড়াইয়ে মোটের উপরে লণ্ডনের বিশেষ ক্ষতি হল না। ১৯২৪ সনে একটি নূতন ব্যাপার ঘটল। এতে নিউইয়র্কের খুব সুবিধা হয়ে গেল। জর্মনির বিরাট মুদ্রাস্ফীতির অবসান ঘটবার পরে তার মার্কের দর আবার স্থির হয়ে গেল; মুদ্রাস্ফীতির সময়ে জর্মনির যত টাকা দেশ ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ড আর হল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিল (ঝুঁকি বা বিপদের মুহূর্তে মূলধনগুলি সর্বদাই পালিয়ে গিয়ে থাকে!), তা আবার জর্মনির ব্যাঙ্কে ফিরে চলে এল। টাকাকড়ির ব্যাপারে আমেরিকা যে দল পাকিয়েছিল জর্মনিও এসে ভিড়ল তারই সঙ্গে; এবার লণ্ডনকেই মুশকিলে পড়তে হল। কারণ এখন লণ্ডনের সাহায্য না নিয়েই বিরাট পরিমাণ আমেরিকার হুণ্ডীকে ইউরোপের হুণ্ডীতে ভাঙিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। আর লণ্ডনের টাকার তখনও দরের স্থিরতা নেই, অর্থাৎ পাউণ্ডের কোনো নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য নেই; পাউণ্ড তখনও স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত।

লণ্ডন শহরের মহাজনরা এবার ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের ব্যবসায়ে ভালো যেটুকু সবই গিয়ে উঠছে নিউইয়র্কের এবং তার ইউরোপস্থ মিত্রদের ঘরে; লণ্ডনের ভাগ্যে পড়ে থাকছে শুধু খুদ-কুঁড়ো। এই ব্যাপার যদি বন্ধ করতে হয় তবে প্রথমেই পাউণ্ডকে আবার সোনার দরে একটা স্থির মূল্য দিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ তার দরটাকে আবার স্থির করে দিতে হবে। অতএব ১৯২৫ সনে পাউণ্ডকে তার পুরোনো দরেই স্থির করে দেওয়া হল। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-মালিক এবং মহাজনদের পক্ষে সেটা একটা প্রকাণ্ড জিত, কারণ পাউণ্ডের দর বাড়বার মানেই হচ্ছে তাঁদের আয়ও বেড়ে যাওয়া। ইংলণ্ডের শিল্পের পক্ষে এর ফল হল খারাপ, কারণ এতে বিদেশের বাজারে ইংলণ্ডের পণ্যের দর বেড়ে গেল; বিদেশের বাজারে আমেরিকা জর্মনি এবং অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশদের সঙ্গে সমানে প্রতিযোগিতা চালানো ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু ইংলণ্ড বেশ জেনেশুনেই তার শিল্পকে খানিক পরিমাণে বলি দিয়েছিল, তার ব্যাঙ্কের ব্যবসাকে বা বলতে পার পৃথিবীর বাট্টার বাজারে তার যে আর্থিক আধিপত্য ছিল তাকে, টিঁকিয়ে রাখবার প্রয়োজনে। পাউণ্ডের মর্যাদা বেড়ে গেল। কিন্তু এর পরেই আবার ইংলণ্ডে কতকগুলো আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, তার খানিকটা কারণ হচ্ছে শিল্পের এই স্বার্থহানি। এর ফলে বেকার-সমস্যা দেখা দিল, কয়লার খনিতে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মঘট চলল, তার পর সর্বব্যাপী ধর্মঘট হল।

পাউণ্ডের দর বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু খালি তাইতেই কুলোল না। আমেরিকার কাছে ব্রিটিশ-সরকারের একটা প্রকাণ্ড পরিমাণ ঋণ ছিল যেটাকে বলা যায় 'চল্‌তি' দেনা অর্থাৎ আমেরিকা প্রায় যে-কোনো মুহূর্তেই সে টাকা ফেরত চাইতে পারত। সেভাবে টাকা চেয়ে ইংলণ্ডকে সে অত্যন্ত বিপদে ফেলে দিত পারবে, পাউণ্ডের দর আবার নামিয়ে ফেলতে পারবে। অতএব ব্রিটেনের বড়ো বড়ো রাজনীতিধুরন্ধররা (স্বয়ং স্ট্যান্‌লি বল্‌ডুইন পর্যন্ত) নিউইয়র্কে ছুটলেন, যুদ্ধ-ঋণের টাকাটাকে কতকগুলো কিস্তিমাফিক শোধ করলে চলে কিনা (একে বলে কিস্তিবন্দী করা) সে সম্বন্ধে আমেরিকার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। ইউরোপের সমস্ত দেশই আমেরিকার কাছে টাকা ধারত; কাজেই এ'দের পক্ষে উচিত ছিল সকলে মিলে একটা পরামর্শ স্থির করা, এবং তারপর যতটা সম্ভব ভালো শর্ত আদায় করে নেবার জন্য আমেরিকাকে গিয়ে ধরা। কিন্তু পাউণ্ডের দরকে আর টাকাকড়ির বাজারে লণ্ডনের নেতৃত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তখন এমন ভয়ানক উৎকণ্ঠিত যে, ফ্রান্স বা ইতালির সঙ্গে আলোচনা করে নেবার কথা তাঁদের মনেই হল না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এবং যে-কোনো শর্তে আমেরিকার সঙ্গে একটা রফা করে

ফেলবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সে রফা হল, কিন্তু অত্যন্ত বেশি দাম দিয়ে; যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নির্দেশমতো কর্তৃকগুলো অত্যন্ত কঠিন শর্তে এ'রা রাজি হয়ে এলেন। এর পরে ফ্রান্স এবং ইতালিও তাদের দেনা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রফা করল, অনেক বেশি ভালো শর্ত পেয়ে গেল তারা।

এই সমস্ত কঠিন পরিশ্রম এবং ক্ষতি স্বীকারের ফলে পাউন্ড এবং লন্ডন শহর রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত বাজারে নিউইয়র্কের সঙ্গে ইংলন্ডের যে লড়াই চলছিল সেটা চলতেই লাগল। নিউইয়র্কের হাতে অনেক টাকা, সে খুব অল্প সুদে দীর্ঘকালের মেয়াদে টাকা ধার দিতে লাগল; এতদিন যারা লন্ডনের বাজারেই টাকা ধার করে এসেছে এমন অনেক দেশকেই (কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত) নিউইয়র্ক লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেল। টাকা ধার দেবার ব্যাপারে নিউইয়র্কের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য লন্ডনের ছিল না; কাজেই সে তখন মধ্য-ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলোকে অল্পদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিয়ে দেখতে গেল। অল্পদিনের মেয়াদে টাকা ধার দেবার ব্যাপারে ব্যাঙ্কমালিকের অভিজ্ঞতা এবং মর্যাদার দাম অনেক বেশি; তার বেলায় লন্ডনেরই জিত। অতএব লন্ডনের ব্যাঙ্কগুলো ভিয়েনার ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে, এবং তাদের মারফত আবার মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের (দানিয়ুব এবং বলকান-অঞ্চলের) ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করল। এই-সব জায়গাতে নিউইয়র্কও কিছু কিছু কারবার চালাতে লাগল।

টাকার বাজারে সে একটা পাগলা ঘোড়দৌড়ের যুগ। কিছুটা লন্ডন এবং নিউইয়র্কের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলেই, জলের মতো টাকার স্রোত এসে ইউরোপে ঢেলে পড়তে লাগল; আশ্চর্য দ্রুতবেগে অসংখ্য লক্ষপতি এবং কোটিপতি গজিয়ে উঠল। এই কারবার যে ভাবে চলত সে ভারি সহজ। একজন উদ্যোগী করিতকর্মা ব্যক্তি হয়তো এর কোনো দেশে একটা রেলওয়ে বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়বে বলে ইজারা আদায় করত, কিংবা দেশলাই তৈরি এবং বিক্রি করা বা ঐরকম কোনো একটা কাজের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে নিত। সেই ইজারা বা একচেটিয়া ব্যবসায় চালাবার জন্য একটা কোম্পানি গড়া হত; সে কোম্পানি তার স্টক বা শেয়ার বাজারে ছাড়ত। এই স্টক বা শেয়ারকে জামীন রেখে নিউইয়র্ক বা লন্ডনের বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলো এদের আগাম টাকা দিত। এইভাবে মহাজনরা নিউইয়র্কের বাজারে শতকরা দু' টাকা সুদে ডলার ধার করত, তারপর সেই টাকা আবার শতকরা দু' টাকা সুদে বার্লিনে বা শতকরা আট টাকা সুদে ভিয়েনাতে ধারে খাটাত। পরের টাকা নিয়ে এইরকম ওস্তাদী হাতে চালাচালি করে এই-সব মহাজনরা অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন আইভান ক্রুগার; ইনি সুইডেনের লোক, দেশলায়ের কারবারে অনেকগুলো একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক বলে এ'র নামই হয়েছিল 'দেশলায়ের-রাজা'। এক সময়ে ক্রুগারের প্রচণ্ড মানসম্ভ্রম ছিল; কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাঁর সমস্ত ব্যবসাটাই ছিল আগাগোড়া জুয়াচুরি, বিপুল পরিমাণ টাকাও তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। কার্যকলাপ ধরা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল বলে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কার আরও কয়েকজন বিখ্যাত মহাজনকে তাঁদের অসৎ নীতির জন্য বিপদে পড়তে হয়েছে।

মধ্য এবং পূর্ব-ইউরোপে ইংলন্ড আর আমেরিকার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছিল তার একটা ভালো ফল হয়েছে। এদের কাছ থেকে রাশিকৃত টাকা এসে পড়ছিল। ১৯২৯ সনে বাণিজ্য-সংকট শুরু হয়েছে, তার আগের কয়েক বছরে ইউরোপের দেশগুলো আবার নূতন করে গড়ে উঠল, তার অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে এই টাকার জোরে।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনে ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে, ফ্রাঙ্কের দামও অনেক পড়ে গেছে। ফ্রান্সের প্রত্যেক ক্ষুদে বুর্জোয়া পর্যন্ত যা পারে জমায় : ফ্রান্সে যাদের হাতে টাকা ছিল তারা সে টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিল, তাদের ভয়, ফ্রাঙ্কের দর পড়ে যাবার ফলে হয়তো টাকাটাই বরবাদ হয়ে যাবে। অন্যান্য দেশের সিকিউরিটি এবং হুন্ডী প্রচুর পরিমাণে কিনে ফেলল এরা। ১৯২৭ সনে ফ্রাঙ্ককে আবার স্থির করে দেওয়া হল, সোনার দরে

তার একটা দামও বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু সে দামটা দাঁড়াল, আগে তার যে দাম ছিল তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশের সমান। যে ফরাসিদের হাতে বিদেশী সিকিউরিটি ছিল, তারা এবারে সে সিকিউরিটি বদলে ফ্রাঙ্কের-অঙ্কে কিছু একটা কিনে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। চমৎকার একটি দাঁও মেরে নিয়েছে তারা, কারণ গোড়াতে তাদের যে-কটা ফ্রাঙ্ক সম্বল ছিল তারা তার পাঁচগুণ পেয়ে যাবে। অতএব মুদ্রাস্ফীতিতে ক্ষতিও এদের কিছুমাত্র হয় নি—আগাগোড়া ফ্রাঙ্ককেই ধরে বসে থাকলে দারুণ লোকসান সইতে হত। ফরাসি সরকার স্থির করলেন এই ফাঁকে তাঁরাও কিছু লাভ করে নেবেন। এদের হাতে যত বিদেশী হুণ্ডী আর সিকিউরিটি ছিল সমস্ত তাঁরা কিনে নিলেন, বদলে এদের দিলেন ফ্রাঙ্কের অঙ্কে লেখা নূতন ছাপা হুণ্ডী। এইভাবে এই বিদেশী হুণ্ডী আর সিকিউরিটিগুলো হাতে পেয়ে ফরাসি সরকার হঠাৎ অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠলেন; বস্তুত সে সময়ে অত বেশি হুণ্ডী আর কারও হাতেই ছিল না। টাকার বাজারের নেতৃত্ব নিয়ে ইংলণ্ড বা আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই ছিল না, সে সামর্থ্যও ছিল না। কিন্তু দু' পক্ষেরই উপরে খানিকটা প্রভাব ফলাবার মতো অবস্থা তাঁদের তখন হয়েছে।

ফরাসিরা ভারি সাবধানী জাত, তাদের সরকারও তাই। মস্তবড়ো লাভের আশা আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু আছে তাও খোয়াবার ঝুঁকি, এর চেয়ে তারা বরং নিরাপদে থেকে অল্প লাভ করাটাকেই ভালো মনে করে। এক্ষেত্রেও ফরাসি সরকার সাবধানী হল, বাড়তি টাকাটাকে কম সুদেই লণ্ডনের ভালো ভালো ব্যাঙ্ক্‌কে ধার দিতে লাগল। এরা হয়তো ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক্‌কে টাকা দিত শতকরা দু' টাকা সুদে; তারা সে টাকা শতকরা ৫ বা ৬ টাকা সুদে ধার দিত জর্মন ব্যাঙ্ক্‌কে; তারা আবার সেটা ভিয়েনাকে দিত শতকরা ৮ বা ৯ টাকা সুদে; শেষপর্যন্ত টাকাটা হয়তো হাঙ্গেরি বা বল্‌কানে গিয়ে পেঁছত তখন তার সুদ শতকরা ১২ টাকা! অনাদায়ের ঝুঁকি যত বেশি টাকার সুদের হারও ততই বাড়বে; কিন্তু ব্যাঙ্ক্ অব ফ্রান্স কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, তার চেয়ে ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের সঙ্গে নিরাপদে কারবার চালানোই তার বেশি পছন্দ। এইভাবে ফ্রান্স খুব বড়ো পরিমাণ টাকা (অর্থাৎ অন্যান্য দেশের যত স্টার্লিঙের অঙ্কে লেখা হুণ্ডী সে কিনে নিয়েছিল) লণ্ডনে গচ্ছিত রাখল, লণ্ডনেরও এতে নিউয়র্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার অনেকখানি সুবিধা হল।

ইতিমধ্যে বাণিজ্য-মন্দা এবং সংকট ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, কৃষিজাত পণ্যের দরও দিন দিন কমে যাচ্ছিল। ১৯৩০ সনের শরৎকালে গমের দর এত নেমে গেল যে পূর্ব-ইউরোপের ব্যাঙ্ক-গুলো তাদের খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারল না, কাজেই ভিয়েনার বাজারে পাউণ্ডে আর ডলারের অঙ্কে যে টাকা তারা ধার করেছিল সেটাও শোধ করতে পারল না। এর ফলে ভিয়েনাতে একটা ব্যাঙ্ক-সংকট উপস্থিত হল; ভিয়েনার সবচেয়ে বড়ো ব্যাঙ্ক ক্রেডিট-আন্‌স্টাল্ট্, সেটা ফেল হয়ে গেল এবং একেবারেই ভেঙে পড়ল। এর ফলে আবার জর্মনির ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল; মনে হল মার্কেরও মূল্যহ্রাস আসন্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখন মার্কের দর পড়ে গেলে জর্মনিতে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের যত মূলধন খাটছে সেটা বিপন্ন হয়; সেই সম্ভাবনাটাকে এড়াবার জন্যই প্রেসিডেণ্ট হুভার ঘোষণা করলেন, এখন এক বছরের মধ্যে দেনা বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হবে না। সে সময়ে ক্ষতিপূরণের টাকা জোর করে আদায় করতে গেলে জর্মনির আর্থিক ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ত। কার্যকালে দেখা গেল এতেও কুলোচ্ছে না, অন্যান্য দেশের কাছে জর্মনির যে-সব বেসরকারি ঋণ আছে তা পর্যন্ত সে শোধ করতে পারছে না। তখন আবার এই ঋণের দরুনও তাকে একটা পরিশোধ-বিরতির অনুমতি দিয়ে দিতে হল।

এর ফল হল এই : ইংলণ্ডের রাশিকৃত টাকা অল্পকালের মেয়াদে জর্মনিকে ধার দেওয়া হয়েছিল, সে টাকা সেইখানেই আটকা পড়ে গেল, বা যাকে বলে 'জমাট বেঁধে' গেল। লণ্ডনের ব্যাঙ্কওয়ালারা মুশকিলে পড়ল—তাদেরও দেনা আছে, সে দেনা তাদের শোধ করতে হবে; জর্মনি থেকে তাদের পাওনা টাকা পাবে বলেই তারা ভরসা করে ছিল। তখন ফ্রান্স আর আমেরিকা

তাদের সাহায্য করতে এল, তাদের ১৩ কোটি পাউণ্ড ধার দিল এরা। কিন্তু সে সাহায্য যখন মিলল তখন ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। লণ্ডনের মহাজন-মহলে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে; আর এ আতঙ্ক একবার দেখা দিলে তখন সকলেই নিজের টাকা তুলে নিতে চায়। ১৩ কোটি পাউণ্ড দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। মনে রেখো, পাউণ্ড তখন স্বর্ণমানের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে, যার হাতে স্টার্লিং আছে সেই তার বদলে সোনা চাইতে পারত।

ব্রিটিশ সরকার তখন শ্রমিকদলের হাতে। তাঁরা আরও টাকা ধার করতে চাইলেন; বিপন্নমুখে নিউইয়র্ক আর প্যারিসের ব্যাংকওয়ালাদের কাছে প্রার্থনা জানালেন। এঁরাও সাহায্য করতে রাজি হলেন, কিন্তু কয়েকটি শর্তে। তার মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারকে শ্রমিক সম্পর্কিত ব্যয়, সমাজ-সেবা, ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যয়-সংক্ষেপ করতে হবে; বোধহয় কর্মচারীদের বেতন-ছাঁটাইয়ের কথাও এঁরা বলেছিলেন। এটা ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী ব্যাংকওয়ালাদের হস্তক্ষেপ। এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে শ্রমিক মন্ত্রীসভার সমালোচনা করা হতে লাগল। সে মন্ত্রীসভার নেতা এবং প্রধান মন্ত্রী তখন র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড। তিনি মন্ত্রীসভা এবং তাঁর নিজের দল, উভয়কেই পথে বসালেন, প্রধানত রক্ষণপন্থীদলের সাহায্যেই নূতন একটি মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এর নাম দেওয়া হল 'জাতীয় সরকার'—সংকট থেকে দেশকে ত্রাণ করবার জন্যই এর সৃষ্টি। ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিপদের মুখে দলকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার যে কটি অতি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত আছে, র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ডের এই কাজটি তাদেরই অন্যতম।

পাউণ্ডকে বাঁচাবার জন্যই জাতীয় সরকারের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ফ্রান্স এবং আমেরিকার কাছ থেকে তাঁরা প্রতিশ্রুত ঋণের টাকা পেলেন, কিন্তু সে টাকা দিয়েও পাউণ্ডকে বাঁচাতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁরা স্বর্ণমান ছেড়ে দিলেন; পাউণ্ড আবার অনিশ্চিত-মুদ্রায় পরিণত হল। পাউণ্ডের দর দ্রুতবেগে কমতে লাগল, কমে কমে শেষে সোনার দরে মাত্র ১৪ শিলিং-এর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল—তার মানে আগে তার যা দাম ছিল এখন তার দাম হল তার দুই-তৃতীয়াংশের মতো।

এই ব্যাপার দেখে পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, এই তারিখটিকে তারা স্মরণ করে রাখল। ইউরোপের সকলেই একে ধরে নিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আসন্ন অবসানের সূচনা বলে; কারণ এর মানেই হচ্ছে, পৃথিবীর টাকার বাজারে লণ্ডনের যে প্রভুত্ব ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল, কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল এদের এই ভবিষ্যদ্বাণী বা প্রত্যাশা (তার কারণ ইউরোপে বা আমেরিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনা প্রায় কেউই করে না, এশিয়ার কথা তো ছেড়েই দিই) ঠিক ফলে উঠল না।

স্টার্লিঙের কাগজী মুদ্রাকে যে কোনো মুহূর্তে বদলে সোনা বানিয়ে নেওয়া যেত বলে অনেক দেশ সোনা হেন জেনেই সে কাগজীমুদ্রা সঞ্চয় করে রেখেছিল; পাউণ্ডের এই পতনের ফলে তাদের মুদ্রা ব্যবস্থাতেও ভাঙন লেগে গেল। এখন আর স্টার্লিং বদ্‌লে সোনা পাওয়া যাচ্ছে না; স্টার্লিঙের দাম শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেছে; অতএব এই-সব দেশেরও টাকার দাম কমে গেল; ইংলণ্ডের টান সামলাতে না পেরে এরাও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

ফ্রান্সের তখন খুব ভালো অবস্থা; সাবধানতার নীতি অবলম্বন করেছিল সে, তার পুরস্কার মিলেছে। জর্মানিতে আমেরিকার এবং তার চেয়েও বেশি করে ইংলণ্ডের সমস্ত লগ্নী টাকা জমাট বেঁধে বসে আছে, টাকার অভাবে তখন তাদের অবস্থা কাহিল; ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল, ফ্রান্সের হাতে অগাধ টাকা রয়েছে—বিদেশী হুণ্ডী এবং সোনার ফ্রাঙ্ক্ দুই-ই তার সিন্দুক ভর্তি। তখন আমেরিকান সরকার আর ব্রিটিশ-সরকার, দুপক্ষই ফ্রান্সের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল; অন্যজনের বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গে তাকে ভিড়িয়ে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ফ্রান্স অতিরিক্ত সাবধানী দেশ, সে কারও প্রস্তাবেই ধরা পড়তে

রাজি হল না—ভালো রকম একটা দাঁও মেরে নেবার সুযোগ এসেছিল, সে সুযোগ নিজেই নষ্ট করল।

১৯৩১ সনের শেষদিকে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের একটা সাধারণ নির্বাচন হল। এই নির্বাচনে জাতীয় সরকার একটা খুব বড়ো রকম জয়লাভ করলেন—জাতীয় সরকার মানেই আসলে রক্ষণপন্থী দল। শ্রমিক দল একেবারে পাত্তাই পেল না। শ্রমিক সরকার হয়তো তাদের সমস্ত মূলধন বাজেয়াপ্ত করে নেবে, এই-সব গল্প শুনে ব্রিটেনের বুর্জোয়াদের ভয় ধরেছিল; আটলান্টিক নৌবহরের ব্রিটিশ নাবিকরা বেতন-ছাঁটাই নিয়ে দিনকয়েকের মতো বিদ্রোহ করেছিল, সেটা দেখেও বোধ হয় এদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল—দলে দলে এসে এরা রক্ষণপন্থী জাতীয় সরকারের দিকে ভিড়ে গেল।

পাউণ্ডের পতনের পর বিষম সংকট এবং বিপদ দেখা দিল, কিন্তু তখনও আমেরিকা ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এই তিনটি দেশ, মানে এদের ব্যাঙ্কওয়ালারা, পরস্পর মিলে মিশে চলতে পারল না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘুঁটি চালতে লাগল, প্রত্যেকেরই আশা অন্যদের ঘাড় ভেঙে নিজের অবস্থাটা ভালো করে নেবে। টাকার বাজারে নেতৃত্বের জন্য কাড়াকাড়ি মারামারি না করে তারা তখন একত্র হয়েও চলতে পারত, সকলে মিলে একটা আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজার গড়ে তুললে পারত। কিন্তু তা হল না, প্রত্যেকেই এরা নিজের ইচ্ছামতো চলতে লাগল। ব্যাঙ্ক্ অব ইংলণ্ড চেষ্টা করতে লাগল লণ্ডনকে আবার তার সেই হারানো গদিতে কী করে বসিয়ে দেওয়া যায়; তার সে চেষ্টা অনেকখানি সফলও হয়েছে—পাউণ্ড এখনও সোনা থেকে বিচ্যুত, তবুও। এই অদ্ভুত কীর্তি দেখে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষের তাক্ লেগে গেছে।

ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান ছেড়ে দিল, তখন অন্যান্য দেশের সরকারি ব্যাঙ্কগুলোও (এই ব্যাঙ্কগুলোকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক), বদলে সোনা পাবে বলে যত স্টার্লিং-দরের হুণ্ডী তারা হাতে রেখেছিল, তা সমস্ত বেচে দিল। এতদিন এই স্টার্লিং-হুণ্ডীগুলোকে তারা জমিয়ে রেখেছিল, কারণ এই হুণ্ডীর বদলে যে কোনো সময়েই সোনা পাওয়া যেত, কাজেই এগুলোকেই সোনার শামিল বলে গণ্য করা চলত। এখন হঠাৎ এই হুণ্ডী প্রচুর পরিমাণে বেচা হতে লাগল; দেখতে দেখতে পাউণ্ডের দর শতকরা ত্রিশভাগ নেমে গেল। পাউণ্ডের মূল্য এই-ভাবে কমে যাবার ফলে, যে খাতকদের (এদের মধ্যে কয়েকটি দেশের সরকাররা এবং অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানও ছিল) দেনা স্টার্লিং দিয়ে শোধ করতে হবে, তারা সোনা দিয়ে দেনা শোধ করতে লাগল—কারণ এখন সোনা দিলে তারা মূল ঋণের শতকরা ত্রিশভাগ কম দিয়ে পারবে। এর ফলে বহু পরিমাণ সোনা ইংলণ্ডে এসে হাজির হল।

কিন্তু সোনার আসল স্রোতটি ইংলণ্ডে এসে পৌঁছল ভারতবর্ষ আর মিশর থেকে। দরিদ্র এবং অধীন দেশ এরা, এদের জোর করেই ধনী দেশ ইংলণ্ডকে সাহায্য করতে বাধ্য করা হল; ইংলণ্ডের আর্থিক স্বচ্ছলতাকে দৃঢ়তর করবার জন্য এদের লুকিয়ে রাখা বিত্ত সম্পত্তি পর্যন্ত টেনে বার করে আনা হল। এ বিষয়ে এদের মতামতের কোনো দামই ছিল না; স্বয়ং ইংলণ্ডের যেখানে প্রয়োজন, সেখানে এদের ইচ্ছা বা ভালোমন্দ কী, তা নিয়ে কেই-বা মাথা ঘামাচ্ছে।

ভারতবর্ষে আমাদের যে 'টাকা' মুদ্রা আছে তার জীবনকাহিনী দীর্ঘ; ভারতবর্ষের দিক থেকে করুণও। ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষার্থে এর দাম বারবার করে বদলে দেওয়া হয়েছে। মুদ্রানীতির এ-সব তত্ত্ব নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না। একটিমাত্র কথা তোমাকে বলব : মুদ্রানীতির ব্যাপারে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার যে-সব কাণ্ডকারখানা চালিয়েছেন, তার ফলে ভারতবর্ষকে বহু টাকা লোকসান সইতে হয়েছে। তারপর ১৯২৭ সনে ভারতবর্ষে একটি তুমুল মতভেদের সৃষ্টি হল, পাউণ্ড এবং সোনার দরে (পাউণ্ড তখন স্বর্ণমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত) টাকার দাম কত বলে ধার্য করে দেওয়া হবে, তাই নিয়ে। এর নাম দিল 'অনুপাত বিতণ্ডা'। সরকার টাকার দাম বেঁধে দিতে চাইলেন এক-শিলিং ছয় পেনি বলে; ভারতবাসীরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বললেন এর দাম এক শিলিং চার পেনি বলে বেঁধে দেওয়া হোক। এ সেই অতি পুরোনো প্রশ্ন; টাকার দর বাড়িয়ে দিলে ব্যাঙ্কওয়ালা

উত্তমর্ণ এবং টাকাওয়ালাদের সুবিধা হয়, বিদেশ থেকে পণ্য আমদানিও বেড়ে যায়। আর টাকার দাম কমিয়ে দিলে খাতকদের বোঝা কমে, দেশের নিজস্ব শিল্প এবং রপ্তানি-ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ভারতবাসীদের এই মতপ্রকাশ সত্ত্বেও অবশ্য সরকারের জিদই বজায় রইল, টাকার স্বর্ণমূল্য এক শিলিং ছয় পেনি বলেই স্থির করে দেওয়া হল। অনেকের মতে এতে একটুখানি মুদ্রা-সঙ্কোচন করা হল, টাকার দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ডই মুদ্রা-সংকোচনের নীতি অবলম্বন করেছিল, ১৯২৫ সনে যখন সে পাউণ্ডকে স্বর্ণমানে ফিরিয়ে আনল তখন। আমরা দেখেছি, সেটা সে করেছিল পৃথিবীর টাকার বাজারে তার নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার গরজে—তার জন্য অনেক ক্ষতিই স্বীকার করতে সে রাজি ছিল। ফ্রান্স জর্মানি এবং অন্যান্য দেশগুলো কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোই সমীচীন মনে করেছিল, কারণ তার ফলেই তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে।

টাকার দাম এইভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের যত মূলধন খাটছিল তারও মূল্য বেড়ে গেল। ভারতীয় পণ্যের দাম ঈষৎ একটু বেড়ে গেল, অতএব ভারতীয় শিল্পের এতে অসুবিধা বাড়ল। সবচেয়ে বড়ো কথা, যত কৃষক এবং ভূস্বামী বানিয়ার কাছে টাকা ধারত তাদের সকলেরই ঋণের বোঝা কিছু বাড়ল। কারণ টাকার দাম বেড়ে যাবার সংগে সংগেই সে ঋণেরও দাম বেড়ে গেল। টাকার দাম ষোলো পেনি থেকে বেড়ে হয়েছিল আঠারো পেনি, মানে দু পেনি বেশি। তার অর্থ হচ্ছে শতকরা ১২½ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি। ভারতের কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ যদি ১০০০ কোটি টাকা বলে ধরো, তবে তার উপরে শতকরা আরও ১২½ ভাগ বাড়ার অর্থ হচ্ছে এদের ঋণ আরও ১২৫ কোটি টাকা বেড়ে যাওয়া—সেটা উড়িয়ে দেবার কথা নয়!

টাকার অঙ্কে অবশ্য ঋণের পরিমাণটা যেমন, তেমনই রইল। কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের মূল্যের হিসাবে তার পরিমাণ বেড়ে গেল। টাকার প্রকৃত মূল্য হচ্ছে সে টাকা দিয়ে যা কেনা যায় তাই—এতখানি গম বা কাপড়চোপড়, বা অন্য কোনো জিনিস বা পণ্য। বিনা বাধায় চলতে দিলে এই মূল্যের সামঞ্জস্যবিধান আপনা হতেই হয়। টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে তার ফলে মুদ্রার মূল্যও কমে যাবে। কৃত্রিম উপায়ে টাকার একটা উচ্চতর মূল্য বেঁধে দেওয়ার মানে হচ্ছে একে এমন একটা কৃত্রিম ক্রয়-ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া যা এর আসলে নেই। অতএব কৃষকরা দেখল, তার আয়ের একটা বৃহত্তর অংশ এখন চলে যাচ্ছে তার দেনা এবং সে দেনার সুদ মিটিয়ে দিতে; তার হাতে বাকি থাকছে আগের চেয়ে কম। এমনি করে টাকার ১:৬ দর ভারতবর্ষে আর্থিক সংকটের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলল।

১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পাউণ্ড স্টার্লিং সোনা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল, সেই সংগে সংগে টাকা সোনা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল—কিন্তু তখনও একে পাউণ্ডের সংগে বেঁধে রাখা হল। ১ : ৬ দর তখনও টিকে রইল; কিন্তু তখন তার মানে হল আগের চেয়ে কিছু কম-পরিমাণ সোনা। টাকা স্টার্লিঙের সংগেই বেঁধে রাখা হল, যেন ভারতবর্ষস্থিত ব্রিটিশ মূলধনের কোনো হানি না হয়; কারণ টাকা যদি তখন যেমন খুশি চলতে দেওয়া হয় তবে হয়তো তার দাম আরও বেশি কমে যাবে, স্টার্লিং-মূলধনের লোকসান ঘটাবে। আসলে ব্যাপার যা দাঁড়াল তাতে লোকসান হল শুধু আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি যে-সব অ-ব্রিটিশ বিদেশীদের মূলধন ভারতবর্ষে খাটছিল তার, কারণ সে মূলধনেরও স্বর্ণমূল্য কমে গেল। টাকাকে পাউণ্ডের সংগে বেঁধে রেখে ব্রিটেনের আরও একটা বড়ো লাভ হল এই, এর ফলে তার শিল্প-গুলির জন্য যত কাঁচা মাল সে এদেশ থেকে কিনে নিচ্ছিল তার দাম সে ব্রিটিশ মুদ্রা দিয়েই মিটিয়ে দিতে পারল। যত বৃহত্তর এলাকা নিয়ে স্টার্লিং চলতি থাকবে, পাউণ্ড ব্যবহারের পক্ষেও ততই সুবিধা।

পাউণ্ডের সংগে সংগে টাকার দাম কমে গেল; তার ফলে দেশের মধ্যে সোনার দরও স্বভাবতই বেড়ে গেল, মানে সোনা বেচে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া যেতে লাগল। দেশের মধ্য তখন প্রচণ্ড টানাটানি আর অভাবের রাজত্ব, কাজেই লোকের অলংকার ইত্যাদি যলে

যার যেটুকু সোনা হাতে ছিল, সমস্ত তারা বেচে ফেলল—সোনার বদলে তারা বেশি করে টাকা পাবে, সেই টাকায় দেনা শোধ দিতে পারবে। অতএব দেশের সমস্ত কোণখুঁজি থেকে সরু সরু ধারায় সোনা এসে ব্যাঙ্কগুলোর হাতে পৌঁছতে লাগল; ব্যাঙ্কগুলো সে সোনা লণ্ডনের বাজারে বিক্রি করে দু' পয়সা লাভ করে নিল। এমনি করে ভারতবর্ষের সোনা ক্রমাগত ইংলণ্ডের দিকে বয়ে চলল, এই ব্যাপার এখনও চলছে। এই সোনা, এবং মিশর থেকেও ঠিক এইভাবেই যে সোনা ইংলণ্ডে চলে যাচ্ছে,—এর জোরেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এবং ব্রিটেনের আর্থিক-ব্যবস্থার মুখ রক্ষা হয়েছে। ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা আর ফ্রান্সের কাছ থেকে যে টাকা ইংলণ্ড ধার করেছিল, এই সোনার দৌলতেই সে-ধার সে শোধ করেছে।

এটা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ, এমনকি সবচেয়ে ধনী দেশগুলি পর্যন্ত, এখন নিজের হাতে যে সোনাটুকু আছে তাকে আটকে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নিতে চাইছে, অথচ ভারতবর্ষ করছে ঠিক তার উলটোটি। আমেরিকান এবং ফরাসি সরকার তাঁদের ব্যাঙ্কের সিন্দুকে বিপুল পরিমাণ সোনার স্তূপ জমিয়ে ফেলেছেন। খনি থেকে সোনাকে মাটি খুঁড়ে বার করে আনা, এবং তারপর আবার মাটির তলাতেই ব্যাঙ্কের গুদামে তাকে খুব গভীর করে পুঁতে রাখা—এ এক আশ্চর্য খেলা খেলছে এরা। অনেক দেশ তো—ব্রিটিশের ডোমিনিয়নগুলো তার মধ্যে—সোনার উপরে বিদেশ-যাত্রা-নিষেধের আদেশই জারি করে দিয়েছে, মানে দেশ থেকে কাউকেই সোনা বাইরে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। ইংলণ্ড তার সোনা আটকে রাখবার জন্যই স্বর্ণমান ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তার কিছুই হচ্ছে না, কারণ ভারতবর্ষের আর্থিক নীতিটি চলে ইংলণ্ডের প্রয়োজন অনুসারে।

ভারতবর্ষের লোকেরা সোনা আর রুপো জমিয়ে রাখে এ অভিযোগ অনেক সময়েই শোনা যায়। এদেশে যে অল্প দু'চারজন বড়োলোক আছে তাদের সম্বন্ধে কথাটা কিছু পরিমাণে সত্যও। কিন্তু এদেশের সাধারণ প্রজা এত বেশি গরিব যে তাদের পক্ষে কিছু জমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। একটু যারা অবস্থাপন্ন কৃষক তাদের সামান্য দু'চার খানা গহনা থাকে, সেইটেই তাদের 'সঞ্চিত ধনরাশি'। ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার কোনো সুযোগই তাদের নেই। সংকটের ফলে এবং সোনার দাম বাড়বার ফলে এদের এই খুচরো গহনাপত্র এবং ভারতবর্ষে যেটুকু সোনা সঞ্চিত ছিল, সমস্তই দেশ থেকে চলে গেছে। দেশে যদি আমাদের জাতীয় সরকার থাকত, তবে দেশের এই সোনাকে সে অসময়ের সম্বল বলে দেশেই আট্‌কে রেখে দিত, কারণ সোনাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক লেনদেনের একমাত্র সর্বজনস্বীকৃত মাধ্যম।

পাউণ্ড আর ডলারের মধ্যে লড়াইয়ের কথা বলছিলাম। এই-সব কার্যক্রমের দ্বারা এবং আরও নানা রকম চাতুরী খেলিয়ে—(এখানে তার বিশদ বর্ণনা দেবার দরকার নেই) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তার আসন অত্যন্ত দৃঢ় করে নিল। ১৯৩২ সনে তার কপাল একবার খুলে গেল, জর্মনিতে আমেরিকারও অনেক টাকা জমাট বেঁধে যাবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একটা ব্যাঙ্ক-সংকট দেখা দিল। এই সংকটের সময়ে আমেরিকার বহু লোক ডলার বিক্রি করে বহু স্টার্লিং কিনল। অতএব ব্রিটিশ সরকার ডলারের অঙ্কে লেখা বহু বিদেশী হুণ্ডী হাতে পেয়ে গেলেন: তারপর নিউইয়র্কের সরকারি ব্যাঙ্কে সেইগুলো দাখিল করে দিয়ে তার বদলে সোনা বার করে নিলেন। ডলার তখনও স্বর্ণমান বজায় রেখেছে, যে কোনো লোকই ডলারের বাবদ সোনা চাইতে পারত। এই ভাবে ব্রিটেনের সোনার ভাণ্ডার আবার বেড়ে উঠল; কোনো বাধাবিঘ্ন পড়ল না, পাউণ্ডের দরও আর কমল না। পাউণ্ড তখনও স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত, তার দরও তখনও অনিশ্চিত। লণ্ডন শহরের হাতে তখন বিদেশী হুণ্ডী এবং সিকিউরিটিও অনেক জমে গেছে; আবার সে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের প্রধান কেন্দ্রীয় বাজার হয়ে উঠল। নিউ ইয়র্ক তখনকার মতো হেরে গেল : তার পরাজয়ের একটা বড়ো কারণ ছিল তার বিরাট ব্যাঙ্ক-সংকট—সে সংকটে হাজার হাজার ছোট ব্যাঙ্ক একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এর কথা তোমাকে আগের একটি চিঠিতেই বলেছি।

১৪৮

ধনিকতন্ত্রী দেশগুলির অনৈক্য

২৮শে জুলাই, ১৯৩৩

মহাজনীর ক্ষেত্রে রেষারেষি আর কূট-চালের কী দীর্ঘ কাহিনীই না তোমাকে শোনালাম— শুনে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হও নি! আন্তর্জাতিক কূটচক্রান্তের এটা একটা জটিল জালবিস্তার— সে জালের মর্মভেদ করা বা তার পাকে একবার জড়িয়ে গেলে আবার তার ফাঁস গলে বাইরে বেরিয়ে আসা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। আমি শুধু তোমাকে বাইরের দৃষ্টিতে এর যেটুকু দেখা যায় তারই একটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছি; আসলে যত কাণ্ড ঘটে তার অনেকখানিই কোনোদিন বাইরে প্রকাশ পায় না, মানুষের চোখে পড়ে না।

আধুনিক জগতে ব্যাঙ্ক-মালিক এবং মহাজনদের ক্ষমতা অপরিসীম। শিল্প-সম্রাটদের প্রভুত্বের যুগও চলে গেছে; বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক-মালিকরাই এখন শিল্প, কৃষি, রেলওয়ে, যানবাহন, এককথায় সমস্ত কিছুকেই খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করছে—দেশের শাসনব্যাপারকে পর্যন্ত। তার কারণ, শিল্প এবং বাণিজ্যের যত উন্নতি ঘটেছে, ততই তাদের আরও বেশী বেশী টাকার দরকার হয়েছে। সে টাকা তাদের যুগিয়েছে ব্যাঙ্কগুলো। পৃথিবীর কাজকর্মের অনেকখানিই এখন চলছে ঋণের জোরে, সে ঋণকে বাড়ায় কমায় এবং নিয়ন্ত্রিত করে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলোই। শিল্প-পতি এবং কৃষক, দু'জনেরই কাজ চালাবার জন্য ধার দরকার, সে ধারের জন্য তাদের ব্যাঙ্কের কাছে যেতে হয়। টাকা ধার দেওয়ার এই ব্যবসাটা ব্যাঙ্কের কাছে যে শুধু একটা লাভজনক ব্যাপার তাই নয়, শিল্প এবং কৃষির উপরে তাদের প্রভুত্বও এরই দরুন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সংকটের মুহূর্তে টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে বা টাকা ফেরৎ চেয়ে এরা খাতকের ব্যবসাটাকেই তছনছ করে দিতে পারে, বা তাকে যে-কোনো রকম শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, উভয়ত্রই এই কথাটা সত্য; কারণ বড়ো বড়ো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-গুলো অন্যান্য দেশের সরকারদের টাকা ধার দেয়, এবং সেই টাকার দরুন তাদের হাতের মুঠোয় পুরে রাখে। নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কওয়ালারা এইভাবে মধ্য এবং দক্ষিণ-আমেরিকার অনেকগুলো সরকারকে নিজেদের হুকুমে চালাচ্ছে।

এই বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলোর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই : সুসময় এবং দুঃসময়, দুই সময়েই এদের লাভের সুবিধা। সুসময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বত্রই একটা সমৃদ্ধি দেখা দেয়, এরাও তার অংশ পায়; এদের হাতে হুড়হুড় করে টাকা আসতে থাকে, এবং সে টাকা এরা বেশ লাভজনক হারেই আবার ধার দিতে থাকে। দুঃসময়ে, মন্দা আর সংকট যখন আসে, এরা টাকাটাকে এঁটে পুঁটুলি বেঁধে বসে থাকে, বাজারে ছেড়ে ঘোরাবার ঝুঁকি নেয় না (এবং এইভাবে মন্দাটাকে বাড়িয়ে তোলে, কারণ ধার না পেলে অনেক ব্যবসাই চালানো কঠিন); কিন্তু তখনও আর-এক দিক দিয়ে এদের লাভ হয়। জমি, কারখানা ইত্যাদি সব জিনিসেরই দাম তখন পড়ে যায়, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানও দেউলিয়া হয়ে যায়। ব্যাঙ্ক তখন এসে এগুলোকে সস্তা দরে কিনে নেয়। অতএব এইভাবে ব্যবসার বাজারে একবার সমৃদ্ধি আর একবার মন্দার চক্রাবর্ত চললেই ব্যাঙ্কগুলোর লাভ।

এবারকার এই প্রচণ্ড মন্দার বাজারেও বড়ো ব্যাঙ্কগুলো সমানেই লাভ করে যাচ্ছে, বেশ ভালো হারে লভ্যাংশ দিচ্ছে। একথা ঠিক, যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ব্যাঙ্ক ফেলও হয়ে গেছে, অস্ট্রিয়া এবং জর্মনিতেও কয়েকটা বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। আমেরিকাতে যে ব্যাঙ্কগুলো ফেল হয়েছে তারা সবই খুব ছোটো ছোটো ব্যাঙ্ক; আমেরিকাতে ব্যাঙ্কের ব্যবসাটা যে নিয়মে চলে সেইটাই ভুল বলে মনে হয়। কিন্তু তা হলেও নিউইয়র্কের বড়ো ব্যাঙ্কগুলো বেশ ভালো লাভই করে নিয়েছে। ইংলণ্ডে কোনো ব্যাঙ্ক ফেল হয় নি।

সুতরাং এখনকার এই ধনিকতন্ত্রী জগতে ব্যাঙ্কওয়ালারাই হচ্ছে সত্যকার বড়োকর্তা; আমাদের যুগটাকে অনেকে নাম দিয়েছেন 'মহাজনীর যুগ', বিশুদ্ধ শিল্প-যুগের পরেই এর আবির্ভাব। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যত্রতত্র লক্ষপতি আর কোটিপতিরা গজিয়ে উঠছে, বিশেষ করে আমেরিকায়—তার তো নামই হয়ে গেছে লক্ষপতির দেশ। লোকের মুখে এদের স্তবস্তুতিরও অভাব নেই। কিন্তু একথাটাও দিন দিনই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে 'উচ্চাঙ্গ-মহাজনীর' রীতিনীতিগুলো খুবই অসাধু পথে চলে থাকে; সাধারণত যাকে আমরা ডাকাতি জুয়াচুরি ইত্যাদি বলি, তার সঙ্গে এর একমাত্র তফাত : এটা অনেক বৃহত্তর ব্যাপার। বড়ো বড়ো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্ত ছোটো ছোটো কারবারকে ভেঙে চূর্ণ করে দিচ্ছে; মহাজনদের বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানার প্যাঁচে পড়ে, সরল-বিশ্বাসী নিরীহ লোক যারা টাকা খাটাতে আসে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়—এই-সব প্যাঁচের মানেই প্রায় কেউ বুঝে উঠতে পারে না। ইউরোপ এবং আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো মহাজনদের মধ্যে কয়েকজনের স্বরূপ সম্প্রতি প্রকাশ হয়ে গেছে, যা সব কাণ্ড জানাজানি হয়েছে সে একেবারে জঘন্য।

টাকার বাজারে নেতৃত্ব নিয়ে ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে লড়াই চলছিল; সে-লড়াইয়ে তখনকার মতো লণ্ডনের জয় হল। কিন্তু সে জয়ের ফল হল কী? বারো বছর ধরে এই সংগ্রাম চলেছে, যে ফলের প্রত্যাশায় এই লড়াই, সেটা ইতিমধ্যে ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়েছে তখন, টাকার বাজারে নেতৃত্ব যে লাভের আশায়, তার অঙ্কও সেই সঙ্গে সঙ্গে কমে যাচ্ছে। বিল অব এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডী আর আগের মতো প্রচুর নেই, ওদিকে সব রকম সিকিউরিটিরও দাম যাচ্ছে কমে; নূতন শেয়ার এবং সিকিউরিটি প্রায় বারই হচ্ছে না। অথচ তখনও বিরাট বিরাট সরকারি ও বেসরকারি ঋণের দরুণ যে সুদ সর্বত্র সবাইকে দিতে হচ্ছিল তার পরিমাণ একই রয়ে গেছে। এই সুদ নিয়মিত দিয়ে যাওয়া খাতক দেশদের পক্ষে ক্রমেই অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক লেন-দেন যা দিয়ে মেটানো যেতে পারে এমন আর কোনো জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব সোনার চাহিদা বেড়ে গেল। কিন্তু সোনাও তখন দরিদ্র দেশগুলো থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে উঠছে ধনী দেশগুলোতে, যাদের মুদ্রার মূল্য তখনও স্থির রয়েছে।

কিন্তু এত সোনা এত ধনসম্পত্তি, শিল্পের এত আধুনিকতম রীতি-নীতি সত্ত্বেও আমেরিকা রেহাই পেল না, মন্দার ধাক্কা তাকেও বিপর্যস্ত করে দিল। ভাগ্যলক্ষ্মীর দেশ আমেরিকা—তার আকর্ষণে বহু দূর দূর দেশ থেকে অজস্র পুরুষ আর নারী চিরদিন সেখানে এসে জুটেছে—সেই আমেরিকারও সর্বত্র ছেয়ে গেল গভীর নৈরাশ্যে। বড়ো বড়ো
চিরদিন দেশটাকে শাসন করে এসেছে, এখন দেখা গেল এদের কার্যকলাপ আগাগোড়াই
ভরা। টাকার বাজারে এবং শিল্পের বাজারে যারা নেতৃস্থানীয়, তাদের উপরে লোকের আর আস্থা রইল না। প্রেসিডেণ্ট হুভার বড়ো ব্যবসায়ীদের দিক টেনে চলতেন, অতএব আমেরিকার জনসাধারণ তাঁর উপরে দারুণ চটে গেল। ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন হল, হুভারকে হারিয়ে দিয়ে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলেন।

১৯৩৩ সনের মার্চমাসের গোড়ার দিকে আমেরিকায় আবার একটি ব্যাঙ্ক-সঙ্কট ঘটল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে হল, ডলারের দামও কমে গেল। অথচ আমেরিকার হাতে তখনও যত সোনা মজুত এমন আর কোনো দেশেরই নেই। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল—শিল্প আর কৃষির উপরে ঋণের যে চাপ পড়ছে তার খানিকটা লাঘব করা, খাতককে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা—ব্যাঙ্ক আর উত্তমর্ণদের তাতে ক্ষতি হবে, তা হোক। ভারতবর্ষে সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকার যা করেছিলেন, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

নানাবিধ সমস্যার চাপে ধনিকতন্ত্রী দেশগুলো ভেঙে চূর্ণ হবার উপক্রম ঘটেছে; সকলে একত্র হয়ে সে-সমস্যার কোনো সমাধান করা যায় কি না, এই আশায় ১৯৩৩ সনের জুন মাসে তাদের একত্র করবার আর-একবার চেষ্টা করা হল। লণ্ডনে 'বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলন' বসল,

বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা 'সংকট-দীর্ণ পৃথিবী'র নাম নিয়ে অনেক কথা বললেন; "এই সম্মেলন যদি ব্যর্থ হয় তবে সমগ্র ধনিকতন্ত্রী জগৎটাই ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে" ইত্যাদি রকমের বহু সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু এত বিপদ এত সাবধানবাণী সত্ত্বেও 'বৃহৎ শক্তিরা' পরস্পরের সংগে হাত মেলাতে পারলেন না, যে যার নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন। ফলে সম্মেলন ভেঙে গেল; প্রত্যেক দেশ নিজের নিজের স্বার্থে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পথ ধরে চলবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

ইংলন্ডের পক্ষে স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশ হয়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। তার যত খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন তা সে উৎপন্ন করতে পারে না, তার শিল্পগুলির জন্যে যত কাঁচামাল দরকার তাও আসে বিদেশ থেকে। অতএব ব্রিটিশ সরকারের এবার চেষ্টা হল—গোটা সাম্রাজ্যটাকে নিয়েই একটা 'অর্থনৈতিক স্বদেশী-নীতি' গড়ে তুলবেন; সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা একত্রে হবে একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল, তার সর্বত্র প্রচলিত থাকবে একই স্টার্লিং মুদ্রার দর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩২ সনে অটাওয়াতে একটি 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলন' ডাকা হল। কিন্তু সেখানেও বিরোধের সৃষ্টি হল; দেখা গেল ইংলন্ডের লাভের খাতিরে নিজেদের কোনো রকম ক্ষতি স্বীকার করে নিতে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ-আফ্রিকা রাজি নয়। ইংলন্ডকেই বরং এদের সমস্ত দাবি-দাওয়া স্বীকার করে নিতে হল। ভারতবর্ষ অবশ্য সরকারি চাপে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল, আমদানী-শুল্কের ব্যাপারে অন্য দেশের মালের তুলনায় সে ব্রিটিশ মালকে কিছু খাতির দেখাবে; যদিও দেশের জনসাধারণ এতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। পরবর্তী কালে বহু ঘটনা থেকেই বোঝা গেছে, অটাওয়া-চুক্তি বিশেষ কার্যকরী হয় নি; এই চুক্তি নিয়ে ইংলন্ড এবং বিভিন্ন ডমিনিয়নের মধ্যে, ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে, বহু সংঘাতই ঘটে গেছে।

এরই মধ্যে আবার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পপ্রচেষ্টা আর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নূতনতর এক বিভীষিকার আবির্ভাব হল। শস্তা জাপানি পণ্যের প্লাবনে সমস্ত বাজার ডুবে গেল; সে পণ্য এমন ভয়ানক শস্তা যে আমদানী-শুল্কের প্রাচীর তুলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। জাপানি মাল এত শস্তা হবার কারণ ছিল অনেক। ইয়েনের দর তখন পড়ে গেছে, জাপানে শিল্প-কারখানায় যে মেয়ে-শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের বেতনের হারও অত্যন্ত অল্প। তাছাড়া জাপান সরকার জাপানের শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য করছেন, জাপানি জাহাজ কোম্পানীরা অত্যন্ত অল্প ভাড়া নিয়ে জাপানি পণ্য বাইরে বয়ে দিচ্ছে। শিল্প-ব্যাপারে জাপানিদের দক্ষতাও তখন অসামান্য হয়ে উঠেছে, ব্রিটেনের প্রাচীন শিল্প-কারখানাগুলোও অনেকেই তাদের সংগে পাল্লা দিতে পারছে না।

আমদানী-শুল্ক বসিয়ে জাপানি পণ্যকে ঠেকানো গেল না; অতএব তখন দেশের বাজারে সে পণ্যের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হল, কোথাও বা তার আমদানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল, মাত্র সেই নির্দিষ্ট-পরিমাণ পণ্যই বাজারে আসতে দেওয়া হবে। কিন্তু, অন্যান্য দেশের বাজার থেকে যদি জাপানি পণ্যকে এইভাবে বাইরে ঠেকিয়ে রাখা হয়, তাহলে জাপানের এই-যে বিরাট শিল্প-কারখানাগুলো, তাদের গতি কী হবে? এর ফলে জাপানের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ওলটপালট হয়ে যাবার সম্ভাবনা; আর এর থেকে অব্যাহতি পেতে গেলেই তাকেও অর্থনীতির বাজারে পাল্টা-মার দেবার পথ খুঁজতে হবে, হয়তো-বা যুদ্ধই বেধে যাবে তার ফলে। ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থায় যে বিরাট রেষারেষি আর অপচয়ের খেলা চলছে, এই হচ্ছে তার অপরিহার্য পরিণাম।

ঠিক তেমনই আবার, ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেসব পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে তাকে যদি ব্রিটেনের বাজারে ঢুকতে না দেওয়া হয়, তার ফলে এই দেশগুলির মধ্যে অনেকের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, নিজের আপাত স্বার্থের খাতিরে একটা দেশ যেসব কাণ্ড করতে থাকে, তার প্রত্যেকটার ফলেই অন্য দেশের উপরে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপরে আঘাত পড়ে, তার ফল হয় দেশে দেশে সংঘাত এবং সংগ্রাম।

স্পেনে বিপ্লব

২৯শে জুলাই, ১৯৩৩

বাণিজ্য-মন্দা আর শিল্পসংকটের এই দীর্ঘ ও অবসাদ-পূর্ণ কাহিনী আর নয়। এবার তোমাকে সাম্প্রতিক জগতের দুটি বড়ো ঘটনার কথা বলব। এর একটি হচ্ছে স্পেনে বিপ্লব; অন্যটি জর্মনিতে নাৎসীদের জয়যাত্রা।

স্পেন আর পর্তুগাল, ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়ে এদের স্থান। ইউরোপের এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এরা এককালে বড়ো রকমেরই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে কাহিনীও তোমাকে বলেছি। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার অভিযান চালিয়ে চালিয়েই এরা সমস্ত শক্তি-সম্বল নিঃশেষ করে ফেলল; পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য দেশ যখন শিল্প ও অন্যান্য ব্যাপারে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, এরা পড়ে রইল বহু পিছনে, সেখানে তখনও পুরোহিতদের অখণ্ড প্রতাপ। জাতীয়তাবাদী স্পেনের শৌর্যের কাছে নেপোলিয়নকেও হার মানতে হয়েছিল, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ফলে যেসব নূতন ভাবধারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, স্পেন তাকে আয়ত্ত করে নিতে পারল না। ফ্রান্স সামন্তপ্রথাকে তুলে দিল, ভূমি-স্বত্বের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলল; স্পেন কিন্তু তখনও অর্ধ-সামন্তনীতিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল—সেখানে অভিজাতরা তখনও বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক, সর্বপ্রকারের বিশেষ ক্ষমতা তখনও তাঁরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করছে। স্পেনে তখন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য—শুধু ধর্ম নয়, জমি, বাণিজ্য, শিক্ষা, সকল ব্যাপারেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা প্রভুত্ব করছে। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানরাই স্পেনে সবচেয়ে বড়ো ভূস্বামী, প্রচুর পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্যও তার হাতে। শিক্ষার ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণরূপেই চলছে তার নিয়ন্ত্রণে।

সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী যাঁরা, তাঁরা ছিলেন নিজেরাই একটা পৃথক জাতির মতো—বহু রকমের বিশেষ অধিকার তাঁদের। অন্যান্য স্তরের সৈনিকের অনুপাতে এঁদের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত বেশি, বাহিনীর প্রতি সাতজনে একজনই হচ্ছেন 'উচ্চপদস্থ' সেনানী। বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে প্রগতিপন্থী, উদার-মতাবলম্বী লোকও অবশ্য ছিলেন; শ্রমিক আন্দোলনও একটা অল্পে অল্পে গড়ে উঠছিল—তার মধ্যে আবার সিন্ডিকালিস্ট, সোশ্যালিস্ট, অ্যানার্কিস্ট ইত্যাদি করে নানা ভাগ। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যা, সবখানিই ছিল ধর্মযাজক, সেনানী আর অভিজাতদের হাতে। উত্তর অঞ্চলে, ক্যাটালোনিয়া আর বাস্ক্-প্রদেশে জোর আন্দোলন চলছিল, তার লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।

স্পেন আর পর্তুগাল, দুই দেশেরই শাসন-ব্যবস্থা ছিল অল্পবিস্তর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র; তার সঙ্গে একটা অতি ক্ষীণ-শক্তি পার্লামেন্টের লেজুড় জোড়া। স্পেনে এই সংসদের নাম ছিল 'কর্‌টেস'। ১৮৭০ সনের ঠিক পরে, অতি অল্পকালের জন্য স্পেনে একটি প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু সে প্রজাতন্ত্র টিকল না, রাজা তাঁর সমস্ত অধিকার ও স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতাসুদ্ধ আবার সিংহাসনে এসে চেপে বসলেন। ১৮৯৮ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ হল; তার ফলে স্পেনের যা কয়েকটা উপনিবেশ এতদিন টিকে ছিল তাও প্রায় সবই হাতছাড়া হয়ে গেল। উপনিবেশ বলতে তার বাকি রইল শুধু মরক্কোর খানিকটা অংশ, স্পেনের সঙ্গেই সেটা সংলগ্ন।

পর্তুগালের এখনও আফ্রিকাতে বড়ো বড়ো উপনিবেশ রয়েছে, ভারতবর্ষেও গোয়া প্রভৃতি ছিটেফোটা আছে। ১৯১০ সনে পর্তুগালের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার পর থেকে এপর্যন্ত বহু বিদ্রোহ সেখানে দেখা দিয়েছে—কখনও রাজতন্ত্রীরা রাজাকে আবার সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছে, কখনও-বা বামপন্থীরা স্বৈরতন্ত্রী শাসককে (Dictator) ও প্রগতিবিরোধী শাসকমণ্ডলীকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। তবু সমস্ত হাঙ্গামার মধ্যেও এই প্রজাতন্ত্রী

রূপটি কোনো-না-কোনো আকারে টিকে রয়েছে; সাধারণত একটা সামরিক দলেরই প্রাধান্য এখানে চলেছে। মহাযুদ্ধে পর্তুগাল মিত্রপক্ষের দলে যোগ দিল; যুদ্ধ যখন শেষ হল, দেখা গেল সে এমনই ঋণে ডুবে গেছে যে দেউলে হতে তার আর বেশি বাকি নেই। পর্তুগালের বর্তমান সরকার অত্যন্ত-রকম প্রগতিবিরোধী ও ফ্যাসিস্ট-ব্রতী। গোয়াতে সকল রকমের জনহিতকর কর্মোদ্যমকেই দাবিয়ে রাখা হয়; প্রজাদের নাগরিক অধিকারকে একেবারেই স্বীকার করা হয় না।

মহাযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ হয়ে রইল, এবং তার দ্বারা বেশ কিছু লাভ করে নিলে। যুদ্ধ-রত দেশদের কাছে সে মালপত্র বেচতে লাগল, দেশে শিল্পপ্রচেষ্টাও স্বভাবতই অনেক বেড়ে গেল। যুদ্ধের পর এল মন্দা, বেকার-সমস্যা, এবং তার ফলে সামাজিক জীবনেও বিক্ষোভ। এইরকম সময়ে, ১৯২১ সনে, মরক্কোতে রিফ-যুদ্ধ শুরু হল; এই যুদ্ধে আবদুল করিম স্পেনের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দিলেন। কিন্তু এর পরেই ফরাসিরা এসে যুদ্ধে যোগ দিল; আবদুল করিমকে পরাজিত করল, তাদের অনুগ্রহে স্পেন-অধিকৃত মরক্কো স্পেনের ভাগ্যেই টিকে গেল। এই মরক্কো-যুদ্ধের মধ্যেই হল প্রাইমো ডি রিভেরার অভ্যুত্থান। ১৯২৩ সনে, দেশের শাসনতন্ত্রকে নাকচ করে দিয়ে তিনি স্পেনের 'একচ্ছত্র শাসক' হয়ে বসলেন। ছ'বছর তিনি শাসন চালালেন; কিন্তু সেনাবাহিনীর তাঁর উপরে আস্থা ক্রমশ কমে এল, ১৯২৯ সনে একটি আর্থিক সংকট হবার ফলে তিনি পদত্যাগ করলেন। রাজা আলফনসো ওদিকে সারাক্ষণই সজাগ হয়ে ছিলেন, প্রগতি-বিরোধী দলদের উৎসাহিত করছিলেন, নিজের প্রতিপত্তি আবার প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছিলেন।

স্পেনের মানুষরা অত্যন্ত পরিমাণে আত্মস্বার্থান্বেষী; এদের মধ্যে যেগুলো প্রগতিপন্থী দল তারাও অনেক সময়েই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেছে। বাকুনিনের কাল থেকেই অ্যানার্কিস্ট মতবাদ নূতন শ্রমিক শ্রেণীর মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; ইংলন্ড বা জর্মনির ধরনে যেসব ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো লোকের কাছে তেমন আমল পায় নি। অ্যানার্কিস্ট আর সিন্ডিকালিস্টরা মিলে একটা বেশ জোরালো দল গড়ে তুলল, বিশেষ করে ক্যাটালোনিয়ায় তার প্রতিপত্তি। প্রগতিপন্থী অন্যান্য দল যারা ছিল, তারা হচ্ছে লিবারেল-ডেমোক্রাট দল, সোশ্যালিস্ট দল, আর কম্যুনিস্ট দল—এটি তখনও অতি ক্ষুদ্র কিন্তু এর প্রতাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। এই দলগুলির প্রত্যেকটাই ছিল প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে। প্রাইমো ডি রিভেরা যে ডিকটেটরি শাসন চালালেন, তার ধাক্কায় এই প্রজাতন্ত্রকামী দলগুলির বুদ্ধি কিছু খুলল। এরা সকলে একত্র হয়ে জোট বাঁধল, পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

এরা প্রথম সাফল্য লাভ করল ১৯৩১ সনের পৌর-নির্বাচনে; সে নির্বাচনে সর্বত্রই প্রজাতন্ত্রী প্রার্থীরা খুব ভালো রকম জিতে গেল। রাজা (তিনি ছিলেন একদিকে বুর্বোঁ আর একদিকে হাপ্‌স্‌বুর্গ্‌দের বংশধর) এই দেখেই ভয় পেলেন, তাড়াতাড়ি করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। দেশে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হল, ১৯৩১ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখে একটি সাময়িক সরকারও প্রতিষ্ঠিত করা হল। এই বিপ্লবে কোথাও হানাহানি বা রক্তপাত প্রয়োজন হয় নি।

রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব, ১৯১৭ সনের মার্চমাসে যে বিপ্লব হয়, তার সঙ্গে স্পেনের এই বিপ্লবের আশ্চর্য মিল আছে। রাশিয়ার জারতন্ত্রের মতোই, এখানেও প্রাচীন রাজতন্ত্রী কাঠামোটি ভেতরে ভেতরে একেবারেই পচে ঝর্‌ঝরে হয়ে গিয়েছিল; একটুখানি নাড়া লাগতেই সে কাঠামো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, বিরোধী পক্ষের মুখোমুখি একবার রুখে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করল না। এর দুটি ক্ষেত্রেই বিপ্লবের মূল কথাটা ছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো; এই প্রচেষ্টা এল বরং যথাযোগ্য সময়ের পরেও বহু বিলম্ব করে, এবং এর ধাক্কাটা প্রধানত এল দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষকদের কাছ থেকে। ধর্মযাজকদের হাতে অসীম ক্ষমতা, প্রজারা সেটাকে একটা ভয়ংকর দুঃসহ বোঝা বলে মনে করছে; রাশিয়ার চেয়েও স্পেনে এই ক্লেশ-বোধ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। এর দুই ক্ষেত্রেই বিপ্লবের ফলে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হল, সমাজের এক একটা শ্রেণীর স্বার্থ এক এক দিকে, কাজেই এরা প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়ে দড়ি-টানা শুরু করল। দেশের মধ্যে ক্রমাগতই খণ্ড-বিদ্রোহ দেখা

স্পেনে গৃহযুদ্ধ
ব্যাস্ক ও আস্টুরিয়ার সীমান্ত, ১৯৩৭
ফ্রান্স
বিলবাও
বার্গোস
ক্যাটালোনিয়া
সারাগোসা
এব্রো
ফ্রাঙ্কোর এব্রো আক্রমণ
বার্সিলোনা
অপর্টো
ফ্রাঙ্কোর গতিপথ
মাদ্রিদ
টলেডো
তেরুয়েল
ম্যাজোর্কা
ভ্যালেন্সিয়া
ইতালীর ঘাঁটি
লিসবন
কর্ডোবা
সেভিল
কার্টাগেনা
কাদিজ
মালাগা
সিউটা
স্পেনীয় মরক্কো, ফ্রাঙ্কোর ১ম ঘাঁটি
বিদ্রোহীদের অধিকৃত অঞ্চল ১৯৩৮ সালের শেষে
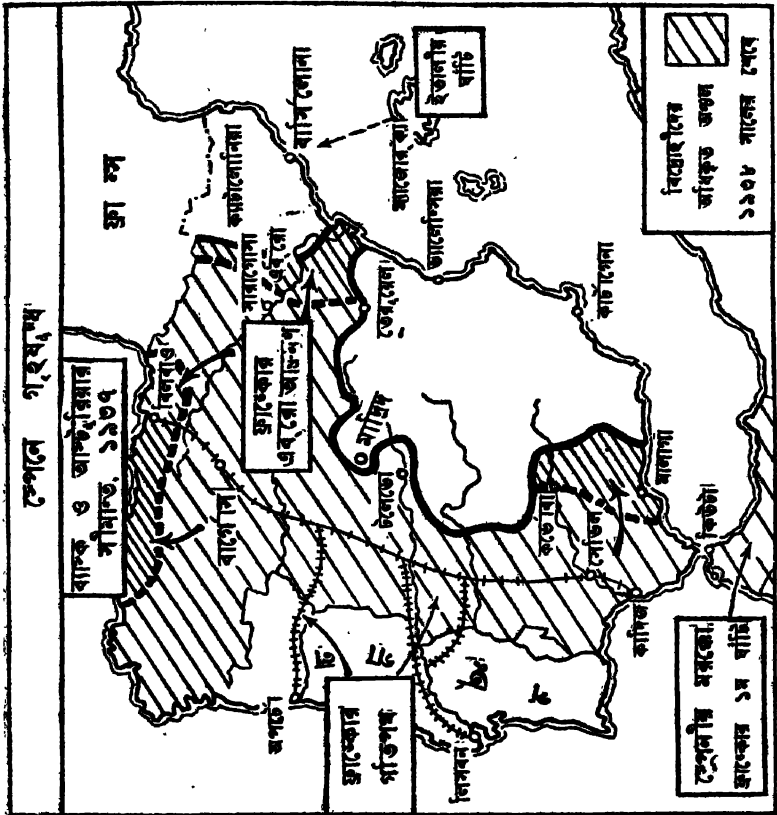
দিতে লাগল। কখনও দক্ষিণপন্থীরা বিদ্রোহ করছে, কখনও বা চরম-বামপন্থীরা। রাশিয়াতে এই অনিশ্চিত অবস্থার পরিণতি হয়েছিল নভেম্বরের বিপ্লবে; স্পেনে এই অনিশ্চিত অবস্থার জের এখনও চলছে।

স্পেনে যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কয়েকটি বস্তু লক্ষ্য করবার মতো। আইনসভায় একটি মাত্র পরিষৎ, তার নাম কর্‌টেস। সকল নাগরিককেই ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে এই : লীগ অব নেশন্‌স্‌-এর অনুমতি ছাড়া প্রেসিডেণ্ট কোনো রকম যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না। যে-সকল আন্তর্জাতিক বিধান লীগ অব নেশন্‌স্‌ তার দপ্তরে লিপিবদ্ধ করে নিলেন এবং স্পেন সরকার স্বীকার করে নিলেন, তার প্রত্যেকটাই সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের আইন বলে গণ্য হয়ে যাবে; এমনকি স্পেনের রচিত কোনো আইনের সঙ্গে যদি তার মিল না হয় তবে সেই ঘরোয়া আইনটিই বরং বাতিল হয়ে যাবে।

এই নূতন গণতন্ত্রী দেশের সরকার-পক্ষ সম্বন্ধে যাঁরা বর্ণনা দিলেন, তাঁরা বললেন, এটা একটা বামপন্থী উদারনৈতিক প্রজাতন্ত্র, তার সঙ্গে একটু সোশ্যালিজ্‌মের গন্ধ মেশানো। প্রধানমন্ত্রী, তথা সরকারি মহলের প্রধানস্তম্ভ ছিলেন ম্যানুয়েল আজানা। প্রথম থেকেই এই সরকারকে নানাবিধ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল—জমি নিয়ে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে, সেনাবাহিনী নিয়ে। এই সব ব্যাপার নিয়ে কর্‌টেস বহু দূর-প্রসারী আইন রচনা করলেন। কিন্তু কার্যত খুব বেশি কিছু করতে পারলেন না। একটি উদাহরণ দিই : আইন করা হল, যে জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা আছে, এমন জমি ২৫ একরের বেশি কোনো একজন লোক বা একটি পরিবারের হাতে থাকতে পারবে না; এবং তাও থাকবে, শুধু যতদিন সে জমিতে তারা চাষ আবাদ চালাচ্ছে ততদিনই। কার্যত কিন্তু বড়ো বড়ো জমিদারদের মহালগুলি সমস্তই টিকে রইল; যাবার মধ্যে গেল শুধু রাজার আর কয়েকজন বিদ্রোহী অভিজাত ব্যক্তির খাস জমিগুলো—এগুলো সবই বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল।

ধর্ম-প্রতিষ্ঠানদের যত সম্পত্তি ছিল, কর্‌টেস তার সমস্তই জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই নীতিকেও কার্যে পরিণত করা হল না। একমাত্র শিক্ষার ব্যাপারেই ধর্মপ্রতিষ্ঠানদের উপরে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হল; অন্যান্য ব্যাপারে তাঁদের অধিকারে আদৌ হস্তক্ষেপ করা হল না। সেনানীরা যে-সব অধিকার ভোগ করছিলেন তার কতকগুলি কেড়ে নেওয়া হল; বহু সেনানীকে খুব দরাজ হাতে মাসোহারা দিয়ে সেনাবাহিনী থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল।

১৯৩২ সনের জানুয়ারি মাসে অ্যানার্কো-সিণ্ডিকালিস্টরা ক্যাটালোনিয়াতে একটা বড়ো রকমের বিদ্রোহ সৃষ্টি করল; সরকার সে বিদ্রোহ দমন করলেন। এই বছরেরই মধ্যে দক্ষিণ-পন্থীরাও একবার বিদ্রোহের আয়োজন করল, কিন্তু সে বিদ্রোহও ব্যর্থ হল।

প্রথম দিকের ক'টি বছরে এই নূতন প্রজাতন্ত্রটি যে কাজ দেখিয়েছে, তার জন্যে তাকে বাহাদুরি দিতে হয়—বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। ভূমি-সমস্যার মীমাংসা করবার জন্য এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যও কিছু কিছু চেষ্টা এঁরা করেছেন। কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের যে চেষ্টা চলেছে তার গতি অত্যন্ত মন্থর। তার ফলে কৃষকরাও অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে। ওদিকে কায়েমী-স্বার্থের মালিকরা এবং প্রগতি-বিরোধী ব্যক্তিরাও দেশের মধ্যেই খুঁটি গেড়ে বসে আছেন—প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সেটা আশঙ্কার কথা। সরকার উদারপন্থী, তাই এঁদের সম্বন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নি।

মন্তব্য—(নভেম্বর, ১৯৩৮) :

১৯৩৩ সনে দেখা গেল, স্পেনে যেসকল প্রগতি-বিরোধী দল ছিল তারা একত্র জোট বেঁধেছে। ১৯৩৩ সনেই দেশে নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে এই দলবদ্ধ দক্ষিণপন্থীরা জিতে গেল। দেশে প্রগতি-বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, সে সরকার এসেই কৃষি সংস্কারের যে চেষ্টা চলছিল সেটা

বন্ধ করে দিল, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলল, এককথায়, আগের সরকার যা কিছু কার্য করেছিলেন তার অনেকখানিই বাতিল করে দিল। এর ফলে তখন আবার বামপন্থী দলদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠল, প্রগতি-বিরোধীদের বাধা দেবার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হল। ১৯৩৪ সনের অক্টোবর মাসে স্পেনের সর্বত্র দাঙ্গা বেধে গেল; কিন্তু সরকার সে দাঙ্গা থামিয়ে দিলেন, বামপন্থীদেরও দমন করে রাখলেন। বামপন্থীরা কিন্তু দমল না, তারা তখনও নিজেদের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে লাগল। এর ফলে একটি গণ-দলের (Popular Front) সৃষ্টি হল, উদারপন্থী, সোশ্যালিস্ট অ্যানার্কিস্ট আর কম্যুনিস্ট, এদের সকলকে নিয়ে। ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্‌টেস-এর নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে এই গণ-দল জিতে গেল, দেশে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। স্পষ্টই বোঝা গেল, এই নূতন সরকার ভূমি-সমস্যার সমাধান করতে আর ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব করতে উঠে পড়ে লেগে যাবেন; এর আগেকার উদারপন্থী সরকার কায়েমী-স্বার্থওয়ালাদের প্রতি যে উদার নীতি দেখিয়েছিলেন এ'রা তা দেখাবেন না। অতএব দেশের মধ্যে বিরোধের হাওয়া ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল; প্রগতি-বিরোধী দলেরা স্থির করলেন এবার তাঁরাও জোর আঘাত হানবেন। পেছন থেকে এ'দের উৎসাহ যোগাতে লাগলেন মুসোলিনি, আর জর্মনির নাৎসিরা।

১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, এই বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হল স্পেন-শাসিত মরক্কোতে। ফ্রাঙ্কোর পক্ষে রইল মুর সেনাবাহিনী—ফ্রাঙ্কো এদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্পেন-শাসিত মরক্কোকে তিনি স্বাধীন করে দেবেন। উচ্চপদস্থ সেনানীরা আর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোকই গেলেন ফ্রাঙ্কোর পক্ষে; দেখে মনে হল সরকারপক্ষের এবার আর রক্ষা নেই। অবস্থা দেখে সরকার তখন দেশের জনসাধারণকেই ডাক দিলেন, বললেন—এস, যুদ্ধ কর। অন্য কিছু অস্ত্র যদি না থাকে তোমাদের, শুধু হাতে ঘুষি চালিয়েই লড়ো। দেশের লোকও এই ডাকে আশ্চর্য রকম সাড়া দিল, বিশেষ করে মাদ্রিদ্ এবং বার্সিলোনা অঞ্চলের লোকরা। সরকার এবং গণতন্ত্র উপস্থিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেল; কিন্তু ফ্রাঙ্কোও স্পেনের বহু স্থান দখল করে নিলেন।

সেই থেকেই সংগ্রাম চলেছে। ইতালি আর জর্মনি ফ্রাঙ্কোকে বিরাট রকম সাহায্য দিচ্ছে, প্রচুর সংখ্যক সৈন্য, বিমান, বৈমানিক-সেনা আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। গণতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য করতেও বহু বিদেশী স্বেচ্ছা-সৈনিক এগিয়ে এসেছিল, সরকারও এরই মধ্যে চমৎকার একটি নূতন সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন। ব্রিটিশ আর ফরাসি সরকার ঘোষণা করেছেন তাঁরা এই যুদ্ধে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না, এই তাঁদের নীতি; কিন্তু এর ফলে কার্যত তাঁদের ফ্রাঙ্কোকেই সাহায্য করা হচ্ছে।

বহু ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছে স্পেনের এই যুদ্ধে; ইতালি আর জর্মনির যে বিমান-বাহিনী ফ্রাঙ্কোর হয়ে যুদ্ধ করছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রের সীমার বাইরে উন্মুক্ত শহর অঞ্চলে নিরীহ জন-সাধারণের উপরে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেছে, তাতে মানুষও মরেছে অসংখ্য। মাদ্রিদ্ রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ হয়েছিল সে তো একটা প্রসিদ্ধ ব্যাপার। বর্তমানে স্পেনদেশের তিন-চতুর্থাংশ স্থানই ফ্রাঙ্কোর দখলে; তবু গণতন্ত্রী সেনা বেশ ভালোরকমই ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে তাকে—সেনা-সংস্থানের দিক থেকে গণতন্ত্রী সরকারকে বেশ শক্তিশালীই বলতে হবে। এ'দের এখন প্রধান বিপত্তিই হচ্ছে, খাদ্যবস্তুর অভাব।

স্পেনের এই যুদ্ধ, এ শুধু একটা দেশের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নয়, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর ব্যাপার—বিচক্ষণ দ্রষ্টাদের এই অভিমত। এটা এখন হয়ে উঠেছে একটা বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতীক—তার একদিকে গণতন্ত্র অন্যদিকে ফ্যাসিজ্‌ম্, দেখা যাক কে হারে কে জেতে। এই জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত মানুষ বিশেষ মনোযোগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে এর দিকে চেয়ে রয়েছে।

১৯০

জর্মনিতে নাৎসীদের জয়লাভ

৩১শে জুলাই, ১৯৩৩

স্পেনে বিপ্লব ঘটতে দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন, কিন্তু বস্তুত আশ্চর্য হবার কিছুই এর মধ্যে ছিল না। এ বিপ্লব ঘটনাচক্রের স্বাভাবিক নিয়ম বশেই ঘটেছে, যাঁরা স্পেনের অবস্থা লক্ষ্য করে দেখছিলেন, তাঁরা জানতেন এ বিপ্লব অপরিহার্য। রাজা-সামন্ত-পাদ্রী নিয়ে যে পুরোনো ব্যবস্থা টিকে ছিল তার আগাগোড়াই ঘুণে খেয়েছে, প্রাণশক্তি বলতে কিছুই তার বাকি ছিল না। আধুনিক যুগের সঙ্গে কোনোদিক দিয়েই তার মিল ছিল না, কাজেই পাকা ফলের মতো একটুখানি নাড়া লাগতেই সেটা টুপ্ করে খসে পড়ে গেল। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীন যুগের সেই সামন্তপ্রথার বহু ভগ্নাবশেষ এখনও টিকে আছে; বিদেশী রাজশক্তি তাকে ঠেকনো দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, তা নইলে সম্ভবত সেটাও বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে যেত।

জর্মনিতে সম্প্রতি যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে, সে কিন্তু একেবারেই ভিন্ন জগতের বস্তু; তাকে দেখে ইউরোপের তন্দ্রা ছুটে গেছে, বহু লোক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন। জর্মনদের মতো একটা সভ্য-সংস্কৃতি এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল জাতি যে পাশবিক এবং বর্বর আচরণ করতে মেতে উঠবে, এ অতি আশ্চর্য ব্যাপার।

জর্মনিতে হিটলার এবং তার নাৎসীদলের জয় হয়েছে। এঁদের বলা হয় ফ্যাসিস্ট; এদের জয়কে বলা হয়েছে প্রতি-বিপ্লবের জয়—১৯১৮ সনে জর্মনিতে যে বিপ্লব হয়েছিল এবং তার পরবর্তীকালেও যে-সব ব্যাপার ঘটেছে, তার সম্পূর্ণ নিরাকরণ। অতি সত্য কথা; হিটলার-তন্ত্রের মধ্যে ফ্যাসিজমের সমস্ত লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি, দেখছি প্রতিক্রিয়ার একটা হিংস্র প্রকাশ, দেখছি সমস্ত উদারপন্থীদের উপরে এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের উপরে একটা পাশবিক আক্রমণ। তবুও কিন্তু এটা সুধমাত্র একটা প্রতিক্রিয়াই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি—ইতালির ফ্যাসিজমের তুলনায় এটা অনেক বৃহত্তর ব্যাপার, জনসাধারণের মনে এর আসনও অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। সে জনসাধারণ মানে দেশের অধিকাংশ প্রজা নয়, শ্রমিকরা নয়; সে হচ্ছে একটি অনাহার-ক্লিষ্ট সর্বস্ব-বঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এখন সে বিপ্লবের পথে চলতে চাইছে।

আগের একটি চিঠিতে ইতালির কথা বলতে গিয়ে আমি ফ্যাসিজম সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম; বলেছিলাম, অর্থনৈতিক সংকটের চাপে পড়ে যখন ধনিকতন্ত্রী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে, তখনই হয় ফ্যাসিজমের সৃষ্টি একটা সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বিত্তশালী ধনিক শ্রেণীরা নিজেদের টিকিয়ে রাখবার চেষ্টায় একটা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে, নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা দল হয় সে আন্দোলনের পরিচালক। ধনিকতন্ত্র বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণ করে এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, অসতর্ক কৃষক এবং শ্রমিককে নিজের দলভুক্ত করে নেয়। তারপর ক্ষমতা হাতে পাবার পর, রাষ্ট্রকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবার পর, এরা সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করে দেয়, সমস্ত শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করে দেয়, বিশেষ করে শ্রমিকদের সমস্ত সংগঠনকেই ভেঙেচুরে দেয়। এই জন্যই এদের শাসনের প্রধান উপায় হচ্ছে বলপ্রয়োগ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে লোকরা এদের সমর্থন করেছে এই নূতন রাষ্ট্রে তাদের চাকরি দিয়ে পোষা হয়; শিল্প-ব্যবসায়ের উপরে খানিকটা সরকারি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সাধারণত প্রবর্তন করা হয়।

জর্মনিতে এর সমস্তই ঘটছে; সেটা অপ্রত্যাশিতও মোটেই ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এর মধ্যে যা আছে সে হচ্ছে, এর পিছনে জনসাধারণের যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তার প্রচণ্ডতা; এবং হিটলারের দলে যারা যোগ দিচ্ছে তাদের সংখ্যার প্রাবল্য।

নাৎসীদের এই প্রতিবিপ্লব ঘটেছে ১৯৩৩ সনের মার্চ মাসে। কিন্তু আমি তোমাকে আরও

কিছু আগের দিনে নিয়ে যাব, এই আন্দোলনের আরম্ভ কীভাবে হয়েছিল সেই অবস্থাটা দেখিয়ে আনব।

১৯১৮ সনে জর্মানিতে যে বিপ্লব হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা ধাপ্পাবাজি; বিপ্লব তাকে মোটেই বলা চলে না। কাইজার চলে গেলেন, একটা প্রজাতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়ে গেল। কয়েক বছর যাবৎ দেশের শাসন-কর্তৃত্ব রইল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে। আগের কালের প্রগতিবিরোধী এবং কায়েমী স্বার্থের মালিক যারা ছিল, তাদের এরা অত্যন্ত ভয় করে চলত, সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে একটা আপোষ স্থাপন করতে চেষ্টা করত। এদের পিছনে জোর ছিল অনেক—তাদের দলটিই প্রচণ্ড শক্তিশালী, তার সভ্যের সংখ্যা বহু লক্ষ; ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি তাদের পক্ষে, দেশের আরও বহু লোক এদেরই সমর্থন করত। তবু প্রগতি-বিরোধীদের সামনে ক্রমাগত কাঁচুমাচু হয়ে থাকা, কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই হল এদের নীতি। উগ্রমূর্তি ধারণ করত এরা শুধু নিজেদেরই মধ্যে চরম বামপন্থীদের প্রতি, আর কমিউনিস্ট দলের প্রতি। দেশশাসনের ব্যাপারে এরা এমন বিশ্রী ভণ্ডুল পাকাতে লাগল যে, শেষে এদের সমর্থক-দেরই মধ্যে অনেকে এদের ছেড়ে চলে গেল। যে শ্রমিকরা এদের পক্ষ ত্যাগ করল তারা গিয়ে জুটল কমিউনিস্ট দলে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা এদের সমর্থক ছিল তারা গিয়ে যোগ দিল প্রগতি-বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে। সোশ্যাল ডেমোক্রাট আর কমিউনিস্টদের মধ্যে ক্রমাগতই যুদ্ধ চলতে লাগল, তার ফলে দুই দলই দুর্বল হয়ে পড়ল।

যুদ্ধোত্তর কালে জর্মানিতে বিপুল মুদ্রাস্ফীতি ঘটল; জর্মানির শিল্পপতিরা আর বড়ো বড়ো ভূ-স্বামীরা মুদ্রাস্ফীতিকেই সমর্থন করলেন। মুদ্রাস্ফীতির ফলে টাকা প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ল; ভূ-স্বামীদের প্রচুর দেনা ছিল, দেনার দায়ে ভূসম্পত্তি বাঁধা ছিল, তাঁরা সেই টাকায় অনায়াসে দেনা শোধ করে দিলেন, বন্ধকী ভূসম্পত্তি আবার উদ্ধার করে নিলেন। বড়ো বড়ো কারখানার মালিকরাও তাঁদের কারখানা বাড়িয়ে তুললেন, বড়ো বড়ো ট্রাস্ট (Trust) গড়ে তুললেন। জর্মানির পণ্য এত সস্তা হয়ে গেল যে পৃথিবীর সর্বত্রই সে পণ্য হু হু করে কাটতে লাগল। জর্মানিতে বেকার-সমস্যার চিহ্নমাত্র রইল না। শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়নগুলি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী; মার্কের দর ক্রমাগত নেমে চলল কিন্তু এরা শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি অক্ষুণ্ণ রেখে দিল। মুদ্রাস্ফীতির আঘাতটা গিয়ে পড়ল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে, তারা একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। ১৯২৩-২৪ সনে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এইভাবে লুপ্ত-সর্বস্ব হয়ে গেল, তারাই প্রথম হিটলারের দলে যোগ দিল। তারপর বহু ব্যাঙ্ক ফেল হল, বেকার-সমস্যা বাড়ল, দেশে অর্থ-সংকট প্রবল হয়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু লোক হিটলারের দলে গিয়ে জুটতে লাগল। দেশের যে যেখানে অসন্তোষে ক্ষোভে দিন কাটাচ্ছে তিনিই হয়ে উঠলেন তাদের সবার আশ্রয়স্থল। আরও একটি জায়গা থেকে তিনি অনেক লোক দলে টেনে নিলেন, সে হচ্ছে পুরোনো সেনাবাহিনীর সেনানী-শ্রেণী। যুদ্ধের পরে, ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে সে প্রাচীন সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল; তার হাজার হাজার সেনানী তখন বেকার বসে আছেন, তাঁদের করবার কিছুই নেই। দেশে তখন বহু বেসরকারি বাহিনী গড়ে উঠছে, এ'রা ক্রমে ক্রমে গিয়ে তারই এক-একটার সঙ্গে জুটে যেতে লাগলেন। নাৎসীদের বাহিনীর নাম ছিল 'ঝটিকা বাহিনী'; আর 'লৌহ-শিরস্ত্রাণ' বাহিনী ছিল জাতীয়তাবাদীদের সেনা—এরা রক্ষণপন্থী, কাইজারের শাসন আবার ফিরিয়ে আনবার পক্ষপাতী।

এই অ্যাডল্ফ্ হিটলার কে? শুনে আশ্চর্য হবে, ক্ষমতালাভের এক কি দুই বছর আগেও ইনি কিন্তু জর্মানির নাগরিকপ্রজা পর্যন্ত ছিলেন না। হিটলার একজন জর্মন-অস্ট্রিয়ান; নিম্নপদস্থ সৈনিক হিসাবে তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। জর্মন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ বিপ্লব বা পুট্শ্-এর আয়োজনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে সামান্য সাজা দিয়েই ছেড়ে দেন। এর পর তিনি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিরোধিতা করবার জন্য তাঁর নিজের দল গড়ে তোলেন, এই দলের নাম, 'নাশিয়নাল সোৎসিয়ালিস্ট্' বা ন্যাশানাল সোশ্যালিস্ট। এই নাম থেকেই নাৎসী কথাটার সৃষ্টি হয়েছে : নাশিয়নাল-এর 'না', আর সোৎসিয়ালিস্ট-এর 'ৎসি'। এই

দলটির নামই সোশ্যালিস্ট; কিন্তু সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। সমাজতন্ত্রবাদ বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, হিটলার ছিলেন তার শত্রু, এখনও তিনি তাইই আছেন। এই দল তার প্রতীকচিহ্ন বলে গ্রহণ করেছে 'স্বস্তিকা'-কে। 'স্বস্তিকা' সংস্কৃত-ভাষার কথা, কিন্তু চিহ্নটা প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত হয়ে আছে। এই প্রতীক-চিহ্ন ভারতে খুবই প্রচলিত এবং মাঙ্গলিক চিহ্ন বলে গণ্য হয়, তা তুমি জান। নাৎসীরা একটি যোদ্ধৃদলও তৈরি করল, তার নাম 'ঝটিকা বাহিনী'; এদের উর্দি ছিল একটা পাট্‌কিলে রঙের শার্ট। এইজন্য নাৎসীদের অনেক সময় 'ব্রাউন-শার্ট' বা 'পাটকিলে-জামা'র দল বলা হয়, ঠিক যেমন ইতালির ফ্যাসিস্টদের আমরা বলি 'কালো-কোর্তার' দল।

নাৎসীদের কর্মসূচীটা বিশেষ পরিষ্কার বা স্পষ্ট নয়। এটা অতিমাত্রায় জাতীয়তাবাদী, জর্মনি এবং জর্মন জাতির মহত্ব সম্বন্ধে এতে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরে আর যেটুকু আছে, সে নানাবিধ বিরোধী-মনোবৃত্তির একটা জগাখিচুড়ি। এটা ভার্সাই সন্ধির বিরোধী, এদের মতে সে সন্ধি জর্মনির পক্ষে অপমানকর; এই কথা শুনেই বহু লোক নাৎসীদের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। মার্ক্‌স্‌বাদ-কমিউনিজ্‌ম-সমাজতন্ত্রবাদেরও বিরোধী এটা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন এবং অনুরূপ সংগঠনেরও বিরোধী। ইহুদি-বিরোধী, কারণ এদের মতে ইহুদিরা বিদেশী জাত, তাদের সংশ্রবে 'আর্য' জর্মন জাতির উচ্চ জীবনাদর্শ কলুষিত এবং হীন হয়ে যায়। ধনিকতন্ত্রেরও কিছু কিছু বিরোধিতা আছে এর মধ্যে, কিন্তু তার দৌড় লাভান্বেষী এবং ধনীদের নামে গালাগালি বর্ষণ পর্যন্তই। সমাজতন্ত্রের কথা এরা একটিমাত্র ব্যাপারে বলে, তাও খাপছাড়া ভাষায় : সে হচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের খানিকটা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

আর এই সমস্তর পিছনেই আছে অদ্ভুত একটা নীতি—বলপ্রয়োগের নীতি। অপরের প্রতি বলপ্রয়োগ এবং উৎপীড়নকে এরা শুধু প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদানই করে না, তাকে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করে। জর্মনির একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক আছেন অস্‌ভাল্ড্‌ স্পেংলার; তিনি এই দর্শনের একজন প্রচারক। তিনি বলেন, মানুষ হচ্ছে "একটি শিকারী পশু, সাহসী, ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর"..."আদর্শবাদ মানেই কাপুরুষতা"......"শিকারী জন্তুই হচ্ছে জীবন্ত প্রাণ-শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন"। তাঁর ভাষায় "সহানুভূতি আপোষস্থাপন এবং শান্তি হচ্ছে দন্তহীন অনুভূতি"; "ঘৃণা—শিকারী পশুর সবচেয়ে খাঁটি জাতিগত-চেতনা"। মানুষকে হতে হবে সিংহের মতো, তার গর্তে তার সমান শক্তিশালী আর একজনের অস্তিত্ব সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। শান্তশিষ্ট গরু পালে মিশে থাকে এবং যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও সেই দিকেই চলে—তার মতো হলে মানুষের চলবে না। সেই সিংহোপম মানুষের পক্ষে যুদ্ধই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কাজ এবং আনন্দ।

অস্‌ভাল্ড্‌ স্পেংলার এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম; তিনি যেসব বই লিখেছেন তাতে যে প্রচুর পরিমাণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। অথচ সেই অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়েও তিনি উপনীত হয়েছেন এই-সব অদ্ভুত এবং ঘৃণ্য সিদ্ধান্তে। তাঁর কয়েকটি কথা আমি উদ্‌ধৃত করে দেখিয়েছি, কারণ হিটলারবাদের পিছনে যে মনোভাবটি রয়েছে তাঁর কথা থেকেই সেটাকে বোঝা যাবে; গত ক'মাস ধরে যে নিষ্ঠুর এবং পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান জর্মনিতে চলেছে, তার ব্যাখ্যাও এরই মধ্যে মিলবে। নাৎসীদলের প্রত্যেকটি লোকেরই এই মত, এমন কথা ভাবা অবশ্য উচিত হবে না। কিন্তু এর নেতারা এবং উগ্র উৎসাহীরা নিশ্চয়ই এই মত পোষণ করেন, এবং তাঁদের দেখেই অন্যরাও বলতে শিখছে। কিন্তু এর চেয়েও বোধ হয় ঠিক কথা বলা হবে, যদি বলি, নাৎসীদলের সাধারণ লোক যারা তারা মোটে কিছুই ভাবে নি। নিজের দুঃখদৈন্য এবং জাতির অপমানের আঘাতে (ফরাসিরা রুঢ় দখল করে নেওয়াতে জর্মনরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল) তারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল; বর্তমান অবস্থাটার উপরেই চটে গিয়েছিল। হিটলারের বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ; সেই বাগ্মীতার জোরেই অগণিত শ্রোতার মনকে তিনি উদ্‌বেলিত করে তুললেন, যা-কিছু ঘটছে তার সমস্ত দোষই চাপিয়ে দিলেন মার্ক্‌স্‌বাদীদের আর

ইহুদিদের উপরে। ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশ জর্মানির প্রতি অন্যায় আচরণ করছে? তাহলে তো লোকদের আরও বেশী করে এসে নাৎসী দলে যোগ দেওয়া উচিত, কারণ নাৎসীরাই জর্মানির সম্ভ্রম রক্ষা করবে। জর্মানির আর্থিক সংকট আরও বেড়ে গেল, তার ফলে দলে দলে লোক এসে নাৎসীদের দলে যোগ দিল।

অল্পদিনের মধ্যেই শাসনব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের প্রভুত্বের অবসান ঘটল। অন্য দলদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, এই ফাঁকে ক্যাথলিক কেন্দ্রীয় দল বলে আরেকটা দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করে বসল। রাইখ্‌স্টাগের (পার্লামেণ্ট) মধ্যে কোনো একটি দলেরই এমন শক্তি ছিল না যে অন্যদের উপেক্ষা করে একা চলতে পারে, কাজেই দেশে ঘন ঘন নির্বাচন হতে লাগল, চক্রান্ত আর দলাদলিও ক্রমাগতই চলতে লাগল। নাৎসীদের দলবৃদ্ধির বহর দেখে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এত ভয় পেয়ে গেল যে তারা ধনিকতন্ত্রী 'কেন্দ্রীয় দল' এবং প্রেসিডেণ্টের পদে বৃদ্ধ সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গের নির্বাচন সমর্থন করল। নাৎসীদের এতখানি দলবৃদ্ধি সত্ত্বেও কিন্তু, সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং কমিউনিস্ট, শ্রমিকদের এই দুটি দলের শক্তি তখনও প্রচুর—শেষ পর্যন্তও লক্ষ লক্ষ লোক এদের পক্ষে ছিল। কিন্তু দুপক্ষেরই এক শত্রু, তবু তার সামনে দাঁড়িয়েও এরা পরস্পর সহযোগিতা করতে পারল না। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে যতদিন শক্তি ছিল, অর্থাৎ ১৯১৮ সনের পর থেকে এই পর্যন্ত, ততদিন তারা কমিউনিস্টদের উপরে প্রচণ্ড উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছে; প্রত্যেকবারই সংকটের মুহূর্তে গিয়ে প্রগতিবিরোধী দলদের পক্ষ অবলম্বন করেছে: কমিউনিস্টদের মনে সেই তিক্ত স্মৃতি তখনও স্পষ্ট। ওদিকে সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল কতকটা ব্রিটেনের শ্রমিক দলেরই মতো, এরা দুজনেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সভ্য। ব্রিটিশ শ্রমিকদলের মতোই তারও অগাধ ধনসম্পত্তি, দেশে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা, দেশের বহু বড়ো বড়ো লোক তার পৃষ্ঠপোষক। তার নিরাপত্তা বা প্রতিষ্ঠা নষ্ট বা বিপন্ন হতে পারে এমন কোনো ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়। আইনের বিরুদ্ধে কিছু করা, বা প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম যাকে বলে তেমন কোনো অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়াকে সে অত্যন্ত ভয় করে চলে। তার যেটুকু শক্তি এবং উদ্যম ছিল তার বেশির ভাগই সে ব্যয় করেছে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অথচ এই দুটি দলই ছিল একধরণের মার্ক্‌স্‌পন্থী।

জর্মানি পরিণত হল একটি যুদ্ধক্ষেত্রে: তার দুদিকে দুটি সমান শক্তিশালী বাহিনী সেজে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর নরহত্যা চলতে লাগল—বিশেষ করে নাৎসীদের হাতে কমিউনিস্ট শ্রমিক হত্যা। এক-একসময় শ্রমিকরাও এর পাল্টা শোধ তুলত। হিটলার একটা প্রকাণ্ড ক্ষমতার পরিচয় দিলেন এই সময়ে—একটা পাঁচমিশেলি দলকে তিনি রাশ টেনে একত্র ধরে রাখলেন, তার মধ্যে নানাবিধ লোক, কারও সঙ্গে কারও সাদৃশ্য নেই। নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে একদিকে বড়ো বড়ো শিল্পপতিদের আর অন্যদিকে অধিকতর ধনী কৃষকদের সে এক বিচিত্র সমন্বয়। শিল্পপতিরা হিটলারকে সমর্থন করছিলেন, টাকা যোগাচ্ছিলেন, কারণ তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে গাল পাড়ছেন, ভাব দেখে মনে হচ্ছে মার্ক্‌স্‌বাদ বা কমিউনিজ্‌মের আসন্ন প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করবার তিনিই একমাত্র দৃঢ় প্রাচীর। দরিদ্রতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা, কৃষকরা, এমনকি শ্রমিকরাও অনেকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল, তাঁর ধনিকতন্ত্র বিরোধী ধ্বনি শুনে।

১৯৩৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ (এখন তাঁর ৮৬ বছর বয়স) হিটলারকে চান্সেলর করে দিলেন। জর্মানিতে এইটেই হচ্ছে শাসন-বিভাগের সবচেয়ে বড়ো পদ, অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদের সমতুল্য। নাৎসী আর জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা মৈত্রী হয়েছিল; কিন্তু দুদিন না যেতেই স্পষ্ট বোঝা গেল নাৎসীরাই সমস্ত ব্যাপারটা চালাচ্ছে, অন্য কেউ কোনো পাত্তাই পাচ্ছে না। একটা সাধারণ নির্বাচন হল, তার ফলে নাৎসীরা এবং তাদের মিত্রদল জাতীয়তাবাদীরা একত্রে রাইখস্টাগে কোনোক্রমে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। অবশ্য এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও বিশেষ আটকাত না, কারণ পার্লামেণ্টে নাৎসীদের যত বিরোধী পক্ষ ছিল সকলকে তারা গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখল। পার্লামেণ্টের সমস্ত কমিউনিস্ট সভ্যকে এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেরও অনেককে এইভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। ঠিক এই সময়ই রাইখ্‌স্টাগের বাড়িটা আগুন লেগে

পুড়ে গেল। নাৎসীরা বলল, এটা কমিউনিস্টদের কীর্তি, রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলবার জন্য তাদের চক্রান্ত। কমিউনিস্টরা এই অভিযোগ ভীষণভাবে অস্বীকার করল; তারা আবার পাল্টা অভিযোগ করল, এ আগুন নাৎসী নেতারাই লাগিয়েছে, কমিউনিস্টদের উপরে আক্রমণ চালাবার একটা অজুহাত তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছে।

তার পর শুরু হল জর্মনির সর্বত্র জুড়ে নাৎসী আতঙ্ক বা পার্টকিলেদের অত্যাচার। প্রথমেই পার্লামেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া হল (পার্লামেণ্টে তখন নাৎসীদেরই সংখ্যাধিক্য, তবুও); রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হল হিটলার আর তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে। এঁরা আইন তৈরি করতে পারবেন, যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। হ্বাইমারে প্রজাতন্ত্রের যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল সেটাকে এইভাবে বাতিল করে দেওয়া হল; সমস্ত প্রকার গণতন্ত্রের প্রতি খোলাখুলিই অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতে লাগল। জর্মনি ছিল একটা যুক্তরাষ্ট্র, তারও অবসান করা হল, রাষ্ট্র-শাসনের সমস্ত ক্ষমতা এনে বার্লিনে কেন্দ্রীভূত করা হল। প্রত্যেক জায়গাতেই ডিকটেটর নিযুক্ত করা হল, এরা একমাত্র নিজের নিজের ঊর্ধ্বতন ডিকটেটরেরই অধীন থাকবে। সর্বপ্রধান ডিকটেটরের পদটিতে স্বভাবতই বসলেন হিটলার স্বয়ং।

এই-সব পরিবর্তন যখন ঘটছে, তারই মধ্যে নাৎসী ঝটিকা বাহিনীকে জর্মনির বুকে ছেড়ে দেওয়া হল। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এরা এমনই একটা অত্যাচার এবং আতঙ্কের রাজ্য সৃষ্টি করল যে তার বর্বরতা আর নৃশংসতা দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এরকম অনুষ্ঠান পৃথিবীতে আর হয় নি। আতঙ্ক সৃষ্টি এর আগেও হয়েছে, লাল-আতঙ্ক শ্বেত-আতঙ্ক আমরা দেখেছি। কিন্তু সে আতঙ্ক সর্বত্রই দেখা দিয়েছে তখন, যখন একটা দেশ বা একটা প্রবল দল গৃহযুদ্ধে প্রাণ বাঁচাবার জন্য লড়াই করছে। মারাত্মক বিপদে পড়ে এবং সারাক্ষণ ভয়ে কণ্টকিত হয়ে তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা সে আতঙ্ক সৃষ্টি করত। কিন্তু নাৎসীদের সেরকম কোনো বিপদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছিল না, ভয় পাবার কারণও তাদের কিছুতে ঘটেনি। শাসনক্ষমতা ছিল তাদেরই হাতে, তাদের কার্যকলাপে বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করবার কোনো সশস্ত্র চেষ্টাও কেউ করে নি। কাজেই এই পার্টকিলে আতঙ্কের জন্ম উত্তেজনা বা ভয় থেকে হয় নি; এ শুধু, নাৎসীদের দলে যারা যোগ দিতে চাইছে না তাদের সকলকে পিষে মারবার একটা অত্যন্ত পাশবিক অভিযান—ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডামাথায় এবং অবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তারা এই অভিযান চালাচ্ছিল।

জর্মনিতে গত মাসকয়েক ধরে যত নৃশংস অনুষ্ঠান চলেছে, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে এখনও চলছে, তার তালিকা তোমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। অতি ব্যাপক ভাবে মানুষকে ধরে নির্মম প্রহার করছে, নির্যাতন করছে, গুলি করে মারছে, হত্যা করছে এরা—পুরুষ নারী কেউই সে আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় নি। জেলখানায় এবং বন্দীশালায় অসংখ্য লোককে আটকে রাখা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে, সেখানে এদের প্রতি ব্যবহারও করা হয় অত্যন্ত খারাপ। সবচেয়ে হিংস্র আক্রমণ চলছে কমিউনিস্টদের উপরে; কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা অনেক বেশি নরমপন্থী হয়েও তাদের চেয়ে খুব বেশি সদ্ব্যবহার পাচ্ছে না। ইহুদিদের উপরে একেবারে মারাত্মক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। অন্যান্য আক্রান্তদের মধ্যে আছে শান্তিকামী, উদারপন্থী, ট্রেড-ইউনিয়ন-পন্থী, আন্তর্জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি। নাৎসীরা বলছে, মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদীদের, বস্তুত সমস্ত 'বামপন্থী'দের, উচ্ছিন্ন করবার জন্যই এটা তাদের যুদ্ধ। ইহুদিদের হাত থেকেও সমস্ত চাকরি এবং পেশা কেড়ে নেওয়া এদের ব্রত। হাজার হাজার ইহুদি অধ্যাপক, শিক্ষক, সঙ্গীতজ্ঞ, আইনজীবী, বিচারপতি, চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইহুদি দোকানদারদের দোকান বয়কট করা হয়েছে, ইহুদি শ্রমিকদের কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। নাৎসীদের যে-সব বই পছন্দ নয় সেগুলোকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, এর জন্য প্রকাশ্য বহ্ন্যুৎসব করা হচ্ছে। অতি সামান্য মতভেদ বা সমালোচনার অপরাধে বহু সংবাদপত্রকে নির্মম-ভাবে দমন করা হয়েছে। নাৎসী অত্যাচারের কোনো সংবাদই কাগজে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না; এর সম্বন্ধে কেউ কানাঘুষা করলে তাকে পর্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

দেশের সমস্ত সংগঠন এবং দলকেই—অবশ্য নাৎসীদল বাদে—দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই উচ্ছিন্ন হয়েছে কমিউনিস্ট দল, তার পর সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল, তার পর ক্যাথলিক কেন্দ্রীয় দল, সকলের শেষে নাৎসীদের মিত্র জাতীয়তাবাদী দলকে পর্যন্ত বিদায় করা হয়েছে। বহু পুরুষ ধরে জর্মন শ্রমিকদের শ্রম অর্থসঞ্চয় এবং আত্মত্যাগের বলে গড়ে উঠেছিল জর্মনির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রেড ইউনিয়নগুলো; সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাদের সমস্ত টাকাকড়ি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জর্মনিতে আর কারোরই বাঁচবার অধিকার নেই, একটি মাত্র দল, একটি মাত্র সংগঠন, সেখানে বেঁচে থাকবে—সে হচ্ছে নাৎসীদল।

নাৎসীদের সেই অপূর্ব দর্শন জোর করে সবাইকে গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে; অত্যাচারের ভয়ে দেশসুদ্ধ লোক এমনই আচ্ছন্ন যে মাথা তুলে প্রতিবাদ করবার সাহসও কেউ পাচ্ছে না। শিক্ষা, অভিনয়, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সবকিছুর গায়েই নাৎসীমার্কা ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিটলারের অন্যতম প্রধান সহকর্মী হের্‌মান গোয়েরিং বলেন : "খাঁটি জর্মন চিন্তা করে তার রক্ত দিয়ে!" আরেকজন নাৎসী নেতার উক্তি হচ্ছে : "বিশুদ্ধ যুক্তি আর অপক্ষপাতী বিজ্ঞানের যুগ চলে গেছে।" শিশুদের পর্যন্ত শেখানো হচ্ছে, হিটলারই দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট, তবে প্রথমজনের চেয়ে আরও বড়ো। জনগণের মধ্যে, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে খুব বেশি শিক্ষার প্রসার নাৎসী সরকারের পছন্দ নয়। বস্তুত হিটলারবাদীদের মতে নারীর স্থান হচ্ছে গৃহে এবং রন্ধনশালায়; তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সন্তান প্রসব করা, যারা রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করবে, প্রাণ বিসর্জন করবে। ডক্টর জোসেফ্ গোয়েবেল্স্ নাৎসীদের আরেকজন বড়ো নেতা, এবং 'জন-শিক্ষা এবং প্রচারকার্যের' ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বলেছেন : "নারীর স্থান পরিবারের মাঝখানে; তার উচিত কর্তব্য হচ্ছে দেশের জন্য এবং জাতির জন্য সন্তান সৃষ্টি করা।...... নারীদের মুক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। যে কাজ পুরুষের সেটা পুরুষের হাতেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে।" জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার প্রণালীটা তাঁর কী, সেকথাও এই ডক্টর গেয়েবেল্স্ নিজেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন : "মানুষ যেমন পিয়ানো থেকে ইচ্ছামতো সুর বার করে, সংবাদপত্রকে তেমনি করে আমার ইচ্ছামতো কথা বলানোই আমার অভিপ্রায়।"

এই রাশিকৃত বর্বরতা নৃশংসতা আগুন আর বজ্র, এর পিছনে ছিল বিত্তহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের অভাব আর ক্ষুধার যাতনা। এটা আসলে ছিল একটা রুজি এবং রুটির জন্য লড়াই। ইহুদি চিকিৎসক আইনজীবী শিক্ষক শুশ্রূষাকারী ইত্যাদিকে এরা তাড়িয়ে দিয়েছে, তার কারণ এদের সঙ্গে যোগ্যতার পাল্লা দিয়ে চলা 'আর্যবংশোদ্ভব' জর্মনদের সাধ্যে কুলোয় নি : এদের সাফল্য দেখে তাদের চোখে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছিল, তাই এদের তাড়িয়ে দিয়ে এদের জায়গাগুলো তারা দখল করতে চেয়েছে। ইহুদিদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ ব্যবসাবুদ্ধিতে তাদের এঁটে ওঠা শক্ত। ইহুদি ছাড়া অন্য লোকেরও অনেক দোকান নাৎসীরা বন্ধ করে দিয়েছে, দোকানের মালিকদের গ্রেপ্তার করেছে, তার কারণ তাদের সন্দেহ এই মালিকরা অতিরিক্ত লাভ করত, অন্যায়-রকম চড়া দাম আদায় করত। নাৎসীদলের পক্ষভুক্ত কৃষকরা পূর্ব-প্রাশিয়ার বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের মহালগুলির দিকে লুব্ধনেত্রে তাকিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে তাদের মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হোক এই তাদের ইচ্ছা।

নাৎসীদের মূল কর্মসূচীর মধ্যে একটি চমৎকার জিনিস ছিল : এদের প্রস্তাব ছিল, দেশের মধ্যে কোনো লোকেরই বেতন বছরে ১২,০০০ মার্কের বেশি হতে পারবে না। বছরে ১২,০০০ মার্ক মানে ৮,০০০ টাকা, বা মাসে ৬৬৬ টাকা। এই প্রস্তাব কতদূর কার্যে পরিণত করা হয়েছে জানি নে। চ্যান্সেলরের বর্তমান বেতন হচ্ছে বছরে ২৬,০০০ মার্ক (অর্থাৎ মাসে ১,৪৪০ টাকা)। এদের প্রস্তাব, যেসব বেসরকারি কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পাচ্ছে, তাদের কোনো ডিরেক্টর বা কর্মচারীরও বেতন বছরে ১৮,০০০ মার্কের বেশি হতে পারবে না—আগের দিনে এই-সব লোকেরা প্রায়ই অত্যন্ত মোটা মোটা মাইনে পেত। দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ, তার সরকারি কর্ম-চারীরা যে-সব বিরাট অঙ্কে মাইনে নিয়ে থাকেন, তার সঙ্গে এই অঙ্কগুলোর তুলনা করে দেখ। করাচী অধিবেশনে কংগ্রেস প্রস্তাব করেছিলেন, ভারতবর্ষে বেতনের সর্বোচ্চ সীমা মাসে ৫০০ টাকা বলে ধার্য করা হোক।

নাৎসী আন্দোলনের মধ্যে নৃশংসতা আর আতঙ্ক সৃষ্টিটাই বড়ো হয়ে চোখে পড়েছে, তবু সে আন্দোলনের পিছনে এ ছাড়া আর কিছু নেই, এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। দেশের বিপুল পরিমাণ শ্রমিকদের কথা যদি বাদ দিই, তবে নিঃসংশয়ে বলতে পারি জর্মনদের মধ্যে বহু-সংখ্যক লোকেরই মনে হিটলারকে ঘিরে একটা সত্যকার উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। সেদিন যে নির্বাচন হয়ে গেল তার অঙ্কটাকে যদি প্রমাণ্য বলে ধরি তবে বলতে হবে জর্মানির শতকরা ৫২ জন লোক এখন তারই পক্ষে। শতকরা এই ৫২ জন লোক বাকি ৪৮ জনকে বা তাদের কতককে ভয় দেখিয়ে ঠান্ডা করে রাখছে। এই শতকরা ৫২ জনের, বা এখন হয়তো তারও কিছু বেশি সংখ্যক, লোকের কাছে হিটলার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। জর্মানিতে এখন যারা যাচ্ছে তারা বলছে সেখানে নাকি একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের হাওয়া আজকাল বইছে, যেন ধর্মের একটা পুনরুজ্জীবন চলছে দেশে। জর্মনদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছে, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা অপমান আর নিপীড়নের যে বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে এতদিনে তার অবসান হল, আবার তারা স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারবে।

কিন্তু জর্মানির বাকি অর্ধেক বা তার কাছাকাছি মানুষের বিশ্বাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। জর্মানির শ্রমিকদের মন তীব্র বিদ্বেষে আর রোষে পরিপূর্ণ; শুধু নাৎসীদের ভয়ংকর প্রতি-হিংসার ভয়েই তারা কোনোমতে শান্ত সংযত হয়ে আছে, তাদের হুকুম মেনে চলছে। সমস্ত শ্রেণী হিসাবেই তারা উৎপীড়ন আর বিভীষিকার কাছে মাথা নত করেছে; দুঃখ আর হতাশাভরা চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে, বিপুল শ্রম আর আত্মোৎসর্গ দিয়ে তিলে তিলে তারা যাকে গড়ে তুলেছিল সে সমস্তই কী চমৎকার ভাবে এরা ধ্বংস করে দিল। গত মাস কয়েকের মধ্যে জর্মানিতে যত কাণ্ড ঘটেছে, তার মধ্যে একটি বৃহৎ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তার সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের সম্পূর্ণ বিলোপ : বাধা দেবার এতটুকু চেষ্টামাত্র না করে এই বিরাট সংগঠনটি কেমন অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করে নিল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এইটিই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর গড়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ, সুসংহত দল। এইটিই ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মেরুদণ্ড স্বরূপ। অথচ সকল অপমান সকল অসম্ভ্রম, শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ বিলোপকে পর্যন্ত সে অতি নিরীহ শান্তভাবে মেনে নিল, একবার প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। অবশ্য শুধুমাত্র প্রতিবাদ করে কোনো ফলই হত না। একটু একটু করে ক্রমে ক্রমে সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা নাৎসীদের কাছে নতি স্বীকার করেছেন; প্রতিবারেই আশা করেছেন, হয়তো এই নতি এবং অপমান স্বীকার করেও তাঁদের খানিকটা অন্তত বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের সেই নতি স্বীকারটাকেই তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে; নাৎসীরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিয়েছে, দেখো, বিপদের মুখে তোমাদের নেতারা কেমন নীচের মতো তোমাদের একা ফেলে সরে দাঁড়াল! ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ইতিহাস; সে সংগ্রামে একাধিকবার তারা জয়ী হয়েছে, পরাজিতও হয়েছে বহু বার। কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা মাত্র না করে শ্রমিকদের স্বার্থকে বলি দেওয়ার, তার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করার এমন গ্লানিকর কাহিনী আর কখনও শোনা যায় নি। কমিউনিস্ট দল বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, একটি সর্বব্যাপী ধর্মঘটের আয়োজন করেছিল। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা তাদের সমর্থন করলেন না, ধর্মঘট ভেস্তে গেল। কমিউনিস্ট দলকেও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে, তবু এখনও তারা একটা গুপ্ত সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছে, সে সংগঠন বেশ ব্যাপক বলেই মনে হয়। এদের একটা সংবাদপত্র গোপনে প্রকাশিত হয় : নাৎসী গুপ্তচর বিভাগের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও নাকি সে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা এখনও বহু লক্ষ। সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের যে নেতারা জর্মানি থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন বিদেশ থেকেই গুপ্ত উপায়ে খানিকটা প্রচারকার্য চালাবার চেষ্টা করছেন।

নাৎসী-আতঙ্কের সবচেয়ে বড়ো আঘাত পড়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর উপরেই। পৃথিবীতে কিন্তু বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল ইহুদিদের প্রতি এদের দুর্ব্যবহার। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম দেখতে ইউরোপের লোকেরা কিছুটা অভ্যস্ত; তাদের সহানুভূতিটাও সর্বত্রই চলে শ্রেণীগত

পরিচয়ের পথ ধরে। কিন্তু ইহুদিদের উপরে যে আক্রমণ হল সেটা জাতিগত আক্রমণ; মধ্যযুগে যেমন হত বা জারশাসিত রাশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে বেসরকারি ভাবে অল্পদিন আগেও যা ঘটত, কতকটা তারই অনুরূপ ব্যাপার এটা। সরকারিভাবেই একটা সমগ্র জাতির উপর এইভাবে আক্রমণ চালানো দেখে ইউরোপ আর আমেরিকার লোকেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে বিস্ময় আরও বাড়ল একটি ব্যাপারে, জর্মানির এই ইহুদিদের মধ্যে কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিও ছিলেন—বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সংগীতজ্ঞ এবং লেখক—এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। জর্মানিকেই এঁরা নিজের দেশ বলে জানতেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোকও এঁদের জর্মন বলেই জানত। এই-সব লোককে নিজের মধ্যে পেলে পৃথিবীর যে-কোনো দেশই নিজেকে ধন্য মনে করত; কিন্তু নাৎসীরা তাদের উন্মত্ত জাতিগত বিদ্বেষের বশে এঁদের তাড়া করে দেশ থেকে বার করে দিল। এই আচরণের বিরুদ্ধে পৃথিবী জুড়ে একটা বিরাট প্রতিবাদ বেজে উঠল। তার পর নাৎসীরা ইহুদিদের দোকানপাট এবং ইহুদি পেশাদার লোকদের বয়কট করবার ব্যবস্থা করল; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ইহুদিদের জর্মানি ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি তারা কিছুতেই দিল না। এই রকম নীতির একমাত্র ফল হতে পারে এদের অনাহারে শুকিয়ে মারা। পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদের ফলে এখন নাৎসীরা ইহুদিদের সম্বন্ধে তাদের প্রকাশ্য কার্যকলাপের তীব্রতা কিছু হ্রাস করেছে; কিন্তু তাদের ইহুদি-নির্যাতনের নীতিটা এখনও অপরিবর্তিতই রয়েছে।

ইহুদি জাতি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, কোনো বিশেষ দেশকে নিজের দেশও এরা বলতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এমন অসহায়ও এরা নয় যে নাৎসীদের এই আচরণের পাল্টা প্রহার দিতে পারবে না। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য আর টাকাকড়ির অনেকখানিই এদের হাতে; অতি শান্তভাবে কোনোরকম হৈ চৈ না করে এরা জর্মানির পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। শুধু পণ্য বর্জন নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি: ১৯৩৩ সনের মে মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে এরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তার থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবটি হচ্ছে: "জর্মানিতে বা তার কোনো অংশে নির্মিত উৎপন্ন বা সংশোধিত সমস্তপ্রকার পণ্য, কাঁচামাল বা উৎপন্ন বস্তুসামগ্রীকে বর্জন করতে হবে; জর্মানির সমস্ত জাহাজ, মাল বহন এবং যাত্রীবহনের ব্যবস্থা বর্জন করতে হবে; জর্মানির সমস্ত স্বাস্থ্য-নিবাস, ক্রীড়া-কেন্দ্র, বা অন্যরকমের যত আশ্রয়স্থল বর্জন করতে হবে: ফলত যে-কোনো কাজে বর্তমান জর্মন রাষ্ট্রের কোনোপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বা লাভ হবার সম্ভাবনা তার সমস্ত থেকেই আমাদের বিরত থেকে চলতে হবে।"

হিটলারতন্ত্রের যে-সব প্রতিক্রিয়া জর্মানির বাইরে দেখা দিয়েছে এটা তার একটিমাত্র। এ ছাড়াও আরও বহু প্রতিক্রিয়া তার হয়েছে, সেগুলো এর চেয়েও অনেক বেশী ব্যাপক। নাৎসীরা আগাগোড়াই ভার্সাই সন্ধিকে নিন্দা করে আসছে, বলছে তাকে নূতন করে রচনা করা হোক। বিশেষ করে জর্মানির পূর্ব-সীমান্ত সম্বন্ধে: সেখানে একটা অদ্ভুত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে ডানজিগ্ পর্যন্ত একটা পোলিশ করিডর খাড়া করে; তার ফলে জর্মানির একটা অংশ বাকি দেশটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অস্ত্রসজ্জায় অন্যদের সমান অধিকার দাবি করেও তারা উচ্চরবে চীৎকার করছে। (তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সন্ধিপত্রের শর্ত অনুযায়ী জর্মানিকে অনেকখানিই নিরস্ত্র করে দেওয়া হয়েছিল)। হিটলারের বজ্রনাদী বক্তৃতা আর জর্মানিতে আবার অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করে তোলবার হুমকি শুনে ইউরোপের একেবারে থরহরি-কম্প লেগে গেল। বিশেষ করে ফ্রান্সের, কারণ জর্মানির শক্তি বাড়লে তারই ভয় সকলের চেয়ে বেশি। কয়েকটা দিন তো এমন অবস্থা রইল, এই বুঝি ইউরোপে যুদ্ধ বাধে। তার পর হঠাৎ এই নাৎসীদের ভয়ের ঠেলাতেই ইউরোপের দেশরা একটা নূতন রকমের দল-বেদল গড়ে তুলল। ফ্রান্স অকস্মাৎ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি একটা অত্যন্তরকম বন্ধুভাব অনুভব করতে লাগল। ভার্সাই সন্ধির ফলে যে-সব নূতন রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে-সব রাজ্যের কিছু লাভ হয়েছিল, সে সন্ধি আবার পালটে দেওয়া হবে, এই ভয়ে তারা সবাই, মানে পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া,

রুমানিয়া ইত্যাদি একত্র জোট বাঁধল, সংগে সংগে রাশিয়ার সংগেও একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অস্ট্রিয়াতে একটা আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হল। সেখানে এর আগে থেকেই একজন ফ্যাসিস্ট চ্যান্সেলর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন, তাঁর নাম ডলফাস্। কিন্তু তাঁর সে ফ্যাসিজ্‌মের জাত হিটলারের-টার চেয়ে আলাদা। অস্ট্রিয়াতে নাৎসীদের জোর প্রতাপ, কিন্তু ডলফাস তাদের দাবিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। হিটলারের জয়ে ইতালি উল্লসিত হল, কিন্তু হিটলারের সবগুলো অভিপ্রায়কে সে ভালো বলে মনে করতে পারল না। ইংলণ্ড বহু বছর ধরেই জর্মানির সমর্থক ছিল; হঠাৎ সে দেশের লোক ভয়ানকরকম জর্মান-বিদ্বেষী হয়ে উঠল, আবার তাদের মুখে 'হুন'দের নামটা শোনা যেতে লাগল। হিটলারের জর্মানি ইউরোপে একেবারে নিঃসংগ হয়ে পড়ল। জর্মানি অস্ত্রহীন; আর ফ্রান্সের সেনাবল প্রচণ্ড; সবাই বুঝল তখন যদি যুদ্ধ বাধে তবে ফ্রান্সের আঘাতে জর্মানি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হিটলার কাজেই তাঁর চাল বদলালেন, শান্তি-স্থাপনের কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁকে আবার উদ্ধার করতে এলেন মুসোলিনি—তিনি এসে প্রস্তাব করলেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্মানি আর ইতালির মধ্যে একটা চতুঃশক্তি চুক্তি হোক।

শেষপর্যন্ত ১৯৩৩ সনের জুন মাসে চারটি জাতি মিলে এই চুক্তিপত্রে সই করলেন; ফ্রান্স কিন্তু সই করবার আগে অনেক ইতস্তত করেছিল। ভাষার দিক থেকে চুক্তিপত্রটি খুবই নিরীহ-প্রকৃতির। এতে শুধু বলা হয়েছে, বিশেষ কয়েকটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, বিশেষ করে ভার্সাই সন্ধির পরিবর্তন করার কোনো প্রস্তাব যদি ওঠে তবে সে সম্বন্ধে, এই চারিটি দেশ পরস্পরের সংগে আলোচনা করে কাজ করবেন। কিন্তু অনেকে আবার এই চুক্তিটাকে দেখছেন, একটা সোভিয়েট-বিরোধী দল গড়বার চেষ্টা হিসাবে। ফ্রান্স খুবই অনিচ্ছাসহকারে এতে সই করেছিল বলে মনে হয়। ১৯৩৩ সনের ১লা জুলাই তারিখে লণ্ডনে সোভিয়েট এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটা হয়তো এই চুক্তিটিরই ফল এবং জবাব। এই সোভিয়েট-চুক্তির প্রতি ফ্রান্স তার প্রবল সহানুভূতি এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, এটা লক্ষ্য করবার বস্তু।

হিটলারের মূল কর্মসূচী, এইটাই জর্মন ধনিকতন্ত্রের কর্মসূচী, হচ্ছে : নিজেকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের ত্রাণকর্তা বলে জাহির করা। জর্মানিকে আরও বেশি জায়গা যদি দখল করতে হয় তবে সে জায়গা মিলবার একমাত্র স্থান হচ্ছে তার পূর্বদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের গা ঘুবলে। কিন্তু সেটা করতে হলে তার আগে জর্মানিকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে নিতে হবে। এইজন্যই এখন ভার্সাই সন্ধির অদলবদল করে এর ব্যবস্থাটা করে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে, অন্তত এটুকু আশ্বাস তাঁর পাওয়া চাই যে এরা কেউ তাঁকে বাধা দেবে না। হিটলারের ভরসা আছে, ইতালি তাঁর পক্ষে থাকবে। এখন যদি ইংলণ্ডকে পক্ষে টেনে নেওয়া যায়, তবে তখন চতুঃশক্তি-চুক্তির বর্ণিত কোনো ব্যাপারের আলোচনায় ফ্রান্স তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও তার সে বিরোধিতাকে সহজেই ডিঙিয়ে চলা যাবে—এইটাই বোধ হয় হিটলারের মনের আশা।

এইজন্যই হিটলার ব্রিটেনের সমর্থন লাভের চেষ্টা করছেন। ব্রিটেনকে প্রসন্ন করতে গিয়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে এ পর্যন্ত বলেছেন, ভারতবর্ষের উপরে ব্রিটেনের প্রতিপত্তি যদি কমে যায়, তবে সেটা একটা বিষম দুর্দৈবের ব্যাপার হবে। হিটলার সোভিয়েটের বিরোধী, এইটাই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে একটা প্রবল আকর্ষণের বস্তু; কারণ তোমাকে বলেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট রাশিয়াকে যতখানি অপছন্দ করে, এমন আর কিছুকেই করে না। কিন্তু নাৎসীদের কীর্তিকাণ্ড দেখে ব্রিটেনের লোকেরাও এত বিরক্ত হয়ে গেছে যে, হিটলারতন্ত্রের সমর্থন যাতে করা হচ্ছে এমন কোনো প্রস্তাব মেনে নিতে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে বেশ কিছুদিন লেগে যাবে।

নাৎসী জর্মানি ইউরোপের একটি ঝটিকা-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, যে-কোনো মুহূর্তে এখান থেকে ঝড় উঠতে পারে। 'আতঙ্ক বিহ্বল ধরিত্রীর' অসংখ্য আতঙ্কের তালিকাতে আরেকটি নাম যোগ হল। কিন্তু জর্মানির নিজের মধ্যে অবস্থা কী দাঁড়াবে? এই নাৎসী রাজত্ব কি টিকবে? জর্মানির মধ্যেও নাৎসীদের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিরোধিতার অভাব নেই; কিন্তু একথা ঠিক,

সংঘবদ্ধ বিরোধীপক্ষ এদের যত ছিল সকলকেই এরা বিচূর্ণ করেছে। জর্মনিতে এখন আর কোনো দল বা সংগঠনের অস্তিত্ব নেই, নাৎসীরাই সেখানে সর্বেসর্বা। নাৎসীদের নিজেদের মধ্যেও দুটি দল আছে বলে মনে হয়; ধনিক আর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এরা তার দক্ষিণপক্ষ; আর দলের সাধারণ কর্মীদের অধিকাংশ, আর সম্প্রতি বহু শ্রমিকও নাৎসীদলে যোগ দিয়েছে তারাও এদেরই দিকে—এরা হচ্ছে তার বামপক্ষ। হিটলারের আন্দোলনকে যাঁরা বৈপ্লবিক উদ্দীপনা যুগিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন অনেকখানিই ধনিকতন্ত্র-বিরোধী প্রগতিবাদী; পরবর্তীকালে তাঁরা বহু সমাজতন্ত্রবাদী এবং মার্ক্‌স্‌বাদীকেও দলে নিয়েছেন। নাৎসী আন্দোলনের এই দক্ষিণপক্ষ ও বামপক্ষের মধ্যে মিল প্রায় কিছুই নেই। হিটলার তবুও এদের দুই পক্ষকে একত্র করে রাখতে পেরেছেন, একে ওর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে দুপক্ষকেই ঠাণ্ডা করে রেখেছেন। এই ক্ষমতাটাই তাঁর বিরাট সাফল্যের হেতু। কিন্তু এটা সম্ভব ছিল শুধু ততদিনই, যতদিন সকলের সাধারণ শত্রু কেউ একজন চোখের সামনে আছে। এখন সে শত্রুরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বা নিজেদের মধ্যেই এসে মিলে গেছে; এবার দক্ষিণ আর বামপক্ষের মধ্যে বিরোধ বেড়ে উঠবেই।

ইতিমধ্যেই তার তূর্য-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বামপন্থী নাৎসীরা বলেছিল, প্রথম বিপ্লব তো সফল, সুসম্পূর্ণ হল, এবার তাহলে 'দ্বিতীয় বিপ্লব'টিকে আরম্ভ করা হোক—এই বিপ্লব হবে ধনিকতন্ত্র, ভূস্বামীতন্ত্র, প্রভৃতির বিরুদ্ধে। হিটলার কিন্তু শুনেই হুমকি ছেড়েছেন, এই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' চেষ্টাকে তিনি নির্মম হস্তে দমন করবেন। অতএব তিনি স্পষ্টভাবেই ধনিকতন্ত্রী দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁর প্রধান সহকারীদের প্রায় সকলেই এখন বড়ো বড়ো গদি দখল করে বসেছেন। বেশ আরামেই আছেন বলতে হবে, কাজেই তাঁদের এখন কোনো পরিবর্তন ঘটাবার আগ্রহ নেই।

হিটলারতন্ত্রের এই কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, নাৎসীদের এই জয়লাভ এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলো ইউরোপের তথা সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপার, এবং এর ফলও বহুদূর ব্যাপক হওয়া সম্ভব। এটা ফ্যাসিজ্‌ম্‌ তাতে সন্দেহ নেই, হিটলার নিজেও একজন খাঁটি ফ্যাসিস্ট। কিন্তু ইতালির ফ্যাসিজ্‌মের তুলনায় নাৎসীদের এই আন্দোলন অনেক বেশি প্রশস্ত, ব্যাপক এবং প্রগতিপন্থী, এর ভিতরের এই প্রগতিপন্থীরা এর রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবে, না নিজেরাই শুধু বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, সেটা এখনও ভবিষ্যতের কথা।

মার্ক্‌সের গোঁড়া মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, নাৎসী আন্দোলনের এই প্রতিষ্ঠালাভ দেখে তাঁরা খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। গোঁড়া মার্ক্‌স্‌বাদীরা চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন, একমাত্র সত্যকার বিপ্লবী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী; অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তুষ্ট এবং সর্বস্ব-বঞ্চিত লোকদের নিজেদের দলে টেনে নেবে, এবং শেষ পর্যন্ত একটা শ্রমিক-বিপ্লব ঘটিয়ে তুলবে। বাস্তবিকপক্ষে জর্মনিতে যা ঘটেছে সেটা একেবারেই এর উলটো। সংকট যখন এল তখন শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের কোনো চেতনাই ছিল না; প্রধানত সর্বস্ব-হারা নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্য থেকে এবং অন্যান্য অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে লোক নিয়েই নূতন একটি বিপ্লবী শ্রেণী গড়ে তোলা হল। গোঁড়া মার্ক্‌স্‌বাদের সঙ্গে এটা খাপ খায় না। কিন্তু অন্যান্য মার্ক্‌স্‌বাদীরা বলেন, মার্ক্‌স্‌বাদকে একটা অন্ধবিশ্বাস বা ধর্ম বা ধর্মমত, অথবা ধর্মের মতো সেও অভ্রান্ত ভাষায় চরম সত্যকে বলে দিয়ে যাচ্ছে, এরকম ধারণা করলে চলবে না। মার্ক্‌স্‌বাদ একটা ইতিহাস-দর্শন। এ শুধু ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে দেখবার একটা বিশেষ পন্থা, যার দ্বারা ইতিহাসের অনেকখানি তত্ত্ব বোঝা যায়, তার বিভিন্ন ঘটনার মধ্যের যোগসূত্রটি ধরা পড়ে। মার্ক্‌স্‌বাদ একটা কর্মনীতি, এর দ্বারা সমাজতন্ত্র বা সমাজ-সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে অবস্থার বহু বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে; মার্ক্‌স্‌বাদের মূল সূত্রগুলিকে সেই অবস্থার বৈচিত্র্য অনুসারে নানা বিচিত্ররূপে প্রয়োগ করে দেখতে হবে।

মন্তব্য—(নভেম্বর, ১৯৩৮) :—

সাড়ে পাঁচ বছর আগে উপরের চিঠিখানি লেখা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে হিটলারের নেতৃত্বাধীনে নাৎসি জর্মনির বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলাভ বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বর্তমান ইউরোপে হিটলারের প্রবল প্রতাপ এবং বড়ো বড়ো শক্তিগুলি (অথবা ইতিপূর্বে যারা বড়ো ছিল) তাঁর কাছে মাথা নত করে ও তাঁর হুমকির দাপটে ভয়ে কাঁপে। বিশ বছর আগে জর্মনি পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল কিন্তু এক্ষণে কোনও যুদ্ধ করে জয়লাভ না করেও হিটলার জর্মনদের বিজয়ী জাতিতে পরিণত করেছেন এবং ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রকে মৃত ও প্রোথিত মনে করা হচ্ছে।

ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরে হিটলারের প্রথম কার্য হল, জর্মনিতে তাঁর বিরোধী দলকে ও নাৎসি দলের শক্তি সুসংহত করা। জর্মনিকে পুরাপুরি 'নাৎসি ভূমিতে' পরিণত করার পর নাৎসি দলের মধ্যে বামপন্থী মনোভাবের মূলোৎপাটন করবার সিদ্ধান্ত করলেন, যেহেতু এরূপ মনোভাবাপন্ন নাৎসিগণ পুঁজিবাদিদের বিরুদ্ধে একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রত্যাশায় ছিল। পাট্‌কিলে-রঙের উর্দিপরা স্বেচ্ছাসেবকের দল (Brown-shirts) ভেঙে দেওয়া হল এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ১৯৩৪ সনের ৩০শে জুন তারিখে গুলি করে মারা হল। আরও অনেককে হত্যা করা হল—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেনারেল ফন শ্লিচার, যিনি এক-সময়ে চ্যান্সেলর ছিলেন।

১৯৩৪ সনের আগস্ট মাসে প্রেসিডেণ্ট ফন হিণ্ডেনবার্গ মারা গেলেন ও চ্যান্সেলর প্রেসিডেণ্টরূপে হিটলার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। জর্মনিতে তখন তিনি সর্বশক্তিমান ফুয়েরর (the Fuehrer) অর্থাৎ জর্মন জাতির অধিনায়ক হলেন। জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট অভাব-অনটন দেখা দিল। এই দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রায় অবশ্যকরণীয়রূপে ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্যের বিরাট ব্যবস্থা করা হল। আবশ্যিক শ্রমিক-সংঘ (Compulsory Labour Camps) প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বেকার লোকদের কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বহুসংখ্যক ইহুদিকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে—তাদের স্থানে জর্মনদের বসান হল। জর্মনির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হল না, বরং উহা খারাপের দিকেই গেল। কিন্তু কাজের অভাবে লোকের বেকার থাকার অবস্থাটা দূর হল। ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে পুনরস্ত্রীকরণ চলতে লাগল, তাতে জর্মন-ভীতি বেড়ে গেল।

১৯৩৫ সনের গোড়ার দিকে সার উপত্যকাতে (Saar basin) জনমত গ্রহণ করার ফলে দেখা গেল যে ওখানকার খুব বেশী সংখ্যক লোকদেরই অভিমত যে তারা জর্মনির সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে চায় এবং এই অঞ্চলকে জর্মনির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। ঐ বছরের মে মাসে হিটলার প্রকাশ্যভাবে ভার্সাই-সন্ধিপত্রের নিরস্ত্রীকরণের উপধারাগুলি নাকচ করে ফেললেন এবং সামরিক শিক্ষা ও চাকুরিগ্রহণ আবশ্যিক বলে ঘোষণা করলেন। পুনরস্ত্রীকরণের জন্য এক বিরাট কার্যপরিক্রমা গ্রহণ করা হল। লীগের অন্তর্ভুক্ত শক্তিবর্গের মধ্যে কেউ কিছু করল না, ভয়ে তারা সকলে, বিশেষতঃ ফ্রান্স, অভিভূত হল। ফ্রান্স আলাপ-আলোচনার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। ব্রিটিশ সরকার নাৎসি-জর্মনির পক্ষ অবলম্বন করাকেই বেশী পছন্দ করল এবং ১৯৩৫ সালের জুন মাসে তার সাথে এক নৌ-চুক্তিতে আবদ্ধ হল।

এর ফল হল অদ্ভুত রকমের। ইংলণ্ড তার পক্ষ ত্যাগ করে যাচ্ছে ভেবে ফ্রান্স ইতালির সহিত মৈত্রীর জন্য প্রস্তাব করল এবং মুসোলিনি উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছে মনে করে আবিসিনিয়া অভিযান সুরু করে দিল।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে হিটলার অস্ট্রিয়াতে সৈন্যসহ ঢুকে পড়লেন এবং জর্মনির সঙ্গে মিলন ঘোষণা করলেন। লীগশক্তিবর্গ পুনরায় মাথা নত করল। অস্ট্রিয়াতে নাৎসীদল ইহুদিদের বিরুদ্ধে অতি নিষ্ঠুর ও মারাত্মক রকমের আন্দোলন সুরু করে দিল।

তার পর নাৎসী আক্রমণের লক্ষ্য হল চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সুদেতান (Sudetan)।

জর্মনদের সমস্যাটি কয়েক মাস ধরে ইউরোপকে তোলপাড় করতে লাগল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি জর্মনদিগকে অনেকটা সাহায্য করল এবং এই নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস ফ্রান্সের ছিল না। অবশেষে, জর্মনির নিকট থেকে একেবারে আসন্ন যুদ্ধের হুমকি পেয়ে ফ্রান্স তার মিত্র চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষ বর্জন করল এবং ইংলণ্ড এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্যে সহায়স্বরূপ হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে জর্মনি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে মিউনিকে যে চুক্তি হল তদ্দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হল। সুদেতান অঞ্চল ও আরও অনেকখানি বেশী জর্মনি কর্তৃক অধিকৃত হল। সুযোগ বুঝে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরিও দেশটার কোনো কোনো অংশ আত্মসাৎ করে লাভবান হল।

এইরূপে ইউরোপের একটা নূতন রকমের ভাগবাঁটোয়ারা আরম্ভ হয়ে গেল—ইউরোপের এ-অবস্থায় ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পর্যবসিত হতে লাগল এবং হিটলার-প্রভাবিত নাৎসী জর্মনি বিজয়গৌরবে প্রভুত্ব করতে লাগল।

১৯১

নিরস্ত্রীকরণ

২রা আগস্ট, ১৯৩৩

লণ্ডনে যে নিখিল-বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন বসেছিল সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে, সে কথা তোমাকে বলেছি। এখনকার মতো সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সভ্যরা যে যার বাড়ি ফিরে গেছেন, অনাবিল আশা প্রকাশ করে গেছেন যে আবার তাঁরা একত্র হতে পারেন, এবারের চেয়ে অধিকতর অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে যেন সেবারকার আলোচনা চলতে পারে।

সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী সহযোগিতা স্থাপনের আরও একটি চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সে হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন। লীগ অব নেশন্সের অনুশাসন অনুসারেই এই সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়েছিল। ভার্সাই সন্ধিতে স্থির করা হয়েছিল, জর্মনিকে (এবং অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, প্রভৃতি বিজিত পক্ষের অন্যান্য দেশকেও) অস্ত্রসজ্জা পরিত্যাগ করতে হবে। নৌবাহিনী বা বিমান-বাহিনী বা বৃহৎ কোনো সেনাবাহিনী সে রাখতে পারবে না। আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল, অন্যান্য দেশগুলো তাদের রণসজ্জা ক্রমে কমিয়ে আনবে, যেন সর্বত্রই রণসজ্জার পরিমাণ, নেহাৎ দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেটুকু একান্ত প্রয়োজন সেই সর্বনিম্ন সীমায় এসে দাঁড়ায়। এই কর্মসূচীর প্রথম অংশটি, অর্থাৎ জর্মনিকে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারটি, সঙ্গে সঙ্গেই কার্যে পরিণত করা হল; দ্বিতীয় অংশটা—সমস্ত দেশকে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবটা—বাকি রয়ে গেল, এখন পর্যন্ত সেটা একটা সাধু ইচ্ছাতেই পর্যবসিত হয়ে আছে। কর্মসূচীর এই দ্বিতীয় অংশটিকে কার্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যেই এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনটিকে শেষপর্যন্ত ডাকা হয়েছিল, ভার্সাই সন্ধির প্রায় তেরো বছর পরে। কিন্তু সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন বসবার আগে একাধিক প্রাথমিক কমিশন কয়েক বছর ধরেই সমস্ত ব্যাপারটিকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন।

অবশেষে ১৯৩২ সনের প্রথম দিকে নিখিল-বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন বসল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এর বৈঠক চলল। বৈঠকে বহু প্রস্তাব উত্থাপন ও প্রত্যাখ্যান হল, বহু বিবরণী পাঠ করা হল, অফুরন্ত যুক্তিতর্ক শোনা গেল। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক থেকে ইহা প্রায় অস্ত্রীকরণ বৈঠকে পরিণত হয়েছে। কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নি, কারণ—কোনো দেশই ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত নয়, প্রত্যেক দেশই নিরস্ত্রীকরণ অর্থে এই বুঝে যে তার

শক্তিসামর্থ্য ঠিক বজায় থাকবে\কিন্তু অপরাপর দেশগুলি নিজেদের নিরস্ত্র করবে বা অস্ত্রসজ্জা কমিয়ে দেবে। প্রায় সব দেশগুলিই স্বার্থপর নীতি অবলম্বন করেছিল কিন্তু এবিষয়ে জাপান ও গ্রেট ব্রিটেন সর্বাগ্রণী থেকে মতৈক্যের পথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেছিল। যে-সময় এই বৈঠক চলছিল, ঠিক সে-সময়ে জাপান লীগকে অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুরিয়াতে এক ভয়ংকর আক্রমণ-মূলক যুদ্ধ চালাচ্ছিল, দক্ষিণ-আমেরিকায় দুটি রিপাব্লিক পরস্পরের সাথে লড়াই করছিল এবং ব্রিটেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী পার্বত্যজাতিদের উপর বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল। চীনে জাপানিরা যে আক্রমণ চালিয়েছে আমেরিকা তার বিরোধিতা করেছিল বটে, কিন্তু জাপানের প্রতি ব্রিটিশের অবিচ্ছিন্ন বন্ধুমনোভাবের জন্যই আমেরিকার সে বিরোধিতা অনেকখানি নিষ্ফল হয়ে গেছে।

অনেক রকমের প্রস্তাব যা করা হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রধান তিনটি এসেছিল যথাক্রমে সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স থেকে। রাশিয়া প্রস্তাব করেছিল যে, সর্ব-মোট শতকরা ৫০ ভাগ অস্ত্রসজ্জা কমিয়ে দেওয়া উচিত। আমেরিকার প্রস্তাব ছিল—এক তৃতীয়াংশ নিরস্ত্রীকরণ। কিন্তু ব্রিটেন এই উভয় প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করেছিল এই বলে যে তার সৈন্যসংখ্যা কমালে চলবে না, বিশেষতঃ নৌবিভাগ অটুট রাখতে হবে, কেননা ওটা পুলিশী কাজ চালাবার জন্যেই তার প্রয়োজন।

জর্মন-আক্রমণের অতীত স্মৃতি ফ্রান্সের মনে স্পষ্ট, সে আগাগোড়াই বলছে, 'নিরাপত্তা' চাই, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তার উপরে এই ধরনের আক্রমণ চলা অসম্ভব যদি নাও হয় অন্তত কঠিন হয়ে উঠবে, এমন একটা ব্যবস্থা তার একান্ত প্রয়োজন। তার প্রস্তাব, লীগ অব নেশন্স্ নিজেরই একটা সশস্ত্র বাহিনী থাকা উচিত, কোনো দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করলে এই বাহিনী তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে এবং এই বাহিনীতে কাজের জন্য প্রত্যেক জাতিকেই লঘুঅস্ত্রে সজ্জিত একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল রাখতে হবে; আর সমস্ত বিমানবাহিনীই থাকবে লীগের কর্তৃত্বাধীনে। কিন্তু এই প্রস্তাবে আপত্তি করা হল এই অজুহাতে যে, যে-কয়টি বৃহৎ শক্তি লীগকে করায়ত্ত করে রেখেছে, এই ব্যবস্থার দ্বারা তাদের শক্তিই আরও বাড়িয়ে তোলা হবে এবং কার্যতঃ ফ্রান্সই ইউরোপে প্রভুত্ব করবে।

আক্রমণকারী কে ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত ছিল, কেননা প্রত্যেক আক্রমণকারী জাতিরই এরূপ ঘোষণা করার অভ্যাস যে, তারা যা কিছু করছে সব আত্মরক্ষার জন্যই করছে। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাপান, আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইতালি স্বীকার করে নি যে, তারা আক্রমণকারী। মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতিই তার শত্রুকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়েছে। কাজেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়া এক সংজ্ঞা দিল, সেই সংজ্ঞা অনুসারে, যে কোনো দেশ সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশের মধ্যে সশস্ত্র সেনাদল পাঠিয়ে দেবে বা এমনকি অন্য দেশের সমুদ্রকূল অবরোধ করে বসবে, সেই 'আক্রমণকারী' বলে গণ্য হবে। তারপর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একটা সংজ্ঞা দিলেন, তার পরে আবার লীগ অব নেশন্সের একটি কমিটিও এ-ধরণেরই এক একটি সংজ্ঞা রচনা করল। রাশিয়া তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে যে অনাক্রমণচুক্তি করল তাতে এই সোভিয়েট সংজ্ঞাই গৃহীত হল। কী ছোটো কী বড়ো, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই এই সংজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হল, ফ্রান্স পর্যন্ত। কিন্তু এই সংজ্ঞা দেখে জাপান ভারী বিব্রত বোধ করতে লাগল! 'আক্রমণকারী'র এই সংজ্ঞা মেনে নিতে ইংলণ্ড অস্বীকার করল; ব্যাপারটাকে একটু অনিশ্চিত করেই রেখে দিতে চাইল। তার সমর্থন করল ইতালি।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রস্তাবের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তার পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন নেই, অন্যান্য জাতির পক্ষেই সেটা আবশ্যক। বিমান থেকে বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে অন্য প্রায় সমস্ত দেশই এইরূপ বোমাবর্ষণ একেবারে বন্ধ করে দেবার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল; তবু ইংলণ্ড এরূপ একটি শর্ত জুড়ে দিল যে, যেটাকে 'পুলিশের প্রয়োজনে প্রান্তবর্তী অঞ্চলে বোমাবর্ষণ' বলে সেটার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতেই হবে। এর মানে হল তার

সাম্রাজ্যের মধ্যে বোমাবর্ষণ করার স্বাধীনতা তার বজায় থাকা চাই। এই শর্তটি আবার সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল না—কাজেই বোমাবর্ষণ তুলে দেওয়ার সমগ্র প্রস্তাবটাই ফে'সে গেল।

জর্মানি অন্যান্য দেশগুলির সমান অধিকার দাবি করছিল এবং সেটা খুব স্বাভাবিকই; হয় অন্যদের যেটুকু অস্ত্রসজ্জা রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাকেও অস্ত্রসজ্জা বাড়িয়ে তার সমান করে নিতে দেওয়া হোক; আর না হয় অন্যরাও অস্ত্রসজ্জা ত্যাগ করে তার সমান হয়ে দাঁড়াক। এটা একেবারে অকাট্য যুক্তি। লীগের অনুশাসনেই কি বলা হয় নি, জর্মানির এই নিরস্ত্রীকরণ অন্য সকলেরও অস্ত্রত্যাগের সূচনামাত্র? এরূপ আলোচনা চলবার সময়েই জর্মানিতে নাৎসিদলের হাতে ক্ষমতা এল এবং তাদের হুমকি ও মারমুখো ভাবভঙ্গী দেখে ফ্রান্স ভয় পেয়ে গেল ও কঠোর মূর্তি ধারণ করল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শক্তিবর্গও। জর্মানির অনুকূলে যে দুইটি প্রস্তাব উত্থিত হয়েছিল তার একটিও স্বীকৃত বা গৃহীত হল না।

নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা যাতে সফল না হয়, তার বাধা-বিঘ্ন রয়েছে যথেষ্ট; এর উপরে আবার যবনিকার আড়ালেও অনেক রকম চক্রান্ত চলেছে, বিশেষ করে এই চক্রান্ত করছে রণসজ্জা-নির্মাণ-কারী ব্যবসায়ীদের মোটা-মাইনেওয়ালা গুপ্তচরেরা। এখনকার এই ধনিকতন্ত্রী জগতে অস্ত্রশস্ত্র এবং ধ্বংসের উপকরণ সামগ্রী তৈরি করার ব্যবসায় একটা অত্যন্ত লাভের ব্যাপার। এই অস্ত্রশস্ত্র এরা তৈরি করে বিভিন্ন দেশের সরকারদের জন্য; কারণ শুধু সরকাররাই যুদ্ধ চালাতে পারেন—এই হচ্ছে রীতি। অথচ মজা এই, সে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে কতকগুলো বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান। এই-সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান মালিক যারা, তারা বিরাট ধনী হয়ে ওঠে, সাধারণত সব দেশের সরকারদের সঙ্গেও এদের খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে এই রকম একটি লোকের কথা বলেছি, তার নাম সার্ বেসিল জাহারফ্। রণসজ্জা নির্মাণের কারখানাতে দারুণ লাভ, তাই এর অংশীদারী অনেকেই কিনতে চেষ্টা করে, সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন ও অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তি এ'দের মধ্যে আছেন।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের আয়োজন বললেই এই-সব রণসজ্জা নির্মাণের কারখানার লাভ। এরা হচ্ছে নরহত্যার পাইকারী ব্যবসাদার; এদের মৃত্যুবর্ষী যন্ত্রপাতি এরা অপক্ষপাতে যে টাকা দেবে তাকেই বেচতে রাজি থাকে। লীগ অব নেশন্স্ যখন চীনকে আক্রমণ করার অপরাধে জাপানকে তীব্র ভর্ৎসনা করছে, ঠিক তখনই ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং আরও অনেক দেশের রণসজ্জার কারখানাগুলো জাপান এবং চীন দু'পক্ষকেই সমানে অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে যাচ্ছিল। সত্যকার নিরস্ত্রীকরণ যদি হয় তবে এই ব্যবসাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, একথা সহজেই বোঝা যায়; কারণ তখন এদের মালই বিকোবে না। তাদের দিক থেকে নিরস্ত্রীকরণটা একটা বিষম বিপদের ব্যাপার, অতএব সে বিপদকে নিবৃত্ত করতে এরা প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকে। বস্তুত তার চেয়েও বেশি-দূর এগিয়ে যায় এরা। অস্ত্রনির্মাণের বেসরকারি ব্যবসা সম্বন্ধে তথ্যনির্ণয় করবার জন্য লীগ্ অব নেশন্স্ একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ করেছিলেন; এ'রা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলি রীতিমতো তোড়জোড় করেই মানুষের মনে যুদ্ধের আতঙ্ক বাড়িয়ে তোলে; নিজের নিজের দেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যার ফলে যুদ্ধ বাধতে পারে এমন সব নীতি গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। এ'রা আরও প্রমাণ পেয়েছেন, সমরবিভাগ এবং নৌবাহিনীর পিছনে কোন্ দেশ কত টাকা ব্যয় করছে, সে সম্বন্ধে এরা মিথ্যা গুজব রটাতে থাকে; যেন তাই শুনে ভয় পেয়ে অন্যান্য দেশরাও তাদের রণসজ্জার পিছনে আরও বেশি টাকা ঢালতে প্রলুব্ধ হয়। এক দেশকে আরেক দেশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত এরা, দেশে দেশে অস্ত্রসজ্জা বাড়াবার পাল্লা লাগিয়ে দিত। সরকারি কর্মচারীদের এরা ঘুষ দিয়ে হাত করত, সংবাদপত্র বার করে তাই দিয়ে জনসাধারণের মতামতকে নিজের ইচ্ছামতো চালাত। তার পর তারা গড়ে তুলত সব আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট আর একচেটিয়া ব্যবসা; তার জোরেই অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে দিত। লীগের এই কমিশন প্রস্তাব করলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানদের পক্ষে রণসজ্জা নির্মাণ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনেও এই প্রস্তাব তোলা হয়েছে, কিন্তু এর বেলাতেও ব্রিটিশ সরকার ক্রমাগতই সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে চলেছেন।

বিভিন্ন দেশের এই রণসজ্জা নির্মাণের কারখানাগুলোর পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগ আছে। এরা দেশপ্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে, মৃত্যুকে নিয়েই এদের খেলা; অথচ এদের নিজেদের কারবার চালাবার বেলায় এরা ঘোর আন্তর্জাতীয়তাবাদী—এদের নামই দেওয়া হয়েছে 'গুপ্ত আন্তর্জাতিক'। নিরস্ত্রীকরণের কথায় এরা ঘোরতর আপত্তি তুলবে এ তো খুবই স্বাভাবিক; সম্মেলনে কোনোরকম মতৈক্য যাতে স্থির না হয় তার জন্য এদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। এদের গুপ্তচররা প্রত্যেক দেশের ঊর্ধ্বতন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহলেই ঘোরাফেরা করেন; জেনেভাতেও এ'দের অলক্ষুনে মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছে, যবনিকার আড়াল থেকে সুতো টেনে এ'রা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়টাকে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে চেষ্টা করছেন।

এই 'গুপ্ত আন্তর্জাতিকে'র সঙ্গে আবার অনেক সময়েই প্রগাঢ় মৈত্রী দেখা যায় বিভিন্ন দেশের গুপ্তচর বিভাগদের। প্রত্যেক দেশই অন্যান্য দেশ থেকে গোপন সংবাদ বার করে আনবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করে। অনেক সময়ে এই গুপ্তচররা ধরা পড়ে যায়, এবং তাদের নিজের দেশের সরকার তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সাফ অস্বীকার করে বসে। ১৯২৭ সনের মে মাসে হাউজ অব কমন্‌সের সভায় এই গুপ্তচর বিভাগ সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে আর্থার পন্‌সন্‌বি (বছর কয়েক আগে ইনি ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র-বিভাগে সহকারী মন্ত্রী ছিলেন; এখন ইনি হয়েছেন লর্ড পন্‌সন্‌বি) বলেছিলেন: "নীতিবোধের ভড়ং নিয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করতে গিয়ে বাস্তব সত্যকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। জাল, চুরি, মিথ্যাকথা, ঘুষ এবং দুর্নীতি, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই পররাষ্ট্র বিভাগে এবং প্রত্যেক চ্যান্সেলরেরই দপ্তরে এগুলোর অস্তিত্ব বর্তমান।......আমি বলব, নৈতিক আচরণের যে সংজ্ঞা পৃথিবীতে স্বীকৃত রয়েছে, তাকে যদি মানি, তবে আমাদের যে প্রতিনিধিরা বিদেশে নিযুক্ত রয়েছে তারা যদি সেই দেশদের সরকারি দপ্তরখানা থেকে গুপ্ত-তথ্য জেনে নেবার চেষ্টা না করে, তাহলে বলতেই হবে তারা তাদের কর্তব্যে অবহেলা করছে।"

এই গুপ্তচর বিভাগের কাজকর্ম গোপনে চলে, তাই এদের নিয়ন্ত্রিত করে রাখাও কঠিন। নিজেদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপরে এদের প্রচণ্ড প্রভাব। এদের সংগঠনও অত্যন্ত ব্যাপক এবং শক্তিশালী। এখনকার দিনে বোধ হয় ব্রিটেনের গুপ্তচর বিভাগই সবচেয়ে বেশি শক্তিমান; এর কর্মক্ষেত্রের বিস্তারও অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। কাগজপত্রে একটি কাহিনী পাওয়া যায়, ব্রিটেনের একজন প্রসিদ্ধ গুপ্তচর রাশিয়াতে সোভিয়েট সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে বসেছিলেন! সার্ স্যামুয়েল হোর ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য; যুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন, রাশিয়াতে ব্রিটেনের যে গুপ্তচর বিভাগ কাজ করছিল তার বড়ো কর্তা। সম্প্রতি তিনি প্রকাশ্য-ভাবে এবং বেশ গর্বসহকারেই ঘোষণা করেছেন, তাঁর সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থা এত চমৎকার ছিল, যে রাসপুটিনের হত্যার সংবাদ অন্য কেউ পাবার বহু আগেই তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন!

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পক্ষে আসল বিপত্তি হচ্ছে এই, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর দেশ আছে—সন্তুষ্ট দেশ এবং অসন্তুষ্ট দেশ, একদিকে রয়েছে যারা প্রভুত্ব করছে তারা, আর অন্যদিকে রয়েছে যারা পদানত হয়ে আছ তারা; একদল চায় বর্তমান অবস্থাটাই টিকে থাকুক, অন্যদল চায় এর পরিবর্তন হোক। এই দুই পক্ষের মধ্যে কোনো স্থায়ী মিটমাট হতে পারে না, ঠিক যেমন একটা শাসক শ্রেণী আর একটা শাসিত শ্রেণীর মধ্যে কোনো সত্যকার স্থায়ী মৈত্রী হওয়া সম্ভব নয়। লীগ অব নেশন্‌স্ মোটের উপর এই প্রভু শক্তিদেরই প্রতীক, কাজেই সে বর্তমান অবস্থাটাকেই টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা-চুক্তি, 'আক্রমণকারী' জাতির সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা, এর সব কিছুই আসলে করা হচ্ছে বর্তমান অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে। যাই কেন না ঘটুক, লীগ যে কটি দেশের ইঙ্গিতে চলছে তাদের মধ্যে কাউকে 'আক্রমণকারী' বলে ঘোষণা লীগ কিছুতেই করবে না; সর্বদাই এমন চাল দিয়ে চলবে যেন অন্য পক্ষকেই 'আক্রমণকারী' বলে ঘোষণা করা যায়।

শান্তিকামীরা এবং অন্য যারা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারণ করতে চায় তারা এই-সব নিরাপত্তা চুক্তিকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে; তার দরুন এক অর্থে এরা এই অন্যায় 'বর্তমান ব্যবস্থা'কেই

টিকিয়ে রাখবার সাহায্য করছে। আর ইউরোপেরই যদি এই অবস্থা, এশিয়া আর আফ্রিকার সম্বন্ধে তো একথা আরও বেশি করে খাটে, কারণ এখানে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঞ্চল দখল করে বসে আছে। এশিয়া আর আফ্রিকাতে 'বর্তমান অবস্থা' অক্ষুণ্ণ রাখার মানে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণকেই টিকিয়ে রাখা।

এই 'বর্তমান অবস্থা'কে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ পর্যন্ত ইউরোপের কারও সঙ্গে কোনোরকম মৈত্রী বা প্রতিশ্রুতির জালে নিজেকে জড়ায় নি।

নিরস্ত্রীকরণের জন্য সব রকমের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যর্থতাই ভালোভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে আজকালকার আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি কতোটা কৃত্রিম ও অসার। প্রত্যেকেই শান্তির কথা বলছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনও করছে। কেলগ-ব্রায়াঁ চুক্তি যুদ্ধকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু কেইবা উহা এখন মনে করে বা কেইবা উহার জন্য মাথা ঘামায়?

মন্তব্য :—নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উত্থাপিত জর্মানির প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যাত হল এবং ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে জর্মানি ঐ সম্মেলন বর্জন করে বেরিয়ে এল, লীগের সদস্যপদেও ইস্তফা দিল। তখন থেকে সে লীগের বাইরেই আছে। জাপানও মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে লীগ ত্যাগ করেছে, এবং আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করাতে লীগ যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে তার দরুন ইতালি লীগ বর্জন করেছে। তাই, তিনটি বড়ো বড়ো শক্তিই লীগের বাইরে আছে—এরূপ অবস্থায় লীগের ব্যবস্থাপনায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোনও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বস্তুত, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের স্বল্প পরেই সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে অস্ত্র-সজ্জার আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। জর্মানি এক বিরাট সৈন্য ও বিমানবাহিনী গড়ে তুলতে লেগে গেল; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরাপর দেশগুলি অতিরিক্ত অস্ত্র-সজ্জার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করল।

১৯২

পরিত্রাতা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৩

এই কাহিনী শেষ করবার আগে (শেষ করতে আর দেরিও এবার বেশি করা যাচ্ছে না) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আর এক নজর তাকিয়ে নাও। সেখানে এখন একটা প্রকাণ্ড এবং চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা চলছে, সমস্ত পৃথিবীও একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ ধনিকতন্ত্র ভবিষ্যতে কোন্ পথে চলবে সেটা নির্ভর করবে এরই ফলের উপরে। ধনিকতন্ত্রী দেশদের মধ্যে আমেরিকা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি সামনে এগিয়ে গেছে; তারই টাকা সকলের চেয়ে বেশি। তার শিল্পকৌশলও অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। অন্য কোনো দেশের কাছেই তার একপয়সা ঋণ নেই, যেটুকু ঋণ আছে সে শুধু তার নিজের প্রজাদেরই কাছে। তার রপ্তানি বাণিজ্যও প্রচুর, দিন দিন তার পরিমাণ আরও বেড়েই চলেছে। অথচ সে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল তার বিরাট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ (শতকরা ১৫ ভাগের মতো) মাত্র। আয়তনে দেশটা ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমান : কিন্তু এদের মধ্যে একটা বড়ো তফাৎ আছে। ইউরোপ অনেকগুলো ছোটো ছোটো দেশে বিভক্ত, তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের সীমান্তদ্বারে অতি উচ্চ শুল্কপ্রাচীর বসিয়ে রেখেছে; যুক্তরাষ্ট্রে তার নিজের এলাকার মধ্যে বাণিজ্যের পথে এরকম কোনো বাধারই অস্তিত্ব নেই। অতএব ইউরোপের তুলনায় আমেরিকাতে বিরাট একটা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য গড়ে তোলা অনেক বেশি সহজ ছিল। ইউরোপের দেশগুলো দরিদ্র হয়ে

পড়েছে, ঋণভারে তারা জর্জরিত; আমেরিকার মতো এই সুবিধাগুলোও তাদের ছিল না। আমেরিকার ছিল প্রচুর সোনা, প্রচুর টাকা, প্রচুর পণ্যসামগ্রী।

কিন্তু এত সব থাকা সত্ত্বেও ধনিকতন্ত্রের সংকট তাকেও অব্যাহতি দিল না, তার সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমেরিকান জাতির প্রাণশক্তি আর কর্মোদ্যমের অবধি ছিল না, তারা হয়ে উঠল অন্ধ অদৃষ্টবাদী। দেশ হিসাবে আমেরিকা তখনও দরিদ্র নয়, তার টাকাকড়ি কিছুই দেশ থেকে উড়ে যায় নি। কিন্তু সে টাকাকড়ি গিয়ে স্তূপীকৃত হল অল্প দু'চারটি মানুষের হাতে। নিউইয়র্কে তখনও কোটিপতিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে; প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কপতি জে পিয়ের-পণ্ট্ মর্গ্যান তখনও তাঁর নিজস্ব প্রমোদ-তরণীতে বিলাস-ভ্রমণ বন্ধ করেন নি—শোনা যায় সে জাহাজটির দাম পড়েছিল ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড। অথচ সেই নিউইয়র্ককে সম্প্রতি বলা হয়েছে 'ক্ষুধার্তদের শহর'। চিকাগো প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরেরও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কার্যত দেউলিয়া হয়ে গেছে, হাজার হাজার কর্মচারীকে মাইনে দিতে পারছে না। আবার সেই চিকাগোতেই এখন একটি বিরাট প্রদর্শনী বা 'বিশ্ব-মেলা' চলছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে "প্রগতির শতাব্দী"।

ঐশ্বর্য আর দৈন্যের এই পাশাপাশি সমন্বয় শুধু যে আমেরিকাতেই দেখা যাচ্ছে তা নয়। লণ্ডনে যাও, দেখবে ব্রিটেনের উচ্চতর শ্রেণীদের অজস্র অর্থ আর বিলাসের প্রমাণ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে, অবশ্য গরিবদের বস্তিগুলো বাদে। আবার যাও ল্যাংকাশায়ারে, যাও ইংলণ্ডের উত্তর বা মধ্য-অঞ্চলে, যাও ওয়েল্‌স্ এবং স্কটল্যাণ্ডের কতকগুলো অংশে, দেখবে বুভুক্ষু বেকার বাহিনীর দীর্ঘ সারি, দেখবে মানুষের শুষ্ক বিবর্ণ মুখ, দেখবে মানুষের জীবনযাত্রার চরম দুর্ব্যবস্থা।

আমেরিকাতে গত ক'বছরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছে, সে হচ্ছে অপরাধ-অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি, বিশেষ করে 'দলবদ্ধ' অপরাধ—এক-একদল গুণ্ডা একত্র মিলে কাজ চালায়, তাদের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে এলে অনেক সময়েই গুলি ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলে। অনেকে বলেন, মাদক পানীয় বিক্রি করা নিষিদ্ধ করে আইন রচিত হয়েছিল, তার পর থেকেই নাকি অপরাধের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধের অল্পদিন পরেই এই 'মদ্যপান-নিষেধ' বিধিটিকে আইনে পরিণত করা হয়। এই আইনটির মূলে খুব উৎসাহ ছিল বড়ো বড়ো কারখানার মালিক-দের; তাঁরা চেয়েছিলেন যেন তাঁদের শ্রমিকরা মদ খেতে না পায়, কারণ তা হলেই তারা কাজ ভালো করতে পারবে। কিন্তু ধনীরা নিজেরা এই আইনকে অগ্রাহ্য করে চললেন, বিদেশ থেকে বেআইনিভাবে মদ আমদানি করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে দেশে মদ বিক্রির প্রকাণ্ড একটা বেআইনি ব্যবসা গড়ে উঠল। এই ব্যবসার নাম ছিল 'বুট-লেগিং'; এরা অন্য দেশ থেকে চোরাই পথে মদ ও সুরাসার নিয়ে আসত, দেশের মধ্যেও গোপনে এসব তৈরি করত। সাধারণত আসল জিনিসটির তুলনায় এই গোপনে তৈরি করা মাল হত অনেক খারাপ এবং অনেক বেশি ক্ষতিকর। এই-সব পানীয় অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হত, যেখানে এ-সব পাওয়া যেত তার নাম ছিল 'স্পীক-ইজি'। আমেরিকার প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরেই এই রকমের হাজার হাজার গোপন পানশালা গজিয়ে উঠল। অবশ্য এর সমস্তটাই বেআইনি ব্যাপার, অতএব এই ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য পুলিশ এবং রাষ্ট্রধুরন্ধরদের ঘুষ খাইয়ে বা ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হত। আইনকে এমন ব্যাপকভাবে অগ্রাহ্য করে চলবার ব্যবস্থা হয়ে গেল, তার ফলে দলবদ্ধ দস্যুবৃত্তিও ক্রমেই বেড়ে চলল। অতএব 'মদ্য-পান নিষেধের' ফলে একদিকে যেমন শ্রমিক এবং গ্রাম্য-অধিবাসীদের কল্যাণ হল, অন্য দিকে তেমনই দেশের বিরাট একটা ক্ষতিও এরই ফলে হয়ে গেল, একটা অত্যন্ত শক্তিশালী চোরাই ব্যবসায়ীর দল গড়ে উঠল। সমস্ত দেশটাই তখন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল : একদল রইল মদ্যপান নিষেধের পক্ষে, এদের নাম হল 'শুক্‌নো'দের দল; অন্য দিকে রইল নিষেধ-বিরোধীরা, তাদের নাম হল 'ভিজে'দের দল।

দলবদ্ধ দস্যুদের অনুষ্ঠিত অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ভয়াবহ হচ্ছে শিশুচুরি : ধনীদের ছোটো ছোটো শিশুসন্তানকে এরা চুরি করে নিয়ে যায়, তাদের আট্‌কে রেখে মুক্তিপণ আদায় করে। কিছু কাল আগে লিণ্ড্‌বার্গের শিশু পুত্রকে এরা এইভাবে চুরি করেছে

এবং তারপর নৃশংসভাবে হত্যা করেছে—সে হত্যার বিবরণ শুনে পৃথিবীসুদ্ধ লোক আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল।

একদিকে এই-সব ব্যাপার, অন্যদিকে বাণিজ্য-সংকট, তার উপর আবার দেখা গেল, দেশের বড়ো বড়ো সরকারি কর্মচারী আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতিপরায়ণ এবং অযোগ্য ব্যক্তি : এই-সব দেখে শুনে আমেরিকার লোকেরা একেবারেই দিশাহারা হয়ে পড়ল। ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে এল প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন। এই নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ লোক রুজভেল্টের পক্ষ অবলম্বন করল; তাদের আশা, রুজভেল্টই এই বিপদে তাদের ত্রাণ করতে পারবেন। রুজভেল্ট একজন 'ডিজে'; ডেমোক্রাটিক দলের লোক তিনি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আসনে এই দলের সভ্য অতি অল্পই এ পর্যন্ত বসেছে।

দুটি ভিন্ন দেশের অবস্থা তুলনা করে দেখবার মধ্যে আনন্দ আছে, তাতে অবস্থাটা বুঝবারও সুবিধা হয়; অবশ্য দুই দেশের নিজস্ব বিশেষত্বগুলোকে মনে করে রেখে তবেই তুলনা করা চলবে। এই জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে যে-সব ব্যাপার সম্প্রতি ঘটেছে তাকে জর্মানি এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে লোভ হয়। জর্মানির সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের সাদৃশ্য বেশি, কারণ দুটি দেশই শিল্প-প্রচেষ্টার দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত, অথচ দুটি দেশেই কৃষিজীবির সংখ্যা বিরাট। জর্মানির মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২৫ জন কৃষক; যুক্তরাষ্ট্রে এদের পরিমাণ শতকরা ৪০ জন। এদের জাতীয় নীতি স্থির করবার ব্যাপারে এই কৃষকদের কথা স্মরণ রেখে চলতে হয়। ইংলণ্ডে তা নয়, সেখানে কৃষকদের আনুপাতিক সংখ্যা অতি অল্প, অতএব তাদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপই করে না; যদিও এখন আবার এদের নূতন করে বাঁচিয়ে তোলবার কিছু কিছু চেষ্টা চলছে।

জর্মানিতে নাৎসী আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ছিল বিত্তহারা নিম্নতর মধ্যবিত্ত লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি; জর্মানির মুদ্রাস্ফীতির পরেই এদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। জর্মানিতে এই শ্রেণীটাই বিপ্লবীপন্থী হয়ে উঠেছিল। আমেরিকাতেও ঠিক এই শ্রেণীটাই এখন বেড়ে উঠছে, এদের বলা হয় "শাদা-কলারওয়ালা প্রোলেটারিয়াট্"; এই নাম দিয়ে এদের শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত প্রোলেটারিয়েট থেকে আলাদা করে বোঝানো হয়, কারণ তারা সাদা-কলার পরবার মতো বাবুয়ানা প্রায়ই করতে পারে না।

অন্যান্য যে-সব ব্যাপারে এদের মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় সে হচ্ছে, মুদ্রা-সংকট, মার্ক পাউণ্ড আর ডলারের স্বর্ণমূল্য থেকে বিচ্যুতি এবং মুদ্রাস্ফীতি, আর ব্যাঙ্ক ফেলের হিড়িক। ইংলণ্ডে কোনো ব্যাঙ্ক ফেল হয়নি, কারণ সেটা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের দেশ নয়, তার ব্যাঙ্কসংক্রান্ত ব্যবসায় সবখানিই চলছে কয়েকটি মাত্র অতি বৃহৎ ব্যাঙ্কের হাতে। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে এই তিনটি দেশে ঘটনার স্রোত একই ভাবে বয়ে চলেছে; সংকটের ধাক্কা প্রথম লাগল জর্মানিতে, তারপর ইংলণ্ডে, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে। জর্মানিতে নাৎসীরা জয়লাভ করেছে, ব্রিটেনে ১৯৩১ সনের নির্বাচনে জাতীয় সরকার জয়লাভ করেছেন, ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে রুজভেল্ট নির্বাচনে জিতেছেন; তিনটি দেশেই মোটামুটি একই শ্রেণীর লোকরা এ'দের পিছনে থেকে এ'দের সাহায্য করেছে। এই শ্রেণীটি হচ্ছে নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আগে এ'দের অনেকেই অন্যান্য দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই তুলনাকে খুব বেশিদূর টেনে নেওয়া চলবে না; এ'দের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ আছে বলেই শুধু নয়, জর্মানিতে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার অবস্থা এখনও ততদূর পরিণতি লাভ করেনি বলেও। কিন্তু এর মধ্যে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, এই তিনটি দেশই শিল্পপ্রচেষ্টার দিক থেকে অত্যন্ত অগ্রবর্তী দেশ; ঠিক একই রকমের কতকগুলো অর্থনৈতিক প্রভাব এই তিন দেশেই কাজ করছে; অতএব এদের যে ফল দেখা যাবে তার মধ্যেও সাদৃশ্য না থেকে পারে না। ফ্রান্স (বা অন্য কোনো দেশ) সম্বন্ধে এই কথাটি এতখানি প্রযোজ্য নয়, কারণ ফ্রান্স এদের তুলনায় এখনও অনেক বেশি কৃষিপ্রধান, শিল্পপ্রচেষ্টার দিক থেকে অনেক কম উন্নত দেশ।

১৯৩৩ সনে মার্চ মাসের প্রথম দিকে রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে প্রচণ্ড একটি ব্যাঙ্ক-সংকট দেখা দিল। বাণিজ্য-সংকট তো

চলছিলই, তার উপরে এটা এল ফাউ। এর কয়েক সপ্তাহ পরে রুজভেল্ট, তিনি যখন কার্যভার গ্রহণ করলেন দেশের তখন কী অবস্থা ছিল তার একটা বর্ণনা দিলেন, বললেন দেশটা তখন 'তিলে তিলে মারা যাচ্ছিল'।

রুজভেল্ট অবিলম্বে কাজে লেগে গেলেন, দ্রুত এবং নিশ্চিত তাঁর কর্মনীতি। আমেরিকার কংগ্রেসের কাছে তিনি এমন ক্ষমতা চাইলেন যার দ্বারা ব্যাঙ্ক, শিল্প এবং কৃষিকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। কংগ্রেস সংকটের ধাক্কায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, তার উপর আবার রুজভেল্টের প্রতি দেশের লোকেরও এতখানি আস্থা; ভেবেচিন্তে কংগ্রেস রুজভেল্টকে তাঁর প্রার্থিত ক্ষমতা দিয়ে দিল। রুজভেল্ট বস্তুত হয়ে উঠলেন দেশের ডিক্‌টেটর (অবশ্য প্রজাতন্ত্রী), দেশের প্রত্যেকটি প্রজা আশাভরা চক্ষু মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল, তিনি অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, সর্বনাশ থেকে তাদের রক্ষা করুন। রুজভেল্ট সত্যই বিদ্যুতের বেগে কাজ শুরু করে দিলেন; কয়েকটি মাত্র সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ দেখে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের তন্দ্রা ছুটে গেল; তাঁর উপরে যে শ্রদ্ধা লোকের ছিল সেটাও বহুগুণে বেড়ে গেল।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে বহুবিধ সিদ্ধান্ত স্থির করলেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল :

১। স্বর্ণমান তিনি ছেড়ে দিলেন, ডলারের দামকে নেমে যেতে দিলেন; এর ফলে খাতকদের ঋণের বোঝা কমে গেল। এটা একটা মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপার।

২। সরকারি অর্থ সাহায্য দিয়ে কৃষকদের দুর্দশার প্রতিকার করলেন; কৃষিকে অর্থ সাহায্য দেবার জন্য প্রকাণ্ড একটা ঋণ তোলবার ব্যবস্থা করলেন—এই ঋণের পরিমাণ ২,০০,০০,০০,০০০ ডলার।

৩। বন-বিভাগের জন্য এবং বন্যা-নিবারক কাজের জন্য অবিলম্বে ২,৫০,০০০ শ্রমিককে কাজে ভর্তি করে নিলেন। এটা করা হল বেকার-সমস্যাকে একটুখানি কমিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে।

৪। বেকারদের সাহায্য করবার জন্য তিনি কংগ্রেসের কাছে ৮০,০০,০০,০০০ ডলার চাইলেন। কংগ্রেস টাকা মঞ্জুর করল।

৫। লোককে চাকরি দিয়ে পোষবার উদ্দেশ্যে সরকারি কাজকর্ম করাবেন বলে তিনি একটি বিরাট পরিমাণ টাকা আলাদা করে রাখলেন। এই টাকার পরিমাণ প্রায় ৩,০০,০০,০০,০০০ ডলার, এই টাকাটা ধার করে তুলতে হবে।

৬। 'মদ্য-পান নিষেধ' আইনটিকে তিনি খুব তাড়াতাড়ি করে নাকচ করিয়ে দিলেন।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সবটাই যোগাড় করতে হবে ধনীদের কাছে ধার করে। রুজভেল্টের সমগ্র নীতিটাই ছিল, এবং এখনও হচ্ছে, প্রজাদের ক্রয়-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা; তাদের হাতে টাকা থাকলে তারা জিনিস কিনবে, বাণিজ্য-সংকট নিজে থেকেই কমে আসবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরকারি কাজকর্মের পরিকল্পনা খাড়া করছেন, সেখানে শ্রমিকরা কাজ পাবে, টাকা আয় করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি খাটুনির সময় কমিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। দিনপ্রতি খাটুনির মেয়াদ কমিয়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে আরও বেশি করে লোকের চাকরি হওয়া।

সংকট এবং মন্দার সময়ে কারখানার মালিকরা সাধারণত যে রীতি অবলম্বন করে থাকেন, রুজভেল্টের এই নীতিটি ঠিক তার বিপরীত। এরা প্রায় সর্বত্রই চেষ্টা করে বেতনের হার কমিয়ে দিতে এবং কাজের সময় বাড়িয়ে দিতে, যেন তার ফলে পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় আরও কমানো যায়। রুজভেল্ট কিন্তু বলছেন, প্রচুর পরিমাণ পণ্য-উৎপাদন যদি আবার আরম্ভ করতে চাই, তবে আমাদের সে পণ্য কিনবার সামর্থ্যও জনসাধারণকে যুগিয়ে দিতে হবে; সেটা করার উপায় হচ্ছে ব্যাপক ভাবেই উচ্চহারের বেতন বিতরণ করা।

রুজভেল্ট-সরকার সোভিয়েট রাশিয়াকেও একটি ঋণ দিয়েছেন, সেই টাকায় সে আমেরিকার তুলা কিনবে। এই দুটি দেশের মধ্যে বৃহৎ-পরিমাণে পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা নিয়েও এই দুটি সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে।

আমেরিকা এতদিন ছিল খাঁটি ধনিকতন্ত্রী দেশ, সম্পূর্ণ এবং অবাধ প্রতিযোগিতার

ক্ষেত্র—যাকে বলে 'ব্যক্তিতন্ত্রী' দেশ। রুজভেল্টের নূতন কর্মনীতিটা এর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, কারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তিনি নানা রকমেই হস্তক্ষেপ করছেন। কার্যত তিনি শিল্প-ব্যবসায়ের উপরে রাষ্ট্রের অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রবর্তন করছেন, অবশ্য তিনি নিজে একে অন্য নামে অভিহিত করেন। আসলে এটা খানিকটা রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্র : শ্রমের সময় এবং রীতি নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া, শিল্প-ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত করা, 'গলা-কাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বন্ধ করা। রুজভেল্ট একে বলেছেন "সকলে একত্র হয়ে পরিকল্পনা খাড়া করা, এবং সে পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা"।

আমেরিকার জাতীয় বিশেষত্ব তার উৎসাহ এবং উদ্যম, এই কাজেও তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শিশু-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের এই হিসাবে শিশু বলে গণ্য করা হবে)। বেশি বেতন দাও—এই হচ্ছে তার ধ্বনি : বেতন বাড়ানো চাই, কাজের সময় কমানো চাই। এই অভিযানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সমৃদ্ধির অভিযান'; শোনা যাচ্ছে সমস্ত দেশটাই নাকি এই অভিযানে সৈনিক সংগ্রহের বিরাট বিজ্ঞাপন-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এরোপ্লেনগুলি দেশের সর্বত্র ছুটোছুটি করে মালিকদের এবং অন্যদের প্রতি আবেদন প্রচার করছে। বড়ো বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটিকেই আলাদাভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজস্ব একটা 'কর্মসূচী' স্থির করতে বলা হচ্ছে; এই কর্মসূচীতে উচ্চতর বেতনের হার ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা থাকবে, এবং একে কার্যে পরিণত করবার জন্য প্রতিষ্ঠান নিজেই দায়ী থাকবে। খুব নম্রভাষায় একটু শাসানিও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, উচিতমতো একটা কর্মসূচী যদি তাঁরা নিজেরা খাড়া করতে না পারেন, তবে অগত্যা সরকার নিজেই তাঁদের হয়ে সেটা তৈরি করে দেবেন। মালিকদের ব্যক্তিগতভাবে একটা করে প্রতিশ্রুতি পত্রে সই করতে বলা হচ্ছে, তাতে তাঁদের কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন বাড়াবেন, কাজের সময় কমিয়ে দেবেন, এই মর্মের প্রতিশ্রুতি লেখা আছে। যে মালিকরা এই ব্যাপারে নিজে থেকেই অগ্রণী হয়ে আসবেন, সরকারের অভিপ্রায় আছে তাঁদের একটা করে সম্মানসূচক পদক দিয়ে দেবেন; যাঁরা পিছনে সরে থাকবেন তাদের লজ্জা দেবার জন্য এই সম্মানিত ব্যক্তিদের নামের একটা তালিকা প্রত্যেক শহরের ডাকঘরে টাঙানো থাকবে।

এই-সব আয়োজনের ফলে পণ্যমূল্যে এবং বাণিজ্যের খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সত্যকার উন্নতি মনোবলের উন্নতি। পরাজয়ের চেতনা যেটা দেখা দিয়েছিল তার অনেকখানিই অন্তর্হিত হয়ে গেছে; জনসাধারণের মনে এবং বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতি একটা অগাধ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছে। ইতিমধ্যেই এরা তাঁর তুলনা করছে আমেরিকার জাতীয় মহাবীর প্রেসিডেন্ট লিংকনের সঙ্গে; রুজভেল্টেরই মতো তিনিও কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন একটি প্রচণ্ড সংকটের মুহূর্তে—গৃহযুদ্ধের মাঝখানে।

ইউরোপে পর্যন্ত বহু লোক রুজভেল্টের দিকে তাকিয়ে রইল, আশা করতে লাগল, সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনিই এসে সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু নিখিল-বিশ্ব অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁর উপরে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। তার কারণ, রুজভেল্ট তাঁর প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ডলারের মূল্য সোনার দরে বেঁধে দিতে যেন তাঁরা অস্বীকার করেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর যে-সব প্রকাণ্ড পরিকল্পনা রয়েছে তার কোনো-রকম ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন কোনো ব্যাপারে যেন সম্মতি না দেন।

রুজভেল্টের নীতিটি নিঃসংশয়েই অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদের নীতি; আমেরিকার অবস্থার উন্নতি ঘটাবেনই এই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ইউরোপের কোনো কোনো দেশ এটাকে পছন্দ করছে না; বিশেষ করে ফ্রান্সের ব্যাংকওয়ালারা এর উপরে বিশেষ বিরক্ত। ব্রিটিশ সরকার রুজভেল্টের প্রগতিপন্থী প্রবৃত্তি অনুমোদন করেন না। তাঁরা চান বৃহৎ ব্যবসা।

অথচ বিশ্ব-রাজনীতির ব্যাপারেও তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের তুলনায় রুজভেল্ট অনেকখানি বেশি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট এবং অগ্রগতিপন্থী।

হিটলারকে তিনি অতি ভদ্রভাষায় যে সাবধানবাক্য শুনিয়ে দিয়েছিলেন, তার ফলেই হিটলার তাঁর তর্জন-গর্জন কমিয়ে ফেলেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও তিনি সংগ্রব স্থাপন করছেন।

আমেরিকাতে, এবং অন্যত্রও যে বৃহৎ প্রশ্নটি আজকাল মানুষের মনে জেগে উঠেছে সে হচ্ছে; রুজভেল্টের চেষ্টা কি সফল হবে? ধনিকতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখবার জন্য একটা বীরোচিত চেষ্টাই তিনি করছেন। কিন্তু তাঁর সাফল্যের মানে হবে, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সিংহাসনচ্যুতি; বৃহৎ ব্যবসায়ীরা সেটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমেরিকার বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরই আধুনিক জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কায়েমী-স্বার্থের দল বলে লোকে জানে। শুধুমাত্র প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের হুকুম শুনে এরা এদের সমস্ত ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না। আপাতত এরা চুপ করে আছে, কারণ জনমতের গতি এবং প্রেসিডেণ্টের জনপ্রিয়তা দেখে এরা একটু ভড়কে গেছে। কিন্তু এরাও সুযোগেরই অপেক্ষায় রয়েছে। আর মাসকয়েকের মধ্যে যদি অবস্থার বড়ো রকম উন্নতি কিছু না দেখা যায়, তবে তখন জনমত রুজভেল্টের প্রতি বিমুখই হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে; বৃহৎ ব্যবসায়ীরাও তখনই স্বমূর্তি ধারণ করবে।

বিজ্ঞব্যক্তিরা অনেকে বলছেন, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অসম্ভবের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন, এ ব্রত তাঁর কিছুতেই সফল হতে পারে না। যদি বিফল হন, তবে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা আবার প্রধান হয়ে উঠবে, হয়তো আগের চেয়েও তাদের শক্তি এবারে বেড়ে যাবে। তার কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন রুজভেল্ট করেছেন, সেইটাকেই তখন বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যক্তিগত লাভ আহরণের কাজে লাগাবে। আমেরিকাতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল নয়, তাকে সহজেই বিচূর্ণ করে দেওয়া যাবে।

মন্তব্য:—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সংকট থেকে মুক্ত হবার ও ধনতান্ত্রিকতাকে নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চালাবার যে প্রচেষ্টা করেছেন তা আংশিকভাবে সফল হয়েছে, যদিও কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। মূলতঃ এই প্রচেষ্টার ভিত্তিতে ছিল সাহায্যদানের (রিলিফ) বিরাট পরিকল্পনা ও মালিকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজের সময় কমিয়ে বেশী বেতন এবং কারখানার লাভের অংশ কর্মচারীদের দিতে রাজী করানো। মালিকগণ, বিশেষতঃ ফোর্ড, এটাকে তাদের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে প্রতিরোধ করল। শিল্প ও কৃষির জন্য বিধিবন্ধ আইন (Codes) ব্যর্থ হয়ে গেল এবং অনেক ধর্মঘট হল। কিন্তু আমেরিকার শ্রমিকদল অধিকতর শক্তিশালী ও সংঘ-সচেতন হয়ে উঠল এবং একটা নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হল। শ্রমিক-সংঘের (Trade Unions) সভ্যসংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। অর্থ-নৈতিক সংস্থার পুনরুন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো শিল্প-বাণিজ্যের মালিকগণ অধিকতর মারমুখো হয়ে উঠল ও রুজভেল্টকে প্রতিরোধ করল। জাতীয় পুনরুত্থান আইন (National Recovery Act) ও কৃষিসংক্রান্ত-সামঞ্জস্য বিধান আইন (Agricultural Adjustment Act) নামক রুজভেল্ট কর্তৃক বিধিবন্ধ প্রধান ধারা দুটির কার্যকরী উপধারাগুলির প্রায় সব-কটিকেই সর্বপ্রধান বিচারালয় (Supreme Court) শাসনতন্ত্রবিরোধী বলে ঘোষণা করাতে সেগুলো অকেজো হয়ে গেল। এভাবেই রুজভেল্টের 'নববিধান' (New Deal) ব্যর্থ হল।

১৯৩৬ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে রুজভেল্ট দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। বড়ো বড়ো শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব এখনও চলছে। কংগ্রেস আর এখন তাঁর প্রভাবের আওতায় নেই, বহু ব্যাপারেই কংগ্রেস তাঁর বিরোধিতা করছে।

পার্লামেন্টী রীতির ব্যর্থতা

৬ই আগস্ট, ১৯৩৩

সম্প্রতি যে-সব ব্যাপার ঘটেছে আমরা তার একটু বিশদ আলোচনাই করলাম; আমাদের এই পরিবর্তনশীল জগৎকে এখনকার দিনে রূপ দিচ্ছে যে-সব শক্তি এবং প্রবৃত্তি, তারও অনেক-গুলোর কথা বিচার করে দেখলাম। এর মধ্যে যে তথ্যগুলো বড়ো হয়ে চোখে পড়ে তার মধ্যে দুটি বস্তু আছে—তাদের নাম আমি আগেই করেছি, তবু তাদের নিয়ে আরও একটু আলোচনা করা দরকার। এই দুটির একটি হচ্ছে যুদ্ধোত্তর যুগে শ্রমিক আন্দোলন এবং প্রাচীন ধরণের সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা; অন্যটি হচ্ছে পার্লামেন্টদের ব্যর্থতা বা বলহানি।

১৯১৪ সনে বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল, শ্রমিক সংগঠনগুলোর শক্তিও তখন হ্রাস পেয়ে গেল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে টুক্‌রো হয়ে গেল—এর কথা তোমাকে বলেছি। এর মূলে ছিল যুদ্ধের আকস্মিক আবির্ভাব; সে সময়ে মানুষের মনে একটা হিংস্র জাতীয় উন্মাদনা জেগে ওঠে, ক্ষণিক একটা উন্মত্ততা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। গত চার বছরে আবার আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে, সেটা এর চেয়ে একেবারেই অন্য বস্তু, এবং এর চেয়েও বেশি শেখবার জিনিস তার মধ্যে আছে। এই চার বছর ধরে পৃথিবী জুড়ে চলছে বাণিজ্য-সংকট; ধনিকতন্ত্রী পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড়ো সংকট আর কখনও দেখা যায় নি। এরই ফলে শ্রমিকদেরও দৈন্য আর দুর্দশা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ এই সংকটের আঘাতে শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে কোনো সত্যকার বিপ্লব-চেতনা জেগে ওঠে নি; সর্বত্র এবং ব্যাপকভাবে তো নয়ই। বিশেষ করে ইংলণ্ডে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এর কোনোই আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

পুরোনো ধরনের ধনিকতন্ত্রের ভাঙন ধরেছে, সেটা সুস্পষ্ট। বাইরে থেকে দেখে যতদূর মনে হয়, পৃথিবীর অবস্থাটা সমাজতন্ত্রী রীতি প্রবর্তনের সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি কামনা করবার কথা যে মানুষদের, মানে শ্রমিকরা তাদেরই অধিকাংশের মনে বিপ্লব ঘটাবার কোনো ইচ্ছা নেই। এদের চেয়ে বরং বিপ্লব-কামনা বেশি প্রখর দেখা যাচ্ছে আমেরিকার রক্ষণপন্থী কৃষকদের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে প্রায় সব দেশেরই নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্যে; শ্রমিকদের তুলনায় এদেরই আগ্রহ-উদ্যম অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে এটা জর্মানিতে; কিন্তু এর সাক্ষাৎ ইংলণ্ডে, যুক্তরাষ্ট্রে, এবং অন্যান্য দেশেও পাচ্ছি, অবশ্য কিছু কম পরিমাণে। আগ্রহের মাত্রার তফাৎ এদের মধ্যে আছে, তার কারণ এদের প্রত্যেকের জাতিগত বিশেষত্ব; সংকটের রূপ সকল দেশে সমান নয়, সেটাও এর একটা হেতু।

যুদ্ধের পর প্রথম কটা বছর শ্রমিকদের মধ্যে যে উগ্র আগ্রহ, যে বিপ্লববুদ্ধি দেখেছিলাম, সেটা গেল কোথায়? শ্রমিকরা কেন এমন নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে গেছে, ভাগ্যে যা আছে তাকেই বিনা তর্কে মেনে নিতে রাজি হয়ে যাচ্ছে? জর্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল কেন আত্মরক্ষার একটু চেষ্টাও না করে ভেঙে পড়ে গেল, নাৎসিরা তাদের চূর্ণ করে দিচ্ছে দেখেও তার প্রতিবাদ মাত্র করল না? ইংলণ্ডের শ্রমিকরা কেন এমন নরমপন্থী আর প্রগতিবিরোধী হয়ে উঠেছে? আমেরিকার শ্রমিকরা সে বিদ্যায় কেন এদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে? অনেকে শ্রমিক-নেতাদেরই দোষ দেন; বলেন তারা অক্ষম, তারাই শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তাদের অনেকে সত্যই এই দোষে অপরাধী সন্দেহ নেই; এরা সুবিধা পেলেই দলত্যাগ করছে, শ্রমিক আন্দোলনটাকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির একটা সোপানস্বরূপ ব্যবহার করছে—এটা খুবই দুঃখের কথা। মানুষের প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক ব্যাপারেই সুবিধাবাদীদের দর্শন মেলে; কিন্তু যেখানে সেই সুবিধাবাদের মানে হচ্ছে পদপিষ্ট দুর্দশাক্লিষ্ট লক্ষ কোটি মানুষের আশা আদর্শ আর আত্মোৎ-

সর্গকে নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজে লাগিয়ে নেওয়া, মানুষের ইতিহাসে তার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্যের কাহিনী বেশি নেই।

নেতাদের হয়তো দোষ আছে। কিন্তু নেতারা তো বর্তমান অবস্থারই সৃষ্টিমাত্র। সাধারণত দেখা যায়, দেশের প্রকৃতি অনুসারে যেমন শাসক তার উপযুক্ত তেমনিতর শাসকই তার ভাগ্যে এসে জোটে; আন্দোলনের নেতা হয়ে বসেন যাঁরা, বিশ্লেষণ করলে শেষপর্যন্ত দেখা যাবে সেই আন্দোলনের সত্যকার কামনা তাঁদেরই মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আসল কথা, এই-সব সাম্রাজ্য-বাদী দেশের শ্রমিক নেতারা বা তাঁদের অনুগামীরা, কেউই এ'রা সমাজতন্ত্রবাদকে একটা জীবন্ত মতবাদ বলে গ্রহণ করেন নি, অবিলম্বে একে আয়ত্ত করা চাই এমন কামনাও তাঁদের মনে জাগে নি। এ'দের উচ্চারিত সমাজতন্ত্রবাদ ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার সঙ্গে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছিল, মিশে গিয়েছিল। উপনিবেশে যে শোষণ চলছে তার লাভের একটা ক্ষুদ্র অংশ এদের হাতেও এসে পৌঁছত; জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করবার ব্যাপারে এরা সেই ধনিকতন্ত্রের অস্তিত্বের উপরেই ভরসা করে থাকত। সমাজতন্ত্রবাদ এদের পক্ষে হল একটা দূরবর্তী আদর্শ, একটা স্বপ্নের স্বর্গলোক,—সে ভবিষ্যতের বস্তু, বর্তমানের নয়। স্বর্গের সেই প্রাচীন কল্পনারই মতো এর নামটাও হয়ে উঠল ধনিকতন্ত্রীদেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায়।

এইজন্যই এই-সমস্ত শ্রমিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানরা সকলেই শুধু সংস্কার-সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়েই খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে রইল, ধনিকতন্ত্রের কাঠামোর গায়ে কোথাও একটুকু হস্তক্ষেপ করল না। এদের সে আদর্শবাদ কোথায় হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; এরা ক্রমে পরিণত হল শুধু বিরাট বিরাট দপ্তরপন্থী প্রতিষ্ঠানে, তার প্রাণ বলে কিছু নেই, বিরাট দেহটার কোথাও এতটুকু সত্যকার শক্তি নেই।

নবজাত কমিউনিস্ট দলের অবস্থা ছিল অন্যরকম। শ্রমিকদের জন্য একটি নূতন বাণী এরা বহন করে এনেছিল, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার যোগ অনেক বেশি, তার আহ্বানের জোরও অনেক বেশি প্রচণ্ড। সে বাণীর পিছনেও ছিল একটি চিত্তাকর্ষক পশ্চাৎপট—সোভিয়েট ইউনিয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ তবুও এই আহ্বানে সাড়া প্রায় মিললই না। ইউরোপ বা আমেরিকার শ্রমিক জনসাধারণ এর দিকে আকৃষ্ট হল না। ইংলণ্ডে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রতিষ্ঠা আশ্চর্যরকম অল্প। জর্মনিতে এবং ফ্রান্সে কিছুটা প্রতিষ্ঠা এর মিলল; কিন্তু জর্মনিতে অন্তত তার দরুন সিদ্ধিলাভ এর কী সামান্য ঘটল তার বিবরণ আমরা দেখেছি। আন্তর্জাতিক কিস্তৃতির দিক থেকে দুটি প্রকাণ্ড পরাজয় এর ঘটেছে, একবার চীনে ১৯২৭ সনে, আর একবার জর্মনিতে ১৯৩৩ সনে। অথচ এই বাণিজ্য-মন্দার যুগে, যখন পৃথিবীতে বারবার করে সংকট ঘটছে, শ্রমিকরা অল্প মাইনে পাচ্ছে, বেকার হয়ে থাকছে, এই সময়েও কমিউনিস্ট দল কিছু করে উঠতে পারল না কেন? কেন, সেটা বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, এর জন্য দায়ী শুধু তাদেরই চালের ভুল, কর্মনীতির ভুল পন্থা। অন্যরা বলেন, কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের সম্পর্ক বড়ো বেশি নিবিড় ছিল; তাই যতখানি আন্তর্জাতিক রূপ এদের কর্মনীতির থাকা উচিত ছিল সেটা হয় নি, সে কর্মনীতির মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করেছে সোভিয়েটেরই নিজস্ব জাতীয় কূটনীতি। হতে পারে, কিন্তু তবুও একে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে মনে করা কঠিন।

কমিউনিস্ট দল বলতে যা বোঝায়, শ্রমিকদের মধ্যে তার তেমন প্রতিষ্ঠা ঘটল না। কিন্তু কমিউনিজমের মতবাদগুলো ব্যাপকভাবেই ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের মধ্যে। পৃথিবীর সর্বত্র, এমনকি ধনিকতন্ত্রের যারা সমর্থক তাদের মনেও, একটা প্রত্যাশা বা একটা ভয় জেগে উঠেছিল, এই সংকটের ফলে হয়তো কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। পুরোনো ধরনের ধনিকতন্ত্রের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, একথা সকলেই বুঝতে পারছিল। নিজস্ব ধনসংগ্রহের এই রীতি, ব্যক্তিগত লাভান্বেষণের এই নীতি, যার কোথাও কোনো সুসংহত পরিকল্পনা নেই, অপচয় বিরোধ আর থেকে থেকে সংকটের আবির্ভাবই যার বিশেষত্ব, একে এবার

যেতেই হবে। এর জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কোনো প্রকারের একটা সুপরিকল্পিত সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা বা সমবায়-ব্যবস্থা। তার মানে এ নয় যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্যও হতেই হবে; কারণ মালিক শ্রেণীদের কল্যাণার্থেই একটা আধা-সমাজতন্ত্রী রূপ দিয়েও রাষ্ট্রকে গড়ে নেওয়া যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্র আর রাষ্ট্রায়ত্ত ধনিকতন্ত্র আসলে প্রায় একই বস্তু; আসল কথাটা হচ্ছে, সে রাষ্ট্রকে চালাচ্ছে কে, তার থেকে লাভই বা হচ্ছে কার—সমগ্র সমাজের, না বিশেষ একটা মালিক শ্রেণীর।

বুদ্ধিজীবীরা এই-সব তর্কবিতর্ক করতে লাগলেন; এদিকে পাশ্চাত্ত্য জগতের শিল্পতন্ত্রী দেশগুলোতে নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা বা ক্ষুদে বুর্জোয়ারা কাজে নেমে গেল। এই শ্রেণীগুলোর মনে একটা অস্পষ্টরকম ধারণা ছিল যে ধনিকতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্রীরা তাদের শুষে নিচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে কিরকম একটা বিদ্রোহের ভাবও তাদের মনে ছিল। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বেশী ভয় করত তারা শ্রমিক শ্রেণীকে, কমিউনিস্টরা যদি ক্ষমতা দখল করে বসে, তখন কী হবে? এই-যে ফ্যাসিজ্‌মের ঢেউ জাগল, ধনিকরা সাধারণত এর সঙ্গেই একটা মিটমাট করে নিল; কারণ তারা বুঝতে পারছিল কমিউনিজ্‌মের প্লাবনকে ঠেকিয়ে দেবার এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। কমিউনিজ্‌মের ভয়ে যারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, ক্রমে ক্রমে তাদের প্রায় সকলেই এসে এই ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করল। এইভাবে, যেখানেই ধনিকতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে, কমিউনিজ্‌মের আবির্ভাব বা তার সম্ভাবনাকে আসন্ন বলে জেনেছে, সেখানেই ফ্যাসিজ্‌ম্‌ অল্প বা বিস্তর পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে পার্লামেণ্টী শাসনরীতি ভেঙেচুরে খান খান হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

চিঠির গোড়াতে দ্বিতীয় যে বৃহৎ ব্যাপারটির কথা বলেছিলাম, এই থেকেই তার কথাও এসে পড়ছে : সে হচ্ছে পার্লামেণ্টগুলোর ব্যর্থতা বা বলহানি। ডিক্‌টেটরি শাসন এবং প্রাচীন-ধরনের গণতন্ত্রের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আগের চিঠিগুলোতে অনেক কথা তোমাকে বলেছি। এটা খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে রাশিয়াতে, ইতালিতে, মধ্য-ইউরোপে। জর্মনিতেও এখন এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে; সেখানে নাৎসীরা শাসনক্ষমতা দখল করে বসবার অনেক আগেই পার্লামেণ্টী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। আমরা দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের হাতে কংগ্রেস একেবারে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে পর্যন্ত এই ব্যাপার দেখা দিয়েছে; ইউরোপের মধ্যে এই দুটি দেশেই গণতন্ত্র সবচেয়ে দীর্ঘদিন এবং সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে টিকে ছিল। ইংলণ্ডের অবস্থাটা দেখা যাক।

ইংরেজদের কাজকর্মের রীতি-নীতি ইউরোপ মহাদেশের রীতিনীতির চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা সবসময়েই পুরোনো ঢংটাকে লোকচক্ষে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে; তার ফলে দেশের মধ্যে কোথাও পরিবর্তন ঘটেছে সেটাও বাইরে থেকে বিশেষ বোঝা যায় না। সাধারণ দৃষ্টিতে যে দেখছে তার মনে হবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আগে যেমন ছিল এখনও তাইই আছে। আসলে কিন্তু এর পরিবর্তন হয়েছে অনেকখানি। আগের দিনে হাউজ অব কমন্‌স্‌ সরাসরিই কর্তৃত্ব করত; তার সাধারণ সভ্যদেরও কথার অনেকখানি দাম ছিল। আর এখন মন্ত্রীসভা বা সরকারপক্ষই প্রত্যেকটি বৃহৎ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির করেন, হাউজ অব কমন্‌স্‌ শুধু সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 'হাঁ' বা 'না' বলবার অধিকারী। অবশ্য 'না' বলে সরকারপক্ষকে গদি থেকে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু সেটা একটা অতি প্রচণ্ড ব্যাপার। অতদূর যেতে হাউজ প্রায়ই চায় না, কারণ সে করতে গেলে নানারকম হাঙ্গামার সৃষ্টি হবে, নূতন করে সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত করতে হবে। কাজেই সরকারপক্ষের যদি হাউজ অব কমন্‌সের মধ্যে একটা সংখ্যাধিক্য থাকে, তবে সে প্রায় যা তার ইচ্ছা তাইই করে বেড়াতে পারে, তার সে কাজে হাউজের সম্মতি আদায় করতে পারে এবং এইভাবে সে কাজটাকে আইনসঙ্গত করে নিতে পারে। অতএব দেখছ সত্যিকার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার হাত থেকে স্খলিত হয়ে শাসনবিভাগের হাতে চলে গিয়েছে, এখনও যাচ্ছে।

তার উপরে আবার, পার্লামেণ্টের কাজের চাপ আজকাল এত বেড়ে গেছে, এত অসংখ্য জটিল সমস্যার সমাধান তাকে করতে হচ্ছে, যে পার্লামেণ্টে কাজের একটা নূতন রীতিই এখন

দাঁড়িয়ে গেছে : যে-কোনো ব্যবস্থা বা আইনের শুধু মূল নীতিগুলোই পার্লামেণ্ট নিজে স্থির করে দিচ্ছে, খুঁটিনাটিগুলো সম্পূর্ণ করে নেবার ভার ছেড়ে দিচ্ছে শাসনবিভাগের বা তার বিশেষ কোনো শাখা-বিভাগের হাতে। এর ফলে শাসনবিভাগের হাতে বিপুল ক্ষমতা এসে পড়েছে, সংকটের মুহূর্তে সে এখন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামতোই কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর কার্যাবলীর সঙ্গে পার্লামেণ্টের সম্পর্ক এইভাবে ক্রমেই আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে। এর প্রধান কর্তব্য এখন কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে শুধু সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করা, প্রশ্ন এবং তথ্য জিজ্ঞাসা করা, আর সরকারপক্ষ সাধারণ যে নীতি ধরে চলেছেন তাকে শেষ-পর্যন্ত অনুমোদন করা। হ্যারল্ড জে লাস্কি বলেছেন : "আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাটা এখন পরিণত হয়েছে শাসনবিভাগের ডিক্‌টেটরিতে; পার্লামেণ্ট বিদ্রোহ করতে পারে এই ভয়েই সে যা একটু সংযত হয়ে থাকছে।"

১৯৩১ সনের আগস্ট মাসে শ্রমিক মন্ত্রীসভা হঠাৎ ভেঙে গেল; এমন অদ্ভুত উপায়ে এটা ঘটানো হল যে তাই থেকেই বোঝা যায় পার্লামেণ্টের এ-ব্যাপারে হাত কত সামান্য ছিল। সাধারণত ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে, হাউজ অব কমন্‌সে সে ভোটে হেরে গেছে বলে। ১৯৩১ সনে হাউজের সামনে কোনো কথাই তোলা হল না এ নিয়ে, কী ঘটছে তাও কেউ জানত না, ক্যাবিনেটের নিজের সভ্যদেরও অনেকেই নয়। প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে খানিক গোপন পরামর্শ করলেন; এঁরা গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করলেন; তার পরই ব্যস, পুরোনো মন্ত্রীসভা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, নূতন একটি মন্ত্রীসভার নাম সংবাদপত্রে ঘোষণা করে দেওয়া হল! পুরোনো মন্ত্রীসভার কোনোকোনো সভ্য সংবাদপত্র পড়েই এই-সব ব্যাপারের কথা প্রথম জানতে পারলেন। এর সমস্তটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত গণতন্ত্রবিরোধী ব্যাপার; শেষপর্যন্ত হাউজ অব কমনস্‌ এটাকে অনুমোদন করেছিল, কিন্তু তাই বলেই সেকথাটা মিথ্যা হয়ে যাবে না। গণতন্ত্র নয়, এটা ছিল ডিক্‌টেটরি শাসনের রীতি।

শ্রমিক মন্ত্রীসভা রাতারাতি সরে গিয়ে তার জায়গাতে এল একটি 'জাতীয় মন্ত্রীসভা'; রক্ষণশীলদের হল তাতে প্রাধান্য, এবং জনকয়েক উদারনৈতিক ও শ্রমিকদলের লোক এই দলে ভিড়িয়ে দিয়ে এটাতে জাতীয় রং ফলানোর চেষ্টা করা হল। যদিও শ্রমিকদল র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ডকে দল থেকে বহিষ্কৃত করে, নেতারূপে মেনে নিতে অস্বীকার করল, তবু তিনিই রইলেন প্রধানমন্ত্রী। 'জাতীয় সরকার' বলতে শুধু বোঝায় এমন একটা সরকারকে, যার মধ্যে বিত্তশালী শ্রেণীরা, সম্পত্তির মালিকরা, সকলেই তাদের মধ্যেকার মতবিরোধ পরিত্যাগ করে এসে একত্রিত হয়েছে, সমাজতন্ত্রী পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে দেবার জন্য। সে সমাজতন্ত্রী পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি ব্যাপক হয়ে পড়বে, মালিক শ্রেণীদের প্রতিষ্ঠাকে বিপন্ন করে তুলবে, বা তাদের উপরে অত্যন্ত ভারী একটা বোঝা চাপিয়ে দেবে এই আশঙ্কা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই হয় এই ধরনের জাতীয় সরকারের সৃষ্টি। ১৯৩১ সনের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে এই অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল : এমন একটা সংকটের সৃষ্টি তখন হল যার ধাক্কায় শেষপর্যন্ত পাউণ্ড সোনা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল; এবং এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ধনিকতন্ত্রীরা তাদের সবখানি শক্তি নিয়ে দল বেঁধে দাঁড়াল সমাজতন্ত্রকে রুখবার জন্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত জনসাধারণকে এরা ভয় দেখাল, শ্রমিকরা যদি জেতে তবে তাদের যার যা কিছু সঞ্চয় আছে সমস্তই হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই ভয়ে এই ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণী একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল, জাতীয় সরকার বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। ম্যাকডোনাল্ড আর তাঁর দলবলরা লোককে বোঝালেন এই জাতীয় সরকার যদি না থাকে তবে কমিউনিজ্‌মের হাত থেকে দেশের আর অব্যাহতি নেই।

এমনি করে ইংলণ্ডেও পুরোনো দিনের গণতন্ত্রে ভাঙন লেগেছে, পার্লামেণ্ট দিন দিন ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়ছে। মানুষকে উত্তেজিত উন্মত্ত করে তোলে এমন কোনো গভীর সংকট, যেমন ধর্ম নিয়ে বিরোধ, বা জাতি এবং গোষ্ঠীগত বিরোধ (আর্য জর্মন বনাম ইহুদি), সর্বোপরি অর্থনৈতিক বিরোধ (আছেদের আর নেইদের মধ্যে),—যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই

গণতন্ত্রের গাড়ি উল্‌টে পড়ে যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা মনে করে দেখো: ১৯১৪ সনে যখন আল্‌স্টার আর বাকি আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে ধর্ম ও জাতিগত বিরোধ শুরু হল, ব্রিটেনের রক্ষণপন্থী দল পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্তও মেনে নিতে সাফ অস্বীকার করে বসল, এমনকি গৃহযুদ্ধেও উস্কানি দিতে লাগল। এইই হয়; বাইরের দৃষ্টিতে যেটা গণতন্ত্রী রীতিপদ্ধতি সেটা দিয়ে যতক্ষণ মালিক শ্রেণীদের প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে ততদিন তারাও নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার খাতিরেই একে ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু সে-গণতন্ত্র যখন ব্যাঘাত ঘটায়, তাদের যে-সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আর স্বার্থ আছে তার পরিপন্থী হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই তারা তাকে পরিত্যাগ করে, ডিক্‌টেটরি রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। ভবিষ্যতে কোনোদিন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সাধনের স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করে বসবে এমন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। সেদিন যদি সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কায়েমী-স্বার্থের উপরে আঘাত হানতে চেষ্টা করে, তবে সে স্বার্থের মালিকরা হয়তো খোদ পার্লামেণ্টকেই অগ্রাহ্য করে চলবে, বা তার সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশে বিদ্রোহ পর্যন্ত উস্‌কে তুলতে চেষ্টা করবে—১৯১৪ সনে আল্‌স্টারের ব্যাপার নিয়ে ঠিক তাইই তারা করেছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পার্লামেণ্ট এবং গণতন্ত্র যতক্ষণ বর্তমান অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখবার সহায়ক, ততক্ষণই শুধু মালিক শ্রেণীরা তাকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। অবশ্য এই গণতন্ত্র সত্যকার গণতন্ত্র নয়; এ শুধু গণতন্ত্র-বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণতন্ত্রী মতামতের অপব্যবহার। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবসর আসে নি, কারণ ধনিকতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মধ্যে মূলতই একটা বিরোধ রয়েছে। গণতন্ত্রের যদি কোনো অর্থ থাকে তবে সে অর্থ হচ্ছে সাম্য; কেবল ভোট দেবার সমান অধিকার নয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনেই সকল মানুষের সমান অধিকার। আর ধনিকতন্ত্র হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত; সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা অল্প কজন লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে। তারা নিজেরা একটা বিশেষ সুবিধার আসন দখল করে বসে আছে, সেই আসনকে নিরাপদ রাখবার জন্যই তারা আইন তৈরি করে; সে আইন যে ভাঙবে সেই গণ্য হবে আইন এবং শৃঙ্খলার বিঘ্নকারী বলে, সমাজের কাছে সে শাস্তি পেতে বাধ্য। এই ব্যবস্থার কোনোখানেই সাম্যের স্থান নেই; মানুষকে যেটুকু স্বাধীনতা এখানে দেওয়া হয় তারও সীমা ধনিকতন্ত্রী আইনকানুনের দ্বারাই নির্দিষ্ট; সে আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনিকতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা।

ধনিকতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মধ্যে এই বিরোধ এদের প্রকৃতিগত এবং চিরন্তন বস্তু; বিভ্রান্ত-কারী প্রচারবাণী আর পার্লামেণ্ট ইত্যাদি গণতন্ত্রের বাহ্যিক অনুষ্ঠান দিয়ে একে অনেকসময়ে প্রচ্ছন্ন করে রাখা হয়—মালিক শ্রেণীরা অন্যান্য শ্রেণীদের দিকে এক আধ টুক্‌রো রুটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাই দিয়েই তাদের অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট করে রাখে। কিন্তু তার পর এমন একটা সময় আসে যখন তাদের হাতেও আর ছুঁড়ে দেবার মতো রুটি অবশিষ্ট নেই, এই দুই দলের মধ্যে বিরোধটাও তখন চরমে ওঠে, কারণ এবার সংগ্রাম আসল জিনিসটিকেই নিয়ে, রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক আধিপত্য নিয়ে। সেই অবস্থাটি যখন আসে, তখন ধনিকতন্ত্রের সমর্থকরা, যারা এত দিন বহু বিভিন্ন দলকে নিয়ে খেলা করে এসেছে, সবাই মিলে একত্র দল বেঁধে দাঁড়ায়—তাদের সকলেরই সকল কায়েমী-স্বার্থের যে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছে তাকে রুখতে চেষ্টা করে। উদারপন্থী দল এবং এদের অনুরূপ সব দলই অন্তর্হিত হয়ে যায়; গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও বাতিল করে দেওয়া হয়। ইউরোপ আর আমেরিকাতে এখন এই অবস্থাটিই এসে উপস্থিত হয়েছে; ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এই অবস্থাটিরই প্রতীক—অধিকাংশ দেশই কোনো না কোনোরূপে সে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে বসেছে। শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বত্র এখন নিছক আত্মরক্ষার জন্যই লড়তে হচ্ছে, ধনিকতন্ত্র তার সবখানি শক্তি সংহত করে রুখে দাঁড়িয়েছে, তার সে নূতন এবং প্রবল সংহতির সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতো শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর নেই। অথচ আশ্চর্যের কথা, সে ধনিকতন্ত্র নিজেও টলমল করছে, নূতন জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এটা প্রায় নিশ্চিত,

এবারকার এই যুদ্ধের পরে যদি সে বেঁচেও থাকে, তাও সে থাকবে অনেকখানি পরিবর্তিত এবং অনেকখানি কঠোরতর রূপ নিয়ে। এবং সেটাও আবার স্বভাবতই হবে এই দীর্ঘ সংগ্রামেরই আরেকটি নূতনতর অধ্যায়ের সূচনামাত্র। ধনিকতন্ত্রের রূপ যে দেশে যেমনই হোক না কেন, তার আমলে যে শিল্পপ্রচেষ্টা, মানুষের যে জীবনধারা আধুনিক কালে চলেছে, তার সমস্তটাই একটা বিরাট রণক্ষেত্র : যেখানে দুই পক্ষের বাহিনীর মধ্যে ক্রমাগত সংগ্রাম চলেছে।

অনেকে ভাবেন, অল্প কয়েকজন করে বিচক্ষণ ব্যক্তির হাতে যদি এক-একটা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হত, তবে এই সমস্ত অশান্তি বিরোধ ও দুঃখ কষ্ট কিছুই আর পৃথিবীতে থাকত না। ভাবেন, এই সমস্ত-কিছুরই মূলে রয়েছে শুধু রাজনীতিবিদ আর রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের বোকামি বা বজ্জাতি। এঁদের ধারণা, সাধু পুরুষেরা যদি শুধু একবার এসে একত্র হন, তবে নীতিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে এবং তাদের রীতিনীতির ভুল কোথায় সেটা দেখিয়ে দিয়েই এই দুর্বৃত্তদের এঁরা অনায়াসে শুধরে নিতে পারতেন। কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা; দোষ মানুষের নয়, দোষ হচ্ছে ব্যবস্থার—এই ব্যবস্থাটাই ভুল। সে ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এই লোকগুলোও এখন যেমনভাবে চলছে তেমনিভাবেই চলতে বাধ্য হবে। একটা জাতির উপরে আরেকটা বিদেশী জাতি এসে রাজত্ব করে; একই জাতির মধ্যেও একটা অর্থনৈতিক শ্রেণী অন্য শ্রেণীদের উপরে প্রভুত্ব করে। কিন্তু যেখানেই একটা দল এইভাবে একটা প্রভুত্ব বা প্রতিষ্ঠার আসন দখল করে বসেছে, সেইখানেই দেখা যাচ্ছে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং ভণ্ডামির ক্ষমতা এদের অসাধারণ—যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজেকেই এরা বুঝিয়ে দেয়, যে বিশেষ সুযোগগুলো তারা ভোগ করছে সেগুলো তাদেরই বিশেষ গুণপনার ন্যায্য পুরস্কার মাত্র। এই কথাতে যদি কেউ আপত্তি করে, তবেই বুঝতে হবে সে ব্যক্তি একটা অত্যন্ত পাজি ছুঁচো বদমায়েস লোক; সমাজের গোছানো ঘরকে অগোছালো করে দেওয়াই তার মতলব। প্রভুত্ব অধিকার করে বসেছে যে মানুষের দল, তার সে সুযোগ-সুবিধাগুলো সে অন্যায় করে ভোগ করছে, সেগুলো তার শান্তশিষ্টভাবেই ছেড়ে দেওয়া উচিত, এমন কথা তাকে বিশ্বাস করানো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এক আধজন ব্যক্তিকে হয়তো-বা একথা বোঝানো যেতে পারে, গেলেও সে অতি ক্বচিৎ; কিন্তু দলসুদ্ধকে? কিছুতেই না। অতএব বাধে সংঘাত বাধে সংগ্রাম, আসে বিপ্লব, মানুষের উপরে নেমে আসে দুঃখ আর দুর্দশার অফুরন্ত বর্ষণ।

১৯৪

পৃথিবীর দিকে একটা শেষ নজর

৭ই আগস্ট, ১৯৩৩

কলম কাগজ আর কালি যতক্ষণ না ফুরোচ্ছে ততক্ষণ চিঠি লেখার শেষ নেই। আর জগতের ঘটনা নিয়ে লেখারও কোনোদিনই শেষ হয় না, কারণ জগৎটা আমাদের ক্রমাগত চলছে তো চলছেই, তার পুরুষ নারী আর শিশুরাও হাসছে কাঁদছে, পরস্পরকে ভালোবাসছে ঘৃণা করছে, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে, তারও কোনো অবসান নেই। এই কাহিনী অবিশ্রাম বয়ে চলেছে, এর শেষ কোনোদিন হবে না। আর এই যে যুগটিতে আমরা এখন বাস করছি, এর জীবনধারাও যেন আগের চেয়ে ক্রমেই আরও দ্রুততর বেগে ছুটে চলেছে, দ্রুততর হচ্ছে এর পায়ের তাল, একের পর এক করে পরিবর্তনও ক্রমাগতই ঘটে চলেছে। এর কথা লিখতে লিখতে এর অবস্থা আবার বদলে যাচ্ছে, আজ যা লিখছি কাল হয়তো সেটা হয়ে যাবে পুরোনো কাহিনী, বহু দূরের খবর, হয়তো বা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। জীবনের নদী কখনোই থেমে দাঁড়ায় না; ক্রমাগতই বয়ে চলে সে : এক-এক সময় আবার হুড়মুড় করে সামনে ছুটে যায় এখন যেমন যাচ্ছে—তখন তার

দয়া নেই মায়া নেই, তার মধ্যে জেগে ওঠে দৈত্যের মতো শক্তি, তার সে স্রোতের মুখে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা আর কামনা কোথায় তলিয়ে যায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র অস্তিত্বগুলো তার কাছে হয় একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের সামগ্রী, তার সেই উন্মত্ত আবর্ত তৃণখণ্ডের মতোই আমাদের নিয়ে লোফালুফি করতে থাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে তার ধারা ছুটে চলতে থাকে কোথায় কে জানে—হয়তো গিয়ে পৌঁছবে একটা পাহাড়ের খাদের গায়ে, তার পর পাথরের ঘায়ে হাজার টুকরো হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়বে; হয়তো বা গিয়ে মিশবে অসীম সমুদ্রে: অনন্ত রহস্যময়, ভীষণ গম্ভীর অথচ প্রশান্ত, নিত্য পরিবর্তনশীল অথচ পরিবর্তনহীন সে কালসমুদ্র।

যতটুকু কথা তোমাকে লেখবার ইচ্ছা ছিল, বা যতটুকু লেখা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কথা আমি ইতিমধ্যেই তোমাকে লিখে ফেলেছি। কী করব, কলমটাই ছুটে চলেছে, থামতে চায় নি। ইতিহাসের অনন্ত প্রান্তরে আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ সম্পূর্ণ হল, তার শেষ দীর্ঘযাত্রাটিও আমরা শেষ করেছি। আজকের দিনেই এসে পৌঁছেছি আমরা, এসে দাঁড়িয়েছি আগামী কালের দরজায়; অবাক হয়ে ভাবছি সে কাল যখন আবার আজ হয়ে যাবে তখন তাকে দেখতে কেমন হবে কে জানে। এবার একটুখানি থামা যাক, পৃথিবীর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখি। কী খবর আছে এই পৃথিবীর আজকের দিনে, এই উনিশ-শো তেত্রিশ সনের সাতই আগস্ট তারিখে?

ভারতবর্ষে দেখছি, গান্ধীজি আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, দণ্ডিত হয়েছেন, যারবেদা জেলে ফিরে এসেছেন। আইন-অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হয়েছে, অবশ্য একটু সংযত রূপে। আমাদের সহকর্মীরা আবার জেলে যাচ্ছেন। আমাদের একজন বীর এবং প্রিয় সহকর্মী যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এইমাত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, ব্রিটিশ সরকারের বন্দী হিসাবেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। আমারও বন্ধু ছিলেন তিনি, পঁচিশ বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমি কেম্‌ব্রিজে নূতন গিয়েছি। জীবনের ধারা মিলিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে, কিন্তু ভারতের জনগণের জীবনকে সত্যিকার জীবন করে গড়ে তোলবার বিরাট সাধনা আজও সমানেই চলেছে। ভারতমাতার হাজার হাজার পুত্র আর কন্যা, তাঁর সমস্ত সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাণশক্তিতে, এবং বহুক্ষেত্রে গুণেও সর্বোত্তম, তারা পচে মরছে জেলখানায় বন্দীশালায়; যে বর্তমান ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে তার সঙ্গে সংগ্রাম করতেই তাদের যৌবন, তাদের কর্মশক্তি এরা নিঃশেষে ঢেলে দিচ্ছে। এদের এই জীবন, এদের এই কর্মশক্তি, এ হয়তো গড়ে তোলার কাজেই লাগতে পারত, লাগত জগৎকে গঠনের কর্তব্যে : কাজের তো অন্ত নেই এ পৃথিবীতে। কিন্তু সে গঠনের আগে আনতে হবে ধ্বংসকে, যেন জমি সাফ হয়ে যায়, নূতন যে ইমারত গড়ে তুলব আমরা, তার স্থান হয় তৈরি। ভাঙা বস্তির মাটির দেওয়ালের মাথায় তো মনোরম অট্টালিকা গড়ে তোলা সম্ভব নয়! ভারতবর্ষে আজ কী অবস্থা চলেছে একটিমাত্র কথা থেকেই সেটা ভালো বুঝতে পারবে : বাঙলাদেশের কোনো কোনো জায়গাতে মানুষ কী পোশাক পরবে সেটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হচ্ছে সরকারি হুকুমের দ্বারা, অন্যরকম পোশাক পরলে তার শাস্তি কারাদণ্ড। চট্টগ্রামে বারো বছর বা তার উপরে যাদের বয়স, সেই ছোটো ছোটো ছেলেদের পর্যন্ত (হয়তো-বা মেয়েদেরও) যেখানেই যাক সর্বত্র একটা পরিচয়-পত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পৃথিবীর আর কোথাও, এমনকি নাৎসী-শাসিত জর্মনিতে, বা শত্রু-সৈন্য দ্বারা অধিকৃত যুদ্ধ-রত দেশেও, কোনোদিন এমন অদ্ভুত আদেশ জারি করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। ব্রিটিশ শাসনে আমরা পরিণত হয়েছি একটা কয়েদী-জাতিতে, ছুটির-ছাড়পত্র নিয়ে যেন চলাফেরা করছি, যখন খুশি সে ছাড়পত্র বাতিল হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঠিক ওপারেই আমাদের প্রতিবেশীদের ব্রিটিশ বিমানবাহিনী বোমা ফেলে বধ করছে।

আমাদের দেশবাসী যাঁরা অন্যান্য দেশে রয়েছেন তাঁদেরও প্রতি সেখানে কেউ সম্ভ্রম দেখায় না, ভদ্র অভ্যর্থনাটুকু পর্যন্ত তাঁরা পাচ্ছেন না কোথাও। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে : নিজের গৃহে যাদের সম্ভ্রম নেই অন্যের বাড়িতে তাঁরা সম্ভ্রম পাবেন কী করে? দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের : সেই দেশেই তাঁরা জন্মেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন; সে দেশের বহু জায়গা, অন্তত নাটালের বহু অঞ্চল, তাঁরাই নিজের শ্রম ঢেলে গড়ে তুলেছেন। বর্ণ-

বৈষম্য, জাতি-বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত, সমস্ত এসে একত্র মিলেছে দক্ষিণ-আফ্রিকার এই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে; এ'রা এখন সেখানে সমাজচ্যুত, এ'দের গৃহ নেই, আশ্রয় নেই। দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বলছেন, এদের এখন জাহাজে করে সেদেশ থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে—ব্রিটিশ গায়নাতে, বা ভারতেই আবার ফিরে যেতে পারে এরা, বা অন্য যে-কোনো-স্থানে। সেখানে গিয়ে এদের অনাহারে মরা ছাড়া পথ থাকবে না, তা হোক, দক্ষিণ-আফ্রিকার সে নিয়ে মাথাব্যথা নেই—শুধু দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে এরা চিরদিনের মতো চলে গেলেই হল।

পূর্ব-আফ্রিকাতে, কেনিয়া এবং তার চারপাশের অঞ্চলগুলি গড়ে তোলার মধ্যে ভারতীয়দের অনেকখানিই কৃতিত্ব ছিল। এখন আর সেখানে তাদের স্থান নেই : আফ্রিকাবাসীরা তাদের উপরে বিরূপ বলে নয়, সেখানকার মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় বাগানওয়ালারা তাদের থাকতে দিতে আপত্তি বলে। সেখানকার সবচেয়ে ভালো ভালো জায়গাগুলো, উঁচু জমিগুলো, আলাদা করে রাখা হয়েছে এই বাগানওয়ালাদের জন্য; আফ্রিকাবাসী বা ভারতবাসীরা সেখানে জমি নিতে পারে না। আফ্রিকাবাসীদের অবস্থা আরও অনেক খারাপ। গোড়াতে সমস্ত জমিই ছিল তাদের, জমিই ছিল তাদের একমাত্র আয়ের উপায়। তার পর তাদের বিপুল পরিমাণ জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিলেন; ইউরোপীয় আগন্তুকদের বিনামূল্যে জমি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে এই আগন্তুকরা বা বাগানওয়ালারাই সেদেশের বড়ো বড়ো ভূস্বামী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়কর দিত না এরা, অন্য কোনো করও প্রায়ই দিত না। রাজকরের প্রায় সমস্ত বোঝাটাই গিয়ে পড়ত দরিদ্র পদানত আফ্রিকাবাসীদের মাথায়। কিন্তু আফ্রিকাবাসীর কাছ থেকে কর আদায় করা কঠিন, কারণ তার সম্পত্তি বলে কিছুই নেই। কর বসানো হত তার জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিসের উপরে, যেমন আটাময়দা এবং কাপড়ের উপরে; এই-সব কিনতে গেলেই তাকে পরোক্ষভাবে কর দিতে হত। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত কর যেটা বসানো হল সে হচ্ছে কুটির এবং মাথার উপরে একটা প্রত্যক্ষ কর : ষোলো বছরের বেশি যার বয়স এমন প্রত্যেক পুরুষ এবং তার পোষ্য পরিবারবর্গের উপরে এই কর ধার্য হত—নারীরাও রেহাই পেত না। কর নির্ধারণের নীতি হচ্ছে, মানুষের যে সম্পত্তি বা আয় আছে, কর ধরা হবে তারই উপরে। আফ্রিকাবাসীদের তো সম্পত্তি বলে কিছু নেই, অতএব তার দেহের উপরেই কর ধার্য করা হল! কিন্তু পয়সাই যদি তার না থাকে, তবে বছরে জনপিছু বারো শিলিং করে এই জিজিয়া কর সে আদায় দেবে কোথা থেকে? এইখানেই ছিল এই করটির আসল ধূর্তামি : করের চাপে বাধ্য হয়েই তাদের টাকা আয় করতে হত, টাকার জন্য ইউরোপীয় বাসিন্দাদের বাগানে কাজ করতে হত, নইলে কর দেওয়া যায় না। এটা শুধু টাকা পাবার ফিকির নয়, বাগানের জন্য সস্তায় মজুর পাবারও ফিকির। এই হতভাগ্য আফ্রিকাবাসীদের অনেক সময়ে বহু দূর দেশ পার হয়ে আসতে হত—সাত শো আট শো মাইল দূরবর্তী মফঃস্বল অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে এরা চলে আসত সমুদ্রকূলের বাগানে কাজ করতে (সে দেশের মফঃস্বল অঞ্চলে কোনো রেলওয়ে নেই, সমুদ্রকূলের কাছাকাছি জায়গাতে শুধু সামান্য খানিকটা আছে), কর দেবার জন্য টাকা আয় করতে।

এই হতভাগ্য শোষিত আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই তোমাকে বলতে পারি, বাইরের জগতের কানে তাদের আর্তনাদ কী করে পৌঁছাতে হয় সেটুকু পর্যন্ত এদের জানা নেই। এদের দুঃখের কাহিনী অতি দীর্ঘ, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে সে দুঃখ এরা বহন করে চলেছে। নিজেদের ভালো ভালো জমিগুলো থেকে বিতাড়িত হয়ে, সেই জমিতেই আবার তাদের ফিরে আসতে হল ইউরোপীয়দের প্রজা রূপে। এই আফ্রিকাবাসীদেরই জমি কেড়ে নিয়ে তাদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল। মনিব হিসাবে এই ইউরোপীয় ভূস্বামীরা আধা সামন্ততন্ত্রী; এদের যাতে অপছন্দ এমন প্রত্যেকটি কার্যকলাপকেই এরা বন্ধ করে দিয়েছে। আফ্রিকাবাসীদের কোনোরকম সংঘ বা সমিতি গড়বার অধিকার নেই, এমনকি শাসন-সংস্কার নিয়ে আলোচনা করবার জন্য পর্যন্ত নয়—কারণ কোনো রকম চাঁদা তোলাই তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। নৃত্যকে পর্যন্ত বেআইনি ঘোষণা করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে, কারণ আফ্রিকাবাসীরা অনেকসময় তাদের গানে এবং নাচে ইউরোপীয়দের নৃত্যভঙ্গির ব্যঙ্গ-অনুকরণ করত, তাকে নিয়ে কৌতুক করত। কৃষকরা অত্যন্ত

দরিদ্র, চা বা কফির চাষ করতে তারা পারে না, কারণ তাতে ইউরোপীয় বাগানওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে।

তিন বছর আগে ব্রিটিশ সরকার খুব গুরুগম্ভীরভাবে ঘোষণা করেছিলেন, আফ্রিকাবাসীদের তাঁরাই অভিভাবক রইলেন, ভবিষ্যতে আর তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হবে না। কিন্তু আফ্রিকাবাসীদেরই কপাল খারাপ, গত বৎসর কেনিয়াতে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব সরকারের সে মহান প্রতিশ্রুতির কথা কেউই আর মনে রাখল না; ইউরোপীয় বাগানওয়ালারা ছুটোছুটি কাড়াকাড়ি করে সে জমি দখল করে বসল, আফ্রিকাবাসী কৃষকদের তাড়িয়ে দিয়ে সোনার সন্ধানে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতির এইই হচ্ছে দাম। এখন শুনছি, এর ফলে শেষপর্যন্ত নাকি আফ্রিকাবাসীদেরই লাভ হবে, জমি হারাবার ফলে তাদের চিত্তের সুখ মনের শান্তি দুইই অনেক বেড়ে গেছে।

স্বর্ণ-খনি অঞ্চলে কাজ চালাবার এই ধনিকতন্ত্রী পদ্ধতিটা একেবারেই অদ্ভুত। একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে কতকগুলো লোককে সত্যিই দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হতে হয়, প্রত্যেকে এই অঞ্চলটির একটি করে অংশ দখল করে বসে, সেখানে সোনা খুঁজতে লেগে যায়। সেই জমির টুকরোটিতে অনেকখানি সোনা পেয়ে যাবে কি মোটেই পাবে না, সেটা তার নিজের বরাত। এই পদ্ধতিটা ধনিকতন্ত্রেরই খাঁটি অনুরূপ। স্বর্ণ-খনি অঞ্চলে কাজ চালাবার একমাত্র সুষ্ঠু উপায় হচ্ছে দেশের সরকারেরই সে অঞ্চলটিকে নিজের আয়ত্ত করে নেওয়া এবং সমগ্র রাষ্ট্রের হয়ে সোনা খুঁড়ে তোলা। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তাজিকিস্তানে এবং অন্যত্র যে-সব স্বর্ণ-খনি আছে, সোভিয়েট সরকার সেখানে ঠিক এইভাবেই কাজ চালাচ্ছেন।

আমাদের এই সর্বশেষ কাহিনীতে কেনিয়া সম্বন্ধে খানিকটা কথা তোমাকে বললাম, তার কারণ এই চিঠিগুলোতে আফ্রিকার কথা আমি কিছুই বলি নি। আফ্রিকা বিশাল মহাদেশ, বহু আফ্রিকাবাসী জাতিতে ভরা। শত শত বৎসর ধরে বিদেশীরা এদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে এসেছে, এখনও করছে। সভ্যতার দিক থেকে আফ্রিকাবাসীরা ভয়ানক পিছিয়ে আছে। কিন্তু জোর করেই দাবিয়ে রাখা হয়েছে এদের, সামনে এগিয়ে চলার কোনো সুযোগই কোনোদিন দেওয়া হয় নি। সে সুযোগ যেখানে পেয়েছে, সেখানে আশ্চর্য উন্নতিও এরা দেখিয়েছে—পশ্চিম-উপকূল-দেশে সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, সেইখানেই এর দৃষ্টান্ত মিলবে।

পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলোর সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথাই বলেছি। সেখানে এবং মিশরে স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলেছে, এক-এক স্থানে তার এক-এক রূপ এবং স্তর দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বৃহত্তর ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার কথাও তাই—এর মধ্যে আছে, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, ডাচ ইণ্ডিজ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। শ্যাম স্বাধীন দেশ; একমাত্র তাকে বাদ দিলে এদের সর্বত্রই এই সংগ্রামের দুটো দিক চোখে পড়বে : একদিকে বিদেশী শাসন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টা, আর একদিকে সমাজে সমান অধিকার বা অন্তত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কামনা করে পদপিষ্ট শ্রেণীদের সংগ্রাম।

এশিয়ার দূর প্রাচ্য অঞ্চলে দেখেছি, বিরাট দেশ চীন অসহায়ের মতো পড়ে আক্রমণকারীর হাতে মার খাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে বহু খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর একটি অংশ কমিউনিজমের ভক্ত, অন্য অংশটি তার ঘোরতর বিরোধী; এই আত্মকলহের সুযোগে জাপান অপ্রতিহত গতিতে তার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে, চীনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক-একটা অঞ্চলকে নিজের আয়ত্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু চীনের দীর্ঘ ইতিহাসে বহুবার সে বহু প্রচণ্ড অভিযান আর বিপদকে কাটিয়ে উঠেছে; এবারও জাপানের এই আক্রমণকে ঠেলে সে আবার বেঁচে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

সাম্রাজ্যবাদী জাপান : অর্ধ-সামন্ততন্ত্রী, সামরিক শ্রেণীর প্রভাবাচ্ছন্ন, অথচ শিল্পপ্রগতির দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত—অতীত এবং বর্তমানের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখানে—চোখে তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য-স্থাপনের মোহময় স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নের পিছনে জেগে রয়েছে রূঢ় বাস্তব সত্য—দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক, তাদের আর্থিক মহাসংকট আর চরম দুর্দশা আসন্ন হয়ে উঠেছে :

আমেরিকাতে এবং অস্ট্রেলিয়ার বিশাল জনহীন প্রান্তরে তাদের প্রবেশের অধিকার নেই। জাপানের সে স্বপ্নের আরেকটি প্রকাণ্ড বাধা সৃষ্টি করছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা—আধুনিক কালে সমস্ত দেশের মধ্যে তারই শক্তি সবচেয়ে বেশি। এশিয়াতে জাপানের রাজ্যবিস্তারের পথে আরেকটি বড়ো বাধা হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। মাঞ্চুরিয়াতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির উপরে বিরাট একটি মহাযুদ্ধের আসন্ন আভাস ইতিমধ্যেই বহু তীক্ষ্ণদৃষ্টি পর্যবেক্ষকের চোখে পড়ছে।

উত্তর-এশিয়ার সমস্ত অঞ্চলটাই সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত; সে এখন নূতন একটি জগৎ, নূতন একটি সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করতে এবং তাকে গড়ে তুলতে ব্যস্ত। বর্তমান সভ্যতা তার অগ্রগতির পথে এই অনুন্নত দেশগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে গিয়েছিল, অল্পদিন আগেও সেখানে একপ্রকার সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ এই দেশরাই এক লাফে সভ্যতার এমন একটা স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে পাশ্চাত্ত্য জগতের সেই অগ্রগামী দেশগুলোও তার বহু পিছনে পড়ে রয়েছে—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য জগতের ধনিকতন্ত্রের ভিত্তি এখন টলমল করছে; ইউরোপ আর এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত এই সোভিয়েট ইউনিয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সারাক্ষণের বিভীষিকা হয়ে। বাণিজ্যমন্দা অর্থসংকট বেকার-সমস্যা এবং বারংবার বিপদের আঘাতে ধনিক-তন্ত্র পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ছে, প্রাচীন ব্যবস্থা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। আর তারই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, আশায় উৎসাহে কর্মশক্তিতে ভরপুর, উন্মত্ত আগ্রহে সে শুধু গড়েই চলেছে, গড়ে তুলছে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাকে। সোভিয়েটের এই যৌবন আর প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য, আরব্ধ কার্যে তার সাফল্য, দেখে পৃথিবীর সর্বত্র চিন্তাশীল মানবমন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।

আরেকটি বৃহৎ দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ধনিকতন্ত্রের ব্যর্থতার সে চমৎকার নিদর্শন। বিষম বিপত্তি, সংকট, শ্রমিক-ধর্মঘট, অভূতপূর্ব বেকার-সমস্যা, এরই মাঝখানে বসে সে বীরের মতো সংগ্রাম চালাচ্ছে আবার সমস্ত গুছিয়ে নিতে, ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। তার এই বিরাট পরীক্ষার ফল কী হবে আমরা আজও জানিনে। কিন্তু ফল তার যাই হোক, যে বিরাট সুবিধাগুলো আমেরিকার নিজস্ব সেগুলো তার হাত থেকে কেউই কেড়ে নিতে পারবে না : তার আছে বিশাল দেশায়তন, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে তার সমস্তই সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়; তার আছে শিল্পকৌশলের প্রাবল্য, সেবিষয়ে পৃথিবীর কোনোদেশই তার সমকক্ষ নয়; তার আছে অসংখ্য নিপুণ এবং সুশিক্ষিত কর্মী। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জীবনযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন খুবই বৃহৎ একটা অংশ গ্রহণ করবে, এতে সন্দেহ নেই।

আর দক্ষিণ-আমেরিকার বৃহৎ মহাদেশটি? সেখানে আছে বহু লাতিন জাতি, উত্তর-অঞ্চলের জাতিদের সঙ্গে তাদের কিছুমাত্র মিল নেই। উত্তর-আমেরিকার মতো নয় এরা : এখানে জাতি-বৈষম্য নেই, বহু জাতি এখানে এসে একত্র মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে—এখানে আছে দক্ষিণ-ইউরোপের মানুষ স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ইতালীয়, আছে নিগ্রো। আছে তথাকথিত রেড্-ইণ্ডিয়ান—আমেরিকার দুটি মহাদেশের এরাই আদিম অধিবাসী। কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রে এই রেড-ইণ্ডিয়ানরা মরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; কিন্তু এইখানে এই দক্ষিণ দেশে এদের সংখ্যা এখনও অনেক, বিশেষ করে ভেনেজুয়েলাতে। এরা প্রায়ই বাস করে বড়ো বড়ো শহরগুলো থেকে অনেক দূরে সরে। তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে, এই দক্ষিণ-আমেরিকার কতকগুলো শহর, যেমন বুয়েনোস আইরেস এবং রিও ডে জানাইরো, শুধু যে খুব বড়ো শহর তাই নয়, দেখতেও ভারি সুন্দর, অতি চমৎকার সব বুলভার্দ্ আছে এখানে। বুয়েনোস আইরেস হচ্ছে আর্জেণ্টিনার রাজধানী, এর লোকসংখ্যা পঁচিশ লক্ষ। আর রিও ডে জানাইরো ব্রাজিলের রাজধানী, তার লোকসংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ।

বহুজাতি এখানে একত্র মিশে গেছে, কিন্তু শাসক শ্রেণীরা হচ্ছে শ্বেত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। সেনাবাহিনী আর পুলিশবাহিনী যে দল বা উপদলটির আয়ত্তে, দেশের শাসন-কর্তৃত্বও সাধারণত তারই হাতে থাকে; আর শাসন-ব্যাপারের উপরতলায় সেখানে প্রায়ই বিপ্লব ঘটছে। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রত্যেক দেশেই প্রচুর খনিজ সম্পদ, কাজেই ধনসমৃদ্ধির সম্ভাবনাও এদের প্রচুর। কিন্তু আপাতত এরা সকলেই রয়েছে দেনায় ডুবে। চার বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র

এদের টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে এরা সকলেই একেবারে বিষম মুশকিলে পড়ে গেল, দেশের সর্বত্র জুড়েই বিপ্লব ঘটতে শুরু করল। এদের মধ্যে প্রধান তিনটি দেশ হচ্ছে আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল এবং চিলি, সংক্ষেপে এদের এ, বি, সি বলে উল্লেখ করা হয়। টাকার টানাটানির জন্য এই তিনটি দেশ পর্যন্ত বিপ্লবের ধাক্কায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

১৯৩২ সনের গ্রীষ্মকাল থেকে এপর্যন্ত দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে তার নিজস্ব দুটি ছোটো খাটো যুদ্ধ হয়ে গেছে; অবশ্য মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের যুদ্ধের মতো এদেরও সরকারি খাতাপত্রে যুদ্ধ বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। লীগ অব নেশন্‌সের অনুশাসন, কেলগ শান্তি চুক্তি এবং অনুরূপ চুক্তিগুলো হবার পর থেকেই যুদ্ধ আর পৃথিবীতে হচ্ছে না। একটা দেশ যখন আরেকটাকে আক্রমণ করছে, তার লোকজনকে মেরে ফেলছে, তাকে আমরা বলছি একটা 'সংঘর্ষ'; চুক্তিগুলোতে 'সংঘর্ষ' নিষেধ করা হয় নি, কাজেই সকলেই আমরা সুখী। মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধটার সমস্ত পৃথিবীর দিক থেকেই গুরুত্ব ছিল; এখানকার এই ছোটোখাটো যুদ্ধগুলোর তা কিছু নেই। কিন্তু এদের দেখেই বোঝা যায়, লীগ অব নেশন্‌স্ থেকে শুরু করে অসংখ্য চুক্তি আর মীমাংসা-পত্র ইত্যাদি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের যে-সব আয়োজন-অনুষ্ঠান নিয়ে এত হৈ-চৈ কলরব, সেগুলো আসলে কতখানি শক্তিহীন আর অর্থহীন। লীগের একজন সভ্য আরেকজনকে আক্রমণ করে; লীগ নিরুপায়ভাবে বসে থাকে, আর নয় তো সে কলহ মিটিয়ে দেবার জন্য অতি ক্ষীণস্বরে দুটো একটা উপদেশ বর্ষণ করে, সে কথায় কেউই কান দেয় না।

দক্ষিণ-আমেরিকাতে এই যে যুদ্ধ বা 'সংঘাত'গুলো চলছে, এর মধ্যে একটা হচ্ছে বলিভিয়া আর প্যারাগুয়ের মধ্যে, একটি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল নিয়ে। এই অঞ্চলটির নাম হচ্ছে চাকো। একজন রসিক ফরাসি বলেছেন, 'চাকো জঙ্গল নিয়ে বলিভিয়া আর প্যারাগুয়ের মধ্যে লড়াই চলেছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন দুজন টেকোমাথা লোক একটা চিরুনির জন্য কাড়াকাড়ি করছে।' যুদ্ধ এরা করছে ঠিকই কিন্তু সে যুদ্ধ সত্যই অতটা অর্থহীন নয়। এই বিরাট জঙ্গল-ভূমিটিতে তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে; তাছাড়া প্যারাগুয়ে নদীটিও এরই মধ্য দিয়ে চলে গেছে; বলিভিয়া থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরে বেরোবার সেই হচ্ছে পথ। ঝগড়ার মিটমাট করে ফেলতে দুটি দেশই অস্বীকার করেছে, ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষের জীবন বলি দিয়েছে এরা।

অন্য যুদ্ধটি হচ্ছে কলাম্বিয়া আর পেরুর মধ্যে। বিবাদের উপলক্ষ্য ল্যাটিশিয়া বলে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, পেরু অত্যন্ত অন্যায়রূপে এটি দখল করে নিয়েছিল। লীগ অব নেশন্‌স্ এর জন্য পেরুকে খুব তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেছিলেন বলে মনে পড়ছে।

লাতিন আমেরিকা (মেক্সিকোও তার মধ্যে পড়ে) ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। মেক্সিকোতে রাষ্ট্র আর ক্যাথলিক পাদ্রীদের মধ্যে বহুবার তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। স্পেনের মতো মেক্সিকোতেও শিক্ষা-ব্যাপারে এবং প্রায় অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই রোমান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের যে বিপুল আধিপত্য ছিল, সরকার সেটা হ্রাস করে দিতে চেয়েছিলেন।

দক্ষিণ-আমেরিকার ভাষা হচ্ছে স্প্যানিশ। একমাত্র ব্রাজিল বাদে, সেখানে পর্তুগীজই হচ্ছে সরকারি ভাষা। এই বিরাট অঞ্চলটি জুড়ে প্রচলিত থাকার ফলে স্প্যানিশ ভাষা আজকাল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। সুন্দর এবং সুশ্রাব্য ভাষা এটা; এর আধুনিক সাহিত্যও চমৎকার সমৃদ্ধ। আজকাল দক্ষিণ-আমেরিকার কল্যাণে বাণিজ্যে-ব্যবহৃত ভাষা হিসাবেও এটা অনেকখানি প্রাধান্য অর্জন করেছে।

মনুষ্যের ছায়া

৮ই আগস্ট, ১৯৩৩

আমাদের শেষ চিঠিটাতে আমরা এশিয়া আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এই কটি মহাদেশের উপর তাড়াতাড়ি করে একবার চোখ বুলিয়ে গেছি। বাকি আছে ইউরোপ, গোলমাল আর ঝগড়ার দেশ ইউরোপ, অথচ গুণও তার অনেক আছে।

ইংলণ্ড এতদিন ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, তার সে প্রাচীন গৌরব সে হারিয়ে ফেলেছে, যেটুকু এখনও আছে তাকে টিকিয়ে রাখতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার নৌশক্তির জোরেই সে নিরাপদ ছিল, এর জোরেই সে এতদিন অন্যদের উপর প্রভুত্ব করেছে, সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে। সে নৌবলও আর আগের মতো নেই। একটা সময় ছিল, বেশিদিন আগের কথাও সেটা নয়, যখন অন্য যে-কোনো দুটো বড়ো দেশের নৌবাহিনীকে একত্র করলে যা হত, ইংলণ্ডের একার নৌবাহিনীই ছিল তার চেয়েও বড়ো এবং বেশি শক্তিশালী। এখন ইংলণ্ড এবিষয়ে সে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র সমান বলেই দাবি করে, প্রয়োজনের মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জাহাজ বানিয়ে ইংলণ্ডকে পিছনে ফেলে যেতে পারবে, সে সংস্থান তার আছে। এখনকার দিনে নৌবলের চেয়েও বড়ো জিনিস হচ্ছে বিমানবল; এবিষয়ে ইংলণ্ডের শক্তি এখনও অন্যদের চেয়ে কম; অনেকগুলো দেশই আছে যাদের যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা ইংলণ্ডের চেয়ে বেশি। বাণিজ্যে তার যে প্রাধান্য ছিল তাও চলে গেছে, আবার তাকে ফিরিয়ে আনবার আশাও আর তার নেই; যে বিরাট রপ্তানি-বাণিজ্য একদা তার ছিল সেও ক্রমেই কমে চলেছে। উচ্চ শুল্কপ্রাচীর বানিয়ে, সাম্রাজ্যের দেশগুলিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা দিয়ে সে সাম্রাজ্যের ভিতরকার বাজারটাকে তার নিজের পণ্যের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে চেষ্টা করছে। এই কথাটারই মানে, সাম্রাজ্যের বাইরেও সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বাণিজ্য চালাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে পরিত্যাগ করেছে। এই সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে সিদ্ধি সে যদি-বা লাভ করে তবু এতে করে পুরোনো দিনের সে প্রাধান্য আর তার ফিরে আসবে না। সেটা চিরদিনের মতোই লুপ্ত হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে এই যে তার সংকীর্ণ সিদ্ধি এটাও কতদূর বিস্তীর্ণ হবে কতদিন টিকবে সেটা সন্দেহস্থল।

টাকাকড়ির বাজার নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল; সে যুদ্ধে ইংলণ্ডই জিতেছে; বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজও মূলধনের বাজারকে সেই চালাচ্ছে; লণ্ডন-শহর আজও তার মুদ্রা-বিনিময় কেন্দ্র। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বিস্তার যতই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার এই জয়ের দীপ্তি এবং মূল্যও ততই কমে আসছে। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, শুল্কপ্রাচীর ইত্যাদি দিয়ে নিজেরাই বিশ্ব-বাণিজ্যের সে বিস্তারকে ক্রমশ কমিয়ে আনছে। অনেকখানি বিশ্ব-বাণিজ্য যদি চলতেও থাকে, বর্তমানের এই ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থা যদি টিকেও থাকে, তবু টাকাকড়ির বাজারে যে নেতৃত্ব ইংলণ্ডের আজও রয়েছে সেটা শেষপর্যন্ত লণ্ডনের হাত থেকে স্খলিত হয়ে নিউইয়র্কের হাতে গিয়ে পৌঁছবে, এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু খুব সম্ভবত সেটা ঘটবার আগে ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাটার মধ্যেই বহু বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে।

ইংলণ্ডের একটা খ্যাতি আছে, পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকেও বদলে নিতে পারে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এ খ্যাতি তার মিথ্যাও নয়—যতক্ষণ তার সামাজিক ভিত্তিতে আঘাত না লাগছে, যতক্ষণ তার মালিক শ্রেণীরা নিজের জায়গায় স্থির বসে থাকতে পারছে। কিন্তু তার সমাজ-ব্যবস্থায় যদি আমূল পরিবর্তন এসে যায়, নিজেকে বদলে নেবার এই ক্ষমতার বলে তখন সে সেই বিষম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারবে কি না, সেটা কেউ বলতে পারে না। এরকমের একটা পরিবর্তন খুব নিঃশব্দে এবং শান্তশিষ্ট

ভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে, এটা খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়। শক্তি আর সুযোগ যারা অধিকার করে বসে আছে, তারা প্রসন্ন মনে তাকে হাতছাড়া করে না।

ইতিমধ্যে বৃহত্তর জগতের কর্মক্ষেত্র থেকে পিছন হটে হটে ইংলণ্ড এসে আশ্রয় নিচ্ছে তার সাম্রাজ্যের মধ্যে; সেই সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখবার জন্যই সে তার গঠন সংস্থানে বড়ো বড়ো পরিবর্তন সাধন করতে স্বীকৃত হয়েছে। ডোমিনিয়নরা খানিকটা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, যদিও এখনও তারা ব্রিটেনের আর্থিক-ব্যবস্থার সংগে বহুপ্রকারে বাঁধা রয়েছে। তার এই বাধক; ডোমিনিয়নদের প্রসন্ন রাখবার জন্য ইংলণ্ড অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে; তবু এখনও তাদের সংগে তার সংঘাত লাগছে। অস্ট্রেলিয়ার হাত পা সবই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের দোরে বাঁধা; জাপানিদের আক্রমণের ভয়েও সে ইংলণ্ডের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলছে। কানাডার শিল্প-ব্যবসায় বেড়ে উঠছে, ইংলণ্ডের কতকগুলি শিল্পের সংগে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াতে সে রাজি নয়। প্রতিবেশী দেশ যুক্ত-রাষ্ট্রের সংগেও কানাডার নানাবিধ সম্পর্ক রয়েছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার মনে সাম্রাজ্যের প্রতি খুব প্রবল প্রীতি নেই, অবশ্য একদা যে তিক্ত সম্পর্ক এদের মধ্যে ছিল সেটা এখন কমে গেছে। আয়ার্ল্যাণ্ড নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে, ইংলণ্ডের সংগে তার বাণিজ্য-যুদ্ধের এখনও অবসান হয় নি। ইংলণ্ড আইরিশ পণ্যের উপরে শুল্ক বসিয়েছিল, ভেবেছিল এই ভাবে ভয় দেখিয়ে আর চাপ দিয়েই আয়ার্ল্যাণ্ডকে বশ্যতা স্বীকার করাবে। কিন্তু তার ফল হয়েছে বিপরীত; এর ফলে আয়ার্ল্যাণ্ড তার শিল্প আর কৃষিকে বাড়িয়ে তোলবার দিকে প্রচণ্ড দৃষ্টি দিয়েছে; আয়ার্ল্যাণ্ড ক্রমশই একটা অনেকখানি আত্মনির্ভর এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। নূতন নূতন কারখানা গড়ে উঠছে সেখানে, চারণভূমিকে আবার রূপান্তরিত করা হচ্ছে শস্যক্ষেত্রে; কৃষির চর্চাও আবার বেড়ে উঠছে। যে খাদ্যসামগ্রী আগে ইংলণ্ডে রপ্তানি হত সেটা এখন লাগছে দেশের লোকেরই ভোগে, তাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাচ্ছে। এতে ডি ভ্যালেরার নীতিরই জয় হয়েছে; ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পাঁজরে আয়ার্ল্যাণ্ড এখন কাঁটার মতো ফুটে রয়েছে—সে উগ্রমতি, উদ্ধত, অটাওয়া চুক্তির সংগে তার কোনোখানেই মিল নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ডোমিনিয়নদের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক ইংলণ্ডের যা আছে তা থেকে তার লাভের আশা বিশেষ নেই। ভারতবর্ষ থেকে হয়তো অনেকখানি লাভ সে তুলে নিতে পারত, কারণ ভারতবর্ষে পণ্যের একটা প্রকাণ্ড বাজার খোলা রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এবং যে অর্থনৈতিক দুর্গতি তার দেখা দিয়েছে, সেটা ব্রিটেনের বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধার কথা নয়। মানুষকে ধরে ধরে জেলে পুরে তাকে ব্রিটেনের পণ্য কিনতে বাধ্য করানো যাবে না। ম্যাঞ্চেস্টারে সম্প্রতি মিঃ স্ট্যানলি বলডুইন বলেছেন :

"ভারতবর্ষকে যখন আমরা হুকুমে চালাতে পারতাম, বলে দিতে পারতাম তার জিনিসপত্র সে কখন কিনবে কার কাছ থেকে কিনবে, সে দিন চলে গেছে। বাণিজ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় হচ্ছে সদ্ভাব। সঙিনের ডগায় ন্যাকড়ার নিশান উড়িয়ে ভারতবর্ষের কাছে মালপত্র বেচে আসতে আমরা আর কোনো দিনই পারব না।"

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তো যা আছে আছেই; তা ছাড়া আবার জাপানের মারাত্মক প্রতিযোগিতার সংগেও ইংলণ্ডকে লড়তে হচ্ছে—এখানে, প্রাচ্য জগতের অন্যত্র, কতকগুলি ডোমিনিয়নের মধ্যেও।

যেটুকু তার এখনও আছে তাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ইংলণ্ড প্রাণপণ চেষ্টা করছে; তার সাম্রাজ্যটাকে একটা অখণ্ড অর্থনৈতিক দেহে পরিণত করতে চাইছে; অন্যান্য যে-সব ছোটো ছোটো দেশ তার সংগে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যেমন ডেনমার্ক, বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি—তাদেরও এরই সংগে যোগ করে নিচ্ছে। এই নীতিটাকে সে মেনে নিচ্ছে বাধ্য হয়েই, ঘটনাচক্রে; এ ছাড়া আর তার উপায় নেই। এমনকি যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষা করবার জন্যও তাকে আরও বেশি আত্মসম্পূর্ণ হতে হবে। অতএব এখন সে তার কৃষিকেও বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করছে। অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি তার কতখানি সার্থক হবে তা এখন

বলতে পারে না। এই নীতির পথে কী কী বাধা, তার অনেকগুলোর নাম আমি করেছি, সে বাধা এর সাফল্যকে ব্যাহত করবে। আর বিফল যদি সে হয় তবে তখন সাম্রাজ্যের সমগ্র কাঠামোটাই একেবারে ভেঙে পড়তে বাধ্য; ইংরেজ জাতিকে তখন অনেকখানি দরিদ্রতর জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু এই নীতি যদি সফল হয় তবে তার মধ্যেও বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর, কারণ এর ফলে হয়তো ইউরোপের বহু দেশের সর্বনাশ উপস্থিত হবে; এই নীতির ফলে তাদের বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণ বিকাশলাভের জায়গা পাবে না; আর ইংলণ্ডের খাতকরা যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তবে তার ধাক্কায় আবার ইংলণ্ডেরও অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

জাপান আর আমেরিকার সঙ্গেও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ তার বাধবেই। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তো বহু ব্যাপারেই তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে; আর পৃথিবীর এখন যা অবস্থা, তাতে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল সম্পদ্-সম্ভারের জোরে ক্রমশ এগিয়েই চলবে, আর ইংলণ্ড পড়বে ক্রমেই পিছিয়ে। এই ব্যাপারের ফল দুটিমাত্র হতে পারে : হয় ইংলণ্ড এই সংগ্রামে তার পরাজয়কে শান্তভাবে স্বীকার করে নেবে; আর না হয় করবে যুদ্ধ—যেটুকু তার এখনও আছে তাও যদি চলে যায় তবে সে এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুদ্ধে আহ্বান করবার সামর্থ্যটুকুও তার থাকবে না, অতএব সেটুকু অন্তত বজায় থাকতে থাকতেই তাকে টিকিয়ে রাখবার একটা শেষ চেষ্টা সে করে দেখবে।

আরও একটি বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ডের আছে—সোভিয়েট ইউনিয়ন। এদের নীতি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পরের দিকে এরা খালি চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে, ইউরোপ আর এশিয়ার সর্বত্র জুড়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনছে। এখনও কিছু দিন হয়তো এই দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে; কিন্তু এদের দুটির মধ্যে মিলন হওয়া একেবারেই অসম্ভব, কারণ এরা দুজনে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের উপাসক।

ইংলণ্ড আজকাল একটা সন্তুষ্ট দেশ, যা কিছু সে চায় সবই তার আছে। তার শুধু ভয়, এটাও তাকে হারাতে হবে। সে ভয় মিথ্যাও নয়। পূর্বের অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে, এবং তারই বলে তার নিজের বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে তাকে টিকিয়ে রাখতে, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। লীগ অব নেশন্‌স্‌কে এই উদ্দেশ্যেই সে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাচক্র প্রবলবেগে ঘুরে চলেছে, তাকে আটকে দেবার ক্ষমতা তার নেই, বা অন্য কোনো দেশেরও নেই। আজ তার শক্তি আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে সে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, সে কথাটাও সমানই নিঃসন্দেহ। তার বিশাল সাম্রাজ্য আজ অস্তোন্মুখ, তার সেই সন্ধ্যার ছায়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এবার সমুদ্র পার হয়ে চলো ইউরোপ মহাদেশে। প্রথমেই আছে ফ্রান্স—সেও সাম্রাজ্যবাদী তার আফ্রিকা আর এশিয়াতে বিরাট সাম্রাজ্য। সামরিক আয়োজনের দিক থেকে ইউরোপে সে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ।* প্রচণ্ড একটি সেনাবাহিনী আছে তার; আরও কতকগুলি দেশ তার নেতৃত্বে এসে সংঘবদ্ধ হয়েছে : পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া। তবুও কিন্তু জর্মানির রণপিপাসু প্রবৃত্তিকে ভয় করছে, বিশেষ করে হিটলারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। ধনিকতন্ত্রী ফ্রান্স আর সোভিয়েট রাশিয়া, এদের পরস্পরের প্রতি মনোভাবের একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে—সে পরিবর্তন সাধনের কৃতিত্ব বস্তুত হিটলারেরই প্রাপ্য। দুজনের একই শত্রু, সেই শত্রুর ভয়েই এরা পরস্পরের মিত্র হয়ে উঠেছে।

জর্মানিতে নাৎসী আতঙ্ক এখনও চলছে, প্রত্যেক দিনই নূতন নূতন নিষ্ঠুরতা, নূতন নূতন অত্যাচারের খবর আসছে। এই নৃশংস অভিযান কতকাল চলবে তা বলা অসম্ভব; ইতিমধ্যেই এটা বহু মাস ধরে চলেছে, এখনও তার তীব্রতা হ্রাসের কোনো লক্ষণ নেই। এই রকমের

*জর্মানির পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার পরে এখন আর একথা খাটে না। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সম্পাদিত মিউনিক চুক্তির পরে ফ্রান্স প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মধ্য-ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে তার মৈত্রীচুক্তিও ভেঙে গিয়েছে।

পীড়ননীতি কখনোই সরকারের স্থায়িত্বের প্রমাণ নয়। জর্মনির যদি যথেষ্ট সামরিক শক্তি থাকত তবে খুব সম্ভবত ইতিমধ্যেই ইউরোপে একটু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেত। সে যুদ্ধের সম্ভাবনা পার হয়ে যায় নি। হিটলার জাঁক করে বলছেন, কমিউনিজ্‌ম্‌ থেকে রক্ষা পেতে হলে তিনিই হচ্ছেন শেষ আশ্রয়স্থল; কথাটা সত্যও হতে পারে, কারণ জর্মনিতে এখন হিটলারতন্ত্রকে না মানতে চাইলে একমাত্র গতিই হচ্ছে কমিউনিজ্‌ম্‌।

ইতালি আছে মুসোলিনির শাসনে; আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে অত্যন্ত কাজের লোকের দৃষ্টিতে, এবং স্বার্থপরায়ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে; অন্যান্য দেশদের মতো সে 'শান্তি' আর 'সদুদ্দেশ্য' ইত্যাদি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো সাধুবাক্য উচ্চারণ করছে না। প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করছে সে; কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস আর অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ না বেধে পারে না। ইতিমধ্যে সে ভালোরকম একটা জায়গা পাবার জন্য ঘুঁটি চালাচালি করছে। নিজে সে ফ্যাসিস্ট, কাজেই জর্মনিতে ফ্যাসিজ্‌মের প্রতিষ্ঠাকে সে অভিনন্দন জানাচ্ছে, হিটলারপন্থীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলছে। অথচ জর্মনদের কূটনীতির যেটা বড়ো লক্ষ্য, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ঐক্যস্থাপন—সেটার সে বিরোধী। সেরকম ঐক্য স্থাপিত হলে জর্মনির সীমান্তরেখা একেবারে ইতালির সীমান্তরেখা পর্যন্তই এসে পৌঁছবে; জর্মনিতে তাঁর ফ্যাসিস্ট ভ্রাতাটি যিনি আছেন তিনি গায়ের এত কাছে ঘেঁষে আসবেন, এটা মুসোলিনির পছন্দ নয়।*

মধ্য-ইউরোপে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির বাস; সংকটের চাপে দুর্দশার চরম হয়েছে; বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফলের ধাক্কাও এরা এখন পর্যন্ত সামলে উঠতে পারে নি। তার উপরে আবার এখন হিটলার আর তাঁর নাৎসীদের ভাবভঙ্গি দেখে এরা একেবারেই বিহ্বল ভীত হয়ে পড়েছে। মধ্য-ইউরোপের এই দেশগুলোর সর্বত্রই,—বিশেষত যেখানে জর্মন অধিবাসী আছে, যেমন অস্ট্রিয়াতে—বহু নাৎসীদল গড়ে উঠছে। কিন্তু নাৎসী-বিরোধী মনোভাবও তার পাশাপাশিই বেড়ে উঠছে; এর ফল হবে সংঘাত। বর্তমানে এই সংঘাতের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে অস্ট্রিয়া।

কিছুদিন আগে, বোধহয় ১৯৩২ সনে, মধ্য-ইউরোপ আর দানিয়ুব-অঞ্চলের ফ্রান্স-ভক্ত রাষ্ট্র তিনটি, মানে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া আর যুগোশ্লাভিয়া একত্রে একটি সংঘ বা মিত্রদল গঠন করেছে। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিলিব্যবস্থাতে এরা তিনটি রাষ্ট্রই লাভবান হয়েছে, তখন যা পেয়েছিল সেটাকে কাজেই এরা টিকিয়ে রাখতে চায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একত্র মিলিত হয়েছে, যে বস্তুটি গঠন করেছে সে বস্তুত একটি যুদ্ধ-করবার-প্রয়োজনে-গড়া মিত্র-সংঘ। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্ষুদ্র মৈত্রী' বা 'লিট্‌ল্‌ আঁতাঁত'। এই তিনটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত এই লিট্‌ল্‌ আঁতাঁত বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপের একটি নবসৃষ্ট বৃহৎ-শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই শক্তিটি ফ্রান্সের পক্ষাবলম্বী, জর্মনির বিরোধী, এবং ইতালির নীতিরও বিরোধী।

জর্মনিতে নাৎসীদের জয়লাভ লিট্‌ল্‌-আঁতাঁত এবং পোল্যান্ডের পক্ষে হল বিপদের সংকেত; কারণ নাৎসীরা শুধু ভার্সাই সন্ধির পুনর্বিচারই দাবি করছিল না (সেটা সকল জর্মনই কামনা করত), এমন সব ভাষায় কথা বলছিল, যা শুনে মনে হয় যুদ্ধকে এরাই কাছে টেনে নিয়ে আসবে। নাৎসীদের কথাবার্তা অন্যান্য চালচলন এমন উগ্র এবং অসংযত ছিল, যে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি যেসব রাষ্ট্র নিজেরা সন্ধিটার পুনর্বিচার কামনা করছিল তারা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। হিটলারতন্ত্রের আবির্ভাব দেখে এবং তার ভয়ে, মধ্য-ইউরোপ এবং পূর্ব-অঞ্চলের যে দেশগুলো এতদিন পরস্পরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছে তারাও পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াল; লিট্‌ল্‌-আঁতাঁত, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বল্‌কান-অঞ্চলের রাজ্যগুলি, কেউই বাদ গেল না। এদের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক ঐক্যস্থাপনের কথা পর্যন্ত

* ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে জর্মনি অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে আত্মসাৎ করে। অবস্থার চাপে পড়ে মুসোলিনি এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু ইতালি তীব্রভাবে এই প্রতিবাদ করল।

চলছে। জর্মানিতে নাৎসীদের আবির্ভাবের পর থেকে এই দেশগুলো, বিশেষ করে পোল্যান্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিও অধিকতর বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। এরই ফল হয়েছে একটা সার্বজনীন অনাক্রমণ চুক্তি—কয়েক সপ্তাহ হল এদের আর রাশিয়ার মধ্যে এই চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে।

তোমাকে বলেছি, স্পেনে সম্প্রতি একটা বিপ্লব হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তার অবস্থা শান্ত হয় নি; মনে হচ্ছে সেখানে আবারও একটা পরিবর্তনের আয়োজন চলছে।

কাজেই দেখছ—ইউরোপ এখন পরিণত হয়েছে অদ্ভুত একটা দাবাখেলার ছকে, তার সর্বত্র সংঘাত আর বিদ্বেষের হুড়োহুড়ি, পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগুলো এক-এক দিকে দল বেঁধে পরস্পরের দিকে বিষবিদ্ধ নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে। নিরস্ত্রীকরণের জন্য অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলছে; আর সর্বত্রই সকলে সারাক্ষণ অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করছে, যুদ্ধ আর ধ্বংসসাধনের মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করে চলেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়েও কথা বলা হচ্ছে প্রচুর; কত যে সম্মেলন বসানো হচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু কাজ হচ্ছে না কিছুই। লীগ অব নেশন্স্ নিজেই ব্যর্থতার একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত; একত্র মিলেমিশে চলবার শেষ চেষ্টা হয়েছিল নিখিল-বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে, সে সম্মেলনও বসেছে, ভেঙেও গেছে, কাজ কিছুই হয় নি। এখন প্রস্তাব উঠেছে, ইউরোপের সমস্ত দেশ, মানে রাশিয়া বাদে ইউরোপের বাকি দেশরা একত্র হবে, একটা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গোছের বস্তু খাড়া করবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'প্যান-ইউরোপ' (নিখিল-ইউরোপ) আন্দোলন। আসলে এটা হচ্ছে একটা সোভিয়েট-বিরোধী দল গঠনের প্রয়াস; তারই সঙ্গে সঙ্গে চলছে, এতগুলো ছোটো ছোটো দেশ কাছাকাছি থাকার ফলে যে অসংখ্য বিপত্তি আর জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা। কিন্তু এদের দেশে দেশে পরস্পর বিদ্বেষ এত প্রচণ্ড যে এ রকমের প্রস্তাবে কেউই কান দিতে পারছে না।

বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটা দেশই অন্যদের কাছ থেকে ক্রমেই আরও বেশি দূরে সরে যাচ্ছে। মন্দা আর বিশ্ব-সংকটের ফলে এই প্রকৃতিটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ তার তাড়ায় পড়ে প্রত্যেক দেশই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সাধনায় মেতে উঠেছে। প্রত্যেকেই নিজের চারপাশে মস্ত মস্ত শুল্কপ্রাচীর তুলে দিয়ে তার আড়ালে বসে আছে, বিদেশী পণ্যকে যতদূর সম্ভব বাইরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। একেবারে সমস্ত বিদেশী পণ্যকে বর্জন করে চলতে অবশ্য কেউই পারছে না, কারণ কোনো দেশই পুরোপুরি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, মানে যা কিছু তার দরকার তার সমস্তখানি জিনিস নিজে নিজে তৈরি করে নিতে কেউই পারছে না। কিন্তু এদের মতি এখন সেইদিকেই, যার যা যা দরকার সব নিজেই উৎপন্ন বা নির্মাণ করে নিতেই এরা চাইছে। কতকগুলো একান্ত অপরিহার্য জিনিস হয়তো আছে, যা শুধু প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্যই দেশের মধ্যে তৈরি করে নেওয়া সম্ভব নয়। যেমন তুলো পাট চা কফি এবং আরও অনেকগুলো জিনিস আছে যা ইংলণ্ডে জন্মানো যায় না, এগুলো গরম দেশের জিনিস। এর মানেই হচ্ছে, ভবিষ্যতে বাণিজ্য বস্তুটা প্রধানত চলবে শুধু এমন দেশদেরই মধ্যে যাদের জলবায়ুর প্রকৃতি আলাদা, কাজেই তারা বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র উৎপাদন বা তৈরি করছে। আর একই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করছে যে দেশগুলি তারা পরস্পরের পণ্য কিনবেই না। এই বাণিজ্য চলবে উত্তর আর দক্ষিণ দেশের মধ্যে, পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে নয়, কারণ জলবায়ুর তফাতটা উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যেই বেশি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সঙ্গে হয়তো নাতিশীতোষ্ণ বা শীতপ্রধান দেশের বাণিজ্য চলবে; কিন্তু দুটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বা দুটি নাতিশীতোষ্ণ দেশের মধ্যে পরস্পর-বাণিজ্য চলবে না। অবশ্য এ ছাড়া আরও অনেক কথা হয়তো ভাববার থাকবে, যেমন এক-একটা দেশের খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। তবু মোটের উপরে এই উত্তর আর দক্ষিণের কথাটাই হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান সূত্র। অন্য সমস্তরকম বাণিজ্যকে শুল্ক-প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

পৃথিবীর এ ছাড়া আর এখন গতি নেই বলেই মনে হয়। একে বলা হয় শিল্প-বিপ্লবের চরম পর্যায়, যখন প্রত্যেকটি দেশই যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পব্রতী হয়ে উঠবে। একথা সত্য, এশিয়া

এবং আফ্রিকার শিল্পসজ্জা সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক বাকি। আফ্রিকা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দরিদ্র দেশ, বেশি পরিমাণ শিল্পজাত পণ্য কেনাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এখনও এই শ্রেণীর বিদেশীপণ্য কিনে চলতে পারে যে তিনটি বৃহৎ দেশ তারা হচ্ছে ভারতবর্ষ, চীন আর সাইবেরিয়া। এই তিনটি দেশে এখনও প্রকান্ড পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের আশা আছে, তাই বিদেশী শিল্পপ্রধান দেশগুলি এদের দিকেই সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। যে-সব বাজারে এরা সাধারণত মাল কাটাত তার অনেকগুলোরই দরজা গেছে বন্ধ হয়ে, কাজেই এরা এখন ভাবছে 'এশিয়ার দিকে অভিযান' চালাবার কথা, যেন সেখানে গিয়ে তাদের বাড়তি পণ্যের বোঝাটা কাটিয়ে দেওয়া যায়; তাদের ধনিকতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়-পড় হয়েছে, তাকে আবার ঠেকনো দিয়ে খাড়া করে দেওয়া যায়। কিন্তু এখন এশিয়াকে শোষণ করা অতটা সহজ নেই; তার এক কারণ এশিয়ার নিজেরও এখন বহু শিল্প গড়ে উঠেছে; আরেকটি কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইংলন্ড ভারতবর্ষকে তার নিজের পণ্যের বাজার করেই জীইয়ে রাখতে চায়; জাপান যুক্তরাষ্ট্র জর্মানিরও এখানে একটু গলা বাড়িয়ে দেখবার ইচ্ছা। চীনেও তাই; তার উপরে আবার রয়েছে তার দেশব্যাপী বিশৃংখলা আর যানবাহনের সুব্যবস্থার অভাব—এর জন্যও সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো কঠিন হয়ে উঠছে। সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ শিল্পজাত পণ্য কিনতে রাজি আছে, যদি সেটা তাকে ধারে দেওয়া হয়, এক্ষুনি তার দাম চাওয়া না হয়। কিন্তু আর অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়নও তার যত জিনিস দরকার প্রায় সমস্তই নিজে তৈরি করে নিতে পারবে।

আগের দিনে সকলের চেষ্টাই ছিল দেশে দেশে অধিকতর পরস্পর-নির্ভরতা, একটা বৃহত্তর আন্তর্জাতীয়তা গড়ে তোলবার দিকে। স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র তখনও টিকে ছিল বটে, কিন্তু স্বাধীন সমস্ত দেশের পরস্পর সম্পর্ক এবং বাণিজ্যের একটা বিরাট এবং জটিল আয়োজনও গড়ে উঠেছিল। এই ব্যাপার এত বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তার ফলে জাতীয় রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদেরই বিঘ্ন ঘটে উঠছিল। স্বভাবত এর পরবর্তী ধাপটাই হওয়া উচিত ছিল একটা সমাজায়ত্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ধনিকতন্ত্রের দিন তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে তখন এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যখন তার পক্ষে অবসর গ্রহণ করা, সমাজতন্ত্রকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে যাওয়ারই কথা। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, সেরকমের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ কেউই করে না। সংকট এবং ভাঙন তার আসন্ন হয়ে উঠেছে দেখে এবার সে আবার হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে বসেছে তার খোলার মধ্যে; একদা পরস্পর-নির্ভরতার পথেই তার গতি ছিল, এখন ঠিক তার উলটো পথে চলতে চাইছে। এই থেকেই আর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব কিনা, বা হলেও সেটা কতদিনের জন্য হবে?

সমস্ত পৃথিবীটাই একটা অদ্ভুত খিঁচুড়ি পাকিয়ে গেছে, নানাবিধ সংঘাত আর ঈর্ষা-বিদ্বেষের জটিল সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে। চিন্তা আর কর্মের যে-সব নূতনতর ধারার আবির্ভাব হচ্ছে তারা এই সংঘাতের সম্ভাবনাকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলছে। প্রত্যেক মহাদেশে প্রত্যেক দেশে এখন দুর্বল আর উৎপীড়িত জনসাধারণ চাইছে জীবনের সুখভোগ্য বস্তুসামগ্রীতে ভাগ বসাতে—তাদেরই শ্রমে সেগুলো তৈরি হচ্ছে, তার ভাগও কেন তারা পাবে না? সমাজকে এরা বলছে, দাও আমাদের সব পাওনা চুকিয়ে, বহুদিন আগে থেকেই সেটা আমাদের প্রাপ্য হয়ে আছে, বাকি রয়ে গেছে। কোনো কোনো জায়গাতে এই দাবি তারা জানাচ্ছে জোর গলায়, কর্কশ ভাষায়, উগ্র মূর্তি ধারণ করে; কোথাও বা জানাচ্ছে অধিকতর শান্তভাবে। কিন্তু এত দীর্ঘকাল ধরে যে দুর্ব্যবহার শোষণ এদের উপর ক্রমাগত চালিয়ে আসা হয়েছে, এবার যদি তারই দরুণ তারা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যদিই এমন কাজ করে বসে যেটা আমরা ভালো বলিনে, তবু সেজন্য এদেরই দোষ দেবার অধিকার আমাদের আছে কি? তাদের তো চিরকাল অবহেলাই করে এসেছি আমরা, এসেছি অবজ্ঞা করে; ভদ্র সমাজে চলবার মতো ভব্য আদবকায়দা তাদের শিখিয়ে দেবার কষ্ট কোনোদিনই স্বীকার করিনি তো!

দুর্বল আর নিপীড়িত জনসাধারণের এই প্রচন্ড জাগরণ দেখে মালিক শ্রেণীরা সর্বত্রই ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একে দমন করবার জন্য একত্র দল বাঁধছে তারা। এরই ফলে আসে ফ্যাসিজ্‌ম্;

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমস্ত বিরোধীপক্ষকে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়। গণতন্ত্র, জনসাধারণের কল্যাণ আর তাদের মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব ইত্যাদি যত বড়ো বড়ো বুলি এরা এতদিন কপ্‌চে এসেছে সেগুলো আর শোনা যায় না; মালিক শ্রেণীদের কায়েমী-স্বার্থের নির্মম শাসন একেবারে উলঙ্গ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, বহু ক্ষেত্রে হয়তো তারা জয়লাভও করেছে বলে মনে হয়। আসে একটা কঠোরতর যুগ, একটা তরবারি আর উগ্র উৎপীড়নের যুগ, কারণ সর্বত্রই তখন যুদ্ধ চলছে, সে যুদ্ধ প্রাচীন ব্যবস্থা আর নূতন ব্যবস্থার মধ্যে জীবনমরণ নিয়ে যুদ্ধ। সে যুদ্ধ ইউরোপে বা আমেরিকায় বা ভারতবর্ষে যেখানেই হোক না কেন, সর্বত্রই তার পণ অত্যন্ত বিরাট; প্রাচীন ব্যবস্থার ভাগ্য এখন ঝুলছে অতি সূক্ষ্ম সুতোর উপরে; এখনকার মতো অবশ্য সে নিজেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করে নিয়েছে তবুও। সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার গোড়াতেই যখন ভাঙন ধরেছে, যখন তার যেটা ন্যায্য দেনা এবং তার উপরে যে দাবি চাপানো হচ্ছে, সেটা শোধ করে দেবার সামর্থ্যও তার নেই : তখন এ অবস্থায় একটা আংশিক সংস্কারের ব্যবস্থা করে আপাত-সমস্যাটার মীমাংসা বা সমাধান করে নেওয়া চলবে না।

রাজনীতি নিয়ে অর্থনীতি নিয়ে জাতিগত পরিচয় নিয়ে এত অসংখ্য বিরোধ চলেছে। পৃথিবীতে এর ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন হয়ে উঠেছে যুদ্ধের কৃষ্ণ ছায়া। পণ্ডিতরা বলেন, এই অসংখ্যপ্রকার বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে তলস্পর্শী হচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে অন্যদিকে কমিউনিজ্‌মের বিরোধ। পৃথিবীর সর্বত্রই এরা পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদের মধ্যে আপোষ হবার কোনো সম্ভাবনাই আর নেই।

সামন্তবাদ, ধনিকবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রমিকসংঘ-কর্তৃত্ববাদ, অরাজকবাদ, সাম্যবাদ—পৃথিবী জুড়ে খালি 'বাদ'-এর ছড়াছড়ি! আর এদের সকলেরই পিছনে ছায়ামূর্তি মেলে দাঁড়িয়ে আছে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাদ—সুবিধাবাদ! অবশ্য যারা তার জন্য আগ্রহান্বিত আদর্শবাদও রয়েছে তাদের জন্য : অর্থহীন স্বপ্ন বা উদ্দাম কল্পনার আদর্শবাদ নয়, সেই সত্যকার আদর্শবাদ যে আমাদের শেখায় মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে, যে আদর্শকে আমরা বাস্তবে পরিণত করবার জন্যই ক্রমাগত লড়ে যাই। জর্জ বার্নার্ড শ এক জায়গাতে বলেছেন :

> "এই তো জীবনের সত্যকার আনন্দ, যে উদ্দেশ্যকে তুমি নিজেই অতি মহৎ বলে জান তার সাধনায় ব্যবহৃত হওয়া; বাতিল বলে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবার আগেই যেটুকু দেবার শক্তি তোমার মধ্যে ছিল তাকে নিঃশেষে দিয়ে যাওয়া; একটা প্রাকৃতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া। তা নইলে তো হতে হয় সদা-অস্থির আত্মসর্বস্ব একটা ক্ষুদ্র কর্দমপিণ্ড, নানা দুঃখে বেদনায় আর অভিযোগে ভরপুর—তোমাকে সুখী করবার জন্যই তার সমস্তখানি মনোযোগকে ঢেলে দিচ্ছে না বলে বিশ্বসংসারের সম্বন্ধে অভিযোগে মুখর।"

ইতিহাসের যেটুকু আলোচনা করলাম তাতেই দেখেছি, পৃথিবী কীরকম ক্রমেই বেশি দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়ে উঠেছে, এর বিভিন্ন অংশ কীভাবে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছে, পরস্পর নির্ভরশীল হতে শিখেছে। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীটাই এখন পরিণত হয়েছে একটি অখণ্ড অবিভাজ্য সমগ্র দেহে; এর প্রত্যেকটি অঙ্গ অন্য অঙ্গদের প্রভাবিত করছে, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে রচনা করা এখন একেবারেই অসম্ভব। সে যুগ আমরা বহুদিন পার হয়ে এসেছি; এখন যদি সত্যকার কোনো সার্থক উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হয়, তবে সে ইতিহাস হবে একটি অখণ্ড বিশ্ব-ইতিহাস; সমস্ত দেশের সমস্ত কাহিনীর সূত্র তারই মধ্যে এসে একত্র মিলবে, যে শক্তি বস্তুত পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের সকলকে চালিয়ে নিচ্ছে তারই পরিচয় আবিষ্কার করতে সে চেষ্টা করবে।

অতীত কালে, যখন বিভিন্ন দেশ এবং জাতি নানা ভৌগোলিক এবং অন্যান্যরূপ বাধা-বিঘ্নের দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত, তখনও নানা সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক এবং

আন্তর্মহাদেশিক প্রবৃত্তির টানে কীভাবে তারা একই ধরনে গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ আমরা দেখেছি। বৃহৎ ব্যক্তিরা ইতিহাসে চিরদিনই স্মরণীয় হয়ে আছেন, কারণ ভাগ্যের প্রতিটি সংকট-মুহূর্তেই মানুষের নিজের চেষ্টায় মানুষ পরিত্রাণ পায়। কিন্তু ব্যক্তির চেয়েও অনেক বড়ো হচ্ছে সেই সব কর্মরত মহাশক্তি, যে প্রায় অন্ধগতিতে এবং অনেক সময়ে নির্মম গতিতেই, ধেয়ে চলেছে সামনের দিকে, তার সেই গতিবেগের আলোড়নে আমরাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের এখন সেই অবস্থা। বহু প্রবল শক্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের যে শক্তি চালিয়ে নিয়ে চলেছে—তাদের সেই তাড়নার বশে মানবজাতিও অন্ধের মতো চলেছে, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাড়ায় যেমন তারা ছুটে চলে। হাজার চেষ্টা করলেও সে শক্তিকে থামাতে আমরা পারব না; তবু পৃথিবীর আমাদের এই নিজস্ব কোণটির মধ্যে তাদের সে চলার বেগ বা গতিকে একটুখানি বদলে দিতে হয়তো আমরা পারি। আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকে আমরা এক এক রূপ নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই : কেউ তাদের দেখে ভয় পায়, কেউ তাদের অভ্যর্থনা জানায়, কেউ বা তাদের রুখতে চেষ্টা করে; কেউ আবার ভাগ্যের সেই প্রবল মুষ্টির মধ্যে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করে। আবার এমন মানুষও আছে যারা সেই ঝড়ের ঘাড়েই চড়ে বসতে চেষ্টা করে, কিছুটা বা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে নেয়—বিরাট একটি ঘটনাপ্রবাহকে নিজের চেষ্টায় চালাবার যে আনন্দ, তারই নেশায় এর সংগে যে বিপদ জড়িয়ে থাকে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়।

অশান্তিতে ভরা এই বিংশ শতাব্দী—এর মধ্যে বাস করে শান্তিতে দিন কাটানো আমাদের অদৃষ্টে নেই। ইতিমধ্যেই এই শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল কেটে গেছে, যুদ্ধ বিপ্লব কিছুরই অভাব তার মধ্যে দেখা যায় নি। ফ্যাসিস্ট-শিরোমণি মুসোলিনি বলেছেন, "সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বিপ্লব চলেছে; ঘটনার স্রোত নিয়তির মতো দুর্বার শক্তিতেই আমাদের সামনে ঠেলে নিয়ে চলেছে।" আর সেই বিখ্যাত কমিউনিস্ট ট্রট্স্কিও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এই শতাব্দীতে বাস করে বিশেষ কোনো শান্তি বা সুখ যেন আমরা পাবার আশা না করি। তিনি বলেছেন, "এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই বিংশ শতাব্দীটি যতখানি অশান্তি আর উদ্‌বেগে পরিপূর্ণ, মানুষের ইতিহাসে এমন আর কখনও হয় নি। আমাদের সময়ে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি শান্তি এবং আরামকেই সকলের চেয়ে বড়ো কাম্য বলে মনে করেন, তবে তিনি একটি বড়ো ভুল করেছেন, বড়ো অসময়ে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছেন।"

সমগ্র পৃথিবী আজ বেদনায় বিহ্বল, যুদ্ধের ছায়া বিপ্লবের সম্ভাবনা একে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অলঙ্ঘ্য ভাগ্যের হাত এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচবার পথ যদি আমাদের না থাকে, তার সম্মুখীন হব আমরা কোন্ ভঙ্গিতে? উট পাখীর মতো কি বালিতে মাথা গুঁজব, নিজেদের লুকিয়ে রাখব এর দৃষ্টির সামনে থেকে? না বীরের মতো এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করব পৃথিবীকে গড়ে তোলার কাজে, প্রয়োজন হলে ক্ষতি আর বিপদের সম্ভাবনাকেও স্বীকার করে নিয়ে, লাভ করব একটা বিরাট এবং মহান ব্রত সাধনের আনন্দ : গৌরব বোধ করব এই জেনে যে "আমাদের পদচিহ্ন ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে"?

ভবিষ্যৎ তার লুকানো পৃষ্ঠাগুলোকে এক এক করে মেলে দিচ্ছে, পরিণত হয়ে যাচ্ছে বর্তমানে; আমরা সকলে, অন্তত যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরা, আশাদীপ্ত দৃষ্টি মেলে তারই দিকে চেয়ে আছি। কী আসবে তার প্রতীক্ষা কেউ করছেন মনে আশা নিয়ে, কেউ-বা করছেন ভয়ে ভয়ে। ভবিষ্যতের সেই জগৎ, সেকি এর চেয়ে অধিকতর ন্যায়ের জগৎ হবে, হবে কি সুখের স্থান, সেখানে কি মানুষের পক্ষে যা-কিছু কল্যাণকর সেগুলো অল্প ক'জন মানুষেরই শুধু মুষ্টিগত হয়ে থাকবে, না সমস্ত মানুষই অবাধে তার ফল ভোগ করতে পারবে? অথবা কি হবে সেটা আজকের চেয়েও নির্মমতর একটা কঠিন পীড়নের দেশ, এখনকার এই সভ্যতা যেটুকু সুখসমৃদ্ধি আমাদের এনে দিয়েছে, হিংস্র এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তারও কি অনেকখানিই সেখানে

অবলুপ্ত হয়ে যাবে? এইই এর দুটি চরম সম্ভাবনা। এর যে-কোনোটিরই আবির্ভাব আমরা দেখতে পারি; এর মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না আমার।

অপেক্ষা করছি আমরা, করছি প্রতীক্ষা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে রকম জগৎ আমরা পেলে খুশি হব তার প্রতিষ্ঠার জন্যও কাজ করে যাচ্ছি। মানুষ একদা পশুর সমান ছিল, সেখান থেকে সে উন্নতির পথে চলে এসেছে শুধু অসহায়ের মতো প্রাকৃতিক শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করে নয়—সে শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, মানুষের প্রয়োজনে সেই শক্তিকেই কাজে লাগাবার অদম্য চেষ্টার জোরে।

আজকের দিনের কথা বললাম। আগামী কালের দিনটি কেমন হবে সেটা তোমাদের হাতে—তোমার এবং তোমারই সমবয়সীদের হাতে; পৃথিবীর সর্বত্র যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছেলে আর মেয়ে আজ বড়ো হয়ে উঠছে, সেই আগামী কালের আয়োজনে অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের হাতে।

১৯৬

শেষ চিঠি

৯ই আগস্ট, ১৯৩৩

শেষ হল, মাণিক, শেষ হল আমাদের এই দীর্ঘ কাহিনী। আর লেখবার আমার প্রয়োজন নেই, তবু শেষকালে একটা আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনা সহযোগে সারা করবার লোভেই আমি আরও একখানা চিঠি তোমাকে লিখতে বসলাম—আমাদের শেষ চিঠি!

আর সারা করবার সময়ও হয়েছিল, কারণ আমার দু'বছরের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। আজ থেকে ঠিক তেত্রিশটি দিন পরে আমি ছাড়া পাব: মানে যদি তারও আগেই না পেয়ে যাই—জেলার তো আগে ছেড়ে দেবেন বলেই আমাকে শাসাচ্ছেন। পুরো দুবছর এখনও উত্তীর্ণ হয় নি; কিন্তু আমি আমার সাজার মেয়াদ থেকে সাড়ে-তিন মাস মাফ পেয়েছি, সমস্ত সচ্চরিত্র কয়েদীরাই সেটা পায়। কারণ এঁদের মতে আমিও একজন সচ্চরিত্র কয়েদী, যদিও এই খ্যাতি অর্জন করার মতো কিছুই আমি করিনি। যাই হোক, আমার এই ষষ্ঠবারের কারাভোগ এবার শেষ হল; আবার আমি বাইরের মুক্ত পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে আসব—কিন্তু কী করতে? এর সার্থকতাই বা কী? যখন আমার প্রায় সমস্ত বন্ধুবান্ধব আর সহকর্মীরা জেলে পড়ে মরছে, সমগ্র দেশটাকেই একটা বিরাট কারাগার বলে মনে হচ্ছে।

কী পর্বতপ্রমাণ চিঠিই বসে বসে লিখেছি আমি! আর কী বিপুল পরিমাণ স্বদেশী কালি ঢেলেছি স্বদেশী কাগজের উপরে! কিন্তু ভাবছি, সত্যকার কাজ কি কিছু হল এতে? এই এত এত কাগজ আর কালি, এ থেকে কি এমন কোনো বার্তা তোমার মনে গিয়ে পৌঁছল যা তোমার ভালো লাগবে? তুমি অবশ্য বলবে 'হ্যাঁ'; কারণ ভাববে অন্য জবাব দিলে হয়তো আমি মনে আঘাত পাব; আমার প্রতি তোমার টান অত্যন্ত বেশি বলেই সে ঝুঁকিটুকু তুমি নিতে রাজি নও। কিন্তু চিঠিগুলো পড়ে তুমি আনন্দ পাও বা নাই পাও, এগুলো লিখে আমি আনন্দ পেয়েছি বলে রাগ করবে না নিশ্চয়ই। দিনের পর দিন এই দীর্ঘ দুটি বছর ধরে এই চিঠিগুলো আমি লিখে গেছি। জেলে যেদিন এসেছিলাম তখন শীতকাল। শীত গিয়ে এল আমাদের ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, দেখতে দেখতেই সে বসন্ত মিলিয়ে গিয়ে এল গ্রীষ্মের উৎকট গরম। তার পর আবার গ্রীষ্মের তাপে যখন মাটি শুষ্ক তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে, মানুষ আর পশু ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে, ঠিক

তখনই ছাড়ল মৌসুমী হাওয়া, বহন করে নিয়ে এল বর্ষার সতেজ স্নিগ্ধ জলধারা। তার পর এল শরৎ, আকাশ হল চমৎকার পরিষ্কার আর নীল, সন্ধ্যাগুলো অপূর্ব মনোরম। এমনি করে বছরের চক্রবৃত্ত শেষ হয়ে গেল, আবার নূতন করে শুরু হল : শীত আর বসন্ত, গ্রীষ্ম আর বর্ষা। আর আমি শুধু এইখানে বসে থাকতাম, বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখতাম তোমার কথা ভাবতাম, একটার পর একটা ঋতুর পার হয়ে চলে যাওয়া দেখতাম, আমার ব্যারাকের চালের উপর বৃষ্টির ধারার টুপটাপ ঝুপঝাপ শব্দ শুনতাম—

হে মধুর বৃষ্টির নিঃস্বন
গৃহচূড়ে, ধরণীর বক্ষে—
বিরহী প্রাণেরে কর স্নিগ্ধ
বরষার হে করুণ সংগীত!

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি লিখেছেন : "অন্য লোক যারা নির্বাসন বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তারা বেঁচে থাকলেও বাঁচে হতাশায় জীবন্মৃত হয়ে; আর বিদ্যাব্রতী ব্যক্তির পক্ষে সেই দিনগুলিই হয় জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের দিন।" তিনি বলছিলেন হুগো গ্রোটিয়াসের কথা। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও দার্শনিক : এঁর প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু দুবছর পরে ইনি জেলখানা থেকে পালিয়ে যান। জেলখানায় এই দুটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন দর্শন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে। বিখ্যাত জেল-ঘুঘু সাহিত্যিক পৃথিবীতে অনেকেই জন্মেছেন : এঁদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হচ্ছেন স্পেনের লেখক সার্ভান্টিস্‌, যিনি ডন-কুইকসোট্‌ লিখেছিলেন; আর ইংরেজ লেখক জন বুনিয়ান, 'দি পিলগ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস' বইয়ের রচয়িতা।

আমি সাহিত্যিক ব্যক্তি নই; জীবনের যে অনেকগুলো বছর জেলখানায় কাটালাম সেই-গুলোই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুর কাল, এমন কথাও বলতে রাজি নই আমি। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, সে বছরগুলো কাটিয়ে দিতে লেখা আর পড়ার কাজ আমাকে চমৎকার সাহায্য করেছে। আমি সাহিত্যিক নই, আমি ঐতিহাসিকও নই : বাস্তবিক, আমি কী তা হলে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ছে। বহু জিনিসই নাড়াচাড়া করে দেখেছি আমি : কলেজে প্রথম ভর্তি হয়েছিলাম বিজ্ঞান নিয়ে, তার পর পড়তে গেলাম আইন, তার পর জীবনে আরও বহুবিধ চিত্তাকর্ষক জিনিসের আলোচনা ও অনুসরণ করবার পরে শেষপর্যন্ত গ্রহণ করেছি ভারতবর্ষের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল-প্রচলিত পেশাটি—জেলে-যাওয়া!

এই চিঠিগুলোতে আমি যা লিখেছি তাকেই কোনো ব্যাপার সম্বন্ধে চরম এবং অভ্রান্ত তত্ত্ব বলে মনে কোরো না। রাজনীতিবিদের স্বভাব, সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধেই সে একটু কিছু বলতে চায়, সব সময়েই এমন ভাব দেখায় যেন আসলে যেটুকু সে জানে তার চেয়ে আরও কত বেশীই তার জানা আছে। কাজেই তার কথা সতর্ক হয়ে শুনতে হয়! আমার এই চিঠিগুলোতে শুধু একটা ভাসাভাসা ছবিই দিয়েছি আমি, অতি সূক্ষ্ম একটু সুতো দিয়ে সেগুলো একত্র গাঁথা। নিজের খেয়ালমাফিকই ইতিহাসের রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, বহু শতাব্দীকে বহু বড়ো বড়ো ঘটনাকে হেলাভরে ডিঙিয়ে চলে গেছি, আবার হয়তো আমার যেটা ভালো লেগেছে এমন কোনো একটা ক্ষুদ্র ঘটনার পাশে দীর্ঘকালের মতো তাঁবু গেড়ে বসে গেছি। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে আমার কী পছন্দ বা অপছন্দ সেগুলো যেমন খুব স্পষ্টই বোঝা যায়, জেলে থাকার সময়ে মাঝে মাঝে আমার মানসিক অবস্থাটাও তেমনি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যা যা আমি লিখেছি সমস্তই তুমি অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ কর এ আমি চাইনে; হয়তো আমার এই বর্ণনাতে ভুলভ্রান্তি অনেকই রয়ে গেছে। জেলখানা—এখানে লাইব্রেরি নেই, হাতের কাছে এমন দুটো বই নেই যে খুলে দেখে নেওয়া যায়—ইতিহাস নিয়ে লিখতে বসবার সবচেয়ে যোগ্য জায়গা এটা নিশ্চয়ই নয়। এই

কাহিনী লিখতে আমাকে বেশির ভাগই নির্ভর করতে হয়েছে আমার নোট বইগুলোর উপরে : বারো বছর আগে প্রথম যখন জেলে বেড়াতে আসা শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই এই নোটবইগুলো আমার জমে জমে উঠেছে। অনেক বইও এখানে এসেছে আমার কাছে; এসেছে, আবার চলে গেছে—কারণ এখানে লাইব্রেরি গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নির্লজ্জভাবে এই-সব বই থেকে তথ্য এবং তত্ত্ব সংগ্রহ করেছি; যা যা আমি লিখেছি তার মধ্যে আমার নিজস্ব মৌলিক আবিষ্কার কিছুই নেই। এক এক জায়গাতে হয়তো আমার চিঠির মানে বোঝাই তোমার পক্ষে শক্ত হবে; সে জায়গাগুলো তুমি বাদ দিয়ে যেয়ো, তাকে নিয়ে মন খারাপ কোরো না। চিঠি লিখতে লিখতে আমার মধ্যেকার বয়স্ক মানুষটিই এক-এক সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, যা লেখা আমার উচিত ছিল না এমন অনেক কথা লিখে চলে গেছি।

আমি তোমাকে দিলাম বিশ্ব-ইতিহাসের একটা খসড়ামাত্র; ইতিহাস এ নয়—এ শুধু আমাদের দীর্ঘ অতীত কাহিনীর দুটো-একটা বিচ্ছিন্ন আভাস। ইতিহাস পড়তে যদি তোমার ভালো লাগে, ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে যে মোহ আছে তার আকর্ষণ যদি অনুভব কর, তবে তখন নিজে থেকেই বহু বই তুমি খুঁজে বার করতে পারবে, সেই বইয়ের মধ্যেও পাবে অতীত যুগের ঘটনাসূত্রকে কী করে আবিষ্কৃত করে দেখতে হয় তার ইঙ্গিত। কিন্তু খালি বই পড়লেই হয় না। অতীতকে যদি সত্য করে জানতে চাও, তবে তার দিকে তাকাতে হবে সহানুভূতি নিয়ে, তাকে বোঝবার ইচ্ছা নিয়ে। যে মানুষ বহুকাল আগে বেঁচে ছিল তাকে যদি ঠিকমতো জানতে হয়, তবে আগে জেনে নিতে হবে সমাজের যে পরিবেশ তার ছিল তাকে, যে-সব অবস্থার আবেষ্টনীতে তার জীবন কেটেছে, যে-সব চিন্তাধারা তার মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাকে। তারাও যেন এই মুহূর্তে বেঁচে আছে, আমাদের মতোই চিন্তা করছে, এমন ধারণা নিয়ে অতীত যুগের মানুষকে বিচার করতে যাওয়াই ভুল। আজকের দিনে এমন মানুষ কেউ নেই যে দাসত্ব-প্রথাকে সমর্থন করবে; অথচ মহামানব প্লেটো স্বয়ং বলেছিলেন, সমাজজীবনের পক্ষে দাসত্ব-প্রথা অপরিহার্য। অল্পদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব-প্রথাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য বহু হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। বর্তমানের মাপকাঠি নিয়ে অতীতকে বিচার করতে আমরা পারিনে; একথাটা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করবে। অথচ অতীতের মাপকাঠি দিয়ে বর্তমানকে বিচার করতে যাওয়াটাও সমানই ভ্রান্ত অভ্যাস, কিন্তু সেকথাটা সকলে স্বীকার করতে রাজি নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই প্রাচীন যুগের যত মতামত বিশ্বাস আর রীতি-নীতিকে পাথরে বাঁধিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে; যে কালে এবং যে দেশে তার জন্ম সেখানে হয়তো এগুলো কাজে লাগত, কিন্তু আমাদের এই বর্তমান যুগের পক্ষে সেগুলো একেবারেই অচল।

তাই, অতীত ইতিহাসের দিকে যদি সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখতে পার, দেখবে তার শুষ্ক কঙ্কাল আবার রক্তমাংসে ভরে উঠবে, চোখের সামনে দেখতে পাবে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের অগণিত জীবন্ত নরনারী শিশুর বিপুল শোভাযাত্রা—আমাদের মতো তারা নয় তবু তারা অনেকখানি আমাদেরই মতো, একই মানবোচিত গুণ একই মানবোচিত ভুলভ্রান্তি তাদের মধ্যেও বেঁচে ছিল। ইতিহাস যাদুর খেলা নয়, কিন্তু দেখবার চোখ যাদের আছে তারা এর মধ্যে যাদুর খেলাও অনেকখানিই দেখতে পায়।

ইতিহাসের চিত্রপ্রদর্শনী উজাড় করে অগণিত চিত্র আমাদের মনে এসে ভিড় করছে। মিশর—বাবিলন—নিনেভে—প্রাচীন ভারতের বহু সভ্যতা—আর্যদের ভারতে আগমন এবং ইউরোপে ও এশিয়ায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা—চীনদেশের সভ্যতার অপূর্ব কাহিনী—নোসস্ এবং গ্রীস—রোম সাম্রাজ্য আর বাইজানটিনা—দুটি মহাদেশের বুকের উপর দিয়ে আরবদের বিজয়যাত্রা—ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং ক্ষয়—আমেরিকার সেই স্বল্প-পরিচিত মায়া এবং আজ্‌টেক সভ্যতা—মঙ্গোলদের প্রচণ্ড দিগ্বিজয়—ইউরোপের মধ্যযুগ, তার চমৎকার গথিক (Gothic) স্থাপত্য-শিল্পানুসারে রচিত গির্জাসকল—ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাব, মোগল সাম্রাজ্য—পশ্চিম-ইউরোপে বিদ্যা এবং কারুকলার পুনরুজ্জীবন—আমেরিকা আবিষ্কার, প্রাচ্য-জগতে আসবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার—প্রাচ্য দেশে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের আক্রমণের আরম্ভ—বড়ো বড়ো কলকব্জার আবির্ভাব,

ধনিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—শিল্পতন্ত্র, ইউরোপীয় জাতিদের প্রভুত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার—আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের বহু বিস্ময়কর আবিষ্কার।

বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে আবার ভেঙে পড়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার কথা ভুলে থেকেছে, তার ধ্বংসাবশেষটুকুও বালুকাস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। তার পর আবার একদিন তথ্যান্বেষী মানব অসীম ধৈর্য সহকারে বালুকাস্তূপ খনন করে তার সেই ধ্বংসাবশেষকে বার করে এনেছে। অথচ মানুষের বহু চিন্তাধারা বহু কল্পনা—সেই সর্বধ্বংসী কালকেও তুচ্ছ করে বেঁচে রয়েছে, সেই বিশাল সাম্রাজ্যের চেয়েও তাদেরই শক্তি বৃহত্তর এবং আয়ু দীর্ঘতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। মেরি কোল্‌রিজ বলেছেন :

ধরাশায়ী মিশরের গৌরব-প্রতিমা
ডুবে গেছে বিস্মৃতি-অতলে,
ট্রয় গেছে, গেছে চলে গ্রীসের গরিমা,
রোমের শিখরে নাই কিরীট-মহিমা,
ভেনিসের দর্প গেছে চলে।
সে-দেশের মানুষেরা—তাদের নয়ন-
ভরা ছিল বিচিত্র স্বপন।
ক্ষণিক বিলাস মাত্র তাহাদের নিজেদেরও কাছে—
অপার্থিব, অর্থহীন, অলস কল্পনা
কায়াহীন ছায়া শুধু, বায়বী জল্পনা—
সেই স্বপ্ন আজও বেঁচে আছে॥

অতীতের কাছে অনেক দানই আমরা পেয়েছি : বস্তুত এখনকার দিনে সংস্কৃতি, সভ্যতা, বা সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান বলতে যা-কিছু আমাদের আছে, এর সবটাই হচ্ছে দূর বা নিকট অতীতের কাছে পাওয়া। অতীতের কাছে সেই ঋণ স্বীকার না করতে চাইলে আমাদের অন্যায় হবে। কিন্তু আমাদের ঋণ বা কর্তব্য শুধু অতীতের প্রতিই নয়। ভবিষ্যতের প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে; অতীতের কাছে আমাদের যে ঋণ তার চেয়েও হয়তো এই কর্তব্যটাই আমাদের পক্ষে বৃহত্তর। কারণ অতীত যা সে অতীতই, তার দিন ফুরিয়ে গেছে, তার আর পরিবর্তন ঘটাতে আমরা পারিনে; ভবিষ্যৎ এখনও অনাগত, হয়তো তাকে ইচ্ছামতো গড়ে নিতেও আমরা খানিকটা পারতে পারি। অতীত ইতিহাস খানিকটা সত্যের সন্ধান আমাদের দিয়ে গেছে; সে সত্যের অনেকখানি আবার লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতেরই মধ্যে, তাকে খুঁজে বার করবার কর্তব্য আমাদেরই। কিন্তু অতীত অনেকসময়ে ভবিষ্যতের উপরে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ওঠে, শক্ত মুঠির মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখে আমাদের। তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ করেই আমাদের মুক্তি লাভ করতে হয়, যেন ভবিষ্যতের দিকে ফিরে তাকাতে পারি, তার দিকে এগিয়ে চলতে পারি।

লোকে বলে, ইতিহাসের কাছে অনেক কিছু আমাদের শিখবার আছে। আবার আরও একটি কথা আছে, ইতিহাস কোনোদিনই নিজের পুনরাবৃত্তি করে না। দুটি কথাই সমান সত্য : শুধু অন্ধের মতো তাকে নকল করবার চেষ্টা করেই তার কাছ থেকে কিছু শেখা যায় না; বা সে আবার পুনরাবৃত্ত হবে বা স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এ প্রত্যাশা করে বসে থাকলেও হবে না। তার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবার উপায় হচ্ছে তার পিছনে গিয়ে উঁকি মেরে দেখা, যে-সব শক্তির জোরে সে পথ চলে সেই শক্তিগুলোকেই আবিষ্কার করতে চেষ্টা করা। কিন্তু তার পরেও যে উত্তর আমরা পাই সেটা প্রায়ই ঠিক সহজ উত্তর হয় না। কার্ল মার্ক্‌স্ বলেন : "পুরোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার একটিমাত্র রীতি ইতিহাসের আছে, সে হচ্ছে নূতন কতকগুলো প্রশ্ন করা।"

প্রাচীন যুগটা ছিল বিশ্বাসের যুগ—অন্ধ, অসংশয়ী বিশ্বাস। অতীত কালের যে-সব অপূর্ব মন্দির মসজিদ এবং গির্জা আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিল্পীদের কারিগরদের এবং জন-

সাধারণের মন এই বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে ছিল বলেই তারা সেগুলো গড়তে পেরেছে, নইলে কখনোই পারত না। অসীম শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা সহকারে তারা একটির পর একটি করে পাথর সাজিয়েছে, পাথর কেটে বার করেছে অপূর্ব সুন্দর নক্সা—সেই পাথর আর নক্সার দিকে তাকিয়েই সে নিষ্ঠার রূপটিও আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রাচীন কালের মন্দিরের চূড়া, মসজিদের সরু গম্বুজ, গথিক গির্জার সুউচ্চ চূড়া—সকলেই তারা সোজা আকাশপানে উঠে গেছে, উঠেছে গভীর শ্রদ্ধার অঞ্জলি বহন করে—সে যেন মর্মরে প্রস্তরে গেঁথে আকাশের দিকে একটি প্রার্থনার অঞ্জলি তুলে ধরা। আগের দিনের মানুষের যে অপরিসীম ভক্তি সেই ভাস্কর্যের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে ভক্তি হয়তো আমাদের নেই; তবু আজও এদের দিকে তাকিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। কিন্তু সে যুগের ভক্তিবিশ্বাসের দিন চলে গেছে; আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে পাথরের মধ্যে সেই যাদু ফোটাবার বিদ্যা। হাজার হাজার মন্দির মসজিদ আর গির্জা আজও প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে; কিন্তু মধ্যযুগে যে প্রাণশক্তিটির বলে সেগুলো জীবন্ত বস্তু হয়ে উঠত, সেই প্রাণের চেতনাটিই গেছে হারিয়ে। এখনকার এই-সব মন্দির-মসজিদ-গির্জা আর সওদাগরি অফিসবাড়ির মধ্যে কোনো তফাৎই নেই; সওদাগরি অফিসই হচ্ছে আমাদের এই যুগের সত্য প্রতীক।

আমাদের এই যুগটাই ভিন্ন জাতের; এটা হচ্ছে মোহভঙ্গের যুগ, সন্দেহ সংশয় আর প্রশ্নজিজ্ঞাসার যুগ। প্রাচীন কালের যে-সব মতামত আর রীতিনীতি ছিল তার অনেক-গুলোকেই এখন আর আমরা মেনে নিতে পারছি না, তাদের উপরে আর আমাদের বিশ্বাস নেই—এশিয়াতে ইউরোপে আমেরিকাতে সর্বত্রই। অতএব এখন আমরা সন্ধানে ফিরছি নূতন পথের, সত্যের নূতনতর রূপের, আমাদের এই পরিবেশের সঙ্গে যে রূপটির সামঞ্জস্য অধিকতর স্পষ্ট হবে। পরস্পরকে ক্রমাগত প্রশ্ন করছি আমরা, করছি তর্কবিতর্ক আর ঝগড়া, খাড়া করছি অসংখ্যরকমের 'বাদ' আর দর্শন। সক্রেটিসের যুগের মতো আমরাও বাস করছি একটা জিজ্ঞাসার যুগে; কিন্তু সে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র শুধু এথেন্সের মতো একটি ক্ষুদ্র নগরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার ক্ষেত্র এখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী।

এক-এক সময়ে পৃথিবীর অন্যায় অশান্তি নৃশংসতা দেখে আমরা বিষণ্ণ হয়ে যাই। সংশয়ের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে আমাদের মন—সে অন্ধকার থেকে অব্যাহতির পথ খুঁজে পাই নে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতে তখন আমাদেরও মনে হয়, এই পৃথিবীতে আশা বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটি মাত্র কাজ আছে যা আমরা করতে পারি, সে হচ্ছে পরস্পরের প্রতি সত্যপালন করে চলা।

এই তো পৃথিবী : এরে জানি,
নিত্য নব নব রূপে বিচিত্রিতা, সৌন্দর্যের রাণী।
মিথ্যা রূপ : নাই প্রীতি, নাই প্রেম, আলোকের কণা
নাহিক আশ্বস্তি হেথা, নাই শান্তি, শোকের সান্ত্বনা।
আমরা দাঁড়ায়ে আছি নিঃসঙ্গ প্রান্তরে, যেথা ধীরে
নামিয়া আসিছে নিত্য অন্ধকার চতুর্দিকে ঘিরে—
সে রাত্রির আবরণে দৃষ্টিহীন সেনাদল মাতে
উন্মত্ত আহবে, হানে যারে পায় অন্ধ অস্ত্রাঘাতে;
শত্রু-মিত্র জ্ঞান নাই, চলে তবু হিংস্র সেই রণ,
জয়ীর হুঙ্কার আর বিজিতের ত্রস্ত পলায়ন।
একত্র মিশিয়া তোলে অর্থহীন মত্ত কোলাহল—
দিশাহারা পান্থ মোরা, খুঁজি পথ আতঙ্কে বিহ্বল॥

অথচ এতখানি দুঃখময় বলেই যদি একে আমরা ভাবি, তবে বুঝতে হবে জীবন ইতিহাস যে শিক্ষা দিল তাকে আমরা ঠিকমতো শিখে নিতে পারি নি। ইতিহাস আমাদের শেখাচ্ছে বৃদ্ধিলাভ আর প্রগতির কাহিনী, মানুষের মধ্যে অনন্ত উৎকর্ষের যে সম্ভাবনা রয়েছে শেখাচ্ছে তারই কথা। জীবনের সম্পদ বহু এবং বিচিত্র; জলাভূমি বিল কাদাডোবা অনেকই হয়তো আছে এর মধ্যে, কিন্তু তেমনই আবার তো মহাসমুদ্রও আছে, আছে পাহাড় পর্বত, তুষারপাত, বরফের দেশ আর অপূর্ব নক্ষত্রখচিত রাত্রি (বিশেষ করে জেলখানাতে!), আছে পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধব, আছে এক লক্ষ্য নিয়ে যাদের সঙ্গে কাজ করছি সেই সহকর্মী ভাইদের মিত্রতাবন্ধন, আছে সংগীত, আছে বই, আছে চিন্তাধারার মহাসাম্রাজ্য। তাই আমাদের প্রত্যেকটি লোকই মন খুলে বলতে পারে—

"হে প্রভু, পৃথিবীতে বাস করতাম আমি, আমি ধরিত্রীর সন্তান, কিন্তু আমাকে পিতার স্নেহে পালন করেছে নক্ষত্রখচিত আকাশ।"

বিশ্বসংসারের সুন্দর বস্তুগুলোকে দেখে মুগ্ধ হওয়া এবং চিন্তা আর কল্পনার রাজ্যে বাস করা অতি সহজ কাজ। কিন্তু শুধু তাই নিয়েই যদি অন্যদের দুঃখকে ভুলে থাকতে চাই, তাদের কী হল না হল সেদিকে ফিরেও তাকাতে না চাই, তবে সেটা সাহস বা স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় নয়। চিন্তার সার্থকতা শুধু সেইখানেই, যেখানে সে কর্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছে। আমাদের বন্ধু রোমাঁ রোলাঁ বলেন :

"কর্মই হচ্ছে চিন্তার উদ্দেশ্য। যে চিন্তা কোনো কর্মের দিকে প্রেরণা দেয় না সে পণ্ডশ্রম, প্রবঞ্চনা মাত্র। অতএব চিন্তার সেবক যদি আমরা হয়ে থাকি, তবে কর্মেরও সেবক আমাদের হতেই হবে।"

কর্মকে মানুষ অনেক সময়ে এড়িয়ে চলতে চায়, কারণ সে কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে তাদের ভয় আছে : কর্ম মানেই ঝুঁকি, বিপদ। কিন্তু ভয়কে দূর থেকেই ভয়ংকর বলে মনে হয়; খুব কাছে গিয়ে যদি তাকিয়ে দেখ তবে আর সে তত ভয়ংকর থাকে না। অনেক সময় আবার সেই হয় সুখপ্রদ সঙ্গী; জীবনের উৎসাহ আর আনন্দকে সে বাড়িয়ে তোলে। আমাদের এই সাধারণ জীবনযাত্রাটা এক এক সময়ে বড়ো একঘেয়ে হয়ে ওঠে, বহু জিনিসকে আমরা শুধু গতানুগতিক বলেই মেনে চলে যাই, তার মধ্যে কোনো আনন্দ খুঁজে পাই না। অথচ জীবনের সেই সামান্য জিনিসগুলো থেকেই যদি কিছুদিন বঞ্চিত হয়ে থাকি, তবে তাদেরই মাধুর্য আমাদের কাছে কী দারুন বেড়ে ওঠে! অনেক মানুষ প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়ে গিয়ে চড়ে; শুধু পাহাড় বেয়ে ওঠার আনন্দের লোভে, একটা বিঘ্নকে অতিক্রম করা, বা একটা বিপদকে জয় করার ফলে যে আত্মপ্রসাদটুকু আসবে তারই লোভে নিজের দেহ এবং প্রাণকে বিপন্ন করে; যে বিপদ সেখানে সারাক্ষণ তাদের ঘিরে আছে তারই তাড়নায় তাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রখরতর হয়ে ওঠে; একটি অতি সূক্ষ্ম সুতোর উপরে জীবনটা ঝুলে রয়েছে বলেই সে জীবনের আনন্দ তাদের কাছে গভীরতর লাগে।

দুটি পথই আমাদের সকলের সামনে খোলা রয়েছে, যেটি ইচ্ছা আমরা বেছে নিতে পারি : বাস করতে পারি নীচের উপত্যকায়, সেখানে অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ধুলো আর কুয়াশা, কিন্তু হাত-পা সেখানে আস্ত থাকবার ভরসা আছে; অথবা গিয়ে চড়তে পারি উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়—সে যাত্রায় বিঘ্ন আর বিপদ হবে আমাদের সঙ্গী; যাত্রার অন্তে পাহাড়ের উপরে পরিচ্ছন্ন বায়ুতে নিঃশ্বাস টেনে বাঁচব, দূরের দৃশ্য দেখে আনন্দ পাব, ঊষার প্রথম সূর্যোদয়কে স্বাগত সম্ভাষণ করব।

এই চিঠিতে বহু কবি এবং লেখকের উক্তি আমি উদ্ধৃত করেছি। আর একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করে আমি চিঠি শেষ করব। এটি একটি কবিতা বা প্রার্থনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত :

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'-
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥"

শেষ করলাম আমরা, এই "মধুর কাব্যোক্তিটি" দিয়ে আমাদের শেষ চিঠিটিও শেষ করলাম। শেষ চিঠিটি? নিশ্চয়ই নয়! আরও অনেক চিঠিই আমি লিখব তোমাকে। কিন্তু এই পত্রধারার শেষ হল, কাজেই এবার তামাম শোধ!

পুনশ্চ

আরব সাগর
১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৮

আজ থেকে ঠিক সওয়া-পাঁচ বছর আগে, দেরাদুনের সদর জেলখানায় বসে এই পত্রাবলীর শেষ চিঠিটি তোমাকে লিখেছিলাম। দু'বছর সাজা আমার, তার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছিল। সেই দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ পুরীতে (তুমি অবশ্য সারাক্ষণই আমার মনের সঙ্গী হয়ে ছিলে) বসে বসে যে বিপুল-পরিমাণ চিঠি তোমাকে লিখেছি তার বোঝাটি তখন তুলে রাখলাম; মুক্তি পেয়ে আবার বাইরের জগতে বেরুবার, গতি আর কর্মে ভরা জীবনের স্রোতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নিলাম। মুক্তিও এল, অল্পদিনের মধ্যেই; কিন্তু পাঁচ মাস পরে আবার জেলখানার সেই পরিচিত কোণটিতে ফিরে গিয়ে হাজির হলাম—আবার আমার দু'বছর সাজা হয়েছে। তখন আবার কলম হাতে করলাম, আবার একটি কাহিনী লিখলাম, এবারের কাহিনী অনেক বেশি ব্যক্তিগত ধরণের।

তারপর আবার বাইরে এলাম; তোমার আর আমার, দুজনেরই জীবনে একটা প্রকাণ্ড শোক নেমে এল—সে শোকের ছায়া আজও আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু সংগ্রামে আর বেদনায় ভরা এই পৃথিবী, নিত্য নূতন আঘাতে আর সংঘাতে এর জীবনধারা সারাক্ষণ বিক্ষুব্ধ, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই মানুষের দেহের মনের সমস্তখানি শক্তি লেগে যায়—ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্ভাগ্য এখানে বড়ো জিনিস নয়। অতএব আবার আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে যেতে হল। তুমি গেলে অধ্যয়নের ছায়া-ঢাকা পথে এগিয়ে, আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম জীবন-সংগ্রামের সেই কোলাহল আর উন্মত্ত আবর্তের মাঝখানে।

যুদ্ধ আর দুঃখ-বেদনার বোঝা বয়ে আরও পাঁচটি বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে; যে জগতে আমরা বাস করছি আর যে-জগৎ গড়ে তুলব বলে আমরা স্বপ্ন দেখছি, দুইয়ের মধ্যে তফাৎটা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আশা নিজেই যেন এক-এক সময়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে, চারদিক থেকে যেসকল দুর্বৃত্তি ক্রমাগত আমাদের তাড়া করে নিয়ে চলেছে, তাদের পীড়নে আশারও কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম। কিন্তু তবুও এই তো, বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি—আমার সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে আরব সাগর, বিপুল তার শক্তি, অসীম তার সৌন্দর্য, স্বপ্নের মতোই সে নিস্তব্ধ, স্বপ্নলোকেরই মতো স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে তার সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত।

আজকের এই পুনশ্চ-চিঠিতে, এই পাঁচটি বছরের কথা তোমাকে বলে দিতে হবে। চিঠি-গুলো নূতন আকারে আবার ছেপে বার করা হচ্ছে; প্রকাশকের ইচ্ছে, এগুলোকে বর্তমান দিন পর্যন্ত এনে পৌঁছে দিই। বড়ো কঠিন কাজ; এই পাঁচ বছরে পৃথিবীতে এত সব কাণ্ড ঘটেছে যে, তাদের কথা যদি লিখতে বসি আর বসে বসে লিখবার যদি সময় পাই, তবে কতখানি লিখতে পারি তার সীমা নেই—হয়তো আস্ত আরেকখানা বইই লিখে বসব। খুঁটিনাটির কথা ছেড়ে দিলাম, খুব বড়ো বড়ো ঘটনা যেগুলো ঘটেছে শুধু তারই যদি একটি তালিকা দিই, দেখবে সেটাও কী প্রকাণ্ড আর দুর্বোধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে। সে চেষ্টা কাজেই করব না; পৃথিবীতে যা ঘটেছে এবং ঘটছে, তার অতি সংক্ষিপ্ত একটু আভাস মাত্র এই চিঠিতে তোমাকে দেব। আগের চিঠিগুলোর সঙ্গেও আমি খানিক খানিক টীকা জুড়ে দিয়েছি, তাতে নূতনতর তথ্য অনেক দেওয়া হয়েছে। এবার এই বছর কটির একটি সংক্ষিপ্তসার তোমাকে শোনাচ্ছি।

শেষদিকের ক'টি চিঠিতে তোমাকে দেখিয়েছিলাম, বর্তমান জগতে কী বিরাট অসামঞ্জস্য আর রেষারেষি সর্বত্র দেখা দিচ্ছে, ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদ কীভাবে মাথা উঁচু করে উঠছে, কীরকম করে পৃথিবীতে যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। এই পাঁচ বছরে সে রেষারেষি আর সংঘাতের তীব্রতা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধ এখন পর্যন্ত বেধে ওঠেনি বটে, কিন্তু আফ্রিকায়, ইউরোপে, এশিয়ার দূর-প্রাচ্য অঞ্চলে, খুব বড়ো বড়ো আর সাংঘাতিক ধরণের যুদ্ধ অনেকগুলোই

হয়ে গেছে। প্রতি বছর, এমনকি প্রতি মাসেই নূতন নূতন যুদ্ধ, আক্রমণ আর বীভৎস নৃশংসতার কাহিনী কানে এসে পৌঁছচ্ছে। পৃথিবীর জীবন-শৃঙ্খলা ক্রমশই ভেঙে পড়ছে; আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ক্ষেত্রে চলেছে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা; জাতি-সংঘ, বা আন্তর্জাতিক জীবনে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য যেসব আয়োজন করা হয়েছিল, তার সবই একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। 'নিরস্ত্রীকরণের' নামটাই এখন একটা অতীত কালের বিস্মৃত বস্তু; প্রত্যেক দেশই দিবারাত্র তার অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রসংগ্রহে যার যতটুকু সাধ্য তার তিলমাত্র বাকি কেউ রাখছে না। সমস্ত জগৎ জুড়ে এখন বিভীষিকার রাজত্ব। নাৎসী আর ফ্যাসিস্টদের উগ্র জয়যাত্রার দাপটে ইউরোপ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, উন্মত্ত বেগে সে ছুটে চলেছে অবনতির পথে, চরম বর্বরতার পথে।

১৯১৪-১৮ সনে যে মহাযুদ্ধ হল, তার মূলে কী-সব ব্যাপার ছিল তার বিস্তৃত আলোচনা আমি আগের চিঠিগুলোতে করেছি। যুদ্ধ হল; সেই যুদ্ধের ফলে হল ভার্সাই সন্ধি, আর হল জাতি-সংঘের সৃষ্টি। কিন্তু পুরোনো যে সমস্যাগুলো ছিল তাদের মীমাংসা এতে হল না; বরং আরও বহু নূতন সমস্যা এসে হাজির হল, ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধ-ঋণ, নিরস্ত্রীকরণ, সম্মিলিত নিরাপত্তাবিধান, আর্থিক সংকট, বিরাট একটা বেকার-সমস্যা। শান্তি-স্থাপনের সমস্যা তো আছেই, তারও পেছনে জেগে রইল বহু জটিল সামাজিক সমস্যা—জগতের ভারসাম্য এদেরই আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে নূতনতর সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জয়যুক্ত হয়েছে, সেখানে চলেছে নূতন ধরণের একটা জগৎ গড়ে তুলবার চেষ্টা; কিন্তু তার সামনে তখনও বহু বিঘ্ন-বিপত্তি, বাইরের দেশরা সকলে একজোট হয়ে তাকে বাধা দিচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সমাজজীবনে অতি গভীর পরিবর্তনের স্রোত দেখা দিয়েছে, কিন্তু বাইরে প্রকাশের পথ নেই তার—দেশের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিক আর আর্থিক ব্যবস্থার চাপে তাকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। ধন-প্রাচুর্য দেখা দিল জগতে, এল পণ্য-উৎপাদনের বিপুল আয়োজন-সম্ভার—যুগ যুগ ধরে মানুষ যে ধন-প্রাচুর্যের স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্ন তার এতদিনে সফল হল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শৃঙ্খলবন্ধনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে ক্রীতদাস, মুক্তির নামে সে ভয় পায়। মূর্খ এই মানব-সমাজ—অভাব আর অতৃপ্তিই এদের অভ্যাস হয়ে গেছে, অন্য কোনো অবস্থার কথা এরা সহজে ভাবতে পারে না। অতএব দেখা গেল, ধন এসেছে কিন্তু সুখ এল না—যে বিপুল ধনৈশ্বর্য বাড়ল পৃথিবীতে মানুষরা নিজেরাই ইচ্ছে করে তাকে নষ্ট করে ফেলতে লাগল, তার উৎপাদন বন্ধ করল, বিক্রয় বন্ধ করল। সে ধন মানুষের ভোগে তো লাগলই না, বরং তার ফলে আরও তীব্রতর হয়ে উঠল বেকার-সমস্যা, বেড়ে গেল মানুষের দৈন্য আর দুঃখ।

এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান হবে কী করে, কী করে আনা যাবে শান্তির ভরসা, এর জন্যে সম্মেলনের পর সম্মেলন ডাকা হতে লাগল, পৃথিবীর সমস্ত জাতি একত্র হয়ে আলোচনা আর বিতর্ক করতে লাগলেন। কত-যে সন্ধি আর চুক্তি আর মৈত্রীস্থাপন হল তার সীমাসংখ্যা নেই—ওয়াশিংটন, লোকার্নো, কেলগ্-চুক্তি, কত-রকমের অনাক্রমণ-সন্ধি! কিন্তু গোড়ায় যেখানে আসল সমস্যা, তার ধার দিয়ে কেউই গেলেন না। ফলে দেখা গেল—রূঢ় বাস্তবতার যেই একটু ছোঁওয়া লাগা, সঙ্গে সঙ্গেই এই সব চুক্তি আর সন্ধি হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় করবার মালিক আর কেউই নেই, একমাত্র উলঙ্গ অসি ছাড়া। ভার্সাই সন্ধি ইতিমধ্যেই মরে ভূত হয়েছে, ইউরোপের মানচিত্র আবার বদলে গেছে, পৃথিবীকে এখন আবার নূতন করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধ-ঋণের প্রশ্নটা অতি সহজেই মিটে গেছে; সবচেয়ে ধনী যে দেশগুলো, তারা সাফ বলে দিয়েছে ও-ঋণের টাকা তারা দেবে না।

কাজেই দেখছ, আমরা ফিরে চলে এসেছি যুদ্ধ-পূর্ব যুগে, ১৯১৪ সনে বা তারও আগের অবস্থায় : সে-সময়কার সমস্ত সমস্যা সমস্ত সংঘাতই আজও বর্তমান, শুধু বর্তমান নয়, পরবর্তী কালের ঘটনাবলীর ফলে তাদের তীব্রতা তিক্ততা এখন আরও শতগুণ বেশি। ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থায় যখন ভাঙন ধরল, তখন তারই পরিণামে এল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, আর হল বড়ো বড়ো একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন। মৃত্যুমুখী ধনিকতন্ত্র উগ্র এবং হিংস্র হয়ে উঠল। পার্লামেন্ট-পন্থী গণতন্ত্রকে পর্যন্ত সে আর সহ্য করতে পারছে না। ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদ মাথা

তুলে দাঁড়িয়েছে তাদের সমস্তখানি উলঙ্গ নৃশংসতা নিয়ে, তাদের সমস্ত রীতি সমস্ত নীতিরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ। এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার সোভিয়েট-অঞ্চলে এক নূতনতর শক্তির আবির্ভাব হয়েছে; প্রাচীন জগৎ-ব্যবস্থাকে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে; সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ, উভয়কেই বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা সে রাখে।

আমরা যে যুগে বাস করছি এটা বিপ্লবের যুগ। ১৯১৪ সনে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন থেকেই এই বিপ্লবেরও শুরু। বছরের পর বছর ধরে এই বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলেছে; পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত দেশ জুড়ে চলেছে এর সংগ্রাম। দেড় শো বছর আগে ফরাসি-বিপ্লব হয়েছিল; তার ফলে পৃথিবীতে মানুষে মানুষে রাজনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু যুগ বদলে গেছে, আজকের দিনে আর শুধু রাজনৈতিক সাম্য নিয়ে আমাদের চলছে না। গণতন্ত্রের গণ্ডীকে এখন আরও বিস্তৃত করতে হবে আমাদের, তার অন্তর্গত করে নিতে হবে অর্থনৈতিক সমস্যাকেও। এইটিই হচ্ছে আজকের দিনের মহা বিপ্লব, এই বিপ্লবেরই মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সে বিপ্লব মানুষের মধ্যে এনে দেবে অর্থনৈতিক সাম্য, গণতন্ত্রকে তার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে; বিজ্ঞান আর যন্ত্র-সাধনার যে দুর্বার প্রগতি পৃথিবীতে চলেছে, এই বিপ্লবের দ্বারাই আমরা তার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলবার শক্তি অর্জন করব।

সাম্রাজ্যবাদ বা ধনিকবাদের সঙ্গে এই নূতন সাম্যটা খাপ খায় না। এদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মানুষে মানুষে অসাম্য আর এক জাতি এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য জাতি অন্য শ্রেণীকে শোষণের উপরে। কাজেই সে শোষণে যাদের লাভ তারা এই সাম্য আনবার চেষ্টাকে বাধা দিচ্ছে; সে সংগ্রাম যেখানে তীব্র হয়ে উঠছে, রাজনৈতিক সাম্য এবং পার্লামেণ্টপন্থী গণতন্ত্রের নামটাকেও এরা অবলুপ্ত করে দিতে চাইছে। এরই নাম ফ্যাসিজ্‌ম্; এর কল্যাণে বহু ব্যাপারে পৃথিবীতে আবার মধ্যযুগের অবস্থা ফিরে চলে এসেছে। জাতি-বিশেষের প্রভুত্বকে এরা খুব মহৎ আদর্শ বলে ঘোষণা করছে; স্বৈরতন্ত্রী রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া—এই ছিল সে যুগের ধারণা, এরা শুধু তার জায়গাতে নাম করছে স্বৈরতন্ত্রী নেতার—তাঁরও ক্ষমতা নাকি ঈশ্বরপ্রদত্ত, সুতরাং অপ্রতিহত। গত পাঁচ বছর ধরে ফ্যাসিজমের শক্তি ক্রমশ বেড়ে উঠেছে, গণতন্ত্রের যত নীতি, স্বাধীনতা ও সভ্যতার যত সংজ্ঞা আমাদের জানা ছিল, সব-কিছুকেই ভেঙে ফেলতে সে ক্রমাগত চেষ্টা করছে। অতএব গণতন্ত্রকে কী করে তার আক্রমণ হতে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এইটেই হয়ে উঠেছে আজকের দিনের সবচেয়ে মর্মান্তিক সমস্যা। বর্তমানে যে সংগ্রাম চলেছে পৃথিবীতে, সেটা একদিকে কমিউনিজ্‌ম্ সোশ্যালিজ্‌ম্ আর একদিকে ফ্যাসিজ্‌ম্—এদের মধ্যে নয়। এই যুদ্ধ বস্তুত হচ্ছে গণতন্ত্র আর ফ্যাসিজমের মধ্যে; গণতন্ত্রের মধ্যে যেখানে যেটুকু সত্যকার শক্তি আছে, সমস্ত একত্র হয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে। আজকের দিনের স্পেন এরই চরম উদাহরণ।

কিন্তু এই গণতন্ত্র-বাদের পিছনে স্বভাবতই জেগে রয়েছে গণতন্ত্রকে আরও বিস্তৃততর করবার কল্পনা। প্রগতিবিরোধীদের তাতে ভয়; কাজেই জগতের সর্বত্র প্রগতিবিরোধীরা সতর্ক হয়ে উঠেছে—মুখে তারা হয়তো গণতন্ত্রেরই জয়গান করছে, কিন্তু তলায় তলায় সহানুভূতি আর আনুগত্য প্রকাশ করছে ফ্যাসিজমের প্রতি। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রেরা কি করতে চাইছে সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট : তাদের লক্ষ্য বা নীতি কী, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার প্রধানত যার উপরে নির্ভর করে চলছে, সে হচ্ছে তথাকথিত 'গণতন্ত্রী' দেশদের কার্যকলাপ—এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে ইংলণ্ডের। এশিয়াতে আফ্রিকাতে ইউরোপে, ব্রিটিশ সরকার চিরদিনই প্রগতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে; ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদকেও যতদূর পারে উৎসাহ এবং সাহায্য দিয়ে চলেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এদের শক্তি বাড়লে তার ফলে খোদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাও বিপন্ন হতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও তাঁরা নিরস্ত হন নি—সত্যকার গণতন্ত্র পাছে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ভয়ের তাড়না এবং ফ্যাসিবাদের নেতাদের প্রতি সমশ্রেণীত্ব-বোধ ও প্রীতিবোধ এঁদের মনে এতই প্রবল। ফ্যাসিবাদ ক্রমশ শক্তিমান হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সকল ব্যাপারে এরই মধ্যে মাতব্বরি শুরু করেছে—এর জন্য বেশির ভাগ বাহাদুরিই

ব্রিটেনের প্রাপ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা গণতন্ত্র বস্তুটাকে একটু বেশি বোঝে এবং মানে; তারা বহুবার ঘোষণা করেছে, ফ্যাসিস্টদের উগ্রনীতিকে যদি অন্যান্য শক্তিরা বাধা দিতে চায়, আমেরিকা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত। ব্রিটেন কিন্তু প্রত্যেকবারই আমেরিকার এই সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ফ্রান্সের কথা বলা বৃথা; তাকে এতটা পূর্ণভাবে লন্ডনের টাকার বাজার আর ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতির মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হচ্ছে, যে নিজে থেকে কোনো স্বাধীন নীতি অবলম্বন করবার সাহসই তার নেই।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন যেগুলি হয়েছে, তাতে দেখা গেছে শ্রমিক-সমস্যার ব্যাপারেও ব্রিটেন বরাবরই প্রগতি-বিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। ১৯৩৭ সনে "আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা" এই সিদ্ধান্ত স্থির করেন : কাপড়ের কারখানার শ্রমিককে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টার বেশি খাটানো চলবে না। এই সিদ্ধান্ত করা হল, ব্রিটেনের ঘোরতর আপত্তি অগ্রাহ্য করে। ব্রিটিশ ডমিনিয়নগুলি পর্যন্ত এ ব্যাপারে ব্রিটেনের পক্ষে গেলেন না, আমেরিকার প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। ভারতের প্রতিনিধি যিনি ছিলেন তিনি অবশ্য ব্রিটিশ সরকারেরই মনোনীত ব্যক্তি; তিনি স্বভাবতই ব্রিটেনের পক্ষে রইলেন। আমেরিকার প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কারখানার মালিকও ছিল, সরকারি প্রতিনিধিও ছিল। দেখেশুনে এঁরা মন্তব্য করলেন, "ব্রিটিশ সরকার যে কতখানি প্রগতি-বিরোধী, জেনেভাতে আসবার আগে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমাদের ছিল না।" এঁদের একজন তো বলে বসলেন, "ব্রিটেনই দেখছি প্রগতি-বিরোধীদের অগ্রদূত হয়ে উঠেছে।"

জাতিসংঘের দুর্বলতা প্রচুর; তবু তখনও আন্তর্জাতিক শান্তির ধ্বজা সে ধারণ করে রয়েছে, তার সংস্থাপত্রে তখনও আক্রমণকারী রাষ্ট্রের প্রতি শাস্তির বিধান লেখা আছে। জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করল, লীগ তখন কিছুই করতে পারে নি (তথ্যনির্ণয়ের জন্য একটা কমিশন অবশ্য লীগ বসিয়েছিল, এবং তার পরে এইরকম করে পররাজ্য আক্রমণের একটা নিন্দাও উচ্চারণ করেছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই)। ব্রিটিশ সরকার এই অভিযানে কার্যতই জাপানকে উৎসাহিত করেছিলেন; এবং তার পর থেকে এই পর্যন্ত তাঁরা ক্রমাগতই লীগকে উপেক্ষা করে চলবার এবং নানারূপে দুর্বল করে ফেলবার নীতি অবলম্বন করে চলছেন। এক-আধবার অবশ্য এক-আধটা ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁরা ন্যায়ের পথে চলে ফেলেছেন, কিন্তু সে নিতান্তই দৈবাৎ, সম্ভবত ভুলক্রমে। নাৎসীবাদ যখন বেড়ে উঠল, সে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করল, যুদ্ধ এবং উগ্রনীতি তার লক্ষ্য; তার মানে খোলাখুলিই লীগের নীতিকে অগ্রাহ্য করা। তখনও কিন্তু ইংলণ্ড সে ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ করল না; তার ফলে লীগ একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ফ্রান্সও কিছু পরিমাণে ব্রিটেনের হাত ধরে চলেছে। ফ্যাসিস্ট দেশরা লীগ ছেড়ে বাইরে চলে গেল—১৯৩৩ সনের অক্টোবর মাসে গেল জর্মনি, তার পরে গেল ইতালি আর জাপান। ১৯৩৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন লীগে এসে যোগ দিল, লীগের দেহে আবার নূতন শক্তির সঞ্চার করল। নাৎসী-জর্মনির কাণ্ড দেখে ফ্রান্সের মনে ভয় ধরেছে, সেই তাড়ায় পড়ে সে সোভিয়েটের সঙ্গে একটা সন্ধি করে ফেলল। ইংলণ্ড কিন্তু কিছুতেই সোভিয়েটের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি নয়, লীগের চুক্তিপত্র অনুসারে নেহাৎ যেটুকু, তাও নয়। তার চেয়ে বরং নাৎসী-জর্মনির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনও সে শ্রেয় বলে মেনে নিলে। ফ্যাসিস্টরা একটির পর একটি অভিযান শুরু এবং সমাপ্ত করতে লাগল; প্রতিবারে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে চলল; তারা স্থির জেনে গেল, লীগকে তারা নিঃসংকোচে অগ্রাহ্য করে চলতে পারে, তার জন্যে কোনো শাস্তিই তাদের পেতে হবে না। ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই তাদের বিপক্ষে যাবে না, এটা তারা ঠিকই বুঝে নিয়েছিল।

এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ক্রমেই ফ্যাসিস্ট শক্তিদের দলভুক্ত হয়ে যেতে লাগলেন। চীনে, আবিসিনিয়াতে, স্পেনে এবং মধ্য-ইউরোপে যে-সকল ব্যাপার ঘটছিল, সেগুলো কেন ঘটতে পারল তার অনেকখানিরই ব্যাখ্যা এর থেকে মিলবে। এর থেকেই বোঝা যাবে, লীগ অব নেশনস কেন ভেঙে গেল—এমন বিরাট এমন গৌরবময় একটা প্রতিষ্ঠান, জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার, সমস্ত মানব-

জাতির উন্নতিসাধনের এতখানি আশা যাকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছিল, কেন সে এমন করে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

আমরা দেখেছি, কী ভাবে জাপান লীগ অব নেশনসকে, সমস্ত সভ্য জগৎকে, অক্লেশে অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুরিয়ায় ঢুকে পড়ল, সেখানে 'মাঞ্চুকুও' বলে একটা তাঁবেদার রাজ্য খাড়া করে দিল। মাঞ্চুরিয়ায় রীতিমতো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল জাপান, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা সে করে নি। মাঞ্চুরিয়ার মধ্যেই সে উস্কানি দিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিল, তার পর সেই বিদ্রোহের দোহাই দিয়ে সে দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গেল। পরের দেশ আক্রমণের এ এক নূতন কায়দা; পরবর্তীকালে ইতালি আর নাৎসী-জর্মানি এই কায়দাটিকে আরও মেজেঘষে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে, তার সঙ্গে আবার জুড়ে দিচ্ছে দেশ-বিদেশে সেই আক্রান্ত দেশের নামে মিথ্যা সংবাদ রটনা—এমন ব্যাপক মিথ্যা প্রচার পৃথিবীতে এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এখন আর পৃথিবীতে 'যুদ্ধ ঘোষণা' করা হয় না; সে-সব এখন সেকেলে হয়ে গেছে। ১৯৩৭ সনে নুরেমবুর্গের এক সভায় হিটলার বলেছিলেন : "আমাকে যদি কোনোদিন কোনো শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে আমি মাসের পর মাস ধরে তার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি আর উদ্যোগ-আয়োজনের ভড়ং করব না; আমার চিরদিন যা করা অভ্যাস এবারেও ঠিক তাই করব—অন্ধকারের মধ্য থেকে অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করব। বিদ্যুতের বেগে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভূমিসাৎ করে দেব।"

১৯৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে সার্ উপত্যকায় গণভোট নেওয়া হল, তার ফলে জর্মানি সার্ দখল করে বসল। ভার্সাই সন্ধিতে অস্ত্র-হ্রাস সম্বন্ধে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছিল, এই বছরেরই মে মাসে হিটলার সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলেন; হুকুম দিলেন, জর্মানির প্রত্যেক লোককে সেনাদলে যোগ দিতে হবে। ভার্সাই সন্ধিকে জর্মানি এমন করে খোলাখুলি এবং এক-তরফা ভেঙে চলেছে দেখে ফ্রান্স আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল। ইংলণ্ড কিন্তু কার্যত জর্মানির এই আচরণকে সঙ্গত বলে মেনে নিল। শুধু তাই নয়, এর এক মাস পরে আরও কিছু বেশি এগিয়ে গেল সে, জর্মানির সঙ্গে একটি গোপন নৌ-সন্ধি সম্পন্ন করে ফেলল। এই ধরণের সন্ধি করার মানেই হচ্ছে ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করা, অতএব ইংলণ্ড নিজেই শান্তি-চুক্তিকে অমান্য করল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই সন্ধি করবার বেলায় ইংলণ্ড তার পুরোনো বন্ধু ফ্রান্সকে একবার জানালেও না কথাটা; এবং কাণ্ডটি সে করল ঠিক এমন একটা সময়ে, যখন জর্মানি বিপুল-পরিমাণে অস্ত্রসম্ভার তৈরি করে নিজেকে আবার রণসাজে সজ্জিত করে নিচ্ছে, গোটা ইউরোপকেই বিপন্ন করে তুলেছে। ফ্রান্সের মতে ইংলণ্ডের এই কাজটা তার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ফ্রান্স এবার ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটল মুসোলিনির কাছে, তাঁর সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যায় কি না দেখতে—তাহলে অন্তত ইতালি-সীমান্তের দিক থেকে তার আক্রান্ত হওয়ার ভয়টা কিছু কমে যায়।

আবিসিনিয়া

মুসোলিনি দীর্ঘকাল ধরে যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন, এর ফলে সেই সুযোগ হাতে এসে পড়ল। বহু বছর ধরেই তাঁর মতলব ছিল আবিসিনিয়া আক্রমণ করবেন; শুধু ইতস্তত করছিলেন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কোন্ পক্ষ নেবে সেইটে স্থির বুঝতে পারছিলেন না বলে। ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির কিছুদিন থেকে প্রচণ্ড মন-কষাকষি চলছিল। ১৯৩৪ সনের অক্টোবর মাসে মার্সাই শহরে যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার আর ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী লুই বার্থো নিহত হলেন—লোকের ধারণা, তাঁদের খুন করেছে ইতালির জনৈক গুপ্তচর। এবার মুসোলিনি নিশ্চিন্ত হলেন; বুঝলেন, তিনি যদি আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন, ফ্রান্স বা ইংলণ্ড তাঁকে সত্যি করে বাধা দেবে না। ১৯৩৫ সনের অক্টোবর মাসে মুসোলিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলেন। লীগ অব নেশনসের তখন অধিবেশন চলছে। আবিসিনিয়া নিজেও লীগের

সভ্য, কাণ্ড দেখে পৃথিবীশুদ্ধ লোক চমকে গেল। লীগ ইতালিকেই আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করল, বহুদিন ধরে বহু টালবাহানার পর ইতালির বিরুদ্ধে গোটাকতক আর্থিক-নিষেধাজ্ঞা জারি করল। তার অর্থ—অন্য যেসব দেশ লীগের সভ্য আছে, তাদের বলা হল, বিশেষ কতকগুলো পণ্য-সামগ্রী তারা ইতালির কাছে বেচাকেনা করতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধ চালাবার জন্য যেসব জিনিস সত্যিকার একান্ত দরকার—যেমন তেল, লোহা, ইস্পাত, কয়লা—এদের নাম এই নিষিদ্ধ-পণ্যের তালিকায় লেখা হল না। অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি দিনরাত কাজ চালিয়ে ইতালিকে তেলের যোগান দিতে লাগল। লীগের এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ইতালি কিছুটা অসুবিধায় পড়ল ঠিকই, কিন্তু এতে তার কাজের সত্যিকার বড়ো ব্যাঘাত কিছু হল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করল, ইতালিকে তেল বেচা বন্ধ করা হোক। ব্রিটেন তাতে রাজি হল না।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-সচিব স্যার্ স্যামুয়েল হোর আর ফ্রান্সের সচিব মঁসিয়ে লাভাল, এঁরা দুজনে যুক্তি করে স্থির করলেন, আবিসিনিয়ার একটা বৃহৎ অংশ ইতালিকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু সমস্ত দেশেই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠল; ফলে স্যার্ স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আবিসিনিয়ার লোকেরা ওদিকে খুবই বীরের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু করলে কি হবে, ইতালির এরোপ্লেনগুলি অত্যন্ত নীচু দিয়ে উড়ে উড়ে দেশের সর্বত্র বোমা ফেলে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে লড়বার শক্তি এদের নেই। অসামরিক জনসাধারণ, নারী, শিশু, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল—সকলেরই উপরে ইতালীয়রা নির্বিচারে আগুনে-বোমা এবং গ্যাস-বোমা ফেলছিল; আবিসিনিয়ার সর্বত্র যা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল সে একেবারে চরম নৃশংস ব্যাপার। ১৯৩৬ সনের মে মাসে ইতালীয় সেনা আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস্-আবাবা'য় প্রবেশ করল; তার পরে ক্রমে ক্রমে দেশেরও বহু স্থান দখল করে নিল। তারপর আরও আড়াই বছর কেটে গেছে। কিন্তু দূর মফঃস্বল অঞ্চলে আবিসিনিয়ার সৈন্যরা এখনও ইতালীয়দের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যি করে আবিসিনিয়া জয় সম্পূর্ণ করতে ইতালির এখনও অনেক দেরি—যদিও ইংলণ্ড আর ফ্রান্স ইতালিকে আবিসিনিয়া-বিজেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

আবিসিনিয়ার এই দুর্ভাগ্য, তার প্রতি লীগের মাতব্বর সভ্যদের এই হীন বিশ্বাসঘাতকতা, এর থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, লীগের আসলে শক্তি বলে কিছুই নেই। হিটলার দেখলেন, তিনিও এবার নির্ভয়ে লীগকে অমান্য করতে পারেন। ১৯৩৬ সনের মার্চ মাসে তাঁর সৈন্যরা রাইনল্যাণ্ডে গিয়ে চড়াও হল—রাইনল্যাণ্ডের সেনাবল আগেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। হিটলারের এই অভিযানেও ভার্সাই সন্ধির শর্ত আরেকবার ভঙ্গ করা হল।

স্পেন

১৯৩৬ সনে ফ্যাসিস্টরা ইউরোপে প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার পথে আরও এক পা এগিয়ে গেল; এর ফলে গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা-উপাসকদেরও একেবারে মরণ-পণ করে সংগ্রামে নামতে হল। আমরা দেখেছি স্পেনে এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলছিল, প্রগতি-পরিপন্থী যাজক আর অর্ধ-সামন্ত বাহিনীর সঙ্গে নবজাত প্রজাতন্ত্রকে প্রাণপণে লড়াই করতে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত সমস্তগুলি প্রগতিবাদী দল একত্র যোগ দিলে; ১৯৩৬ সনে এরা সবাই মিলে একটা গণতান্ত্রিক দল গঠন করল। এর কিছুদিন আগে ফ্রান্সেও একটা গণতান্ত্রিক দল তৈরি হয়েছে—তার উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিস্টদের বাধা দেওয়া। ফ্যাসিস্টদের শক্তি তখন ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠছে। ফ্রান্সে গণতন্ত্রের অবসান ঘটাবে বলে সে খোলাখুলিই হুমকি চালাচ্ছে; ইতিমধ্যেই একবার ফ্রান্সের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়ে গেছে, তবে সে-বিদ্রোহ সফল হয় নি। এই গণ-তান্ত্রিক দলের আবির্ভাবে ফ্রান্সের জনসাধারণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, নির্বাচনে এঁরা জয়লাভ করলেন, এঁদের প্রতিষ্ঠিত সরকার শ্রমিকদের দুঃখ-লাঘবের জন্য অনেকগুলো আইন তৈরি করে দিলেন।

স্পেনের গণতান্ত্রিক দলও কর্‌টেসের নির্বাচনে জয়ী হল, শাসনক্ষমতা হাতে পেল। দেশের শাসন ব্যবস্থায় নানাবিধ সংস্কার প্রয়োজন, দীর্ঘকাল ধরে সে সংস্কারের কাজে কেউ হাত দেয় নি; সেই সংস্কার সাধন করবেন, ধর্মপ্রতিষ্ঠানদের প্রতিপত্তি কমিয়ে দেবেন, দেশের কাছে এই ছিল এ'দের প্রতিশ্রুতি। যদি সত্যই এ'রা এইসব সংস্কার ঘটিয়ে বসেন, এই ভয়ে দেশের যেখানে যত প্রগতিবিরোধী দল ছিল সবাই একত্র জোট বাঁধল, এ'দের ওপরে আঘাত হানবে বলে প্রস্তুত হল। ইতালি আর জর্মানির কাছে এরা সাহায্য চাইল, তারাও সানন্দেই সাহায্য করতে রাজি হল। ১৯৩৬ সনের ১৮ই জুলাই তারিখে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। স্পেনের মুর সেনা তাঁর পক্ষে; অজস্র প্রলোভন আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের তিনি হাত করে নিয়েছেন। ফ্রাঙ্কোর ভরসা ছিল, অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যুদ্ধ-জয় সমাপ্ত করে ফেলবেন; না পারবারও হেতু নেই, দেশের সেনাবাহিনী তাঁর পক্ষে, বাইরে থেকেও দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তাঁকে সাহায্য যোগাচ্ছে। সবাই মনে করল, প্রজাতন্ত্রী সরকারের এবার আর রক্ষা নেই। কিন্তু সেই চরম বিপদের মুহূর্তে তাঁরা স্পেনের জনসাধারণকে ডাক দিলেন, বললেন—তোমাদের স্বাধীনতাকে তোমরাই এসে রক্ষা কর; তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বিলিয়ে দিলেন। সে ডাক শুনে দেশশুদ্ধ সাধারণ জনতা জেগে উঠল, ফ্রাঙ্কোর কামান আর বিমান বাহিনীর সঙ্গে প্রায় খালি হাতেই তারা লড়াই শুরু করে দিল। এদের বিক্রমে ফ্রাঙ্কোকেও থেমে দাঁড়াতে হল। গণতন্ত্রের পক্ষ হয়ে লড়াই করবার জন্যে অন্যান্য দেশ থেকেও অজস্র স্বেচ্ছাসৈনিক স্পেনে এসে উপস্থিত হল। এরা সকলে মিলে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী তৈরি করল, স্পেনের চরম প্রয়োজনের দিনে এই বাহিনী তাকে যে সাহায্য দিল তার তুলনা হয় না। কিন্তু এদিকে যেমন এই স্বেচ্ছাসৈনিকরা আসছিল, ওদিকেও তেমনই ইতালির সরকারি সেনাবাহিনী দলে দলে এসে হাজির হল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে; ইতালি এবং জর্মানি থেকে ফ্রাঙ্কো অজস্র পরিমাণ বিমান, বৈমানিক, কারিগর আর অস্ত্রশস্ত্র পেতে লাগলেন। অদ্ভুত যুদ্ধ—ফ্রাঙ্কোর পিছনে রইল ইতালি আর জর্মানির সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ সেনা-নায়করা; আর প্রজাতন্ত্রী স্পেন সরকারের পক্ষে রয়েছে প্রজার উৎসাহ, সাহস আর বিপুল আত্মোৎসর্গ। বিদ্রোহীরা ক্রমাগত এগিয়ে চলল, ১৯৩৬ সনের নভেম্বর মাসে তারা মাদ্রিদ্ শহরের দ্বারে এসে পৌঁছল। কিন্তু তারপরই প্রজা-বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে তাদের বাধা দিল, বিদ্রোহীরা আর এগোতে পারল না। 'নো পাসারান্'—'যেতে দেব না এদের'—এই ধ্বনি প্রজাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। মাদ্রিদ্—বিমান থেকে, বড়ো বড়ো কামান থেকে প্রতিদিন তার ওপরে অজস্র বোমা আর গোলার বৃষ্টি হচ্ছে, তার অপূর্ব সৌধরাজি বিধ্বস্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে, আগুনে-বোমার স্পর্শে শহরের সর্বত্র অবিরাম বহ্ন্যুৎসব চলেছে, তার বীর সন্তানেরা তাকে রক্ষা করবার জন্যে হাজারে হাজারে এসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে—তবু মাদ্রিদ্ দাঁড়িয়ে রইল মাথা উঁচু করে। যুদ্ধে সে হারে না, তাকে জয় করা যায় না। মাদ্রিদের উপকণ্ঠে বিদ্রোহী সেনা প্রথম যেদিন এসে পৌঁছেছিল, তারপর পুরো দু'টি বছর কেটে গেছে। এখনও তারা সেইখানে, শহরের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাদ্রিদ্‌বাসীর হুঙ্কার শুনছে—'নো পাসারান্'—'যেতে দেব না এদের'। মাদ্রিদ্ শহর ভগ্ন বিধ্বস্ত, তার দুঃখের অন্ত নেই, তার সঙ্গীসাথী কেউ নেই, তবুও গর্বভরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে, মাদ্রিদ্ আজও স্বাধীন। স্পেনের লোকেরা বীরদর্পে দর্পিত, শত আঘাতেও তারা হার মানতে জানে না—তাদের সেই অদম্য মনোবলের জয়স্তম্ভ হয়ে রইল তাদের রাজধানী মাদ্রিদ্!

স্পেনের এই যুদ্ধটির সম্পূর্ণ স্বরূপটি আমাদের বুঝে নিতে হবে—কারণ এ শুধু একটা স্থানের বা একটা জাতির নিজস্ব ঘরোয়া কলহ নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো ব্যাপার। এর শুরু হয়েছিল, গণতন্ত্রী পন্থায় নির্বাচিত পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দিয়ে। তখন বিদ্রোহীদের মুখে ধুয়ো ছিল—ঐ কমিউনিজ্‌ম্ এলো, ঐ ধর্ম বিপন্ন হল। কিন্তু সে গণতান্ত্রিক দল যে প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি, তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট ছিল খুবই কম—একরূপ না বললেই চলে; এ'দের বেশির ভাগই ছিলেন সোশ্যালিস্ট এবং প্রজাতন্ত্রবাদী। আর ধর্মের কথা যদি বল, প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সব চেয়ে বেশি বীরত্ব আর নিষ্ঠা নিয়ে যারা লড়াই করছে তারা হচ্ছে বাস্ক-প্রদেশের ক্যাথলিকরা—এ'রা

নিশ্চয়ই 'ধর্মদ্রোহী' নয়। আসল কথা তা নয়। জর্মনিতেই বরং হিটলার ধর্মমতের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকতে দেন নি; স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকার ধর্মাচরণে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার করছেন, সে অধিকার রক্ষা করছেন। তবে, জমি আর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের যে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম ছিল, সেটা অক্ষুণ্ণ রাখতে অবশ্য এঁরা রাজি নন। আসলে এই বিদ্রোহটা হল গণতন্ত্রেরই বিরুদ্ধে; প্রজাতন্ত্রী সরকার জমির ওপরে সামন্তদের আর বড়ো বড়ো জমিদারদের আধিপত্য লোপ করে দেবেন, এই আশঙ্কায়। আগেও বলেছি, এরকম ভয়ের কারণ যখন ঘটে, তখন আর প্রগতিবিরোধীরা গণতন্ত্রী কায়দা-কানুন মেনে চলা দরকার মনে করে না, জনসাধারণকে বুঝিয়ে তাদের ভোটের জোরে শাসন-ক্ষমতা হাত করবার মতো ধৈর্য তাদের থাকে না। তখন তারা সোজাসুজিই অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। যুদ্ধ পীড়ন আর বিভীষিকার সৃষ্টি করে তারই জোরে জনসাধারণকে বশীভূত করে ফেলতে চেষ্টা করে।

স্পেনের সেনাবাহিনী আর পুরোহিতরা একত্র চক্রান্ত করে বিদ্রোহ সৃষ্টি করল; ইতালি আর জর্মনি এই দুই ফ্যাসিস্ট দেশ সানন্দে এদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আসবার কারণও ছিল। স্পেনকে তারা করায়ত্ত করতে চায়; সেটা পারলেই তখন ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রতিপত্তি বাড়বে, সেখানে তারা নৌসেনার ঘাঁটি করতে পারবে। স্পেনে বহু প্রকার খনিজ সম্পদ আছে, সেটার প্রতিও এদের লোভ কম নয়। কাজেই দেখছ, স্পেনের এই যুদ্ধটা মোটেই গৃহযুদ্ধ নয়; আসলে এটা হচ্ছে ইউরোপীয় যুদ্ধ। ইউরোপে শক্তি-প্রতিষ্ঠার দাবা-খেলায় এটা একটা ঘুঁটির চাল— এর দ্বারা তারা ফ্রান্সকে পরাভূত করতে আর ব্রিটেনকে নিস্তেজ করে ফেলতে চাইছে, সেটা পারলেই ইউরোপের সর্বত্র ফ্যাসিবাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। ইতালি আর জর্মনির মধ্যেও এ ব্যাপারে খানিকটা স্বার্থের সংঘাত আছে; কিন্তু আপাতত কিছুকালের মতো তারা একত্র হয়েই চলল।

স্পেন যদি ফ্যাসিস্ট হয়ে যায়, তবে ফ্রান্স একেবারেই মারা পড়বে; ব্রিটেনেরও বিপদ— ভূমধ্যসাগর দিয়ে বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে, দুই দিকেই তার প্রাচ্য-দেশে যাতায়াতের পথ বিঘ্ন-সংকুল হয়ে উঠবে। জিব্রাল্টার তখন আর কোনো কাজেই আসবে না ব্রিটেনের, সুয়েজ খালেরও বিশেষ দাম থাকবে না। অতএব, গণতন্ত্রের প্রতি প্রীতির ফলে না হোক, অন্তত নিজের স্বার্থের গরজেও ইংলণ্ড আর ফ্রান্স এই বিপদে আইনত যেটুকু পারা যায় সেটুকু সাহায্য স্পেন সরকারকে দেবে, বিদ্রোহ দমনে তাকে সাহায্য করবে, এইটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখানেও দেখা গেল দেশের সরকার বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হচ্ছে, তার ফলে যদি সমগ্র দেশের স্বার্থ বিপন্ন হয় তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্রিটিশ সরকার ভেবেচিন্তে একটি 'নিরপেক্ষ-থাকার' পরিকল্পনা খাড়া করে ফেললেন—আমাদের এই যুগে এতবড়ো বিরাট প্রহসন আর হয় নি। জর্মনি আর ইতালিও সে নিরপেক্ষতা-সংসদের সভ্য, অথচ তারা খোলাখুলিই এই বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করে যাচ্ছে, একেই দেশের আইনসম্মত শাসনকর্তৃপক্ষ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের সেনাদল ফ্রাঙ্কোর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, তাদের বৈমানিকরা স্পেনের শহরগুলির উপরে বোমা বর্ষণ করছে। অতএব এই 'নিরপেক্ষতা'র মানে দাঁড়িয়েছে—একমাত্র বিদ্রোহীরাই অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাবার অধিকারী। ব্রিটিশ সরকারের ইঙ্গিত অনুসারে ফ্রান্সও তার পিরেনীজ-সীমান্তপথ বন্ধ করে দিয়েছে, যেন সে পথ দিয়ে কোনোরকম সাহায্য স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাছে গিয়ে না পৌঁছতে পারে।

খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে ব্রিটেনের জাহাজ স্পেনে যায়, এর বহু জাহাজ ফ্রাঙ্কোর বিমান ও নৌসেনারা ডুবিয়ে দিয়েছে; আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ফ্রাঙ্কোর সেই আচরণেরই সাফাই গেয়েছেন। গণতন্ত্র পাছে বেড়ে ওঠে, তার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার এই অবস্থাতে এসে পৌঁচেছেন। দিনকয়েক মাত্র আগে ব্রিটিশ সরকার ইতালির সঙ্গে একটি চুক্তি নিষ্পন্ন করেছেন, তার দ্বারা ফ্রাঙ্কোর বৈধতা স্বীকারের পক্ষে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন, ইতালিকেও স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। বস্তুত, স্পেন-প্রজাতন্ত্র যদি ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের উপরে ভরসা করে থাকত বা এদের উপদেশ শুনে চলত, তবে বহু পূর্বেই তার শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ব্রিটেন আর ফ্রান্সের এই বিপরীত নীতি সত্ত্বেও স্পেনের লোকরা জিদ ধরে রইল, ফ্যাসিস্টদের কাছে

মাথা নোয়াতে কিছুতেই রাজি হল না। তাদের পক্ষে এটা এখন হয়ে উঠেছে একটা স্বাধীনতার যুদ্ধ—বিদেশী আক্রমণকারীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার যুদ্ধ। অপূর্ব এই যুদ্ধ, এর তুলনা শুধু প্রাচীন মহাকাব্যেই মিলবে—বীরত্ব আর অধ্যবসায়ের যে আশ্চর্য নিদর্শন এরা দেখাচ্ছে তা দেখে জগৎশুদ্ধ মানুষের তাক লেগে যাচ্ছে। ওদিকে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যুদ্ধ করছে যে ইতালীয় আর জর্মন বিমানবাহিনী, তারা দেশের সর্বত্র শহরে গ্রামে, অসামরিক জনসাধারণের উপরে এমন নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করছে যে, তার চেয়ে ভয়াবহ কাজ আর হতে পারে না।

গত দু'বৎসরের মধ্যে প্রজাতন্ত্রী সরকারের চমৎকার একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে; বিদেশ থেকে যত স্বেচ্ছাসৈনিক এ'দের সাহায্য করতে এসেছিল, তাদের সকলকেই সম্প্রতি তাঁরা নিজের নিজের দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্পেনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জমি এখন ফ্রাঙ্কোর দখলে, মাদ্রিদ্ এবং ভ্যালেন্‌শিয়াকেও তাঁর সৈন্যরা ক্যাটালোনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে; কিন্তু তবুও এই নূতন প্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনী ফ্রাঙ্কোর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এব্‌রো'তে কয়েক মাস ধরে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলেছে, সেই যুদ্ধে এই বাহিনী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে তাদের ক্ষমতা কতখানি। এটা এখন স্পষ্টই বোঝা গেছে, এই বাহিনীকে পরাস্ত করা ফ্রাঙ্কোর সাধ্য নয়—এক যদি বিদেশ থেকে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য আমদানি তিনি করেন, সে কথা আলাদা।

স্পেন-প্রজাতন্ত্রের অগ্নি-পরীক্ষা চলছে, তার মধ্যেও সবচেয়ে বড়ো সমস্যাই এখন তার হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্যের অভাব, বিশেষ করে শীতের ক'টা মাস। তার কারণ, শুধু তার সেনাবাহিনী, আর এখনও যে-অঞ্চলগুলো তার হাতে রয়েছে তার সাধারণ বাসিন্দাদের, খাদ্যই সংগ্রহ করতে হচ্ছে না সরকারকে; ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা এই প্রজাতন্ত্রী সরকারের এলাকায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদেরও খাদ্য যোগাতে হচ্ছে তাঁদের।

চীন

স্পেনে কী নৃশংস কাণ্ড চলেছে তা দেখলে; চীনের ভাগ্য নিয়ে যে খেলা চলছে এবার তা দেখা যাক।

জাপান মাঞ্চুরিয়ায় ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল, ব্রিটিশ সরকারও জাপানেরই জয় কামনা করছিলেন। আমেরিকা জানিয়েছিল, ব্রিটেন যদি জাপানের এই আক্রমণকে বাধা দিতে চায়, আমেরিকা ব্রিটেনকে সাহায্য করবে। আমেরিকার সে প্রস্তাব ব্রিটেন প্রত্যাখ্যান করল। ব্রিটেন এইভাবে জাপানকে উৎসাহিত করল, শক্তিশালী একটা প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি আরও বাড়িয়ে দিতে গেল—কেন? বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই জাপান সাম্রাজ্যবাদী জাতি হিসাবে শক্তিসঞ্চয় করে বেড়ে উঠেছে; উঠেছে প্রায় ব্রিটেনেরই আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে। প্রথমদিকে ব্রিটেনের মতলব ছিল, জাপানকে দিয়ে জার-শাসিত রাশিয়াকে জব্দ করে রাখা। মহাযুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েট রাশিয়া, অতএব তখনও জাপানের পৃষ্ঠরক্ষা করার নীতিটাই ব্রিটেন বজায় রেখে চলল। চলতে চলতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, এখন জাপানের নিজের হাতেই ব্রিটেনের স্বার্থ বিপন্ন হবার উপক্রম। ১৯৩৩ সনে আমেরিকা সোভিয়েট ইউনিয়নকে বৈধরাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তারও একটা বড়ো কারণ ছিল জাপানের সঙ্গে আমেরিকার রেষারেষি।

১৯৩৩ সনের পর থেকে চীনে পাশাপাশি কয়েকটি সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে: চিয়াং কাই-শেকের জাতীয় সরকার—অন্যান্য রাষ্ট্ররাও একে স্বীকার করে নিয়েছেন; দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টন সরকার—এ'রাও বলেন, এ'রা কুওমিন্‌টাংএর নীতি মেনে চলেন; চীনের মধ্যপ্রদেশে প্রকাণ্ড একটি সোভিয়েট অঞ্চল। এছাড়া মধ্য-প্রদেশে গুটিকতক অর্ধ-স্বাধীন সমর-নায়ক সামন্তও এখন পর্যন্ত টিকে আছেন। ওদিকে পিপিংএর উত্তরদিকে এসে বসেছে জাপান—চীন থেকে সে ক্রমাগত মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে। চিয়াং কাই-শেকের উচিত ছিল জাপানিদের এই অভিযানকে বাধা দেওয়া। তা না করে তিনি

যুদ্ধে সোভিয়েট অঞ্চলগুলিতেই বড়ো বড়ো সেনাদল বছরের পর বছর ধরে পাঠাতে লাগলেন— সে অঞ্চলগুলিকে বিধ্বস্ত করবার কাজেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করতে লাগলেন তিনি। এই অভিযানগুলি প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হল; যখন তাঁর সেনাদল দৈবাৎ এইসব অঞ্চল দখল করে নেয়, চীনা সোভিয়েটের সেনারা তাদের হাতে ধরা দেয় না, দেশের আরও ভিতরদিকে সরে গিয়ে আবার নূতন করে কায়েম হয়ে বসে। সেনাপতি চু-টে'র পরিচালিত অষ্টম রুট আর্মি আট-হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে চীনদেশ পাড়ি দিয়েছিল, সামরিক অভিযানের ইতিহাসে সে অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী বিখ্যাত হয়ে আছে।

এইভাবে বছরের পর বছর ধরে চিয়াং কাই-শেক আর সোভিয়েট-চীনের মধ্যে লড়াই চলল; অথচ সোভিয়েট-চীন নিজে থেকেই বলেছিল, চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে একত্র হয়ে জাপানি-আক্রমণকে বাধা দিতে সে প্রস্তুত আছে। ১৯৩৭ সনে জাপানিরা একটা খুব বড়ো-রকমের আক্রমণ শুরু করল; এর ধাক্কায় পড়ে শেষপর্যন্ত এই দুই পক্ষ একত্র হয়ে জাপানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও চীনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল, ১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে এই দুই দেশের মধ্যে একটি অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পন্ন হল।

জাপানিরা এবার প্রচণ্ড বাধা পেয়ে গেল। সে বাধাকে ভেঙে ফেলবার জন্য তারা আকাশ থেকে বোমা ফেলে বিপুল-পরিমাণ ও অতি ভয়ঙ্কর নরহত্যা চালাতে লাগল, আরও অনেক এমন বর্বরোচিত কাণ্ড করতে লাগল যে শুনেও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এই বিষম অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই চীনে নবীন জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। চিরকাল ধরে যে আলস্য আর ঢিলেমি চীনাদের চরিত্রগত হয়ে ছিল, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা একেবারে নূতন মানুষ হয়ে বেঁচে উঠল। জাপানি বিমানের আক্রমণে চীনের বহু বড়ো বড়ো শহর ভস্মস্তূপে পরিণত হল, মানুষ যে কত মরল তার সংখ্যা করা যায় না। এই যুদ্ধ চালাতে জাপানকেও বেগ পেতে হচ্ছিল কম নয়। এর চাপে তার আর্থিক জীবন ও রাজস্ব-নীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বার উপক্রম হল। ভারতবাসীরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রকে সহানুভূতি দেখিয়েছিল, এবারেও তাদের সহানুভূতি স্বভাবতই গিয়ে পড়ল চীনাদের দিকে। ভারতবর্ষে, আমেরিকায় এবং আরও অনেক দেশে প্রকাণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল : জাপানি মাল বর্জন কর।

জাপানের সেনাবল প্রচণ্ড, এত করেও কিন্তু তাকে ঠেকানো সহজ হল না, চীনের মধ্যে জাপানিরা ক্রমেই আরও বেশি এগিয়ে চলল। ব্যাপার দেখে চীনারা তখন গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করল, জাপানিদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। জাপানিরা সাংহাই এবং নান্‌কিং দখল করল। তারপর ক্যাণ্টন আর হ্যাংকাও-এর কাছে যখন গিয়ে পেঁছিল, চীনারা নিজেরাই আগুন লাগিয়ে এই দুটি প্রাচীন নগরীকে ধ্বংস করে দিল। জাপানিরা গিয়ে দখল করল এদের ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষকে, ঠিক যেমন একদা নেপোলিয়ন মস্কো দখল করেছিলেন। জাপানিরা জয়লাভ করছে, কিন্তু চীনাদের প্রতিরোধকে বিধ্বস্ত করতে তার এখনও ঢের দেরি; প্রতিটি পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীনাদের মনোবল আর দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠছে।

অস্ট্রিয়া

এবার ইউরোপে ফিরে যাব, দেখব অস্ট্রিয়ার পরিণাম কী হল। একদিক থেকে নাৎসী-জর্মনি, অন্যদিক থেকে ফ্যাসিস্ট ইতালি তাকে ঠেসে ধরেছে, দুয়ের চাপে পড়ে সে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রী দেশটির প্রাণ যাবার উপক্রম। ওদিকে অর্থসঙ্গতিও নেই তার, দেশের মধ্যেও প্রচণ্ড দলাদলি। ভিয়েনার পৌরশাসন রয়েছে প্রগতিবাদী সোশ্যালিস্টদের হাতে, কিন্তু সমস্ত দেশটাকে শাসন করছে তার ঘরোয়া ধরনের একটি ধর্মযাজকপ্রধান ফ্যাসিস্ট দল, ডলফাস তার চ্যান্সেলর (প্রধান মন্ত্রী)। ডলফাসের ভরসা, নাৎসীরা যদি অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে, সেদিন মুসোলিনি এসে তাঁকে রক্ষা করবেন। এই আশায় তিনি মুসোলিনির সঙ্গে সন্ধি করলেন। ইতালি থেকে ডলফাসের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল, যদিও সেটা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধ। মুসোলিনি ডলফাসকে উপদেশ দিলেন,

সোশ্যালিস্টদের মেরে ঠাণ্ডা করে দাও। ডলফাস স্থির করলেন, ভিয়েনাতে এই-যে সোশ্যালিস্টরা রয়েছে এদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নেবেন। এর ফলেই ১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতিবিপ্লব হল। চার দিন ধরে ভিয়েনা শহরে লড়াই চলল। তার বিখ্যাত শ্রমিক-গৃহগুলিকে কামান চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হল। ডলফাস জিতলেন; কিন্তু জিতলেন, বাইরে থেকে কেউ অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলে তাকে বাধা দেবার শক্তি রাখত যে একটিমাত্র দল, তাকেই ভেঙে দিয়ে।

ওদিকে নাৎসীদের চক্রান্ত সমানে চলছে। ১৯৩৪ সনের জুন মাসে ভিয়েনা শহরে ডলফাস নাৎসীদের হাতে নিহত হলেন। নাৎসীদের মতলব ছিল, এই কাণ্ডটির পরই জর্মানি থেকে নাৎসী বাহিনী গিয়ে অস্ট্রিয়া আক্রমণ করবে। হিটলারের সেনাদল সীমান্ত পার হয়ে আসতে উদ্যত, এমন সময় বাধা পড়ল; মুসোলিনি জানিয়ে দিলেন, জর্মন সেনা যদি অস্ট্রিয়ায় ঢোকে, তবে অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করবার জন্য তিনিও তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে দেবেন। অস্ট্রিয়া জর্মানির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, জর্মন-রাজ্যের সীমান্ত ইতালির গায়ের পাশে এসে পেঁছিবে, এটা মুসোলিনির পছন্দ নয়। ১৯৩৫ সনে হিটলার ঘোষণা করলেন, অস্ট্রিয়া জয় করবার, বা জর্মানির সঙ্গে তাকে যুক্ত করে নেবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর নেই।

কিন্তু আবিসিনিয়াতে যুদ্ধ চালিয়ে চালিয়ে ইতালির শক্তি কমে আসছিল। গ্রেটব্রিটেন আর ফ্রান্সের সঙ্গেও তার মনকষাকষি ক্রমে বেড়ে চলেছে। অতএব তখন মুসোলিনি বাধ্য হয়েই হিটলারের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেললেন। এবার আর অস্ট্রিয়ার ওপর হস্তক্ষেপ করতে হিটলারের বাধা রইল না; অস্ট্রিয়াতে নাৎসীদের প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়তে লাগল। ১৯৩৮ সনের প্রথম দিকেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন স্পষ্ট বলে দিলেন, অস্ট্রিয়াকে যদি কেউ আক্রমণ করে, ব্রিটেন তাকে রক্ষা করতে যাবে না। তখন আর কি। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর তখন শুস্‌নিগ্‌। তিনি বললেন, গণভোট নেব, দেখা যাক দেশবাসী কোন্‌দিকে যেতে চায়। হিটলারের তাতে আপত্তি। ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে হিটলারের সেনা অস্ট্রিয়া আক্রমণ করল। সে আক্রমণে বাধা দেবার কেউ ছিল না। হিটলার ঘোষণা করলেন, অস্ট্রিয়া ও জর্মানির মিলন হয়ে গেল। দীর্ঘকালের দেশ অস্ট্রিয়া, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে থেকেছে সে—এমনি করে তার শেষ হল; ইউরোপের মানচিত্র থেকে অস্ট্রিয়া নামটাই মুছে গেল। তার শেষ চ্যান্সেলর শুস্‌নিগ্‌ জর্মনদের হাতে বন্দী হলেন; জর্মনরা জানিয়ে দিলে, নাৎসীদের হুকুম পুরোপুরি মেনে চলেন নি এই অপরাধে তাঁর বিচার হবে। শুস্‌নিগ্‌ এখনও নাৎসীদের বন্দী হয়ে আছেন।

অস্ট্রিয়াতে এসেই জর্মন নাৎসীরা জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিল—নাৎসী-শাসনের প্রথম যুগে জর্মানিতে যে আতঙ্ক তারা সৃষ্টি করেছিল, এর তুলনায় সেটাও কিছু নয়। ইহুদিদের উপরে অমানুষিক উৎপীড়ন শুরু হল, সে উৎপীড়ন এখনও চলছে। ভিয়েনা শহর চিরদিনই ছিল সৌন্দর্য আর সংস্কৃতির লীলাভূমি; তার বুকে এখন চলেছে উদ্দাম বর্বরতা আর নৃশংসতার প্রেতনৃত্য।

চেকোশ্লোভাকিয়া

নাৎসীদের অস্ট্রিয়া-জয়ের নমুনা দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি ভয় পেল চেকোশ্লোভাকিয়া—তাকে এখন তিন দিক থেকেই নাৎসী-জর্মানি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলেরই দৃঢ় ধারণা হল এইবার চোকোশ্লোভাকিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। নাৎসীদের আক্রমণের কায়দাই হচ্ছে, প্রথমে সে-দেশের সীমান্ত অঞ্চলে চক্রান্ত-জাল বিস্তার করা, বিদ্রোহ বা অশান্তির সৃষ্টি করা; এ ক্ষেত্রেও সেটা ইতিমধ্যেই যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে একটা অঞ্চলের নাম সুদেতেন ল্যাণ্ড; এরই নাম আগে ছিল বোহেমিয়া। এখানে একটা জর্মনভাষা-ভাষী জাতি বাস করত; অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের আমলে এদেরই প্রতিপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। চেক্‌ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকাটা এদের পছন্দ নয়। তাছাড়া সে রাষ্ট্রের সম্বন্ধে সত্যকার অভিযোগও এদের অনেক ছিল। এরা খানিকটা স্বায়ত্তশাসনের

অধিকার চাইছিল। কিন্তু জর্মনির সঙ্গে যুক্ত হবার কোনো ইচ্ছে এদের ছিল না—এদের মধ্যে বহু জর্মন ছিল যারা নাৎসী-রাজত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতীত কালেও বোহেমিয়া কোনোদিনই জর্মনির অন্তর্ভুক্ত হয় নি। অস্ট্রিয়া অবলুপ্ত হয়ে গেল, সকলেই ধরে নিল হিটলার এবার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করবেন। এই সম্ভাবনা ভেবে বহু লোক শঙ্কিত হয়ে উঠল, ভয়ে ভয়ে তারা সেখানকার স্থানীয় নাৎসীদলে গিয়ে যোগ দিল, তাই করে যদি কিছুটা নিরাপদ হয়ে নেওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। শিল্প-বাণিজ্যে তার বিপুল সমৃদ্ধি, রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলার দিক দিয়েও তার ত্রুটি নেই, তার সেনাদলের শক্তি এবং দক্ষতা অসামান্য। ফ্রান্স এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তার মৈত্রী রয়েছে, যুদ্ধ বাধলে তখন ইংলণ্ড তার পক্ষ নেবে, এ ভরসাও তার ছিল। মধ্য-ইউরোপে তখন সে-ই একমাত্র গণতন্ত্রী দেশ বেঁচে রয়েছে, অতএব পৃথিবীর যেখানে যত গণতন্ত্রী দেশ আর দল সকলেরই তার প্রতি দরদ আছে, আমেরিকাও এদের দলে। অতএব যুদ্ধ যদি বাধে, এই গণতন্ত্রী শক্তিরা তখন একত্র সংবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের হাতে ফ্যাসিস্ট শক্তিদের পরাজয় অনিবার্য—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই কারও মনে ছিল না।

সুদেতেনে যে সংখ্যালঘু জাতিটি রয়েছে তাদের কথা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা উঠেছে; তাদের অভাব-অভিযোগগুলোর প্রতিকার করা হোক—এও অতি ন্যায্য কথা। একথা কিন্তু সত্য, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সংখ্যালঘুদের প্রতি যতটা সদ্ব্যবহার করা হচ্ছিল, মধ্য-ইউরোপের আর কোনোখানেই সংখ্যালঘুরা তেমন পায় নি। আসল কথাটা সংখ্যালঘুর সমস্যা নয়। সেটা হচ্ছে, হিটলারের ইচ্ছে—তিনি চান, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমস্তগুলি জায়গাই তাঁর করায়ত্ত হয়ে থাকবে, তাঁর ইচ্ছেমতো চলতে যে না চাইবে তাকে গায়ের জোরে এবং জুলুমের ভয় দেখিয়েই তিনি চলতে বাধ্য করবেন।

সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য চেক-সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তারা যা কিছু চাইল প্রায় প্রত্যেকটা কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, এদের একটা দাবি যেই তাঁরা মেনে নিচ্ছেন, তৎক্ষণাৎ আবার নূতন করে আরও বেশি ব্যাপক রকমের দাবি খাড়া করা হচ্ছে—এমনি করে করে গোটা রাষ্ট্রটারই প্রায় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। ঘরের পাশেই একটি প্রজাতন্ত্রী দেশ থাকা হিটলারের অসহ্য হয়ে উঠেছে, অতএব এটিকে পাকেপ্রকারে খতম করে দেওয়াই তাঁর সংকল্প, একথা বুঝতে কারোই বাকি রইল না। ব্রিটেনও এমন ভেক ধরল যেন এই সমস্যাটির একটা শান্তিপূর্ণ আপোষ-নিষ্পত্তি করে দেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এর নামে যে নীতি সে অবলম্বন করল, তার মানে হিটলারের অভিযানকেই সমর্থন করা। লর্ড রান্‌সিম্যানকে ব্রিটিশ সরকার প্রাগে পাঠিয়ে দিলেন; তিনি এই ব্যাপারে "শালিসী" করে দেবেন। কার্যত সে-শালিসীর কায়দাটা চমৎকার। চেক-সরকারের ওপরে তিনি ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলেন, নাৎসীদের দাবি মেনে নাও। শেষপর্যন্ত চেকরা লর্ড রান্‌সিম্যানের নিজস্ব প্রস্তাবগুলোকেই মেনে নিল, সে প্রস্তাবের ব্যাপকতা বহু দূর। কিন্তু তারপরই নাৎসীরা আরও লম্বা দাবির ফিরিস্তি খাড়া করল; সে দাবি মেনে নিতে চেকরা যাতে সহজে রাজি হয় এই বলে জর্মন সেনাও রণসাজে সজ্জিত হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে তখন চেম্বারলেন নিজেই শালিসী করতে ছুটলেন। বের্ক্‌তেস্‌গাদেন-এ গিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। হিটলার তাঁর চরম-পত্র দিয়েছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা বৃহৎ অংশ জর্মনিকে ছেড়ে দিতে হবে—চেম্বারলেন তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। তারপর ইংলণ্ড আর ফ্রান্স দুই বন্ধু একত্র হয়ে তাঁদের পুরোনো বন্ধু ও মিত্ররাজ্য চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপরে চরমপত্র জারি করলেন,—হিটলারের সমস্ত দাবি অবিলম্বে মেনে নাও, তা নইলে আমরা দুজনে তোমাকে একেবারেই পরিত্যাগ করব। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের এমন অপূর্ব বন্ধুবাৎসল্য দেখে বিস্ময়ে এবং অতর্কিত আঘাতে চেকরা হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষোভে আর নিরাশায় পড়ে চেক-সরকার সেই চরমপত্রকেই মেনে নিতে বাধ্য হলেন। আবার চেম্বারলেন হিটলারের চরণে বার্তা নিবেদন করতে ছুটলেন। হিটলার তখন রাইন নদীর তীরবর্তী গোদেস্‌বার্গে আছেন। গিয়ে দেখলেন,

হিটলার এবার আরও অনেক বেশি বেশি চাইছেন। এবারকার দাবি এত বেশি যে, চেম্বারলেন হেন ব্যক্তিও তাতে সায় দিতে পারলেন না। অতএব হিটলারও স্পষ্টই শাসানি শুনিয়ে দিলেন, তবে আর কি, তৈরি হও। এটা হল, ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। ইউরোপের সর্বত্র যুদ্ধের—বিশ্ব-যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে এল; প্রত্যেক দেশেরই মানুষরা গ্যাস-মুখোস পরে প্রস্তুত হয়ে বসল। দেশে দেশে পার্কে মাঠে বাগানে সর্বত্র ট্রেঞ্চ কাটা হয়ে গেল—কে জানে কখন কোন্ দিক থেকে হিটলারের বোমারু বিমান এসে হাজির হয়। তখন আবার চেম্বারলেনকে দৌড়তে হল, মিউনিকে হিটলার বসে আছেন, তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন। মঁসিয়ে দালাদিয়ে এবং সিনর মুসোলিনিও গেলেন সেখানে। রাশিয়া ছিল ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মিত্ররাজ্য, তাকে কিন্তু ডাকা হল না। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ণয় করতেই এ'রা যাচ্ছেন, সে নিজেও এ'দের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ; অথচ তার একটা মতামত পর্যন্ত এ'রা জিজ্ঞাসা করলেন না। হিটলার এক নূতনতর দাবির তালিকা দিলেন, সে তালিকা প্রকাণ্ড। তাঁর কথায়ও ঘোরপ্যাঁচ নেই; সোজা বললেন, এ যদি না হয় তবে আমি অবিলম্বে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করব, তাতে যদি যুদ্ধ বাধে আমি কি জানি। অতএব এ'রা কজনে তাঁর সেই দাবিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করে নিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিউনিকের চুক্তিপত্র রচিত হল, চার দেশের চার মহানায়ক তাতে স্বাক্ষর করলেন।

তখনকার মতো যুদ্ধটা বাধল না; সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষই প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু সে-স্বস্তিটুকু কেনা হল কতখানি দাম দিয়ে? এর ফলে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের লজ্জাসরম আর সম্ভ্রম বলে কিছু বাকি রইল না; ইউরোপে গণতন্ত্রী আদর্শের উপরে একেবারে মরণ-আঘাত হানা হল; চেকোশ্লোভাকিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; শান্তি স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে লীগ অব নেশনসের আয়ু শেষ হয়ে গেল; মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে নাৎসীদের জয় জয়কার পড়ে গেল—আর তাকে রুখবে কে? অথচ, এতখানি দাম দিয়ে যে শান্তি কেনা হল সেটা স্থায়ী নয়, শান্তিই নয় সেটা। আসলে সে একটা ক্ষণিক যুদ্ধ-বিরতি মাত্র; এর ফলে যে ফুরসৎটুকু পাওয়া গেল সেই অবসরে প্রত্যেক দেশ প্রাণপণে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে নিল—যুদ্ধ আসবে সে তখন জানা কথা।

মিউনিক-চুক্তির পর থেকে ইউরোপ এবং জগতের ইতিহাস নূতন রূপ নিল। দেখা গেল ইউরোপের নূতন রকম ভাগাভাগি শুরু হয়ে গেছে। ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার খোলাখুলিই নাৎসী ও ফ্যাসিস্টদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতালির সঙ্গে তার যে চুক্তি হয়েছিল ব্রিটেন তাড়াহুড়ো করে সেটাকে আইনত স্বীকার করে নিলে। ইতালি আবিসিনিয়া জয় করেছে, এই চুক্তির দ্বারা ব্রিটেন সেটাকে বৈধ বলে স্বীকার করল; স্পেনের ব্যাপারেও ইতালির হস্তক্ষেপে আর তার আপত্তি রইল না। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি আর ইতালি, এদের মধ্যে একটা চতুঃশক্তি-মৈত্রী ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে লাগল—এরা চারজনে মিলে রাশিয়াকে এবং স্পেনে বা অন্যত্র যেসব গণতন্ত্রী দল তখনও রয়েছে তাদের, ঠেকিয়ে রাখবে।

রাশিয়া

এইভাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে বড়ো বড়ো দেশগুলো চক্রান্ত করছিল আর মস্ত মস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরক্ষণেই তাকে ভেঙে ফেলছিল; অথচ ঠিক তারই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রাশিয়া তার সমস্ত আন্তর্জাতিক কর্তব্য আর প্রতিশ্রুতি নিখুঁতভাবে পালন করে চলল, শান্তিকামী এবং যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধী হয়ে রইল, মিত্ররাজ্য চেকোশ্লোভাকিয়াকে শেষপর্যন্তও পরিত্যাগ করল না—এটা একটা দেখবার মতো বস্তু। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স কিন্তু রাশিয়াকে একেবারেই আমল দিল না, উগ্রপন্থী যুদ্ধকামীদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে লাগল। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া নিজেও শেষপর্যন্ত নাৎসীদের খপ্পরেই গিয়ে পড়ল, রাশিয়ার সঙ্গে তার যে মৈত্রী ছিল সেটা ছিন্ন করে দিল। চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেটে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। হাঙ্গেরি আর পোল্যাণ্ডও ক্ষুধার্ত শকুনির মতো এসে পড়ে তার

খানিকটা হাতিয়ে নিয়েছে। দেশের মধ্যেও বহু পরিবর্তন ঘটেছে; শ্লোভাকিয়া এখন নিজেকে স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজের বলে এখন যেটুকু অবশিষ্ট, তাও বস্তুত পরিণত হয়েছে জর্মনির অধীন রাজ্যে।

এর ফলে রাশিয়ার যে বৈদেশিক-নীতি ছিল তাতে একটা প্রকাণ্ড আঘাত লাগল। তবুও আজ তার বিপুল শক্তি; সে-ই এখন একমাত্র দেশ যে ইউরোপে আর এশিয়ায় ফ্যাসিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্র-বিরোধীদের বাধা দেবার ক্ষমতা রাখে। গত ক'মাস ধরে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স রাশিয়াকে একেবারেই উপেক্ষা করে চলছে; কিন্তু আজকের দিনে রাশিয়া একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ। প্রথম যে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সে খাড়া করেছিল সেটা মোটামুটি সফলই হল; যদিও তার খুঁটিনাটি অংশ সবগুলো ঠিকমতো হয়ে ওঠে নি—বিশেষ করে, উৎপন্ন জিনিষপত্রের উৎকর্ষ খুব ভালো হয় নি। এর অবশ্য কারণও ছিল—রাশিয়ার যন্ত্রশিল্পীরা তখনও বিশেষ শিক্ষিত বা কর্মদক্ষ নয়, যানবাহন ব্যবস্থাতেও বহু বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল। তাছাড়া, এই পরিকল্পনায় প্রধানত ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল বৃহৎ-শিল্প গড়ে তোলার দিকে; ফলে সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্রের অপ্রাচুর্য ঘটেছে, মানুষের জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। তবু কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলেই রাশিয়া খুব অল্পসময়ের মধ্যে বড়ো বড়ো শিল্প-কারখানা গড়ে তুলল, কৃষিকেও সমবায় পদ্ধতিতে সুসংহত করে তুলল; সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে রাশিয়া বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে তার ভিত্তি এইখানেই গড়া হয়ে গেল। এরপরই এল তার দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)। প্রথম পরিকল্পনার যে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, সেগুলো দূর করাই হল এর লক্ষ্য। আগের বারে বৃহৎ-শিল্পের উপরে ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল; এবার ঝোঁক দেওয়া হল ক্ষুদ্র-শিল্পের উপরে যারা নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করে। এর কাজও অতি দ্রুত এগিয়ে চলল, জীবনযাত্রার মান দেখতে দেখতে উচ্চ হয়ে উঠল, এখনও তার ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক দিয়ে, এবং আরও অনেক অনেক ব্যাপারেই, সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র যা প্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, সে একটা বিস্ময়কর বস্তু। প্রগতির এই প্রচেষ্টাকে সে অব্যাহত রাখতে চায়, যে সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে গড়ে তুলেছে তাকে আরও সুসংহত করে নিতে চায়। অতএব আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাশিয়া অতি দৃঢ়চিত্তে শান্তির পথ অবলম্বন করে রইল। লীগ্ অব নেশন্‌সেও সে এই নীতিই ঘোষণা করল : প্রত্যেক রাজ্যে অস্ত্রসজ্জা যথাসাধ্য কম করা হোক, সকলে মিলে শান্তিরক্ষার যৌথ-ব্যবস্থা করা হোক, কেউ অন্যকে আক্রমণ করলে অন্য সকলে একত্র হয়ে তাকে বাধা দেওয়া হোক। পৃথিবীর অন্য শক্তিশালী দেশগুলো সকলেই ধনিকতন্ত্রী তবু তাদের সঙ্গেও রাশিয়া সদ্ভাব স্থাপন করতে চাইল—সমস্ত দেশেই কমিউনিস্ট পার্টিরা, অন্যান্য প্রগতিবাদী দলদের সঙ্গে একত্র হয়ে গণসংঘ বা যুক্ত-সংঘ গড়তে চেষ্টা করল।

দেশের সকল ব্যাপারে এতখানি প্রগতি ও সমৃদ্ধি, তবু কিন্তু ঠিক এই সময়টাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটা প্রবল সংকট দেখা দিল। স্টালিন আর ট্রট্স্কির মধ্যে যে বিরোধ হয়েছিল তার কথা তোমাকে বলেছি। এবারে, দেশে যে শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত তার প্রতি প্রসন্ন নন, এমন বহু লোক ক্রমে একত্র জোট বাঁধলেন; শোনা যায় এ'দের অনেকে নাকি ফ্যাসিস্টদের সঙ্গেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। সোভিয়েট গোয়েন্দা বিভাগের (জি. পি. ইউ) বড়োকর্তা ইয়াগোদা, তিনি পর্যন্ত নাকি ছিলেন এদের দলে। সোভিয়েট সরকারের একজন মাতব্বর ব্যক্তি কিরভ, ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে খুন করা হল। এবার সরকার তৎপর হয়ে উঠলেন, বিপক্ষ দলের সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ১৯৩৭ সন থেকে শুরু করে রাশিয়াতে অনেকগুলি বড়ো বড়ো মামলা হল। এই মামলা নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রবল মতভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টি হল; কারণ এই সব মামলায় রাশিয়ার বহু বিখ্যাত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আসামী হয়েছিলেন। যাঁদের তখন বিচার ও দণ্ড হল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রট্স্কিপন্থীরা এবং দক্ষিণপন্থী নেতারা (রাইকভ্, টম্স্কি, বুখারিন), আর ছিলেন কয়েকজন খুব উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী, মার্শাল টুখাচেভ্স্কি এ'দের মধ্যে প্রধান।

এইসব মামলা ও বিচার, এবং যে-সব ঘটনার ফলে এদের উৎপত্তি হল, এ নিয়ে কোনো স্থির মতামত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে কঠিন; কারণ এর ভেতরকার তথ্য যেমন জটিল তেমনই অস্পষ্ট। তবু এটা নিঃসংশয়েই বলতে পারি, তখন এই মামলা নিয়ে পৃথিবীতে বহু লোক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার যাঁরা অকৃত্রিম সুহৃৎ তাঁরাও অনেকে ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্বন্ধে যাঁদের মন বিরূপ, তাঁদের সেই বিরূপতা তো স্বভাবতই বেড়ে গেল। সে সময়কার ঘটনাবলী যাঁরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করছিলেন তাঁদের মত হচ্ছে, স্টালিনের শাসন অবসান করবার জন্যে সত্যই একটি বৃহৎ ষড়যন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছিল। এবং বিচার যেগুলো হয়েছে, অকারণে হয় নি। একথাও ঠিক, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে জনসাধারণের কোনো-রকম সমর্থন ছিল না, এবং এর ফলে জনসাধারণ বরং স্টালিনের বিরোধী-পক্ষেরই প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। কিন্তু তাহলেও এত বড়ো একটা ব্যাপক চণ্ডনীতি—এর দ্বারা, রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও গলদ আছে এই কথাই প্রমাণ হয়। হয়তো এর আঘাত বহু নিরপরাধ ব্যক্তির উপরেও পড়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার যে মর্যাদা গড়ে উঠেছিল, এর ফলে সেটা কিছু ক্ষুন্ন হল।

অর্থ-সংকটের অবসান

১৯৩০ সনে ব্যবসাবাণিজ্যে বিরাট মন্দা শুরু হয়েছিল; বহু বছর ধরে তার ধাক্কায় সমস্ত ধনিকতন্ত্রী দেশই পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে রইল। কিন্তু অবশেষে তারও কিছু সুরাহার লক্ষণ দেখা দিল। অনেক দেশই সংকটের চাপ খানিকটা কাটিয়ে উঠল; কিন্তু ব্রিটেনে এটা যত সহজ ও দ্রুত হল তেমন আর কোথাও নয়। তার কারণও ছিল। ব্রিটেন পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করেছে, আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়েছে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র যত পণ্য বেচার বাজার আর কাঁচামাল যোগানোর সঙ্গতি আছে, তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। এই সুযোগ সকলের ছিল না। বিদেশী মালের উপরে আমদানি শুল্ক বসাল ব্রিটেন, আর দেশী কারখানাকে অর্থসাহায্য দেবার ব্যবস্থা করল, কৃষিব্যবস্থার সংস্কার সাধন করল, কারখানা-মালিকদের মধ্যে এমন সংগঠন গড়ে তুলল যেন তাদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষির মাত্রা কমে যায়। এর ফলে তার দেশের বাজার আবার তেজী হয়ে উঠল। কোন্ মাল কে কতখানি তৈরি করবে তার একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, এবং উৎপন্ন মালের মূল্যে-বণ্টনে কে কতখানি ভাগ পাবে তার একটা ব্যাপক ব্যবস্থা খাড়া করবারও চেষ্টা করল সে। তাছাড়া ডেনমার্ক এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া-অঞ্চলের দেশগুলির উপরেও চাপ দিতে লাগল যেন তারা ব্রিটেনজাত পণ্য বেশি করে কেনে।

এর ফলে বাণিজ্যমন্দার যেটুকু সুরাহা হল তার পরিমাণ কম নয়; কিন্তু এর ফলে তার বহির্বাণিজ্য অনেক কমে গেল। কাজেই, এই সংকট-মুক্তি হল আপেক্ষিক এবং আংশিক মাত্র, কারণ বাণিজ্যসংকটের সত্যকার সমাধান হয় তখনই যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আবার আগের মতো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একথাও মনে রাখতে হবে, আমেরিকার কাছে ব্রিটেনের প্রচুর ঋণ, কিন্তু সে-ঋণ সে শোধ করে নি, করবার ইচ্ছেও নেই তার। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য যেটুকু আবার বেড়ে উঠেছে পৃথিবীতে, তার খানিকটা কারণ হচ্ছে বহু দেশের দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বাড়িয়ে নেবার আয়োজন ও চেষ্টা। অস্ত্রশস্ত্র বেশি বিক্রী হবার ফলে উৎপাদন ও বাণিজ্য বাড়তে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ের এরকম শ্রীবৃদ্ধির ফল মারাত্মক, এর স্থায়িত্বও কিছু নেই। ব্রিটেনে বিপুল-পরিমাণ শ্রমিক আজও পর্যন্ত বেকার রয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

অর্থসংকট থেকে ইংলণ্ড এখনকার মতো পরিত্রাণ পেয়েছে, কিন্তু তার সাধের সাম্রাজ্যটির প্রায় নাভিশ্বাসের অবস্থা। সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরাচ্ছে যে-সব রাজনৈতিক আর অর্থ-নৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টা, তাদের শক্তি দিনদিনই বেড়ে চলেছে। ইংলণ্ড নিজেও আর তাকে তেমন

বিশ্বাস করতে পারছে না। যে-সাম্রাজ্য যে আর বেশিকাল টিকবে এমন ভরসা তার নেই। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বহু আভ্যন্তরিক সমস্যা জমে উঠেছে, তার সমাধান ইংলণ্ড করতে পারছে না। ভারতবর্ষ 'স্বাধীনতা চাই' বলে দৃঢ় পণ করেছে, তার শক্তিও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষুদে দেশ প্যালেস্টাইন, সে-ও ইংলণ্ডের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। ধনিকতন্ত্রী ব্যবসায়ের বাজারে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা। রাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে এতদিন যে প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য ছিল, এখন আমেরিকা সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। ব্রিটিশ সরকার যত বেশি করে ফ্যাসিস্ট শক্তিদের দিকে চলে যাচ্ছেন, আমেরিকাও ততই তাকে ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া অব্যাহতগতিতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করে চলেছে; সেটা সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তু। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলো এখনও ধন-সম্পদে পূর্ণ, লোভনীয় বস্তু—জর্মানি আর ইতালি লুব্ধ দৃষ্টিতে এদের দিকে চেয়ে আছে। মিউনিকে ইংলণ্ড তাদের ধমকানি অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে এসেছে; অতএব এখন তারা ইংলণ্ডকে প্রায় একটা দ্বিতীয়-শ্রেণীর শক্তি বলেই গণ্য করছে, তার সঙ্গে রীতিমতো হুকুমের সুরে কথা কইছে। এখনও যদি ইংলণ্ড গণতন্ত্রকে প্রসারিত করত, যৌথ নিরাপত্তার নীতিটা ঠিকমতো অনুসরণ করত, তবে আবার তার শক্তিসংহতি বাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু তা সে করছে না, সে-সব কল্পনা ছেড়ে দিয়ে সে প্রাণপণে হিটলারেরই স্তুতিগান করছে। অতএব তার সাম্রাজ্য-নীতির মধ্যেও আর কোনো সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নেই, মিউনিক-চুক্তির মধ্যে যে অসংখ্য অসঙ্গতি ছিল, তার ধাক্কাতেই এখন তার সাম্রাজ্য বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে।

উপনিবেশসমূহ

জর্মানি উপনিবেশ চাই বলে রব তুলেছে; সে নাকি নিঃস্ব এবং 'অতৃপ্ত' দেশ। কিন্তু তাই যদি হয়, যে-সব ছোটো ছোটো দেশের মোটেই উপনিবেশ নেই, তাদের অবস্থাটা কি? আর সত্যিকার 'নিঃস্ব' যারা—উপনিবেশের বাসিন্দারা—তাদের কথাই বা কে বলছে? আসলে এই সমস্ত যুক্তিতর্কেরই মূল কথাটা হচ্ছে, এরা সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে। নইলে, একটা দেশ তৃপ্ত থাকবে কী অতৃপ্ত থাকবে, সেটা নির্ভর করে তার নিজের মধ্যে কী রকম অর্থনৈতিক নীতি সে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার ওপরে। সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেশে দেশে ধনসম্পদ আর প্রতিপত্তিতে ছোটো-বড়োর তফাৎ থাকবেই, অতএব অতৃপ্তিরও কিছুতেই অবসান হবে না। বিপ্লবের আগে রাশিয়া ছিল জারের সাম্রাজ্য, লোকে বলত সেটা 'অতৃপ্ত' রাজ্য, তাই তার এলাকা আরও বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। এখনকার দিনের সোভিয়েট রাশিয়ার আয়তন তার চেয়ে অনেক কম, তবুও তার মনে 'অতৃপ্তি' নেই; কারণ সে সাম্রাজ্য স্থাপনের কামনা রাখে না। তার আর্থিক নীতিটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

জর্মানির উপনিবেশ দরকার, কারণ তা না হলে তার কাঁচামালের সংস্থান হচ্ছে না,—একথাও মোটেই সত্য নয়। খোলা বাজার পড়ে আছে, কাঁচামাল তো কিনেই নিতে পারে। আসল কথাটা হচ্ছে, উপনিবেশ যদি থাকে, তবে সেখানকার মানুষদের শোষণ করে নিজের কিছু লাভ করে নিতে পারবে সে। জর্মানির টাকার দর কমে গেছে, মার্ক এখন প্রায় 'অচল' টাকা। জর্মানির মনের কথাটা হচ্ছে, উপনিবেশ যদি পায়, তখন সেখানকার লোকদের ঘাড়ে এই অচল টাকা চালিয়ে সে কাঁচামাল কিনবে, তারপর আবার জর্মানির শিল্পজাত পণ্য কিনতে তাদের বাধ্য করবে।

গত পাঁচ বছরে যে-সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে, এবং তার যে-সব ফলাফল দেখা গিয়েছে, তার কিছু কিছু কাহিনী তোমাকে বললাম। ঠিক কোনখানটিতে এসে গল্প শেষ করব বুঝতে পারছি না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে অশান্তি, পরিবর্তন আর সংঘাত; কোনো একটি স্থান বা দেশকে নমুনা ধরে নিয়ে সমস্ত বিশ্বের সমস্যাগুলোর ব্যাখ্যা করা বা সমাধান নির্দেশ করা এখন প্রায় অসম্ভব। সমাধান যদি করতেই হয়, করতে হবে গোটা পৃথিবীকেই নিয়ে। সে পৃথিবীও এখন ক্রমেই এগিয়ে চলছে আরও অবনতির দিকে। যুদ্ধ আর হিংসাবৃত্তিরই

এখানে রাজত্ব। ইউরোপ ছিল প্রগতির পথে বর্তমান জগতের পথ-প্রদর্শক, সে আজ চাকা-ভাঙা গাড়ি হাঁকিয়ে ফিরে চলেছে বর্বরতার যুগে। এতদিন যে-শ্রেণীগুলো তার সমাজ শাসন করে এসেছে তারা এখন জরাজীর্ণ অথর্ব, চতুর্দিক থেকে সমস্যা আর বিপত্তির জাল তাদের ঘিরে ফেলেছে, সে জাল ছিন্ন করবার শক্তি তাদের একেবারেই নেই।

পৃথিবীর ভারসাম্য এমনিতেই চঞ্চল ছিল, মিউনিক-চুক্তির ধাক্কায় সে একেবারে উল্টে পড়ে গেল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ক্রমে ক্রমে নাৎসীদের কুক্ষিগত হয়ে যেতে লাগল; প্রত্যেক দেশেই নাৎসীদের ব্যাপক চক্রান্ত চলতে লাগল। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যান্ড, নেদারল্যান্ড্‌স্‌, বেলজিয়াম এবং লুক্‌সেমবুর্গ—উত্তর-ইউরোপের এই ক্ষুদ্র দেশগুলিকে একত্রে বলা হয় অস্‌লো-গ্রুপ; এরা দেখল ব্রিটেন তাদের মিত্র কিন্তু তার সে মৈত্রীর মূল্য এখন আর কিছুমাত্র নেই। অতএব এরা বলে দিল, আমরা নিরপেক্ষ, যৌথ-নিরাপত্তা বিধানের কোনো ব্যাপারের মধ্যেই যেতে আমরা রাজি নই। দূর-প্রাচ্য অঞ্চলে জাপানের উগ্রনীতি আরও বেড়ে উঠল—ক্যান্টন দখল করে নিল সে, হংকং নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গেও তার ঠোকাঠুকি বেধে গেল। প্যালেস্টাইনে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের মনোমালিন্যও অত্যন্ত বেড়ে গেল। চেম্বারলেন ফ্যাসিস্ট শক্তিদের তোয়াজ করে ফিরছিলেন, ওদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নাৎসীদের উদ্দেশ্য এবং রীতিনীতির তীব্র সমালোচনা করছিলেন। ইউরোপের নিত্য-নৈমিত্তিক ঝগড়াঝাঁটি, আর ফ্যাসিস্টদের উগ্রনীতির প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভয়-ভক্তির বহর দেখে আমেরিকা বিরক্ত হয়ে এদের কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়াল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসজ্জা শুরু করে দিল। সোভিয়েট ইউনিয়নও তাই করছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশদের সঙ্গে মৈত্রী ও অনাক্রমণ-চুক্তি স্থাপনের নীতি সে গ্রহণ করেছিল, সে-নীতি বিফল হয়েছে; এখন হয়তো তাকে বাধ্য হয়েই একা দাঁড়াতে হবে। অথচ আমেরিকা আর রাশিয়া, দুজনেই জানে, এখনকার এই ভয়ত্রস্ত পৃথিবীতে একা দাঁড়ানো বা নিরপেক্ষ থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়; যুদ্ধ যদি বাধে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার আবর্তে জড়িয়ে পড়তে তাদের হবেই। অতএব সেই দিনের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

আমেরিকা

আমেরিকায় আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে যে নীতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গ্রহণ করেছেন, তাকে বহু বাধাবিঘ্ন পার হতে হয়েছে; সুপ্রীম কোর্ট এবং দেশের প্রগতি-বিরোধী দলরা বহুবার তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন। সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসে রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাতন্ত্রী-দলের শক্তি কিছু বেড়েছে। কিন্তু তবু এখনও ব্যক্তিহিসাবে রুজভেল্টের জনপ্রিয়তা অসাধারণ, আমেরিকার জনমনের উপরে তার প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আরও একটি সুন্দর নীতি রুজভেল্ট অনুসরণ করেছেন। সে হচ্ছে, দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। মেক্সিকোতে সরকার এবং আমেরিকান ও ব্রিটিশ তেল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। মেক্সিকোতে একটি ব্যাপক বিপ্লব হয়ে গেছে, তার ফলে জমির ওপরে জনগণের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মপ্রতিষ্ঠানদের, এবং তেলের খনি ও জমিতে যাদের স্বার্থ ন্যস্ত ছিল, তাদের বহু বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার এর ফলে লুপ্ত হয়ে গেল; সুতরাং এরা এই পরিবর্তনকে বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

সমস্ত জগৎ জুড়ে রেষারেষি আর হানাহানি, তার মাঝখানে তুরস্ক দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব শান্তির দেশ—তার শত্রু কেউ নেই। গ্রীস ও বলকান-দেশদের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে তার বিরোধ ছিল, বিরোধ সে মিটিয়ে ফেলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ব্রিটেনের সঙ্গে তার

সম্পর্ক, সৌহৃদ্যের সম্পর্ক। আলেকজান্দ্রেতা নিয়ে (তোমার মনে আছে বোধ হয়, সিরিয়াকে ফ্র্যান্সের রক্ষাধীন অঞ্চল করে দেওয়া হয়েছিল। ফ্রান্স সিরিয়াকে ভাগ করে পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্য তৈরি করেছে। আলেকজান্দ্রেতা তারই মধ্যে একটি) ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের একটা বিবাদ বেধে ।। আলেকজান্দ্রেতার বাসিন্দাদের বেশির ভাগই হচ্ছে তুর্কি। ফ্রান্স শেষপর্যন্ত তুরস্কের কথা মেনে নিয়েছে, আলেকজান্দ্রেতাকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

কামাল আতাতুর্কের বিচক্ষণ শাসনে পরিচালিত তুরস্ক এই ভাবে তার জাতিগত বৈষম্য ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে যত সমস্যা ছিল তার অতি সুন্দর সমাধান করে ফেলেছে; এখন সে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানে ব্রতী হয়েছে। দেশের লোকদের যে কল্যাণ আতাতুর্ক সাধন করেছেন তার তুলনা নেই। ১৯৩৮ সনের ১০ই নভেম্বর তিনি মারা গিয়েছেন; দেশের সেবার যে ব্রত তিনি নিয়েছিলেন সে ব্রত নিঃসংশয়ে সফল হল এটা তিনি নিজেই দেখে গেছেন—এই সৌভাগ্য সকলের হয় না। আতাতুর্কের পরে তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন তাঁরই পুরোনো সহকর্মী, জেনারেল ইস্‌মেৎ ইনোনু।

ইসলাম

মধ্য-প্রাচ্যে ইসলামের অদম্য প্রাণশক্তিকে কামাল আতাতুর্ক একটা নূতন ভাবধারায় উদ্দীপিত করে গেলেন। তাঁর শিক্ষায় তুরস্ক নূতন রূপ পরিগ্রহ করল, মধ্যযুগীয় রীতিনীতি কুসংস্কার সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আধুনিক জগতের অগ্রণী দেশদেরই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়ে গেল। মধ্যযুগের প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্রই আতাতুর্কের এই দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল, এখন মধ্য-প্রাচ্যের সর্বত্র বহু প্রগতিপন্থী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে; এরা ধর্মমতের চেয়ে জাতীয়তাবোধকেই বড়ো করে দেখছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অবশ্য এর প্রভাব এখনও তেমন ব্যাপ্ত হয় নি। তার কারণ, এখানকার মুসলমানরা অন্যান্য অধিবাসীর সঙ্গে এখনও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর অধীন।

বিশ্ব-সংকটের স্বরূপ

পৃথিবী জুড়ে যে সংঘাত এই যুগে চলেছে, তার দুটি বৃহৎ ক্ষেত্র হচ্ছে ইউরোপ আর প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চল। এই দুই স্থানেই ফ্যাসিবাদ উগ্রমূর্তি ধারণ করে জেগে উঠেছে, গণতন্ত্র আর জনস্বাধীনতাকে ভেঙে চূর্ণ করে দেওয়া, সমগ্র পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই তার লক্ষ্য। ফ্যাসিস্টদেরও একটা আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে উঠেছে পৃথিবীতে; এরা যুদ্ধ ঘোষণা না করেও খোলাখুলি সর্বত্র যুদ্ধ চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই এদের চক্রান্ত-জাল ছড়িয়ে পড়েছে—এই সব দেশেই এরা চেষ্টা করে করে হাঙ্গামা আর অশান্তি বাড়িয়ে তুলছে, যেন সেই অশান্তি দমনের ছল করে সে-দেশের ওপরে গিয়ে হানাহানি চালাবার একটা সুযোগ মেলে। যুদ্ধ আর হানাহানিকে এরা পরম গৌরবের বস্তু বলে স্পষ্টই ঘোষণা করছে; আর এমন মিথ্যা ও বৃহৎ প্রচারকার্য চালাচ্ছে, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও মিলবে না। এদের মুখের ধুয়ো হচ্ছে কমিউনিজম্‌কে বাধা দেওয়া; আসলে এই বুলির পিছনে আত্ম-গোপন করে এরা চাইছে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিতে। বস্তুত আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা কোনোখানেই উগ্রপন্থা অবলম্বন করে নি, বহু বছর ধরে তারা বরং শান্তি আর গণতন্ত্রেরই ধ্বজা ধারণ করে রয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নাৎসীরা বহুবার বহু ষড়যন্ত্র খাড়া করেছে, এর অনেকগুলোর বিচারও হয়ে গেছে। ১৯৩৭ সনে ফ্রান্সে এদের একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে, তার মতলব ছিল ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে ভেঙে ফেলা। এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা ছিল ক্যাগুলার্ড বা 'টুপিওয়ালার' দল—জর্মানি ও ইতালি থেকে এদের অস্ত্রশস্ত্রের যোগান আসছিল। এরা বহুস্থানে বোমা ফেলেছে, বহু মানুষ হত্যা করেছে। ইংলণ্ডে কতকগুলো খুব প্রতিপত্তিশালী

যা আছে যারা ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তাকে ক্রমেই ফ্যাসিস্টপন্থী করে তুলছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ফ্যাসিস্টরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের একেবারে উগ্রতম পূজারী। শুধু তাই নয়, মধ্য যুগের মতোই এরা দেশে দেশে ধর্মগত ও জাতিগত বিদ্বেষ আর হিংসা সৃষ্টি করছে। জর্মনিতে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট, দুই সম্প্রদায়কেই সমানে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে। জর্মনিতে আর্যত্বের নামে জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে, সম্প্রতি ইতালিও এই ধুয়ো ধরেছে। ইহুদিদের উপরে, এমনকি যাদের বংশে কিছুমাত্র ইহুদি রক্তের সংস্রব আছে তাদেরও উপরে ধীর স্থির ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হচ্ছে; জগতের ইতিহাসে কোথাও এই উৎপীড়ন-কৌশলের তুলনা মিলবে না। ১৯৩৮ সনে নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে প্যারিস শহরে জর্মনির এক রাজনীতিবিদ নিহত হন। তাঁকে খুন করে একটি পোল্যান্ডবাসী ইহুদি যুবা; ইহুদি জাতির উপরে যে নৃশংস উৎপীড়ন জর্মনিতে চলছে, তারই আক্রোশে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এটা নেহাৎই একটি ব্যক্তির নিজস্ব-কৃত ব্যাপার। অথচ এরই অপরাধে জর্মনিতে সমগ্র ইহুদি অধিবাসীর উপরে অবিলম্বে উৎপীড়ন শুরু হয়ে গেল; সে উৎপীড়ন অতি সুসংবদ্ধ, স্বয়ং জর্মন-সরকার তার উদ্যোক্তা। দেশের যেখানে ইহুদিদের যত ধর্মমন্দির ছিল, তার প্রত্যেকটিকে পুড়িয়ে ছাই করা হল, ইহুদিদের দোকানপাট যত ছিল সব ভেঙেচুরে লুঠপাট করে নেওয়া হল; রাস্তাঘাটে, এমনকি বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে অসংখ্য ইহুদি পুরুষ ও নারীর উপরে নির্মম আক্রমণ চলল। নাৎসী-নেতারা এই সমস্ত ব্যাপারকেই উচিত-কাজ বলে সাফাই দিলেন; এই অত্যাচারের পরও আবার নাৎসী-সরকার হাঙ্গামার অপরাধে জর্মনির ইহুদিদের কাছ থেকে আট কোটি পাউন্ড জরিমানা আদায় করে ছাড়লেন।

অত্যাচারের পীড়নে কত মানুষ আত্মহত্যা করছে, ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে—নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে চলেছে শোকদীর্ণ সহায়হীন গৃহহীন হতভাগ্যের দল, যুগ যুগ সঞ্চিত দুঃখের বেদনায় এরা মূহ্যমান, পৃথিবীর পথ ধরে অন্তহীন যাত্রা এদের—কোন্ দিকে? কোথায় যাবে এরা, কোথায় গিয়ে পাবে নিশ্চিন্ত আশ্রয়? সমগ্র পৃথিবী আজ ভরে গেছে উদ্বাস্তু পলাতকের ভিড়ে—ইহুদি, সুদেতেনল্যান্ড থেকে বিতাড়িত জর্মন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ফ্রাঙ্কোর অধিকৃত এলাকা থেকে পলাতক স্পেনের চাষিগৃহস্থ, চীনবাসী, আবিসিনিয়া-বাসী—সকলেই আজ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। নাৎসীবাদ আর ফ্যাসিবাদের এই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ফল। এদের দুর্গতি দেখে সমস্ত পৃথিবী ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠছে; এই পলাতকদের দুঃখমোচনের জন্য দেশে দেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। অথচ এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তথাকথিত গণতন্ত্রী দেশ ইংলন্ড আর ফ্রান্স যে নীতি অবলম্বন করে আছে সে হচ্ছে এই নাৎসী জর্মনি আর ফ্যাসিস্ট ইতালির সঙ্গে বন্ধুত্ব আর সহযোগিতার নীতি। ফ্যাসিস্টরা মানুষের উপরে উৎপীড়ন আর আতঙ্কের ঝড় চালাচ্ছে, সভ্যতা ও শালীনতাকে ভেঙে লুপ্ত করে দিচ্ছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিণত করছে উদ্বাস্তু পলাতকে—এদের আজ গৃহ নেই আশ্রয় নেই, পৃথিবীর বুকে এখন এতটুকু ঠাঁই নেই যাকে এরা আজ নিজের দেশ বলে মনে করতে পারে। ফ্যাসিস্টদের এই মহাব্রতে তাদের সহায়তা করছে ইংলন্ড আর ফ্রান্স—গণতন্ত্রের জন্মভূমি, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলন্ড আর ফ্রান্স! গান্ধীজির ভাষায় বলতে হয়, ফ্যাসিস্টদের যা লক্ষ্য তার স্বরূপ যদি এই হয়, তবে "জর্মনির সঙ্গে মৈত্রীর কথা উঠতেই পারে না। একটা জাতি নিজেকে বলছে ন্যায় ও গণতন্ত্রের উপাসক, আর একটা জাতি এই দুয়েরই শত্রু বলে নিজেকে স্পষ্টভাষায় জাহির করছে—এই দুই জাতির মধ্যে মৈত্রী হয় কী করে? অথবা কি বুঝব, ইংলন্ড এখন শস্ত্রব্রতী একনায়কত্বকেই তার আদর্শ বলে মেনে নিচ্ছে, গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে তার দিকেই ক্রমে এগিয়ে চলেছে?"

ইংলন্ড আর ফ্রান্স, এরাই যদি ফ্যাসিস্ট শক্তিদের পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়াল, তাদের সমস্ত কার্যকলাপের সাফাই গাইতে লাগল, তবে আর ছোটো রাষ্ট্রদের কি অপরাধ! মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণরূপেই ফ্যাসিস্ট-চক্রের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের এই

আচরণে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বস্তুত এদের স্বাধীন সত্তা বলেও কিছু আর অবশিষ্ট নেই, এরা এখন অতি দ্রুত বেগে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ফ্যাসিস্টদের অধীন দাস-রাজ্যে। এদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নাৎসী জর্মানির ইঙ্গিতে। প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার পাল্লায় জর্মানি এখন ইতালিকেও হারিয়ে দিয়েছে; ইতালি এখন ফ্যাসিস্টদের এই যৌথ-সংঘের একজন ছোটো-অংশীদার মাত্র। জর্মানি আর ইতালি, দুজনেই উপনিবেশ চাই বলে রব তুলেছে; কিন্তু আসলে জর্মানি স্বপ্ন দেখছে পূর্বদিকে রাজ্য-বিস্তারের—ইউক্রেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে পর্যন্ত সে গ্রাস করতে চায়। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সও খুব সম্ভবত তার এই লোভেরই আগুনে ইন্ধন যোগাবে; এর দ্বারা হয়তো তাদের নিজেদের অধিকৃত স্থানগুলি ফ্যাসিস্টদের গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারে, এই আশায়। কিন্তু সে আশা একেবারেই মিছে।

এই পঙ্কিল আবর্তের মাঝখানে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুটি প্রকাণ্ড দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। আজিকার জগতে এরা দুটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ। বিপুল এদের দেশ-বিস্তার, জীবনযাত্রার উপকরণের দিক দিয়ে এরা প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ; সমর-শক্তির দিক থেকেও প্রায় অপরাজেয়। দুজনেই এরা ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদের বিরোধী—যদিও বিরোধের যুক্তি দুয়ের এক নয়। ইউরোপে সোভিয়েট রাশিয়াই আছে এখন ফ্যাসিজমের পথে একমাত্র বাধা; সে যদি বিনষ্ট হয় তবে ইউরোপে গণতন্ত্রেরও অবসান হয়ে যাবে—ফ্রান্স আর ইংলণ্ডেও সেদিন গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ইউরোপ থেকে বহু দূরে, ইউরোপের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসা তার পক্ষে সহজ নয়, আসবার ইচ্ছেও নেই তার। কিন্তু তবু যদি ইউরোপ বা প্রশান্ত-মহাসাগর অঞ্চলের গোলযোগে তাকে হস্তক্ষেপ কোনোদিন করতে হয়, সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড শক্তির খেলা কিছু দেখা যাবে—সে যে পক্ষে যাবে তার জয় হবেই।

ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্য-অঞ্চলে যেসব গণতন্ত্রী দলরা নূতন জেগে উঠছে, এরাও গণ-স্বাধীনতার পক্ষে। তাছাড়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির মধ্যেও কয়েকটিই আছে ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিবাদী। গণতন্ত্র আর গণ-স্বাধীনতার মাথার উপরে আজ প্রচণ্ড বিপদ ঘনিয়ে আসছে; সবচেয়ে বড়ো বিপদ, তার নিজের তথাকথিত মিত্ররাই পিছন থেকে তার পিঠে ছুরি বসাচ্ছে। কিন্তু তবুও হতাশার কারণ নেই। গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠার খাঁটি রূপটি কী, তার চমৎকার এবং উদ্দীপনাময় দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি স্পেনে আর চীনে। এই দুটি দেশেই যুদ্ধ তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে, তবু সেই ভয়ঙ্কর দুর্দশার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে একটি নূতন জাতির, জাতীয় জীবনের ও কর্মপ্রচেষ্টার বহু ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে নূতন প্রাণের স্পন্দন।

কিন্তু তবুও সংশয় জাগে। ১৯৩৫ সনে আবিসিনিয়া আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৩৬ সনে হল স্পেনে বিদ্রোহ। ১৯৩৭ সনে চীনের ওপরে জাপান নূতন করে অভিযান করেছে। ১৯৩৮ সনে নাৎসী জর্মানি অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেছে, পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তার নাম লুপ্ত করে দিয়েছে; চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে অধীনরাষ্ট্রে পরিণত করেছে। প্রত্যেকটি বছর অঞ্জলি ভরে নিয়ে আসছে দুঃসংবাদ আর দুর্দৈবের ডালি। ১৯৩৯ সনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম আমরা—এবার কি হবে? আগ্রহে আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করে আছি—আমাদের জন্যে, জগতের জন্যে, কি উপহার বয়ে নিয়ে আসবে এই নূতন বৎসরটি—আশার বাণী, না নিরাশার অভিশাপ?